৪২৪।৬

বঙ্গলক্ষ্মী

ষষ্ঠ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৩৭—কার্ত্তিক ১৩৩৮

বঙ্গলক্ষ্মী

সম্পাদিকা

শ্রীহেমলতা দেবী

৬ষ্ঠ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ হইতে কার্ত্তিক ১৩৩৮

বঙ্গলক্ষ্মী

—১৩৩৭ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩৮ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত—

অ

অমৃতরূপম্ (কবিতা)—শ্রী সেবক ৯৪

অতীত ও বর্ত্তমান—শ্রী শৈলজা সেনগুপ্তা ২৬৩

অ-বিচার (কবিতা)—শ্রী সেবক ১৮৬

অষ্টপদী (কবিতা)—শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার ২৯১

অসমাপ্ত মিলনের (কবিতা)—শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ৩৩৩

অন্তর্দৃষ্টি (গল্প)—শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি ৪৬৭

অন্যায় যে করে (কবিতা)—শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ৫৪৫

অজানার ডাক (একাঙ্ক নাটিকা)—শ্রী জ্যোতিপ্রসন্ন সেন, বি-এ ৯১৬

আ

আমাদের সাহিত্যসাধনা—মৌলবী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম-এ ১৬

আরতি (কবিতা)—শ্রী বিশ্বেশ্বর দাস ৪৩

আসন (গল্প)—শ্রী দীপ্তি দেবী ৪৭

আনন্দ-সঙ্গীত (কবিতা)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ১৫২

আমাদের মহিলা কর্ম্মী ২২৯

আধুনিক আইরিশ বা গেলিক সাহিত্য—শ্রী শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ ৩৪৩

আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সম্মেলন—শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি ৪২৭

আহরণ— ৪৬২, ৮৯০, ৯৮৯

আল্পনার ছন্দ—শ্রী সুধাংশুকুমার রায় ৫৩৪

আত্মার আশ্রয় (গল্প)—শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী ৫৭১

আদর্শ নারী—শ্রী সুখলতা রাও, বি-এ ৫৮৯

আবাহন (গীতিকা)— ৭৬৫

আধুনিক ভারতে নৃত্যকলার পরিণতি—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস [illegible]

ই

ইংলণ্ড (কবিতা)—শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস

ইউরোপে একশো দিন—ডাঃ শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৪৫

উ

উপন্যাস পাঠের অপকারিতা—শ্রী অসিতনাথ রায় চৌধুরী ৩৮৫

এ

এ পিঠ ও ও-পিঠ (গল্প)—রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর ১০৮

এগিয়ে চল (কবিতা)—শ্রী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ২৭৫

এক কোঁটা অশ্রু (গল্প)—শ্রী কুমুদ ভট্টাচার্য্য ৩৩৯

একাকীয়া (কবিতা)—জসীম উদ্দীন ৭২৪

এডগার ওয়ালেস্—শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর ৯৬৫

ক

কুড়ানো চিঠি (গল্প)—শ্রী উষারাণী দেবী ৯৫

কেন্দ্র সমিতির কথা— ১৫৭, ২৩৯, ৩০৯, ৩৯৯, ৪৭৯, ৫৯৪, ৬৮১, ৭৬২, ৮৩৯, ৯১৯, ৯৯৯

কন্যাদায় (গল্প)—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ ১৭৯

কবে হ'তে (কবিতা)—শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ১৯২

কণ্ঠস্বর (কবিতা)—শ্রী মমতা মিত্র ৪৫৬

কলঙ্কিনী (কবিতা)—শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৪০৮

কবি বিহারীলাল—শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়,
আই-সি-এস ৫২৬
কবির গান, ছড়া ও পাঁচালী—
শ্রী মনোমোহন নরসুন্দর, এম-এ ৭৭২
কানাডা (দেশ-পরিচয়)—শ্রী পুলিনবিহারী
সাহা ৮৩০
কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি—
শ্রী সরোজনাথ ঘোষ ৮৪৬
কথিত ভাষায় হাস্যরস—শ্রী সুধাংশুকুমার
হালদার, আই-সি-এস ৯৩২

খ

খোকা খুকীর পাতা (ক) হ'তেম যদি—
শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্ ৩৬
(খ) খেলা—শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৩৭
খেয়ালের ক্ষতি (গল্প)—শ্রী দীপ্তি দেবী, বি-এ, বি-টি ১৪৭

গ

গাছপালা—রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,
এম-এ,আই-এস-ও ৫৯
গৃহলক্ষ্মী (গল্প)—শ্রী দীপ্তি দেবী,
বি-এ, বি-টি ২২২
গ্রামের আল্পনা—শ্রী সুধাংশুকুমার রায় ৩২৪
গৌরমণির ছেলে (গল্প)—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ ৪১৫
গোরের উপর (কবিতা)—শ্রী মনোজ বসু ৬৪৮
গাঁয়ের মেয়ে (কবিতা)—শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়, বি-এ ৬৮১
গান—অধ্যাপক শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৬৯৮
গৌতম বুদ্ধ—শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু ৮৬৬

ঘ

ঘরে বাইরে— ২৮,১৩১,১৯৬,২৬৯,৩৬১,৪৩৬,
৫৫৬,৬৩০,৭১৮,৭৯৫,৮৮৩,৯৪২

চ

চণ্ডীদাস—মোহাম্মদ এনামুল হক, এম-এ ৮৮,২৫৬
চিরসাথী ও প্রথম দিনের দেখা (গান)—
শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ১৬৯
চীন মাতৃকা—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৩৯৩
চলার গান—শ্রী হেমলতা দেবী ৩৮৬
চেনা-অচেনা—শ্রী প্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭৫
চাষার ব্যথা (কবিতা)—শ্রী কালীপদ ঘটক ৪৩৭
চিতা-নির্ব্বাণ (কবিতা)—৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫২৫
চীনা রীতিনীতি—শ্রী বিমলেন্দু সরকার, বি-এ ৬৩৫
চিরন্তনী (কবিতা)—শ্রী কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত,
এম-এ,বি-এস-সি, এম্ বি ৮৮২

ছ

ছেলে ও মেয়ে (কবিতা)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত,
আই-সি-এস ৮২৯
ছবি (গল্প)—শ্রী বিমলাংশুপ্রকাশ রায়, বি-এ ৯৩৮

জ

জয়ী প্রেম (কবিতা)—শ্রী প্রথমনাথ কুণ্ডার ৭৪
জেনেভা যাত্রী বঙ্গনারীর পত্র
শ্রী সুকুমারী রায় চৌধুরী ১৮৪,৫৪৯
জাগৃতি—শ্রী ইলা দেবী ৩২৭
জাগরণী (গীতিকা)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত,
আই-সি-এস্ ৬০৫
জোষিদা টৌরাজিরো—শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু ৭১৪
জলে-স্থলে (কবিতা)—
শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস ৯১০

ড

ডমরু (কবিতা)—শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার,
আই-সি-এস ৫৮১

ত

তখন আমার বয়স হইবে নয় কি দশের কাছে (কবিতা)—
শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস ৩৭৫
তপস্যা (গল্প)—শ্রী পরিমল গোস্বামী, এম-এ ৫৪০
তুমি কথা কও (কবিতা)—শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী,
বি-এ ৭১৪
তোমার উদ্যানে (কবিতা)—শ্রী বিশ্বেশ্বর দাস ৯১০
তৃতীয় পক্ষ (কবিতা)—শ্রী অনন্তকুমার সান্যাল ৮৮৫

দ

দেশের মানুষ — ১

দান্তে—৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৩

দোসর (উপন্যাস)—শ্রী সতীশ রায় — ৩৮,১২৭,১৯৩,২৭৯,৩৫৬,৪৬৩,৫৯৭

দেশের কাজে বাঙলার মেয়ে—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ — ৬৮

দহন-সাথী (কবিতা)—শ্রী যতীন্দ্র সেনগুপ্ত — ৪২৭

দেহাতীত (কবিতা)—শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার — ৬৬২

দ্বন্দ্ব –শ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৭২৩

দুঃখীর ভূগোল (কবিতা)—শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ — ৮২৯

ন

নিন্দক (কবিতা)—শ্রী সেবক — ৫০

নব্য মার্কিন সাহিত্যের পরিচয়—শ্রী সুধীরকুমার মিত্র, বি-এ — ৯৯

নানা কথা — ৫৯,৯৫২,২০৯,২৯৯,৩৮২,৪৫৭, ৫৭৮,৬০২,৭৪৩,৮২৬,৮৯৮

নারীত্বের নিকষ—শ্রী রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী — ১৩৭

নব জন্ম (কবিতা) — ১৬১

নারীর কাজ—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ — ২৪২

নক্ষত্রের সংখ্যা—শ্রী জগদানন্দ রায় — ১'৪

নির্ঝর (কবিতা)—অধ্যাপক শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল — ২৫৫

নারী (কবিতা)— শ্রী সুকুমার সরকার — ৩৬০

নদী-নালা—রায় বাহাদুর শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, আই-এস-ও — ৬২৮

নারীর নাগরিক দায়িত্ব—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ — ৬৩২

নারীত্বের আদর্শ—শ্রী শান্তিময়ী দত্ত — ৬৬৮

নারীর স্বাস্থ্য—ডাঃ শ্রী রমেশচন্দ্র রায়, এল্ এম এস্ — ৭৫', ৮১৭, ৯০১

নারী-শক্তি—শ্রী উষা মিত্র — ৯১৩

নারীর উক্তি (কবিতা)— শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ — ৯৩৯

প

পরিবারে নারীর স্থান—শ্রী সুধাময়ী দেবী, বি-এ — ৫৫

পথে পথে—শ্রী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী — ৬৯

পরিহাস (গল্প)—শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস — ৭৭

পৃথিবীর ডাক— — ৮৯

পথের ছবি (কবিতা)—শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস — ১৫২

প্রাচীন ভারতে নারীমর্য্যাদা—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ — ১৪০

পারুল বৌ (গল্প)—শ্রী দীপ্তি দেবী, বি-এ, বি টি — ২৮০

পরাণ-বন্ধু (কবিতা)—বন্দে আলী মিয়া — ৩০৫

পরবাসী (কবিতা)—শ্রী নিখিলেশ রাহা — ৩৪৫

পক্ষাশ্রয়ী শাবক (গল্প)—শ্রী উষারাণী দেবী — ৩৬৯

পারস্যের নারী—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ — ৩৯২

প্রাচীন পল্লীজীবন—শ্রী মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল — ৪২৩

পল্লী-সন্ধ্যা (কবিতা)—শ্রী যজ্ঞেশ্বর রায় — ৪৮৪

পথ-বাঁকে (কবিতা)—শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস — ৬৬৫

প্রার্থনা—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস — ৬৮৫

পল্লীসম্পদ—শ্রী মনোজমোহন বসু — ৭৫৩

পৌরুষ—শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু, সাহিত্যরত্ন, বি-এ — ৭৬৬

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মহিলা-কবি—স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী — ৭৭০

প্রেম নয় (গল্প)—শ্রী মনোজ বসু — ৭৮১

পতঙ্গের মৃত্যু (কবিতা)—শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭৮৭

প্রাচীন সাহিত্যে নারীর দুঃখ—শ্রী রমেশ বসু, এম্-এ — ৯২৩

পল্লীরাষ্ট্র—শ্রী বলাই দেবশর্ম্মা — ৯২৮

পূরবী (কবিতা)— শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় — ৯৪১

ব

বাংলার বীর সন্তান "রায়বেঁশে"—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস — ৪:৮

বীরভূমের শিক্ষার কথা— শ্রী গৌরীহর মিত্র, বি-এ — ৫৪৬

বাঁধন (কবিতা)—শ্রী বিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫৯০
বঙ্গসাহিত্যে দীনেশচরণ—শ্রী ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম্-এ ৬০৯
বিরহিণী (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৩১৯
বাণীর ডল (গল্প)—রেণু ৬০৩
বিদ্যাপতি-কাব্য নারীচরিত্র—শ্রী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ৬৮৬
ব্রহ্মবাদিনী মহিলা—পণ্ডিত শ্রী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ৩
বধূ-বরণ (গল্প)—শ্রী শান্তা দেবী, বি-এ ৫
বাংলার চিত্রকলা—শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ২৩
বিরহিণী প্রকৃতি (কবিতা)—শ্রী প্রকৃতি সিংহ ৮০
বাঙ্গালীর কন্যাশিক্ষা—শ্রী বলাই দেবশর্ম্মা ৮৫
বঙ্গ-সাহিত্য—শ্রী শিবরতন মিত্র ১৭৯,২৭৫,৪৫২,৭৩৫
ব্যারাম হয় কেন ?—ডাঃ শ্রী রমেশচন্দ্র রায় ১৯৯
বিহারীলাল ও নারী—শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস ২০৪,৩৪৫
বঙ্গলক্ষ্মীর কয়েকজন লেখিকা ২১৫
বিজয়িনী (গল্প)—শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু, বি-এ ২৪৮
বাংলার পল্লীসম্পদ—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ২৯৬
বিশ্বভারতীতে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ—শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ৬৭৩
ব্রতকথার আল্পনায় নানা বস্তুর 'ঠাট' ও তাহার অঙ্কনপদ্ধতি—শ্রী সুধাংশুকুমার রায় ৬৯১
বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৬৯৯
বাংলার যোদ্ধা—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ৭২৫
বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—শ্রী নীরজাবাসিনী সোম, বি-এ, বি-টি ৭৪০
বিধিলিপি (গল্প)—শ্রী কল্যাণী দেবী ৭৪৬
বাহিরের পথে (ভ্রমণকাহিনী)—শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী ৭৭৭,৮৮৭,৯৫০
বাসর (কথিকা)—শ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৯৩
ব্রত-কথার আল্পনায় নানা বস্তুর ঠাট ও তাহার ছড়া—শ্রী সুধাংশুকুমার রায় ৮৬১
বাঙালী মেয়েদের দেখাশুনা ও পড়াশুনা—শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ ৯৩৬
বালক অপরাধীর দল—শ্রী দীপ্তি দেবী, বি-এ, বি-টি ৯৪৪
বালুচরে (কবিতা)—শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৯ ৫
বিদ্রোহ (গল্প)—শ্রী অমিয়া দত্ত ৯৬৮

ভ

ভাস্করের প্রতীক্ষা—শ্রী শিবরতন মিত্র ১ ৫
ভোর বেলায়—শ্রী আশিষ গুপ্ত ১৩৩
ভাঙা মন্দির (কবিতা) শ্রী দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ ৩১৫
ভারত-গাথা—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ৩২১
ভূত-ভারতী (উপন্যাস)—শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ৪৪৫, ৫৫৭, ৬৫৭, ৮২১, ৮৯৫, ৯৫৭
ভাস্কর (কবিতা)—শ্রীপ্রভাস সেন, বি-এস-সি ৭১৭
ভুলের বেলা (কবিতা)—শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ৭৭৫
ভাদ্র (কবিতা)—শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস ৮০৬
ভাগ্যচক্র (গল্প)—শ্রী সীতা দেবী, বি-এ ৮৫৪
ভারতের সংস্কৃতিতে রসকলার স্থান—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ৮৭৫
ভিখারিণী মেয়ে (গল্প)—কুমারী অচলা মুখোপাধ্যায় ৯৮৭

ম

মাধুকরী (কবিতা)—শ্রী পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০
মা—ঘরে ও বাহিরে—শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ২০
মানুষ হয়েছে তাই যুগে যুগে নিজে ভগবান (কবিতা) শ্রী নরেন্দ্র দেব ১০৪
মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ—পণ্ডিত শ্রী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ১০৬
মায়ের বুক (কবিতা)—জসীম উদ্দীন ১১৫
মানস-আরতি (কবিতা)—শ্রী সেবক ২২৯
মানব মনের সিন্ধু-শিয়রে (কবিতা)—শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৬৮
মাণরের পথে—শ্রী সুবিমলচন্দ্র সরকার, বি-এস-সি ৩৫১

মা ও শিশু—মিসেস্ এন্. টার্নটন, এম-এ, এম-বি, সি-এইচ-বি ৩৭৩
মহিমা—শ্রী ভক্তি ৪৭৫
মাটির সাক্ষী (গল্প)—শ্রী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২১
মাতৃত্ববিদ্যা—শ্রীমতী রোডা মিলার ৬৪৭
মধ্যমণি (গল্প)—শ্রী সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯৯
মেয়েদের প্রতি—শ্রী অনুরূপা দেবী ৮০৫
মা নাই ? (কবিতা)—৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৮৪৫
'ম'কার মাহমা—শ্রী প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্ ৮৯১
মন্দির (কবিতা)—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী ৯১৮
মাটির ঢেলা (কবিতা)—শ্রী হেমলতা দেবী ৯৫৬

য

যাত্রা-পথে (কবিতা)—শ্রী হেমলতা দেবী ৮৬০

র

রাখী (কবিতা)—শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ৫
রাজপুতানার কয়েকদিন—শ্রী হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম-বি ১১১
রিক্ততা (কবিতা)—শ্রী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী ২৩৩
রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪০৫
রবীন্দ্র-জন্মোৎসব (কবিতা) শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ৫৫৫
'রায়বেঁশে'র অজ্ঞাতবাস—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ৫৬২
শ্রীরবীন্দ্র জয়ন্তী—শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস ৬১৫
রায়বেঁশের রাই-বেশ—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্ ৬৩৭
রায়বেঁশে রসকলা—শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্ ৭৯৭

ল

লেডী অবলা বসু—শ্রী হেমলতা সরকার ৪৭

শ

শিশুর মনস্তত্ত্ব—শ্রী মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল ২৩১
শিউড়ী মেলা—শ্রী ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, এম-এ ৩১৬
শিশু-খাদ্য—শ্রী ইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এল-এ-এম-এস ৪৩২
শিক্ষার ক্ষেত্র—কুমারী ডোরিন ইয়ং, বি-এস সি (লণ্ডন) ৫৯৪
শিল্পী ডাইক—শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর ৯১১

স

সাধুমার কথা—সাধুমা ২৩,২৩৩
সমিতির কথা— ২৩৬, ৩০৬, ৩৯৪, ৪৭৫, ৬০১, ৬৬২, ৭৫৬, ৮৩৭, ৯১৭, ৯৯৫
সোনার বাংলা (কবিতা)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ১২৫
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬২
সাহিত্যের মূল উৎস—শ্রী সরোজনাথ ঘোষ ১৯২
সরোজনলিনী (কবিতা)—শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস ২০৭
স্থাপত্য মহিলাদের অবলম্বনীয়—শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ২০৯
স্বরলিপি— ২১৮
সাধনা (গান)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ২৪১
সুলভ খাদ্য—ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ২৮৩
সুর ও স্বরলিপি—শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৭
সেকাল ও একাল—শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী ৩৯২
সুফী মতবাদের উদ্ভব—মোহাম্মদ এনামুল হক, এম-এ ৪০৭
সোনার প্রদীপ (গান)—শ্রী হেমলতা দেবী ৪১৪
সেদিনো ত (কবিতা)—শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ৪৩১
স্বরূপ (কবিতা) ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭১
স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মের দায়িত্ব—মৌলভী একরামদ্দীন ৫৮২
স্বরলিপি (রায়বেঁশের গান) শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস ও সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৩
স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কি—শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বি-এ ৬০৩

সারাদিন (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ৬৫২
সঙ্ঘমিত্রা (কবিতা)—শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭৩৯
সাঁওতালী সৃষ্টিরহস্য—শ্রী কালীপদ ঘটক ৭৮৭
স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ (আলোচনা;—শ্রী পরিমল গোস্বামী, এম-এ ৭৯১
সাহিত্য-সাধনা—শ্রী শিবরতন মিত্র ৮১০
সেকালের কথা—রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর ৮৫১
সান্ত্বনা (কবিতা)—শ্রী সেবক ৮৯৭
সম্পাদিকার জল্পনা ৯৬২
সোনার মেয়ে (কবিতা)—শ্রী কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় ৯৯১

হ

হাল ফ্যাসান—শ্রী দীপ্তি দেবী, বি-এ, বি-টি ৬৪৫, ৭২০, ৮০৭, ৯০৬

ক্ষ

ক্ষমা (গাথা) শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৭
ক্ষীর ও নীর ৬৬, ৩২৬, ৪৮৩, ৬৬৬, ৭৩৩, ৮৯৪, ৯৪৯

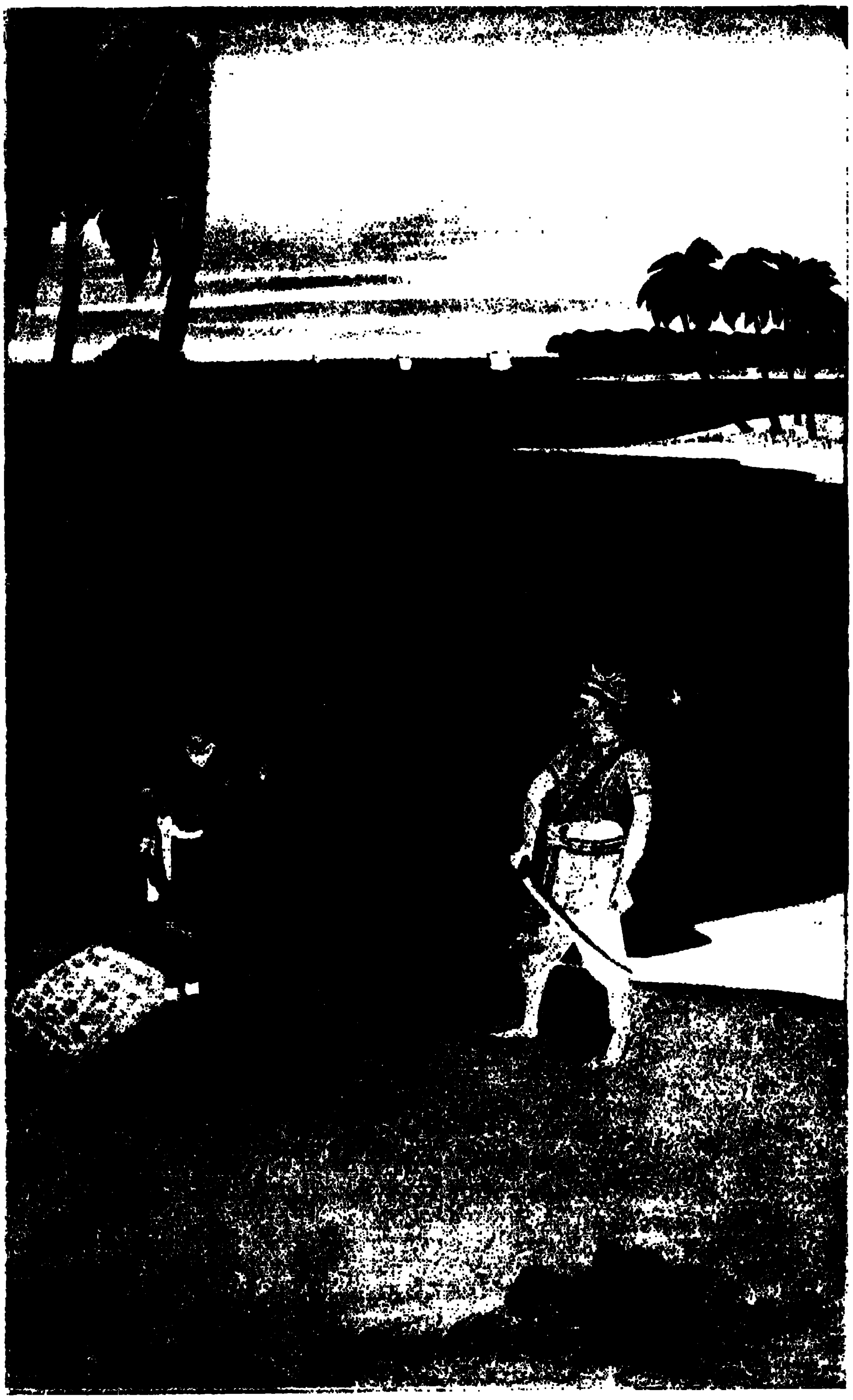

সিংহলে বিজয়সিংহ

বিজয়সিংহ সিংহলে শুধু
হেনেছে কৃপাণ;
বঙ্গ তাহার কাহার লাগি? —
মিলন কি সম্মান!

শিল্পী— শ্রী [illegible] কুমার গুপ্ত

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ [১ম সংখ্যা

দেশের মানুষ

দেশের মানুষ তোমরা দেশের আনন্দ,—
পৃথিবীর সঙ্গে পাতাও
নূতনতর সম্বন্ধ।
শুনে' লও খবর সবে
পৃথিবী নূতন হবে,
বেছে' লও আপন আসন
যেথায় তোমার পছন্দ।

মানুষ এত নির্ব্বোধ জীব নয়, যে, জেনে' বুঝে' নিজের অনিষ্ট ঘটাবে। ইষ্টই সে চায়, সাধারণতঃ না-জানা না-বোঝা বশতঃই সে ইষ্টের বদলে অনিষ্ট ঘটিয়ে বসে। অজ্ঞ মা ছেলেকে মাছের মুড়া ও একবাটী পাঁঠার মাংস খাইয়ে ভাবেন তার উপর পুরু সর-জমানো ঘন দুধটুকু খাওয়ালে বুঝি ছেলের শরীরে আরো বেশী বলাধান হবে। ফলে অজীর্ণ রোগে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে যে ছেলে মারা পড়্‌বে সেকথা অজ্ঞ মা জানেন না। জানেন না বলে' হিতে বিপরীত ঘটান— অমৃত ভেবে নিজের হাতে ছেলের মুখে বিষ তুলে' দেন।

গায়ের জোরে ছেলে যদি প্রতিবেশীর উপর অন্যা অত্যাচার সুরু করে, অজ্ঞ বাপ গর্ব্বিত হ'য়ে ভাবেন, ছেলে বুঝি এমনি করে' ক্রমে মহাবীর হ'য়ে উঠ্‌বে—পাড়ার সবাই তাকে ভয় করে' চল্‌বে। কিন্তু বেশীদিন যে সেটা খাট্‌বে না। দশের শক্তি একজোট হ'য়ে একদিন যে তার অত্যাচারের শোধ তুল্‌বে—ভীমের মত বলশালী ছেলেকে তার ভুঁয়ে ফেলে ভূমিসাৎ কর্‌বে, সে কথা অজ্ঞ বাপ জানেন না। জানেন না বলে' দশের যোগে যে মানুষের আসল শক্তি বৃদ্ধি সেকথা ছেলেকে শেখাতে পারেন না। ফলে দশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঁচার পরিবর্ত্তে ছেলে মরণের মুখেই এগিয়ে চল্‌তে থাকে।

অজ্ঞ মায়ের আবেষ্টনের মধ্যে পরিবার কত ছোট হ'য়ে কত সঙ্কীর্ণ স্তরে নেমে থাকে—তাঁদের অবুঝপনা ও অন্যায় জেদে পরিবারের কত সুখসুবিধা নষ্ট ও কত প্রকারে উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে—ছেলেমেয়েরা কতখানি অনাহারে ও অরক্ষিত ভাবে মানুষ হয়, ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন।

মায়ের জ্ঞানবুদ্ধি বাড়িয়ে—যাকে কালের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে' তোলার জন্য দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোক-মাত্রেই এখন বিশেষ আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছেন। কুমারী মেয়েকে তাঁরা যথাযথভাবে শিক্ষিতা করে' তুলে' তবে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে চাইছেন। বিবাহের পরেও যারা শিক্ষালাভে উৎসুক তেমন মেয়ের সংখ্যাও এখন নিতান্ত কম নয়। অসহায় বিধবাদের শিক্ষা ত দিতেই হবে, উপার্জ্জন করে' পেট চালাবার ও সসম্মানে পরিবারের মধ্যে বাস করার জন্য। তা ছাড়া মহৎ কাজে জীবন দিয়ে সংসার-সুখের অতিরিক্ত আর একটি অপার্থিব আনন্দময় সুখের আশা তাঁরা অন্তরে পোষণ করেন। সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে হ'লেও শিক্ষা থাকা চাই, দেশ-কাল-পাত্র বুঝে' কি ভাবে কি করতে হবে জানার জন্য।

শিক্ষা অতীতকে দেখায়, ভাবীকে ভাবায়, বর্ত্তমানকে কাজে লাগাতে শেখায়,—অসৎকে সে সৎ করে, ও সৎকে মহৎ করে' তোলে নিজের গুণে। দেশের ঘরে-ঘরে স্ত্রীশিক্ষার আদর যে আজ বেড়ে গেছে, সে কেবল সৎ মেয়েদের সুশিক্ষার সুফল দেখে'। যারা সৎ, উচ্চ শিক্ষা পেলে যে তাঁরা কত বেশী সৎগুণের আধার হ'য়ে উঠেন, তেমন মা-বোন স্ত্রী-কন্যা যাঁদের ঘরে আছেন তাঁরাই তা বোঝেন। প্রত্যেক পরিবারে তাঁরা মস্ত সহায়।

অজ্ঞ বাপের অধিকারে পরিবার কি ভাবে পীড়িত হয় অনেকেই তা জানেন ও দেখেছেন। বাড়ীর মেয়েদি'কে অপরিমিত শাসনে রাখা ও ছেলেদি'কে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া—অজ্ঞ বাপের একটি বিশেষ লক্ষণ। গায়ের জোরকেই তিনি বড় বলে' জানেন,—ধর্ম্মবুদ্ধির ধার বড় একটা ধারেন না। স্ত্রীকে নিজের চেয়ে দুর্ব্বল জেনে অনা-য়াসে তাঁর প্রতি অত্যাচার ও প্রতি কথায় কটূক্তি করে' নিজেকে খুব উপযুক্ত কর্ত্তা হিসাবে শ্লাঘা বোধ করেন। সৎবুদ্ধির সহায়তায় সকলের সহযোগিতার ফলে যে অপরি-মেয় বলসঞ্চয় ঘটে, সে খবর তিনি রাখেন না। তাই সর্ব্বপ্রকারে নিজেও বিড়ম্বিত হন, পরিবারকেও বিড়ম্বিত করেন।

দেশের ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা এখনো কিছু কম নাই। এখনো লক্ষ পরিবার এই সকল অত্যাচার ও অজ্ঞতার চাপে প্রতিদিন নিগৃহীত ও বিড়ম্বিত হ'চ্ছে। শিক্ষার দ্বারা সকলের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও মন মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ না হ'লে এর হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি নাই—

ছোট মন বড় হোক্,
বুদ্ধি হোক্ সোজা,—
দশে মিলে' করি কাজ
নেমে যাক্ বোঝা

অজ্ঞতার যে বিপুল বোঝা এখনো দেশের বুকে স্তূপা-কার হ'য়ে চেপে আছে, তাকে নামাতে হ'লে দশে মিলে একজোট হ'য়ে কাজ সুরু করতে হবে চারিদিক থেকে—দেশের সকল লোকের শেখ্‌বার ও শেখাবার সুযোগ ঘটাতে হবে বিধিমতে—সকলকে খাটতে হবে অবিশ্রাম। তবেই সারা পৃথিবীর সঞ্চিত জ্ঞান দেশের বুকে এসে জমবে। দেশের জ্ঞানে পৃথিবীর জ্ঞান মিশিয়ে দেশের মানুষ নূতন হ'য়ে গড়ে' উঠে পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে এগিয়ে পড়বে সহজে।

পৃথিবীকে নূতন করে' গড়ে' তোলার ভার মানুষের। মানুষ অজ্ঞ থাক্‌লে পৃথিবীর কাজ চলে না। না-জানার পথ পেরিয়ে জানার পথে প্রত্যেক মানুষকে পা বাড়িয়ে চল্‌তে হবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে পৃথিবীর কাজ করতে হবে সারাক্ষণ। এই ঐশ্ব-রিক প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করে' বাঁচ্‌তে পারবে কে?

দেশের বুকে এই প্রেরণা আজ নেমেছে—দেশের জল-মাটিতে তার প্রভাব বিস্তার হয়েছে—দেশের মানুষ বল্‌তে সুরু করেছে—আমরাও পৃথিবীর কাজ করব—পৃথিবীকে যা' পারি তা' দিয়ে যাব—কাজ করে' পৃথিবীর গায়ে নিজে-দের চিহ্ন রেখে যাব নিখুঁত ভাবে।

এ ডাকে সাড়া না দিবে কে?—

সাড়া দাও, সাড়া দাও হে গুপ্ত অমৃত,
প্রত্যক্ষ চেতনলোকে স্ফুটতর হও,
মিলনের মহাভূমি কর অনাবৃত—
সবার অন্তর হ'তে একই কথা কও।

ব্রহ্মবাদিনী মহিলা

পণ্ডিত শ্রী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

অনেক দিন হইতেই এদেশের মহিলাগণ বেদাধ্যয়নে বঞ্চিতা, অথচ বেদই আর্য্যজাতির আদি ও শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। এবিষয়ে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মহিলারাও শূদ্রের ন্যায় অনধিকারিণী। প্রাচীন কালে এই অনধিকার ছিল না। মন্ত্রদ্রষ্টৃ অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রের রচয়িতৃ ঋষিদের মধ্যেও মহিলা-ঋষির নাম পাওয়া যায়। উপনিষদ্ বেদেরই অন্তর্গত,—বেদের শ্রেষ্ঠভাগ। তাহাতে গার্গী ও মৈত্রেয়ী নাম্নী দুজন ব্রহ্মবাদিনী মহিলার বিবরণ পাওয়া যায়। এই মহিলাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মবিষয়ে অতি উচ্চ উচ্চ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইঁহাদের কিছু পরিচয় এবং উল্লিখিত তত্ত্বসমূহের কিছু বিবরণ দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিদ্যা সম্বন্ধে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে একটা জাগরণ আসিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। যাঁহারা তাহা করেন নাই তাঁহাদের অনেকেও নানা উচ্চ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা কেহ করিতেছেন বলিয়া জানি না। "বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই" এই লৌকিক নিষেধ যেন তাঁহারা অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মানিয়া লইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পড়িয়া যদি কেহ কেহ ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহিত হন তবে শ্রম সার্থক মনে করিব।

প্রথমে মৈত্রেয়ীর কথা বলিব। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে তাঁহার বিবরণ আছে। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ্ অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। এত প্রাচীনকালে আমাদের দেশের মহিলারা, অন্ততঃ কেহ কেহ, গভীর ও জটিল দার্শনিক প্রশ্নের বিচার করিতেন, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরবর্ত্তী সময়ে দেশ কত নামিয়া গিয়াছে, ইহা ভাবিয়া হৃদয় ব্যথিত হয়। মৈত্রেয়ী আমাদের পক্ষে বড় দূরের মেয়েও নহেন, তাঁহাকে বাঙ্গালী মেয়ের প্রতিবেশিনী বলিলেই হয়। যে দেশকে আমরা এখন বিহার বলি সে দেশেই প্রাচীন বিদেহ বা মিথিলা রাজ্য ছিল। বিদেহরাজ জনকের নাম সকলেরই জানা আছে। রামায়ণে তিনি সীতাদেবীর পিতা ও রাজা রামচন্দ্রের শ্বশুর বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু উপনিষদে সীতা বা রামের উল্লেখ নাই। উপনিষদে জনক ব্রহ্মবাদী ঋষি এবং বেদবিদ্যার উৎসাহ দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার একজন বন্ধু ও সম্ভবতঃ সভাপণ্ডিত ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। উপনিষদুক্ত ঋষিদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য একজন প্রধান ঋষি,—প্রধানতম

পণ্ডিত শ্রী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

বলিলেও কিছুই অত্যুক্তি হয় না। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন, কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। কাত্যায়নী ছিলেন "স্ত্রীপ্রজ্ঞা" অর্থাৎ গার্হস্থ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞা। মৈত্রেয়ী ছিলেন "ব্রহ্মবাদিনী" অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় অনুরক্তা। এই ঋষি-পরিবারের গার্হস্থ্যজীবনের বিশেষ কোন বিবরণ উপনিষদে পাওয়া যায় না। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে প্রাচীন প্রথানুসারে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য জীবনের অবসানে বানপ্রস্থ অবলম্বনে ইচ্ছুক হইয়া

মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, "মৈত্রেয়ি, আমি এই আশ্রম পরিত্যাগ করিতেছি। কাত্যায়নী ও তোমার মধ্যে আমার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছি।" সম্পত্তি নিতান্ত অল্প ছিল না। পাঠকপাঠিকা এই প্রবন্ধেই পরে দেখিবেন যাজ্ঞবল্ক্য এক-দিনেই সহস্র গো এবং দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী সম্পত্তির কথা ভাবিতেছিলেন না; এতদিন স্বামীর মুখে ব্রহ্ম ও অমৃতত্ব সম্বন্ধে যাহা শুনিয়া আসিতেছিলেন তাহা ভাল করিয়া বোঝা হয় নাই, এদিকে স্বামী আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে চলিলেন, আর তাঁহার উপদেশ শ্রবণের সুবিধা হইবে না, এই দুঃখেই তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইতেছিল। তাই স্বামীর প্রস্তাবের উত্তরে তিনি বলিলেন, "হে ভগবন্, এই সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্ত দ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি তাহা লইয়া অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, উপকরণবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেমন, তোমার জীবনও তেমনি হইবে। বিত্তদ্বারা অমৃতত্বলাভের কোন আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহা লইয়া আমি অমৃতা হইতে পারিব না তাহা লইয়া কি করিব? অমৃতত্ব বিষয়ে ভগবান্ যাহা জানেন তাহা আমাকে বলুন।" যাজ্ঞবল্ক্য এই উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি প্রেমশূন্য হন নাই। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার প্রিয়াই ছিলে, এখন আমার প্রেম বর্দ্ধিত করিলে। এসো, বসো, আমি তোমার নিকট অমৃতত্ব ব্যাখ্যা করিতেছি। আমার বাক্যে মনোযোগ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য প্রদত্ত অমৃতত্বের ব্যাখ্যা পরে দিব। আগে গার্গীর গল্প বলি।

জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত একটা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে কুরু পঞ্চাল প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতে অনেক নানা ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই বৃহৎ ব্রাহ্মণসঙ্ঘের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ বেদজ্ঞ, তাহা জানিতে বিদেহরাজের কৌতূহল জন্মিল। এই কৌতূহলতৃপ্তির জন্য তিনি একটি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। যজ্ঞভূমির সন্নিকটে তিনি একসহস্র গো অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেক গো-র শৃঙ্গদ্বয়ে দশ-দশ পাদ স্বর্ণ বাঁধিয়া দিলেন। উপায়টাকে অদ্ভুত বলিয়াছি, কিন্তু এই মূল্যবান দক্ষিণা দিয়া তিনি সত্যই তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর পাইলেন। রাজা ব্রাহ্মণসভার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ তিনি এই সমস্ত গো লইয়া যান।" নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেওয়া এবং পরীক্ষা দ্বারা এই দাবী প্রমাণ করা, উভয়ই কঠিন কার্য্য। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন না। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার একজন ছাত্রকে বলিলেন, "বৎস সামশ্রব, এই গোসমূহ আমার আশ্রমে লইয়া যাও।" তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিবাদ ও অশান্তির ভাব প্রকাশ পাইল। অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "তিনি কিরূপে বলিলেন তিনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ?" রাজার হোতা অর্থাৎ ঋগ্বেদের পুরোহিত অশ্বল বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই কি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ব্রহ্মিষ্ঠকে আমি নমস্কার করিতেছি, কিন্তু আমি গোলাভ করিতে ইচ্ছা করি।" প্রকারান্তরে বলা হইল, "আমি ব্রহ্মিষ্ঠ কি না তাহা আপনারা পরীক্ষা করুন।" পণ্ডিতগণ পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ হইলেন না। সাতজন পণ্ডিত ও একজন পণ্ডিতা বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন লইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সকল প্রশ্নেরই সন্তোষকর উত্তর দিলেন, সুতরাং স্বর্ণমণ্ডিত সহস্র গো তাঁহারই রহিল। উল্লিখিতা পণ্ডিতা—গার্গী বাচক্নবী। তিনি যেভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিলেন তাহাতে বোধ হয় তিনি পঠদ্দশায় যাজ্ঞবল্ক্যের সতীর্থা ছিলেন। সেকালে ঋষিদের আশ্রমে যুবকযুবতীরা একসঙ্গে বেদাধ্যয়ন করিতেন। মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে এবং ভবভূতির উত্তর রামচরিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, গার্গী সমবেত ব্রাহ্মণ-দিগকে বলিলেন, "ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, আমি ইঁহাকে দুটা প্রশ্ন করিব। ইনি যদি এই দুটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবে আপনারা কেহই ইঁহাকে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।" ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "গার্গি, জিজ্ঞাসা কর।" গার্গী বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যেমন কাশী কিম্বা

বিদেহ দেশের কোন বীরপুত্র ধনুতে জ্যা-রোপণ করিয়া শত্রুবিদারী দুটি শর হস্তে লইয়া উপস্থিত হয়, আমিও তেমনি দুটি প্রশ্ন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তুমি এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দাও।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, গার্গি, জিজ্ঞাসা কর।" প্রশ্ন দুটি এবং যাজ্ঞবল্ক্যের প্রদত্ত দীর্ঘ উত্তর যদি পাঠকপাঠিকার জানিতে ইচ্ছা হয় তবে তাহা "বঙ্গলক্ষ্মী"র পরের সংখ্যায় বলিতে ইচ্ছা রহিল।

রাখী

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

তুমি মোর হাতে বেঁধে দিলে রাখী
　　শ্রাবণের পূর্ণিমায়,
ডাগর তোমার কালো দুটি আঁখি
　　ঘেরা পক্ষ্ম-নীলিমায়।
সেই কথা আজ মনে পড়ে বারবার,
যদিও আকাশে ধরে না আজিকে
　　শরৎ-আলোর ভার।
ক্ষণ-মিলনের চপল নিমেষ,
　　আলো কতটুকু তার ?

তোমার হাতের পরশ-আবেশ,
　　রাখীর রঙীন 'তার'
ছিঁড়িয়া খসেছে কোথায় ঘরের কোণে,
রং-ধোয়া সুতা কেবা তারে রাখে মনে ?
তবু আজ এই অবাধ পথের পারে,
রঙীন সে আলো আঁখির কালোয়
　　মন আঁকে বারে বারে।
স্বচ্ছ নীলিমার সীমন্তে সিঁদুর জ্বলে,
তাই দেখে মোর আঁখি যে ভরিল জলে !

বধূ-বরণ

শ্রী শান্তা দেবী বি-এ

হরিহরবাবুর ছেলেটিও যেমন সুন্দর মেয়েটিও তেমনি। তার উপর ছেলেটির আবার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতিও আছে। বাইশ বৎসর বয়সেই সে এম্ এ পাশ করিয়া কলেজে প্রফেসারী করে, দুই চারিটা বড়লোকের ছেলেকে পাখার তলায় বসিয়া ঘণ্টা দুই লম্বা চওড়া উপদেশ দিয়াই উপরি আরো দেড় শ' টাকা ঘরে আনে, আবার গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান গাহিয়াও বোকা লোকদের কাছ হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করে। একরত্তি ছেলে, এরি মধ্যে মাসে সোয়া তিন শ' রোজগার! কাজেই পাড়ার লোকের চোখে যে দিনরাত পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? মেয়ে থাকিলেই এমন ছেলেকে জামাই করিতে ইচ্ছা করে, যতই কেন না নারীপ্রগতির কথা বলিয়া দুহুরে মেয়েরা ছেলেদের দর কমাইতে চেষ্টা করুক্।

পাড়ায় মেয়ে অনেকেরই ছিল, কিন্তু সে কথা বলিতে সাহস হইত কম লোকেরই। শুধু মেয়ে থাকিলেই ত হয় না। কবিরাজী বড়ির যেমন অনুপানটাই বেশী দরকার

মেয়ের চেয়ে তেমনি তার আভরণটাই বেশী প্রকাশযোগ্য। মেয়ে ত জেলে, কলু, মুচি, মুদ্দফরাশ সকলেরই থাকে, তাই বলিয়া হরিহরবাবুর বাড়ীতে সেই সব টেঁপী, খেঁদি, বুঁচি ও পুঁটিদের অস্তিত্বের কথা প্রচার করিতে কি কেহ কোন দিন গিয়াছে? সুতরাং নবকান্তবাবুর মেয়েটি ভাল রাঁধুনী, গঙ্গাগোবিন্দবাবুর মেয়েটি ভাল গাইয়ে, কি অচ্যুতবাবুর মেয়েটির চোখজোড়া খুব ভাসা-ভাসা ইহা লইয়া দ্বিপ্রহরের মজলিসে কন্যা-জননীদের যতই অহঙ্কার দেখা যাক, পিতাঠাকুররা হরিহর বাবুর বৈঠকখানায় সে-সব কথা কোনোদিন তুলিবার স্পর্দ্ধা দেখান নাই।

কিন্তু নিকুঞ্জবাবুর সাহস অসাধারণ। তাঁহার মেয়েটির বয়স আঠারো বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আজও সে প্রথমভাগ শেষ করিতে পারে নাই। রূপের মধ্যে হাত পা নাকমুখ চোখ যথাস্থানে থাকা ছাড়া আর বেশী কিছু বলিবার নাই, আর গুণের মধ্যে আছে আশ্চর্য্য হিসাব ও সম্পত্তিজ্ঞান।

জ্ঞানদার এই জ্ঞানটায় ঘর বাহির ও পাড়ার সবাই চমৎকৃত হইত। সে আজ পর্য্যন্ত তাহার একটা ছুঁচও কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ধার দেয় নাই। যদিই ছুঁচটা লোকসান যায়, তাহা হইলে চাহিয়া ত লওয়া যাইবে না। নিজের প্রয়োজনে সে পরকে সর্ব্বদাই হয়রাণ করিয়াছে, কারণ পৃথিবীতে কাজ আদায় না করিয়া লইলেই ফস্কাইয়া যায়; অথচ পরের প্রয়োজনে কখনও ধরা ছোঁওয়া দেয় নাই, কারণ জগতে পরোপকার করিয়াও কেহ নিন্দার হাত হইতে মুক্তি পান নাই। জগতে কোনো শক্তি কি দ্রব্য য কখনও অপচয় হয় না, এই জ্ঞানটা নিশ্চয়ই তাহার টনটনে ছিল; তাই ঘরে মাছ পচিয়া গেলেও সে পরকে দিত না, পচা মাছেও সার হইতে পারে ভাবিয়া; অম্বলের অসুখ হইলেও নিজের অংশ আহার্য্য আকণ্ঠ গিলিয়া লইত ডাক্তারের চিকিৎসা বিদ্যার কাজে লাগিবে মনে করিয়াই সম্ভবতঃ। বোধ হয় নিজের সমস্ত শক্তি নিজ ভবিষ্যৎ সংসারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে বলিয়াই পিতৃসংসারে কোনোদিন কোনো কাজই সে করিত না।

নিকুঞ্জবাবুর সখ হইল এই মেয়েটির কথা হরিহরবাবুর কাছে তুলিবেন। হরিহরবাবুর পুত্র প্রফেসার নিরঞ্জনকে এই কন্যার রূপ কি গুণে মুগ্ধ করিয়া ফেলিবেন—অন্ধ পিতৃস্নেহ থাকিলেও নিকুঞ্জবাবু তা ভাবেন নাই। তবু কথাটা তিনি একদিন হরিহরবাবুকে একলা পাইয়া বলিয়া বসিলেন। বৈঠকখানার তক্তপোষের উপর পা মুড়িয়া বসিয়া হরিহর চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্ত মনে রূপা-বাঁধানো হুঁকার ধোঁয়ার পাকে পাকে ভাবী বৈবাহিকের টাকার তোড়ার অস্পষ্ট ছায়া দেখিতেছিলেন। নিতান্ত ভালমানুষ বলিয়া কৃতী পুত্রের পিতা হইয়াও তামাকের ধোঁয়ার বাহিরে এই টাকার থলিটির সন্ধান করিতে তাঁহার লজ্জায় বাধিত। আশা ছিল পুত্রের রূপগুণ ও যশের সৌরভে টাকার তোড়া আপনি মধুলোভে অলির মত উড়িয়া আসিয়া পড়িবে।

এমন সময় কিনা নিকুঞ্জ আসিয়া বলিলেন, "আমার সেজো মেয়েটি এই গেল আষাঢ়ে ষোলয় পা দিয়েছে। আর ত ঘরে রাখা চলে না, ভাই।"

হরিহরের টাকার থলি এক মুহূর্ত্তে ধোঁয়ায় মিলাইয়া গেল। তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, জ্ঞানদা ত নিরঞ্জনের চেয়ে মাত্র চার বছরের ছোট। বড় হয়েছে বৈকি। তবে মেয়েটি তোমার কালো, বুদ্ধিশুদ্ধিও কিছু আজ পর্য্যন্ত ভাল পথে যাচ্ছে না। একটু মাথার দোষ আছে না কি কে জানে? মেয়ের বিয়ে দিতে তোমাকে একটু কষ্ট পেতে হবে।"

নিকুঞ্জ বলিলেন, "সে তো জানিই, ভায়া। আর কেউ হলে কি আর বল্‌তাম? নিতান্ত তুমি আপনার লোক, তাই তোমাকে বল্‌ছি। ভায়ের মত তুমি, দয়া করে কেউ যদি নেয়, তাহলে সে তুমিই।"

হরিহর বড় বিপদে পড়িলেন। মানুষের মুখের উপর "না" বলিতে তিনি পারিতেন না। অনেক মাথা চুল্‌কাইয়া গড়গড়ার নলটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইয়ে—আমাদের নিরুর মার—একটু সুন্দরের দিকে চোখ কিনা—সহজে কাউকে মনে ধরে না।"

নিকুঞ্জ দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া টাকমাথা দুলাইয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "হেঁ, হেঁ' যা বলেছেন, এমন কার্ত্তিকঠাকুরের মত স্বামী যাঁর, চট্ করে যাকে তাকে মনে ধরবে কেন তাঁর? সে কি আর আমি বুঝি না? এমনি অরসিক পেয়েছ আমায়?

তা' সে যাক্ গিয়ে। গিন্নীর যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মনে ধরে না সে ত খুব ভালই। কিন্তু এ হোল ছেলের বিয়ের কথা।"

হরিহর অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি গিন্নীকে আর নিরুকে জিজ্ঞাসা করে বলব।"

নিকুঞ্জ তখন আসল কথা পাড়িলেন। হরিহর তাঁহাকে যে প্রথম কথাতেই দরজা দেখাইয়া দেন নাই ইহাতেই নিকুঞ্জ অনেকটা আশ্বাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার মেয়েকে কেহ যে ঘরে লইতে সহজে রাজি হইবে না, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে কোনো ফন্দি ফিকির করিয়া যদি কাহারও ঘাড়ে চড়ানো যায় এই চেষ্টায় তিনি অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন। প্রথমেই ফন্দিটা বলিয়া দিলে অমন মেয়ের দর আর এককণাও থাকিবে না, তাই প্রথমতঃ মেয়ের নাম করিয়াই কথাটা পড়িয়াছিলেন। এখন রাস্তাটা একটু পরিষ্কার পাইয়া অন্য কথাটা তুলিলেন।

হরিহরবাবুর মেয়ে বুনির নাম বাপ মা কি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু তাহার চেহারাটা বনদেবীর মতই সুন্দর ছিল। ভালো ছেলে দেখিলে জামাই করিতে অনেকেই ব্যগ্র হয়, কিন্তু বৌ করিতে ব্যগ্র হয় এদেশের মানুষ কেবল তেমনি মেয়েকে যে রূপে কি গুণে কি অর্থে কেবল ভালোই নয়, অসাধারণও। আর কোনো দিকে কি ছিল, না বলিলেও এইটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে, বুনি রূপে অসাধারণই ছিল।

নিকুঞ্জবাবুর ইচ্ছা ছিল একটা দাঁও মিলিলে বুনিকে তিনি পুত্রবধূ করিয়া আনেন। সে ইচ্ছাটা সফল হওয়া খুব শক্ত ছিল না, এইজন্যে যে, জ্ঞানদার দাদার সঙ্গে জ্ঞানদার রূপে গুণে সাদৃশ্যটা ছিল আশ্চর্য্য রকম কম। মিঠুকে জ্ঞানদার দাদা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিত না।

তাই নিকুঞ্জ বলিলেন, "দেখ ভাই, গেনিকে যে দয়া করে নিতে বলছি সেটা কি আর সবটাই দয়া? আমি বন্ধু হয়ে তোমার উপর অত্যাচার ত করতে পারি না। মেয়েটা আমার একটু কালো হলেও হৎকুচ্ছিৎ ত নয়। তাকে যদি তুমি ঘরে নাও, তাহলে আমিই কি আর তোমার একটা উপকার করব না? তোমরা হাল ফ্যাশানের মানুষ, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছ, গাড়ীঘোড়া চড়াও, ইংরেজী বলাও, বক্তৃতা করাও। কিন্তু যাই কর না কেন, কন্যাদায় আমাদেরও যা তোমাদেরও তা। তোমার বুনুর বিয়েরও ত একটা ভাবনা আছে। ধর যদি আমার মিঠুর সঙ্গে বুনুর বিয়ে হয় তোমার একটা দুশ্চিন্তা কি কমে না? আমরা গরীব মানুষ, টাকা পয়সা নেই। অন্য উপকার আর কি করতে পারি? তুমি যদি আমার মেয়েটি ঘরে নাও, তাহলে আমিও তোমার মেয়েটি ছাড়া আর কাউকে বৌ করব না।"

হরিহর নির্ব্বাক হইয়া সব কথা শুনিলেন। বলিতে পারিলেন না, "তোমার মেয়ে আর আমার মেয়েতে কি তুলনা হয়? ঐ একটা কেলে আধপাগলা হিংসুটে মেয়ে আর আমার ইন্দ্রাণীর মত সুন্দরী সরস্বতীর মত বিদুষী লক্ষ্মীস্বরূপা মেয়ে! কিসে আর কিসে?"

তবু শুধু একবার বলিলেন, "আমার মেয়ে যে নেবে সে নিজের গরজেই নেবে। বিধাতা আর যত দায়ই আমায় দিয়ে থাকুন, কন্যাদায় দেন নি।"

নিকুঞ্জ একটু কাবু হইয়া বলিলেন, "সে কথা আলবৎ মানি। ও মেয়ে যদি দায় হয়, তবে আর সব মেয়েকে ত অভিশাপের কম কিছু বলাই চলবে না। তবে কি না এই গিয়ে—আমার মিঠুও ত নিতান্ত বাজে ছেলে নয়। নিজের মুখে নিজের ছেলের কথা বলছি বলে কিছু মনে কোরো না, অনেক সুন্দরী অনেক বুদ্ধিমতী মেয়ের বাপই টাকা নিয়ে সেধে আমার ছেলেকে জামাই করতে চেয়েছে। আমি ব'লে তাই লোভ সামলেছি। তোমার মেয়েটিকেই আমাদের বৌ করবার ইচ্ছা, কোথায় কার টাকা আছে কি রূপ আছে তা দেখতে আমরা চাই না।"

হরিহর বেচারী ভালমানুষ। মনে করিলেন—'হবেও বা'। তিনি পিতা বলিয়া বুনিকে যেমন রূপে গুণে অদ্বিতীয়া মনে করিতেছেন, জগতে হয় ত তেমন অনেকই আছে এবং তাহাদের পিতারা তাই পরের দরজায় দরজায় জামাই খুঁজিয়া বেড়ায়। তাছাড়া মিঠুর কথা গঙ্গাগোবিন্দের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতে কন্যার পিতাদের এতটা আগ্রহ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

সে ছেলে স্কলারশিপ লইয়া বিলাত যাইতেছে, তাহার উপর কাগজে কবিতা ও গল্প লিখিয়া অল্পদিনেই সাহিত্যিক

মহলে নাম করিয়া লইয়াছে। টাকা পয়সা যদিও এখনও কিছুই ঘরে আনিতে পারে নাই, তবু পথে ঘাটে সকলেই যাহাকে দেখিলে নমস্কার করে এবং স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েদের মুখে দিবারাত্রিই যাহার নাম ফেরে, সে বিলাত হইতে আসিয়া টাকার তোড়া ঘরে বোঝাই করিবে না এ কি কখনও হইতে পারে ?

ভাবিয়া দেখিলেন সর্ব্বগুণ জগতে মিলিবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং বুনির মত মেয়ে জগতে থাক্ বা না থাক্ মিঠুর মত জামাই তাহার জন্য না জুটিতেও পারে। কিন্তু জ্ঞানদা—? নিরঞ্জনের ভাগ্যে এমন স্ত্রী মনে করিতেই যে বুক ফাটিয়া যায় ! ইচ্ছা হইল বলেন—"আমার দরকার নেই।" কিন্তু যদি গৃহিণী শুনিয়া চটিয়া উঠেন ? "যত ভাল জামাই আসে সবাইকে দূর করে দেওয়া তোমার এক রোগ হয়েছে !" গৃহিণীর অষ্টপ্রহর এই ঝঙ্কারটা কাণে বাজিয়া উঠিল।

অগত্যা হরিহর বলিলেন, "আচ্ছা, কথাবার্ত্তা কয়ে দেখি, বাড়ীতে সবাই কি বলে !"

(২)

নিরঞ্জন নিজেই যে কেবল দেখিতে সুন্দর ছিল তা নয়, সুন্দরী না হইলে কোনো মেয়ের সঙ্গে সে সহজে কথাই বলিত না। সুতরাং সে যে অকস্মাৎ জ্ঞানদাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়া যাইবে, একথা তাহার বন্ধুবান্ধব ত স্বপ্নেও ভাবে নাই, পিতামাতাও কল্পনা করেন নাই। কিন্তু ঘটিল তাই। মা যখন নিরঞ্জনকে বলিতে গেলেন, "বাবা, বুনির জন্যে খুব ভাল একটা সম্বন্ধ এসেছে ; কিন্তু তাদের মেয়েটিকে তুমি না বিয়ে করলে তারা হয়ত বুনির বিয়েতে মত করবে না।"

নিরঞ্জন আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল, "কে মা তারা ? কাদের বাড়ী ? খুব বড় ঘর কি ?"

মা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বড় বল্‌তে হবে বৈকি ! এখন টাকা থাক্ বা না থাক্ রামনগরের মিত্তির ত ! তাদের চেয়ে বড়ঘর আর ক'টা আছে ? তার উপর ছেলে আজ বাদে কাল বিলেত যাচ্ছে। তার বাড়া আর আমরা কি পাব ? কেষ্ট বিষ্টু লাট বেলাট ত জুটবে না, সবাই জানে। পাত্তরের সেরা পাত্তর ওদের মিঠু। সেধে তারা নিতে চাইছে, ঠেলা কি উচিত ?"

নিরঞ্জন মা'র কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "মিঠু ? ও তাই নাকি ? সে ত সত্যিই এ যুগের সেরা ছেলে। তেমন ছেলে তোমরা আর পাবে না। অত বড় ঘরের সঙ্গে আর অমন ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়াটাই খুব বড় ভাগ্য।"

মা বলিলেন, "আমিও ত তাই বলি। কিন্তু বাবা, ওদের মেয়েটা—?"

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল ; তারপর বলিল, "নিজের মেয়ে ভাল বরে পড়লেই হ'ল। পরের মেয়ে খারাপ ত তোমার কি ? ছেলে ত কেউ শ্বশুরবাড়ী পাঠায় না।"

মা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছুই বলিলেন না ! পরদিন বুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া যখন মার কাছে নালিশ করিল, "মা, দাদার বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে। এত লেখাপড়া শিখে শেষকালে এই বুদ্ধি ! বলে কিনা—মেয়েদের আবার রূপগুণ ? ওসব বিয়ের আগে পর্য্যন্তই।"

তখন মা আরো বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বিয়ের পর কি সব উবে যায় ?"

বুনি বলিল, "গঙ্গামাটি আর ড্রেনের মাটি সবই এক ছাঁচে পড়্‌লে এক রকম দেখায়। ছাঁচটাই নাকি আসল।"

মা ছেলের কথা বুঝিলেন। বুনি ও নিরঞ্জন দুজনেরই বিবাহের কথা চলিতে লাগিল। পাকা হইতেও বেশী দেরী হইল না। দেনা পাওনার কথা একবার উঠিয়াছিল, তাহাতে হরিহর বলিয়াছিলেন, "আপনারাই ও বিষয়ে বুঝে দেখ্‌বেন।"

নিকুঞ্জ বলিলেন, "হ্যাঁ, ওজনে কোন্ দিক ভারী তা ত আমি বুঝ্‌তেই পারছি। জ্ঞানদাকে আমার সাধ্য-মত কিছু দেব বৈকি। তবে মিঠুর বৌ-এর জন্যে আমি কিছু চাইব না। কেবল আপনারা নিজে থেকে যা দিতে করতে চাইবেন তাই হবে। সে খরচটুকুই আপনার।"

সেই কথাই রহিল ; কেবল জ্ঞানদার বিবাহ আগে আর বুনির বিবাহ পরে হইবে এইটা উপরি ব্যবস্থা হইল। নিকুঞ্জ বলিলেন "গেনি ত বছর খানিকের বড়, ওর বিয়েটা আগে হ'লেই কি মানায় না বেশী ?"

(৩)

বাড়ীতে দুইটি বিবাহ, কাজেই কাপড়ওয়ালা গহনা-ওয়ালার ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। যে আসে সেই বাবুদের খোঁজ না লইয়া সোজা মেয়েদের কাছে কার্ড পাঠাইয়া দেয়। বুনির মা বিনা পণে মেয়ের অমন বিবাহে খুব খুসী, তবে এমন রাজপুত্রের মত ছেলের ভাগ্যে ওই কুৎসিত বোকা বউটা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দ রাখিবার আর ঠাঁই থাকিত না। যাহাই হউক, তাই বলিয়া নিজের মেয়ের বিবাহে সাধ আহ্লাদ ত আছে। বেয়াই পণ না চাহিলেও নিজের মেয়েজামাইকে না দিয়' কি থাকা যায়? ব্যাপারীরা যে আসিত সেই কিছু গছাইয়া যাইত। শাড়ী, জামা, গহনা, গৃহসজ্জা, বাসন কোশন যে যা লইয়া আসিল বুনি পছন্দ করিয়া বসিল। নিরঞ্জনের একটা মাত্র বোন, সে বলিল, "মা, কিনে দাও। ওর বিয়েতে কিছু বাদ পড়লে চল্‌বে না।" .

মা কিনিয়া দিয়া সরিয়া যাইতে চাহিলেই বুনি বলে, "দাদার বৌকে একটা দেবে না, মা?"

একে ত ঐ বউ, তার উপর যদি জিনিষপত্রেও কৃপণতা করা হয়, তাহা হইলে ছেলের কাছে মুখ দেখানো যাইবে না। নিরঞ্জনের সম্মুখেই বুনি বৌএর কথা তোলে, অগত্যা জ্ঞানদার নাম করিয়াও একটা একটা কেনা হয়। বেণারসী-শাড়ী. ঢাকাইশাড়ী, মান্দ্রাজী,সুরাটি, মারাঠি, চীনা, ফরাসী সব কাপড়ই জোড়া জোড়া আসিল। গহনাও যেখানে বুনির দশভরি হইল, সেখানে জ্ঞানদার অন্ততঃ পাঁচভরি ত হইলই। তারপর মিঠুর জন্য বরাভরণ সোনার ঘড়ি, হীরার আংটি, সোনার বোতাম, শাল, বেণারসী জোড় কিছুই বাদ পড়িল না। বউ মনের মত হয় নাই, তাহার জন্যই যখন এত খরচ হইল, তখন এমন সভা-উজ্জ্বল জামাইকে একটা জিনিষও কি কম দেওয়া যায়? তার উপর আবার আস্‌বাবপত্র আছে। কাজেই যেমন তেমন করিয়া আট নয় হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীতেও স্যাকরা, ঢাকাইওয়ালার ভীড় কিছু কম হয় নি। তবে তিনি খবর পাইলেই বিদায় করিয়া দেন, বলেন, "দুটো দুটো বিয়ের ঠেলা, আমার অনেক হিসেব করে চল্‌তে হবে।" গিন্নী বলেন, "তা ত হবেই, মেয়ের বিয়ের খরচ ছেলের বিয়েতে পুষিয়ে যায়। তা তুমি ত দয়া করে কিছুই নিচ্ছ না বেয়াইএর কাছ থেকে।" নিকুঞ্জ মহাত্যাগীর মত মুখ করিয়া বসিয়া থাকেন। বরকনে নিক্তিতে চড়াইলে কোন্ বাড়ীর পাওনা বেশী হয় তা আর কিছু বলেন না।

জ্ঞানদা কিন্তু ব্যাপারীদের কার্ড পাইলে নিজেই তাহা-দের ডাকিয়া পাঠায়। যাহা পছন্দ হয় তুলিয়া লয়; মা যদি বলেন, "অত বড় টুক্‌রোটা রাখ্‌লি, ওতে ত দুটো জামা হবে। বৌ আস্‌ছে, তার জন্যেও একটা করে দিস্‌।"

জ্ঞানদা বলে, "ওটা আমি পছন্দ করেছি, দুটোই হোক্‌, চারটে হোক্‌, আমার। বৌকে কেন দিতে যাব?"

জ্ঞানদা যাহাতে হাত দেয়, তাহা সে লইবেই। পাঁচটা জিনিষও যদি তাহার পছন্দ হয় ত প্রয়োজন থাক্‌ বা না থাক্‌ সবগুলাই সে লইবে। বৌ যাহা পছন্দ করিয়া লয় নাই কেন সে তাহা বৌকে লইতে দিবে? দেখিয়া দেখিয়া মিঠুর বড়ই রাগ হইত; কিন্তু তবু লজ্জার খাতিরে ভাবী বধূর হইয়া সে কিছু বলিতে পারিত না।

বুনির জন্য নিকুঞ্জর কোনো জিনিষপত্র গহনাকাপড় করিবার কিছুই আগ্রহ নাই; কাজেই ফরমাস্‌ দিয়া কিছুই তৈরী করা হয় নাই। সাধিয়া যাহারা বাড়ীতে জিনিষ লইয়া আসে তাহাদের কাছেও কিছুই লওয়া হয় না, কারণ যে কেহ বাড়ীতে ঢুকিতে পায় এবং দুই একটা পছন্দমত জিনিষ আনে তাহার গুলা ত জ্ঞানদাই লইয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলে। তাহার শুইবার ঘরে খাটের তলায় ছাড়া অন্য জায়গায় বাক্সগুলি সে রাখিতে দেয় না, পাছে কেহ কিছু নাড়াচাড়া করে! পাড়ার মেয়েরা বিবাহের জিনিষ দেখিতে আসিলে জ্ঞানদা নিজে চাবি খুলিয়া নিজ হাতে এক একটি জিনিষ আলাদা করিয়া দেখায়; একটি তোলা হইলে তবে অন্য আর একটি বাহির করে। তাহার রকম দেখিয়া মেয়েরা বলিত, "বাবা, কনে নয়ত কন্তেকর্ত্রী! সারাক্ষণ ঘটিকম্বল গোছাতে এত ব্যস্ত যে লজ্জাসরমই ভুলে গেছে।"

জ্ঞানদার জিনিষ দেখিতে দেখিতে মেয়েরা প্রায়ই মন্তব্য করিত, "মেয়ে ত অনেক গুছিয়ে নিল। বৌকে কি দিচ্ছেন?"

জ্ঞানদার মা রোজ রোজ এককথা শুনিয়া লজ্জায় পড়িয়া স্বামীর কাছে নালিশ করিতে গেলেন। নিকুঞ্জ চটিয়া বলিলেন, "দেব কোথা থেকে? তোমার গুণবতী মেয়ের বিয়েতে পণ লাগ্‌বে না মনে করেছিলাম; তা তিনি ত নিজেই সোনারূপো থেকে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পর্য্যন্ত ঘরসংসারের সব জিনিষ যা পছন্দ হচ্ছে তাই দু হাতে আঁক্‌ড়ে ধরছেন। যেটা দরকার নেই, সেটাও বলে,—এটা সস্তায় পেয়েছি, ছাড়লে লোকসান হবে। এত খরচের উপর আবার বৌকে কি করে দেব? এই বিয়েটা হয়ে যাক্‌, তখন খরচের অবস্থা বুঝে তার জন্যেও কিন্‌ব এখন।"

গৃহিণী মেয়েমহলে গিয়া বলেন, "এই বিয়ের হ্যাঙ্গামটা চুক্‌লেই ওদিক্‌কার সব সুরু করব। একসঙ্গে দু কাজে হাত দিলে কি সাম্‌লানো যায়?"

বড়দি' এবং মেজদি'র বিবাহে পণের টাকা ছাড়া আর যা কিছু দেওয়া হইয়াছিল কোনোটাই জ্ঞানদা ছাড়িল না। বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া পর্য্যন্ত সে সকলের কাছে খোঁজ করিয়া গত দুই বিবাহের ফর্দ্দগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। লিখিতে জানিত না কাজেই লিখিয়া রাখিতে পারে নাই, তবে তাহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার লোক খাড়া রাখিয়াছিল। ইহার উপর পছন্দ, দরে সস্তা, সংসারে দরকার, হালফ্যাশান ইত্যাদি কারণে ফর্দ্দ বড় ত হইলই। দেখিয়া শুনিয়া নিকুঞ্জ চটিয়া আগুন!

"এমন ঘরের-শত্রু-বিভীষণ মেয়ে জান্‌লে কে বিনা পণে বৌ আন্‌তে যেত? সব পাগলকে পারা যায়, সেয়ান পাগলকে পারা দায়।"

বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। গাত্রহরিদ্রার দিনে বরের বাড়ী হইতে জ্ঞানদার জন্য গহনা, কাপড়, জামা, তেল সাবান, আয়না চিরুণী যাহা কিছু আসিল, কোনোটাই দায়সারা জিনিষ নয়। জরির বেনারসী, পাকা সোনার সাতলহরী, ফরাসী সাবান ও সুগন্ধি, রেশমের সেমিজ পেটিকোট যে দেখিল সেই ধন্য ধন্য করিল। কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল মিঠু। তাহার বোনের জন্য এত ঘটা করিয়া যাহারা জিনিষ পাঠাইল, তাহাদেরই সর্ব্বগুণান্বিতা মেয়ের জন্য এবাড়ী হইতে আজ পর্য্যন্ত ত কিছুই যোগাড় হয় নাই। তাহারা রূপগুণের অভাবকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিল আর ইঁহারা রূপগুণ সব থাকিতেও একটু সমাদর করিলেন না।

জ্ঞানদার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহসভায় কন্যার আঁচলে বাক্সের চাবী বাঁধা দেখিয়া কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ সকলেই চমৎকৃত হইল। দুই একজন খুলিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সভার মধ্যে ঝুটোপুটি বাধিবার ভয়ে পারে নাই।

নিরঞ্জন জামাই হইয়া আসিয়া এ বাড়ীর অবস্থা সমস্তই বুঝিল। তাহার এত আদরের বোনকে যে ইহারা এমন হতশ্রদ্ধা করিয়া ঘরে আনিতেছে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। একটা সামান্য কিছু আয়োজনও কি থাকিতে নাই?

মিঠুর সহিত তাহার পরিচয় অনেক কালের। ভাবও অল্পস্বল্প আছে। আর কাহাকেও না পাইয়া সে মিঠুকেই বলিল, "তোমাদের বাড়ী থেকে বুনিকে কি কিছুই দেওয়া হবে না?"

মিঠু লজ্জিতভাবে বলিল, "কি জানি, ভাই? দিলেও হয়ত সামান্যই দেবে।"

নিরঞ্জন বলিল, "কেন, বুনি কি এমনই ফেল্‌না মেয়ে যে তাকে দুখানা ভাল কাপড় কি গহনা দেওয়া যায় না?"

মিঠুর মনে কথাটা বড় নিষ্ঠুর আঘাত করিল। বুনি আর জ্ঞানদার তুলনা মনে মনে সে সর্ব্বদাই করিত, কিন্তু এই কথাটা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিয়া গেল। যেমন করিয়াই হউক সে মাকে বলিবে ঠিক করিল। তাহার ভাবী বধূ বলিয়া সে বলিতে সঙ্কোচ করিতেছিল। কিন্তু বধূ যে নিরঞ্জনের সহোদরা একথাও তাহার মনে রাখা উচিত ছিল। অন্য বাড়ীর মেয়ে হইলে তাহাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুতেই পাশ কাটাইয়া যাওয়া চলে না।

বিকালবেলা মা জ্ঞানদাকে নূতন গহনা কাপড় পরাইয়া চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া দিতেছিলেন। আজকের দিনটি মাত্র সে এবাড়ী থাকিবে। কাল সকালেই শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে। মিঠু আসিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন, "খেটে খেটে বাছার রং কালি হয়ে গেছে। আজ বাদে

কাল তোরও যে বিয়ে, একটু যে যত্ন আত্তি দরকার তা ভুলেই গিয়েছিলাম। মেয়েটাকে নিয়েই সারা হলাম।"

মিঠু একেবারেই বলিয়া বসিল, "আমাকে ভুলে যাও তাতে দুঃখ নেই; আমি তোমারই ছেলে, রাগ করলেও কিছু এসে যাবে না। কিন্তু তোমার মেয়ে ছাড়া পরেরও যে একটা মেয়েকে নিজের সংসারে আন্‌ছ তা ভুলে যাও কেন?"

মা হতবুদ্ধি হইয়া ছেলের দিকে তাকাইলেন। মিঠু বলিল, "নিরঞ্জনের ত বোন সে। তোমরা যে তার বোনের জন্যে কিছুই করাও নি, তা কি তার শুন্‌তে বাকি আছে মনে কর? সে ত আমাকে স্পষ্টই বল্‌ল—বুনি কি এমনই ফেল্‌না যে তাকে দুখানা ভাল গয়না কাপড়ও দেওয়া যায়

মা বলিলেন, "নতুন জামাই বাড়ীতে পা দিয়েই কে ফেল্‌না আর কে তোল্‌না তার বিচার করতে বসেছেন!'

মিঠু বলিল, "করবেই ত। তোমাদের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করলে তোমরা ছেড়ে দিতে?"

গৃহিণী মেয়ের চুল বাঁধা ফেলিয়া উঠিয়া ফর্ ফর্ করিয়া কর্তার কাছে গিয়া হাজির হইলেন। "ওগো, তোমার নতুন জামাই এসেই আমাদের খুঁৎ ধরতে বসে গেছে। তার বোন্‌কে অনেক গয়না কাপড় দিতে হবে, সে মিঠুকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে। ছেলেও তেমনি—বিয়ে না হতেই—বৌয়ের হয়ে লড়্‌তে লেগেছে।"

নিকুঞ্জ গৃহিণীর দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "নিরঞ্জন বলেছে তার বোনকে গয়না কাপড় দিতে? কি গয়না কাপড় দিতে আজ্ঞা হয়েছে? তোমার ছেলেকে খোঁজ করতে বল গে।"

গৃহিণী বলিলেন, "যা বল্‌ছে তাই দিতে হবে নাকি? ওদের টাকা আছে, ওরা খরচ করেছে, আমাদের যদি না থাকে তবু করতে হবে?"

নিকুঞ্জ বলিলেন, "তাঁরা যদি আজ্ঞা করেন দিতে হবে হয়ত।"

কর্তা রাগ করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন গৃহিণীর বেশী কথা বলা হইল না।

পরদিন কন্যাবিদায়ের সময় বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। জ্ঞানদার চোখে জল নাই, কিন্তু মা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন। জ্ঞানদা মাথাটা যথাসাধ্য সরাইয়া লইতেছে, পাছে চোখের জলে তাহার বেণারসী কাপড়ে দাগ লাগিয়া যায়। বড়দি ও মেজদি নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া বার বার বলিতেছে, "গেনুর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, ভাই; তুমিই তাকে সাম্‌লে চোলো। তুমিই আমাদের ভরসা। এমন রত্ন স্বামী পেয়েও তার মর্য্যাদা হয়ত কোনোদিন রাখ্‌তে চেষ্টা করবে না। সবই আমাদের দুরদৃষ্ট। তুমি ভাই, তাকে ক্ষমা করবে জানি।"

তাহাদের চোখের জলে নিরঞ্জনের হাত ভিজিয়া গেল। জ্ঞানদা তেমনি অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু নিরঞ্জনের চোখ দুটি জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

সবাই কর্তাকে খুঁজিতেছিল। কয়েকটা মোড়ক হাতে করিয়া ঠিক এমনি সময় তিনি ছুটিয়া আসিলেন। কন্যার দিকে তাকাইলেন না! জামাতার সম্মুখে মোড়ক-গুলা খুলিয়া বলিলেন, "তোমার বোন্‌কে গয়না দিতে বলেছিলে, বাবা; দেখ এ গয়না তোমার পছন্দ হয়? চল্‌বে?"

নিরঞ্জন ভাল করিয়া না তাকাইয়াই সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িল গহনা যাচাই করিবার মত মনের ভাব তাহার এখন ছিল না। সে ভাবিতেছিল—পিতৃগৃহ ছাড়িতে যাহার চোখে একটু সজল ভাবও দেখা যায় না, সে না জানি কেমন পত্নী হইবে? তাহার দৃষ্টি এই বিচ্ছেদ-কাতর গৃহের দুঃখে যতটা সজল হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল তাহার নিজেরই দুঃখে।

কন্যা পতিগৃহে চলিয়া গেল বটে; কিন্তু তাহার দুঃখে বেশী কাঁদিবার কাহারও সময় হইল না। নিকুঞ্জ বলিয়া-ছেন—"ছেলের বিয়ের আয়োজন ভাল করে করতে হবে।" এতদিন সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই, কাজেই সমস্ত আয়োজনটাই নূতন করিয়া সুরু করিতে হইল। ঘি তেল ময়দা মিঠাই হইতে কাপড়-চোপড় সবই এখন খরিদ করিতে হইবে। ছেলেরা সেই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। মেয়েদের ভাঁড়ার গোছানো, তত্ত্ব সাজানো, ঝাড়া

বাছা, পিঁড়ি চিত্তির, আলপনা কত যে কাজ তার ঠিক নাই।

কোনো ক্রমে গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব গেল। কাপড়-চোপড় বেশ ভালোই, তবে সঙ্গে গহনা নাই। দেখিয়া নিরঞ্জন বলিল, "গহনা ত কয়েকটা দেখ্‌লাম, হয়ত লোকের হাতে পাঠাতে চায় না, তাই রেখে দিয়েছে। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দেবে।"

জ্ঞানদাও তাড়াতাড়ি বলিল, "আসবার সময় বাবার হাতে ত দুটো তিনটে বাক্স দেখে এলাম। বৌদির জন্যেই ত সব। তাই ত বাবা বল্‌লেন শুন্‌লাম।"

নূতন বৌএর মুখে এখনই কথা শুনিয়া পাড়া প্রতিবাসী একটু অবাক্ হইল বটে। তবে সকলেই খুসী হইল, এবাড়ীর মেয়েকে কিছু গহনা অন্ততঃ পরে দেওয়া হইবে জানিতে পারিয়া।

এ বাড়ীতে যখন কন্যাবিদায় হইল, তখন বুনিকে সাম্‌লানো যায় না। সবাই বলে, "বুনি, চন্দন যে ভেসে গেল, কাজল যে ধুয়ে গেল। ও বুনি, আর কাঁদিস্ না, নাক অত লাল হলে শ্বশুরবাড়ী নাম্‌বি কি করে?" কেহ বলে, "মেয়েটাকে একটু হাওয়া কর।"

কেহ বলে, "একটু ধীরে সুস্থে গো, অত তাড়া দিও না; মেয়ে দেওয়া কি সহজ কথা? হুট্ কর্‌লেই বার করা যায় না।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ৫।৬ ঘণ্টা বেশী দেরী হইল কন্যা পাঠাইতে।

পিতামাতা ভাই বন্ধু সকলকে কাঁদাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই বুনি চলিয়া গেল। মা আসিয়া শয্যা নিলেন, বাবা লাইব্রেরীতে খিল দিলেন, দাদা ষ্টীমারের টিকিট কিনিয়া সেদিনকার মত বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় মিঠুর হাত চাপিয়া শুধু বলিল, "ভাই, আমি যা দাম দিয়েছি, তার চেয়ে বেশী আর কি কিছু আছে?"

শ্বশুরবাড়ীতে তখন মহা ঘটা। রাস্তার উপর নূতন লাল কাপড় পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া বরবধূ আসিবে। দিদিরা শাঁখ ও উলুর রিহার্সাল দিতেছেন, যাহাতে পাড়ার লোকের কাণে তালা ধরিয়া যায়। ছোট বোন দুধে আলতার গোলা তৈয়ারি করিতেছেন, বধূ তাহার উপর দাঁড়াইবে শাশুড়ী গহনার বাক্স খুলিয়া দেখিতেছেন বধূর গায়ে কেমন গহনা মানাইবে।

ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐরে ঐ বৌ আস্‌ছে রে!" ঘন ঘন শাঁখ বাজিয়া উঠিল, ছেলে-মেয়ে সকলে সমস্বরে উলুধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া দিল। গৃহিণী গহনার বাক্সটা লইয়া দৌড়িলেন, বৌ তুলিয়া মুখ দেখিতে হইবে। কর্ত্তা সে বাক্সটা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, "ওটা আমার কাছে থাক্। তুমি ঐ চেন ছড়াই দাও গিয়ে।"

বধূর ঘোমটা তুলিয়া গৃহিণী ক্ষুণ্ণমনে সরু চেন ছড়া পরাইয়া কোলে করিয়া নামাইলেন। ঘরে আসিয়া বসিতেই শ্বশুর বধূর কোলের উপর হীরার নেক্‌লেস্ ও ব্রেস্‌লেট জোড়া রাখিয়া দিলেন। বধূ শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা কুড়াইয়া লইল। মিঠুর দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল। সে বধূর আঁচল হইতে গহনাগুলা ছিনাইয়া লইয়া নিজের পকেটে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে বলিল, "কর কি, কর কি? এখুনি জোড় ভাঙ্‌তে নেই।"

মিঠু মার দিকে তাকাইয়া বলিল, "মা, তোমরা মনে করেছিলে আমরা চলে আস্‌বার অনেক পরে চিঠিখানা পৌঁছবে। কিন্তু আমাদের যে ছ' ঘণ্টা দেরী হতে পারে তা ভাব নি। তাই মনে কর নি যে চিঠিখানা আমিই হাতে করে ফিরে আস্‌ব।"

মিঠু একখানা চিঠি মার পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। গৃহিণী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীরই হস্তাক্ষর।

স্বামী লিখিতেছেন :—"বেয়াই মশাই, আমার মেয়েকে সাধ্যমত কিছু দিয়েছি আপনি দেখেইছেন। কিন্তু আপনার মেয়ের জন্যে আমি কিছু চাই নি। কেবল আপনারা যা দিতে করতে চাইবেন তাই হবে বলেছিলাম। বধূমাতাকে আমি কিছু দিব এমন কথা ছিল না। কিন্তু আমি তাঁহার জন্য তেমন কিছু করিতে পারি নাই—ইহা আপনার পুত্রের পছন্দ হয় নাই। তাই তাঁহারই পছন্দমত কিছু অলঙ্কার আনিয়া দিয়াছি। বিলটি আপনাকে পাঠাইলাম—৮০০৲। সুবিধামত শোধ করিয়া ফেলিলে সুখী হইব।"

নিকুঞ্জ কখন যে সরিয়া গিয়াছেন কেহ দেখে নাই। মিঠু বলিল, "চিঠিখানা আমি অনেক কষ্টে নিরঞ্জনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি তোমাকে দেখাব বলে।"

গৃহিণী বলিলেন, "শুভকার্য্যের সময় ওসব থাক্, বাবা! আগে কাজটা চুকিয়ে নিতে দে। আমরা মেয়েমানুষ ও সবের কি জানি?"

দান্তে

৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি হইতে চিরজন্মের মত নির্ব্বাসিত হইয়া, পৈশাচিক অত্যাচারের কঠোর হস্তে মুহুর্মুহু জীবন পরীক্ষা করিয়া, নয়নের জল নয়নে করিয়া ইটালীয় কবি দান্তে হৃদয়ের শোণিত দিয়া যে কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার শেষ নাই, অবসান নাই,—তাহা জগতের অস্তিত্বের সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত,—তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের অতি আদরের বিরল বস্তু। দান্তের লালিত্যময় কবিতা পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হই, তাঁহার জীবনের অসাধারণ ঘটনাসমূহ সমালোচনা করিয়া আমরা স্তম্ভিত হই, আমাদিগের মস্তক স্বতঃ অবনত হইয়া আসে,—আমরা আমাদিগের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফেলি। মমতাহীন সংসারের শত-সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, চতুঃপার্শ্বস্থ হিংসা, দ্বেষ ও কুটিলতার বক্রদৃষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, যিনি হৃদয়ের আলোকে, স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে সত্যের সরল ও সুগম্য পথে অস্খলিতচরণে বিচরণ করিয়াছেন, সেই দেবশিশু দান্তে জগতের বন্দনীয়। পৃথিবীর কোটী কোটী মানবসন্তান জীবনের মহাপথে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে সম্মুখে অল্পমাত্র বিভীষিকা দেখিয়া পশ্চাৎপদ হয়, কিন্তু দান্তে করুণাময় পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া, নির্ভীকচিত্তে দেবলোকবাসীর ন্যায় অতি গৌরবের সহিত সারাজীবন সেই পথে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে মহত্ত্বের উপর আপনার হিরণ্ময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই সিংহাসন ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বের বিষময় ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া আপনার মহিমায় আপনি বিরাজমান। সমুচ্চ পর্ব্বতের আশে পাশে মেঘে ছাইয়া ফেলিলেও তাহার শিরোভাগ যেমন সূর্য্যের কনকরশ্মিরূপ মুকুট পরিয়া জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ দান্তের চতুর্দ্দিকে অত্যাচারের ভীষণ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেও তাঁহার হৃদয় স্বর্গের আলোকে সমুদ্ভাসিত ছিল। দান্তে যে তাঁহার সমকালীন লোকদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ মহৎ ব্যক্তির যথার্থ গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে সমসাময়িক লোকেরা সক্ষম নহে।

৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতিদূর হইতে না দেখিলে যেমন চিত্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না সেইরূপ কালের অতি-দূরভাগে না দাঁড়াইলে আমরা মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব যথার্থ অনুভব করিতে পারি না; সেই নিমিত্ত দান্তে একদিন দীনহীন মলিনবেশে আহারের নিমিত্ত যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যিনি মরণকালেও জননী জন্মভূমির মুখ দেখিতে পান নাই, যিনি অত্যাচার-কম্পিত কলেবরে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, সেই দান্তে আজ

ইটালীর অলঙ্কার, কাব্য-জগতের অলঙ্কার,—মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

ঘোর মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার অন্ধকারের সহিত যেমন হৃদয়ও অন্ধকার হইয়া আসে, বাহিরের মেঘের ছায়া অন্তরে পতিত হয়, সেইরূপ দান্তের মহৎকাহিনী পাঠ করিতে করিতে মহত্বের ছায়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, আমরা দান্তের প্রশান্ত দৃষ্টির স্বর্গীয় ভাব উপলব্ধি করি। দ্রুতগামিনী স্রোতস্বিনী যেমন সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের উদার বক্ষে আশ্রয়লাভ করিবার নিমিত্ত অবিরল অবিশ্রান্তস্রোতে বহিতে থাকে, সেইরূপ যখন আমরা দান্তের অসামান্য কার্য্যসমূহ মনে মনে চিন্তা করি তখন পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদিগের হৃদয় সেই বিপুল আশ্রয়কে লাভ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়। আজকালকার দিনে দান্তের জীবনকাহিনী আমাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমরা চাটুকারের দল হইয়া পড়িয়াছি, নিজের স্বার্থের নিমিত্ত এবং আপাততঃ সুবিধার নিমিত্ত সত্যকে মিথ্যা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না; জলদেবতা Proteus-এর ন্যায় জোর-জবরদস্তি না করিলে আমরা কখনও সত্য কথা বলি না, যতক্ষণ সুবিধা পাই ততক্ষণ মিথ্যা কথা বলি। পরের মন যোগান লইয়া আমাদিগের বিষয়। আত্মমর্য্যাদা যে একটি পদার্থ আছে, তাহা আমাদিগের বোধ হয় না। লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আশ্রয়দাতার বিনাশের সহিত আপনি বিনাশ পায়, আমরাও সেইরূপ পরের গলগ্রহ হইয়া থাকি এবং পরের দুর্দ্দশার সহিত আপনার দুর্দ্দশা আনয়ন করি। আমরা যখনই আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা পাই তখনই অভদ্র হইয়া পড়ি। কোন ভদ্র ইংরাজের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে যদি পারিলাম তবে মনে করি কি না কাজ করিলাম! এককথায় আমাদিগের চরিত্র যতদূর মন্দ হইবার তাহা হইয়াছে। এক্ষণে দান্তেকে অনুসরণ করা আমাদিগের উচিত। অগাধ জলরাশির মধ্যে থাকিয়া আলোক-স্তম্ভ যেমন নাবিকদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়, দান্তেও সেইরূপ মহত্বের উপর দাঁড়াইয়া মর্ত্ত্যবাসীদিগকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক অসৎ কার্য্য হইতে সতর্ক করিয়া দেন। দান্তে আমাদিগের নিকট ধ্রুবতারা,—কিন্তু ভয় পাছে Indian Byron, Indian Scott ইত্যাদির ন্যায় Indian Dante ইতিমধ্যে আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং আমরা আসল দান্তেকে ছাড়িয়া নকল দান্তেকে পূজা করি।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স নগরীতে দান্তের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই দান্তে স্বদেশানুরাগী ছিলেন,—স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত তিনি প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমরা আজকাল অত্যন্ত স্বদেশহিতৈষী হইয়াছি, স্বদেশের নিমিত্ত থাকিয়া থাকিয়া আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। অভাগিনী মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় ফাটিতে থাকে; সেই নিমিত্ত আমরা বাহিরে ভারত-উদ্ধার ভারত-উদ্ধার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া করি ও অবশেষে গৃহে আসিয়া মিথ্যা কথা বলি, গালাগলি দিই, ইংরাজরা যাহাতে আরো অত্যাচার বৃদ্ধি করে তাহার উপায় উদ্ভাবন করি. এককথায় ভারতের শ্রাদ্ধ করি। দান্তে মুখে স্বদেশ-হিতৈষিতা বলিয়া চেঁচাইতেন না কিন্তু কার্য্যে স্বদেশ-হিতৈষিতা দেখাইতেন। অতি অল্পবয়সে তিনি স্বয়ং যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং রাজ্য-শাসন-ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩০০খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্লোরেন্স নগরীর বিচারকপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় ইটালীতে রাজনৈতিক দল ছিল—একদলের নাম গুয়েল্‌ফ, অপরদলের নাম ঘিবেলীন। দান্তে গুয়েল্‌ফ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিছুকাল দান্তে অতি উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন এবং প্রথমে তাঁহার দল ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু দৈবের হস্ত হইতে এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহার দল ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। এই হীনবলের কারণ আত্মবিবাদ। পৃথিবীর যত অনিষ্ট হয় তাহার কারণ যদি অনুসন্ধান করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে আত্মবিবাদই অধিকাংশ অনিষ্টের মূল। আমরা যে স্বদেশের নিমিত্ত কোন কাজ করিতে পারি না, তাহার কারণ কি আত্মবিবাদ নয়? আমরা মাতৃদুগ্ধের সহিত আত্মবিবাদ-বিষ পান করিয়াছি, মৌন অবস্থা হইতেই অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়াছি,—কুরুক্ষেত্র হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে আত্মবিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই পাপকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া অতি সহজ কার্য্য নয়। আমাদিগের মধ্যে যখন কেহ সদভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া

দেশের মঙ্গলবিধান করিতে চেষ্টা করেন, তখন যদি আমরা তাঁহার কোন কুমৎলব আছে এইরূপ ঠিক করিয়া শুভ-কার্য্যে বিঘ্ন দিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলেই আমাদিগের মধ্য হইতে আত্মবিবাদ চলিয়া যাইবে নচেৎ চিরকাল থাকিবে। শত্রুদিগের সহিত যুঝিতে না পারিয়া দান্তে যখন ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহাকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অনেক বৎসর নির্ব্বাসিত-অবস্থায় যাপন করিয়া চতুর্দ্দিকের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া অতি অসহায় অবস্থায় দান্তে ১৩২১ খৃষ্টাব্দে রেভেনা নগরে প্রাণ-ত্যাগ করেন। মরিবার সময় তিনি বলেন "Hero I am laid shut out from my native shore."—"জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইখানে আমি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলাম"। ফ্লোরেন্সবাসীদের এই নিষ্ঠুরতা চিরকাল সকলের মনে থাকিবে। ফ্লোরেন্সবাসীদিগের অকৃতজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া Byron তাঁহার Child Haroldএ বলিয়াছেন "Ungrateful Florence, Dante sleeps afar!" "অকৃতজ্ঞ ফ্লোরেন্সবাসী দান্তে তোমাদিগের নিকট হইতে অনেক দূরে শয়ন করিয়া আছেন!" একবার দান্তেকে অনুতপ্তবেশে, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি মরণকেও স্বীকার করিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন না, আত্মমর্য্যাদার অত্যুচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন "কখনই না, শরীরে একবিন্দু মাতৃরক্ত থাকিতে আমি এইরূপে নীচভাবে স্বদেশে প্রবেশ করিব না, যদি কেহ এইরূপ পথ দেখাইয়া দিতে পারে, যেখান দিয়া গমন করিলে আমার সম্মানের কিছুমাত্র হানি হইবে না, তাহা হইলে দ্রুতপদক্ষেপে, অতি আহ্লাদের সহিত সেই পথ দিয়া জন্মভূমিতে প্রবেশ করিব নচেৎ আমি স্বদেশে আর প্রত্যাগমন করিব না।" আমরা যদি দান্তের অবস্থায় পড়িতাম তাহা হইলে অতিশয় বুদ্ধিমানের মত বলিতাম "আঃ! বাঁচা গেল, আর কষ্টভোগ করিতে হইবে না, গলায় চাদর দিয়া কাণ মলিতে মলিতে দেশে প্রবেশ করিতে হইবে এই বই ত নয়, এ আর কেন পারিব না, বাপরে! এমন সুবিধা কি ছাড়া যায়?" এই বলিয়া যত শীঘ্র পারিতাম প্রবেশ করিতাম। সুবিধা ছাড়িতে আমাদিগের মত জাতি বোধ হয় কোনকালেই প্রস্তুত নহে।

ঊষার আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় দান্তের চরিত্রে কোমল ও কঠোর এই দুই বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার ও গর্ব্ব দেখিয়া সংসারের প্রতি দান্তের কেমন অশ্রদ্ধা হইয়াছিল, হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রাণ-প্রতিমা বিয়াত্রীচকে যে অকৃত্রিম প্রেম করিতেন সেই প্রেমের অকাল-অবসানে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। অধরে হাসির রেখা থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে বিষাদের ছায়া ছিল, পৃথিবীর অন্যায়াচরণ দেখিয়া তিনি বাহিরে হাস্য করিতেন বটে কিন্তু অন্তরে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতেন; মনুষ্যের প্রত্যেক পদস্খলন তাঁহার নিকট অতি গুরুতর বলিয়া বোধ হইত বটে কিন্তু পদস্খলিতের উপর তাঁহার অনুকম্পা ছিল, তাঁহার সঙ্কল্প অতি দৃঢ় হইলেও তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গের মৃদু জ্যোতিতে পরিপ্লুত ছিল; কর্ত্তব্যের কঠোর আদেশকারী হইলেও তাঁহার হৃদয় হইতে সদাই করুণার উৎস উৎসারিত হইত, তাঁহার হাস্য বিকটরূপী হইলেও তাহার মধ্যে অনুকম্পা-রেখা দেখিতে পাওয়া যাইত।

এইখানে অধ্যাপক Dowden যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"We know the type of character which the influence send to form high strung intense with eye of spiritual vision; severe, yet with springs of exquisite tenderness welling from the rock, one who has the girdle always knotted about his loins and his lamp ever burning. Dante, is indeed definite exact and severe, he if ever any teacher says to his pupil, "Be accurate." And in the midst of severity there spring up in Dante's nature wells of the finest pity and tenderness."

দান্তে স্বদেশের নিমিত্ত খাটিবার যেরূপ সুবিধা পাইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা আমাদিগের অনেক বেশী সুবিধা আছে। ইচ্ছা করিলে আমরা এরূপ কার্য্য করিতে পারি যাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যজগৎ বিস্ময়ে অভিভূত হইতে পারে। আমাদিগের এত অভাব আছে যে তাহা দূর করিতে পারিলে

আমাদিগের নাম চিরকাল অমর হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা অলসতায় এত জড়ীভূত হইয়া আছি, যে আমাদিগের অভাব আছে বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয় না, তা অভাব দূর করিব কি? পল্লীগ্রামে কতশত অভাগা বিষাক্ত পুষ্করিণীর জলপান করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত নাই, আমাদিগের দেশের লোকেরা এত হীনবল হইতেছে কেন তাহার কারণ উদ্ভাবন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করি না, কাজের মধ্যে আমরা কেবল আবদার করিতে পারি এবং সাধুতার দোহাই দিয়া বলিতে পারি—"If any one smites you on the right cheek turn him the left one."

আজ যে ইটালীর এত উন্নতি দেখিতেছি তাহা কেবল দান্তের আজীবন অমানুষিক পরিশ্রমের ফল,—আজ যে ইটালীকে স্বাধীন দেখিতেছি সেই স্বাধীনতার বীজ দান্তে যথার্থ বপন করেন,—আজ যে চিত্রনৈপুণ্যের নিমিত্ত ইটালী বিখ্যাত সেই চিত্রনৈপুণ্যের প্রাণদাতা দান্তে। দান্তেই যথার্থ স্বহস্তে ইটালীকে নির্ম্মাণ করেন। তিনি যদি আমাদিগের ন্যায় বিলাসিতার পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ভারতের ন্যায় ইটালীও আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিত। দান্তে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সেই কার্য্যে তাঁহার হস্তের চিহ্ন পড়িয়াছে; সেই চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে কালও অসমর্থ। ইটালীয়রা যখন ভীষণ অন্ধকারে পথ হারাইয়া ভ্রমণ করিতেছিল তখন দান্তে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা কালকে দগ্ধ করিতে পারে কিন্তু কাল তাহাকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না। দান্তে আর নাই, মুমূর্ষ ইটালীকে প্রাণদান করিয়া তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সমাধির উপরে ইটালীয়ানদের অশ্রুবারি ঝরিতেছে,—তাহারা স্বপনে তাঁহাকে দেখিতেছে, তাঁহার কথা শুনিতেছে, আজ ইটালী তদ্গত-প্রাণ। দান্তে যে কেবল ইটালীয়ানদের দান্তে তাহা নহে, তিনি আমাদের দান্তে, তিনি জগতের দান্তে, তাই তাঁহার নিমিত্ত আমরাও শোক প্রকাশ করি।

আমাদের সাহিত্য সাধনা

মৌলভী মুহম্মদ মন্‌সুরউদ্দীন এম-এ

সাহিত্য জাতির নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষার রূপময়ী মূর্ত্তি। যে আশা-বেদনা সুখ-দুঃখ জাতির মন চঞ্চল ক'রে তুলে সাহিত্যে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাহিত্যরূপ সুধা পরিবেশন করতে হ'লে বহু শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন, তবেই তা সম্ভবপর। জাতি তিলেতিলে যে রস সংগ্রহ করে তা পরে অন্যান্য জাতিরও রসবস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়।

বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিকে নজর দিলে আমরা আলাওল প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমানের সাক্ষাৎ পাই। বাঙলা সাহিত্য গ'ড়ে তুলতে যথেষ্ট তাঁরা করেছেন।

ভারতচন্দ্র ও হায়াত মাহমুদ একই যুগের লোক এবং হায়াত মাহমুদের সাধনা সত্যই বাঙলা সাহিত্যে অনুপম। আরবী-পারসী-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ আলেম হ'য়েও তিনি একনিষ্ঠভাবে বাঙলা ভাষার সেবা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলে মনে হয়—এই কবির অভ্যুদয়।

বাঙলা সাহিত্য গ'ড়ে তুলতে প্রাচীনকালের মুসলমানেরা যেমন একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আধুনিককালের মুসলমানেরা সেই সাধনা-ধারা কতদূর রাখতে পেরেছেন তা একবার খোঁজ ক'রে দেখা যাক্।

১৭৫৭ তে মুসলমানদের পক্ষে জাতীয় জীবনের এক শোচনীয় অধ্যায় সুরু হ'ল। এ অধ্যায় শুধু নিশ্চেষ্টতা, মূঢ়তা ও কর্ম্মবিমুখতার যুগ।

বাঙলা ভাষা যে মুসলমানদের মাতৃভাষা নয় এ সম্বন্ধে একদল লোকের ধারণা এই সে দিন পর্য্যন্তও বদ্ধমূল ছিল।

এই মনোবৃত্তির মূলে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি গভীর ঔদাসীন্য রয়েছে। এককথায় বাঙলা সাহিত্য ব'লে যে একটা সাহিত্য আছে এই সাধারণ জ্ঞান এককালে একদলের অনুন্নত শিক্ষিত মানুষের কাছে অ-জাগ ছিল। বাঙলা সাহিত্য যাঁরা আলোচনা করতেন তাঁরা তাঁদের অনুকম্পার যোগ্য ব'লে মনে মনে ঠাউরাতেন। এর ফল হয়েছে, কোন চিন্তাশীল সুশিক্ষিত মুসলমান বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়ে আপনার কথা প্রকাশ করতে সাহস পান নাই। বাঙলা ভাষা মুসলমান অশিক্ষিতের ভাষাই র'য়ে গেছে।

তবুও বাঙলা সাহিত্য-সেবায় কয়েকজন বাঙালী মুসলমান আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সাধনায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছিল। মুন্সী রিয়াজউদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, মুন্সী মোজাম্মেল হক এই তিনজন মনীষী সেই অন্ধকার যুগে একান্তভাবে এই কার্য্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। মরহুম মোশারফ হোসেনও এই যুগের লোক।

মুন্সী রিয়াজউদ্দীন সাহেব পূর্ব্ববাঙলার লোক; শেখ আবদুর রহিম ও মোজাম্মল হক সাহেবান পশ্চিমবাঙলার লোক। কিন্তু এই তিনজন প্রথম যুগে একেবারে হরিহরআত্মা ছিলেন। তিন বন্ধু মিলে খবরের কাগজ প্রকাশের প্রয়াস পান।

মুসলমানদের মধ্যে এই সময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছিল। মৌঃ নওয়াব আলী চৌধুরী, জজ আমির আলী, মিঃ শামসুল হুদা প্রভৃতি মনীষী বাঙলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিলেন; এবং এই দলের নেতা ছিলেন ঢাকার উজ্জ্বলরত্ন নওয়াব সলিমুল্লাহ সাহেব।

সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু এই তিন বন্ধুর কারুই এ বিষয়ে সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং তাঁরা ঢাকার নবাব সাহেবের শরণাপন্ন হন। এঁদের চেষ্টার ফলে "সুধাকর" প্রকাশিত হয়। সুধাকর মুসলমানদের নব চেতনার সৃষ্টি করে। এই সময় "মিহির" নামীয় অন্য একখানি কাগজও বের হয়। তৎকালীন অশিক্ষিত মুসলমান-সমাজে দুইখানি কাগজ চলা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। ফলে এই দুই কাগজ একত্র সম্মিলিত করা হয় এবং "মিহির ও সুধাকর" নামে প্রচারিত হয়।

মিহির ও সুধাকরের সময় নবনূর প্রকাশিত হয়। নবনূরের প্রভায় বাঙলার ঘনান্ধকার আকাশ সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠে—সাহিত্যের এক নব প্রচেষ্টার আয়োজন মহাসমারোহে চল্‌তে থাকে। "অগ্নিকুক্কুট"এর গ্রন্থকার পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন, "কোরানে"র অনুবাদক মৌলবী তস্‌লিমউদ্দীন প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের রচনাসম্ভারে "নবনুরের" ডালি পূর্ণ থাকত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "বান্ধব" এই সময় ঢাকায় চল্‌তে থাকে। নবনূর ও বান্ধবের প্রবন্ধাদি নিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মধুর ও কষায় বাদপ্রতিবাদ করতেন।

এক কথায় এঁরা আধুনিক কালের সাহিত্যের বনিয়াদ গ'ড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

শেখ আবদুর রহিম সাহেবের "হজরত মোহাম্মদের জীবনী ও ধর্ম্মনীতি" তৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। তৎকালে লোকের এমনি ধারণা ছিল যে বাঙলা ভাষায় ও-বিষয়ে বই লিখ্‌লে চলতে পারে না, অর্থাৎ তা সমাজ গ্রহণ করতে রাজী হবে না; এবং এইজন্য আলিয়া মাদ্রাসার আরবী-পারসী অধ্যাপকদের ওই বইয়ের জন্য সনদ নিতে হয়েছিল।

মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন সাহেবের সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধাবলীও এই সময় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারলাভ করে। নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবও সাহিত্যসেবীদিগকে আর্থিক উৎসাহ বাদেও স্বয়ং গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। "হজরতের মিলাদ" তাঁর মধুর রচনা।

এই সমস্ত সাহিত্যিক কলিকাতা ও তার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মেলার সুযোগ ও সুবিধা পেতেন। কিন্তু সুদূর মফঃস্বলেও সাহিত্যসাধনা নীরবে চলেছিল।

হজরত মখদুম সাহেবের কর্ম্মভূমি রাজসাহীতে মির্জ্জা ইয়সুফ আলী সাহেব মুসলমান-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গাজ্জালীর কিমিয়ায় ই সায়াদত-এর বঙ্গানুবাদ সুসম্পন্ন করেন। "সৌভাগ্য স্পর্শমণি" একখানি অপূর্ব্ব ও বিরাট

গ্রন্থ। এমন গ্রন্থ সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে দুইখানি নাই। ইসলামের কৃষ্টি ও দর্শন সম্বন্ধে এমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল বই আর নাই। এই বইখানা বাঙলার মুসলমানদের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করেছে।

মুসলমান ধর্ম্মের অমূল্য গ্রন্থ কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ একজন অমুসলমানের প্রাপ্য। কিন্তু ঐ গ্রন্থ মুসলমানদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই, কেননা মুসলমান পণ্ডিতেরা ঐ গ্রন্থকে একদেশদর্শী অনুবাদ নামে আখ্যাত করেছেন।

ময়মনসিংহের করটিয়া হ'তে কোরানশরীফের এক সুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উহার অনুবাদক মৌলবী নইমুদ্দীন সাহেব। এই গ্রন্থখানি বাঙলার মুসলমানদের ধর্ম্মজীবন অর্থপূর্ণ ক'রে তুলে।

মুসলমানদের সাহিত্যসাধনা বিশেষ সমারোহে চল্‌ছিল। মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেবের নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য উচ্চ সাহিত্য পদবীলাভে বঞ্চিত। কিন্তু সাহিত্যের যা প্রধান গুণ তা তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত। এককালে বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যিনি মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেবের বক্তৃতা বা রচনাবলী পাঠ করেন নাই। তাঁর রচনার ভঙ্গী মনোমুগ্ধকর, ওজগুণপূর্ণ, ও ভাষা লঘু ও প্রাঞ্জল।

সাহিত্যসাধনার ও গবেষণার বন্ধুর পথের যাত্রী মুন্সী আবদুল করিম সাহেবের নাম বাঙলায় সুপরিচিত। তিনি বাঙলার দধীচী। তিনি একান্তভাবে সাহিত্যসাধনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই জ্ঞানতপস্বীর নির্জ্জন সাধনা ও আত্মত্যাগ বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। অন্য কোন দেশে হ'লে তিনি রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন।

শেখ ফজলল করিম প্রভৃতি সাহিত্যিকবর্গ নিয়মিতভাবে "ইসলামপ্রচারে" রচনা দিতেন। ইস্‌লামপ্রচার জনসাধারণের মধ্যে খুব প্রসারলাভ করেছিল। এই মাসিক পত্রিকাখানিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ থাকত।

সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব "নবনূরের" সম্পাদক ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যের সেবা করেছেন। তাঁর "ডালি", "তাপসী রাবেয়া" সাহিত্যিক সমাজে বেশ সমাদৃত।

কবি কায়কোবাদ ও কবি মোজাম্মল হক দুইজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি। হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁদের কাব্যপাঠে আনন্দিত হন।

মৌলানা আকরম খাঁ ও মৌলানা মনিরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদী সাহেব উভয়েই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। তবুও তাঁরা গবেষণার পাষাণপথে মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। গ্রন্থকার হিসাবে খাঁ সাহেব অল্পবয়স্ক। তাঁর মোস্তাফা-চরিত এই সেদিন বের হয়েছে। কিন্তু ইস্‌লামাবাদী সাহেবের "ভারতে মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস" অনেকদিন আগেকার লেখা। আসল কথা এই যে এই দুটি লোকই মাদ্রাসায় শিক্ষিত ও সেকেলে, তবুও বাঙলা সাহিত্য-সেবায় ত্রুটি করেন নাই।

নবপর্য্যায় "সুলতান" বের হওয়ার পূর্ব্বে ইসলামাবাদী ও সিরাজী সাহেব প্রভৃতির চেষ্টায় একবার সুলতান জনসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। সংবাদপত্র-পরিচালনা ও প্রচারে খাঁ সাহেব ও ইস্‌লামাবাদী সাহেব উভয়েই দক্ষ। মোহম্মদী জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় মন্ত্রবাদী। উহা দেশের মধ্যে খুব প্রচারিত হয়েছে।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী কবি ও ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সিরাজী সাহেবের ভাষা পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর ন্যায় অত্যন্ত বেগবতী কিন্তু অগভীর। তিনি সুবক্তাও বটেন।

শিশুসাহিত্য-রচনায় খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক বেশ পটু ছিলেন। তাঁর "নবিকাহিনী" প্রভৃতি বই শিশুসাহিত্যে ক্লাসিকে পরিণত হইয়াছে। তাঁর লেখা বেশ ঝরঝরে ও সরল।

অতিআধুনিক কালের বাঙলা সাহিত্যসেবীদের মধ্যে মিঃ এস ওয়াজেদ আলীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশী নাই; এবং তিনি যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও

প্রাণবন্ত যত্ন নিয়ে সাহিত্যচর্চ্চা করেন তাও আমাদের মধ্যে সুদুর্লভ।

এতদিন আমাদের লেখার মধ্যে বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা মতবাদ ফুটে উঠে নাই। সম্প্রতি তা আজকালকার সাহিত্যে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী নূতন চিন্তা ও ভাবনার জয়যাত্রা চলেছে। তার পুলকশিহরণ বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিককেও উতল ক'রে তুলেছে। জরাজীর্ণ পুরাতনকে নির্ব্বিচারে আর কেহ এখন গ্রহণ করতে রাজী নহেন। পুরাতনকে পরীক্ষা ক'রে তবে আসন দিতে এঁরা প্রয়াস পাচ্ছেন।

এই নূতন চিন্তাধারাবাহক হিসাবে মিঃ এস্ ওয়াজেদ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যসাধনাকে একটি বিশিষ্ট নিজস্ব মূর্ত্তি দিতে চেষ্টা করেছেন। এতদিন সাহিত্যে নিয়ে লোকে খেয়াল-খুশীমত যা'ই সাধ হ'ত তা'ই করতেন; কিন্তু তিনি ঐ উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সত্যই সাহিত্য যদি একটি বিশিষ্ট পথ কেটে না বেরুল তাহ'লে তার যে ক্ষতির পরিমাণ তা খুব বেশী। উহা প্রকৃত প্রভাব ও শক্তি পরিচালনা করতে পারবে না। মিঃ ওয়াজেদ আলীর লেখা বেশ সুন্দর, ভাষা হিসাবে তিনি বীরবলপন্থী; এবং চিন্তায় যুক্তিবাদী-মতবাদেরই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঢাকার অধ্যাপক আবদুল ওদুদ ও মৌলবী আবদুল হুসেন সাহেবদের মাঝে এইখানে পার্থক্য। ঢাকার দল নতুন ক'রে গড়তে চান, এবং এই জন্য তাঁদেরকে নিয়ে সাহিত্যিক মহলে বেশ একটু হৈ চৈ প'ড়ে গেছে; কিন্তু মিঃ ওয়াজেদ আলী পুরানকে সংস্কার করতে চান। উভয় দলই শক্তি ও খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। অধ্যাপক ওদুদের ভাষা অতি চমৎকার। এমন ভাষার উপর দক্ষতা বাঙলায় আর কোন সাহিত্যিকের নাই।

এই নূতন গতিশীল সাহিত্যে একজন মহিলার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যে আমাদের মনের কথা ফুটে উঠছে। এবং সে কথা আমরা এই মহিয়সী মহিলার মুখে প্রথম শুনি। তাঁর নাম হ'চ্ছে মিসেস আর, এন্ হোসেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ও বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের বাঙালাদেশের অশিক্ষিতা অবরোধবাসিনীদের কল্যাণসাধনের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি। তাঁর লেখা "মতিচুর" প্রভৃতি গ্রন্থ একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হ'য়ে রচিত। তাঁর রচনা বেশ মধুর ও অম্লরসযুক্ত।

তাঁর অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ ক'রে মিসেস্ এম রহমান "চানাচুর" প্রকাশ করেন। মিসেস্ রহমানের লেখাও বেশ ওজগুণসম্পন্ন এবং মাঝে মাঝে তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ। নারীদের লেখায় যে আমাদের সাহিত্য মুখরিত হ'য়ে উঠছে, উহা আনন্দের কথা। নারী হ'চ্ছে জাতির মা।

সাহিত্যে যে আমাদের নানা সমস্যার ও প্রশ্নের সমাধানের কথা উঠেছে তা বড়ই আশার কথা। বিশ্বব্যাপী মুস্লিম জগতে যে ভয়ঙ্কর আন্দোলন চলছে তার ঢেউ আমাদের অতি ক্ষীণ বাঙলা ভাষার প্রাণে এসেও লেগেছে। সাহিত্যে যখন জাতির মনের কথা ধরা পড়বে তখনই উহা যথার্থ সাহিত্য-পদবাচ্য হবে। সাহিত্যে ভাবতে শেখাই বড় কথা। এবং আমরা ভাবতে শিখেছি—তার প্রমাণ আমাদের সাহিত্য। বিশ্বের সাহিত্য আমরা আমাদের নিজস্ব এ সুরটি যেন ভাল ক'রে প্রকাশ করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা।

মাধুকরী

শ্রী পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

অপ্‌রাজিতে! অপ্‌রাজিতে! শোন্‌লো কথা—একটি কথা,
একটি কথা শোন্‌,—
কাঁদিস্‌ কেন চুপটি ক'রে একলাটি তুই আপন ঘরে,
ব্যথায় দহিস্‌ কোন?
আজকে আমি নই কারু আর, মোর জীবনের সব গুরুভার
তোর পদে দিই চুপে,
হাত ধ'রে মোর যেথায় নিবি, সেইখানেতেই আমায় পাবি
শান্ত স্বরূপ-রূপে।

দাঁড়া, দাঁড়া, ক্ষণিক দাঁড়া,—পারুল হোথায় কাঁদছে যে—
অভিমানে মরল হায়—!
কি হ'লো গো পারুল তোমার?—তোমার বুকেই বুকটা দিয়ে
পরাণ আমার মরণ চায়।
তুমি আমার সত্যিকারের চাওয়া-পাওয়া পরম বঁধু,
তোমার কাছে চাইছি ক্ষমা,
যা কিছু মোর নেবার আছে বুকের থেকে জমাট মধু
তোমার কাছেই নেব—রমা!

দূর থেকে ও ডাক্‌ছে কে গো, আমি যেন চিনি চিনি,
মোর জীবনের ভোরের বেলা—
ওরেই যেন পেয়েছিলেম বিশেষ ক'রে বুকের মাঝে,
খেলেছিলেম প্রাণের খেলা।
আজ্‌কে আমি কেমন ক'রে মূল্যবিহীন করি ও'রে,
নাই বুঝি ও'র একটি দলের দাম্‌,—
মোর অতীতের কয়েকটা দিন ওই দিয়েছে রঙিন ক'রে,—
'নলিনী' ও'র অনেক সাধের নাম।

সোনা! তুমি কাঁদছ ব'সে ঘরের কোণে রুদ্ধ হাওয়ার চাপে,
রঙটা তোমার কেঁদেই শুধু মরে—
তোমার বুকে স্থান নেব যে এমন সাহস নাইক আমার,
তোমার চাওয়া শুধুই পাগল করে।
যেদিন তুমি ফুল হ'য়ে গো ফুটবে সবার মাঝে
ধূলায় ধূসর এই ধরণীর বুকে,
আপনি সেদিন যাবে খ'সে তোমার আমার মাঝের সীমারেখা,
মান্‌-অভিমান সেদিন যাবে চুকে'!

মা—ঘরে ও বাহিরে

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যাঁহারা মানুষের হিতসাধন সকলের চেয়ে বেশী করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বার্থবুদ্ধি হইতে তাহা করেন নাই। মানুষের মনে অন্যের প্রতি যে করুণা, সমবেদনা এবং প্রীতি আছে, তাহারই প্রেরণায় তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষতিলাভ গণনা না করিয়া, অনেক স্থলে নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখ, আরাম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া, এবং কখন কখন নানাবিধ বিদ্রূপ, উৎপীড়ন, অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া তাঁহারা মানবের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই মহৎ চেষ্টায় অনেকের প্রাণান্তও হইয়াছে।

সত্য বটে, জগতে সকলে সুখী না হইলে চিন্তাশীল একজন মানুষও সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। মুক্তি সম্বন্ধেও একজন বোধিসত্ব বলিয়াছেন, যতদিন একটি জীবেরও মুক্তি হইতে বাকী থাকিবে, ততদিন তিনি মুক্তির প্রার্থী নহেন। কিন্তু জগতের মহামানবেরা একারণে সকলের কল্যাণ ও

সুখ-সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন নাই, যে, অন্য সকলের সুখ না হইলে তাঁহাদের সুখ হইবে না, কিম্বা অন্য সকলের মুক্তি না হইলে তাঁহাদের মুক্তি হইবে না। তাঁহারা অন্তর্নিহিত প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া লোকশ্রেয়-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই মত আরও অনেকে এখনও মানুষের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

অতএব স্বার্থবুদ্ধি অপেক্ষা প্রেমের প্রেরণাই অধিকতর শক্তিশালী, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু লোকহিতসাধন দ্বারাই নিজ নিজ স্বার্থ ভাল করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাও সত্য। জননীদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সুশিক্ষিতা সুমাতা তাঁহার সন্তানদের স্বাস্থ্য, বল, জ্ঞান, সৎচরিত্র, ধনসম্পদ এবং আনন্দ কামনা করেন।

সকলেই জানেন, কেবল নিজের ঘর-বাড়ীটি পরিষ্কার রাখিলেই শিশুদের ও পরিবারস্থ অন্য সকলের স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না। পল্লী, গ্রাম ও সহর পরিষ্কার না রাখিলে কোন বাড়ীর লোকই নিরাপদ নহেন। বস্তুতঃ রোগের বীজ এরূপ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া দেশব্যাপী হয়, যে, কোন একটি পল্লীর কোন একটি পরিবারকে রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে নির্ভয় করিতে হইলে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি মন দেওয়া দরকার। ইহাও কম করিয়া বলা হইল। রোগ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া নানাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহামারী হইয়াছিল, তাহা স্পেন দেশ হইতে আসিয়াছিল। এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাহাতে রোগবীজের আমদানি-রপ্তানি না হয়, তাহার জন্য যে-সব বন্দরে যাত্রীজাহাজ লাগে, সেখানে যাত্রীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার নিয়ম আছে। কোন আগন্তুক যাত্রীর সংক্রামক পীড়া থাকিলে তাহাকে বন্দর যে-দেশের সেদেশে অবিলম্বে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, রোগমুক্ত হইবার পর তাহাকে ঢুকিতে দেওয়া হয়। প্রাচ্য মহাদেশের কোথায় কি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহার খবর সিঙ্গাপুর হইতে সভ্য-জগতে দিবার জন্য লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ (জাতিসঙ্ঘ) ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, নিবার্য্য রোগের হাত হইতে যথাসম্ভব নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কেবল নিজের পল্লী, গ্রাম, নগর, জেলা, দেশ, মহাদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলে না, জগদ্ব্যাপী বন্দোবস্তের দরকার। এইরূপ বন্দোবস্তের চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে কেবল পুরুষেরা থাকিলে চলিবে না, মহিলাদিগকেও থাকিতে হইবে। বস্তুতঃ আধুনিক সময়ে মানবের কল্যাণের জন্য যত চেষ্টা হইতেছে তাহাতে জননীর জাতির প্রভাব লক্ষিত হইতেছে।

দুর্নীতির পরিপোষক সামগ্রী বহুদূরে উৎপন্ন হইলেও তাহা যে উৎপত্তিস্থান হইতে সুদূরে অবস্থিত দেশেরও অনিষ্ট করিতে পারে, বায়োস্কোপের কোন কোন চলচ্চিত্র তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রস্তুত কুৎসিত চলচ্চিত্র আমাদের দেশেরও লোকদের মন ও চরিত্র কলুষিত করিতে পারে। অতএব, আজকাল কেবল নিজের দেশের দুর্নীতির কারণগুলার উচ্ছেদের উপায় চিন্তা করিলেই চলিবে না, দূরতম দেশের কল্যাণচিন্তাও করিতে হইবে।

অনেক কু-অভ্যাস, ব্যসন ও পাপ আছে, যাহাতে স্বাস্থ্যহানি এবং দৈহিক ও আত্মিক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এই সব কু-অভ্যাস, ব্যসন ও পাপ হইতে জননীরা কেবল নিজের নিজের সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হইলে চলিবে না। তাহারা তাহাদের বয়স্যদের সহিত মিশিবেই। এই বয়স্যদিগকেও স্বাস্থ্য ও শক্তির হ্রাসের ঐসকল কারণ হইতে রক্ষা করা দরকার। নতুবা সঙ্গদোষে ঐসব কু-অভ্যাস, ব্যসন ও পাপ বিস্তৃতিলাভ করিবে। বলিতে পারেন, "আমার সন্তানদিগকে কাহারও সহিত মিশিতে দিব না।" সন্তানদিগকে এইরূপ আলাদা করিয়া আগলাইয়া রাখা কাহারও কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, অধিকাংশের পক্ষে নহে। যাহাদের পক্ষে সম্ভব, তাহাদেরও সন্তানেরা সম্পূর্ণ নিজের পরিবারের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে, মানুষ সামাজিক জীব বলিয়া পরস্পরের সংস্পর্শে সংঘর্ষে ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার চরিত্রের যে উৎকর্ষ ও দৃঢ়তা সাধিত হয় এবং সামাজিকতার যে আনন্দ সে পায়, তাহা হইতে পৃথক-রক্ষিত শিশু ও বালকবালিকারা বঞ্চিত হয়। তদ্ভিন্ন, যাহারা দীর্ঘকাল আলাদা গৃহদুর্গে

রক্ষিত হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর মনুষ্যের সহিত মিলামিশার সময় তাহাদের যথেষ্ট আত্মরক্ষার ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

অতএব, এ ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে, নিজ নিজ সন্তানদের মঙ্গলসাধনের উপায় অপর সকলের সন্তানদেরও মঙ্গলসাধন।

অজ্ঞপ্রধান মূর্খপ্রধান সমাজে জ্ঞানী হওয়া বড় কঠিন; কারণ আমরা কেবল বিদ্যালয়ে পুস্তক ও পত্রিকাদি হইতেই জ্ঞানলাভ করি না, পর্য্যবেক্ষণ হইতে জ্ঞানলাভ করি, এবং সর্ব্বসাধারণ যাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকি এবং যাহাদের সহিত মিশি সকলের নিকট হইতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে শিক্ষালাভ করি। এই "সর্ব্বসাধারণ" যত জ্ঞানী হইবে, আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের জ্ঞানও তত অধিক হইবে। অজ্ঞানী ও কুসংস্কারাবিষ্ট লোকদের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া নিজেরা মূঢ়তা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত থাকিবার এবং সন্তানদিগকে মুক্ত রাখিবার আশা করা বৃথা। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন চাকর-চাকরাণীদের দ্বারা শিশুদের মন স্বভাব চরিত্র অলক্ষিতে কেমন করিয়া কু-গঠিত ও বিকৃত হয় সে কথা অনেকে ভাবেন না। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন পরিবারের শিশুদিগের সহিত মিশিয়া শিক্ষিত পরিবারের শিশুদেরও ক্ষতি হয়।

অতএব নিজের সন্তানদিগকে প্রকৃত জ্ঞানী করিতে হইলে সমাজের সকল শ্রেণীর ও স্তরের সকল বয়সের নর-নারীর মধ্যে জ্ঞানবিস্তার একান্ত আবশ্যক। আগে যে সব কথা লিখিয়াছি, তাহাতেই কতকটা বুঝা যাইবে যে, সমাজ ভাল না হইলে সন্তানদিগকে ভাল রাখা দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেও চলে। মুক্ত বাতাসে আসিলেই যে পীড়িত হয় সে সুস্থ মানুষ নহে। তেমনি, অন্য মানুষের সঙ্গে মিশিলেই যাহার চারিত্রিক স্খলনের সম্ভাবনা আছে মনে হয়, তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা কোথায়? কিন্তু ক্রমাগত কুচরিত্রের সংস্পর্শে ও প্রভাবে আসিয়াও ভাল থাকিতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়। সেইজন্য কোনও মানুষকে—বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক মানুষকে—সচ্চরিত্র করিবার ও রাখিবার একটি প্রধান উপায় অন্য সব মানুষেরও চারিত্রিক উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখা।

এ পর্য্যন্ত আমরা মানুষের যে-সব সম্পদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম, ধনসম্পদের চেয়ে তাহা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ধনসম্পদ সম্বন্ধেও ইহা সত্য, যে, গরীবের দেশে তত বেশী ও তত অধিক সংখ্যক ধনী থাকিতে পারে না যত থাকিতে পারে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী লোকদের দেশে। ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ; ইহার জনপ্রতি গড় আয় ইংলণ্ডের বা আমেরিকার জনপ্রতি গড় আয় অপেক্ষা অনেক কম। সেইজন্য আমাদের দেশেও লক্ষপতি ক্রোরপতি থাকিলেও আমেরিকায় যতজন লক্ষপতি ও ক্রোরপতি আছে, আমাদের দেশে তত নাই; এবং আমেরিকার যত জন ক্রোরপতির প্রত্যেকের যত কোটি করিয়া টাকা আছে, আমাদের দেশে কাহারও তাহা নাই। ধনীর দেশেই যে খুব ধনী হইতে পারে, তাহার কারণ মোটামুটি সহজেই বুঝা যায়। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করাই ধনী হইবার সকলের চেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সস্তা ও দামী পণ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা প্রভূত মূলধনসাপেক্ষ কারখানার উপর নির্ভর করে। সেরূপ মূলধন যোগান ধনীর দেশের লোকদের পক্ষেই সম্ভব। তাহার পর উৎপন্ন জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে বেশী পরিমাণে কিনিবার লোক না থাকিলে ধনশালী হইবে কি প্রকারে? অতএব বিক্রেতাকে ধনী হইতে হইলে অন্ততঃ সচ্ছল অবস্থার বহু ক্রেতা আবশ্যক। সঙ্গতিপন্ন সমাজেই তাহা সম্ভব। ওকালতী ব্যারিষ্টারী করিয়া অনেককে ধনী হইতে সঙ্গতিপন্ন বহু মক্কেল চাই, এবং তাহা সঙ্গতিসম্পন্ন সমাজেই সম্ভব। জ্ঞানবত্তার পরিমাণ অনুসারে সব দেশে অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা কম টাকা পান। কিন্তু দরিদ্রের দেশে তাঁহাদের আয় ধনীর দেশের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের আয় অপেক্ষা অনেক কম। অন্যান্য নানা ব্যবসা ও বৃত্তির আলোচনা করিয়াও ইহা বুঝা যায়, যে, ধনীর দেশে ধনী হওয়া যত সহজ, দরিদ্রের দেশে তত সহজ নহে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে নিরানন্দ দেশে এবং সমাজেও অল্পসংখ্যক লোক আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিতে পারে; কিন্তু সেরূপ দেশে ও সমাজে হৃদয়বান্ কাহারও আনন্দ হইতে পারে কি?

জননীগণ সকলের শ্রেয়ের পথের পথিক হইলে নিজ নিজ সন্তানদের জন্য শ্রেয় লাভ করিতে পারিবেন।

বাংলার চিত্রকলা

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

আর্টের সম্বন্ধে কথা উঠিলেই একদল বলিয়া থাকেন "ইণ্ডিয়ান আর্ট বুঝি না, লম্বা লম্বা হাত-পা।' তাঁহারা বোঝেন গ্রেস্কো বেবির ছবি অথবা রেলোয়ে বুকষ্টলের দু'পেনি দামের মেগাজিনের সুন্দরী মেয়ের মুখ। এঁরাই হাত-মাথা নাড়িয়া বলিয়া থাকেন 'ইণ্ডিয়ান আর্ট লম্বা লম্বা হাত-পা।' আচ্ছা, এই সব শিল্পরসিকেরা কিরূপ চিত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন? তাঁহাদের গৃহে হয়ত দেখিব একটি চিত্র টানানো আছে, নাম হয়ত "সিক্তবসনা"—কলিকাতার বহুসমাদৃত এক মাসিকপত্র হইতে কাটিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। একটি স্ত্রীলোক কলসী-কাঁখে ভিজা কাপড়ে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া আছে, নীচে আবার দুই ছত্তর জ্ঞানদাসের বৈষ্ণব-পদাবলী লেখা আছে। বিলাতী বিজ্ঞাপন বা কেলেণ্ডারের ছবিও ইঁহাদের নিকট কম আদর পাইয়া থাকে না—চিত্রের বিষয় হয়ত, একটি মেমসাহেব ধূমপান করিতেছেন, ঠোঁটে আর দুই গালে সিঁদুর-মাখান। এই মেমসাহেবকেই যদি সিগারেট ফেলিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়, এবং স্কার্টের যায়গায় যতদূর সম্ভব দেহকে প্রকাশ করাইয়া শাড়ী পরাইয়া দেওয়া হয়, তবে ইনিই বাংলার একশ্রেণীর চিত্রকরদের বেনভাসে, এবং বাংলার কলাপ্রিয়দের নিকট সমাদৃত হইবেন।

সংস্কৃত একটি কথা আছে—"যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা, শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্? লোচনদ্বয়হীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি?" বুদ্ধিবৃত্তিকে যাহারা বস্তুঘটিত ব্যাপার হইতে ঊর্দ্ধে তুলিতে পারে না, তাহাদের কাছে আর্টের ব্যাখ্যা বৃথা।

কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমরা গ্রহণ করি intellect বা বুদ্ধিবৃত্তির ভিতর দিয়া। বুদ্ধিবৃত্তি চায় বিচারবিতর্কে তৌলদণ্ডে ওজন করিয়া সকল জিনিষের হিসাব খতাইয়া লইতে। আর্ট তেমন করিয়া হিসাব খতাইয়া লয় না। অবশ্য তার intellectual বা বুদ্ধিবৃত্তির একটা দিক আছে, সেখানে কিছু ব্যাখ্যা বা টিকা-টিপ্পনী চলে, কিন্তু তার আসল স্থান হৃদয়ের রাজ্যে—কল্পনার রাজ্যে। আর্ট আপনার আলোকে আপনি আলোকিত, আপনিই মহীয়ান্। আর্ট অতলস্পর্শ গভীর,—তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়।

আইনষ্টাইনের relativity বা আপেক্ষিক-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তি, জাভার প্রজ্ঞাপারমিতা বা দাক্ষিণাত্যের নটরাজের মূর্ত্তির ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন? "আমার নয়ন ভুলান এলে, কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!"—ব্যাস, এই বলিলেই যথেষ্ট।

অলঙ্কারশাস্ত্রে আছে, কাব্য হইতেছে রসাত্মক বাক্য। কাব্যের উদ্দেশ্য মনের ভিতর রসের উদ্রেক করা। কাব্যের ন্যায় আর্ট সম্বন্ধেও বলা বলে যে ইহার উদ্দেশ্যও রসানুভূতি আনয়ন করা। একথা যে শুধু আমাদের দেশের আর্ট সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা নয়, যে কোনো দেশের আর্ট সম্বন্ধে একথা বলা চলে।

সঙ্গীতকার সৃষ্টি করে সুর, আর রূপকার সৃষ্টি করে রূপ। আমরা আমাদের সৃষ্টিকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে চাই। আমাদের সৃষ্টি যদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার মূল্য হইয়া যায় কম; তার মূল্য বাড়ে, সে যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তর্লোকে পৌঁছায়।

বাহিরে দেখিতেছি গ্রহচন্দ্রতারকা-খচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ—phenomenal world, আর আমাদের মনের মধ্যে রহিয়াছে ইন্দ্রিয়াতীত অন্তর্জগৎ—nominal world। বহির্জগৎ সসীম, আর অন্তর্জগৎ অসীম। শিল্পী বহির্জগতের সসীম বস্তুর ভিতর অসীমের বার্ত্তা ফুটাইয়া তোলে। এখানে শিল্পী যেন খোদার উপর খোদকারী করে,—বিশ্বকর্ম্মার পাশে আসন দাবী করে।

শিল্পী আঁকিল এক ফুল, কোনো বনভূমিতে তার

দোসর মিলিল না। উদ্ভিদশাস্ত্রের লক্ষণগুলি যদি মিলাইয়া দেখি, সবগুলি ঠিক মিলিল না। তবুও সে ছবি লোকেরা গ্রহণ করিল। কেন এমন? বাগানে টবের ভিতর তো ফুল রহিয়াছেই, তবুও ফুলের ছবি গৃহে কেন স্থান পাইল? তার কারণ ছবির ভিতর প্রকৃতির ফুল হইতে আরো বেশী কিছু পাই। ছবির ভিতর আর্টিষ্টকে পাই। শিল্পী তার সৃষ্টি মনের-মাধুরী মিশাইয়া রচনা করে। ছবির ভিতর দিয়া শিল্পীর ভাবধারার সহিত মিলিত হই।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় "ছবির পরখ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"চিত্রকরের আঁকা একটি বস্তুর ছবি ও ফটোগ্রাফে তোলা সেই বস্তুর ছবিতে তফাৎ অনেকটা; চিত্রকরের আঁকা ছবিতে বস্তুটির রূপ ছাড়া চিত্রকরের বস্তুটি দর্শনে আনন্দের যে উপলব্ধি হয়েছিল, বিশেষ ক'রে তারই রূপ দেখি। ফটোতে সেই বস্তুর জড়রূপ দেখি, কিন্তু আনন্দের মূর্ত্তি দেখি না। বল্‌তে পারা যায়, যখন স্বভাবের জড়রূপ দেখে আনন্দ হয়, তখন হুবহু নকলেও (ফটো) আনন্দের উদ্রেক হ'তে পারে। কারণ কোনো একটি বস্তু দেখে কোনো ব্যক্তির রসের উদ্রেক হোল না, আর একজন কবির মন মেতে উঠল। কিন্তু চিত্রকরের চিত্রে একটি বিশিষ্ট রসের উদ্রেকের প্রয়াস থাক্‌বেই। তা'হলে ছবি হ'ল রসের ঘনরূপ, বা আনন্দের ঘনরূপ।"

ইহার সঙ্গে সমালোচক ফ্রাঙ্ক রাটারের উক্তির তুলনা করা যাক। Evolution in Modern Art এ তিনি লিখিয়াছেন —"A man who paints landscapes or portraits is not necessarily an artist. He may be the merest manufacturer of likeness. Liberal verisimilitude to the accepted appearances of places and persons is never by itself evidence of high artistic merit. It is the function of art not merely to state fact but to communicate an emotion and the more simply that emotion is conveyed through the sense to which the particular art directly appeals the purer and higher is the art."

লক্ষ্য করিবেন পশ্চিমের কলারসিকও বলিতেছেন, আর্টের উদ্দেশ্য হইল emotion বা রসের সৃষ্টি। আবার বলিতেছেন "A correct drawing of a church or of an old building subsequently demolished possesses a genuine historic or topographical interest, because it is accurately drawn. Accuracy is an intellectual quality and art is an affair of the emotion." কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোনো আধুনিক মতই বলে না, কোনো বস্তুকে হুবহু আঁকিতে পারিলেই আর্ট হইল। ঘটনা-বিবৃতিতেই আর্টের পরিসমাপ্তি হয় না।

আমরা বলিয়া থাকি এ ছবি বা মূর্ত্তি ভাল, অথবা ভাল নয়; যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কেন এরূপ, উত্তর হইবে ভাল লাগে অথবা লাগে না। যদি আবার প্রশ্ন হয় কেন ভাল লাগে বা লাগে না, তবেই মুস্কিলে পড়িতে হইবে। সাধারণতঃ বিচার এই ভাবে হইয়া থাকে—এই মুখটি সুন্দর লাগে বা লাগে না; আর এই দৃশ্যচিত্রের রঙ কেমন ফলাইয়াছে, পাহাড়-নদী-গাছপালা একেবারে ঠিক ঠিক আঁকিয়াছে।

ভাস্কর্য্য হউক, আর চিত্রই হউক তাহার দুইটা দিক আছে, ফ্রাঙ্ক রাটার এই দুই দিক উল্লেখ করিতেছেন—Creative imagination এবং Technical skill বলিয়া; অর্থাৎ ভাবদৃষ্টি এবং প্রকাশকৌশল। এই দুটার একটার কোথায় শেষ এবং অপরটার কোথায় আরম্ভ বলা যায় না। বস্তুতঃ দুটা একসঙ্গেই চলে, একটাকে বাদ দিয়া আর একটা চলে না। ভাব এবং প্রকাশ দুই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শিল্পী যেরূপভাবে কল্পনা করিয়াছে, তাহার প্রকাশভঙ্গিমা সেরূপ হওয়া চাই।

শিল্পী যেন আমাদের সম্মুখে নূতন জগতের যবনিকা উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তারাজ্যে নূতন আলোকপাত করে। আমরা নিত্য দেখিতেছি পূর্ব্ব গগন আলোকিত করিয়া প্রভাত আসিতেছে, মানবের প্রবাহ চলিয়াছে দৈনন্দিন কর্ম্মচেষ্টায়, পশুপক্ষী বাহির হইতেছে আহার-অন্বেষণে; ধূসর সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে, শান্তিপিয়াসী জীব নিজ নীড়ে ফিরিতেছে;

অন্ধকার ব্যাপ্ত হইল, বিরাট অম্বরতলে তারকা জ্বলিল, চরাচর সুষুপ্তিতে ঢলিয়া পড়িল।

জগতের যে এই শোভা, এত রংয়ের খেলা, এত মাধুর্য্য, এত রহস্য, কে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে? সে নিশ্চয়ই শিল্পী। মানুষের নানাদিকে নানা কর্ম্মপ্রচেষ্টা, ব্যবসাবাণিজ্য, কলকারখানা। তাহা মানুষের দেহের অভাব মিটায়, কিন্তু আর্ট মিটায় মনের ক্ষুধা। আর্টই জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে। আর্ট প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কিন্তু আর্ট জীবনকে পূর্ণ করে। গৃহে চিত্র না থাকিলে জীবনধারণের কোন অসুবিধা হয় না তবুও মানুষের মন তাহা চায়। ইহা যেন মানুষের মনের আদিম বৃত্তি। আদিম মানব, প্রস্তরযুগের মানব তাহাদের বাসস্থান পর্ব্বতগহ্বরে জীবজন্তুর চিত্র আঁকিয়াছে, তাহা এখনও বিস্ময়ের বস্তু।

আমাদের দেশে আর্টের সমালোচনা অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে, মাসিকপত্রাদি ঘাঁটিলেই তাহা বোঝা যাইবে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই হইল Metaphysics বা আর্টের দার্শনিক তত্ত্ব অথবা Archeology বা পুরাতত্ত্ব।

এই শ্রেণীর সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন—Indian art হইল spiritual এবং idealistic, আধ্যাত্মিক ও ভাবতান্ত্রিক; আর ইউরোপীয় আর্ট realistic বা বস্তুতান্ত্রিক।

Times পত্রিকার বিজ্ঞাপনস্তম্ভে একদিন চোখ পড়িয়া গেল, কোথায় কোন্ এক বিদ্যালয়ে নাকি এক আর্টিষ্টের প্রয়োজন, qualification হইল তার Realistic European Art এবং Idealistic Indian Art দুটোই জানা চাই। অদ্ভুত সামঞ্জস্য! আর্টের কেমন ফরমাস!—আর্টের এরূপ Waterlight compartment থাকিতে পারে না। এ যেন মিশ্রিত খদ্দর—টানাটা বিলাতী মেঞ্চেষ্টারের সূতা আর পোড়েন চরকাকাটা সূতা, উপরে 'স্বদেশে প্রস্তুত' ছাপমারা। এ মিশ্রণ বেশী দিন টেঁকে না, ছিঁড়িয়া যায়।

অস্কার ওয়াইল্ডের কোন এক রচনায় পড়িয়াছিলাম বলিয়া যেন মনে হইতেছে—Art criticism is also a creative art. এই উক্তির কোন মূল্য নাই বলিয়া অস্বীকার করা যায় না।

তাজমহলের গম্বুজটা ভারতীয়, কি সারাসানিক, অথবা ইণ্ডোসারাসানিক, তাহা লইয়া লেখকগণ মাথা ঘামান। অবশ্য এ সমালোচনার কোন মূল্য নাই তাহা বলিতেছি না, তবে কোনো জিনিষ Aesthetic বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক হইতে দেখার প্রয়োজন আছে।

বিশেষ কোনো চিত্র বা মূর্ত্তি কোন্ পদ্ধতিতে শিল্পী করিয়াছে, কোন্ যুগে করিয়াছে, ইহার কি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা লইয়া সমালোচক ব্যস্ত।

বর্ত্তমানে ভারতের আর্টের যুগকে বলা হয় 'রেনেশাঁ'র যুগ। অবনীন্দ্রনাথ হইলেন এ যুগের প্রবর্ত্তয়িতা—সমগ্র ভারতবর্ষই এখন কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থাকে গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, মাদ্রাজ এই তিনটি প্রধান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হইলেন তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় হইতে। অবনীন্দ্রনাথ একরকম বিরুদ্ধ-মতবাদের ভিতর দিয়া তাঁহার শিল্পনীতি প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার স্কুল বা শিল্পগোষ্ঠীকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিবৎসর চিত্রপ্রদর্শনী হইতেছে এবং মাসিকপত্রাদিতে ইহার প্রচার চলিয়াছে। ইহার সার্থকতা তখনই সম্পূর্ণ হইবে, যখন সর্ব্বসাধারণ এই চিত্রকলাকে আদর করিতে শিখিবে। আমার মনে হয় সেই সময় এখনো আসে নাই। খুব কম লোকই চিত্রকলার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারে। Intelligents কিছু বাদ দিলে সাধারণের ভিতর খুব কমই এই চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ধনী-সমাজের ভিতর যাঁহাদের অর্থগৌরবটা একটু বেশী রকমের, তাঁহাদের ভিতর হয়ত জনকয়েক চিত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের অধিকাংশই করেন ফ্যাশানের খাতিরে, তাঁহাদের art এবং culture-এর কথা বাহিরের whitewash বা চূণের প্রলেপমাত্র। মূলচিত্র সংগ্রহ করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়, কিন্তু অন্যেরা তো কমদামের ছাপাচিত্র সংগ্রহ করিতে পারে। আজ প্রতিগৃহে যেমন রবিবর্ম্মার ছবি দেখা যায়, তেমনি অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের চিত্র থাকা উচিত। কিন্তু বাজারে চ্যাটার্জ্জির album ছাড়া অন্য চিত্র মিলিবে না।

ইহার চাহিদা হইলেই প্রকাশকেরা কম দামে এই চিত্র ছাপাইতে পারে। প্রদর্শনীতে মূলচিত্র যাহা বিক্রী হইয়া যায়, তাহা অধিকাংশই চলিয়া যায় বিদেশে।

ইহা পরিতাপের বিষয় আমাদের শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। আর আমাদের দেশের ধনীরা আমাদের শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা না করিয়া ইউরোপীয় দ্রব্যে তাঁহাদের বৈঠকখানা বা ড্রয়িং-রুম সাজাইয়া থাকেন। তাঁহাদের জাতীয়তার কোঠা যে কেবল শূন্য তাহা নয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার দিক হইতেও যদি তাঁহাদের বিচার করিয়া দেখি, তাঁহাদের বিকৃত রুচির পরিচয় পাইব। তাঁহাদের বৈঠকখানা furniture shop বা আসবাবের দোকান বই কিছুই নয়।

ইন্দোরে প্রবাসী সাহিত্য-সম্মিলনের সময় কোন ধনী বণিকের প্রাসাদ দেখার সুযোগ হইয়াছিল। গৃহের সাজ-সজ্জা এবং আসবাবপত্র দেখিয়া মনে হইল, সৌন্দর্য্যবোধের এত দুর্গতি! গৃহসজ্জার নামে মানুষ গৃহে এত আবর্জ্জনা আনিয়া স্তূপীকৃত করিতে পারে? ধনীরা সৌন্দর্য্যবোধের স্থানে তাঁহাদের অর্থপ্রাচুর্য্যই নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিতে চান। তাঁহাদের সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার সুন্দর হউক আর কুৎসিত হউক, তাহা বিচার করিবার শক্তি নাই; বেশী দামী হইলেই হইল। ধনী তাঁহার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতে গিয়া যে এক জায়গায় শূন্যতা দেখাইয়া দিলেন, সে বোধ তাঁহার হয় না।

আর্টিষ্টরা অনেক সময় একরকম জিনিষ সৃষ্টি করে যাহা সহজে বাজারে কাটিতে পারে; তাহাতে আর্টিষ্ট নিজেকে খর্ব্ব করে। সাধারণের চাহিদা অনুসারে যে জিনিষ প্রস্তুত হয়, ভবিষ্যৎকালে তাহার মূল্য থাকিবে না। একমাত্র কালই সর্ব্বাপেক্ষা বড় পরীক্ষক।

আমাদের ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা লক্ষ্য করা যাইবে, অনেক শিল্পীর আঁকিবার একটা type দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ক্রমশঃই দেখা যাইতেছে সে বিশেষ পথে চলিয়া নিজের সৃজনীশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে,—সেই বিশেষ রীতি ছাড়া অন্য কোনও মৌলিকতা দেখাইতে সমর্থ হয় না। নূতন শিল্পী যাহারা এই দলে ভর্ত্তি হইতেছে তাহাদেরও এই ভাব। আমাদের আর্ট-ক্রিটিকদের দৃষ্টি এই দিকে পড়ে নাই। তাঁহার ওরিয়েণ্টাল ষ্টাইলে আঁকা ছবির Spiritualism এবং Mysticism দেখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর যে Exhibition হইতেছে, তাহাতে কিছু experiment নাই, নূতনত্ব নাই। অঙ্কশাস্ত্রে যাহাকে বলে permutation and combination তাহাই চলিতেছে। অনেকেই এই ব্যাপারটা অনুভব করেন, কিন্তু খোলাখুলি ইহা বলা মানে হইল অপ্রিয় সত্য বলা।

আমাদের আর্টে এখন প্রাণ নাই গতি নাই—এক ষ্টাইলই, এক বিষয়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে;—সেই কলসী-কাঁখে যমুনার পথে বিরহ-প্রতীক্ষা, গোলাপের ঝরা-পাপড়ি আর কত দেখিব! এই literary sentimentalism আর কত চলিবে? যেখানে পরিবর্ত্তন নাই সেখানে বৃদ্ধি নাই। কানু ছাড়া গীত নাই,—এই নীতি আমি মানিতে রাজি নহি।

ইউরোপের আর্টে কতরকম experiment চলিতেছে—Impressionist, Cubist, Individualist, Futurist ইত্যাদি। ইহাদের সহিত ইউরোপের বর্ত্তমান চিন্তাধারার এবং সাহিত্যের তুলনা চলে। চিত্রকলা এবং ইউরোপীয় সাহিত্য parallel ভাবে বা সমান্তরালে চলিতেছে। Manet, Whistler, Degas, Ganguin, Van Gogh, Cezanne, Pablo Picasso, Maurice Denis, Henry, Matisse প্রভৃতি চিত্রকারগণ চিত্রশিল্পে নূতন ধারা আনয়ন করিয়াছেন। এক এক সময় অবশ্য ইঁহাদের extremism বা অত্যুগ্রতা বরদাস্ত করা মুস্কিল হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না, ইউরোপীয় শিল্পে ইঁহারা নূতন শক্তি দিয়াছেন। ইঁহারা জানাইয়াছেন—র‍্যাফেল, রুবেন্স, টিশিয়ান, ভ্যান ডাইক, রেমব্রাণ্টের মধ্যে সব নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, আর্টিষ্টদের নূতন ক্ষেত্র জয় করিবার আছে। আমি আমাদের নূতন শিল্পীদের ইউরোপের অত্যুগ্রবাদীদের উগ্রতা অনুসরণ করিবার উপদেশ দিই না, তবে ইহা নিশ্চিন্ত বলিতে পারা যায়, এই সকলের অনুশীলনে আমাদের শিল্পপ্রচেষ্টায় নূতন শক্তি দিবে।

বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী গগ্যাঁ (Paul Gauguin) বলেন, "In art there are only revolutionists and plagiarists." আমাদের আর্টে এখন যথেষ্ট plagiarism আছে, কিন্তু এখন একটু revolutionএর দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

অজন্তা এক সময় বিদ্রূপ আনয়ন করিত, এখন দেখি সকলেরই অজন্তার ষ্টাইলে আঁকার চেষ্টা—বুকে একটুকরা কাপড় বাঁধা, কোমরে কতগুলি ন্যাকড়ার ফালি ঝুলিতেছে, কোমর ঈষৎ বাঁকা, এ যেন সোজা ফরমুলা অজন্তার আর্ট আঁকার! এ সমস্ত ছবি মনে হয় যেন অজন্তার caricature।

শুধু কেবল কতগুলি ভঙ্গী, পরিচ্ছদ, অলঙ্কারাদি নিলেই অজন্তার আর্ট হইল না। তার spirit বুঝিতে হইবে। অজন্তার আর্টের একটি বিশেষত্ব হইল তার Caligraphy। Caligraphyর কৌশলটুকু আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের আর্টের আর এক নূতন অধ্যায় সুরু হইবে।

ইউরোপের হালের অনেক শিল্পী এই Caligraphy লইয়া কসরত করিতেছে। চীন জাপান বলুন, পারস্য বলুন, মোগল রাজপুত সকলেরই মূলনীতি হইল Caligraphy Caligraphy হইল বিশেষভাবে এশিয়ার সম্পদ। এই Caligraphy বা রেখাকৌশল হইল এশিয়ার চিত্রের ভাষা। প্রাচ্য চিত্রকলার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হইলে এই রেখার ভাষা বুঝিতে হইবে। ছবির বিশেষ গুণ হইল আমার মতে তিনটি জিনিষ—(১) Composition, (২) Drawing, (৩) Colour. অর্থাৎ (১) গঠন, (২) রেখা, (৩) রং।

মানবশরীরে যেমন শিরা-উপশিরায় জীবনপ্রবাহ স্পন্দিত হয়, তেমনি ছবির রেখাতে প্রাণের ছন্দ লীলায়িত হয়। ছবির ড্রয়িং যদি timid বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে রং তাহাতে প্রাণ দিতে পারে না। ছবির composition ছবির সকল অংশকে সুবিন্যস্ত করিয়া ছবিকে একটি concrete বা সংহত জিনিষ করিয়া তোলে।

আমাদের চিত্রকলা এখন miniature painting বা ছোট চিত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে, ইহার প্রসার তখনই হইবে যখন আমরা mural painting বা প্রাচীর-চিত্রে হাত দিব। নূতন দিল্লী লইয়া আজকাল mural painting এর কথা খুব শোনা যাইতেছে। দেশী বিলাতী সব কাগজেই লিখিতেছে নূতন দিল্লীতে নাকি ঘটা করিয়া খুব একটা Indian art-এর revival হইতেছে। ভারতের অজন্তা, বাগ, সীতা নবসাল, সিংহলের সিগিরিয়া, পোলোনারুয়া প্রভৃতির frescoর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। প্রাচীর-চিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে; দেওয়ালে বড় করিয়া আঁকিলেই তাহা দেওয়ালের উপযুক্ত চিত্র হয় না। সেই হিসাবে মনে হয় দিল্লীর mural decoration ব্যর্থ হইয়াছে।

আর্টকে শুধু আর্টস্কুলে এবং ধনীর প্রাসাদে বন্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। যদি তাই হয়, তাহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ধনের মত হইবে। আমাদের নিত্যকার জীবনে, আমাদের গৃহে, আমাদের প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কলালক্ষ্মীকে স্থাপন করিতে হইবে।

আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের চম্পকঅঙ্গুলি গৃহচত্বর ও গৃহ-প্রাঙ্গণ আলপনায় সুশোভিত করুক। চম্পকঅঙ্গুলি কেবল কাব্যের উপমা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কাজের ভিতর তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। সংস্কৃত-সাহিত্যে—কাব্য নাটকাদিতে যথেষ্ট উদাহরণ আছে, পুরললনাগণ কাষ্ঠফলকে চিত্রাঙ্কণ করিতেছেন। আজকালকার শিক্ষায়তনে পত্রলেখা চিত্রলেখাদের সন্ধান মিলিবে না। অর্থশাস্ত্রের থিওরি অথবা James the first-এর তারিখ বলিতে পারিলেই বলি শিক্ষা। চতুঃষষ্টী কলার সবই গিয়াছে। আজকাল সঙ্গীতের কিছু রেওয়াজ হইতেছে। সেই সঙ্গে চিত্রবিদ্যারও রেওয়াজ হইবে না কেন? মেয়েদের বিশেষভাবে চিত্রবিদ্যা একটি শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত।

শিক্ষার গোড়ার দিক হইতে বালকবালিকাদের দৃষ্টি চিত্রাঙ্কণের দিকে দিলে তাহাদের চিন্তাপ্রকাশের সহায়তা করিবে। বিদ্যালয়ে ভালভাল চিত্র টানানো থাকা উচিত। ভাবচিত্রের সংস্পর্শে থাকিলে দৃষ্টি সম্মোহিত হইবে,—সৌন্দর্য্যের রুচি জন্মিবে।

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে সাজসজ্জার ও পারিপাট্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত। আর্টকে এই ভাবে যদি শিক্ষার সহিত প্রয়োগ করা চলে, তবে ক্রমশঃ ইহা কেবল পুস্তকের নীতির ভিতর থাকিবে না, প্রাত্যহিক জীবনের সহিত তাহার সংযোগ হইবে।

এই 'ঘরে বাইরে' বিভাগে আমরা বহুদিন হইতে দেশ-বিদেশের নারী-কৃতিত্বের কথা বিবৃত করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি কেহ কেহ বলিতেছেন, বৃথা বিদেশী শ্বেতাঙ্গিনীদের পুরুষালি কাজের চিত্র-পরিচয় না দিয়া ভারতীয় নারী-গরিমার বিবরণ প্রকাশই শ্রেয়তর—বিদেশীরা জানুক আমাদের মেয়েরাও বিশ্বসভায় যশের দাবী রাখে। একথাটি আমাদেরও মনের কথা। কিন্তু আমাদের দেশের নারীরা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিতে এখনও কুণ্ঠিতা হইয়া থাকেন এবং আমরা অনেক সময় চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হই। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁহাদের বহির্বিকাশের ক্ষেত্র এখনও ততটা পান নাই অন্যান্য স্বাধীন জাতির নারীরা যতটা পাইয়াছেন। আমরা চাহি, মেয়েরা পরীক্ষাই পাশ করিবে না, বরং কার্য্যতঃ এমন কিছু করিবে যাহাতে জাতিকে চলমান ও বলবান করে। বীর্য্যময়ী জননীর আবির্ভাব এদেশে হউক,—আমাদের 'বঙ্গলক্ষ্মী' চায় মঙ্গল-আলিম্পনে তাঁহারই পাদপীঠ রচনা করিতে—মৃদু হুলুধ্বনি সহকারে।

পাশ্চাত্য সতী

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় এই 'পাশ্চাত্য সতী'র কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন নিম্নলিখিত রূপে—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

"আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতেও শ্রদ্ধা সহকারে উত্তমা বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অন্ত্যজ জাতির নিকট হইতেও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এবং অসদ্বংশ হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবে।"

মহামতি মনুর এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কোন বিশেষ সদ্‌গুণ কোন বিশেষ জাতির একচেটিয়া নহে। ভারতবাসীরা যে বড়াই করিয়া থাকেন—দাম্পত্য জীবনের চরম সুখ এই পুণ্যময় ভারতের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই—তাহাও যে কতদূর অসত্য, নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি তাহা স্থির করিবে।

ইংলণ্ডে আর্ল কভেণ্ট্রী মহাশয় ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার জেলার মধ্যে এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। উরসেষ্টার সায়ারে তাঁহার একটি সম্পত্তি ছিল। তিনি শিকারী হিসাবেও বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি তাঁহার পিতামহের সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। বৃটিশ ইতিবৃত্তে আর্লরূপে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল জীবিত ছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার প্রকৃতি স্বাবলম্বী ও উদার ছিল। গত মহাযুদ্ধে দারুণ

অর্থাভাব সত্ত্বেও তিনি তাঁহার জমিজমার সূচ্যগ্র অংশও বিক্রয় করিতে বা প্রজাগণের খাজনা বৃদ্ধি করিতে প্রলুব্ধ হন নাই। প্রজাগণ ১৯২৭ সালে তাঁহার অশীতি বাৎসরিক জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করে। এই সম্বর্দ্ধনা-সভায় তাহারা নিজেরাই "জমা" দশ টাকা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করে কিন্তু মহাপ্রাণ লর্ড কভেণ্ট্রী তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

লর্ড কভেণ্ট্রী সৌভাগ্যবশতঃ একটি আদর্শ রমণীকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্তা, সাধ্বী, পতিপরায়ণা ও যাবতীয় নারী-সুলভ গুণে অলঙ্কৃতা নারী অতি বিরল।

জীবদ্দশায় স্বামীর সঙ্গ সুখে-দুঃখে কখনও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। লর্ড কভেণ্ট্রী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, লেডী কভেণ্ট্রী তখন দিবারাত্র স্বামীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পতি-বিরহ অসহ্য হওয়ায় তিনি অসুস্থ হইয়া—"আমি আর বাঁচিব না"—এই বলিয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। ইহাই তাঁহার কালশয্যা হইয়া দাঁড়াইল। পতির মৃত্যুর তিন দিবস পরেই রমণী-কুল-মণি লেডী কভেণ্ট্রী দেহত্যাগ করিলেন।

এই মহিমাময়ী ইংরাজ-সতীর পবিত্র কাহিনী চিরস্মরণীয়। সতীকাহিনী অল্পায়তন হইলেও হীরকের ন্যায় মহামূল্য। এই নারী যদ্যপি যে-দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সতী-ধর্ম্ম হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভে সমর্থ হয় নাই, তথাপি তিনি সতী;- এবং স্বর্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সতীর স্থানভেদ নাই।

বিমানচারিণী ব্রুস

বিখ্যাত বিমানচারিণী মিসেস্ ব্রুস সম্প্রতি করাচীতে জনৈক সংবাদপত্র-প্রতিনিধির নিকট তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহা একখানি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এইরূপ :—তিনি বলেন যে, ২৫শে সেপ্টেম্বর ভোর বেলা তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন এবং উক্ত দিবস রাত্রিতেই মিউনিকে পৌছেন। পরদিবস তিনি বেলগ্রেড অভিমুখে রওনা হন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর কনষ্টান্টিনোপল পৌছেন। কনষ্টান্টিনোপলেই তাঁহার পথের কষ্ট আরম্ভ হয়। তথায় তিনি দুই দিবস আবদ্ধ থাকেন কারণ তাঁহার নিকট বেতারে সংবাদ প্রেরণ করিবার একসেট যন্ত্র ছিল এবং স্থানীয় সরকার ঐ নিমিত্ত তুর্কী সরকারের কোনও প্রকার লিখিত ছাড়পত্র নাই বলিয়া (তিনি গুপ্তচর ভাবিয়া) আপত্তি প্রকাশ করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, অনুমতি লাভের জন্য তুরস্কের রাজধানী এঙ্গোরায় তিনি গমন করিবেন; কারণ ডাকযোগে লিখিত আদেশ পাইতে কয়েক সপ্তাহের প্রয়োজন হইবে। সমুদ্রতীর হইতে এঙ্গোরা পাঁচ হাজার ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। তথায় অনেক পাহাড়-পর্ব্বতাদিও আছে। তিনি সহরের উপর ঘুরিয়া অবতরণ করিবার কোনও সুবিধাজনক স্থান না দেখিয়া খেলার মাঠে অবতরণ করিবেন মনস্থ করেন; কিন্তু তখন মাঠে খেলা চলিতেছিল ও বহু লোক খেলা দর্শন করিবার জন্য তথায় জমিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার অবতরণ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি একটি কৃত্রিম বোমা তথায় নিক্ষেপ করেন; ফলে সমগ্র মাঠটি জনশূন্য হইয়া যায় এবং তিনি তথায় কয়েকবার চেষ্টা করিবার পর নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করেন। একঘণ্টা পর গবর্ণরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়. গবর্ণর তাঁহার সাহায্যার্থ সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কতিপয় দিবস পর তিনি আকাশপথে উত্তর এশিয়া মাইনরের প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংসন এস্কিসেরে গমন করেন; ঐ স্থানটি এঙ্গোরার ১৬৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। তিনি তুরস্কের সামরিক গোপন এরোড্রাম ডাস্কে অবতরণ করেন; তথাকার গবর্ণর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং স্কোনিয়াতে তিনি পৌছিলে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথাকার গবর্ণরের নিকট তার করিয়া দেন। পরদিন (১লা অক্টোবর) তিনি স্কোনিয়া যাত্রা করেন। স্কোনিয়ায় পৌছিয়া তিনি আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু আলেপ্পো হইতে ৪০ মাইল দূরে পথিমধ্যে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। আরবগণ অনতিবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং একজন আরব তাঁহাকে বাঁধিয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে লইয়া পলায়ন করিতে থাকে। ঠিক ঐ সময় একজন ফরাসী কর্ম্মচারী একদল সৈন্য সহ

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। পরে পেট্রোল সংগ্রহ হইলে পর তিনি পুনরায় বিমানপথে রওনা হন এবং ৩রা অক্টোবর রাত্রিতে বাগদাদে অবতরণ কারন। ৪ঠা অক্টোবর তিবি বুসায়ারে গমন করেন। ৫ই অক্টোবর সকালবেলা তিনি জাস্ক রওনা হন। কিন্তু সন্ধ্যায় কো-ই-মোবারকে অবতরণ করিতে বাধ্য হন; অবতরণ করিবার মূলে ছিল—প্রবল ধূলি-বাত্যা। কো-ই মোবারকে তাঁহার অবস্থানকালীন ঘটনাবলী আরব্যোপন্যাসের ন্যায়ই চমকপ্রদ। ভীষণ-আকৃতি বেলুচী এবং পারস্যের উপজাতিগণ তাঁহার নিকট আগমন করে। তিনি মনে করেন যে, তাঁহার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত। তাহারা আসিয়াই তাঁহার নিকট টাকা পয়সা প্রভৃতি চাহিতে থাকে। ভয়ে তিনি তাঁহার নিকট যাহা ছিল সমস্তই তাহাদিগকে প্রদান করেন। রাত্রিতে তিনি বিমানপোতেই অবস্থান করেন। তৃতীয় দিবস সকাল বেলা তিনি স্থির করেন যে পদব্রজেই তিনি জাস্ক যাইবেন। এস্থান হইতে জাস্কের দূরত্ব কুড়ি মাইল। একজন বেলুচী গাইডকে সঙ্গে করিয়া তিনি পদব্রজে জাস্ক অভিমুখে রওনা হন। দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি জাস্ক টেলিগ্রাফ অফিসে একজন বেলুচী দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, "দুর্ঘটনা—সাহায্য চাই।" এই সংবাদ জাস্কে ১৩ই অক্টোবর পৌঁছে। এই সংবাদ পাইয়া টেলিগ্রাফ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট একদল সাহায্যকারীকে তাঁহার উদ্ধারার্থ কো-ই-মোবারকে প্রেরণ করেন। উদ্ধারকারী দল ১৪ই অক্টোবর সকাল বেলা পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী এক বেলুচী গ্রামে তাঁহাকে দেখিতে পায়। পরে ইঞ্জিনিয়ার মিঃ উইলসন অস্থায়ীভাবে বিমানপোতখানি মেরামত করিয়া দিলে পর তিনি পুনরায় আকাশপথে জাস্কে পৌঁছেন। ভগ্ন ইঞ্জিনের নূতন অংশ বিলাত হইতে আসিলে বিমানপোতখানি নূতন করিয়া মেরামত করা হয়; এবং মিসেস ব্রুস গত শনিবার দিবস ভোর বেলা আকাশপথে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার জন্য নূতন উদ্যমে পুনরায় যাত্রা করিয়াছেন।

সমবায়ে মহিলা-কর্ম্মী

আমরা এখানে একজন প্রসিদ্ধা মার্কিন মহিলা সমবায় কর্ম্মীর চিত্র প্রকাশিত করিলাম। ইনি নিউইয়র্কের একটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানের হোম্ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর—মিস্ ভেরা ম্যাক্রে। ইনি সম্প্রতি "সমবায় আন্দোলনে মহিলা" বিষয়ে একটি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন—আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ কো-অপারেশান (কংগ্রাস্) নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের এক মহতী সভায়।

মিস্ ভেরা ম্যাক্রে

চীনা বিদুষী

মিস্ নেলী চৈয়ং

এই চীনা বালিকা মিস্ চৈয়ং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'শিক্ষক-শিক্ষায়তনের' একজন কৃতী গ্রাজুয়েট। ইনি সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন—ঘরে ও বাহিরে (botter home and botter business) যাহাতে মেয়েরা সমান মহীয়সী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন—তাহার প্রচার-প্রচেষ্টা করিতে।

নারী-আন্দোলনে রেড্ ইণ্ডিয়ান মহিলা

সিনোরিটা রোজালমীরা কোলোমো একজন তরুণী রেড্ইণ্ডিয়ান। ইনি সম্প্রতি নারী-আন্দোলন বিষয়ে ইণ্টার

সিনোরিটা কোলোমা

আমেরিকান নারী-কমিশনে সহকারিণীর কার্য্য করিয়াছিলেন—কৃতিত্বের সহিত।

ভাগীরথী-অতিক্রমে বালিকা

সম্প্রতি হুগলী (ঘুটিয়াবাজার) সেণ্ট্রাল এ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে সন্তরণে ভাগীরথী অতিক্রম করার প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। জুবিলী পুল হইতে চুঁচুড়ার জোড়ঘাট পর্য্যন্ত এক মাইল স্থান সন্তরণ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব এই যে, অনুপমা শীল নামে একটি আট বৎসরের বালিকা পোনের মিনিটে ঐ এক মাইল বেশ সহজভাবে অতিক্রম করিয়াছিল।

সঙ্গীত-দিগ্বিজয়িনী

মিস্ গাট্‌মান

এই ইয়াঙ্কি মহিলাটি কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় দেশ-সমূহে 'কনসার্ট টুর' বা সঙ্গীত-সফর করিয়া প্রচুর যশ ও অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন।

মোটরচারিণী

মিস্ মার্গারেট্ বেল্‌চার ও মিস্ এলিস্ বাজেল নাম্নী দুইজন শ্বেতাঙ্গিনী সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন হইতে মিশরের কায়রো সহর পর্য্যন্ত একখানি কুড়ি পাউণ্ড মূল্যের মোটর গাড়ীতে চড়িয়া সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়াছেন। ব্যবহৃত গাড়ীখানি পুরাতন, বিশ পাউণ্ড মূল্যে তাহা কেনা হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল তারিখে যাত্রা করিয়া তাঁহারা ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে আট হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হন।

মিস্ বাজেল্ কেপ টাউনের সর্ব্বপ্রথম মহিলা ট্যাক্সি-চালক।

সাধুমা'র কথা

সাধুমা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু মা'র আর চিন্তার হাত থেকে নিস্তার ছিল না। তাঁর হয় একটি মেয়ে কি একটি ছেলে লিবার-জ্বরে ভুগছে, নয় মারা গেছে,— এ সব একটা কিছু ঘটনা আছেই। নয়ত আমার পিতা দিদিমা, কর্ত্তামণির সঙ্গে কিছু বাদ-বিসম্বাদ করছেন। তার দরুণ মা'র সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্ত হ'য়ে থাকতে হ'ত। আমার পিতা যে কিছু মন্দ লোক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর একটা দোষ ছিল, তিনি মাঝে-মাঝে নেশার বশীভূত হ'য়ে কলহ গোলমাল করতেন। তাঁর সংসারে মন বস্‌ত না, কেননা তিনি বেশ বুঝতে পারতেন যে, এ সংসার কেবল পাঁচজনের লুটের বাজার। যদি এ কথা বুঝিয়ে বল্‌তে যেতেন, কোন ফল হ'ত না; দিদিমা ধমক দিতেন। কিন্তু বাবা বেশ বুঝতে পারতেন যে, তাঁর সন্তানগুলির ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। বাবাকে আমার কর্ত্তামণি খুব আদরযত্ন করতেন ও বাবুয়ানায় লালন-পালন করেন। ছোটবেলায় বাড়ীতে মেম রেখে ইংরাজি শেখান। সাহেবের ইস্কুলে পড়ান। শুনেছি যে বাবা যদি অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে ইংরাজি বল্‌তেন, লোকে বল্‌ত এ ইংরাজে কথা কইছে, পরিষ্কার উচ্চারণ ছিল। আর তাঁর মন খুব খোলা, ও পরোপকারে রত ছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে' বল্‌তেন যে, আমায় একটি বাবু করে' মানুষ করেছেন, একটু কষ্ট সইবার ক্ষমতা নেই; মখ্‌মল জরি মুড়ে, ক্ষীর সর ছানা খাইয়ে, আর আদর দিয়ে দিয়ে একটি কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার বানিয়েছেন; আর আমার ছেলেমেয়েগুলিকেও সেইমত করেছেন; কিন্তু এ সকল বাবুয়ানা কিসে চিরকাল চল্‌বে, বিষয় বে-বন্দোবস্ত, প্রচুর ব্যয়, আর তেমনি দেনা; আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। এই সকল নানা কারণে বাবার মন বড় খারাপ হ'ত; হ'লেই তিনি চিন্তারাক্ষসীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ঐ সুরাদেবীর আশ্রয় নিতেন। তিনি প্রায় নানা দেশভ্রমণেই জীবনাতিবাহিত করেছিলেন। শেষ তাঁর মৃত্যু হয় প্রয়াগধামে, ২৪ ঘণ্টার ভিতর কলেরায়। আমার বাবা বাড়ীতে এলে বড় খুসি হতুম, কিন্তু যেদিন নেশা করতেন আমি সেদিন বড় ভয় পেতুম। আমি দিদিমার কাছে আর ওবাড়ীতেই বেশী সময় অতিবাহিত করতুম। খেলা, আমোদ-আহ্লাদ—এইটি হ'লেই বড় আনন্দে থাকি। বাবা বৃন্দাবনে গিয়ে বনযাত্রা করেছিলেন, পরে অতি সুন্দর একখানি সচিত্র গোলকধাম এঁকেছিলেন। প্রথম আঁকেন সংসার-আশ্রম—তাতে চিত্রিত ছিল পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, পিতামাতা, দাসদাসী, গৃহপালিত পশুপক্ষীবেষ্টিত একটি ভবন। আবার তিন নং চিত্র বিশ্রাম-ঘাট—সেটি আমাদের নিজ বাড়ী; আর দশ নং ছিল নরককুণ্ড, একটি কঙ্কালবেষ্টিত কূপ। উচ্চস্থানে ছিল সুরলোক, তাতে ইন্দ্ররাজার যে প্রতিমূর্ত্তি, সেটি অঙ্কিত করেছিলেন তাঁর পিতার। তিনি বড় আদুরে ছেলে ছিলেন, তাঁকে কর্ত্তামণি বাবু বলে' ডাকতেন, আর তিনি বাবা বলতেন। আমার পিতার চেহারা ঠিক ইংরাজদের মতই ছিল। আর তাঁর স্বভাব ছিল—এ না হ'লে চলে না, এটি না হ'লে আহার করা যাবে না, তা নয়; যেদিন যা হোক্ চ'লে যেত। আর খুব নকল করতে পারতেন। সবজাতীয় কথা কইতে পারতেন—বেহারা, বামুন, রজক, জলের ভারী, পরামাণিক, এদের সকলকার সঙ্গেই নকল-আনন্দ করতেন।

আমি পূর্ব্বেই লিখেছি আমার নীচে দুটি ভগ্নী ছিল, তারা দুজনেই পীড়িত ছিল; তাদের বিস্তর চিকিৎসা হয় কিন্তু পরমায়ু ছিল না। একটির মৃত্যু হয় চার বৎসর বয়সে; তখন মা আমার পূর্ণগর্ভা ছিলেন, সেইদিন রাত ২টার সময় একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। তার পরদিন আর একটি কন্যা মারা যায়, তার বয়স ছ'বৎসর। এই রকমে মা বিস্তর শোক পেয়েছিলেন।

আমার বিবাহের সম্বন্ধ হবার মধ্যে নানা কথা এসে পড়েছে। দুর্গাপূজা হ'য়ে গেল, পরে পূর্ব্বদর্শিত দেবতার মত লোকটি, যিনি ইডেন পার্কে দর্শন দিয়েছিলেন, তিনি পূজার পর দ্বাদশীর দিন পুনরায় আমাদের বাড়ীতে দর্শন দিদিমা আমায় বল্লেন—যাও দিদি খেলা করগে। আমি চলে' গেলুম, একেবারে পাশের বাড়ী। পরে বাড়ী এসে সকলেরি মুখে শুনতে লাগলুম যে, আমার বেশ ভাল জায়গায় বিয়ে হবার সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে গেল। যিনি এসেছিলেন,

সাধুমা

দেন। দিদিমার কাছে এসে, প্রণাম করে' বসে' মিষ্টি মিষ্টি করে' কত কথা কইতে লাগলেন। আমিও দিদিমার কাছে বসেছিলুম। ক্রমে ক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। তিনি আমার শ্বশুর, খুব অমায়িক লোক। আর তিনি এটর্ণি, তাঁর একটি ছেলে; ছেলেটিও নাকি খুব সুন্দর ও ভালমানুষ। ঝিয়েরা সব আমায় খুব

ক্ষেপায়,—এইবার আর গাড়ী চড়ে' বিবি হ'য়ে বেড়াতে পাবে না, ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে' থাকতে হবে। আমিও শুনে শুনে যেন কিছু একটু বদ্‌লে গেলুম, একবার-একবার একটু একটু চিন্তা করতে লাগলুম, মনে হ'তে লাগ্‌ল মা ও মেজমা যেমন বউ, সেইরকম আমিও বউ হব ত? আর বেড়াতে যেতে পারব না, ঠাকুরবাড়ী গিয়ে কীর্ত্তন শোনা হবে না। হোলির সময় দেউড়িতে বড় গামলায় আবীর গুলে'একবার ঠাকুরবাড়ীতে, একবার রাস্তায়, একবার ও-বাড়ীর দিদিদের সঙ্গে আবীর-খেলা আর হবে না। কিন্তু কি জানি আমার দেহটা পরমেশ্বর কি উপাদানে গঠিত করেছেন, চিন্তা আমায় বেশীক্ষণ চিন্তিত করতে সক্ষম হয় না,তখনি মন জোর করে' নূতন আনন্দ এনে চিত্ত প্রফুল্ল করে। আমি অমনি একটা স্থির করে' গঠন করে' নিলুম। বেশ ত ভালই, বরের বাড়ী যাব, কত গহনা পরব, ভাল ভাল জরির কাপড় পরব, আবার নতুন বাড়ী দেখব। শুনছি বাগান পুকুর আছে, ফুল তুল্‌ব, পুকুরে স্নান করব, বেশ কত মজা হবে। আমরা ত কাউকে শ্বশুরবাড়ী যেতে দেখিনি, ওবিষয় যে কি দুঃখ তা জানিনে। আমার যেমন খেলাধূলা, খাওয়াপরা চল্‌ছিল, সেই মতই চলেছে। নূতন ঘটনার মধ্যে একবার আমি, দাদা, খাজাঞ্চিদাদা আর কর্ত্তামণি বামুন, চাকর, বেহারা নিয়ে বজরায় করে' ফরাসডাঙ্গায় হীরালাল শীলের গঙ্গার উপর যে বাগান ছিল, তাতে গিয়ে মাসখানেক থাকি। আমার খুব আমোদ, বেলা ৭টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত-জলের উপর থাকতুম। বাগানে নেমে স্নান-আহারটা সেরে নিয়ে, আবার ওঠা হ'ত। তারপর রাত্রি ৮টার পরে নেমে বৈঠকখানায় শোওয়া হয়। কর্ত্তামণির বায়ুর প্রকোপ হওয়াতে, সাহেব ডাক্তার ব্যবস্থা দেন কিছুদিন জলে জলে বেড়ালে উপকার হবে। তবে কর্ত্তামণি বড়ই ভীতু ছিলেন, তাঁর রাত্রে বোটে থাকতে সাহস হ'ত না, সেইজন্য ঐ বাগানে নেমে থাকা হ'ত। আর রান্না, ভাঁড়ার, লোক-জনের থাকা, সব বাগানেই ছিল। এক মাস থেকে কর্ত্তামণির একটু সুস্থ ভাব হয়, কিন্তু তাঁর আর ভাল লাগল না। দাদার পড়া কামাই, আমিও যাহোক টটা-টিটী করি, তাও বন্ধ; এইসব নানা কথার আলোচনা করে' কর্ত্তামণি বল্লেন, আর নয়, বাড়ী চল। পরদিনই আমরা বাড়ীর দিকে আসতে লাগলুম, দু'রাত বুঝি বজরায় ঘুমতে হয়, ভাঁটার টানে টানে তবে তিন দিনে কলকাতায় পৌছলুম। তার দিনকয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যাকালে, একটি আধবুড়ো লোক এল, তার কালো রং, নাকটি খুব মোটা, খাঁদা, আর ঠোঁটদুটিও খুব মোটা, মাথায় আধপাকা আধকাঁচা চুল, সেগুলি সব খোঁচা খোঁচা হ'য়ে উর্দ্ধমুখে আছে; চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাও আবার কোটরে প্রবিষ্ট; আর তার সাজ একখানি সরু লালপাড় ধুতি, আর গলায় একখানা কোঁচানো চাদর, পরে মনে পড়ে' গেল গলায় দু'কণ্ঠি মালা, হাতে একটি ছাতা। তখন আমি বেড়িয়ে এসে প্রায় দিদিমার কাছেই সন্ধ্যার সময় শুয়ে থাকতুম। দিদিমা মহা-ভারত রামায়ণ পড়তেন, আবার কোনদিন পদ্মপুরাণ, কি যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পড়তেন। আমার শুনতে খুব ভাল লাগত। আবার কোন দিন আমায় আস্তে আস্তে ভাল উপদেশ দিতেন,—এমনি করে' শ্বশুর বাড়ী যেয়ে ননদকে ভক্তি করবে, ননদের আর কেউ নেই, তিনি শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে প্রণাম করবে; তোমার সব জায়েরা আছেন, তাঁদের কথা শুনবে, তাঁদের সব ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে ভাব করে' খেলা করবে,যেন কখনও কাউকে মারাধরা কোরনা। যদিও দিদিমা জানতেন যে, আমি কখনও কারও ছেলেমেয়েকে মারিনি, তবু আমার ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দিতেন। সেই যে অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিটিকে বসিয়ে রেখেছি, এখন তার কথা হোক্। সে বুড়ো বল্‌ছে--আজ্ঞা মা, বড়-মা পাঠালেন, তাঁর ছোট ছেলের বউটি ও-মাসে মারা গেছেন, একটি বছরের মেয়ে রেখে গেছেন। তাই মা তাঁর বিবাহের জন্যে একটি মেয়ে খুঁজছেন,—যদি আপনার পৌত্রীটির সঙ্গে দেন, তাহলে এই শ্রাবণ মাসে বিবাহ হ'য়ে যায়। দিদিমা একটু ইতস্ততঃ করে বল্লেন যে, তোমাদের ছোট বাবুর ছেলেটি কেমন, তাঁর বিবাহ করে হবে? দিদিমা একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন, কেননা ছোট বাবু যে ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে' গেছেন, সে ছেলেকেও ঐ গিন্নিই মানুষ করেছেন; আবার নিজের ছেলের জন্যে বলে' পাঠালেন,—এর ভাবটি কি বুঝতে হবে। তখন ঐ লোকটি বলছে যে, ঐ বড়মার ভাইঝি আছেন দুটি, তার বড়টি খুব সুন্দরী,

তার সঙ্গে সে বাবুর বিয়ে দিতে মা'র খুব ইচ্ছা, তবে এখনও কিছু ঠিক নেই। তখন দিদিমা একটু ভাব পেলেন, বল্লেন, আচ্ছা, তুমি কাল একবার এস, ও মেয়ে এখন ছোট, এই আট বৎসর চলছে, আর ওর মা-বাপকে বলি, আমি এখনি কি বল্ব। পরে বুড়ো আর একটি প্রণাম করে' চলে' গেল। দিদিমা সব কাণ্ড শুনে আর থাকতে পারলেন না, মাকে ডেকে বল্লেন—আবার বিয়ে টলমল, এখন কোন আশা নেই।

এইরকম কথাবার্ত্তা হ'য়ে প্রায় এক মাস কেটে গেল। আর এখন কোন ঘটনা নেই। আমার বোনগুলি যে মারা যায় তা' আগেই লিখেছি। এখন একটি খোকা ছিল, আমি আর দাদা। আমি দাদার সঙ্গে একদিন একদিন লুকিয়ে স্কুলের গাড়ীতে উঠে বসে' থাকতুম, কেউ জানতে পারত না, পরে খোঁজ নিয়ে শুনতেন। আমার দাদা তখন পড়তেন নর্ম্মাল স্কুলে, আমি একটু স্কুলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চলে' আসতুম। সেইবার পৌষ মাসে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্‌ আসেন, কলকাতায় খুব ধুম পড়ে' যায়, আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়; তবে এখনকার মত বৈদ্যুতিক আলো তখন আবিষ্কার হয় নি, ল্যাম্পে রং গুলে' গুলে' বাহারী করে' সাজানো হয়েছিল, আর গ্যাস্‌। তবে বাজি নানাপ্রকার হয়েছিল। জগদানন্দের বাড়ী বরণ হয়েছিল; আমরা জাহাজ দেখতেও গিয়েছিলুম। জাহাজের নীচের গহ্বরে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু ছিল, তাদের দুধ বাদ্‌শা খেতেন; তাদের গায়ের রং সাদা ধব্‌ধবে, তার ভিতর থেকে গোলাপী আভা বেরচ্ছে। তারপর দোতলায় খানার তদ্বির হ'চ্ছে; তেতলায় সব আফিস-ঘর, পল্টনরা পাহারা দিচ্ছে; আর যুবরাজ চৌতলায় থাকেন। এক এক করে' সব ঘরগুলি দেখলুম, বড় চমৎকার! আয়নার দরজা আর রকম রকম মখ্‌মল-মোড়া কৌচ সোফা ছিল, বড় বড় আয়না টাঙানো। এক ঘরে প্রকাণ্ড স্নানের টব, আল্‌না, আয়না, টয়েল করবার সব জিনিস; আর একটি ঘর লাইব্রেরী, তা'তে সব সোনালীমোড়া বাঁধানো বই আর টেবিলচেয়ার সাজানো ছিল; আবার তাস খেলবার একটি টেবিল ছিল, তার চারদিকে চেয়ার দেওয়া। শোবার ঘরটি অন্য ধরণের সাজানো, খাট মশারী আয়না ফুলদান, মোটা কারপেট মোড়া ছিল। আমার কর্ত্তামণি আমায় কিছু দেখাতে কি খাওয়াতে পরাতে বাকি রাখেন নি; যখন কলকতায় যা নতুন হবে, সারকাস্‌, ইংরাজি থিয়েটার, ফেন্‌সি-ফেয়ার—সব দেখাতেন; মিউজিয়মে প্রায় যেতুম, জুলজিকেলে মাসে একদিন যাওয়া হ'ত; আমার বেড়াবার আমোদটা বড় ছিল।

(ক্রমশঃ)

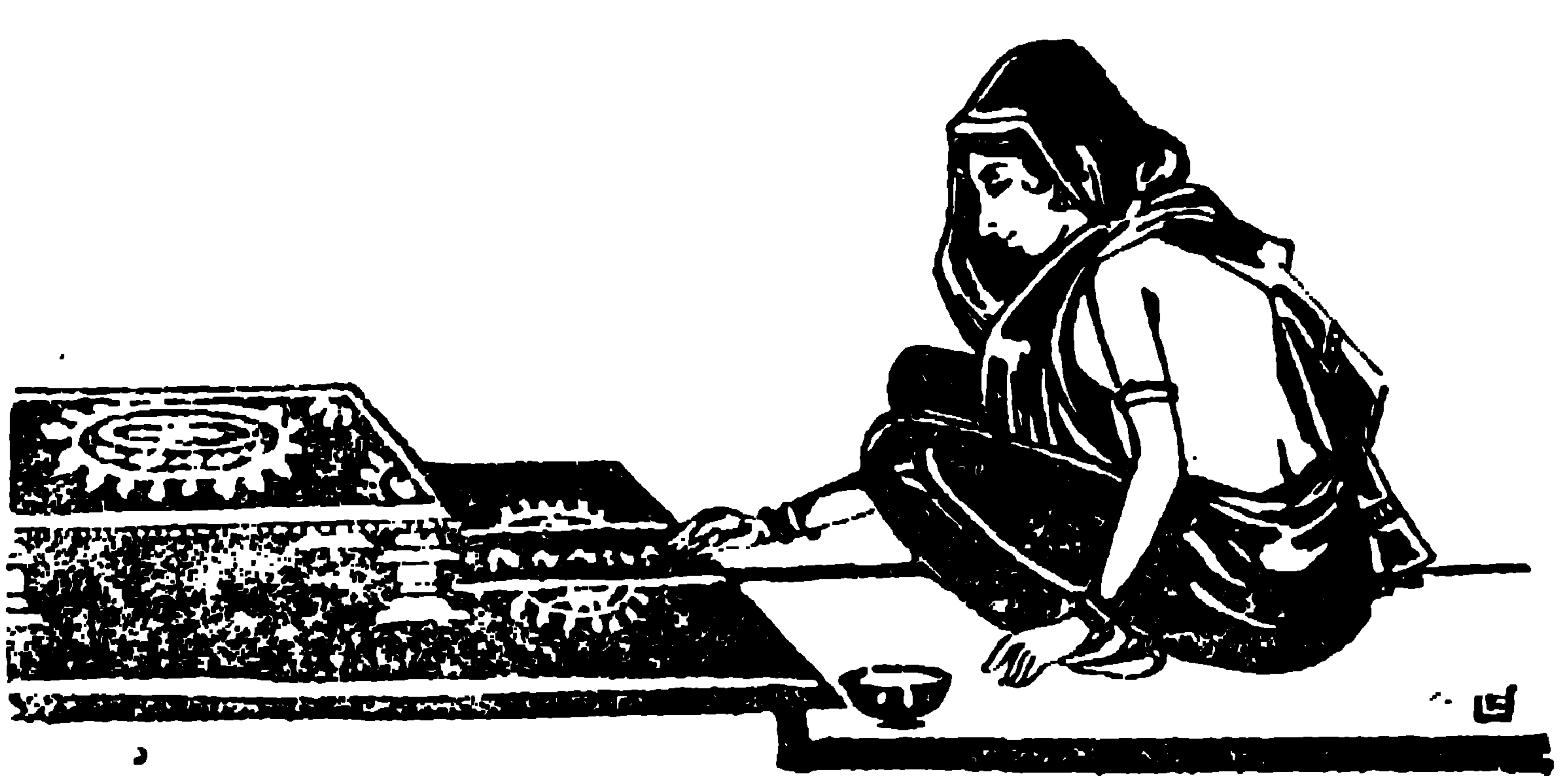

হ'তেম যদি—

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

হ'তেম যদি বদ্যি, রোগী চাইলে খেতে পথ্যি—
সাগু বার্লি ছাড়া কর্‌তেম সবেতেই আপত্তি।
হ'তেম যদি ডাক্তার, কাণে ষ্টেথোস্‌কোপ্ লাগিয়ে—
মুখটি কর্‌তেম ভারী রোগীর বুকে হাত চাপ্‌ড়িয়ে।

হ'তেম যদি গবর্ণমেণ্ট-আফিসের কর্ম্মচারী—
সবার উপর হুকুম ঝেড়ে কর্‌তেম খবরদারী।
হ'তেম যদি কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কি জজ্—
ভাব্‌তেম আমার মত দুনিয়ায় নেই কেউ আর দিগ্‌গজ্!

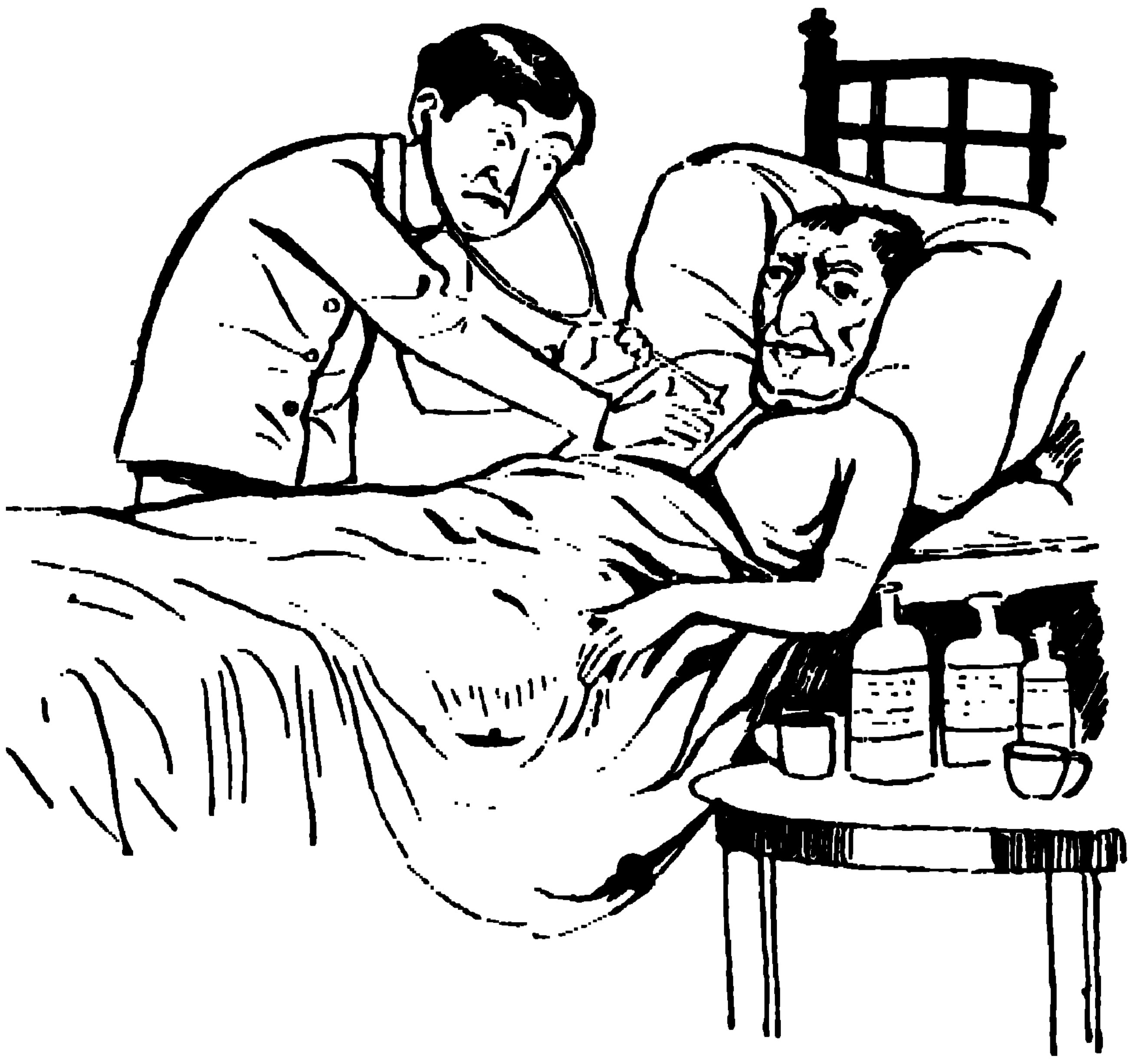

'মুখটি কর্‌তেম ভারী রোগীর বুকে হাত চাপ্‌ড়িয়ে—'

'চক্ষু বুজে জেলের হুকুম দিতেম কলম ঘ'ষে—'

হ'তেম যদি হাকিম, উঁচু এজ্‌লাসেতে ব'সে—
চক্ষু বুজে জেলের হুকুম দিতেম কলম ঘ'ষে।
হ'তেম যদি জমিদারদের নায়েব কি গোমস্তা—
বাজারের সব জিনিস হ'ত আমার বেলা সস্তা।

হ'তেম যদি ধন-কুবের নব্য মাড়োয়ারী—
বড়বাজার ছেড়ে কর্‌তেম বালিগঞ্জে বাড়ী।
হ'তেম যদি স্কুলের গুরুমশাই কিম্বা পণ্ডিত—
ছাত্রদেরে কর্‌তেম তেড়ে বেত্র দিয়ে দণ্ডিত।

হ'তেম যদি বিলাত-ফেরত্ হাকিম কি ব্যারিষ্টার—
নামের গোড়ায় "বাবু" কেটে বসিয়ে দিতেম "মিষ্টার"।
হ'তেম যদি এটর্ণি কি উকিল কিম্বা মোক্তার—
পসার ক'মে গেলে পরে ব্যবসা করতেম দোক্তার।

'ছাত্রদেরে করতেম তেড়ে বেত্র দিয়ে দণ্ডিত—'

হ'তেম যদি সাহেব সুবোর খানসামা কি বেহারা—
পাগ্‌ড়ি তক্‌মা এঁটে কর্‌তেম খুব জাঁকালো চেহারা।

'পাগ্‌ড়ি তক্‌মা এঁটে কর্‌তেম খুব জাঁকালো চেহারা—'

হ'তেম যদি দর্‌ওয়ান কি পুলিস কনেষ্টবল—
ছাতু আর ডাল-রুটি খেয়ে চেহারা কর্‌তেম ডবল।
হ'তেম যদি কল্‌কাতা ইউনিভার্‌সিটির ছাত্র—
পরীক্ষা পাস কর্‌তেম প'ড়ে গাইড্-পুঁথি মাত্র।
কাউন্সিলের এম্, এল্, সি যদি হ'তেম জিতে ভোটে—
মেদিনী কম্পিত কর্‌তেম গলাবাজির চোটে।
হ'তেম যদি আরো যা-সব হ'তে ইচ্ছে করে—
তাহ'লে কি কর্‌তেম সে-সব ভেবে বল্‌ব পরে!

খেলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

আলো-ছায়া—(১) খেলোয়াড়-সংখ্যা এক এক দলে ৮ জন বা ততোধিক। সমস্ত খেলোয়াড় চক্রাকারে দাঁড়াইবে। আলোর দলের একজনের পর ছায়ার দলের একজন দাঁড়াইবে। ২ দলেরই দলপতি পাশাপাশি থাকিবে। প্রত্যেক ২ খেলোয়াড়ের মধ্যে অন্ততঃ ১½ গজ স্থান থাকিবে। মধ্যস্থ, চক্রের মধ্যস্থানে থাকিবে। দুইটি টেনিস্ 'বল' (একটি সাদা একটি কাল) নিয়া মধ্যস্থ দলপতিদের হাতে দিবেন। দলপতিদ্বয় বিপরীত দিকে তাহার নিজের দলের লোকের কাছে 'বল' চালাইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপভাবে 'বল' ঘুরিয়া আবার দলপতিদের হাতে আসিবে। ৩ বারের মধ্যে ২ বার অথবা ৫ বারের মধ্যে ৩ বার যে দলপতির হাতে আগে 'বল' আসিবে সেই দল জয়ী।

আলো-ছায়া—(২) সমস্ত খেলোয়াড় দুই লাইনে মুখামুখি হইয়া এমনভাবে দাঁড়াইবে যাহাতে ১জন আলোর সম্মুখে একজন ছায়া থাকে এবং প্রত্যেক আলোর সম্মুখে একজন ছায়া থাকে। দুই দলেরই দলপতি থাকিবে একপার্শ্বে। মধ্যস্থ দলপতিদের কাছে মধ্যস্থানে দাঁড়াইবেন এবং বিভিন্ন রঙের দুইটি 'বল' নিয়া দলপতিদের হাতে দিবেন। বংশীধ্বনি বা অন্য কোন সঙ্কেতে মাত্র দলপতিদ্বয় সম্মুখের লাইনে নিজ খেলোয়াড়ের কাছে 'বল' ছুড়িয়া দিবে। সে আবার তার সম্মুখের নিজ দলের

খেলোয়াড়ের কাছে 'বল' দিবে। এইভাবে 'বল' শেষ পর্য্যন্ত যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দলপতির হাতে পড়িবে। ৩ বারের মধ্যে ২ বার অথবা ৫ বারের মধ্যে ৩ বার যে দলপতি আগে 'বল' পাইবে তাহারা জয়ী। দুই লাইনের মধ্যে অন্ততঃ ২½ গজ স্থান থাকিবে এবং ২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১ গজ।

কোণের বল—খেলোয়াড়-সংখ্যা এক এক দিকে ১০ হইতে ৩০ জন। ক্ষেত্র ৪৮ ফুট দীর্ঘ ২৪ ফুট প্রস্থ। মধ্যস্থানে রেখা দ্বারা ক্ষেত্রকে সমান ২ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। ক্ষেত্রের প্রত্যেক কোণে ৬ ফুট দীর্ঘ ৬ ফুট প্রস্থ এক একটি ঘর থাকিবে। দুই দল ক্ষেত্রের দুই দিকে থাকিবে, কিন্তু ১ দলের পশ্চাতে ২ কোণে যে দুই ঘর থাকিবে। তাহাতে অপর দলের ২ জন থাকিবে। এইরূপ অপর ২ ঘরে অন্য দলের ২ জন থাকিবে। মধ্যস্থ মধ্যবর্ত্তী রেখার একপার্শ্বে থাকিবেন। কোণের ঘরে যেসব খেলোয়াড় আছে তাহারা ঘরের বাহির হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন খেলোয়াড়ও কোণের ঘরে ঢুকিতে পারিবে না। মধ্যস্থ একটি "ফুটবল" নিয়া মধ্যরেখার উপর জোরে ফেলিয়া দিবেন; 'বল' রেখার যে দিকে যায় সেই পক্ষ 'বল' নিয়া অপর পক্ষের পশ্চাতে তাহাদের যে দুই সঙ্গী আছে, তাহাদের কাহারও কাছে ছুঁড়িয়া মারিবে। তাহারা কেহ সেই 'বল' ধরিতে পারিলে সেই পক্ষের ১ হইবে। ধরিতে না পারিলে অপর পক্ষ বল নিয়া অন্য কোণে মারিবে। এইভাবে খেলা চলিবে। একপক্ষ চেষ্টা করিবে যাহাতে অন্য পক্ষের কোণের খেলোয়াড়দ্বয় 'বল' ধরিতে না পারে। এইভাবে যাহাদের প্রথমে ২০ হইবে তাহারাই জয়ী।

হাত-বল—খেলোয়াড়-সংখ্যা এক এক পক্ষে ১১ হইতে ১৫ জন। ক্ষেত্রের পরিমাণ সম্ভবমত। 'গোল' ৩ গজ দীর্ঘ ২ গজ প্রস্থ। 'গোল'-রেখার মধ্যে 'গোল'রক্ষক ভিন্ন আর কোন খেলোয়াড়ই যাইতেপারিবে না। ক্ষেত্রে খেলোয়াড় সন্নিবেশ ঠিক ফুটবলেরই মত। ১১ জনের অধিক খেলোয়াড় একদিকে হইলে অন্য স্থানের খেলোয়াড় বেশী হইতেপারে কিন্তু গোলরক্ষক সর্ব্বদা একজনই থাকিবে। সম্মুখের ৫ জন খেলোয়াড় ছাড়া আর কোন খেলোয়াড়ই মধ্য-সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না। 'গোল'-রক্ষক ছাড়া অন্য কেহ 'বলে' পা লাগাইতে পারিবে না; কেবলমাত্র 'গোল'-রক্ষক শরীরের যে কোন অঙ্গ লাগাইতে পারিবে। 'বল' ধরিয়া কোন খেলোয়াড় ৩ পায়ের বেশী চলিতে পারিবে না। সম্মুখের খেলোয়াড়গণ বিপক্ষের 'গোল'-রেখার বাহিরে আসিয়া 'বল' 'গোলে' নিক্ষেপ করিবে। 'বল' 'গোলের' মধ্যে না পড়িলে 'গোল' হইবে না। খেলোয়াড়গণ ইচ্ছা করিলে করতল দ্বারা আঘাত করিতে করিতে 'বল' নিয়া চলিতে পারে। কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে বিপক্ষ 'গোল'-রেখার বাহির হইতে বিনা-বাধায় 'গোলে' একবার 'বল' নিক্ষেপ করিতে পারে; মাত্র 'গোল'-রক্ষক বাধা দিতে পারিবে।

সম্পূর্ণ

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(২০)

সুন্দরবনে অশোকদের খানিকটা জমিদারি ছিল। সেইখানে সে চলিয়া আসিয়াছে। বনের কোলে, উন্মুক্ত মাঠের উপরে সে একখানি বাংলো কিনিয়াছে। আশে-পাশে কোল-সাঁওতালদের কুঁড়ে। জ্যোৎস্নারাতে তাহারা বাঁশী বাজায়,—বর্ষায় মাদলের তালে তালে তাণ্ডবনৃত্যে উদ্দাম হইয়া উঠে। বসন্তে মহুয়া ফল ছেঁচিয়া মদ তৈয়ারী করে। এই তাহার প্রতিবাসীদের পরিচয়। ছেলেবেলা হইতে বরাবর হোমিওপ্যাথির উপর তাহার ঝোঁক ছিল। সে গরীব দুঃখীদের ভিতর সেই ওষুধ বিতরণ করে—তাহারাও আপদে বিপদে উপকারের ঋণ ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পায়। অশোক কখনো একলা বেড়ায়, কখনো বসিয়া লেখে, কখন বা পড়ে—এমনি করিয়া তাহার দিন যায়।

অশোকের ডায়রি হইতে—

"বনের ভিতর প্রথম দিন। আমি যদিও শ্রান্ত তবু সুখী। বনের সমস্ত পশুপাখী আমার চারিধারে এসে ভিড় করল—আমার মুখের পানে পরিচিতের মত তাকিয়ে থাকল। গাছের গায়ে কত রকমের পোকা।

মাটির উপর একজোড়া তেলাপোকা স্থির হ'য়ে রয়েছে; একসারি পিঁপড়ে সার বেঁধে চলেছে তাদের ঘরকন্নার উপকরণ যোগাড় করতে। ভগবানের সংসারে প্রতিদিনকার মঙ্গলকর্ম্মে আদিম আয়োজন চলেছে। আমি 'ডিঙি' মেরে মেরে চলতে লাগলাম,—পাছে অসাবধান পদক্ষেপে একটি জীবন-কণিকারও প্রাণনাশ হয়।

একটা অপরূপ প্রসন্নতায়, শান্তিতে আমার মন ভ'রে উঠতে লাগল। প্রাণের উদ্বেগ, অশান্তি, জ্বালা যেন প্রকৃতি-মা'র হাতের স্নিগ্ধ প্রলেপে ধীরে ধীরে আরাম হ'য়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। আমার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্যে বনের মহান্ সত্তা যেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে;—যে আদিম যুগের মানুষ সভ্যতার কৃত্রিমতার আবর্জ্জনার আড়ালে সুপ্ত ছিল, সে তার স্বভাবের কোলে আবার ফিরে এসেছে তাই তার প্রাণ আজ আনন্দে ভরপুর।

মা'র কোলে ফিরে আসা ছোট ছেলের মত আমি আনন্দে বার বার অর্থহীন চীৎকার ক'রে উঠলাম। মৃদু আবেগে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। আমি আজ সুখী! তাই আদিমকালের মানুষের মত হাঁটু গেড়ে ব'সে আজ এই প্রথম অন্তরের যথার্থ প্রার্থনা ভগবানের চরণে নিবেদন ক'রে দিলাম।

সুস্থ চোখ সুদূর দিকচক্রবাল দেখবার দাবী রাখে। বহুদূর পর্য্যন্ত দেখতে পেলে আমরা সহজে পরিশ্রান্ত হই না।

আমার প্রিয় বনভূমি!—ভগবান ত তোমার কোলেই আমাকে প্রথম পাঠিয়েছিলেন। তোমার অন্তরের শান্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। পুরাকালে কত ঐশ্বর্য্যবান রাজা প্রাসাদের ভোগবিলাস স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে তোমার কোলে কুটীর বেঁধে ঋষিদের শিষ্য হ'য়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পেতেন।

আমি বনের ভিতর বেড়াতে বেড়াতে মাঝে মাঝে থামতে লাগলাম, আর প্রিয়জনের মাধুরীভরা মুখের মত চারিদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলাম। প্রত্যেক তরু-লতাগুল্ম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গকে নাম ধ'রে ডাকতে লাগলাম! আর আবেগে, আনন্দে, ভালোবাসায় আমার মন ছাপিয়ে চোখে জল ভ'রে উঠতে লাগল। ঐ যে ঝোপের ভিতর পাতার আড়ালে বনের ফুল ফুটে রয়েছে—ও যেন প্রাণের ভালবাসায় ভরা। আমি ঝুঁকে পড়লুম তার দিকে—কাঁটার ছড় লেগে আমার গায়ে দু'জায়গায় রক্তরেখা ফুটে উঠল—ভ্রূক্ষেপ নেই সে দিকে। আমি পাগলের মত আবেগে, অথচ অতি সন্তর্পণে, যেন আমার ব্যস্ততার ব্যথা পাবে এই রকম সাবধানে একটি চুম্বন তার শিশির-মধু-ভরা পাপড়ির উপর নিবেদন করলাম।

একটু শিশির-মধু আমার ঠোঁটে লেগে গেল—জিভ দিয়ে চেপে মিষ্টি লাগল—মুখে অকারণে হাসি এল। আশে-পাশের পাহাড়গুলোর দিকে এইবার আমার দৃষ্টি পড়ল। এগুলো যেন ধরণীর বিস্ময়!—নিজের সৌন্দর্য্য নিজে 'ডিঙি' মেরে দেখার একটা উৎসুক চেষ্টা। পাহাড়গুলো যেন ইঙ্গিতে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে! আমি কত কথা ভাবতে ভাবতে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম।

দূরে—বহুদূরে উড়ন্ত চিলটাকে নীলিমার কোলে এখন একটা কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি ওকে এই পাহাড়ের উচ্চতা থেকে বেশ দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু পাহাড় থেকে ঐ চিলের তীক্ষ্ণ স্বরটা আমার চিন্তাকে দূরে, আরো দূরে পাঠিয়ে দিলে।

আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের কোলের সমস্ত সন্তানগুলির কল্যাণ হোক। অনন্তকালের মধ্যে কি শুভক্ষণ এই দিনটি! আজ আমার মন এই বিরাট বনের মত বড় হ'য়ে গিয়েছে। আজ আমি প্রসন্ন মনে বলছি—আমার অতিবড় শত্রুদেরও যেন কল্যাণ হয়। সুযোগ বুঝে আমার অনিষ্ট করতে যারা কখনো পিছ-পা হয়নি, বন্ধু ব'লে তাদের দিকে আজ আমি হাত বাড়িয়ে দিতে রাজী আছি। এই সুন্দরী পৃথিবীর বুকে তাদের জীবনযাত্রা আনন্দময়, কল্যাণময় হোক।

আজ মনে হ'ল—ভগবান, স্বর্গ এসব কিছুরই অস্তিত্ব নেই, এ সমস্তই মিথ্যা কল্পনা। কেবল এই পৃথিবীর জীবন

আর সকলের ভালবাসা একমাত্র সত্য। আমি অনন্তকাল ধ'রে ভালবাসতে চাই—মানুষের ভালবাসা পেতে চাই।"

* * *

সমস্ত লোকজন হইতে দূরে, সহরের কোলাহলের বাহিরে, সেই বিজন স্থানে অশোকের দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। নিজের কাজ সে সব নিজে করে—লোকজন রাখার হাঙ্গামা করে নাই। ভাবিয়াছিল সাঁওতালদের কাছ হইতে কতকগুলি গরু কিনিবে—কিন্তু সেই তৃণতরুশূন্য দিগন্তবিস্তৃত ধূসর প্রান্তরের পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল, পশুগুলি তাহা হইলে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে।

সে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, আর একলা,—সবদিকে দৃষ্টিও দিতে পারে না। তখন বর্ষা পড়িয়াছিল। এই সময়ে এই প্রস্তর-কঙ্করময় বন্ধুর ভূমিখণ্ডে হঠাৎ যেন সবুজের বন্যা আসে। ভুট্টা ক্ষেতের জমি ঠিক করা, চারা বসান, আল বাঁধিয়া দেওয়া—মেলা কাজ। অশোক জনকয়েক মজুর ধরিল; সমস্ত দিন তালপাতার টোকা মাথায় দিয়া, ক্ষেতের আলের উপর দাঁড়াইয়া, তাহাদের কাজ দেখিল। নিজে হাপর হইতে চারা বাহির করিয়া সারবন্দী দিয়া বসাইল—সাঁওতাল মজুরেরা এলোমেলো ভাবে বসাইতে যাইতেছিল সে তাহাদের বারণ করিল। কাজ শুধু মানুষের প্রয়োজন মেটান নয়, খানিকটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাও কাজের অঙ্গ। অশোকের সৌন্দর্য্যপিপাসু মনে এখনো সেদিকে বেশ দৃষ্টি ছিল। পশুপাখী সে বড় ভালোবাসে। গোয়ালে ভাগ করিয়া আগল দিয়া সে কতকগুলি ছাগল ভেড়া পুষিয়াছিল। তাহাদের জন্য তাজা ঘাসের সেরূপ প্রয়োজন নাই। আর বর্ষা পড়িতেই সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছিল, যে, দগ্ধতাম্রের মত দিগন্তবিস্তৃত আকাশ যেমন ঘনকালো জলভরা মেঘে ভারী হইয়া উঠিল, অমনি সেই শুষ্কতৃণ মরুভূমির মত প্রান্তরখানি হঠাৎ কোন্ যাদুকরের দণ্ডের আঘাতে সবুজ ঘাসে ছাইয়া গেল। দুপুর বেলা হঠাৎ যেদিন মেঘ ডাকিয়া ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি আসিত,—সে আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিত না। বই-খাতা ফেলিয়া খালিমাথায় সে বৃষ্টিতে ভিজিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত।

মাথার লম্বা চুল বাহিয়া মুখের উপর বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িতেছে—সে এক আশ্চর্য্য গা-শির্‌শির্-করা পুলকময় অনুভূতি! ঝমঝম রবে বৃষ্টি ঝরার তালে তালে তাহার প্রাণ-মন তান ধরিয়া উঠিত—সে গলা ছাড়িয়া গান জুড়িয়া দিত।

একদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়া চেয়ারের উপর তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে—পায়ের উপর মুখ রাখিয়া 'ভুলো' (দিনকতক হইল কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া তাহার জীবন-যাত্রায় যোগ দিয়াছিল) ঝিমাইতেছে। মাঝে মাঝে বাদলার দমকা হাওয়া বৃষ্টির শীকরকণা বহন করিয়া খোলা জানালা দিয়া হুস্ হুস্ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল। হঠাৎ সে শুনিল, 'ডাক্তারবাবু—"

মেয়েদের করুণ সুরের ভয়-ভরা গলা! সে চম্‌কিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "কে রে?"

"আমি মুংরী।"

সে তাহাকে চিনিল। বনের কোলে তাহাদের কুটীর। বড় গরীব,—বাপে-ঝিয়ে কষ্টে থাকে। মা অনেকদিন মারা গিয়াছে, টাকার অভাবে বাপ আর বিবাহ করে নাই।

মুংরী যেন কালো পাথরে খোদা, ছিপছিপে লম্বা; চৌদ্দ ছাড়িয়া পনেরোয় পা দিয়াছে। বিবাহ দিলে মেয়ে পর হইয়া যাইবে,—তাহার একলা-ঘরের কাজকর্ম্ম কে করিবে? এ বয়সে তাহার বড় কষ্ট হইবে। মুংরীর বাপ তাহার বিবাহ দেয় নাই।

চঞ্চলা হরিণীর মত সে মাঠে মাঠে, প্রতিবেশীর ক্ষেতের ফসল চুরি করিয়া, বালকদের সাথে ঝগ্‌ড়াঝাটি, আঁচড়া-আঁচড়ি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যে দেখে সে হাসিয়া বলে—পাগ্‌লী মেয়ে!

অশোকের সহিত তাহার আগেই ভাব হইয়া গিয়াছিল। আর, কাহার সহিত যে তাহার অ-ভাব তাহা বলা মুস্কিল। এক একদিন সে শালপাতার ঠোঙা করিয়া অশোককে বনের ফুল আনিয়া দিত। প্রথম প্রথম অশোক দাম বলিয়া পয়সা দিলে সে হাসিয়া পরম আগ্রহে পয়সাগুলি লইয়া আঁচলে বাঁধিত। কিন্তু দিনকতক পরে কি জানি কেন—সে ফুল প্রায় নিয়মিত যোগাইত, কিন্তু দাম দিতে গেলে শশব্যস্তে ছুটিয়া পলাইত। হাসিয়া বলিত, "ফুলের আবার দাম কি বাবু?

ওত' আমি বন থেকে তুলে আনি। আপন মনের খুসীতে দিলাম, ওর দাম চাই না।"

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মুংরী,এতরাত্রে এসেছিস্ কেন, কি হয়েছে রে?"

মিনতিকরুণ জল-ভরা চোখ তুলিয়া মুংরী বলিল, "বাবু, আমার বাপ্‌কে বোঙায় পেয়েছে। ওঝা ডাকতে গেলাম, এতরাতে সে পথ হেঁটে আস্‌বে না, আপ্‌নি চলুন; আপনার অনেক ভাল ওষুধ আছে,—আমার বুড়ো বাপের জান বাঁচিয়ে দিন।"

ওঝার কথা শুনিয়া অশোকের হাসি আসিল। কিন্তু সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওঝার কাছে না গিয়ে আমার কাছে আগে এলেই ভাল কর্‌তিস্।" "আমি আস্‌তে চেয়েছিলাম। বাপ বল্‌লে ওঝা ছাড়া তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আপ্‌নি কি যাবেন না বাবু?" তাহার কাজলভরা চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছিল—চোখ দুইটি লাল ফোলা-ফোলা। অশোকের মনে হইল এই চঞ্চল মেয়েটি কেমন করিয়া আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। অশোকের মন বড় নরম; তাহার দয়া হইল, বলিল, "চল, দেখি গিয়ে কিছু করতে পারি কি না।"

মুংরী লণ্ঠনটা তুলিয়া লইল। অশোক দরজায় চাবি দিয়া হোমিওপ্যাথির বাক্সটা হাতে করিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

পথে মুংরী একটি কথাও বলিল না। আসন্ন বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় সে যেন একেবারে মূক হইয়া গিয়াছিল। সাবধানে আলো ধরিয়া উঁচুনীচু পথ দেখাইতে লাগিল।

অশোক পৌঁছিয়া দেখিল বুড়ার শেষ দশা। কলেরা হইয়াছে; এর আগে ঔষধ দিয়া চেষ্টা করিলে হয়ত বাঁচিত, —এখন আর আশা নাই। তবুও সে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। বুড়া বলিল, "আমাকে বোঙা নিয়ে যাবে, ওঝা এলনা, আমাকে কেউ রাখ্‌তে পারবে না। তোমার অনেক টাকাকড়ি, তুমি বড় ভালো লোক, মেয়েটাকে নোকর রেখ, বড় শক্ত কাজের মেয়ে—" বলিয়া সে চুপ করিল। তাহার যন্ত্রণাবিকৃত মুখ ক্রমশঃ মৃত্যুর প্রশান্তিতে ভরিয়া গেল।

অশোক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুংরীর কান্না-ভরা মুখের পানে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল।

মুংরী অশোকের ঘাড়ে পড়িয়াছে। প্রথমে অশোক বিরক্ত হইল। জীবনটা সে নির্জ্জনে একলা কাটাইবে;—দুর্ভাগ্য আবার আপদ জুটাইল কেন? আবার মনটা যখন সম্মুখের দিগন্ত-বিস্তৃত শূন্য প্রান্তরের মত খাঁ খাঁ করিত, তখন মনে হইত মানুষের সঙ্গও মনের একটা অবলম্বন। এমন কি পশুও একলা থাকিতে পারে না।

তাই যখন দেখিত মুংরী ভুট্টাক্ষেতে শূকর তাড়াইতেছে, কূয়া হইতে জল তুলিয়া বাগানের চারা গাছের আলবালগুলি জলে ভরিয়া দিতেছে,—তাহার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিত। সে ডাকিত,—"মুংরী!"

মুংরী তাড়াতাড়ি কাদা-হাত জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিত, "কি বাবু?"

"আজ হাটের দিন; তোর জন্যে কি আনব রে?"

"কই, কিছু ত দরকার নেই!"

"কেন সেদিন যে বল্‌ছিলি তোর কাপড় ছিঁড়ে গেছে?"

"ও হ্যাঁ—" তার মুখে অকারণে হাসি দেখা দেয়। সাঁওতালীদের তাঁতে বোনা লালপেড়ে মোটা কাপড়খানি অশোক যখন তাহাকে আনিয়া দিল, মুংরী হেঁট হইয়া তাহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। আশোক গ্রামের ছেলেদের লইয়া একটা স্কুলের মত গড়িয়াছে। বিকাল বেলা তাহার ক্লাশ বসে। কোনো দিন রাত্রে সে তাহাদের ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইয়া গল্প বলে। নিজের যতখানি সাধ্য, তাহাদের শিশু-জীবনে ছবি ও বইয়ের ভিতর দিয়া সে আনন্দের সাড়া আনিতে চেষ্টা করে। ছেলেদের কাহাকেও বেতন দিতে হয় না। তাহাদের ডাকাডাকি করিতে হয় না, এমন কি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে হইতে তাহারা আসিয়া জমা হয়। কারণ যাহারা আগে আসিবে সকলকেই অশোক লজেনচুস দেয়। মাষ্টারটি ছেলেদের মন জয় করিয়া লইয়াছিল। মুংরী একদিন বলিল, "আমিও পড়ব বাবু।"

অশোক তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "বেশ ত; কিন্তু তুই আমাকে বাবু বলিস্ কেন? তুই আমাকে দাদা ব'লে ডাক্‌বি—কেমন? আর আমিও তোকে মৌরী বল্‌ব।"

সে হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

কিন্তু হয়ত অভ্যাসের বশে দাদা কোন দিন সে বলিতে পারিল না; ভুল ধরাইয়া দিলে হাসিত। সে চঞ্চলা বটে কিন্তু বুদ্ধিমতী, আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রথমভাগ শেষ করিয়া ফেলিল।

"বাবু, আপনি বলেছিলেন প্রথমভাগ শেষ করতে পারলে আমাকে একটা ছবিভরা গল্পের বই কিনে দেবেন,—কই, দিন।"

অশোক সস্নেহে বলিল, "আচ্ছা? এইবার কলকাতায় গিয়ে তোমার জন্যে কিনে আন্‌ব।"

মুংরী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "আপনি সহরে যাবেন, আবার আস্‌বেন ত—!"

"কেন রে! ও-ভয় হচ্ছে কেন তোর, মৌরী?"

"আমি একবার বাবার সঙ্গে সহরে গিয়েছিলাম। সেখানে কত গাড়ী, কত ঘোড়া, লোক-জন, বড় বড় বাড়ী!—সহরের বাবুরা কি এই সব ছেড়ে বনগাঁয়ে থাক্‌তে পারে?"

তাহার আর না-আসিবার আশঙ্কায় একজন মানুষের মনে এতখানি উদ্বেগ হয়?—অশোক মনে মনে খুসী হইয়া উঠিল।

বাংলোখানি কোন্ এক নীলকুঠীর সাহেবের ছিল। চলিয়া যাইবার সময় তৈজসপত্র-সমেত সে নিলামে বিক্রয় করে।—অশোক তাহাই কিনিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সে যেমন এলোমেলো অগোছাল, এতদিন সমস্ত গৃহ-সৌষ্ঠব ধূলিমলিন, গৃহকোণ আবর্জ্জনা-স্তূপে, কীটপতঙ্গের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল। অশোক মেলা মুর্গী-পেরু প্রভৃতি কিনিয়াছিল। সেগুলি অবাধে খাদ্যকণিকা সংগ্রহ করিয়া এবং পোকা-মাকড় খুঁজিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত।

মৌরী আসিয়া আসবাবপত্রের ধূলা ঝাড়িয়া, মেজে জল দিয়া ধুইয়া, নেকড়া দিয়া মুছিয়া, সমস্ত ঝক্‌ঝকে তকতকে করিয়া তুলিল। তারপর যেদিন অশোক বলিল, "মৌরী! সমস্ত রইল, দেখিস্ শুনিস্। আমি আসি তা হ'লে—আবার শীঘ্র ফিরে আসব।"

মৌরী কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "আমাকে নিয়ে চল বাবু! আমিও যাব। আমি একলা থাক্‌তে পারব না গো!"

"ছিঃ, কাঁদে না। বোকা মেয়ে!—আবার আস্‌ব বলছি।"

অশোক চলিয়া গেল। মৌরী একদৃষ্টে তাহার গরুর গাড়ীর ধূলায় ঝাপ্‌সা পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অশোকের চোখও বিশেষ শুষ্ক ছিল না। গাড়ী যখন অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে তখন তাহা সে প্রথম টের পাইল। তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া অশ্রুসিক্ত আঁখি ও কপোলতল মুছিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "কি আপদ!"

(ক্রমশঃ)

আরতি

শ্রী বিশ্বেশ্বর দাস

তোমারে আমার মরমের ডোরে
বাঁধিয়া রাখিতে চাই,
দুখের আঁধারে তোমারে যেন গো
নিবিড় করিয়া পাই।
তব জল বায়ু ভূধর আকাশ
মোর সারা চিতে হোক্ পরকাশ,
ওগো দয়াময় দাও মোরে তব
অভয় চরণে ঠাঁই।

সংসার-মোহ-মায়া মাঝে আমি
হারায়ে ফেলেছি কূল,
কিযে করি আমি নিজে নাহি বুঝি
পদে পদে হয় ভুল।

জীবনের প্রাতে ছিনু আমি যেথা
মোরে নিয়ে চল নিয়ে চল সেথা,
চিত্ত-দেউলে জ্বালাও তোমার
মহিমার গুগ্‌গুল।

বধির দেবতা, তোমার বিরহে
দিন যে কাঁদিয়া যায়,—
দেখা দাও এসে একবার মোর
হৃদয়-দুয়ারে হায়!
এই জীবনের যতেক সাধনা
সব দিয়ে হোক্ তব আরাধনা,
অন্তর মোর কর ভরপুর
তব ধ্যান-সুষমায়।

লেডী অবলা বসু

শ্রী হেমলতা সরকার

যাঁর নাম এই প্রসঙ্গের শিরোদেশে শোভা পাইতেছে—তিনি বর্ত্তমান যুগের ভারতনারীর আদর্শ। বর্ত্তমান যুগের ভারতনারীর আদর্শ কি? পূর্ব্বেই তাহা নির্দ্দেশ করা উচিত। প্রাচীনকালের ভারতনারীর আদর্শ যে এখন আর কার্য্যগত জীবনে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, এ বলা বাহুল্য। কথায় বলে "সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই।" বর্ত্তমান যুগের অভাবমোচনার্থ নবযুগের আদর্শ বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে দেখা দিতেছে। এই আদর্শের বিশিষ্টতা কি? গৃহপরিবারেই নারীর জীবনের প্রসার নয়। গৃহপরিবার, সমাজ, স্বদেশ, বর্ত্তমান যুগের নারীর জীবনের পরিধির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। গৃহ ছাড়িয়া সমাজ নয়, সমাজ ছাড়িয়া স্বদেশ নয়। অগ্রে গৃহপরিবার, তৎপরে প্রতিবেশী ও সমাজ এবং স্বদেশ। বর্ত্তমান যুগের আদর্শ নারী পতি-পুত্র-কন্যার প্রতি অনুরাগবতী,—তাঁদের সেবায় অক্লান্ত, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের প্রসার গৃহের চতুঃসীমায় আবদ্ধ নয়—সে হৃদয়ে সমাজ, স্বদেশ ও বিশ্ব স্থান পায়।

এই যে দুটি কথায় বর্ত্তমান যুগের নারীজীবনের আদর্শের প্রধান লক্ষণ বলিলাম, এই আদর্শটি মিলাইয়া আমরা বর্ত্তমান যুগের নারীচরিত্র যাচাই করি। তাই সরোজনলিনীর জীবনে বর্ত্তমান আদর্শ উজ্জ্বলভাবে দেখা দিয়াছিল বলিয়া আপনাদের নিকট সরোজনলিনীর এত আদর। ঠিক সেই কারণেই লেডী অবলা বসুকে

আমরা বর্ত্তমান যুগের আদর্শ রমণী বলিয়া সমাদর করি।

জীবিতকালে কাহারও চরিতকথা লেখা রীতি নয়; কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মৃতের সমাধিতে ধূপের সুগন্ধ ছড়াইলে তাঁহার আত্মার কোন তৃপ্তি আছে কিনা জানি না। যাঁরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে আলোকরশ্মি ছড়াইতেছেন, যাঁদের চরিত্রের সৌরভে সংসার আমোদিত, যাঁদের সেবাধর্ম্মে সমাজ গৌরবান্বিত, তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণস্বীকার তাঁদের জীবদ্দশায় করিতে নাই, একথা কোন্ শাস্ত্রে বলে? যদি 'দেয়' কিছু থাকে, এখনই দিই না কেন? জীবিত মানুষের প্রাপ্য কি কিছু নাই?

আমি তাই সনাতন প্রথাকে মানিতে প্রস্তুত নই। বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি, অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণীর গৌরবে নারীকুল গৌরবান্বিতা—তাই তাঁর কথা বলিতে মন আনন্দে পূর্ণ হয়।

শ্রীমতী অবলা বসু—স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের কন্যা। দুর্গামোহন দাসের ন্যায় হৃদয়বান, দানশীল, নির্ভীক ধর্ম্মবীর বঙ্গদেশে অতি বিরল। হৃদয়ের প্রসারতায় উদারতায় দুর্গামোহন দাসকে পরাস্ত করিতে পারে, এমন লোকের নাম করিতে পারি না। এই দাসবংশ পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশ—বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য এই বংশ চিরপ্রসিদ্ধ। এমন বংশে, এমন পিতার ঘরে শ্রীমতী অবলার জন্ম। দুর্গামোহন দাস মহাশয় কন্যাদিগকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখেন নাই। তাঁর কন্যাগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিতা। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা রায় বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য আজীবন প্রাণপাত করিয়া আসিতেছেন। গোখলে বালিকা-বিদ্যালয় তাঁর মহাকীর্ত্তি, তিনিই বঙ্গনারীদিগের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম রমণী "ফেলো" মনোনীত হইয়াছেন। এ গৌরব সামান্য গৌরব নয়—তিনি চিরজীবনের সাধনায় ইহা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁরই সহোদরা শ্রীমতী অবলা বসু গৃহে ও বাহিরে, কল্যাণরূপিণী মহীয়সী নারীর আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। গৃহে পতিপার্শ্বে যিনি ইঁহাকে একবার দেখিয়াছেন তিনিই বলিবেন গৃহলক্ষ্মীর জীবন্ত ছবি তিনি দেখিয়াছেন। অজ রাজা তাঁর পত্নী ইন্দুমতীর শোকে বিলাপ করিয়া যতগুলি কথা বলিয়াছেন তা স্মরণ হয় শ্রীমতী অবলা বসুকে দেখিলে। আহা! কবি কালিদাস কি ছবিই আঁকিয়াছেন! পত্নী গৃহিণী, পত্নী প্রিয়সখী, পত্নী সচীব, পত্নী ললিতকলা-সহযোগিনী,—এই না পত্নীর আদর্শ ছবি। স্যার জগদীশ-চন্দ্র বসুর জায়া এই সমুদয় লক্ষণগুলি সার্থক করিয়াছেন। তিনি দুর্গার ন্যায় নিয়ত পতির অনুগামিনী; এ জীবনে একদিনের জন্যও পতির পার্শ্ব ছাড়া হন নাই। একদিন স্যার জগদীশচন্দ্রের এক ভাগিনেয় মামার গৌরব স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন "জগতের লোক জানে না আমরা জানি, মামার এই গৌরব কার জন্য—সে আমাদের মামী। মামা এ-মামা হতেন না, যদি মামীকে স্ত্রীরূপে না পেতেন; সব গৌরব আমাদের মামীর!"

ভগবান সন্তানভাগ্য এই দম্পতিকে দেন নাই কিন্তু ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীকে লইয়া শ্রীমতী অবলা সন্তানের সকল অভাব ঘুচাইয়াছেন। নিজের জননীর চেয়ে মামীর প্রতি ইঁহাদের প্রাণের টান কিছু কম নয়। সারা পৃথিবী এই দম্পতি ভ্রমণ করিয়াছেন। যে দেশে গিয়াছেন, লেডী বসু কত খুঁটিনাটি, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপহার সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলকে দিবার জন্য। পরিবার কিছু ক্ষুদ্র নয়, স্নেহাস্পদের সংখ্যাও কিছু কম নয়—কিন্তু ভুলভ্রান্তি নেই, কেউ উপেক্ষিত নয়—এই প্রীতির বোঝা বহন করা কিছু সহজ নয়। কিন্তু লেডী বসুর কিছুতেই বিরক্তি নাই—সকলের ভার বহন করিয়াই তিনি সুখী। এত যে গভীর স্বজনপ্রীতি, কিন্তু পতির সেবার জন্য এমন কোন কষ্ট নাই যা সাধ্বী পত্নী বহন করতে না প্রস্তুত? স্বামীর স্বাস্থ্য, স্বামীর শান্তির প্রতি পত্নীর কি প্রখর দৃষ্টি! সংসার সম্বন্ধে পতি কিছুই জানেন না, যখন যা প্রয়োজন কলের মত আসিতেছে। পতি যখন বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতেছেন, পত্নী তখন একান্তে বসিয়া তাঁর সেবার আয়োজন করিতে-ছেন। পতির উপর আর কেহ নাই, আর কোন চিন্তা নাই—তাঁর তিলমাত্র অসুবিধা করিয়া পত্নী স্বর্গের সুখও চান না। পতির রুচিই চূড়ান্ত—নিজের আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদে পর্য্যন্ত স্বামীর রুচিই স্বীকার্য্য।

সাধ্বী অবলা বসু

স্বামীকে জগৎসংসার হইতে নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন এই সাধ্বী পত্নী। এই নির্লিপ্ততাই পতিকে বিজ্ঞানরাজ্যে প্রগাঢ় অভিনিবেশের সহিত প্রবেশের ক্ষমতা দিয়াছে। এই কারণেই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানরাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছেন, তাঁর অত্যাশ্চর্য্য গবেষণা ও সাধনার ফলে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানরাজ্যে এই মহাদান সম্ভব হইত না, যদি না তাঁর সাধ্বী পত্নী এই দীর্ঘকাল তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে পরিতৃপ্ত ও সুখী না করিতেন; এবং নিজ মস্তকে সমুদয় কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর সময় এবং সুবিধা না দিতেন? পতিসেবায় আত্মবলিদান দিয়াছে এমন নারী ভারতে শতসহস্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পতির চিন্তায় দেহ ভস্মসাৎ করিয়াছেন এমন নারীর গণনা হয় না এই ভারতবর্ষে—কিন্তু পতিকে মহত্বের শিখরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে নীরবে সাধনা করিয়াছেন কয়জন? পাছে ধ্যানস্থ পতির গভীর সমাধি ভঙ্গ হয় এই ভয়ে কে আপনার কণ্ঠ নীরব রাখিয়া আপনার সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নিয়ত পতির পার্শ্বচারিণী থাকিতে পারিয়াছেন? স্যার জগদীশচন্দ্র মহাসাধক সন্দেহ নাই কিন্তু কত বড় সাধিকা তাঁর পত্নী সে কথা জগৎ জানে না। সীতা সাবিত্রীর দেশেও এই পতিধ্যেয়া সাধ্বী পত্নীকে সমাদর করিতে হয়। পতির কল্যাণচিন্তার অগ্রে কোন চিন্তা লেডী বসুর নাই। অবসরসময়ে তিনি যে সকল সামাজিক হিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকেন তাহা কিছু কম নয়। নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তিনি কতপ্রকার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়াছেন। বালিকাদিগের সুশিক্ষার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা, তিনি নারীশিক্ষা-মন্দিরের কর্ম্মকর্ত্রী। কত দুঃখিনী নারীর দুঃখমোচনের জন্য তিনি প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছেন। এই একটি নারীর চেষ্টায় সংসারের দুঃখভার কত লঘু হইয়াছে চিন্তা করিলে প্রাণে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। এত প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রাণ তিনি অবকাশসময়ে পতিসেবার যেটুকু সময় পান সেটুকু সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া বাহিরের এত কাজ করেন। তাঁর বাহিরের কার্য্যের তালিকা দেখিলে মনে হয় যে তাঁর সমুদয় শক্তি দেশহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, ঘরসংসার দেখিবার সময় নাই। কিন্তু লেডী বসু সুনিপুণা গৃহিণী, গৃহকর্ম্মে অতিশয় দক্ষা। পতিসেবার ভার কখনো কাহারো হাতে সমর্পণ করেন না। পরিচিত-অপরিচিত দেশবিদেশের কত লোক তাঁর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁরাই জানেন লেডী বসুর আতিথ্য কি প্রকার? ঘর-বাহির, আপন-পর লইয়া এমন ওজন করিয়া সংসার করিতে পারে কয়জন? লেডী অবলা বসু আদর্শ পত্নী, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ রমণী ও আদর্শ সমাজসেবিকা। এমন নারীমূর্ত্তি যখন এদেশে ঘরে ঘরে আবির্ভূত হইবেন তখনই এদেশের সুদিন আসিবে—তৎপূর্ব্বে নয়। *

* বর্ত্তমান যুগে নারীর 'সতীত্ব' বা সাধ্বীত্বের আদর্শ লইয়া তরলমতি নব্যশিক্ষিত-শিক্ষিতা অনেকে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় লিখিত 'সতীত্ব' নামক সুচিন্তিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন অনেককে উপহাসের সহিত উহার সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি। তথাকথিত ফ্যাসানপ্রিয় বাতিকগ্রস্তরা স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর উচ্চশিক্ষিতা সাধ্বী পত্নী লেডী অবলা বসুর জীবনের এই রেখাচিত্রে তাঁর চরিত্রের পরিচয় পাইয়া এখনও কি বলিবেন, এই আত্মিক-সাধনাসম্ভূত সতীত্বের আদর্শ জাতির পক্ষে অনাবশ্যক এবং প্রগতির পরীপন্থী?

এই সংখ্যার ঘরে বাইরে' বিভাগে লেডী কভেণ্ট্রীর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংগ্রহ প্রকাশিত হইল তাহা পড়িলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে, যে, সতীত্ব কোন দেশ বা সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া নহে—উহা সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশীয়া নারীদের একটি সহজাত পবিত্র বিশেষত্ব।

বঃ সঃ

আসল

শ্রী দীপ্তি দেবী

"ফুলের পরিণতি ফলের সুধারস,
সফল দোঁহে পেয়ে দোঁহার সুপরশ।
ছিন্ন কর যদি শুকায়ে মরে হায়,—
ভিন্ন তবু তারে কভু না করা যায়।"

—হেমলতা দেবী

খোকাবাবুর আগমনটাকে তার বাপ-মা দু'জনে ঠিক এক-ভাবে নিতে পারে নি। খোকাকে পেয়ে তার ১৭ বছরের মা অনিলা ভাব্‌লে আজ তার নারীজন্ম সার্থক হ'ল, এত-দিন সে কেবল তার স্বামীর সঙ্গিনী ছিল, আজ তার স্থান আরও উচ্চে কারণ এখন সে তাঁর সন্তানের জননী। এই ক্ষুদ্র ফুলের মত মানবশিশুটিকে জন্ম দিয়া অনিলা মাতৃত্বের আনন্দে এতই ভরপুর ছিল, যে, তারই দরুণ সে যে যমের দোরের কাছাকাছি গিয়েছিল এ কথা তার মনে স্থান পেলে না। মা হ'য়ে অনিলার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হ'ল—আনন্দময়ী, চঞ্চলা, চিন্তাশূন্যা, রহস্যময়ী বালিকার স্থানে একটি ধীরা, নম্রা, চিন্তাশীলা মমতাময়ী নারীকে দেখা গেল।

খোকা ভূমিষ্ট হবার পর তার পিতা সুধীরের মনে ভাল-বাসার চেয়ে ভাবনারই উদ্রেক হ'ল বেশী। তার ভয় হ'ল এইবার বুঝি সে তার অনিলাকে হারায়, এতদিন অনিলার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তারই ছিল, এবার একজন ভাগীদার এসে জুটল। অনিলা কি আর আগের মত সুধীরের বিষয় ভাব্‌বার সময় পাবে? সুধীর যখন তাকে চাইবে তখন হয়ত অনিলা এই নূতন অতিথিকে নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকবে যে তার আহ্বানে সাড়া দেবার অবসরই পাবে না। সকল কাজে অনিলার সাহায্য পাওয়াটা কেমন অভ্যাসের মত হ'য়ে গিয়েছে, এখন সেটা ঠিক সেইরূপ ভাবে না পেলে তার দিন চল্‌বে কেমন ক'রে? এই সকল কারণে খোকার আসা-টাকে সুধীর তেমন স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে পারে নি।

বড় গর্ব্বের সঙ্গে অনিলা খোকার সঙ্গে সুধীরের পরিচয় করিয়ে দেয়, কিন্তু খোকার পিতার মুখে সে যে উদাসীন ভাব দেখ্‌তে পেয়েছিল তাতে তার উৎসাহটা অনেক-খানিই ক'মে যায়। খোকাকে কোলে করতে অনুরোধ করাতে সুধীর যখন বিরক্ত হয়ে বলেছিল—"ছোট-ছেলে আমার ভাল লাগে না," তখন অনিলা মনে সত্যই বড় আঘাত পেয়েছিল। পুরুষমানুষে ছোট-ছেলে না ভালবাস্‌তে পারে কিন্তু এ যে নিজের ছেলে? খোকাকে উপেক্ষা করা মানে খোকার মাকেও তাচ্ছিল্য করা। অনিলাকে সুধীর কি কেবল স্ত্রী ব'লেই জেনেছিল, তাকে কি তার সন্তানের জননীরূপে কখনও দেখে নি? পুরুষ মানুষ অনেক স্ত্রী-লোকের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে রাজী আছে; কিন্তু তার সন্তানের জননীর পদ একজনকেই দেয়। যাকে সমস্ত পৃথিবীর সামনে সে নিজের ছেলের মা ব'লে স্বীকার করতে প্রস্তুত, তাকেই সে সত্যি ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, এইটাই হ'ল পুরুষের ভালবাসার প্রধান পরীক্ষা। তা হ'লে কি সুধীর তাকে ভালবাসে না? এতদিন কি সে কেবল ভালবাসার অভিনয় করত? অনিলা এর কোনই মীমাংসা করতে পারলে না। খোকার প্রতি সুধীরের উদাসীন ভাব লক্ষ্য ক'রে অনিলা ঠিক করলে যে খোকার সম্বন্ধে আর একটিও কথা সে তার স্বামীকে বলবে না, তার ছেলে তার একারই থাকুক, সে তার বাপ-মা দুইই হবে। এই কারণে খোকার প্রতি অনিলার ভালবাসাটা আরও গভীর, আরও প্রবল হ'ল,—সে এই অনাদৃত বঞ্চিত শিশুটিকে একেবারে

নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইলে।

এদিকে সুধীর ভাবে অনিলা ছেলেকে নিয়ে এত তন্ময় যে ছেলের বাপের দিকে দৃক্‌পাত করবারও সময়টুকু থাকে না! ছেলেই এখন তার সব, আর তাই বা না হবে কেন? ছেলে যে তার নিজের রক্ত-মাংসে গড়া জিনিষ, তাকে ছেড়ে সুধীরের প্রতি কি তার টানটা বেশী হবে? সুধীরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি? দুটো মন্ত্র পড়লেই কি ভালবাসা জন্মায়? এতদিন অনিলা ভালবাসার সামগ্রী পায় নি, তাই সুধীরের দিকে দু'বার ফিরে চাইত, এখন আর সুধীরকে নিয়ে তার কি প্রয়োজন? অনিলা যদি এমন-ভাবে তাকে নিজের জীবন থেকে বাদ দিতে পারে তবে সে-ই বা কেন তার কাছে কাঙালের মত হাত পেতে থাক্‌বে? তার মিল্‌ আছে, বেন আছে, হার্ব্বাট স্পেন্সর, ম্যাক্সমুলার, হেগেল সবই আছে, তবে আর ভাবনা কিসের? সে এদের নিয়ে কোনরকমে জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে।

একদিন সুধীর অনিলাকে বল্লে—"তোমার ছেলের কান্নার জ্বালায় রাত্রে ঘুমবার যো নেই, আমি পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করেছি।" এর উত্তরে অনিলা একটিও কথা বল্লে না, কেবল তার বুক তোলপাড় ক'রে একটি নিশ্বাস বার হ'য়ে শূন্যে মিশে গেল। সুধীর খোকাকে কেবল অনিলার ছেলে ব'লে জানে, তার নিজের সঙ্গে খোকার যে সম্পর্ক আছে সেটা স্বীকার করতে সে অনিচ্ছুক। অনিলা তার অসহায় ক্ষুদ্র সন্তানটির দুর্ভাগ্যের বিষয় ভেবে মর্ম্মাহত হ'ল। খোকার আস্‌বার সম্ভাবনা হ'লে অবধি অনিলার মনে আশা হয়েছিল যে এইবার সুধীরের সঙ্গে তার বন্ধন আরও দৃঢ় হবে, আরও অবিচ্ছিন্ন হবে, কিন্তু হ'ল ঠিক তার বিপরীত—খোকা এসে তাদের বন্ধন যেন আরও শিথিল হ'য়ে গেল, অনিলার ভয় হ'ল শেষে বিচ্ছেদ না ঘটে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অনিলা খোকাকে নিয়ে নিজের ঘরে ব'সে খেলা করছিল, এ খেলার সঙ্গে ১০ বছর আগের পুতুলখেলার বড় বেশী প্রভেদ নেই। সুধীর ঠিক এই সময় একটা পাঞ্জাবী-হাতে অনিলার ঘরে এসে এই মাতা ও শিশুর ক্রীড়া দেখে গম্ভীর মুখে বল্লে—"জামাটাতে একটাও বোতাম নেই, এটা যদি দয়া ক'রে আগে থেকে দেখে রাখ্‌তে তা হ'লে এসময় এখানে এসে তোমার কাজে বাধা দিতে হ'ত না।" সুধীরের কথায় অপ্রস্তুত হ'য়ে অনিলা বল্লে—"দাও, আমি এখুনি বোতাম টেকে দিচ্ছি।" সুধীর অপ্রসন্ন মুখে বল্লে—"না, থাক, শেষে তোমার ছেলে কাঁদতে সুরু করবে। আমি না হয় অন্য একটা জামা পরব।" সুধীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এরূপ ব্যাপার খোকা আসবার আগেও অনেকবার হ'য়েছিল, সুধীর তো তখন মোটেই বিরক্ত হয় নি এবং এই নিয়ে কত ঠাট্টা তামাসা করেছিল। আজকের এই বিরক্তিটা তা হ'লে অন্য কারণে। কারণটা বুঝ্‌তে অনিলার বেশী দেরী হ'ল না।

খোকার ছবি তোলাবার অনিলার বড় সখ, কিন্তু সাহস ক'রে সে এ বিষয় সুধীরকে কোনদিনও বল্‌তে পারে নি। একবার তার মামাত ভাই সমর তাদের ওখানে এসে কোড্যাক দিয়ে খোকার অনেকগুলি ছবি তুলে দেয়। অনিলা সেই ছবিগুলো একটা এলবামে রেখে দিয়েছিল। একদিন কি একটা কাজে অনিলার ঘরে এসে, সেই এলবাম-টার উপর সুধীরের চোখ পড়ে। খুলে দেখে—সেটা খোকা আর তার মার ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছবিতে পরিপূর্ণ। ঈর্ষ্যায় তার মন ভ'রে উঠ্‌ল—এরা দুজনে পরস্পরকে পেয়ে বেশ সুখী, তাকে আর কেউ চায় না। হঠাৎ মনে হ'ল খোকা ত শুধু একা অনিলার নয় তবে কেন অনিলা তাকে একটুও ভাগ দিতে চায় না। গোড়াতে সেই যে খোকাকে চায় নি একথা ভুলে গিয়ে সব দোষ অনিলার ঘাড়ে চাপান হ'ল। অনিলাই স্বার্থপরের মত খোকাকে নিজের ক'রে নিতে চায়—পাছে বাপকে ভালবাস্‌তে শেখে, তাই অনিলা খোকাকে তার কাছ থেকে দূরে রেখে তাকে চেন্‌বার অবসর দেয় না, সে একাই তার ভালবাসা দখল ক'রে নিতে চায়। একবার মনে হ'ল, কোন রকমে যদি খোকাকে অনিলার কাছ থেকে আলাদা করা যায় তা হ'লে হয় না? অনিলা সুধীরের কাছে ফিরে আস্‌তে পারে কিন্তু মার কোল থেকে তার ছেলেকে কেড়ে নেবার মত সাহস তার ছিল না।

একদিন রাত্রে খোকার কান্না কিছুতেই থামান গেল না, অনিলার ভয় হ'ল হয়ত খোকার অসুখ করেছে, রাত্রে সে একা কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। পাশের ঘরে তার স্বামী ছিলেন, খোকার জন্যে তাঁর নিদ্রা ভাঙাতে

অনিলার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অন্য কোন উপায় না দেখে অগত্যা তাকে সুধীরের শরণাপন্ন হতে হ'ল। অনিলার ভীতি-ব্যাকুল চোখ দেখে সুধীরেরও ভয় হ'ল; সেই রাত্রে সে নিজে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লে,ডাক্তারের আশ্বাস-বাণী শুনে তবে নিশ্চিন্ত হ'ল। খোকা যতক্ষণ ঘুমোয় নি ততক্ষণ সে অনিলার কাছেই ব'সে ছিল, অনিলা কিন্তু খোকাকে নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে সেদিকে লক্ষ্যই করে নি। খানিক ব'সে থেকে সুধীর নিজের ঘরে চ'লে গেল—এখানে তার জন্যে স্থান নেই, অনিলার ছেলে সুস্থ হয়েছে এই যথেষ্ট।

দিনের পর দিন সুধীরের ব্যবহারে আঘাত পেয়ে অনিলার হৃদয়খানি ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ সাম্‌লাতে না পেরে গাছের ডালগুলি যেমন নুয়ে পড়ে, অনিলারও শরীর তেম্‌নি ভেঙে পড়্‌ল। ডাক্তার এসে বল্লেন, অনিলার শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। অনিলার রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখ আর ক্ষীণ দেহখানি দেখে সুধীরের চমক্ ভাঙল—সত্যিই তো অনিলা ছেলেমানুষ, সে নিজের শরীরের বিষয় কি বোঝে? তারই তো দেখা উচিত ছিল যাতে অনিলার ঠিকমত যত্ন হয়। তারই সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে সে অনেক কষ্টে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, কোথায় তাকে আরও বেশী ক'রে যত্ন করবে না সুধীর বৃথা অভিমান ক'রে এত-গুলো দিন নষ্ট করল।

ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনিলার সেবার ভার সুধীর নিজের হাতে নিলে। খোকাকে দেখবার মত ক্ষমতা অনিলার ছিল না, তাই সে এখন দাসীর কাছেই থাকে। একদিন সুধীর খোকাকে অনিলার কাছ থেকে তফাৎ করতে চেয়ে-ছিল কিন্তু আজ তার কি মনে হয়? অসহায়া অনিলা তার সন্তানের দিকে যে ব্যথিত করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেই দৃষ্টির কাছে মনে মনে হার মেনে সুধীর ভাবলে, কবে অনিলার হাতে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। তার মনে আর হিংসা নেই, সে এখন কেবল অনিলার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে চায়। অনিলাকে অনেক কথা বলবার আছে, অনেক বিষয়ের জন্য মাপ চাইবার আছে কিন্তু তার এই দুর্ব্বল অসুস্থতায় তাকে আরো বেশী উত্তেজিত করতে সাহস হ'ত না।

একদিন অনিলা সুধীরকে বল্লে—"দেখ, আমার মনে হয় না আমি আর বেশীদিন বাঁচব।" সুধীর ভগ্নকণ্ঠে ব'লে উঠলো—"অনিলা, এ কথাগুলো বলা কি তোমার উচিত হ'চ্ছে? আমার জন্যে না হোক অন্ততঃ খোকার বিষয় ভেবে তোমার এ চিন্তা কি মনে আনতে দেওয়া উচিত?" অনিলা দুঃখের হাসি হেসে বললে—"হ্যাঁ জানি, এ পৃথিবীতে এক খোকারই আমার প্রয়োজন।" সুধীর একটু ঝুঁকে প'ড়ে বল্লে—"তোমার আর কারুর প্রয়োজন নেই?" "এক সময় ভাবতাম, তোমার কাছে হয়ত আসতে পারব, এখন আমার সে ভুল ভেঙেছে, এখন দেখছি আমার না হ'লে তোমার দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যায়—" সুধীর বাধা দিয়ে বল্লে—"না অনিলা, তোমার না হ'লে আমার একটি দিনও কাটবে না, জোর ক'রে কাটাবার চেষ্টা ক'রে দেখলাম সে হবার নয়, তোমাকে আমার চাইই।" অনিলা ম্লান হাসি হেসে বল্লে—"তোমার জীবন থেকে আমায় সরিয়ে ফেলতে কেন চেয়ে-ছিলে?" লজ্জিতভাবে সুধীর বল্লে—"সে কেবল ঈর্ষ্যার জ্ব'লে-পুড়ে চেয়েছিলাম। আমি এমনই নীচ যে নিজের ছেলেকে হিংসা করতাম, তাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে মনে করতাম, ভাবতাম—সে বুঝি তোমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে, তাকে পেয়ে তুমি আমায় ভুলে যাবে।" অনিলা একটুখানি হাসলে, সেই হাসিতে আর ব্যথার চিহ্ন নাই, তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—"তুমি কেন সব যা-তা ভেবে নিজে কষ্ট পেলে ও আমাদের কষ্ট দিলে? তোমাকে কোনদিনও ভুলতে পারব না, এ ত তুমি বেশ জান। খোকা যে একবারে অসহায় তাই তার বিষয় বেশী ভাবতে হয়, সেই জন্য অনেক সময় পূর্ব্বের মত তোমার সেবা করতে পারি নি, সেটা কেবল বাইরের দিক থেকে, আমার মনের মধ্যে একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি, বরং তোমায় আগে কেবল স্বামী ব'লে ভালবাসতাম এখন তোমায় আরও উচ্চ স্থান দিয়েছি কারণ এখন তুমি আমার সন্তানের পিতা। আমার মন কি এতই সঙ্কীর্ণ যে তোমায় বাদ না দিলে তোমার সন্তানের স্থান সেখানে হবে না? তোমরা দুজনেই যে আমার সব,—আমি কাউকেই ত্যাগ করতে পারব না।"

দাসী খোকাকে নিয়ে স'রে এল, আজ প্রথম সুধীর নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে, অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে খোকার নিদ্রিত মস্তকে একটি চুম্বন মুদ্রিত ক'রে তাকে তার মার পাশে শুইয়ে দিলে। অনিলা একবার খোকার দিকে চেয়ে তারপর তার স্বামীর দিকে চাইলে—আজ আর তার মনে কোনই ক্ষোভ নেই।

নিন্দক

("নিংদক বাবা বীর হমারা—" ইত্যাদি। দাদূ।)

শ্রী সেবক

নিন্দক ?—সে যে মম চিত্তের
পাতক-পাতন বীর,
অ-দানমূল্যে বিচারি' আমারে
হানে নিন্দার তীর।
কোটি কর্ম্মের পুঞ্জিত কালি
লাভলোভ-হীন দেয় প্রক্ষালি';
নিজেরে ডুবায়ে—মগ্ন আমারে
মিলায় ত্রিদিব-তীর।

নিন্দক মোর—আহা! সে থাকুক
চিরজীবী যুগ-যুগ;
অমৃতরূপের দরশন পাই—
সে যে তারি অহেতুক
অবৈতনিক করুণা অপার।
কী নিঃস্বার্থ পর-উপকার!…
হে দাদূ, নিন্দা করে যে আমারে
নমি তারে নত-শির!

নানা কথা

শিক্ষার আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ

গত সংখ্যার নানাকথায় বলা হইয়াছে, শিক্ষার সহিত সাধনার সামঞ্জস্যই প্রকৃত শিক্ষা—দার্শনিক ক্যাণ্ট যাহাকে good education বা সৎশিক্ষা বলিয়াছেন—উহাই শিক্ষার আদর্শ। এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধনা-হীন শিক্ষা-প্রণালীই এই আদর্শ হইতে আমাদের দূরে লইয়া গিয়াছে।

প্রথমে ইহা আমরা বুঝিতে না পারিলেও, কেহ কেহ আজ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

নব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কারণের মূলে এই যে অসন্তোষ, ইহা আমাদের মনগড়া কথা নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলিয়াছেন। * রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ইংরাজী শিক্ষার পত্তনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—ইংরাজীজানা দেশী কর্ম্মচারী গড়িয়া তোলা। প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল যতদিন, ততদিন এই ফাঁকি ধরা পড়ে নাই। কিন্তু চাকরী হইতে চাকুরের সংখ্যা একদিন বাড়িয়া গেল এবং চাকুরের 'জনক' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়িল সেইদিন। আমরা দেখিলাম, দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে।

কিন্তু এই বাহিরের কারণ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ইহার ভিতরের নালিশও ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, বিদ্যা বাহির হইতে জমা হইতেছে, ভিতর হইতে কেহ সাড়া দেয় না—অর্থাৎ, কলসে জল ভরা হইতেছে প্রচুর কিন্তু তাহা দান বা পানের যোগ্য নহে। দেখিতে চাহিলে প্রমাণ চোখের উপর দেখান যায়:—

পাশকরা ডাক্তার পুঁথি মিলাইয়া চিকিৎসা করিয়া যশ অর্জ্জন করে, চিকিৎসাশাস্ত্রে নূতন তথ্য যোগ করিতে পারে না; ইঞ্জিনিয়ার পুঁথি মিলাইয়া কাজ করিয়া পেন্সন লইতেছে, যন্ত্রতত্ত্বে কিছু দান করিল না। কিন্তু ইহার কারণ ধীশক্তির অভাব নহে, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি। আমরা বিদ্যাগ্রহণ করিতেছি ভাঁড়ার ঘরে চাল ডাল নুন তুলিবার মত, দেহে খাদ্য গ্রহণ করিবার মত নয়।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীই যে এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী, অভ্যস্ত অন্ধতার মোহে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এই মোহ ত্যাগ করিতে হইবে এবং শিক্ষাকে সত্য এবং প্রাণের জিনিষ করিতে হইবে।

এই যে শিক্ষাকে সত্য এবং প্রাণের জিনিষ করা ইহাই শিক্ষার আদর্শ—good education বা সৎশিক্ষা—যাহার বিষয় আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি।

---

* ব্রতীবালক—পৌষ, ১৩৩৬।

রবীন্দ্রনাথের পীড়া

সম্প্রতি বিদেশে রবীন্দ্রনাথ গুরুতর পীড়িত জানিয়া আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিগত ২০শে অক্টোবর নিউহেভেন (য়্যুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্) হইতে অতর্কিত-ভাবে 'রয়টার' এই তার প্রেরণ করেন—"বিশ্বকবি হঠাৎ দারুণ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাঃ এইচ্, এম্, মার্ভিনের মতে—তাঁহার যেরূপ অবসরের প্রয়োজন তাহা যেখানে পাওয়া সম্ভব, সেরূপ স্থানে এখনই চলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার তাঁহার অবস্থার গুরুত্ব বাড়াইয়া কিছু বলিতেছেন না, বরং কম করিয়াই বলিয়াছেন।" একদিন পরে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর নিকট "রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত ভাল; তাঁহার সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ নাই।"—এই মর্ম্মের তার আসায় আমাদের দুশ্চিন্তা কিয়দ্‌পরিমাণ কমে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্বেগ হইতে পারি নাই। তারপর ২৪শে তারিখের তারে "শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। ডিসেম্বরের শেষ ভাগেই তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।" জানিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সুস্থ শরীরে তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

*

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে রঁম্যা রঁলা

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী মঁসিয়ে রঁম্যা রঁলা শ্রীযুক্ত রামানন্দ-বাবুর নিকটে (শান্তিনিকেতনে) তাঁহার মঙ্গলবাণী প্রেরণ করিয়াছেন। উহার শেষভাগে রঁলা মহাশয় বলিয়াছেন—"আমি এবং আমার ভগ্নী যে কিরূপ আবেগ ও সহানুভূতির সহিত আপনাদের দেশের তপস্তা-ব্যঞ্জক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে।"

আমরা জানি, মঁসিয়ে রঁলার অন্তরের সহিত ভারত-আত্মার সংযোগ সংস্থাপিত হইয়াছে বহুদিন হইতেই। ভারতীয় সাধনার প্রতি তিনি যে অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী-রচনা তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। ইংরাজী "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় মাঝে-মাঝে তাঁহার যেসব পত্র প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলেও তাঁহার ভারত-প্রেমিক চিত্তের স্পর্শ পাওয়া যায়। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

অনুন্নত সম্প্রদায়

ঋষি-কবি বলিয়াছেন—"তুমি যারে পশ্চাতে রেখেছ সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"; এবং সমাজে যাহাদের 'ছুঁইলে জাত যায়' করিয়া রাখা হইয়াছে, "অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।" অনেক দিন পূর্ব্বে যাহা বোঝা উচিত ছিল, অনেক দিন পরে তাহা বোধগম্য হইতেছে। 'জাতের বিচার' জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। জাতিকে সবল করিতে হইবে,—তাই অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন চলিতেছে। কিন্তু কখন হইতে? যখন হইতে উন্নত শ্রেণীদের প্রতি তাহাদের বিদ্রোহ প্রকাশ পাইয়াছে। এইত সেদিনও কোন কোন প্রদেশের অস্পৃশ্য অন্ত্যজরা দেবমন্দিরে প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা থাক্। পশ্চাতের ছায়াকে সম্মুখের কায়ায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু সে শুধু শ্রেণীবিশেষের গলায় উপবীত পরিধান করাইয়া বা দলবিশেষকে মন্দির-প্রবেশের অধিকার দান করিয়া নহে; এবং অনুন্নতদের পক্ষেও ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে যে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য মনোনীত হইলেই তাঁহারা উচ্চতম অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রয়োজন—মনুষ্যত্বের সাধনার প্রয়োজন। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। বুকার ওয়াশিংটন আমেরিকার অন্ত্যজ হইয়াও সাধনায় শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। 'সন্তন জাত না পুছো নিরগুণিয়া"—দোঁহায় কবীর বলিয়াছেন, সাধুর পরিচয় তাঁর জাত নয় সাধনা। 'রুইদাস' মুচি ছিলেন,—'শ্বপচ' ছিলেন ঝাড়ুদার। একমাত্র কথা—চাই শিক্ষা, চাই সাধনা, চাই শিক্ষার সহিত সাধনার সামঞ্জস্য।

অনুন্নতদের শিক্ষা

কিন্তু অনুন্নতদের শিক্ষা শুধু পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না—মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার চাই; এবং, এজন্য সরকার, ম্যানিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড বা জমিদার শ্রেণীর উপর নির্ভর করিলে হইবে না,—প্রচারের জন্য মহিলাকর্ম্মীও চাই।

*

অনুন্নতদের শিক্ষায় মহিলাকর্ম্মী

আমরা এইরূপ একজন বাঙালী মহিলা কর্ম্মীর পরিচয় এখানে প্রদান করিতেছি। ইনি শ্রীমতী সরলাবালা রায়—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের (সঞ্জীবনী সম্পাদক) ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইনি গত বৎসর হইতে (১৩৩৬) উত্তরবঙ্গের পত্নীতলা (দিনাজপুর) নামক একটি গ্রামে রাজবংশী, হাড়ী, পলিয়া প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর মেয়েদের লইয়া একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য প্রশংসাজনক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহার স্থাপিত "সরলা বালিকাবিদ্যালয়ে" ৩০টি ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছে। ছাত্রীরা স্বভাবতঃই দরিদ্র হওয়ায় শিক্ষাদান অবৈতনিক অবস্থায় চালাইতে হইতেছে, এবং, এমন কি অনেক সময় তাহাদের বই পর্য্যন্ত কিনিয়া দিয়া সাহায্য করিতে হয়। এই অবস্থায় সাধারণের প্রদত্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া সেই সুদূর মফঃস্বলের জেলায় জেলায় সহরে গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া দান কুড়াইয়া ফিরিতে হইতেছে ইঁহাকে। ইঁহার সৎসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে এমন বিত্তবান কি একজনও নাই যিনি এককালীন কিছু দান করিয়া প্রতিষ্ঠাত্রীর সঙ্কল্পকে সহজে সফল করিয়া তুলেন ?

*

ভারতে স্বায়ত্ত শাসন

সম্প্রতি "ক্রিশ্চিয়ান্ সেঞ্চুরি" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ডাঃ ষ্ট্যান্লি জোন্স ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত শাসন লাভ উষার মত সুনিশ্চিত। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সখ্যতা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। এবং তাঁহার বিশ্বাস স্বাধীন ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বৃটিশ মাল অধিক বিক্রয় হইবে। তিনি বলেন, বিদেশী বর্জ্জনের মূলে আছে ভীষণ অসন্তোষ। এ-বিরোধের অবসান হইতে দশ বৎসর বা তাহার চেয়ে কম সময় লাগিতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন—"বিদেশী বাণিজ্যদ্রব্যের সহিত ভারতবর্ষ **পাশ্চাত্য আদর্শও** সম্ভবতঃ গ্রহণ করিবে।"

ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রান্তি বলিয়া মনে করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,—য়ুরোপই একদিন **প্রাচ্য আদর্শ** গ্রহণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে।

*

নূতন আদমসুমারী

এবার যে আদমসুমারী আরম্ভ হইতেছে, তাহাতে বিশেষত্ব ও নূতনত্ব আছে। প্রথমতঃ—নির্ভুল লোকগণনার চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ—য়ুরোপীয়ান এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য যে পৃথক সিডিউল-প্রথা অবলম্বিত হইত তাহা রহিত করা; তৃতীয়তঃ—শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান; চতুর্থতঃ—বিভিন্ন স্থানে ও গৃহে কতপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়, হিসাব করিয়া দেখা হইবে তাহা দ্বারা শিক্ষা ও সভ্যতার কিরূপ আদান-প্রদান হইতেছে। এবং বাঙলার শিক্ষা ও সভ্যতা সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতীয়দিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে কিনা ঐ উপায়ে তাহার প্রকৃত পরিমাপ নিরূপিত হইবে। পঞ্চমতঃ—ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে কতজন বেকার আছেন তাহা নির্ণয় করিয়া তাঁহাদের কে কিরূপ নিজেকে ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন এবং কিরূপ কার্য্যের জন্য নিজেকে উপযোগী মনে করেন তাহা জানা।

আমরা জানি, ভদ্রলোক বেকারদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজী উপাধিগ্রস্ত এবং তাঁহাদের সকলেই কেরাণীগিরির জন্য নিজেদের উপযোগী মনে করেন, ও সাধারণ শ্রমসাধ্য উপায়ে বা ব্যবসায়ে আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা করিলে তাঁহাদের মান খোয়া যাইবে, এইরূপ মনে করেন।

*

মাদার ইংল্যাণ্ড

সম্প্রতি "সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া"র মিঃ শিবস্বামী আয়ার ডাঃ মেরি ষ্টোপ্‌সের একখানি নূতন গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। বইখানির নাম 'মাদার ইংল্যাণ্ড' বা 'মাতা ইংল্যাণ্ড'। ডাঃ মেরি ষ্টোপ্‌সের নাম আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিশ্চয়ই অপরিজ্ঞাত নহে। 'বার্থ কন্‌ট্রোল' বা জন্মশাসন-আন্দোলনে তাঁহার কার্য্যের পরিচয় সমস্ত পৃথিবীর লোকে জানে। এই পুস্তকে তাঁহাকে লিখিত বহুসংখ্যক রমণীর (কেবলমাত্র যাঁহাদের নামের আদ্যাক্ষর 'এ' হইতে 'এইচ') পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সকলে শুনিয়া ভীত ও চমকিত হইবেন যে, যে সকল সন্তানসম্ভবা তাঁহাদের 'সম্ভব' নষ্ট করিতে চাহেন এরূপ প্রায় ২০ হাজার ইংরাজনারী ডাঃ ষ্টোপসের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। * আইন অনুসারে দণ্ডনীয় এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া শঙ্কাপ্রদ হইলেও উক্ত পত্র-লেখিকাগণের ইচ্ছা—"যে ভাবেই হউক না কেন তাঁহারা ইহা করিবেনই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্ভব না হইলে শারীরিক বলপ্রয়োগ করিয়াও।" 'মাদার ইংল্যাণ্ডে' ডাঃ ষ্টোপ্‌স্ বিশেষভাবে ইংরাজসমাজকে অবিলম্ব-সতর্কতা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে ভারতীয় সমাজকে ঢালিয়া সাজিতে চাহেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন।

*

তরুণ-তরুণীর চরিত্রহীনতা

সম্প্রতি সাউথ এণ্ডের (লণ্ডন) একটি ধর্ম্মযাজকদের সভায় ডাঃ এস, জে, পিটার্স এম-পি বলিয়াছেন,—"এই জাতির যুবক যুবতীরা সম্পূর্ণ নৈতিক চরিত্রহীন হইতে বসিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"যতই কেন না তোমরা আইন প্রণয়ন কর, আইন স্বভাব সংশোধন করিতে পারিবে না। দণ্ডের ভয় অপরাধীকে বরং অপরাধ গোপন করিতেই শিখায়।"

হায় সংযমহীন পাশ্চাত্য শিক্ষা!...কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাতেই বা নীতি ও সংযমের স্থান কতটুকু?

*

মার্কিনী বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের জন্য আমাদের দেশের অধিকাংশ বালিকার বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। সম্প্রতি মার্কিন স্কুলসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, যে, বাল্যবিবাহের জন্য (অল্পসংখ্যক হইলেও) বালিকাদের শিক্ষায় বাধা পড়ে। রিপোর্টে প্রকাশ—যে সকল বালিকা বাল্যবিবাহের জন্য স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৫ বৎসরের ৮৩ জন, ১৪ বৎসরের ২০ জন, ১৩ বৎসরের ১ জন এবং ১২ বৎসরেরও ১ জন আছে।

কিন্তু ইহাতে আমাদের কিছু বলিবার বা ব্যঙ্গ করিবার অধিকার নাই, কারণ সেখানে ৮ বৎসরের বালিকার বিবাহ দিয়া কেহ পুণ্য অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে না।

*

সিংহলে শিল্পী মনীষী দে

উদীয়মান কৃতী শিল্পী শ্রীযুক্ত মনীষী দে'র নাম আমাদের 'বঙ্গলক্ষ্মী'র পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট নিশ্চয়ই অপরিচিত নহে, কারণ ইঁহার পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটে ভূষিত হইয়া বঙ্গলক্ষ্মী বৎসরাধিক কাল প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইনি সিংহলে যাইয়া ইঁহার চিত্রের একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। প্রদর্শনীতে বিশেষ করিয়া তাঁহার উড্‌কাট্‌স্-গুলি (কাঠ-খোদাই চিত্র) বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। আমরা এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি যে, শিল্পী উত্তরোত্তর অধিকতর যশ লাভ করুন।

*

সহাধ্যয়ন

বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর বিদ্যায়তনসমূহে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসরই ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে ছাত্রীসংখ্যার

* মিস্ মেয়োর দেশের (আমেরিকা) ২০ লক্ষ মাতাও প্রতিবৎসর নানা উপায়ে সন্তানসম্ভব নষ্ট করিয়া থাকেন।

নগণ্য থাকিলেও আজ তাহাদের সংখ্যা মোট ছাত্রসংখ্যার-শতকরা ১৩ জন। আমাদের দেশেও যে সহাধ্যয়ন অচিরে প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন, 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে বহুবার সে বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সহাধ্যয়ন বিষয়ক দুইটি উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছি—একটি লিখিয়াছিলেন শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবী বি-এ, এবং অপরটি 'বঙ্গনারী' নামে একজন বিশিষ্টা লেখিকা। পাঠকপাঠিকাগণ প্রবন্ধ দুইটি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

*

শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত ইংলণ্ডে যাইতেছেন, ইহা আশ্বিনের বঙ্গলক্ষ্মীতে বিবৃত হইয়াছে। সম্প্রতি 'ওয়ার্ডহল, ম্যাঞ্চেষ্টার' হইতে তিনি আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার য়ুরোপ-যাত্রা-পথে জাহাজে, এবং ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া লণ্ডনে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারে তিনি যে কয়টি মহিলার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মাতৃ-জাতিসুলভ স্নেহ-মমতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তিনি জানাইছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতা ব্যতীত হৃদয়ের দিক দিয়া আমাদের ভগিনী ও মাতাদের মতই তাঁহারা সাধ্বী ও মহীয়সী। বস্তুত. জগতের সমস্ত নারীহৃদয়ই মূলে এক উপাদানে গঠিত।

*

জ্ঞানী ভারত

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ সি, ভি, রমণ এই বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-গবেষক রূপে বিশ্ববিশ্রুত নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহা শুধু আমাদের ভারতের গৌরবের বিষয় নহে—সমগ্র এসিয়া এজন্য গর্ব্বিত, কারণ বিজ্ঞানের জন্য এসিয়ার মধ্যে এই সম্মান লাভ করিলেন ইনিই প্রথম।

ত্যাগপ্রাণ রাষ্ট্রনৈতিক-ভারতের কথা বাদ দিলেও তপঃসাধক জ্ঞানী-ভারত এই যে আজ বিশ্বসভায় আসন-গ্রহণের জন্য আহূত হইয়াছেন ইহা মানব-মহাযজ্ঞকে সফলতার পথে লইয়া যাইতেছে সন্দেহ নাই। এই সূত্রে প্রাচ্যসূর্য্য রবীন্দ্রনাথের কথা আবার আমরা নূতন করিয়া স্মরণ করিতেছি।

বারান্তরে আমরা ডাঃ রমণের তপস্যা ও সিদ্ধির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

পরিবারে নারীর স্থান

শ্রী সুধাময়ী দেবী বি-এ

বর্ত্তমান যুগ হইতেছে অর্থনৈতিক যুগ। অর্থের প্রয়োজন অবশ্য সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশে সকল যুগেই ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় সকল প্রকার আদর্শকে ছাপাইয়া অর্থের তুলাদণ্ডে সকল ব্যক্তির, সকল বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য বলিতে কেবল ধনই বুঝাইত না; ধনধান্য-পূর্ণ, আত্মীয়স্বজন-বেষ্টিত গৃহশ্রীই ছিল ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। সেই গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব একটি অধিকার ছিল; সেই অধিকার অর্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিবার মত দুরবস্থা তখনও হয় নাই,—কারণ সংসার চালাইবার জন্য সকল বস্তু কেবল অর্থ দিয়াই যে পাওয়া যাইত এমন নয়; এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য একটি দ্রব্য পাওয়া যাইত। দরিদ্র প্রতিবেশীকে কিঞ্চিৎ খাদ্য দিয়া বা পরিধেয় একটি বস্ত্র দিয়া তাহার নিকট হইতে কাজ পাওয়া যাইত;

আবার সেই কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও পাওয়া যাইত। ফলে, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের ভেদ থাকিলেও সেই ভেদ হৃদ্যতাকে ছাপাইয়া উঠিত না। অর্থসমস্যা উৎকট আকারে দেখা না দেওয়ার দরুণ একান্নবর্ত্তী পরিবার সহজভাবে চলিতে পারিত; অর্থ দিয়া পরিবারস্থ সকলে সাহায্য করিতে না পারিলেও বিবিধপ্রকার সেবা-দ্বারা প্রত্যেকেই পরিবারের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট থাকিত। তখন যেমন একদিকে বিনা পয়সায় বসিয়া খাওয়ার প্রশ্ন উঠিত না, অপর দিকে অন্যের পরিবার বলিয়া কাহারও

শ্রী সুধাময়ী দেবী বি-এ

সঙ্কোচ ও ঔদাসীন্য থাকিতে পারিত না। এখন একান্নবর্ত্তী পরিবার যে সম্ভব হইতেছে না তাহার মূল কারণ অর্থসমস্যা। অভাবে স্বভাব যায়—এই কথাটি যে আংশিকভাবে সত্য তাহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। যে-কয়টি টাকা পরিবারের কর্ত্তা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করে, তাহা দ্বারা অতিকষ্টে স্ত্রীপুত্রের মাত্র ভরণপোষণ চলে, অনেকক্ষেত্রে তাহাও চলে না। ইহার উপর কি আর কাহারও চাপ সহে—বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বসিয়া খায় তাহার? এই যেমন একদিকের মনোভাব, আবার যে ঐরূপভাবে পরিবারে বাস করিতে আসে তাহারও পরিবারের প্রতি কোনওরূপ টান হইতে পারে না; সংসারের যতটুকু কাজ তাহার করিতে হয় তাহাও সে করে মাপিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায়, প্রাণ তাহাতে থাকে না। সকল সম্বন্ধ আসিয়া ঠেকে দেনা-পাওনার সম্বন্ধে। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধও সেই দেনা-পাওনার সম্বন্ধ। 'পুরাতন ভৃত্যে'র নিদর্শন আর এখন পাওয়া দুষ্কর। এমন কি, অতি পবিত্র যে বিবাহবন্ধন তাহার মধ্যেও বাজারদর আসিয়া ঢুকিয়াছে। এদেশে তাহা স্পষ্টভাবে পণপ্রথার আকারে সমাজে শিকড় গাড়িয়াছে; পশ্চিমে তাহার রূপ মার্জ্জিত, কিন্তু দেনা-পাওনার তাগিদ যে সেখানেও পুরামাত্রায় চলিয়াছে তাহা নারীজাতির নিজস্ব উপার্জ্জনের জন্য অত্যধিক সংগ্রাম দেখিলেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ এই অর্থসমস্যা সকল দেশের সমাজকেই বিশেষভাবে নাড়া দিতেছে, সমাজের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। ভারতে পণপ্রথার ফলে আর অল্পবয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, কারণ বিবাহের যোগাড় ত করা চাই। ফলতঃ আপনা হইতেই মেয়ের বিবাহের বয়স বাড়িয়া চলিতেছে। আইন করিয়া বা অন্য কোনও উচ্চ আদর্শের বশে সমাজে যতটুকু পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে, তাহার চেয়ে অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইতেছে স্বতঃ এই অর্থের তাগিদে। পশ্চিমের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উপার্জ্জনের তাড়নায় ছুটাছুটি করিতেছে; ফলে পরিবারের শ্রী—শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই যে অর্থসমস্যা ইহাই এখন সর্ব্বত্র, সকল সমাজে উচ্চ-নীচের তারতম্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। নারীজাতির সাক্ষাৎভাবে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন নাই, ইহাই ছিল পূর্ব্বের সকল দেশের সামাজিক ব্যবস্থা। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পুরুষের উপর ছিল উপার্জ্জনের ভার, নারীর উপর ছিল সংসার সুশৃঙ্খলরূপে চালানোর ভার। এই ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চ-নীচের তারতম্য ছিল না। গৃহের কর্ত্রী তখন বাস্তবিকই কর্ত্রী ছিলেন। স্বামীর বা পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থ নিজেরই অর্থ মনে করিয়া তাহা যথাযথ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সেই ব্যয় অপরিমিতও হইত না, আবার সঙ্কুচিত কৃপণতাও তাহাকে বিসদৃশ করিয়া তুলিত না; কারণ উভয় দিক দিয়াই অর্থের অধিকার সমান মনে করা হইত।

ক্রমশঃ অর্থের মূল্যই যখন আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, বিনা অর্থে যখন কানাকড়ির জিনিষও পাওয়া দুর্লভ হইতে লাগিল, অভাব-অভিযোগ ও অতৃপ্তির মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিল, তখন সাক্ষাৎভাবে অর্থোপার্জ্জনই হইল শ্রেষ্ঠতার মাপকাঠি। পরিবারে নারীর স্থানও অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল। সংসার-পরিচালনার কাজ যত বড় দায়িত্বপূর্ণই হউক, অর্থকরী নয় বলিয়া তাহার মূল্য আর বিশেষ রহিল না। ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় নারী সংসারের ভার বহন করে এই হইল পুরুষ ও নারী উভয়েরই ধারণা।

পুরুষের চক্ষে নারী হইল হীন, নারীর মনে জাগিয়া উঠিল নিজের শক্তির প্রতি অবিশ্বাস, নিজের কর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা। এই হীনতা ও দীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া পুরুষেরই সমকক্ষ হইবার জন্য ব্যগ্রতা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। সংসার-পরিচালনার মধ্যে যে বিচক্ষণতা, যে অভিনিবেশের প্রয়োজন তাহার অভাব ঘটিতে লাগিল নারীর মধ্যে; কেননা পুরুষ পদে পদে তাহাকে দায়িত্ববিহীন মনে করিয়া সংসারের কেবল দাসীবৃত্তিটুকুই তাহার উপর রাখিল, অর্থব্যয় প্রভৃতি অন্যান্য সকল ব্যবস্থাই রহিল তাহার নিজের হাতে। নারীও বস্তুতঃ শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে দিন দিন যন্ত্রবিশেষেই পরিণত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক বিবেচনা করিয়া মাথা খাটাইয়া কাজ করিবার শক্তি ও স্পৃহা নষ্ট হইয়া গেল।

নারীজাগরণের আন্দোলনের মধ্যে প্রায়ই যে উদগ্র ঝাঁঝ দেখিতে পাওয়া যায় পুরুষের প্রতি, তাহা ঐ পুরুষের অবজ্ঞা ও নারীর আত্মঅবিশ্বাস, এই দুয়েরই প্রতিক্রিয়ার ফল। ইহা অবশ্যই সত্য যে উপার্জ্জন করিবার মত শক্তি নারীর থাকা চাই। ঘরে বসিয়া কিরূপে উপার্জ্জন করা যায় তাহার বিবিধ পন্থা আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। প্রয়োজন হইলে বাহিরে আসিয়াও যাহাতে সে উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার যোগ্যতা নারীর থাকা চাই। তবে ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে গৃহের কর্ত্রীকে বাহিরে আসিয়া উপার্জ্জন করিতে হইলে গৃহের কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে বাধ্য। অবশ্য সুগৃহিণী তাহারও সুব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই ব্যবস্থা প্রয়োজনবিশেষের জন্য, সাধারণ নিয়ম ইহা কখনই হইতে পারে না। প্রয়োজনবিশেষে গৃহকর্ত্রীকে উপার্জ্জন করিতে হইলে সেক্ষেত্রে রেষারেষির ভাব থাকে না; বরং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভাবই থাকে। অন্যথা, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই উপার্জ্জনের সমান ব্যবস্থা থাকিলে প্রায়ই দেখা যায় পুরুষেরা অলসপ্রকৃতির হইয়া পড়ে, উদ্যমের অভাব তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। বর্ম্মাদেশের মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী, উপার্জ্জনের ক্ষমতাও তাহাদের বেশী। খাসিয়া পাহাড়েও এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাহার ফল যে তেমন ভাল নয় তাহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। পারিবারিক বন্ধন তাহাদের নাই বলিলেই চলে। এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উপার্জ্জন করে। আপাতদৃষ্টিতে এদের অনেকের পারিবারিক বন্ধনও সুখের মনে হয়; কিন্তু মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শক্তি বরাবর এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না; পুরুষও গৃহের টান তেমন করিয়া অনুভব করে না। ফলে তাহাদের নৈতিক জীবন ভয়াবহ হইয়া উঠে।

এখন, প্রশ্ন উঠিতে পারে যে একা পুরুষের উপার্জ্জনে আজকাল সংসার চলা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সংসার চলা সত্যই কঠিন, যদি সংসারের দায় সবটাই পুরুষের ঘাড়ে ফেলিয়া মেয়েরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের এযুগের ভ্রান্ত বিশ্বাস এই যে অর্থই ঐশ্বর্য্যের ও শক্তির পরিচায়ক। পূর্ব্বে লক্ষ্মীশ্রী কথাটি প্রয়োগ করা হইত সেই মেয়ের উপর, যাহার আগমনে সংসারের ঐশ্বর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিত। ইহার অর্থ আর কিছুই নয় সেই মেয়ের ভিতরকার শক্তি ও প্রেরণায় পুরুষের শক্তি ও উদ্যম উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইত। পরিবার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও উপার্জ্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত। এদিকে ঘরের লক্ষ্মীও কায়মনোবাক্যে সুব্যবস্থা দ্বারা পরিমিত ব্যয়ে সংসার চালাইতে প্রয়াস পাইত, কারণ সংসার যে তাহারই। ইহার উপর ঘরে বসিয়া শিকা, ঝুড়ি, কাঁথা, মাদুর প্রভৃতি ছোটখাট কতরকম শিল্পের চর্চ্চা করিত।

নগদ অর্থ তাহা হইতে পাওয়া যাক বা না যাক সংসারের প্রয়োজনের জন্য সে সকল দ্রব্য নগদ দাম দিয়া কিনিতে হইত না। ঘরেই শাকসব্জীর বাগান, গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, দুধাল গাভী—এই সকল ছিল গৃহস্থের ঐশ্বর্য্য। এই সকল ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা কি কেবল অর্থের অভাবে না উদ্যমের অভাবে?

তারপর, একথা উঠিতে পারে যে অতীতকে এখন ত আর ইচ্ছা করিলেও সম্পূর্ণ সেই মূর্ত্তিতে ফিরাইয়া আনা চলে না, সুতরাং বর্ত্তমান যুগেরই অনুযায়ী ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। গ্রামে ফিরিয়া যাও—**Back to the village** বলিয়া গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও সেকথা কানে তুলিতে লোকের সময় লাগিতেছে। সহরে সকল দ্রব্যেরই মূল্য অর্থ দিয়া নির্দ্ধারিত। অর্থ না ফেলিলে সামান্য একটি জিনিষও পাওয়া দুষ্কর। এখানে খাওয়া-পরার জন্য বাহুল্য বাদ দিয়াও ন্যায্য যে ব্যয় হয় তাহা চালাইতে হইলে গৃহস্থকে অতি সুবিবেচনার সহিত না চলিলে হয় না। তবে খাওয়া ও পরা এই দুইটি প্রয়োজনের মধ্যে কোনটির মূল্য অধিক সে সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় ভুল করিয়া থাকি। অনেক স্থলেই ভদ্রতার দোহাই দিয়া বেশভূষার পরিপাট্যে আমাদের আয়ের মোটা অংশ বাহির হইয়া যায়; যাহা বাকী থাকে তাহা দিয়া পেট চলে না। অনেক গৃহস্থেরই এই অবস্থা। ইহার পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় তাহাত আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমাদের জাতিগত শক্তির যে অভাব হইয়াছে তাহা এখন সহজে পুনরায় অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। আবার খাদ্যের মধ্যে আমাদের যতটা বাহুল্য থাকে, সার পদার্থ তাহার অতি অল্প অংশই থাকে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এখন অল্প ব্যয়ে পুষ্টিকর খাদ্য কিরূপে পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। মেয়েদেরই এ বিষয় বিশেষভাবে জানা দরকার। অর্থাভাবে ততটা নয়—তাহাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের ফলে পরিবারস্থ সকলে স্বাস্থ্য ও বীর্য্য হারায় একথা তাঁহাদের ভুলিলে চলিবে না। ভদ্রতা-রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্নতা ও বিলাসিতা যে এক জিনিষ নয় তাহা মেয়েদের বুঝা বিশেষ দরকার। কারণ তাঁহারাই আবার তাঁহাদের সন্তানদের এবিষয়ে ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারেন, এবং এই দিক দিয়া সংসারের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারেন।

পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় গৃহিণী যদি নিজে প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলে সেই-দিক দিয়াও ব্যয়সংক্ষেপ হয়।

পরিবারস্থ সকলের খাদ্যের অব্যবস্থার দরুণ স্বাস্থ্যহানি হইলে আর একদিক দিয়া খরচ বাড়িয়া যায়; সে হইতেছে চিকিৎসক ও ঔষধ-পথ্যের খরচ। এই খরচ মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে কিরূপ বিব্রত করিয়া তোলে তাহাত আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। গৃহিণীকে এবিষয়ে সতর্ক হইতে হইলে দৈনন্দিন খাদ্য প্রস্তুতের প্রতি তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহাতে চাকর বামুন দিয়া রান্না করাইতে হইলেও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে খাদ্য অপরিচ্ছন্ন হইতে পারে না। খরচও কম পড়ে, কারণ চাকর বামুনদের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে তাহারা যে বেশী খরচ করিবে ইহা ঠিকই। আবার ক্রমাগত সতর্ক দৃষ্টি দিতে যে সময় যায়, তাহাতে অনেক সময় নিজেই সেইটুকু করিয়া লইতে পারা যায়। বিশেষতঃ আজকাল 'কুকার' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায় বাহির হওয়াতে রন্ধনের কাজ এক দিকে যেমন সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, তেমনই স্বাস্থ্যের দিক দিয়া তাহার উপকারিতা যথেষ্ট।

তারপর সন্তানদের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের যে অঙ্ক, তাহাও সংক্ষিপ্ত করা যায়, যদি মা সেই শিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করেন—অন্ততঃ কিছুকালের জন্য। অর্থের দিক দিয়াই কি কেবল ইহার প্রয়োজনীয়তা? নিজের সন্তানদের শক্তি-সামর্থ্য নিজে বুঝিয়া, তাহার কোন্ দিকে ঝোঁক বেশী তাহা লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষায় যে সুফল পাওয়া যায় তাহা কি আর অন্যকে দিয়া সম্ভব হইতে পারে? মাতাপিতা উভয়েই এই বিষয়ে সমযোগে চিন্তা করিয়া, আলোচনা করিয়া সন্তানদের শিক্ষার কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলে আর শিক্ষাসমস্যা লইয়া এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না। পিতা যে নিয়মিত সময় দিতে পারিবেন, এ আশা করা বৃথা, তবে তাঁহার পরামর্শ, সহানুভূতি থাকা চাই, সুচিন্তিত সাহায্য পাওয়া চাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে সাক্ষাৎভাবে উপার্জ্জন না

করিলেও পরিবার-সুনিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহকর্ত্রী যে চিন্তা ও শক্তি ব্যয় করেন, তাহার মূল্য বড় কম নয়। প্রথমতঃ খাদ্যের সুব্যবস্থা দ্বারা ও অনেকস্থলে ভৃত্যের ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া তিনি পরিবারের আর্থিক সুবিধা করিয়া থাকেন। উপার্জ্জন করিতে বাহিরে যাইতে হইলে এই ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হয় না। উপরন্তু ভৃত্যের উপর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় চিকিৎসক ও ঔষধ-পথ্যের ব্যয় বাড়িয়া যায়। তাহার পর অনেক স্থলেই পরিধেয় বস্ত্র তৈয়ারী করিতে দিতে হয় দরজির নিকট; তাহারও ব্যয় কম নহে। শিশুদিগের শিক্ষা প্রথম হইতেই অন্যের নিকট দিতে হইলে সেই ব্যয় বহন করিতে হয়, শিক্ষার ফলও অনেক স্থলে ভাল হয় না। এই সকল দিক ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে পুরুষেরও আর বলিবার প্রবৃত্তি থাকে না যে সংসারের ব্যয়ভার বহন করিতেছে সে একাই, নারীও নিজের কর্ম্মের প্রতি পদে পদে আস্থা হারায় না।

অবস্থাবিশেষে নারীর উপার্জ্জনের প্রয়োজন হইতে পারে; তাহা ভিন্ন ঘরে বসিয়া অবসরমত সে অর্থকরী কাজ অনেক করিতে পারে। কিন্তু বক্তব্য এই যে কেবল উপার্জ্জনের দিক্ দিয়াই যে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও নিম্নত্বের বিচার, ইহার ভ্রম যে কতদূর তাহাই নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। এই দর-কষাকষির মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ে উভয়ের প্রতি যেন শ্রদ্ধা না হারায়। পরিবারে ও সমাজে প্রত্যেকে নিজের স্থান স্থির বিচক্ষণতার সহিত বাছিয়া লইতে পারিলেই নিজেরও মঙ্গল অপরেরও মঙ্গল।

গাছপালা

রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, আই-এস-ও

আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা সুন্দর কোন্ বস্তু, আমি বলিব—গাছপালা। গাছপালা না থাকিলে পৃথিবীটা হইত মরুভূমি।

পাহাড় পর্ব্বতের যে এত সৌন্দর্য্য—তাহা গাছপালার মণ্ডিত বলিয়াই। ফুল বড় সুন্দর; তাহার জন্ম কিন্তু গাছেই।

হাওয়া, রৌদ্র এবং মাটি হইতে গাছ রস সংগ্রহ করে। জীবজন্তুর মত গাছের মলমূত্র ক্লেদ প্রভৃতি নাই। ফল ও ফুল অনাবিল ও পবিত্র বস্তু। দেবতার অর্চ্চনায় তাহা ব্যবহৃত হয়। এ মহৎ দান গাছেরই।

কিন্তু কেহ কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছে কি, পৃথিবীতে গাছ যদি না থাকিত, জীবের আহারের সংস্থান তাহা হইলে হইত কিরূপে? ধান, গম, শস্য, শষ্প সমস্তই উদ্ভিদজ। "ধানগাছ" কথাটা শুনিতে আমাদের কেমন কেমন লাগে বটে, বস্তুতঃ ও একটা গাছই। সুতরাং বলিতে হইবে গাছপালা পরম উপকারী।

সংস্কৃত ভাষায় গাছপালাকে বলে ওষধি। ওষধি হইতে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাই ঔষধ। অতএব গাছপালাই জীবের জীবন।

সকলের অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচে কে? ঐ গাছই। চারি পাঁচ শত বৎসরের গাছ এখনো স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ে জঙ্গলে যাঁহারা বেড়াইয়াছেন, এমন সব গাছ সম্ভবতঃ তাঁহাদের চক্ষে পড়িয়া থাকিবে। এ সকল গাছের আকার-প্রকার দেখিয়া সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়, তাহারা বার্দ্ধক্যপীড়িত হয় নাই। গাছ যে বহুদিন বাঁচে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা দৃঢ় ও শক্তিশালী কোন্ বস্তু? সে ঐ গাছেরই কাঠ। এই কাঠে নৌকা, জাহাজ, কড়ি, বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এখনই না হয় লোহার কড়ি প্রভৃতি হইয়াছে; কিন্তু সেকালে এসব ছিল কোথায়? এখন হয় ইস্পাতের জাহাজ, কিন্তু তখনকার দিনে কাঠের জাহাজই সমুদ্রে যাতায়াত করিত। সকল স্থানেই নৌকাগুলি কিন্তু কাঠের। আজ পর্য্যন্ত দরজা-

জানালাও কাঠের ভিন্ন অন্য কিছুরই হয় না। লোহার জানালা-দরজা করিলে তাহা অত্যন্ত ভারী হয়। রৌদ্রের তাপে সেগুলি হইবে গরম, শীতকালে হইবে ঠাণ্ডা। কাঠের জিনিষে কিন্তু তাহা হয় না। কাঠ, গাছের অংশ বলিয়াই তাহা সম্ভবতঃ নাতিশীতোষ্ণ। সেইহেতুই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে কাঠের প্রায় একই ভাব। মাঝে মাঝে রং দিয়া রাখিলে কাঠ ঠিক্ থাকে শতাধিক বৎসর। পুরাতন

রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ. আই-এস্-ও

বাটীতে কেহ যদি রক্ষক না থাকে, দরজা-জানালা চোরে খুলিয়া লইয়া যায়; কিন্তু চৌকাঠগুলা যাহা চোর মহাশয়েরা দয়া করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যান, সেগুলিকে সহজে নষ্ট হইতে দেখা যায় না।

গাছের স্বভাব বড় মিষ্ট, বড় শান্ত, বড় মনোরম। নিদাঘের রৌদ্র, বর্ষার দাপট ও ঝাপট, শীতের কন্‌কনে হাওয়ায় গাছ থাকে স্থির, ধীর ও শান্ত—মনোহারিত্বের কোনো বৈলক্ষণ্যই গাছে দৃষ্ট হয়না।

গাছের ধর্ম্ম কি? প্রথম, ছায়া-দান। ছায়া দান করে সে সকলকেই—পাপাত্মা, পুণ্যাত্মার বিচার গাছ করে না একবারেই। যে আসিয়া তাহার ছায়ায় আরাম ভোগ করিতে চায়, তাহাকেই সে তাহা করিতে দেয়। বিধিনিষেধ একবারেই নাই তাহার।

গাছ হইতে বিলাসের বস্তু ও পূজার উপাদানও পাওয়া যায়। নানাপ্রকার সুগন্ধি ফুল ঐ গাছেরই সন্তান সন্ততি। নিজের জন্য রাখে না সে একটিও। তুমি সবগুলি পাড়িয়া লও, আবার ফুল ফুটিবার সময়ে ততগুলি কি তাহার বেশী ফুল, গাছ তোমাকে দান করিবে। ফল সম্বন্ধেও ঐ কথা। আম, কাঁটাল, লিচু প্রভৃতি কত সুস্বাদু ফলই মানুষ পায় গাছ হইতে। এত ফলের একটীও সে রাখে না নিজের ব্যবহারের জন্য, তাহার সম্পদ তোমার আমার সুবিধার্থে। মানুষ তবুও গাছের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না—আশ্চর্য্য!

গাছের কাণ্ড—দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া কি কাণ্ডটাই আমরা না করি? ঘরের সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র ঐ গাছেরই দেওয়া জিনিষ, অর্থাৎ কাঠে প্রস্তুত। পরিধেয় বস্ত্রের আসল জিনিষ যে কাপাস তুলা, তাহাও ঐ গাছেরই সম্পত্তি। গদি, বালিস প্রভৃতি তৈয়ারী হয় শিমুল তুলায়। গাছ না দেয় কি? গরু যে দুধ দেয়, তাহার খাদ্য ঘাস-পাতা—উদ্ভিদরাজ্যেরই প্রজা তাহারা। ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যাহার মাংস খাইয়া অনেক মানুষের রসনা তৃপ্ত হয়, সে ছাগল ভেড়ার খাদ্যও ঐ শস্য-শস্প, পাতা-লতা।

গাছপালা না থাকিলে জীবজন্তু হয়ত একদিনও বাঁচিতে পারিত না। আবার গাছ যখন শুকাইয়া যায়, আমরা তখন তাহাকে করি ইন্ধন। গাছ হইতে উৎপন্ন চাল, ডাল, গমের আটা, নানাপ্রকার তরকারী পাই আমরা বিস্তর। আর গাছেরই কাঠ জ্বালাইয়া তাহা রন্ধন করিয়া আমরা উদর পূরণ করি—তাহাতেই পুষ্ট হয় আমাদের শরীর। গাছের দেওয়া জিনিস আমরা কাঁচাও খাই, পাকাও খাই, রাঁধিয়াও খাই। দান গ্রহণ করিয়াও দাতাকে আমরা চিনিতে পারি না, এইটুকুই আশ্চর্য্য!

এখন বলিব, গাছই যথার্থ যোগী, গাছই যথার্থ ত্যাগী, গাছই পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করে। নিজের জন্য সে রাখে না কিছুই। এমন করিয়া জীবের সেবা আর করে না কেহই। গাছ সকল বস্তুর অপেক্ষা মনোহর, সুদৃঢ়, দীর্ঘায়ু এবং জীব ও জগতের পরম উপকারী বন্ধু। স্বার্থচিন্তা সম্ভবতঃ তাহার একেবারেই নাই। গাছের অনুকরণ করিতে পারিলে মানুষ বোধ হয় ধন্য হয়।

গাছ ত আমরা দেখিতেছি সকলেই, কিন্তু অল্প লোকই গাছের কথা অতি অল্পই ভাবে। মানুষমাত্রেই বোধ হয় সুন্দর, দীর্ঘায়ু ও শক্তিশালী হইতে চায়। গাছের ফল, গাছের ফুল, গাছের মূল, গাছের পাতা, গাছের ছাল, গাছের রস প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য ও ভেষজের মধ্য দিয়াই মানুষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে। কত বড় শক্তিশালী এই গাছ! আর ধর্ম্মোপদেষ্টা হিসাবেও এত বড় ধর্ম্মোপদেষ্টা ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আর আছে কিনা সন্দেহ। গাছ কহে না কথা, করে কিন্তু কায! সে চাহে মাত্র একটু জল—তাহাতেই তাহার শোভা, আর তাহাতেই তাহার ফসল। পাহাড় জঙ্গলে যে সকল গাছপালা আছে, তাহার গোড়ায় জল ঢালিতে হয় না মানুষকে। কিন্তু সে সকল গাছও দেয় সবই; প্রতিদান চাহে না কিছুই। "প্রেম প্রেম" করিয়া মানুষই মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। গাছের কিন্তু সাড়া নাই, শব্দ নাই, ঢাক নাই, ঢোল নাই, কাঁসী নাই, বাঁশী নাই—অকাতরে, অযাচিতভাবে, অক্ষুণ্ণ হইয়া অনাদি কাল হইতে সে প্রেম গাছ বিলাইয়া আসিতেছে আর ভবিষ্যতে বিলাইবেও। তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, গাছের চেয়ে বড় প্রেমিক কে? এমন প্রশ্নে কতক লোক হয়ত হাসিবে, কিন্তু ভাবুক যে, সে ভাবিবে। "মণি-কণার" কবি "শাসন" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

"আকাশ ঘেরে চাঁদ উঠিলে দীপ্ত তারা লুপ্ত হয়,
তখন বাতি জালিয়ে কেবা মুক্ত-পথে পান্থ রয়!
হৃদয়-ভরা আলোক যেবা পেয়ে গেছে পুণ্যফলে,
তা'র শাসনে শাসিত হ'য়ে বৃত্তিগুলা নিত্য চলে।"

গাছের প্রেম যাঁহারা না বুঝিবেন, ঐ শাসনের কথা তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া গাছপালার কথা আপাততঃ এইখানেই আমি শেষ করিলাম।

পথে পথে

শ্রী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী

পথে পথেই কাটিবে বেশীর ভাগ—ফাঁকে ফাঁকে হইবে সমাজ-সেবা, এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া এবার আসামের দিকে দীর্ঘযাত্রা। শনিবার আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়াই যাত্রার গোছান সুরু করিলাম। কার্য্যসূচীর তালিকাখানি হইতে বুঝিয়াছিলাম যে প্রায় তিন-সপ্তাহব্যাপী এই যে ঘূর্ণী এর মধ্যে কোথাও একদিন বিশ্রাম নাই; কাযেই কাপড় ধোলাই করারও কোন সুযোগ ঘটিবে না, তাই সাধ্যমত বেশীপরিমাণ কাপড় ও আবশ্যকীয় জিনিষে বড় চামড়ার সুটকেসটিকে বোঝাই করিয়া লইতেছিলাম। রাত তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে, কাল ভোর না হইতেই ট্রেন ধরিব,—মনের মধ্যে কেমন একটা উচাটন ভাব। এই সময়ে ক্যাপ্টেন দত্ত দেখা করিতে আসিলেন। কুমিল্লা হইয়া আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন; পরে তাঁহার দাদাকে টেলিগ্রামও করিয়া দিয়াছিলেন। ভোর বেলা তাঁহার নিজের মোটরই পাঠাইবেন বলিলেন আপনা হইতে। তাঁহার সৌজন্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব সকল কাযে সকল ব্যবহারে পাইয়াছি। মানুষ মনুষ্যত্বের কাছে কত বেশীপরিমাণ ঋণী তাহাই ভাবি। কতকগুলি আবশ্যকীয় ওষুধপত্রও সঙ্গে ঠিক করিয়া লইলাম। পানীয় সম্বন্ধে ভক্তিভাজন মেসোমহাশয় পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া

দিয়াছেন। আসামের কথা ভাবিলেই জ্বরের কথা মনে হয়। বিদেশ বিভূঁই!—এই সংস্কার-ভীতি মন হইতে মুছিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। কেমন একটা চাঞ্চল্য মনকে ঘিরিয়াছিল, এরূপ সকল সময় ত হয় না, রাত একটা পর্য্যন্ত ঘুম হইল না। দু' একটা খুঁটিনাটি জিনিষ এই ফাঁকে মনে পড়িয়া গেল—'এটাসিকেসে' পুরিয়া আবার আসিয়া শুইলাম। ভাবিলাম, দুঃখ-অসুবিধা-ক্লেশভোগ এসব কি আমাদেরি আয়ত্তের মধ্যে? এ আবার কি রকম দুর্ব্বলতা!—

"বিপদ সম্পদ তোমারি আশিস্, তোমারি স্নেহের দান," এই ভাবের প্রার্থনা জাগিবার পর অন্তরে একটি অনির্ব্বচনীয় শান্তি আসিল, চাঞ্চল্য আর রহিল না, কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাল করিয়া না ভাঙিতেই জোর করিয়া উঠিয়া পড়িলাম—ঘড়িতে দেখিলাম চারটে বাজিতে কুড়ি মিনিট বাকী। আরও একঘণ্টা ঘুমান চলিত বটে কিন্তু আবার ঘুমাইলে উঠিতে দেরী হইতে পারে। দোতলায় নামিয়া আসিয়া কিছু কিছু গৃহকার্য্য করিলাম; প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বেডিং ঠিক করিলাম। স্নান-আহ্নিক সারিয়া চা খাইতেছি, মোটর আসিল ঠিক ৬টার সময়। ষ্টেশনে আসিয়া শৈলেশ বাবুর খোঁজ করিলাম। তাঁহাকে না দেখিয়া কুলীদের দ্বারা 'চিটাগাং মেল' ট্রেনে জিনিষ তুলিলাম। জানি, শৈলেশ বাবু ঠিক সময়েই আসিবেন; ছ'টার সময় বাড়ীতে তিনি আমাকে টেলিফোনে জানাইয়াছিলেন যে তিনি ঠিক সময়েই যাইবেন, আমি যেন একটু আগেই যাই। শৈলেশ বাবু কুলীর ভাড়া চুকাইয়া ট্রেনে উঠিবার সময় আমাকে দৈনিক কাগজ কিনিয়া দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছাড়িল। এইরূপে ৭ই সেপ্টেম্বর ৭টা ১১ মিনিটে আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশন ত্যাগ করিলাম। গোয়ালন্দে ট্রেন পৌছিতে সেদিন তিন-চার ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল, কারণ আমরা আসার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই কলিকাতাগামী 'ঢাকা মেল'-খানি লাইনচ্যুত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে।

তিন-চারখানি গাড়ী জলের মধ্যে উল্টিয়া ডুবিয়া আছে দেখিলাম। ডাক্তার ও কর্ম্মচারীদের ভিড় ও ব্যস্ততা দেখিলাম হতাহতদের লইয়া। সারাদিন তীব্র রৌদ্রে ট্রেনে বড়ই খারাপ লাগিল। ষ্টিমারে আসিয়া স্নান করিবার পর অর্দ্ধেক ক্লান্তি দূর হইল। স্নানাদির সুবিধার জন্যই ষ্টিমারে আসিয়া প্রথমশ্রেণীর টিকিট লইলাম। এখানে আসিয়া পরিচিত লোক পাইলাম—নোয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত রাখাল সেন ও তাঁর পত্নী। তাঁদের বন্ধু মিসেস চাটার্জ্জি (পুরী বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী চাটার্জ্জির কনিষ্ঠ পুত্রবধূ) পুত্রসহ ইঁহাদের সঙ্গে নোয়াখালি বেড়াইতে যাইতেছেন।

প্রথমতঃ দূর হইতে আমি শ্রীযুক্ত সেনকে চিনিতে পারি নাই; তিনি অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিতেই আমি প্রতি-নমস্কার করি। মিঃ সেন আমার সন্তানদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর ডেকে বসিয়া আমরা চারজন (মিঃ সেন, মিসেস সেন, মিসেস চাটার্জ্জি ও আমি) কথাবার্ত্তা বলি। আমি কোথায় যাইতেছি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য ও আমাদের এবারকার কার্য্য-প্রণালীর বিষয় তাঁহাদের বলিলাম। রাত্রে ষ্টিমার ত্যাগ করিয়া চাঁদপুরে ট্রেনে উঠিলাম। ষ্টিমার আজ দেরিতে পৌছিয়াছে বলিয়া দৌড়িয়া ট্রেনে উঠা গেল; চাঁদপুরে কিছুক্ষণ থাকিবার যে কথা ছিল তাহা আর হইল না। পরদিন কাঁটাখাল নামক স্থানে গাড়ী বদলাইয়া বেলা সাড়ে নটার পর হালিয়াকান্দি পৌছিলাম। প্রায় ২৭ ঘণ্টা পর গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ষ্টেশনে তত্রস্থ সম্পাদিকার বাড়ীর লোকেরা অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের সঙ্গে ডাকবাংলোয় পৌছিলাম। জিনিষপত্র গুছাইয়া স্নান করিলাম। প্রায় এগারটার সময় চা খাইলাম। সম্পাদিকার বাড়ীতে দুপুরে আহারের জন্য লইয়া গেলেন। ওখানকার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মিত্র ও মিসেস মিত্রের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মিসেস মিত্র আমাদের ঢাকার পরিচিতা মেয়ে। সেখান হইতে মোটরে সভাস্থলে গেলাম। অনেক মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় ও কথাবার্ত্তা হইল। বালিকা-বিদ্যালয়গৃহে সভাটি হইয়াছিল। রাত্রে সম্পাদিকার বাড়ীতেই আহার ও শয়নের ব্যবস্থা ছিল। সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রভাবতী রায়, তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্য সকলে অত্যন্ত যত্ন করেন। সে বাড়ীর আতিথ্যের খ্যাতি সে অঞ্চলে খুবই বিস্তৃত। রাত্রিতে নূতন স্থানে আমার সেরূপ

ভাল ঘুম হয় না, তবুও সেদিন ঘুমাইয়াছিলাম।

রাত্রি চারটের অনেক পূর্ব্বেই বাড়ীর বধূরা সকলে শয্যাত্যাগ করিলেন। আমিও বিছানা বাক্স বাঁধিয়া তৈরী হইলাম। তাঁহারা ঐ শেষরাত্রিতে চা ও জলখাবারের আয়োজন যথেষ্ট করিয়াছিলেন, অত ভোরে আমার খাওয়া অভ্যাস নাই বলিয়া চা ছাড়া কিছুই খাই নাই। শৈলেশ বাবুকে ডাকবাংলোতে চা পাঠাইয়াছিলেন। মোটরে ষ্টেশনে আসিয়া ৫টার ট্রেনে আবার রওনা হইলাম।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

শিলচর আমাদের কার্য্যতালিকার মধ্যে ছিল না। কিন্তু হালিয়াকান্দিতে পৌঁছিয়াই আমরা শিলচর যাইবার টেলিগ্রাম পাই কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার জে, ডি, ওয়েলকার-এর নিকট হইতে। টেলিগ্রামের ঠিকানামত আমরাও রায়-সাহেব ভারতচন্দ্র চৌধুরীকে ঐ দিনই রাত্রি ৭টার সময় সভার ব্যবস্থা করিবার জন্য টেলিগ্রাম করি। শিলচরে সেই রায় সাহেব মহাশয় এবং অন্য কেহ কেহ ষ্টেশনে আমাদের লইতে আসেন। আমরা কামিনী চন্দ মহাশয়ের জামাতা উকীল হেম বাবুর বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। হেমবাবুর ভ্রাতা পরেশ বাবু স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছেন। হেম বাবুর পত্নী (কামিনীবাবুর কন্যা) ওখানকার সমিতির সম্পাদিকা। গত বৎসর ঐ স্থানটি বন্যাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইঁহাদের দ্বিতলগৃহের সিঁড়ি পর্য্যন্ত কিভাবে জল বাড়িয়া সমস্ত বাড়ীটিকে ডুবাইয়া দিয়াছিল সে সকল কাহিনী বাস্তবিকই রূপকথার মত শুনিতেছিলাম। রাত্রে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত সভা হয়। মেয়েরা বসিয়াছিলের চিকের আড়ালে। হেম বাবুর কনিষ্ঠা ভগ্নী জ্যোৎস্না আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন ; সেজন্য আমি মনে মনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। শিলচরে মেয়েদের দুইটি হাইস্কুল আছে। পূর্ব্বে একটি হাইস্কুল ছিল মিশনারীদের, এখন অন্য আর একটি স্থানীয় লোকদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভাল জিনিষের অনুকরণ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিশনারী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন ও কলিকাতা ডাওশিয়েসন হইতে বি-এ। তাঁহাদের অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জল নির্ম্মল দেখিয়া আমি তথায় স্নান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি, তারপর আমি ও জ্যোৎস্না বহুক্ষণ সাঁতার কাটিয়া স্নান করি। শ্রীমতী জ্যোৎস্না সম্প্রতি নবপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ও অর্থ-অভাব দূর করিবার জন্য প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া স্কুলটিকে সুন্দর ভাবে পরিচালন করিতেছেন। এখানে শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গলের বিষয় লইয়া মহিলা-সমিতির উপকারিতা দর্শাইয়া কিছু বলিয়াছিলাম। রাত ন'টার পর সভা ভঙ্গ হয়। হঠাৎ জানিলাম যে এখনকার সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন। তিনি আমার স্বামীর সুহৃদ ও সতীর্থ। তাঁহারা পতি-পত্নী সভাস্থানে আসিয়াছিলেন। এই ডাক্তার সাহেব ও রায় সাহেব ভারতচন্দ্র চৌধুরী—এঁরাই এই শিশুমঙ্গলের প্রধান উৎসাহী ও উদ্যোগী। জ্যোতিলাল বাবুর পিতা বৃদ্ধ বিহারী বাবু আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন—আমাকেও একান্ত স্নেহ করেন। তাঁহাকে দেখিতে তাঁদের বাড়ীতে গেলাম রাত ৯' টার পর। তিনি আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। আমি ওখানে গিয়াছি বা যাইতে পারি আমার নাম দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বড়ই আনন্দের সহিত কথা-বার্ত্তা হইল। জ্যোৎস্নার সহিত তাঁদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদির পর বিশ্রাম করিলাম। রাত্রি-শেষে আবার জিনিষ গুছাইয়া চা খাইয়া ভোরের ট্রেনে রওনা হইলাম।

১০ই সেপ্টেম্বর ; করিমগঞ্জ। এখানে আসিয়া সার্কিট হাউসএ উঠিলাম, উহা পূর্ব্ব হইতে রিজার্ভ করা ছিল। এখানে ষ্টেশনে কেহ ছিল না ; সমিতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এখানে আসিয়া আমরা প্রথমটা অনেক বিষয়েই বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। বেলা দু'টা বাজিতে চলিল আহারাদির কোন ব্যবস্থাও করিতে পারা যায় না। টিলার উপর সার্কিট হাউস—চারদিকে খর রৌদ্র যেন সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতেছে ; ভাদ্রের রুদ্র রৌদ্রদাহ ; বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, বিশেষতঃ সেই দগ্ধ মধ্যাহ্নে আমাদেরও পথকষ্টে শরীর ক্লান্ত ছিল। তবু প্রয়োজনে পড়িয়া বাহির হইতে হইল। শৈলেশবাবু অনেক ঘোরাঘুরি না করিলে

সেদিন সভা হওয়া অসম্ভব ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন এই সময়ে প্রবলতর হওয়ায় অন্যান্য সমাজসেবা ও লোক-হিতের আদর্শ নিস্তেজ। আমাদের রহিয়া সহিয়া আস্তে ধীরে সুযোগ লইবার সময় ছিলনা। পরদিনই অন্যত্র না গেলে সকল কার্য্যসূচীটি নষ্ট হইয়া যায়। যাহাহউক, সেইদিনই সভার ব্যবস্থা ও লোকজনকে সঠিক-সংবাদটি দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরা সার্কিট হাউস হইতে প্রয়োজনে ডাক-বাংলোতে গিয়া অযাচিতভাবে এক সদাশয় ভদ্রলোকের আতিথ্য ও যত্ন পাইয়া গেলাম; তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাদের তাঁহাদের গৃহে নিয়া গিয়া অনেক আতিথ্য করেন এবং পরে তাঁহার মোটরকারখানি দিয়াও অনেক সাহায্য করেন। এই অভাবনীয় ঘটনা কখনও ভুলিবার নয় তখন সত্যই মনে হইয়াছিল—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!
পুরান আবাস ছেড়ে চলি যবে
মনে ভেবে মরি, কি জানি কি হবে!
নূতনের মাঝে চিরপুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই।"

পরদিন সকালবেলা ট্রেনে উঠিবার পূর্ব্বে মোটরে মিশন-হাউসে যাই—সেখানে মিশনারী মেম মিস্ ইভেনস্-এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি সরোজনলিনীর জীবনী কিনিলেন স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য। তথা হইতে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে যাই। এই টিলাটি সর্ব্বাপেক্ষা খাড়া ও উচ্চ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাঁপাইয়া পড়ি। তাঁহাকে কেন্দ্রসমিতির মেম্বর হইতে অনুরোধ করি ও এখানকার পুস্তকাদি দিই। তিনি বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক হইলেন। অন্তঃপুরে তাঁর পত্নীকে দেখিলাম। তাঁহাকে অত্যন্ত রক্তশূন্য কোমলাঙ্গী দেখিলাম। চারিদিকে পর্দ্দা ও আবরণে তাঁহাকে যেন রৌদ্রবর্জ্জিত টবের ফুলগাছের মতই অতি ক্ষীণ সুকোমল মনে হইল। ইঁহাদের আদর করা ও ভদ্রতার কায়দা আমার খুব ভাল লাগে।

১১ই সেপ্টেম্বর। বৈকালে ট্রেন হইতে নামিয়া খেয়া-নৌকায় নদী পার হইয়া শ্রীহট্ট বা সিলেট নামিলাম। জিনিষপত্র সহ কুলীদের নিয়া ডাকবাংলোতে গেলাম। সেখানে বিশ্রাম করিয়া স্নানাদি সারিতে রাত্রি হইল। সম্পাদিকা মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করিতে মহিমবাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদের হঠাৎ আসিবার বিষয় কিছুই জানিতেন না। তাঁর রুগ্ন আত্মীয়াকে দেখিতে গিয়াছিলেন, কাযেই শ্রীযুক্তা নলিনীবালা চৌধুরীর সহিত দেখা হইল না। বিশেষ পরিচিত আত্মীয়স্থানীয় বিনোদ-দা'দের বাড়ী গেলাম। তাঁর ভ্রাতা বিরজা বাবু কলিকাতাতেই থাকেন; আমি সিলেট রওনা হইয়াছি লোকমুখে শুনিয়া আমি কলিকাতা ছাড়িবামাত্রই টেলি-গ্রাম করিয়া দেন। আমরা যে কত স্থান ঘুরিয়া সিলেট পৌছিব তা তাঁরা জানিতেন না। বিনয় বাবু 'তার' পাইয়া প্রত্যহ ষ্টেশনে আসিয়া ফিরিতেন। পরে জানিলেন ডাক্-বাংলোর একটি ঘর রিজার্ভ করা আছে বটে কিন্তু কবে কোন্ সময় পৌছিব ঠিক্ জানিতেন না। তাঁহারাও অতর্কিতে আমাকে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। অতি অল্প সময় তাঁদের কাছে ছিলাম। সকলকেই দুঃখিত করিয়া রাত্রে আহারাদির পরই ষ্টিমারে আসিলাম। বিনয়বাবু অনেকক্ষণ ডেকে ছিলেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করিলেন। ফিরিবার রাস্তায় আবার সিলেট পড়িবে নিশ্চয়ই, যেন দেখা করি, ষ্টেশনে আসিবেন; তাঁরা এই সব বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত একটায় ষ্টিমার ছাড়িল। অনেকক্ষণ ডেকে বসিয়াছিলাম। পরে জোরে বৃষ্টি ও ঝড়ের মত আরম্ভ হইল। ক্যাবিনে গিয়া শুইলাম।

পরদিন সুনামগঞ্জে পৌছিলাম। অনেক লোক ষ্টেশনে আমাদের লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একজন মুসলমান। তিনিও কর্ম্মচারীদের পাঠাইয়া আমাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ অনেকবার লইয়াছেন। এখানেও সার্কিট হাউস রিজার্ভ ছিল। সন্ধ্যার পর সভা আরম্ভ হয়। আরম্ভের পূর্ব্বেই এখানে কিছু গোলমাল হইয়াছিল। একদল লোকের ধারণা হয় যে গভর্ণমেণ্ট টাকা দিয়া আমাদের পাঠাইয়াছেন—চরকা, খদ্দর-আন্দোলন প্রভৃতি দমন করিতে। রাত্রিতে আহারাদির পর নৌকায় উঠিলাম। বেহেলী হইতে নৌকা ও লোকজন-

সহ রায় সাহেবের ছেলে সুধাবাবু আসিয়াছিলেন আমাদের লইয়া যাইবার জন্য। সারা রাত্রি নৌকায় কাটিল।

শ্রীমতী অমলারাণী বসু

সকালবেলা ন'টার পূর্ব্বেই রায় সাহেব কৈলাসবাবুর বাড়ী পৌঁছি।

এখানকার সম্পাদিকা কৈলাসবাবুর কন্যা শ্রীমতী অমলারাণী বসু। এখানকার সমিতির সভ্যাদিগকে লইয়া আলোচনায় বেশ কাটিল। ইঁহাদের উৎসাহ একবার দেখিবার মত জিনিষ। সমিতির কার্য্যও খুব সন্তোষজনক। এখানে অমলারাণীর কথা কিছু ভাল করিয়া বলা দরকার।

অমলারাণী রায় সাহেবের একমাত্র আদরিণী কন্যা। উপযুক্ত স্বামীর হাতে পড়েন, অল্প বয়সে বিবাহ হয়। ১৬ বৎসরে একটি শিশুপুত্র লইয়া বিধবা হন। সকল কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ থাকায় ইঁহার পিতার চেষ্টায় ইনি এখন ঐ বেহেলী গ্রামে পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার জননী বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছায় অমলার আমরা আর্থিক কোনই অভাব থাকিতে দিই নাই, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট জমিজমাও করিয়া দিয়াছি, একটিমাত্র ভাগ্নেকে মামারা মানুষ করিবেনই যত্নের সহিত। আমার মেয়ে পোষ্টমাষ্টারির মাহিনা সবই তাঁর শাশুড়ী ও ১০।১২ বৎসরের নাবালক দেবরটির আহার ও শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া থাকে।"

গ্রামে গ্রামে বিধবা মেয়েদের অনেক আর্থিক ক্লেশ, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহিতে হয়। এই সকল উদাহরণ গ্রহণ করিলে অনেক হাহাকার ঘুচিত। অনেক দুঃখ ঘুচাইবার হাত মেয়েদের অভিভাবকদের হাতে, আমাদের নিজেদের হাতে; একথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

ইংলণ্ড

শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

ভালবেসে আসি নাই আমি তোর কোলে,
ভালবেসে ডাকি নাই তোরে 'মা' 'মা' বলে';—
তোর কাছে আসি কভু নাহি ছিল সাধ,
আসিতে হইল শেষে—বিধাতার বাদ!
আজ তোরে ছাড়িবার কালে দেখি হায়,
মন যে কেমন করে, আঁখি ফিরে চায়···
অলক্ষ্যে কখন হায় আমার পরাণে
স্নেহের শিকল দিলে, কেহ নাহি জানে।
সন্তান না হই, মোরে পর ভাব নাই,
স্নেহটুকু, দয়াটুকু, পাই যাহা চাই।
তোমার মেঘের ঘটা পরাণ ভুলালো,—
তোমার সবুজ ঘাস কী মায়া বুলালো!
জননী না হও তুমি, আছে নারী-হিয়া,
আমারে করিলে স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহ দিয়া।

হারামণি—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম-এ। প্রাপ্তি-স্থান—প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—১॥০ আনা।

বাঙলার অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লীসমূহের পথে ঘাটে অক্ষর-পরিচয়মাত্র-হীন বাউল বৈরাগী ফকিরদের মুখে যে-সকল গান সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকার সেইরূপ কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়া "হারামণি" নামক এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পল্লীগীতি-সংগ্রহ উদ্দেশ্যে 'হারামণি' নামে বহুদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি বিভাগ খোলা হয়—বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই ঐ নামের প্রবর্ত্তক ও প্রথম মণি-সংগ্রাহক, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ও উঁহার পশ্চাতে ছিলেন সম্ভবতঃ। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের জন্য ঐ নাম গ্রহণ করিয়া ভালোই করিয়াছেন।

প্রাচীন লোকসাহিত্যের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক বিস্মৃত সমাজের পরিচয়ের দিক দিয়াও এই সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই সংগ্রহের জন্য সংগ্রাহককে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইলে সত্যের ভিত্তির উপর তথ্যের প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়, তিনি তাহা করেন নাই।

সংগৃহীত সঙ্গীতগুলি ছাড়াও ইহাতে 'বাউল গান' ও 'পল্লী-গানে বাঙালী সভ্যতার ছাপ' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ আছে; এবং গ্রন্থকারের 'নিবেদন' বা 'ভূমিকা'টিকেও অন্য একটি প্রবন্ধ বলিতে পারা যায় কারণ উহা ঊনবিংশ সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধ বিশেষের পরিবর্ত্তিত রূপ, অপিচ, গ্রন্থপ্রকাশের পর প্রথম ও শেষ প্যারাগ্রাফ্ বাদ দিয়া উহা 'বিচিত্রা'য় (বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭) প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ কয়টি সুলিখিত হইলেও গ্রন্থকারের অনবধানতা প্রযুক্ত ইহাতে কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। যথা—"বাউল ও ফকিরেরা যখন দুইদল একস্থানে সমাগত হয় তখন তাহারা নিজেদের দলের গুরুকে বড় প্রমাণ করিবার জন্য গানের উপরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন ও হিঁয়ালীচ্ছলে আক্রমণ করে।" ইহা সত্য নহে; বোধ হয় তিনি কতকগুলি বিশেষ পদের সাধন-বিষয়ক গূঢ় ইঙ্গিতগুলির মর্ম্মার্থ ধরিতে না পারিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছেন। অবশ্য, ভারতীয় ধর্ম্ম-সাধনার সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, এবং সে জন্য তাঁহাকে অপরাধী করাও যায় না। দ্বিতীয় ভুল—উত্তর-ভারতে প্রচলিত 'মুশায়রা'র সহিত 'কবি'-গানকে এক শ্রেণীতে ফেলা। 'মুশায়রা' কাব্য-রসিকদের বৈঠকে extempore কবিতার আবৃত্তি-প্রমোদ; * 'কবি'-গান বিবাদীদলের সহিত বাদী কবি-

---

* 'পল্লী-গান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ'—শ্রী মনোমোহন ঘোষ।

ওয়ালার গানের লড়াই, এবং প্রায়শঃই উহা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। তৃতীয়—"রাজসাহী জেলার চলনবিল অঞ্চলে এখনও পদ্মপুরাণ (পদ্মপুরাণ ?) গীত হয় বলিয়া শুনিয়াছি।" শুধু চলনবিল অঞ্চলে নহে, রাজসাহী ও পাবনা জেলার অনেক অঞ্চলেই ইহা প্রচলিত—যদিও ইহা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে সত্য। চতুর্থ—"মেয়েলি গান হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিলেই চলে," ইহা ঠিক নয় ; পাবনা ও বগুড়ার অনেক অঞ্চলে এখনো ইহা সুপ্রচলিত। † পরবর্ত্তী সংস্করণে ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবে মনে করিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। এমন সুন্দর বইখানি নিখুঁত হইয়া প্রকাশিত হয় ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়লিপি লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি 'দু'কথা' লিখিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার দুঃখ করিয়াছেন ; কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও 'বাউল'-গানের মূল কথা উহাতে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে এবং উহা গ্রন্থকে অধিকতর মূল্যবান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি বিগত আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীর 'আহরণ' বিভাগে ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "আমি তার (এই সব সঙ্গীত-সংগ্রহের) অভিনন্দন করি,—সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব-চিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধ'রে আপন সত্য রক্ষা ক'রে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে।"

আশা করি, গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকারকে তাঁহার এই প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ প্রয়াস-কৃতিত্বের জন্য আমরা শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

চক্রধর

† মনোমোহন বাবু বলিয়াছেন, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিং, শিলেট প্রভৃতি জেলাতেও ইহার প্রচলন আছে।

ব্যথা ও বেদনা—শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। **প্রকাশক**—শ্রী গিরীন্দ্রনাথ মিত্র। ৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—উল্লেখ নাই।

লেখক তরুণবয়সে শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে নবপরিণীতা পত্নী ও আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া সুদূর ইংলণ্ডে গমন করেন ও আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কবিতাগুলি প্রিয়-বিচ্ছেদ-ব্যথায় ভরপূর। গ্রন্থপরিচয়ে তাঁহার পিতা সুপণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইহাতে কল্পনার লীলা নাই, শব্দের আড়ম্বর নাই, আছে শুধু অন্তরের তীব্র অনুভূতি"। প্রবাসে প্রিয়জনের তীব্র বিচ্ছেদবেদনা ঘনীভূত হইয়া তাহা ভাষার আকার নিয়াছে, বহি পড়িয়া একথা আমাদেরও মনে হইয়াছে। কবিতাগুলি যেন পবিত্র প্রেমের প্রতীক ! বাংলার অনাড়ম্বর স্নেহযুক্তা নারীমূর্ত্তির আদর্শ বিদেশের সহস্র চাকচিক্য-বিলাসে বিভ্রান্ত না হইয়া একটি গভীর ভাবব্যঞ্জক শ্রদ্ধা জাগাইয়াছে—সেই প্রেরণায় বিদেশের নারীও পবিত্র মহিমামণ্ডিতা মাতৃমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিতা হইয়াছেন।

প্রথমে জননীর মধ্য দিয়া, পরে সমস্ত রূপে সমস্ত সম্বন্ধে এই পরিচয় উজ্জ্বলতর,—যথা—

"তোমারে চিনেছি নারী একখানি রূপে
স্নেহমাখা হৃদিখানি গৃহ-কোণে চুপে ;
দেহ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে বুক হ'তে মধু দিয়ে—"

লাবণ্য, যৌবন সব অক্লেশে ত্যাগ করিয়া বিরাগিনী তপোমনোহরা নারী তাঁর ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছেন বলিয়া—

"আমারে করিল মুগ্ধ মাধুরী তোমার,
জননীরূপিণী নারী লহ নমস্কার।"

আবার মাধুর্য্যের কল্পলোকে প্রেমের অলকামাঝে এই একেশ্বরী দেবীকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

"দুঃখভরা, কষ্টভরা, ধরণীর মাঝে
স্বর্গ আন, আন প্রাণ, পুরুষের কাজে—"
*　　*　　*　　*
মঙ্গল বিলায়ে চল অতি লঘুভার—
প্রেয়সী-রূপিণী নারী লহ নমস্কার।"

বিরহী চিত্ত প্রিয়া উদ্দেশ্যেই অনেক কবিতা লিখিয়াছে এবং সেই প্রেমে একটি খাঁটি পবিত্র সুর ধ্বনিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যেমন বলিয়াছেন -

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে পিরীতি মুখেরকথা।
বিরিখের ফল নহেক পিরীতি নাহি মিলে যথা তথা॥

এবং কবি রবীন্দ্রনাথেরও কৈশোর-কবিতায়—

ভালবাসা ভালবাসা সবাই ত কয়,
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলা নয়।

কিন্তু এই সেই শুদ্ধ প্রেমানুভূতি ; কবি বলিয়াছেন—

"আমার এ ভালবাসা—
কেহ কারে বাসে নাই, কারো মনে আসে নাই,
প্রকাশিতে নারে তাহা মানবের ভাষা।"

এই নবীন কবির প্রেমানুভূতির মধ্যে একটি পবিত্র সুর যে আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

শ্রী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী

দেশের কাজে বাঙলার মেয়ে

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

কার্ত্তিক সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীর "নানাকথায়", এসিয়া নারী-মহাসম্মিলনের উদ্যোগ-কেন্দ্র হইতে যে একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পারস্যের জাতীয় মহিলা-সঙ্ঘের সভানেত্রী উক্ত মহাসম্মিলনের সম্পাদিকাকে যে একখানি চমৎকার পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর জাভার নারীসঙ্ঘের নিকট হইতেও বেশ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন,—"এসিয়া এবং জগতের কল্যাণের জন্য, আপনারা যে আমাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমিতিগুলিকে একত্রে আনিয়া কাজ করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে আমাদের মনে বড়ই আনন্দপূর্ণ সহযোগেচ্ছা জাগিতেছে। নিমন্ত্রণ পাইয়া শুধু যে আমরা খুসি হইয়াছি তাহা নয়, উহাকে আমাদেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষার উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

আমরা, অর্থাৎ ইন্দোনেসিয়ার মেয়েরা, আমাদের এসিয়ার ভগিনীদের দেখিতে পাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব। ইহাতে বিভিন্নদেশের নারী-আন্দোলন বুঝিবার পক্ষেও আমাদের যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

আমরা আমাদের সমিতিগুলি হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছি, তাঁহারা আমাদের হইয়া কথা বলিবেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা যাইয়া আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। কারণ তাঁহাদের যাওয়া না যাওয়া অনেকটাই আমাদের সমিতিগুলির আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

আপনারা অনুগ্রহ করিয়া দুইজন প্রতিনিধির স্থান রাখিবেন কি? আমরা আশা করিতেছি, আমরা এসিয়া ও জগতের কল্যাণকামী এই সম্মিলনে যোগ দিয়া, কিছু কাজ করিতে পারিব।"

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকায় এই নারী সম্মিলনের বিষয় একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, উহার অনেক কথাই প্রণিধানযোগ্য। লেখক বলিতেছেন,—"বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর জগৎব্যাপী একটা নারী-আন্দোলন দেখা দিয়াছে। অনেক দেশেই মেয়েদের পুরুষের দাসত্বপাশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা দৃঢ়চিত্ততা এবং কষ্টসহিষ্ণুতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন এবং একে একে তাঁহাদের অধীনতার শৃঙ্খল খসিয়া পড়িতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায়, স্ত্রী-স্বাধীনতার বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে বিগত মহাযুদ্ধের সময়, পুরাতন সামাজিক সংস্কার ও নিয়মাদি অনেকাংশেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যে সকল

পুরাতন আইনের জোরে স্ত্রীলোককে পুরুষের নীচে স্থান দান করা হইত, তাহা বেশীর ভাগই পরিশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, এবং স্ত্রীলোককে জীবনের সকল দিকে, এবং কর্ম্মজগতের সকল বিভাগেই, পুরুষের সহিত সমান অধিকার দেওয়ার চেষ্টা খুব দৃঢ়চিত্ততার সহিত করা হইতেছে। এই জগৎব্যাপী আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষও আর নীরব নাই। যদিও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের ভিতর বেশীর ভাগই অশিক্ষিতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্না, তবুও নূতন-আলোকপ্রাপ্তাও অনেকে আছেন, এবং ইঁহারা পুরাতন বাধা-নিষেধ অতিক্রম করিয়া, স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে চলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। যতই দিন কাটিবে, ততই পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীর এই বিদ্রোহ তীব্রতর হইয়া উঠিবে, এবং অধিক প্রসার লাভ করিবে। মানবজাতির ক্রমোন্নতির পথে পুরুষ যে বিপুল ক্ষমতালাভ করিয়াছে, তাহার বলে এই আন্দোলনকে দমন করিবার প্রয়াস ব্যর্থ ও মূর্খতার পরিচায়ক হইবে। নারীকে যদি তাহার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিবার অবসর ও সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে শুধু নারী নয়, সমগ্র মানবজাতিরই অশেষ কল্যাণ হইবে। আজ না হউক কাল, নারীজাতি নিজেদের পূর্ণ অধিকার লাভ করিবেনই, এবং তাঁহাদের বাধা দিলে আর কোনো লাভ হইবে না, শুধু স্ত্রীপুরুষের এই সঙ্ঘাতকে অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখা হইবে।

অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সমান অধিকার লাভ বলিতে ঠিক এক-অধিকার লাভ বুঝায় না। স্ত্রী-পুরুষের শরীর ও মনের যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি অধিকারলাভ ও ব্যবহারেও কিছু কিছু প্রভেদ থাকিবে। এবং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে পুরাতন প্রথা ও নিয়ম মাত্রই, কেবল পুরাতন এই দোষে পরিত্যাজ্য নয়। প্রথাটি যে পুরাতন হইতে পারিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে মানবসমাজের বিশেষ স্থানে ও কালে উহার প্রয়োজন ছিল, না হইলে এতকাল কালের আক্রমণ সে সহ্য করিতে পারিত না। স্ত্রীপুরুষের সম-অধিকারলাভকে ভিত্তি করিয়া যে সামাজিক পুনর্গঠনের প্রস্তাব চলিতেছে তাহার অর্থ এই নয় যে সামাজিক সকল নিয়ম উঠিয়া যাইবে এবং পারিবারিক জীবন ধ্বংস পাইবে। যাঁহারা নারী-আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং যে সকল মহিলা এই আন্দোলনে নেত্রীর কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাগে কর্ত্তব্য এই বিপদটি নিবারণ করা। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই সমস্যাটি এখন অতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে, সুতরাং মিশর, তুরস্ক, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতির নারী-আন্দোলনকারীরা পাশ্চাত্যের এই অভিজ্ঞতা

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

দ্বারা লাভবান্ হইতে পারেন। এই কারণে আমরা এসিয়ার নারী-সম্মিলনের প্রস্তাবটিকে আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, আন্দোলনটিকে উপযুক্ত পথে পরিচালন করিতে পারিবেন।

সমিতির উদ্যোক্তাগণ যে যে বিষয়ে আলোচনা হইবে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ব্যাপক আর কিছু হইতে পারে না। সম্মিলনে যে সব বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাবাদি হইবে, তাহাতে সমাজ-সংস্কারের কাজ বহুদূর

অগ্রসর হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আশা করি যে বিভিন্নদেশীয়া প্রতিনিধিগণ, পরস্পরের সহিত মত মিলাইয়া দেখিবেন, এবং সম্মিলনের সম্মুখে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে, তাহাতে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও নূতন দৃষ্টি আনিয়া, সেগুলির বিচার করিবেন। সম্মিলনের কর্ত্রীগণ যে কার্য্যাবলীর ভিতর প্রাচ্য সভ্যতার বিশেষত্ব রক্ষাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করার চেষ্টাকে যে তাঁহারা বাধা দিতেছেন, ইহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

লাহোরে যে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে ইহা আনন্দের বিষয়। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা সমাজ-সংস্কারের কাজে প্রায় আর সকল প্রদেশের অধিবাসীগণ অপেক্ষা অগ্রসর। আমরা আশা করি তাঁহারা এই সম্মিলনটিকে সার্থক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। লাহোর যে প্রথম এসিয়াবাসী-নারী-সম্মিলনের অধিবেশনক্ষেত্র হইয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে গৌরবের কথা। এসিয়ার নানাদেশ হইতেই সম্মিলনের উদ্যোক্তোরা সহায়তালাভের আশা পাইয়াছেন। প্রতিনিধিবর্গের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি উপযুক্ত অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইতেছে। এই সমিতির সভ্য হইবার জন্য একটা আবেদন বাহির করা হইয়াছে। আমরা আশা করি পাঞ্জাববাসীরা এই আবেদনে কর্ণপাত করিবেন, এবং অধিক সংখ্যায় এই সমিতিতে যোগদান করিবেন। সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য মাত্র আর তিন মাস সময় আছে। যাঁহারাই নারীর মুক্তিকামী, তাঁহাদের সকলেরই এই অনুষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন সফলতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

বাঙলা দেশের মেয়েরাও আশা করি পশ্চাৎপদ থাকিবেন না। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার মন্ত্র এই প্রদেশেই প্রথম পঠিত হয়। এখনকার বাঙলার মেয়ে যেন এ গৌরবের কথা ভুলিয়া না যান। আমাদেরও শুধু নিজেদের প্রতি নয়, প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি, জগতের কল্যাণের প্রতি অনেক কর্ত্তব্য আছে। নানাজাতীয়া মেয়েদের সহিত মিলামিশা করিলে জগৎটাকে চিনিবার সুবিধা হয়; চিন্তার আদানপ্রদানে চিন্তা করিবার শক্তিও প্রসার লাভ করে। আশা করি অনেক বাঙালী মেয়ে এই সভায় যোগদান করিয়া নিজেরা উপকৃত হইবেন এবং অন্যকে উপকৃত করিবেন। ভবিষ্যতে এইরূপ একটি সম্মিলন যাহাতে বাঙলাদেশে হইতে পারে তাহার জন্য বিভিন্ন নারী-সমিতিগুলির এখন হইতে চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা করিলে তাঁহারা যে নিশ্চয়ই সফল হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতায় এইরূপ একটি মহাসম্মিলনের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। পাঞ্জাবে শিক্ষিতা এবং উন্নতিপ্রয়াসিনী নারী যত আছেন, বাঙলাদেশে তাহার চেয়ে কম নাই। তবে শতাব্দীর অবরোধ ও অভ্যাসের ফলে তাঁহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রেরণা অনেকটা যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর মেয়ে কাহারও চেয়ে কম বোঝেন, বা দেশকে কম ভালবাসেন, তাহা বোধ হয় কেহই মনে করেন না। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে অন্যান্য প্রদেশের মেয়েরা সমাজ-সংস্কারাদি কার্য্যে, নারীর নানাবিধ অধিকারলাভের চেষ্টার ক্ষেত্রে যেমন দ্বিধা না করিয়া অগ্রসর হইয়া যান, বাঙালীর মেয়ে তা পারেন না। অবরোধপ্রথা অবশ্য অনেকটাই ইহার জন্য দায়ী। হাজার ইচ্ছা থাকিলেও, ঘরে বসিয়া বাহিরের সব কাজে যোগ দেওয়া যায় না এবং সারাক্ষণ গাড়ী করিয়া বেড়াইবার মত সাধ্য সব মেয়ের থাকে না। আমাদের দেশে মেয়েদের লইয়া কিছু একটা করিবার প্রস্তাব হইবামাত্র প্রথম গাড়ীর ভাবনা উপস্থিত হয়। এই বাধাটাকে সবলে দূর করা উচিত। পায়ে হাঁটিয়া চলার মধ্যে কোনো অগৌরব নাই, এবং লোকের চোখে পড়িলে তাহাতেও কোনো ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই একটা বাধার জন্য কত কাজে তাঁহারা যে যোগ দিতে পারেন না, তাহার ঠিকানা নাই। লাহোরে যে প্রকার সম্মিলনের আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে প্রচুর অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম অবশ্যম্ভাবী। কলিকাতায় যদি এইরূপ একটি সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে অর্থের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে বাঙলার আতিথ্য প্রসিদ্ধ। তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করা হইয়াছিল, সেইরূপ নাকি অন্য কোনো

অধিবেশন-ক্ষেত্রে হয় নাই। অকারণে অর্থব্যয় করাটা যে একটা গুণ, তাহা অবশ্য আমার বলিবার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলিতে চাই যে টাকা জুটিবে না, এই ভয়ে পিছাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। তবে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিবার লোকের অভাব যাহাতে না হয় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন খুব উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছিল। দেশের এবং দশের কাজ করায় উৎসাহ থাকা যে শুধু প্রয়োজন তাহা নয়, উহার জন্য শিক্ষাও প্রয়োজন। আমরা যে কোনো অংশে পুরুষের চেয়ে হীন নই, তাহা শুধু বক্তৃতায় জাহির করিলে ও কাগজে লিখিলে হইবে না, উহা আমাদের হাতে কলমে করিয়া দেখাইতে হইবে। বড় বড় মহা-সম্মিলনে প্রতিনিধিদের আদর-অভ্যর্থনা, মণ্ডপ সাজান, শৃঙ্খলাবিধান করা, শান্তিরক্ষা এমন কি রাস্তার গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি সব কাজই স্বেচ্ছাসেবকরা করেন, ইহার জন্য মাহিনা দিয়া লোক রাখা হয় না। লাহোরেও খুব সম্ভব স্বেচ্ছাসেবিকারাই সব কাজ করিবেন। আমাদের প্রথমতঃ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এইরূপ সম্মিলন একটির অধিবেশন করিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহার পর, উহার জন্য প্রথম হইতে এমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত, যেন উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি না থাকে। বাহির হইতে প্রতিনিধি যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা যেন কোনো কারণেই মনে না করিতে পারেন যে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ এক প্রদেশে তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন। এই প্রদেশেই মহাত্মা রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই নারীর মুক্তির মন্ত্র প্রথম এদেশে উচ্চারণ করেন। আমরা যেন এই সম্মানের অযোগ্য বিবেচিত না হই।

জয়ী প্রেম

শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার

লভিতে চাহি না আমি কলুষিত জয়
মানুষের বক্ষে হানি' শাণিত কৃপাণ ;
প্রাণের ঠাকুর যেথা পদে পদে কয়,—
"প্রেমে কর বিশ্ব জয়, অমৃত-সন্তান !"
মানুষের যাহা কিছু শেষ করি' দিয়া
ঘটে যদি পরাজয়, হায় সে-ও ভালো ;
আত্মার বিধান তবু হাস্যে উড়াইয়া,
চাহিনে করিতে মোর এ-অন্তর কালো।
অনাদি তিমির হ'তে আমি ওগো জানি
জাগিল মানুষ যবে প্রথম-প্রভাতে
এই ধরণীর বুকে, প্রচারিল বাণী,—
"সত্য শুধু প্রেম—নাহি দ্বন্দ্ব কারো সাথে।"
হে মোর আমিত্ব, করি' অবহেলা তারে,
বিমুখ করিবে কেন নর-দেবতারে ?

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

সেনহাটী

গত ৯ই অক্টোবর ১৯৩০ আমাদের সমিতির পঞ্চম বার্ষিক শারদীয় সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় মধ্য-ইংরাজী বালিকাবিদ্যালয়-গৃহে এবার সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রায় তিনশত মহিলা এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বালিকাদিগের দ্বারা কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ" অভিনয় করা হইয়াছিল। নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি যোগে বালিকাদিগের "নটরাজ" অভিনয় উপস্থিত সকলেরই মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করিয়াছিল। সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ হইবার পর সমিতি-প্রস্তুত চার্টের সাহায্যে মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেওয়া হয়। সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদের সমিতির আলোচ্য বর্ষের প্রধান কাজ "নারী-শিল্প-বিদ্যামন্দির" প্রতিষ্ঠা। সম্পূর্ণ নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই এই বৃহৎ কার্য্যে আমরা হাত দিয়াছিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার সময় আমরা যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইয়াছি, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি হইতে। আমাদের এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি আমাদের চিঠি লিখিয়া জানান, "আপনারা একটি স্থায়ী শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার সহানুভূতি আছে। প্রার্থনা করি, আপনাদের সমিতির সভ্যাগণের অক্লান্ত চেষ্টায় তাহার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে।" এই বিষয়ে কেন্দ্রসমিতির সাধারণ সম্পাদক রায় অবিনাশ-চন্দ্র বানার্জ্জি মহোদয়ও আমাদের পত্র লিখিয়া জানান—"মহিলাসমিতির অধীনে সেনহাটীতে আপনারা যে একটি স্থায়ী শিল্প-স্কুল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবিষয়ে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।" তাঁহাদের সহানুভূতি ও উৎসাহকে সম্বল করিয়াই আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম; ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজ গ্রামের হিতকামী প্রত্যেক ভদ্রলোক ও মহিলারই সাহায্য ও সহানুভূতি আমরা লাভ করিয়াছি। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা নলিনীবালা দত্তকে আমাদের শিল্পবিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক কেন্দ্রসমিতি হইতে দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে জামা, ছাট-কাট, সেলাই, এমব্রয়ডারীর

কাজ, এবং বিভিন্ন তাঁতে কাপড়, তোয়ালে, সতরঞ্চ, গালিচা, আসন বুনান ও চরকায় সুতা কাটা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দুইটি সেলাইয়ের কল কিনিবার জন্য শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস পাল ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট যথেষ্ট অর্থসাহায্য আমরা পাইয়াছি, এই জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর খুলনা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল বাহাদুর ও খুলনার ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ ডাঃ জে, জি, সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি আমাদের নারীশিল্প-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সমিতির ও স্কুলের কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে জেলা বোর্ডের ভাল সাহায্য যাহাতে পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের একটি সেলাইয়ের কল কিনিবার জন্য ৬০ টাকা দান করিয়াছেন। পরিদর্শন-পুস্তকে রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন—"আজ সেনহাটী শিল্প-বিদ্যামন্দির পরিদর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী নলিনীবালা দত্ত সুনিপুণা ও সুশিক্ষিতা। ছাত্রী-সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩৮। শীঘ্র আরও ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এরূপ বিদ্যালয় বহুসংখ্যক স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ডাঃ সেন পরিদর্শন-পুস্তকে লিখিয়াছেন—"বাংলার মফঃস্বলে এইরূপ ধরণের বিদ্যালয় বোধ হয় ইহাই প্রথম। দুই-একটি আর যা দেখা যায় তা সবই মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত। ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে সেনহাটীর মেয়েরা শিল্প-শিক্ষার আবশ্যকতা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি এর সাফল্য কামনা করি।"

উপযুক্তভাবে কার্য্য-পরিচালনা করিবার জন্য আমরা আলোচ্যবর্ষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত একটি ২০ টাকা মূল্যের পুরস্কার পাইয়াছি। স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের মেয়েদের খেলিবার জন্য আমরা একসেট ব্যাড্‌মিন্টন ও একসেট ভাল বল খেলিবার সরঞ্জম কিনিয়া দিয়াছি। গত ২৮শে এপ্রিল কেন্দ্রসমিতির শিল্পবিদ্যালয়ের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি-এ,বি-টি যখন স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন তখন আমরা সকল সভ্যা একত্র হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করি। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সমিতি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের আলোচনা হয়। আমাদের প্রস্তুত চার্টগুলি দেখিয়া তিনি খুব প্রীত হয়েন।

শ্রী কিরণকুমারী সেন,
সম্পাদিকা

সাবিত্রী সম্মিলনী

আজকের এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে আমরা যতগুলি নারী একত্রিত হয়েছি সর্ব্বপ্রথমে আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করবার সার্থকতা কি কেবলমাত্র আমরা যদি অর্থলাভের বিষয় চিন্তা করি তাহ'লে এর আসল উদ্দেশ্যকে আমরা হারিয়ে ফেলব। অর্থসমস্যাও যে এর একটি কারণ তা ভুললে চলবে না কিন্তু আমরা নারীরাও যাতে নিজের দেশের মাটি ও জল হাওয়ায় উৎপন্ন বস্তুর দ্বারা নানারকম জিনিষ প্রস্তুত ক'রে স্বাবলম্বী হ'য়ে সংসারের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে সক্ষম হই—এর প্রধান কারণ ইহাই। আমরা আজ অন্যান্য জাতির নিকট নানা বিষয়ে পিছিয়ে প'ড়ে রয়েছি এবং তার জন্য দুর্দ্দশাভোগও যথেষ্ট করছি। কার দোষে আজ আমাদের এই অবস্থা তা আমি এখানে বিচার করতে আসিনি, কিন্তু যে কারণেই হোক্ যখন আমাদের এই অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয়েছে তখন নিজেদের প্রত্যেককে আমাদের সেই বাধা হ'তে মুক্ত হতে হবে, যাতে ক'রে আমরা শক্তি ও জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে এই অপবাদ খণ্ডন করতে সক্ষম হই। ভারতের মহাচক্রের পরিবর্ত্তনের ভিতরে আজ নারীকে স্থির ধীর চিত্তে দেশের দিকে তাকিয়ে,দেশের যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, দেশের নরনারী ও শিশুরা যাতে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচ তে পারে, তার চেষ্টা প্রথমে করতে হবে। সেই যদি আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয় তবে আজকার দিনে নিজেদের মনকে সেই আদর্শের দিকে নিয়ে তার উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে হবে, যে আদর্শের গৌরবে একদিন ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হয়েছিল। এ কেবলমাত্র পুরুষের একার কাজ নয়, এর সঙ্গে নারীশক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

"সাবিত্রী সম্মিলনীর" প্রথম উদ্দেশ্য—যাতে আমাদের দেশের মেয়েরা দেশীয় শিল্প প্রস্তুত করতে শেখেন এবং দেশের মধ্যে তার প্রচার হয়। এই প্রথম অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আমরা কতখানি সফল হয়েছি বলতে পারি না, তবে আশা হয় যে এর পরের বারে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে। আজকার অনুষ্ঠানটিতে যাঁদের সঙ্গে আমাদের মিলিত হবার সৌভাগ্যলাভ ঘটেছে তাঁদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা—আমরা নারীরা সকলে মিলে যাতে এই কাজটিতে সর্ব্ববিষয়ে, দেশীয় প্রথায়, দেশীয় ভাবে, দেশীয় কর্ম্মের ভিতর দিয়ে দিন দিন উন্নতি সাধন করতে পারি, তার জন্য সহায়তা করুন। এ কাজের দায়িত্ব এবং উন্নতির আশা প্রত্যেক নারীর উপর নির্ভর করছে।

আমরা গত ফাল্গুন মাস হ'তে "সাবিত্রী সম্মিলনীর" গঠনকার্য্যের সূচনা করেছি। আমাদের শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরলাবালা সরকার, শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, শ্রীমতী চারুবালা ঘোষ, শ্রীমতী নিরুপমা ঘোষ, শ্রীমতী প্রভাবতী দে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের চেষ্টায় ও উৎসাহে এই সম্মিলনী গঠিত হয়েছে। শ্রীমতী চারুবালা ঘোষ যখন এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর স্বামীবিয়োগ হয়, তাঁর সেই শোকবহ্নির মধ্যেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও পরম সহিষ্ণুতার সহিত সম্মিলনীর সর্ব্ববিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছেন। আজ সম্মিলনীর কাজের যতটুকু সফলতা সকলের সম্মুখে আমরা দেখাতে সাহস করেছি, কেবলমাত্র তাঁর কার্য্যগুণে। আশা হয়, এই রকম কর্ম্মী আমরা প্রত্যেক পল্লীতে লাভ ক'রে "সাবিত্রী সম্মিলনীর" উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবো।

শ্রী রমা দেবী, সম্পাদিকা,
জোড়াসাঁকো,
কলিকাতা

কেন্দ্রসমিতির কথা

বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

আগামী ১৯শে জানুয়ারী হইতে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব আরম্ভ হইবে। তৎসঙ্গে একটি শিল্প-প্রদর্শনী, মহিলা-সম্মিলন এবং প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইবে। মফঃস্বল মহিলাসমিতির প্রতিনিধিগণকে সকল উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। যথাসময়ে তাঁহাদের নিকট বিভিন্ন উৎসবের সংবাদ প্রেরিত হইবে। শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য যাঁহারা শিল্পদ্রব্যাদি প্রেরণ করিবেন তাহা ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে কেন্দ্রসমিতির কার্য্যালয়ে আসিয়া পৌঁছান আবশ্যক।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার জীবন অবলম্বন করিয়া "নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখিকাকে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয় একটি ৫০৲ মূল্যের পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধে ১৫ শতের অধিক কথা থাকিবে না। তাহা বাংলাভাষায় এবং মহিলাদের লিখিত হওয়া চাই। উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়া যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকেও একটি ২৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হইবে। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে চান, তাঁহারা আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রবন্ধটি সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের নামে ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। উপযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী এই সকল প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহাই গৃহীত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রবন্ধ রচয়িত্রীর চিত্রসমেত সমিতির মুখপত্র "বঙ্গলক্ষ্মী"তে প্রকাশিত হইবে। আগামী ১৯শে জানুয়ারী কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসব-সভায় প্রবন্ধ-রচয়িত্রী বা

তাঁহার কোন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে অভিনয়

আগামী ২৭শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটের সময় সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে সুপ্রসিদ্ধ মেসার্স জে, এফ, ম্যাডান কোম্পানী তাঁহাদের ম্যাডান থিয়েটার ও প্যালেস অব ভ্যারাইটিস নামক বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে "This is heaven" নামক প্রসিদ্ধ ছায়াচিত্রের অভিনয় প্রদর্শন করিবেন। সমিতির সভানেত্রী লাটপত্নী মাননীয়া লেডী জ্যাকসন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অভিনয় দর্শন করিবেন। ম্যাডান কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী মিঃ রোস্তমজীর বিশেষ অনুগ্রহে এবং মেসার্স ম্যাডান ভ্রাতৃদ্বয়ের সৌজন্যে আমরা প্রতিবৎসর এই-প্রকার অভিনয়লব্ধ সাহায্য পাইয়া আসিতেছি। আমরা কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীগণকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নিমতায় আন্তর্জ্জাতিক সমবায়-দিবস উৎসব

গত ২রা নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে স্থানীয় কো-অপারেটিভ সমিতি এবং নিমতা সমবায়-মহিলাসমিতির উদ্যোগে অষ্টম আন্তর্জ্জাতিক সমবায়-দিবস উৎসব অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে স্থানীয় সমবায়-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে একটি বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী, প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী এই সভায় যোগদান করেন। সর্ব্বপ্রথমে ঐক্যতান বাদ্য এবং উদ্বোধন-সঙ্গীত হইলে পর শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তীর সভানেত্রীত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। নিমতা এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন। প্রথমে সমবায়-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ সমবায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রচারক মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে সমবায় বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। সভানেত্রী একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ অভিভাষণে সমবায়ের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারকার্য্য

গত ১৪ই নভেম্বর শুক্রবার কুষ্টিয়া মহিলাসমিতির উদ্যোগে কুষ্টিয়া মোহিনী-মিল প্রাঙ্গণে নবনির্ম্মিত মণ্ডপে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্য-লেখা চক্রবর্ত্তী ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন কলিকাতা হইতে গিয়া এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী এই সভায় সভানেত্রীর কার্য্য করেন এবং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে মহিলারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিলে যে তাঁহাদেরই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে সমর্থ হইবেন তাহা নহে পরন্তু তাঁহারা জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পবিষয়ক বহু সমস্যারও সমাধান করিতে পারিবেন। সভানেত্রীর বক্তৃতা শেষ হইলে পর স্থানীয় মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নিভা রায় সমিতির কার্য্যের একটি ক্ষুদ্র বিবরণী পাঠ করেন। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্র-সাহায্যে নারী-প্রগতির আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তৎপর দিন ১৫ই নভেম্বর শনিবার শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুনীতি বসুর সহিত বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। মহিলাসমিতির সভ্যারা একত্রিত হইয়া সমিতির একটি ফটো তোলেন।

সাঁতরাগাছী মহিলা-সমিতি

গত ৫ই আশ্বিন সোমবার সাঁতরাগাছী বালিকাবিদ্যা-লয়-গৃহে স্থানীয় মহিলাগণের উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ

করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ অভিভাষণে শিল্পচর্চ্চা দ্বারা আর্থিক সমস্যার, স্বাস্থ্যজ্ঞানলাভ দ্বারা অকালমৃত্যু ও সংক্রামক ব্যাধিবিস্তার সমস্যার এবং সাধারণ শিক্ষা-লাভ দ্বারা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ-সমস্যার সমাধানে বঙ্গীয় মহিলাসমাজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠে। তিনি মহিলাসমিতির ভিতর দিয়া স্থানীয় মহিলা-গণকে এই সব কার্য্য করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বিভিন্ন মহিলাসমিতির কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবীকে সম্পাদিকা করিয়া এখানে একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৬শে কার্ত্তিক বুধবার সাঁতরাগাছী মহিলাসমিতির উদ্যোগে স্থানীয় বালক-সমিতির গৃহে মহিলাদের একটি সভা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহিলা-সমিতির কার্য্য-চী ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অপর কয়েকটি মহিলা বক্তৃতা করিলে সমিতির কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করা হয়। বালক-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের হলঘরটী এবং একখানি ছোট ঘর এই মহিলাসমিতিকে তাঁহাদের কার্য্য চালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সমিতি কেন্দ্রসমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে।

স্বদেশী ক্রুসে সূতা

সেলাইয়ের জন্য যে সকল ক্রুসের সূতার প্রয়োজন হয় এযাবৎকাল তাহা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া আসি-তেছে। দেশী ভাল সূতা পাওয়া যায় না বলিয়া বাধ্য হইয়া বিলাতী সূতা ব্যবহার করিতে হইত। আমাদের সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত ট্রেডিং কোম্পানী নাম দিয়া ২২নং সুকিয়া লেন, রাধাবাজার, কলিকাতায় স্বদেশী মিলের সূতার প্রস্তুত ক্রুসে সূতা তৈয়ার করিবার কল স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সকল প্রকার সুন্দর সুন্দর রঙীন ও সাদা সূতা প্রস্তুত হইতেছে। হরিদাসবাবু এই সূতার কতকগুলি নমুনা আমাদিগকে প্রদান করিয়া-ছেন। সূতাগুলি ব্যবহার করিয়া আমরা সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি। দেশ-হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই-প্রকার স্বদেশী শিল্পের বহুল প্রচারের জন্য উৎসাহ প্রদান করা উচিত। আমাদের মফঃস্বলের মহিলা-সমিতিগুলির মধ্যে এই সূতা ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করিতেছি।

শিক্ষালয়ে বিশিষ্ট পরিদর্শকগণ

গত ৪ঠা নভেম্বর সুপ্রসিদ্ধ মেসার্স এণ্ডারসন রাইট কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মিস্ এলিজাবেথ রাইট এবং মিঃ ওয়ালসিয়ার সরোজনলিনী নারীশিক্ষালয় পরিদর্শন করেন। মিস্ রাইট পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন—"অদ্য সর্ব্বপ্রথম এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিলাম এবং যে সুন্দর কার্য্য হইতেছে তাহা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। মহিলাগণকে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়া বেশ খুসী এবং সন্তুষ্ট বোধ হইল। এই কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আমি বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব এবং ভবিষ্যতে শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণের প্রস্তুত দ্রব্যাদি মধ্যে মধ্যে ক্রয় করিবার বাসনা রহিল। আমি এই প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সাফল্য কামনা করি।"

পরিহাস

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

(ক)

আফিস কামাই করিয়া সুরেশ বাসায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। মা ও ছোট ভাই ভবেশের আজ চার পাঁচ দিন জ্বর। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত্রে রাত জাগিয়া গ্রহণের স্নান করিতে যাইয়াই এই কাণ্ডটা তাহারা বাধাইয়াছে। আর কেহ তেমন নাই যে তাহাকে ইহাদের দেখা-শোনার ভার দিয়া সুরেশ আফিসে যায়। উপরের ভাড়াটিয়া মহিম বাবুর স্ত্রী সর্ব্বদা দেখা শোনা করিতে পারেন না—আর তার উপর সুরেশরা এ বাসায় নূতন আসিয়াছে, ভাল করিয়া পরিচয় এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই।

সুরেশ অল্পবেতনে মাড়োয়ারী আফিসে কাজ করে। বয়স আটাইশ এই রকম হইবে। এখনও বিবাহ করে নাই। মা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া হয়রান হইয়াছেন; কিন্তু সুরেশের এক কথা—"আর না বাড়লে বিয়ে কর্ব্ব না।" কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল—সুরেশ তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করিত না

বছর তিন আগের কথা। এক রবিবারে আহারাদির পর সুরেশের মা বিছানায় একটু গা গড়াইয়া দুপুর-শেষে বিছানা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। সুরেশ ঘরের মধ্যে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণ পর দুয়ারে কাহাদের যেন কথা শোনা গেল। সুরেশ চাহিয়া দেখিল, দুই তিন জন অপরিচিত মেয়েমানুষ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটিকে সে চিনিল—একটি তের চোদ্দ বৎসরের মেয়ে। তাহাদের ঐ সামনের গলি দিয়া যাতায়াত করিতে সে ইতিমধ্যে বারকয়েক মেয়েটিকে দেখিয়াছে। বাড়ীটাও চিনে। সুরেশ আশ্চর্য্য বোধ করিল। কিন্তু একটু পরেই কারণ জানিতে পারিল।

এ বাড়ীতে গোটা দুই ঘর খালি ছিল—ভাড়া দেওয়া হইবে। দুপুরবেলার অবসরে, কাছেই মনে করিয়া মেয়েরাই দেখিতে আসিয়াছে। মাকে ডাকিয়া তাহারা ঘরদুটি দেখিতে লাগিল। দেখাইয়া শোনাইয়া দিতে দিতে মা মেয়েদের মধ্যে যিনি বয়স্কা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ মেয়েটি কি আপনার মেয়ে মা?"

হঠাৎ জবাব শোনা গেল—"কেন, নেবেন না কি?"

জবাব শুনিয়া সুরেশ 'থ' খাইয়া গেল; এইটুকুর মধ্যে মেয়েরা এমন করিয়া বলিতে পারে!

মা বলিলেন, "ছেলে ঘরেই আছে, দেখ্‌তে পারেন।"

ফিরিয়া যাইবার সময় বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে সুরেশকে তাহারা আড় চোখে একটু দেখিয়াও গেল যেন।

তাহারা চলিয়া গেলে এবিষয়ে মায়ের সঙ্গে সুরেশের কোন কথাই হইল না। মা ছেলেকে জানিতেন। কিন্তু সুরেশ আশ্চর্য্য হইল এই মেয়ে-জাতটার উপর,—কি হালকা-প্রকৃতির ইহারা।

বিকালবেলায় বারান্দায় বসিয়া সুরেশ উনুন ধরাইতেছিল, সেই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া আবার কে এক বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত। আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া সুরেশ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। এইরূপ নিতান্ত ছেলেমানুষি—ধরণ-ধারণ তাহার ভাল লাগিল না।

মা বাহির হইয়া আসিলেন।

বৃদ্ধা মাকে দেখিয়া বলিলেন, "ঘরটা আমিও একবার দেখে যাব, ওদের কথায় বিশ্বাস কি।" বলিয়া তিনি ঘরে ঢুকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন, মা সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। বৃদ্ধার ঘর পছন্দ হইল না। ছেলে বউয়ের না হয় হইল, কিন্তু পায়খানার ঐ অত কাছে তিনি বিধবা মানুষ কিছুতেই রান্না করিতে পারিবেন না। অসুবিধার জন্যই উঠিয়া আসা, সেই অসুবিধাই যদি রহিয়া গেল—

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কি আপনার নাত্‌নি মা?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "না, আমরা এদের ঘরের ভাড়াটিয়া—"

উহারা চাহিয়া গেল। সুরেশের বিবাহের জন্য মা যে ভিতরে ভিতরে কতখানি পাগল হইয়াছেন সেই কথাটা বুঝিতে পারিয়া সুরেশের বড়ই দুঃখ হইল।

(খ)

কয়েক দিন চলিয়া গিয়াছে। কথাটা কিছুই নয়, তবুও সুরেশ ভাবিয়া দেখিয়াছে,—ঐ যে কথাটি উহারা সেদিন বলিয়া গিয়াছিল, উহা নিতান্তই পরিহাসচ্ছলে; তা না হইলে ইহার মধ্যে খোঁজ-খবর একটা কিছু করিতই।

চলিতে ফিরিতে মাঝে মাঝে সুরেশ মেয়েটিকে দেখে—খুব সামনাসামনি নয়, একটু দূর হইতেই। সেদিনকার কথাটা তাহার মনে পড়ে, একটু ইতস্ততঃ বোধ হয়। ওর হয়ত সে কথা মনে থাকিতে পারে!

লাইব্রেরী হইতে সুরেশ বই লইয়া ফিরিতেছিল—দেখে, সেই মেয়েটি তাহাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। একেবারে কাছ দিয়া যাইতে হয়। একটু কেমন যেন লাগিতে লাগিল। কিন্তু কাছে আসিয়া সুরেশ একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল তাহাকে দেখিয়া মেয়েটি দৃষ্টি অবনত করিয়াছে। এইরূপ সহসা অপ্রতিভ লজ্জিত ভাব দেখিয়া সুরেশ বুঝিতে পারিল, সেদিনকার কথাটা তাহা হইলে মনে আছে। সুরেশ তাহাদের বাসার সদর দরজায় ঢুকিতে আর একবার মুখ ফিরাইয়া ওদিক পানে চাহিল—দেখিল, মেয়েটি তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

(গ)

একটা ধাক্কা সুরেশের মনে লাগিল। সুরেশ তাহাকে আমল দিতে চাহিল না। কিন্তু ধাক্কা যত ক্ষুদ্রই হোক তাহার একটা কিছুতে আঘাত করিবার ক্ষমতা আছে এবং ক্ষতি সে কিছু করেই।

দিন চলিতে লাগিল। সুরেশ খায় দায় আফিসে যায়, আবার টিউশনিও করে। একদিন সে আবিষ্কার করিল—মেয়েটি মন্দ নয়। চোখোচোখি হইলে সেই অপ্রতিভ হইয়া মাথা নীচু করিয়া ফেলা, আঁচলের খুঁট হইতে সহসা কি একটা বাছিতে যাওয়া বেশ লাগে। একটা অস্পষ্ট বেদনার আঁচও যেন সে মুখের উপরে দেখিতে পায়। ক্ষুদ্র ধাক্কাটা আর একটু নাড়া চাড়া দিয়া বসে।

ঐ বাড়ীটার পাশেই আর একটা বাড়ী। পাড়ার ছেলেরা মিলিয়া সেখানে একটা সান্ধ্য-সমিতি বা ক্লাব মতন করিয়াছে। কয়েক দিন হইল সেখানে থিয়েটারের রিহার্সাল চলিয়াছে। একদিন মহিমবাবুর ছেলে দেবেন সুরেশকে একরূপ জোর করিয়াই তাহাদের ক্লাবে ধরিয়া লইয়া গেল। সবাই সুরেশকে পার্ট লইবার জন্য অনেক খোসামোদ করিতে লাগিল, সুরেশ কিছুতেই স্বীকার করিল না। আফিস ও কাজের নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইয়া চলিয়া আসিল। দেবেন অত্যন্ত বিরক্ত হইল।

সুরেশ বেশী লোকের সঙ্গ ভালবাসিত না। তাই আজ পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধব তাহার খুব কম। সন্ধ্যাবেলায় কোন কোন দিন সুরেশ বাড়ীর রকে আসিয়া বসে। একটু বসিয়া খানিকক্ষণ পরেই উঠিয়া চলিয়া যায়—টিউশনির তাগিদ আছে।

যে সব মানুষ বাহিরে কিছু প্রকাশ করে না, বাহির হইতে বেশ শক্ত মনে হয়,—ভিতরে ভিতরে হয়ত তাহারা অনেকেই দুর্ব্বল। পঁচিশ বৎসর পার হইয়া যায়, আজ পর্য্যন্ত সুরেশের দুর্ব্বলতা-দোষ কেউ দিতে পারে নাই। এমন কি মা পর্য্যন্ত পুত্রের এইরূপ রস-কস-শূন্য ভাব দেখিয়া অধুনা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আপনার মধ্যে আর দশ জনের চাইতে কম তাহার কিছুই ছিল না—ছিল না শুধু তাহার প্রকাশের ইচ্ছা। সে যেন আপনার মধ্যে আলো-ছায়ার খেলাটা একেবারে নিজেই সবটুকু অনুভব করিতে চাহিত।

মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এই শান্ত বিনম্র ভাব, সহসা সচকিত নমিত দৃষ্টি কি যে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করে!

ক্রমশঃই তাহার টিউশনিতে যাইতে দেরী হইতে লাগিল।

(ঘ)

দেবেনের ছোট বোন রুণু পাড়া বেড়াইতে ওস্তাদ। বয়স তাহার নয় কি দশ। কিন্তু বয়সের মাপকাঠি ডিঙাইয়া ইতিমধ্যেই সে গিন্নি সাজিয়াছে।

সেদিন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সুরেশকে একলাটি পাইয়া রুণু চুপিচুপি বলিল, "তোমার কথা ও-বাড়ীর নীলি দি' জিজ্ঞেস কর্চ্ছিল আমায়। বল্লে, কাউকে

বলিস্‌নে যেন। কি তোমার নাম, কি চাক্‌রী কর, কোথায় তোমাদের দেশ—এই সব। আমি বল্লুম, অত সব জানি না বাপু। আমি শুধু নামটা বলে' দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ সুরেশ দা', তোমার নাম কি সুরেশচন্দ্র রায় নয়?" কোন মতে সুরেশ বলিল—"হ্যাঁ।" রুণু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "বুঝতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে নীলি দি'র বিয়ে হবে বুঝি?"

রুণু চলিয়া গেল। সুরেশের সারাদেহের রক্তস্রোত বিপুল বেগে নাচিয়া উঠিল; একটি অপরিচিতা সুন্দরী তরুণী তাহার কথা জানিতে চায়, ইহার সুস্পষ্ট অর্থ বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। কিন্তু কি মনে পড়িয়া সহসা সুরেশের পুলকোজ্জল মুখখানি নিঃসহায় বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কি একটা যেন বিপুল শান্তির অন্বেষণ করিয়া—শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সামনের একটা নারিকেল বৃক্ষের পাতার নড়াচড়া দেখিতে লাগিল।

থিয়েটারে রিহার্সাল দিতে যেসব ছেলেরা আসে, তাহাদের মধ্যে দুই চারিজনের দৃষ্টি যে ঐ মেয়েটিরই উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, সুরেশ তাহা দেখিতে পায়—তাহার রাগ হয়। কিন্তু সহসা মেয়েটি যখন তাহাদের ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে রুষ্টমুখে চলিয়া যায়, একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া যেন সে বাঁচে।

দিন এমনি করিয়াই যাইতেছিল; একদিন পরিসমাপ্তি ঘটিল। অঘ্রাণ মাসের মাঝামাঝি একদিন ওবাড়ীতে বড় ধুমধাম পড়িয়া গেল। মিস্ত্রি আসিয়া সারা বাড়ীটা ইলেট্রিক লাইটে সাজাইয়া দিয়া গেল; লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, গয়লায়, ময়রায়, দাসদাসীতে ওদিকটা সরগরম হইয়া উঠিল। সুরেশ রুণুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এত ধুমধাম কিসের রে ওবাড়ীতে রুণু?"

রুণু উচ্চহাস্য করিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেল—"জানো-না বুঝি, নীলি দি'র যে বিয়ে!"

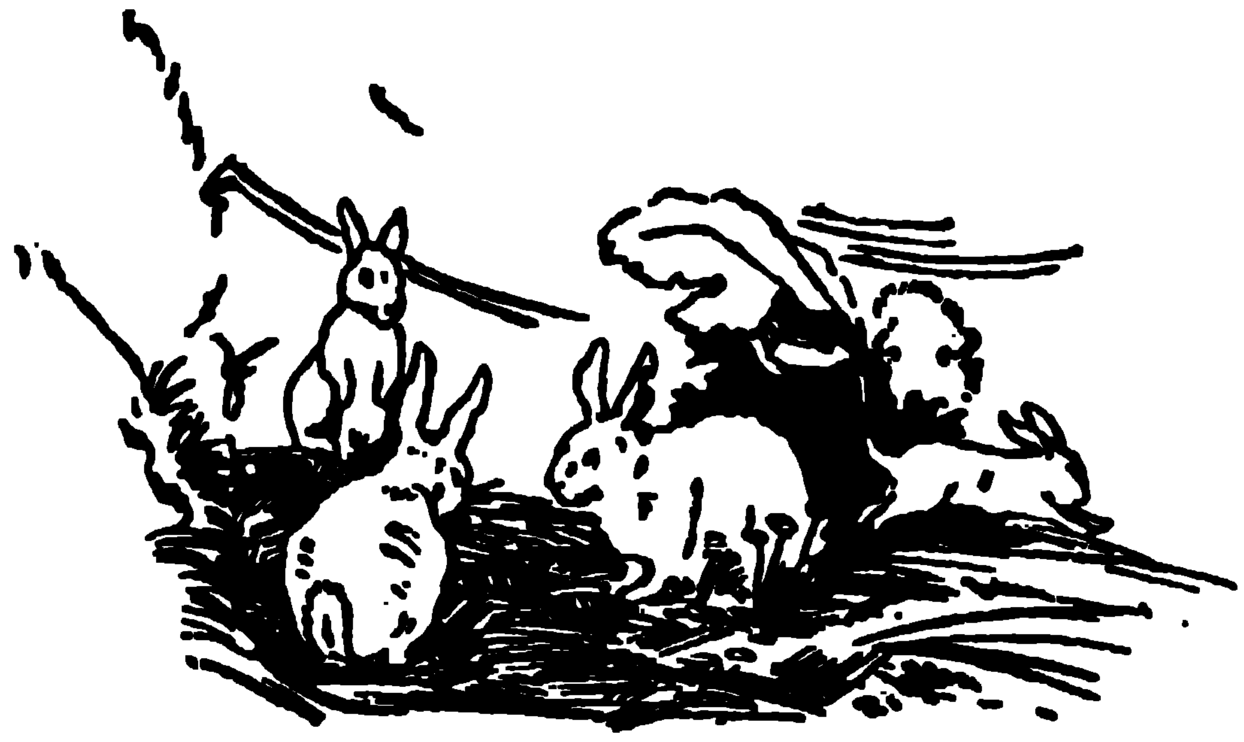

বিরহিণী প্রকৃতি

শ্রী প্রকৃতি সিংহ

শ্যামলা মেয়ে   করুণ চেয়ে
কাজল-চোখে কি তুই চাস্ ?
ছড়ায়—ছিঁড়ে'   খোঁপার 'গোড়ে',
চুলের সাথে ফুলের রাশ !
দাঁড়াস্ কেন আমার দ্বারে,
কাঙাল যে, সে কী-দেয় কা'রে !
নয়নভরা ব্যথার বারি,—
উদাসিনি, তা'ই কি চা'স্ ?

"সেদিন সাঁঝে আমার কবি
হারিয়ে গেছে কোথায় হায়,—
এ পথ দিয়ে যায়নি ত' সে ?—
বিরহিণী তারেই চায়।
ভুঁইচাঁপা ফুল ঐ যে ভুঁয়ে—
ফুট্‌ল কি তার চরণ ছুঁয়ে ?
মুখ যে ফিরাও ?—কিসের দুখে
তুমিও ফেল দীর্ঘশ্বাস !"

মুখে গোলাপী আভা
অটুট রাখিতে
ও
প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে
চিরপ্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত

"হিমানী স্নো"
অনেক অনুকরণেও যথার্থ ই
অনমুকরণীয়

"হিমানী স্নো"
—বঙ্গলক্ষ্মীদের প্রসাধনের নিত্য সহচর—

প্রসাধন দ্রব্যের সম্পূর্ণ তালিকার
জন্য পত্র লিখুন

উৎকৃষ্ট সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতকারক—
হিমানী ওয়ার্কস
৫৯ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
৪৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street, Calcutta
and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

মায়ের আদর

ছাওয়াল আমার দুধের ছাওয়াল
আয় কোলে আয় নেচে,—
ছাগলী-দোয়া দুধ খাওয়াব
যেটুক আছে বেঁচে।

শিল্পী—শ্রীঅণুকণা গুপ্ত

C. H. ARAN & CO.

// বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৭ [২য় সংখ্যা

পৃথিবীর ডাক

জন্ম

পৃথিবী কেন যে তৈরী হয়েছে কেউ তা বলতে পারে না। তবে মানুষ ভাবতে গিয়ে ভেবে নিয়েছে পৃথিবী যেন মানুষের জন্য গড়া। এমনতরটি ভাববার তার কারণও আছে। যুগ-যুগান্তর চ'লে গেছে—পৃথিবী সৃষ্টি হ'য়ে কত রকমের জীবজন্তু, পশু-প্রাণী, কত রকমের গাছপালা, ওষধি-বনস্পতি কোলে নিয়ে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়েছে—কেউ তাদের দেখেনি, চেনেনি,—কেউ তা'দি'কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেনি।

কত মহাসাগরের জল কত দিন কত রাত পৃথিবীর বুকে এসে আছ্‌ড়ে প'ড়ে আবার ফিরে চ'লে গেছে কেউ তার খবরও বলতে পারে না, কেউ তা শুনে'ও শেষ করতে পারে না। তারা শুধু এসেছে আর গেছে—শুধু আয়োজনটুকু ক'রে রেখে গেছে—পৃথিবীর নির্ব্বাক মুখে তারা কথা ফোটাতে পারেনি—তার চাপা বুকে কত কি চেপে আছে কেউ তারা তা খুলে দেখাতে পারেনি। তাই কত কাল কত যুগ পর্য্যন্ত, পরিণত হ'য়েও, পৃথিবী নিজের কথা নিজে শুনতে পায়নি, নিজের ভাষা নিজে বুঝতে পারেনি, সে শুধু তার বুকে মানুষ আসেনি ব'লে।

পরিণতি

মানুষকে পৃথিবীতে আনবার জন্য পৃথিবী কত সাধনা, কত তপস্যাই না করেছে। বুকের চাপা আওয়াজে সে কতদিন কতবারই না ডেকেছে—

আয় রে মানুষ আয়,—
আমার বুকে অবাধ হাওয়া
অমনি ব'য়ে যায়
কে বা তারে চায়?
কার বুকে সে তুফান তুলে
আনন্দ জাগায়?
তুই না এলে হায়!
রাতে দিনে অবাধ হাওয়া
অমনি ব'য়ে যায়।

তপস্যার আগুনে তপ্ত হ'য়ে নিজের অস্পষ্ট ভাষায় কতবারই না সে গুমরে ব'লে উঠেছে—

জাগছে আমার বুকে জ্ঞানের
অথৈ পারাবার,
আয় চ'লে আয় আয় রে মানুষ
করবি ব্যবহার।

কতবার কত রকমে নিজের আবেদন জানিয়ে বলেছে—

যা আছে সব নিয়ে,
অঙ্গ আমার সাজিয়ে দে তোর
হাতের তুলি দিয়ে।

কাতর হ'য়ে নিবেদন করেছে—

তোদের চিহ্নটুক,
রাখব আমি বুকে ধ'রে
যুগের 'পরে যুগ।
আসবে আবার নূতন মানুষ
দেখবে তারা চেয়ে
তোদের চেনায় আমার বুকের
পথ রয়েছে ছেয়ে।
জাগবে কুতূহল,
খুঁজবে জ্ঞানের অতলখনি
আনন্দে বিহ্বল।

ডাক

ফিরে ফিরে ডাকে—

আয়রে মানুষ আয় আনন্দে
জাগিয়ে চারিধার,—
আমার বুকের অথৈ জ্ঞানের
নে তুই সমাচার।

কত দিনের কত সাধনা, কত তপস্যার ফলে পৃথিবী মানুষকে পেয়েছে—কত চেষ্টায়, কত যত্নে তাকে মূর্ত্তি দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে—কে তা জানবে? পৃথিবীর কাছে একটি মানুষ-মূর্ত্তির দাম যে কত বেশী তা কেউ জানে না। তার

তপস্যার বিরাম নাই, সাধনার অন্ত নাই। আরও নূতন জ্ঞানে, নূতন ভাবে, নূতন আকারে মানুষকে ফুটিয়ে তোলার জন্য আজও পৃথিবী আয়োজন ক'রেই চলেছে দিবারাত্রি—মানুষকে পেয়ে সে এখন খোলা আওয়াজে বল্‌তে সুরু করেছে—

মানুষের আগমন

মানুষ আমার বুকের মানুষ
আমার বুকের জয়,—
আমি তোর ত্যাগের বস্তু নয় ;
অসার জেনে মিথ্যা মোরে
করিসনে কেউ ভয়,—
মনে রাখিসনে সংশয় ;
সব সাধনার সিদ্ধিতে মোর
তোরি হবে জয়,
সত্য সুনিশ্চয়।
মোর আনন্দে জন্ম তোদের,
মোর আনন্দে লয়,
আমার বুকে তুই রে মানুষ
আনন্দ অক্ষয়,
অলঙ্ঘ্য প্রত্যয়।

শত যুগের মন্থনে এই
অমৃত সঞ্চয়,
জয় মানুষের জয় !
মানুষ এসে আমার বুকে
নিত্য নূতন হয়,—
পৃথিবী হয় আনন্দময় !

মানুষ এসে পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। কথা না ক'য়ে পৃথিবী কত কথাই মানুষকে শিখিয়েছে। পৃথিবীর বুকের ভাষাই আজ মানুষের মুখে ফুটে উঠেছে নানাদিক থেকে নানা আকারে। মানুষ নূতন ক'রে বল্‌তে শিখেছে—

মানুষের ভাষা

এই পৃথিবীর মানুষ মোরা
অন্য কিছু নয়,—
সকল যুগের সব মানুষের
সত্য পরিচয়
মোরা অন্য কিছু নয়।
প্রথম যুগে হলেম যবে
তোমাতে উদয়,
জন্মমৃত্যু সবই ছিল
তোমাতে আশ্রয় ;

শত যুগের শেষে সেটি
তেমনিতর রয়—
ঘটে না ব্যত্যয়।
তোমায় ছেড়ে হে পৃথিবী
আমরা কিছু নয়,—
সকল কথার শেষ-কথা এই
সত্য পরিচয়।

সাফল্য

পৃথিবীর অন্তর্নিহিত অজেয় শক্তির পরিচয় মানুষ পেয়েছে, তার মৃণ্ময় মূর্ত্তির অন্তরালে অধিষ্ঠিত চিন্ময়রূপের দর্শন মানুষের মিলেছে, আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে সকল মানুষ তাই এখন বল্‌তে সুরু করেছে—আমরা পৃথিবীর মানুষ,—পৃথিবীর জন্য কাজ করব আমরা সবাই মিলে,—নিজেদের ছোট শক্তির সবটুকু দিয়ে পৃথিবীকে বড় ক'রে দিয়ে যাব যে যতটা পারি। মানুষের আনন্দ তাতেই অব্যাহত। মানুষের মুক্ত ভাষার আজ স্পষ্ট কথা—

মানুষের কাজ

হে পৃথিবী হে পৃথিবী
হে চিরবিস্ময়!
তোমার কাজে জীবন মোদের
করব মোরা ক্ষয়।
হৃদয় সাথে হৃদয় করি'
নিত্য বিনিময়,
হব অভিন্নহৃদয়।
তোমার বুকে রত্নমাণিক
যা আছে সঞ্চয়,
মোদের বুকে সফল হ'য়ে
উঠুক সমুদয়—
মানুষ জাগুক জগৎময়,
সব মানুষের বুকে বাজুক
জয় পৃথিবীর জয়—
পৃথিবী হোক্ আনন্দময়!

বাঙালীর কন্যাশিক্ষা

শ্রী বলাই দেবশর্ম্মা

জীব ও জড়-জগৎ একই নিয়মে পরিচালিত। প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র সংজ্ঞা আছে, প্রত্যেকেরই একটা বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতাকে অবলম্বন করিয়াই জড় এবং জীব অভিব্যক্ত হইতেছে, পরিণত হইতেছে, তাহার আত্মসত্তার সার্থকতা লাভ করিতেছে। এইজন্যই ভাগবত-নির্দ্দেশ :—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ। যে যাহা, যাহার স্বপ্রকৃতি যেমন, সে ঠিক তেমনটি হইয়াই সৃষ্টির মধ্যে সত্য ও সফল। লতা অটবী না হইয়াও তাহার লতিকাত্বেই পরিপূর্ণ। আবার এই নীতি কেবল একত্বেই পর্য্যবসিত নহে,—সংহতিতেও পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

বাঙালীর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ও আছে। তাহার স্বভাবচরিত্র, তাহার অন্তঃ-প্রকৃতি একটি বিশেষ সাধনায় ও শক্তিতে গঠিত হইয়াছে। এই গঠন নিমেষের নহে। ইহার মাঝে আকস্মিক কিছু নাই। বহুযুগ-পরম্পরায় ইহার উদ্ভব এবং বিকাশ। এবং উহাই তাহার বাঁচিবার ও অভ্যুদিত হইবার একান্ত আশ্রয়। বিগতকে বাদ দিয়া আগত ও অনাগতের আবির্ভাব অসম্ভব। কেবল আবির্ভাব নয়, রক্ষা পাওয়াও দুষ্কর। এইজন্য ভগবানের সাবধান-বাণী :— স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ।

বাঙালী—বাঙালীই। তাহার বাঙালিয়ানার বিলোপে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। বহুযুগের উত্তরাধিকারসূত্রে বাঙালী জাতি তাহার প্রাক্‌পুরুষের নিকট হইতে যে স্বভাব ও সংস্কার পাইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বাঙালীর জীবনসাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। অন্য কিছু নহে,—অন্য কিছুতেই হইবে না।

নারী ও পুরুষ লইয়া একটি জাতি সম্পূর্ণ। ইহার কোন একটিকে উপেক্ষা করা চলে না। সমাজের পক্ষে নারী ও নরকে সম্পূর্ণরূপেই আবশ্যক। কেহ অবহেলিত, কেহ সুসেবিত হইলে চলিবে না।

বাঙলায় বিদ্যা ছিল এবং বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থাও ছিল। আর এই বিদ্যা ও তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবল পুরুষেরই ছিল না, তাহার নারীজাতিরও ছিল। তবে যাহা ছিল, তাহা অন্য কাহারও মত ছিল না। বাঙালীর মতই ছিল—বাঙালীর স্বভাব ও শক্তির অনুকূলই ছিল।

শিক্ষা কেবল জানা নহে, কতকগুলি বিষয় অবগত হওয়াও নহে। শিক্ষা-ব্যাপারে সেইজন্যই সার্ব্বভৌমিকতা থাকিতে পারে না। অবশ্য শিক্ষা-ব্যাপারে একটা সামঞ্জস্য আছে, তাহা কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে মাত্র। কেবল জানা কিন্তু শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নহে। চরিত্রকে, মানবের স্বপ্রকৃতিকে ফুটাইয়া তোলা,—স্বরূপটিকে—সে সত্য করিয়া যাহা, তাহাকে সেই রূপে সার্থক করাই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। প্রভেদ এই কারণেই, এই জন্যই শিক্ষা-ব্যাপারে পার্থক্য। প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক ও চরিত্রগত শিক্ষায় তাহার সনাতন স্বভাব-ধর্ম্মের আনুগত্যই আবশ্যক।

বাঙালী একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন ছিল। সর্ব্ব-বিষয়েই তাহার স্বপ্রতিষ্ঠা ছিল। ইতিহাস তাহার বিরাট সাক্ষী। তখন বাঙালীর শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, স্বাধীনতা ও শক্তি সবই বর্ত্তমান ছিল। স্ত্রীশিক্ষা এবং কন্যা-শিক্ষাও ছিল। একটা বৃহৎ জাতির যাহা থাকিতে পারে, তাহা সবই পর্য্যাপ্তরূপেই ছিল।

বিগতদিনের বাঙালীর কন্যাশিক্ষা কেমন ছিল, তাহার পরিচয় কোন পুঁথিপত্রে না থাকিলেও তাহার গার্হস্থ্য জীবনের স্তরে স্তরে উহা স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। আর সেই চিহ্নকে অবলম্বন করিয়াই বাঙালীর কন্যা ও স্ত্রীশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাঙালীর কথা কহিতে হইলে ভারতের কথা—ভারতের সনাতন সভ্যতার কথা কিছু বলিতে হইবে। তবেই বাঙালীর কন্যাশিক্ষার তথ্যটি ভাল করিয়া চেনা যাইবে।

ভারতীয় সভ্যতার গতি অন্তর্মুখীন; উহা বাহিরকে কতকটা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল। এবং মানব-অন্তরে যে দৈবী ভাবগুলি, তাহার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া সেই বৃত্তি-গুলির উন্মেষের জন্য শুশ্রূষু হইয়াছিল। সেই কারণেই ভারতের আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা-সভ্যতা কতকটা যেন সংহত ও স্বাভাবিক। উহা যেন ঘরকরণা, সমাজ-গোষ্ঠী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই পরিচালিত হয়। বহির্বিষয়ে জ্ঞান যত বাড়ুক বা না বাড়ুক, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির সর্ব্বোচ্চ অনুশীলন হউক বা না হউক, বুদ্ধি ও মনীষার চর্চ্চা হউক বা না হউক, তাহাতে তত আসিয়া যায় না; অন্তরটির কিন্তু পরিপূর্ণ বিকাশ চাই। মানবতার মহীয়ান বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা একান্তই আবশ্যক। *

বাঙলারও এই একই ধারা, একই লক্ষ্য। বাঙলা তাহার মানুষকে মানুষের মত করিয়াই গড়িতে চাহিয়া-ছিল। তাহাকে পিতামাতা, কন্যা-ভগিনী করিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল,—সমাজ-সংহতির উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিল। এবং যাহা মানবতার পরম আদর্শ তাহাতেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

আধুনিক প্রথামত আগেকার বাঙলায় ঠিক বালিকা-বিদ্যালয় ছিল কিনা জানা যায় না। পুঁথিপত্র লইয়া, গাড়ী চড়িয়া, দশটা-চারিটা একটা নিতান্ত কৃত্রিম আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া লেখাপড়া শিখিবার কোন ব্যবস্থা থাকিলে আজ তাহার একটা অবশেষ-চিহ্ন থাকিত। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে শিক্ষা পাইত; তাহার গোষ্ঠী-পরিবারের, সমাজ-সংসারের উপযুক্তা হইয়াই গঠিতা হইত। কেমন করিয়া হইত তাহারই একটু পরিচয় লইব।

বৈশাখের বিশোভিত উষা। কাননে কুঞ্জে মল্লিকা-মালতী, চম্পক-বকুলের সমারোহ—শাখায় শাখায় দোয়েল শ্যামা পাপিয়া কোয়েলার কুহরণ। প্রাচী-র বক্ষে কনক-দীপ্তি। এই সৌন্দর্য্য-স্নাত পবিত্র মুহূর্ত্তে পাঁচ বছরের মেয়েটি মায়ের বাহুপাশ ও ঘুমের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া কহিল—"যাই মা।" বালিকা তাহার ব্রতের জন্য ফুল তুলিতে ব্যস্ত হইয়া বিছানা ছাড়িল। আজ তাহার "পুণ্যি-পুকুর ব্রত।"

মেয়ে উঠিয়া মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া ফুল তুলিতে চলিল। এত ভোরে, এত তাড়াতাড়ি এই কচি মেয়ের উঠিবার কারণ কি? তাহাকে যে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে! ব্রতের জন্য, দেবতা-আরাধনার জন্য মেয়ের প্রাতরুত্থান শিক্ষা হইল। আর তাহার কচি মন সৌন্দর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর শিক্ষা পাইল ঘুমাইতে নাই, কাজ করিতে হয়। এই কাজ কেবল নিজের কাজ নহে; ইহা কাজের সহিত সেবা, সেবার সহিত পুণ্যবত্তা। সহজে, স্বাভাবিকভাবে জীবনের একটা মহৎ শিক্ষার বীজ উপ্ত হইল। ইহাই বাঙালীর কন্যা-শিক্ষার প্রাথমিক অনুষ্ঠান।

ইহার পর ব্রতানুষ্ঠান। পূজা কোন সিদ্ধমন্ত্রে নহে, সংস্কৃতেও নহে। যে ভাষায় সে হাসে কাঁদে, ক্ষুধায় খাবার চায়, ভাইবোনকে আদর করে, খেলায় উল্লাস প্রকাশ করে, সেই একান্ত সহজ ভাষা। বালিকা মন্ত্র পড়িতেছে:—

"পুণ্যি পুকুর—পুষ্পমালা—
কে পূজে রে সকালবেলা;
আমি সতী পুণ্যবতী—"ইত্যাদি।

ইহার পর "রামের মত স্বামী পাব,
লক্ষ্মণের মত দেওর পাব।"

ইহা নারীজীবনের সহজ ও শ্রেষ্ঠ তৃষ্ণা। কোন গরিষ্ঠ আদর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ না হইলেও স্ত্রীজাতি বীর, ঐশ্বর্য্য-শালী, রূপবান্ ভর্ত্তারই কামনা করেন। কিন্তু বাংলার মেয়ে রামের মত স্বামীর আদর্শ পোষণ করিয়া দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করিতে শিখিল। শ্রীরামচন্দ্র—যিনি মর্ত্ত্যে সাকার ভগবান, পুণ্য এবং পবিত্রতার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি, যিনি পিতৃভক্তি, সত্যব্রতের পরিপূর্ণ আদর্শ, সেই নর-দেবতাই বাঙলার কিশোরী কুমারীর অভীষ্ট দেবতা। ঐশ্বর্য্য, বিলাস, রক্তমাংসের সৌষ্ঠব নহে—বঙ্গকুমারী চাহিতেছে ভাবগত-

---

* বহির্বিষয়ক জ্ঞানেও প্রাচীন ভারত অত্যুন্নত ছিল—ভারতীয় দর্শনসমূহ তার সাক্ষী। এবং ইহারই সোপান বাহিয়া একদা আত্মার অমৃতত্বে উপনীত হইয়াছিল সে। তবে বাহিরকেই একান্তভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া ছিল না যে, ইহাও সত্য।

বঃ সঃ।

সান্নিধ্য। তাহার পরই 'লক্ষ্মণের মত দেবর'। ইহাতে তাহার ক্ষুদ্র কামনাকে আরও একটু বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামী প্রিয় ও পূজ্য। কিন্তু কেবল স্বামী লইয়া একটি সংকীর্ণ সংসারের গণ্ডী নহে, স্বামীর প্রিয় ও প্রেয়কেও—তাঁহার সর্ব্বস্বকেও চাই।

বালিকা মন্ত্রপাঠ করিতেছে :—

"সীতার মত সতী হব
কুন্তীর মত বাড়ুনী হব
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব—"

কামনার বিশুদ্ধির পরই নারীত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা। কেবল স্বামী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব হইলেই হইবে না, উপযুক্ত পত্নী হওয়াও প্রয়োজন। তাই বালিকা মন্ত্র পড়িতেছে—সীতার মত সতী হব। সীতার মত সতী, এমন স্বামী-প্রাণা, এমন শুচি-শোভনা, স্বামীর জন্য উৎসর্গীকৃতা নারী আর কোথায়? তাহার পর কুন্তীর বড় বাড়ুনী হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব। রন্ধনের মধ্য দিয়া নারীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি নহে, তৃপ্তির সহিত ক্ষুন্নিবৃত্তিই স্বাস্থ্য ও মনের অনুকূল। যে খাদ্যে পরিতোষ পাওয়া যায় তাহা শুধু খাদ্যবস্তুর গুণে নহে, রাঁধিবার কৃতিত্বে। এই কৃতিত্ব রন্ধননিপুণতা নহে—স্নেহশীলতা। প্রীতি ও মমতাই খাদ্যদ্রব্যকে অমৃত-স্বাদু করে। সেইজন্যই আকাঙ্ক্ষার নিবেদন—'দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।'

ব্রত করিতে করিতে বালিকা যে মন্ত্র প্রত্যহ আবৃত্তি করে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় তাহারই অমৃতময়ী কাহিনীগুলি শুনিয়া শুনিয়া সীতা, দ্রৌপদী, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির ইতিহাস শিক্ষা করে—জাতীয় অবদানের সহিত সুপরিচিত হয়। কোন রূপকথার গল্পে শেখা নয়, ঐতিহাসিক কাহিনী জানা নয়; বালিকা যে আদর্শ অবগত হইল, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার কতক কতক পরিচয়ও পাইতে লাগিল। মা, ঠাকু'মা, খুড়ি, জ্যেঠির অক্লান্ত গৃহকর্ম্ম দেখিয়া, তাঁহাদের স্নেহ-মমতা, সেবা-শুশ্রূষা লক্ষ্য করিয়া, আদর্শকে নিত্যকার জীবন-ব্যাপারে অনুসরণ করিয়া বালিকার মঙ্গলময়ী নারী-চরিত্র সহজভাবে গঠিত হইতে লাগিল।

ইহার পর এই আদর্শকে অনুশীলনের দ্বারা সার্থক করিয়া তুলিতে, আত্মীয়স্বজন বালিকাকে একটু একটু করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকার দিলেন। মা তাহাকে পূজার আয়োজন করিতে বলিলেন, কখন কুট্‌না কুটিয়া দিতে আদেশ করিলেন, কখনও বা ভাইবোনদিগকে স্নানাহার করাইতে অথবা বাপ-দাদার কাছে বসিয়া ভোজনের সময় তাঁহাদের হাওয়া করিতে, ক্রমশঃ দুই একটা রাঁধিতেও বলিলেন। এইরূপে তাহার বালিকা-জীবন নারীত্বের সর্ব্বোচ্চস্তরে দীক্ষিতা হইতে লাগিল। সে কন্যা, পত্নী ও মাতৃত্বের মহনীয় শিক্ষালাভ করিতে লাগিল।

বাঙালীর জাতীয় আদর্শ—সে তাহার নারী-জাতিকে কন্যা, ভগ্নী এবং জননী রূপেই পাইতে চায়। বাঙালী বোঝে নারীর কাছে তাহার একমাত্র প্রাপ্য—স্নেহ ও মমতা। সেই জন্য তাহার কন্যাশিক্ষার এই প্রকার রীতি-নীতি। আর একটি কথা বলিয়া রাখি—বাঙালীর মাতা, ভগ্নী, কন্যা এই গৃহমুখী শিক্ষার ফলে শুধু হাতাখুন্তি লইয়াই জীবন কাটান নাই, তাঁহাদের সেবাস্নিগ্ধ হস্তে করাল কৃপাণও ঝলসিত হইয়াছে। বাঙালীর ইতিহাসে সেই শক্তির অবদান-পরম্পরা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

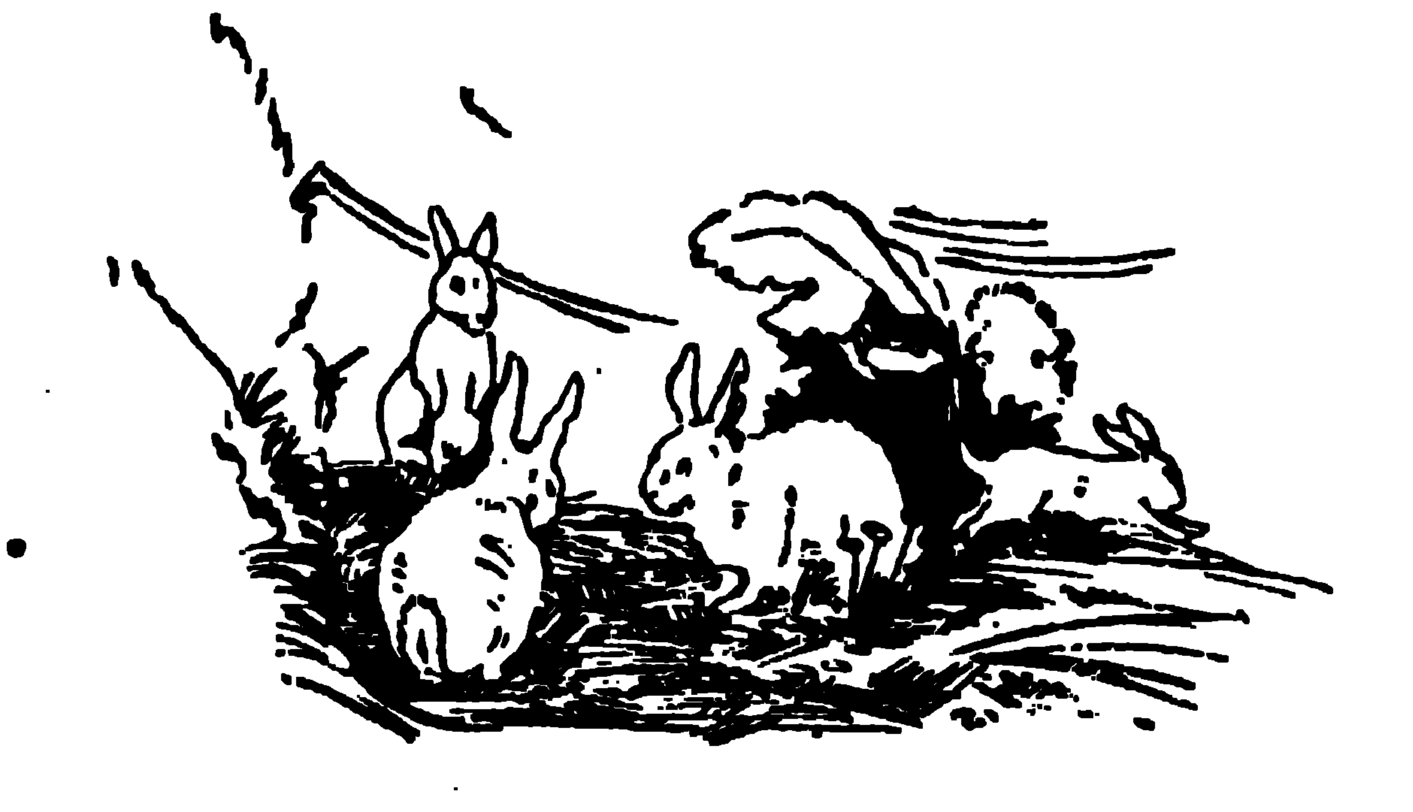

চণ্ডীদাস

মোহাম্মদ এনামুল হক এম-এ

মহাকবি চণ্ডীদাস, * বীরভূম জেলার অন্তর্গত, শাকুলিপুর থানার অধীন নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলা স্বভাব-সৌন্দর্য্যের জন্য চির প্রসিদ্ধ; ইহার কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ, কোথাও শীতল নির্ঝরিণী, কোথাও ময়ূরাক্ষী, অজয়, শাল প্রভৃতি স্রোতস্বিনী কুলুনিনাদে মন্থরগতিতে প্রবাহিত, আর কোথাও তৃণগুল্মবিশোভিত অত্যুঙ্গ পর্ব্বতমালা ছবির মত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিক্‌চক্রবালে মিশিয়া গিয়াছে। স্বভাবের এই সুরম্য নিকেতন, বাঙ্গালার দুইজন প্রাচীন কবিকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত—ইঁহাদের একজন জয়দেব, আর অপর ব্যক্তি মহাকবি চণ্ডীদাস।

আমরা জানিতে পারিয়াছি, কবি চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু, কোন্ নির্দ্দিষ্ট সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা এখন একরূপ অসম্ভব। তবে চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলেও, তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে, পারিপার্শ্বিক ঘটনা পরীক্ষা ও সমসাময়িক বিবরণাদি পাঠ করিয়া একরূপ স্থির করা যাইতে পারে। তাহা নিম্নে একে একে প্রদান করিতেছি।

চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে আমরা এক প্রমাণ পাইতেছি যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বা তাঁহার সমকালবর্ত্তী কেহই তাঁহাকে দেখেন নাই, অথচ তাঁহারা সকলেই তাঁহার গীতে মুগ্ধ ছিলেন। আমরা জানি মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা লিখিয়া যে নরহরি সরকার, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাসের গান তাঁহার সময় 'ভুবনব্যাপী' হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় নরহরির সময় চণ্ডীদাসের যে গান ভুবনব্যাপী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই প্রাচীন যুগে, তাহার খ্যাতিলাভ করিতে অন্ততঃ এক শতাব্দী বা তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন সময় আবশ্যক হইয়াছিল। নরহরি সরকার ১৪৭৫ বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই দুইটি বিষয় হইতে, আমরা এই ধারণা করিতে পারি যে, কি মহাপ্রভু বা নরহরি, তাঁহাদের কাহারও জীবনকালে চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। কত আগে জীবিত ছিলেন তাহা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হইবে। ইঁহাদের সময় জীবিত থাকিলে, নিশ্চয়, বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন না কোন তত্ত্ব সংগৃহীত হইত সন্দেহ নাই।

বহু প্রাচীন পদে চণ্ডীদাসের বর্ণনা পাওয়া যায়; তন্মধ্যে "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দুহুঁজন পিরীতি"-আদি চারিটি পদে। চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির কবিতা-বিনিময়, সুরধুনী-তীরে সাক্ষাৎ ও রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রাচীন পদগুলির রচনাকাল জানা যায় নাই; এই পদগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংগৃহীত "পদকল্পতরুতে" পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যাপতি মিথিলারাজ

---

* চণ্ডীদাসকে জানিতে গিয়া যেখানে আমি যে উপাদান লাভ করিয়াছি তাহা সংগ্রহ করিয়া, একত্রে কবিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

Bibliography :—

1. History of Bengali Language and Literature—Dr. D. C. Sen.

2. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

3. Chaitanya and His Age—Dr. D. C. Sen.

4. Chaitanya and His Companions—Dr. D. C. Sen.

5. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—ভূমিকা—বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ।

6. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী।

7. নানা সাময়িক পত্র ও পরিষৎ-পত্রিকা।

—লেখক

শিবসিংহের সময়ে জীবিত ছিলেন। এবং শিবসিংহ কবিকে বিস্‌পী গ্রাম ১৪০০ খৃ-তে দান করেন; রাজার তাম্র শাসনে দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি মহারাজা শিবসিংহের সহযাত্রীরূপে গঙ্গাবতরণ-পথে বঙ্গে আগমন করেন। শিবসিংহ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং মাত্র সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করেন। ভাগীরথীতীরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন সম্বন্ধে, বিদ্যাপতির পদাবলী-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাঁহার সংশয়ের কোন কারণ নির্ণয় করেন নাই। বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের যে মিলন হয়, তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশে এই প্রবাদটি চলিয়া আসিয়াছে; যতক্ষণ তাহার বিপক্ষে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয় হইতে মনে হয়, চণ্ডীদাস পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে বিরচিত, ঈশান নাগর-কৃত "অদ্বৈতপ্রকাশে" লিখিত আছে যে মিথিলায় ভ্রমণকালে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এবং অদ্বৈতাচার্য্য বিদ্যাপতির মুখে সুমধুর গীতালাপ শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। যতদূর জানা যায় অদ্বৈতাচার্য্য চণ্ডীদাসের সম্পর্কে আসেন নাই। অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনকাল ১৪৩৪ হইতে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ। অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সুদূর মিথিলার কবি বিদ্যাপতির মিলন হইল; আর বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের সহিত মিলন হইল কি না তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না —ইহার কারণ কি? হয়ত চণ্ডীদাস তখন জীবিত ছিলেন না; খুবসম্ভব তখন তিনি পরলোকে। ইহা হইতে মনে হয়, চণ্ডীদাস পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে মারা গিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাসের দুইটি পংক্তি এইরূপ :—

১ ৩ ২ ৫
"বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ।
৯ ৯ ৬
নবহুঁ নবহু রস গীত পরিমাণ॥"

এই দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে) ৯৯৬টি পদ রচনা করেন। তাঁহাদের মতে কবিতা হইতে প্রাপ্ত অঙ্ক শকাব্দ-বোধক।

পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল এবং আরও উল্লেখ করিয়াছি যে, যতদিন এই দুই কবির মিলন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-প্রমাণসূচক কোন সঠিক সত্য প্রকাশিত না হয় ততদিন এই প্রাচীন প্রবাদটিকে কিছুতেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই দুই কবির মিলনের কথা যদি প্রকৃতই সত্য হয়, তবে আমরা দেখিতেছি, উভয় কবির বয়স তখন সমান ছিল না,—চণ্ডীদাস তখন প্রৌঢ় অবস্থায় পা দিয়াছিলেন, আর বিদ্যাপতি সবেমাত্র উদীয়মান কবি ও তরুণ যুবা। আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিবার কারণ এই, চণ্ডীদাসের যশঃসৌরভ যদি তখন সুদূর মিথিলায় গিয়া না পৌঁছিত, মৈথিলী কবি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বঙ্গে আগমন করিবেন কেন? এবং চণ্ডীদাসের যশঃ এইরূপ দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িতে, খুব সম্ভব, কবির চল্লিশ বৎসর বয়স আবশ্যক হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমরা দেখিতে পাই, ভালবাসা বা 'পিরীতি'র উন্নত ধারণাবিষয়ক আলোচনাই দুই কবির মধ্যে চলিয়াছিল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির উপর এই দুই বিষয়ে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা বিদ্যাপতির "ভাব সম্মিলনের" পদগুলিতে সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতির অন্য পদগুলি মাঝে মাঝে একটু কুরুচিদুষ্ট কিন্তু ভাবসম্মিলনে গিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত শুভ্রতা ও পবিত্রতার উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পণ্ডিত-সমাজে যখন এবম্বিধ মতামত লইয়া জোরে আলোচনা চলিতেছিল, তখন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কার করেন। এই পুস্তক আবিষ্কৃত হওয়ায়, চণ্ডীদাসের জীবনকাল সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত প্রমাণ সংগৃহীত হইল। এই পুস্তকের হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রাচীন হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞগণ রায় প্রকাশ করিলেন, এই হস্তাক্ষর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বের ব্যতীত পরের কিছুতেই হইতে পারে না। এই পুস্তকখানিতে কবির হস্তাক্ষর নাই

কি আছে তাহা এখানে আলোচনা-সাপেক্ষ নয়; তবে পুস্তকখানি কবি ব্যতীত অপর লোক যে নকল করিয়া রাখিয়াছিল তাহা স্থির নিশ্চিত; কেন না পাণ্ডুলিপিতে দুইরূপ হস্তাক্ষর পরিদৃষ্ট হইবে। পুস্তকখানি অপর ব্যক্তির দ্বারা অনুলিখিত হইবার পূর্ব্বে তাহা যে সাধারণে আদরলাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; নতুবা অপর লেকা পুস্তকখানি নকল করিয়া রাখিবে কেন? আমাদের মনে হয় পুস্তকখানি তখনকার দিনে সাধারণে এইরূপ আদৃত হইতে অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসর আবশ্যক হইয়াছিল। তাহা হইলে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ এই পুস্তকের রচনাকাল বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানিতে মধ্যে মধ্যে যেরূপ সুরুচির অভাব বিদ্যমান, তাহাতে মনে হয় ইহা চণ্ডীদাসের পরিণত বয়সের রচনা নহে; হয়ত চণ্ডীদাস তখন যুবক।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অতি-আধুনিক আবিষ্কার—তাঁহার অতি মর্ম্মন্তুদ ও বিষাদময় মৃত্যু। বঙ্গদেশের এই বাণীপুত্রের এহেন শোচনীয় মৃত্যু ১৩৮০ হইতে ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা পরে আলোচনা করা যাইতেছে। এখন দেখা যাক কবির মৃত্যু সম্বন্ধে কি পাওয়া যায়।

অনেক দিন হইতে, চণ্ডীদাসের পৈতৃক গ্রাম নান্নুরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এমন একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল, চণ্ডীদাসের উপর স্থানীয় কোন নবাবের বেগমের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি পতিত হয়, এবং পরে নবাব একথা জানিতে পারিয়া চণ্ডীদাসের বধসাধন করেন। এই বধসাধনের ব্যাপারকে নানাজন নানাভাবে ব্যাখ্যা করিত। কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন কতকগুলি কাগজপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাতে চণ্ডীদাসের এই শোচনীয় মৃত্যুর ইতিহাস লিখিত আছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলি চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রামীর লিখিত। ইহাতে রামী লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাসের এই শোচনীয় মৃত্যু স্থানীয় কোন নবাবের বেগমের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, তাহা গৌড়াধিপতির আদেশে সম্পন্ন হয়। চণ্ডীদাস গৌড়াধিপতির অনুরোধে গান করিবার জন্য রাজসভায় গমন করেন; কবির গানে বেগম মুগ্ধ হইয়া যান এবং চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিণী হন। বেগম নবাবের নিকট নির্ভীকভাবে এই অনুরাগের কথা স্বীকার করেন। নবাবের আদেশে চণ্ডীদাস হস্তীপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া দারুণ কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। কবির আত্মীয়বর্গের সম্মুখে, এইরূপ কশাঘাত করিয়া, তাঁহার প্রাণহননের দণ্ডাজ্ঞা ছিল; সুতরাং রামী ও বেগম সকলেই কবির এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছিলেন। বেগম এই দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হন; তাঁহার সেই মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। বেগমের মৃত্যুতে রামীর হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং তিনি মৃতদেহের পদযুগল স্পর্শ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন।

এই অপূর্ব্ব শোক-গীতিকা হইতে, ইহাও জানা যায় যে, চণ্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, পরে এই ক্রুদ্ধ নবাবের আদেশে নান্নুরের বাশুলী মন্দিরের ধ্বংস সাধিত হয়।

একটি দেশব্যাপী জনশ্রুতি যখন আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি-সম্বলিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন তাহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা কি?

এইরূপ শোচনীয় ভাবে মহাকবি চণ্ডীদাসের জীবলীলা সাঙ্গ হয়। এখন আমরা দেখিব, এই মৃত্যুর সময়, চণ্ডীদাসের বয়স কত হইতে পারে। খুব সম্ভব, তখন চণ্ডীদাসের বয়স ৪০ বৎসরের অনধিক। কেননা, আমরা দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের উপর নবাবের বেগমের প্রণয়দৃষ্টি পড়িয়াছিল; এদেশে ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তির সহিত কোন মেয়ে প্রণয় করিতে প্রায় সাধ করে না। সুতরাং চণ্ডীদাসের মৃত্যুসময়ে, তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর বলিয়া ধরিয়া লইলে তাঁহার জীবনকাল একরূপ স্থির করা যায়। তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

চণ্ডীদাসহন্তা এই গৌড়াধিপতি কে, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। কিন্তু আমরা যদি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে চণ্ডীদাসের যৌবনের রচনা বলিয়া ধরিয়া লই, এবং এই পুস্তকখানির রচনাকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৩৫০খৃঃ) বলিয়া মানিয়া লই; এবং মৃত্যুর সময় চণ্ডীদাসের বয়স ৪০ বৎসর বলিয়া স্বীকার করি, তবে আমরা দেখিতে পাই, চণ্ডীদাসহন্তা গৌড়াধিপতি দ্বিতীয় সামহুদ্দিন

ব্যতীত আর কেহ নহেন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে ৪জন নবাব অধিষ্ঠিত হন; তাঁহারা সামসুদ্দিন ভেঙ্গরা (১৩৪২-১৩৫৮) সুলতান গিয়াসুদ্দিন (১৩১৯-১৩৭৩), আসসালাতিন (১৩৭৩-১৩৮৩), ও সামসুদ্দিন দ্বিতীয় (১৩৮৩-১৩৮৫)। ইঁহাদের মধ্যে সামসুদ্দিন ভেঙ্গরা ও আসসালাতিন নিতান্তই প্রজাপালক ও উদার ব্যক্তি ছিলেন, এবং সুলতান গিয়াসুদ্দিন নিতান্তই কবিভক্ত ও প্রতিভার সমাদরকারী রাজা ছিলেন। গিয়াসুদ্দিন, পারস্যের হাফেজকে নিজ সভায় আমন্ত্রিত করেন এবং এই গিয়াসুদ্দিন সম্বন্ধে বিদ্যাপতি প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, এই তিন ব্যক্তির রাজত্বের সময়, চণ্ডীদাস মারা যায়েন নাই। চতুর্থ সোলতান দ্বিতীয় সামসুদ্দিন প্রজাপীড়ক নরপতি ছিলেন, তাঁহার সময় হিন্দু জমিদারগণ বিদ্রোহী হয় ও তাঁহাকে হত্যা করে। তিনি দেশে এতই অত্যাচারী ছিলেন যে, হিন্দু জমিদারেরা তাঁহাকে হত্যা করিল, অথচ মুসলমানেরাও তাঁহার সাহায্য করিল না। আমাদের মনে হয়, এই অত্যাচারী নবাব দ্বিতীয় সামসুদ্দিনই চণ্ডীদাসের উপর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। তাহা হইলে চণ্ডীদাস ১৩৮৩ হইতে ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিহত হন। এবং তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর বলিয়া ধরিয়া লইলে তিনি ১৩৪০ কি তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সমুদয় ঘটনা পরীক্ষা করিয়া মনে হয়, তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগেই নিহত হন।

চণ্ডীদাসের শোচনীয় ও শোকাবহ মৃত্যুসম্বন্ধে বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ যে কিছু লিখেন নাই তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। বৈষ্ণবগণ যাহা কিছু দুঃখজনক ও শোকাবহ, যাহা কিছু মানুষের বেদনার দ্বারে আঘাত করে, সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। তাঁহারা মহাপ্রভুর মৃত্যুসম্বন্ধেও লিখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে চণ্ডীদাসের এই শোচনীয় মৃত্যুসম্বন্ধে কোন তথ্য আমরা আশা করিতে পারি না।

এখন আমরা বলিতে পারি, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (সম্ভবতঃ ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে বা তৎসমকালে) বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে যেমন সঠিক কিছু বলা চলে না, জীবনের ঘটনা সম্বন্ধেও তেমন কিছু বলিতে পারা যায় না। নানা-স্থান হইতে সংগৃহীত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখই তাঁহার বর্ত্তমান জীবনীর উপাদান।

চণ্ডীদাসের পিতা "বাসুলী"র পূজক ছিলেন। বাসুলী দেবীকে কেহ কেহ "চণ্ডী" বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। চণ্ডীদাসের পিতা বাসুলীর সেবক ছিলেন বলিয়াই দেবীর নামের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজ পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ "বাসুলী"কে ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ-দেবতা বলিয়াও মনে করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, "বাসুলী" "বাগীশ্বরী" শব্দেরই অপভ্রংশ। চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর কবি স্বয়ং বাসুলী দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। এখন কেহ কেহ আবার এ বিষয়েও সন্দেহ করিতেছেন। এই সন্দিগ্ধ পণ্ডিতগণ মনে করেন, কি চণ্ডীদাস বা তাঁহার পিতা কেহই বাসুলীর সেবক ছিলেন না। চণ্ডীদাস ও তাঁহার পিতা বাসুলী-সেবক ছিলেন বলিয়া দেশে যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। কেন না কৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাস বাসুলীর সেবক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

চণ্ডীদাসের আর এক নাম "অনন্ত।" তিনি বড়ু উপাধিও ব্যবহার করিতেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রায় প্রতি পদে তিনি বাসুলীর সেবক ছিলেন বলিয়া এবং বড়ু উপাধি ও অনন্ত নাম-ধারী বলিয়া পরিচিত।

চণ্ডীদাসের পিতামাতাকে লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ভৈরবী নাম্নী এক 'কামিনী'র গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই মতের সত্যতা কতটুকু তাহা আমরা বলিতে পারিব না।

কেহ কেহ চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত বিপরীত মত পোষণ করেন। অনেকে বাঁকুড়ায় গিয়া ছাতনা দেখিয়া আসিয়া এবং গ্রামবাসীদের প্রবাদ-বাক্য শুনিয়াও এ বিষয় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

সুতরাং জনশ্রুতির উপর হঠাৎ একটা মত খাড়া না করিয়া, আমরা বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামকেই কবির জন্মভূমি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

চণ্ডীদাস অবন্তীপুরে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। এই অবন্তীপুর নান্নুরের কোন পল্লী হইবে। চণ্ডীদাসের পাঠাভ্যাস অবস্থায় জীবনের এক মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। অবন্তীপুরে একদিন এক 'নাগরী' আসিয়া দেখা দিল। এই নাগরীটিকে দৃষ্টিমাত্র তিনি আত্মবিস্মৃত ও দেশকাল-জ্ঞান-তিরোহিত; শিক্ষা দীক্ষা তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু কবি আত্মসংবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, তাহাকে বিস্মৃত হইতে সচেষ্ট হইলেন;—ফল বিপরীত হইল।

"বসিয়া অবন্তীপুরে পঢ়ুঞা পঢ়ন পড়ে......

........................রমণী সনে॥

চণ্ডীদাস অতি অল্প বয়সেই, বোধ হয় যৌবনের প্রারম্ভেই প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কিরূপে প্রেমে পড়েন, সে বিষয় লইয়া অনেকগুলি গল্প প্রচলিত আছে; উপরের গল্পটিও সেই পর্য্যায়ভুক্ত। আর একটি গল্প এইরূপ:—

কবি একদিন বাজারে মাছ কিনিতে গিয়াছিলেন। বাজারে কোন মাছুনী হইতে মাছ কিনিতে যাইয়া, তিনি দেখিতে পাইলেন মাছুনী সমান অর্থের বিনিময়ে কবিকে যত মাছ দিল, অন্য এক ব্যক্তিকে ততোধিক দিয়াছিল। মাছুনীর নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কবি জানিতে পারিলেন যে, মাছুনী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভালবাসে। কবি নীরবে দাঁড়াইয়া এবিষয়ে কতক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং এহেন মানসিক প্রবৃত্তি ও অনুভূতি কবির নিকট মধুর বলিয়া বোধ হইল। কথিত আছে, ঠিক সেই দিনই রামী তাঁহার সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া কবির দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয় এবং কবি তাহাকে দেখিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-হারা হইয়া রামীকে ভালবাসেন।

যেইরূপেই হউক, চণ্ডীদাস যৌবনের প্রারম্ভে রামী বা রামিণীকে ভালবাসিয়াছিলেন, এমনকি এই রামিণীর পদে আত্ম বিকাইয়া দিয়াছিলেন। রামিণী নান্নুরের "বাসুলী" মন্দিরের সেবাদাসী বা দেয়াসিনী (দেববাসিনী) ছিল। এই রামিণী একজন রজকের মেয়ে, এবং এই রামিণীই কবির প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল। একজন ব্রাহ্মণযুবক এইরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া রজকিনী রামিণীর প্রেমে মত্ত হওয়ার কথায় সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ফলে কবি অচিরেই সমাজচ্যুত হন। কিন্তু কবি সমাজে নির্ম্মমভাবে নিগৃহীত হইয়াও রামিণীকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রামিণীও চণ্ডীদাসকে সব প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল।

রজকিনী রামিণীর কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস অনেকদিন সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। একদা তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে বলিলেন, "শুন শুন চণ্ডীদাস।

তোমার লাগিয়া আমরা সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ॥
তোমার পিরীতে আমরা পতিত নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটুম্বভোজন করিয়া উঠাব কুলে॥"

কবির এ বিষয়ে বড় আগ্রহ ছিল না; তবে তাঁহার ভ্রাতা নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে জাতিতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসকে "নীচ প্রেমে উন্মাদ" বলিয়া এবং "পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার, তাহার সম্মতি নহে"—ইত্যাদিরূপ আপত্তি করিয়া, আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শেষে নকুল ঠাকুরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

এদিকে চণ্ডীদাস জাতিতে উঠিতেছে শুনিয়া রামিণী "নয়নের জলে কাঁদিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে।" কিন্তু কাঁদিয়া "পৃথিবী ভিজাইয়া"ও যে শান্তি নাই। রামিণী দেখিল ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন হইয়াছে, "সীতামিশ্রী" "অলকা" প্রভৃতি বহুবিধ আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে; এবং ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উদ্যত। রামিণী প্রাণের আবেগে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তাঁহার স্বর্গীয় প্রণয়ের শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য, যে প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণভোজের আয়োজন হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বে কোন বকুলতলায় আত্মগোপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধরণী সিক্ত করিতেছিল। তখনও তাহাকে কেহ দেখে নাই।

এমন কি চণ্ডীদাসও নয়। ব্রাহ্মণেরা আসিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস পরিবেশনে নিযুক্ত; রজকিনী বকুল-কুঞ্জ হইতে মাথা তুলিয়া পিরীতিময় জপিতে জপিতে সমস্তই দেখিতেছেন। ইহার পর কি হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই, পুঁথির লেখা মুছিয়া গিয়াছে। প্রবাদ—একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে এবং চণ্ডীদাস রামিণীকে লইয়া সমাজে উঠেন।

চণ্ডীদাস 'সহজ' ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম শাখা সহজযানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সহজ ধর্ম্মের প্রভাব যে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঁচিয়া-ছিল তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যান্য শাখায় যেরূপ দুষ্কর নিয়মপালনের ব্যবস্থা আছে, এই সহজযানে তেমন কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের দুষ্কর নিয়ম ও নৈতিক কঠোরতার বিরুদ্ধে এই সহজযান বিদ্রোহ বলিয়া মনে হয়। সহজযানের মূল কথা হইল—"যদি তোমার বোধিসত্ত্ব বাসনা থাকে, তবে গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর এবং পঞ্চকাম উপভোগ করিতে থাক। কেবলই আনন্দ কর, কেবলই আনন্দ কর।" উপরোক্ত সহজযানের সাধনপ্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়া সহজ-ভজন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। উহা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। সহজ সাধনে পরকীয়া রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সহজ সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী উত্তম আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, আপনাদিগকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা অথবা তাঁহার অনুগত সখীজ্ঞানে বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ বিবিধ লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। নায়িকা-সাধন সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

"শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয়।"

চণ্ডীদাসের অনেক পদে এইরূপভাবে সহজ-আচারের গুরুত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বোধ হয়, চণ্ডীদাস সহজ-ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া, রামিণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন। ইহাকে তাঁহার পরকীয়া প্রেমের বিকাশ বলিয়া বলা যাইতে পারে। কবি রামিণীকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন, গোপীদের চেয়েও অত্যধিক ভালবসিতেন। চণ্ডীদাসের ভালবাসায় কামের গন্ধ ছিল না; তাঁহার প্রেম স্বর্গীয়। কবির প্রেম কতদূর গভীর ছিল তাহা তাঁহার কয়েকটি কথায় প্রকাশ পাইবে। তিনি লিখিয়াছেন,

"রজকিনী রূপ, কিশোরীস্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।"

"রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম।" অথবা

"তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও মাতৃপিতৃ।"

চণ্ডীদাস সহজধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, অনুমান হয়। তাঁহারা নিঃস্ব ছিলেন না, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরও অভাব ছিল না। যাঁহারা এতদিন চণ্ডীদাসকে "আজীবন কুমার" বলিয়া অভিহিত করিতেন, তাঁহাদের সম্বল এক বড়ু শব্দ। তাঁহারা "বড়ু" শব্দে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া মনে করেন। আমরা মনে করি "বড়ু" শব্দ সংস্কৃত "বর" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বড়ু", "বড়ুয়া" উক্ত শব্দেরই রূপভেদ—ইহার অর্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। চণ্ডীদাসের এমন কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে মনে হয়, তিনি পরকীয়া সহজধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে, বিবাহিত হইয়াছিলেন।

চণ্ডীদাসের প্রৌঢ়াবস্থায় মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার মিলন ভাগীরথীতীরে সুসম্পন্ন হয়। সে বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। প্রবাদ—কবি চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি কবির এই অপবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস একাধারে কবি, পণ্ডিত ও গায়ক ছিলেন। তাঁহার গানের কথা তাঁহার মৃত্যুপ্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারিয়াছি। তিনি যে পণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে তাঁহার রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনকে কবির প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি; সেকালেও চণ্ডীদাসের বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি ছিল। তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শিতা সম্বন্ধে নরহরি সরকার সাক্ষ্য দিতেছেন,—

"পরম পণ্ডিত, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব
জিনিয়া যাহার গান।"—নরহরি।

কবি কোথায় দেহরক্ষা করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে

উল্লেখ করিয়াছি। এ শোকাবহ ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবাদ আছে; তাহার দুইটি এইরূপ। একদা তিনি রামিণীসহ নিকটবর্ত্তী মতিপুর গ্রামে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন, তথায় নাটমন্দির পতনে উভয়ের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন চণ্ডীদাস শেষ-জীবনে বৃন্দাবনে গমন করেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সমুদয় গল্পের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

চণ্ডীদাস, পদাবলীর জন্যই বঙ্গদেশে আজ মরিয়াও অমর। বঙ্গবাসী কবির জন্মমৃত্যুর কোন খোঁজ-খবরই রাখে নাই, কিন্তু কবির পদাবলীগুলিকে, বিকৃতভাবেই হউক বা অবিকৃতভাবেই হউক, অন্তরের অর্ঘ্যে আজ প্রায় পঞ্চ শতাব্দী ব্যাপিয়া হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়া আসিয়াছে। এক চণ্ডীদাস পঞ্চভূত লইয়া মরিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু আজ কোটি কোটি অশরীরী চণ্ডীদাস বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। বাঙ্গালী চণ্ডীদাসের জন্ম মৃত্যুর খবর রাখে নাই,—রাখিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে নাই। যে চণ্ডীদাসকে লইয়া বাঙ্গালী অহর্নিশি নাড়াচাড়া করিতেছে, যেই চণ্ডীদাস বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভ তুলিবার কোন বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। চণ্ডীদাস একদিন অন্তরের সমস্ত রস নিংড়াইয়া অনুভূতির অক্ষরে গান রচনা করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী তাঁহাকে সাদরে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অমৃতরূপম্

'অজ্ঞা অপরংপার কী বসি—' ইত্যাদি। দাদূ)

শ্রী সেবক

জ্ঞানের অতীত দেবতা—অসীম
আকাশে আসন তাঁর!
হরিদম্বরী পরি' সুন্দরী
ধরা করে সিংগার * —

ফুলে ফলে আর রূপে রসে সে যে
রূপ ধরে বসুধার।
গরজে গগন—স্থলজল ভরি'
রটে জয়-জয়কার।

মহাকাল-মুখে কালী অবলেপি'
নিত্য সু-কাল 'সাঁঈ',
অমৃতের মেঘ ঘনাল—দয়াল
কখন বরিষে ভাই!

---

* প্রসাধন

কুড়ানো চিঠি

শ্রী ঊষারাণী দেবী

কুয়াসার ওড়নায় অবগুণ্ঠন টেনে হেমন্তের ঊষা শিশির-ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় পুরী এক্সপ্রেসটা খড়্গপুর ষ্টেশনে এসে থামলো।

নির্ম্মল সারা রাত খালি কামরায় একলা বেশ আরামেই এসেছে। এখন গাড়ী থামবার ঝাঁকানিতে জেগে উঠে কাচের বন্ধ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দিনের আলো দেখে উঠ্‌বে কিনা ভাবছে, এমন সময় খট ক'রে দরজা খুলে একটি বছর বাইশ তেইশের বাঙালী মেয়ে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লো।

মেয়েটি গাড়ীতে উঠে নির্ম্মলের মুখ থেকে সমস্ত গাড়ীটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দরজার দিকে ফিরে বাইরে কুলির হাত থেকে ছোট একটি সুটকেশ তুলে নিয়ে তাকে বিদায় দিল।

একখানি বেঞ্চির ওপর সুটকেশ রেখে সেটি খুলে একখানি বই বা'র ক'রে একপাশে ব'সে গায়ের শালখানি একটু ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে হাতের বইয়ের পাতায় সে চোখছুটি আর মনটিকে নিবিষ্ট ক'রে দিল।

নির্ম্মল এতক্ষণ ধ'রে উঠে-বসা উচিত কিনা ভেবে ভেবে শেষটায় চুপচাপ শুয়ে থাকাই সুবিধা মনে করলে। তারপর মাঝে মাঝে মেয়েটিকে বেশ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে মনে মনে আলোচনা আরম্ভ করলে।

আজকালকার ছেলে হ'লেও নির্ম্মল আজকালকার মেয়েদের চাল-চলনটা মোটেই পছন্দ করতো না। এই-সব মেয়েরা পথে বা'র হবার সময় একটা আল্‌গা আবরণও আবশ্যক মনে করে না ব'লে নির্ম্মলের রাগটা ছিল সব চেয়ে বেশী।

এই মেয়েটির গায়ে শালখানি জড়াবার ভঙ্গীটিতে নির্ম্মল কেমন যেন একটা স্বস্তি বোধ করছিল। মেয়েটির সাড়ীর লাল পাড়টি সিঁথির জলজলে সিঁদুরের কোল ঘেঁসে সমস্ত মাথাটিকে জড়িয়ে কাঁধের ওপর থেকে সবুজ শালের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে এসে পায়ের রক্তরেখায় লুটিয়ে পড়েছে। আপনাকে আবরণ করবার এই শোভন ভঙ্গীটি নির্ম্মলের ভারী সুন্দর মনে হচ্ছিলো। মেয়েটির কালো কোঁকড়া চুলের অযত্ন শোভায় ঘেরা শ্যামল মুখখানির শান্ত শ্রী, বড় বড় পল্লবঘেরা কালো ছুটি চোখের কেমন যেন ক্লান্ত-উদাস দৃষ্টি সব মিলিয়ে নির্ম্মল এই মেয়েটির এমন একটা বিশিষ্টতা অনুভব করছিল যা নাকি এর আগে পথে কখন কোন মেয়েকে দেখে করেনি;—সেই সব মেয়েদের সঙ্গে কোথায় যেন এর মিল ছিল না। নির্ম্মল সেটা ঠিক ধরতে পারছিল না ব'লে মেয়েটির পরিচয় পাবার জন্যে সে মনে-মনে বেশ উৎসুক হ'য়ে উঠলেও মেয়েটির নির্লিপ্ততায় সে আলাপের কোন অবসর পেলে না।

২

গাড়ী এসে হাওড়ায় থামলো। কুলির দলের ছুটোছুটি—ভিড় আরম্ভ হলো। মেয়েটি আস্তে আস্তে বইখানি বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে একটা কুলির হাতে সুটকেশটি তুলে দিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল।

নির্ম্মলও আপনার মালপত্তর কুলির মাথায় তুলে দিয়ে নামতে যাবে দেখে,—ঠিক গাড়ীর দরজার কাছে একখানি সাদা পুরু খামের চিঠি প'ড়ে রয়েছে। নির্ম্মল তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে প'ড়ে দেখলে খামের ওপর পরিষ্কার মেয়েলী হাতে শুধু লেখা রয়েছে "শ্রীমতী রমা রায়—" কিন্তু কোন ঠিকানা নাই। বোধ হয় তাড়াতাড়িতে কেবল নামটি লিখেই লেখিকা রেখে দিয়েছেন—পরে ঠিকানা লিখে পোষ্ট করবেন ভেবে। সেটাকে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে নির্ম্মল গাড়ী থেকে নেমে পড়লো।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিক চেয়ে নির্ম্মল মেয়েটিকে খুঁজে নিলে যদি চিঠিখানি ফেরত দেওয়া যায়, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলে না। একটা গাড়ীর মাথায় মোটমাট তুলে দিয়ে নির্ম্মল গাড়ীর ভেতর ব'সে

চিঠিখানি বার ক'রে খুলে দেখবে কিনা ইতঃস্তত: করতে লাগল। ভাবলে ভিতরে ঠিকানা আছে, দেখে ফেরৎ দেওয়া যাবে। দু'খানি চিঠি ছিল খামখানির মধ্যে। ঠিকানা দেখা হ'ল, কিন্তু ফল হ'ল না।একখানিতে 'কলিকাতা' ও এক-খানিতে 'রেঙ্গুন'—এইমাত্র ছিল। চিঠি দু'খানি খামে বন্ধ ক'রে আবার খাম খুলে বের করলে। অন্যের গোপনীয় কথা জানবার প্রয়াস অন্যায় জেনেও যৌবনসুলভ কৌতূহলই জয়লাভ করল। নীল রংয়ের কাগজে লেখা একখানি চিঠির নীচে 'রমা' লেখা; নির্ম্মল সেখানিই আগে পড়তে লাগলো—মনুদি!

প্রায় বছর সাতেক পরে তোমার চিঠিটা পেয়ে অবাক হ'য়ে গেলুম। চিঠিটা খোলবার আগে একবারও ভাবতে পারিনি এর মধ্যে ভ'রে যে কথাগুলি তুমি পাঠিয়েছ সেগুলি এতদিন পরে তোমার চিঠি পাবার আনন্দটা নিমেষে নষ্ট ক'রে দিয়ে আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যাথার দিনরাত্তির কাঁটার মত ফুটে থাকবে। কেন এমন করলে তুমি?—কি এমন কারণ হয়েছিল যাতে আমার সেই মাসীমার মেয়ে হ'য়ে হিন্দুর মেয়ের পরমতীর্থ স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে তোমার একটুও বাধলো না! যে মাসীমার মুখের ঘোমটা কখনও সিঁথির সীমা পার হয়নি, গলার স্বর কখনও দরজার বাইরে যায়নি, তাঁরই মেয়ে হ'য়ে আজ নারী-প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়ে পথে পথে কাজ ক'রে বেড়াতে একটুও ইতস্তত: করলে না? কি ক'রে এ সম্ভব হ'লো মনুদি! তোমাকে যে আমি ভাল ক'রেই জানি, তাই কোন কিছুই যে অনুমান করতে পারছি না।

তোমার বিয়ের দু'বছর আগেই আমি এখানে চ'লে এসেছি, তাই যাঁর ঘরে তুমি গিয়েছিলে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এই দূর থেকেই শুনেছিলুম দেহের, মনের, আর অর্থের ঐশ্বর্য্য নাকি তাঁর অতুল। তবে কেন এমন হ'লো?

তুমি লিখেছ এ ভিন্ন তোমার আত্ম-সম্মান বজায় রেখে বেঁচে থাকবার উপায় ছিল না। মাসীমা মেস'মশাই মারা যাওয়ায় তোমার পৃথিবীর আপন পরিচয় শেষ হয়েছে, তাই বাধ্য হ'য়ে তোমায় নারীপ্রতিষ্ঠানেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। তোমার এই কথা আমি মেনে নিতে পারলুম না। হিন্দুর ঘরের মেয়েদের স্বামীকে বাদ দিয়ে আলাদা কোন স্থান আছে কি?

সারাটা জীবন পরের মুখ চেয়েই যাদের কাটাতে হয়, নিজেকে ভুলতে পারাটাই তাদের সব চেয়ে বড় শিক্ষা নয় কি? প্রকৃতি আর সমাজ এই দুটোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিন্দুর মেয়েদের গ'ড়ে তোলা হয় ব'লেই তো তারা সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রকৃতির স্বামীর ঘরে গিয়ে প্রতি পায়ে পায়ে আঘাত পেয়েও সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তবু সংসারের বাইরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাবার কল্পনাও সে কোনও দিন করতে পারে না।

আমার মাসীমাও তো এই রকম ক'রেই তোমায় গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই তুমি এ কি ক'রে ফেললে মনুদি

তোমার মুখেই সব শুনবো ব'লে আমি ব'সে রইলুম। চিঠি পেয়েই তুমি এখানে চ'লে আসবে। তোমার ছোট বোনটির ঘরে তোমার জন্যে সম্মানের আসন চিরদিন পাতা থাকবে।

তোমার রমা তোমার পথ চেয়ে জল-ভরা চোখে ব'সে আছে জানবে; আসতে দেরি ক'রো না!

ইতি—

তোমার রমা

প্রথম চিঠিখানি পড়া শেষ ক'রে নির্ম্মল দ্বিতীয় চিঠিখানি খুলে পড়া আরম্ভ করলো—স্নেহের রমা!

চিঠি পেলুম। প্রথম চিঠিটা যখন তোকে লিখি তখন মনটা আমার এমন এলোমেলোভাবে আচ্ছন্ন ছিল যে সব কথা খুলে লিখতে পারিনি। কেন সে সময় তোকে চিঠিটা লিখেছিলুম সেটাও জানাই নি।

প্রথম যখন সমস্ত শিক্ষা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে এই অন্তঃপুরের সীমা পার হ'য়ে বিশ্বের পথে পা দিলুম তখন নিজের অনভ্যস্ত মনের মধ্যে এমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম যে কারুর কাছে এটা ভাল কি মন্দ তার একটা বিচার ক'রে নেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলুম। হাজার রকম যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে চাইলুম—কেন এই কুণ্ঠা? আমার ভালোমন্দের বোঝা ব'য়ে বেড়াবার জন্যে কারুকে তো পেছনে ফেলে আসিনি, তবে কেন!

মন তবু মানে না, কৈফিয়ত সে দেবেই। অথচ সংসারে আপন ব'লে দাবী করতে পারে এমন কারেও সে খুঁজে পায় না। বার বার তোর কথা মনে হ'লো তাই শেষটা তোকেই লিখলুম।

তুই চ'লে যাবার পর আমার কোন কথাই আর জানিস না তাই এই সাত বছরের সব কথাই আজ তোকে খুব সংক্ষেপে লিখছি।

তোর বোধ হয় মনে আছে, আমার মা ছোটবেলায় আমার বিয়ে দিয়ে জামাই নিয়ে তাঁর ছেলের সাধ মেটাতে চেয়েছিলেন। তাই ন'বছর থেকেই আমায় প্রায় রোজই সেজেগুজে রকমারী লোকের সামনে ঘাড় গুঁজে ব'সে সম্ভব অসম্ভব অনেক কথার উত্তর দিতে হ'তো। আর রংটা আমার আরো কালো কিনা, চুলটা ঠিক নিজের কিনা এর প্রমাণ দিতে অনেক অপমান অবাধে সহ্য করতে হ'তো।

বছর চারেক ধ'রে হাজারখানেক লোকের এই রকম পরখের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি আর মাও আমার অনেকখানি নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন, এমন সময় হঠাৎ দু' চার দিনের কথায় তোর বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেল। বিয়ের আটদিন পরে তুই স্বামীর সঙ্গে সেই বর্ম্মা মুলুকে চ'লে গেলি।

তুই চ'লে যাবার পর মা যেন কেমন আশাহীন হ'য়ে পড়লেন। মেস'মশাই মার দুঃখ দেখে অনেক চেষ্টায় তাঁর এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক ক'রে ফেললেন।

আমরা তোদের বাড়ীতে থাকতেই সব ঠিক হ'য়ে গেল। মাঝে পৌষ মাসের ক'টা দিন গেলেই মাঘ মাসের প্রথমেই একটা দিনও ঠিক করা হ'ল। মা আমার খুসী-মনে ব[illegible] ফিরে বিয়ের খুঁটি-নাটি কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন।

রোজই সন্ধ্যে বেলা বাবা-মা দু'জনে ব'সে তাঁদের এত আরাধনার জামাইকে কি দেবেন তারই একটা ফর্দ্দ হ'তো। রোজই জমার চেয়ে খরচের দিকটা ভারী হ'য়ে পড়তো। কাল আরো কমাতে হবে ব'লে সেদিনকার মতো দু'জনেই দুঃখিত হ'য়ে উঠে পড়তেন।

এমনি ক'রে বাবা-মার দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন মেস'মশাই এসে মাকে বললেন—'আবার একটা মুস্কিল হ'লো দেখছি। ছেলেটা নিজে মেয়ে দেখতে চায়। তাই ভাবছি আজকালকার ছেলে খানিকটা সাদা রং কি হাজারকত টাকা না পেলে পছন্দ করবে? যাই হোক, রেখ' মেয়েটাকে ঠিক ক'রে, কাল নিয়ে আসবো একবার।'

সামনেই ছিলুম দাঁড়িয়ে। মার মুখের দিকে চাইলুম। মুখখানি তাঁর সাদা হ'য়ে গেছে। মেস'মশায়ের কথার কোন উত্তর দিবার শক্তিও তাঁর ছিল না বোধ হয়। মনে হ'লো কেন আমি জন্মেছিলুম,—কেন বেঁচে আছি!

পরের দিন যথানিয়মেই দেখাশোনা হ'য়ে গেল। তিনি যাবার সময় ব'লে গেলেন এ-রকম কালো মেয়ে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে নাকি অসম্ভব।

অসহ্য! এ অপমান যে কত তীব্র তুই হয় তো বুঝবিনে, কেন না তোকে তো কখন আমার মত—শুধু আমার মত কেন হিন্দুর ঘরের পনের আনা মেয়ের মত—সংসারের মাপ-কাঠিতে নিজেদের মূল্য যাদের শূন্য হ'য়ে দাঁড়ায় সেই সব লোকের কাছে নির্ব্বিচারে বিচারপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়িয়ে অবহেলার অপমান সহ্য করতে হয়নি তাই তুই হয়তো এ আঘাত যে কত গভীর তা বুঝতে পারবিনে।

আজো আমি ভাবি, এ অপমান থেকে নিজেকে বাঁচাবার পথ বাংলার মেয়েরা কি কোন দিন খুঁজে পাবে না!

আমি কিন্তু সেদিন মরিয়া হ'য়ে মাকে ব'লে ফেললুম—এই যে দোরে দোরে নিজেকে ফেরি ক'রে ফেরা, এর অপমান আর আমার সহ্য হ'চ্ছে না।

খানিকটা চুপ ক'রে থে[illegible] [illegible]ই ভাল মা, তোর বিয়ে আমরা দেব না। [illegible] [illegible] চোখ বুজলে কোথায় কার কাছে তুই দাড়া[illegible]। সেই কথা মনে ক'রেই তো আর মান-অপমান কোন কিছুই ভাবতে পারি না আমরা।

বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে সেদিন মাকে ভরসা দিয়েছিলুম, নিজের পায়েই দাঁড়াবো আমি—কোন ভয় নেই তাঁর।

তারপর আমার কথাই রইল। প্রায় বছর দুই বিয়ের

কোন কথাই আর হ'লো না। আমিও বাড়ীতে বাবার কাছে প'ড়ে এরি মধ্যে মাট্রিকটা পাশ ক'রে ফেল্‌লুম। শুধু পড়া আর পড়া—একে অবলম্বন ক'রেই একদিন দাঁড়াতে হবে ব'লে একান্ত আগ্রহে একে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করলুম। বিশ্বাস ছিল সিদ্ধি আমি পাবই। এমন সময় জীবনগতি হঠাৎ মোড় ঘুরে অন্য রাস্তা ধরলো।

মেস'মশাই একদিন এসে মাকে বললেন—এবার এমন জামাই তোমার ঠিক করেছি যে এতদিনের পাওয়া দুঃখ সব সার্থক ব'লে মনে করবে। ছেলের যেমন রাজপুত্রের মত রূপ তেমনি ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক হ'য়ে যাবে। মনু-মা'র কপাল ভাল তাই হতভাগাগুলো এতদিন অপছন্দ করেছে।

মা একটু হেসে বললেন—আর কেন, ও সব আশা তো ছেড়েই দিয়েছি। মেয়ে এখন বড় হয়েছে, সেও রাজী হবে না।

মেস'মশাই ব'লে উঠলেন—পাগলামি ক'রো না, মেয়ে রাজী না হয় আমি বুঝবো, তুমি সব যোগাড় করো।

তার তিন দিন পরেই আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। প্রথম স্বামীর ঘরে যাবার সময় যখন মাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালুম মা আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখের জলে অন্ধ হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, যে ঘরে আজ যাচ্ছ চিরদিন সেই ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে থেক। আজ মনে হ'চ্ছে, স্নেহাকুল মার মন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া দেখতে পেয়েছিল হয় ত।

আমার বিয়ের মাস দুই পরে কলেরা এখানে মহামারী হ'য়ে দেখা দিল। আর একে একে মা বাবা মাসিমা মেস'-মশাইকে নিয়ে গিয়ে আমার আপন পরিচয় শেষ ক'রে দিল। কি ক'রে যে সইতে পারলুম আজও তা ভেবে পাই না। সমস্ত সংসার থেকে নিজেকে নির্ব্বাসিত ক'রে শুধু বিছানায় প'ড়ে থাকতুম। এই সময় স্বামী আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে কি আগ্রহেই আমায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতেন।

প্রায় মাস ছয়েক পরে আবার আগের মত সুস্থ হ'য়ে উঠলুম। সহজ জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজের মনের দিকে চেয়ে নিজেই অবাক হ'য়ে গেলুম। শোকাচ্ছন্ন মন আমার কখন যে তার সমস্ত প্রেম শ্রদ্ধা নিঃশেষে স্বামীর পায়ে উজাড় ক'রে দিয়ে আপন ব'লে আশ্রয় নিয়েছে কিছুই তো তার বুঝতে পারিনি আমি। কোন পুরুষ কোন দিন আমার মনের এমন জায়গায় আসন পাততে পারবে এ বিশ্বাস আমার কোন দিন ছিল না।

তার পর ধীরে ধীরে আপনাকে আর খুঁজে পেলুম না। পাবার ইচ্ছাই কি ক'রেছিলুম! আমি যে সুখস্বপ্নে আচ্ছন্ন হ'য়ে চারটি বছর ঘুমেই কাটিয়েছিলুম। আজ তোকে কেমন ক'রে বোঝাবো আমি সে স্বপ্ন আমার মত সুন্দর! আমার এই গোলাপ গাছের মত কাঁটায় ভরা জীবনে সেই বছর ক'টি স্মৃতির শিশিরে সিক্ত হ'য়ে অনুরাগের রাঙা রংয়ে ফুটে থাকবে চিরদিন। এই ফুলক'টির সৌরভের গৌরব আমায় সকল অগৌরব থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

এই বছর চারটি শেষ হবার দু'মাস পরে আমরা প্রথম দেখলুম মীরাকে স্বামীর এক বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে—সেই বন্ধুর পিসতুত বোন মীরা।

বাপ-মা তার অনেক দিন মারা গেছেন। একটি মাত্র ভাই। সেও এখন সাগর-পারে। মীরা তাই বোর্ডিংয়েই থাকে। মাঝে মাঝে ছুটিতে আসে এঁদের বাড়ী বেড়াতে।

কেমন দেখতে সে তোকে লিখে তা বোঝাতে পারবো না আমি। চলা বলা হাসি কথা সব মিলিয়ে এমন একটা পরিপূর্ণ মাধুর্য্য তার যে, তার আকর্ষণ অনুভব না করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় মীরাকে কামনা করা পৃথিবীর সম্রাটের পক্ষেও লজ্জাকর নয়।

সেদিন ফেরবার সময় সস্ত্রীক বন্ধুকে আর বিশেষ ক'রে মীরাকে নেমন্তন্ন ক'রে এলুম আমরা।

তারপর মাসখানেক ধ'রে আসা-যাওয়া চলতে লাগলো।

তারপর ধীরে ধীরে আমার চোখের ওপর স্বামীর চোখে সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের আরতি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগলো।

সে আলোয় অন্ধ হ'য়ে গেলুম।...

তারপর সেই অন্ধকারে, হাত বাড়িয়ে এতদিন পরে আবার নিজেকে খুঁজে পেলুম।

আরও একমাস পরে একদিন আমার সতী-মায়ের

মুখখানির স্মৃতি বুকে নিয়ে আর বাবার দেওয়া টাকাক'টির পাস্‌বুকখানি হাতে ক'রে এই নারী-প্রতিষ্ঠানে এসে আশ্রয় নিলুম। তুই হয়তো বলবি এটা আমার বাহাদুরি। কিন্তু তা নয়।

সত্যিকারের দাবী যখন আমার কিছুই আর রইল না তখন মিথ্যের একটা জালে জড়িয়ে আমরা তিন জনেই কষ্ট পাই কেন! তাই আপনার হাতেই সেইটা ছিঁড়ে দিয়ে কুমারী মীরার আমার আসনে এসে বসবার পথটা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে ভালই করিনি কি?

আমার একলা পথে চলতে হবে ব'লেই তো একদিন নিজেকে প্রস্তুত ক'রেছিলুম। মাঝের ক'টা দিনের এই অমৃত-আস্বাদ এ যে দেবতার আশীর্ব্বাদ—এ আমার পথের সম্বল, এরই জোরে পথের সকল কষ্ট আমার দূর হ'য়ে যাবে।

চিঠি পেয়েই তুই আমায় চ'লে যেতে লিখেছিস। যাবো বোন, তোরই কাছে যাবো। আমার ক্লান্ত দেহ যখন তার শেষশয্যা পাততে চাইবে তখন তোর ঘরের একটি কোণ ছাড়া এ পৃথিবীতে তার আর তো কোন জায়গা নেই। তখন তোর মনু-দি'কে মনে রাখিস ভাই!

বড় ক্লান্ত। আজ এখানেই শেষ করলুম

ইতি—

তোর মনুদি

চিঠিখানি পড়া শেষ হ'য়ে গেলে নির্ম্মল সেখানি পকেটে রেখে গাড়ীর পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—মনুদি! তুমি নিশ্চয়ই আমার দিদি তাই তোমার ক্লান্ত-মূর্ত্তি আমায় এমন ক'রে আকর্ষণ করেছিল।

নির্ম্মলের সমস্তটা অন্তর এই স্বজনহীনা ব্যথাতুরা কিন্তু আত্মনির্ভরশীলা নারীর দু'খানি পা সহানুভূতির অশ্রুধারায় সিক্ত ক'রে দিয়ে ছোট ভাইয়ের অধিকার ভিক্ষা চাইবার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠল এবং উদ্দেশ-আশা-হীন পথের জনতার দিকে চেয়ে নিরুদ্দিষ্টার জন্য একটা নিষ্ফল দীর্ঘশ্বাস ফেলল—তখন চোখদুটি তার অশ্রুতে ঝাপসা হ'য়ে এসেছে।

নব্য মার্কিন সাহিত্যের পরিচয়

শ্রী সুধীরকুমার মিত্র বি-এ

বিংশ শতাব্দী ও গত দুইশত বৎসরের ভিতর মার্কিন সাহিত্যের বিকাশ ইতিহাসের দিক হইতে অত্যন্ত মূল্যবান। এই সময়ের মধ্যে মার্কিন কবি ও ঔপন্যাসিক এবং সমালোচকগণ কখন্ ইংরাজী ধারা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৪ সাল হইতে মার্কিন জাতি আপন সাহিত্য গড়িয়াছে। ইহার ভাব, ভাষা, সমস্যা, সমস্ত নিজস্ব সম্পদ। যে সকল মার্কিন ইহার অংশরূপে ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারা জাতি ও ভাব-প্রেরণার দিক হইতে পুরাপুরি আমেরিকান।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য কি রকম ইংরাজীঘেঁসা ছিল, আলোচনা করিলে রূপান্তর অত্যন্ত চোখে ঠ্যাকে। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া আমেরিকার পত্রিকা-সেবক ও গ্রন্থকারগণ ইংরাজীর নকল-নবীশি করিয়াছে।

কেহ উপন্যাস রচনা করিলে তাহাকে আমেরিকান ডিকেন্স্ কিম্বা আমেরিকান ট্রোলোপ বলা হইত। কবিকে আমেরিকান শ্রীমতী হেম্যান্স বা আমেরিকান স্যুইনবার্ণ আখ্যা দেওয়া হইত। আমেরিকার যে সকল লেখক আমেরিকার সামাজিক বিষয় লইয়া লিখিত, অথচ ইংরাজী ভাবভঙ্গীই প্রকাশ করিত, তাহাদের বিজাতি-সংশ্রব অব্যাহত দেখিতে পাওয়া যায়।

কুপারের "ল্যাট বাম্পো", লংফেলোর "হিয়াওয়াথা" ও "মিনিহাহা" প্রভৃতি রচনাসমূহ ইঙ্গ-মার্কিনী। নাটক, নভেল, কাব্য, সর্ব্বত্র এই ইঙ্গ-প্রীতি। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে মার্কিন সাহিত্য বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনদিন ইংরাজিয়ানার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, এমন কি সে চেষ্টাও করে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন সাহিত্যের আসল জিনিসের যে অংশটি ইংরাজীর ধারা অনুসরণ করে নাই, তাহার জন্ম সীমান্তপ্রদেশের উদ্দীপনার ফলে, এবং তাহার বিকাশ ওয়াল্ট হুইটম্যান ও মার্কটোয়েনের রচনায়। আমেরিকার এই সীমান্তপ্রদেশ ভারি মজার। অন্য যে সমস্ত দেশে সীমান্ত-রেখা বলিয়া বস্তু ছিল এবং এখনও আছে যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল পদার্থ কাহারও নাই, এবং যদি থাকে, আমেরিকায় যে মাত্রায় পাওয়া যায়, সে পরিমাণে নাই। এই সীমান্ত-প্রদেশ আমেরিকাকে ইংরাজী ও ইউরোপীয় ধারা-মুক্ত সাহিত্য গঠনোপযোগী সামগ্রী দিয়াছে। জীবন সেখানে নূতন ছিল, সম্পূর্ণ নূতন বলিলে যাহা বুঝায় অবিকল তাই। সাহিত্য-রস-পিপাসুরা কিন্তু হুইটম্যান ও মার্কটোয়েনের এই মার্কিনত্ব বুঝিল না, এবং বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহাদিগকে অনাদরে রাখিল, আসল মার্কিন সাহিত্য গর্ভ-শয়ান থাকা সত্বেও। সমালোচকদের হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই মার্কটোয়েন জন-সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠেন। হুইটম্যানের "লিভস অফ্ গ্রাস" পুস্তক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কিন্তু তদ্-সত্বেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাব্দের পূর্ব্বে ওঁর বিশেষ নাম-ডাক হয় নাই।

এই দুইজন লোককে, একজন পদ্য ও অপর-জন পদ্যের ভিতর দিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। গণতন্ত্রবাদ তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদরূপ বল লইয়া, নয়া ইংলাণ্ড ও মধ্য এ্যাট-লানটিকস্থিত ষ্টেট্‌সমূহ যে সমস্ত ইংরাজিয়ানার ধুয়া আমদানী করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। "লিভস্ অফ্ গ্রাস" গ্রন্থে হুইট্‌ম্যান প্রচলিত কাব্য-রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জারি করিলেন, এবং মার্কটোয়েন তাঁর 'ইনোসেন্টস্ এ্যাব্রড' ও অন্যান্য গ্রন্থদ্বারা তদ্‌কালবর্ত্তী আমেরিকান ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-ধারার প্রতি তাঁহার বিরাগ প্রকাশ করিলেন। হুইটম্যান ও মার্কটোয়েন যে কেন বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মার্কিন সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই তাহা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। এই সময়ে মার্কিন সাহিত্য নিজ বলে আপন সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য মাথা ঘামাইতে-ছিল এবং স্বীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া আপন অন্তরাত্মার পরিচয় পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল।

এই পরিবর্ত্তন আনয়নকালে কি কি ঐতিহাসিক শক্তি কাজ করিতেছিল? গত বিশ বৎসরে মার্কিন সাহিত্যে যে বিরাট উন্নতি হঠাৎ হইল তাহা বুঝিতে হইলে এ প্রশ্নের আলোচনা প্রথমে করা প্রয়োজন। আমেরিকান সাহিত্যের স্বরূপটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশ পায়। ঐ সময়ে, স্পেন-মার্কিন যুদ্ধাবসানে, বর্ত্তমান-কালের জাতিসমূহের ভিতর আমেরিকা একটি বিশ্ব-শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে যে মধ্যম শ্রেণীর ছিল, স্পেন-বিজয় এবং পরবর্ত্তী নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে আধুনিক জগতে উহার সম্মান বাড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইংরাজের নায়কতা লইয়া কোন কথাই সে কহে নাই। পূরাকালে ইংলণ্ডের সহিত যে সকল মত-দ্বৈধতা ঘটিয়াছে তাহা শক্তিমানের সহিত দুর্ব্বলের স্পর্দ্ধামাত্র। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়াদারি ব্যাপারে আমেরিকা বরাবর ইংলণ্ডের মুখ তাকাইয়া থাকিত। জ্ঞানী-গুণীরা পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে সম্মান করিত। ভাষার সাদৃশ্য দুইজাতির মস্তিষ্কের যোগ নিবিড় করিয়া বাঁধিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যের একটা নিজস্ব স্থান ছিল, কেবল সৌন্দর্য্য-সম্ভারে নয়, পশ্চিমাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দেশের সুপ্রাচীন সাহিত্য বলিয়াও।

এই সকল কারণবশতঃ মার্কিন লেখক যদি ইংলণ্ডের প্রশংসা পাইত তাহা হইলে যে চরিতার্থ হইয়া যাইত, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ডাউনিং ষ্ট্রীট যেমন আমেরিকার অর্থঘটিত ব্যাপার পরিচালনা করিত, বিলাতী পত্রিকাগুলা কালের রুচি ও মতামত নির্দ্দেশ

করিত। কোন মার্কিন লেখক যদি ইংলণ্ডে সম্মান পাইলেন, অমনি তাঁহার যশ সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িত। শুধু যে সম্মান পাইতেন তাহা নহে, পার্থিব লাভও ঘটিত। সকল দিক দিয়াই তাঁহার উন্নতি হইত। এ প্রভাবের কারণ অনেকখানি মনস্তত্বজনিত ব্যাপার। যাহাই হউক ইহার আধিপত্য কিছু কম ছিল না। যে সকল লেখক সৃষ্টির প্রেরণায় লিখিতেন, আমেরিকার সেই ধুরন্ধরেরা হুইটম্যান ও মার্কটোয়েন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, যাঁহারা সীমান্ত-প্রদেশের চৈতন্ত আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং নাগরিক সভ্যতার একান্ত বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই কেবল এই প্রভাবকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন।

আমেরিকা বিশ্ব-শক্তিরূপে প্রকট হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতে আমেরিকার দেশ হিসাবে স্থান না থাকাতে উহার নিজস্ব সাহিত্যও ছিল না। এ দেশ উঠিতেছিল বটে, কিন্তু তখনও বিশেষ উঠে নাই। বিশ্ব-শক্তি হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাব গেল। সমস্ত জাতির মনোভাবও বদলাইয়া গেল। ক্রমশঃ আমেরিকার চিন্তাশীলরা দেখিলেন যে মার্কিন সাহিত্য আপন পায়ে দাঁড়াইতে পারে, এবং সাহিত্য ও ধন-বিভাগ, দুই বিষয়ই আপন মনোমত করিয়া উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এই সময়ে হুইটম্যান ও মার্কটোয়েন লোকের চোখে পড়িলেন এবং শিল্পী ও সমালোচকের নিকট হইতে প্রাপ্য মর্য্যাদা পাইলেন। বিগত পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধের অবসান আমেরিকার সহিত না ঘটিয়া যদি গ্রেট্ বিটেনের সহিত হইত, পৃথিবীর সেরা শক্তি বলিয়া, তাহা হইলে এ পরিবর্ত্তন কখনই এমন সুন্দর ফল ফলাইতে পারিত না। ইংরাজী প্রভাব সম্পূর্ণ ঘুচিয়াছে। এখন হইতে মার্কিন সাহিত্য প্রাচীন উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইল। আপন শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিল। নূতন উদ্যমে ভরপুর হইয়া, পরমুখাপেক্ষা না রাখিয়া, স্বীয় ভাগ্য পরিনির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইল।

এ ভাগ্য-চক্রের স্বরূপ কি? ইহার প্রতিনিধি কাহারা? কাব্যে চরম বিপ্লবীর দল আছে, নানাবিধ মুক্ত-ছন্দের হোতা—তাঁহারা এই নব অভ্যুত্থানের অতি চমৎকার রূপ দিতেছেন। আমী লাওয়েল, রবার্ট ফ্রষ্ট, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, ভ্যাকেল্ লিণ্ডসে, রবিন্‌সন্ জেফার্স এবং এড্‌গার লী মাষ্টার্স এ দলের আদর্শ-স্থানীয়। পূর্ব্বোক্ত সকল নায়কগণ প্রত্যক্ষভাবে না হউক অপ্রত্যক্ষভাবে হুইটম্যানের কাব্য-কলার নিকট ঋণী। এ দলের কোনো কবিকেই ইংরাজীর ছায়া-স্বরূপ বলা চলে না। উঁহারা ষোলআনা আমেরিকান। এমন কি আমী লাওয়েল, যাঁর জীবনসূত্র খাস ইংরাজ হইতে আসিয়াছে, এবং যাঁর মনে ম্যান-ডোলীনের শব্দ ও এগ্‌লানটাইনের চেহারা সতত উঁকি-ঝুঁকি মারিত, তিনি পর্য্যন্ত মধ্য-পশ্চিমের কবিদের মত এই বিদ্রোহে জোর মাতিয়াছিলেন। আধুনিক কাব্যের এই নূতন ধারা-প্রবর্ত্তনে তাঁর প্রবল সমর্থন এই নব-জাগরণকে কিছু কম সহায়তা করে নাই। এ কাজে আরো দুইজন স্ত্রীলোকের নাম দেখা যায়,—হ্যারি মনরো, ইনি তাঁহার "পদ্য" নামক পত্রিকায় নব যুগের বহু বিদ্রোহী কবিকে জুটাইয়াছিলেন; এবং মার্গারেট এ্যানডারসন্, তাঁহার "ক্ষুদ্র সমালোচনা" পত্রিকায় গদ্যে পদ্যে ঐ একই কাজ করেন।

এই কবির দল স্বদেশের ছবি আপন মনোমত ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে থাকেন, কারণ তাঁহাদের বিদ্রোহ ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে, সামাজিক ব্যাপার লইয়া নহে। এতদ্‌নিমিত্ত প্রাচীন কাব্যগঠনের প্রতি হুইটম্যানের যুগান্তরকারী বিদ্রোহ নবদলের মনে ধরিয়াছিল। কতক ক্ষেত্রে, যেমন ই, ই, কামিংগস্ ও গারট্রুড্ ষ্টিনের কবিতায় এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এমন ভীষণ রূপ ধরিয়াছিল যে তাহাকে হ য ব র ল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। স্যাণ্ডবার্গ, রবিন্‌সন্ ফ্রষ্ট, লিণ্ডসে ও মাষ্টার্স প্রভৃতির কাব্যে বহিঃ ও অন্তর-প্রকৃতির সহিত চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। আমেরিকার ছবি হুবহু আঁকিবার লোভে এই নবীন কবিগণ কাব্যের মূল-সূত্রাংশ ও কলা-কৌশলের বিরুদ্ধে পরস্পরের বিরোধ থাকা সত্বেও হাওয়েল-কথিত "হাসিই আমেরিকার স্বরূপ" মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার স্থলে তাঁহারা আমেরিকায় এমন সব অঘটন ঘটিতেছে দেখিলেন যেগুলি "হাস্যময়ী রূপ" হইতে বহু-দূরস্থিত। আমেরিকা শ্রেষ্ঠ জাতি ও বিশ্ব-শক্তি হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু কিসে? যন্ত্রে, যন্ত্র-উদ্ভাবনে ও পণ্যসম্ভারে

—একটি গোটা জাতি বাষ্প ও ইস্পাতের কীলকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মার অবস্থা কি? উহা গুঁড়া হইয়া যাইতেছে,—আপনা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। সমস্ত মাথা একছাঁচে ঢালাই হইতেছে। প্রতিভা ও আত্মবিকাশ লোপ পাইতেছে। ইহার ফলে নবীন সাহিত্য-রথীগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা-কল্পে এই বিদ্রোহ সুরু করিয়াছেন। যে সমস্ত শক্তি মানুষকে যন্ত্রের নিকট বলি দিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ জানাইতেছেন।

এ প্রতিক্রিয়ার দলপতি ছিলেন আমেরিকার প্রথম কবি এডগার লী মাষ্টারস্। স্ব-প্রবর্ত্তিত যতি লাগাইয়া মুক্ত-বন্ধন ছন্দে "স্পুন রিভার এ্যানথলজি" নামক কাব্যগ্রন্থে আমেরিকার গাঁয়ের নানা ছবি আঁকেন। এমন মনোহর ছবি মার্কিন সাহিত্যে পূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নাই। মৃত ব্যক্তির অদ্ভুত স্বগতোক্তির ভিতর দিয়া কী মনোজ্ঞ কাব্যরচনাই যে করিয়াছেন, পড়িলে মনে হয়, পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট সহরখানি যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে।

পুস্তকের প্রত্যেক কবিতাটিতে এই একই ভাব পরিলক্ষিত হয়। উহাতে প্রকৃতির হাস্যময়ী রূপ নাই, আছে পিঙ্গল, নিরানন্দ, বীভৎস রূপ। ইহার ভিতর দিয়া মাষ্টার্স দেখাইয়াছেন সভ্যতার ফলে গ্রামের, ছোট ছোট সহরগুলির কি ভীষণ অবস্থা ঘটিতেছে। জীবনকে কে যেন শুষিয়া লইয়াছে, তাহার শিকড় শুকাইয়া গিয়াছে। এ আবেষ্টনের ভিতর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান টিকিতে পারে না, মানুষের অন্তরাত্মা বাঁচিতে পারে না।

বর্ত্তমান কাব্যের অধিকাংশের ভিতর ঐ একই বিরোধ, কেবল পটের তফাৎ। মাষ্টার্স গ্রামের জন্য যে অভিযোগ করিয়াছেন, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ সহর লইয়া সেই লড়াই করিয়াছেন। "ধোঁওয়া ও ইস্পাত" কাব্যে ভীষণ চীৎকার করিয়াছেন। ভ্যাকেল লিণ্ডসে এ যুদ্ধের গোড়ার দিকে অধিকতর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি রবিনসন ফ্রষ্টের কাব্য, যাঁর বিষয়বস্তু নদীতট বা শান্তিপূর্ণ পর্ণকুটীরের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে কাব্য-প্রেরণার জন্য, তিনি পর্য্যন্ত এই হাহুতাশে যোগ দিতে ছাড়েন নাই। ফ্রষ্টের কাব্য বিষাদে পূর্ণ নহে, একটু হ্লাদ-ময়ী, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার প্রাণ-প্রতিম গ্রামগুলিতে এবং সারা আমেরিকাময় কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে সে ছাপ যে তাঁহার কাব্যে পড়ে নাই এমত নহে। এড্উইন আরলিংটন রবিনসনের কাব্যেও উহা বর্ত্তমান। রবিনসনের "প্রভু" কবিতায় দোকানীর বয়স ও গুণের নিরিখ বলিয়া যে বিদ্রূপাত্মক লাইনটি আছে তাহাতে আমাদের একালের উপর তাঁর বিরক্তির ভাব প্রতিফলিত হইতেছে।

"স্পুন রিভার এ্যানথলজি"তে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি সেই সমস্ত কথা এ যুগের উপন্যাসেও দেখি। "কান্ট্রী পিপিল্" গ্রন্থে রুথ সাকোর চাষীরা মাষ্টার্সের "স্পুন রিভার এন্থলজি"র অনুরূপ। উইলা ক্যাথারের উপন্যাসে, বিশেষ তাঁহার "মাই এ্যান্টোনিয়া" ও "প্রফেসার্স হাউস" গ্রন্থদ্বয়ে, সীমান্তপ্রদেশ, এবং চাষ-আবাদ বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি আদি-কৃষাণদিগের কি হইল তাহার জ্বলন্ত ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। সার উড্ এ্যান্ডারসন্—"উইনেস্বার্গ, ওহিয়ো, ষ্টোরিটেলার্স ষ্টোরি এবং পুয়ার হোয়াইট" গ্রন্থে ঐ একই বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। এই সকল ঔপন্যাসিকেরা আমেরিকার গ্রাম্য-সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার যথাযোগ্য রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে সবগুলিই মার্কিনী উপন্যাস হইয়াছে আমেরিকার নিজস্ব সম্পদ। উহাতে অনুকরণের নামগন্ধ নাই। এ্যান্ডারসনের "উইনেস্বার্গ, ওহিয়ো" যেমন মার্কিনী রসে ওতপ্রোত, তেম্নি দেশের খাঁটি জিনিষ—ফ্রষ্টের "নর্থ অফ্ বোস্টন", মাষ্টার্সের "স্পুন রিভার এ্যান্থলজি" এবং লিণ্ডসের "কনগো"। এই সকল গ্রন্থকারেরা কেবল যে তাঁহাদের উপাদান-সংগ্রহের জন্য দেশের চিত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা নহে, উহাকে জন্ম-পত্রিকার মত খাঁটি স্বদেশী রূপ ও ছন্দ দিয়াছেন।

আমেরিকার এই নবধারার ভিতর **সিনক্লেয়ার লিউইসের** অপেক্ষা কেহই লোকচক্ষে অধিকতর উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। "মেন ষ্ট্রীট" গ্রন্থে লিউইস "স্পুন রিভার এ্যান্থলজি"র গদ্যময়ী বিবৃতি প্রকাশ করেন। লিউইসের মধ্যে ব্যঙ্গের এক টা ক্ষমতা ছিল যাহা মাষ্টার্সের লেখায় নাই। বিদ্রূপাংশ ছাড়িয়া দিলে সহুরে-জীবনের ফাঁকা ফাঁকা ভাব, বাসন্দের অন্তঃসারশূন্যতা,

ভণ্ডামি ও ছোটলোকামি ইত্যাদি উনি অতি নিখুঁত করিয়া আঁকিয়াছেন—ঠিক যেন একখানি ফটোগ্রাফ। "ব্যাবিট্" প্রহসনের চূড়ান্ত। ইহাতে আমেরিকার স্বরূপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এমন সরস রচনা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। "ব্যাবিট" আমেরিকার আসল মূর্ত্তি, ষোল-আনা স্বদেশী চিত্র। জেনীথ্ হুবহু মার্কিনী নগরী-মূর্ত্তি—মার্কিনী ছাড়া অন্য কিছু হইতেই পারে না। এল্মা গ্যান্ট্রী যেন ঘরের লোক। প্রহসনে বিদ্রূপের ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত মার্কিনী। খাঁটি আমেরিকান ছাড়া এমন লেখা অন্য লোকে লিখিতে পারে না। *

থিয়োডোর ড্রেইসারের উপন্যাস ও ইউজিন ও'নীলের নাটকে গ্রাম বা ক্ষুদ্র সহরের কথা প্রায়ই নাই। ও'নীলের গোড়ার দিকের লেখায় এজাতীয় চিত্র অল্পস্বল্প আছে বটে কিন্তু ইদানীন্তন লেখায় সে ঝোঁক আর পরিলক্ষিত হয় না। ও'নীল ও ড্রেইসার দুইজনেই যন্ত্র ও নগর লইয়াই ব্যস্ত। ও'নীল ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী লেখকগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে উপন্যাসের মত নাটকও অ-মার্কিনী ছিল। বিংশ শতাব্দীতে, আমেরিকা বিশ্ব-ব্যাপারে আসিয়া পড়াতে, সাহিত্য ও নাটকে একটা প্রাণ আসিল। মুডির "দি গ্রেট্ ডিভাইন ও দি ফেৎ হিলার" প্রভৃতি নাটক খাঁটি নাটকের দ্যোতক। উহার প্রকাশের পর হইতেই ফিলিপ ব্যারি, সিড্নে হাওয়ার্ড, পল গ্রীন এবং ইউজিন ও'নীল প্রভৃতির নাটক দেখা দ্যায়। অন্য নাট্যকার অপেক্ষা ও'নীলই বরং আমেরিকার চিরন্তন রূপটি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য নাট্যকার নামমাত্র ছুঁইয়া গিয়াছেন, উনি কিন্তু "দি হেয়ারী এ্যপ্, ষ্ট্রেঞ্জ্ ইণ্টারলিউড, ডাইনামো" প্রভৃতি গ্রন্থে আমেরিকার আব্হাওয়ার ভিতর দিয়া স্বদেশের সমস্যার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। অভিনব তাহার রূপ,—কিন্তু হুবহু মার্কিনী তাহার প্রকাশভঙ্গী। ও'নীলের নাটকে ইংরাজী হইতে প্রেরণা লওয়া হয় নাই। তিনি শিল্প-কৌশলের সৌষ্ঠব বাড়াইতেছেন এবং স্বীয় পট ও বিবৃতি অনুসারে এক নূতন নাট্য-শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

ড্রেইসারের উপন্যাসের সহিত ও'নীলের নাটকের সৌসাদৃশ্য আছে। দুইজনের রচনাতে একই বিফলতাবাদ চলিয়াছে। ড্রেইসার বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্যা লইয়া বিভোর। ও'নীল ওকথা যদিও বিশেষ পাড়েন নাই, কিন্তু উনিও ড্রেইসারের মত, আমেরিকায় মানুষের অবস্থা যে কি ঘটিতেছে তাহা লইয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ড্রেইসারের উপন্যাসে একটা হতাশার সুর লাগিয়া আছে। বর্ত্তমান সমাজে মানুষের কি ভীষণ দুর্গতি! ব্যক্তির উপরে অজানা শক্তির আধিপত্য তাঁহার মস্তিষ্ককে নিয়ত পীড়া দিয়াছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিবিশিষ্ট তাঁহার সুন্দর হৃদয়খানি এই দুর্দ্ধর্ষ শক্তির প্রভাবে নিয়ত চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে। নিয়তির ভয়-ভীষণ ছায়াসমূহ যেন তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং তাঁহার পরাজয় সূচিত করিতেছে। ড্রেইসার ও ও'নীলের সকল রচনাতেই এই হতাশার সুর। "দি ট্যাইট্যান, দি ফাইন্যানসিয়ার, ও দি আমেরিকান ট্র্যাজিডি" নাটকে এ ভাব খুবই জ্বলজ্বল্ করিতেছে। এবং "বিয়ণ্ড দি হোরাইজন, দি হেয়ারী এ্যপ, ডিজায়ার, ষ্ট্রেঞ্জ ইন্টারলিউড, ডাইনামো" প্রভৃতি নাটকগুলি এই দর্শনবাদের উল্টাভাব প্রকাশ করিলেও তাহার শক্তি কিছু কম নহে। যেমন, "ডাইনামো" নাটকে ও'নীল "বিয়ণ্ড দি হোরাইজন"কে এবিষয়ে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত নাটকে যন্ত্র বিশেষ কোন অংশ লয় নাই। বস্তুতঃ-পক্ষে যন্ত্র হঠাৎ একটা রূপক হইয়া উঠিল—একটা রাক্ষস, একটা পিশাচ-দেবতা। মানুষ উহার ইন্দ্রজালের বিপাকে পড়িয়া উহার ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর যন্ত্রেরই জয় হইতে থাকিবে—তাহার নির্ম্মাতার নহে।

এই বিপুল সংগ্রাম যে বর্ত্তমান মার্কিন সাহিত্যে এরূপ জীবন্ত শক্তি আনিতে পারিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, মানুষ এই সঙ্ঘবদ্ধ যান্ত্রিক সমাজে আপনাকে পুরাপুরি মিলাইতে পারিতেছে না; ব্যক্তিবিশেষের সংস্কারের বাহিরে এই সামাজিক সাম্য-সামে গড়া জগতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ রক্ষা করার ব্যর্থ প্রয়াস উহাকে দগ্ধ করিতেছে। বিশেষ করিয়া শিল্পীগণ, যাঁহারা জীবন-সংগ্রামে আপন ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যাইবার মুখে

* ১৯৩০ সালের সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ ইঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

আসিয়াছেন, তাঁহারা এই বিপর্য্যয়ের সংহার-মূর্ত্তি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছেন। আমেরিকার 'ইন্‌ডাস্ট্রী'র উন্নতির সহিত এই যে সমস্ত মানুষকে এক-সাটে গাঁথা, সমস্ত শিল্পকে ব্যবসাদারিতে আনিয়া ফেলা, প্রভৃতি যাবতীয় চিত্রগুলি মার্কিন আর্টিষ্টগণ আক্রমণ করিতে সুরু করিয়াছেন। এই সাটে-ফেলা ও ব্যবসাদারগিরিকেই সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস বিদ্রূপ করিয়াছেন, উপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার ইহার নিন্দা করিয়াছেন এবং থিয়োডোর ড্রেইসার আক্ষেপ করিয়াছেন।

সমালোচনার ক্ষেত্রেও এই দ্বন্দ্বের নূতনতর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ-অভিযান আধুনিক রূপদক্ষ ও সমালোচকের জন্য নূতন রণ-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে। মানবতাবাদীর দল, আরভিং ব্যাবিট ও পল এল্‌মার মোরের সেনাপত্যে বর্ত্তমান যুগের ভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক-যুগের প্রতি বিরোধ সুব্যক্ত। মীমাংসা স্বরূপ তাঁহারা দ্বৈতবাদের উপর ঝোঁক দিতেছেন; ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট বিচারজ্ঞান দেখা যায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী হিসাবে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে মানুষকে বাঁচান ও সেই সঙ্গে যন্ত্রকেও অক্ষুণ্ণ রাখা এ দুইটি কাজের সমন্বয় কোনক্রমেই সম্ভব নহে। ইহার নিমিত্ত মূল্যামূল্যের নিখুঁতিস্বরূপ তাঁহারা বিজ্ঞানের স্থলে প্রজ্ঞানের দিকে অধিকতর ঝোঁক দিতে-ছেন। বিরুদ্ধবাদীরা নব-মানবতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সমস্যা, বর্ত্তমানে যাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া উহাতে যে ধর্ম্মের ছোপ রহিয়াছে তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অনেকখানি সময় নষ্ট করিতেছেন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক মিষ্টার মেঙ্কেনের আধিপত্য যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ এই জটিল ও দুর্দ্ধর্ষ সমস্যার বিরুদ্ধে তিনি আর ইন্ধন যোগা-ইতে পারিলেন না।

পুরাপুরি দেশজ হইয়া উঠায় মার্কিনী সাহিত্যে নব-নব সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। জেম্‌স ব্রঞ্চ ক্যাবেল কিম্বা থরনটন উইল্ডারের মত যাঁহারা এড়াইয়া চলিবেন, তাঁহারা পইকটেস্‌মি বা পেরু অভিমুখে যাইতে পারেন উপাদান-সংগ্রহের জন্য, নহিলে এই সকল নূতন সমস্যা লইয়াই চলিতে হইবে—জন ডস্‌ প্যাসস্‌, মাইকেল গোল্ড এবং আর্‌নেষ্ট্‌ হেমিংওয়ে প্রভৃতি লেখকগণের মত। *

"মানুষ হ'য়েছে তাই যুগে যুগে নিজে ভগবান!—"

শ্রী নরেন্দ্র দেব

দিনান্তের ক্লান্ত অন্ধকারে
সহসা হারায়ে পথ
সেদিন আমার রথ
থেমেছিল তব রুদ্ধদ্বারে;
গভীর হতেছে দেখে রাত
দুয়ারে করেছি করাঘাত
ডেকেছি আগ্রহে বারে বারে।
ভেবেছিনু হেথা বুঝি আছে মোর মরমী আপন
ফিরিতেছি যারে খুঁজি এতকাল নিখিল ভুবন।

সাড়া দিয়ে আমার আহ্বানে
বাহিরিলে দ্বার খুলি,
হাতের প্রদীপ তুলি
বিস্ময়ে চাহিলে মুখ পানে।
মুহূর্ত্তে মিলিল পরিচয়,
আঁখি তব ঘোষিল অভয়
পথিকে তুষিল প্রীতিদানে।
প্রসন্ন হাসিতে তব ধন্য হ'লো অতিথির প্রাণ,
অন্তরে জাগিল আশা—বুঝি তার পেয়েছি সন্ধান!

---

* কারেন্ট হিষ্ট্রী হইতে।

এলো নেমে কী যেন আবেশ!
আনমনে হে সুন্দরী!
যেন স্বপ্ন অনুসরি'
এ মন্দিরে করিনু প্রবেশ;
তোমারে মানসী জেনে মোর
নয়নে লাগিল কি যে ঘোর,
ধ্বংস হ'লো সংশয়ের লেশ!
উঠিল সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপি পুলকের অপূর্ব্ব স্পন্দন
আনন্দের অরবিন্দ মুঞ্জরিল সঞ্জীবিয়া মন!

কে জানিত' সকলি সে ভুল!
তুমি দেবী, নহ নারী,—
জানিলে এ পথচারী
চরণে সঁপিত কি গো ফুল?
কেন ওগো, কহিলে না ডেকে—
"ফিরে যাও এ মন্দির থেকে
আমি দেবী জগতে অতুল!
দেবতার বধূ শুধু অমর-সঙ্গমে তৃপ্ত হই;
তুমি যারে খুঁজে ফেরো—পান্থ! আমি সে মানবী নই!"

এতদিনে জানিয়াছি আজ,
তুমি দেবী—নিরুপমা—
নহ, নহ প্রিয়তমা,
সেদিন চিনিনি তব সাজ।
এসেছিলে চির-চেনা বেশে
সোহাগে ধরিনু হাত হেসে,
স্মরণে শিহরে মনে লাজ!
আমার ঈপ্সিতা সে-তো দেবী নয়, সে যে শুধু নারী,
স্নেহে প্রেমে করুণায় মরুমাঝে মমতার ঝারি!

নহে সে-তো স্বর্গের প্রতিমা,
মর্ত্ত্যের মাধুরী সে যে,
সুখে দুখে ওঠে বেজে;
কল্পনায় মেলে তার সীমা!
সে আমার চিরন্তনী প্রিয়া,
ভালোবেসে গিয়েছে রাখিয়া
এ ভুবনে নারীর গরিমা।
অলোক-সুষমা তুমি, সুদুর্লভ, স্বর্গের বাঞ্ছিতা,—
তোমারে চাহিনি আমি কোনোদিন ওগো অনিন্দিতা!

পথহারা এ পথিকে তুমি—
কেন ডেকে নিলে ঘরে?
কেন হেন সমাদরে
অধীর অধর তার চুমি,
ব'লেছিলে—"হে পরাণ-প্রিয়!
তুমি মোর চির-বন্দনীয়,
এ হৃদয় তব রাজ্যভূমি!"
সেদিন বলিতে যদি—"ভুল ক'রে আসিয়াছ মিতা,
ত্রিদিবের দেবী আমি, নহি তব জীবন-দয়িতা—"

তাহ'লে এমন ক'রে আজ,—
মর্ম্মে মোর মর্ম্ম-ভাঙা
বিঁধিত না রক্ত-রাঙা
অসুর-জর্জ্জর-করা বাজ!
সেদিন বুঝিলে মোর ভুল
ফিরিয়া যেতাম ল'য়ে ফুল,
—দেবী-পূজা নহে মোর কাজ
মনের মানুষে খুঁজি ফিরিতাম ভুবনে আবার
সমস্ত জীবন ধ'রে ধরণীর এপার-ওপার!

জানি, তুমি খেলিয়াছ খেলা;
মানুষে ভেবেছো দীন,
তবু কেন হেন হীন—
প্রাণ ল'য়ে করো হেলা-ফেলা?
ভালোবেসে যে রমণী দেবী—
বিধাতা কৃতার্থ তারে সেবি!
স্বর্গের দেবীরে তাই লজ্জা দেয় মৃত্তিকার মেয়ে!
মানুষ নহেক দীন প্রেমহীন দেবতার চেয়ে।

স্বর্গ নিজে গ'ড়ে তোলে, তারা!
সৃজন-পালন-লয়
মানুষের ঘোষে জয়,
ত্রিলোকে অক্ষয় তার ধারা!
মাটির এ মানুষের কাছে
বার-বার হার মানিয়াছে
তোমাদের দেবতা যাহারা।
প্রেমের অমৃত-পানে মৃত্যুঞ্জয়ী মোরা মহাপ্রাণ,
মানুষ হ'য়েছে তাই যুগে যুগে নিজে ভগবান!

মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

পণ্ডিত শ্রী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

বিগত সংখ্যায় "ব্রহ্মবাদিনী মহিলা" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিশ্রুতি অনুসারে মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনের সার ভাগ যতদূর সহজ ভাবে পারি বলিতে চেষ্টা করি। যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু ছিলেন উদ্দালক আরুণি (বৃহদারণ্যক ৬,৩,৭)। আরুণি যখন দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহে বারো বৎসর বেদাধ্যয়ন করিয়াও পরমতত্ত্ব শিখে নাই, কেবল বেদের কর্ম্মকাণ্ডই শিখিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে পরাবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, যেমন স্বর্ণ, লৌহ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত একটি বস্তুর প্রকৃতি জানিলেই স্বর্ণ, লৌহ ও মৃত্তিকা-ঘটিত সমস্ত বস্তুই জানা হয়, তেমনি এমন একটি বস্তু আছে যাহাকে জানিলে সমস্ত জগৎই জানা হয়, কারণ জগতের সমস্ত বস্তুই তাহা হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতেই স্থিত। "সেই বস্তুই সত্য, সেই বস্তু আত্মা, সেই বস্তু তুমি।" "তৎ ত্বম্ অসি"—তাহা তুমি অর্থাৎ বিশ্বাত্মাই জীবের আত্মা, এই উপদেশ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য এই উপদেশের সার গ্রহণ করিয়া তাহা গুরুর প্রণালী হইতে ভিন্ন প্রণালীতে মৈত্রেয়ী ও জনকের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যে মৈত্রেয়ীর অমৃতত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি আমার প্রিয়াই ছিলে, এখন আমার প্রেম বর্দ্ধিত করিলে," সেই কথা ধরিয়াই বলিতে লাগিলেন—পত্নী যে পতির প্রিয় তাহা পতির জন্য নহে, আত্মার জন্য; পতি যে পত্নীর প্রিয় তাহা পত্নীর জন্য নহে, আত্মার জন্য; তেমনি পুত্র, কন্যা, ধন, স্বজাতি, অন্য প্রাণী, অন্য বস্তু যে আমাদের প্রিয়, তাহা ঐ সকল বস্তুর জন্য নহে, আত্মারই জন্য। অর্থাৎ ঐ সকল বস্তু যদি অনাত্ম হইত, আমরা যদি ইহাদের মধ্যে আত্মাকে না দেখিতাম, তবে ইহাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা, আমাদের আত্মভাব হইত না। আমরা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে ইহাদের মধ্যে আত্মাকে দেখি, তাহাতেই এই সমুদায়ের প্রতি আমাদের প্রেম যায়। যিনি স্পষ্টভাবে সকলের মধ্যে আত্মাকে দেখেন তাঁহার কাছে সকলই প্রিয় হয়,—"আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" সুতরাং আত্মাকে দেখিতে হইবে,—'দ্রষ্টব্যঃ'। আর দেখিতে হইলে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আত্মার কথা শুনিতে হইবে,—'শ্রোতব্যঃ'। শুনিয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা বুঝিতে হইবে,—'মন্তব্য'। বোঝার পর গভীরভাবে আত্মার ধ্যান করিতে হইবে,—'নিদিধ্যাসিতব্য'। নিদিধ্যাসনের ফল—দর্শন। আত্মাকে দেখিলে বোঝা যাইবে যে সাধারণ লোকে যে জগতের বস্তুগুলিকে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে এবং আত্মাকে শরীরে বদ্ধ একটি ক্ষুদ্র বস্তু মনে করে, তাহা ভুল। যাজ্ঞবল্ক্য এক একটি বস্তুর নাম করিয়া বলিয়াছেন, এই বস্তুকে যে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, এই বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ তাহাকে নিজস্বরূপ জানিতে দেয় না। প্রকৃতপক্ষে "এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদয় বস্তু তাহাই যাহা এই আত্মা।" জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদের চিন্তা লৌকিক চিন্তা হইতে কত ভিন্ন, পাঠক-পাঠিকা এখন তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। ভিন্ন বলিয়াই সেই তত্ত্ব গভীরচিন্তা-বিহীন লোককে বুঝান অতি কঠিন। যাজ্ঞবল্ক্য দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ অবলম্বন না করিয়া কয়েকটি উপমা দ্বারা মৈত্রেয়ীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জগৎকে যে লোকে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মাকে পৃথক মনে করে, তাহা অসঙ্গত। বাদ্যমান দুন্দুভি, শঙ্খ বা বীণার শব্দ শুনিয়া যদি কোন বালক বলে সেই শব্দ তাহাকে ধরিয়া দিতে হইবে, কিন্তু দুন্দুভি, শঙ্খ বা বীণা সে চায় না, তাদের বাদককেও চায় না, তাহার আবদার যেমন অসঙ্গত, দৃষ্ট রূপ, শ্রুত শব্দ, আস্বাদিত রস, দৃষ্টি, শ্রবণ ও আস্বাদন হইতে, অর্থাৎ দ্রষ্টা, শ্রোতা ও আস্বাদয়িতা হইতে,

পৃথকভাবে আছে, এই কথা বিশ্বাস করাও তেমনি অসঙ্গত; অথচ তত্ত্বজ্ঞানহীন লোক,—বিদ্বান্ অবিদ্বান সকলেই তাহা বিশ্বাস করে। একটা অনাত্ম অচেতন জগৎ স্বতন্ত্রভাবে আছে, ইহার সাক্ষী বা আধাররূপী কোন আত্মা থাকিতে পারেন, কিন্তু না থাকিলেও জগতের থাকিতে কোন বাধা নাই, এই ধারণাই সাধারণ লৌকিক ব্যবহারের ভিত্তি। লোকে মনে করে এরূপ কোন আত্মাকে তো দেখি না, শুনি না, স্পর্শ করি না, তবে আর উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইব কিরূপে? দেখা শোনা প্রভৃতি, যাতে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এ-রকম দুটা পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব বুঝায়, তাকেই লোকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মনে করে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলেন আর একটা উচ্চতর প্রমাণ,—আর এক রকমের দেখা আছে; শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহা সম্ভব হয়। সেই দেখাতে প্রকাশ পায় গোটা বস্তু একটাই, সেই বস্তু আত্মা, আমরা যাকে নিজ আত্মা বলি সেই আত্মাই,—আর জগৎ তার বিশ্বরূপ। সেই বস্তু যখন এক,—দ্রষ্টা দৃষ্ট দুইই,—তখন চক্ষু দিয়া তাহাকে কিরূপে দেখা যাইবে? চক্ষুর দেখাতে তো প্রকৃত বস্তু দ্বিধা হইয়া যায়, আর এই দ্বৈতভাব তো ভুল। আরুণি শ্বেতকেতুকে যে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যও মৈত্রেয়ীকে সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝাইতেছেন যে সৈন্ধবখণ্ড জলে রাখিলে মিলাইয়া যায়, আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহাতে জলটা সমস্ত লবণাক্ত হইয়া যায়; যেখান হইতে জল লইয়া আস্বাদন কর সেখানকার জলই লবণাক্ত বোধ হয়। তেমনি বিশ্বে বিশ্বাত্মাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ কর না বটে, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপে, বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়া আছেন; আত্মজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে একবারে অন্তরাত্মারূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। লোকে মনে করে বিশ্ব আছে ও থাকিবে, কিন্তু বিশ্বাত্মা আছেন কিনা সন্দেহ,আর জীবাত্মা দেহপাতের পর থাকিবে কিনা তাহাতে আরো সন্দিগ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্ব, বিশ্বাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব দেখাইয়া জীবাত্মার অমৃতত্ব নিঃসন্দিগ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার প্রমাণ বুঝিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহার ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদ মূলে সত্য। পরমাত্মার বাহিরে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু বা আত্মা থাকিতে পারে না, এবং জীবাত্মা পরমাত্মামার অমরত্বে অমর,একথা ঠিক। কিন্তু একটা প্রশ্ন মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে অমীমাংসিত থাকে,—যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ নির্ব্বিশেষ কি বিশিষ্ট? এক অদ্বিতীয় বিশ্বাত্মার ভিতরে রূপরসাদি অসংখ্য বস্তু এবং মনুষ্যাদি অসংখ্য জীবাত্মা আছে, না বহুত্বমাত্রই ভুল, পরমাত্মা একলা, একাকী? পরমাত্মার জ্ঞান অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু আমরা অজ্ঞানতা হইতে জ্ঞানে যাই, জ্ঞান হইতে অজ্ঞানতায় যাই। আমরা জানিয়াও ভুলি, ভুলিয়া আবার স্মরণ করি। আমরা ঘুমাইয়া সমস্ত জ্ঞান হারাই, আবার জাগিয়া সমস্ত ফেরৎ পাই। এসকল পরিবর্ত্তন কাহার? জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ না পড়িলে এবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মত ভাল বোঝা যায় না। সেই সংবাদ আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্রাহ্মণে। তাহাতে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্যের ঝোঁকটা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের দিকে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে প্রজাপতি নামক ঋষি এবং কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে প্রজাপতির শিষ্য ইন্দ্র বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আচার্য্যদের তো কথাই নাই, উপনিষদের ঋষিদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত, অন্ততঃ দুটা ভিন্ন মত আছে। "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।" তাহাতে ক্ষতি নাই। বিভিন্ন মতের তুলনা ও বিচার ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। যাঁহাদের ইচ্ছা হয় ঋষিদের উক্তি শ্রদ্ধার সহিত অথচ যুক্তচিত্তে পাঠ করিবেন। সম্ভব হইলে পরে 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে এবিষয়ে আরো কিছু লিখিতে পারি।

এ-পিঠ ও ও-পিঠ

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

এ-পিঠ

এই বছর কুড়ি আগের কথা। তখন আমি কিছুদিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলাম। সেই সময় একবার কার্য্যোপলক্ষে আমাকে কলিকাতায় সপ্তাহ খানেকের জন্য আস্‌তে হয়েছিল। কলিকাতায় তখনও আমার অনেক বন্ধু ছিলেন। তাঁদের একজনকে আমার আস্‌বার কথা জানালে তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, আমিও সানন্দে তাঁর গৃহে কয়েক দিন থাকব ব'লে সম্মতি জানালাম।

যথাসময়ে তাঁর বাড়ীতে এসে উঠলাম। তিনি বেশ বড় চাকুরী করেন; মাসে পাঁচ ছয় শত টাকা তাঁর উপার্জ্জন। সংসারে তাঁর বৃদ্ধ পিতা আছেন, মা অনেকদিন পূর্ব্বে মারা গিয়েছেন। এই বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী ও দুইটী পুত্র—এই তাঁর সংসার। বাপ কাজকর্ম্ম করেন না, উপযুক্ত পুত্রের উপার্জনের উপর নির্ভর ক'রে দিন যাপন করেন।

বাড়ীটি ছোট, পুরানো। উপরে খানকয়েক ঘর, নীচেও তাই; এ ছাড়া নীচে উঠানের পাশে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর আছে। উপরের একটী বড় ঘরই বন্ধুবরের বৈঠকখানা; বেশ সাজানো-গোছানো। একপাশে টেবিল চেয়ার আলমারী সোফা আছে, আর একদিকে ফরাস বিছানাও আছে। নীচেও একটা বৈঠকখানারই মত ঘর আছে। তাতে সাজগোছ নেই বল্‌লেই হয়; খানদুই চৌকী পাতা আছে আর তার উপরে মাদুর, দেওয়ালের দিকে গোটাদুই বিছানা জড়ানো আ'ছে। আমি প্রথমে গিয়ে নীচের এই ঘরটার মধ্যেই উঠে'ছুলাম; তাই এ ঘরের আস্‌বাব-পত্র দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমার উপস্থিতির সংবাদ পেয়েই বন্ধু মহাশয় উপর থেকে নেমে এসে আমাকে উপরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানেই আমার অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন।

আমি পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যার পর। রাত্রিতে যখন আহার করতে বস্‌লাম, তখন বন্ধু ও তাঁর দুটী ছেলে আমার সঙ্গে খেতে বস্‌লেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কৈ, আপনার বাবা খাবেন না? তাঁর সঙ্গে যে দেখাও হোলো না।"

বন্ধু বল্‌লেন, "বাবা আজ বাড়ীতে নেই, ফরাসডাঙ্গা গিয়েছেন, কা'ল বিকেলে আস্‌বেন।"

তারপর আহারাদি শেষ ক'রে উপরের বৈঠকখানাতেই বিশ্রাম করলাম। পরদিন আমাকে ন'টার মধ্যে বেরুতে হবে, বন্ধুও ন'টাতেই আফিসে বেরুবেন, তাই তাঁর সঙ্গেই আহার ক'রে, তাঁরই গাড়ীতে বে'র হলাম। পথের মধ্যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি আফিসে চ'লে গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, তাঁর পিতা নীচের ঘরের বারান্দায় একখানি বেঞ্চের উপর ব'সে আছেন। তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। সেখানে ব'সে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ছি, এমন সময় বন্ধু মহাশয় আফিস থেকে ফিরে এলেন এবং আমাকে ডেকে নিয়ে উপরে উঠলেন।

রাত্রিতে আহারের সময়ও বন্ধুর পিতাকে আমাদের সঙ্গে ব'সে আহার করতে দেখলাম না। আহারের পর, কি জন্য ঠিক মনে নেই, আমি একবার নীচে নেমে এসেছিলাম। নীচের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে আমি সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি সেই ঘরেরই এক পার্শ্বে ব'সে বন্ধু মহাশয়ের পিতা আহার করছেন। আর সে আহার্য্যদ্রব্য কি জানেন?—খুব মোটা চাউলের ভাত, একটা বাটীতে খানিকটা ডা'ল, আর থালার পার্শ্বে খানিকটা চচ্চড়ি, আর কিছু না। এদিকে এই একটু আগেই বন্ধু মহাশয়, ও তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে ব'সে আমি যা আহার করলাম, সে যে কত-কি, তার পরিচয় দিতেও এতদিন পরে ঘৃণা বোধ হ'চ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে মনটা যে কি রকম খারাপ হ'য়ে গেল, তা

আর বলতে পারিনে; ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান ত্যাগ করি। তা আর হোলো না। উপরে চ'লে গেলাম।

বন্ধু মহাশয় শয়ন করতে গেলেন। তাঁর চাকর আমার বিছানা ঠিক ক'রে দেবার জন্য যখন এল, তখন তাকে উপরের বারান্দায় ডেকে নিয়ে কর্ত্তাবাবু কোথায় শুয়ে থাকেন, কি আহার করেন জিজ্ঞাসা করলে সে যা বিবরণ দিল, তার সার মর্ম্ম এই যে, তার মা-ঠাকুরাণী (বন্ধু মহাশয়ের স্ত্রী) বাড়ীর মনিব। তাঁর হুকুমে সব চলে। কর্ত্তাবাবু শুয়ে থাকেন নীচের ঘরের একখানি চৌকীর উপর। দ্বিতলে তাঁর উঠবার হুকুম নেই। তিনি নীচের ঐ স্যাঁতসেঁতে ঘরেই থাকেন। বাড়ীর রান্না দুই স্থানে হয়—উপরের রান্নাঘরে বামুনঠাকুর রাঁধে বাবু, গিন্নী আর তাঁর দুই ছেলের জন্য, আর নীচে রাঁধবার জন্য একটা ব্রাহ্মণের মেয়ে আছে। সেই রান্না খান কর্ত্তাবাবু, আর চাকরবাকর, ঝি, বামুন-সবাই। নীচে যাঁরা আহার করেন, তাঁদের জন্য গিন্নী মোটা চাউলের ভাত, ডা'ল, চচ্চড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন; মধ্যে মধ্যে যদি তাঁর হুকুম হয়, তা হ'লে সামান্য মাছেরও ব্যবস্থা হয়। সে কদাচিৎ। চাকরটী বড় ভাল মানুষ। সে শেষে বল্‌ল—"বাবুজি, আজ আট-নয় বছর এ বাড়ীতে চাকরী করছি। এই ভাবই দেখে আসছি। বুড়ো কর্ত্তা-বাবুর যে কি কষ্ট হয়, তা আর আপনাকে কি বলব। আমি কতদিন তাঁকে বলি, 'কর্ত্তা, যেদিক দুই চোক যায়, চ'লে যান না। একটা পেটই ত, যেমন ক'রে হয় চ'লে যাবে।' তা কি তিনি শোনেন; চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বলেন, 'ওরে নিমাই, তোর ছেলে নেই, নাতি হয় নি, তাই বুঝতে পারিস নে। ওদের ছেড়ে কি আমি থাক্‌তে পারি? আমার কোন কষ্ট হয় না নিমাই, দিন গেলে ওদের মুখ দেখে আমি সব ভুলে যাই।' এর উপর ত কথা চলে না বাবু, কি বলেন?"

আমি আর কি বল্‌ব। নিমাই চ'লে গেল; আমি সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যে ভাবলাম, তা এতদিন পরে আর কি বল্‌ব। কোন রকমে রাতটা সেই পাপগৃহে কাটিয়ে সকালবেলাই বন্ধুর অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা ক'রে সে-স্থান ত্যাগ করলাম। সে যাত্রায় আর যে দুই তিন দিন কলিকাতায় ছিলাম, আর কোন বন্ধুর বাড়ী না গিয়ে শিয়ালদহের একটা হোটেলেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

এই হোলো এ-পিঠ।

ও-পিঠ

উপরি-উক্ত ঘটনার চার কি পাঁচ বছর পরের কথা।

সে সময় নানা পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য আমাকে কয়েক মাসের মত কলিকাতার বাসা তুলে দিতে হয়েছিল।

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

আমি স্থির করেছিলাম, যতদিন বাসা না করি, ততদিন কোন একটা 'মেসে' থাক্‌ব; তারপর সুবিধা হ'লে পুনরায় বাসা করব।

আমার এই সঙ্কল্পের কথা শুনে আমার একটী বন্ধু বিশেষ আপত্তি করলেন। তিনি বল্লেন, তাঁর যখন বাড়ী এখানে এবং সে বাড়ীতে যথেষ্ট স্থান আছে, তখন

আমার কোন 'মেসে' থাকা কিছুতেই হবে না—তাঁর বাড়ীতেই থাক্‌তে হবে।

আমার এই বন্ধুটীর অবস্থা ভাল। তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী করেন। আর যথেষ্ট—লোকে বলে তিনি মাসে দুই তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁর বাপ-মা বর্ত্তমান নেই। তাঁরা পাঁচ ভাই, তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। অন্য চার ভাই-ই কৃতবিদ্য এবং তাঁরাও দু-পয়সা উপার্জ্জন ক'রে থাকেন। আমার বন্ধুর সন্তানাদি হয় নাই, অন্য চার ভাইয়েরই অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। সবাই এক বাড়ীতে এক অন্নে থাকেন। সুতরাং পরিবার বৃহৎ। এই পরিবার পরিচালনের ভার সন্তানহীনা বড়-বৌয়ের উপর। তিনি আদেশ করেছেন, অন্য ভাইয়েরা যিনি যা উপার্জ্জন করবেন, তা সংসারে দিতে পারবেন না—তাঁরা নিজের নিজের উপার্জ্জিত অর্থ, যাঁর যেমন ইচ্ছা, তেমনি ভাবে ব্যয় করবেন—সংসার-খরচের জন্য কাহারও নিকট থেকে একটা পয়সাও নেওয়া হবে না—সব খরচ আমার বন্ধু বড়বাবুর উপার্জ্জন থেকে হবে। ছোট ভাইদের ছেলে মেয়েরা কোন কিছুর জন্য তাদের বাপ-মার কাছে হাত পাততে যেতে পারবে না—অন্নপূর্ণা বড়-বৌ সকলের সকল অভাব, সকল আব্‌দার পূরণ করবেন। এই তাঁদের সংসারের ব্যবস্থা। এই আনন্দের হাটে এসে আমি বাসা বেঁধেছিলাম।

দুই-চার দিন যেতেই আমি দেখ্‌তে পেলাম, আমার বন্ধুপত্নী, এই সংসারের বড়-বৌ, ছেলেমেয়েদের জ্যেঠাই-মা, চাকর-ঝিদের 'মা-লক্ষ্মী', সত্যসত্যই দেবীস্বরূপিণী। তাঁর একেবারে কড়া আদেশ ছিল, বাড়ীতে যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলকে সমান ভাবে দেখ্‌তে হবে। উনি বড়বাবু, উনি ছোটবাবু, ওটি সেজবাবুর ছেলে, সুতরাং ওদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে—বড়-বৌয়ের সংসারে এটী হবার যো নেই। চাকর বামুনদের উপর বড়-বৌয়ের আদেশ ছিল, বড়বাবু থেকে আরম্ভ ক'রে রামের-মা ঝি পর্য্যন্ত সবাইকে একই রকম খাদ্যদ্রব্য একই পরিমাণে দিতে হবে—কোন কারণেই কম-বেশী করা হবে না। কেহ অসুস্থ হ'লে সে পৃথক কথা; কিন্তু যাঁরা সুস্থশরীরে এ বাড়ীতে বাস করবেন, তাঁদের ভিতর কোন রকম পার্থক্য এই বড়-বৌয়ের সংসারে হবার যো ছিল না। দিনের বেলায় সকলের এক-সঙ্গে আহার করা সম্ভব ছিল না কিন্তু রাত্রিতে সকলকে একসঙ্গে আহার করতে হবে—এ একেবারে বাঁধা নিয়ম ছিল। আর সেজন্য অনেক সময় আমার বন্ধু বড়বাবুকে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকতে হোতো। তাঁকে যদি আগে আহার করবার জন্য বলা হোতো', তিনি বল্‌তেন—"না, তা হবার যো নেই। বড়-বৌয়ের আদেশ, বাড়ীর কর্ত্তা কাউকে ফেলে রেখে খেতে পাবেন না, সকলের সঙ্গে ব'সে খেতে হবে।"

এই নিয়ম থাকায় যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, যেমন ক'রেই হোক রাত ন'টার পূর্ব্বে বাড়ী আস্‌তেনই, নইলে যে বড়বাবুকে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকতে হবে। এমনই সুন্দর ব্যবস্থা এই বাড়ীর ছিল।

একদিনের একটী ঘটনার কথা বলি। আমি সন্ধ্যার সময় বন্ধুর বৈঠকখানায় ব'সে আছি, এমন সময় একটী চাকর একটা ঝুড়ি নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে একটা জিনিষ আনবার জন্য পয়সা দিতে গেলাম। চাকরটি বল্‌ল, "বাবু, মা-লক্ষ্মী ব'সে আছেন, এখনই কুড়িটা কমলানেবু এনে দিতে হবে; দেরী করলে চল্‌বে না। তাঁর নেবু এনে দিয়ে তারপর আপনার জিনিষ এনে দেব।" এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

সেই সময় আমার বন্ধু ভিতর থেকে বৈঠকখানায় এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়-বৌয়ের এত তাড়াতাড়ি কুড়িটে কমলানেবু আন্‌বার জন্য বাজারে লোক দৌড়িল কেন?"

বন্ধুবর হেসে বল্‌লেন, "ওটা আমারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হয়েছে। কোর্ট থেকে ফিরবার সময় রাস্তার ধারে একজন কমলানেবু বেচছে দেখে আমি পাঁচটা নেবু কিনে এনেছি। সে লোকটার কাছে পাঁচটার বেশী ছিল না। বড়-বৌ পাঁচটা নেবু দেখে হেসেই অস্থির! আমাকে বল্‌লেন, 'আচ্ছা মানুষ তুমি। পাঁচটা নেবু আন্‌লে কোন বিবেচনায়? দুই কোয়া নেবু যদি এক-একজনকে দেওয়া যায়, তাতেও যে পাঁচটা নেবুতে কুলোয় না।' তাই হরেকেষ্টকে বাজারে পাঠালেন নেবু কিন্‌তে।

সেই নেবু এলে বাড়ীর এই ছাব্বিশ জন মানুষকে ঠিক সমান-সমান ক'রে বেঁটে দিয়ে তবে তাঁর অব্যাহতি।"

আমি বল্‌লাম—"ও পাঁচটা নেবু ছোট ছেলেমেয়েদের দিলেই ত হোতো।" বন্ধু বল্‌লেন, 'আমিও ত সেই কথাই বলেছিলাম, তাতে বড়-বৌ বল্‌লেন, 'আমার যে সবাই ছেলেমেয়ে—সবাই সমান—ছোট-বড় কেউই নেই'।"

আমি শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলাম—পাঁচ বছর আগের আর এক বন্ধুর গৃহস্থালীর কথা মনে হোলো।

এই ও পিঠ।

রাজপুতানায় কয়েকদিন

শ্রী হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় এম-বি

মানবজীবনে প্রকৃতির স্বভাব শোভা সন্দর্শন বড় কামনার ধন, কিন্তু চিকিৎসকের কার্য্য লইয়া এ কাব্য উপভোগ বড় দুঃসাধ্য। তবুও দৃষ্টি যখন চতুর্দ্দিকের এই প্রাচীর-ঘেরা মহানগরীর ধূম ও ধূলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতির চিরসন্তান মানবাত্মা প্রকৃতির কোলে ফিরিয়া যাইতে চায়। তাই সহস্র অসুবিধার মধ্যেও দুই-চারি দিনের ছুটি লইয়া স্বভাবরাণীর মুক্ত বক্ষে ভ্রমণ করিয়া যে চোখভরা তৃপ্তি লইয়া ফিরিয়াছি, তাহাই বলিতে চাহি।

২৭শে সেপ্টেম্বর বেলা ৪টায় "তুফান মেলে" রওনা হই। সেদিন মহাপঞ্চমী; দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রাম, নগর, প্রান্তর ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিল। আমার কক্ষে সহযাত্রী যিনি উঠিয়াছিলেন সঙ্গী হিসাবে তিনি অতি উত্তম। বাহিরে স্বল্প চন্দ্রালোকে প্রায়-অদৃশ্যমান জগৎ, ও ভিতরে এই আনন্দময় সঙ্গীর সাহায্যে কখনও নিদ্রায় কখনও গল্পে সমস্ত রাত্রি বেশ কাটিয়াছিল।

ভোরে এলাহাবাদে ট্রেন থামিলে তথায় চা পান এবং বেলা ১১টায় স্নানান্তে একবার "রেষ্টুরেণ্ট-কারে" আহারাদি ভিন্ন নূতন কিছু ঘটে নাই। বেলা ১টায় টুণ্ডলায় ট্রেন বদল করিয়া বেলা ৪টার সময় আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে আসি; সেখান হইতে হোটেল ঠিক করিয়া ওঠা ও আহারাদির ব্যবস্থা করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পরদিন চিরন্তন প্রথানুযায়ী আগ্রার দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করিলাম।

স্বল্প জ্যোৎস্নালোকে যমুনাতটে অপূর্ব্ব রূপসী আজ আপনার চিরবিরহিণী উদাসিনী মূর্ত্তি লইয়া বসিয়া

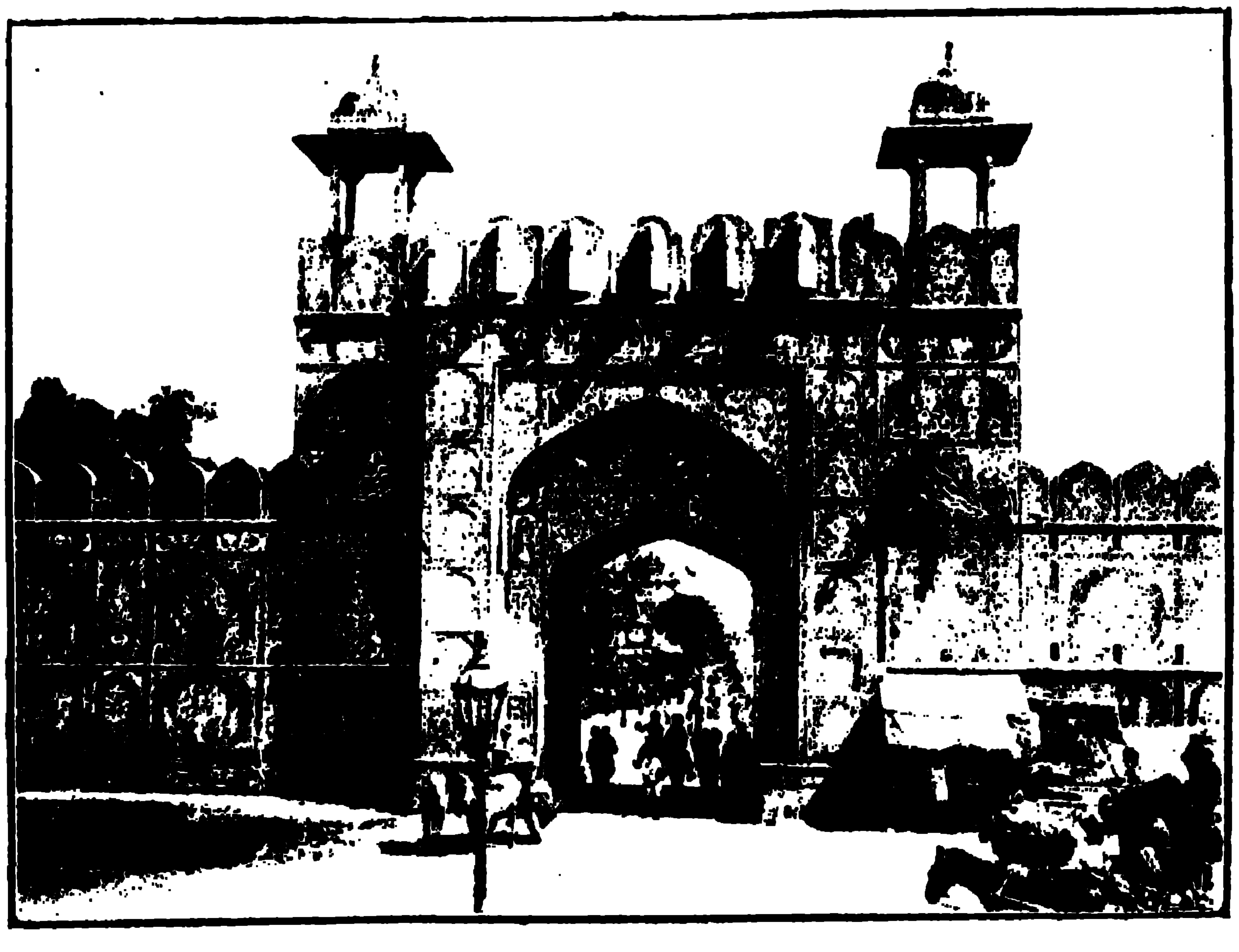

নগর তোরণ—জয়পুর

আছে!...তারপর সেকেন্দ্রা, ইস্‌মৎউদ্দৌল্লা, ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ফোর্ট,—অতীতের স্মৃতি লইয়া সবই দাঁড়াইয়া আছে। যোধাবাঈয়ের মহলে যাইয়া মনে হইল, সেই পুণ্যশীলা নারীর

স্ফটিক-প্রাসাদের অভ্যন্তর—অম্বর

স্মৃতি এই সৌধের মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত রহিয়াছে; সাহজাহান যেখানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন,—সম্মুখে যমুনা তৎপশ্চাতে তাজ—মর্ম্মরের ক্ষুদ্র অথচ অপরূপ কারুকার্য্যময় বারান্দাটি।

আমীর দিন রাত্রি সাড়ে নয়টার ট্রেনে জয়পুর রওনা হইয়া ভোর ৪টায় জয়পুর পৌঁছাইলাম। সুদীর্ঘ প্রাচীর বেষ্টিত সুপ্ত নগরীর তোরণদ্বার তখনও খোলে নাই। কিছুক্ষণ ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে বিশ্রাম করিবার পর হঠাৎ সুমধুর সানাই বাজিয়া বুঝাইয়া দিল যে নগর-তোরণ খুলিয়াছে। কুলীরা সকলেই যেন স্বাধীন নৃপতি! যাহাই বলিবে তাহাই দিতে হইবে। তবুও কথঞ্চিৎ তর্ক-বিতর্কের পর গাইডের (guido) কথানুসারে উভয়ের মধ্যে একটা রফা হইল এবং জয়পুরের প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়া শকট ছুটিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোচওয়ান বলিয়া উঠিল, "গাড়ী যায়।" দুইজন সঙ্গীনধারী আসিয়া গাড়ীর দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। একি!—তাহারা জানিতে চাহে আমরা কোন-রূপ পণ্য বিক্রয় বা ক্রয় করিতে এই রাজ্যে আসিয়াছি কিনা। আমি নামিয়া গিয়া অফিসে বলিয়া আসিলাম, "আমি চিকিৎসক, দেশ দেখিতে আসিয়াছি।"

ভোর ৬টায় গাড়ী যাইয়া এড্‌ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হোটেলে দাঁড়াইল। অতি সুন্দর উদ্যান-বাটিকা। অতি উত্তম কক্ষ, এবং সমস্ত কক্ষগুলিই আসবাবমণ্ডিত। তবে প্রতি কথায় এত বেশী পয়সার দাবী করে যে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। আমার ট্রেনের সঙ্গী আগ্রায় আমার সঙ্গে এক হোটেলেই ছিলেন, এবং এখানেও এক হোটেলেই উঠিলেন।

আহারাদি সমাপনান্তে মিউজিয়ম্ এবং রাজপ্রাসাদ দর্শন করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিলাম। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার সময় নগ্নপদ এবং টুপীপরিহিত-মস্তক হইতে হইল। "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ!"...সমস্ত সহর যেন চিত্র-বৎ;—এমন এক ধরণের চিত্রবৎ অট্টালিকা এবং পরিষ্কার প্রশস্ত রাজপথ কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, সমস্ত সহরে কোথায়ও এতটুকু আবর্জ্জনা নাই।

বেলা প্রায় ৪টার সময় মহারাজ মানসিংহের "অম্বর-প্রাসাদ" দুর্গাভিমুখে রওনা হইলাম। পার্ব্বত্য পথ। দুই পার্শ্বে পর্ব্বত; মধ্যে মানবের দুর্ব্বল দু'খানি হস্তনির্ম্মিত পথ পাহাড় কাটিয়া মাইলের পর মাইল চলিয়াছে। অনন্ত অগণিত বৃক্ষশ্রেণী স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান, যেন মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা পথভ্রষ্ট হরিণ ও ময়ূর রাস্তায় আসিয়া "ফিটনের" সম্মুখে পড়িতে লাগিল। হরিণগুলির কৃষ্ণ নয়নের কী ভীত চাহনি!...কি অপূর্ব্ব প্রকৃতির লীলাভূমি!

সহর হইতে ৭ মাইল পথ আসিবার পর অম্বর-দুর্গে প্রবেশ করিলাম। সমস্তদিন ঘুরিয়া বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; পিপাসায় বুক শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। "জল, জল" বলিতে "গাইড" একটু নীচুতে লইয়া গিয়া দাঁড়াইল; এক সন্ন্যাসী এক সুপরিষ্কৃত পাত্র ভরিয়া সুশীতল কূপের

জল ঢালিয়া দিতেছেন,—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া শীতল হইলাম।

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণে পশ্চিম গগন তখন উদ্ভাসিত। সে অপূর্ব্ব আলোকে আমরা পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলাম। পুরাতন প্রাসাদ অর্দ্ধভগ্ন—নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু মানসিংহের প্রাসাদ, উদ্যান এবং জলাশয় সকলই অতি পরিষ্কার এবং সযত্নে রক্ষিত। সেদিন মহানবমী; পূর্ব্বদিন মানমন্দিরের শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী কালীমাতার পূজোপলক্ষে মহিষ বলি হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম পূর্ব্বে তৎস্থানে নরবলি হইত। পর্ব্বতোপরি সুবিস্তীর্ণ অঙ্গন, চতুর্দ্দিকে হর্ম্ম্যরাজি; অঙ্গনতল এবং প্রাসাদের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পর্ব্বতগাত্রে যে ঢালু পথ নির্ম্মিত হইয়াছে সমস্ত শোণিত-রঞ্জিত। সমস্ত প্রাসাদ ও কালীমন্দিরের সন্ধ্যারতি দেখিলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানীয় লোক এবং গাইড বলিল, পথে বড় বাঘের ভয়। কাজেই নামিতে আরম্ভ করিলাম।

আবার সেই পথ—'বার চন্দ্রালোকে বনভূমির অপূর্ব্ব শ্রী! মনে হইতে লাগিল, এই পথের যেন শেষ নাই, সীমা নাই! পরদিন প্রাতে গোবিন্দজীর মঙ্গলারতি দেখিলাম;—মানবের চিরন্তন সঙ্গীত "জয়দেব, জয়দেব" রবে মন্দির কম্পিত হইতেছে। সুন্দর উদ্যানের মধ্যে শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত গোবিন্দজীর মন্দির।

বেলা ১০টায় আজমীর রওনা হইয়া বেলা ৫টায় আমরা আজমীর পৌঁছিলাম। এই পথটুকুতে আমাদের বড় কষ্ট হইয়াছিল। ভীষণ গরম—মধ্যে মধ্যে হু হু করিয়া উত্তপ্ত বালুকার ঝড় বহিয়া যাইতেছে। আজমীরে আমাদের অনেক আত্মীয় বাস করেন; তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটান গেল। এই সহর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত; মধ্যে সেটুকু সমতল ভূমি, সেইটুকু সহর। আজমীরও প্রাচীর দিয়া ঘেরা, প্রাচীরের ভিতর সহরটুকু অত্যন্ত অপরিষ্কার ও ধূলি-মলিন। যদি বি, বি, সি, আই রেলের হেড কোয়ার্টার সেখানে না থাকিত তাহা হইলে সহর অতিশয় ছোট হইত। পর্ব্বতের সানুদেশে প্রশস্ত রাস্তার উপর সিভিল-লাইনের জন্য নির্ম্মিত বাড়ীগুলি ভারী সুন্দর ও বাগান-ঘেরা। এই সেই পৃথ্বীরাজের আমলের আজমীর,—পর্ব্বতের চূড়ার উপর তাঁহারই নির্ম্মিত "তারনাথ" দুর্গ।

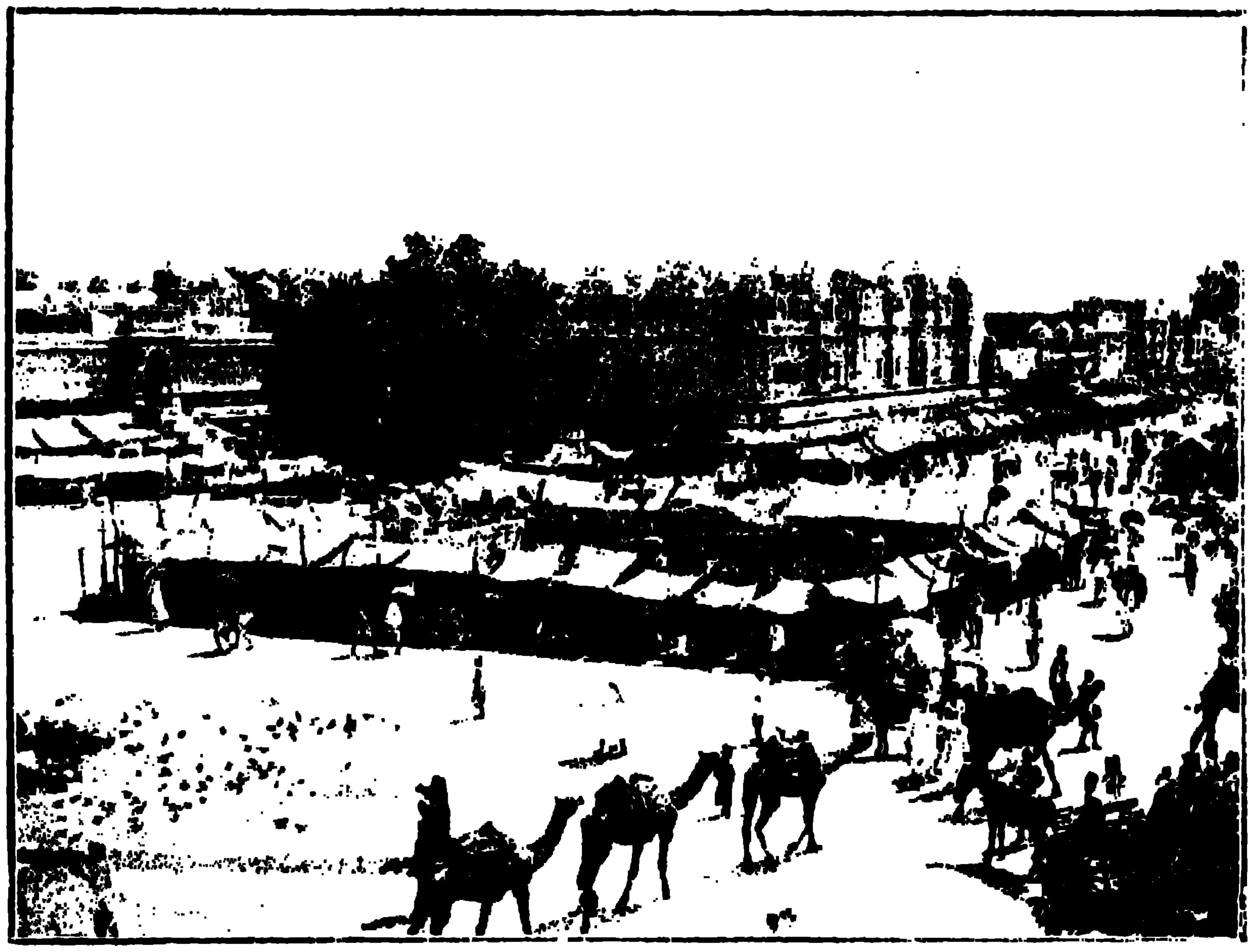

মানাক চক—জয়পুর

পরদিন সাজাহান-নির্ম্মিত "আনাসাগর" দেখিতে গেলাম। ৬।৭ মাইল ব্যাপী পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত প্রকাণ্ড হ্রদ। সম্রাট সাজাহান উহার তিন দিক অতি উত্তমরূপে শ্বেতমর্ম্মরের দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে মর্ম্মর-ছত্রী, এই ছত্রীর উপরকার কক্ষগুলিও একই প্রকার। পর্ব্বতের উপর "আনাসাগর" হইতে ঘাট বাঁধাইয়া সুদৃশ্য ত্রিতল অট্টালিকা;—শুনিলাম উহা ব্রিটিশ দূতের নিবাস-গৃহ। "আড়াই দিনকা ঝোপরা"ও একটি দেখিবার জিনিষ। প্রস্তর-নির্ম্মিত জৈন মন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য আড়াই দিনে আমূল পরিবর্ত্তিত করাইয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব

কোরাণের বয়েৎ লিখাইয়া মস্‌জিদ পরিণত করিয়াছিলেন। জৈন সম্প্রদায় পুনর্ব্বার আর একটি মন্দির করিয়াছিলেন; সেটিও দেখিতে মন্দ নয়।

সমস্ত আজমীরে ৬০।৭০ ঘর বাঙালী বাস করেন। গত বৎসর হইতে তাঁহারা এই সুদূর প্রবাসে দুর্গাপূজাও করিতেছেন। দেখিলাম এই ৬০।৭০ ঘর বাঙালী উৎসাহে ও আনন্দে যেন একমন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছেন। বড় ভাল লাগিল। এবার ৺পূজায় আর বিদেশী কাহারও পরিধেয় নহে—সকলেই আপদমস্তক খদ্দরভূষিত। পরদিন পুষ্করতীর্থে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া শয়ন করিতে গেলাম। ভোর ৫টায় চা-পান করিয়া একখানি বাড়ীর-মোটর ও একখানি ট্যাক্সিতে সকলে মিলিয়া রওনা হইলাম। সহর ছাড়িয়া হু-হু শব্দে দ্রুতগামী যান ছুটিয়া চলিল। "আনাসাগর" ছাড়াইয়া "দেবীটোল"। এখানে লোক-প্রতি একআনা এবং মোটরের ৷৷০ লইল, পরে এক একখানা করিয়া ছাড়পত্র লিখিয়া দিল।

এবার আমাদের মোটর দু'খানা আরাবল্লীর গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিল। ভগবানের রূপ যে কি বিরাট—মানুষের ক্ষুদ্র রসনার কি সাধ্য যে তাহা প্রকাশ করে! দুই পার্শ্বে গগনচুম্বী পর্ব্বতশৃঙ্গ, মধ্যে সঙ্কীর্ণ অথচ অতি পরিষ্কার পার্ব্বত্যপথ, মুহূর্ত্তে পেছনে ফিরিয়া দেখি আর পথ নাই,—কখনও মোটর ডবল স্পীড্‌ দিয়া সজোরে চড়াইয়ে উঠে কখনও বিনা ষ্টার্ট (start) এ মাইলের পর মাইল গড়াইয়া চলে। কি অপূর্ব্ব শোভা! এমন সময় প্রাচীদিক্‌ আলোকিত করিয়া ঠিক যেন পর্ব্বতের পিছন হইতে বালারুণ উদিত হইতে লাগিল ও সমস্ত বনভূমি অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইল,—"পাহাড়ের পর পাহাড় আবার পাহাড়; অসংখ্য অগণ্য যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ; কোথায়ও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।"

বেলা প্রায় ৭টায় সময় মোটর ক্ষুদ্র পুষ্কর গ্রামে প্রবেশ করিল। ছোট ছোট কিন্তু প্রস্তরনির্ম্মিত পাকা বাড়ীগুলি, বালুকাময় পথ, অল্প স্বল্প বাজার, দোকান সবই আছে দেখিলাম। দাম বাড়িয়া উঠিতেছে, কাজেই পুষ্কর হ্রদ দর্শন করিয়া সাবিত্রী পর্ব্বতের অভিমুখে চলিলাম কথিত আছে, এই হ্রদ শিব নিজে খনন করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদিগের ইহা একটি বড় তীর্থ। এইখান হইতেই যোধপুরের মরুভূমির আরম্ভ। মাইলখানেক পথ বালুকার উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছাইলাম। স্থানীয় একজন পাণ্ডা-পথপ্রদর্শক সঙ্গে ছিলেন। এই বালুকার ভিতর ঘাসের বড় বড় কাঁটা আছে। যাঁহারা নগ্নপদে যাইতেছিলেন তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে আঃ-উঃ করিতে শুনিলাম। পর্ব্বতে বড় বড় পাথর সিঁড়ির আকারে আবহমান কাল ধরিয়া সাজান আছে,—তাহাও আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া। সাবিত্রী পর্ব্বত উচ্চতায় প্রায় তিন মাইল হইবে; কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠার দরুণ প্রায় চারি মাইল। বালির উপর দিয়া মাইলখানেক পথ আসিতে হয় বলিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে বড়ই ক্লান্ত হইতে হয়। যাহা হউক কোন মতে উঠা গেল। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় সাবিত্রী দেবীর মন্দির। দেবী শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিতা। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, এবং দুই পার্শ্বে ২।৪ খানি কক্ষ আছে, পাণ্ডারা তাহাতে বসবাস করেন। একটি কূপও পর্ব্বতোপরি আছে, জল অতি শীতল। মন্দির-দ্বার রাত্রে সুদৃঢ় লৌহ-অর্গলে বন্ধ করা হয়। শুনিলাম সেখানে বড় ব্যাঘ্র-ভীতি। প্রাঙ্গণ-প্রান্তে ২।৪ খানি লোহার চেয়ার আছে; উঠিয়া একটু বিশ্রাম করার পরই পাণ্ডারা অতি উত্তম পেড়া ও জল আনিয়া দিল। আহার করিয়া প্রাচীর-প্রান্তে দাঁড়াইলাম। কি নৈসর্গিক শোভা!—যে অদৃশ্য যাদুকরের অপরূপ মায়াদণ্ডে এই শোভার সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহাকে বারবার প্রণাম করিলাম।

শুনিলাম, ইনি আদি সাবিত্রী দেবী; ইঁহারই বরে মানবী সাবিত্রী—সতীরাণী সাবিত্রী জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার উপর রাগ করিয়া ইনি পর্ব্বতে চলিয়া আসেন। নীচে ব্রহ্মার মন্দির—যজ্ঞ করিবার জন্য তিনি পত্নী গায়ত্রী দেবীর সহিত বসিয়া আছেন। নামিবার সময় তত কষ্ট হইল না! বেশ নামিয়া আসিলাম। তবে সেই দুরারোহ পর্ব্বতের উপরেও অসংখ্য ভিক্ষুকের সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এবার পুষ্কর হ্রদে সাধ্বীদের কেহ কেহ স্নান করিলেন। মাইলখানেক হ্রদ, তাহাতেই অগণ্য কুমীর আছে বলিয়া

শুনিলাম ; হ্রদের মধ্যে ৩।৪টি ভাসিতেছেও দেখা গেল অসম্ভব মৎস্য ; ধরিবার নিয়ম নাই কাজেই অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে ; কুম্ভীরকুলই অল্পস্বল্প যা ধ্বংস করা হয়। হ্রদের চারিদিকে অসংখ্য ঘাট ; দুই চারিটা করিয়া ছোলা ফেলিতেই অসংখ্য মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাণ্ডা ঠাকুরকে কিছু দক্ষিণা দিয়া এবং উত্তমরূপে গরম জিলিপী ও সন্দেশ ভক্ষণ করিয়া মোটরে ওঠা গেল। খাদ্যদ্রব্যে কোন ভেজাল নাই—দামেও সস্তা, জিনিষও উৎকৃষ্ট। আবার সেই পথেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিলাম। আমাদের কেবল মাঠ দেখাই অভ্যাস ; মাটির সামান্য স্তূপ দেখিলেই আমাদের আনন্দ হয়। অতএব আরাবল্লীর এই গিরিবর্ত্ম্য কতখানি যে আনন্দদায়ক হইয়াছিল তা আর কি বলিব !

পরদিন আত্মীয়স্বজনের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কার্য্যানুরোধে কলিকাতা ফিরিতে হইল। কিন্তু অরূপের রূপের যে কণামাত্র দর্শন করিয়া কলিকাতা ফিরিয়াছি তাঁহারই শ্রীচরণোদ্দেশে বারবার প্রণাম করিতেছি।

মায়ের বুক

জসীম উদ্দীন

আমার ঘরে কে এলি রে ! এলি খুসীর সাগর বেয়ে,
—হাসিখুসির ঢেউ দোলায়ে এলি আমার বুকটি ছেয়ে।
কে এলি রে চাঁদের দেশের চাঁদের চুমো জ্যোছনা-ঝরা
সারাটি গায় চাঁদের দেশের ঝলমল আদর-ভরা।
তোরে আমি কোথায় পেলাম ? খেল্‌তে যেয়ে সাগর-পারে
নুড়ী পাথর কুড়িয়ে কি রে গেঁথে নিলাম গলার হারে !
আমার খোঁপার ফুলে কি তুই জড়িয়ে গেলি সোনার ভোমর,
ও রে মাণিক ও রে রতন—ও রে আমার সোনার গোমর !

তোরে আমি কোথায় রাখি ?—কোলের কাছে ?—
বুকের মাঝে ?
আমার চোখের কাজল-কোঠায় ? ঠিক ত কিছুর পাচ্ছি
না যে।
কি কথা আজ বলব তোরে ! সোনা ! যাদু ! লক্ষ্মীমণি !
কোন কথাই মনের মত লাগছে না যে আজ এখনি।
যদি এমন পেতাম কথা, আমার বুকের আদর-যতন,
সব নিঙাড়ি সেই কথাটি হ'ত আমার মনের মতন !
ও রে যাদু ব'লে দে তুই কোন্ নামে আজ ডাকব তোরে,
কোন নামে আজ ডাকলে তোরে আমার মায়ের
বুকটি ভরে।

ও রে আমার টুক্‌রো হীরে, ও রে আমার দোপাটি ফুল,
আমার বুকের শিশু চাঁদা,—আমার খেলার রাঙা পুতুল !

ওরে আমার শিমুল তুলো ! ইচ্ছে করে উড়িয়ে বায়ে
তোরে নিয়ে বেড়িয়ে আসি অনেক দূরের গগন-গাঁয়ে।
—ইচ্ছে করে চাঁদের খাটে ঘুম পাড়িয়ে আজকে তোরে
বকের পাখার বাতাস করি সারাটি রাত আদর ক'রে।
—ইচ্ছে করে জড়িয়ে তোরে ঘুম পাড়িয়ে আবার জাগাই,
আবার তোরে ঘুম পাড়িয়ে ঘুম-পাড়ানি গানটি যে গাই।
অনেক কিছুই ইচ্ছে করে,—মনে মনে ভয়ও জাগে
আমার এসব পাগলামি তোর ভাল যদি নাই বা লাগে।
তোরে ল'য়ে কি করি আজ ? সোনা আমার লক্ষ্মী আমার,
যূঁই-কুসুমি ফুলের মত জড়িয়ে থাক কোলটি এ মা'র।

ও কি রে তুই উঠলি কেঁদে !—ওগো তুমি এক্ষুণি যাও,
চোদ্দ হাজার মাল্লা মাঝি ময়ূরপঙ্খী নৌকো সাজাও।
কোথায় জাগে প্রদীপকুমার চোদ্দ হাজার জ্বালিয়ে বাতি,
হয়ত সে আজ পায়নিক খোঁজ হেথায় আছে তাহার সাথী।
আসুক সে আজ ঢোল ডগরে বাজিয়ে সানাই বাজিয়ে কাড়া,—
খুকু আমার, মাণিক আমার, ঘুমোও দেখি লক্ষ্মী-পারা !

ভাস্করের প্রতীক্ষা

শ্রী শিবরতন মিত্র

(১)

প্রবীণ ভাস্কর বিন্দুমাধবের সুখ্যাতি দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। বহু দূর-দূরান্তর হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া, তাঁহার নিকট ভাস্কর-শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার ক্ষুদ্র পল্লী মুখরিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কত শিষ্য ভাস্কর-শিল্পের জ্ঞান-সঞ্চয়ে কতই না অগ্রসর হইয়াছে ;—তাহাদের নৈপুণ্য দেখিয়া, তাহাদের খোদিত কারুকার্য্য দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে কতই না প্রশংসা করিত। কিন্তু স্বয়ং গুরুদেব, তাহাদের এইরূপ কৃতিত্বে বিশেষ সন্তোষলাভ করিতে পারিতেন না। তাহাদের রচনায় এমন একটা গুরুতর ত্রুটি রহিয়া যাইত, যাহার জন্য, তাঁহার সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সত্বেও, তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। ইহাতে তাঁহার দুঃখের অবধি রহিত না।

বিন্দুমাধব পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল, ভাস্কর-শিল্প-সাধনায় একাগ্রমনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আজিও সাধনার বিরাম নাই—হয়ত, আজীবন হইবেও না। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তথাকথিত ভাস্করের অভাব নাই। প্রত্যহই কত শিল্পী, নিত্য নূতন মূ গঠন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে—পাষাণময় দেবমূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তের হৃদয় আলোকিত করিতেছে। যত গ্রাম তত শিল্পী—যত মন্দির তত দেবমূর্ত্তি। কিন্তু কৈ, ইহারা ত সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ হইলেও, বিন্দুমাধবের অপূর্ব্ব প্রতিভা ও দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার সান্নিধ্য-লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিল না। তাঁহার সাধনার প্রক্রিয়া বা সাফল্যের অন্তর্নিহিত হেতুর পরিচয় কি, তাহা জানিবার আগ্রহ-লাভের অধিকার পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইল না।

সমাগত শিষ্যগণ সকলেই তাঁহার শিল্প-ভবনে সুদীর্ঘ-কাল অবস্থান করিয়া, কেবলমাত্র গঠন-শিল্পের বাহ্যকৌশল আয়ত্ত করিয়াই, উৎফুল্ল-হৃদয়ে, উপার্জ্জন করিবার আশায় কর্ম্মক্ষেত্রে জুটিয়া যায়। প্রস্তরখণ্ডকে হাতুড়ী-বাটালীর সাহায্যে কাটিয়া কাটিয়া, কোনরূপ একটা মূর্ত্তি বাহির করিতে পারিলেই তাহারা কৃতার্থ! কেবলমাত্র অর্থের আশায়, তাহারা দিনের পর দিন, অখণ্ড প্রস্তরকে কাটিয়া কাটিয়া, দেবতার প্রতিমা বাহির করে এবং তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জন হইল ভাবিয়াই চরিতার্থ হয়।

বিন্দুমাধব সাধারণ শিষ্যবর্গের এইরূপ হৃদয়হীন ভাব লক্ষ্য করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু তিনি আশা ত্যাগ করিলেন না। এই সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী-কাল ভাস্কর-শিল্পের সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া,তিনি বার্দ্ধক্যের সীমান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও এরূপ কোন অনাগত শিষ্যের প্রতীক্ষায় তিনি দিনযাপন করিতেছেন, যাহাকে তিনি কালে, উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া, তাঁহার চিরসাধনালব্ধ ভাস্কর-শিল্পের মূল তথ্যটুকু বুঝাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

কঠিন প্রস্তর—ততোঽধিক কঠিন লৌহাস্ত্র লইয়া কার্য্য করিতে করিতে কি ভাস্করের হৃদয় বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হইয়া যাইবে? ভাস্করের জীবন কি এতই নীরস, এতই শুষ্ক, এতই কঠোর! তাহার কি কার্য্যে আনন্দ নাই—হৃদয়ে প্রীতি নাই—প্রাণে প্রফুল্লতা নাই?—কেবলই কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম! কর্ম্মান্তে, কেবলই অর্থ—অর্থ—অর্থ! কর্ম্ম কর, দারুণ গ্রীষ্মে, প্রখর রৌদ্রে, লৌহ-প্রস্তরের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ কর—দিবারাত্রি দেহকে নিষ্পেষিত করিয়া, হাতুড়ী-বাটালীর অবিরাম আঘাতে প্রস্তর হইতে মূর্ত্তি কাটিয়া বাহির কর—আর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন কর,—ইহাই কি ভাস্করের নির্দ্দিষ্ট নিয়তি? এত কষ্টের পর পাথর কাটিয়া কাটিয়া, মূর্ত্তি যখন ক্রমেই ফুটিয়া উঠিবে, তখন ভাস্করের মনে, অচিরকাল-মধ্যে পারিশ্রমিক-লাভের আশ্বস্ততা ব্যতীত কি, অপরবিধ কোনরূপ অপার্থিব আনন্দ-লাভের স্থান নাই! তাহার

হৃদয়-মন কি সাংসারিক চিন্তায় এতই আচ্ছন্ন, এতই অবরুদ্ধ?—কিন্তু সাধারণ ভাস্কর-জীবনে যে ইহাই কঠোর সত্য।

অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী শিল্পী বিন্দুমাধব বুঝিতে পারে না—ধারণা করিতে পারে না—ভাস্করের জীবন কেন এত নীরস, এত শুষ্ক, এত হৃদয়হীন হইবে! হিমগিরির কঠিন পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া জাহ্নবী-ধারা প্রবাহিত হয়—ভাস্করের প্রাণ কি তদপেক্ষাও কঠিন যে তাহার পেষণে মানব-হৃদয়ের সুকোমল ভাবধারার অনন্ত উৎস চিররুদ্ধ হইয়া রহিবে? ভগবানের রাজ্যে কি এতই নির্ম্মম বিধান রহিতে পারে? জগতে ভাস্করগণ কি বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্য নয়? তাহারা কি সর্ব্ববিধ মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত হইয়া চিরকাল পশুজীবন যাপন করিবে? না,—করুণাময় ভগবানের এইরূপ নির্ম্মম বিধান কখনই হইতে পারে না।

এইরূপ সুখকর কল্পনায় প্রলুব্ধ হইয়া বিন্দুমাধব নিরাশ হৃদয়ে বল-সঞ্চয় করেন। ভাস্কর-জীবনে, কঠোর সাধনায় তিনি ভগবানের সুস্নিগ্ধ করুণাবারি সিঞ্চনে অভিষিক্ত হইয়াছেন;—সেইরূপ সাধনা করিয়া, অপরের পক্ষেও ত ভগবানের তুল্যরূপ করুণালাভ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য কৈ, এতদিন মধ্যে ত কোন শিষ্যেরই আকাঙ্ক্ষা দেখিলেন না। তবে কি এ জীবনে, সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোরতম সাধনার অমৃতময় ফল কাহারও হস্তে দিয়া যাইতে পাইবেন না! এই পবিত্র ভাস্কর-শিল্পের সাধনায় যে-অমৃতের আস্বাদ পাইয়া নিজে ধন্য হওয়া যায়, জগৎ ধন্য হয়, তাহার সন্ধান কি কাহাকেও দিয়া যাইতে পারিবেন না? মৃত্যুর সাহত কি ভগবানের অপূর্ব্ব করুণার দান চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে? তাহা কি হয়? আসিবে—সে দিন আসিবে। অদূর-ভবিষ্যতে তাঁহার সাধনালব্ধ ফল গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্র আসিবেই।

এইরূপ সুখ-স্বপ্ন, বাস্তবে পরিণত হইবার মুগ্ধ আশায়, বিন্দুমাধব আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন।

(২)

পল্লীপ্রান্তে অদূরে একটি অনতিউচ্চ পাহাড়। সেখান হইতে মনোমত প্রস্তর সমভূমিতে কর্ম্মশালার নিকট আনীত হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছে। বিন্দুমাধবের শত শত শিষ্য, সেইস্থানে যাহারা যেমন অধিকারী, তাহারা সেইভাবে নিজ নিজ দল বাঁধিয়া কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

কোন দল সামান্য শিল-নোড়া, কোন দল বা পাথরের ইট, কোন দল বা পাথরের কার্ণিশ ও তৎসংক্রান্ত ক্ষোদিত ফুল লতা-পাতা, কোন দল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকে দশ-মহাবিদ্যা, দশাবতার, ও অন্যান্য নানাবিধ পৌরাণিক ছবি, কোন দল বা দেবতার মূর্ত্তি, আবার কোন দল বা মনুষ্যমূর্ত্তি

শ্রী শিবরতন মিত্র

গঠন বা উৎকীর্ণ করিতেছে। উচ্চাধিকারী শিষ্যের দল নিম্নাধিকারী শিষ্যবর্গের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিতেছে। সর্ব্বোপরি, স্বয়ং গুরুদেব বিন্দুমাধব সময়মত সমগ্র কর্ম্মশালা পরিদর্শন করিয়া, উচ্চাধিকারী শিষ্যগণকে মাত্র দুই-এক কথায় সংক্ষেপে উপদেশ দিয়া, নিজকর্ম্মে অনন্যমনে নিমগ্ন হইতেছেন।

ছাঁচে মাটি টিপিয়া যেরূপ একই গঠনের অসংখ্য ছবি প্রস্তুত হয়, বিন্দুমাধবের বিশাল কর্ম্মশালার অগণিত শিষ্য-বর্গও তদ্রূপ-প্রণালীতে নিয়মিতভাবে পাষাণের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গঠন করিতেছে। বাঁধা-ধরা মাপকরা কাজ

—ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। কোন দেবতা-বিশেষের মূর্ত্তি গঠিত হইবে—মূর্ত্তির দাঁড়াইবার বা বসিবার ভঙ্গী, হস্ত-পদাদির সংস্থানপ্রণালী, সর্ব্বোপরি, মূর্ত্তির সাধারণ গঠন-ক্রিয়া, ভাস্কর-শিল্পের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী-মতই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার জন্য ভাস্করের কোনরূপ চিন্তার, বা ভাব-আবাহনের আবশ্যক নাই—কেবলমাত্র, ভাস্কর-শিল্পের প্রাথমিক জ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিগঠনের নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্ত রহিলেই হইল। প্রয়োজন হইবামাত্র ভাস্কর বিনা চিন্তায়, বিনা ভাব-আরাধনায় সঙ্গে সঙ্গেই পাষাণ কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী-সম্মত মূর্ত্তি গঠন করিয়া অর্থের জন্য প্রতীক্ষা করে

সাধারণ শিল্পীর ইহাই আচরণ ;—ভাস্কর-শিল্পের প্রাথমিক কৌশলগুলি অল্পকালমধ্যেই আয়ত্ত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি বা দ্রব্যাদি গঠনের বাঁধা নিয়মগুলি মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পর, সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চিরজীবন লোহা-পাথরের সহিত বৃথা যুদ্ধ করিয়া দেহ ক্ষয় করে ;—কলুর বলদের মত চিরকালই হাঁটিয়া মরে, কিন্তু এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। চিরকালই প্রস্তর কাটিয়া কত মূর্ত্তিই না গড়িল—কত ফুল, কত লতাপাতা কাটিয়া উঠাইল, কিন্তু কার্য্যের উপর প্রাণের ছাপ নাই—রচিত কর্ম্মে শিল্পীর মনের কোন পরিচয় নাই! প্রণালী এক—নিয়ম এক ; সুতরাং, ছাঁচে তৈয়ারী মাটীর পুতুলের মত, বিভিন্ন ভাস্করের গঠিত মূর্ত্তি এক। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়, মন ও আকৃতির যেমন ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট বৈষম্য বা বিশিষ্টতা আছে, এই সকল মূর্ত্তি-গঠনে তাহার কোন পরিচয় নাই। এই সকল মূর্ত্তি-গঠনে রচয়িতার বৈশিষ্ট্য-বিকাশ বা প্রকাশ অপেক্ষা, তাহার বিলোপ-সাধনেই যেন শিল্পীর কৃতিত্ব! ইহাতে এক একজন ভাস্কর, শিল্পী না হইয়া মজুরে পরিণত হইয়াছে। কেন না, মজুরের কাজ পরিশ্রম ;—শিল্পীর কাজ মনন, ও তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে, তাহারই সাধনার পরিচয়-প্রদান।

কিন্তু তাহা হইতেছে কৈ ? বিন্দুমাধবের জীবনব্যাপী দারুণ আক্ষেপ ত ইহারই জন্য। যে শিল্পসাধনায় তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যে শিল্পকে আশ্রয় করিয়া তিনি ভগবৎসাধনায় পথের সন্ধান পাইবার আশায় উৎফুল্ল রহিয়াছেন, তাঁহার সেই চির-আরাধ্য শিল্পের কি এই শোচনীয় পরিণতি! কেবল কল ও ছাঁচে-ফেলা ছবির মত ছবি হইবে ?—তাহাতে সাধনার পরিচয়, প্রাণের পরিচয়, শিল্পীর ভাব-সাধনার কৃতিত্বের পরিচয় প্রকটিত হইবে না ? যে মজুর—সেই মজুরই রহিবে! মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে না ?—শিল্পীকে কি এমনি করিয়া আত্মহত্যা করিতে হয় ?

বিন্দুমাধব এইরূপ ভাবনায় অতিশয় কাতর হইয়া, ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে প্রার্থনা করেন—'ভগবন্,আমার এই চির-আরাধ্য শিল্পের সম্মান রক্ষা কর—শিল্পীদের আত্মহত্যার মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ কর। দয়া করিয়া তাহাদের চিররুদ্ধ হৃদয়দ্বার খুলিয়া দাও—চির-আড়ষ্ট মন সরল করিয়া দাও—তাহারা চিন্তাশীলতার পবিত্র স্পর্শে জাগ্রত হইয়া উঠুক। চিন্তা করিয়া, ভাবের সাধনা করিয়া পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হউক। তাহাদের কৃতিত্বে পবিত্র ভাস্কর-শিল্প জগতে বরেণ্য হইয়া উঠুক।'

নিত্যলীলাময় ভগবানের বিচিত্র লীলার প্রকট সাধনই ভারতীয় শিল্পীর চরম আকাঙ্ক্ষা। লীলা-বিশেষের ধ্যানধারণা দ্বারা মানসপটে যে অস্পষ্ট আভাস জাগিয়া উঠিবে, সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা তাহাই ঘনীভূত করিয়া, শিল্পী প্রস্তরের উপর সেই অ-রূপ মূর্ত্তিকে স্বরূপভাবে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে। শিল্পীও ঋষি—শিল্পীও ভগবানের অনুগৃহীত আপনার জন। তাঁহারই অনুভূত ও ধারণালব্ধ মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া, কত পাপী তাপী, তাহাই ভগবানের প্রতীক্ রূপে পাইয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়,—কত জ্ঞানী, কত যোগী, তাঁহাদের রচিত মূর্ত্তির মধ্যে, তাঁহাদের চির-আরাধ্য ধনের পরিচয় বা নিদর্শনের সন্ধান পাইয়া চরিতার্থ হয়। শিল্পীর কার্য্য এতই গুরুতর, কর্ত্তব্য এতই কঠোর,—সাধনা এতই কষ্টসাধ্য, এতই দুষ্কর। ইহা অবহেলার নহে—তুচ্ছতাচ্ছিল্যের নহে—কেবলমাত্র জীবিকা-অর্জ্জনের পন্থামাত্র নহে। তবে কেন ভগবান দয়া করিবেন না ? বিন্দুমাধবের এত অনুনয়-বিনয়, এতই কাতর ক্রন্দন, এতই ব্যাকুল আহ্বান—সকলই কি তিনি ব্যর্থ ও বিফল করিয়া দিবেন ?

বিন্দুমাধব তাঁহার নিভৃত সাধন-কক্ষে বসিয়া, তন্ময়-

ভাবে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, দীর্ঘশ্বাস সহ বলিয়া উঠেন—'হা ভগবন্!'

(৩)

বিন্দুমাধবের সুবিস্তৃত কর্ম্মশালায় শত শত শিষ্যগণ আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে অনন্যমনে নিযুক্ত রহিয়াছে। কাহারও কোন দিকে লক্ষ্য নাই—অবান্তর কোন ব্যাপারে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই—করিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিও নাই। শকটসংলগ্ন আবদ্ধচক্ষু ঘোটকের মত, সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত, জগতে কোন কিছুর উপর তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইতে পায় না;—বাহ্যদৃষ্টির মত আন্তর-দৃষ্টিও তুল্যরূপ সীমাবদ্ধ! অভ্যাসধর্ম্ম-বশে কাজ করে, মনের সহায়তার প্রয়োজন নাই,—মন অবান্তর বিষয়ে নিযুক্ত রহুক, বা দূর-দূরান্তরে ছুটিয়া বেড়াক্, হস্ত কিন্তু কার্য্য করিবে—নির্দ্দিষ্ট প্রণালী-সম্মতই কার্য্য করিবে। মন হস্তকে সাহায্য করে না—হস্তও স্বকার্য্যের সহায়তার জন্য মনকে টানিয়া আনা আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে করে না! সুতরাং সাধন-পূত সমাহিত চিত্তের বিচিত্র স্পর্শে তাহাদের রচনা শান্ত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠে না।

বিন্দুমাধবের কর্ম্মশালায় কয়েকদিন হইতে তাঁহার অগণিত শিষ্যবর্গের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব প্রতিভা-দীপ্ত নবাগত যুবক-শিষ্য নারায়ণ, অনতিকাল মধ্যেই তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া, কর্ম্মরত বিভিন্ন শিষ্যদলের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে ভাস্কর-শিল্প-সংক্রান্ত প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

নারায়ণ অল্পদিন মাত্র বিন্দুমাধবের কর্ম্মশালায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে—কিন্তু এই অত্যল্পকাল মধ্যেই সে শিল্প-সংক্রান্ত নিয়মাদি যেরূপ দ্রুত আয়ত্ত বা অধিগত করিয়াছে, তাহাতে উচ্চাধিকারের শিষ্যগণ সকলেই শঙ্কা করিত—হয়ত, অচিরকাল মধ্যেই সকল শিষ্যকে অতিক্রম করিয়া এই অপরিণতবয়স্ক যুবক শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। এই নবাগত তীক্ষ্ণধী শিষ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় বিন্দুমাধবের কর্ণগোচর হইল। কিন্তু, চিরনৈরাশ্যে জর্জ্জরিত ও অবসাদগ্রস্ত বিন্দুমাধবের হৃদয়ে, তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত আশা পূর্ণ হইবার কোনরূপ কল্পনাও তখন স্থান পাইল না।

নবাগত নবীন যুবক নারায়ণ উচ্চাধিকারী শিষ্যগণকে যে সকল প্রশ্ন করিত, সেই সকল প্রশ্ন, এই সুদীর্ঘকাল শিল্প-শিক্ষার সময় তাহাদের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। এই জন্য, এই জিজ্ঞাসু যুবক-শিষ্যের অভিনব ও বিচিত্র প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া রহিত। শিল্প-শাস্ত্রের আবহমানকাল-প্রচলিত বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিব—ইহাতে আবার প্রশ্ন কেন—সন্দেহ কেন? এ কি-প্রকারের শিষ্য? শিষ্যের মনে, গুরুদত্ত আদেশের হেতু-জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি! এ কেমন বিদ্রোহী শিষ্য? গুরুদেব শুনিলে বলিবেন কি? এত কষ্ট করিয়া দূর-দূরান্তর হইতে স্বজনবর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া, এখানে কর্ম্মশালায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। হায়! ইহার এরূপ বিদ্রোহভাব লক্ষ্য করিলে, গুরুদেব নিশ্চয়ই ইহাকে কর্ম্মশালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন। শিষ্যগণ এই কল্পনায় তাহার প্রতি করুণ-নয়নে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেও, কেহই তাহার সুসঙ্গত প্রশ্নের সমাধান, বা সদুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইল না।

যুবক ভাবিত—যাহার মূর্ত্তি গঠন করিতে হইবে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছবির ন্যায়, তাহার মূর্ত্তি যথাযথ নকল করিলেই, শিল্পীর কলাজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা হইল না। সেই মূর্ত্তির মধ্যে, অনুকৃতজনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-সম্মত সাধারণ ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—তবেই মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইবে, নচেৎ তাহা একটি পুত্তলী হইবে মাত্র! দেবমূর্ত্তি ও পৌরাণিক মূর্ত্তি-গঠনের মূলমন্ত্র ইহাই হওয়া উচিত। যে দেব-মূর্ত্তি গঠন করিব, প্রাচীন শাস্ত্রে ধ্যানধারণা-বলে প্রত্যক্ষদর্শী বা দূরদর্শী ঋষিগণ, সেই দেবতার যেরূপ প্রকৃতির, বা অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই সেই দেবতার কল্পিত মূর্ত্তি গঠন করিয়া, তাহাতে এমনতর ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, যাহা দেখিবামাত্র, সেই দেবতার সমগ্র পরিচয় যেন দর্শকের মনোমধ্যে স্বতঃই মূর্ত্ত হইয়া উঠে। শিল্পী গঠিত-মূর্ত্তিতে এইরূপ ভাব-বিকাশে সমর্থ হইলেই তাহা প্রাণবন্ত হইবে—নচেৎ, তাহা বালকের প্রস্তরময় ক্রীড়নক মাত্র!

নারায়ণ, সতীর্থ শিষ্যবর্গকে এই সকল তথ্যের সন্ধান পাইবার আশায় কতই না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু, তাহারা ইহার কোন মর্ম্মই অবধারণ করিতে পারিত না—শূন্য-দৃষ্টিতে অবাক্ হইয়া রহিত।

নারায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করিত—'এই যে আপনারা, এই একটি প্রস্তরখণ্ড লইয়া একটি মূর্ত্তি গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা ত কোন শিল্পীর পরিদৃষ্ট আদর্শের মূর্ত্তি নহে। তবে কেন আপনি অপরের কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই মূর্ত্তি গঠন করিবেন? আপনারা নিজেই কেন, যে-মূর্ত্তি গঠন করিবেন, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, তাহার মূল প্রকৃতি নির্ণয় করুন না এবং তাহাই মূর্ত্তি মধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রকটিত করিয়া তুলুন না?'

পাগলের মত কি যে আবোল-তাবোল বকিতেছে আশঙ্কা করিয়া তাহারা নারায়ণের চিত্তবুদ্ধির আশু বিলোপ-সাধনের জন্য ভগবানকে স্মরণ করিত।

নারায়ণ কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হয় না। সে পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলে—'মহাশয়, আপনারা বহুকাল ধরিয়া এই কর্ম্মশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন,—আমি নবাগত, অনভিজ্ঞ ও শিল্পশাস্ত্রে একেবারে অপ্রবিষ্ট অবোধ শিক্ষার্থী মাত্র। আমার কিন্তু মনে হয়, মূর্ত্তি-গঠনের প্রাথমিক কৌশলগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া শিক্ষা করিলেই শিল্পীর শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় না—চিরজীবন শিল্প-আলোচনায় রত হইয়া উত্তরোত্তর শিক্ষা লাভ করিবার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হয় মাত্র।'

তাহারা ভাবে—'অবোধ যুবক নারায়ণ বলে কি? কর্ম্মশালায় যাইয়া যাহা শিখিবার তাহা শিখিয়া লইলাম—শিক্ষা-কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল। তাহার পর উপার্জ্জনের কাল। এই সহজ কথা ত সকলেই জানে। কিন্তু এই অবোধ যুবক বলে কি?—শিক্ষার আরম্ভ হইল এইখানে—সাধন সমগ্র জীবনে—পরিসমাপ্তি মরণে!...বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবকের সুমতি হোক্।'

উচ্চাধিকারী শিষ্যগণ, নবাগত তরুণ-শিষ্যের এই সকল অদ্ভুত প্রশ্ন ও মতবাদ, বাল-সুলভ চপলতা-প্রসূত অর্থহীন জিজ্ঞাসা বা ধারণামাত্র বলিয়া ক্ষমা করিত। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা-বৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা নারায়ণের মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা আশঙ্কা করিল এবং একদিন গুরুদেবকে সে-কথা নিবেদন করিল।

(৪)

বিন্দুমাধব তাঁহার সুবিস্তৃত কর্ম্মশালার এক প্রান্তে স্বতন্ত্র নিভৃত কক্ষে বসিয়া আছেন। তাঁহারই আরব্ধ একটি অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে। প্রাচীন ভাস্কর-শিল্পের আদর্শ-স্বরূপ যে সকল নিদর্শন কর্ম্মশালায় ব্যবহার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে কয়েকটি মাত্র কক্ষ-মধ্যে ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। এতদ্ব্যতীত, এই গৃহে অপর কোন উল্লেখযোগ্য স্থায়ী গৃহসজ্জার সমাবেশ নাই।

বিন্দুমাধবের সম্মুখে অভিযুক্ত যুবক-শিষ্য নারায়ণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে—তাহার পশ্চাতে অভিযোগকারী উচ্চাধিকারী শিষ্যগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া গুরুদেবের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে।

অভিযোক্তা শিষ্যমণ্ডলী, বিন্দুমাধবের নিকট নবাগত যুবক-শিক্ষার্থী নারায়ণের বিদ্রোহী অভিমতের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছে, তিনি ত তাহাই প্রচারিত করিবার জন্য সমগ্র জীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন! কিন্তু, তাঁহার সে শিক্ষা, সে উপদেশ-প্রণালী গ্রহণ করিবার মত শিষ্য এতদিন তিনি প্রাপ্ত হন নাই। এখন, এই নবাগত শিষ্য নারায়ণের কথা শুনিয়া, তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

'বুঝিবা ভগবান এত দীর্ঘকাল পর, জীবনের শেষপাদে তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, তাঁহারই সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদন গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত শিষ্য প্রেরণ করিয়াছেন—এতদিন পর বুঝি বা ভগবান তাঁহার সাধনালব্ধ বীজ বপন করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত জন কি সত্য সত্যই এতদিনে তাঁহার নিকট আসিয়াছে? ভগবান কি, এই দীনতম শিল্পীর প্রতি সত্য সত্যই এত দয়া করিলেন!'—এইরূপ চিন্তা করিয়া আবার মনে মনে শঙ্কান্বিতও হইলেন। ফলতঃ, যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্যে, আনন্দে ও আশঙ্কায়, তাঁহার চিরনৈরাশ্যময় হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

বিন্দুমাধব নারায়ণকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'নারায়ণ, তুমি এই অল্পদিন

মধ্যেই ত ভাস্কর-শিল্পের প্রাথমিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছ। সুতরাং, তুমি এখন এই শিল্পে পারদর্শী হইয়াছ—আর তোমার ত শিক্ষণীয় বিষয় কিছুই অবশিষ্ট রহিল না ; কি বল ?'

নারায়ণ সপ্রতিভভাবে গুরুদেবকে বলিল—'গুরুদেব, আমার মনে হয়, ভাস্কর-শিল্পের প্রাথমিক শিক্ষা গঠন-প্রণালী অধিগত করিলেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইল না—বলিতে কি, তখনই তাহার এই শিল্প আলোচনার ও প্রকৃষ্টরূপ শিক্ষা করিবার অধিকার জন্মিল। এতদিন যাহা শিখিলাম, তাহা ত পাশবিক বলের কাজ—মজুরের কাজ। কিন্তু, এই পাশবিক বা শারীরিক বলকে নিয়মিত করিবার যে মনন-শক্তির আবশ্যক, তাহার সন্ধান পাইলাম কৈ ? তাহা না হইলে যে এ শিক্ষা শিক্ষাই নহে ! সমস্তই যে বৃথা হইল। ছাপে-তোলা পুতুল, বা কলে-গড়া ছবির সহিত ইহার পার্থক্য রহিল কৈ ? পাথর কাটিবার প্রণালী শিখিলাম—হাত বশ হইল ; এইবার হাত, কাজে লাগাইবার মত পটু হইল। কিন্তু কাজে লাগাইবার শক্তি কৈ ? মনকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে না পারিলে, মন, হস্তকে আয়ত্তাধীনে রাখিয়া পরিচালিত করিতে পারিবে কেন ? সুতরাং, এই মানস-প্রকৃতির পরিচর্য্যা শিক্ষা করিতেই হইবে। এই পরিচর্য্যা-সাধনাই এই শিল্পের প্রাণ। গুরুদেব, এইবার আপনার এই অধম অকৃতী শিষ্য আমাকে সেই সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিয়া আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিন—আমি জীবনব্যাপী সাধনার যোগ্যতা-অর্জ্জন ও অধিকার-লাভ করিয়া ধন্য হই।'

বিন্দুমাধব—বৎস, তুমি কি বলিতে চাও, শিল্পী ভাবিবে বেশী—কাজ করিবে কম ?

নারায়ণ—গুরুদেব, তাহাই ত ঠিক। শিল্পী-নামের উপযোগী ব্যক্তির ত ইহাই কর্ত্তব্য। মজুর-শিল্পী অল্পসময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবে—শুদ্ধ অর্থের জন্য। তাহাতে না আছে তাহার নিজের আনন্দ, না আছে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ! গুরুদেব, সে কি শিল্পী ?

বিন্দুমাধব—তাহা হইলে প্রকৃত শিল্পী সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ? আদর্শ-শিল্পী বলিলে তুমি কি বুঝ ?

নারায়ণ—আপনার সৎশিক্ষাধীনে রহিয়া, আপনারই প্রসাদে আমি যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতেছি। আমার ধারণা ভ্রান্ত হইলে, তাহা সংশোধন করিয়া চরিতার্থ করুন। কোন দেবতা বা মনুষ্য—যাহারই মূর্ত্তি গঠন করিবার সঙ্কল্প করিব—দীর্ঘকাল পরিচিন্তন ও সাধনার ফলে, অগ্রে তাহার মূল-প্রকৃতিটি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। একাগ্রমনে ভাবিতে ভাবিতে এ-সম্বন্ধে আকাশ বা বায়ুরূপী ধারণা, ক্রমে অস্পষ্ট মেঘ বা কুজ্ঝটির মত কোনরূপ অনির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত হইলে, কার্য্যারম্ভ করিব। কার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময়, মেঘ বা বায়ুরূপী চিন্তা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকিবে। দেখিতে দেখিতে সেই ঘনীভূত বা আকার-প্রাপ্ত চিন্তা, হাতের কাজে প্রকটিত হইতে থাকিবে। তাহার পর ক্রমে, এমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সময় আসিবে, যখন দেখিব,—আমার সেই ঘনীভূত ভাব মানস-ক্ষেত্র ছাড়িয়া, হাতের কাজের উপর ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। মানস-ক্ষেত্র তখন মুক্ত হইয়াছে—হাতের কাজও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। গুরুদেব, যে-শিল্পী এই প্রণালীতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তিনিই কালে প্রকৃত শিষ্য-পদবাচ্য হইবার যোগ্য—অপরে নহে।

বিন্দুমাধব যুবক-শিষ্য নারায়ণের ভাস্কর-শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণার কথা অবগত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। দয়াময় ভগবান এতদিনে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন বুঝিয়া, তাঁহার নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হইয়া গেল ! তিনি আবেগভরে নারায়ণকে পরম স্নেহাতিশয্যে বক্ষে টানিয়া লইয়া, তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন যুবক-শিষ্য নারায়ণের শিল্পসংক্রান্ত ধারণার কথা, অপর শিষ্যগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। গুরুদেবের নিকট ভর্ৎসনার পরিবর্ত্তে নারায়ণ, যে অপূর্ব্ব সম্মান লাভ করিল, তাহা তাহাদের কল্পনারও অতীত ! তাহারা নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

(৫)

অনন্যমনে সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোরতম সাধনা করিয়া বিন্দুমাধব তিলে তিলে যে ভাব বা জ্ঞান-বিত্ত সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার গঠিত মূর্ত্তিতে নিঃশেষে

প্রযুক্ত করিয়াছেন। তিনি চির-জীবন, শিল্পরাণীর যে আদর্শ মূর্ত্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এতদিন পর, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার সময়, মনোমধ্যে স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া উঠিল। তিনিও তখন তাঁহার অসম্পূর্ণ মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাঁহার বাটালীর শেষ স্পর্শ দ্বারা তাহা প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন।

এখন সাধারণে সেই মূর্ত্তির দর্শনলাভের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে লোক-সমাগম হইতে লাগিল। মূর্ত্তির গঠন-সৌষ্ঠব ও অঙ্গ-বিন্যাসের মাধুর্য্য, সর্ব্বোপরি, সমস্ত মুখমণ্ডলের করুণ-রসাশ্রিত অপূর্ব্ব শান্তভাব লক্ষ্য করিয়া, দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়া গেল। কত দেশের কত শিল্পী আসিয়া একবাক্যে এই অপূর্ব্ব-সুন্দর মূর্ত্তির অজস্র প্রশংসা করিয়া গেল। সকলেই উল্লসিত হইয়া একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গেল—"এ মূর্ত্তি যেন বিধাতার দান—এ মূর্ত্তি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব—অনিন্দ্যসুন্দর! ইহাতে কলা-কৌশলের কোনরূপ ব্যত্যয় নাই—এই মূর্ত্তিতে কোন কিছুর অভাব লক্ষ্য করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ধন্য শিল্পীর সাধনা,—পরম সৌভাগ্যশালী এই সার্থক শিল্পীর জয় হউক!"

ভাস্কর বিন্দুমাধব কিন্তু, দেশ-বিদেশের কলাভিজ্ঞ শিল্পীদের মুক্তকণ্ঠের অযাচিত প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়াও,তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা—সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায়, সাধারণ শিল্পীগণও হয়ত গঠিত মূর্ত্তির বাহ্যসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া অজস্র প্রশংসাবাদ করিতেছে। একটি সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোরতম সাধনা ও আত্মত্যাগের কথা যে এই মূর্ত্তির সহিত অবিমিশ্রভাবে বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে? যদি কেহ, তাঁহারই মত কঠোরতম সাধনা দ্বারা, বা ভগবৎ-কৃপায় তাঁহারই মত অধিকার লাভ করিয়া শিল্পকলা বুঝিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে, তবে সেই সাধক-শিল্পীর প্রশংসাবাণী লাভ করিতে পারিলে, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা, পরিশ্রম ও চিন্তার সার্থকতা হয়! কিন্তু এমন অধিকারী শিল্পী মিলিবে কোথায়?

তাঁহার সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী যুবক-শিষ্য নারায়ণ, এ অধিকার-লাভের উপযুক্ত পাত্র। তাহার মত ভগবৎ-কৃপাশ্রিত উচ্চাধিকারী শিল্পীর নিরপেক্ষ প্রশংসা, শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে। কিন্তু সে শিষ্য কোথায়? সে, তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতির লীলা-নিকেতন —নদী-বন, জঙ্গল-পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাববিত্ত সঞ্চয়ের জন্য কোথায় কোন্ দূরদূরান্তে চলিয়া গিয়াছে! সে কি আর আসিবে?—তাহার কি আর গুরুদেব বলিয়া মনে আছে?

কিন্তু নারায়ণ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুদীর্ঘকাল দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সুদূরবর্ত্তী দেশে, সে তাহার গুরুদেবের রচিত অনিন্দ্য-সুন্দর দিব্যমূর্ত্তি গঠনের সংবাদ পাইয়া, ও তাহার অজস্র প্রসংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধন্যতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায়, গুরুদেবের কর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল! কিন্তু সুদীর্ঘকাল পর, নবাগত শিষ্যবর্গ কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

স্বয়ং গুরুদেব, মূর্ত্তির পাদপীঠ-মূলে উপবিষ্ট আছেন। আর দলে দলে দর্শনার্থী আসিয়া সকলেই একবাকে অজস্র প্রশংসা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তাহারই মধ্য হইতে নারায়ণ আপন মনেই, পরম আনন্দভরে বলিয়া উঠিল—'অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—অপূর্ব্ব কল্পনা—অপূর্ব্ব কল্পনার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি-বিকাশ! সবই অপূর্ব্ব—সবই অপূর্ব্ব—সবই অপূর্ব্ব; —কেবলমাত্র যা একটির অভাব!' অতি উল্লাসভরে এই কথা বলিয়াই নারায়ণ জনতা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোথায় কোন্ দিকে চলিয়া গেল।

শিষ্য ভাবিল—'কি অনিন্দ্যসুন্দর কল্পনা—কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের দ্যোতনা! গুরুদেবের এই ভাব-সম্পদ্ আয়ত্ত বা অধিগত করিতে, বা তাঁহারই শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার লাভ করিতে এখনও বহু সময় ও সাধনা আবশ্যক।' এই ভাবিয়া সে সকলের অজ্ঞাতে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি অজ্ঞাতসারে কোথায় কোন্ দিকে চলিয়া গেল।

বিন্দুমাধব তাঁহার ন্যায্য-প্রাপ্য প্রশংসা সকলের নিকট প্রচুরভাবে প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে চরিতার্থতা বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, তাঁহার গঠিত মূর্ত্তিতে কে যেন, কিসের অভাবের কথা বলিয়া গেল! কে সে? কিসের

অভাব ?—শত চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা জানিতে বা অনুমান করিতে পারিলেন না।

বিন্দুমাধব কিন্তু, ইহাতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কত লোক আসিয়া এই অভাবাত্মক মন্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া, কতরূপেই তাঁহাকে বুঝাইল। কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা, একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল ভাবিয়া, তিনি কিছুতেই সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ-বয়সে এইজন্য দারুণ দুশ্চিন্তা-পীড়িত হইয়া তিনি অচিরেই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমেই, তাঁহার যেন জীবনী-শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার গঠিত মূর্ত্তিতে কিসের অভাব, তাহা জানিতে না পারিলে, তাঁহার যে মরণেও সুখ নাই—শান্তি নাই! আর তিনি সুস্থচিত্তে মরিতেই বা পারিবেন কেন? এই দারুণ চিন্তা-পীড়িত অবসাদগ্রস্ত দুরবস্থার মধ্যে রহিয়াও, দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল।

আজ বিন্দুমাধবের অন্তিমকাল উপস্থিত। কিন্তু, সফলতা-মণ্ডিত সিদ্ধ-সাধকের অন্তিমকালে যে প্রসন্নোজ্জ্বল স্বর্গীয় মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, বিন্দুমাধবের চরমকালে তাহার বিকাশ হইল কৈ? বিষাদের কালিমায়, তাহা যেন মসীমলিন হইয়া গেল!

এমন সময় নারায়ণ দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার চরণ ধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল। তাহাকে দেখিয়া মুমূর্ষু বিন্দুমাধব দুর্ব্বল ও অবসন্ন-হৃদয়ে কতই না বল-সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার বদন-মণ্ডল যেন বহু আশায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি কতই না আগ্রহভরে, তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে তাঁহার গঠিত মূর্ত্তি বেশ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিয়া আসিতে বলিলেন। শিষ্য আদেশ প্রতিপালন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, আমার গঠিত এই মূর্ত্তি-সম্বন্ধে, তোমার ন্যায় বিশিষ্ট প্রতিভাশালী শিল্পীর অভিমত জানিতে পারিলেই, আমি সর্ব্বতোভাবে আশ্বস্ত হইতে পারি। আমার গঠিত প্রতিমা দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে অযাচিতভাবে অজস্র প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু বাবা, কে একজন, এই মূর্ত্তিতে একটি বিষয়ের অভাবের কথা বলিয়া গিয়াছে! বাবা, সে কিসের অভাব ?—লক্ষ্য করিয়া থাকিলে, আমায় বলিয়া দাও—আমি, শত চেষ্টা করিয়াও তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। অপর কেহ বলিয়া দিয়াও আমায় চিন্তামুক্ত করিতে পারে নাই।'

নারায়ণ গুরুদেবের নিকট এই কথা শুনিয়া, পুনরায় তাঁহার চরণধূলি মস্তকে লইয়া বলিল—"গুরুদেব, একথা অপর কেহ বলিয়াছে কি না জানিনা,—তবে, আমিই একথা বলিয়াছিলাম। মধ্যে একবার, আপনার গঠিত মূর্ত্তির অজস্র প্রশংসা শুনিয়া তাহা দেখিতে আসিয়াছিলাম, এবং মূর্ত্তি দেখিয়া অতিমাত্রায় মুগ্ধ হইয়া, অজস্র প্রশংসাবাদ করিবার পর, উত্তেজিত হইয়া মহানন্দে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলাম—'এই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তির সবই অপূর্ব্ব—কেবলমাত্র যা একটির অভাব।' এই কথা বলিয়াই, কাহারও নিকট আত্ম-পরিচয় না দিয়া—এমন কি, আপনার নিকটও আত্মপ্রকাশ না করিয়া চলিয়া যাই। তাহার পর, সাধনায় কতদিন গিয়াছে;—আজ পুনরায় আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিয়া ধন্য হইলাম।"

মুমূর্ষু বিন্দুমাধব ক্ষীণতমকণ্ঠে বলিলেন—'তোমার অকুণ্ঠ প্রশংসায় আমি গৌরব বোধ করিলাম। কিন্তু অভাব কিসের বাবা?' এই বলিয়া তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

নারায়ণ তাড়াতাড়ি বলিল—'অভাব আর কিসের গুরুদেব?—অভাব কেবল বাক্যের! বাক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই, বিশ্ব-স্রষ্টা ও স্রষ্টা-শিল্পীর পার্থক্য মুছিয়া যাইত!...'

এই কথা শুনিয়া বিন্দুমাধব আশ্বস্ততার একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার জরাগ্রস্ত রোগ-মলিন বদন-মণ্ডল সুস্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল-প্রভায় সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

নক্ষত্রের সংখ্যা

শ্রী জগদানন্দ রায় এম-এ

পরিষ্কার রাত্রিতে আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া যে হাজার হাজার নক্ষত্রকে জ্বলিতে দেখা যায়, তাহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের সূর্য্যের মতো এক-একটি জ্যোতিষ্ক। এই কথা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের অনেক প্রাচীন বিশ্বাসকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন এবং যে বিশ্বাসকে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও সত্য বলিয়া জানিতাম, এখন তাহাদের অনেক-গুলিকে অসত্য বলিয়া ছাড়িতে হইতেছে। কিন্তু নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের যে ধারণা ছিল তাহা ঠিকই আছে। আকাশের কোণে যে খুব ম্লান নক্ষত্রটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে, তাহা আধুনিকদেরও মতে আমাদের সূর্য্যের মতো একটা প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক। হয়ত, সূর্য্য অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বড়। আমাদের সূর্য্যকে ঘেরিয়া যেমন পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহেরা ঘুরপাক খায়, হয়ত সেই নক্ষত্রটিকে ঘেরিয়াও অনেক গ্রহ ও উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায়। অতি দূরে আছে বলিয়া আমরা তাহাকে সূর্য্যের মতো উজ্জ্বল ও বড় দেখি না এবং তাহাকে কত গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহাও জানিতে পারি না।

আকাশের দিকে তাকাইলে মনে হয়, নক্ষত্রদের সংখ্যা অসংখ্য অর্থাৎ তাহাদের গুণা যায় না। কিন্তু খালি চোখে যতগুলি তারা নজরে পড়ে, জ্যোতিষীরা তাহাদের গুণিয়াছেন; তাহাদের প্রত্যেকের নাম দিয়াছেন; এবং আকাশের কোন্ স্থানে তাহারা আছে আকাশ-মানচিত্রে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, আমরা খালি চোখে ছয় হাজারের বেশী নক্ষত্র দেখিতে পাই না। কিন্তু ইহাই কি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নক্ষত্রের সংখ্যা? তুমি-আমি হয়ত বলিব,—"হাঁ, ইহাই চরম সংখ্যা।" চোখে দেখাকে অবিশ্বাস করা যায় না,—চোখে দেখা লইয়া মামলা-মোকদ্দমা হয়, জেল দ্বীপান্তর হয়, এমন কি ফাঁসি পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং চোখে দেখাকে অবিশ্বাস করা যায় না। বৈজ্ঞানিক বলেন, "না, তোমার চোখকে বিশ্বাস করিয়ো না। আমাদের চোখের শক্তি সীমা-বদ্ধ। একবিন্দু পুকুরের জল লইয়া দেখ,—কেমন পরিষ্কার। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে ফেলিয়া তাহাকে পরীক্ষা কর। দেখ, কত হাজার হাজার জীবাণু তাহাতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ ওলাউঠার রোগের উৎপত্তি করে, কেহ টাইফয়ডের উৎপত্তি করে, কেহ বা যক্ষ্মা-রোগের জন্ম দেয়। খালি চোখে মাঠের শেষে বন-রেখার দিকে তাকাও। দেখ, সবই অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। কেবল সবুজ রঙে বুঝা যাইতেছে, সেখানে গাছ আছে। দূরবীণ দিয়া তাহাকে লক্ষ্য কর। দেখ, দুই ক্রোশ দূরের সেই বনের প্রত্যেক গাছের ফুল ফল পাতাকে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অতএব চোখকে বিশ্বাস করিয়ো না।"

জ্যোতিষীরাও তাহাই বলেন। আকাশের যে জায়গা ফাঁকা অর্থাৎ যেখানে তারা নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার মুখ রাতের বেলায় কিছুক্ষণ খুলিয়া রাখ। দেখ, ফোটোগ্রাফের কাচে সেই ফাঁকা জায়গায় অনেক নক্ষত্রের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, বলিতে হয়, তোমার বা আমার দুইটা চোখের তুলনায় ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার সেই একটা কাচের চোখ দেখে ভালো।

যাহা হউক, জ্যোতিষীরা ঐ রকমে আকাশের সর্ব্বাংশের ফোটোগ্রাফ তুলিয়া সমস্ত নক্ষত্রের সংখ্যা পাইয়াছেন প্রায় চল্লিশ কোটী! ইহার মধ্যে আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই কেবল ছয় হাজার। কিন্তু এই চল্লিশ কোটীকেই চরম সংখ্যা মনে করিবেন না। বর্ত্তমান যুগকে লোকে যান্ত্রিক যুগ বলে। পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকের কণ্ঠস্বর যে নিমেষ মধ্যে অপর প্রান্তের লোকেরা শুনিবে,—বেশী দিন নয়, ত্রিশ বৎসর আগেকার

বৈজ্ঞানিকেরা তাহা কল্পনাই করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাও এই যুগে সম্ভব হইল। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বায়স্কোপ, এরোপ্লেন,—সকলে মিলিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং আকাশের চল্লিশ কোটী নক্ষত্র যন্ত্রবলে যে একদিন একশত কোটী হইবে না তাহা কখনই জোর করিয়া বলা যায় না।

ধরা যাউক, আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা চল্লিশ কোটীর একটিও বেশী নয়। ভাবিয়া দেখুন, এই চল্লিশ কোটীর প্রত্যেকটি এক-একটি সূর্য্য, কেহ কেহ বা মহাসূর্য্য অর্থাৎ আকারে দশ হাজার বিশ হাজারটা সূর্য্যের সমান। তাহারা আমাদের এই "মহাদ্যুতি" সূর্য্যের তুলনায় বহু-সহস্রগুণ তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়াইতেছে। আবার তাহাদের প্রত্যেকটিকে ঘেরিয়া আমাদের পৃথিবীর মতো বা আমাদের পৃথিবীর হাজার-গুণ বড় গ্রহেরা প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাহাদের দূরত্বই বা কত,—লক্ষ কোটী যোজনে তাহা মাপা যায় না।

ভাবিয়া দেখুন, সেই চল্লিশ কোটী নক্ষত্রের একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র সূর্য্যের অধিকারে একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রহে আমরা বাস করিতেছি; এবং তাহারি এক কোণের এক ক্ষুদ্র নগরে বসিয়া আস্ফালন করিতেছি। বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমরা এবং আমাদের ভূ-সম্পত্তি কত তুচ্ছ ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। দেয়ালীর রাত্রিতে নগরে যে হাজার-হাজার প্রদীপ জ্বালা হয়, তাহার একটি নিভিয়া গেলে যেমন উৎসবের অঙ্গহানি হয় না,—তেমনি হঠাৎ যদি একদিন আমাদের সূর্য্যদেব তাঁহার ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রহ-উপগ্রহ ও ধূমকেতুদের লইয়া লোপ পান, তবে ব্রহ্মাণ্ডের লীলা এবং মহিমা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না। আমাদের এই সৌরজগৎ সমুদ্র-সৈকতের একটি অতি ক্ষুদ্র বালুকণার মতোই তুচ্ছ বস্তু।

সোনার বাংলা

(মিশ্র-বাউল)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

(১)

সোনার বাংলা মোদের বল্‌লো কানা।
রোগের আবাস ব'লে হ'লো জানা॥

মরে অকালে নর-নারী শত শত—
যারা বেঁচে তারাও আধ-মরার মত;—
করে' ঘরে ঘরে মানুষেরে শয্যাগত
নানা ব্যাধির বাহন উড়ে মেলে ডানা॥

দেহে প্রবেশ পেলে ম্যালেরিয়ার অংশ,
নিত্য কুইনাইন্ সেবনে নাশো ব্যাধির বংশ;
কর ইন্‌জেকসন্ নিয়ে জ্বর ত্বরায় ধ্বংস;—
কভু শয্যায় মশারি বিনা শয়ন মানা॥

কর ভাদ্র আশ্বিন হ'তে অগ্রহায়ণ—
প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত কুইনাইন্ সেবন—
হবে ম্যালেরিয়া-নিবারণী কবচ রচন:—
জলে কেরোসিন্ ছড়িয়ে মারো মশার ছানা॥

নির্ম্মল জলে বাঁচে জীবের জীবন—
হয় জলের হেলায় নানা রোগের গঠন;—
কর আবদ্ধ জলের অবাধ নিঃসারণ,—
বুজাও রুদ্ধ জলের আধার ডোবা খানা॥

গাছ ঝোপ কেটে' আনো আলো হাওয়া ;—
যাবে রোগের কবল হ'তে নিস্তার পাওয়া ;—
কভু জলকে রেখো না ঘাস-পানায় ছাওয়া—
নাশি' জলের ঘাস-পানা ভাঙো যমের হানা ॥

দুগ্ধের সেবনে বাড়ে জাতির প্রভাব ;
আর ধেনুর হেলায় হয় দুগ্ধের অভাব ;—
পুনঃ জাগুক্ দেশে ধেনু-চর্য্যার স্বভাব—
গো- পালন বিজ্ঞান হোক্ সবার জানা ॥

(২)

কর নিত্য ব্যায়াম ক্রীড়া ধর্ম্মের অঙ্গ ;—
খোলো মুক্ত আকাশ-তলে খেলার সঙ্ঘ ;—
হয় ব্যায়াম ক্রীড়ার অভাবে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ;—
বসে অলস শরীরে নানা রোগের থানা ॥

কোমর বেঁধে সবাই কাজে লাগো,—
ধনোৎ- পাদন-ব্রতে দেশের মুক্তি মাগো ;—
কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়ে হেলা ত্যাগো ;—
কর শিল্পের প্রসার খুলে' কল্-কারখানা ॥

একের বোঝা কর দশের লাঠি—
রজ্জু পাকাও বেঁধে তৃণের আটি ;—
হেরি' সঙ্ঘ-শক্তির রচা সোনার কাঠি—
সরে' দূরে পলাবে বাধা বিপদ নানা ॥

পরাশ্রিত হ'য়ে থাকা কর ঘৃণা,—
বরং মরণ তা-হ'তে শ্রেয় আহার বিনা —
খেটে' আত্ম-শক্তির পূর্ণ প্রসার বিনা,
মনুষ্যত্বের বিকাশ কভু যায় না আনা ।

থাকে শিক্ষার অভাবে জাতি অনুন্নত,
শিক্ষা বিনা মানুষ হয় পশুর মত ;—
কর শিক্ষার প্রভায় দেশ আলোকিত ;—
যেন শিক্ষায় বঞ্চিত হ'য়ে কেউ থাকে না ॥

আপন দেশে যা কিছু সুন্দর, সত্য,—
সযতনে কর তাহা শিক্ষায়ত্ত ;—
ভ্রমি' বিশ্বের তীর্থ, আহর নূতন তথ্য :—
হোক্ সকল দেশের জ্ঞান সবার জানা ॥

মায়ের জাতি যেথায় অন্ধকারে,
সে দেশ বিশ্বে সবার কাছে হারে ;—
জ্বালো জ্ঞানের আলো, নারীর মুক্তির দ্বারে ;—
সে মূঢ়, যে তোলে তাতে ধর্ম্মের মানা ॥

পদানত মাথা কর সমুন্নত—
সাম্যের প্রসার কর জীবন-ব্রত,—
হও সবার হিতের ব্রতে সবাই রত ;—
তাতে বিধির আশিস্ দেশে হবে আনা ॥

আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠানে
পুনঃ শক্তির উৎস এনে জাগাও প্রাণে ;—
মিলে' নৃত্যের তালে তালে নির্ম্মল গানে—
খোলো জীবনে আনন্দ-স্রোতের মোহানা ॥ *

---

* এই গানটি সিউড়ী ম্যালেরিয়া-নিবারণী সঙ্ঘ বা এ্যাসোসিয়েসন্-এর প্রথম অধিবেশনে গীত হইয়াছিল।

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(২১)

অশোক কলিকাতায় আসিয়া দেখিল সুধীর নাই, সে তাহাদের সেবা-সংঘের কি একটা কাজে আহমেদাবাদ গিয়াছে। কলিকাতার বক্র-সঙ্কীর্ণ গলি, এমন কি তাহার রাজপথ পর্য্যন্ত তাহার কাছে বড় অপ্রশস্ত বলিয়া বোধ হইল। চারিদিকে বড় বড় বাড়ীর সুখময় কারাগার—কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই। ইহারা যেন চারিদিক হইতে মানুষের দেহ-মনকে চাপিয়া রাখিয়াছে, মুক্ত বাতাসে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস লইতে দিতেছে না। ইহার মধ্যে মানুষ কেমন করিয়া একাদিক্রমে সমস্ত জীবন কাটায় সে আজ বুঝিতে পারিল না। সে সুধীরের বাড়ী হইতে তাহার বর্ত্তমান ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিল।—

"প্রিয়বরেষু,—ভাই সুধীর, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমি কলকাতা ছেড়ে যাই,—গাঁয়ে মাস কতক কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছি। একেবারে নিঃসঙ্গ থাকবার গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে বিশেষ ক্লেশদায়ক হ'য়ে উঠেছিল। সমস্ত দিনের কাজের পর যখন সন্ধ্যাবেলা মাঠ ভেঙে আমার কুঁড়েতে ফিরতাম, তখন বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার ক'রে উঠ্‌ত। আমি একরকম নিজের মনের কাছে হার মেনে চ'লে এসেছি। জীবনটা এত ব্যথাভরা কান্না হবে তা কি জানতাম ভাই! যে পথে চলেছিলুম সে পথের মোহ তখন চোখে লেগে ছিল, এল কালবৈশাখীর কালো ঝড়,—শিকড় শুদ্ধ উপড়ে নিলে আমাকে। যখন ঝড় কেটে গেল,—দেখলুম আমার সেই বহুদিনের চিরপরিচিত পথ, সুন্দরী ধরণীর সঙ্গে আকাশের যেখানে মিলন সেখানে রয়েছে,—আর আমি অনেক দূরে অন্য পথের প্রারম্ভে রক্তাক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছি।

সেই ঝড়ের মুখে আমার পথের সাথী জীবনের দোসর আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ল। এই অচেনা পথে চল্‌তে চল্‌তে পুরানো পথ যখন বহুদূরে মাঝে মাঝে দেখা দেয় তখন সন্ধ্যার স্তিমিত-আলোকে আমার সেই বড়-ভালোবাসার ধনের রেখামূর্ত্তি কখনো কচিৎ চোখে পড়ে বই কি! কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখা শুধুই তিয়াস বাড়িয়ে যায়।...আজ মনটা বড় অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। কেবলি মনে জাগ্‌ছে একটি প্রশ্ন—সেটি এই যে, এই ভিন্নমুখী দুই পথের আবার কোথাও মিলন ঘট্‌বে কি?

মিলনের আশ্বাস যদি পাই তাহ'লে আমার সমস্ত ক্লান্তি, দুঃখ, ব্যর্থতাকে তুচ্ছ ক'রে আমার দরদিয়ার আশায় আমি থাকতে পারি। যদি তা-ই না হোল'তবে কেন খেটে মরি! নিঃস্বার্থভাবে কোনো কিছু করার মত বড় আমি নই; আমি চাই আমার তা'কে—যদি না পাই পৃথিবী রসাতলে যাক্—আমার দুঃখ নেই। যে দুঃখ আমার, তোমারও সেই দুঃখ সুধীর! তোমার গোপন বেদনার উৎসকে আমি আবিষ্কার করেছি, আর সে ব্যথার কাহিনী যে কত গভীর, কত করুণ, তা আমার আর বুঝতে বাকী নেই। দেশের জন্য খাটার এই শক্তি,—তার প্রেরণা কে দিচ্ছেন, আমার মুখে তাঁর নামটি শুন্‌তে চাও কি?—তিনি ইন্দুলেখা। তোমার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে যদি কোনো বেদনা দিয়ে থাকি, মাপ কোর' বন্ধু!...

তাই, যে দুঃখ আমার, তোমারও সেই দুঃখ সুধীর!—আমরা সমব্যথী। মিলন-সুধা-সাগর-তীর থেকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ফিরে যাওয়াই আমাদের বরাতে বিধাতা লিখেছেন। কিন্তু চল্‌তে বাধা কি ভাই!—চল্‌তে থাকো। এখনো যে "So much suites to search, So much closets to explore, So much alcoves to importune."

তাই নয় কি? তারপর একদিন "অন্ধকার নামিবে নীরবে, প্রেমনত নয়নের দীর্ঘপল্লবের স্নিগ্ধ ছায়া সম!"

সেদিন আমরাও অন্ধকারের সেই স্নিগ্ধতার সঙ্গে মিশে যাব। দুঃখ কি ভাই? ইতি

তোমার দরদী বন্ধু—অশোক।"

পরিচিত আর কাহারো সহিত দেখা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কলিকাতার বন্ধুদের আন্তরিকতাবিহীন শিষ্টাচারে তাহার কোনকালে আস্থা ছিল না। একবার ভাবিল শেফালিকে একবার লুকাইয়া দেখিয়া আসি। মনে কি ভাবিয়া বলিল, না। তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে গোটাকতক ভালো-জাতের বিলাতী মোরগ,—মৌরীর জন্য একজোড়া শাড়ী ও একটা ছবিভরা বাংলা বই কিনিয়া আবার অজ্ঞাতবাসে চলিয়া গেল।

যখন সে পৌঁছিল তখন রাত হইয়া গিয়াছে। শরৎ-আকাশের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার দিক ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথম যেদিন সে এখানে আসিয়াছিল সেদিনকার মত আজ আর তাহার মনে শূন্যতা ছিল না। ভাবিতেছিল, ভুলো কুকুরটার জন্য যে ডগ্-বিস্কুট লইয়া যাইতেছে, সে যখন তাহা পাইবে কেমন খুসী হইয়া, লেজ নাড়িয়া, তাহার পুরাতন প্রভুকে অভ্যর্থনা করিবে। আর মৌরী!—সেই বা এতক্ষণ কি করিতেছে! তাহার এই আকস্মিক আগমনে কত না জানি বিস্মিত, আনন্দিত হইবে। দামী মোরগগুলো কুলীর মাথার ঝাঁকানিতে কঁক কঁক করিয়া উঠিতেছিল। তাহাদের স্বরের ভিতরও সে যেন নূতন প্রতিবেশী পরিজনের সম্ভাষণের সাড়া পাইল।

ভুলো দূর হইতে মানুষ দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছিল, কাছে আসিয়া গায়ের গন্ধে প্রভুকে চিনিতে পারিয়া, ল্যাজ নাড়িয়া, মাথা দুলাইয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সে যেন অনেকদিন পরে তাহার হারানো প্রিয়জনকে ফিরিয়া পাইয়াছে—তাহার সেই চাপা ঘেউ ঘেউ রবের ভিতর সেই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য কী আকুতি!

"চুপ ভুলো, গোলমাল করিস্ নি।" অশোক তাহার মাথা চাপ্ড়াইয়া দিল। ভুলো যেন তাহার কথা বোঝে, সে চুপ করিয়া গেল।

ঘরের দরজা ভিতর দিক হইতে বন্ধ—খোলা জানালা দিয়া বাহিরে আলো আসিতেছিল। সে দেখিল টেবিলের উপর তাহার ফটোগ্রাফটি ফুল দিয়া সাজান, সামনে মৌরী—পরনে তার দেওয়া লাল-পেড়ে শাড়ী, বসিয়া কখনো বা দ্বিতীয় ভাগের পড়া অভ্যাস করিতেছে, কখনো বা আনমনা ভাবে কি-যেন ভাবিয়া মাথা নাড়িতেছে। তাহার কালো মুখের উপর আসন্ন যৌবন একটা মসৃণ-চিক্কণতা আনিয়া দিতেছিল।—কপোলের উপর শুকাইয়া যাওয়া অশ্রুজলের দাগ। অশোক দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া ভাবিল, এতবড় বিপুল জগতে তাহার জন্য ভাবিবার লোকও তাহা হইলে একজন আছে! সে দূরে গেলে একজনের চোখে জল পড়ে, এ এক পরম আনন্দময় উপলব্ধি। মৌরীর জন্য আনীত ছবি-ভরা গল্পের বইখানি তাহার হাতে ছিল, সে জানালা দিয়া তাহা চকিতে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া পাশের অন্ধকারে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল মৌরী কি করে।

মৌরীর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল একটা বিস্ময়—সে 'কে?' বলিয়া চমকিয়া উঠিল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য হ্যারিকেনের পল্‌তে বাড়াইয়া দিল। বইখানি দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া অশোককে দেখিয়া ছোট মেয়েটির মত একেবারে নাচিতে লাগিল! তাহার চোখে, মুখে, চঞ্চল দেহ-ভঙ্গীর মধ্যে যেন আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না; হাসিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিল, এমনি আত্মহারা ভাবে সে বলিল, "ও! আপনি! এমনি ভয় লেগেছিল আমার! হঠাৎ কি ক'রে এসে পড়্‌লেন?"

অশোক হাসিয়া বলিল, "তা যেন এলাম,—এতরাত্রে খাবার যোগাড় করবে কি ক'রে? আমার বড় খিদে পেয়েছে যে!"

পা ধুইবার জন্য জল-গামছার যোগাড় করিয়া দিতে দিতে মৌরী বলিল, "সে জন্যে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না! আপনি 'আজ আস্‌বেন মনে ক'রে' আমি রোজ রাত্রে দু'জনের জন্যে ভাত রাঁধি। আবার আসেন না দেখে সেই বাসী ভাত পরের দিন খাই।—দুপ'রে আর রাঁধতে মন লাগে না।" বলিয়া সে যেন সরম-সঙ্কুচিতভাবে হাসিতে লাগিল।

এ ভাবটি অশোকের অপরিচিত—এই বুনো মেয়েটির এমন লাজুক ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। বলিল, "তুমি ত এর আগে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকতে না—কখন ঘুমিয়ে পড়তে, আজ তবে কেন এতক্ষণ জেগে ছিলে?"

মৌরী বলিল, "আপনি চ'লে যাবার পর, আমি অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে পড়ি,—হঠাৎ কখন এসে পড়্তে পারেন এই মনে ক'রে। আর আজ সকালে যখন 'কাড়ালে' পাখী ডেকে গেল, তখন থেকেই আমার মন বল্‌ছিল যে আজ আপনি নিশ্চয় আস্‌বেন। সেই জন্যেই ত এত রাত পর্য্যন্ত আলো জ্বেলে বই নিয়ে আপনার জন্যে ব'সে ছিলাম।"

অশোক অন্তরের গোপন তৃপ্তি-সুখকে হাসিতে হাল্কা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, চল এখন খেতে যাই।"

অশোকের নিজের কোনো বোন ছিল না, তাই ভগিনীর যত্ন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। আর, ভালবাসা অশোকের স্বভাব। তাই এই মা-বাপ-হারা অনাথা মেয়েটিকে সে নিজের বোনটির মতই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তার আদর-আবদার স্নেহ-জ্বালাতনে সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিত।

প্রতিদিন সে অশোকের খাওয়া হইয়া গেলে, তার বাসন-পত্র উঠাইয়া রাখিয়া, নিজের জন্য ভাত বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিত।

অশোক বলিল, "আজ অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আজ আর তুমি পরে খেয়ো না, আমার খাবার দিয়ে তুমিও নিজের ভাত বেড়ে নাও।"

মৌরী বলিল, "না, বিকেলে আমি খাবার খেয়েছিলাম, এখনো আমার সে রকম ক্ষিধে পায় নি। আপনি খেয়ে নিন, তার পরে খাব।"

অশোক বুঝিয়া মৃদু হাসিল, আর কোনো আপত্তি করিল না।

অশোক নত হইয়া আহার করিতেছে, মুখের উপর প্রদীপের আলো পড়িয়াছিল,—মৌরী মুগ্ধমনে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া ছিল।

কেহ মুখের পানে চাহিয়া থাকিলে না দেখিয়াও তাহা অস্বচ্ছন্দ-বোধের সহিত বুঝিতে পারি। সে চোখ তুলিতেই মৌরী লজ্জা পাইয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়া, সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া, কথাবার্ত্তার অন্তরাল খুঁজিল, বলিল, "জানেন বাবু! শেয়ালে কালো রংয়ের মোরগটা নিয়ে গেছে।"

"কেন, পাখীর ঘরের তারের বেড়া কোথাও ভেঙে গেছে বোধ হয়?—ক'টা মুরগী ডিম দিচ্ছে?"

"এখন দুটা তিনটা দিচ্ছিল। কালো মোরগটা ধ'রে নিয়ে যাবার পর একটাও ডিম দেওয়া বন্ধ করেছে!"

"ছাগল ভেড়া এদের কোন বাচ্চা হয় নি?"

"হ্যাঁ, সেই পাটকিলে রংয়ের ছাগলীটার তিনটা কালো বাচ্চা হয়েছিল—একটা হ'য়েই ম'রে গেল; দু'টো আছে এখন। ওদের আর রাখা যায় না—ক্ষেতে গিয়ে পড়ে; যে গাছে মুখ দেয় তাতে আর ফসল হয় না।"

অশোক খুসী হইয়া পশুপাখীর শুভাশুভের খোঁজখবর লইতে লাগিল। এখন সে মানুষের সাহচর্য্য অপেক্ষা পশুপাখীর জীবনে বেশী আনন্দ পায়। মৌরী যেন তাহাদেরি একজন—কেবল সে কথা বলিতে পারে এই যা তফাৎ!

"পায়ে পালকওয়ালা বিলাতী মোরগগুলো দেখেছিস মৌরী?"

"হ্যাঁ, কত বড়,—আর কি সুন্দর দেখ্‌তে! নিশ্চয়ই অনেক দাম নিয়েছে?"

"তা নিয়েছে, রাতের মত ওদের টুকরি-শুদ্ধ ঐ ভাঁড়ার-ঘরেই তালা বন্ধ ক'রে রেখে আয়—সকালে উঠে তারের ঘরে দেওয়া যাবে।"

অশোকের মনে হইতে লাগিল সে যেন রবিন্‌সন্ ক্রুশো, আর ঐ সাঁওতাল মেয়েটি যদিও ফ্রাইডে নয়—সে তাহার আরো সুন্দর কবিত্বময় নামকরণ করিয়াছে—সে মৌরী। সভ্যতার ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত জাহাজখানা হইতে সে যেন এইসব জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছে! এই সব অর্দ্ধনগ্ন আদিম অধিবাসীদের সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে সেও তাহার পা মিলাইতে চায়। মৌরীর ইচ্ছা—সে আরো খানিকক্ষণ বসিয়া অশোকের সঙ্গে কথা বলে। এতদিন চুপ করিয়া থাকিয়া অশোককে না দেখিয়া তাহার মন কথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অশোক বড় পরিশ্রান্ত—ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসিতেছে; সে তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "অনেক রাত হয়েছে, আলো

নির্ভয়ে শুয়ে পড়ুনগে'—আমি বিছানা, মশারি সব ঠিক ক'রে রেখেছি।"

অশোক তাহার মুখের পানে সস্নেহে চাহিয়া, হাসিয়া বলিল, "তুই আমাকে প্রণাম করলিনে যে?"

প্রণাম করিতে অশোক তাহাকে শিখাইয়াছিল। আনন্দে আত্মহারা মৌরী বাস্তবিকই সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু যে পূর্ণ প্রণামখানি সে অশোকের চরণে মনে মনে নিবেদন করিয়াছিল, তাহাতে বাহিরের লৌকিকতার প্রণামে কি কিছু যায় আসে?—এই অনার্য্যা বালিকার স্বভাব-সরল মনে তাহা ত জাগে নাই। সে অপ্রস্তুত হইয়া হাসি-মুখে বলিল, "ও হ্যাঁ, আমি ভুলে গেছিলাম, কিছু মনে করবেন নি বাবু!—" বলিয়া সে হেঁট হইয়া অশোকের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

"ফের বাবু—।" অশোক হাসিয়া, তাহার মাথার চুলের উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, "তোমার ভাল হোক্।"

এই দুখিনীর জন্ম এই সরল মঙ্গল-কামনা অশোকের মনে তাহার প্রণাম করার অনেক আগেই জাগিয়াছিল। মৌরী ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। অশোক লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, কেন জানি মৌরীর দুই চোখ অশ্রু-সজল হইয়া উঠিয়াছে।

অশোক তাহাকে কেন প্রণাম করিতে শিখাইয়াছিল তার একটা যুক্তি আছে,—কেবল একজনকে অকারণ নতি-স্বীকার করাইয়া তার শ্রদ্ধা আদায়ের জুলুমে নয়। বিছানায় শুইয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল।

মানুষের মন এত দুর্ব্বল—দেহ তার চেয়েও বেশী। সে-দেহের কথা বলিতেছি না যা স্থূল মাংসপেশীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে,—মনের চেয়েও সেই অন্তর্দেহ দুর্ব্বল, যাহার অনুভূতির সুখের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া মানুষ আত্মসমর্পণ করে—মুহূর্তের ভুল চিরকাল মনে অনুতাপের তুষানল জ্বালিয়া দেয়।

যে-কোনো তরুণীর প্রতি যুবকের এই সুলভ মনোভাব যদিও অশোককে অভিভূত করিতে পারিত না, তবুও সে দেহ-মনের দ্বারে এক সতর্ক প্রহরী রাখিয়াছিল—সে মৌরীকে প্রণাম করিতে শিখাইয়াছিল। যে শ্রদ্ধা করে তার সেই শ্রদ্ধায় আঘাত দিতে মানুষ পারে না—তার চক্ষু-লজ্জায় বাধে।

(ক্রমশঃ)

ঘরে বাইরে

নিজেদের কাজের পরিচয় অপরকে জানানোর অর্থ—'তোমরা আমাদের ভুল বুঝিয়ো না, আমাদেরও প্রাণ আছে, আমরাও প্রগতির পথে চলিতেছি।' কিন্তু এই ঘরের খবর বাহিরে জাহির করিবার চেয়েও উদ্দেশ্য শ্রেয়তর হয়—যদি আমরা মনে করি, আমাদের ইহা আছে, আমরা ইহা করিতেছি সত্য, কিন্তু বাহিরের উহারাও আরো অনেক-কিছু করিতেছে, আমরাও ঐগুলি করিতে প্রয়াস পাইব; এবং সর্ব্বোপরি আমাদের লুপ্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধীরে ধীরে সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করিব আত্ম-সমাহিত হইয়া—সেজন্য ঢক্কা-নিনাদ না করিলেও চলে। নিজকে জানানোর চেয়ে নিজকে ও অন্যকে জানাই হইতেছে মহত্তর সাধনা।

গল্পে লোক সাহিত্য

মাদাম কালাস

প্রাচীন জনশ্রুতি বা লোকসাহিত্যের উপকরণ লইয়া বর্ত্তমান জগতে খুব কম সাহিত্যিকই গল্প রচনা করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক গল্পের আদরও ফুরাইয়া আসিয়াছে যেন। আজকালকার লেখকরা সাধারণতঃ সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা-সমূহকেই কথা-সাহিত্যের বাহন নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। প্রাচীন লোক-সাহিত্যকে গল্পের বাহন করিয়াছেন এরূপ উৎকৃষ্ট গল্প-লেখকের সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীতে দুই-চারি জনের বেশী নয়। মাদাম কালাস এইরূপ একজন উৎকৃষ্ট গল্পলেখিকা। ইনি কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনী নহেন, যদিও শ্বেত-দ্বীপ বাসিনী। ইনি লণ্ডনস্থ এষ্টোনিয়ান মন্ত্রী মিঃ কালাসের পত্নী। ইনি তত্রত্য এষ্টোনিয়ান সঙ্ঘের সভানেত্রীও। ইনি জাতিতে ফিন এবং হেল্‌সিংফোর্সে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করেন। ইঁহার পিতা হেল্‌সিংফোর্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

মহিলা সিনেটার

শ্রীমতী করিন ম্যাকে উইলসন কানাডা সিনেটের একজন মহিলা সিনেটার। ইনিই প্রথম মহিলা—যিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সংসদে এইরূপ উচ্চপদ লাভ করিয়া সম্মানিতা হইয়াছেন। মন্‌ট্রিল-এর ভূতপূর্ব্ব সিনেটার রবার্ট ম্যাকের ইনি পত্নী। ইঁহার পিতা ছিলেন গ্লাডষ্টোন ও লরীয়ার মতাবলম্বী উদারনৈতিক। শ্রীমতী করিন আশৈশব রাজনৈতিক আবেষ্টনেই বর্দ্ধিতা। ফরাসী প্রদেশ 'কুইবি' ইঁহার জন্মস্থান। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় সমান

শ্রীমতী ম্যাকে

পারদর্শিতা ইঁহার। কানাডিয়ান পার্লামেণ্টের ইংরাজী বক্তাদিগের মধ্যে ইনি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। বহু-দেশ-ভ্রমণ ইঁহাকে বিজ্ঞতরা করিয়াছে।

আট বৎসর পূর্ব্বে ইনি "ওটাযা, উদারনৈতিক মহিলা-গণের সমিতি" স্থাপন করেন। পরে, "কানাডা, উদার-নৈতিক মহিলাগণের জাতীয় সঙ্ঘ" পরিচালনেও ইনি কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করেন—উহার প্রধান পরিচালন-কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং চেয়ারম্যান এখনও ইনিই।

শ্রুতি-যন্ত্র আবিষ্কার

যারা কানে-খাটো এবং যারা তাদের সঙ্গে কথা বলে উভয়ের পক্ষেই পরস্পর কথোপকথন যুগপৎ লজ্জাকর ও কষ্টপ্রদ এবং ততোধিক অসুবিধাজনক—বাজারে প্রচলিত সাধারণ চোঙ বা শিঙা লইয়া সর্ব্বদা চলা-ফেরা করা বা কানে লাগাইয়া কথাবার্ত্তা বলা।

সম্প্রতি একজন মহিলা আবিষ্কারক এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য চমৎকার একটি যন্ত্র বাহির করিয়াছেন—যাহা একটি অতি ক্ষুদ্র ছোট-হাতব্যাগ, ব্রোচ, বা হ্যাটের বোতামের সঙ্গেও অলক্ষিতে বসাইয়া লওয়া চলে; এবং তাহা কানে-খাটোদের পক্ষে সম্ভ্রমরক্ষক ও

মিসেস্ ডেণ্ট্

প্রতিপক্ষের নিকটও অ-অসুবিধাকর। মিসেস্ ডেণ্ট্-এর এই যন্ত্রের নাম 'আরডেণ্টি'। ইহা দূরশ্রুতিবর্দ্ধকও বটে। বেড্‌ফোর্ডের ডাচেস্ ইহা আনন্দের সহিত ব্যবহার এবং ইহার প্রশংসা করেন।

নাট্য-কথায় বালিকা

কলিকাতার নবশক্তি, নাচঘর প্রভৃতি পত্রিকায় সময়ে সময়ে নাট্যকথা লইয়া আলোচনা ও সমালোচনা হয়। কিন্তু শুধু ঐ বিষয়ের জন্যই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে কাহাকেও দেখি না। কুমারী হেলেন ট্রেভেলিয়ন বালিকা হইলেও ইংলণ্ডের নাট্যকলা সম্বন্ধে সমীচীন এবং সরসসুন্দর নাট্য-কথা শুনাইয়া পাঠকদিগকে মুগ্ধ করিতে পারেন। এবিষয়ে তাঁহার প্রতিভা অনন্য-

কুমারী হেলেন ট্রেভেলিয়ন

সাধারণ। ইঁহার মাতা শ্রীমতী হিল্‌ডা ট্রেভেলিয়ন একজন নাট্যকলা এবং নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্টা মহিলা। মাতার পদাঙ্কানুসরণই ইঁহাকে সহজে কৃতী করিয়াছে এবং খ্যাতি দিয়াছে।

বাঙালী মহিলার কৃতিত্ব

কুমারী উমা বসু গত বি-এস্-সি পরীক্ষায় ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের বি-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে 'মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য স্বর্ণ-পদক' এবং 'সোনামণি রৌপ্য-পদক' দান করিয়াছেন।

মুসলমান ছাত্রীর পারদর্শিতা

কলিকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ছাত্রী (খাঁ বাহাদুর সাদুজ্জমানের কন্যা) কবিতা-আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় বহু অমুসলমান বালিকার মধ্যে বিশেষ পুরস্কার পাইয়াছেন।

ভোরবেলায়

শ্রী আশীষ গুপ্ত

বেজায় ঠাণ্ডা,—নয় কি ?

হ্যাঁ, শীতটা হঠাৎ পড়েছে।

এ রকম আর কখনও পড়েনি কল্‌কাতায়।

সবাই তাই বল্‌ছে।

মেঘটা কেটে গেল।

সেইজন্যেই হাওয়াটা জোর দিচ্ছে।

চারদিকে বসন্ত দেখা দিচ্ছিল।

এবার হয়ত একটু কম্‌বে।

টিকে নিয়েছেন ?

না নেব নেব ভাব্‌ছি।

আমিও নেব ঠিক করেছি।

বাড়ীশুদ্ধ সবাই ?

হ্যাঁ, ছোটদের আগে নেওয়ান দরকার।

টিকেদারকে আস্‌তে বলেছি।

দেশী মিউনিসিপ্যালিটি হ'য়ে ভারী সুবিধে হয়েছে।

রাস্তার নামগুলোর ইংরেজী নেমপ্লেটের পাশে বাংলা প্লেট থাকে।

তর্জ্জমা নয়—একই নাম, ভিন্ন অক্ষরে।

ইংরেজী-না-জানা লোকের পক্ষে বড় সুবিধে।

আবার নিজেদের মতাবলম্বী কোন লোক এলে ঘটা করে' অভিনন্দন দেয়।

কর-দাতাদের আর দুঃখ নেই।

এক ফোঁটাও না!

স্বরাজ হ'লে কি রকম সুবিধে হবে, বুঝুন্!

কিন্তু কলের জল কমেছে।

স্বরাজ হ'লে হয়ত একেবারেই পাওয়া যাবে না।

তা না যাক্, জলের গাড়ী আস্‌বে দোরগোড়ায়।

বাল্‌তী নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব।

এক্সারসাইজ্ও হ'য়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

ট্যাক্স কিন্তু কম্‌বে না।

ভোটের সময় এগিয়ে এল।

কিন্তু আমাদের রাস্তায় জঞ্জাল ফেল্‌বার কোন টব নেই।

না থাকুক, অন্য লোকের খালি জায়গা আছে।

কিন্তু মালিকেরা মাঝে মাঝে রিপোর্টের ভয় দেখায়।

কতদিন আর দেখাবে? স্বরাজ হ'লে দুঃখ থাক্‌বে না।—

লাহোরে যাচ্ছেন ?

কংগ্রেস দেখ্‌তে ?

না, এগজিবিশান দেখ্‌তে।

বোধ হয় যাবনা, বড্ড শীত।

শুধু বক্তৃতায় শাণাবে না।

লেপ-তোষক চাই।

তা ছাড়া, লাহোর এগ্‌জিবিশান কল্‌কাতা এগ্‌জিবিশানের মতন কিছুতেই হবে না।

বাঙ্গালীর মতন ভলান্টিয়ার পাওয়া শক্ত!

বিশেষতঃ অশ্বারোহী সৈন্য।

সে ঘোড়াগুলোর কি হ'ল?

কল্‌কাতা কংগ্রেসের?

হ্যাঁ।

জানিনে, একবার খবর নিলে হয়।

লাহোরে পাঠাল কি?

বোধ হয় না।

সেগুলো কি এখনও জীবিত আছে?

গেল-বছর তাদের চেহারা দেখেছিলাম—

কাজেই অত বড় আশাটা করতে পারিনে, এই বল্‌ছেন?

তাদের চামড়া দিয়ে খুব সম্ভব ঢোলক তৈরী হ'য়েছে।

বাজায় কে?

বল্‌তে পারিনে।—

আপনি ডমিনিয়ান ষ্টেটাস, না ইণ্ডেপেণ্ডেন্স্‌-ওয়ালা?

পয়লা জানুয়ারীতে স্থির কর্‌ব।

ডমিনিয়ান ষ্টেটাস কাকে বলে?

ঠিক জানিনে।

আমার এক বন্ধু আছে—

কিন্তু ঠাণ্ডাটা একটু বেশী পড়েছে।

সে বলে সে একনমিক্‌স্‌ পড়ে, প্রথম 'সি'টার ওপর একটু জোর দেয়।

দেশটা বিলেত হ'য়ে উঠ্‌ল।

হ্যাঁ, যে রকম ঠাণ্ডা। বন্ধু বলে একনমিক্‌স্‌ না পড়্‌লে জানা যায় না।

কি? শীতের কথা?

না ডমিনিয়ান্‌ ষ্টেটাস আর ইণ্ডেপেণ্ডেন্সের পার্থক্য?

ওঃ—

সে আমায় বলে, তোমরা ওসব কি বুঝবে?

কংগ্রেসে যাচ্ছে?

না।

গেল-বার ভলেন্টিয়ার ছিল?

হ্যাঁ, অশ্বারোহী সৈন্য; এখন পদাতিক।

ঘোড়াটা কোথায়?

জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কি বলে?

জবাব দেয় না।

ছাত্র-আন্দোলন কিন্তু জোর চল্‌ছে।

তরুণরা আরও জাগ্‌বে।

সিগারেটিক্যালি বল্‌ছেন, না, লিটারালি?

দুইই।

আমাদের বাড়ীতে জনকয়েক তরুণ আছে।

কোথেকে এল?

এসেছে দেশ থেকে ছুটিতে বেড়াতে।

ক্রিকেট খেলে?

হ্যাঁ, সারা দুপুর। সন্ধ্যেবেলা রাজনীতির চর্চ্চা করে।

আরও জাগ্‌বে।

কিন্তু আটটার সময় শোয়।

তাতে কিছু যায়-আসে না।

আর সকাল আটটায় ওঠে।

শরীর ভালো থাক্‌বে।—

ওপাড়ায় কাল মারামারি হ'য়ে গেল।

মাথাও ফেটেছে দু'চার জনের।

এপাড়ার ছেলেরা লাঠি নিয়ে গিয়েছিল।

ওপাড়ার ছেলেরাও লাঠি এনেছিল।

আর থান-ইট।

ওপাড়ারই দোষ।

মাথা ওদেরই বেশী ফেটেছে।

ওপাড়ার ছেলেদেরই পুলিসে ধরে' নিয়ে গিয়েছে।

ওপাড়াই যত নষ্টের গোড়া।

যত ঝগড়া বাধায় ওরাই।

আমি আফিসে ছিলাম ঝগড়ার সময়।

আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে।

কিন্তু কি রকম ঠাণ্ডা পড়েছে, দেখেছেন?

হ্যাঁ, বড্ড বেশী।

নতুন ট্রাম কেমন হ'ল ?

ভালো না।

কাচের জানলা নেই।

কাঠের শাটার আছে।

বৃষ্টির সময় শাটার বন্ধ করে' দিলেই বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘোচে।

ঠাণ্ডার সময়ও।

যে রকম শীত !

গরম চা হ'লে ভালো হয়।

আনতে বলেছি।

আগেরটাই ভালো।

কি ? চা ?

না, ট্র্যাম।

হ্যাঁ, বেশী জায়গা ছিল।

হাত-পা ছড়িয়ে বসা যেত—

কাচের জানলা তুলে দিয়ে।

আমি নতুন ট্র্যামে চড়িনি।

আমিও না।

মোটে ত একখানা বেরিয়েছে—

কালীঘাট লাইনে।

আমাদের এ লাইনে এলে চড়্‌ব।

কিন্তু লোকের কাছে শুনেছি।

আগেরটাই ভাল।—

"জহর" কিন্তু চমৎকার হয়েছে।

রজনী মুখুয্যে,—সুপার্‌ব্‌ !

বাংলা নাট্যশালার নতুন রূপ দিয়েছেন।

পৃথিবীর নটসমাজে বাংলার অভিনেতা আর আজ হেয় নয়।

ওঁরই দৌলতে হ'ল।

ভীমসিংহের অংশ অভিনয়ের কিন্তু তুলনা হয় না।

বইটা ছাট্‌বার কাট্‌বারই বা কি বাহাদুরী !

সত্যিকার প্রযোজকের লক্ষণ সবগুলোই ওঁতে বিদ্যমান।

আমি কিন্তু "জহর" দেখিনি।

আমি রজনী মুখুয্যে মশাইয়ের কোনও অভিনয়ই দেখিনি।

আমি রজনীবাবুর চেহারা দেখিনি আজ অবধি।

আমি দেখেছি একদিন্‌ ট্র্যামে।

ওঃ—

আর দেখেছি ফোটোতে।

সে আমিও দেখেছি, সিনেমায়।

কিন্তু "জহর" চমৎকার হ'য়েছে !

বাস্তবিক, নাট্যকারকে কোথাও খাটো করেন নি।

"মরীচিকা"ও গ্র্যাণ্ড্‌।

কেন "অজাতশত্রু" কিরকম হ'য়েছিল ?

সে ত মারভেলাস্‌ !

কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে।

আরও পড়্‌বে বোধ হয়।

চীন আর রাশিয়ার যুদ্ধ হয়ত আবার বাধ্‌ল।

বাধুক্‌।

আমাদের দেশ পর্য্যন্ত না এসে পৌঁছলেই হয়।

বলা যায় না, বড় কাছাকাছি।

চীনেগুলো আচ্ছা বোকা !

বোকা না হ'লে আর লড়াই কর্‌তে যায় ?

সোভিয়েটরাও কম আহম্মক নয়।

দুটোই সমান।

কোন্‌ দুটো ?

চীন আর সোভিয়েট।

চীনের ব্যাপারটা কিন্তু কিছু বোঝা যায় না।

ওদের অক্ষরের মতনই ওটা জটিল।

কিন্তু খাসা জুতো বানায়।

কারা ?

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের চীনেগুলো।

আর বেশ সস্তা।

হ্যাঁ, খুব টেঁকসই।

বাঙ্গালী সব ব্যবসাতেই পেছু হট্‌ছে।

আজকাল অবাঙ্গালীরই জয়-জয়কার।

কিন্তু বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে।

সারা দুনিয়ার ভিতর সেরা মাথা বাঙ্গালীর।

শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কাছে হার মান্‌তেই হবে

কিন্তু অত্যন্ত শীত—

হ্যাঁ, র‍্যাপার একখানা বোধ হয় কিন্‌তে হবে।

বৃষ্টিও একটু একটু হ'চ্ছে।

চেনা-শোনা শাল-ওয়ালা আছে ?

গায়ের কাপড় কিন্‌বেন ?

হ্যাঁ—

নগদ ?

আমার ধারে কারবার নেই।

আমার চেনা শাল-ওয়ালা আছে।

জান্‌লার সার্শীটা বন্ধ করে' দিন্।

একটা কাচ ভাঙ্গা—

ভাইপোটা গুল্‌তি তৈরী করেছে—

কোনটি ?

ছোটটা,—সব জিনিষই টিপ করে।

পরিষ্কার বুদ্ধি ত!

আমার মাথাটাও সেদিন টার্গেট বানিয়েছিল।

কপালের ফুলোটা কি তারই নাকি ?

হ্যাঁ, সার্শীর ভাঙ্গা কাচটাও।—

এবার মানুষের টাকা কম্‌ছে।

এবং জিনিষের দর বাড়্‌ছে—

প্রাণ বাঁচান দায় হ'য়ে উঠল!

একটাকা সের দিয়েও খাঁটি দুধ পাওয়া যাবে না—

পিঠে-পায়েস খাওয়া উঠে যাবে।—

বেজায় ঠাণ্ডা—

গরীবদের ভারী কষ্ট হবে।

চা-টা' এলে বাঁচি।

বাইরের গোলমাল কিসের ?

ছোট ভাইপোর গলার শব্দ—

ছেলেটি বোধ হয় বেশ শান্ত ?

হ্যাঁ, বড্ড!—

গুল্‌তিটা নিয়ে আস্‌বে না ত ?

বলা যায় না।

কিন্তু দিনটা কি বিশ্রী—

সূর্য্য উঠবে না—

কমলালেবু এখনও ভালো ক'রে বাজারে ওঠেনি

হাঁসের ডিম বলে সাড়ে তিন পয়সা একটা!

দুনিয়াটা পয়সার খেলা।—

ভাইপোটা বলে,—

কোন্‌টা ?

ছোটটাই,—বলে, কমলালেবুর গাছ পুঁতব, নিজেরা হাঁসের ডিম পাড়্‌ব—

বুদ্ধিমান্ ছেলে!

আইন্‌ষ্টাইনের বক্তৃতা পড়্‌লেন ?

না, কিন্তু খাসা বলেছেন!

হ্যাঁ,—যদিও আমি পড়িনি।

আমিও না; তবে রমাপতি বল্‌ছিল, চমৎকার!

পণ্ডিত লোক!

কে ? রমাপতি ?

না, আইনষ্টাই—।

রমাপতিও ফেল্‌না যায় না।

হাজার হ'ক বাঙ্গালীর মাথা—

আইনষ্টাইনকে নস্যি বানিয়ে ছেড়ে দেবে!

দেখবেন, বাঙ্গালীর কাছে ও আইন্‌ষ্টাইন-ফাইন-ষ্টাইন আর বেশীদিন নয়।

খবরের কাগজগুলো একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে।—

আপনার গান শেখার কি হ'ল ?

শিখ্‌ছি ত।

কই শুনতে-টুনতে পাইনে।

ক্লাবে গিয়ে গাই।

কেন ?

সব মেম্বার একজায়গায় জুটি।

তাতে কি হয়েছে ?

সবাই-ই প্রায় গায়—

ওঃ—

সেখানকার পাড়ার লোকদের সঙ্গে—

ওঃ—

অথবা পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া বাধ্‌লে—

ওঃ—

অনেকগুলিকে একত্রে পাব।

বুঝেছি।

আর এখানে একা গাইলে, পাড়ার লোকে একসঙ্গে জুটে—

বুঝেছি—

আমাকে কোণঠেসা করবে।

হয়ত বা পুলিশ ডাকতে চাইবে।

ঠিক বলেছেন!—

কিন্তু কি-রকম শীত পড়েছে, দেখেছেন?

হ্যাঁ, সার্শীটা সারাতে হবে।

তার আগে আপনার ভাইপোর গুল্‌তিটা সরান দরকার।

কোন লাভ নেই—

কেন?

আবার একটা বানাবে।

চেষ্টা-যত্ন আছে!

হ্যাঁ, আর আমার মাথাটাও চারিদিক দিয়ে ফুলে উঠবে।

তবে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।

সার্শীটাই সারাব।

সেই ভালো।

চেয়ারটা জান্‌লার কাছ থেকে সরিয়ে নিন্।

ভাঙা সার্শীটার ওপরে কাগজ লাগিয়ে দিয়েছি—

কিন্তু বড্ড ঠাণ্ডা!

শীতটা বড় বেশী পড়েছে।

আরও পড়্‌বে, দেখ্‌বেন!—

আপনার শরীর ভালো আছে?

হ্যাঁ,—আপনি?

এই একরকম।

বাড়ীর সব ভালো?

আপনাদের আশীর্ব্বাদে

কিন্তু, কি শীত!

বড্ড! *

* ১৯২৯, ডিসেম্বর সকাল।

নারীত্বের নিকষ

শ্রী রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

প্রতিমা সাধনার মূর্ত্তি; ইভ্ আকাঙ্ক্ষার চিত্র। একটি পূজার শতদল, অপরটি সোহাগের গোলাপ। প্রতিমা ধ্যানময়ী, স্নিগ্ধগম্ভীরা প্রতিমা। ইভ হাস্যময়ী, ক্রীড়ারতা, চঞ্চলা প্রকৃতি। এটি শান্তি, ওটি সুখ। এক তপোবনের লক্ষ্মী, অন্য নগরের শ্রী। প্রতিমা সমুদ্রের গভীরতা; ইভ মুক্তার তারল্য।

প্রতিমা সমুদ্রসৈকতে ছুটাছুটি করে না, তরঙ্গের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ইভ্ হাসিতে হাসিতে ছুটাছুটিই করে, চাহিয়া থাকার মত স্থৈর্য্য তাহার নাই। প্রতিমা আত্মবিসর্জ্জনমূলক প্রেমের চিত্র! ইভ্ আত্মনিবেদনে ভরা প্রেমের ছবি। দুইই আদর্শ, দুইই সুন্দর। প্রতিমা প্রাচ্যের, ইভ পাশ্চাত্যের আদর্শ। একজনের ত্যাগ স্বভাবজাত, অপরজনের ত্যাগ অবস্থাসংজাত। এ পূজারিণী দেবী, ও প্রণয়িনী মানবী। প্রতিমা আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে কিন্তু হারাইয়া বসে নাই। ইভ বিলাইয়া দিয়াছে, হারাইয়াও বসিয়াছে। প্রতিমার আমিত্বের ভিতর আপনার ভোগাকাঙ্ক্ষা ছিল না; ইভের তাহা ভরাই ছিল।

প্রতিমা বিবাহের রাত্রেই পবিত্র মন্ত্রের শক্তিতেই পতিকে আপনার হৃদয়ের আসনে দেবতারূপে বসাইয়াছে, কার্ত্তিকের মত স্বামীর রূপ-সৌন্দর্য্য ঐ আসনটিকে সুদৃঢ় এবং মধুর করিয়া রাখিয়াছে। বিমলেন্দুর আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া ইভকে রক্ষা করায় ইভের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হইল,—রূপবান্ পুরুষদর্শনে তাহার সেই নারীহৃদয়ে একরূপ

অনুরাগ জন্মিল। প্রাচীন কবির কথায় ইহা চক্ষুরাগ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকেই মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমশঃ দুইদিনের পরিচয়ে সেই অনুরাগে মাদকতা এবং উন্মত্ততা আসিয়া দেখা দিল। ইভ্ তখন বিমলেন্দুকে হৃদয়ের রাজা করিল। তারপর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

প্রতিমার ভালবাসায় মাদকতা এবং মত্ততা ছিল না, প্রগাঢ় তদীয়তাটি ছিল। সে ভালবাসা শান্ত বননদীর মত নীরবে ধীরে ধীরে বহিয়াছে;—জল স্বচ্ছ উর্ম্মি-মৃদুল, গতিটি সংযত ও ধীর। ইভের ভালবাসায় তদীয়তা অপেক্ষা মদীয়তা-ভাবই অধিক ছিল। তার ভালবাসা অশান্ত গিরিনদীর মত আপনার ভাবে সবেগে বহিয়া চলিয়াছে—জলটি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, কিন্তু বর্ষায় বড় আবিল, বড় প্রবল; স্রোতটি তখন প্রখর ও দুর্ব্বার, গতিটি চপল।

প্রতিমার কোমল স্মৃতিপটে প্রথম পতিদেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়; স্মরণে, ধ্যানে এবং বিরহের তন্ময়তায় তাহাই চিন্ময় হইয়া প্রত্যক্ষবৎ হইয়া উঠে—ইহা প্রেমের একতম আদর্শ। ইভের প্রথম কৃতজ্ঞতা, তার পর চক্ষুরাগ, অনুরাগ। দর্শনে, পরিচয়ে এবং মেলামেশায় তাহাই প্রাণময় সজীব হইল। সামান্য স্ফুলিঙ্গ লেলিহান অগ্নি হইয়া দেখা দিল। অথবা, ক্ষুদ্র উৎস বেগবতী স্রোতস্বতী-রূপে পরিণত হইল। প্রতিমার এ ভালবাসা অলৌকিক বা অহেতুক নহে, সতীসুলভ সহজ প্রেম। ইভের ভালবাসা ভোগময়ী প্রকৃতির অনুরূপ দাম্পত্য-প্রণয়। প্রথমটিতে মদনের শরক্ষেপের অবসর ছিল না; দ্বিতীয়টিতে ছিল। প্রতিমা প্রেমের সাধনায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিজয়িনী ছিল। ইভ্ প্রথমে প্রেমের সাধনায় আত্মসমর্পণ করিয়া পরাজিতা হইয়াও শেষে বিজয়িনী হইয়াছিল।

প্রতিমা উপাস্যা প্রতিমারই মূর্ত্তি। ইভ্ আকাঙ্ক্ষিতা প্রকৃতিরই ছায়া। ইভ্ অর্থে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ত্রিসন্ধ্যা;—সন্ধ্যা প্রকৃতিরই প্রকারভেদ মাত্র। ভারতবর্ষ প্রতিমার ভিতর ভাগবতী শক্তির বিকাশ দেখে। প্রতীচ্য ইভের মধ্যে বিশ্বশক্তির বিলাস লক্ষ্য করে।

পিতার সহিত স্বামীর মনোবাদ, স্বামীর গৃহত্যাগ এবং তাহাদের সম্বন্ধচ্ছেদে প্রতিমার পতি-প্রেম হ্রাস পায় নাই, তন্ময়তায় ধ্যানে বরং গাঢ়ই হইয়াছিল। তাহার চক্ষুর উপর নিয়তই ভাসিয়া থাকিত স্বামীর মুখখানি, "কুসুমদামসজ্জিত সুন্দর,কান্ত" সে দেহখানি, সে পুষ্পসজ্জা, সে লোভনীয় মিলন-কক্ষ।

ইভ্ প্রথম দর্শনেই বিস্ফারিতনয়নে বিমলেন্দুকে চাহিয়া দেখে, দুই দিনের পরিচয়েই তাহার কোমল করপল্লব থর-থর করিয়া কাঁপে, মৃদুস্পর্শটি আপনা হইতেই মৃদু শিহরণ আনিয়া দেয়। বিবাহ হইবার বাধা নাই,—হৃদয়ের বেগ আর থামে না। "তাহার মুখে চোখে, কথাবার্ত্তায়, হাসির তরঙ্গে, সঙ্গীতে, নৃত্যে—প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে আনন্দের হিল্লোল" বহিয়া যায়। বিবাহের মধুবাসর-যাপনের মধ্যেই স্বামীর সহিত সারা বাগান ছুটা-ছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলে। প্রেমের, আনন্দের এবং সার-ল্যের এমন ছবিটি প্রেমিক যুবার বড়ই আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।

প্রতিমা দেখিল স্বামী ফিরিঙ্গি-কন্যা বিবাহ করিয়াছে। অন্তরে তাহার তখন ঝড় উঠিল। তথাপিও সে সংযতা ও আত্ম-সমাহিতা হইয়া রহিল। "দম্‌কা পাগ্‌লা বায়ু সমুদ্র বহিয়া আসিয়া সৈকতে হুহু শব্দে" উড়িয়া গেলেও, বালুকা-রাশি সেই বায়ুভরে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘনান্ধকারে ভরিয়া গেলেও সহিষ্ণুতাময়ী নারী সমুদ্রের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়াই থাকিত। এ চিত্র দেখিলে গভীর শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে এবং বিস্ময়ে অন্তর কাহার না ভরিয়া উঠে?

ইভ্ যখন শুনিল, প্রতিমার মত স্ত্রী-বর্ত্তমানে তাহার স্বামী প্রতারণা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ে যে বিষম ঝড় উঠিল, বাহ্য প্রকৃতিতে তাহার একটি ছায়াও দেখা দিল। "প্রচণ্ড পাগ্‌লা বায়ু সমুদ্র-বারির সহিত" বিষম সংগ্রাম জুড়িয়া দিল, সে সংগ্রামে "বায়ু, সমুদ্রবারি ও নিশীথরাত্রির অন্ধ তমিস্রা ভেদ করিয়া একটি আর্ত্তনাদ" উত্থিত হইল। ইভ্ বহিঃপ্রকৃতির আর্ত্ত-নাদ আপন অন্তরের মধ্যেই শুনিতে পাইল। করুণ সম-বেদনা এবং কোমল শ্রদ্ধায় হৃদয় সিক্ত হইয়া গেল।—ইভের তখন কি উদ্দাম উত্তেজনা!

প্রতীচ্যের চক্ষুতে স্ত্রী-বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ-

বিবাহ বলিয়াই গণ্য নহে,—ইভ্ অপমানে ক্রোধে আত্মহারা হইল। চিন্তাশক্তি তখন তাহার বিলুপ্ত, ওষ্ঠে ওষ্ঠ দংশন করিয়া কক্ষতলে পা ঠুকিয়া সরলা কোমলপ্রাণা নারী গর্জ্জিয়া উঠিল—"ভণ্ড, প্রতারক!"

মেঘ সরিয়া গেল,—সারা জগৎ সূর্য্যকিরণে প্লাবিত হইল। মনস্বিনী প্রেমিকা নারীর উত্তেজনা ও ক্রোধের অবসানেই অভিমান ও ক্রন্দন দেখা দেয়। শেষে কিন্তু প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যামিনীতে হ্রদের জলে শত চন্দ্রের শত প্রতিবিম্ব-পাত—উভয়ে উভয়ের কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া গান শোনা আর জগৎ-সংসার ভুলিয়া যাওয়া—ইভ্ তাহা কি ভুলিতে পারে? গভীর প্রেমের বিস্মৃতি—সে যে প্রেমিক-প্রেমিকার অসহ্য। প্রেম অমর,—শত অপরাধের মধ্যেও সে মরে না। এইরূপে প্রেমমুগ্ধা সরলা ইভের চিত্তে হাসি-কান্নার, স্বস্তি-অস্বস্তির, আশা-নিরাশার, আলোক-অন্ধকারের এবং প্রেম-অভিমানের সংঘর্ষ বড়ই মধুর ও উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রতিমা চিরদিনই স্বল্পভাষিণী, গাম্ভীর্য্যময়ী ও মহীয়সী নারী। পিতার সহিত যতই মনোবাদ থাকুক, স্বামী ডাকিলে সে হৃদয়ের টানেই হউক বা সতীধর্ম্ম-বলেই হউক পিতার সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া স্বামীর দারিদ্র্য ভাগ করিয়া লইতে প্রস্তুত। এ যে ভারতের সতী, সাবিত্রী, সীতা ও দময়ন্তীর আদর্শে গঠিতা সতী-নারী! স্বামী না ডাকিলেও শেষে পিতার সহিত "মুকুলিত যৌবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া" স্বামীর অন্বেষণেই একপ্রকার ছুটিয়া গিয়াছিল। স্বামীকে ছাড়িয়া যে জীবন সে বহন করিতেছিল, তাহা "নীরস, কঠোর প্রাণহীন। সাহারার অনন্ত-বিস্তার ধূ ধূ বালুকারাশির" মত। তাহার পিতা পুনরায় তাহার বিবাহ দিবার কথা বলিলে সে বলিয়াছিল, "হিন্দুর মেয়ের দুইবার বিবাহ হয় না। বিবাহের বন্ধন মাত্র ইহজন্মের নহে, পরজন্মেরও।" শুধু প্রতিমা বলিয়া নহে, ইভের মুখেও ঐ বাণীর অনুরূপ ধ্বনিও শুনিয়াছি। যার ফলে "মরীসের" প্রেম ভগিনীস্নেহে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ইভ্ স্বামীকে "ভণ্ড, প্রতারক" বলিয়া গালি দিয়াছিল,—"আমাকে ছুঁয়ো না" বলিয়া আপনাকে স্বামী হইতে দূরে-দূরেই রাখিয়া দিয়াছিল। তাহার মনটি তেমন উত্তেজিত ও বিদ্রোহী না থাকিলেও স্বামীর প্রতি কিন্তু বিমুখ হইয়াই রহিল। সংস্কার এবং বিবেকই ইভকে এই অসহযোগিতা-মন্ত্রে দীক্ষিতা করিল। তাহার হৃদয় সহযোগ চাহিতেছিল, কিন্তু বিবেক ও সংস্কার সহযোগিতা চাহিল না। ইভ্ অশান্ত মনের আবেগে, অসংস্কৃত বিবেক-বলে এবং মাত্র স্বাভাবিক সংস্কার সাহায্যেই অশান্ত মনটিকে দমন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল; ফলে হৃদয়ই ক্ষতবিক্ষত হইল, হৃদয়-জয় আর হইল না। শেষে একদিন রাত্রে ইভ্ বুকভরা প্রেমের সঙ্গে অনুতাপ মিশাইয়া স্বামীর নিকট আপনাকে আবার তেমনই করিয়া বিলাইয়া দিবার জন্য স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। গিয়া দেখিল, স্বামী তখন নিদ্রিত। শুনিল, নিদ্রিতাবস্থায় তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব স্বামী "প্রতিমা, প্রতিমা" বলিয়া প্রাণের করুণ প্রেম-নিবেদনটি জানাইতেছে। ইভের মিলনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—হৃৎপিণ্ড কে যেন ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। একে দুর্ব্বল শরীর, আহত কোমল হৃদয়, তার উপর আঘাতের উপর এই বিষম আঘাত, সরলা ইভ্ সহ্য করিতে পারিল না। শেষে অসহায়ভাবে শয্যা লইল। স্বামী যদি তাহাকে ভালবাসিত, তবে সে "বিবাহ-নহে-বিবাহটিকে" মানিয়া লইয়াই মনের আনন্দে জীবনের দিন কাটাইয়া দিত। মিলনের সুখময় দিনে ইভের যে প্রেম মদীয়তাময় ছিল, দুঃখ-বিরহ সহ্য করিয়া আঘাতের উপর আঘাত খাইয়া সেই প্রেম তদীয়তাময় হইয়া দেখা দিল। আত্মনিবেদনের মধ্যে এইবার আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা মিলিল। ইভ্ দেখিল, প্রতিমা স্বামীরই, স্বামী প্রতিমারই, তবে সে কেন তাহাদের মিলনের পথে কণ্টক হইয়া থাকিবে? অভাগী মনে-প্রাণে শেষসম্বল মরণকেই চাহিল। কুন্দ এ অবস্থায় ভারতের নারী হইয়া আত্মহত্যা করিল। ভোগপ্রধান প্রতীচ্যের নারী হইলেও ইভের আত্মহত্যায় মতি জন্মিল না। প্রিয়তমের প্রণয়-বারি-সেকে তিলোত্তমা মরণের মুখ হইতে আপনাকে রক্ষা করে। ইভ্ ত সে প্রণয়-বারি-সেক পাইল না,—কেবল সান্ত্বনার বাতাসে বাঁচিবে কেন? কুন্দের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, নগেন্দ্র একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিলেই সে

মরিত না। ইভের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র নহে, অপরিসীম,—স্বামীর প্রণয় ফিরাইয়া পাওয়া ব্যতীত আর কিছুতেই সে বাঁচিতে চাহে না। ওপারে আবার দেখা হইবে এই বিশ্বাস লইয়াই সে ইহলোক ছাড়িয়া গেল। খৃষ্টানের ধর্ম্ম-সংস্কার-বশে অনন্ত জীবনে স্বামীকে পাইবে এই আশাই লইয়া সেই সুখেই সে মরণকে বরণ করিল। ইহলোকেই যে সব শেষ নহে, এ শিক্ষা আত্মদানমূলক প্রেমই তাহাকে শিখাইয়াছে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইভ্ শেষ-বিদায়ের দিনে প্রতিমাকে অনুরোধ করিয়া যায় "যেন সে স্বামীর শূন্য স্থান পূর্ণ করে।" ইহা ইভের আত্মত্যাগ এবং উচ্চ-মনেরই পরিচায়ক। এ যে কত বড় দান,তাহা প্রতিমা মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝিল; কৃতজ্ঞতায়, স্নেহে ও সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় ভরিয়া রহিল। ইভ বাঁচিল না, কিন্তু যে আদর্শ সে রাখিয়া গেল তাহা সুন্দর, মধুর এবং অপূর্ব্ব। প্রতীচ্যের এই আদর্শ ভারত সগৌরবে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়া গেল।

প্রতিমাকে যখন তাহার স্বামী বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তখন তাহার দেহটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পরীক্ষা তাহার কাছে বড় সঙ্কটই হইত, যদি না ইভ্ সে সময়ে "ইন্দু, ডার্লিং" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত। প্রতিমা তাহার সহিত স্বামীর চারি-চক্ষুর মিলন হইবামাত্র দৃষ্টি অবনত করিল। অন্তরের ভিতরকার চাঞ্চল্য ভিতরেই রহিল, বাহিরে প্রকাশ পাইল না। স্বভাবতঃ এমনই সে সংযম-ধৈর্য্য-শালিনী।

পিতার ইচ্ছায়, আপনার মনের আবেগেও বটে, প্রতিমা দার্জ্জিলিং ছাড়িয়া পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে কেমন স্নেহশালিনী, মাতৃত্বের ক্ষুধা যে তাহার মর্ম্ম-মাঝে কিরূপ সংগোপনে এতদিন লুক্কায়িত ছিল, তাহা অনাথ নেপালী বালক শৈলকে বক্ষের উপর তুলিয়া লওয়াতেই সপ্রকাশ। শৈলকে সান্ত্বনারূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রতিমা একরূপ সুখে-দুঃখে জীবনটা কাটাইয়া দিত। কিন্তু তাহা হওয়া বিধাতার ইচ্ছা নহে,—হইলও না। প্রতিমা ইভকে ছাড়িতে চাহিলেও মায়াবিনী মেয়েটি ক্রমশঃই তাহাকে আপনার নিকটেই টানিতে লাগিল। প্রতিমার আকর্ষণই যে অলক্ষে এই কার্য্য করিতেছিল তাহা কেহই জানিল না। প্রেম প্রেমময়কে আকর্ষণ করিবে ইহা প্রকৃতির নিয়ম।—চিল্কা হ্রদ হইতে প্রতিমাকে তাহার স্বামী উদ্ধার করিল, জীবনদান করিল। জল-মগ্না প্রতিমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ভীতিবিহ্বল-নেত্রে কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "প্রতিমা! প্রতিমা!" প্রতিমার সংযমের বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিলেও তথাপি সে অবিচলিত রহিল। ভিতরেই আলোড়িত,—উপরে কিন্তু নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ স্থির।

প্রতিমা স্বামীর প্রেম-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিল। সরলা, একান্ত নির্ভরশীলা, পতিগতপ্রাণা বালিকা ইভের দশা কি হইবে, তাহার বুক যে ভাঙ্গিয়া যাইবে, এইজন্য সে স্বামীর নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। প্রবঞ্চক, স্বার্থপর পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ না হইলে সতী-নারীর ক্ষমা পাইবার যোগ্যতা তাহার হয় না। বিমলেন্দু প্রতিমাকে পাইল না। ইভ্ যখন চিরবিদায় লইল, 'স্বামীর শূন্য স্থান পূর্ণ করিও' বলিয়া অনুরোধ করিয়া গেল, তখনও তপস্বিনী হইয়াই জীবনটি কাটাইয়া দিবে, ইহাই প্রতিমার সঙ্কল্প। এমন কি, অনুতপ্ত ভিক্ষুকের মত দীনবেশে কাতরভাবে বিমলেন্দু প্রতিমার ক্ষমা এবং আশ্রয় ভিক্ষা করিলেও সে টলিল না। ইভের মুখ চাহিয়াই সে এই কৃত্রিম-হইয়া স্বাভাবিকতায়-পরিণত কাঠিন্যে আপনাকে আবৃত করিয়াই স্বামীকে ফিরাইয়া দিল।

হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে,—মেঝের ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া প্রতিমা কাঁদিতেছে,—যাতনা-ক্লিষ্ট তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে করুণ-কাতর আহ্বানের ধ্বনি মৌন আর্ত্তনাদের মত বাহির হইয়া আসিতেছে,—তবু সঙ্কল্প অবি-চলিত। এ ত্যাগ, এ সংযমন কেবল ভারতের মাটিতেই সম্ভব,—অথচ স্বামীই তাহার দেবতা, স্বামীর প্রেমলাভই তাহার বিশ্বজগতের কামনার ধন। ইভের প্রতি অবিচারটাই তখন সে বড় করিয়া দেখিতেছে—আপনার সুখের পানে দৃষ্টি নাই। স্বামীর অবস্থার পানে দৃষ্টি করে নাই তাহা নহে; নহিলে অমন কান্না সে কাঁদিবে কেন? স্বামীকে ফিরাইয়া দিয়া স্বামীর ম্লান মুখখানি মনে করিয়াই সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া অমন কান্না কাঁদিয়াছে।

মাতাজী আসিয়া যখন তাহার স্বামীর আত্মহত্যার

প্রয়াসের কথা, সে-ই তাহার স্বামীকে এখানে আসার কথা বলিয়া দিয়াছে বলিল, এবং মনের মধ্যে বাসনা চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে ত্যাগ করিলেই সেটা ত্যাগ হয় না, তাহা ত্যাগের ভাণ মাত্র, সে ত্যাগ পাপেরই নামান্তর, এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিল, তখন প্রতিমার দ্বিধা-সঙ্কোচ আর রহিল না। উপরের কৃত্রিমতার আবরণটি খসিয়া গেল, —ভিতরের স্বচ্ছ মধু উচ্ছলিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

প্রতিমা স্বামীর নিকট ধরা দিল। প্রতিমার আত্মত্যাগ-পূত প্রেম কল্যাণে চরিতার্থ হইল। ভারতের সাধনা জয়যুক্ত হইয়া দেখা দিল।

* * *

ভারতের এই সাধনার চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া সাহিত্য-স্রষ্টা সত্যেন্দ্রকুমারের সাহিত্যসাধনা প্রকৃতই সার্থক হইয়াছে। ভারতের সাধনার জয়ের সহিত কবির সাধনাও জয়যুক্ত হইয়াছে। সাধনার মূর্ত্তি বলিয়া ইহা কল্পনার বিকাশ নহে,—সত্য বস্তুর বিকাশ। ইহা চিন্ময়ী হইয়া সজীব,—ছায়া নহে এ প্রতিমা। নামকরণের ভিতরেই চরিত্রটির একটি চমৎকার বিকাশ ও পরিণতি দেখা গিয়াছে। এ প্রতিমা বাঙ্গালার চণ্ডীমণ্ডপ ও ভারতের মন্দির-আলো-করা প্রতিমা। এ প্রতিমার আবির্ভাব ভারতেই সম্ভব। ইহার পার্শ্বে প্রতীচ্য-প্রকৃতি ইভের চিত্রটি আঁকিয়া দিয়া কবি প্রতিমা এবং প্রকৃতির তত্ত্ববস্তুটি আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। এইজন্য তিনি দেশের ও দশের সুখ্যাতির পাত্র। ইভ্ যখন হাস্য-ময়ী কুমারী, তখন তাহার অরুণোদয়ে উদ্ভাসিত উষারূপ। নববিবাহিত অবস্থাটি তার জীবনের নূতন সুপ্রভাত। আশা-নৈরাশ্য, হাসি-কান্না, অভিমান-ক্রোধ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং জীবন-মৃত্যুর সংঘর্ষই তাহার প্রখর মধ্যাহ্নের রূপ। শেষভাগটি সায়াহ্নের অস্তমিত তপনের শেষরশ্মির সহিত উপমিত। আকাশের গায়ে সে রশ্মি মিলাইল। জীবন-রশ্মি অনন্ত জীবনের সুখশান্তির আশায় অজ্ঞের পরমপদের সন্ধানে ছুটিয়া গেল। ইভ্ প্রকৃতির মূর্ত্তি বলিয়াই কখন বন্যা মৃগীর মত ছুটাছুটি করিয়াছে, মত্তা পক্ষিণীর মত হাসিয়া লুটাপুটি খাইয়াছে, আশ্রয়চ্যুতা লতার মত ভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে;—বসন্তের মাধুরী, গ্রীষ্মের তাপ, বর্ষার ঘোর-ঘটা, শীতের স্তব্ধভাব প্রকৃতিরূপা ইভের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

এই আলোচনা প্রতিমার উদ্দেশে আমার পুষ্পাঞ্জলি, ইভের উদ্দেশে শ্রদ্ধার জলদান,—এ আমার প্রতিমাপূজা এবং প্রকৃতি-উপাসনা। প্রতিমা এবং ইভের আদর্শ নারীত্বের নিকষে ফুটিয়া উঠুক, দেখিয়া আমরা ধন্য হই। চরিত্রস্রষ্টা কবির সাধনা সফল হউক। *

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর "প্রতারক" উপন্যাসের দুইটি চরিত্র-সমালোচনা।

আগামী সংখ্যায় যাঁহারা 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে লিখিবেন তাঁহাদের কয়জন—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় | শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় (ডাঃ) | শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার

ইত্যাদি।

পথের ছবি

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

হেঁটে পার হ'য়ে চোতের শুক্‌নো নদী
ওপারে দাঁড়ায়ে দেখি,
'কুসুম'-ফুলের বাহার লেগেছে ক্ষেতে—
সোনার পাথার সে কি!
'ফুল-বাতাসিতে' হেলিছে দুলিছে ধীরে
ঝুম্ ঝুম্ তাল দিয়া,—
পথ চলি আর আনন্দে প্রাণ নাচে
মধু-বাস তার পিয়া।

শিমুল গাছের তলা দিয়া পথ গেছে,
তারই নীচ দিয়া যাই,
দুপুরের রোদে একটু দাঁড়াই সেথা,
উপরের পানে চাই।
পাতা ঝরে' গেছে—ভরেছে অনেক ফুলে—
তবু উদাসীন সাজ;
ভালবাসে যেন এমনি রকম বেশ
কাঙাল শিমুল গাছ!

বাড়ীর 'দোপায়' 'হালট' পথের 'পরে
লাউগাছ মাচা-বেড়া,
তামাকের চারা সারি সারি নামিয়াছে—
হাল্‌কা বেড়ায় ঘেরা।

কচি কচি বড় ঘাস-ঠাসা চারিপাশ,
তারই মাঝে কাছে-দূরে
রাই-সরিষার রং-তাজা গাছগুলি
কি করে' উঠেছে ফুঁড়ে'।

গরুর গাড়ীর সারি চলে' যায় ধীরে
একমনে মাঠ দিয়া,
তাড়াহুড়া নাই, গাড়োয়ান লইতেছে
ওরই মাঝে ঘুমাইয়া—
মটরের ক্ষেতে চাসীরা লেগেছে কাজে,
তোলে, আঁটি বাঁধে, গায়,
পলাশ-বনের মাঝ দিয়া যেতে যেতে
উঁচু সুরে গান গায়।

বাব্‌লায় ঘেরা পুকুরের পাড়ে বসি
একলা আপন-মনে;
ও গ্রামে কোকিল ডাকিতেছে শোনা যায়
কোন্ সে কুঞ্জ-বনে।
চৈৎ-দুপুরের উদাসীন মন কাঁদে
সমুখে চাহিয়া হায়,
যত গান আছে, যত প্রাণ আছে হেথা—
সব যদি পাওয়া যায়!

প্রাচীন ভারতে নারীমর্য্যাদা

শ্রী সীতা দেবী

আমাদের ভারতবর্ষকে নানাদিক দিয়া অনুন্নত প্রমাণ করা আজকাল একদল লোকের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে অবশ্য তাঁহাদের স্বার্থ আছে, সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন সব কথাই সত্য কথা বলেন না। ভারতের নারীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা খুবই যে হীন, ইহা তাঁহারা অহরহই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, এবং সত্যমিথ্যা নানা নজির দেখাইয়া নিজেদের মতকে সমর্থন করিতেছেন।

ভারতনারীর অবস্থা কিন্তু প্রাচীনকালে কোনোদিক দিয়াই অনুন্নত বা হীন ছিল না। এখনও আমাদের দেশে নারীকে কোনোপ্রকার অধিকার লাভ করিতে হইলে যে-পরিমাণ বেগ পাইতে হয়, অন্যান্য দেশে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক পাইতে হয়। নানাকারণে ভারতের নারী কিছুদিন পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু যেকোনো কাজের ডাক আসিলেই আজকাল তাঁহারা যে-প্রকার উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিতেছেন, তাহাতে সহজেই বুঝা যায় যে ভিতরের প্রেরণা, বুদ্ধি,দেশ ও দশের প্রতি অনুরাগ, কিছুই তাঁহাদের ভিতর হইতে লুপ্ত হয় নাই, সাময়িক বাধা-বিপর্য্যয়ে আচ্ছন্ন হইয়াছিল মাত্র।

প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান কতখানি উচ্চে ছিল, তাহা কয়েকটি উদাহরণ হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। মনুষ্য-সমাজে পুরোহিত, ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা, ইঁহাদের স্থান সকলের উপরে। সভ্যজগতে এখন হিন্দু, মহম্মদীয়, খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ, এবং পারসিক, এই কয়টি ধর্ম্মমত প্রচলিত বলিয়া মোটের উপর ধরা যায়। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ যথাক্রমে বেদ, কোরান বাইবেল, ত্রিপিটক এবং জেন্দ্ আবেস্তা। এইগুলি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে কি দেখা যায়? সদা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের বাণী পুরুষের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে, স্ত্রীলোক কখনও উহা শুনিবার অধিকারিণী হন নাই। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রণয়নে স্ত্রীলোকের কোনই হাত নাই। মনুষ্য-সমাজে যাহা সকলের অপেক্ষা উচ্চপদ তাহা কোনোদিন নারীকে দেওয়া হয় নাই। সকল দেশেই সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই এই অবিচার, শুধু প্রাচীন ভারতের হিন্দুদিগের মধ্যে ছাড়া। ঋগ্বেদ হিন্দুদের মতে সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী। ঋষিগণ এইসকল গাথা লাভ করিয়াছিলেন, পরে উহা লিপিবদ্ধ হয়। এই ঋগ্বেদের ১০ম অধ্যায়ে কুড়িটিরও অধিক গাথা আছে, যাহা নারীর নিকটেই প্রকাশিত হয়। ইঁহাদের সকলেরই নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ বহু প্রাচীনকালের গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই কেবল বেদ-পাঠ ও বেদশিক্ষা দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাদের মুখ হইতেই বেদের বাণী শ্রবণ করিত, নিজেরা বেদ-পাঠ করিবার অধিকারী তাহারা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণরা যদি নারীর হীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, তাঁহাদের নাম বেদ হইতে মুছিয়া ফেলিতেন, তাঁহাদিগকে কেহই বাধা দিত না, এমন কি সে কথা কেহ জানিতেও পারিত না। কিন্তু এই চেষ্টা কোনোদিনই হয় নাই, কারণ ধর্ম্মের রাজ্যে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা হীন, ভারতীয় মানুষ কোনোদিন মনে করেন নাই। ঈশ্বরের বাণী শুনিবার অধিকার নারীর ও পুরুষের সমানই আছে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, এইদিকে অন্ততঃ নারীর কৃতিত্বকে বাধা দিবার কোনো চেষ্টা করেন নাই। অন্য অনেক বিষয়ে অবশ্য নারীর অধিকার পুরুষের নীচে ছিল।

খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্মে নারী কখনও পুরোহিতের পদ পাইতে পারেন না। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে পোপ সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক। তাঁহার নিম্নে কার্ডিনাল, বিশপ প্রভৃতি অসংখ্য পুরোহিত আছেন। কিন্তু পোপের পদ পাওয়া দূরে থাকুক, কার্ডিনাল বা বিশপের পদও কোনো-দিন কোনো নারী অধিকার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। রোমান ক্যাথলিক এবং গ্রীক ক্যাথলিকদিগের

ভিতর স্ত্রীলোক ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যও করিতে পারেন না। প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেও নারী আর্চ্চবিশপ, বিশপ বা ধর্ম্মযাজক হইতে পারেন না; তবে প্রটেষ্টাণ্টদিগের বিভিন্ন শাখা আছে, উহার মধ্যে কোনো কোনো শাখাভুক্ত নারীরা ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য করিতে পারেন বটে। প্রাচীন ভারতে অবস্থা কিন্তু অন্য প্রকার ছিল। সমাজে বা দেশে ঋষিদের উচ্চে কাহারও স্থান ছিল না। এই ঋষির পদ পাইতে নারীকে কেহই বাধা দিত না। বহু নারী-ঋষির নাম আজও আমরা সংস্কৃত শাস্ত্রে, কাব্যে, সাহিত্যে দেখিতে পাই।

মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা পুরুষ-দেবতারই ধারণা। ঈশ্বরকে তাঁহারা পিতৃ-রূপেই দেখেন। কিন্তু এক হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোথাও ঈশ্বরের মাতৃরূপ কেহ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নারীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী বলিয়া মনে না করিতে পারিলে, ঈশ্বরের মাতৃরূপ ধারণা করা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে দেবতা যতগুলি, দেবীও ততগুলি। বরং দেবীরাই পূজা-লাভ বেশী করেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে নারীকে সাধকজীবনের একটা অন্তরায় বলিয়াই ধরা হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতের বিবাহ নিষিদ্ধ। পোপকে ব্রহ্মচারী হইতেই হইবে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে নারী সাধনার সহায়ই ছিলেন, অন্তরায় ছিলেন না। অবশ্য, নারী নরকের দ্বার, এ-ধরণের মতও ভারতবর্ষে শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাহা পরবর্ত্তী যুগের কথা। প্রাচীন ভারতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের কোনো অনাদর ছিল না। সস্ত্রীক ধর্ম্ম-আচরণ করারই বিধি ছিল। যাগযজ্ঞে স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর সহিত যোগ দিতেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও স্ত্রীর অবস্থা হীন ছিল না। বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে গৃহীর জীবন যাপন করাই শাস্ত্রসঙ্গত ছিল।

নারীর শিক্ষালাভের পথে কোনোই অন্তরায় ছিল না। তখনকার দিনের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা যাহা, অনেক নারীই তাহা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ অপেক্ষা তাঁহাকে হীন বলিয়া কেহ মনে করিত না। প্রকাশ্য সভায় তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পুরুষকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিতেন। কিন্তু পুরাতন গ্রীস্ বা রোমে, কোনো রমণী, সোক্রাটীশ্ বা প্লেটোকে, কি সিসিরোকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিতে সাহস করিয়াছিলেন বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই। উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতেও অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজে নারীকে উপাধি-দান লইয়া যে পরিমাণ গোলোযোগ হয়, তাহাতে প্রাচীন ভারত যে অনেকাংশে বর্ত্তমান সভ্যজগৎ হইতে উন্নত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

সামাজিক রীতিনীতিও, সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, নারীর পক্ষে অপমানজনক ছিল না। তাঁহাকে পতি-নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইত। ইহা হইতেই বুঝা যায়, নিতান্ত বালিকা-বয়সে বিবাহ হইত না, এবং কন্যা কিছু পরিমাণ শিক্ষা অন্ততঃ লাভ করিতেন। নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্ব্বাচীনের প্রতি কেহ নিজের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নির্ব্বাচনের ভার ছাড়িয়া দেয় না। এমন কি নিজে বিবাহের প্রস্তাব করিবারও অধিকার তাঁহার ছিল, তাহা সাবিত্রীর বা দেবযানীর উপাখ্যান হইতে অনুমান করা যায়। উলুপী, হিড়িম্বা প্রভৃতি নারীরা ঠিক আর্য্যসমাজভুক্তা ছিলেন না, কিন্তু ইঁহাদের সহিত আর্য্য-হিন্দুদের বিবাহাদি চলিত। ইঁহারাও নিজেরাই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই অধিকার এখনও ইউরোপ বা আমেরিকার নারীও লাভ করেন নাই।

রাজ্যশাসন, প্রজা-পরিপালন প্রভৃতি কার্য্যেও নারীর অধিকার ছিল। মহাভারতের যুগেও দেখা যায়, রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদা প্রজাদের সকল শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। নারী-যোদ্ধার ধারণা করা তখনকার দিনে কিছু নূতন ব্যাপার ছিল না। স্বামী অক্ষম হইলে, বা মৃত হইলে, শিশু-সন্তানের হইয়া রাজ্যচালনা করাও চলিত। সত্যবতী, কুন্তী প্রভৃতি মনস্বিনীর উপাখ্যানে আমরা ইহা বুঝিতে পারি।

ঐতিহাসিক যুগে, উচ্চশিক্ষিতা নারী, নারী-সেনা-নায়িকা, নারী-রাজ্ঞী, সকলই আমরা দেখিতে পাই। লীলাবতী, খনা, উভয়ভারতী, তখনকার দিনের যে-কোনো পুরুষকে অবলীলায় পরাজিত করিতে পারিতেন। রাণী দুর্গাবতী, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, সুলতানা

রাজিয়া, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, এবং অসংখ্য রাজপুত রমণী ইহার প্রমাণ।

এখনও উচ্চশিক্ষার অবসর পাইলে নারী যে সর্ব্ববিষয়েই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন, তাহা যাঁহারাই বিগত কয়েক বৎসরের ইউনিভার্সিটি-পরীক্ষার ফলাফল মন দিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস না করিয়া পারেন না। আইন ব্যবসায়ে, চিকিৎসা ব্যবসায়ে, যেখানেই তাঁহারা সুবিধা ও সুযোগ পাইয়াছেন, নারী নিজের স্বাভাবিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। সামাজিক সংস্কার-কার্য্যে, রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভ-ক্ষেত্রে, তাঁহারা সর্ব্বদাই অগ্রসর। আমাদের দেশে কংগ্রেস সর্ব্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার দুইটি অধিবেশনে নারী সভানেত্রী হইয়াছেন, শ্রীমতী অ্যানী বেসাণ্ট, এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। পাশ্চাত্য-জগৎ এ-হিসাবে এখনও ভারতের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমেরিকায় কখনও নারী রাষ্ট্রনেত্রীরূপে নির্ব্বাচিতা হন নাই, বা ইংল্যাণ্ডে কখনও কোনো মহিলাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দান করিবার কথা উঠে নাই। সেদিন পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টে নারী-সভ্য হইবার অধিকারলাভের জন্য রীতিমত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী আজকাল ঠকিয়া শিখিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, এক-পায়ে খোঁড়াইয়া চলিলে কখনও কোনো পথে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। জগতের চক্ষে তাঁহারা যে এত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তার প্রধান কারণই এই একটি। প্রাচীন ভারতে যে নরনারীর সাম্যের আদর্শ ছিল, তাহা হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইয়াছিলেন। জাতির অর্দ্ধেককে ঘুম পাড়াইয়া রাখিলে, সে জাতির দ্বারা বড় কাজ কিছু হইতে পারে না। বরং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সুশিক্ষিতা নারী, শিক্ষিত পুরুষ অপেক্ষা সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে অধিক প্রয়োজন। কারণ শিক্ষিত পিতার অশিক্ষিত সন্তানসন্ততি অনেক জায়গায়ই দেখা গিয়াছে, কিন্তু কোনো শিক্ষিতা জননী সন্তানের শিক্ষায় কখনও অবহেলা করেন না। আমাদের দেশে অনেক জ্ঞানী-গুণীর ঘরে নিতান্ত অশিক্ষিতা স্ত্রী কন্যা বধূ অহরহই দেখা যায়। কিন্তু পরিবারের শীর্ষস্থানীয়া একজনও যদি অন্ততঃ সুশিক্ষিতা থাকেন, তাহা হইলে এই রকম ব্যাপার কখনও ঘটিতে পারে না।

কিন্তু ভারতনারী ঘুমাইয়া ছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক মহিমার ক্ষেত্রে তাঁহাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিলে, প্রাচীন ভারতে তাঁহাদের যে মূর্ত্তি দেখিয়া নারীকে দেবী বলিয়া সকলে পূজা করিত, সেই স্থান তাঁহারা আবার ফিরিয়া পাইতে পারেন। অবশ্য দেবীত্ব লাভ না করিলেও যে তাঁহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি আছে তাহা আমি মনে করি না। মানুষের সকল রকম অধিকার যদি তাঁহাদের দেওয়া যায়, এবং অধিকারগুলির সদ্ব্যবহার করিবার সকল সুবিধা ও সুযোগ তাঁহারা পান, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। আমাদের দেশে নামে এখন মেয়েদের অনেক রকম অধিকার স্বীকার করা হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ সে অধিকার তাঁহাদের ভোগ করিবার সুযোগ হয় না। এই সকল কৃত্রিম বাধা দূর করা উচিত। ভারতবর্ষে নারীকে প্রধানতঃ পরিবারের গৃহিণী এবং সন্তানের জননীরূপেই দেখা হইয়াছে। এখনও তাঁহাকে কেবল ঐ পদের উপযোগী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই হয়। তাহাও যদি যথেষ্ট পরিমাণে হইত ত ভাল ছিল, কিন্তু কি প্রকার শিক্ষা তাঁহার প্রয়োজন, উহা প্রাচ্যভাবে দান করা হইবে, না, পাশ্চাত্যভাবে, কি একেবারে কোনো শিক্ষাই দেওয়া হইবে কি-না, এই সব লইয়া অনর্থক বাকবিতণ্ডাতেই দিন কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু শুধু পরিবারের গৃহিণী এবং সন্তানের জননী হইবার জন্য যে শিক্ষা দরকার, তাহাই কেবলমাত্র দেওয়া হইবে কেন? অবশ্য অধিকাংশ নারীই বিবাহ করিয়া, সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবেন, তাহা ঠিক। সকল দেশে, সকল কালে, তাহাই ঘটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভিন্ন, অসাধারণ মানুষও জগতে জন্মগ্রহণ করে ত? পুরুষের ভিতর নূতন নূতন পথে যাত্রা করিবার লোক ত ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। নারীর ভিতরেও কেহ কেহ এমন থাকিতে পারেন, সংসারে স্বামীপুত্র লইয়া বাস করা অপেক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, অচেনা, অজানার ডাক যাঁহার মনে প্রবলতর। তাঁহাকে কেন বাধা পাইতে হইবে? যাঁহার ভিতর যতটা ক্ষমতা আছে, যেদিকে কর্ম্মপ্রেরণা আছে, তাহা দ্বারা দেশ এবং সমাজ কেন উপকৃত হইবে না? আমাদের দেশে কি মাদাম কুরীর মত বৈজ্ঞানিক নারী জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না? আমাদের দেশে কি মিস্ ইয়ারহার্ট বা এমি জন্‌সনের

মত সাহসিনী নারী কেহ থাকিতে পারেন না? আমাদের মধ্যে কি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বা এলিজাবেথ্ ফ্রাইয়ের মত দেশসেবিকা হওয়া অসম্ভব? তাহা ত একেবারেই বোধ হয় না। কিন্তু সুযোগ নাই, সুবিধা নাই। সবাইকে একই ছাঁচে ঢালিয়া, এক চেহারা দান করিবার জন্মই যেন সমাজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। পারিবারিক জীবনেও যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার প্রয়োজন। কেবলমাত্র হাত-পা, নাক-চোখ লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই, নারী জননী বা গৃহিণী হইবার উপযুক্ত হইলেন, এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। বরং অন্যদিকে সফলতা অর্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ তাহাতে কেবল একদিকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু জননীর দায়িত্ব বড় গুরুতর, কতদিকে যে তাঁহার শিক্ষা প্রয়োজন, কতদিকে যে তাঁহার সজাগ থাকা প্রয়োজন, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। এই জীবনের জন্যই সকল নারীকে কেন যে উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়, এবং অন্যান্য অল্পায়াসসাধ্য জীবনের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়, তাহা বাস্তবিক বুঝিয়া ওঠা দুঃসাধ্য। স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন, তিনি কি ভাবে নিজের জীবন কাটাইবেন, তাহা তাঁহার নিজের নির্ব্বাচন করিবার অধিকার থাকা উচিত। নারী বলিয়াই কেন কৃত্রিম বাধা তাঁহার পথরোধ করিবে? এ কাজটা নারীর উপযুক্ত, এটা অনুপযুক্ত, এ বিবেচনা করার ভারও নারীর হাতেই থাকা ভাল। পুরুষ নারীকে যেভাবে দেখিতে চান, তাহা ছাড়াও তাঁহার অন্যরূপ হওয়া কি সম্ভব নয়? তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়, ততই মঙ্গল।

নারীর পথে পুরুষ অপেক্ষা নারী নিজেই কিছু কম বাধা সৃষ্টি করেন না। বরং অশিক্ষার জন্য মনের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার বেশী, এইজন্য নারীর কর্ম্মক্ষেত্রকে নারী অত্যন্তই ছোট করিয়া দেখেন। নিজেরা যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা কন্যা বা বধূকে করিতে দেখিতে তাঁহারা কেন পিছাইয়া যান? যাহা নিজেদের জীবনে কল্পনামাত্র ছিল, তাহা পরবর্ত্তী যুগের মেয়েদের মধ্যে কার্য্যে ঘটিয়া উঠুক, এই আকাঙ্ক্ষাই করা উচিত।

প্রাচীন ভারত হইতে এই শিক্ষাটা আমরা অন্ততঃ লাভ করিতে পারি যে নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে নানা জায়গায় তাঁহার স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রেরণা বাধা পায়, সেইজন্য তাঁহাকে হীনপদ অধিকার করিতে হয়। যদি এই সকল বাধা দূর করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সকল দিকে কাজ করিবার ক্ষমতা ক্রমেই বিকশিত হয়। যাহা কখনো করি নাই, তাহা করিতে মানুষের স্বভাবতঃই একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু সম্মুখে পথ অবারিত দেখিলে, অগ্রসর হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। নারী এখনও যাহা করিতে পারেন নাই, ক্রমে ক্রমে তাহাও যে করিতে পারিবেন, এমন আশা করা কিছু দুরাশা নয়।

সুতরাং প্রথমতঃ আমরাই যেন আমাদের উন্নতির পথে বাধা না হই। "এমন কথা বাপের জন্মে শুনি নাই"—বলিয়া নূতন সব প্রয়াসকে দমন করিবার চেষ্টাটা আমাদের মধ্যে বড়ই প্রবল। বাপের জন্মে যাহা দেখি নাই ও শুনি নাই, তাহা দেখিবার ও শুনিবার আশায়ই ত বাঁচিয়া থাকা উচিত! পৃথিবীতে উন্নতির সম্ভাবনা এখনও ত শেষ হইয়া যায় নাই? যাহা কিছু ঘটিবার সবই যদি নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যজাতির আর টিঁকিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু এখন সকল দিকেই আশার আলোক উজ্জ্বলতর হইয়া দেখা দিতেছে। পুরুষের যদি উন্নতির পথ অসীম হয়, নারীরও তাহাই হওয়া উচিত—গৃহকোণেই তাঁহার জগৎ যেন ফুরাইয়া না যায়।

খেয়ালের ক্ষতি

শ্রী দীপ্তি দেবী

"স্বপন-ছায়া-ঘেরা অলস দেহ-মনে
পশিল কোন্ সুর কোন্ সে মায়া-ক্ষণে ;
চেতনা—তনু হ'তে ক্ষণিক খসি' যায়,
আলেয়া জ্বলি' উঠি' মিলাল দূরে হায় !"
—হেমলতা দেবী

চার বছর বয়সে আমি যখন প্রথম স্কুলে যাই তখন থেকেই শিউলির সঙ্গে আমার আলাপ। আলাপটা ক্রমশ: বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াটা খুব যে স্বাভাবিক তা নয় কারণ সবদিক দিয়েই তাতে আমাতে অনেক প্রভেদ। শিউলির বাপ সিভিলিয়ন, ধনে মানে দশের এক, আর আমার দুটি বোন ছাড়া আপন বল্‌তে কেউ নেই। শুনেছি এক সময় নাকি আমাদের বেশ ভাল অবস্থাই ছিল, সে অবস্থা থাকলে আমরাও আজ সবার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে পার্‌তাম—কিন্তু যার যা ছিল সে-বিষয় ভেবে কোন লাভ নেই, যা আছে তাই এখন ভোগ করা যাক্। থাক্‌বার মধ্যে আছে একটা ছোট বাড়ী, তার অর্দ্ধেকাংশ ভাড়া দিয়ে গোটা-ত্রিশেক ঘরে আসে, আর বাকি অংশটিতে আমরা তিন বোনে থাকি। অর্থাৎ আমার দিদি ও ছোট বোন থাকে ;—আমার নিজের অধিকাংশ সময় কোলকাতার বাইরেই কেটে যায়।

তিন বোনের মধ্যে আমি মেজ, আমার বড় বোনের নাম মনোরমা, আর ছোট বোন তিলোত্তমা এখন সবে পাঁচ বছরের। বাবা মারা যাবার পর দিদি নিজের পড়া বন্ধ ক'রে দিয়ে কোন একটি বালিকাবিদ্যালয়ে সেলাই শিখিয়ে মাসিক কুড়িটে টাকা মাইনের একটি চাকরী নিলেন। এই সামান্য আয় থেকে তিনি আমায় আই-এ পর্য্যন্ত পড়ান।

সেই শিশু-বিভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে আর ইণ্টার-মিডিয়েট অবধি শিউলি আর আমি একই ক্লাসে প'ড়ে আস্‌ছি। শৈশবের বন্ধন সহজে শিথিল হয় না। পাশ ক'রে আমি কোল্‌কাতার বাইরে একটি মেয়ে-স্কুলে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী পাই। শিউলির সঙ্গে এই প্রথম বিচ্ছেদ। তবু চিঠি-পত্র লেখালিখি ক'রে বন্ধুত্বটা বেশ জীইয়ে রাখা গিয়েছিল। এ ছাড়া ছুটিতে বাড়ী আস্‌লে পর দেখা-শুনা পুরো দমে চল্‌ত।

আমি যে-স্কুলে চাকরী পাই সে স্কুলটি সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয় থেকে কিছু তফাৎ। কোন একটি চটকলের মালিক এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। গঙ্গার উপর বাড়ীটি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, দেখ্‌লেই থাক্‌তে ইচ্ছা করে। এইটিই হ'ল এখানকার মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের থাক্‌বার বাংলো। অদূরেই স্কুল-বাড়ী,—সবুজ ঝাউগাছ দিয়ে ঢাকা। এই কলে যে-সব বাবুরা কাজ করেন তাঁদেরই মেয়েরা এই স্কুলে পড়ে, এ ছাড়া আশে পাশে যে দু' দশ ঘর ভদ্র-পরিবার আছেন তাঁদেরও মেয়েরা এইখানে বিদ্যালাভের জন্যে আসে।

এই কলের মালিক কোল্‌কাতার বিখ্যাত ধনী প্রিয়-নাথ মুখোপোধ্যায়। ভাল ক'রে কারবার চালাবার জন্যে তিনি তাঁর একটিমাত্র ছেলে শিশিরকুমারকে বহুকাল ইউরোপে রেখে ইউরোপীয় ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষার সুযোগ দেন। সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরেছেন। কোল্‌কাতার আফিসের ভার প্রিয়নাথবাবুর উপর, তিনি বড় একটা এখানে আসেন না। কলের সব কাজ-কর্ম্ম শিশিরবাবুই দেখেন।

শিশিরবাবুর বয়স ৩০।৩২ হবে, অথচ তিনি অবিবাহিত। এর প্রধান কারণ—তাঁর মা নেই—শুধু মা নয়, মাতৃ-স্থানীয়া কেউ নেই। প্রিয়নাথবাবু নিজের কাজে ডুবে আছেন—তাঁর ছেলেও তদ্রূপ। থিয়েটার রোডের মস্তবড় বাড়ী ভাড়া খাট্‌ছে। প্রিয়নাথবাবু ছেলেকে নিয়ে আফিসের উপর-তলায় থাকেন। দাড়ি-গোঁফ-যুক্ত চাপকান-পরা বুড়ো আবদুল্লাই তাঁদের সংসারের একমাত্র গৃহিণী! শিশিরবাবুর চারটি বোন,—প্রত্যেকেরই বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে তাঁদের মা থাক্‌তে, এবং প্রত্যেকেই শিশিরবাবুর চেয়ে বয়েসে ছোট। তাঁরা যে সাহস ক'রে বউ আন্‌বার কথা তুল্‌তে পারেন না সেটা বলা বাহুল্য। ভগ্নীপতিরা মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে শিশিরবাবুকে উপদেশ দেন বটে, তবে এখনও সে উপদেশ তেমন ফলদায়ক হয় নি।

প্রিয়নাথবাবুর ঘরের কথা আমি জান্‌লাম প্রভাদি'র কাছে। প্রভাদি' আমাদের এই স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। এখানে কাজ নেবার আগে প্রিয়নাথবাবুর মেয়েদের গৃহ-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

আমার এই চাকরীটি বেশ সুখের। মাইনে অল্প হ'লেও খাইখরচের একটি পয়সা লাগে না, গঙ্গার উপর সাজান-গোছান বাড়ী। বড় বড় টেনিস্-কোর্ট; প্রকাণ্ড লাইব্রেরী; হপ্তায় হপ্তায় বিনা পয়সায় বায়স্কোপ; এ ছাড়া সোডা-লেমনেড-বরফ ইত্যাদি মিলের খরচায় দেদার পাওয়া যায়। হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি, সব-কিছুই এখানে আছে। এমন সুবিধা আর কোথাও পেতাম ব'লে ত' মনে হয় না।

সেদিন কুলি-লাইনের ধার দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম প্রভাদি' আর আমি। এদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরগুলো দেখ্‌তে আমার লাগে বেশ। এখানকার অনেক মজুরণীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় আছে। তারা মাঝে মাঝে আমাদের কাছে তাদের কত সুখদুঃখের কথা বলে—সকলের মুখে কিন্তু শিশিরবাবুর প্রশংসা আর ধরে না। কবে তিনি কার অসুস্থ ছেলেকে নিজের মোটরে ক'রে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে এনেছেন, কবে কার রুগ্ন মেয়ের জন্যে গরম কাপড় এনে দিয়েছেন ইত্যাদি নানারকম কথা তাঁর সম্বন্ধে সবাই বলে। আর কিছুদিন পর এরা বোধ হয় শিশিরবাবুর মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজো কর্‌তেই সুরু ক'রে দেবে!

সূর্য্য প্রায় ডুবু-ডুবু,—আকাশ একেবারে লালেলাল। পাখীগুলো দলে দলে বাসার উদ্দেশে উড়ে চলেছে। শরৎকালের সন্ধ্যা,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আঁধার হ'য়ে এল। একপাল গরু চারদিকে ধূলো উড়িয়ে আপনমনে মন্থর-গতিতে বাড়ীর দিকে চলেছে, মাত্র দুটি কচি রাখাল-ছেলে তাদের পথ প্রদর্শক। সাম্‌নে লাল সুর্‌কি-ফেলা রাস্তা, তার আশে পাশে নানা দিশি-বিলিতি ফুলের গাছ। শরতের ঝিরঝিরে বাতাস তাদের গন্ধ নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে একেবারে দিগ্বিদিকে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম, এমন সময় চেয়ে দেখি বেশ একটু ভীড় জমেছে—ঠিক ঐ দক্ষিণদিকের খোলা মাঠটার ধারে। কাছে গিয়ে দেখি শিশিরবাবু মাঝে দাঁড়িয়ে, আর তাঁকে ঘিরে আছে এখানকারই মজুরদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। তিনি পকেট থেকে নানা-রকম উপভোগ্য জিনিষ বের ক'রে চারধারে ছড়িয়ে দিচ্ছেন আর তারা দৌড়ে দৌড়ে সেগুলো কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে-মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ছে,—সঙ্গে সঙ্গে শিশিরবাবুও বেশ স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্ছেন। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি তিনি 'প্রস্থান' দিলেন। প্রভাদি' আপন মনেই বল্লেন—"শিশিরবাবু ছোট ছেলেপিলে এত ভালবাসেন, কেন যে নিজে বিয়ে করেন না জানি না!"

সেবার পূজোর ছুটিতে বাড়ী আসি। দিনগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ আনন্দের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। স্কুল খুল্‌বে খুল্‌বে হ'য়ে এসেছে এমন সময় একটা অঘটন ঘট্‌ল। বিপদ যখন আসে তখন ধীরে-সুস্থে, ভেবে-চিন্তে আসে না, একেবারে হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে এসে পড়ে,—আর সে একাও আসে না, দলবল নিয়েই যে ওর কারবার!

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা খুকিটা জ্বরে পড়্‌ল। হপ্তাখানিক পরও জ্বর সার্‌ল না দেখে দিদি ডাক্তার ডাক্‌তে বল্লেন। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, কালাজ্বর। চিকিৎসা চল্ল; এমন সময় আমি প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙে হ'লাম একেবারে শয্যাশায়ী। মরার উপর খাঁড়ার ঘা! খুকির জন্যে দিদির অবিশ্রান্ত খাটুনি, এর উপর আমি

হ'য়ে রইলুম একেবারে নিষ্কর্ম্মা। এদিকে দু'জনের চিকিৎসার জন্যে বেশ কিছু খরচও হ'ল। সেভিংস ব্যাঙ্কে যা-কিছু সামান্য জমান ছিল তাও আস্তে আস্তে তুলতে হ'ল। কিন্তু এর উপর দিয়ে গেলেও যে বাঁচ্তাম! ডাক্তার বল্লেন,—আমার বিছানা থেকে উঠ্তে অন্ততঃ এক মাস লাগ্বে, তার চেয়ে বেশীও হ'তে পারে। এদিকে আজ-বাদ-কাল স্কুল খুল্বে, সময়ে কাজে ভর্ত্তি না হ'তে পার্লে অমন চাকরীটা মাঠে মারা যায়। কি ক'রে এ-যাত্রা চারদিক সামলাব তাই ভাব্বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম, ঠিক এই সময়ই শিউলির কথা মনে প'ড়ে গেল। বড়লোকের মেয়ে সে, তবু গরীব ব'লে কোনদিন সে আমায় ঘৃণার চোখে দেখে নি। বিপদে আপদে সব সময়ই সে আমার প্রধান ও একমাত্র সহায়। ভগবান্ আমায় সব দিক দিয়ে মারেন নি,—ক'জন শিউলির মত বন্ধু পায়? শিউলি আমার বিপদের কথা শুনে দেখতে এল ও আশ্বাস দিয়ে গেল যে, সে আমার জন্যে যা' হয় একটা ব্যবস্থা কর্‌বে। ব্যবস্থাটা যে ঠিক এইরকম দাঁড়াবে তা' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। শিউলি যখন তার পরদিন এসে জানালে যে যে-ক'দিন আমি বিছানা থেকে উঠ্তে না পারি সে-ক'দিন ও আমার কাজের ভার নিতে প্রস্তুত। আমি সত্যিই অবাক হ'লাম। ধনীর একমাত্র কন্যা,—ইস্কুলমাষ্টারি কি তার সাজে? শিউলি ব'লেই অমন প্রস্তাব কর্‌তে পার্‌ল! তাকে থামাবার অনেক চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু সে একবার যা ঠিক করে তার আর নড়্চড়্ হয় না, অগত্যা বাধ্য হ'য়ে আমায় রাজী হ'তে হ'ল।

শিউলি ত' কাজে ভর্ত্তি হ'ল এদিকে আমি রোজ দিন গণি কবে আবার নিজের কাজের ভার নিয়ে ওকে ছুটি দিতে পারব। ডাক্তার কখনো বলেন এই সেরে উঠ্লাম ব'লে, আবার কখনো বলেন দু'চার হপ্তা আরও লাগ্বে। এমন অলসভাবে দিন কাটান আমার কুষ্ঠিতে লেখে না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। এদিকে কিছু কর্‌বার না থাকায় আবল-তাবল কতরকম কি যে আমার মাথায় বাসা বাঁধ্ত যে, সে জঞ্জাল সাফ করা এক দায়।

এর আগে আমি নিজের সম্বন্ধে তেমন ক'রে কখনো ভাবিনি, ভাব্বার বোধ হয় অবসরও পাইনি। আজ এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেরই কথা বেশী ক'রে মনে হ'তে থাকে।

আমার চেহারার দিকে কোনদিনও মনোযোগ দিই নি। রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে নিজেকে দেখা আমার অভ্যাস ছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে যাকে দেখতে পেতাম তাকে যে সুন্দরী বলা যায় না সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না। রং আমার ফর্সা ত নয়ই অথচ কষ্টিপাথরের মত কালোও নয়—সে কালোরও একটা মাধুর্য্য আছে,-মাঝামাঝিটাই যে সব চেয়ে খারাপ! চোখ নাক মুখ আমার ভালও নয় মন্দও নয়, আমি রোগাও নই মোটাও নই, মোটের উপর বিশেষত্ববিহীন. নেহাৎ রামী-শ্যামীর দলের লোক আমি। এ হেন আমার জীবনে যে অদ্ভুত কোন ঘটনা ঘট্‌বে না, সে আমি ভাল ক'রেই জান্‌তাম। তবুও কেন যে এক এক সময় মনে হ'ত যদি আমি শিউলির মত সুন্দরী হ'তাম—ঠিক ওরই মত এক-মুঠো শিউলি ফুলের মত! তা' হ'লে হয়ত কোন রাজ-পুত্রের সন্ধান পেতাম, যে এই ভিখিরি মেয়েকে রাজমুকুট পরাতে চাইত!

হঠাৎ যে কেন গল্পের নায়িকা সাজ্‌বার সখ্ হ'ল ভগবানই জানেন। নায়িকা হিসাবে নম্বর দিতে গেলে আমার ভাগ্যে যে শূন্য পড়্‌বে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই জেনেও যে মাসে মাসে রঙীন স্বপন দেখ্‌তাম না তা' আমি বল্‌তে পারি না, বিশেষতঃ এই-সময় যখন হাতে কোন কাজ ছিল না।

প্রতি হপ্তায় শিউলির একখানা ক'রে চিঠি পাই, এ ছাড়া প্রতি রবিবারে সে আমায় দেখতেও আসে। তারই মুখে মাঝে মাঝে শিশিরবাবুর কথা শুনতে পাই। শেষা-শেষি শিউলির কথায় মনে হ'ল শিশিরবাবুর সঙ্গে ওর আলাপটা বেশ জ'মে গিয়েছে। বোধ হ'ল—দু'জনেই দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট।

আমি হলপ ক'রে বল্‌তে পারি যে সুস্থ অবস্থায় এ খবরে আমার মনে এতটুকুও দুঃখ হ'ত না, কিন্তু সেদিন যেন মনের কোন্ এক গোপন কোণে একটু যেন কিসের ব্যথা! না না, তাও কি সম্ভব? আমার কপালে যা কোনদিনও জোট্‌বার নয়, সেটা অন্যে বিশেষতঃ শিউলি

পাচ্ছে জেনে হিংসে করা ত' আমার ধাতে নেই ? এ তবে আমার হ'ল কি ! হ্যারিসনের "ফিউচার অব্ উইমেন" প'ড়েই কি এই দশা হ'ল ! তৎক্ষণাৎ মিলের "সাবজেক্‌সন অব্ উইমেন" খুল্লাম। হ্যারিসনের "এন্‌জেল অব দি হার্ট," "কুইন অব দি হোম"-টোম আমার মোটেই মানায় না।

শিউলি এদিকে আপনমনে কত কথা ব'লে যেত—কবে শিশিরবাবু ওকে একটা গোলাপ পেড়ে দিতে গিয়ে কাঁটার ঘায়ে হাত চিরেছিলেন, কবে কোন্ সন্ধ্যায় পাছে শিউলির ঠাণ্ডা লাগে ব'লে নিজের ওভারকোট খুলে তাকে পরিয়ে দেন, এ সব অনেক কথা তার মুখে শুন্‌তাম। এ সময় আমি যদি নিজের মনের উপর কড়া পাহারা না বসাতাম তা' হ'লে হয়ত নিজেকে শিউলি ব'লে ভুল কর্‌তাম।

সেদিন ফের খানিকক্ষণ রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম,—আর যায় কোথা ? অমনি কত রং-চংয়ে ছবি আপনমনেই আঁক্‌তে শুরু ক'রে দিলাম, অবশ্য নিজেকে নিয়েই সে ছবি আঁকা—এই কালো মেয়ে তার কালো হরিণ চোখ-টোক আর কি ! ঠিক এম্‌নি সময় শিউলি এসে আমার চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বল্লে—"কিরে সুষমা, কি এত ভাবছিস্ ? হঠাৎ আমি ব'লে ফেল্লাম—"শিশিরবাবুর কথা—" শিশিরবাবুর নাম করতেই শিউলি যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে পড়্‌ল, আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস্ করলে—"ওঁর বিষয় কি ভাব্‌ছিলি—?" আমি আপনমনে ব'লে চল্লাম—"পূর্ণিমার রাত, আমরা সবাই নৌকায় ক'রে গঙ্গার উপর বেড়াচ্ছিলাম, শিশিরবাবুও সঙ্গে ছিলেন. কি সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল ! হঠাৎ কি জানি কেমন ক'রে একেবারে পড়্‌লাম গিয়ে জলে, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের পড়্‌বার শব্দ শুন্‌লাম,—যখন জ্ঞান হ'ল তখন শুন্‌লাম, শিশিরবাবু বলছেন—'যাক বাঁচলাম, কি ভয়ই দেখিয়েছিলে ! অমন ক'রে কি ঝুঁক্‌তে আছে ? যদি খুঁজে না পেতাম ?' তাঁর কথা শেষ হ'বার আগেই বল্লাম—'আমার বাঁচা-মরাতে কারু কিছু এসে যায় না—' আমাকে তিনি আর বল্‌তে দিলেন না।—আচ্ছা ভাই, এ জীবনটার মূল্য একজনের কাছেও আছে জান্‌লে কেমন লাগে ?" তারপর একটু হেসে বল্লাম—"কি অদ্ভুত স্ব—"আমার কথা শেষ না হ'তে হ'তেই শিউলি বল্ল—"অনেক রাত হয়েছে, আর্ আসি।" শিউলি চ'লে গেল।

(শেষ)

কিছুদিন হ'ল আমি নিজের কাজে ফিরে এসেছি ; শিউলি চ'লে গিয়েছে তার বাবার কাছে। যাবার সময় পূর্ব্বেরই মত মিষ্টি ক'রে বিদায় নিল, কিন্তু তবুও যেন একটা বেসুরো আওয়াজ আমার কানে লেগে রইল। বিশ বৎসরের বন্ধুত্ব আমাদের, তাতে একদিনও ভাঁটার টান ধরে নি, এইবারই বুঝি ভাঙন্ লাগ্‌ল !

শিশিরবাবুর সঙ্গে পূর্ব্বেরই মত দেখা হয় কিন্তু এবার যেন তাঁকে বিশেষ গম্ভীর দেখ্‌লাম। কাজকর্ম্মে সে উৎসাহ নেই, সদাই অন্যমনস্ক। বোধ হয় শিউলি চ'লে গিয়েছে ব'লে। তা' এখানে ব'সে দুঃখ ক'রে লাভ কি ? শিউলিকে নিজের ক'রে নিলেই পারেন ? এর ভিতরকার ব্যাপার তখন পর্য্যন্ত জান্‌তাম না, সেদিন প্রভাদি'র কাছে শুন্‌লাম। শিশিরবাবু শিউলির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে গিয়েছে। কথাটি আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ'ল না। এর সন্ধান নেবার জন্যে সেই রবিবারই গেলাম—কোলকাতা।

শিউলির বাড়ী গিয়ে দেখি সে বিছানায় শুয়ে। অবেলায় তাকে এমনভাবে শুয়ে থাক্‌তে দেখে মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল,—অসুখ-বিসুখ ত কিছু করে নি ?

শিউলি নিজে অস্বীকার করল, কিন্তু ওর চেহারা দেখে মনে হ'ল ও যেন কতকাল রোগে ভুগেছে। শিশিরবাবুর কথা পাড়্‌বার আগেই সে বল্ল—"আচ্ছা সুষমা, লুচি-সন্দেশের ব্যবস্থা কবে কর্‌ছ ?" আমি হেসে বল্লাম—"সেই কথাই ত আমি তোকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তুই ব'লেই আমায় ঐ প্রশ্ন করলি, আমার চেহারা দেখে কি মনে হয় যে লুচি-সন্দেশের লোভেও কেউ আমার কাছে এগুবে ?" শিউলি এর উত্তরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"কেন ভাই, একজনের কাছে অতিপ্রিয় হবার স্বাদ ত' তুমি পেয়েছ, তোমার জীবনের মূল্য নেই আর ত' বলা চলবে না।" কথাটা যেন চেনা চেনা মনে হ'ল, অথচ কে যে বলেচে বা কোথায় যে শুনেছি কিছুই ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। আমি ভাব্‌ছি দেখে শিউলি বল্ল—"আর

লুকচ্ছ কেন ভাই, একদিন পূর্ণিমার রাতে কে তোমার জল থেকে বাঁচিয়েছিল—?" সব কথা মনে প'ড়ে গেল। আমার স্বপ্নটাকে সে কি সত্য ব'লে ধ'রে নিয়েছে নাকি? তাই বুঝি শিউলি শিশিরবাবুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে-এসেছে? হায়রে! আমার মত লোকের স্বপ্ন দেখাও বিড়ম্বনা।

সেই রাতে স্কুলে ফিরে গেলাম। পরদিন শিশির-বাবুকে সব কথা চিঠি লিখে জানালাম, লিখ্‌তে আমার মাথা কাটা গেল, কিন্তু শিউলির জীবনটা মাটি হ'তে বসেছে,—তাকে ত' বাঁচাতে হবে? চিরজন্ম যে অবজ্ঞার ডালি মাথায় নিয়ে রয়েছে, অল্প-বেশীতে তার আর কি আসে যায়! শিউলিটা কিন্তু নেহাৎ গাধা!—কি ক'রে সে বিশ্বাস কর্‌ল যে এ-হেন পোড়াকাঠের জন্যে কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে, বিশেষ ক'রে শিশিরবাবু!

সেইদিনই বিকালে শিশিরবাবু শিউলির ওখানে চ'লে গেলেন। শীঘ্রই লুচি-সন্দেশের ব্যবস্থা হবে।

আমারই জন্যে যে গোল বেধেছিল, তা আমিই আবার শুধ্‌রে দিলাম, শোধরাবার অবসরটুকু যে পেলাম তার জন্যে আমি ভগবানে কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এইবার কিন্তু আমার নিজের অন্ন এখান থেকে উঠ্‌ল।

আনন্দ-সঙ্গীত

(বাহার—দাদ্‌রা)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

আনন্দ-ময় অসীম আকাশ
　　তারার মেলায় ভরা;
আনন্দ-ময় বিভুর প্রেমে
　　বিশ্ব-ভুবন গড়া॥
আনন্দ-উল্লাসে ফোটে কানন-পথে ফুল;
আনন্দ-হিল্লোলে মলয় খেলে দোদুল্ দুল্;—
আনন্দ-ময় চাঁদের কিরণ ভুবন-উজল-করা॥
　　আপন মনের আনন্দেতে গাহে বনের পাখী;
　　আনন্দ বিতরে কোকিল কুহু কুহু ডাকি';
　　অ-থই-তলের আনন্দ-ঢেউ সিন্ধু-উথল-করা।
আনন্দ-ময় আলোয় তিমির নাশে ঊষা-রাণী,—
দিগ্বিদিকে ঝঙ্কারিছে আনন্দেরি বাণী;—
আনন্দ-ময় প্রেমের দানে ধরা হয় অমরা॥

নানা কথা

শিক্ষার আদর্শ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচ

গত সংখ্যার 'নানা কথা'য় আমরা বলিয়াছি, যে, শিক্ষাকে দেহে খাদ্যগ্রহণ করিবার মত গ্রহণ করিতে হইবে—যে খাদ্য রস, রক্ত প্রভৃতি রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে প্রাণশক্তি দান করিয়া থাকে; এবং বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহার পরিপন্থী, ও আমরা আমাদের অত্যন্ত অন্ধতার মোহে জানিয়া-বুঝিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

কিন্তু আমরা বিশ্বাস না করিলেও ইহা ধ্রুব সত্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে বিজাতীয় বুলি আওড়াইতে শিখায়, মূলতে উপাধির বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া মস্তিষ্ককে উষ্ণ করতঃ আমাদিগকে উদ্ধত করে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের তীর্থপথে অগ্রণী করে না। অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম অছে; এবং আমরা কথাটা সাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠদের দিক দিয়া বলিতেছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর এক বক্তৃতায় * বলিয়াছেন, তিনি যখন য়ুরোপে ছিলেন তখন অনেক বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ী বড় বড় জাপানীর সঙ্গে মিশিবার সময় যখন বড় বড় ইংরাজী কথা বলিতেন, তখন অপরপক্ষ সবিনয়ে নিবেদন করিতেন, "Excuse me, I can just follow you, don't know much." পক্ষান্তরে আমাদের দেশের ছেলেরা গ্রাজুয়েট না হইতে পারিলে, বিশেষতঃ ইংরেজী বকুনি ঝাড়িতে না পারিলে 'মানবজন্ম বৃথা গেল' মনে করে। অর্থাৎ অস্মদ্দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে কথা বলিতে শিখায়,

* নারায়ণগঞ্জ স্কুলের বক্তৃতা।

কাজ করিতে নহে, এবং কথা অপেক্ষা কাজই বড় হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের আনন্দমোহন কলেজে প্রদত্ত "ভাব ও ভাষা" শীর্ষক বক্তৃতার * কথা মনে পড়ে। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানে' আছে—
"আমরা বক্তৃতায় যুঝি…কিন্তু কাজের সময়—"

বার্ণাড'শ' বলিয়াছেন মানুষকে অচল এবং মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিকে ভোঁতা করিবার যন্ত্র এই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকা ভাঙিয়া 'প্রকৃতির উদ্যান' প্রস্তুত করিবার কথা বলিয়াছেন। † বর্ত্তমান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড বলেন বিশ্ববিদ্যালয় হিতের চেয়ে অহিত-সাধনই করে অধিকতর—"The university life dose more harm than good." তাঁর প্রতিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান নহে। প্রাচ্যসূর্য্য রবীন্দ্রনাথের ললাটেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নাই, এবং আমাদের সন্দেহ হয় তথাকথিত ছাঁচে পড়িলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হইতেন না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাহা জানেন ‡ এবং সেই জন্যই শান্তিনিকেতনে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব বল্ডুইন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে কোন্ খেতাবওয়ালা অস্বীকার করিতে পারে? এডিসনের

* 'অভিভাষণ'—বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন, ১৩৩১।

† রবীন্দ্রনাথের "তপোবন" নামক অতুলনীয় প্রবন্ধটি কেহ ইচ্ছা করিলে পড়িয়া দেখিতে পারেন। উহা ১৩১৬ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

‡ 'নানাকথা'—বঙ্গলক্ষ্মী, কার্ত্তিক, ১৩৩১।

অদূরদর্শী শিক্ষক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—You are too stupid to be taught anything ; "তুমি এত বড় অজমূর্খ যে তোমাকে কিছু শেখানো অসম্ভব." আজ এডিসন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক।

আমাদের শেষ কথা এই যে, এই সুলভ ডিগ্রির মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে,—জ্ঞানলাভের জন্য তপস্যা করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বাঁধাবুলি আওড়াইতে না পারিলেই আমরা "too stupid" হইয়া যাইব না, বরং আমরা জ্ঞানীর মর্য্যাদা অর্জ্জন করিতে পারিব যদি কথার উপর কাজকে, ভাষার উপর ভাবকে, ছাঁচের উপর প্রাণকে স্থান দিতে সক্ষম হই। দার্শনিক ক্যাণ্ট ইহাকেই good education বা সৎশিক্ষা বলিয়াছেন, এবং জাগতিক মঙ্গলের ইহাই মূল উপাদান—"It is through good education that all the good in this world arises."

*

শিক্ষা ও সর্ব্বসাধারণ

যে দেশের শিক্ষাপ্রণালী দেশের অধিকাংশ লোককে—সর্ব্বসাধারণকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া দেয়, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি সুদূরপরাহত। সেখানে ব্যয়বহুল ও চাকচিক্যশালী বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাহা পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের দেশেও ইহা আজ স্বীকৃত হইয়াছে এবং সূচনা স্বরূপ ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন চলিতেছে। ইহা ভাল কথা। সর্ব্বসাধারণের জন্য এই যে ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন ইহার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন নিঃসন্দেহ, এবং সে অর্থ অবশ্য যোগাইতে হইবে দেশবাসী সকলকেই। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি বিশেষ কতগুকলি লোক—যাহারা সব চেয়ে কম দিতে পারে—তাহাদিগকেই সব ব্যয় বহন করিতে হয়, এবং যাহারা সব চেয়ে বেশী দিতে পারে তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া শিক্ষার মহিমা গান করে, তাহা হইলে তাহাও পরিহাস নহে কি ?

সার্ব্বজনীন শিক্ষায় রাশিয়া

সম্প্রতি রাশিয়া হইতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র 'প্রবাসী'তে * প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, দশবৎসর পূর্ব্বেও রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের দেশের জনসাধারণের মতই অজ্ঞতার সমপর্য্যায়ে ছিল ; কিন্তু মাত্র দশবৎসরের মধ্যে সেই সব লক্ষ লক্ষ মূক মানুষকে উহারা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নাই, মনুষ্যত্বের সম্মানে সম্মানিত করিয়াছে। সে শিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা সমস্তই আছে ; এমন কি, আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্য যে শিক্ষার আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার শিক্ষাব্যয়-বিধানের জন্য দেশবাসীর কৃচ্ছ্রসাধনার কথাও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন—সেজন্য আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাইতেছে কম নয়, কিন্তু সেই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত সকলেই লইয়াছে, আমাদের মত সকলের চেয়ে অক্ষম কতকগুলি লোকের মাথায় গুরু করভার চাপান হয় নাই।

*

রাশিয়ার শিক্ষায় গলদ

এই যে শিক্ষা, যাহা মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একটা গুরুতর গলদের কথাও তিনি বলিয়াছেন এবং তিনি আশঙ্কা করেন যে সেজন্য তাদের একদিন বিপদও ঘটিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সে গলদ হচ্চে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েচে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বর সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ ফেটে হবে চুরমার, নয়, মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"

*

সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ

মার্কিন ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইস্ এবার সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। বিগত ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, সকলেই জানেন।

* প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

এদেশের ইংরাজী উপন্যাস-পাঠকদের নিকট সিন্‌ক্লেয়ারের নাম সুপরিচিত। ইঁহার "দি ইনোসেণ্টস্," "ত্রী এয়ার" প্রভৃতি উপন্যাস অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন বলিয়া মনে করি। তাঁহারা উপন্যাসগুলি পড়িলে সভ্যতা-গর্ব্বী মার্কিন সমাজের পতন-পদস্খলনের পরিচয় পাইয়া সত্যই আমাদের মন ব্যথিত হইয়া উঠে, এবং উন্নতি ও উল্লম্ফন, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার যে এক নহে তাহার প্রতীতি জন্মে। বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে—অর্থবাদী আমেরিকার বিশ্রী যান্ত্রিক সভ্যতা এবং ছাঁচে-ঢালা সমাজ-জীবনের কৃত্রিমতা। * এবং অমৃত-সন্ধানী মানব-মন স্বভাবতঃই ব্যাকুল হইয়া ভারতীয় সাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

*

অধ্যাপক রমণের আবিষ্কার

গত সংখ্যায় আমরা অধ্যাপক রমণের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। যে আবিষ্কারের জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব রশ্মি এবং "রমণ-রশ্মি" নামে খ্যাত। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ব্যতীত আলোক-(পদার্থ) বিজ্ঞানের সে অলৌকিক বার্ত্তা সাধারণের বোধগম্য হইবে না জানিয়া আমরা উহার বিবৃতি প্রদানে ক্ষান্ত হইলাম। আকাশ ও সমুদ্রের বিস্ময়কর গাঢ় নীলবর্ণের প্রকৃত রহস্য এই "রমণ-রশ্মি" বা "রমণ-প্রক্রিয়া" দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের এক অভিনব দিকে ইহা আলোকপাত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের চক্ষে ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার।

*

রমণের কৃতিত্বের ক্রম

ছাত্রাবস্থায় রমণ যখন প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন তাঁর বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম জড়বিজ্ঞানের এম-এ। জানিনা বৈজ্ঞানিক রমণকে ইহার পর কোন্ প্রলোভন একবার সরকারী রাজস্ববিভাগের কর্ম্মে প্রলুব্ধ করিয়াছিল (ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, বেঙ্গল); কিন্তু সরকারী কার্য্যের অবকাশেও ইনি বিজ্ঞানসাধনায় বিরত হন নাই, এবং সেই সময় কলিকাতার বিজ্ঞানসভার সদস্য হন। ইহার পর রেঙ্গুনে বদ্‌লি হন। পিতৃবিয়োগে অবকাশ লইয়া যখন মাদ্রাজে ফিরিয়া আসেন, তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের বীক্ষণাগারে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সরকারী কাজ ত্যাগ করিয়া নবস্থাপিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। আবিষ্কারের কেন্দ্রাগার তাঁহার কলিকাতাই। সরকারী কার্য্যের সময় এবং তাহার পর তিনি বৈদেশিক কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিতেন। ঐ সকল গবেষণামূলক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যে বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হয়। ইহার পর তিনি য়ুরোপ আমেরিকার বিভিন্ন স্থান হইতে বহুবিধ সম্মান লাভ করেন। বৎসর দুই পূর্ব্বে তাঁহার য়ুরোপ অবস্থানকালে বহু প্রসিদ্ধ বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা-সফর করেন। ভারতসম্রাট-অনুমোদিত মহা সম্মানজনক 'হিউজেস' স্বর্ণপদক, ইটালীর বিজ্ঞানপরিষদের 'প্রেমিও ম্যাটেওসী' প্রভৃতি পদক তিনি লাভ করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে (জুন) তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদত্ত হয়। আমরা অধ্যাপক রমণের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

*

গ্রাম্য সাহিত্য

আজকাল প্রাচীন লোকসাহিত্য বা পল্লীসাহিত্যের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং অনেকে লুপ্তপ্রায় লোকগাথা বা পল্লীসঙ্গীতসমূহ সংগ্রহ করিতেছেন। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে—সংগ্রহ মাত্রই হইতেছে, সৃষ্টি হইতেছে না। কালোপযোগী নূতন গ্রাম্য সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে মনোযোগী হইতে কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না। ইহার কারণ, আমরা সহর-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি এবং মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ পল্লীর সহিত সংযোগ-সূত্র স্বহস্তে ছিন্ন করিয়াছি। পল্লীর মাঠ-ঘাট, পল্লীর সুখ-দুঃখ, পল্লীর দুর্দশা ও দুর্দ্দশা-মোচনের পথনির্দ্দেশ প্রভৃতি লইয়া পল্লীর উপযোগী সহজ সরল ভাষায় কেহই সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হইতেছেন না। কিন্তু একটা জাতিকে জাগ্রত করতঃ অগ্রণী করিতে হইলে পল্লীর প্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না—পল্লীর প্রতি মমত্ববোধ জাগাইতে হইবে। কিন্তু সেজন্য মমতাবান্ হৃদয় চাই।

*

গ্রাম্যসাহিত্যে গুরুসদয়

এইরূপ একটি মমতাবান হৃদয়, তথাকথিত উচ্চ নাগর-সাহিত্যিক ক্ষমতা সত্ত্বেও, খ্যাতির প্রলোভন ত্যাগ করিয়া উপেক্ষিত পল্লীবাসীদের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের কথা বলিতেছি। নিজে ধনাঢ্য ও 'অভিজাত' হইয়াও গ্রামের কাজের ক-খ-গ রচনা করিতে বসিয়াছেন তিনি। তাঁহার কচুরীপানার

---

* এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'নব্য মার্কিন সাহিত্যের পরিচয়' প্রবন্ধে মার্কিন সাহিত্যের তথা সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের বিশদ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

গান, মাটি চাষের গান প্রভৃতি সঙ্গীত স্বাস্থ্যহীন অন্নহীন দুর্ভাগ্য দরিদ্র পল্লীবাসীদের জন্য নব আশার বাণী বহন করিয়া আনিতেছে। কেহ ইহাকে 'ছড়া' বা 'বচন' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে চাহিলে করিতে পারেন, কিন্তু জাতীয় সম্পদ হিসাবে ইহার স্থান গতানুগতিকতার অনেক উর্দ্ধে বলিয়া আমরা মনে করি। 'সোনার বাংলা'র শ্রীহীন রূপ তাঁহার হৃদয়কে সত্যই ব্যথিত করিয়াছে এবং তার হৃতশ্রী ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি এই গ্রাম্য-সংহিতা রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, এমন একদিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই গান গীত হইবে এবং জীবন্মৃতদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সাহায্য করিবে। *

•

হিন্দুসমাজ সম্মিলন

সম্প্রতি ঢাকায় হিন্দুসমাজ সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। উহার সভানেত্রী মনোনীতা হইয়াছিলেন—শ্রীযুক্তা সরলা দেবী। হিন্দুধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তিনি বলেন, ইহা এক মহাভাবের প্রেরণা-প্রণোদিত। এই ধর্ম্ম মানুষকে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের মার্গদর্শক ধর্ম্ম। কোন মানুষকে ইহার বক্ষপুট-নিহিত অপূর্ব্ব অমৃতসম্পদ হইতে বঞ্চিত না রাখাই প্রচারের উদ্দেশ্য। সমাজ-সংগঠন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য—হিন্দুসংগঠন আত্মরক্ষার জন্য, পরপীড়নের জন্য নহে। কেহ যদি মনে করেন সুগঠিত সুসম্বদ্ধ হিন্দুসমাজ ভারতের অন্য সমাজের পক্ষে আতঙ্কজনক হইবে, তাহা ভুল। এই সমাজ যদি সত্যই সুসংগঠিত হয় তবে ইহা প্রত্যেককে রক্ষাদানপটু হইবে। শুধু হিন্দুনির্য্যাতন নিবারণ নহে, অত্যাচারী দ্বারা অপর কাহারও অত্যাচারও নিবারিত হইবে। যে সম্প্রদায়ের দুর্ব্বৃত্তগণের হাতে হিন্দু সব চেয়ে পীড়িত হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের সুচরিত্রেরাও যদি হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রযত্নে সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন, উল্টিয়া বিরক্ত হন, তবে নাই আসিল ভারতের সে স্বরাজ—যাহাতে সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা চিরদুর্ব্বল থাকিতে বাধ্য।

আমাদের কথা—সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং সম্প্রদায়-অতীত প্রতিবেশিত্ব এই উভয় উপাদান লইয়াই ভারতীয় সমাজকে গড়িতে হইবে।

•

এসিয়া নারী-মহাসম্মিলন

নিখিল এসিয়া নারী-মহাসম্মিলনের উদ্যোগ-কেন্দ্র হইতে ইতিপূর্ব্বে যে একখানি আবেদনপত্র বাহির হইয়াছিল তাহা বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীতে আমরা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সম্প্রতি রাণী লক্ষ্মীবাই রাজবাদী (Hony. organising Secretary) আর একখানি আবেদনী প্রকাশিত করিয়াছেন।

সম্মিলনীর অধিবেশন ক্রমশঃই নিকটতর হইয়া আসিতেছে; রাণীজী ব্যাকুল অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন, যে, আরও অধিকসংখ্যক নর-নারী এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সংসদের সদস্যরূপে সমাগত হইয়া ইহাকে সফলতার পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করুন। সদস্য-পদের প্রবেশিকা—মাত্র দশ টাকা। ইহা ছাড়া এক-কালীন বিশেষ অর্থ-সাহায্যের আশাও তিনি করেন। অর্থের অভাবে কি এই মিলন-মহাযজ্ঞের অন্তরায় ঘটিবে? আনুষঙ্গিক ব্যয়বিধান ব্যতীতও যে সকল প্রতিনিধি বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে ইহাতে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের পাথেয়, আহার, বাসস্থান, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির জন্যও ব্যয় আছে।

দুঃখের বিষয় ভারতীয় রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ 'কন্‌সেশানে' অস্বীকার জানাইয়াছেন। ইহাতে ফল হইল এই যে গমনাগমনে যে ব্যয় অনুমিত হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ ব্যয় পড়িবে। আবেদনকারিণী ভারতীয় ধনী জমিদার এবং স্বাধীন ষ্টেটসমূহের অধিপতিগণকে অর্থসাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, সিংহল, ব্রহ্ম, বেলুচিস্থান, নেপাল, পারস্য, জাপান এবং যবদ্বীপ হইতে প্রতিনিধিবর্গের আগমন-প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে; নিউজিল্যাণ্ড এবং যুনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রতিনিধিরা সমাগত হইয়াছেন; এবং শ্যাম, জর্জ্জিয়া, আফগানিস্থান, চীন, ইন্দোচীন, ইরাক ও তুর্কীস্থান হইতে যোগ-জ্ঞাপক পত্রবিনিময় হইয়াছে।

কলিকাতা, বম্বে এবং করাচীস্থ অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদিকাগণ—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতী কৈয়জ তৈয়াবজী এবং শ্রীমতী হোমী মেহ্‌তা।

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য হইবার প্রবেশিকা এবং অন্যান্য দান শ্রীমতী এম, ই, কাজিন্‌স্, ২৫, লরেন্স রোড, লাহোর—এই ঠিকানাতেও প্রেরিত হইতে পারে।

আমরা রাণীজীর আবেদনের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং ভগবানের নিকট ইহার সাফল্য প্রার্থনা করি।

---

* 'সোনার বাংলা' নামক শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের এইরূপ একটি গান এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

সমিতির কথা

দশানী নারীমঙ্গল সমিতি

সম্প্রতি খুলনা জেলার অন্তর্গত দশানী গ্রামে একটি মহিলাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় এবং মহিলাদের অদম্য উৎসাহে ইহার উদ্বোধন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অনেকদিন হইতে এই গ্রামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠার কল্পনা অনেকের মনে উঠিয়াছিল কিন্তু নানা অসুবিধা হেতু এই কল্পনা সত্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কেন্দ্র-সমিতি-প্রেরিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী সন্নিকটবর্ত্তী কাঁঠালগ্রামে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহাকে আমাদের গ্রামে একটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি ছায়াচিত্রযোগে শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মহিলাসমিতির উপকারিতা সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দেন। সেইদিন কতিপয় মহিলার বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় এই সমিতি স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা বিনোদিনী সেন ও তদীয়া কন্যা শ্রীমতী উষাপ্রভা দাসের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গত ৩রা কার্ত্তিক শ্রীযুক্তা বিনোদিনী সেনের সভানেত্রীত্বে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। সভায় বহু মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, বাস্তবিক তাহা সুখের ও আনন্দের বিষয়। এই সভায় ১০জন সভ্যা লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্তা বিনোদিনী সেন স্থায়ী সভানেত্রী, এবং শ্রীযুক্তা দুর্গারাণী দাস ও শ্রীযুক্তা ননীবালা সোমকে সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রতি তিন মাসে একটি সাধারণ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সভ্যা-সংখ্যা প্রায় ১০০। কেন্দ্রীয় সমিতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের ভিতর পরস্পর মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান, আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবা, শিশু-কল্যাণ ও মাতৃজাতির উন্নতি এবং গৃহশিল্প ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা এই সমিতির উন্নতিকল্পে কতিপয় উন্নতিকামী ও সহৃদয় যুবকের সাহায্য পাইতেছি। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এই সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইত না। আমি এই সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সহৃদয় গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

টুটীকাণ্ডি আর্য্য-নারী-সমিতি

ভগবানের কৃপায় এ বৎসরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আমরা দিল্লী চলিলাম। দিল্লীতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ায় সমিতির অধিবেশন স্থগিত রহিল কিন্তু নিয়মিত ভাবে চাঁদা আদায় হইবে।

সমিতির অর্থ-ভাণ্ডারে ১৯২৯ সালের জমা ১৭০৲ ছিল। ১৯৩০ সালের আদায় ৮৭॥৶০; মোট ২৫৭॥৶০। তন্মধ্যে খরচ ১৩৪৸/০ আনা। মোটামুটি দান কিশোরগঞ্জ দাঙ্গা ৫৲, ঢাকা দাঙ্গা ১০৲; ঢাকার কোন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য ১০৲; যে সকল জামা পাঞ্জাবী প্রভৃতি দান করা হইয়াছে তজ্জন্য খদ্দর ২০৲, পশম ২৲। স্থানীয় অনাথ-আশ্রম ৫৲, একটি দরিদ্র বালকের স্কুলের বেতন ও পুস্তক বাবদ ৮৲ বিদ্যাসাগর বাণীভবন ১০৲। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্র-সমিতিতে যুক্ত হইবার ফি, মাসিক পত্রিকা বাঁধাই, ডাক-খরচ, খাতা, সূতা, রিল ইত্যাদিতে কিছু ব্যয় হইয়াছে, এবং মাসিক পত্রিকার মূল্য দেওয়া হইয়াছে। বাকী টাকা সমিতির জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্যয় হইয়াছে। সমিতির অর্থভাণ্ডারে ১২৪ টাকা ৸/০ আনা রহিল।

বালকবালিকাদের উন্নত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। গান, সেলাই, পড়া, ড্রয়িং, ব্যায়াম, কাপড়ের ফুল প্রভৃতি শিখান হইতেছে। পূজার সময় তাহারা "ভক্তির ডোর" ও "পূজারিণী" অভিনয় করিয়াছিল। ইহাদের প্রস্তুত ৭।৮টি জামা গরীবদের দেওয়া হইয়াছে।

সমিতির সভ্যাগণ প্রায় সকল কার্য্যেই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন এবং আরো উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সিমলায় যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাতে সমিতির সভ্যাগণ নিম্নলিখিত ভাবে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন:—

(১) শ্রীমতী রেণু রায়—বয়স ১৩ বৎসর। ওয়াটার-পেনটীং-এ প্রথম পুরস্কার স্বর্ণমেডেল এবং বালিকা-বিভাগে এম্ব্রয়ডারির জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্যমেডেল এবং ছবিকে কাপড় পরাইবার জন্য ও মাছের আঁশের কাজের জন্য প্রশংসাপত্র।

(২) শ্রীমতী ছবি ঘোষ—বয়স ১০ বৎসর। সূতলী দ্বারা প্রস্তুত আসনের জন্য প্রশংসাপত্র এবং সেলাইয়ের বাক্স।

(৩) শ্রীমতী কমলা সেন—বয়স ১০ বৎসর। সূচী-শিল্পে প্রশংসাপত্র।

(৪) কুমারী রেণু সেন—মাটির কাজ ও সস্‌পেণ্টিং-এ প্রশংসাপত্র।

(৫) শ্রীমতী সুধাময়ী সেন ও শ্রীমতী নীলিমা দাস গুপ্ত—ছাঁটকাটের জন্য প্রশংসাপত্র।

(৬) শ্রীমতী রাধারাণী বিশ্বাস—সূচী-শিল্পে প্রশংসাপত্র।

(৭) শ্রীমতী নীরজনলিনী ঘোষ—সূতার পাখার জন্য প্রশংসাপত্র।

(৮) শ্রীমতী পঙ্কজিনী ধর—কাঁথার জন্য সোনার মেডেল।

(৯) শ্রীমতী নলিনীবালা সেন—সূচী-শিল্পে প্রথম পুরস্কার সোনার মেডেল, দ্বিতীয় পুরস্কার রূপার মেডেল এবং প্রশংসাপত্র।

চরকা ও তকলীতে সূতা-কাটা কিছু কিছু শেখা হইতেছে। ভাল করিয়া শিখিবার এবং সমিতিকে উন্নত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে।

কেন্দ্র-সমিতির কথা

ম্যাডান থিয়েটারে অভিনয়

গত ২৭শে নভেম্বর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে করপোরেশন ষ্ট্রীটস্থ ম্যাডান থিয়েটার ও প্যালেস অফ ভ্যারাইটিস্ রঙ্গমঞ্চে একটি ছায়াচিত্রের অভিনয় হইয়াছিল। সমিতির পৃষ্ঠপোষিকা লাটপত্নী মাননীয়া লেডী জ্যাকসন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমিতির কর্ম্মীগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অভিনয়ের টিকিট বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিদধিক ৯০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ম্যাডান কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতি বৎসর আমাদের এই প্রকার সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহার জন্য কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী মিঃ রোস্তমজী এবং মেসার্স ম্যাডান ভ্রাতৃদ্বয়কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক-সংবাদ

আমাদের সমিতির পরিচালক-সভার সভাপতি মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী গত একমাস কাল কালাজ্বরে ভুগিয়া গত ১৩ই ডিসেম্বর মৈমনসিংহে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই মহা শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

আমরা মাননীয় রাজা সাহেব এবং তাঁহার পরিবার-বর্গকে আমাদের অন্তরের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি

আমাদের সমিতির অন্যতমা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে পুরী গমন করিয়াছিলেন। গত চার মাস কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি বিধবা-শ্রমের পরিচালনকার্য্য করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আশ্রমের গঠন, পরিচালন এবং উন্নতিবিধানে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। বিশেষভাবে তিনি মেয়েদের দ্বারা একটি সুন্দর বাগান প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং ছাত্রীদিগকে ব্রহ্মস্তোত্র শিখাইয়াছেন।

মহিলা-উদ্যানে সভা

গত ৪ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় লেডীস্ পার্কে বিশেষভাবে পর্দ্দানসীন মহিলাদের জন্য ৪ নং স্বাস্থ্যসমিতি একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হন এবং আলোকচিত্র সাহায্যে রোগ-বীজাণুর শক্তি ও প্রতিষেধের উপায়, অন্যান্য দেশের তুলনায় বঙ্গে ধ্বংস-প্রবণতার কারণ বিশদভাবে প্রদর্শন ও বর্ণন করেন। বহু মহিলা একত্রিত হইয়া বিশেষ আগ্রহসহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন ও মাঝে মাঝে এইরূপ বক্তৃতাদি আরও যাহাতে হয় তাহার জন্য মিসেস চক্রবর্ত্তীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

কুষ্টিয়া মহিলা-সমিতি

গত তিন বৎসর কুষ্টিয়ায় একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের সুযোগ্যা সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা সুনীতি বসুর আহ্বানে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এই সহরে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় টাউনহলে পুরুষ ও মহিলাদের একটি মিলিত সভায় নারীমঙ্গল ও

মহিলাসমিতির কর্ত্তব্যবিষয়ক বক্তৃতা করেন। গত ১৪ই নভেম্বর কুষ্টিয়া মিল-প্রাঙ্গণে মহিলাদের একটি সভা হয়। মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নিভা রায় সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদিকারূপে এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। স্থানীয় মহিলারা অতি উৎসাহের সহিত এই সমিতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারকার্য্য

বাগনান

গত ১৩ই ডিসেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যার সময় হাওড়া জেলার বাগনান গ্রামে স্থানীয় নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয়ের হলে বাগনান মহিলাসমিতির উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হয়। টালা মহিলাসমিতির সম্পাদিকা ও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা হোমাঙ্গিনী সেন সভানেত্রীত্ব করেন। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সেন অতি সুললিত বক্তৃতায় এই ভীষণ অর্থসমস্যার দিনে মহিলারা শিল্পশিক্ষা লাভ করিয়া পুরুষদের সাহায্যকারিণী না হইলে এই সমস্যা সমাধানের আর কোনও পথ নাই এবং এই কার্য্য করিতে হইলে মহিলাসমিতিরূপ প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া করিলেই তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা এই কথা বিশেষ করিয়া মহিলাদের বুঝাইয়া দেন। তৎপরে কেন্দ্রসমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠনসহযোগে দেশ-বিদেশের মহিলাসমিতির কার্য্যাবলী প্রদর্শনপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন। রেভাঃ ভাই শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় এই কার্য্য সাফল্যযুক্ত করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্যামবাজার

গত ১৫ই ডিসেম্বর সোমবার শ্যামবাজার মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে বাঁটরা মহিলাসমিতির শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি বিশ্বাসের উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠনসহযোগে মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং দেশ-বিদেশের মহিলা-সমিতিসমূহের কার্য্যাবলী প্রদর্শনপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ সকলেই ধীর স্থির ভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

সাঁতরাগাছী

গত ৯ই ডিসেম্বর সাঁতরাগাছী মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহিলাসমিতির কার্য্যধারা ও কার্য্যসূচী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবী সমিতির পূর্ব্বকৃত কার্য্যাবলী বিবৃত করিয়া উপস্থিত সভ্যাদিগকে বুঝাইয়া দেন এবং পরের কার্য্যের একটি কার্য্যসূচী তৈয়ারী করিয়া সেইরূপ কার্য্য করিতে সকলকে উদ্বোধিত করেন।

শ্যামপুকুর

গত ১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্যামপুকুর মহিলাসমিতির উদ্যোগে স্থানীয় মহিলাদের একটি সভা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বিভিন্ন মহিলাসমিতির কার্য্যাবলী প্রদর্শনপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন। শ্যামপুকুর, তেলীপাড়া, কম্বুলিয়াটোলা ও আনন্দ লেন প্রভৃতি স্থানের বহু মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতায় উপস্থিত মহিলাবৃন্দ সকলেই কেন্দ্রসমিতির কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং খুব উৎসাহসহকারে ধীর স্থির ভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার জীবন অবলম্বন করিয়া "নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-লেখিকাকে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয় একটি ৫০৲ মূল্যের পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধে ১৫ শতের অধিক কথা থাকিবে না। তাহা বাংলাভাষায় এবং মহিলাদের লিখিত হওয়া চাই। উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়া যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকেও একটি ২১৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হইবে। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে চান, তাঁহারা আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রবন্ধটি সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের নামে ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। উপযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী এই সকল প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহাই গৃহীত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ রচয়িত্রীর চিত্রসমেত সমিতির মুখপত্র "বঙ্গলক্ষ্মীতে" প্রকাশিত হইবে। আগামী ১৯শে জানুয়ারী কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসব-সভায় প্রবন্ধ-রচয়িত্রী বা তাঁহার কোন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।

বার্ষিক স্মৃতিউৎসব

আগামী ১৯শে জানুয়ারী কলিকাতায় স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহোদয়ার বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইবে। প্রতিবৎসর সকল শ্রেণীর এবং সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিয়া তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং তাঁহার সংকল্পপ্রসূত নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যের বিষয় আলোচনা করেন। বিভিন্ন মহিলাসমিতি এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলের মহিলা-

প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিগণকে এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি। গত বৎসরের স্মৃতিসভায় বিরাট জনসমাগম, উপস্থিত মহিলাগণের উন্নতির বিষয়ে প্রবল উৎসাহ, সুদূর মফঃস্বল হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহাদের শুভাগমন দেখিয়া আমাদের মহিলাসমিতিগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমাদের মনে নবীন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। আগামী স্মৃতিসভার অধিবেশনে ভগবান সুনিশ্চিত স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর অশরীরী আত্মার সাহায্যে বাংলার নির্যাতিতা ভগিনীগণের মধ্যে আরও প্রবলভাবে জাগরণের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলশক্তি প্রদান করিবেন। মফঃস্বলের বহুসংখ্যক ভদ্রমহিলা এই সভায় যোগদান করিয়া, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে নারীজাতির প্রকৃত উন্নতিবিধান হইতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন। মফঃস্বল মহিলা-সমিতিসমূহের যে-সকল প্রতিনিধি আসিবেন, তাঁহারা যদি এই সভায় কোন প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে পত্র লিখিয়া জানাইতে হইবে। যদি প্রতিনিধিগণের মধ্যে কেহ কোন উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিতে চান, তাহাও পূর্ব্ব হইতে জানান আবশ্যক, নচেৎ উহা সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের তালিকাভুক্ত করিতে পারা যাইবে না। নারীমঙ্গলকামী প্রত্যেক মহিলাকে আমরা এই সভায় যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

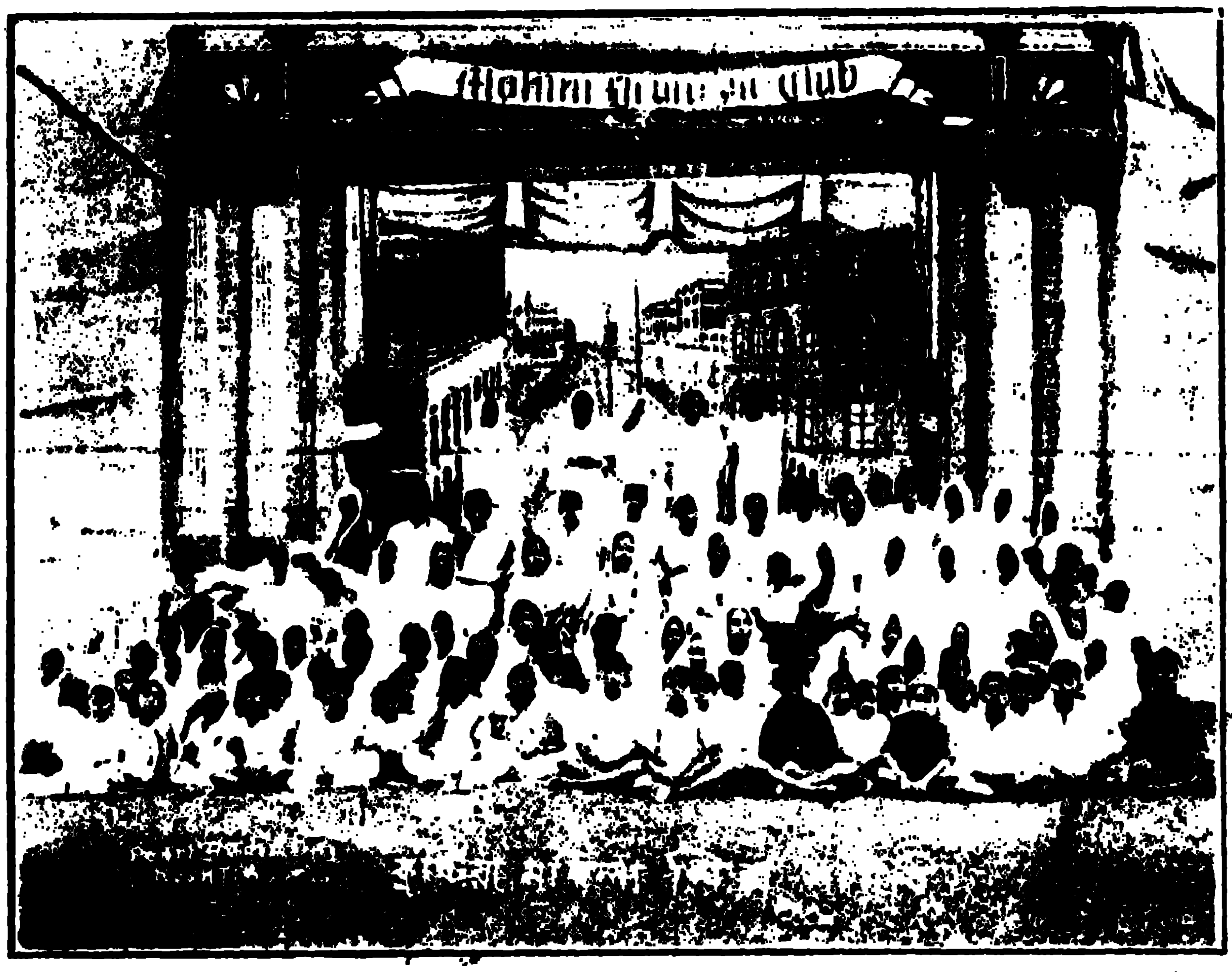

কুষ্টিয়া মহিলা-সমিতি

শিল্পপ্রদর্শনী

প্রতিবৎসর কেন্দ্রসমিতি বিভিন্ন মহিলাসমিতির প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতায় একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এবার আগামী ১৮ই জানুয়ারী ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে এবং ৭ দিন খোলা থাকিবে।

মহিলা-সভা

আগামী ২০শে জানুয়ারী স্মৃতিউৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলাসমিতির প্রতিনিধি, বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীবৃন্দ, এবং কলিকাতা ও

মহিলাসমিতির কার্য্যবিবরণী

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসবের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু আমরা এখনও অনেক মহিলাসমিতির নিকট হইতে তাঁহাদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাই নাই। এই মফঃস্বলের মহিলাসমিতিগুলির কার্য্যের সফলতার উপরই কেন্দ্রসমিতির সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। অতএব যাঁহারা কার্য্যবিবরণী পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রেরণ করিবার জন্য আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি।

বার্ষিক উৎসবের প্রোগ্রাম

১৬ই জানুয়ারী ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনে মহিলা-সমিতি-প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৯শে জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬টার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির ৬ষ্ঠ বার্ষিক স্মৃতিসভা।

২০শে জানুয়ারী ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনে ৪ ঘটিকার সময় মহিলাসম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

২০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রীতিসম্মিলন, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা।

শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণের বনভোজন

গত ১৩ই ডিসেম্বর সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম মহোদয়ার মৈত্রীতে স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের উদ্যান-বাটিকায় ছাত্রীগণের বার্ষিক বনভোজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা কামিনী বসু, ডাঃ হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ স্কুল-কমিটির সভ্যগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ছাত্রীগণ প্রত্যূষে স্কুলের মোটর'বাসে' দমদম গমন করিয়া সমুদয় রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুশীলা দেবী, শ্রীমতী সুপ্রভা সেন এবং কয়েকজন ছাত্রী অতি সুনিপুণভাবে অল্প সময়ের মধ্যে রন্ধনকার্য্য শেষ করেন। ছাত্রীগণ সমস্ত দিন খোলা হাওয়ায় আমোদ-প্রমোদ করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বার্ষিক পরীক্ষার পরে উন্মুক্ত স্থানে এইরূপ স্বচ্ছন্দভাবে ছাত্রীগণের সমবেত কার্য্য এবং তৎসঙ্গে আমোদ-প্রমোদ তাহাদের মনে নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিয়াছে। স্কুলের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী প্রতিভা সেন বি-এ নিপুণা গৃহিণীর ন্যায় অতিথি-অভ্যাগত এবং ছাত্রীগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান।

ইম্পিরিয়ালের চা—

দাদু'কেও একটু না দিলে তৃপ্তি হয় না।

সুগন্ধি, সুস্বাদু, তৃপ্তিকর

ইম্পিরিয়ালের চা

সবাই পছন্দ করেন।

ইম্পিরিয়াল টি কোং

৭৪।২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ কলিঃ ১১৩২

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

ছিন্ন তার

ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার, বীণা কি বাজিবে আর,
হাসিটুকু নিয়ে গেছে—রেখে গেছে হাহাকার !
(৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শিল্পী—শ্রী প্রকৃতি দেবী

C. H. ARAN & CO.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচলে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৭ [৩য় সংখ্যা

নবজন্ম

পুরাতন যত কিছু ব্যর্থ কেন হবে,
কেন তার অস্থিমজ্জা চূর্ণ করি' তবে
গড়িয়া তুলিতে হবে একান্ত নূতন ?
কেন এ প্রলাপ, কেন হেন দুঃস্বপন ?
জগতের জন্ম হ'তে অদ্যকার দিন
বাহিয়া এল কি শুধু চিন্তা-অর্থ-হীন
মুহূর্ত্তাবশেষ ? নাহি সত্য সুনিশ্চিত,
অলঙ্ঘ্য বিধানে যার ঘটে বিশ্বহিত ?
নাহি কি সত্যের বুকে সৌন্দর্য্য অক্ষয়,
আনন্দ-স্পন্দনে যার অমৃত সঞ্চয়,
করে মর্ত্ত্য-প্রাণ ? লভে উচ্চতর গতি,
আনে দৃষ্টি নবতর, নূতন পদ্ধতি
জগতের বুকে ? ঘটে নবীন সৃজন,
যুগান্তর-বার্ত্তা বহে নব জন্মক্ষণ ?

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনিলে আমাদের রক্ষণশীল দেশবাসী ভীত হইয়া পড়িত। ছেলেদের মত মেয়েদেরও যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথম মনে করাইয়া দিলেন স্ত্রীলোক বুদ্ধিহীনা নহে। তিনি লিখিলেন,—

"স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

বিদ্যাসাগর কর্ম্মী। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি জানিতেন, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ভিন্ন দেশবাসী এক পা-ও অগ্রসর হইবে না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" পুত্রের মত কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিতে এবং শিক্ষা দিতে হইবে। শাস্ত্রবচনকে মূলমন্ত্র করিয়া বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে ব্রতী হইলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সরকার নিজের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহোদয় এবং খৃষ্টান মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্তৃক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়; পরে 'বীটন নারী বিদ্যালয়'—এই নূতন নামকরণ হয়। গোড়া হইতেই বিদ্যাসাগরকে সহকর্ম্মী এবং উৎসাহী বন্ধু-রূপে পাইবার সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম পরিচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্রকে একজন অক্লান্তকর্ম্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগরকেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক-রূপে কাজ করিবার জন্য ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর দুইপাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" —মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ আগষ্ট, ১৮৫১)। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ডালহাউসি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের (মার্চ্চ, ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোটলাট ইহাকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১৮৫৬, ১২ই আগষ্ট তারিখের পত্রে বীডন সাহেব বাংলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে, এবং তাঁহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার প্রস্তাবও পত্রে ছিল। কমিটির সদস্যরূপে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাঁহার

---

* সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, (রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০৫)

উপর স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোটলাটকে লিখিলেন:—"কমিটির সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের সম্পাদক হিসাবে পূর্ব্ব পরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।"

বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি, ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের মত বিদ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্যত্র বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্যা। সেই সমস্যা-সমাধানের উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলা দেশে ছোটলাট হ্যালিডে সেই কাজে হাত দিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টর। হ্যালিডে তাঁহার সহিত এ-সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিলেন। এ কাজ কত কঠিন সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সৎকার্য্যে জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।

বিদ্যাসাগর অল্পদিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে, ১৮৫৭)। ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারের কাছে ৩২৲ টাকা মাসিক সাহায্যের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি পূর্ব্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দোয়ারহাটা ও বৈদ্যবাটী থানার অন্তর্গত গোপাল-নগর, এবং বর্দ্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই তিনখানি আবেদন-পত্রে ছিল। ছোটলাট সকল দরখাস্তই মঞ্জুর করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাসীরা বিদ্যালয়-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোটলাট জানিতে চাহিলেন, বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টারদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোনো আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনাও তিনি পূর্ণ করিবেন।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নভেম্বর, ১৮৫৭ হইতে মে, ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর নিজ এলাকাভুক্ত চারিটি জেলায় ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্দ্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে তিনটি, ও নদীয়ায় একটি। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। *

* বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৮৫৮, ১৩ই এপ্রিল বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ের সম্পর্কে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে। সরকারী সাহায্যদান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আর একটু ঢিলা না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১৮৫৬, ১লা অক্টোবর তারিখের পত্রে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছোটলাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে এমন একটা আশা পাওয়া যাইবে, তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

১৮৫৮, ৭ই মে তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে একান্ত বাধা জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্য-সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝিলেন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্কুলগুলি অবিলম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্যা—শিক্ষকদের বেতন। প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাঁহারা মাহিনা পান নাই। ১৮৫৮, ৩০এ জুন পর্য্যন্ত ধরিলে তাঁহাদের সকলের মোট পাওনা হয়—৩৪৩৯৵৫।

এই সম্পর্কে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের ২৪এ জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। পত্রখানির মর্ম্ম দেওয়া গেল :—

"হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ তৈয়ারী করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্ত্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।

"সরকারী আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা সরকার এ-বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।"

ডিরেক্টর বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া বলিলেন,—

"পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন-না স্ত্রীশিক্ষা-সম্পর্কে এই কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাবৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দূরবর্ত্তী স্থানের অন্তবিধ কর্ত্তব্যের গুরুভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, কর্ত্তৃত্বের বিশেষ উচ্চপদেও যিনি অবস্থিত ন'ন, এমন একব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীতও গ্রাম-সমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেইদিকে কতটাই না তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্ম্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে?"

ছোটলাট ডিরেক্টরের অনুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং

"সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের" কথা উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারটা পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

এই ব্যাপার লইয়া পত্রলেখালেখির পর শেষে ভারত-গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ দিলেন—

"দেখা যাইতেছে পণ্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই-সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯৶৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায় হইতে সপরিষদ বড়লাট সাহেব তাঁহাকে মুক্ত করিতেছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।

"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির, অথবা সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয়-গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কোনো স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগণার বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে অনুরোধ থাকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার-সমর্থিত কতকগুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হইবে।" (২২এ ডিসেম্বর, ১৮৫৮)

কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ সিপাই-বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনটনবশতঃ বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে কোনো স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন;—তবে আশা দিলেন, বিষয়টা ভবিষ্যতে বিবেচিত হইবে।

১৮৫৮, নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকার পণ্ডিতের উপর সুবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাজে যে আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়েই পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন,—এই গল্প বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকগণই রচিয়াছেন। ইহার কোনই ভিত্তি নাই।

১৮৫৮, নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাসিক ৫০০৲ টাকার আয় হ্রাস, সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতি,—এ-সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন। ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ রায় প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্ম্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন।*

* বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন—"যে সকল বালিকাবিদ্যালয়, ছোট লাট হেলিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ন্যূনাধিক চারি সহস্র টাকা স্বয়ং ঋণ করিয়া উক্ত বিদ্যালয়সমূহের পণ্ডিতগণকে প্রদান করেন এবং ত্বরায় অধিকাংশ বালিকাবিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া নদীয়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ রামজীবনপুর উদয়রাজপুর গোবিন্দপুর ঈড়পালা কুরাণ যোগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ২০টী বালিকাবিদ্যালয় স্থায়ী করেন, এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় স্বয়ং ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাহায্যে নির্ব্বাহ করিতেন। যে যে মহানুভবেরা উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিতেন তাঁহাদের নাম এই—তৎকালীন গবর্ণর জেনেরালের পত্নী লেডি ক্যানিং, হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সিসিল বীডন ও তৎকালীন কৌনসেলের মেম্বর গ্রাণ্ট ও গ্রে সাহেব প্রভৃতি এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও চকদিঘী নিবাসী বাবু সারদাপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি। এই সকল মহোদয়েরা ভারতবর্ষের কামিনীগণের ভাবী হিতকামনায় বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রতি মাসেই অগ্রজ মহাশয়ের নিকট নিয়মিত টাকা প্রেরণ করিতেন। কতিপয় বৎসর উক্তরূপ সাহায্যেই বালিকাবিদ্যালয় সকল চলিয়া আসিতেছিল। পরে অগ্রজ মহাশয় তৎকালীন ছোট লাট গ্রাণ্ট সাহেবের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছে তাহা স্যর বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"শুনিয়া সুখী হইবেন, মফঃস্বলের যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সে-গুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুলও খোলা হইতেছে।"

ছোটলাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন-স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৩, জানুয়ারি মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাঁহার বেশী ছিল না, তবুও বীটন বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন।

মিস মেরী কার্পেন্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্ম্মী ও ভারত-বন্ধু বলিয়া সুপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার প্রচার ছিল তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। বিদ্যাসাগর যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে একজন বড় কর্ম্মী, একথা সুবিদিত। মিস কার্পেন্টার কলিকাতা পৌঁছিয়াই পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন্ সাহেব বীটন বিদ্যালয়ে মিস কার্পেন্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিলেন। ১৮৬৬ ডিসেম্বর মাসে ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন্, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস কার্পেন্টার উত্তরপাড়ায় বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্থাপিত বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে বিদ্যাসাগরের বগী গাড়ি উল্টাইয়া যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। সে সাজ্ঘাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১, জুলাই মাসে তাঁহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না,—প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ বীটন বিদ্যালয়েই একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস কার্পেন্টার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম, এম, ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্য লোক এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। মিস কার্পেন্টারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের ঔচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর, ১৮৬৬)। বিদ্যাসাগরও ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তাহার একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন; তিনি লিখিয়া পাঠান :—

"আমার মতে, কোন-কিছু করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যাপারে যাঁহারা অনুরাগী, সমাজের সেই-সব মান্যগণ্য ব্যক্তির মতামত জানা উচিত ছিল। কিন্তু সভাতে তাঁহাদিগকে আহ্বানই করা হয় নাই, এবং তাঁহাদের সাহায্যও চাওয়া হয় নাই; এ অবস্থায় সরকারের নিকট প্রস্তাবিত আবেদনে আমার নাম সংযুক্ত রাখা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমাকে সভায় উপস্থিত হইতে বলা হয়, তখন সোজাসুজি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে মিস কার্পেন্টারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য; তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই যে উহা যথারীতি সভা হইবে অথবা এরূপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এত সংক্ষেপ হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি এমনই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম যে সভার

আংশিক চাঁদা গ্রহণ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন (বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, পৃঃ ১৩২)

আলোচনায় যোগদান অথবা আলোচ্য বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় দুঃখের সহিত আমি কমিটি হইতে আমার নাম প্রত্যাহার করিতেছি।" *

১৮৬৭, ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘপত্রে বাংলার ছোট লাট স্যর উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এ-প্রস্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি উত্তরে ছোটলাটকে লিখিলেন,—

"আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বীটন বিদ্যালয়েই হোক বা স্বতন্ত্রভাবেই হোক, হিন্দু-সমাজের গ্রহণোপযোগী একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্য মিস কার্পেন্টার যে-উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন,—এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বস্তুতঃ, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী; যতই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। ইহা যে সাফল্যলাভ করিবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু সরকারকে সাক্ষাৎভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোনমতেই পরামর্শ দিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগারো বছরের বিবাহিতা বালিকাদেরই বাড়ি হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে কিরূপ সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ-কার্য্যে পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক দিক দিয়া শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কতদূর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

"সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত-গভর্ন্মেণ্টের পত্রখানিতে এক প্রশস্ততর পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—সাহায্যদান-প্রণালীর প্রবর্ত্তন। দেশের লোক মিস কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যতদূর বুঝিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকই এরূপ সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ করিবে না; তবুও যাহারা ইহার সফলতায় অতিবিশ্বাসী, সত্যই যদি তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে, আশা করা যায়, তাহারাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সরকারী অর্থসাহায্যে এ-সম্বন্ধে ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

"আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই। কিন্তু ভারত-সরকার যে-বিধি প্রচার করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না।

"মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয় তাহা আমি বিশেষ জানি,—একথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ-প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্য্যকর করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, সাফল্যের কোনোই নিশ্চয়তা নাই, এবং এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোনমতেই আমি এ ব্যাপারে পোষকতা করিতে পারি না।

"বীটন বিদ্যালয়ের জন্য যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই;—এ-বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মফঃস্বলের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির

* Letter to Baboos Keshub Chunder Sen, M. M. Ghose and Dwijendra Nath Tagore, dated 3 Decr. 1866.

পক্ষে আদর্শরূপে কাজ করিবে বলিয়াও শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ এক সুব্যবস্থিত বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দুসমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। চারিপাশের জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে; তাই আমার বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা সার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির যথেষ্ট অবসর আছে। কার্য্যকারিতার হানি না করিয়াও, বিদ্যালয়ের খরচ অর্দ্ধেক কমাইতে পারা যায়।" (১ অক্টোবর, ১৮৬৭)

কিন্তু বাংলা সরকার মিস্ কার্পেণ্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শীঘ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও ঘটিল।

ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্য্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজনসাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল ও বীটন স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্য মিসেস্ ব্রিট্‌পে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন (২৭ জানুয়ারি, ১৮৬৯)। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া গেল। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর কমিটির সদস্যদের—বিশেষভাবে কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগর এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না।

শেষে কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও বীটন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নর্ম্মাল স্কুলটি সফলতা লাভ করিল না। পরবর্ত্তী ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল উহা তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। ১৮৭২, ৩১এ জানুয়ারির পর হইতে ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কার্য্যাবলীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে, বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল।

পরিশিষ্ট

বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়

হুগলী :—

গ্রাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	মাসিক খরচ
পোটবা	২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭	২৯৲
দাসপুর	২৬ ,,	২০৲
বঁইচি	১ ডিসেম্বর	৩২৲
দিগসুই	৭ ,,	৩২৲
তালাণ্ডু	৭ ,,	২০৲
হাতিনা	১৫ ,,	২০৲
হয়েরা	১৫ ,,	২০৲
নপাড়া	৩০ জানুয়ারি, ১৮৫৮	১৬৲
উদয়রাজপুর	২ মার্চ্চ	২৫৲
রামজীবনপুর	১৬ ,,	২৫৲
আকাবপুর	২৮ ,,	২৫৲
শিয়াখালা	১ এপ্রিল	২০৲
মাহেশ	১ ,,	২৫৲
বীরসিংহ	১ ,,	২০৲
গোয়ালসারা	৪ ,,	২৫৲
দণ্ডীপুর	৫ ,,	২৫৲
দেপুর	১ মে	২৫৲
রাউজাপুর	১ ,,	২৫৲
মলয়পুর	১২ ,,	২৫৲
বিষ্ণুদাসপুর	১৫ ,,	২০৲
বর্দ্ধমান :—		
রানাপাড়া	১ ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০৲
জামুই	২৫ জানুয়ারি, ১৮৫৮	৩০৲
শ্রীকৃষ্ণপুর	২৬ ,,	২৫৲
রাজারামপুর	২৬ ,,	২৫৲
জ্যোৎ-শ্রীরামপুর	২৭ ,,	২৭৲
দাঁইহাট	১ মার্চ্চ	২০৲
কাশীপুর	১ ,,	২১৲
সাহুই	১৫ এপ্রিল	২৫৲
রসুলপুর	২৬ ,,	৩১৲
বস্তীর	২৭ ,,	২০৲
বেলগাছি	১ মে	২০৲
মেদিনীপুর :—		
ভাজাবন্ধ	১ জানুয়ারি, ১৮৫৮	৩০৲
বদনগঞ্জ	১০ মে	৩১৲
শান্তিপুর	১৫ ,,	২০৲
নদীয়া :—		
নদীয়া	১ মে	২৮৲
		৮৪৫৲

চির-সাথী

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

হ'য়ে আছ চির-সাথী হৃদয়-পুরী জুড়ে,—
নও ত তুমি দূরে বঁধু নও ত তুমি দূরে !
মরম-তলে পলে পলে তোমার পরশ পাই,
জ্বলে প্রদীপ তোমার আলোর যখন যেথায় যাই ;
তোমার আগমনীর ধ্বনি শোনায় সকল সুরে ॥

ক্ষণে ক্ষণে তোমার সনে নূতন পরিচয়
গড়ে আমার বিশ্ব-ভুবন নূতন শোভাময় ;
আমার শূন্য গৃহ পূর্ণ তোমার অমর অধিষ্ঠানে—
আমার বিরহ, বেদনা-মধুর—মিলন-ডোরের টানে ;—
আমার মরণ-জয়ী জীবন তোমার প্রেমের শিখায় পুড়ে ॥ *

প্রথম দিনের দেখা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

তোমার সাথে আমার সে যে প্রথম দিনের দেখা—
আছে জীবন-প্রাতের স্বপন-রঙে স্মৃতির পটে লেখা ॥
কত অতীত যুগের মিলন-কথা জাগ্‌ল তখন মনে—
কত জন্মান্তরের প্রণয় দেখা দিল দরশনে ;—
কত চির-পরিচিত তোমার চ'খের কাজল-রেখা !

গেঁথে নূতন বরণ-মালা তুমি দিলে আমার গলে—
আমি রাখ্‌ব তারে চির-নবীন আমার চ'খের জলে।
হ'য়ে সঙ্গোপনের সাথী আমার চল্‌বে তুমি পথে—
জ্বল্‌বে তোমার হোমের শিখা আমার জীবন-ব্রতে—
অনন্ত-পার যাত্রা আমার লাগ্‌বে না আর একা ॥ *

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

* সরোজনলিনীর উদ্দেশে লিখিত। (গান দুইটির স্বরলিপি এই সংখ্যার শেষের দিকে প্রকাশিত হইল।)

কন্যাদায়

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা বাঙালীর ঘরের নিয়ম। সুতরাং ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরানী চণ্ডীচরণ যখন ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন কুবের, তখন কেহ হাসিয়া মুখ ফিরায় নাই। চণ্ডীচরণের আশা ছিল যে ধন-ঐশ্বর্য্যের দেবতাকে এই রকম সস্তাতেই ফাঁকি দেওয়া যাইবে; কিন্তু কার্য্যতঃ সে রকম কিছু দেখা গেল না। বাপের ত্রিশ টাকা মাহিনার উপর আরো বিশ টাকা অনেক কষ্টে যোগাড় করিতেই কুবের প্রায় জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দিলেন। পিতৃদত্ত নাম যে তাঁহার জীবনে সার্থক হইবে না, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবে সেজন্য বেশী কোনো দুঃখ তাঁহার মনে ছিল না। কোনোমতে দিন কাটাইয়া দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু পৈতৃক দুরাশাটা তাঁহার খানিক পরিমাণে না ছিল তাহা নয়। অনেকগুলি পুত্রসন্তান জন্মিবার পর যখন স্ত্রী একটি কন্যাকে জন্মদান করিলেন তখন আঁতুড় ঘরেই কুবের তাহার নাম রাখিয়া দিলেন ইন্দ্রাণী। পাড়া-প্রতিবেশী তাঁহার পছন্দের তারিফ করিয়া বলিল, "তা বেশ খাসা নাম হয়েছে, এখন মেয়ের বরাত সেই মত হ'লেই হয়।" আর একজন বলিল, "তা বরাত যেমনই হোক, মেয়ের রূপ খুব হয়েছে। ইন্দ্রাণী ত ইন্দ্রাণীই বটে। গরীবের ঘরের মেয়ে কে বলবে? ঠিক যেন আর্ম্মানী বিবির মেয়ে!"

বাস্তবিকই মেয়েটি খুব সুন্দরী হইয়াছিল। বাপ-মা একটুখানি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, "যাক, মেয়ে না হয় একটা হ'লই? ছেলেগুলো ত খালি হয় আর মরে, এটা হয়ত টিকে যাবে। চেহারা ভাল থাকলে বিয়ে দিতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না। হয়ত এর পরে কপাল ফিরেও যেতে পারে।"

ইন্দ্রাণী বাড়িতে লাগিল। দরিদ্র-ঘরে আদর-যত্ন কিই বা হয়? মায়ের দুধ, মায়ের কোল, তাও পুরামাত্রায় জোটে না। খাটিয়া খাটিয়া মায়ের শরীরে আছেই বা কি যে সে শিশুকে খাওয়াইবে? যেটুকু দুধ খাইবার পায়, বাকি সাবু জল, বার্লির জল খাইয়াই খুসী হইতে হয়। মেয়ে কোলে করিবার সময় কোথায়? সারাদিন ত হাড়ভাঙা খাটুনি। যখন নিতান্ত শিশু ছিল তখন মা তাহাকে রান্না ঘরেই কাঠের বড় পিঁড়ার উপর কাঁথা পাতিয়া শোওয়াইয়া রাখিত। মেয়ে হাসিত, কাঁদিত, খেলা করিত, আবার খেলিতে খেলিতে ঘুমাইয়া পড়িত। মায়ের সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। একহাতে কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্না করা, বাসন ধোয়া, খাইতে দেওয়া, ইহার ভিতর ফাঁক কোথাও নাই, কাজের জাল একেবারে ঠাস করিয়া বুনা।

অল্প যখন বড় হইল, তখন ইন্দ্রাণীর বাহন জুটিল তাহার ছোট দাদা। পাঁচটি ছেলের মধ্যে বাঁচিয়া আছে দুইটি মাত্র। বড় ছেলে স্কুলে পড়ে, তাহার বোন কাঁধে করিয়া বেড়াইবার সময় নাই। ছোট সুনীল, মাত্র পাঁচ বৎসরের, পড়াশুনার বালাই তাহার নাই, সুতরাং তাহাকেই কাজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য সে ইন্দ্রাণীকে রাখিত যত, ফেলিয়া দিত তাহার চেয়ে বেশী, তবু সুনীলের তত্ত্বাবধানে খুকীকে রাখিয়া মা স্নানাহারটা সারিয়া লইতে পারিতেন। দিনের ভিতর তাঁহার কোনোকিছু ভাবিবার সময়ও হইত না, রাত্রে মলিন ছিন্ন বিছানায় শুইয়া, মেয়ের পদ্মকুঁড়ির মত মুখখানি দেখিয়া সস্নেহে ভাবিতেন, আর দুই-চারিটা বৎসর কোনোমতে কাটাইয়া দিতে পারিলে, এই মেয়েই তাঁহার সাহায্য করিতে শিখিবে।

মেয়ে ক্রমে বড় হইতে লাগিল। তেমন মোটাসোটা নয়, কিন্তু সোনার কুচির মত ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে। কথা-বার্ত্তায়ও তাহার বুদ্ধি যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িত! মা মনে মনে অহঙ্কার করিত, "গরীব হ'লে কি হয়, রাজা-রাজড়ার ঘরে এমন সন্তান হয় না। ঐ ত গলির ওপারে দত্তরা রয়েছে,

টাকার ছাদার ওপর ব'সে আছে। কিন্তু মাগো, কি কুচ্ছিৎ ছেলেপিলে! মেয়েটাকে দেখলে মনে হয় যেন কোলা ব্যাঙটা! তাঁর আবার সাজ-পোষাকের ঘটা কত, মখমল, সাটিন্ ছাড়া পরেন না তিনি। গাড়ী চ'ড়ে বেড়াতে যান, একটা ঝি, একটা দারোয়ান তাঁর সঙ্গে। আমার বাছাকে আজ অবধি নূতন জামা, একজোড়া জুতো দিতে পারি নি, কিন্তু লাখ' লোকের মেলায় মানুষে তার দিকেই চেয়ে থাকে।"

ইন্দ্রাণী মেয়েটি একটু চঞ্চল, ছটফটে। মায়ের কাছে ইহার জন্য বকুনি তাহাকে সারাক্ষণই খাইতে হয়, মারও যে মাঝে মাঝে পিঠে না পড়ে তাহা নয়। "গেরস্তর ঘরের মেয়ে অমন ধিঙ্গী কেন গা? এর পর শাশুড়ী যে ঝাঁটার বাড়ী দেবে মুখে? মেয়ে ছেলের অত বাড় কেন?" এই কথাগুলি উঠিতে বসিতে তাহার দুই কানে মধু বর্ষণ করে, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে দমাইতে পারে না। গালাগালি তাহার এক কান দিয়া ঢোকে, আর এক কান দিয়া বাহির হয়। নিজের ভাই, পাড়ার যত ছেলে, ইহারাই তাহার খেলার সাথী, তাহাদের সঙ্গে সমানে সে রান্নাঘরের কাঠ লইয়া ক্রিকেট্ খেলে, ঘুড়ি ধরিবার জন্য বাঁশ লইয়া ছোটে, সুতায় মাঞ্জা দিবার জন্য বোতলভাঙা কুড়াইয়া বেড়ায়।

অফিস হইতে ফিরিয়া, হাতমুখ ধোওয়া, জল খাওয়া সারিয়া, ইন্দ্রাণীর বাবা সুনীলকে ডাকিয়া কাছে বসান একটু পড়াইবার জন্য। বয়সের তুলনায় তাহার পড়াশুনা মোটেই হইতেছে না। দুইটুর ধাড়ি, নিজে বই একেবারে হাতে করে না। বাপ থাকেন অফিসে, মা থাকেন রান্না-ঘরে, কে বা তাকে ধরিয়া বসাইবে? একটা ছেলের স্কুলের মাহিনা গুণিতেই জিব বাহির হইয়া পড়ে, আর একটাকে ভর্ত্তি করিবার আর ক্ষমতা নাই। বড় হইয়া হতভাগা ঝাঁকামুটের কাজই করিবে, অদৃষ্টের লিখনই তাহার তাই। ইন্দ্রাণীও ভাইয়ের সঙ্গে ছেঁড়া প্রথমভাগ এবং ভাঙা শ্লেট লইয়া আসিয়া বসে, কিন্তু ভিতর হইতে ক্রমাগত ডাক আসিতে থাকে, "ও ইন্দু, কোথায় গেলি? ও রে, দুখানা কাঠ চেলা ক'রে দিয়ে যা না? দুটো হলুদ বেটে দিতে বল্‌লুম তা পোড়ারমুখী গেল কোথায়? হাতী হেন মেয়ে, একে দিয়ে সংসারের যদি একটা উব্‌গার আছে!"

ইন্দ্রাণীর কানে সেসব কথা যাইত কিনা সন্দেহ। সে পড়াশুনা যত করুক্ বা নাই করুক্, ভাণ করিতে ভাল বাসিত খুব। ভাঙা শ্লেটে কত যে হিজিবিজি কাটিত তাহার ঠিকানা নাই, বাপকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিয়া যাইত, "দাঁড়ি দিলে কি হয় বাবা, আর কুট্‌কী দিলে? আমায় একটা ফুল লিখে দাও না? আমি ছোড়দার চেয়ে ভাল লিখব, তুমি দেখো।"

কুবের গম্ভীর মুখে একবার সুনীলের শ্লেটে দেখেন, একবার ইন্দ্রাণীর শ্লেটে দেখেন। ক্লিষ্ট অন্তঃকরণে ভাবেন, মেয়েটাই ছেলে হইলে পারিত। বুদ্ধিশুদ্ধি যা থাকিবার তা ইহারই আছে। কিন্তু মেয়েছেলে, বুদ্ধি না থাক, লেখা-পড়া না শিখুক, তত আসিয়া যাইত না। চেহারার গুণে তরিয়া যাইত। কিন্তু সুনীলটার গতি হইবে কি? সত্যই কি কায়েতের ছেলে শেষে মুটেগিরি করিবে, না লোকের বাড়ী বাসন মাজিতে যাইবে?

বড়মানুষের দিন, গরীবের দিন সমান তালেই পা ফেলিয়া চলিয়া যায়। দত্তদের বাড়ী একদিন মহা সমারোহে আলো জ্বলিল, ব্যাণ্ড বাজিল, অতিথি-অভ্যাগতের ভীড়ে রাস্তায় গাড়ী-চলা বন্ধ হইয়া গেল; সেই কোলাব্যাঙের মত মেয়েটার বিয়ে, তাই এত ঘটা। ইন্দ্রাণীর মা ঈর্ষা-পীড়িত চিত্তে চোখ ফিরাইয়া লইলেন। দত্তবাবু দশ হাজার টাকা পণ দিয়া, বিলাতফেরত বর আনিতেছেন, সোনা-দানায় মেয়েকে মুড়িয়া দিতেছেন। আর ইন্দ্রাণী? তাহারও যে বিবাহের বয়স হইয়াছে, একথা ভাবিতেই সভয়ে পিতা-মাতার মন পিছাইয়া যায়। মেয়ের বয়স এখনও লোকের কাছে তাঁহারা বলেন দশ বৎসর। কিন্তু পাড়ার সকলে ইন্দ্রাণীকে হইতে দেখিয়াছে, কাহার মুখে তাঁহারা হাত-চাপা দিবেন?

পড়াশুনা সত্যই সুনীলের বিশেষ কিছু হইল না। গলাটা ভাল ছিল, পাড়ার যত থিয়েটারের আখ্‌ড়া, গানের আখ্‌ড়া হইল তাহার আড্ডা। পিতার সামনে সে ভয়ে আসে না, তিনি অফিসে বাহির হইয়া গেলে তখন বাড়ী আসিয়া নাওয়া-খাওয়া করে। মা গাল দেন, ঝাঁটা লইয়া

মারিতে আসেন, কিন্তু ছেলে স্নান করিয়া রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে, থালা ভরিয়া ভাত বাড়িয়া আনিয়া দেন। কাজেই সুনীলের স্বভাবের কোনোই পরিবর্ত্তন হইল না।

ইন্দ্রাণী চলনসই রকম বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল বাপের কাছে শিখিয়া লইয়াছিল। কুবের মেয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু যত্ন লইতেন না বটে, তবে সে ছেঁড়া বই-খাতা লইয়া আসিয়া জুটিলে, অল্পস্বল্প পড়া বলিয়া দিতেন, লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। নানা দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইবার আগেই তাঁহার শিরদাঁড়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কোনো কাজেই তাঁহার উৎসাহ ছিল না। কিন্তু চাকরী না করিয়া উপায় নাই, স্ত্রীপুত্র খাইবে কি? বড় ছেলের পড়ায় মন ছিল, পয়সার অভাবে তাহাকেও কলেজে পড়াইতে পারেন নাই, ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সে অল্প বেতনে সওদাগরি অফিসে কাজে ঢুকিয়াছে। মাহিনা বাড়িতে বাড়িতে ত তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইবে, ছেলের পয়সায় ভাত খাওয়া তাঁহার অদৃষ্টে নাই। সম্প্রতি মেয়ের বিবাহের ভাবনা তাঁহার স্কন্ধে ভূতের মত চাপিয়া আছে, শয়নে স্বপনে একথা তিনি ভুলিতে পারেন না।

সেদিন সবে ইন্দ্রাণী বই হাতে করিয়া বাপের কাছে আসিয়া বসিয়াছে, এমন সময় তাহার মা আসিয়া জুটিলেন। মেয়েকে বলিলেন, "যা না, ডালটা একটু দেখ্‌গে। সারাদিন খালি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান, রান্নাবান্না শিখ্‌বি কবে? পড়তে বসেছেন! প'ড়ে ত একেবারে এম্-এ পাশ করবেন!"

ইন্দ্রাণী অগত্যা উঠিয়া গেল। গৃহিণী স্বামীর নিকটে বসিয়া বলিলেন, "বলি, মেয়েকে ব'সে পড়ালেই হবে? তার বিয়ে-থা দিতে হবে না?"

কুবের বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস চেঁচালেই বিয়েটা খুব এগিয়ে যাবে? তলে তলে যতটা চেষ্টা করবার তা ত করছিই। গরীবের মেয়ের বিয়ে অমনি বললেই ত হ'য়ে যায় না?"

ইন্দ্রাণীর মা বলিলেন, "তা কোথাও কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে নাকি, কিছু ত শুনি না? এ দিকে পাড়ার লোকে ত আমার হাড়-মাস খুব্‌লে খাচ্ছে। মেয়ের ত বয়েস বাড়ছে বই কমছে না? চোদ্দ পার হ'য়ে পনেরো বছরে পা দিতে চলেছে।"

কুবের বলিলেন, "সেটা আর চীৎকার ক'রে সবাইকে জানিয়ে কি হবে? পনোরোও নয় যোলো, তা আমি জানি। কথাবার্ত্তা কইছি ত দু'চার জায়গায়, কিন্তু সব জায়গায় টাকার খাঁই যা, এগোতে ভরসা হয় না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা টাকাই না হয় নেই, আমার ইন্দুর মত সুন্দরী মেয়ে কি পথে ঘাটে পাওয়া যায়? রাজার ঘরের বৌ হবার যুগ্যি ও!"

কুবের বলিলেন, "রূপের আর দাম কত? গেরস্ত ঘরের বি-এ পাশ ছেলে, তারই দাম পাঁচ হাজার হাঁকে, সুন্দর তারা চায় না, টাকাটা পেলে কত তাদের উপকার হয়। তা অন্যকে দোষ দেব কি, আমরা নিজেরাই কি আর টাকা ছেড়ে সুন্দর চাইব? খোকার বিয়ের কথাও দু'চারজন বল্‌ছেন। ওর মধ্যে যে দু' পয়সা দিতে চাইবে, তারই দিকে আমরাও ঝুঁকব।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের না হয় খেতে গেলে মাখ্‌তে কুলোয় না। সব মানুষেরই ত আর এই রকম দশা নয়? সুন্দর বৌও ত দু'চারজন খোঁজে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে রাজা-রাজ্‌ড়া বড়লোকের ঘরে। সেদিকে চোখ তুলে আমরা চাইতেও পারি না। আর সুন্দর মেয়ে চায়, দোজবরে বুড়ো বরের জন্যে। সেরকম জায়গায় দিতে চাও ত খোঁজ করতে পারি, বিনা পয়সায় হ'য়েও যেতে পারে।"

ইন্দ্রাণীর মা বলিলেন, "ওমা, অমন সোনার প্রতিমা, আগুনে স'পে দেব? আগে দেখ না হয় অন্য সব জায়গায় চেষ্টা ক'রে।"

কুবের বলিলেন, "সে ত দেখ্‌ছিই। যাক্, ও চিন্তা ত সারাক্ষণ আছেই, ও নিয়ে বকাবকি ক'রে আর হবে কি? যাও, মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে, পড়াটা ব'লে দিই ওর অর্দ্ধেক বুদ্ধি যদি সুনীলটার থাকত, তাহ'লে সে মানুষ হ'য়ে যেত।"

গৃহিণী বলিলেন, "তার কি লজ্জা আছে? নিত্যি লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছে, তবু আড্ডা ছেড়ে নড়ে না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "লাথি-ঝাঁটার সঙ্গে সঙ্গে ভাতের থালাও

ত এগিয়ে দিচ্ছ, তা লজ্জা হবে কোথা থেকে? খাওয়াটা বন্ধ হ'ত, তাহ'লে কেমন আড্ডায় ব'সে থাকে, তাই দেখ্‌তাম। কাজে মন যাবে কেন?"

"মা হ'য়ে কাঁড়ি গিলে ব'সে থাক্‌ব, আর ছেলেটা মুখ শুকিয়ে বেড়াবে, সে আমার দ্বারা হবে না বাবু, হাজার হোক্ নিজের পেটের ছেলে ত? তা তুমি একটু শাসনও কর' না, মায়ের কথা কি বেটাছেলে শোনে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "বেটার টিকি দেখ্‌তে পাই যে শাসন করব? আমি যতক্ষণ বাড়ী থাকি সে আর এমুখো হয় না। আবার কোথায় এক বায়স্কোপের কোম্পানী হয়েছে, এখন গিয়ে তাদের দলে ভিড়েছে।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, এবং ইন্দ্রাণী আসিয়া, পড়িতে বসিল। কুবের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, "সত্যি, রাজরাণী হবার মত মেয়ে! কোথায় কোন্ আস্তাকুড়ে ফেলে দিতে হবে কে জানে? গরীব হওয়া সব চেয়ে বড় পাপ, এ জগতে।"

ইন্দ্রাণী হঠাৎ বলিল, "বাবা, এপাড়ায় একটা মেয়েদের ইস্কুল হ'চ্ছে, জান?"

তাহার বাবা পাড়ার খবর বড় একটা রাখিতেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই নাকি মা? কারা করছে"

ইন্দ্রাণী বলিল, "কে এক বড়মানুষের বৌ বিধবা হয়েছে। তার ঢের টাকা, তাই দিয়ে ইস্কুল করছে। অনেক মেয়েকে বিনা মাইনেয় পড়াবে। আমি যাব, বাবা?"

কুবের বলিলেন, "তা যাস্। তোর মাকে একবার ব'লে দেখ্, সে আবার রাগারাগি না করে।"

মা প্রথমটা রাজী হইলেন না। কাজ করে না করে না, হাজার বলিলেও, খানিকটা কাজ ইন্দ্রাণীকে দিয়া হয়ই। সেটুকু সুবিধা ছাড়িতে তাঁহার মন উঠিতেছিল না। মেয়েছেলের অত লেখাপড়ার দরকারই বা কি? আর ও বিনামাহিনার স্কুলে কতই বা শিখিতে পারিবে? মেয়ে বড় হইয়াছে, এখন টো টো করিয়া সারাদিন ঘুরিবার জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। চোখে চোখে রাখা দরকার।

কুবের সংসারের কোনো কথাতেই প্রায় কথা বলেন না। এবার হঠাৎ তিনি মেয়ের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, "ওগো, তুমি বোঝ না। তোমার কাজ যা তা-ত সকাল বিকেলে, দুপুরবেলা আর তোমার কি কাজ? পাঁচজনের মধ্যে যাওয়া-আসা করা ভাল। কখন কার চোখে প'ড়ে যায়, ঠিকানা কি? হয়ত বিনা পয়সায় ভাল বিয়ে হ'য়েও যেতে পারে। এ-রকম ত কত নাটক-নভেলে পড়া গেছে। ও যাক্ ইস্কুলে।"

ইন্দ্রাণী স্কুলে চলিল, লেখাপড়া শিখিবার জন্য নয়, মানুষ হইবার জন্য নয়, বিবাহের সুবিধা যদি কোনোগতিকে হইয়া যায়, এই আশায়। স্কুলে মাহিনা লাগে না, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে হয়, বই-খাতা কিনিতে হয়। গৃহিণী ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নিত্যি ফরসা শাড়ী, সেমিজ, সায়া জোটাব কোথা থেকে? মেয়েকে মেমসাহেব করার দিকে সখ ত খুব, এদিকে ট্যাঁকে ত পয়সা নেই।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ওগুলো ওর বিয়ের খরচের মধ্যে ধ'রে রাখ। দশটাকা খরচ ক'রে হয়ত হাজার টাকা বাঁচাতে পারবে।"

সুতরাং ঘরে যা শাড়ী ছিল, বাক্সে তোলা, কোথাও যাইবার আসিবার জন্য, তাহাই বাহির করিয়া দেওয়া হইল। পাশের বাড়ীর বৌ বেশ সেলাই জানে, তাহাকে বলিয়া কহিয়া সেমিজ গোটা দুই তিন সেলাই করাইয়া লওয়া হইল। আর দরজীর দোকান হইতে দুইটা ব্লাউস্ কিনিয়া আনা হইল ধারে। কুবের বলিয়া আসিলেন, মাসের গোড়ায় হাতে টাকা পাইলে তিনি দামটা দিয়া দিবেন।

গৃহিণী বলিলেন, "এগুলো কি ছাই নিয়ে এলে? দু' মাসও টি'কলে হয়, যা ক্যারকেরে কাপড়ের।"

কুবের ব'লিলেন, ঐতেই ৫৲ টাকা দাম, আবার ভাল ট্যাঁকশই কাপড় চাইলে দশটাকার কম হ'ত না। এ-ই যত্ন ক'রে রাখ, যেন সহজে না ছেঁড়ে।"

মা কাপড়-জামা সব মেয়ের সামনে ধপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নাও গো, তোমার সাজ-পোষাক। যেন দু'দিনে ছিঁড়ে ফেল না, আমরা আর জোগাতে পারব না। ময়লা হ'লে সাবান দিয়ে কেচে নিও।"

ইন্দ্রাণী এই সামান্য কাপড়চোপড় পাইয়াই যেন হাতে স্বর্গ পাইল। বারবার করিয়া পাট করিয়া ঝাড়িয়া নিজের ভাঙা টিনের বাক্সে তুলিয়া রাখিল। বই, খাতা চাহিয়া চিন্তিয়া জোগাড় করিয়া, পরদিনই সে স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। স্কুলের মেয়েকে ভর্ত্তি করিতে লইয়া চলিলেন।

ইন্দ্রাণী বাপের সঙ্গে স্কুলে চলিল, বুকভরা আশা-আনন্দ লইয়া। তাহার মা জানলায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, আহা, মেয়ে যেন রূপে গলিটা আলো করিয়া চলিয়াছে। অথচ কিই বা তাহার সাজ পোষাক? একখানি পুরাতন কালাপেড়ে ফরাশডাঙ্গার শাড়ী আর সস্তা বিলাতী ছিটের ব্লাউস। হাতে চারগাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি, সোনা-রূপার চিহ্নও নাই অঙ্গে। এই মেয়েকেই যদি দত্ত-বাড়ীর সেই মুট্‌কী মেয়েটার মত জরির শাড়ী, জামা, হীরার গহনা পরান হইত, তাহা হইলে রাজবাড়ীর মেয়েও তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারিত না। গৃহিণী মনে মনে তেত্রিশ কোটী দেবতার কাছে মানত করিতে লাগিলেন, মেয়ে যেন কোনো সুপাত্রের নজরে পড়ে, নারীজন্মটা তাহার যেন সার্থক হয়।

ইন্দ্রাণীর মাথায় কিন্তু তখন এ সব চিন্তা ছিল না। লেখাপড়া শিখিয়া সে মানুষের মত হইবে, বড়দা কথায় কথায় "গোমুখ্যু" বলিয়া তাহাকে গাল দিতে পারিবে না, সকল বিষয়ে সমানে কথা বলিবার তাহার অধিকার জন্মিবে, এই আশাই তাহাকে উৎসাহ দিতেছিল। ছোড়দা বায়স্কোপের ষ্টুডিও হইতে কতরকম ছবিওয়ালা সব বই লইয়া আসে, সেগুলিও ইংরাজী শিখিলে সে পড়িতে পারিবে। বিবাহের জন্য সে বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত ছিল না। আশে পাশে যে সব বিবাহিতা বৌ-ঝিদের দেখিত, সবাই সংসার-ভারে, সন্তান-ভারে বিব্রত, কাহাকেও দেখিয়া ইন্দ্রাণীর মনে তাহাদের মত হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিত না। বরং তাহার চেয়ে মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের দেখিয়া তাহার হিংসা হইত। কেমন তাহারা আরামে আছে, দিব্য গাড়ী চড়িয়া রোজ স্কুলে আসিতেছে যাইতেছে, মাসের গোড়ায় মোটা মাহিনা পাইতেছে, কেমন তাহাদের সুন্দর সাজসজ্জা, কেমন ফিটফাট চালচলন। দেখিলে লোভ হয়, উহাদের জীবনে যেন অভাব নাই, পীড়ন নাই। তাহার অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এই মানুষগুলিকেই ভাল লাগিত। এই রকম হইতে পারিলে বেশ হয়, কোনো আপদ-বালাই নাই। আর তাহাদের কি পরাধীন জীবন! নিজের বলিতে একটা পয়সা নাই, মায়ের কাছে চাও, তাঁহারও কিছু নাই। বাপের কাছে চাহিলে পয়সার বদলে শুনিতে পাওয়া যায় খালি অভাবের আর্ত্তনাদ! নিজে টাকা আনিতে পারিলে কত ভাল হইত! টাকার অভাবে তাহার যে বিবাহ হইতেছে না, ইহাতে ইন্দ্রাণী খুসীই ছিল। আরো কয়েক বৎসর বিবাহটা বন্ধ থাকিলে সে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিবে, কাজ করিয়া টাকা আনিতে পারিবে, মা বাপের সাহায্য করিতে পারিবে, নিজেও ইচ্ছামত খরচ করিতে পারিবে।

স্কুলেও ইন্দ্রাণীর নাম হইয়া গেল দেখিতে দেখিতে। রূপের জন্য শুধু নয়, পড়াশুনারও তাহার মত তৎপর মেয়ে ক্লাশে একটিও ছিল না। বেশী বয়সে সে নীচের ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু half yearly পরীক্ষার পরেই তাহাকে উপরের ক্লাশে তুলিয়া দেওয়া হইল। ইন্দ্রাণীর মা গর্ব্ব করিয়া বলিলেন, "গরীব ব'লেই না এতদিন পড়াতে পারিনি, নইলে এতদিনে মেয়ে আমার কলেজে পড়্‌ত।" দু'দিন আগে তিনিই যে মেয়ের স্কুলে যাওয়ার পথে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা এখন মেয়ের কৃতিত্বের আনন্দে ভুলিয়াই গেলেন।

পাশের বাড়ীর গৃহিণীর সঙ্গে কথা হইতেছিল, তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের পড়াশুনার উৎপাত নাই। বারো বৎসর বয়স হইতে না হইতে বিবাহের তাড়া পড়িয়া যায়, এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে সকলের বিবাহ ত হইয়া যায়ই, দুই-চারিজন সন্তানের জননীও হইয়া বসে। এইই সনাতন রীতি, আর ইহাতে তাঁহাদের গর্ব্বের সীমা নাই।

ইন্দ্রাণীর মায়ের কথা শুনিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পড়াশুনো সবই মেয়েছেলের বিয়ের জন্যে ত? নইলে তারা কি আর শামলা মাথায় দিয়ে আপিসে যাবে? কথায় বলে 'কিঞ্চিৎ লিখনং, বিবাহকারণম্।' তা সে দিকে ত কৈ মন দিচ্ছ না? মেয়ে ত পেল্লায় ডাগর

হ'য়ে উঠ্‌ল। আমার শনীর চেয়ে মাস-তিনেকের ছোট মোটে, আমি ত সবই জানি।”

অন্য লোকের কাছে ইন্দ্রাণীর মা গলা বাহির করিয়া প্রমাণ করিতেন, যে, মেয়ের বয়স এগারোর বেশী নয়, তবে এক্ষেত্রে তাহা খাটিবে না জানিয়া তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। মনে মনে অবশ্য প্রতিবেশিনীর কথায় সায় না দিয়া পারিলেন না। সত্যই ত মেয়ের বিবাহই হইল আসল, সে লেখাপড়া শিখুক বা না-ই শিখুক তাহাতে কিই বা আসে যায়? তবে লেখাপড়া শিখিলে বিবাহের সম্ভাবনা বেশী, এইজন্যই না স্কুলে দেওয়া?

কুবের মেয়ের জন্য বর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ত হায়রান হইয়া গেলেন, কিন্তু বিনা-টাকায় ভাল বর এদেশে কোথায়? মেয়ে সুন্দরী শুনিয়া প্রথম প্রথম দুই-চারিজন দেখিতে আসিবার কথা বলিত, কিন্তু একেবারে কিছুই পাইবার আশা নাই শুনিয়া শেষ পর্য্যন্ত কেহই আর বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিত না। কুবেরের পিঠটা আরো কুঁজো হইয়া আসিতে লাগিল এবং তাঁহার স্ত্রীর মেজাজ এমনি সপ্তমে চড়িল যে সুনীল শুদ্ধ মাঝে মাঝে ভাত খাওয়া বাদ দিতে লাগিল। খাইতে আসিলেই মা তাড়া করিয়া আসেন, “মুখপোড়া ছেলে, কেবল শূওরের মত গিল্‌তে এস, বোনের জন্যে একটা পাত্র দেখ্‌তে পার না? এত লোকের সঙ্গে ত মেলামেশা? এর পর উনুনের ছাই দেব খেতে। মর্‌লে পরে যে লোকে কাঁধ দেবে না রে হতভাগা। ঘরেই কি প'চে থাক্‌ব?”

সুনীল এখন দিশী ফিল্ম তৈয়ারীতে একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছিল, বোনের বিবাহের কথা ভাবিবার তাহার অবসর ছিল না। গালাগালি এবং ভাত নীরবেই গিলিয়া সে পলায়ন করিত। বড় ভাই অনিল গাল খাইলে বলিত, “বিনা পয়সায় মেয়ে পার কর্‌তে চাও, তা অত সহজে হয় না। কার কাছে কথা পাড়তে যাব? অন্ততঃ দুশো পাঁচশ' দিতে ভরসা ক'রে দু' চারজনের কাছে কথা পাড়তাম। সুন্দর হ'লে কি হয়? অমন সুন্দর কত আছে!”

ইন্দ্রাণী যে এ সব কথা শুনিত না তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে তাহার মা-বাপের প্রতি বিন্দুমাত্রও সমবেদনা জাগিত না। তাহার রাগই হইত। বিয়ে, বিয়ে করিয়া সব যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। বিয়ে না হইলে কি চলে না? খাওয়া পরার জন্যই না বিবাহ দরকার? তা ইন্দ্রাণীকে ভাল করিয়া পড়াশুনা করিতে দিলে সে নিজেই অনেক লোককে খাইতে দিতে পারিবে। প্রেম, ভালবাসা এ সবের প্রতি তাহার আকর্ষণ যে না ছিল তাহা নয় তবে আশে পাশের সংসারগুলিতে এ-সবের পরিচয় বড় সে পাইত না। সেখানে খালি অশান্তি, কলহ, হাড়ভাঙা খাটুনি। টাকাকড়ি না থাকিলে সুখ-শান্তি কিছুই থাকে না, এ ধারণাটা তাহার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সারাদিনের পর হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সাক্ষাৎ হইল, এবং সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা উঠিয়া, তৎক্ষণাৎ ঝগড়া বাধিয়া গেল। ইন্দ্রাণী জানিত, ভাল বিবাহ তাহার হইবে না, কারণ তাহার বাবার টাকা নাই। তাহার চেয়ে নিজে মানুষ হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টাই তাহার বেশী ছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে, বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে, একথা জানা থাকিলেও, সে কথাটাকে আমল দিতে চাহিত না। সে প্রমোশন পাইয়া পাইয়া বেশ উঁচু ক্লাশে উঠিয়া গিয়াছিল, আরো বৎসর-দুই পড়িতে পাইলে পরীক্ষা দিয়া কলেজে ঢুকিতে পারে। কিন্তু ততদিন কি তাহাকে কেহ নিষ্কৃতি দিবে?

সকাল বেলা পড়া করিতে বসিয়াছে, এমন সময় মা আসিয়া গাল দিয়া তাহাকে তুলিয়া দিলেন, “বিবি মেয়ের খালি পড়া আর পড়া। হাইকোর্টের জজ হবেন! আমি দাসী বাঁদী আছি কেবল খাটতে; যা, বাসন ক'খানা মেজে দিগে যা।”

ইন্দ্রাণী বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে কলতলায় গিয়া ছাই লইয়া বাসন মাজিতে বসিল। বাসন-গুলা সব তাহার আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল। বাৎসরিক পরীক্ষায় যে মেয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইবে, তাহাকে ৪০ৼ টাকার একটা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইন্দ্রাণী সহজেই উহা পাইতে পারে, যদি মা সারাদিন তাহার পিছনে না লাগিয়া থাকেন।

এমন সময় অপরিচিত স্বরে ডাক শুনিল, “সুনীলবাবু বাড়ী আছেন?”

ইন্দ্রাণী মুখ তুলিয়া চাহিল। সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একজন বাবু তাহার ছোড়দার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। ইন্দ্রাণীর রাগ তখনও পড়ে নাই, সে বেশ উঁচু গলায় বলিল, "সুনীলবাবু বাড়ী নেই, তাঁর ইুডিওতে দেখুন গিয়ে।"

যুবক বলিল, "আমি সেখান থেকেই আসছি, সেখানে ত তিনি নেই। বিশেষ কাজে তাঁকে এখনি দরকার।"

ইন্দ্রাণী বলিল, "তবে গানের আথড়ায় আছেন, আর কোথায় যাবেন?"

যুবকটি অকারণেই আরো কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

বাসন লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিতেই তাহার মা বলিলেন, "যার তার সঙ্গে অমন ক'রে কথা ক'স্ কেন রে? বিয়ে হবে কোথা থেকে, যা মেয়ের চালচলন! লোকে একটা নিন্দে রটাতে পেলে বেঁচে যায়।"

ইন্দ্রাণী বলিল, "ভিতরে ঢুকে ডাক্‌ছে, তা কি করব কথা না ব'লে? লেজ তুলে দৌড়ব? তোমাদের কিসে যে ভাল চাল হয় আর কিসে খারাপ হয়, তা তোমরাই জান।"

মা চটিয়া বলিলেন, "চোপার ডালি! খালি মুখে মুখে জবাব। ইস্কুলে গিয়ে এই বিদ্যেই হ'চ্ছে। আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিস্, সন্ধ্যের সময় একজনরা দেখ্‌তে আসবে।"

ইন্দ্রাণীর মেজাজ আরো খারাপ হইয়া গেল। সে মায়ের কথার উত্তর না দিয়া, ফিরিয়া গিয়া পড়িতে বসিল।

কুবের সেদিন অসুখের ছুতা করিয়া অফিস গেলেন না, অনিল কামাই করিতে সাহস করিল না, সে চলিয়াই গেল। সুনীলের টিকিই দেখা গেল না, মা তাহার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব গালি বর্ষণ করিয়া চলিলেন। ইন্দ্রাণী স্কুলে যাইবার জন্য ভাত চাহিতে আসিল। মা বলিলেন, "নেই বা গেলি আজ, ঘরদোর সাফ করতে হবে, জলখাবার কর্‌তে হবে, কত কাজ প'ড়ে আছে।"

ইন্দ্রাণী বলিল, "তোমাদের ছাইয়ের কাজ তোমরাই কর গিয়ে। আমার ভাতেও দরকার নেই, খেকেও দরকার নেই।" সে রাগ করিয়া না খাইয়াই চলিয়া গেল।

গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন, "দেখলে মেয়ের মেজাজ? এ শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে চল্‌তে পারবে? এর অদৃষ্টে ঢের দুঃখ আছে।"

কুবের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দুঃখ ত আছেই। জেনেশুনে তাকে ত ভাসিয়ে দিচ্ছি। অমন মেয়ে কেন যে আমার ঘরে এসেছিল!"

গৃহিণী বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর, শুভ কর্ম্মের গোড়াতে অমন নিশ্বাস ফেল্‌তে নেই। অদৃষ্টে থাকে ঐ বরের ঘরেই তার সুখ হবে। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীরও কত সুখ-সৌভাগ্য হ'তে দেখেছি। তবে অতগুলো ছেলেমেয়ে এই যা।"

কুবের কোনো উত্তর দিলেন না। মেয়ের বিবাহের তাগিদ শুনিয়া শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া অবশেষে তিনি একটি পাত্র স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। ভদ্রলোক তাঁহার অফিসেই কাজ করেন, কয়েক মাস আগে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, দেখিবার লোক কেহ নাই। এইজন্য তিনি বয়স্থা মেয়ে খুঁজিতেছিলেন। ইন্দ্রাণীর কথা শুনিয়া সহজেই রাজী হইয়াছেন। অবশ্য খুব সুপাত্র তাঁহাকে কোনোদিক দিয়াই বলা যায় না। মাত্র ১০০৲ টাকা মাহিনা, বছর-পঁয়তাল্লিশ বয়স, পাঁচটি ছেলেমেয়ের পিতা। কিন্তু বিনাপয়সায় এর চেয়ে ভাল কোথায় পাওয়া যাইবে? নিজের হতভাগ্যের দোহাই দিয়া, কুবের নিজের আহত পিতৃস্নেহকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

মেয়ে দেখিবার বিশেষ যে কোনো প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। বিবাহ একরকম স্থিরই হইয়া গিয়াছিল। তবে মেয়ে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়া নিয়ম যখন, তখন সেটা করাই ভাল, মনে করিয়া বরপক্ষ আজ আসিবার কথা বলিয়া দিয়াছেন। বেশী লোক নয়, বর নিজে আসিবেন এবং সঙ্গে তাঁহার এক মামা আসিবেন।

ইন্দ্রাণী স্কুল হইতে আসিয়া দেখিল, মহাধুম লাগিয়া গিয়াছে। দাদাদের শুইবার ঘর ধোওয়া, মোছা, ঝাড়া চলিতেছে। বিছানায় উপর ফরসা চাদর ও ভাল তাকিয়া। বুঝিল এগুলি পাশের বাড়ী হইতে চাহিয়া আনা

হইয়াছে। মা রান্নাঘরে জলখাবার করিতে ব্যস্ত। লুচি-ভাজার গন্ধে বাড়ী একেবারে আমোদিত।

ইন্দ্রাণী দরজার সামনে আসিতেই, মা তাড়াতাড়ি একটা থালায় খানকয়েক লুচি, বেগুনভাজা, মিষ্টি অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "নে, নে, খেয়ে নে আগে। উপোস ক'রে সারাদিন, মেয়ের চেহারা হয়েছে দেখ না? খেয়ে মুখ-হাত ভাল ক'রে ধো, এখনি ও-বাড়ীর ছোট বৌ আস্‌বে, তোকে সাজাতে।"

ইন্দ্রাণীর একে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছিল, মায়ের কথায় তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত রাগে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু খাওয়াটা সে সারিয়া ফেলিল। মনে মনে কি যেন সঙ্কল্প আঁটিতে লগিল, তখনকার মত মাকে কিছুই বলিল না।

পাশের বাড়ীর ছোট বৌ আসিয়া ডাক দিল, "কই মাসিমা, মেয়ে কই? খোকাটা যা প্যান্‌পেনে, আমার আস্‌তে দেরি হ'য়ে গেল।"

ইন্দ্রাণীর মা ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, "এস মা, এস! মেয়ে এই যে ঘরে। একটু ভাল ক'রে সাজিয়ে দিও মা, সোনাদানা কিছু ত নেই!"

বউ বলিল, "যা রূপসী মেয়ে আপনার, সাজের দরকারই বা কি? এম্‌নি দেখ্‌লেই মূর্চ্ছো যাবে।"

ইন্দ্রাণীকে সাজান-গোজান হইয়া গেল। মেয়ের মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখিয়া, ছোট বউ ঠাট্টা করিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "গৌরী হেন ঝি, তোমার কপালে বুড়ো বর, আমি করব কি?"

ইন্দ্রানী ঝট্‌কা মারিয়া মুখ সরাইয়া লইল। তাহার মা চোখ টিপিয়া, ইসারায় ছোট বউকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

খানিক পরে, বর আসিল। অভ্যর্থনা করা, জলযোগ করান সব হইয়া গেল। পাড়ার দু'চারজন বউ-ঝি জুটিয়াছিল, তাহারা উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "ওমা, বড় যে বেমানান হবে।"

ইন্দ্রাণীর মা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "তা কি করব বাছা, গরীবের মেয়ে, যেমন অদৃষ্ট! কপালে সুখ থাক্‌লে ওতেই সুখ হবে।"

কুবের আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন, মেয়ের গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইতে তাঁহার সাহস হইল না। ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া প্রৌঢ় বরের দৃষ্টিও বিস্ময়চকিত হইয় উঠিল। সুন্দর মেয়ে তিনি শুনিয়াছিলেন বটে, তবে এমন অগ্নিশিখার মত রূপ আশা করেন নাই। বরের মামা, নিয়মমত নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া, গিনি হাতে দিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উঠিবার সময় বলিলেন, "এর পর দিনস্থির করলেই হয়।"

ইন্দ্রাণী উঠিয়া আসিয়া, রাগে ক্ষোভে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিতেই, সে তাঁহার প্রসারিত হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমরা কি সত্যিই ঐ বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে নাকি?"

মেয়ের চোখে জল দেখিয়া, মায়েরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "কি করব বাছা? গরীবের ঘরে জন্মেছিস্‌, আমাদের সাধ্য কি ভাল বিয়ে দেবার? তবে স্বভাব-চরিত্র ভাল আছে, চাকরীতেও উন্নতি আছে ব'লে শুনেছি।"

ইন্দ্রাণী মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মায়ের আঁচ বহিয়া যাইতেছিল, তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় সুনীল কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। ইন্দ্রাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে ইন্দু? কাঁদছিস্ কেন? মাষ্টার বকেছে?"

ইন্দ্রাণী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁ মাষ্টার বক্‌বে! কোন দিন কেউ আমায় বকে কি না? আর ওসবের দফা ত সারছ তোমরা, আর কোনো জন্মে পড়তে আমি পারব কি না?"

সুনীল আরো অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পড়বি না কেন? কি হয়েছে?"

ইন্দ্রাণী বলিল, "বাবা কোথা থেকে এক বুড়ো ধ'রে এনেছেন, তার সঙ্গে নাকি আমার বিয়ে ঠিক্"—রোষে ক্ষোভে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

সুনীল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "দেখ্, ইন্দু, আমি তোকে বাঁচাতে

পারি, যদি আমার কথামত চলিস্। বাবা-মা অবিশ্যি রাগ করবেন, কিন্তু তোর ভাল বই মন্দ হবে না।"

ইন্দ্রাণী মাথা তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "কি করতে হবে বল না? আমি ঠিক করব। ঐ বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। ভাব্‌তেই আমার ঘেন্না লাগে।"

সুনীল এধার ওধার চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ইন্দ্রাণীর কানে কানে কতগুলা কি বলিয়া গেল। শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রাণীর মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল, তাহার পরেই রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা হইয়া গেল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "এতে বাবা-মার কোনো অনিষ্ট হবে না ত?"

সুনীল সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু না, সহরে কে কার অনিষ্ট করতে পারে? আর মেয়েও নেই তাঁদের যে কেউ বিয়ে ঠেকাবে। তোর যদি অমত না থাকে তা হ'লেই হ'ল। বয়সও ত আঠারো হ'তে চল্‌ল, আইনেও আট্‌কাবে না। আর কেই বা আইন-আদালত করতে যাচ্ছে? আমার ত বিশ্বাস, এখন রাগ করলেও পরে সবাই খুসীই হবে।"

ইন্দ্রাণী বলিল, "খুসী হোক্ না হোক্ ব'য়েই গেল। আমায় বড় খুসী করছিল কিনা? ওঁদের কোনো ক্ষতি না হয়, তাহ'লেই হল।"

সুনীল বলিল, "কিছু হবে না, আচ্ছা তুই বোস্, আমি আস্‌ছি।"

ইন্দ্রাণীর মায়ের সেদিন মেয়ে দেখার উৎপাতে কোনো কাজই হয় নাই। তিনি মশলা বাটিতে বাটিতে ডাকলেন, "ও ইন্দু, থোড়ের তরকারিটা একটু কুটে দিয়ে যা মা। একহাতে কত করব?"

কোনো উত্তর পাইলেন না। দু'তিনবার ডাকিয়া, শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন মেয়ে রাগ করিয়া জবাব দিতেছে না।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। ছেলেদের ঘরে গিয়া দেখিলেন, সেখানেও কেহ নাই। বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন। ভর্ সন্ধ্যায় মেয়ে গেল কোথায়? কখনো ত সে তাঁহাকে না বলিয়া কোথাও যায় না? কিছু ভাল-মন্দ হইল নাকি? দারুণ একটা অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতরটা শুকাইয়া উঠিল।

কুবের পাশের বাড়ীর ধারকরা বাসন ফেরত দিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে অমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "মেয়েটাকে দেখ্‌ছি না, কোথায় গেল দেখ।"

কুবের হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর শুইবার ঘরে ছুটিয়া আসিলেন। গৃহিণীর চোখে পড়ে নাই, কিন্তু তাঁহার চোখে প্রথমেই পড়িল একখানা চিঠি। মেয়ের পড়ার টেবিল হইতে সেটা তুলিয়া লইয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন:

শ্রীচরণেষু,

বাবা, ইন্দুকে আমি নিয়ে চল্‌লাম। আমি হতভাগা, কোনো ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু ওর বলিদান দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারব না। আমার সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টার মিঃ গুহ সেদিন ওকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন। এত সুন্দর, আর এত expressive চেহারা কখনো তিনি দেখেন নি। ভাল অভিনেত্রীর অভাবে আমাদের ছবিটা মাটি হ'তে বসেছিল। ইন্দু এ কাজ নিতে রাজী আছে। মাসে প্রথমে তিনশ' টাকা ক'রে তাকে দেওয়া হবে, পরে ঢের বাড়বে। আপনি তার জন্যে ভাব্‌বেন না। মিঃ গুহ মস্ত টাকাওয়ালা লোক, বি-এ পাশ ক'রে আমেরিকায় অনেকদিন ছিলেন। তিনি ইন্দুকে বিয়ে করতে খুব রাজী আছেন, যদি সে মত করে। আমার বিশ্বাস ইন্দু তাঁকে পছন্দই করবে। বিয়ের পর বরক'নে নিয়ে আপনাদের প্রণাম করতে যাব।

প্রণত

সুনীল।

গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। "হতভাগী ম'ল না কেন? শেষে কুলে কালি দিয়ে গেল!" কুবের নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বঙ্গ-সাহিত্য

শ্রী শিবরতন মিত্র

প্রারম্ভিক

প্রথম অধ্যায়—সাধারণ কথা

(১) বঙ্গভাষা-কথন, সীমা-নির্দ্দেশ— ভারত-ভূখণ্ডের মধ্যে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর—এই চতুঃসীমান্তর্গত দেশমধ্যে অধিকাংশ অধিবাসিগণ মাতৃভাষারূপে যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাই স্থূলতঃ 'বঙ্গভাষা' নামে অভিহিত।

ভারতবর্ষ আকারে বঙ্গদেশ ও আসামের সাড়ে আট গুণ বড় হইলেও, জনসংখ্যার অনুপাতে, কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন গুণ মাত্র। সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে ৪৯২৯৪০০০ বা পাঁচ কোটি লোক বঙ্গভাষা, মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলতঃ, সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দের প্রায় ষষ্ঠাংশ লোক এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সপ্তমাংশ লোক বঙ্গভাষায়, পরস্পর মধ্যে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা লক্ষ্যের বিষয় যে পৃথিবীর মধ্যে বঙ্গভাষীর সংখ্যা অবহেলার কথা নহে।

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—প্রাচীনতম আর্য্যজাতির চারিকোটি তিরানব্বই লক্ষ বংশধরগণ যে ভাষায় আপনাদের দৈনন্দিন হর্ষবিষাদ ও জল্পনা-কল্পনার কথা বিবৃত করে,—যে ভাষায় কথা কহিয়া আপনাদের সংসারযাত্রা সুখ-স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত করে, জগতের ভাষা-তালিকায় সেই বঙ্গভাষা সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। *

কোন ঐতিহাসিক ঘটনা-বিশেষের মত, দেশমধ্যে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইবার কাল-নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তত্রাচ, ইহা যে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে একটি চিন্তাশীল, মেধাবী, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতির মনোভাব-জ্ঞাপনের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। † তবে প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন দেশের ইতিহাস, শুদ্ধ সেই দেশের অধিপতিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য-তালিকা বা তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ-সংযুক্ত নীরস নির্ঘণ্ট মাত্র নহে। সেই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও তাহার ক্রম-বিবর্ত্তন, জনসাধারণের মানসিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশ, উৎকর্ষাপকর্ষ-জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, এবং অপরাপর বহুবিধ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করাই ইতিহাসের মুখ্য কর্ত্তব্য। দেশ বিশেষের ভাষা ও সাহিত্য মধ্যে এই উপকরণগুলি যেরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ অন্যত্র নহে। আমাদের বঙ্গদেশের প্রাচীনকালের তথা-কথিত ইতিহাস নাই বলিয়া বৃথা অনুশোচনা করা বা নিরাশ হওয়া সঙ্গত নহে। একমাত্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা যাহা কিছু উপকরণ প্রাপ্ত হই, তাহা সর্ব্বতোভাবে ঐতিহাসিকগণের ক্ষোভের অপনোদন করিতে সমর্থ না হইলেও, যে অনেকাংশে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

* পৃথিবীর মধ্যে মাতৃভাষারূপে যে-সকল ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার সংখ্যানুক্রমিক তালিকা এই—(১) উত্তর চীন (২০ কোটির অধিক); (২) ইংরাজী (প্রায় ১৫ কোটি) (৩) রুষ (প্রায় ৮ কোটি); (৪) জার্ম্মাণ (৭৷ কোটি); (৫) স্পেনীয় ভাষা (৫৷৷০ কোটি); (৬) জাপানী (প্রায় ৫৷০ কোটি); এবং (৭) বাঙ্গালা (৪ কোটি ৯৩ লক্ষ)।

† বঙ্গের বাহিরেও উড়িষ্যা, ময়ূরভঞ্জ, নেপাল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন শিলা-লিপি ও গ্রন্থ প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভাষা-তত্ত্বের জটিল রহস্য, শব্দতত্ত্ব-বিজ্ঞান-বিষয়ক স্বতন্ত্র পুস্তক বা ব্যাকরণ-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আপাততঃ আমরা মোটামুটিভাবে ইহাই জানিয়া রাখি যে বাঙ্গালা ভাষা আদৌ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ইহা 'প্রাকৃত ভাষা' নামে অভিহিত হইত। কালে, বঙ্গভাষা বা 'গৌড়ীয় সাধুভাষা,' পূর্ব্বকথিত 'প্রাকৃত ভাষা' হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত ভাষা হইতে আহৃত হইলেও, আরবী, পার্শী, ইংরাজী, পর্ত্তুগীজ এবং অপরাপর ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহ হইতে নানাবিধ শব্দ বঙ্গভাষা মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ইহাকে শব্দ-সম্পদে সমধিক সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ত্তমান সন্দর্ভে আমরা সংক্ষেপে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের যথাসম্ভব একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়া, ইহার ক্রমবিকাশ ও তৎসহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট সময়ের জনসাধারণের মানসিক ও সামরিক অবস্থার কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

(৩) বঙ্গসাহিত্যের প্রসার, সম্ভাব্য অস্তিত্ব—আমাদের দেশে অল্পদিনমাত্র পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং এখন গ্রন্থাবলী জনসাধারণে যেরূপ অত্যল্পকাল মধ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না। কেহ কোন গ্রন্থরচনা করিয়া বন্ধুবর্গের নিকট পাঠ করিলে, এবং তাহা তাঁহাদের মনোমত হইলে, তাঁহারা সেই সেই গ্রন্থের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি করিয়া লইতেন। এইরূপে নব-রচিত বা প্রাচীন গ্রন্থরাজি বেতনভুক্ লিপি-কার দ্বারা লিখিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ বিস্তৃতিলাভ করিত। যাঁহার যে গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন, তিনি কেবল সেই গ্রন্থেরই প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতেন, অপরাপর গ্রন্থের সহিত পরিচয়-স্থাপনের তাদৃশ সুবিধা হইত না। এই নিমিত্ত অনেক গ্রন্থ, বিস্তারের অভাবে, চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কোন যুগ-বিশেষে, কোন শ্রেণীর গ্রন্থের আদর জনসমাজে বর্দ্ধিত হইলে, তদেতর শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থরাজি কেহ রক্ষা করিবার, বা নূতন প্রতিলিপি করিয়া তাহার সংখ্যা ও প্রসার বর্দ্ধিত করিবার কোনরূপ চেষ্টাই হইত না। এতদ্ব্যতীত, কীট ইত্যাদি দ্বারা এবং গ্রন্থাধিকারীর অযত্ন ও অমনোযোগিতা বশতঃ কত শত-সহস্র গ্রন্থ যে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কত গ্রন্থকারের সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের ফল, চিরকালের মত অতল বারিধিবক্ষে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে! হয়ত, তাঁহাদের মধ্যে কতজন জ্ঞান-গরিমায় ও রচনা-কৌশলে সাহিত্য-জগতে পরম সম্মানিত স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

সৌভাগ্যের কথা, এখন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে আশু-ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিবার সাগ্রহ প্রচেষ্টা, অধিকাংশ সুশিক্ষিত বঙ্গ-সন্তানের অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই অল্পকালের চেষ্টার ফলে, আমরা অবগত হইয়াছি—সামান্য কয়েকজনমাত্র গ্রন্থকারের মস্তিষ্কপ্রসূত গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের ক্ষীণ সম্পদ নহে।* বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার-গৃহে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া অসংখ্য মনস্বী, তাঁহাদের চিরজীবনব্যাপী ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফল, ক্রমাগতই সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি নষ্ট বা চিরলুপ্ত হইলেও, জগদ্সমক্ষে গৌরব করিবার এখনও যথেষ্ট গ্রন্থ বা রচনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদরচয়িতাগণের পদাবলীর ন্যায় পীযূষবর্ষী অপূর্ব্ব কোমল-কান্ত পদাবলী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের ন্যায় চরিত-গ্রন্থ, কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ ও কাশীরাম দাস-বিরচিত মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য প্রভৃতি লইয়া, পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্য, জগদ্সমক্ষে ভাব, ভাষা ও সৌন্দর্য্যানুভব-ক্ষমতার জন্য স্পর্দ্ধা করিলে অশোভন হইবে না।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবিগণের সমবেত চেষ্টায় অনেক লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের উদ্ধারসাধন হইতেছে এবং এই প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধার কার্য্য যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস

* মদ্রচিত "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" নামক, বঙ্গভাষার যাবতীয় পরলোকগত সাহিত্য সেবকগণের চরিতাভিধান-গ্রন্থে, রচনাদর্শসহ পাঁচ হাজারের অধিক বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের বর্ণানুক্রমিক পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। "বঙ্গ-সাহিত্য" গ্রন্থখানি, এই 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য রচিত হইল।

দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে এখনও এমন অসংখ্য গ্রন্থ অপ্রকাশিত রহিয়াছে, যাহা কালে প্রকাশিত হইলে, সাহিত্য-জগতে সম্মানিত স্থান বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।§

(৪) প্রাচীন-গ্রন্থের মৌলিকত্ব অবিসম্বাদিত নহে—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রাচীনকালে বেতনভুক্ লিপিকারগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থাবলীর অনুলিপি প্রস্তুত হইত। এই প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার সময় লিপিকারগণ, ইচ্ছামত কোন স্থান বা পরিবর্জ্জন, কোন স্থান বা পরিবর্ত্তন এবং কোন স্থান বা স্বকীয় রচনার পরিবর্দ্ধন দ্বারা মূল গ্রন্থ বিকৃত করিয়া তুলিত। সুতরাং, যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, সেই গ্রন্থ ততই লিপিকারগণের ক্রমিক দৌরাত্ম্যে বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বঙ্গসাহিত্য, প্রায় সমগ্রই কবিতা বা ছন্দাকারে গ্রথিত। এই নিমিত্ত, সেই সমুদয় গ্রন্থরাজি সহজে কণ্ঠস্থ হইবার যেরূপ সুবিধা ছিল, কল্পনাপ্রিয় ও কবি-প্রকৃতি জনসাধারণের স্থলবিশেষে মৌখিক কবিতারচনা দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার আশঙ্কাও যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল। এই সকল কারণ বশতঃ কোন প্রাচীন পুস্তকের একাধিক প্রতিলিপির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে পরস্পর মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু অংশবিশেষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার পরিলক্ষিত হয়।

কোন বিপুলকায় গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার সময় অধ্যবসায় ও আন্তরিক স্পৃহা বা আগ্রহ বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। তদভাবে, অনেক বৃহৎ গ্রন্থের আবশ্যকমত অংশ-বিশেষের প্রতিলিপি করিয়া লিপিকারগণ অবশিষ্ট অংশের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিত না। এই জন্য বহু গ্রন্থের অংশ-বিশেষ মাত্র রক্ষিত হইয়া আসিতেছে—পরিত্যক্ত অংশের এখন আর সন্ধান পাওয়া দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

(৫) প্রাচীন-সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রায় যাবতীয় গ্রন্থই ছন্দাকারে বিরচিত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ পুস্তকই মন্দিরা-চামর বা বাদ্যসহকারে গীত হইত। পাশ্চাত্য-সাহিত্যের মত বঙ্গসাহিত্য, প্রধানতঃ মানব চরিত্র লইয়াই আলোচনা করে নাই। ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গবাসী, ধর্ম্মমত-বিশেষের সংস্থাপন-প্রয়াসে, কাব্যাকারে বিরুদ্ধবাদিগণের উপর স্বীয় আরাধ্য-দেবতার প্রাধান্যের কথা, বিবিধ উপাখ্যান-সংযোগে বর্ণন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছে। আবার, প্রবাল-কীটের দ্বীপসংগঠনের ন্যায় এক একটি নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আখ্যান আশ্রয় করিয়া বহু শিক্ষিত ও নিরক্ষর কবি, বহুশত বর্ষ ধরিয়া নব নব কল্পনা-সংযোগে তাহা অপূর্ব্ব নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই মহাভারত, রামায়ণ, কৃষ্ণচরিত্র, চৈতন্য-চরিত, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী বা গৌরী-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে, বহু-সংখ্যক কবি বিভিন্ন সময়ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব আরাধ্য-দেবতার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থরচনায় ব্রতী হইবার কথা বিবৃত করিয়াছেন। খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণ প্রায়ই রাজাশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্তমনে গ্রন্থরচনা করিবার অবসর বা সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। এই নিমিত্ত বঙ্গসাহিত্য, বহুকাল হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে দেশাধিপতিগণের অভয়আশ্রয়-লাভ করিবার শুভসুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, অবাধগতিতে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মকলহের ফলে বঙ্গভাষার পুষ্টি হইয়াছে সত্য—কিন্তু, কলহ বা সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডার পরিবর্ত্তে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবের উন্মাদনায় বৈষ্ণবগণ, বঙ্গভাষায় যে বিপুল সাহিত্য-সম্ভার প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা যে কেবল যথেষ্টরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাহা নহে—পরন্তু, ইহা বিশ্ব-সাহিত্যে

---

§ আমার জীবনব্যাপী ক্ষীণতর একক চেষ্টার ফলে বীরভূম 'রতন'-লাইব্রেরীতে পাঁচ হাজারেরও অধিক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে বহু অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার-রচিত রচনাসম্ভার বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' গ্রন্থে, এই সকল গ্রন্থকারগণের রচনাদর্শসহ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে, তৎসমুদয়ের যথাস্থানে উল্লেখ রহিবে।

পরম সম্মানিত আসন প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গবাসীকে ধন্ত ও কৃতার্থ করিয়াছে।

(৬) সাহিত্যে অলৌকিকতা—প্রত্যেক বিভিন্ন মানবজাতিরই জীবন ও সাহিত্যের বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতা, সেই জাতির কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, আচার-ব্যবহার, গার্হস্থ্য জীবন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেশভূষা, কিংবদন্তী প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই বিশিষ্টতার সহিত পরিচয়-সংস্থাপনই সাহিত্য-সাধনার চিরন্তন প্রয়াস। অপ্রত্যক্ষ শক্তি, যোগবল, তপস্তা, সংযম, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া,মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি দ্বারাই আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, আমাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে।

শুদ্ধ আমাদের কেন? বিশ্বের কোন্ সাহিত্য কল্পনার উদ্দাম গতি, পৌরাণিক ও অতিমানুষিক কল্পনার সংমিশ্রণে পুষ্টিলাভ করে নাই? বিশ্বের কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ অতিমানুষিক কল্পনায় ছত্রে ছত্রে পুষ্টিলাভ করে নাই।

মানবমাত্রেই কল্পনা করে—এবং এই কল্পনার মধ্য দিয়াই মানবের আদর্শ-জীবন বা ভবিষ্যতের বিকাশ-পন্থা, তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয়। মানবমাত্রই স্ব স্ব জাতীয় জীবনের কল্পনা বা ভাব-ধারার সহিত সংযুক্ত হইয়া হৃদয়ে বলসঞ্চয় করে। সুতরাং, মানব-জীবন গড়িয়া তুলিতে কল্পনাপ্রবণ কবির কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই জন্য স্ব স্ব প্রাচীন কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যেকেরই পরিচিত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য।

মানুষ মানুষকে জানিবে এবং মানুষকে জানিয়া সে আরও বড় মানুষ হইবে—ইহাই সাধনা। এই সাধনায় আমাদিগকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, আমাদের সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে হইবে। কেননা মানুষ যখন স্ব স্ব জাতীয় জীবনের অতীত কল্পনা-রাজ্যের সমীপস্থ হয়, তখন তাহারা তাহাদের বাস্তব জীবনের যেরূপ নিবিড়ভাবে পরিচয় প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া, যাঁহারা বিরুদ্ধমত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে এই কয়টি কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

(৭) আধুনিক সাহিত্য—স্থূলতঃ ধরিতে গেলে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরী, মার্শম্যান্ বা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে, বঙ্গভাষার আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। তখন হইতে বহুদিনের স্বেচ্ছাধৃত ছন্দের নিগড় উন্মোচন করিয়া বঙ্গভাষার অবাধে বিচরণ করিবার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে এবং অচিরকাল মধ্যে, ইহা কিরূপ সলীল, গতিশীল এবং সর্ব্বত্র বিচরণক্ষম হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। এখন মুদ্রাযন্ত্রের শুভ প্রসাদে সাময়িক সাহিত্য, সংবাদপত্র এবং নানাবিধ নিত্য নব সুরচিত চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থনিচয় প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় অঙ্গই যুগপৎ যথাযথরূপে পরিপুষ্ট হইতেছে।

এখন বঙ্গসাহিত্য কেবলমাত্র ধর্ম্মের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে—এখন আমরা বঙ্গভাষায় কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি দ্যায়দর্শন-বিষয়ক, কি শিল্পকলা-বিষয়ক, কি অপর যে কোন জটিল-বিষয়ক সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাবরাজি অনায়াসে সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি। ভারতপ্রবাসী পাশ্চাত্য মনীষী J. D. Andorson মহাশয়ও এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিতেছেন—

I am quite convinced that Bengali is one of the greatest expressive languages of the world, capable of being the vehicle of as great things as any speech of men.

অর্থাৎ—'আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি যে বঙ্গভাষা পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম ব্যঞ্জনামূলক ভাষার অন্যতম—মানবের ভাষায় যতদূর উন্নততর ভাব প্রকাশ করা সম্ভব, বঙ্গভাষা এখন তৎসমুদয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে।'

পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে, বঙ্গসাহিত্য যে দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন বঙ্গভাষায় লিখিত অনেক পুস্তক পাশ্চাত্য ভাষা-সমূহে অনূদিত হইয়া যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে।

(৮) আশা ও আশঙ্কা—এখন আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ক্রম-বিবর্ত্তন ও তৎসহ যে-সকল পুণ্য-স্মৃতি মহানুভবগণ ইহার উন্নতি-কল্পে

জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র সাধক-জীবনের স্থূলকথা, ও স্থলবিশেষে তাঁহাদের রচনাদর্শসমূহ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মাতৃভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-বৃদ্ধি যে জাতীয় জীবনের উন্নতির ধ্রুব লক্ষণ, তাহা এখন আর, আশা করি, বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। নিধুবাবুর সহিত একমত হইয়া কে না বলিবে—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চত্য মনীষী Thomas De Quency বলিয়াছেন—'মাতৃভাষার উন্নতি-কল্পে, প্রত্যেক সুসন্তানেরই জীবনের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য।'

অনেক দিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ এক পুরস্কার-বিতরণ সভার বঙ্গের প্রথম গবর্ণর Lord Carmichael যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ-যোগ্য; তিনি বলিয়াছিলেন—

'Sound knowledge of one's mother-tongue is the best foundation of all true education. It is a great thing to be proud of your mother-tongue and to be able to speak it well and to standup for it, against all comers. It increases a man's pride in his race and country. I am proud that I am a scotsman and I hope that each of you boys, is likewise proud of your nationalities, whether you be Nepalee, or Bhutia, or Bengali, or Lepcha, for its own sake'. (—Jan. 21, 1913)

অর্থাৎ—'মাতৃভাষার সম্যক্ জ্ঞানার্জ্জনই, প্রকৃত সুশিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি। নিজের মাতৃভাষায় গৌরব-বোধ, মাতৃভাষায় সুন্দররূপে মনোভাব পরিব্যক্ত করিবার ক্ষমতা-র্জ্জন, এবং ইহার বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হওয়া—এ সকল অতি উচ্চাঙ্গের কথা। ইহাতে প্রত্যেকেরই, নিজ নিজ দেশ ও জাতির জন্য গৌরব বোধ করিবার ভাব সমধিক প্রবুদ্ধ করিয়া দেয়। আমি নিজে একজন স্কট এবং এই জন্যই আমি নিজকে সমধিক গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আশা করি, তোমরাও—নেপালী, ভুটানী, বাঙ্গালী বা লেপচা—যে-কোন জাতিই হও না কেন—নিজ নিজ জাতির জন্য গৌরব বোধ করিবে।'

Rev. Long বলিয়াছেন—Mother tongue is the mouldering element of all communities. অর্থাৎ—মাতৃভাষাই সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের মূলীভূত উপাদান।

বঙ্গসাহিত্যের এই ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া বা ইহার ক্রমোন্নতির ধারানুবর্ত্তন করিয়া যদি কাহারও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি ইহার উন্নতি-কল্পে হৃদয় মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতির দীনতম লেখক যথেষ্টরূপ পুরস্কৃত হইবে।

(৯) যুগ-নির্দ্দেশ—গ্রন্থ-বিভাগ—উষার অরুণ আভার ন্যায় অগ্রদূতরূপে জয়দেব ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি ও সাধনার পুণ্য-প্রভাবে, ঘোরতমসাচ্ছন্ন সমগ্র বঙ্গদেশ আলোকিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। তাঁহার ভাস্বর আত্মালোকের রশ্মি-রেখা-সম্পাতে প্রেম সরোবরে অগণিত শতদল যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র দেশ পুলকিত এবং অপূর্ব্ব সৌরভে ক্ষুদ্র মানবচিত্তকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। নিতাইচাঁদের স্নিগ্ধরশ্মির সুখস্পর্শে একেবারে শত-শত কুমুদ দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ, গৌর-নিতাইয়ের প্রেম-পীযূষধারায় অভিষিক্ত হইয়া, ক্ষীণপ্রাণ ও হীনবুদ্ধি মানবের নীরস ও শুষ্কচিত্ত সরসতা ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিল—দেশময় গ্রামে গ্রামে একাধারে ভক্ত কবি ও প্রেমিকের উদ্ভব হইল। তাঁহাদের দেশপ্লাবী অমৃতস্পর্শী প্রেম-বন্যায় অভিসিঞ্চিত হইয়া, সেই প্রেম-প্রকাশের প্রচেষ্টায় বঙ্গসাহিত্যে যে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বঙ্গ সাহিত্যের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কাল। এই নিমিত্ত আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালকে কেন্দ্র করিয়া, আমাদের আরব্ধ গ্রন্থের বিভাগ-নির্দ্দেশ করিলাম—

প্রথম ভাগ —প্রাক্-চৈতন্য যুগ;
দ্বিতীয় ভাগ—চৈতন্য-যুগ;
তৃতীয় ভাগ—চৈতন্যোত্তর যুগ;
চতুর্থ ভাগ—আধুনিক যুগ।

বলা বাহুল্য, যে, বর্ণন-সৌকর্য্যার্থ প্রত্যেক ভাগই আবার বহু উপবিভাগ ও অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। পাঠকগণ ক্রমেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। (ক্রমশঃ)

জেনেভা-যাত্রী বঙ্গনারীর পত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুকুমারী রায় চৌধুরী

বার্লিন,

৩০শে জুন, ১৯৩০ সাল।

আমরা পরশুদিন জেনেভা ছাড়ি এবং আজ বার্লিনে পৌছেছি। তোমার জামাইবাবুর শরীর অসুস্থ থাকায়, আমাদের জন্য শোবার গাড়ী (Sleeping Car) নওয়া হ'য়েছিল। ঐ গাড়ীতে দু'জনকার থাকার ও শোবার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ঘণ্টা টিপ্‌লেই পরিচারক এসে চা প্রভৃতি দিয়ে যেত। "জেনেভা বার্লিন এক্স্‌প্রেস্" ঘণ্টায় ৫০ মাইল চলে। গাড়ীর স্প্রিং, গদি প্রভৃতি এত সুন্দর যে অত জোরে গাড়ী চলে তা' মোটেই টের পাওয়া যায় না। ট্রেনখানি নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে বার্লিনে পৌছায়—আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ী হ'তে নেমে, মোটরে ক'রে ব্রেডার সাহেবের শ্রমিক-কার্য্যালয়ে (Labour Office) গেলাম। সেখানে গিয়ে শুন্‌লাম, তিনি আমাদের আন্‌বার জন্য মোটর নিয়ে ষ্টেশনে গিয়েছেন। তখন বুঝ্‌লাম আমরা ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে আসায় তাঁর সাথে দেখা হয়নি। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে ব্রেডার সাহেব এসে উপস্থিত হ'লেন।

কার্ল ব্রেডার খুব অমায়িক ব্যক্তি—ইনি ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে, বাংলায় পাটকলের মজুরদের অবস্থা দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। সেইসময় তোমার জামাইবাবুর সাথে তাঁর আলাপ হয়। তিনি এখনো আমাদের মনে রেখেছেন দেখে খুব খুশী হ'য়েছি। ব্রেডার সাহেব এখন সমগ্র জার্ম্মান দেশের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের কর্ত্তা।

১লা জুলাই।

আজ কার্ল ব্রেডার আমাদের জার্ম্মান সম্রাটের বাগান-বাড়ী 'পট্‌স্‌ডাম্' (Potsdam, the Country Caste of Kaiser) দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন—বাড়াটি এখান হ'তে ৫০ মাইল দূরে। সুন্দর প্রাসাদ এবং চমৎকার ফুলের বাগান দেখ্‌লাম, এই প্রাসাদে একসময় কাইসার বাস ক'রতেন। এখন এই বাড়ী এবং বার্লিনের প্রাসাদ যাদুঘর করা হ'য়েছে।

আমরা এখান হ'তে, ব্রেডার সাহেবের সাথে বার্লিনের পার্লামেণ্ট দেখ্‌তে গেলাম। তাঁর একজন ইংরাজী-জানা সেক্রেটারী আমাদের সাথে ছিলেন।

কার্ল ব্রেডার, এখানকার অনেক মেম্বরদের সাথে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। এখানে মোট ২০০ শত জন মেম্বর আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২০।২২ জন মহিলা মেম্বর র'য়েছেন দেখ্‌লাম। কিছুক্ষণ ধ'রে এখানে বক্তৃতা শোনা হ'ল। পার্লামেণ্টের কমিউনিষ্ট্ মেম্বররা প্রকাশ্যে কন্‌সারভেটিভ্ বক্তাকে গালি দিলেন। এখানে ভয়ানক রকম হৈচৈ হয় দেখ্‌লাম।

আমরা প্রায় সন্ধ্যা ৭টার সময় বাসায় ফিরে এলাম। শুন্‌লাম শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পুত্র আমাদের জন্য ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা ক'রে শেষে চ'লে গেছেন। তিনি পুন-রায় আস্‌বেন ব'লে গেছেন।

২রা জুলাই।

আজ আমরা মোটরে ক'রে এখান থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি সিমেণ্টের কারখানা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে একটি সুন্দর হোটেলে গেলাম। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য মস্ত ভোজ হয়। প্রায় ২০০ শত নরনারী ঐ ভোজে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা সকলেই শ্রমিক-কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী। একজন সাহেব সকলকার হ'য়ে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলেন। পরে আমরা সকলে মিলে আহার ক'রতে বস্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে আমি সেই হোটেলটির বাগান দেখবার জন্য যায় হ'লাম। একজন সুইস্ মহিলা আমার সাথী হ'লেন। তিনি আমার অনেক গাছের নাম ব'লে দিলেন। নানারকম সুন্দর ফল-ফুলের

গাছ দেখ্‌লাম। এই স্থানটি ভাল ক'রে দেখ্‌ব ব'লে সন্ধ্যার সময় রাস্তায় বার হ'য়ে পড়্‌লাম। এখানেও সুন্দর সুন্দর ছোট-বড় নানারকম হ্রদ আছে দেখ্‌লাম—এগুলি দেখ্‌তে আমার ভারী ভাল লাগে। এখানে বহু নরনারী মোটর-বোটে ক'রে হ্রদের বুকে ভাস্‌ছেন। আমরাও একখানি বোটে উঠে কিছুক্ষণ ঘুরলাম; আমাদের বাসায় ফিরতে ১০টা বেজে গেল।

৩রা জুলাই।

আজ শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পুত্র, তাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ফরাসী পত্নী আমাদের বাসায় এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় হ'চ্ছেন ডাক্তার। এঁদের সকলকে আমার ভাল লাগ্‌লো। প্রায় ঘণ্টা-দুই আমাদের সঙ্গে গল্প ক'রে ও পরে চা খেয়ে এঁরা চ'লে গেলেন।

ঢাকার বোটানী-ছাত্র শ্রীযুক্ত গুহও ছিলেন। ইনি আমাদের এখানে প্রায়ই আসেন। শ্রীযুক্ত গুহ একসময় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সহকারী ছিলেন।

এখানে প্রায় ৪০।৪৫ জন ভারতীয় ছাত্র এবং বাসিন্দা আছেন—থিয়েটার বা বায়স্কোপে তাঁদের অনেককেই দেখ্‌তে পাই।

এইবার বার্লিন সহরের কথা তোমায় কিছু লিখি। এই সহর সুন্দর সাজান—চারিদিকে ফল-ফুলের গাছ এবং নানারকম সুন্দর হ্রদ আছে। এখানকার রাস্তাগুলি 'বালিগঞ্জ এভিনিউয়ের' মত চওড়া। এখানে মস্ত মস্ত প্রাসাদ আছে।

জার্ম্মান জাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি—তার প্রমাণ যুদ্ধের পর ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেই এরা ধ্বংসের পথ হ'তে কী সুন্দর অভ্যুত্থান ক'রেছে। যুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার হ'য়েছিল—অর্থাভাবে এবং অনাহারে কত লোক মারা গিয়েছিল—কিন্তু আজ সেই জাতি জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে! আজ তার কল-কারখানা, রেল, জাহাজ প্রভৃতি পুরাদস্তুর রকম চ'ল্‌ছে।

এই জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং...যাক্‌ ব'লছিলাম কি, এখানকার মহিলারা সুইস্‌ মহিলাদের চাইতে উন্নত। এঁরা গৃহস্থালী-কার্য্যে, শিশু-পালনে খুব পটু। এখানকার ধনী মহিলারাও বিলাসিতা ভালবাসেন না। জার্ম্মান মহিলারা সর্ব্ববিষয়ে পুরুষদের মত সমান অধিকার পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি এঁরা মদ্যপান বন্ধ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ক'রছেন।

Schauspielhaus—বার্লিন

আমরা শীঘ্রই ব্রুসেল্‌স্‌ যাব এবং সেখান হ'তে ৫।৬ দিন পরে লণ্ডনে রওনা হব।

তোমার জামাইবাবুর জ্বর এখনো ছাড়েনি। দেখি লণ্ডনে গিয়ে কি হয়।

ব্রুসেল্‌স্‌;
১১ই জুলাই।

আমরা বার্লিন ছেড়ে কোলো প্রভৃতি জার্ম্মান সহর হ'য়ে বেল্‌জিয়মে পৌছেছি। উপস্থিত ব্রুসেল্‌স্‌ সহরের একটি প্রকাণ্ড হোটেলে আছি।

এ সহরটি প্রায় ১০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত; তার প্রমাণ এখানকার অতি-প্রাচীন গির্জ্জাগুলি।

বেল্‌জিয়ম অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ফরাসীর অধীনে ছিল। ১৮৩০ সালের যুদ্ধে ইহা স্বাধীন হয়। এবৎসর এখানে শতাব্দীর স্বাধীনতার জন্য মহা উৎসব চ'ল্‌ছে। এণ্টওয়ার্প, ঘেণ্ট, ব্রুসেল্‌স্‌ প্রভৃতি সহরে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হ'য়েছে। কয়েকদিনের জন্য রেলের ভাড়া অর্দ্ধেক হ'য়ে গিয়েছে। নানা দেশ হ'তে বহু যাত্রী এই উৎসব

দেখ্‌তে আস্‌ছে। তাদের নানারকম সাজসজ্জা এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে ভারী মুগ্ধ হ'চ্ছি। আমি তোমার জামাইবাবুর সাথে প্রদর্শনী দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। সেখান হ'তে পছন্দমত কয়েকটি জিনিষ নিয়ে এসেছি। এখানকার জিনিষপত্র খুব সস্তা ব'লে মনে হয়।

শুন্‌লাম এখানকার রাজা লিওপোল্ড দয়ালু—প্রজারা তাঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তিনি একজন মস্ত যোদ্ধা। এদেশের রাজকার্য্যের সকল ভার এখানকার পার্লামেন্টের উপর। এ দেশের নারীদের ভোট নাই। এঁরা রোমান-ক্যাথলিক—পলিটিক্সের কোন ধার ধারেন না। এখানকার নারী সর্ব্বদা গৃহস্থালীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

১২ই জুলাই।

আজ এখানকার পার্লামেন্টের মেম্বর শ্রীযুক্ত সামরসেন এম পি'র বাড়ীতে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—তাঁর স্ত্রীর সাথে আমার আলাপ হ'ল। ইনি মিষ্টভাষিণী—খুব পরিশ্রম ক'রতে পারেন। গৃহস্থালীর সকল কাজ প্রায় নিজে ক'রে থাকেন। এঁর নিজের তৈয়ারী কতকগুলি রেশমের কাজ-করা ছবি প্রভৃতি দেখ্‌লাম।

আমরা বিকালের দিকে মোটরে ক'রে "মজুর-প্রাসাদ" দেখ্‌তে গেলাম। এটি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এর ভিতরে "কো অপারেটিভ্‌ সোসাইটী অফিস" (Co-operative Society Office) প্রভৃতি আছে। এখানকার মিটিং-হল, পাঠাগার প্রভৃতি খুব বড় ও বেশ সাজান। এই অট্টালিকা হ'তে সমগ্র বেল্‌জিয়মের মজুরদের কল্যাণ-সাধন হয়। এখানকার সব দেখে নিয়ে পরে সহরের দু'মাইল দূরে আমরা মজুরদের বাসা দেখ্‌তে যাই। সুন্দর বাগানের মাঝে ছোট ছোট বাড়ীগুলি দেখ্‌তে ভারী ভাল লাগ্‌ল। এখানে ফল এবং ফুলের বাগানও আছে। মাসিক ৩০৲ টাকা ক'রে চারখানা ঘরের ভাড়া। ঘরগুলি খুব ছোট নয়—এর ভিতরে সামান্য আসবাবপত্রও আছে। কিছু দূরে দোকান ও গোশালা আছে দেখ্‌লাম। এখানকার মজুরদের থাকার কোন কষ্ট নেই দেখে ভারী সুখী হ'লাম।

ফেরবার পথে একটি হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। বাসায় ফিরলাম ৬টায়। শ্রীযুক্ত গুহ আমাদের জন্য বসে আছেন দেখে তাঁর সাথে গল্প ক'রতে বস্‌লাম। চৌধুরী মহাশয় ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন দেখে তাঁকে পাশের আরাম-কেদারাখানিতে (easy-chair) শুতে বল্‌লাম।

১৪ই জুলাই।

আজ মোটরে ক'রে সমস্ত সহর দেখে নিলাম। এখানকার একটি দোকান হ'তে এনামেল-করা সেফ্‌টিপিন্‌ ও একজোড়া কানের দুল কিন্‌লাম। সন্ধ্যার সময়, চৌধুরী মহাশয় এখানকার থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার জন্য প্রস্তাব করলেন—আমি রাজী হ'লাম। রাত্রের আহার সেরে নিয়ে পথে বার হ'লাম। শ্রীযুক্ত জু—আমাদের সাথী হ'লেন। বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। শ্রীযুক্ত জু—আমাদের পৌছে দিয়ে নিজের বাসায় চ'লে গেলেন।

লণ্ডন,
১৭ই জুলাই।

আজ আমরা এখানে পৌছেছি। রাত্রে "নূতন ইণ্ডিয়া হাউসে" নিমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী ঐখানে মস্ত ভোজের আয়োজন ক'রেছিলেন। সেখানে রাজা, মহারাজা, লাট, ডিউক প্রভৃতি অনেকে এসেছিলেন। আমি কয়েকটি নামের তালিকা তোমায় দিলাম। যথা,—

বরোদার মহারাজা এবং মহারাণী, জয়পুরের মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজা, কপূর্রতলার মহারাজা, লর্ড রেডিং, লর্ড এবং লেডি ইঞ্চকেপ্‌, লর্ড বার্ণহাম, লর্ড মেষ্টন, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডাঃ প্রমথ সিন্‌, মিঃ ওয়েজ উড্‌ বেন, মিসেস্‌ ফিলিপ স্নোডন, স্যার এলবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী এবং কুমারী যোশী প্রভৃতি।

স্যার এবং লেডি চট্টোপাধ্যায়ের মনস্কামনা এতদিনে পূর্ণ হ'য়েছে—তাঁরা মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে ঐখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেখানে নানারকম আমোদ-প্রমোদ থাকায় আমরা একটু রাত ক'রে বাসায় ফিরে এলাম।

১৯শে জুলাই।

আজ আমরা প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের বাগান-বাড়ীতে গিয়েছিলাম। এই

বাগান-বাড়ীটির নাম "চেকার্স" (chequers)—লণ্ডন হ'তে ৪০ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই বাড়ীটি দেখ্‌তে ভারী সুন্দর—৭৮০০ শত বিঘা জমির মাঝখানে প্রকাণ্ড প্রাসাদটি অতি সুন্দরভাবে তৈয়ারী। প্রাসাদের চারিপাশে ফুলের বাগান ও বাগানের মাঝে মাঝে পাথরের নানারকম সুন্দর মূর্ত্তিগুলি সাজান আছে। বাড়ীর ভিতরে নানারকম প্রাচীন আস্‌বাবপত্র আছে—সুন্দর সুন্দর ছবি প্রত্যেক ঘরেই আছে। ১৯২৯ সালে লর্ড লি ব্রিটিস্‌ গভার্ণমেণ্টকে "চেকার্স" দান করেন। সেই সময় হ'তে প্রধান মন্ত্রীরা অর্থাৎ লয়েড্‌ জর্জ্জ, ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতি এখানে সময় সময় বাস ক'রে থাকেন। ইহা বহু বৎসর পূর্ব্বে গঠিত।

অলিভার ক্রোমওয়েলের সময়কার তলোয়ার, পিস্তল, পোষাক, টুপি প্রভৃতি অনেক জিনিষ এখানে আছে। তাঁর হাতের লেখা চিঠি রয়েছে দেখ্‌লাম। ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব আমাদের এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সমস্ত জিনিষ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর পুত্র জন ও সেসময় আমাদের কাছে ছিলেন। তাঁর কন্যা ঐ সময় গ্রামের কোনও শিক্ষালয়ে পারিতোষিক বিতরণ ক'রতে গিয়েছিলেন সেইজন্য তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাইনি। জন নিজ হাতে আমাদের চা প্রভৃতি দিলেন। মন্ত্রী-পত্নীর সাথে আমাদের আলাপ হ'ল। আমরা প্রায় ঘণ্টাতিনেক সেখানে কাটিয়ে বাসায় ফিরলাম।

রাত্রে শ্রীযুক্ত বসু ও মিত্র আমাদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য হাজির—চৌধুরী মহাশয়ের শরীর ভাল না থাকায় আমি যেতে চাইলাম না। তাঁরাও আর গেলেন না। আমি শ্রীযুক্ত বসুকে গান করবার জন্য বল্‌লাম। তিনি একখানি বাংলা গান ধ'রলেন। বহুদিন পরে বাংলা গান শুন্‌তে ভারী ভাল লাগলো—তাছাড়া শ্রীযুক্ত বসুর গলা খুব চমৎকার। পরে এঁদের কথা তোমায় লেখ্‌বার ইচ্ছা রইল।

২১শে জুলাই।

এই কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু মিলে গিয়েছে—এঁরা সকলেই আমাদের দেশের ছেলে। আমি তোমায় তিন কুলীন বন্ধুর কথা কিছু লিখ্‌ব—শ্রীযুক্ত বসু, ঘোষ এবং মিত্র আমাদের এখানকার দিনগুলি বেশ সরগরম ক'রে রাখ্‌ছেন। শ্রীযুক্ত মিত্র খুব ভাল বেহালা বাজান—ঘোষ ভাল বাঁশী বাজাতে পারেন এবং বসু এত চমৎকার গাইতে পারেন যে তিনি গান ক'রলে সেখানে বহুলোক এসে জমা হয়। এ-হেন তিন গুণী ব্যক্তি আমাদের বাসায় প্রত্যহ আসেন—এবং তাঁদের গান-বাজনা শোনার সৌভাগ্য আমাদের প্রায়ই হয়।

আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় একটি ছোটখাট সাহিত্য-সম্মিলন বসেছিল। এখানে দেশ-বিদেশের সাহিত্যচর্চ্চা চল্‌ছিল—কিন্তু আমার মনে হয় তার চাইতেও বেশী চল্‌ছিল বাক্‌যুদ্ধ! আমি দুই কানে আঙুল দিয়ে কোন

Gare du Nord et Place Rogier—ব্রুসেল্‌স্‌

রকমে ব'সেছিলাম। শেষে মাথায় এক ফন্দি এল—নিজের হাতে তৈয়ারী খাবারগুলো ডিসে ক'রে সাজিয়ে এনে এক-একে মেজের (Table) উপর জড় ক'রতে লাগ্‌লাম। দেখি, সাহিত্যচর্চ্চা থেমে গেছে—কেহ কচুরী কেহ বা সিঙ্গাড়ায় কামড় দিতে আরম্ভ ক'রেছেন! ভাবলাম আমার বুদ্ধি আছে বটে!...সকলের চা প্রভৃতি খাওয়া হ'লে শ্রীযুক্ত বসুকে গান করবার জন্য অনুরোধ ক'রলাম।

তিনি গাইতে লাগ্‌লেন—

"মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমঃ নমো নমঃ নমো নমঃ নমো,
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝম ঝমো ঝম ঝমো ঝম ঝমো।"

* * * *

ঘোষ এবং মিত্র বাঁশী ও বেহালা বাজাতে লাগলেন। গানখানি পূর্ব্বে তোমার কাছ হ'তে শোনা হ'লেও নূতন লাগল। তাঁকে আরো অনেকগুলি গান করিয়ে তবে ছাড়া হ'ল। গান শেষ হ'লে দেখা গেল রাত ১২টা বেজে গিয়েছে। আজকের মত সভা ভাঙল।

২৩শে জুলাই।

আজ শ্রীযুক্ত পেথিক লরেন্স এম-পি এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। আমরা তাঁর বাড়ীতে গেলাম। এঁদের বাড়ীটি মাঝারি গোছের—সুন্দর সাজান। আমরা যাবামাত্র শ্রীযুক্ত এবং শ্রীযুক্তা লরেন্স আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এঁদের দু'জনকে নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে—১৯২৮ সালে এঁরা আমাদের চন্দননগরের 'কমলালয়ে' আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছিলেন। আমাদের সেই সময়কার ছবি এঁদের ঘরে রয়েছে দেখ্‌লাম।

শ্রীযুক্ত পেথিক লরেন্স এম-পি এখন রাজকোষের (Treasury) সেক্রেটারী হ'য়েছেন। তাঁর সাথে আমাদের ভারত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। শুন্‌লাম স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলনে, শ্রীযুক্তা লরেন্স ২।৩ বার জেলে গিয়েছেন। আমরা কিছুক্ষণ তাঁর ওখানে কাটিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

বিকাল বেলা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-সম্পাদিকা (লণ্ডন শাখা) শ্রীযুক্তা হেনা সেন মহাশয়ার বাড়ীতে গেলাম—সেখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। ডাঃ সেন এবং শ্রীযুক্তা সেন দু'জনেই বাড়ীতে ছিলেন। ডঃ সেন মহাশয় এখন চৌধুরী মহাশয়ের চিকিৎসা ক'রছেন। শ্রীযুক্তা আয়েঙ্গারের সাথে আমার আলাপ হ'ল। ইনি স্যার কে, জি, গুপ্তের ভাগ্নী। শ্রীযুক্তা আয়েঙ্গার তাঁর কন্যার পড়ার জন্য উপস্থিত বিলাতে আছেন।

শ্রীযুক্তা সেন তাঁর নিজের হাতে তৈয়ারী নানারকম খাবার আমাদের দিলেন। আমরা তৃপ্তির সহিত খাবারগুলি খেলাম।

পরে আমরা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যকল্পে একটি অভিনয় করবার কথা তাঁর কাছে পড়ালাম। তিনি বল্‌লেন, ভারতীয় আন্দোলনের ফলে ইংরাজরা এখন বড়ই বিরক্ত আছে—তাদের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না। অবশেষে আমরা সকলে মিলে স্থির ক'রলাম, শ্রীযুক্তা লরেন্সকে নিয়ে ২।১ জন বিখ্যাত অভিনেতার কাছে যাওয়া হবে। তাঁদের কাছে এই বিষয় আলোচনা ক'রে তাঁরা যা বলেন তাই করা হবে।

রাত্রে আমরা 'হাউস অফ কমন্সে' (House of Commons) মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতি মন্ত্রী এবং মন্ত্রী-পত্নীদিগের সাথে ডিনার খেলাম। আমরা ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের সামনে বসেছিলাম। শ্রীযুক্ত যোশী এবং কুমারী যোশীও ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া এবং বক্তৃতা শেষ হ'তে রাত্রি ১১টা হ'য়ে গেল। আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

২৪শে জুলাই।

আজ রাতে আমাদের বাসায় একটি গানের আসর বসেছিল। সেই তিন বন্ধু আরো কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন। এঁরা সকলেই গান ক'রতে পারেন। শ্রীযুক্ত সরকার নামে এক ভদ্রলোক বেশ ভাল গাইতে পারেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বসু গাইলেন। তিনি থাম্‌লে পর আমি শ্রীযুক্ত সরকারকে গাইবার জন্য অনুরোধ ক'রলাম।

তিনি প্রথমেই ধরলেন, "ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢা...লো—" গানখানা পূর্ব্বে কোথায় শুনেছি ব'লে মনে হ'লো—হঠাৎ তোমার রহস্যপূর্ণ চিঠির কথা মনে প'ড়ে গেল। শ্রীযুক্ত সরকারকে ব'ল্‌লাম, এর পর কিন্তু "যাও যাও যাও যাবার বেলায় রাঙিয়ে দিয়ে যাও" গানখানা গাইতে হবে। সকলে প্রশ্ন করলেন, কেন? চৌধুরী মহাশয় তখন, দত্ত সাহেবের সাথে তোমাদের বিখ্যাত নর্ত্তক উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখ্‌তে যাওয়ার কথা এবং তিনি ঐ দু'টি গানের কি রকম ভূয়সী প্রশংসা ক'রেছিলেন তাও বলতে ছাড়লেন না—সকলে শুনে খুব হাস্‌তে লাগলেন।

পরে আরো ২।৪ খানি গান ক'রে তাঁরা বিদায় নিলেন।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌লো।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যের মূল উৎস

শ্রী সরোজনাথ ঘোষ

কোন দেশ বা জাতির সভ্যতার দ্যোতক সেই দেশ বা জাতির সাহিত্য। সভ্যতার উন্নতির পরিমাপ করিতে হইলে সেই দেশের সাহিত্যের কষ্টিপাথরকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা অনিবার্য্য। সভ্যতার নানাবিধ পারিপার্শ্বিক বিকাশ থাকিতে পারে; কিন্তু সাহিত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রতীচ্য বা প্রাচ্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কি বলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিবিশিষ্ট যে কোনও সভ্য মানুষ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

চন্দ্র-সূর্য্য, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-শোভিত সৌরজগৎ সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য—বৃক্ষলতা-শোভিত এই বসুন্ধরা ও তাহার বিচিত্র রূপ আবহমানকাল হইতেই নানাভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। মানুষ তাহা নয়ন মেলিয়া দেখে, শব্দময় জগতের উৎকট ও মধুর নানাপ্রকার শব্দতরঙ্গ তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, গন্ধময় জগতের ঘ্রাণপ্রবাহ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে পুলকিত অথবা বিরস করিয়া তুলে। এইরূপে বস্তুতান্ত্রিক জগতের রূপ রসগন্ধ স্পর্শানুভূতি মানুষের অন্তরে নানাপ্রকার ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল অনুভূতিকে প্রকাশ করে মানুষের ভাষা। সেই ভাষার দ্বারা যাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় তাহাই সাহিত্য।

সভ্য মানুষ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অনুভূতিকে ভাষারূপ বাহনের সাহায্যে অন্যের অনুভবগম্য করিয়া তুলে, তাই তাহার সাহিত্য দেখা যায়। সভ্য মানুষ যাহাদিগকে অসভ্য বা বর্ব্বর নামে অভিহিত করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ভাষা থাকিলেও তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সভ্যতার প্রধান মাপকাঠি সাহিত্য।

এজন্য যে দেশ বা জাতি যতদূর সভ্যতামার্গে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সাহিত্য সেই অনুপাতে পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে।

সভ্যতার আনুষঙ্গিক নানাবিধ প্রকাশকে বাদ দিয়া এখানে শুধু সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কারণ, অন্যান্য বিষয়ের যে সকল প্রকাশ, সমস্তই সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। শৌর্য্যবীর্য্য, ধন-সম্পদ, আচার-বিচার, ধর্ম্ম, জ্ঞান—সভ্য দেশ বা জাতির যাহা কিছু লক্ষণ, সমুদয় ব্যাপারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যের প্রভাব ও পুষ্টির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান এখানে নাই।

ইতিহাসে এমন কোনও সভ্যদেশ বা জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না, যাহার সাহিত্য ছিল না। এমন হইতে পারে, কালধর্ম্ম প্রভাবে সেই সভ্য জাতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা অন্য কোনও শক্তিশালী জাতির সাহিত্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ সাধন ঘটিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য ব্যতীত কোনও সভ্যতার উদ্ভব, প্রচার বা পরিপুষ্টি হয় নাই, হইতে পারে না, ইহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে হইবে।

সাহিত্য বলিতে, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাকেই বুঝাইবে। পণ্ডিতগণ এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মানব-সভ্যতার প্রকাশ দুইভাবে ঘটিয়া থাকে—বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক। কিন্তু সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিকাশ যে দেশে যে জাতির মধ্যে ঘটিয়া থাকে, সেই দেশ বা সেই জাতি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সোপানপথে আধ্যাত্মিকতার সৌধচূড়ায় আরোহণ করিয়াছে, ইহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবার সম্ভাবনা। এমন হয়ত হইতে পারে, কোনও দেশ বা জাতি শুধু বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষদেশে উপনীত হইবার পর আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই হয়ত অন্য সভ্যতার দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া পড়িয়াছে;

সুতরাং সে দেশ বা জাতি সভ্যতার তেমন উন্নতি করিতে পারে নাই ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। প্রতীচ্য দেশের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন হইলেও, সে মতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি? গ্রীক্ ও রোমাক সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া অন্ত সভ্যতায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। দেখা যায়, এই দুই প্রাচীন জাতি সভ্যতামার্গে বিচরণ করিলেও আধ্যাত্মিক মার্গে তাহাদের অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহাতে সমগ্রজাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় ইহারা চরম উন্নতি সাধন করিয়াছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সৌধচূড়ায় আরোহণ করিবার বিরাট চেষ্টা এই উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃষ্ট পরিমাণে আরব্ধ হয় নাই। কিছু কিছু হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। যে সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন তাহা অনুসৃত হইলে আজ গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বিলোপসাধন ঘটিত না।

মিশরের ফারোয়া নৃপতিবৃন্দের যুগে সে দেশে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার পথে তদানীন্তন মিশরীয় জাতি অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল কিনা তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় এ যুগে পাওয়া যায় না।

অধুনা প্রতীচ্য জগৎ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চরমশীর্ষে উন্নীত হইয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার পথে সেই অনুপাতে অগ্রসর হইবার লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে না। এই কারণেই তৎসম্বন্ধে প্রতীচ্য মতবাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কোন কোন মনীষী প্রতীচ্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের এই ধারণারই পোষক। বস্তুতান্ত্রিকতা যখন আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয় অথবা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখনই মানব-সভ্যতা উন্নত অবস্থায় উন্নীত হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, সাহিত্যের মূল উৎস কোথায়।

সাহিত্য গড়িয়া উঠে, সেই দেশের কর্ম্ম, ধর্ম্ম, মনোবৃত্তি এবং আর্ত্তব আবেষ্টনের প্রভাবে। মানুষের অনুভূতি যখন বিকাশোন্মুখ হইয়া প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে, তখন ভাষার সাহায্যে সে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। এই রূপ বা মূর্ত্তি যখন ক্রমশঃ সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতে থাকে, তখন তাহার পরিপুষ্টি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

দেশের প্রতি ঐকান্তিক মমতা ও প্রেম, দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা যখন মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করে, অভিভূত করিয়া তুলে, তখন প্রকাশিত সাহিত্যে তাহার প্রভাব দৃষ্ট হইতে থাকে।

সাহিত্য যখন সুন্দরতর হয় ও পরিপুষ্টির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সেই সাহিত্যে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। দেশের প্রতি ভক্তি, স্বজাতির কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা তখন আপনা হইতেই আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

এই বিরাট ভূমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত যে সকল সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাদের সাহিত্য এখনও বিদ্যমান আছে, সূক্ষ্মভাবে সেই সকল সাহিত্য আলোচনা করিলে এই সত্যই প্রমাণিত হয়।

মোটকথা, প্রকৃত সাহিত্য দেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য ব্যতীত কখনই জন্মিতে পারে না। বস্তুতান্ত্রিকতা হইতে আধ্যাত্মিকতা পর্য্যন্ত সাহিত্যের লীলাভূমি। দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি—সমস্তই বস্তু হইতে জাত এবং অধ্যাত্ম ব্যাপার লইয়াই তাহার চরম পরিণতি। একটু ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে এই সত্যে উপনীত হইতেই হইবে।

কোনও সাহিত্য স্বজাতি ও স্বদেশকে বাদ দিয়া রচিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যসমূহে ইহার অমোঘ প্রমাণ রহিয়াছে।

সুতরাং সুধীজনকে স্বীকার করিতে হইবে, সাহিত্যের মূল উৎস স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি। যাহার মধ্যে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নাই, স্বদেশবাসী বা স্বজাতির প্রতি প্রেম নাই, তাহার রচিত সাহিত্য কখনই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। প্রতীচ্য জগতের সাহিত্য যে সুন্দর ও মধুর তাহার প্রধান কারণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনায় স্বজাতি-বাৎসল্য ও স্বদেশপ্রেম পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাব যে পরি

মাণে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, আধ্যাত্মিকতার প্রভাব সেরূপ পরিপুষ্ট হয় নাই। আধুনিক প্রতীচ্য জগতের সাহিত্য সম্বন্ধে পরে বলিতেছি, কিন্তু রোমক ও গ্রীক সভ্যতার যুগে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেও আধ্যাত্মিকতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াও গ্রীসের দর্শনশাস্ত্র এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, যাহার পর অগ্রসর হইবার শক্তির পরিচয় গ্রীক মনীষীদিগের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আধুনিক প্রতীচ্য জগৎ বিজ্ঞানশাস্ত্রে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে, তাহার দর্শন ও সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ অপূর্ব্ব পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও বস্তুতান্ত্রিকতার সীমারেখা ছাড়াইয়া তাহা আধ্যাত্মিকতার সৌধচূড়ার দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে।

এখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দেখা যাউক। বস্তুতান্ত্রিকতার এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের স্মরণাতীত যুগ হইতে প্রবর্ত্তিত সভ্যতা কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এখন গবেষণার বিষয়। বিরাট সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য মন্থন করিয়া তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিবার মত সাধনা ও পরিশ্রম এখনও পর্য্যন্ত আশানুরূপভাবে কেহ করেন নাই। কিন্তু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ মাঝে মাঝে যে সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিতেছেন, তাহা হইতে এইটুকু অবগত হওয়া যায় যে, ভারতীয় সভ্যতায় একযুগে বস্তুতান্ত্রিকতা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং এমন পরিপুষ্ট সাহিত্য কোনও সভ্যদেশে উদ্ভূত হয় নাই; এ কথা অতিরঞ্জিত বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

বস্তুতান্ত্রিকতার সহিত আধ্যাত্মিকতার এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন পৃথিবীর অন্য কোনও সাহিত্যে নাই, একথা সগর্ব্বে বলিতে পারা যায়।

বস্তুতান্ত্রিকতা হইতে আধ্যাত্মিকতার সৌধচূড়ায় কিরূপে ভারতীয় সভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এজন্য সংস্কৃত সাহিত্য প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত অমর হইয়া থাকিবে। নানা অভিঘাতের মধ্য দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিতে হইলেও এই অপূর্ব্ব সাহিত্যের প্রবাহধারা মন্দীভূত হয় নাই। অন্ধকার যুগে তাহার প্রবাহধারা ক্ষীণ হইয়া গেলেও আবার নবোদ্যমে তাহার গতি যেন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যসমাজেও বিসর্পিত হইতেছে এবং কালে তাহা আরও প্রবল হইবে ইহা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্য অন্ততঃ সহস্র বৎসরের পুরাতন। ইহার উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্টই রহিয়াছে। বিগত ৫০।৬০ বৎসর হইতে এই সাহিত্য ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে। নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও বাঙ্গালা সাহিত্য সভ্যসমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাকে তুচ্ছ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সত্য বটে বঙ্গসাহিত্যের নানাবিভাগে এখনও অনেক দৈন্য রহিয়াছে, কিন্তু কালে, প্রকৃত সাহিত্য-সাধকবর্গের একান্ত তপস্যার প্রভাবে সে সকল দৈন্য নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইয়া আমাদের বঙ্গসাহিত্য অত্যুচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিবে।

বঙ্গসাহিত্যের খাতে যেদিন প্রবাহবেগ তরতরভাবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন দেখা গিয়াছিল, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই মূল উৎসের সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি এত দ্রুত কখনই সংঘটিত হইতে পারিত না।

যাঁহারা বলেন, বঙ্গসাহিত্যে বহুমুখীনতার অভাব বিদ্যমান, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতবিরোধ নাই। এখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন কোন ভাব প্রকাশ করিবার অনেক সুষ্ঠু শব্দ নাই। ইহা সত্য। কিন্তু সে দৈন্য দূরীভূত করিবার জন্য সাহিত্য-সাধকগণের প্রাণপণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। শব্দসম্পদের অফুরন্ত খনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি যদি বাঙ্গালী সাহিত্য-রসিকদিগের অনুরাগ-দৃষ্টি আরও প্রবল হয়, তাহা হইলে ভাবপ্রকাশের জন্য কোনও শব্দেরই অভাব ঘটিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা

নাই। কিন্তু অনেক সাহিত্যসেবী এবিষয়ে প্রয়োজনীয় সাধনা করিতেছেন ইহা স্বীকার করা চলে না।

বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণ মূল উৎসের সন্ধান করিয়া তাহার প্রেরণায় যদি আজ সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতে পারেন, নকল সাহিত্যের রচনা না করিয়া আত্মানুসন্ধান দ্বারা দেবী ভারতীর পূজায় অবহিত হন, তাহা হইলে বস্তুতান্ত্রিকতা হইতে আধ্যাত্মিকতার সৌধচূড়ায় বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরবময় আসন গ্রহণ করিতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির সাধনা সমাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রেম আপনা হইতেই আবির্ভূত হইবে। এই বিশ্বপ্রেম সংস্কৃত সাহিত্যের অস্থি-মজ্জাগত মর্ম্ম ও রূপ। রসিক পাঠকগণ তাহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন। বিশ্ব-সাহিত্য বলিতে আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিব এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য ব্যতীত আর কোনও সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গীনভাবে এ প্রশংসা অর্জ্জনের অধিকারী হয় নাই। ইহা শুধু কথার কথা নহে—প্রমাণিত সত্য। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ন্যায় এমন সর্ব্বজনব্যাপী, সর্ব্বদেশব্যাপী সভ্যতার কখনও উদ্ভব হয় নাই, সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় এমন দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে সুমহান সাহিত্যও এখনও পর্য্যন্ত কোনও দেশে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই।

আধুনিক যুগে যে সকল সভ্যতা ও সাহিত্য পরিপুষ্টির পথে চলিয়াছে, তাহাদের অগ্নিপরীক্ষার সমাপ্তি এখনও ঘটে নাই, ভবিষ্যতের পরিণতি কতদূর অগ্রগামী হইবে তাহাও পরীক্ষাসাপেক্ষ।

কবে হ'তে

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

কবে হ'তে সাথীহারা সে কথায় আর কাজ কিবা,
কেটে ত গিয়াছে কত বর্ষ-মাস, কত রাত্রি-দিবা,
সুখে দুখে মন্দয় ভালোয়,
ছায়ায় আলোয়।
এখন বিদায় শুধু মাগিছে পরাণ,
সাঁঝের সোনার রংয়ে করিয়া সিনান,
নীলিমার পথ বাহি' নীড়ে-ফেরা পাখী
যে গানে সমাপ্ত করে, সারাদিনে যাহা ছিল বাকী;
সেই শেষ-গান,
হ'য়ে আসে আহ্বান
অন্তরে আমার,
নিঃশব্দে নিভৃত পথে, নামে যথা নিশীথ-আঁধার॥

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

"বাবু! উঠুন, আপনার চা, খাবার এনেছি।"

অশোক জাগিয়া উঠিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল তাহার শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া, কালো রাতের ছদ্মবেশে তরুণী ঊষার মত হাস্যমুখী মৌরী! চোখ দু'টি যেন শুকতারার মত স্বচ্ছ—উজ্জ্বল-মধুর আলো জ্বলিতেছে। সে বলিল, "কত বেলা হ'য়ে পড়েছে—উঠুন। আমার সব কাজ ক-খন সারা হ'য়ে গেছে। ঐ বড় মোরগগুলোর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।"

অশোক উঠিবার কোন চেষ্টা না করিয়া, তেমনি অলস-ভাবে বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া বলিল, "আজ আর উঠ্‌তে ইচ্ছে করছে না রে মৌরী!"

খোলা জানালা দিয়া শরত-সকালের সোনালি রোদ এক-ঝলক ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইদিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া প্রবীণ অভিভাবিকার মত মৌরী বলিল, "না, উঠুন, দেখ্‌ছেন কত রোদ উঠেছে! (হঠাৎ উদ্বিগ্ন-ভাবে) আপনার কোনো অসুখ করে নি ত? দেখি!—" বলিয়া মৌরী তার কপালের উপর তার কালো হাতখানি রাখিয়া, শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে লাগিল; তারপর ভুরু বাঁকাইয়া কালো চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া বলিল, "কৈ না ত, কিচ্ছু হয় নি—সব আপনার দুষ্টুমি!"

তাহার একটি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। অশোক এতক্ষণ অসুখের ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল; আর কৌতুকপূর্ণ নয়নে আড়ে আড়ে মৌরীর পানে তাকাইয়া দেখিতেছিল, সে কি করে। এবার সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "পাকা গিন্নীটি হ'য়ে উঠেছিস্ একেবারে! এখন একটি কর্তার যোগাড় না দেখ্‌লে আর চল্‌ছে না।"

মৌরী লজ্জায় মুখ নীচু করিল। তাহার হাসিমুখ হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল, সে বলিল, "বাবু, আমি এবাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারব না!"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে, এখন মুখ ধোবার জল নিয়ে আয় দেখি নি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌরী চলিয়া গেল। সমস্ত সকাল ধরিয়া ফুলের এবং সব্জি-বাগানটির তদারক করিয়া ফিরিল। দুইজন মজুর লাগাইয়া ভগ্নপ্রায় বেড়াগুলি বাঁধিয়া লইল। পাখীর ঘরের তারের জাল আবার মেরামত করিল। কলিকাতা হইতে আনীত বিলাতী মোরগগুলিকে জাল-ঘেরা উঠানে ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদের দানা দিল। তাহারা দেশী মুরগীদের সহিত মিশিয়া কঁক-কঁক করিয়া চরিয়া বেড়াইয়া দানা খুঁটিয়া খাইতেছে—তাহা সে পরমানন্দে উপভোগ করিল।

ভুলো বরাবর প্রভুর পিছু পিছু ফিরিতেছিল। সকালবেলা ডগ্-বিস্কুট খাইয়া তাহার লোভ বাড়িয়া গিয়াছিল। আর ক্ষেতের ভিতর হইতে শূকর, ছাগল প্রভৃতি তাড়াইতে সে ওস্তাদ। অশোক তাহাকে একটু আদর করিল, সে নাচিয়া কুঁদিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে, প্রান্তরের সে শুষ্ক কঙ্করখচিত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মূর্ত্তি আর নাই। বর্ষার নববারিধারা-পুষ্ট তৃণে প্রান্তরপৃষ্ঠ শ্যামচিক্কণ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট তৃণ-ফুলের শিশিরের উপর শরতের সোনার আলো পড়িয়া চারিদিক শোভায়, সজীবতায় ঝলমল করিতেছে।

আগেকার নীলকর সাহেবটি বোধ হয় বেশ সৌখীন ছিলেন; নানান রকম ফল-ফুল-গাছে তাঁর বাগানখানি ভরা। এতদিন অযত্নে পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও শেফালি-গাছের তলায় গুটিকয়েক ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে; অশোক সেগুলি সযত্নে কুড়াইয়া লইল। বর্ষাধৌত সুনীল আকাশ,—স্বপ্নের মত, শুভ্র, লঘু, খণ্ড মেঘ মৃদু বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছিল। আবেশ-ভরা দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া,

অলস মধুর রৌদ্রে ইউক্যালিপটাস গাছে হেলান দিয়া অকারণে অশোক ডাকিল, "মৌরী!"

মৌরী রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল, উত্তর দিল, "যাই—"

সে হাসিমুখে কাছে আসিতে অশোক দেখিল যে সে হাত-মুখ সাবান দিয়া ধুইয়া, কলিকাতা হইতে আনীত তাঁতের রঙীন নূতন কাপড়খানি পরিয়াছে। প্রসাধন-শেষে খোঁপায় লাল ফুল গুঁজিয়াছে। পুরুষের মন-হরণে নারীর বেশভূষার, লাস্য-লীলার সুপ্ত সংস্কার হঠাৎ এই আদিম তরুণীর সরল মনে জাগিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। ছোট মেয়েটির মত তাহাকে আর কাছে ডাকিতে বা আদর করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। অশোক চিন্তিত হইল। মৌরী বলিল, "ডাকছিলেন আমাকে?"

অশোক যে কিজন্য তাহাকে ডাকিয়াছিল, সে নিজে জানে না। প্রকৃতির মধ্যে শরতের পূর্ণতা দেখিয়া বোধ-হয় তাহার শূন্য মনে অমনি একটি পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। কিন্তু সে যে কথাগুলি বলিল, তাহা সাধারণ। অশোকের মনে হঠাৎ যে ভাবটি জাগিয়াছে, কথাগুলি মোটেই তাহার মূর্ত্তি নয়। বলিল, "হ্যাঁ, মজুরটাকে কূয়ো থেকে জল তুলে চানের ঘরে রাখ্‌তে বলেছিলাম,—রেখেছে কিনা দেখ্‌ ত'!"

"হ্যাঁ, দিয়েছে। আপনার কাপড়-তোয়ালেও চানের ঘরে রেখে দিয়েছি। বেলা হ'ল ঢের—চান ক'রে নিন্। খাবার তৈরী হয়েছে।"

মৌরী ঠমকে চলিয়া গেল। তাহার চলন-বলন কি যেন একটা কথা বলিতে চায়—অশোক ভীত হইল। ক্ষেত হইতে ঢ্যাঁড়স, বেগুন, পেঁয়াজ তুলিয়া, ডিমের ঝোল করিয়া, মাংস রাঁধিয়া মৌরী যেন এক নিমন্ত্রণের রান্না রাঁধিয়াছিল। অশোক ব্যঞ্জনের পরিমাণ দেখিয়া চোখদুইটা বড় বড় করিয়া হাসিয়া বলিল, "আ, সর্ব্বনাশ! করেছিস কি মৌরী! এত রান্না এত অল্পসময়ের মধ্যে রাঁধ্‌লি কি ক'রে?"

মৌরী আত্ম-প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া কোনো উত্তর দিল না—আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ নীচু করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল!

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় পোর্ট-ফোলিওতে করিয়া তার প্রিয় গ্রন্থকারদের অনেকগুলি ইংরাজি বই অশোক আনিয়াছিল। আহারাদির পর তাহার মনে হইল, নানারকম তরকারী থাকার দরুন বড় গুরুভোজন হইয়া গিয়াছে। সে তাহার বিছানার উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িবার ভয়ে তাহার প্রিয় কবি ব্রাউ-নিংয়ের কাব্যগ্রন্থের "চয়নিকা"খানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পাতা খুলিতেই "এভিলিন হোপ" কবিতাটি চোখে পড়িল। এটি তাহার একটি প্রিয় কবিতা—লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া stanzaটা সে আবার পড়িল—

Just because I am twice as old,
And our paths in this world diverge so wide,
Each was nothing to each must I be told,
We are fellow mortal's ? nothing beside ?

শেফালির জন্য তাহার বড় মনকেমন করিতে লাগিল! পাশ ফিরিয়া দেখিল, মৌরী খাটের পাশের টিপয়টির উপর হাত রাখিয়া তাহার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

"মৌরী! আমাকে কি কিছু বল্‌বে তুমি?"

"কাল রাতে আপনার রাত জেগে ভালো ঘুম হয়নি। আমি পা টিপে দিই; আপনি ঘুমোবার একটু চেষ্টা করুন।"

অশোকের হাসি পাইল। কিন্তু সে যে তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে একটু সেবা করিতে চায় ইহাতে বাধা দিতে বা আপত্তি করিতে তাহার মন সরিল না। আর সে জগতে কাহারো কাছে এমন কিছু ভালবাসা পায় নাই—যে তাহাতে অযত্ন করিবে।

আজ তাহার কবিতা পড়িয়া স্বপ্ন দেখার শেফালি কোথায়? সে ত তাহাকে চায় না। আর আজ অশোক রূপহীন, কুৎসিত। সুন্দরকে দূরে থাকিয়া অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারে বটে—কিন্তু তাহার হাতের সেবা লইবার অধিকার নাই। প্রাণের ক্ষুধাও কি মিটাইতে পারিবে?—যদিও সে কখনো ভালোবাসে, অশোক ভাবিবে করুণা করিতেছে।

কিন্তু মৌরীর কাছে তার কোনো লজ্জা নাই!

মনখানি তার যত সোনার আলোতেই ভরা থাক—বাহিরে সে নিকষ-কালো। আর, অশোকেরও তাই,—কিন্তু—

ভাবনাটা সে শেষ করিতে পারিল না; দেখিল তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, মৌরী খাটের উপর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়াছে।

অশোক ম্লান হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা মৌরী! আমি যদি তোকে এই সব বাড়ী-ঘর, জমি-জমা দিয়ে কলকাতায় চ'লে যাই, তাহ'লে তুই কি করিস?" —বলিয়া, উত্তরে সে কি বলে শুনিবার জন্য, অশোক উৎসুক-দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

মৌরী তাহার একাগ্র, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে বিব্রত হইয়া বলিল, "আবার আস্‌বেন ত? তাহ'লে আমি এসব আপনার জন্যে আগ্‌লে নিয়ে ব'সে থাকি!"

অশোক বলিল, "না যদি একেবারে না আসি, তোকে যদি চিরদিনের জন্য দিয়ে চ'লে যাই?"

মৌরী কথাটায় যেন ভীত হইয়া, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে আমি এসব নিতে চাইনে গো! আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

এই সোজা কথা বাবু বুঝিতে পারে না, এবার মৌরী হাসিয়া বলিল, "বাঃ! একলা কি কেউ থাক্‌তে পারে?"

তাহার সরল যুক্তি শুনিয়া অশোক বলিল, "তাই ত!"

রান্নাঘরের পিছনে এক-টুকরা জমি ভাল করিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া, মৌরী একটি ছোট ফুলবাগান করিয়াছে। অধিকাংশই দেশী ফুল, কেবল অশোক কতকগুলি সীজন-ফ্লাওয়ারের বীজ কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিয়াছিল। সে-টুকুতে সে আর কাহাকেও হাত দিতে দিত না। খুরপি আর জলের ঝারি লইয়া সকালে বিকালে সেই ভূমিটুকুর পরিচর্য্যা করা তাহার এক কাজ ছিল।

আশেপাশের অনুর্ব্বর বন্ধুর ভূমিখণ্ডের সহিত সেই জমিটুকুর কোনো মিল নাই। অনবরত জল-সিঞ্চনে সবুজ ঘাসে ভরা প্লটটি মরুভূমির মধ্যে এক-টুকরা মরূদ্যানের মত দেখাইত। বিকালে আসিয়া মৌরী বলিল, "ফুল-বাগিচায় আপনার আজ চা-জলখাবারের জায়গা করেছি, উঠুন।"

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি রে?"

মৌরী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, দেখ্‌বেন আসুন।"

বাহিরে আসিয়া অশোক দেখিল, তাহার ক্যাম্প-টেবিলটি এবং চেয়ারটি কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বিছানো হইয়াছে। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম এবং খাবারের পাত্র সাজানো—সমস্তটা একটা বড় তোয়ালে দিয়ে ঢাকা।

"তোর যে ক্রমশঃ সাহেবি টেষ্ট হ'য়ে পড়ছে, এসব তুই কোথায় শিখ্‌লি বল্‌ ত?"

সে হাসিমুখ নীচু করিয়া রাখিল, কোনো জবাব দিল না। তাহার রূপ নাই, কিন্তু যে প্রাণখানি সে নিবেদন করিতে চায়—তাহা যে অম্লান পুষ্পের মত পবিত্র, শুভ্র-সুন্দর! অন্ধকারের অন্তরালে এই আলোর সন্ধান অশোক সমবেদনা দিয়া জানিতে পারিল। তাই যখন সে আহার করিতেছিল—তাহার মনে আনন্দ হইতে লাগিল। আহার কেবল দেহের ক্ষুধা মেটানো নয়, যখন সেটা হৃদয়-স্পৃষ্ট থাকে তখন সেটা মনেরও একটা উপভোগ। ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অশোক অলসভাবে ভাবিতেছিল, ভালবাসা মনের ধর্ম্ম, প্রতিদিনকার প্রয়োজন মেটানোর বহু ঊর্দ্ধে তার স্থান। কিন্তু অক্লান্ত হাতের স্পর্শভরা একান্ত সেবা-যত্নের মধ্যে যে আন্তরিকতা—যে হৃদয়ের স্পর্শ সে পাইতেছে,—অভিধানে তাহাকে কি বলে এই সরলা বন্যবালিকা তাহা জানে না। মনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যময় পরিণতি হয়ত তাহার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে সে যে কি অমূল্য রত্ন দানের জন্য উৎসুক—কালো কয়লার খনিতে পড়িয়া থাকিলেও ত সে অপরিস্কৃত আসল হীরকের মূল্য কম নহে—জহুরী না হইলেও অন্ততঃ এটুকু অশোক বুঝিতে পারিতেছিল।

এমনি করিয়া অশোকের দিন যায়।

(ক্রমশঃ)

নারী-সেনাধ্যক্ষ

পিকিনের ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ—'বিধবা চ্যাং' নামে অভিহিতা নামজাদা এক দস্যু-নারীকে সম্প্রতি ন্যাশ-নালিষ্ট গবর্ণমেণ্টের একটি সেনাদলের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বিধবা চ্যাং রবিনহুডের ন্যায় দরিদ্রদিগের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার নিমিত্ত ধনীদের নিকট হইতে একপ্রকার চৌথ আদায় করে। চ্যাংএর সেনাদলে তিন-হাজার লোক আছে। জাতীয়-দলের গবর্ণমেণ্টের সেনাপতি জেনারেল ফান-সো-ইউনের চতুর্থ বাহিনীর সহিত তাহার সৈন্যদলকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধে এই সেনাদল উক্ত নারীর নেতৃত্বে মার্শাল ফেং-উ-শিয়াংয়ের সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'বিধবা চ্যাং' হোনান সহরের একজন ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী ছিল। দস্যুদল কর্ত্তৃক ঐ সহর অধিকৃত হয়। দস্যুগণ তাহার স্বামী ও শিশু-সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং ঐ পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে। এই আঘাত পাইয়া চ্যাং কিছুকালের জন্য পাগলের মত হইয়া পড়ে; কিন্তু সেই শোকাবেগ কাটাইয়া উঠিবার পর প্রতিহিংসা-গ্রহণের প্রবৃত্তিতে তাহার চিত্ত পূর্ণ হয়। সে একটি দস্যুদলে যোগদান করে এবং ঐ দলের সর্দ্দারের মৃত্যুর পর তাহার স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। 'বিধবা চ্যাং'য়ের দলে ৫০ জন স্ত্রীলোক আছে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই তরুণী। সমর-পরিষদে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে; গৃহযুদ্ধের সময়ে লড়াই করিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে উহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে। নারীরাই চ্যাংয়ের শরীর-রক্ষী; এই রক্ষীদলে তাহার আত্মীয়েরাই শুধু আছে। গবর্ণমেণ্টের সেনাদলের অপেক্ষা বিধবা চ্যাংয়ের তথাকথিত দস্যুদলকেই লোকে অধিক আদর করে; কারণ দলনেত্রী চ্যাং ধনীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী।

সেবারূপিণী

মিসেস কানেল গারট্রুড

সম্প্রতি বেলগ্রেড্ নগরে (সোর্ভিয়া), "ডাঃ এল্‌সি ইংলিস নারী-হাসপাতালের" উদ্বোধন-উৎসবানুষ্ঠানে নেতৃত্ব উপলক্ষে, শ্রীমতী গারট্রুড্ কীনেল, রাজা আলেকসান্দার কর্ত্তৃক উচ্চসম্মানে সম্মানিতা হইয়াছেন। 'Order of St. Sava' এবং 'সার্ভিয়ার রেড্ ক্রস্' পদক-পদবী যুগপৎ তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমতী কীনেল স্বর্গীয় স্যার জন কাস্-এর কন্যা এবং ভাইকাউন্টেস্ কোড্রে বা শ্রীমতী অ্যানীর কনিষ্ঠা সহোদরা। ইঁহার শিক্ষাকাল অংশতঃ ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে কাটিয়াছে। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সঙ্গীতেও ইনি বিশেষ পারদর্শিনী।

কিন্তু শুধু ইহাই নহে, নারীপ্রগতি-আন্দোলনের ইনি একজন স্মরণীয়া নেত্রীস্থানীয়া কর্ম্মিণী। নিয়মতান্ত্রিক দলের (constitutional party) স্বনামপ্রসিদ্ধা স্বর্গীয়া ডেম মিলিসেণ্ট ফসেট্-এর সহকারিণীরূপে ইনি অনেক-কিছু করিয়াছেন। বিগত ১৯১৪, অগাষ্টের "Society for women's suffrages" বা "নারী-অধিকার সমিতির" চেয়ারম্যান থাকাকালীন ইনি উহার সংগঠন, প্রচার,প্রসার, অর্থসংস্থান প্রভৃতি সব-কিছুর ভার একরূপ স্বয়ংই লইয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যা হইয়াছিলেন।

সমাজসেবা ও সাধারণ পরিচর্য্যা-কার্য্যেও ইঁহার কুশল-হস্ত সম প্রসারিত। "রয়াল ফ্রি হস্‌পিটাল"-এর সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টা। এই প্রতিষ্ঠান গত মহাযুদ্ধে সেবাকার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে,—ইহা অনেকেই জানেন।

সব দিক দিয়া বিচার করিলে আধুনিক নারীসমাজে শ্রীমতী কীনেল একটি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারবিশেষ, সন্দেহ নাই।

সৌন্দর্য্য-সৃজয়িত্রী

ভাস্কর্য্যে, চিত্রকলায়, সাহিত্যে মানুষের প্রতিভা বিবিধরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। নারীর কলা-কুশলতা কোন কোন বিষয়ে পুরুষের চেয়েও সমধিক বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। প্রসাধন-বৈচিত্র্য যেমন নারীর বিশেষত্ব,—প্রসাধক পরিধেয় পরিকল্পনাতেও তেমনি তার বৈশিষ্ট্য আছে। এইরূপ একজন পরিধেয়-পরিকল্পনা ও প্রস্তুত-কারিণী মহিলার পরিচয় এখানে আমরা দিলাম।

মাদাম মাদ্‌লিন ভীয়োঁনেৎ একজন ফরাসী মহিলা। একখানি বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকার মতে শ্রীমতী ভীয়োঁনেৎ হইতেছেন "world acknowledged a great artist and a great French woman"—অর্থাৎ, জগদ্বিখ্যাতা একজন শ্রেষ্ঠশিল্পী এবং মনস্বিনী ফরাসী-মহিলা। ইঁহার মুখ্য

মাদ্‌লিন ভীয়োঁনেৎ

উদ্দেশ্য ব্যবসায় নহে—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, এবং ইঁহার সৃষ্টিতে ইনি খাঁটি ফরাসীধারা রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী যশের সহিত ইঁহাকে স্বর্ণদানেও কৃপণতা করেন নাই। ইঁহার শিল্পাগারে ১১ শত কারিগর ইঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া থাকেন।

চা-পরীক্ষাকারিণী

চা-পরীক্ষাকারিণী (Tea taster) নাম শুনিয়া আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ চমকিত হইবেন না বা ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপ-বিদ্যুৎ বিকশিত করিবেন না। বর্ত্তমান জগতের অন্যতম প্রধান ব্যবসায় এই চা। এই ব্যবসায় করিয়া পাশ্চাত্য ব্যব-সায়ীরা প্রচুর আর্থিক উন্নতিলাভ করিয়াছেন ও করিতে-ছেন। এই ব্যবসায়ে নারী-হস্তস্পর্শ অশোভন বা অসঙ্গত নহে। বিদেশী মতে "Tea is woman's drink"—

নারী-পানীয় এই চা। পুরুষদের পক্ষেও নারী-পরিবেশিত চা পরম উপাদেয় বলিয়া প্রবাদ আছে। আমরা এখানে গ্রেটবৃটেনের একজন চা-পরীক্ষাকারিণীর পরিচয় দিতে চাই। ইনি কুমারী আরভিং—সমগ্র গ্রেটবৃটেনের মধ্যে ইনিই একমাত্র (only one woman tea taster in the whole Great Britain) এই পথাবলম্বিনী। চিত্রে ইঁহার কার্য্যের আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইঁহার জন্য শিক্ষা-সাধনার আবশ্যক। কারণ, বিশেষজ্ঞগণের মতে—

মিস্ আরভিং

"Tea-tasting is not the sort of thing, one learns in five minutes, or five months, or even five years." অর্থাৎ এই পরীক্ষা-জ্ঞান দুই-চারি মিনিট, দুই-চারি মাস দূরে থাক, দুই-পাঁচ বৎসরেও লাভ করা কঠিন।

চা-করের দেশের মানুষ আমরা এ বিষয়ে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। কিন্তু চাকুরের জাতিরা কি কেরাণী-গিরি সুলভ পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত ছাড়া স্বাধীন ব্যবসায়গত বৃত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবে বা কন্যাদিগকে করিতে দিবে?

তিন ভগ্নী

মাদ্রাজবাসিনী এই তিন ভগ্নী শিক্ষাক্ষেত্রে সমান পারদর্শিনী। অগ্রজা শ্রীমতী জীয় মাণিকম্ (ছবির মধ্যস্থলে) বর্ত্তমান কনভোকেশনে কৃতিত্বের সহিত বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ'র জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মধ্যমা শ্রীমতী গুণা মাণিকম

তিন ভগ্নী

(ছবির দক্ষিণে) "উইমেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে"র বি-এ'র ছাত্রী (Senior B. A. Student) এবং কনিষ্ঠা শ্রীমতী পদ্মা মাণিকম (ছবির বামে) কুইন মেরী কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্রী। শিবপুরম্-এর (মাদ্রাজ) শ্রীযুক্ত পি, ভি, মাণিকম নায়কার, বি-ই'র পুত্রী এই তিন ভগ্নী।

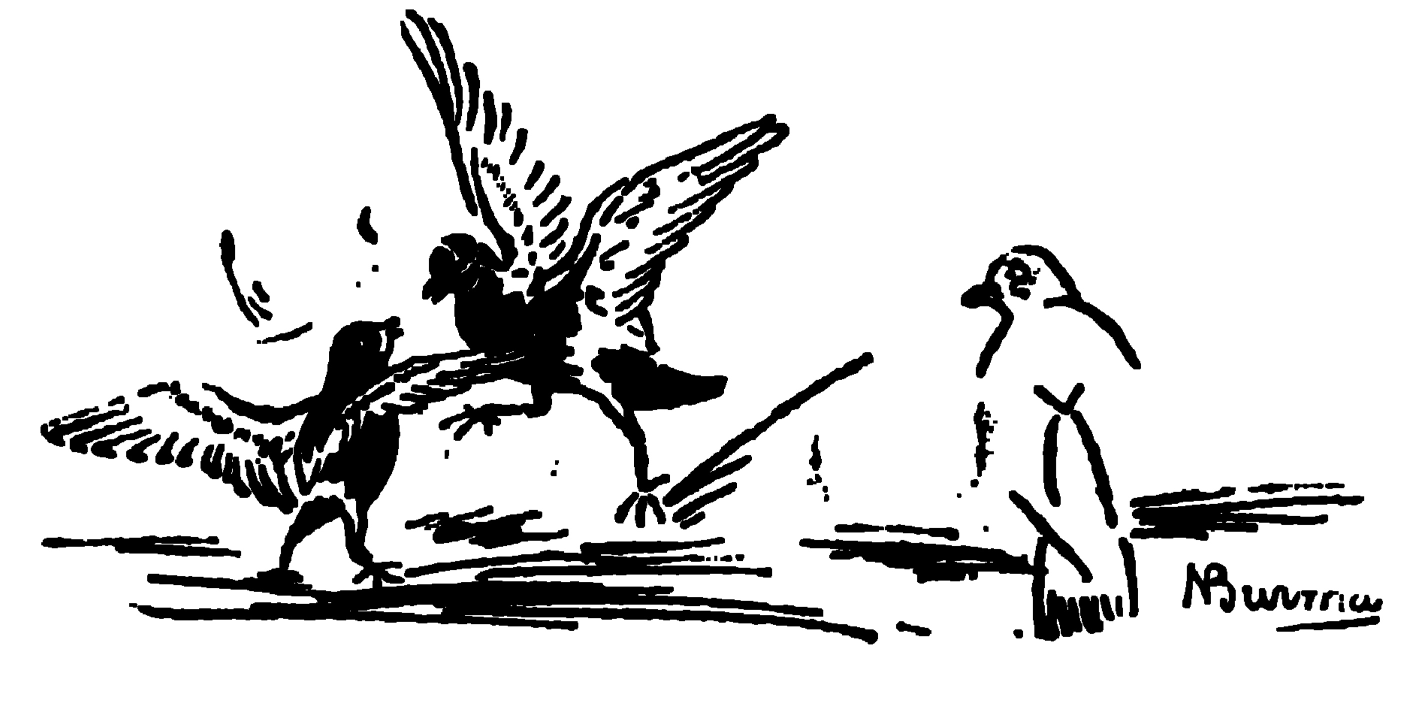

ব্যারাম হয় কেন ?

ডাঃ শ্রী রমেশচন্দ্র রায়

এদেশে এত ব্যারাম চতুর্দ্দিকেই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই মনে ধারণা জন্মিয়াছে, বাঁচিতে হইলেই ব্যারামে ভুগিতে হয়। "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্" এই প্রবাদ-বচনটি উক্ত ধারণার পোষকতা করিতেছে। বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে, ইয়ুরোপেও লোকেরা এই ভাবে ভাবিত, এবং তখন ইয়ুরোপের লোকদের গড়-পড়তা আয়ুষ্কাল বিশ বৎসর বলিয়াই ধরা হইত। সেই ইয়ুরোপের সরকার ও জনসাধারণের প্রাণপাত সমবেত চেষ্টায়, আজ আয়ু গড়ে চল্লিশের উপর বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমানে, ভারতীয়দের গড় আয়ু পঁচিশ বৎসর বলা যায়। এবং ভারতীয়রা মনে করেন যে, ব্যারাম হওয়াটাই নর-দেহের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা, ভাল থাকাটা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা—"ভাগ্যের কথা"।

কথাটা ঠিক্ উল্টা। এ দেশের জ্যোতিষীদিগের মতে, এ দেশের লোকদের শতবৎসরের উপরে পরমায়ু হইতে পারে (১০৮ হইতে ১২০)। "শতায়ুর্ভব" বলিয়া যে আশীর্ব্বচনটি এখনো উচ্চারিত হয়, উহা পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ-মতের অনুকূলেই যায়। এই আশার কথাটি এখন আমাদিগকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে। এবং প্রত্যেক লোকের মনে দৃঢ়ভাবে এই ধারণা করিতেই হইবে যে, দেহের পক্ষে

সুস্থ থাকাটাই—স্বাভাবিক অবস্থা,
ব্যারাম হওয়াটা—অস্বাভাবিক অবস্থা।

ভাবিয়া দেখুন, আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন কেমন সুস্থ অবস্থায় এ পৃথিবীতে আসি। তাহার পরে, আমরাই নিজ দোষে ব্যারামে পড়িয়া, ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এই "দুর্লভ মানবদেহকে" ক্ষীণ ও জীর্ণ করি।

এক্ষণে, প্রশ্ন হইতে পারে,—ব্যারাম হয় কেন? আমাদের কি দোষ বা ত্রুটিতে অসুখ হয়? এ কথার এক-কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়,—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যে-সকল নিয়ম আছে, তাহা লঙ্ঘন করার ফলেই ব্যারাম হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান নিয়মগুলি কি কি, তাহার সংক্ষিপ্তসার এখানে বলিয়া দিতেছি।

প্রধানতঃ, চারিটি কারণে ব্যারাম হয়। প্রথম কারণটি—যথোপযুক্ত পরিমাণে ও যথোপযুক্তভাবে খাইতে না পাওয়া। খাবার দোষ একটি নয়, সহস্রটি। যে খাদ্য আমরা খাই, তাহা দেহের আয়তনের পক্ষে, শ্রমের পরিমাণের পক্ষে, বয়সের পক্ষে, এবং ঋতু হিসাবে, যথেষ্ট না হইতে পারে। খাদ্যে ভেজাল দেবার জন্য, অথবা অযথা-ভাবে প্রস্তুত করার জন্য, সে খাদ্য দেহের পক্ষে উপকারী না হইতে পারে। ভেজাল দেওয়া তেল-ঘি, মাটা-তোলা দুধ, কলে মাজা চাউল, কলের ময়দা, রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত চিনি প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্থল। বাসি, অসিদ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ খাবারও দেহের পক্ষে অনুকূল নহে। পীড়িত জীবজন্তু হইতে আহৃত খাদ্যদ্রব্য ব্যারামের কারণ, যেমন টিউবারকল্ জীবাণু-দুষ্ট গাভীর দুগ্ধ বা গো-মাংস, ফিতাকৃমিদুষ্ট শূকর-মাংস ইত্যাদি। কাজেই, ইংরাজীতে যে একটি প্রবাদ-বচন আছে—A man digs his grave with his teeth (অর্থাৎ, ভোজনের দোষেই মানুষ মরে), এ কথাটি খুব ঠিক্।

ব্যারাম হইবার দ্বিতীয় কারণ—শরীরে কোনও বিষ প্রবেশ করা। ভ্রমবশতঃ, কুঁচিলা (strychnine, nux vomica), সেঁকো বিষ (arsenic), কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ প্রভৃতি খাইলে, দেহ খারাপ হয়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু মদ্যপান, অত্যধিক তামাক, দোক্তা, সুর্ত্তি প্রভৃতি সেবন, গঞ্জিকা, কোকেন সেবন প্রভৃতিও যে ব্যারাম সৃষ্টি করিয়া আয়ুক্ষয় করিয়া দিতে পারে, তাহা অনেকেই ভাবিতে পারেন না। পচা, বাসি খাবার খাইয়া, বা নিত্য অবেলায় বা বেশী রাত্রে ভোজন করিয়া, নিত্য অতি-ভোজন করিয়া, অলক্ষ্যে

শরীরকে বিষাক্ত করার কথাও আমাদের মনে আসে না। পরে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি ব্যারাম ধরিলে, আকাশ হইতে পড়ি—কেন এমন হইল?

ব্যারাম হইবার তৃতীয় কারণ,—কদভ্যাস। মানুষ সদা-সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে এবং নিত্য নিয়মিত পরিশ্রম করিবে, এইটাই হইল স্বাভাবিক অবস্থা। তাহা না করিয়া, যদি ঘর-দ্বার সব বন্ধ করিয়া শুই, অথবা মাথা মুড়ি দিয়া ঘুমানর অভ্যাস করি, বা সারা দিনরাত অলস-ভাবে অন্দরের মধ্যে জীবনযাপন করি; যদি গায়ে রাত-দিন জামাজোড়া আঁটিয়া থাকি বা স্নান না করি—এ সকল-গুলিই পরে ব্যারাম জোটাইয়া দেয়। রাতদিন পান খাওয়া, যখন তখন য়া'-তা' খাওয়াও, ব্যারামের হেতু।

ব্যারাম হইবার চতুর্থ কারণ—জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্রই রোগ জীবাণুরা উপস্থিত আছে। শ্বাসের সঙ্গে, খাদ্য ও পেয়ের সঙ্গে, গা চুলকাইয়া বা ছড়িয়া বা কাটিয়া যাওয়ার ক্ষতের সঙ্গে,—এই তিনটি পথে, জীবাণুরা আমাদের দেহে ঢোকে। সত্য কথা বলিতে কি, অহর্নিশিই আমাদের দেহের সঙ্গে জীবাণুদের সংগ্রাম চলিতেছে। কখনো আমরা জয়ী হইতেছি; কখনো জীবাণুরা জয়ী হইতেছে। যতক্ষণ আমরা সুস্থ থাকি, বুঝিতে হইবে যে, আমরা জয়ী হইতেছি; অসুখে পড়িলেই বুঝিতে হইবে যে, তখনকার মত, জীবাণুরাই জয়ী হইল। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্ষয়কাশ, হাম, বসন্ত প্রভৃতি যে কোনও ছোঁয়াচে ব্যারামের কথা বল, সবগুলিই জীবাণু-ঘটিত ব্যারাম। অতএব, জীবাণুদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা থাকা প্রয়োজন। তোমার যে শত্রু, তাহার বিষয়ে সকল সন্ধান তুমি লইতে পারিলে, তবে তাহাকে তুমি জব্দ রাখিতে পার। এই জন্য, জীবাণু সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া, সংক্ষেপে জীবাণুতত্ত্ব কিছু বলিতেছি।

জীবাণুতত্ত্ব

জীবাণু কি?—জীবদের মধ্যে যাহারা অণুতুল্য ক্ষুদ্র, তাহারাই জীবাণু। সাদা চক্ষে ইহাদিগকে দেখা যায় না—কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের (মাইক্রসকোপ) সাহায্যেই ইহাদিগকে দেখা যায়। আবার, অণোরণীয়ান্ (ultra-microscopic) জীবাণুও আছে। তাহারা বর্ত্তমান কালের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেরও অগোচর; যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, 'ইচ্ছা'বসন্তের জীবাণু। ইংরাজীতে জীবাণুদিগকে নানা নামে অভিহিত করা হয়; যথা, germs, microbes, micro-organisms, bacilli, bacteria ইত্যাদি। এ কথাগুলির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে; তাহা লইয়া গোল বাধাইব না।

জীবাণুরা কোথায় থাকে?—সৃষ্টির আদিকাল হইতেই, জীবাণুরা এ পৃথিবীতে আছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এবং পৃথিবী বেষ্টন করিয়া যে বায়ুমণ্ডল (atmosphere) বিরাজমান রহিয়াছে, সেই বায়ুমণ্ডলেও ইহাদিগকে দেখা যায়। সম্ভবতঃ, কেবল মহাসমুদ্রের মাঝখানে, বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধতম ভাগে (যেমন উচ্চ পর্ব্বতোপরি), খুব-গভীর টিউবওয়েলের তলদেশে, সুস্থদেহ জীবের শরীরের উপাদানের মধ্যে ও সেই সেই জীবের নিঃশ্বাস-বায়ুতে ইহারা নাই। কিন্তু কোনও জীবের পাকযন্ত্র জীবাণু-শূন্য নহে। যেখানে জীবজন্তুর যত বেশী সমাগম, সেখানেই জীবাণুদের সেই অনুপাতে সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। আর সেই জন্য সেখানে তত ব্যারাম। এই জন্য, পাড়াগাঁয়ের চেয়ে, সহরে ব্যারাম বেশী দেখা যায়।

জীবাণুরা পরাঙ্গপুষ্ট (parasitic)।—ইহারা আশ্রয়-দাতার রস গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়; এবং সেই আশ্রয়-দাতার দেহের অনিষ্ট করে। আমরাও যেমন মলমূত্রাদি ত্যাগ করি, জীবাণুদের দেহ হইতেও সেরূপ একটি দ্রব্য নিঃসৃত হয়, যাহা আমাদের দেহের পক্ষে উগ্র-বিষ বলিয়া toxin (বা বিষ) নামেই অভিহিত হয়। স্বল্পসংখ্যক কোনও কোনও জীবাণু মৃত-জীবের দেহের রস ভক্ষণ করে, কেহ বা উদ্ভিদরসভোজীও বটে।

চারিটি জিনিষ না হইলে যেমন আমরা বাঁচি না—জীবাণুদেরও সেই চারিটি জিনিষ চাই। প্রথম,—বায়ু, দ্বিতীয়,—জল, তৃতীয়,—যথোপযুক্ত উত্তাপ, এবং চতুর্থ,—খাদ্য। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে। কয়েকটি জীবাণু আছে যাহারা বায়ুতে বাঁচে না—নির্ব্বাত স্থানে

বাঁচে (ধনুষ্টঙ্কার সৃষ্টিকারী জীবাণু এই জাতীয়)। হাওয়ায় জলের বাষ্প থাকে বলিয়া, আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারি ; একদম জলীয় বাষ্পশূন্য হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। আমরা ইচ্ছামত জল ব্যবহার করিতে পারি বটে,—কিন্তু জলে ডুবিলে মরিয়া যাই। জীবাণুরা হাওয়ার জলীয় বাষ্পই চায়—কিন্তু তাই বলিয়া জলে ডুবিলে, মরে না ; এইজন্য, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতির জীবাণু পুকুরের জলে অনেক দিন বাঁচে। শীতাতপে, ইচ্ছামত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া, আমরা আত্মরক্ষা করি। কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডায় (যেমন বরফে) বহুক্ষণ থাকিলেও জীবাণুরা মরে না—মৃতপ্রায় হইয়া থাকে মাত্র। পরে বরফ গলিলেই তাহারা চাঙ্গা হয় ; কিন্তু ফুটন্ত জলে যেমন মানুষও মরে, জীবাণুরাও তেমনি মরে। এইজন্য, জল ফুটাইয়া খাওয়ার এত আবশ্যকতা এবং বরফ ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। রৌদ্রে বেশীক্ষণ থাকিলে কোনও জীবাণু বাঁচে না—এইজন্য খোলা জায়গার এত আদর, কিন্তু অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে জায়গাতেই তাহারা খুব বাড়ে (এইজন্য এঁদোঘর ব্যারামের আড্ডা)।

জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি।—উপযুক্ত খাদ্য, জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রভূমি, হাওয়া এবং মানুষের দেহের উত্তাপের মত (৯৮'৪) উত্তাপ পাইলে, দশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে, মাত্র একটি জীবাণু হইতে বিশ লক্ষ জীবাণু উৎপন্ন হইতে পারে ! সুখের বিষয় এই যে, অনন্তকাল ধরিয়া, একই স্থানে, ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, এক ঘরে বহুলোক বাস করিলে তাহাদেরই নিশ্বাসের বায়ুতে, মলমূত্রে যেমন সে যায়গাটি তাহাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, তেমনি জীবাণুরা সংখ্যায় অত্যধিক হইলে, আপনাদেরই দেহমলে তাহারা ক্ষীণ হইয়া আইসে। এই ভাবে যায়গাবিশেষে তাহাদের আধিক্য হইলে, ক্রমশঃ কালে তাহারা মরিয়া যাইতে আরম্ভ করে।

মানুষের আত্মরক্ষার উপায়

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সমস্ত "ছোঁয়াচে" (infections or contagious) ব্যারাম জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট হয় ; তাহা ছাড়া ধরিতে গেলে, যতরকম ব্যারাম আছে, তাহাদের বারো আনার মূলে ঐ জীবাণুরা। তবে, মানুষ কি জীবাণুদের বিরুদ্ধে নিতান্ত অসহায় ?—না, তাহা নহে। আমাদের চতুর্দিকে অসংখ্য জীবাণু সদা সর্ব্বদাই রহিয়াছে, তবুও আমাদের মধ্যে অনেকেই বেশ সুস্থ আছেন। কেমন করিয়া তাঁহারা সুস্থ আছেন, তাহা সকলেরই জানা দরকার। জীবাণুরা আমাদের দেহে তিনটি পথ দিয়া প্রবেশ করিতে পারে—মুখ-পথে, অর্থাৎ খাদ্য ও পেয়ের সঙ্গে, যেমন কলেরা, টাইফয়েড্ ব্যারামের বিষ ; প্রশ্বাস গ্রহণের সময়ে, নাসা ও শ্বাস-নলের ভিতর দিয়া বুকে যায়, যেমন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ক্ষয়কাশ, নিউমোনিয়ার বিষ ; এবং চর্ম্মের কোথাও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষত হইলে—চর্ম্মের সেই ভিন্ন-স্থান হইতে রক্তে যাইয়া মিশে, যেমন ফোড়া, বিসর্প ইত্যাদির বিষ। এইবার, এই জীবাণুদের নরদেহে প্রবেশের প্রত্যেক পথ ধরিয়া, সেই সেই পথে ভগবান আমাদিগকে জীবাণু হইতে রক্ষা করিবার কি কি নৈসর্গিক উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

প্রথমে, দেহের আবরক চর্ম্মের কথা বলা যাউক। (১) আমাদের গাত্রচর্ম্মের (structure of skin) গঠনের দিকে দৃক্‌পাত করিলে দেখা যায় যে, আমাদের চর্ম্ম, দেহের বর্ম্ম (shiold) রূপে কাজ করে। হাত ও পা—এই দুইটি লইয়াই আমাদিগকে বেশীর ভাগ সময়ে কাজ করিতে হয় ; আর ঐ দুইটির তলাই (palm and sole) কত পুরু ! আমরা চর্ম্মের যে যে অংশকে বেশী খাটাই, চর্ম্মের উপরিভাগের সেই সেই অংশ পুরু হইয়া উঠে—যেমন পাল্কী-বেহারাদের কাঁধ, পাদুকাবিহীনদিগের পদতল ও সূত্রধরদিগের হাতের তলা। ইহার ফলে, সামান্য আঘাতে চর্ম্ম ছিন্ন হইতে পায় না। আর ছিন্ন না হওয়ায়, জীবাণুরা দেহে প্রবেশ করিতেও পায় না।

(২) তাহার পরে, ঘাম হওয়ায়, চর্ম্মের উপরিস্থ জীবাণু ঘর্ম্মে ধৌত হইয়া যায়। এবং (৩) কোথাও কাটিয়া রক্তস্রাব হইলে, তাহাতেও ক্ষত-স্থানে হঠাৎ প্রবেশলাভ করা দূরের কথা, জীবাণুগুলি ধুইয়া যায়। চর্ম্মকে কেন বর্ম্ম বলা হয়, এখন বুঝিলেন কি ?

দেহের মধ্যে রোগজীবাণু প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় রাজপথ, আমাদের শ্বাসপথ—শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে, নাসিকাই

শ্বাসকার্য্যের জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে—মুখ-পথে শ্বাস লওয়া শুধু অস্বাভাবিক নয়, রোগেরও হেতু। এইজন্ত যাহারা তাহা করে, আমরা তাহাদিগকে "হাঁ করা" বলিয়া ঘৃণা করি! মুখ খুলিয়া একদণ্ডও শ্বাস গ্রহণ করা অন্তায়। আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের নাকের ভিতরে, দৃশ্য ও অদৃশ্য বহু লোম থাকে এবং সেখানে সর্ব্বদাই আঠাল পদার্থ (sticky mucus) থাকে। কাজেই, যদি কোনও রোগ-জীবাণু প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত আমাদের নাসাপথে প্রবেশ করিল, তাহারা ঐ আঠাল পদার্থে জড়াইয়া বা অদৃশ্য লোমে আটকাইয়া বাহিরেই রহিয়া যায়। পরে, নাক ঝাড়িলে বা ধুইলে অথবা হাঁচিলে, তাহারা নির্গত হয়। মুখের ভিতরে, অপর প্রান্তে, দুই পাশে, নীচের কষ-দন্তের পিছনে, ছোট ছোট কুলের-আঁটির মত টন্‌সিল বলিয়া দুইপাশে গ্ল্যাণ্ড আছে। খাদ্যের সঙ্গে, প্রশ্বাসের সঙ্গে মুখের ভিতরে কোনও জীবাণু প্রবিষ্ট হইলে উক্ত টন্‌সিল্ তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখে। বহুদিন তাহা হইলে, টন্‌সিল্ বাড়ে। বস্তুত মুখের মধ্যে টন্‌সিলরা দ্বারবানের কাজ করে। তাহা ছাড়া, টন্‌সিল এড়াইয়া, কোন রোগজীবাণু উদরস্থ হইলে, সেখানকার নানারূপ জীর্ণ রসে তাহারা ধ্বংস হয়।

এখন যদি চর্ম্ম কোনও রকমে ভেদ করিয়া এবং শ্বাসপথ ও মুখগহ্বরের সকল রকম ফাঁদ এড়াইয়া কোন রোগজীবাণু সরাসরি রক্তে যাইয়া মিশে, তবে সেখানেও তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য শ্রীভগবান্ সুন্দর কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। রক্তে—জীবাণু যাইয়া পড়িলে, দুইটি উপায়ে তাহাদের ধ্বংস-সাধনের চেষ্টা হয়। প্রথমটি এই :—আমাদের রক্তে শ্বেত ও লাল এই দুই রকমের কঠিন পদার্থ আছে; তাহাদিগকে যথাক্রমে শ্বেতকণিকা (white corpuscle) ও লালকণিকা (red corpuscle) বলে। দেহের মধ্যে কোনও বিজাতীয় পদার্থ (foreign body) প্রবিষ্ট হইলে, এই শ্বেতকণিকাগুলি দলে দলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। দেহে প্রবিষ্ট কোনও বিজাতীয় পদার্থ যেখানে শ্বেতকণিকা দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে জায়গাটি ফুলে (swelling), ব্যথাযুক্ত হয় (pain), দেখিতে রক্তাভ হয় (redness), এবং হাত দিলে গরম (hot) ঠেকে। যেখানেই একত্রে এই চারিটি লক্ষণের সমাবেশ হয় (উত্তাপ, heat, রক্তাভ, redness, বেদনা, pain, ও স্ফীতি, swelling), আমরা বলি সেইখানে "প্রদাহ" (inflammation) হইয়াছে। যদি প্রদাহ কমিয়া যায় (inflammatiou subsides), তবে বুঝিতে হইবে যে, শ্বেতকণিকাদেরই জয় হইল—শত্রু নিহত হইয়াছে।

দ্বিতীয়টি এই :—রক্তের এরূপ একটি বিশেষ শক্তি আছে যে, শরীরের মধ্যে অল্প অল্প করিয়া প্রত্যহ কোনও বিষ প্রবিষ্ট হইলে তৎবিষের প্রতি-বিষ (বা বিষঘ্ন পদার্থ, antidote) এই দেহ আপনার মধ্যেই সৃষ্টি করিতে পারে। জীবাণুরা মানব-দেহে প্রবেশ করিবার পর জীবাণুদের দেহ হইতে যে টক্‌সিন মানবরক্তে নিঃসৃত হইতে থাকে, সেই টক্‌সিনের উত্তেজনার ফলে, সেই টক্‌সিন-ধ্বংসকারী প্রতি-বিষ (বা বিষঘ্ন, anti-toxin) সঙ্গে সঙ্গে রক্তের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এই প্রতি-বিষের (anti-toxin) ক্রিয়ার ফলে, জীবাণুদের টক্‌সিন বা বিষ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে যেমন ক্ষারের সঙ্গে অম্ল মিশাইলে উভয়েই ধ্বংস হয়। প্রত্যেক জীবাণুর বিষ-বিশেষের (specific toxin) প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, শুধু সেই বিষ ধ্বংসকারী প্রতি-বিষরই (specific anti-toxin) সৃষ্টি হয়—এমন "সাধারণ" কোনও প্রতি-বিষ (universal antidote) সৃষ্টি হয় না, যাহা "সকল" জীবাণুর সকল বিষ ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়। জীবাণুদিগের দেহজাত বিষকে টক্‌সিন বলে; মানব-দেহে টক্‌সিনের প্রতিক্রিয়া-ফলস্বরূপ যে বিষহর প্রতি-বিষ সৃষ্টি হয়, তাহাকে অ্যান্টি-টক্‌সিন বলে।

দেহ যদি সুস্থ থাকে,—তাহা হইলে দেহে জীবাণু প্রবেশজনিত "টক্‌সিন্" উৎপন্ন হইলেই, আত্মরক্ষার্থে দেহ প্রতি-বিষ বা "অ্যান্টি-টক্‌সিন্" সৃষ্টি করিয়া আত্মরক্ষা করে। যাহার দেহ তাদৃশ সুস্থ নয়,—যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের গায়ে রক্ত কম, যাহাদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট বর্ত্তমান, তাহাদের দেহে যথোপযুক্ত পরিমাণে অ্যান্টি টক্‌সিন সহজে সৃষ্টি হয় না, সে দেহ টক্‌সিনে মুস্‌ড়াইয়া পড়ে। সেরূপ লোকদের দেহে, "সামান্য" মাত্রায় ও অল্পঅল্প করিয়া ঐ জীবাণুর দেহজ মৃদু বিষ প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে, তখন যেন সেই অসুস্থ দেহে নব-বলের সঞ্চার হয়, সে তখন

উঠিয়া-পড়িয়া ক্রমে আবশ্যক পরিমাণে অ্যান্টিটক্সিন্” সৃষ্টি করিতে লাগিয়া যায়। সামান্য মাত্রায়, দেহে মৃদু-বিষ-প্রবিষ্ট করানকে, “টীকা” দেওয়া বলে। টীকা দেওয়ার ইংরাজী শব্দ “ভ্যাক্‌সিনেসান্”। “ভ্যাক্-সিনেসান্” কথাটি “ভ্যাকা” এই বাক্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। “ভ্যাকা” শব্দের অর্থ, গরু। প্রথমে গো-বসন্তের রস লইয়া টীকা আরম্ভ করা হয় বলিয়া, এখন যে কোনও “বীজের” (বা ব্যারামের “মৃদু”-বিষের) টীকা লওয়াকেই, ভ্যাক্-সিনেসান লওয়া বলে। ভ্যাক্‌সিনেসান্ বা টীকা দেওয়ার কি ফল? জড়ভরত-প্রকৃতির দেহকে আত্ম-রক্ষার্থে (অ্যান্টিটক্সিন প্রস্তুত করণে) “উত্তেজিত” করা। এখন বুঝিলেন, কেন টীকা দিতে বলা হয় ?

কিন্তু যেখানে রোগী প্রচণ্ড বিষের ফলে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে সেখানে তাহাকে সামান্য মাত্রায় মৃদু-বিষ দ্বারা উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করা নিষ্ফল - কারণ, যতদিনে যথোপযুক্ত প্রতি-বিষ সৃষ্ট হইতে পারে,তাহার মধ্যে রোগী মরিয়া যাইতে পারে। সে রকম স্থলে ঐ ব্যারামে ভুগিয়া সারিয়াছে এমন জীবের রক্তরস (serum) এই রোগীর গায়ে ফুঁড়িয়া দিলে, রোগী তৈরী প্রতি-বিষ পাইয়া সহজে ও সত্বর আরোগ্যলাভ করে। এরূপ করাকে serum injection treatment বলে। এরূপ serum এ ভুগিয়া সারিয়াছে এমন জীবের রক্তে তৈয়ারি anti toxin ব্যবহৃত হয়।

ছোঁয়াচে-ব্যারাম

আজকাল যত ব্যারাম দেখা যায়, তাহার বারো আনাই জীবাণু-ঘটিত; অর্থাৎ শরীরে জীবাণু ঢুকিয়া যত ব্যারাম উৎপন্ন করে। সহরগুলিতে যত ঘন-বসতি হইয়াছে, যানে, দোকানে, হোটেলে, স্কুলে, আদালতে, বায়স্কোপে, থিয়েটারে যত একসঙ্গে মানুষে-মানুষে বা মানুষে-পশুতে ঘেঁসাঘেঁসি, ছোঁয়া-ছুঁয়ি হইতেছে, ততই একের হইতে অপরে রোগ-জীবাণু বিসর্পিত হইতেছে।

তাহা ছাড়া, বড় বড় সহরে, লোকাধিক্যবশতঃ, দরিদ্ররা ও মধ্যবিত্তেরা এদোঁ, স্যাঁতান বা ছোট ছোট ঘরে বাস করিতে বাধ্য হয়। সে সব ঘরে, না সূর্য্যালোক যায়, না হাওয়া ভাল করিয়া খেলে; তাহার পরে, ভাড়া-গাড়ী, নৌকা, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে কত রকমের লোক একত্রিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের গায়ের ময়লা বা জীবাণু ছড়াইয়া যায়। এই কারণেই, আজকাল ব্যারাম এত বেশী হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, অধিকাংশ জীবাণুঘটিত ব্যাধিই নিবার্য্য (preventable)

নিবারণের সাধারণ উপায়—এপর্য্যন্ত যত ছোঁয়াচে ব্যারাম জানা গিয়াছে, তাহাদিগের বিষয় খুব ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, কয়েকটি নিয়ম পালন করিলেই ছোঁয়াচে ব্যারামকে সহজেই নষ্ট করা যায়। সামান্য একটি কিছু জ্বলিয়া গেলে, তাহা নিভান সহজ—বেশী করিয়া আগুন ধরিলে, নিভান দুরূহ। জীবাণু-ঘটিত ব্যারামের পক্ষেও এই কথাটি বেশ খাটে। যদি দুই একটি রোগী আক্রান্ত হইবামাত্র, উঠিয়া পড়িয়া, দৃঢ়তার সহিত নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যায়, তবে অঙ্কুরেই ব্যারামের বিষকে নষ্ট করা সম্ভবপর হয়। দেরী করিলে, ব্যাপকভাবে ব্যারাম ছড়াইয়া পড়ে। তখন তাহাকে দমন করা যেমন কষ্ট তেমনি ব্যয়সাধ্যও বটে। এই জন্য, কোথাও সামান্য একটি জীবাণু-ঘটিত ব্যারাম পাইলেই, পর-পর নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতেই হয়। যথা,—

(১) যে বাড়ীতে কোনও ছোঁয়াচে রোগ হয়, তৎক্ষণাৎ সে বাড়ীর কর্ত্তার এই এই গুলি অবশ্যকর্ত্তব্য :—

(ক) সরকারে সংবাদ দেওয়া যে, বাটীতে ব্যারাম হইয়াছে। ইহাকে ইংরাজীতে Notification to Health Officer বলে। এই Notification সম্বন্ধে পরে বলিব।

(খ) যে ব্যক্তির অসুখ হইয়াছে তাহাকে—বাটীর এমন নিরিবিলি অংশে (বা হাঁসপাতালে) স্থানান্তরিত করা, যেখানে বাটীর অপর কেহ যায় না। এইরূপ করাকে isolation বা segregation করা বলে। শুশ্রূষাকারী-দিগের প্রতিও এই ব্যবস্থা অন্ততঃ আংশিকভাবে করিতে হয়।

(গ) রোগীর ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি ও ভোজন এবং পান-পাত্র স্বতন্ত্র রাখা ও সকলের শেষে ধৌত ও মাজা চাই।

(ঘ) রোগীর মলমূত্র, বমি, কাস, ক্ষতের মামড়ি, পূয ইত্যাদি ঢাকা দিয়া লোসানসমেত পাত্রে ধরিয়া দিনান্তে পুড়াইয়া ফেলা চাই।

(২) যাহারা সে ব্যারামে পড়ে নাই—তাহাদিগকে প্রতিষেধক-টীকা দিয়া দেওয়া উচিত (preventive vaccination)। 'ইচ্ছা'বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতির প্রতিষেধক টীকা পাওয়া যায়।

(৩) খাদ্য ও পানীয়—যাহাতে অপর কর্ত্তৃক দূষিত হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা চাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বিহারীলাল ও নারী

শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

একটি কথা বিশেষ প্রচলিত যে বাংলার মেয়ের মত কোমল হৃদয় নাকি আর কোন দেশের মেয়ের নেই, জগতে নাকি এই হিসাবে সে অদ্বিতীয়। বাংলার তৃণদলেরই মতন নাকি কোমল তার অন্তঃকরণ, বাংলার মাটিরই মত তা নরম এবং বাংলার আকাশের মতই তার চোখে শ্রাবণের ধারা নামে অতি অকারণেই। তাই যদি হয়, আমরা বল্‌ব, যে একথা তা হ'লে আরও সত্য, যে, বাংলার ছেলের মত নারীকে ভালবাস্‌তে আর কোন দেশের ছেলে পারে নি, পারে না, পার্‌বেও না। এ, জাতীয়তা-বোধে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পক্ষপাতিত্ব-দোষদুষ্ট অন্ধ স্বদেশপ্রেমিকের কথা নয়, ঠাণ্ডা-মাথায় ন্যায়মত বিচারের ফলে এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, এ হ'ল সেই। প্রমাণস্বরূপ আমরা দুজন কবির নাম কর্‌ব, পারেন ত তাঁদের মত আরেকটিকে জগতের যেখান হ'তে কেউ খুঁজে বার করুন। তাঁদের জন্ম এই দেশের মাটিতেই, এই দেশী নারীই তাঁদের হৃদয়মন্দিরের দেবী ছিলেন এবং এই দেশী ভাষাতেই তাঁরা দুজনে তাঁদের হৃদয়ের অনুভূতি লিপিবদ্ধ ক'রে বাংলা সাহিত্যকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে গিয়েছেন। এঁদের প্রথম হলেন চণ্ডীদাস ও দ্বিতীয়—কবি বিহারীলাল। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় সম্পদ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ এবং মানব-হৃদয়ের সুন্দরতম বৃত্তিটির পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি। তাঁর কথা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তাঁরই পদ অনুসরণ ক'রে, তাঁরই দেশের আর একটি কবি, তাঁরই মত উদার সুরে আর একদিন বাঙালীকে সেই মধুর গান শুনিয়েছিলেন। তাঁর সেই গান, সেই কবিতাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিহারীলাল নারীকে কতখানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন, নারীর দুঃখে তাঁর মনের সহানুভূতির গভীরতা কতখানি ছিল, এ সব কথা জান্‌লে, আধুনিক মহিলাসমাজের অনেকখানি আনন্দ হবে। তাঁর শ্রেষ্ঠ তিনখানি কাব্যগ্রন্থ হ'চ্ছে, 'বঙ্গসুন্দরী', 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন'—সময়-অনুসারে পর পর এই তিনটি এই ভাবেই প্রণীত হয়। এই তিনটিরই প্রধান চরিত্র বা প্রেরণার উৎস হচ্ছেন নারী। 'বঙ্গনারী' হ'ল সাধারণ বাঙালী নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, 'সারদামঙ্গলের' নায়িকা স্বয়ং সরস্বতী বা তাঁর কবিতা দেবী এবং তৃতীয়টি একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার উদ্দেশে রচিত। মেয়েটির ইতিহাস অতি সুন্দর। বিহারীলালের সারদামঙ্গল পাঠ ক'রে একটি মহিলা বিশেষ খুসী হয়ে তাঁকে 'সাধের আসন' নাম দিয়ে একটি আসন বুনে উপহার দেন। তাঁর এই সামান্য কাজটিই কবিকে এই প্রণয়নে উৎসাহ এনে দেয়, সেইভাবে তিনিই এর বাগ্‌দেবী।

বঙ্গসুন্দরী দশ সর্গে সমাপ্ত একটি কাব্যগ্রন্থ। এতে নারীর আটটি রূপের বর্ণনা আছে এবং সাধারণ বঙ্গনারী এর নায়িকা।

প্রতি রূপটিতে নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং নারীর গুণে মুগ্ধ ভাবের উচ্ছ্বাস বিশেষ চোখে পড়ে। কবির—

সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,—
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

পার্থিব জীবনই হ'ল অগ্নিকুণ্ড। এই অগ্নিকুণ্ড তাঁর জীবনতার অসহনীয় ক'রে তুলেছে, তিনি চারদিকে শান্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কিন্তু শান্তি তিনি পান না, জ্বালা তাঁর জুড়ায় না। শেষে তিনি একমাত্র জুড়াবার স্থান পেলেন—তিনি হচ্ছেন,—

প্রিয়তম সখি সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ-উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,—
মনের তিমির দূর হয়!

* * * *

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন তাই স্বর্গ হাতে পাই!—
অতুল আনন্দভরে,
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই!

সেই জীবন-জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত 'আমি' সেই 'আমি' আর থাকেন না, পৃথিবীও নরক মনে হয় না আর, স্বর্গে রূপান্তরিত হয়, সে যেন কোন গল্পরাজ্যের মায়ার কাঠির স্পর্শে। সেই মায়ার কাঠি হলেন নারী।

এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে, তিনি সাধারণ নারীর গুণকীর্ত্তন করেছেন। এখানে নারীর যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন তাতে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কত যে গভীর, সেটা সুন্দর উপলব্ধ হয়। যে বন্দনা-গান এখানে তিনি লিখে গেছেন, তেমন বুঝি আর কখনও কেউ নারীর জন্যে লিখে যান নি। কবির ভাষায়, তা 'শুনে গ'লে যায় আর্দ্র হৃদয়, শিশির শীতল অশ্রুজলে।' নারীকে সেই চোখে দেখা সাধারণ চোখে হয় না, দিব্যদৃষ্টি চাই। সেই দিব্যদৃষ্টি কেবল তিনিই পেয়েছিলেন, এটাও তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। তাঁর মতে নারী এই—

জগতের তুমি জীবিতরূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা;

* * * *

প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা-নির্ঝর, দয়ার নদী;—
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

সেবিকা নারীর এই ছবি তিনি এঁকেছেন—

রোগীর আগার বিষাদে আঁধার,
বিকার-বিহ্বল রোগীর কাছে,
পাশাপাশি হাতে করি' অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়া আছে।

কল্যাণী নারীর এই ছবি—

করম-ভূমিতে পুরুষ সকলে
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয়,
তব সুশীতল প্রেম-তরুতলে
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়!

তাই নারীর পায়ে তিনি এই ব'লে অর্ঘ্য জানাচ্ছেন—

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন,
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয়-ধন।

এই হচ্ছে নারী সম্বন্ধে তাঁর চরম বাণী। নারীর সবই তাঁর কাছে মধুর, এমনি কোরে তিনি তাকে দেখেছেন। তাই জন্যেই ত মানুষ কোন্ ছার,—দেবতাও নারীর রূপই ধ্যান করেন—আর কারো'ও নয়। হিমালয়ের বিপুল নির্জ্জনতার মধ্যে বসে মহাদেব কার যে ধ্যান করেন—সে কথা ত এতদিন কেউ ধরতে পারে নি। তাঁর কবির মন কিন্তু তা ধরে ফেলে দিয়েছে—সে আর কারও নয়, এই নারীরই রূপ।

হিমালয়ে আসি' করি' যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা,
ধেয়ান তোমারি কমল-চরণ,
ভাবে গদগদ মানস খোলা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই নারীর আকর্ষণে পাগল। রাধা হলেন বিশ্বনারীর প্রতিরূপ। তাই—

নিশীথ-সময়ে আজও ব্রজবনে
মদনমোহন বেড়ান আসি',
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে সঘনে
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।

নারীকে এর থেকে বড় ক'রে আর কোন ভাবে চিত্রিত করা যায় কি? তিনি মানুষের শুধু ধ্যানের ধন নন, দেবতারও। আর কোন দেশের কবি কি এত বড় কথা বল্‌তে পার্‌তেন? কবিরই ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে বল্‌তে ইচ্ছে করে—মধুর মধুর এই লেখা!

চতুর্থ সর্গে তিনি অন্তঃপুরিকা নারীর ছবি এঁকেছেন। ছবিখানি একাধিক দিক হ'তে চিত্তাকর্ষক। ১৩০৯ সাল বিহারীলালের মৃত্যু-বৎসর, তারও কত আগে এই বই লিখিত—এই কথা দুটি আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। সে ত আজ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। তখনকার দিনেও একটি কবির হৃদয় অন্তঃপুরে বন্দিনী নারীর দুঃখে ব্যথিত হয়েছিল, এটি কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এবং সে যুগের লোক হ'য়েও তিনি যে এমন মত জাহির কর্‌তে পেরেছিলেন—সেটি তাঁর মনের উদারতা আমাদের স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেয়। কোন অন্তঃপুরিকা দুঃখ ক'রে বল্‌ছেন,—

অন্দর মহল অন্ধ কারাগার,
বাঁধা আছি সদা ইহার মাঝে;
দাসীদের মত খাটি অনিবার
গুরুজন মন-মতন কাজে।

* * * *

হাঁফায়ে হাঁফায়ে ঘোমটা-ভিতরে
যদিও পচিয়ে মরিয়া যাই,
তবুও উঠিয়ে ছাদের উপরে
সমীর সেবিয়ে বেড়াতে নাই!

বাহিরের জগৎ তাঁর কাছে একেবারে অবরুদ্ধ, তা দেখ্‌বার হুকুম নাই, তা হ'লে কুলমর্য্যাদা রক্ষা হয় না যে। অন্তরে স্বাধীনতা পাবার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা!

বন উপবন ভূধর সাগর
তরঙ্গ-লহরী নদীর বুকে,
গ্রাম উপগ্রাম নিকুঞ্জ নির্ঝর
শুনিলাম শুধু লোকের মুখে।

তাই সকল আকাঙ্ক্ষা বুকেই ব্যাহত হ'য়ে র'য়ে যায়। বাহিরের জগৎ অবরুদ্ধ, বই পড়্‌তে তাঁর তবু আগ্রহ, তাতেও যদি বাহিরকে জান্‌বার একটি সুযোগ মেলে। কিন্তু তাও ত হবার যো নেই, গুরুজনের নিষেধ আজ্ঞা, সে যে অলঙ্ঘনীয়—লেখা-পড়া শিখ্‌লে নারী হয় ত ছাড়া হ'য়ে যাবে, পুরুষকে সে মান্‌বে না। পুরুষের হাতে গড়া আইনের তাই জন্যে এই একতরফা অবিচার। কবির এ নিতান্ত অসহ্য, তাই তিনি বলেছেন একান্ত খেদ ক'রে—

যেমন দেশের পুরুষ সকলে,
দেশ ছাড়া কিছু দেখেন নাই;
তেমনি আমরা অন্দর মহলে,
অন্দর মহল দেখি সদাই!

মনের দুঃখের আতিশয্যে, বাল্মীকির শ্লোকের মত, তাই এই অভিশাপ তাঁর অন্তর হ'তে বেরিয়ে এসেছে:—

গারদে রেখেছে দুখিনী সকলে,
অধীনতা-বেড়ি পরায়ে পায়,
জান নাক হায় সতী-শাপানলে
পুরুষের সুখ জলিয়া যায়।

সকল নারীই তাঁর সাধারণ ভাবে পূজ্যা, কিন্তু বিশেষ-ভাবে পূজ্যা প্রেয়সীরূপিণী নারী। অন্তবেশে নারী তাঁকে তত মুগ্ধ করেন নি, যত করেছেন এই-বেশিনী নারী। তাই শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্যটি তিনি নিবেদন করেছেন—এই নারীরই পায়ে। তাঁর 'সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান' আছে এঁরই তরে।

কবি গেয়েছেন—

আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে,
চিরদিন সুর-কুসুম অনুপ,
সমান নূতন ফুটিয়ে রবে।

এ ভবভূতির সেই কথা—'বার্দ্ধক্যে যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ'। তাই—

যতদিন রবে মনের চেতনা,
যতদিন রবে শরীরে প্রাণ,
ততদিন এই রূপসী কল্পনা,
হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান।

(ক্রমশঃ)

সরোজনলিনী

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

বারিধি-কল্লোল সম একদিন বাজাইয়ে শাঁখ
দেশের মহিলাগণে তুমি, দেবি, দিয়েছিলে ডাক—
"টুটিয়ে তিমিরময়ী নিশীথের ক্লান্ত কুজ্ঝটিকা
জ্বেলে দাও প্রতি-ঘরে স্ত্রীশিক্ষার তীব্র দীপশিখা।"
এ মন্ত্র সাধনতরে নিজহাতে হোম-অগ্নি জ্বালি
প্রজ্জ্বলিত রাখি বহ্নি উৎসাহের মধুপর্ক ঢালি,
মরণের সিন্ধুতটে হে সাগ্নিকে, দিয়ে গেলে কানে
অমোঘ এ মন্ত্র তব তোমারি রচিত প্রতিষ্ঠানে।

নারীকে কল্যাণ আজি নিতে হবে জিনে নিজবলে
শুধু অন্তঃপুরে নহে ধূলিম্লান তপ্ত পথতলে,
যেথায় কাঁদিছে ব্যথা, ব্যর্থ আশা, পুঞ্জীভূত ক্ষয়
সেথায় নামিতে হবে নারীরে প্রসারি বরাভয়।
অমঙ্গল সাথে রণ করি, যুদ্ধ-পরিণতি দিনে
নারীরে পুরুষ সাথে কল্যাণেরে নিতে হবে জিনে
এ ছিল আদর্শ তব, নারীশ্রেষ্ঠা সরোজনলিনী
ভারতের তপঃস্নিগ্ধ-গন্ধ-পূত ওগো কমলিনী।

তোমার পতাকাতলে মিলিয়াছে আজি জনে জনে,
কাঁপিছে বিপুল আশা বিশাল প্রাণের শিহরণে,
জানি আর দেরী নাই আসিছে সে কী বিপুল বেগে,
ঈষন্মুক্ত রথচূড়া হেরি তার ঘনকৃষ্ণ মেঘে,
তারই অভিনন্দনের গন্ধে অন্ধ সারঙ্গেরা ছুটে—
ভারতের দুঃখ-মৌন মুখে বুঝি হাস্যরেখা ফুটে!
নবীন-জীবন দিনে উচ্ছ্বসিত অশ্রুর অঞ্জলি
তোমারি তর্পণতরে আঁখি হ'তে উঠিছে উচ্ছলি।

স্থাপত্য মহিলাদের অবলম্বনীয়

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

আগে বঙ্গদেশে মহিলারা বাড়ীতে নিজের নিজের পরিবারবর্গের সহিত সম্পৃক্ত কাজই করিতেন। কখন কখন দারিদ্র্যবশতঃ ভদ্রবংশের কোন কোন নারীকেও অন্যত্র কাজ করিতে হইত; কিন্তু তাহা প্রায়ই পাচিকার বা তদ্বিধ অন্য কোন কাজ। দেশে বালিকাদের শিক্ষা নূতন করিয়া প্রবর্তিত হইবার পর শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখন অল্পসংখ্যক মহিলা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে আরম্ভ করেন। এখন ইঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। নারীরা আরও ২।১টি বৃত্তি ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিয়াছেন। যথা, চিকিৎসকের কাজ, ধাত্রীর কাজ ও শুশ্রূষাকারিণীর কাজ। ধাত্রীর কাজ অবশ্য বরাবরই নারীরা করিতেন, কিন্তু এই বৃত্তি নিম্নশ্রেণীর নারীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এখন নানা ধর্ম্মের ও জাতির নারীরা ধাত্রীর কাজ শিক্ষা করিয়া ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন।

খুব অল্পসংখ্যক মহিলা আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে শ্রীমতী রাধাবাঈ আত্মারাম সগুণের পুস্তকের দোকান তথাকার পুস্তকের দোকানগুলির মধ্যে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ দোকান এখনও আছে কিনা জানি না।

পেশাদার অভিনেত্রীর কাজ ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীর মেয়েদের করণীয় কাজের মধ্যে এখনও গণ্য হয় নাই। আমাদের দেশের সামাজিক গঠন ও প্রথা এবং নৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে উহা নারীদের বৃত্তির মধ্যে এখন পরিগণিত না হওয়াই ভাল। চলচ্চিত্রের অভিনয় দ্বারা শুনিয়াছি ২।১টি ভদ্রবংশীয়া নারী উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

চিত্রাঙ্কণেও কোন কোন মহিলা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু চিত্রাঙ্কণ, পুস্তকরচনা, সাংবাদিকের কাজ প্রভৃতি মহিলাদের করিবার মত কাজ হইলেও, এখনও উহা হইতে ঘরসংসারের খরচ চলিবার মত অবস্থা অল্পস্থলেই হইয়াছে।

একটি বৃত্তির দিকে এখনও মহিলাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। তাহা স্থাপত্য। আমেরিকায় কোন কোন মহিলা এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশে মহিলাদের ইহা শিখিবার সুযোগও কম। ইহা সচরাচর সামান্য পরিমাণে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে অন্যান্য যে-সব দৈহিক শ্রমসাধ্য বিষয় শিখান হয়, তাহা মেয়েদের উপযোগী নহে। কিন্তু আলাদা করিয়া স্থাপত্য শিখাইবার ব্যবস্থা হইলে তাহা মেয়েরা শিখিতে পারেন। চিত্রের মত ইহাও একটি শিল্প বা কলা। নারীরা যখন ছবি আঁকা শিখিতে পারেন, তখন ইহাও শিখিতে পারেন। স্থাপত্যে কৃতিত্বলাভ অংশতঃ সৌন্দর্য্যবোধ ও সুষমাবোধের উপর নির্ভর করে। এই অনুভূতি মেয়েদের আছে। বাসগৃহে মেয়েদিগকে দিনরাত্রির মধ্যে যত বেশী সময় যাপন করিতে হয়, পুরুষদিগকে ততক্ষণ নয়। সুতরাং ঘরবাড়ী কেমন হইলে তাহা বাসের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, সুবিধাজনক ও আরামদায়ক হয়, তাহা মেয়েরা সহজে বুঝিতে পারেন। ঘরবাড়ীর নক্সা করা চিত্রশিল্পীদের পক্ষে সহজ। নারীরা যখন ছবি আঁকিতে পারেন, তখন তাঁহারা ঘরবাড়ীর নক্সাও আঁকিতে পারিবেন।

নারীদের অবলম্বনীয় সকল বৃত্তির বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। নতুবা খেলনা নির্ম্মাণ, পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার কাজ, পুস্তক বাঁধিবার কাজ, ফোটোগ্রাফী, অলঙ্কার নির্ম্মাণ প্রভৃতির বর্ণনা করা যাইতে পারিত।

নানা কথা

শিক্ষার আদর্শে ছাঁচ আবশ্যক কিন্তু একান্ত নহে

গত সংখ্যার 'নানা কথায়' নির্ণীত হইয়াছে, good education বা সংশিক্ষাই হইতেছে শিক্ষার আদর্শ—যে শিক্ষা মানুষকে ছাঁচ হইতে প্রাণে উত্তীর্ণ করে। একটা জাতিকে প্রাণবান করিতে হইলে এইরূপ শিক্ষাই আবশ্যক এবং প্রাণবান জাতিরাই জগতের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে।

আমরা বলিয়াছি 'ছাঁচ হইতে প্রাণে উত্তীর্ণ করে'। ছাঁচ বা একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীকে এখানে অস্বীকার করা হইতেছে না—প্রাথমিক অবস্থায় ইহাও অত্যাবশ্যক—কিন্তু ইহাই একান্ত নহে। একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যে, এই ছাঁচ হইবে চারা গাছকে 'বেড়া'র বাঁধনে বাঁধিবার মত। কিন্তু এই 'বেড়া'র অর্থ নিরেট প্রাচীর নয়, অবকাশ-বহুল সীমা-বিশেষ ; এবং এই সীমা, বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া পৃথক পৃথক জাতির পক্ষে পৃথক পৃথক। আরও, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সীমার আকারও পরিবর্ত্তিত হয়। 'বেড়া'র ফাঁকে প্রচুর আলোক বাতাস আসিয়া চারাকে তরুত্বে প্রবুদ্ধ করিবার মত, ছাঁচের ফাঁকে মুক্তপ্রাণের স্পর্শ আসিয়া শিক্ষার্থীকেও মনুষ্যত্বে প্রবুদ্ধ করিবে। তারপর এমন একটা সময় আসে যখন 'বেড়া' ও ছাঁচের কাজ ফুরায়।

*

কন্যাশিক্ষা

কন্যাশিক্ষার জন্য এইরূপ একটি ছাঁচের পরিচয় গত-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মার সুলিখিত প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকায়, 'বেড়া'র ফাঁক প্রাচীরের নিরেটত্বে পরিণত হইয়াছে। ঘরের ভিতরে থাকিয়া বাহিরের বৃহৎ বিশ্বকে যেন আংশিক ভাবে অস্বীকার করা হইল বলিয়া মনে হয়। খনা,লীলাবতীর দেশের মেয়েদের পক্ষে বহির্বিষয়ক জ্ঞান অনাবশ্যক বলা যায় কি ? ব্রত-নিয়মাদি পালন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া মূল্যবান নিঃসন্দেহ, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিধি আরও ব্যাপক। কন্যাকে কন্যাও হইতে হইবে, মানুষও হওয়া চাই। তার পর কালের সঙ্গে সঙ্গে নবতর ব্রত-নিয়মাদিও বিরচিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে কন্যাদিগকে সমান ভাবে নামিতে হইবে। অধিদেবতা বিশ্বরথ-যাত্রায় বাহির হইয়াছেন ;—পুত্রদিগের সঙ্গে কন্যাদিগকেও সেই রথের রশি টানিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

*

কন্যাশিক্ষার অপর দিক

কন্যাশিক্ষার অপর দিক মেয়েদিগকে মেম বানাইয়া তুলিবার প্রয়াস। চলনে বলনে কথাবার্ত্তায় কায়দা-কানুনে

এদেশী মেয়ে বলিয়া চেনা দায় হইয়া উঠে—বর্ণ ও পরিচ্ছদ ছাড়া। কিন্তু কোন্ দেশী মেয়ে? অক্ষম পরদেশী অনুকরণে জাতীয় বৈশিষ্ট্য মরিয়া যায়; 'ফরাসী ধরণে হাসি' 'সাহেবী ধরণে কাসি'ও হাস্তকর হইয়া উঠে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের কথায় —"নবোত্তমই উন্নতির দ্যোতক; গতানুগতিকতা এবং পরানুকরণ ধ্বংসের চিহ্ন। অতীতের জ্ঞান যতই পূর্ণাঙ্গ হউক না কেন, যে আকারে তাহা আচ্ছাদিত তাহা চিরন্তন হইতে পারে না। ঐগুলি নূতন করিয়া গঠন আবশ্যক কিন্তু তাহা পরানুকরণ নহে।"

*

কন্যাশিক্ষায় কুমারী ও বিধবা

কন্যাশিক্ষা বলিতে কুমারীদের শিক্ষাই ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু অল্পবয়স্কা বিধবা যাহারা অনাথা হইয়া পিতৃ-সংসারে আসিয়া আশ্রয় লয়, অথবা 'খাইয়া পয়মাল করিল' গঞ্জনা সহিয়া স্বামীর পরিবারে জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করে, তাহাদিগকেও কন্যাশ্রেণীভুক্ত করা উচিত। তাহা-দিগের জন্য বিশেষ-শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কাহারও গলগ্রহ স্বরূপ না হয় এরূপ অর্থকরী শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ত আছেই, তাহা ছাড়া এরূপ জ্ঞানলাভেরও প্রয়োজন যাহাতে সান্ত্বনা, সংযম ও আত্মিক জ্ঞানসম্ভূত শান্তি যুগপৎ তাহারা লাভ করিতে পারে, অথবা শুশ্রূষা ও শিশুশিক্ষাদান-প্রণালী শিখিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। গৃহশিক্ষয়িত্রী ও শুশ্রূষাকারিণীর কাজের অর্থনৈতিক মূল্যও আছে। অবশ্য, সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে আত্মিক জ্ঞানলাভ।

*

বিধবাশ্রম

এই বিধবাদের শিক্ষার কথা আমরা আন্কোরা উপলব্ধি করিলাম না। বিধবাশিক্ষার প্রচেষ্টা দেশে আরব্ধ হইয়াছে এবং দুই একটি বিধবাশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে আদর্শ (ideal) শিক্ষার কথা বলিতেছি তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি দেখিতে পাই না। আমরা এখানে শিক্ষার কঠোরতার সহিত গৃহের আনন্দের সামঞ্জস্যের কথা বলিতেছি।

*

আশ্রম-সংলগ্ন বালিকাবিদ্যালয়

এরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার আদর্শ বোধ হয় আশ্রম-সংলগ্ন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে—যে বিদ্যালয়ে স্থানীয় গৃহস্থদের বালিকারা আসিয়া পাঠগ্রহণ করিবে এবং আসিবার সময় কৃচ্ছ্রক্লিষ্টা বিধবাদের জন্য বহন করিয়া আনিবে গৃহজাত আনন্দের অমৃত-স্পর্শ। পক্ষান্তরে বালিকারাও তিক্ত ঔষধ গলাধঃ-করণ করিবার মত গৃহাবেষ্টনহীন তথাকথিত বিদ্যালয়ের নীরস পুথির পাঠ মাত্রই গ্রহণ করিবে না, সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক আবেষ্টনও লাভ করিবে *।

*

আদর্শ বিধবাশ্রম

বালিকা-বিদ্যালয় সহ এইরূপ একটি আদর্শ বিধবাশ্রম সম্প্রতি পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পুরী বসন্ত-কুমারী বিধবাশ্রমের কথা বলিতেছি। নারীশিক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তা করিয়া থাকেন এরূপ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন † —"বালিকাদের জীবনের সহজ আনন্দের সংস্পর্শে বিধবাদের জীবনে আনন্দের পুনস্ফুরণ হ'চ্ছে, আবার বিধবাদের জীবনের সংযত নিয়ম-নিষ্ঠার সংস্পর্শে বালিকাদের কোমল প্রাণে অলক্ষ্যভাবে জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব-জ্ঞানের উপলব্ধি অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠছে। ফলে, আশ্রমটি একদিকে যেমন বিধবাদের পক্ষে নিরানন্দের কারাগার না হ'য়ে নিত্য নূতন আনন্দের আবাসভূমি হ'য়ে উঠছে, তেমনি বিদ্যা-লয়ের বালিকাদের পক্ষে ইহা একটি দ্বিতীয় গৃহ স্বরূপ হ'য়ে উঠছে।..."

* "সাধারণতঃ বিধবাশ্রমের জীবনে একটা শুষ্ক নিরা-নন্দতার আবহাওয়া ও বিধিবিধানের কঠোর নিয়মনিষ্ঠার ভাব লক্ষিত হয়। আবার বাংলার সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়েদের পারিবারিক জীবনের ধারার সঙ্গে বিচ্ছেদ ও বিরোধের ভাব পরিলক্ষিত হয়।"—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস।

† 'পুরীর শ্রীক্ষেত্রতীর্থে'—বঙ্গলক্ষ্মী, কার্ত্তিক, ১৩৩৭।

আমরা এই আদর্শ বিধবাশ্রমটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

*

জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতা

অধ্যাপক ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের নাম এদেশে কাহারই অজ্ঞাত নহে। ইনি হিবার্ট লেক্‌চারে আমন্ত্রিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে সম্মানিত হইয়াছেন। উক্ত হিবার্ট লেক্‌চার, এবং সম্প্রতি-প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ তিনি প্রতীচ্যের জড়বাদ এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এই—একপ্রকার সাংঘাতিক জড়বাদ আমাদিগের অধ্যাত্মবাদকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিতে বসিয়াছে। আমরা অধিক বেতনের জন্য জীবনদানে প্রস্তুত, কিন্তু উচ্চ আদর্শের জন্য নহে। ঐহিক সুখভোগের প্রতি আমাদের ভক্তি এক-প্রকার কুসংস্কারের ন্যায়ই হইয়া উঠিয়াছে। এই জড়বাদরূপ নাগপাশের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়—তপস্যা *। ত্যাগ, সহনশীলতা এবং কৃচ্ছ্রসাধনা এই তপস্যার মন্ত্র।

*

নিখিল এসিয়া শিক্ষা-সম্মিলন

সম্প্রতি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল এসিয়া শিক্ষা-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। নূতন কিছু না হইলেও ‡ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং সময়োপযোগী। তাঁহার প্রধান কথা এই—"প্রাচ্যখণ্ড বা এসিয়া আধ্যাত্মিক অমৃতের (culture of the soul) এবং পাশ্চাত্যখণ্ড বা য়ুরোপ-আমেরিকা পার্থিব জড়সম্পদের অধিকারী; এই উভয়ের মিলন না হইলে জগতের প্রকৃত মঙ্গল অসম্ভব।..." সুদূর প্রাচ্য-প্রদেশাগত প্রতিনিধিদিগের মধ্যে চৈনিক প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত 'ওয়ং' মহাশয়ের প্রস্তাব স্মরণীয়তর। তিনি এসিয়া মহাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে অধ্যাপক ও অধ্যাপন-বিনিময়ের প্রস্তাব করেন *। দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য সম্মিলনকে চীন দেশ হইতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সম্মিলনের প্রদর্শনীতে প্রাচীন চৈনিক চিত্রসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

*

কবি ইক্‌বালের 'আল্‌নস্কারী' স্বপ্ন

কবি ইক্‌বাল—স্যার মহম্মদ ইকবালের নাম সকলের নিকট তেমন সুপরিচিত না হইলেও, অনেকের পরিচিত এবং এই পরিচয়ের মূল তাঁর কবিপ্রসিদ্ধি §। সম্প্রতি এই কবি সেই পুরাতন প্যান-ইস্‌লামের (Pan-Islam—বিশ্বমোস্‌লেমবাদ) স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁর এই স্বপ্ন জাতীয়তাকে (Nationalism) পদদলিত করিয়া চাহে একমাত্র মোস্‌লেমী ঐক্য। যথা—"পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান প্রভৃতি লইয়া একটি মোস্‌লেম রাষ্ট্র গঠন করা উচিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়াই হউক বা বাহিরে থাকিয়াই হউক, যদি স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপন করিতে হয়, তবে অন্ততঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতকে মোস্‌লেম রাষ্ট্রে পরিণত না করিয়া উপায় নাই এবং উহাই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মোস্‌লেমদের শেষ উদ্দেশ্য।..."

স্বপ্নের উপর মন্তব্যপ্রকাশ অসঙ্গত। বিশেষতঃ, কোন জাগ্রত জাতীয়তা স্বপ্ন-কথায় আশঙ্কিত হয় না।

*

নারী—সেবাদাসী ?

সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ মুস্লিম যুব সম্মিলনীর (হাওড়া) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে মিঃ আবদুল হোসেন যে

* "স তপো তপ্‌ত্বা স তপঃ তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজৎ (তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন, তপস্যার দ্বারা তিনি এই সব সৃষ্টি করিয়াছেন)"—উপনিষদ।

‡ বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন।

* রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সর্ব্বপ্রথম এই অধ্যাপক ও অধ্যাপন বিনিময়ের প্রবর্ত্তন করেন।

§ কবি ইক্‌বালের সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয় মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে—বিচিত্রা, ১৩৩৭।

অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করা গেল—"হে বাঙ্গলার মুস্লিম যুবক, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী হিন্দুদিগের নিকট হইতে কি পাইতে আশা কর? তাহারা ইচ্ছা করিয়া তোমাদিগকে কিছুই দিবে না…হিন্দু-দিগের হাতের ফাঁক দিয়া ভিক্ষুকের ঝুলিতে কিছুই পড়িবে না…তোমরা এককালে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলে। পৃথিবীর পুরুষগণ কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমাদের চরণধূলি চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইত এবং পৃথিবীর নারীগণ তোমাদের হারেমে সেবাদাসীর কার্য্য করিত। কিন্তু আজ তাহা আকাশ-কুসুমের অসম্ভব কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। সেই সমস্ত মহামহিমান্বিত মুসলমানদিগের বংশধরগণ আজ গোলামের গোলামে পরিণত হইয়াছে।…"

আমরা হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারিতেছি না!

*

সাম্প্রদায়িকতায় দার্শনিক দৃষ্টি

সম্প্রতি ঢাকা কার্জ্জন-হলে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় সভাপতি অধ্যাপক এ, আর, ওয়াদিয়া বলেন যে, সম্প্রদায়িক বিবাদের প্রতিকারের জন্য ছাত্রদিগের উচিত দর্শনের দৃষ্টি লইয়া এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়া। মনোবৃত্তির যে ঘাত-প্রতিঘাতে এরূপ বিবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এই দৃষ্টির ফলে তাঁহারা সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিবেন। তাঁহার বিশ্বাস, ছাত্রগণ যদি এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা নিবারণের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে এইগুলি আর সংঘটিত হইবে না। এই সমস্ত ঘটনাকে যে প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না, তাহা সত্য নহে, কারণ, দক্ষিণ-ভারতে এইরূপ বিবাদ কখনও ঘটে না। অধ্যাপক ওয়াদিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, মানুষের যে সমস্ত চিত্তবৃত্তি সত্য ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সেইগুলিই এই প্রকার সমাজিক দুর্নীতির সৃষ্টি করিয়া থাকে। ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিক এবং এই কথা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের উচিত তদনুরূপ যোগ্যতার সহিত জীবনকে গঠন করা এবং এই সমস্ত শোচনীয় ব্যাপারের সম্মুখীন হওয়া।

আমরা অধ্যাপক ওয়াদিয়ার শুভাকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

*

ছাপার ভুল

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"ছাপাখানার ভূত।" বাংলা ভাষাতেও 'মুদ্রাকর-প্রমাদ' সুপ্রচলিত। গ্রন্থকার, সম্পাদক সকলকেই এই প্রমথ বা প্রমাদের হাতে লজ্জিত ও অপদস্থ হইতে হয়। অন্য দেশে ওখার ব্যবস্থায় ভূত ছাড়িতে দেরী হয় না; নির্ভুল ছাপা সেসব দেশে কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দীর 'বিলাত ভ্রমণে' পড়িয়াছি—সামান্য একটা ছাপার ভুলের জন্য,প্রেসের সুনাম নষ্ট হইবে ভাবিয়া প্রেসের মালিক অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও গ্রাহককে নিজের খরচে মূল্যবান কাগজ কিনিয়া পুনরায় ছাপাইয়া দিলেন। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের এইরূপ সুনাম আছে; শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু ঐ প্রেস সম্বন্ধে একবার অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন, মনে পড়ে। কিন্তু সাধারণ প্রেসের মালিকগণ এ বিষয়ে বড়ই অসতর্ক। তাঁহারা ফাঁকি দিয়া পাখী মারিতে চান—কোন প্রকারে ছাপাইয়া টাকা পকেটস্থ করিতে পারিলেই হইল। ফাইনাল প্রুফে যেসব ভুল ছিল না, ছাপা হইবার পর দেখা যায় সেইরূপ ভুল হইয়াছে। একবার '৩.৬.২৯' এইরূপ লিখিত তারিখ-চিহ্ন '৩·৬·২৯' রূপে কম্পোজ হইয়া আসিলে সংশোধন করিয়া দেওয়ায় বিপরীত ফল হইয়াছিল—অর্থাৎ ছাপা হইল '৩০৬০২৯'। এইরূপ হইবার কারণ কম্পোজিটারের অসতর্কতা, প্রেসের মালিকের তাড়াহুড়া এবং নিরক্ষর প্রেসম্যানের উপর নির্ভর করা।

এজন্য, যিনি সম্পাদন করেন বা যিনি ফাইনাল প্রুফ দেখেন একমাত্র তাঁহার উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ভুল। এবং কাগজের মালিকের পক্ষে কর্ত্তব্য—প্রেসকে জোরের সহিত সাবধান করিয়া দেওয়া, প্রমাদগ্রস্ত ফর্ম্মা প্রেসের ব্যয়ে পুনর্মুদ্রিত করা এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করা।

সাহায্য বন্ধ হইবে না

("সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত হইল)—১৯২৭-২৮ সালে গবর্ণমেণ্ট পুরুষদের জন্য সাহায্যকৃত কলেজে ১২,৬৭,১৫৪ টাকা; হাই স্কুল, মধ্য স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলে ২৭,২৮,১৩৫ টাকা; অন্যান্য শ্রেণীর স্কুলে ৪,৬৭,০৮৭ টাকা; মোট ৪৪,৫২, ৩৬৬ টাকা দিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদের জন্য সাহায্যকৃত কলেজে ২১,০৬০ টাকা; হাই স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলে ৮,৬৬,১০৫০ টাকা; অন্যান্য স্কুলে ৬৫,১৫৪ টাকা দিয়াছেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে মোট ৫৪,০৭,১০৩ টাকা দিয়াছিলেন।

এই সাহায্য বন্ধ করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। বঙ্গদেশে পুরুষদের জন্য সাহায্যকৃত কলেজের সংখ্যা ২৯; হাই, মধ্য ও প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৩৩,৬৫৪; অন্যান্য স্কুলের সংখ্যা ১৫৯১; মোট ৩৫১৭৭। স্ত্রীলোকদের জন্য সাহায্যকৃত কলেজের সংখ্যা ২; হাই, মধ্য ও প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ১২,৩২১; অন্যান্য শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা ৪৩; মোট ১২,৩০৬। সাহায্যকৃত কলেজে ছাত্র-সংখ্যা ১৪,৮২৯; হাই, মধ্য ও প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৪,০৩৯০৭; অন্যান্য স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৮১ ৮৩; মোট ১৫, ০০,২২৪। সাহায্যকৃত কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা ৮৮০; হাই, মধ্য ও প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রী-সংখ্যা ৩৫৫, ৯৯৬; অন্যান্য শ্রেণীর স্কুলের ছাত্রী-সংখ্যা ১৬৮১; মোট ৩,৫৮,৫৬৪।

যদি গভর্ণমেণ্ট-সাহায্য বন্ধ হইত তাহা হইলে ৪৮,১৩৩ কলেজ ও স্কুলের অনেকগুলি উঠিয়া যাইত। ঐ সকল কলেজ ও স্কুলে যে, ১৮,৫৭,৯৮৯ জন ছাত্র ও ছাত্রী পাঠ করে, তাহাদের পড়া বন্ধ হইত। ৫৪ লক্ষ টাকা বাঁচাইবার জন্য ১৮ লক্ষ ছাত্র ও ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ করা হইত।…নিরক্ষর বঙ্গদেশে নিরক্ষরতা আরও বৃদ্ধি পাইত। আর একটি কুফল এই হইত যে, জনসাধারণের গভর্ণমেণ্টের উপর যে শ্রদ্ধা আছে, তাহা হারাইত। বঙ্গদেশে যে মহা দুর্দ্দিন আসিত, গবর্ণর তাহা হইতে এই দেশকে রক্ষা করিয়াছেন।

কারুসঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন, কলাভবনের শিল্পীগণ কারুসঙ্ঘ নামে যে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিষয় শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নানারূপ শিল্পকর্ম্ম দ্বারা স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের চেষ্টা করা। শিল্পীগণ পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা সমবায়-নীতিতে এই কার্য্য করার চেষ্টা করিতেছেন।

অল্প কিছু মূলধন লইয়া কারুসঙ্ঘের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। কারু-সঙ্ঘের ছয়জন সভ্য আছেন; সকলকেই কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া মূলধন পুষ্ট করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ এবং আগ্রহেই এই সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে, সেজন্য কলাভবনের শিল্পীগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। এই সঙ্ঘের যাহা নিয়ম তাহা সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় হইলেন এই সঙ্ঘের সভাপতি। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে শিল্পীগণ কাজ করিয়া থাকেন। এই প্রচেষ্টা যে কেবল অর্থনীতির দিক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নহে, শিল্পীগণ যে কয়টি কারুশিল্পে বা crafts-এ হাত দিয়াছেন নতুন নতুন পরিকল্পনা দ্বারা তাহার উন্নতিরও চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদের দেশের নানাপ্রকার হাতের কাজ রহিয়াছে বংশানুক্রমিক কারিগরদের হাতে, তাহারা বাপ-দাদার শেখানো বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করিতেছে। তাহারা তাহাদের কাজে নতুন ডিজাইন দিতে সক্ষম হইতেছে না। নতুন যে ডিজাইন আমাদের কারুশিল্পে ঢুকিয়াছে এবং ঢুকিতেছে, তাহার অধিকাংশই বিলাতের তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পের অনুকরণ। শিল্পের এই অবনতি কেবল আর্টিষ্টরাই দূর করিতে পারেন।

বাংলার চিত্রকরগণ এতাবৎকাল কারুশিল্পের প্রতি তেমন যত্ন প্রকাশ করেন নাই; এখন ক্রমশঃ তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কারুকর্ম্ম বা applied art না মানিলে চলিবে না। ইউরোপীয়

শিল্পীদের এই প্রচেষ্টা বহুদিন হইতে চলিতেছে, তাঁহারা ব্যবহারিক শিল্পের উন্নতিবিধানে যত্নতৎপর।

সৌন্দর্য্যানুরাগ মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। বাড়ীর তৈজসপত্র, জানালার পর্দ্দা, গহনা, অলঙ্কার সকল দ্রব্যই যদি নয়নাভিরাম হয়, মন তৃপ্ত হয়। উচ্চ দামী চিত্র দিয়া ঘর সাজাইতে ধনী ছাড়া সকলে সক্ষম হয় না, কিন্তু ধনী-দরিদ্র সকলেই চায় তাহাদের ঘরের ব্যবহারিক দ্রব্য সকল সুন্দর হয়। আর্টিষ্টের পরিকল্পনার সহিত যখন কারুশিল্পের সংযোগ হয়, আর্ট তখনই পূর্ণতা লাভ করে।

৮.৯ বৎসর পূর্ব্বে কলাভবনে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর উৎসাহে এবং ফরাসী মহিলা-শিল্পী শ্রীযুক্তা আন্দ্রে কার্পেলেসের শিক্ষাধীনে একবার কারুশিল্পের প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। কারুশিল্পকে কেবল শিক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য না করিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাহাতে তাহার চাহিদা হয়, এবার তাহারই চেষ্টা হইতেছে।

এখানকার মেয়েরা ছুঁচের কাজে বা এম্‌ব্রয়ডারিতে ও 'বাটিকের' কাজে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। এ-সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নতুন ডিজাইনের জ্ঞান জন্মিতেছে। বাটিকের চেষ্টা আমাদের দেশে নতুন। যবদ্বীপের বাটিকের কাজ প্রসিদ্ধ। কাপড়ের উপর ডিজাইন করিয়া তাহা মোম দিয়া ঢাকিয়া ছোপাইয়া লইতে হয়। ছাপা ডিজাইন হইতে এই কাজের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কারুসঙ্ঘে যে বাটিকের কাজ সুরু হইয়াছে, ইহাতে দেশে একটি নতুন ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিবে।

অনেক যায়গায় কারুশিল্পের শিক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মেয়েদের অনেকেরই সখ আছে এম্‌ব্রয়ডারি করা,—ছুঁচের কাজে ব্লাউজ-পিস্, টেবিল-ক্লথ ইত্যাদি সুশোভিত করা। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ডিজাইনে মৌলিকতার অভাব। কাজে দক্ষতা থাকিলেও সুন্দর পরিকল্পনার অভাবে সেসব ডিজাইন চিত্তাকর্ষক হয় না। কোনো বিলাতী ডিজাইন নকল করিয়া এম্‌ব্রয়ডারি করিতে হয়। সেই অভাব দূর করিবার জন্য কারুসঙ্ঘ 'সীবনী' নামে একটি ডিজাইনের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। কারুসঙ্ঘের সভ্য শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

সম্ভব হইলে কারুসঙ্ঘ ক্রমশঃ আসবাবপত্র, গহনা ইত্যাদি ডিজাইনের পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করিতে পারে।

কারুসঙ্ঘ আপাততঃ এই সকল কাজ করিয়া থাকে। (১) চিত্র—Book illustration, Poster design etc. (২) মূর্ত্তি—Designs and portraits in clay and plaster of Paris and terra cotta. (৩) বাটিকের কাজ—Batik work. (৪) ফ্রেস্কো চিত্র—Fresco painting. (৫) গহনা, আসবাবপত্র ইত্যাদির ডিজাইন—Designs for ornaments, furniture etc. (৬) উড্‌কাট্‌—Wood cut."

আমরা আশা করি, কারুসঙ্ঘের এই প্রচেষ্টা দেশের নিকট অনাদৃত থাকিবে না।

*

ধর ব্রাদার্সের ক্যালেণ্ডার

আমরা হ্যারিসন রোডের বিখ্যাত মণিহারী বিপণিকার শ্রীযুক্ত ধর ব্রাদার্সের ১৯৩১ সনের মুদ্রিত ক্যালেণ্ডার উপহার পাইয়াছি। ইহা সুরুচিসম্পন্ন এবং সুন্দর।

"বঙ্গলক্ষ্মী"র কয়েকজন লেখিকা

প্রতি বৎসরই বহু প্রতিভাশালিনী বঙ্গ-বিদুষী অগ্রগণ্যারা বিবিধ সারগর্ভ সন্দর্ভ-সম্ভারে 'বঙ্গলক্ষ্মী'কে সমৃদ্ধা করিয়া থাকেন, 'বঙ্গলক্ষ্মী'র পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন। আমরা এখানে বিগত বৎসরের (১৩৩৬—৩৭) বিশিষ্ট কয়েকজন প্রবন্ধ-রচয়িত্রীর আলোকচিত্র প্রকাশিত করিতেছি।

শ্রীমতী হেমলতা সরকার

শ্রীমতী নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি

শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ

শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী বি-এ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি-এ

শ্রীমতী সীতা দেবী বি-এ

শ্রীমতী শান্তা দেবী বি-এ

শ্রীমতী রাণী সুরুচিবালা চৌধুরী

স্বরলিপি

চির-সাথী

সিন্ধু—দাদ্‌রা

কথা :—শ্রী গুরুসদয় দত্ত সুর :—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি :—শ্রী নির্ম্মলনলিনী দে

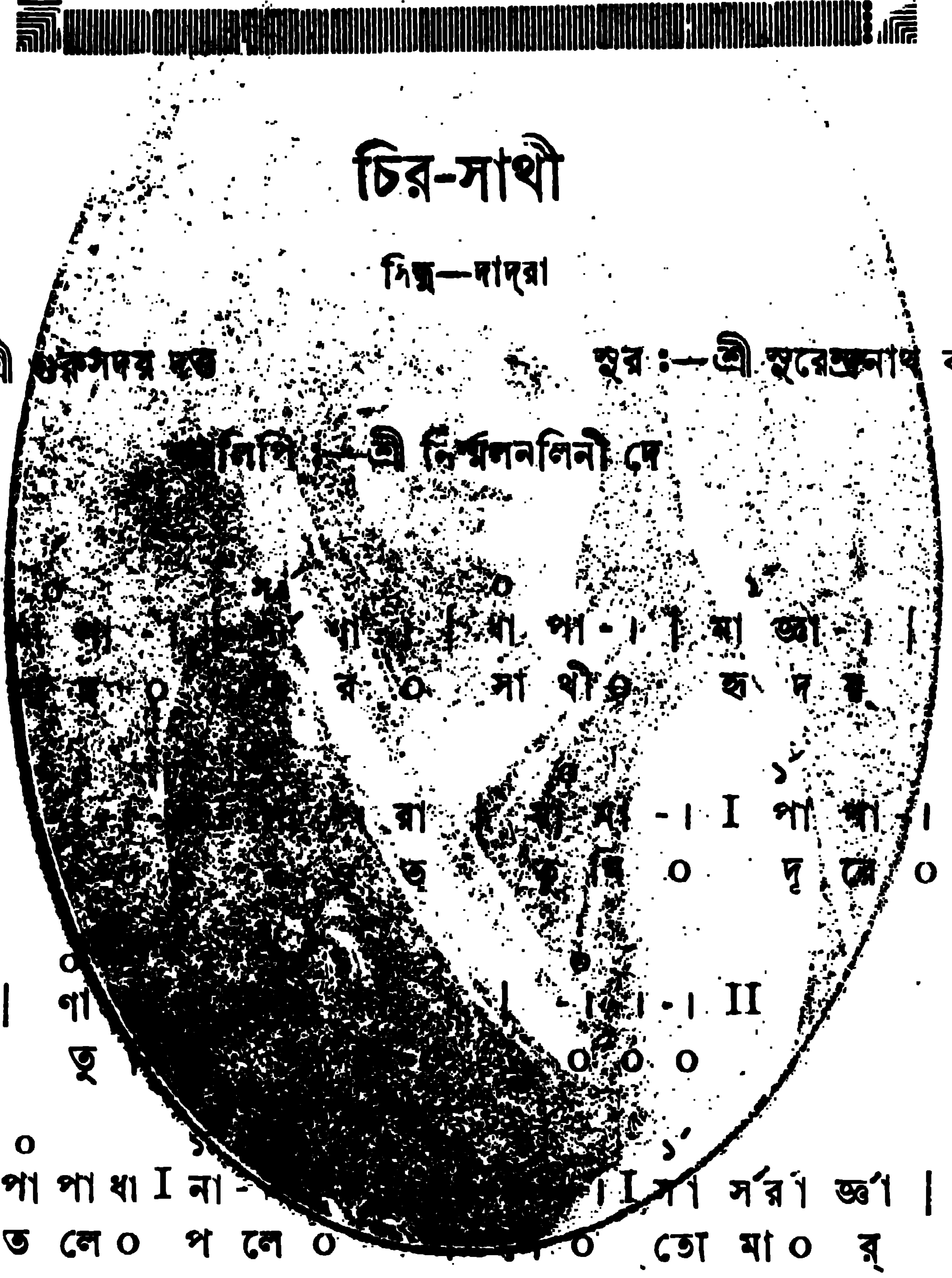

II সা রা -। | ... I ধা পা -। | মা জ্ঞা -। | রা সরা জ্ঞা]
হ য়ে ০ ... সা থী ০ হ দ য় পু রী ০ ০

রা সা -। | ... রা | ... I পা ধা -। | ধা ধা ণা I
জু ড়ে ০ ... দূ রে ০ বঁ ধু ০

ধা র্সা র্সা | ণা ... | -। -। -। II
ন ও ত তু ... ০ ০ ০

{ মা মা -। | পা পা ধা I না ... । I র্সা র্সর্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সনা -। I
ম র ম্ ত লে ০ প লে ০ ... ০ তো মা ০ র্ প র ০ শ্

সা -। -। | -। -। -। I ধা ণা -। | র্রা র্রা -। | র্মা র্জ্ঞা -। | র্রা র্সা -। I
পা ০ ০ ০ ০ ই জ্ব লে ০ প্র দী প্ তো মা র্ আ লো র্

র্রা র্সা -। | ণা ণা ধা I পা -। -। | -। -। -। } পা পা র্সা | র্সা র্সা র্রা I
য খ ন্ যে থা য়্ যা ০ ০ ০ ০ ই } তো মা র্ আ গ ০

র্সা ণা -। | ধা পা -। I পা মা -। | জ্ঞা রা জ্ঞা I রা সা -। | -। -। -। II
ম নী র্ ধ্ব নি ০ শো না য় স ক ল্ সু রে ০ ০ ০ ০

১´　　　　০　　　　১´　　　　০　　　　১´　　　　০
পা পা র্সা | সা র্সা র্রা | র্সা ণা - । | ধা পা - । | পা মাজ্ঞা রা | - । রা রা I
ক্ষ ণে ০　ক্ষ ণে ০　তো মা র　স নে ০　নূ ত ০ ০　ন্ প রি

১´　　　　০　　　　১´　　　　০　　　　১´　　　　০
পা - । - । | - । - । - । I না না - । | ধা না - । I ধানা র্সা না | ধা পা - । I
চ ০ ০　০ ০ য়্　গ ড়ে ০　আ মা র্　বি০ ০ শ্ব　ভু ব ন্

১´　　　　০　　　　১´　　　　০　　　　১´　　　　০
পা মা - । | জ্ঞা জ্ঞা রা I সা - । - । | - । মা মা I { মা - । পা | না না - । I
নূ ত ন্　শো ভা ০　ম ০ ০　য়্ আ মার্ { শূ ০ ন্য　গৃ হ ০

১´　　　　০　　　　১´　　　　০　　　　১´　　　　০
র্সা - । র্সা | র্সা র্সা না I র্সা র্সার্রা-জ্ঞা | র্রা র্সা র্রা | না র্সা - । | - । - ধা ধা |
পূ ০ র্ণ　তো মা র　অ ম ০ র্　অ ধি ০　ষ্ঠা নে ০　০ আমার

১´　　　　০　　　　১´　　　　০　　　　১´　　　　০
র্রা র্রা - । | র্রা র্ জ্ঞা র্মা | র্মা জ্ঞা - । | র্রা র্সা - । I র্রা র্সা - । | ণা পা ণা I
বি র ০　হ বে ০ ০　দ হ ০　ম ধু র্ মি ল ন্　ভো রে র

১´　　　　০　　　　০　　　　১´　　　　০　　　　১´
ধা পা - । | (- । পা পা) } - । মা মা I পা পা র্সা | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা - । |
টা নে ০　০ আ মার } ০ আ মার্　ম র ণ　জ য়ী ০　জী ব ন্

০　　　　১´　　　　০　　　　১´　　　　০
ধা পা - । I পা মা - । | জ্ঞা রা জ্ঞা I রা সা - । | - । - । - । II II
তো মা র্　প্রে মে র্　শি খা য়্　পু ড়ে ০　০ ০ ০

স্বরলিপি

প্রথম দিনের দেখা

ভৈরবী—দাদ্‌রা

কথা :—শ্রী গুরুসদয় দত্ত   সুর :—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি :—শ্রী নির্ম্মলনলিনী দে

১´ ০ ১´ ০ ১´
সা সা- দা | দা পা া | না দা পা | পা মাজ্ঞা জ্ঞা I ঋা সা ঋা |
তো মা র সা থে ০ আ মা র্‌ সে যে০ ০ প্র থ ম

০ ১´ ০ ১´ ০
মা জ্ঞরা জ্ঞা | ঋা সা া | া দ্‌া দ্‌া I ণ্‌া সা - জ্ঞা | রা জ্ঞা - া I
দি নে০ র্‌ দে খা ০ ০ আ ছে জী ব ন্‌ প্রা তে র্‌

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
রা জ্ঞা - া | রা জ্ঞা ঋসা | সা সা - ঋা | মা জ্ঞা া | ঋা সা া | া া া II
স্ব প ন্‌ র ঙে ০০ স্মৃ তি র্‌ প টে ০ লে খা ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
পা পা | মা মা - দা | দা দা ণা I ণা র্সা - া | সা র্সা া I
ক ত | অ তী ত | যু গে র্‌ মি লন্‌ | ক থা

১ ০ ১ ০ ১ ০
দা -া ণা | র্সা র্সর্ঋা র্জ্ঞা I র্ঋা র্সা া | া র্সা র্সা I র্জ্ঞা া র্জ্ঞা | া র্ঋ র্সা I
প ড়্‌ ল ত খ ন্‌ ম নে ০ ০ ক ত জ ০ ন্মা ০ স্তরের

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
ণা দা - া | ণা সা া I র্সা দা া | ণা র্সর্ঋা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা া | া দা দা |
প্র ণ য়্‌ দে খা ০ দি ল ০ দ র০ ০ শ নে ০ ০ ক ত

১´ ০ ১´ ০ ১ ০
র্সা র্সা া | র্ঋা র্সা া I র্সা র্ণা া | দা পা - া I জ্ঞা জ্ঞা - া | মা জ্ঞা - া I
চি র ০ প রি ০ চি ত ০ তো মা র্‌ চ খে র্‌ কা জ ল্‌

১´　　　•
র্ঋা সা ।　।　।　।　II
রে খা ০　০　০　০

১´　　　•　　　১´　　　•
{ জ্ঞা জ্ঞা I সা সা - । | সা সা ঋা I জ্ঞা মা - । | - । - মামা I
{ গেঁ থে　নূ ত ন্　ব র ণ্　মা লা ০　০ তুমি

১´　　　•　　　১´　　　•
মা জ্ঞামা পদা | দা পদা ণা I দা পা - । | - । জ্ঞা জ্ঞা I
দি লে০ ০০　আ মা০ র্　গ লে ০　০ আ মি

১´　　　•　　　১´　　　•
রা - । জ্ঞা | রা জ্ঞা - । I রা জ্ঞা - । | রা জ্ঞা ঋসা I
রা খ্ ব　তা রে ০　চি র ০　ন বী ০ন্

১´　　　•　　　১´　　　•
সা সা ঋা | মা জ্ঞা - । I ঋা সা - । | - ।　} মা মা I
আ মা র্　চো খে র্　জ লে - ০　০　} হ য়ে

১´　　　•　　　১´　　　•
মা দা দা | দা দা - ণা I ণা র্সা - । | । র্সা র্সা I
স ০ ঙ্গো　প নে র্　সা থী ০　০ আ ম'র্

১´　　　•　　　১´　　　•
দা - । ণা | র্সা র্স র্ঋা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা - । | - । - । - । I
চ ল্ বে　তু মি ০ ০　প থে ০　০ ০ ০

১´　　　•　　　১´　　　•
র্জ্ঞা - । র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা - । I র্রা র্জ্ঞা - । | র্রা র্জ্ঞা র্ঋসা I
জ্ব ল্ বে　তো মা র্　হো মে র্　শি খা ০ ০

১´　　　•　　　১´　　　•
সা র্সা র্ঋা | মা র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা - । | - । - । - । I
আ মা র্　জী ব ০ ন্　ব্রতে / ০　০ ০ ০

১´　　　•　　　১´　　　•
দা দা র্সা | র্ঋা র্সা - । I ণা র্সা ণা | দা পা - । I
অ ন ০　স্ত পা র　বা ০ ত্রা　আ মা র

১´　　　•　　　১´　　　•
মা পা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা | ঋা সা - । | । - । - । II II
লা গ্ বে　না আর্　এ কা ০　০ ০ ০

গৃহলক্ষ্মী

"গৃহে রহি' গৃহলক্ষ্মী নাশ' গৃহ-বিঘ্নচয়,
অন্তরে একান্ত প্রেম চিরস্নিগ্ধ মধুময়।"

—হেমলতা দেবী।

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

অশোকের বাড়ী আজ অন্ধকার। গৃহলক্ষ্মী গৃহে না থাক্‌লে বাড়ীর চেহারা যেমন হয় সেই রকম আর কি। ললিতা কিন্তু সখ ক'রে স্বামী সংসার ফেলে দার্জ্জিলিং পাহাড়ের আশ্রয় নেয় নি তাকে বাধ্য হ'য়েই যেতে হয়েছিল। আজ এই অন্ধকার ঘরের কোণে ব'সে অশোক সেই কথাই ভাব্‌ছিল। এই সবে তের বৎসর হ'ল তাদের বিবাহ হয়েছে। বিবাহের দিনটা অশোকের বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই একদিন ফাল্গুন সন্ধ্যায় যাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পেয়েছিল সেই দিনটা ত ভোলবার নয়। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'টা বছর ঘুরে গেল, কিন্তু এই ছটি নবীন সংসারীর মনে কোন পরিবর্ত্তনই হ'ল না। তারা যে আগ্রহ নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিল সেই আগ্রহ তাদের পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল বরং যেদিন ললিতা তাদের বিবাহের সফলতার চিহ্নস্বরূপ এক নূতন প্রাণের সাড়া পেল সেদিন হ'তে সংসার কর্‌বার আগ্রহটা তাদের উভয়েরই মনে প্রথম স্থান নিল। দুজনে কত সুখের ছবি না একত্রে ব'সে এঁকেছিল—ঐ ঘরটায় সে থাক্‌বে, তার অভ্যর্থনার জন্যে ঘরটা নূতন ক'রে সাজাবার দরকার। একদিন দুপুরে দুজনে শিশুর ব্যবহারের উপযুক্ত বিস্তর আসবাবপত্র কিনে নিয়ে এসে সারাদিন ধ'রে ঘর সাজাল, কিছুতেই যেন তৃপ্তি হয় না, মনে কেবলি ভয় হয় বুঝি বা এই নূতন অতিথির উপযুক্ত কিছুই হ'ল না।

তার পর নাম নিয়ে কিছু দিন কাট্‌ল। দুজনেই স্থির করেছিল যে এই আগন্তুকটি একটি ফুটফুটে ফুলের মত মেয়ের সাজেই তাদের কাছে ধরা দেবে। মা বল্লেন, মেয়ের নাম রাখ্‌বেন "সন্ধ্যা"। বাপের সে নাম পছন্দ হ'ল না। "সন্ধ্যা" নাম কালো মেয়েকেই মানায়, ললিতার মেয়ের কি ঐ নাম সাজে? মা হেসে বল্লেন—"বা রে, মা'র মত হ'লে ত' মেয়ে কালো হবে।" বাপও হেসে উত্তর দেন—"অমন কালো হ'লে ত বেঁচে যাই, বিয়ের সময় একপয়সা বের কর্‌তে হয় না।" অবশেষে দুজনে মিলে ঠিক করলেন মেয়ের নাম রাখবেন "তারা"। "তারা" কিন্তু তাদের কোলে রইল না। বাপ মা'র বুক আঁধার ক'রে অসময়ে গিয়ে ঐ আকাশেরই বুকে তারা হ'য়ে ফুটে রইল। সেদিনের ছবি যেন চিরকালের জন্যে মুছে যায়। "তারা" ত' গেলই, সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও যেতে বসেছিল। বহুকষ্টে তাকে কোনরকমে প্রাণে বাঁচান গিয়েছিল। তারপর ডাক্তারের আদেশমত তাকে যতশীঘ্র সম্ভব পাহাড়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। অশোকের যাবার কোন উপায় ছিল না, মস্তবড় আপিসের ভার তার উপর। শেষে ললিতার বাপ-মা আপন সংসার বড় ছেলে-বৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে একটিমাত্র আদরিণী কন্যার স্বাস্থ্যের অন্বেষণে দার্জ্জিলিং রওনা হলেন। ললিতার ভ্রাতৃবধূ সুমিত্রার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে যতদিন ললিতা না ফেরে ততদিন অশোক যেন তাঁদেরই ওখানে থাকে; অশোক কিন্তু নিজের বাড়ী ছেড়ে যেতে রাজী হয় নি, বোধ হয় ললিতার স্মৃতি-জড়িত এ ঘরগুলি ছেড়ে যাবার শক্তি তার ছিল না।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে এসে অশোক ললিতার ব্যবহার-করা ঘরটিতে ঢুকল, এইখানেই সে বৈকালের জলযোগ করে। সবই ত' রয়েছে, কেবল একটিমাত্র মানুষের অভাবে সংসারটা কি হ'য়ে যায় একেবারে মরুভূমি! ঐ ত তার পরা শাড়ী এখনও আল্‌নায় ঝুলছে; ঐ ড্রেসিং-টেবিলের উপর তার মাথার চিরুণীটি ঠিক সেই রকমই ত' প'ড়ে রয়েছে, কয়েকগাছি চুলও যে তাতে এখনও জড়ান। কিন্তু তবুও কেন এ-ঘরের এমন

শ্রীহীন চেহারা। হঠাৎ অশোকের চোখ পড়্‌ল একটা ছোট টেবিলের উপর—এক-গুলি পশম, একটি শিশুর পায়ের অর্দ্ধসমাপ্ত মোজা...মা'র প্রাণের কত স্নেহ প্রেম, কত হর্ষ গর্ব্ব আবার কত বেদনা কত ভগ্ন-আশা না ওতে মাখান আছে! অশোকের চোখদুটো জ্বালা করতে লাগল, তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(২)

সেদিন রবিবার। বারাণ্ডার এক কোণে ব'সে অশোক একটা চায়ের পেয়ালা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এমন সময় সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর অশোকের এই আঁধার গৃহ-কোণ আলো ক'রে এসে দাঁড়াল চপলা। চপলা ললিতার বন্ধু, সুন্দরী ত' বটেই, আর উপর এই সৌন্দর্য্যটা কি ক'রে ফুটিয়ে তুলতে হয় সে বিষয়েও তার খুব নজর ছিল। কমলা রঙের কালো রেশম ও জরির কাজ-করা জর্জ্জেটের শাড়ী, ঐ রঙেরই কাঁধ পর্য্যন্ত হাতকাটা জামা, ঘাড়ে খোঁপা, তার বাঁ দিকে একটা [illegible] কাঁটা। কানের রূপোর ফুল, গলায় একছড়া কালো জেডের মালা, ঐ রকমই জেডের ইয়ারিং তার সাদা গাল ছুঁয়ে [illegible] এসেছে, কপালে সিঁদুরের বড় টিপ, পায়ে কালো মখমলের উপর জরির কাজ-করা স্যাণ্ডেল, হাতে সোনার চুড়ি ও কঙ্কণ, বাঁ হাতের মণিবন্ধে কালো ফিতেয় বাঁধা সোনার ঘড়ি, বাঁ দিকের উপর-হাতে কালো জেডের তাগা, তারই মধ্যে একটা কমলা রঙের ছোট সিল্কের রুমাল গোঁজা। চারধার সেণ্ট পাউডারের গন্ধে ভরপুর। হঠাৎ এই বিদ্যুৎ-শিখাটিকে দেখে অশোক একেবারে চমকে গেল। চপলা অপ্রস্তুত হবার মেয়ে নয়, সে একটু হেসে বল্লে, "কি অমন অবাক হ'য়ে গেলেন কেন? আমার কি এ-বাড়ীতে আসা নিষেধ নাকি?" অশোককে কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই সে ব'লে চল্ল—"কৈ ললিতাকে ত' দেখছি না? ঘর দোর অন্ধকার ক'রে একাই যে ব'সে রয়েছেন? এত পরিবর্ত্তন হ'ল কেমন ক'রে?" চপলা একটু থামতে অশোক বল্ল—"সে ত' এখানে নেই, দার্জ্জিলিং এ বড় অসুখ করেছিল, ডাক্তাররা মাস-ছয়েকের জন্যে পাহাড়ে থাকতে বলেছেন।" "ওমা তাই নাকি?" চপলার এতটা আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ ছিল না। কারণ এ খবরটা সে আগেই পেয়েছিল সুমিত্রার কাছে। যা হ'ক সে ব'লে চল্ল—"তাই বুঝি এমনভাবে ব'সে কাড়কাঠ গুনছেন? তাকে একলা বড় যেতে দিলেন? একজন সারতে গিয়ে শেষে কি আর একজন রোগে পড়বে? তা আপিসটা নেহাৎ খোলা, তা' না হ'লে আজ আর কি আপনার দর্শন পেতাম? ললিতা থাকতে ঐ নমস্কার ক'রেই সেরে দিতেন, আজ একটু বিপদে পড়েছেন কি বলুন? কার হাতে আমায় সঁপে দেবেন? আপনার উড়ে বেয়ারা বনমালী কি চল্‌বে? ললিতার আয়াটা থাকলেও বরং সুবিধা হ'ত নয় কি? কতবার আপনার বাড়ী এসেছি, দু' দণ্ড ব'সে কথা বলাটাও প্রয়োজন বোধ করেন নি, আমরা এমনি হেয়!" এতগুলো কথা একনিশ্বাসে ব'লে ফেলে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে চপলা ব'সে পড়ল।

চপলা বসবার পর অশোক'ও নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে ব'সে চপলার কোন কথার জবাব না দিয়ে বল্লে—"আপনাকে এক পেয়ালা চা দিতে বল্‌ব কি?"

[illegible]

একবার যা চেয়েছে তা অন্যে দিতে বাধ্য। [illegible]

দা' আর বিমলা বৌদি'ও আপনার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছেন—”

সতীশের নাম শুনে অশোকের ধড়ে প্রাণ এল। তার মুখের উপর থেকে যে কালো মেঘ স'রে গেল চপলার নজরে তা পড়্‌ল না, সে তখন তার নিজের কুঁচ্‌কে-যাওয়া সামনের আঁচলের ভাঁজটা চোস্ত করতে ব্যস্ত। আঁচলটা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে দিতে সে বল্লে—“কি এত ভাব্‌ছেন? বাড়ী থেকে বেরুতে গিন্নীর নিষেধ আছে নাকি? ভয় নেই, তাকে না হয় আমি লিখে দেব যে এতে আপনার কোন দোষ নেই, আপনি ঠিকমতই তার স্মৃতি-পূজো কর্‌ছিলেন, আমিই আপনাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছি, দোষ যদি কাউকে দিতে হয় সে আমাকে।”

এ-রকম ধরণের কাথাবার্ত্তা অশোকের ভাল লাগছিল না, সে তাই তাড়াতাড়ি বল্ল—“চলুন যাই. সতীশের সঙ্গে অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।”

“আমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে, বন্ধুর টানেও যে যেতে রাজী হ'লেন এটাই আমাদের মহা ভাগ্যি।”—বেশ বিদ্রূপের সুরেই চপলা এই কথাগুলো বল্ল। অশোক কোন কথায় কান না দিয়ে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হ'ল। চপলার কথার ঝাঁজে মনটা বেশ একটু তিক্ত হ'য়ে গিয়েছিল, তবে সতীশের সঙ্গে গত-দিনগুলির আলোচনার পর অশোক যখন বাড়ী ফির্‌ল তখন তার মনের গ্লানি ক'মে গিয়েছিল অনেকখানি।

এর পর থেকে প্রতি সন্ধ্যা প্রায় অশোকের চপলাদের ওখানেই কেটে যায়। কোন দিন বিকালে চা-পানের পর গান-বাজ্‌না আমোদ-আহ্লাদ চলে, কোন দিন রাতটা তাদের সিনেমা থিয়েটারেই কেটে যায়। অশোকের পয়সা থাকায় পেলিটিতে মধ্যাহ্ন-ভোজন, রাত্রে ফার্পোতে ডিনার করা, বৈকালে উটরাম-ঘাটে চা-পান ইত্যাদি নিত্যই লেগে থাক্‌ত। এ ছাড়া প্রায় প্রতি রবিবার হয় ব্যারাকপুর নয় বরানগর নয় এম্‌নি কোথাও গিয়ে বনভোজন প্রভৃতিতে দিনগুলো বেশ আনন্দের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলেছিল। অবশ্য চপলাই যে এসব উৎসবগুলোর প্রধান পাণ্ডা সেটা বলা বাহুল্য।

প্রথম প্রথম চপলার হাবভাব ধরণধারণ অশোকের মোটেই ভাল লাগত না। মেয়েদের মধ্যে সে বেশী মেশে নি; নিজের কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরে বড় একটা কোথাও সে বেরুত না। নারী-হিসাবে সে এক ললিতাকেই চেনে। চপলার সাজ-গোজ কথাবার্ত্তা সবই ললিতার থেকে পৃথক। ললিতাকে প্রথম যেদিন সে দেখে তার পরণে ছিল ত' একটা লাল চেলির জামা আর একখানা লালপেড়ে গরদ। বরাবরই তার এই ধরণের সাজ-সজ্জা। সংসারের কাজকর্ম সেরে তার বাকি সময়টা আশেপাশের বৌঝিদের অমনধার লেখাপড়া, সেলাই বা গান-বাজ্‌না শিখিয়েই কাটিয়ে দিত। প্রজাপতির মত রঙীন ডানা মেলে এখানে-সেখানে কোনদিনও সে ঘুরে বেড়ায় নি। পাউডার সেন্টের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। তার মুখখানা চপলার মত পাথরে খোদাই প্রতিমার মত না হ'লেও সর্ব্বাঙ্গে তার এমন একটা শ্রী ছিল যে দেখলেই তাকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাতে সবারেরই লোভ হ'ত। ললিতার তুলনায় চপলাকে গোড়ায় অশোকের কেমন ভাল লাগে নি। তবে এই মেশা-মিশির ফলে আগের বিরুদ্ধ ভাবটা অনেকখানিই কেটে গিয়েছিল। ইদানীং তার সঙ্গটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল একটু কেমন নেশার মত—লাগ্‌ত ভালো।

(৩)

সাম্‌নের বড়দিনের ছুটিতে চপলাদের কল্‌তায় বেড়াতে যাবার কথা ছিল। সতীশের এক বন্ধুর সেখানে গঙ্গার উপর একটা বাড়ী থাকায় অসুবিধার কোন কারণ ছিল না। অশোকেরও যে যাবার নিমন্ত্রণ ছিল সেটা বলা বাহুল্য। ঠিক ঐদিন আবার ললিতার বৌদি তাকে দুপুরে খাবার জন্যে ব'লে পাঠিয়েছিলেন।

এর পূর্ব্বে অনেকবার বৌদির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে অশোক চপলাদের সঙ্গে বেড়াতে চ'লে গিয়েছিল। এবার কিন্তু না গেলে তাঁরা সত্যিই দুঃখিত হবেন, অথচ তার মন টানছিল কল্‌তার দিকে। অনেক যুক্তিতর্কের পর সে বৌ-দির ওখানে যাওয়াই ঠিক কর্‌ল। এই বিষয় চপলাকে আগে থেকে শুনিয়ে দেওয়াই ভাল মনে ক'রে সে তাকে সব কথা—টেলিফোনে জানাল। চপলা শুনে একটু আব্দারের সুরেই বল্ল—“বৌদিকে বলুন আপিসের কাজে বাইরে যাচ্ছেন। কি বল্‌ছেন? ওটা মিথ্যা হবে? মিথ্যা হবে ত' হয়েছে কি? আনন্দ ত' পাবেন? অমন 'হোয়াইট

চাই' বলা প্রচলিত আছে, কেউ দোষ দেবে না। কি বল্‌ছেন? মিথ্যা বল্‌তে আপনার এখনও ভয়? ললিতা দেখ্‌ছি আপনাকে একেবারে একটি "গ্যার গেলাহাড" তৈরী করেছে—মিথ্যাকে ভয়, মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চাইতে ভয়, রঙীন জলের গ্লাসকে ভয়, গিন্নির বিনা-হুকুমে বাড়ী থেকে বেরুতে ভয়, পাছে তিনি জান্‌তে পারেন তাই বৌদির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে ভয়, এমন ক'রে কি পুরুষ-মানুষের চলে? ললিতার উচিত তাহ'লে আপনাকে একটা "গ্লাস-কেসে" বন্ধ করে রাখা। পাঁচ জনের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে এত ভয় করলে চল্‌বে কেন? সাধে কি আপনাকে সবাই স্ত্রৈণ বলে?"

এর মধ্যে কেন যে হঠাৎ ললিতা এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল তা অশোক কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারল না। আর প্রতি-পদে চপলা যে কেন তাকে স্ত্রীর বশীভূত ইত্যাদি ব'লে বিদ্রূপ করে তারই বা মানে কি? "আচ্ছা দেখা যাবে।" ব'লে সে তাড়াতাড়ি টেলিফোন রেখে উপরে চ'লে এল।

একা ঘরে ব'সে অশোক ভাবতে লাগল কেবল চপলারই কথা। কেন সে তাকে অমন তাচ্ছিল্য করে? সত্যিই কি সে স্ত্রীর আঁচল-ধরা? কৈ ললিতা ত তাকে কখনও কোন বিষয় হুকুম করে না, বরং অশোকেরই কথা-মত সে নিজে চলে। তাই জন্যেই না ললিতা যা ভালবাসে তাই করবার একটা আগ্রহ তার মনে সদাই বিরাজ করে? এতে ত' আদেশের কোন লেশ মাত্র নেই, সে স্বেচ্ছায় ললিতাকে সুখী করবার জন্যে যা করে সেটা ত' ললিতার জুলুম নয়? এ ত' কেবল আদান-প্রদান মাত্র; ললিতার ব্যবহারে সে একদিনও অসুখী হয় নি তাই সে চায় ললিতাও যেন সুখ ছাড়া তার হাতে আর কিছু না কখনও পায়। এতে আদেশ, হুকুম, প্রভুত্ব, জুলুম এসবের ত' স্থান নেই? তবে কেন চপলা বারবার তাকে এমন ক'রে আঘাত করে?

হঠাৎ মনে হ'ল চপলা ত' ললিতার বন্ধু,তবে কি ললিতা নিজের দর বাড়াবার জন্যে চপলার কাছে এই রকমের একটা আভাষ দিয়েছে? ক্রোধে অপমানে সে একেবারে জর্জরিত হ'য়ে পড়ল। ললিতার মিষ্টি মুখের জায়গায় চপলার বিদ্রূপভরা ঠোঁটের কোণে যে হাসির রেখা দেখা যেত সেইটাই স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠল, ললিতার মধুমাখা কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে চপলার তাচ্ছিল্যভরা ঠাট্টার সুরটাই তার কানে বাজ্‌তে লাগ্‌ল বেশী ক'রে। আত্মানুরাগে বা পড়লে মানুষ বোধ হয় এমনই অন্ধ হ'য়ে যায়।

একটা বাজে-ওজরে সুমিত্রার নিমন্ত্রণ কাটিয়ে দিয়ে অশোক ভোরে চপলাদের সঙ্গে ফল্‌তার পথে বেরিয়ে পড়ল। অশোক নিজে মোটর চালাচ্ছিল আর তার পাশে ছিল চপলা। কার' মুখে কথা নেই তবে মাঝে মাঝে ভোরের হাওয়ায় ওড়া চপলার আঁচলখানা অশোকের গায়ে উড়ে প'ড়ে তার অস্তিত্বটা তাকে জানিয়ে দিচ্ছিল নূতন ক'রে বারেবার।

সতীশের বন্ধুর বাড়ীখানা দেখে সকলেই মহাখুসী—মস্তবড় বাড়ী, প্রকাণ্ড খোলা বারাণ্ডা, সামনেই গঙ্গা, এর চেয়ে বেশী লোকে আর কি চাইতে পারে? খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ক'রে চার জনে কেল্লা দেখ্‌তে বেরুল। চলা অভ্যাস নেই অথবা ইচ্ছা ক'রেই হ'ক চপলা খানিক পিছিয়ে পড়ল। বাধ্য হ'য়ে অশোককেও ধীরে যেতে হ'ল কারণ সতীশ ও বিমলা বেশ খানিক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। অশোককে একলা পেয়ে চপলা একটু মুচকে হেসে বললে—"এলেন যে বড়?" "তোমার আহ্বান অগ্রাহ্য করা কি সোজা কথা?" এই প্রথম অশোক চপলাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করল। চপলার সাদা গালদুটোতে বেশ একটু গোলাপী আভা ফুটে উঠ্‌ল, পুনরায় সে মৃদু হেসে বল্লে—"মুখে বোল ফুটেছে দেখছি।" "তোমার মত শিক্ষয়িত্রীর কাছে যার হাতে-খড়ি তার বোল ফুটতে কতক্ষণ? যাক্, যদি ক্লাইভের আমলের কেল্লাটি দেখবার ইচ্ছে থাকে ত' শীঘ্র এগিয়ে চল।" "সত্যি, দাদা বৌদি কতদূর এগিয়ে গিয়েছেন। তা যে কাঁটাবন, চলা ভার, দেখুন না এমন সুন্দর শাড়ীখানা কি রকম ছিঁড়ে গেছে—"বাধা দিয়ে অশোক বল্লে—"শাড়ীর চেয়ে যে অমন সুন্দর হাতখানা চিরেছে সেদিকে লক্ষ্য আছে?" চপলার গোলাপী গাল রক্তজবার রূপ ধারণ করল। তার মুখের দিকে চাইতেই অশোকের চোখ আপনি নত হ'য়ে গেল। মন যেন একটা কিসের অসোয়াস্তিতে ভ'রে উঠল।

তাড়াতাড়ি চীৎকার ক'রে সতীশকে থামতে ব'লে অশোক চপলাকে বল্লে—"পা চালাও, শেষে কি এইখানেই রাত কাবার করবে নাকি?" দ্রুতপদে চপলা দাদা বৌদির দিকে এগিয়ে চল্‌ল। অশোক তাদের অনুসরণ করলে, কিন্তু মনটা তার কেমন অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল, কিছুই যেন আর অনুভব করতে পারছিল না। কত উৎসাহ নিয়ে সে আজ পথে বেরিয়েছিল, সে উৎসাহ মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় চ'লে গেল। দুর্গ, গঙ্গা, মাঠ, জঙ্গল সব ফেলে মন তার বালিগঞ্জের একখানি রুদ্ধ-দুয়ারের মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল—একখানি পরা শাড়ী, একটি চিরুণী তাতে কয়েকগাছি চুল যে এখনও জড়ান! আর—একখানি শিশুর পায়ের অসমাপ্ত মোজা! চোখ দুটো জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল।

খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ পূর্ব্বেরই মত চল্ল কিন্তু অশোকের মন এতে আর সায় দিতে পার্‌ল না।

(৪)

আপিসের কাজ সেরে অশোক সন্ধ্যা বেলা বাড়ী এসে শোবার ঘরে ঢুক্‌তেই খাটের পাশে টিপায়ের উপর নজর পড়্‌ল। একখানা চিঠি সেখানে রয়েছে। হাতের লেখা দেখে চিঠিখানা যে কার তা আর বুঝতে দেরি হ'ল না। অনেকক্ষণ চিঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর সে ধীরে ধীরে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়্‌তে লাগ্‌ল। ললিতা লিখ্‌ছে—"আজ দু'তিন হপ্তা হ'ল তোমার কোন খবর নেই, কেন এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ? শরীর সার্‌বে ব'লে নিজেই ত' জোর ক'রে এখানে পাঠিয়েছ, কিন্তু এটা জান না যে মনের সঙ্গে শরীরের কতখানি যোগ? মা রোজ জিজ্ঞেস করেন তোমার চিঠি পেয়েছি কিনা, আমিও সমানে মিথ্যা ব'লে যাচ্ছি যে হ্যাঁ পেয়েছি, তুমি ভাল আছ, অথচ সত্যি যে কেমন আছ তা আমি নিজেই জানি না। এই মিথ্যার দায় থেকে আমাকে বাঁচান কি তোমার উচিত নয়? এক লাইন লিখ্‌তে এত কি সময় লাগে? 'ভাল আছি' এ দুটো কথা কি এতই বড়? বৌদি লিখেছেন যে তুমি কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে অনেকবার নিমন্ত্রণ ক'রে তোমার দেখা পান নি। অন্ততঃ রবিবার-রবিবার একবার ক'রে তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌লে ভাল হয় না? আমার দিক দিয়ে ত' খুবই হয়। নিজে যখন আমার খোঁজ নেবে না এবং নিজেরও খবর দেবে না পণ করেছ, তখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে খবর নেওয়া ছাড়া আমার আর কি উপায় রেখেছ? আচ্ছ, সত্যি কথা বল ত'? কি দোষ করেছি যার জন্যে আমার সঙ্গে তোমার আড়ি? বিচার না ক'রেই কি দণ্ড দেওয়া ঠিক? তিন হপ্তা ধ'রে লেখেই চলেছি অথচ তোমার দিক দিয়ে কোন সাড়া নেই, এমন ক'রে আর কতদিন চল্‌বে? আজ থেকে আমিও লেখা বন্ধ কর্‌লাম। বৃথা লিখে তোমায় জ্বালিয়ে অপরাধ বাড়াব না। আমার মরণ-বাঁচন যার কাছে সমান তাকে আর নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি জানাব? মেয়ে-মানুষের প্রাণ, সহজে বের হবার নয়, আমি এখনও অনেক-দিন বাঁচব, তোমার যত খুসী কষ্ট দিও।"

চিঠি পড়া সমাপ্ত ক'রে অশোক অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল, চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল একটি অতি প্রিয় মুখ তার পাশে আরও একটি ছোট্ট ফুলের মত মুখ, দু দিনের দেখা, তবু কত আপনার! এম্‌নি ক'রেই এরা তাকে মায়ার জালে জড়িয়ে রেখেছে। তাদেরই সুখী কর্‌বার এই প্রচণ্ড ইচ্ছাটাকে এরা দুর্ব্বলতা মনে করে, সেই নিয়েই ললিতা আবার বন্ধুদের কাছে জাঁক করে। নিজের ক্ষমতা পাঁচজনের কাছে জাহির ক'রে বাহবা নেবার লোভটা সে সম্বরণ কর্‌তে পারে নি। নিজের দিকটাই সে চিন্‌ল, এতে অশোকের যে কি ক্ষতি হবে সে-দিকটা সে একেবারে ভেবে দেখ্‌ল না। মোটের উপর সে আর অশোক যে এক এটা সে মান্‌তে চায় না। তাই সে চপলার কাছে এমন একটা অপদার্থ জীব দাঁড় করাতে পার্‌ল...স্ত্রৈণ? স্ত্রীর আঁচল-ধরা, স্ত্রীর আজ্ঞাকারী ভৃত্য, স্ত্রীর গোলাম? ললিতা সত্যই তাকে এই ঠাওরেছে? কেবল সে তাকে দুঃখ দিতে চায় না এই অপরাধে? দুঃখ দেওয়াই যদি পৌরুষের প্রধান পরিচয় হয় তবে ললিতা দুঃখ নিক্। কড়ায় গণ্ডায় নিক্তির ওজনে পূর্ণ ক'রে নিক্ সে যত চায়। অশোক তাতে বাধা দেবে না। চপলার ব্যঙ্গভরা চাহনি, সেই বিদ্রূপের হাসি, এ সে আর সইতে পারবে না। ললিতার কাছে সে অপদার্থ স্ত্রৈণ দাস মাত্র, ললিতার এই ধারণাকে সে

সমূলে উৎপাটিত ক'রে ছাড়বে। এ অপমান সে আর সইবে না, সইবে না, সইবে না! অশোক ললিতার চিঠিখানা বন্ধ ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল।

(৫)

আজ আট মাস হ'ল ললিতা ঘরে ফেরে নি, অথচ তার বাড়ী আস্‌বার কথা ছিল দু'মাস পরে। সেই শেষ-চিঠি পাবার পর অশোক তার আর কোন খবরই পায় নি। সুমিত্রাদের সঙ্গে দেখা করা সে অনেককাল ছেড়ে দিয়েছে। চপলার গৃহই এখন তার একমাত্র আশ্রয়। মন যখন কিছুতেই মান্‌তে চায় না, কেবলই ঐ রুদ্ধ-দুয়ারের কাছে ঘুরে মরে, তখনই সে ছুটে যায় চপলার কাছে, যদি তার হাসির স্রোতে গানের ঢেউয়ে মনের মেঘ শূন্যে উড়ে যায় অন্ততঃ কিছুক্ষণেরও জন্য। মাঝে মাঝে চোখের সাম্‌নে যখন ভেসে উঠ্‌ত একখানি শুভ্র হাত, তার মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ একটি শিশুর পায়ের অসমাপ্ত মোজা, তখন অশোক চোখের সে জ্বালা জোড়াবার জন্যে ছুটে যায় চপলার কাছে, তারই গৌরবর্ণ হাতের দিকে চেয়ে একটি শুভ্র কোমল হাতের স্মৃতি যদি ভোলা যায় অন্ততঃ কয়েক মুহূর্ত্তেরও জন্য।

এমনি ক'রেই অশোক কেবল নিজের পৌরুষের মর্য্যাদা বজায় রাখ্‌বার জন্যে নিজেরই হাতে নিজের নরক সাজাল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূজোর ছুটি এসে গেল। কোলকাতা ছেড়ে কোথাও পালাবার জন্যে অশোকের মন হয়েছিল একেবারে অস্থির, অথচ কোথায় গেলে যে শান্তি পাবে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ল না। চপলার সঙ্গ তার আর ভাল লাগে না, নূতনত্বের আকর্ষণ কেটে গিয়েছে বরং সেই তার জীবনে এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে ব'লে তাকে সহ্য করা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল বড়ই কঠিন। সে যদি তাকে বারবার এমন ক'রে আঘাত না করত, বার বার এমন ক'রে সে পুরুষনামের অযোগ্য এটা না জানাত তাহ'লে সে ত' এইদিকে মনযোগই দিত না, যেমন দিন কেটে যাচ্ছিল তেমনই দিনগুলো চ'লে যেত, সে ত' এর দরুণ তার বিবাহিত জীবনে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা অনুভব করে নি, তবে এই নিয়ে বৃথা নাড়াচাড়া ক'রে কি লাভ তার হ'ল? চপলা কেন এমন উল্কার মত তার জীবন-আকাশে এসে দেখা দিল? দেখা দিয়ে তার কি সর্ব্বনাশই না সে করল। ললিতা আর তার মধ্যে আজ যে ব্যবধান দাঁড়িয়েছে সে তার স্বরচিত হ'তে পারে, তবে এর মূলে যে আছে চপলাই। এখন এর হাত হ'তে রক্ষার উপায় কৈ? বড়ই কঠিন। একবার ভাব্‌ল দার্জ্জিলিং যাবে, সেখানে হয় ত' ললিতারা এখনও আছে, তার কাছে গিয়ে মাপ চাইবে, আবার মনে হয় মাপ চাইবার মুখ কি সে রেখেছে? এই যে শুধু শুধু ললিতাকে এত কষ্ট দেওয়া হ'ল এর কৈফিয়ৎ সে কি দেবে? তার পৌরুষাভিমানের বৃথা গর্ব্ব ললিতার সুখদুঃখের চেয়ে অনেক বড় এটাই কি সে তাকে বল্‌বে? অবশেষে তার এক বন্ধুর কাছে রাঁচি যাওয়াই ঠিক হ'ল। যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা অশোক নিজের ঘরের খাটের উপর প'ড়ে ছিল, বহুচেষ্টা ক'রেও চোখদুটোকে পাশের ঐ বন্ধ-দরজার দিক থেকে ফেরাতে পারছিল না। অবশেষে থাক্‌তে না পেরে সে গিয়ে দাঁড়াল ঐ রুদ্ধ-দুয়ারেরই পাশে, কে যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল একেবারে সেই টেবিলের কাছে যেখানে প'ড়ে ছিল ললিতারই হাতের বোনা শিশুর পায়ের একখানি মোজা। যার উদ্দেশ্যে এটা তৈরী সে কিন্তু তার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করল না, আগেই এসে আবার তখুনি সে চিরবিদায় নিল, মোজা তার অসমাপ্তই র'য়ে গেল। অশোকের মাথা আপনিই লুটিয়ে পড়্‌ল সেই ধুলোর উপর।

"ঠাকুর জামাই!"—সুমিত্রার ডাকে, চম্‌কে উঠে অশোক সে ঘর ছেড়ে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। সুমিত্রাকে প্রণাম করাও হ'ল না। সুমিত্রা কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বল্ল—"বার্‌বার বলাতেও তুমি একদিনও আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর নি, অথচ অন্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তুমি একদিনও পিছপা হওনি, এও আমার অজানা নয়। আমাদের উপেক্ষা ক'রে তুমি কেবল ললিতার দাদা-বৌদিরই অপমান কর নি, এর সঙ্গে তার বাপ-মাও জড়িত কারণ তাঁদের বাদ দিয়ে আমরা ত' কেউ নই। তুমি যদি আমার নিজের বোনের স্বামী হ'তে তাহ'লেও আমি তোমার এ বাড়ীর ধুলো মাড়াতাম না, কিন্তু তুমি ললিতার স্বামী, এ যে আমার

কত বড় সম্পর্ক তা তুমি বুঝবে না। তাই আমি অপমান পেয়ে ও পুনরায় অপমানিত হবার আশঙ্কা রেখেও এখানে এসেছি—" অশোক কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল সুমিত্রা তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—"আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে আসিনি; আমি কেবল জান্‌তে চাই যে ললিতার প্রতি তোমার এ ব্যবহারের কোন ন্যায্য কারণ আছে কি না।" অশোককে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সুমিত্রা বল্লে—"উত্তর দেওয়া না দেওয়া সে তোমার হাত, তবে তুমি ওকে একেবারে ত্যাগ করেছ কি না, তা না জেনে আমি এখান থেকে একপা-ও নড়ব না—" "আপনি কি বল্‌ছেন? ললিতাকে ত্যাগ করব আমি?" অশোকের কথায় বিন্দু-মাত্র বিচলিত না হ'য়ে সুমিত্রা বল্লে—"এমন ভাবে কেলেঙ্কারী করার চেয়ে ললিতাকে ত্যাগ ক'রে আর একটা বিয়ে করাটা কি এতই অদ্ভুত? চপলা ত' এখনও অবিবাহিতা, কোন অসুবিধা হবার ত' কারণ নেই।" "অন্যে যা বলে বলুক আপনিও যে ঐ কথাগুলো বিশ্বাস করেছেন এইটাই আমার যথেষ্ট শাস্তি।" অশোকের মাথা আপনিই হেঁট হ'য়ে গেল। সুমিত্রা একটু কোমল স্বরে বল্লে—"কি করি বল'? বিশ্বাস না করবার ত' পথ রাখ নি ভাই, সকলেরই মুখে যে তোমার আর চপলার নাম—" "বৌদি, আমার দিকটা একবার চেয়ে দেখুন, আপনি ত' জানেন বিয়ে হ'য়ে অবধি জ্ঞানতঃ ললিতাকে কোনদিনও কষ্ট দিই নি কিন্তু সে এর পুরস্কার কি দিয়েছে জানেন? বন্ধুদের কাছে স্ত্রৈণ সাব্যস্ত ক'রে দিয়ে সে নিজের গৌরব চারধারে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে—"বাধা দিয়ে সুমিত্রা বল্লে—"ললিতার সঙ্গে এতদিন যে ঘর করেছে তার মুখে এ কথা শুনব আশা করি নি—"কে যেন অশোকের মুখে চাবুক বসিয়ে দিল, সহসা কোন কথাই তার জোগাল না, শেষে ধীরে ধীরে সে বল্লে—"চপলা ললিতার বন্ধু, সে যখন আমায় স্ত্রীর-আঁচল-ধরা ইত্যাদি ব'লে ঠাট্টা করে তখন এইরূপ ধারণা হওয়াটা কি এতই অস্বাভাবিক?" "মাপ করতে হবে ভাই, তোমার বুদ্ধির বেশী প্রশংসা করতে পারলাম না—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, একদিনও কি তোমার মনে সন্দেহ হয় নি যে চপলা তোমার স্ত্রীর আঁচল-ধরার জায়গায় নিজেরই আঁচল-ধরা দেখ্‌তে চেয়েছিল? যাবার আগে এই কথাটুকু ব'লে যাই—যে মেয়ে ফাঁদ পেতে একজন বিবাহিত পুরুষের মন-হরণের চেষ্টা করে সে মেয়ে নারীনামের অযোগ্যা—আর যে পুরুষ এই রাক্ষসীকে নারী ব'লে ভুল করে সে মানুষ-নামের অযোগ্য।"

সুমিত্রা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। অশোক আর থাকতে না পেরে ব'লে উঠল—"বৌদি, যাচ্ছেন ত' চলে কিন্তু যাবার আগে একবার ব'লে যান সে কেমন আছে—"

সুমিত্রা স্নেহভরা চোখে অশোকের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে—"তার খবর নেবার অধিকার তুমি বড় রাখ নি, তবে সে ব'লেই মার্জ্জনা পাবার ভরসা রাখতে পার। অনেক দিন গৃহলক্ষ্মীকে অনাদরে ধূলোয় ফেলে রেখেছ, তাতে তোমার যে কতখানি মঙ্গল হ'য়েছে তা তোমার চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যায়। যাও, গাড়ী থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে তার আপন সিংহাসন ফিরিয়ে দাও—"

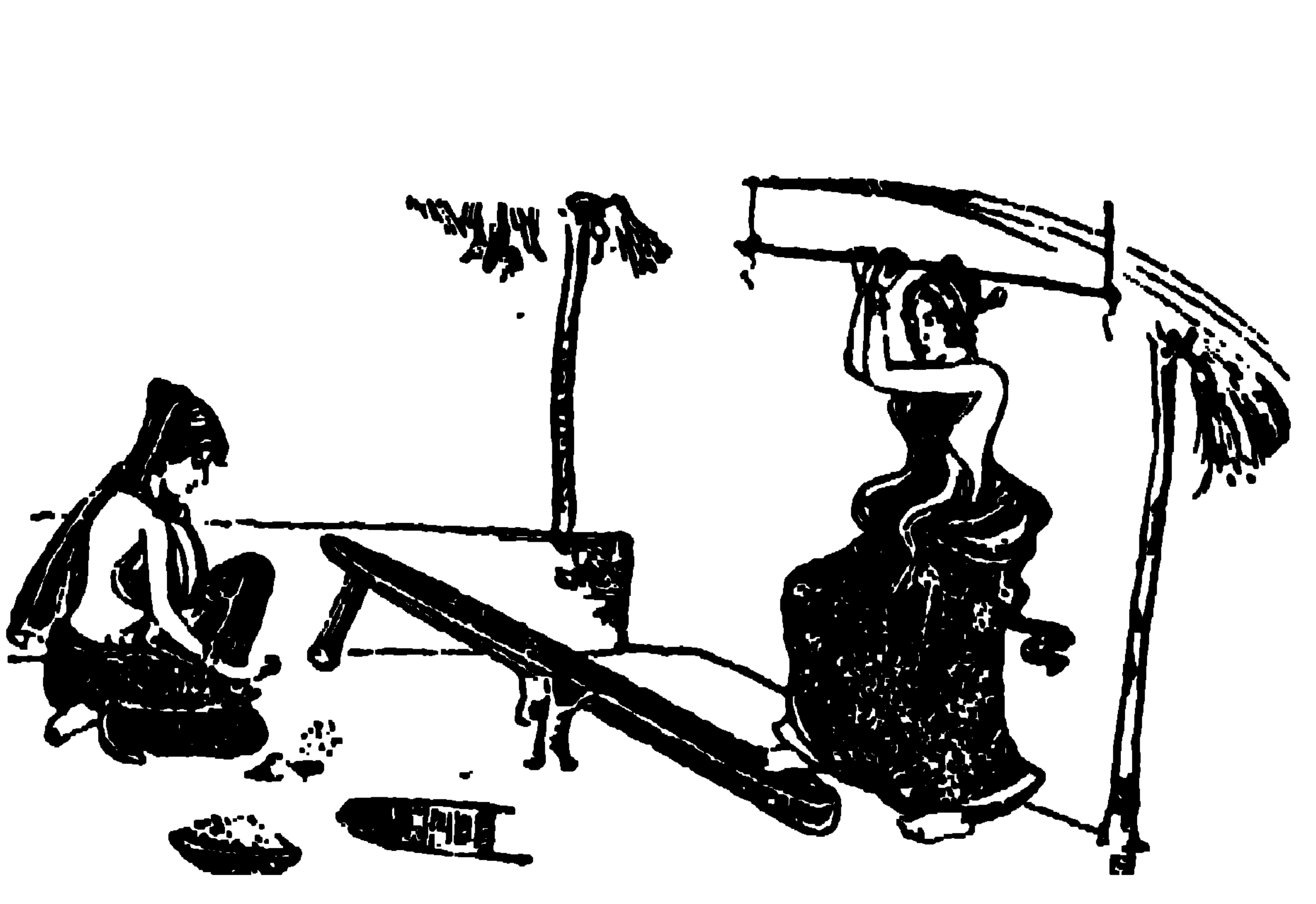

আমাদের মহিলাকর্ম্মী

শ্রীমতী শৈলবালা বিশ্বাস

শ্রীমতী শৈলবালা বিশ্বাস শ্রীহট্ট জেলার সুরমা-ভেলী সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা এবং প্রথম উদ্যোক্তা। তিনি অনেক সময়ই স্বামীর সহিত স্বামীর কর্ম্মক্ষেত্রে সুরমা-ভেলী চা-বাগানে ইটাখোলায় অবস্থান করেন। এই সকল স্থানে অনেক সময়ই কর্ম্মীদিগকে সামাজিক মেলামেশায় বঞ্চিত হইয়া জীবনযাপন করিতে হয়। সামাজিক জীব মানুষের পক্ষে ইহা কত কষ্টকর তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মিসেস বিশ্বাস এই অভাব ঘুচাইবার জন্য ইটাখোলায় একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় ২০।২৫ জন মহিলা লইয়া এই সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পবিষয়ক উন্নতিসাধন করাই তখন এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। মেলা-মেশা দ্বারা নিজেদের সামাজিক উন্নতিসাধন করার জন্যও মহিলারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমান্বয়ে সমিতির কার্য্য শ্রীহট্টের অন্যান্য অংশে প্রচার ও বিস্তারের জন্য আসাম গভর্ণমেণ্টের নিকট মিসেস বিশ্বাস সাহায্য প্রার্থনা করেন। আসাম গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই কার্য্যের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এই কার্য্যের প্রচারের জন্য দুই বৎসর ২০০্ শত টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করেন। মিসেস বিশ্বাস এই অর্থের সাহায্যে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক ও মহিলা-কর্ম্মীর দ্বারা শ্রীহট্টের বিভিন্ন মহকুমা ও অনেক গণ্ডগ্রামেও মহিলাদের ভিতর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রচারককার্য্যের ও মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। এই প্রচারকার্য্যের ফলে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলভিবাজার হাইলীকান্দি, বেহেলী, ইটাখোলা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি

শ্রীমতী শৈলবালা বিশ্বাস

সুপরিচালিত মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই মহিলারা শি কার্য্য করিয়া পারিবারিক অর্থাভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীযুক্তা শৈলবালা বিশ্বাসের স্বামী শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন বিশ্বাস মহোদয় তাঁহাকে এই কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। গত বৎসর মিসেস বিশ্বাস রোগশোকে জর্জ্জরিতা,—পুত্রের মৃত্যুতে বিশেষ অভিভূতা থাকিলেও এই নারীমঙ্গল কার্য্যে তাঁহার একটুও ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয় নাই। শোকাতুরা জননী হইলেও তিনি ভুলিতে পারেন নাই যে সমাজের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহাও তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাই হৃদয়ের ব্যথা গোপন করিয়া তিনি অন্য মহিলাদের রোগ দুঃখ দৈন্যের বোঝা বহন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচারকার্য্যের আয়োজন ও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী যখন এবার প্রচারকার্য্যের অন্তে এই মহিলার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন রুগ্ন অবস্থায়ও এই মহিলা যেভাবে তাঁহাদিগের আতিথেয়তা করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসার্হ। আজও আমাদের দেশের অনেক লোক মনে করেন মহিলার পক্ষে গৃহকার্য্য-সম্পাদন ও সমাজসেবার কার্য্য একযোগে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই সকল মহিলাদের কার্য্য বর্ত্তমানে প্রতিনিয়ত প্রমাণ করিতেছে যে ইহা সম্ভব এবং এই সম্ভাবনীয়তার উপরই পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের উন্নতি নির্ভর করে। আমাদের বিশ্বাস আছে মিসেস বিশ্বাসের আদর্শ এবং কর্ম্মোৎসাহ তাঁহার সহকর্ম্মীদের ভিতরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

মানস-আরতি

শ্রী সেবক

তব আত্মার উৎসবে আজি—
অমরী, অমৃতময়ী,
শত দিক হ'তে শত নরনারী
আসিল অর্ঘ্য বহি'।
ফুল সম্ভারে, দীপ-সমারোহে,
হর্ষে হাস্যে ছন্দিত হ'য়ে,
সঙ্গীতে, শুভভাষে, সুর-লয়ে
অমরা—মর্ত্ত্য-মহী!

সেবার আড়ালে লুকায়ে সেবক
হেথায় সবার পিছে
ধ্যান-ধূপ নিয়ে দাঁড়ায়েছি চুপে
ধূলায় ধাপের নীচে;
মৌন মন্ত্র জপিয়া স্মরণে
হে দেবী, তোমার অরূপ চরণে
করি অপরূপ মানস-আরতি
চিন্ময়ীরূপা অয়ি!

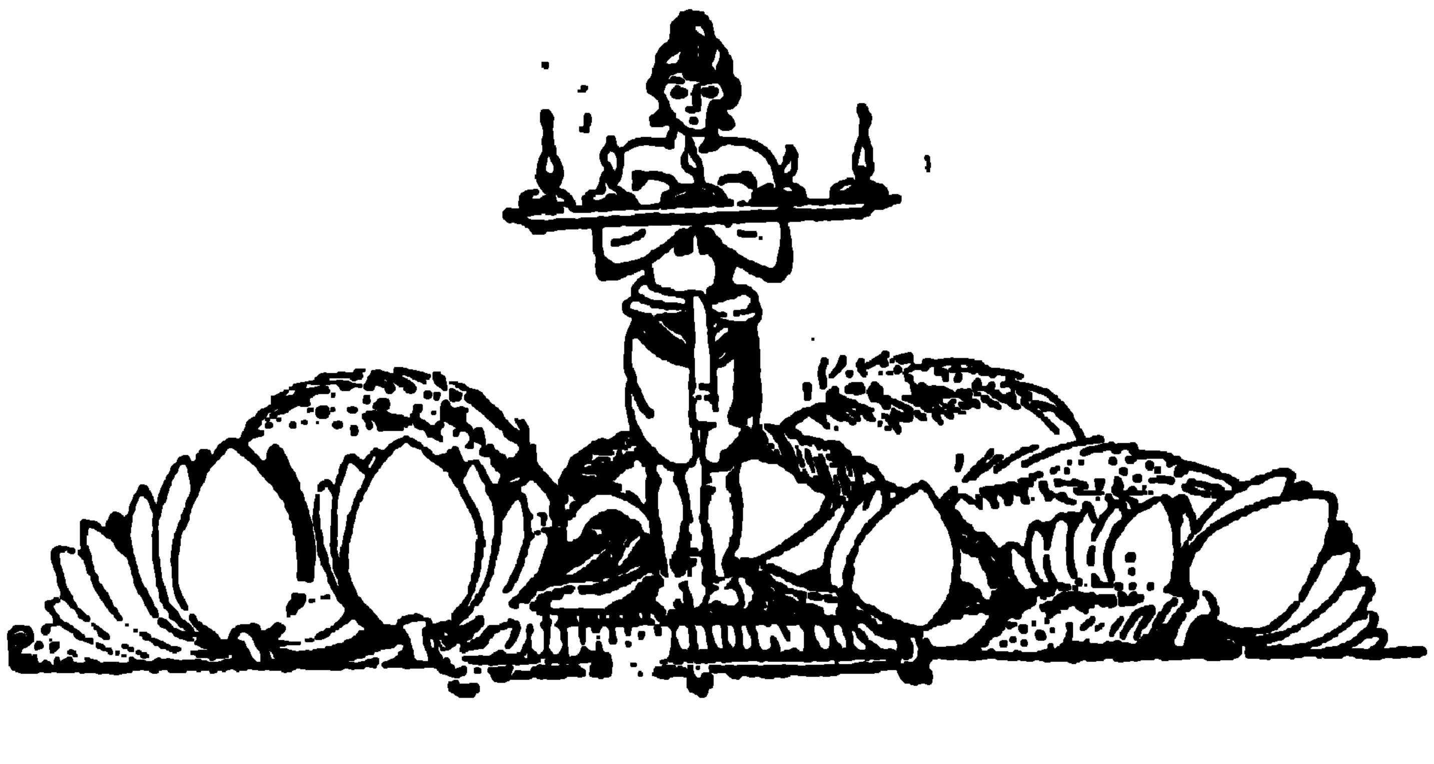

শিশুর মনস্তত্ত্ব

শ্রী মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে, চরিত্র অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। কথাটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিশুর জন্মের পর এই অভ্যাসের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ এই অভ্যাসের সমষ্টিই চরিত্র—সুন্দরভাবে জীবনযাপন করিবার প্রধান সহায়। জীবনের আরম্ভেই শিশুর কোন কোন বিষয়ে বিশেষ প্রবণতা লক্ষিত হয়—কোন কোন বিষয়ে তাহার কোন ঝোঁক থাকে না। অভিভাবকের কর্ত্তব্য ভাল ঝোঁকগুলির পত্তন সুদৃঢ় করা, মন্দগুলি সমূলে উচ্ছেদ করা। এই ঝোঁকগুলিই অভ্যাসে পরিণত হয় ও এই অভ্যাসের দ্বারাই পরজীবনে মানুষ মানুষের বিষয় বিচার করে। এই অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিই ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তোলে।

স্বভাবের গঠন পারিপার্শ্বিকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। শিশু-জীবনের চারিপার্শ্বের ঘটনার বৈচিত্র্য শিশুর সুকোমল মনকে আক্রমণ করে ও মনের উপর ছাপ দিয়া দেয়। অভিভাবক ও অভিভাবিকার লক্ষ্য হওয়া উচিত এই ঘটনাবৈচিত্র্যকে নিয়মিত করা ও শিশুর মঙ্গলে নিয়োজিত করা। বয়সের বৃদ্ধির সহিত মনের নমনীয়তা হ্রাস পায়, বিরূপ বা অনুরূপ আবেষ্টনের মধ্যে মনের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

আপনি কি পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুভব করিয়াছেন? মাতাপিতা সাধারণতঃ কতকগুলি ভুল করিয়া বসেন। নিম্ন-প্রদত্ত উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

(ক) আপনি কি ঘন ঘন উত্যক্ত বোধ করেন?

এই খিট্‌খিটে স্বভাব শিশুমনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অনুরূপ স্বভাব গড়িয়া তোলে।

শিশুর সামান্য পীড়া হইয়াছে, আপনি এই বিষয় নিরন্তর চিন্তা করেন ও নড়িতে চড়িতে এই কথা উল্লেখ করেন। ইহার ফলে শিশুর মনে এই অসুখের কথাটি জলজ্বল্ করিতে থাকে ও সেই কথা ভাবিয়া তাহার পীড়া বৃদ্ধি পায়।

শিশুর সামান্য পীড়া, পিতা বলিলেন, স্কুলে পাঠাইও না। মাতা সম্মতি দিলেন। শিশু এই পীড়ার অজুহাতে প্রায়ই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিতে লাগিল। অন্যদিকে সামান্য অসুস্থতায় অতিরিক্ত আদর পাইয়া আদরের লোভে খোকা-খুকী অসুখের ভাণ করিয়া বসে। চারিধারে বিপদে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

শ্রী মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল

অনেক মাতাপিতা আছেন যাঁহারা শিশুকে খেলায় যোগ দিতে বারণ করেন। ভয়, শিশু একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে, হাত-পা হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইবে, হয়ত পুড়িয়া যাইবে, কত না 'হয়ত' হইবে, কিন্তু ইহাতে বিষম অনিষ্ট ঘটে। শিশুর শরীর ও মনের উপর ক্রীড়ার প্রভাব অপরিসীম একথা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ইহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা, সৎসাহস ও উপায়-উদ্ভাবনে পরিপক্কতা বৃদ্ধি পায়। এগুলি পরজীবনে যে মনুষ্যত্বের বা নারীত্বের বিকাশের অত্যাবশ্যকীয় মালমসলা।

মনে রাখিবেন শিশু চারাগাছের মত ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠে, চারাগাছের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য যেমন মাটি, সূর্য্যের উত্তাপ ও বৃষ্টির আবশ্যক, তেমনি শিশুর বৃদ্ধির জন্য কোমলতা ও ধৈর্য্য আবশ্যক। ক্রোধ, বিরক্তি ও চাঞ্চল্য, ঝড় ও বন্যার মত এই চারাগাছকে নষ্ট করে। মনে রাখিবেন সদয় ব্যবহার ও সহজ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত কার্য্য কখনই বিপথে লইয়া যায় নাই।

(খ) আপনি কি শিশুকে অত্যধিক আদর করেন ?

আপনি শিশুকে না খাওয়াইলে সে খায় না, আপনি তাহাকে না ঘুম পাড়াইলে সে ঘুমায় না। আপনি এই স্নেহের দাবী উপভোগ করেন, কিন্তু ইহা শিশুর ভবিষ্যতের পক্ষে অনিষ্টকারক। এই সব বিষয় অভ্যাসে পরিণত হয় ও তাহার পরিণত জীবনে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। পুত্র বা কন্যা ইহাতে প্রতি-বিষয়ে পর-মুখাপেক্ষী হইতে শিখে—কোন কার্য্যেই নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে না। সোহাগের আতিশয্যে তাহাদের আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় অভিলাষের ইন্ধন যোগাইলে, সংসারের ভার যখন তাহাদের স্কন্ধে পড়ে তখন স্থিরভাবে কোন ভার বহন করিবার যোগ্যতা তাহারা অর্জ্জন করে না। আপনি যদি শৈশবে ন্যায়-অন্যায় না বিচার করিয়া তাহার প্রত্যেক ইচ্ছা পূরণ করেন, জীবন-সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া যখন তাহার অনেক অভিলাষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িবে, সেই অনাগত দিনে তাহার মনোভাব কিরূপ হইবে আজ ভাবিয়া দেখুন।

(গ) শিশুর দ্বারা কোন কাজ করাইয়া লইবার জন্য আপনি কি তাহাকে অনেক সময় নানা অলীক কথা কহিয়া থাকেন ?

মনে রাখিবেন ইহাতে শিশুর মনের সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্ত্তী যে ব্যবধান তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। শৈশবে মন যখন সুকোমল সেই সময়েই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অসত্য ও মিথ্যার উপর অশ্রদ্ধা-ভাব সুদৃঢ় করা উচিত। আপনি পূর্ব্বে শিশুকে কোন কথা বলিয়া থাকিবেন, সে সেইমত কাজ করিয়াছে। আপনার কিন্তু কাজটি মনোমত হইল না। আপনি ক্রোধপরবশ হইয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া, বলিয়া উঠিলেন, 'কই আমি ত বলি নাই!' ইহাতে শিশু সন্ত্রস্ত হইয়া আপনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, এই কথার প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহসে কুলায় না কিন্তু মনে মনে সে আপনাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। মনে রাখিবেন যে বড় হইয়া সে একদিন আপনাকে চোখ ঘুরাইয়া বলিবে, 'কই আপনি ত ওকথা বলেন নাই!' (যদিও আপনি সেই কথাই বলিয়াছিলেন।) ইহাতে শিশু আপনাকে বিশ্বাস করিতে শিখে না ও যদিও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অপরিণত, কোন এক অদৃশ্য প্রভাবে শিশুর মন আপনাকে বিচার করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাণ করিয়া রাগের বা অনুরাগের বশে আপনি শিশুর সম্পর্কে আসিয়া সত্য-মিথ্যার গণ্ডী অবলীলাক্রমে অতিক্রম করেন কিন্তু ইহার দ্বারা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে ভীষণ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনার বীজ শিশুমনে রোপিত হয়।

রিক্ততা

শ্রী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী

অপ্রত্যাশিতেরে খুঁজি, খুঁজি অসম্ভব,
জেনেছি হৃদয় মোর রিক্ত সে বৈভব;
জীর্ণ কঙ্কালের সম তারে রাজবেশ
পরায়েছি, ঘুরায়েছি কত শত দেশ,
যদি কভু সাতসমুদ্রের পরপারে
মিলে রাজকন্যা—নিদ্রা হ'তে জাগাবারে
যদি সে সক্ষম হয়—ভিতরে কাঙাল
ক্ষুধায় কাঁদিয়া মরে, বলে ছদ্মজাল
ছিন্ন করি পথে পথে ধূলিতলে রাখ,
বিশ্বের সবার সনে হোক্ যাত্রা। ঢাক
তবু কেন আবরণে? মর ঘুরে ঘুরে?
চির অসম্ভব লাগি চির নিদ্রাপুরে
রিক্ত কর রিক্ত কর ছদ্মজাল মম
দূরে ফেলে দাও হে প্রিয় নির্ম্মম!

সাধুমা'র কথা

সাধু-মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন আমার কর্ণবেধ হ'য়ে গেল, তাতে আর বিশেষ কিছু ধুমধাম হয় নি ; আপনা-আপনি নিমন্ত্রণ ক'রে আনন্দ-নাড়ু পূর্ব্বদিন হয়। পরে পঞ্চমীর দিন কর্ণবেধ হ'তে আরম্ভ হ'ল। আমাদের কর্ণবেধে ষষ্ঠী, মার্কণ্ড পূজা হয় ; পরে আমার স্নান হ'য়ে অধিবাস হ'ল, লালপাড় কাপড় প'রে হাতে বড় বড় চারটি সন্দেশ আর চারটি নাড়ু নিয়ে কান বেঁধাতে বসলুম। আমার মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে কখন কাঁদব না, যতই কষ্ট হোক। ব'সে গেলুম, বাজনাবাদ্য হ'তে লাগল, কানটি একটু হাত দিয়ে ড'লে নিয়ে বেঁধাতে বসল, আমি স্থির হ'য়ে রইলুম। মা দিদিমার কিন্তু ভয় হ'চ্ছে আমি হয়ত কত কাঁদব, কি উঠে কর্ত্তামণির কাছে পালাব, কিন্তু সেসব কিছুই না। তারপর উঠে আবার লাল ফুলপাড় চেলি প'রে, গলায় 'গ.ড়' মালা দিয়ে, মল, বালা, গলায় হার দিয়ে, চন্দন প'রে বরণ হ'লো। ঠাকুর-বাড়ী প্রণাম করতে যাওয়া হ'ল ; আর কর্ত্তামণিকে প্রণাম করতে গেলাম, তিনি কেঁদে ফেললেন, তাঁর ঐরকম অসুখ ছিল, বেশী আহ্লাদ হ'লেই চক্ষু জলে পূর্ণ হ'ত। তিনি আমায় আদর-আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেন—এইবার মেয়েটিকে কোথায় বিদায় ক'রে দেবার মতলব করেছ।

আমার কর্ণবেধের পর ক্রমে ক্রমে আমার উপর কানে দুটি ছিদ্র করা হয়, আর মাঝের কানদুটি ছিদ্র হয় ; ঐরকমে হয়, কাঁদা কি গোলমাল কিছু হয় নি। পরে আবার সেই মধু খানসামা একদিন এসে বল্লে—মা, বড় বৌঠাকরুণ বলেছেন এবার নাকটি বিঁধিয়ে দিতে। দিদিমা বল্লেন যে নাক বিঁধতে বলেছেন, ওর টিকলো নাক কি না, একটু শক্ত পাটা, লাগবে ব'লে বেঁধাইনি। এখন তো সব বিবিয়ানা, কেউ নথ পরে না। মধু খুব পাকা লোক, সে বল্লে—না, না, আমাদের বাড়ী সবাই নথ পরে, আমার বাবু নথ, মল, আলতা পরা বড় ভালবাসেন। তখন দিদিমা বল্লেন—তবে দেরী নয়, ফাগুন মাসে দিলে হ'ত, চৈত মাস যায়, কাল একটা ভাল দিন দেখে দেব। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে মধু বিদায় নেয়, মাকে ডেকে দিদিমা সব কথা বলেন। তার পরদিন, দিন ভাল ছিল, বাসন্তী পঞ্চমী, আমার নাক বেঁধানো হ'য়ে গেল ; এবার কিন্তু চোখের জল পড়ল, আমার নাকটা বড় শক্ত, খুব লেগেছিল।

এইবার আমার শ্বশুরবাড়ীর কথা। বৈশাখ মাসে ফুলদোলের দিন আমার বড় জা এসে একটি মোহর দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে যান, এর নাম পাকা দেখা। দিন স্থির ক'রে আমার শ্বশুরবাড়ীর পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মশায় আসেন ; আর একদিন এসেছিলেন আমার কোষ্ঠি নিতে, আমাকে ডেকে দেখেওছিলেন,—মা আমাদের চমৎকার সুন্দরী ব'লে ভগবতীর সঙ্গে তুলনা ক'রে যান। পরে দু-তিন দিন পর দিদিমা একদিন গিয়ে আমার বরকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসেন। এসে খুব সুখ্যাতি করেন, কেবল বলেন যে একটু পাতলা গড়ন, মুখ চোখ চুল অতি সুন্দর, রংটি হলদে হলদে, খুব ঠাণ্ডা স্বভাব, কথাগুলি আস্তে আস্তে, অতি নম্র ভাব ; আর সব ছেলেগুলি নম্রতামাখা, বৌ তিনটিও বেশ, বাড়ী-ঘর ভাল, এখন দু-হাত এক হ'য়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই !

পরে একদিন ভট্টাচার্য্য এসে ব'লে যান, ১৩ই আষাঢ় গোধূলি-লগ্নে বিবাহ ; কোন্ সময় গাত্রহরিদ্রা দিতে হবে, কোন্ সময়ে বাসিবিবাহের যাত্রা, কোন দিন নবধা গমন, সব লগ্নলেখা লগ্নপত্রিকা দিয়ে যান। পরে মধু এসে আমার মের্জাই চেয়ে নিয়ে গেল, দিদিমাও জুতোজামার মাপ চেয়ে পাঠালেন ; একটি এসেন্সমাখা কামিজ আর ফিরোজা পশমের ভরাট সাদা পুঁতির আঙুর-ফলপাতা দেওয়া

জুতা জোড়া আসে। এ কথাগুলি লিখছি আমার স্মরণ-শক্তির চিহ্ন-বলে ; যেটুকু লিখেছি তা সঠিক, অতিরঞ্জিত কথা কিছুই নেই। আমার পিত্রালয়ে আমি এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাব, এর আগে আমার ও-বাড়ীর দিদি শ্বশুরবাড়ী গেছেন, নইলে এনাদের সব কুলীনের ছেলে সুশ্রী দেখে এনে ঘরজামাই রাখা হয়। আমার এইবার নূতন পথ প্রকাশ হবে, আমার নূতন সংসারের মধ্যে বাস হবে, নূতন মানুষদের সঙ্গে মন মিলাতে হবে। এ সব অজানা ; আমার স্বভাব, অশন-বসন, চলন, ভাবভঙ্গী, কথা, শয়ন সকলি পরিবর্ত্তন হবে। সব আয়োজন হ'তে লাগল। আমার বিবাহের সময় আমার পিতামহের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়, ভিতরে ভিতরে খুব ঋণ ; এদিকে বাড়ী গাড়ী জমিদারী সব মজুত আছে। ডবল সুদে ঋণ পান ; সরকার আর খরচের আমলারাও বেশ ঐ বাবদে উপার্জ্জন করে। তা ছাড়া জমিদারীর টাকাও সুবিধা পেলে লুটতে ছাড়ে না। সংসার দেখতে একমাত্র আমার পিতামহী ; পিতামহ বায়ুরোগগ্রস্ত, আর পিতার সংসার বিষতুল্য,—কে দেখে। পাঁচজন অনুগ্রহ ক'রে বিলক্ষণ ব্যয় করে ; এমন যে, সমস্ত দিন দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর কামাই নেই। এদিকে আমার বিবাহ উপস্থিত, মানের জন্য কিছু ত দিতে হবে। কিছু সোনা গা-সাজানো গহনা করতে দিলেন, আর এক সুট রূপার বাসন গড়াতে দিলেন, আর পিতল, কাঁসা, পূজার তামার বাসন, খাট বিছানা আল্না দেরাজ জলচৌকী সব একরকম চলনসই-গোছ যোগাড় করলেন। তবে এখনকার মত এত খুঁটিয়ে দেবার প্রথাও বেরয় নি ; যত দিন যাচ্ছে তত এ ফ্যাশন বেশী বেশী বেরচ্ছে। যতটুকু যার সামর্থ্য, তা যেন একটু অতিক্রম হ'য়েও উঠছে। তবে আমার বিবাহের সময় 'দল'বৃদ্ধি হয়। আমার শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে পূর্ব্বে দল ছিল না, তাঁদের ত নিমন্ত্রণ হবেই, এ ছাড়া অনেক বাড়ী দল হ'ল। সেজন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের আয়োজন করতে হবে, তার ফর্দ্দ প্রস্তুত হ'ল। একদিন মাছ-ভাত হ'ল, সেটা গাত্রহরিদ্রার দিন ; আর বিবাহের দিন জলপান। এ ছাড়া ফুলশয্যা পাঠানো, জোড়ে আসা, পরে বিবাহ হ'য়ে গেলে কুটুম্ব খাওয়ানো। এইমত অনেক ফর্দ্দ প্রস্তুত হ'ল, কিছু-না কিছু-না ক'রেও খাইখরচ ও দানসামগ্রী সবসমেত তিন হাজার টাকা ব্যয় হয় শুনেছিলাম। যাই হোক, ১০ই আষাঢ় আমার গায় হলুদ হবে, ৯।১০ই থেকে আমার শ্বশুরালয়ের সামাজিক বেরিয়েছিল। সব বাড়ি দিতে দিতে আমাদের বাড়িতে আসে—চারখানা ক'রে পিতলের থালা, তার এক থালায় বাদাম পেস্তা ইত্যাদি নানাপ্রকার মেওয়া, আর এক থালায় বাদামের বরফি, এক থালা মেওয়ার বরফি, আর একখানিতে সন্দেশ আর একটি ক'রে নয়নসুখের থান ছিল। আমার দাদাশ্বশুর মহাশয় বড় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি কিসে লোকের সুবিধা হয়, তার হিসাব বিশেষরূপ জানতেন, বৈষয়িক বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। তাঁর সু-বন্দোবস্তে আমার বিবাহে খুব যশ পেয়েছিলেন। আমার শ্বশুরের ঐ একমাত্র সন্তান ; সেজন্য বেশ ভালরূপ ক'রেই বিবাহ-উৎসব নিষ্পন্ন করবার মনন করেন। আর হয়ও তাই। তবে এখনকার যুগের বিয়ে অন্যপ্রকার, আর তখনকার আর এক ধরণ, কিছু প্রভেদ আছে। পরদিন আবার গায়ে হলুদ এল, তখনকার নিয়মে মাছ, দই, সন্দেশ, ক্ষীর, ফুলমালা আর হলুদ। আর একজন ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদী-চন্দন, ধানদূর্ব্বা, মোহর নিয়ে এলেন ; বেশী কিছু দেবার প্রথা ছিল না। এখনকার দিনে এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে, হোক ; যখন যেরূপ হাওয়া, তখন মানুষ সেইমত চলে। সেদিন ত খুব বাদ্যবাজনা ক'রে আমার গাত্রহরিদ্রার উৎসব, আহারাদি সাঙ্গ হ'ল। দিদিমা নিজে আমার চন্দনতিলক পরালেন, ঠাকুরের চরণে প্রণাম ক'রে আসা হ'ল ; তিনি বুঝি নয়নভঙ্গী দ্বারায় আজ্ঞা দিলেন—যাও, আমি তোমার জন্য সকলি প্রস্তুত রেখেছি, তোমার সকলি সুখের, দেখো যেন দুঃখে আচ্ছন্ন হ'য়ে হৃদয় অন্ধকার ক'রো না। বাস্তবিক আমার এই ধারণাটি দৃঢ়, যে দুঃখ কি ? যখন কার্য্য অনুযায়িক ফল পাব, তখন আর দুঃখ কি ? সকলি আনন্দ। আনন্দময়ের রাজ্যে যেন এইরূপ আনন্দেই সকল প্রাণী থাকে, হৃদয় পরিষ্কার রেখে আনন্দময়ের আনন্দধামে সদানন্দে থাকে। পরদিন আমার নাড়ুকোটা,—সকালবেলা চাল ধোওয়া, নারিকেল কোরা, তিল ঘসা এই সব রীত হ'ল। প্রায় বেলা ১০টার সময় আমার আইবুড় ভাত খেতে যাবার

নিমন্ত্রণ ছিল দাদামশায়ের বাড়ী। দিদিমা সাজিয়ে চন্দন প'রিয়ে বসিয়ে রেখেছেন, পরে তাদের ঝি পাল্কি নিয়ে এল, আমায় নিয়ে গেল।

আমার যাবার পর তাঁরা আমায় নিয়ে দিদিমার ঘরে বসান। তারপর এক এক ক'রে লোক জমা হ'য়ে সব বসলেন; আমার নাক, মুখ, চোখের কিছুক্ষণ উল্লেখ হ'য়ে মোটের উপর আমি একজন সুন্দরীর মধ্যেই পরিগণিত হলাম। তাঁরা কর্ত্তার কাছে নিয়ে গেলেন, তিনিও দেখে বল্লেন—"বেশত, মেয়েটি খুব শান্ত।" তখন আমি মনে মনে হাসছি যে, এঁরা আজ আমার শান্ত বলছেন, আমি মাঠে কত দৌড়তে পারি এঁরা ত আর দেখেন নি! পরে আমায় খাওয়ার জন্য উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি খেতে ব'সে আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে পোলাওয়ের মাছ, মুড়ার চোখ মুখে তুলছি আর সামনে এক এক বার চাইছি; দেখি যে একটি ভুবনমোহন মূর্ত্তি সম্মুখের বারাণ্ডার রেলের ধারে দাঁড়িয়ে, লাল রংয়ের বেনারসী চেলি পরিধান, খালি গায়ে কাঁধের উপরে পটি-কোঁচানো চাদর, মুক্তার কণ্ঠী, যুঁই ফুলের 'গড়ে' মালা, কপালে চন্দন-কেশর মিশ্রিত, তাতে প্রশস্ত ললাটে লতিকাকারে কুঞ্চিত কেশের অতি সুন্দর শোভা দেখলাম, তার নীচে আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু, খগচঞ্চুর মত নাকটি, কান দুটি যেন ঠিক মানুষের হাতে গড়া, ঈষৎ গোঁফের রেখা, বর্ণটি ঠিক হরিতাল-মাখানো, গঠনটির সুন্দর রমণীয় শোভা, না অতিশয় লম্বা, না বেশী খর্ব্ব। এমন রূপ আমি কখনও দেখি নি,—জানি নে যে এমন রূপ মানুষের হয়। তার উপর কি কমনীয় মূর্ত্তি,—মৃদু মৃদু হাসিমাখা ঠোঁটদুটি, দাঁতগুলি ঠিক মুক্তার মত। আমি ন' বছরের বালিকা, আমি সুন্দর জিনিষ ভালবাসি, চক্ষুর সামনে সুন্দর সামগ্রী দেখলে কে আর না চায়? আমি জানতুম না যে, এ আমার বর। আমার চেয়ে-দেখা দেখে আমার খাবার কাছে যাঁরা ব'সে ছিলেন, তাঁরা সব মুখ-চাওয়া করতে লাগ্‌লেন; আমার তখন সে বিষয়ে কোন দৃষ্টি ছিল না। পরে আমার ছোট দিদিমা যিনি হতেন তিনি বল্লেন তখনকার তাঁদের আদরের ভাষাতে—(এখনকার সভ্য জগতে নিন্দনীয় হ'তে পারে)—"ওলো ও কি, দেখছিস্ কি?—ও তোর বর!" তখন আমি মুখ হেঁট করলুম, আর সকলে একটু হাস্‌তে লাগলেন। কিন্তু আমার মনে কোন কিন্তু হয় নি। কেনই বা হবে? আমি প্রথমতঃ বালিকা, তার উপরে আমাদের বাড়ীতে কারো বিবাহ দেখিনি, কিছুমাত্র জানিনে; লজ্জা যে কাকে বলে তাও জানিনে। একমাত্র পাশের বাড়ীর বড়দির ও ছোট্‌দির বিয়ে দেখেছিলুম, তাও অত খেয়াল নেই; বর হয়েছে, খায়, বেড়ায়, বই পড়ে, ইস্কুল যায়—এই জানি, আর কিছু জানি নে। এখনকার বালকবালিকাগুলি অল্পকালেই এ সকল গূঢ়তত্ত্ব, লজ্জাশীলতা, সাজসজ্জা খুব শীঘ্র শেখে; আমার কিন্তু এ বিষয় সকলি অজ্ঞানা ছিল। আমি প্রায় বেশী সময় পুরুষ মানুষের সঙ্গেই অতিবাহিত করতুম। তারই জন্য হোক্, কি সমবয়স্কা বেশী ছিল না ব'লেই হোক, আমার স্বভাব অনেকটা পুরুষ-ভাবাপন্ন ছিল। যখন বাড়ী এলাম, দিদিমা একবার আমার ঝিকে সব জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেন; সে সব ব'লে চ'লে যাবার পর, আমায় কাছে বসিয়ে, যেয়ে পর্য্যন্ত ও ফেরার সময় তক্, কি হ'ল না হ'ল,সব খুঁটিয়ে জেনে নিলেন,—তাঁর এই স্বভাব ছিল। সব কথাই হয়েছিল, কেবল আমি বর দেখেছি, এই কথাটি হয় নি,—ওটি আমার মনের সাথেই খেলা কর্‌ছিল। আমার বড় আমুদে প্রাণ, এ কথা আমি আগে থেকেই লিখে গেছি। এখন পাঠকপাঠিকা মাতা-পিতারা বিশেষ লক্ষ্য রেখে যাবেন, আমার লেখবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নেই, ভাষ জ্ঞান পর্য্যাপ্ত নেই, আপনারা নিজগুণে দোষ মার্জ্জনা করবেন।

গায়ে হলুদের পূর্ব্ব দিনে, আমার বাবা সকালে ফোর্টের ভিতরে নিয়ে বেড়িয়ে আনেন, মনুমেণ্ট চড়া হয়, পরে দুপুরবেলা যাদুঘর ও জুলজিকেল গার্ডেন দেখে আসি। বৈকালে গাড়ের মাঠে রোজ যেমন বাজনা শুনে বাড়ী ফিরি, সেইমত হয়। কেবল সেদিন কর্ত্তামণি আমার দিকে ভাল ক'রে চাননি, আমার বেশ মনে আছে। আর যদি কোন সময় চার চক্ষু এক হয়েছিল, তাহ'লে জলপূর্ণ দৃষ্টি। আমি পূর্ব্বেই লিখেছি যে এমন ভালবাসতে কেউ পারবে না আমায়। এখন চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ণ হ'য়ে পঁয়তাল্লিশে পদার্পণ করলাম, এখনও পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তামণির মতন মেজাজের লোক দেখলাম না। পরে আমার লাড়ু কোটা, মাখা, পাকানো, ভাজানো, আবার ঠাকুরের সেবা লাগানো হ'য়ে গেল; তারপর সব বাড়ী বিলি করা হ'তে লাগল, ঝাঁকার উপর আট দশ হাঁড়ি বসিয়ে বামুনরা এক এক দিকে গেল। মায়েরা রাত দুটা পর্য্যন্ত অনেকজন ব'সে তরকারি বানানো, পান-সাজা করতে লাগলেন। আমার সেদিন আর কি কাজ,—একবার বাইরে একবার বাড়ীর ভিতর এই ঘুরছি। লালপাড় শাড়ী পরা, খোঁপায় একগাছি মালা, গলায় একগাছি 'গ'ড়ে মালা, হাতে রূপার কাজল-লতা, পায় চারগাছি মল ঝম্‌ঝম্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আমার গায়ে হলুদ হয় ১০ তারিখে আর বিবাহ হয় ১৩ তারিখে; মধ্যে দুদিন, একদিন আমার মাসীমার বাড়ী আয়বুড় ভাত খেয়ে আসি, পরে সেদিন পরম্ গরম লাড়ু দুটি খেয়ে, জলপান খেয়ে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লুম।

(ক্রমশঃ)

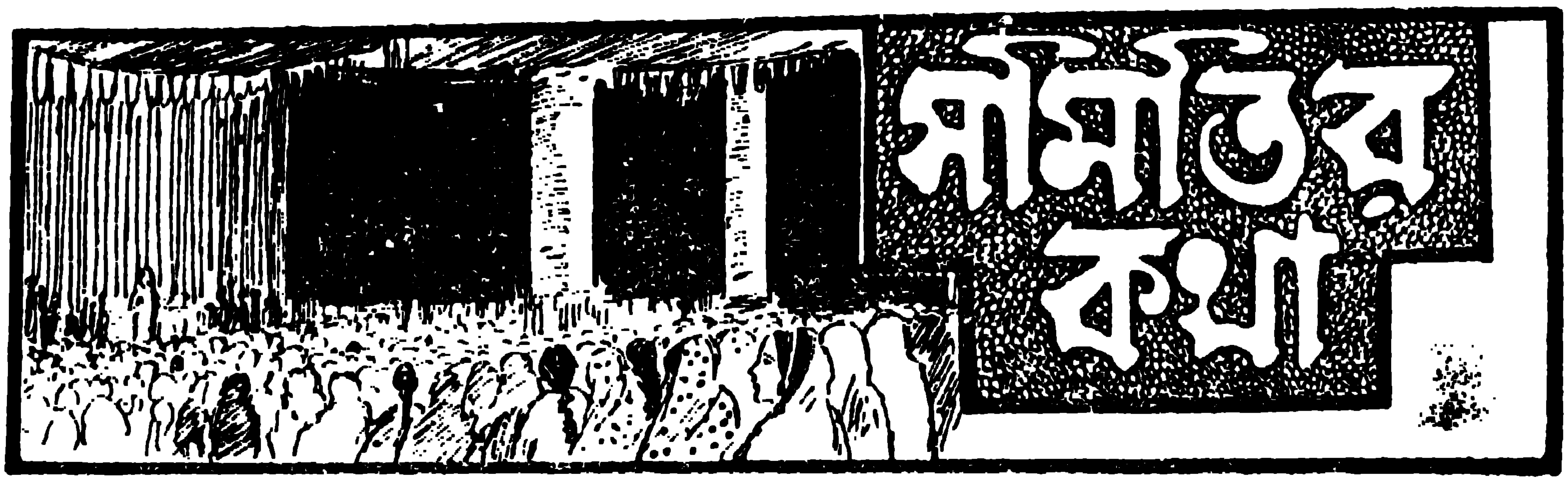

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

মৌলমিন মহিলা-সমিতি

শ্রীযুক্তা শান্তিময়ী দত্তের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যোগের ফলে গত ৯ই মার্চ্চ, ১৯৩০, মৌলমিন মহিলাসমিতি স্থাপিত হয়।

সমিতির উদ্দেশ্য:—(১) দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় দ্বারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, সহানুভূতি এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি; (২) কথাবার্ত্তা, আলোচনা, প্রবন্ধ, পুস্তকাদি পাঠ এবং নানাপ্রকার শিল্প-চর্চ্চার দ্বারা পরস্পরের সহায়তায় জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন; (৩) সম্মিলিত চেষ্টায় সমাজ ও জাতির সেবা।

সমিতির বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা মাত্র ২০ জন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এল মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা বিধুমুখী দাসগুপ্তা আমাদের সভা-নেত্রী। সম্প্রতি তিনি দেশে যাওয়াতে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শান্তিময়ী দত্ত সমিতির সকল কার্য্যভার বহন করিতেছেন।

প্রতি মাসে একবার মাত্র মহিলা-সমিতির অধিবেশন হয়। সমিতির স্থায়ী গৃহ নাই। স্থানীয় কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দুর্গা-মন্দির-গৃহে সমিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু স্থানটি সুবিধাজনক মনে না হওয়াতে সভ্যাগণের আহ্বানে তাঁহাদের গৃহেই অধিবেশন হইতেছে। ন্যূনতম মাসিক ।• আনা চাঁদা দিলেই সভ্যাশ্রেণীভুক্ত করা হয়। অবিবাহিতা বয়স্কা বালিকাদিগকে মাঝে মাঝে সঙ্গীতাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদ দিবার জন্য সমিতিতে আহ্বান করা হয়। তাহাদিগের সেলাই শিক্ষা দিবার জন্য সমিতির ফণ্ড হইতে দর্জ্জি নিযুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু বালিকাগণ প্রয়োজনানুরূপ বেতন দিতে অক্ষম হওয়ায় এবং সমিতির অর্থের অভাব থাকায় এখন পর্য্যন্ত কোনও ভাল বন্দোবস্ত করা যায় নাই। সম্পাদিকার তত্ত্বাবধানে বালিকাদিগের একটি শিল্পবিভাগ খোলা হইয়াছে, সেখানে বালিকাগণ পরস্পরের সাহায্যে সেলাই শিক্ষা করে এবং তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সম্পাদিকা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। তাহাদের কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য সমিতির ফণ্ড হইতে মাঝে মাঝে কাপড়, সূতা প্রভৃতি কিনিয়া দেওয়া হয়।

সমিতির অধিবেশনে যাতায়াতের জন্য ফণ্ড-অভাবে সমিতি হইতে কোনো বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় নাই। সভ্যাগণ নিজ ব্যয়ে যাতায়াত করেন। নিকটবর্ত্তী কোনো গৃহে সভা হইলে অনেকে হাঁটিয়াই যাতায়াত করেন। সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকগণের বিশেষ সহানুভূতি কিছু পাওয়া যায় না বরং কাহারও কাহারও মনে সমিতির কার্য্যের বিরুদ্ধভাবই দেখা যায়। ইহা সত্ত্বেও যে মহিলারা এই কয়জনও মিলিত হইতেছেন, ইহাতে মহিলাদের মনের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সমিতির বয়স মোটে দশমাস চলিতেছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতি সামান্য কাজই হইয়াছে।

প্রতি অধিবেশনে কিছু পাঠ ও আলোচনা হয়। (১) পরিবারে জননীর দায়িত্ব, (২) স্বাস্থ্যপালন, (৩) শৃঙ্খলা, (৪) সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম, (৫) সমিতির প্রয়োজনীয়তা, (৬) মাতৃত্ব, (৭) নারীর কর্ত্তব্য, (৮) গৃহধর্ম্ম—এই কয়টি বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা হইয়াছে। স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন শ্রদ্ধেয় এম, এল্, কুণ্ডু মহাশয় "সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার কন্যাদের দ্বারা সমিতিতে পাঠ করান। সেজন্য তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্তা—বিভাবতী দত্ত, মালতী মুখোপাধ্যায়, কৌশল্যা-রাণী কুণ্ডু, অমিয়কণা ভৌমিক, শতদল দে চৌধুরী, বিভাসিনী ব্যানার্জ্জি, সরোজিনী মুখার্জ্জি, নীরদা কুণ্ডু এবং শান্তিময়ী দত্ত প্রবন্ধ লিখিয়া আলোচনা উত্থাপন করেন।

আলোচনার দ্বারা সভ্যাগণ চিন্তার আদান-প্রদানের সুযোগ পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

গত মে মাসে বর্ম্মার একটি বিখ্যাত সহর পিগু (Pegu) ভীষণ ভূমিকম্পে এবং অগ্নিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার অল্পদিন পরেই রেঙ্গুন সহরে বর্ম্মাদের সহিত কোরঙ্গী (দক্ষিণ ভারতবর্ষীয়) কুলীদের ভয়ানক এবং মারাত্মক দাঙ্গা হয় এবং তাহার ফলে হাজার হাজার চোরঙ্গী পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশু বর্ম্মাদের অমানুষিক অত্যাচারে নিপীড়িত, হত এবং গৃহহীন হয়। সেই সময় (জুন মাসের প্রথমে) আমাদের সমিতির সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং দুইজন সভ্যা—শ্রীযুক্তা অনুপমা কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্তা অমিয়কণা ভৌমিক, শিশুদের, দুরবস্থাগ্রস্ত নরনারীর এবং বিপন্ন কোরঙ্গীদের সাহায্যার্থ, সকলজাতীয় মহিলাদিগের দ্বারে দ্বারে কাতর নিবেদন জানাইয়া অর্থ ভিক্ষা করেন এবং ১৮১৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া পিগু এবং কোরঙ্গী রিলিফ ফণ্ডে দান করেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভৌমিক মহাশয় সম্পাদিকাকে এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

স্থানীয় কমিশনার সাহেবের সভানেতৃত্বে এবং সহরের বিশিষ্ট ভারতবর্ষীয় এবং ব্রহ্মদেশীয় অধিবাসীদিগের সহায়তায় সহরে একটি শিশুমঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির অক্লান্ত চেষ্টায় সহরের শিশুমৃত্যুর হার ক্রমে কমিতেছে এবং অনেক দরিদ্র পরিবার বিনাব্যয়ে ধাত্রীর সেবা লাভ করিয়া উপকৃত হইতেছে। আমাদের সমিতির সম্পাদিকা শিশুমঙ্গল সমিতির পরিচালক-সভার একজন সভ্য। আমাদের সমিতি গত অক্টোবর মাসে এই মহৎ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ এবং সহানুভূতি জানাইয়া শিশুমঙ্গল সমিতির সাহায্যকল্পে এককালীন ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সমিতির আয় অতি অল্প বলিয়া এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আশানুরূপ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে নাই। সমিতির অধিকাংশ সভ্যাই পরিবারের ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদাদি নিজেরা প্রস্তুত করিয়া পরোক্ষভাবে সংসারের আর্থিক সহায়তা করেন। সমিতির বালিকা-বিভাগের অনেক বালিকাই এম্ব্রয়ডারী, উলের কাজ, চটের আসন, মাছের আঁশের কাজ, দড়ির পাপোষ প্রভৃতি কাজ জানে কিন্তু দ্রব্য-বিক্রয়ের সুবিধা না থাকায় বেশী করিবার উৎসাহ দিতে পারা যায় না। সমিতির দশমাসের আয়ঃ

মোট আয়—৯১ ৫০

মোট ব্যয়—৪৩/১০

হস্তস্থিত ৪৮৸৶১০ মাত্র

কেন্দ্রসমিতি হইতে মাসিক সাহায্য পাইলে শিক্ষার কিছু বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রী শান্তিময়ী দত্ত
সম্পাদিকা।

যশোহর

ইং ১৯২৫ সালের মে মাসে কলিকাতা হইতে কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া যশোহরে একটি মহিলাসমিতি গঠন করেন। এযাবৎ নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া এই মহিলা-সমিতি চলিয়া আসিতেছে। গত মে মাসে সমিতি পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিল।

সমিতির প্রারম্ভে কেন্দ্রসমিতির কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত মহিলাগণকে সমিতি-পরিচালনার ভার দিয়া যান :—

শ্রী রাসবালা মিত্র (স্যার সুরেন মল্লিকের ভগ্নী), সভানেত্রী ; শ্রী প্রমীলাবালা মিত্র, সম্পাদিকা ; শ্রী হিরণ্ময়ী দত্ত, কোষাধ্যক্ষ ; ও মিসেস গিলবার্ট, সহ-সম্পাদিকার কাজ করেন।

এই সময় মাসে একবার করিয়া সমিতির অধিবেশন হইত। কোন কোন বই হইতে প্রবন্ধ পড়া হইত।

সভ্যা-সংখ্যা ৩৪ জন ছিল। সমিতিতে উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম্ম হয় নাই।

১৯২৬ সালে উক্ত সম্পাদিকা পদত্যাগ করেন এবং মিসেস গিলবার্ট বিলাত চলিয়া যান। স্থানীয় এক বিশিষ্ট ঘরের কোন পারিবারিক দুর্ঘটনায় সমিতির কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়।

আলোচ্যবর্ষের অগাষ্ট মাসে অপরাপর সভ্যাগণের ইচ্ছানুসারে শ্রী চারুশীলা ধর সম্পাদিকার পদে নিযুক্ত হন। এই সময় চারুশীলা ধর ও শ্রী হিরণ্ময়ী দত্ত সহরের অনেক বাড়ীতে যাইয়া সভ্যা-সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন। সমিতির স্থায়ী কোনও বাসগৃহ না থাকায় স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে সমিতির অধিবেশন হইত। ঐস্থানে নানা অসুবিধা হওয়ায় পরে সভ্যাগণ নিজ নিজ গৃহে সমিতি করিবার আগ্রহ করিয়াছিলেন। তদবধি নিয়মানুক্রমে প্রত্যেক সভ্যার গৃহে অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহাতে সভ্যাগণ নিজেদের মধ্যে মেলা-মেশার অধিকতর সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। সম্পাদিকা এই সময় সমিতির কাজকর্ম্মের কতকগুলি শ্রেণী-বিভাগ করেন।

১ম। শিল্প-শিক্ষাঃ—কয়েকজন শিল্প-পারদর্শী সভ্যার পরিচালনায় সহরের ৩,৪ জায়গায় কয়েকটি শিল্প-ক্লাস খোলা হইয়াছিল। এই সব স্থানে ফ্রক, ব্লাউজ, ছেলেদের প্যাণ্ট, বডিজ, এম্ব্রয়ডারী, টেবিল-ক্লথ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল সূচিশিল্প প্রস্তুত হইলে

একটি প্রদর্শনী খুলিয়া উহা বিক্রয় করা হইয়াছে। এইরূপ একটি প্রদর্শনীতে একদিন ৪৭।৹ মূল্যের শিল্প বিক্রয় হইয়াছে। এই শিক্ষার ফলে যশোহরের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে মেয়েরা সাধারণ জামা কাপড় প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। বর্ত্তমানে মহিলাসমিতি হইতে ১৫ টাকা বেতন দিয়া সভ্যাগণকে উত্তমরূপ ছাঁটকাট শিখাইবার জন্য একজন দরজী রাখা হইয়াছে। মহিলাগণ এইভাবে শিক্ষালাভ করিলে আর্থিক সমস্যারও কতকটা সমাধান হইবে।

ব্যায়াম বা শরীর-চর্চ্চা—সমিতির সভ্যাগণের মধ্যে শরীর-চর্চ্চা অথবা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে যশোহর মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা একটি ব্যাড্‌মিণ্টন ক্লাস খুলিয়াছেন। এই স্থানটি একজন সভ্যার গৃহসংলগ্ন একটি নিরালা ময়দানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যের দুরবস্থা ও একটানা জীবনযাত্রার প্রণালী দেখিয়া এইরূপ খেলাধূলার ব্যবস্থার উপকারিতা নির্দ্ধারণ করা যায়। সভ্যাদিগের নিকট হইতে।৹ চাঁদা ধরিয়া এই ক্রীড়া-সমিতিটি চলিতেছে। সকলেই উৎসাহ করিয়া নিয়মিতভাবে এইস্থানে যোগ দিয়া থাকেন।

মহিলাদের মধ্যে শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চায় যশোহর সমিতিই প্রথম পথ প্রদর্শক।

আমোদ-প্রমোদ—আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে আমোদ-আহ্লাদের কোন ব্যবস্থার একান্ত অভাব। একটানা জীবনযাত্রার প্রণালী মেয়েদের কর্ম্মক্লান্ত দেহকে আরও অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে! সেইজন্য মাঝে মাঝে তাহাদের শরীর ও মনটাকে হাল্কা করিবার জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা অতি দরকারী। সেইজন্য সমিতিতে কখনো এইরূপ আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করি। যশোহর মহিলাসমিতিতে মাঝে মাঝে সমিতির মহিলা ও মেয়েদের দ্বারা হাস্যরসাত্মক কবিতাপুস্তক পাঠ অথবা অভিনয় হইয়া হইয়া থাকে। একবার সম্পাদিকার গৃহে এইরূপ মেয়েদের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" হইয়াছিল; উপস্থিত সভ্যাগণ সকলেই আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। গত জুলাই মাসে সম্পাদিকার বিশেষ উদ্যোগে মেয়েদের "রাজা ও রাণী" অভিনয়টি অতি সুন্দর হইয়াছিল। বিশেষ সুমিত্রা ও কুমার সেনের ভূমিকায় ২ জন মেয়ে এতাদৃশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল যে তাহাদের উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রী মণিপ্রভা ঘোষ ও ডাঃ জে, আর, ধর দুইটি সুবর্ণপদক পারিতোষিক প্রদান করেন। ঐ দিন ২০০ মহিলা-দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত কখন কখন সামান্য চাঁদা লইয়া মেয়েদের মধ্যে বনভোজন ইত্যাদি হইয়া থাকে।

সমিতি-গঠন—যশোহর মহিলাসমিতির অনেক সভ্যা কার্য্যোপলক্ষে ঝিনাইদহে যান এবং চেষ্টা করিয়া তথায় একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিয়া আসেন। অতঃপর উহা কেন্দ্রসমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সমিতির সাহায্য—(১) সমিতির অর্থ হইতে ২জন দরিদ্র বালিকাকে স্কুলে পড়িবার খরচ দেওয়া হয়। উহারা প্রায় ২ বৎসর যাবৎ শিক্ষালাভ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত অনাথা দুঃস্থা বিধবা প্রভৃতিকে সাধ্যমত সমিতি সাহায্য করিয়া থাকে।

(২) ১৯২৬ ও ১৯২৮ এই দুই বৎসর যশোহর সমিতির ২ জন কেন্দ্রসমিতি হইতে ১৫ ও ২০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই টাকা হইতে যশোহরের দুইটি বালিকাবিদ্যালয়ে দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

(৩) সমিতির সভ্যাগণ একটি দরখাস্ত করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী হইতে ১২৲ বেতনে একজন শিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ ধাত্রী সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনা পয়সায় কাজ করিয়া থাকে।

সভ্যাগণ প্রত্যেকে।৹ চাঁদা দিয়া সভ্যা-শ্রেণীভুক্তা হইয়া থাকেন। সমিতি হইতে গাড়ীভাড়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক অধিবেশনে ২টি ঘোড়ার গাড়ী সভ্যাদের যাতায়াতের জন্য নিযুক্ত থাকে।

বর্ত্তমানে সমিতিতে ২৩০৲ টাকা গচ্ছিত আছে। ঐ টাকা সভানেত্রীর নামে ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে।

(সমিতির মাসিক ব্যয়) দরজীর মাহিনা—	১৫৲
গাড়ী ভাড়া—	৪৲
চাপরাশী—	৩৲

দুইটি মেয়ের পড়ার ব্যয়— ৩৲+২২৲=২৫৲

বর্ত্তমানে দেশের এই আন্দোলনে সমিতির গঠনমূলক কার্য্যে অত্যন্ত বাধা পড়িতেছে। আমরা আশা করি ক্রমশঃ এই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের মহিলা-সমিতি নানা বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

শ্রী চারুশীলা ধর
সম্পাদিকা

কেন্দ্রসমিতির কথা

দশানী গ্রামে মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী

গত ১লা জানুয়ারী খুলনা জেলার অন্তর্গত দশানী গ্রামে স্থানীয় মহিলাদের উদ্যোগে মহিলাদের শিল্পকার্য্যের একটি প্রদর্শনী দশানী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-গৃহে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনীতে বহু প্রকারের শিল্পদ্রব্য, যথা উলের কাজ,চিকণের কাজ, সূচিশিল্প, বিভিন্ন প্রকারের জামা, পোষাক, পুঁতির কাজ, ঝাঁকা, ফুলের সাজি, মালা, পাট ও শনের শিকা, পেন্সিল-চিত্র, উলের ছবি,তাঁতে বোনা কাপড় ইত্যাদি উপস্থিত করা হইয়াছিল। বাগের হাট, দশানী, কাঁঠাল এবং নিকটবর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বহু নরনারী এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। দশানী মহিলাসমিতির উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যগুলি দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ১লা জানুয়ারী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে একটি বিরাট মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এই সভায় যোগদান করেন। দশানী মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা দুর্গারাণী দাস, বাগের হাট মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা মিত্র প্রভৃতি মহিলারা এই সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে জাতির উন্নতিসাধনে নারীর শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, সুতরাং এই নারীশক্তিকে সংঘবদ্ধ করাই মহিলাসমিতির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ আলোক-চিত্র সাহায্যে বর্ত্তমান যুগে নারীর কর্ত্তব্য ও সাধনা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রায় সহস্রাধিক পুরুষ ও নারী এই সভায় যোগদান করেন।

কাঁঠাল মহিলাসমিতি

গত ৩১শে ডিসেম্বর কাঁঠাল মহিলাসমিতির একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী হইয়াছিল। গ্রাম্য নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেক শিল্পদ্রব্য এখানে প্রদর্শিত হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া মহিলা-দিগকে প্রদর্শনীর আবশ্যকতা এবং মহিলাসমিতির কার্য্য বিষয়ে পরামর্শ দেন।

বালীগঞ্জে মহিলা-সভা

কলিকাতা কর্পোরেশনের ২১ নং স্বাস্থ্য-বিভাগের উদ্যোগে গত ৩০শে ডিসেম্বর বালীগঞ্জে জগবন্ধু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-হলে স্থানীয় মহিলাদের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, নারীর উন্নতি সাধিত না হইলে জাতির উন্নতিসাধন সম্ভব হয় না। এদেশের নারী যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিল্প বিষয়ে উন্নতিসাধন না করিতে পারে তবে এদেশের পক্ষে জগতের উন্নতিতে তাল রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইবে না। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন নারীপ্রগতি বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন।

যশোহর জেলায় প্রচার-কার্য্য

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় স্থানীয় লোকদের আহ্বানে যশোহর জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গণ্ডগ্রামে প্রচারকার্য্যের জন্য বহির্গত হন। তিনি ইতনা, কালিয়া, জয়পুর, লোহাগড়া, মল্লিকপুর প্রভৃতি বহু গ্রামে আলোকচিত্র সাহায্যে মহিলাসমিতি, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, সেবা-শুশ্রূষা, বিভিন্ন শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা অতি উৎসাহের সহিত এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতনা, কালিয়া প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যেই মহিলা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্তি

সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার জীবনী অবলম্বন করিয়া নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যে ৫০৲ টাকা এবং ২৫৲ টাকা মূল্যের দুইটি স্বর্ণপদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় দিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, মৌলমিন মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শান্তিময়ী দত্ত তাঁহার প্রথম পুরস্কার ৫০৲ টাকার স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্তা সুপ্রভা দত্ত দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫৲ টাকার স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

প্রচার ও গঠন-কার্য্যের জন্য পুরস্কার

প্রচার ও গঠনকার্য্যের জন্য এবার আসাম, সুরমা মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শৈলবালা বিশ্বাস শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ৫০৲ মূল্যের স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

মহিলাসমিতির কার্য্যের জন্য পুরস্কার

সুপরিচালন এবং গঠনমূলক কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাসমিতিগুলি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ২০৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—(১) যশোহর, (২) ডোঙ্গর ঘাট, (৩) সেনহাটি, (৪) খুলনা, (৫) বাগের হাট, (৬) বাগের হাট আদি-সমিতি, (৭) বারাশত, (৮) টাঙ্গা, (৯) কুড়িগ্রাম, (১০) শ্রীহট্ট মূলঘর। বাইনান মহিলাসমিতি ১৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার পাইয়াছেন। ময়মনসিংহ মহিলাসমিতি গঠনকার্য্যের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ৫০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন।

অভিনয়ের জন্য পুরস্কার

গত পূজাবকাশের পূর্ব্বে অভিনয়ের জন্য শ্রীযুক্ত হরিধন মুখার্জ্জি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় প্রদত্ত ২৫৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি ডাঃ এইচ, এন, রায় প্রদত্ত রৌপ্যপদক পাইয়াছেন।

শিয়ালদহ মোটর সার্ভিস

শিয়ালদহ মোটর সার্ভিসের স্বত্বাধিকারী মিঃ এ, এ, সোভান ১৯২৯ সাল হইতে ১২ মাসের জন্য তাঁহার কোম্পানীর সমস্ত বাসে যাতায়াতের জন্য একখানি ফ্রি পাশ দিয়া আসিতেছেন। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এবারও মিঃ সোভান সমিতির কর্ম্মীগণের সুবিধার জন্য ১৯৩১ সালের ১২ মাসের জন্য একখানি ফ্রি পাশ দিয়াছেন। এবং প্রতিবৎসর এইরূপ ভাবে একখানি করিয়া ফ্রি পাশ দিয়া সমিতিকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া গত ১৩ই ডিসেম্বর সরোজনলিনী শিল্প-শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম মহোদয়ার নেতৃত্বে স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের বাগানবাটীতে ছাত্রীগণের যে বন-ভোজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, মিঃ সোভান সেই অনুষ্ঠানে কলিকাতা শিল্পশিক্ষালয় হইতে দম্‌দম্ উদ্যানবাটীতে ছাত্রীগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সকাল ও বিকালে দুই বার দু'খানি বাস দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা শিয়ালদহ মোটর সার্ভিস কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও মিঃ সোভানের মঙ্গল কামনা করিতেছি। শিয়ালদহ মোটর সার্ভিস কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এস, সি রায় ও মিঃ এ, হোসেনও আমাদিগকে এই বিষয় অনেক সাহায্য করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ইম্পিরিয়ালের চা—

দাদু'কেও একটু না দিলে তৃপ্তি হয় না।

সুগন্ধি, সুস্বাদু, তৃপ্তিকর

ইম্পিরিয়ালের চা

সবাই পছন্দ করেন।

ইম্পিরিয়াল টি কোং

৭৪।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ কলিঃ ১১৩২

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

তীর্থের পথে

দেব-দরশনে চলে একমনে
তীর্থযাত্রী দল,
বাঞ্ছিত ধামে হেরিবে নয়নে
লভিবে ইষ্টফল।

শিল্পী—শ্রীযতুপতি বসু

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৭ [৪র্থ সংখ্যা

সাধনা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস

সবার কাজে আপনাকে দে বিলায়ে;
ও তুই সবার মনে আপনাকে দে মিলায়ে॥

মনের আপন-পরের প্রভেদ দে তুই নাশায়ে,—
তোর স্বার্থ-প্রাচীর বিশ্ব-প্রেমের বানেতে দিক্‌ ভাসায়ে।
যদি শান্তি পাবি সবার চ'খের অশ্রু দে তুই মুছায়ে;
যদি স্বস্তি পাবি সবার বুকের ব্যথা দে তুই ঘুচায়ে॥

যদি বৃহৎ হবি সবার তরে বিত্ত দে তোর বিলায়ে;
যদি মহৎ হবি সবার সনে চিত্ত দে তোর মিলায়ে।
যদি উচ্চ হবি সবার নীচে আসন নে তোর বিছায়ে;
যদি অসীম হবি সবার জীবন স্নেহে দে তোর সিঁচায়ে॥

যদি শ্রেষ্ঠ হবি সবার সেবায় মাথা দে তোর নোয়ায়ে;
যদি শুদ্ধ হবি সবার দেহের ধূলি দে তুই ধোয়ায়ে।
যদি সফল হবি সবার বোঝা ব'য়ে দে হাত বাড়ায়ে;
যদি অমর হবি সবার মাঝে আপনাকে ফেল্‌ হারায়ে॥

নারীর কাজ

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যে অবস্থা ছিল, তার সঙ্গে গত দশ বৎসরের, বিশেষ ক'রে গত দুই-তিন বৎসরের অবস্থার সকল দিক দিয়েই খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায়। এই যে সময়টা, এটা লোকমতের জাগরণ, বিশেষ ক'রে নারী-জাগরণের যুগ। আমার মত যাঁরা কোনো কারণে সাত-আট বৎসর বিদেশে ছিলেন, তারপর কলকাতায় ফিরেছেন, তাঁরা এই তফাৎটাকে বেশী লক্ষ্য করেন। আমরা নিজেরা স্কুলে কলেজে যখন পড়েছি, সেটা খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, কিন্তু তখনও রাস্তায় ঘাটে ভদ্রঘরের মেয়েদের হাঁটা-চলাটা অত্যন্ত নূতন ব্যাপার ছিল। নিজেরা হেঁটেছি ব'লে নানারকম অসুবিধা আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। ঠিক আট-দশ বৎসর না হোক, তার সামান্য কিছু আগেই, মেয়েদের কোনো উৎসব কোনো অনুষ্ঠানে, উপাসনা করবার বা বক্তৃতা করবার উপযুক্ত লোক মেয়েদের ভিতর খুঁজে পাওয়া শক্ত হ'ত। দু'চারজন মাত্র মেয়ে প্রকাশ্যে সাধারণ সভা-সমিতিতে বক্তৃতা প্রভৃতি দিতেন, তাঁদের সব সময় পাওয়া যেত না। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের উৎসবে এবং সভায় আচার্য্যের কাজ এবং বক্তার কাজ পুরুষেরাই করতেন। এটা কারো কাছেই বিশেষ বিসদৃশ ব্যাপার মনে হ'ত না। মেয়েরা যে আলাদা উৎসব বা সভা করছেন সেটাকেই সবাই যথেষ্ট উন্নতিশীলতার প্রমাণ ব'লে ধরতেন, তাঁরা নিজেরাই সে-সকল ক্ষেত্রে সবকিছু করবেন, এটা তাঁদের কাছে কেউ প্রত্যাশাও করত না।

এখন যে সব দিক দিয়ে সময় ফিরে গিয়েছে এটা দেখে একসঙ্গে আনন্দ এবং আশা দুইই মনে জাগে। রাস্তায় ঘাটে, ভদ্রঘরের মেয়ে শোভন পরিচ্ছদে চলাফেরা করছেন, ট্রামে এবং বাসে চ'ড়ে যেখানে প্রয়োজন যাচ্ছেন, এটা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা বাঙলার বাইরে এমন কোনো স্থানে থেকেছেন, যেখানে অবরোধের উৎপাত নেই, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সে-সব দেশে পথের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে, নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখদুটো খানিক পরিমাণে তৃপ্ত হয়। দেশের শ্রী যাঁরা, তাঁদের যদি ক্রমাগত পরদা-চাপা দিয়ে রাখা হয়, তাহ'লে দেশের প্রতি অবিচার করা হয়, এ কথাটা বাঙালীরা এতদিন কেন বোঝেন নি জানি না। খানিকটা রাজনৈতিক কারণে, এবং খানিকটা জনমতের পরিবর্তন হওয়ার জন্যে অবরোধের কড়াকড়ি এখন বাংলা দেশে অনেকটা ক'মে গিয়েছে। মফঃস্বলের কথা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু কলকাতায় যা দেখি, তাতে মনে হয় এই মুক্তিলাভ মেয়েদের স্থায়ীই হবে। যাঁরা একবার জড়তা, ভীরুতা ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, সমানে পথে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন, তাঁরা কোনদিনই আর কোটরের ভিতর ফিরে যেতে পারবেন না। যে অধিকার-লাভের আশায় তিনি পথে বেরিয়েছিলেন, তা পান, বা নাই পান, স্বাধীন ভাবে বিচরণ করার অধিকার তাঁর থেকে গেল। এটা কিন্তু কম লাভ নয়। যে মানুষ ইচ্ছা করলে দুই-পা হেঁটে চলতে পারে না তার দ্বারা দেশের বা দশের কোনো কাজ হওয়া ত সম্ভব নয়, এমন কি নিজের উন্নতির পথেও এই স্বাধীনতার অভাব তার সব চেয়ে বড় বাধা হবে।

তারপর নিজেদের সব কাজ নিজে করার কথা। এখন কলকাতায় ত দূরের কথা নিতান্ত ছোট সহরেও মেয়েদের সভায় বক্তৃতা করবার বা সভানেত্রী হবার মেয়ের কোনই অভাব হয় না। বক্তৃতাদি যা হয় তা হয়ত সর্ব্বত্র খুব উঁচুদরের হয় না, কিন্তু তাঁরা নিজেরা যে সমস্ত ব্যাপারটা চালাতে পারেন অন্যের সাহায্য না নিয়ে, এইটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। মেয়েদের যে এই আত্মনির্ভর, এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, এইটাই হ'চ্ছে প্রধান জিনিষ, তাঁরা কি ভাবে কি করছেন সেটা তার পরের কথা। প্রথম কাজ

আরম্ভ করার সময় সেটাতে দোষত্রুটি থাকতে বাধ্য, মহী-রাবণের পুত্র অহিরাবণের মত জন্মগ্রহণ ক'রেই কেউ যুদ্ধ করতে সুরু করে না এবং কালক্রমে সে-সকল দোষত্রুটি নিজের থেকেই সংশোধিত হ'য়ে যায়। এটার জন্যে বেশী ভাব-বার কোনো প্রয়োজন নেই। এই নারীশক্তির জাগরণের জন্যে প্রশংসা অনেক পরিমাণে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রাপ্য। কলকাতার মত সহরে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হ'তে হ'তে যেসব জিনিষ ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই সমিতি নিতান্ত অখ্যাত ছোট জায়গাতেও সেসব জিনিষ অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোথাও সম্ভবতঃ তাঁদের বিফল হ'তে হয়নি। মানুষ যদি একবার বিশ্বাস করতে পারে যে তার দ্বারা একটা কাজ হওয়া সম্ভব তাহ'লে সে-কাজ ফেলে কখনও সে স'রে যায় না। হয়ত প্রথমেই সেটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় না, যেখানে মোটর হাঁকান দরকার সেখানে গরুর গাড়ী চালাতে হয়, কিন্তু সকলেই বুঝতে পারে যে মৃদুগতিতে হ'লেও কাজ অগ্রসরই হ'চ্ছে।

এখন আমাদের দেখতে হবে এই নবজাগ্রত শক্তিকে কোন্ পথে চালাতে হবে, কোন্ কাজে লাগাতে হবে। এত-দিন পর্য্যন্ত যা কাজ হয়েছে তা মেয়েদের মধ্যেই হয়েছে, কেবল মাত্র মেয়েদের জন্যই হয়েছে। তাঁরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে, মতের আদানপ্রদানে মনের জড়তা ঝেড়ে ফেলতে পারেন, বিশ্বের এবং দেশের কিছু অন্ততঃ খোঁজখবর রাখতে পারেন, অর্থনৈতিক দাসত্বের হাত থেকে সামান্য পরিমাণেও মুক্ত হ'তে পারেন, প্রধানতঃ সেই চেষ্টাই হয়েছে। আরম্ভের পক্ষে, এবং আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে, কাজ কিছু মন্দ হয়নি। কিন্তু জাতির জননী, পালয়িত্রী, শিক্ষয়িত্রী যাঁরা, তাঁদের অল্পে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। তাঁরা নিজেরা উন্নত হোন্, স্বাধীন হোন্, বিশ্বের মুক্তির সঙ্গীত তাঁদেরও অন্তরে ধ্বনিত হোক্, এ সকলেই এখন আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু নারী যখন আত্ম-নির্ভরক্ষমা হবেন, পরিপূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির অধিকারিণী যখন হবেন, তখনই কি তাঁর কাজ শেষ হ'য়ে যাবে? তা মোটেই নয়। এতদিন ত তাঁর নিজেকে শিক্ষা দিতেই গিয়েছে, এখন পরকে শিক্ষা দেবার, পরের জন্যে খাটবার দিন তাঁর এসেছে।

কথা উঠতে পারে, ঘরেই মেয়েদের যথেষ্ট কাজ রয়েছে, বাইরে তাঁরা আবার কি কাজ করতে যাবেন? মেয়ে এবং পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র এবং কার্য্যপ্রণালী কি একই হবে? আমাদের মেয়েরা কি অন্ধভাবে পাশ্চাত্য মেয়েদের নকল করবেন, না নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রেখে তাঁরা কাজ করবেন? এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে, কোথাও বা একরকম সমাধান হয়েছে, কোথাও অন্যরকম। আমার যা মনে হয়, তা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করব। ঘরে মেয়েদের যথেষ্ট কাজ আছে তা ঠিক, কিন্তু সেইগুলিই শুধু তাঁদের সব কাজ নয়। বাইরের জগতেও তাঁদের বিশেষ কাজ এবং বিশেষ স্থান আছে। নারী শুধু ঘরের গৃহিণী, সন্তানের জননী এবং পালয়িত্রী নন, তিনি দেশের এবং দশের একজন। এই দুটির উন্নতির জন্যে তাঁর সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এমন কি, পরিবারের ভিতর তাঁর যা প্রধান কাজ, সন্তানকে উপযুক্তভাবে পালন করা, তাকে মানুষের মত মানুষ ক'রে তোলা, তা তিনি কখনও করতে পারবেন না, যদি না তিনি বাইরের কাজে যোগ দেন। দেশের বালকবালিকার শিক্ষাপ্রণালী কেমন হওয়া দরকার, স্বাস্থ্যচর্চ্চা কি ভাবে হওয়া দরকার, তা স্থির করবার ভার বালকবালিকাদের জননীদের হাতে একেবারেই যদি না থাকে, তাহ'লে সেটা একটা অত্যন্ত অশোভন এবং অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়, এবং তার ফল কখনও ভাল হ'তে পারে না। বালকবালিকা-সম্বন্ধীয় আইন, তাদের বিচারালয়ে বিচারপতির কাজ, এসব বেশীর ভাগ মেয়েদের হাতে থাকা উচিত। মেয়েদের নিজেদের সম্বন্ধীয় আইনগঠনের ভার, তাঁদের বিচারের ভার, অভিযুক্তা মেয়ের পক্ষ-সমর্থনের ভার, এসব মেয়েরা যে-ভাবে, যতটা সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে করতে পারবেন, পুরুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। চিকিৎসা-বিভাগে নারী-চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা অত্যন্ত গোঁড়া ব্যক্তিও আজকাল স্বীকার করেন। নার্স প্রভৃতির কার্য্যক্ষেত্র ত দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং ঘরের ভিতরের কাজই মেয়েদের একমাত্র কাজ এটা আর কিছুতেই বলা চলে না। আর ঘরের ভিতরের

প্রধান কাজ যা মেয়েদের, অর্থাৎ সন্তান- পালনের কাজ, তা ত মেয়েদের চিরজীবন ধ'রে করতে হয় না? অনেক মেয়ে আছেন যাঁদের ছেলেমেয়ে বড় হ'য়ে গিয়েছে, বা যাঁদের ছেলেমেয়ে নেই, তাঁরা কি শুধু ব'সেই থাকবেন? আজকাল গৌরীদানের প্রথা আর নেই, অনেকক্ষেত্রেই মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্কা এবং সুশিক্ষিতা হ'য়ে তারপর বিবাহ করেন। যতদিন তাঁরা সংসারে প্রবেশ না করছেন, ততদিন কি শুধুই ব'সে থাকবেন? দেশ বা সমাজ কি তাঁদের কাছে কিছুই দাবী করতে পারে না? এগুলিও ভেবে দেখ্‌বার কথা। নারী এবং পুরুষকে দেশ, সমাজ, পরিবার, সর্ব্বক্ষেত্রেই পাশাপাশি কাজ করতে হবে, তা না হ'লে কাজের অঙ্গহানি খানিক পরিমাণে হবেই। অবশ্য দুজনে যে ঠিক একই কাজ করবেন তা নয়। কিন্তু সকল কাজেরই দুটো দিক আছে, কারণ মানবসমাজই দুই ভাগে বিভক্ত। নারী যেমন পুরুষের হ'য়ে তাঁর সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন না, পুরুষও তেমনি নারীর হ'য়ে ঘরে-বাইরে তাঁর সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন না। মেয়েরা যদি সকল দিক দিয়ে নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, সেটাই সকলের চেয়ে ভাল হয়। অবশ্য এটা করতে হ'লে, তাঁদের শুধু মুখের কথায় অধিকার দাবি করলে চল্‌বে না, তাঁদের প্রমাণ করতে হবে অধিকারের সুব্যবহার তাঁরা করতে পারেন, এবং তাঁদের পুরুষের অর্থনৈতিক দাসত্বের থেকে মুক্তি পেতে হবে। উদরান্ন বা আশ্রয়ের জন্য যদি তিনি সর্ব্বদা পুরুষের মুখ চেয়ে থাকেন, তাহ'লে তাঁর কোনোক্ষেত্রেই স্বাধীনতা থাকবে না। হয়ত এতে তাঁদের আরাম এবং আলস্যচর্চ্চার কিছু অসুবিধা হবে, কিন্তু এটা তাঁদের সহ্য ক'রে যেতে হবে। কিছুদিন নিজেদের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা উপভোগ করার পর, তাঁরা আর কোনোদিনও নিজেদের আগেকার পিঞ্জরে ফিরে যেতে চাইবেন না।

তারপর আমাদের দেশের মেয়েদের নিজস্বতা রক্ষা ক'রে চলার কথা ওঠে। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যথেষ্ট ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। আমরা খানিক পরিমাণে অন্ধভাবেই পশ্চিমের অনুকরণ করেছি। এটা অবশ্য হয়েছে এই কারণে যে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার প্রাচ্য আদর্শ আমাদের সামনে ছিল না, পাশ্চাত্য যেটা সেটাই ছিল। প্রাচীন ভারতে এই জিনিষদুটি যে পূর্ণমাত্রায় ছিল, সেকথা কেউ ভেবে দেখা দরকার মনে করেননি, সমসাময়িক জগতে চোখের সামনে যে জিনিষটা তাঁরা দেখেছিলেন, সেইটাই মূলশুদ্ধ উপড়ে আনার চেষ্টাই করেছিলেন। ফলে আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা অনেকক্ষেত্রেই ঠিক শোভন রূপ ধরেনি। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে এগুলির আমি নিন্দা করছি বা এগুলিকে বিদায় করতে চাইছি। শিক্ষা এবং স্বাধীনতা যে ধরণেরই হোক, তার মূল্য সমানই, তবে দেশের মেয়েকে দেশী শাড়ীতে যেমন মানায়, বিদেশী গাউনে ততটা সুন্দর আমাদের চোখে লাগে না, আসলে যদিও মানুষটি একই থাকে, তার স্বভাব-চরিত্রও সম্ভবতঃ বদ্‌লে যায় না। এটা বিভিন্ন রুচির কথা, আসলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মজ্জাগত এমন কিছু পার্থক্য নেই। মানুষের মনকে মুক্ত এবং স্বাধীন করা, ব্যবহারিক জগতে তাকে সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম ক'রে তোলা, এইটাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় যেমন সাধিত হয়, প্রাচ্য শিক্ষায়ও তাই হয় যদি শিক্ষাটা সুশিক্ষা হয়। তবে দেশের এবং দেশবাসীর সঙ্গে সম্পর্কটা যাতে না ঘুচে যায়, আমাদের দেখ্‌লে, আমাদের কথা শুন্‌লে, কোন্ দেশ কোন্ সমাজ থেকে আস্‌ছি, সেটা সম্বন্ধে মানুষ গবেষণা না করতে বসে তা হ'লেই হ'ল। বাংলাভাষায় যদি আমরা অর্দ্ধেকেরও বেশী ইংরেজী মিশিয়ে বলি, দেশী অতিসুন্দর কাপড়চোপড় ত্যাগ ক'রে মাকড়শার জালের মত বিদেশী কাপড়ে নিজেদের অর্দ্ধাবৃত ক'রে বেড়াই এবং গালে মুখে রং মেখে সং সেজে ব'সে থাকি, সেটা দেখতে খারাপ হয় এবং তাতে আমাদের ঐহিক-পারত্রিক কোনো উন্নতিই হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষার যেগুলি অত্যন্ত খেলো অবর্জ্জনা মাত্র, সেগুলি অনুকরণ করবার কি দরকার? যেগুলি সেদেশের মেয়েকেও মানায় না, যার বিরুদ্ধে তাদের দেশেও আন্দোলন হ'চ্ছে, সেগুলি আমরা মাথায় তুলে নিতে যাই কিসের জন্যে? নারী শুধু গৃহে নয়, সমাজে, সাহিত্যে এবং শিল্পে, যা সুন্দর, যা পবিত্র তাকেই

রক্ষা করবার এবং সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবেন, এইটাই ভারতবর্ষের মানুষ ভারতের নারীর কাছে প্রত্যাশা করে। পারিবারিক জীবনে যেমন তিনি পরিবারের কোনো মানুষের কদাচারের অপবিত্রতার প্রশ্রয় দেবেন না, বাইরের জগতেরও যে-কোনো কাজের সঙ্গে তিনি সংসৃষ্ট থাকবেন, তার ভিতরেরও শ্লীলতা, পবিত্রতাকে তিনি ক্ষুণ্ন হ'তে দেবেন না। এটা তাঁরা কি ক'রে করবেন, যদি নিজেদের জীবনে এই শোভন এবং সুন্দরের উপাসিকা তাঁরা না হন? নিজেদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা কেন তাঁরা বিসর্জ্জন দেবেন? পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণে সাজসজ্জা করার আগে তাঁকে ভেবে দেখ্‌তে হবে, তাতে সত্যই তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হ'চ্ছে কিনা। একদল কাণ্ডজ্ঞানহীন, ভুঁইফোঁড় সাহিত্যিক যদি বঙ্গভাষাকে পঙ্কিল এবং অপবিত্র ক'রে তোলেন কেবল মর্কটবৃত্তির পরিচয় দিয়ে, মেয়েরাও কেন মূর্খের মত তাঁদের নকল করতে যান? না হয় আধুনিক ব'লে খ্যাতি তাঁদের নাই হবে? আধুনিক হওয়াটার মধ্যেই এমন কিছু মহিমা নেই যে ওখান তার পিছনে ছুটতে হবে। জিনিষটা গ্রহণ করবার আগে দেখতে হবে সেটা আধুনিক এবং উপকারী কিনা। না হ'লে পশ্চিমের নানাপ্রকার মহামারী যেমনভাবে আমরা ঘরে ডেকে এনেছি, এবং ফলে মরণের দিকে বেশ দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছি, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমাদের সেই দশা হবে। দেশের মেয়েদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় কোনো ক্ষেত্রে না দেন। একদল গাইয়ে আছেন, গান শেখবার আগে তাঁরা ওস্তাদের মুখভঙ্গী শেখেন, আমাদের দশা যেন সেইরকম না হয়। ক্ষমতা লাভ ক'রে, তার যথাযোগ্য ব্যবহার যেন আমরা করতে শিখি। আমাদের সকল ক্ষেত্রে, সক্ষমভাবে কাজ করতে হ'লে যে পরিমাণ শিক্ষা দরকার তা হ'তে এখনও ঢের বাকি আছে। আমাদের দেহ-মনের শতাব্দী-সঞ্চিত জড়তা ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে, পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর থেকে নিজেকে অনেক পরিমাণে মুক্ত করতে হবে। এইসব কাজে মন দেওয়া আগে প্রয়োজন। যাঁর যেদিকে রুচি, যাঁর যেদিকে ক্ষমতা, সেই দিক দিয়ে তিনি দেশের উন্নতির চেষ্টা করবেন। উৎসাহ-উদ্যমকে বাজে কাজে অপব্যয় করবার দিন এখন আর নেই। মেয়েরা ভাল ক'রে চিনে নিন, তাঁদের আসল কাজ কোন্‌খানে, তারপর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কার্য্যে ব্রতী হোন, এই আমার তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ।

ইউরোপে একশো দিন

ডাঃ শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র *

(১)

২৫—৯—৩০

ওয়ার্সা (Warsaw—Poland) থেকে মস্কো;

পথে (U. S. S. R.) চল্‌তি ট্রেনে।

প্রিয় শ্রীশ,

১লা আগষ্ট বেরিয়েছি দেশ থেকে। রাস্তায় গেছে ২০ দিন এ পর্য্যন্ত Venice থেকে Munich, Salzburg, Budapest, Vienna, Prague Hamburg Dresden Berlin ও Warsaw ঘুরলাম। সর্ব্বত্রই ধুতি, শাল ও গান্ধী টুপি পরে' ভারতবর্ষকে যথাসাধ্য প্রচার করছি। খুব বড় লোক থেকে সাধারণ সকলে খুব পছন্দ করছে। কত ছবি তুলে নিচ্ছে। খদ্দরের গান্ধী-টুপির কত আদর। ভয়ানক পরিশ্রম যাচ্ছে। এই সব দেশে কত শিখলাম। এত জ্ঞান কাকে দিয়ে যে দেশের

---

* সম্প্রতি বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর (Bengal Social Service League) সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় একশো দিনে ইউরোপের ১৩টি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজসেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনই তাঁর এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ডাঃ মৈত্র একজন প্রবীণ সমাজসেবক। নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি তিনি তাঁর সহকারী-কর্মী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন; পত্রগুলি পাঠ করিলে যুদ্ধের পর ইউরোপের অবস্থা অনেকটা জানা যাইবে। —বঃ সঃ

ড্রেসডেনের রাজপথে ডাঃ মৈত্র ও একজন বন্ধু

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

আশীর্ব্বাদক
তোমাদেরই ছিলেন।

(২)

৩০—৯—৩০

স্নেহের শ্রীশ,

মস্কো থেকে লিখ্‌ছি। আজ ৩ দিন এখানে। এতদিন যেমন অভাবিত-পূর্ব্ব আদর-যত্ন সর্ব্বত্র পেয়ে এসেছি, আজ মস্কোতে তেমনি মাথা রাখবার স্থান নাই—খাবার নাই। তাঁর আশ্চর্য্য দয়ার লীলায় আছি এক ৮০০ কম্যুনিষ্টের আড্ডায় এবং একটি ঘরের আধখানায়।

কাল এখানকার সর্ব্বপ্রধান বিরাট Opera House এ Cultural Relation Societyর সাহায্য টিকিট পেয়ে গিয়েছিলাম। ৭ তলা থিয়েটারের বাড়ী। ৩০০০ লোকের মধ্যে একখানা শাল-গায় সাদা গান্ধী টুপী পরা আমি! সকলের চোখ আমার দিকে চেয়ে—দেখুক একজন হিন্দু এসেছে। বোধহয় কোন American এসে টুপী খুলতে বল্লে; আমি সগর্ব্বে বল্লাম—'না'। বাস্, আর কোন কথাই নাই।

কাজে লাগাব! এখান থেকে লোক নিয়ে যেতে হয়। কেউ কেউ প্রস্তুত হচ্ছে। এদের কি চরিত্র! সর্ব্বত্র কি যে আদর-যত্ন পাচ্ছি। Leagueএর আদর্শ সর্ব্বত্র প্রচার করছি; সকলেই এই আদর্শে জাতকে স্বাধীন হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেন।

আরো ঘুরে 'মস্কো' চলেছি। কিন্তু যে বাঁশীর ডাক শুনে কেবল Dresdenএর স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী দেখব ভেবে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম সে ডাক যে থামছে না। যাহোক যিনি বা'র করেছেন তিনিই দেখবেন। তাঁকে প্রণাম করি—

"কত অজনারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,

ড্রেসডেন, স্বাস্থ্য-মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্টের অফিসে ডাঃ মৈত্র

ড্রেসডেন, যুব-নিকেতনে (Jugendenheim) ডাঃ মৈত্র

জার্মানীতে ও রাশিয়াতে সর্ব্বত্রই দেখছি যে স্বাস্থ্যের ও জনশিক্ষার জন্য সকল সহরেই Museum ও Exhibition-এর অন্ত নাই। Dresden-এ আমি আমাদের Travelling Welfare Camp-এর ছবি Exhibition-এর Presidentকে দেখালেম, তিনি অবাক হ'য়ে বল্লেন "আপনারা দেখি আমাদের আগেই এইটি বের করেছেন।" মনে খুব আনন্দ হ'ল।

যা হ'ক, রাশিয়ার কথা লিখ্‌ছি।

একেবারে নূতন দেশ, নূতন মানুষ—একদিক থেকে দেখলে ভীষণ স্থান। এখন রাশিয়া আসা একটা adventure. মুরগী একটা ১০৲, ডিম ৸০ আনা। Guide ছাড়া চলা অসম্ভব—না বুঝি একটা কথা, না বোঝাতে পারি একটা কথা, না পড়তে পারি এক বর্ণ। এদের অক্ষর পর্য্যন্ত বিভিন্ন। প্রত্যেক ঘণ্টা গাইডকে ১॥০ দিচ্ছি এবং আমি তাকে রোজ ১২ ঘণ্টা ঘোরাচ্ছি ও ঘুরছি। তার উপর তার খাওয়া ও ট্রামভাড়া। Taxi প্রায় নাই, সবই State Car. নূতন সহর হ'চ্ছে। সমগ্র দেশ উঠে-পড়ে লেগেছে নূতন রাশিয়া গ'ড়ে তুলতে। রাশিয়া ঈশ্বরকে বিসর্জ্জন দিতে চাচ্ছে সত্য, কিন্তু তার জায়গায় মানুষকে বসিয়েছে।

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—"

চণ্ডীদাসের এই কথাটা যেন ওদেশে আজ সবাই বলছে এবং তার জন্য সকলেই স্বার্থত্যাগও করছে। নৈতিক পবিত্রতা খুব বেশী—Prostitutes প্রায় নেই বল্লেই হয়। Prison ত জেলখানা নয়—যেতে ইচ্ছা হয়। এখানেও ধুতি আর গান্ধী-টুপি পরছি। সকলেই Gandhi আর Tagore—মহাত্মা ও রবীন্দ্রনাথকে জানে। গান্ধীতে এরা খুব interested. Tagore—হৃদয় অধিকার করেছেন অনেকের। কি চমৎকার সমাজসেবার কাজ এঁরা করেছেন নানা দিক থেকে।

ভ্রমণে বড় শিক্ষা হয়। দলে দলে ভারতীয় যুবা ও প্রৌঢ় এই ভ্রমণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হোক ও ইউরোপের বাছা বাছা লোক দেশে নিয়ে যাক। নূতন ভারত গড়তে হ'লে এদের সংস্পর্শে মন গড়তে হবে।

বড় পরিশ্রম হ'চ্ছে। অসুখ না হ'লে বাঁচি। পরে Leningrad যাচ্ছি। তার পর ফিন্‌ল্যাণ্ড এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া।

আছি ভালই।

তোমাদের বিজেন।

(৩)

প্রিয় ভাইয়েরা,

এই প্যাকেট যখন পৌছবে তখন বাড়ীর দিকে রওনা হ'চ্ছি। ৯ই নবেম্বর রওনা হবো। ২১ শে বোম্বে পৌছব।

রাশিয়ার পর সুইডেনের Stockholm ও নরওয়ের Oslo হ'য়ে আজ ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ যাচ্ছি। তারপর জার্ম্মানী হ'য়ে—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড হ'য়ে ভিনিস্‌-এ জাহাজ ধরব।

রাশিয়ার পর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে

বেঁচেছি। সকল দিক দিয়ে এই দেশ রাশিয়া থেকে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন। যুদ্ধের আবর্ত্তে এরা পড়েনি। আর্থিক স্বচ্ছলতার ভিতর দিয়ে এরা বেশ যাচ্ছে। ধর্ম্মপ্রবণ জাতি। নৈতিক আবহাওয়া পরিষ্কার। জ্ঞান-অর্জ্জনে এরা অগ্রবর্ত্তী। এই নরওয়েই ইবসেন (Ibsen), হামসুন প্রভৃতি জগ বিখ্যাত লেখকদের জায়গা। এখানে বিখ্যাত পণ্ডিত Prof. Sten Konow-র সঙ্গে খুব আলাপ হ'ল। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন—এত ভাল সংস্কৃত জানেন। প্রাগে পণ্ডিত Prof. Lesung এর সঙ্গে বড় আমোদে সময় কেটেছে। সহরের প্রাসাদ, Museum এর চেয়ে সত্যকার মানুষের স্পর্শ পাওয়া ঢের বেশী মূল্যবান।

১৮ বৎসর পূর্ব্বে একবার ইউরোপ এসেছিলাম এবং সেই হিসাবে টাকা-কড়ি এনেছিলাম। এখন খরচ তার ডবল। যতদূর পারি হেঁটে, ট্রামে ও third class এ travel করছি।

তোমাদের কথা সর্ব্বদা ভাবি। এখানে এখন বরফ পড়ছে। এইবার গৃহাভিমুখে যাত্রা—তার পর সাক্ষাতে সব কথা হবে। ইতি

তোমাদের

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

বিজয়িনী

শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি-এ

দূরাগত বাঁশীর আওয়াজের মত তখনও সুরের রেশ কানে বাজিতেছিল। নিঝুম রাত্রি, চলন্ত বাষ্পীয় শকট, নারীর কোমল কণ্ঠ—অস্পষ্ট সঙ্গীত রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে "বন্দেমাতরম্" কথাটি মূর্ত্ত হইয়া আমার সদ্য তন্দ্রালসোত্থিত নয়নপ্রান্তে দেখা দিতেছিল। কি মধুর! কি সুন্দর!

বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ মৃদুকরস্পর্শে আমাকে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "ঘাট ষ্টেশন এলো বুঝি, উঠে পড়ুন সিদ্ধেশ্বর বাবু।"

আমি বেঞ্চে বসিয়া একবার বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, নিশার শিশির তখনও গাছের পাতায় মুক্তার মত ঝলমল করিতেছিল, দূরে চক্রবালে আকাশপ্রান্ত সবেমাত্র সিন্দুরলিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আমি আলস্য ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "কি চমৎকার প্রাণ-মাতানো গান, তার উপর মধুর নারীকণ্ঠ—"

বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিলেন, "হাঁ, এই ঢঙই হয়েছে বাট! ঘরের মেয়েছেলেরা এখন আর আবরু মানতে চায় না, খিড়কী লাফ পেড়ে একবারে সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। ভ্যালা এক গান্ধী দেখা দিয়েছে দেশে!"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "চুপ চুপ, বলেন কি আপনি? কেউ শুনতে পেলে রক্ষে থাকবে না। দেশশুদ্ধ লোক মেতে উঠেছে; আপনি সে স্রোতে বাধা দিতে চান না কি?"

কথাবার্ত্তা হিন্দীতেই হইতেছিল। বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ বাঙ্গালাও যে জানেন না তাহা নহে। তবে কথা কহিতেন তাঁহার মাতৃভাষায়। আমরা উভয়েই বেগুসরাই এর স্কুলমাষ্টার, বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ হেড্ মাষ্টার, আমি সেকেণ্ড। আমি বাঙ্গালী, তিনি বিহারী। কিন্তু বিহারী হইলেও তিনি কলিকাতার মেট্রোপলিটানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গ্রাজুয়েট হইয়াছেন; তাঁহার পিতা বাঙ্গালার লাট দপ্তরে মোটা মাহিনার চাকুরী করিতেন। একটা ছুটির পর আমরা কলিকাতা হইতে কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "রেখে দিন আপনার দেশশুদ্ধ লোক! ভেড়ার পাল দিন-কতক

চেঁচাবে, তার পর সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে—এর নাম বৃটিশ রাজত্ব!"

মুঙ্গের ঘাট ষ্টেশন। শীতের শেষ, ভোরের কুহেলিকা তখনও দূরবিসারী গঙ্গাস্রোতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, মনে হইল যেন জাহ্নবী শ্বেতাম্বরণে দেহ আবৃত করিয়া দুরন্ত শীতের শিহরণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। নাতিদূরে জেটির পার্শ্বে পারের ষ্টীমারের সঙ্গে তখনও বৈদ্যুতিক আলোকমালা তারাদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। আমি সেই দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া জেটির সোপানে অবতরণ করিতেছিলাম।

অকস্মাৎ পশ্চাতে একসঙ্গে অনেক যাত্রীর পাদুকাধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। সে দৃশ্য ত জীবনে ভুলিবার নহে! একে একে গণনা করিয়া দেখিলাম, পর-পর তিন-চারি শ্রেণী দেশসেবিকা মৃদুগুঞ্জনে "দেশ হামারা" সঙ্গীতের সুর আবৃত্তি করিতে করিতে ষ্টীমারের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—তাঁহাদের বিদ্যুদ্দামদীপ্ত নয়নে উৎসাহ-উদ্দীপনার অফুরন্ত হাসি স্থানটিকে যেন প্রাণময় করিয়া তুলিতেছিল। বিশুদ্ধ শুদ্ধান্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা নারী আজ কিসের প্রেরণায় বহির্জ্জগতের ধূলিমলিন রাজপথে বহির্গত হইয়াছেন!

বাষ্পীয় জলযানের মধ্যম-শ্রেণীতে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবার পর বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এ রাই বুঝি তখন গাড়ীতে গানের বাহার দিচ্ছিলেন? কাল বোধ হয় মুঙ্গের জামালপুর কত্তে ক'রে ফিরে আসছেন! কাগজে পড়েছিলুম বটে সেখানে মেয়েরা জোর পিকেটিং চালাবে।"

আমি প্রমাদ গণিলাম। যাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কথাগুলি বলা হইতেছিল, তাঁহারা আমাদের নিকটেই স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিহারীগুলা কি অসভ্য! শিক্ষিত হইয়াও নারীর সম্মান রাখিতে শিখে না। ছিঃ ছিঃ!

মনে মনে এই কথা তোলাপাড়া করিতেছি এমন সময়ে উচ্চ কর্কশ স্বরে ষ্টীমারের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। চমকিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলাম, টিকিট-বাবু একটি কেবিনের দ্বারের দিকে একবার অগ্রসর হইতেছেন, আ বার ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া আসিতেছেন। বাবুটি বিহারী, দুই-তিন বার চেষ্টার পর সাহসে ভর করিয়া দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই এক বিরাট গর্জ্জন যেন ষ্টীমারখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল, বাবুটিও অমনই শশব্যস্তে কেবিন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই সময়েই একখানা রাঙ্গামুখ মুহূর্ত্তের জন্য কক্ষদ্বারে দর্শন দিয়া কেবিনের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইল—সে মুখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল!

বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ উদ্গ্রীব হইয়া টিকিট-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, ব্যাপারখানা কি?"

উত্তরে টিকিট-বাবু যাহা বলিল তাহাতে বুঝিলাম, কেবিনের যাত্রী গৌরাঙ্গ, টিকিট দেখিতে চাহিলে সে মারিতে আসিয়াছিল।

কমলেশ্বরী বাবুর সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, সিদ্ধেশ্বর বাবু, দেখুন! আপনি না এইমাত্র বল্‌ছিলেন, দেশে যুগান্তর এসেছে? এই আপনাদের যুগান্তর? যুগান্তর না মাথান্তর! এই সমস্ত কাওয়ার্ড নিয়ে আপনারা দেশোদ্ধার করতে চান?"

দেশসেবিকারা নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, কেন মশাই, এর সঙ্গে দেশোদ্ধারের সম্পর্ক কি? আপনারা এই চাকুরে টিকিট-কালেক্টারের কাছে কি আশা করেন?"

তরুণীর নিকট আমি পরিচিত না হইলেও আমি তাঁহার পরিচয় জানিতাম। তিনি বেগুসরাইয়ের উকীল বাবু বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণকুমারী। শুনিয়াছিলাম, তিনি শিক্ষিতা, মিসনারী স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বোধ হইল, তিনি এই দেশসেবিকা-সঙ্ঘের নেত্রীত্ব করিয়া তাঁহাদিগকে বাঁকীপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার পর জামালপুর মুঙ্গেরে তাঁহাদের কর্ম্মসূচী সাঙ্গ করিয়া ভোরের ট্রেনে ঘাট ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

আমি মনে প্রমাদ গণিলাম। যোগ্যপাত্রের সহিত আলোচনা শোভনই হইয়া থাকে। কিন্তু কমলেশ্বরীপ্রসাদ? না-জানি এই শিক্ষিতা তরুণীগণের প্রতি তিনি কি রূঢ় ভাষাই

প্রয়োগ করেন! অপেক্ষা করিতে হইল না, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। কমলেশ্বরীপ্রসাদ রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কি আশা করি না করি, সে-বিষয়ে তোমাদের কাছে পরামর্শ চাইছি না ত? তোমার মত অমন ঢের মেয়েকে আমি বেত দিয়ে শায়েস্তা করেছি—"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ওঃ আপনি বুঝি সরযূনাথ হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার? হাঁ, আপনার সে গুণ আছে বটে। আপনিই না স্কুলে ছেলেরা মহাত্মার জন্মতিথিতে জাতীয় পতাকা তুলেছিল ব'লে স্কুল বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন?"

কমলেশ্বরীপ্রসাদ আগুন হইয়া বলিলেন, "বেশ করেছি, ফাইন করেছি, রাষ্টিকেট ক'রে দিয়েছি। তুমি যে ভারী ফাজিল মেয়ে দেখছি! খদ্দর প'রে হো হো ক'রে বেড়ালেই বুঝি মস্ত পেটরিয়ট সাজা যায়? দেশোদ্ধার করছেন! তোমাদের ঐ গান্ধীই দেশটার মাথা খেলে দেখছি।"

তরুণীদের মধ্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। পূর্ব্বোক্ত তরুণীটির মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মুখখানি হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনি প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মশাই, মহাত্মা কি অপরাধ করলেন?"

কমলেশ্বরীপ্রসাদ বিষম উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "অপরাধ? কি না করেছেন তিনি? দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলেন—"

মেয়েটি বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি কি তা হ'লে বলতে চান, বেশ খেয়ে-দেয়ে নিদ্রা দিয়ে বাবুয়ানা ক'রে ঘুম ভেঙ্গে দেখবেন স্বরাজ হয়েছে?"

কমলেশ্বরীপ্রসাদ ক্রোধে প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে বাজে বকতে চাই নি। উচ্ছন্ন দিলে, উচ্ছন্ন দিলে—ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খেলে—"

কৃষ্ণকুমারী ধীর শান্তভাবে বলিলেন, "দেখুন, গাল দিয়ে কেউ কখনও কাউকে খাটো করতে পারেনি। আপনি শিক্ষিত হ'য়ে ইতিহাস প'ড়ে অবশ্যই তা জানেন।"

এবার কমলেশ্বরী বাবুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ক্ষতসেতুবন্ধন জলস্রোতের মত তাঁহার রুদ্ধ ক্রোধের স্রোত অসম্বদ্ধ বাক্যের আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। উদ্যত মুষ্টি আস্ফালন করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কে গা নবাব সেরাজুদ্দৌলার বেগম যে, তোমার কাছে কথার কৈফিয়ৎ দিতে হবে? তোমাদের লজ্জা করে না, এইরকম ক'রে টহল দিয়ে বেড়াতে? আগাপাস্তলা চাবুক হয়—"

আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে টানিয়া লইয়া নিম্নতলের সোপানের দিকে অগ্রসর হইলাম, ঠিক সেই সময়ে বংশীধ্বনি করিয়া বাষ্পীয় জলযান অপর পারের ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। খালাসীদের হুড়াহুড়ি ও যাত্রীদের ব্যস্ততার মাঝে আমাদের এই ঘটনার গুরুত্ব ডুবিয়া গেল। দ্বারপথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে পশ্চাতে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিলাম. দেশসেবিকা তরুণীরা আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে। মনে হইল, তদ্দণ্ডে বসুন্ধরা দ্বিধা-ভিন্ন হইয়া আমায় গ্রাস করিলেই ভাল হইত!

(২)

ওপারের ঘাট ষ্টেশনের চড়াই উঠিবার সময় হাতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কমলেশ্বরীপ্রসাদ বলিলেন, "এই-সব চেলা নিয়ে দেশোদ্ধার হবে? স্বরাজ হবে? ঝেঁটা মার!"

আমি বলিলাম, "কেন, মেয়েটি ত এমন কিছু বলে নি, বরং বরাবরই বিনীতস্বরে কথা কইছিলো।"

কমলেশ্বরীবাবু বলিলেন, "বলে নি? ইম্‌পার্টিনেণ্ট! বাপের বয়সী আমি—চুল পাকালুম ছেলেমেয়ে পড়িয়ে—আমার কাছে চাইছে কৈফিয়ৎ! বলেন কি সিদ্ধেশ্বর বাবু, এসব এদেশে কোনকালে ছিল কি? বিশেষ, আমাদের মেয়েরা—এদের এ-রকম তেরিয়া মেজাজ কবে কোন্ কালে ছিল?"

আমি আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না, কি জানি কোথায় গিয়া জল দাঁড়াইবে! কমলেশ্বরী বাবুর কিন্তু তখনও কথার কামাই নাই, তিনি ষ্টেশন-প্লাটফরমে উঠিয়া পাদচরণা করিয়া বেড়াইবার সময়ও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "পেট্-রিয়ট! এরা আবার পেট্রিয়ট! আমাদের সময়ে আমরা কি এজিটেশানটাই না করেছি! মনে পড়ে কি, সেবার দাদাভাই নৌরজীর গাড়ী টানা? তখন এসব বাঁদরামি ছিল না, খদ্দরের হুজুগও ছিল না। কিন্তু আমাদের মধ্যে বাহুবলের চর্চ্চা তখন খুবই ছিল। তখন পাড়ায় পাড়ায় কুস্তী জিমনাষ্টিক। এই বুড়ো বয়েস—চুল পেকে এসেছে

—তবুও দেখছেন হাতের কব্জীখানা? ক্রিকেট-ম্যাচ খেলতে গিয়ে গড়ের মাঠে ফিরিঙ্গীদের কি ঠেঙ্গানটাই ঠেঙ্গিয়েছিলুম সেবার! জানেন সিদ্ধেশ্বর বাবু—”

হঠাৎ প্রথম শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষের মধ্য হইতে একটা গুরুগম্ভীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা বিস্ময়ে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যে গৌরাঙ্গমূর্ত্তিটি বাষ্পীয় শকটের কেবিনের দ্বারে চকিতে চপলা-চমকের মত একবার মুহূর্ত্ত মাত্র দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিল, দেখিলাম সেই মূর্ত্তিই বিশ্রাম কক্ষের দ্বারে ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ভীত সন্ত্রস্ত একান্ত-কাতর ষ্টেশনের নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী—যেন বধার্থ-নীত যজ্ঞীয় অজবিশেষেরই মত থর থর কম্পিত হইতেছে। সে চিত্র সুনিপুণ শিল্পীর তুলিকায় অঙ্কিত হইবার যোগ্য।

উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম সেই গৌরাঙ্গ-প্রভু প্লাটফর্ম্মের দিকে পক্ককদলীসদৃশ স্থূল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে, “উঠাও, আবি থুক উঠাও।” বেচারী রেলকর্ম্মচারীর মুখ-চক্ষুর ভাব তখন যে-আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা হর-কোপানলে ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বে পুষ্পধন্বারও হইয়াছিল কি না সন্দেহ! সে কেবল ভয়কম্পিত স্বরে কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিতেছিল, “আর করবো না হুজুর! গরীব-পরোয়ার মেহেরবান!”

সাহেব সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, “থুক উঠাও, আবি উঠাও। কাহে থুক ফেকা হিঁয়া?”

ঘটনাটি বুঝিয়া লইতে বাকী থাকিল না। গোলযোগে আরও কয়জন যাত্রী ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ও নিকট শুনিলাম, সাহেব ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত কথা কহিয়া আসিয়া সবেমাত্র বিশ্রাম-কক্ষে পদার্পণ করিয়াছে, এমন সময়ে উক্ত রেল-কর্ম্মচারী কক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় অভ্যাসবশতঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছিল। অমনই সাহেবের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে। এ মেজাজ বিগড়াইবার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়া-ছিলাম। উৎসুক হইয়া ব্যাপারের যবনিকাপাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সাহেব তখন কর্ম্মচারীর ঘাড় ধরিয়া মুখ নামাইয়া দিয়া বলিতেছে, “উঠাও, মুখমে উঠাও।” কি বীভৎস ব্যাপার!

বহু কাকুতি-মিনতির পর সাহেবের দয়া হইল, তিনি তাহাকে হস্তদ্বারা নিষ্ঠীবন মুছাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি শিষ দিতে দিতে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ এতক্ষণ আমারই মত নীরবে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। এইবার বলিলেন, “বোধ হয় এ লোকটা মুখ্‌খু চাষা, এদেশে এসে নবাব ব'নে গেছে। কিন্তু তাও বলি, ও লোকটাই বা এত জায়গা থাকতে সাহেবের সামনে এসে থুথু ফেললে কেন? ভারী নোংরা স্বভাব এদেশের লোকের!”

আমি বলিলাম, “তা এ যে বড় অন্যায়—ও-ত ঘরে ফেলে নি, বাইরে থুথু ফেলেছে, তাতে কি দোষ হয়েছে?”

কমলেশ্বরী বাবু এই সময়ে সম্মুখে ষ্টেশন-মাষ্টারকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “গাড়ী এত লেট কেন? হ'ল কি?”

মাষ্টার মশাই বলিলেন, “লেট কি, হয় ত আজ গাড়ী না আসতেও পারে। মাঝে মানসী জংসনে একটা মালগাড়ী ডিরেল্‌ড্‌ হয়েছে। সেটা সরাতে না পারলে ত গাড়ী আসবে না।”

কমলেশ্বরীপ্রসাদ বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, “এঁ্যা, বলেন কি? তবেই ত! আজ যে স্কুল খুলবে।”

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, “এ ত কারও হাত-ধরা নয়, একসিডেন্ট!” কথাটা বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

আমিও হাসিয়া বলিলাম, “বলেইছি ত আপনাদের বি, এল, ডবলিউ রেলটা ব্যাড অ্যাণ্ড ওয়ার্ষ্ট রেল!”

এই সময়ে আমরা তার-বাবুর কক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলাম। সেখানে প্লাটফর্ম্মের উপর একখানা বেঞ্চ ছিল। আমরা তাহার উপর বসিয়া পড়িলাম। ক্ষণপরেই দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি প্যাণ্টালুনের দুই পকেটে হাত রাখিয়া শিষ দিতে দিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কি জানি কেন, আমার মনে ভবিষ্যৎ একটা

অমঙ্গলের ছায়াপাত হইল। কমলেশ্বরী বাবু বলিলেন, "দুই-একজন ওদের মধ্যে এমন আছে বটে, কিন্তু ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে খুবই ভদ্রতা করে।"

আমি নীরব রহিলাম।

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের কথা হইতেছিল, তিনি তখন মাল ওজন করা যন্ত্রের কলগুলা নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ কমলেশ্বরীপ্রসাদ বাবু সেই দিকে অগ্রসর হইয়া সাহেবকে যন্ত্রের উপর দাঁড়াইতে বলিয়া ওজন ঠিক করিতে লাগিলেন। ওজন দেখা শেষ হইলে পর সাহেব তাঁহাকে মৃদু হাসিয়া ধন্যবাদ দিয়া ওজন লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কমলেশ্বরীপ্রসাদ বাবু ওজন-যন্ত্রের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি যন্ত্রের উপর রক্ষিত ছিল। সাহেব ইসারা করিয়া তাঁহাকে হাতখানি সরাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন, এইরূপই বুঝিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে তিনি কি বলিলেন, আমরা কিছু দূরে অবস্থান করিতেছিলাম বলিয়া শুনিতে পাইলাম না। দেখিলাম, কমলেশ্বরীপ্রসাদ বাবু হস্তটি অপসারিত করিলেন বটে, কিন্তু একপদও নড়িলেন না।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যে মুহূর্ত্তে সাহেবের মুখে আমরা ভাবান্তরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকটিত হইতে দেখিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে ভীষণ গর্জ্জন নির্গত হইল,—'keep off, হঠ যাও।'

কমলেশ্বরীপ্রসাদ বাবুর গৌরবর্ণ মুখখানা আরও গৌর হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও তাঁহাকে একপদ নড়িতে দেখিলাম না, তিনি নিম্নস্বরে সাহেবকে কি কথা বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। তখনই শুনিলাম ভীষণ চীৎকার করিয়া সাহেব বলিতেছে, "হঠ যাও, ইউ ড্যাম নিগার!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ সজোরে বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদের কপোলের উপর নিপতিত হইল। আমি মস্তক অবনত করিয়া মুখ লুকাইয়া ফেলিলাম, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত কোথা হইতে নিমেষে কি হইয়া গেল তাহা কেহ বুঝিতে পারিলাম না!

(৩)

যখন মুখোত্তোলন করিলাম, তখন দেখিলাম, বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ ঠিক তেমনই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু সাহেব সেখানে নাই। পার্শ্বে তার-বাবুর কামরার দ্বারে দাঁড়াইয়া তিন-চারিটি তরুণী দেশসেবিকা ব্যথাভরা নয়নের দৃষ্টি কমলেশ্বরী বাবুর অবনত আননের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছে! তাঁহারা কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইলেন না, সম্ভবতঃ ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদকে আমার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমি সাহস করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলাম না। ছিঃ ছিঃ চাহিব কি করিয়া! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কমলেশ্বরীপ্রসাদের মুখ-চক্ষুতে তখন কোন লজ্জা কোন ঘৃণার লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিতেছে না। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কোন কিছু অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হয় নাই—যেন যেমন গঙ্গার স্রোত বহিতেছিল তেমনই বহিতেছে,—এমনই ভাবে তিনি রুষ্টস্বরে বলিলেন, "ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত এখনও দেখেন নি! এ আর কুলীমজুর না, সমস্ত ভারতবর্ষে এই নিয়ে তুমুল এজিটেশান তুলবো। পত্রিকা, লিবার্টি, এডভান্স, বসুমতী,—হয়েছে কি এখন? বেটা জানোয়ার—ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না—"

আমার পার্শ্বস্থ বিহারী ভদ্রলোকটি বলিলেন, "থামুন না মশাই—ওসব বড়াই ভাল শোনাত যদি ঐ জানোয়ারের সামনা-সামনি হত—"

কমলেশ্বরী বাবু আরক্ত-মুখে বলিলেন,—'জানোয়ার না ত কি? পেটে ক-অক্ষর নিষিদ্ধ মাংস, নইলে কি ছেড়ে কথা কইতুম? ওসব ফিরিঙ্গী আমার ঢের দেখা আছে।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা মালুম পাওয়া গিয়েছে এই কতক্ষণ!"

চাপা হাসির একটা টিটকারী সুর বাতাসে ভাসিয়া গেল। কমলেশ্বরী বাবু উহা অনুভব করিলেন বলিয়া মনে হইল না। তবে তিনি যে বিহারী ভদ্রলোকটির কথায় বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাক্‌রোধেই বুঝিতে

পারিলাম। আমি কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "তাইত, ভারী লেট হ'ল, সব কাজ যে পণ্ড হ'য়ে গেল।"

ঠিক সেই সময়ে ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে আমরা সকলে চাপিয়া ধরিতে তিনি বলিলেন, "মুস্কিল হয়েছে, গাড়ী আরও দু'ঘণ্টা লেট হবে ব'লে নে হ'চ্ছে। এদিকে সাহেব বড় তাড়া দিচ্ছে। ওর মেম খুব অসুখে পড়েছে। ও প্ল্যান্টার, কলকাতায় গিয়েছিল কাজে, সেখানে তার পেয়ে ছুটে আসছে, বলছে, একখানা ট্রলি যোগাড় ক'রে দিতে। তাই কুলীর সন্ধানে যাচ্ছি।"

দেশসেবিকারা এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নেত্রী কৃষ্ণকুমারী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আর আমরা? আমাদের কি ব্যবস্থা করেছেন?"

মাষ্টার মহাশয় বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তাইত মা, আপনাদের জন্যে যে কি ব্যবস্থা করি—"

কথাটা বলিয়া তিনি মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না সেজন্যে। আমরা আজ আপনার বাসাতেই অতিথি হব। কি বলেন?"

মাষ্টার মহাশয় একগাল হাসিয়া বলিলেন, "সে সৌভাগ্য কি হবে মা, আমাদের? চলুন, আপনাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

কৃষ্ণকুমারী বলিলেন, "তার অপেক্ষা রেখেছি কি না আমরা—আমরা গিয়ে মার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে এসেছি, তিনি এতক্ষণ আমাদের রান্নাবান্না চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা একটা তার করতে এইছিলুম। আর না ভাই পার্ব্বতী, চট্ ক'রে তারটা করি গিয়ে।"

দেশসেবিকারা চলিয়া গেলেন। ষ্টা-টার আলো যেন নিভিয়া গেল।

মাষ্টার মহাশয় আনন্দ-গদ্গদ্‌স্বরে বলিলেন, "মালক্ষ্মীরা দেশটায় যেন নতুন আলো এনেছেন। জানেন মশাই, এঁদের মধ্যে দু'চার জন কত বড়লোকের মেয়ে? এঁর বাবাকে বেহারে চেনে না কে? মাসে দশ-বারো হাজার টাকা রোজগার করেন। কিন্তু থাকেন কি সাদাসিধে চালে! মালক্ষ্মীও তেমনই—ঐ যে দেখছেন খদ্দরের সাড়ী আর গাছকতক চুড়ী—বাস ঐ পর্য্যন্ত।"

পূর্ব্বোক্ত বিহারী ভদ্রলোকটি বলিলেন, মশাই, আমি ওসব খুব জানি। দেশে এমন মালক্ষ্মী কত দেখতে পাবেন। ওঃ কি অদ্ভুত কাণ্ড! কোটিপতির মেয়েরা হাসপাতালে রোগীর সেবা করছেন, গরীবের পাঠশালে পড়াচ্ছেন! সার্থক মহাত্মার শিক্ষা!"

আর একটি বিহারী যাত্রী বলিলেন, "শুধু কি খদ্দর পরছেন আর শোভাযাত্রা ক'রে বেড়াচ্ছেন তা নয়, ওঁরা চরকা কাটছেন, সুতো দিচ্ছেন, কত শিল্পকার্য্য করছেন, একদণ্ড ব'সে নেই মালক্ষ্মীরা।"

মাষ্টার মশাই বলিলেন, "আহা মালক্ষ্মীরা বেঁচে থাকুন, এই ত্যাগের পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবেন।" তিনি আর দাঁড়াইলেন না, দ্রুতপদে ট্রলির কুলী যোগাড় করিতে চলিয়া গেলেন।

কমলেশ্বরীপ্রসাদের মুখখানার তখন যদি অনেক চিত্র গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ছায়াচিত্রের মালিক যে বহু অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই! পাছে মুখ হইতে কোন অশোভন কথা অতর্কিতভাবে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি প্লাটফরমের প্রান্তদেশের দিকে চলিয়া গেলেন। আমাদের মধ্যে তখন অবাধে এই সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। আমি বলিলাম, "হাঁ কথাটা আপনারা ঠিক বলেছেন বটে। যদিও আমি এসব পিকেটিং ফিকেটিং-এর পক্ষে নেই—আর সবাই বলবে যে আইন না মানলে সমাজের শৃঙ্খলা ক্রমশঃই ভেঙ্গে যাবে—তবুও এর মধ্যে দেশে যে ত্যাগের হাওয়া এসেছে বা মেয়েদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, এর জন্যে মনে আনন্দ না এসে পারে না। মহাত্মা গান্ধী এ হিসাবে মস্ত লোক।"

বিহারী ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মস্ত লোক? বাঃ! যুগ-পুরুষ! হাতিয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু প্রেমের দ্বারা শত্রুর মনকে জয় করা যায়, এ শিক্ষা ক'জন দিয়েছেন?"

আমি বলিলাম, "কেন, শ্রীচৈতন্য?"

মাষ্টার মহাশয় ও প্ল্যান্টার সাহেবকে কথা কহিতে

কহিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমাদের আলোচনা থামিয়া গেল। সাহেব অর্দ্ধপথেই বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিল, আমরা মাষ্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি, ব্যাপার কি? কুলী পাওয়া গেল?" "না ঐ ত মুস্কিল বেধেছে। কুলী বেটারা বেঁকে বসেছে। শুনলুম, কুলীর কণ্ট্রাক্টারকে সাহেব থুথু চাটিয়েছে না কি করেছে ব'লে, কোন কুলী ট্রেণ ঠেলতে রাজী হ'চ্ছে না। এদিকে সাহেব বলছে, পঞ্চাশ টাকা দেবে, ওকে নিয়ে গেলে। যাই, কুলীর সর্দ্দার বেটাকে ধরি গিয়ে। জ্বালা আপদ!"

বৃদ্ধ মাষ্টার মহাশয় একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই একটা কুলীরই মত লোক সম্মুখে উপস্থিত। মাষ্টার মহাশয় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল, যাবে এরা?" সর্দ্দার সেলাম করিয়া বিষণ্ণমুখে বলিল, "নেহি হুজুর! কই নেহি যায়েগা।"

মাষ্টার মহাশয় পক্ক কেশে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "কি মুস্কিল! তাই ত, করা যায় কি?"

পশ্চাৎ হইতে ভারী গলায় উচ্চারিত হইল, "Make it hundred." সাহেবকে দেখিয়া আমরা চমকিত হইলাম। কখন অজ্ঞাতসারে সেখানে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

মাষ্টার মহাশয় সর্দ্দারকে একশত টাকার কথা বলিলে সে বলিল,—লক্ষ টাকা দিলেও তাহারা যাইবে না, সেখানেই তাহারা আসিতে চাহিতেছে না।

সাহেব বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যাইবে না? পুলিস দিয়া লইয়া যাইব। ড্যাম সোয়াইন!"

কিন্তু ভয়প্রদর্শনেও ফলোদয় হইল না, কুলীর সর্দ্দার আদেশপালন করা দূরে থাকুক, সেই যে গালি শুনিয়া সরিয়া পড়িল, আর তাহারও পাত্তা পাওয়া গেল না। সাহেব অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ষ্টেশন-মাষ্টার বেচারীকেই যেন সমস্ত অপরাধের মূল বলিয়া চীৎকার করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

অবস্থা যখন এমনই সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইল, তখন মাষ্টার মহাশয় সাহেবকে বলিলেন, "তা হ'লে আমি গোরখপুরে তার ক'রে দিই গিয়ে—সেখান থেকে না হয় একটা ব্যবস্থা করুক, আমার দ্বারা এর বেশী কিছু হবে না স্যার!"

সাহেব প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার মুখ হইতে অসম্বদ্ধ বাক্য বাহির হইতে লাগিল। তিনি মাষ্টার মহাশয়ের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া উদ্যতমুষ্টি হইয়া পরুষকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কোথা যাও তুমি? আমার পত্নী মৃত্যুশয্যায়, তুমি আমার সেখানে যাবার ব্যবস্থা না ক'রে পালাচ্ছ কোথায়? ইডিয়ট!" সাহেবের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও দয়া হইল। কিন্তু কমলেশ্বরীপ্রসাদ যে এই দৃশ্য বিশেষ আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার মুখচক্ষুই বলিয়া দিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমার ক্ষমতায় কুলালে আমার বলতে হোতো না স্যার। কিন্তু কি করবো স্যার, কুলীরা ত আমার হাতধরা নয়! দেখলেন ত, সর্দ্দারের কথাও গ্রাহ্য করলে না।"

সাহেব ক্রোধভরে প্লাটফর্ম্মের অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, "কোনরকমে কুলীদের রাজী করাতে পারেন না, মাষ্টার মশাই? আহা, ওর স্ত্রীর মরণাপন্ন ব্যারাম—"

"থাম হে সিদ্ধেশ্বর বাবু! অত দয়া দেখিয়ে আর কাজ নেই। বেটা চাষা, মাষ্টার মশাইকেও এইমাত্র ইডিয়ট ব'লে গাল দিলে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে। ওর মনের অবস্থা কি রকম এখন ভাবুন দেখি। এই যে মা-লক্ষ্মীরা! পায়ের ধূলো দিয়ে এলেন গরীবের আস্তানায়? গাড়ীর কোন পাত্তাই নেই। কি করবো—" দেশসেবিকাদিগকে তিনি আরও কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে প্ল্যাণ্টার সাহেব প্রায় উন্মত্তের মত তথায় উপস্থিত হইয়া মাষ্টার মহাশয়ের দুইটি হস্ত ধরিয়া ব্যগ্র মিনতির সুরে বলিলেন, "চলুন, ষ্টেশন-মাষ্টার, কুলীলাইনে—আমি সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে এসেছি—কি করলে তারা রাজী হবে?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আপনি বল্‌লেও তারা রাজী হ'ল না?"

সাহেব বলিলেন, "না—রাজী হ'ল না—যত টাকা চায় দিবো বল্‌লুম—ভয় দেখালুম—কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'ল না। চলুন, আপনি আমার অবস্থা বুঝিয়ে বলবেন চলুন—বোধ হয় আমার পত্নীর অন্তিমকালের কথা বল্‌লে তাদের দয়া হ'তে পারে।"

এই সময়ে দেশসেবিকাদের নেত্রী কৃষ্ণকুমারী পরিষ্কার ইংরাজীতে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পত্নী কি রোগশয্যায়? কোথায় আছেন তিনি? আপনি কি তাঁর কাছে যাবেন?"

সাহেব সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিনি মজিদপুরের নীলকুঠিতে। আপনি কে?"

কৃষ্ণকুমারী বলিলেন, "আমি দেশসেবিকা -দেশ-মায়ের কন্যা। আপনার ত এখনই সেখানে যাওয়া দরকার। চলুন, আমরা একবার কুলীদের বুঝিয়ে দেখি গে'।"

সাহেবের মুখে তখন যে ভাবের অভিব্যক্তি হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি প্রায় নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, "আমায় আপনি রক্ষা করুন—কুলীরা যা চায় তাই দোবো—আপনি দয়া ক'রে তাদের বোঝাবেন চলুন, আমি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবো।"

যখন আমরা সকলে কুলীগাইনে উপস্থিত হইলাম এবং মাষ্টার মহাশয়ের ডাকে কুলীরা বাহির হইয়া আসিল, তখন অকস্মাৎ তাহাদের শত কণ্ঠ হইতে বজ্রনাদে ধ্বনিত হইল, "মহাত্মা গান্ধীজীকা জয়! জয় মায়ীজীলোককো জয়!"

কুমারী কৃষ্ণকুমারী স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "বাপলোকসব, এই সাহেবের জরু-র কঠিন ব্যায়রাম, এঁকে তোমরা মানসী অংসন ছাড়িয়ে দিয়ে এস। আমরা আগে ত একথা শুনিনি—যাও, বাপেরা সব।"

আমার নয়নে দরদর ধারা বহিল—কাহারও নয়ন সে-সময় অনার্দ্র দেখিলাম না—আর বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়—দেখিলাম, সেই তেজোগর্ব্বে দৃপ্ত বাহুবলাশ্রয়ী শ্বেতপুরুষের নয়নপ্রান্তে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

নির্ভর

অধ্যাপক শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

নির্ভর মম অন্তরতম অপার কৃপার 'পরে;
নির্ভর প্রাণ, করুণানিধান, তোমার অমর বরে।
এ দেহ জীর্ণ হতেছে জরায়,
হবে সে বিলীন মলিন ধরায়,
প্রাণে যে তোমার অজর ঝরার অমৃতের ধারা ঝরে।

মরিব না আমি মরিবে মরণ,
লভিব অটল তোমার শরণ,
উড়ায়ে ভস্ম কুড়ায়ে জীবন রাখিবে অসীম ঘরে।
তুমি আছ কাছে ভয় নাই কারও,
আরও কাছে এস আরও আরও আরও;
দেহ ও মরণ যবে হয় মারো আছি আমি তোমা তরে।

চণ্ডীদাস

মহম্মদ এনামুল হক এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চণ্ডীদাস অতি সূক্ষ্ম ও উচ্চাঙ্গের প্রেমের গান গাহিয়াছেন। তিনি শুধু বসন্তের কোকিল নহেন, শুধু মিলনের গানে তাঁহার কণ্ঠ কল্লোলিত নয়। তাঁহার যে কণ্ঠে মিলনের গান মধুর হইয়া স্ফুরিত হইয়াছিল, সেই কণ্ঠেই বিরহের বাণীও করুণ হইয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান, বৈষ্ণবদিগের প্রেমমূলক গানের ন্যায় পূর্ব্বরাগ, দৌত্য, অভিসার, সম্ভোগমিলন, মাথুর ও ভাবসম্মিলন প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত।

চণ্ডীদাস-বর্ণিত পূর্ব্বরাগের রাধিকা, যেন একজন উন্মাদিনী। প্রেম-সরোবরে তিনি শতদলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছেন। স্বীয় নিবিড়-কৃষ্ণ কুন্তলদাম আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন একবার দেখিতেছেন,—তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি শোভা পাইতেছে। করযোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না, মেঘের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া মরিতেছে—কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের ন্যায়। একদৃষ্টে তিনি ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেখানেও নয়ন কৃষ্ণরূপের সন্ধান করিতেছে। নব পরিচয় এইরূপ —

রাধার কি হইল অন্তরব্যথা।
সে যে বসিয়া একলে　　থাকয়ে বিরলে
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে　　চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে　　রাঙ্গাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা।
এলাইয়া বেণী　　ফুলের গাঁথুনি
দেখায় খসায়ে চুলি।
আকুল নয়নে　　চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি।
এক দিঠি করি　　ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে,
চণ্ডীদাস কয়,　　নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

তারপর প্রেমের বিহ্বলতা; কত বিনয়, কত অনুনয়, কত মধুমাখা ক্রোধ; সেই ক্রোধে কাঠিন্য মাত্র নাই, ফুলদলে সেই ক্রোধের সৃষ্টি,—মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া, আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আহত হইয়া আসা,—কত কাতর অশ্রুর সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি। প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়—সেই দুঃখ চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে স্ফুরিত।

চণ্ডীদাসের গানে মানব-মনের কোন ক্ষুদ্র প্রেম-অনুভূতিও বাদ পড়ে নাই। তাহা যেমন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, আর কোথাও তেমনটি হয় নাই। কি বিদায়মুহূর্ত্তে আকাঙ্ক্ষা-জড়িত বিষাদ, কি অভিসারের গোপন আয়োজনের ভাববিহ্বলতা, কি মিলন-ক্ষণের অব্যক্ত আনন্দ—সমস্তই সুন্দর আর সুন্দর, এবং মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু এত করিতে গিয়াও মহাপণ্ডিত চণ্ডীদাস, তাঁহার ভাবপ্রকাশের জন্য পৌরাণিক সাহিত্যের ধার ধারেন নাই। চণ্ডীদাসের রাধিকা-চিত্র এত উজ্জ্বল ও মূর্ত্তিমান তুলিতে অঙ্কিত যে, সেই চিত্র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে পরিষ্কারভাবে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়, সেই চিত্র দেখিতে দেখিতে মনে হয়, বুঝি কোন অতিপ্রকৃত প্রেমময়ীর বিহ্বল চিত্রই দেখিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট কত বেশে কত ছলেই না আসিতেছেন,—ইচ্ছা একবার রাধিকাকে দেখিয়া তাপিত পরাণ জুড়াইবেন। তিনি কখনও নাপিতানীর বেশে আসিয়া রাধিকার নাড়ী টিপিয়া দেখিতেছেন; কখনও বাজীকরের বেশে আসিয়া গ্রামে খেলা জুড়িয়া দিয়াছেন,

আর রাধিকাসহ গ্রামের মেয়েরা পর্দার অন্তরাল হইতে তাঁহাকে দেখিতেছেন; এমন কি, তিনিও হয়ত অবসরমত একচোখ রাধিকামূর্ত্তি দেখিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন, এবং সময় সময় রাধিকাও রাখালবালকের বেশে বৃন্দাবনের গোচারণভূমিতে কৃষ্ণকে দেখিতে যাইতেছেন। এইরূপই উভয়ের প্রেম—কবির ভাষায়

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥"

কিন্তু চণ্ডীদাস এমন করিয়া মানুষী প্রেমের বিশ্লেষণ করিলেও তাহা ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেমরাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদান-প্রদানময় প্রেমভাব তত ঊর্দ্ধ উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমপ্রসঙ্গ লইয়া চণ্ডীদাস যে প্রেমের কথা জগতকে শুনাইয়াছেন, তাহার সহিত এই মর-জগতের কোন সম্পর্ক নাই; তাহা মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা মানুষের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেবতার রাজ্যে পৌঁছিয়াছে। এই প্রেম এত গভীর ও এত উচ্চ যে তাহা মানুষের সীমার বাহিরে; এই প্রেমে বিচ্ছেদ ও মিলনের পার্থক্য নাই, এখানে সবই মিলন সবই বিচ্ছেদ, এইখানে দুইজন দুইজনের চিত্তে দিনযাপন করে, কিন্তু বিরহের কথা ভুলিতে পারে না—তাই কাঁদিয়া একজন অপর জনের মর্ম্ম ভাসাইয়া দেয়। তাই কবি বলিয়াছেন—

দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধতিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জিয়ে।
মানুষ এমন প্রেম কভু না দেখিয়ে॥

মানবী রাধার কথা কথা কহিতে যাইয়াও চণ্ডীদাস মানুষের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আশ্চর্য্যরূপে পবিত্রতার সহিত ধর্ম্মজগতের কথা কহিয়াছেন; তিনি বলেন,

"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।"

আবার

"তুমি হও পিতৃমাতৃ, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী,
তুমি সে মন্ত্র তুমি সে তন্ত্র তুমি উপাসনা রস।"

এপর্য্যন্ত কোন প্রেমিক—প্রেমিকাকে "মাতা, পিতা বা বেদমাতা গায়ত্রী"রূপে উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন কি? এখানেই বুঝা যায় কবির প্রেমের পরিসর কতদূর বিস্তীর্ণ।

চণ্ডীদাসের কবিতাগুলি মানুষীপ্রেমের আবরণে ঢাকা হইলেও, তাহা আধ্যাত্মিকতার প্রকৃষ্ট ছাপ বহন করিয়া ধন্য হইয়াছে। যমুনা ভারতের নদী, বৃন্দাবন ভারতেরই স্থান ও রাধাকৃষ্ণ জগতেরই মানুষ বটে; কিন্তু তাহা ভক্তের চক্ষে চিরদিন আধ্যাত্মিক রূপকের রূপান্তর বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। ভক্তগণ মনে করিয়া থাকে, বৃন্দাবন মানুষেরই মন এবং তাহাতে ভগবানের "নিত্যলীলা" প্রকাশিত। রাধা আয়ান ঘোষের পত্নী হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদে আত্মোৎসর্গিত, যেমন মানুষের মন সংসারের সহিত আবদ্ধ হইলেও ভগবানের জন্য নিত্য-উৎসুক।

চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না; কেননা সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্ম-পুস্তকেও বিরল। "বঁধু কি আর বলিব আমি" প্রভৃতি গান শুধু বৈষ্ণবদের কণ্ঠে সে গীত হইয়া থাকে তেমন নহে, তাহা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রাহ্মমন্দিরগুলিতে ও ব্রাহ্ম-গায়কের মুখে ভক্তিবিমিশ্রিত ভাব-বিহ্বলতার সহিত গীত হইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের গানগুলি কিরূপ মানুষীপ্রেম ছাড়াইয়া গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় ভাববিহ্বল ও ছন্দমুখর আনন্দে স্বর্গের দুয়ারে হানা দিয়াছে,—তাহার নমুনা দেখুন—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহমন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কুলশীল জাতিমান॥
অখিলের নাথ তুমিহে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজনপূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনুমন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপপুণ্য সম, তোমার চরণ মানি॥

চণ্ডীদাসের কবিতা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যের অগ্রদূত। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবপদাবলীর মূলে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যেরূপ রসসিঞ্চন করিয়াছে, এক চৈতন্যদেবের মূর্ত্তিমান প্রেম ভিন্ন আর কিছুই সেইরূপ করে নাই। আবার আমরা জানি, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ গাহিতে গাহিতে কখন কখন আত্মহারা হইয়া পড়িতেন; এইজন্যই বোধ হয় চণ্ডীদাস বৈষ্ণবদিগের এত প্রিয়। ফলতঃ বলিতে গেলে বৈষ্ণবসাহিত্যের ধারা উমাপতি ধর ও জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিলেও, চণ্ডীদাসে আসিয়া তাহা একরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া তাহা যেরূপ পত্রপুষ্পে বিশোভিত হইয়াছিল, তাহাও সাহিত্যিককে কম আকৃষ্ট করে না।

সে যাহা হউক চণ্ডীদাস প্রেমের কবি; তিনি প্রেম দিয়া বঙ্গদেশকে পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের তারে সুর-যোজনা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট কবি হঠাৎ ভবিষ্যতের ছবিও দেখিয়া ফেলিয়াছেন। এই ছবি প্রায় এক শতাব্দী পরের ছবি—এই ছবি চৈতন্যদেবের প্রেমের ছবি। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস প্রেমের গান গাহিতে গাহিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া, একশতাব্দী পরবর্ত্তী প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবের মোহন মূর্ত্তি দিব্যদৃষ্টিতে হঠাৎ দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার তেমন কি আছে? কবিরা সাধারণতঃ ভবিষ্যদ্বক্তা; তাঁহারা বর্ত্তমানে বাস করিলেও দিব্য-দৃষ্টিপথে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি দর্শন করিয়া অনেক সময় গান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী যে পূর্ণ হইয়াছে, ইতিহাস তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বহন করিতেছে। চণ্ডীদাস এক-দিন ভাবাবেশে রাধিকার বর্ণ বর্ণনা করিতে গিয়া, গদগদ কণ্ঠে গাহিয়া ফেলিলেন,—

"আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
...
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এমন হইবে কোন দেশে॥"

চণ্ডীদাস হঠাৎ আর একদিন গাহিয়া ফেলিলেন,—

"সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যাজিয়াছি কাজলের সাধ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অনন্ত দহে
পাশরিলে না যায় পাশরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনুমন চুরি করে
না চিনয়ে কালা কিম্বা গোরা॥

এই পদ দুইটির "এমন হইবে কেন দেশে" এবং "না চিনয়ে কালা কিংবা গোরা"—এই দুইটি ছত্র পড়িয়া স্বপ্নের ন্যায় একটি অলীকভাব মনে জাগরিত হয়—যেন, ভাবী ঘটনা যেরূপ সম্মুখে ছায়াপাত করে, পরমসুন্দর চৈতন্য-দেবও তেমনই তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দীপূর্ব্বে প্রেমিক কবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই রূপের পূর্ব্বাভাস পাইয়া আহ্লাদে চণ্ডীদাস ইহার প্রাক্কালে পক্ষীর ন্যায় অস্পষ্ট কাকলী দ্বারা তাঁহার আগমনী গান করিয়া-ছিলেন। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ চৈতন্যদেব স্বজীবনে দেখাইয়াছিলেন। যদি চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে রাধিকার "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর," কৃষ্ণ-অঙ্গ ভ্রমে কুসুমলতা আলি-ঙ্গন, একদৃষ্টে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নবপরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ, কবির কল্পনা হইয়া যাইত, এবং ভাবের উচ্ছ্বাসজাত এই ভ্রমময় আত্মবিস্মৃতি আজ শুষ্কযুগে কবি-কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। চৈতন্যদেব, বৈষ্ণবনীতি-সমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন, এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এবং এই শাস্ত্রের শোভাস্বরূপ, পূর্ব্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন ইত্যাদি যে-সমুদয় লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, তাহা আস্বাদযোগ্য এবং আস্বাদিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস রাধিকার পূর্ব্বরাগের প্রথমেই "কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য" প্রচার করিয়াছেন;—এই নাম মধুময়, ইহা অমৃ-

ক্ষণ মুখেই লাগিয়া থাকে। নাম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টান্ত—মানুষী ভালবাসার সাহিত্যে বিরল; কিন্তু রাধিকা যে, "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো"।—ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্তচিত্ত আপনা আপনি ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন যেন তখন থাকিয়ও থাকে না, ইন্দ্রিয় প্রশমিত, মনে নামের মধুভরা মোহ—সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। চণ্ডীদাসের যে সমুদয় পদ এই-রূপ নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে, সেইগুলি পাঠ করিতে করিতে কি, যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণ ভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিতে শুনিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণপুতলি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বাভাষ সূচিত করিতেছে না?

চণ্ডীদাসের রাধিকা, "বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।" নীল নিচোল-পরিহিতা রাধিকামূর্ত্তি বৈষ্ণবসাহিত্যে সুলভ বটে, কিন্তু এখানে রাঙ্গাবাস (গেরুয়া) পরা রাধিকামূর্ত্তি কি সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তির মত দেখাইতেছে না? তাঁহার পরিধানে গেরুয়া এবং আহারে বিরতি, মেঘ দেখিলে কৃষ্ণভ্রমে করযোড়ে সকাতর অনুনয়, একদৃষ্টে ময়ূরময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ—সমুদয় কি বৈষ্ণব-সাধুগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না?

বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগের, "ক্ষণে ক্ষণে নয়নকোণে অনুসরই, ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥" প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদ্‌ভিন্ন-যৌবনা রাধিকার রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু বিদ্যাপতির সেই চপলা রাধিকা চণ্ডীদাসের হাতে অপূর্ব্ব ধ্যানপরায়ণা মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্যপ্রভুর দুইটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মোটের উপর চণ্ডীদাসের রাধিকা মূর্ত্তি চৈতন্যদেবেরই মূর্ত্তি। চণ্ডীদাসের রাধিকা মৃতবৎ অজ্ঞান হন, চৈতন্য-প্রভুও মৃতবৎ অজ্ঞান হইয়াছিলেন; চণ্ডীদাসের রাধিকা তমাল দেখিয়া আলিঙ্গন করিতেন, মেঘ দেখিয়া আত্মহারা হইতেন, সমুদ্র দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে ঝাঁপ দিতেন, আর চৈতন্য-প্রভু জীবনে তাহা দেখাইয়াছেন; চণ্ডীদাসের রাধিকা কৃষ্ণের নাম জপ করিতে করিতে অবশ হইয়া পড়িতেন, চৈতন্যদেবও তাহাই হইতেন। এইরূপভাবে চণ্ডীদাসের রাধিকাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, দেখা যাইবে ইহা যেন চৈতন্যদেবেরই মূর্ত্তি। চণ্ডীদাস প্রায় শতাব্দী-পূর্ব্বে ভাব-বিহ্বলতার বশে যাহা অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তাহা প্রেমের অক্ষরে সত্যতায় প্রমাণিত করেন। চৈতন্যদেবের এহেন জীবন্ত প্রেমের চিত্রই পরবর্ত্তী বা তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিগণ চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের এহেন জীবন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকেই ভক্তি ও প্রেমের সুরে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর চণ্ডীদাস এক-শতাব্দী পূর্ব্বে এই চিত্র দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার আগমনী গান করিয়াছিলেন। উভয় কবিরই মিলনের স্থল চৈতন্যদেব—একজন ভবিষ্যদ্বক্তা আর একজন গুণ-গায়ক। একজন সামনে বসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, আর একজন ভবিষ্যৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের প্রচলিত (Extant) পদাবলী-সম্বলিত নিম্নলিখিত কয়েকখানা পুস্তক এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে—যথা

পুস্তকের নাম	পদ-সংখ্যা
(১) শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন	„ ৪১৯
(২) পদাবলী (সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত)	„ ৮৩০
উহার পরিশিষ্ট	„ ৯
(৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত একখানা বৃহৎ গীতিকাব্যের অংশ-বিশেষের ২১টি পত্র—পদসংখ্যা সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ সমস্ত মিলাইয়া ৬০টি।	

কিন্তু এই খণ্ডিত পুঁথিটির পদে যে সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাতে দেখা যায়, এই বৃহৎ কাব্যে ২০০০ হাজারেরও অধিক পদ ছিল।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে এক প্রধান আবিষ্কার—"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন"। কেহ কেহ "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের"

প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কেহ বা এই পুস্তকের মোহিনীতে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদগুলিকে জাল মনে করিয়া "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকেই" কবির একমাত্র খাঁটি লেখা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদিগকে দুইদলের গোঁড়ামির ভিড় ঠেলিয়া সত্য উদ্ধার করিতে হইবে। নিম্নে এই পুস্তকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাহা যাহা আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইতেছি—

(১) আপত্তিকারকের একজন বলিতেছেন, চণ্ডীদাসের রচনা পূর্ব্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" বিকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে; চণ্ডীদাসের কতক কতক পদ ভাঙ্গিয়া অনন্ত নামক গায়ক, এই কাব্যখানি রচনা করিয়া আসাম হইতে চালাইয়াছেন। কপোলকল্পিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, এমন দুঃসাহসিক উক্তি প্রকাশ করিতে খুব কম লোকই সাহস করিয়া থাকে। অনন্ত নামক একজন "গায়ক" ছিল, এবং আসামে তার বাড়ী ছিল, এইরূপ কথা আপত্তিকারক কোথায় পাইলেন কে বলিবে? যদিও আসামীয় প্রাচীন ভাষার সঙ্গে, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" ভাষার কতকটা ঐক্য আছে (সেইরূপ ঐক্য উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার ভাষার সঙ্গেও পরিদৃষ্ট হইবে), একথা নিশ্চিত যে, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ঠিক যথাযথ ভাষা যদি কেহ লিপিবদ্ধ করিতেন, তবে সেই ভাষার, বঙ্গদেশীয় অপরাপর প্রদেশের প্রাচীন কথিতরূপ যে আধুনিক সময় হইতে অনেক বেশী পাওয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ, আসাম, উৎকল ও মিথিলার ভাষাগত ঐক্য অনেকটা বেশী ছিল। সেই ঐক্য দেখিয়া চমকিত হইয়া যাইবার কোন কারণ নাই; কারণ সেইরূপ ঐক্যের নিদর্শন পাওয়া যাওয়াতেই, পুথিখানি প্রামাণিক বলিয়া মনে হইবে।

(২) "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পুথিখানি যে অতি প্রাচীন অক্ষরে লিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি বাঙ্গালা অক্ষরের পাণ্ডুলিপির সহিত এই পুঁথির পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন, এই পুস্তকের অক্ষর নিতান্তই পুরাতন। এই পুস্তকখানির অক্ষর দেখিয়া এ-সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ইহার হস্তলিপি ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ের বা তাহারও পূর্ব্বের; কিছুতেই পরবর্ত্তী নহে। কাজেই দেখা যাইতেছে, এই পুস্তকখানি চণ্ডীদাসের সময়েই লিখিত হইয়াছিল। ইহার লিপি দুই বা ততোধিক লোকের হওয়াতে কিছু আসে যায় না। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে এক শতাব্দীর পুথির অংশবিশিষ্ট একই কাগজে পরবর্ত্তী শতাব্দীর লোক নকল করিয়াছেন। এইরূপ নকল সচরাচর অতি অল্পকালের মধ্যেই হইয়া থাকে।

(৩) কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আরও জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত, তিনি "বড়ু" উপাধি ব্যবহার করিতেন, এবং বাসুলী দেবীর আজ্ঞায় পদ রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই, বহুপূর্ব্বে তাঁহার "অনন্ত" নাম পাওয়া গিয়াছিল; তাঁহার "বড়ু" উপাধি ও বাসুলীর আদেশ সম্বন্ধে, প্রত্যেকেই অবগত। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস, এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাসের পদগুলি যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধৃত এবং কবির প্রচলিত পদের পাঠ পাশাপাশি রাখিলে স্থির করা যাইতে পারে। যথা "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" আর পদাবলীর "প্রথম প্রহর নিশি" একই পদেরই ভাষার রূপান্তর। এইরূপ বিস্তর পদে চণ্ডীদাসের পরিচিত সুর আমাদের কর্ণে বাজিয়া উঠিতেছে।

(৪) কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীরা আর একটি আপত্তি করিয়া থাকেন, এই পুস্তকে পদাবলীর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া কোথায়? ইহা পাড়াগাঁয়ের কৃষক কবির অকপট লালসার কথা।—ইহাতে মহাকবি চণ্ডীদাসের গগনস্পর্শী আধ্যাত্মিকতা কোথায়? তাঁহাদের মতে, মহাকবি চণ্ডীদাস আদর্শ প্রেমের উচ্চ গ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ইহার অনেক নিম্নে। ইহা ব্যভিচারী-প্রেমের শ্লীলতাশূন্য আবর্জ্জনা—

আঁধারে ছিল তাহা, প্রকাশিত হইয়া চণ্ডীদাসকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল।

চণ্ডীদাসকে আমরা এপর্য্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। কিন্তু ইহা একরূপ অনিবার্য্য। দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যায় এক অতিশয় নৈতিক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রাদির বিশেষ অনুশীলনের ফলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্লীলতা ও সংযমের অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যে তাহার বিস্তর প্রমাণ রহিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের আধ্যাত্মিকতা যাহাই থাকুক না কেন, তাহার কুরুচি প্রত্যেক পাঠকের চক্ষে পড়িবে। তাঁহার জীবনে, "পদ্মাবতী" নাম্নী এক "সেবাদাসী" তাঁহার সঙ্গিনী ছিল। এমন কি দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনগুলিও, এইভাবে পর-রমণীর প্রতি আসক্তির সংগীতি ঘোষণা করিতেছে। লক্ষ্মণ সেনও কলিঙ্গ রমণীগণের প্রেমলাভ করিয়াছিলেন।

যুগ যখন এইরূপ ঘোর নৈতিক দুর্গতিগ্রস্ত, তখন "কৃষ্ণ ধামালী" নামক একপ্রকার গান "রংপুর", "কোচ-বিহার" ও দিনাজপুর" প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আমাদের মনে হয় বঙ্গের নৈতিক অধঃপতনের সময় এই গানগুলি বঙ্গব্যাপী ছিল এবং পরে উত্তরবঙ্গে ইহারা আত্মগোপন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সে যাহা হউক "কৃষ্ণ ধামালী"গুলি "আসল" ও "শুকুন" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। "আসল" "কৃষ্ণ ধামালী" এত অশ্লীল যে তাহা গ্রামের বাহিরে গীত হয়, ভিতরে গান করিবার প্রথা নাই। "শুকুন" "কৃষ্ণ ধামালী"গুলি এত অশ্লীল নয়। এই "কৃষ্ণ ধামালী"গুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ; এইগুলি যে একদিন বঙ্গদেশের সাধারণের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শুনিবার আকুল তৃষ্ণা মিটাইয়া দিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

"শুকুন" ধামালীগুলিকে সুন্দর করিয়া, সাধুভাষায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, কবিত্বমণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন। যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন পাওয়া না যাইত,তবে গীত-গোবিন্দ ও কৃষ্ণ ধামালীর পরে হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইত না। শ্রেষ্ঠ কবি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি বর্ত্তমান যুগের কবি ও ভবিষ্যৎ যুগের নির্দ্দেশক। তিনি স্বীয় যুগকে আঁকিতে যাইয়া হঠাৎ দিব্য সজ্ঞানে ভাবী যুগের ছায়াপাত করেন। চণ্ডীদাস যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে? তিনি সেই যুগের বাঙ্গালা ভাষার অমার্জ্জিত রূপ, রুচি ও ইঙ্গিতকে তাঁহার রচনায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া, অকস্মাৎ প্রেমসাধনার যুগের আলো দেখিয়াছিলেন; সেই আলো তাঁহার লালসার মাথায় বজ্রাঘাত করিয়াছিল, এবং সেই আলোকপাতে তাঁহার "রাধা-বিরহ" অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। "জন্মখণ্ড", "তাম্বুলখণ্ড" "দানখণ্ড", "বৃন্দাবনখণ্ড, গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তিনি বাগ্দেবীর কৃপায় নূতন মন্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন—সেই মন্ত্রে মোহিনীতে "রাধাবিরহ" আশ্চর্যরূপে উপাদেয় হইয়া উঠিল।

(৫) কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানি যে বিশেষ প্রামাণিক, তাহার একটি নিদর্শন এই যে, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহা বিষ্ণুপুর রাজ-লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। ইহা সকলেই জানেন যে বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবদের একটা বড় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিত সেই রাজসভায় থাকিতেন, তাঁহারা কোন জাল বৈষ্ণব-পুথি সেই লাইব্রেরীতে কখনও স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই পুথিখানি বহু-দিন যাবৎ সাধারণে প্রচারিত হয় নাই—ইহা যেন জগতের একধারে পড়িয়াছিল। সুতরাং ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সংসাধিত হয় নাই। আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই পুথির কোন খবরই কেহ জানিত না। ইহা জনসমাজে কখনও আদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সমাজে আদৃত না হওয়াতেই ইহার ভাষা অবিকৃত রহিয়াছে।

(৬) সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের যে পদাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত পদ সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা চণ্ডীদাসের কিনা সে বিষয়ে পাণ্ডিত-সমাজে যথেষ্ট মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস তাঁহার পদাবলীতে অন্য লোকের অনেক ভেজাল চলিয়া গিয়াছে। মোটের উপর এই পদাবলীর অধিকাংশ পদ যে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা

চণ্ডীদাসের, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। নিম্নে একাধিক চণ্ডীদাসের বিষয় আলোচনায়, এসব বিষয়ে আরও নূতন আলোকপাত হইবে।

(৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুথিখানা পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম কয়েকটি পত্রে চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার শেষভাগে "দীন-চণ্ডীদাসের" ভণিতাযুক্ত যে গানগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নহে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

এখন আমরা দেখিব, দেশবিখ্যাত চণ্ডীদাসকে, এই যে এতগুলি পদের রচক বলিয়া বাঙ্গালী এতদিন ধরিয়া ফুলচন্দন দিয়া আসিতেছে, তাহার সমস্তই, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের বিরচিত পদ হয় কিনা; যদি না হইয়া থাকে, তবে অপরাপর পদগুলি কাহার? "চণ্ডীদাস" নাম দেখিলেই যে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা নান্নুরের চণ্ডীদাসকে বুঝিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। খুব সম্ভব, চণ্ডীদাস একজন ছিলেন না। বিভিন্ন চণ্ডীদাস বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে, লোকে তাঁহাদিগকে ভুল করিয়া বলা খুবই সম্ভবপর। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা নান্নুরের চণ্ডীদাস তখন দেশবিখ্যাত, কাজেই লোক অন্যান্য চণ্ডীদাসের কবিতাকে তাঁহার সহিত গোল করিয়া হয়ত চালাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক ভণিতায় পুরাতন কবিগণ নিজনাম রক্ষা করার যে প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহাই এখন পণ্ডিতসমাজে গোলের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহারা একাধিক ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ের অনুসন্ধানে তৎপর করেন। ফলে এখন দুইজন চণ্ডীদাসের বিষয় একরূপ জানা যাইতেছে, অন্যান্য চণ্ডীদাসের বিষয় তেমন কিছু জানা যায় নাই। এই দুইজনের একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস আর অপর ব্যক্তি "দীন-চণ্ডীদাস"। কি করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যতগুলি পদ আছে, তাহাতে আমরা নিম্নলিখিত রূপ ভণিতা পাইতেছি: যথা—

(১) বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাস গায় (২৬৪ পৃষ্ঠা)

(২) গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগনে (২৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (৮০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা অনেকপ্রকার ভণিতা পাইতেছি, যথা:—বড়ু চণ্ডীদাস, বাসলীসেবক চণ্ডীদাস, দীন-চণ্ডীদাস, দীন-ক্ষীণ চণ্ডীদাস, দীন-হীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিখানার শেষভাগে দীন-চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ২১টি পত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রথম যে কয়টি পত্রে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়; তাহা 'পরবর্ত্তী দীন-চণ্ডীদাসের ভণিতাসম্বলিত পত্রগুলি হইতে আকারে ও হস্তাক্ষরে পৃথক। ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হয় যে, প্রথম কয়েকটি পত্র অন্য কোন পুথি হইতে সংগৃহীত। দীন-চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত শেষ পদের সংখ্যা ২০০; ইহা হইতে এই পদ-সংগ্রহের বৃহত্ত্ব অনুমান করা যায়। এই পুথিখানির কোন পদেই "বড়ু চণ্ডীদাস" বা "বাসলী-সেবক চণ্ডীদাসের" কোন ভণিতা পাওয়া যায় নাই। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই "চণ্ডীদাস", "বড়ু চণ্ডীদাস" বা "বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস" হইতে পৃথক ব্যক্তি।

এখন বেশ দেখা যাইতেছে, চণ্ডীদাসের ভণিতা নানা জায়গায় নানা ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সকল ভণিতাযুক্ত ব্যক্তি কি একই ব্যক্তির ভিন্ন আখ্যা, না ইহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিশিষ্টতা সূচিত হইতেছে, তাহা বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ। নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে একাধিক চণ্ডীদাসের বিবরণ তিনি অবগত নহেন। কিন্তু নানা কারণে আমাদের মনে হয়, নানা পুস্তকের এতগুলি ভণিতায়, যে এতগুলি চণ্ডীদাসের সংবাদ পাইতেছি, তাঁহারা একই ব্যক্তি নহেন এবং একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভণিতা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি। এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত;—কৃষ্ণকীর্ত্তনে দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস বা আদি চণ্ডীদাসের কোন ভণিতাই পাওয়া যায় না। অতএব কৃষ্ণ-

কীর্ত্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ও বাসলীসেবক চণ্ডীদাসকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি; তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দীন চণ্ডীদাস, দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস ও দীনহীন চণ্ডীদাস অপর এক ব্যক্তি বলিয়া আমাদের মনে হয়। তিনি বড়ু চণ্ডীদাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। আমরা মনে করি, বিনয়ের খাতিরে, তিনি স্থানে স্থানে নিজকে "দীন ও হীন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই "দীন চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে ১৩৩৩ সনের পৌষের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ইনি নরোত্তম ঠাকুরের (১৫৬৫) শিষ্য, ইঁহার রচিত নরোত্তম-বন্দনাও পাওয়া গিয়াছে।" অতএব দেখা যাইতেছে, এই দীন চণ্ডীদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। এইরূপ নানা কারণে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর "দীন চণ্ডীদাস" কিছুতেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর "বড়ু চণ্ডীদাস" হইতে পারেন না।

অপরাপর চণ্ডীদাস সম্বন্ধে—যেমন দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস—কোন নূতন তথ্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা পৃথক কি একব্যক্তি সে বিষয় কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না, তাঁহাদের নির্দ্দেশ করাও কঠিন ব্যাপার।

অতীত ও বর্ত্তমান

শ্রী শৈলজা সেন গুপ্তা

সেদিন আমাদের আলোচনা চলিতেছিল—মেয়েদের আদর্শ সম্বন্ধে। কথাটির একটি সুনির্দ্ধারিত মীমাংসার জন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, কাজেই আলোচনায় যুক্তি ও প্রমাণের অপেক্ষা কোলাহলের ভাগই বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। জোর গলায় যাহাতে সকলেই শুনিতে পায়, এমনভাবে আমি বলিলাম, "দেখাও দিকি, আমাদের সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, দময়ন্তীর মত আদর্শ অন্য কোনও দেশে? গর্ব্ব করবার মত আজ আমাদের কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু তবুও যেটুকু সম্মান এখনও আমাদের আছে, তা' এইসব সতীদের দেশে জন্মেছি ব'লে—তাঁদের পরিচয়ে। এটা ঠিক জেনো যে, যদি আবার কোনও দিন বিশ্বের দরবারে আমাদের সকলের সঙ্গে সমান আসন পাওয়ার সুযোগ আসে, তবে সে যোগ্যতা আমাদের এইসব নামের ভিতর দিয়েই অর্জ্জন করতে হবে!—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কমল বলিয়া উঠিল, "আর আগেকার মত যমরাজা মিতালী করতে এসে, তিন পা' এগিয়ে ধর্ম্মের বাঁধনে কাবু হ'য়ে পড়বেন না বা মা-বসুন্ধরাও সপ্ততল পাতালের নীচ থেকে সিংহাসন শুদ্ধ উঠে এসে কোলে তুলে নেবেন না!—সে ব্যবস্থাও নিজেদেরই এখন করতে হবে।"

কমলের কথার সুরে যেন অনেকখানিই শ্লেষ প্রচ্ছন্ন ছিল। বেশ কড়া রকমের একটা উত্তর দিতে গিয়া নিজেকে সামলাইয়া নিলাম, শুধু বলিলাম—"সে দোষ তাঁদের নয়, সে দোষ আমাদের।"

ভুরু কুঁচকাইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি-রকম?"

বলিলাম, "নিজেই ভেবে দেখ না—সাবিত্রীর যে কঠোর তপস্যা আর সাধনার জোরে যমরাজ নিজে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সত্যবানের প্রাণ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল—সে তপস্যা বা সাধনার আকুলতা আমাদের আছে? আর সীতার মত অমন কায়মনোবাক্যে স্বামী-ভক্তি যদি কারও থাকে, তবে মা-বসুন্ধরা নিশ্চয়ই আসবেন—আসতে তিনি বাধ্য!"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে কমল বলিল, "বাজে কথা বোলোনা! সাবিত্রীর মত কঠোর তপস্যার জোর আমাদের না থাকতে

পারে কিন্তু আকুলতা নাই? মা যখন রুগ্ন সন্তানের প্রাণের জন্য দেবতার দুয়ারে মাথা খোঁড়েন—স্ত্রী স্বামীর জন্য কাতর প্রাণে দেবতার চরণে মিনতি জানান—তার মধ্যে আকুলতা নাই তুমি বলতে চাও? জীবন বোসের স্ত্রীকে দেখছ ত? বিধাতাপুরুষ তার অদৃষ্ট সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা দেবেন বলতে পার?"

উত্তরের অপেক্ষায় কমল আমার মুখের দিকে চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জোড়া চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিলাম না, বলিলাম, "বিধাতা পুরুষ কার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা দেবেন, শেষ পর্য্যন্ত না দেখে মানুষ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। ডাকের মত ডাক হ'লে তাঁর আসন এখনও এই কলিযুগেও ট'লে থাকে। শেষ মুহূর্ত্তে বেঁচে ওঠা—এমন কি বড় বড় ডাক্তাররাও 'প্রাণ নাই' এমন অনুমান করার পর আবার বেঁচে উঠেছে—এমন কথাও যে না শোনা যায় তা' নয়। এই সেদিনও খবরের কাগজে—"

বাধা দিয়া কমল বলিল, "খবরের কাগজে কি উঠেছিল সে জানি, আর এ-রকম যে না শোনা যায় তা' নয়। কিন্তু এ-রকম ঘটনা আজকাল খুবই কম দেখা যায়—কচিৎ কখনও। হাজারে একটিও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। দেখ, এখন আর সেদিন নাই—যখন দেবতারা মানুষের ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতেন, স্মরণ করলেই যখন-তখন এসে হাজির হতেন। কথায় কথায় বর কি শাপ একটা কিছু দিয়ে বসতেন—সময় সময় আগুপাছু না ভেবে এমন এক একটি বর ভক্তকে দিয়ে বসতেন—যে, তার ঠেলায় স্বয়ং বরদাতাকে শুদ্ধ 'নাস্তানাবুদ' হ'তে হ'ত। তখন দেবতা ও মানুষে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ছিল—কুটুম্বিতাও খুব ঘনিষ্ঠ রকমেরই দেখা যেত। ভক্ত যে সে ত দেখা পাবেই—অভক্ত পাষণ্ডদের দেখা দিতেও তাঁরা ত্রুটি করতেন না—রাগ হ'লেই সশরীরে এসে হাজির হ'য়ে হয় একটা মারাত্মক কোনও শাপ দিয়ে দিতেন নয়ত একেবারে 'ভস্ম' ক'রে 'ল্যাঠা' চুকিয়ে দিয়ে যেতেন। দেবতা নিয়ে ঘর কর্ণে কর্ণে সাধু ও পুণ্যাত্মাদেরও অনেকরকম ক্ষমতা জন্মাত—ইচ্ছা করলে বা চেষ্টা করলে তাঁরাও অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারতেন। সতীত্ব স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। যে-সব মেয়েরা অচলভাবে তাঁদের সতীধর্ম্ম পালন করতেন—পুরস্কারস্বরূপ অনেক অনুগ্রহই তাঁরা দেবতার কাছ থেকে পেতেন। কিন্তু এখন? এখন যদিও বা কারও বরাতে কখনও কোনও কিছু ঘ'টেও যায়—সেটা আমরা তাঁর দান ব'লে মানতে চাই না—নিজেদের অদৃষ্টের বাহাদুরি সেখানে জাহির করি। দেবতা ও ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের এমনই ব্যবধান বেড়ে চলেছে দিন দিন। এর কারণ কি জান? দেবতার দান এখন আর আগের মত প্রত্যক্ষভাবে—সোজা তাঁর হাত থেকে না এসে, দশজনের হাত ঘুরে আসে ব'লে, আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না।"

উৎসাহিত কণ্ঠে আমি বলিলাম, "তবেই দেখ, দোষ কাদের? প্রতি কথায় যেখানে অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা—সত্যের স্থান সেখানে হ'তে পারে না। তখনকার দিনে দেবতা ও মানুষে যে এতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—সে'ক মানুষের বিনা চেষ্টাতেই হয়েছিল, তুমি মনে কর? কোনও বড় জিনিষ পেতে হ'লে নিজেকে তার উপযুক্ত ক'রে গড়তে হয়—সেই যোগ্যতা লাভের জন্য মূল্যও খুব বড় রকমের দিতে হয়। অনেক কঠোর তপস্যা, অক্লান্ত সাধনার জোরে যে সম্পদ একদিন আমরা লাভ করেছিলাম—নিজেদের অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ও অবহেলায় ইচ্ছে ক'রে সে সম্পদ আমরা হারিয়েছি। আমাদের এই দুর্গতি, এই শোচনীয় অবনতির জন্য দায়ী আমরা। যে দেশের মেয়েরা স্বামীকে দেবতার চাইতেও ভক্তি করতেন ব'লে, কতবার দেবতাকে সতীর সম্মান রাখতে সিংহাসন ছেড়ে মর্ত্ত্যের মাটিতে নেমে আসতে হয়েছে, সেই দেশের মেয়েদের কাছে স্বামী এখন দু'দিনের পথের সাথী—প্রমোদের সঙ্গী! তার বেশী নয়।"

সন্ত্রস্তভাবে জিভ কাটিয়া কমল বলিল, "আরে বাপ্‌রে, এমন কথা বোলোনা! আমাদের মত দু'চারজনের কাছে স্বামীর ওজন অনেকটা হালকা হ'য়ে গেলেও, এমন অনেক মেয়ে এখনও আমাদের দেশে ঘরে ঘরে আছেন, যাঁরা স্বামীকে জীবনের পথের সুখদুঃখের সাথী না ভেবে তার অনেক উপরে স্থান দিয়ে ওজনের "তুলাদণ্ড" গড়ে ঠিক রেখে দিয়েছেন।"

চাপা হাসির একটা মৃদুতরঙ্গ সারা ঘরে খেলিয়া গেল। আমি কিছু বলিবার আগেই কমল বলিল, "তুমি যে দোষ

আমাদের দিলে, সেজন্য আমাদের চাইতেও বেশী দায়ী তাঁরা—যাঁদের সময়ে মহাভারতের সেই বিশ্বাসী যুগের পরেই প্রথম অবিশ্বাসের যুগ আরম্ভ হয়েছিল। চারিদিক-ঘেরা অন্ধকারের ভিতর ব'সে আমরা যদি আজ আলোর অস্তিত্ব স্বীকার না করি সে দোষ আমাদের যত—তার চাইতেও বেশী তাঁদের, যাঁরা ঘরভরা আলো প্রথম নিভাতে সুরু করেছিলেন।"

"দোষ যাদেরই থাক, আমাদের কি সেই হারানো জিনিষ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত নয়?"—আমার প্রশ্নের উত্তরে চিন্তিত কণ্ঠে কমল বলিল, "চেষ্টা করলে যদি ফিরিয়ে আনা যেত—তাতে বোধহয় কারও বিশেষ আপত্তি থাকত না। অন্ততঃ এ কথাটা সকলেই স্বীকার করতেন যে, 'সংসার-আশ্রমটি' মানুষের বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিব্যি গড়-গড়িয়ে চ'লে যেত—সতীত্বের মাহাত্ম্যে অনেকরকম অশান্তি-উপদ্রবের হাত থেকে সমাজ রেহাই পেত। কিন্তু তা হয় না। বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর ঝোড়ো হাওয়ায় ঘর বেঁধে বসে, হাজার হাজার বছর আগের মহাভারতের যুগকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা যে—স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কি বলব? যুগরথ যখন চলতে আরম্ভ করে—তখন তার টানে জল্পবিস্তর সকলকেই চলতে হয়—পিছিয়ে প'ড়ে অতীতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা—বৃথা! পণ্ডশ্রম মাত্র।"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তাই ব'লে চেষ্টাও কেউ করবে না? নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মানুষ তার থেকে বাঁচবার চেষ্টা করে, আর আমরা অমনি অমনি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভেসে পড়ব? আমাদের আবার তপস্যা করতে হবে,—নিজের লুপ্ত শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য সীতা-সাবিত্রীর মত আবার সাধনা করতে হবে। তারপর দেখা যাবে কি হয় না হয়। চেষ্টার ফল নিশ্চয়ই কিছু আছে।"

কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া কমল বলিল, "চেষ্টাটা কি ভাবে করতে হবে শুনি? কালধর্ম্মে মেয়েদের মন যেন বিভিন্নমুখী হ'য়ে পড়েছে—চুপচাপ ঘরে ব'সে শুধু স্বামী-পুত্রের সেবা বা ঘরের কাজ ক'রেই তারা এখন আর তৃপ্ত নয়—উঁকি মেরে পৃথিবীকেও চিনতে চেষ্টা করছে। এইসব বেয়াড়া অবাধ্য স্বভাবকে সমস্ত দুষ্ট থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে এসে স্বামীর পায়ের নীচে বসিয়ে দেওয়া—বড় সোজা কথা নয়। বর্ত্তমানের সমস্ত প্রভাব কাটিয়ে পুরাতনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া—খুব বড় শক্তির দরকার। এই শক্তি কিসে থেকে প্রয়োগ করতে হবে? আমাদের হাতের-পাঁচ শেষসম্বল যাগযজ্ঞে, পূজাআর্চ্চায়, না আধুনিক কোনও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে?" তিক্ত কণ্ঠে বলিলাম, "যদি তাও হয়, ক্ষতি কি? তোমার কথার ভঙ্গীতে মনে হ'চ্ছে যে তুমি আমাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ ধ'রে সাধন-ভজন যাগ-যজ্ঞের কোনও মূল্য স্বীকার কর না?"

কমল বলিল, "এমন কথা আমি বলি না বলতেও পারি না। এ এত সস্তা জিনিষ না যে তোমার আমার মত লোক এর মূল্য বিচার কর্ত্তে ব'সে নিজেদের ধৃষ্টতার পরিচয় দেব। এ সম্বন্ধে কোনও বেশী কথা বলতে চাই না আমি, শুধু এইটুকু বলতে পারি, ভগবানকে ডাকা, সে যে ভাবেই ডাকি না কেন—ডাক তার নিজের শক্তিতে গিয়ে তাঁর কানে পৌঁছায়! শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধিনিয়মের কোথায় কি ত্রুটি হ'ল না হ'ল—সেজন্য সে ডাক মাঝপথে আটকে যায় না বা তিনি ফিরিয়ে দেন না। না হ'লে এত রকম যে ধর্ম্মপ্রথা দেশে দেশে প্রচলিত, তার প্রতি-ধর্ম্মের চলিত মতে প্রতি বিপক্ষ ধর্ম্মকেই অচল হ'য়ে থাকতে হয়, তা হ'লে। ভগবান ও মানুষ এই দুয়ের ভিতর যে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়—তা মানুষের তৈরী—তাঁর সৃষ্টি নয়। থাক্ এ নিয়ে আলোচনা এখন বন্ধ থাক, যা বলছিলে বল।"

কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিলাম না, কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। কমল বলিল, "সাবিত্রী সত্যবানের প্রাণের জন্য যা করেছিলেন—যে মেয়ে তাঁর স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তাঁর পক্ষে স্বামীর প্রাণের জন্য লজ্জা, মান, ভয়-ডর বিসর্জ্জন দেওয়াটা খুব বেশী কথা নয়। জগতে প্রত্যেক জিনিষেরই একটা দাবী আছে। প্রেম বা ভালবাসাও তার দাবী সুযোগ পেলেই উপস্থিত করে। আমার স্বামী, পুত্র বা প্রিয়তম আত্মীয়ের মঙ্গলের জন্য যদি বুক চিরে রক্ত দিতে হয়—দুঃসাহসের কাজ করতে হয়—না ক'রে উপায় নাই। তাদের উপর আমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসাই, যেমন ক'রে হোক তার পাওনা কড়া-ক্রান্তি হিসেব ক'রে আদায় ক'রে নেবে—ফাঁকি সেখানে

চলবে না। যে লাঞ্ছনা, বিপদ ইচ্ছা করলে দূরে এড়িয়ে যাওয়া যায়, স্বামীর জন্য সেই বিপদ ইচ্ছা ক'রে বরণ ক'রে নিতে আজও অনেককে দেখা যায়। আসামের সতী জয়মতী, প্রতি তিলে তিলে অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য ক'রে, অত্যাচারীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন—নিজের প্রাণ দিয়ে স্বামীকে বাঁচিয়ে গিয়েছেন—তাঁর সেই আত্মদান কি সাবিত্রীর কৃচ্ছ্রসাধনের কাছে তুচ্ছ! আজও সহস্র হৃদয়ের আকুল হাহাকার, আর্ত্তরোদন উপরের দিকে ভেসে চলেছে। তবে কেন জানি না—সহস্রজনের আকুলতার মাঝখানে, কচিৎ কখনও একজনের আবেদন তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছায়—বাকী সব আমাদের চোখে ব্যর্থ হয়। এমন যে সাবিত্রী তিনিও তাঁর যুগে একলাই সাবিত্রী ছিলেন।" একটু থামিয়া কমল বলিল, "আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর যে কোনও দেশের ইতিহাস খুঁজলে দেখতে পাবে স্বামীর জন্য আত্মত্যাগ, স্বামীকে বাঁচাতে অথবা তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছায় নিশ্চিত মৃত্যুর নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া এখনও একেবারে বিরল হ'য়ে যায় নাই।"

বলিলাম, "বিরল না হ'লেও হ'তে হয়ত বেশী দেরী নাই! যে ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ আত্মবিসর্জ্জনে সেই গভীর ভালবাসার আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নষ্ট ও বিকৃত হ'য়ে যাচ্ছে। নারী যখন নিজেকে রিক্ত ক'রে ভালবাসতে শেখে তখনই তার ভিতরে আপনা থেকে সতীধর্ম্ম জেগে ওঠে। প্রেম এখন অবসর-সময়ের সৌখিন খেয়ালমাত্র, কাজেই সতীত্বের দৃঢ় ভিত্তি তার উপর দাঁড়াতে পারছে না। কিছুদিন আগেও এদেশের মেয়েরা হাসতে হাসতে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিয়েছেন—তাঁর বিচ্ছেদ-দুঃখ সইতে পারবে না ব'লে। কিন্তু তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সেই দেশের মেয়েদেরই এমন মানসিক অবনতি হয়েছে যে তারা জীবন্ত স্বামীকেও যে কোনও মুহূর্ত্তে দূরে ঠেলতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। সাবিত্রী সত্যবানের জন্য যা করেছিলেন সেই করাটাই খুব বড় কথা নয়, বড় কথা তার মূলে যে আপন-ভোলা গভীর প্রেম ছিল, সেই প্রেম।"

কমল বলিল, "কিন্তু শুধু এই প্রেমই যে তখন অচল সতীত্বের একমাত্র কারণ ছিল তা নয়। এর সঙ্গে ছিল দেবতা, ধর্ম্ম ও পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস। ইহলোকের ক্ষণ-স্থায়ী জীবন ও সুখের অপেক্ষাও পরলোকের অনন্ত জীবন ও অক্ষয় স্বর্গসুখের আকাঙ্ক্ষাই তখন সকলের কামনার ছিল। এই দেবতা ও ধর্ম্মকে আড়াল ক'রে, স্বামী তখন মেয়েদের সম্মুখে দাঁড়াতেন—স্বামী ছিলেন মেয়েদের কাছে দেবতা ও পরলোকের পথে 'গেট' বা তোরণ। মেয়েদের পরলোকে, অক্ষয় স্বর্গে স্থান নিতে হ'লে এই স্বামীর ভিতর দিয়ে তাঁদের যেতে হবে ব'লে তাঁরা জানতেন। তাই তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন ও অবিচ্ছিন্ন সুখের আশায়, পার্থিব সুখ তুচ্ছ মনে ক'রে স্বামীর জীবনে জীবন ও মরণে মরণ বরণ ক'রে এসেছেন। স্বামীকে প্রসন্ন ক'রে নিজের পরলোকের পথ নির্ব্বিঘাট ও পরিষ্কার ক'রে রাখবার চেষ্টা করেছেন। প্রেমের সম্পর্ক যে সব সময়েই সব জায়গায় থাকত তা বলা যায় না। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ তখন শতাধিক বিয়েও হয়ত করতেন আর এইসব স্ত্রীদের মধ্যে অনেকেরই অদৃষ্টে এক বিয়ের রাত ছাড়া, জীবনে আর কোন দিন স্বামীদর্শনরূপ সৌভাগ্যলাভের সুযোগ বড় একটা ঘটত না। কিন্তু এক দিনে এক সঙ্গে যখন এই সব মেয়েরা বিধবা হতেন দূর হ'তে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে—কারণ মৃত্যুকালেও এতগুলি স্ত্রীর একসঙ্গে সেবা স্বামীর ভোগ করবার সুযোগ কখনও আসত না—তাঁদের মধ্যে অনেকেই যাঁদের স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়া সম্ভব হোত না তাঁরা স্বামীর শবদাহের বদলে তাঁর ব্যবহৃত খড়ম, লাঠি, ছাতা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে জ্বলন্ত চিতায় হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে সতী হতেন। এঁদের এইভাবে সতী হওয়ার কারণ কি তুমি প্রেম মনে কর? প্রেমের সম্পর্ক এখানে মোটেই থাকত না বল্লে অন্যায় বলা হয় না;—থাকত, স্বামীকে ইহলোকের দেবতা মনে ক'রে তাঁর উদ্দেশে জীবনত্যাগ ক'রে, চিত্রগুপ্তের হাতে বিনা-কৈফিয়তে ছাড় লাভ ক'রে পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষা। প্রেমই যদি সতীধর্ম্মের কোন কারণ হোত, তাহ'লে পৃথিবীর এত দ্রুতপরিবর্ত্তন হোত না। ভালবাসা কথাটা আজও পৃথিবী হ'তে উঠে যায় নাই—যতদিন সৃষ্টি থাকবে ততদিন থাকতে হবে। অতি নিকৃষ্ট পশুজীবনেও আমরা সঙ্গী-প্রীতির অনেক আকর্ষণের পরিচয় পাই। তাদের মধ্যেও জোড়ার একটা মারা গেলে বা ধরা পড়লে

বাকী অন্যটার ইচ্ছাকৃত শোচনীয় দুর্দ্দশার অনেক গল্প আমরা শুনতে পাই। পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণই স্তর-ভেদে ক্রমশঃ উন্নত ও মার্জ্জিত হ'য়ে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মাঝে স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে। এ ভগবানের স্বেচ্ছার দান—তাঁর সৃষ্টির মূল রহস্য! এর উপর কারও জোর চলে না!"

ঘরের সকলেই কমলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমার কিছু বলা না বলা, এখন দুইই সমান অনাবশ্যক। একটু থামিয়া কমল বলিতে লাগিল, "কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রেমের আদর্শ ও রূপের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে ও হ'য়ে থাকে, বস্তু লোপ পাওয়ার জিনিষ নয়। লোপ পেয়েছে আমাদের মেয়ে-পুরুষ সকলেরই মন হ'তে বিশ্বাস ও ভক্তি। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচি, মতবাদ ও আদর্শবাদেরও পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে। আজ হোক, কাল হোক, দু'দিন পরেই হোক, এই পরিবর্ত্তনের অল্প-বিস্তর সকলকেই নিতে হবে। এই পরিবর্ত্তনের প্রভাবেই আরও অনেক দামী জিনিষের সঙ্গে আমাদের দেশের সতীত্বের প্রাচীন আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হ'য়ে আসছে। চেঁচামেচি, হা-হুতাশ ক'রে বিশেষ লাভ নাই। মানুষের শক্তির চাইতেও বড় এক শক্তি মানুষের জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ ন্যায়-অন্যায়ের দাবীকে অগ্রাহ্য ক'রে নিঃশব্দে সকলের অগোচরে আপনার কাজ ক'রে চলেছে। আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনও মূল্য সে রাখে না—সকলের ধ'রে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টাকে, কখন কেমন ক'রে হেলায় সরিয়ে দিয়ে, সেই শক্তি নিজের পথ নিজে ক'রে সকলের মাঝখান দিয়ে বিজয়রথ টেনে নিয়ে চলেছে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। বাধা দিলে যদি ফল পাওয়া যেত তাহ'লে আমাদের দেশের বেদগান-মুখরিত, হোমধূমে আচ্ছন্ন, শান্ত, পবিত্র, উদার, মহৎ আদর্শ আজ তার বিজয়-রথের চাকার নীচে পথের ধূলায় গুঁড়িয়ে যেত না। এত দুর্গতি অন্ততঃ আমাদের মত নিরীহ, ধর্ম্মভীরু, স্বতঃসন্তুষ্ট দেশবাসীর বরাতে ঘটত না। বর্ত্তমানের যে স্রোত সমস্ত দেশকে প্লাবিত ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, তাকে একটা সীমাবদ্ধ খাতে বদ্ধ করতে যেও না। তোমার চেষ্টা ত বৃথা হবেই উপরন্তু সেই স্রোত বাধা পেয়ে আরও দুর্জ্জয় শক্তিতে ফুঁসে আসবে। তার পথ আরও কেটে, স্রোতকে ক্ষীণবল ক'রে দাও। নানাদিকে পথ কেটে বর্ত্তমানের উচ্ছৃঙ্খল স্রোতকে সংযত শান্ত ক'রে আন। মানুষকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা কর,—যে দেবতারা তাদের কাছ থেকে দূরে স'রে গিয়েছেন, সেই দেবতাদের ফিরিয়ে এনে, মনুষ্যত্বের ভিতর আবার তাঁদের প্রতিষ্ঠা কর। নারীকে জীবনের উচ্চ আদর্শ, মহৎ লক্ষ্যের পথ দেখিয়ে দাও, দেখবে তার লুপ্ত মনুষ্যত্বের সঙ্গে সতীত্বের উচ্চ আদর্শও আবার তার মনে জেগে উঠবে। যে মহৎ হবে, উন্নত হবে,—কোনও নীচ কল্পনা তাকে জোর ক'রে চেপে ধ'রে তার সঙ্কীর্ণ আয়ত্তের মধ্যে টেনে নিতে পারে না।..."

কি বলিতে যাইতেছিলাম—কমলের দৃপ্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিবাদের ক্ষীণ কণ্ঠ আমার মধ্যে মিলাইয়া গেল—বলিতে গিয়া বলিতে পারিলাম না।

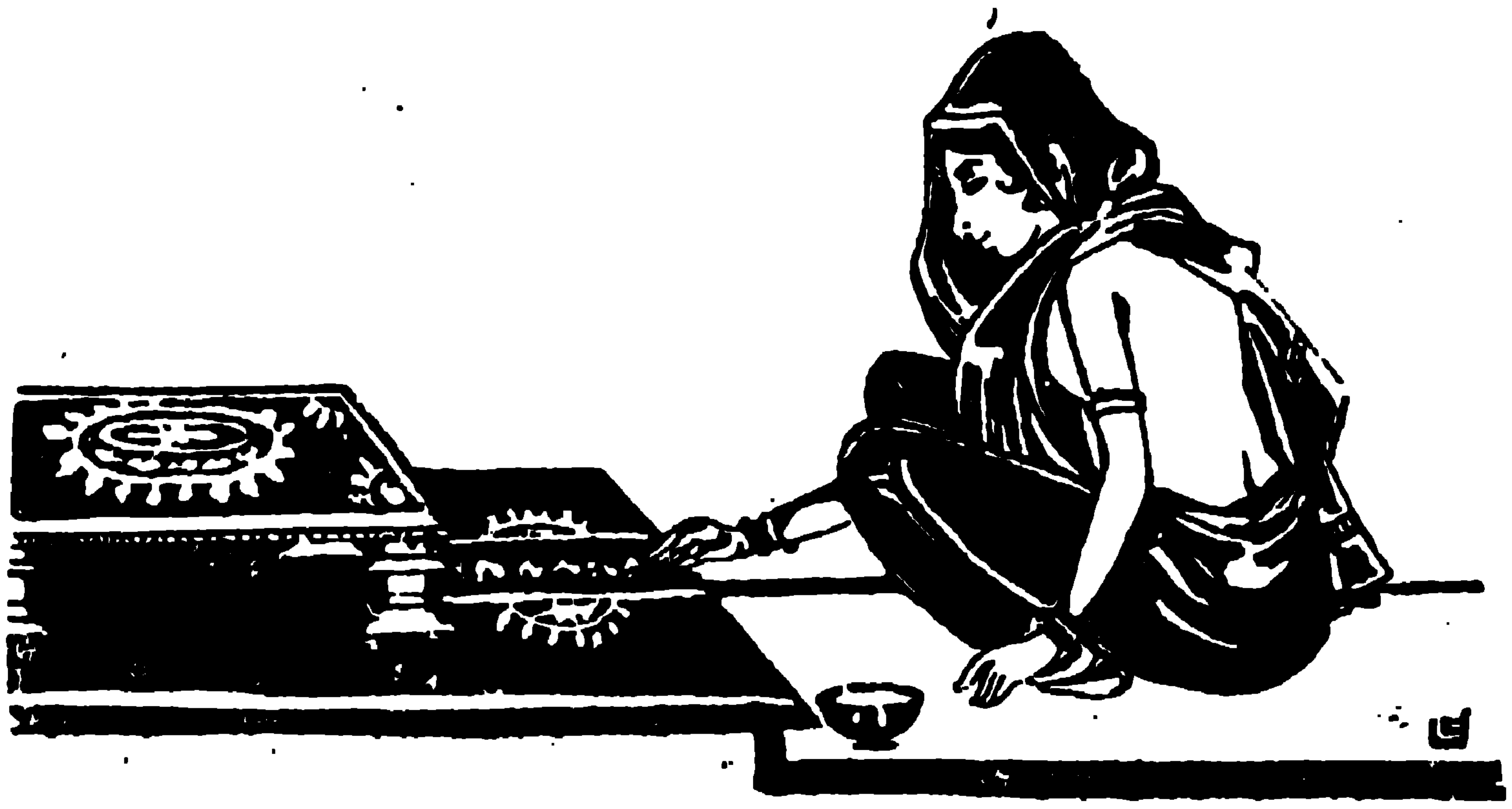

মানব-মনের সিন্ধুশিয়রে

শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানব-মনের সিন্ধুশিয়রে ক্রন্দন শুনি কা'র ?
বহু দূর হ'তে কে ডাকিছে আজ দ্বীপান্তরের পার ?
না ফুটিতে ওগো সন্ধ্যার জুঁই,
ঘরের প্রেয়সী, ঘুমালি কি তুই,
কমলের চোখে ঘনাল কি ছায়া, মেঘের অন্ধকার ?
মানব-মনের সিন্ধুশিয়রে ক্রন্দন শুনি কার ?

(২)

প্রেয়সী, তোমার বাহুলতা আজ শিথিল হইল কেন ?
নিম্ব-রসের তিতা লাগিয়াছে বিম্ব-অধরে যেন !
হোথা, দেখ দূর সমুদ্র-পারে
নীলাম্বরের প্রান্ত-কিনারে
সিন্ধু-শকুন উড়ে যায় দূর পারের যাত্রী হেন !
বিম্ব অধরে চুম্বন তব তিতা হ'য়ে গেল কেন ?

(৩)

এখনো কি মোর স্বপ্নের ঘোর কলঙ্ক-বিভাবরী
পোহায়নি তব বিবশ অঙ্গ অলস অঙ্কোপরি ?
যৌবন-দীপে শেষশিখা তবে,
অবেলায় আজি জ্বালিতে কি হবে,
এই ইন্ধনে পুড়িবে কি তবে শেষের নীলাম্বরী !
স্বপনের ঘোর কাটে নাই মোর কলঙ্ক-বিভাবরী !

(৪)

থাক তবে থাক, দূর সিন্ধুর গর্জ্জন শুনি আজ,
সিন্ধবাদের সৈনিক বুঝি পরেছে সিন্ধু সাজ !
কোথা যেন কোন্ পারাবার-পারে
দীর্ঘ দিনের দূর কারাগারে
মানব-মনের বন্দীরা যেন, সন্ধ্যার ম্লান লাজ—
আবরিয়া মুখে, কাঁদিছে নীরবে, দূর হ'তে শুনি আজ !

(৫)

গৌতম কেন তেয়াগিল গেহ, ছাড়িল সিংহাসন ?
রাজার ছেলের কি অভাব ছিল,—দুঃখের আয়োজন ?
কোন্ বেদনায় ভিখারীর বেশে
গিরিদরীবনে, দুর্গম দেশে—
নিরঞ্জনার অশ্রুতে দিল জীবনের নিবেদন ?
গৌতম কেন কামকাঞ্চনে করিল 'অকিঞ্চন' ?

(৬)

সে কি বুঝেছিল রমণীর রূপে নিখিল নরের মন
পিঞ্জরে পোষা পাখীর মতন করিতেছে ক্রন্দন ?
নিশীথে যখন পালঙ্ক 'পরি
নারীর নয়নে ঘুম এল ভরি',
পুরুষ তখন জাগিল সহসা, শুনিল আমন্ত্রণ—
মানব মনের গিরি-গুহাতলে করিছে কে ক্রন্দন ?

(৭)

কোন্ নারী কবে লালসার লোভে পুরুষের প্রতিভায়
চিরদিন তরে রাখি বাঁধিয়া রক্তকমল-পায় ?
ঘর-মুখে যত টানিছে নারী,
মহাবীর্য্যের মহা আহ্বানকারী
ততবার নর, ছাড়িয়াছে ঘর, ভাবিয়াছে দেবতায়—
কোন্ নারী কবে রাখিল বাঁধিয়া পুরুষের প্রতিভায় ?

(৮)

এ কোন্ পুরুষ মহাবলশালী, আমার মনের তলে—
মহাসিন্ধুর ভৈরব গান রচিল কৌতূহলে ?
ওরে দূরগামী অর্ণবযান,
কোন্ তীর্থের লাগিয়া এ প্রাণ
যোদ্ধার বেশে জাগিয়া উঠিল, কোন্ দীপ সেথা জ্বলে ?
আমার জীবন-তরণী কি তাই ভাসিল সিন্ধুজলে ?

(৯)

আজো যেই কূলে যায় নাই কেহ, হয়নি আবিষ্কার,—
প্রেত-জগতের রহস্যসম যেথায় অন্ধকার—
জোনাকীর আঁখি জ্বলে কিনা জ্বলে,
চন্দ্রকিরণ পড়ে নাকো জলে,
সেই অজ্ঞাত অন্ধ জগতে খুলিয়া বন্ধদ্বার,
আনিব নূতন মানুষের মন, যেথায় অন্ধকার !

(১০)

প্রেয়সী, তোমার কূল ছাড়ি তবে, অকূলে দিলাম পাড়ি,
তোমার মনের মহলে এখন ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী !
আমার মনের বেদনার গানে
নূতন মানুষ জাগিল যেখানে,
সেই অপরূপ প্রাণ-সন্ধানে ভাসাইনু মোর তরী,
মহাসমুদ্রে মিশিবে জীবন অকূল সিন্ধু 'পরি !

অবকাশে সে-দেশের মা-বাপ-ছেলে

এ-দেশের অধিকাংশ মা অবকাশ-সময়টা পরচর্চ্চা করিয়া বা গা গড়াইয়া কাটান ; পিতা নিজের বা পাড়ার বাবুদের বৈঠকখানায় গল্পগুজবে বা তাসে অতিবাহিত করেন ; আর, ছেলেরা ও মেয়েরা রক্ষিত স্থান হইতে আচার-আমসত্ব চুরি করিয়া খাইয়া বা লুকাইয়া নভেল পাঠ করিয়া কাটায়। সে দেশের-মা-বাপ-ছেলেরা সাধারণতঃ অন্যরকমে তাহাদের ছুটি উপভোগ করিয়া থাকে। বাড়ীর মা-বাপ, ছেলে-মেয়েদের লইয়া, মোটর বা সাইকেল-যোগে বাহির হইয়া পড়েন—উন্মুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে ক্যাম্প বা তাম্বু-জীবন যাপন করিবার জন্য ; স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দপ্রদ উপায়ে শিক্ষা দান ও গ্রহণও হইয়া থাকে।

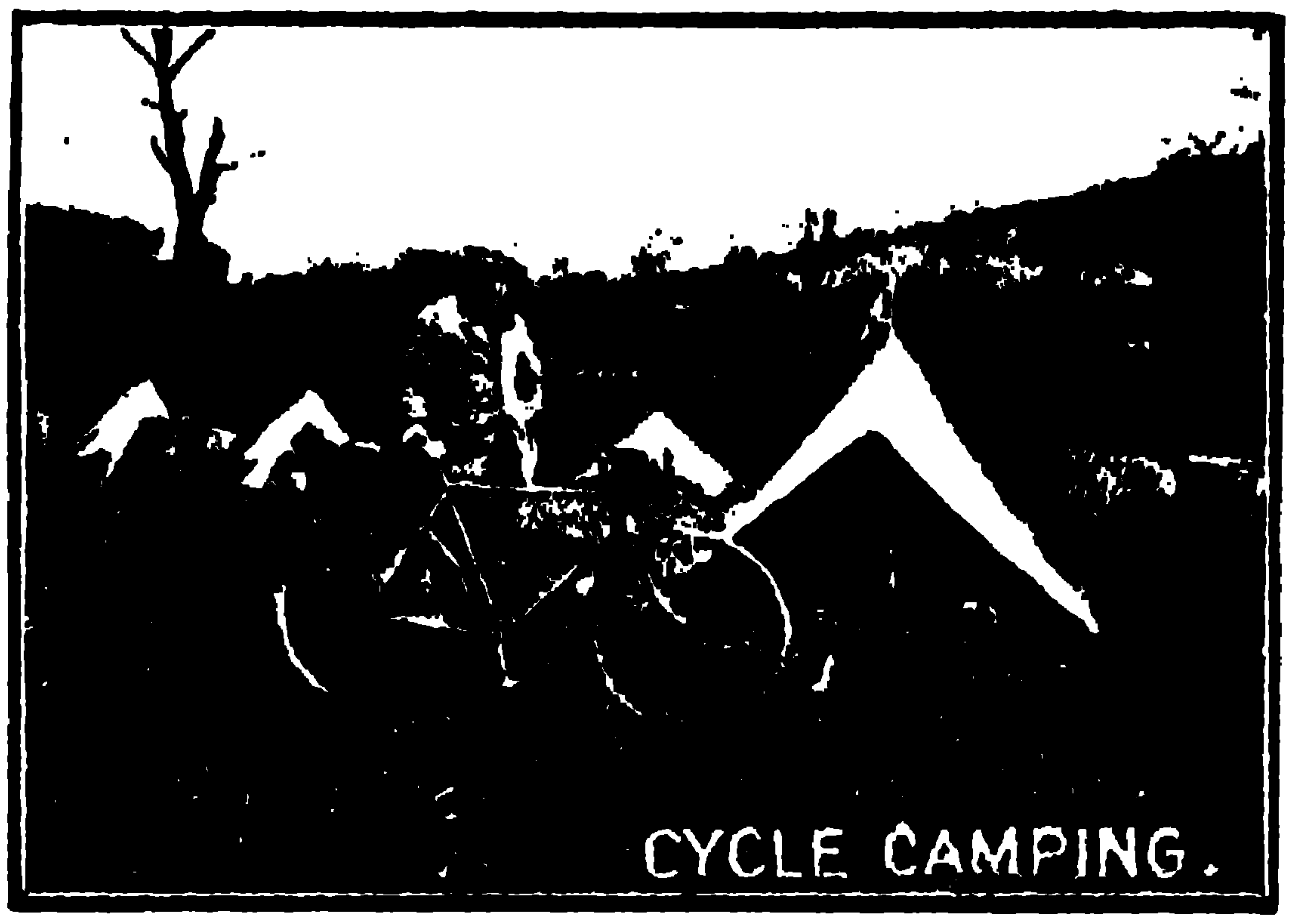
CYCLE CAMPING.

সাইকেল-ক্যাম্পিং : সাইকেলেই সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত বহন করিয়া লইয়া গিয়া মনোমত স্থলে অস্থায়ী আবাস রচনা করা হয়—তাম্বু খাটাইয়া

MOTOR CAMPING.

মোটর-ক্যাম্পিং : গৃহস্থালীর জিনিষপত্রসহ মোটর ইচ্ছানুযায়ী চালিত করা হয়। তারপর নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইলে স্থান মনোনীত করিয়া সেখানে প্রবাস-তাম্বু স্থাপন করা হয়।

CHILDRENS CORN[illegible]

শিশু-মহল : ক্যাম্পে চমৎকার শিশু-মহল রচিত হইয়াছে। মুক্ত আকাশের তলে, অবাধ আলোক-হাওয়ার প্রতিবেশে, প্রকৃতিকে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া শিশুর দল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

নিখিল এসিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা-সঙ্ঘ

নিখিল এসিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা সঙ্ঘ (All Asian Association of University Women) নামক একটি সঙ্ঘ কিছুকাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে, সম্বাদপত্রের পাঠক-

পাঠিকাগণ জানেন। সম্প্রতি 'মিচিগানে' এই সঙ্ঘ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। চীন, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, তুরস্ক এবং ভারবর্ষের প্রতিনিধিগণ এই সঙ্ঘ-মিলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মিলনীর সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষা ছিলেন —কুমারী জানকী অম্মল (চিত্রের বামে)।

জাপানী মূক-অভিনয়

মহীশূরের (Mysore State) 'মহিলা সেবা-সমাজ' তথাকার একটি অগ্রগণ্য প্রগতি-সঙ্ঘ। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার এবং জনসেবায়—ইহার উদ্দেশ্য। সম্প্রতি সেখানে

"জাপানের সৌরভ" নামক একটি নাটকের মূক অভিনয় অভিনীত হইয়াছিল। ঐ অভিনয়-সভায় মহীশূরের যুবরাণী সভাধিনেত্রী-রূপে উপস্থিত ছিলেন।

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(২২)

বিশ্বেশ্বরীকে চিঠি লিখিয়া সঞ্জীব অনেকদিন উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল. কিন্তু সে চিঠির কোনো জবাব আসিল না। তাহার পিতার পত্র সে পাইল বটে, কিন্তু এ বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ বা আভাস তাহাতে ছিল না। সঞ্জীব চিন্তিত হইয়া উঠিল—তবে কি মা সে চিঠি পান নাই ?

ইন্দুলেখার সহিত তাহার কলেজে নিয়মিত দেখা হইত, কিন্তু তাহারা সাবধান হইয়া গিয়াছিল ; সেখানে সকলের সামনে তাহারা আর পূর্ব্বের মত ঘনিষ্ঠতা দেখাইত না। তবে বিকালের দিকে তাহারা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিত। দেখা যাইত, নানা কাজের ছল-ছুতায় proxyর বন্দোবস্ত করিয়া, তাহারা খানিকটা সময় অন্তর সুযোগ বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে ! ফল হইল এই যে, fifth year-এর এগ্‌জামিন শেষ হওয়ার আগের দিন ইন্দুলেখার সহিত সঞ্জীবের দেখা হইলে ইন্দু হাসিয়া বলিল, "মুখ বড় শুকনো দেখ্‌ছি যে, কি রকম লিখ্‌লেন আজ,—ভাল হয়েছে ত ?" সঞ্জীব সেদিন ভাল লিখিতে পারে নাই। কারণ এমন অনেক প্রশ্ন ছিল, যাহা সে ক্লাশ কামাই করার দরুণ একবার পড়িবারও সুযোগ পায় নাই। যদিও সে ক্লাশে একজন ভালো ছেলে ব'লিয়া গণ্য ছিল তবুও তাহার সে বৎসর মনের উড়ুউড়ু অমনোযোগিতার জন্য, কোনো-কিছুতে সেরূপ মন বসিত না। এখন সঞ্জীব ইন্দুলেখার এগজামিনের কথায় পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে, তাই সে হাসিয়া বলিল, "ওই একরকম হ'ল !"

ইন্দু অভিমানের সুরে বলিল, "ওটা একটা মামুলী কথা। আমার সঙ্গেও কি আপনি formalityর সঙ্গে কথা বলবেন ?"

সঞ্জীব অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, লেখাটা সেরকম সুবিধার হয়নি—অনেকগুলো প্রশ্ন আমার পড়াই ছিল না।"

ইন্দুলেখা কিন্তু এ কয়দিন ভালই লিখিয়া আসিতেছিল। সঞ্জীবের কথা শুনিয়া সে একটু ম্রিয়মান হইয়া পড়িল, আর একটা দিন হইলে ত হ্যাঙ্গামা চুকিয়া যায়। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "গা-হাত-পা কাম্‌ড়ে আমার শরীরটা এমনি জ্বর জ্বর করছে ! বোধ হয় কালকে আমি আর এগ্‌জা মন দিতে আস্‌তে পারব না।" সঞ্জীব যদি আর একবছর fifth yearএ থাকে, এবং থাকাই সম্ভব—যখন সে পরীক্ষার জন্য ভাল করিয়া প্রস্তুত হয় নাই এবং লেখাতেও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই,—তাহা হইলে ত ইন্দুলেখা তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে। এ চিন্তা ইন্দুকে ব্যথিত করিল। প্রিয়জনকে অতিক্রম করিতে পারা প্রেমের ধর্ম্ম নয়, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও সে প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে থাকে, সাথে সাথে চলে। সঞ্জীবকে ফেলিয়া ইন্দু কি ডিগ্রি লইবে —না তাহা হইবে না, সে স্থির করিল সে কাল সে অসুখের ছুতা করিয়া ঘরে শুইয়া থাকিবে, এ বছর সে আর এগ্‌জামিন দিবে না। সঞ্জীব তাহার মতলব খানিকটা অনুমানে বুঝিতে পারিল, বলিল, "না ইন্দু ! ওরকম পাগলামি কোর' না,—কর যদি, আমি মনে বড় কষ্ট পাব ! আর মনে করব—আমার জন্যেই তোমার এগ্‌জামিন দেওয়া হোল না, তোমার অকৃতকার্যতার জন্যে আমিই দায়ী।"

ইন্দু লজ্জিত-মুখে হাসিয়া বলিল, "না, না, তা নয়। কিন্তু কাল যদি আমার বাস্তবিক জ্বর আসে—তাহ'লে কি ক'রে আসব এগজামিন দিতে ? ভবিষ্যতের শরীরগতিকের কথা ত কিছু বলা যায় না, যদি বর্ত্তমানে তার কিছু সূচনা হ'য়ে থাকে।"

"নাঃ তোমাকে আমি চিন্‌তে পেরেছি—আদুরে বোন্‌ তুমি, যদি খেয়াল হয়, বিছানায় শুয়ে থাক্‌বে, আর তোমার

দার্শনিক দাদা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌বেন, 'তা হ'লে থাক ইন্দু! তোর আর এ-বছর এগজামিন দিয়ে কাজ নেই।' আমিও পড়া তৈরী না হ'লে স্কুলে যাবার ভয়ে ছেলেবেলায় অনেক কিছু করেছি!—সব বুঝি!" বলিয়া সঞ্জীব ছেলে-মানুষের মত হাসিতে লাগিল।

তার বিরস বদনে হাসি ফুটিতে দেখিয়া খুসী হইয়া ইন্দুলেখা বলিল, "তবু ভাল! আপনি যে আমাকে আজকাল একটু একটু চিন্‌তে পারেন এ আমার ঢের ভাগ্যি!—কাল আমি ঠিক আসব, আপনার এ অভিযোগের পর আমার আর না এসে উপায় নেই!"

সঞ্জীব মেসে ফিরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া আসা আবশ্যক অনুভব করিল। সে এস্‌প্লেনেড-গামী ট্রামে চড়িয়া ব'সল। ট্রামে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এই যে এতক্ষণ ইন্দুলেখার সহিত তাহার সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্ত্তা হইয়া গেল, তাহা তাহার মন ভুলাইবার জন্য খানিকটা ছলাকলার অভিনয় না অন্য কিছু?

সঞ্জীব ও ইন্দুলেখার এগজামিন হইয়া গেল। এখন দিন-কতকের জন্য তাহারা নিশ্চিন্ত—সামনে অখণ্ড অবসর। এই সময়টা সঞ্জীব প্রায় রাঁচি যায়, কিন্তু এ বার গেল না। বিশ্বেশ্বরী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, মোটামুটি তাহার জবাব লিখিয়া দিল। পরীক্ষার পড়ার চাপে তাহার শরীর খারাপ, অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া সে জানিয়াছে, দিনকতক তাহার কোথাও চেঞ্জে যাওয়া দরকার; রাঁচিতে এখন গরম পড়িয়াছে—সে এ-বছর দার্জ্জিলিং যাইবে।

সে তাহার বিবাহের কথা, টাকা পাঠানর কথা, কিছুই লিখিল না। মা-বাপের উপর রাগ ও অভিমানে তাহার মনখানি ঝড়ের আগের প্রকৃতির মত রুদ্ধ-আবেগে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

গ্রীষ্মের ছুটির সময় কোনো পাহাড়-পুরীতে গিয়া শীত উপভোগ করা হরমোহন বাবুর একটা মস্ত সখ ছিল। এ বিষয়ে তিনি টাকার হিসাব করিতেন না। সংসার-খরচ বাদে সমস্ত বৎসরের স্বল্প-সঞ্চিত অর্থ তিনি এই ভ্রমণ-আনন্দে নিঃশেষে খরচ করিয়া আসিতেন। ইন্দু-লেখাও প্রতি বৎসর তাঁহার সহিত যাইত। হরমোহন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইন্দু-লেখার প্রতি শিশুর মত নির্ভরশীল ছিলেন; তাই ইন্দুকে ছাড়িয়া বিদেশে কোথাও এক-পা বাড়াবার কল্পনা করা পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ইন্দু আসিয়া, যেন একটু লজ্জিত-মুখে হরমোহন বাবুকে বলিল, "আচ্ছা দাদা! সঞ্জীব বাবুও দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন এ বছর; তাঁকে আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে বল্‌লে হয় না?"

হরমোহন বাবু বলিলেন, "বেশ ত, তাহ'লে সব এক-সঙ্গে বেড়ানো হয়,—গল্প-আলোচনায় দিনগুলো এক-রকম ভালোই কাটে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকলে কি তাঁর সুবিধা হবে? বড়লোকের ছেলে, কোনো ভালো হোটেল, কিংবা স্যানিটেরিয়েমে থাকতে চাইবে হয় ত!"

ইন্দুলেখা বুদ্ধিমতী, সে মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, এই প্রস্তাবে সঞ্জীব নিশ্চয়ই আনন্দের সহিত সম্মত হইবে। আর, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে না, এই আশাতেই ত সে বাড়ী না গিয়া এবার দার্জ্জিলিং যাইতে চাহিতেছে। দাদা ত আর তাহা জানে না, সঞ্জীবের মনের কতখানি যে আজ তাহার বোনটি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ ইন্দুলেখাকে অদেয় সঞ্জীবের কি থাকিতে পারে! ইন্দুলেখা বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "সঞ্জীব বাবুকে রাজী করবার ভার আমার উপরে; তোমার কোনো আপত্তি নেই ত?"

"না তাতে আমার কি আপত্তি থাক্‌তে পারে?"

সাইকলজির প্রফেসর বোনের মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া মৃদুহাস্য গোপন করিলেন।

দার্জ্জিলিংয়ে ম্যাকিণ্টস রোডে তাহারা একখানি ছোট বাড়ী লইয়াছে। রহস্যভরা কুয়াসার অন্ধকারে তাহারা সকাল-সন্ধ্যায় হাল্কাভাবে গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোনো দিন হরমোহন বাবু সঙ্গে যান, কোনো দিন যাইতে পারেন না, ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করেন। কিন্তু সেই দুইটি তরুণ-মনের যেন অক্লান্ত উৎসাহ! প্রকৃতির সৌন্দর্য্যনিকেতনের নব নব কক্ষ আবিষ্কারের

জন্য সহরের ইট-কাঠ-পাথরের কারাগার-মুক্ত, স্কুল-পালানো দুইটি বালকবালিকার মত তাহারা সারা দিন প্রাণের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় !

সেদিন বিকাল বেলা তাহারা যখন চা-পান করিয়া বাহির হইল, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার—ক্ষণিক বৃষ্টিসিক্ত গাছপালা মেঘমুক্ত রৌদ্রকরে চারিদিকে ঝলমল করিতেছে !

মল রোডের চারিদিকের জনসমাগমের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহারা পছন্দ করিত না। জনশূন্য বার্চহিল রোড বাহিয়া তাহারা সেদিন একটা ঝর্ণার সঙ্গে সঙ্গে, উহা কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে দেখিবার জন্য কার্ট রোডের দিকে আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া ক্রমাগত নীচে নামিয়া যাইতেছিল।

দার্জ্জিলিং সুন্দরীর হাসিতে বিশ্বাস নাই, কারণ কাঁদিতে তাহার বেশীক্ষণ লাগে না। সঞ্জীব একটি ছাতা লইয়াছিল। হইলও তাই।

অনেক দূরে, জঙ্গল-ঢাকা নীচের খাদে যেখানে শাদা মেঘ কুণ্ডলী পাকাইয়া গুহার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল, সেগুলি ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া, বিস্তৃত হইয়া, চারিদিক কুয়াসার জালে ছাইয়া ফেলিল। ক্রমশঃ কুয়াসা ঘন হইতে ঘনতর হইয়া মেঘের আকার লইল এবং ঝুপ ঝুপ করিয়া চারিদিকে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

ইন্দুলেখা আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে আবৃত করিয়া সঞ্জীবের ছাতার মধ্যে মাথা বাঁচাইয়া বলিল, "আপনি ভারি বাদুলে – যেদিন আপনার সঙ্গে বেরুব সেইদিনই বৃষ্টি !"

সঞ্জীব বলিল, "দার্জ্জিলিংয়ের দেবতা যেন আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন—এই ঝরঝরে রোদ আবার এই স্যাঁত-সেতে বৃষ্টি ! এস, এই বড় গাছটির আড়ালে দাঁড়ানো যাক্, ছাতায় আর মাথা বাচে না।"

"আচ্ছা, জীবনের এই হাসিকান্না সুখদুঃখ-ভরা দিন-গুলো কোথায় গিয়ে জমা হয় বলতে পারেন, সঞ্জীববাবু? এই দু'দিনের দেখাশোনার মধ্যে কত কথা, কত আশা, কত সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা—মনের স্মৃতির কৌটায় যেগুলো অমূল্য রত্নের মত চিরদিন রেখে দিতে ইচ্ছা করে, কোথায় তারা হারিয়ে যায় ! কত জিনিষ আমরা পাই, মনে হয় তা নিত্যকালের জিনিষ, কিন্তু কালকে আর তাদের সন্ধান মেলে না !"

নির্জ্জন রাস্তায়, কুয়াসার অন্ধকারের অন্তরালে, মেঘলোকের মধ্যে বাহিরের জগতের মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব এই দুটি আপনাহারা তরুণ-মনের কাছে কুয়াসারই মত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদার কথাবার্ত্তা শুনে শুনে তুমিও যে শেষে মৈত্রেয়ীর মত দার্শনিক হ'য়ে উঠলে ! কিন্তু যদি হঠাৎ ব'লে বস, "যেনাহং কিং কুর্য্যাম যেনাহং নামৃতস্যাম—তা'দিয়ে আমি কি করব যা'তে আমাকে অমরত্ব দেবে না", তা হ'লে যে আমি বড় মুস্কিলে পড়ব ইন্দু!"

ইন্দুলেখা লজ্জাবতীর মত সঙ্কুচিতা কিশোরী নয়, সে সঞ্জীবের প্রায় সমবয়সী। সঞ্জীবের বাহুর মধ্যে তাহার হাতখানি ছিল, সে বলিল, "আপনার জীবনের মধ্যে যে কি অমৃত গুপ্ত আছে সে আপনি কোনোদিন চেয়ে দেখেন নি, কিন্তু আমি তা খুঁজে পেয়েছি।"

"তুমি অত ভারী কথা বোল না ইন্দু,—বুঝতে পারি না। আমার মনের ভিতরটা এই 'ফগে'র মত হাল্কা, এই ঝরঝর ক'রে জল এল, আবার কুয়াসা কেটে ঝল্‌মলে রোদ্ ! ফুল ফোটে তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে আবার ঝ'রেও যায়; কিন্তু তাই ব'লে তার সৌন্দর্য্যটি কি ক্ষণিকের? একজন প্রেমিকের স্মৃতিতে সে যে চিরকাল অমর হ'য়ে থাকে।"

"আপনিও যে কবি হ'য়ে উঠেছেন সঞ্জীব বাবু! আবার বলেন আমি কবিতা বুঝি না ?"

"ওটা সুন্দরীদের সঙ্গগুণে !"

ইন্দুর কাঁধের ব্রোচে একটা ডালিয়া ফুল আট্‌কান ছিল, সঞ্জীব তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "ইন্দু! আমার কোটের button-holeএ কেউ কখনো ফুল গুঁজে দেয়নি ! দরজি যে কেন এটা তৈরী করেছিল, চিরকাল শূন্য থাকবে ব'লে কি ?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই না, কিন্তু যে-সে ফুল দিলে কি আপনার স্যাহেব-দর্জ্জির সম্মান রক্ষা হবে ?"

"চুলোয় যাক সাহেব দরজি! যার জন্যে সে সুটটা তৈরী করেছে, তাকে বুঝি তোমার চোখে পড়ে না?"

"পড়ে, কিন্তু সে এতদূরে থাকে যে তার নাগাল পাই না। আর সব জিনিষ সে নিতে চায়. কিছুই দিতে চায় না। এত কৃপণ সে!"

সে অভিযোগে কান না দিয়া সঞ্জীব বলিল, "সবই কি তাকে চেয়ে নিতে হবে? অন্নপূর্ণার দানের মর্যাদা যে তাতে অনেক ক'মে যায়! অযাচিত দানই ত সব চেয়ে বড় দান।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তবুও সে দান নেবার জন্য শিবকে একদিন ভিখারী সাজ্‌তে হয়েছিল!"

"শিব ত চিরকালের ভিখারী,—কারো কাছে কিছু চাইতে ত তাঁর অসম্মান নেই। তবুও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবার চাইতে পূর্ণতাময়ীর হাত থেকে তিনি তাঁর ভিক্ষা-ঝুলি একেবারে ভ'রে নিতে চান!"

আপনি আমাকে অশোক বাবুর একটা কবিতা মনে পড়িয়ে দিলেন—'হে নারী! পূর্ণতাময়ী!—পুরুষের অন্তর-আসন, সব শূন্য পূর্ণ করি' বিরাজিছ রাণীর মতন!' চমৎকার, না?"

সঞ্জীব ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিল, "আমি কবিদের দেখ্‌তে পারি না! মেয়েদের অনাবশ্যক প্রশংসা ক'রে, তারা একেবারে তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তাদের মনে এক বৃথা-গর্ব্ব জাগিয়ে দেয়,—তারা যেন কোন্ এক অপরূপ স্বর্গের জীব! আর তুমি বল্‌ছ, শিব অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন,—কিন্তু তাঁকে পাবার জন্যে তপস্যা ক'রে অপারগ হ'য়ে তাঁর বিমুখ মনের ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে যে মদন ও বসন্তের শরণাপন্ন হ'য়ে ছলাকলার নির্লজ্জতার অভিনয় করেছিলেন, তা কোনো ভদ্রমেয়ের উপযুক্ত হয়েছিল কি? কুমারসম্ভবের কবি অকুণ্ঠিতচিত্তে এ রকম চরিত্রের অবতারণা করলেন কোন্ সাহসে? সে তোমাদের মত মেয়েদের হাব-ভাব, ছলা-কলা, স্বামী-ধরা ফাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন ব'লেই ত!"

অপ্রত্যাশিত অপমানের আঘাতে, দুঃসহ বিস্ময়ে ইন্দুলেখা যেন একেবারে নীল হইয়া গেল—কয়েক মিনিট ধরিয়া তার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"এত ছোট মন নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে মেশেন?" ক্রোধে তাহার দুই চোখে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া উঠিল,—অভিমানে চোখ জলে ভরিয়া আসিল!

ইন্দুলেখার মধ্যে বিদ্যুৎ-বৃষ্টির এমন অপূর্ব্ব শোভা সঞ্জীব আর কোনদিন দেখে নাই; সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ সেন, রাগ্‌লে আমি Brute হ'য়ে পড়ি—আমার জ্ঞান থাকে না। আমার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর ইন্দু! আমি মুখে যা' উচ্চারণ করেছি সে আমার মনের কথা মোটেই নয়, তা' তুমি ত জান? তুমি আর কাউকে প্রশংসা করবে, আর কারো কথা তোমার মনে স্থান পাবে, এ আমি সইতে পারি না। আমার ভালবাসা বড় স্বার্থপর কারণ সে এক-অন্ত! তাই আমি কাল্পনিক কারণেই ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে পড়ি। এই আমার মনের দুর্ব্বলতা। আমার দুর্ব্বলতা, অযোগ তা যদি তোমার ভালবাসার আড়াল দিয়ে সকলের কাছ থেকে না ঢেকে নিতে পার ইন্দু, তবে আমি কোথায় আশ্রয় পাব? আর আমার এই অসহিষ্ণুতা মাপ করবে নাকি? তোমাকে বেশী ভালবাসি ব'লেই—"

পুরুষের চেয়ে নারীর ভালোবাসার শক্তি কত বেশী। সাময়িক অপমান, উপেক্ষার আঘাতেও সে মুহ্যমান হয় না। বাহিরে সে লতার মত ললিত, ক্ষীণ-দুর্ব্বল, কিন্তু অন্তরে সে বহুদূর-মূল-প্রসারী বনস্পতির মত ঝড়ের সমস্ত আঘাতে অটল থাকে। প্রিয়কে আবার ফিরিয়া পাইবার প্রতীক্ষায়, তাহার মন জয় করিবার আশায় ধৈর্য্য ধরিয়া, তপস্বিনী উমার মত, সে যে জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করিয়া থাকে!

"আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি ইন্দু! তুমি কি আমাকে মাপ করবে না?"

ইন্দু অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া রহিল, কথা বলিল না, তখনো তাহার চোখের জল শুকায় নাই।

সঞ্জীব কাতর হইয়া বলিল, "বল তুমি আমাকে ক্ষমা করলে?"

শরৎকালের বৃষ্টির মত ইন্দুলেখার চোখে জল মুখে হাসি দেখা দিল। সে তাহার কোটের button-hole এ ডালিয়া ফুলটা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "বাবা-মাকে খবর দিন আমি তাঁদের পদসেবা ক'রে ধন্য হব।"

সঞ্জীব তাহার দুই চক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—কি অনাবিল স্বচ্ছ অতলস্পর্শ গভীরতা।

ক্রমশঃ

এগিয়ে চল্

শ্রী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

চল্‌তে হবে অনেক দূরে,
বইতে হবে বোঝা,
হয় নি যে তোর সরণি শেষ,
হয়নি রে পথ খোঁজা।
মৃত্যু-দুখে থামিসনা রে
চল্ এগিয়ে জোরে,
পড়্‌বি কেন ব্যথায় বাঁধা
নিরাশ পথিক্ ওরে!
যাত্রী ওরে, এই ধরণীর
তীর্থ হ'তে তুই

নিস্‌নে ব্যথা দুখের জ্বালা
ব্যর্থতা শুধুই।
মৃত্যু-জ্বালা মথন করি'
অমৃত কর্ পান,
তীর্থ হ'তে পাথেয় নে রে
ছাড়্ রে অভিমান।
মর্ত্ত্যে কিগো শুধুই আছে
ব্যথার ঘন-কালো?
দেখিস্‌নি কি ভুবন-জোড়া
প্রভাত-রবির আলো!

বঙ্গ-সাহিত্য

শ্রী শিবরতন মিত্র

প্রারম্ভিক

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাধারণ তথ্য *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১। **বৈদিক সাধনা ও বৌদ্ধধর্ম্ম**—বুদ্ধদেব ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্মের আংশিক প্রতিবাদ হইলেও, পূর্ণাঙ্গ প্রতিবাদ বা উচ্ছেদক নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে বহু বহু মহর্ষির বহুপ্রকার দর্শনের ও বহুবিধ সাধনা-দর্শের এক বিরাট সমবায় বুঝায়। যাহাকে বৌদ্ধমত বলা হয়, তাহা চিরদিনই এই বৈদিক সাধনার ভিতর বর্ত্তমান ছিল। বৈদিক ধর্ম্মে প্রথম হইতেই কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের বিরোধ যে বীজরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা বেদের সংহিতা-অংশের অনেক সূক্তে বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ কর্ম্মবাদের পক্ষপাতী, আর রাজর্ষিগণ জ্ঞান-বাদের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-শক্তি ও ক্ষাত্র-শক্তির প্রতিযোগিতা—বৈদিক সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের অতি সুপরিচিত কথা।

বুদ্ধদেবের উদ্ভব, ভারতের বিস্তার ও কর্ম্মের ইতিহাসে যে

---

* বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশলাভ করিতে হইলে, কতকগুলি সাধারণ তথ্য সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। সেইগুলি সমগ্র বঙ্গসাহিত্য-সৌধের ভিত্তি-ভূমি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে সেইরূপ কতকগুলি সাধারণ তথ্যের আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

একটি যুগান্তরকারী সুমহৎ ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। † বুদ্ধদেবের উদ্ভব সুস্পষ্টরূপে কি কি সম্পদ আমাদিগকে দান করিয়াছে, বৈদিক সাধনার কোন্ কোন্ বিশিষ্ট অংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছে এবং কোন্ কোন্ অংশকে গৌণ ও নিষ্প্রয়োজন বোধে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহার তালিকা করা আবশ্যক।

'বুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে স বৌদ্ধঃ'—বুদ্ধির দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহাই যাহারা গ্রহণ করে, তাহারাই বৌদ্ধ। জৈন-মত এবং বৌদ্ধ-মত মূলতঃ একরূপ। কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে শাক্য-সিংহ গৌতমকে 'মহাবীর' বলা হইয়াছে।

'অহিংসা সুনৃতাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহ'—অহিংসা, সত্য ও প্রিয়বাক্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পঞ্চব্রত বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের প্রথম কথা। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মের নীতিবাদের উপরেই এই দুই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। যাগ্‌যজ্ঞ, মন্ত্র, দেবতা প্রভৃতি অ-দৃষ্ট ও অ-লৌকিক উপায়ের উপর নির্ভর না করিয়া মানুষ নীতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এই সমাজেরই সেবা করুক —ইহাই বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা— অ-দৃষ্ট ঈশ্বর বা দেবতার শরণাগত না হইয়া এই সারধর্ম্মের সাধনায় মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া যাঁহারা বুদ্ধত্ব ও জিনত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই উপাসনা কর। এই বুদ্ধ ও জিনের উপাসনা হইতেই অবতার-উপাসনা ও গুরুর উপাসনা বিস্তৃত-রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শাক্য-সিংহ গৌতমের বা ঐতিহাসিক বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অবতার-কথা বৈদিকসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে বুদ্ধদেবও বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এক নূতন রকমের অবতার—এতই নূতন যে, তাঁহাকে 'অবতার' না বলিয়া 'উত্তার' বলাই উচিত। তিনি তপস্যার দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া পরে করুণায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রথমে 'উত্তার', তাহার পর 'অবতার'। বুদ্ধদেবের উদ্ভব মানবীয় তপস্যার বা **মানবতার** বিজয়-গৌরব। মানুষ ঈশ্বর বা এই মানুষেই ঈশ্বর—ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান কথা।

শাস্ত্র ও গুরু—এই দুইটি কথাই বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতারূপে গুরুর প্রতিষ্ঠা? না, গুরুর বাক্য বলিয়া শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা? বুদ্ধদেবের উদ্ভবের দ্বারা গুরুই বড় হইলেন—শাস্ত্র গৌণ হইয়া গেল। শাস্ত্রবাদীরা এই জন্যই বুদ্ধদেবকে নাস্তিক পর্য্যন্ত বলিয়াছেন।

শাস্ত্রের উপর গুরুর প্রতিষ্ঠা—ইহাও মানবতার বিজয়।

বুদ্ধদেবের পর, আমাদের দেশে অনেক সিদ্ধ-গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মণ্ডলীতে, বুদ্ধদেবের ন্যায় বা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় পূজা পাইয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণও এই গুরু-পূজা।

মানুষ সাধনার দ্বারা ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছে, বা ঐশ্বরিক শক্তিসমূহ অর্জ্জন করিয়াছে,—ইহা বুদ্ধদেবের পর অনেক মহাত্মার জীবনে দেখা যাইতেছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য এই-সকল মহাত্মাগণের কীর্ত্তি-কথা।

বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে গুরু-পূজাতেই পর্য্যবসিত হইল। বুদ্ধ-দেবের এবং মহাবীরেরও মূর্ত্তি খুব আড়ম্বরের সহিত পূজিত হইতে লাগিল। বুদ্ধ ও মহাবীরের অলৌকিক কীর্ত্তিকথা, উৎসবে উৎসবে ও অন্যান্য সময়ে, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতির সাহায্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। আবার প্রত্যেক ধর্ম্মের যাহা হয়, তাহাও হইল—নানারূপ 'বামমার্গ'ও প্রচলিত হইতে লাগিল। এই সব 'বামমার্গ'-এর পরিচয় তন্ত্রে ও পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব নামে পরিচিত সমাজের গুপ্ত অন্তরঙ্গ সাধনে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরে বহু লোকসমাগম হয়। বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের গুরুরা সমাজে অতিশয় প্রতিপত্তি সৃষ্টি করিলেন দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণেরা অনেকে বৌদ্ধ ও জৈন-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া, ভিতর হইতে, আবার অনেকে বাহির হইতে, রাজশক্তির সাহায্যে ও নিজেদের প্রতিভাবলে চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি শক্তির মূর্ত্তি ও পৌরাণিক অবতার প্রভৃতিকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধসংঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া,

† সুপ্রসিদ্ধ আধুনিক ঐতিহাসিক H. G Wells বলেন—কেবল ভারতের ইতিহাসে নহে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে।

কি প্রকারে, বৌদ্ধধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়া নহে, ভিতর হইতে বিগলিত করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে নমিত বা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহার নিদর্শন "ভক্তিশতক" নামক গ্রন্থে* বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে, সাধনার যাবতীয় ধারাগুলি আবার আসিয়া একত্র মিলিত হইল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই, জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এই মিলন বা মহা-সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছিলেন।

কবি জয়দেব স্বর্গকে ছোট করিয়াছেন, স্বর্গের সুধাকেও ছোট করিয়াছেন—তাঁহার মতে মানবীয় প্রেম স্বর্গ ও সুধা অপেক্ষাও দুর্লভ! সুতরাং জয়দেব গোস্বামীর রচনায় **মানবতাই** বিজয় দেখা যাইতেছে। চণ্ডীদাসেও ঠিক্ তাহাই—"সবার উপরে মানুষ সত্য', ইহাই চণ্ডীদাস কবির কেন্দ্রীভূত সার কথা। আর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসিয়া যাহা দিলেন, তাহার প্রথম কথা—ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বা ভক্তি বড়। আর এই ভক্তি বা প্রেম-ভক্তি মনুষ্যেরই সম্পত্তি—দেবতার নহে। ভগবান্ নরলীলায় আসিয়া মানুষের বা ভক্তের প্রেমের নিকট বিজিত হইয়া নিজকে সফল করিতেছেন—ইহাই গৌরাঙ্গ-লীলার প্রাণের কথা।

---

* ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র ভারতী এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি গৌড় দেশীয় ব্রাহ্মণ। রাজা পরাক্রমবাহুর শাসন-কালে ইনি লঙ্কাদ্বীপে যান। ভক্তিশতক গ্রন্থ **১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে** রচিত। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবেরই মহাত্ম্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে—

বুদ্ধো বা গিরীশোঽথবা সভগবাংস্তস্মৈর্নমস্কুর্ম্মহে

আবার আছে—

দেবঃ শত্রুর্ণবৈরী হরিবপি ন রিপুঃ কেবলী নং সপত্নে:

সুতরাং—শৈব, বৈষ্ণব ও 'ক্ষপণক' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তখন বৌদ্ধসমাজের ভিতর হইতে, একটা সন্ধি বা মৈত্রীর চেষ্টা হইতেছে। আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতিভা এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত। ভারতবর্ষেও ভোজরাজ, ভর্তৃহরি প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সময়ে রচিত গ্রন্থাদি হইতেও ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ-যুগের সাধনায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, বৌদ্ধনীতি ও বৌদ্ধ মানবতা, আর শঙ্করাচার্য্যের আত্মতত্ত্ব, এই ত্রিধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছিল। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বঙ্গসাহিত্য এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের আয়োজন বা উদ্যোগ-পর্ব্ব।

'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে, শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে বলিতেছেন— ভগবান,—শাস্ত্র, গুরু ও আত্মা—এই তিন প্রকারে আপনাকে জানাইয়া থাকেন।

'শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানায়'।

ব্রাহ্মণ বা কর্ম্মকাণ্ডই শাস্ত্র, বুদ্ধদেব গুরু, আর শঙ্করাচার্য্য বা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী আত্মা, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ বা বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাধন—এই তিনের ত্রিবেণী-সঙ্গম!

২। বৌদ্ধ প্রভাব—এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল তাহার কারণ সনাতন ধর্ম্মের বা বৈদিক সধানার যাহা প্রকৃতই সনাতন বা সার্ব্বজনীন (universal) এবং যাহা প্রত্যক্ষতঃ মানবীয় ও লোকহিতাখ্যের সাধনা (distinctly human and utilitarian), বুদ্ধদেব ও তাঁহার পারিষদগণ তাহাই নিষ্পাদিত করিয়াছিলেন। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম্ম সার্ব্বজনীন হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর ভারতে বৌদ্ধ নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল ভারতে তাহাদের স্থান নাই—ভারতের বাহিরে তাহাদের বাস!

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অপসৃত হইয়াছে—এই কথাই সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কথাটা একেবারেই অমূলক। বৌদ্ধধর্ম্ম, ভারতবর্ষীয় সাধনারই ফল। বৈদিক সাহিত্যে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সত্য নিহিত রহিয়াছে, সেই সকলেরই একটি বিশেষ রকমের বিকাশ ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম্ম আর কিছুই নহে। 'বৌদ্ধ'-নাম ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছে বটে—কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা প্রাণ, ভারতবর্ষ হইতে তাহ যাইতে পারে না। কারণ ইহার প্রাণ একটা স্বতন্ত্র সত্তা নহে- ইহা ভারতবর্ষীয় মহাপ্রাণের একটা বিশেষ প্রকারের প্রকাশ মাত্র। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আধ্যাত্ম-সাধনার অস্থিমজ্জা-মধ্যে সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও বিদ্যমান। যৌবনের মধ্যে শৈশব যেমন, আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া

সার্থকতা লাভ করে, বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকৃতভাবে আলোচিত হয় নাই। ভারতের ইতিহাসে চিরদিন একটি ঐক্যবিধান-চেষ্টা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমরা এখনও স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারি নাই। এদেশে অনেক ধর্ম্মকলহ, অনেক সমাজ-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্য হইতে যাহা কিছু স্থায়ী ও মূল্যবান উপকরণ, তাহাই গ্রহণ করিয়া, ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতে করিতে ভারতের বর্ত্তমান সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতকে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে, আমরা ইহার বিরাট অতীতের সমগ্র সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিব।

৩। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন রূপ—সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় তাঁহার 'Comparative Study in Vaishnavism and Christianity' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে, বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাসমূহ কি প্রকারে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এইস্থানে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

(১) উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানেও ভক্তগণের পক্ষে বৈদিক যজ্ঞাদির ত্যাগের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড একেবারে বর্জ্জন করে। বৈষ্ণবেরাও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এই লক্ষণ বৌদ্ধসাধনার ফলস্বরূপ এবং ইহার মূলবীজ উপনিষদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। (২) বৈদিক-যজ্ঞের পশুবধের বিরুদ্ধে অহিংসার শান্তি-পতাকা উত্তোলন করিয়া বুদ্ধদেব যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সেই অহিংসাও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। (৩) মৈত্রী, দয়া ও সেবা-আদি হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা হইলেও, বৌদ্ধসাধনার মধ্য দিয়া বলসঞ্চয় পূর্ব্বক, বৈষ্ণবধর্ম্মের মেরুদণ্ড বলিয়া গণ্য হইয়াছে। (৪) নবধাভক্তির যাহা শেষ কথা, অর্থাৎ আত্ম-নিবেদন,—তাহাও, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, বৌদ্ধধর্ম্মের এই তিনটি মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। (৫) প্রতীকোপাসনা (Image-worship), মহাপুরুষগণের ব্যবহৃত বস্তুর পূজা (Worship of Relics), তীর্থ-সেবা প্রভৃতিও, পৌরাণিক সাধনার মধ্য দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে। (৬) বিষ্ণুর অবতার-তত্ত্ব,—যাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ—তাহার বীজও বৈদিক সাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ জাতকমালা পাঠে জানা যায় যে এই বৈদিক সত্য, বৌদ্ধগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আশ্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বিষয়েও বৈষ্ণবধর্ম্মে, বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণতি পরিলক্ষিত হইতেছে। (৭) মানস-ধ্যান, নামযশ, নামাবলী গ্রহণ প্রভৃতি, উপনিষদ মধ্যে সূক্ষ্মভাবে, বৌদ্ধধর্ম্মে উজ্জ্বলভাবে, এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে উজ্জ্বলতম ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত যে বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মেরই বিকাশ, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সেই বিকাশের একটা সোপান মাত্র। (৮) শূদ্র ও মহিলাগণকে আধ্যাত্মিক অধিকার দান, সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার,—বৈষ্ণবধর্ম্মের এই দুইটি বিশেষ লক্ষণও বৌদ্ধ সাধনার ফল। (৯) গৃহী ও সন্ন্যাসীভেদে দ্বিবিধ প্রকারের গুরু-সম্প্রদায় গঠন,—ইহাও বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। (১০) বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের নারীসাধন-প্রণালী কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, বৌদ্ধদিগের যোগ, সমাধি, প্রণিধান, পারমিতা প্রভৃতি, পাতঞ্জল যোগসূত্র, প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থ নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতির নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্য দিয়াই, উত্তরাধিকার-সূত্রে এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস। ভারতের বর্ত্তমান ও ভারতের সুদূর অতীতের মধ্যে, একটা নাড়ীর সম্বন্ধ—একটা পারম্পর্য্যের সচেতন যোগসূত্র রহিয়াছে। সেইটুকু ধরিতে পারিলেই, ভারতবর্ষ আমাদের নিকট সত্যরূপে প্রকাশিত হইবে—নচেৎ নহে।

৪। পুরুষ ও প্রকৃতি-বাদ—বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্গত কতকগুলি সারভূত মহাসত্যের পূর্ণবিকাশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিল, তাহাকে বৌদ্ধসাধনার পূর্ণাঙ্গ

পরিণতি বলা যায় না। বৈদিক ধর্ম্মের কতকগুলি মহাসত্য যেমন বৌদ্ধ সাধনায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তেমনি আরও কতকগুলি তুল্যরূপ প্রয়োজনীয় মহাসত্য উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া পড়িল।

বৈদিক সাধনার 'পুরুষবাদ', 'সোহংবাদ', 'অহংব্রহ্মাস্মিবাদ', বা 'তত্ত্বমসিবাদ,—একত্র করিলেই বৌদ্ধধর্ম্ম পাওয়া যায়। অহিংসা-মন্ত্রও বৈদিক—যদিও বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞে পশুবধের বিধান আছে। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্ম মূলতঃ তিনট প্রধান শাখায় বিভক্ত - কর্ম্ম (Ritualism), যোগ (Occultism and Psychism) ও জ্ঞান (Gnosticism)। ইহার সঙ্গে অবশ্য 'ভাববাদ' (Mysticism) যোগ ক।। যাইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মে এই কর্ম্মকাণ্ড উপেক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডকে বাদ দিয়া সমাজিক ধর্ম্ম চলিতেই পারে না। কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্মকাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইল।

বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করিয়া 'ভক্তিমার্গ' বা 'ভাববাদ' ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইল। আর যোগসাধনা, বুদ্ধদেবের প্রথম হইতেই ছিল। কাজেই, কিছুদিন রাজশক্তির আশ্রয়ে বা অন্যান্য রাজনীতিক কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ-প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্ররূপে আত্মরক্ষা করিলেও, অধিকদিন তাহা স্বতন্ত্র ছিল না। তিব্বত দেশে প্রচলিত লামা-পদ্ধতি আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেবই, পরপর ভিন্ন গুরুর দেহে অবতীর্ণ হইতেছেন। এখনও যিনি প্রধান লামা, তিনি সেই আদিবুদ্ধ হইতে অভিন্ন বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। সুতরাং গুরুমাত্রেই যে নিজ সম্প্রদায়ে বুদ্ধরূপে বিঘোষিত হইবেন, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। গুরুপূজা বা গুরুব্রহ্মবাদ অতি সহজেই বুদ্ধের স্বতন্ত্র উপাসনা অপসারিত করিয়াছিল। গোরক্ষনাথ, মীননাথ প্রভৃতি এই প্রকারের গুরু।

গুরুবাদের সহিত অবতারবাদের সম্বন্ধও অতি নিকটবর্ত্তী। আর অবতারসমূহের ঐক্যের উপর, বা যাবতীয় অবতার এক পরম আশ্রয় বা অবতারী হইতে নিঃসৃত—এই সিদ্ধান্তের উপরেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের, শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরিণতি (Transition) খুবই স্বাভাবিক।

এই স্থানে আর একটি কথা ভাবিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন বৈদিক পুরুষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, শাক্তধর্ম্মও সেইরূপ দেবী-সূক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্ম্মে ক্রমে ক্রমে নারী-উপাসনা (Apotheosis বা womanhood) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক দেবী-সূক্তের প্রধান কথা, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী হইয়া বলিতেছেন—'আমিই আদ্যাশক্তি; নিখিল দেব-ঋষি আমিই প্রসব করিয়াছি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত শক্তি খেলা করিতেছে, সমস্তই আমা হইতে নিঃসৃত।' এই দেবীসূক্ত, আর কেনোপনিষদের ইন্দ্রকর্ত্তৃক উমা-হৈমবতীর আরাধনা - এই দুইটি একত্র করিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রজ্ঞাপারমিতা-তত্ত্বের আবির্ভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাজ্ঞপারমিতা—মহাবিদ্যা এবং বুদ্ধ জননী। কেবল একটি বুদ্ধ নহে—অগণ্য অসংখ্য বুদ্ধ, এই মহা বিদ্যার সন্তানরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং হইবেন

শক্তি-উপাসনা, চিন্তাশীল মানবের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। বিকল্পাত্মক মন (Concrete mind), বস্তুর ভাবনা ছাড়িয়া, সঙ্কল্পাত্মক (Abstract) অবস্থায় উঠিয়া যখনই গুণের বা জাতির চিন্তায় অভ্যস্ত হয়, তখনই শক্তি উপাসনা আরম্ভ হয়।

'পুরুষবাদ' ও 'প্রকৃতিবাদ' বৈদিকধর্ম্মে প্রথম হইতেই রহিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও বাদানুবাদও রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভবের পর, এই বাদানুবাদই চলিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা বাদানুবাদ করেন—কিন্তু সাধারণ লোকে সেই বাদানুবাদের কঠিনতার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারা, পরস্পর-বিরোধী যাবতীয় মতবাদই কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক পণ্ডিতেরই সম্মাননা ও পূজা করে। ইহাও ভারতবর্ষের একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

এই কারণে শিব, দুর্গা, কালী, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রকৃতি যাবতীয় দেবদেবী হিন্দুর গৃহে একত্র পূজিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব্বে, তান্ত্রিকতা, শক্তি-উপাসনা, ভিন্ন ভিন্ন গুরুর উপাসনা, ধর্ম্মপূজা, মনসা-পূজা প্রভৃতি বহু বিরোধী মতের সংঘর্ষ চলিতেছিল। তিনি এই সমুদয় মতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-

দেবকে, তাঁহার ভক্তেরা বলেন—তিনিই রাধা—শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ আজ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন—শ্রীরাধা বা শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের গুরু। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাও বলা যায়। সুতরাং ইহা 'পুরুষবাদ' 'প্রকৃতিবাদে' পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিয়াছিলেন *—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে—তখন তিনি বৈদিক ভারতের সাধনক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের বীজই বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ বুদ্ধদেব, কুমারিল ভট্ট, গোরক্ষনাথ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের সাধনপরিসিঞ্চন, এবং জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রেমমন্ত্রের সিদ্ধ ঋষিগণের তপস্যালোক প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মরূপ মহা-মহীরুহে পরিণতি লাভ করিল।

৫। **ভক্তিবাদ**—ভক্তিমার্গ ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বীজ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে অদ্বৈতবাদ ও ...নমার্গ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও কর্ম্মবাদ যে সময়ে বিপুল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সময়ে 'ভাগবত', 'সাত্বত', 'বৈখানস' ও 'পঞ্চরাত্র' মতাবলম্বী ভক্তগণ, নিভৃতে আপনাদিগের গুরুগত পারম্পর্য্য ও আধ্যাত্ম সাধনার অমূল্য দীপ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন—ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।"†

বৌদ্ধধর্ম্মও যে পরবর্ত্তী কালে দেশ-বিদেশে ভক্তিসাধনার পরিণতিলাভ করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাইতেছি। ‡

এই সমস্ত বিরুদ্ধ-মতের সহিত সংঘর্ষে দুর্ব্বল বা নিষ্প্রভ হইয়া দূরের কথা, ভক্তিতত্ত্বের দার্শনিক গভীরতা যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি'—গীতা (১৩।১৯)

† George Thibant's Introduction to Vedanta Sutra—part I.

‡ 'ভক্তিশতক' নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই প্রকারে বহু যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়া ভক্তিলতার অমৃত বীজ রসসঞ্চয় করিতে করিতে, স্তবকে স্তবকে সুরম্য কুসুমে-সুশোভিত হইয়া, জয়দেব—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় সেই ভক্তিলতাই, তাঁহার পূর্ণ পরিণত সুস্নিগ্ধ ছায়ায় সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাঁহার মহিমার নিকট, অন্যান্য ধর্ম্মসাধনা অন্ততঃপক্ষে কিছুকালের জন্য নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই যে, জয়দেব, চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির ন্যায় কবি, অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব একটি বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক ব্যাপার নহে—তাঁহাদিগের পশ্চাতে এক বিপুল ও দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় সাধনা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা এক মহাসাধনার পূর্ণ-পরিণত অমৃতময় ফলস্বরূপ!

বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে, এই ভক্তি, রস-রূপে গৃহীত হইয়াছিল। ভক্তি যে 'রস'—এই কথাটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বে যে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল তাহা নহে,—শ্রীধরস্বামীর টীকাদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ভক্তি-রসের সাধনাকে, সার্ব্বজনীনরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কার্য্যটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের **মানবতার** গৌরব-প্রতিষ্ঠা, জয়দেব চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি সিদ্ধ কবিগণের মানবীয় রসের মধ্যে ভগবল্লীলার চরম প্রাকট্য প্রদর্শন—এই কার্য্যটিকে, অর্থাৎ ভক্তিকে 'রস'-রূপে বা 'রস-ব্রহ্মরূপে' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই প্রকারেই বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে, সাহিত্য ও ধর্ম্ম, মানবের এই দ্বিবিধ সাধনা, একীভূত হইয়া গেল।

৬। **বৈষ্ণব পদাবলী**—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য-আলোচনার উপযোগী যে সমুদয় উপকরণ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিকতা খুবই কম। একই বিষয় বা উপাখ্যান, বহু কবি পরপর বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। নূতন কল্পনার খেলা নিতান্তই কম।

এ কথাটি সত্য। কিন্তু এই বঙ্গ-সাহিত্যে এবম্বিধ বৈচিত্র্য-হীনতার হেতু কি, তাহাও চিন্তা করা আবশ্যক।

মানব-জাতির উন্নতি-পথ বা সাধন-পথ, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে ঠিক একরূপ নহে। বাঙ্গালীর ইতিহাস বলে—এক সময়ে এই বাঙ্গালী জাতি 'তিব্বত, চীন ও জাপানে' এবং জাভা সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল—'হেলায় লঙ্কা জয়' করিয়াছিল। বাঙ্গালীর অর্ণবপোত, কেবল 'ভারত-সাগর ময়' নহে—অন্যান্য মহাসাগরে ভ্রমণ করিত। এই সব কথা, অনেক পূর্ব্বের। আমরা যে সময় হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইতেছি, সে সময় বাঙ্গালীর এই বাণিজ্যবিস্তার বা রাজ্যবিস্তার প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই অবস্থাটি যে অধঃপতনের অবস্থা, তাহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বাহিরে ছুটাছুটি করা, একটা অভাবের ও প্রয়োজনের তাড়নার ফল। বাঙ্গালীকে সে তাড়না ভোগ করিতে হয় নাই। পৃথিবীর স্বর্গ ভারতবর্ষ—আর ভারতবর্ষের স্বর্গ বাঙ্গালা, ইহা মুসলমান বাদসাহেরাও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই স্বর্গ ছাড়িয়া বাঙ্গালীরা আর কোথায় যাইবে?

কিন্তু বাঙ্গালী বাহিরে দিগ্বিজয়ে বাহির হয় নাই বলিয়াই যে তাহার প্রতিভা ও মনীষা ম্লান হইয়াছিল বা ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা নহে। মানুষের সম্মুখে দুইটি জগৎ রহিয়াছে—একটি বাহিরের জগৎ আর একটি ভিতরের জগৎ। ভারতের আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'বাহিরের শত্রুগণকে জয় করিবার পূর্ব্বে ভিতরের শত্রুগণকে জয় কর। * তাহা হইলেই প্রকৃত বিজয় লাভ করিবে।' বুদ্ধদেবের বাণীও ঠিক এইরূপ। বুদ্ধদেব কেন, ধর্ম্মাচার্য্য মাত্রই এই কথা বলিয়াছেন।

আমরা যে সময় হইতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের নিদর্শন পাইতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালী জাতি, অন্তর্জ্জগতের আধিপত্য লাভ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টান্বিত। এখনও আবার ভারতবর্ষে আত্মশক্তির বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গদেশের চিরন্তন সাধনার মূলমন্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেবই বাঙ্গালার আত্মা—বঙ্গীয় সাধনার মহাসিদ্ধি। তিনি নরলীলায় যে কেবল সর্ব্বোত্তমতা দেখাইয়াছেন তাহা নহে; তিনি দেখাইয়াছেন যে এই মানুষ রণস্থলে বিজয়ী বীররূপে, বা রাজসিংহাসনে মহারাজ চক্রবর্ত্তীরূপে, বা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে', নিজের মানবতার সফলতা লাভ করে না—সর্ব্বোত্তম নরলীলা বেণুহস্তে গোপবেশের ভিতর, নদীর তীরে, চিরবসন্তের কুঞ্জশোভায়, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মধ্যেই, নিজের এক চরম সাফল্য আস্বাদন করে।

সুতরাং, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাহিরের জগতের বিবিধ বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ নানারূপ বিবরণ নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। ভিতরের জগতের এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহা এখনও বর্ত্তমান যুগের মানবের অপরিজ্ঞাত ও স্বপ্নাতীত।

গোরক্ষনাথ কি ছিলেন? মীননাথ প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন? তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বা যোগ-শক্তির যে সকল কথা প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখিতে পাই, সেই সব কথা কি একেবারে অলীক বা শূন্যগর্ভ কল্পনা? মনে করুন, এই সব কথা যদি আংশিক রূপেও সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর এই অন্তর্জ্জগৎ-বিজয়ের কথা, কত বড় কথা, তাহা আমাদিগকে ধীরচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে।

এইবার আর একটি কিছু নূতন রকমের বড় কথা উত্থাপন করিতেছি। সাহিত্য বা বৈষ্ণব-কবিতা জিনিষটি কি? কবি কে?—কবি ও কবিতার সহিত মানবজাতির সম্বন্ধই বা কি?

একটি ভাবের জগৎ রহিয়াছে। এই ভাবের জগতই সত্য জগৎ, নিত্য জগৎ বা চিৎজগৎ। সেই জগতের আলোক আমাদের জগতে বা আমাদের চিন্তায় বা অনুভূতিতে আসিতেছে। সেই আলোকের নাম—'ভাব' *। কবি বা ঋষির হৃদয় একটি যন্ত্র—এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া চিৎজগতের ভাবালোক আমাদের এই অন্ধকারময় ভবসংসারে আসিতেছে। মানুষকে 'ভাবুক' ও 'রসিক'

* 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং—গীতা ৩।৪৩

* Mathew Arnold এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

হইতে হইবে। কবি বা ঋষি যে ভাব আনিলেন, তাহা যদি মানুষের কলা-বিনোদনের একটি মানসিক ক্রীড়নক মাত্র হয়, তাহা হইলে কবির সাধনা নিষ্ফল হইয়া গেল। কবির ভাবালোক হৃদয় দিয়া গ্রহণ কর এবং তোমরাও প্রত্যেকে কবি হও।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিগণ সিদ্ধপুরুষ বা মহাজন নামে খ্যাত †—তাঁহারা প্রত্যেকেই 'চাপরাস'প্রাপ্ত প্রচারক। আমাদের দেশের প্রাচীন কবি মাত্রই, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা Prophet। কাজেই তাঁহাদের মধ্য দিয়া যে সকল ভাব বা চিন্তা পাওয়া গিয়াছে, সেই ভাব ও চিন্তাকে সার্ব্বজনীন করিবার প্রয়োজন পরবর্ত্তী কবিগণ সর্ব্বদা অনুভব করিতেন।

এই কারণে দেখা যায়, মূল কবিকে উপেক্ষা বা অনাদর করিলেও তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত ভাব, চিন্তা এবং আখ্যায়িকা বা লীলাকথাকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহা প্রচার করা হইয়াছে। ভাবকে যাহারা সত্য বলিয়া মনে করে, অর্থাৎ যাহারা 'বস্তু-সত্যবাদী' নহে—'ভাব-সত্যবাদী', তাহাদের পক্ষে, এই প্রকারের সাধনা নিতান্তই স্বাভাবিক।

একটি ভাবের ক্ষীণালোক কবে কোন্ হৃদয়ের মধ্য দিয়া আসিয়া সাহিত্যে শব্দময়ী বা বাক্যময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী কত কবি, সেই ভাবালোকটি, নিজ নিজ হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্য সাধনা করিলেন।

† 'শ্রীমদ্ভাগবত' ১।১।৩।

ক্রমে ক্রমে সেই ভাবালোক, এক মহাভাবের মহিমাময় সূর্য্যরূপে, জাতির হৃদয়ে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া দিল। রাধাতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে, এই শ্রীরাধাই মহাভাব ও 'বৃষভানুসুতা'। কত কবি, ঋষি ও ভাবুকের জীবনব্যাপী মহাসাধনা, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে—তবে আমরা এই শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই নিমিত্ত, প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় যেমন আমরা ব্যাপকতা বা বিষয়-বৈচিত্র্যের অল্পতা বা দৈন্য দেখি, তেমনি গভীরতার ক্রমিক বৃদ্ধিও দেখিতে পাই। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইহাই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং এই লক্ষণটির জন্য আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানুষের অন্তর্দৃষ্টির এই ক্রমবিকাশ, রস-রাজ্যের গভীরতার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবার এই যে ক্রমিক চেষ্টা—কেবল নরলোকে নহে, নরলোক, দেবলোক, বৈকুণ্ঠ ও গোলক—অর্থাৎ সেই অনন্তের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার যে ক্রমিক সাধনা, বৈষ্ণব-কবিতায় বা বৈষ্ণব কবির শ্রীবৃন্দাবনের নরলীলায় এবং বিশেষ করিয়া শ্রীরাধারাণীর তপস্যায় সেই সাধনার মহাসিদ্ধি দেখিতে পাইতেছি। ইহাই বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিতা—আর শ্রীচৈতন্যদেব এই বৈষ্ণব-কবিতার মূর্ত্তিমান শ্রীবিগ্রহ। (ক্রমশঃ)

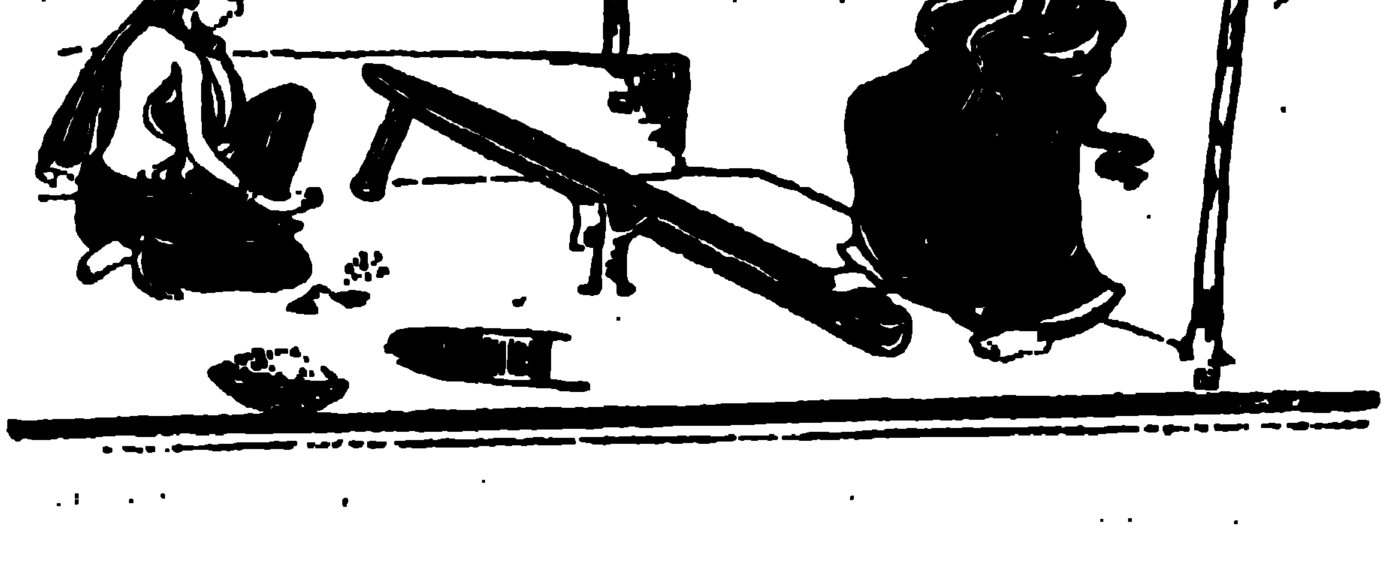

সুলভ খাদ্য

ডাঃ শ্রী সুন্দরীমোহন দাস

স্বচ্ছন্দ বনজাতেন
শাকেণাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থং
কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥

গাছের কোটরে বাস করিত এক পাখী অনেকগুলি ছানা নিয়া। জটাধারী বিড়াল-তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে "মায়া ও, মায়া ও" ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিয়া পক্ষিণীকে বলিলেন, "মা, আমি তপস্বী, আজ তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব।" পক্ষিণী ভীত হইয়া বলিল, "বাবা আমাকে মাপ কর; আমার ঐ ছেলেগুলি বড়ই ভয় পাচ্চে।" বিড়াল-তপস্বী বলিলেন: "সবই মায়া, মায়া, মায়া; ও মায়া ত্যাগ কর। আর দেখ, আমি তপস্বী, মাছ-মাংস খাই না। সুতরাং তোমার ছেলেদের আশ্বস্ত হ'তে বল।"

"স্বচ্ছন্দ বনজাতেন
শাকেণাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থং
কং কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ?"

"এই পোড়া পেটের জন্য কে মহাপাতক করে, যখন সুলভ বনজাত শাকসব্জী খেয়ে সেই পেট ভ'রে যায়।"

বাল্যকালে এই গল্প পাঠ করিয়া এই ধারণা হইয়াছিল যে যাহারা শাকসব্জী খাওয়ার কথা বলে তাহারা ভণ্ড-তপস্বী। আদত খাদ্য মাছ, মাংস, ডিম। কার্য্যতঃ তাহাই দেখিতাম। প্রতিদিন বালভোগের সময় মা একটা হাঁসের ডিমসিদ্ধ খাওয়াইতেন। মাছ আমাদের দেশে প্রচুর। চারিবেলা ভাতের সঙ্গে নানাবিধ মাছের তরকারী ও ভাজা। মাংস দেখিলে আনন্দে নাচিতাম। কলিকাতায় ছাত্রাবাসে একদিন অন্তর মাংসের ব্যবস্থা ছিল। এখন যিনি পরম বৈষ্ণব বৃন্দাবনের মহান্ত সন্ত দাস, ছাত্রাবাসে তিনি ছিলেন তারাকিশোর চৌধুরী। হাড়ে ফসফরাস্ আছে বলিয়া তিনি মুরগীর ঠ্যাং চিবাইয়া খাইতেন।

বাল্যকাল হইতেই মাছ মাংস ডিমই খাদ্য, আর শাক-সব্জী অখাদ্য, এই ধারণা ছিল। নিমন্ত্রণস্থলে নিরামিষ আসিলে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিতাম: "আর বৈদ্যবাটী কেন? পেট ভর্ত্তি হ'লে কি মাংস আসবে?" এখানকার তরী-তরকারী অধিকাংশ বৈদ্যবাটী হইতে আসে।

ডাক্তারী পুস্তকে লেখা ছিল, খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ ৫ প্রকার: প্রোটীড (মাংসজাতীয়), ফ্যাট (মাখনজাতীয়), শর্করা (চিনিজাতীয়), সল্ট (লবণ বা ধাতুজাতীয়), এবং জল। এই পাঁচ প্রকার খাদ্যেই দেহের পুষ্টি ও তুষ্টি। শুনিতাম ফলমূলাহারী মুনিঋষিরা ২০০।৩০০ বৎসর বাঁচিতেন। কথাটা ফুস্ করিয়া উড়াইয়া দিতাম। আমাদের ছাত্রাবাসে কুমারখালী অঞ্চলের এক ছাত্র ছিলেন, তাঁহার নাম বিপিনচন্দ্র চৌধুরী। তিনি ছিলেন নিরামিষবাদী। বিলাতের নিরামিষ-সমিতি (Vegitarian Society) কর্ত্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তিকা দেখাইয়া বলিতেন, "এই দেখুন সাহেবেরা পর্য্যন্ত নিরামিষ ধরেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জন্তু বাঁদর; তারা কখনও মাছ-মাংস খায় না; সর্ব্বাপেক্ষা বলবান জন্তু হাতী গাছপালাই খায়।" আমি বলিতাম, "মশাই, বাঁদুরে বুদ্ধিটা আপনারই একচেটে থাক। আর হাতীটার মতন মোটা-বুদ্ধি আপনাদের আছে ব'লেই মুষ্টিমেয় ইংরেজ আপনাদের ত্রিশকোটীকে কানে ধ'রে ঘুরাচ্চে।" তর্কের সময় যেমন হইয়া থাকে, আমরা মনে করিতাম আমাদের জিত, তিনি মনে করিতেন তাঁহার জিত। আমরা দলে পুষ্ট ছিলাম, দলপতি ছিলেন তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়। তিনি খুব তার্কিক ছিলেন, মনোবিজ্ঞানে এম-এ। আমার স্ত্রী ব্রাহ্মসমাজে আসিবার সময় আমেরিকান মিশন-বাড়ীতে পাদ্রীদের সঙ্গে স্বর্গীয়

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির একটি হাঙ্গামা হয়। তাই তারাকিশোরবাবু তাঁহার হেমাঙ্গিনী নামের পরিবর্ত্তে নাম রাখিয়াছিলেন—"হাঙ্গামিনী"। আমার স্ত্রী ইহার পাণ্টা জবাব দিয়া তারাকিশোরবাবুর নাম রাখিয়াছিলেন—'তর্ককিশোর'। মাংসাশী তারাকিশোর বাবুর সঙ্গে বিপিন বাবু তর্কে হারিয়া যাইতেন।

যাহা হউক, মাংসই যে সর্ব্বপ্রধান খাদ্য, এবং মাংসাশী জাতিই যে শ্রেষ্ঠ জাতি এ ধারণা বহুকাল ছিল। বিশেষতঃ রামপাখী সাহেব-ভোজ্য বলিয়া তজ্জনিত 'কারী' ভোজনার্থ রসনা লালায়িত ছিলেন। দেশে গুরুজন ভয়। কলিকাতা আসিয়া সন্ধান নিলাম আলবার্ট স্কুলের গোয়ালা অভিলাষ ব্রাহ্মসমাজ-ঘেঁষা। তিনি পরে "দুঃখিত" হইয়াছিলেন। নববিধান সমাজে একদিন ১৮০ জন দীক্ষিত হইবার কথা। অভিলাষ বলিলেন, তাঁহাকেও "দুঃখিত" হইতে হইবে। এ-হেন ব্যক্তির হস্তপক্ক পেরু-মুরগী-কারী ভোজনে নাকি স্বর্গ-সুখ লাভ করা যায়। তাঁহার নিকট প্রথম মুরগীভোজন দীক্ষা।

১৮৮৫ সালে দীক্ষা পাইলাম ভিন্ন প্রকার। "মাংস, ডিম" ভোজনে "ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।" এত কালের মাংস লিপ্সা একমুহূর্ত্তে বিদূরিত হইল। আধ্যাত্মিক কারণ আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাব।

কিঞ্চিৎ গবেষণার পর ১৮৯৬ সালে "স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান" লিখিলাম। নাইট্রোজেন-প্রধান "প্রোটীড্" খাদ্যশ্রেণী মাংসপেশী গঠন করে। সেই প্রোটীড-প্রধান খাদ্য মাংস, ডিম প্রভৃতি। সাহেবদের প্রধান খাদ্য তাহাই। আমাদের খাদ্যে কি তেমন প্রোটীড্ নাই? কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মাংসাশীদের বল ও ক্ষিপ্রকারিতা অধিক। আমি লিখিলাম:

"বন্য হরিণ, গাভী ও শূকর কি ব্যাঘ্র অপেক্ষা দ্রুতগামী ও শ্রমসহিষ্ণু নহে? দালাহারী ভারতসৈন্য মাংসাহারী ব্রিটিশ সৈন্য অপেক্ষা যে কিছুতেই ন্যূন নহে একথা কে না জানে?" কথার ভিত্তি চাই কিন্তু বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই শাদা, কালা নয়। পার্ক্‌স্, ওয়ার্ডেন্ প্রভৃতির খাদ্য-বিশ্লেষণ পুস্তকে পাইলাম:

প্রোটীড্

মাংসে শতকরা	......	২০.৫
মসুর দালে	"	২৫.১
সোনামুগে	"	২৩.৮

বস্। লড়াই ফতে! নিরামিষাশী দালভোজীর জয়! কিছুকাল পরে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ৺চূণীলাল বসু মহাশয় সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া খাদ্যবিশ্লেষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাংলা ও ইংরাজী সহজ ভাষায় স্বাস্থ্য-তত্ত্ব প্রচারে তিনিই অগ্রণী। পুস্তকে এবং বক্তৃতায় তিনি দালের মাহাত্ম্য বহুদিন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দাল পর্য্যন্ত। শাকসব্জী? ওসব হাব্‌জা গোব্‌জা মরণকামিনী বিধবাদের জন্য। তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। পুষ্টিকর মসুর খাইলে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিত, তাই বিধি ঐ হাব্‌জা গোব্‌জা, আর নিষেধ মসুর দাল।

১৯১০ সালে ফতোয়া আসিল সমুদ্রের ওপার হইতে, ভাইটামীন্ সংযুক্ত খাদ্য প্রতিদিন চাই। ইহাই খাদ্যের প্রাণ! এই খাদ্য-প্রাণ ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। খাদ্য-প্রাণের মূল শাকসব্জী। "হরিবোল!—লুচী ভাস্‌ল।" যেদিন প্রথম লুচী ভাজার উদ্যোগপর্ব্ব, ঘিয়ের কড়ার চারিদিকে কৌতূহলপূর্ণ গ্রামবাসী কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান। লুচী ঘৃতসাগরে ডুবিয়া গেল; গভীর নৈরাশ্য। যখন ভাসিয়া উঠিল, "হরিবোল!—লুচী ভাস্‌ল" বলিয়া সকলে চীৎকার করিল। এতদিন আমাদের সংস্কার-সাগরে শাকসব্জী নিমগ্ন ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভাবে ভাসিয়া উঠিল। তাই বলি, "হরিবোল! শাকসব্জী ভাস্‌ল।" আজ হাটে মাঠে ডাক্তার অ-ডাক্তারের মুখে ঐ একই কথা "ভাইটামীন্"। আজ বৈদ্যবাটী হইয়াছে জীবন-কাঠি।

ঐ ভাইটামীন্ বা খাদ্যপ্রাণ বস্তুটা কি? ইহার জন্ম-বৃত্তান্তই বা কি?

যে বৎসরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজের ললাটে জয়-তিলক পরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই বৎসরে জেম্‌স্ লিণ্ড্ নামক এক ডাক্তার নৌসৈন্যপ্রাণ রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে একখানা পুস্তক রচনা করিয়া বহুলোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্কার্ভি নামক রোগে বহু নৌ-সৈন্য মারা যাইত। তাহারা ক্রমশঃ রক্তশূন্য এবং

জীর্ণশীর্ণ হইত। নানাস্থানে রক্তস্রাব হইত, চোখ মুখ পা ফুলিত। তাহাদের রসদের সঙ্গে টাটকা নেবুর রস ব্যবস্থা করিবার পর ঐ রোগ একেবারে কমিয়া গেল। কেন? প্রশ্নের উত্তর আসিল না। বেরি-বেরি রোগের যখন প্রথম প্রাদুর্ভাব, জাপানে ও জার্ম্মানিতে পায়রার উপর খাদ্যগুণ পরীক্ষা চলিল। ফলে ছাটা চাল খাওয়াইয়া দেখা গেল তাদের বেরি-বেরি রোগে মৃত্যু হইতে লাগিল। ছাটিয়া যে লাল গুঁড়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা খাওয়াইয়া রোগের উপশম হইয়াছিল। লাল তুষে বা ভূষিতে কি আছে? প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। ইঁদুরকে খাদ্যের সঙ্গে তেল খাওয়াইয়া দেখা গেল তাদের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল; মাখন ও ডিমের কুসুম তেলের পরিবর্ত্তে দেওয়াতে আবার জীবনীশক্তি বাড়িতে লাগিল। মাখন ও ডিমে কি আছে? তখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা নিরুত্তর। ১৯১২ সালে হপ্‌কিন্স্ বলিলেন—খাদ্যের মধ্যে প্রাণস্বরূপ বিদ্যমান কিছু আছে যাহা না থাকিলে কেবল ডিম-মাংস প্রভৃতি ভোজনে জীবন রক্ষা হয় না। তিনি তাহার নাম রাখিলেন সহকারী খাদ্য। ইহারই বর্ত্তমান নাম ভাইটামীন। ইহাদের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে এ, বি, সি, ডি, ঈ।

মাখন বা মাছের তেলে মিশিয়া থাকে ভাইটামীন্ এ—দুধ, ঘি, মাখন, পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতির মেটেতে, রাজহাঁস, মুরগী ও ইলিস জাতীয় মাছ প্রভৃতির মেটে ও ডিমে, শাকসব্জীতে এবং অঙ্কুরিত মটর, ছোলা, গম, সীমের বীচি প্রভৃতিতে ইহা বেশি থাকে। ইহাতে পুষ্টি হয় এবং রোগনিবারণ-শক্তি বৃদ্ধি করে।

জলে গোলা ভাইটামীন্ বি—শুধু জলে থাকেনা, কিন্তু খাদ্যের জলীয় অংশে থাকে। ইহার অভাবে বেরি-বেরি রোগ হয়। চালের উপর যে লাল আবরণ থাকে তাহাতে, ভূসিতে, ডিমে, সীমের বীচি, দাল প্রভৃতি নানারকম বীচিতে, গম, বিলাতী বেগুন, পেঁয়াজ, কমলানেবু, সয়াবীন্ বা ভাটি-কলাই, বড় বড় বর্ব্বটী, বেগুনে সীম, মাখন সীম, করলা প্রভৃতিতে এই পোষ্টাই গুণ থাকে।

জলগোলা ভাইটামীন্ সি—টাটকা ফল, শাকসব্জী, টাটকা অসিদ্ধ দুধ, নেবুর রস, বিলাতী বেগুন, বাঁধা কপি, শালগম, মূলো, লেটুস্ (সেলাড্ শাক), বাঁধুনী শাক প্রভৃতিতে ইহা থাকে। ইহার অভাবে স্বার্ভি রোগ হয়। দুধ কি তরকারী খুব বেশি সিদ্ধ করিলে এই পোষ্টাই গুণ নষ্ট হয়।

মাখনে বা মাছের তেলে মিশান ভাইটামীন ডি—মাখন, ডিমের কুসুম, ইলিস জাতীয় মাছের তেলে (কড্ লিভার অয়েল), পশু পক্ষী মাছের মেটেতে ইহা বেশী পরিমাণে থাকে। ইহার অভাবে ছেলেদের হাড় বাঁকা বা রিকেট রোগ হয়। গর্ভাবস্থায় প্রসূতিদের খাদ্যে এই বস্তুর অভাবে শিশুর দাঁত সময়মত উঠে না। উঠিলেও নষ্ট হয়। মাতৃদুগ্ধ এই রিকেট রোগ নিবারণ করে। সূর্য্যালোক এই ভাইটামীন বৃদ্ধি করে। যে সব গরু ঘরের ভিতর বাঁধা থাকে, তাহাদের দুগ্ধে এই পোষ্টাই গুণ থাকে না।

মাখনে গোলা ভাইটামীন ঈ—লেটুস্, মটর শাক, অঙ্কুরিত যব এবং গমে বেশী থাকে। ইহাতে বন্ধ্যাদোষ নিবারিত হয়।

সর্ব্বপ্রকার ভাইটামীনের মূল কিন্তু শাকসব্জী। সমুদ্রে অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ খায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ। ঐ মাছ খায় কড্ মাছ। তাই কড্ মাছের লিভারে এত ভাইটামীন্। সূর্য্য-কিরণস্পৃষ্ট তৃণভোজী গাভীর দুগ্ধের তুলনায় এত পোষ্টাই গুণ কিসে আছে?

আমাদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবটা আমরা দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িত করি। কিন্তু সাধারণ সুলভ খাদ্য বাছিয়া লইলে সে অভাব থাকে না। প্রথমত ধরা যাউক সকাল-বেলার প্রাতরাশ। চা আর বিস্কুট নইলে চলে না। বস্তুতঃ চায়ে পুষ্টিকর কিছুই নাই, অনিষ্টকর বিষ আছে। কড়া চায়ের বিষ অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি নানা রোগ আনয়ন করে। বিস্কুট প্রভৃতি নরম জিনিষ খাইয়া ছেলেরা স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর নারিকেল মুড়ি চিঁড়ে প্রভৃতি আর খাইতে চায় না। তাই তাহাদের চোয়াল ও দাঁত শক্ত হয় না। খাবারের সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা, আদা ও গুড় খাওয়া উচিত। ধপধপে শাদা চিনি খাইয়া গুড় আর ভাল লাগে না। কিন্তু গুড় অধিক পুষ্টিকর। ইহাতে ভাইটামীন্ আছে, চিনিতে নাই।

আমেরিকার একজন অধ্যাপক মহিলা-ডাক্তার হেলেন

মিচেল আমেরিকান মেডিকেল সমিতির কাগজে লিখিয়াছেন, মৎস্যমাংস-প্রধান এক জেলে বস্তি তিনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে রাত্রি-অন্ধতা, বেরিবেরি, রিকেট্, স্কার্হির্ব প্রভৃতি রোগ অত্যন্ত প্রবল। যথোচিত খাদ্যের অভাবে এই সব রোগ হয়। ইহারা মাছ-মাংস এবং চিনি এবং শাদা ময়দা (কলে ছাঁটা) যথেষ্ট পায়। কিন্তু দুধ, শাকসব্জী এবং ফল পায় না। ছেলেদের দাঁত ভাঙ্গা এবং ক্ষয়গ্রস্ত। মাংস ও গুড় ব্যবহারের দরুণ রক্তে লোহার পরিমাণ ঠিক থাকে ; গুড়ের পরিবর্ত্তে চিনি দিয়া দেখা গিয়াছে রক্ত ক্রমশঃ শাদা ও পাতলা হইয়া গেল। আবার গুড় দেওয়াতে সে দোষ সারিয়া গেল।

এই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সম্বন্ধে কেবল দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমরা পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে জানি না। ঢেঁকি-ছাটা আলোচালের ভাত ফেণ না ফেলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মুগ, মসুর প্রভৃতি দাল,সীম, বেগুন, শালগম, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, মোচা প্রভৃতি তরকারীর সঙ্গে খাওয়া যায়। ঝোলশুদ্ধ মাছ কিম্বা সামর্থ্য থাকিলে দুধ, ঘি, দৈ, ঘোল যদি কিছু কিছু খাওয়া যায়, পালং পুঁই, রাঁধুনী, পেঁয়াজ, কপি, বাঁধা কপির পাতা প্রভৃতি শাক জলের ভাবে সিদ্ধ করিয়া সুপ যদি নিত্য খাওয়া যায়, সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। অশ্বমূত্র-বর্ণবিশিষ্ট চা ও চিনি না খাইয়া, বাজারের বিষাক্ত ধূলাময় মাছিস্পৃষ্ট বাসি ভেজাল খাবার না খাইয়া নারিকেল মুড়ি চিড়ে দই কিম্বা ঘরে প্রস্তুত হালুয়া নিম্‌কি সন্দেশ প্রভৃতি খাইলে পয়সাও বাঁচে, স্বাস্থ্যরক্ষাও হয়। শসা পেঁপে পেয়ারা কালজাম প্রভৃতি ফলের অভাবও গ্রামে নাই। আর দুধ ক্ষীর মাখনের অভাবও ঘুচিয়া যায়—হা চাকুরী যো চাকুরী না করিয়া যদি যুবকেরা গ্রামে গ্রামে গো, গো-শালা, গো-চারণ মাঠ প্রভৃতির উন্নতিবিধানে তৎপর হন এবং দুগ্ধভাণ্ডার সুপরিচালনা শিক্ষা করিয়া গ্রামে ও সহরে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ করেন। আমাদের ধারণা পাশ্চাত্য দেশে মাখন, দুধের দাম বেশি। ভ্রান্ত ধারণা। প্রাগ্, বার্লিন প্রভৃতি সহরে দুধের সের ছয় সাত পয়সা। কারণ তাঁহারা অ-হিন্দু হইয়াও খাঁটি হিন্দুর অবশ্য-কর্ত্তব্য গো-সেবা করিয়া থাকেন। আর আমরা গো-শালায় গো-মাতার প্রতি কুৎসিত নৃশংস ব্যবহার এবং বৎসরান্তে কসাইর হস্তে সমর্পণ দেখিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছি !

অ-বিচার

শ্রী সেবক

তোমরা সবাই দেখিতে দেখিলে
বা'র আবরণটাই—
কাজের বিচারে অগোচর র'ল
'কাজের কারণ' তাই।
অবগুণ্ঠের করিলে বিচার,—
রহিল না কিছু ভিতরে কি আর ?
হাসির ম্লানিমা ?—অশ্রুর গ্লানি ?...
হায়, তা' স্মরণ নাই !

ভ্রূভঙ্গে দেখ ললাটের ক্ষত,
মর্ম্ম না তার বুঝি'
ভাবো,—দুষ্কৃতি-লাঞ্ছনা-লেখা—
কলঙ্ক-ভার বুঝি ?
জীবন-যুদ্ধে যুঝি' অবিরত
শ্রান্ত সে—ভালে অস্ত্রেরি ক্ষত।
তবু, ছি ! কুটিল ক্রূর হাসি হাসো ?
একি আচরণ ভাই !

হায় প্রদীপের কাচ-আবরণ—
ম্লান, ধোঁয়া মলা, কালো,
কি দাহে তোমার দহিল নিদয়
রাত্‌ভোর-জ্বলা আলো।

দীনতা তোমার ঘুচাবে না কেউ?
দুঃখের কালি মুছাবে না কেউ?
তার চেয়ে হও হঠাৎ টুটিয়া
তুমি বিদীরণ—ছাই!

পারুল বৌ

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ বি-টি

"না জেনে সঁপেছে দেবতারে প্রাণ,
ব্যর্থ হবে না পাবে প্রতিদান।
মানুষ রহিবে আপনা ভুলিয়া,
দেবতা অর্ঘ্য লইবে তুলিয়া।"
— হেমলতা দেবী

কলেজে আমি ছিলাম একটু বেশ মুরুব্বি গোছের। তার একটা কারণও ছিল। দেখ্‌তে শুন্‌তে যেমনই হই, লেখাপড়ার সখটা ছিল বেজায়। বিশেষ কবিতার বই নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা আমার একটা 'বাই' বল্লেও চলে। কথায় কথায় শেলী, কীট্‌স, টেনিসন্‌, সুইনবার্ণ আওড়ানর চোটে কলেজের মেয়েগুলার দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে কালে আমি একজন সরোজিনী নাইডু টাইডু হ'তে পারব। এর উপর ছবি আঁকাটাও একরকম আসত, এক্‌জিবিশনে দু-একখানা ছবি বিক্রীও হয়েছিল। এই জন্যেই বোধ হয় সব কাজে আমার মতামত নেওয়াটা ডাল-ভাত খাওয়ারই মত প্রয়োজনীয়ও হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল এই মেয়েদের কাছে। ঐ ত সেদিন অরুন্ধতী যাচ্ছিল তার মামার বাড়ী, সেখানে বিশেষ কোন "একজনের" সঙ্গে তার দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল। আর যায় কোথায়? কাপড় ছাড়্‌বার ঘণ্টা পড়তে না পড়তে সে আমায় টান্‌তে টান্‌তে একেবারে নিয়ে গেল তার বাক্সর সামনে। যেখানে যা কিছু শাড়ী জামা ছিল সব খাটের উপর টেনে ফেলে দিয়ে বল্ল—"ধীর', বল্‌ ত ভাই কোন্‌ কাপড়টা পরব?" কাপড় যদি বা বাছা হ'ল ত চুল বাঁধা নিয়ে এক সমস্যা। কপাল থেকে সব চুল সরিয়ে নেবে, না টিলে রাখ্‌বে? ঘাড়ে খোঁপা তাকে বেশী মানায়, না সে বিবিয়ানা খোঁপা বাঁধবে? রূপোর ফুল দুটো খোঁপার দু-ধারে দেবে, না দুটোই একদিকে দিলে মানাবে বেশী? সিঁদুরের টিপটা ছোট হবে, না গোল চারআনার আয়তন নেবে? এই সবের মীমাংসার পরই না সে নিশ্চিন্তমনে "একজনের" সঙ্গে দেখা করতে যেতে রাজী হ'ল! আর শনিবারের কথা ত' ছেড়েই দাও। কোথাকার সব চুড়িয়ালা, ঢাকাইয়ালার হয় আমদানি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণটা নিয়ে টানাটানি। মণিকার চুড়ি বেছে দিতে হবে, চারুর ছিটের টুকরো দেখে কিনে দিতে হবে। সাবিত্রী তার ভাবী বরকে চিঠি লিখবে, তা' কি রকম চিঠির কাগজ বিলাতফেরৎ নবীন ব্যারিষ্টারের পছন্দসই তাও আমি না ব'লে দিলে চল্‌বে না। শুধু কি তাই? ঐ প্রফুল্লটার পাকা-দেখার দিন তাদের বাড়ী সাজাবার ভার দিলেন আমারই উপর তার মা স্বয়ং। কেবল যে মেয়েদেরই আমা। প্রয়োজন তা' নয় মেয়েদের মায়েরাও এর থেকে বাদ যেতেন না।

কলেজের সব মেয়েগুলাই ছিল আমার অনুগত, তবে মীনার সঙ্গে ভাবটা ছিল যেন একটু বেশী। তার যত

মনের কথা প্রাণের কথা তা আমায় না ব'ল্লে তার তৃপ্তি হ'ত না! প্রত্যেক কাজে আমার মতামত না নিয়ে সে এক-পা'ও নড়ত না। এমন পাগলী কি দুনিয়ায় দুটো আছে?

মীনা পড়ত দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আর আমার ছিল এটা শেষ বছর। সেদিন বুঝি শুক্রবার, বিকালে কাপড়-চোপড় ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমেই দেখি উৎসুক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে মীনা। আমায় দেখেই সে বল্লে—"চলুন আমার সঙ্গে, মোটর দাঁড়িয়ে আছে।" আমি ত তার কথা শুনে অবাক! কোথাও কিছু নেই একেবারে গাড়ী নিয়ে হাজির! আমি একটু হেসে বল্লাম—"দূর পাগল, এখুনি কি ক'রে যাব? সুবর্ণদি'কে না ব'লে কলেজ থেকে পালান ত চলবে না? আগে ব'ল্লে না হয় তাঁকে ব'লে রাখতাম, তিনি ত এখন চ'লে গিয়েছেন চা খেতে। তা ছাড়া ফিলজফির নোটগুলা ত অনেকদিন থেকে তোলা হয়নি, এইবার না ক'রে ফেল্লে অনেক পিছিয়ে পড়ব। তুই বরং তার চেয়ে কাল সকালে একবার নিতে আসিস, আমি ততক্ষণ সুবর্ণদি'র কাছ থেকে অনুমতি-টনুমতি নিয়ে ঠিক হ'য়ে থাকব।" আমার কথায় সজোরে ঘাড় নেড়ে মীনা বল্ল—"না ধীরাদি', তা হবে না, আসুন—অনুমতির জন্যে ভাব্‌বেনা. আমি আগে থেকেই সুবর্ণদি'কে ব'লে রেখেছি, আপনি তখনও নাবেন নি। আমার বিশেষ দরকার, একমুহূর্ত্তও আমি অপেক্ষা করতে পারব না, চট্‌ ক'রে চ'লে আসুন।" কি আর করি—যেতেই হ'ল। মীনার যে বিশেষ দরকার! দরকার বোধ হয় কিছুই নয়, এই নেমন্তন্ন খেতে যাবে হয়ত কোথাও, তাই সে চায় যে সাজিয়ে দেব; কি এইরকমই কিছু। এমনতর যে হয় নি তা ত' নয়? তবুও না গেলে উপায় কি? আল্লা-দীটার চোখ থেকে এখুনি নেবুর রস গড়াবে আর কি!

বাড়ী পৌঁছতেই সে ধ'রে নিয়ে গেল তার শোবার ঘরে, তার মার সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা কর্‌বারও ফুরসৎ দিল না। ব'সেই সে বল্লে—"প্রশান্ত বাবুর কথা জানেন ত?" প্রশান্তর কথা কিছু কিছু জান্‌তাম বটে। প্রশান্তর সঙ্গে মীনার দেখা হয় সিমুলতলায়। কোলকাতায় এসেও প্রশান্ত মীনাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে নি। মীনার সমবয়সীরা এই নিয়ে মীনাকে ঠাট্টা করে এ আমি স্বকর্ণে শুনেছি! তাই একটু হেসে বল্লাম—"ও বুঝেছি, নেমন্তন্নর চিঠিটা কেমন হবে তাই বুঝি আমার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে চাস্‌?" আমার কথায় মীনা একটুও হাসল না, তার মুখটা যেন হ'য়ে গেল আরও গম্ভীর। সে ধীরে ধীরে বল্লে—"না ভাই ধীরাদি', নেমন্তন্নর চিঠি ছাপাবার আগেই তোমার সঙ্গে পরামর্শের দরকার।" একটু থেমে আবার সে বল্‌তে লাগ্‌ল—"মার ইচ্ছা প্রশান্ত বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।" আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম—"বেশ ভালই ত', মার ইচ্ছাটাকে এবার নিজের ক'রে নে, আমরাও লুচি-পাঁটার শ্রাদ্ধ করি।" কিন্তু সে আমায় বাধা দিয়ে বল্লে—"আপনি সব কথা আগে শুনুন, তারপর আপনার কি মতামত আমায় জানাবেন। প্রশান্তবাবু সুপুরুষ, ধনী, শিক্ষিত। বাপ-মায়ের বালাই নেই। সব দিক থেকেই ভাল। এমন লোককে যে মার জামাই করবার সাধ হবে সেটা আর কি আশ্চর্য্য? আর এমন স্বামী পেতে গেলে ভাগ্যের জোর চাই সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। দাঁড়ান, সবটা শুনুন,—যেদিক দিয়েই দেখুন, প্রশান্ত বাবুর মত হীরের টুক্‌রো ছেলে আজকালকার দিনে ক'টা আছে? —কিন্তু চাঁদের কলঙ্কের মত তাঁরও একটু কলঙ্ক আছে—তাঁর প্রথমা স্ত্রী জীবিত।" "বল কি!" আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লাম।—মীনা কিছু বল্‌বার আগেই বল্লাম—"তিনি তোমাদের কাছে এতদিন একথা বলেন নি বুঝি?"

মীনা শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—"প্রথমবার যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় তখন তাঁর পিতৃপরিচয়টাই যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি যেদিন এ বাড়ীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে চান তখন তিনি নিজেই বাবার কাছে সব কথা খুলে বলেন। ব্যাপারটা হ'চ্ছে—এই ১০ বছর আগের কথা। প্রশান্ত বাবুর যখন প্রথম বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ কি ২০। বিয়েতে তাঁর একেবারেই মত ছিল না। বাবা-মা একরকম জোর ক'রেই বিবাহ দেন। বিয়ের পর তিনি কোলকাতায় থেকে লেখাপড়া করতে লাগ্‌লেন, তাঁর স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ীই র'য়ে গেলেন। প্রশান্তবাবুর বাপ-মা ও শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে কোলকাতার বাড়ীতে

এনে রেখেছেন। তিনি কিন্তু নিজে থাকেন আমাদের এই বালিগঞ্জেই। স্ত্রীকে তিনি বেশ স্বচ্ছলতার মধ্যেই রেখেছেন, কিন্তু ঐখানেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সকল সম্পর্কের শেষ। মা বলেন এঁকে বিয়ে করলে সতীন যে আছে এ কথা কোনদিনও টের পাব না। এক্ষেত্রে আমি কি তাঁকে বিয়ে করব? আপনার কি মত?"

মীনার কথাতে আমি ত এক মহাসমস্যায় পড়লাম। কোন্ কাপড় তাকে মানাবে, কি বাঁ কাঁধে দার্জ্জিলিং-এর বড় ব্রোচটা আটকাবে, না নরম কাপড়ের গুচ্ছটা এম্‌নি কাঁধে ফেলে রাখবে, এসব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা এক, আর কেউ কাউকে বিয়ে করবে কিনা—এ একেবারে এক বিপরীত ব্যাপার! কারু বিয়ে আর সম্বন্ধে থাকতে আমি মোটেই ভালবাসি না। কে জানে কার ভাগ্যে কি আছে! শেষে কি আমি তার জন্যে দায়ী হব? আমি এস্থলে নীরব থাকাই উচিত মনে ক'রে মৌনব্রত অবলম্বন করলাম।

মীনা কিন্তু ছাড়ল না। সে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বল্লে—"আচ্ছা মীরাদি', সামান্য কি পরব না-পরব তাও সে আপনার মত না নিয়ে হবার নয়, আর আমার জীবনের এতবড় সমস্যার ভার আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন কোন্ আক্কেলে?—আপনার কোন ভয় নেই, এ বিয়েতে আপনার কি মত স্পষ্ট ক'রে বলুন।" মীনার কাছ থেকে অভয় বাণী পেয়ে আমার যা বলবার তাকে বল্লাম—"দেখ্ ভাই মীনা, যদি কিছু বেফাঁস ব'লে ফেলি ত ক্ষমা করিস। তুই স্পষ্ট কথা শুনতে চাস তাই নির্ভয়ে বলছি। সতীন ভাই আর কিছুই নয় সতীনই, সে যত দূরেই থাকনা। কে এমন মেয়ে আছে যে সতীনের নামে শিউরে ওঠে না? আমি তোর বিষয় তত ভাবছি না; তোর ত' ভাই কিছুরই অভাব নেই, রূপে গুণে ধনে মানে তুই ত' অনেকের উপরে,—প্রশান্তর মত অমন পাত্র তোর অনেক জুটবে, কিন্তু প্রশান্ত বাবুর অভাগা স্ত্রীটার কথাটা একবার ভেবে দেখ্। স্বামী তার নিজের ভোগে নাই আসুক তবু সে জানে স্বামী তারই—একদিন তার স্বামীকে ফিরে পেলেও পেতে পারে, মাত্র এইটুকু আশা নিয়েই না সে বেঁচে আছে! কিন্তু একবার যদি প্রশান্তর বিয়ে তোর সঙ্গে হয় তাহ'লে তার সে আশা চিরদিনের জন্যেই হ'য়ে যায় ধূলিসাৎ। শূন্য গৃহে শূন্য মনে সেই যে একটি মেয়ে চোখের জল ফেলবে তাতে কি তোর মঙ্গল হবে? তার সে দীর্ঘশ্বাস তোর বুকে ঝড় তুলবে না? যার কিছু নেই, যে সর্ব্বস্বহারা, তার কাছ থেকে তার শেষসম্বলটুকু কেড়ে নিয়ে তার সে ব্যথা নারী হ'য়ে তুই-আমি যদি না বুঝব ত' বুঝবে কে? ইহকাল পরকাল তার এই প্রশান্তর সঙ্গেই গেথে গিয়েছে, গাথুনি যতই আল্গা থাকুক ছিঁড়ে ফেলবার নয়। যাক্, তুই মনে করিস না যে আমি তোর বিষয় একেবারেই ভাবছি না—তুই যদি মনে বুঝিস যে প্রশান্তকে না পেলে তোর নিজের জীবন অসম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে তবে তুই তাকে বিয়ে কর, নিজেকে ত বাঁচান চাই—হাতে পেয়ে চিরদিনের জন্যে ব্যর্থতাকে বরণ ক'রে নেওয়া ত' সহজ নয়? তবে কেবল যদি সুপাত্র ব'লেই তাকে বিয়ে করতে চাস, তাহ'লে একবার ভাই সেই মেয়েটার বিষয় ভেবে দেখিস; নারী হ'য়ে নারীরই বুকের কাঁটা হ'য়ে থাকার চেয়ে নিজের সুখ ভোলাটা কি আরও গৌরবের নয়?"

আমার যা বলবার তা ত' ব'লে আমি খালাস। এখন মীনার যা ইচ্ছা হয় সে করুক। বিয়ে-থা'র মধ্যে বাইরের কারু না থাকাই ভাল, তবে মীনা যখন কিছুতেই ছাড়ল না তখন প্রশান্তর সে অভাগিনী বৌটার জন্যে একটু ওকালতি ক'রে আসা গেল। তার নামও জানি না, তাকে চোখেও কখন দেখিনি তবুও সেই পাতায় ঢাকা বনফুলটির জন্যে মনে কেমন ব্যথা বোধ হয়। সূর্য্যের প্রখর তাপ, বর্ষার প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপ্‌টা সব মাথায় নিয়ে সে যে এখনও ঝ'রে যায় নি সে কিসের জোরে? কেবল একদিন তার দেবতার তাকে প্রয়োজন হ'তে পারে এইটুকু আশা বুকে নিয়েই না সে বেঁচে আছে?

যা হ'ক, সোমবার দিন সকালে মীনাকে দেখে ত' আমি অবাক! মুখ-চোখ তার হাসিতে উজ্জ্বল। আমায় দেখেই সে বল্লে—"ওঃ মীরাদি', তুমি যে আমার কি উপকার করেছ তা আর কি বলি। তুমি চ'লে যেতেই মাকে গিয়ে বল্লাম—'দেখ মা, বাবাকে বল প্রশান্ত বাবুকে লিখে দিন যে তাঁকে জামাই পাবার মত ভাগ্য নিয়ে তোমরা আস নি।' আমার কথা শুনে মা ত' প্রথমটা বেশ ঘাব্‌ড়েই গিয়েছিলেন, তার-

পর তাঁকে যখন সব কথা বল্লাম তখন মা বল্লেন—'বেশ ত' বিয়ে না করতে চাস ত' করিস্ নে। সতীন থাকতে বিয়ে দিতে যে আমার খুব ইচ্ছা ছিল তা' নয়,তবে প্রশান্ত ছেলেটি ভাল, যেচে করতে চাচ্ছিল, তাই তোকে একবার ভেবে দেখ্তে বলেছিলাম এই আর কি।' ধীরাদি', আমার মনটা যে কি হাল্কা হ'য়ে গিয়েছে সে আর তোমাকে কি বল্ব, মনে হ'চ্ছে মাথার উপর থেকে কত বড়ই না বোঝা নেমে গেল।" মীনার কথাতে আমি যে সন্তুষ্ট হ'লাম সেটা বলা বাহুল্য। সন্তুষ্ট হবার একটা কারণও ছিল। আমি অনেকদিন থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে আমার অসিত-দা'র সঙ্গে মীনাকে বেশ মানাবে। আর মাস-দুয়েকের মধ্যেই তিনি বিলেত থেকে এসে পড়বেন। এই ঘটকালিটা আমার করতেই হবে।

মীনার ত' একরকম ব্যবস্থা মনে মনে ঠিক ক'রে রাখ্-লাম কিন্তু প্রশান্তর সেই স্ত্রীটা আমায় বড়ই জ্বালাতে সুরু করেছে। সময় নেই অসময় নেই কেবলি তার কথা মনে হ'তে থাকে। তাকে দেখ্বার সখটা দিন দিন বেড়েই যেতে লাগ্ল। শেষে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে তার সঙ্গে একটা সম্পর্কও দাঁড় করালাম—এই সইয়ের বোন্‌পো-বৌয়ের বকুলফুলের ভাইঝি জামাই গোছের আর কি! যা হ'ক, এক শনিবার বিকালে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর্লাম। বাড়ীটি বেশ, দেখ্লেই মনে হয় নারীর কল্যাণহস্তের ছোঁয়াচ এতে লেগেছে।

প্রশান্ত বাবুর বৌটির নাম পারুল। নামটা তাকে মানিয়েছিল বেশ। ফুলেরই মত ছোট্টখাট্ট মেয়েটি সে। তাকে দেখ্লেই রূপকথার পারুল দিদিকে মনে পড়ে—তুলনা যার নেই।

একবার পরিচয়ের পর আনাগোনা রীতিমতই সুরু হ'ল। প্রশান্ত বাবুর এক দূরসম্পর্কের পিসিমাই পারুলের একমাত্র অভিভাবিকা। পারুল বৌয়ের লেখাপড়ার সখ মন্দ ছিল না, নিজের চাড়ে অনেক কিছুই সে শিখে ফেলে-ছিল। একটি ফিরিঙ্গি মেমের কাছে সে নাকি কিছুদিন ইংরেজিও পড়েছিল। মেমটির পরিচয় পেলাম পারুলের পিস্‌শাশুড়ীর কাছে। প্রথম প্রথম পিসিমা আমায় সুনজরে দেখেন নি। আমাকে তিনি ঐ "খিষ্টানী মাষ্টারণীর" দলেই ফেলেছিলেন বোধ হয়। প্রথম দিন তাঁর কথা শুনে ত' আমি হেসেই খুন। যদিও আমি চটীজোড়াটা ঘরের বাইরেই ছেড়ে আস্লাম আর যতদূর সম্ভব পোষাক-পরিচ্ছদে সাবেক ভাবটা বজায় রেখেছিলুম তবুও পিসিমার কাছে আমি র'য়ে গিয়েছিলুম অস্পৃশ্য। অতি সন্তর্পণে নিজের কাপড়-চোপড় বাঁচিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে পারুল বৌকে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাগা বৌমা, সেই আলখাল্লা-পরা নেড়ী মাগীটি আর আসে না বুঝি? তার জায়গায়ই এটিকে জুটিয়েছ? তা' বাছা তার চেয়ে এ একরকম হয়েছে ভাল। তবুও ত বাঙালী,—হোক না কেষ্টান, সাজগোজের একটা ছিরি ছাঁদ আছে। সেই ঠ্যাঙ্গের উপর কাপড়-জড়ান্ ধুচুনি-মাথায় নেড়ীকে দেখলে আমার পিত্তি জ্ব'লে যেত। সারা সিঁড়ি গোবর-জল ছিটিয়ে তবে না আমি সিঁড়ি ভাঙতাম—।"

আমি যে কি কষ্টে হাসি সাম্‌লেছিলাম তা' বলা অসম্ভব। এর উপর যখন পারুল বল্লে যে সেই মিস্ রবিনসনের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে,তখন পিসিমার কথাতে আমি আমার সকল গাম্ভীর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়ে হাস্তে লাগলাম একেবারে মেজের উপর লুটিয়ে প'ড়ে! পিসিমা বল্লেন—"কি বল্লে বাছা, রবি সোমের বিয়ে হয়েছে? কৈ আমাদের ত' নেমন্তন্ন করে নি? একেবারে ফাঁকি দিলে? আসুক তার বাপ, একচোট ঝগড়া করব।" কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে পারুল বল্লে—"না গো পিসিমা না, রবির বিয়ের কথা কে বলেছে,আমি বল্‌ছিলাম আমার সেই মেমের কথা—"পিসিমা এক-মুখ হাঁ ক'রে গালে হাত দিয়ে সুর টেনে বল্লেন—"ও হরি! সে তস্কারও বর জুটল? ওদের সমাজে কি কন্যেদায় নেই? যত পাপ করেছি কি ছাই আমরা? হ্যাঁগা বলদিকিনি, তোমাদের মত সুন্দরীদের পার করতেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাই, আর সে বুড়ীটে পার হ'য়ে গেল? দুগগা! দুগগা!" বিধাতার এক-চোখোমির বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়ে তিনি সারসের মত লম্বা পা ফেলে চ'লে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

একদিন পারুলের ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম বেশ একটু সকাল সকাল। পারুলের তখনও খাওয়া হয় নি, সবে খেতে বস্‌ছিল। আমাকে তার খাবার কাছেই ডেকে

পাঠাল। বামুন ঠাকুর ভাতের থালা পিঁড়ির সামনে বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেল, পারুলও দরজায় খিল্ দিল। তারপর আসন বিছিয়ে আর একটি ঠাঁই কর্‌ল, একখানা শ্বেতপাথর ও কতকগুলি বাটিতে তার নিজের পাত থেকে ভাত তরকারি খানিক তুলে সাজিয়ে রেখে ঢাকা চাপা দিল। আমার একটু কৌতূহল হ'ল। এ বাড়ীতে পিসিমা ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, ঝি-চাকরের কথা অবশ্য আলাদা। পিসিমার যে আঁদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই সেটা ত' জানা কথা। তবে কার জন্যে পারুল নিজে না খেয়ে ভাত তুলে রাখ্‌ল? তাকে জিজ্ঞেস করাতে প্রথম সে চুপ ক'রে রইল, তারপর হেঁটমুখে পাতের ভাত নাড়্‌তে নাড়্‌তে সে বল্লে—"আমি এই ভাবে তাঁর জন্যে ভাত তুলে রেখে তবে নিজে খাই—যদি তিনি বাড়ী আসেন।"

আমার মাথাটা আপনি হেঁট হ'য়ে গেল পারুল বৌয়ের কথায়। এও কি সম্ভব? যে যাকে চায় না তাকে এমন ক'রে চাইতে মানুষ কখনও পারে কি? বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে পারুল বৌয়ের মুখের দিকে চাইলাম, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কবে থেকে তুমি তাঁকে এত ভালোবেসেছিলে?" সে বল্লে, "যেদিন আলো জ্বেলে মালা পরিয়ে মন্ত্র পড়া হয়েছিল। আচ্ছন্নমনে মন্ত্র শুনে মনে হয়েছিল ইনি বুঝি দেবতা, তার পর থেকে সে-ভাবটা আর মুছতে পারিনি।"

স্বামী আসে না পারুল তাই জানে; স্বামী যে আবার বিয়ে করতে গিয়েছিল সে খবর তার কানে পৌঁছয়নি বুঝ্‌লুম। যাক্—তার তপোভঙ্গ না করাই ভাল, তার পতিদেবতা এ পূজা গ্রহণ করুন বা না করুন যিনি সত্যিকার দেবতা তাঁর কাছে পূজার এ নৈবেদ্য ব্যর্থ যাবে না নিশ্চয়! পারুল বৌয়ের চরণে মনে মনে ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করলুম।

রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে ভাবতে লাগ্‌লুম এযুগে এও কি সম্ভব?

অষ্টপদী

শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার

পাই নি সন্ধান—মম মর্ম্ম-কুঞ্জে কবে
ফুটিয়াছ ধীরে ধীরে স্বর্গীয় সৌরভে
কী আশা কী ভাষা ল'য়ে অয়ি মনোলোভে,
বল বল, শুনি কোন্ অরুণ প্রভাতে?

অন্তরের অন্তরেতে দেখি আঁখি মেলে'
বেঁধেছ বাসর-ঘর—গন্ধদীপ জ্বেলে'
প্রতীক্ষায় আছ ব'সে—অবগুণ্ঠ ফেলে'
উদাসিনী-বেশে—নাহি নিদ্ আঁখিপাতে!

নানা কথা

মুক্ত মহাত্মা

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা সুবুদ্ধি ও সদাশয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। দেশ-বিদেশের নিকট-দূরের সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার মহান্ আত্মার সম্মুখে সম্ভ্রম-নত—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলিয়া জগদ্বাসীর সম্পূজ্য তিনি। আমরা জানি, কোন সীমায়তন দ্বারা আত্মাকে আয়ত্ত করা যায় না—নিখিল জগৎ আত্মার আয়ত্তীভূত। আত্মার প্রকাশে নরের মধ্যে নারায়ণ আবির্ভূত হন। আমরা নর-নারায়ণকে নতি জানাইতেছি।...গৃহের মঙ্গল হউক, বাহিরের মঙ্গল হউক; —দেশের মঙ্গল হউক, বিশ্বের মঙ্গল হউক!

*

পণ্ডিত মতিলাল

কয়েক দিন হইল পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। উচ্চ আদর্শের জন্য স্বপরিবারসহ স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়া, শেষে স্বয়ং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন ইনি। ইঁহার মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত-আত্মার উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতেছি।

*

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্ত্তন

জরা যাঁহাকে জর্জ্জর করিতে পারে নাই, জ্ঞানের সাধনায় বার্দ্ধক্যকে যিনি যৌবনের প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, সেই বিশ্ব-পরিব্রাজক ঋষি-মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পরে স্বদেশ-প্রত্যাগমন করিয়াছেন;—আমরা তাঁহাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রদোষ-বর্ণচ্ছটায় ভারত-গগন আবার অনুরঞ্জিত হইয়া উঠুক, এবং গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ প্রদোষক্ষণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

*

প্রতীচ্যে রবীন্দ্রনাথের বাণী

সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এবার প্রতীচ্যে এই বাণী দান করিয়া আসিয়াছেন*—যে, যে-অমৃত মানবাত্মাকে পরম পরিতৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে, চরম ঐশ্বর্য্য-বিলাস-ক্ষমতার মোহাবর্ত্তে পড়িয়া দুর্ভাগ্য প্রতীচ্য জাতি সে অমৃতকে হারাইয়াছে। ইক্ষুর মত দুর্ব্বল অসহায়কে পিষ্ট-নির্জ্জিত করিয়া সম্ভোগ-উপকরণ-আহরণ, আত্মাকে ক্লান্ত-অবনত করিয়া ফেলিয়াছে। অধিকাংশকে বঞ্চিত করিয়া অল্পকে স্বাচ্ছন্দ্য-দান-প্রয়াস, অধিকাংশকে অসন্তুষ্ট এবং অল্পকেও অতৃপ্ত ও অসুখী করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে দিগ্বিজয়-রত আলেকজাণ্ডারকে ভারতীয় সন্ন্যাসী 'দণ্ডী' একদিন বলিয়াছিলেন, "We honour God, love man, neglect goldand contemn death; you on otherhand, fear death, honour gold, hate man and contemn God." অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরকে পূজা করি, মানুষকে ভাল-

---

* নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর হোটেলের বক্তৃতা।

বাসি, সম্পদকে তুচ্ছ এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করি; তোমরা ইহার বিপরীত।

কিন্তু কোথায় সে অমৃত? আমরা বলি, ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি ফিরাও—কান পাতো। ত্যাগী ভারতবর্ষ বলিতেছেন—"ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, লোভের দ্বারা নয়।" *

*

রবীন্দ্রনাথের মতে দেশের জমিদার

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে একটি বক্তৃতায় † প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ একটি অপ্রিয় কঠোর সত্য প্রকাশ করিয়াছেন দেশের জমিদারদের সম্বন্ধে। যথা—"জমিদার কি সর্ব্বনেশে জীব, তোমরা জান, আমরাও জানি। আমি জমিদার, হয়ত আমার মধ্যেও সে পাপ আছে।" সে পাপ কি? তিনি বলেন, "তখন তাঁরা পরম আশ্রয় ছিলেন সকলের। প্রজার সঙ্গে তাঁদের অন্তরের যোগ ছিল, কল্যাণের সম্বন্ধ ছিল। এখন তাঁরা সহরে থাকেন, নিজের কাজকর্ম্ম করেন, উপার্জ্জন করেন, কেবল গ্রাম থেকে টাকা নেবার বেলায় আছেন। এই রকম করে' সম্বন্ধটার গ্লানি হয়েছে। মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কলুষিত হয়েছে—লোভের দ্বারা এবং নানারূপ দুর্ব্বলতার দ্বারা। উপায় নাই, গ্রামের লোক নিরুপায় হয়েছে।" রবীন্দ্রনাথের মতে এই দুর্গতি হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়—"জানান যে, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তোমরা শক্তিহীন হয়েছ, পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে' তোমাদের শক্তিক্ষয় হয়েছে। তোমরা যখন মানব-সম্বন্ধকে স্বীকার করে' একত্রে মিলিত হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে, তখন সকল তাপ, সকল অভাব, সকল দৈন্য দূর হ'য়ে যাবে।"

এই যে মানব-সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া মিলিত হওয়া, ইহা করিতে হইলে তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা করিতে হইবে, এবং এই সকল প্রচেষ্টার প্রথমে তাহাদিগকে জানাইতে হইবে যে, আমরা তোমাদের আপনার লোক। ৫ই অক্টোবর, ১৯৩০-এ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে লিখিত একখানি পত্রে * রবীন্দ্রনাথ এইরূপ কথাই পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছিলেন। যথা—"আমি তো একজন জমিদার··· ·কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে আমি তাদের আপন লোক···এবং আমিই তাদের দিচ্ছি...।

* "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ"—উপনিষদ।

† প্রত্যাবর্ত্তনের পর শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতা।

*

পুরাতন ভৃত্য

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, অনেকদিন পূর্ব্বে কোন এক সাময়িক পত্রে—সম্ভবতঃ মাসিক বসুমতীতে—পড়িয়াছিলাম, কোন এক লেখক রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' নামক প্রসিদ্ধ কবিতার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, এখন আর মনিবের সুখ-দুঃখের সমভাগী সেই পুরাতন ভৃত্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা এককালে এদেশের স্বভাববিশেষত্ব ছিল; এবং দৈনিক বাজার-খরচের পয়সা চুরি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুর বাক্স-পেঁট্‌রা প্রভৃতি ভাঙিতেও আজকালকার ভৃত্যগণ প্রায়শঃই সমান পারদর্শী। ইহার পর লেখক দেশের আব্‌হাওয়া খারাপ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আফ্‌শোষ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ আবিষ্কার করিতে তিনি প্রয়াসী হন নাই। অবশ্য, মূল প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা ছিল না।

*

পুরাতন প্রভু

দেশের আব্‌হাওয়া খারাপ হইবার মূল কারণ হইতেছে পুরাতন প্রভুর পরিবর্ত্তন। ভৃত্যকে স্বকার্য্য-সাধনের যন্ত্র স্বরূপ মনে না করিয়া সেও যে মানুষ—তাহারও যে নিজের শীতাতপ সুখদুঃখ-বোধ বলিয়া কিছু আছে, সেও যে প্রভুর পরিবারেরই একটি প্রাণবান অংশ, তাহার জন্যও যে অন্তরে স্নেহ-মমতা পোষণ করিতে হয়, সে জ্ঞান সত্যই কি প্রভুদের অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই? রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন পত্রে' আছে—একদিন তিনি তাঁহার বিশেষ কোন ভৃত্যকে উপস্থিতির নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না দেখিয়া

* প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

মনে মনে অধৈর্য্য ও রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া প্রাত্যহিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাহার একটি পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুই এই বিলম্বের কারণ। এই পত্রাংশটিতে আমরা কবির গভীর মমত্ববোধ দেখিয়া মুগ্ধ হই। কিন্তু আজকালকার দিনে প্রভুরা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ভৃত্যের এইরূপ বিলম্বের জন্য উহার কারণ জিজ্ঞাসা দূরের কথা, ধমক দ্বারা কৈফিয়ৎ-প্রদান-প্রয়াসী ভৃত্যের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া বসিবেন। অবশ্য, প্রভুভৃত্যের সম্পর্কের আর একটা দিক আছে। তাহা বিনিময়ের দিক—অর্থের সহিত কাজের বিনিময়। কিন্তু বিনিময় ব্যাপারে মূল্যের সমতা থাকা প্রয়োজন। সমতা না থাকিলে অসন্তুষ্টি স্বাভাবিক, এবং তাহাতে কাজেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। সর্ব্বোপরি সত্যকথা এই যে, হৃদয় পাইতে গেলে অগ্রে হৃদয় দান করিতে হইবে—দেখিতে হইবে অপর পক্ষ অন্নবস্ত্রাভাবে বিব্রত কিনা।

*

নারীর কলাকুশলতা নাই

বিলাতের ইটন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ডাঃ সি, এ, এলিংটন সম্প্রতি একটি বালিকাবিদ্যালয়ের (St. Monica's Girls' School. Tadworth, Surrey.) পারিতোষিক-বিতরণ সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "গৃহই তোমাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, গৃহিণীরূপে তোমাদের কর্ম্মকৃতিত্ব সত্যই অনন্যসাধারণ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কলাকুশলতা নাই বলিলেই চলে। স্মরণীয় কোন মহিলা-মহাকবি, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বা ওস্তাদ সঙ্গীতবেত্তা আমরা খুঁজিয়া পাই না। তোমরা বলিবে, তোমাদিগকে সে সুবিধা দেওয়া হয় নাই - আমরা দিই নাই। ইহা সত্য নহে। মধ্যযুগে তোমরা জগতকে কি অবদান দিয়াছ? তোমাদের স্বামীরা যখন মৃগয়ায় ব্যাপৃত থাকিত—তখন কি তোমরা গৃহে প্রচুর অবকাশ লাভ করিতে না? কিন্তু তখনও ত তোমরা কোন স্থায়ী কলাসৃষ্টি করিয়া জগতকে উপহার দান কর নাই? ইহার কারণ কলারসের উপাদান তোমাদের মধ্যে আদৌ নাই। কিন্তু একবিষয়ে তোমাদের মাতৃজাতির তুলনা নাই। তোমরা ধরিত্রীর মতই সর্ব্বংসহা—সহ্যগুণে পুরুষ অপেক্ষা তোমরা অধিকতর সাহসী। পুরুষ যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে থামিয়া যায়, তোমরা নারীরা সেই দুরূহ পথে স্বচ্ছন্দ-হাসিমুখে অগ্রসর হইতে পার।"

আমরা আমাদের দেশের নারীদিগকে ইহার প্রতিবাদ করিতে আহ্বান করিতেছি। কারণ আমাদের কলাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী—নারী।

*

পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি

পল্লীপ্রগতির জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ, অকৃত্রিম পল্লী-সাহিত্যানুরাগী এবং পল্লীসাহিত্যস্রষ্টা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয়ের চেষ্টায় সম্প্রতি বীরভূম, শিউড়ীতে "পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি" নামক একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। বাংলার অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লীসমূহের অন্ধকার বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় যে সকল মহামূল্য মণিসম্পদ অনাবিষ্কৃত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সেইগুলির উদ্ধার, সংরক্ষণ এবং তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই, প্রধানতঃ এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। সৌধ-সাহিত্য-বিলাসের সুলভ করতালির মোহ পরিত্যাগ করিয়া, নাগর-সাহিত্যিক শক্তির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তথাকথিত যশের আশা না রাখিয়া, পল্লীর জন্য এবং পল্লীবাসীদের জন্য এই যে অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ, ইহার জন্য জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই।

'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি'র উদ্দেশ্যকে নিম্নলিখিত চারিটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) দেশের প্রাচীন লোকসঙ্গীতের (লোক-গীত ও লোক-নৃত্য) উদ্ধার ও সংরক্ষণ; (২) বিলুপ্তপ্রায় কথাসাহিত্য, গ্রাম্য শিল্পকলা, আল্পনা প্রভৃতির পুনরুদ্ধার; (৩) বিলুপ্তপ্রায় গ্রাম্য ক্রীড়াকৌতুকের পুনঃ প্রচলন; (৪) এই সমিতির মুখপত্র স্বরূপ 'পল্লীসম্পদ পত্রিকা' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পরিচালন।

সমিতি-পরিচালক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এইরূপ—

সভাপতি (প্রেসিডেণ্ট)—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্;

সহ-সভাপতিদ্বয় শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন। সম্পাদক (সেক্রেটারী)—রায় শ্রী নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়; সহ-সম্পাদকত্রয়—শ্রী গৌরীহর মিত্র বি-এ, জসীম উদ্দীন, শ্রী মনোজ বসু।

আমরা সমিতির সাফল্য কামনা করি।

*

শ্রীযুক্ত দত্তের আবিষ্কার

সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অগোচরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় সংগুপ্ত কোন দ্রষ্টব্যকে সাধারণের দৃষ্টিক্ষেত্রে আনয়ন করাকে আবিষ্কার বলে। আর একরূপ আবিষ্কার হইতেছে—যাহা অহরহই দৃষ্টিগোচর বটে কিন্তু যাহার অপ্রকৃত ছদ্মবেশটাকেই প্রকৃত বলিয়া ভ্রম করিতেছি, ছদ্মজাল উন্মোচন করিয়া তাহার সত্য স্বরূপকে প্রকাশ করা। পরবর্ত্তী আবিষ্কার আবিষ্কারকের পক্ষে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক এবং যশের বিষয় বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ সম্প্রতি এইরূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। 'অত্যাশ্চর্য্য' বলিলাম কেন, তাহার কারণ আছে। নারী-বেশের মধ্যে বীরযোদ্ধার আবিষ্কার কি অত্যাশ্চর্য্য নয়? 'রাই-বেশের' মধ্যে তিনি 'রায়বেঁশের' আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙলার কোন কোন পল্লী-অঞ্চলে রাই বা রাধিকার বেশ পরিধান করিয়া এক-সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর লোক নৃত্য করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত দত্তের অন্তর্দৃষ্টি হঠাৎ ধরিয়া ফেলিয়াছে—'রাইবেশে'র অন্তরালে লুকাইয়া আছে অধুনাবিস্মৃত বাঙলার সেই 'রায়বেঁশে' যোদ্ধার দল—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বহুস্থলে যাহাদের বীরত্বকাহিনী বর্ণিত আছে। আমরা এখানে আর বেশী কিছু বলিব না। এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দত্তের 'বাঙলার পল্লীসম্পদ' প্রবন্ধে ইহার বিস্ময়কর বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা দত্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

*

নবতন ভারত-বিধানে নারীর স্থান

ভারতীয় কবি বলিয়াছেন—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" তারপর বহুদিন গত হইয়াছে, বহু অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া আসিয়া ভারত-নারী সত্যই আজ জাগিয়াছে—সংস্কারের যবনিকা তুলিয়া ফেলিয়া প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। এ শুধু আমাদের কথা নয়; ভারতীয় ষ্টাটুটারি কমিশনকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে—"The women's movement in India holds the key of progress and the results it might attain are incalculably great." অর্থাৎ ভারত-নারীআন্দোলন জাতীয় উন্নতির দ্যোতক এবং ইহার ফল অবশ্যই মহৎ।

কিন্তু নবতন ভারত-বিধানে নারীর রাজনৈতিক অধিকারকে উদাসীন ভাবে আমল দেওয়া হয় নাই জন্য, ভারত গভর্ণমেণ্টের আচরণে শঙ্কিত হইয়া (filled with apprehension by the attitude of the Government of India) ভারত-নারীর প্রতিনিধিরূপে মিসেস সুব্বারায়ণ (Mrs. Subbarayan) এবং বেগম শাহ্ নওয়াজ গোলটেবিল বৈঠকের ভোটাধিকার-সাব্‌কমিটিতে একটি আবেদন পেশ করিয়াছিলেন (২১. ১২. ৩০)।

আবেদনকারিণীদের উদ্বেগ প্রকাশিত হইয়াছিল দুইটি বিষয়কে প্রধানতঃ কেন্দ্র করিয়া। প্রথম—ভোটাধিকার, দ্বিতীয়—ব্যবস্থাপক সভায় স্থানলাভ। ভোটাধিকার সাধারণতঃ বিত্তকে ভিত্তি করিয়া (based on property) নির্দ্ধারিতকরণ প্রচলিত; কিন্তু ভারতে বিত্তাধিকারিণী নারী-সংখ্যা নগণ্য। ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন বিষয়ে দেশের আচার বা সংস্কার স্বভাবতঃই দেশবাসীকে নারী-নির্ব্বাচনে উৎসাহিত করিবে না,—অন্য দেশেও করে না। উদাহরণ স্বরূপ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আইরিশ ফ্রি-ষ্টেটের নাম করা যাইতে পারে। এমন কি সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডও মাত্র ১৫ জন নারীকে পার্লামেণ্টের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। আবেদনকারিণীরা প্রথমোক্ত ভোটাধিকার এবং শেষোক্ত নির্ব্বাচনের জন্য গোলটেবিলের 'বিশেষ বিবেচনা' আশা করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহারা জানিতেন যে 'অনুগ্রহের চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রই সমধিক প্রার্থনীয়' (a fair field and no favour) ভারত-নারীর অভিমত।

আমাদের অভিমত এই যে, 'উপযুক্ত ক্ষেত্র' সমধিক

প্রার্থনীয় হইলেও প্রাথমিক অবস্থায় 'বিশেষ বিবেচনা'র আশা করা অপরাধ নহে। কিন্তু 'উপযুক্ত ক্ষেত্র' নারীকে নিজের সাধনায় অর্জ্জন করিতে হইবে,—জাতি-গঠনে জাতির জননীকে অগ্রসর হইতে হইবে শিক্ষায়, জ্ঞানে, স্বধর্ম্মে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যে, সত্যনিষ্ঠায়, আত্মার তপস্যায়।

*

প্রাপ্তিস্বীকার

প্রথম—আমরা ১ বি ওল্ড্ পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের কলিকাতা ফাইনান্স কোম্পানীর নিকট হইতে ইংরাজী নববর্ষের মনোরম দেওয়াল-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

দ্বিতীয়—বোম্বাই হইতে কে, টী, ডোঙ্গর কোম্পানীর নববর্ষের জননী ও শিশুর চিত্রের (বালামৃত-সেবনে শিশু-সন্তানের আকৃতি কিরূপ হয়) সুবৃহৎ ও মনোজ্ঞ ক্যালেণ্ডার উপহৃত হইয়াছে।

বাংলার পল্লীসম্পদ *

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় মন্ত্রী বাহাদুরকে আজ এখানে পাইয়া আমাদিগকে ধন্য ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। দেশের মঙ্গলকার্য্যে ইনি সর্ব্বদা ব্রতী; তাই আমি এই জেলার সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট কতকগুলি দাবী উপস্থিত করিতে চাই। আশা করি, তিনি এইসব বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এই জেলার প্রভূত মঙ্গল-সাধনে সাহায্য করিবেন।

শিল্প

এই জেলায় এককালে গালার কাজ, কাঁসার কাজ, লোহার কাজ, তাঁতের কাজ, রেশম-শিল্পের কাজ, রঙীন পর্দ্দার কাপড়ের কাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিল্পকার্য্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাহাতে দেশের প্রভূত ধনাগম হইত। তাহার মধ্যে আজকাল সকলগুলির অবস্থাই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি বিলুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জেলার লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এইসব শিল্পীদের মধ্যে শত শত সমবায়-সমিতি গঠনপূর্ব্বক তাহাদের মূলধন-সংস্থানের উপায় ও বাজারে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহাদের মধ্যে সমবায়-সমিতি গঠন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলনের এপর্য্যন্ত যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য এ জেলার সকলেই গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ আছে। যাহাতে এবিষয়ে আরও সাহায্য করা হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য আমরা মন্ত্রী বাহাদুরকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

কৃষি

এ জেলার উন্নতির আর একটি প্রধান অন্তরায়—সেচনের জলের অভাব। বীরভূম একসময়ে প্রকৃতই বীরভূমি ছিল, তার কারণ এ জেলার মাটিতে তখন সোনা ফলিত। এখন নানা কারণে সেচনের জলের নিতান্ত অভাব হওয়ায় প্রায়ই ফসল মরিয়া যায়। পূর্ব্বে যখন এ জেলাতে ছিলাম, তখন সর্ব্বপ্রথম এখানে সেচনের জলের সুব্যবস্থার জন্য এবং 'সেচন-পুকুর' ও বাঁধগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করা হয়। তাহাতে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও

* সিউড়ী কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশের অনুলিপি। এই উদ্বোধন-সভার সভাপতি ছিলেন বঙ্গীয় কৃষি ও শিল্প-বিভাগের মন্ত্রী খান বাহাদুর মাননীয় কে, জি, এম্, ফারোকি।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস

এ জেলার জলাভাব দূর হওয়ার অনেক দেরী। যাহাতে এই জলাভাব শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে দূর হয় সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সুব্যবস্থার বিধান করিবার জন্য কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করিতেছি। আজ এই জেলার সকলে তাঁহার নিকটে "জল দাও, জল দাও" বলিয়া সমস্বরে আবেদন করুন—যেন সে আবেদন তিনি ভুলিতে না পারেন, এবং আপনাদের এই নিদারুণ অভাব মোচনের জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন।

জাতীয় জীবনে চাষী ও চাষের স্থান

জাতীয় জীবনে চাষের ও চাষীর স্থান যে কোথায়, দেশের সাম্‌নে আমরা তাহার নির্দ্দেশ এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া করিতে চেষ্টা করিয়াছি। চাষীর জোরেই যে দেশের শক্তি, চাষের মূলেই যে দেশের আশা, চাষীর মুখে ভাষা না সরিলেও সে যে ছোটলোক নয়, এই বাণী আমরা আজিকার এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া, এবং এই প্রদর্শনীর প্রত্যেক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া দেশের সম্মুখে প্রচার করিতে চাই। আর এটা আমরা দেশের সাম্‌নে জোর করিয়া বলিতে চাই যে, শিক্ষিত লোককে আবার লাঙ্গল ধরিয়া চাষের ক্ষেতে নামিতে হইবে,—আবার তাহাদিগকে গতর খাটিয়া চাষা বনিতে হইবে। বিজ্ঞানের আলোকে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়া সেই মশাল-হাতে তাহাদিগকে চাষের ক্ষেতে নামিতে হইবে। তখন সেই আলোর স্পর্শে চাষীর যে নব-জীবন ও নবশক্তি লাভ হইবে, তাহার দ্বারা চাষীই দেশের সকল দুঃখ সকল দৈন্য নাশ করিতে সমর্থ হইবে। আমার 'চাষা' শীর্ষক গানে এই কথাই বলিয়াছি, এবং আমাদের মহামান্য মন্ত্রীবরকে আমরা আজ অনুরোধ করিব যে, তিনি—দেশের রাজশক্তির যে অত্যুচ্চ শিখরে তাঁর আসন, তাহা হইতে ক্ষণ-কালের জন্য অবতরণ করিয়া, জ্ঞানের মশাল হাতে লইয়া চাষের ক্ষেতে নামিয়া আসুন, এবং স্বয়ং লাঙ্গল চালাইয়া, চাষী যে ছোটলোক নয় তাহা প্রমাণ করিয়া, সেই লাঙ্গলের চাষের দ্বারা এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন। চাষীই যে দেশের সকল সম্পদের মধ্যে একটি সর্ব্বোচ্চ সম্পদ, ইহা আজ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাম্‌নে ঘোষিত হউক।

স্বাস্থ্যোন্নতি, কৃষির উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি—বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতি এবং সর্ব্বোপরি এই জেলার জলসেচন-প্রণালীর উন্নতির জন্য নানারূপ শিক্ষণীয় তথ্য নানাভাবে সাধারণের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা এই প্রদর্শনীতে করা হইয়াছে। এবং এই প্রদর্শনী যাহাতে প্রকৃতপক্ষে এইসব বিষয়ে সাধারণের শিক্ষাপ্রচারের, চিন্তাধারার স্ফুরণের এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্দীপনার উদ্বোধন করে, তাহার জন্য প্রদর্শনীর কর্য্যাধ্যক্ষগণ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আমি আশা করি যে, তাঁহাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে।

লোক-গীত ও লোক-নৃত্য

এগুলি ছাড়া এই প্রদর্শনীতে একটা নূতন বিষয়ের চেষ্টাও আজ বাংলা দেশে নূতন করিয়া করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমি এই নূতন প্রচেষ্টাকে এতই মূল্যবান বলিয়া মনে করি যে, আমি আশা করি, এই বিষয়ে মন্ত্রী বাহাদুর এবং দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি বিশেষ করিয়া লাভ করিতে সমর্থ হইব। এই নূতন প্রচেষ্টার বিষয়—বাংলার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের (Folk song and Folk dance) পুনরুদ্ধার, রক্ষা ও পুনঃ প্রচলন।

নৃত্যগীত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

নাচগান সম্বন্ধে বাংলা দেশে আজকাল কোন কথা বলিতে, একটু কেন, বিশেষ ভাবেই ভয় হয়। কেন না, দেশের জনমতের মধ্যে এবিষয়ে একটা বিকৃত ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। নৃত্যগীত—বিশেষতঃ নৃত্য আদতেই একটা খারাপ জিনিষ বলিয়া লোকের বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এদেশে প্রাচীন কালে যে এভাব ছিল না তাহা ঠিক। এই দেশের শাস্ত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারের সঙ্গে মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্যের কথা এখনও প্রচলিত আছে। এবং এদেশেই স্বয়ং নারদমুনির নির্ম্মল নৃত্যগীতের উদ্দীপনায় যে মানুষ অনুপ্রেরণা পাইয়াছে তাহার কাহিনীতেও সংহিতা ও পুরাণ ইত্যাদি পরিপূর্ণ। আবার এই দেশেতেই গৌর-নিতাই নাচিয়া গাহিয়া ভক্তি-

রসের প্লাবনধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন এবং কত দুরাচার পাপীর জীবন সেই নির্ম্মল ধারায় বিধৌত করিয়া বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যে দেশে নৃত্যগীতের আদর্শ এত উচ্চ,—নৃত্যগীতের স্থান যে বিশ্বের সকল সূক্ষ্মকলার উচ্চে এবং ইহারা যে মানুষের প্রাণ ঈশ্বরের পদপ্রান্তে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে ইহার জলন্ত উদাহরণ যে দেশ পৃথিবীর সকল দেশ হইতে এত সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দিয়াছে, সেই দেশে আজ যে এই নৃত্যগীত এত হেয় বলিয়া পরিগণিত, ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, এই বীভৎস ভাবের মূলে আমাদের আধুনিক শিক্ষার বিকৃত ধারা।

ছাপ পায় নাই। আমার বাল্যকালের সেই পল্লীর জীবন ছিল নির্ম্মল নৃত্যগীতে ভরা। বাউলরা গাহিয়া গাহিয়া নাচিত,—মুসলমানরা মহরমের সময় জারি গান গাহিয়া গাহিয়া নাচিত, এবং সারি গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিত, এমন কি, হিন্দুদের দুর্গাপূজার সময় তাহারা নৌকা-বাচের অভিনয় করিয়া গাহিত ও নাচিত। ছেলেবেলায় আমরাও তাহাদের সহিত গাহিয়াছি নাচিয়াছি। এমন কি, আমাদের গ্রামের ভদ্রমহিলারাও বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি নানা পর্ব্ব এবং 'জলভরা' ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে অতি সহজ ও নির্ম্মল ভাবে গাহিয়া গাহিয়া নাচিয়াছেন। তাহাতে কেহ কখনও কোন কুৎসিত ভাব মনে স্বপ্নেও আনে নাই। কাজেই

জারি গান ও নৃত্য— শিউড়ী প্রদর্শনী

[সম্মুখের বৃদ্ধ লোকটি 'বয়াতী'- শ্রীযুক্ত দত্ত এবং একজিবিশান-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে পদক-পুরস্কার-প্রাপ্ত]

প্রাচীন নৃত্যগীতে নির্ম্মল ও সহজ আনন্দ

আমি ইহা বলিতেছি আমার নিজের জীবনের যে অল্প কিছু অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার ফলে। সৌভাগ্যবশতঃ আমার ছেলেবেলা আমি কাটাইয়াছিলাম বাংলার এক সুদূর কোণের নিভৃত পল্লীতে। আজকাল তার কথা মনে হইলে মনে হয়, সে যেন এক অতীত যুগের কথা। তখনও সেই সুদূর পল্লীর কোন লোক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের

আমার ছেলেবেলায় আমি শিখিয়াছিলাম যে, লোক-গীত এবং লোক নৃত্য একটা পরম নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জিনিষ এবং তাহা জাতির জীবনে নানা দিক হইতে আনন্দের স্ফুরণের সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের দিক হইতেও যে এই সকল প্রাচীন লোক-নৃত্যের নির্দ্দোষ ভাবের অঙ্গসঞ্চালনের ব্যায়াম হিসাবে একটা বিশেষ মূল্য ছিল, এ বিষয়ে তখন ভাবি নাই কিন্তু এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। অর্থাৎ, জাতির জীবনে লোক-গীতের ও লোক নৃত্যের যে কত উচ্চস্থান এবং

নানা দিক হইতে জাতির জীবনীশক্তি-বিকাশের ইহা যে কত সহায়তা করে, তাহা আমার ছেলেবেলার সেই পল্লীজীবনের নৃত্যগীতের প্লাবন-ধারার কথা এখন মনে হইলে বুঝিতে পারি।

নৃত্যগীতে ধর্ম্মসমন্বয়

আর শুধু বাইরের দিক হইতেও নয়, শিক্ষার দিক হইতেও তাহার মূল্য ছিল খুব বড়। সেই বহুল-প্রচলিত বাউলের গানে, জারি গানে ও কীর্ত্তনের গানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মসমন্বয়ের কি যে একটা সুন্দর ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং জাতির বহুযুগের অর্জ্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডারের বড় বড় সত্যগুলি সহজ কথায় সাধারণের বোধগম্যরূপে গানের সুরের মধ্য দিয়া কি সুন্দর ভাবে ইতরভদ্র সকল নরনারীর মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উদ্দীপনার সঞ্চার করিত, তাহা এখন বুঝিতে পারি।

রাইবিশে (রায়বেঁশে) নৃত্য—শিউড়ী প্রদর্শনী

আধুনিক শিক্ষায় রুচিবিকার

গ্রাম ছাড়িয়া যখন জেলার হাইস্কুলে এবং তারপর কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিলাম, তখন দেখিলাম যে, সহরের লোক নাচগানকে কুভাবে দেখে—বিশেষতঃ নাচকে তাহারা খুবই কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছে। সহরে এইরূপ কয়েকটা বছর থাকিবার পর আমার সেই অতীত পল্লীজীবনের সহজ নির্ম্মল নৃত্যগীতের কথা যেন একটা স্বপ্নের মত অপ্রকৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কি, আমাদের আধুনিক শিক্ষার ধারার ফলে, সেগুলি একটা বর্ব্বরতা ও কুসংস্কারমূলক প্রথা—মনে অনেকটা এইরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছিল।

য়ুরোপে লোক-সঙ্গীতের পুনঃ প্রবর্ত্তন

সম্প্রতি য়ুরোপের নানাদেশ ঘুরিয়া দেখিলাম, লোক-সঙ্গীতের স্থান জাতীয় জীবনের শিক্ষাক্ষেত্রের কতবড় একটা সম্পদ। সেখানে দেখিলাম যে, প্রত্যেক দেশে প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের পুনরুদ্ধারের বিরাট প্রচেষ্টা চলিতেছে, এবং সকলশ্রেণীর লোককে সেগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেইসব জাতিও আজকাল বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আধুনিক শিক্ষা যদি

শুধু বিজ্ঞানের নীরস বাস্তবতায় অতিরিক্ত নির্ভরের ফলে জাতীয় জীবনের আদিম সহজ-সরল ভাবের উৎসগুলিকে অনাবশ্যক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে জাতি ও ব্যক্তি একটা অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হয়—যে সম্পদ যুক্তিতর্কমূলক দর্শন-বিজ্ঞানেও লাভ করা যায় না। দেশের এইসব মহামূল্য লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের প্রচলন আমাদের দেশে যত ছিল অন্যদেশে তত ছিল না। অন্যান্য দেশে এখন এইগুলি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের মহাসৌভাগ্য বশতঃ দেশের যেসব শ্রেণীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষার ধারা এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারা এখনও এইসব মূল্যবান জাতীয় সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। আপনারা এই সম্পদের উদাহরণ পাইবেন আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমান বাউলের গানে ও নৃত্যে, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের জারি গান ও নৃত্যে।

এই প্রদর্শনীতে এইসকল প্রাচীন পল্লীসম্পদকে সাধারণের সমক্ষে আবার উচ্চস্থান দিবার প্রচেষ্টা এবার আমি করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে যে কত নির্ম্মল আনন্দের উৎস, আমাদের দেশের বিশেষ অভিজ্ঞতাজাত ধর্ম্মসমন্বয়ের কত সুন্দর চিন্তা ও ভাবধারা আমাদের জন্য যুগযুগ হইতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সাধারণের কাছে সাক্ষাৎ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই মুসলমান জারির দলকে সুদূর ময়মনসিংহ হইতে আনাইতে প্রদর্শনী-কমিটির প্রভূত ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে যদি এই মহামূল্য পল্লীসম্পদগুলির প্রকৃত পরিচয় দেশের লোক আবার লাভ করে এবং ইহার পুনরুদ্ধার ও ব্যাপকভাবে পুনঃ প্রচলনের প্রচেষ্টা হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়, তাহা হইলে এই ব্যয় সার্থক হইবে।

বাউল গান ও নৃত্য—সিউড়ী প্রদর্শনী

পল্লীবাসীর যান্ত্রিক কুশলতা

আমাদের পল্লীসম্পদের দুইটি আবিষ্কার এই প্রদর্শনীতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম আবিষ্কার—পল্লীবাসীর যান্ত্রিক কুশলতা। জয়দেব কেন্দুলীর পার্শ্ববর্ত্তী 'টিকরবেথা' নামক একটি গ্রামে একদিন গিয়া হঠাৎ আবি-

ষ্কার করিলাম যে, সেই গ্রামের একজন সামান্য অশিক্ষিত কর্ম্মকার, পাশ্চাত্য বিখ্যাত পেট্রোমাক্স্ ডেলাইট আলোর অনুকরণে একটি '১০০০ বাতির শক্তিসম্পন্ন' একটি আলো তৈয়ারী করিয়াছে, এবং স্ক্রু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সেড্, মিটার ইত্যাদি প্রত্যেক অংশ, কাহারও সাহায্য না লইয়া, বা বাজারে না কিনিয়া, নিজেই নিজের ঘরে প্রস্তুত করিয়াছে। ইহার অসাধারণ যন্ত্রকুশলতা দেখিয়া আমি এবং এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম, এবং বাংলার অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের মধ্যেও যে কত স্বাভাবিক ভাবের জীবন্ত প্রবাহ বর্ত্তমান আছে, এই কথায় অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু ইহা সত্য। মাসাধিক কাল পূর্ব্বে সৌভাগ্যক্রমে এই আবিষ্কার করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। দশ বছর আগে আমি যখন দীর্ঘকাল একবার এই জেলায় ছিলাম, তখন ইহাদের পরিচয় পাইবার সুযোগ আমার হয় নাই। এবার এই জেলার লোক-নৃত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে এই সুযোগ ঘটিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলাম, ডোম-বাউরী জাতীয় নিম্নশ্রেণীর একদল লোক একপ্রণালীর নৃত্য করে—ইহাকে 'রাইবিশে' নৃত্য বলে। হিন্দুদের বাড়ীতে বিবাহের আনন্দ-উৎসবে এই

জারি গান ও নৃত্য—শিউড়ী প্রদর্শনী

প্রতিভা লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। বাংলার পল্লীর স্বাভাবিক প্রতিভার একটি নিদর্শন—এই চমৎকার শক্তিসম্পন্ন প্রদীপের নির্ম্মাণকুশলতা এই প্রদর্শনীতে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাংলার পল্লীতে 'রায়বেঁশে' যোদ্ধার পুনরাবিষ্কার

দ্বিতীয় আবিষ্কার—বাংলার প্রাচীন যোদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। এখনও যে বাংলার সহস্রবর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন যোদ্ধাদের বংশধরগণ বাংলায় বর্ত্তমান আছে, এবং তাহাদের মধ্যে যে এখনও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যোদ্ধ- শ্রেণীর লোকদিগের নৃত্য দেখাইবার জন্য ডাক পড়ে। আমি ইহাদের নৃত্য দেখিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় একটি বন্ধু আমাকে তাহাদের নৃত্য দেখাইবার আয়োজন করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সাঁওতাল ভীল ইত্যাদি বর্ব্বর জাতির নৃত্যের মতনই একটা কিছু দেখিব। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। যে মুহূর্ত্ত হইতেই ইহা দলকে নৃত্য করিতে করিতে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম—কি দেখিলাম! ইহা ত থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের

কৃত্রিম নৃত্য বা কোন অসভ্য জাতির উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য নয়। ইহাদের নৃত্য দেখিবার প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মনে আমার সন্দেহ রহিল না যে, এই নৃত্যকলার উৎস জাতির জীবনের এবং জাতির ইতিহাসের একটা বিশেষ উচ্চস্থানে। কি সুন্দর বীরোচিত ভাবভঙ্গী,—কি সংযম,—কি অনিন্দ্য ছন্দচাতুর্য্য, এবং সকলের উপরে কি একটা যেন অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় ভাব! যেন অতীতের কি একটা বাণী ইহারা এই নৃত্যের এবং ভাবভঙ্গীর ভিতর দিয়া আমাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু মুখের ভাষায় তাহা ফুটাইয়া

"নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—
মহামূল্য জিনিষ এ।"

কেন লিখিলাম?—কি করিয়া জানিলাম? আমার মন যেন স্বতঃই বলিয়া দিল, যে, ইহার সঙ্গে দেশের একটা কিছু বড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহারা যে কেবল একটা নৃত্যই দেখাইয়াছিল তাহা নহে, এমন সুন্দর ব্যায়ামকৌশল দেখাইল যাহা অপূর্ব্ব, অসাধারণ বলিয়া আমার মনে হইল। তখন হইতেই আমি অনেক সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের কাছে 'রাইবিশে' নৃত্য ও ব্যায়ামকলার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে

রাইবিশে (রায়বেঁশে) নৃত্য—শিউড়ী প্রদর্শনী

বলিতে পারিতেছে না। কারণ যদিও তাহারা অতীতের এই নৃত্যকলাকে অক্ষুণ্নভাবে বজায় রাখিয়াছে তবু অতীতের সেই রহস্যময় কাহিনী তাহারা নিজেই ভুলিয়া গিয়াছে।

'নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—'

এই 'রাইবিশে' নৃত্যের রহস্য সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাকে পাইয়া বসিল, এবং আমি ইহাদের সম্বন্ধে এই নৃত্যের তালে তাল মিলাইয়া একটি গান রচনা করিয়া ফেলিলাম।* আর সেই গানে লিখিলাম—

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমতঃ কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। তারপর কোন পণ্ডিত বন্ধু বলিলেন, রাজবংশী জাতের নাম হইতেই হয়ত 'রাইবিশে' নামের উৎপত্তি হইয়াছে,—হয়ত রাজবংশী জাতের লোকরাই এই নৃত্য ও ব্যায়ামকলার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। আমি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কারণ আমি জানিতাম যে রাজবংশীদের মধ্যে এরূপ নাচের প্রচলন নাই। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহারা অনেক সময় বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে স্ত্রীলোকের বেশ পরিধান করিয়া নৃত্য করে; সেই জন্যই হয়ত এই নৃত্যের "রাই-বেশ"

* সম্পূর্ণ গানটি 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।—বঃ সঃ

আখ্যা লাভ হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই হয়ত ইহাদের নাম 'রাইবিশে' হইয়াছে—কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছে না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই নৃত্য সামরিক-নৃত্য জাতীয় এবং ইহার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আছেই।

আবিষ্কারের প্রমাণ

আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তাহার ফলে সপ্তাহকাল পরে তিনি তাঁহার 'রতন লাইব্রেরী' মন্থন করিয়া যে-সকল প্রামাণ্য তথ্য-সংগ্রহ আমাকে আনিয়া দিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না যে, এই 'রাইবিশে'ই ধর্ম্মমঙ্গলের, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর এবং অন্নদামঙ্গলের রায়বাঁশ-(ভল্ল) ধারী অমিতবীর্য্য "রায়বেঁশে" যোদ্ধা * যাহারা একাদশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান জেলার 'শ্যামারূপার' গড় হইতে মহামদ পাত্রের নেতৃত্বে 'ময়না-গড়ে' লাউসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল,—যাহারা অতি সুদূর অতীতের গৌরবময় যুগে একদিন কলিঙ্গরাজের নেতৃত্বে সুদূর গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে যাহারা মানসিংহের বিজয়বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্য, ও সামাজিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতি সত্ত্বেও তাহারা যে সেই একাদশ শতাব্দীর বীরোচিত ভাবভঙ্গী ও সামরিক নৃত্যপ্রণালী অটুটভাবে যুগের পর যুগ সযত্নে রক্ষা করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে,—এইসকল প্রাচীন পুস্তকে তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও যুদ্ধপ্রণালীর পরিচয় পাইয়া, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এমন কি, অনেক বিষয়েই সেই প্রাচীন বর্ণনার সঙ্গে তাহাদের বর্ত্তমান ভাবভঙ্গী হুবহু মিলিয়া গেল।

অবনতি ও অবনতির কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উৎকট অবনতিবশতঃ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, অন্নাভাবে কোথাও কোথাও ইহারা লুঠতরাজ ইত্যাদি করিয়া আইনের কবলে পড়িয়া দণ্ডলাভ করিয়াছে। বীরভূম জেলা ব্যতীত বাংলার আরও কতিপয় জেলায় এই শ্রেণীর লোক আছে বলিয়া আমি এখন শুনিতেছি। অবশ্য, ইহাদের সকলের মধ্যে এই প্রাচীন নৃত্যকলা ইত্যাদির কৌশল সমভাবে বর্ত্তমান নাই। এমন কি, ইহাও শুনি যে অনেক জায়গায় ইহারা স্ত্রীলোকের বেশ পরিধান করিয়া (অর্থাৎ 'রাই-বেশে') নৃত্য করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী যুগের জন-সাধারণের কুরুচিপ্রসূত বিকৃতি। যে 'রাইবিশে' দলের নৃত্য এই প্রদর্শনীতে দেখান হইবে, ইহাদের নৃত্যে সৌভাগ্য-বশতঃ এরূপ কোন দোষ প্রবেশ করে নাই, এবং ইহাদের স্বভাবচরিত্রে নৈতিক দোষ প্রবেশ করে নাই বলিয়াই শুনিয়াছি। তবে এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে অন্যত্র কেহ কেহ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য এবং সমাজের

---

* রাজা (সংস্কৃত) = রাআ (প্রাকৃত) = রায়; রায়—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; রায় বাঁশ = শ্রেষ্ঠ বাঁশ = ভল্ল বা বল্লম (এই 'রায় বাঁশ' দ্বারা বল্লমের হাতল নির্ম্মিত হইত বলিয়া বল্লমেরই 'রায় বাঁশ' আখ্যা লাভ হইয়াছিল); রায়বেঁশে = ভল্লধারী যোদ্ধা।

এই 'রায়বেঁশে'র কথা ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' পাওয়া যায় এইরূপ—(মহামদ পাত্রের ময়নাযাত্রা) "রণভূঁয়া, মল্লভূঁয়া, মগধ মাগধ মিঁয়া, একলক্ষ সেনা সঙ্গে ধায়। ধানুকী বাহুকী ঢালী, রায়বেঁশে খারি-কালি, রাহুত মাহুত সমুদায়॥"

মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গলেও' আছে—"রায়বেঁশে রাউত বসেছে রণসাজে।"

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র বহুস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—১। (সিংহলের রাজা শালবানের যুদ্ধসজ্জা) "বাজননূপুর পায়, বীরঘণ্টা পাইক ধায়, রায়বাঁশ্যা ধায় খরশান।" ২। (কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসজ্জা) "বাজননূপুর পায়, বীরমুঠা পাইক ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।" ৩। (কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসজ্জা—পাঠান্তর) "সোনার নূপুর পায়, বীর বেড়াপাকে ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।......পরিধান বীর ধড়ি, কানে ফটিকের খড়ি, অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙা মাটি॥" ৪। (কলিঙ্গরাজের গুজরাট আক্রমণ) "শত শত বাজে ঢাক, পাইক ধায় লাখে লাখ, কার কেহ না শুনে বাণী। রায়বাঁশ তবকী, ফরিকাল ধানুকী, আগুদলে কনকনিশানী॥" ৫। "মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া, কেহ ধায় ফিরায়ে নেজা।"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' আছে—"আগে চলে লালপোষ খাস-বরদার। সিপাই সকলে চলে কাতারে কাতার॥ তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল। দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥"

রামপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থেও আছে—"কোটি কোটি তীরন্দাজ, যেথা বিন্ধে একন্দাজ, রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।"

ইহাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহারের কথা মনে করিয়া দেখিলে বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

নৃত্যকলার মূল্য

কিন্তু তাহা সত্বেও তাহারা যে তাহাদের পুরুষানুক্রমিক সামরিক বীরোচিত সুন্দর নৃত্যকলার গৌরবময় প্রণালী অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে ইহা কম আশ্চর্য্য নয় এবং বর্ত্তমান যুগের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এই নৃত্যপ্রণালী এত সুন্দর, এত বীরত্বমণ্ডিত, সূক্ষ্মকলার এত উচ্চ আদর্শে গঠিত যে ইহা আমাদের দেশের লোক-নৃত্যের মধ্যে—এমন কি পৃথিবীর লোক-নৃত্যের মধ্যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই লোক-নৃত্য দেখাইবার আয়োজন এই প্রদর্শনীতে আমি করিয়াছি। আমার অনুরোধ. দেশের লোক যেন, ইহা যে 'ছোটলোকেরাই' দেখাইতেছে এবং ইহাদের নৈতিক স্বভাবচরিত্র সর্ব্বত্র আদর্শস্থানীয় নয়, তাহা ভুলিয়া গিয়া, সূক্ষ্ম-কলার দিক হইতেই ইহার প্রণালী গ্রহণ করিয়া ও শিক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধিবান করেন। যদি এখন ইহার পুনরাবিষ্কার সত্বেও, আমাদের দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞার ফলে ও উৎসাহের অভাবে, ইহা দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করিবার অপরাধের অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত হইব। ইহার শিক্ষাপ্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে বালবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র জাতির নৈতিক এবং শিল্পকলার আদর্শের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যয়ামের উৎকর্ষসাধন হইবে, ও জাতীয় জীবনে আনন্দের নির্ম্মল ব্যবস্থার আয়োজন হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য

এই প্রদর্শনী-ভূমিতে আপনাদের সঙ্গে বাঙলার প্রাচীন যোদ্ধাবংশধরদের চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের সমাজের বিধানে লাঞ্ছিত-অবনত, দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্ভাগ্যময় জীবনের ভিতর দিয়াও যে তাহারা দেশের প্রাচীন এই উচ্চ সূক্ষ্মকলাকে আমাদের জন্য সযত্নে যুগের পর যুগ অভ্যাস করিয়া, রক্ষা করিয়া আসিয়া উপহার দিয়াছে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাহাদের কি দিব? আমার মনে হয়, আমরা যদি ইহার প্রতিদানে পুনরায় তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে আর্থিক ও নৈতিক জীবনের অবনতির দুঃখময় গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারি, এবং তাহাদের সযত্নরক্ষিত এই মহামূল্য কলাবিদ্যাকে জাতীয় জীবনে উচ্চস্থান প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি এবং দেশের প্রতি দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইবে।

আমাদের প্রদর্শনী যদি আপনাদের কাছে ইহাদের পুনরাবিষ্কার করিয়া, ইহাদের পুনঃ পরিচয় দিয়া দেশের লোকদিগকে এই কাজে ব্রতী করিতে পারে, এবং ইহার সঙ্গে দেশের নানাবিধ লোক-সঙ্গীতের ও বাংলার অন্যান্য মহামূল্য পল্লীসম্পদের পুনরুদ্ধার ও বহুল-প্রচলনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়া, দেশের শিক্ষিত লোকের চক্ষে ইহাদিগকে আদরণীয় করিয়া তুলিয়া জাতীয় জীবনে উচ্চ আদর্শ দান করিতে সমর্থ হয়, এবং ইহাদের সাহায্যে জাতীয় জীবনকে আবার নির্ম্মল আনন্দের প্লাবনধারায় আনন্দময় এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরসের সহজ ও নির্দ্দোষ উপলব্ধিতে সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিবার সহায়তা করিতে পারে, তাহা হইলেই আমাদের প্রদর্শনীর চেষ্টা সার্থক হইবে বলিয়া বিবেচনা করি।

পরাণ-বন্ধু

বন্দে আলী মিয়া

পরাণ বন্ধু মোর,
আমার নয়নে ফুটেচে আজিকে তোমার চোখের লোর।
কাক্-জ্যোস্নার সকল আঁধার দিয়েছি তোমায় ঢেলে',
আলোটুকু তার পরাণে আমার রেখেচি প্রদীপ জ্বেলে'।
সাগর-তলের মাণিক আমার লোনাজল তব লাগি,'—
মরমী কবির মুখ পানে চাহি' দিন-রাত আছো জাগি'।

বন্ধু মরম-চোর,
আমারো যে আছে বেদনা তবু—তা সবি থাকে অগোচর।
বিষটুকু সব পান করি' মোরে অমৃত দিয়াছ ফেলে,'
নীলকণ্ঠের অশেষ বেদনা সহিতেছ অবহেলে।

পহেলী চাঁদের উতলা মলিন সাঁঝে,
তোমারে হেরেচ নিশীথ রাতের স্বপন-খেয়ালী সাজে।
গিয়েছিনু হায় দুয়ারে তোমার পিয়াসা অঢেল নিয়া,
নয়নে উথলে ব্যথার পাথার—তুষিবে মোরে কী দিয়া?
ভাবিতে পারোনি—জানোনিক মনে—কেমনে যতন হবে,
এরি আবডালে দেখেছিনু তব পরাণের বৈভব।

বন্ধু পিয়াসী মোর,
তোমার বুকের কুহেলি আমায় হানিচে স্বপন-ঘোর।
ওই বেদনায় কাঁদিচে একেলা মোর এ উপোসী হিয়া,
অ-পাওয়া বুকের অভিশাপ ভরা বহ্নি-দাহন নিয়া।

পরাণ-কাঁদানি হারান' বন্ধু মোর,
দোঁহার জীবনে ভুল করে' হায় রচেছ যে মায়াডোর,
সেই কামনার ব্যথার পুলকে ঝরিচে চোখের জল,
মাধবী-রাতের অ-থই সোহাগ পায়না তাহার তল,
তুমি গেছ আগে প্রদীপ জ্বালায়ে পথের আঁধার ঠেলি'—
কত কথা মোরে কয়েছো গোপনে অশ্রুরে অবহেলি'।

বন্ধু মরমী হায়
পদ্মার পারে দিয়েচো বিদায় উতলা পূবের বায়।
আজিকে তোমার প্রদীপ নিবেচে কাজল-সন্ধ্যেবেলা,—
অনাদি কালের আঁধার প্রহরে একেলা করিছ খেলা!

রেঙ্গুন সরোজনলিনী সমিতি

গত মে মাস হইতে রেঙ্গুনে সরোজনলিনী সমিতি খোলা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাস অবধি, নিয়মিতভাবে মাসে ২ বার সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। ৪৫ জন মহিলা সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। মাসিক ।০ আনা হইতে ১৲টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা মহিলাগণ দিয়া থাকেন। সমিতিতে কাট-ছাঁট শিখাইবার ক্লাস খোলা হইয়াছে। সংগৃহীত চাঁদার অর্থে সেলাই-ক্লাসের জন্য দৈনিক ১৲ টাকা হিসাবে একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। সমিতির প্রত্যেক মহিলাকে তকলি চালান শেখান হইয়াছে—চরকায় সূতা কাটাও শেখান হইয়াছে। এক্ষণে মহিলাগণ ঘরে ঘরে নিজের সময়মত তকলি চালাইতেছেন। অক্টোবর মাস হইতে প্রতি সপ্তাহেই শনিবারে সমিতির অধিবেশন হইতেছে সমিতিতে Junior First Aid Classএর ১২টি বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ২১ জন মহিলা ধারাবাহিকরূপে এই ক্লাসে যোগ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২০ জন মহিলা St. John Ambulance সমিতির ডিপ্লোমা-পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। জানুয়ারী মাসের শেষভাগে ইঁহাদের পরীক্ষা হইবে। এতদ্ব্যতীত সমিতিতে বক্তৃতা, গানবাজনা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু বি-এ (Under Secretary to the Govt. of Burma General Department) মহিলাগণের নিকট "মিতব্যয়িতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি মহিলাদিগকে সঞ্চয় শিক্ষা দিবার জন্য সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া প্রত্যেক মহিলাকে সঞ্চয়-বাক্স প্রদান করিয়াছেন। এই বাক্স প্রতিমাসে "সমবায়-সমিতিতে" পাঠান হইবে এবং প্রত্যেক মহিলা তাঁহার সামান্য সঞ্চিত অর্থের উপর বাৎসরিক ৩৵০ আনা সুদ পাইবেন। এই কার্য্যে সকল মহিলাই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। প্রফেসার ইন্দুভূষণ মজুমদার এম-এ, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে সমিতির মহিলাগণের নিকট কিছু বলিয়াছেন। কলিকাতা হইতে আগত ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য "নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে মহিলাগণের নিকট সহজ ভাষায় বক্তৃতা দিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝাইয়া দিয়াছেন। মাঝে মাঝে শুধু মেলা-মেশার জন্য গানবাজনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত রেঙ্গুনে স্থানীয় নানারূপ গোলমাল থাকা সত্ত্বেও মহিলাগণ নিয়মিত সমিতিতে যোগদান করিয়া নানারূপ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। এই কার্য্যে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের এবং সমিতির মহিলাগণকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদিকা—শ্রী ললিতা রায়

নীলফামারী মহিলা সমবায়-সমিতি লিমিটেড

এই সমিতি ১৯২৯ সনের জুলাই মাসে স্থাপিত। নারী-জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। গত বৎসর সমিতির সভ্যা-সংখ্যা ৪৯ ছিল। এ বৎসর আরও ২জন সভ্যা যোগদান করিয়াছেন। সমিতিটি কো-অপারেটীভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট।

বৎসর-প্রারম্ভেই সামতি হইতে বয়নশিল্পে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। এবং উহাতে শিক্ষালাভ হেতু ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ডিপার্টমেণ্ট হইতে ডিমনষ্ট্রেটীং পার্টির শিক্ষাধীনে দেড় মাস কাল শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সভ্যাগণ কার্পাস সূতায় কাপড় প্রস্তুত করতঃ উপযুক্ত লাভে বিক্রয় করিতেছেন। অতি অল্পকাল মধ্যে নারীরা বয়নশিল্পে যেরূপ পারদর্শিনী হইয়াছেন তাহা পরিদর্শন করিয়া ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিপার্টমেণ্টের ইন্স্পেক্টর ও ডিরেক্টর মহোদয়গণ অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সহৃদয় সাব্‌ডিভিসানাল অফিসার ও কো-অপারেটীভ ডিপার্টাণ্টের আসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর মহোদয়গণও মাঝে মাঝে সমিতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং উহার উন্নতি-কল্পে সদুপদেশ দানে মহানুভবতার পরিচয় দিতেছেন। অর্থাভাব বশতঃ এ বৎসর মাত্র ২ খানি ফ্রেমলুম্ তাঁত ক্রয় করা হইয়াছে। এবং ৭ জন সভ্যা নিজ ব্যয়ে পাট হইতে সূতা প্রস্তুতোপযোগী ৭ খানি চরকা ক্রয় করিয়াছেন। কার্পাস সূতার চরকায় অনেকেই সূতা প্রস্তুত করিতেছেন। সভ্যাগণ যেরূপ আগ্রহ এবং উৎসাহে তাঁতের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই সুখের ও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। অর্থাভাব হেতু সমিতি কার্য্যালয়-প্রস্তুতে অক্ষম বিধায় সেক্রেটারীই তাঁহার নিজ ব্যয়ে একখানি ঘর ও তাঁতের কার্য্য-পরিচালনার উপযোগী একখানি টীনের চালা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

সমিতির ১৩ জন সভ্যা এ বৎসর ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করতঃ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্বাবৎ সমুদায় ব্যয় স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড বহন করিয়াছে।

প্রতি দিনই সভ্যারা সমবেত হইয়া তন্তুবায়-কার্য্যে ও সূতাকাটায় রত থাকেন। মাসে ২।৩ বার সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাব বশতঃ সমিতির অন্যান্য উন্নতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইতেছে না।

যে স্বর্গীয়া দেবী এতদ্দেশে নারীজাগরণের সৃজয়িত্রী, যাঁহার প্রচেষ্টায় আমরা আজ সমিতিরমুখ দেখিতেছি, তাঁহার প্রতি আমাদের ঐকান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুরবালা দত্ত
সম্পাদিকা

দশানি নারীমঙ্গল সমিতি (খুলনা)

গত ১৭ই পৌষ স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সমিতির অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় ভদ্রমহিলাগণের প্রদর্শনী ১৫ই পৌষ তারিখে খোলা হয়। এই প্রদর্শনী প্রথম দুই দিন পুরুষদিগের জন্য এবং ১৭ই মহিলাগণের জন্য খোলা থাকে। শুদ্ধ এই গ্রামবাসিনী মহিলাদের শিল্পকার্য্য লইয়া ইহা খোলা হয়। কলিকাতা কেন্দ্রসমিতির একনিষ্ঠা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গি এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

১৭ই পৌষ বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কমলা মজুমদার মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় প্রায় পাঁচ ছয় শত মহিলাদের উপস্থিতি দেখা গিয়াছিল—তাহার মধ্যে বাগেরহাট ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মহিলাগণ প্রায় ৫০ জন ছিলেন। এই সভায় কেন্দ্র-সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমিদনী গাঙ্গি একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেন যে "ভারতবাসী আজ স্বরাজ লাভের জন্য ব্যস্ত কিন্তু নারী-জাগরণ ব্যতীত স্বরাজ অসম্ভব। আজ যদি গোলটেবিলে বসিয়া বৃটীশ সরকার বলেন যে তোমাদের স্বরাজ দিলাম তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ লাভ হইল না। স্বরাজ কেহ দিতে পারে না, স্বরাজ সাধনার দ্বারা লাভ করার বস্তু। নারীদের অজ্ঞান-অন্ধকারে রাখিয়া স্বরাজ লাভ করা যায় না। তাই প্রয়োজন হইয়াছে নারীশিক্ষার—তাই দরকার হইয়াছে নারীজাগরণের বর্ত্তমান স্বরাজলাভ ও ভাবী ভারতের মঙ্গলের জন্য। তারপর তিনি কিভাবে নারীশিক্ষায় উন্নতি করা যায় ও বর্ত্তমানে তাঁদের কি কর্ত্তব্য এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া শ্রীমতী লীলা মিত্র, শ্রীমতী অনিলা হালদার ও শ্রীমতী শোভারাণী দাস সভায় বক্তৃতা করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী দুর্গারাণী দাস কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। শ্রীমতী কিরণময়ী সোম শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গিকে অভিনন্দিত করেন ও সভানেত্রী মহোদয়া সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

অবশেষে এই সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিনোদিনী

সেন নিমন্ত্রিতা মহিলাদের, শ্রীযুক্তা গাণ্টি ও স্থানীয় স্কুল-কমিটিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করেন।

অতঃপর কেন্দ্রসমিতির সেবক, কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন ম্যাজিকলণ্ঠন দ্বারা নারীজাগরণ বিষয়ক বক্তৃতা করেন। রাত্রি ৭॥০ ঘটিকায় সভার সমস্ত কার্য্য শেষ হয়।

শ্রী দুর্গারাণী দাস
সম্পাদিকা

ঠাকুরগাঁও মহিলাসমিতি

গত ১৯শে জানুয়ারী রবিবার ৺সরোজনলিনী দত্তের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় মহিলাসমিতির সভ্যার এবং অন্যান্য মহিলাগণ একত্র সমবেত হইয়া একটি শিল্পপ্রদর্শনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পরিচালনা করিয়াছেন। স্থানীয় সবডিভিসনাল অফিসারের ভগ্নী শ্রীমতী পুষ্পরাণী দেবী প্রদর্শনীর উদ্বোধনকার্য্য সম্পাদন করেন। সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দাসগুপ্তা ৺সরোজনলিনী দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার সমিতি-প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাঠ করেন এবং ঐ সম্বন্ধে লিখিত সুন্দর একটি প্রবন্ধ হইতে উপস্থিত মহিলাদিগকে মহিলাসমিতির কার্য্যকারিতা এবং উপকারিতা সম্যকভাবে বুঝাইয়া দেন। সমিতির সভ্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা দাসগুপ্তা ও শ্রীমতী শতদলবাসিনী ঘোষ তাঁহাদের সুমধুর সঙ্গীতে উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছেন।

এবৎসর নানারূপ বাধা-বিঘ্নের জন্য কেন্দ্রসমিতির শিল্প-প্রদর্শনীতে কোনরূপ দ্রব্যাদি পাঠান যায় নাই। ঐ সব দ্রব্যাদি দ্বারা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সমিতির মহিলাদিগের দ্বারা প্রস্তুত রুমাল, টেবিলক্লথ, মোজা, জামা, পেনী ইত্যাদি প্রদর্শনীর জন্য ও কতক কতক বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেনগুপ্ত মহাশয় একটি রুমালের মূল্য ২৲ দুই টাকা সমিতিতে দান করিয়া সমিতির আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পরিশেষে উপস্থিত মহিলাদিগের ও প্রদর্শনীর আলোকচিত্র তুলিয়া সভাভঙ্গ করা হয়। এবং উপস্থিত বালকবালিকাদিগকে মিষ্ট পরিবেশন করিয়া মহিলারা অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্রী ইন্দুমতী দেবী
সম্পাদিক

কেন্দ্রসমিতির কথা

বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসর ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মহা সমারোহে কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গত ১৬ই জানুয়ারী স্যার যদুনাথ সরকারের পত্নী লেডী শ্রীমতী কাদম্বিনী সরকার ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন করেন। মফঃস্বলের বহু মহিলাসমিতি হইতে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর হস্তনির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনীতে আনীত হইয়াছিল। মহিলা-সমিতির প্রভাবে আমাদের দেশের মহিলাগণ শিল্পকার্য্যে কিরূপ ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছেন, এই শিল্প-প্রদর্শনী হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশ ও আসামের বিভিন্ন মহিলা-সমিতি হইতে প্রায় ৫০ প্রকারের দশ হাজার শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনীতে আনীত হইয়াছিল। আসামের অন্তর্গত বেহেলী মহিলাসমিতি ও সরোজনলিনী শিল্পশিক্ষালয়ের শিল্পদ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায়, তাহাদিগকে দুইটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রার্থনা-সভা

গত ১৮ই জানুয়ারী রবিবার ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনে স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর উদ্দেশে একটি প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয়া আত্মার কল্যাণকামনা করিয়া একটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন; "ভগ্নী সরোজনলিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; তাঁর মধ্যে আর্য্যনারীর বিশেষত্ব সুন্দররূপে ফুটে উঠেছিল। স্বামী-পুত্রের কল্যাণকে সম্পূর্ণরূপ রক্ষা ক'রে তিনি দেশের সেবা করতে পেরেছিলেন। দেশের দুঃখী মেয়েদের জন্যে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। তাঁর প্রিয় কর্ম্মের সফলতা আজ তিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু তাঁর পবিত্র আত্মার সে রত্ন আজ অনেক মানুষের মধ্যে ফুটে উঠেছে। আমি অনুভব করছি, সেই সাধ্বী ভগিনীর আত্মা আমাদের সঙ্গে আজ ভগবৎ-আরাধনায় মিলিত হয়েছে।"

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী শ্রীযুক্তা মণিকা দেবীকে ধন্যবাদ-প্রসঙ্গে বলেন:—

শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী

"শ্রীমতী মণিকা দেবীকে আমি বহুদিন হইতে জানি। তাঁহার অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং সাধ্বীত্বের পরিচয় তাঁহার প্রত্যেক গৃহকর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। তাই একজন সধবার স্মৃতিসভায় আর-একজন সধবাকে আহ্বান করিয়াছি। এইরূপ কোন বড় সভায় পূর্ব্বে আর কোনদিন আমরা তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেখি নাই। তিনি নিজে কিরূপ মনস্বিনী ও গুণবতী মহিলা, তাহা তিনি বাহিরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতা হইয়াও তিনি জাতীয় স্বধর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাবতী। তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয়। তাঁহার গুণে তাঁহার সংসার শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ, কিন্তু তিনি তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন গোপনেই রাখেন। আমরা মনে

করি, তাঁহার পুণ্যচরিত বর্ত্তমান সময়ের নারীগণের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি যদি এখন নারী-উন্নতির অধিনেত্রীরূপে প্রকাশ্যভাবে কার্য্য করেন, তাহা হইলে দেশ উপকৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

এই উপলক্ষে স্বর্গীয় সরোজনলিনীর চিত্র একটি বেদীর উপর পুষ্পপত্র দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সরোজনলিনী নারী-শিক্ষালয়ের কয়েকজন ছাত্রী কয়েকটি ভাবোদ্দীপক সুন্দর সঙ্গীত দ্বারা সকলের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিলেন।

বার্ষিক স্মৃতি-সভা

গত ১৯শে জানুয়ারী সোমবার কলিকাতার এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে বিপুল উৎসাহ এবং মহাসমারোহের সহিত সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান

মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী

হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ উপস্থিত হন। সভায় এত জনসমাগম হইয়াছিল যে সুবৃহৎ এলবার্ট হলের উপরে ও নীচে কোন স্থানে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। বহু লোক অসীম ধৈর্য্যসহকারে সভার শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া ছিলেন। সভায় প্রায় পাঁচশত জন মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সুদূর আসাম প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানের মহিলাসমিতি সমূহের অনেক প্রতিনিধি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সভায় যোগদান করতঃ আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সভারম্ভে সরোজনলিনী নারীশিল্প-শিক্ষালয়ের ১২জন ছাত্রী সমস্বরে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর রচিত উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন।

তৎপরে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সভানেত্রী-নির্ব্বাচন প্রস্তাব করিয়া বলেন, আমাদের দেশে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি নারীসমাজের উন্নতির জন্য যে বিপুল কার্য্য করিতেছেন তাহা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

সভানেত্রী-নির্ব্বাচন কার্য্যের পর শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী সমিতির গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

তৎপরে সভানেত্রী—সরোজনলিনী নারী-শিল্প শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণ, মহিলাসমিতি এবং সমিতির কর্ম্মীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণের পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মিসেস আরকুহার্ট, মিঃ এ, টি, ওয়েষ্টেন, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সেন, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্টারন্যাশনাল লেবার এসোসিয়েসনের মিসেস হাগা, এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

মিসেস আরকুহার্ট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, প্রাচীনকালে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ হস্তনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর শিল্পকার্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের সূক্ষ্মকার্য্য সমস্ত পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অধিকাংশস্থলে পুরুষেরাই এই কার্য্য করিতেন। কিন্তু আনন্দের বিষয়, পুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কলাকৌশল ভারতীয় মহিলাগণ অনায়াসেই শিখিতে পারিতেছেন। এই সকল দ্রব্যের বিশেষরূপ কাটতি থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, সমিতির উচিত—অল্পমূল্যে ছেলেদের ভাল জামা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা। স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সামতির কর্ম্মীগণ মহিলাসমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলে অচিরে বঙ্গ-

দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থের উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে প্রধাবিত হইবে।

সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "আমাদের বাল্যকালে স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে কত বাধা ছিল। আজ তাহা বহু পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে। তাহার জন্য এই সমিতির চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। ভারতবর্ষ দরিদ্র, নিঃসম্বল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দুঃখদুর্দ্দশা-মোচনের, আমাদের নানা সমস্যা-সমাধানের শক্তি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। আমাদের দেশের মহৎ নারীগণের জীবন হইতে আমরা সে শক্তি পাইতেছি।" তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া সমিতির অশেষ কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করেন।

শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী সভানেত্রীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী সভানেত্রীর অশেষ গুণপনার উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সরোজনলিনী ক্যালেণ্ডার

সম্প্রতি কেন্দ্রসমিতি সমস্ত বৎসরের বাংলা ও ইংরাজি বার, মাস ও তারিখ, ও সরোজনলিনীর প্রতিকৃতি-সম্বলিত দেওয়ালপঞ্জিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জিকাতে ১২ মাসের ১২ খানি পাতা আছে। ইহার উপরিভাগে সরোজনলিনীর জাগরণ-বাণী বড় বড় অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রসমিতির সাহায্যের জন্য এই পঞ্জিকা দুই আনা মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকার নামে ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা এই ঠিকানায় দশ পয়সার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে একখানি ক্যালেণ্ডার প্রেরিত হয়।

কোয়েকার ওট্‌স

কোয়েটার ওটস্ নামক (Quaker Oats) নামক একপ্রকার খাদ্য আমেরিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ওট নামক বৃক্ষের ফল হইতে প্রস্তুত। আজকাল চিকিৎসকগণ ওট হইতে প্রস্তুত এই খাদ্যকে আদর্শ খাদ্য বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে কার্ব্বোহাইড্রেট (Carbo-Hydrate), প্রোটিন (Protein) এবং ভাইটামিন পূর্ণমাত্রায় থাকায় ইহা দেহের শক্তিবর্দ্ধক, মাংসপেশী গঠনকারী এবং রক্ত ও স্নায়ুমণ্ডলীর হিতকারী। প্রতিদিন এই খাদ্য ব্যবহার করিলে শরীরের যথেষ্ট উপকার হয়। আজকাল বঙ্গদেশে যেসকল দ্রব্য সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহাতে দেহ-গঠনের উপযোগী যথেষ্ট পদার্থ থাকে না। কোয়েকার ওট্‌স তাহার অভাব পূরণ করিবে।

স্বর্গীয়া মৃণালিনী মজুমদার

ময়মনসিংহ "মহিলাসমিতির" উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী মজুমদার গত ৭ই মাঘ বুধবার ময়মনসিংহ সহরে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। মৃণালিনী একজন সুলেখিকা ছিলেন। তাঁহার প্রণীত টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত গ্রন্থ ইংরেজীবিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইতেছে। অনেক মাসিক পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। নানাবিধ শিল্পবিদ্যায় তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার নিজহস্তের প্রস্তুত তাঁতের বস্ত্র বিগত London Wembly Exhibitionএ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল। চিত্রবিদ্যায় তিনি ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি, মুক্তাগাছা মহিলাসমিতি প্রভৃতি বহু প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মৃণালিনী একজন আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তিনি নিজ হস্তে সকল গৃহকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে সাহিত্য-সেবা ও চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ময়মনসিংহ মহিলাসমিতির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

শিউড়ি প্রদর্শনী

গত ৩১ শে জানুয়ারী বীরভূম জেলার শিউড়িতে যে কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় তাহাতে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে একটি ষ্টল খোলা হইয়াছিল। এই ষ্টলে বহু মহিলাসমিতির প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রয় করা হয়। তন্মধ্যে খুলনা জেলার মৌভোগ মহিলাসমিতির কাঁথা, যশোহর জেলার অন্তর্গত

ডোঙ্গাঘাটা মহিলাসমিতির কাঁথা, কলিকাতা টালা মহিলা-সমিতির জ্যাম, জেলী, সাবান, সিমলা আর্য্যনারী মহিলা-সমিতির সূচীশিল্প ও এমব্রয়ডারী অঙ্কনের কাজ, ও সরোজ-নলিনী শিল্পবিদ্যালয়ের কার্পেট ও তাঁতের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিভিন্ন কাজের জন্য উল্লিখিত মহিলাসমিতিগুলি প্রদর্শনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হইতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের মাননীয় কমিশনার মিষ্টার গুডে আই-সি-এস্ মহোদয় আর্য্যনারী মহিলাসমিতির কাজে এতই খুসী হইয়াছিলেন যে তিনি ঐ সমিতির অনেকগুলি শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ঐ ষ্টলে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বহু পুস্তক, প ত্রকা ও কার্য্য-বিবরণাদি বিক্রয় হয়। গত ২ রা ফেব্রুয়ারী এই প্রদর্শনী উপলক্ষে স্থানীয় সরোজ-নলিনী মহিলা-মিলনমন্দিরে শিউড়ি মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত মহিলারা ঐ সভায় যোগদান করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই সভায় সভানেত্রীত্ব করেন এবং নারী-মঙ্গল বিষয়ে অতি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

বাঁকুড়া মহিলাসমিতির উৎসব

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির বার্ষিক উৎসব ঐ সমিতির সভানেত্রী মিসেস দের গৃহে অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। সমিতির সভ্যারা ভিন্ন বহু মহিলা ও বালকবালিকা এই সভায় যোগদান করেন। সরোজনলিনী জীবনকালেই স্বয়ং এই মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন ওয়েস্লিয়ান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিষ্টার ব্রাউন সাহেবের পত্নী মিসেস ব্রাউন এবিষয়ে সরোজনলিনীর প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার পর হইতে বহু মহিলারা এই সমিতির কার্য্যভার অতি দক্ষতা ও শ্রদ্ধার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। বাঁকুড়ার বর্ত্তমান জেলা জজ মিষ্টার জে, দে আই-সি-এস মহোদয়ের পত্নী এই কয়েক বৎসর অতি সুন্দররূপে এই সমিতি পরিচালনা করিতেছেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও কখন তাঁহার এই কার্য্যে একটুও ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় না। তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা এবং মধুর ব্যবহারে মহিলাসমিতি একটি ক্ষুদ্র পরিবার ও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত। বার্ষিক উৎসব-দিনে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন এই সভায় যোগদান করেন এবং বর্ত্তমান যুগে নারীত্বের আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বাঁকুড়া মহিলা-সমিতি প্রায় ২ বৎসর হইল একটি শিশু-পরিচর্য্যাগার পরিচালনা করিতেছেন। এইখানে দুঃস্থ অসহায় শিশু-দিগকে খাবার, ঔষধ, পথ্য এবং পোষাক-পরিচ্ছদাদি নিয়মিত বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামপুরে প্রদর্শনী

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে শ্রীরামপুরে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। শ্রীরামপুরের ৺ক্ষেত্রমোহন সাহা ব্যবসায়ী ও জমিদার এইখানে এই মেলা প্রথম আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় উৎসাহী যুবকেরা এই মেলায় একটি শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন। সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে এইখানে মহিলাসমিতির শিল্প-দ্রব্যগুলির একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

হাওড়া নারীমঙ্গল সমিতি

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে ৫০৮ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে হাওড়া জেলা নারীমঙ্গল কেন্দ্রসমিতি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে একটি সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সরোজ-নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সভার উদ্দেশ্য বি বৃত করিয়া ডাঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জী একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে হাওড়া জেলায় মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকার্য্যের জন্য হাওড়া নারী-মঙ্গল সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে তাহা সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা স্থির হয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপ'ত, মিঃ বি, কে, ঘোষ সম্পাদক এবং ডাঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জী কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন সভায় উপস্থিত সকলেই নবগঠিত সমিতির সভ্য হইতে স্বীকৃত হন। এবং প্রাথমিক কার্য্যারম্ভের জন্য সভাক্ষেত্রে প্রায় দুইশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সমিতির উদ্দেশ্য

প্রচারের জন্য বিভিন্ন মহিলাসমিতির প্রতিনিধি এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে লইয়া একটি পৃথক মহিলা-কমিটি গঠন করা স্থির হয়। একজন সদাশয় সভ্যের সহৃদতায় রামকৃষ্ণপুরে একটি মহিলা-শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিনা ভাড়ায় একখানি ঘর পাওয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে একটি শিল্প শিক্ষালয় খোলা হইবে। হাওড়া নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যালয় ৫০৮নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে স্থাপিত হইয়াছে।

যশোহর শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী

গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার বৈকাল বেলা যশোহর শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উপলক্ষে স্থানীয় বি, সরকার মেমোরিয়াল হলে স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ-মিলিত একটি বিরাট সভা হয়। জেলা-মেজিষ্ট্রেটের পত্নী সভানেত্রীত্ব করেন। সরোজ-নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি শিশুমঙ্গলের পূর্ব্বকৃত্য মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর দিবস রবিবার ১লা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময় উক্ত হলে আরও একটি সভা হয়। বহু মহিলা ও পুরুষ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেন্দ্র-সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে ধাত্রীশিক্ষা ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সিংহলে মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠান

সম্প্রতি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির আদর্শে, সিংহলে (Central Board Women's Institute) মহিলা কেন্দ্রসমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। মিসেস্ এ, আই, এলমার বি-এ তাহার সম্পাদিকা। আমাদের কেন্দ্রসমিতির কার্য্যালয় যেমন কলিকাতায়, তেমনি এই মহিলাসমিতি-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় সিংহলের প্রধান নগর কলম্বোতে। আরও আনন্দের বিষয়, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহিত অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য সিংহলের এই মহিলা-প্রতিষ্ঠান ৩৲ টাকা চাঁদা প্রেরণ করিয়াছেন।

স্কুলে সাহায্য

লণ্ডনের ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সরোজ-নলিনী নারী-শিল্পশিক্ষালয়ে এ বৎসর ৩২১৲ টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর এসোসিয়েসন এই শিক্ষা-লয়ের জন্য এই সাহায্য দিবেন কিনা তাহাও বিবেচনা করিবেন। আমরা এই এসোসিয়েসনের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শিউড়িতে মহিলা-সভা

শিউড়ি মহিলাসমিতি পুনঃ সংগঠন করিবার জন্য স্থানীয় মহিলাদের আহ্বানে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী গত ৩ শে জানু-য়ারী শিউড়ি গমন করেন। তিনি শিউড়ি গমন করায় স্থানীয় মহিলাগণের মধ্যে একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য "শিউড়ি সরোজনলিনী মিলন-মন্দিরে" একটি বৃহৎ মহিলাসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সমিতির সম্পাদিকা সমিতির সভ্যাগণের পক্ষে নিম্নলিখিত অভিনন্দনটি পাঠ করেন :—

"হে বরেণ্যা!

আজি আমাদের এই সমিতির অধিবেশনে আমাদের মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা ফলবতী করিবার জন্য যে আপনি আমাদের এই সমিতি-মন্দিরে শুভ-পদার্পণ করিয়া আমাদের সকলের গৌরব ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন তজ্জন্য আমাদের এই সমিতির মহিলাবৃন্দের পক্ষে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। হে শুভে, আপনার কল্যাণে আজি আমাদের এই সভার কার্য্যে যেন ভগবানের আশিস্ বর্ষিত হয়।

হে বঙ্গলক্ষ্মী-পূজারিণি, আপনি যে এই নারীজাতির কল্যাণের একনিষ্ঠ সাধনায় নারীজীবনের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, আপনার সেই সুউচ্চ আদর্শের প্রভাব দ্বারা আজিকার আপনার সুযোগ্য অভিভাষণে এই মহিলা-সমিতির মহিলাগণ প্রভাবান্বিত হইবেন, এই আনন্দের আশায় সবার হৃদয় মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতেছে। যে দেশ খনা, গার্গী, লীলাবতী প্রভৃতি মহীয়সী বিদুষী নারীগণের আদর্শ সযতনে হৃদয়ে ধারণ করিত, যে দেশে গৃহস্থ-নন্দিনীর কল্যাণ-কামনায় শাস্ত্রকারগণের শাস্ত্রের বিধান ছিল "পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ—", যে দেশে এখনও মাননীয়া সরোজ-

নলিনীর মত মহীয়সী নারীর আবির্ভাব হয়, সে দেশ কখন্ কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে অজ্ঞানতার কুসংস্কার-তমিস্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আজি বিশ্বনারীর সভায় আসন পাইবার অযোগ্য হইয়াছে। সেই কুসংস্কার-জাল ছিন্ন করিয়া নারী-জাতিকে মুক্তি দিবার জন্য আপনার অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করুন। আপনার সেই বাণী শ্রবণ করিয়া আমরা আমাদের নারীজীবন সাফল্যে ও গৌরবে মণ্ডিত করি।

আশা করি, আপনি এই শুভবার্ত্তাই প্রচার করিবেন যে ভগবানের আশীর্ব্বাদে সেই বরণীয় মুহূর্ত্ত আসিয়াছে,—দুঃখময় দুঃসহনীয় গভীর অন্ধকার রজনীর অবসানে জ্ঞানালোকের উষার প্রভায় আবার বঙ্গনারীর জীবন উদ্ভাসিত হইয়া বিশ্ব-নারীপ্রগতির তালে তালে নৃত্য করিবে।

যে দেশের "পুরুষ আবদ্ধ নিজ নিজ দেশে, নারী অবরুদ্ধা আপন আবাসে," সে দেশে আবার, কবির—

"সরস্বতীর মূর্ত্তি সেজে, উদ্ভাসিত জ্ঞানের তেজে,
শক্তিমন্ত্র সাধন করে' গড়্‌বে নারী সন্তানেরে—"

এই বাণী সার্থক হউক্।

আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, সুন্দর শোভন কথার মালা গাঁথিয়া আপনাকে উপহার দিবার সাধ্য আমাদের নাই, তাই আমাদের এই সামান্য ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ্য আপনাকে নিবেদন করিয়া আমরা চারিতার্থ হইলাম। আজি আমাদের এই অভিনন্দনের ভাষার অন্তরাল হইতে যে একটি বিষাদময় স্মৃতি সমুত্থিত হইতেছে তাহার উল্লেখ না করিয়া আমাদের হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছে না। আজি আমাদের এই সম্মিলনে এই মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী চিরস্মরণীয়া বরণীয়া সরোজনলিনী উপস্থিত নাই;—কিন্তু আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই অনুভূতির বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে যে তাঁহার স্বর্গগত পবিত্র আত্মা এই সমিতি-মন্দিরের বাতাসে প্রতি রেণুকণায় পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আমাদের অদ্যকার এই সম্মিলনীর কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার জন্য অশেষ মঙ্গলাশিস্‌ধারা বর্ষণ করিতেছেন।

হে মাননীয়া অতিথি, আজি আমরা আমাদের এই সমিতির পক্ষ হইতে আপনার সুদীর্ঘ জীবন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ও অদ্যকার এই সম্মিলনের সভানেত্রী বরণ করিয়া ধন্য হইলাম।'

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী অভিনন্দনের উত্তরে স্থানীয় মহিলাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, "বর্ত্তমান যুগে মেয়েদের সম্মুখে অনেক নূতন সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর এই পরিবর্ত্তনের জন্য পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির স্থান, অধিকার, কর্ত্তব্য ও পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছে। সমাজে ও পরিবারে বিধবাদের স্থান সেই দুর্ব্বল অংশের একটি। সমাজকে শক্তিশালী করিতে হইলে যাহাতে পরিবারের বিবাহিতা, অবিবাহিতা এবং বিধবা প্রত্যেক ব্যক্তি মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারে বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহার দিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও আমাদের হিন্দু পরিবারে অনেক গলদ আসিয়া পড়িয়াছে। পুত্রকে বধূর অতিরিক্ত অনুরক্ত হইতে দেখিলে শাশুড়ীরা পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের কন্যার পক্ষে বিপরীত ভাব পোষণ করেন। তাঁহারা জামাতা কন্যার বিশেষ অনুরক্ত হন। স্বামী বিদ্বান ও স্ত্রী মূর্খ হইলে তাহাদের মিলনের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে ঘরে ও বাহিরে আন্তরিক সহযোগিতা না থাকিলে সংসারের প্রভূত কল্যাণ-সাধন হয় না। এইসব নানা সমস্যার কিরূপ সমাধান হইবে সে বিষয়ে প্রত্যেক মেয়ের চিন্তা করা দরকার। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা, অধিকার, পারিবারিক জীবনে স্থান, আমাদের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিরূপে বর্ত্তমান কালোপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তন করা যায়, সেই সমস্যার সমাধান মেয়েদেরই করিতে হইবে।"

ভাঙা মন্দির

শ্রী দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

গ্রাম-পথে ভাঙা শিব মন্দির
বট সঙ্কুল দেহ,—
দিন-দুপুরেও ভিতরে তাহার
প্রবেশিতে নারে কেহ।
জীর্ণ প্রাচীর-ফাঁকে,
নীড় রচিতেছে কাকে,
চামচিকা আর বাদুড় উড়িছে
চৌদিকে শত শত;
হেরি তার দশা সন্ধ্যায় মোর
ঝরে আঁখি অবিরত।

হে দেব-দেউল, শঙ্খঘণ্টা
শুনিতে পাওনা তুমি,—
আমার মর্ম্মসঙ্গীত দিয়ে
গেনু তব পদ চুমি'।
দাঁড়ায়ে রয়েছ দূরে,
পথের প্রান্ত জুড়ে',
রাখাল ছেলের ভীড় জমিতেছে
অঙ্গনে অহরহ;
ভগ্ন দেউল, দীন পূজারীর
প্রণতি আজিকে লহ!

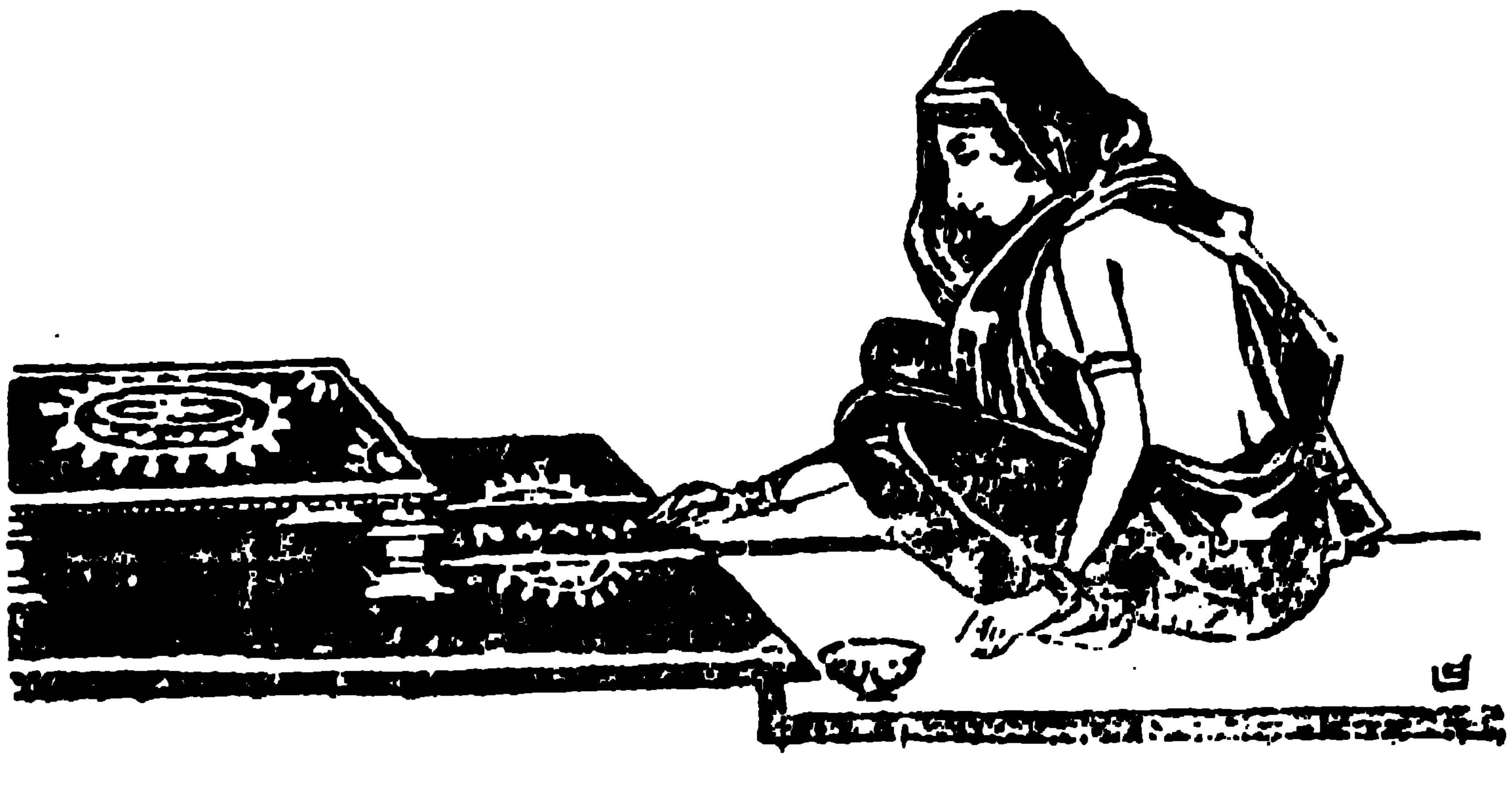

শিউড়ি মেলা

শ্রী ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ এম-এ

বীরভূমে নবজীবনের সাড়া

শিউড়িতে মেলা ও প্রদর্শনী * দেখিতে গিয়া এবার বীরভূমে প্রকৃতই নবজীবনের সাড়া পড়িয়াছে প্রত্যক্ষ করিলাম। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় এবং সরকারী-বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অক্লান্ত চেষ্টায় গত ৩১শে জানুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত একটি বিরাট প্রদর্শনী ও মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এরূপ সুন্দর শিক্ষাপ্রদ এবং অভিনব ধরণের মেলা ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বলের কোন সহরে হইতে দেখা যায় নাই। মেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, প্রভৃতি লোক-শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গে লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের অভিনব সমাবেশ সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। মেলায় কতকগুলি বড় রকমের বিশেষত্ব দেখিতে পাইলাম। নূতন ও পুরাতন এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য, হিন্দু মুসলমানে প্রীতির সম্মিলন, দেশের লোকের কাজের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা দ্বারা একটা কল্যাণ সৃষ্টি করার ভাব এবং সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক ভেদ-বুদ্ধির বিলোপের একটা রূপের প্রকাশ, এইগুলি এই মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে উচ্চনীচ সকলের মুখে সমান ভাবে আনন্দের বিকাশ এর পূর্ব্বে কোন মেলায় আমরা দেখি নাই। তারপর মেলার শোভা-বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন দৃশ্যের বৈচিত্র্য দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম। প্রতিদিন প্রায় ১লক্ষ লোক সুদূর পল্লীর নানাস্থান হইতে মেলাক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল এবং সকলেই মনের ভিতরে একটি নূতন শিক্ষা, নূতন জ্ঞান এবং নূতন আনন্দ লাভ করিয়া ফিরিয়াছিল।

জ্ঞানের মশাল জ্বালিবার আহ্বান

গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার বঙ্গীয় সরকারের কৃষি ও শিল্প-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর ফারোকী এই মেলার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। উদ্বোধন-কার্য্য সম্পূর্ণ নূতন ভাবে, অভিনব প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রথমে প্রায় দু'শত ছাত্র সমস্বরে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় রচিত একটি সার্ব্বজনীন প্রার্থনা-সঙ্গীত গান করেন :—

"ভগবান হে! খোদাতালা হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!"

তৎপরে দত্ত মহাশয় মাননীয় মন্ত্রীকে প্রদর্শনী-উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন করিতে আহ্বান করিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় বীরভূমে জলাভাব, জাতীয় জীবনে চাষী ও চাষার স্থান, লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের প্রচলন, নৃত্যগীতে ধর্ম্মসমন্বয় এবং বঙ্গদেশের পল্লীসম্পদ সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। †

তৎপরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বক্তৃতা করিয়া প্রদর্শনী-উদ্বোধনের জন্য অগ্রসর হন। চারটি সুসজ্জিত বলদ

---

* ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭—"বীরভূমের সদর শিউড়ীতে বাৎসরিক চারিটি মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শিউড়ীর গবাদি পশু ও কৃষিশিল্প বিষয়ক প্রদর্শনীই (বড় বাগানের মেলা) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বীরভূম কৃষিপ্রধান স্থান জানিয়া ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ড্রেক ব্রোকম্যান (Mr. Drake Brockman) সাহেব এই জেলার ও অন্যান্য জেলার কৃষি শিল্প গবাদি পশু ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি-সাধনকল্পে এক অনুষ্ঠান করিবার কল্পনা করেন; কিন্তু তিনি এইস্থান হইতে বদলী হইয়া যাওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট কোলিয়ার (Mr. Collier) সাহেব ইংরাজী ১৮৯৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে উক্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন। ইংরাজী ১৯১১ খ্রীঃ ব্যতীত এই মেলা বরাবর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া মেলার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং যে আশা লইয়া এই মেলা প্রবর্ত্তন করা হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে। সাধারণতঃ মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই বড় বাগানের মেলার অধিবেশন হয়। দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই মেলার উদ্বোধনাদি কার্য্যে যোগদান করিয়া মেলাটিকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন। ইহা গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য ব্যতীত মূলতঃ সাধারণের চাঁদা প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত। গভর্ণমেণ্ট এই মেলার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে এই মেলা নানা বিষয়-বিভাগে পর্য্যবসিত হইয়া বহু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।..." —বঃ সঃ

† শ্রীযুক্ত দত্তের বক্তৃতা এই সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশিত হইল।—বঃ সঃ

লাঙ্গল লইয়া সেইজন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু মন্ত্রী-মহোদয়ের হস্তে লাঙ্গল অর্পণ করেন। তিনি এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানের মশাল * লইয়া অন্য হস্তে আলিপনা দ্বারা সুসজ্জিত ভূমির কতকাংশ চষিতে চষিতে প্রদর্শনীর পুরোদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া কৃষককে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে। কৃষি যে হেয় কার্য্য নহে তাহা সর্ব্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে ভূমিকর্ষণ করিয়া প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

বসিয়াছিল। এই হাটে মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য খুঁজিলে পাওয়া যাইত। দ্বিতীয় অংশ সভাসমিতি, আমোদ-প্রমোদ এবং নির্দ্দোষ নৃত্যগীতের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মূল প্রদর্শনীর প্রথম ভাগে জেলার কৃষিজাত সকল-প্রকার দ্রব্য সজ্জিত হইয়াছিল।

কৃষি-বিভাগ

কৃষি বিভাগকে সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ ভাবে সজ্জিত করিবার দিকে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। জেলায় উৎপন্ন সকলপ্রকার ফল, শস্য

প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভা—মধ্যস্থলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

মেলা

সহর হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে সুবিস্তৃত উদ্যানে মেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মেলা ও প্রদর্শনীকে কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রথম অংশে মানুষের আবশ্যকীয় সকলপ্রকার দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের হাট

এবং সব্জীর উৎকৃষ্ট নমুনা প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। কৃষি বিভাগে নিরক্ষর কৃষক হইতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দেখিবার এবং শিক্ষা করিবার অনেক কিছু ছিল। প্রদর্শনী দেখিয়া বাস্তবিকই কৃষকেরা অনেক নূতন জ্ঞান পাইয়াছে। বীরভূমের শুষ্ক মাটিতে যে ১০।১২ ফুট উচ্চ কয়ম্বাটুরের ইক্ষু জন্মায় তাহা আমরা জানিতাম না। এই ইক্ষু হইতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট গুড়ের নমুনা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। অনুসন্ধানে জানা গেল স্থানীয় কৃষকদের জমি

‡ এই 'জ্ঞানের মশালের' পরিকল্পনা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয় করিয়াছেন। —বঃ সঃ

হইতেই ইহার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। জেলার নানাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট লাউ, কুমড়া, বেগুন, মূলা, আলু সংগৃহীত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত সুলতানপুর "শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের" কৃষিবিভাগ হইতে বিভিন্নপ্রকার উৎকৃষ্ট সারের নমুনা, নানাপ্রকার ধান, চীনা বাদাম, বেগুন, পেঁপে প্রদর্শনীতে আনীত হইয়াছিল। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে ৫০ রকমের ধান্য, নানাপ্রকার তুলার নমুনা, ব্যবহারের প্রণালী, মুগ, মটর, কলাই, বরবটি, অড়হর, মসুরে, ছোলা, তিল, মেতি, সারষা প্রভৃতি সমস্ত রকম শস্য, রেশমকীট পালনের নানা অবস্থা, রেশম হইতে সূতা প্রস্তত প্রভৃতি কৌতুকপ্রদ ভাবে দেখান হইয়াছিল। স্থানীয় প্রকার ছাপান কাপড় ও সাড়ী প্রদর্শনীর বিশেষ শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিল। বিশ্বভারতী, পল্লীসংগঠনের বিভিন্ন উপায়গুলি ত্রিবর্ণ চিত্রে অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ শিক্ষার বিষয় হইয়াছিল। শিল্পচর্চ্চা, রোগ প্রতিকারের উপায় অবলম্বন, সমবায়-ভাণ্ডার, সেবাশ্রম, পল্লীসমিতিকর্ত্তৃক পুষ্করিণী-সংরক্ষণ, মহিলাসমিতি, মন্দির-সংস্কার, কুইনিন বিতরণ, ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি, জঙ্গল পরিষ্কার, মশকনিবারণের জন্য খাল ডোবায় কেরোসিন দেওয়া, গ্রামের রাস্তা প্রস্তত, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, ডোবা ভরাট করা, গ্রামে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা, ড্রেন পরিষ্কার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ নিবারণ প্রভৃতি নানাবিষয়ে লোকশিক্ষার জন্য

'জ্ঞানের মশাল' হস্তে মাননীয় মন্ত্রীর দ্বারোদ্ঘাটন-উদ্যোগ

কর্ম্মকারগণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী লাঙ্গল, কোদাল, জল সেচন করিবার দুনি, গুড় জ্বাল দেওয়া কড়া প্রভৃতি প্রদর্শনীতে আনিয়াছিল। সমবায়-বিভাগ হইতে নানাপ্রকার ছবি, চার্ট ও পুতুলের সাহায্যে কৃষিকার্য্যে সমবায়ের উপযোগিতা, কৃষিকার্য্যের জন্য গোপালন, গরুর বিভিন্ন কাজ বিশেষ কৌতুকপ্রদ ভাবে দেখান হইয়াছিল।

শিল্প-বিভাগ

প্রদর্শনীতে দেশীয় শিল্পের বহুপ্রকার দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রস্তত শতরঞ্জ, আসন, গালিচা, নানা-সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখান হইয়াছিল। বীরভূমে বহুকাল হইতে নানাপ্রকার তসর, গরদ, মটকার ধুতি ও সাড়ী অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তত হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা তাঁত বুনিয়া ঐসকল দ্রব্য কিরূপে নির্ম্মিত হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিল। বীরভূমের নানাস্থানে চরকার সূতা ও খদ্দর প্রস্তত হইয়া থাকে। ৪।৫ টি খদ্দরের দোকান নানাস্থান হইতে আনীত বহুপরিমাণ খদ্দর ও চরকার সূতা প্রদর্শন করিয়াছিল। সুদূর ঢাকা হইতেও সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য-সমন্বিত খদ্দরের সাড়ী প্রদর্শনীতে বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। কলিকাতার সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রদর্শিত

কাপড় ও শিল্পের উপর অতি সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য দেখিয়া দর্শক-মণ্ডলী বিস্মিত হন। সূচিকার্য্য ব্যতীত সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি হইতে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর গালিচা, শতরঞ্জ, তোয়ালে, কাঁথা প্রভৃতি সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সুলতানপুর "...রাম উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়" হইতে দা,ছোরা, বঁটি, রামদা', ছাতা, তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে বিভিন্ন বর্ণের অতি সুন্দর সুন্দর চামড়, চামড়া খারাপ হওয়ার কারণ, কত প্রকারের চামড়া মানুষের কাজে লাগিতে পারে - তাহা একটি স্থানে দেখান হইয়াছিল। সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে একটি ছোট চাউল প্রস্তুতের কল আসিয়াছিল। তাহার মূল্য মাত্র ২২৲। এই কল একজনের দ্বারা অতি সহজে চালান যায় এবং ঘণ্টায় ৫ সের চাউল হয়। পিতল কাঁসার দ্রব্য অতি সহজ উপায়ে পালিস করিবার জন্য বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ হইতে কেরোসিন তেলে পরিচালিত একটি কল এবং ছাতার বাঁটে চিত্র করিবার আর একটি ১৫৲ টাকা মূল্যের কল প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই কলগুলির মূল্য অতি অল্প কিন্তু ইহা দ্বারা যুবকগণ আয়ের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন।

বিশ্বভারতী হইতে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, ছুতারের যন্ত্রাদি প্রভৃতি নানাপ্রকার লোহার কাজ যাহা স্থানীয় কর্ম্মকারগণ প্রস্তুত করিতে পারে তাহা দেখান হইয়াছিল।

প্রদর্শনীতে বীরভূমনিবাসী শ্রী চন্দ্রভূষণ ক...কার সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্বে ও প্রতিভায় এক হাজার ক্যাণ্ডেল লাইট শক্তির একটি আধুনিক লাইট তৈরী করিয়াছে। এই দীপানির্ম্মাণ প্রতিভার প্রতি আদর ও সম্মান-জ্ঞাপনের চিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শনীর পক্ষ হইতে উহাকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাধারণ বিভাগে দেশী খেলনা ও পুতুল হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তিপুরের ধুতি পর্য্যন্ত সকলপ্রকার স্বদেশী জিনিষের ষ্টল ছিল।

সেচন-বিভাগ

সরকারী সেচন-বিভাগ হইতে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের জলপথসমূহ, তাহাদের উৎপত্তিস্থান, নদীর পার্শ্বে গ্রামসমূহ মাটি খুঁড়িয়া অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছিল।

সাঁওতাল পরগণার পাহাড় হইতে বক্রেশ্বর নদ বাহির হইয়া এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বক্রেশ্বর হইতে খাল কাটিয়া তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষার সময় বক্রেশ্বরের জল এই খাল দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং এই প্রকারে খালের চারিদিক প্রায় দশ হাজার বিঘা জমির সেচের সুবিধা হইবে। আগামী বর্ষাকাল হইতেই ঐ সকল স্থানের গ্রামবাসীগণ এই সেচের সুবিধা পাইবেন। ফলে জলাভাবে ঐ ১০ হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইবে না। জেলার আর কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ খাল কাট হইলে চাষের সুবিধা হয় তাহাও দেখান হইয়াছে।

পশুপালন-বিভাগ

প্রদর্শনীর একটি অংশে স্বাস্থ্যবান গাভীর বলদ, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। সরকারী পশু-চিকিৎসা বিভাগ হইতে অসুস্থ হইলে পশুদের কিরূপ চিকিৎসা করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য একজন উপযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়া সমবেত কৃষকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব-প্রচার

প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের অনেক আয়োজন হইয়াছিল। সুন্দর সুন্দর কবিতা ও ছবিতে মেলার সমস্ত স্থান ভরা ছিল। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কি করিতে হয় তাহা সুন্দর কবিতার ভাষায় বড় বড় অক্ষরে দেওয়া হইয়াছিল।*

যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, মনে শক্তি জাগে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিয়া দেশের দারিদ্র্য, রোগ এবং দুর্দ্দশা নিবারণ করিতে পারা যায়, শিক্ষাদ্বারা কুসংস্কার বিদূরিত হয়, তাহার বিষয় মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ কার্য্যে, কথায়, চিত্রে, বাক্যে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিরক্ষর কৃষক মজুর হইতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত কয়দিন মেলা দেখিয়া মনে একটা নূতন ভাব লইয়া ফিরিয়াছে।

ব্রতী-বালকদল

মেলা উপলক্ষে বীরভূমের বিভিন্ন স্কুল হইতে বহুসংখ্যক ব্রতী আসিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। তাহারা মেলায় যোগদান করিয়া উৎসাহ ব্যঞ্জক সঙ্গীতের সহিত একযোগে মার্চ্চ করিতে করিতে ধাবিত হইয়া স্কাউট দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার সাধিত হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছিল। কলিকাতা হইতে অল্ বেঙ্গল বয়স্কাউট এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী মিঃ এন, এন, ঘোষ তাঁহার স্কাউট দল সঙ্গে মেলায় যোগ দিয়া সকলের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেন।

বিশ্বভারতীর সুবিখ্যাত "যুযুৎসু" ওস্তাদ শ্রীযুক্ত টাগা গাকী শান্তিনিকেতনের যুযুৎসু ক্রীড়কদিগকে লইয়া প্রদর্শনীতে আসিয়া ক্রীড়া দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

* কবিতাগুলি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি এস্ রচিত। —বঃ সঃ

পল্লীসম্পদ রক্ষা

মেলার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাচীন লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের প্রচলন চেষ্টা। তজ্জন্য জেলার ভিন্ন স্থান হইতে 'রাইবিশের' দল আনীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, রাইবিশেরা প্রাচীন বাংলার রাজাদের ভল্লধারী যোদ্ধা ছিল। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যুদ্ধকালীন যেরূপ নৃত্য করিত এখনও তাহারা সেইরূপ নৃত্য ও আরাব করিয়া থাকে। প্রদর্শনীতে বাউল গান ও বাউল নৃত্যের যথোপযুক্তরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারা নানাপ্রকার ভাব সঙ্গীত ও নৃত্যদ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। মৈমনসিংহ হইতে জারির দল আসিয়া সুন্দর নৃত্য ও গীতে সকলের মন মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গীতের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব আছে।

মেলার প্রাঙ্গণে পল্লীসম্পদ রক্ষার জন্য একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সভাপতি এবং রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সম্পাদক হইয়াছেন।

মেলায় মাননীয় দত্ত মহাশয়ের রচিত সঙ্গীতগুলি স্থানীয় লিঙ্ক্ ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া প্রদর্শনীতে নূতন ভাব ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার "ভারত-গাথা", "চাষা" এবং "রাইবিশে" গানের ন্যায় ভাবোদ্দীপক এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক সঙ্গীত বাংলা ভাষায় অতুলনীয়। "রাইবিশে" গানের মত কোন জিনিষ বাংলা ভাষায় নাই বলিলেই চলে।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, শিউড়ি মেলা ও প্রদর্শনী লোকশিক্ষার ও জাতীয় জীবনে নূতন ভাব এবং নূতন আনন্দ সৃষ্টি করিবার দিকে বিশেষভাবে সাফল্য দান করিয়াছে।

এই কর্ম্মযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। ইহার গঠন ও পরিচালনে আমরা তাঁহার অমানুষিক কর্ম্মশক্তি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা আত্মোৎসর্গের প্রেরণা যাহা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। আপনাকে যিনি দিতে পারেন তিনিই সাধক, তিনিই সত্য। তাঁহার প্রাণশক্তি সকলের প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া দেশের কার্য্যে আত্মদান করিতে সকলকে অনুপ্রাণিত করুক, এই প্রার্থনা।

ইম্পিরিয়াল চায়ের গন্ধ—

– খুকুমণিরও মন ভুলায়

যেমনি গন্ধ তেমন তার স্বাদ—
পাকা লোকের হাতে ব্লেণ্ড করা
দার্জ্জিলিং ও আসাম বাগানের

'ইম্পিরিয়াল চা'

ইম্পিরিয়াল টি কোং

৭৪।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলি: ১১৩১

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

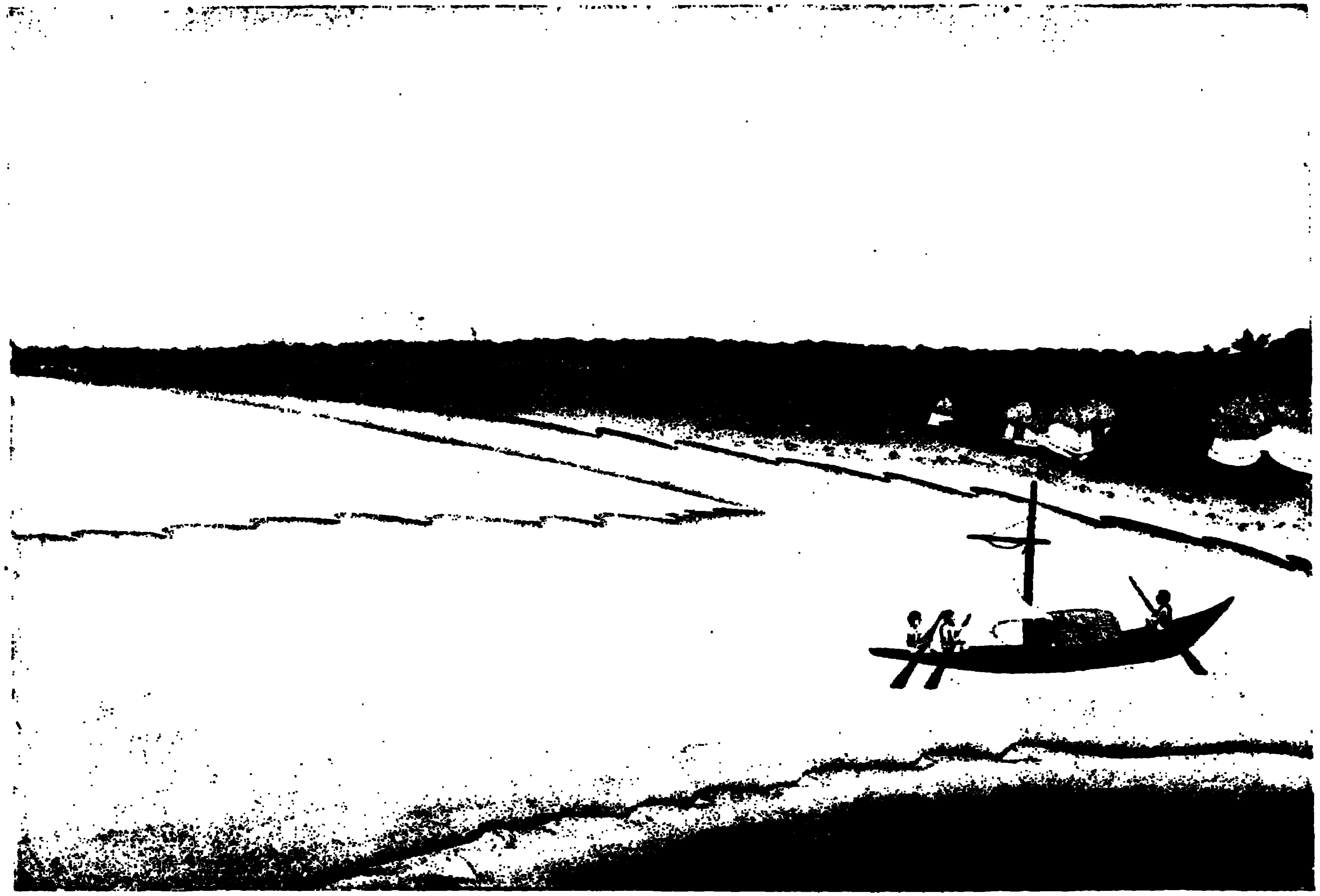

ভোরের ভেলা

দূর আকাশে দিচ্ছে দেখা
রাঙা রেখার ওই চিনারে,
ভোরের ভেলা ভাসল সুখে
নদীর বুকে এই কিনারে।

শিল্পী—শ্রী নিভাননী চৌধুরী

C. R. ABAX & CO

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৭ [৫ম সংখ্যা

ভারত-গাথা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

ভারতে জন্মে মানুষ পুণ্য-ফলে --
বহু পুণ্য-ফলে !
কত অতীত যুগের মধুর স্মৃতি --
মিশে আছে তার
নদী কানন মরু পাহাড় প্রান্তরে—
জলে স্থলে ॥

(হেথা) তপোবনের তরুচ্ছায়ায় শকুন্তলার দেখা ;
পঞ্চবটীর বনের পথে সীতার পায়ের রেখা ;—
(হেথা) ভবভূতি কালিদাসের অমর মসী-রেখার টানে—
নর-নারীর হৃদয় দোলে !

(হেথা) রচে' গীতার অমর গীতি
ভাঙ্‌লো মানুষ মৃত্যু-ভীতি ;—

(হেথা) বিশ্ববাসীর মরম-ব্যথায় প্রাসাদ-ত্যাগী উদাস-পরাণ শাক্যমুনি--
পেতেছিল ধ্যানের আসন
বোধি-তরুর শাখার তলে ॥

(হেথা) লিখেছিল অশোক রাজা স্তম্ভ-গায়ে লিপি ;
জহর-ব্রতে পদ্মিনী তার পরাণ দিল সঁপি' ;—
(হেথা) প্রেমের রাজা সা-জাহানের মানস-রাণীর মূর্ত্তি রচা—
মমতা-ঝরা মর্ম্মরের অশ্রুজলে ।

(হেথা) লিখে গেছে রক্তে তাদের বীরত্ব-কাহিনী
রাজপুত্, শিখ্, মোগল পাঠান মারাঠা-বাহিনী ;—
(হেথা) রণজিৎ সিং রাণা-প্রতাপ শিবাজী আর আকবরের
গান গাহে মা—
ঘুমপাড়ানীর মধুর বোলে ॥

ভালোবেসেছিল হেথা রজকিনী রামী ;
মিলেছিল মীরাবাইএর অনন্ত-রূপ স্বামী ;—
(কত) পতিব্রতা সতী হেসে' কোমল প্রাণ আহুতি দিল—
পতিত সমাজের রচা চিতানলে ।

(হেথা) উঠেছিল বেজে' রাজা রামমোহনের ভেরী
ধর্ম্মনীতির অধঃপাত আর নারীর দুঃখ হেরি' ;—
(হেথা) বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ কেশবের
জীবন-প্রদীপ—
গভীর নিশির আঁধার নাশি' উঠ্‌ল জ্বলে' ॥

(হেথা) যুঝেছিল চাঁদ-বিবি আর দুর্গাবতী রণে ;
জাহানারার কবর-ভূমি সজীব হরিত্ তৃণে ;—
(হেথা) ধাত্রী পান্নাবতী আপন রক্তে গড়া বুকের মাণিক বলি দিল—
ভারত-নারীর ত্যাগ-ব্রত সাধনার বলে ।

(হেথা)　রুধেছিল পুরু-রাজা সেকেন্দরের গতি ;
　　শিক্ষালাভে ব্রতী ছিল গার্গী লীলাবতী :—
(হেথা)　মৈত্রেয়ী রামানুজ কবীর নানক-গুরুর
　　　　জ্ঞানের স্রোতের মন্দাকিনী —
　　　　প্রবাহিল প্লাবন-ধারা নর-নারীর প্রাণের তলে ॥

(হেথা)　প্রচারিল যুগে যুগে কত উদার জ্ঞানী
　　প্রেম ভকতি জীবে দয়া অহিংসতার বাণী ;—
(হেথা)　ঘর-বিরাগী অনুরাগী গোরাচাঁদের
　　　　প্রাণ-মাতানো প্রেমের তানে—
　　　　নেচে' নেচে' গাহে বাউল দলে দলে।

(হেথা)　বেজেছিল চণ্ডীদাস আর জয়দেবের বীণা ;
　　রচিল পদ বিদ্যাপতি তুলসীদাস আর খনা ;—
(হেথা)　মধুসূদন দ্বিজেন্দ্রলাল হেম নবীন আর বঙ্কিমের
　　　　গাঁথা মালা-
　　　　　গরবিনী বঙ্গরাণীর বক্ষে দোলে ॥*

* গানটির স্বরলিপি এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইল।—বঃ সঃ

গ্রামের আল্পনা

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

ঘরের জিনিসের উপর আমাদের দরদ নাই, তাহার খোঁজ আমরা রাখি না ;—ইহার ফলে কত যে গৃহশিল্প কত যে বাউলের গান, কত যে ব্রতকথা, যা একদিন পল্লীগ্রামের সরল প্রাণের সহজ অনুভূতির দ্বারা অপূর্ব্ব রূপে রসে বিকশিত হইয়াছিল, তা শুধু আমাদের অবহেলা ও অবজ্ঞার দরুণ কতক বা মরণোন্মুখ হইয়া, কতক বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে খোঁজ আমরা কয়জনা রাখি ?

এমনি একটি মরণোন্মুখ পল্লী-শিল্প—আল্পনা। পূজা-পার্ব্বণ বা যে-কোন উৎসবের সময়ে পল্লীগ্রামের মহিলারা তাঁহাদের ঘর, বারান্দা ও উঠান সামান্য পিঠুলি গোলা জল দিয়া একটি মাত্র অঙ্গুলির স্পর্শে অপূর্ব্ব রেখা-পাতে এমন সুন্দর ও সুষমাময় করিয়া তোলেন যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে আমাদের পল্লীগ্রামের সমগ্র নারীসমাজই শিল্পী। আর কোন দেশের মহিলারা তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে এমন করিয়া রূপ দিতে পারেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। অবশ্য আমাদের দেশেও একদিনে ইহার সৃষ্টি হয় নাই ; সমগ্র বঙ্গনারীর স্নিগ্ধ অথচ তত্ত্বান্বেষী প্রাণের যোগাযোগে কালে কালে তাহার অনুভূতির ক্রমবিকাশে আল্পনা সুসঙ্গত ও সুসম্পূর্ণ রূপে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে।

কিছুদিন হইতে আমি খুলনা-যশোহরের আল্পনা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। বঙ্গের তথা ভারতের অন্যান্য স্থানের আল্পনা হইতে খুলনা-যশোহরের আল্পনায় একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য যতক্ষণ না খুলনা-যশোহরের সমস্ত আল্পনা সংগৃহীত হইতেছে, ততক্ষণ উহার বিশিষ্টতা অথবা অন্যান্য প্রদেশের আল্পনার সহিত উহার কোনপ্রকার তুলনামূলক আলোচনা করা বিধি-সঙ্গত হইবে না। তবে উহার মূল কথাটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

কোন জিনিসের পূর্ণ রূপ দেওয়া নয়, কেবল মাত্র তাহার 'চরিত্র' বা 'ঠাট'টিকে গ্রহণই আল্পনার মূল কথা এবং ঐখানেই তাহার সৌন্দর্য্য। মানুষ পাখী মাছ গাছ,—এর প্রত্যেকটির প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে মন না দিয়া তাহার প্রত্যেকটির সমগ্র রূপের সংক্ষেপ অথচ সুষমাপূর্ণ অঙ্কনেই আল্পনার পরিণতি।

সাধারণতঃ আল্পনাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি—(ক) ব্রতকথার আল্পনা,(খ) বৃত্তাকার আল্পনা, গ) ফুল লতা প্রভৃতির আল্পনা। ব্রতকথার আল্পনা সাধারণতঃ ব্রত-কথার কাহিনী অনুসরণ করিয়া চলে ; কিন্তু এমন অনেক ব্রত আছে আল্পনা শিক্ষাই যাহার মূল উদ্দেশ্য, সেই সব স্থানে ব্রতকথাই আল্পনার অনুসরণ করিয়া চলে। এবং প্রায়শঃ গ্রাম্যজীবনের সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে ঐ সমস্ত আল্পনার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কে যে-কোনও বস্তু আসিয়াছে তাহাকেই মহিলারা আল্পনায় স্থান দিয়াছেন। গরু, ঘোড়া, হাতী, মাছ, পাখী, গাছ, লতা-পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া হাট-বাজার, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, মঠ-মন্দির, জোড় বাঙ্গলা, এমন কি আকাশের চন্দ্র সূর্য্য তারা কিছুই বাদ যায় নাই।

এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড ছবির মত ব্রতকথার আল্পনার দু-একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। প্রথমেই মানুষকে কেমন করিয়া রূপ দিয়াছে তাহাই দেখা যাক্। মানুষের বেলায় সহজ সরলতার সহিত কেবল মাত্র দুই হাত দুই পা ও মস্তকটি রাখিয়া আর সমস্ত খুঁটিনাটিকে অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে আমরা কেবল মাত্র মূল 'মানুষ'টিকেই পাই, মানুষের বাহ্য প্রকাশের গোলমালের মধ্যে আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে না। মেয়ে-মানুষের অঙ্কনে, সেই পল্লীগ্রামের

লজ্জানম্র ঘোম্‌টা-টানা বউটি, মাথার উপর ঘোম্‌টার ছোট বক্র রেখাটি দিয়া এমনি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে দেখিলে বিস্ময় লাগে।

তারপর দুই জোড়া পাখী—'হেঁচি-কচকচি' ও 'গোড়া-গুড়ী' কি অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এককোণা হইতে ছড়ান চাউলের উপর ঠোকর মারিয়া বসিয়াছে। পাখীর ইঙ্গিতটি (Suggestion) কি চমৎকার! এই রকম রান্নাঘরের ছবিটিতে, ছোট্ট বউটি রান্না করিতে বসিয়াছে—কাঠ, জলের কলসী, তিন-ঝিঁক্ ওয়ালা উনান, হাতা বাউলী কোনকিছুর অভাব নাই। এক পাশে বাড়ীর

রান্নাঘর

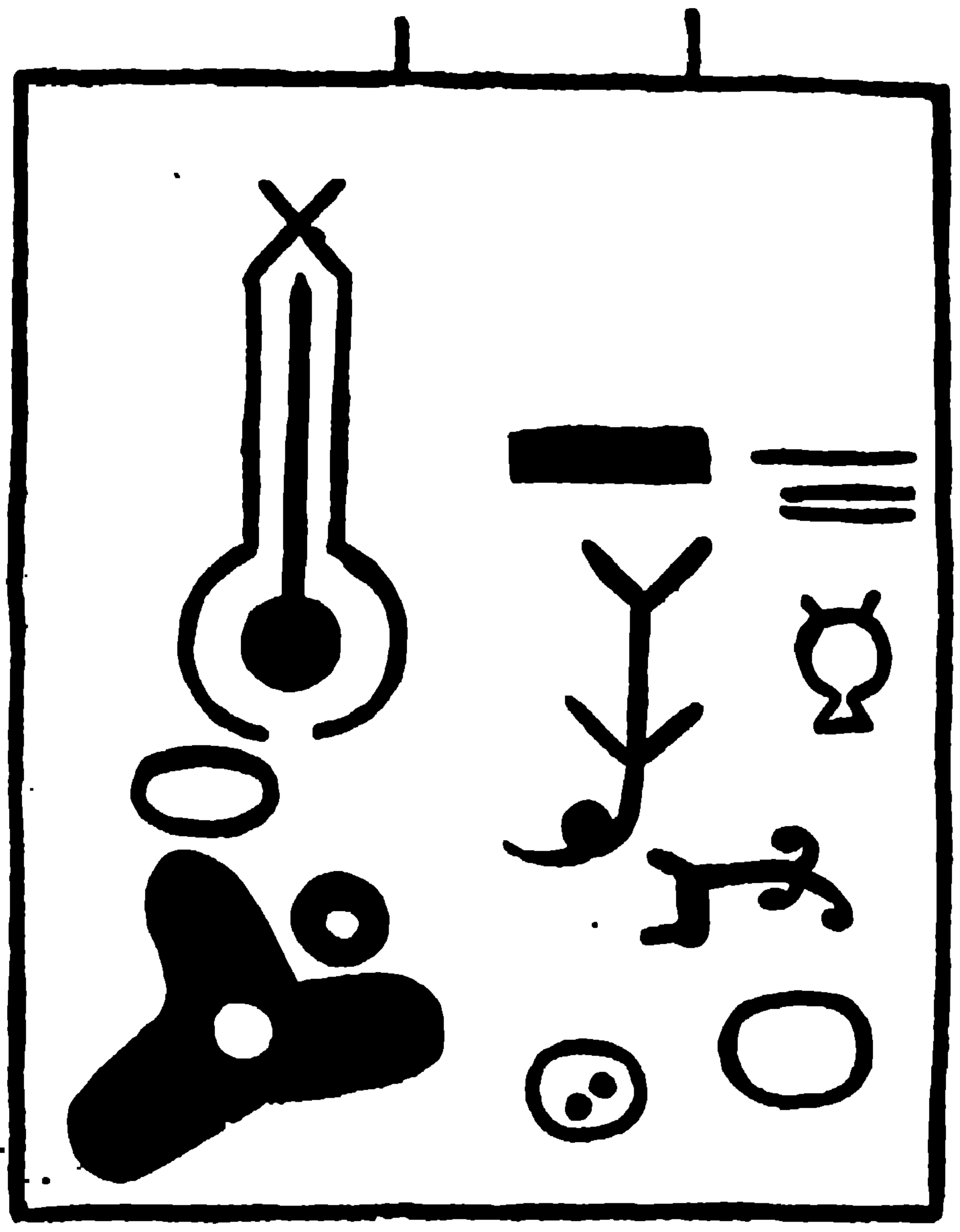

চন্দ্র-সূর্য্য-তারা

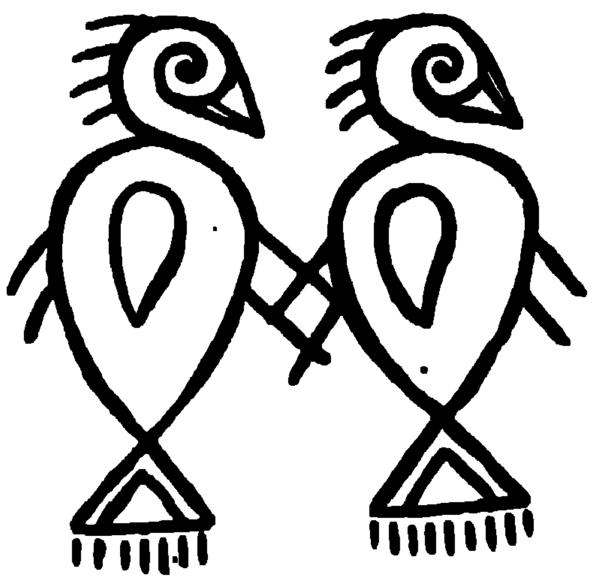

জোড়া পাখী

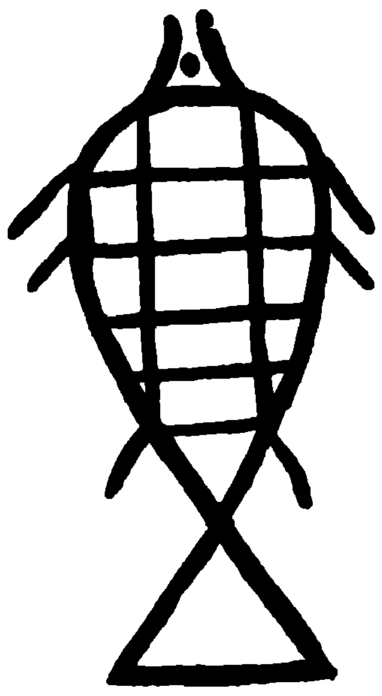

মাছ

আল্‌পনার আলঙ্কারিকতার চূড়ান্ত কৌশল এই দুটি ছবিতে দেখিতে পাই। পারিপ্রেক্ষিকতার বালাই আল্‌পনায় একেবারে নাই, অথচ বিষয়বস্তুর সংস্থানে অতি সজাগ প্রাণের পরিচয় পাই। এই হিসাবে ঢেঁকি-শালের ছবিটি আমার নিকট বিস্ময়কর! ঢেঁকি-শালের কর্ম্মতৎপরতার ভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে। সর্ব্বোপরি বউদুটির অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া এক দুষ্ট পাখী হঠাৎ ঢেঁকি-শালের পোষা বিড়ালটি খাবার লোভে ছোঁ-ছোঁ করিয়া ঘোরে। একেবারে সত্যিকারের পল্লীগ্রামের রান্নাঘরের ছবিটি! হাতা-বাউলী দুটির যোগাযোগ অতি সহজ অথচ চাতুর্য্য-পূর্ণ।

চন্দ্র সূর্য্য তারা এই তিনটি বস্তু যদিও দূরে দূরে চলিয়া থাকে কিন্তু আল্‌পনায় এমনি সুন্দর কৌশলে পরস্পরকে স্থান দেওয়া হইয়াছে যে, কোনরূপেই জাগতিক নিয়মের

অবস্থার কথা আমাদের মনে হয় না; বরং এই তিনটি জিনিষকে একসঙ্গে উপভোগ করার যে আনন্দ তাহা আমরা পাই। চন্দ্রের পাশে পাশে ও মাঝখানে এক-একটু বক্র রেখা টানিয়া রচনাটিকে আরও চমৎকার করা হইয়াছে। পাল্কীর আল্পনাটিতে কোন কিছুই বাদ যায় নাই— বেহারারা কেউ বা একখানি লাঠি ভর দিয়া চলে, পাল্কীর ভিতরে বৌটি শুইয়া, সামনে ও পাশে দুইটি তাকিয়া বালিশ, কোলের কাছে ছোট তিনটি ছেলে মেয়ে।

এইরূপ ব্রতকথার সহিত আল্পনার প্রচলন আমাদের দেশে কত যে ছিল তাহার সংখ্যা নাই। ছোট ছোট মেয়েরা আগে কত রকমের ব্রত পালন করিত। ব্রত-পালনের সঙ্গে সঙ্গে কত নীতিকথা, কত সুকুমার শিল্পই যে তাহারা শিখিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন কত ব্রত ছিল যাহার ফলে শুধু আল্পনাই মেয়েরা শিখিতে পারিত। কিন্তু এখন মেয়েরা ব্রতকথা ও আল্পনাকে অসভ্যতা মনে করে; ফলে ক্রমে ক্রমে সমগ্র আল্পনা-শিল্পটিই আমাদের দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ব্রত ভিন্ন অন্য উৎসব বা পূজা উপলক্ষে বৃত্তাকার আল্-পনাই দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় এক-একটি বিভিন্ন উৎসব বা পূজার সময় এক-একটি বিশিষ্ট আল্পনা অনেক স্থানে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিবাহের সময় একপ্রকার আল্পনা দেওয়া হয়—তাহাকে বৌ ছত্র বলে। লক্ষ্মী-পূজার নির্দ্দিষ্ট আল্পনাটিতে মধ্যস্থলে দুইখানি লক্ষ্মীর পা দিয়া পরস্পর সতেরটি বৃত্ত অঙ্কিত করিবার নিয়ম; তবে যশোহরে ঐ নিয়মের বহুপ্রচলন আছে কিন্তু খুলনার দিকে ঐরূপ কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম না থাকায় মহিলারা ইচ্ছানুরূপ আলপনা দিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত আল্পনার বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব সত্যই আনন্দের বিষয়। সামান্য কুঁড়ে-ঘরকে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এমনি সুষমাময় করিয়া তোলা হয় যে তাহাকে সত্যই দেবারাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বোপরি প্রত্যেকটি আল্পনার ছন্দোবদ্ধ গতি ও রেখার সাবলীল ভাব দেখিয়া চমক লাগে। সত্য বলিতে গেলে আল্পনার রেখার সাবলীলতা ও অঙ্কনের চাতুর্য্যের সহিত অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র ভিন্ন আর কোথাও ইহার তুলনা মিলে না। বিশেষ করিয়া অজন্তা গুহার ছাদের বৃত্তাকারে অঙ্কিত চিত্রের সহিত এই সকল আলপনার বেশ সমতা লক্ষিত হয়।

'বৃত্তাকার' আল্পনার মধ্যে দুটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। একটিকে "ক্রম-পুষ্ট" ও অপরটিকে "ক্রম-বর্দ্ধিত" এই দুই নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এক একটি ভিন্ন ভিন্ন 'লতা' পরস্পর অসংযোজিত ভাবে স্থাপিত হইয়া যে আল্পনা পুষ্টিলাভ করে তাহাই "ক্রম-পুষ্ট" আল্পনা। ঐ সমস্ত 'লতা' সুন্দর ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ। লক্ষ্মীপূজার আল্পনাটি ক্রম-পুষ্ট আলপনার পর্য্যায়ে পড়ে। 'ক্রম-বর্দ্ধিত' আল্পনা মূল হইতেই রেখাগুলির পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

ঘরের দেয়ালে, বাস্ন-খুঁটীতে ও দরজা হইতে উঠান পর্য্যন্ত ফুল-লতাপাতা কাটিয়া যে আল্পনা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে মহিলাদের উদ্ভাবনী-শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বারান্তরে আল্পনার অঙ্কন পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করিবার আশা রহিল। কেবলমাত্র আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। একদিন যে-শিল্প আমাদের পল্লীগ্রামের নিভৃত অন্তরে স্বত-উৎসারিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আজ বিজাতীয় শিক্ষার দরুণ আমাদের নিকট অসভ্যতা ও নোংরামি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু আল্পনার মধ্যে যে সমগ্র বঙ্গনারীর সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় পাই তাকে অবহেলা করিবার যে মনোভাব তাহাকে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের একটি দৃষ্টান্ত মনে করি। তবে আশার কথা এই যে আজকাল কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা আল্পনার প্রতি দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও আল্পনা-সংগ্রহের একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতীয় প্রাচ্যকলা-সমিতির মহিলা-বিভাগে ও শান্তিনিকেতন কলা-বিভাগে আল্পনাকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষরা ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু যে মহিলাদের অঙ্গুলিস্পর্শে এক-দিন এই শিল্পের জন্মলাভ ঘটিয়াছিল আজ তাঁহারাই সমবেত-ভাবে ইহাকে না বাঁচাইলে ইহাকে আর কোনরূপেই বাঁচানো যাইবে না।

[library stamp]

জাগৃহি

শ্রী ইলা দেবী

আজকের জগতে নারীর চিত্ত ব্যেপে যে চাঞ্চল্য জেগেছে তার মূলের মহামন্ত্র হ'চ্ছে 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'—যার গম্ভীর আদেশ-ধ্বনিতে নারীর মহানিদ্রা টুটে গেছে; বিশ্ব মানবীও আজ বলতে শিখেছে 'আমার প্রাপ্য কোথায়'।

প্রাপ্যকে প্রাপ্ত হ'তে বিরোধ উঠবে আজ অনেক; বহু তর্ক, বহু চিন্তা, বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন এতে। বিজ্ঞানের মতে নারী-পুরুষ homogeneous,—একই পদার্থের দ্বিবিধ অংশ। এ তথ্য যদি ধার্য্য হয় তাহ'লে নারী পুরুষ, ছোট-বড়, কম-বেশী এ উক্তি প্রযোজ্য হ'তে পারে না। ক্রম-বিকাশের প্রথম স্তরে একই বস্তু বিভক্ত হ'য়ে হ'ল নর ও নারী। কালের আলোয় ক্রমবিকাশের পাপড়ির পর পাপড়ি খুলে চললো। পরিবর্ত্তন বিশ্বজগতে তুলির পরে তুলি বুলিয়ে নব নব রঙ ফলিয়ে তুলল। সারা সৃষ্টির সাথে মানবজীবনেও সে রঙের খেলা বিচিত্র আভা ছড়িয়ে দিল। নরনারীর মাঝে এল তখন শ্রম-বিভাগ—division of labour; নব-উন্মেষিত জগতে কর্ম্মের অভাব নেই, নারী নিল গৃহের ভার, পুরুষ গেল বাহিরে।

তখন বাহির এত বিস্তীর্ণ হয় নি, ভিতর হ'তে এত বিচ্ছিন্নও তাই হ'তে পায় নি। কিন্তু সময়ের সাথে বাহির ক্রমে প্রসারিত হ'তে লাগল—জগৎকে জয় করা, শক্তিকে বশে আনার প্রবল প্রয়োজন পুরুষকে আশা-উৎসাহের মায়া-বাঁশী বাজিয়ে ক্রমেই গৃহ হ'তে দূরে দূরান্তরে টানতে লাগল। পুরুষ যতই গৃহছাড়া হয়, গৃহ ততই নারীকে নিবিড় ক'রে ঘিরে রাখে;—গৃহকে সে গ্রহণ করেছে, তাকে পরিত্যাগ ক'রে সেও বাহির হ'য়ে যায় কেমন ক'রে। নিজের জুড়ে-বসা জায়গায় অন্যের ভাগপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় স্বার্থ বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায়; জীবজগতে এই সনাতন নিয়মটি চিরপ্রচলিত। গৃহবাসী নারীরও হ'ল তাই, বাহিরে যদি সে পা বাড়াতে যায়, পুরুষ চমকে ওঠে, 'আরে আরে কর কি, এযে আমার সীমানা।' গৃহের সম্বন্ধে নারী সেই প্রথাই খাটাতে পারলে না, কারণ পুরুষ যতই ভ্রাম্যমান্ হোক, গৃহ হ'তে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয় নি, গৃহ হ'তে বাহির হ'য়ে আবার তার ভ্রমণের চরম লক্ষ্য গৃহেরই পানে;—ভিতর ও বাহিরের মাঝে সে করেছে যোগ-সংস্থাপন।

পাশ্চাত্যে নারী ঘর হ'তে বাহিরে এসে নিজের অধিকার দাবী করেছে। সেই অতিরিক্ত সচল দেশে, অতিরিক্ত জাগ্রত মানব, নারীর অধিকার নিয়ে এত ঝড় তুলেছে যার বেগে তারা হয়ত পথভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে কোথাও; আমাদের দেশের অতিসতর্ক ব্যক্তি কখনো কখনো সেই ভ্রষ্টপথের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভারতনারীর পথের দাবীকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন। আমাদের এই নিশ্চল দেশে গতির ঝড় উঠতে এখনো বহু বিলম্ব আছে। এ দেশে মেয়েদের অগ্রসর হবার পথই নেই, কোন্‌টা সুপথ কোন্‌টা বিপথ এ প্রশ্ন আসবে কোথা হ'তে। পাখী যখন পিঞ্জর-মুক্ত হবে, আকাশ-পথের ঠিকানা সে বজ্রবিদ্যুতের মাঝেও জয় ক'রে নেবে; তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ রেখে পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত ধ'রে দিয়ে প্রাচ্যের সমস্যাসমাধানে সাবধান হওয়ার কিছুমাত্র উপকারিতা নেই। গতির মাঝে ব্যথা আছে ব'লে তাকে নিভৃতে রাখলে চলবে না, এগিয়ে চলার মাঝ দিয়েই একদিন নারী খুঁজে পাবে কোন্‌টা সত্যের পথ।

সব থেকে লজ্জার বিষয় যে স্ত্রীস্বাধীনতার দৃষ্টান্ত পশ্চিম আমাদের দেখিয়ে শেখাচ্ছে। যে দেশে ব্রহ্মবাদিনী মেয়েরা সভামধ্যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করেছেন, দর্শনের তর্ক তুলেছেন, বেদ রচনা করেছেন,—তেজোময়ী রমণীরা যুদ্ধ করেছেন,—সেই দেশের মেয়েরাই আজ বদ্ধগৃহের মাঝে আবক্ষ-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে; বাহিরে আসতে পা তাদের জড়িয়ে যায়, কর্ম্মের আমন্ত্রণে যোগ দিতে ভয়ে পেছিয়ে যায়। নারীর মধ্যে কর্ম্মের যে পারগতা ছিল, তার ব্যর্থতায় ক্রমেই সেটা বিনষ্ট হ'য়ে গেল। সৃষ্টির নিয়মই এই,—যার প্রয়োজন নেই তার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। নিজের অতিক্ষুদ্র পরিসরের মাঝে নারী

তার সমস্ত পারগতা হারিয়ে ফেলেছে। মহত্তের প্রারম্ভ যেমন ক্ষুদ্র হ'তেই,—নিজেকে প্রসারিত করার প্রশস্ত ক্ষেত্র-অভাবে সে মহৎও আবার ক্ষুদ্রতাতেই বিলীন হ'য়ে যায়। উর্দ্ধবাহু ঋষির অচলবাহুর মত নারীর কর্ম্মশক্তি হ'য়ে গেছে এখন সম্পূর্ণ নিশ্চল ও স্থবির।

স্ত্রীস্বাধীনতার এ অধঃপতন কবে হ'তে ও কী কারণে আমাদের দেশে হয়েছে তা ইতিহাসে জানা যায়, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষে মোগল পাঠান প্রভৃতি বিজাতীয়ের যখন শাসন সুরু হ'ল—পর্দ্দার প্রচলনও তখন আরম্ভ হ'ল, নারী প্রবেশ করলে অন্তঃপুরে। এটা সত্য যে 'অবরোধন' কথাটা আমাদের দেশে বহুদিন প্রচলিত, এমন কি অশোকা-নুশাসনে এর উল্লেখ চ'খে পড়ে; কিন্তু তখনকার দিনের স্ত্রীশিক্ষা ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি দেখে বোঝা যায় যে অবরোধন অর্থে অবরুদ্ধ হারেম বোঝায় না,—এযুগে lady's chamber বল্‌তে যা বোঝায় তাই কতকটা বোঝাত। তা না হ'লে ধর্ম্মমহামাত্রদের অবরোধন পরিদর্শন সম্ভবপর হ'ত না।

বর্ত্তমানে অপরিসর এই গণ্ডীর মাঝে অপ্রতুল কর্ম্ম নিয়ে নিজের চ'খে, পুরুষের চ'খে নারী যে আজ কতখানি হেয় হ'য়ে আছে তার দৃষ্টান্ত অনুক্ষণ দৃষ্ট হয়। তার সংবাদ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও আমাদের অবনমিত ক'রে রেখেছে বিশ্বসভায়। যারা নারীকে অন্যের পাপদৃষ্টি হ'তে রক্ষা করতে অসমর্থ ব'লে, মেয়েদের আত্মনির্ভরতার শিক্ষা ও সুযোগ দেবার পরিবর্ত্তে, অন্তঃপুরের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে অবগুণ্ঠনের আবরণ জড়িয়ে দিল তাদের মুখে,—তারাই দোষারোপ করে নারী নরকের দ্বার! এর চেয়েও হীন অবস্থা আর কী হ'তে পারে? সনাতন সেই প্রশ্ন উঠতে পারে, 'অন্তঃপুরে নারী দেবী হ'য়ে রাজত্ব কর্‌ছ, সেখানে তার অখণ্ড-প্রতাপ, কত মহিমা, মাধুর্য্য,—এ দৈন্য সবই মনগড়া। দেবীত্ব অর্জ্জন করতে হ'লে যদি বিশ্বজগতের কর্ম্মধারার প্রসারতা হ'তেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা মাত্র সম্বল করতে হয়, তাহ'লে এ দেবীত্বে উর্দ্ধে উঠার সুখ কিছুমাত্র নেই—উর্দ্ধ হ'তে পতনের আনন্দ-টাই অনুক্ষণ অনুভবনীয়।

রাজত্ব অথবা অখণ্ড-প্রতাপ, এটি কয়জনের ভাগ্যে জোটে? বধূদের সাধারণ গৃহস্থগৃহে পাঁচজনের আজ্ঞাধীনে সকলের মনোরঞ্জন ক'রে থাকতে হয়; বয়ঃজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের তিরোধানের পর পর্য্যন্ত বধূ যদি বেঁচে থাকে সে কতকটা নিজের মতামতে চলতে পারে—সেটুকুও স্বামীর ইচ্ছা ও স্বভাবের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অখণ্ড-প্রতাপ অর্থে স্বামী যদি স্নেহশীল হন, স্ত্রীর মতামত তাহ'লে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু এর ভেতরেও ভ্রান্তি আছে। পুরুষেরা শতকরা আমাদের দেশে মেয়েদের চেয়ে অধিক লিখনপঠনক্ষম, এবং তাদের বাহিরে গতিবিধি থাকায় মেয়েদের অপেক্ষা মনের প্রসার বাড়াবার সুযোগ অধিক থাকে। এরূপস্থলে সাধারণতঃ মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষের শিক্ষিত ও বিচক্ষণ হবার সম্ভাবনা বেশী। যার বুদ্ধি শিক্ষার দ্বারা নির্ভুল, যুক্তির দ্বারা সুন্দর হয়েছে, সংসারে তারই মতামতের প্রাধান্য থাকে, এই স্বাভাবিক। আমাদের অন্তঃপুরিকা-দিগের শিক্ষা যেরূপ লজ্জাকররূপে স্বল্প, তাতে মেয়েদের বুদ্ধির প্রসারের ও বিচক্ষণতার সুযোগ কোথায়? স্ত্রী যদি প্রয়োজন-অনুযায়ী শিক্ষিতা ও বিচক্ষণা না হন, তা স্বত্বেও তাঁর মতানুযায়ী চললে সংসারে উন্নতির আশা করা যায় না; শুধু মমতায় অন্ধ হ'য়ে স্বামী যদি বুদ্ধি-শিক্ষা-বিহীনা পত্নীর বিবেচনা-অনুযায়ী চলেন, তাতে সংসারের কল্যাণ হয় না; স্ত্রীর দিক্ দিয়েও এতে গৌরবের বিশেষ কিছু নেই, কারণ তাঁর এ প্রতাপ তাঁর বিবেচনা বুদ্ধি-বিদ্যা ও গুণাবলী-লব্ধ ততটা নয় যতটা মমতার বশে ও করুণার দ্বারা লব্ধ।

স্নেহ, মাধুর্য্য প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিগুলি যা অন্তঃপুরে নারী কাজে লাগায়, কেবল অন্তঃপুরের জন্যই তা অভি-সঞ্চিত রাখা সঙ্কীর্ণতা ভিন্ন কিছুই নয়; যা কল্যাণকর তাতে সকলের দাবী আছে;—নারী আজ শুধু অন্তঃপুরে স্নেহ সেবা দান করছে, বাহিরে কত রুগ্ন অসহায় রোগে মরছে—তাদের সাধ্যানুযায়ী সেবার আনন্দ হ'তে বঞ্চিত সে। নিজের সন্তানকে শুধু নিয়ে সে অন্তরালে অন্তঃপুরে ব'সে আছে—বাহিরে কত মাতৃহারা কেঁদে বেড়াচ্ছে—তাদের স্নেহদানের সামর্থ্য থাকলেও সুযোগ নেই। বাহিরে এলেই গৃহ যে বঞ্চিত হবে এ অসম্ভব; গৃহের পরও যদি সামর্থ্য সঞ্চিত থাকে তাহ'তে বাহির কেন বঞ্চিত হবে?

সে জন্য মনে হয় এতদিনে দেবীত্ব প্রভৃতির সহজ সত্যটা উপলব্ধি করার দিন এসেছে,—সাধারণ মানবীয় যা অধিকার সেটাই ফিরিয়ে নিতে হবে এবার। কিন্তু বহুদিনের পর-নির্ভরতায় যা হস্তস্খলিত হয়েছে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া সহজসাধ্য নয়,—দীর্ঘ সমস্যা-জটিল পথ পার হ'তে হবে প্রথমে।

মেয়েদের অন্তঃপুর হ'তে বাহিরে আসা সম্বন্ধে চিরপুরাতন আর একটি উক্তির মাঝে মাঝে প্রয়োগ হ'তে শোনা যায়,—"পুরুষ আগে যথেষ্ট রকম সংযত হোক্ তবে নারী বাহিরে আসবে'; এ ধরণের মতামতের বিশেষ সারবত্তা অনুভব করা যায় না। জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির সভ্য হবার অপেক্ষায় থাকতে হ'লে অগস্ত্য মুনির প্রত্যাবর্ত্তন-প্রার্থী নারীজাগরণের বিন্ধ্যপর্ব্বতকে এ জগতে আর মাথা তুলতে হবে না, চিরদিন তাকে অপেক্ষাতেই কাটাতে হবে। যে উন্নত হ'তে চায় সে যদি পরের অপেক্ষায় থাকে তাহ'লে তার কৃতকার্য্য হবার দৃষ্টান্ত এ জগতে স্বল্প। যে নারী যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছে সে নিজের মর্য্যাদা নিজেই রক্ষা করতে সমর্থা হবে, অন্যের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই। এই যে পল্লীতে পল্লীতে নির্য্যাতিতা রমণীর করুণ কাহিনী শোনো যায়, তারা পরিপূর্ণভাবেই অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুরবাসিনী। অথচ নির্য্যাতিতা তারাই সংখ্যায় সব'চেয়ে বেশী। অবরোধে থেকে থেকে দেহযন্ত্র তাদের এমনই অচল হ'য়ে গেছে যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছুটে পালাবার সামর্থ্যটুকুও নেই তাদের,—অন্য উপায়ে প্রতিরোধ ত স্বপ্নেও বহির্ভূত। মাদ্রাজ ও মারাঠি মেয়েরা অনবগুণ্ঠিত হ'য়ে স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করতে ভয় পান না। এবং তাঁরা যে মানসম্ভ্রম হারাচ্ছেন তাও নয় অবশ্য। আজ বাংলাতেই কত মহিলা সম্পূর্ণ অবরোধ হ'তে বাহিরে এসে রাজনৈতিক যুদ্ধে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছেন, তাতে তাঁদের সম্ভ্রমের হানি হয়েছে এমন শোনা যায় না।

একটা প্রচলিত প্রথাকে প্রচলনে রাখবার জন্যে শুধু পর্দ্দার এই গ্লানিজনক শক্তিহীনতা বজায় রাখা শ্রেয়, না যা অনিবার্য্য অবশ্যম্ভাবী কল্যাণকর স্বাধীনতা তাকেই বরণ করা শ্রেয়, এটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময় এসেছে আমাদের অনেক দিন। অবরোধ-প্রথানুযায়ী ক্ষবরুদ্ধ হ'য়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য যে কী ভয়াবহরূপে ভগ্ন হ'য়ে গেছে তা সকলেই জানেন। কঠিন পরিশ্রম মেয়েদের যথেষ্টই আছে, অথচ আমাদের দরিদ্র দেশে সাধারণতঃ উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার্য্য জোটে না—ভগবানের দান মুক্তবায়ু হ'তেও মেয়েরা নিজেদের বঞ্চিত ক'রে রেখেছে। পল্লীগ্রামে গৃহের বাহিরে গমনাগমনে মেয়েরা মুক্ত বাতাস-আলো পেতে পারে; সহরের মেয়েরা গৃহ হ'তে বহির্গত হ'লেই যে নির্ম্মল বায়ু পাবে এমন নয়, কিন্তু যাদের দূরে ভ্রমণ ক'রে আসার সময় ও সুযোগ নেই তারা অন্ততঃ বাহিরে এসে বাজার করা দোকানে যাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে অভ্যস্ত থাকলে সেগুলির জন্যে তাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না এবং এ সামান্য ভ্রমণটুকুতেও শরীরের কতকটা উপকার সাধিত হয়। সকল সভ্য দেশে মেয়েরা এসব কাজ করত লজ্জা বোধ করেন না; আমাদের দেশেও সম্ভ্রান্ত মহলারা নিজেরা দোকানে যান। এই ভাবে বাহিরের জগতের সাথে পরিচয় আরম্ভ করলে মেয়েদের জড়ত্ব ক্রমে ক্রমে ঘুচে যাবে, আত্মনির্ভরতা জাগবে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও মঙ্গল হবে। আমাদের দেশের অবরুদ্ধা মেয়েদের গভীর আত্মঅবিশ্বাসই তাদের অসহায় ক'রে রাখার প্রধান কারণ; তাদের এই অপার ভীরুতা, দুর্ব্বলতা ও জড়ত্ব অবরোধমুক্ত না হ'লে কখনও মোচন হবে না;—এসব মোচন না হ'লে কখনও তাদের উন্নত হবার, মানুষ ব'লে মাথা তোলবার, কর্ম্মের আহ্বানে সাড়া দেবার আশা থাকবে না, অধিকার জন্মাবে না।

নারী যখন অবরোধ হ'তে বাহিরে এসে দাঁড়াবে, তখন তার সবার বড় প্রয়োজন হবে বিদ্যাশিক্ষার। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড—মেরুদণ্ড কোথাও জীর্ণ থাকলে দেশের উত্তিষ্ঠান অসম্ভব। যেখানে সাধ্য আছে এখন সেখানে মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যে সে বিবাহ করুক না করুক প্রয়োজন হ'লে পরের মুখাপেক্ষী না হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের শিক্ষার উপর নির্ভর করতে পারবে। অর্থাৎ মেয়ে-পুরুষ উভয়ের শিক্ষা একান্ত ভাবে সমপরিমাণ হওয়া চাই, যাতে অভাবে পড়লে পুরুষ যতখানি তার বিদ্যাবত্তার উপর নির্ভর করতে পারে, মেয়েরাও সেটুকু হ'তে বঞ্চিত না হয়। এ

সম্বন্ধে আরও একটা বিবেচনার বিষয় আছে, বর্ত্তমানে যে অল্প ক'টি নারী উপার্জ্জনক্ষম হয়েছেন তার বেশীর ভাগ শিক্ষা-বিভাগে এবং অতি সামান্যসংখ্যক আইন ও চিকিৎসা-বিভাগে গেছেন। কিন্তু সমগ্র নারীর জন্যে কেবল ঐ পথটুকু উন্মুক্ত রাখলে কিছুতেই চলবে না, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম—যেমন চিকিৎসা, আইন, অভিনয়, এঞ্জিনিয়ারিং কৃষিকার্য্য, শান্তিরক্ষা কার্য্য ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীকে কৃতী ক'রে তুলতে হবে। ছেলেদের যেমন আজকাল নিজ নিজ মনোবৃত্তি-অনুযায়ী কর্ম্মপথে রাখার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়, মেয়েদেরও প্রথমে মনোবৃত্তি-বিকাশের অবসর দিতে হবে, এবং তাদের সুবিধা-অনুযায়ী পথে অগ্রসর হবার সুযোগ দিতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে নারী যে-কোনও বিভাগে প্রতিপত্তি লাভ করতে অপারগ হবে না; চিকিৎসা, কৃষি, আইন প্রভৃতি যাতে ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন এসব বিষয়ে মেয়েরা বিশেষ ভাবে উপযোগী।

তবে এও একটা কথা বটে যে কত শিক্ষিত পুরুষ ত অন্নের জন্যে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে; নারীও যদি সেই ধরণের শিক্ষা পায়, তাহ'লে হাহাকারের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না, কারণ শিক্ষা থাকলেই যে সংস্থান হবে তার ত কোনও স্থিরতা নেই। এ একটা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই। তবে এ সমস্যার বোধ হয় সমাধান আছে। অনুমিত হোক, একজন পুরুষ সংস্থানের উপায়ে ব্যাকুল হ'য়ে বেড়াচ্ছে, গৃহে তার মা বোন স্ত্রী—তিনটি প্রাণী; তার অভাব তাহ'লে সর্ব্বশুদ্ধ চারটি প্রাণীর অনুযায়ী। কিন্তু তার মা বোন স্ত্রী তিনজনে যদি অন্নসংস্থানের চেষ্টা করে তাহ'লে সংস্থান-প্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি হ'ল বটে কিন্তু এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে যে তাতে অভাবের পরিমাণ বাড়েনি, কারণ একজন পুরুষকে যতটা অভাবপূরণের চেষ্টা করতে হচ্ছিল এরা তিনজনে সেটা ভাগ ক'রে নিল, অভাবের পরিমাণ বাড়লও না কমলও না—বিভক্ত হ'য়ে গেল মাত্র। তবে এ বিষয়ে একটি গুরুতর সমস্যা আছে, মেয়ে-পুরুষে দুজনে মিলে কর্ম্মে যোগ দিলে কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে, তাতে পারিশ্রমিকের হার ক'মে যেতে পারে, এবং এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে এ বিভক্তির উপকারিতাটা কোথায়। প্রথম সমস্যা অর্থাৎ পারিশ্রমিকের হার যদি ক'মে যায় তাহ'লে ক্ষতি অবশ্যই হবে—যে বাড়ীর মেয়েরা কাজ করতে অপারগ অথবা যেখানে শিশুর সংখ্যা অধিক ও বয়স্কের সংখ্যা অল্প এমন সব গৃহস্থের মহা বিপদ হবে। বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়ে-পুরুষে এক-সাথে কর্ম্ম আরম্ভ ক'রে কর্ম্মী বাড়ছে কিন্তু কর্ম্ম বাড়ছে না, অথচ কর্ম্মীর আধিক্য এবং কর্ম্মের অনাটন হ'লে পারিশ্রমিক হ্রাস হ'তে বাধ্য। কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হ'তে পারে না কারণ দেশ যতই উন্নত হবে, কর্ম্মেরও ততই বৃদ্ধি হবে। অসভ্য জাতির অভাব অল্প—তাদের নগর-নির্ম্মাণ করতে হয় না, তাদের বসনের প্রয়োজন নেই, আহার্য্য বন হ'তেই সংগ্রহ হয়,—কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র, সাহিত্য-বিজ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা যতই সভ্য হ'তে আরম্ভ করে, কর্ম্ম ও কর্ম্মীর সৃষ্টি হয় তখন। আমাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু অসমর্থ ব'লে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিদেশ হ'তে গ্রহণ করছি। ক্রমোন্নতির সাথে আমাদের পরনির্ভরতা ঘুচবে, তখন নিজেদের প্রয়োজনীয় নিজেদের নির্ম্মাণ করতে হবে। কর্ম্ম সব দিকে বৃদ্ধি হবে, কর্ম্মীরও প্রয়োজন হবে তখন। অতএব মেয়ে-পুরুষে একসাথে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে পারিশ্রমিকের হার হ্রাস হবার সম্ভাবনা শেষে (in the long period) থাকবে না।

দ্বিতীয় সমস্যা।—মেয়েদের কর্ম্মে যোগ দেবার উপ-কারিতা যে কত মহৎ তা এই আত্মনির্ভরতার যুগে সহজেই অনুমেয়। সচরাচর দেখা যায়, একটি মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির উপর বৃহৎ এক সংসার নির্ভর করছে। সে ব্যক্তিটির কোনও বিপদে সমস্ত পরিবারবর্গ পড়বে অকূল পাথারে। মেয়েদের যদি উপার্জ্জন-উপযোগী শিক্ষাটা থাকে অন্ততঃ, তা'হলে তাদের সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে সহস্র অত্যাচারের মাঝে পড়তে হবে না—পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় তারা নিজেদের কোনও উপায় নিজেরাই ক'রে উঠতে পারবে। কোনও একটি নিঃসম্বল শিক্ষিত পুরুষ ও সেই একই অবস্থার একজন অশিক্ষিতা নারীর তুলনা করা যেতে পারে। পুরুষ তার শিক্ষার বলে পাঁচটা টাকাও মাসে উপার্জ্জন করতে পারবে; অবশ্য ঝড়-ঝঞ্ঝা অনেকই তাকে সইতে হবে, কিন্তু অন্ততঃ তার প্রচেষ্টার বাধা কোথাও নেই,—সহায় আছে শিক্ষার। অথচ মেয়েরা অধিকাংশ স্থলেই অশিক্ষিতা বা এত অল্প শিক্ষিতা, যা দিয়ে আর যাই হোক জীবিকা-অর্জ্জন কিছুতেই

হ'তে পারে না। অতএব সহায়-সম্বলহীন হ'য়ে পড়লে নারীকে যেয়ে নির্ভর করতে হবে কোনও আত্মীয় অথবা অনাত্মীয়ের 'পরে। সেখানে তাকে কতখানি অবজ্ঞা, গঞ্জনা ও পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

পরনির্ভরা নারী চোখের জলে ভিজিয়ে প্রত্যেক গ্রাসটি মুখে তুলছে সেইটা বাঞ্ছনীয়, না, তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনও আত্মনির্ভর হ'য়ে উপার্জ্জন করা সেটাই মঙ্গল? শিক্ষা থাকলে নারী নিজের সামান্য ভরণ-পোষণটা নিশ্চয়ই স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করতে সক্ষম হ'তে পারে। তখন কর্ম্মের আনন্দে মুছে যাবে তার আত্মগ্লানি—অর্জ্জনের সাথে ঘুচবে তার আত্ম-অবিশ্বাস। তার কর্ম্মের লুপ্ত পারগতা, সত্যের লুপ্ত অনুভূতি সবই পুনঃপ্রাপ্ত হবে। নিজের এ হীনতা সহ্য ক'রে সে সত্যকে ধ্বংস করছে, আত্মাকে অপমান করছে,—এ কী পাপ নয়? সামান্য খাদ্যাখাদ্যের পাপে, তুচ্ছ স্পর্শদোষের পাপে আমরা জাতি হারাই, আর এই যে অন্যায় সহ্য করার পাপ, সত্যকে হেয় করার পাপ, নারীকে মনুষ্যত্ব হ'তে বঞ্চিত করার পাপ, এটা কি মহাপাতক নয়? আজও কি রুদ্রের দৃষ্টি জাগবে না এদেশে যার ঘৃণার আগুনে অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী জ্ব'লে খাক্ হ'য়ে যাবে,—যে আগুনের আলোয় মনুষ্যত্বের পুনর্জাগরণ হবে!

সঙ্গতিপন্ন গৃহের শিক্ষার ব্যবস্থা পুত্রকন্যার জন্য সমান করতে হবে। কিন্তু দেশের সাধারণ ব্যক্তি সামান্য গৃহস্থ মাত্র; যেখানে একটি পুত্রকে শুধু সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে পিতা নিঃস্ব হ'য়ে পড়েন, সেস্থানে কন্যাকেও সমপরিমাণ শিক্ষা দেওয়া কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? তার জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক।

শিল্পশিক্ষা-দায়ী বিদ্যালয় এ সমস্যার প্রধান সমাধান। কলকাতায় দু'একটিমাত্র এরূপ ধরণের শিক্ষাসমিতি আছে। প্রতি সহরে প্রতি গ্রামে এর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারতে অজস্র রকম শিল্পকলা রয়েছে, চর্চ্চা অভাবে অধিকাংশই বিনষ্ট ও লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। গ্রামে, সহরে, সমৃদ্ধ নগরে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের অর্থাৎ যেখানে যে শিল্পগুলির প্রচলনের সম্ভাবনা ও সুযোগ অধিক, সেগুলি সংস্থাপনার আবশ্যক। তার মধ্যে সহজ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুতো কাটা, বস্ত্রবয়ন, জামার কর্ত্তন ও সীবনবিদ্যা গ্রাম, সহর ও নগর-নির্ব্বিচারে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ও প্রয়োজন। তা ছাড়া সমৃদ্ধ সহরে, যে স্থানে আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ সম্ভবপর, সেখানে সোনারূপার কাজ, হাতীর দাঁত ও চন্দনকাঠের কাজ, মখমল ও রেশমের কাজ, এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম্মের শিক্ষা-বিভাগ স্থাপনা করা প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরগুলিতে আলোকচিত্র গ্রহণ, চিত্রাঙ্কণ, পশুপক্ষীপালন, উদ্যানগঠন, অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য মাটি, কাগজ ও কাঠের খেলনা, বাক্স, সাবান, এবং সম্ভবমত সৌখিন রেশম ইত্যাদির শিল্প শিক্ষা দিতে হবে। মিষ্টান্ন, আচার প্রভৃতির তৈয়ার-প্রকরণ অনেক মেয়েরই জানা আছে, সে গুলির প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে।

পল্লীগ্রামে বাঁশ ও বেতের কাজ, সম্ভবমত পশুপক্ষী-পালন, মাদুর, পাটি, সতরঞ্চি ও সাধারণ ব্যবহার্য্য আসন-নির্ম্মাণ, মাটির ও কাগজের খেলনা, সাদাসিধা জুতা ও চটি তৈয়ার, হাঁড়ি-কলসী গঠন ও এই প্রকারের নানা কাজ শিক্ষাদানের নিতান্ত প্রয়োজন। পল্লীগ্রামে যেসব রমণীর একটুখানিও জমি আছে শিক্ষা থাকলে তাইতে তারা সারা বছরের সব্জি এবং হলুদ,লঙ্কা প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারে। বাংলা দেশে বিশেষ ক'রে মাটি উর্ব্বরা হওয়ায় বাগান করার সুবিধা অনেক বেশী। হাঁস মুরগী পায়রা ভেড়া ছাগল প্রভৃতি পশুপালন করা বিশেষ ব্যয় অথবা শ্রম-সাধ্য নয়, অথচ লাভ যথেষ্ট হ'তে পারে।

এসব শিল্পের একেবারে যে প্রচার নেই তাত নয়ই, বরং অধিকাংশগুলিই বহুস্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাতে যতটা লাভ আশা করা যায় তেমন কিছুই হয় না, কারণ লোকে একান্তভাবে জীবিকার জন্যে সেগুলির উপরই নির্ভর করে। তা ছাড়া সংসারের দু'একটি ক'রে পুরুষ মাত্র একাজ করে; মেয়েরা এসব কাজে পারদর্শী না হওয়ায় সাহায্য করতে পারে না। উৎপাদন অতি অল্প হওয়ায় লাভ মোটেই আশাজনক হয় না; তাই দেখে তার পরবর্ত্তী কেউ আর সে বিষয়ে শিক্ষা নেয় না—ক্রমে সে শিল্পটি লুপ্ত হ'য়ে যায়। মেদিনীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত মস্‌লন্দ শিল্প এই দশা-প্রাপ্ত হ'য়ে শিল্পজগতের শোচনীয় ক্ষতি করেছে। শুধু বাংলাতেই কত জায়গায় যে গরদ ও নানারূপ রেশমের

কাপড়, কাঁসা এবং কত ভিন্ন রকমের শিল্প এইভাবেই ক্ষয় হ'য়ে গেছে তা উল্লেখ ক'রে শেষ করা যায় না।

গৃহের মেয়েরা যদি এইসব কার্য্যে শিক্ষা পেয়ে এগুলিতে হস্তক্ষেপ করে তাহ'লে পুরুষদিগের সাহায্য যথেষ্ট হয় এবং তারা অন্য উপায়েও কিছু উপার্জ্জন করতে যেতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক নারী গৃহের অন্যান্য কাজ যে ভাবে করে, এই কাজগুলি সেইরূপ প্রত্যেকের অত্যাবশ্যকীয় মনে ক'রে নিয়মিত করতে হবে। সময়মত মেয়ে-পুরুষ একসাথে কাজ করবে; উৎপাদন এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হবে। যেখানে যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছিল তার পরিমাণ বহুল হবে; দ্রব্য উন্নত ও সুলভ হ'লে তার চাহিদারও অভাব হবে না।

শিল্প-বিভাগগুলিকে আরও একটু সাহায্য করতে হবে। এসব শিল্প যা উৎপন্ন হবে সেগুলিকে শিল্প-বিভাগ নিজে ক্রয় করতে না পারলেও কেবলমাত্র যদি অন্যান্য দোকানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করতে পারেন তা'হলেও শিল্পীদের যথেষ্ট সাহায্য হবে, এবং উৎসাহও বর্দ্ধন করা হবে।

সংসার-পরিচালনার পক্ষে এরূপে অশেষ কল্যাণ বৃদ্ধি হবে, ঘরে ঘরে অভাব হ্রাস হবে; দেশ যেমন আত্মনির্ভর হ'তে যাচ্ছে, প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে, প্রতি নারী আত্মনির্ভর হ'য়ে উঠবে, প্রত্যেক সংসার সম্পন্ন ও উন্নত হ'য়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করবে। কেবলমাত্র নারীর পক্ষ হ'তে নয়, একটা জাতির পক্ষে, সমগ্র এক মহাদেশের পক্ষে সুপ্তির অপসারণ, সত্যের জাগরণ, এ কী স্বল্প উপকারিতা! যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জড়তা পরিহার ক'রে, অপারগতার অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে ফেলে, আত্ম-অবিশ্বাসের কঠিন প্রাচীরকে ভেঙে দিয়ে, নারীর বাহিরে এসে শিক্ষাগ্রহণের দিন একান্ত এসেছে। রাজ্যহীন রাজার মত দায়িত্ববিহীন দেবী-আখ্যা ঝেড়ে ফেলে প্রকৃত মানবীর দায়িত্ব গ্রহণ করবার সময় এসেছে। তাই বোধ হয় একথা পুনরুক্তি করলে দোষ হবে না, মেয়েদের আপনাপন অবরুদ্ধ নিরাপদ গৃহের মাঝে তুচ্ছ স্বার্থ ক্ষুদ্র চিন্তাকে নিয়ে কাল কাটাবার সময় আর নেই। বিশ্বের আহ্বান-বিষাণ বেজেছে,—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'—এ আহ্বানে নারী যদি শুধু যোগ না দেয়, নিজের প্রাপ্য গ্রহণ না করে, বাহিরের সাথে ভিতরের পরিপূর্ণ সাম্য সামঞ্জস্যে সুন্দর ক'রে না তোলে, তবে ব্যর্থ সে!—তার যত মাধুর্য্য, যাকিছু মহিমা সবই বৃথা! আজকে প্রত্যেক নারীকে শিক্ষার ব্রত গ্রহণ ক'রে নিজেকে সকল বিষয়ে পারগ ক'রে তুলতে হবে—সকল কর্ম্মের ভারগ্রহণে অকুণ্ঠিত হ'তে হবে।

বাহিরে পরিশ্রম আছে, বিপদ আছে, অভাব আছে,—সে পরিশ্রমে আনন্দ পেতে হবে, বিপদে নিজেদেরই ত্রাণ করার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, অভাব নিজেদেরই মোচন করতে হবে। বাহিরের আলোক, বাহিরের মঙ্গল ভিতরে বরণ ক'রে আনতে হবে; ভিতরের শান্তি, ভিতরের কল্যাণ বাহিরে বিতরণ করতে হবে।—তবেই নারী ধন্য হবে, সেই দিনই হবে নারীর পরম গৌরবের দিন।

অসমাপ্ত মিলনের—

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

অসমাপ্ত মিলনের পূর্ণ অভিনয়,
তারি লাগি' কাঁদে কি হৃদয় ?
আছে লোভ, ক্ষোভ, তবু তারি অন্তরালে
দ্বিধাহীন নিরাসক্ত মানস-মরালে

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

কে দেয় অলক্ষ্যে ডাক,—উৎকর্ণ, উদাসী
সুদূরে মেলিয়া আঁখি, শুধু বলে "আসি।"
কোথা পথ কে দেবে বলিয়া,—
দিগন্তের পরপারে গেছে কি চলিয়া !

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চীন মাতৃকা

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বিপ্লবের অপর দিক

উপর্য্যুপরি যুদ্ধবিগ্রহ, দস্যুতা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্দ্দৈবের সংবাদ পাঠ করিয়া বর্ত্তমান চীনের বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু সেই বিপ্লব-বিপর্য্যস্ত, অব্যবস্থিত কলুষ-পঙ্করাশির মধ্য হইতে যে একটির-পর-একটি দল মেলিয়া নবতন কল্যাণ-শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিকাশ-সৌরভ সাধারণতঃ সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত, শুষ্ক সংবাদসংগ্রহে পাওয়া যায় না। এজন্য আবশ্যক —প্রত্যক্ষ দর্শন বা প্রত্যক্ষদর্শী-প্রদত্ত বিবৃতি-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত হওয়া।

এই স্ফুটনোন্মুখ কল্যাণ-শতদলের একটি দল হইতেছে —চীনের নারী-জাগরণ। বাহিরের দিক হইতে এই জাগরণ সহজেই চোখে পড়ে ;—শিক্ষয়িত্রী, ম্যাজিষ্ট্রেট, ট্রেড্ য়ুনিয়ন-সেবিকা, প্রচারিকা, সেক্রেটারী, ডাক্তার, অভিনেত্রী, উপাধি-অর্জ্জনকারিণী (diplomats) প্রভৃতি রূপে আজ-কাল অনেক চীন নারীকেই দেখিতে পাওয়া যায়। সমষ্টির অনুপাতে অত্যল্প হইলেও, ইহা বিশ্বাস করা অসঙ্গত নহে যে, এই নারীরা যখন ক্রমে রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন, তখন বিশ্বশক্তি-প্রবাহে একটি প্রবলতর নবশক্তি বহমান করিতে সক্ষম হইবেন। এবং ভাবোত্তেজনা সত্ত্বেও, মাতৃরূপে সম্পূজিতা ও পত্নীরূপে পরামর্শদাত্রী চীন নারীর জাতীয় স্বভাব ও মনোভাব ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল প্রকার আন্দোলনের দিক হইতেই, এই জাগরণ স্বতঃই আন্তর্জাতিক শান্তির অভিমুখে গতিশীল।

রাষ্ট্র ও নারী

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীর হস্তক্ষেপ চীনের জাতীয়

মনোবৃত্তির একান্ত প্রতিকূল। কারণ, চীনের প্রাচীনতম নীতিশাস্ত্র হইতে এই সংস্কার উদ্ভূত হইয়া ইহা সে-দেশের সমগ্র জন-ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান নান্‌কিং গভর্ণমেণ্টের প্রতি 'সুং-বংশীয়' পদবী-ঘটিত লোকবিরোধকেও ইহার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে দাঁড় করানো যায়। এই 'সুং বংশীয়' নামের একটি চমৎকার উত্তেজক ইতিহাস আছে। প্রসিদ্ধ চীন রাষ্ট্রনেতা চীয়াং কাইসেকের 'কুওমিন্‌টাং'-প্রতিষ্ঠার সাফল্যের মূলে একটি শক্তিময়ী নারীর প্রভাব স্বীকৃত হয়। ইনি স্বর্গীয় রাষ্ট্রগুরু সান ইয়াৎ সেনের বিধবা সহধর্ম্মিণীর অন্যতমা ভগ্নী এবং চীয়াং কাইসেকের পত্নী। তাঁহার অপর ভগ্নীর স্বামী এইচ, এইচ, কুং হইতেছেন বাণিজ্যসচিব এবং ঐ ভগ্নী-দিগেরই একটি ভ্রাতা টি,ভি, সুং হইলেন অর্থসচিব। চীয়াং কাইসেক-মণ্ডলীর 'সুং-বংশীয়' আখ্যালাভের কারণ ইহাই।

সুং-ভগ্নীরা অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ আধুনিক রুচি-সম্পন্না —অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও অন্তর-সম্পদে সম-সমৃদ্ধা। বিশেষ করিয়া মাদাম চীয়াং কাইসেক তাঁহার স্বামীর রাষ্ট্রসাধনার সহিত এমন একান্ত ও একাত্ম ভাবে সংযুক্ত যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্বে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। ইহা ব্যতীত যুদ্ধাহতদের জন্য একাধিক হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠার মূলেও ইনি আছেন। সহকর্ম্মিণীরূপে সাধারণ সভাসমিতিতে ইনি সর্ব্বদাই স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকেন।

'কুওমিন্‌টাং' আন্দোলনের প্রবর্ত্তয়িতা স্বর্গীয় ডাঃ সান ইয়াৎ সেন সর্ব্বপ্রথম ইহার ক্রম-অগ্রসরকে সব রকমে বিশ্ব-গণ-আন্দোলনের ধারানুবর্ত্তী করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মুক্তিমন্ত্রের ঋষি স্বদেশকে জাতি, পাঁতি এবং স্ত্রীপুরুষের অধিকার-ভেদ (race, class and sex) সকল দিক দিয়া মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। নারী-মুক্তির প্রারম্ভে যেমন লৌহপাদুকা-বন্ধন হইতে তাহাদিগের গতিকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের মনকে মুক্তির অমৃত-আস্বাদ দান করিবার জন্য শিক্ষা এবং সংস্পর্শের বর্দ্ধমান বহুপ্রকার সুবিধা দান করা হয়। কিন্তু ব্রিটেন এবং আমেরিকার জাতি-জননীদিগের মতন জন-জীবনে সমান স্থান লাভ করিতে হইলে আরও অনেককাল তাহাদিগকে সাধনা করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

কন্‌ফ্যুসিয়সের প্রভাব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কোন কোন শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক অন্ধসংস্কার ও অনুশাসন এই বিরাট জাতিকে বিষয়-বিশেষে অন্ধ ও অচল করিয়া রাখিয়াছে। এই সব সংস্কার-পাশ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সান ইয়াৎ সেন তিনটি বিশেষ

মাদাম সান ইয়াৎ সেন—
চীনের রাষ্ট্রগুরু ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের পত্নী।

বিধি (Sun Yat Sen's Three Principles) প্রণয়ন করিয়াছেন—যাহা স্কুলসমূহের বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিধির অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহার প্রয়োগ মৃদু, কারণ ব্যাধি পুরাতন ও অন্তঃপ্রসারী।

চীন জাতির যুগেতিহাসে পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, সম্রাটের দুর্ব্বলতার ফাঁকে যখনই কোন নারী শাসন-বল্গা ধারণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার শাসনকার্য্যে দুর্নীতি বা অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। চীনের প্রাচীন জ্ঞানী-গুরু

কনফ্যুসিয়স নারী সম্বন্ধে উচ্চ মত পোষণ করিতেন না। তাঁর মতে মানুষের ভিতর দাস এবং নারীদিগের সহিত আচরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন। প্রশ্রয় পাইলেই ত হারা মাথায় চড়িয়া বসে। যদি তাহাদিগের জন্য বিশেষ বৃত্তির বন্দোবস্ত করা হয়, তাহারা সঞ্চয়-গর্ব্বে দুর্ব্বিনীত হইয়া পড়ে। তিনি বলেন, মেয়েরা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিবে—নিজের ইচ্ছায় এক-পাও নড়িবে না। এক-কথায়, নিজের বিবেচনায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অধিকারই তাহার নাই। অবশ্য, ইহার সহিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে যে, বীর-যুগে (in the days of heroes) যখন প্রাচীন প্রাজ্ঞ সম্রাটগণ সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, তখনকার দিনে কোন এক সম্রাট সভার ক্ষমতাবান দশজন মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একজন ছিলেন নারী; এবং ঐ সময়েই চীন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার রেশম-প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হয় সম্রাট 'হুয়াং-টাই'-পত্নী সম্রাজ্ঞী সিলিং (Hsiling) দ্বারা ২,৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে।

রাজ্ঞী বা সম্রাজ্ঞী সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী অথবা ঐতিহাসিক কাহিনী অন্যান্য দেশেও বিরল নহে। যথা—"সু-রাণী বেস্—Good Queen Bess", "রক্তিকা মেরি—Bloody Mary" এবং "মেরি, স্কট-রাজ্ঞী—Mary, Queen of scots", ইত্যাদি। আমরা জানি, এইরূপ কাহিনী জাতীয় ঐতিহ্যে অলক্ষ্যে আলোক-পাত করিয়া থাকে।

সমাজে মাতার স্থান

"গৃহই নারীর প্রকৃত ক্ষেত্র"—চীনের ঐতিহ্য ইহাই। তদ্দেশীয় মহান্ নীতিগ্রন্থ-চতুষ্টয়ের একখানিতে ইহাই বলা হইয়াছে—"একটা পরিবারের প্রীতির দৃষ্টান্তে একটা গোটা সাম্রাজ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর এবং পারিবারিক সৌজন্য বৃহৎ একটা দেশকেও সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।" ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, দেশের গভর্ণমেণ্টকেও পারিবারিক নীতি-বিধানের উপর কতটা নির্ভর করিতে হয়।

চীনের সমাজজীবনে মাতার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। সাম্রাজ্যবাদের দিনে কোন বিধবা সম্রাজ্ঞী (Empress Dowager) এইরূপ বিধান করেন যে, অভিষেকের দিনে স্বয়ং সম্রাটকেও তাঁহার মাতাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে—তিনবার নতজানু হইয়া এবং নয়বার 'কো টো' (ko-tows) করিয়া। আজকালকার দিনে কোন চীন সন্তান জননীকে নবচান্দ্র-বৎসরান্তে (Lunar New Year) বা তাঁহার জন্মদিনে অনুরূপ সম্মান জ্ঞাপন করিয়া থাকে। চীনজাতি ইহা ভুলিতে পারে নাই যে তাহাদের প্রাচীন দুইজন জ্ঞানী-

মিস্ নেলী চৈয়:—
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত। Better Home and Better Business—অর্থাৎ সুচিন্তিত গৃহ ও ব্যাপক কর্ম্ম ইঁহার জীবন-ব্রত।

গুরু কনফুসিয়স এবং মেনসিয়স সম্পূর্ণরূপে মাতৃক্রোড়েই পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি বাল্যে (২।৩ বৎসর বয়সে) পিতৃহীন হন।

শিক্ষা ও শিক্ষার অন্তরায়

পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে মেনসিয়স-জননী যেরূপ চক্ষে জীবনের সমস্যাসমূহ পরিদর্শন করিতেন, আজও চীনবাসীরা সেইরূপ দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া থাকে। নৈতিক ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই চীনের শিক্ষাবিধি প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার মূলে শিক্ষার প্রয়োজন; কর্ম্মজীবন মানুষকে ঐশ্বর্য্য

ও ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য—ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমতার পরিণতি। বালকদিগের শিক্ষায় (প্রাথমিক মধ্য ও উচ্চতম) যে সাধারণ নীতিসমূহ অনুসৃত হয় বালিকাদিগের শিক্ষা ব্যাপারেও তাহাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সহাধ্যয়ন' সন্তোষজনক হইলেও, মধ্য-বিদ্যালয়গুলিতে তাহার প্রতিকূলতা পরিলক্ষিত হয়। বহুসংখ্যক বালিকা বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিয়া থাকে। কিন্তু নারী-শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হইতেছে—উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষয়িত্রীর অভাব এবং প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডারের অপ্রতুলতা। অবশ্য দরিদ্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক শিক্ষকরূপে সময়-দান এবং শিক্ষায়তন-পরিচালনের জন্য অর্থ-দান বিরল নহে। যেমন একবার মাঞ্চুরিয়ার তরুণ শাসক চ্যাং-হুই-লিয়াং তাঁহার ব্যক্তিগত পিতৃবিত্ত হইতে হইতে ৯০ হাজার ডলার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সব সময় ও অর্থ-দান—দয়া ও দানশীলতার পরিচায়ক হইলেও সমগ্রের অজ্ঞানতা-দূরীকরণের দিক দিয়া তাহা নগণ্য—মরুভূমিতে বারি বিন্দু তুল্য। অশিক্ষার অন্ধকার দূরব্যাপী—দেশময় নিরক্ষর, দুর্ভাগা নরনারীর দল।—ঐসব ম্লান মূক-মুখে ভাষা দিয়া কে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া, শুধু সে-দেশের নহে, বিশ্বের বিরাট শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিবে?

যুগ-পরিবর্ত্তন

প্রথম খৃষ্ট শতকে যিনি "নারী-নীতি" (Female Precepts) নামক গ্রন্থ-বিশেষ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই প্যান-হুই-প্যান যদি আজ পুনরায় চীন দেশে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে কোন আধুনিক চীন নগরীতে তাঁহার অনুগমন করা অল্প কৌতুকপ্রদ হয় না। যাঁর মতে ব্যক্তিপ্রতিভা বা বুদ্ধিশীলতা নহে, কিন্তু নতশিরে নির্দেশ-পালন, নিরহঙ্কারিতা এবং সতীত্বই হইতেছে একমাত্র নারী-ধর্ম্ম; তিনি যদি আজ দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে প্রথমেই তাঁর চোখে পড়িবে-রেশমী গাউন-পরা, মাথায় ঝাঁকালো রকমের টুপি, কোন চীন বালিকা হয়ত সিগারেট সেবন করিতেছে, কিম্বা 'যাজ্' (jaz) নৃত্য করিতেছে, অথবা পুরুষ-বন্ধুদিগের সহিত এক টেবিলে বসিয়া ডিনার খাইতেছে। তিনি বিস্মিত হইবেন এবং অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিবেন,—সে দিন আর সত্যই নাই!—সেই রেশম-কীট পালনের যুগের বেশভূষা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে;—কোথায় সেই গৃহকর্ম্মরতার শোভন পরিচ্ছদ, পূজারিণীর পবিত্র পরিধেয়? তিনি স্তম্ভিত হইয়া আরও শুনিবেন যে, সেই চীন বালিকা আজ পৃথিবীর দূর সীমা পর্য্যন্ত একাকী পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছে, অন্ততঃ দুটি বিদেশী ভাষাতেও সে স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারে, সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে এবং আইন-প্রণয়ন-প্রণালী ও রাষ্ট্রনীতি বা দেশশাসন বিষয়েও সে বিজ্ঞতরা।

বিবাহ-বিধি

কিন্তু এই যুগ-পরিবর্ত্তনের মধ্যেও চীনের সেই সুপ্রাচীন বিবাহ-বিধি এখন পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গিয়াছে। বিবাহ চীন নারীর ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ এবং জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা বা উপাসনাসহ উদ্বাহ-কৃত্য সম্পূর্ণ হইলে তবে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক প্রকৃত অধিকার জন্মে। কারণ, উত্তরাধিকারী-প্রজনন ব্যতীত কন্যার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই পত্নী সন্তানবতী না হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ (divorce) করিতে পারেন, অথবা উপপত্নী গ্রহণ করেন এবং তাহা প্রায়শঃই পত্নীর সম্মতিক্রমেই হইয়া থাকে। উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানও পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মতই আইনসঙ্গত ভাবে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। উপপত্নী সন্তানবতী না হ লে অগত্যা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয় এবং প্রধানতঃ গ্রহণ-কর্ত্তার কোন ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রই গৃহীত হয়।

বাগ্‌দান ব্যাপার মেই-জেন (মধ্যবর্ত্তী) নামক ঘটক-শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত। এই ঘটকগিরি যেমন সম্মানজনক তেমনি দায়িত্বপূর্ণও বটে। উভয় পক্ষের ঠিকুজী, বয়স এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, পরে সম্বন্ধ স্থির হয়। বিধবা-বিবাহকে লোকে এখনও বিধি-বহির্ভূত ও গর্হিত মনে করে। কোন সন্দিগ্ধ য়ুরোপবাসী বলেন—"দ্বিতীয় বিবাহ অস্বীকার করিয়া বা স্বকীয় সতীত্ব-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সেকালের বিধবারা যেরূপ সম্মান লাভ

করিতেন বা গৌরব বোধ করিতেন, তাহা কি সত্যই এখনও তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে ?" তিনি বিপত্নীকদের দিক দিয়াও আশা করেন না যে, প্রথমা পত্নীর প্রতি শোক-প্রকাশার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত পুনর্ব্বিবাহ স্থগিত রাখা হয়।

প্রাচীন রীতি-অনুযায়ী বাগ্‌দানের জন্য নির্দ্দিষ্ট বয়স দশ অথবা দ্বাদশ বৎসর—তার চেয়ে কম হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহা অবশ্যকরণীয় বিধি। এই বাল্যকালীন বাগ্‌দান-প্রথা অনেক সময় অসুখী বিবাহিত-জীবনের কারণ হয়। প্রায়ই এইরূপ হয় যে, বর হয়ত পরবর্ত্তী যৌবনে লম্পটে পরিণত হইল,—স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনাহীনতায় মর্ম্মগ্লানি সহিতে না পারিয়া বধূ আত্মহত্যা করিয়া জীবনের জ্বালা জুড়াইল। মমতাহীনা শাশুড়ীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে বধূর আত্মহত্যা—সাধারণ ভাবে ইহাও ঘটিতে দেখা যায়। অবশ্য, এখন—অর্থাৎ অত্যাধুনিক সময়ে, প্রণয়-ঘটিত বিবাহ (love-marriage) অনেক ঘটিতে দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজের চেয়ে চীনের বিবাহের বয়স গড়ে অনেক কম ; পঁচিশ বৎসরের অবিবাহিত যুবক প্রায়ই চোখে পড়ে না। বিবাহ যেন মানবত্বের প্রধান পরিচয় ;—অবিবাহিত পুরুষকে, যে বয়সেরই হউক না কেন, ব্যঙ্গচ্ছলে "খোকা" বলিয়া পরিচিত করানো হয়।

পত্নী ত্যাগ চীনের একটি প্রাচীন প্রথা। ইহাও বলা হয় (কেহ কেহ অস্বীকারও করেন), স্বয়ং কনফুসিয়স এবং তাঁহার পৌত্র 'তে সু' প্রথমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও, চীয়াং কাইসেক তাঁহার প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার পর শ্রীমতী সুং-এর পাণি-পীড়ন করেন। সেকালের চৈনিক বিধানে পত্নীত্যাগের সাতটি কারণ এই—বন্ধ্যাত্ব, চরিত্রহীনতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বাচালতা, চৌর্য্যপ্রবৃত্তি, স্বামীর পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা এবং কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ততা।

আজকালকার সামাজিক রীতিতে যেসব বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের পৃথকীকরণ প্রচলিত, তাহার কোন কোনটি বেশ একটু বিচিত্র রকমের। প্রাচীনপন্থীদের ভোজ-পর্ব্বে (dinner party) স্ত্রীলোকদিগকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়। মধ্যপন্থী—যাঁহারা আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারে নারীদিগকে অতিথি-অভ্যাগম কালে অভ্যর্থনার অধিকার দেওয়া হইলেও ভোজারম্ভেই তাঁহারা অন্তরালবর্ত্তিনী হন। পূর্ণনব্যপন্থীরা অবশ্য পত্নীকন্যা-সহ পাশ্চাত্য নীতিরই অনুসরণ করেন।

চীন ভিক্ষুণী

সেখানে আর এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা পুরুষ-সংস্পর্শহীন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করেন—তাঁহারা ভিক্ষুণী বা বৌদ্ধব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনী (Budhist nuns), এবং চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে শাস্ত্রতঃ বাধ্য। চীন ভাষায়

মিস্ সোমি চেঙ্—

এই বিদুষী মহিলা চীনের জাতীয় আন্দোলনের আত্মাস্বরূপা এবং স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণা। ১৯২৮ সালের প্রারম্ভে ইনি চীন জাতীয়-গভর্ণমেণ্টের বিশেষ-দূত রূপে ফরাসী দেশে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাহার উপর যে গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল, সেরূপ ভার পূর্ব্বে কখনো কোন গভর্ণমেণ্ট নারীর উপর অর্পণ করিতে সাহসী হন নাই।

ইঁহাদিগকে 'কু-জি' বলা হয়। ব্রত-জীবনে প্রবেশ করিবার সময় নবদীক্ষিতাকে নূতন নাম গ্রহণ করিতে হয় ; কিন্তু ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ না করিলে তাঁহাকে ভিক্ষুণীর সকল অধিকার প্রদত্ত হয় না। এই সব সন্ন্যাসিনী—যাঁহারা মুণ্ডিতশীর্ষা, বহুভাঁজ-বিশিষ্ট পরিচ্ছদ-আবৃতা এবং পুরু সুকতলাযুক্ত পাদুকা-পরিহিতা, ইঁহাদের সন্ন্যাসের ত্যাগ-রিক্ত মূর্ত্তি সত্যই মনকে অভিভূত করিয়া থাকে। সন্ন্যাসিনী-

মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইতেছেন দয়াময়ী (Goddess of Mercy) কুয়ান-ইন পুসা—মঠগুলি এই দেবীমূর্ত্তিরই দৈবাধীনে সংরক্ষিত বলিয়া বিদিত। এই দেবীর বাহু-আশ্রয়ে একটি জাতক বা শিশুমূর্ত্তি;—প্রধানতঃ যাহারা সন্তান কামনা করে তাহারাই এই দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই 'কুয়ান-ইন' মূর্ত্তি পুরুষ দেবতারূপে চিত্রিত হইত। এই মূর্ত্তি-বিবর্ত্তনের কারণ গবেষণা-সাপেক্ষ। এই 'কুয়ান ইন' মঠাশ্রিতা 'কু-জি' সন্ন্যাসিনীদের প্রতি চীনবাসীরা একটা ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সাধারণ ভাবে তাঁহাদের উপর চরিত্রহীনতার আরোপ করা হয়। এমন কি, তাঁহাদের সাধুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ না থাকিলেও তাঁহারা যে 'ই-পি-জি-জেন'—অর্থাৎ পরিবারের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মুক্তির স্বার্থপরতায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এই জন্যই যেন শুধু তাঁহারা একান্ত অপরাধিনী।

নারী-সৌন্দর্য্য

চীন-নারীর সৌন্দর্য্য বুঝিতে (to appreciate) হইলে একটু ধীরতার প্রয়োজন এবং তাহা সময়-সাপেক্ষ—একটা নূতন শিল্পের পরিকল্পনা বা রস-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিবার মতই। কিন্তু একবার সেই অমৃতের আস্বাদ লাভ করিতে পারিলে বহুদিন তার মোহন মাধুর্য্য মনকে অভিষিক্ত করিয়া রাখে। সপ্তশত বর্ষ পূর্ব্বে বিখ্যাত ইতালীয় (Venetian) ভ্রমণকারী মার্কোপোলো একবার এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেই মাধুরী-স্মৃতি আজীবন তিনি ভুলিতে পারেন নাই। উইলিয়াম্‌স্ নামক একজন রসিক শ্বেতাঙ্গ লেখক তাঁহার একখানি গ্রন্থে চীন সাহিত্যিকদের রচনাসংগ্রহ হইতে চমৎকার চমৎকার নারী-রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। চীন সাহিত্যিকের চোখে—"নারীর মস্তক-মন্দিরের শীর্ষে 'সাইকাডা' (Cicada) পতঙ্গের সুভঙ্গ কেশ-চূড়া;—সুবিন্যস্ত ভ্রূযুগল দেখিলে উদ্গতপক্ষ রেশম-কীটের কথা মনে পড়ে।..." চীন কবি গাহিয়া থাকেন—

"ঠোঁটদুটি ঠিক পীচের (Peach) কুঁড়ি,
গালদুটি তার বাদাম ফুল;—
হাঁটুতে কাঁপে ছোট্ট কটি—
উইলো (Willow) চারা দোদুল দুল্।
কালো চোখে আলোক ঝলে—
ঢেউ-দোলানী স্রোতের জলে
রোদের ঝিলিক;—পদক্ষেপে
পদ্ম ফোটে ঐ রাতুল!..."

বিদেশী বিশ্বাস

চীনবাসীদের সম্বন্ধে বিদেশীদের মনে এই ধারণা দৃঢ়-বদ্ধমূল যে, তাহাদের মধ্যে শিশুকন্যা-হত্যা বা হস্তান্তর একটা প্রথার মতই প্রবল ভাবে প্রচলিত। ইঁহারা একরূপ কালো-রঙের গরুর গাড়ীর গল্প করেন—যেসব গাড়ী দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া অপ্রত্যাশিত, পরিত্যক্ত শিশুদের কুড়াইয়া আনে। চীনের মত একটা বিরাট দেশে কতিপয় অনন্যমেয়-সংখ্যক শিশু এই প্রকার হস্তান্তরিত কি অন্তর্হিত হয় সে বিষয়ে অনুমান করা, কিছু বলা বা বিতর্ক তোলা সুকঠিন। জানি না, ইহার কোন প্রমাণিত ভিত্তি আছে কিনা। বিদেশীদের এই বিশ্বাসের সহিত সমানভাবে তুলনা করা যায়—ঐসব বিদেশীদের সম্বন্ধেও চীনবাসীরা এই ধারণা পোষণ করে যে তাহারা গোত্রকুলহীন পরগাছা-বিশেষ! যাহা হউক, নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, এই অনাকাঙ্ক্ষিতা ও অনাদৃতা চীন কন্যকাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে হইলে, অন্বেষীর পক্ষে কর্ত্তব্য, শ্রেণী নির্ব্বিচারে চীন পরিবারের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়া, তাহাদের গৃহজীবন সম্বন্ধে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালাভ, এবং অপহৃতশিশু দম্পতীগণের মনোভাবের সম্যক বিশ্লেষণ।

চীনা কুসংস্কার

মেয়েছেলের 'খেঁকশিয়ালী আবিষ্ট হওয়া'-রূপে একটা অদ্ভুত চীনা কুসংস্কারের কথা আমরা শুনিতে পাই। প্রথমতঃ কোন মেয়ে, খেঁকশিয়ালীর দ্বারা যাদুগ্রস্ত বা আবিষ্ট হয় এবং তারপর অমানুষোচিত ও অস্বাভাবিক পাশব প্রবৃত্তি প্রকটিত হইয়া ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়—যতক্ষণ না ওঝার দ্বারা ঝাড়ানো যায়। ইহাও শুনা যায় যে খেঁক-

শিয়ালীও ইচ্ছা করিলে মানুষ-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। সুন্দরী বালিকাদের প্রতিই নাকি তার লোভ! অনেক অন্ধবিশ্বাসী চীনা সদম্ভে এমন কথাও বলিয়া থাকে যে সে স্বচক্ষে 'শিয়ালী সভা' (fox assemblies) এবং 'শিয়ালী মানুষ' (fox-transformation) দেখিয়াছে।

নব প্রচার

এই খেঁকশিয়ালীর উপাখ্যান ছাড়া আরও বহুবিধ কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে এই প্রকারের ভ্রান্তবিশ্বাস বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারকার্য্য চলিতেছে। প্রচারকেরা 'তা তাও মিসিন' অর্থাৎ 'কুসংস্কার নিপাত যাও' এইরূপ উচ্চ চীৎকারের সহিত প্রচারকার্য্যে বাহির হয়। সহর এবং গ্রাম সর্ব্বত্রই এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমান অভিযান সুরু হইয়াছে। বড় বড় সহরের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্য যেমন অপরিমেয়, কুসংস্কারেরও তেমনি অন্ত নাই। এবং সম্ভবতঃ, সাংঘাই, হাঙ্কো, ক্যাণ্টন, টিনসিন প্রভৃতি নগরীতে যাহারা কলকারখানায় কাজ করিয়া দিনাতিপাত করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকা।

প্রচারের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজকাল এইসব স্ত্রীলোকেরা ট্রেড-য়ুনিয়ন-আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ধর্ম্মঘট সংগঠন করে। এমন কি, তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও সাধারণ সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতেও দেখা যায়,—কেহ কেহ বা ধর্ম্মঘট-সংক্রান্ত পিকেটিং-এর অংশও গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে;—আলো, অন্ন এবং প্রাণের পূর্ণ অর্জ্জনে চীন মাতৃকা আজ তপঃসাধনা করিতে বসিয়াছেন। *

একফোঁটা অশ্রু

শ্রী কুমুদ ভট্টাচার্য্য

অনিলের বিবাহ।

কথাবার্ত্তা সব ঠিক্‌ঠাক। সাম্‌নে পৌষ মাসটা—তার পরেই।

অনিলের মনে আনন্দের বিজলী খেলিয়া বেড়ায়। কাজে উৎসাহ, মুখে হাসি, ব্যবহারে সরলতা। আগের চেয়ে যেন একটু বেশি।

বন্ধু পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছে। মেয়ে সম্বন্ধে নানা কথা অনিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কিছু—একটাও যেন ভুলে বাদ গেলে চলিবে না।

পাত্রী অপছন্দের নয়। অনিল খুসী হয়।

কথা কহিতে কহিতে অনিলের মুখে অকারণে অনেকখানি হাসি দেখা দিতে চয়। অনিল চাপিতে চেষ্টা করে; কিন্তু কোন্ ফাঁকে একটুকরা হাসি পিছ্‌লিয়া ঠোঁটের কোণে আসিয়াই পড়ে। সেটুকু অনিল ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। বিবাহ করাটার মধ্যে যেন অভিনব কৌতুকের কিছু একটা রহিয়া গিয়াছে।

মাঝে মাঝে হাসি চাপিতে গিয়া অনিল আবার অনাবশ্যক গম্ভীর হইয়া পড়ে। মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয়—যেন একটা ভুলিয়া-যাওয়া কথা এইমাত্র না মনে করিলেই নয়।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনিল ভাবে, পৌষমাসে বিবাহ না হওয়ার মধ্যে কোনো যুক্তি নাই। আর পৌষমাসটাও অতিরিক্ত দীর্ঘ—শীঘ্র শেষ হইতে জানে না। বালিসে মুখ গুঁজিয়া কি ভাবিয়া অনিল আপন মনেই এক একবার হাসিয়া ফেলে। এ-পাশ ও-পাশ করিয়া, হাত-পা ছুঁড়িয়া কিছুতেই ঘুম আসিতে চায় না। পারিলে মাঘমাসটাকে

* ধীমান প্রবাসী-বিদ্যার্থী শ্রীমান বীরেন্দ্রসদয় দত্ত এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।—লেখক।

উঠিয়া গিয়া এখনই যেন হাত ধরিয়া লইয়া আসে! সম্ভব অসম্ভব নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ভোরের দিকে অনিল ঘুমাইয়া পড়ে।...

ছাঁদনাতলায় অনিল আসিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে অবগুণ্ঠিতা অদৃষ্টপূর্ব্বা অপরিচিতা বধূ। বর ও বধূর দুখানি হাত সংযুক্ত করিয়া পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিলেন। অনিলের দেহ একবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শুভদৃষ্টির সময় অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া নববধূ একটুখানি হাসিয়া ফেলিল। অনিল দেখিল—বধূর গৌরকান্তি, আয়ত দুটি চক্ষু, মুখখানাতে কৈশোরের লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। অনিলের মনে হইল ইহাকেই সে যেন চাহিয়াছিল—এমনি একখানি ছবিই সে মনের পটে অনেকদিন ধরিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছে।

অনিলের মন খুসিতে ভরিয়া গেল। দুঃখ করিবার কিছু নাই তবে!

পরিহাস-মুখরাদের পরিহাসের প্লাবন শেষ হইল অনেক রাত্রিতে। নির্জ্জন গৃহে অনিলকে একলা পাইয়া নববধূ মুখের ঘোমটাখানি নিজেই খুলিয়া ফেলিল—চোখে মুখে কৌতুক ও কৌতূহলের একটা অত্যুজ্জ্বল হাসি লইয়া অনিলের দিকে চাহিল।

অনিলও হাসিয়া তাহার মুখখানির দিকে তাকাইল। তাই তো—ঠিক এমনি একটি সপ্রতিভাবেই তো সে চাহিয়াছিল! অকারণ লজ্জায় মুখখানা ঢাকিয়া রাখিবে, সাধিয়া ঘোম্‌টা খসানো যাইবে না, জড়পিণ্ডের মতো বিছানার সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে চাহিবে—তেমন তো এ নয়!

অনিল ধীরে একটু আগাইয়া আসিল। দুই হাতে নববধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল। অনিলের মুখ খুসির আলোকে ছাইয়া গেল।

তারপর বধূর মুখখানি আপনার বুকে আনিয়া রাখিয়া অনিল ধীরে ধীরে তাহার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। একবার বলিল—মালতি, যেমনটি আমি চেয়েছিলুম তেমনিটিই ঠিক পেলুম। কোনো ক্ষোভ আমার মনে রইলো না। তোমাকে পেয়ে সত্যি আমি সুখী হলুম!...

মালতী কোন উত্তর করিল না। সলজ্জ হাসিমাখা মুখখানি অনিলের বুকে লুকাইয়া ফেলিল।

নিজের লেখা গল্প ও কবিতা অনিল মালতীকে একদিন পড়িয়া শুনাইল। মালতীকে পাইয়া সে কী পাইয়াছে তাহারই একটি মধুর ছবি অনিল একটি কবিতায় ফুটাইয়াছিল। মালতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে এবং বুঝিতে পারিয়া খুসী হইয়াছে। অনিল মনে করিল তাহার কবিতা লেখা সার্থক হইয়াছে।

ধীরে ধীরে অনিল মালতীকে লিখিতে প্ররোচিত করিল। এবং কয়েক দিন পরে সত্য সত্যই মালতী যখন একটি কবিতা লিখিয়া আনিয়া অনিলকে দেখাইল, অনিল একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। দাম্পত্য-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ লইয়া লেখা কবিতা। ছোটো অথচ সুন্দর—ছন্দে মিলে কোন ভুল নাই, ভাব সহজ ও সুস্পষ্ট; কবির প্রথম রচনা হিসাবে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আনন্দে অনিল কি করিবে ভাবিয়া পাইল না।

অনিলের সাহিত্যিক এবং অসাহিত্যিক অন্তরঙ্গরা অনিলের বাড়ীতে আসিয়া আড্ডা জমায়। মালতী অতি সহজে তাহাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আসে। চা তৈরী করিয়া নিজের হাতে তাহাদিগকে পরিবেশন করে। মাঝে মাঝে দুটি চারটি হাসির কথা বলিয়া তাহাদের হাসাইতেও ছাড়ে না। পত্নী-গর্ব্বে অনিলের মন ভরিয়া ওঠে।

স্বামীর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতে মালতী লজ্জাবোধ করে না। কেশ-বেশ-বিন্যাসেও মালতী আধুনিক রুচি অনুসরণ করিয়া চলে। সব কাজেই মালতী বেশ সপ্রতিভ—অথচ নারীসুলভ ব্রীড়া, কমনীয়তা কিছুরই তাহার অভাব নাই। অনিল ভাবে, ভাগ্যিস্ এমনটি পাইয়াছিলাম! যদি না পাইতাম—

অনিল আর ভাবিতে চাহে না।

মালতীকে লইয়া বর্ত্তমান তাহার মধুময়,—অনাগত ভবিষ্যৎ স্বপ্নের মতো মনোহর।

• • •

কিন্তু এ সবই স্বপ্ন – সত্য নহে। অনেকগুলি বিনিদ্র রজনী এই কল্পনা-বিলাস লইয়াই কাটাইয়াছে সে।

স্বপ্ন কাটিয়া সত্য আসিল আরো পরে।

দীর্ঘ পৌষ তাহার অস্বাভাবিক দীর্ঘতা লইয়া শেষ হইল। তারপর 'মাঘের বুকে সকৌতুকে' যে আসিল সে মালতী নহে—মনোরমা। অনিল ভাবী বধূ সম্বন্ধে খুঁটিয়া খুঁটিয়া অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে কিন্তু তাহার নামটাই কেবল জানিয়া লয় নাই। কিংবা জানিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। অথবা ভুলিয়া না থাকিলেও 'মনোরমা'র চাইতে 'মালতী'কেই তাহার পছন্দ হইয়াছিল বেশি।

ছাঁদ্নাতলাতে মনোরমার হস্তসংস্পর্শে অনিল দেহে তেম্নি শিহরণ অনুভব করিল। দৃষ্টি-বিনিময়ের সময় বধূ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল না বটে কিন্তু অনিলের মনে হইল, মনোরমা মালতীরই মতো কিশোরী, তেমনি গৌরকান্তি,—ঠিক মালতীর মতো না হইলেও মনোরমা তাহার চেয়ে খুব বেশি অসুন্দর নয়।

নির্জ্জন বাসরে মনোরমা নিজে ঘোমটা খুলিয়া অনিলের দিকে চাহিল না। সাধিয়া অনিলকে তাহার ঘোমটা খসাইতে হইল। অনিল তাহার মুখখানি বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—তোমাকে নিয়ে আজ নতুন জীবনে প্রবেশ করলুম মনোরমা, আমাদের এ জীবন সুখের হোক।

মনোরমা সলজ্জ হাস্যে অনিলের বুকে মুখ লুকাইল না। এ কথায় খুসি বা দুঃখিত কি যে হইয়াছে সে, মুখ দেখিয়া তাহাও বোঝা গেল না।

তবু তাহাকে বুকে লইয়াই অনিল রাত কাটাইল। দুঃখবোধ করিবার কিছু হইয়াছে এমন তাহার মনে হইল না।

মনোরমাও মূর্খ নয়। 'প্রিয়তম', 'তোমারই দাসী' এগুলি সে অনায়াসেই লিখিতে পারে। তবে মাসিকের গল্পগুলি সে ভালো বুঝিতে পারে না। গল্পের শেষ 'সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল' না থাকিলে তাহার তৃপ্তি হয় না।

কবিতা লেখা দূরে থাক্ কবিতা সে কখনো পড়িলই না। অনিলের কবিতা শুনিয়া কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। তবু অনিল কবিতা লিখিয়া চলিল। কবিতা লেখা অসার্থক মনে হওয়ার কোনো কারণ ঘটিল না।

মনোরমা অনিলের বন্ধুদের সাম্নে বাহির হইতে চাহে না। অনিল একদিন তাহার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লইয়া অতর্কিতে মনোরমার ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই মনোরমা আধ-হাত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল। অনিল অনেক চেষ্টা করিয়াও বন্ধুর সঙ্গে তাহাকে কথা বলাইতে পারিল না। শেষে অনিল হাল ছাড়িয়া দিল।

তবু পত্নীকে লইয়া হাসি-ঠাট্টায় অনিলের অনেক সময় কাটে। অভাব কিছুর ঘটিয়াছে তাহা মনে হয় না।

কেশ-বেশ-বিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর ফ্যাসানই মনোরমার অভ্যস্ত। অনিল নিজ হাতে একদিন তাহাকে আপনার মনের মতো করিয়া সাজাইয়া দিল। মনোরমার তাহা পছন্দ হইল না। বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের বেশ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল। পরে টান মারিয়া সব খুলিয়া ফেলিয়া নিজের খুসিমতো সাজিল।

অনিল হাসিল। দুঃখবোধ বোধ হয় করিল না।

নারীসুলভ লজ্জার কমনীয়তার মনোরমার অভাব নাই। বরং স্বাভাবিকের চাইতে কোনোটা অনেক বেশি করিয়াই আছে। কিন্তু অভাব যাহার আছে, অনিল তাহাই এক-দিন বেশি করিয়া চাহিয়াছিল। কিন্তু আজ যেন কোন অভাবই তাহার বোধ হইল না।

বর্ত্তমানে অনেক মধু সে খুঁজিয়া পাইতেছে। অনাগত ভবিষ্যৎকেও মোটেই অন্ধকার মনে হইতেছে না। সবই আছে– নাই কেবল অতীতের মধুর স্বপ্নগুলি!

তবু অনিল অসুখী নয়।

শুধু এক একদিন অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়িবার পর অনিলের একটু ক্লান্তি আসে! সাম্নে টেবিলটার উপর কতকগুলি বই ও খাতা ছড়ানো। অনিলের কবিতার প্রশংসা করিয়া একটা মাসিকে খানিকটা লেখা বাহির হইয়াছিল—সেটাও টেবিলের উপর খোলা পড়িয়া আছে। অনতিদূরে সুখশায়িতা পত্নী। তাহারই ঘুমন্ত মুখখানির দিকে অনিলের চোখ পড়ে।

মনের কোণে কোথায় যেন একটুখানি কান্না অতি করুণসুরে বাজিয়া ওঠে। ধীরে অনিল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে—এই কি চাহিয়াছিলাম? এই কি সব?

কলিকাতার রাস্তা

শিল্পী—শ্রী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

খোলা জানালা দিয়া অনিল আলোয় ভরা আকাশখানার দিকে তাকায়।

আবার তাহার মনে হয়, এই আকাশখানাকে ঘিরিয়াও তো যুগে যুগে কত কবি কত কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেখানেও তো আজ তাহাদের একফোঁটা অশ্রু ছাড়া কিছুই আর সঞ্চিত হইয়া নাই!

আধুনিক আইরিশ বা গেলিক সাহিত্য

শ্রী শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

বিংশ শতাব্দীর এই জগদ্ব্যাপী জাগরণের দিনে কোন জাতিই আর অবসাদগ্রস্ত হয় নাই। সাহিত্যে, শিল্পে, নব নব ভাব-ধারায় সবদিকেই আজ প্রবল প্রাণের স্পন্দন প্রত্যেকটি জাতির সত্তাতেই অনুভূত। এই যুগে আয়ার্ল্যাণ্ডও যে ঘুমাইয়া নাই সেকথা বলাই বাহুল্য। এখন আয়ার্ল্যাণ্ডে নবযুগ আসিয়াছে—এক বিরাট পরিবর্ত্তনের যুগ। কিন্তু বাহিরের জগৎ—বিশেষতঃ আমাদের দেশের অনেকেই সে সংবাদ সম্যক রাখেন না। আয়র্ল্যাণ্ডের এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রকৃত পরিচিত যদি কোনও দেশ থাকে তবে সে দেশ জার্ম্মানী। কিন্তু মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে সে আবর্ত্তনের মহান্ রূপ বিশ্বের সকল জাতিকেই চমকিত করিয়া দিবে। বিশেষতঃ আইরিশ বা গেলিক সাহিত্য যে ভাবে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে সে সাহিত্য অচিরে—শুধু ইউরোপের নয়—সমগ্র বিশ্বের সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সাহিত্য হিসাবে গেলিক ভাষা আজিও আশানুরূপ ভাবধারা ও কলাকৌশল-প্রকাশের অধিকারী হয় নাই, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহাই এককালে গেল্ বা আইরিশ জাতির কল্পনাতীত ছিল। কে জানে কোন্ সাহিত্যের কত সম্পদ এ জগতে পাণ্ডুলিপির আকারে অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত অবস্থায় ধ্বংসোন্মুখ! কেই বা জানে, কবে কোন্ দরদী রামের পাদস্পর্শে পাষাণ-চাপা সেই সব অনবদ্য সাহিত্য-অহল্যার উদ্ধার হইবে?

গেলিক ভাষা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সজীব ভাবের আদান-প্রাদানের যোগ্য এক সাবলীল ভাষা হইয়া উঠে। সেই সময়েই গেলিকের একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত রূপ দেখা দেয়। কিন্তু তার পরই তাহার দুর্দ্দশার দিন ঘনাইয়া আসিল। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় আইরিশ জাতির স্বদেশপ্রেমকে টুঁটি টিপিয়া মারিবার আশাতেই বোধ হয় গেলিক সরস্বতীর কণ্ঠরোধ করিলেন। কিন্তু হায় রে মানবের মূর্খতা!...সভ্য সহর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গেলিক ভাষা আশ্রয় লইল সুদূর সভ্যতাবর্জ্জিত অজ্ঞতাচ্ছন্ন প্রদেশে। ফলে কনেমেরার (Connemara) অনুর্ব্বর সমুদ্রকূলে, ডোনেগাল (Donegal) ও কেরির (Korry) উন্নত ভূভাগে দীনহীন অত্যাচার-ক্লিষ্ট কৃষককুল অচ্ছেদ্য বন্ধনে গেলিক সরস্বতীকে নিজেদের হৃদয়-মনের সঙ্গে বাঁধিয়া লইল।

শতাব্দী-ব্যাপী অত্যাচারের পর জাতীয় শাসনতন্ত্র আয়ার্ল্যাণ্ডে পুরাতন জাতীয় ভাষার উদ্ধারসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এবং প্রতি বৎসর দলে দলে শিক্ষকসম্প্রদায় গেলিক ভাষায় শিক্ষিত হইতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে সে শিক্ষকদল ছড়াইয়া পড়িলেন। আইন করিয়া জনসাধারণকে বাধ্যতামূলক গেলিক শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে গেলিক-শিক্ষিত ছাড়া অন্য কেহ গৃহীত হইবে না—এই হইল নিয়ম। রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে গেলিকের পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হইল। লোকে বুঝিল, দেশে উন্নতি করিতে হইলে, পদমর্য্যাদা পাইতে হইলে, গেলিক শেখা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু এমন সময়ও ছিল, যখন আয়ার্ল্যাণ্ডের সহরে গেলিক জানা লোক

খুব কমই দেখা যাইত। যে অল্পসংখ্যক কয়েক ব্যক্তি গেলিক জানিতেন, তাঁহাদের চিহ্ন ছিল পোষাকের উপর বুকে সংলগ্ন একটি সোনার আংটি ;—অর্থাৎ অঙ্গুরীয়ধারক গেলিক বোঝেন এবং গেলিকে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। আজ সেই গেলিক শিক্ষার ঝোঁক আয়ার্ল্যাণ্ডে নবযুগের অবতারণা করিয়াছে। গেলিক পণ্ডিতেরা আশাও করেন নাই যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের

উইলিয়ম বাট্লার য়েট্স্—
গেলিক আন্দোলনের জন্মদাতা।

প্রাচীন জাতীয় ভাষা এতটা উপচীয়মান হইয়া উঠিবে। মনে হয়, আগামী দশবৎসরের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোকেরই কথ্যভাষা ইংরাজী হইতে গেলিকে পর্য্যবসিত হইবে।

বিখ্যাত কবি উইলিয়াম বাট্লার য়েট্স্ (William Butler Yeats) এই গেলিক পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনের জনক (Father of Gailic Movement)—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। গেলিক ভাষার এই অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই গেলিক সাহিত্যের মরা গাঙে দুই কূল ছাপাইয়া বান আসিল। আজ গেলিক সাহিত্যে ক্রমবিবর্দ্ধনের উদ্দাম বেগ। তাই নিকট-ভবিষ্যে যে সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সুনিশ্চিত উচ্চাসন লাভ করিবে তাহার সম্বন্ধে সকলেরই কিছু জানা দরকার।

আধুনিক গেলিক সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে Father O' Heary-র নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম-জীবনে একজন গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে প্রথম রচনা—Seadana একখানি অমর গ্রন্থ। Seadana ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। O' Heary-র বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রাচীন অস্পষ্ট পুঁথিগত গেলিক ভাষাকে এক নবীন রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান Cork-এর কথ্যভাষায় তিনি রচনা আরম্ভ করেন। মানবহৃদয়ের অতি খুঁটিনাটি ভাবগুলিও, তাঁহার কলাকৌশল ও সাধারণ সাবলীল কথ্য-ভাষার মিলনে, এত সুন্দর ভাবে তাঁহার রচনায় দেখা দিয়াছে যে তাহা অবর্ণনীয়। Father O' Heary ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহাকে দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের গেলিক সাহিত্য-সেবীদের আদর্শ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী লেখক তেমনি O' Conaire। এই কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুতে গেলিক সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর। ছোট-গল্প রচনার দিক দিয়া তিনি জগতের যে কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সমকক্ষ। ১৯১৬ অব্দে আইরিশ বিপ্লবের সময় তাঁহাকে ডাব্লিনের আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার গৃহ ও কয়েকখানি নাটক ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাঁহার লেখা - অপূর্ব্ব সরলতা ও বাস্তব জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার কবিদৃষ্টিতে আয়ার্ল্যাণ্ডের বাস্তব জীবনের চিত্র এক অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমস্ত রচনাই ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। An Crann Geige, Brian Og প্রভৃতি লেখা তাঁহার নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

Seamus O' Grianna একজন অতি-আধুনিক গেলিক উপন্যাস লেখক। তাঁহার সাহিত্যে ডেনেগালের অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার ও রিভিয়িরার সূর্য্যকরোজ্জ্বল বেলা-ভূমির যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটি কই আর দেখা

যায় না। গেলিক জনসাধারণের নিকট তাঁহার রচনা খুব প্রিয়, কিন্তু তাঁহার বই এখনও ইংরাজীতে অনূদিত হয় নাই। তাঁহার রচনার মধ্যে Michael Ruadh, Caislear Oir প্রভৃতি বিখ্যাত বই।

পরলোকগত O' Looighaire আধুনিক গেলিক অভ্যুত্থানের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার হোমারের গেলিক অনুবাদ, Imitation of Christ এবং অনেকগুলি ছোট গল্প গেলিক সাহিত্যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আইরিশ কবি Edward Lysaght ইংরাজীতে বহু কাব্যরচনা করিয়া কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি "M" ছদ্মনাম লইয়া সম্প্রতি গেলিক ভাষায় Cursai Tomasis নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। সে উপন্যাসখানির সমাদর আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র—এবং যথেষ্ট।

আজকালকার খ্যাতনামা গেলিক সাহিত্যিকদের মধ্যে Piarais Beaslai. "An seabac", Tomais O' Rahilly, "Torna" এবং Father Dineen-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

পরবাসী

শ্রী নিখিলেশ রাহা

এখন আমার গ্রামপথ ধরে' ফিরিছে সকলে ঘরে,—
আঁকা-বাঁকা পথে আগে পিছে চলে আকাশ কথায় ভরে'।
বধূরা জ্বেলেছে তুলসীর মূলে দীপ,
কপালে এঁকেছে ঘন খয়েরের টীপ,
সুচারু দেহটি ঘিরিয়া পরেছে শুভ্র কাপড়খানি,—
কেশ-প্রসাধন যতনে সেরেছে সিঁথায় সিঁদুর টানি'!

গ্রামের প্রান্তে ছোট নদীতীরে কয়েকটি বাঁধা তরী,
ভাঙা ভাঙা সুরে মাঝি গান গায় কাহার বিরহ স্মরি'।
কলসী-কাঁখেতে যারা রোজ ঘাটে আসে,
জল ভরে আর কথায় কথায় হাসে,
তাহারা যে যার ঘরে ফিরে গেছে,—নির্জ্জন পথ 'পরে
কদম্বরেণু উতলা বাতাসে তরুমূলে ঝ'রে পড়ে!

আমাদের ঘরে সব কাজ বুঝি এখনও হয়নি সারা,
প্রতি ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিতেছে—যেন কয়েকটি তারা!
হাঁসগুলি সব আসে নাই ফিরে ঘরে,
পুকুরের পারে বৃথা চীৎকার করে,
পোষা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শোনা যায় মাঝে মাঝে—
দিনে ঘুমালেও সন্ধ্যা হ'তেই ব্যস্ত প্রভুর কাজে।

মা'র বুঝি আজ কাজ বড় বেশী—এখনও রয়েছে বাকী,—
চাকর-বাকর যে যেমন পারে সকলেই দেয় ফাঁকি;
বাড়ীর ঠাকুর, 'এখনি আসিব' বলে'
রান্নার মাঝে কাজ ফেলে গেল চলে',
উনুনের 'পরে ভাত পুড়ে যায়,—মা-ই তার কাজ করে
ছোট বোন একা টেবিলে ঝুঁকিয়া ইতিহাস বই পড়ে।

আমার আজিকে একদিন ছুটি—কোন কাজ হাতে নাই,
বসিয়া বসিয়া হাবিজাবি কথা এত মনে পড়ে তাই।
কোন্‌দিন কবে একেলা নদীর জলে
সন্ধ্যারবির দেখেছিনু আলো জ্বলে,—
বাড়ীতে কে কবে কি কথা কয়েছে ফিরে' ফিরে' মনে হয়;—
ছুটির দিবস আজিকে আমার বৃথায় কাটিল নয়?

বিহারীলাল ও নারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

প্রেয়সী নারীকে প্রণয়-অর্ঘ্যদানের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতখানি কি জান্‌তে হ'লে, আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বারে যেতে হবে। কারণ জগতের সভ্যতায় এই তথ্য বৈষ্ণবেরই বিশেষ দান। নারীর মাতৃরূপটি বড় নয়, কন্যারূপটি বড় নয়, বন্ধুরূপটি বড় নয়—সকলের ওপরের রূপটি হ'চ্ছে প্রেয়সীর রূপ। বৈষ্ণবের কাছে যশোদা বড় নন, বড় হলেন রাধা। পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রসই তাঁদের মতে সব থেকে বড় রস,—পরম রস সখ্য নয়, বাৎসল্য নয়, দাস্য নয়, ভক্তি নয়।

এর কারণ এই যে, অন্য সব রসই একপেশে, সর্ব্বতোমুখী নয়,—কেবল মধুর রসই রস-উৎস এবং অন্য সব রসের আশ্রয়। মধুর রসই শত দল পদ্মের মত দিকে দিকে পাপড়ি মেলে ফুটে উঠ্‌তে জানে, অন্য রস তা পারে না—তারা সীমাবদ্ধ, তারা তেমন ক'রে মুক্ত নয়। বাৎসল্য ত্যাগেরই ধর্ম্ম—পিতা বা মাতা সন্তানের জন্য দিয়েই যান কেবল, পরিবর্ত্তে কিছু নেন না; তাঁদের শুধু দানেরই ধর্ম্ম, গ্রহণের নয়। দাস্যও তাই—কেবল একপেশে সেবার ধর্ম্ম, সেবাগ্রহণের আদেশ সেখানে নেই। সখ্যও সীমাবদ্ধ—সেখানে তেমন উন্মুক্ত ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দেবার উপায় নেই। সেই সম্বন্ধে যেন অনেকখানি আবরণ থাকে, দু'জনের বিভিন্নতা ভেদ ক'রে একতালাভ একান্ত অসম্ভব। ভক্তি-রসে ভক্তই কেবল অর্ঘ্য দিয়ে যায়, পরিবর্ত্তে সে অর্ঘ্য পায় না। এও অন্য-রসের মত একপেশে দোষদুষ্ট।

দুইটি ব্যক্তির মধ্যে এই সবগুলি সম্বন্ধই অপূর্ণ সম্বন্ধ—সেখানে হয় একজন গ্রহণ করেন কিম্বা একজন দান করেন, সে গ্রহণের প্রতিদান বা দানের বদলে গ্রহণ নেই। এমন সম্বন্ধে দুইটি আত্মার মাঝখানে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধটি ফুটে উঠ্‌তে পারে না,—তারা দ্বন্দ্বের অতীত হ'য়ে ওতঃপ্রোত ভাবে পরস্পর মিল্‌তে পারে না,—তাদের মাঝে আবরণের ভেদ র'য়ে যায়, তাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস কখনও গভীরতম হ'তে পারে না। কিন্তু মধুর রসে যেমন দান আছে তেমন প্রতিদান আছে, যেমন গ্রহণ আছে তার বদলে প্রতিগ্রহণও আছে। যিনি দাতা তিনিই গ্রহীতা হন, যিনি ভক্ত তিনিই উপাস্য হন, যিনি উপাস্য তিনি আবার ভক্ত হন। অন্য সম্পর্কে একজনের উদারতা আনে অন্যজনের হীনতা, একজনের দান আনে অন্যজনের ঋণ। সেখানে সমান ভাবে মিল্‌বার সুযোগ নেই, সেখানে বড়য় ছোটয় মিলন—সে সখ্যের শান্তি নয়, বৈষম্যের কদর্য্যতা। কেবল মধুর রসেই এ ভেদ থাক্‌তে পারে না, দু'জনেই সম্পূর্ণ ভাবে সমান, কেউ বড় নন, কেউ ছোট নন—তাই জন্যে ঘনিষ্ঠতম মিলনটি এই স্থানেই সম্ভব। যেখানে এমনভাবে প্রাণের বিনিময় হয় সেইখানেই দুইটি হৃদয়ের পূর্ণতম মিলনকে আমরা পাই, সেইখানেই আনন্দ সহস্রধারা হ'য়ে বইতে জানে—সেই ত ভূমানন্দের আস্বাদ, আর কিছু নয়!

এই জন্যই মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস, এই জন্যই মধুর রস অন্য সব রসের আধার। অন্য রসগুলির প্রত্যেকটি যদি এক-একটি বাদ্যযন্ত্রের একটি মাত্র সুর হয়, মধুর রস হবে সেই সবগুলি রসের ঐক্যতান বাদন। সে আরও জটিলতর, পূর্ণতর এবং মধুরতর। অন্য রসগুলি যদি হয় একটি ফুলের এক একটি পাপড়ি,—মধুর রস হবে পাপড়িগুলি সমেত সমগ্র ফুলটি। বিশ্বের সকল কবির মনকে সেই-জন্যেই এই রসটি এমন ভাবে মুগ্ধ করেছে, বিশ্ব-সাহিত্যের তিন-চতুর্থ অংশ তারি জন্যে এই রসেরই মহিমা কীর্ত্তন করেছে। এবং তাই কবির চোখে নারীর এই রূপটি সুন্দরতম ঠেকেছে। তাঁর পায়েই কবি তাঁর

শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি তাই নিবেদন ক'রে দিয়েছেন। এই নারী সম্পর্কে বিহারীলাল গেয়েছেন—

আননে লোচনে স্বরগ প্রকাশ,
হৃদয়-প্রফুল্ল কুসুম তুমি :
জুড়াতে আমার জীবন উদাস
ধরায় উদয় হয়েছে তুমি !

* * * *

তিনি একাধারে—

বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখী আমোদিনী আমোদ সেবি,
সান্ত অন্ত বাসী ললিত কলায়,
সমাধি-সাধনে সদয়া দেবী।

তাই তিনি তাঁকে এই ব'লে স্বাগত করেছেন—

এস উষারাণি, এস সরস্বতি,
এস লক্ষ্মি, এস জগৎ-ছটা ;
এস সুধাকর বিমল মালতী,
আহা কি উদার রূপের ঘটা !

কালিদাস তাঁর 'অজের বিলাপে' নারীর এই মূর্ত্তিটিই এঁকেছিলেন—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
অতিপকরুষেণ মৃত্যুনা হরতা ত্বাং কিং ন মে হৃতম্ ॥

এই নারীই ভবভূতির কাছে—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে—।

জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণের—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

তাঁকে উদ্দেশ ক'রেই বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস গেয়েছেন—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ—।

এবং সেই সুরে সুর মিলিয়ে বিহারীলাল গেয়েছেন—

প্রেমে তুমি মম অমূল্য রতন,
যুগ-যুগান্তের তপের ফল ;
তব প্রেম-স্নেহ অমিয়-সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল !

এই পরম সুন্দর সত্যটি আমাদের আদিম কবি বাল্মীকির চোখ যে এড়ায়নি এটি কম আশ্চর্য্যকর জিনিষ নয়। নারীর এই রূপটি কেন শ্রেষ্ঠ সেটি তিনি সীতার মুখে কত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রামায়ণে সীতা বল্‌ছেন—

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ ॥

পিতা আমাকে সব দিতে পারেন না - স্বল্প দেন, ভ্রাতা দিতে পারেন না, সন্তানও পারে না,—যিনি আমায় তাঁর সর্ব্বস্ব নিঃশেষে দিতে পেরেছেন সেই ভর্ত্তাই আমার সব থেকে বড় দেবতা। পুরুষও ঠিক সেইভাবে বল্‌তে পারেন —মাতা আমাকে সব দিতে পারেন না, ভগিনী পারেন না, কন্যা ও পারে না,—আমার প্রিয়া, কেবল যিনি আমায় তাঁর সর্ব্বস্ব নিঃশেষে দিয়ে দিয়েছেন—তাঁর পায়েই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি নিবেদন করব না ত কার পায়ে করব ?

আমাদের কবিও ঠিক সেই কথা বলেন। তাঁর দাম্পত্য-জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা যা পাই তাতে এই সুরটিই সব থেকে বড় ক'রে বাজে। তিনি এক বন্ধুকে চিঠিতে এই রকম লিখেছিলেন—

'ভালবাসার সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন। * * * * ভালবাসার চরম চরিতার্থতার স্থান এই বিশ্ব। * * * * নরনারীতে ভালবাসা প্রথম প্রস্ফুটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় রাখে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই অমায়িক আত্মভাব দেবদুর্ল্লভ। ইহারই নাম পরমার্থ—স্বার্থ নহে।"

এই অনুসারে তাঁর মতে জীবনের সব থেকে পরম চরিতার্থতার ছবি এই রকম—

ভালবাসে, ভালবাসি,
ভূমা প্রেমানন্দে ভাসি ;
সদা মন হাসি হাসি, সৌরভ-গৌরব।

* * * *

প্রাণ প্রেমরসে ভোর,
গলে দোলে প্রেম-ডোর,
হৃদে প্রেম-ঘুমঘোর,
মাতোয়ারা নয়ন-চকোর।

আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

ফুটিলে প্রেমের ফুল,
ঘুমে মন ঢুল ঢুল,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল!

*   *   *   *

প্রণয় পবিত্র কাম,
সুখ-স্বর্গ-মোক্ষধাম—।

এমন ক'রে দাম্পত্য-প্রেমের জয়গান আর কোন কবি গেয়েছেন কিনা জানি না। প্রণয়ই মানুষকে মুক্তি এনে দেয়,—ধর্ম্ম নয়, শাস্ত্র-আলোচনা নয়, নৈতিক জীবন নয়। এই ত ধর্ম্ম, সকলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

প্রেম ত গোপনে দুইটি হৃদয়ের মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রয় না; সে যে আলো, তাই 'আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে'। তা হ'তে সকল জীবের প্রতিই ভালবাসা আসে, সর্ব্ব জীব-হিতের ইচ্ছা তখন আপনা হ'তেই মনে জাগে। তাই তিনি বলেছেন—

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই;
ভালবাসি নারী-নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই!

কবি তাঁর সারদামঙ্গল বইখানি তাঁর 'প্রেয়সীর' নামে উৎসর্গ করেছেন। তাতে তাঁর প্রতি সুগভীর ভালবাসার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। সেখানে তিনি লিখ্ছেন—

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফুলহার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার।

অন্য জায়গায় ঘুমন্ত প্রেয়সীর মুখখানি তাঁর মুখ হ'তে এই বাণী ফুটিয়ে তুলেছে—

আহা এই মুখখানি,
প্রেম-মাখা মুখখানি,
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি কে দিল আমায়!
কোথায় রাখিব বল,
ত্রিভুবনে নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায়
হৃদয়ে ধরিতে না কুলায়।

*   *   *   *

কি জানি কি ঘুম-ঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!

এ কবিতার একনিষ্ঠতাই প্রাণ, ভাবের গভীরতাই সৌন্দর্য্য। কি চোখে যে তিনি দেখেছেন এ সুখের তুলনা হয় না। এ সুখ সকল সৌন্দর্য্যের আধার যে শুধু তাই নয়, এ সুখ সকল সুখের আধার।

সেই মুখ শুভ মুখ,
সেই সুখ পূর্ণ সুখ,
অমরের অপরূপ স্বর্গ-সুখ চাই না।

তা চাইবেন কেন? সে সুখের কাছে স্বর্গ-সুখও তুচ্ছ হ'য়ে যায়,—সে রূপের কাছে স্বর্গের মাধুরীও ম্লান হ'য়ে যায়। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ-শতদল
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার।

এই প্রেয়সী একাধারে তাঁর লক্ষ্মী, তাঁর সরস্বতী, তাঁর সব। তাঁর উপস্থিতিতেই ঘরকে আলো করে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব হরণ করে,—কেবল মাত্র তাঁর দানই কবির সকল দুঃখ মোচন ক'রে দিতে পারে। তাই তিনি সগর্ব্বে গেয়েছেন—

তোমায় দেখি অনিবার—
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক গে' এ বসুমতী যার খুসী তার!

এমন তেজস্বিতা, এমন মনের বল তিনি কোথা হ'তে পেলেন? তাঁর অন্তরের নিগূঢ় প্রেমই কি তাঁকে সে বল দেয় নি?

জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলো কবির মনকে একদিন মুগ্ধ করেছে তাই তিনি গাইছেন—

সব চেয়ে সুখকর
তব মুখ মনোহর,—
হেরিয়া অমর নর পশুপক্ষী প্রাণী,
সচেতন অচেতন
সকলে প্রফুল্লমন,
কি অমৃত আছে এই আননে না জানি!

কিন্তু একথা মেনেও তিনি মানতে চান না; প্রিয়তমার মুখ হ'তে সুন্দরতম মুখ কি কিছু থাকতে পারে নাকি? তাঁর কবি-মন এ কথায় সায় দিলেও তাঁর প্রেমিক মন একথা কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে রাজী নয়। উত্তরে স্পর্দ্ধাভরে তাঁর অন্তরের প্রেমিকটি বলেন—

প্রিয়ার পবিত্র মুখ
উদার স্বরগ-সুখ
কেবল আমারি তরে বিধির সৃজন।

তাঁর কবি-মন বলে—

তুমি শশী সকলের
মোহমন্ত্র হৃদয়ের,
নন্দনের পারিজাত কুসুম অমর।

প্রেমিক মন উত্তর দেয়—

উথলে অমৃতরাশি,
মুখেতে ধরে না হাসি,
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর;
প্রেয়সীরো থর থর
হাসিমাখা বিম্বাধর,
সাধের স্বপনময়ী মূর্ত্তি মনোহর।

কার মুখ বেশী ভাল তার কে মীমাংসা ক'রে দেবেন? কাজ নেই ঝগড়ায়,—এস দুজনে মিটমাট ক'রে ফেলি। সব শেষে এই ঠিক হ'ল—দুই ভাল—যদিও প্রেম বড়;—

আর কিছু নাই দুখ;
ওই চাঁদ, এই মুখ
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই;
(কিন্তু) যাই আমি যেইখানে
যেন আমি খোলা প্রাণে
একমাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই।

অনেকের চোখে এই জিনিষটি নিতান্ত ছেলেমানুষি ঠেক্‌তে পারে; কিন্তু এ ছেলেমানুষির মধ্যেই তাঁর গভীর প্রেমের কত সুন্দর একটি ছবি ফুটে উঠেছে, সেট যার চোখ আছে তিনি নিশ্চয় দেখতে পাবেন, অরাসকজন অজ্ঞ ব'লেই হাস্‌বে।

এই প্রেয়সীকে তিনি যে কেবল আনন্দের আধার রূপে পেয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি একাই তাঁর সব। তাঁর প্রেমের, তাঁর স্নেহের, তাঁর ভক্তির চরিতার্থতা—সমস্তই প্রেয়সীতে। তিনি একাই তাঁর কাছে সমস্ত জগৎস্বরূপ। তাই তাঁর সম্বন্ধে কবির চরম বাণী এই—

উদার লাবণ্য তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি,
হৃৎপদ্মে সরস্বতী,
প্রেম স্নেহ ভক্তিভাবে দেখি অনিবার—
প্রেয়সী আমার!

এমন ভালবাসা কে বাসতে পারেন, এমন ভালবাসার গানই বা কে শুনতে পারেন? এই চরম,—এর উপরে কিছু থাকতে পারে না। 'দান্তে' বোধ হয় তাঁর 'বেয়াত্রি'চ'-কে এত ভালবাসেন'নি, মহাদেবের সতীর প্রতি ভালবাসা একে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। কবি ভবভূতির কথায় বলতে ইচ্ছে করে—এমন প্রেমের তুলনা হয় না, কচিৎ কোথাও দেখা যায়—

'ভদ্রং প্রেম সমানুষস্য কথং হি একমেব তৎ প্রাপ্যতে।'

নারী-জীবনের আর একটি দিক তাঁকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল, এবং তাঁর পুরুষ-জীবনের প্রতি সেই পরিমাণে কতখানি বিদ্বেষ আনিয়ে দিয়েছিল, সেই কথাটির উল্লেখ ক'রেই আমাদের এই আলোচনার শেষ করব। নারীর মাতৃজীবন তাঁকে অত্যন্ত বেশী মুগ্ধ করেছিল। একটি নূতন জীবকে নিজের দেহের মধ্যেই আশ্রয় দিয়ে, ধীরে ধীরে বড় ক'রে তুলে একদিন সংসারে এনে, তারপর নিজের বুকের অমৃত দিয়েই বর্দ্ধিত ক'রে তোলার যে আনন্দ—এই আত্মত্যাগের যে গৌরবময় মহিমা তা হ'তে পুরুষ বঞ্চিত। সেটা তাঁর মতে পুরুষের অতিবড় দুর্ভাগ্য। জীবনের একদিকের

একটি অতি মধুর অনুভূতি হ'তে সে একেবারে বঞ্চিত। তাই আমাদের পুরুষ-কবি দুঃখ ক'রে গিয়েছেন—

বৃথা পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধানা নারী,
কতই কতই বেশী স্নেহ-সুখে অধিকারী!

তাঁর মেয়েকে প্রাণ দিয়ে তিনি ভালবাসেন, তবু তিনি তৃপ্তি পান না, মায়ের যে ভালবাসা সে ভালবাসা ত তিনি মেয়েকে দিতে পারেন না। একি পরম দুর্দৈব! প্রকৃতি তাঁর প্রতি বিরূপ,—কেন তাঁকে তেমন ক'রে গঠন করেনি, এই তাঁর অভিযোগ। স্বাভবিক ভাবে যে ভালবাসা বুঝতে পারেন না, মুখের ভাষায় সে কথা বুঝাতে চেষ্টা কর্‌ছেন মেয়েকে—

স্বভাবে অভাব আছে, পুরাব কেমন করে' ?
প্রাণে যত ভালবাসা তত বাসা বাসি তোরে।

মেয়েকে তাঁর কোলে নিয়েছেন, আদর কর্‌ছেন, তবু তৃপ্তি হয় না। খেয়ালী মেয়ে কোন্ খেয়ালের বশ তিনি জানেন না, বাবার বুকে মুখ থুয়েছে, তাই বাবার দুঃখ আর বাধা মানে না। এখানে মুখ রাখা কেন, এটা একান্তই বৃথা, এ ত আর তার মায়ের বুক নয়! এখানে অমৃত বহেনা—

কোথায় রাখিলি মুখ, এযে বুক মরুস্থল,
বহে না স্নেহের নদী, ফলে না অমৃত-ফল!

হায় রে কষ্ট পুরুষের,—এ দুঃখ বিধাতা বুঝেন না। কোন পুরুষ যে মাতৃত্বের আনন্দ অনুভব কর্‌তে এত অনুরাগী এবং তা সম্ভব নয় ব'লে এতখানি দুঃখিত হ'তে পারেন—কোন নারী হয়ত কোনদিন তা ভাব্‌তে পারেন নি। কিন্তু পুরুষের মনে এ দুঃখ সত্যিই জাগে—একথা জান্‌লে কি এ-বিষয়ে সৌভাগ্যবতী মহিলাদের গৌরব বোধ হবে?

এমন ভাবেই আমাদের এই পাগল কবি রমণীর গুণে মুগ্ধ। রমণীর দুঃখে তাঁর কত কষ্ট, রমণীর সৌভাগ্যে তাঁর কত আনন্দ, রমণীর গুণকীর্ত্তনই তাঁর কবিতা, রমণীর রূপ-ধ্যান তাঁর ধর্ম্ম এবং সব শেষে নিজে রমণী হ'তে পারেন নি ব'লে তাঁর বুকভরা কি আপশোষ! তিনি কি পাগল? হবেন বা! তাতে কি তাঁর গৌরবের হানি হয়? এতটুকু নয়। আমাদের সব থেকে বড় দেবতাটি হচ্ছেন পাগল ভোলানাথ—তবুও তিনি দেবাদিদেব,—মহাদেব! তবুও তিনি আমাদের পূজ্য। আমাদের এই কবিটি পাগল হন, যা'ই হন, তিনিও আমাদের পূজ্য—তাঁর উদার মনের জন্য, তাঁর সুন্দর ভাষায় জন্য এবং সর্ব্বশেষে তাঁর অপরূপ নারী-মহিমা কীর্ত্তনের জন্য।

মালয়ের পথে

শ্রী সুবিমলচন্দ্র সরকার বি-এস্‌সি

পেনাং শব্দের অর্থ সুপারি। কেন যে ও দ্বীপটির নামকরণ পেনাং হয়েছে বুঝতে পারলাম—যখন প্রভাতের কুজ্ঝটিকার আবরণ ভেদ ক'রে জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করল। সুপারি ও নারকেলের রাজ্য পেনাংয়ের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি দেশে থাকতে শুনেছি,—যাঁরা দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের শোভা বর্ণনা করতে শতমুখ তাঁরাও স্বীকার করেন, পেনাংয়ের প্রবেশদ্বার থেকে দ্বীপটির শোভা অপূর্ব্ব। বাস্তবিক জাহাজ যখন ক্রমে এগিয়ে এসে নঙ্গর ফেলতে সুরু করল, তখন প্রকৃতিরাণী কী অপরূপ সৌন্দর্য্য-সম্ভারে প্রতিভাত হ'লেন।

বলে সে যাত্রায় কোনপ্রকারে নিষ্কৃতি পেলাম। গাধাবোটকে একটা ছোট 'লাঞ্চ' ধীরে সামনের দিকে অনির্দ্দিষ্ট "কেরেন্টিন" কয়েদখানায় টেনে নিয়ে গেল।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে দু'একজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তাঁদের বিদায়ক্ষণের শুষ্ক হাসি দেখে আমাদের মনে শরৎ বাবুর অঙ্কিত কেরেন্টিনের চিত্র ভেসে উঠল। জনৈক পাঞ্জাবী বন্ধু তাঁর এক আত্মীয়াকে নিয়ে আস্‌ছিলেন মালয়, তাঁর দুরবস্থা কল্পনা ক'রে একটু সহানুভূতি জেগেছিল। বেচারী হিন্দুর মেয়ে, কলকাতায় শেষ অন্নগ্রহণ করেন—এর পর কেরেন্টিনে আরও ৪।৫ দিন

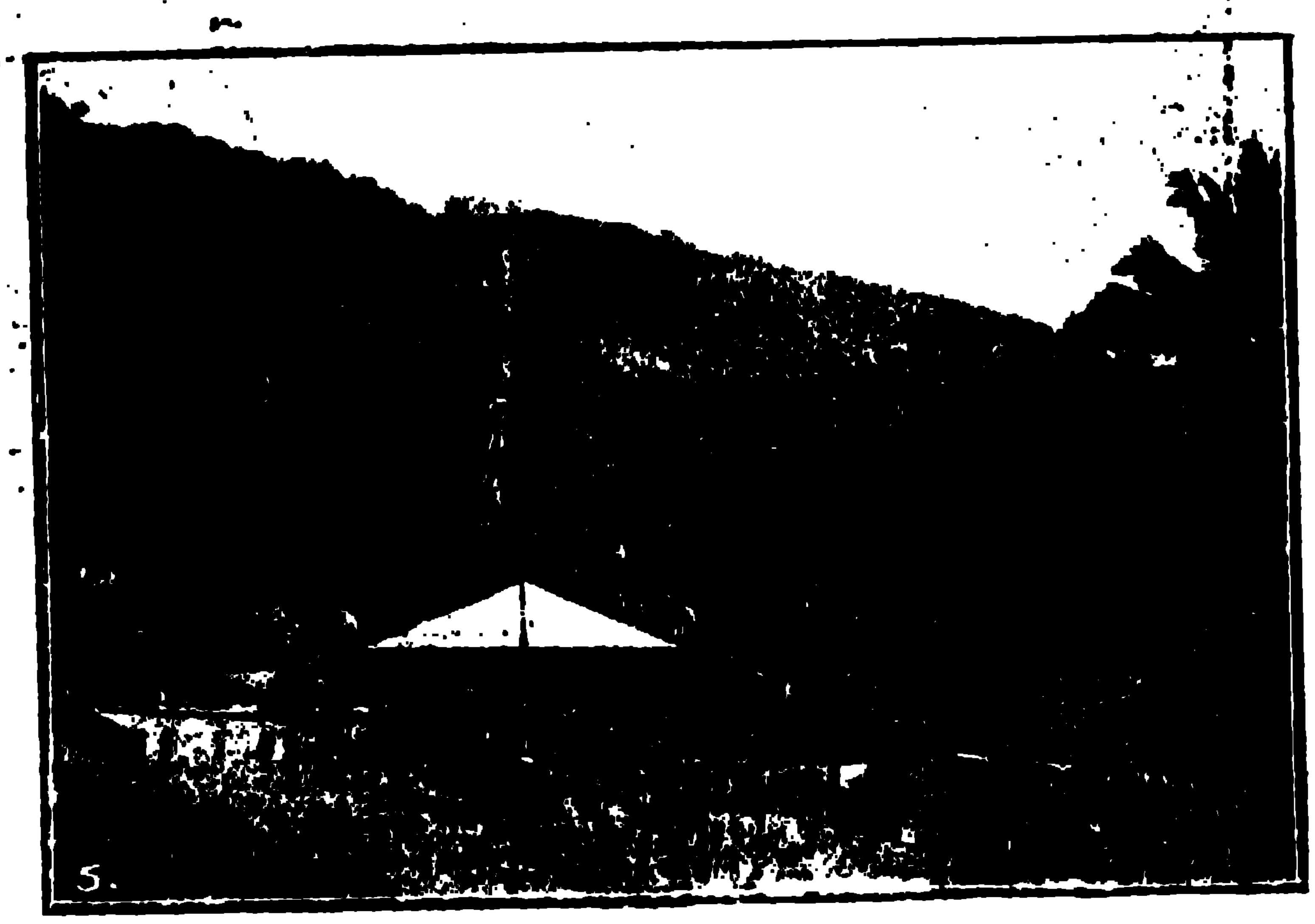

পেনাংহিল রেলওয়ে—পাহাড়ের নীচের ষ্টেসন

জাহাজ বন্দরে লাগবার পূর্ব্বে যথারীতি পুলিশ, কাষ্টমস্‌ ও ডাক্তারের পরীক্ষা-ক্রিয়া সমাপন হ'লে, শোনা গেল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে একজন কম পড়ছে। এর জন্য দায়ী সাব্যস্ত হ'ল—কর্ত্তৃপক্ষের বিধান অনুসারে তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য যাত্রীরা। কাজেই একটা গাধাবোটের ওপর সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের গাদা হ'ল। আমাদের বর্ণচ্ছটায় বিমুগ্ধ হ'য়ে কোনো ভক্ত আমাদেরও ঐ স্থানে পাঠাবার আয়োজন করেছিলেন কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর টিকিটের

থাকতে হবে, একথা জাহাজের কর্ত্তাদের মুখে শোনা গেল। একজনের পাপের জন্য অন্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এ ঐতিহাসিক সত্য; নচেৎ মিরজাফর, উমিচাঁদ বা পতিত ব্রাহ্মণের জন্য সমগ্র ভারতকে আজ এ দুঃখ বরণ করতে হবে কেন? যাক্‌ সে কথা।—আমাদের সাথে মাসখানেক পরে ভাগ্যক্রমে ঐ গাধাবোট-যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীর (পঞ্চম নয়!) জনৈক অতিথির দেখা হয়; তখন তাঁর কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম, সকলকে তিনদিন

তিনরাত আটক রেখে মন শুদ্ধ হ'লে disinfecting fluidএ স্নান করিয়ে পবিত্র ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ও অধ্যায়ের পর আমাদের নামাবার জন্য একখানা লাঞ্চ এসে জেটীতে তুলে দিয়ে গেল মাঝ-দরিয়া থেকে। বলতে ভুলে গিয়েছি যে সব পরীক্ষা মাঝ-দরিয়াতেই হয়েছিল। সব পরীক্ষাই দেখি জীবনে আসে এমন স্থানে যেখান থেকে কূল পাওয়া মুস্কিল। কিন্তু আমরা যদি বা কূল পেলাম বরাতগুণে, এসে ঠেকলাম ভাষা-সঙ্কটে। একজন কুলি ত আমাদের মালগুলোর দিকে এসে 'সাতু ডুয়া টিসা আম্পা' ক'রে গুনে' তার ঠেলাগাড়ীতে তুলে লম্বা একটা বক্তৃতা দিলে। যখন আমরা পরস্পর চোখ-চাওয়াচাউয়ি করছি,

চীনা মাঝি। এ ছাড়া আর একপ্রকার নৌকা দেখা যায় —তাদের বর্ম্মা মুলুকের মত 'সাম্পান' বলে—এতে ক'রে মালাইরা মাছ ধরে। মালয়ে চীনা ও ভারতীয় উভয় দেশ-বাসী এসেছিল কুলিগিরি করতে,—কিন্তু ভারতীয়েরা এখানে কুলিই র'য়ে গেছে আর চীনারা আজ কর্ম্মকুশলতা ও পরিশ্রম-গুণে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইংরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

মালয়ের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য হ'চ্ছে টিন আর রবার। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ টিন এবং অর্দ্ধেক রবার মালয়ে উৎপন্ন হয়। ভারতীয়ের এই ঐশ্বর্য্যে কোনরূপ অংশ আছে ব'লে এখনও শুনিনি। কিন্তু চীনারা আজ রবার এবং টিনে

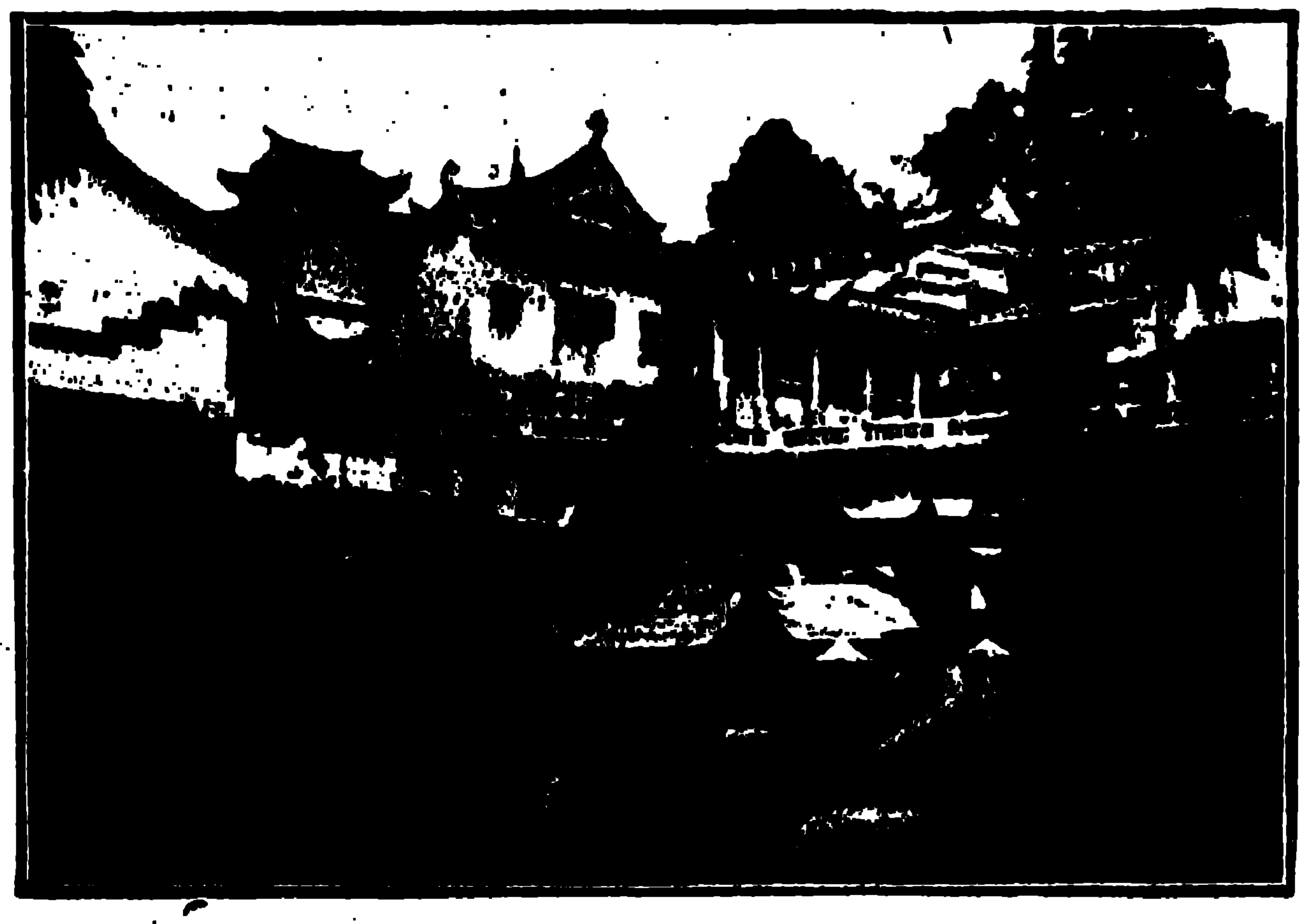

পর্ব্বতের গায় চীনামন্দির সমূহ

তখন জনৈক বন্ধু বিশুদ্ধ বাংলায় মনের আবেগে ব'লে ফেললেন—'বক্তৃতা ত দিলে, আমরা যে কিছুই বুঝলাম না।' যা হোক, জানা গেল একজন আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিছুক্ষণ থেকে। অনতিবিলম্বে তিনি সামনে এসে একগাল হেসে ভাঙা ইংরাজীতে বললেন—তিনি আমাদের সঙ্কট-মোচন করতে পূর্ব্বব্যবস্থা-অনুযায়ী প্রেরিত হয়েছেন। আমরা ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

পেনাং নেমেই মনে হ'ল পীতরাজ্যে এসে পড়েছি। রাস্তার কুলি-মজুর থেকে দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই মনে হ'ল চীনাদের হাতে। এবং পরে জানতে পেরেছি এ রাজ্য বাস্তবিকই চীন-প্রতিপত্তির অন্তর্ভুক্ত। জাহাজঘাটায় যেসব নৌকা দেখলাম—এ:ক চীনারা 'জাঙ্ক' বলে—সব

ইংরাজের সাথে সমানে টক্কর দিচ্ছে। ভারতীয়েরা কুলি আর কেরাণী হ'য়ে এসেছিল এবং সেইভাবেই আছে।

মালয়ে এসে পাতাতঙ্কের কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম। চীনারা এতই অধ্যবসায়ী যে ওদের মধ্যে যদি পরশ্রীকাতরতা আর হিংসা না থাকত, বিদেশীদের বহু পূর্ব্বেই প্রাচী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পীতসাম্রাজ্য গড়তে পারত।

পেনাং-এ দর্শনীয় জিনিষের অন্ত নেই। বাস্তবিক প্রকৃতিদেবী তাঁর সৌন্দর্য্যসম্ভার এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির ওপর উজাড়-হস্তে ঢেলে দিয়েছেন। সৃষ্টির অসহ্য নেশায় ভরপুর হ'য়ে কোন্ কলাস্রষ্টা সবুজের ওপর সবুজ ঢেলে অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত করেছেন একে! এর প্রমাণ বিশেষ ক'রে মেলে 'পেনাং হিল রেলওয়ে'তে ভ্রমণ করলে। সহর থেকে

পাহাড়ের নীচ পর্য্যন্ত মোটর কিম্বা রিক্সাতে যেতে হয়; সেখান থেকে ট্রেন চাপতে হয়। এগুলি ঠিক সাধারণ রেলগাড়ীর মতো নয়—ষ্টীম-ট্রাম বল্‌লেই ঠিক হবে।

এই ট্রামে চ'ড়ে পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে উঠতে আধ-ঘণ্টাও লাগে না। 'বুকি বেন্দেরা' প্রায় ২৭৫০ ফুট উঁচু। মালাই ভাষায় বুকি অর্থে পর্ব্বত বোঝায়। বুকি বেন্দেরা থেকে দ্বীপটির সম্পূর্ণ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। চারদিকে সমুদ্র-বেষ্টিত এই শ্যামল ভূখণ্ড 'ধরিত্রীর স্বর্গখণ্ড' বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। দূরে প্রণালীর অপর পৃষ্ঠে দেখা যায় নয়নমুগ্ধকর পর্ব্বতশ্রেণী—এগুলি অবশ্য প্রধান উপদ্বীপের ওপর।

বুকি বেন্দেরা একটি ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রত্যহ বিকালে এখানে বহু সৌন্দর্য্যপিপাসু এবং স্বাস্থ্যান্বেষী আসেন সান্ধ্যভ্রমণে। এখানকার ক্রাগ হোটেল এবং আরও কয়েকটা বাংলো দেখবার মতো। সমস্ত দৃশ্য দেখে ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে সহরে ফিরে যাওয়া যায়।

পেনাং দ্বীপ—শুধু পেনাং কেন সারা মালয়—মোটরে বেড়াবার অতি উৎকৃষ্ট স্থান। পৃথিবীর মধ্যে মালয়ের মতো সুন্দর রাস্তা কোথাও নেই শুনা যায়। মালয়ের সমস্ত রাস্তাই পিচ দেওয়া এবং মালয়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এই প্রকার রাস্তায় ভ্রমণ করা যায়। দেশের ভাবী-ভ্রমণকারীদের মধ্যে যাঁরা মোটর আনতে সক্ষম, তাঁরা যদি মোটরে পেনাং থেকে সিঙ্গাপুর মোটরে ভ্রমণ করেন তাহ'লে তাঁদের 'মালয় ভ্রমণ' সার্থক হবে। মালয়ে ৩৫০০ মাইল ভ্রমণোপযোগী রাস্তা আছে।

পেনাং দ্বীপ মোটরে ঘুরে আসতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগে—পথ প্রায় ৪৫ মাইল। এতে দ্বীপটির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আইডিয়া হবে। দ্বীপটি পর্ব্বতাকীর্ণ। নারকেল ও সুপারি গাছের সৌন্দর্য্য অবশ্য বাঙালীর কাছে সুপরিচিত। কিন্তু বিশেষ, বিশেষের সঙ্গগুণে অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করে। ঘন মেঘের জটা যখন সুপারি গাছের মাথায় মৃদু দুলতে থাকে, অথবা তীরের নারকেল গাছ দেহ বাঁকিয়ে আগ্রহভরে সমুদ্রের কাছে চুম্বনের মিনতি জানায়—সে দৃশ্য অবর্ণনীয়।

পেনাং ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে চীনা মন্দির এবং সর্প-মন্দির না দেখলে। চীনা মন্দিরগুলি পাহাড়ের গায়ে। এর মধ্যে নবনির্ম্মিত মন্দিরটির স্থাপত্যকলা দর্শনযোগ্য। দেশের বাইরে ভারতীয় জ্ঞানবীর বুদ্ধের প্রতিকৃতি দেখে মনটা ভ'রে উঠেছিল।

বটানিকাল গার্ডেনট অপর এক দর্শনীয় স্থান। এখানে বানরের অন্ত নেই এবং অনেকে বেড়াতে যান বিকালে কলা ও অন্যান্য ফল নিয়ে। ভারতে যাঁরা পুরী অথবা বিন্ধ্যাচল—অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে গিয়েছেন তাঁরা এ সম্বন্ধে অনুরূপ উপভোগ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন। বিকালবেলা অবসর-বিনোদনের এটা একটা প্রকৃষ্ট স্থান।

চীনা মন্দিরের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য

পেনাংয়ের তিনদিকে ভূমি থাকায় পোতাশ্রয় হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট। এইজন্যই পেনাং পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ব'লে পরিগণিত। অবশ্য সিঙ্গাপুরের উন্নতির সঙ্গে পেনাংয়ের বন্দর হিসাবে গুরুত্ব অনেক ক'মে গিয়েছে, তা হ'লেও কি ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবে কি লোকসংখ্যায় পেনাং সিঙ্গাপুরের নীচেই।

মালয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই; কাজেই মালয়ের উচ্চ চাকরীর ছাড়পত্র—ব্রিটিশ ডিগ্রি। ভারতীয় ডিগ্রি এখানে অনুমোদিত নয়। মালয়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

'পেনাং 'ফ্রি স্কুলের' স্থান উচ্চে। এই স্কুলে মালাই, চীনা এবং ভারতীয় ছাত্র শিক্ষালাভ করছে। পেনাং ফ্রি স্কুল ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলের মডেলে গঠিত।

ব্রিটিশ মালয়ের পোলিটিক্যাল ভাগ তিনটি। প্রথম, ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্ট—এর অন্তর্ভুক্ত হ'চ্ছে সিঙ্গাপুর, পেনাং, ওয়েলেসলি প্রদেশ, ডিণ্ডিং এবং মালাক্কা। দ্বিতীয়, ফেডারেটেড মালয় ষ্টেট্স—এর অন্তর্গত পেরা, সিলানগর, পাহাং এবং নেগ্রি সেম্বিলান। তৃতীয়, আন্‌ফেডারেটেড মালয় ষ্টেট্স্—এর ভিতর জহর, কেদা, পার্লিস, কেলান্তান এবং ট্রেনগনু রাজ্য। এই তিনটির শাসনপ্রণালীর মোটামুটি পার্থক্য এই:—প্রথম বিভাগ ইংরাজশাসিত উপত্যকার টিনের খনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী। তা ছাড়া রবারের চাষের জন্য এই সমস্ত ষ্টেটের বহু জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে ইদানীং। রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে রবার এষ্টেট এবং টিনখনির যানবাহনের জন্য। তা সত্ত্বেও মালয়ে এখনও এমন ভীষণ জঙ্গল আছে—যে, মোটরে ৩০।৪০ মাইল চ'লে যান, তবু—জনমানবের চিহ্নমাত্র পাবেন না।

আজকাল টিন ও রবারের বাজার এতো প'ড়ে গেছে যে মালয়ব্যাপী হাহাকার উঠেছে। মালয়ের সমস্ত ব্যবসাই এর সাথে প'ড়ে গেছে। দিনের পর দিন টিনের খনিগুলি একে একে লালবাতি জ্বালছে। রবারের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। এই ত সেদিন 'ট্যাপিং হলিডে' গেল বাজারকে তুলবার

সমুদ্রতীরে সুন্দর সুপারি ও নারিকেল-বীথি

ঠিক ব্রিটিশ ভারতের মতো, এর রাজধানী সিঙ্গাপুরে। দ্বিতীয় বিভাগ চারটি দেশী রাষ্ট্রের সঙ্ঘ—এদের সংবেত রাজধানী কুয়ালালামপুর। আমাদের সাইমন কমিশন অনেকটা ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটের মতো ভারতীয় দেশী রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়বার আভাষ দিয়েছে। 'এফ এম-এস্'-এ একটা কাঠপুত্তলিকার মতো ফেডারাল কাউন্সিল থাকলেও ইংরাজের উপদেশ, নির্দ্দেশ এবং ইচ্ছামত শাসন চলছে। প্রত্যেক ষ্টেটে ভারতের মতো এজেণ্টই সর্ব্বশক্তিমান। আনফেডারেটেড মালয় ষ্টেটে ইংরাজের শাসন ততখানি প্রত্যক্ষ নয়; তার কারণ বোধ হয় এগুলি অনুন্নত এবং গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত—রাজস্বের ততটা উপযোগী নয়। 'এফ এম-এস্'-এর উন্নতি টিন এবং রবারের জন্য। কিন্টা জন্য, কিন্তু টিন রবার এতো বেশী তৈরী হ'চ্ছে যে এ ব্যবসায়ের আশু উন্নতির কোন আশাই বিশেষজ্ঞেরা দেখতে পাচ্ছেন না। যবদ্বীপ ও সিংহলে রবারের অবস্থাও ওই একই প্রকার।

এর ফলে মালয়ে ভীষণ বেকারসমস্যা উপস্থিত। রবার এষ্টেটের শ্রমিক প্রায় সবই ভারতীয়—তামিল এবং মালাবারী। টিন-খনিতে ভারতীয় শ্রমিক এক-তৃতীয়াংশ, কাজেই ভারতীয় শ্রমিকেরা আজ বড়ই দুরবস্থায় পতিত। অনেকেরই দু'বেলা অন্ন জোটা কষ্টকর হ'য়ে উঠেছে। যদিও ভারতীয় এবং চীনের নতুন শ্রমিক আমদানী বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, তবু এতে বেকারসমস্যা সমাধানের কিছুই হবে না।

মালয়ের অধিকাংশ ষ্টেট রবার ও টিনের ওপর যে রপ্তানি-শুল্ক তা বাজারদর হিসাবে Sliding scale-এ নিরূপিত হয়, কাজেই গভর্ণমেণ্টের অবস্থাও আর্থিক হিসাবে বড় কাহিল।

মালয়ে বাঙালীর সংখ্যা খুব কম। আমরা প্রথমে এখানে এসে শুনেছিলাম বাঙালী শ্রমিক এখানে অনেক। বাস্তবিক তখন একটু আশ্চর্য্য যে হইনি তা নয়—কারণ বাঙালী যে শারীরিক পরিশ্রম করতে এখানে আসবে এ স্বপ্নাতীত। কলকাতায় থাকতে এক মিস্ত্রিকে বলেছিলাম—'এ কারখানায় ত বাঙালী কুলি মোটেই দেখিনা?' এর উত্তরে সে বলেছিল—বাঙালী কি কখনও কুলি হয় বাবু? বাঙালীর প্রাণ যায় তবু মোট মাথায় তুলবে না—তাদের রোজগারের উপায় মাথা এবং হাতের নিপুণতা। বাস্তবিক মিস্ত্রিটি বাঙালী-বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দিল।

মালয়ে শিখ শ্রমিকের সংখ্যা বড় কম নয়। শিখজাতি পৃথিবীর বহু স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে। মালয়ে শিখরা বাঙালী ব'লে আত্মপরিচয় দেয়। এর কারণ বোধ হয় এরা কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে ব'লে। প্রকৃত বাঙালীর সংখ্যা খুব কম; দু'চারজন ব্যারিষ্টার সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুরে আছেন। কিছু কিছু ডাক্তার রবার-বাগানে কাজ করেন—তার ঠিক সংখ্যা বলা মুস্কিল। দু'একজন স্কুলমাষ্টার, পোষ্ট আফিসের কেরাণীও দেখা যায়। কিন্তু সংখ্যা একত্রে বোধহয় আঙুলে গণা যায়। ভারতীয় এম্-বি ডিগ্রি একমাত্র এখানে অনুমোদিত; কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীন-ব্যবসায়ী বাঙালী ডাক্তারের সংখ্যা নাই বললেই চলে। বাঙালী যে কেন বিদেশে আসতে এতো পরাঙ্মুখ বলা মুস্কিল। কেরাণীগিরি করছে তামিল মালাবারী সিংহলিরা। বাংলার অন্নসমস্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে কম নয়, একটা কারণ বোধ হয় বাঙালীর ভিটের মায়া এবং মিশবার ক্ষমতার অভাব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেখেছি বাঙালী বাইরে গিয়ে স্থানীয় লোকের সাথে মিশতে পারে না। সঙ্গছাড়া মানুষ থাকতে পারে না সত্য কিন্তু বাঙালীর পক্ষে বাঙালীর সঙ্গ একেবারে যেন অপরিহার্য্য। দল বেঁধে না গেলে এমিগ্রেশন সফল হয় না। দল ছাড়া গেলে নৈতিক অবনতিও শীঘ্র হওয়ার সম্ভাবনা।

যতদিন নারীরা এমিগ্রেশনে যোগ না দেন, ততদিন বিদেশ-গমন হয় স্বল্পকালস্থায়ী। এজন্য বোধ করি যেসব বাঙালী পূর্ব্বে গিয়েছিলেন তাঁরা দেশে ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর সংখ্যা ক'মে গিয়েছে, এবং তাঁদের কর্ম্ম—যারা স্থায়ীভাবে থাকতে ইচ্ছুক সেই তামিল মালাবারীদের হাতে গিয়ে পড়েছে।

পেনাং থেকে প্রধান উপদ্বীপে যেতে ষ্টীমারে পার হ'তে হয়। F.M.S.R.-এর ষ্টীমার প্রায় ২০ মিনিটে প্রণালী পার ক'রে প্রাইতে পৌঁছে দেয়। রেলকোম্পানীর কুলিই বিনা-ভাড়ায় যাত্রীদের মাল সব ষ্টীমার থেকে ট্রেনে চাপিয়ে দেয়। প্রাই থেকে রেলে সিঙ্গাপুরে যেতে ২৪ ঘণ্টা লাগে। এখান থেকে শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক যাওয়া যায় বরাবর ট্রেনে। ব্যাঙ্কক পেনাং থেকে ৩২ ঘণ্টার রাস্তা। যারা জাপান বা আমেরিকায় যেতে চান পেনাং থেকে রেলে ও মোটরে সেখানে গিয়ে জাহাজে চাপতে পারেন। পেনাং পেডাংবেসার পর্য্যন্ত F. M. S. R; তারপর Royal State Railway of Siam-এর আরম্ভ। শ্বেতহস্তী এবং বুদ্ধ উপাসকের রাজ্য শ্যামে দেখবার প্রচুর উপাদান আছে শুনতে পাই।

এবার মালাইদের কথা বলা যাক্। মালাইরা সব মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে আরবেরা এসে মালাক্কা অধিকার করে এবং ক্রমে সমস্ত উপদ্বীপ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বে এরা হিন্দু ছিল। আমাদের এখনও বৃহত্তর বাংলার ইতিহাস রচনা হয়নি; যেদিন এ ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হবে সেদিন বাঙালীর শৌর্য্যবীর্য্যের এক নতুন অধ্যায় খুলে যাবে। এর জন্য প্রয়োজন প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের প্রাণপাত পরিশ্রম। বাংলার ইতিহাসের অনেক প্রমাণই মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ বালীতে ছড়ান রয়েছে। মালয়ের ভাষা এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ এখনও মুছে যায় নি।

মালাইদের অবয়ব মঙ্গোলিয়ান ছাঁচে ঢালাই। এদের গায়ের রঙ বাদামী—যদিও ফরসা এবং কালো রং দুষ্প্রাপ্য নয়। এদের মুখের বিশেষত্ব—গণ্ডের হাড় একটু উঁচু। এককালে ফিলিপাইনের ইটাশ জাতি এখানে বসবাস

করেছিল। ইন্দোচীনের সাকাই ও মন্ন জাতির অস্তিত্বও এখানে পাওয়া যায়। শ্যামের শামশামরা এখানে এক-কালে বসতি স্থাপন করে। সুমাত্রার পালেম্বাং বংশ এবং মেনানকাবু জাতি মালয়ে পর-পর সাম্রাজ্য স্থাপন করে। মেনানকাবুর বংশধরদের মধ্যে মাতৃতন্ত্রমূলক আচার-ব্যবহার এখনও প্রচলিত। এরা এখনও নারীকেই পরিবারের কর্ত্তা বলে' মনে করে।

মালাইরা বেশ সৌখিন এবং আরামপ্রিয়। মালাই গ্রামে গেলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকেই বাড়ীর চারিধারে সুদৃশ্য ফুলের বাগান করে। মালাই বাড়ী কতকগুলি খুঁটির ওপর কাঠ দিয়ে তৈরী; এর কারণ বারমাসই খুব বৃষ্টি হয় ব'লে। এদের বেশভূষাও বেশ সুন্দর। রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে কাপড় পছন্দ করবার ক্ষমতায় অন্যান্য দেশের সভ্যতরা ভগিনীদের চেয়ে এদেশের মেয়েরা কম যায় না। মেয়েরা গায়ে আজানুলম্বিত জামা পরে—যা সামনের দিকে কাটা। মুখশ্রী মধুর করবার জন্য এরা সুন্দর ওড়না পরে, কিন্তু আমাদের দেশের মুসলমানদের মতো এদের এখানে ওড়না পর্দ্দাগ্যাস সৃষ্টি করে না। এদের পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

মালাই পুরুষেরা সাধারণতঃ রঙীন লুঙ্গি পরে। যাদের অবস্থা স্বচ্ছল তারা ঢিলা পায়জামার উপর সুন্দর চাদর প্যাঁচ দিয়ে পরে। গায়ে একটা ঢিলা জামা—এরা একে 'বাজু' বলে। এই এদের জাতীয় পরিচ্ছদ। সমস্ত পোষাক বেশ ঢিলা এবং বিচিত্র ভাঁজে আর্টিষ্টিক রূপ দেয়। সাধারণতঃ এরা রঙীন জিনিষই পছন্দ করে। অবশ্য আজকাল ইংরাজী-সভ্যতার প্রসারের ফলে পুরুষেরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করছে—তাহ'লেও সমাজে জাতীয় পোষাকেরই আদর।

এদেশের সাধারণের স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ। তার কারণ ম্যালেরিয়া অখণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করছে। অধিকাংশ লোকেরই মুখশ্রী ফ্যাকাশে এবং বাঙালীর মতোই পেটভরা পিলে। অন্যান্য রোগের তেমন প্রধান্য নেই—কিন্তু এক ম্যালেরিয়াই জীবনীশক্তি হরণ করবার জন্য যথেষ্ট।

সাধারণ মালাইদের কর্ম্মক্ষেত্র—চাষবাস। ধান, কলা, নারকেল এদের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য। এরা ভারতীয়ের চেয়েও কর্ম্মশক্তিহীন,—দেশের কোনো ব্যবসাতেই এদের অংশ নেই। দেশকে ভারতীয় ও চীনা শ্রমিক উন্নত করছে। সহরে মালাই একপ্রকার দেখা পাওয়া দুর্ঘট!

মালয়ের জলবায়ু বেশ ভিজে, কাজেই তাপবৈষম্য দিবারাত্রিতে বড়ই কম। বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ঋতু-বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে। বর্ষা এখানকার একমাত্র প্রবল ঋতু। সমুদ্রের মৃদু হাওয়া পূর্ব্ব বা পশ্চিম উপকূল থেকে সকল সময়ই পাওয়া যায়—কাজেই শীত-গ্রীষ্মের পার্থক্য বোঝা দুষ্কর। বর্ষাস্নাত ও প্রচুর সূর্য্যালোকিত এই দেশের তরুলতা বারমাস কী অজস্র আনন্দে নয়নস্নিগ্ধকর রূপ ধরে রয়েছে! পেনাং শ্যামল সৌন্দর্য্যের লীলাভূমির প্রবেশ-তোরণ সাজিয়ে ভ্রমণপিয়াসী নরনারীকে আহ্বান পাঠাচ্ছে। দেশের মাটি ছাড়বার সময় ভেবেছিলাম সোনার বাংলার স্বর্ণসিন্দুরের চেয়ে বর্ণের আর কি গরিমা থাকতে পারে? বাংলার মতো সোনার কমল এবং সোনার ফসল এরাজ্যে না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান এরাজ্যে ব'সে সারা বছর উপভোগ করা যায়। কবির মানসী প্রতিমার কাজল-চোখের অঞ্জন এই মালয় দেশ!

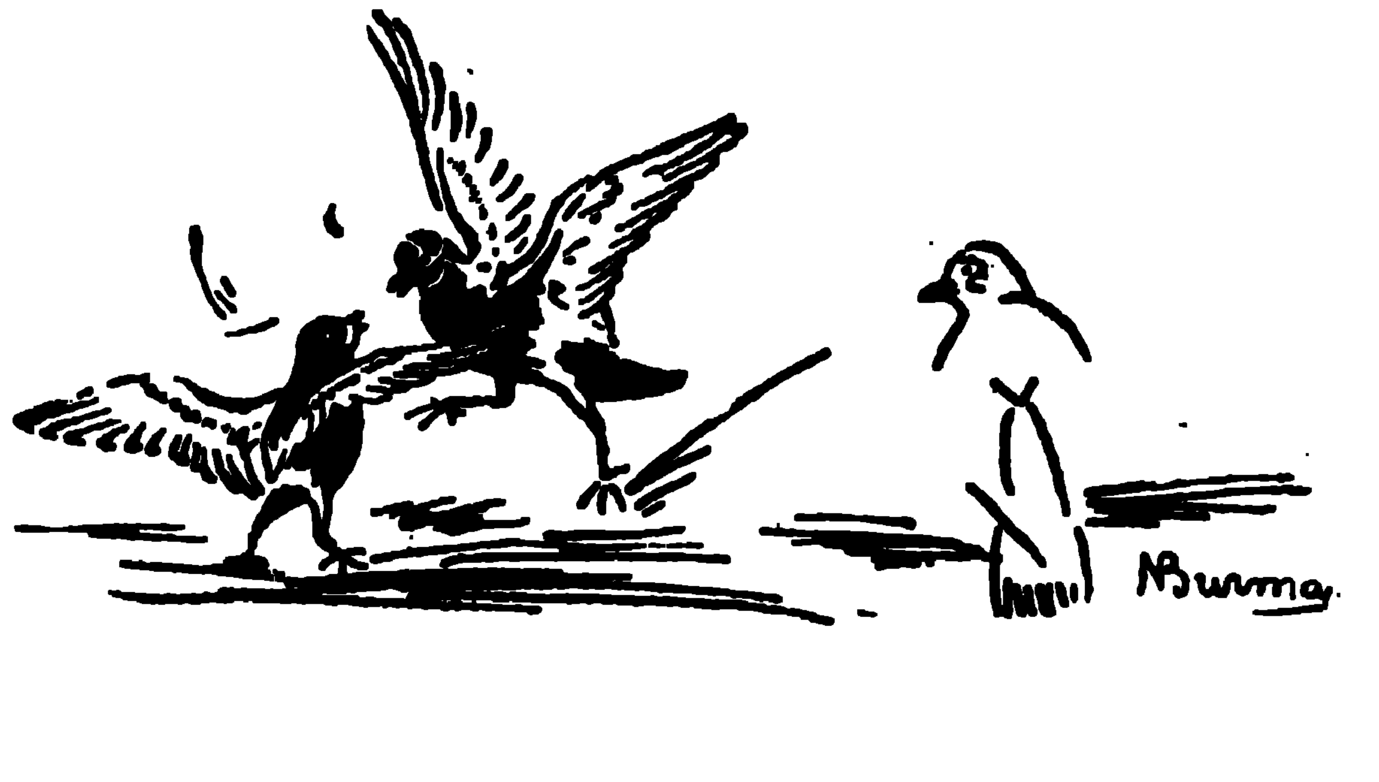

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(২৩)

হরমোহন বাবুর সহিত কথা বলা খোলামাঠে পরিষ্কার হাওয়া খাওয়ার মত তৃপ্তিকর। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া তিনি সর্ব্বদা এমন এক উচ্চভূমিতে বিচরণ করেন—যেখান হইতে পৃথিবীর আদর্শের সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি অভাব-অভিযোগের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য তাঁহার চোখে পড়ে।

ছোট ছোট ভাবনা-মানুষের মনকে যাহা পীড়িত করে,—তাঁহার মুখের সরল প্রসন্ন হাসি দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন তাহা হইতে মুক্ত।

হরমোহন বাবুকে যখন সঞ্জীব ও ইন্দুলেখা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—তখন তাঁহার নিমীলিত চক্ষুতে আনন্দাশ্রু বহিতেছে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাস্যে তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে সঞ্জীব, তা' আমি বোঝাতে পারছি না! ইন্দু,—আমাকে ছেড়ে যে তুই চ'লে যাবি, আমার দশা হবে কি? আর আমার ফাই-ফরমাসই বা খাট্‌বে কে!"

ইন্দু লজ্জিত হইয়া মৃদু হাসিল। তাহার মনে পড়িল, হরমোহন বাবু প্রথম-যৌবনে তাহার বাল্যসখী দীপালিকে ভালোবাসিয়াছিলেন, মেয়েটিও তাঁহাকে অবহেলা করিত না।

আশা ছিল হয়ত একদিন· কিন্তু মানুষের আশা ভগবানের ইচ্ছার কাছে কিছুই না। মেয়েটির মৃত্যু হইল। হরমোহন বাবুকে অনেকে ভালবাসিত কিন্তু তিনি তাঁহার একটি ভালবাসাকে পাত্রান্তরিত করিতে পারিলেন না। তবে তিনি বিধাতার এই বিধানের বিপক্ষে কোনোদিন অভিযোগ করিতেন না; বলিতেন, "তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য বোধহয় আমার জীবনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই সার্থক হ'য়ে উঠতে চায়।" যে প্রেম তাঁহার জীবনে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল—তাহা ক্রমে তিনি বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন!

বলিলেন, "সঞ্জীব, তুমি তাহ'লে তোমার বাবাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দাও, তাঁর একটা মত নেওয়াও ত দরকার?"

সঞ্জীব বলিল, "আমি বাবাকে একখানা চিঠি লেখেছিলাম, কিন্তু তিনি তার ভালমন্দ কিছুই জবাব দেননি। আমার ভয় হয়, আমার এ বিয়েতে তাঁর কোনো মত বা সহানুভূতি পাব না—!"

হরমোহন বাবু বলিলেন, "তুমি একটা কথা ভেবে দেখ্‌তে ভুলে গিয়েছ। সংস্কৃতে একটা প্রাচীন প্রবাদ-বচন আছে। মনস্তত্ত্ব হিসাবে তার মূল্য বড় কম নয়, এ অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। সেটা হ'চ্ছে "মৌনম্ সম্মতি লক্ষণম্!" বলিয়া তিনি হাহা করিয়া শিশুর মত সরল হাসি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার সে হাসির ঢেউ সঞ্জীবের এবং ইন্দুলেখার মনের কূলে আসিয়া আঘাত করিল—তাহাদের বিরস মনেও খানিকক্ষণের জন্য সরস হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

তবুও সঞ্জীব প্রসন্ন হইতে পারিল না, সে বিষণ্ণ হইয়া, উদ্বিগ্নভাবে হরমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি আমি বাবার মত না পাই, আশা করি, আপনি আমাদের মিলনে আপত্তি করবেন না। আসছে বছর আমাদের এগ্‌জামিন শেষ হ'য়ে যাবে তখন আমরা স্বাধীনভাবে জীবন আরম্ভ করতে পারব।"

এ প্রশ্নের উত্তরে হরমোহন বাবু কি বলেন শুনিবার জন্য সঞ্জীব উদগ্রীব হইয়া রহিল। খানিকক্ষণ ঘরটা এমন চুপ হইয়া গেল, যে, মনোযোগ করিয়া শুনিলে সকলের নিশ্বাস পর্য্যন্ত শোনা যাইত! ইন্দুলেখা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া এমনভাবে দাদার মুখের পানে তাকাইয়া ছিল, যেন এই কথাটির উপরে তাহার সব নির্ভর করিতেছে।

খানিকক্ষণ নতনেত্রে ভাবিয়া হরমোহন বাবু মুখ তুলিলেন, তিনি বলিলেন, "সে বুঝ তোমাদের উপর। তোমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার আমার কোনো অধিকার নেই।"

টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইল—আর এক সপ্তাহ পরে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।

জনশূন্য ক্যালকাটা রোড বাহিয়া সেদিন তাহারা অপরাহ্নবেলায় দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ইন্দু বলিল, "চল, আজ জলাপাহাড়ের দিকে ওঠা যাক্। বেশী লোকজনের বাস নেই, বেশ নির্জ্জন।"

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার—বাতাসটা সে রকম ঠাণ্ডা নয় ত! পথের ধারের বাড়ীগুলি যেন ছবির মত! বাড়ী-সংলগ্ন বাগানগুলি গোলাপফুলে আলো করিয়া আছে! পপ্‌লার গাছের বীথিকায় পথে সঞ্জীব বলিল, "ইন্দু, তোমার মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে, তুমি শ্রান্ত হয়েছ; আর উঠে কাজ নেই - এস এই বেঞ্চটায় বসা যাক।"

উভয়ের মন আজ বিশ্বেশ্বরী ও ভবতোষ বাবুর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহারা টেলিগ্রাম পাইয়া কি বলেন কি করেন উদ্বিগ্নচিত্তে উভয়ে তারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। বেঞ্চে বসিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাহারা বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে ইন্দুলেখা বলিল, "বাবা-মা যদি না আসেন, বিবাহে আশীর্ব্বাদ না করেন, তবে বিবাহ না হওয়াই ভাল। আমি ভাবছি, পরীক্ষা শেষ ক'রে তাহ'লে কোন দূর দেশে গিয়ে জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করব। বাবা-মার দীর্ঘ-নিশ্বাস অভিশাপের মত সারাজীবন বহন করতে পারব না—"

সঞ্জীব গভীর বেদনার স্বরে বলিয়া উঠিল, "সে কি ইন্দু! এও কি সম্ভব! আমি যে তা হ'লে একেবারেই উন্মাদ হ'য়ে যাব—জীবনের সকল সূত্র একসঙ্গে ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে আমি বিভ্রান্তির চরম সীমায় পৌঁছাব।"

ইন্দুলেখা দেখিল এতটা গভীর করিয়া কোন কিছুকে ভাবিতে সঞ্জীব অক্ষম—এত বড় দুঃখের ভার গ্রহণ করিতে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে—তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "অনুমানে কাল্পনিক দুঃখ সৃষ্টি ক'রে লাভ নাই; সত্য সম্মুখে উপস্থিত হ'লে তখন কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। চলুন,—একটু ম্যালে বেড়িয়ে আমরা বাড়ী ফিরি।"

ম্যালে আসিয়া পাঁচজনের মুখ দেখিয়া উভয়েরই মন একটু প্রফুল্ল হইল। এদিক ওদিক একটু বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য কিছু দ্রুতগতিতে সেদিন উহারা নীচে নামিতে লাগিল।

বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পৌঁছিয়া দেখিল ভবতোষ বাবু এবং বিশ্বেশ্বরী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। টেলিগ্রামে ঠিকানা দেওয়া ছিল—তাঁহারা সেই বাসায় গিয়া উঠিয়াছেন। এই সম্মানিত অতিথিদের সুখ-সুবিধার জন্য বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় নির্ব্বিরোধী হরমোহন বাবু মহা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সঞ্জীব ও ইন্দুকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া তিনি একটু আশ্বস্ত হইলেন, "এই যে সঞ্জীব ফিরেছ। তোমার বাবা, মা সব এসেছেন যে! তাঁরা যদি আসবার সময় সংবাদ দিয়ে ষ্টেশনে থাক্‌বার জন্যে টেলিগ্রাম ক'রে দেন তাহ'লে আর উঁদের এত হাঙ্গাম পোয়াতে হ'ত না। বড় কষ্ট হয়েছে!" বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

এই সম্মানিত অতিথিদের আকস্মিক আবির্ভাবে তিনি এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, যে, কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। সঞ্জীব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

হরমোহন হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্তমনে আবার তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিলেন। দাদার দশা দেখিয়া ইন্দুলেখার বড় হাসি পাইয়াছিল; সে মুখ ফিরাইয়া মৃদু-হাসি গোপন করিল। আবার—তাহার অবর্ত্তমানে এই শিশু-প্রকৃতি প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির কি অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করিয়া করুণায় তাহার আঁখি ছলছল করিতে লাগিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উদগতপ্রায় অশ্রু দমন করিল।

ইন্দুকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সঞ্জীব ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বাবাকে ও মাকে প্রণাম করিল এবং অপরাধী পুত্রের মত কাঁচুমাচুমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ভবতোষ বাবু রাশভারি লোক। চিঠিপত্রে যে কথাগুলি সঞ্জীব সহজে তাঁহাকে লিখিতে পারিয়াছিল, এখন তাহার পুনরাবৃত্তি করা

সঞ্জীবের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ভবতোষ বাবু প্রশান্ত মৃদুহাস্তে বলিলেন,"কই,আমার বৌমাকে দেখতে পাচ্ছিনে ত ? তাঁকে ডাক। আমার আশীর্ব্বাদ করা বাকী রয়েছে যে!"

সঞ্জীব বিস্ময়ে ও আনন্দে অবাক হইয়া গেল। ইন্দুলেখা বাহিরে দাঁড়াইয়া স্পন্দনহীন বুকে কান পাতিয়া পিতাপুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে এইবার ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া নিজেই ভিতরে প্রবেশ করিল।

ইন্দুলেখা ভবতোষ বাবুকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবার পর, বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ভবতোষ বাবু এক মুহূর্ত্ত ইন্দুর মুখের পানে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাইলেন, তারপরে তাঁহার দৃষ্টিও কোমল হইয়া আসিল; তিনি বলিলেন, "এই নাও মা তোমার আশীর্ব্বাদী—" বলিয়া পকেট হইতে চামড়ার কেসে ভরা এক-জোড়া জড়োয়া এয়ারিং বাহির করিয়া ইন্দুর হাতে দিলেন, ও দু'জনের মাথায় দুই হাত রাখিয়া বলিলেন, "মা ইন্দু! বাবা সঞ্জীব! তোমরা যে পরস্পরকে জীবনের দোসর রূপে বেছে নিয়েছ, কোনো বাধাবিঘ্ন মতামতের অপেক্ষা রাখনি, এতে তোমাদের মনের দৃঢ়তারই পরিচয় দিয়েছ। আমি এতে রাগ করিনি—এতে আমি খুসী হয়েছি। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি, পরস্পরের প্রতি তোমাদের এ মনোভাব সংসারের শত দুঃখ-কষ্ট অভাব-অশান্তির মধ্যেও যেন চির-কাল অবিচলিত থাকে। বৌমা! আমি তোমার দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে যাই। সংসারের মধ্যে ডুবে থাকলেও তোমার দাদার মত সঙ্গী পেলে, ভেসে বেড়াবার সে পুরানো অভ্যাস ছাড়তে পারি না।" বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে লাইব্রেরী-ঘরের অভিমুখে হরমোহনের কাছে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বেশ্বরী এতক্ষণ পরিপূর্ণ স্নেহের দৃষ্টিতে ইন্দুলেখার লজ্জিত আনত মুখখানির পানে অনিমেষ আঁখিতে তাকাইয়া ছিলেন।

হেলিওট্রোপ রংয়ের শাড়ীপরা, ইন্দুলেখার লজ্জা-আনন্দ-আভামণ্ডিত আনম্র মুখের মঙ্গল-শ্রীটুকু তাঁহাকে ধীরে ধীরে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল।

সঞ্জীব বিশ্বেশ্বরীর একমাত্র সন্তান, যে সন্তান মা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না। কেমন করিয়া এই মেয়েটি হঠাৎ আসিয়া এই কয়দিনে তাহাকে এমন আপন করিয়া লইয়াছে যে তাহার জন্য সঞ্জীব এতদিনের সম্বন্ধের সমস্ত স্নেহ-যত্নের বাঁধন কাটাইয়া পর হইয়া যাইতেও রাজি! ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী আসিলে, সমস্ত মেয়ের মনে যে সহজ ঈর্ষা অধিকার করে, ক্ষণিকের জন্য তাহা বিশ্বেশ্বরীর কাছে ইন্দুলেখাকে বধূরূপে মনের মধ্যে বরণ করিয়া লইতে বাধা দিতেছিল, কিন্তু যখন ইন্দু তাঁহার পদধূলি লইতে গিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদের আশায় তাঁহার পদতলে আপনাকে লুটাইয়া দিল, এবং সঞ্জীব মা'র বাহু ধরিয়া কোলের কাছে দাঁড়াইয়া সেই পুরানো দিনকার ছেলেটির মত আবদার-মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে, নীরব অনুরোধের চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইন্দুকে উঠাইয়া তাহার মাথাটি বুকে চাপিলেন ও চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন,—ধরিয়া মনে হইল, কিছুদিন আগে তিনি যেমন শেফালির মধ্যে তাঁহার মৃতা কন্যা অনীতার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছিলেন,—এও যেন অবিকল তাই!

যে প্রিয় চলিয়া যায়, সে কেবল কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহাই যেন শিখাইয়া যায়,—কাহারো মুখে ত প্রতিচ্ছবি রাখিয়া যায় না! কিন্তু মনের মধ্যে যে অমল দীপশিখা জ্বালিয়া যায় তাহা অনন্তকালের। সেই অনির্ব্বাণ দীপের আলোকে যাহাকে দেখি তাহাকেই সে-ই বলিয়া ভ্রম হয়,—না ভ্রম নয়, সেই আমাদের সত্য দৃষ্টি!

চিবুক হইতে হাত নামাইয়া বিশ্বেশ্বরী তাহা চুম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৌ মা, তুমি আমার এই-ধারে এসে দাঁড়াও—" বলিয়া শ্বশুরের দেওয়া এয়ারিং জোড়াটি ইন্দুর হাত হইতে লইয়া তাহার কানে পরাইয়া দিলেন, এবং ডান হাতে ছেলে ও বাম হাতে বৌকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "সঞ্জীব, তুমি এতদিন একলা ছিলে—আমার সমস্ত স্নেহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী। আজ আমার বৌমা এসে তার অর্দ্ধেক অধিকার ক'রে নিলে। সে ভালই হয়েছে! আর তুমিও তোমার অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে বোধ হয় রাজি আছ?" সঞ্জীব হাসিয়া বলিল, "বা! তা হবে কেন? আমার হ'চ্ছে জন্মগত

অধিকার ;—আর ইন্দুকে সে অধিকার অর্জ্জন ক'রে নিতে হবে। আমি আমার অধিকারের দাবী-দাওয়া সহজে ছাড়্‌ব কেন মা ?" ইন্দুলেখা নম্রভাবে মৃদু হাসিয়া চুপি-চুপি বলিল, "মা, আমাকে উনি ভয় দেখাচ্ছেন! কিন্তু আমার অধিকার দাবী করতে আমি কারো ওকালতি চাইনে। আপনাদের চরণসেবা ক'রে আমি তা অর্জ্জন ক'রে নেব! আজ থেকে আমি আপনাদের দাসী হলাম—" সঞ্জীব মনে মনে ভাবিতেছিল, ইন্দু কথাগুলি কেমন গুছাইয়া সহজভাবে বলিতেছে। ও কি মন জয় করিবার যাদু জানে? অন্য কেহ বলিলে ইন্দুর কথাগুলি নাটুকে বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে ও বলার ধরণে সব মানাইয়া যাইতেছে!

ব্রাহ্ম মেয়ে সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরীর জন্মগত ধারণা এক-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এমনি মানুষের মন! তিনি চমৎকৃত হইয়া, তাহার ললাটে স্নেহচুম্বন দিয়া, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বালাই! তুমি আমাদের দাসী হ'তে যাবে কেন? তুমি আমাদের হারিয়ে-ফিরে-পাওয়া মেয়ে···" বলিয়া তিনি তাহাকে সস্নেহ আবেগে বুকে টানিয়া লইলেন।

ক্রমশঃ

নারী

শ্রী সুকুমার সরকার

নারীর নয়নে যে পাবক জ্বলে গাহি তারি স্তবগান—
যুগে যুগে আর কালে কালে টানে মুগ্ধ বিশ্বপ্রাণ।
কালো চোখে তার কি স্বপন বোনা—
অপরূপ মায়া-রূপের মোহানা ;
সুন্দর তারি স্বর্ণ-সায়রে অবগাহি' করে স্নান!

আকাশে বাতাসে শ্যামলে সুনীলে নারীর নিগূঢ় মায়া
রূপের লক্ষ ইন্দ্রধনুতে লভিছে লোভন কায়া।
তারি আঁখি হ'তে হরিয়া নীলিমা
আকাশ পেয়েছে নীল মধুরিমা,
শ্যামায়মান যে তৃণ-লতা-প্রাণ লভিয়া পদ্ম ছায়া!

বসন্ত তার মলয় লভেছে নারীর নিশাস পিয়া,
প্রথম পুষ্প ফুটায়েছে নারী তার রাঙা হাসি দিয়া।
আদি-সৃজনের যে প্রথম বাণী
তারে রমণীর নারী ব'লে জানি,
অরূপ অলখে প্রথম রূপের উল্লাস উছসিয়া!

নারী-কণ্ঠের কলকাকলীতে প্রথম বাজিল বাঁশী,
নারী বাহু-ডোর গড়িল প্রথম জীবনের ফুল-ফাঁসি!
তারি সে পরশ শিহর লহরী
প্রথম ছন্দ হ'য়ে ওঠে ভরি',
পঞ্চশরের ফুলশরে দিলো নিজেরে সে পরকাশি।'

প্রথম বিরহ ব্যথিয়ে উঠিছে নারীর নয়ন জলে,
প্রথম সোহাগ ব্রীড়ান্বিত তার রাঙা কপোলের তলে!
প্রথম স্নেহের সুমধুর সুধা
ঢালিল নারীর হৃদয়-বসুধা,
মহামানবের জীবন প্রথম তারি মাঝে কথা বলে!

প্রথম আলোর প্রভাত এনেছে নারীর বর্ণ-রবি,
কালো কেশভার আদিম নিশার সুনিবিড়তম ছবি!
বিধাতা তাহার জীবন সায়রে
হাসি-কান্নায় উৎসব করে,
নারীর প্রতিমা গড়িতে সে যেন অজানিতে হোলো কবি!

অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী

শ্রীমতী কে, ভি, অনন্তরামন

ইনি সম্প্রতি-সংঘটিত 'মহীশূর রাজ্য মহিলা মহা-সম্মিলনী'র অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, লোককল্যাণ প্রভৃতি এই সম্মিলনীর মুখ্য লক্ষ্য ছিল।

বায়ু-বিশেষজ্ঞা

ইনি প্রথম ভারতীয় হিন্দুমহিলা, যিনি প্রথম শ্রেণীর ("A" class) 'বিমান-পরিচালন অনুমোদনী' (Pilot's

শ্রীমতী উর্ম্মিলা পারেখ

license) লাভ করিয়াছেন। ছবিতে ইঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন—মেজর ভেচ্, ইঁহার বিমান-শিক্ষক (Instructor)।

লক্ষ্যভেদ-প্রতিযোগিতা

কানাস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের (আমেরিকা) উদ্যোগে এই আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়িক লক্ষ্যভেদ-প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইয়াছিল এবং জনৈক সৈনিক-বিশেষজ্ঞ ইহা পরিচালিত করিয়াছিলেন —যিনি পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন।

মেয়েরা লক্ষ্যভেদে উদ্যত হইয়াছেন

পক্ষাশ্রয়ী শাবক

শ্রী উষারাণী দেবী

লেক রোডের ধারে সুন্দর একখানি বাড়ী। প্রকাণ্ড বাড়ী, পরিচ্ছন্ন বাগান, পাশে মোটারের আস্তানা—সবগুলি এক হ'য়ে সকলকে মালিকের অগাধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় অনুক্ষণ জানিয়ে দিচ্ছিল।

গভীর রাত—পথ নির্জ্জন। পল্লী নিঃশব্দ; শুধু মাঝে মাঝে পথের কুকুরগুলা ডেকে উঠে আধ-জাগা লোকের মনে একটা আতঙ্ক এনে দিচ্ছে।

বড় বাড়ীটার সবগুলি আলো অনেকক্ষণ নিবে গ্যাছে। শুধু দোতালার ছাতের পাশে ছোট ঘরটার বাতি একবার একবার জ্ব'লে উঠে আবার তখনি নিবে যাচ্ছে। ঘরের ভিতর একখানি তক্তপোষের ওপর একটি ষোল-সতের বছরের ছেলে রোগবিবর্ণ মুখে শুয়ে আছে। পাশে ব'সে মা ছেলের জ্বরতপ্ত কপালে মাঝে মাঝে ভিজে হাত বুলিয়ে দিয়ে একখানি হাতপাখা নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস দিচ্ছেন।

ছেলেটি মাঝে মাঝে মাকে একটু শুয়ে পড়তে অনুরোধ করছে। মা আস্তে আস্তে ছেলের মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বলছেন—শুচ্ছি বাবা; তুমি একটু ঘুমোও—আমি শুচ্ছি।

ছেলে অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইল। একটু পরে আবার মিনতির সুরে মাকে বল্লে—ঘুম যে আমার আসছে না মা! রাত যে অনেক হ'লো, কতক্ষণ তুমি ব'সে থাকবে? ভোর হ'লেই তো তোমার সেই খাটুনী আর জেঠাইমার বকুনি আরম্ভ হবে। এইখানেই একটু শোও মা তুমি!

মা একটু ... বললেন—কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ নরু, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না।

নরু তার একটু জোরের সুরে বল্লে—হাঁ মা, কষ্ট তোমার খুব হ'চ্ছে! আমার এই অসুখ হ'য়ে অবধি তো তোমার রাতে ঘুম নেই; দিনে তো সময়ই পাওনা শোবার। কতদিনে যে সারব!...হঠাৎ যেন নরুর কি মনে প'ড়ে গ্যাল, মাকে জিজ্ঞেস করলে—আজ ক' তারিখ

হ'লো মা ? মা আস্তে আস্তে উত্তর করলেন—সাত তারিখ বাবা !

"সাত তারিখ ?—সে কি ! আমার পরীক্ষার আর মাত্র তিন দিন বাকী ? কি হবে মা !"

মা সান্ত্বনার সুরে বললেন—কি আর হবে, কাল তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।

নরু হতাশ ভাবে উত্তর করলে—যদি না ছাড়ে তো কি হবে মা ! . মা কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ছাতের ওপাশের ঘরগুলার সব ক'টা ঘড়ীতে একে একে দুটো বেজে গেল। মা তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের এক-পাশে গিয়ে ছেলের পথ্য ঠিক ক'রে নিয়ে কাছে এসে বললেন—এটা খেয়ে নাও বাবা।

নরু মাথাটা একটু উঁচু ক'রে বার্লিটুকু খেয়ে নিলে। মা এসে আবার শিয়রে বসতে গেলে নরু বাধা দিয়ে বল্লে—না মা, আর তুমি বোস না। তোমার কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারি না !···

মা ছেলের পাশেই একটু শুয়ে পড়লেন। তাঁর হাতের পাখা নিঃশব্দে নড়তেই লাগলো। পাশে শুয়ে ছেলে নিজের রোগযন্ত্রণার চেয়ে মায়ের নিদ্রাহীন সেবায় বেশি কাতর হ'য়ে উঠতে লাগলো। রোগদুর্ব্বল মন তার পরীক্ষা না দিতে পারার কল্পনায় আরো ব্যাকুল হ'য়ে উঠতে লাগলো। আস্তে আস্তে সে ডাকলে—মা ! ..মা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—কেন বাবা ? নরু আস্তে আস্তে বল্লে—আমি কি কোন রকমে এই দু'দিনে ভাল হ'তে পারি না ?

মা উত্তর করলেন—কেন ও সব এখন ভাবছ নরু ! জ্বর যদি আরো বেড়ে যায় ? চুপ ক'রে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করো।

"ঘুম যে আমার আসছেনা মা। যদি পরীক্ষা না দিতে পারি তবে যে আর কোনও উপায় নেই। ম্যাট্রিকটি পাশ করতে পারলেই মাষ্টার মশাই বলেছেন আমায় একটি ইঞ্জি-নিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন। সেখানে প্রথমেই তারা ৩০৲-৪০৲ টাকা ক'রে দেবে। এই আশাতেই তো একটি বছর ধ'রে এদের এত অপমান—তোমার এত কষ্ট সব সহ্য কচ্ছি মা ! যদি না পরীক্ষা দিতে পারি সব যে বৃথা হবে !

মা পাখা দিয়ে ছেলের মাথায় হাওয়া দিতে দিতে বললেন—কি আর হবে বাবা ? কপাল আমাদের মন্দ ; এ বছর যদি না ই দিতে পার, আরও একটা বছর কষ্ট সহ্য করতে হবে।

ছেলে হতাশ ভাবে উত্তর করলে—আমরা না হয় কষ্ট করলুম কিন্তু পড়ার খরচ দেবে কে মনে আছে ? এবার পড়াতেই জেঠাই মা বলেছিলেন বাপ যার পথে বসিয়ে গ্যাছে তার আবার পরের কাছে ভিক্ষা ক'রে পড়া কেন ? এ বছরের বই আর পড়া চলবে না। বই কেনা থেকে আরম্ভ ক'রে সব খরচই আবার লাগবে ; কে দেবে মা !

মা চিন্তাকুল মুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। ছেলে আবার বলতে লাগলো—রাতের মত কম যদি দিনেও থাকতো জ্বরটা তো না সারলেও আমি কোনও ভয় পেতুম না, বেশ লিখতে পারতুম। কিন্তু দিনে যে জ্বরটা বড্ড বাড়ে, মাথার কেমন গোলমাল হ'য়ে যায়। তাই ভয় হ'চ্ছে। যা'ই হোক মা, কাল একসময় তুমি এদের ব'লে মত ক'রে রেখ। যদি জ্বর নাই কমে তবু আমি যাব—শেষ অবধি চেষ্টা ক'রে দেখবো যদি পারি। মাষ্টার মশাইকে ব'লে পাঠিও কারুকে দিয়ে, তিনি যে ক'রে হোক নিয়ে যাবেন আমায়।

আবার সব ঘড়ীগুলায় একে একে চারটে বেজে গেল। শেষরাতের ঠাণ্ডা হাওয়া নরুর সকল ভাবনা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সবভোলান ঘুমের হাতে সঁপে দিল। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তন্দ্রাহারা মা অতল চিন্তাসমুদ্রের মাঝে ডুবে গেলেন।

২

দুপুর প্রায় গড়িয়ে গ্যাছে। বড় লোকের বাড়ী—খেতে একটু দেরিই হয়। বাড়ীর গিন্নী উমাশশী সবার কাছে গল্প করেন—এ কি আর শাক-ভাত যে সাত-সকালেই রান্না শেষ হবে। পাঁচ রকমের পাঁচখানা করতে করতে দেরী হ'য়ে যায়। এই ধর না নরুর মার ঘরেই কোনও দিন সাত আট খানার কম তরকারীই হয় না ! কি ক'রে আর না রাঁধতে দেই বল না ? আমরা পাঁচরকম খাব, আর ও মাছ খাবে না ব'লেই এক তরকারীর

ভাত খাবে এমন অবিবেচনা আমার নয়। হ্যাঁ, খরচ কিছু বেশী হয় বটে, তা কি আর করবো বল—ওরা ঘাড়ে যখন পড়েইচে। এই যে ছেলের পড়ার বায়নায় আমার এক-কাঁড়ি টাকা লাগছে—বই থেকে আরম্ভ ক'রে কোন্‌টায় আর 'না' বলতে পাচ্ছি বলো? তাই ওদের দুটো পেটের খাওয়ায় কম করবো! ভাগ্যে যখন এমন ঘাড়তে ঢুক্‌তে পেরেছে, খাক্ পেট পুরে'।…পাড়ার মেয়েরা উমাশশীর এই উদার মন আর অগাধ পয়সার গল্প শুনে বাড়ী গিয়ে বলাবলি করতেন—আহা তবু যদি না নরুর মা আসতে আসতেই নিরমিষ ঘরের আর খাবার তৈরীর দুটো ঠাকুরই না ছাড়িয়ে দিতেন!

নরুর মা সুলতা রান্নাঘরের মধ্যে বাটীতে বাটীতে তরকারী তুলে কর্ত্তার জন্যে সাজিয়ে দালানে আসনের সামনে রেখে এসে রান্নাঘরের একপাশে ব'সে পড়লো। কর্ত্তা-গিন্নির খাওয়া হ'লে তবে সে নিশ্বাস নেবার অবসর পাবে। বেলা প্রায় দুটো, এখনও একফোঁটা জলও পড়ে নি তার মুখে। সকাল থেকে রান্না আর খাবার তৈরী, একে একে জলখাবার সাজান, সব কাজই যে কলের মত ক'রে গ্যাছে—বিরাম নেই। কিন্তু সব কাজের মধ্যেও মন তার প'ড়ে ছিল নরুর কাছে। সে আজ ক'দিন ধ'রে জ্বর নিয়েই পরীক্ষা দিচ্ছে। আজ হ'লেই শেষ হয়। আশঙ্কায় আকুল মন অশক্ত দেহ প্রতি কাজেই অপারগ হ'য়ে প'ড়ে পদে পদে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তবু উপায় নেই—আশ্রিত সে, তার আবার উদ্বেগ কি!

সামনের দালানেই কর্ত্তা খেতে বসেছেন। গিন্নি কাছে ব'সে আছেন। মোচার ঘণ্টটা কর্ত্তা মুখে দিয়েই ফেলে দিলেন। গিন্নি ব'লে উঠলেন—কি হলো, ফেলে দিলে কেন?

কর্ত্তা একটু বিরক্ত ভাবে বললেন—নুন দেওয়া হয়নি।

কর্ত্তার ফরমাসী তরকারী মোচার ঘণ্ট—তাতেই নুন নেই, গিন্নি আর না রেগে কি থাকতে পারেন? নরুর মার রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—দেখ নরুর মা, এ-রকম ক'রে লোকের মুখের জিনিষ নষ্ট না ক'রে সোজাসুজি 'কিছু পারব না' বল্লেই হয়। ওঁর ছেলে রোগ নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে ক'দিন, তার যত জ্বালা হয়েছে আমাদের। এই চার দিন ধ'রে কি যে নষ্ট করছে তা কি বলবো! এক কড়া দুধ কাল বেড়ালকে দিয়ে খাওয়ালে। আরে, রোগা ছেলে পাঠিয়ে এত যদি মনই খারাপ হবে, তবে তাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে পাঠালি কেন? পাশ ক'রে ছেলে কোন্ জজ হবে শুনি? এই তো সেদিন আমাদের বাড়ীই একটা পাস-করা বাঙালী ছোঁড়া এসেছিল ঠাকুর হ'তে। আমি কি আর কিছুই বুঝি না ভাবো?—সবই বুঝি। এসব আমার সতুর ওপর হিংসের হয়। শুধু হিংসে করলে কি হবে, কপাল থাকা চাই। ভিকিরির ছেলের সঙ্গে সতুর তুলনা? আমি সইলেও ভগবান কেন সইবেন। এতদিন গিয়ে এই সময়টাই জ্বর হয় তা না হ'লে!

কর্ত্তা জানতেন গিন্নির মুখ একবার খুললে আর শীগ্‌গির বন্ধ হয় না। দুপুর বেলা খাবার সময় বকাবকি ভালও লাগছিল না। তাই একটু তাড়াতাড়িই খাওয়া শেষ করলেন। কর্ত্তা উঠে যেতেই গিন্নির মুখ অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। নরুর মাকে বকুনি তাই তখনকার মত বন্ধ হ'ল।

নরুর মা রান্নাঘরে এতক্ষণ একভাবেই ব'সে ছিল। উপায়হীন উদ্বেগাকুল মন তার তখন এ বাড়ীর বহুদূরে কোন অজানা এক পরীক্ষামন্দিরের অভ্যন্তরে রোগদুর্ব্বল পুত্রের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সৌভাগ্যের গর্ব্ব-গরিমায় উৎফুল্ল এরা কেমন ক'রে বুঝবে—নিজের সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে স্নেহশূন্য অপরিচিতের মধ্যে পরীক্ষার কঠিনতায় পুত্রকে রোগশয্যা থেকে তুলে দিয়ে পরাধীনা মার মন কেমন আতঙ্কে আকুল হ'য়ে থাকে।

সুলতা আপন মনে ভেবেই যাচ্ছে। ক্ষুধাতৃষ্ণার কোন তাগিদ,—সদ্যপ্রাপ্ত লাঞ্ছনার কোন লজ্জা সে অনুভব করতে পারছিল না। প্রতিদিনের সংসার তার সকল বোঝা নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে তার মন থেকে নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়ে শুধু একখানি রোগবিবর্ণ কাতর মুখ ফুটে উঠেছিল।

একে একে সকলের খাওয়া শেষ হ'য়ে গেল। সমস্ত বাড়ীটায় একটা বিশ্রামের ঝিমুনি এসে পড়লো। নরুর মা সেই একই ভাবে ব'সে আছে। এমন সময় কর্ত্তার গলায় নরুর নাম তার অবসন্ন দেহ-মনে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে তুলে দিলে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে শুনলে—

কর্ত্তা সরকারকে গাড়ী তৈরী করিয়ে নিয়ে গিয়ে নরুকে আনতে বলেছেন। সে নাকি সেখানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। মাষ্টার মশাই এখানে ফোন করেছেন। সুলতার পায়ের নীচের মাটি যেন স'রে গ্যাল। দিনের আলো তার চোখের ওপর থেকে মিলিয়ে গিয়ে সব অন্ধকার হ'য়ে গ্যাল!

৩

নরুর সেই পরীক্ষা দিতে দিতে অজ্ঞান হ'য়ে ফিরে আসার পর মাস তিনেক প্রায় হ'য়ে এলো। মাস খানেক নরুর জ্বরে আচ্ছন্ন অজ্ঞান অবস্থাতেই কেটে গেছে। তারপর অল্পে অল্পে জ্বর ক'মে একেবারে সুস্থ হ'তে আরো একমাস গেল।

সদ্য রোগমুক্ত নরু দুর্ব্বল দেহটাকে মনের উৎসাহে টেনে নিয়ে পরীক্ষার ফল জানতে দু'এক জায়গায় হাঁটাহাঁট করতে লাগলো। কোথাও কোনও সন্ধান পায় না। শেষ দিন শেষের প্রশ্নপত্রটা ভাল ক'রে না লিখতে পারলেও অন্য বিষয়ে তার পাস-নম্বর থাকবে ব'লেই তার বিশ্বাস।

পরীক্ষার ফল বা'র হবার এখনও দিন-পনর দেরী। নরুর মন যেন আর অপেক্ষা করতে চায় না; মন তার এরোপ্লেনের মত উড়ে চলতে চায়। এই লাঞ্ছনার কারা থেকে মুক্ত হ'য়ে কতদিনে সে মার সঙ্গে আপনার উপার্জ্জনের অন্ন-কণা পর্ণকুটীরে ব'সে হাসিমুখে হাল্কা বুকে গ্রহণ করবে তার কল্পনা তাকে ক্লান্ত হ'তে দেয় না। এরি মধ্যে মাষ্টার মশাইকে সঙ্গে ক'রে দুটো ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর সঙ্গে কথা সে একরকম ঠিক ক'রে রেখেছে—পাসের সার্টিফিকেট-খানি পেলেই সে দু' চার দিনেই সব ঠিক ক'রে ফেলতে পারে।

তার এই ঘোরা-ফেরায় সতু আর উমাশশী রাতদিন ঠাট্টা-তামাসা আরম্ভ করেছে। উমাশশী তো নরুকে 'জজ বাবু' ব'লে ডাকতে সুরু করেছেন। কিন্তু অদূরে মুক্তির আলোর কল্পনা নরুকে এমন উৎফুল্ল ক'রে রেখেছিল যে এই অপমানের জ্বালা—যার তীব্রতায় সে এই একটি বছর ধ'রে জর্জ্জরিত হ'য়ে মুক্তির পথ খুঁজতে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, সেই অপমান আরও শতগুণ তীক্ষ্ণ হ'য়েও তাকে আঘাত করতে পার্চ্ছে না।

শুধু একটি কথা তার মনে ধ্বনিত হ'য়ে উঠছিল—আর ক'দিনই বা!

এমনি ক'রে উগ্র উৎকণ্ঠায় দিনগুলো সব কেটে গ্যাল। কাল নরু জেনে এসেছে—আজ সকালে তাদের পরীক্ষার ফল জানিয়ে দেওয়া হবে। সকালে উঠে সুলতার সন্ধানে নীচে এসে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে দেখলে, মা তার একরাশ ফল কেটে মিষ্টি নিয়ে বাড়ীর সবার জলখাবার সাজতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। ছেলেকে দেখে একটু ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলেন—কি রে, কি হয়েছে? এখানে যে...সঙ্গে সঙ্গে একবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিলেন, উমাশশী কোথায়। কি জানি, এত সব খাবার হ'চ্ছে, তার কাছে এসময় ছেলেকে দেখে যদি কিছু ব'লেই বসেন। সে কলঙ্কের লজ্জা রাখবার ঠাঁই নেই যে!

নরু মায়ের মুখ দেখেই মনের ভাব কতকটা বুঝে তাড়াতাড়ি বল্লে—আমি এখন কলকাতা যাচ্ছি। আসতে যদি দেরী হয় কিছু ভেব না তুমি। খবর না পেলে আসব না আমি। অনেকটা দূর কিনা—বার বার যেতে কষ্ট হবে।

সুলতা ছেলের কাছে একটু স'রে এসে উদ্বিগ্ন সুরে ব'লে উঠলেন—এখনি যাবি? রান্নার তো এখনও ঢের দেরি, কিছু তো খাস নি, রোগা শরীরে খালিপেটে এতটা পথ হাঁটতে পারবি কেন? একমুখ হেসে নরু মাকে বলল—খুব পারব মা। দেরী আমার সহ্য হ'চ্ছে না। খবরটা জেনে ফিরে এসে তোমার কাছে ব'সে সুস্থমনে খাব। বেলায় গেলে রোদে বরং কষ্ট হবে। এখন তবে যাই। তুমি কিছু ভেব না, আমি এই এসে পড়লাম দেখ না তোমার রান্না হবার আগেই।

নরু চ'লে গ্যাল। সুলতা সেই দিকেই চেয়ে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হ'তে লাগলো অল্পদিন আগের নিজের হাতে গড়া সেই ছোট সংসারটি। সে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সর্ব্বস্ব ছিল এই নরু। এই ছেলের একটু কষ্টে স্বামী তার কি ব্যাকুলই হ'য়ে পড়তেন! আজ কোথায় তিনি? তাঁর অভাবে পরাশ্রয়ে সতত লাঞ্ছিত নরু আজ অশক্ত পায়ে অভুক্ত হ'য়ে মায়ের কাছ থেকে চ'লে গ্যাল। অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য হাতে নিয়ে অভাগিনী মা চেয়ে

রইল—তার এককণাও সন্তানের মুখে তুলে দেবার তার শক্তি নেই। এই যে জীবন, এর শেষ কোথায়—কবে ?

৪

ছা তর পাশে সেই ছোট ঘরটার মধ্যে সেই বিছানায় সারা দিনের অনাহারী পথশ্রান্ত নরু মুখ গুঁজে শুয়ে অবিরল কান্নায় বালিসটাকে ভিজিয়ে ফেলেছে। পাশে ব'সে মা কান্নাভরা চোখে ছেলের দিকে চেয়ে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সুলতার নিজের মনও সেন অবসাদে অবসন্ন হ'য়ে নরুর মতই নিরুপায় কান্নায় লুটিয়ে পড়তে চাইছিল। কিন্তু অভাগিনী মা পুত্রের এই ব্যর্থতার ব্যথা ভুলিয়ে দেবার জন্যেই আপনার মনকে সবল ক'রে তোলবার চেষ্টা করছিলেন।

আস্তে আস্তে নরুর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে সুলতা বলতে লাগ্‌লেন—'কেন বাবা তুমি এমন অধৈর্য্য হ'য়ে পড়ছ ? তুমি তো এমন দুর্ব্বলমন নও বাবা,—এতদিন তুমিই যে আমায় কত বুঝিয়ে এসেছ !

নরু কান্নাচাপা গলায় বলতে লাগলো—মা ! তখন যে আমার আশা ছিল, পাশ ক'রে চাকরী করবো তোমার দুঃখ শীগগির দূর করবো। আমার সব আশা যে নষ্ট হ'য়ে গ্যাল ! আর কেমন ক'রে তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব ?

সুলতা নরুর মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বলতে লাগলেন—হবে বাবা, তুমি বেঁচে থাকলেই আমার সব দুঃখ দূর হবে !...

ক্ষীর ও নীর

সাগরদোলা—শ্রী কাত্যায়ণী দেবী। ১৪, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট যুগবাণী সাহিত্যচক্র হইতে প্রকাশিত।

'সাগরদোলা'র গল্পগুলি শিশুদের জন্য লিখিত; এবং কল্পনা-সাগরের ঢেউ তুলিয়া ইহা শিশু-মনকে দোলা দিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কতকগুলি গল্পের কঙ্কাল বিদেশী সাহিত্য হইতে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু শরীরসংস্থান ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন গ্রন্থকর্ত্রী,—অর্থাৎ অনুবাদ নহে, ভাব-অনুসরণ। 'প্রবাসী'র "ছেলেদের পাত্‌তাড়ি" ও 'মুকুল' পত্রিকায় কয়েকটি প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখিকার লিখিবার শক্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। গল্পগুলি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

ভারতবর্ষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন—শ্রী ভুবন-মোহন দাস এম এ। প্রকাশক—বি, কে, দাস এণ্ড কোং, ৪ উইলিয়ামস্ লেন, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

সংক্ষেপে আর্য্যশাসনকাল হইতে দিল্লীতে ইংরাজের ভারত-রাজধানী প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়া, পরে সংক্ষিপ্ততর ভাবে লর্ড মণ্টেগুর ভারত-পর্য্যবেক্ষণের ইঙ্গিত-সহ ইহা শেষ হইয়াছে। স্কুলপাঠ্য সাধারণ ইতিহাস হইতে অনেক প্রয়োজনীয় ও অপরিজ্ঞাত বিষয়ের অবতারণায় ইহা অধিকতর মূল্যবান। ভারতবর্ষের বিবর্ত্তন বিষয়ক মোটামুট একটা সহজ জ্ঞান ইহা পাঠ করিলে লব্ধ হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের অনেকেই ইংরাজী-অনভিজ্ঞ, কিন্তু বাঙলা ভাষায় তেমন ইতিহাস-গ্রন্থ বিরল; দেশের ইতিহাস জানার কর্ত্তব্যের দিক হইতে ইহার বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়।

কিশোর রামায়ণ—শ্রী রাজকুমার চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কিশোরদের জন্য আরও দুই-একখানি এইরূপ রামায়ণ প্রচলিত থাকিলেও ইহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। তথাকথিত রামায়ণ কয়টির কোনটি সংক্ষিপ্ততর, কোনটি বা খুব বড় না হইলেও শিশুদের মনের পক্ষে গুরুভার, অথবা বাহুল্য-বর্দ্ধিত ও প্রয়োজনীয়-বর্জ্জিত। শিশুদের মনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া রচনার দিক দিয়া বিচার করিলে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে ইহা শিশুপাঠ্য সুগ্রন্থ বটে। ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট।

স্বরলিপি

ভারত-গাথা

কথা ও সুর—শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্   স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাউলের সুর—দাদরা।

০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
সা II সা সা -া I সা মা মা | মা মা -া | -া -া গা | রা সা -া I -া -া সা | সা সা রা I
ভা র তে ০ জ ০ ন্মে মা নু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ ০ ভা র তে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০II
সা মা মা | গা গা -সা I সা -া সা | রা সা -া I -া -া -া | -া সা সা I
জ ০ ন্মে মা নু ষ্ পু ০ ণ্য ফ লে ০ ০ ০ ০ ০ ব হু

১´ ০ ১´
সা -া সা | রা সা -া I -া -া সা II
পু ০ ণ্য ফ লে ০ ০ ০ "ভা"

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
পা পা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা ণা ণা I ধা পা -া I
ক ত অ তী ত যু গে র্ ম ধু র্ স্মৃ তি ০ মি শে আ ছে তা র্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
ণা ণা -া | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I মা -া মা | পা ধা পা I
ন দী ০ কা ন ন্ ম রু ০ পা হা ড় প্রা ০ ন্ত রে ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
মা পা মা | গা রা সা I ন্ সা -া | রা সা -া I -া -া সা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ জ লে ০ স্থ লে ০ ০ ০ "ভা"

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
সা সা | সা সা মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা -গা I রা রা -া | রা রা গা I
হে থা ত পো ০ ব নে র্ ত রু র্ ছা য়া য়্ শ কু ০ ন্ত লা র্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা পা -া | -া -া -া I সা মা মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা গা I
দে খা ০ ০ ০ ০ প ০ ঞ্চ ব টী র্ ব নে র্ প থে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
রা রা -া | রা রা গা | মাপা -া | -া পা পা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা I
সী তা র্ পা য়ে র্ রেখা ০ ০ হে থা ভ ব ০ ভূ তি ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I মা মা -া | পা ধা -া I
কা লি ০ দা সে র্ অ তু ল্ ম সী ০ রে খা র্ টা নে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´
পা মা গা | রা সা -া I গা গা -া | রা সা -া I ন্‌া সা -া | রা সা -া I -া -া সা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ন র ০ না রী র্ হৃ দ য়্ যো গে ০ ০ ০ "ভা'

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
{পা পা I মা পা -া | না না -া I র্সা র্সা -া | র্সা না -া I র্সা -া র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I
{হে থা র চে ০ গী তা র্ অ ম র্ গী তি ০ ভা ঙ্ লো মা হু য্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
না -া না | র্সা র্সা র্রা I র্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া } পা পা
মু ০ ত্যু ভী তি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ } হে থা

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
র্সা -া না | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I
বি ০ শ্ব বা সী র্ ম র ম্ ব্য থা য়্ প্রা সা দ্ ত্যা গী ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
ণা ণা -া | ধা পা -া I মা -া মা | পা ধা -া I পা মা গা I রা সা -া I
উ দা স্ প রা ণ্ শা ০ ক্য মু নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
-া -া সা | সা সা রা I গা গা -া | রা সা -া I গা গা -া | রা সা -া I
০ ০ পে তে ছি ল ধ্যা নে র্ আ স ন বো ধি ০ ত রু র্

১´ ০ ১´
ন্‌া সা -া | রা সা -া I -া -া সা II
শা খা র্ ত লে ০ ০ ০ "ভা"

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
সা সা I সা সা -মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা গা I রা -া রা | রা রা গা I
হে থা লি খে ০ ছি ল ০ অ শো ক্ রা জা ০ স্ত ০ ম্ভ গা য়ে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা পা -া | -া -া -া I সা সা মা | মা মা -া I মা -া মা | মা মা গা I
লি পি ০ ০ ০ ০ জ হ র্ ব্র তে ০ প ০ ল্লি নী তা র্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
রা রা -া | রা রা গা I মা পা -া | -া পা পা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা রা I
প রা ণ্ দি ল ০ স পি ০ ০ হে থা প্রে মে র্ রা জা ০

১´　　০　　১´　　০　　১　　০
র্সা গা -া | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I মা -া মা | পা ধা -া I
সা জা ০　হা নে র্　মা ন স্　রা ণী র্　মূ ০ র্ত্তি　র চা ০

১　　০　　১´　　০　　১´　　০
পা মা গা | রা সা -া I সা মা মা | মা মা সা I সা -া সা | রা -া -া I
০ ০ ০　০ ০ ০　ম ম তা　ঝ রা ০　ম ০ র্ম্ম　রে ০ র্

১´　　০　　১´
সা -া সা | রা সা -া I -া -া সা II
অ ০ শ্রু　জ লে ০　০ ০ "ভা"

১´　　০　　১´　　০　　১　　০
পা পা I মা পা -া | না না -া I র্সা -া র্সা | র্সা না -া I র্সা র্সা র্জা | র্রা র্সা -া I
কে থা　লি খে ০　গে ছে ০　র ০ কে　তা দে র্　বী র ০　ম কা ০

১´　　০　　১´　　০　　১　　০
না র্সা -া | -া -া ণা I ণা -া ণা | -া ণা -া I ধা ণা -া | পা ধা -া I
হি নী ০　০ ০ ০　রা জ্ পু　ত্ শি খ্　মো গ ল্　পা ঠা ন্

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
ণা ণা র্রা | র্সা ণা -া I ধা পা -া | -া -া -া I -া -া -া | -া পা পা I
মা রা ০　ঠা বা ০　হি নী ০　০ ০ ০　০ ০ ০　০ হে থা

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
র্সা র্সা র্সা | -া র্সা র্রা I র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I
র ণ জি　ৎ সিং ০　রা ণা ০　প্র তা প্　শি বা ০　জি আ র্

১´　　০　　১　　০　　১´　　০
মা -া মা | পা -া -া I মা -া মা | মা ধা -া I পা মা গা | রা সা -া I
আ ক্ ব　রে ০ র্　গা ন্ গা　হে মা ০　০ ০ ০　০ ০ ০

১´　　০　　১´　　০　　১´
মা -া মা | মা মা সা I সা সা -া | রা সা -া I -া -া সা II
সু র্ পা　ভা নি র্　ম ধু র্　বো লে ০　০ ০ "ভা"

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
-া -া I　সা সা মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা গা I রা রা -া | রা রা গা I
০ ০　ভা লো ০　বে সে ০　ছি ল ০　হে থা ০　র জ ০　কি নী ০

১´　　০　　১´　　০　　১´　　০
মা পা -া | -া -া -া I সা সা মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা গা I
রা ণী ০　০ ০ ০　মি লে ০　ছি ল ০　মী রা ০　বাই বে র্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
রা রা -া | রা রা গা I মা পা -া | -া পা প I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা I
অ ন ০ স্ব রূ প্ স্বা মী ০ ০ ক ত প তি ০ ব্র তা ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা -া পা I মা মা -া | পা ধা -া I
স তী ০ হে সে ০ কো ম ল্ প্রা ণ্ আ হু তি ০ দি ল ০

১´ ০ ১´ ০
পা মা গা | রা সা -া I সা সা -া | সা সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ প তি ০ ত স ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
গা গা -া | রা সা -া | ন্ সা -া | রা সা -া I -া -া স II
মা জে র্ র চা ০ চি তা ০ ন লে ০ ০ ০ "ভা"

১ ০ ১´ ০ ১´ ০
পা পা I মা পা -া | না না -া I র্সা র্সা -া | র্সা না -া I র্সা -া র্জা | র্রা র্সা -া I
হে থা উ ঠে ০ ছি ল ০ বে জে ০ স্বা জা ০ রা মু খো হ নে র্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা র্সা -া | -া -া ণা I ণা -া ণা | ণা ণা -া I ধা ণা -া | পা ধা -া I
জে স্রী ০ ০ ০ ০ ধ ০ র্ম্ম নী তি র্ অ ধঃ ০ পাত্ আর্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
ণা ণা র্রা | র্সা -া ণা I ধা পা -া | -া -া -া I -া -া -া | -া পা পা I
না রী র্ দুঃ ০ খ হে রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হে থা

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা -া | ধ পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I
বি ০ দ্যা সা গ র্ দে বে ০ দ্রু না থ্ বি বে ০ কা ন ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা মা -া | পা পা -া I মা মা -া | পা ধা -া | পা মা গা | রা সা -া I
স্ব কে ০ শ বে র্ জী ব ন্ প্র দী ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´
সা সা -া | সা সা -া I গা গা -া | রা সা -া I ন্ -া সা | রা সা -া I -া -া সা II
গ ভী র্ নি শি র্ আঁ ধা র্ না শি ০ উ ঠ্ ল জ্ব লে ০ ০ ০ "ভা"

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
সা সা I সা সা মা | মা মা -া | মা -া মা I মা মা গা | রা -া রা | রা রা গা I
হে থা যু ঝে ০ ছি ল ০ চাঁ দ্ বি বি আ র্ দু ০ র্গা ব তী ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা পা -া | -া -া -া I সা সা মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা গা I
র ণে ০ ০ ০ ০ আ হা ০ না রা র্ ক ব র্ তু মি ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
রা রা -া | রা রা গা I মা পা -া | -া পা পা I র্সা -া র্সা | র্সা -া র্রা I
স জী ব্ হ রি ত্ তৃ ণে ০ ০ হে থা ধা ০ ত্রী পা ০ গ্রা

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা -া ণা | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I
মা তা ০ আ প ন্ র ০ ক্তে গ ড়া ০ বু কে র্ মা ণি ক্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা মা -া | পা ধা -া I পা মা গা | রা সা -া I গা গা -া | রা সা -া I
ব লি ০ দি ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভা র ত্ না রী র্

১´ ০ ১´ ০ ১´
গা -া গা | রা সা -া I ন্া সা -া | রা সা -া I -া -া সা II
ত্যা গ্ ব্র ত সা ০ ধ না র্ ব লে ০ ০ ০ "ভা"

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
পা পা I মা পা -া | না না -া I র্সা র্সা -া | র্সা না -া I র্সা র্সা র্জা | র্রা র্সা -া I
হে থা রু ধে ০ ছি ল ০ পু রু ০ রা জা ০ সে কে ০ ন্দ রে র্

১ ০ ১´ ০ ১´ ০
না র্সা - | -া -া ণা I ণা -া ণা | ণা ণা -া I ধা ণা -া | পা ধা -া I
গ তি ০ ০ ০ ০ শি ০ ক্ষা লা ভে ০ ব্র তী ০ ছি ল ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
ণা -া র্সা | র্সা ণা -া I ধা পা -া | -া -া -া I -া -া -া | -া পা পা I
গা ০ র্গী লী লা ০ ব তী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হে থা

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I
মৈ ০ ত্রে য়ী রা ০ মা নু ষ্ ক বী র্ না ন ক্ গু রু র্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
ণা ণা -া | ধা পা -া I মা -া মা | পা ধা -া | পা মা গা | রা সা -া I
জ্ঞা নে র্ স্রো তে র্ ম ০ ন্দা কি নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
-া -া সা | সা সা সা I গা গা -া | রা সা -া I গা গা -া | রা সা -া I
০ ০ প্র বা হি ল প্লা ব ন্ ধা রা ০ ন র ০ না রী র্

১´ ০ ১´
ন্া সা -া | রা সা -া I -া -া সা II
প্রা ণে র্ ত লে ০ ০ ০ "ভা"

১ ০ ১ ০ ১´ ০
সা সা I সা সা মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা গা | রা রা -া | রা রা গা I
হে থা প্র চা ০ রি ল ০ যু গে ০ যু গে ০ ক ত ০ উ দা র্

১´ 0 ১´ 0 ´ 0 ১´ 0
মা পা -া | -া -া -া I সা মা মা | মা মা -া I মা মা -া I মা মা গা | রা রা -া I ঃা রা গা I
জ্ঞা নী ০ ০ ০ ০ প্রে ম্ ভ ক ক্তি ০ জী বে ০ দ য়া ০ অ হিং ০ স তা র্

১´ 0 ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
মা পা -া | -া পা পা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্রা I র্সা না -া | ধা পা -া I ণা ণা -া I ধা পা -া I
বা ণী ০ ০ হে থা ঘ র্ বি রা গী ০ অ মু ০ রা গী ০ গো রা ০ চাঁ দে র্

১´ 0 ১ 0 ১´ 0 ১´ 0
ণা -া ণা | ধা পা -া I মা মা -া | পা ধা -া I পা মা গা | রা সা -া I -া -া সা | সা সা রা I
প্রা ণ্ মা তা নো ০ প্রে মে র্ তা নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে চে নে চে

১´ 0 ১´ 0 0
গা গা -া | রা সা -া I ন্‌া সা -া I রা সা -া I -া -া সা II
গা হে ০ বা উ ল্ দ লে ০ দ লে ০ ০ ০ "ভা"

১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
পা পা I মা পা -া | না না -া I র্সা -া র্সা | র্সা না -া I র্সা -া র্জ্ঞা I র্রা র্সা -া I
হে থা বে জে ০ ছি ল ০ চ ০ ণ্ডী দাস্ আর্ জ য়্ দে বে র ০

১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
না র্সা -া | -া -া ণা I ণা ণা -া | ণা ণা -া I ধা -া ণা | পা ধা -া I
বী ণা ০ ০ ০ ০ র চি ০ ল প দ্ বি ০ দ্যা প তি ০

১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
র্ণা -া র্রা | র্সা ণা -া I ধা পা -া | -া -া -া | -া -া -া | -া পা পা I
তু ল্ সী দাস্ আর্ খ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হে থা

১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
র্সা সা -া | সা সা র্রা I র্সা ণা -া | ধা পা -া I ণা -া ণা | ধা পা -া I
ম ধু ০ সূ দ ন্ দ্বি জে ০ শ্র লা ল্ হে ম্ ন বীন্ আ র্

১ 0 ১ 0 ১ 0
মা -া মা | পা -া -া I মা মা -া | মা ধা -া I পা মা গা | রা সা -া I
ব ০ ঙ্কি মে ০ র্ গাঁ থা ০ মা লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ 0 ১ 0 ১ 0 ১
-া -া সা | সা সা সা I গা -া গা | রা সা -া I ন্‌া -া ন্‌া | রা সা -া I -া -া সা II II
০ ০ গ র বি নী ব ০ ঙ্গ রা ণী র্ ব ০ ক্ষে দো লে ০ ০ ০ "ভা"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মা ও শিশু

মিসেস্ এন, টাল্‌টন এম-এ, এম-বি, সি-এইচ-বি

সন্তানসম্ভবা জননীর রক্ত পরিষ্কার রাখা

কোন দন্তচিকিৎসকের দ্বারা দাঁতগুলি যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া নিন। যতদূর সম্ভব খোলা বাতাসে থাকুন। অন্ত্র-পরিষ্কারকারক খাদ্য দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার রাখুন, এবং যদি আবশ্যক হয় তবে ক্যাসকারা ইভাকুয়েট ব্যবহার করিতে পারেন। প্রতিদিন উষ্ণ জলে স্নান করিয়া লোমকূপ খোলা রাখিবেন। অতিরিক্ত গরম, দুইবার পাক করা, অথবা ভাজা খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, বদহজম না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হইবেন। খাইবার নির্দ্দিষ্ট সময়েই খাইবেন; প্রধান খাবার দ্বিপ্রহরেই খাওয়া উচিত।

বুকের দুধ খাওয়াইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া

দেখিবেন যেন দুধের বোঁটা শিশুর সহজে চুষিবার উপযোগী বড় হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং অন্য অঙ্গুলির মধ্যে ঘষিয়া প্রতিদিন—শিশুর জন্মের দুইমাস পূর্ব্ব হইতে উহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। যদি বোঁটা অত্যন্ত বসিয়া গিয়া থাকে তবে ব্রেষ্টপাম্প ব্যবহার করিয়া উহাদিগকে প্রথম বাহির করিয়া নিন। যাহাতে স্বভাবতঃ শক্ত হইয়া বোঁটা ফাটিয়া অথবা ঘা হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হইবেন। ঐ উদ্দেশ্যে রক্ষিত একখানা দাঁতমাজা ব্রাস অথবা অন্য কোন ব্রাস-সাহায্যে দুধের বোঁটা শিশুজন্মের দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই প্রতিদিন দুইবার করিয়া ঘর্ষণ করিয়া দিবেন। প্রথমে খুব মৃদুভাবে ঘষিবেন—যে পর্য্যন্ত না উহা অপেক্ষাকৃত অল্প কোমল হয়।

স্পিরিট অথবা মলম ব্যবহার করিবেন না। যদি মাংস-পেশীগুলি দুর্ব্বল হয় তবে ঠাণ্ডা জলে উহা প্রতিদিন স্পঞ্জ করিয়া দিবেন এবং খস্‌খসে গামছা দ্বারা ঘষিয়া দিবেন।

৯ মাস বয়স হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত কিভাবে দুধ ছাড়াইয়া অন্য খাদ্য দিতে হয়

৯ মাস বয়সে মাতা আস্তে আস্তে দুধ ছাড়াইতে চেষ্টা করিবেন। এক একবার বুকের দুধ দেওয়া বাদ দিয়া সেই সেই বারে জল মিশ্রিত গরুর দুগ্ধ-মিশ্রণ খাওয়াইবেন। প্রত্যেক বার পরিবর্ত্তন অন্ততঃ এক সপ্তাহ অন্তর হইবে। অত্যন্ত দরিদ্রদের মধ্যে যেখানে ভাল গরুর দুধ পাওয়া যায় না সেখানে প্রত্যেক বার পরিবর্ত্তন মা অন্ততঃ দুই সপ্তাহ অন্তর করিবেন।

প্রথম পরিবর্ত্তন

বুকের দুধ খাওয়ান প্রাতে ৬টায়, ১০টায়। বিকালে ২ টায়—বাটী অথবা গ্লাস হইতে একবার দুগ্ধ-মিশ্রণ খাওয়াইবেন।

যথা:—সিদ্ধ দুগ্ধ ২॥০ আউন্স অথবা ৫ টেবিলস্পুন-ফুল, চূণের জল ২ টেবিলস্পুন-ফুল, চিনি ২ টিস্পুন-ফুল, সিদ্ধ জল ঠাণ্ডা করা সাড়ে চার আউন্স, কড্‌লিভার অয়েল চায়ের চামচার অর্দ্ধ চামচা অথবা শতকরা ৫০ ভাগ কড্‌লিভার অয়েল ইমালসন চায়ের চামচার এক চামচা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

কড্‌লিভার অয়েল, অথবা কডলিভার অয়েল ইমালসন গরম পড়িলে অর্দ্ধমাত্রা দেওয়া উচিত। খুব গরম পড়িলে ইহা মাঝে মাঝে একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন

বুকের দুধ প্রাতে ৬টায়;—অপরাহ্ন ২টায় এবং রাত্র ১০ টায় দুইবার অন্য প্রস্তুত খাদ্য। এইভাবে সিদ্ধ গরুর দুগ্ধ ৮ টেবিলস্পুন-ফুল অথবা ৪ আউন্স, চূনের জল অর্দ্ধ আউন্স অথবা এক টেবিলস্পুন-ফুল, চুণ দুই চায়ের চামচা, ঠাণ্ডা সিদ্ধ জল ৩॥০ আউন্স অথবা ৭ টেবিলস্পুন-ফুল, কড্‌লিভার অয়েল অর্দ্ধ টিস্পুন-ফুল, অথবা শতকরা ৫০ ভাগ কড্‌লিভার অয়েল ইমালসন চায়ের চামচার এক

চামচা। চায়ের চামচার তিন চামচা ঠাণ্ডা সিদ্ধ জলে চায়ের চামচার তিন চামচা লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া ৬ মাস বয়সে দেওয়া যায়। কিন্তু যেখানে প্রথম হইতেই শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হইয়াছে সেখানে একমাস বয়সেই লেবুর রস দেওয়া উচিত। চায়ের অৰ্দ্ধ চামচা লেবুর রস সমপরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া, ক্রমে ৬ মাসে চায়ের চামচার ৩ চামচা জলে দিয়া এবং এক বৎসরে চায়ের চামচার ৬ চামচা জলে দিয়া, উক্ত রস দুগ্ধ খাওয়াইবার এক ঘণ্টা পূৰ্ব্বে দেওয়াই শ্রেয়। ৯মাস বয়স হইতে ক্রমে যেন অন্য খাবার দেওয়া হয়। খুব আস্তে আস্তে শিশু এই নূতন খাদ্য হজম করিতে অভ্যস্ত হয়। দুধ ছাড়ান সম্পূর্ণরূপে হইয়া গেলে গোদুগ্ধের মিশ্রণের শক্তিও বাড়াইয়া দেওয়া যায় যেন ১২ মাস অথবা অল্প পরে পূর্ণ শক্তিযুক্ত সিদ্ধ দুগ্ধ দেওয়া সম্ভব হয়। রাত্র ১০ টার সময়ের খাদ্যের পরিমাণ ক্রমান্বয় কমাইতে হইবে—যেন এক বৎসরের মধ্যেই রাত্র ১০ টার খাবার একেবারেই বাদ দিয়া দেওয়া যায়। খাদ্যে শক্ত খাদ্যের ভাগ বৃদ্ধি হওয়ায় রাত্রের খাবার খুব কম করা যায়।

তৃতীয় পরিবর্ত্তন

দুইবার বুকের দুধ খাওয়ান—প্রাতে ৬ টায় এবং রাত্রে ১০ টায়। তিনবার অন্য প্রস্তুত খাদ্য—প্রাতে ১০ টায়, অপরাহ্ন ২ টায়, এবং সন্ধ্যা ৬ টায়। প্রত্যেক বারের খাদ্য এইভাবে প্রস্তুত করা হইবে।

যথা :—সিদ্ধ গরম দুধ ৪ আউন্স অথবা ৮ টেবিল-স্পুন ফুল, চূণের জল অৰ্দ্ধ আউন্স অথবা এক টেবিলস্পুন-ফুল, চিনি চায়ের দুই চামচা, ঠাণ্ডা সিদ্ধ জল ৩॥০ আউন্স অথবা ৭ টেবিলস্পুন-ফুল, কড্‌লিভার অয়েল চায়ের চামচার অৰ্দ্ধ চামচা, অথবা শতকরা ৫০ ভাগ কড্‌লিভার অয়েল ইমালসন চায়ের চামচার এক চামচা।

চতুর্থ পরিবর্ত্তন

প্রাতে ৬ টায় বুকের দুধ একবার দিবেন, এবং সকালে ১০ টায়, অপরাহ্ন ২ টায়, সন্ধ্যা ৬ টায় এবং রাত্র ১০ টায় এক একবার। প্রত্যেক বারের খাদ্য এইরূপে প্রস্তুত হইবে :—সিদ্ধ গরুর দুধ ৪ আউন্স অথবা ৮ টেবিলস্পুন-ফুল, চূণের জল অৰ্দ্ধ আউন্স অথবা এক টেবিলস্পুন ফুল, চিনি চায়ের চামচার দুই চামচা, ঠাণ্ডা সিদ্ধ গরম জল ৩॥ আউন্স অথবা ৭ টেবিলস্পুন ফুল। কড্‌লিভার অয়েল অৰ্দ্ধ টিস্পুন-ফুল অথবা শতকরা ৫০ ভাগ কড্‌লিভার অয়েল ইমালসন্ এক টিস্পুন ফুল।

পঞ্চম পরিবর্ত্তন

প্রস্তুত খাদ্য প্রাতে ৬ টায়, ১০ টায়, বৈকালে ২টায়, সন্ধ্যা ৬ টায়, এবং রাত্রে ১০ টায়। এই রূপে খাদ্য প্রস্তুত হইবে :—সিদ্ধ গরুর দুগ্ধ ৪ আউন্স অথবা ৮ টেবিলস্পুন-ফুল, চূণের জল অৰ্দ্ধ আউন্স অথবা এক টেবিলস্পুন ফুল, চিনি চায়ের চামচার দুই চামচা, ঠাণ্ডা সিদ্ধ জল ৩॥০ আউন্স অথবা ৭ টেবিলস্পুন-ফুল, কড্‌লিভার অয়েল অৰ্দ্ধ টিস্পুন-ফুল অথবা শত করা ৫০ ভাগ কড্‌লিভার অয়েল ইমালসন্ এক টিস্পুন-ফুল।

৮ মাস বয়স হইতেই শিশুকে শক্ত রুটীর বহির্ভাগ, অথবা ভারতবর্ষীয় শিশুকে শক্ত চাপাটি দেওয়া যায়। প্রাতে ১০টা, অপরাহ্ন ২টা এবং সন্ধ্যা ৬ টায় অন্য খাবারের ১০-১৫ মিনিট পূর্ব্বে ইহা দেওয়া যায়। ইহা দ্বারা শিশু চোয়াল এবং মাড়ী ব্যবহার করা শিখে।

৯ মাস হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত শিশুর খাদ্যের তালিকা

খাবার সময় পরিবারের উপযোগী করিয়া ব্যবস্থা করুন। শয্যাত্যাগের পর প্রাতে ৬ টায় অথবা ঐরূপ কোন সময়ে উপরে বর্ণিত প্রণালীতে প্রস্তুত গরুর দুগ্ধ-মিশ্রণ-পান।

প্রাতরাশ—প্রাতে ১০ টায় বা ৯-৩০ মিনিটে। খাবার পূৰ্ব্বে রুটীর শক্ত উপরিভাগ অথবা চাপাটি। বার্লি অথবা ওট অথবা ভাতের জেলি—৯ মাস বয়সে চায়ের চামচার দুই চামচা হইতে আরম্ভ করিয়া, ১০ মাস বয়সে টেবিল চামচার এক

চামচা এবং ১ বৎসর বয়সে ৩ টেবিলস্পুন ফুল পর্য্যন্ত উপরে বর্ণিত প্রণালীতে মিশ্রিত দুগ্ধপান।

মধ্যাহ্ন ভোজন—১টায়, অপরাহ্ণ ১-৩০ মিনিটে বা ২ টায়। শক্ত রুটী অথবা চাপাটি। ১০ মাস বয়সে দুগ্ধ মিশ্রণের সহিত সুপক দুগ্ধের পুডিং। ১১ মাস বয়সে তারতরকারীর ঝোল, রুটীর টুকরা, দুগ্ধের পুডিং, সুজী, অল্প সিদ্ধ ফল অথবা পেঁপে দুগ্ধ-মিশ্রণ পান করিতে দিতে হইবে।

সন্ধ্যা ৬ টায়—ভাজা রুটী অথবা চাপাটি, ভাত, বার্লি, ওট, অথবা সুজীর জেলী, দুগ্ধ-মিশ্রণ পান করিতে দিতে হইবে।

রাত্র ১০ টায়—অতি অল্পমাত্রায় দুগ্ধ-মিশ্রণ পান করিতে দিতে হইবে—যেন দ্বিতীয় বর্ষারম্ভেই উহা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

খাবার সময়ের অন্তরে অন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ পরিষ্কার জল পান করিতে দেওয়া উচিত।*

* এই প্রবন্ধ অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত কোন ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ নহে। লেখিকা "বঙ্গলক্ষ্মী"র জন্যই বিশেষভাবে ইহা রচনা করিয়াছেন। ইহাকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন—শ্রী শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ (চ্যারক)।—বং সঃ

তখন আমার বয়স হইবে নয় কি দশের কাছে

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

তখন আমার বয়স হইবে নয় কি দশের কাছে,
ন'দি'র বিয়েতে বিয়ের যাত্রী যাই :
বিশ ক্রোশ দূর—মাঝে একদিন থাকিতে হইবে পথে,—
হেঁটেই চলেছি,—গাড়ীর যোগাড় নাই।
ন'দি' চলে' গেছে ছয়-বেহারার পাল্কী চড়িয়া কাল,
মালী মাসী আর বোঁচা সাথে গেছে তার;
আমরা চলেছি ঢিমে-তেতালায় গল্পগুজবে মেতে,
চামার র হাট আজ তক্ হব পার।
বেগারীরা সব আগে আগে যায়, চন্দ্রমোহন শেষে,
মাঝখানে মোরা লম্বা সে এক দল ;
মাঠের মানুষ কাজ ফেলে রেখে খানিক চাহিয়া থাকে,
এতগুলি লোক দেখে বাড়ে কুতূহল।
বোশেখ মাসের প্রথম তখন, গরম পড়েনি তত,
দিন দুই আগে বৃষ্টি হয়েছে বেশ ;
পথ ঘাট মাঠ ধোয়া ফিট্‌ফাট্,—রাস্তা চলিতে তাই
কোথাও ছিল না এতটুকু কোন ক্লেশ।
মাঠভরা পাকা পায়রা', চিনার বাদামী রংএর জমি ;
সবুজের পোঁচ দিয়েছে ধানের চারা ;
গ্রামের প্রান্তে উদাসীন-সাজ শুক্‌না শিমুল গাছ,
ফুল ফোটা ক্রমে হ'য়ে এল তার সারা।
সকাল বেলার সোনালী রৌদ্রে স্নিগ্ধ বাতাস খেলে,
প্রজাপতি-ঝাঁক ফুলে ফুলে উড়ে যায় ;
কত সে বিয়ের বাড়ীর পাশ দে' চলিতে চলিতে শুনি—
বড় মিঠাসুরে সানাই যেন কি গায়।
ফয়তাপুরের বাজারে আসিয়া বেগারীরা মোট রাখে,
গামছায় মোছে ঘামের তপ্তধারা ;
বাবা বুঝে দেন মুড়্কি-চিড়ার পয়সা তাদের হাতে।—
পিছনে দেখেন চন্দ্রমোহন খাড়া!
ফয়তাপুরের রসগোল্লার নামডাক খুব আছে,
কুণ্ঠা জানায় বিনয় করিয়া তাই ;
বাবা বুঝিলেন লোভী সুচতুর চন্দ্রের ক্ষুধা কিসে—
কমের পক্ষে সের-দুই তার চাই।
ঠিক দু'পহরে ধলেশ্বরীর বালু-চর হই পার—
এখানে সেখানে একগলা, বুক জল :
ডুবানো নায়ের গলুয়ে বসিয়া মাছ-রাঙা মাছ খোঁজে,
উড়িয়া বেড়ায় গাঙচিলাদের দল।

দীঘল পাড়ার বটতলা এসে পৌঁছিনু কিছু পরে,—
প্রকাণ্ড গাছ—ঘাসেভরা নীচ তার;
সবাই মিলে দই-চিঁড়া খেয়ে ঠাণ্ডা করিনু নাড়ী,
ব্যবস্থা হ'ল খানিকটা গড়াবার।
বেলা পড়ে' এল, ঝির ঝির ক'রে বাতাস ছাড়িল—বাঃ রে!
আল-পথ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলি;
আমি সকলের ছোট্ট বলিয়া আদর সবাই করে,
তুলে এনে দেয় কুসুমফুলের কলি।
চামারীর হাট পার হ'য়ে যাই, সমুখে জোছনা ওঠে,
তখন চলেছি চওড়া হালট দিয়া;
ঠাণ্ডা-গরম মিশান বাতাস লাগিল কেমন গায়,—
মনটা আমার দিল যেন চমকিয়া!
দু'ধারে পলাশ মাদারের গাছ,—পুকুর একটা দূরে,
উঁচু পাড়ে তার তাল ও ঝাউয়ের সারি;—
থেকে থেকে দোলে, সাঁই সাঁই করে বিশ্রী রকম যেন,—
মনটা আমার ভয় পেয়ে যায় ভারি!
আজ চেয়ে দেখি আমার জীবনে গিয়াছে সেদিন চ'লে—
তেমন সরল ভয়ালু পরাণ নাই;
আনন্দ-ভয় সুখ বিজড়িত অতীতের স্মৃতিপানে
অবসর-দিনে কখনো ফিরিয়া চাই!

বিশ্বভারতীতে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

সমগ্র ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ নাই—কোন প্রদেশেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে, বাংলা-দেশেও নহে। বাংলাদেশে পর্দাপ্রথার প্রচলন থাকায় শিক্ষার যে ব্যাঘাত আছে, তাহা মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কেরল প্রভৃতি দেশে নাই। এইজন্য বঙ্গে যেখানে যাহা কিছু বন্দোবস্ত আছে, তাহা সকলের জানা উচিত এবং সেই বন্দোবস্তের পূর্ণব্যবহার করা উচিত।

বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ ছেলে ও মেয়েদের একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা এখন কলিকাতার কোন কোন কলেজ এবং অন্যত্রও কোথাও কোথাও চলিতেছে। সুতরাং এবিষয়ে এখন কিছু বলিতে চাই না। কেবল ইহাই সকলকে মনে রাখিতে বলি, যে, গৃহস্থের বাড়ীতে এবং সমাজে যখন ছেলে ও মেয়েরা একত্র বাস এবং চলাফিরা মেলামেশা করে, তখন বিদ্যামন্দিরে তাহাদের একত্র শিক্ষালাভও স্বাভাবিক।

বিশ্বভারতীতে মেয়েরা বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ শিক্ষা বি এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। কেহ কোন সরকারী পরীক্ষার জন্য পড়িতে না চাহিলে বি-এ'র তুল্য শিক্ষালাভের ব্যবস্থা এখানে আছে। তদ্ভিন্ন তাহারা চীন ও তিব্বতী ভাষা শিখিতে পারে। সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত সাধারণ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাহিত্যের অনুশীলন এখানে বি-এ পরীক্ষা অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

মানসিক পরিশ্রম যাহারা করে, তাহাদের পক্ষে মুক্ত-বাতাসে বিচরণ, দৈহিক শ্রম, ব্যায়াম প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। বিশ্বভারতী বোলপুর হইতে প্রায় দুই-মাইল দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে অবস্থিত বলিয়া এখানে মেয়েরা অসঙ্কোচ স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারে। অধ্যাপনাও ঘরের মধ্যে না হইয়া গাছের তলায় বা অন্য খোলা জায়গায় হয়। তা ছাড়া, তাহাদের খেলার জায়গা আছে। তাহারা জাপানী ব্যায়াম জুজুৎসুও শিখিতে পারে। ইহা ব্যায়াম এবং আত্মরক্ষার উপায় দুই-ই। জাপানের একজন বড় ওস্তাদ ইহা শিখাইয়া থাকেন। অনেক মেয়ে ইহা শিক্ষা করে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ভালই শিখিয়াছে। কাশীতে পৌষ মাসে যে সমগ্র এশিয়ার শিক্ষা-কনফারেন্স হইয়াছিল, তাহাতে ইহারা জুজুৎসুর কৌশল দেখাইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বাসগৃহ আছে। কবি ইহার নাম প্রথমে শ্রীভবন এবং পরে শ্রীনন্দন দিয়াছেন। এখানে

ছোট ও বড় মেয়েরা শ্রীযুক্তা হেমবালা সেন বি-এ'র সুযোগ্য ও সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বাস করে। শান্তিনিকেতনের এই এবং অন্যান্য অট্টালিকা ও রাস্তা সন্ধ্যার পর বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হয়।

বিশ্বভারতীর শিক্ষার আদর্শ সর্ব্বাঙ্গীন। আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে পরিণত করা বড় কঠিন। এখানে তাহা কতকটা হইয়াছে। বিশ্বভারতীর আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে দুটি জিনিষ চাই। কবিকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবর্ষ পঙ্গু। কবি বিশ্বভারতীতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় চালাইতে ব্যগ্র; কিন্তু অর্থাভাবে পারেন না। তথাপি কিয়ৎপরিমাণে তাহা আছে।

বিশ্বভারতীতে সকল রকমের শিক্ষার যেমন একত্র সমাবেশ আছে, ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা নাই। এখানে মেয়েরা সাধারণ শিক্ষা ছাড়া, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিখিতে পারে। চিত্রাঙ্কণবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থাও এখানে আছে। তাহার সঙ্গে মূর্ত্তিগঠনও

কুমারী আশা অধিকারী এম-এ—কলেজ-ক্লাসে সংস্কৃত পড়াইতেছেন

এমন সব অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা আবশ্যক, যাঁহারা কবির আদর্শে আস্থাবান্ এবং তাহা বুঝিয়া তদনুসারে কাজ করিতে সচেষ্ট ও সমর্থ। এরূপ সুশিক্ষক তিনি একেবারে পান নাই, এমন নয়। পাইয়াছেন। কিন্তু আরো বেশী পাওয়া দরকার। বিশ্বভারতীর আয়বৃদ্ধিও আবশ্যক। আধুনিক শিক্ষা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সামান্যই আছে। সেই তাহারা শিখিতে পারে। কাঠের ছবি খোদাইয়ের কাজও শিখান হয়। সেলাই ও অন্যবিধ সূচিশিল্প শিখিবার সুযোগ আছে। রন্ধনাদি নানাবিধ গৃহকর্ম্মও মেয়েরা শিক্ষা করে।

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন বিভাগে মেয়েরা নানারকম শিল্পের কাজ শিখিতে পারে। বীরভূমের ইলামবাজার প্রভৃতি স্থান গালার খেলনা প্রস্তুত করিবার জন্য বিখ্যাত। শ্রীনিকেতনে ইহা শিখান হয়। কাঠের বাক্স, পাত্র প্রভৃতির উপর লাক্ষালেপন (lacquer work) প্রভৃতিও শিক্ষা

শ্রীনন্দন—অন্তঃপ্রাঙ্গণ

দেওয়া হয়। এখানে নূতন নূতন পরিকল্পনা (ডিজাইন) অনুযায়ী পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজও শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েরা কাপড় সতরঞ্চ আসন প্রভৃতি বুনিতে এবং জয়পুর বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি স্থানে যেমন ছাপ-দেওয়া কাপড় প্রস্তুত হয়, কাপড়ে সেইরূপ ছাপ দিতে শিখে। তরকারীর বাগানের কাজও তাহারা শিখিতে পারে। এখানের একজন শিক্ষয়িত্রী কাপড় জামা প্রভৃতির উপর সূচিশিল্পের নানারকম সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা শিক্ষা দেন। কাপড় রঙাইবার ও চিত্রিত করিবার "বাটিক"-প্রণালীও এখানে শিখান হয়।

ধর্ম্মই মানবসমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীগণ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আচরণ শিক্ষা করিতে পারেন। এখানে প্রাতঃসন্ধ্যা সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা আছে। তদ্ভিন্ন প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা হয়। কবি যখন সুস্থ থাকেন ও শান্তিনিকেতনে থাকেন, তখন তিনি বুধবারের উপাসনা করেন। অন্য সময়ে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক—সাধারণতঃ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়—এই সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়া থাকেন। এখানে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান ও ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে।

এখানে বর্ষাকালে বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ উৎসব ও বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়। শীতকালে ৭ই পৌষের উৎসব এবং মাঘোৎসব হয়। বসন্ত কালেরও সুশোভন উৎসব আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এবং এই সকল উৎসবের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতির প্রভাব পরোক্ষভাবে অনুভব করে।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে নানা বিদ্যার ও ভাষার বহু গ্রন্থ আছে। অনেক সংবাদপত্র, মাসিক পত্র ও ত্রৈমাসিক পত্র আছে। ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি হস্তলিখিত সচিত্র পত্রিকা আছে। সম্প্রতি কলেজ বিভাগের ছেলেমেয়েরা "হেরাল্ড" নাম দিয়া একটি টাইপলিখিত সাপ্তাহিক বাহির করিতেছে। চীন ও তিব্বতীয় গ্রন্থের সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার সুবিধা এখানে আছে। সমগ্র বিদ্যালয়ের এবং এক এক বিভাগের সাহিত্যসভা আছে। তাহাতে ছাত্রছাত্রীরা স্বরচিত প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা পাঠ করে এবং প্রসিদ্ধ কবিদের কবিতা আবৃত্তি করে।

নিকটবর্ত্তী গ্রামের বালকবালিকা এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগীর পরিচর্য্যা শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতির কাজও ছাত্রছাত্রীরা করিয়া থাকে।

শীতকালে ছাত্রছাত্রীরা কোন কোন অধ্যাপক অধ্যা-

পিকার তত্ত্বাবধানে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে যায়। তাহাতে তাহাদের দেশদর্শন হয় এবং নিজেদের দৈনন্দিন সব কাজ নিজেই করিবার অভ্যাস বাড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানে ছাত্র ও ছাত্রীরা একত্র শিক্ষা লাভ করে। বাংলাদেশের বালকদের কোন কোন প্রাথমিক পাঠশালায় দুচারজন বালিকাও শিক্ষা পায়; কিন্তু সাধারণ ইংরেজী স্কুল-সকলে এরূপ একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণতঃ দেখা যায় না। কলিকাতার ও মফঃস্বলের কোন কোন কলেজে ছাত্রদের সহিত ছাত্রীরা একই ক্লাসে পড়ে বটে। বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভ সম্বন্ধে ছাত্র ও ছাত্রীদের সমান অধিকার যেমন স্বীকৃত হইয়াছে, জ্ঞানদান সম্বন্ধেও তেমনি অধ্যাপকদের সহিত অধ্যাপিকাদের সমান অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। স্কুলবিভাগে যেমন অধ্যাপকদের নিকট ছাত্র ও ছাত্রী উভয়েই এক এক শ্রেণীতে পড়ে, তেমনই কয়েকজন অধ্যাপিকার নিকটও পড়ে। তদ্ভিন্ন, কলেজ বিভাগের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী হইতে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে শ্রীযুক্তা আশা অধিকারী এম্-এ ছাত্রছাত্রীদিগকে সংস্কৃত পড়াইয়া থাকেন। শিশুবিভাগের ভারও তাঁহার উপর আছে। সুযোগ পাইলে কবি অধ্যাপিকার সংখ্যা আরও বাড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে বাংলা ছাড়া অন্য প্রদেশের কতকগুলি ছাত্রীও শিক্ষালাভ করেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে বাঙালী ছাত্রীরা সমগ্রভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির (cultureএর) জ্ঞান পরোক্ষভাবে লাভ করিতে পারে ও তাহার প্রভাবে উপকৃত হইতে পারে। বিদেশী ছাত্রীও এখানে কোন-না-কোন বিদ্যা শিখিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এখন একটি জাপানী ছাত্রী—শ্রীমতী হোশী (Hoshi)—বাংলা ও সংস্কৃত শিখিতেছেন। ইনি একদিন লাহোরে সমগ্র এশিয়ার মহিলাদের কন্‌ফারেন্সে সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিদেশী ছাত্রীদের সংস্পর্শও হিতকর।

শ্রীনন্দন

মোটের উপর, এখানে ছাত্রীদের শিক্ষার যেমন বন্দোবস্ত আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তাহা আছে বলিয়া অবগত নহি—বঙ্গে ত নাই-ই।

আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠের অপকারিতা

শ্রী অসিতনাথ রায় চৌধুরী

উপন্যাস পাঠ করা খুব খারাপ একথা বললে একদেশ-দর্শিতার দ্বারা সত্যের অপলাপ করা হবে *। তবে উপন্যাস যদি সৎসাহিত্যের অন্তর্গত না হয়, অর্থাৎ উপন্যাস যদি কেবলমাত্র অশ্লীল সাহিত্যের নামান্তর হয়, তবে উপন্যাস ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে ত দূরের কথা, সমাজের অথবা জাতির পক্ষেও পরোক্ষভাবে বিশেষ অনিষ্টকারী।

জাতীয় ইতিহাস পাঠে যেমন কোন জাতি-বিশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, উপন্যাসপাঠেও সেইরূপ আমরা নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করতে পারি। নায়ক-নায়িকার কৈশোর অথবা যৌবনকাল থেকে আরম্ভ ক'রে তার জীবনের অধিকাংশ ভাগ যেরূপে অতিবাহিত হয়েছে অথবা হয়, তার সঙ্গে পাঠকের নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বাংশ অথবা কতকাংশ হুবহু মিলে যায় ব'লে, পাঠকের হয়ত কোন কোন উপন্যাস ভাল লাগে, কিম্বা উপন্যাসের আখ্যানভাগে এমন কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ থাকে, যাতে ক'রে তা পাঠকের হয়ত বিশেষ তৃপ্তিদায়ক হ'য়ে থাকে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তরল অথবা লঘু উপন্যাস পাঠে মনোবৃত্তি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া নিরোধ হয় না। সেই কারণে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ অথবা নারীর পক্ষে চিত্তচাঞ্চল্য-কর উপন্যাস পাঠ করা আদৌ সঙ্গত নয়।

উপন্যাস বলতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক ছাড়া এমন কয়েকজন অজানা অচেনা লেখকের বই আজকাল আমরা দেখতে পাই যা সস্তাদরে বস্তাভরা পেলেও আসলে কিন্তু আমরা তাতে ভূষি ছাড়া মাল কিছুই পাই না। শুধু চাঁদের আলো, ভাদ্রের ভরা নদী, বসন্ত-পবন-হিল্লোল প্রভৃতি গালভরা বাক্যসমষ্টির উল্লেখ ক'রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা দ্বারা অথবা কোন উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকার রূপ-বর্ণনা করবার সময় সেই মামুলী প্রথায় "চুলগুলো তার ভ্রমর-কৃষ্ণ, চোখদুটি তার পটলচেরা, ভ্রূযুগল তার ধনুর আকার, গ্রীবাভাগটি মরাল-সম" ইত্যাদি বাক্যচ্ছটা অথবা শব্দবিন্যাসের দ্বারায় পাঠকের মন মোহিত করবার ব্যর্থ চেষ্টা কোন লেখকের পক্ষে খুব শ্লাঘার বিষয় নয়। যে উপন্যাসে আদর্শ পিতৃ চরিত্র, মাতৃ-চরিত্র, স্বামী-চরিত্র, ভগিনী চরিত্র, ননদ-চরিত্র প্রভৃতি নাই, সে উপন্যাস পাঠ করার কোন সার্থকতাই উপলব্ধি করতে পারি না। তা ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই উপন্যাসের বিষয়-ভাগে নূতনত্ব নাই - ভাষায় মাধুর্য্য নাই - বর্ণনা ত্রুটি-বিচ্যুতি-বহুল - আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ নাই এবং বহু অংশে বর্ণনীয় বিষয় অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। সেক্ষেত্রে বুঝতে পারি না কেন সেই সমস্ত লেখক পুস্তকের প্রচ্ছদপটে ছাপার হরফে তাঁদের নিজেদের নাম দেখবার জন্যে লালায়িত হন। এমন দুই একজন লেখককে জিজ্ঞাসা করলে বলেন "For satisfaction আত্মতৃপ্তির জন্য) বইখানা লিখেছিলাম।" কিন্তু আত্মতৃপ্তির জন্যই যদি হয় তবে আমার মনে হয় যা-তা একটা বড় গল্প অথবা উপন্যাস ৫।৭ টাকা ফর্ম্মা-দরে, কিস্তীবন্দিতে পরিশোধ করবার কড়ারে, মুদ্রাযন্ত্র-কর্ত্তৃপক্ষের শরণাপন্ন না হ'য়ে, বাঁধানো, রুলটানা, তকতকে, ঝকঝকে Exercise bookএ সেগুলো লিখে রাখলেই ভাল হয়। তাতে ক'রে লেখকের আত্মতৃপ্তিও হয়, অথচ লোকসমাজে, কিম্বা পাঠকসমাজে অথবা সাহিত্য আসরে তাঁকে নিন্দনীয়ও হ'তে হয় না।

উপন্যাসের নাম দিয়ে আজকাল এমন কতকগুলো অশ্লীল সাহিত্য অবাধে প্রচলিত হয়েছে - যা বাস্তবিকই সমাজের তথা জাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। এমন উপন্যাস

---

* ১৩৩৪-এর মাসিক বসুমতীর 'দপ্তর'-বিভাগে প্রকাশিত 'উপন্যাস পাঠের উপকারিতা' পাঠকগণ পড়িয়া দেখিবেন।—বঃ সঃ

আজকাল খুব কমই দেখতে পাই যা স্বচ্ছন্দে মা-বোনদের সামনে অসঙ্কোচে পড়া যায় অথবা পড়বার জন্যে তাঁদের হাতে নির্ব্বিবাদে তুলে দেওয়া যায়।

অনেক লেখক তাঁদের বর্ণিত বিষয়ভাগকে "সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত" ব'লে মুখবন্ধে প্রচার করেন। কিন্তু ঘটনা সত্য হ'লেও উত্তেজক অশ্লীল কোন ঘটনা অথবা বিষয়কে বর্ণনা ক'রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করবার অধিকার তাঁর থাকতে পারে না।

বর্ণিত ঘটনা সত্য বা মনগড়া যেমনই হোক, এটুকু বললে বোধহয় বিশেষ গর্হিত হবে না যে এই সকল উত্তেজক সাহিত্য অনবরত পাঠ করতে করতে পাঠকের মনোবৃত্তি বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়। সকলেই জানেন এইরূপ কয়েকখানি অশ্লীল পুস্তক অমুকের "আত্মকাহিনী" নাম নিয়ে এতই প্রচলিত হয়েছে যে প্রত্যেক মাসে মাসে সংস্করণের পর সংস্করণ মুদ্রিত ও বিক্রীত—এমন কি ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় ভাষান্তরিত হ'চ্ছে। কিন্তু ঐগুলি দেশের যুবকদিগকে যে হলাহল বণ্টন ক'রে দিচ্ছে তার ফলে অনেকের অধোগতি অনিবার্য্য।

এই সমস্ত নানাকারণে আমি বলতে বাধ্য হ'চ্ছি যে উপন্যাস পাঠ করা, অন্ততঃ অনবরত পাঠ করা, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আজকাল এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং তার দরুণ বর্ত্তমান সাহিত্য কুঞ্জে এত আগাছার সৃষ্টি হয়েছে ও হ'চ্ছে যে সেই সমস্ত আগাছা বা পরগাছাগুলো সম্পূর্ণ ভাবে উচ্ছেদ ক'রে সেই পবিত্র সাহিত্যকুঞ্জকে সুসংস্কৃত করবার উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও কাব্য-বিশারদের মত কয়েকজন ভাল মালীর আবির্ভাব আশু-প্রয়োজনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এতদ্ভিন্ন উপন্যাসপাঠের বাতিক আজকালকার মেয়েদের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রচলিত হ'চ্ছে। তাতে তাঁরা আর পূর্ব্বের মত রন্ধনবিদ্যায় বা গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হ'তে পারছেন না। পাঁচ রকমের পাঁচখানা নিজেদের হাতে তৈরী ক'রে যে তাঁরা সকলের সামনে দেবেন বা অন্যান্য গৃহস্থালী কাজ ভাল ক'রে করবেন সে অবসর তাঁদের কই? যে সময়টুকু তাঁরা ঐ কাজে ব্যয় করবেন সে সময়ে তাঁরা উপন্যাসখানির আরও খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে নায়িকার কি পরিণতি হ'ল সেটা দেখতে উৎসুক। তাই বলছি উপন্যাসপাঠের প্রাচুর্য্য হেতু সংসারের অনেক খুঁটিনাটি কাজে আজকাল মেয়েরা অবহেলা করেন এটা আমার দৃঢ় ধারণা।

অন্যদিকে তাকালে দেখতে পাই উপন্যাসপাঠের আধিক্যহেতু পল্লীসংস্কার প্রভৃতি করণীয় কার্য্যের কথা যুবকেরা চিন্তা করবার অবসর পান না। তাঁরা সহরে বাস ক'রে বাবু হ'য়ে বসেছেন—পল্লীর কথা ভাববার তাঁদের সময় হয় না। উপন্যাস পাঠ ক'রে তাঁরা অনেকে বিলাসী এবং অসংযমী হ'য়ে পড়েছেন; অথচ আজও বুঝলেন না যে বিলাস জিনিষটা সংযমসাধনের পরিপন্থী। তাঁরা সব এতদূর বাবু হ'য়ে পড়েছেন যে যেখানে ট্রাম নাই, থিয়েটার নাই, ভাল রজক নাই, সখের সামগ্রীর মনোহারী দোকান নাই, বিদ্যুতের পাখা নাই, তড়িতের আলোক নাই, সেখানে তাঁরা থাকতে পারেন না। কেননা আজকাল-কার ঐ সব রাশি রাশি রাবিশ উপন্যাস পাঠ ক'রে তাঁদের প্রবৃত্তি ঐরকম ভাবেই গ'ড়ে উঠেছে।

পরিশেষে আমি আবার বলতে চাই যে কতকগুলো লঘু সাহিত্য পড়লে অথবা উত্তেজক কতকগুলো বাজে উপন্যাস পড়লে পাঠকদের বুদ্ধিবৃত্তি ঐ এক প্রেমবিষয়ক ছাড়া অন্যদিকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ভোঁতা হ'য়ে যায় এবং তার দরুণ সেই সমস্ত উপন্যাস-পাঠকদের পক্ষে উচ্চস্তরের চিন্তা করতে বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়। কেননা, লঘু ও তরল বিষয় চিন্তা করতে করতে তাঁদের মনোবৃত্তি এত খাটো ও নীচু হ'য়ে যায়, যাতে ক'রে তাঁদের পক্ষে ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চস্তরের পুস্তকাদি পাঠ ক'রে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অথবা সে সমস্ত জটিল বিষয়ে স্বাধীনভাবে উচ্চচিন্তা করতে তাঁরা বিশেষভাবে অশক্ত হন।

এই সমস্ত নানা কারণে যা-তা লেখকের লেখা যা-তা উপন্যাস পাঠ না করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

নানা কথা

সম্ভোগ-সংঘাত

বহুকে বঞ্চিত ও নিগৃহীত করিয়া অল্পের স্বাচ্ছন্দ্য-লাভ-নীতি বা ভোগ-সংঘাত দ্বারা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক ঘোর অশান্তির দুর্য্যোগ সংক্রমিত হইয়া নিদারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছে। কিছুদিন হইল মহাজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্য জগতকে এই ভোগমদ হইতে বিরত হইবার জন্য সতর্কবাণী এবং এই বিক্ষোভ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র সত্যপথের সন্ধান দান করিয়া আসিয়াছেন—যাহার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে আরও একবার বলিয়াছি *। মহাত্যাগী মহাত্মা গান্ধীও একাধিকবার ইহা বলিয়াছেন,—এবং শুধু বলা নহে, স্বীয় জীবনের ত্যাগ রিক্ত তপস্যা দ্বারা আজও পর্য্যন্ত ইহা বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছেন। ভগবান্ বিশ্ব ভাগ্যবিধাতা জানেন, সম্ভোগীর এই ভোগমোহ কবে ছুটিবে!

*

বৈরাগী ভারত

ঐ সংঘাত-জাত বিক্ষোভেরই অন্যতম প্রকাশ—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শান্তি-হীনতা। সৌভাগ্যের বিষয়, বৈরাগী ভারত তাঁহার আত্মার নির্দ্দেশ হারান নাই,—ত্যাগ এবং অহিংসাকেই তিনি আত্মরক্ষার অনন্যসহায় অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রেমের দ্বারা জয়ী হইতে চান,—শুধু স্বদেশের নহে, জগতের শান্তিপ্রতিষ্ঠা তাঁহার লক্ষ্য।

*

শান্তি-সন্ধি

ভোগ-নিমজ্জন, মানুষের আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও, অবিনাশী আত্মার বিলুপ্তি ঘটে না। ভোগের কলুষ-পঙ্কেও ত্যাগের পঙ্কজ-বীজ সংগুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে, এবং একদা অনুকূল লগ্নে তাহা উপ্ত হইয়া উঠিয়া পঙ্ককে অতিক্রম করিয়া মৃণাল-পথে আলোক উন্মুখ হয়। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন একথা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই। বর্ত্তমান গান্ধী-আরুইন শান্তি সন্ধি ইহাই প্রমাণিত করিল। এই যুগসন্ধি কালে এই যে ভোগ আসিয়া ত্যাগের কর-ধারণ করিল, ইহা বিশ্ববিধাতার দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য বলিয়া মনে করি। জগতের ইতিহাসে ইহা শান্তি-সন্ধি নামে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই।

*

ভোগের আক্ষেপ

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এখানে না বলিয়া পারিলাম না। কথাটা এই—যে, আরোগ্যমুখ পীড়িতদেহের মত ত্যাগমুখ ভোগেও আক্ষেপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কথিত সন্ধির সূচনায় সম্রাটপ্রতিনিধি সাধু আরুইন তাঁহার

* বঙ্গলক্ষ্মী—ফাল্গুন, ১৩৩৭।

প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ভোগদেহ শিহরিত হইয়া এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশিত হইয়াছিল †—"অৰ্দ্ধনগ্ন ভারতীয় ফকির সম্রাট-প্রাসাদের মর্ম্মরসোপান অতিক্রম করিতেছেন, ইহা স্মরণ করিলেও যুগপৎ ঘৃণা ও লজ্জায় শরীর শিহরিয়া উঠে ..."

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই—ইহাই স্বাভাবিক। আমরা শুধু বলি—'সাধু আরুইন! তোমার শুভেচ্ছা পূর্ণ হোক, সার্থক হোক!'

*

লেডী আরুইনের আবেদন

সম্প্রতি মাননীয়া লেডী আরুইন দিল্লীতে একটি মহিলা-শিক্ষায়তন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আবেদনী প্রকাশিত করিয়াছেন—যাহাতে 'চাঁদা' দ্বারা তেরলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। প্রস্তাবিত শিক্ষায়তন—শিক্ষাবিধি সম্বন্ধীয় গবেষণা, শিক্ষাদানপ্রণালী শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। ঐ শিক্ষায়তন-সংলগ্ন একটি বালিকাবিদ্যালয়ও থাকিবে—উক্ত বিষয়গুলি practically বা কার্য্যতঃ শিক্ষা করিবার জন্য।

সাধু আরুইনের সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে আমরা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

*

ছাত্র-সম্মিলনে কমলা দেবী

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'নিখিলবঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনের' সভানেত্রী মনোনীত হইয়া বিদুষী শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী কমলা দেবী বিশ্ববিখ্যাতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতৃবধূ, এবং ননন্দার মতই বাগ্মিতাশালিনী ও সর্ব্বজন-পরিচিতা। প্রথম শ্রেণীর একজন অভিনেত্রীরূপেও ইঁহার খ্যাতি আছে। কিছুদিন হইল কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে প্রদর্শিত 'বসন্তসেনা' নামক চিত্রাভিনয়ে ইঁহার অভিনয় অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। সর্ব্বশেষে, ইনি একজন দেশমাতৃকার একনিষ্ঠা পূজারিণী।

•

† এই আক্ষেপে ভাষা দিয়াছিলেন মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি-উৎসব

আগামী বৈশাখের ২৫শে (১৩৩৮) মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বয়ঃক্রমের সপ্ততিতম সীমারেখা উত্তীর্ণ হইবেন। ঐ দিন শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসব যাহাতে সৌষ্ঠব-সমারোহে সার্থক হইতে পারে তাহার জন্য বিশ্বভারতী-সংসদ একটি আবেদন-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন *। অপর একটি আবেদনীও প্রচারিত হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী, স্যার জগদীশ বসু, রোমা রলাঁ, এলবার্ট আইনষ্টাইন, কোষ্টিস্ পালামাস প্রভৃতি গুণীগণ কর্ত্তৃক সম্মিলিতভাবে। তাঁহাদের বক্তব্য এইযে—দেশবিদেশের অনুরক্ত ভক্ত বান্ধব আত্মীয়গণ মহাকবির চতুর্দ্দিকে মণ্ডলী রচনা করিয়া অন্তরের প্রীতি দিয়া কবিকে অভিনন্দিত করুন। †

* যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন,

আগামী ১৩৩৮ সনের ২৫শে বৈশাখ পূজ্যপাদ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষে আমরা শান্তিনিকেতনে সুচারুভাবে একটি জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে কবি এবং তাঁহার অনুষ্ঠানের সহিত প্রীতিযুক্ত সহৃদয়বর্গের শুভেচ্ছা ও সহযোগ লাভ করিব, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

এই সময় বিশেষ ভাবে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক, কর্ম্মী, অথবা যাঁহারা যে কোনো ভাবে আশ্রমের সঙ্গে মনে মনে যোগযুক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইলে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।

প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের ঠিকানা এবং জন্মোৎসব সম্পর্কীয় যাবতীয় চিঠি-পত্রাদি শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

শান্তিনিকেতন—১৩ই ফাল্গুন ১৩৩৭ সন।

নিবেদক

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	শ্রী নন্দলাল বসু
শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন	শ্রী প্রমোদারঞ্জন ঘোষ
শ্রী নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রী গৌরগোপাল ঘোষ
শ্রী নেপালচন্দ্র রায়	শ্রী আশা অধিকারী
	শ্রী হেমবালা সেন

† "কবির জন্মদিনের উৎসব শান্তিনিকেতনে অবশ্য ২৫শে বৈশাখই হইবে। সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার জয়ন্তী-উৎসব ১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) হইবে।"—প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৭।

আমরা আমাদের পুরাতন ভাষায় ‡ আমাদের গৌরব-রবিকে আবার অভিনন্দন জ্ঞাপন করি—"প্রদোষ-বর্ণচ্ছটায় ভারত-গগন অনুরঞ্জিত হইয়া উঠুক, এবং গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ প্রদোষক্ষণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক।"

*

"রবীন্দ্রনাথের দান"

এই উৎসব উপলক্ষে "রবীন্দ্রনাথের দান" বাচক একটি রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া কবিকে অর্ঘ্যদান করিতে বিশ্বভারতী-সংসদ ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং সেইজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে আহ্বান করিয়া একখানা পত্র প্রচারিত হইয়াছে—তাঁহাদের রচনার জন্য (ক)।

*

"রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণগ্রন্থ"

"Golden Book of Tagore" বা "রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণ-গ্রন্থ" নামক অপর একখানি সচিত্র সংগ্রহ-গ্রন্থও প্রকাশিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ, যাঁহারা মিলিতভাবে উৎসব-আবেদনী প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি গ্রথিত হইবে। "Golden Book of Tagore"—এই সংগ্রহের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন ফরাসী মনীষী রোমাঁ রলাঁ। ইঁহারাও প্রবন্ধ ও চিত্রের জন্য বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পীদিগকে আহ্বান করিয়াছেন (খ)।

*

গুরুসদয়ের আবিষ্কার ও রবীন্দ্রনাথ

'রাই-বেশে'র মধ্যে 'রায়বেঁশে' যোদ্ধার সন্ধানলাভ বা যুদ্ধনৃত্য-রূপ দেশের লুপ্তরত্নের উদ্ধার করিয়া, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আমাদের জাতিকে যে কিরূপ মহামূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা গতবারে দিয়াছি। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, ঐ "রায়বেঁশে" নৃত্যপ্রণালী তিনি শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়া সমাজে নির্ম্মল আনন্দের আবেষ্টন রচনা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয়-নৃত্যের আবিষ্কার ও প্রচারে মুগ্ধ হইয়া সম্প্রতি গুণীশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (গ)

*

বিশ্বভারতীতে "রায়বেঁশে" নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা

বিশ্বকলাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ এই "রায়বেঁশে" নৃত্য-আবিষ্কারে শুধু আবিষ্কারককে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী শিক্ষায়তনে যাহাতে এই অপূর্ব্ব নৃত্যকলা শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই "রায়বেঁশে" নর্ত্তক-দলের নৃত্য সম্প্রতি বিশ্বভারতীতে প্রদর্শিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

*

আবিষ্কারের ক্ষোদিত প্রমাণ

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের সৌজন্যে শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁহার "রায়বেঁশে" আবিষ্কারের অন্যতম ক্ষোদিত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা বীরভূম জেলার কোন পল্লীগ্রাম-বিশেষের ইষ্টকনির্ম্মিত একটি মন্দিরের একখানি উৎকীর্ণমূর্ত্তি ইষ্টকখণ্ড। বসু মহাশয় এই শতাব্দী-পুরাতন ইষ্টকখণ্ড অনেকদিন পূর্ব্বে হস্তগত করিলেও, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, এবং উহা যে আবিষ্কারকেরই প্রাপ্য সৌজন্যের সহিত ইহা জ্ঞাপন করিয়া, তিনি তাঁহাকে সাগ্রহে ইহা উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। *

*

‡ 'নানাকথা'—বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন, ১৩৩৭।

(ক) শ্রীমতী আশা অধিকারী, শান্তিনিকেতন—এই ঠিকানায় রচনাবলী পাঠাইতে হইবে।

(খ) চিত্র ও প্রবন্ধাবলী প্রেরিত হইবে—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, এই ঠিকানায়।

(গ) রবীন্দ্রনাথের অভিমত-লিপি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

* এই উৎকীর্ণ মূর্ত্তির চিত্র-পরিচয় শীঘ্রই বঙ্গলক্ষ্মীতে মুদ্রিত হইবে।

চণ্ডীদাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি

সম্প্রতি (২২. ২. ৩১) প্রাচীন বাংলার মহাকবি চণ্ডীদাসের জন্মভূমি "নান্নুর" গ্রামে, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়া, "চণ্ডীদাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি" নামে একটি সংসদ সংগঠিত হইয়াছে। ইহার মনোনীত সভাপতি—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্; সহ-সভাপতিগণ—রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘোষ; সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—রায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর। ঐ সমিতি-সংগঠন সভায় এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—যে, বঙ্গগৌরব মহাকবি চণ্ডীদাসের স্মৃতি সুন্দর ও স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য তাঁহার জন্মভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র "নান্নুর"কে দেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তীর্থে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হউক নিম্নলিখিত ভাবে —(ক) চণ্ডীদাসের ভিটা খুঁড়িয়া প্রত্নসংগ্রহ প্রচেষ্টা; (খ) 'দেবপাত' পুকুর (চণ্ডীদাসের সাধন-সহচরী রজকিনী রামী যেখানে কাপড় কাচিতেন বলিয়া প্রবাদ) ও তাহার পাড়গুলির সংস্কার এবং উহার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন-সংস্থাপন; (গ) রজকিনী রামী যে প্রস্তরখণ্ডের উপর কাপড় কাচিতেন বলিয়া প্রবাদ, তাহা পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের উচ্চ ভিটার উপর সংরক্ষণ।

দেশ-প্রাণ গুরুসদয়ের দৃষ্টি শুধু কোন-একটি বিষয়-বিশেষেই নিবদ্ধ নহে, দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্যেই তিনি সম-তৎপর। দেশবাসী তাঁহার এই দেশপ্রাণতা অবশ্যই বিস্মৃত হইবে না।

*

স্বর্গীয়া উমা দেবী

বাতায়নের কবি উমা দেবীর অকাল-তিরোধানে আমরা আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছি। বঙ্গভারতী তাঁহার একজন একনিষ্ঠা পূজারিণীকে হারাইয়া সত্যই ক্ষতিগ্রস্তা হইলেন। কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাসে তাঁহার দক্ষতা সমানভাবে ফুটনোন্মুখ হইয়াছিল। তাঁহার 'বাতায়ন'নামক কাব্যগ্রন্থ সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'প্রবাসী'তে তাঁহার অনেক ছোট গল্প আমরা পড়িয়াছি এবং সুখ্যাতি করিয়াছি। ১৩৩৬-এর 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁহার 'কাজলী' নামক উপন্যাস পড়িয়া আমাদের ভালো লাগিয়াছিল। এইরূপ একটি প্রাণবান প্রতিভা ফুটবার মুখেই টুটিয়া গেল। কবি রজনী সেনের গানের একটি চরণ আমাদের মনে পড়িতেছে—

ফুটিতে পারিত গো
ফুটিলনা সে—"

*

বৈশাখের বঙ্গলক্ষ্মী

আগামী বৈশাখ-সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী বিচিত্র ও বিশিষ্ট চিত্র ও প্রবন্ধ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির চিত্রালঙ্কারে ইহা শোভনতর হইয়া পাঠকপাঠিকা-গণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করি। রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণকিরণসম্পাতে ইহার আরম্ভ-পত্র চিত্ত-উজ্জ্বল-কারী হইবে;—তারপর থাকিবে গুরুসদয়ের বহুচিত্রময় কাব্যনিবন্ধ 'রায়বেঁশে'র পরিচয় ও 'রায়বেঁশে'র গান, শ্রীমতী সীতা দেবীর সুন্দর গল্প 'গোরমণির ছেলে', শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রের 'বঙ্গসাহিত্য', শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণিকা, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরীর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস 'ভূত-ভারতী', শ্রীমতী দীপ্তি দেবীর ছোট গল্প, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সন্দর্ভ, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'শ্রী সেবক' প্রভৃতির কবিতা, এবং আরও অনেক-কিছু।

'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রত্যেক বাঙালীর সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে।

*

আনন্দ-সন্ধ্যা সম্মিলন

সম্প্রতি (১৯. ১০. ৩১) সিউড়ি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে 'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে একটি আনন্দ-সন্ধ্যার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সমিতির সভাপতি পল্লী-প্রেমিক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এবং সিউড়ি প্রদর্শনী কমিটির নিমন্ত্রণে

কলিকাতা হইতে কবি শ্রীযুক্ত জসীম উদ্দিন, কবি শ্রীযুক্ত মনোজ বসু প্রমুখ পাঁচজন শিল্পী সিউড়িতে গমন করিয়াছিলেন। এই পরম উপভোগ্য আনন্দ-সন্ধ্যা তাঁহাদের পরিকল্পিত এবং দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে পরিপুষ্ট। বাংলার যে আনন্দময় প্রাণবস্ত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহার সংকিঞ্চিৎ সভা-সমক্ষে উপস্থাপিত করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। যে অপূর্ব্ব নৃত্য ও গীত অবহেলায় ও দারিদ্র্যে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, কবি জসীম উদ্দীন প্রারম্ভে অতি আবেগময়ী ভাষায় তাহার পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ অতঃপর পল্লীসঙ্গীত গান করেন। এই সকল গানের কবি অখ্যাত গ্রাম্য-কৃষক—কিন্তু গানের সুরে পল্লীর আনন্দ-বেদনা যেন গলিয়া গলিয়া পড়ে। বিনয় বাবুর সুরের মায়ায় সভার মধ্যে নদীসঙ্কুল পূর্ব্ববঙ্গ, তথাকার মধুর বিরহ-বেদনা, তাহার কলাবন, বাঁশঝাড় যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। তারপর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় পল্লীনৃত্য প্রদর্শন করেন। সকলগুলিই দর্শকদিগকে অপরিসীম আনন্দ দান করিয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের বাউলনৃত্যের সত্যই তুলনা নাই। শ্রীযুক্ত মনোজ বসু স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর স্মৃতি-অবলম্বনে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। (ফাল্গুনের বিচিত্রায় কবিতাটি ছাপা হইয়াছে। *) প্রাতঃকালের সভায় উহা পাঠ করা হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ সেই সময়ে এত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে পুনরায় এই সময়ে উহা পাঠ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। পুনরায় মনোজ বাবু উহা আবৃত্তি করেন। ভাবলালিত্যে, আন্তরিকতায় এবং ফল্গুনদীর মত আন্তর্নিহিত বেদনার ইঙ্গিতে কবিতাটি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। সভার সকলের চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। দত্ত মহাশয়ের কর্ম্মময় জীবনের অন্তরালবর্ত্তী সুগোপন ব্যথাটুকু সেই মুহূর্ত্তে সকলের চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইলা দেবী, শ্রীযুক্ত এস্, কে, হালদার, রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় লাল, হেতমপুরের কুমার সাহেবগণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ও প্রশংসাবাক্যে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

* বৈশাখের বঙ্গলক্ষ্মীতে উহা উদ্ধৃত হইবে।—বঃ সঃ

চলার গান

(বাউলের সুর)

শ্রী হেমলতা দেবী

বাজে কথার দিন্ গিয়েছে—এখন কাজের কথা বল্।
সবাই মিলে একযোগে আজ মানুষ হওয়ার পথে চল্॥
স্বষ্টিখানা যেমন খাঁটি—
খাঁটি যেমন ধরার মাটি—
তেম্নি খাঁটি হ'তে হবে, ছাড়্তে হবে মিথ্যা ছল্।
বুঝ্তে যেন পারে সবাই
অন্তরে মোর কি আছে ভাই ;—
কাজে কথায় ঐক্য হ'লে ফল্বে যে অব্যর্থ ফল॥

মোহের আলস যাবে ছেড়ে,
মনের সাহস যাবে বেড়ে ;—
ঘুচ্বে সবার মলিন বদন—ফুচ্বে মুখে অন্ন-জল।
চল্তে হবে দিনের আলোয়,
মান্তে হবে সবার ভালোয় ;—
সাম্নে তুলে ধর্তে হবে অন্তর্য্যামীর অমোঘ্ বল।
চলার পথে সচল হ'য়ে অচল অবল সবাই চল্॥ *

* সিউড়ি প্রদর্শনীতে বাউল-নাচের সঙ্গে গীত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পারস্যের নারী

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত, বাঙলার মেয়েরা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশগুলির বিষয় প্রায় কিছুই জানতেন না। ঘর-সংসার ছাড়া আর-কোনো বিষয়ে তাঁদের মন দেবার কোনো সুযোগ বা সুবিধা ছিল না। এখন নানা কারণে তাঁদের এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে গিয়েছে। বাইরের জগতের খবর তাঁরা কিছু কিছু পাচ্ছেন, এবং বাইরের জগৎও তাঁদের খবর কিছু কিছু পাচ্ছে। ভারতবর্ষীয় সকল প্রদেশের মেয়েদের সভা-সমিতি প্রায়ই হচ্ছে। এবার লাহোরে এসিয়ার নারীদেরও একটি সম্মিলন হয়ে গেছে। এতে আরো মনের প্রসার বাড়বার এবং অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করবার সুবিধা মেয়েদের হবে ব'লে আশা করা যায়।

এসিয়ার অনেক দেশেই মেয়েদের অবস্থা কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত খুবই হীন ছিল—বিশেষ ক'রে মুসলমানপ্রধান দেশগুলিতে। যেখানে অবরোধের কড়াকড়ি বেশী, সেখানে নারীর উন্নতি কোনো দিক দিয়েই সম্ভবপর নয়। যাকে চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মত খাঁচার মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখা হয়, তার দ্বারা সমাজের বা দেশের কি কাজ হতে পারে?

কিন্তু মানুষ কেবলমাত্রই যে জানোয়ার নয়, তার প্রমাণ সে দেয়, দারুণ অবনতির ভিতর থেকেও নিজেকে উন্নত করবার চেষ্টায়। এখন সব দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যেই সাড়া প'ড়ে গিয়েছে, কেউ আর পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। মেয়েরাও জেগে উঠছেন। দারুণ দুর্গতি এবং অবনতির মধ্যে থেকে তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়াবার, মানুষের অধিকার লাভ করবার এবং মানুষের কাজ করবার চেষ্টা করছেন। পারস্যে নারীর অবস্থা অত্যন্তই হীন ছিল, কিন্তু কি ক'রে তাঁরা আবার লুপ্ত অধিকার ফিরে পাচ্ছেন, তার একটা ইতিহাস বঙ্গনারীর কাছে ভাল লাগতে পারে। কারণ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমাদের অবস্থাও প্রায় এই রকমই ছিল। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় পারস্যের নারীদের বিষয় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তার থেকে আমরা এঁদের বিষয় অনেক কথাই জানতে পারি।

পারস্য-সভ্যতার ইতিহাস, জগতের সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য। লিখিত ইতিহাসের যে যুগ, তার আগেই ইরাণীরা জরথুস্ত্রের প্রভাবে সমাজ-বদ্ধভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। জরথুস্ত্র আর্য্যদের ভিতর প্রথম ঋষি বলা যেতে পারে। সমাজের ক্রমোন্নতির নানারকম নিয়ম ইনি প্রণয়ন করেন, সেগুলি সবই প্রায় বেশ উচ্চ অঙ্গের।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে পারস্যে আকমানীয় বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই সময় সমাজের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল, কারণ তখন জরথুস্ত্রের নিয়মই সকলে পালন করতেন। এর পরই আলেকজান্দার দিগ্বিজয় করতে বা'র হন, এবং ভারতবর্ষে আসার পথে পারস্য জয় করেন। কিন্তু তিনি দেশ জয় করেন মাত্র, দেশের সভ্যতাকে জয় করতে পারেন নি। গ্রীক সভ্যতার যেটুকু প্রভাব ইরাণের উপর পড়েছিল, তাও অল্পদিনের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায়, এবং সাসানীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবামাত্রই ইরাণী সভ্যতা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত এই ধারাই সমানে চলতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের পতাকা পারস্যে দেখা দেয়, তখন থেকে সকল দিকেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

আকমানীয় এবং সাসানীয় রাজত্বকালে নারীর অবস্থা খুব উন্নত ছিল। যে কোনো আধুনিক মানুষ, নারীর জন্যে যা-কিছু অধিকার চাইতে পারেন, প্রায় সবই তখন বর্ত্তমান ছিল। তাঁদের সকলেই সম্মানের চক্ষে দেখত, এবং সকল দিকেই তাঁদের অধিকার পুরুষের সমকক্ষ ছিল। দেশবাসী সকলেই শিক্ষিত এবং উন্নত মতাবলম্বী হওয়াতে, এবং মতের ও চিন্তার আদান-প্রদান থাকাতে এই অবস্থা সম্ভব হয়েছিল। বিবাহ-সম্বন্ধের গৌরব সকলেই স্বীকার

করতেন, এবং সামাজিক সব নিয়মই সেই স্বাধীনযুগের উপযুক্ত ছিল।

কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে সমস্তই অন্যরকম হয়ে গেল। নূতন এক জাতি, নূতন সামাজিক নিয়মাদি নিয়ে আবির্ভূত হলেন, এবং শাসনদণ্ডের জোরে পারস্যের নরনারীকে এই-সকল মানতে বাধ্য করলেন। তাঁদের ধর্ম্ম ছিল ভিন্ন এবং সমাজসংসার সম্বন্ধে সকল মতই ছিল ভিন্ন। পুরাতন ইরাণী সভ্যতা এবং এই নূতন সভ্যতার প্রভেদ এত অধিক ছিল, যে দুটির মধ্যে কোনো রফা করা সম্ভবপর হ'ল না। অগত্যা পুরাতন যেটা তাকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় নিতে হ'ল, নূতনটিই থেকে গেল। ফলে নারীজাতির শোচনীয় অধঃপতন হ'ল। নানাপ্রকার ঘৃণ্য নিয়মের শৃঙ্খলে তাঁরা বাঁধা পড়লেন, এবং গৃহের প্রাচীরের মধ্যে বহু শতাব্দীর মত তাঁরা অবরুদ্ধ হ'লেন। তাঁদের অশ্রুপাত কেউ গ্রাহ্য করল না।

বিজয়ী জাতি যে-সকল অসংখ্য নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠিত করলেন, তার ভিতর তিনটি পারস্যের নারীর পক্ষে অতিশয় অপমানকর এবং অনিষ্টকর ছিল। সমাজের মধ্যে নরনারীর যে সমান অধিকার থাকা সম্ভব, তা মুসলমানরা বিশ্বাসই করতে পারতেন না। সুতরাং স্ত্রীলোককে তাঁরা ভোগের জিনিষ ভিন্ন আর কিছু মনেই করতেন না, এবং নারীদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের মনে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস ছিল না। সর্ব্বদাই তাঁরা নারীকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন।

তাঁরা নিজেদের চরিত্রের কলঙ্ক ঢাকা দেবার জন্যই যেন পরদা এবং বোরকা পরার নিয়ম প্রবর্ত্তন করলেন। নারীদের কাছে কোনো বিষয়ে সাহায্য, জ্ঞান বা সাধারণ বন্ধুত্ব কিছুই তাঁরা প্রত্যাশা করতেন না, সুতরাং তাঁদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই রইল না। পুরুষের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য শুধু নারীকে অশিক্ষিতা ক'রেই তাঁরা তুষ্ট হলেন না, একসঙ্গে চারটি স্ত্রী বিবাহ করারও অধিকার রাখলেন। এটা শুধু যে কাগজে-লেখা অধিকার ছিল তা নয়, প্রায় প্রত্যেক পুরুষই বহু বিবাহ করতেন। উপপত্নী রাখা এবং ইচ্ছামত স্ত্রীত্যাগ করাতেও তাঁদের সামাজিক বা আইনতঃ কোনই বাধা ছিল না।

গৃহের ভিতর নারীরা যে অংশে বাস করতেন সেটাকে 'অন্দরুন' বলা হত। এখানে তাঁরা পুরুষের খেলনার মত বাস করতেন, তাঁদের বয়স বাড়ত কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি কিছুরই বিকাশ হত না। তাঁরা সকলপ্রকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, অক্ষরজ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁদের ছিল না, এবং জগৎ ও মানবজীবন সম্বন্ধে কোনো উদার ধারণাও তাঁদের ছিল না। অন্দরমহলের আবহাওয়া একেবারে শ্বাসরোধকারী এবং শোচনীয় ছিল। অবস্থাটা আরো ঘৃণ্য ছিল এইজন্য যে একই মহলে একজন পুরুষের সকল পত্নী এবং উপপত্নীরা বাস করতেন। সুতরাং, এই হতভাগিনীদের মধ্যে সারাক্ষণই প্রভুর ভালবাসা লাভের জন্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে থাকত। ফলে নানারকম ষড়যন্ত্র, পাপাচরণ, হত্যা প্রভৃতির বিভীষিকা অন্দরমহলের জীবনধারাকে পঙ্কিল ক'রে রাখত।

প্রভুর সুনজরে না থাকতে পারলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই তাঁদের অদৃষ্টে জুটত না, সুতরাং প্রভুর প্রিয়পাত্রী হবার চেষ্টাই তাঁরা যথাশক্তি করতেন। যাতে কোনো রকমে তাঁর বিরাগভাজন না হন, সেদিকে তাঁরা খুবই সতর্ক থাকতেন। তাঁরা শুধু পর্দ্দানশীন্,—মানুষের কোনো অধিকার তাঁদের ছিল না। যদি প্রভুকে খুসি না করতে পারতেন, যদি তাঁদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যেত, অথবা যদি তাঁদের পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ না করত, তখনই তাঁদের পরিত্যক্তা হবার সম্ভাবনা দেখা দিত।

কিন্তু এটা ছিল উচ্চশ্রেণীর এবং ধনীবংশের নারীদের জীবনযাত্রার প্রণালী। এঁরা কেবল উপভোগের জিনিষ হয়েই দিন কাটিয়ে দিতেন। দরিদ্রের ঘরে নারীর অবস্থা ছিল মানুষ এবং জানোয়ারের মাঝামাঝি। স্ত্রীদের দিয়ে চাষ-বাস, মোট বওয়া প্রভৃতি কাজ বিনাবেতনে বেশ করান যায়, এটা পুরুষরা বেশ বুঝত, এবং যথাশক্তি বহুবিবাহ ক'রে যেত। অনায়াসে বিবাহবিচ্ছেদও চলত, সুতরাং নারীদের পাপব্যবসায়ে লিপ্ত করাতেও বিশেষ বাধা ছিল না। উচ্চবংশের ভিতর পরদা এবং বোরকার কড়াকড়িটা খুব বেশী ছিল, চাষাভুষোর ভিতর এতটা ছিল না। স্ত্রীলোকরা কোথায়ও যেতে আস্‌তে হ'লে বোরকা ব্যবহার করতেন। বোরকা একটি কৃষ্ণবর্ণের আলখাল্লার মত, কেবল দেখবার জন্য চোখের কাছে দুটি ছিদ্র থাকত।

পারস্য দেশসেবিকা-সংঘের কয়েকজন কর্ম্মী ও সভ্য। প্রথম সারির সকলের বামে এই সংঘের সভানেত্রী শ্রীমতী মাস্তুরা খানুম ; ঐ পংক্তির চতুর্থজন ইহার সম্পাদিকা শ্রীমতী নুরুল হুদা খানুম।

এতে অঙ্গাচ্ছাদন ক'রে যখন তাঁরা চলাফেরা করতেন, তখন তাঁরা মানুষ না প্রেত কিছু বোঝা যেত না।

উচ্চবংশের নারীদের মধ্যে হাজারকরা তিনজন মাত্র লিখতে পড়তে জানতেন, সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরা এবং যাযাবর শ্রেণীর মেয়েরা প্রায় পশুর মতই মূর্খ ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা বিশুদ্ধ পারসিক ভাষা বুঝতে পারতেন না, তাঁরা একপ্রকার মিশ্র ভাষায় কথা বল্‌তেন এটাকে 'খারী' বলা হ'ত। তাঁদের দৈনিক জীবনযাত্রা এত একঘেয়ে ছিল, যে আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করা শক্ত। এক যদি কোথাও কোনো উৎসবে তাঁরা যেতেন বা বিদেশযাত্রা করতেন, তাহ'লে একটুখানি বৈচিত্র্যের স্বাদ পেতেন। তাও বাইরে বেরবার সময় আপাদমস্তক আবৃত ক'রে কাপড়ের পুট্‌লির মত তাঁদের যেতে হ'ত। মধ্যে মধ্যে তাঁরা 'হামাম্' নামক স্নানাগারগুলিতে যেতেন, এখানে মেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, গল্প করা হ'ত, অনেক ঘণ্টা ধ'রে চা-পান, সরবৎ পান প্রভৃতি চলত। কিন্তু তাঁদের স্বাধীনতা,

রাজবন্দীর স্বাধীনতার মতই ছিল, তার বেশী নয়। পেশোয়াজ এবং টিলা জ্যাকেট এই তাঁদের সাধারণ পোষাক ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁদের পোষাকের একটু পরিবর্ত্তন হয়। তখনকার সম্রাট শাহ নসিরউদ্দিন ইউরোপ ভ্রমণ করতে যান। তাঁর রঙ্গমঞ্চের নর্ত্তকীদের পোষাকটা খুব পছন্দ হয়, এবং ফিরে এসে তিনি নিজের 'হারেমে' এই পোষাকের প্রচলন করেন। সম্রাটের অন্দরমহলে যা চলে তাই ফ্যাশান, সুতরাং অন্যান্য ধনী গৃহেও ক্রমে এটার চলন হয়ে যায়। কিন্তু বাইরের লোকে অবশ্য এ পরিবর্ত্তনের কোনো চিহ্ন দেখতে পেল না, কারণ প্রকাশ্যে বেরবার সময়, সেই সাবেকী বোর্‌কা চাপা দেওয়া সমানে চল্‌তে লাগ্‌ল।

মেয়েদের অবস্থার ক্রমই অবনতি হ'তে লাগ্‌ল এবং এক সময়ে সেটা এত শোচনীয় হ'ল যে আর উদ্ধারের আশাও প্রায় কারো মনে রইল না। কিন্তু বহু পূর্ব্বকাল থেকেই নারীর ভিতর বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। পূর্ব্বকালে সুফি ধর্ম্মমত এবং আধুনিক কালে বাহাই ধর্ম্মমত এই নারী-বিদ্রোহকে সমর্থন করতেন। বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সমান, তাঁদের সম্বন্ধও অনেক উন্নত। নারীরা প্রকাশ্যে বা'র হন, বন্ধুবান্ধবকে অভ্যর্থনা করেন, কথাবার্ত্তা বলেন। মুসলমান সংসারের আবহাওয়ার সঙ্গে এঁদের সংসারের আবহাওয়ার কোনো সাদৃশ্য নেই।

বাহাই ধর্ম্ম যদিও নারীর মুক্তিপথে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, তবু রাজনৈতিক একটা পরিবর্ত্তনের পরই নারী-জাতি শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে সক্ষম হল। এ যেন বন্যাস্রোত পাষাণ-প্রাচীর ভেঙে বার হ'ল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রেজা শাহ পহ্লবী, কাজার শাহের হাত থেকে পারস্যের শাসনভার কেড়ে নেন। এইবার নূতন যুগের আবির্ভাব হল, "পারস্য দেশসেবিকা সঙ্ঘ" নামক একটি নারীসমিতিও প্রতিষ্ঠিত হল।

উন্নতিপন্থীদের যথেষ্ট বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে। সনাতনপন্থীরা সকল দেশেই এগিয়ে চলাকে ঠেকাতে চেষ্টা করেন, পারস্যেও তার ত্রুটি হয়নি। যা হোক, এই নারীসঙ্ঘ এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ করতে পারছেন। এই সমিতি পারস্যের নারীর অশেষ উন্নতি সাধন করেছে। এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে মোটা-মুটি কিছু বলা যায়। প্রধানতঃ ছয়টি বিষয়ে তাঁরা মনোযোগ দিচ্ছেন, সেগুলি এই,—

(১) স্ত্রী-স্বাধীনতা: তাঁদের অবগুণ্ঠন-মোচন এবং অবরোধ-মোচন।

(২) সামাজিক, নাগরিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে তাঁদের পূর্ণ অধিকার-লাভ।

(৩) ষোলো বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকাদের বিবাহ রোধ করা।

(৪) বহুবিবাহের সমূলে উচ্ছেদ করা।

(৫) বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিলে, স্বামীর নিকট কন্যাপণের টাকা আদায় করা।

(৬) নারীদের অবাধে মেলামেশা করার অধিকার লাভ, এবং বিরোধীপক্ষের সহিত তর্কযুদ্ধ করার অধিকার-লাভ।

এই সবকটি উদ্দেশ্যই মুসলমান সামাজিক নিয়মের বিরোধী। মুসলমান সম্প্রদায় সমগ্র নারীজাতিকে যে দুর্গতির ভিতর রেখেছেন, এটা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

সনাতনপন্থী মোল্লারা এবং তাঁদের শিষ্যেরা এই সমিতিগুলির উপর খড়্গহস্ত। এতদিন পর্য্যন্ত সম্রাটের সাহায্যে তাঁরা এই-সকল শাস্ত্রবিরোধী ব্যাপারকে ধ্বংস করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। আধুনিক যুগে নারী-স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁদের ভিতর হাজী মির্জ্জা আবুল কাসিম আজাদ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী খানুম সাহানাজ্ আজাদ প্রথম। এঁরা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পরদা-প্রথা তুলে দেবার চেষ্টা করেন এবং একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমিতি থেকে একটি ছোট মাসিক পত্রও বা'র করা হ'ত। কিন্তু নানা জায়গা থেকে তাঁরা বিরুদ্ধতা লাভ করতে লাগলেন, বিশেষ ক'রে ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। ফলে, আড়াই বৎসর পরেই পত্রিকাখানির প্রচার বন্ধ হয়ে গেল, এবং সমিতির উদ্যোক্তা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তিহারাণ থেকে বিতাড়িত হয়ে তাব্রিজে বন্দী হলেন। বন্দীদশা, কারাগারের অমানুষিক অত্যাচার, কিছুই এই কর্ম্মীপুরুষকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি, এবং

এখনও তিনি পারস্যের নারীজাতির উন্নতিকল্পে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছেন।

হাজী মির্জ্জা আজাদের যেসকল বন্ধু তিনি নির্ব্বাসিত হবার পরেও তিহারাণে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফোরাকদিন্ নামে এক ব্যক্তি, সস্ত্রীক আবার এই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এঁদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তার নাম 'জাহাজনা'। এটিও কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামীর অত্যাচারে টিঁকতে পারল না, এবং সমিতির সকলেই প্রায় কুম্ নামক স্থানে নির্ব্বাসিত হলেন।

নয় বৎসর পূর্ব্বে আবার এই প্রচেষ্টা সুরু হ'ল। এবার কাজের ভার নিলেন, একজন নারী। তাঁর নাম লেডী খানুম্ মহতাব্ খান্ এস্কান্দেরী। তিনি কয়েকজন সুশিক্ষিতা আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা মহিলাকে একত্রিত ক'রে, সম্প্রতি যে দেশসেবিকা সঙ্ঘের কথা বলা হ'ল, তার ভিত্তিস্থাপন করেন। নারীর কাজের ভার নারী যখন স্বয়ং হাতে তুলে নেন, তখন তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী! এইবার সমিতিটি টিঁকে গেল, মোল্লাদের ক্রোধেও এটি ভস্মীভূত হ'ল না। পারস্যের নারী এই মহীয়সী মহিলার কাছে চিরঋণী।

এঁকেও অনেক উৎপাত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। পথে ঘাটে, অসভ্য মানুষে এঁর উপর ঢিল ছুঁড়েছে, অকথ্য ভাষায় এঁকে গাল দিয়েছে, এমন কি গভর্ণমেণ্টও কয়েকবার এঁকে নানাস্থানে অন্তরীন্ অবস্থায় রেখেছেন। কিন্তু যার জন্য তিনি এত কষ্ট সহ্য করেছিলেন, সেই সমিতিটি টিঁকে থেকে তাঁর সকল কষ্ট সার্থক করেছিল। দিন দিন এটির উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল। এই উন্নতির জন্য অবশ্য একটি মানুষের সাহায্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ইনি প্রধান মন্ত্রী বাহ্‌রাম্ শাহ্। ইনি নিজে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পরিপোষক; এ বিষয়ে ইনি অনেক পুস্তক রচনা করেছেন।

লেডী এস্কান্দেরী মারা যাবার পর, লেডী মান্সুর খানুম্ আফ্‌শার্ সাহস ক'রে এই কাজের ভার নেন। ইনিই লেডী এস্কান্দেরীর পরে সভানেত্রী হন, এবং এখন পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই মহিলা আজারবৈজানের অধিবাসিনী, এবং বিদেশে নানাস্থানে শিক্ষালাভ করেছেন। ইনি লেডী এস্কান্দেরীর উপযুক্ত সঙ্গিনী, তাঁর সমস্ত জীবন তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গ করেছেন। সম্প্রতি তিনি মেয়েদের জন্যে একটি স্কুল স্থাপন করেছেন, এটির নাম 'আক্‌বর মাদ্রাসা'। এখানে মেয়েদের মধ্যে মুক্তিমন্ত্র প্রচার করা হয়।

পারস্যের বর্ত্তমান সম্রাট রিজা শাহ্ পল্‌হ্‌বী এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সাহায্যে এখন এই সমিতির কর্ম্মশক্তি বহুবিস্তৃত হ'য়ে পড়ছে, এবং দেশসেবিকারা আশা করছেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা পারস্যের নারীর মধ্যে যুগান্তর এনে ফেল্‌তে পারবেন। সমিতির অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আস্‌রাফ টিমুরতাসীর নাম করা যেতে পারে। ইনি মন্ত্রীসভার একজন সভ্য এবং স্ত্রীস্বাধীনতার স্বপক্ষে। নিজহস্তে ইনি নিজের কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করেছেন। 'আক্‌বর মাদ্রাসা'র আর একজন পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন, মির্জ্জা জাহেদ্ খান্ মাহ্‌মুদী ইনিও একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

এই সমিতি ইউরোপের নানাস্থান থেকে সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বসূচক অনেক পত্র পেয়েছেন। এঁরা ভারতবর্ষের নারীসমিতিগুলির সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করতে পেলে অত্যন্ত খুসি হবেন। এসিয়াবাসিনী-নারীসম্মিলনীর নিমন্ত্রণ পেয়ে, সর্ব্বপ্রথম এঁরাই সহকারিতা করতে চেয়ে পত্র লিখেছিলেন, এবং প্রতিনিধিও পাঠিয়েছিলেন। এঁরা যেরকম দুর্গতির ভিতর থেকে কেবলমাত্র আত্মচেষ্টায় আবার উঠ্‌তে পেরেছেন, তা সকল দেশের নারীদের প্রশংসা পাবার এবং অনুকরণ করবার জিনিষ। একমাত্র তুরস্কের নারী ছাড়া, এত গভীর দুর্দ্দশা আর কোনো নারীজাতির হয়েছে কিনা সন্দেহ। ভারতের নারীকেও অন্ধ গোঁড়ামীর এবং স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে বটে কিন্তু এখানে অন্ততঃ শাসনবিভাগ এঁদের বিরুদ্ধে দল বেঁধে ব'সে নেই। এখানে স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ নিলে সামাজিক অত্যাচার অনেককে সহ্য করতে হয়েছে বটে, কিন্তু নির্ব্বাসন বা কারাবাস কারো অদৃষ্টে ঘটেনি। সুতরাং আমাদের ত আরো অগ্রসর হয়ে যাবার কথা। যতখানি পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে চল্‌বে না, মানুষের পরিপূর্ণ অধিকার পাবার জন্যে এখনও আমাদের অনেক সংগ্রাম করতে হবে।

সেকাল ও একাল

শ্রী প্রসন্নময়ী দেবী

আমাকে যে আজিকার এই স্মৃতি সভার সভানেত্রী করা হইয়াছে ইহাতে আমি গৌরব অনুভব করিতেছি কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে বিষাদের ছায়াও পড়িতেছে, কেননা যাঁহার উদ্দেশে এই স্মৃতি-সভা তিনি আমার পৌত্রী কিম্বা দৌহিত্রীর বয়স্কা ছিলেন। কালের গতি অনিবার্য্য তাই আজ আমার এই বার্দ্ধক্যাবস্থায় আমি সেই কচি বয়সের মেয়ের মৃত্যুদিবস স্মরণ করিতে আসিয়াছি।

সরোজনলিনী শৈশব হইতেই আমাদের বিশেষ স্নেহ-পাত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতার সহিত আমাদের পরিবারের বহুকালের পরিচয়। শৈশব হইতে কৈশোর ও পরবর্তী অবস্থায়, সরোজনলিনীর শিক্ষাদীক্ষা ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ আমি ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। কিরূপ ভাবে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশেরও একটি মেয়ে নিজেকে ও পারিপার্শ্বিক আরও দশজনকে উপযুক্ত কন্যা, স্ত্রী ও মা হইতে শিক্ষা দিতে পারে, সরোজনলিনীর স্বল্পস্থায়ী জীবন তাহার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সীতা সাবিত্রী যে শুধু মাত্র পৌরানিক উপাখ্যানই নয় তাহা সরোজনলিনী তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মত মেয়েরাই এখনও পুরাকালের প্রাতঃস্মরণীয়া সতীনারীর আদর্শ বজায় রাখিতে সাহায্য করেন।

আমি প্রাচীনা, তাই আমার মনে স্বতঃই প্রাচীন আদর্শগুলির উদয় হয়। প্রাচীন আদর্শানুবর্ত্তিতার আর এক নাম আজকাল গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কার—কিন্তু এই ধারণা একেবারে অমূলক। যাঁহারা প্রাচীনপন্থী বলিয়া জাঁক করিয়া এই সব কুসংস্কার আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকেন তাঁহারাও যেমন ভ্রান্ত, তেমনি যাঁহারা হাল-ফ্যাসানের কেতাদোরস্ত হইয়া আমাদের সত্যকার আদর্শগুলির প্রতি পিঠ ফিরাইয়াছেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। বয়স হিসাবে আমি সিপাহী বিদ্রোহের যুগ হইতে আজিকার আধুনিকতম যুগ পর্য্যন্ত নারীপ্রগতির খবর দিতে পারি। মোটের উপর আমার মনে হয় যে আজকাল নারীদের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে নারীজাতির উন্নতির চেষ্টা প্রসারলাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ শিক্ষার সুযোগ ও সুগমতা—আমাদের শৈশবে যাহা একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। তবু একেবারে যে ছিল না তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

আমাদের গ্রামের কথা বলিতে পারি। বাল্যকালে দেখিয়াছি আমাদের পিসী, খুড়ী, জ্যেঠি রামায়ণ মহাভারত

শ্রী প্রসন্নময়ী দেবী

ত পড়িতে পারিতেনই উপরন্তু বিষয়কার্য্যাদি সংক্রান্ত হিসাবপত্রও তাঁহারা রাখিতেন। আমাদিগের রাজসাহী অঞ্চলে বড় বড় জমিদারী মেয়েরাই চালাইয়া আসিয়াছেন। রাণী ভবানীর নাম ভারতবিশ্রুত—তিনিও আমাদেরই রাজসাহী অঞ্চলের নারী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি তাঁহার জননীর নিকট হইতে লব্ধ। এখনও আমাদের দেশে বড় বড় বাড়ীর গৃহিণীরাই সমস্ত কাজে কর্ত্তাদের উপযুক্ত সহায়তা করিয়া থাকেন।

বাল্যকালে আমরা —অর্থাৎ যাহারা বয়সে ছোট তাহারা —বালকের বেশ পরিয়া কাছারী-বাড়ীতে পড়িতে যাইতাম। ছুতার মিস্ত্রী কাঠফলকে বারো স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ খোদিত করিয়া দিত; তাহার সাহায্যে আমাদের অক্ষর-পরিচয় হইয়াছিল। পাঠশালায় আমরা বালিকারা যাইতাম না। গ্রাম্য কালীবাড়ীর পাঠশালায় গৃহের বালকগণ পড়িতে যাইত। আমরা প্রাতে একবার তালপত্রে লেখা শিখিতাম ও দাতাকর্ণ ইত্যাদি জাতীয় উপাখ্যান পড়িতাম। তাহার পর সমস্ত সময় গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্ব্বাগ্রে শিব গড়ান ও দেবার্চ্চনার আয়োজন সব নির্ভুলভাবে শিখাইতেন। ক্রমে রন্ধন ও পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্য্যও শিক্ষা হইত। পাথরে ছাঁচকাটা, শিকা তৈয়ারী, কাঁথা সেলাই, নারিকেলের চিড়ে, জিরে, পদ্মচিনি, ধানের মালা, কঙ্কণ, নানাপ্রকার আলপনা ও শুভকার্য্যে পিঁড়িচিত্র এবং পঞ্চরঙের গালিচা, তুলিচা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকরী ও সৌখীন শিল্প শিক্ষা দিতে পরিপক্ক গৃহিণীরাই গুরুগিরি করিতেন। কালীশ্বরী দিদি বলিয়া একজন রক্তবস্ত্রা বিধবা ছিলেন তিনি আমাদের অপেক্ষা একটু বেশী বয়সের মেয়েদের লইয়া রামায়ণ মহাভারত, সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির উপাখ্যান শিখাইতেন। এইরূপে সেকালে মেয়েদের শিক্ষা হইত।

তখনকার দিনের তুলনায় এখনকার শিক্ষার ধরণ অনেকটা ব্যাপক এবং মেয়েদিগকে বহির্জগতের সহিত মেলামেশার সুযোগ দিয়াছে। ইহাতে তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে। নারীপ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে জাতীয়-জাগরণের মূল ভিত্তি নারীজাগরণ। কবি গাহিয়াছিলেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ যে দেশের চারিদিকে একটা নবীন আশার আলোক দেখা যাইতেছে, তাহার বর্ত্তিকা ভারতীয় নারীরাই অগ্রসর হইয়া ধারণ করিয়া চলিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে একটা কথা অনেকের মুখেই শোনা যায় যে নারীজাতির এই বহির্গামী ভাব সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। একটু তলাইয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে এই সম্প্রসারণ নারীজাতির বিশেষ কেন্দ্রে কোনরূপ ক্ষীণতার সৃষ্টি করে না। পূর্ব্বাপেক্ষা যে পরিবর্ত্তন নারীজগতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা এই যে, নারী আজ আর গৃহের কোণে অন্ধকারে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই পড়িয়া নাই—সংসারে তাহার যে অন্যান্য মহৎ কর্ত্তব্য আছে সেগুলি সম্পাদন করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, বরঞ্চ আনন্দ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। একথা মনে করা ভুল যে বর্ত্তমান নারী-আন্দোলন আমাদের ভারতীয় নারীসমাজকে মেমসাহেবী সমাজ করিয়া তুলিবে, কেননা প্রত্যেক বিভিন্ন জাতীয় নারী তাহাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আজ যে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া দেশের ও দশের হিতসাধন করুক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা এবং এই কার্য্যেই যাঁহার স্মৃতিসভায় আজ আমরা সমবেত হইয়াছি তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষিত হইবে।*

* সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক মহিলাসম্মিলনে পঠিত।

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

—সরোজনলিনী

ডোঙ্গাঘাটা মহিলাসমিতি

১। স্থাপনের ইতিহাস ঃ—আমাদের সমিতির বয়স এখনও বৎসর পূর্ণ হয় নাই। ১৩৩১ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে ইহার প্রতিষ্ঠা। যে গ্রামের এই সমিতি, উহা যশোহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে—নিভৃততম পল্লী। তবু সহরের শিক্ষিত সুমার্জ্জিত জীবনের সাথে গ্রামের অনেক মেয়ে-পুরুষের পরিচয় আছে। ইঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি মহিলা প্রস্তাব করেন,—আমরা পাড়াগাঁয়ে আছি বটে, কিন্তু তা' বলিয়া অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিব কেন? আমরা মিলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করিব। পুরুষদের মধ্যে তরুণ-সম্প্রদায়ের বিশেষরূপ সহানুভূতি পাইলাম। সমিতিতে বালিকা বৃদ্ধা কাহারও যোগ দিতে বাকী রহিল না। মহিলাদের সভা হইল। এত উৎসাহের সঞ্চার হইল যে সভাস্থলেই আটজন মহিলা গায়ের গহনা খুলিয়া দিলেন। মহিলা-সমিতির উদ্বোধন হইল।

২। উদ্দেশ্য ঃ—সমিতির উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের নারী-জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন। নারী যাহাতে অসহায় ও পুরুষের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে যৎকিঞ্চিৎও উপার্জ্জন করিতে পারে আমরা তাহার চেষ্টা করি। পাড়াগাঁয়ে-চলিত অলসতা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা—আমরা ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে চাই। নারী ঘরের কোণে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া স্বাস্থ্য হারাইয়া জীবনের মেয়াদ দ্রুত নিঃশেষ করে, আমরা তাহাদিগকে আলোয় আনিয়া ব্যায়াম ও খেলা-ধূলায় স্বাস্থ্যবতী করিয়া তুলিতেছি। অজ্ঞতার জন্য এবং ব্যবস্থার দোষে প্রসবকালে প্রসূতি। অকাল-বিয়োগ ঘটে—অজস্র শিশুমৃত্যু ঘটিয়া থাকে—আমরা জননী ও সন্তানদের বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। ম্যাজিক লণ্ঠন সংযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া, প্রতি রবিবারে মিলিত হইয়া শিক্ষা ও সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা দ্বারা মহিলাদের মানুষ করিয়া তুলিতে চাই। পরস্পরের সদ্ভাব-স্থাপন, আর্ত্তের সেবা, দরিদ্রের সাহায্য প্রভৃতি সকল জনহিতকর কার্য্যেই সমিতির উদ্যোগ আছে।

৩। সভ্যাসংখ্যা ঃ—আমাদের দুই শ্রেণীর সভ্যা। প্রথম—"ক" শ্রেণীর স্থানীয় সভ্যা। ইঁহারা গ্রামেই থাকেন এবং অর্থে ও সামর্থ্যে সমিতিকে নিয়মিত সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা চল্লিশ। এই সভ্যাগণ ছাড়াও অনেকে সমিতির অধিবেশনে যোগ দিয়া থাকেন এবং নানা বিষয়ে সমিতির উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সভ্যা বলিয়া ধরা হয় না। বারোটি মেয়ে সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকা—তাঁহারাও সভ্যা-

শ্রেণীভুক্তা নহেন। দ্বিতীয়—"খ" শ্রেণীর প্রবাসী সভ্যা। ইঁহারা অধিকাংশ কাল গ্রামে থাকেন না, অতএব সমিতির অধিবেশনে নিয়মিত যোগ দিতে পারেন না। বাহিরে থাকিয়া ইঁহারা সমিতির জন্য প্রচার করেন, অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। ইঁহাদের সংখ্যা এগার জন।

৪। জনসেবার কার্য্য :—একটি পিতৃমাতৃহীন বালককে সমিতি স্কুলের মাহিনা দিয়া থাকেন। সরসীবালা দত্ত নাম্নী একটি বালবিধবাকে হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রমে পাঠান হইয়াছে—উহার ব্যয় সমিতি বহন করিয়া থাকেন। ছয়টি চরকা ও বহু তকলী বিতরণ করা হইয়াছে। তা ছাড়া তূলা ও তকলী কলিকাতা হইতে কিনিয়া লইয়া কেনা-দামেই দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি দুঃস্থ সম্ভ্রান্ত মহিলাকে নূতন কাপড় দেওয়া হইয়াছে। গত বড়দিনের সময় কাঙালী-বিদায় এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমিতির সভ্যাগণ যথাশক্তি পীড়িতের শুশ্রূষা ও দরিদ্রের অভাব-মোচনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

৫। পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান ও মেলা-মেশার চেষ্টা :—প্রায় প্রতি রবিবারেই সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। উহাতে সাহিত্য, শিক্ষা ও রীতিনীতির আলোচনা হয়। নানাপ্রকার শুভকর প্রস্তাবও গৃহীত হইয়া থাকে। মহিলারা লিখিত ও মৌখিক বক্তৃতা করেন। বিগত ২০শে কার্ত্তিক মহিলারা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটকখানি অভিনয় করিয়াছেন। প্রেক্ষাগৃহে কেবলমাত্র মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল। অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল (২রা অগ্রহায়ণের 'বঙ্গবাণী'তে খবরটি ছাপা হইয়াছে)। ঐ তারিখেই অধিবেশন-গৃহের প্রাঙ্গণে মহিলারা প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চাঁদা তুলিয়া এবং প্রতি বাড়ী হইতে উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। পুরুষেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দেড়শতের অধিক লোক ভোজন করিয় ছিলেন।

৬। স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার :—এই বিভাগের ভারপ্রাপ্তা কর্ম্মী সরলাবালা বসু (ছোট) যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বামী ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বসু, ও ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র বসু অনেক সহায়তা করেন। মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমিতি ব্যাডমিণ্টন খেলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—অনেকে সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কাগণ নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ করিয়া থাকে। গত ২০শে কার্ত্তিক সমিতি বালিকাদের সন্তরণ-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিয়া পুরস্কারাদি দান করিয়াছেন (২রা অগ্রহায়ণের 'বঙ্গবাণী' দ্রষ্টব্য)। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করা হয়।

৭। মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কার্য্য : সমিতি-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে অধিবেশন-গৃহের সম্মুখের বাড়ীতে আমাদের একজন সভ্যা প্রসবকালে মারা গিয়াছিলেন। সেই হইতে সমিতি এই বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে যথোপযুক্ত কাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঐ অঞ্চলে শিক্ষিতা ধাত্রী নাই। তজ্জন্য সমিতির তরফ হইতে রানরঙ্গিণী বসু ও সরযূবালা রায়কে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত মহিলাটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে।—ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বসু মহিলাদ্বয়কে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। অচিরে কোন একটি মহিলাকে 'চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে' পাঠাইবার চেষ্টা হইতেছে। মহিলাগণের অজ্ঞতা দূর করিবার মানসে ইতিমধ্যেই আমরা ম্যাজিক লণ্ঠন ও এই বিষয়ের স্লাইড লইয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। নিকটবর্ত্তী বৃহত্তম ভদ্রপল্লী পাঁজিয়া হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের কর্ম্মীগণ তথায় নানা গ্রাম হইতে সমাগত বহুশত মহিলার সমক্ষে এই বিষয়ের বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। বড় দিনের সময়ে প্রচার-কার্য্য আরও জোরে চালানো হয়। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি, আমাদের ম্যাজিক লণ্ঠন ও স্লাইডগুলি কয়েকদিন ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, সরোজনলিনী সমিতির অফিসে রক্ষিত ছিল। প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয় উহা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় স্লাইডগুলি দেখিয়া তৎসম্পর্কে বক্তৃতা করিবার অনেক উপদেশ দিয়া উপকৃত করেন।)

৮। গৃহশিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা :—(ক) সমিতির অফিস-গৃহে ও অধিবেশন-গৃহে শিক্ষয়িত্রীরা সমবেত হন। এক এক বিষয় শিক্ষার জন্য সপ্তাহের মধ্যে এক বা একাধিক দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। শিক্ষয়িত্রীরা যথাসময়ে উপস্থিত হন। ছাত্রীরা সমবেত হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(খ) কোন শিক্ষয়িত্রী আছেন কিনা :—সঙ্গীত ও শিল্পশিক্ষার জন্য তিনজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। সকলেই অবৈতনিক।

(গ) কি কি বিষয়ে গৃহশিল্প শেখানো হয় :—সূচিশিল্প, উলের কাজ, কাটিং, সেলাই, সূতাকাটা, আঁইসের কাজ প্রভৃতি।

(ঘ) কতজন মহিলা কি কি প্রকার গৃহশিল্প শিক্ষা করিয়াছেন :—

সূতা কাটা—অন্যূন পঞ্চাশ জন ;
সূচিশিল্প—পনের জন ;
কাটিং—সাত জন।

(ঙ) গৃহশিল্প শিক্ষা করিয়া কতজন কি পরিমাণ উপার্জ্জন করেন :—সমিতি-প্রতিষ্ঠার পরে এই কয়েক মাসের মধ্যে এখনও কেহ উল্লেখযোগ্য উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। ৪ জন কুমারী সূতার ব্যাগ তৈয়ারী করিয়া একটাকা দেড়টাকা করিয়া পাইয়াছেন। সূতা কাটিয়া কেহ কেহ ব্যবহারের কাপড় তৈয়ারী করিয়াছেন। কার্টিং শিখিয়া এযাবৎ পনেরটি জামা ও সেমিজ তৈয়ারী হইয়াছে- কিন্তু হাতের প্রথম কাজ কেহ বিক্রয় করিবেন না।

(চ) আপন আপন গৃহের ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য সমিতির সভ্যারা প্রস্তুত করেন :—বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার মূল্যের হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা নাই। কেন্দ্রসমিতির প্রদর্শনীতে তাহার কিছু কিছু পাঠানো হইয়াছিল।

(ছ) প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা :—এখান হইতে সহর বহুদূরে। তজ্জন্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারি না। চরকার সূতা কোন একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দিন-কয়েক বিক্রয় হইয়াছিল—পরে অসুবিধা ঘটিল। বিক্রয়ের অসুবিধার জন্যই গৃহশিল্প-বিষয়ক উৎসাহ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রসমিতির সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা করি।

(জ) কোন শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিনা :—গত শীতকালে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল। ভাদ্রের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য। এই গ্রাম ও কাছাকাছি গ্রামসমূহ হইতে মহিলাগণের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হয়। উৎসাহবর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল।

(ঝ) যে সকল শিল্প ও চারুকলার বিষয়ে সমিতির মনোযোগ আছে :—সেলাই, জামা, সেমিজ প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদের সেলাই ও কাটছাট, রিপুকর্ম্ম, সূচিশিল্প, আসন, কাঁথা, সূতাকাটা (বস্ত্রবয়ন জোলাদিগের দ্বারা করাইয়া লইবার ব্যবস্থা সমিতি করিয়াছেন), নানাপ্রকার মিঠাই ও সন্দেশ প্রস্তুত, পাটের দড়ি তৈয়ারী, মুড়ি ভাজা, বড়ি দেওয়া, কাপড় ধোলাই, রন্ধন, কাপড়ের ফুলতোলা, তালের পাখা, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হইতে জিনিষপত্র যথা মাছের আঁইস হইতে নানাবিধ সুদৃশ্য দ্রব্য-নির্ম্মাণ, সুপারী-কাটা, নানাপ্রকার উলের কাজ, আলপনা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্পী সুধাংশু রায় মহাশয় কয়েকটি মহিলাকে চিত্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত করিয়া গিয়াছেন।

(ঞ) দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য সমিতি হইতে যেসব উপকরণ সরবরাহ করা হয় :—সমিতি কলিকাতার মূল্যে তূলা সরবরাহ করেন। উৎসাহ দিবার জন্য লোকসান স্বীকার করিয়া অকেজো সূতাও খরিদ করেন। চারিটি চরকা আপাততঃ মূল্য না লইয়া দেওয়া হইয়াছে। সূতা কাটাইয়া লইয়া উহার মূল্য হইতে অল্প অল্প করিয়া চরকার দাম শোধ হইবে। উল ও গুটির সূতা কলিকাতার দামে সরবরাহ করা হয়। জামা তৈয়ারী করিবার জন্য যে সকল সভ্যার থানের আবশ্যক হয়, তাঁহাদিগকে কলিকাতা হইতে উহা কিনিয়া সেখানকার দরেই দিবার ব্যবস্থা আছে।

৯। সমিতির সভায় যাতায়াতের উপায় :—গ্রামের মধ্যস্থলে বালিকাবিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত গৃহে সমিতির অধিবেশন হয়। মহিলারা পদব্রজে সভায় উপস্থিত হইয়া থাকেন।

১১। সমিতির স্থায়ী গৃহ আছে কিনা :—ইটের

দেওয়াল, পাতার ছাউনী, ২৪´×১০½´ আয়তনের অফিস-বাড়ী সম্প্রতি তৈয়ারী শেষ হইয়াছে। উহার দক্ষিণে খোলা প্রাঙ্গণ। ইহা সমিতির নিজস্ব গৃহ।

১২। সমিতি সম্বন্ধে সাধারণের সহানুভূতি কিরূপ ঃ—সমিতি প্রতিষ্ঠার সময়ে সকলবয়সী নারী ও পুরুষের বিশেষ সহানুভূতি পাইয়াছিলাম। ইদানীং আমরা অবাধ মেলামেশা করিতেছি, ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে যোগ দিই, নাট্যাভিনয় করিয়াছি, গ্রামান্তরে পদব্রজে হাঁটিয়া যাই—প্রভৃতি কারণে কতিপয় বয়স্কা নারী ও পুরুষের বিদ্বেষভাজন হইয়াছি।

১৩। যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলা সমিতিকে বিশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন:—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—সমিতিকে একটি উৎকৃষ্ট ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নগদ অর্থেও প্রভূত সাহায্য করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—২৫নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর—সমিতি স্থাপনের সময়ে ১০৲ টাকা দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর একটি রৌপ্যপদক ও মাসিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বঙ্কনবিলাস বসু—ডোঙ্গাঘাটা, যশোহর প্রতি বৎসর একটি রৌপ্যপদক ও একটি মূল্যবান পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন আর কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য কেহ করিয়াছেন তাহার সঠিক বিবরণ দিতে পারিলাম না। সম্পাদিকার নামসহি ও সমিতির সিলমোহর-সংযুক্ত ছাপানো রসিদ বহি লইয়া কর্ম্মীগণ যশোহর, খুলনা, কলিকাতা ও অন্যান্য পল্লীগ্রামে অর্থসংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। রসিদের নম্বর অনুযায়ী আদায়ের বিবরণ পরে কোষাধ্যক্ষার খাতায় লিখিত হইবে। বৈশাখ মাসে কর্ম্মীরা রসিদ-বহি ফেরত দিবেন, তখনই সমস্ত জানা যাইবে। গ্রামের অধিবাসীরা ধনী নহেন, নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর। তাই প্রতি বাড়ীতে মহিলারা আহার্য্য কমাইয়া দৈনিক অন্ততঃ একমুষ্টি চাউল রাখিয়া দেন। প্রতি রবিবারে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ উহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা সমিতির আয়ের একটি বিশেষ পন্থা।

১৪। কেন্দ্রসমিতির পুরস্কার পাইলে কি করা হইবে ঃ—একটি সেলাইয়ের কল কেনা এবং কয়েকজনকে ধাত্রীবিদ্যা শেখানো বড় দরকার। কেন্দ্রসমিতির পুরস্কার পাইলে তাঁহাদের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী এই দুইটি বিষয়ের একটিতে পুরস্কারের টাকা ব্যয় করিব।

১৫। সব্‌জীবাগান ও উদ্যান-রচনায় সমিতির কার্য্য ঃ—সমিতির নিজস্ব যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার চারিদিক ঘিরিয়া ফুলের বাগান তৈয়ারী করিবার আয়োজন হইয়াছে। অধিকাংশ সভ্যার ব্যক্তিগত সব্‌জীবাগান আছে। কেহ কেহ ফুলের বাগানও করিয়া থাকেন।

১৬। গো-পালন, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে প্রচেষ্টা ঃ—সমস্ত সভ্যার গৃহেই গোপালনের ব্যবস্থা আছে। সমিতি এই বিষয়ে কিছু চেষ্টা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। আগামী বৈশাখ মাসে এই গ্রামের ভদ্রসম্প্রদায় হলচালন-উৎসব করিবেন বলিয়া চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে মহিলা-সমিতির বিশেষ কিছু করিবার নাই।

১৭। বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে সমিতির চেষ্টা ঃ—গ্রামে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড-চালিত বালিকা-বিদ্যালয় আছে। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দত্ত সমিতির শিক্ষাবিষয়ক ভারপ্রাপ্তা সভ্যা। অনেক বয়স্থা মেয়ে ও বধূ বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে বাড়ীতে গিয়া ইনি অবসর-সময়ে পড়াইয়া আসেন (ভাদ্রের 'বঙ্গলক্ষ্মী' দ্রষ্টব্য)।

১৮। পারিবারিক জীবনে নৈপুণ্যলাভের চেষ্টা ঃ—কুমারীগণকে গৃহস্থালী, রন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা দিবার ভার লইয়াছেন সমিতির একজন বিশিষ্টা সভ্যা শ্রীমতী কিরণবালা ঘোষ।

১৯। বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালনে সাহায্য ঃ—সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই গ্রামে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড-চালিত বালিকাবিদ্যালয় আছে। উহার শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দত্ত সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। তবুও বিদ্যালয়-পরিচালনে সুবিধা হইবে

বলিয়া শ্রীমতী সরসীবালা দত্ত নামক একটি বালবিধবাকে সমিতি কলিকাতা 'হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রমে' শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি শিক্ষিতা হইয়া আসিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইবেন (ভাদ্রের 'বঙ্গলক্ষ্মী' দ্রষ্টব্য)।

২০। **পল্লী-সংগঠনে মহিলাসমিতির কার্য্য ঃ**— এই সমিতি পল্লীগ্রামে অবস্থিত। আমাদের সকল প্রচেষ্টাই পল্লীবাসিনী নারীজাতির উন্নতির জন্য। পল্লীর উন্নতি-সাধনের জন্য আমরা যে যত্ন করিতেছি তাহার পরিচয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

২১। **বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ঃ**—কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মহিলাদিগের সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মহিলাদের কোনপ্রকার যোগাযোগ ইতিপূর্ব্বে ছিল না। সমিতি-সৃষ্টির দিন হইতে আমরা এই বিভেদ দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। অনুন্নত সম্প্রদায় যাহাতে সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হন তজ্জন্য আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর একটি সভ্যাকে ভার দিয়াছি। তাঁহার নাম শ্রীমতী হেমলতা নাথ। ইনি জাতিতে যুগী। এই মহিলাটি সমিতির জন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ত করেনই, অধিকন্তু প্রতি অধিবেশনে অনেক যুগী, কর্ম্মকার ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মহিলাদিগকে উপস্থিত করিয়া থাকেন।

২২। **ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা, রোগীর সেবা প্রভৃতি বিষয়ে সভ্যাগণের সমবেত চেষ্টা ঃ**— ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে সমিতির কর্ম্মপদ্ধতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রোগীর সেবা সম্বন্ধে সভ্যাদের ব্যক্তিগত পরিশ্রমের কথাও বলা হইয়াছে। আমরা এই বৎসর দুইজন ডাক্তার দিয়া এই বিষয়ে কতগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিব।

২৩। **স্থানীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিধবাদের জন্য কর্ম্মপ্রচেষ্টা ঃ**—চারিটি বিধবাকে চরকা দিয়াছি, তূলাও সরবরাহ করিয়াছি। একটি বালবিধবাকে হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রমে শিক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে। অনেকগুলি বিধবা কাঁথা তৈয়ারী করিতেছেন, সমিতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। খেজুরপাতা দিয়া একপ্রকার পাটীও তৈয়ারী হইতেছে। সমিতি শীঘ্রই একটি বিধবাকে ধাত্রী-বিদ্যা শিখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

২৪। **সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ ঃ**—(ক) ১২ই আষাঢ় তারিখের অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে "পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গাড়ী বা পাল্কীতে যাইবার প্রথা থাকায় ঐ কারণে অনেক অর্থব্যয় হয় এবং তজ্জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মহিলাগণের মধ্যে মেলামেশার বাধা ঘটিতেছে, অতএব সমিতি ঠিক করিতেছেন অতঃপর শারীরিক অক্ষমতা না থাকিলে পদব্রজেই মহিলারা গমনাগমন করিবেন।" এই প্রস্তাবানুযায়ী অনেক মহিলা পদব্রজে গমনাগমন সুরু করিয়াছেন।

(খ) সমিতির একটি সভ্যা প্রসবকালে মারা যাওয়ায় ২৬শে আষাঢ় তারিখের সভায় শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গত বৎসরের শিশুজন্ম ও মৃত্যুর হার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন - প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশু ছয়মাস বয়সের পূর্ব্বে মারা গিয়াছে।

(গ) ১০ই শ্রাবণ তারিখে পার্শ্ববর্ত্তী গড়ভাঙা গ্রামে গিয়া সমিতির কর্ম্মীরা শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়া আসেন।

(ঘ) ১৫ই শ্রাবণ রাত্রিতে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "মাতৃত্ব ও শিশুকল্যাণ" বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

(ঙ) পাঁজিয়ায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের বক্তা ১৭ই শ্রাবণ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "মাতৃত্ব ও শিশুকল্যাণ" এবং প্রসঙ্গতঃ মহিলাসমিতির কার্য্যকারিতা, সরোজনলিনী সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় বহুস্থল হইতে মহিলাসমাগম হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে নৌকাযোগে পর্য্যন্ত মহিলারা আসিয়াছিলেন।

(চ) ২০শে কার্ত্তিক মহিলারা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা অভিনয় করিয়াছেন।

(ছ) ২০শে কার্ত্তিক কুমারীগণের সন্তরণ-প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারবিতরণ হইয়াছে।

(জ) ঐ তারিখেই মহিলাগণের চরকা ও তকলী-

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারবিতরণ হইয়াছে।

(ঝ) সমগ্র গ্রামবাসী সমিতি-গৃহের প্রাঙ্গণে ঐ দিন প্রীতিভোজন করিয়াছিলেন।

২৫। আয়-ব্যয়ের হিসাব—সমিতির বয়স এখনও বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কর্ম্মীরা বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া সমিতির জন্য অর্থসংগ্রহাদি করেন। তাঁহাদের নিকট থেকে হিসাব লইবার সময় এখনও হয় নাই। অতএব এই সময়ে আমরা আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে পারিলাম না। পরে সঠিক হিসাব দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

শ্রী নলিনীবালা বসু
সম্পাদিকা

* * *

পল্লীলক্ষ্মী

ডোঙাঘাটার মহিলাসমিতির করকমলে—

আমার সুদূর পল্লী হইতে এসেছ বোনেরা মা'রা,
বহিয়া এনেছ কুটীরশিল্প পল্লী স্নেহের ধারা।
ছায়ায় শীতল বন-বীথি-তলে বসিয়া পাতার ঘরে,
কত না সোনার স্বপন কুড়ায়ে রেখেছ আঁচল ভ'রে।
রঙীন সূতার আখর টানিয়া তাদের দিয়েছ কায়া,
নক্সী কাঁথায় রঙিন পাখায় মেখেছ মমতা মায়া;
তোমাদের সাথে এসেছে গাঁয়ের যত বোন আর মাতা,—
তাহাদের বুক যেন তোমাদের কুটীর-শিল্পে পাতা।
ঘন বাঁশবন, তারি ফাঁক দিয়ে আলোকের আলপনা
তোমাদের গাঁর জনহীন বাট ক'রে যায় বন্দনা।
শাখে শাখে ডাকে গাঁয়ের পাখীরা, তোমাদের গেহকোণে
ছোট ছোট দুখ ছোট ছোট সুখ,—তাতে সুর-জাল বোনে।
সেইখান হ'তে এসেছ তোমরা পল্লীর মা বোনেরা,
সে দেশের যাহা গর্ব্বের যেন তোমাদের মাঝে ঘেরা।
তোমাদের এই বিপণীর থালা—পূজার প্রদীপ ধরি'
অনাগত যুগ দেবতারে যেন লইছ বরণ করি'।
হয় ত ইহারি আলো-পথ ধ'রে আসিবে বঙ্গমাতা,
হইবে গাঁয়ের কুটীর-শিল্পে আসন তাহার পাতা।

১৯।১।৩১
কলিকাতা

জসীম উদ্দীন *

কেন্দ্রসমিতির কথা

বসিরহাট মহিলা শিল্পপ্রদর্শনী

গত ৮ই মার্চ্চ রবিবার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাটের টাউনহলে স্থানীয় মহিলাসমিতির উদ্যোগে একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী ঐ সভায় সভানেত্রীর কার্য্য করেন। মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মহিলা এই প্রদর্শনী ও সভায় যোগদান করেন। সভানেত্রী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-সমস্যা সম্বন্ধে অতি প্রাণস্পর্শী ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ বর্ত্তমান ভারতে নারীর কর্ম্মধারা বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরব বহুপরিমাণে কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার এবং বয়স্কের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর নির্ভর করে। মহিলারাই এই কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারেন। গত ৯ই মার্চ্চ সোমবার শিল্পপ্রদর্শনী এবং শিশুপ্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা

---

* কবি জসীম উদ্দীন সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির গত বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীতে যশোহর জেলার অন্তর্গত ডোঙাঘাটা মহিলা-সমিতির শিল্পকার্য্য দেখিয়া উক্ত সমিতির উদ্দেশে কবিতাটি রচনা করিয়া উপহার দিয়াছেন। "পল্লীলক্ষ্মী" নামটি আমাদের দেওয়া।—বঃ মঃ

চক্রবর্ত্তী ঐ সভায় সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সুস্থ সবল শিশু, পরিচ্ছন্না ধাত্রী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারু ও কারুশিল্পের জন্য এবং স্বেচ্ছাসেবিকাদিগের কর্ম্মতৎপরতার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্থানীয় মহিলাসমিতির সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুধা মজুমদার মহোদয়ার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতার ফলে এই অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল।

কস্‌বা মহিলাসভার অধিবেশন

গত ৭ই মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কস্‌বা গ্রামে কস্‌বা মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায় বি এ ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায় সমিতির সভ্যাদের শিল্পকার্য্য দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহারা এই অল্পকালের মধ্যে সেলাই, সূচিশিল্প এবং চিকণের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে যে উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহা অতীব আশাপ্রদ বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুক্তা রায় রেডক্রশ সোসাইটীর শিশু পরিচর্য্যাগার পরিদর্শন করেন। মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম এ. বি-টি মহোদয় এবং শিশু-পরিচর্য্যাগারের স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা শ্রীযুক্তা ঘোষ—শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায়কে সমিতি ও শিল্পপরিচর্য্যাগারের কর্ম্মপ্রণালী বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে নারী-মঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি মহিলাদিগকে কুটীর শিল্প এবং কৃষির সাহায্যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং সর্ব্বত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণের দ্বারা পরিবার ও জাতির উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইতে আহ্বান করেন। তিনি বিশেষ করিয়া বলেন—নারীর পক্ষে অর্থোপার্জ্জনের চেয়েও বড় কাজ পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

শ্রীরামপুর প্রদর্শনী

শ্রীরামপুর শিবশঙ্কর জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে গত ১লা ফাল্গুন একটি শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন। এই প্রদর্শনীর সহিত সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সেলাই, সূচিশিল্প, চিকণের কাজ, বেতের কাজ, অন্যান্য শিল্প-দ্রব্য এবং পুস্তক ও পুস্তিকার একটি ষ্টল খোলা হইয়াছিল। প্রায় তিন সপ্তাহ কাল বহু পুরুষ ও মহিলা এই ষ্টলের বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সম্মিলনীর শিল্পপ্রদর্শনী

নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির উদ্যোগে গত ৫ই মার্চ্চ বাগবাজারের রায় ৺পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাড়ী একটি শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। তাহাতে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বহু শিল্পদ্রব্যও প্রদর্শিত ও বিক্রয় হয়। নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সম্মিলনীর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির শিল্পদ্রব্য ও সূচিশিল্পগুলি পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত সুখী হন এবং একখানা সূচি-শিল্পের কাজ তিনি ক্রয় করেন।

কাশীপুর নারী-কল্যাণ সমিতি

যশোহর জেলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে কিছুদিন হয় নারী-কল্যাণ সমিতি নামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতিকে কলিকাতা সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। সুকবি শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ এম-আর-এস মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুমতি দেবী অন্তঃপুরিকাগণকে জামার ছাঁট-কাট ও শিল্প শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীপুর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-বি মহাশয় ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা করিতে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ও শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী চিত্রশিল্প শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী মেয়েদের সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিবেন। উক্ত সভার মুষ্টিভিক্ষার সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমিতির ব্যয় যথাসম্ভব নির্ব্বাহ হইবে স্থির হইয়াছে। শ্রীযুক্তা অর্গলা দেবী এই সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীযুক্তা নলিনী গাঙ্গুলী ইহার সম্পাদিকা।

নাংলা মহিলাসমিতি

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নাংলা গ্রামে সম্প্রতি একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এস্, এন, খাতুন সমিতির সম্পাদিকা ও প্রতিষ্ঠাত্রী। আমরা এই সমিতির মঙ্গল কামনা করি।

লোহাগড়া মহিলাসমিতি

কিছুদিন হয় সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী প্রচারকার্য্যের জন্য যশোহরে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে যশোহরের অন্তর্গত লোহাগড়া গ্রামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা রমলা সরকার ঐ সমিতির সম্পাদিকার কার্য্য করিতেছেন।

বহুবাজার মহিলাসমিতির বার্ষিক উৎসব

গত ১০ই মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ৺শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে বহুবাজারে 'বহুবাজার মহিলাসমিতি'র বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখার্জ্জি মহাশয়ের পত্নী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা উমাশশী দেবী সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। ঐ বিবরণী হইতে জানা যায় যে এই সমিতির বালিকাদের শিক্ষা এবং মহিলাদের শিল্প ও সাধারণ শিক্ষার জন্য অতি যোগ্যতার সহিত নিয়মিত ভাবে ক্লাশ পরিচালন করা হইতেছে। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য মহিলাদিগকে বিভিন্ন সামাজিক কার্য্যে যোগদান করার জন্য অতি ওজস্বিনী ভাষায় আহ্বান করেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গীত ও বাদ্য উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রায় বাহাদুর এ, সি, বানার্জ্জি এবং মিসেস মুখার্জ্জি সঙ্গীত ও বাদ্যের জন্য দুইটি বালিকাকে দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

রাজবালা মহিলাসমিতির বার্ষিক উৎসব

গত ১লা চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫টায় ভবানীপুর গিরিশ মুখার্জ্জি রোডে "গিরিশ ভবনে" রাজবালা মহিলাসমিতির প্রথম বার্ষিক উৎসব-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন করা হয়। শ্রীযুক্তা সু... লেখা চক্রবর্ত্তী সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। সভা... বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে "আজ চারিদিকে মহিলাস... দেখিতে পাওয়া যায়, মনে করিবেন না যে ইহা এক... সম্ভব হইয়াছে। ইহার সূচনা হইয়াছিল ৫০ বৎসর পূ... অর্দ্ধ শতাব্দী বড় কম নয়। আমাদের বাল্যক... আমরা দেখিয়াছি, আমার পিসিমাতা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকু... দেবী 'সখী সমিতি' নামে এক সমিতি প্রতি... করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা ৺হিরণ্ময়ী দেবীর স্থা... একটি সমিতি ছিল, তাহা এখন তাঁহার প্রতি... 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রমের' সহিত সংযুক্ত হইয়া... তৎপরে তিনি মেয়েদের কার্য্য ও সমিতির প্রয়োজন... ...ন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

কেন্দ্রসমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন মা... লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

মেয়েদের রচিত নানাবিধ দ্রব্য সভাস্থলে রক্ষিত... ছিল। সভানেত্রী মহোদয়া ও অপরাপর সকলে... দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন।

হিন্দু অবলা-আশ্রমে আলোকচিত্র সাহায্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা

গত ১৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হিন্দু অবলা-আ... কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল স... বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায় বি-এ, শিল্প-বি... লয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী প্রতিভা সেন বি-এ, কুমারী মমতা মিত্র বি-এ, ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র... বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী... উপস্থিত হন। মহিলা কর্ম্মীরা আশ্রমবাসী মহিলাদের... আলাপ-পরিচয় করেন। সন্ধ্যাকালে প্রচারকগণ আ... চিত্র সাহায্যে স্বাস্থ্য ও ধ্রুবচরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা... মহিলারা রাত্রে শিশুপালনাগার (Babies' ... পরিদর্শন করেন।

ল্যান্সডাউন রোড মহিলাসমিতির বার্ষিক...

গত ১লা চৈত্র রবিবার ল্যান্সডাউন রোডে... সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সরো...

দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সমিতির বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পঠিত হয় উক্ত সমিতির পরিচালিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী কর্ত্তৃক। সূক্ষ্ম সূচি-কর্ম্মের জন্য তিনজন মহিলা পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীমতী লাবণ্যলেখা দেবী মেয়েদের কার্য্য ও সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। সভানেত্রী ওজস্বিনী ভাষায় সমাগত মহিলাদের সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনারা উঠুন, যাঁর মধ্যে যেটুকু শক্তি আছে তাই তিনি কর্ম্মে নিয়োজিত করুন। কার ভিতরে কি শক্তি কি গুণ আছে তাহা অনুশীলন না করিলে প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া? অলস ভাবে দিন কাটানো উচিত নয়। শুধুই রন্ধনগৃহের মধ্যে আপনাদের কর্ম্ম সীমাবদ্ধ নয়, রন্ধন করুন আপনারা কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের চিত্তবৃত্তির উন্নতি সাধন ও মানবের কল্যাণকর নানাবিধ কর্ম্ম করিতে আপনাদের অনুরোধ করিতেছি। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাতে অবহেলা করিবেন না—যার মধ্যে যে ক্ষমতা সুপ্তভাবে আছে তিনি তাহার বিকাশসাধনে তৎপর ও যত্নবতী হন। যাঁর বলিবার শক্তি আছে তিনি বলুন, জীবনের নানাদিক ফুটাইয়া তুলুন, কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার যিনি অধিকারিণী তিনি তাই করুন, গান যিনি গাহিতে পারেন তিনি গান করুন,—মোট কথা যাঁর ভিতর যে গুণ আছে তিনি তারই বিকাশ ও পরিচালনার দ্বারা উত্তরোত্তর উন্নতি-সাধন করিয়া নিজের, দেশের ও দশের উপকার করুন।" তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা নূতন ভাব ও উদ্দীপনায় সকলের মন ভরিয়া তুলিয়াছিল। যন্ত্র-সঙ্গীত ও জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসবে পুরস্কার-বিতরণ

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসবে নিম্নলিখিত মহিলাসমিতি এবং কর্ম্মীগণ পুরস্কার পাইয়াছেন :—

(১) সুরমা উপত্যকা মহিলাসমিতি কেন্দ্রের সম্পাদিকা শ্রীমতী শৈলবালা বিশ্বাস প্রচারকার্য্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই সি এস্ প্রদত্ত একটি ৫০৲ মূল্যের স্বর্ণপদক; (২) মৈমনসিংহ মহিলাসমিতি উৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ৫০৲ টাকা পুরস্কার। নিম্নলিখিত মহিলাসমিতিসমূহ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ২০৲ টাকা হিসাবে পুরস্কার পাইয়াছেন :—(৩) টাঙ্গাইল মহিলাসমিতি,(৪) সেনহাটী মহিলাসমিতি, (৫) শ্রীহট্ট মহিলা-সমিতি, (৬) বাগেরহাট মহিলাসমিতি ১নং, (৭) খুলনা মহিলাসমিতি, (৮) ডোঙ্গাবাটা মহিলাসমিতি, (৯) যশোহর মহিলাসমিতি, (১০) বারাসত মহিলাসমিতি, (১১) কুড়িগ্রাম মহিলাসমিতি, (১২) বাগেরহাট আদি মহিলাসমিতি। (১৩) বাইনান মহিলাসমিতি—মিঃ আই, এস, মুখার্জ্জি প্রদত্ত ১৫৲ টাকা পুরস্কার, (১৪) মূলঘর মহিলাসমিতি—রায় সাহেব এস, এন, ব্যানার্জ্জি প্রদত্ত ১৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার; (১৫) বেহেলি মহিলাসমিতি—রায় সাহেব এস, এন্ ব্যানার্জ্জি প্রদত্ত ১০৲ টাকা পুরস্কার; (১৬) সরোজনলিনী নারী-শিল্পশিক্ষালয়—উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের জন্য শ্রীযুক্তা কামিনী বসু প্রদত্ত ১৫৲ টাকা পুরস্কার। (১৭) শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত, মোমিন,—"নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ৫০৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার; (১৮) শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত, শ্রীহট্ট,—"নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার জন্য ২৫৲ টাকা মূল্যের দ্বিতীয় পুরস্কার। (১৯) শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায়—অভিনয়ের জন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ২৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার; (২০) শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—অভিনয়ের জন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ২৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার। (২১) শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—অভিনয়ের জন্য ডাঃ এইচ, এন, রায় প্রদত্ত রৌপ্য পদক পুরস্কার। (২২) ইটনা মহিলাসমিতি—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ১০৲ টাকা পুরস্কার; (২৩) ঘোষনগর মহিলা-সমিতি—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ১০৲ টাকা পুরস্কার। শ্রীমতী নিভারাণী ভাদুড়ী—ডাঃ নরেশনাথ ঘোষ প্রদত্ত সঙ্গীতের জন্য রৌপ্য পদক।

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক নির্ব্বাচন

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৩১ সালের জন্য কর্ম্মপরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন :—

পৃষ্ঠপোষিকাগণ

মাননীয়া লেডী জ্যাক্সন, বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী, লেডী মুখার্জ্জি,

সহঃ পৃষ্ঠপোষিকাগণ

লেডী সিংহ, লেডী বসু, সন্তোষের রাণী সাহেবা, দিঘাপতিয়ার রাণী সাহেবা, নারাজোলের শ্রীমতী বীণাপাণি খান, লেডী ইসমাইল সেট, মিসেস এস, এন, মল্লিক।

সভানেত্রী

মাননীয়া রাজমাতা মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী।

সহঃ সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি-আই-ই, এম-এ, বি-এল, রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল, মাননীয় মিঃ খাজা নাজিমুদ্দিন সি-আই-ই, লেঃ কর্ণেল হাসান সুরাবর্দ্দি, মাননীয় সার এ, কে, গজনভি,মাননীয় খান বাহাদুর কে,জি, এম, ফারোকি। মাননীয় লেঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এম এ, বি এল।

পরিচালক-সভার সভাপতি

মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এম-এল-সি।

পরিচালক-সভার সহঃ সভানেত্রী

শ্রীমতী নীরজবাসিনী সোম বি এ, বি-টি।

সহঃ সভাপতি

রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বাহাদুর।

সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ

রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ।

সম্পাদিকা

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী।

সহযোগী সম্পাদকগণ

শ্রীমতী গীতা দেবী বি এ, বি-টি, শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ বি-এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ এম-এ।

পরিচালক-সমিতির সভ্যগণ

(১) মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এম-এল সি, (২) শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি, (৩) রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বাহাদুর, (৪) রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম-এ, (৫) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, (৬) শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ বি-এল, (৭) ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় এম-বি, (৮) শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, (৯) শ্রীযুক্তা গীতা দেবী বি-এ, বি-টি, (১০) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, (১১) মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম-এল-সি, (১২) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, (১৩) শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, (১৪) শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, (১৫) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বি-এল, (১৬) শ্রীমতী প্রতিভা সেন বি-এ, (১৭) রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি এল, (১৮) শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস, (১৯) মিঃ এইচ, কে, দে বার এট্-ল, (২০) শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন, (২১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (২২) ডাঃ পি, সি, সেন, (২৩) শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, (২৪) শ্রীযুক্তা কামিনী বসু, (২৫) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী পি এইচ-ডি, (২৬) শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, (২৭) শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র গুপ্ত, (২৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, (২৯) মিঃ টি, পি, সেন, (৩০) শ্রীযুক্তা হৃদয়বালা বসু এম এ, (৩১) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য, (৩২) শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র, (৩৩) শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত (৩৪) ক্যাপ্টেন এন, এন, দত্ত, (৩৫) মিঃ এন, ঘোষ, (৩) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩৭) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, (৩৮) মেজর এ, সি, চ্যাটার্জি, (৩৯) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৪০) শ্রীযুক্তা মনীষা রায় এম-এ, (৪১) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪২) মেজর জে, সি, দে আই-এম-এস, (৪৩) মিসেস জে, সি, দে, (৪৪) মিঃ বি এম, দাস, (৪৫) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল, (৪৬) মিঃ টি, সি, বসু, (৪৭) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ।

লোটাস ডে উপলক্ষে অর্থসংগ্রহ

গত ১৯ শে জানুয়ারী লোটাস ডে উপলক্ষে কেন্দ্র-সমিতির সাহায্যের জন্য প্রায় ৯ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে ইহার জন্য অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

হাওড়া নারীমঙ্গল সমিতি

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছি হাওড়া ৫০৮ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে হাওড়া জেলায় কার্য্যের জন্য সরোজনালি নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান গঠি[ত] হইয়াছে। ইহার কার্য্য সুপরিচালনের জন্য একটি পুরুষদে[র] কমিটি এবং একটি মহিলাদের কমিটি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা শোভনা দেবী এই মহিলা-কমিটির সভানেত্রী, শ্রীমতী বি, জে, চৌধুরী এল্-এম্ এস্ সম্পাদিকা এবং মিসেস জি, ডি, দে, শ্রীমতী উমারাণী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী অণিমা দেবী এবং শ্রীমতী সর[যূ] সেন ইহার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
কলিকাতা

লাভচাঁদের

জড়োয়া গহনা

সোনারূপার অলঙ্কার
বঙ্গলক্ষ্মীদের চিরআদরের

ডিজাইন ও কারুকার্য্যে
উৎকর্ষতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ

লাভচাঁদ শেঠ

(ভূতপূর্ব্ব লাভচাঁদ মোতিচাঁদ জুয়েলার্স কোম্পানীর প্রধান অংশীদার)

শোরুম :—
২২।১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা
(লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়)
(ফোন ২৩৬১ কলিকাতা)

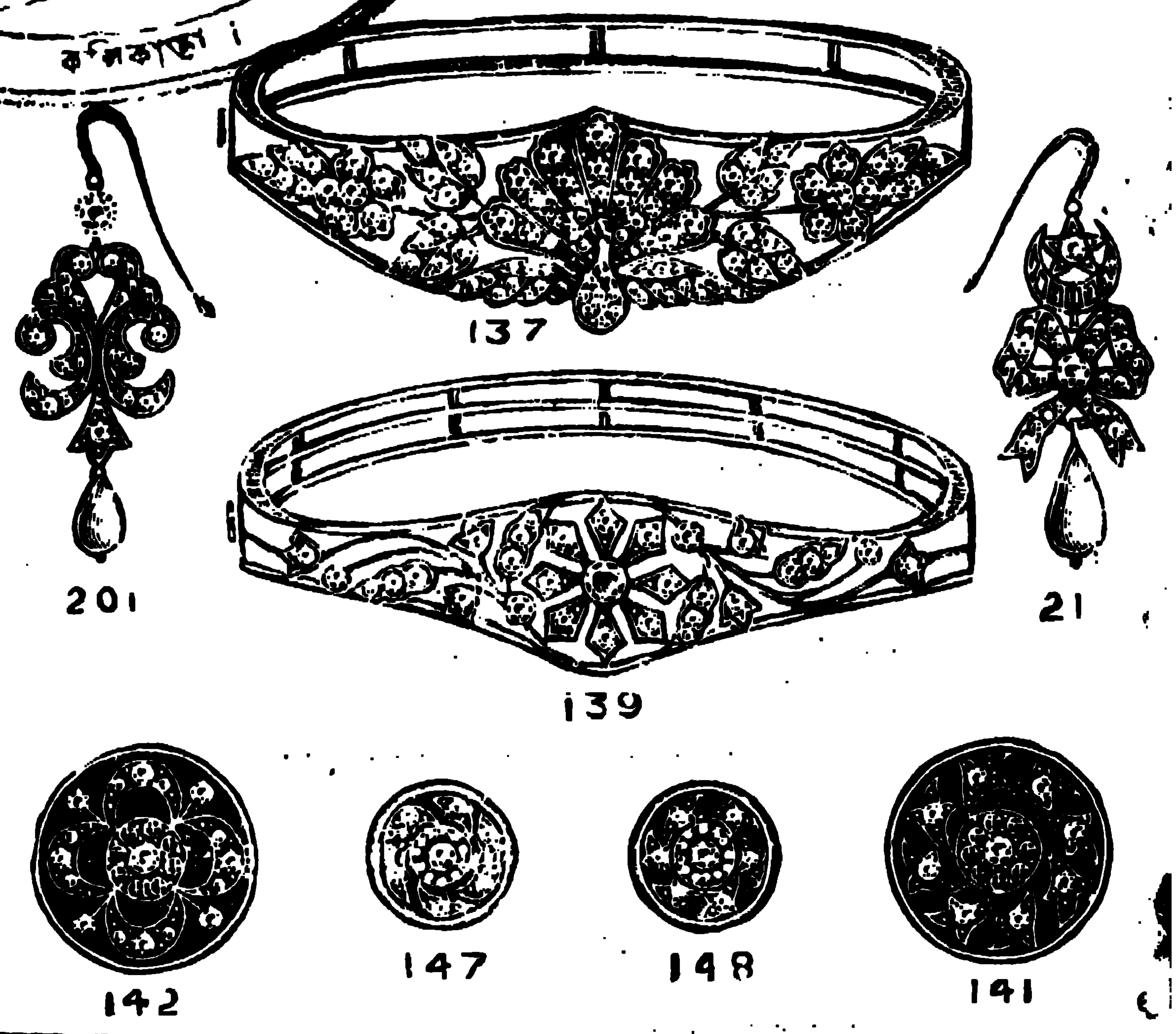

অফিস ও কারখানা :—১২ নং পুলিস হস্পিটাল রোড, কলিকাতা
পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and published by him at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ]　　বৈশাখ, ১৩৩৮　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্র

সুহৃদ্বর

……………………বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যবসায় দেখ্‌লুম তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েচে। দেশের স্বাস্থ্য এবং অন্নের সংস্থান খুবই জরুরি সন্দেহ নেই—কিন্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। দেশের জনসাধারণ বল্‌তে যাদের বোঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্যেগীতে কাব্যকলায় অজস্রভাবে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করেচে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকুণ্ডের মতো এখনো তার অবশেষ দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ। আমরা গ্রন্থকীট, দেশের গভীর প্রাণপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরেজি স্কুলের "ইস্কুল্ বয়"—সেইজন্যে পুঁথির নজীর অনুসরণ করে' বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী কর্‌তে আমাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্যপ্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ কর্‌তে পারি। তার মধ্যে একটি হচ্চে নৃত্য। সরস্বতীর এই মহদ্দানকে আমাদের ভদ্রসমাজ অবজ্ঞা করে' পেশাদারের ঘরে ঠেলে দিয়েচে—জনসাধারণের মধ্যে আড়ালে আব্‌ডালে কিছু কিছু আছে সসঙ্কোচে—আপনি তাকে অখ্যাতি থেকে মুক্ত করে' সর্ব্বজনের মধ্যে তার আসন করে' দেবার চেষ্টা করচেন, এ একটা বড়ো কাজ। সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরূক করে' রাখে, মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না—আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে মারা যায়। আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নতুন আবিষ্কার করেচেন; এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। এই নাচের উৎ-

সাহকে আপনি জেলার ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও সঞ্চারিত করে' দিচ্চেন। পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী। আমাদের দেশেরও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য;—তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক্ সার্থক হোক্। *

২৭ ফাল্গুন,
১৩৩৭

আপনার—
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

* শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয়কে লিখিত পত্রাংশ। —বঃ সঃ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

স্‌ফী মতবাদের উদ্ভব

মোহাম্মদ এনামুল হক এম-এ

"স্‌ফী" শব্দর মৌলিক অর্থের সহিত এই বিশ্ববিশ্রুত মতবাদের উদ্ভবের একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। আপাত-দৃষ্টিতে ইহা অবান্তর বলিয়া মনে হইলেও, চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপ্রাসঙ্গিক নহে—কেন না, ইহাকে বাদ দিয়া স্‌ফী মতবাদের গোড়ার কথা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কেহ কেহ মনে করেন, "স্‌ফী" শব্দ আরবী "স্বফা" ধাতু হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে—অর্থ, "পবিত্রতা"। তাঁহাদের মতে পবিত্র ব্যক্তিরাই স্‌ফী। এই পবিত্রতার সংজ্ঞা-দান ও পবিত্র ব্যক্তিদের পরিসর-নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা নানা-প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন ; এ স্থলে তাহার অবতারণা অবান্তর।

কেহ কেহ বলেন, "অহ্‌লু-স্‌-সুফ্‌ফহ্‌" অর্থাৎ "পর্য্য-ঙ্কোপবিষ্ট" এই বাক্যাংশ হইতেই "স্‌ফী" শব্দের উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মতে, যে সকল মুসলমান সাধু, ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগে, মস্‌জিদের বহির্দ্দেশে পর্য্যঙ্কে বসিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন, তাঁহারাই "স্‌ফী"।

আবার কেহ কেহ মনে করেন, গ্রীক Philosophos (প্রজ্ঞাপ্রিয়) শব্দের আরবী অপভ্রংশ "ফয়্‌লুস্থফ্‌" অর্থাৎ "দার্শনিক" হইতে "সুফী" শব্দের উদ্ভব ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মতে, যে সকল মুসলমান সাধু ধর্ম্মের দর্শনসম্মত ব্যাখ্যা দিয়া নিজেদের জীবনকে অনুরূপভাবে পরিচালিত করিয়া-ছিলেন, তাঁহারাই "সুফী"।

আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, গ্রীক Sophisma (জ্ঞান) শব্দের আরবী অপভ্রংশ "সফ্‌সতী" অর্থাৎ "ভ্রান্ত কূটতার্কিক" হইতেই "সুফী" শব্দ গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যাঁহারা বিপথগামী কূটতর্কের অবতারণা করেন, তাঁহারাই "সুফী"।

কিন্তু, যিনি যাহাই মনে করুন, এখন অধিকাংশ আরবী পণ্ডিতদের মতে "স্‌ফী" আরবী "ইস্‌ম্‌-জামিদ্‌" বা মূল বিশেষ্যপদ "স্‌ফ" বা "পশম" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে যে সমুদয় লোক ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগে পশমের জামা (ফাঃ জামহ্‌) পরিয়া সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহারাই "স্‌ফী"। বাস্তবিকই, ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগে পশমী পোষাক—অনাড়ম্বর বিলাসহীনতা ও অনাসক্তির প্রতীক ছিল। স্বয়ং দ্বিতীয় খলীফহ্‌ হদ্‌রত্‌ 'উমর্‌ পশমী জুব্বহ্‌ (সুদীর্ঘ জামা) পরিধান করিতেন। "খুলফা-ই-রাশিদীন্‌" বা আদর্শ খলিফাদের পর, যখন ধীরে ধীরে ইস্‌লামে বিলাসিতা, আড়ম্বর ও সংসার-আসক্তি বাড়িয়াই চলিল, খুব সম্ভব তখনই, এমন একদল লোক ইস্‌লামে বাহির হইয়া পড়িলেন, যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে না হউক, (কেন না, একটি স্বল্পসংখ্যক লোক-সংঘের দ্বারা বিরাট জাতিটাকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই) নীরবেই, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা নিজের জীবনকে আড়ম্বর ও আসক্তির হাত হইতে সম্পূর্ণই মুক্ত রাখিয়া আপনাদিগকে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের সম্মুখে এক একটি আদর্শরূপে খাড়া করিলেন। সুতরাং, ইঁহারা অচিরেই, "স্‌ফী" বা "পশমী পোসাক পরিধানকারী" নামে অভিহিত হইয়া পড়িলেন।

স্‌ফী মতবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এক একটি ভীষণ মত খাড়া করিয়াছেন। তাহার বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া কাজ নাই। যাঁহারা এ বিষয় বিশেষভাবে অনুশীলন করিতে চাহেন, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রবন্ধ-সংলগ্ন গ্রন্থবিবরণ (Bibliography) * ও এবিষয়ে জর্ম্মান

* Bibliography:—

i. The Holy Quran—Moulvi Muhammad Ali (English Translation).

ii. A literary History of the Arabs—R. A. Nicholson.

পণ্ডিতদের আরও মৌলিক গ্রন্থ আলোচনা করিতে পারিবেন। যাঁহারা যাই বলুন, এ কথা সত্য যে,স্বূফী মতবাদ মানবের স্বাভাবিক চিন্তাধারা ও মর্ম্মমুখ (Mystic) জ্ঞানের একটি স্ফুরণরূপ। মানুষের বাহ্যিক জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, মর্ম্মমুখ চৈতন্যের বিকাশও স্বাভাবিক। সভ্য মানুষের মন চিরদিন অজানাকে জানিতে চাহিয়াছে ও চাহিবে, অজ্ঞাতকে পরিজ্ঞাত করিবার সন্ধান খুঁজিয়াছে ও খুঁজিবে, অনুপলব্ধকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছে ও পাইবে। মানুষের মন যাহা পায়, সাধারণতঃ তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না; মানুষ যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখে, তাহার পশ্চাতে অদৃশ্য কি রহিয়াছে, তাহাকে জ্ঞানের চক্ষে, প্রাণের আঁখিতে, মর্ম্মের নয়নে বুঝিবার ও দেখিবার প্রয়াস পায়। এই যে অজানাকে জানিবার, অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হইবার, অনুপলব্ধকে উপলব্ধি করিবার, ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলা অথচ চিরপ্রবহমান অনন্তপ্রয়াস, তাহা মানবের পক্ষে শাশ্বত, সত্য ও স্বাভাবিক। অনন্তকালই তাহার সাক্ষী; মানুষের ইতিহাস তাহার অতি নগণ্য অংশকে লইয়াই গঠিত হইয়াছে। স্বূফী মতবাদের উদ্ভবের মূলেও ঠিক এমনই একটি তীব্র প্রেরণা ও তাহার অনুভূতির সন্ধান আমরা পাইয়াছি। একটু চিন্তাশীলতার সহিত উদারভাবে দেখিলেই দেখা যাইবে, প্রত্যেক নবীন ধর্ম্ম-উদ্ভবের মূলে মুখ্যতঃ দুইটি বিষয়ই রহিয়াছে—একটি মানুষকে অন্তর্মুখ করিয়া অজানার সন্ধান বলিয়া দেওয়ার প্রয়াস; আর অন্যটি তাহাকে বহির্মুখ করিয়া সভ্যতা ও জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা। পরে ধর্ম্ম যখন জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখন হয়ত এই দুইটির কোন একটি ধর্ম্মানুবর্ত্তীদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে, এবং হয়ত ধীরে ধীরে একটি অপরটিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে। প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনের প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলেই, এই দুইটি বিষয় অনায়াসেই ধরা পড়িতে পারে। হজ্রত্ মুহম্মদ্ও এমনই একটি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন;—তাঁহার নব-প্রচারিত ধর্ম্ম ইস্লামেও এই দুইটি দিক ছিল। তাঁহার পর যে চারিটি মহাপুরুষ তাঁহার শূন্যপদ পূর্ণ করিয়াছিলেন, মুস্লিম্-জগতে অদ্যাপি তাঁহারা "খুলফা-ই-রাশিদীন্" বা "আদর্শ-অনুবর্ত্তী" নামে সম্মানলাভ করিয়া থাকেন; ইহার একমাত্র কারণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের উপর্য্যুক্ত দুইটি আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, ইস্লাম ধর্ম্ম এই চারিজন (অবূবকর্; 'উথ্মান্; 'উমর্; 'অলী) মহাপুরুষের পর যখন মর্ম্মের দিক হইতে কর্ম্মের (এই "কর্ম্মের" দ্বারা বৌদ্ধদের কর্ম্মবাদের ন্যায়, কোন মতবাদের দিকে ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; একটি নূতন সভ্যতা, যেমন "সারাসিন" বা আরবীয় সভ্যতা, গড়িয়া তুলিতে যে সকল কর্ম্মের আবশ্যক তাহাই বুঝান হইতেছে) দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন এমন একদল মুসলমান—অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ও নগণ্য ছিল—বাহির হইয়া পড়িলেন, যাঁহারা নীরবেই ইস্লামের অতিরিক্ত কর্ম্মপ্রিয়তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সাধারণতঃ, ধর্ম্মের দিকে একটা অতিরিক্ত ঝোঁক আসিয়া পড়িলে, তাহার যে অবস্থালাভ অবশ্যম্ভাবী, ইস্লাম তাহার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। একদিকে ইস্লামী শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা যেমন বাড়িয়া চলিল, তেমনই অন্যদিকে তাহার বিলাসিতা, অমিতাচার, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও নানাবিধ ঐহিকতাও দিন দিন বাড়িয়া চলিল; মর্ম্মের দিক ধীরে ধীরে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় মরণের পথে ছুটিয়া চলিল। এই নির্ব্বাণোন্মুখ মর্ম্মপ্রদীপের শেষ অথচ উজ্জ্বল শিখাটুকুকেই স্বূফী মতবাদের উদ্ভবের মূলে দেখিতে পাই। কর্ম্মের পথে যখন বেজায় বাড়াবাড়ি চলিল, মর্ম্মের পথেও একটু বাড়াবাড়ি চলিতে লাগিল—উভয়ের সংঘর্ষের ফলেই স্বূফীদের উদ্ভব হইল। এ কথাটি একটু পরে, আরও খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। পৃথিবীতে যুগে যুগে মর্ম্মমুখ সাধুপুরুষের

iii. Literary History of Persia—E. G. Browne.
iv. Encyclopaedia of Religion and Ethics. Edited by James Hastings. Vol. XI.
V. The Development of Metaphysics in Persia. Dr. Iqbal.
VI. Studies in Islamic Mysticism—R. A. Nicholson.
VII. Encyclopaedia of Islam—Article on Yasweef.
VIII. Yadh-Kirah-i-Awlya-i-Hind (Urdu—Introduction).

আবির্ভাব ঘটিয়াছে; তাঁহারা সকলেই অজানার সন্ধানে চলিয়াছিলেন; সূফীগণও তাহাই করিয়াছেন। তবে পৃথিবীর অন্যান্য সাধুপুরুষ ও মুসলমান সূফীদের পার্থক্য কোথায়? সে কি শুধু আরবী নামটির মধ্যে পর্য্যবসিত, না আরও কিছু বিভেদ-রহস্য বর্ত্তমান? যদিও মুসলমানদের সূফী ও পৃথিবীর অন্যান্য সাধকদের "মা-ই-মক্‌সূদ্" বা অভীপ্সিত স্থান এক, তবু এই উভয়শ্রেণীর সাধকের মধ্যে একটি পরিষ্কার বিভাজ্যরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। যখন উভয়শ্রেণীর সাধক-আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটে (অর্থাৎ সূফীদের 'ফনার" অবস্থায় পৌঁছায়), হয়ত তখন তাঁহাদের কোন পার্থক্যই থাকে না, কিন্তু তাহার আগে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। এই বিভিন্নতাটুকু হইল মার্গজ। সূফীরা একশ্রেণীর মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন, আর অপরাপর সাধকেরা অন্যান্য শ্রেণীর মার্গ বাহিয়া অভীপ্সিত স্থানের দিকে চলিতে থাকেন। এই ব্যাপারটি একটি বৃত্তের পরিধি হইতে সোজাসুজিভাবে কেন্দ্রে পৌঁছিবার ব্যাপারের সহিত তুলিত হইতে পারে। বৃত্তের পরিধি হইতে অসংখ্য ব্যাসার্দ্ধ টানিলে, তাহা যেমন ঠিক কেন্দ্রে গিয়া মিশিয়া যায়, অথচ প্রত্যেক ব্যাসার্দ্ধের একটি স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান, তেমনই পৃথিবীর যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী সাধক, যেখান হইতেই তাঁহার মূল বাঞ্ছিতের (পরমেশ্বরের) উদ্দেশে যাত্রা করুন, পরিশেষে ঐ ভগবৎ-কেন্দ্রে গিয়াই মিশিয়া যান। এক একটি ব্যাসার্দ্ধ যেমন কেন্দ্রে গিয়া না মিশা পর্য্যন্ত পৃথকভাবে অবস্থান করে, তেমনই যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ সীমায় না পৌঁছায় ততক্ষণ এক মার্গগামীরা অপর মার্গগামীদের সহিত মিলিতে পারে না। সূফীরা ইস্‌লাম-নির্দ্দেশিত মার্গগামী বলিয়াই সূফী নামে খ্যাত, নতুবা সকল সাধকের গোড়ায় ঐ অনির্দ্দিষ্ট ও অজানিতের সন্ধানই রহিয়াছে।

এখন দেখা যাইবে, সূফী মতবাদের উদ্ভবের মূলে ইসলামের মর্ম্মমুখী শক্তিকে কর্ম্মমুখী শক্তি গ্রাস করিবার বিপুল প্রচেষ্টায়, পরশক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব্বশক্তির চৈতন্যপ্রাপ্তি বা জাগরণ কতটুকু নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং যে জাগরণ বা চৈতন্যপ্রাপ্তি, বিলাসিতা, আড়ম্বর ও সংসার-আসক্তির সংঘাতে লাভ করা যায়, তাহাতে যে এই সমুদয়ের কোনটিই পাওয়া যাইবে না তাহা স্বাভাবিক। প্রাথমিক যুগের সূফীদের জীবনই ইহার প্রমাণ। তাঁহারা হজ্‌রত্ মুহম্মদ্ ও তদীয় আদর্শ-অনুবর্ত্তী চতুষ্টয়ের সরল, সহজ ও অনাসক্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের জীবন পবিত্রতা ও ভগবৎ-সাধনার জীবন্ত ও জ্বলন্ত মূর্ত্তি। তাঁহারা বাঞ্ছিতকে হৃদয়ের নিবিড়তম অন্তস্তলে অনুভব করিতেন এবং তাহার সহিত শুভ ও মধুর মিলনের জন্য যতপ্রকার কষ্টসহ্য ও সাধনা করিতে হয়, তাহা অম্লানবদনে ও আনন্দাপ্লুত মনে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাথমিক যুগের সাধনাপ্রধান সূফীদের মধ্যে হসন্ বস্‌রী (মৃত্যু ৭২৮ খ্রীঃ), ইব্‌রাহীম্-ইব্‌ন অদ্‌হম্ (মৃঃ ৭৭৭ খ্রীঃ), অবূ হাশিম্ (মৃঃ ৭৭৭ খ্রীঃ), বীবী রাবিয়াহ্ (মৃঃ ৭৫৩ খ্রীঃ), দা'উদ্ তয়ী (মৃঃ ৭৮১ খ্রীঃ), ম'রূফ্ কর্‌খী (মৃঃ ৮১৫ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায়। এই সমুদয় সূফীদের নাম ইস্‌লাম্ জগতে এমনই প্রসিদ্ধ যে, উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল মতাবলম্বীদের মানস-পটে একটি পবিত্রতা, সারল্য ও নিস্পৃহতার ছবি, কঠোর সাধনা ও তপস্যার মূর্ত্তি লইয়া অমনই ভাসিয়া উঠে। তাঁহাদের জীবনী ও বাণী পাঠ করিলে, স্পষ্টই দেখা যাইবে ইঁহাদের মর্ম্মমুখী প্রতিভা কেমন-ভাবে ও কোন্ মার্গ অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছিল। তাহার বর্ণনা ও বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। তাঁহারা সকলেই আরববাসী ছিলেন; ইস্‌লামী আওতায় (Environment) ইস্‌লাম্-নির্দ্দেশিত মার্গ অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা "ম'রফত্" বা ইস্‌লামের মর্ম্মমুখ দিক গ্রহণ করিয়া বাঞ্ছিতের সঙ্গে শুভ মিলন-উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন। কর্ম্মমুখ দিকের সংঘাতে এই মর্ম্মমুখ দিক চৈতন্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া, উপযুক্ত সাধকদের কাহারও কাহারও মানসিক সমতা (Mental equilibrum) রক্ষিত হয় নাই সত্য,—তাঁহারা একটু অধিকভাবে কর্ম্মমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, একটি বিরুদ্ধশক্তির বিপক্ষে দাঁড়াতে হইলেই, প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই সূফী সাধকদের মধ্যে কোনরূপ ভাবের প্রাবল্য বা উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার বিকাশ দেখিতে পাই না; ইহাই হইল এই প্রাথমিক যুগের সূফী সম্প্রদায়ের বিশে-

যত্ন। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, আরবের স্বূফী আন্দোলন, "খারিজী", "মুর্‌জ'য়ী", "মু'তষিলী", "সফবী" প্রভৃতি আন্দোলনের মত কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলন নহে; ইহা অনেকটা ব্যক্তিগত (Individualistic) আন্দোলন। এক একটি সাধক বাঞ্ছিতকে লাভ করিতে গিয়া "ত্বরীকত্" বা "ইস্‌লামী মার্গকে" অবলম্বন করিয়া, বাঞ্ছিতলাভে যিনি যতটুকু সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ততটুকুই গ্রহণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন; ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যহেতু, কালে স্বূফীদের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় ও অগণ্য স্বাধীন ভাবুক ও সাধক দেখা দিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে এই স্বূফী সাধকদের মধ্যে বিষয় অনাসক্তির দিকটি অধিকভাবে দেখা দিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য ও ভাবের প্রাবল্য ও আবশ্যকীয় আনুষঙ্গিকরূপে (Necessary concomitant) আসিয়া পড়িল। ইসলাম কখনও বৈরাগ্য ও ভাবাবেশের দিকটাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয়দান করে নাই; প্রাথমিক যুগের স্বূফীরাই তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, স্বূফী মতবাদ একটি শতাব্দীর মধ্যেই ইস্‌লাম-নির্দ্দেশিত (ত্বরীকত) একপার্শ্বে আসিয়া পড়িতেছে; কিন্তু তখনও মার্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই, বা মার্গের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া লইতে সক্ষম হয় নাই। স্বূফী মতবাদ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত (Individualsitic) ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়া, এমন কি, একটি নির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতেও তাহার মানসিক অভিরুচির অনুরূপ বিভিন্ন পাশ্বগ্রহণেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সময়, স্বূফী মতবাদ ইস্‌লামী রাজ্যের নানাস্থানে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্বূফীরা তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, নবম শতাব্দীর শেষভাগে ধুন্‌নূন্ মিস্‌রী (মৃঃ ৮৬০ খ্রীঃ) স্বূফী মতবাদের শৃঙ্খলাবিধান ও ব্যাখ্যা করিতেছেন, 'অশ্-শিব্‌লী খুরাসানী (মৃত্যু ৯৪৬ খ্রীঃ) মস্‌জিদের মিম্বরে (বেদীতে) দাঁড়াইয়া প্রকাশ্য সভায় স্বূফী মতবাদ প্রচার করিতেছেন এবং জুনয়দ্ বগ্‌দাদী (মৃঃ ৯১০ খ্রীঃ) নিবিষ্টমনে তাহা ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছেন। এইরূপেই স্বূফী মতবাদ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে, দশম শতাব্দীর প্রথমপাদের মধ্যে, একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহা বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিস্রস্তভাবে বিভিন্ন স্বূফীদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল, আর এখন প্রধানতঃ ধুন্‌নূন্ মিস্‌রীর (মৃঃ ৮৬০ খৃঃ) চেষ্টায় ও পরিশ্রমে একটি শৃঙ্খলালাভ করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবার মত শক্তিলাভ করিল।

এখন দেখা যাউক, তাঁহাদের মতবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে স্বূফীরা কি বলিতে চাহেন। সকল শ্রেণীর স্বূফীরা একবাক্যে বলিয়া থাকেন হ্বদ্‌রত্ মুহম্মদ্ তাঁহার জামাতা ও বন্ধু হ্বদ্‌রত্ 'অলীকে (হত্যা ৬৬১ খ্রীঃ) গুপ্তজ্ঞান (Esoteric knowledge) দান করেন। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন, স্বয়ং হ্বদ্‌রত্ মুহম্মদ্ তাঁহার জীবদ্দশায় সত্তর জন লোককে "মুরীদ্" অর্থাৎ দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। 'অলী নাকি হ্বসন্, হুসয়্‌ন্, খব্‌জহ্ কমীল্-বিন্-যিয়াদ্, হ্বসন্ বস্‌রী (মৃঃ ৭২৮ খৃঃ) এই চারি ব্যক্তিকে খলীফহ্ অর্থাৎ গুপ্তজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিনিধি করেন। পরে স্বূফী মতবাদ ইঁহাদের প্রতিনিধির দ্বারাই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল অনৈতিহাসিক ও উদ্ভট কথার কোন সত্যতা নাই; সুতরাং এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

এই মতবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে স্বূফীরা যে ঐতিহাসিক ধারার উল্লেখ করেন, তাহাতে কোন সত্যতা নিহিত না থাকিলেও, তাঁহাদের মতবাদের দ্বিতীয় দিকটি কিছুতেই উপেক্ষার সামগ্রী নয়, এবং সেই দিকটিই আমাদের নিকট এই মতবাদের উদ্ভব ও দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার নির্দ্দিষ্ট রূপগ্রহণের প্রধানতম কারণ বলিয়া মনে হয়। স্বূফীরা বলিয়া থাকেন ধর্ম্মের বাহ্যিক আচারব্যবহার ও নিয়মকানুনাদি ব্যতীত হ্বদ্‌রত্ মুহম্মদের নিকট একটি গুপ্তজ্ঞানের দিকও ছিল। সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতির কথা তিনি প্রচার করিয়া গেলেও এই গুপ্তজ্ঞানের কথা একেবারে লুপ্ত রাখিয়া যান নাই; কুর্‌আন্ শরীফেই তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। বাস্তবিকই কুর্‌আনে এমন কতকগুলি শ্লোক (আয়িত) রহিয়াছে, যাহা চিন্তাশীল মানুষকে স্বতঃই

মর্ম্মবাদী করিয়া তোলে। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে সূফী মতবাদ, এই সমুদয় শ্লোকমালাকেই কেন্দ্র করিয়া, ধীরে ধীরে হজ্‌রত্ মুহম্মদের মৃত্যুর পর, প্রায় দুইশত-বৎসর পর্য্যন্ত রূপগ্রহণ করিতেছিল। সুতরাং সূফী মতবাদের মূল সূত্রগুলির সহিত পাঠকদিগকে সাক্ষাৎ পরিচিত করিতে হইলে, এই কতিপয় শ্লোকের সহিতও সাক্ষাৎ পরিচয় অত্যাবশ্যক। সূফীরা বলেন, গুপ্তজ্ঞান অথবা মর্ম্মবাদ (হিক্‌মহ্ = Mysticism) কুর্‌আন শরীফের লৌকিক শিক্ষা হইতে পৃথকবস্তু; এই কথার সাপক্ষে তাঁহারা কুর্‌আনের এই শ্লোকটি বলিয়া থাকেন,—"কেননা আমরা তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন প্রেরিতপুরুষ পাঠাইয়াছি: তিনি আমাদের সংবাদ (মতান্তরে, শ্লোকমালা বা নিদর্শনমালা) তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকেন, তোমাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন, তোমাদিগকে এই কুর্‌আন্ শিক্ষাদান করেন এবং **গুপ্তজ্ঞান** (হিক্‌মহ্) শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং যাহা তোমরা (পূর্ব্বে) জানিতে না তাহা (ও) শিক্ষা দিয়া থাকেন।"* তাঁহারা বলিয়া থাকেন কুর্‌আনে এই যে **গুপ্তজ্ঞানের** কথা বলা হইয়াছে, তাহা কুর্-আনের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নহে; কেন না, যদি তাহা কুর্‌আনের শিক্ষার অন্তর্গত হইত, তবে "**গুপ্তজ্ঞান**" (হিক্‌মহ্) শব্দটি এখানে অতিরিক্ত হইয়া পড়িত; কারণ কুর্‌আনের (কিতাব) পার্শ্বেই গুপ্তজ্ঞান কথাটি লিখিত হইয়াছে। কুর্‌আনে যদি গুপ্তজ্ঞান থাকিত, তবে পৃথক করিয়া গুপ্তজ্ঞানের নাম করার কোন সার্থকতা থাকিত না। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন, তাহা এইরূপ,—"(তাঁহারাই মুসলমান) যাঁহারা **অদৃষ্টবস্তুতে** (ঘয়ব) বিশ্বাসস্থাপন করেন এবং নমায আদায় করেন এবং আমরা যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা (সৎ-পথে) ব্যয় করেন।" † এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, **অদৃষ্টবস্তুর** রূপ কি এবং তাহা কোথায়? প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে কুর্‌আন্ বলিতেছে,—"'অল্লাহ্ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আলোক (নূর) স্বরূপ।" * দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছে,—"এবং এই পৃথিবীতে ও তোমাদের মধ্যে (মতান্তরে, তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে) বিশ্বাসকারীদের জন্ম (দ্রষ্টব্য) চিহ্ন রহিয়াছে;—কি, তোমরা কি তাহা দেখিতে পাইতেছ না?" † স্থানান্তরে আবার বলিতেছে,—"আমরা তাহার (মানুষের) গ্রীবাস্থিত ধমনী হইতেও নিকট-তর।" ‡

কুর্‌আন্ শরীফের এই সমুদয় শ্লোককে ভিত্তি করিয়া সূফী মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, পরবর্ত্তী সূফীরা এই শ্লোকগুলি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য শ্লোকমালার ব্যাখ্যা ও অতিরিক্ত আলোচনা, তৎ-ব্যাখ্যা, ও তৎ-আলোচনা করিতে গিয়াই উত্তরকালে সর্ব্বেশ্বরবাদের (Pantheism) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। সে ইতিহাসের ধারা একটু পরেই আলোচনা করিতেছি। **অদৃষ্টবস্তু** বা বাস্তিতের সঙ্গে মিলনের পূর্ব্বে, যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয় বলিয়া সূফীরা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা মূলতঃ এই শ্লোকগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে, বাস্তিতের সঙ্গে মিলনের বা তাহার মধ্যে লীন হইয়া যাওয়ার (ফনা-ফীল্লাহ্ অথবা বকা বি-ল্লাহ্) পূর্ব্বে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়; যথা:—

১। অদৃষ্টবস্তুতে বিশ্বাস বা ঈমান্।
২। অদৃষ্টবস্তুর অনুসন্ধান বা তলব্।
৩। অদৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বা 'ইরফান্।
৪। অদৃষ্টবস্তুতে বিলীন বা ফনা ফী-ল্লাহ।

---

* কমা 'অর্সল্না ফীকুম্ রসূলা-ম্-মিন্কুম্ য়ত্লু 'অলয়্কুম্ আয়াতিনা ব্ য়যক্কীকুম্ ব ব্'অল্লিমুকুমু-কিতাব ব্-ল্-হিক্মত ব্ য়'অল্লিমুকুম্ মা লম্ তকূনূ ত'লমূন।

কুর্‌আন্—দ্বিতীয় অধ্যায়—১৫১ শ্লোক।

† 'অল্লধীন য়ূমিনূন বি-ল্-ঘয়্বি ব্ য়ুকীমূন-স্-স্বলাত ব্ মিম্মা রযক্নাহুম্ য়ুন্ফিকূন।

কুর্‌আন্—দ্বিতীয় অধ্যায়—৩ শ্লোক।

* 'অল্লাহু নূরু-স্-সমাৱাতি ব্-ল্-'অর্দ্বি।

কুর্‌আন্—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—৩৫ শ্লোক।

† ব্ ফী-ল্-'অর্দ্বি আয়াতুন্ লি-ল্-মূকিনীন ব্ ফী 'অন্ফুসিকুম্ 'অ ফলা তুব্সিরূনা।

কুর্‌আন্—একান্ন অধ্যায়—২০ ও ২১ শ্লোক।

‡ ব্ নহ্নু 'অকরবু 'ইলয়্হি মিন্ হবলি-ল্-ৱরীদি।

কুর্‌আন্—পঞ্চাশ অধ্যায়—১৬ শ্লোক।

প্রথমতঃ, স্থূফীকে ঘয়্‌বে (অদৃষ্টবস্তুতে) বিশ্বাস,—শুধু স্বীকারমূলক বিশ্বাস নহে, আন্তরিক উপলব্ধিমূলক পূর্ণবিশ্বাস করিতে হয়। এই দৃশ্যমান জগৎ ও বস্তু ব্যতীত, তাহার পশ্চাতে অদৃশ্য ও মানবের সাধারণ জ্ঞানের অগোচর আরও এমন এক জগৎ ("আলিম্ ই ঘয়্‌ব্) রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে না পারিলে, সাধারণ জ্ঞান পূর্ণ হয় না, সুতরাং সেই জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার অস্তিত্ব ও নিগূঢ়ত্বের উপর সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়, বিশ্বাস যখন স্থাপিত হইল, তাহার পূর্ণ অস্তিত্ব ও নিগূঢ়ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ যখন ঘুচিয়া গেল, তখন তাহার জ্ঞানকে পূর্ণ করিতে হইলে, এই অদৃষ্টবস্তুর অনুসন্ধান আবশ্যক। কিন্তু সে এই মরজগতের মানুষ হইয়া কোথায় (এবং কিরূপে?—তাহা তাহার এ বিষয়ে অভিজ্ঞ গুরু বা "মুরশিদ্"ই বলিয়া দিবেন) সেই অদৃশ্যবস্তুর সন্ধান করিবে। তাহাকে কোথাও দূরে সে বিষয়ের সন্ধান করিতে হইবে না; সেই অদৃষ্টবস্তু যে "তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী হইতেও নিকটতর" স্থানে অবস্থান করিতেছে; "এই পৃথিবীতে এবং তাহার নিজের মধ্যেই" যে তাহার "পরিস্ফুট চিহ্ন" বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাকে বলিতে পারা যায়,—"কি, তাহারা কি দেখিতে পাইতেছে না, এই উষ্ট্রগুলি কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, আকাশ কিরূপে উর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছে, পর্ব্বতগুলিকে কি সুদৃঢ়ভাবে পত্তন করা হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীকে কিভাবে বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে? সুতরাং স্মরণ কর, কেন না তুমি একজন স্মারক মাত্র।" * অতএব বলা হইল, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিরহস্যের ভিতর দিয়া সেই অদৃষ্টবস্তুর ইঙ্গিত ও অভিব্যক্তির আভাস বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তীকালে এইভাব হইতেই স্থূফীদের মধ্যে সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism) আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, প্রকৃতির ভিতর, আকাশ-বাতাসের অভ্যন্তরে, সেই অদৃষ্টবস্তুর সন্ধান করিতে করিতে থই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন! তাই, অনেকে বিপথগামী হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন, বুঝি এই পরিদৃশ্যমান জগতকে ছাড়াইয়া 'অল্লাহ নহেন, ইহারই ভিতর দিয়া তিনি আপনাকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করেন; সুতরাং ইহা না হইলে বুঝি তাঁহার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় না; এইগুলিকে বাদ দিয়া বুঝি তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই ভ্রান্তধারণাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বেশ্বরবাদী (Pantheistic) করিয়া তুলিয়াছিল।

এইরূপেই সৃষ্টিরহস্যের বিষয় চিন্তা করিতে এবং ধ্যান-ধারণা ও সাধনা করিতে করিতে স্থূফীদের মধ্যে এমন একদিন আসিয়া পড়ে, যখন তাঁহারা অকস্মাৎ দেখিতে পান, সেই অদৃষ্টবস্তু এখন আর অদৃশ্য নহে। ইহাই 'ইরফান বা জ্ঞানলাভের অবস্থা। তিনি তাহাকে প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারেন, ভাবিতে পারেন, দেখিতে পারেন। এখন অদৃশ্যবস্তু প্রত্যক্ষ বস্তু হইয়া যায়; সুতরাং তাহার বিষয় সম্যক্ ও সুনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানলাভ (Perfect knowledge) করিতে আর তেমন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে না। তিনি আস্তে আস্তে এখন সম্যক্ জ্ঞানলাভের পথে ধীর, স্থির ও প্রশান্তমনে অগ্রসর হইতে থাকেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে যখন স্থূফী জ্ঞানের চরমসীমায় পৌঁছেন, তখন তাঁহার ও অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদ থাকে না, পার্থক্যের পর্দ্দা উঠিয়া যায়, তিনি অদৃষ্টবস্তুতে বিলীন হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। এই অবস্থায়, কেহ কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া "অহং ব্রহ্ম" "অনা-ল্ হক্‌ক্" "আমিই সত্য" প্রভৃতি ধর্ম্মবিগর্হিত বাক্যও বলিয়া ফেলেন দেখা গিয়াছে। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল,—কুর্‌আন্ শরীফে বলা হইয়াছে,—"নিশ্চয় আমরা 'অল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব।" * এখানে প্রশ্ন উঠে মানুষ 'অল্লাহর নিকট ফিরিয়া গিয়া, তাঁহার মধ্যে বিলীন হইবে, না

---

* 'অ ফলা য়নযুরূন 'ইল-ল্-'ইবিলি কয়ফ্ খুলিকত্, ব্ 'ইল-স্-সমা'ই কয়্ফ রুফি'অত্ ব্ 'ইল্-ল্-জিবালি কয়ফ নুসিবত্, ব্ 'ইল-অ-'অর্দি কয়্ফ সুতিহত্, ফ ধক্কির 'ইন্নমা 'অনত্ মুধক্কির।

কুর্‌আন্—অষ্টাশী অধ্যায়—১৭ হইতে ২১ শ্লোক।

* 'ইন্না লি-ল্-লাহি ব্ 'ইন্না 'ইলয়াহি রাজি'উন।—কুর্‌আন্।

আর কোথাও তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিবে? স্ফূীরা মনে করেন, মানুষ 'অল্লাহর নিকট ফিরিয়া গিয়া তাঁহারই মধ্যে বিলীন হইবে; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যেরা ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, স্ফূী মতবাদ যখন এইরূপ ভাবে ধুন্নূন্ মিস্‌রী (মৃঃ ৮৬০ খৃঃ) প্রমুখ স্ফূীদের দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তখন ইহা ধীরে ধীরে মিশর, পারস্য, বোখারা, সমরকন্দ ও তুর্কীস্থান প্রভৃতি মুস্‌লিম্ রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রত্যেক ধর্ম্ম ও মতবাদের বহুল বিস্তৃতিতে, সাধারণতঃ যে অবস্থা হয়, ইহাও সেই অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইল না। প্রত্যেক ধর্ম্ম ও মতবাদ প্রথমতঃ এক বা ততোধিক মহাপুরুষের এবং পর পর আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ধারাবাহিক চিন্তাধারার সংযোগে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা সর্ব্বাঙ্গকুৎসিত হইয়া পড়িয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং ইহাকে অনায়াসে প্রবহমান জলধারার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনী যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মলভাবে পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, পথে অসংখ্য জলধারার সংযোগে বৃহদাকার ধারণ করিয়া সাগরের দিকে অগ্রসর হয়, আর এই উপজলধারাগুলির নির্ম্মলতা, অনাবিলত্ব ও শক্তির উপর মূল জলধারার নির্ম্মলতা, অনাবিলতা ও শক্তি নির্ভর করে, ঠিক তেমনই কোন নূতন ধর্ম্ম বা মতবাদও পরবর্ত্তী চিন্তাধারার শক্তি, সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মলতাকে এড়াইয়া চলিতে পারে না। নদী যেমন নানা দেশ-বিদেশের উপর দিয়া চলিতে চলিতে তত্তৎ দেশের স্বচ্ছ ও আবিল জলরাশিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনই কোন নূতন ধর্ম্ম ও ভাবধারাও নানা দেশের আচার-ব্যবহার, ভাব ও চিন্তাধারাকে সঙ্গে লইয়া বড় হইতে থাকে। ঐ সমুদয় চিন্তাধারার আবিলতা ও অনাবিলতার উপরই পরবর্ত্তী ধর্ম্ম ও মতবাদের আবিলতা ও অনাবিলতা অনেকখানি নির্ভর করে। স্ফূী মতবাদও এবম্বিধ অবস্থার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে পরিপুষ্টিলাভ করিতেছিল। ইহা আরব ছাড়াইয়া যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই ইহার সহিত নূতন নূতন পূর্ব্বদেশীয় ভাবধারার সম্মিলন ও সঙ্গম ঘটে। কিরূপে এইরূপ স্থানীয় ভাবধারার সঙ্গম ঘটিল তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অবান্তর। আমরা দেখিয়াছি স্ফূী মতবাদের গোড়ার কথাগুলিতে এমন সব ফাঁক রহিয়াছে, যাহাতে অনায়াসে অন্যান্য ভাব ও চিন্তাধারা ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার স্থান করিয়া লইতে পারে। ফলে, তাহাই ঘটিয়াছিল।

স্ফূী মতবাদের ইতিহাসে দেখিতে পাই, পারস্যে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথম ইহা সর্ব্বেশ্বরবাদের (Pantheism) দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ হইতে দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই দিক পূর্ব্বদেশীয় স্ফূীদের মধ্যে দেখা দেয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, 'অবূ য়যীদ্ বা বায়িযীদ্ বিস্‌তামী (মৃঃ ৮৭৪ খ্রীঃ), জুনয়্‌দ্ বগ্‌দাদী (মৃত্যু ৯১০ খ্রীঃ) এবং মন্‌সূর্ হল্লাজ্ (হত্যা ২৬শে মার্চ্চ, ৯২২ খ্রীঃ) প্রভৃতি স্ফূীরা ন্যূনাধিক সর্ব্বেশ্বরবাদী (Pantheistic) হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পারস্যবাসী ছিলেন। মন্‌সূর হল্লাজের কথা কিংবদন্তীতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে সুতরাং তাঁহার বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন নাই। বায়িযীদ্ বিস্‌তামী বলিতেন, "আমিই সত্য, আমিই সত্য ভগবান, আমাকে ভগবৎ-প্রশংসায় আহ্বান কর।" আর জুনয়্‌দ্ বগ্‌দাদী বলিয়াছিলেন, তব্‌হীদ্‌কে (ভগবানের পূর্ণ একত্বকে) অস্বীকার করাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তব্‌হীদ্।" এইরূপ Pantheismএর ধারা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। একাদশ শতাব্দীর স্বনামপ্রসিদ্ধ স্ফূী 'অবূ স'ঈদ্-বিন্-'অবিল্ খয়্‌র্ খুরাসানীর (মৃঃ ১০৪৯ খ্রীঃ) হাতে সর্ব্বেশ্বরবাদ যে শুধু আরও একটু অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে, তিনি স্ফূী মতবাদকে কবিত্বপূর্ণ, জ্ঞানমার্গবিরুদ্ধ (Anti-scholastic) ও নীতিহীন বিশ্বাসে (Antinomian) ভরপূর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাইবে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে, একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বগ্‌দাদ্ হইতে খুরাসান পর্য্যন্ত বিশাল প্রাচ্যখণ্ডের মধ্যে, স্ফূী মতবাদ সর্ব্বেশ্বরবাদে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই মতবাদের এহেন নূতন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে, গোঁড়া-সম্প্রদায় যে একেবারে নীরব ছিল তাহা নহে। তাঁহারা ইহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের কাণ্ডকারখানায় মন্‌সূর্ হল্লাজ্ ৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হন; প্রসিদ্ধ

স্থূফী শিহাবু-দ্-দীন্-য়হ্‌য়া-অস্-সুহ্‌রব্‌র্দী ১১৯১ খৃষ্টাব্দে আলেপ্পোতে (Aleppo) সুলতান্ স্বলাহ্-দ্-দীনের পুত্র মলিকু-য্-য়াহির কর্ত্তৃক শিরচ্ছেদিত হন; স্থূফী মতবাদের মধ্যে "হুরূফী" মতের প্রতিষ্ঠাতা ফদ্‌লুল্লাহ্, তিমুর লনগ্ কর্ত্তৃক ১৪০২ খৃষ্টাব্দে বধিত হন এবং তাঁহারই মতাবলম্বী তুর্কী কবি নসীমী ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে, জীবন্ত অবস্থায় শরীরের চর্ম্ম উঠাইয়া লইতে দিয়া আলেপ্পোতে দেহত্যাগ করেন। এখন, দেখা যাইতেছে Pantheismএর যে ধারা নবম শতাব্দী হইতে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসিয়াও থামিতেছে না। মাঝখানে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, বিশ্ববিশ্রুত মহাপণ্ডিত 'ইমাম্ ঘয্‌যালী (মৃত্যু ১১১১ খ্রীঃ) মসীর সাহায্যে এই সর্ব্বেশ্বরবাদী স্থূফী মতবাদকে একবার ভীষণ ভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, মসী ও অসি উভয়ই সর্ব্বশেষে ইহার ব্যাপকত্বের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। 'ইমাম্ ঘয্‌যালী প্রমুখ পণ্ডিতদের স্থূফী মতবাদের সহিত জ্ঞানমার্গের (Scholasticism) সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

উপরে আমরা যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছি, তদ্দ্বারা মোটামুটিভাবে প্রতীয়মান হইবে, স্থূফী মতবাদ কি অবস্থার ভিতর দিয়া কখন জন্মলাভ করিয়া, কি ভাবে তাহার জন্মকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল। ইহা পথ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিল ও যে ভাবে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার আভাষটুকুর সহিত একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে স্থূফী মতবাদের মধ্যে ভীষণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতাপও হ্রাস পাইতে থাকে। এ সকল বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত সামগ্রী। সুতরাং আর অধিক অগ্রসর হইয়া কাজ নাই।

সোনার প্রদীপ

(গান)

শ্রী হেমলতা দেবী

হে নারী তোমার গৃহের দ্বারে
    সোনার সারে প্রদীপ জ্বালো;
যে জন আসে পথের পাশে
    সবার প্রাণে পড়ুক আলো।
তোমার হাতে জ্বালিবে যে দীপ
হারান পথে মিলাবে সে দিক,
তোমার প্রেম-পুণ্যশিখাটি
    হরিবে সবার মনের কালো॥
(সোনার সারে প্রদীপ জ্বালো)

আরাধনা তব নাশিবে ক্লেশ,
সাধন-সত্যে পূরিবে দেশ,
অসীম ধৈর্য্য অচল বীর্য্যে
    একমনে তুমি ব্রতটি পালো—
    সারে সারে সারে প্রদীপ জ্বালো॥
সার্থক হোক সবার জীবন,
পথ-লুণ্ঠিত ক্ষত দেহ-মন
হউক ধন্য, তোমার পুণ্য
    বহিয়া আনুক সবার ভালো—
    সারে সারে সারে তুমি প্রদীপ জ্বালো॥*

---

* সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বিগত বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-সভার প্রারম্ভ-সঙ্গীতরূপে গানটি গীত হইয়াছিল।

গৌরমণির ছেলে

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

আট বৎসরের ছেলে কিশোরকে লইয়া গৌরমণি বিধবা হইলেন। তাঁহার শুধু যে স্বামীই গেল তাহা নয়, জগৎ-সংসারের ভিত্তিও যেন খসিয়া পড়িল। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল অতি অল্পবয়সে। গরীব গৃহস্থের ঘর হইতে আসিয়াছিলেন তিনি বনিয়াদী বড়ঘরের বৌ হইয়া। অবশ্য শ্বশুরকুলের ভাঙনদশা ইতিপূর্ব্বেই সুরু হইয়াছিল, এবং তাঁহার আগমনের সময় পুরাতন জীর্ণ বাড়ী এবং বিপুল বংশের অহঙ্কার ভিন্ন আর কোনো সম্পদ বড় অবশিষ্ট ছিল না। জমিদারী চালচলন বজায় রাখিবার সঙ্গতি আর তাঁহাদের ছিল না; কেবলমাত্র জাঁক করিতেই পয়সা খরচ হয় না, সেটাই তাঁহারা পুরামাত্রায় বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ীটার ফাট ধরিয়াছিল অগণ্য জায়গায়, ইট খসিয়া পড়িতেছিল অনেক স্থানে, এবং দরজা-জানালা অভগ্ন অবস্থায় প্রায় একটাও ছিল না। কিন্তু এই বাড়ী ভিন্ন তাঁহাদের যাইবার স্থান জগতে ছিল না। জোড়াতালি দিয়া ইহারই কঙ্কালসার বক্ষপঞ্জরের ভিতর দুই ভাই এবং এক বিধবা বোন, বৃদ্ধা জননীকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গৌরমণির স্বামী শিবদাস ছোট ভাই, বড় ভাই বিপ্রদাসের বহুদিন আগেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিবদাস অবিবাহিতই ছিলেন। কিন্তু বাঙালীর ঘরে শেষ পর্য্যন্ত বৌ জুটে না এমন হতভাগ্য পুরুষ কমই জন্মগ্রহণ করে। বিধবা দিদি এবং বৃদ্ধা মাতার বিলাপে কলির শিবেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। সমান সমান ঘরে আর তাঁহার কনে জুটিবার সম্ভাবনা ছিল না, বয়স বেশী এবং তহবিল শূন্য। তাহা ভিন্ন টাকাওয়ালা ঘরের মেয়ে আনিয়া, কথায় কথায় তাহার মুখনাড়া খাইবারও ইচ্ছা বড় একটা ছিল না। সুতরাং আগেকার কালের কর্ম্মচারী যদুনাথের কন্যা বালিকা গৌরমণির উপরেই সকলের চক্ষু পড়িল। মেয়ের বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র, তাহাতে আটকাইল না। এ বাড়ীতে দুগ্ধশুভ্র বর্ণ ভিন্ন আগে আগে কোনো বধূর প্রবেশ-অধিকার ছিল না। গৌরমণি নামে গৌরী, কাজে শ্যামাঙ্গী ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও আটকাইল না। গৌরমণির বিবাহ হইয়া গেল। এমন বংশে তিনি যে প্রবেশ করিতে পাইলেন, সেটাই যদুনাথ এবং তাঁহার পরিবারের সকলে অত্যন্ত বড় সৌভাগ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেন।

বালিকা গৌরমণি একমাথা সিঁদুর এবং হাতভরা লোহা শাঁখা পরিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিলেন। স্বামীকে তিনি ঠিক মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না, স্বামীও সে বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ কোন সাহায্য করিলেন না। তাঁহার উগ্র বংশমর্য্যাদা এবং পুরুষত্বের অহঙ্কার লইয়া তিনি সুদূর হইয়াই রহিলেন। গৌরমণি স্বামীকে দেবতাই ভাবিতেন বেশীর ভাগ, স্বামী ভাবিতেন অল্প পরিমাণে এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই বয়স্ক শিশুও খানিকটা মনে করিতেন বোধ হয়। শিবদাস উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদার বংশের অর্থটা শুধু পান নাই, তবে অন্য দোষগুণ সকল পরিপূর্ণ ভাবেই পাইয়াছিলেন। নিজের জন্য এক পা হাঁটিয়া যাইতে ব এক গেলাস জল গড়াইয়া লইতেও তাঁহার বাধিত। যতদিন গৌরমণি ঘরে আসেন নাই, ততদিন শিবদাসের অসন্তোষ এবং অসুবিধার সীমা ছিল না। বিধবা দিদি তাঁহার কাজকর্ম্ম খানিক করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু তিনিও এই বংশেরই মেয়ে, ইহারই ধারায় মানুষ। সেদিন পর্য্যন্ত এক এক বৌ-ঝির ঘরে দুইটি করিয়া দাসী কাজ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারাও কাজকর্ম্মে বিশেষ আরাম পাইতেন না, যাহা নিতান্ত না করিলে নয়, সেটুকু করিয়া দিয়া সরিয়া পড়িতেন।

গৌরমণি বিবাহ করিয়া আশ্রয় পাইলেন কতখানি তাহা বলা যায় না তবে আশ্রয় দিলেন অনেকখানিই। বিবাহের পর প্রথম দুই বৎসর তাঁহার স্বামীর ঘর এবং

পিতার ঘরে পালা করিয়া যাওয়া-আসা করিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর তিনি পাকাপাকি ভাবে শ্বশুর-বাড়ীতে সংসার করিতে লাগিয়া গেলেন। সমস্ত দিন-রাতের ভিতর তাঁহার অবকাশ ছিল না, এবং তাহা লইয়া তাঁহার কোনো আক্ষেপও ছিল না। এই জমিদার বংশে তাহার পিতৃকুল বংশানুক্রমে কাজ করিয়াছে, ইহাদেরই অন্নে এবং বদান্যতায় পুষ্ট হইয়াছে, ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভক্তি গৌরমণির অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। শিবদাসের প্রতি তাহার যে ভালবাসা, তাহা ঠিক পত্নীর প্রেম ছিল না, বেশীর ভাগই ছিল পূজারিণীর পূজা, অনুরক্ত সেবিকার সেবা। ইহারা এখন বিধি কর্তৃক বিড়ম্বিত, সেই জন্য আরো বেশী করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী। গৌরমণি অল্পবয়সেই ননদের দেখাদেখি স্বামীর সব কাজ শিখিয়া লইলেন, এবং এমন নিখুঁৎ ভাবে করিতে লাগিলেন যে শ্বশুরবাড়ীর লোকেও তাহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। স্বামীর কাজ ছাড়াও সংসারের অনেক কাজ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ না করিয়া অন্য কাজের কাছে তিনি কিছুতেই ধরা দিতেন না। শিবদাসের কাজে কোথাও ত্রুটি ঘটিলে সমস্ত দিন অশান্তিতে তাঁহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া যাইত। স্বামীকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া তবে রাত্রিকালে তিনি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেন। এই ঘণ্টাদুই সময় তাঁহার নিজেকে মনে পড়িত, সমস্ত দিনের মধ্যে আর অবসর ছিল না।

বহুদিন তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। ইহাতে স্বামীসেবায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঢালিয়া দিবার তাঁহার সুবিধা হইয়াছিল। শাশুড়ী মারা গিয়াছিলেন, ননদ নিজের দুঃখ দুর্ভাবনা লইয়াই থাকিতেন, গৌরমণির সন্তান-হীনতার জন্য দুঃখ করিবার কেহ ছিল না। বড় জায়ের ছেলে-মেয়ে ছিল, তাহারাই বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবে, এই ধারণা লইয়াই সকলে সন্তুষ্ট ছিল।

অধিক বয়সে কিশোরকে ক্রোড়ে পাইয়া গৌরমণির হৃদয় তৃপ্ত হইল বটে, কিন্তু সন্তানের কাছে ধরা দিবার মত অবসর তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নানা কাজ যেমন স্বামীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে করিতেন, সেইভাবে সন্তান-পালনও করিতে লাগিলেন। সন্তানের জননী হইলে পত্নীত্বের দাবী অনেকটা কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু গৌরমণির বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। তাঁহার ভিতর জননী কোনোমতেই পত্নীকে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

শিশুকাল হইতেই কিশোর খানিকটা স্বাধীনভাবে বাড়িতে লাগিল। তাহার দৈহিক প্রয়োজন যাহা কিছু, তাহা কোনোমতে মা মিটাইয়া চলিতেন বটে, কিন্তু তাহার শিশুজীবনের বিকাশের পথে আর কোনো সাহায্য সে কোথা হইতেও পাইল না। তাহাকে নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া ঘরে বন্ধ করিয়া দিয়া, মা অন্য কাজে প্রস্থান করিতেন, ছেলে কেমন করিয়া যে সময় কাটাইতেছে, তাহা দেখিবার সময় তাঁহার ছিল না। নিতান্ত চীৎকার, কান্নাকাটি শুনিলে একবার আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া যাইতেন, নিতান্ত দুর্ঘটনা কিছু ঘটিয়াছে দেখিলে ঘরে ঢুকিয়া তাহার প্রতি-কার করিতেন, না হইলে আবার তাড়াতাড়ি নিজের কাজে প্রস্থান করিতেন। শিশুকে দুদণ্ড বুকে করিয়া আদর করা, তাহার কচিমুখের হাসি-কাকলি উপভোগ করা, তাহার পুষ্পকোমল দেহের সৌরভে আপনাহারা হওয়ার সৌভাগ্য, গৌরমণির কোনোদিনই ঘটিল না। একলা শিবদাস তাঁহার হৃদয়ে দেবতা, স্বামী এবং সন্তানের স্থানও যেন অনেকখানি অধিকার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিশোর বড় হইতে লাগিল। জন্মাবধি কাহাকেও পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় করিতে পাইল না বলিয়া তাহার স্বভাব কেমন একটু বেয়াড়া হইয়া গেল। কাহারও প্রতি তাহার কোনো পক্ষপাত দেখা যাইত না, বালককাল হইতেই সে পুরাদস্তুর সুবিধাবাদী হইয়া উঠিল। পিসী বলিতেন, "ছেলের রকম দেখ, মায়া-মমতা ব'লে একটা জিনিষ নেই, বড় হ'য়ে ডাকাত হবে।" গৌরমণি ছেলের নিন্দায় ব্যথিত হইতেন বটে কিন্তু তাহা লইয়াও খুব বেশী মাথা ঘামাইবার তাঁহার সময় ছিল না। তাঁহার জায়ের ছেলে-দুটি কেমন লক্ষ্মী, দেখিলে দুই চক্ষু জুড়াইয়া যায়, এক মাইল দূর হইতে তাহাদের দেখিলেও বনিয়াদী বংশের ছেলে বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু কিশোরের সবই সৃষ্টিছাড়া, শুধু যে আত্মীয়স্বজনের প্রতিই তাহার মমতা ছিল না, তাহা নয়, কোনো কিছুর উপরেই ছিল না। এটা করিতে নাই, ওকথা বলিতে নাই, বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

খনিয়াদী বংশের মর্য্যাদারক্ষার দিকে তাহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। বাপ, জ্যাঠাকেও সে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। গৌরমণি সন্তানের অপরাধে সদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু কি উপায়ে যে ছেলের মতিগতি ফিরাইবেন, তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেন না।

জমিদার-বাড়ীর টাকাকড়ি, গহনাগাটি, আস্‌বাবপত্র, এমন কি বাসনকোষণ পর্য্যন্ত অধিকাংশই জমিদার বংশ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছিল, তবে নিতান্ত সামান্য দু-একটা জিনিষ এখনও ঘর খুঁজিলে বাহির হইয়া পড়িত। শিবদাসের ঘরেও প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের এইরকম দুই-চারিটি নিদর্শন ছিল। একটি রূপার গড়গড়ায় এখন পর্য্যন্ত তিনি তামাক খাইতেন, গৌরমণি প্রত্যহ সেটিকে নিজের হাতে মাজিয়া তাহার উজ্জ্বলতা অম্লান রাখিতেন। আর বাক্সের ভিতর তোলা ছিল একজোড়া পুরাতন কাশ্মীরি শাল, কোথাও কালেভদ্রে যদি যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ইহা শিবদাসের গায়ে উঠিত। গৌরমণির হাতে বা গলায় সোনারূপার চিহ্নও ছিল না, যে শাঁখা হাতে তিনি স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাই শুধু অক্ষয় হইয়া ছিল। তবে বৌএর মুখ দেখিয়া শাশুড়ী তাঁহাকে একটি সোনার সিঁদুর-কৌটা দিয়াছিলেন, সেইটিই তিনি মহাযত্নে নিজের সিন্দুকে রাখিয়া দিয়াছিলেন। নিজের পুত্রবধূর মুখ দেখিবার সৌভাগ্য যদি হয়, তাহা হইলে এইটি তাহাকে যৌতুক দিবেন, এই আশা মনে মনে পোষণ করিতেন। এই কয়টি জিনিষকে তিনি প্রায় পূজার জিনিষ মনে করিতেন, এগুলির পরিচর্য্যায় তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত।

দিন একইভাবে কাটিতেছিল। শ্বশুরঘর করিতে আসার পর একমাত্র কিশোরের জন্মের মাসটায় তাঁহার চিরন্তন কার্য্যপ্রণালীর কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেই কয়েকটা দিন তাঁহার অসুখ ও অশান্তির সীমা ছিল না। স্বামীর না জানি কত অসুবিধাই হইতেছে! জাতাশৌচের মাসটা কাটিয়া গেলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। ছেলেকে কোল এবং মন হইতে অনেকখানিই সরাইয়া ফেলিয়া, আবার মহোৎসাহে স্বামীসেবায় লাগিয়া গিয়াছিলেন। নিজের অনাদরে পালিত শরীরে তাঁহার রোগবালাই ছিল না, সুতরাং ইহার পর কোনোদিন আর শিবদাসকে অবহেলা বা অযত্ন সহ্য করিতে হয় নাই।

শিবদাসের একটু আধটু পড়াশুনা করা অভ্যাস ছিল। ইংরাজী ভাল জানিতেন না, তবে সংস্কৃত বেশ খানিকটাই জানিতেন। দুচারখানি বই যা তাঁহার ছিল, তাহাই লইয়া চশমা জোড়া চোখে লাগাইয়া, রোজ সকালবেলা বসিয়া যাইতেন। স্নানের সময় হইলে, গৌরমণি তাঁহার তেল, গামছা, সাবান, ধুতি সব গুছাইয়া রাখিয়া, তাঁহাকে খবর দিতেন। স্বামী উঠিয়া গেলে, তিনিই বই, চশ্‌মা সব তুলিয়া গুছাইয়া রাখিতেন, তাহার পর যাইতেন খাবারের জায়গা ও ব্যবস্থা করিতে। রান্নাবান্না নিজেই সব করিতেন, করিবার অন্য লোকও ছিল না, এবং অন্য কাহারও কাজ স্বামীর পছন্দ হইবে না এ আশঙ্কাও ছিল। রান্না দুই পালা তাঁহাকে করিতে হইত, বাড়ীর সকলের আহার্য্য ছিল একপ্রকার, শিবদাস এবং বিপ্রদাসের ছিল অন্যপ্রকার; দুই বৌ স্বামীদের রান্না আলাদা আলাদা করিতেন, এবং এজমালি রান্নাটা দুই জা এবং ননদে পালা করিয়া করিতেন। বাবুদের ভাতডাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি জিনিষই আলাদা করিতে হইত, এবং নিখুঁত ভাবে করিতে হইত। বিপ্রদাসের ছেলেমেয়েরা এ লইয়া কোনোদিনই কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই, ব্যবস্থাটা তাহারা সঙ্গত বলিয়া মানিয়াই লইয়াছিল। বাপ জ্যাঠা যেমন লম্বায় বড়, তাহার উপর কাহারও কোনও হাত নাই, তাঁহাদের আহার ও আরামের আয়োজনও সেইরূপ বড়, এ বিষয়ে কাহারও কোনো কথা বলিবার নাই।

গোলমাল সুরু করিল, সৃষ্টিছাড়া কিশোর। একদিন খাইতে বসিয়া বলিল, "মা, আমি চিংড়ী মাছের মালাই-কারী খাব।"

মা বলিলেন, "ও ত তোমার বাবার জন্যে, আমাদের জন্যেও আজ চিংড়ী মাছ হয়নি, পোনা মাছ হয়েছে।"

কিশোর বলিল, "বাবাকে পোনা মাছ দেও, আমি আজ চিংড়ী মাছ খাব।"

গৌরমণি জিভ কাটিয়া বলিলেন, "তা কি কখনও হয়? উনি এ পাৎলা ঝোল খেতে পারেন না।

কিশোর জেদ করিয়া বলিল, "না, আমি চিংড়ী মাছ

খাব। বাবা রোজ কেন সব ভাল ভাল জিনিষ খাবে, আর আমরা খালি যা-তা খাব?”

গৌরমণি উত্তর না দিয়া, কিশোরের বাটিতে মাছের ঝোল দিতে গেলেন। কিশোর রাগ করিয়া ঝোলশুদ্ধ বাটি লাথি মারিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া, একলাফে শিবদাসের জন্য সাজান আহার্য্যের মধ্য হইতে বড় চিংড়ী মাছটা তুলিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন আর মাছ জোগাড় করিয়া রান্না করিবার সময় ছিল না, স্বামীর আহার্য্যের একটা পদ যে কমিয়া গেল, ইহাতে গৌরমণির মানসিক অশান্তির সীমা রহিল না। কিশোর সেদিন চিংড়ী মাছ খাওয়ার শাস্তি স্বরূপ, কোনোপ্রকার খাবারই পাইল না, কিন্তু তাহাকে ইহাতে একটুও অনুতাপ প্রকাশ করিতে দেখা গেল না।

শিবদাস চিংড়ী মাছ অপহরণের কাহিনী শুনিয়া বলিলেন, “ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা মোটেই ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকের ছেলের মত এমন হ্যাংলামি শিখ্‌ল কোথা থেকে?”

গৌরমণি বলিলেন, “কি জানি? কাউকে ত এ-রকম করতে দেখে না।” ছোট ছেলেমেয়েকে না দিয়া বাপ জ্যাঠা যে রোজ নানারকম উপাদেয় জিনিষ দুই বেলা তাহাদের সামনেই আহার করেন, এটাকে তাঁহারা কুদৃষ্টান্ত মনে করিতে অভ্যস্ত হন নাই। গৌরমণি ভাবিলেন, তাঁহার রক্তে বনিয়াদিত্বের যে অভাব আছে, তাহারই ফলে কিশোরের এসকল দোষত্রুটি দেখা যাইতেছে; মনে মনে অনুতপ্তও হইলেন।

কিশোর সত্যই কালাপাহাড় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কোনো কিছুকে সমীহের চক্ষে দেখা তাহার কোষ্ঠিতে লেখে নাই। এই অভাবটাই গৌরমণিকে অত্যন্ত বেশী পীড়া দিত। ভদ্রলোকের ছেলে, বাপ-পিতামহকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেছে না, ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। নিজে যেমন স্বামীসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন, সকলের জীবনের সার্থকতাই তাই তিনি সেবার মধ্যে, ভক্তি-অবনত আত্মত্যাগের ভিতর খুঁজিতেন। কিশোর বালকমাত্র, তবু তাহার মতিগতি তাঁহার ভাল ঠেকিত না। দিনান্তে যখন হাঁক ছাড়িবার সময় হইত, তখন ঠাকুরঘরে গিয়া মাথা খুঁড়িতেন, “ছেলের সুমতি দাও ঠাকুর!”

কিশোরের কিন্তু সুমতিলাভের বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শিবদাস একদিন স্নান করিতে গিয়াছেন, গৌরমণি তাঁহার আহার্য্য সাজাইতেছেন, এমন সময় কিশোর ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, “মা, দেখে যাও।”

কোনো প্রয়োজনে ডাকিতেছে মনে করিয়া গৌরমণি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিবার উপক্রম হইল। কিশোর শিবদাসের চশমা পাড়িয়া নাকে পরিয়াছে, এবং তাঁহার দোয়াত-কলম লইয়া চমৎকার একজোড়া গোঁফ আঁকিয়াছে। মাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, “দেখ মা, ঠিক বাবার মত দেখাচ্ছে না?”

গৌরমণি তৎক্ষণাৎ তাহার গালে চড় মারিয়া চশমা কাড়িয়া লইলেন, এবং ছেলেকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া জল দিয়া তাহার অমন আশ্চর্য্য শিল্পসৃষ্টিটিকে ধুইয়া দিলেন। চশমা জোড়ার কাছে তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাহার যে অনেকটাই অবমাননা হইয়াছে, সে বিষয়ে গৌরমণির কোনো সন্দেহ ছিল না। ভয়ে একথা শিবদাসের কাছে তিনি উল্লেখ পর্য্যন্ত করিলেন না।

এই কিশোর যখন আট বৎসরের হইল, তখন মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে, শিবদাস, আদর যত্ন, সেবা শুশ্রূষা সব কিছুর বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। যাহা কিছুকে অবলম্বন করিয়া গৌরমণির সংসার এতদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, সব একসঙ্গে ভাঙিয়া পড়িল।

শোকের নিদারুণ আঘাতে কিছুদিন প্রায় তন্দ্রাবিষ্টের মতই তাঁহার কাটিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে যখন তাঁহার সকল দিকের চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন, সংসারকে তাঁহার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাঁহাকে সংসারের কোনো প্রয়োজন নাই। সকলে মিলিয়া বুঝাইল, “ছেলে রয়েছে, তাকে মানুষ কর, তোমার কাজের ভাবনা কি? এ ত ঘরে ঘরেই হচ্ছে, সবই দেবতার ইচ্ছা।”

কিন্তু কিশোর আর ধরা দিল না। মায়ের কোল যখন সর্ব্বাপেক্ষা তাহার প্রয়োজন ছিল, তখন শিবদাস তাহাকে

বঞ্চিত করিয়াছিলেন। আজ যখন শিবদাস গৌরমণিকে পরিপূর্ণ অবসর দিয়া গেলেন, তখন ছেলের আর মাকে প্রয়োজন নাই। সমগ্র হৃদয়-মন দিয়া কাহাকেও যত্ন না করিতে পারিলে গৌরমণির জীবন একেবারে অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিত, কিন্তু কিশোরকে আদর-যত্ন করা ছিল অসম্ভব। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাওয়ার সময় ভিন্ন তাহার টিকিই দেখা যাইত না। স্কুলে সে ইচ্ছামত যাইত বা যাইত না, এবং এ বিষয়ে হাজার শাসন করিলেও কাহারও কথা শুনিত না। তাহার জন্য ঘরদোর গুছাইয়া বা জিনিষপত্র সাজাইয়া কোনো লাভ ছিল না, কারণ এ সকল সে উপভোগ করিতে পারিতও না, চাহিতও না। নিজের বংশমর্য্যাদা রক্ষার দিকে তাহার সম্পূর্ণ অমনোযোগ ছিল, যত গরীব-দুঃখী, ছোটলোক-ভদ্রলোক সবাইকে সে নির্ব্বিচারে বরণ করিয়া লইত, তাহাদের সঙ্গে সব খেলায় যোগ দিত, তাহাদের গানের আখড়ায় গিয়া নিজের সুকণ্ঠের পরিচয় দিত।

এমন কি একদিন এক সখের থিয়েটারের আখ্‌ড়ায় গিয়া সখী সাজিয়া নাচিতেছে বলিয়া শোনা গেল। গৌরমণি একেবারে লজ্জায় ও দুঃখে মাটিতে মিশিয়া গেলেন। এ ছেলে একেবারে বংশের মুখ পুড়াইতে বসিয়াছে, ইহাকে তিনি কি করিয়া সুপথে আনিবেন? বিধবা স্ত্রীলোক তিনি, তাও এত বড় বংশের বধূ, তিনি ত আর ছেলের পিছন পিছন চৌকিদারের মত দৌড়াইয়া বেড়াইতে পারেন না?

নিরুপায় হইয়া তিনি বড় জায়ের শরণ নিলেন। বিপ্রদাস ভাইয়ের পরিবার সম্বন্ধে কখনও কোনো কথা বলিতেন না। ইহাই ছিল এ বংশের নিয়ম। ইঁহাদের বিষয়সম্পত্তি যেমন ভাগ হইত, স্নেহ-মমতা, দায়িত্ববোধ সবই তেমনই চুলচেরা ভাগ হইত। কোনোমতেই তাঁহারা আইনের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতেন না। শিবদাস বাঁচিয়া থাকিতে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে বিপ্রদাসের ব্যবহার যে রকম নির্লিপ্ত ছিল, এখনও তাহা হইতে কোনোই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু কিশোরের অনাচারটাও এবার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। অগত্যা স্ত্রীর কথায় বিপ্রদাসের টনক নড়িল, নিজে গিয়া কান ধরিয়া তিনি ভাইপোকে বাড়ীতে টানিয়া আনিলেন।

ফলে, দিন দুই কিশোর একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। যখন তাহাকে পাওয়া গেল, তাহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া, গৌরমণির আর শাসন করিবার ভরসা রহিল না। তবু না বলিলে নয়, এইভাবে বলিলেন, "এমনি ক'রে কি বাপ-পিতেমহের নাম ডোবায় রে?"

কিশোর উদ্ধতভাবে বলিল, "আহা ভারি ত নাম! তাঁরা যা ডুবিয়ে গেছেন, তার বেশী আর আমি ডোবাব না।"

গৌরমণি ইহার পর আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। কিশোরকে শাসনের ক্ষমতা তাঁহার যে নাই তাহা বুঝিতেই পারিলেন। এ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান বটে, কিন্তু ভিন্ন জগতের মানুষ। তাঁহারা জগৎ-সংসারকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এ সে দৃষ্টিতে দেখে না।

কিশোরকে একদিন তিনি আশ্রয় দেন নাই, আজ নিজেও কিশোরের কাছে কোনো আশ্রয় পাইলেন না। নিজের ব্যর্থ সেবা ও পূজার ভার লইয়া ইহার পর তিনি দেবতারই চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। শিবদাস একদিন দেবতাকেও আড়াল করিয়াছিলেন, কিন্তু পাথরের দেবতার অভিমান নাই, তাই গৌরমণি সেখান হইতে বিতাড়িত হইলেন না। কিন্তু হৃদয় তাঁহার মরুভূমির মত শুষ্কতায় ভরিয়া উঠিল। সেবার ভিতর, পূজার ভিতর, পূর্ব্বের সে তৃপ্তি, সে বুকভরা সার্থকতা তিনি আর খুঁজিয়া পাইলেন না।

দিন কাটিতে লাগিল। কিশোর যৌবনে পা দিতে চলিল, কিন্তু মতিগতি তার দিন দিন উল্টাপথেই চলিতে লাগিল। কোনোক্রমে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া, সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল। গানবাজনা, থিয়েটার এই সব লইয়াই তাহার দিন কাটিত, মাঝে মাঝে মাসিক পত্রে কবিতা লিখিত, গল্প লিখিত, মায়ের কাছে মধ্যে মধ্যে কাগজগুলি লইয়াও আসিত, কিন্তু গৌরমণি খুলিয়াও দেখিতেন না।

রোগ তাঁহার শরীরে কোনোদিনই ছিল না। সধবা অবস্থায় একলা তিনি তিনটা মানুষের খাটুনি খাটিতেন। কিন্তু ইদানীং তাঁহার শরীর ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্যর্থতার বোঝা আর তিনি বহন করিতে পারিতে ছিলেন না। জগতে তাঁহাকে কাহারও প্রয়োজন নাই, কাহারও

আরাম, সুখ ও সান্ত্বনা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই, ইহা ভাবিতে গৌরমণি অভ্যস্ত ছিলেন না। স্বামী মরিয়া তাঁহাকে একেবারে সকল দিক দিয়া অবলম্বনহীন করিয়া গিয়াছিলেন।

সকলে পরামর্শ দিত, "ছেলের বিবাহ দাও, একটি বউ আসুক, তাহ'লে ছেলেরও ঘরে মন বস্‌বে, তোমারও আবার সংসার ভ'রে উঠ্‌বে। এমনি ক'রে কি মেয়েমানুষের দিন কাটে?" গৌরমণি কিন্তু মনে উৎসাহ পাইতেন না। কিশোরের বৌ, সে না জানি কেমন হইবে। কিশোরের অনাচারগুলি তবু বেশীর ভাগই অনুষ্ঠিত হইত বাড়ীর বাহিরে, গৌরমণি মনে পীড়া অনুভব করিলেও চক্ষু তাঁহার নিষ্কৃতি পাইত। কিন্তু বৌও যদি ছেলের মত হয়, তাহা হইলে গৌরমণিকে আর বাড়ীতে টি‍ঁকিতে হইবে না। স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই যে নারী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাহা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন এবং বধূ যে ছেলের কথাই মানিবে, তাঁহার কথা মানিবে না, ইহাও তিনি ধরিয়াই লইয়াছিলেন। সুতরাং কিশোরের বিবাহের কথায় মুখে যোগ দিলেও মন তাঁহার যোগ দিত না। তিনি যেমন করিয়া সমস্ত হৃদয় দিয়া শ্বশুর-কুলের পূজা করিয়াছেন, সেইরূপ করিতে পারে, এমন মেয়েই দেখিতেন না।

বিপ্রদাসের বড় ছেলেটির বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। বড় জা একদিন গৌরমণিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওদেরই ঘরে আর একটি মেয়ে আছে, ভাগ্নী না কি হয়, সেটিও বিয়ের যুগ্যি। তোমার মত হয় ত কিশোরের জন্যে দেখা যায়, তারা ব'লে পাঠিয়েছে। মেয়ে দেখ্‌তে ভালই, শুনলাম্।"

গৌরমণি নিরুৎসাহভাবে বলিলেন, "ঘর কি রকম? আজকালকার যা সব মেয়েছেলে, হট্ ক'রে কথা দিতে ভরসা হয় না।"

বড় জা বলিলেন, "ঘর ভালই, নইলে কি আর আমরা সম্বন্ধ করছি? তবে আজকালকার মেয়ে একেবারে কি আর আমাদের মত হবে? এ মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে, গানবাজনাও শিখছে, নইলে যে আবার ছেলেদের মন ওঠে না। তোমার ছেলে ত আবার বিশেষ ক'রে যা গান-পাগলা।"

ছেলের পছন্দমত বউ আনিতেই গৌরমণির সবচেয়ে আপত্তি ছিল। তাহা হইলে সংসার দুদিনেই ভূতের বাথান হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিলেন, "দেখি ছেলেকে ব'লে।"

বড় জা বলিলেন, "তা দেখ। এক জায়গায় হ'লে মন্দ হয় না, দুটি বোন মিলে মিশে থাকবে।"

রাত্রে খাইবার সময় তিনি ছেলের কাছে কথা পাড়িলেন। কিশোর ভ্রূকুট করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বিয়ে করবে না ত আরো কিছু! বউ খাবে কি, ঘাস?"

গৌরমণি ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "কেন আমরা কি ঘাস খেয়েছি?"

কিশোর বলিল, "তোমার দিন যা ক'রে গেছে তাও দেখেছি। অমন জানোয়ারের মত খাটবার জন্যে আমি পরের মেয়ে আন্‌তে চাই না।"

তাঁহার যে জীবন এমন পূর্ণ, এমন শান্তিময় ছিল, তাহার সম্বন্ধে এমন অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য শুনিয়া গৌরমণি পীড়িত-অন্তঃকরণে চুপ করিয়া রহিলেন, ছেলের কাছে বিবাহের কথা তুলিতে তাঁহার আর কোনোদিন প্রবৃত্তি হইল না।

ভাসুরপোর বিবাহ হইয়া গেল, বৌ আসিল, দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। সকলে ভালই বলিল, কিন্তু গৌরমণির পছন্দ হইল না। ইহারা একেবারেই যে তাঁহাদের মত নয়। নিজের সুখ-সুবিধা, আরাম-বিরাম লইয়া কেতকী ফুলের মত কণ্টকময় হইয়া আছে, ইহাদের একেবারে অন্যের জীবনে মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই, ইচ্ছাও নাই। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যেমন করিয়া বিশাল নদের বক্ষে বিলীন হইয়া যায়, তিনিও তেমনি করিয়া স্বামীতে আপনহারা হইয়াছিলেন, কিন্তু সে আদর্শই কি সংসার হইতে মুছিয়া গিয়াছে?

মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিত কাশী চলিয়া যান, কিন্তু এই ঘরসংসার, এই সব তুচ্ছ জিনিষপত্র, যা স্বামী ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এই গুলির মায়া কাটাইতে পারিতেন না। এখনও যেন স্বামী বাঁচিয়া আছেন এমন ভাবেই তিনি ঘর-দ্বার, জিনিষপত্রের যত্ন করিতেন।

শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীর তাঁহার আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তবু ঘড়া ঘড়া জল তোলা, ঘর ধোওয়া, বারান্দা ধোওয়ায় তাঁহার বিরাম ছিল না। একটুপানি

কাজ করিয়া বসিয়া পড়িতেন ; কিন্তু হাল ছাড়িতেন না, একটুখানি বিশ্রাম করিয়া আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজে লাগিয়া যাইতেন।

কয়দিন একটু মেঘলা করিয়াছিল। সকালে উঠিয়া গৌরমণি দেখিলেন বেশ পরিষ্কার আকাশ, চন্‌চনে রোদ উঠিয়াছে। মনে মনে স্থির করিলেন, স্নানের আগে গরম কাপড়চোপড় সব রোদে দিয়া ঝাড়িয়া তুলিবেন। স্বামীর কাপড়গুলি তিনি কিশোরকেও ব্যবহার করিতে দিতেন না, তাহা বাক্সে তোলাই থাকিত।

বাক্স খুলিয়াই তাঁহার মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। সর্ব্বপ্রথম, বাক্স খুলিলেই চোখে পড়িত সেই পুরাতন কাশ্মীরি শাল জোড়া। গৌরমণি দেখিলেন বাক্সের ভিতর শাল নাই! তন্নতন্ন করিয়া বাক্স খুঁজিলেন, একেবারে উপুড় করিয়া সব কাপড় মেঝেতে ঢালিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শালের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। অন্য কোনো বাক্সে রাখেন নাই, তাহা স্থির জানিতেন, তবু আরসব বাক্স প্যাঁটরা খুলিয়া ঝাড়িয়া দেখিলেন, কোথাও নাই। তখন একেবারে হতাশ হইয়া মেঝের উপরে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার যেন বুকের একখানা হাড় খসিয়া গেল।

ছোট ভাসুরপো নীরদ সেখান দিয়া যাইতেছিল, তাঁহাকে অমন করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে খুড়িমা, অমন ক'রে ব'সে আছেন, যে?"

গৌরমণি আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "ওঁর সেই শালজোড়া খুঁজে পাচ্ছি না, বাবা!"

নীরদ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি বলেছি তা মেজ্‌দাকে বলবেন না কিন্তু, তাহ'লে সে আমাকে ধ'রে ঠ্যাঙাবে। শাল সে নিয়ে গেছে, আজ তাদের থিয়েটার হবে সেখানে কাকে যেন পরাবে।"

গৌরমণির পরিচিত জগৎটা যেন মহাশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। এতবড় অনাচার এ জগতে হয়! আর তার অনুষ্ঠাতা, তাঁহার পুত্র স্বয়ং! মৃত পিতার শালকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল কিনা কোন থিয়েটারের অভিনেতার জন্য?

ভাসুরপো ততক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছিল। গৌরমণি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর, জন্মে যা কখনও করেন নাই, তাহাও করিলেন। ঘরের দরজাটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পাড়ার যে বাড়ীটাতে থিয়েটারের আখ্‌ড়া হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল। তখন পূর্ণ উদ্যমে রিহার্সাল চলিয়াছে, বাহির হইতে তিনি গানবাজনা, চীৎকার শুনিতে পাইলেন। ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কোথাও বাধা পাইলেন না।

বড় একটা ঘরে রিহার্সাল হইতেছে, সকলে তাহাতেই ব্যস্ত, গৌরমণির প্রবেশ কেহ লক্ষ্য করিল না। তিনি চাহিয়া দেখিলেন পাড়ার নদেরচাঁদ মুদির ছেলে শালজোড়া গায়ে দিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছে এবং উৎকট রবে গান গাহিতেছে।

গৌরমণি তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কিশোর!"

কিশোর বাজনা বাজাইতেছিল। মায়ের ডাকে চম্‌কিয়া বাজনা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। খানিকটা বিস্মিত এবং খানিকটা ভীত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি হঠাৎ এখানে যে?"

মা তেমনি গলায় বলিলেন "ওঁর শাল তুই এনেছিস্, এই জায়গায়? কার গায়ে দিয়েছিস্?"

কিশোর এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিয়া, একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এনেছি ত, তাতে এমন কি দোষ হয়েছে? আমি বেশ ভাল ক'রে কাচিয়ে দেব এখন।"

গৌরমণি হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আনিস্‌নে, আনিস্‌নে, আমার ঘরে আর আমি তুল্‌ব না। দেবতার নৈবেদ্য তুই কুকুর দিয়ে চাটালি?" তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কে যে তাঁহাকে বাড়ী আনিল, কেমন করিয়া যে আসিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জ্ঞান হইয়া দেখিলেন নিজের ঘরে শুইয়া আছেন। ভাসুরঝি রমা তাঁহার পাশে বসিয়া আছে। গৌরমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোর কোথায় রে?"

রমা বলিল, "এতক্ষণ ত এখানেই ছিল, এই মাত্র বেরিয়ে গেল। দরকার হ'লেই ডাকতে বলেছে।"

গৌরমণি বলিলেন, "আচ্ছা মা, তুই যা, আমি এখন ভালই আছি।"

রমা চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গৌরমণি শেষে উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দৃঢ় হাতে স্বামীর ব্যবহারের জিনিষ যে ভাঙা আলমারীতে থাকিত, তাহা খুলিয়া সেই রূপার গড়গড়াটি বাহির করিয়া রাখিলেন নিজের বাক্স হইতে সোনার সিন্দুর-কৌটাটিও বাহির করিয়া রাখিলেন, বাক্স হইতে স্বামীর কাপড়চোপড় যাহা ছিল তাহা সবই বাহির করিয়া ফেলিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া গড়গড়াটি বহুকষ্টে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন। কাপড়চোপড়, টুকরাগুলি এবং কৌটাটি কাপড়ের আঁচলে লুকাইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। কাঠের আগুন জ্বালিতে বেশীক্ষণ লাগিল না, তিনি বেশী করিয়া কাঠ দিলেন। তাহার পর আঁচল খালি করিয়া সব আগুনের ভিতর ঢালিয়া দিলেন। সন্তানের চিতার দিকে মাতা যে দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, সেইভাবে আগুনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আগুন বহুক্ষণ জ্বলিল, তাহার পর কোন এক সময় নিভিয়া গেল।

সংসার আর গৌরমণিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। একটা মাস কাটিল, পরের মাসটা আর কাটিল না। অমাবস্যার রাত্রের অন্ধকারে গৌরমণি পথ খুঁজিয়া পাইলেন। যাঁহার আশ্রয় পাইয়া, যাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার জীবন একমাত্র সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, তাঁহারই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাচীন পল্লীজীবন

শ্রী মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল

একটা কথা এখন প্রায়ই শুনা যায়—ভারতবর্ষ গ্রামের মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা পল্লীজীবনের মধ্যেই লক্ষিত হয়। ভারতবাসীদিগকে বুঝিতে হইলে ভারতের গ্রামবাসীগণকে প্রথমে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—গ্রামে ফিরিয়া যাও, গ্রামের উন্নতি কর—গ্রামের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আন, নষ্টসৌন্দর্য্য পুনরুদ্ধার কর।

রাষ্ট্রের সহিত গ্রামের সম্বন্ধ

পুরাকালে ভারতবর্ষের গ্রামগুলির কথা এখন উপকথার মত শুনাইবে। তখন সমগ্র দেশের পরিমাণ-গণনায় একটি গ্রাম ছিল একক অর্থাৎ এক সংখ্যা—রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একটি পল্লী সমবেত ভাবে এক বলিয়া পরিগণিত হইত। অনেকে বলেন যে বৈদিক যুগে রাজা, প্রজার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে গ্রামের কর্ত্তাকে আহ্বান করা হইত। ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার Corporate Life in Ancient India পুস্তকে উক্ত বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন যে প্রজা রাজাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইত, কিন্তু মনোনীত করিত না। কিন্তু উভয় দলই স্বীকার করেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা প্রজার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন।

অথর্ব্ববেদ সংহিতায় তৃতীয় কাণ্ডে, প্রথম অনুবাদের তৃতীয় সূক্তে ও চতুর্থ সূক্তে এবং ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে ১৭৩ সূক্তে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে,—

"হ্বয়ন্তু ত্বা প্রতিজনাঃ প্রতি মিত্রা অবৃষত।
ইন্দ্রাগ্নি বিশ্বে দেবাস্তে বিশি ক্ষেমমদী ধরণ্॥"

অথর্ব্ববেদ ১ অ। ৩ সূ। ৬ঋ

আপনার বিরুদ্ধবাদীগণ অপনাকে আহ্বান করেন আপনার মিত্রগণ আপনাকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

ইন্দ্র, অগ্নি এবং সকল দেবগণ প্রজাগণের মধ্যে আপনার প্রতিষ্ঠা কামনা করিতেছেন।

ত্বাং বিশো বৃণত ং রাজ্যায়ৎ ত্বামিমাঃ প্রদিশঃপঞ্চ দেবীঃ।
বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব ততো ন উগ্রো বিভজা বসূনি॥
অথর্ব্ব।১ অ। ৪সূ। ২ ঋ

হে রাজন্! প্রজাগণ আপনাকে রাজকার্য্যে বরণ করিতেছে। এই পঞ্চমণ্ডল আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আপনি সিংহাসনে সমাসীন হউন এবং আপনি আমাদিগের বিবিধ মঙ্গল সাধন করুন।

আ ত্বাহার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্ব্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ॥
ঋগেদ।১০ম।১৭৩ সূ।১ঋ

হে রাজন! আপনাকে আমাদের এই রাজ্যে স্বামিত্বে বরণ করিতেছি, আপনি রাজ্যের অধিপতি হউন। প্রজাসকল একবাক্যে আপনাকে কামনা করিতেছে। রাজ্য আপনাতেই অবিচলিত থাকুক।*

শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা দুই রকম নির্ব্বাচনকারীর নাম পাই—সারথী ও গ্রামনী। পরবর্ত্তী কালে রামায়ণে আমরা পাঠ করি যে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময়ে রাজা দশরথ সহরের ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

নানা নগর বাস্তব্যান্ পৃথগ্জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাঃ প্রধানান্ পৃথিবীপতি॥
(অযোধ্যা কাণ্ড)

আরও পরবর্ত্তী যুগে মহাভারত পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে রাজা প্রতীপ তাঁহার পুত্র দেবপীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় গ্রামবাসীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহারা ও সমবেত নগরবাসী দেবপীর পরিবর্ত্তে রাজভ্রাতাকে উক্ত পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। রাজা যযাতি তখন জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন তখনও পল্লীর প্রজামণ্ডলীর সম্মতি অনুসারে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

গ্রামপতি বা মণ্ডলের কার্য্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গ্রাম ছিল একক সংখ্যা। এই গ্রামের একজন অধিপতি থাকিতেন। তাঁহাকে নানা নামে অভিহিত করা হইত—গ্রামাধিপ, গ্রামনী, গ্রামপতি, গ্রামভোজক প্রভৃতি। ইনি ইঁহার অধিকারভুক্ত গ্রামের বিচারক ও শাসনকর্ত্তা উভয়ই ছিলেন। ইঁহার সহিত রাজার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা স্থিরভাবে বলা দুরূহ, কিন্তু রাজ-নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইঁহার বিশেষ হাত ছিল এবং সময়ে অসময়ে রাজা এই গ্রামপতিবর্গকে আহ্বান করিয়া ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ঋকবেদে এই গ্রামনীর কথা পাওয়া যায় এবং সংহিতা ও ব্রাহ্মণেও এই গ্রামনীর কথার উল্লেখ আছে। মগাবগগ জাতকে লিখিত আছে যে বিম্বিসার ৮০,০০০ গ্রামের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন এবং প্রত্যেক গ্রামের প্রধানকে এক সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন গ্রামপতি (গ্রামভোজক) যদি তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেন বা উচ্চতর পদ হইতে নিম্নতর পদে অবনত করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা হ্রাস করিতেন। এই গ্রামের মণ্ডলের পদ বংশপরম্পরাগত ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রামপতি বিচার ও শাসন উভয় কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। আধুনিক নাগরিক কর্ত্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের দ্বারা যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, ইঁহাদের জন্য সেই সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত ছিল—যথা সভাগৃহ নির্ম্মাণ, পরিব্রাজকদিগের জন্য বাসগৃহ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, মন্দির স্থাপন, আতুর-অনাথের সৎকারের জন্য আর্থিক সাহায্য, নদী প্রভৃতি জলপথের বাঁধ নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

গ্রামপতি যথেচ্ছভাবে বা খামখেয়ালী-বশে সে ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারিতেন না। গ্রামের "সভা" তাঁহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সভার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে বলেন যে এই "সভা" গ্রামবাসী লইয়া গঠিত হইত এবং

---

* শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সঙ্কলিত বেদ হইতে গৃহীত।

"সমিতি" সমগ্র জাতি লইয়া গঠিত হইত। অথর্ব্ববেদে এই সমিতি ও সভার উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকৃতির কথার উল্লেখ আছে। ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সভা (পুগ) এবং সমিতির (গণ) বিষয় বর্ণিত হইতে দেখি। এই সভায় গ্রামের আমোদ-প্রমোদ ব্যাপার স্থিরীকৃত হইত। এই সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যদি কোন ব্যক্তি সাধারণের দর্শনীয় কোন প্রদর্শনীর কার্য্যের সহায়তা না করে তাহা হইলে তাহাকে উক্ত প্রদর্শনীর দর্শন হইতে বঞ্চিত করা হইত। এই সভা ও সমিতিতে এখনকার ন্যায় যথেষ্ট দলাদলি থাকিত।

এই গ্রামপতির একটি প্রধান কার্য্য ছিল, রাজস্ব আদায় করা এবং দস্যু ও লুণ্ঠনকারীর হাত হইতে গ্রামকে রক্ষা করা। 'জাতকে' গ্রামপতির উক্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রামবাসীগণকে উক্ত কার্য্যে গ্রামপতির সাহায্য করিতে হইত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। যখন গ্রামের প্রধান সমগ্র গ্রামের কোন কার্য্যে দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইতেন তখন গ্রামের লোক তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিত। যদি কোন ব্যক্তি গ্রামের জনসাধারণের কোন চুক্তি ভঙ্গ করিত, তাহাকে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিবার অনুজ্ঞা মনুতে উল্লিখিত আছে।

কুলবক 'জাতকে' বর্ণিত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে আমরা গ্রামের ভিতরের বিধি-ব্যবস্থার আভাস পাই :—জনৈক "গ্রামভোজক" তাঁহার অধিকারের মধ্যে নানা দোষের জন্য গ্রামবাসীদিগকে অর্থদণ্ড করিতেন। ইহা তাঁহার উপার্জ্জনের একটি কৌশল ছিল। উক্ত গ্রামে বোধিসত্বের আবির্ভাব হইল। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া পল্লীবাসীবর্গের চরিত্র সংশোধিত হইয়া গেল। ইহা গ্রামপতির উপার্জ্জনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য গ্রামপতি একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, একদল লুণ্ঠনকারী গ্রামের মধ্যে আসিয়া জানপদবর্গের নানা অনিষ্টসাধন করিতেছে। তাহাদিগের বিশিষ্ট শাস্তি হওয়া আবশ্যক।" রাজা এই কথা শুনিয়া নিজে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। তদন্ত করিয়া তিনি গ্রামপতির দুষ্টামি ধরিয়া ফেলিলেন ও শাস্তিস্বরূপ উক্ত গ্রামাধিপকে তিনি বোধিসত্বের কৃতদাস হইয়া থাকিবার জন্য আদেশ দিলেন, এবং বোধিসত্বের অনুচরবর্গের মধ্যে উক্ত গ্রামপতির সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিলেন।

কৃষক নিজের কার্য্যে অবহেলা করিলে গ্রামপতি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইলেও ঐ দুর্ভিক্ষের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেন। গহাপতি 'জাতকে' নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ আছে :—কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। প্রজাবর্গ "গ্রামভোজকের" নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত। গ্রামপতি তাহাদিগকে মাংস দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বলিলেন, এখন হইতে দুই মাসের মধ্যে শস্য ছেদনের পর পণ্যদ্রব্যের দ্বারা আমার ঋণ পরিশোধ করিও। ইহার মধ্যে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, পুরাকালে দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দ্রব্যের আদান প্রদান হইত। মুদ্রা-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই বিনিময়-ব্যবসায়ের প্রচুর প্রচলন ছিল। তখন সংযমের সাহায্যে ব্যবসা চালান হইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেকালে একটি পল্লী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমবেত ভাবে এক বলিয়া পরিগণিত হইত। যদি কেহ গবাদি পশু অপহরণ করিত, তখন কে চোর তাহা স্থির করিতে না পারিলে, যে গ্রামে ঐ পশুর পদচিহ্ন থাকিত সেই গ্রামকে শাসন করা হইত। পদচিহ্ন ম্লান বা বিচ্ছিন্ন প্রতীয়মান হইলে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্কন্ধে দোষারোপ করিয়া উহাকে শাস্তি দেওয়া হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নিম্নলিখিত অনুজ্ঞা আছে—যদি কোন কৃষক কোন গ্রামের কোন কাজ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহা হইলে তাহার যে অর্থদণ্ড হইবে সেই অর্থ উক্ত গ্রামের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে।

আমরা এখন যাহা ইংরাজীতে club বা "পরিষদ" বলি, তখন গ্রামের মধ্যেও তাহার প্রচলন ছিল। ইহাকে গোষ্ঠী বলা হইত। বৎসায়ণ উক্ত ক্লাবের নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন :—

"জনমনুরঞ্জয়েত্ কর্ম্মষুচ সাহায্যেনচানু গৃহ্নীয়াৎ উপকারয়েৎচ্চেতি।"

ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্ত শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত

করেন যে উক্ত গোষ্ঠী কেবল যে প্রমোদাগার ছিল তাহা নহে, উহা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে অনেক কার্য্য করিত।

তখন সুরার প্রচুর প্রচলন ছিল। অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিত তাহা হইলে গ্রামপতি তাহাকে বিহিত শাস্তি প্রদান করিতেন। 'জাতক' সাহিত্যে নানাপ্রকার শাস্তির কথার উল্লেখ আছে। খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে মাংস একটি প্রধান খাদ্য ছিল। মধ্যে মধ্যে গ্রামপতিকে তাঁহার অধিকারের ক্ষেত্রের মধ্যে মদ্যপান ও পশুবধ-নিবারণের আজ্ঞা ঘোষিত করিতে হইত।

উপরে খৃষ্ট জন্মিবার বহু বৎসর পূর্ব্বের পল্লীজীবনের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষয় এত বিস্তৃত ও দুরূহ যে অল্প সময়ের মধ্যে ইহার পূর্ণ প্রকৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা বৃথা। কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া এবং কোন্ কোন্ দিকে এই বিষয়ের চর্চ্চা হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার সামান্য প্রয়াস করা হইয়াছে মাত্র। এখন বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন গ্রামের একটি চিত্র আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত প্রাচীন 'সূর্য্যের গানের' মধ্যে বাঙ্গালার বহু প্রাচীন গ্রামের নিখুঁত ছবি অঙ্কিত করা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সেকালের হিন্দু নর নারীর গার্হস্থ্য জীবনের অনেক মর্ম্মকথা আমাদের প্রাণের নিগূঢ় তন্ত্রী স্পর্শ করে।

কয়েকটি ছত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করিব—

"সোনার বাটীর আগর চন্নন রূপার বাটী তৈলরে।
স্নান কর ছাওয়াল সূর্য্যাইরে॥
দুগ্ধের পুষ্কর্ণী সূর্য্যাই দুইঞা দাতি ডুবরে।
স্নান কর ছাওয়াল সূর্য্যাইরে॥"

* * *

"মণ মণ চাউল হইলে পূজায় বইতে পারি।
ছড়া ভরা কলা হৈলে পূজায় বইতে পারি॥
সের ভরা ধূপ হৈলে পূজায় বইতে পারি।
সাজি ভরা পুষ্প হৈলে পূজায় বইতে পারি॥"

* * *

পূজার পর সূর্য্যের আহার হইতেছে—

"পূজা খাইয়া ছাওলাল সূর্য্যাই জলপান কল্যা কি।
হাল্যা বাড়ীর দুগ্ধ দধি গোয়াল বাড়ীর ঘি॥
পূজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্য্যাই চতুর্দ্দিক চায়।
জলপান কল্যা ছাওয়াল সূর্য্যাই মুখশুদ্ধা কল্যা কি।
বারৈ বাড়ীর পান সুপারি গাছের হরিতোকী॥
ওপার দুইটি বাওনের কন্যা মল খাড়ুয়া পায়।
তাহা দেখ্যা সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া কর‍্তে চায়॥"

* * *

সূর্য্যের বিয়ে হইতেছে—

"আম ফলে থোকা থোকা তিতৈল ফলে বেকা বেকা।
ছাওয়াল সূর্য্যাই বিয়া করেন মায় ঝোলা টাকা টাকা॥
খাড়ো খাড়ো নাইরকোল গাছটি পিরছাইলা ফলে।
ছাওয়াল সূর্য্যাই বিয়া করেন ঘৃতের প্রদীপ জলে॥

* * *

সূর্য্যের স্ত্রী গৌরীর শ্বশুরবাড়ী গমন—

"আজ যা গৌরী কাঁদ্যা কাট্যা।
কালই আইস্ গৌরী হাস্যা বস্যা॥
গৌরীর মায় কাঁদে কাটে।
হাজার টাকা গাইতে বাঁধে॥"

* * *

সূর্য্য শ্বশুর বাড়ী আসিয়া আহার করিতেছেন—

"...শালীরা যে পান দিবে কাপড়ে মুছ্যা খাইও॥
শাশুড়ী রেঁধেছে দারা ঝলে আর ঝোলে।
শালা বৌ পশেন দারা সুবর্ণেরি থালে॥"

এখন স্বর্ণের ও রৌপ্যের পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়ম ধাতুর পাত্র ব্যবহৃত হইতেছে; দুগ্ধের পুষ্করিণীর স্থানে দুগ্ধের ছিটা দিয়া কাজ সারা হয়; পূজার জন্য আর মণ মণ চাল জুটিয়া উঠে না, তাহা এখন মুষ্টিমাত্রে অবশিষ্ট; সোনার বাটীতে আর অগুরু চন্দন দেওয়া হয় না, স্বর্ণের ন্যায় চন্দনকাষ্ঠও মহার্ঘ। সেরভরা ধূপের স্থানে কাঁচ্চা পরিমাণও সব সময় জুটে না। হালুই বাড়ী (চাষীর ঘর) আজ দুগ্ধদধি-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত; হরিতকী বৃক্ষ আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখেন নাই; বারুই বাড়ীর পানের সাক্ষাৎ গ্রামের লোকের মেলে না—সহরে চলিয়া যায়। সুপারি গাছও বিরল হইয়া পড়িয়াছে। শালার বৌ সুবর্ণের থালে

আর পরিবেশন করেন না—মৃৎপাত্র তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। বিবাহে আর ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে না, মিশ্রিত তৈল ব্যবহার হয়।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্র হইতে সেকালের শ্রমশিল্পের কথা অনেক জানা যাইবে।

গৌরীর অভাব-মোচনে সূর্য্যের সঙ্কল্প—

তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি কাপড়ের দুঃখ পামু।
নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসামু॥
তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।
নগরে নগরে আমি শাঁখারী বসামু

সূর্য্যের গান ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, যুগের পূর্ব্বের কল্পনা (?) বলিয়া মনে হয়।

১১শ ১২শ খৃষ্টাব্দে মানিকচন্দ্র রাজার গান বিরচিত হয়। ইহা হইতে মাণিকচন্দ্র রাজার রাজত্বকালে প্রজার অবস্থার একটা ধারণা হয়।

গ্রামবাসীর অবস্থা তখন স্বচ্ছল ছিল। স্বচ্ছল বলিতে ইহা বুঝায় না যে তাহাদের প্রভূত অর্থ ছিল। কিন্তু জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাব ছিল না। লোকের অভাব ছিল অল্প, এবং অভাবও অনায়াসে গ্রামেই পূরণ হইয়া যাইত। গ্রামেই তুলা উৎপাদন হইত, গ্রামের তাঁতি কাপড় বুনিত, গ্রামের চাষা চাষ করিত, গ্রামের কামার লোহার দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিত, গ্রামের কুমার হাঁড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত, রন্ধনকাষ্ঠ গ্রামের বনজঙ্গল হইতে পাওয়া যাইত। গ্রামের মাটি, গ্রামের বাঁশ-বৃক্ষাদি গৃহনির্ম্মাণের সাজসরঞ্জাম যোগাইত। গ্রামের গাছগাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইত। গ্রামের তিলি তেল প্রস্তুত করিত। গৃহে গৃহে ঘি, দধি, শর্করা, প্রস্তুত হইত। খাদ্যদ্রব্যের জন্য কাহারও অপেক্ষায় থাকিতে হইত না। গ্রামের টোল, গ্রামের পাঠশালা শিক্ষা বিস্তার করিত। তখন গ্রামগুলি এখনকার মত ব্যাধির মন্দির ছিল না। পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে মিলিত, লোকের স্বাস্থ্যও ছিল ভাল। জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য উৎকণ্ঠা ছিল না,—কন্যার বিবাহের জন্য বাস্তুভিটা নিলামে চড়িত না।

বাঙ্গালী জাতি ভাবপ্রবণ। জড়বাদী পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া সেই মনোবৃত্তি আজ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেকালে সেই ভাবের ধারা মন্দাকিনীর ন্যায় পল্লীর গৃহে গৃহে প্রবাহিত হইত।

গৌরী শ্বশুরবাড়ী গমন করিতেছেন, নৌকা ধীরে ধীরে জল-পথে অগ্রসর হইতেছে :—

"ভাঙ্গা নাও মাদারের বেঠা চল্‌কে উঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই মায়ের কাঁদম শুনি॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চল্‌কে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই ভায়ের কাঁদন শুনি॥"
ভাঙ্গা ছাও মাদারের বৈঠাচল্‌কে ওটে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝিভাই বুইনের কাঁদন শুনি॥

গার্হস্থ্য জীবনের প্রারম্ভে মাতা পিতা ভ্রাতাভগ্নী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় পল্লীবালিকার এই সকরুণ হৃদয়োচ্ছ্বাস, ইহা সেকালের বাঙ্গালার পল্লীর একান্ত নিজস্ব।*

* সম্প্রতি 'পল্লী-স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রাচীনভারতে গ্রামের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ পড়িয়া দেখিতে পারেন। বঃ সঃ

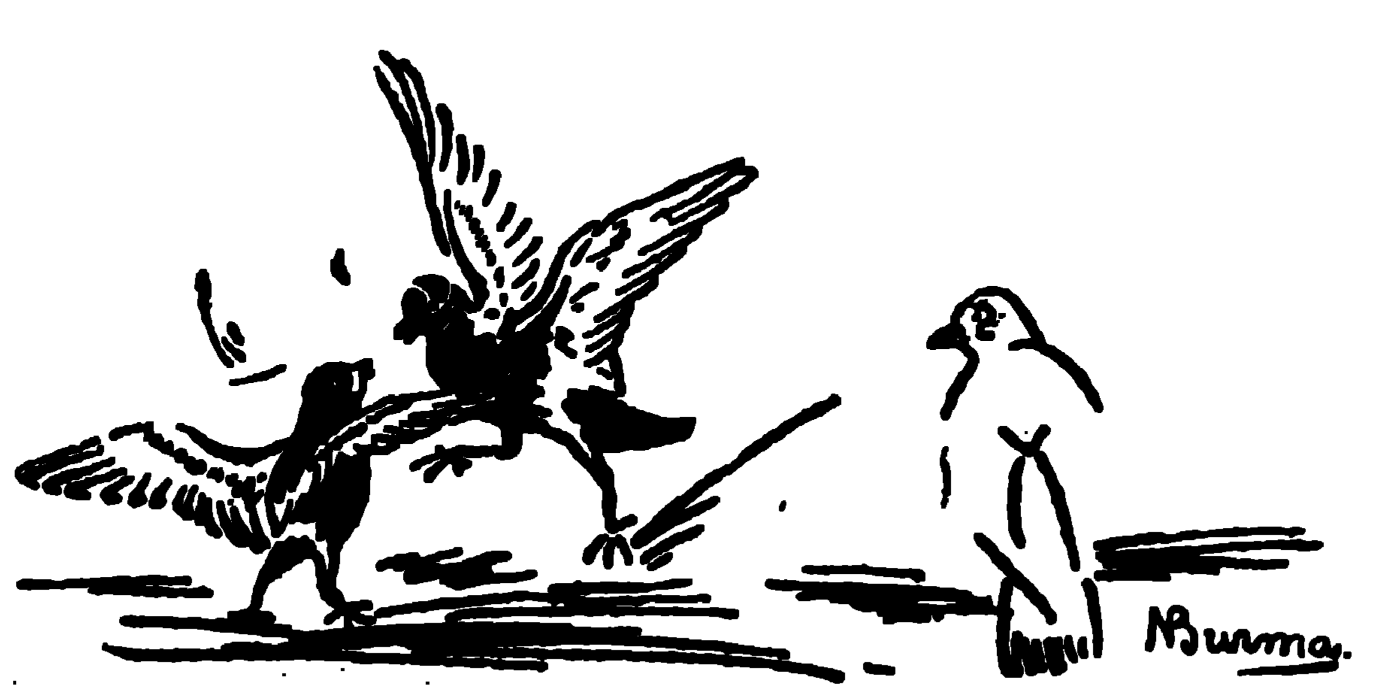

দহন-সাথী

শ্রী যতীন্দ্র সেনগুপ্ত

দূর মরু-পথে যাত্রা করেছি তরু-শ্যামলিমা-হীন,
উষর পথের ধূসর মায়া যে ডাকে মোরে নিশিদিন।
ডাকে মরীচিকা দহন-শিখার হাহাকার-কম্পনে,
ডাকে অসহন রৌদ্র-দহন নীরব নিমন্ত্রণে।
বহ্নি-শয়ন পাতি',—
বেপথুমানা কে বধূ আজি ডাকে হইতে বাসর-সাথী ?
বাসক-সজ্জা রচিয়াছে সে যে জ্বালার মুকুট পরি',
অঙ্গ বেড়িয়া মরু-ঘূর্ণীর দাহ-ভরা উত্তরী।
কণ্ঠে জড়ান চিরপিপাসার মালা-ভারে পড়ে হেলি',—
তনু ঘেরি' দোলে লেলিহ শিখার রূপের রক্ত চেলী।
অন্ধ ব্যোমের কোণে,—
তারি বেদনার বিষনিশ্বাস ঘনায়েছে ক্ষণে ক্ষণে।
কেবা বধূ সেই, চিনিনা ত তারে, নাম নাহি তার জানা,
এই শুধু জানি তারে আঁকড়িতে মন মেলিয়াছে ডানা।
শুধু জানি তার অনল-দহন-ভুজ-ভুজঙ্গ-বাধে
বুকের বেদনা অশ্রু হইয়া গলিবারে শুধু কাঁদে।
তপ্ত বালুকাকণা
চরণে তাহার ধীরে ধীরে আঁকে রক্তিম আলিপনা।
তার চরণের অনল-লাক্ষা বক্ষে লইব আঁকি',—
মোর হৃদয়ের চিতা লবে সে যে বুকের আগুনে ঢাকি'।
বহ্নি-শয়ন পাতি'
মরুদেশে আজ ডাকিতেছে ওই আমার দহন-সাথী।

আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা-সম্মেলনের কথা

শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

এল্‌সিমোর, ডেনমার্ক ;
৮ই আগষ্ট, ১৯২৯

যে বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছি, সেটা বড়লোকের বাড়ী নয়—এমন কি এদের মধ্যবিত্তও বল্‌তে পারা যায় না। পাড়াটাও সহরের অপেক্ষাকৃত গরীবদের ব'লেই মনে হয়। তবুও কোথাও মলিনতা বা অপরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ে না। ইংলণ্ডে এ ধরণের লোকের ভিতর বাসা করা একেবারে অসম্ভব। একটি ঘর পেয়েছি। ঘরের দেয়াল সেকেলে পোষাক ও অনেক ফটো দিয়ে ভরা। গৃহস্বামী বোধ হয় 'মুক্তি-ফৌজের' একজন মুরুব্বি গোছের ছিলেন—তার একটা সার্টিফিকেট খুব যত্ন ক'রে বাঁধান দেখ্‌ছি। ভোর-বেলায় জেগে নানারকম আবোল-তাবোল ভাবনা খেয়ালি চালে মাথায় আনাগোনা করছে। জানালা দিয়ে পূবের আলো ঘরে এসে পড়েছে ; গ্রীষ্মের শেষ যদিও, সূর্য্য খুব ভোরেই ওঠে—অন্ততঃ মানুষ ওঠ্‌বার অনেক আগে। এমন সময় পায়ের কাছের দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ। মুখের উপর ইংরেজি 'Come in'টাই এসে পড়েছিল—তাড়াতাড়ি জার্ম্মান ভাষায় বললুম—'ভিতরে এসো।' বিছানা থেকে আর বের হওয়া হ'ল না, কারণ ড্রেসিং গাউনটা যখন দূরে ঝুলচে—তখন এমন ভাব দেখান যাক যেন তখনই সবে আমার ঘুম ভাঙল। একটি প্রৌঢ়া, একটি 'ট্রে'তে কফি ও সকালবেলার খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। ভাল ক'রে একটু দেখে নিলাম। গৃহস্বামিনী ব'লেই তো মনে হ'ল। কাপড়-চোপড় যদিও তেমন উচুদরের না—

তবুও ভদ্র, একটা শ্রী আছে। একটা পাত্রে খানিকটা গরম জল রেখে—ছোট টেবিলটি আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে, যেমন 'সুপ্রভাত' ব'লে হেসে প্রবেশ করেছিলেন তেমনি বিদায় নিলেন।

ভেবেছিলাম আমার দেরী হ'য়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের জোগাড় ক'রে সহরটা সকাল সকাল দেখ্‌বার মতলব করেছিলাম। প্রথম যাঁর দরজায় করাঘাত করলুম, তিনি দেখি দিব্যি নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছেন, তাঁর পাশেই তাঁর চা চাপা দেওয়া রয়েছে। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সভ্য জগতে এত সকালে ওঠাটা আদব-কায়দা-বিরুদ্ধ। যা'ই হোক্, তাঁকে উঠ্‌তে হ'ল। দ্বিতীয় বাসায় গিয়ে হবে। প্রতি-ঘণ্টায় একটি ফেরি-জাহাজ এপার ওপার করছে। তার মধ্যেই রেলের লাইন পাতা—এই জাহাজেই যাত্রীগাড়ীও মালগাড়ী ও পার করা হয়। দূরের যাত্রী যারা তাদের ওঠা-নামার অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। ভারতবর্ষের রেলে দূরে যাবার একটা সুখ আছে—দেশটি বিরাট হওয়ায় ভিন্নজাতীয় পুলিশের উপদ্রব নেই। ইউরোপে (Continent)—মনে আছে, একবার ট্রেনে একরাত্রির মধ্যে চার বার চার সীমানায় আমায় বিভিন্ন জাতের পুলিশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে মরজি হ'লে তাঁরা বাক্সগুলিও ওলোট-পালট ক'রে দেন। ছোট স্বাধীন রাজ্য পাশাপাশি রয়েছে—পথিকের সবার দাবীই

হেল্‌সিংবার্গ

দেখি, ব্যাপার একই। দল্ জোগাড় করতে অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল। তাই স্থির হ'ল যে 'Lunch' খাবার জন্ম আর ফিরে আসা হবে না। স্নানের পোষাক (Bathing-suti), তোয়ালে, এবং একটা বাক্সে আমাদের সকলের 'Lunch' নিয়ে সমুদ্র-পারের দিকে চল্লাম।

এল্‌সিনোর বন্দরটি বেশ ছোটখাট—খুব বড় জাহাজের প্রবেশের পথ নাই। বন্দরের ভিতর বোধ হয় পাঁচ ছয়-খানার বেশী জাহাজ ধরে না। একটি নরওয়ের, একটি ওলন্দাজ ও একটি রুচ্ জাহাজ বন্দরে মাল বোঝাই করছে। ওপারে সুয়েডেনের তীর। সমুদ্রের ব্যবধান মাইল চারেক মিটিয়ে চল্‌তে হয়।

সমুদ্রের পার দিয়ে চলেছি। শান্ত সমুদ্র—ঢেউয়ের বালাই নেই। পুরীর ও সিংহলের সমুদ্রের কথা মনে হ'চ্চে;—তার তুলনায় একে নদী ব'লে মনে হয়। ডাইনে 'ক্রোনবার্গ' দুর্গ। এর সঙ্গে হ্যামলেট ও ওফিলিয়ার স্মৃতি জড়ান রয়েছে। দুর্গের বাইরে ওফিলিয়ার সমাধি ও ওফিলিয়া-বিতান। এই দুর্গের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কন্‌ফারেন্স বস্‌বে। সেখানে তো অনেকবারই যাতায়াত করতে হবে, তাই এখন যাবার প্রবৃত্তি হ'ল না। সমুদ্রের 'পরে বড় বড় প্রাসাদের মত বাড়ী। দেয়াল তুলে' খণ্ড খণ্ড ক'রে সমুদ্রটাকেও এরা

অধিকার করেছে। এইসব সীমানায় বাইরের লোকের স্নানের অধিকার নেই। কিছু দূরেই এখানকার সব চেয়ে বড় হোটেল 'ম্যাবিয়েনলিষ্ট'! দলের একটি ফরাসী তরুণী বল্লেন—"এটাই এখানকার সব চেয়ে fashionable জায়গা।" হোটেলের পিছনে সমুদ্র—সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান। উদ্যানের প্রবেশ-দ্বারে দুজন প্রহরী পাহারায় রয়েছে। তারা জানাল যে আমাদের ভিতর দিয়ে যেতে কোন বাধা নাই। নিরিবিলি দেখে জলের কিনারায় দুপুর বেলাটা কাটাবার মত জায়গা বেছে নেওয়া গেল।

বিকেল বেলা। অল্প পরেই ক্রোনবার্গ দুর্গে শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হবে। কন্‌ফারেন্সের পুরো নামটা—The International Conference on New Education. ইউরোপে আজকাল আন্দোলনের (Movement) অভাব নেই। এক লণ্ডন সহরেই যে কত বিভিন্ন সভাসমিতি আছে তার সংখ্যা নেই। এদেশে Leisured classএ যে লোকের অভাব নেই এটা তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষার ধারাকে নতুন পথে নেবার জন্য যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেটা কেবলমাত্র ধনীর নিষ্কর্ম্ম মস্তিষ্কের অবসরযাপনের খেয়াল নয়। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তার আগুনে পুড়িয়ে ইউরোপের জন-সাধারণকে দু-একটি সত্যের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। যারা দূরে ছিল, যারা এই বিপ্লব পিছন থেকে ঘটিয়েছিল কিন্তু তার তীব্রদহনে দগ্ধ হয় নি, তারা কিন্তু আজও সেই পুরাতন আত্মপ্রসাদে মগ্ন হ'য়ে আছে। মহাসমরের কোলাহল যখন থেমে গেল, তখন যুদ্ধরত দেশমাত্রেই অনেকে এই প্রশ্ন করলেন—"এই মহাদুর্গতি সভ্যসমাজে কি ক'রে সম্ভব হ'ল ?" যাঁরা যুদ্ধ করেননি, কিন্তু করিয়েছেন; যুদ্ধটা যাঁদের জন্য খুবই একটা লাভজনক ব্যবসায়, তাঁরা বল্লেন—"এ মানুষের ধর্ম্ম, মানুষ বাঁচতে হ'লে যুদ্ধ করবেই, নইলে যে মানুষ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হবে।" দুঃখ যারা পেয়েছে তারা কিন্তু এই অকল্যাণকে এত সহজে স্বীকার ক'রে নিল না। তারা বল্ল, এই যদি পরিণত মানুষের ধর্ম্ম হয়—তবে যাতে এই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় তার আয়োজন করা প্রয়োজন। যে শিক্ষা-পদ্ধতি মানুষকে এমন ক'রে গড়েছে—যে, তার সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা তাকে অমানুষ ক'রে তুলেছে, সে শিক্ষা পদ্ধতির যতই বাইরের আড়ম্বর থাকুক না কেন, মানবসমাজের তাহা মহতী বিনষ্টি। শিক্ষা শুধু জ্ঞানের জন্য নয়; তাহা মানুষের বাচ্চাকে মানুষ করবার জন্য। যুদ্ধের সময় কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে যে বীভৎস পঙ্কে মানুষ নেমেছিল, পশুরাও তার অনেক উপরে। পাশবিক বললে পশুদের উপর মিথ্যা-কলঙ্ক আরোপ করা হয়, কেন না তা একান্ত মানুষিক, মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব—দেখা গিয়েছে। দেশ-হিতৈষিতার মুখোস প'রে মানুষ যদি এত কদর্য্য ও এত নির্লজ্জ হ'তে পারে, তবে যে সকল শিক্ষানিকেতনে এই মানবসমাজের চরিত্রগঠন হয়েছে, তার কি আমূল সংস্কার আবশ্যক নয় ?

মহাসমরের পূর্ব্বেই শিক্ষানিকেতনগুলিকে নতুন আদর্শে গড়বার একটা চেষ্টা চলছিল, কিন্তু মহাসমরের শেষে এই আন্দোলন পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। দুটো কারণ এর নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, আগেই বলা হয়েছে পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি যে মানবসমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় নি তার প্রমাণ এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। কার্য্যের পরিচয় তার ফলে—তাই ভুক্তভোগীরা নতুন ক'রে শিক্ষার কথা ভাবছিলেন। তখনও শিশু যারা তারা যেন এ ভুল না করে এমন শিক্ষা তাদের দিতে হবে যে স্বার্থান্বেষী বণিক্-সম্প্রদায় জনসাধারণকে মুগ্ধ করতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই সময় Psychologyর (মনোবিজ্ঞানের) অতি দ্রুত পরিণতি হচ্ছিল। মানুষের মন সম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য তখন আবিষ্কৃত হ'ল। যে Psychology পূর্ব্বতন শিক্ষাপ্রথার ভিত্তি ছিল, তার বহু পরিবর্ত্তন হ'ল। তরুণ মনোবিজ্ঞানের (The New Psychology) নতুন আলোতে পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক গলদ ধরা পড়ল। যদিও শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারের চেষ্টা অনেকদিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, উপরি-উক্ত কারণে মহাসমরের পর একদল লোক সমবেত চেষ্টা করতে লাগলেন কি ক'রে এই পথে কাজ আরও দ্রুত অগ্রসর হয়। ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল; নবীন শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষার জন্য। এঁরা স্থির করলেন শিশুদের সহজ ও

স্বাধীন ভাবে বাড়তে দেবেন—কোন রকম সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাস ও স্বদেশপ্রীতি এ-সকল তরুণ মনকে যেন বিকৃত না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হ'ল। মানুষ নিজেকে যেন বড় ক'রে দেখতে পায়-এমন শিক্ষা এঁদের আদর্শ। নতুন প্রণালীতে শিক্ষাব্রতী যারা তারা যখন পূর্ণবয়স্ক হবে, তারা যেন যে-কোন দেশের যে-কোন জাতির লোককে মানুষ বোধে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করতে পারে। পূর্ব্বে এটা ধ'রেই নেওয়া হ'ত, অন্যদেশের লোকেরা যেহেতু ভিন্ন, সেকারণে অদ্ভুত ও অসভ্য। শৈশবেই নানাপ্রকার বিকৃত বিবরণ শুনে বিদেশীদের প্রতি তরুণ-মনগুলি বিরূপ হ'য়ে উঠত। বলা বাহুল্য মিশনারীদের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে—অর্থাৎ বিকৃত অথচ মুখ-রোচক ক'রে অন্যদেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অপবাদ রটনা ক'রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে—বড় কম নয়। এই যে নবীন উদ্যম এ যাতে ব্যর্থ না হয় এবং সফল ও সার্থক হয়, এ উদ্দেশ্যে সমস্ত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে যাঁরা এই শিক্ষার আদর্শকে স্বীকার করেছেন, তাঁদের প্রতিনিধিদের একত্র সমবেত হবার জন্য দ্বৈবার্ষিক একটি কনফারেন্স আহূত হয়। সমস্ত ইউরোপে যখন গ্রীষ্মাবকাশ হয়, তখন কোন একটি মনোরম জায়গায় এর অধিবেশন হয়। সমবেত প্রতিনিধিদের একই সঙ্গে ছুটি ও কনফারেন্সের কাজ হয়।

বেলা প্রায় সাড়ে চারটা। ক্রোনবার্গ দুর্গের পরিখার সেতু পার হ'য়ে দুর্গের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে দেখি প্রায় পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়েছে। নানা বয়সের লোক—যদিও সবই ইউরোপীয় পোষাক তবুও ওরই মধ্যে পার্থক্য অনেক। দেখেই মনে হয় বহু দেশের সংমিশ্রণ হয়েছে। দু'তিনটি ভারতীয়ের রঙীন পাগড়ী অনেকের কৌতূহল আকর্ষণ করছে। পুরুষদের পোষাকে রংয়ের যে অভাব নারীর বেশে তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে। পাশ্চাত্য মহিলা-দের পায়ের পাতা থেকে আরম্ভ ক'রে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত নানা দৈর্ঘ্যের বেশবিন্যাস দেখছি। জনকতক ভারতীয়া তাঁদের বিচিত্র রঙীন শাড়ী দিয়ে সভায় যেন পূবের রং বুলিয়ে দিয়েছেন। ক্যামেরা হাতে যাঁরা তাঁদের দৃষ্টি শাড়ীতে ও পাগড়ীতেই আবদ্ধ। সভা যখন ভাঙবে তখন ক্যামেরার হাত থেকে ভারতাগতদের নিষ্কৃতি নেই। বসবার জায়গা নেই—যা আয়োজন করা হয়েছিল সব আসনই দখল হ'য়ে গেছে। মঞ্চের উপর আসীন রয়েছেন, সভানেত্রী শ্রীমতী এন্‌সোর। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছেন এল্‌সিনোরের মেয়র, হেলসিংবোর্গের শিক্ষামন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী ইত্যাদি।

এইবার রীতিমত "অফিসিয়াল" অভ্যর্থনা সুরু হ'ল। যে যাঁর ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন আর ফরাসী, জার্ম্মান ও ইংরাজিতে তার মর্ম্ম বুঝিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। অনুবাদ করবার ভার যোগ্য হস্তেই অর্পণ করা হয়েছে। অভ্যর্থনা-শেষে অভ্যাগত যাঁরা তাঁদের মুখপাত্রেরা উঠলেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্য। শ্রীমতী এন্‌সোর ডেনমার্কের জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে কনফারেন্সের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আদর্শ বিবৃত করলেন। নানা দেশের মনীষীগণ যে সমবেত হয়েছেন, তাঁরা শিক্ষার মধ্য দিয়ে কেবল মাত্র নিজের দেশের নয় সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণসাধন করবেন। তিনি খুবই আশা করেছিলেন যে কবি রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হ'তে পারবেন। তাঁর অনুপস্থিতির জন্য কনফারেন্স হয়ত খুবই বঞ্চিত হ'ল। স্কটল্যাণ্ডের ডাঃ বয়েড্, জার্ম্মানির ডাঃ ডাইটারসের পর উঠলেন একজন আমেরিকান। হাতে তাঁর গুটান রয়েছে দুটি নিশান। সাধারণতঃ বক্তৃতামাত্রেরই একটু ঘুমপাড়ানি শক্তি আছে তা অনেকেই হয়ত মেনে নিতে রাজি হবেন। মনটায় যেন একটু ঝিম্ ধরেছিল,—এই অভিনবের অভিঘাতে মনটা আবার উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন যে তিনি আটলাণ্টিকের ওপার থেকে মার্কিন জাতির অভিনন্দন বহন ক'রে এনেছেন। লোকটি কে, পরিচয় পাবার জন্য ইচ্ছা হ'ল। আমার আশেপাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের অনেকেই চোখ দিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে এ?" তিনি প্রতিপন্ন করলেন যে এই শুভ অনুষ্ঠানে ডেনমার্ক ও আমেরিকার শুভমিলন হয়েছে—সেটাই তিনি প্রমাণ করলেন দুটো নিশান দু-হাতে নিয়ে এবং অবশেষে দুটো হাতকে মাথার উপর একত্র ক'রে। দুটো জাতকে এত সহজে এমন সুন্দর ভাবে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য মনে মনে নই মার্কিনের আগন্তুককে তারিফ না ক'রে

থাকতে পারলাম না। বলা বাহুল্য শ্রোতাদের অনেকেই এই আন্তর্জাতিক মিলনোপযোগী গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পারেন নি।

তারপর যিনি উঠলেন তিনি আমাদের স্বদেশী—প্রফেসর —,"ভারতীয় প্রফেসর"—ইউরোপীয় সংজ্ঞায় নয়। পরনে ধুতি, গায়ে কাল কোট, মাথায় উজ্জ্বল লাল রংএর শিরস্ত্রাণ, পায় 'সু' পরা, ধুতির পিছনে মোজাসংযুক্ত সাস্‌পেণ্ডার ছুটো দেখা যাচ্ছে। ভারতের অনেক প্রদেশ ঘুরেছি, ইনি যে ঠিক কোন্ প্রদেশের সেটা মালুম হ'ল না। ইনি মঞ্চে দাঁড়িয়েই অনুদাত্ত-উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী সভাস্থ সব লোককে শুনিয়ে দিলেন। এতক্ষণ ধ'রে যে সব বক্তৃতা হয়েছে তিনি সবগুলিকে একনিমেষে ম্লান ক'রে দিলেন। ভাবের এমন আবেগ, চিন্তার এমন উচ্ছৃঙ্খলতা, গলার এমন খেলা, এবং বক্তৃতার এমন অবান্তরতা কেউ দেখাতে পারেন নি। অবান্তর ভাবোচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতা আমাদের কি একটা রোগের মত দাঁড়িয়ে গেছে? একাধিক বার এ-রকম শুনেছি। হয়ত সভায় যে বিষয় আলোচ্য তার সঙ্গে ভারত-সমস্যার সম্পর্কের লেশমাত্র নেই, তবুও সুবিধে পেলেই একজন ভারতীয় বক্তা উঠে ভারতের অতীত গুণকীর্ত্তন ক'রে দিয়ে, আমাদের বর্ত্তমানের একান্ত দৈন্য ও অসীম লজ্জা সভামধ্যে প্রচার ক'রে কি এক নিগূঢ় আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন সে একমাত্র তিনিই বল্‌তে পারেন। ইউরোপ-প্রবাসের সময় এ দুর্ভোগ অনেক ভুগেছি। এবার ভারতের মুখ্য মুখপাত্র আসন গ্রহণ করলে যে বাঁচা যায়! এ শ্রেণীর বক্তারা সাধারণতঃ শারীরিক ক্লান্তি না হ'লে থামেন না।

কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনার অধিবেশন সাঙ্গ হ'ল।*

(ক্রমশঃ)

সেদিনো ত

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

সেদিনো ত এইমত শরতের প্রসন্ন প্রভাত
আলোর অলোক হাস্যে জানায় স্বাগত,
শেফালি সুরভি বায়ু,—অশ্রুঝরা রাত
যেন এ জীবন হ'তে চির অপগত।
মধ্যাহ্নের স্বর্ণরশ্মি, প্রভাতের প্রবোধিত আশা
মনে হ'ল গোধূলিতে আনিয়ে মিলায়ে
মুখরিবে মৌনতার নবতর ভাষা,
চন্দ্রের অতন্দ্র হাসি চলিবে বিলায়ে।
অস্ত গেল সন্ধ্যা-সূর্য্য, নিবে গেল ঘরের প্রদীপ,
ঘিরে এল অন্তহীন অন্তিম-আঁধার;
আকাশে কোথাও নাই নক্ষত্রের দীপ,
কেমনে চলিবে পান্থ,—ধ্রুব গেল তার!

---

* ইহা একটি প্রবন্ধের পূর্ব্বানুবৃত্তি। ইহার অপর দুই অংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে—১৩৩৬-এর পৌষের (১১৭ পৃঃ) এবং ১৩৩৭-এর আষাঢ়ের (৫৯৫ পৃঃ) 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে। নানা কারণে প্রবন্ধকার একসঙ্গে সমগ্র প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিয়া আমাদিগকে না দিতে পারাতেই এরূপ প্রকাশ-বিপর্য্যয় ঘটিতেছে।—বঃ সঃ

শিশু-খাদ্য

কবিরাজ শ্রী ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল্‌-এ-এম্‌-এস্‌

শিশু-খাদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই দুগ্ধের কথা বলা আবশ্যক। মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে, দুগ্ধই শিশুর জীবনধারণের প্রধান সম্বল। আয়ুর্ব্বেদ এই জন্য ইহার একটি নাম দিয়াছেন—"বালজীবন"। দুগ্ধকে আয়ুর্ব্বেদে অমৃত বা পয়ঃ বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই ইহা অমৃতস্বরূপ। দুগ্ধে প্রায় সকল জাতীয় খাদ্যই বিদ্যমান থাকে। এই জন্য শরীর-পুষ্টির পক্ষে ইহা যে বিশেষ সহায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক মত

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, শিশু ব্যতিরেকে, বয়স্কদিগের পক্ষে কেবলমাত্র দুগ্ধদ্বারা শরীরের পোষণকার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না, কারণ প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে শরীরধারণের জন্য খাদ্যসমূহে যে যে উপাদান যে যে পরিমাণে থাকা প্রয়োজন, দুগ্ধে তাহার সমস্ত নাই। শিশুদিগের পক্ষেই কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধন ও পোষণকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

দুগ্ধের নানাপ্রকার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গব্য দুগ্ধ, ছাগী-দুগ্ধ, মেষী-দুগ্ধ, মহিষী-দুগ্ধ ও গর্দ্দভীর দুগ্ধের প্রচলনই বেশী। স্তন-দুগ্ধই শিশুদিগের পক্ষে অমৃততুল্য। শিশুদিগের পক্ষে স্তন-দুগ্ধের অভাব হইলে অন্য দুগ্ধ হিতকর।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একশত ভাগ স্তন-দুগ্ধে জল ৮৯ ভাগ, নাইট্রোজেন-ঘটিত উপাদান ৪ ভাগ, স্নেহ-জাতীয় উপাদান ৩ ভাগ, শর্করা জাতীয় উপাদান ৩ ভাগ ও ধাতব উপাদান একভাগের ½ অংশ বিদ্যমান থাকে। সমস্ত প্রাণী-দুগ্ধেই শিশুর শরীররক্ষার আবশ্যকীয় উপাদান বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ঐসকল উপাদানের তারতম্য থাকে। গব্য দুগ্ধের সহিত স্তনদুগ্ধের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্তন দুগ্ধ অপেক্ষা গব্য দুগ্ধে জল কম কিন্তু কঠিন বস্তু (solids) অত্যধিক মাত্রায় আছে, আবার স্নেহ, লবণ-পদার্থ ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ গব্য দুগ্ধে অধিক কিন্তু শর্করা অল্প।

দুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে একদিকে খাঁটি দুগ্ধ যেমন দুর্ল্লভ হইয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে দুগ্ধের দামও নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে। দুগ্ধের চাহিদা যতটা বাড়িয়া গিয়াছে ততটা খাঁটি দুগ্ধ যোগান দেওয়া বর্ত্তমানে সম্ভব হইতেছে না। ইহার কারণ আমাদের মনে হয় যতদিন না সমর্থ গৃহস্থ আবার গোপালনে মনোযোগী হইতেছেন ততদিন এ সমস্যার সমাধান হইবে না। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বলিতে হয় যে, যেখানে শিশু ও রোগী এবং সন্তানসম্ভবা নারী ও শিশুর জননী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ পায় না, সেখানে কোন বয়স্ক ব্যক্তির দুগ্ধপানের অধিকার নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কোন প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, লণ্ডনে ও প্যারিসে কলিকাতার চেয়ে দুগ্ধ দামে সস্তা অথচ একেবারে নির্জ্জলা। মনে রাখিতে হইবে যে, ও দেশে দুগ্ধ প্রধানতঃ শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সেখানে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অস্বাভাবিক বৈষম্য নাই। আর তা ছাড়া ঐ সকল জাতি গো-পূজক হিন্দুর চেয়েও অধিক পরিমাণে গো-পালনে ও গো-সেবায় তৎপর।

সে যাহা হউক, দ্বাদশ মাসের পর শিশুকে স্তন্য ত্যাগ করাইয়া অন্য আহার্য্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। একদিনেই স্তন্য ত্যাগ করান সম্ভব নহে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্তন্য ত্যাগ করাইতে হইবে। কিন্তু এই সময় যদি শিশুর দাঁত উঠিবার জন্য পেটের পীড়া হয় তাহা হইলে স্তন্য ত্যাগ করাইতে নাই। পরে শিশু সুস্থ হইলে শিশুকে একটু একটু করিয়া অন্য খাদ্য খাওয়াইতে অভ্যাস করাইতে হইবে।

এক হইতে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক শিশুর প্রত্যহ অন্ততঃ একসের খাঁটি গব্য দুগ্ধ বা ছাগ-দুগ্ধ পান করা দরকার। আজকাল গব্য দুগ্ধ যেরূপ মহার্ঘ হইতেছে তাহাতে ছাগপালন করা প্রতি সংসারে বিশেষ আবশ্যক। ছাগপালনের ব্যয় অতি অল্প, পল্লীগ্রামে কোন খরচ নাই বলিলেই চলে। অথচ সহরে ছাগদুগ্ধের দর অত্যন্ত বেশী এবং উহার ব্যবসায়টা পশ্চিমাদের একচেটিয়া। অনেক বাঙ্গালী ছাগপালনে সক্ষম। ছাগদুগ্ধ মুখঢাকা পাত্রে রাখিয়া জলপূর্ণ কড়ায় বসাইয়া জ্বাল দিলে সমধিক গুণশালী হয় এবং ছাগদুগ্ধ জ্বাল দিবার রীতিই এই।

পেটেণ্ট ফুড

আজকাল বাজারে বিদেশ হইতে আমদানী বহু পেটেণ্ট খাদ্য বা ফুড আনীত হইয়া শিশুর খাদ্য বলিয়া বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু উহার কোনটাই দুগ্ধও নহে—রুটি, বিস্কুট, এরোরুটও নহে। ঐ সকল "বিদেশী ফুড" কোনক্রমেই শিশুকে খাওয়ান উচিত নহে। বহু খ্যাতনামা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিকিৎসক ঐ সকল খাদ্য দ্বারা শিশুর যে ভীষণ অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ-সকল বিদেশী খাদ্য খাওয়াইতে নিষেধ করিয়াছেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়

শিশুখাদ্য সম্বন্ধে অন্য কিছু আলোচনা করিতে গেলে তিনটি বিষয় নজরে পড়ে—

(১) ধনী ও মধ্যবিত্তের সংসারে অতিভোজন (over feeding)

(২) অহিতভোজন (wrong feeding)

(৩) অভাবের সংসারে খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য (under feeding)

এখন এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। স্বচ্ছল সংসারে শিশুকে অধিক দিন পর্য্যন্ত শুধু দুধ খাওয়াইয়া রাখা হয়। অনেক জননী মনে করেন, শিশুকে অল্প বয়স হইতে ভাত খাইতে অভ্যস্ত করিলে উহাদের 'ভেতো' চেহারা হয়, পেট মোটা হয় ইত্যাদি। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অধিক পরিমাণে না খাইলে কিছুতেই পেট মোটা হয় না। দরিদ্রের শিশু অল্প বয়স হইতে ফেন ভাত খাইয়া যথেষ্ট বল সঞ্চয় করে, আর এই সব ভদ্রসম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যেই যকৃতের পীড়া বেশী দেখা যায়। এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুকে আস্তে আস্তে অল্প পরিমাণে ভাত খাওয়ান অভ্যাস করান উচিত। প্রথম হইতেই পুরাতন আতপ চাউলের ভাত অভ্যাস করাইলে উপকার আছে, অথচ অজীর্ণের আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যহ কিছু কিছু শাকসব্জী শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত। শিশু সহজে তরকারী খাইতে চাহে না, তরকারীর মধ্যে আলুটাই স্বেচ্ছায় খাইয়া থাকে। বেশী আলু খাওয়ার দরুণ অনেক শিশুর মেদবৃদ্ধি হয়; যতদিন না ভাল করিয়া চিবাইতে শেখে, ততদিন পর্য্যন্ত শাকসব্জীর সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উচিত। মাংসের যে ভাবে সুপ বা সুরুয়া প্রস্তুত হয় সেই ভাবে আস্ত শাকসব্জীকে ছোট ছোট খণ্ড করিয়া অত্যল্প মশলা সংযোগে সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধ সব্জী-গুলিকে চটকাইয়া কাথটুকু ছাঁকিয়া লইতে হইবে। শিশু চিবাইয়া খাইতে শিখিলে, ছাঁকিবার প্রয়োজন নাই। তবে শিশু যাহাতে সব্জীগুলি ভাল করিয়া চিবাইয়া ছিবড়াগুলি ফেলিয়া দেয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় বলেন, ফেনের সহিত উক্ত প্রকারের সব্জী সংযোগ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করিয়া দিলে বেশ পুষ্টিকর শিশুখাদ্য প্রস্তুত হয়, অথবা ফেনের সহিত লবণ, লেবুর রস এবং অল্প গুড় সংযোগ করিয়া শিশু-দিগকে খাইতে দেওয়া উচিত।

ছোট ছোট মাছ বা মাছের ঝোল দেওয়া চলিতে পারে; এ বয়সে মাংস না দেওয়াই ভাল। কাঁচা ডিমের কুসুমটুকু মধ্যে মধ্যে দিলে উপকার আছে।

প্রত্যহ কিছু কিছু 'সাময়িক' টাটকা ফল বা ফলের রস অভাবে কাগজি বা পাতিলেবুর রস গুড় সহযোগে দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা চিবাইয়া খাইতে শিখিয়াছে, তাহাদিগকে ইক্ষু প্রভৃতি দাঁতে ছাড়াইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। জানিয়া রাখা ভাল যে, প্রত্যহ কিছু কিছু শক্ত জিনিস দাঁতে চিবাইয়া খাইলে দাঁত শক্ত হয় এবং চিরকাল ভাল থাকে। শিশুরা বাদাম, চীনাবাদাম, ছোলা, মটর প্রভৃতি জিনিষ প্রাকৃতিক প্রেরণাতেই ভালবাসে।

শিশুর ভালবাসার হিসাবে অনেক পুষ্টিকর সাধারণ

জিনিষ সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা সেগুলিকে হয় অবহেলা করি, নয় স্বাস্থ্যনাশের ভয়ে দিই না। এই ভয় অমূলক, মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিলে ভয়ের কোনই কারণ নাই। আঙ্গুর, আপেল, ন্যাসপাতি, বেদানা, কিস্‌মিস্‌, মনাক্কা, আখরোট, খোবানি, খেজুর প্রভৃতি মহার্ঘ ফল নাই জুটুক, শশা, কলা, বিলাতী বেগুন, কাঁচা পেঁয়াজ, জাম, জামরুল, মিষ্ট কুল, পেয়ারা, ফুটী, তরমুজ, আনারস, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, আক, যখন যাহা জুটিবে তাহাই নির্ভয়ে শিশুদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। বাজারের খাবার বিষবৎ পরিত্যাজ্য; তৎপরিবর্ত্তে মুড়ি, মুড়কি, চিড়া, খই, ছোলা-সিদ্ধ, কলাই শুঁটী (কাঁচা বা সিদ্ধ), ছোলার চাক, মুড়ির

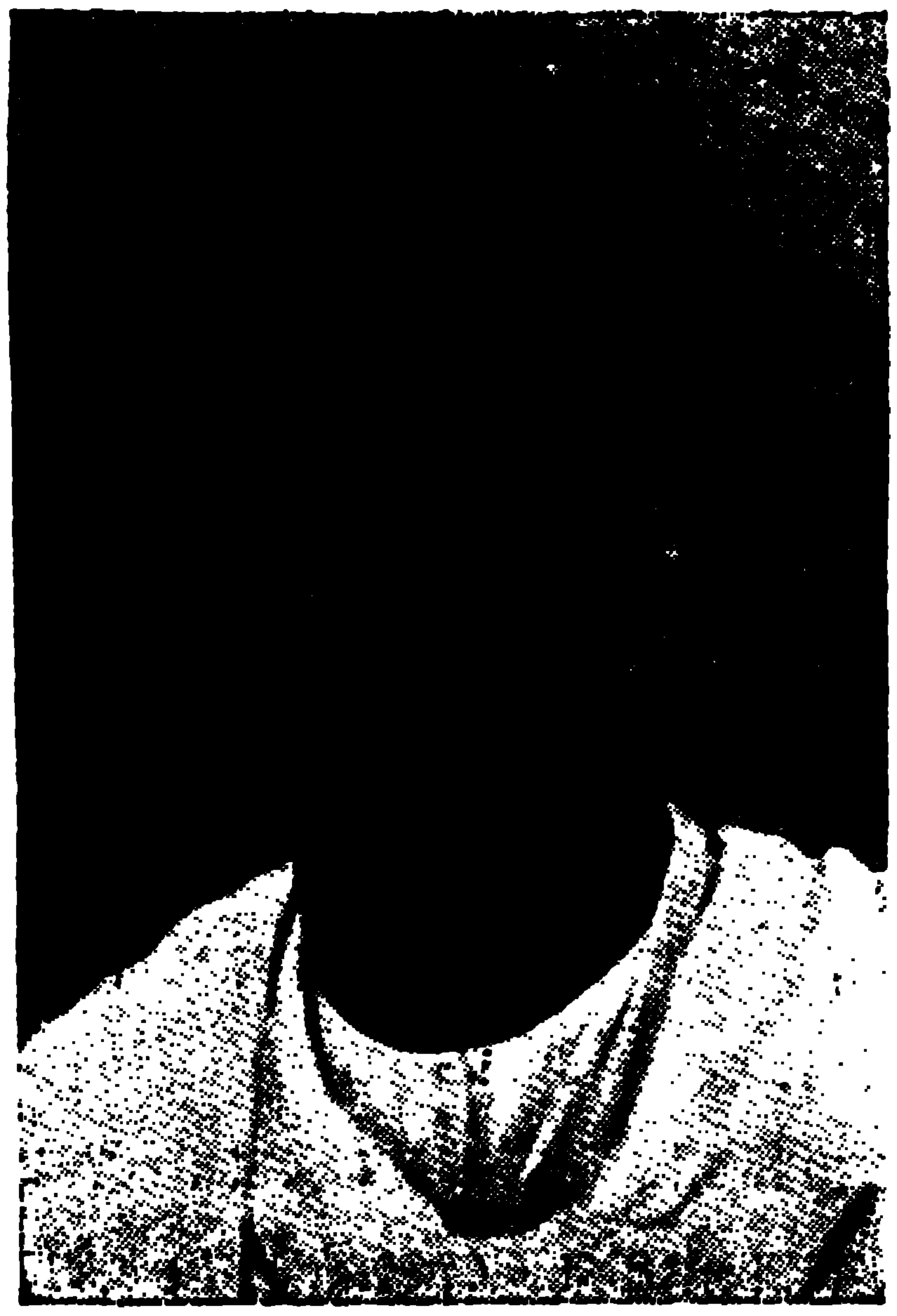

কবিরাজ শ্রী ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

চাক, চিড়ের চাক, মোহনভোগ ইত্যাদি। চিনি শিশুদের উপযোগী নয়। চিনি সেবনে উহাদের অনিষ্ট হয়, চিনির পরিবর্ত্তে গুড় দেওয়া উচিত।

মাতার অজ্ঞতা

শিশুদের খাদ্যের মাত্রা সম্বন্ধে আমাদের পুরমহিলারা যথেষ্ট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যে সকল শিশুর কথা ফুটে নাই, তাহাদের কথা ধরা যাক। শিশু ক্ষুধা পাইলে কাঁদে সত্য, কিন্তু জঠরজ্বালা ব্যতিরেকে অন্য কারণেও যে শিশু কাঁদিতে পারে সে কথা জননীরা প্রায় ভুলিয়া যান। শিশু কাঁদিলেই তাহার মুখে স্তনদান করা হয়। এ বিষয়ে দিদিমা, পিসীমা, ঠাকুরমারাই বেশী অপরাধী। হয়তো সে সময়ে বাস্তবিকই শিশুর ক্ষুধা পায় নাই, পূর্ব্বভুক্ত দুধ জীর্ণ না হওয়াতে তাহার পেট কামড়াইতেছে। কাজেই সেক্ষেত্রে স্তন্য অমৃতের কাজ না করিয়া গরলের কাজ করে। শিশু ঠিক ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে কি তাহার পেট কামড়াইতেছে বা কান কট্‌কট্‌ করিতেছে সেটুকু বুঝিয়া তাহাকে আহার দেওয়া উচিত। নচেৎ, অজীর্ণ, উদরাময়, দুধ-তোলা প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা। ছোট ছোট শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া খাওয়ান কোন ক্রমেই উচিত নহে।

শিশুখাদ্যের তালিকা

আমরা মোটামুটি শিশুখাদ্যের একটি তালিকা প্রদান করিলাম। এই তালিকা মত শিশুকে খাওয়াইলে শিশুর কোন অপকার হইবে না, বরং শিশু সবল হইবে ও সুস্থ থাকিবে।

বয়স	দুধ	জল	পরিমাণ	সময়ের ব্যবধান
১ সপ্তাহ	১ ভাগ	২ ভাগ	½ ছটাক	৩—৪ ঘণ্টা
১ মাস	২ ভাগ	৩ ভাগ	১ ছটাক	৪ ঘণ্টা
৩ মাস	১ ভাগ	১ ভাগ	½ পোয়া	৪ ঘণ্টা
৬ মাস	৩ ভাগ	১ ভাগ	১ পোয়া	৪ ঘণ্টা

তিন হইতে পাঁচ বৎসরের ছেলের উপযুক্ত মোট দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ:—চাউল ½ ছটাক, দাল ½ ছটাক, আলু ১ ছটাক। অন্যান্য তরকারী ১ ছটাক। দুধ ৩ পোয়া। কাঁচা ডিম ১টা। গুড় ½ ছটাক। চিড়া বা মুড়ি ½ ছটাক। যে কোন ফল উপযুক্ত পরিমাণে।

ছয় বৎসরের ছেলের উপযুক্ত মোট দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ:—চাউল ১ ছটাক। দাল ½ ছটাক। মাছ বা মাংস ১ ছটাক বা ডিম ১টা। ঘৃত ½ ছটাক। আলু ১½ ছটাক। অন্য তরকারী ১½ ছটাক। আটা ১ ছটাক। গুড় ½ ছটাক। চিড়া বা মুড়ি ½ ছটাক। যে কোন ফল উপযুক্ত পরিমাণে।

পালনীয়

শিশুর দাঁত যাহাতে পরিষ্কার থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। শক্ত জিনিষ না খাইলে দাঁত বা মাড়ী শক্ত হয় না এ কথা মনে রাখা আবশ্যক।

প্রত্যেকবার খাইবার পূর্ব্বে শিশু যাহাতে মুখ ও হাত ধুইতে শেখে, সেটা অভ্যাস করান উচিত।

নিজেরা খাইতে ব'সলেই, শিশুর মুখে যখন তখন কিছু খাদ্যাংশ তুলিয়া দেওয়া উচিত নয়। স্নেহের নামে, অজ্ঞাতসারে তাহাদের ক্ষুদ্র পাকস্থলীর উপর অত্যাচার করা হয়। সূতিকাঘর হইতেই শিশু যাহাতে রাত্রি দশটার পর কিছু না খায়, সে অভ্যাস করান উচিত। আমরা দেখিয়াছি, সূতিকাগারে যদি প্রথম হইতেই রাত্রি দশটার পর শিশুকে স্তন্যদান না করা যায়, তাহা হইলে প্রথম দুই এক দিন শিশু কাঁদে বটে, কিন্তু তৎপরেই তাহার অভ্যাস হইয়া যায় এবং অকাতরে নিদ্রা যায়। ইহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু শিশুর পক্ষেও মঙ্গলজনক, জননীর পক্ষেও আরামদায়ক।

শিশুর আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত।

প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর বয়স্ক শিশু যাহাতে মলত্যাগের চেষ্টা করে সে অভ্যাস করান উচিত। প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে রৌদ্রসেবন শিশুদেহের পক্ষে আহারের মত প্রয়োজনীয় ও বলপ্রদ। তবে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। গ্রীষ্মের রৌদ্র বায়ুবর্দ্ধক ও শরতের রৌদ্র পিত্তকর। তবে, উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ সকল সময়েই হিতকর, কিন্তু অত সকালে শিশুর দেহে উপযুক্ত আচ্ছাদন থাকা দরকার।

চেনা-অচেনা

শ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ছেলেট এসে সুধালো, "তাকে কোথায় পাবো?"

বুড়ো হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে সামনের পথটা—তাল গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে, মরা নদীর বাঁকে বাঁকে যে পথটি গিয়ে মিশেছে দূরের ঐ নীল বনের অন্ধকারে।

ছেলে বেরোল সেই পথ ধ'রে তার অচেনা অথচ খুব জানা কোন মানুষকে খুঁজতে।

২

মেয়েটি তার বুড়ী দিদিমাকে সুধালো, "সে কোন্ পথে আসবে?"

দিদিমা তাকে দেখিয়ে দিলে সমুখের পথটা—শাল বনের আলো-ছায়ে, ভাঙা শিব মন্দিরের গায়ে গায়ে যে পথটি এসে শেষ হোয়েছে শান-বাঁধানো শ্যাওলাধরা ঘাটের কিনারায়।

মেয়েটি জলের বুকে কল্‌সী ভাসিয়ে ব'সে থাকে তারই পথ চেয়ে যাকে সে কখনও দেখেনি অথচ যে তার খুবই আপন।

ঘরে বাইরে

পত্রিকা-সম্পাদিকা

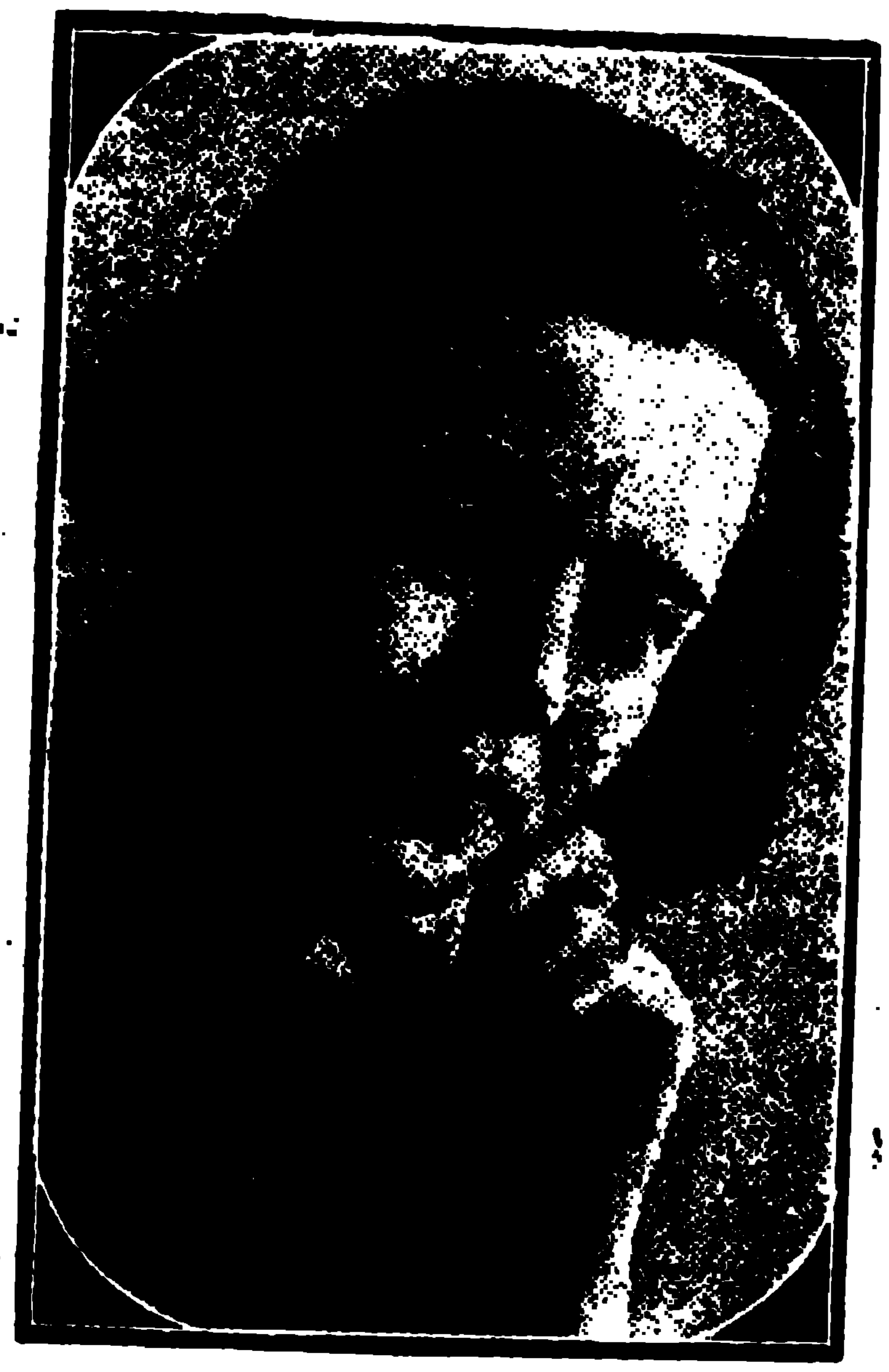

শ্রীমত সেজা নেবারাবুল

মিশ.রর (Egypt) একমাত্র কিন্তু বিখ্যাত নারী-প্রগতিমূলক পত্রিকা "L' Egyptienn."-এর সম্পাদিকা-রূপে শ্রীমতী সেজা নেবারাবুলের কৃতিত্বের সমাদর বিদেশীরাও করিয়া থাকেন।

মহিলা-সম্মিলনীর সভানেত্রী

মাননীয়া শ্রীমতী ত্রিবাঙ্কুরের ছোটরাণী

সম্প্রতি-সংঘটিত মাদ্রাজ মহিলা-সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব-সভায় ইনি সভানেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

মাঙ্গালোর মহিলা-সঙ্ঘ

মহিলা-সঙ্ঘ (Ladies' Club) মাঙ্গালোর

মাঙ্গালোরের বিখ্যাত 'মহিলা-সঙ্ঘের' এই আলোক-চিত্রখানি গৃহীত হইয়াছে—কিছুদিন পূর্ব্বে লেডী বিয়াট্রিস ষ্ট্যান্লীর উক্ত 'মহিলা-সঙ্ঘ' পরিদর্শন উপলক্ষে।

সোভিয়েট মহিলা-মন্ত্রী

মাদাম আলেকজান্দ্রা কোলান্তে

ষ্টকহল্‌ম্‌-স্থিত সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রী হইতেছেন—একজন মহিলা। সোভিয়েট মহিলা-মন্ত্রী মাদাম আলেকজান্দ্রা কোলান্তে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিতা ও প্রসিদ্ধা।

চাষার ব্যথা

শ্রী কালীপদ ঘটক

খালি আমার অশথ্‌ গাছের তল ;
আজ ফাগুনে আমায় ফেলে কোথায় আছিস্‌ বল্‌—
ও তুই কোথায় আছিস্‌ বল্‌।

পাতার কুঁড়ে ধ'সে গেছে—যতন করে কে ?
লাগতে হবে ক্ষেতের কাজে এখন মোরে যে।
পান্তা ভাতের থালি আর
যোগাবে কে নদার পার,
সাঁজের বেলা মাঠের ধারে আনতে যাবে জল—
কে আর আনতে যাবে জল।

সজনে গাছে ফুল ফুটেছে, মাচা ভরা লাউ,—
তু'ফলা তোর সাধের গাছে পাক্‌লো পিয়ারাও।
রাধ্‌বে কে আজ আপন হাতে
কলমী শাক আর কুমড়ো-ভাতে,
তু' বিনে হায় পরাণ আমার বল্‌লো রে পাগল—
তোরে কম্‌নে ভুলি বল্‌।

বুলবুলি আর দেয় না সাড়া—ঘাব্‌ড়ে গেছে যে ;
পায়রাগুলো বাউরা হ'য়ে খাওয়া ত্যেজেছে।
কোকিল-ছানা কয়েত্‌-ডালে
ডাকে না আর সাঁজ-সকালে,
ছন্নছাড়া গোয়াল-ভরা গাই-গরু-ছাগল—
তাদের কম্‌বে কে আগল ?

সেই সে-বছর বিয়ের বেলা সেজে রাঙা বউ,
যখন এলি, আগুন-ভরা ঝিঙে ফুলের ঢেউ ;
পড়ছে মনে কতেক কথা—
হিজল-তলায় মালা গাঁথা,
ডগ্‌ডগে তোর সিঁথির সিঁদুর,—চোক্‌-ভরা কাজল,—
আমি কম্‌নে ভুলি বল্‌।

খোকার যে তোর বা' ফুটেছে ডাক শিখেছে 'মা',—
কচি কচি দাঁতগুলি তার দেখতে পেলে না।
রাতদিনই সে কেঁদে সারা,
রয় না আমার কোলটি ছাড়া,
ডুক্‌রে উঠি বুকে ক'রে তোরি বুকের ফল—
এ যে তোরি বুকের ফল।

যে দেশে তুই ঘর বেঁধেছিস নিরিবিলি আজ—
বেলার শেষে চলবো আমি সেরে আপন কাজ ;
আর যে একা রইতে নারি,
যেতেই হ'ল এ দেশ ছাড়ি,'
খাঁচা ভেঙে উড়্‌বো এবার—কাটবো রে শিকল,—
ওরে যাচ্ছি আমি চল্‌॥

বাংলার বীরসন্তান—"রায়-বেঁশে"

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

ইতিপূর্ব্বে বাংলার বীরসন্তান "রায়-বেঁশে" যোদ্ধাদের বীরমূর্ত্তির সহিত বাঙ্গালী পাঠকদের পরিচয় করাইয়াছি।* ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর বীরোচিত নৃত্যকলা ও অসাধারণ সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখিলে, ইহারা যে কেবল নামে নয়, প্রকৃতি-পরম্পরায়ও সহস্র বর্ষাধিক পূর্ব্বের বাঙ্গালী "রায়-বেঁশে" যোদ্ধা-বীরদিগের বংশধর, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মমঙ্গলের, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর, অন্নদামঙ্গলের সেই তিনশত বর্ষ হইতে সহস্র বৎসর

"বোরো- বোদুর আর আজন্তার গুহা হ'তে
যেন উঠে এসেছে লোক বাংলার পথে।"

আগেকার "রায়-বেঁশে" যোদ্ধার ভাবভঙ্গী ও বেশভূষার সহিত ইহাদের কি আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় সাদৃশ্য! সেই "বাজন-নূপুর পায়" (১), সেই "বীর-মুঠা" (২), সেই "মণ্ডলী"(৩) করিয়া "বেড়া-পাকে" ধাওয়া (৪), পরিধানে সেই "বীর-ধড়ি" ও সেই "অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙা মাটি!"(৫)

সমাজের বহু-শতাব্দীব্যাপী অবজ্ঞা, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও, ইহারা যে কি করিয়া বাঙ্গালীর এই মহামূল্য গৌরবময় জাতীয় সম্পদস্বরূপ বীরোচিত সামরিক নৃত্যকলা ও ব্যায়াম-ক্রীড়া সযত্নে অভ্যাস করিয়া অটুট রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা মনে করিলে, আমাদের মূঢ়তা মগ্ন সমাজের ব্যবহারের জন্য প্রাণ যেমন লজ্জায় ও ধিক্কারে ভরিয়া উঠে, তেমনি এই ডোম-বাউরী-জাতীয় আমাদের সরলপ্রকৃতি আনন্দময়-

---

* বঙ্গলক্ষ্মী—ফাল্গুন, ১৩৩৭।

(১) "বাজন-নূপুর পায়,বীর-ঘণ্টা পাইক ধায়, রায়বাঁশা ধায় খরশান।" —কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী সং, ১৩১৩। ২৬৫ পৃঃ)।

(২) "বাজন-নূপুর পায়, বীর-মুঠা পাইক ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।" [illegible]—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী সং, ১৩১৩। ৯৫ পৃঃ)।

(৩) "সোনার নূপুর পায়, বীর বেড়-পাকে ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং, ১ম ভাগ। ২২৯ পৃঃ)।

(৪) "মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া—" —কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং, ৬৭৯ পৃঃ)।

(৫) "পরিধানে বীর-ধড়ি কানে ফটিকের খড়ি, অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙা মাটি।"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং, ১ম ভাগ। ২২৯ পৃঃ)।

"তবু ভোলে না অতীতের গৌরব-ধারা,
নাচে বীরের নৃত্য,— হ'য়ে আত্মহারা।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

"থাকে নিরম্বোদর— রাখে বক্ষ স্ফীত!"

প্রাণ অসীমসহিষ্ণু বীরভ্রাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও স্নেহরসে প্রাণ আর্দ্র হইয়া উঠে ও তাহাদিগকে বুকে টানিয়া আনিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—"ধিক্ সে সমাজ, যে সমাজ তোদের 'ছোট লোক' 'নীচ লোক' আখ্যা দিয়া, অস্পৃশ্য করিয়া, পদদলিত করিয়া, উপবাসে কৃশাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে!"

কিন্তু ইহা এই পতিত বাঙালী সমাজের একটা পরম আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের কথা যে, উপবাসে নিরন্নোদর, শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত, ও অস্পৃশ্যতার অন্ধ অবজ্ঞায় উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, ইহাদের আত্মার বীরোচিত তেজ ও আনন্দ ইহারা এখনো হারায় নাই; এবং তাহারা এই মহাসম্পদগুলি হারায়

এই যে আজ আমাদেরই অতি-আপন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের সঙ্গে আমাদের বহুযুগের পর নূতন করিয়া আবার পরিচয় হইল, তাহার ফলে যেন সেই উদ্বোধন ও সেই প্রচেষ্টা আমাদের "শিক্ষিত", "সম্ভ্রান্ত" ও "ভদ্র" সমাজের হয়—এই আমার প্রাণের আশা ও প্রার্থনা! "রাইবিশে" নামে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও আজ সেই অতীত যুগের গৌরবময় বাংলার বীরসন্তান "রায়-বেঁশে" যোদ্ধাদের বীর-বংশধরগণ আমাদিগকে আবার বীর-প্রকৃতিতে নূতন করিয়া দীক্ষিত করুক ও বীরের প্রকৃত মর্য্যাদা দেখাইতে আমাদিগকে শিক্ষিত করুক।

বীরের নৃত্যকলার পরিচয় ও শিক্ষা পাইবার জন্য

"পায়ে বাজন-নূপুর, বুকে অসীম সাহস,
পেটে অন্নের ক্ষুধা, মুখে নৃত্যের হরষ।"

নাই বলিয়াই এখনো বাঙালী হয়ত অতীতের আত্মঘাতী ভুল সংশোধন করিয়া ইহাদিগকে ইহাদের উপযুক্ত আদর ও স্নেহ দান করিয়া, ইহাদিগের অন্নসংস্থান ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, ইহাদিগকে বীরোচিত-প্রকৃতির শিক্ষকের পদে বরণ করিয়া লইবে, এবং ইহাদিগের নিকট হইতে আমাদের অতীত যুগের এই সকল উদ্দীপনাময় অমূল্য সামরিক নৃত্যকলা ও ব্যায়াম-ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনে আবার শক্তি,সাহস ও আনন্দের সহজ ও জীবন্ত ধারার উৎস জাগাইয়া তুলিতে পারিবে,—এই আশা আমি করি।

বাঙ্গালী যেন আর আধুনিক সহরের কৃত্রিম নাট্যালয়ে দলে দলে গিয়া বহু অর্থব্যয়ে বাইনাচের অনুকরণ-মিশ্রিত ও বিদেশিনী নারী-শিক্ষয়িত্রী ম্যাদাম্ প্যাভ্লোভার শিষ্যত্বে শিক্ষিত লাস্য ও তাণ্ডব-নৃত্যের মিশ্র খিচুড়ী দেখার ফ্যাসানে মত্ত না হইয়া, বাঙলার পল্লীতে শত 'উদয়শঙ্করের' শিক্ষাগুরু-স্থানীয় ভারতীয় আদিম বিশুদ্ধ তাণ্ডব নৃত্যকলার যে জীবন্ত মূর্ত্তরূপ আজ কাঙাল-বেশে বাংলার পথে পথে বেড়াইতেছে তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে এবং তাহার প্রকৃত আদর করিতে পারে!

"রাইবিশে"র পরিচয়

(১)

বাঙ্গালী যোদ্ধার কি স্বরূপ দেখায়
তার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি যদি দেখবি ত আয়।
বোরো- বোদুর * আর অজন্তার † গুহা হ'তে
যেন উঠে এসেছে লোক বাংলার পথে!
বহু দীর্ঘ শতাব্দীর অবজ্ঞা স'য়ে
পথে ভ্রমে বীরের দল কাঙাল হ'য়ে।

রণ- বীরের অতীতের প্রকৃতির ভঙ্গে
ফিরে বীরত্ব-বিশ্রুতি-লুপ্ত বঙ্গে।
পায়ে বাজন-নূপুর,বুকে অসীম সাহস,
পেটে অন্নের ক্ষুধা, মুখে নৃত্যের হরষ;—
মুহুঃ হুঙ্কার-রবে ভীতি জাগায় মনে,
তেজো- দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ-ঝলক্ নয়নে;—
বেড়া- পাকের চাকে কভু দ্রুত ঘুরে,
বেগে দাপট মেরে' কভু শূন্যে উড়ে;—

"বেড়া- পাকের চাক কভু দ্রুত ঘুরে,
বেগে দাপট মেরে' কেভু শূন্যে উড়ে।"

তবু ভোলে না অতীতের গৌরব-ধারা,
নাচে বীরের নৃত্য,—হ'য়ে আত্মহারা।
পদ- দলিত লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত
থাকে নিরন্নোদর—রাখে বক্ষ স্ফীত!

কভু ব্যাঘ্র-ঝম্পে পড়ে ভূমিতলে,
কভু লম্ফে কাঁপায় ক্ষিতি সিংহের বলে।
মহা- দেবের মূর্ত্তি কালের ভস্মে ঢেকে'
খেলে তাণ্ডব-নৃত্যে গায়ে ধূলি মেখে';—
রণ- ভল্ল-বিহীন হাতে মুষ্টি পেকে'
রণ- ভল্ল বিক্ষেপ-রীতি বেড়ায় এঁকে।
কবে আস্‌বে সে দিন,—ভাবে থেকে' থেকে'—
যেদিন চিন্‌বে স্বদেশবাসী আমরা যে কে?

* সুদূর বৌদ্ধযুগে যে সকল বঙ্গদেশবাসী যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ কর্ত্তৃক আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই ভুবনবিখ্যাত 'বোরোবোদুর' মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার ভাস্কর্য্য ও অতুলনীয় মূর্ত্তিগঠন-দক্ষতা সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে।

† অজন্তা গুহার চিত্রিত বীরমূর্ত্তির ও পরিচ্ছদ-প্রণালীর সঙ্গে বর্ত্তমান 'রাইবিশে'দের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাওয়া গিয়াছে।

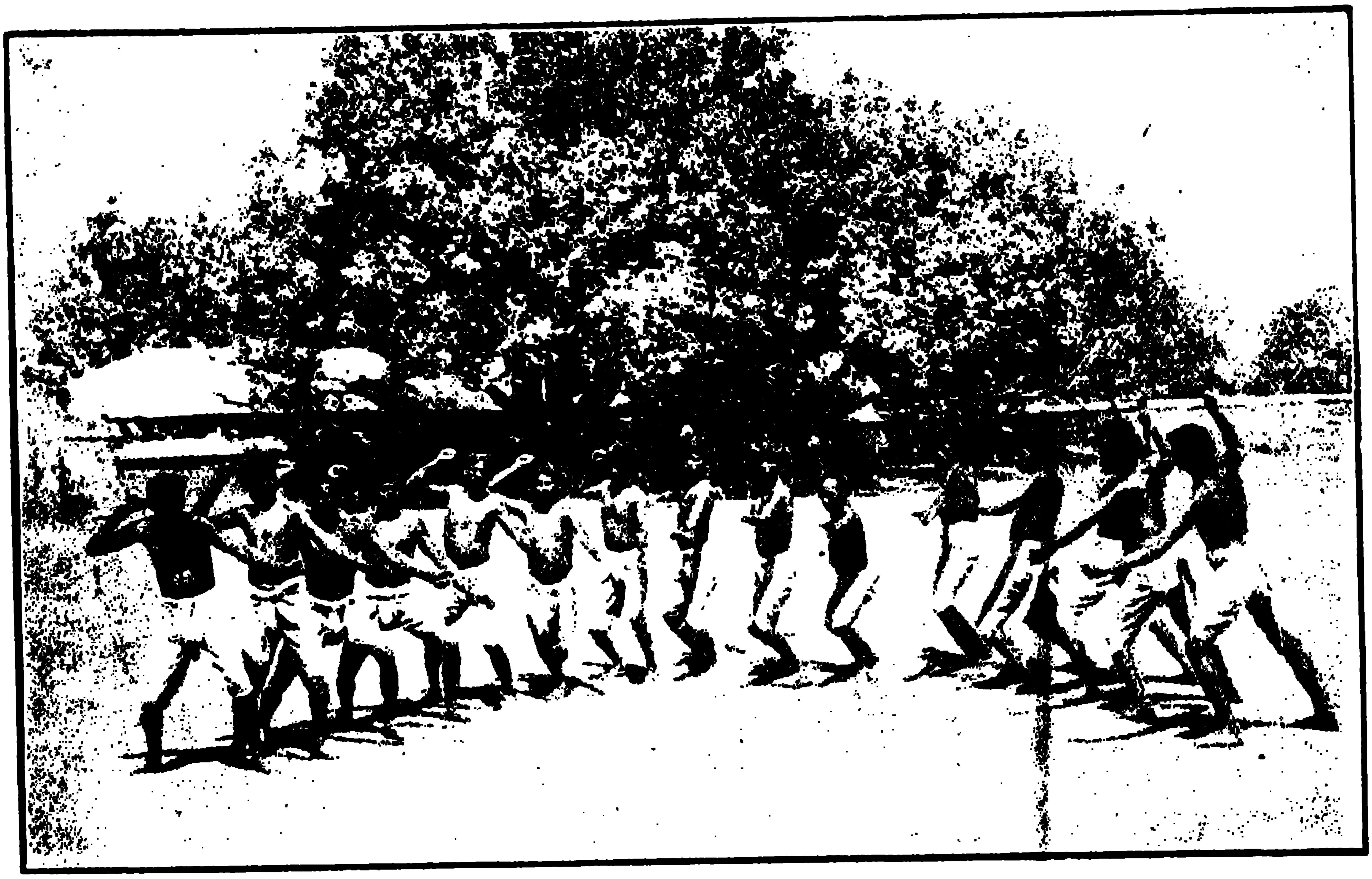

"রণ- ভল্ল-বিহীন হাতে মুষ্টি পেকে',
রণ- ভল্ল-বিক্ষেপ-রীতি বেড়ায় এঁকে

"রণ- নৃত্য-কলার তেজোদ্দীপক ধারা
যারা বুঝ্‌বে,—এদের দেখে' বুঝুক্ তারা।"

"রণ- বীরের ক্রীড়ার তেজোস্ফুটক ধারা
যারা শিখ্‌বে,—এদের কাছে শিখুক্ তারা।"

(২)

শূদ্র যে কে,　আর ক্ষত্র যে কে ?—
স্পৃশ্য যে কে,　আর অস্পৃশ্য কে ?—
তা　বুঝ্‌বে জগৎ-বাসী এদের দেখে' !
কোন্‌টি যে আসল, আর কোন্‌টি মেকি—
তা　চিন্‌বে জগৎ-বাসী এদের দেখি' !
খেলে'　নৃত্যে বাংলার লোক এদের দেখে'
পুনঃ　প্রাণে আনন্দ-ধারা আন্‌বে ডেকে' ।
কভু　হয় না কুভাব মনে নির্ম্মল নাচে—
তা　শিখ্‌বে বাংলার লোক এদের কাছে ।
রণ-　নৃত্য-কলার তেজোদ্দীপক ধারা
যারা　বুঝ্‌বে,—এদের দেখে' বুঝুক্ তারা ।
রণ-　বীরের ক্রীড়ার তেজোস্ফুটক ধারা
যারা　শিখ্‌বে,—এদের কাছে শিখুক্ তারা ।

(৩)

মহা-　মদ পাত্রের 'রায়-বেঁশে' সহায়
এম্‌নি　ছুটেছিল লাউ-সেনের ময়নায় । (১)
রাজ-　নগরবাসী 'বীর-রাজা'র বংশ (২)
'রায়-　বেঁশে'র সহায়ে কর্‌ত শত্রুর ধ্বংস ।
রাজা　মানসিংহের দুর্দ্ধর্ষ ফৌজ্ 'রায়বেঁশে'
এম্‌নি　নাচ্‌ত উল্লাসে রণ্-বিজয় শেষে । (৩)

(১) একাদশ শতাব্দীতে মহামদ পাত্র 'ময়নাগড়' আক্রমণ করেন । ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' ইহার উল্লেখ আছে (বঙ্গবাসী সং, ১২৯৫ । ২৭২ পৃঃ) ।

(২) বীরভূম, রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন 'বীর-রাজা' বংশীয় হিন্দুরাজাগণের এবং তৎপরবর্ত্তী মুসলমান রাজাগণের সৈন্যশ্রেণীতে অনেক "রায়-বেঁশে" যোদ্ধা ছিল, এবং তাহাদের বংশধরেরা এখনো 'রাইবিশে'র দল নামে খ্যাত ।

(৩) অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র । বঙ্গবাসী সং, ১২৯৬ । ১১৪ পৃঃ ।

"আয় মোরা সবাই মিশে'—
খেল্‌ব রাইবিশে । " *

* সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয় যুবকেরা 'রাইবিশে' দলের নিকট 'রাইবিশে'-নৃত্য শিক্ষা করিতেছে ।

ক- লিঙ্গের সম্রাটের পদাতিক বেশে
এম্‌নি ছুটত "রায়বেঁশে"র দল গুজরাট দেশে। (৪)
থেকে ছদ্মবেশে অধঃপতিত দেশে
"রায়- বেঁশে" নাচে রাইবিশের বেশে। (৫)

"রাইবিশে"র গান (৬)

আয় মোরা সবাই মিশে',—খেল্‌বো রাইবিশে।
মোরা খেল্‌বো রাইবিশে—
মোরা নাচ্‌বো রাইবিশে।
আয় মোরা সবাই মিশে',—খেল্‌বো রাইবিশে॥
নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—
মহামূল্য জিনিষ এ।
আয় মোরা সবাই মিশে', খেল্‌বো রাইবিশে॥
মোদের ভাবনা ভয় কিসে?—
হ'য়ে খেলায় মগ্ন—ভাবনা ভয় ভাঙ্‌বো নিমিষে।
হ'য়ে নৃত্যে মগ্ন—ভাবনা ভয় নাশ্‌বো নিমিষে॥
আঃ—*

দামামার তালে তালে হেলে' দুলে'
মোরা মার্‌বো কুঠার নিরানন্দের মূলে।
দেখে' পরের নাচ আন্‌বো না কুভাব মনে—
নেচে' নির্ম্মল আনন্দ পাবো আপন মনে॥
আঃ—

আয় রে দশ-বিশে!—
আয় রে চল্লিশে!—
আয় রে ছিয়াল্লিশে!—
আরে, ভয় কিসে?—
দুলে' নৃত্যের বশে, মার্‌বো পিত্তের বিষে!
আঃ—

রাজা মানসিংহের দুর্দ্ধর্ষ ফৌজ্‌ "রায়বেঁশে"—
এম্‌নি নাচ্‌ত উল্লাসে রণ-বিজয় শেষে।
ক- লিঙ্গের সম্রাটের পদাতিক বেশে
এম্‌নি ছুট্‌ত "রায়বেঁশে"র দল গুজরাট দেশে॥
আয় বিভেদ ভুলি' সবে খেলি মিশে'!
আয় বিভেদ ভুলি' সবে নাচি মিশে'!
আয় মোরা সবাই মিশে,—খেল্‌বো রাইবিশে!
আঃ—আঃ—আঃ—

---

(৪) কবিকঙ্কণ চণ্ডী বঙ্গবাসী সং, ১৩১৩। ৯৫ পৃঃ।

(৫) আধুনিক বাঙ্গালীদের বিকৃত রুচির ফলে অনেক স্থলে রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরদিগের বীরোচিত নৃত্যের কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে তাহা আগামী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দত্ত "রায়বেঁশের রাই-বেশ" নামক সচিত্র প্রবন্ধে বিশেষভাবে বিবৃত করিবেন।—বঃ সঃ

(৬) শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত "রাইবিশে" নৃত্যের তালে তাল মিলাইয়া এবং তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে ভাষায় সুপরিস্ফুট করিয়া এই গান রচনা করিয়াছেন। ইহার সুরও অপূর্ব্ব গতিশীল—এবং বীর-রসের অভাবনীয় উদ্দীপনা-ময় (আগামী সংখ্যায় ইহার স্বরলিপি বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত হইবে)। শিউড়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী খান বাহাদুর ফারোকী মহোদয় এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে, শিউড়ী লীজ (Lee's) ক্লাবের এমেচার সঙ্গীত-সমিতির বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক 'রাইবিশে' নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি গীত হইয়াছিল। এখন সুলতানপুর হাইস্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রাইবিশে নৃত্যের সহিত এই গান শিক্ষা ও আবৃত্তি করিয়া অপূর্ব্ব আমোদের আস্বাদ উপভোগ করিতেছে।—বঃ সঃ

* রায়বেঁশেরা নৃত্য করিতে করিতে মুহুর্মুহু "আঃ" শব্দে সিংহনাদ করিয়া উঠে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভূত-ভারতী

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

প্যাচ্‌পেচে বর্ষা। সকাল থেকে সুরু হয়েছে, সন্ধ্যা সাতটা বাজে। আমাদের ক্লাবের জানালার সার্শি ছিল না, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জলের পাতলা ছাঁট ঘরে এসে পড়্‌ছে; যতটা জায়গা শুক্‌নো আছে তার মধ্যে ছ-সাত বন্ধুতে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বসে' আছি। নিছক বন্ধুত্বের জায়গায় খুব বেশী ঘেঁসাঘেঁসিটা ভালো নয়। পৃথিবীতে এমন মানুষ ক'জন যাদের মধ্যে ভালোর চাইতে মন্দের দিক্‌টাই বেশী নেই? দূর থেকে সব জড়িয়ে তবু একরকম লাগে। সুতরাং পরস্পরের অতি-সান্নিধ্যটাকে নাকচ কর্‌বার জন্যে নানা বিচিত্র গল্পের রঙীন্ পর্দ্দা বোনা হচ্ছে। মনের চারদিকে তাই জড়িয়ে যথাসম্ভব পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল কর্‌ছি।

অহিংস অসহযোগ নিয়ে গল্পের সুরু হয়েছিল, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ভূতের গল্প হচ্ছে। এবং ভূতদের এই বাহাদুরিটা আছে যে তাদের গল্প একবার সুরু হ'লে আর সহজে থাম্‌তে চায় না; অন্ততঃ যদি শীগ্‌গির থামে ত একেবারে থামে, আর কোনো প্রসঙ্গ তার থেকে উঠে পড়ে না। অহিংস অসহযোগের সঙ্গে ভূতের সম্পর্কটা এই প্রকার।—

সমর আক্ষেপ করে' বল্‌ছিল, "ধারাসানার সত্যাগ্রহ শেষকালে বৃষ্টির জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।"

সতীন্ বল্‌লে, "বৃষ্টি ত অহিংস অসহযোগের চাইতেও তেজালো জিনিষ আমি মিইয়ে যেতে দেখেছি।"

সতীন্ থাকে রেঙ্গুনে, ছুটিতে কল্‌কাতায় বেড়াতে এসেছে। বল্‌লে, "বর্ম্মা-কুরুঙ্গি হাঙ্গামার দিনে বর্ম্মারা সমস্ত-দিন ধরে' 'দা' শানিয়ে, 'জঙ্গল' থেকে লরী বোঝাই করে' লোকটোক আনিয়ে, রাত্রে একটা দস্তুর মতো প্রলয়কাণ্ড কর্‌বার জন্যে অনেক খেটেখুটে তৈরী হ'লো, সহরের লোক ভয়ে কাঁপে। কিন্তু সন্ধ্যা হ'তেই এমন তুমুল বৃষ্টি সুরু হ'লো যে তাতে ভিজেই বেচারাদের সব spirit গেল দমে'। নিজেদের আড্ডা ছেড়ে কেউ আর বেরুলই না, কাটাকুটি যা কর্‌বার ঐ দিনেদিনেই যা তারা সেদিন করে' নিতে পেরেছিল।"

হরিপদ বল্‌লে, "mob mentalityর ধরণই ঐ। একবার কোনোরকম করে' তার মোড় ফিরিয়ে দিতে পার্‌লেই ফিরে যায়। যারা সাম্‌নে দেখে না, তারা পেছনেও তাকায় না।"

আমি বল্‌লাম, "বৃষ্টিতে যে একটা দেশের ভাগ্য নিরূপিত হয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ ত আমাদের ইতিহাসেই রয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের দিনে নবাবের বারুদ যদি জলে না ভিজ্‌ত, তবে আজ ধারাসানায় সত্যাগ্রহ কর্‌বারও হয়ত দরকার হ'ত না, আর বর্ম্মাতেও কুরুঙ্গিরা কচুকাটা হ'ত কিনা সন্দেহ।"

এর থেকে পলাশীর যুদ্ধের কথা উঠে পড়ে' কিছুক্ষণ আমাদের আসর জমিয়ে রাখ্‌ল। একটু একটু করে' সম-সাময়িক ইতিহাসের আরও অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা কর্‌লাম। হরিপদ বল্‌লে, "মীরজাফরই না-হয় বেইমান ছিল, কিন্তু তার যে হাজার হাজার সৈন্য ছিল, তাদের মধ্যে কি একজনও মানুষ ছিল না? তাদের মধ্যে একজনও কি দেশটাকে দেশ বলে' ভালোবাস্‌ত না? একজনও ছিল না, যে সত্যিকারের বীর?—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যাচারের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়াতে পারে?"

সতীন্ বল্‌লে, "হয়ত মীরজাফর তাদেরও কিছু একটা ফাঁকিতে ভুলিয়েছিল।"

জীবন বেশী কথা বলে না, কিন্তু যখন কিছু বলে, দস্তুর মতো ভাবিয়ে দেয়। বল্‌লে, "দেশের জন্যে ততটা ভালো-বাসা থাক্‌লে ফাঁকিতে তারা ভুল্‌ত না। আমাদের দেশের লোকে দেশটাকে কোনোদিন দেশ বলে' দেখেইনি, তার আর তাকে ভালোবাস্‌বে কি? এটাকে তারা জান্‌ত ছু নরা বলে'। লড়াই হ'ত রাজার রাজায়। যারা মাইনে

নিয়ে সেপাই হ'ত তারা লড়্‌ত, অন্যেরা লড়্‌ত না। আমি বল্‌ছি, মীরজাফরের সেপাইরা লড়্‌তে হবে না শুনে দস্তুর মতো খুসি হয়েছিল। ইংরেজকে যত দোষই দাও, তারাই আমাদের দেশটাকে প্রথম দেশরূপে দেখেছে, এবং তারই ফলে তারা এদেশের রাজা। আমরা দেখি নি যে, তারই শাস্তি পরাধীনতার দ্বারা ভোগ করছি। এখনো দেখ্‌ছি না, তাই দন্ত বিকশিত করে' provincial autonomyর ফাঁদে পা বাড়াচ্ছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' কাট্‌লে সতীন্ বল্‌লে, "আমাদের দেশের লোকের দেশাত্মবোধ ছিল কি ছিল না তার প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করেছি ত ইংরেজের লেখা ইতিহাস থেকে? সে ইতিহাস প্রামাণ্য নাও হ'তে পারে।"

আমি বল্‌লাম "সেটা কি ইংরেজের দোষ? তোমরা নিজেদের ইতিহাস নিজেরা লেখনি কেন?"

এর পর সাধারণভাবে ইতিহাস লেখার কথা উঠ্‌ল।

হরিপদ বল্‌লে, "এখনও কি চেষ্টা কর্‌লে লেখা যায় না?"

আমি বল্‌লাম, "ছাই যায়। এক বানিয়ে লেখো যদি ত হয়।"

সমর আক্ষেপ করে' বল্‌লে, "সত্যি আমাদের জাতির বহু সহস্র বর্ষব্যাপী জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার কোনো চিহ্ন কোথাও বিশেষ কিছু রইল না।"

হরিপদ বল্‌লে, "হয়ত ইতিহাস ছিল, মুসলমানরা পুড়িয়েছে।"

আমি বল্‌লাম, "উঁহু, হ'তে পারে না। Pseudo-ইতিহাসগুলো রইল, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র সব রইল, কেবল বেছেবেছে ইতিহাসগুলিই গেল পোড়া, এ সম্ভব নয়।"

সমর বল্‌লে, "ছিল এবং নেই, আর ইতিহাস ছিল না, আমাদের পক্ষে দুইই সমান। কথা হচ্ছে দেশের লুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার কর্‌বার উপায় কিছু আছে কিনা। আমাদের অপবাদ আছে যে আমরা সারাক্ষণ প্রাচীনতার দোহাই দিয়েই কাজ চালাই, নূতনের দিকে তাকাতে শুদ্ধ চাই না। কিন্তু যে জিনিষগুলির দোহাই আমরা দিই সেগুলি সত্যি সত্যি প্রাচীন কিনা তা শুদ্ধ জানবার আমাদের উপায় নেই। যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে আমাদের সভ্যতা তৈরী হয়েছে তার মধ্যে কি পরিমাণ শকদের, কি পরিমাণ হূণদের, কি পরিমাণ যবনদের, কি পরিমাণ দ্রাবিড়দের আর কি পরিমাণ অনার্য্য আদিম ব্যাধ-নিষাদ-কিরাত-শবরদের contribution তাও আমাদের বুঝ্‌বার কোনো সুবিধা নেই। সভ্যতার ইমারত নূতন করে' গড়্‌তে হ'লে তার ভিতটার কথা ভালো করে' জানা থাকা চাই, জমির নীচেকার মাটি কোথায় শক্ত কোথায় নরম, কোথায় পলিমাটি কোথায় পাথুরে, কোন্ জায়গার উপরে কতখানি ভার সইবে, তা বুঝ্‌তে না পার্‌লে সভ্যতা গড়্‌বার সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম হবে।"

হরিপদ বল্‌লে, "লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা সুরু হয়েছে, তার ফলে কাজও কিছু হচ্ছে, কিন্তু সে আর কতটুকু? যা একেবারে কোনো চিহ্ন না রেখেই গেছে তাকে কোনো উপায়েই আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অথচ কি গৌরবময় ছিল আমাদের ইতিহাস, যেটুকু চিহ্ন আছে তার থেকে তার প্রমাণ আমরা ভালো করে'ই পাই—"

খুব ক্ষোভ আক্ষেপ হাহুতাশ চল্‌তে লাগল। পূর্ব্বপুরুষেরা যে আমাদের কথা ভেবে তাঁদের ইতিহাস আমাদের জন্যে রেখে যান্‌নি, তাঁদের এই অবিবেচনা ও স্বার্থপরতার জন্যে তাঁদের প্রতি কটূক্তিও হ'লো কম নয়। হঠাৎ এক-কোণ থেকে সতীনের এক বন্ধু, তাঁর নামটা এখন ভুলে গেছি, বলে' উঠ্‌লেন, "একটা উপায় সত্যিই বোধহয় এখনো আছে। কারুর ইচ্ছা হ'লে সেদিক দিয়ে গবেষণা করে' দেখ্‌তে পারেন।"

আমরা সকলে কৌতূহলী হয়ে তাঁর দিকে ঘুরে বস্‌লাম। সতীন্ বললে, "কি উপায় শুনি?"

বন্ধু প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করে' তারপর বল্‌লেন, "পারলৌকিক সাক্ষ্য।"

সতীন্ বললে, "অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও সেই সেই যুগের দেহমুক্ত আত্মাদের ডেকে তাদের দিয়ে ইতিহাস লিখিয়ে নিতে হবে?"

বন্ধু বল্‌লেন, "চেষ্টা করে' দেখ্‌তে ক্ষতি কি?"

জীবন বল্‌লে, "কি উপায়ে সেটা হবে?"

বন্ধু বললেন, "Planchette, Ouija Board, Automatic Writing, Trance Mediumship, Direct Communication, Clairvoyance, উপায় ত কতরকমই আছে ?"

জীবন বললে, "ধরা যাক, মীরজাফরের আত্মাকে আনা গেল, তিনি যে সত্যি কথাই বলবেন তার কি অর্থ আছে ?"

সমর বললে, "তিনি মীরজাফর না আর কেউ তাই বা কি করে' জানব ?"

আমি বললাম, "যাকে মীরজাফর বলে' ভাবব, তিনি ইংরেজ ঐতিহাসিকের ছদ্মবেশী আত্মাও হ'তে পারেন।"

একটা হাসির রোল্ উঠল, সেটা থামলে সতীন্ বললে, আসল কথা তিনি at all কারুর আত্মা কি না সেইটে জানবারই সন্তোষজনক কোনো উপায় পাওয়া যাবে না।"

বন্ধু বললেন, "প্রেতাত্মার অস্তিত্বেই যদি বিশ্বাস না থাকে তবে আর কোনো কথা নেই। কিন্তু দেশেবিদেশে এত প্রমাণ জড়ো হয়েছে, বিশেষতঃ বিগত কয়েক বৎসরে, যে বিশ্বাস না করে' আর উপায় নেই।"

জীবন বললে, "আমি এবিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলে কিছুই বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমি আজ অবধি যতজনকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা কেউ নিজে কিছু দেখেনি। সকলেই কারুর না কারুর কাছ থেকে শুনেছে। আপনারা নিজের চোখে কেউ ভূত দেখেছেন বলতে পারেন ?"

এইখানে ভূতুড়ে গল্পের আরম্ভ। সকলে আরও একটু জমাট হ'য়ে বসা গেল।

প্রথমে হরিপদ তার অভিজ্ঞতা বলতে সুরু করল।

"ভূত কি না বলতে পারি না, কিন্তু আজও অবধি ব্যাপারটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক বলে' কোনো উপায়ে আমি ভাবতে পারছি না।

"আমি সেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ আইন পরীক্ষা দিচ্ছি; যখন পরীক্ষার আর দিন-তিনেক বাকী, তখন হঠাৎ খবর এল, দেশে আমার একমাত্র বোন্ সুমতির বসন্ত হয়েছে। বাড়ী যাবার জন্তে তৈরি হচ্ছি, আবার খবর এল, রোগ এখন অবধি মারাত্মক কিছু নয়, পরীক্ষা নষ্ট করে' যেন চলে' না আসি। পরীক্ষার শেষে হষ্টেলে ফিরে খবর পেলাম, সুমতি নেই। কিছুদিন পরে দেশ থেকে এক জ্ঞাতিভাই এল, তার কাছে সব শুনলাম। দ্বিতীয় টেলিগ্রামটি আমাকে আশ্বাস দেবার জন্তে সুমতি নিজে করিয়েছিল, তখনই তার প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। তারপর যে ক'দিন সে বেঁচেছিল, সারাক্ষণ আমায় ডেকেডেকে চোখের জল ফেলেছে,—মরবার সময়ে আমার নাম মুখে করে' মরেছে। তেরো বছরের মেয়ে, যে জিনিষকে আমার শুভ বলে' জানত, নিজের এত ঐকান্তিক অন্তিম ইচ্ছাকেও তার চেয়ে সে বড় করেনি।...

"সেবারে ছুটিতে আর বাড়ী গেলাম না।

"প্রাক্‌টিস্ সুরু করবার বছর-দুই পরে, কিছু টাকা জমিয়ে ভাবলাম, বেঁচে থাকতে যার জন্তে কিছুই করা হয়নি, তার চিতার ওপরে সে লজ্জা এবং বেদনাকে পাথর চাপা দিয়ে রেখে আসব। ক্রীষ্টমাসের ছুটিতে বাড়ী চললাম।

"নৌকো যখন ঘাটে এসে লাগল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়েছে, কিন্তু গোধূলির আলো আকাশের গায় একেবারে মরে' যায়নি। ক্লান্ত মাঝিরা নৌকো তীরে বেঁধে তামাক ধরাল, আমি জিনিসপত্র তাদের জিম্মা করে' দিয়ে ডাঙায় উঠে পড়লাম ঘাট থেকে আমাদের গ্রাম মাইল-দুয়েকের পথ, নলখাগড়ার বন, খালবিল ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা মেঠো রাস্তা। আলো থাকতে থাকতে গ্রামে পৌছবার জন্তে একটু তাড়াতাড়ি পথ চলছি।

"প্রায় অর্দ্ধেক পথ এসে হঠাৎ দেখলাম পথ থেকে খানিকটা দূরে ধানের ক্ষেতের উপরে একটা ছোট খালের ধারে ঢালু জমির উপর একটি মেয়ে চুপচাপ বসে' আছে। কোনো কৃষকের মেয়ে হবে। বিশেষ কিছু লক্ষ্য করলাম না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার কি মনে করে' ফিরে চাইলাম। দেখলাম, মেয়েটি ঘুরে বসে' আমাকেই একদৃষ্টে দেখছে। ততদূর থেকে তার চেহারাটা বুঝবার উপায় ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হ'লো, মেয়েটির বসবার ধরণে খুব বেশী সুমতির সঙ্গে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে।

"আবার পথ চলতে চলতে নিজের বোকামিতে নিজেরই হাসি পেল। নিশ্চয় কোনো চাষার মেয়ে, বাপের সঙ্গে ক্ষেতের কাজে এসেছে, বাপের কাজ শেষ হবার অপেক্ষায়

বসে' আছে।··কিন্তু এই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে ক্ষেতের কি এত কাজ থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। পথে কোথাও আর কোনো মানুষের চিহ্নও ত দেখ্‌তে পেলাম না। চতুর্দ্দিকে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে দেখ্‌লাম, কেউ কোথাও নেই।

"বাড়ী পৌঁছে সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। বহুদিনের সঞ্চিত অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা অশ্রুস্রোতে গলে' বেরিয়ে এল, তার প্লাবনের মুখে আর সমস্তই ভেসে চলে' গেল।

"পরদিন বিকেলে একটা গাছের গুঁড়িকে বেশ করে' চোখা করে' নিয়ে, একটা বড় কাঠের হাতুড়ি নিয়ে দলবল-সহ চল্‌লাম সুমতির চিতা চিহ্নিত করে' রেখে আস্‌তে। পাথরের স্মৃতিফলক তৈরি হ'তে তখনও কিছু দেরি ছিল। শ্মশানে যারা গিয়েছিল তাদের সকলকে ডেকে সঙ্গে নিলাম, যেন স্থানটির সম্বন্ধে কোনো ভুল না হয়।

"ভুল সম্ভবতঃ হ'লো না। কারণ গ্রামের ঠিক শ্মশান বল্‌তে কোনো জায়গা নির্দ্দিষ্ট করা ছিল না। গ্রাম থেকে দূরে নদী বা খালের ধারে যার যার খুসি মতো শবদাহ করা হ'ত, তার ফলে একটি চিতার আর একটিকে overlap করবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ঘেঁসাঘেঁসিও হ'ত না। একটু মাটি খুঁড়্‌তেই মাটি-মেশানো কাঠকয়লা আর ছাই বেরিয়ে পড়্‌ল। জায়গাটাকে চিহ্নিত করে' বাড়ী ফির্‌লাম। তার কিছুদিন পরে কল্‌কাতায় ফিরে এলাম। চিতার উপরে স্মৃতিফলক বসানো হয়েছে।

"কিন্তু একটা কথা কাউকে আজও পর্য্যন্ত আমি বলিনি। ঠিক সেই চিতার জায়গাতেই আগের দিন সন্ধ্যার ম্লানায়মান্ গোধূলির আলোর নীচে, দিগন্তপ্রসারী নির্জ্জনতার মাঝখানে সেই রহস্যাবৃতা মেয়েটিকে আমি বসে' থাক্‌তে দেখেছিলাম।"

খানিকক্ষণ আবার ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌ল। সন্দেহের কথা, সংশয়ের কথা অনেক বলা যেত, **illusion, delusion, hallucination, autosuggestion** এমনি ধারা অনেক কথা মনে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগ্‌ল, কিন্তু হরিপদর মুখের দিকে চেয়ে কারুর আর মুখ ফুটল না।

এরপর সমর বল্‌তে লাগ্‌ল।

"আমি ঠিক স্পষ্ট স্বচক্ষে দেখেছি তা বলা চলে না, কিন্তু ঘটনাক্রমে একেবারে ব্যাপারটার মাঝখানে আমি গিয়ে পড়েছিলাম। নিছক শোনা কথার চাইতে আমার সাক্ষ্য হয়ত সেই কারণে কিছু বেশী প্রামাণ্য ব'লে গৃহীত হ'তে পারে।

"আমিও ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছিলাম। রেল ষ্টেশন থেকে আমাদের গ্রাম মাইল-সাতেক দূরে। যথাসময়ে খবর দিলে ষ্টেশনে ঘোড়া হাজির থাকে, কিন্তু সেবারে বিনা-খবরে যাচ্ছিলাম। ষ্টেশনে এবং কাছাকাছি গ্রামে খোঁজ করে' যখন ঘোড়া পাল্কী বা গরুর গাড়ী কিছুই পাওয়া গেল না, তখন স্থির কর্‌লাম পায়ে হেঁটেই পথটা চলে' যাব। আর কোনো অসুবিধা ছিল না, কিন্তু গ্রীষ্মকালের দুপুর, কাঠ-ফাটা রোদ, পথে তৃষ্ণার্ত্ত হ'লে পানীয় জল পাওয়াও সহজ ছিল না, পানযোগ্য জল ত নয়ই। সাদা ধূলিভরা পথ রোদ পড়ে' অসিফলকের মতো চকচক কর্‌ছিল।

"মাইল তিনেক এসে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসে' পড়্‌লাম। ইচ্ছে কর্‌তে লাগল, রোদ না পড়া পর্য্যন্ত সেইখানেই বসে' থাকি। কিন্তু বাড়ী যাবার তাড়া ছিল, আমি তখন নব বিবাহিত, বাড়ীতে বিরহিণী প্রেমিকা পত্নী পথ চেয়ে বসেছিলেন।

"উঠ্‌ব উঠ্‌ব কর্‌ছি, এমন সময় দেখ্‌লাম একটা গরুর গাড়ীর সঙ্গে একদল স্ত্রীপুরুষ মহা কোলাহল কর্‌তে কর্‌তে হেঁটে আস্‌ছে। ভালো করে' লক্ষ্য করে' দেখ্‌লাম, গাড়ীটা খালি। ভারি অবাক্ লাগ্‌ল। এই ভর্ দুপুরে, খাঁখাঁ কর্‌ছে রোদ, এর মধ্যে সকলে মিলে পায়ে হেঁটে চলেছে, সঙ্গে এতবড় একটা গাড়ী যাচ্ছে খালি, এরা কি সবশুদ্ধই পাগল?

"ভাব্‌লাম হয়ত গরু-দুটোর কিছু হয়েছে। কিন্তু অমন সুস্থ-সবল গরুই বাংলা দেশে সচরাচর চোখে পড়ে না। গাড়ীটাও কিছুমাত্র জখম হয়নি, তা সহজেই বুঝ্‌তে পারা গেল।

"তারা আর একটু কাছাকাছি হ'লে শুন্‌লাম, সকলে মিলে প্রাণ ভরে' কাকে গাল দিচ্ছে,—মুখপুড়ী, হতচ্ছাড়ী, শয়তানী, রাক্ষুসী, শাঁকচুন্নী, ইত্যাদি গালভরা আদরের

নামে কাকে যেন তারা অভিহিত করছে। স্ত্রীলোক মাত্র দুজন, এবং কটূক্তিগুলি প্রধানতঃ তাদেরই শ্রীমুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল, সুতরাং যাকে উদ্দেশ করে' কথাগুলি হচ্ছে তিনি দলের কেউ নন তা বোঝা গেল। কিন্তু কোনো অনুপস্থিত মানুষকে দুপুরের রোদে পথ চল্‌তে চল্‌তে লোকে যে সপ্তমে গলা চড়িয়ে সদলবলে এত উৎসাহ করে' গালাগাল দিতে পারে তা আমার জানা ছিল না। কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে উঠে পড়্‌লাম। এগিয়ে গিয়ে একটি বৃদ্ধকে দলের মুরুব্বি সাব্যস্ত করে' তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে? তোমরা খালি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সবশুদ্ধ হেঁটে কেন চলেছ? এমন অশ্রাব্য গালি-গালাজই বা কাকে করছ?'

"বৃদ্ধ তেতে উঠে বল্‌লে, 'হেঁটে কেন চলেছি? কেন চলেছি তা ঐ শাঁকচুন্নীকে জিজ্ঞেস কর, সর্ব্বস্বান্ত করেও বেটীর তৃপ্তি নেই, যতরকম করে' মানুষকে জ্বালানো যায় জ্বালাচ্ছে। মাথায় ওর এত শয়তানী আসেও!'

"আমি বল্‌লাম, 'কাকে জিজ্ঞেস করব? কার কথা বলছ?'

"বৃদ্ধ বল্‌লে, 'কেন, দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ঐ যে গাড়ীতে জাঁকিয়ে বসে' আছে? আচ্ছা, দাঁড়াও না। আমার ত দিন ফুরিয়েই এল, আমিও মরব, আমিও একদিন ভূত হব, তখন বেটীকে দেখে' নেব।'

"গাড়ীর মধ্যে বেশ করে' তাকিয়ে দেখ্‌লাম, কেউ নেই। গাড়োয়ান শুদ্ধ নেমে পড়ে' অন্যদের সঙ্গে হেঁটে চলেছে। গাড়োয়ান লোকটা বাঙালী এবং দলের মধ্যে একমাত্র তাকেই একটু প্রকৃতিস্থ বলে' বোধ হ'লো। তার পাশে পথ চল্‌তে চল্‌তে তার কাছে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুন্‌লাম।

"সঙ্গের স্ত্রীলোক-দুটির একজন বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা, অপরটি তাঁর ভগিনী। একটি পাঁচছ' বছরের ছেলে, বৃদ্ধের প্রথম বিবাহ-লব্ধ একমাত্র পুত্রের তনয়। একটি দশ এগারো বছরের ছেলে, তার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র। অপর লোকটি ভৃত্য।

"বৃদ্ধের দেশে বিষয়-সম্পত্তি প্রচুর আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আছে কৃপণ বলে' খ্যাতি এবং তদুপরি স্ত্রৈণতা। শেষের গুণটা দ্বিতীয়বার বিবাহের পর প্রকাশ পেয়েছে। এই বিবাহের সময় বৃদ্ধের বড় ছেলে বেঁচে ছিল, তার তখন বিবাহও হয়েছে, পৌত্রের তখনো জন্ম হয়নি। পুত্রের বিবাহে টাকাকড়ি কিছু পাওয়া যায়নি, সে স্বেচ্ছায় মেয়ে ঠিক করে' বাপের অমতে বিয়ে করেছিল বলে' আগে থাকতেই তার সঙ্গে বৃদ্ধের সদ্ভাব ছিল না, তার উপরে দ্বিতীয় পক্ষের আবির্ভাব হওয়ার পরে ছেলে তাঁর প্রায় চক্ষুশূল হয়ে উঠ্‌ল। তারপর নূতন ভার্য্যা যখন তাঁকে একটি পুত্রসন্তানও উপহার দিয়ে ফেল্‌লেন তখন স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রবধূর এক অতি সামান্য কলহের সূত্র ধরে' পুত্রকে ও পুত্রবধূকে তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ী থেকে একদিন তাড়িয়ে দিলেন।

"অবস্থাপন্ন ঘরের একমাত্র ছেলে, অন্নবস্ত্রের ভাবনা কোনোদিনই যে তাকে ভাব্‌তে হ'তে পারে এ চিন্তাও কারও মনে স্থান পায়নি, তার নিজের মনে ত নয়ই। রোজগারের কোনো যোগ্যতাই তার ছিল না। স্ত্রীকে নিয়ে নিঃসহায় অবস্থায় তার দুর্দ্দশার একশেষ। স্ত্রীর গয়না বেচে, দরিদ্র শ্বশুরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে' বহু কষ্টে তাদের দিন কাটতে লাগ্‌ল। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে দিনান্তে এক-বেলা দুমুঠো ভাতও তাদের জোটে না। বৌটি বাড়ী বাড়ী ঘুরে' কারু ধান ভানার সাহায্য করে', কারুকে কাঁথা সেলাই করে' দিয়ে দুচার আনা যা নিয়ে আসত তাই দিয়ে কখনো একদিন কখনো বা দুদিন পরপর তাদের সামান্য কিছু আহার জুটত। স্বামীর তখন আর কাজ করবার অবস্থা ছিল না, শরীর-মনের উপর তার যে জুলুম চল্‌ছিল তার ফলে তার যক্ষ্মারোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

"অবস্থাটা যখন সবদিকে এমনি অনুকূল তখন একদিন সময় বুঝে বৃদ্ধের এই পৌত্রটির শুভাগমন হ'লো। বৌ বল্‌লে, 'ছেলেটার মুখ চেয়ে একবার অভিমান ভুলে বাবার কাছে যাও। আমরাই না-হয় তাঁর কাছে অপরাধ করেছি, এ তো কিছু অপরাধ করেনি।' কিন্তু ছেলে কিছুতেই বাপের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে যেতে রাজি হ'লো না। বল্‌লে, 'আমরা না খেতে পেয়ে মরছি তাও তিনি জানেন, এ যে হয়েছে সে খবরও তাঁর কাছে গিয়েছে, আমাদের জন্যে কিছু করবার মতো মনের গতিক হ'লে নিজে থেকেই তিনি করতেন। গিয়ে আর শত্রু হাসাব না।'

"এর কিছুদিন পরেই সে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়িয়ে একেবারে এমন জায়গায় গেল যেখান থেকে অতি-বড় হতভাগাকেও ফিরে এসে লোক হাসাতে হয় না। বৌটি শোক কর্‌লে না, একহাতে নীরবে চোখের জল মুছে আর-একহাতে ছেলেটিকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে শ্বশুরের কাছে এসে হাজির হ'লো। বল্‌লে,'ছেলের অপরাধের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, শাস্তি তার ত সম্পূর্ণ হয়েছে। এ ত কোনো অপরাধ করেনি, একে নিন।' বৃদ্ধ ছেলেশুদ্ধ তাকে দূর দূর করে' তাড়িয়ে দিলেন। আস্‌বার সময় বৌ কেবল বলে' এল, 'ভগবান সত্যি কেউ থাক্‌লে আপনার বিচার হ'ত; যে দুঃখ আপনি দিলেন, অতিবড় শত্রুতেও মানুষকে তত দুঃখ দেয় না।'

"ভগবানের বিচার অনুসারেই কিনা জানা সহজ নয়, কিন্তু তার কিছুদিন পরে বৌটিও অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে কলেরায় ভুগে মারা গেল। তার বাপ-ভাইরা এসে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেল। বুড়ো ভাব্‌লে, আপদ চুক্‌ল, কিন্তু আপদের সুরু হ'লো সেই দিন থেকেই।

"প্রথম প্রথম বৃদ্ধের খাবারে সঙ্গে ছাই, ধুলো ইত্যাদি মাখা হ'তে আরম্ভ হ'লো, সেটাকে অলৌকিক কিছু বলে' কেউ প্রথমে বুঝ্‌তেই পারেনি। তারপর ক্রমে ক্রমে সেই জিনিষটাই সুনিয়মে ঘট্‌তে লাগ্‌ল। কোনো-কোনোদিন থালায় কে পচা গোবর, বিষ্ঠা ইত্যাদি রেখে দিতে লাগ্‌ল। বাড়ীতে গরুর হাড়, পচা মাংস ইত্যাদি পড়্‌তে লাগ্‌ল, কে কোথা থেকে ফেল্‌ছে তার কোন নিশানা পাওয়া যেত না। দুধের বাটি মুখের কাছে পর্য্যন্ত উঠে হাত কেঁপে ঝনঝন করে' পড়ে' যায়, সযত্নে পাতা বিছানা চুপচুপে হয়ে ভিজে থাকে, ঝড়ের রাত্রে বন্ধ দরজা-জানালা একসঙ্গে হুড়-দাড় করে' খুলে যায়। ঘুমন্ত স্ত্রীর গা থেকে গয়না শুদ্ধ এর পরে কে টেনে খুলে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল, মোকদ্দমার দিন সব-চেয়ে জরুরি দলিলটা খুঁজে পাওয়া যায় না, ছেলেটা থেকে থেকে ভয় পায়, রাত্রে ঘুমের মধ্যে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, দরজা খুলে বেরিয়ে চলে' যায়। নাতিকে দিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দিইয়ে দেখ্‌ল, কিছু ফল হ'ল না।

"এমনি ভাবে কয়েক বছর কাট্‌ল, বৃদ্ধ সহজে দমবার লোক ছিল না। শেষে অত্যাচার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লে এক-দিন বৌকে সে সামনাসামনি দেখ্‌লে। বল্‌লে, 'ঢের হয়েছে এইবার ক্ষেমা দাও, আমি তোমার ছেলেকে নিয়ে আস্‌ছি।'

"ক'দিন অত্যাচারটা বন্ধ রইল, তারপর আবার নূতন উদ্যমে সুরু হ'লো। বুড়ো বল্‌লে, 'আবার কেন, ছেলেকে আন্‌লাম ত!'—না, ছেলেকে তার বিষয় সম্পত্তি এখনই লেখাপড়া করে' আলাদা করে' দিতে হবে। তার মা চিরকাল ভূত হ'য়ে তাকে আগ্‌লে থাক্‌তে পার্‌বে না, এখনই তাকে যা দেবার তা দিয়ে দিতে হবে।—বুড়ো সহজে রাজি হ'ল না, কিন্তু বৌয়ের উৎপাতে বেঁচে থাকাই যখন প্রায় দায় হ'য়ে উঠ্‌ল তখন নিরুপায় হ'য়ে তাকে গাল পাড়্‌তে পাড়্‌তে বিষয়ের চার আনা নাতিকে রেজিষ্টারী করে' লিখে দিল। ভাব্‌ল, উৎপাতের এবারে শান্তি হবে; কিন্তু উৎপাত ক্রমে বেড়েই চল্‌ল। বৌ শ্বশুরকে নিরিবিলি পেয়ে একদিন বল্‌লে, "তোমার পেছন পেছন ঘুরে আমারও কষ্টের শেষ নেই, আমার স্বামীর কাছে শুদ্ধ আমি ফিরে যেতে পার্‌ছি না, তা হোক, তোমার দুর্দ্দশার আমি একশেষ না করে' যাব না, এমনদশা কর্‌ব যে শেয়াল কুকুরে তোমার দুঃখ দেখে' কাঁদবে, এখনই তোমার হয়েছে কি? এর পর তোমার ছোট ছেলেকে একদিন গলা টিপে মার্‌ব। ভালো চাও ত এখনো আধা-আধি করে' বিষয় বেঁটে দাও, এক পাই আমার ছেলের ভাগে কম হ'লে আমি তোমাকে ছাড়্‌ব না।'

স্থাবর, অস্থাবর, ব্যক্ত এবং গোপন সমস্ত বিষয়ের পুরো-পুরি আট আনা নিজের ছেলের নামে লিখিয়ে নিয়ে তবে বুড়োকে সে রেহাই দিল। গয়ায় দ্বিতীয়বার তার পিণ্ডি দিয়ে বুড়ো সপরিবারে বাড়ী ফিরে চলেছে। সবই বেশ ভালোয় ভালোয় চল্‌ছিল, হঠাৎ আজ ষ্টেশন থেকে ছ'সাত মাইলগিয়ে গরুর গাড়ী কিছুতে আর চল্‌তে চায় না। কি ব্যাপার, না বৌ পথ আগ্‌লেছে। ভেতরে জায়গা হয় না বলে' তার ছেলেকে চাকরের সঙ্গে হাঁট্‌তে দেওয়া হয়েছিল, সেই তার রাগ। বুড়ো বল্‌লে, 'বাপরে বাপ, তোমার মতো বেয়াড়া ভূতও ত আর দেখিনি, একচুল এদিক ওদিক হবার যো নেই? আচ্ছা আচ্ছা, ওকেও গাড়ীতে তুলে নিচ্ছি।'

"তবু গাড়ী নড়ে না, গাড়োয়ান গরুগুলিকে যত তাড়া দেয়, সেগুলো ডাইনে নয়ত বাঁয়ে মাঠের মধ্যে নেমে ছুট দেয়। গাড়ী-শুদ্ধকে উল্টে দেবার উপক্রম। বুড়ো বল্‌লে, 'পথ ছাড়্‌না সর্ব্বনাশী,আবার কি চাই তোর?' না, অর্দ্ধেক রাস্তা এসে 'গাড়ীতে তুলে নিচ্ছি' বল্‌লে হবে না। সকলে মিলে হেঁটে আবার সুরুর জায়গায় ফিরে যেতে হবে, সেইখান থেকে তার ছেলেকে গাড়ীতে নিয়ে খুড়ি বলে' আবার নূতন করে' যাত্রা কর্‌তে হবে। তাই তারা ছ' মাইল হেঁটে আবার ষ্টেশনে ফিরে চলেছে।

"কথায় কথায় অনেক দূর এগিয়ে এসেছিলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে নিজের পথ ধর্‌লাম। কিন্তু সেই খোলা দিনের আলোতেও নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পথ চল্‌তে বারবার আমার গা কাঁটা দিয়ে দিয়ে উঠ্‌ছিল।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর জীবন বল্‌লে, "বৌটিকে তার শ্বশুর ছাড়া আর কেউ কখনো চোখে দেখেছে?"

সমর বল্‌লে, "তা আমি জিজ্ঞেস করিনি, কথার ভাবে মনে হ'লো বুড়ো একলাই তাকে দেখ্‌ত এবং একমাত্র সে-ই তার কথা শুন্‌তে পেত।"

জীবন বল্‌লে, "হয়েছে। বৃদ্ধের অপরাধী মন তাকে নিয়ে এ একটা খেলা খেলেছে মাত্র, ভূতটুত বাজে। একটা কিছু শাস্তি না পেয়ে এবং কৃত-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না করে' তার নিজেরই আত্মার তৃপ্তি ছিল না, মনের কাছে একটা বৌয়ের ভূত দাঁড় করিয়ে নিজের মনকে সে ফাঁকি দিয়েছে।"

আমি বল্‌লাম, "হয়ত ফাঁকিটা সে নিজেকে দেয়নি, নাতির প্রতি সুবিচার কর্‌বার ইচ্ছা তার ছিলই, গৃহিণীকে ভয়টা ছিল তার চেয়ে বেশী, এবং আগাগোড়া ব্যাপারটা গৃহিণীকে ফাঁকি দেবার জন্যেই সে stage manage করেছে।"

সতীন বল্‌লে, "কিন্তু অত্যাচারগুলো?"

জীবন বল্‌লে, "সমর নিজে সেগুলি চাক্ষুষ করেনি, সুতরাং সেগুলি আমাদের আজকের আলোচনার বাইরে।"

আমি বল্‌লাম, "আমি একটা গল্প জানি সেটা আগাগোড়াই আর-একজনের কাছে শোনা, কিন্তু এমন ভয়ানক—"

"শুনব না, শুন্‌তে চাই না" "ordor, order" বলে' সকলে এক সঙ্গে কোলাহল করে, উঠ্‌ল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বঙ্গ-সাহিত্য

শ্রী শিবরতন মিত্র

প্রাক্‌-চৈতন্য যুগ

হিন্দু শাসনাধিকার কাল – বৌদ্ধ ও তন্ত্র-প্রভাব

(খ্রীঃ ৯ম হইতে ১৩শ শতাব্দী—অনুমান ৮০০-১২০০ খ্রীঃ)

তৃতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[ডাক ও খনার বচন—রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' —ময়ূর ভট্টের 'ধর্ম্মমঙ্গল'—গাথা-সাহিত্য (ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোরক্ষ-বিজয়)—গীতি-সাহিত্য (যোগীপাল, মহীপাল-গীতি)—চর্য্যা-পদাবলী ('চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়,' 'বোধিচর্য্যাবতার')—কাল-পরিচয়]

১। **ডাক ও খনার বচন**—অতি প্রাচীন কাল হইতে সাধারণ গৃহস্থের অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অতিপ্রয়োজনীয় বহু উপদেশমূলক শ্লোক বা 'বচন' আমাদের বঙ্গীয় সমাজে প্রচলিত আছে। এই সমস্ত 'বচন' বা চলিত কথা বা প্রবাদ-বাক্য সাধারণতঃ 'ডাকের কথা' বা 'ডাক-পুরুষের কথা'—নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি-বিশেষ এই শ্লোক বা বচন-সমূহের রচয়িতা নহে *। কত নিরক্ষর অশীতিপর প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ, কত কাল ধরিয়া, এই সমুদয় শ্লোকে বা বচনে, তাহাদের সমগ্র জীবনের সার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সার মর্ম্ম,শুভঙ্করের আর্য্যার ন্যায় সহজ কথায় মূল সূত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রবালকীটের দ্বীপ-গঠনের ন্যায় এই-ভাবে ডাক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গ্রন্থবদ্ধ হইয়া নহে—লোক-মুখে রক্ষিত হইয়া সুদীর্ঘকাল যথেষ্ট জ্ঞান-বিতরণের সহায়তা করিয়া আসিতেছে। 'ডাকের বচন' নামে প্রচলিত অধিকাংশ বচনাবলীতে মানব-চরিত্র-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা নিবদ্ধ আছে। জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ব প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ বিষয়েও জাতীয় অভিজ্ঞতার ফল এই সকল বচনে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্প্রতি নেপালে 'ডাকার্ণব তন্ত্র' নামক একখানি ডাক-বচনের সংগ্রহ-পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে, বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ, বঙ্গদেশে প্রচলিত ডাকের বচনাবলী সঙ্কলিত করিয়া, টীকা-টিপ্পনী দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল বচনাবলীর প্রাচীনত্বের, ইহাও অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের দেশে এই সকল বচন লোকমুখে প্রচলিত থাকায়, কালক্রমে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সুসংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। নেপালে রক্ষিত 'ডাকার্ণব তন্ত্রে' সংগৃহীত রচনাবলী, কালের পরিবর্ত্তন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, সংগ্রহ-কালের প্রাচীন রূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভাষা-দৃষ্টে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই সকল বচনাবলী খ্রীষ্টীয় ৮০০-১২০০ অব্দ মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে।

'ডাকের বচনে'র ন্যায় 'খনার বচনে'ও বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী নিবদ্ধ আছে। কিন্তু উভয়ের আলোচ্য বিষয় এক নহে—ডাকের বচনে যেরূপ মানব-চরিত্রের ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে, খনার বচনেও তদ্রূপ কৃষি, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও অন্যান্য নানাবিধ বিধি-নিষেধের আলোচনা আছে। এগুলিও লোকমুখে আবহমান-কাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মিহিরের পত্নী প্রখ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্যাবতী খনার সহিত এই বচনাবলীর রচনার কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না।

* কেহ কেহ অনুমান করেন—'ডাক'-নামক কোন গোপ-জাতীয় ব্যক্তি, এই জাতীয় বচনাবলীর আদি-রচয়িতা।

এই স্থলে আমরা উভয়বিধ বচনের কয়েকটি করিয়া উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ডাকের বচনে স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফল কত অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় কত সুন্দর ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে—

(১)

নিয়ড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থেকে।
ডাকে বলে এ নারী ঘরে না টেকে॥

(২)

ঘরে আখা বাইরে রান্ধে।
অল্প কেশ ফুলায়ে বান্ধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়।
ডাকে বলে এ নারী ঘর উজাড়॥

(৩)

রৌদ্রে কাঁটা-কুটায় বান্ধে।
খড়কাট বর্ষাকে বান্ধে॥
কাঁখে কলসী জলকে যায়।
হেঁট মুণ্ডে কাউকে না চায়॥
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে॥

খনার বচনে জাতীয় অব্যর্থ অভিজ্ঞতাগুলি অতি সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে—

(১)

কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা'॥
কৃষককে বল্‌গে বান্ধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥

(২)

পৌষ গরমি বোশেখ জাড়া।
প্রথম বর্ষায় ভরে গাড়া॥
খনা বলে শুনহে স্বামী।
শ্রাবণ ভাদর নাইকো পানি॥

(৩)

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কান্ধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ভাগ্য হাভাত॥

(৪)

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী, শুন পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফিরে, কিন্‌তে না পান ধান॥

২। 'শূন্য পুরাণ'—আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতে বাহ্যতঃ অপসারিত হইলেও, বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতে ধর্ম্ম-পূজা রূপে ইহার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময় সমগ্র গৌড়-বঙ্গে মহাযান সম্প্রদায়-ভুক্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্য্যগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইলে, অসাধারণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন হাড়িপা, কানিপা, রামাই প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

এই মহাযান সম্প্রদায়-ভুক্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের মধ্যে নানা দেবদেবীর উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে তাহারা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ত্রি-রত্ন—'বুদ্ধ', 'ধর্ম্ম' ও 'সঙ্ঘ' মধ্যে, 'ধর্ম্ম' পুরুষ রূপে এবং 'সঙ্ঘ' রমণী-মূর্ত্তি রূপে কল্পনা করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির পার্শ্বে স্থাপিত করিয়াছে। ক্রমে 'ধর্ম্ম', স্বতন্ত্র দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তন্মাহাত্ম্য সূচক গ্রন্থ ও পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হয়। তদবধি বৌদ্ধগণ, আপনাদের ধর্ম্মকে 'সদ্ধর্ম্ম' ও সম্প্রদায়কে 'সদ্ধর্ম্মী' আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে।

'ললিত-বিস্তর' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে 'ধর্ম্ম-চক্র' বা ধর্ম্মপ্রচার-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের অপর নাম—'ধর্ম্মরাজ' এবং বুদ্ধের বাক্য বা ধর্ম্ম-নীতি 'ধর্ম্ম' নামে পরিচিত। আবার ধর্ম্ম শব্দে দৃশ্যমান বস্তুও বুঝায়। এদিকে, মহাযান সম্প্রদায়-ভুক্ত বৌদ্ধদের মতে দৃশ্যমান বস্তু মাত্রই—'শূন্য'। তাই, ধর্ম্মের রূপ 'শূন্য' বা নিরাকার—প্রস্তরাধারে তাহার পূজা হইয়া থাকে মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে রামাই পণ্ডিত, ধর্ম্ম-পূজা-

পদ্ধতি প্রচলনের আদি গুরু বা পাণ্ডা। ইনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্ত্তী ময়নাপুর ও চাঁপাতলার মধ্যে 'হাকন্দ' নামক স্থানে সাধনার সিদ্ধিলাভ এবং পরিশেষে মোক্ষলাভ করেন। আশী বৎসর বয়সে বিবাহ করিলে ধর্ম্মদাস নামে এক পুত্র জন্মলাভ করেন। ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র। ইঁহাদের বংশধরগণই ধর্ম্মপূজকগণকে, পূজার অধিকারদানচ্ছলে 'তন্ত্র-দীক্ষা' প্রদান করেন এবং ইঁহারাই ময়নাপুরের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মরাজ যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পুরোহিত।

রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার প্রধান পণ্ডিত বা প্রবর্ত্তক রূপে সাধারণতঃ পরিচিত হইলেও, আমরা সমকালে বর্ত্তমান চারিজন প্রধান পণ্ডিতের নাম প্রাপ্ত হই। ইঁহাদের মধ্যে সেতাই পণ্ডিতের অধীনে ৫০০ গতি, নীলাই পণ্ডিতের অধীনে ৬০০ গতি, কংসাই পণ্ডিতের অধীনে ১২০০ গতি এবং রামাই পণ্ডিতের অধীনে ১৬০০ গতি ছিল। এতদ্ব্যতীত এই চারি পণ্ডিতের অধীনে কোটাল এবং ঘটদানী বা আমিনি ছিল—

সত্তিজুগে দিল সাঁঝা বসুএ আমিনি।
সেতাই পণ্ডিত তথা করএ সঙ্খর ধ্বনি॥
তেতাযুগে সাঁঝা দিল চরিএ আমিনি।
নীলাই পণ্ডিত সেথা দেএ সংখ ধ্বনি॥
দাপরেতে সাঁঝা দিল গঙ্গা যে আমিনি।
কংসাই পণ্ডিত সেথা করেন সংখ ধ্বনি॥
কলিযুগে সাঁঝা দিল দুর্গা যে আমিনি।
রামাই পণ্ডিত সেথা করেন সংখ ধ্বনি॥
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
সোল সঅ গতি দেয় জঅ জঅকার॥
সাঁঝার জাল গতি ভাই সাঁঝাএ দেহি মন।
সাঁঝার বেনে সাঁঝা দিলে তুষ্ট নিরঞ্জন॥
গাইল পণ্ডিত রাম ধম্মপদ সার।
গাজন সহিত দেয় জঅ জঅকার॥

('শূন্য পুরাণ'— পৃঃ ৮৬ ৮৮)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের উল্লেখ রহিলেও, "এই চারিজন ধর্ম্ম-পণ্ডিতই একই সময়ের লোক হইতেছেন। যেখানে বেশী ধুমধামে ধর্ম্মপূজা হইত, সেখানে চারিজনেই স্ব-স্ব দলবল লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট দিকে আসন পাইতেন। সেতাই পশ্চিমে, কংসাই পূর্ব্বে, রামাই উত্তরে এবং নীলাই দক্ষিণে অধিষ্ঠিত হইতেন। তাঁহাদের কোটালগণও ঐরূপ স্ব-স্ব দিক্ রক্ষা করিতেন। এই পূর্ব্ব-প্রথা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ময়নাপুর ও জামালপুরের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোৎসবের সময় ঐ সকল নিয়মপালনের কথা শুনা যায়।" ('শূন্য পুরাণ'—ভূমিকা ৪/০)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাযান সম্প্রদায়-ভুক্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের মূলমন্ত্র—শূন্যবাদ। হিন্দুগণের ন্যায় বহু দেবদেবীর উপসনাও এই সম্প্রদায়ের আচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ। রামাই পণ্ডিতই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং এই "শূন্যবাদ" ও "ব্রহ্মজ্ঞানবাদ" প্রচারোদ্দেশে গদ্য-পদ্যময় "শূন্য পুরাণ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।* এই 'শূন্য পুরাণই' ধর্ম্মপূজার আদি গ্রন্থ। ঘনরাম প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গলের কবি, এই গ্রন্থকে 'পণ্ডিত-পদ্ধতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে এখনও উত্তররাঢ়ে প্রায় সর্ব্বত্র ধর্ম্মের 'গাজন'-উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থখানি একান্নটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে, পাঁচটি উপবিভাগে, 'সৃষ্টি পত্তন' অর্থাৎ শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন ধর্ম্ম হইতে কিভাবে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইল, তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশটি অধ্যায়ে ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গাদি বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি-পত্তনের প্রথমাংশ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥

* এই গ্রন্থখানি, ইতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী ও গ্রন্থকারের জীবনী সহ, বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১৩১৪ সাল)। উদ্ধৃত অংশসমূহের পৃষ্ঠাঙ্ক এই গ্রন্থ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে, গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইবে। লেখকের 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' নামক চরিতাভিধান গ্রন্থে প্রত্যেক গ্রন্থকারেরই বিশদ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পুজিবাক দেহ।
মহাশূন্ত মধ্যে পরভুব্ আর আছে কেহ॥
রিসি যে তপসী নহি নহিক বাম্ভন॥
পাহাড় পর্ব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥
বার বরত নহি ছিল রিসি যে তপসী।
তীখ থল নহি ছিল গঙ্গা বারানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার॥
দশদিক্‌পাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন॥
চারিবেদ নহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার।
জীবজন্ত নহি ছিল ন ছিল বিম্বপাত।
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ॥
শূন্যত ভরমন নরভুব্ শূন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মাআধর॥ (পৃঃ ১-২)*

'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থ হইতে রচনাদর্শ স্বরূপ, উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে প্রাচীন কালের রচনার ধারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

অথ বারমাসি

কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্থ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কম্নি †। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি। সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাশ।—(৬৯ পৃঃ)

অথ ধম্মস্থান

হে জঅসঙ্খ হে বিজঅসঙ্খ তুহ্মি সংখ হইএ চিরাই। তুহ্মার জলে স্নান করেন স্রীধর্ম্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্নান এনখিম্ব কৈসের পাবন সইতের পাবন সবল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসা ঞী ভকতবৎসল। সুবন্নের কোদাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল। জটার কুলে গে ন নীর যে নীর লইআ দসমন্য গতি বাখানি। ব্রহ্মা হইলেন পণ্ডিত বিষ্ণু হইলেন কম্নি—মহাদেব মেলি করেন জলপাবন। মূল পাবন স্থল পাবন গোষ্ঠী পাবন ছায়া পাবন পন্ডিত পাবন উত্তর দক্ষিন পুব পশ্চিম পাবন।—(৮৪ পৃঃ)

দেবীর মনঞি।‡

নম সত্ত সত্ত করতার
নিরঞ্জন নৈরাকার॥
উদআস্তি হইলেন গোসাঞি সুন্নর সঞ্চার।
ভেদি নহি ভিনে সেই করতার॥
অহিকার বিকার ধম্ম ধবল মুর্ত্তি।
ধবল বন্নর ধম্ম করিনা আকার স্থিতি।

নকারে নমো নিরঞ্জন। অকারে নমো বম্ভা। সকারে নমো বিষ্ণু। মকারে নমো মহাদেব। অঅ নামে সিব শক্তি ভঅতাবন অনাদি জুগপতি। নিসকলস্তিরূপ সুন্নধর। তাহারে ভজে জত অমর॥

হর পাপ বিমোচন।
সার করেন নিরঞ্জন॥
রামাইর বাবা সিদ্ধ।
ভকতা বর দেহ অনান্দ॥

* দেহারা=মঠ; পুজিবাক=পূজা করিবার জন্য; আঁবর=অম্বর বা আকাশ; ধুন্ধুকার='ধূমান্ধকার' শব্দের অপভ্রংশ; করতার=কর্ত্তা।

† ধামাৎ কম্নি=ধামাধিমানকরণিক বা ধর্ম্মাধিকরনিক। ‡ মনঞি বা মনুই=মনন।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাবল্য বশতঃ সদ্ধর্ম্মী ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণ বঙ্গীয় সমাজে ডোম প্রভৃতি অধস্তন জাতির পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-সূচক কীর্ত্তি-গাথা—'শূন্য পুরাণের' অনুকরণে রচিত ধর্ম্মমঙ্গলের গান, জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল, (তখন আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাইব) কত কত ব্রাহ্মণ কবি 'আদি-পুরাণ,' 'অনিল-পুরাণ,' 'অনাদি-মঙ্গল,' ও 'ধর্ম্ম-পুরাণ' প্রভৃতি নামে 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' বা 'গৌড়-কাব্য' রচনা করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট পরিপুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

কণ্ঠস্বর

শ্রী মমতা মিত্র বি-এ

তোমারে দেখিনি আজো; তব কণ্ঠস্বর
ধরিয়া মানসী মূর্ত্তি মোহন মধুর
আশ্রয় পেয়েছে সখি, অন্তরেতে মম
প্রতিপদ-সাঁঝে ভীরু চন্দ্রোদয় সম।
নাইবা দেখিনু চোখে, কণ্ঠস্বর সাথে
পরিচয় হোক শুধু তোমাতে আমাতে;
আমার যা-কিছু আছে, যত সাধ-আশা,
তোমারই নিবেদিব—সব ভালবাসা।
তোমারে চেনার বুঝি শেষ কোথা নাই,—
নিত্য নব-নব রূপে রসে দেখা পাই;
নিজেরে রঙালে রঙে কুহক-তূলতে।
অন্তর-রহস্য-দ্বার না পারি খুলিতে!
বিমুগ্ধ শ্রবণে মোর তব কথা আজি
মধুর করুণ সুরে উঠিতেছে বাজি'।

নানা কথা

আরুইন অর্ব্বাচীন নহেন

সাধু আরুইন-কৃত শান্তি-সন্ধিকে প্রতীচ্য ভোগ-বাদীর দল পূর্ণ সমর্থনের সহিত যে গ্রহণ করিতে পারে নাই, আক্ষিপ্ত ভোগ যে মিঃ উইনষ্টন্ চার্চ্চহিলের মুখে কিরূপ উদ্ধত বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু সুখের বিষয়, চিন্তাশীল ইংলণ্ড আরুইনকে অর্ব্বাচীন মনে করেন নাই। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'স্পেক্‌টেটর' বলেন, "কংগ্রেস-হীন আপোষ-আলোচনাই অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ—আয়র্লণ্ডীয় আপোষে 'সিনফিন'কে অস্বীকার করিবার মতই।" স্পেক্‌টেটর এই বলিয়াও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'আইরিশ কন্‌ভেন্‌শনে'র প্রাক্কালে (১৯১৯) আয়র্লণ্ড যদি আরুইনের মত **সাধু ও ধীমান** ব্যক্তিকে লাভ করিতে পারিত তাহা হইলে তখন সেখানে ঐরূপ শোচনীয় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া আতঙ্কের উদ্রেক করিত না।

আমরা সাধু **সম্রাট প্রতিনিধিকে** আবার এই বলিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, সত্যই তিনি ইংলণ্ডকে আলেয়া হইতে **আলোকে** উত্তীর্ণ করিয়াছেন।

*

স্বরাজের সংজ্ঞা

সম্প্রতি সন্দিগ্ধ কোন কোন সাংবাদিক-জিজ্ঞাসুকে মহাত্মা গান্ধী "ভারতীয় পূর্ণ স্বরাজের" সংজ্ঞা নির্ণীত করিয়া দিয়াছেন এইরূপ :—পূর্ণ স্বরাজ অর্থ পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন বর্ত্তমান সভ্যদেশ-প্রচলিত ছাপমারা স্বাধীনতাকে ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা যায় না। ইহাকে অন্তর্নিয়ন্ত্রিত বা আত্মিক শাসন বলা যাইতে পারে—ইংরাজীতে যাহার পরিভাষা এখনও সৃষ্ট হয় নাই। অন্যজাতি-নিরপেক্ষ সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতা ইহা নহে। ইংলণ্ডও এই স্বরাজমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু মাণ্ডলিকদিগকে পরস্পর পরস্পরের হিতেচ্ছু হইয়া ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটির কথা আমাদিগের মনে পড়িতেছে—

"হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

*

সভ্যতা ও সাধনা

সভ্যতা - সিভিলিজেশন ; সাধনা—কাল্‌চার। সাধনা-হীন সভ্যতা বাঞ্ছনীয় নহে। "পর-অশন-বসন-ভূষণ-ভাষণ"-রূপ তথাকথিত সভ্যতার প্রবাহে জাতীয় বৈশিষ্ট্য যদি কোন জাতি হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে জাতি কদাচ স্বরাজ লাভ করিতে পারে না—কেহ সাধিয়া স্বাধীনতা দান

করিলেও। ইতিহাসে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। রোমক সভ্যতার চাপে একবার বৃটন জাতিরও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। রোমক শাসন হইতে মুক্ত হইয়াও হৃতবৈশিষ্ট্য বৃটন 'এঙ্গেলস' ও 'স্যাক্সন'গণের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষায় উপমা দিয়া বলা যায়,—খাঁচা খুলিয়া উড়াইয়া দিলেও 'খাঁচার পাখী' ফিরিয়া আসিয়া খাঁচায় প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের "খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে"—কবিতাটি পড়িলেও ইহার চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে।

সম্প্রতি 'ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স' বা 'ভারত ব্যবসায়ী-সংঘের' সভায় মহাত্মা গান্ধী প্রকারান্তরে এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যে ভারতের বর্ত্তমান কঠোর আত্মিক তপস্যা, ইহা শুধু ভূম্যধিকার বা প্রভুত্ব-অর্জ্জন নহে;—স্বরাজের গূঢ়ার্থ হইতেছে, কাল ও বংশ-পরম্পরাগত জাতীয় সাধনার পরিপুষ্টি ও পূর্ণ প্রকাশের প্রকৃত অধিকারলাভ।

মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সত্যই আমরা ভারত-আত্মার মূর্ত্ত স্বরূপকে দেখিতে পাইতেছি। 'ভারত ভাগ্য-বিধাতা'র জয় হউক!

*

স্ব-শিল্প রক্ষায় অনুরাগ

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় 'কটন্ স্পিনার্স এণ্ড্ ম্যানুফেক্চারার্স এসোসিয়েশন' বা 'কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায়ী-সংঘ' বলিতেছেন যে, 'শান্তি-সন্ধি'র পর যেন বয়কট আরও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে—যাহার ফলে লাঙ্কাসায়ারের অবস্থা শোচনীয়তার শেষপাদে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমাদের মতে, বয়কট বোধ হয় ইহার প্রকৃত কারণ নহে,—দেশীয় শিল্পের রক্ষণ ও প্রবর্ত্তনই ইহার মূল কারণ। যে নিজস্ব গৃহশিল্প প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, গৃহস্বামীর দৃষ্টি আজ তাহারই উপর পড়িয়াছে। সুহৃদ্ ইংলণ্ডের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য, এইজন্য ভারতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ ও প্রকাশ করা, এবং সম্ভব হইলে সাহায্যও করা। আমরা **ভারত গবর্ণমেণ্টকেও** এজন্য অনুরোধ করিতেছি।

*

স্ব-ভাষণ

নিজের শিল্প-রক্ষায় দেশ যেমন আজ মনোনিবেশ করিয়াছে—স্বকীয় ভাষার প্রতিও তাহার সেইরূপ মনোযোগ ও অনুরাগ অত্যাবশ্যক। এক বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ আজ যেন সে দিকে একটু মনোযোগ দিয়াছে বলিয়াই মনে হয়—যদিও তাহা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। সম্প্রতি পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত ভারতীয় বাগ্মী কেহ কেহ বিদেশী ভাষায় বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও দেশী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙালী পাণ্ডিত্যাভিমানীর দল এখনও পর-ভাষণের মোহ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তিনি ঘরের মানুষের সহিত কথা বলিতেও বিলাতী বকুনি ঝাড়িতে অতি-তৎপর,—দেশীয় ভাষার সম্বাদপত্র ত পড়িতেই চান না। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, তিনি বাংলা ভাষায় ভালোরূপ কথা কহিতে পারেন না—কারণ তাঁহার ভাব-বহনের উপযুক্ততা সে ভাষার নাই। কেহ কেহ বা ইংরাজীর তর্জ্জমা করিয়া অদ্ভুত প্রকারের অর্থহীন প্রলাপ বকিয়া থাকেন—এবং তাহাতেই বুঝা যায় যে সত্যই তিনি মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন! অবশ্য, আমরা এখানে সমগ্রের কথা বলিতেছি না, অধিক-সংখ্যকের কথা বলিতেছি।

সম্প্রতি 'ষ্টেটস্ম্যান' পত্রিকা এ বিষয়ে বেশ একটু চিম্‌টি কাটিয়াই বলিতেছেন যে, "তোমাদের দেশের অধিক-সংখ্যক সম্বাদপত্রই ইংরাজী ভাষায় এবং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তোমাদের দেশীয় ভাষা হইতে ইহাকেই তোমরা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে কর।"

আমরা ইহার প্রতিবাদ করিব কেমন করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। ইংরাজী শিক্ষার মোহ সত্যই আমাদিগকে এইরূপ ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকে পরিণত করিয়াছে!

*

প্রীতি ও অনুগ্রহ

সম্প্রতি সম্বাদপত্রে এই সম্বাদটি পাঠ করা গেল—"রামনবমী উপলক্ষে নানা স্থান হইতে আগত অস্পৃশ্যগণকে 'চৌশালা'র (নাগপুর) সাধারণ ব্যবহার্য্য কূপগুলি ব্যবহার

করিতে দেওয়া হইয়াছে।" পাঠ করিয়া বুঝা গেল—অধিকার-দান-কর্ত্তারা ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, এবং হয় ত বা তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া ইহা সম্বাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা একটি উদাহরণ মাত্র। এবম্বিধ অধিকার দান, উন্নয়ন বা হিতসাধন এই প্রকারেরই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, দেবতা যেন উচ্চ বেদীমঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া পা বাড়াইয়া অভাজনকে পদাঙ্গুলি-স্পর্শের অনুমতি দিলেন! আমরা ভুলিয়া যাই যে, পতিতকে পাতিতে তুলিতে হইলে আন্তরিক প্রীতির প্রয়োজন—সাড়ম্বর অনুগ্রহ নহে।

ক্ষেত্রে এইরূপ অনুগ্রহই বর্ত্তমান—প্রকৃত প্রীতি নহে। সভায় বক্তৃতা, চাঁদার তালিকা প্রস্তুত করা বা চাঁদা তোলা, সহরের খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠান প্রভৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে হয় ত ত্রুটি চোখে পড়িবে না;—কিন্তু কোথায় সেই প্রীতি, যে প্রীতি সহানুভূতি ও সমবেদনা-পূর্ণ প্রাণ লইয়া সেইসব অজ্ঞ সাধারণের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিশিয়া তাহাদের সহিত একাসনে বসিয়া জ্ঞানবর্ত্তিকা জ্বালিবার পরামর্শ করে? "আমি তোমার উপকার করিতেছি"—এই ভাব থাকিলে উপকার ছাপাইয়া উপকারীর অহমিকাই ফেনোচ্ছল হইয়া উঠে।

শ্রী চন্দ্রভূষণ কর্ম্মকার (টিকরবেথা—বীরভূম)

*

নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞতা-দূরীকরণ

নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞতা-দূরীকরণের জন্য যে আজকাল কিছু কিছু প্রচেষ্টা চলিয়াছে সেই প্রচেষ্টার মূলেও অধিকাংশ

*

কৃষক, শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও চাকুরে-শ্রেণী

পল্লীর কৃষক ও সহরের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য খাঁটি হিত-প্রচেষ্টা একেবারে বিরল নহে। কিন্তু ভদ্র চাকুরে-

শ্রেণীর দিকে 'অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত' ব্যতীত কষ্টমোচনের প্রকৃত প্রয়াস কিছুই হয় নাই—যদিও তাহাদের দুর্দ্দশাই সব চেয়ে শোচনীয়তম। প্রভুদের নিকট আবেদন নিবেদন অরণ্যে রোদনের মতই—কারণ প্রভুত্ব মানুষকে স্বার্থপর ও অন্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিদেশী প্রভুর তুলনায় দেশীয় প্রভুদের হৃদয়হীনতাই সমধিক। হয়ত ইহা পরাধীন জাতির দাস-মনোভাবের ফল। অধিক কাজের

শাসন ও পালন

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বা শাসক সম্প্রদায় সাধারণতঃ বেত্রপাণি গুরুমহাশয়ের মত দেশের শাসনকার্য্যেই অনন্ত-ব্রতী হইয়া থাকেন—পালনকার্য্যের দিকে কটাক্ষমাত্র না করিয়া; অথবা মনোযোগী ছাত্রের মত রুটিন-মাফিক মার্কা-মারা পালনের ছকে দাগা বুলাইয়া যান। কিন্তু স্বচক্ষে

শ্রী অনুকূল মাহারা (শিউড়ী—বীরভূম)

বিনিময়ে অল্প মূল্যদান ইহাত স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার,—কিন্তু সেই মূল্যও নিয়মিত ভাবে প্রদান করিতে প্রায়শঃই তাঁহারা কুন্ঠিত; তারপর মনের আনা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আরদালি বা বেয়ারার অধিকার হইতে মননশীল কর্ম্মীর স্থান অধিকতর সম্মানজনক নহে। অর্থাৎ, শক্তিমান প্রভু বাঘ ও গরুকে একঘাটে জল খাওয়াইয়া থাকেন।

*

দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহা দূর করিবার অবসর তাঁহারা পান না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে,—এবং তাহাতেই বুঝা যায় যে শাসকগণ পালনকার্য্যে ব্রতী হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার তাঁহারা করিতে পারেন—সাধারণ দেশপ্রেমিক সংস্কারকদের চেয়েও সহজে ও সুন্দর ভাবে। আমরা এখানে এইরূপ একটি আদর্শ জনহিতৈষী শাসকের কথা বলিতেছি—ইনি বর্ত্তমান বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস। আমরা নিজের মুখে

এখানে আর কিছু বলিব না। 'বীরভূম বার্ত্তা' বলিতেছেন—"বীরভূমে সম্প্রতি এমন একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছেন যাঁহার সকল দিকেই সমান দৃষ্টি, সমান আগ্রহ এবং সমান তৎপরতা—শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, সকল বিষয়েই তিনি বীরভূমকে উন্নত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমে যাহাতে কর্ম্মপ্রবলতা বৃদ্ধি পায় সে দিকেও যেমন তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি আছে, আবার বীরভূমের লোক যাহাতে আধিব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাস্থ্যবলে বলীয়ান হইতে পারে সে দিকেও তিনি তেমনি আন্তরিক যত্ন লইতে ক্রটি করিতেছেন না—" ইত্যাদি।

প্রত্যেক জেলা যদি এইরূপ মহাপ্রাণ শাসকের সাহচর্য্য লাভ করিত তাহা হইলে আর দেশের দুঃখ ছিল কি!

পল্লী-প্রতিভা

বাঙালীর প্রতিভা নাই—একথা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন দেশসমূহে ব্যক্তি-প্রতিভা যেরূপ বিচিত্রভাবে সহজে ব্যক্ত হইয়া উঠে, এখানে তাহার নিতান্ত অভাব। প্রধান কারণ—দৈন্য,স্বাস্থ্যহীনতা এবং রাষ্ট্রের সাহচর্য্য ও সহযোগিতার অনমুকূলতা। কিন্তু এখনও বাংলার অখ্যাত পল্লীর অজ্ঞাত অন্ধকার কোণে অনেক প্রতিভার প্রদীপ উৎসাহের তৈলাভাবে অনাদরে নিভিয়া যাইতেছে। আরও, এমন চক্ষু অল্পই আছে যাহার দৃষ্টিপাত ঐ সকল মৃণ্ময়-প্রদীপকে আবিষ্কার করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয় সম্প্রতি এইরূপ দুইটি পল্লী-প্রতিভাকে লোক-লোচনের সম্মুখে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। প্রথম—১০০০ দীপ-শক্তির ডেলাইট (পেট্রোমাক্স ল্যাম্পের অনুরূপ) ল্যাম্প ও ৬০০ দীপ-শক্তির টেবল্‌ল্যাম্পের নির্ম্মাতা শ্রী চন্দ্রভূষণ কর্ম্মকার। নির্ম্মাতা এইগুলির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অংশও স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই ল্যাম্পগুলি বিদেশী ল্যাম্প হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। কর্ম্মকারের বাড়ী বীরভূম জেলার টিকরবেথা গ্রামে।

দ্বিতীয়—পোষ্টার ও প্ল্যাকার্ড-লিপিকার শ্রী অনুকূল মাহারা। লিপিকার কষ্টে সৃষ্টে লিখিতে পড়িতে পারে মাত্র। কিন্তু তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে, দৃষ্টি ও তুলিকা-দক্ষতায় সে সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে পোষ্টার, প্ল্যাকার্ড প্রভৃতি লিখিতে পারে—ছাপাখানার হরফ হইতেও শোভন বর্ণবিন্যাসে (চিত্র-সংলগ্ন লেখাগুলি শিউড়ী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল)। মাহারার বাসস্থান—বীরভূমের শিউড়ী সহরে।

স্যানাটোজেন

গ্রীষ্মকাল আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার নরনারী স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় কষ্টভোগ করেন। ইহাতে শারীরিক বলহানি হয়। এই বলহানতা রোধ করিবার জন্য অনেকে অনেক ঔষধ এবং উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে শক্তি প্রদান করিতে পারে এরূপ কোন বলকারী খাদ্য এই সময়ে খাওয়া দরকার। স্যানাটোজেনই (Sanatogen) এইরূপ দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল করিয়া থাকে। সমস্ত পৃথিবীর প্রায় ২৪ হাজার ডাক্তার ইহাকে আশ্চর্য্যরূপ স্নায়ু এবং স্বাস্থ্য-গঠনকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এবং আমাশয় হইতে আরোগ্যকালীন শরীরে বলবিধানের জন্য ইহা নিয়মিত সেবন করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কারণ স্যানাটোজেন (Sanatogen) রক্ত, মাংস এবং অস্থি-বিধানের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা প্রদান করিয়া থাকে। সকল জাতির লোকই স্যানাটোজেন সেবন করিতে পারে। কারণ প্রস্তুতকালীন ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

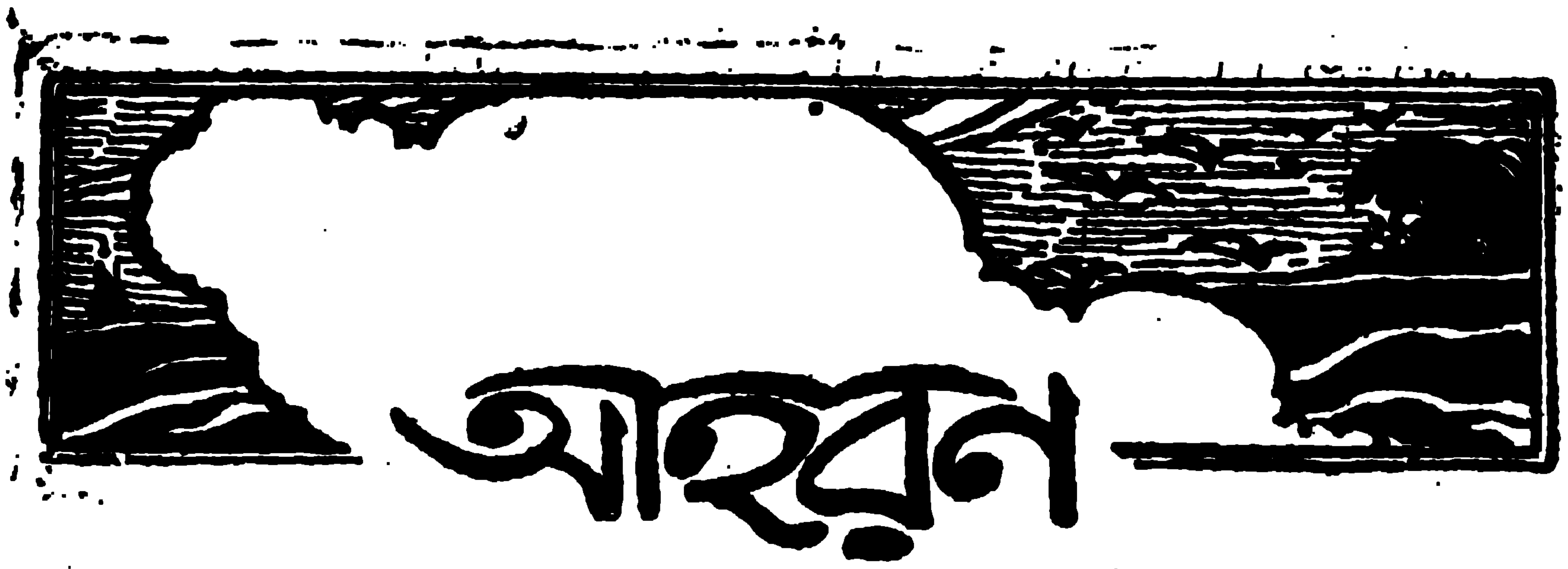

রাজার দুলাল বৈরাগী হ'ল

শ্রী মনোজ বসু

গাঙের কিনারে বেলা ডুবু ডুবু! ঝরা কামিনীর বাসে
হায়, অবেলার রাজ-ঝিয়ারীর তন্দ্রা নামিয়া আসে।
আঁধার ঘনালো ঘন বাঁশ বনে, বন ছেড়ে সে আঁধার
দাঁড়ালো নিরালা শেষে বটছায়ে শ্মশানঘাটার পার,
শেষে সে আঁধার চুপি চুপি হায় পশে গিয়ে কার প্রাণে?
রাজার পুত্র কাঁদিল না, শুধু দুলালীর আঁখি টানে।
রাজার ছেলে সে রাজককন্যার টানিছে নলিন-আঁখি
আর বলিতেছে—"আমারে একেলা ফেলিয়া পালালে
না কি?"
যে দু'চোখে হাসি নাচিত সদাই—হায়, চোখ খুলিল না,
শ্মশানঘাটায় বেলা ডুবে যায়, ছড়ায়ে আলোর সোনা!

রাজার পুত্র কাঁদিল না, বলে—"আনিব সোনার কাঠি,
আমার সোনার পুতলী আবার জিয়াইব পরিপাটী—"
দিশা নাই—ছুটে শাঙনের মেঘ সারা ভুবনের মাঝ—
মনের কথার সাক্ষী কেবল শ্মশানের বটগাছ।
রাজার দুলাল মাটির ধুলায় সব ছেড়ে বৈরাগী—
হায়, দুশ্চর এ কি তপস্যা ঘুমন্ত প্রিয়া লা'গি'।
এ কেমন ধারা, তবু সে কাঁদে না—বিশুষ্ক দু'নয়ান—
বড় ব্যথা বুকে বাজে, তাই আরো জোরে জোরে গায় গান।

আজি সে সোনার কাঠি পাইয়াছে কিন্তু সেজন নাই,
সোনার বরণী শ্মশানের ঘাটে কবে হ'য়ে গেছে ছাই।
প্রিয়া নাই— তবু ঐ সে ছুটিছে সোনার কাঠিটি হাতে,
কোথা? সবখানে। পথ ঠিক নাই— ঘুম নাই
আঁখি-পাতে—
কত গাঁয়ে গাঁয়ে, বিলে, আল্-পথে, উলুর কুটীর মাঝ,
আর দীঘি-পাড়ে দীঘল ছায়ায় ছুটিছে রাজাধিরাজ।
প্রিয়া মরিয়াছে, আর সে দেখিল বাংলার ঘরে ঘরে
নারী মরিয়াছে, নারী-কঙ্কাল সারি সারি আছে পড়ে'।
যারে পায় তারে ছোঁয়ায় সে তার হাতের সোনার কাঠি,
সোনার সীতারা উঠিয়া দাঁড়াল বাংলার মাটি ফাটি'।
এক নারী গেল, তাহারি ধেয়ানে কোটি নারী পায় প্রাণ,
রাজার পুত্র শোকেতে কাঁদে না—জোরে জোরে গায় গান।

মড়া জিয়াবার নেশায় পাগল, তার কি নজর আছে
কোটি নারীদের মাঝখানে কবে তারো প্রিয়া জাগিয়াছে?
তিনি বেঁচেছেন। সতীর মূরতি দেখে এনু দূর গাঁয়ে,
গেঁয়ো মেয়েদের সঙ্গে মিতালি ঘন বন-প্রচ্ছায়ে।
তোমার প্রিয়ারে চোখে দেখে এনু, শব-সাধনার ঋষি!
পাতার কুঁড়ের পাশে ঝিঁঝি ডাকে—আঁধার
নিশুতি নিশি—
পিদিম-আলোর পল্লীর বধূ সিলাই করিছে কাঁথা,
আর মনে মনে গুন্ গুন্ করে তোমাদের প্রেম-গাথা।
আমি দেখে এনু, গাঁয়ে সাঁঝ নামে—শাঁখ বাজে ঘরে ঘরে—
তোমার প্রিয়ার ছবিটির আগে মেয়েরা প্রদীপ ধরে।

এক বিধবারে হাসিতে দেখিনি, দু'চোখ রহিত ভরি'—
তব প্রিয়া তার চোখ মুছালেন—সে যে তাঁর সহচরী।
তোমার হিয়ার কমল আজিকে একেলা তোমার নয়,
আমি দূর গাঁয়ে কুটীরে কুটীরে পেয়ে এনু পরিচয়।
সতী-হারা শিব, তুমি যে ছড়ালে বরতনু প্রেয়সীর,
সারা বাংলায় ছড়াইয়া উহা রচিয়াছে মন্দির।
দেখে আসিলাম, যেখানে পড়েছে সতীদেহ এক কুটি,
অপরূপ-রূপ শতদল হ'য়ে অমনি উঠেছে ফুটি'।
আজি দেখিলাম, দেশ জুড়ে' তব বিরহের গাঙ চলে,
তার দুই কূলে কত কত ফুল ফুটিয়াছে দলে দলে।
আমি দেখি আর বিস্ময় মানি, উল্লাসে নাচে প্রাণ,
একি অপরূপ তাজ গড়িয়াছ হে বিরহী শাজাহান!
নীলাকাশ চিরি' শির তুলি' নাহি দম্ভের ভঙ্গিমা,
শক্ত পাথরে ঘেরি' চারিধার গড়ো নাই এর সীমা;
এ তাজের কোলে চুপে চুপে যেই অশ্রু-যমুনা বয়
তার ক্ষীণধারা যাত্রীরা কেহ দেখেনাক নিশ্চয়।
তোমার মতন বুক হোলো যার ব্যথার আগুনে খাক,
তব মন্দিরে আসুক অভাগা, আসিয়া হাসিয়া যাক;
এসে দেখে যাক বুকে শোক নিয়া হাসা যায় মন খুলে',
অশ্রু-পিছল শ্মশানঘাটাও ঢাকা যায় ফুলে ফুলে।
হে মহৎ, তুমি শাওনের মেঘ বক্ষে বাদলরাশি—
বাদল কখনো ঝরিতে দেখিনে, দেখি ঝিঝিকের হাসি!*

—বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৩১

* সরোজনলিনীর স্মৃতি-অবলম্বনে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের উদ্দেশে।

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(২৪)

সকল সভ্যতা-সংস্পর্শ হইতে দূরে, বন্ধু-বান্ধব-বর্জ্জিত নির্জ্জনবাস, প্রথমে যেমন অশোকের অসহ্য ঠেকিয়াছিল, ক্রমশঃ আর সেরূপ মনে হইতেছিল না। আবার এই সূর্য্যালোকিত বিশ্বে, বাঁচিয়া থাকিয়া, জীবনকে প্রকৃতির অমৃত-রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া, আশা-উন্মুখ প্রাণে আর-এক জনের অপেক্ষায় পথ চাওয়াতেই সে এক আনন্দ খুঁজিয়া পাইল।

আর তার পালিত পশুখাখী, গাছপালার জীবন-ধারার সহিত যেদিন সে নিজের সত্তাটি মিলাইতে পারিল—সেদিন মনে হইল, কই, পৃথিবীতে কাহারো জীবন ত ভগবান একেবারে ব্যর্থ করেন না!

আর সেই মিলিত জীবনধারার উপর মৌরীর প্রাণের রূপটি যখন প্রভাতের স্বর্ণ-রবিরশ্মির মত ঝিল্‌মিল করিয়া কাঁপিয়া উঠিত তখন অশোকের মনে যেন এক অজ্ঞাত সার্থকতার সাড়া পড়িয়া যাইত।

পশুপক্ষীর সংখ্যা অনাবশ্যক বাড়িয়া গেলে তাহাদের বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠাইতে তাহার বড় কষ্ট হইত। যে জীবন সে দিতে পারে না, সে জীবন হিংসা করিয়া নষ্ট করিতে সে অক্ষম। মাংস পাওয়াতেও তাহার মনের বিবেক ও সৌন্দর্য্য-বোধ আহত হইতে লাগিল। সে একেবার নিরামিষাশী হইয়া পড়িল। মৌরী অনুযোগ করিত, "বাবু! আপনার শরীর ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে পড়ছে। শাকভাত খেলে কি শরীর থাকে, এখানে ভালো তরকারীও পাওয়া যায় না।"

"আমার বড় কষ্ট হয় মৌরী! যে জীবগুলাকে আমি নিজের হাতে বেড়ে উঠ্‌তে সাহায্য করেছি, মানুষ হ'য়ে নিষ্ঠুরের মত তাদের মেরে ফেলে সেই মরা শরীর আমি কেমন ক'রে খাব!" কথাটা বলিতে তাহার শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত!

মৌরী আর কিছু বলে না, সে চুপ করিয়া থাকে। আগের চেয়ে সে অশোককে এখন চিনিয়াছে, তাহার চিন্তা

এবং অনুভূতি খানিকটা অনুসরণ করিতে পারে। এখন সে বেশ বাংলাও বলিতে পারিত। সন্ধ্যাবেলার এক-একদিন অশোকের সঙ্গে সে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইয়া, শিক্ষা ও আমোদ দিতে চেষ্টা পাইত। তাহার সকল মঙ্গল-কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকায় এই সহকারিণীটি অশোকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিল।

আজকাল অশোক নিজের সম্বন্ধে যেমন অমনোযোগী থাকিত, মৌরী তাহার সমস্ত ছোটখাট সুখ-সুবিধার তেমনি ছিল সতর্ক প্রহরী। তাই রাত দশটার পর তার পড়িবার আলো না নিভাইয়া উপায় ছিল না; এবং খামখেয়ালী ভাবে যখন-তখন স্নানাহার মৌরীর স্নেহ-শাসনে সংযত হইয়া আসিতেছিল। এই পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীকে অশোক কোনোদিন চাহিয়া দেখে নাই। কিন্তু তার হাতের সেবা ও যত্ন প্রকৃতির আলো-বাতাসের মত না হইলে চলিত না।

মাটির রস টানিয়া, গূঢ় জীবন-পুলকে, আকাশের আলোকের দিকে ডালপালা মেলিয়া, গাছটি প্রতিদিন একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে; তাহার সেই বৃদ্ধির মূলে কতখানি রহস্য আছে। শীতের শেষে যেদিন তার সমস্ত পাতাগুলি ঝরিয়া গেল, প্রাণের সবুজ রংহারা গাছটি দেখিয়া সেদিন মনে হইয়াছিল, জীবনটি বুঝি শেষ হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ নববসন্তের এক দিনে পত্রহারা, রিক্ত, কুৎসিত শাখাগুলির মধ্যে কোন্ রসাতল হইতে, সঞ্জীবনী-সুধার জোয়ার আসিয়া, বৃক্ষের মৃত্যুভরা মোহ-নিদ্রা ভাঙিয়া দেয়, সেই জীবন-জোয়ারটি শুষ্ক বৃক্ষের মধ্যে সরস কিশলয়রূপে বাহির হইয়া আসে, আর তাহার মধ্যে প্রাণের ঘুমন্ত বাসনারাশির মত ফুলের কুঁড়িগুলি ধীরে পাপড়ি মেলিতে থাকে—তখন মুহূর্ত্তেই আকাশ-বাতাস সেই জীবন-উন্মেষকে আপন বলিয়া বরণ করিয়া লয়। অশোক মনের মধ্যে প্রকৃতির শুশ্রূষা-শালার এই স্নিগ্ধ সেবাটি পাইতেছিল। এই মূক জীবনগুলির প্রাণের আনন্দলীলা পর্য্যবেক্ষণ করার মত বিস্ময়ে সে বুঝিতে পারিতেছিল, নিজের মধ্যে, অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে কত পরি-বর্ত্তন হইতেছে।

আর এই ভাবাহারা প্রাণীগুলি!—ওরা ত আমাদের সহযাত্রী। মৌরীর মত কথা বলিতে পারে না, কিন্তু ভালবাসা বোঝে। গরুগুলি যখন গলা চুলকাইয়া আদর লইবার আশায় গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়, গা চাটিয়া মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করে; বাহিরে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র-পাতের সময়, ভয়ে, পায়ের তলে কুণ্ডলী পাকাইয়া, ভুলো কুকুর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে,—তখন তাহাদের চোখের তারার আলোর আত্মার যে রহস্য-শিখা জ্বলিয়া ওঠে, সেই শিখা ত আমাদের মধ্যেও জ্বলিতেছে!

অশোকের হঠাৎ মনে পড়িত, আকৃতির বিভিন্নতা থাকিলেও আমরা সকলে সমধর্ম্মী। এক আগুন যেমন আর এক আগুনকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভালবাসা পাইবার গোপন, অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা সকলকেই সমভাবে চঞ্চলিত করিতেছে,—জীবনের সমবেদনায় অহরহ আকর্ষণ করিতেছে। পশু-পক্ষী, তরু-লতা, মানুষের মধ্যে সেই একই বুভুক্ষার হোমানল-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে অনাদি-কাল হইতে।

কাজের ছলে, অশোকের আশেপাশে মৌরী ঘুর-ঘুর করিয়া বেড়াইতেছে। হয়ত কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অশোকের সহিত কথাবার্ত্তা সুরু করিবে তাহারই উপায় ভাবিতেছিল। কাছে আসিয়া অকারণে কথা বলা, কোনো প্রিয় কাজ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা, কোনো প্রসঙ্গে এ চেষ্টা সুস্পষ্ট হইলে লজ্জিত মুখে মৃদু হাসিয়া স্থানান্তরে সরিয়া যাওয়া—অশোক উদাসীন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিত। প্রথমে সে বন্যবালিকার সরল প্রণয়জ্ঞাপনের লুকোচুরি চেষ্টা দেখিয়া মনে মনে হাসিত; কিন্তু শেষে আর সত্যকে মনের মধ্যে উপহাসে উড়াইয়া দিতে সে ব্যথা অনুভব করিত।

কিন্তু স্নেহ যে কখন্ কুয়াসার মত হৃদয়-গুহা হইতে উঠিয়া, বাহিরের আর্দ্রতার সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া রসভরা প্রেমের নিবিড় মেঘে পরিণত হয়, কেমন করিয়া অকস্মাৎ পরিষ্কার আকাশ আবিলতার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—কেমন করিয়া প্রকৃতির নিয়মে সে উন্মুখী ধরণীকে বৃষ্টি-ধারায় সিঞ্চিত করিয়া তার তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করে,—সে নিজেই বুঝিতে পারে না।

মাঘের শেষে অশোকের শরীর খারাপ হইল। মৌরী বলিল, "আপনি সমস্ত সকাল-ভোর মাঠে, রোদে দাঁড়িয়ে চাষার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করেন, এত হাতের খাটা-খাটুনি কি ভদ্রলোকের পোষায়? দিনকতক বিশ্রাম করুন।"

অশোক বলিল, "তা কি হবে বল্ ত? এখনি ত কাজের সময়। ও শরীরের একটু অসুখ—দু'দিনে সেরে যাবে।"

কিন্তু দু'দিনে সে অসুখ সারিল না, ক্রমেই তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। মৌরী বলিল, "দিন-কতক ছেলেদের ছুটি দিন,—বিকেল বেলা বরং খানিক ফাঁকা হাওয়ায় বেড়িয়ে আসা ভাল।" অশোক বলিল, "তুই আমার জন্যে এত অকারণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়িস্ কেন বল্ ত মৌরী! একবার ছুটি পেলে কি ওরা আর আসতে চাইবে? এমনি ওদের কত সাধ্য-সাধনা ক'রে নিয়ে আসতে হয়।"

মৌরী এবার রাগিয়া বলিল, "চুলোয় যাক ওরা! নিজের ভালো যাদের নিজের বুঝবার সাধ্য হবে না কোনোদিন—তাদের জন্যে মিছামিছি প্রাণপাত ক'রে লাভ কি?"

অশোক তাহার রাগ দেখিয়া, তাহার ক্রুদ্ধ মুখের পানে চাহিয়া, নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল—কোনো উত্তর দিল না।

তাহার হাসি দেখিয়া মৌরীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "নিজের শরীর কিসে ভালো থাক্‌বে, না থাকবে, ছোট ছেলেদের মত এ আপনি বোঝেন না। আবার কিছু বল্‌লে হেসে উড়িয়ে দেবেন! আপনাকে নিয়ে কি করি বলুন ত?"

বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া সে লজ্জিত হইল। অশোকের দৃষ্টি তাহার সঙ্কুচিত মুখের দিকে ছিল না, সুতরাং সে বুঝিতে পারিল না। সে হাসিয়া বলিল, "সেই-জন্যই ত তোর কাছে আমার শরীরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জমা রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজকর্ম্ম করি। অসুখ হ'লে তুই দেখ্‌বি; আমাকে বকিস্ কেন?"

সেদিন সকালে আর অশোক কাজ দেখিতে গেল না। বিছানায় শুইয়া মৌরীকে বলিল, "আজ আর আমার ভাত রাঁধিস নি মৌরী! শরীরটা ভারি খারাপ বোধ হ'চ্ছে—জর আস্‌ছে বোধ হয়।"

মৌরী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "কই দেখি?" বলিয়া স্নেহময়ী মাতার মত কপালে হাত দিয়া শরীরের উত্তাপ অনুভব করিয়া চিন্তিত মুখে বলিল, "তাই ত! আপনি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খান, হয়ত ঘাম দিয়ে জর ছেড়ে যেতে পারে।"

অশোকের বাংলা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারির বই পড়িয়া সেও একটু একটু রোগনির্ণয় করিতে ও ওষুধ দিতে শিখিয়াছিল। সকল বিষয়ে কৌতূহল তার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। দুজনের যুক্তিতে মিলিলে অশোক একটা ওষুধ খাইল। অশোক বলিল, "তুই ভাত রেঁধে খেয়ে নে মৌরী; আর জন-মাঝিদের, যাদের কাল আসতে বলেছিলাম তাদের যেতে ব'লে দে। বল্, বাবুর অসুখ করেছে—আজ আর কাজ হবে না।"

মৌরী তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া অশোকের শিয়রে আসিয়া বসিল।

"শেলফ থেকে ঐ বইগুলো পেড়ে দাও দিকিনি—"

সেবার কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময়ে সে চাষবাস ও পশুপক্ষী-পালন সম্বন্ধে অনেক ইংরাজি বাংলা বই আনাইয়াছিল। সেগুলির উপদেশের সহিত মিলাইয়া সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যবহার করিত।—"আজ আর না পড়লেই ভাল ছিল; মাথা ধরেছে বল্‌ছিলেন।"

অশোকের মনে পড়িল, "ও হ্যাঁ, তাইত! মাথাটা বড় কামড়াচ্ছিল।"

"কপালে একটা জলপটি দিয়ে দেব?"

"না থাক্!"

"থাক্ কেন?"

মৌরী ত্বরিতে উঠিয়া গিয়া খানিকটা অডিকলোন জলে মিশাইয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া অশোকের মাথায় জলপটি বাঁধিয়া দিল, এবং পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

অশোক সস্নেহে বলিল, "তুমি কিছু রাঁধ্‌লে মৌরী! আজ খাবে কি?"

"সে রকম ক্ষিধে নেই আজ। কালকে রাতে আপনার জন্যে যে রুটি হয়েছিল, সব ত আপনি খান নি—অনেকগুলি

প'ড়ে ছিল, সেইগুলো খেয়ে একরকম ক'রে কাটিয়ে দেব। রাঁধতে ইচ্ছে করছে না আজকে আর।"

বেশী কথা বলিতে অশোকের মাথার যন্ত্রণা হইতেছিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল- এবং পাখার ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া পড়িয়া সে স্বপ্ন দেখিল,—যেন শেফালি তাহার অসুখের খবর শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। তাহার বিশৃঙ্খল রুক্ষ চুলগুলি সযত্নে হাত দিয়া পাট করিয়া দিতেছে। তার অধোরৌষ্ঠে সে যেন কার ওষ্ঠস্পর্শ অনুভব করিল। সে কাঁদিতেছে—একফোটা গরম অশ্রুজল টপ্ করিয়া যেন তাহার মুখের উপর পড়িল। না, এ ত স্বপ্ন নয়! ঘুমের ঘোরে হাত দিয়া সে সত্য সত্যই মুখের উপর জলের আভাস পাইল। সে বিস্ময়ে নিদ্রাজড়িত আঁখি কষ্টে খুলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কই? কেউ না! মাথার কাছে কেবল মৌরী বসিয়া তেমনি পাখার বাতাস করিতেছে। অশোক মনোযোগ করিয়া দেখিল দেখিতে পাইত, তার চোখদুটি অশ্রুসিক্ত। কিন্তু তাহাকে জাগিয়া উঠিতে দেখিয়'ই মৌরী বলিল, "যাই, আপনার জন্য গরম দুধটা নিয়ে আসি।" বলিয়া পাখা রাখিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। জর-বিহ্বল অশোক ঠিক ব্যাপারটি বুঝিল না। আবার বালিশ আঁকড়াইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

সমস্ত দিনরাত অঘোর অচৈতন্যের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল, অশোক তাহা মোটে টের পাইল না। সকালের দিকে তাহার খুব ঘাম হইল, এবং শরীরের উত্তাপ অনেক কমিয়া গেল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল, যেমন আগের দিন মৌরী শিয়রের কাছে পাখাটি লইয়া বসিয়া ছিল—আজও ঠিক তেমনি বসিয়া আছে। হিমশীতল কালো হাতখানি তাহার জরতপ্ত মাথার উপর অমৃতের প্রলেপের মত বোধ হইল। সে হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের উত্তপ্ত বুকের উপর রাখিল—যেখানে জীবনের তরঙ্গিত দুঃখ-সুখ রাতদিন ধুক-ধুক করিতেছে। শূন্য ঘরের সান্ত্বনার মত নির্জ্জনতার এই মমতা মৌরী যতখানি তাহাকে প্রাণের টানে দান করিতেছে, এমন বেদনার মধ্যে সহানুভূতি জানাইবার জগতে তাহার আর কেহ নাই। অশোক তার ঠাণ্ডা হাতখানি মুখে চোখে বুলাইয়া একবার ওষ্ঠে স্পর্শ করিল, বলিল, "এখন ক'টা বেজেছে মৌরী?"

"বোধ হয় বেলা নটা-দশটা হবে। সমস্ত রাত আপনার ভালো জ্ঞান ছিল না। একটি গোটা দিন কেটে গিয়েছে।"

অশোক ফুল ভালবাসে। টিপয়ের উপর ফুলদানীতে মৌরী সকাল বেলা একগোছা শিশিরসিক্ত ফুল আনিয়া রাখিয়াছিল—যেন অশোক ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিলেই দেখিতে পায়। সেই দিকে তাকাইয়া অশোক বলিল, "সমস্ত রাত এমনি ক'রে জাগ্‌তে আছে মৌরী,—তোমারও যদি অসুখ হ'য়ে পড়ে, এই বিদেশ-বিভূঁয়ে কে দেখবে আমার? চান ক'রে খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোও গে।" মৌরী রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত মুখে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তা হোক, ওষুধ আর একদাগ আপনাকে দিয়ে আমি খেতে যাচ্ছি।"

অশোককে ওষুধ খাওয়াইয়া মৌরী চলিয়া যাইতেছিল, অশোক তাহাকে সস্নেহে কাছে ডাকিয়া তার রুক্ষ অলকে ঘেরা কপালখানিতে একটি স্নেহচুম্বন দিল। তার এ আদরের উত্তরে মৌরী কিছু বলিতে পারিল না। বিস্মিত অশোক দেখিল তার ক্লিষ্ট মুখ বাহিয়া চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অনাবৃষ্টির সময় মরুময় দেশে যেমন বৃষ্টি হইলে পিপাসার্ত্ত মাটি তাহা এক মুহূর্ত্তে শুষিয়া লয়, অশোকের আদর-কণা মৌরী তেমনি তৃষ্ণার্ত্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মন-ভূমি এত উত্তপ্ত ছিল যে তাহা তৎক্ষণাৎ বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

অন্তর্দৃষ্টি

"সকল ব্যথা রঙিন হ'য়ে
গোলাপ হ'য়ে ফুটবে—"

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

লীলার মতন সুন্দরী চট ক'রে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। রং মুখ, নাক চোখ, গড়ন পেটন কোনদিকেই তার খুঁৎ ছিল না। সারাটা দিন তার মুখের দিকে চেয়েই কাটিয়ে দেওয়া চলে। লীলার বাপ ব্যারিষ্টার, পশার মন্দ নয়, তবে অতিরিক্ত সাহেবী মতাবলম্বী হওয়ার দরুণ দিশী মহলে তাঁর বেশী আদর ছিল না। লীলাও ঠিক মেমসাহেবের মত মানুষ হয়েছিল। চাল-চলন আচার ব্যবহার সব দিক দিয়েই সে ছিল যেন একটি পাশ্চাত্য মহিলার প্রতিরূপ; কেবল অঙ্গে তার নামে মাত্র পাতলা জর্জ্জেটের শাড়ীখানা থাক্‌ত জড়ান। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মহিলারা তাকে দেখে বলতেন—"আহা, অমন দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়েটিকে ফিরিঙ্গি সাজে মাটি করেছে।" এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা উদারপন্থী তাঁরা খানিকটা মেনে নিতেন বটে তবে লীলার সব আচরণগুলি হজম করা তাঁদেরও পক্ষে শক্ত হ'ত। এক ঐ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন যাঁরা তাঁরাই লীলার সঙ্গসুখ লাভের সুযোগ পেতেন।

এ-হেন লীলার সঙ্গে যখন মোহিত বাবুর বিয়ের ঠিক হ'ল তখন সব সমাজেই একটা সাড়া প'ড়ে গেল। মোহিত বাবুর অগাধ পয়সা,—পৃথিবীর এমন দেশ নেই যা তিনি না দেখেছেন। বহুবৎসর-ব্যাপী ইয়ুরোপ ভ্রমণের পর দেশে ফেরাতে তাঁর বন্ধুরা সকলেই ধ'রে নিয়েছিল যে তিনি একজন পুরোদস্তুর সাহেব ব'নেই আসছেন। কিন্তু পূর্ব্বের ব্যবস্থার যখন কোন পরিবর্ত্তনই ঘট্‌ল না তখন তাঁর বন্ধুরা যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন সেটা বলা বাহুল্য। আবার যখন তাঁরা শুনলেন মোহিত বাবু লীলার মত মেমসাহেবকে বিয়ে করতে উদ্যত তখন তাঁরা হাস্‌বেন কি কাঁদবেন কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না।

এদিকে লীলার বন্ধুরাও এর কোন মানে খুঁজে পেল না। মোহিত বাবুর মত লোকের সঙ্গে লীলার বিয়ে? এ যে কল্পনাও করা যায় না। পলা ছিল লীলার অন্তরঙ্গ-বন্ধু ও প্রধান শিষ্যা। সে স্পষ্টই তাকে জিজ্ঞেস করলে—"হ্যাঁরে লিল, ঐ বর্ব্বরটার সঙ্গে ঘর করতে পারবি?" "লীলাও অম্নি হেসে জবাব দিলে—"তুই কোন্ যুগের মেয়ে রে? আজকালকার দিনে কেউ বুঝি ঘর করে? লোকটার অগাধ পয়সা জানিস্ তো? একা সে কত খরচ করবে? তাই আমি তাকে অনুগ্রহ ক'রে খরচ করতে সাহায্য করব।"

যা হোক, যে যা বলে বলুক, লীলা আর মোহিতের বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে গেল। বিয়ের পর মোহিতের বন্ধুরা মোহিতের মধ্যে কোনই পরিবর্ত্তন খুঁজে পেল না; এদিকে লীলার বন্ধুরাও দেখে—লীলা আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, কোন প্রভেদই হয় নি।

আজে বাজে কথা বলা মানুষের একটা রোগ-বিশেষ। নানা কথা তাই কানে আসে। মাঝে একবার শোনা গেল যে বিয়ের পরদিন থেকেই লীলা-মোহিতের মধ্যে একেবারে কথা বন্ধ। আর একদিন একঘর লোকের মাঝেই পলা লীলার খরচের হিসেব দিতে ব'সে গেল—প্যারিসের তৈরী সিল্কের "আণ্ডার ক্লোদিং"-এ তার যা খরচ হয় সেই টাকাতে অনেকে ছেলে পুলে নিয়ে অনায়াসে সংসার চালিয়ে দিচ্ছে। এর উপর জুতো-মোজার কথা ত ছেড়েই দাও। এতেও কি শেষ? হেয়ার ড্রেসারের বাড়ী "পারমানেণ্ট ওয়েভ" করাতে প্রতি মাসেই যেতে হয়, তারপর চুলে "স্যাম্পু" করানও চাই - ইউডের ওখানে না গেলেই নয়। আবার হাত "ম্যানকিওর" করানও এক পর্ব্ব। এর উপর নাচ শেখবার জন্তে তার লাগে ঘণ্টা পিছু এক গিনি। "বাথ-সল্ট", সেণ্ট

পাউডার, "লিপ-ষ্টিক্", হেয়ার লোসান, এসবের জন্যে যা লাগে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। থিয়েটার বায়স্কোপের খরচ তার খুব বেশী নয়, কারণ তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য লাভের জন্যে অনেকেই হা ক'রে ব'সে আছে। মোহিত নাকি এতে কোন বাধা দেয় না, বাধা দেবার সাহসও বোধ হয় তার নেই।

যাক্, এসব কথা কিন্তু মোহিত কানে নেয় না, সে নিশ্চিন্তমনে তার ডাইরিতে লেখে—"ফুল ফুটবে, আমার সকল ব্যথা রঙিন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠবে—"

উপস্থিত কিন্তু গোলাপের জায়গায় কাঁটারই ভাগটা বেশী ক'রে দেখা দিল।

একদিন সমস্ত কলকাতা সহরকে চম্‌কে দিয়ে লীলা বিলাত যাত্রা করল।

মোহিত-লীলার বিয়ের কথা, ঘরের কথা প্রায় পুরনো হয়ে এসেছিল; আবার চারদিকে আগুন জ্ব'লে উঠল।

মিসেস মিটারের ড্রয়িং-রুমে সেদিন মস্ত বড় মজলিস। মিসেস ডাট তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনীকে চাপা গলায় বল্লেন—"শুনেছ ভাই, লীলা মোহিতকে কলা দেখিয়ে ভেগেছে?" "গলাটা চাপতে গিয়ে স্বরটা বোধ হয় একটু অতিরিক্তই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কারণ মিসেস গুপ্টা যিনি কানে কম শোনেন, তিনিও শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কার সঙ্গে পালাল কিছু শুনেছিস্?" মিসেস ডে অনেকক্ষণ কোণ-ঠাসা হ'য়ে ছিলেন, এই ফাঁকে তিনি ব'লে উঠলেন—"সরোজিনী ত' বল্‌ছিল সে নাকি কোন এক জার্ম্মান ব্যারনের সঙ্গে গিয়েছে।" মিসেস পেন (পূর্ব্বপুরুষেরা বোধ হয় পাইন ছিলেন) হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ওডিকোলনে-ভেজা রুমালখানা সযত্নে গালের উপর বুলিয়ে নিয়ে বল্লেন—"না, জার্ম্মান ব্যারন নয়, ইটালিয়ান কাউণ্ট।"

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে সুহাসিনী সরকার দাঁড়িয়ে উঠে ভাঙা কাঁসীর মত গলা বাজিয়ে বল্লেন—"দূর, তোরা কেউ সঠিক খবর জানিস না, মড ডাইভারের লেখা "লীলামণি" নভেলখানা ত' সবাই পড়েছিস? সেইটা এবার নাকি ফিল্মড্ হবে, আর আমাদের বিখ্যাত লীলা দেবীই "লীলামণির" পার্ট নেবেন।" যেন ঠিক মধ্যস্থলে বোমা ফাটল—একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল, তারই মধ্যে বারাণ্ডা থেকে সিগারেটের ধুঁয়োর মধ্যে দিয়ে মিসেস ঘোষের চাঁচা গলার স্বর ভেসে এল—"ডাব্‌ল টু হার্টস —"

সেই রাত্রে মোহিত তার ডাইরিতে লিখল—"পাখীর ডানা ভেঙে তাকে ঘরে আটকে রেখে লাভ নেই, যাক সে উড়ে যতদূর সে যেতে চায়, তারপর যদি সে তার আপন নীড়ের প্রকৃত সন্ধান পেয়ে থাকে তাহ'লে সে এসে ধরা দেবেই। কলমটা একটা পুরনো লেখার উপর আপনি বুলিয়ে গেল—"ফুল ফুটবে, আমার সকল ব্যথা রঙিন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠবে—"

লীলা আজ মুক্ত পাখী। হাতে অনেক পয়সা, কোন দিকে কোন বাধা নেই। অল্প বয়সে বিয়ে হ'য়ে তার সব স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে, এই অভিযোগ লীলা মোহিতের বিরুদ্ধে আনে, সেই জন্যে মোহিত লীলার ইউরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। কোলকাতায়ও মোহিত লীলার খেয়ালের পথে কোন দিনও কোন বিঘ্ন ঘটায়নি তবে মোহিতের অস্তিত্বটাই লীলার কাছে বাধা স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, এখন কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট নেই। যা প্রাণ চায় তাই ক'রে সে ক'টা মাস বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে দিল। তারপর লীলার সঙ্গে এক বাঙালী যুবকের আলাপ হয়। নির্ম্মলকুমার কিন্তু আর সবায়ের মত লীলার রূপের কাছে অর্ঘ্য সা জয়ে এনে দাঁড়াল না। এ অপমান লীলা কেমন ক'রে সইবে? কত কবি তার রূপের প্রশংসা করেছে, কত চিত্রকর তার রূপের জ্যোতি তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রেছে, স্পেনদেশে না ইটালিতে এই রূপের সৃষ্টি হয়েছে এই নিয়ে কত তর্ক-বিতর্ক হ'য়ে গিয়েছে আর সামান্য এই বাঙালী যুবক কিনা মুখ ফিরিয়ে নেয়? লীলা এবার তার সব শক্তি দিয়ে নির্ম্মলকুমারকে পরাস্ত করবার আয়োজন সুরু করল।

একদিন কোন একটা পার্টিতে অনেক কৌশল ক'রে লীলা নির্ম্মলকুমারকে একলা পায়। তার সঙ্গে যেন হঠাৎ সেই মাত্র প্রথম দেখা হ'ল লীলা এই রকমই একটা ভাণ করল, তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—"আমার শরীরটা ভাল বোধ হ'চ্ছে না, দয়া ক'রে কি আমার বাড়ী পৌঁছে দেবেন?"

এইবার বাধ্য হ'য়ে নির্ম্মলকে লীলার দিকে চাইতে হবে, একবার চাইলে তার পরাজয় নিশ্চিত। নির্ম্মল তাকে বাড়ী নিয়ে গেল। পথে কোন কথাই হ'ল না। লীলা গাড়ী থেকে নেমে নির্ম্মলকে এক পেয়ালা কফি খাওয়াবার জন্যে সাদরে নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে নির্ম্মল বল্লে—"কফি আনবার প্রয়োজন নেই; আপনি আমার দেশের মেয়ে, তাই আপনাকে বল্‌ছি, এ সাংঘাতিক খেলা বন্ধ করুন। এম্‌নি ক'রে কোন্‌দিন যে কার কুপ্রবৃত্তি-গুলো জাগিয়ে তুল্‌বেন তার কোন ঠিক নেই। যেটা খেলার ছলে সুরু করেছেন সেটা শেষে আপনার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট ক'রে দেবে। সেদিন আপনাকে দেখে একজন সাহেব আর একজন সাহেবকে কি বলেছিল জানেন? সে বলে যে তার ভারতবর্ষ দেখ্‌বার সখ আর নেই, এ দেশেরই ক্যারিকেচার দেখ্‌বার জন্যে অতদূরে কে যাবে? যদি নতুন কিছু দেখ্‌বার থাক্‌ত তাহ'লে না হয় সে একবার ঘুরে আস্‌ত।...এ লজ্জার হাত থেকে আপনি আমাদের রেহাই দিন! দেশে ফিরে যান, নিজের দেশের যে অপমান কর্‌ছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করুন গিয়ে। এটা মনে রাখ্‌বেন যে, যে দেশের যা রীতিনীতি তা সে দেশেরই লোককে শোভা পায়, বাঙলা দেশের মেয়েকে কি এসব সাজে?"

লীলাকে আর বেশী কিছু শোনাবার প্রয়োজন ছিল না। শরীরের সব রক্ত এসে তার কপালের দুই ধারে হাতুড়ির মত পিট্‌তে লাগ্‌ল।

দেশে ফিরে লীলা এক গরীব আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠ্‌ল। হ্যারিসেন রোডের এক গলির মধ্যে ছোট্ট বাড়ীটি। যে ঘরটাতে লীলা আশ্রয় নিয়েছিল সে ঘরের জানালা দিয়ে বড় রাস্তা দেখা যায়। দিনরাত কেবল কোলাহল। ঘড়্ ঘড়্ ট্রাম চলেছে, তারই কোল ঘেঁসে দোতালা 'বাস'গুলো দৈত্যের মত হুহু ক'রে পথিকের ঘাড়ে এসে পড়্‌ছে। সাম্‌নে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে একটু জায়গা পাচ্ছে সেই দিক দিয়ে বোঁ ক'রে দু-একখানা ট্যাক্সি বেরিয়ে পড়্‌ছে, তাদের প্রাণের মায়া নেই, জেলে যাবার ভয়ও নেই। এর উপর রিক্সা, গরুর গাড়ী ত' আছেই, তারপর চলন্ত মানুষের ভীড়। পুরুষ স্ত্রীলোক, সাধু সন্ন্যাসী, ছেলে বুড়ো কেউই বাদ যায় না। এত লোক এত মানুষের সাড়া, তবুও লীলার মনে হয় পৃথিবীতে সে একা। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, হালভাঙা নৌকা কোথায় গিয়ে ঠেক্‌বে?

পৃথিবীতে তার কাছে যেগুলি ছিল সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে গর্ব্বের—রূপ, ঐশ্বর্য্য, যৌবন, পাশ্চাত্য শিক্ষা, এরা কিন্তু তাকে শেষ পর্য্যন্ত কতখানি সুখ দিতে পার্‌ল? এদেরই জন্যে সে, সব ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত ছিল? কোথায় সে বিশ্ববিজয়িনী হ'য়ে রাজরাণীর আসনে বস্‌বে,না সে একটি অন্ধকার ঘরের কোণে ব'সে দিন কাটাচ্ছে? একজনের হৃদয়-সিংহাসনের পূর্ণ অধিকার পেয়ে সে সুখী হ'তে পারে নি, সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি, তাই সে জয় যাত্রায় বেরিয়েছিল,—ছায়ার পিছনে ছুট্‌তে গিয়ে সে আসলটাও হারাল। একদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই ছিল কি আনন্দের, কিন্তু আজ? প্রতি ঘণ্টা যেন এক একটা দিন, প্রতি দিন যেন এক একটা বৎসর, এক একটা যুগ—তবুও বাঁচ্‌তে হবে? যে বাঁশীর সুর চিরকালের জন্যে নীরব তাকে সযত্নে তুলে রেখে কোন লাভ আছে কি?

একটি অন্ধকার ঘরের জানালা। তার একপাশে রাজধানীর জনতা-কোলাহলপূর্ণ বড় রাস্তা, অন্য পাশে একটি ক্লান্ত নারী। তাদের মাঝে ক'খানা লোহার গরাদ!

"লীলা, এস ঘরে যাই।" অন্ধকার ঘরের নীরবতা ভেদ ক'রে মোহিতের স্বর লীলার কানে ভেসে আস্‌তেই সে চম্‌কে উঠ্‌ল। লীলার ত' ঘর নেই। আপন হাতে ত' সে সব ভেঙে দিয়েছে; ফের্‌বার পথ কি আর আছে?

আজ লীলাকে দেখ্‌লে তার সঙ্গীরা তাকে সুন্দরী বল্‌তে দ্বিধা কর্‌ত। পরনে তার অর্দ্ধমলিন মোটা মিলের শাড়ী, রুক্ষ চুলের ভারে মাথা তার নত, নগ্ন পা দুখানি শ্বেত-পদ্মের কুঁড়ির মত কালো মেজের কঠিন বুকের উপর স্থির হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। আর তার চোখ দুটি? যে চোখের উথ্‌লে পড়া হাসির কাছে হাজার হাজার লোক বাঁধা পড়েছিল, সে চোখ দুটিতে আজ জমাট হ'য়ে রয়েছে কত যুগের না-ঝরা অশ্রু।

মোহিতের মনে হ'ল, সে লীলাকে কোনদিনও এত সুন্দর দেখে নি। লীলার একটু কাছে এগিয়ে এসে সে ফের বল্লে—"লীলা, চল ঘরে যাই।" যেন কিছুই হয় নি, ঘণ্টা খানেকের জন্যে সে পরের বাড়ী বেড়াতে এসেছিল তাই

তাকে মোহিত নিতে এসেছে। ক্ষমা না চাইতেই ক্ষমা করা? মানুষ কি তা পারে? ক্লান্ত চোখদুটো লীলা মোহিতের দিকে তুলে ধীরে ধীরে বল্লে—"ভেবেছিলাম পায়ে ধ'রে মাপ চাইব, সে অবসরও তুমি দিলে না—" বাধা দিয়ে মোহিত বল্লে—"মাপ চাইবার প্রয়োজন নেই, কুশিক্ষার ফলে তুমি যা করেছ—তার জন্যে তোমাকে কোন দিনও দায়ী করি নি। তুমি নিজেকে চেন্‌বার আগে আমি তোমায় চিনেছিলাম। বিদেশী শিক্ষার অন্তরালে যে তুমি লুকিয়েছিলে সেই আসল তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম।" লীলার নত মুখখানি মোহিত তুলে ধ'রে গাঢ় স্বরে বল্লে—"ঝিনুকের বুকের মধ্যে মুক্তা লুকোন থাকে জান ত'? আবার সেই মুক্তা পেতে গেলে ঝিনুককে আঘাত দিয়ে ভেঙে ফেল্‌তে হয়। আজ আমি যে মুক্তার সন্ধান পেলাম এর মূল্য নেই, দুঃখ এই যে এই রত্ন পাবার উপযুক্ত আমি নই—বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা—।"

লীলা জড়িত স্বরে বলল—"তোমার পায়ে মাথা রেখে আমার চির তৃপ্তি...

সেই রাত্রে মোহিত তার ডাইরিতে লিখ্‌ল—"আমি জান্‌তাম একদিন নিশ্চয়ই 'ফুল ফুটবে, আমার সকল ব্যথা রঙিন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে'—"

স্বরূপ

ডাঃ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যে বলে মানুষ হ'তে
নিজে কিন্তু মোটেই নয়,
কথায় দিব্যি উদার সাজে,
কাজের ধারা উল্টো বয়।
ভাণের ভেকে নীর সাজে ক্ষীর,
নেই হাতিয়ার—হাম্‌বড়া বীর!
দোকান্‌দারি বিশ্ব জুড়ে',—
আসল মেলা শক্ত হয়॥

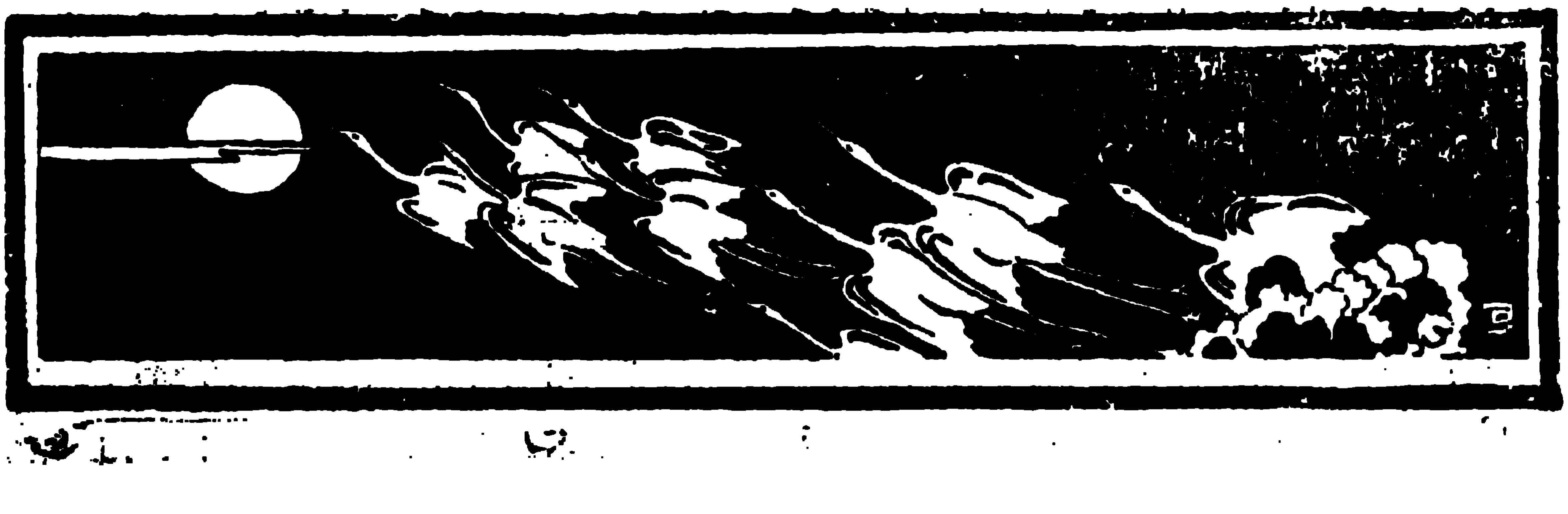

বসিরহাট

গত ৭ই, ৮ই, ৯ই মার্চ্চ স্থানীয় মহিলা-সমিতির উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য, শিল্প ও শিশু-প্রদর্শনী বসিরহাট গৌর-ভবনে মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ প্রদর্শনীতে মহিলাগণের উৎপন্ন তকলির ও চরকার সূতা, পশমের নানাবিধ কার্য্য, ফুলের সাজি, মালা, পাট ও শণের শিকা, সূচিশিল্প, সোয়েটার, সার্ট, পাঞ্জাবী, তাঁতের কাপড়, তোয়ালে, পেন্সিল, পশম ও রেশমের চিত্র প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদি আসিয়াছিল। বসিরহাট মহিলা-সমিতি, বসিরহাট বিবেকানন্দ-সঙ্ঘ, ধান্তকুরিয়া দাক্ষায়ণী বালিকাবিদ্যালয়, বসিরহাট বালিকাবিদ্যালয়, পুঁড়া বয়ন-বিদ্যালয়, ঝিনকা লেডী মুখার্জ্জী বালিকাবিদ্যালয় ও যদুরহাটী বালিকাবিদ্যালয়ের উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যাদিও প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। বসিরহাট বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও মহিলা-সমিতির বিশিষ্ট সভ্যা শ্রীযুক্তা সূর্য্যমুখী ভাদুড়ীর নেত্রীত্বে বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী বিশেষ প্রশংসার সহিত সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

প্রথম দিবস – ৭ই মার্চ্চ বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর স্থানীয় সুযোগ্য মহাকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী বসিরহাট মহিলা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মজুমদার মহোদয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা করেন ও বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পাদক ডাঃ ডি, এন, মৈত্র মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া প্রদর্শনী-গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে অনুরোধ করেন। তৎপরে বসিরহাট মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হৃদয়শশী ঘোষাল সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন ও বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস, স্থানীয় উকীল মৌলভী সাকায়েতুল্লা সাহেব ও প্রধান শিক্ষ-

দশানী মহিলা-সমিতি

মিত্রী শ্রীযুক্তা সূর্য্যমুখী ভাদুড়ী স্বাস্থ্য ও শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় প্রদর্শনীর উপকারিতা ও বর্ত্তমান যুগে নারীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মিষ্টার এ, এফ, এম আব্দর রহমান এম, এল, সি, ও শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল, মহোদয়গণ সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে, তিনি "জাতীয় জাগরণে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার জন্য স্থানীয় মহিলাগণকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। সন্ধ্যায় বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী ও কলিকাতা সমবায়-সমিতির কর্ম্মীগণ ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিল্প ও সমবায় বিষয়ক বক্তৃতা করার পর প্রথম দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

মহিলাকর্ম্মী—শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী মহোদয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় নারীমঙ্গল এবং মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে সন্ধ্যায় ঐ সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, ছায়াচিত্রের সহযোগে মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পোন্নতি বিষয়ক বক্তৃতা করেন। রাত্রে মিসেস্ বেণ্টলীর "শিশুর ক্রন্দন" ও শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হওয়ার পর দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিবসেও বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকে। প্রাতে মহিলা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুধা মজুমদার ও সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী মহোদয়াগণ শিল্পজাত দ্রব্য মধ্যে পুরস্কারযোগ্য দ্রব্যগুলি

বসিরহাট মহিলা-সমিতির বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ

দ্বিতীয় দিবসে বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকে ও মধ্যাহ্নে শিশু প্রদর্শনী হয়। সহস্রাধিক মহিলা ও প্রায় দেড়শত শিশু যোগদান করেন। শিশুদিগকে প্রথমতঃ উন্নত ও অনুন্নত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর শিশুদিগকে বয়সের অনুপাতে ছয় মাস, এক বৎসর, দুই বৎসর ও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। মহিলা-সমিতির কতিপয় সভ্যা শ্রীযুক্তা সুধা মজুমদার মহোদয়ার নেত্রীত্বে প্রাথমিক নির্ব্বাচনকার্য্য সমাপ্ত করিলে, স্থানীয় খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের নেতৃত্বে প্রত্যেক শিশুকে পরীক্ষা করেন। শিশুদিগকে পরীক্ষাকালীন প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, কমলালেবু, লজেন্স ও খেলনা প্রদান করা হইয়াছিল।

অপরাহ্নে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা

নির্ব্বাচন করেন। মধ্যাহ্নে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের নেতৃত্বে স্থানীয় চিকিৎসকগণ ত্রিশজন শিক্ষিতা ধাত্রীকে পরীক্ষা করেন ও তৎপরে বঙ্গীয় রেডক্রশ সোসাইটির পক্ষ হইতে মিসেস্ হারম্যান্ ও তাঁহার মহিলা সহকর্ম্মীগণ শিশু ও মাতৃমঙ্গল বিষয়ক বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী মহোদয়ার সভা-নেত্রীত্বে সহস্রাধিক মহিলাগণের এক বিরাট সভায় পারিতোষিক বিতরণ করা হয়।

—শিশু-প্রদর্শনী—

উন্নত শ্রেণীর শিশুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিশুকে শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রদত্ত "সুধা স্বর্ণপদক", এগারটি শিশুকে ১১ খানি রৌপ্যপদক, ১০টি শিশুকে প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয়।

অনুন্নত শ্রেণীর শিশুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিশুকে ৫৲ ও ১৭টি শিশুকে ১৲ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত মোট ৪৩৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

—শিল্প-প্রদর্শনী—

শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্য্যের জন্য শ্রীযুক্তা চারুশীলা দাসী প্রদত্ত সুদৃশ্য ও কারুকার্য্য-খচিত "চারুশীলা-স্বর্ণপদক", অধিকতম প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য বসিরহাট বিবেকানন্দ-সঙ্ঘকে "মীনাপদক", ১২ জন মহিলাকে ১২ খানি রৌপ্যপদক ও কতিপয় মহিলাকে প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয়।

"দেবদূত", ও অরোরা সিনেমা কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণসখা' প্রদর্শনের পর প্রদর্শনীর কার্য্য সমাপ্ত হয়।

যাঁহারা এই বিপুল আয়োজনে অর্থসাহায্য করিয়াছেন ও যে সকল কর্ম্মী অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে, এবং সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, বঙ্গীয় রেড্‌ক্রশ সোসাইটি, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী ও কলিকাতা সমবায়-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মিসেস হ্যারম্যান ও তাঁহার মহিলা-সহকর্ম্মীগণ, এবং শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন প্রমুখ

বসিরহাট মহিলাসমিতির বার্ষিক উৎসব-সভা.

—ধাত্রী—

১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ধাত্রীব্যাগ, ও অপর চারজন ধাত্রীকে ৭৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

—স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী—

স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর কার্য্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবিকা-নেত্রী শ্রীযুক্তা সূর্য্যমুখী ভাদুড়ী ও সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সূচি-কার্য্যের স্থানীয় শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা পরা-মাণিককে দুইখানি প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয়।

রাত্রে চলচ্চিত্রের সাহায্যে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগ কর্ত্তৃক

ব্যক্তিগণ যাঁহারা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমাদিগের গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে, বসিরহাট মহিলা-সমিতির সুযোগ্যা সভা-নেত্রী শ্রীযুক্তা সুধা মজুমদার মহোদয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই সমিতির কার্য্যের প্রসার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও মহিলাদিগের মধ্যে এক নূতন প্রেরণার আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে বসিরহাট "মহিলা-প্রদর্শনী" কখনই সম্ভবপর হইত না। তাঁহার অসীম উদ্যম ও সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য

প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁহাকে আমাদিগের গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ত্তমান নারী-প্রগতির যুগে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই মহিলাগণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে। নারী-সমাজের এই বহুধারা উন্নতির যুগে বসিরহাটের মহিলাগণও নিজদের কল্যাণকার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। বহুদিনের অন্ধ সংস্কার ও বন্ধন মুক্ত করিয়া আমাদিগের মধ্যে মানসিক আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের দ্বারা আমরা যে শিক্ষার ও সভ্যতার বহুল প্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন ও সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছি, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা সেই চিরবাঞ্ছিত গৌরবময় সাফল্য লাভে বঞ্চিত না হই। যেন আমরা জড়তার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নবযুগের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হই।

শ্রী সুধারাণী বসু
সহঃ সম্পাদিকা, বসিরহাট মহিলা-সমিতি

কালিয়া

আমাদের সমিতির বর্ত্তমান সভ্যা-সংখ্যা ১২ জন মাত্র। আমরা যখন প্রথম সমিতির কল্পনা করি, তখন মাত্র ৩টি ভগিনী মিলিয়া। আমাদের সমিতি এক বছর পাঁচ মাস হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কাজ যৎসামান্য যাহা হয়, তাহা গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মাসে একটি করিয়া সমিতির অধিবেশন হয়; অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় থাকে—(১) সমিতির প্রয়োজনীয়তা, (২) নারীর কর্ত্তব্য, (৩) জননীর দায়িত্ব, (৪) শিশু-গঠনের প্রণালী, (৫) পণপ্রথা-বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা, (৬) বর্ত্তমান যুগের অবস্থা, (৭) বর্ত্তমানে নারী-সমাজ জাতির সেবার কতখানি অধিকার করিয়াছে, (৮) নানান পুস্তক হইতে প্রবন্ধ পাঠ।

স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস শর্ম্মা তাঁহার বাটীর একটি ঘর সমিতির ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেখানেই সমিতির অধিবেশন হয়। সে জন্য সমিতি উক্ত ভদ্রমহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

সমিতিতে "রেখা" নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হইয়াছে; ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সমিতি খোলা থাকে; সমিতির নিকটস্থ সভ্যাগণ প্রত্যহ ঐ সময় উপস্থিত থাকেন। সমিতি একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আনেন,—সভ্যাগণ তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ সূতা কাটেন, জামা-সেমিজ ইত্যাদি তৈয়ারী করেন। স্কুলের ছুটীর পর বালিকাদের লইয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমিতির নিকট খেলা হয়। শনি ও রবি-বার বালিকাদের গান, স্তব, সেলাই ও এমব্রয়ডারী শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ সমস্ত সেলাই বিক্রয় করা হয়। প্রত্যেক অধিবেশনে মেয়েদের কবিতা আবৃত্তি ও গানের ব্যবস্থা থাকে। গত আশ্বিন মাসে সমিতির বালিকারা "বঙ্গ-বালা" নামক নাটিকা অভিনয় করিয়াছে। ঐ সময়ই স্থানীয় চরকা-প্রতিযোগিতায় ২৪টি পুরস্কারের মধ্যে সমিতির সভ্যা ও বালিকারা ৯টি পুরস্কার পাইয়াছে। সমিতির ও অন্যান্য সাধারণের জন্য তাঁত-বয়ন শিক্ষার নিমিত্ত গত শ্রাবণ মাসে ১৫৲টাকা মাহিনা দিয়া সমিতি একজন তাঁতী রাখিয়াছিল। ২ মাস রাখিয়া সমিতি তাঁতটি উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, ইহা একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সে জন্য সাড়ে পনর আনা লোক অর্থ-সাহায্য দূরে থাকুক, মৌখিক সহানুভূতি দেখাইতেও কুণ্ঠা-বোধ করেন! প্রায় লোকই সমিতির যে কি প্রয়োজনীয়তা তাহা বুঝিতে চাহেন না; আমরা মুষ্টিমেয় ভগিনীরা অক্লান্ত চেষ্টায়ও এই জন্য সমিতির আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারি নাই। সমিতিতে যে সূতা কাটা হয়, তাহা দিয়া কাপড় তৈরী করিয়া বিক্রয় করা হয়। সমিতিতে অনেকেই সূতা কাটা শিক্ষা করিতে আসেন। কোন বিধবা দরিদ্রা তাঁহার কন্যার বিবাহে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে ৬টি টাকা, ১ জোড়া কাপড়, সেমিজ, ব্লাউস দিয়া সাহায্য করা হয়। আর একটি দরিদ্রা এখানে তাঁহার আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়া ফিরিয়া যাইবার টাকা হারাইয়া ফেলেন, নিরুপায় হইয়া তিনি সমিতিতে জানাইলে সমিতি তাঁহাকে তাঁহার যাইবার আংশিক ব্যয় দিয়া সাহায্য করেন। মাঝে মাঝে সমিতিতে চাঁদা তুলিয়া মেয়েদের লইয়া চড়ুইভাতি হইয়া থাকে। প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মধ্যে সমিতির কার্য্যের প্রতি বিরুদ্ধভাব থাকিলেও যুবকগণ আমাদের নানাভাবে

সাহায্য, উৎসাহ ও সহানুভূতি দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এবং তাঁহাদেরই উৎসাহে সমিতির মহিলাগণ বিশেষ আগ্রহে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। কিছুদিন সমিতির বালিকারা সমিতির আয়ের জন্য মুষ্টিভিক্ষা করিত। নানা অপ্রিয় আলোচনার জন্য সম্প্রতি তাহা বন্ধ আছে। বালিকাদের কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য রান্না, সেলাই প্রভৃতি প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের যোগ্যতা-অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হয়। মেয়েরা চাঁদা তুলিয়া ও সমিতির সাহায্যে গত সরস্বতী পূজা বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছে। ঐদিন সন্ধ্যার সময় অনেক ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মেয়েদের সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রী বিভা দেবী, সম্পাদিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মলিনা

শ্রী ভক্তি

আমার মনের ভুল কিনা জানি না,—কিন্তু আকাশ সীমায় ঐ আধখানা চাঁদ দেখ্‌লে এখনো মুখ না-লুকিয়ে পারি না। হয়তো বা একদিন ওর শুভ্র-সুন্দর হাসিটি দেখে' স্বপন-পুরীর রাজ-কুমারীর গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে হাস্‌তে গিয়ে মুক্তার মতো সাদা দাঁতগুলির কথা মনে পড়েছে। আর সে-আনন্দ কোনো মতে চেপে' রাখ্‌তে পার্‌তুম না—তাই মনে হোতো, অসীমের পাখী হ'য়ে একবার উড়ে' গিয়ে বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে সেই 'ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতের' বারতা পৌঁছে দিয়ে আসি! তখন যেন আমার বাস্তব জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকতো না; সব হারিয়ে একদৃষ্টে আবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ আকাশ পানে তাকিয়ে থাকতুম।...

মলিনা একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিল। শুনেছিলুম, তার মা'র মৃত্যুই নাকি তার এ প্রকার গাম্ভীর্য্যের একটিমাত্র কারণ।...দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের আলাপটা বেশ ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। অধিকাংশ চাঁদনী রাতের নিশুতি সময়ে আমরা হোষ্টেলের ছাদে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে আপন আপন মনোভাব অকপটে খুলে বল্‌তুম। তার সঙ্গে যেদিন আমার শেষ কথা হয় সেদিনো ঐ যে ধনুকের মতো চাঁদটা দেখ্‌ছো, ও ছিল আমাদের নীরব সাক্ষী। তাই ওর কাছে আজ আমার এতো লজ্জা,—আমার কাছে তাই ও' আজ একটা এতো বড়ো বিসদৃশ অদ্ভুত পদার্থ! কিন্তু এ ধারণা আমার মর্‌লেও যাবে না যে, তার প্রায় কথাগুলি আজ-কালকার মাসিকের দু'পাতা উল্টানো ছেলে-মেয়েদের ঘুরিয়ে বলা অর্থহীন বক্তব্যগুলির মতো না, সেগুলি উপযুক্ত তথ্য এবং যুক্তিপূর্ণ। তার সহপাঠী হ'য়ে একদিকে যেমন আমি গর্ব্ব অনুভব কর্‌তুম, অন্যদিকে তেমনি নিজের অক্ষমতার জন্য অন্তরে অন্তরে মরে' যেতুম। মনে হোতো, তার থেকে আমি কোথায় এবং কতো দূরে যে পড়ে' আছি তার ইয়ত্তা নেই।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে সে আমায় বল্‌লো, দেখ্‌ ভাই, বর্ত্তমান আন্দোলনটা আমার কাছে কেমন যেন একপেশে ফাঁকি বলে' মনে ঠেকে। আমি একলা অনেকবার অনেক করে' অনেক ভাবে ভেবে-চিন্তে দেখেছি কিন্তু এর সত্যটা আমার বুদ্ধির বাইরেই র'য়ে গেল আজ পর্য্যন্ত। আমি বল্‌লুম, বাকী দুটো (ভূত, ভবিষ্যৎ) তো হয়েছে, এটা আর না-ই হোক গে'—নে। সে তার একগোছা কপালে-পড়া এলোচুল বাঁ কানের পাশে গুঁজে রেখে অভিমানের সুরে বল্‌লো, তোর সব তাতেই তামাসা আর বিদ্রূপ, তাই তো বল্‌তে চাই না কিছু। বেশ,ভালো কথা, আমার যদি বুঝ্‌তে ভুলই হ'য়ে থাকে বুঝিয়ে দে ভালো করে'—এমনি ছাড়্‌ছি

না কিন্তু। বল্লুম,এ তো সোজা কথা। আমার দেশের কর্ত্তৃত্ব আমার হাতে, তাতে কারু কিছু বল্বার নেই—থাক্তে পারে না, থাক্লেও শুন্বো না। সে বল্লো, তা হ'লেই কি পাওয়া পূর্ণ হ'য়ে গেল? স্বাধীনতার সূত্র কি সত্যিই তাই? ঘরের কলসীটা ছেঁদা থাক্লে দুনিয়ার সমস্ত সমুদ্রগুলো তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেও সে যে পরিপূর্ণ হয় না, সে কথা কি ভুলে যাচ্ছিস? ঘরে ঘরে আজ যেসব বিপদ ফেনিয়ে উঠেছে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে' বাইরের খোঁজে যাওয়ার মতো বিড়ম্বন', আমার মনে হয়, অল্পই আছে। তুই হয়তো বা ইতিহাসের পাতাগুলো ঝর্ ঝর্ করে' উল্টিয়ে দেখিয়ে দিবি যে, এমন সব দেশেই হ'য়ে থাকে। তাই তো! কিন্তু সব দেশ তো আর ভারতবর্ষ নয়। তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা তোর ইতিহাস আরেকটি দেশের মধ্যে দেখাতে পার্বে না। তাই, তার চাওয়া এবং পাওয়া অপর দেশের মতো কক্ষণো হোতে পারে না। যাক্ এখন আমার কথা হ'চ্ছে যে. দেশের মধ্যে নারী-ধর্ষণ এবং তার না-প্রতিকারের ব্যবস্থাটা আমায় মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করে' তোলে। সাগর-পার থেকে স্বাধীনতা আন্‌তে অনেক সর্ব্বত্যাগী নেতা দেখ্তে পাই; কিন্তু ভাই, এই সর্ব্বনাশা ধর্ষণ-নীতিটা মূলে নষ্ট কর্তে কোনো অল্পত্যাগীও তো চোখে পড়ে না। আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, আমার বিয়ের পর যদি ভাগ্যক্রমে আমাকে আমার অন্যান্য ধর্ষিতা বোনদের দলে যেতে হয় তা-হ'লে কি করি জানিস্? "বর"কে ভালো করে' বুঝিয়ে দিই যে, যে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা কর্তে পারে না, বিপদে বুকে তুলে' নিতে পারে না তার ডান হাতখানা বাড়ানো শোভা পায় না! শেষে সমস্ত অপহৃতা বোনদের নিয়ে সমাজের তথা সারা দেশের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে' দিই। দেশের শাসক সম্প্রদায় যেমন মিলনের জন্যে আমাদের নেতাদের বার বার আহ্বান কর্ছেন, তেমনি নেতারাও আমাদের সঙ্গে একটা মীমাংসা না করে' কখনো পারবেন না।

যে বকুল গাছটা আমাদের মাথার উপর কয়েকটা সু-দীর্ঘ এবং পত্রবহুল বাহু মেলে' দাঁড়িয়েছিল, তারি একটা শাখার পত্রপুট থেকে জলের ফোঁটার মত গড়িয়ে কয়েকটা ফুল তার নিটোল কপোলের উপর পড়ায় সে চম্‌কে উঠ্লো। সে কপোলে একবার করাঙ্গুলি বুলিয়ে নিয়ে আবার বল্লো, দেখ্, মজা কি জানিস্? এই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিটাই তাদের অপদার্থ এবং আমাদেরও দিনে দিনে পঙ্গু করে' তুল্‌ছে। এ শিক্ষার আত্মোন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, নীচের দিকে যতোটা নাম্‌তে পারা যায় তদ্বিষয়ে পূর্ণ সাহায্য করে—অর্থাৎ তার পথটা সেই আবিষ্কার করে' দেয়; এবং ধীরে ধীরে কখন যে সেথায় পৌঁছে দেয় কেউ ঠাহর কর্‌তে পারি না। তদুপরি, এ শিক্ষা কক্ষণো সাধারণ শিক্ষা হোতে পারে না। কারণ, নর এবং নারী যখন ভিন্নপ্রকৃতির, তখন তাদের শিক্ষা-প্রণালীটাও অবশ্য পৃথক হ'তে বাধ্য। তবে নারীর শিক্ষা-পদ্ধতি যে ঠিক কি ভাবের হবে তা' বেশ স্পষ্ট করে' উঁচু গলায় বল্‌তে পারি না, যেহেতু এ বিষয়ে সমস্ত দেশেই যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এমন শিক্ষা তার আজ পাওয়া উচিত যাতে তার মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিপ্রাণ নারীত্ব ফুটে' উঠ্‌বার পক্ষেও সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করে। এ দিকটা একেবারে অস্বীকার করে' বা চাপা দিয়ে কতকটা আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম সমস্যা বিশ্লেষণ কর্‌তে শেখানোর মধ্যে যে কতো বড়ো নির্ম্মমতা এবং হীনতার পরিচয় তা অন্তর্য্যামীই জানেন শুধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বই মুখস্থ বিদ্যেটা নারী-জীবনের পূর্ণ সার্থকতা এনে দেয় না বরং সঙ্কুচিত করে' দেয়। এমনি নূতন কথা যে সে আমায় নিত্যি কতো শুনিয়েছে তার হিসেব নেই। আমার উত্তর দেবার পূর্ণ অক্ষমতা জেনেই হোক্ কিম্বা অন্য যে কোনো কারণের জন্যেই হোক্ সে আমার কাছে যেন কোনো কিছু আশা না রেখেই আপন মনে একটানা হড় হড় করে' বলে' যেতো। আমি?—আমি সাপুড়ের কাছে সাপটার মত নিশ্চল অবস্থায় তার পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাক্‌তুম!

• • • •

তিন বছর পরের কথা বল্‌ছি। সেদিন—একদিন আমার ছোটো বোন গৌরী একখানা দৈনিক পত্রিকা হাতে ছুটে' এসে আমায় পড়ার ঘরে ঢুকে' যে মর্ম্মন্তুদ বুক-ফাটা

খবরটা দিল এবং আঙুল দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা যে লেখাটা দেখালো তা আমি অনেকক্ষণ বিশ্বাস করতে পারি নি। খবরটা উপর্য্যুপরি পাঁচ বার পড়লুম। চোখ বেয়ে রক্ত ঝরলো কি জল ঝরলো কিম্বা কিছুই ঝরলো না, বুঝতে পারলুম না। খালি, একটা অস্ফুট হাহাকার দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। বহুদিন আগের তার মুখে বেরিয়ে যাওয়া একটা কথা আজ সত্যে পরিণত হ'ল দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। বললুম, অভাগী যেথায় আছিস্ থাক্, একটা সম্বাদও কি দিতে নেই? কিন্তু, আমার এ মনোভাব বেশী দিন অন্তরে পোষণ করতে হয় নি —কারণ এর চোদ্দ কি পনেরো দিনের পর তার একখানি নিজের হাতের চিঠি (খামে আঁটা) আমার কাছে এলো। লেখা ছিল—

"ভাই সুলেখা,—সাধারণে না-চাইলে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টাটাকে অপরে যা' বলে বলুক অন্ততঃ তুই ভাই সেটাকে ব্যর্থ-প্রয়াস বলিস্ নি! নর-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধীও —মাপ করিস্ যদি ভুল বলে' ফেলি—কিছু দিনের জন্যে সাধারণের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে কসুর করেন নি। এই চিরন্তন-রীতি। তাই, আমিও মনে করেছিলুম, নিজেকে অনন্তকালের জন্যে লুকিয়ে রাখবো। কিন্তু আজ নিরন্তর মনের সঙ্গে ক'দিন ধরে' যুদ্ধ করে' পরাজিত হ'য়ে কলমের মুখে তোকে ধরা দিলুম। তোর সেই অ-চয়িত সবে ফোটা গোলাপের মতো নিষ্পাপ মুখখানা, বিশেষ করে' তোর সেই দূরকে নিকট করে' নেওয়ার শক্তিটা আমায় সত্যি পরাজিত করেছে—কিন্তু তোর কোনো যুক্তি-তর্ক আমাকে নাগাল পায় নি! থাক্।—

এখন আমার কথা জানতে কৌতূহল আর চেপে' রাখতে পারছিস নি—নয়? আজ আর বিশেষ কিছু বলবো না। তবে কিছু বলতে যাবার আগে একটা কথা বলে' রাখি; রাগ করিস্ নি কিন্তু ভাই! আমার কাহিনী শোনবার আগে এবং পরে তোর অন্তরে যদি কোন বেদনা বা সহানুভূতি জাগে আর সেটা যদি তোর ব্যক্তিগত হয়, আমার তাতে কিছু বলতে নেই। কিন্তু যদি তার মধ্যে সমাজের কিছু আমেজ থাকে আমি তাকে ক্ষমা করতে কোনো মতে রাজী না। কারণ তাদের সমাজ আমাদের যে চোখে দেখে তার থেকে উঁচু চোখে আমরা তাকে দেখি না—বরং অন্য চোখে দেখি।

অহল্যা নারীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হারিয়েও পতিগৃহে স্থান পেল। কিন্তু তোরা আজ যদি আমার কথা বিশ্বাস করিস, শোন্ বলি, আমাদের মধ্যে এখানে এমন একজনও আছে, যে তার সে সম্পদ বুক দিয়ে রক্ষা করে' বাঁচিয়ে রেখেছে। সে এখনো খাঁটি—শুধু তোদের কল্পনার কুদৃষ্টিতে ছাড়া। বিশ্বাস করলি নি, নয়? আচ্ছা শোন্, গোস্বা করিস্ নি কিন্তু—'অপ্রিয় সত্য বলবার অধিকার একমাত্র বন্ধুরই আছে' ব'লেই বলছি। আজ তোদের সতীত্বের জবাবদিহি দিতে গিয়ে জনক-তনয়ার মতো যদি অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়, বল্ দেখি, তোদের বুকে কি এ সাহস আছে যে ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদ বহন করে' স-শরীরে তোদের স্বামীদের কাছে ফিরে আসবি?

ভাই সুলেখা, তুই বোন আমায় ভুল বুঝিস্ নি। আমি শুধু বলতে চেষ্টা করছি, কেবল তোরা—সমাজের ভিতরে থাকা আমার সব বোনেরা আমাদের ঘৃণা করিস্ নি, করুণার চোখে দেখিস্ নি!

অহল্যার কথা বলতে গিয়ে আধ্‌খানা বলেছি। আমার কি ধারণা জানিস্? আমার ধারণা, এইখানেই গৌতম প্রকৃত ঋষি গৌতম, এইখানেই তাঁর বিরাট মহনীয়তা। তা' বলে' মনে করিস্ নি যে, আমি আবার তোদের কাছে যেতে অভিযোগ-অনুযোগ জানাচ্ছি! আমি জানি, গৌতমের আর জন্ম হয় নি, এমন কি তাঁর আদর্শ পর্য্যন্তও লোপ পেয়েছে।

আমার এখন প্রধান সঙ্কল্প, যেখানে যতো আমার পতিতা বোন (আমার সম-দশার) আছে তন্ন তন্ন করে' খুঁজে বের করবো। এবং একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে' তোদের সমাজের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান সুরু করে' দেব। অদূর ভবিষ্যে এই দুই সমাজে যে একটা সংঘর্ষ হবে সে-সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চিত।

ইচ্ছা করে'ই আজ আমার ঠিকানা দিলুম না। আসছে-

বারে আমার সম্বন্ধে আরো কিছু জানাবো আর ঠিকানাও দেব।

ভালোবাসা জ্ঞাপন কর্‌লুম, খোলা মনে নিতে পার্‌লে নিস্।

তোরা যারা আছিস্ একটু সাবধানে থাক্‌বি। এবং সতত নিজেদের সমাজের অধীন না করে' সমাজকে নিজের বশীভূত রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বি। পরমেশ্বরের আশীর্বাদ এবং আমাদের সকলের মিলিত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তোদের সাহায্য কর্‌বে। ঐ শোন্,—

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে—।"...

ইতি

তোর—মলিনা

কলঙ্কিনী

শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

হে সুন্দরি, কোনদিন আধ-মৃদু অন্ধকারে বসি'
সমুদ্র-শিয়রে,
বহু দূর-দূরান্তের শুনেছ কি বিষাদ-সঙ্গীত
সন্ধ্যা-বায়ু-ভরে?
গভীর নিরাশাপূর্ণ আকাশের নীরব মহিমা
একান্ত উদাস,
সেই ক্ষণে মনে হয়, এই দীর্ঘ মানব-জীবন
ক্রূর পরিহাস।
নাহি সুখ, নাহি তৃপ্তি, সীমাহীন নিষ্ঠুর উদার
অনন্ত সমুদ্র হ'তে শুনা যায় শুধু হাহাকার।
মনে হয় মৃত্যু যেন অন্ধকার পরাবার-তলে
ক্লান্ত জীবনের লাগি' গাঁথি' মালা একান্ত বিরলে
ডাকিতেছে আয়, আয়!—সেই গীতি বিষাদ-ছায়ায়
অকূলের স্রোতে ভেসে যায়,
ধ্বনি তার জাগে বুঝি পৃথিবীর নিদ্রিত বিবরে
জীবনের তৃষিত নিশায়।

তোমারে শুনাব সেই জীবনের নিশীথ-রাগিণী
সমুদ্রের গীতি,—
আমার হৃদয়-তলে শোন সেই গভীর ক্রন্দন
অকূল বিস্মৃতি।

অয়ি মোর কলঙ্কিনী, জীবনের প্রথম নায়িকা,
আজি অন্ধকারে
তাই কি সংসার ত্যজি' আসিয়াছ দুয়ারে আমার
নব অভিসারে?
একি সুখ, একি শান্তি? এরি নাম বুঝি ভালবাসা,
সুদীর্ঘ জীবন ধরি' মরণের প্রবল পিপাসা!
এই ভুজতটে বসি' শুনেছ কি নিবিড় আহ্বান,
আমার বক্ষের তলে কোন্ মৃত্যু গাহিতেছে গান?
কে তোমারে ডাকে প্রিয়া আজিকার রাত্রি-অন্ধকারে—
প্রণয়ের এ'কি নিবেদন?
যৌবন-যমুনা-কূলে চিরদিন শুনিলাম বুঝি
কূলহারা নারীর ক্রন্দন?

আজি হ'তে গেল সুখ গেল তব সমাজ-বন্ধন,
স্নেহের সংসার;
সমগ্র রজনী ধরি' কলঙ্কিত চন্দ্রমা-কিরণ
মুখে দুজনার!
এই আলো-অন্ধকারে চিনে লই তোমারে প্রেয়সী
কলঙ্কিতা নারী,—
এ'রি লাগি যুগে যুগে যৌবনের করিল সাধনা
পুরুষ পূজারী?

পৃথিবীর এক তীরে থাক্ থাক্ পড়িয়া সংসার,
তোমার চরণোপান্তে এই মোর শ্রেষ্ঠ উপহার
আনিয়াছি প্রিয়তমে ! হে রমণী, তোমা 'পরে তাই
প্রথম প্রেমের দাবী—আর কোন সীমা-রেখা নাই !
মোর বক্ষ-লগ্ন হ'য়ে তাই পূর্ণ মুক্ত তুমি আজ,
ঘুচিয়াছে বন্ধনের লাজ !
তোমারে দিলাম আমি কলঙ্কের নব আবরণ—
যৌবনের শ্রেষ্ঠতম সাজ !

এ প্রণয় হ'তে মোরা জীবনের নব পরিচয়
লভিনু নির্জ্জনে ;
তবে বেদমন্ত্র শুন, বিবাহের প্রথম রাগিণী
আজি সন্ধিক্ষণে !
বাসরের দীপশিখা নিভে যদি গিয়াছে বাতাসে,
জ্বালি পুনর্ব্বার।
শ্মশানের ভস্ম আনি' অঙ্গে তব দিলাম সাজায়ে
যোগিনী আমার !
কেন এ ক্রন্দন তব ? সন্ন্যাসিনী, দীক্ষা লহ আজ,
প্রেমের শ্মশানে পুড়ি' ভস্ম হ'লো সংসার সমাজ।
স্নেহ-ছায়া গৃহ নাই, নাই কোন স্বামী—পরিবার ;—
এ প্রেমের কাছে নাই বন্ধনের কোন কারাগার ;—
বাসরের দীপ নহে, শ্মশানের শিখা জ্বলে আজ,
খুলে ফেলো গৃহিণীর সাজ।
সন্ন্যাসিনী, এসো, এসো—পৃথিবীতে তোমার আমার
ফুরায়েছে সংসারের কাজ !

কেন্দ্রসমিতির কথা

নিখিল বঙ্গ শিল্প-প্রদর্শনী

গত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার ৪৩নং চিৎপুর রোডে নিখিল বঙ্গ শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় এবং প্রায় দুই সপ্তাহ কাল এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে এখানে একটি ষ্টল খোলা হয়। মহিলাদের প্রস্তুত বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য এখানে প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজসেবা সম্বন্ধীয় তথ্য ও গাথা-সম্বলিত সুচিত্রিত চার্টগুলি জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

ঢাকুরিয়া মহিলা ব্যায়ামশালার উদ্বোধন

গত ২২শে মার্চ্চ রবিবার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ঢাকুরিয়া গ্রামে একটি মহিলা ব্যায়ামশালার উদ্বোধন হয়। ঢাকুরিয়া যুবক-সমিতি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে স্থানীয় পুরুষ ও মহিলাদের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত লোকদের ভিতরে রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহাদুর, স্বাস্থ্যপরিদর্শিকা মিসেস ঘোষ, যাদবপুর কলেজের প্রফেসার মিষ্টার এস, সি, দাস গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভানেত্রী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহিলাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার শরীরচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ আলোক-চিত্র সাহায্যে "মহিলাদের স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম" বিষয়ে বক্তৃতায় বলেন, শারীরিক শক্তির বিকাশের জন্য ব্যায়ামশালা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রের বিশেষ প্রয়োজন; শারীরিক শক্তির বিকাশ রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতই একান্ত প্রয়োজনীয়। সঙ্গীতান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

উথালী মহিলাসমিতি

গত ২৩শে মার্চ্চ নদীয়া জেলার অন্তর্গত উথালী গ্রামে উথালী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-প্রদর্শনী সম্পর্কে একটি বিরাট মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। এই মুসলমানপ্রধান স্থানের প্রায় ছয়শত মুসলমান মহিলা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই

সভাস্থলে সমাগত হন। চুয়াডাঙ্গার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মিসেস এ, কে, বসু সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সভানেত্রী তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিষয়ক বহু সমস্যার উল্লেখ করিয়া সমস্যা- মাধানের পথ-নির্দ্দেশ করেন। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ নারী-মঙ্গল ও মহিলা-সমিতির কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভানেত্রীর আহ্বানে মোসাম্মাৎ বদরুন্নেসাকে সম্পাদিকা করিয়া একটি মহিলা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

লেক এরিয়া মহিলাসমিতি

গত ২৪ শে মার্চ্চ মিসেস কে, সি, দের সভানেত্রীত্বে কালীঘাটে পি ১৬৭ লেক রোডে 'লেক এরিয়া মহিলা-সমিতি' ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। উপস্থিত লোকদের মধ্যে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীমতী সুখময়ী রায়, কুমারী মমতা মিত্র, কুমারী প্রতিভা সেন, রায় এস, সি, ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম, এ, বি, টি, ডাক্তার জয়গোপাল ব্যানার্জ্জি, ডাক্তার জে, সি, ঘোষ, ডাক্তার ব্রহ্মচারী, মিসেস কটল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। রায় শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহাদুর গত বর্ষের শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী অতি ওজস্বিনী ভাষায় মহিলাদিগের নিকট শিশুমঙ্গল ও নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি জীবন ও মনের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য মহিলাদিগকে শিক্ষা ও শিল্পচর্চ্চায় মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার ব্রহ্মচারী বলেন যে নিবার্য্য ব্যাধি ও শিশুমৃত্যুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সাধারণের ভিতরে স্বাস্থ্যজ্ঞানের প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় সকলকে স্বাস্থ্য-প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে মহানগরীতে শিশুমৃত্যু কমাইতে হইলে শিশু-পরিচর্য্যাগার একান্ত প্রয়োজন।

নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রচার

গত ২৯শে মার্চ্চ কসবা নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম, এ, বি, টি, স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা মিসেস এস, বি, ঘোষ, হিন্দু অবলা-আশ্রমের শিক্ষয়িত্রী কুমারী বীণা রায় এবং সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালতু গ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহারা ঐ স্থানে একটি খোলা মাঠে তাম্বু সন্নিবেশ করেন, এবং পার্শ্বস্থিত কাননের বৃক্ষরাজির গাত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিষয়ক চিত্রাঙ্কিত চার্ট সমূহ টাঙাইয়া দেন। এই গ্রামের বহু পুরুষ নারী ও শিশু সহ এই স্থানে উপস্থিত হন। উপস্থিত শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, এবং স্বাস্থ্যবান সুন্দর শিশুদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। বহু মেয়েরা এইস্থানে কাছিটানা এবং অন্যান্য গ্রাম্য ক্রীড়ায় উৎসাহ প্রদর্শন করেন। মিসেস ঘোষ সন্ধ্যাকালে মাতৃত্বের দায়িত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

নড়াইলে মহিলাসমিতি

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনের সম্পর্কে নড়াইলে শিল্প-প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে গত ৬ই এপ্রিল সোমবার একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুলতা সরকার সভানেত্রীর কার্য্য করেন। একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহিলাদিগকে নারীশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন। উপস্থিত মহিলাদের উৎসাহ ও আগ্রহে ঐ স্থানেই প্রায় ৪০ জন মহিলাকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে নারীপ্রগতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম বিষয়ে দীপালোচনা

শ্যামবাজারে ডাফ্ স্কুলের সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া মিস হগের আহ্বানে ৯ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিকট স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে

বক্তৃতা দেন। মিস হগ এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও এই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে বাঙ্গালীরা যদি আরও স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত না হন তাহা হইলে এই জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

বিভিন্ন সাব্-কমিটির সভ্যগণ

কেন্দ্র সমিতির বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনের জন্য ৫টি সাব্-কমিটি আছে। প্রত্যেক বৎসর এই সকল সাব্-কমিটি পরিচালক-সভা কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কমিটিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

স্কুল কমিটি

স্কুল কমিটি সরোজনলিনী নারী-শিল্পশিক্ষালয় পরিচালন করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্কুল কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—(১) মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এম, এল, সি (সভাপতি), (২) শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম, বি, এ, বি, টি, (সম্পাদিকা) (৩) রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ, (৪) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, (৫) ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায় এম, বি, (৬) শ্রীযুক্তা কামিনী বসু, (৭) ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, (৮) শ্রীযুক্তা গীতা দেবী, বি, এ, বি, টি, (৯) শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ বি, এল, (১০) শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন বি, এ, (১১) মিসেস জে, সি, দে।

প্রচার-বিভাগ পরিচালন কমিটি

(১) শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ (সম্পাদক), (২) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, (৩) শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এফ, আর, এস, এ, (৪) শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, (৫) মিঃ টি, সি, বসু, (৬) কেন্দ্র সমিতির প্রচারিকা।

অভিনয়-পরিচালন কমিটি

(১) মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এল, সি (সম্পাদক), (২) শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, (৩) মিঃ টি, সি, বসু, (৪) ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় এম, বি, (৫) শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি, এ, বি, টি, (৬) শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবী বি, এ, বি, টি।

মহিলাসমিতি পরিদর্শন কমিটি

(১) শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী (সম্পাদিকা), (২) শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন, (৩) শ্রীযুক্তা মনীষা রায়, এম, এ, (৪) শ্রীযুক্তা গীতা দেবী, বি, এ, বি, টি, (৫) শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, (৬) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী।

অর্থসংক্রান্ত কমিটি

(১) রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (সম্পাদক), (২) শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি, এ, বি, টি, (৩) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, (৪) শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এফ, আর, এস, এ, (৫) ডাঃ পি, সি, সেন, এম, বি, এফ, আর, এ, এস, (৬) ডাঃ পি, নিয়োগী পি, এইচ, ডি।

কেন্দ্র সমিতির ইংরাজি মাসিক

আগামী জুলাই মাস হইতে কেন্দ্র সমিতির কার্য্যালয় হইতে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র ন্যায় "সরোজনলিনী" নামে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। গত পরিচালক-সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি, এ, বি, টি, এই পত্রিকার সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র এক্ষণে কেবল মাত্র বঙ্গদেশে আবদ্ধ নহে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, সুদূর ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র সমিতির আদর্শে মহিলাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। পুণ্যশ্লোকা সরোজনলিনীর বাণী দেশ-বিদেশে প্রচার এবং ভারতের মহিলা-সমাজের প্রকৃত অবস্থার সহিত বিদেশবাসীগণকে পরিচিত করাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের রচনা প্রকাশিত হইবে। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য—ভারতে ৩৲ এবং বিদেশে ৩৷৹ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কেন্দ্রসমিতির নূতন সভ্য

গত ১৫ই এপ্রিল পরিচালক-সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কেন্দ্র সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আজীবন সভ্য:—(১) শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (বরোদা)।

সাধারণ সভ্য:—(১) শ্রীমতী ইন্দুরাণী দত্ত, (২) মিঃ এস, এন. মজুমদার (ডুমকা), (৩) শ্রীযুক্ত অভয়পদ মুখোপাধ্যায় (রামপুরহাট), (৪) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ হাইত (বোম্বাই), (৫) ডাঃ বি, কে, বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), (৬) ডাঃ কমলাপদ ভট্টাচার্য্য এম-বি (পূর্ব্বস্থলী), (৭) ডাঃ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মিত্র (কলিকাতা), (৮) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ এম, এ (নৈহাটী শ্রীরামপুর), (৯) মিঃ ডি, এন, দত্ত (চুঁচুড়া), (১০) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম, এ (কলিকাতা), (১১) শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দে (কলিকাতা), (১২) রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম, এ, বি, টি (কশবা, বালীগঞ্জ), (১৩) শ্রীযুক্তা শকুন্তলা বসু (মধুপুর), (১৪) ডাঃ টি, পি, ভট্টাচার্য্য (শ্রীরামপুর), (১৫) শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষাল (কলিকাতা), (১৬) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুপ্ত (কটক), (১৭) শ্রীমতী কল্যাণী দেবী (হুগলী), (১৮) শ্রীযুক্ত বলাইলাল শেঠ (কলিকাতা), (১০) ডাঃ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (কয়ম্বাটুর), (২০) শ্রীমতী বিনয়বালা ঘোষ (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর), (২১ মিঃ এন, বি, মুখোপাধ্যায় (কেয়েটা, বেলুচিস্থান), (২২) শ্রীযুক্ত অনাদি কিঙ্কর রায় (নানুর, বীরভূম), (২৩) মিসেস এল, এম, ঘোষ (কলিকাতা), (২৪) শ্রীমতী সরযূবালা দেবী (কলিকাতা), (২৫) লেডী শ্রীমতী কাদম্বিনী সরকার (কলিকাতা), (২৬) মিসেস জ্যোতিঃলাল সেন (শিলচর), (২৭) শ্রীমতী হেমলতা মিত্র (কলিকাতা), (২৮) শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী, (২৯) শ্রীমতী শৈলবালা সেন (হাওড়া), (৩০) শ্রীযুক্ত বগলাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল (বীরভূম), (৩১) শ্রীযুক্ত অনিলভূষণ দত্ত এম, এস্ সি (কলিকাতা), (৩২) শ্রীযুক্ত দামোদরকুমার রায়, (৩৩) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সিউড়ি), (৩৪) মিঃ বি, কে, চৌধুরী (কলিকাতা), (৩৫) মিঃ বি, ডি, বসু, (কলিকাতা), (৩৬) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (খড়দহ), (৩৭) শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বি-ই।

কেন্দ্র সমিতির নূতন মহিলা কর্ম্মী

শ্রীযুক্তা চারুলতা সরকার কেন্দ্র সমিতির মফঃস্বল প্রচার-বিভাগের এবং শ্রীযুক্তা মমতা মিত্র ইঁহার কার্য্যালয়ে মহিলা-কর্ম্মী নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা নারীসমাজের হিতসাধনের জন্য পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন।

নার্সিং শিক্ষা

প্রায় দেড় বৎসরের অধিক হইল কেন্দ্র সমিতির সহযোগী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের পরিচালনে সরোজনলিনী নারী-শিল্পশিক্ষালয়ে নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছেন আগামী জুলাই মাসে তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। এ বৎসর যাঁহারা নার্সিং ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে চান তাঁহারা স্কুলের লেডী সুপারিন্টেন্‌ডেন্টের নিকট আবেদন করিবেন।

মিসেস্ বেঞ্জামিন

মিসেস্ বেঞ্জামিন্ ইতিপূর্ব্বে সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির লণ্ডন শাখার একজন উৎসাহশীলা সভ্যা ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া নানাস্থানে আমাদের সমিতির জন্য প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের একটি উচ্চ ইংরাজি বালিকাবিদ্যালয়ে সরোজনলিনী সমিতির কার্য্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি মালয় প্রদেশের নানাস্থানে এখানকার সমিতির আদর্শে মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মিস্ সোমের বক্তৃতা

গত ১০ই এপ্রিল শুক্রবার আহিরীটোলা "কানাইলাল ধর বালিকাবিদ্যালয়ের" ত্রয়োদশ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব এবং পুরস্কার-বিতরণ সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কেন্দ্র সমিতির

সহঃ সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। বালিকাগণ সুন্দর সঙ্গীত এবং আবৃত্তি দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করেন। বিদ্যালয়ের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে প্রকাশ যে ৺কানাইলাল ধর এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ধর গত ১৬ বৎসরে স্কুল ফণ্ডে ১৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহারা বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ দিয়াছেন। স্থানাভাববশতঃ বহু বালিকাকে গত বৎসর ভর্ত্তি না করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে স্কুল, গভর্ণমেণ্ট ও করপোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছে এবং তাঁহাদের নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে সুপরিচালিত হইতেছে। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রধান সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহাতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহার জন্য ব্যায়াম এবং ড্রিল শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করেন।

সরোজনলিনী সমিতির কর্ম্মী শ্রীমতী চারুলতা সরকার বলেন, বালিকাগণের শিক্ষার জন্য যেরূপ সুন্দর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের শিক্ষার জন্য আহিরী-টোলায় সেইরূপ একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক।

সভানেত্রী মিস্ সোম প্রায় ৫০টি পুরস্কার বালিকাগণের মধ্যে বিতরণ করেন এবং "মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ" সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। প্রথমে তিনি পরলোকগত কানাই বাবু এবং তাঁহার পুত্র শরৎ বাবুর বদান্যতা এবং সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মেয়েদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য ঘর ও বাহিরের সমন্বয়, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিল্পকার্য্য, রন্ধন প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ করিতে ও মেয়েদের আত্মনির্ভর হইতে বলেন। স্ত্রীভাবে, কন্যা ও জননীরূপে, তাঁহাদের স্বামী, পিতা ও সন্তানদের পার্শ্বে ঘরে বাইরে সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় বঙ্গমহিলার কমনীয়তা, মাধুর্য্য, সেবাপরায়ণতাকে বজায় রাখিয়া গৃহ, সমাজ ও স্বদেশের উন্নতির জন্য সহ-যোগিণী ও সহকর্ম্মিণী রূপে কার্য্য করিবার জন্য তিনি মেয়েদের অনুরোধ করেন।

ক্ষীর ও নীর

কলিকাতায় চলাফেরা—শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫৫, অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো হইতে প্রকাশিত।

ইহা, কিরূপভাবে কলিকাতার রাস্তায় চলিতে ফিরিতে হইবে, গাড়ী চালাইবার বিধিবিধান কিরূপ বা গাড়ীর রাস্তা পার হইয়া অপর পাদপথে পৌছিতে হইলে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য প্রভৃতি সহর-পথের চলিত আইন-কানুনের বই নহে। কৌতূহলপ্রদ ও কৌতুককর ভাবে গ্রন্থকার ইহাতে তাঁহার বাল্যকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কলিকাতার ক্রমবিকাশের একটি মনোজ্ঞ খস্‌ড়া প্রদান করিয়াছেন। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন, "প্রাচীন সম্প্রদায় যদি তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহা হইলে স্থানীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহের পক্ষে উহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে নিঃসন্দেহ।"

শ্রীমতী—শ্রী জগদীশ গুপ্ত। ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বাগ্‌চী এণ্ড্ সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—১৷৷০ টাকা।

তরুণ গল্পলেখকদের মধ্যে জগদীশ বাবুর গল্পগুলি লিখন-ভঙ্গী ও বিষয়-বৈশিষ্ট্যে পাঠক-সমাজে ক্রমশঃই আদর লাভ করিতেছে। ইহার একাধিক গল্প আমাদের প্রকৃতই ভালো লাগিল। ভাষা ও প্রকাশের মধ্যে সংযম আছে—ফেনানো নহে; অল্প কথায়, দুইচারিটি রেখার টানে চরিত্রগুলি মন্দ ফুটে নাই। কিন্তু 'অন্ধ-অদৃষ্টবাদ'-মূলক কয়েকটি গল্প আমাদের মনকে পীড়িত করিয়াছে।

পল্লী-সন্ধ্যা

শ্রী যজ্ঞেশ্বর রায়

ডুবে গেল ধীরে ধীরে
পশ্চিম আকাশ-তীরে
ক্লান্ত রবি ল'য়ে তার আরক্ত কপোল।
নেমে এল অন্ধকার
এলাইয়া কেশ-ভার,
চোখে তার তারকার কটাক্ষ বিভোল ॥

আঁখি-আগে তন্দ্রাসম
জমে ধীরে সন্ধ্যা-তম,
থেমে আসে দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল।
তিমির-গুণ্ঠন-তলে
গৃহ-দীপ-ভাতি জ্বলে,
শিশু-ক্রোড়ে জননীর নয়ন সজল ॥

ধূপ-দীপ ল'য়ে করে
তুলসীর মঞ্চোপরে
পল্লী-বধূ ভক্তিভরে বলে—"হরিবোল"।
মন্দিরে মন্দিরে উঠে
সন্ধ্যার তামসী টুটে'
সান্ধ্য-সংকীর্ত্তন—বাজে করতাল খোল ॥

ছাতিমের শীর্ণ শিরে
ক্ষীণ শশী উঠে ধীরে
স্বপ্নাবেশে বালিকার মৃদু-হাসি প্রায়।
বিহগ-কাকলি-তান
হ'য়ে আসে অবসান,
ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ বাজে মৃদু মূর্চ্ছনায় ॥

দিনের কিছু অংশ

সৌন্দর্য্য চর্চ্চায় কাটান সকলেরই কর্ত্তব্য কারণ রূপ যদিও সকলের ভাগ্যে ঘটে না তথাপি যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা যেমন তেমন চেহারাও দশের আকর্ষণ যোগ্য করে তোলা যায়

রূপ ও সৌন্দর্য্যের জন্য
চিরপ্রসিদ্ধ ও অতুলনীয় প্রসাধন

হিমানী স্নো

ও

রমণীর স্বভাব কোমল অঙ্গে ব্যবহার যোগ্য

হিমানী সাবান

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

সোল এজেন্টস :—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

সাবান ও সুরভি প্রস্তুতকারক
হিমানী ওয়ার্কস্
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him at 45, Beniatola Lane, Calcutta.

কালিদাস

শিল্পী—শ্রীহৃষীকেশ দাস

C. H. ARAN & CO.

// বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ [৭ম সংখ্যা

চিতা-নির্ব্বাণ

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শেষ হ'ল, ফুরাল সকলি,
শূন্যতলে অনল মিলায়;
দেহ প্রাণ সব ছিল কালি,
আজ আর চিহ্ন পাওয়া দায়।
যে কাঁদিবে কাঁদুক সে আজ,
যে দেখিবে দেখুক স্বপন,
লোকান্তরে দেবতার সাজ—
মৃত সনে অনন্ত মিলন।
দেখুক সে মৃত সুহৃদের
মৃত্যুপারে আশার পূরণ,
লোকে লোকে করুক সে ফের
মমতার সেতু বিরচন।
হায়, তবু সজলনয়ন
নিবাইতে হবে চিতানল,
বল পুনঃ করি' আহরণ
আহরি' আনিতে হবে জল।
আন জল, ঢাল শান্তিজল,
নিবাও গো নিবাও সন্তাপ,—
ভয়াল সে নির্ব্বাণ-বিহ্বল,—
সে যেন মৃতেরি মনস্তাপ।
চিতার উত্তাপ সনে, হায়!
ছিল যেন প্রাণের উষ্ণতা,
এইবার সব ঘুচে যায়
সম্বন্ধ সম্পর্ক আত্মীয়তা।
কি রহিল? ছাই শুধু ছাই!
কি ছিলরে? সোনার মানুষ!
কারে খোঁজ? চিহ্ন তার নাই।
আছে শুধু ছাই আর তুঁষ। *

---

* ইহা কবির অপূর্ব্ব-প্রকাশিত রচনা।

কবি বিহারীলাল

শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

কবিগুরু বাল্মীকির জিহ্বাগ্রে কবিতালক্ষ্মী সেইদিনই অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যেদিন মহাকবির হৃদয় ক্রৌঞ্চদম্পতীর দুর্ভাগ্যে করুণায় গ'লে গিয়েছিল। কবিতার উৎপত্তি যে কোন্‌খানে তার ইঙ্গিত রামায়ণের এই ছোট্ট সুন্দর ঘটনাটি হ'তেই মিলে। কবিতা হৃদয়ের জিনিষ, মাথার নয়। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যখন এতই প্রবল হ'য়ে উঠে যে নিজেকে ব্যক্ত না ক'রে পারে না, তখনই সে ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা পায়। মাথা তখন তাকে ভাষা দেয়, অনুরূপ রূপ দেয়, কিন্তু প্রাণ দেয় সেই হৃদয় ছাড়া আর কেউ নয়। কবিতা বনিয়াদি ঘরের মেয়ে, সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের নয়, সেই জন্যেই ত তার বিশেষ বেশের দরকার পড়ে। যে বেশটি সাধারণ নয়, যে বেশটি তার বনেদিত্ব ফুটিয়ে তুলে, সেইটিই তার অপরূপ বেশ। তাকে সাধারণ সাদা শাড়ী মানায় না, তার চাই রঙকরা জরিপেড়ে কাপড়; তার হাতে শুধু দু'গাছি শাঁখা আর নোয়া হ'লেই চলে না, তার চাই হাতে সোনার চুড়ি—ঠুন ঠুন ক'রে তাতে তাল দেবার জন্যে। রঙীন কাপড় হ'ল তার সুন্দর ভাষা, আর সোনার চুড়ি ছন্দ।

যা সাধারণ দৈনিক জীবনের পোষাক তাকে আমরা আটপোরে বলি, সে অত্যন্ত সাধারণ, তাই তার বিশেষত্ব রাখ্‌বার দরকার নেই। ঠিক সেই রকম গদ্য হ'ল আমাদের আটপোরে ভাষা,—এ ভাষায় আমরা দৈনিক আলাপ-পরিচয়ের কথা বলি, সাধারণ জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করি, চিঠি লিখি। আর পদ্য হ'ল আমাদের পোষাকী ভাষা। সাধারণ চিন্তার ধারা, সাধারণ ঘটনা লিপিবদ্ধ হবে গদ্যে, কারণ আর কিছুই নয়, তা গদ্য ব'লেই। আর অসাধারণ অনুভূতি বা অসাধারণ চিন্তা, তা লিপিবদ্ধ হবে পদ্যে—তার কারণ সেইটিই তার অনুরূপ পোষাক। কালিদাসের মত বড় কবি যদিও ব'লে গেছেন 'কিমিব হি মধুরং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্'—সে কথা যেন খাটে না মনে হয়। সুন্দর জিনিষের যে-কোন একটা পোষাক হ'লেই চলে, এ কথায় ত মন সায় দেয় না, এমনটি ঘট্‌লে বরং মন বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসে। গরীবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে যেন মানায় না, এই ত সাধারণ লোকের ধারণা,—এত রূপ এত গুণ এর উপযুক্ত স্থান রাজার ঘরে, এমনই ত লোকে ব'লে থাকে! কোকিলের অমন সুন্দর গলা, কিন্তু তার রঙটা কালো ব'লে কত লোকের মনে দুঃখ র'য়ে গেছে। গোলাপের কাঁটা কত লোকের চক্ষুশূল। একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই, যেমনটি যার মানায় তেমন হওয়া চাই, তবেই ত দেখায় ভাল। সেই জন্যেই আমাদের দশজনের চেষ্টা—সুন্দরকে সুন্দর পোষাক দিয়ে, সুন্দর পারিপার্শ্বিক গ'ড়ে তুলে' তাকে আরও সুন্দর কর্‌তে, তবেই যেন মন তৃপ্তি পায়। এই জন্যেই ত অসাধারণ চিন্তা বা অসাধারণ অনুভূতির বেশ হ'চ্ছে গদ্য নয়, পদ্য।

এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথাটি এই যে কবিতা চিন্তাবহুল নয়, অনুভূতিবহুল। আগের ভাষায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হবে, মাথার জিনিষ নয়, হৃদয়ের জিনিষ। তার কারণ, কবি সত্যের পূজারী নন শিবের পূজারী নন, সবার গোড়ার কথা হচ্ছে তিনি সুন্দরের পূজারী। সত্য যে কি সেই তথ্যের অনুসন্ধানে অসত্যকে বাছাই ক'রে ক'রে ত কবি সময় কাটান না; তিনি সত্য হ'ক, অসত্য হ'ক, সুন্দর হ'লেই তাকে কাছে টেনে নেন, কোলে স্থান দেন। অলীক কল্পনা কবিতার মাধুর্য্য বাড়িয়ে তুলে, তাকে দূষিত করে না। কল্পনার দৌড়ের সেখানে শেষ নেই, অবাধ যথেচ্ছচারিতায় রাজত্ব সেখানে—তাই ত সেটা 'সব পেয়েছি'র দেশ, তাই ত সে আনন্দময়, সে মধুর। শিবের সন্ধানে ঘুরবেন নীতিজ্ঞেরা, কবি নন। তাঁরা বল্‌বেন, এটা কোরো না ওইটা কর, যেহেতু এটা মন্দ আর ওইটা ভাল; নীতিবিরুদ্ধ জিনিষকে সাহিত্যে স্থান দিও না, তা হ'লে কুনীতির প্রচার হবে, খবরদার! কবি-সাহিত্যিক কিন্তু সে কথায় কান দেন না, তিনি বলেন, বুঝি না তোমার ভালমন্দ, আমি বুঝি শুধু সুন্দর ও অসুন্দর। সুন্দর যা সে ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক,

তার গলায় আমি বরণমাল্য দেবই দেব, এই হ'ল আমার ধনুকভাঙা পণ। এই মনোভাবই 'আর্ট ফর্ আর্ট্স্ সেক' নীতির মূলে। ঠিক এই কারণেই কবিতা সত্য বা অসত্য সমালোচনার বাহন নয় বা নৈতিক সমালোচনার বাহন নয়। দর্শনের বই ও নীতিশাস্ত্রের বই গদ্যেই মানায় ভাল, পদ্যে তার নীরসতা আরও বাড়িয়ে দেয় বৈ কমায় না। দর্শন বা নীতির জিনিষ কেবলমাত্র তখনই কবিতায় স্থান পেতে পারে, যখন সে চিন্তার জিনিষ না থেকে অনুভূতির জিনিষ হ'য়ে পড়ে, মাথার জিনিষ না হ'য়ে হৃদয়ের জিনিষ হয়। পদ্যের প্রাণ হ'চ্ছে অনুভূতি, চিন্তা নয়। একটি গভীর অনুভূতি, হৃদয়কে যা আলোড়িত করে, সেই হ'ল কবির বেদনা। এবং সেই অনুভূতি বা বেদনার অভিব্যক্তি হ'ল কবিতা। কবিতার ভাষ', কবিতার ছন্দই কেবল মাত্র যেন সেই বেদনাকে ঠিক প্রকাশ কর্‌তে পারে, গদ্য তা পারে না। সেইখানেই ত কবিতার বিশেষত্ব, এবং সেই ত হ'ল কবিতার বেঁচে থাক্‌বার সব থেকে বড় দাবী, তা না হ'লে গদ্য পদ্যে ভেদ রাখ্‌বার ত কোন দরকার ছিল না।

তাই যদি হয়, তা হ'লে তথাকথিত কাব্য বা মহাকাব্য আসল কবিতা নয়। তার অতীত কালে থাক্‌বার একটা দরকার ছিল, যখন ছাপা কলের সৃষ্টি হয় নি, যখন মানুষকে মুখস্ত ক'রে এই সমস্ত লিপিবদ্ধ ঘটনাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হ'ত। তখন কবিতার আকারে তা থাক্‌লে মনে রাখ্‌বার সুবিধা হ'ত, এই ছিল তার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা। এই জন্যেই নভেল তার স্থান অধিকার ক'রে বসেছে এবং একেবারে তার বংশও নির্ম্মূল ক'রে দিয়েছে বোধ হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে তবু কয়েকটি কাব্য প্রণয়নের কথা শোনা যেত, আজকাল তাও যায় না। আমাদের যোগীন্দ্র বসুর কাব্য দুখানি অতীত যুগের জিনিষ, হাল ফেসানের তা মোটেই নয়। এই ভাবে ইংরেজিতে যাকে বলে 'ব্যাল্যাড্' বা কাহিনী, তারও অনুরূপ বেশ পদ্য নয়, গদ্য। আজকাল তার স্থান অধিকার ক'রে বসেছে ছোট গল্প। রবীন্দ্রনাথের পলাতকার গল্পগুলি বেশী সুন্দর হয়েছে, না গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি? কবিতার একেবারে আসল প্রকাশটি আমরা পাই গীতিকবিতায়, যে কবিতা আমরা সুরসংযোগ ক'রে গাইতে পারি। এই কবিতা মাত্র আধার তাকে গদ্যে রূপ দেওয়া যায় না,—গদ্যে কখনও গান হয় না, কবিতার আকারে তাকে থাক্‌তে হবে, পদ্যই তার স্বরূপ। অন্য সকলজাতীয় কবিতাই গদ্যে রূপান্তরিত হ'তে পারে, কিন্তু গীতিকবিতা তা পারে না—এর একই রূপ, রূপান্তর নাই। 'পল গ্রে'ও যখন ইংরেজি শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সঞ্চয় ক'রে তাঁর বিখ্যাত 'ট্রেজারী' সঙ্কলন করেন, তখন তিনি তাঁর সে বইতে কেবল মাত্র গীতি-কবিতাকেই স্থান দিয়েছিলেন, আর কোনজাতীয় কবিতাকে নয়। তখন তাঁর মনে নিশ্চয় কবিতার খাঁটি রূপ সম্বন্ধে এই ধরণের কোন ভাব জেগে থাক্‌বে।

এই সকল কথাগুলি আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন কবি বিহারীলাল। এই জন্যে তাঁর বিশেষত্ব এবং এই জন্যই তিনি বাংলা কবিতার আধুনিকতম যুগের প্রবর্ত্তক—মাইকেল নন, হেমচন্দ্র নন, আর কেউ নন। মাইকেলের প্রতিভা ছিল, তিনি আমাদের 'সনেট' দিয়ে গেছেন, তবুও তিনি আধুনিক কবি নন। কাব্যরাজ্যের এখনকার যুগ হ'চ্ছে, মহাকাব্যের নয়, কাহিনীর নয়, গীতি-কবিতার যুগ। বিহারীলালই বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম গীতিকবিতার বিজয়পতাকা উড়িয়ে দেন এবং সেই জন্যেই অধুনিক যুগের গোড়ার কবির নাম কর্‌তে হ'লে আমরা কর্‌ব তাঁর নাম।

এই কথাটি যে কতখানি সত্য তা প্রমাণ কর্‌তে বেশী কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হবে না। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ, বর্ত্তমান পৃথিবীতে শুধু কেন, পূর্ব্বেরই মত বোধ হয় সর্ব্বকালীন সারা সৌর-জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনিও একথা স্বীকার কর্‌তে অগৌরব বোধ করেন নি যে বিহারীলাল তাঁর কাব্যগুরু ছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১, আষাঢ় সংখ্যায়) তিনি যা লিখেছিলেন তার অংশ নীচে তুলে দেওয়া হ'ল—

'বর্ত্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদা-মঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায় না; কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ী ভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান পথ.........এই সম্বন্ধে

আমার এই কাব্যগুরুর নিকট আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া অভিনয় করিয়াছিলাম ....সেই নাটকের মূল ভাবটি এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গল হইতে গৃহীত।'

অন্য একজন সাহিত্যসেবী বলেছেন—"পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের বহির্বিকাশ যেমন তদীয় শিষ্য পরিব্রাজক বিবেকানন্দে, ঋষি-কবি বিহারীলালেরও তেমনি বহির্বিকাশ রবীন্দ্রনাথে।" কথাটি অনেকখানি সত্য। বিহারীলালের আর এক শিষ্যও তাঁর কাছ হ'তে শেখা 'সুরে নিজের বাঁশী বাজিয়ে বাঙালীর মনে আনন্দ সঞ্চার করেছিলেন। তিনি তেমন সুপরিচিত ন' হ'লেও কবিক্ষমতা তাঁর যথেষ্টই ছিল। ইনি হলেন অক্ষয়কুমার। তাঁর গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা তিনি এই ভাবে জানিয়েছিলেন—

"বুঝিয়াছি গুরো কিবা শ্রেয় ভবে
কি যে সে মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে
সুখ-দুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি'।"

'এই আরাধ্যা হলেন তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, এর কথা 'সারদামঙ্গল' সমালোচনা সম্পর্কে আমরা ভালভাবে জান্‌ব। কবিতাকে যে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন, তার জন্য দারিদ্র্যও বরণ করতে কুণ্ঠিত হ'তেন না, সে কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—

'দরিদ্র ইন্দ্রত্বলাভে
কতটুকু সুখ পাবে?
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার,—
করিব সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার।'

এমনভাবে যিনি শিষ্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন, তাঁর যে ক্ষমতা বড় কম ছিল না, তা এমনিই বুঝা যায়। তবুও যে বাংলা কাব্যরসিক সমাজে, তাঁর নাম তেমন প্রচলিত নয়, এইটিই ত আশ্চর্য্যের বিষয়। কেন যে এমন হ'ল কে বল্‌তে পারেন? সাহিত্যে খ্যাতি সব সময়ই কি ঠিক যোগ্যতা অনুসারে হয়, না সময় সময় খেয়ালক্রমে হ'য়ে থাকে? তাই যদি না হবে ত ভবভূতির মত কবিরও কেন তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে উপযুক্ত সমঝদার জোটেনি, তাঁকে কেন দুঃখ ক'রে বল্‌তে হয়েছিল যে যাঁরা তাঁর নিন্দে করেন, 'জানান্তি তে কিমাপি, তেষাং প্রতি নৈষো যত্নঃ।' কবি বিহারীলালের বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত স্থান কোথায় সেইটা নির্দ্দেশ করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিহারীলালের কবিতার ভাষা কেমন সুন্দর তার পরিচয় আমরা তাঁর কাব্যগুলির সমালোচনা সম্পর্কে যথেষ্টই পাব। তবে এইটুকু বিশেষ ক'রে বলা দরকার যে তিনি বাংলা কবিতায় যে সৌন্দর্য্য এনেছিলেন, তার আগে আর কেউ তা আন্‌তে পারেন নি। বেশী নয়, কয়েকটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করলেই সেটা বুঝা যাবে। রাত্রির বর্ণনায়—

'শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা দেলা ভুলি;
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে।
দূরে দূরে নীল জলে
দু'একটি তারা জ্বলে,
আমার মুখের পানে দীপ্‌-দীপ্‌ চায়—
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায়।'

খানিক পরে—

'জাগিল সকল তারা
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা
মেঘগুলি ঢুলি ঢুলি কোথায় চলিল।
লুকায়ে চপলা মেয়ে
থেকে থেকে দেখে চেয়ে
কি যেন মনের কথা মনেই রহিল!
* * *
নীরব ধরণী রাণী
হাসিছে আননখানি,
বিকশিত কেশপাশে
কতই কুসুম হাসে,
নাচিছে অদূরে মেয়ে গিরি-নির্ঝরিণী!'

এই যে মানুষের রূপে প্রকৃতিকে দেখা, মানুষের অনুভূতি জড়-অঙ্গে আরোপ করা, এই ত হ'ল কবির অন্তর্দৃষ্টি। এ যাঁর নাই, তিনি কবি নন। কবির এক প্রধান

কাজ মনে হয়, মানুষের আশে পাশের সকল কিছুকে তার ঘনিষ্ঠতর ক'রে গ'ড়ে তোলা, তাদের সঙ্গে ভাবের ও অনুভূতির আদানপ্রদানের পথ উন্মুক্ত করা। এই গুণটি বাংলার কবিদের মধ্যে আমরা প্রথম পাই বিহারীলালের মধ্যে। তাঁর ঋষির অন্তরই এই দিকটিকে এমন সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আর কেউ পারেন নি। এই যে কথাটি—'আমার মুখের পানে দীপ্‌-দীপ্‌ চায়', 'কি যেন মনের কথা মনেই রহিল'—স্বল্প কয়েকটি কথা, এরা এই জড়পদার্থগুলিকে যেন অদ্ভুত ক্ষমতাবলে প্রাণবান্‌ হৃদয়বান্‌ ক'রে তোলে। দু' একটি তুলির টানের পিছনে এত ক্ষমতা!—এই ত কবিত্ব!

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ তিনখানি কাব্যগ্রন্থ হ'চ্ছে—বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল ও সাধের আসন। তিনটি বইয়ে কবির তিনটি বিভিন্ন রূপের পরিচয় পাই। 'বঙ্গসুন্দরী'তে আমরা তাঁকে দেখি সাধারণ নারী ও বিশেষরূপে বঙ্গনারীর ভক্তরূপে *, 'সারদামঙ্গলে' তাঁকে দেখি কবিতাসুন্দরীর বিরহী প্রেমিক হিসাবে এবং 'সাধের আসনে' তাঁকে পাই দার্শনিকরূপে। এই প্রবন্ধ তাঁর শেষের দুইটি কাব্যের সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলালের একটি বিশেষ রকমের বিশেষত্ব আছে। ইনি এ বিষয়ে একেবারে অসাধারণ। এঁর কাছে কবিতা পেশা নয়, কবিতা কালক্ষেপের একটা অবলম্বন নয়, বা অবসর সময়ের সঙ্গী নয়—কবিতা তাঁর কাছে সর্ব্বস্ব। কবিতার কথা তিনি ধ্যান করেন, কবিতার সাহচর্য্য তিনি ভোগ করেন এবং কবিতার বিরহে তিনি একান্ত কাতর হন। কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটি ছিল অন্তরতম সম্বন্ধ, কবিতা তাঁর প্রিয়তমা। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্পর্কে তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন—

"বিহারী বাবু সর্ব্বদাই কবিত্বে মজগুল থাকিতেন, তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন।"

কবি উদয়-আকাশে তাঁর সেই আরাধ্যা দেবী কবিতাসুন্দরীকে সহসা আবিষ্কার করেছেন এই নিয়ে 'সারদামঙ্গল' আরম্ভ—

'ওই কে অমরা-বালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে।
চরণ-কমলে লেখা
আধ আধ রবিরেখা
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।'

তিনি তাঁর স্বাগত গাইছেন এই ব'লে—

'এস মা, ঊষার সনে
বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয়-কমলে।'

এই বাণীকে তিনি স্বাগত ক'রে বরণ ক'রে নিচ্ছেন। তিনি ধন, অর্থ, মান কিছুই চান না, তিনি চান সেই করুণা-রাণীকে, সারদা দেবীকে। তাই তিনি লক্ষ্মীর নিকট থেকে এই ব'লে বিদায় নিচ্ছেন—

'এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার,—
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগিজন তপোবনে আর।'

লক্ষ্মী থাকুন, আর রাগ ক'রে চ'লে যান, কবির কিছুই তাতে আসে যায় না। কবিতাসুন্দরী কাছে থাকলেই হ'ল, আর কিছুর তা হ'লে তাঁর আর প্রয়োজন হয় না। তাঁকে সঙ্গে পেলে শ্মশানেও তিনি স্বর্গ রচনা করতে পারেন—

'তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দুই ভাল লাগে।
* * * *
তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমাহারা হ'লে আমি প্রাণহারা হই।'

এমনি কবি তাঁর কবিতাসুন্দরীকে ভালবেসেছেন। কবিতাই তাঁর সর্ব্বস্ব, তাঁকে নিয়েই তিনি সারাটি জীবন কাটিয়ে দেবেন এই তাঁর একমাত্র কামনা—

---

* ১৩৩৭, মাঘ ও চৈত্র, 'বঙ্গলক্ষ্মী' দ্রষ্টব্য।

'যে ক'দিন আছে প্রাণ
করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণতলে॥'

তাঁর সঙ্গসুখ কবির একান্তই প্রার্থনীয়, তিলেকের ব্যবধানও তাঁর অসহ্য বায়ুর মত, জলের মত তিনি তাঁর জীবন-ধারণের একান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ, একেবারে না হ'লেই নয়। তাই তিনি লিখ্ছেন—

'অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যজি লোকালয়-ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে।'

'সারদামঙ্গল' যেন এই সরস্বতী-বিয়োগ-কাতর কবির বিরহ-উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি। সারদাকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও তাঁকে পান না, মন তাঁর ব্যথার ভারে নুয়ে পড়ছে। অবশেষে দেখা পেলেন—কিন্তু সে অভিমানিনী-বেশে, তিনি তখন ধরা দিয়েও ধরা দিতে চান না, ধর্‌তে গেলে পালিয়ে যান। পরে সারদা আবার অন্তর্হিতা হলেন, কবি তাঁর অন্বেষণে হিমালয়ের সকল প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কবি যেন পুরুরবা এবং সারদা হলেন উর্ব্বশী। সেই স্থান,—সেই বিচ্ছেদ-মূঢ় প্রেমিক কর্ত্তৃক প্রেমিকার অন্বেষণ। দুটি ঠিক একই ধরণের ছবি একটি কালিদাসের আঁকা, অপরটি বিহারীলালের। দুটি ছবিই সুন্দর, অপূর্ব্ব, মনোরম।

সরস্বতী তাঁর 'সাধের স্বপনের ললনা', তাঁকে হারিয়ে তিনি করুণ সুরে গান ধরেছেন—

'কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রি দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব' অকাতরে।'

এই ভেবে তিনি পাগল। জীবন বিষাদময়, সকলই বিরস ঠেকে, সে সোনার কাঠির স্পর্শ কোথায় গেল? 'হৃদি-কমলকামিনী' তাঁর আজ কাছে নাই, সেই জন্যে—

'কোন সুখ নাই মনে
সব গেছে তার সনে
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার!
বুঝি কোন্ পদ্মবনে
লুকায়েছে সঙ্গোপনে
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার!'

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কবি তাঁর হৃদয়দেবীকে পেয়েছেন, কিন্তু এ কি বেশে?—

'বিরাজ সারদে কেন এ ম্লান কমল-বনে?
* * *
মলিন মলিন বেশ,
মলিন চিকণ কেশ,
মলিন মধুর মূর্ত্তি, হাসি নাই চন্দ্রাননে।'

তাঁর কোলে বীণা সে ত নিত্যসুখের, কোনদিন মৌন হ'য়ে থাক্‌তে জানে না, তারও আজ কিন্তু এই বেশ—

'চির আদরিণী বীণা
বেশ যেন দীনহীনা
ঘুমায়ে পায়ের কাছে প'ড়ে আছে অচেতনে।'

তিনি দেখা দিয়েও দেখা দেন না, মন্দাকিনীর ওপারে তিনি, এপারে কবি।—

'মাঝেতে উথলে নদী, দুপারে দুজন,
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজন!'

কবির বিরহ কাতর হৃদয় মিলনের জন্য উৎসুক। তাঁর এ ব্যবধান সহ্য হয় না—

'আকুল ব্যাকুল প্রাণ
মিলি তারে ধাবমান
কেন এসে অভিমান সমুখে উদয়!'

এমনি সময় তাঁর সে লাবণ্যলতা আবার তিরোহিতা হলেন। দেখা দিয়ে আবার লুকানো, এ কি নিষ্ঠুরের মত খেলা! তাঁর প্রাণে বড় বেজেছে, তাই ক্ষোভভরে তিনি গাইছেন—

'কে আমারে অবিরত
ক্ষেপার ক্ষ্যাপার মত,
জীবন-কুসুম-লতা কোথা রে আমার।'

কবি আবার তাঁর পলাতকার অন্বেষণে ছুটেছেন। সামনে মন্দাকিনী বইছে, তাকে জিজ্ঞেস কর্‌ছেন—

'বল দেবী মন্দাকিনী
ভেসে ভেসে একাকিনী
সোনামুখী তরীখানি নিয়েছে কোথায়!'

খুঁজেও দেখা মেলে না, ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে—এ যন্ত্রণা যেন সহ্য হয় না, এর চেয়ে মরণ ভাল। তাই অভিমানের তীব্র আবেগে তিনি এই ব'লে কাঁদ্‌ছেন—

'আমার এ বজ্র-বুক,
ত্রিশূলের তীক্ষ্ণ মুখ
দাও দাও বসাইয়ে, এড়াই যন্ত্রণা !

*　　•　　*

আর আমি কাঁদিব না
আর আমি কাঁদাব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন !'

তবু কি মন তা মানে? আবার তাঁর হারান প্রিয়ার জন্যে মন কেঁদে ওঠে; তাঁর প্রতি ভালবাসা দ্বিগুণ বেগে উথ্‌লে উঠে, তাঁকে ফিরে পাবার ব্যাকুলতা তীব্রতর হয়। মরণকে ডাকা, সে ত অভিমানের বাণী, কতক্ষণ টিক্‌তে পারে? প্রেমের এমনি গতি—শত আঘাতেও সে পরাঙ্মুখ হয় না, তবু আশা বুকে রাখে প্রিয়জন ফির্‌বে ফির্‌বে, এত নিষ্ঠুর কি সে কখনো হ'তে পারে? তাই আবার সেই অভিমানিনী পলাতকাকে খোঁজবার সাড়া প'ড়ে যায়। কবি আবার ছোটেন হিমালয়ের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, উর্ব্বশী বিরহী পুরুরবার মত, সতী দেহত্যাগ ক্ষুব্ধ ভোলানাথের মত। সে খোঁজের বিরাম নাই। এই সম্পর্কে কবির হিমালয়বর্ণনা আমরা পাই। তাঁর সকল কাব্যের মধ্যে এই অংশটি বিশেষ প্রসিদ্ধ কারণ এই বর্ণনাটি এত হৃদয়গ্রাহী ও এত সুন্দর যে অতি সহজেই সকলের মনকে আকর্ষণ করে।

এক নিমিষে কেবল মাত্র দুটি লাইনে হিমালয়ের বর্ণনা তিনি সম্পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন, এমনি তাঁর কবিক্ষমতা। হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্গে সব থেকে যে উপমাটি মেলে সেইটিই তিনি দিয়েছেন। হিমালয় পর্ব্বতমালা যেন অনন্ত জলধি' তা

'ব্যেপে দিগ্‌ দিগন্তর
তরঙ্গিয়া ঘোরতর
প্লাবিয়া যে নভোঙ্গন জাগে নিরবধি।'

ক্ষুব্ধ উন্মত্ত অবস্থায় সমুদ্রকে যিনি দেখেছেন তিনিই বুঝ্‌বেন উপমাটি কত সুন্দর হয়েছে। যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বতমালার ঢেউ ব'য়ে চলেছে, এক একটি শৃঙ্গ এক একটি ঢেউ-এর মাথা,—তুষার তার ফেণা। মহান তার মূর্ত্তি, তার সামনে চোখ বুজে আসে।—

'পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে।

*　　*　　*

তার　ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে, ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া লুটে সিন্ধু-পদতলে।'

হিমালয় শুধু মহান নয়, মনোহরও বটে। সেখানে—

'জলধারা ঝর ঝর,
সমীরণ মর মর,
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চারিদিকে,—
চমকি আকাশময়
ফুটে উঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুল্লতা মিলায় নিমিষে।'

এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে হিমালয়ের বুকের ওপর লতা, গুল্ম, কুঞ্জ কত খুঁজলেন, তবু তাঁর মানসীর দেখা পেলেন না। কেন, তবে তাঁর কি কোন ত্রুটি হয়েছে, সারদা অভিমান করেছেন? তাই যদি হ'য়ে থাকে যেন ক্ষমা করেন, দেখা দেন, তা না হ'লে ত গতি নাই—

'হে সারদে দাও দেখা,
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়;
কি বলেছি অভিমানে
শুনোনা শুনোনা কানে,
বেদনা দিওনা প্রাণে ব্যথার সময়।'

তাঁর প্রার্থনায় অভিমানিনীর মান বোধ হয় ভাঙ্‌ল, তাই বোধ হয় তিনি আবার দেখা দিতে এলেন। না দিয়ে কি থাক্‌তে পারেন, তিনি যে 'করুণা-মেয়ে'। অদূরে ঐ দাঁড়িয়ে কে? তিনিই নয়?—

'আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কান নাই, মন নাই, আমার কথায়।'

কবির সে কথায় তাঁর মুখে হাসি ফুটল। কবির দুঃখ কোথায় ধুয়ে-মুছে গেল। আবার তিনি আনন্দে গেয়ে উঠলেন—

'আহা কি ফুটিল হাসি,—
বড় আমি ভালবাসি
এই হাসি-মুখখানি প্রেয়সী তোমার!'

এমনি কবিতাসুন্দরীকে তিনি ভালবাসেন, এমনি তার সঙ্গে দিন-রাত্তির ধ'রে প্রণয় খেলা। তাঁর সঙ্গে বিরহ অসহ্য—যেমন অদ্ভুত তেমনি মনোমুগ্ধকর। এমনটি বড় দেখা যায় না। এমন নেশার চোখ যাঁর আছে তিনিই ত সত্যিকারের কবি!

বিহারীলালের সব শেষে প্রণীত বইখানির ইতিহাস যেমন অপূর্ব্ব বইখানিও তেমন কবির মনের আর এক দিকের পরিচয় আমাদের এনে দেয়। তিনি কেবল কবি নন, দার্শনিকও বটে; দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টিও তাঁর যথেষ্ট পরিমাণ ছিল এবং তার বলে তিনি যে তথ্যে উপনীত হয়েছেন, তা কত সুন্দর সেটাও আমাদের অনুভব করবার বিষয়।

এক মহিলাকবি 'সারদামঙ্গল' হ'তে এই লাইন ক'টি লিখে একটি আসন কবিকে উপহার দিয়েছিলেন—

'হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও?'

এবং তার নাম দিয়েছিলেন 'সাধের আসন'। সেই নাম অনুসারে এই বইয়ের নাম। 'কাহারে ধেয়াও' এই কথা দুটি সেই চরম ধ্যেয় বস্তুটির অনুসন্ধানে কবিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং তা হ'তেই তাঁর দর্শনের সৃষ্টি। কত সামান্য কাজ মানুষকে কত বড় প্রেরণা এনে দেয়। যিনি এই কথা দুটি আসনে লিখে দিয়েছিলেন তিনিই ভাবতে পেরেছিলেন এমনটি হবে? কত সামান্য ঘটনার কত বড় ফল! এটিও কম বড় দেখ্‌বার বিষয় নয়।

কবির মনের কাছে বিশ্বরহস্য কান্তিরূপেই প্রকাশ। সমস্ত জগৎটি কান্তির লীলাভূমি। কান্তি তার আত্মা, বহির্জগৎ তার দেহ; কান্তি অন্তর—জগৎ বাহির। দুই পরস্পর-অবলম্বী, প্রাণ ও দেহের মত। এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই দুটিই আবহমানকাল স্থায়ী। সৃষ্টির সঙ্গে এই যে প্রলয়ের লীলা পাশাপাশি চলেছে তার পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। সে হ'চ্ছে এই যে পরিবর্ত্তন ভিন্ন কান্তির উপলব্ধি হয় না, সৌন্দর্য্যবোধ আলোড়িত হয় না। সেই জন্যই ধ্বংসের প্রয়োজন। তবে একেবারে লয় কোথাও নেই, 'সমষ্টি'র মধ্যে লয় আছে, 'সমগ্রে'র মধ্যে নেই। সেই লয় পুরাতনকে টেনে নেয়, মুছে দেয়, নূতনের প্রকাশের পথ ক'রে দেবার জন্যে। নিত্য নবরূপে এবং একসঙ্গে অসংখ্য রূপে সেই কান্তিরই লীলা চলেছে। তোমরা মানুষেরা সেই সৌন্দর্য্য চোখ দিয়ে দেখ, কান দিয়ে শোন, সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রাণ পূরে ভোগ কর। এই ত আনন্দ, এই ত জীবনের পরমার্থ। কিন্তু চরম রহস্য উদ্ঘাটন কর্‌তে কেউ যেন না যান। রহস্যই বিশ্বের প্রাণ, রহস্যই সৌন্দর্য্যবোধ এনে দেয়। সমস্ত যদি জানা হ'য়ে যায়, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য লুপ্ত হ'য়ে যাবে, সেই ত হ'ল মহাপ্রলয়,—মহাপ্রলয় আর কিছু নয়। এই পরম রহস্যটি তাই মানুষের অজ্ঞেয়, বুদ্ধির নাগালের বাহিরে। এই হ'ল তাঁর দর্শন।

পারিভাষিক কথায় বল্‌তে গেলে তাঁকে আমরা বলব, তিনি রহস্যবাদী বা 'মীষ্টিক্' এবং তাঁর মতে 'পরমসত্য' জ্ঞানের বাহিরে, অর্থাৎ তিনি 'এ্যাগ্‌নষ্টিক' বা অজ্ঞেয়বাদী। সে কথা যাক—তাঁর দর্শনের সব থেকে সুন্দর অংশ হ'চ্ছে এই যে তিনি বিশ্বলীলার অর্থ কি তার সম্বন্ধে যেন প্রকৃত উত্তরটি ধ'রে ফেলে দিয়েছেন। সেইটাই তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব।

এইবার আমরা কবির নিজের কথাতেই তাঁর দর্শনটি বুঝ্‌তে চেষ্টা করব। বিশ্বের চারিদিকে সৌন্দর্য্যের, লাবণ্যের ছড়াছড়ি, তারা সকলই তাদের আধারস্বরূপা সর্ব্বদেহ-অধিষ্ঠাত্রী কান্তিরূপা দেবীর কথা বলে—

'কহে যেন রূপের কথা
বসন্তের তরুলতা
সমীরণে ডেকে বলে নির্জ্জনে কাননফুল;
শুনে সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুল ঢুল।'

তিনি আরও গাইছেন—

'যেদিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই,

অত্যুল্লাসকারী অয়ি
পরম আনন্দময়ী—
কে তুমি মা কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাসিত ?'

এই 'কে'র উত্তর বুঝি পাওয়া যায় না। এ রহস্য চিরকালের জন্য অভেদ্য। বুদ্ধিকে এ ধরা দেয় না, কেবল মনের খেদ বাড়িয়ে দেয়। কবির নিজের কথায়—

'এত বড় কাণ্ডখানা
বুদ্ধিতে না যায় জানা ;
বাইবেল, কোরাণ, বেদ,
মেটে না মনের খেদ !'

এই কথাই তিনি আর এক জায়গায় এই ভাবে বলেছেন—

'ধেয়াই কাহারে দেখি, নিজে আমি জানিনে।
মধুর মাধুরীবালা,
কি উদার করে খেলা—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।'

কথায় এ প্রকাশ করা যায় না, অন্তরে আব্‌ছায়া অনুভব করা যায় মাত্র। এ সেই উপনিষদের কথা—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।

এ রহস্য ভেদ করা যায় না যে শুধু তাই নয়, ভেদ করবার জন্যে সৃষ্টিও নয়। এ সৃষ্টি এত সুন্দর, এত মধুর—তার কারণ এ রহস্য আবৃত ব'লে। এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'লেই সকল সৌন্দর্য্য মিলিয়ে যাবে, সকল আলো নিভে যাবে,—সেই হ'ল মহাপ্রলয়।

'রহস্য বিশ্বের প্রাণ
রহস্যই স্ফূর্ত্তিমান
রহস্যে বিরাজমান ভব।

* * *

রহস্যই মনোলোভা,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-শোভা !'

বিশ্বে মহাপ্রলয় নেই, যা আছে তা খণ্ডপ্রলয়। মহাপ্রলয় থাক্‌তে পারে না, কারণ কান্তি নিত্য—চিরস্থায়ী। কাজেই তার বাহিরের রূপটিও চিরস্থায়ী—

'বিশ্বের প্রকৃতি এই—
একেবারে লয় নেই ;
এক যায় আর আসে
তরুণ সৌন্দর্য্যে ভাসে।'

এক যায় অন্যের পথ ক'রে দেবার জন্যে, কান্তির বহিরাবরণকে নিত্য নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে। এই ভাবে পুরাতনের একঘেয়েত্ব ঘুচিয়ে দেওয়াই, এই খণ্ডপ্রলয়ের উদ্দেশ্য

সৃষ্টির আদিমতম রূপটি, যেটি আমাদের দার্শনিকদের মতে ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা, তিনি এইরূপ বর্ণনা করেছেন—

'পূর্ণ মহামহেশ্বর
বাক্য-মন-অগোচর।

* * *

কার্য্য নন, কর্ত্তা নন,
ভোগ নন, ভোগী নন।'

* * *

এই নির্গুণ রূপ, এ কি ভাল লাগে? এই নির্ব্বিকার অবস্থা কেবল আনন্দের আধার আর কিছু নয়, এ অত্যন্ত অসহ্য।

'কেবল পরমানন্দ
কি যেন বিষম ধন্দ।

* * *

নিরলিপ্ত পাপ পুণ্যে
থাকা শুধু শূন্য শূন্যে ?

* * *

জ্বালাতন, জ্বালাতন,
ঘোরতর জ্বালাতন—কি বিষম জ্বালাতন !'

এই জন্যই সৃষ্টির প্রয়োজন, এই জন্য সৃষ্টির প্রেরণা। কেবল আপনাতেই আপনি থাকা, এক আছে, দুই নেই, কার্য্য নেই, পরিবর্ত্তন নেই—সে কি বিপুল শূন্যতা! সেই শূন্যতা দূর করবার জন্যেই এককে দুই হ'তে হবে, বহু হ'তে হবে, সৃষ্টি করতে হবে। এ সেই উপনিষদের বাণী, কবি নূতন ক'রে আমাদের বোঝালেন—'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।' তারপর সেই একমাত্র অদ্বিতীয়ের একাকীতা ভাল লাগল না, তিনি তখন ঠিক করলেন বহু হ'তে হবে,—'সোহমন্যত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি'। এই হ'ল সৃষ্টির প্রেরণা; তারপর তিনি তপস্যা

ক'রে সৃষ্টি করলেন, এক বহু হলেন। তবেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি,—তবেই মাধুর্য্যের সৃষ্টি। সৃষ্টি হ'ল যেন, সৃষ্টির অর্থ কি?—সে সম্বন্ধে এই বোধ হয় চরম এবং পরম উত্তর, এর চেয়ে বড় কথা কেউ শোনাতে পারেন না। কবির কথায় নির্গুণরূপে থেকে থেকে জ্বালাতন হ'য়ে 'পূর্ণ মহেশ্বর' পৃথিবীতে জন্ম নিলেন—

'জ্বালা জুড়াবার তরে
এলেন নন্দের ঘরে।'

এই হলেন কবি বিহারীলাল। কবিতা তাঁর প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তরবাসিনী। নারী তাঁর চক্ষে মহীয়সী, জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্ব তাঁর চক্ষে সৌন্দর্য্যের চিরন্তন লীলা-স্থল—কান্তিরূপিণী রহস্যময়ীর আধার। এমন যিনি দেখতে জানেন, এমন যিনি লিখতে জানেন, তাঁর ভাগ্যেও যথেষ্ট সমাদর লাভ হয় নি। তাঁর নাম দু'দশ জনে জানলেও তাঁর বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম লোকেরই আছে। যোগ্যতা অনুসারে তাঁর নাম কত ওপরে হওয়া উচিত! এই পাগল কবিটির কি তেমন দিন আসবে না যেদিন তিনি তাঁর উপযুক্ত সমাদর পাবেন? ভবভূতি তাঁর জীবনে সমাদর পাননি, সে জন্যে কত দুঃখ করেছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ত তাঁর ভক্তের অভাব হয় নি। আমরাও এই প্রার্থনা করি যে বিহারীলাল যেন একদিন তাঁর উপযুক্ত সমাদর পান। সে প্রার্থনা অপূর্ণ রবে কি?

আল্‌পনার ছন্দ *

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

সেই পুরান আমোলের গুহাগাত্রের আলঙ্কারিক চিত্রকলার যে ছন্দ, সেই সব পুরান পটুয়াদের পরিপুষ্ট চিন্তার যে ব্যাখ্যান, আমাদের এই সুদূর পল্লীগ্রামের (খুলনা ও যশোর অঞ্চলের) গৃহাঙ্কিত আল্‌পনারও মূলে সেই একই ছন্দ,—পল্লীমায়েদের সরল প্রাণের সহজ অনুভূতির অনাড়ম্বর ব্যাখ্যানেও সেই একই প্রকাশ দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অজন্তার ১ নং গুহার ছাদে অঙ্কিত পদ্ম ও মৃণালের যোগাযোগে তখনকার দক্ষ শিল্পীরা যে ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, 'ফুল ও লতাপাতা'র আল্‌পনায় অবিকল সেই একই ছন্দ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে একটি মূল লতা ঢেউ খেলিবার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রত্যেক ফাঁকে ফাঁকে অজন্তার চিত্রে একটি বড় প্রস্ফুটিত পদ্ম অঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু আল্‌পনায় যদিও ঐ স্থলে পদ্ম ব্যবহৃত হয় না তথাপি ঐ ঐ স্থলে এক একটি বিচিত্র পুষ্পের অবতারণা করা হয়। আশ্চর্য্য,—দুই স্থলের কোথাও প্রকৃতিকে যথাযথ নকল করা হয় নাই। বরং দুই দক্ষ ও সহজ শিল্পীর আলঙ্কারিক ছন্দের মূলগত সাদৃশ্য দেখিয়া চমক্ লাগে। সর্ব্বোপরি ঐ সব প্রাচীন চিত্রে যেমন সমতা (Balance) অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হয়, আল্‌পনায়ও তাহা অতি নিপুণভাবে প্রকাশমান। এমন কি, অজন্তার ঐ সমস্ত আলঙ্কারিক চিত্র যেমন 'জমাট' করিয়া অঙ্কিত, আল্‌পনায়ও ঐ একই 'জমাট' সুর দেখিতে পাই।

অজন্তার ১১ নং গুহার ছাদে অঙ্কিত বৃত্তাকার চিত্রের সহিত যদি বৃত্তাকার আল্‌পনার তুলনা করা হয়, তবে উভয়ের অঙ্কনপদ্ধতির সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য্যরূপে লক্ষিত হয়। বৃত্তাকার আল্‌পনা মাত্রেই তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক আল্‌পনার মধ্যস্থলকে কেন্দ্র করিয়া, সমগ্র আল্‌পনার একতৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া একটি পদ্ম অঙ্কিত হয়। উহাকে 'মূল-পদ্ম' বলিতে পারি। এবং বৃত্তাকার আল্‌পনার ইহাই প্রথম অংশ। 'ক্রম-পুষ্ট' আল্‌পনার প্রথম অংশের পর দ্বিগুণ স্থান পর পর নানাপ্রকার সুদৃশ্য লতার সমাবেশে পুষ্ট। এবং প্রত্যেকটি লতা এক একটি রেখা দ্বারা বিভক্ত। এবং উহাই বৃত্তাকার

* ১৩৩৭, চৈত্র, বঙ্গলক্ষ্মীর 'গ্রামের আল্‌পনা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আল্পনার দ্বিতীয় অংশ। রেখাগুলি যে স্থলে শেষ হয় ঐ স্থলে একটি শেষ 'সহজ' রেখা দ্বারা সমস্ত আল্পনাটিকে বেষ্টনী দেওয়া হয়; এবং ঐ রেখার উপর হইতে 'কলসী' কাটা হয়। 'কলসী' কাটাই আল্পনার শেষ, এবং বৃত্তাকার আল্পনার ইহাই তৃতীয় অংশ

এখন অজন্তার ১১ নং গুহার ছাদে অঙ্কিত বৃত্তাকার চিত্রটির সহিত, আল্পনার উপরে বর্ণিত মূল অঙ্কন-পদ্ধতির তুলনা করিলে, অত্যন্ত সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। ঐ চিত্রটিও তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমেই কেন্দ্রস্থলে একটি পদ্ম—আল্পনার মূল-পদ্মের অনুরূপ। তৎপরে অত্যন্ত সুদৃশ্য দুইটি লতা। প্রত্যেকটি এক একটি রেখা দ্বারা বিভক্ত—সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে অঙ্কিত আল্পনার দ্বিতীয় অংশের অনুরূপ। অবশ্য অজন্তার লতা, ও আল্পনার লতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। তথাপি উভয়ের অবস্থান ও ছন্দ এক। তবে উভয়ের তৃতীয় অংশের আকৃতি এক নহে কিন্তু অবস্থান এক।

মূল-পদ্ম নানাপ্রকার। অবশ্য প্রত্যেক মূল-পদ্মের সহিত তাহার পরবর্ত্তী লতা বা 'কলসী'গুলিও একই ছন্দের হইয়া থাকে; এবং তাহাই সঙ্গত। মূল-পদ্মের দলগুলি পাঁচটি হইতে পোনেরো বা তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অজন্তার ১ নং গুহার ছাদের বৃত্তাকারে অঙ্কিত চিত্রের পাপড়িগুলির সহিত, আল্পনার 'মূল-পদ্মে'র পাপড়িগুলির ছন্দ প্রায় একই প্রকার। ইহা আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—আমাদের দেশে বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে পিঁড়ীর উপরে যে 'শতদল'পদ্ম অঙ্কিত হইয়া থাকে তাহা ঐ ১ নং গুহার ছবিটির হুবহু অনুরূপ।

এই স্থলে ভয়ে ভয়ে একটি কথা বলিতে চাই। অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের ছন্দের সহিত যেমন বাংলা দেশের আল্পনার ছন্দের ও অঙ্কনপদ্ধতির মূলগত ঐক্য দেখিতে পাই এমন আর কোন প্রদেশের আল্পনায় দেখিতে পাই না। লক্ষ্মৌ স্কুল অব আর্টস্ এণ্ড ক্রাফটস্-এর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় তাঁহার 'অজন্তা' নামক পুস্তকে অজন্তার গুহাগাত্রের চিত্রাবলী বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকিবে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কালীঘাটের পটের চিত্রাবলীর সহিত সাদৃশ্যই ঐ সন্দেহ প্রকাশ করিবার একটি কারণ। আমি মাত্র ঐ সন্দেহ আর একবার প্রকাশ করিলাম।

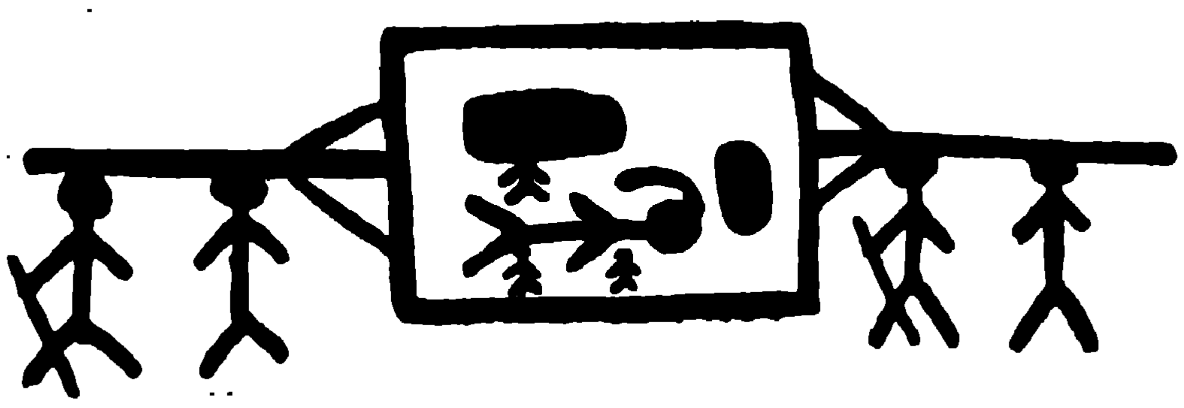

পাল্কী বেহারা
(ব্রতকথার আল্পনা)

হেঁচি-কর্‌কচি—একজোড়া পাখী
(ব্রতকথার আল্পনা)

'মূল-পদ্মের' ধারা সাধারণতঃ অন্তর্মুখী। কিন্তু 'ক্রম-বর্দ্ধিত' আল্পনার 'মূল-পদ্ম' প্রায়শঃ বহির্মুখ, তাহার পাপড়ি কেন্দ্রাভিমুখ, এবং বহির্মুখ 'মূল পদ্মের' পাপড়িগুলি বহিরাভিমুখে স্থাপিত হইয়া কেন্দ্রস্থলে সমতা (Balanco) রক্ষা করে। কিন্তু 'ক্রম-পুষ্ট' ও 'ক্রম-বর্দ্ধিত' এই উভয় প্রকার আল্পনার দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ যে-স্থলে নানা ছন্দের লতার সমাবেশ, তাহা সম্পূর্ণ ও স্বতই বহির্মুখ। উভয় প্রকার আল্পনার তৃতীয় অংশ, যাহাকে গ্রাম্যভাষায় 'কলসী' কাটা বলে, তাহা অপূর্ব্ব কৌশলে অন্তর্মুখ করিয়া অঙ্কিত হয়, এবং ঐ

'কলসী' অতি আশ্চর্য্যরূপে সমতা-কেন্দ্র রক্ষা করিয়া আল্‌পনাটিকে সুদৃশ্য ও সুসঙ্গত করিয়া তোলে।

'মূল-পদ্মের' পর দ্বিতীয় অংশে যে লতার বেষ্টনী থাকে, ঐ সকল 'লতা' প্রায়শঃ কোন বিশেষ একটি দ্রব্যের আদর্শ হইতে গৃহীত অর্থাৎ ঐ আদর্শ বস্তুর লতাভূত অবস্থা। যেমন শঙ্খ, ফুল, ধানের শীষ, লক্ষ্মীর 'পা' ইত্যাদি। শঙ্খ-লতাটির গঠন অত্যন্ত সুন্দর ও কৌশল-পূর্ণ। 'ক্রমবর্দ্ধিত' আল্‌পনার লতাগুলি অবশ্য ঐ প্রকার নহে। তাহা কেবলমাত্র কতকগুলি অসমরেখার বেষ্টনী মাত্র। কিন্তু সমস্ত রেখা অত্যন্ত সমতা রক্ষা করিয়া অঙ্কিত হয়। এবং ঐ সমস্ত রেখাপাতের দ্বারা যে ক্রমিক কক্ষ সৃষ্টি হয় তাহা নানাবিধ বিচিত্র পুষ্প-পত্রের দ্বারা পূর্ণ করা হইয়া থাকে।

বৃত্তাকার আল্‌পনার সর্ব্বশেষ অংশের নাম 'কলসী'। উহা এক একটি করিয়া পর পর বৃত্তাকারে অঙ্কিত থাকে। প্রত্যেকটির মস্তকে দুইটি করিয়া শাঁখা দুই বিপরীত দিকে বাঁকিয়া সমতা-কেন্দ্র রক্ষা করে। অনেক সময় মধ্যস্থলে আরও একটি শাঁখা অঙ্কিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত শাঁখা-গুলির গায়ে বক্রভাবে অনেকগুলি পাতা অঙ্কিত হয়।

পুকুরের সজ্জা (ব্রতকথার আল্‌পনা)

দুই এক শ্রেণীর 'কলসী' দেখিতে জলের কলসীর মত, বোধ হয় ঐ জন্য উহাকে 'কলসী' বলা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে উহার কি নাম তাহা জানি না। ঐ সমস্ত 'কলসী'র মূল অনেক প্রকারের হইয়া থাকে—ত্রিকোণাকার, পাণ-পত্রাকার, কলসীর আকার, অনেক সময় পিঁয়াজের আকারেরও হইয়া থাকে; তবে সমস্তগুলিরই মূল ধারা বহির্ম্মুখী। এক প্রকার 'কলসী' আছে তাহার মূল পরস্পর-সংযোজিত ভাবে প্রসারিত হয়। সংক্ষেপে ইহাই বৃত্তাকার আল্‌পনার বৃত্তান্ত।

লক্ষ্মী-পূজার সময় পূজাস্থল হইতে বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে 'পা' অঙ্কিত হইয়া থাকে। উহাকে লক্ষ্মীর 'পা' বলে। গ্রাম্য লোকের ধারণা বাহির হইতে লক্ষ্মী দেবী

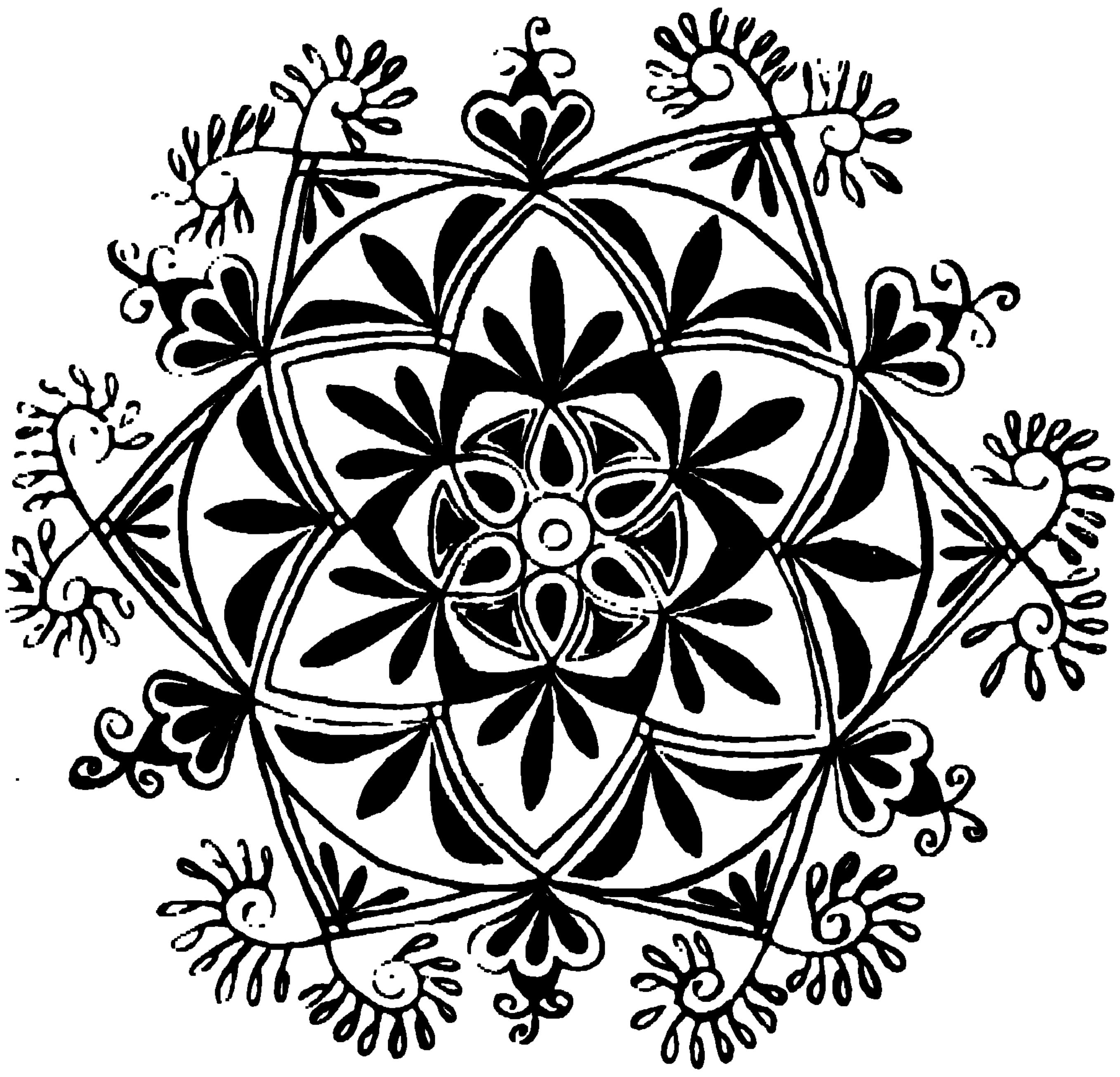

ক্রমবর্দ্ধিত আল্‌পনা

হাঁটিয়া পূজাস্থলে আসেন ও ঐ তাঁহার পদচিহ্ন। ঐ পদ-যুগল যদি সাধারণ মানুষের মত হইত, তাহা হইলে উহার কোন মূল্যই থাকিত না। মানুষের 'পা' ও দেবীর পায়ের মধ্যে বিশেষ প্রকারেই পার্থক্য রক্ষা করা হইয়াছে। লক্ষ্মীর 'পা' পাঁচ প্রকার। প্রত্যেকটিতেই অপূর্ব্ব উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় আছে। ধানের শীষ্ আল্‌পনায় খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে নানাভাবে—কখন বক্র কখন সরল রেখায় ধানের শীষ্‌কে অঙ্কিত করা হয়।

ব্রতকথার আল্‌পনা সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। তাহা এক একটি খণ্ড খণ্ড ছবির মত (চৈত্রের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য)। ঐ গুলিকে ব্রত-কাহিনীর Illustration বলা যায়। ব্রত-কথার এক একটি ছড়া অতি মধুর, তাহার সহিত ঐ ছড়ার আল্‌পনার Illustration আরও সুন্দর। ঐ সমস্ত আল্‌পনাগুলি প্রায়শঃ গ্রাম্যজীবনের সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে গৃহীত। এবং উহা কোন

জিনিষের যথাযথ অনুকরণ নহে কেবল মাত্র উহার 'ইঙ্গিত' বা 'ঠাট'।

এই প্রকার আল্পনা-সম্বলিত ব্রতকথার প্রচলন আমাদের দেশে অনেক ছিল। অল্প বয়সে মেয়েরা এই-রকম বহুপ্রকার ব্রতকথার সঙ্গে আল্পনা দিয়া, আল্পনার 'ধাঁচ' ও সাবলীল রেখাপাতের কৌশলটি করায়ত্ত করিয়া ফেলিত। এই রকম একটি ব্রতের ছড়া ও তাহার আল্পনার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।—

ব্রতটির নাম "বেল-পুকুরের ব্রত"। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন, কুমারী মেয়েরা এই ব্রত আরম্ভ করিয়া

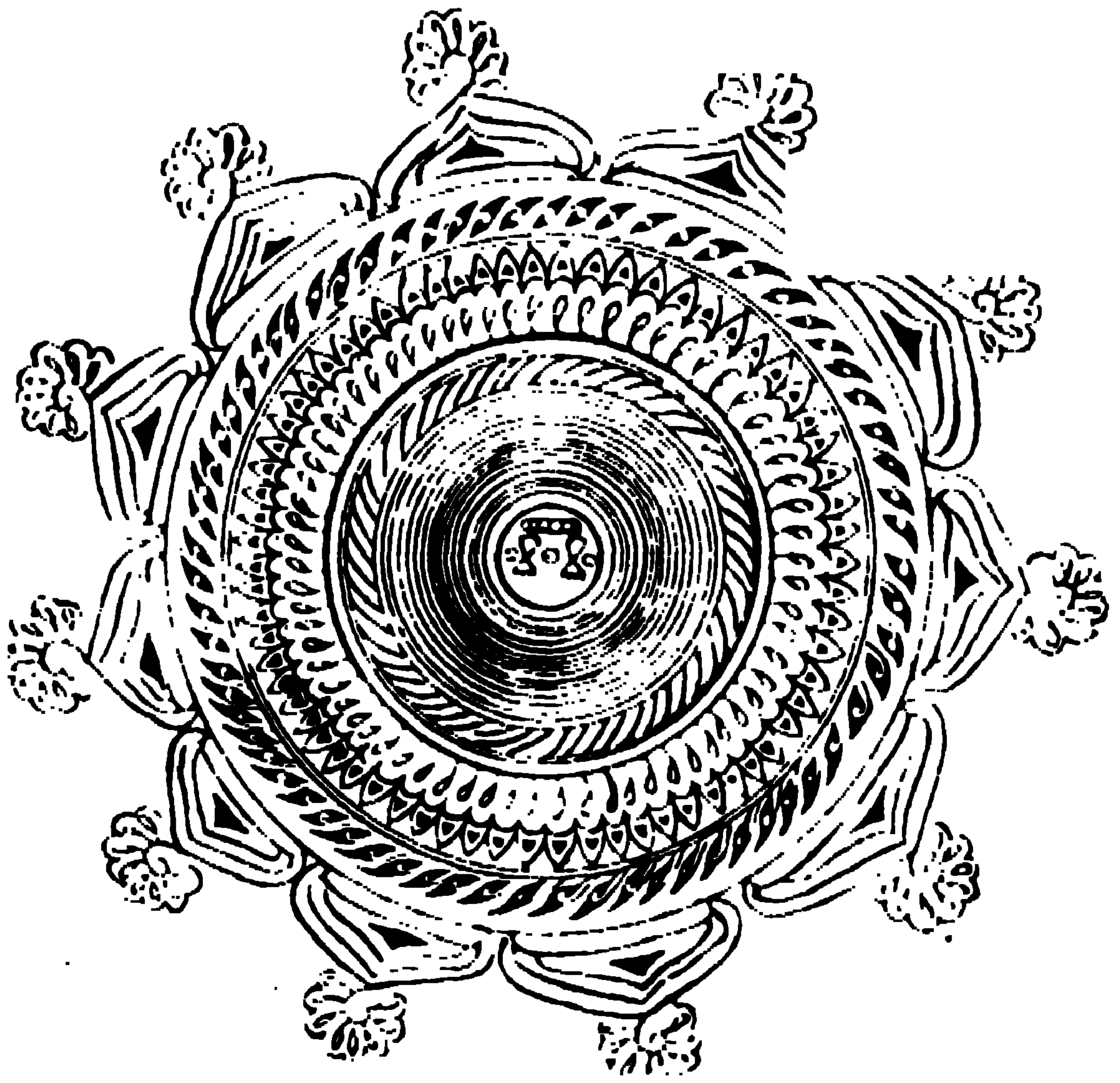

লক্ষ্মীপূজার আল্পনা

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে ইহা শেষ করিয়া থাকে। একটি অতি ছোট্ট পুকুর কাটিয়া তাহার আশে পাশে সমস্ত উঠান ভরিয়া নানা প্রকারের আল্পনা দেয়; আর রোজ বৈকালে মন্ত্র পড়িয়া, দূর্ব্বা দিয়া পূজা করে। মন্ত্রগুলি আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র একটি পল্লীগ্রামের দুখী-সুখী মেয়ের অতি চেনা হাসিকান্নার ইতিহাস। মন্ত্রগুলির সঙ্গে আল্পনাও অতি আশ্চর্য্য রূপে তাল রাখিয়া চলে।

ছোট্ট পুকুরটির চারি পাশে রেখা টানিয়া ও কোণায় "কলসী" কাটিয়া চমৎকার করিয়া তোলা হয়। প্রথমেই পুকুর-পূজা—

বেলপুকুর বেলেশ্বর
ভাই আমার লক্ষ্মীশ্বর।
লক্ষ্মী লক্ষ্মী ডাক পড়ে
সোনার থালে হাত পড়ে।
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু
শাঁখার আগায় সুবর্ণের খাড়ু॥

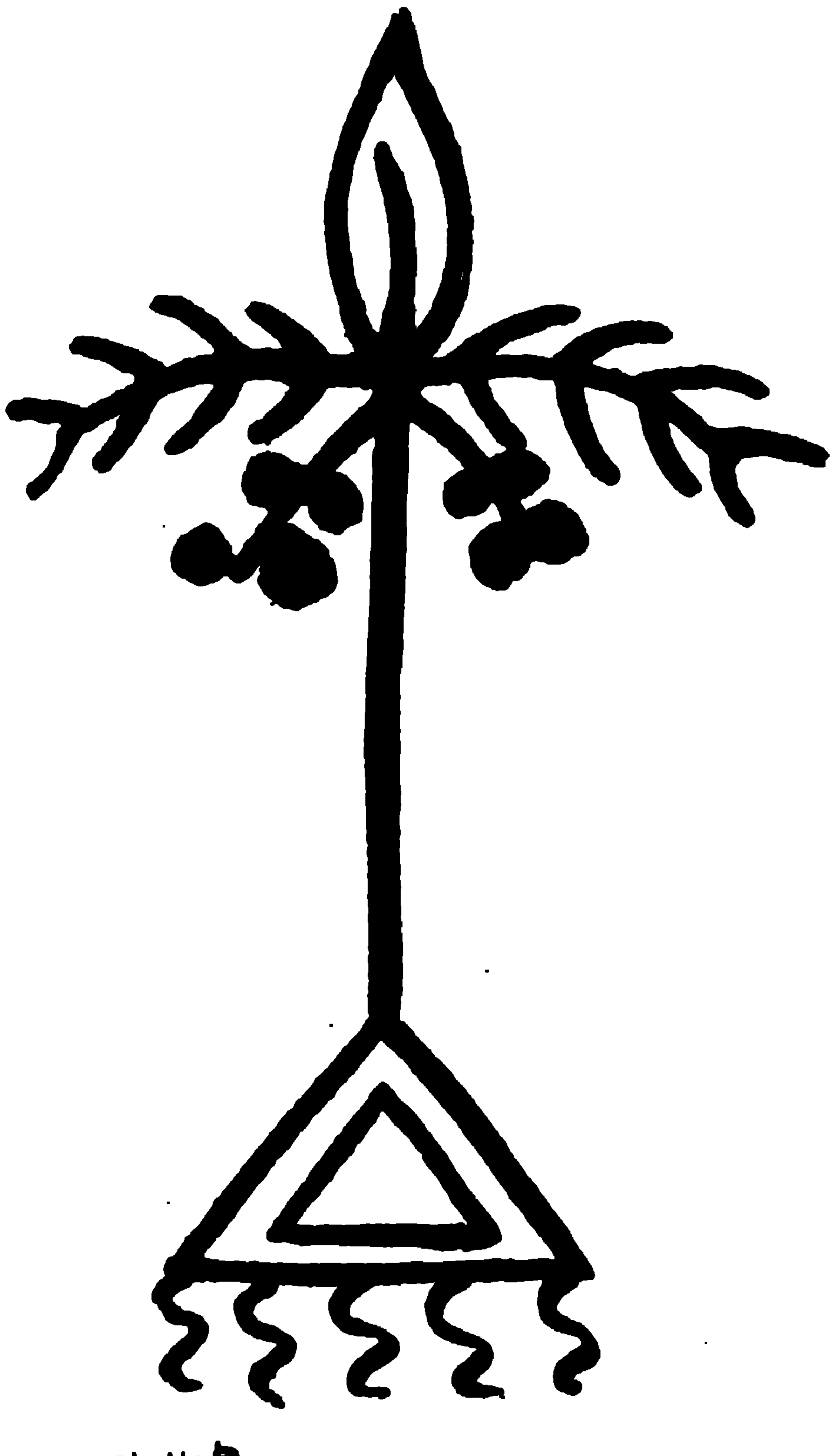

...গুয়া গাছটি
মুষ্টি ধরে মাজা,
বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর
ভাই হয়েছেন রাজা।

ছোট্ট মেয়েটির বিবাহ হয় নাই; বাপের বাড়ীতেই থাকে। দাদা-বৌদির আদর যত্নে পালিত হয়। বেলেশ্বরকে (শিব) ডাকিতে গিয়াই প্রথমে মনে পড়িল দাদার কথা; দাদা তার লক্ষ্মীর মত বৌটি নিয়া যেন ভাল খায়,ভাল থাকে। "সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু" এই কথাটিতে তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষার কথা ধরা পড়ে। তার দাদার বৌটি যেন "শাঁখার আগায় সুবর্ণের খাড়ু" পরিতে পায়।

এমনি করিয়া দিন কাটে, বিবাহের বয়স হয়। মনে

মনে ভাবে, না জানি কেমন স্বামীর হাতেই না পড়ে। আর সব সহিবে কিন্তু মূর্খ স্বামী সহিবে না।—

হর হর শঙ্কর দয়া কর নাথ,
—কক্ষণ না পড়ি মূর্খের হাত।

সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলির এক টানে শিব আঁকিয়া দেয়। তার পর 'চন্দ্র, সূর্য্য, তারা'র পূজা। "চন্দ্র, সূর্য্য, তারা'র আল্‌পনাটিতে সমতার (Balance) উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই। প্রথমে সূর্য্য, তাহাকে বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধ চন্দ্র, তাহার উপরে পাশে পাশে দুই সারি তারা সুসম্বদ্ধ ভাবে অঙ্কিত হয়।

যাক্ এমনি করিয়া মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেল।—

তারা পোজেন তারিণী
সুক্ সোয়ামী মরে নি!

স্বামী তাহার সুখের হইয়াছে; এখন ঘর-সংসারের কথা তাহার মনে হয়—রান্নাঘর, গোশালা, ঢেঁকীশালা সকলই তাহার চাই।—

আমি দিলাম পিটুলীর রান্নাঘর
আমার যেন হয় সত্যির রান্নাঘর।
আমি দিলাম পিটুলীর ঢেঁকীঘর
আমার যেন হয় সত্যির ঢেঁকীঘর।
ইত্যাদি, ইত্যা দ।...

সব চাইতে এই সমস্ত রান্নাঘর, ঢেঁকীঘর প্রভৃতি অঙ্কনে বেশী নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। (চৈত্রমাসের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য) কিছুদিন যায় সুখে দুখে স্বামীর ঘর করে, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সর্ব্বদাই কেমন ভয় ভয় করে—স্বামী যদি আর একটি বিবাহ করিয়া বসে? তাই সব সময়ে প্রার্থনা করে—

আয়না আয়না
সতীন যেন হয় না।

কিন্তু হইলে কি হয়? স্বামী তাহার বিবাহ করিয়া বসিল—একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে সাতটি। মন তাহার ক্ষোভে দুঃখে বিষ হইয়া গেল, অথচ তাহার দুঃখ দেখিবার সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই। যাকে দেখে তার কাছেই সতীনের মৃত্যু কামনা করে। রান্নাঘরে "হাতা-বাউলী" নাড়া চাড়া করিতে করিতে বলে—

হাতা হাতা হাতা
খা সতীনের মাথা!

"হাতা-বাউলী" দুটির যোগাযোগ অতি সহজ ও চাতুর্য্যপূর্ণ। (চৈত্র মাসের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য)

এত দুঃখে শ্বশুরবাড়ী তাহার আর ভাল লাগে না। কেবলি মনে হয়—বাপের বাড়ী হইতে পাল্কি নিয়া যদি তাহাকে কেহ লইতে আসে তবে সে তাহার ছেলে-মেয়ে সহ চলিয়া যায়।—

বাপের বাড়ীর দোলাখানি শ্বশুরবাড়ী যায়।
আস্‌তি যাতি দোলাখানি ক্ষীর কর্পূর খায়॥

(পাল্কির আল্‌পনার বিবরণ গত চৈত্র মাসের বঙ্গলক্ষ্মীতে দ্রষ্টব্য)

কিন্তু বাপের বাড়ী হইতে কোন পাল্কি ত আসে না! নিজের দুঃখের মধ্যেও বাপ-ভায়ের মঙ্গলচিন্তা সে করে। কল্পনায় বাপ-ভায়ের সুখ-ঐশ্বর্য্যের সীমা শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া দেয়।—

কাহিলী গুয়া গাছটি মুষ্টি ধরে মাজা,
বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর ভাই হয়েছেন রাজা!

গুয়া গাছটির (সুপারি) ঠাটটিকে আলপনায় বেশ ভালভাবেই পাওয়া যায়। উপরের ছড়াটিতেও 'মুষ্টি ধরে মাজা' এই কথাটিতে আকৃতির আভাষ দিয়া যায়। তার পরে সত্যি সত্যি, একদিন সতীনের মৃত্যু হইল, কিন্তু সতীনের উপর তার ক্রোধের সীমা নাই। তাই উপরের কোঠা হইতে একবার নীচে আসিয়া দেখিয়াও গেল না।—

পাখী, পাখী, পাখী,
(সতীন ম'লো) উপর কোঠার ব'সে দেখি। (পাখীর আল্‌পনা চৈত্রমাসের বঙ্গলক্ষ্মীতে দ্রষ্টব্য)

তারপর উপর কোঠা হইতে হুকুম দিল।—

চেলা, চেলা, চেলা, চেলা,
চাছ দুয়োর দে ফেলা!

সতীনের শব সে সদর দরজা দিয়াও যাইবে না!

সতীনের মৃত্যুর পর দিন বেশ সুখে কাটিয়া যায়।—

ঢেঁকি পড়ন্ত,
গাই গলন্ত,

উনন জ্বলন্ত,

গৃহস্থের নিত্য আনন্দ !

সব শেষের মন্ত্রটিতে বঙ্গনারীর দয়া ও উদারতার পরিচয় পাই। সতীনের উপরে ভিন্ন আর কাহারো উপর তাহার ক্রোধ নাই। এমন কি জগতের মঙ্গলই তার আকাঙ্ক্ষা।—

তিন কোণা পৃথিম* চার কোণা আলো

অমুক···পূজ' ক'রে জগতের ভালো !

নিজের মঙ্গল তো বটেই জগতের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করিয়া পূজা শেষ হয়।

এইরূপ ব্রতকথা ও তৎসঙ্গে আল্‌পনার প্রচলন আমাদের দেশ হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। আল্‌পনায় নানা জন্তুর ও দ্রব্যের যে সকল 'ঠাট' বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছিল তাহা চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমি নিজে যখন পল্লীগ্রামের ছড়া ও আল্‌পনার প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম, তখন কোন মহিলাই আমাকে পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন নাই। যাঁহারা অতি-বৃদ্ধা তাঁহারা বলিলেন, "ঐ সব ছড়া এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এবং আল্‌পনা দিতে গেলে চোখেও দেখি না, অধিকন্তু হাতও কাঁপে।" যাঁহারা মধ্যবয়সী তাঁহারা বলিলেন, "ছেলে-বেলায় একবার চেষ্টা করেছিলাম বটে; কিন্তু ওতে হবে কি? তাই আর কিছু করিও নি, মনেও নেই।" ছোট মেয়েরা বলিল, "ছ্যা! ও সব কি আর ভদ্রলোকের কাজ? ও পদ্দি উঠে গেছে।" ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন!

বাংলা দেশের আল্‌পনায় বাংলার স্নিগ্ধ, শ্যামল, পবিত্রতার ছন্দই পাই। বাংলার কোমল, ধর্ম্মপ্রাণ মহিলাদের হস্তেই এর জন্ম। বঙ্গনারীর ইহা একান্ত গৃহকোণের নির্লিপ্ত সাধনার ধন—তাঁহাদের সহজ সরল চিন্তার অকৃত্রিম প্রকাশ। আমি যখন মান্দ্রাজে ছিলাম, তখন দেখিতাম মান্দ্রাজী মহিলারা ফাঁকা ছিদ্রবিশিষ্ট রোলারের (Roller) ভিতর চাউলের গুঁড়া দিয়া দুই তিন টানেই আল্‌পনা দিতেন (ইহাকে আল্‌পনা না বলাই ভাল)। এই কৃত্রিমতার ভিতর শিল্পীপ্রাণের কোনও পরিচয় পাই না। এমন কি অন্যান্য প্রদেশের (উড়িষ্যা প্রভৃতি) আল্‌পনার তুলনা করিলে, বাংলার আল্‌পনায় যেরূপ নৈপুণ্য ও গভীর কৌশলের পরিচয় পাই তাহা অন্যান্য প্রদেশের আল্‌পনায় পাওয়া যাইবে না। আজ এই শিল্প যদি বাংলার শিক্ষিত নারীর অবহেলার দরুণ বিনষ্ট হইয়া যায় তবে ভবিষ্যতে আক্ষেপের সীমা রহিবে না।

এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যে গত ফাল্গুন মাসের 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে দেখিলাম পল্লীর শিল্প ও সাহিত্য রক্ষাকল্পে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়দিগের উদ্যোগে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির দৃষ্টি আল্‌পনার' প্রতিও আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

* পৃথিম—পৃথিবী।

তপস্যা

পরিমল গোস্বামী এম্-এ

ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুকাল হইতেই এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে জাতি হিসাবে আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার বয়স যখন ষোল, তখন এক বন্ধুর সংস্পর্শে আসিয়া আমার সকল ধারণা উলট-পালট হইয়া গেল। তখন প্রথম বুঝিলাম আমাদের সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত অর্থ নাই।

ক্রমশঃ জ্ঞান বাড়িল। পল্লী ছাড়িয়া সহরে পড়িতে আসিলাম। এখানে বিশ্বের যাবতীয় লোকের ভীড়। জাতিতে কেহ কাহারো চেয়ে ছোট কিংবা বড় মনে করিয়া দীনতা কিংবা গর্ব্ব প্রকাশ করে না। হোটেলে, চায়ের দোকানে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, একসঙ্গে থাকা,—দেখিয়া বড় আরাম পাইলাম।

বিজ্ঞান পড়ি। সমস্ত ব্যাপার বিজ্ঞানের চোখে দেখিতে শিখিলাম, এবং ইহাতে নিজের মত্ আরো দৃঢ় হইল। দেখিলাম, ভণ্ডামি না করিয়া আচার পালন করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে।

মনুসংহিতা হইতে ব্রাহ্মণের পরিচয় লইয়া দেখিলাম, এ যুগে কেহ জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন না। যিনি পরের সেবা করেন তিনি শাস্ত্রমতে শূদ্র. কিন্তু শাস্ত্রকে অমান্য করিয়া শুদ্ধমাত্র গলায় পৈতা ঝুলাইয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করেন। দেখিলাম, আমাকে যাঁহারা শাস্ত্র মানে না বলিয়া গালাগালি করিয়াছেন, শাস্ত্রকে তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই নস্যাৎ করিয়া বসিয়া আছেন।

কাজেই আমি বিনা দ্বিধায় মুরগী খাইতে আরম্ভ করিলাম। একজন শুভার্থী বলিলেন, অতটা বাড়াবাড়ি না করিলেও চলে। মনুসংহিতা খুলিতে হইল। দেখিলাম মুর্গী খাওয়া নিষেধ আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চালতা খাওয়াও নিষেধ আছে। বলিলাম, চালতা খাওয়া এবং মুর্গী খাওয়া উভয়ই সমান অপরাধ, কিন্তু সমাজ অবাধে চালতা খাইতেছে।—ইহার কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না।

সেইদিনই পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। ভাবিলাম, জন্মগ্রহণ করিবার পর ব্যাকরণ পড়িয়া ভাষা শিখিতে হয় নাই, সুতরাং শাস্ত্র খুলিয়া খাইতেও শিখিব না। জীবনে যদি কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহাই সাধন করিব, কি খাইব, কি পরিব, ইহা লইয়া সময় নষ্ট করার মত মূর্খতা আর নাই।

ক্রমশঃ দল পাকাইয়া তুলিলাম। আমাদের নিয়ম হইল এই যে আমরা কাহারো কোনো আচারকে শ্রদ্ধা করিব না, বিচার যেখানে না চলে, সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। সমাজসংস্কারের আগ্রহ ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিল। মাসিকপত্র বাহির করিয়া তাহাতে নিজেদের মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমরা দেখাইলাম, জগতের নিকট আমরা যে এত হীন, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা অস্বাভাবিক। আমরা মানুষকে ঘৃণা করি বলিয়াই যাহারা মানুষ তাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে। মানুষের স্পর্শ মানুষেরের কাছে অপবিত্র এই নিকৃষ্টতম মনোভাবটি আমাদিগকে সকল দিক হইতে দরিদ্র করিয়াছে। মুসলমানকে আমরা এতকাল সমাজে স্থান দিই নাই বলিয়াই তাহারা আমাদের সঙ্গে মিশিতে পারিল না। আজ যে তাহারা আমাদিগকে অবিশ্বাস করে, তাহা ত আমাদেরই দোষ। তাহাদের সকল রকম স্পর্শ আমরা এত কাল এড়াইয়া চলিয়াছি বলিয়া, আমাদের ঘৃণা তাহাদের ঘৃণাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

—এই রকম সব বিষয়, যাহা দেশের লোকে শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ এবং গালাগালির চোটে অস্থির হইয়া উঠিলাম।

দেশের লোকে ঠিক করিল, আমরা খৃষ্টান হইয়া গিয়াছি। অর্থাৎ উদারতা দেখাইতে গেলেই সে হয়

খৃষ্টান, না হয় আর কিছু,—হিন্দু হইয়া উদারতা দেখাইবার উপায় নাই।

আমরা বলিলাম,—যাহা বলিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে যদি কিছু যুক্তি থাকে তাহা আমরা জানিতে চাই, আমরা খৃষ্টান কিনা তাহা প্রশ্ন নয়।

ইহার উত্তরে যাহা তাঁহারা প্রকাশ করিলেন, তাহার উপরে কোনো কথা চলে না। প্রতিবাদকেরা ঠিক করিয়াছেন, কোনো কলেজে পড়া মেয়ের প্রেমে পড়িয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছি, কাজেই আমাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহারা মূল্যবান সময় নষ্ট করিবেন না।

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত, কিন্তু হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিল না। আমি জানিতাম ইহার মূলে লেশমাত্র সত্য নাই, কিন্তু কথাটা পিতার কানে পৌঁছিল।

আমাদের মধ্যে সুরেশ নাম করিয়া যে ছেলেটি ছিল, সে বলিল, আমাকে অনুমতি দিন, লেখকের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আসি।—তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে ইহা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

আমি বলিলাম, দেখিতেছ না, দেশের অধিকাংশ লোকের মত্ উহার পিছনে রহিয়াছে,—এক জনকে ঠাণ্ডা করিলে কোন ফল হইবে না। সুধাংশু নামে যে ছেলেটি ছিল, সে বলিল, আপনি যদি চুপ করিয়া যান, তাহা হইলে আমরা জোর পাইব কোথায়?

আমি বলিলাম কোনো লোকের সঙ্গে ও আমাদের শত্রুতা নয়, আমাদের শত্রুতা অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে। যা কিছু অসঙ্গত, যা কিছু মিথ্যা, তাহার বিরুদ্ধে ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়াছি—ইহাকে তুমি চুপ করিয়া থাকা বল?

সুধাংশু একখানা খাতা বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। ইহাতে 'স্পর্শদোষ' নামক উহারই লেখা একটা প্রবন্ধ আছে।—আমাদের মাসিকের জন্য সুধাংশু নিয়মিত প্রবন্ধ লেখে।

আমি বলিলাম, মাসিক চালানো বোধ হয় আর সম্ভব হইবে না। সুধাংশু হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আমি বলিলাম, পিতার নিকট হইতে কড়া চিঠি পাইতেছি, দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

দেশে ফিরিয়া বিবাহ করিতেই হইল। পথভ্রষ্ট সন্তানকে পথে আনিতে পিতৃদেব এবং মাতাঠাকুরাণী যে পন্থার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য। তাঁহারা এমন ঘরের মেয়ে আনিলেন যেখানে শাস্ত্রচর্চ্চা এবং আচারপালন অতি নিষ্ঠার সহিত হইয়া থাকে। আমার যিনি শ্বশুর তিনি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, এবং কন্যারও পাণ্ডিত্য না থাক বিদ্যা কম ছিল না। সে মুগ্ধবোধ শেষ করিয়াছে এবং আচারপালনেও তাহার শিক্ষা পুরাদস্তুর হইয়াছে।

বিবাহের পূর্ব্বে আমার গুণগ্রাম শ্বশুর পক্ষীয় কেহ জানিতে পারেন নাই, জানিলে আমাকে যে জামাতৃপদে বরণ করা হইত না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিবাহ উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য উপবীত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, শুভকার্য্য সমাধা হইবমাত্র তাহাকে পুনরায় মুক্তি দিলাম। ফলে দ্বিতীয়বার শ্বশুর-বাড়ীতে যাইতেই সকলে ধরিয়া ফেলিলেন যে আমার পৈতা নাই। আমার অব্রাহ্মণোচিত আচরণে শ্বশুর-শাশুড়ী লজ্জায় এবং ঘৃণায় আমার সহিত ভাল করিয়া আলাপই করিতে পারিলেন না। ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমাকে পাইয়া বসিলেন। কেহ কেহ এতদুর পর্য্যন্ত গেলেন যে আমি কোন্ হোটেলের গোমাংস সব চেয়ে বেশি পছন্দ করি তাহার নাম বলিতেই হইল। নাম বলিলাম বটে, কিন্তু এ কথাও বলিলাম যে উহাতে গুরুতর দোষ হয় বলিয়া আমি মনে করি না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি এ পর্য্যন্ত উহা খাই নাই। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, তা যদি না হয় তবে তোমার পৈতা কোথায়?

আমি রসিকতা করিয়া বলিলাম, আমার অস্থাবর বিশেষ কোনো সম্পত্তি এতদিন ছিল না, সুতরাং তালা-চাবির ব্যবহার কখনো করিতে হয় নাই। চাবি সঙ্গে সঙ্গে রাখিলে উহা বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পৈতাও থাকিত, হয়ত এখন হইতে রাখিতে হইবে।

আমার সঙ্গে যাঁহারা আলাপ করিলেন, তাঁহারা আমার নিকট হইতে দূরে বসিয়াছিলেন। নিকটে আসিতে কেহ সাহস করেন নাই, কেননা তাঁহাদের জাত যাইবার আশঙ্কা ছিল।

ভাবিয়াছিলাম, রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়া মনটাকে একটু প্রফুল্ল করিব, কিন্তু শচী যতক্ষণ জাগিয়াছিল,

ততক্ষণই কাঁদিয়াছে। আমি বারবার তাহাকে আদর করিবার চেষ্টা করিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিয়াছি—আমার সঙ্গে বিবাহ হওয়াতে তুমি কি অসুখী হইয়াছ? কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হয় নাই। তাহার লজ্জা খুব বেশি, আমার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথাই বলে নাই—সুতরাং তাহার চোখের জলের ভাষা আমার নিকট দুর্ব্বোধ হইয়াই রহিল।

অশান্ত মন লইয়াও যথাসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ভোরের বেলা ঘুম ভাঙিতেই দেখি শচী পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছে।

শ্বশুরগৃহ হইতে যেদিন স্বগৃহে ফিরিলাম, সেদিন আমার সঙ্গে শচী ছিল না। শুনিলাম, সে সময় স্বামীর সঙ্গে যাওয়া প্রথা নয়।

ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, শচীকে আর আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেওয়া হইবে না। পিতা এবং মাতা, যদিও আমার নাস্তিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ এবং ক্ষুণ্ন ছিলেন, তথাপি আমার শ্বশুরের ব্যবহারে অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারাও স্থির করিলেন, বধূকে কোনো অবস্থাতেই আর ঘরে আনিবেন না। শ্বশুর প্রচার করিলেন, বেহাই ফাঁকি দিয়া খৃষ্টান ছেলেকে চালাইয়াছে। এবং সে কথা একদিন পিতার কানে উঠিল। তখন তিনিও প্রচার করিতে লাগিলেন, ছোটলোকের ঘরের মেয়ে আমাদের ঘরে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। শ্বশুর এবং পিতা আমাদের ভবিষ্যৎ স্থির করিয়া ফেলিলেন,—আমাদের মতামত জানিবার প্রয়োজন ছিল না।

অপমান এবং প্রতিশোধ হিসাবে ব্যাপারটা মন্দ লাগিল না—কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া উঠিল। ভাবিয়া দেখিলাম, শচীর কোনো দোষ নাই। সে, যে সংসারে মানুষ, সেখানে আমার মত অনাচারীকে শ্রদ্ধা করিতে পারে না। ধর্ম্মের জন্য যে সংসারের শিশু-বিধবা আজীবন বৈধব্য পালন করে, সে সংসারের সধবাও ধর্ম্মের জন্য বিধবার মত জীবন যাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। স্বামীর ধর্ম্মই স্ত্রীর ধর্ম্ম এ কথা সকল সময়ে খাটে না। স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হয়, স্ত্রী ত দুশ্চরিত্রা হইতে পারে না। কাজেই সে আমাকে স্বামী বলিয়া জানিলেও ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবে।

বড় অস্থির হইয়া উঠিলাম। মনে হইল আমি নিজে কি স্ত্রীকে লাভ করিবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি না? চিরদিনই ত স্ত্রী নিজের সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়া স্বামী-দেবতার পূজা করিয়াছে,—স্বামীর পক্ষে কি কিছুই ছাড়িবার প্রয়োজন নাই?—শুভদৃষ্টির সময় শচীর যে লাজ-নম্র মুখখানা দেখিয়াছিলাম, সেই অসহায় করুণ মুখখানা মনে পড়িল, আর মনে পড়িল তাহার চোখের জল।

ভাবিয়া দেখিলাম, কোটি কোটি লোকে যে অন্ধতাকে আশ্রয় করিয়া সুখে দিন কাটাইয়া দিতেছে, আমি তাহার মধ্যে একা বিদ্রোহী সাজিয়া না পারিব সমাজের কোন উপকার করিতে—কেননা কেহ আমার কথা শুনিবে না, আর না পারিব নিজে সুখী হইতে—কেননা কেহ আমাকে কোনো সাহায্যও করিবে না। মাঝখান হইতে ভগবান শচীর হাতে আমার জন্য যে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইব।

কলিকাতা ফিরিয়া গেলাম। আমাদের মাসিক পত্রিকার নাম ছিল 'বিদ্রোহী,' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিলাম 'সনাতনী'। পরিত্যক্ত অর্থহীন সামাজিক আচার-গুলির অর্থ বাহির করিবার কাজে লাগিলাম, এবং যে বিজ্ঞানকে ব্যক্তিত্বের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলাইয়া দিলাম। দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

নিজের সংস্কারকে জোর করিয়া ত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু করিতেই হইবে। শচীর জন্য যদি পৃথিবীকে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব, ইহাও হইল প্রতিজ্ঞা।

'বিদ্রোহী'র গ্রাহকসংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ জন, 'সনাতনী'র গ্রাহকসংখ্যা হইল দশ হাজার। ইহার পরেই টিকি রাখিলাম, এবং মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষাশী হইলাম।

মাসিকের সাহায্যে প্রচার করিলাম যে কঠোরতাই আমাদের ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। মানুষের মন ক্রমাগতই নীচের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহাকে

নিরন্তর বাঁধিয়া, ধাক্কা দিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া রাখিতে হয় বলিয়াই হাজার রকম বিধিনিষেধ দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মনকে ক্রমাগত আঘাত না করিলে তাহাকে পবিত্র রাখা যায় না,সেই জন্যই আমাদের ধর্ম্মে যে-সব নিষ্ঠুর বিধি আছে, তাহার সহজ কোন অর্থ নাই, এবং সেই কারণেই তাহার সার্থকতা এত অধিক।

এই সব কথা যতই আলোচনা করিতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, ইহাই সত্য, এবং আমার আগের যাহা-কিছু ধারণা ছিল সব মিথ্যা, সব ভুল। শচীর জন্য আমি মিথ্যাকেই ত্যাগ করিতেছি, এ আমার নূতন শিক্ষা।

আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে পারি পিতামাতা এমন আশঙ্কা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কি আশঙ্কা করিতেছেন, এবং কি না করিতেছেন—সে দিকে মন দিবার সময় আমার ছিল না। পিতৃদেব একদিন আমাকে গৃহে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছিলেন,—আমি তখন ভূতের গবেষণায় ব্যস্ত ছিলাম। আমি বহু আড়ম্বর করিয়া বুঝাইয়া দিলাম, আমাদের আত্মার কি কি বিশেষত্ব থাকিলে মৃত্যুর পর তাহারা বৃষ্টির ধারার সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হইয়া খাদ্য-কণিকার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, এবং সেই পথে মানবদেহে প্রবেশ করে। পিতৃদেব আমার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন, এবং হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

এমন বিষয় রহিল না যাহা লইয়া কিছু না কিছু আলোচনা করিলাম না। অলৌকিক দৈববিধানের কথা প্রচার করিতে গিয়া এক বিষয়ে খুব সুবিধা হইয়া গেল। অনেকেই আমাকে ধরিয়া বসিলেন,—লুপ্তপ্রায় তন্ত্রাদি হইতে ব্যাধিমুক্তি এবং গ্রহশান্তির মন্ত্র উদ্ধার করিয়া কবচের সাহায্যে তাহা দেশের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। বিস্তর অনুসন্ধান এবং দুই-চারিজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিন প্রকার কবচ বাহির করিলাম। ফলে আমাদের মাসিকের উপযুক্ত প্রচারের জন্য সামান্য যে একটু আর্থিক টানাটানি ছিল তাহা ঘুচিয়া গেল। টাকায় তিনটি হিসাবে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াও মাসে প্রায় পাঁচশত টাকা আমদানী হইতে লাগিল।

বুদ্ধির ভ্রান্তপথে চলিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়া-ছিলাম, আজ ভারতের অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দেখি সেখানে বুদ্ধির লেশমাত্র আবশ্যকতা নাই। যে জ্ঞানের মশাল উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে, তাহাই বহন করিবার গৌরবই হইল আসল গৌরব, সেখানে নিজের আলো জ্বালাইবার স্পর্দ্ধা যেন না করি।

শচীর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া উঠিল, সে যেন আমার দেবতা, তাহার বর পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিতেছি। শচী মুগ্ধবোধ শেষ করিয়াছে বলিয়া ব্যাকরণের পথ আমার কাছে প্রীতিকর হইয়া উঠিল, সে শুদ্ধ-পবিত্র বলিয়া আমি সকল রকম অশুচিতা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছি। শচী আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চলিয়াছে।

সুরেশ, সুধাংশু প্রভৃতি আমাকে বহুদিন হইল ছাড়িয়া গিয়াছে, এবং আমার বিরুদ্ধে অনেক রকম মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে। একদিন উহারা আমার নিকট আসিয়া তর্ক সুরু করিয়া দিল। সুরেশ বলিল,—যে পদ-সেবার বিরুদ্ধে আপনি একদিন অভিযান করিয়াছিলেন, আজ কোন্ মুখে শত শত লোকের সেই পদসেবা আপনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতেছেন?

আমি বলিলাম, লোকে যে আমাকে ভক্তি করে ইহাকে ত অন্ধভক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। কেহ তর্ক করিয়া ভক্তি করে না। পিতা-পিতামহেরা যে চরণে প্রণতি করিয়াছে, বংশধরেরাও সেই চরণে প্রণত হইবে। আমি ব্রাহ্মণ, কাল-ধর্ম্মে আমার আচার নষ্ট হইয়াছে, উপবীত খসিয়া পড়িয়াছে, তবু আমার মধ্যে যুগ-যুগান্তের প্রাচীন ব্রাহ্মণ জীবিত আছেন,—আমি তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবার কে?

ইহার উত্তরে সে যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর শুনিলাম না, তাহাকে জোর করিয়া থামাইয়া দিলাম।

ইহার পর আর একদিন উহারা কতগুলি অস্পৃশ্য লোককে আমাদের কালী-মন্দিরে আনিয়া বলে যে উহারা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবে। এবারে আর তর্ক করি-লাম না—আমার হাতে লোকের অভাব ছিল না, তাহারা লাঠি চালাইল।

সুরেশের হাত ভাঙিয়াছিল বলিয়া আমি দুঃখিত, কিন্তু তাহারও অতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয় নাই।

ভক্তির এবং পূজার প্রাচুর্য্যে আমার পদমর্য্যাদা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতে লাগিল। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে আমার মনে হইতে লাগিল যেন বয়সে আমি প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছি। আমার মুখে চোখে একটা সাত্বিকতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্তদের মুখে এমন কথাও শুনিতে পাইলাম। ফলে শচীকে পাইবার জন্য যে তপস্যা করিতেছিলাম সেই তপস্যা ধর্ম্মের কঠোরতার মধ্যে লুপ্ত হইতে পারে এমন একটি আশঙ্কা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এই কথাটা প্রায়ই মনের মধ্যে উঁকি মারিয়াছে যে শচী যদি আমাকে বাদ দিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারে তবে আমার জীবনেই তাহার এমন কি প্রয়োজন? আমরা দুইজনে চিরদিন দুই তীরে স্থির হইয়া বিরাজ করি, মাঝখান দিয়া ধর্ম্মের নদী অনন্তকাল প্রবাহিত হইতে থাকুক। কিন্তু তাহা হইলে আমি কী ত্যাগ করিলাম? শচীর জন্য সত্যকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু সত্যকে ত ত্যাগ করিতে হয় নাই।—আমি মিথ্যাকে ত্যাগ করিয়াছি বলিয়াই কি আমার এমন পদবৃদ্ধি হইল যাহাতে শচীকেও ত্যাগ করিতে হইবে?—সত্যের সঙ্গে শচীর কোন বিরোধ নাই—অতএব আমি তাহাকে ছাড়িতে পারি না।

শচী সাধনার পথে চলিয়াছে, আমিও সাধনার পথে চলিয়াছি। দুইজনের সাধনা একসঙ্গে মিলিলেই তবে আমরা সত্য করিয়া উভয়ে উভয়কে লাভ করিব।—আমাদের মিলন শুভ হউক।

শ্বশুর মহাশয় আমাকে অনেক দিন হইতেই চিঠি দিতেছেন, তিনি আমাকে বহু পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা ত করিবেনই—বোধহয় এখন আমাকে পাইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন।

পিতা এবং মাতা আমার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম প্রথম বেহাইয়ের উপর রাগ করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেন এমন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, এখন ধরিয়াছেন বধূকে ঘরে আনিলে আমার কোনো আপত্তি হইবে কি না।

আমি উভয়ত্রই জানাইলাম যে বধূ ঘরে আনিতে আমার আপত্তি নাই, এবং আমি শীঘ্রই শ্বশুরগৃহে যাইতেছি।

পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী, রেলষ্টেশন হইতে নৌকায় সেখানে পৌছিতে বারো ঘণ্টা লাগে। আমি যখন পৌছিলাম, তখন সকাল হইয়া গিয়াছে।

পৌছিয়াই দেখিলাম, সেখানে বিস্তর ভীড় জমিয়া গিয়াছে। অতীতের কথা মনে পড়িল। একদিন ইঁহারা আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন,—আজ আমাকে পাইবার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পরে জানিতে পারিলাম, ভীড় আমার জন্য নহে। শ্বশুরগৃহে দুই দিন পূর্ব্বে ডাকাত পড়িয়াছিল। লুন্ঠনের সঙ্গে তাহারা শচীকেও নাকি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই মাত্র তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

শুনিবামাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, ক্ষণকালের জন্য আমার চিন্তাশক্তি লোপ পাইল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্যই। শ্বশুরের এবং গ্রামশুদ্ধ লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিয়া আসিতে আমার কোনো অনুতাপ হয় নাই।

অন্দর হইতে যথারীতি ক্রন্দনরোল উঠিয়াছিল,—বোধ করি শচীর অন্তর আমার ব্যবহারে হাহাকার করিয়াও উঠিয়াছিল, কিন্তু আমার কী অপরাধ?

এই যে কঠোর ধর্ম্মশাসন, এই যে মহৎ নিষ্ঠুর বিধি, ইহাকে কি সামান্য নারীর ব্যর্থ-হাহাকারের নীচে স্থান দিতে হইবে? নরনারীর জন্ম-মৃত্যু, বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না এই অসীম জগৎ-মহাসাগরে বুদ্বুদের মতই কি ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিয়া ফাটিয়া যাইতেছে না? ইহার কাছে কি সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়া অসত্যকে পূজা করিতে হইবে?—কদাপি নহে।

আমি পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে ধর্ম্মসাধনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে চোখের জলের স্থান ছিল না। শিশু-বিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় পণ্ডিত হইয়াও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই দিনকার ভুল আজ সংশোধন করিবার সময় আসিয়াছে।

আমার দৃঢ়তা দেখিয়া দেশের লোকে আমাকে অবতারের

আসনে বসাইয়া দিল, আমি শচীকে বিসর্জ্জন দিয়া কলি-যুগের রাম হইলাম।

আমি মনে প্রাণে পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম আর একটি পবিত্র জীবনের সঙ্গে মিলিব বলিয়া। যাহাকে আধুনিকেরা গোঁড়ামি বলিয়া গালাগালি দেয়, সেই গোঁড়ামিই ত আমার ধর্ম্মের ভিত্তি এবং গৌরব। সুতরাং যে স্ত্রীকে ডাকাতের ঘরে দুই দিন থাকিতে হয়, সেই অপবিত্রাকে পরিত্যাগ করাতে আমাকেও তাহারা গালাগালি দিবে। আমিও একদিন দিয়াছি। কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের যে বাহবা পাই-তেছি তাহার কি কোনো মূল্য নাই?

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে"

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

না গো, তুমি পারিবে না আপনার সুখদুঃখ দিয়া
আপনারে ঘেরিবারে মেঘজালে। নয়ন ধাঁধিয়া
ঐ যে উঠিছে সূর্য্য, সর্ব্বমানবের ভাগ্যধারা
জ্যোতিতে বহিয়া, তার রশ্মিপাতে হবে আত্মহারা
এই মেঘজাল,
জ্বলজ্বল তীক্ষ্ণ খড়্গে নাশিবে সে সকল জঞ্জাল
একটি নিমেষে,
অতিথির মতো শেষে
উতরিবে গোপন চরণে
তব হৃদয়ের দ্বারে, রাঙাইয়া শোণিত-বরণে
প্রতি বাষ্পকণাটিরে আতপ্ত অরুণ অনুরাগে!

যে রাজ্যে দেবতা রাজা, তার মাঝে কোথা নাহি জাগে
নিষেধ-প্রাচীর তুলি' প্রভেদের ভূমি-ভাগাভাগি।
দেবত্র ব্রহ্মত্র নাহি, পৈতৃক সম্পদ কারো লাগি',
নিষ্কর কৃষির ক্ষেত্র, নিঃশুল্ক বাণিজ্য-অধিকার।
এক স্রোতোবারি হ'তে মেটে তৃষ্ণা আমা-সবাকার;
যদি কারো অশ্রু মেশে অতর্কিতে সেই স্রোত সনে,
তাহার বিস্বাদ রয় সবাকার তরে।
তৃণাসনে
পথপাশে যে ভিখারী দলিত গলিত পুষ্প সম
পূতিগন্ধ ছড়ায় বাতাসে, হায়, তার সে বিষম
বিষশ্বাসে,
রত্নাসনে পীড়কের বক্ষের আবাসে
মৃত্যু বাঁধে বাসা!—
মোরা বলি, সর্ব্বনাশা
বিধির বিধান-দণ্ড এমনি অমোঘ চিরদিন!
ভুলে যাই, এই বিষ, একই সাথে পশে দোষহীন
সেবানিষ্ঠ বিধবার ঘরে,
প্রাণের পুতুলি তার শিশুগুলি, তাহাদেরো কচি
শিরোপরে
নামে সে ন্যায়ের দণ্ড তেমনি নিঠুর সর্ব্বনাশে!

প্রতি মানবের পাপ কোন্ স্রোতে বহি' চলি' আসে
সর্ব্বমানবের পাপ হ'য়ে, তাই দণ্ড তার
সর্ব্বমানবের দণ্ড। মনে হয়, যদি আপনার
পাপের না ক্ষমা করি, যদি অনুতাপে
পলে পলে দহি, যদি নিষ্করুণ রুদ্র অভিশাপে
আমার সে দীনতারে প্রপীড়িত করি লাঞ্ছনায়,
তবে আমি সহিব না অপরের তিলেক অন্যায়।
আপনার পাপ বলি' প্রতি মানবের যত পাপে
নিদারুণ অক্ষমায় দহিব অনল-অভিশাপে।

ক্ষমা অক্ষমের তরে নহে।
দুর্ব্বল করে কি ক্ষমা? সে কেবল সহে।
কভু নিরুপায়তার অন্তরে অন্তরে গ্লানি বহি',
অন্তরালে অক্ষমার তীব্র দাহে দহি'
কহে সে, করিনু ক্ষমা, যবে ক্ষমা করে
নিজ শক্তিহীনতারে। কভু ভেঙে পড়ে

সকাতর করুণায়, দরবিগলিত অশ্রুজলে
সে গ্লানিরে মুছে ল'য়ে, সে দাহ নিভায়ে নানাছলে
আপনারে করে প্রবঞ্চনা।
অন্তরে যে সত্য জ্বলে তার এ লাঞ্ছনা
প্রেম কভু নাহি সহে। দয়া তার নাহি।
নিষ্পলক আঁখিপাতে সে আলোকে চাহি'
দৃষ্টিতে আড়াল করা অশ্রুজল নাহি ঝরে তার।
যেই প্রেম ক্ষমা করে, তার নির্ম্মমতা দেবতার
নির্ম্মমতা সম!

হে দেবতা, হে দেবতা মম!
এ কোন্ নিঠুর লীলা আপনারে ল'য়ে তুমি কর?
আঘাতে আঘাতে তুমি আমারে যে করিলে জর্জ্জর
অহর্নিশি, তবু জানি এতটুকু এই মোর ব্যথা
তব বক্ষে বাজে যবে, ভরে' তোলে তব অসীমতা,
আবার আঘাত করো তবু!
কি দারুণ প্রেম তব, দয়াহীন, ক্ষমাহীন প্রভু!

নিজ বলে বলী,
যে প্রেম না দণ্ড দেয়, প্রেম নাহি বলি
সে ক্লৈব্যেরে। দণ্ড-পুরস্কার,
এ দুয়ে সমান ভাবে কেবল প্রেমেরই অধিকার;
সেই প্রেম ক্ষমা করে শতগুণ করে'
সে দণ্ড সে পুরস্কার ফিরে ল'য়ে! কল্যাণের তরে
প্রয়োজন হয় যদি, তবে
হানে সে মরণ-দণ্ড শোণিত-উৎসবে;
শুধু যবে হানে,
বিনাশের বজ্র গড়ে নিজ অস্থি-দানে।

বীরভূমের শিক্ষার কথা

শ্রী গৌরীহর মিত্র বি-এ

এখনকার মত তখন এখানে কোনরূপ স্কুল-কলেজাদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বালক-বালিকাগণকে সেকালের গুরুমহাশয়ের নিকট লেখাপড়া শিখিতে হইত। সে সময় শ্লেট, পেন্সিল, কাগজ ইত্যাদির আমদানি হয় নাই বলিয়া শিশুগণকে "রামখড়ি" দিয়া মেজের উপর হাতের লেখা অভ্যাস করিতে হইত। বাড়ীর তৈয়ারি কালী দিয়া বাঁশ কিম্বা শরের কলমের সাহায্যে তালপত্রে বা ভূর্জ্জপত্রে লিখিবার রীতি ছিল। এই কালী শুদ্ধ দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত হইত এবং তাহা কখনই উঠিয়া যাইত না। কালী তৈয়ারি এবং ইহার গুণ সম্বন্ধে এখানে যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"তিল ত্রিফলা শিমুলছালা
ছাগদুগ্ধে করি মেলা
লৌহ-পাত্রে লোহার ঘসি
ছিঁড়ে পত্র, না ছাড়ে মসী।"

তখন শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। বালকগণকে মুখে মুখে অনেক বিষয় অভ্যাস করিয়া মনে রাখিতে হইত। হিসাবপত্র, মানসাঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যাইত। আজকালকার পড়ুয়ারা ঐসব বিষয়ে একরূপ অজ্ঞ বলিলেও কিছু নিন্দার হইবে না; কাগজকলম, বই ইত্যাদির সুখসুবিধার জন্য সমস্ত বিষয়ই স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার মোটেই আবশ্যক করে না। ইহা তাহার একটি কারণ বলিয়া মনে হয়; কারণ, কিছু জানিবার দরকার হইলে বই খুলিলেই প্রায়ই পাওয়া যায়।

এখনকার শিক্ষা যেন কতকটা ভাসাভাসা রকমের হইয়া পড়িয়াছে। তখন কিন্তু এরূপ ছিল না; যে যে বিষয়ে শিখিত সে সে বিষয়ে প্রথম হইতেই গভীর আগ্রহের সহিত শিখিয়া অগাধ জ্ঞান লাভ করিত। তখন প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল

এবং ক্ষেতে প্রচুর শস্যও উৎপন্ন হইত। এখন সকলের বাড়ীতে সেরূপ প্রচুর দ্রব্য নাই, তাই আজকালকার শিক্ষা (দায়ে পড়িয়া) অর্থকরী শিক্ষা বা চাকুরীলাভের নামান্তর বলিয়া ধারণা করা কিছুই অসঙ্গত নহে।

সে সময় সংস্কৃত, পারসী শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে টোল, মক্তব ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। কালের গতিতে সে-সব টোল ইত্যাদি অনেক উঠিয়া গিয়াছে। যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প বলিতে হইবে। দিন-দিন সংস্কৃত শিক্ষা দিবার আদর যেন কমিয়া যাইতেছে।

আমাদের জেলার লোকসংখ্যা (পু ৪২২৯৮৬+স্ত্রী ৪২৪৫৮৪) মোট ৮৪৭৫৭০ জন। তন্মধ্যে ১০ বৎসর বয়সের (ছেলে ৪১৭৪ + মেয়ে ৪১৩) ৪৫৮৭ জন, ১০ হইতে ১৫ বৎসরের (ছেলে ১০১৫৫ + মেয়ে ৮১৬) ১০৯৭১ জন, ১৫ হইতে ২০ বৎসরের (পু ১০৭৩৭ + স্ত্রী ৯১১) ১১৬৪৮ জন, ২০ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ বৎসরের (পুঃ ৫৭৬৩৮ + স্ত্রী ২৩৭৬) ৬০০১৩ জন লোক লেখাপড়া জানে। আবার ইহাদের মধ্যে ১০ বৎসর বয়সের (ছেলে ১৪৯ + মেয়ে ২০) ১৬৯ জন, ১০ হইতে ১৫ বৎসরের (ছেলে ১৪২৬ + মেয়ে ২৩) ১৪৪৯ জন, ১৫ হইতে ২০ বৎসরের (পু ২৩২৭ + স্ত্রী ৪১) ২৩৬৮ জন এবং ২০ বৎসর ও তদূর্দ্ধে (পু ৬৫৬০ + স্ত্রী ১০৭) ৬৬৬৭ জন ইংরাজী লেখাপড়া জানে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এখানে (পু ৮২৭০৪ + স্ত্রী ৪৫১৬) ৮৭২২০ জন লোক বাঙলা এবং (পু ১০৫৬২ + স্ত্রী ১৯১) ১০৬৫৩ জন লোক ইংরাজী জানে। বাকী (পু ৩৪০২৮২ + স্ত্রী ৪২০০৬৮) ৭৬০৩৫০ জন লোক একেবারে নিরক্ষর। এই সমস্ত লোকদের যাহাতে শিক্ষা-লাভ হয় তাহার সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃত শিক্ষালাভ না হইলে কোন-কালে কোন দেশ উন্নত হইতে পারে না।

তবে আজকাল দেখা যাইতেছে যে দিন দিন লোক শিখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই জেলায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ৩টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, এখন সে স্থানে ২২টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইয়াছে। এইভাবে সকল রকমের স্কুলের ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা সুখের কথা সন্দেহ নাই। নিজের দেশকে উন্নত করিতে হইলে নিজেদের ভালরূপ শিক্ষা করিতে হইবে। নিরক্ষর থাকিলে কোন দেশ উন্নত হইতে পারে না।

নিম্নে ১৯২৫ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের স্কুল ও ছাত্র-সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমাদের দেশ শিক্ষার পথে দিন দিন কিরূপ অগ্রসর হইতেছে—

স্কুলের নাম	স্কুলের সংখ্যা		ছাত্র-সংখ্যা	
	১৯২৫ খৃঃ	১৯৩০ খৃঃ	১৯২৫ খৃঃ	১৯৩০ খৃঃ
(১) এনট্রান্স	১৫	২১	৩৭৭৭	৪৬৫৭
(২) মধ্য ইংরাজী	৫০	৩৯	৪০৪৪	৩২০৫
(৩) মধ্য বাংলা	৪	৪	২৫০	১৫৯
(৪) প্রাথমিক	৬৩৮	৬৮২	১৯০৯৭	২০২৫৩
(৫) মক্তব	১৪৬	১৯০	৩৯৬৩	৫১৯১
(৬) নৈশ	১৪৪	১০৩	২৮১৯	২২২৪
(৭) সংস্কৃত টোল	১৪	১৮	১২১	১৭৮
(৮) জুনিয়র মাদ্রাসা	২	৫	১৩৯	৪৩৮
(৯) গুরুট্রেনিং	৪	৩	৫৯	৬৮
(১০) সাঁওতাল স্কুল	৭৬	৯৪	১৫৪৮	১৯০৭
(১১) শিল্প	৬	৭	১০১	২৪০
(১২) প্রাইভেট	২	১০	২৫২	৮৫৬
(১৩) সঙ্গীত	—	১	—	১১
মোট	১১০১	১১৫৭	৩৬,৭০	৩৯৪৮৭

স্কুলের নাম	স্কুলের সংখ্যা		ছাত্রী-সংখ্যা	
(১৪) মধ্য ইংরাজী	১	১	৮৪	৯৫
বালিকা বিদ্যালয়				
(১৫) প্রাথমিক „	৮৫	৮৭	১৮১৭	২০১০
(১৬) মক্তব „	৮৪	১১৪	১৮১০	২৫৪৫
মোট	১৭০	২০২	৩৭১১	৪৬৫০
সর্ব্বসমষ্টি	১২৭১	১৩৫৯	৩৯৮৮১	৪৪১৩৭

এতদ্ব্যতীত হেতমপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইয়া বহু ছাত্রের অল্পব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ পরিষ্কার হইয়াছে।

এ জেলার লোক স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী নহে। এখানকার মেয়েদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন মেয়ে মাইনর পর্য্যন্ত পড়ে; তাহার উপর কেহই যায় না। মাইনর পরীক্ষা দিবার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বেই অনেকেরই বিবাহ হইয়া যায় এবং স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হয়। এখানে মেয়েদের পড়িবার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। সম্প্রতি হেতমপুরের মহারাজকুমার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য স্কুল তৈয়ারি করিতে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়া মেয়েদের প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।*

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা-প্রসাদ মল্লিক বি-এ ভাগবতরত্ন, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় সাহিত্যিক মিলিয়া এখানে একটি সাহিত্য-সম্মিলন গঠন করেন। ইহার কাজ কয়েক বৎসর বেশ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এই সভা অনেককে সাহিত্যচর্চ্চার দিকে টানিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সভা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। এখন ঐ সাহিত্যসম্মিলনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

জেলার ছোটখাট অনেকগুলি লাইব্রেরী রহিলেও বোলপুর শান্তিনিকেতনের "বিশ্বভারতী লাইব্রেরী", সদর সিউড়ী "রতন লাইব্রেরী" ও "টাউনহল লাইব্রেরী" বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় শান্তি-নিকেতনের লাইব্রেরীতে বহু প্রকারের বহু পুস্তক সংগৃহীত হইয়া জনসাধারণের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইয়াছে। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক" নামক সুবৃহৎ চারিতাভিধান গ্রন্থ সঙ্কলন জন্য ৩৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বহু মুদ্রিত এবং প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। কালে তাহাই "রতন লাইব্রেরী" নামক এক সুবৃহৎ লাইব্রেরীরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই লাইব্রেরীতে এক হাজারের উপর ইংরাজী পুস্তক, সাত-আট হাজার বাঙলা মুদ্রিত পুস্তক এবং প্রায় ছয় হাজার হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি এই রত্নভাণ্ডারের কথা না জানেন। বহুমূল্য প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তকই এই লাইব্রেরীর বিশেষত্ব।

হেতমপুরের রাজাদের অর্থানুকূল্যে সিউড়ীতে "টাউন হল লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রায় ৫।৬ পাচ ছয় হাজার মুদ্রিত ইংরাজী বাঙলা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ, ভাগবতরত্ন মহাশয়ের অর্থে ও সম্পাদকতায় সদর সিউড়ী হইতে "বীর-ভূমি" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত সিউড়ী হইতে "বীরভূম বার্ত্তা ও "বীরভূম বাণী" এবং রামপুরহাট হইতে "রাঢ় দীপিকা" নামক তিনখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

* আমরা জানি, এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয়। — বঃ সঃ

জেনেভা-যাত্রী বঙ্গনারীর পত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুকুমারী রায়চৌধুরী

লণ্ডন,
৩০শে জুলাই, ১৯৩০।

তোমার চিঠি পেয়েছি। বাবা একলাই অসুস্থ শরীরে চট্টগ্রাম গিয়েছেন জেনে বিশেষ চিন্তিত হলাম। মা তাঁর সাথে গেলেন না কেন? তোমার জামাই বাবুর জর না ছাড়ায় তাঁকে শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছ, সে কথা তাঁকে বল্লাম। তিনি বল্লেন, এখন জাহাজ পাওয়া যাবে না—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমাদের যেতে হবে। জাহাজের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব্বে জানান হয়নি ব'লে পাওয়া গেল না। এবারে শারদীয়া পূজার সময় আমায় এই সুদূর প্রবাসে থাকতে হবে জেনে মন ভারী দ'মে গেছে!

আজ শ্রীরামপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল হাওয়েল সাহেব আমাদের বাসায় এসেছিলেন। ইনি ভারী আমুদে ব্যক্তি—এঁর গল্প শুন্‌লে না হেসে থাক্‌তে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত হাওয়েল সম্বন্ধে তোমায় বেশী কিছু লেখা আবশ্যক মনে করি না, কারণ এঁর বিষয় অনেক কিছুই ভায়ার কাছ হ'তে তোমার শোনা আছে। এই সহৃদয় হাস্যরসিক তাদের ছাত্রজীবনের দিনগুলি কি রকম ক'রে সরস ক'রে রাখ্‌তেন তা তোমার অজানা নেই। কাজেই এঁর বিষয় আর কিছু লিখ্‌লাম না। শ্রীযুক্ত হাওয়েল প্রায় ঘণ্টা-খানেক আমাদের এখানে ছিলেন, পরে চৌধুরী মহাশয়কে সাথী ক'রে পথে বার হলেন।

আজ বর্দ্ধমানের মহারাজা আমাদের নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় আমি সেখানে যাইনি। চৌধুরী মহাশয় একাই নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে গেলেন।

বিকালে শ্রীযুক্ত বি—এবং স—এসে উপস্থিত হলেন। চৌধুরী মহাশয় বাসায় নেই শুনে তাঁরা অতি অল্পক্ষণ পরে বিদায় গ্রহণ করলেন।

এখন চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম! একমাত্র রাস্তার মোটর যাতায়াতের শব্দ মাঝে মাঝে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দিচ্ছে। রাত খুব গভীর হয়েছে ব'লেই মনে হ'চ্ছে; আজকের মত থাম্‌লাম।

১লা আগষ্ট।

পূর্ব্বেই লিখেছি শ্রীযুক্তা হেনা সেন মহাশয়ার সাথে আমাদের আলাপ হয়েছে—তিনি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য একটি ভোজ দিতে চান কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমরাই তা বন্ধ করিয়েছি।

এখানে কয়েকটি ভারতীয় মহিলার সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁরা গাওয়ার ষ্ট্রীটে ভারতীয় ছাত্রদের হোষ্টেলে মাঝে মাঝে দেশী খাবার খেতে আসেন—সেই-খানেই তাঁদের সাথে আমার আলাপ-পরিচয় হয়।

এই ভারতীয় ছাত্রদের হোষ্টেলে প্রায় ৫০ জন ভারতীয় ছাত্র বাস করে, কিন্তু প্রত্যহ এখানে ৮০।৯০ জন ভারতীয় নরনারী এসে আহার ক'রে থাকেন। এখানে হিন্দুস্থানী পাচকে রন্ধন করে এবং ৭।৮ জন ইংরাজ মহিলা খাবার সরবরাহ ক'রে থাকে। এখানে প্রত্যহ লুচি, পরোটা, মাছের ঝোল, মাংসের কারি, কোর্ম্মা, দই, ক্ষীর, জিলাপী প্রভৃতি পাক হ'য়ে থাকে, তা ছাড়া ফরমাস-মত অন্যান্য খাবারও রোজ হয়। এখানকার সকল খাবারের দাম সস্তা—লণ্ডনের অন্যান্য ভারতীয় হোটেলে এর অপেক্ষা ডবল দাম।

আমরা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্য-কল্পে একটি অভিনয় করবার চেষ্টা করছি তা তোমায় পূর্ব্বেই জানিয়েছি—উপস্থিত গ্রাফ্‌টন থিয়েটারের (Grafton Theatre) মালিকের সাথে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা চল্‌ছে। কুমারী দস্তুর নামে একজন পারসী মহিলা "শকুন্তলা"র এক অঙ্ক অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন বল্‌ছেন—দেখি কতদূর কি হয়।

এই সময় লণ্ডনে টিকিট বিক্রয়ের বড়ই অসুবিধা, কারণ এখানকার যাবতীয় ধনাঢ্য নরনারী অগাষ্ট মাস হ'তে বায়ু-

পরিবর্ত্তনের জন্য কন্টিনেণ্টে (Continent) যাত্রা করেন এবং তাঁরা সেপ্‌টেম্বর মাসের পূর্ব্বে এখানে ফিরেন না; কাজেই তাঁদের কাছ হ'তে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। একমাত্র ছাত্রদের উপর আমাদের নির্ভর কর্‌তে হবে। মোট কথা, লেডী মোস্‌লী (কর্জ্জন-দুহিতা), লেডী লিটন, লেডী লুটিয়েন্স প্রভৃতি যে সকল নামজাদা ইংরাজ মহিলার উপর আমরা নির্ভর কর্‌তে পার্‌ব মনে করেছিলাম তাঁরা সকলেই এখন সমুদ্রের অপর পারে—জার্ম্মানী, সুইজার ল্যাণ্ড বা ফ্রান্সে চ'লে গিয়েছেন। কিন্তু আশা মানুষকে ছাড়্‌তে চায় না—দেখা যাক্ কি ক'রে উঠ্‌তে পারা যায়!

গেল না। পরে আমরা জোন্‌স্ সাহেবের সাথে "হাউস অফ্ লর্ডসে" গেলাম। সেখানে লর্ড চান্সেলারের কেদারা, সম্রাটের সিংহাসন প্রভৃতি দেখ্‌লাম।

আগামী মঙ্গলবার দিন আমরা কেম্ব্রিজে যাব। শ্রীযুক্ত গারেট ঐদিন আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি লর্ড কেব্‌লের (Lord Cable) জামাতা এবং বার্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার শ্রীযুক্ত বেন্থলের ভগ্নীকে বিবাহ করেছেন। শ্রীযুক্ত গারেট পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য বম্বেতে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন—কিন্তু ঐ কাজের জন্য তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি, কাজেই ও-কাজ তাঁর ভাল লাগল

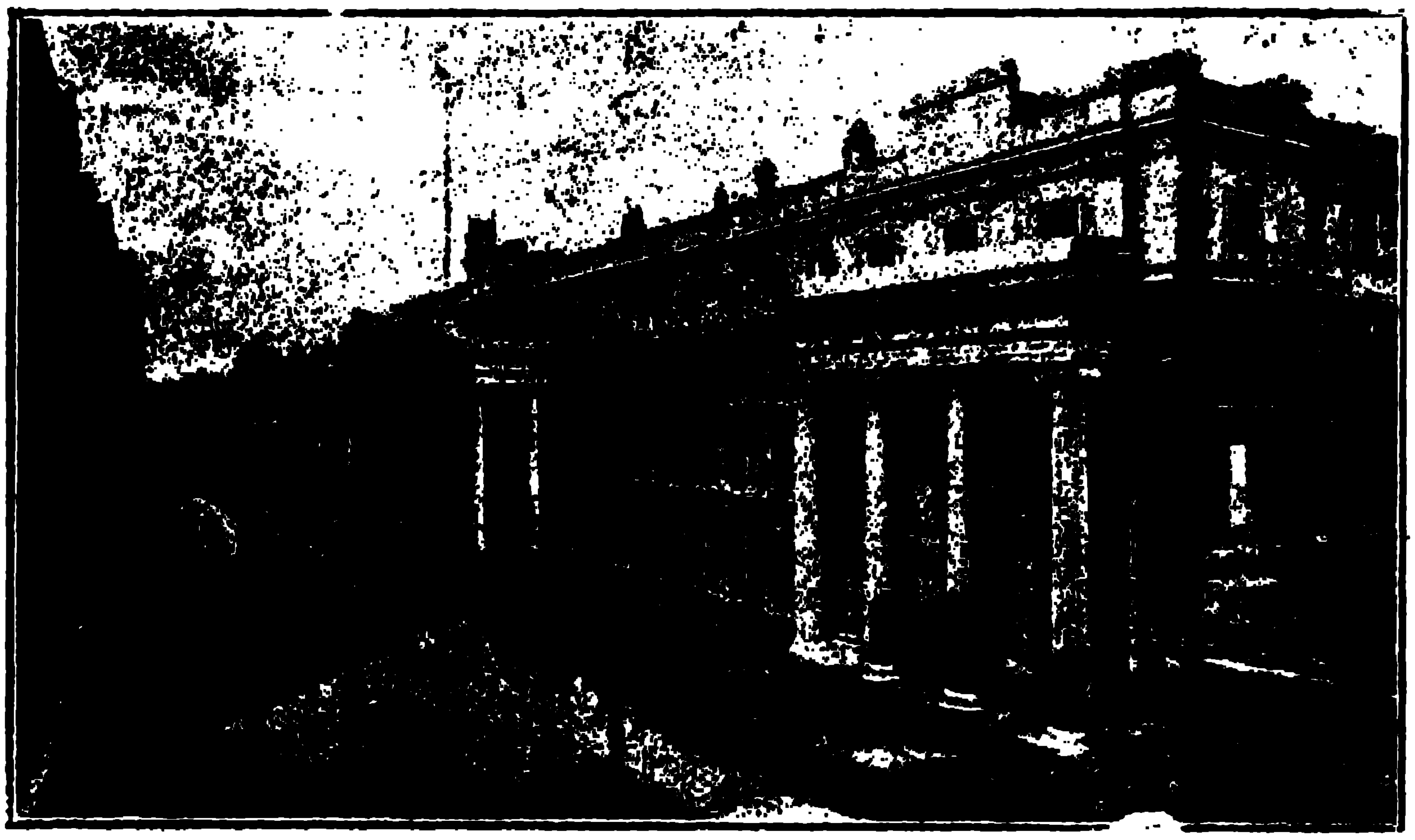

জেনারেল পোষ্ট্ অফিস (লণ্ডন)

আজ পার্লামেণ্টের এই সেসনের শেষ দিন ছিল—আমি চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়েছিলাম। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু মার্ডি জোন্‌স্ এম-পি, যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় "সরোজনলিনী নারী শিল্প-শিক্ষালয়" পরিদর্শন কর্‌তে গিয়েছিলেন, তিনি আমাদের সাথে নিয়ে পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কামরা দেখালেন। আমরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা শুন্‌লাম। শ্রীযুক্ত পেথিক লরেন্স এম-পি, ইনকম টেক্স সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। শেষ দিন ও ছুটির জন্য অধিকাংশ মেম্বরই অনুপস্থিত ছিলেন। মার্ডি জোন্‌স্, ভারতীয় সেক্রেটারী বেন সাহেবকে আমাদের সাথে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য অনেক খুঁজ্‌লেন, কিন্তু তিনি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে চ'লে যাওয়ায় তাঁর দেখা পাওয়া না। তিনি সিভিল্ সার্ভিস ছেড়ে দিলেন এবং নিজের দেশে ফিরে গিয়ে চাষের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ কর্‌লেন। কেম্ব্রিজের অতি নিকটে বারিংটন (Barrington) নামক পল্লীতে ৩০০ একর অর্থাৎ ৯০০ বিঘা জমিতে তিনি কৃষিক্ষেত্র তৈরী করেছেন। শ্রীযুক্ত গারেট ভারতবর্ষের কৃষি সম্বন্ধে একখানি সুন্দর বই লিখেছেন—তার নাম হ'চ্ছে 'An Indian Commentary.' ভারতবর্ষে কিসে কৃষিমঙ্গল হ'তে পারে তা দেখানই তাঁর উদ্দেশ্য। আমার মনে হয়, যাঁরা কৃষি সম্বন্ধে জান্‌তে ইচ্ছুক তাঁদের এই বইখানি পড়া উচিত।

আমরা এ পর্য্যন্ত শ্রীমান বীরেন্দ্রসদয়ের সাথে দেখা ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। আগামী মঙ্গলবারে শ্রীযুক্ত গারেটের

ওখান হ'য়ে তার কাছে যাবার ইচ্ছা আছে।

৫ই—

আজ সকালে আমরা কেম্ব্রিজে গিয়েছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের প্রিয় পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রসদয় আমাদের ষ্টেশনে নিতে এসেছিল। আমরা সর্ব্বপ্রথম তার সাথে বোর্ডিং দেখতে গেলাম। সে ইমানুয়েল কলেজের ছাত্র এবং তার বোর্ডিং কলেজের পাশেই। বীরেন্দ্রসদয় তিনখানি ঘর পেয়েছে—শোবার ঘর, পড়ার ঘর ও ভাঁড়ার ঘর। তাদের খাবার ঘর কলেজের ভিতরে। সে প্রথম পরীক্ষা পাশ করেছে এবং ব্যারিষ্টারী ও সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দেবে। যে সকল পাঠ্য বিষয় সে নিয়েছে তাতে মনে হয় ১৯৩২ সালে সে ইণ্ডিয়ান সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা পাশ করতে পারবে। আমরা কয়েক মিনিট বীরেন্দ্রসদয়ের ঘরে বিশ্রাম ক'রে, পরে তাকে নিয়ে কেম্ব্রিজ হ'তে ৭ মাইল দূরে বারিংটন পল্লীতে যাই। ভূতপূর্ব্ব আই-সি-এস্ এবং অক্সফোর্ডের ফেলো শ্রীযুক্ত গারেট নিজের মোটর নিয়ে ষ্টেসনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা মোটরে ক'রে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে শ্রীযুক্তা গারেটের সাথে আলাপ হয়। ইনি ডেভন্সায়ারের বিখ্যাত বেছল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা গারেট দেখতে বেশ সুশ্রী—বয়স ৩২ থেকে ৩৪-এর মধ্যে হবে। এঁর কর্ম্মপটুতা বিশেষ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। শ্রীযুক্ত গারেট খুব সুশিক্ষিত ব্যক্তি। এঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও শক্তি আছে—তা তাঁর কৃষিক্ষেত্র দেখলেই বোঝা যায়। এই চাষের জমিতে ফল-ফুলের বাগান, সব্জী ক্ষেত, বিট্‌পালমের ক্ষেত, আরো কত রকম ক্ষেত রয়েছে তা আর কি বলব। অদূরে কারখানায় বিট্‌পালম হ'তে শর্করা তৈয়ারী হয় দেখলাম। গারেট সাহেবের একটি প্রকাণ্ড গোশালা আছে—সেখানে ২৪.২৫টি দুগ্ধবতী গাভী থাকে। এ ছাড়া শূকর, বিড়াল, কুকুর, মুর্‌গী প্রভৃতি নানারকম জীবজন্তু তাঁরা রেখেছেন দেখলাম।

টাওয়ার ব্রিজ (লণ্ডন)

লণ্ডন সহরে এঁদের একটি সুন্দর বাড়ী আছে, কিন্তু এই ইংরাজ দম্পতীর প্রাণমন বারিংটন পল্লীতে, কাজেই তাঁদের সেই বাড়ীটি বেশীর ভাগই খালি অবস্থায় প'ড়ে থাকে। আহারের সময়, গোয়ালিয়র মহারাজের ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত রবিন্‌সন্ এবং তাঁর স্ত্রীর সাথে আলাপ হ'ল। পরে গারেট সাহেবের অতিবৃদ্ধা অন্ধ মাতার সাথে আলাপ হয়। তাঁর পরিচর্য্যার কোন রকম ত্রুটী নাই দেখলাম পুত্রবধূর প্রাণঢালা সেবাযত্নে তিনি বেশ আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। তিনিও পুত্র এবং পুত্রবধূকে অতিশয় স্নেহ করেন, তা তাঁর সাথে গল্প ক'রে বুঝতে পারলাম।

আমরা শ্রীযুক্ত রবিন্‌সনের মোটর ক'রে বীরেন্দ্রসদয়ের

কলেজে ফির্লাম। মিনিট পনের পরে নিজেদের শরীর আগুনে সেঁকে নিয়ে, ৯।৹ টার গাড়ীতে আমরা লণ্ডনে রওনা হলাম।

৯ই—

আজ আমরা কয়েকটি বাঙ্গালী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সকাল হ'তে খেটে নানারকম খাবার তৈয়ারী কর্লাম। সকলে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হ'লেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁদের সাথে গল্প কর্তে লাগ্লেন—আমি সেই অবসরে রেকাবী ক'রে খাবার সাজিয়ে নিয়ে খাবার ঘরে গেলাম। পরে সময়মত তাঁদের আহার কর্তে ডাক্লাম। এঁরা সকলেই আমার প্রত্যেকটি খাবারের প্রশংসা কর্লেন। আমার রান্না এঁদের ভাল লাগে জেনে ভারী তৃপ্তি পেলুম।

বলা বাহুল্য এ নিমন্ত্রণে সেই তিন কুলীন বন্ধুও বাদ পড়েন নি! আহারের পর শ্রীযুক্ত বসু গান ক'রে সকলকে আনন্দ দিলেন। এর পর শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর বেহালায় (Violin) একখানি ইংরাজী গৎ বাজালেন। বেহালা যে এত সুন্দর শুনতে লাগে তা আজ প্রথম জান্লাম!

রাত্রি ১১টার পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিদায়গ্রহণ কর্লেন।

১২ই—

আজ সার জর্জ্জ গড্ফ্রের (Sir George Godfrey) বাড়ীতে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—আমরা যথাসময় সেখানে উপস্থিত হলাম। সার জর্জ্জ গড্ফ্রে বার্ড কোম্পানীর একজন অংশীদার। ইনি খুব প্রবীণ ব্যক্তি—এঁর স্ত্রীকেও প্রবীণা বলা চলে। এঁরা উভয়েই আমাদের খুব যত্ন কর্লেন।

সার জর্জ্জের একটি প্রকাণ্ড সাদা রংয়ের আইরীশ উল্ফ্ হাউণ্ড আছে—কুকুরটি আমায় দেখেই, কি জানি কেন লেজ নাড়্তে নাড়্তে আমার অতি নিকটে এল ও আমার কাপড় শুঁক্তে এবং 'ভৌ—ভৌ-উ' ক'রে ডাক্তে লাগ্ল। প্রথমে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার জামাই বাবু আদর ক'রে তার মাথায় হাত দেওয়াতে, আমিও সাহস ক'রে তার মাথায় হাত বুলতে লাগ্লাম। লেডী গড্ফ্রে হেসে আমায় বল্লেন, 'ওটা তোমাদের দেশ হ'তে কিনে আনা হয়েছে কিনা, তাই ও তোমায় চিন্তে পেরেছে'।—তাঁর কথা শুনে আমরা সকলে হাস্তে লাগ্লাম।

বাস্তবিক কুকুরটির রকমসকম দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করেছিলাম আমি কোনদিনই কুকুর তেমন ভালবাসি না, কিন্তু সে আমার গায়ে কি পেয়েছিল তা সে-ই জানে, আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম কুকুরটি এক মিনিটের জন্যও আমার পাশ হ'তে স'রে যায় নি।

আজ এই কুকুরটি, তোমার হঠাৎ পাওয়া কালো গরুকে স্মরণ করিয়ে দিলে। জগতের এমনিই নিয়ম বটে—কখন্ কে কাকে ভালবাসে আর কি গুণই বা তার মধ্যে পায় তা ঠিক সব বুঝে উঠ্তে পারা যায় না!

১৫ই—

বিকালে সবেমাত্র চা পান ক'রে উঠে বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছি, এমন সময় বীরেন্দ্রসদয় এসে উপস্থিত হ'ল। আমি তাকে বস্তে ব'লে বাড়ীওয়ালীকে (Land lady) চায়ের জন্য বল্তে গেলাম। পরে আমি ঘরে পা দিবামাত্রই সে ব'লে উঠ্ল, 'মাসীমা, আপনি যদি এ রকম ব্যস্ত হন তাহ'লে আমি কিন্তু আর এখানে আস্ব না।' মুখে বল্লাম, সে কি কথা! আমি মোটেই ব্যস্ত হই নি। কিন্তু মনের কাছে আমায় স্বীকার কর্তেই হয় যে যাকে স্নেহ করা যায়, সে কাছে এলে ব্যস্ত না হ'য়ে থাক্তে পারা যায় না।

আজকাল সময় সময় আমার কেবলই মনে হয়,—এদের ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হবে—নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবে যে আনন্দ পাই তা একনিমিষে নিভে যায়।

চা পান কর্তে কর্তে, বীরেন্দ্রসদয় বল্লে, 'আপনারা নাকি শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছেন?' আমি বল্লাম, হাঁ, সেপ্টেম্বর মাসে যাব। সে বল্লে, 'আমার একটি কাজ কর্তে পারবেন?' আমি বল্লাম, কি কাজ বল। সে বল্লে, 'আমার বাবাকে কতকগুলি ভাল বাংলা রেকর্ড পাঠাতে বল্বেন।' আমি বল্লাম, বেশ, কি কি রেকর্ড পাঠাতে হবে লিখে দিও। সে তৎক্ষণাৎ পকেট হ'তে একটি গানের তালিকা বার ক'রে আমার হাতে দিলে।

আমি যত্ন সহকারে সেখানি আমার বাক্সয় তুলে রাখ্‌লাম।

সন্ধ্যার সময় আমরা বায়স্কোপ দেখ্‌তে গেলাম। বইখানি আমার বেশ ভাল লাগ্‌লো। একটি নর্ত্তকীর জীবন-কাহিনী নিয়ে গল্পটি লেখা—প্লটটি বেশ নূতন ধরণের। বাসায় ফির্‌তে আমাদের রাত হ'ল। হোটেলে খেয়ে নিয়েছিলাম, সেই জন্য সোজা শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম।

১৭ই—

আজ আমরা "লণ্ডন স্তম্ভ" (Tower of London) দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। এই প্রাসাদে পূর্ব্বে রাজারা বাস কর্‌তেন এবং পরে এইখানেই অনেক রাজা রাণীকে বন্দী ক'রে রাখা হ'ত। এক্ষণে যাবতীয় রাজকীয় মণি, মুক্তা, হীরা ইত্যাদি এখানে সংরক্ষিত হয়। পাঞ্জাব নৃপতি বীর রণজিৎ সিংহের কোহিনুর হীরা দেখ্‌লাম। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ কুলিনিয়ান হীরক এখানে রয়েছে। শুনা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকা হ'তে ইহা সম্রাট এড্‌ওয়ার্ডকে উপহার দেওয়া হয়েছে। এই হীরাটি একটি ক্রিকেট্‌ বলের চাইতে কিছু বড়। এর উজ্জ্বলতা এত বেশী যে কিছুক্ষণ এর দিকে দৃষ্টি রাখা যায় না। আমরা বহু মূল্যবান রাজমুকুট ও নানা-রকম গহনা দেখ্‌লাম। ঐ সকল জিনিষ কাচের বাক্সের ভিতর সাজান আছে। বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত আছে। আমরা সব দেখে, পরে মোটরে ক'রে বাসায় ফির্‌লাম।

১৯শে—

আজ সকালে আমরা আমাদের এক বন্ধুকে নিয়ে, এখানকার বোর্ডিং হাউসে তাঁর ঘর দেখ্‌বার জন্য বার হয়েছিলাম। ইতিপূর্ব্বে তিনি অনেক চেষ্টা ক'রেও কোন জায়গায় ঘর ঠিক ক'তে পারেন নি। তাঁর বিশ্বাস, কালা আদ্‌মীকে এরা সহজে জায়গা দিতে চায় না। যাই হোক্‌ চৌধুরী মহাশয়কে নিয়ে পুনরায় ঘর খুঁজ্‌তে বেরুন গেল। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে আমরা একটি বোর্ডিং হাউসের কাছে এসে পৌঁছলাম—বাড়ীটির কাচের জানালায় একটি দড়িতে ঝুলান কার্ডে "এপার্টমেণ্ট" (Apartment) লেখা ছিল। আমরা সেখানে থাম্‌লাম এবং দরজার কড়ায় আঘাত (Knock) কর্‌তে লাগ্‌লাম। একটি পরিচারিকা দরজা খুলে দিলে। আমরা তাকে ঘর খালি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে, আমি জানি না, গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌ছি। মিনিটখানেক বাদে সে ফিরে এসে বল্‌লে, না, এখানে ঘর খালি নাই। সেখান হ'তে আমরা অন্যত্র ঘরের চেষ্টা দেখ্‌তে গেলাম। পরে আবার আর এক জায়গায় গেলাম।

এক, দুই, তিন, চার ক'রে গুনে দেখা গেল—আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ৭টি বোর্ডিং হাউসে ঘুরেছি এবং সব জায়গাতেই ঐ একই উত্তর পাওয়া গেল। শেষবার যেখানে গিয়েছিলাম, কড়া নাড়্‌তেই গৃহকর্ত্রী নিজে বেরিয়ে এলেন। তিনিও ঘর সেখানে খালি নাই বলাতে, আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লাম ও রাগতঃ স্বরে বল্‌লাম, তবে এ রকম মিথ্যা "এপার্টমেণ্ট" লেখার মানে কি বল্‌তে পারেন? গৃহকর্ত্রী একটু থতমত খেয়ে বল্‌লেন, ঘর খালি আছে কিন্তু তা কেবলমাত্র মহিলাদেরই ভাড়া দেওয়া হয়। আরো কটু কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চৌধুরী মহাশয় ইসারায় থাম্‌তে বলায় আর কিছু বল্‌লাম না।

আমায় রাগে গস্‌গস্‌ কর্‌তে দেখে আমাদের বন্ধুটি হেসে বল্‌লেন, আপনি ভয়ানক চটেছেন দেখ্‌ছি—চলুন বাগানে বেড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে আসা যাক্‌।

তাঁর কথায় আমরা এখানকার কোনও একটি বিখ্যাত বাগান দেখ্‌তে গেলাম। এই বাগানে খুব গাছপালা এবং ঝোপ্‌ঝাপ্‌ দেখে মনে হয়, এ দেশের নরনারী 'হাইড্‌ এণ্ড সিক্‌' (hide and seek) খেলায় খুব মজবুত! আর হয়ত সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বাগানটি তৈয়ারী করান হয়েছে। যাই হোক্‌ আমরা বাগানে খানিক পায়চারী ক'রে বাসায় ফিরিলাম।

২২শে—

আমরা কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্রকে নিয়ে মহারাণীর 'উইণ্ডসর কাসেল্‌ (Windsor Castle) দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। এই সুনির্ম্মিত প্রাসাদটি লণ্ডন হ'তে ৩০ মাইল দূরে—টেম্‌স্‌ নদীর কিনারায় বল্‌লেই হয়। এর ঠিক পাশেই আর একটি সুউচ্চ প্রাসাদ পথিকের দৃষ্টিগোচর হয়,

সেটি হ'চ্ছে বিখ্যাত ইটন্ স্কুল (Eton School)। আমরা কাসেলের গেটের ভিতর প্রবেশ করবামাত্র মহারাণীর সুরম্য কানন দেখতে পেলাম। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় খানিকক্ষণ বাগানে ঘুরে ফুলের শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। পরে সকলে মিলে কাসেলের ভিতর প্রবেশ করলাম। এর প্রত্যেক কক্ষ সুচারুরূপে সজ্জিত আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পোষাক-পরিচ্ছদ, খাট-বিছানা অতি সুন্দর ভাবে সাজান রয়েছে। ছেলেদের খেলা-ঘরগুলি সব চাইতে আমার চমৎকার লাগ্‌ল! এখানে ছোটখাট জুতা, মোজা, টুপি, লাঠি ইত্যাদি সযত্নে রাখা আছে। বর্ত্তমান সম্রাটের ছেলেবেলাকার অনেক জিনিষ এখানে দেখ্‌লাম। আমরা এ ঘর সে ঘর ঘুরে সমস্ত জিনিষ দেখে, ৬টার সময় বাসায় ফির্‌লাম। সেখানে শ্রীযুক্ত পি—র লেখা একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন যে আর অভিনয় করবার কোনই আশা রইল না, কুমারী দত্তর শীঘ্রই লণ্ডনের বাইরে চ'লে যাচ্ছেন। আমাদের অত আশা বন্ধুর এক চিঠিতেই কোথায় মিলিয়ে গেল। চৌধুরী মহাশয় তখুনিই বন্ধুর বাসায় গিয়ে সমস্ত খবর জান্‌তে চাইছিলেন, আমি বারণ করাতে তিনি আর গেলেন না।

২৩শে—

উঃ! কি ভয়ানক গরম আজ তিন দিন হ'তে এখানে পড়েছে! ঘরে একেবারেই টেঁকা যাচ্ছে না—বিজলী-পাখার (electric fan) অভাব খুব ভাল ক'রেই অনুভব করছি। এত উত্তাপ—সহ্য করতে না পেরে প্রত্যহ ১০। ২ জন ক'রে লোক প্রাণ হারাচ্ছে। এসব দেখে শুনে আর বেশী দিন এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না।

আজ প্রীতি-দি'র একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি একেবারে মেম সাহেব ব'নে গিয়েছি কি না। তাঁর বিশ্বাস আমি এখানে গাউন পরি! তাঁর চিঠি প'ড়ে অবধি আমার খালি হাসি পাচ্ছে! এখান হ'তে ফিরে গিয়েই অন্ততঃ একটি বারের জন্যও তাঁর কাছে যেতে হবে এবং আমি একটুও বদ্‌লে গেছি কি না তা তাঁকে পরীক্ষা করতে বলা হবে। আমার এই পল্লীবাসিনী দিদিটির মত কল্পনার দৌড় আর কতগুলি ভগিনীর আছে বল্‌তে পার?

২৬শে—

আমরা ১৬ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হ'তে প্যারিসে রওনা হব এবং মার্সেলস্ হ'তে ১৯শে তারিখে জাহাজে উঠ্‌বো। আমরা যে জাহাজে যাচ্ছি তার নাম "কাইসার-ই-হিন্দ" (Kaisor-i-hind)—এই জাহাজেই সার জর্জ্জ গড্‌ক্রে ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছেন। একজন পরিচিত লোকের মুখ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে শুনে খুশী হয়েছি।

ভায়াকে ব'লো, আমার চিঠি পাবামাত্র সে যেন আর, বাক্‌হেলকে (Secretary, Servants of India Society) তাঁর বম্বের ঠিকানায় চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়, আমরা ৩রা বা ৪ঠা অক্টোবর ঐখানে পৌছব। সুবিধা হয় ত' তোমরা দু'জনেই বম্বেতে আস্‌তে পার এবং যদি আসা হয় তাহ'লে আমায় জানাতে ভুল' না। ফের্‌বার সময় বম্বেতে ২।১ দিন থেকে সেখানকার সব জিনিষ দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে। পূর্ব্বে সময়াভাবে কোনও জিনিষ দেখা হয় নি। লণ্ডন সহর কি রকম দেখ্‌তে, তা তোমায় এখন পর্য্যন্ত লিখিনি ব'লে তুমি রাগ করেছ লক্ষ্মী বোনটি! আমার ওপর রাগ ক'র না, আমি ত আর মহিলা-কবি বা লেখিকা নই যে সমস্ত দেশের বর্ণনা নিখুঁত ভাবে লিখ্‌তে পারব। তা ছাড়া কিছু লিখ্‌তে গেলেই যদি কুমারী মেও'র (Miss Mayo) মত সরস ভাষা ও ভাব কলম দিয়ে বার হ'য়ে পড়ে সেই ভয়েই এতদিন লেখা হয়নি, কিন্তু তোমার যখন একান্ত জেদ চেপেছে আমায় কিছু লিখ্‌তেই হবে—আমার খিচুড়ী ভোগ তোমার সাম্‌নে ধ'রে দিচ্ছি—

অতি অপরূপ লণ্ডন সহর কেমনে বর্ণিব তাহা,
চারিদিকে তার যেন্নি প্রাসাদ মরি কিবা রূপ আহা!
প্রকৃতির শোভা এতটুকু নাই এই অপরূপ দেশে,
বড় আশা ক'রে এসেছিনু হেথা নিরাশ হয়েছি শেষে।
ভেবেছিনু ইহা ভূস্বর্গই হবে যখন দেখিনি তারে,
ভাষায় খুঁজিয়া পাইনাক নাম এখন কি বলি এরে।
হেথা নরনারী চেনা দায় বড়, দু'জনেরই কেশ ছাঁটা—
কেশ রাখা হ'লে বিষম বিপদ কেবল একটা ল্যাঠা।
বুদ্ধি এদের বড়ই প্রখর—জ্ঞানের আলোক নাই,
সাদা ও কালোর ভেদাভেদ-জ্ঞান আজো রয় হেথা তাই।
আর এক কথা, নারী খায় হেথা চুরুটিকা ছোট বড়,
টিন টিন ভাই শেষ ক'রে ফেলে একাধিক হ'লে জড়।
আর কত কব রসনায় বাধে—আমি নই মিস্ মেও,
তা ছাড়া জান ত' প্রবাদেই আছে "নুন খেলে গুণ গেও"!
তাই ব'ল এবে এ জাতির মত পারশ্রমী, পরিষ্কার,
কর্ম্মনিপুণ, রসিক, চতুর দুনিয়ার মেলা ভার।

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমার দিদি *

সমাপ্ত

* এই ভ্রমণকাহিনীটি ১৩৩৭-এর শ্রাবণ সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।—বঃ সঃ

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

দেবো না হে তোমায়, রবি,
অস্ত যেতে দেবো না !
তোমায় মোরা ভুলে' যাবো—
স্বপ্নেও তা ভেবো না ॥
তোমার আলোর রঙ্গিন্ ছটায়
রাঙ্গ্‌লো সবার প্রাণ ;
মরম-বীণায় বাজে সবার
তোমার মোহন তান ॥
আনন্দময় ছন্দে তোমার
উঠ্‌ল হৃদয় নাচি' ;
তরুণতার মন্ত্র তুমি
দিলে সবায় যাচি' ॥
তোমার তপোবনে ফুটে
তক্ষশিলার ফুল ঃ—
ভারত-নিঝর-সুসিঞ্চিত
ভারত-তরুর মূল ॥
দৈন্য-হারা বাংলা—লভি'
বিশ্বে অতুল কবি ;
ধন্য ভারত—বক্ষে ধরি'
স্নিগ্ধ রবির ছবি ॥
তোমার সুরের তানে সদা
উঠ্‌বে দেশে গান ;
অশেষ রসে থাক্‌বে দেশে
তোমার মসীর দান ॥
প্রাণের কোণে ধ্বনিত হ'য়ে
তোমার অমর বাণী
সীমার মাঝে অসীমতার
পরশ দিবে আনি' ॥
আস্‌বে যখন নেমে' দেশে
নিবিড় মেঘের কালো,
উড়িয়ে দিবে আঁধার তোমার
অস্ত-বিহীন আলো ॥
যুগে যুগে সজাগ করে'
তোমার জন্ম-ভূমি
চির-নবীন উষার দেশে
উদয় হবে তুমি ॥
দীপ্ত ভুবন তোমার আলোয়—
তাতে মোদের লক্ষ্য নাই ;—
তুমি মোদের পথের প্রদীপ—
অন্তরে তাই তৃপ্তি পাই ॥
অস্তাচলের শিখর হ'তে
দাও রাঙ্গিয়ে দিগ্‌বিদিক্ ;—
বিশ্ব-মানব-হৃদয়-রবি,
সত্যে উজল হে নির্ভীক্ !

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮

ঘরে বাইরে

বিলাতী কারখানায় (Factory) ভারত-নারী

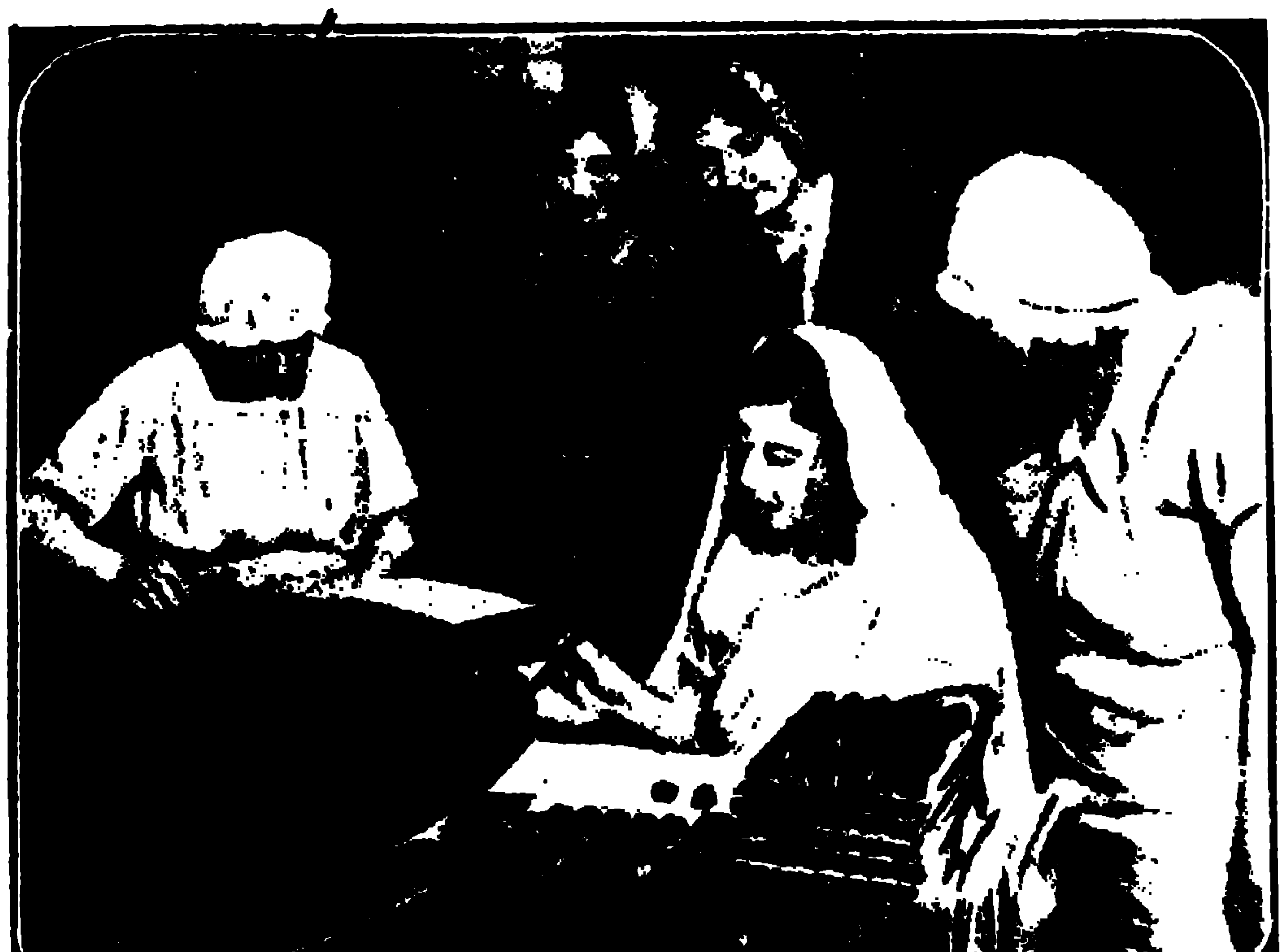

ভারতীয় শিক্ষার্থিনীর দল বিশেষ বিশেষ জিনিষ তৈয়ারীর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিলাতী কারখানা পরিদর্শন করিতেছেন। সম্মুখের প্রাচ্যমহিলাটি হাতে-কলমে চকোলেট প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিতেছেন।

জষ্টিস্ অফ্ দি পীস্

ইনি—লেডী বাইরামজী জীজীভয় সম্প্রতি বোম্বের "জষ্টিস্ অফ দি পীস্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক-পদে মহিলা

বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার কুমারী মিথিভাই আর-দেশী বোম্বাই আইন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্শা নিক্ষেপ শিক্ষা

বাটারসি পার্কে ইংরেজ বালিকারা বর্শা নিক্ষেপ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন - বর্শা বিশেষজ্ঞা জার্মান শিক্ষয়িত্রী ফ্রাউলিন মার্টেল জেকবের নিকট।

ভুত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

কোলাহল থাম্‌লে সতীন্ বল্‌তে সুরু কর্‌ল,—

"তখন আমি নতুন রেঙ্গুনে গিয়েছি। চারদিক-চাপা সিন্দুকের মতো flatগুলোতে মানুষ কি করে' যে থাকে ভেবেই আমার আশ্চর্য্য বোধ হ'ত। অনেক খোঁজাপাতা করে' সহর থেকে বাইরে বেশ খানিকটা দূরে পৌনা বস্তিতে বাংলো ধরণের পুরনো একটা বাড়ী ভাড়া কর্‌লাম। বেশ বড় বাড়ী, উপর তলা, নীচ তলা, ছোট একটি বাগান, গোটা-দুই out house এবং গারাজ, সব আমার। একলা মানুষ, একটু আধটু মাছির উৎপাত ছাড়া নিরিবিলি বেশ আরামেই আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

"অত দূরে তখনো electric connection পাওয়া যেত না। কেরোসিন্ জাল্‌তে হয়। তাতে প্রথমটা কিছুই অসুবিধা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ একদিন অসুবিধা সুরু হলো। অনেক রাত জেগে তখন আমার আপিসের কাজ দেখ্‌তে হ'ত। হঠাৎ একদিন রাত বারোটা আন্দাজ সময়ে আমার বস্‌বার ঘরের আলোটা দপ্ করে' উঠে নিবে গেল। দেশলাই জেলে প্রায় পঁচিশটা কাঠি নষ্ট কর্‌লাম, কিছুতেই সেটাকে আর ধরাতে পার্‌লাম না। কোথায় কি যে বিগ্‌ড়েছে অন্ধকারে তা বুঝতেও পার্‌লাম না কিছু। পরের দিন দেখ্‌লাম, টেবিলের ওপর আলোটা ঠিকই জ্বল্‌ছে। ভাব্‌লাম চাকরেরা ঠিক করে' রেখে থাক্‌বে। কিন্তু সেদিনও ঠিক রাত বারোটা আন্দাজ সময়ে আগের দিনেরই মতো আলোটা দপ্ করে' নিবে গেল।

"বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে আর একটা আলো এনে ধরালাম, কিন্তু সেটিও দেখ্‌লাম ভালো জ্বল্‌ছে না, থেকে থেকে দপ্‌দপ্ করে' লাফাচ্ছে, শেষটা নিবেও গেল। আর আলো জাল্‌বার চেষ্টা না করে' বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম।

"এবার প্রায় রোজই এই ব্যাপার ঘট্‌তে লাগ্‌ল। রাত বারোটা বাজ্‌তেই কি যে হয়, দপ্‌ দপ্‌ করে' আলোগুলো নিবে যায়। কিছুতেই সেগুলোকে তারপর আর জ্বাল্‌তে পারিনে। ভয় পাব না ঠিক করে'ও কেমন মাঝে মাঝে গা-টা একটু ছম্‌ছম্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কাকেও এ বিষয়ে কিছু বললাম না, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হবার ভয় ছিল।

"Dover বলে' একটি ইউরেশীয় প্রতিবেশীর বাড়ী প্রায়ই বিকালে আমি bridge খেল্‌তে যেতাম। একদিন কথায় কথায় সে বল্‌লে, 'তোমার এমন চেহারা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে কেন! রাত্রে ভালো করে' ঘুম হয়?'

"আমি বল্‌লাম, 'হাঁ, ঘুম বেশ হয়, কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস কর্‌ছ?'

"না, কিছু না, বলে' সে আর তার স্ত্রী একবার একটু চাওয়াচাওয়ি করে' নিল। আমি বল্‌লাম, 'তোমরা আমাকে ভয় পাওয়াচ্ছ, কি ব্যাপার বলই না? শরীর খারাপ হবার এতরকম কারণ থাক্‌তে ঘুম না হবার কথাটাই বিশেষ করে' তোমার মনে হলো কেন?'

"একটু ইতস্ততঃ করে' Dover বল্‌লে, 'কি জানো, বাড়ীটার বড় সুনাম নেই। কেন, তুমি কি কিছু লক্ষ্য করনি?'

"আমার বিগত কয় রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা তখন তাকে আমি বল্‌লাম। সে বল্‌লে, 'ঠিক তাই। ও' বাড়ীতে রাত বারোটার পরে কি যে হয়, কিছুতেই কোনো আলো জ্বালা রাখ্‌বার উপায় নেই। একমাসের বেশী কোনো ভাড়াটেকে ও' বাড়ীতে আজও পর্য্যন্ত সেই জন্যেই টিক্‌তে দেখলাম না। তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব আজ ক'দিন থেকেই আমরা ভাব্‌ছি, কিন্তু রোজই বল্‌তে ভুলে যাই।'

"আমি বল্‌লাম, 'কিন্তু কি হয় আলোগুলোর? সে-গুলো অমন হঠাৎ দপ্‌ করে' নিবেই বা কেন যায়, এবং তার পরে কিছুতেই আর জ্বল্‌তেই বা চায় না কেন?'

"সে বল্‌লে, 'আজ রাত্রে তুমি ত ও' বাড়ীতেই শুচ্ছ? আজ আর তোমার সেটা শুনে কাজ নেই। কালকেই আর কোথাও shift কোরো, তারপর সব বল্‌ব।'

"আমি বল্‌লাম, 'আমি ভয় পাব ভাব্‌ছ? কিন্তু এতখানি শোন্‌বার পর বাকীটা না শুন্‌লে ভয় আমি আরও বেশী-ই পাব। আজই তোমাকে সব বল্‌তে হবে।'

"ঘরের আলোটাকে ভালো করে' উস্কে দিয়ে Dover বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে :—

" 'তুমি শুধু আলোগুলোকে নিব্‌তেই দেখেছ, কিন্তু আলো যে নেবায় তাকেও আমি কয়েকবারই দেখেছি। চোখের কাছে আলো থাক্‌লে কিছুই প্রায় দেখা যায় না, সেই জন্যেই তুমি দেখ্‌তে পাও নি। কিন্তু বাইরে কাছা-কাছি কোথাও অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে যদি দেখ ত প্রায় পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবে। রাত বারোটার কাছাকাছি বাজ্‌তেই সিঁড়ির নীচেকার মাঠের ঝোপঝাড়ের মধ্যে আস্তে আস্তে কুয়াসার মতো একটা জিনিস জমাট বাঁধ্‌তে থাকে, আস্তে আস্তে সেই জমাটবাঁধা ঝাপ্‌সা কুয়াসা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়, তখন ভালো করে' তাকিয়ে দেখ্‌লে মানুষটির হাত-পা, তার শরীরের গড়ন, তার পরনের সেই পুরনো দিনের পা অবধি নেমে আসা রাত্রের পোষাক, সব বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উপরে উঠেই যেখানে যে আলো দেখ্‌তে পায় ছুটে ছুটে গিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সে নেবায়।

" 'প্রায় বছর দশেক আগেকার কথা, আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে, আর চোদ্দ আর দশ বছরের দুটি ছেলেকে নিয়ে মহিলাটি আমাদের প্রতিবেশী হয়ে আসেন। তখনো আমার বাবা বেঁচে। আমার আজও বেশ মনে আছে, বাড়ীঘর গোছানো শেষ হ'তেই তিনি নিজে এসে বাবার সঙ্গে আলাপ কর্‌লেন, বল্‌লেন, আমার নাম Mrs. Perrin, আমার স্বামী B. I. S. N.-এর জাহাজের কাপ্তেন, এর নাম Ursula, এটি Johnnie, আর এই Dicky। আমার স্বামী মাসে দু'বার করে' তিন দিনের জন্যে কেবল আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে আস্‌বেন, বাকী দিনগুলো আমাকে একলাই এদের নিয়ে থাক্‌তে হবে। তোমরা নিশ্চয় আমা-দের দেখ্‌বে।

" 'মহিলাটিকে দেখ্‌লে কিছুতেই মনে হ'ত না যে Ursula তাঁর মেয়ে, মনে হ'ত দুটিতে যেন বোন্, কপালে অস্ফুট কয়েকটি সমান্তরাল রেখা ছাড়া তাঁর মুখের বা দেহের আর কোথাও বয়সের কোনো চিহ্নই চোখে পড়্‌ত না।

ছোট মানুষটির সুন্দর ছোট মুখটিতে সর্ব্বদাই হাসি লেগে থাকৃত, কিন্তু তাঁর চোখ দুটির দৃষ্টি ছিল ধারালো ছুরীর ফলার মতো তীব্র, সে দৃষ্টিকে কিছুতেই ভুলতে পারা যেত না।

"'অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যোগ স্থাপিত হয়ে গেল। Mr. Perrin এলে তাঁর সঙ্গেও আলাপ হলো। তিনি মহিলাটির দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী, সুশ্রী বলিষ্ঠদেহ যুবা। সন্তানগুলি মহিলাটির প্রথম বিবাহজাত। স্বামীটির দোষের মধ্যে ছিল রাত্রে একটু বেশী মদ খেয়ে প্রায় অসাড় হয়ে বাড়ী আস্‌ত।—কিন্তু আস্‌ত, স্ত্রীর প্রতি সেইটুকু কর্ত্তব্যের ত্রুটি কখনো কর্‌ত না। এবং যতদিন তারা আমাদের কাছে ছিল, একদিনও কোনো কারণে তাই নিয়ে বা আর কিছু নিয়ে তাদের মধ্যে সামান্য এতটুকু মনোমালিন্য হ'তে দেখিনি।

"'কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলো বাপকে দু-চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ত না। বিশেষ করে' Ursula। বাপ ছিল তার দু-চক্ষের বিষ। আমার প্রায় সমবয়সী ছিল বলে' তার সঙ্গে আমার যথেষ্টই ভাব হয়েছিল, আমাকে প্রায় সব কথাই সে বল্‌ত। একদিন বলেছিল, সুবিধা পেলেই বাপের মুখটাকে আচ্ছা করে' আঁচ্‌ড়ে দিতে তার ইচ্ছে করে। বাপ বাড়ী এলে বিরক্তিতে তার খেতে ঘুমতে শুদ্ধ ভালো লাগে না। তার মাও কি বেছে বেছে লোক পেলে না, কোথাকার এক ছোক্‌রা-বয়সী ছোঁড়াকে ধরে' বিয়ে কর্‌লেন। লক্ষ্মীছাড়া মর্‌বেও না শীগ্‌গির। আমি বল্‌তাম, তুমি ত আর কিছুদিন বাদেই বিয়ে করে' চলে' যাবে, তোমার এত ভাবনা কিসের? সে বল্‌ত, তার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে মোটেই নেই, মাকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে তার ভাল লাগ্‌বে না। আমি একটু চোখ মট্‌কে বল্‌তাম, মায়ের কাছাকাছি বাড়ীতে থাকৃতে পাও এমন কারুকে ধরে' বিয়ে কর না? সে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে' আমার গালে তার কোমল হাতখানি দিয়ে মার্‌ত।

"'Betty, তুমি আর অমন মুখ কোরো না, তোমাকে ত বল্‌তে গেলে আর একজনের বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে আমি ছিনিয়ে এনেছি।...হ্যাঁ, Ursula সুন্দরী ছিল বটে, অমন সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না, Bettyকে আমি অবশ্য বাদ দিয়ে বল্‌ছি। বাপকে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে খিটিমিটির আর শেষ ছিল না। মেয়ে বল্‌ত, ওই মাতাল-টাকে বাবা যে বলি সেই ঢের, ওকে আবার ভালোবাস্‌তে হবে? মা বল্‌ত, দেখ্‌, মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্‌। মাতাল আবার কি? ঝড়ঝাপটায় সারাক্ষণ সমুদ্রের ওপর ভাসে, দু'দিন যা একটু ছাড়া পায়, একটু আয়েস কর্‌বে না? মেয়ে কিছুতেই বাগ মান্‌ত না, মায়ের দিকেও বাগ মানাবার চেষ্টার বিরাম ছিল না। মিষ্টিকথায় বুঝিয়ে, উঠ্‌তে বস্‌তে পাঁচমুখে বাপের প্রশংসা করে', নানা ছলে বাপের সঙ্গে মেয়েকে একলা ফেলে সে মেয়ের মনটাকে নরম কর্‌তে প্রয়াস পেত। তাতে যখন কিছু লাভ হ'ত না, মেয়েকে গাল দিত, মাঝেমাঝে চড়চাপড়টাও দিত,—মেয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ কর্‌ত।

"'একবার ব্যাপারটা কোনো সূত্রে চরমে গিয়ে পৌঁছল। মেয়ে বল্‌লে, তোমার গুণের স্বামীকে নিয়ে তুমি থাকো, আমি চল্‌লাম আমার বন্ধু Lizyর বাড়ী। মা কত করে' বোঝাল, মেয়ে কিছুতেই শুন্‌ল না। মা তখন রাগ করে' বল্‌লে, আচ্ছা যাচ্ছিস্‌ ত একেবারে যা—আর এবাড়ী ফিরে আসিস্‌ নি।

"তিনদিন কেটে গেলেও মেয়ে যখন ফির্‌ল না, তখন মায়ের আর রাগ করে' থাকা পোষায় না। একটা গাড়ী ডেকে দুশ্চিন্তায় শুষ্কমুখ নিয়ে সে মেয়ের বন্ধুটির বাড়ী গিয়ে হাজির হলো। Lizy তাকে আদর করে' বসিয়ে বল্‌লে, Ursulaর খোঁজে এসেছেন? Mrs. Perrin বল্‌লে, হ্যাঁ, কেন—সে তোমার এখানে নেই? Lizy বল্‌লে, আমার কাছেই ও' ছিল, এই মাত্র তার বাবা তাকে Pictures দেখাতে নিয়ে গেলেন।

"'খুসির হাসি Mrs. Perrinএর মুখচোখ ভরে' উপ্‌চে পড়্‌তে লাগ্‌ল। রাত্রে মেয়েকে বল্‌লে, এমন মানুষ আর দেখেছিস্‌? তুই এত কাণ্ড কর্‌লি, তা এতটুকু রাগ নেই, নিজে থেকে তোকে খেয়ে আন্‌তে গেল। নিজের বাপের চেয়ে কিসে কম? মেয়ে কোনো কথা বল্‌লে না। এর পর মেয়ের মনটা খানিকটা বদ্‌লেছে বলে' Mrs. Perrinএর বোধ হ'তে লাগল। বাপের সঙ্গে খুব যে একটা হেসে কথা কইত তা নয়, কিন্তু বাপ সহরে ফিরে এলে তাকে কোথাও

নিয়ে যেতে চাইলে সে যেত। তার মা ইচ্ছে করে'ই অনেক সময় যেত না, তাতে বড় একটা আপত্তি কর্‌ত না।

" 'সেবারে Perrinএর জাহাজ নদীতে ঢুক্‌বার মুখে একটা 'brig'এর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একটা ভাঙা propeller নিয়ে বন্দরে এল। যেখানে চারদিন থাক্‌বার কথা ছিল সেখানে শোনা গেল সেবার দেরি হবে কম করে'ও দশদিন। এত দীর্ঘ দিনের ছুটি নাবিকদের অদৃষ্টে কোনো দুর্ঘটনা না ঘট্‌লে সহজে জোটে না। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে স্থির কর্‌ল, ছুটিটিকে যথাসাধ্য তারা উপভোগ কর্‌বে। চড়িভাতি, excursions, থিয়েটার, cinema, নাচ-গান, party ইত্যাদি পুরো দমে চল্‌তে লাগল্‌। কিন্তু ছুটি শেষ হবার মুখে Mrs. Perrinএর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর হঠাৎ নিউমোনিয়া হওয়াতে আমোদের শেষ দিনটার programmeটা গেল ভেস্তে। অনেক চেষ্টাতেও বন্ধুটির রোগ সার্‌বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে' Mrs. Perrin তাঁর প্রাণপণে সেবা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

" 'সেদিন গাড়ীতে উঠ্‌বার সময় স্বামীকে ডেকে বল্‌লেন, আজ বন্ধুর অবস্থা একটু বেশী খারাপ, রাত্রে আমি আর ফির্‌ব না। তুমি ভোরে গিয়ে খবর নিও।

"কিন্তু ভোর অবধি দেরি হলো না। রাত এগারটার একটু পরেই বন্ধুটি মারা গেলেন। শোকার্ত্ত পরিবারকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা বিশেষ না করে' Mrs. Perrin সরাসরি একটা গাড়ী ডেকে বাড়ী ফিরে চল্‌লেন। রাত তখন প্রায় বারোটা।

"বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখ্‌লেন, তত রাত অবধি বস্‌বার ঘরের আলো জ্বল্‌ছে। তাঁর স্বামীর রাত জেগে পড়াশুনা কর্‌বার অভ্যাস ছিল না, একটু আশ্চর্য্য বোধ হলো। ভাব্‌লেন, কিজানি, বর্ম্মাদের পাড়া, হয় ত বাড়ীতে চোর ঢুকেছে। একটু দূরে থাক্‌তেই গাড়ীটাকে বিদায় করে' দিয়ে পায়ে হেঁটে চল্‌লেন, ভাব্‌লেন লুকিয়ে দেখ্‌বেন, ব্যাপারখানা কি। যদি সত্যি চোর হয় তাহ'লে ফিরে এসে আমাদের জাগিয়ে আচম্‌কা তার উপর পড়ে' তাকে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন।

" 'সিঁড়ির নীচে বাগানে এসে দাঁড়িয়ে শুন্‌লেন, অস্ফুট কথাবার্ত্তার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ভালো করে' কান পেতে শুনে মনে হলো, গলার সুর তাঁর পরিচিত। তবু সাবধানে পা টিপে টিপে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর স্বামী একটা আরাম-কেদারায় বসে' আছেন, তাঁর কোলের ওপরে তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে Ursula! সাম্‌নে টিপয়ের উপর শ্যাম্পেনের খালি বোতল আর খালি দুটি গেলাস। শ্যাম্পেনের ঝোঁকে আলোটার কথা কারও মনে হয়নি, আলোকিত কক্ষে পরস্পরের কানে কানে গুঞ্জনালাপের অবসরে—

" 'আর দেখ্‌তে পার্‌লেন না, এ দৃশ্য কেউ দেখ্‌তে পারে না, পড়্‌তে পড়্‌তে ছুটে গিয়ে ঘরের আলোটির উপর নিজের গায়ের wrapperটা চাপা দিয়ে সেটাকে তিনি নিবিয়ে দিলেন।

" 'তার কিছুদিন পরেই brain fever হয়ে মহিলাটি মারা গেলেন। সেই হ'তে ঐ বাড়ীতে রাত বারোটার পর আর আলো জ্বল্‌তে পারে না। ঠিক সেই রাতটির মতো মহিলাটির দেহমুক্ত আত্মা প্রতিরাত্রে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, সিঁড়ির গোড়ায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দেয়, তার পর পাগলের মতো ছুটে গিয়ে গায়ের wrapper চাপা দিয়ে আলোটাকে নিবিয়ে ফেলে।...যদি চাও ত, আজ রাত্রে চল, বাইরে থেকে দেখ্‌বে তার কাণ্ড। রাত বারে টা বাজ্‌তে আর ত বেশী দেরি নেই।

"কিন্তু আমার আর কিছু দেখ্‌বার উৎসাহ ছিল না। সে রাত্রে একটি বন্ধুকে ডাকাডাকি করে' জাগিয়ে তাঁর বাড়ীতেই রাত্রিবাস কর্‌লাম। পরের দিন সহরের মধ্যে সেই চারদিক চাপা সিন্দুকের মতো flatই একটা ভাড়া নেওয়া গেল।"

সতীনের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বিজলী-বাতিটা হঠাৎ দপ্‌ করে' একবার কেঁপে' উঠ্‌ল। সকলে চম্‌কে একসঙ্গে উপরের দিকে চেয়েই একসঙ্গে আমরা হেসে উঠ্‌লাম। হাসি থাম্‌লে জীব বল্‌লে, "তোমার বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে' ব্যাপারটা চাক্ষুষ করা উচিত ছিল।"

সতীন বল্‌লে, "চাক্ষুষ আমার যা কর্‌বার ছিল তা ত আমি করে'ই ছিলাম। রাত্রের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আব্‌ছায়া মুর্ত্তি একটা চোখে দেখ্‌লে কি আর বেশী লাভ হ'ত? তোমরা সেটাকে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের সৃষ্টি বলে' খুব

সহজেই ত উড়িয়ে দিতে পারতে। কিন্তু রাত বারোটা বাজতেই পাড়াশুদ্ধ লোকের চোখের উপরে রোজ জাজ্বল্যমান আলোগুলো দপ্ দপ্ করে' নিবে যাওয়া, আর যা'ই হোক hallucination বলে' একে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বছরের পর বছর বহু লোকে এ ব্যাপার দেখেছে। আমি নিজে দেখ্‌বার আগে কারুর কাছে ঘুণাক্ষরেও এ বিষয়ে কিছু শুনিনি যে এটিকে autosuggestion বল্‌বে।"

জীবন মাথা চুলকে বললে, "হ্যাঁ, সে কথাও ঠিক ; কিন্তু কোনো ব্যাপারকেই সহজে অলৌকিক বলে' ভাবতে নেই. ওটা আদিম মানবের মনোবৃত্তি। দাঁড়াও ভেবে দেখ্‌ছি, কি সঙ্গত ব্যাখ্যা এর হ'তে পারে।"

আমি বল্‌লাম, "হয় ত সেই জায়গার বায়ুস্তরের কোনো বিশেষ একটি গ্যাসের ক্রিয়ার ফলে এ ব্যাপার ঘট্‌ত।"

হরিপদ বল্‌লে, "বায়ুস্তরের গ্যাসের ক্রিয়াটা ঘড়ি ধরে' রাত বারোটায় কেন ঘট্‌বে ?"

আমি বল্‌লাম, "পাড়ার কোথাও tannery, refinary, রাসায়নিক গবেষণাগার, এই ধরণের কিছু ছিল কি ?"

হরিপদ বল্‌লে, "ধর ছিলই, তার ক্রিয়াটা বেছে বেছে পাড়ার কেবল ঐ একটা বাড়ীর ওপরেই কেন হবে ?"

সতীনের সেই ব্রহ্মপ্রবাসী বন্ধুটি ভূতের গল্প সুরু করিয়ে দিয়ে দিব্যি চুপচাপ সেই কোণটিতে এতক্ষণ বসে' ছিলেন। আমাদের কোনো সমালোচনার মধ্যে একটি কথাও তারপর আর তিনি বলেন নি। এইখানে দীর্ঘকালের নীরবতা ভঙ্গ করে' অকস্মাৎ তিনি বল্‌লেন, "হ্যাঁ, গ্যাসও হ'তে পারে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কিছু একটা পরিবর্ত্তন, সেটা গ্যাস হ'তেও আপত্তি নেই। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনটা একটা সুনির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট একটা বাড়ীতে কেন ঘট্‌ত সেইটে হচ্ছে প্রশ্ন। যে ব্যাপারগুলোকে আমরা অলৌকিক বলি, সেগুলি লৌকিক জগতে যখন ঘটে তখন জাগতিক কোনো না কোনো নিয়মকে আশ্রয় করে'ই ঘটে। এ ত আজকাল সকলের জানাই আছে যে ভূতরা যে বস্তুকে আশ্রয় করে' আমাদের দৃষ্টির গোচর হয়, সেটা জাগতিক, তার নাম ectoplasm, তাকে বোতলে ভরে' রাখা যায়, ওজন করা চলে। সতীন বাবু যে ব্যাপারের কথা বলছেন তাতে Mrs. Perrinএর ভূত হয় ত সত্যি সত্যি বায়ুস্তরের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিয়েই আলোগুলোকে নিবোত।"

জীবন বল্‌লে, "বায়ুস্তরের পরিবর্ত্তনটা কি কারণে ঘট্‌ত সেটা জানি না বলে'ই বল্‌ছি সেটা ভূত। ওটা অজ্ঞানতারই আর একটি নাম।"

বন্ধুটি বল্‌লেন, "জীবন বাবু এ অন্যায় বল্‌ছেন। পৃথিবীতে আরও অনেক ব্যাপার ঘটে যার কারণ আমরা জানি না, কিন্তু তার সবগুলিকেই ভৌতিক মনে করি না। ভূমিকম্প কেন ঘটে তার খুব সন্তোষজনক সংশয়াতীত কারণ সব সময় আমরা জান্‌তে পাই না, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী arrested হবার দিনে বর্ম্মাতে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেল সেটাকে কেউ অলৌকিক বলে' মনে করে নি। কিন্তু ধরুন যদি সেই ভূমিকম্প কেবলমাত্র গান্ধী যে সহরে arrested হয়েছিলেন সেইখানে সেদিন কেবল হ'ত, আর তার পর থেকে প্রত্যেকদিন ঠিক সেই সময়টিতে কেবল সেইখানেই নিয়মিত হ'তে থাক্‌ত, তবে সেটাকে অলৌকিক ব্যাপার মনে করা কিছু অন্যায় হ'ত না। তার সঙ্গে কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক থাক্‌লে তাকে ভৌতিক বলা যেত।"

আমি বল্‌লাম, "অর্থাৎ আপনার মতে, কোনো মৃত ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো কোনো ঘটনা যদি বেশ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে intelligently ঘট্‌তে থাকে, আর সেটা কোনো পার্থিব উপায়ে ঘট্‌ছে বলে' প্রমাণ করা না যায়, তাহ'লে সেটাকে ভৌতিক বলে' মনে করতে হবে।"

বন্ধু বল্‌লেন, "বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাই। ভৌতিক বলে' মনে করা যায় এমন আরও অনেক রকমের জিনিস আছে।"

আমরা সকলে প্রায় সমস্বরে বলে' উঠ্‌লাম, "বলুন, আমরা শুনব।"

তিনি বল্‌লেন, "কি বল্‌তে হবে ?"

আমরা বল্‌লাম, ভূতের গল্প। আপনি নিশ্চয়ই অনেক ভূত দেখেছেন।"

তিনি বল্‌লেন, "ঠিক ভূতের নয়, কিন্তু ভূতুড়ে গল্পই একটা আপনাদের বল্‌ব। শুনুন।"

আমরা বল্‌লাম, "অতদূরে এক কোণে বসে' কি গল্প বলা হয় ? সকলের মাঝখানে এসে বসুন ভালো করে'।"

(ক্রমশঃ)

'রায়-বেঁশে'র অজ্ঞাতবাস

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি এস্

"বাঙ্গালী যোদ্ধা" !

"বাঙ্গালী যোদ্ধা" কথাটি বলিলে, বিদেশীদের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালীদের মধ্যেও অনেকেই এখনও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। বাঙ্গালী যে যুদ্ধ করিতে পারে ইহা কল্পনা করাও আজকাল একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিগত জার্ম্মান যুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় যে বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট পাঠানো হইয়াছিল, তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল কি না কিম্বা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা বেশীর ভাগ লোকেরই নাই। মোট কথা, আজকাল এটা এক রকম স্বতঃ-সিদ্ধের মতই হইয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালী "যোদ্ধার জাতি" নয় অথবা বাঙ্গালী জাতি হইতে যোদ্ধা তৈয়ারি করা একটা অস্বাভাবিক এবং দুষ্কর কাজ। অথচ খৃষ্টের জন্মের বহু-শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এই বাঙ্গালী জাতির যুদ্ধবিদ্যার ও নৌ-বিদ্যার পারদর্শিতার যত প্রমাণ পাওয়া যায়, তত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের জাতির সম্বন্ধে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। সেই সুদূর খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র-যাত্রার যে প্রধান বন্দর ছিল বাংলা দেশেরই তাম্রলিপ্তে, তাহার অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার সম্বন্ধে কোনই দ্বিধা নাই। ইহাও অকাট্য-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর নির্ম্মিত যুদ্ধজাহাজে বাঙ্গালী নৌ-বাহিনী সুদূর সিংহল ও যবদ্বীপে শত্রুদলকে বাহুবলে পরাভূত করিয়া সে সব দেশে ভারতের একচ্ছত্র জয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী বহু-শতাব্দী ব্যাপিয়াও যে বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্য ভারতবর্ষের

'রায়-বেঁশে' নৃত্য

'রায়-বেঁশে' নৃত্য

মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ক্রমেই পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সৈন্যের অস্তিত্বের এবং শৌর্য্য-বীর্য্যের এইরূপ প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও সীতা-রামের সমর-বাহিনী যে বাঙ্গালীই ছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কি স্থলযুদ্ধ কি নৌযুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

এখন যে "বাঙ্গালী যোদ্ধা" কথাটা বলিতেই লোকে হাসিয়া উঠে, সামান্য তিন শত বৎসর কালের মধ্যে এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা পৃথিবীর ইতিহাসের এক আশ্চর্য্য রহস্য। এই আশ্চর্য্য রহস্যের সঙ্গে বাংলার বীর-সন্তান 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাদের উন্নতি-অবনতির রহস্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। প্রাচীনকালে যে সকল বিজয়ী বাঙ্গালী সেনানী-দল নৌবাহিনীতে সিংহল যাত্রা করিয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধারা ছিল এবং তাহারা যে অজয় নদীর তীরবর্ত্তী রাঢ় অথবা বীরভূম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিল, তাহার জীবন্ত প্রবাদ অন্ততঃ তিন শত বৎসর আগে এদেশে বর্ত্তমান ছিল, ও তাহা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (ক)। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাদিগের শৌর্য্যের প্রমাণ আমরা পাই ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহে যে সকল ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতেও বাঙ্গালী 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাদের বীরত্ব-কাহিনীর প্রমাণ আমরা পাই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে। ধর্ম্মমঙ্গল,

---

(ক) 'সবাকারে বাড়ী ঘর করি সমর্পণ। নৌকায় চড়িল হরি শিবের স্মরণ॥...কারু হাতে কেরোয়াল কারু হাতে পাস। কারু হাতে দণ্ড কারু হাতে রায়বাঁশ॥...ইহনা পুরনা ঠাই মাগিল মেলানি। বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ। (ধনপতির নৌকারোহণ—২০০ পৃঃ)

"খেপে পাইক বাঙ্গালী, খাণ্ডা ফণা বিজুলি, কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা। মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া, কেহ ধায় ফিরায়ে নেজা॥ পাইকের কলকল, ভরিল সিংহল, শিঙ্গা কাড়া ঢমক নিশান। সুভট্ট ভয়ঙ্করী, সঘনে সুছন্দরী, গগনে হানে শিখিবাণ॥"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ই, প্রে, সং। (সিংহলে ত্রাস—২০৮ পৃঃ)

অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়িলে এই ধারণা স্পষ্ট মনে উদয় হয় যে, আজকাল স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য-প্রদেশীয় হাই-ল্যাণ্ডার যোদ্ধারা তাহাদের অতুলনীয় শৌর্য্য-বীর্য্যে যেরূপ সমগ্র বিলাতী সৈনিকদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠার স্থান লাভ করিয়াছে, সেইরূপ বাংলা দেশে খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহুযুগ ব্যাপিয়া 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধারাও বাঙ্গালী সৈন্যদের মধ্যে শক্তি, সাহস ও পরাক্রমে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 'রায়-বেঁশে'দের নাম এবং তাহাদের শক্তি, সাহস, অপূর্ব্ব যুদ্ধচাতুর্য্য ও সামরিক ভাবভঙ্গীর কথা ভাবিতে ও বর্ণনা করিতে ভারতচন্দ্র ঘনরাম ও মুকুন্দ-রামের যে গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠিত, এই কাব্যগুলি পাঠ করিয়া তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এই ত গেল তিন শত বৎসর আগেকার বাঙ্গালীর মনের অবস্থা। এবং এই তিন শত বৎসর পরেই আমরা দেখিতে পাই এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—"বাঙ্গালী যোদ্ধা" কথা বলিতেই লোকে হাসে—বিদেশীরা ত হাসেই, বাঙ্গালী

গুর্খা নাচ—নাচ আরম্ভ

নিজেও হাসে! যে 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধার অসীম সাহস, শক্তি ও যুদ্ধ-চাতুর্য্যের বর্ণনায় এই সকল কাব্য পরিপূর্ণ, সেই 'রায়-বেঁশে' নামের স্মৃতি পর্য্যন্তও ইতিমধ্যে এই বাংলা দেশে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকেই আজকাল ঘনরাম, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের

গুর্খা নাচ—নাচিতেছে

লিখিত এই কাব্যগুলি কাল্পনিক অলীকতাপূর্ণ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। কেন না, ইঁহাদের কাব্যে আছে বাঙ্গালী যোদ্ধার যুদ্ধের বর্ণনা,—আর সে বর্ণনাতে আছে বাঙ্গালী যোদ্ধার অসাধারণ সাহস ও যুদ্ধ-কুশলতার কাহিনী। "বাঙ্গালী যোদ্ধা" জিনিষটা যখন একটা কাল্পনিক আখ্যায়িকার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন এই কাব্যগুলিও যে একটা কাল্পনিক আখ্যায়িকা-শ্রেণীভুক্ত, এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকের কাছে এই সব কাব্যের যুদ্ধের গল্পগুলি একটা হেঁয়ালির মতই অমূলক ও অবোধ্য। সুতরাং সেই সব কাব্যবর্ণিত 'রায়-বেঁশে' নামটাও এতদিন বাঙ্গালী পাঠকের কাছে একটা হেঁয়ালির মতই অমূলক ও অবোধ্য ছিল, কারণ 'রায়-বেঁশে' বলিয়া যে কোন জীব বর্ত্তমান আছে তাহা কেহ ভাবে নাই! 'রায়-বেঁশে' যে কি বস্তু তাহা ঐ বইগুলির বর্ণনা ছাড়া জানি-বার উপায় ছিল না। আর সেই বইগুলিই যখন কল্পিত বলিয়া ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, তখন 'রায়-বেঁশে' নামক

যোদ্ধাশ্রেণীও যে একটা অলীক কবি-কল্পনা মাত্র এই ধারণা হওয়াটাও অস্বাভাবিক নহে।

যোদ্ধার অজ্ঞাতবাস

কিন্তু বিগত চারি মাসের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, 'রায়-বেঁশে' নামক যোদ্ধাগণ যে বাস্তবিকই বাংলা দেশে ছিল কেবল তাহা নহে, এমন কি তাহাদের বংশধররা এখনও বাংলা দেশেই বর্ত্তমান আছে—কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ছদ্মবেশে। এবং এই দীর্ঘ ছদ্মবেশের অন্ততঃ শেষ ভাগ তাহারা যাপন করিয়াছে এই বীরভূম জেলায় এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে নর্ত্তক-ব্যবসায়ে—নর্ত্তক এবং নর্ত্তকীর বেশে।

এই 'রায় বেঁশে' যোদ্ধাদের কথা বলিতে বলিতে ভারতবর্ষের আর এক দল যোদ্ধার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহাদের নাম ছিল—পঞ্চ পাণ্ডব। তাঁহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে প্রবঞ্চিত হইয়া দুই বার যোদ্ধৃত্ব ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে এবং অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল। প্রথম অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা বাস করিয়াছিলেন—এই রাঢ় প্রদেশের বীরভূম জেলার একচক্রা * নামক স্থানে। ইহার নিকটবর্ত্তী কোন বনপ্রদেশে ভীম ভীষণদর্শন 'কৃষ্ণ-অঙ্গ' † হিড়িম্ব এবং বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এবং হিড়িম্বের ভগিনী কৃষ্ণাঙ্গী হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ও হিড়িম্বার গর্ভে এইখানেই তাঁহার ঘটোৎকচ নামক বীরসন্তানের জন্ম হইয়াছিল।

এই বীরভূম প্রদেশের জঙ্গলেই যে হিড়িম্বের অরণ্য ছিল, এই বীরভূমের একচক্রা নামক স্থানই যে মহাভারতের বর্ণিত একচক্রা, এবং এখানেই যে পঞ্চ পাণ্ডবগণ প্রথম অজ্ঞাতবাসে থাকা কালীন ভীম হিড়িম্বকে বধ করিয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এই সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এত প্রবল, এবং পঞ্চ পাণ্ডবদের নামের সঙ্গে এই প্রদেশের একচক্রা, কোটাসুর, ভীমগড়, পাণ্ডবেশ্বর প্রভৃতি এতগুলি স্থান সংশ্লিষ্ট আছে যে এই জনপ্রবাদ বহু যুগের বিশ্বাস ও কিম্বদন্তীর উপর স্থাপিত বলিয়া মনে হয়। *

যাহা হউক জনপ্রবাদ ও পুঁথিপুরাণ-মূলক অনুমান ও তর্কের উপর নির্ভর ছাড়িয়া দিলেও আমরা কয়েকটি বড় বড় বাস্তব ও জীবন্ত কথা পাই; প্রথমতঃ, এই বীরভূম অঞ্চলের 'রায়-বেঁশে'দের বর্ণ ও আকারপ্রকার মহাভারতের বর্ণিত ঘটোৎকচেরই অনুরূপ; দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের শক্তি, সাহস ও সামরিক ব্যায়াম-কুশলতা দেখিলে ইহারা যে "ভীমের বাচ্চা" জাতীয় এই কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়, আর এই শক্তি, সাহস ও কুশলতার মূল ভিত্তি ইহাদের প্রকৃতির এত গভীরতম প্রদেশে প্রোথিত যে এগুলি ইহারা বহু যুগের দৈন্য-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ভুলিয়া যাইতে বা হারাইতে পারে নাই; তৃতীয়তঃ, ইহাদের রণ-তাণ্ডব নৃত্য কলা-গৌরবে ও সৌন্দর্য্য-সম্পদে একমাত্র গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুনেরই নৃত্য-শিষ্যের যোগ্য। একাধারে ঘটোৎকচের প্রতিকৃতি ও প্রকৃতির সহিত এত সাদৃশ্যসম্পন্ন, ভীমের মত শক্তি, সাহস ও সামরিক ব্যায়ামক্রীড়া-কুশলতার উত্তরাধিকারী ও অর্জ্জুনোচিত রণ-তাণ্ডব নৃত্যে পারদর্শী শত শত লোক ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে বর্ত্তমান নাই,

---

* "Ekchakra.—A village in the Mayureshwar thana of the Rampurhat subdivision. Here the five Pandava brothers are said to have taken refuge during their exile and legend relates that here Bhim killed a monster named Hirambak and married his sister Hirimba, by whom he begot a son called Ghototkach, who, as related in the Mahabharat, played a conspicuous part in the battle of Kurukshetra. Another account is that Ekchakra was a tract of country comprising Nimai, Ghoradaha, Gauntia and Kotasur, and that Bhim resided there with his wife and mother. Kotasur is said to have been the dwelling place of a monster named Bakasur, whom Bhim slew."

—Birbhum District Gazetteer (1920) by L. S. S. O'malley). [P. 116]

দ্রষ্টব্য—(১) প্রবাসী ১৩৩১, ফাল্গুন, ৬৬৮ পৃঃ। (২) মহাভারতের আদি পর্ব্বে 'একচক্রা'র উল্লেখ।

† মহাভারত (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)—পৃঃ ১৩৩।

* "According to tradition, the district was once inhabited by fierce jungle tribes, black sturdy men, who devoured any flesh they could obtain. Their chief was one Hirambak, who was killed by Bhima, one of the five Pandava brothers, during their exile."

—Birbhum District Gazetteer by L. S.S. O'malley. P. 34.

এ কথা বোধ হয় জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। সুতরাং, ভীমসেনের ও ঘটোৎকচের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয়ে যে বহুল-প্রচলিত জনপ্রবাদ এ দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাকে পুঁথির লেখার কোথাও দু'একটা ভুলভ্রান্তির উপর নির্ভর করিয়া অযৌক্তিক অথবা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

সকলেই জানেন, অদৃষ্টচক্রে দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পঞ্চ পাণ্ডব বীর-ভ্রাতাদিগকে আবার দীর্ঘকাল বনবাসে এবং তাহার পর ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে হইয়াছে ইহা ভারত-ইতিহাসের এক আশ্চর্য্য রহস্য। এবং পাণ্ডবদিগের সহিত বীরভূমের সম্বন্ধ প্রধানতঃ প্রবাদমূলক হইলেও, এই দুইটি ব্যাপারের অভাবনীয় সাদৃশ্য যে বাঙ্গালীর কল্পনারাজ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি করিবে তাহা স্বাভাবিক। পাণ্ডবদিগের মতনই এই 'রায়-বেঁশে'দিগকেও অদৃষ্ট দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া যোদ্ধার ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক অদৃষ্টের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালী জাতির অবস্থায় এবং প্রকৃতিতে যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এই দুই-

ঘটোৎকচের বংশধরগণ (?)—'রায়-বেঁশে'র দল

থাকিতে হইয়াছিল, ও সেই সময়ে অর্জ্জুনকে বৃহন্নলা নামে নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিয়া বিরাট-অন্তঃপুরে নৃত্যশিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যে বীর-ভূমির সঙ্গে পাণ্ডবদিগের প্রথম-অজ্ঞাতবাসের এই অভাবনীয় সম্বন্ধ, সেই বীরভূমিতেই যে বাংলার শ্রেষ্ঠ বীর-সৈন্য 'রায়-বেঁশে'দিগকে দুই শতাব্দী বা তদূর্দ্ধ দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসে ও ছদ্মবেশে নর্ত্তক ও নর্ত্তকী বেশে তিন শত বৎসরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, তাহা এই 'রায় বেঁশে'-দের ভাগ্য ও অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা পর্য্যালোচনা করিলে যথেষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

বাংলার ইতিহাসে পরিবর্ত্তন

পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বাঙ্গালী 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাদের গৌরবে বাংলা দেশ

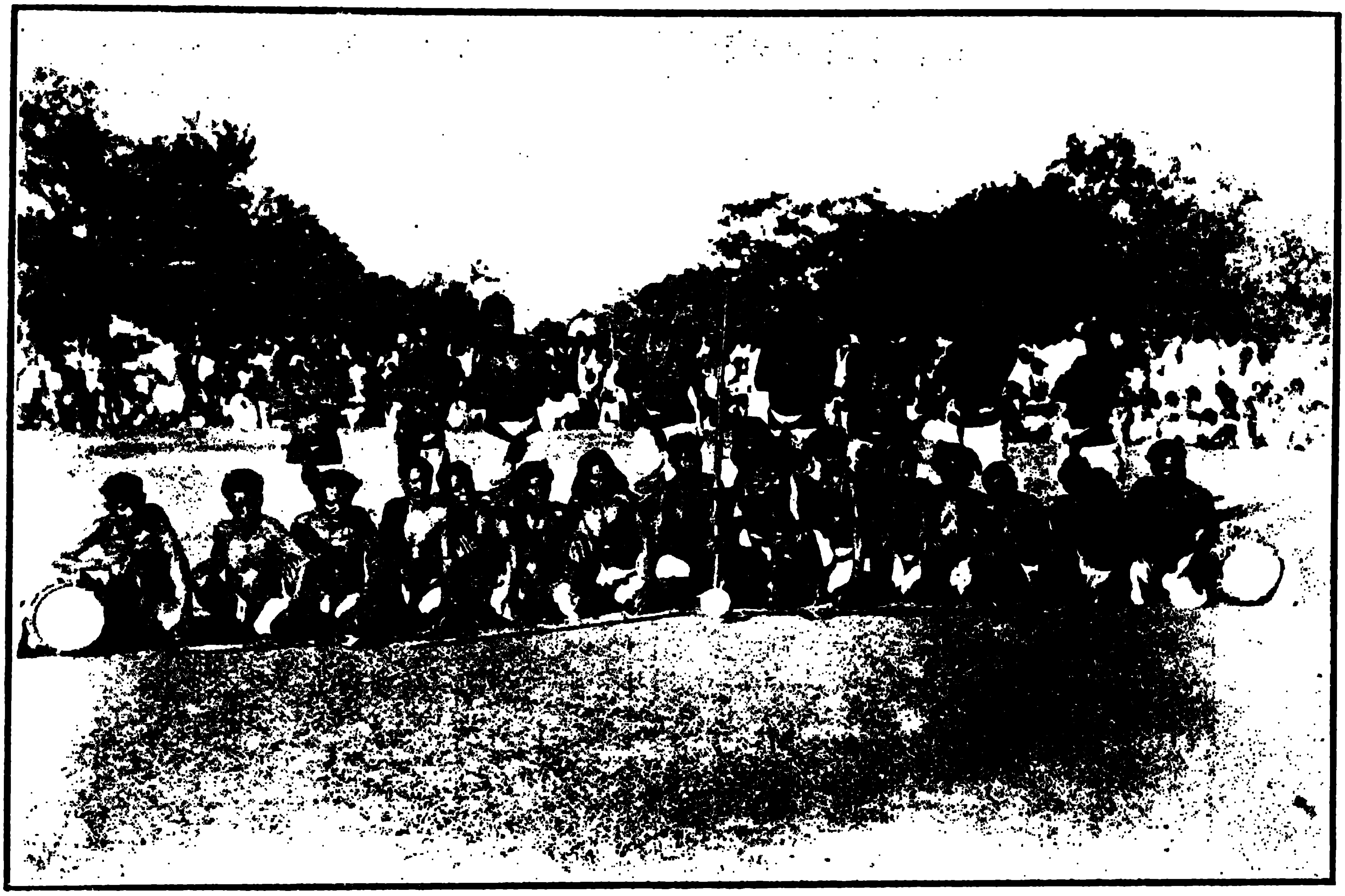

ঘটোৎকচের বংশধরগণ (?) — 'রায়-বেঁশে'র দল

ও বাংলা সাহিত্য গৌরবান্বিত ছিল। ইহার পর হইতেই বাংলার গভীর প্রকৃতি ও চরিত্রে একটা আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সেই পরিবর্ত্তনের কারণ অথবা কারণগুলি যে কি তাহা আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তবে বাঙ্গালীর আধুনিক ভীরুত্ব বা কাপুরুষত্বের প্রবাদের মূলে যে পরিবর্ত্তন, এবং বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার মূলেও যে পরিবর্ত্তন, তাহা বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী এবং তাহার পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধারা বাংলার হিন্দু মুসলমান রাজাদের—স্বয়ং মোগল সম্রাটের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মানসিংহেরও সৈন্যশ্রেণীতে স্থান পাইয়া নিজেদের যুদ্ধ-ব্যবসায় পরিচালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছে *। তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও এই সুযোগ অনেক পরিমাণে ছিল। 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধারা যে শুধু বীরভূমেই ছিল তাহা নহে; ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ডমকা অঞ্চলে, বর্দ্ধমান অঞ্চলে এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বহুসংখ্যক 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধা বর্ত্তমান ছিল। এখনও তাহাদের বংশধররা এই সব জেলায় সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া যায় নাই। ইহারাই যে এখন 'রাইবেঁশে' নামে আখ্যাত তাহার বিশদ পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠকদের দিয়াছি। * এখনও ইহাদের মধ্যে যেরূপ শক্তি, সাহস ও অত্যাশ্চর্য্য সামরিক ব্যায়াম-কৌশল অবশিষ্ট আছে, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আলীবর্দ্দী খাঁর ও সিরাজুদ্দৌলার সমর-বাহিনীতে যে সব বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল এবং ক্লাইবের লাল-পল্টনে যে সব বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল বলিয়া অকাট্য প্রমাণ ইতিহাসে আছে, কিন্তু যাহাদের বসতি-স্থান, জাতি ও বংশ-

* অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র। বঙ্গবাসী সং, ১২৯৬। ১১৪ পৃঃ।

* বঙ্গলক্ষ্মী, ১৩৩৭, ফাল্গুন ও ১৩৩৮, বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরিচয় নির্ণয় সম্বন্ধে এমন কি যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পর্য্যন্তও এখনও বিস্তর আনুমানিক কল্পনা, জল্পনা, সন্দেহ ও তর্ক-যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে এই 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। যদি কাহারও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে আমি বলি যে, অনুমানের উপর তর্ক না করিয়া তাঁহারা এই সব জীবন্ত যোদ্ধা-মূর্ত্তিদের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ পরিচয় করুন। তাহা হইলে, ইহাদের দীর্ঘযুগব্যাপী দৈন্যমগ্ন অবস্থা সত্ত্বেও, ইহারা যে যোদ্ধার জাত ও ইহাদের অস্থিমজ্জাপেশী যে বীরের বীর্য্যে গঠিত এবং ইহাদের ধমনীতে যে এখনও বীরের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। পরন্তু দেখিবেন যে, এই বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, অসাধারণ শক্তি ও সাহস-সম্পন্ন, আধুনিক সমাজের বিচারে অবনত বীরের দল যে সেই মহাবীর ভীমের ঔরসজাত অমিতবিক্রম যোদ্ধা ঘটোৎকচেরই বংশধর, এই অনুমানকে মন হইতে দূর করিয়া রাখা দুষ্কর হইবে*। রায়বাঁশ (ভল্ল) ধারণ হইতে বঞ্চিত হইয়াও ইহারা এখনও কাল্পনিক যুদ্ধে রায়বাঁশ (ভল্ল) পরিচালনার ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাংলার পথে পথে কাঙ্গালবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যোদ্ধার প্রকৃতি যে শত অবজ্ঞা, শত দৈন্য, শত নির্য্যাতন সত্ত্বেও মানুষ সহজে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারে না, তাহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ বাংলার এই দৈন্য-প্রপীড়িত ও সমাজের হাতে নির্য্যাতিত 'রাইবিশে'র দল।

যোদ্ধার বেকার-সমস্যা

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহের প্রথা নাই। ইহার ফলে সেই প্রাচীন অসংখ্য 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধা-দলকে যে দারুণ বেকার-সমস্যায় পড়িয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নিতান্ত অসুবিধায় ভুগিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেক 'রায়-বেঁশে'কে যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তাহার উল্লেখ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র ফিফ্‌থ্‌ রিপোর্টে (Fifth Report) (১৮১২) আছে। সৌভাগ্যক্রমে সকল 'রায়-বেঁশে'কেই তাহা করিতে হয় নাই। অনেকে স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের অধীনে ঘাটোয়াল, কোটাল, নগদী, বরকন্দাজ, পাইক প্রভৃতিরূপে জীবিকা-অর্জ্জনের সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই নানা কারণে সেই সুযোগও ক্রমে ক্রমে কমিয়া

"ভীমের বাচ্চা"—'রায়বেঁশে'

আসিয়াছে। সুতরাং কি করিয়া তাহারা নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে, এই বেকার-সমস্যা এই বহুসংখ্যক 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাগণের বংশধরদিগের সম্মুখে এক বিষম বিভীষিকারূপে উপস্থিত হইল। ভারত-ইতিহাসের ইহাও একটি অভাবনীয় রহস্য যে, এই সমস্যার সমাধান ইহারা করিল সেই প্রণালীতে—যে প্রণালীতে স্বয়ং ভারতের আদর্শ মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার ছদ্মবেশ কালীন জীবিকা-নির্ব্বাহের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নৃত্য-ব্যবসায় অবলম্বনে।

যোদ্ধার নৃত্যবৃত্তি

জাতীয় বীরত্ব-স্মৃতি-বিস্মৃত আমাদের অনেকেরই হয় ত

* পশ্চিম রাঢ় প্রদেশের যে সকল কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা বহুশতাব্দী হইতে মল্লখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং পশ্চিম রাঢ়ের 'মল্লভূমি' আখ্যা দান করিয়াছে, তাহারা যে খুব সম্ভবতঃ ঘটোৎকচেরই বংশধর এই অনুমান মহাভারতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দিক হইতেও অযৌক্তিক নহে। এ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইহাতে হাসি পাইবে, এবং অনেকেই বলিবেন, যাহারা নৃত্য-ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহারা কখনও যোদ্ধা ছিল ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভারতবাসীর কাছে বীর-চূড়ামণি অর্জ্জুনের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোনও দৃষ্টান্ত দিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের যে পত্রাংশ গত সংখ্যায় 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী"। ইহা যে ঠিক তাহা আমরা অনেকেই জানি। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর বিখ্যাত হাইল্যাণ্ডার যোদ্ধাদের অসিনৃত্য (sword-dance) দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। স্বয়ং প্রলয়ঙ্কর মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও অর্জ্জুনের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি যখন ছদ্মবেশ ধারণ করেন, তখন ধনুর্বিদ্যার পরেই নৃত্যবিদ্যায় তাঁহার সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল বলিয়াই তিনি ছদ্মবেশে অন্য কোন জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া এই নৃত্যবিদ্যাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে নৃত্যবিদ্যা মহা-পৌরুষের সহচরী হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য, সে নৃত্যবিদ্যা আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অথবা বাই-নাচের লাস্য-প্রণালীর নৃত্যবিদ্যা নহে। ইহা ভারতের আদিম বিশুদ্ধ তাণ্ডব জাতীয় প্রলয়-নৃত্য।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, ভারত সাম্রাজ্যের পাঠান সৈন্যদের মধ্যে কোন কোন সৈন্যদল 'খট্টক' নৃত্য নামক এক প্রকার নৃত্য করিয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গে এই রাইবিশেদের নৃত্যের অল্প কিছু সাদৃশ্য আছে। দুর্দ্দম সাহসী গুর্খা সৈন্যরাও এক প্রকার নৃত্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা তাণ্ডব জাতীয় নহে। হিন্দুদের বিশুদ্ধ প্রণালীর রণ-তাণ্ডব নৃত্যের প্রচলন, রাঢ় প্রদেশের 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাদের মত, এইরূপ ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির সৈন্যদলের মধ্যে আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এখানে স্বতঃই একটা প্রশ্ন মনে আসে—এই তাণ্ডব নৃত্যের বহুল প্রচলন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে না হইয়া এই রাঢ় অঞ্চলের যোদ্ধাদের মধ্যে হইল কেন? পঞ্চ পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বনবাস কালে যে 'একচক্রা' নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা বীরভূম জেলায়ই 'একচক্রা' এই বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহার সঙ্গে এই ব্যাপারের হয় ত কোন একটা সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ হয়ত স্বয়ং অর্জ্জুনই এই অঞ্চলে বাস কালীন ইহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন, এই কল্পনা যে এ ক্ষেত্রে নিতান্ত অস্বাভাবিক অথবা অযৌক্তিক তাহা বলা যায় না।

বিবাহেতে "রাইবিশে"

যাক্ কল্পনা ও অনুমান-রাজ্যের কথা। এখন বাস্তব-রাজ্যের কথা বলি। 'রায়-বেঁশে'রা দেখিল যে, যুদ্ধবিদ্যা দ্বারা আর জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় নাই। এখন আর সেই ভল্লও (রায়-বাঁশ) নাই এবং ভল্ল (রায় বাঁশ) ব্যবহারের সুযোগও নাই। এখন করিতে হইবে জমিদারদের পাইকগিরি ও বরকন্দাজি। অনেকে তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল অগণ্য; বরকন্দাজি ও পাইকগিরিও যে সকলের জুটিয়া উঠে না! সুতরাং ইহাদের অর্জ্জুনের মতই যুদ্ধবিদ্যার পরিবর্ত্তে নৃত্য-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। ইহা অর্জ্জুনের পক্ষে যেমন ছিল স্বাভাবিক, ইহাদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক হইল। কারণ,যুদ্ধযাত্রা কালীন এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং পরে ইহারা যে মণ্ডলী করিয়া উল্লাসের সহিত নৃত্য করিত এবং সেই নৃত্যে তাহারা যে বিশেষ পারদর্শী ছিল, ইহার প্রমাণ আমরা পাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, অন্নদামঙ্গলে ও ধর্ম্মমঙ্গলে *। যুদ্ধ-বিদ্যার পরিবর্ত্তে ইহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের এখন তিনটি পুঁজি রহিল—সামরিক তাণ্ডব নৃত্য, সামরিক ব্যায়ামক্রীড়া প্রদর্শন ও প্রয়োজন অনুসারে লাঠি বা বল্লম ব্যবহার করিয়া তাহাদের মনিবদের—জমিদারদের ও সমাজের ধনীদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। এই ত্রিবিধ বৃত্তির সংযোগে ইহাদের প্রধান স্থান স্বভাবতঃই এখন হইয়া গেল—বিবাহ উপলক্ষে বরের পাত্রী-গৃহ-গমনে নৃত্য করিতে করিতে শোভাযাত্রার অনুগমন ও পথে বরের দলকে বিপদ হইতে রক্ষা করা। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাঢ় অঞ্চলে বিবাহ

* —কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং—২২৯ পৃঃ ও ৬৭৯ পৃঃ)
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী সং, ১৩১৩। ৯৫ পৃঃ ও ২৬৫ পৃঃ)
ধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম। (বঙ্গবাসী সং, ১২৯৫। ২৭২ পৃঃ)
অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র। (বঙ্গবাসী সং, ১২৯৬। ১১৪ পৃঃ)

উপলক্ষে 'রাইবিশে'র নাচ, 'রাইবিশে'র ব্যায়ামক্রীড়া এবং শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন ও রক্ষাবিধান একটা গৌরবময় ব্যাপারে পরিণত হইল। আর, সেই সুযোগে রাইবিশেদেরও জীবনযাত্রার একটা সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হইয়া গেল। তাহারা তখন তাহাদের চিরাভ্যস্ত সামরিক তাণ্ডব নৃত্যই এই সব বিবাহ উপলক্ষে প্রদর্শন করিত। তাহাদের ব্যায়ামক্রীড়াও ছিল এবং এখনও আছে অদ্ভুত দৈহিক শক্তি, সাহস ও কুশলতার পরিচায়ক। ইহারা কখনও এই সকল ব্যায়ামক্রীড়া কোন সার্কাসে শিক্ষা করে নাই। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাচীন কালে বাংলার ও বাংলার বাহিরের অসংখ্য যুদ্ধক্ষেত্রে যে সামরিক ব্যায়ামক্রীড়া অভ্যাস করিত, তাহাই তাহারা বংশপরম্পরাক্রমে, তাহাদের অবস্থার দুর্ভাগ্যময় শত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, অভ্যাস করিয়া যতদূর সম্ভব অটুট রাখিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বড় বড় সার্কাসের অদ্ভুত ব্যায়ামক্রীড়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও এই রাইবিশে ব্যায়ামক্রীড়ার অত্যদ্ভুত শক্তির পরিচয় ও কুশলতা দেখিয়া এখনও বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়।

"রায়-বেঁশে"র "রাই"-বেশ

কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস যে, কালক্রমে জীবিকা-নির্ব্বাহের এই প্রণালীটিও ইহাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ, অনেকেই বিবাহ উপলক্ষে রাইবিশে না আনিয়া ব্যাণ্ড ইত্যাদি আনিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া বাঙ্গালী জনসাধারণের অবস্থার, মনের ও শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয়ে রুচিরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—বিশেষতঃ নৃত্য সম্বন্ধে। বাই-নাচের ও অন্যান্য প্রকার লাস্য জাতীয় নাচের মোহে যে বাঙ্গালী একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল,—তাহার কাছে পুরুষের ল্যাঙ্গট-পরা কাটখোট্টা নাচ ভালো লাগিবে কেন? ইহারা যে যোদ্ধার জাত তাহা ইতিমধ্যে বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে, এবং যোদ্ধারও যে একটা স্বাভাবিক নৃত্য আছে এবং সে নৃত্য তাণ্ডব জাতীয়, তাহাও বাঙ্গালী জাতি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছে। 'রায় বেঁশে' নামের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহাও যে তাহারা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহা নহে, 'রায়-বেঁশে' নামটা পর্য্যন্ত তাহারা ভুলিয়া গিয়া এখন এই নাচের নাম তাহারা দিয়াছে 'রাইবিশে'। সুতরাং এখন এই 'রাইবিশে' নামে পরিচিত প্রাচীন 'রায়-বেঁশে'দের আদর, যোদ্ধার সামরিক নৃত্যের মাপকাঠিতে হইবার অবকাশ আর রহিল না। এই যুগে বাঙ্গালী শুধু তিন প্রকার নৃত্যের সঙ্গেই পরিচিত ছিল—অর্থাৎ বাই-নাচ, বাউল ও কীর্ত্তন জাতীয় ভক্তি-মূলক নাচ ও কৃষ্ণলীলার নাচ। কীর্ত্তনের নাচ ব্যতীত এই তিন প্রকার নৃত্যেই নর্ত্তকেরা কোন একটা বিশেষ বেশভূষা পরিধান করিয়া নৃত্য করে। সুতরাং নগ্নদেহে শুধু 'বাঁরধড়ি' (ল্যাঙ্গট) পরিয়া পুরুষের নৃত্য যে বাঙ্গালীর চোখে আর ভালো লাগিবে না, ইহা বোঝা দুষ্কর নহে। বিবাহের সময় স্বভাবতঃই বাউল অথবা কীর্ত্তন-নৃত্যের স্থান নাই। সুতরাং রাইবিশে নর্ত্তকদের প্রতিযোগিতা করিতে হইল বাই-নাচের সঙ্গে ও কৃষ্ণলীলার নাচের সঙ্গে। এবং এই প্রতিযোগিতায় যে কি করিয়া তাহাদের অধিকাংশকেই 'রায়-বাঁশ'-এর পরিবর্ত্তে 'রাই-বেশ' ধরিতে হইল তাহার বিচিত্র কাহিনীই এখন আমরা বিবৃত করিব। *

(ক্রমশঃ)

---

* বহুচিত্রে সমৃদ্ধ হইয়া আগামী আষাঢ় সংখ্যায় প্রবন্ধকারের "রায়-বেঁশের রাই-বেশ" প্রকাশিত হইবে —বঃ সঃ

আত্মার আশ্রয়

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

"সত্যি ভাই?"

"হ্যাঁ, সবই সত্যি।"

"তবে এতদিন বলিস্ নি কেন?"

"এমন নির্ম্মম সত্য, এমন অদৃষ্টের পরিহাস বলে' কোন লাভ আছে বলতে পারিস্ কি?"

"তা না থাকতে পারে, তবে তোর মনের ব্যথার কিছু লাঘব হ'ত বলে'ই মনে করি।"

"ভগবান যাকে 'কালোরূপ' দিয়ে সৃষ্টি করে' এমন উপহাস করেন, মানুষ তাকে কতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারে তুই তাই বল্?"

"সত্যি নীলি, আমি প্রথম থেকেই ভেবে নিয়েছিলাম তোদের মিলনে কোথায় যেন কি গলদ র'য়ে গেছে, কিন্তু আমি এখানে না থাকায় কিছুই বুঝে' ও করে' উঠ্তে পারি নি।"

"এতে মানুষের বোঝার বা করার আর কিছু আছে বলে' ত আমার মনে হয় না। হিন্দুনারী আমি, এই আমার বিধিলিপি বলে' মেনে নিয়েছি এবং আমার দুরদৃষ্ট মনে করে'ই সব সহ্য করে' যাচ্ছি।"

"আচ্ছা নীলি, ভূপতি বাবু কি একদিনের জন্যও তোকে কাছে ডাকেন নি?"

"তোকে ত বল্লামই, সেই ফুলশয্যার রাতে যে উঠে চলে' গেলেন তারপর এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের ভেতর কোনদিন আমার ঘরে পা দেন নি।"

"বেশ, তুই কেন তাঁর ঘরে পা দিয়ে তোর নারীজন্ম সার্থক করে' তুল্লি নি?"

"চেষ্টা করেছিলুম মীনা, কিন্তু সুযোগ পাই নি। তিনি নিজে সর্ব্ববিষয়েই এমন করে' আমার সংশ্রব বাঁচিয়ে চলেন যে আমি কোনমতেই তাঁকে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার কাছে পাবার সুযোগ করে' উঠ্তে পারি নি।"

"আচ্ছা নীলি, তোর শ্বশুর ত জান্তেনই যে ভূপতি বাবু 'কালো-মেয়ে' বিয়ে করবেন না, তবে কেন ছেলেকে মিথ্যা কথা বলে' এতগুলো টাকা নিয়ে তোর সঙ্গে বিয়ে দিলেন?"

"শ্বশুর ভেবেছিলেন 'মেয়ে সুন্দরী' এই মিথ্যাটুকু বলে' একবার বিয়ে দিতে পার্লেই কোন গণ্ডগোল থাক্বে না। তা ছাড়া আমার বাপ-জ্যাঠা তাঁদের কালো মেয়ের সঙ্গে সাদা টাকার ওজন সমান করে' দিয়ে শ্বশুরের সিন্দুক পূর্ণ করে' দিয়েছিলেন—সেও এক মস্ত কথা।"

"সত্যি কথা বল্ ত নীলি, দোষ কার—ভূপতি বাবুর না তার পিতার?"

"দোষ কারুরই নয়, দোষ আমার পোড়া অদৃষ্টের—দোষ আমার কালো রূপের।"

এখানেই বলে' রাখা ভাল, মীনা ও নীলি দুজনে বাল্যসখী। পাশাপাশি বাড়ী। মীনার রং বাঙালী মেয়ের পক্ষে ফর্সাই বটে। মা-বাপের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ের ভেতর সেও একটি। মীনা গরীবের মেয়ে, তাই তার বাপ ধনী জামাই পাবার আশা মনেও স্থান দেন নি, কোন রকমে কিছু টাকা সংগ্রহ করে' এক ৫০৲ টাকা মাইনের কেরানীর সঙ্গে মীনার বিবাহ দেন। স্বামীর ঘরে গিয়ে সে বেশ গুছিয়ে ঘরসংসার পেতে বসেছিল।

নীলি খুব ধনীর মেয়ে না হ'লেও অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিল, আর তাহার বাপ ও জ্যাঠা একান্নভুক্ত থাকায় এবং এই দুই ভাইয়ের পরিবারে অনেকগুলি ছেলের ভিতর সে-ই একমাত্র মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিল বলে' বাঙালীর ঘরের কালো মেয়ে হ'লেও আদর পেয়েছিল অপর্য্যাপ্ত। নীলির চেহারা স্বাস্থ্যের লালিত্যে সুন্দর, দেহের গড়ন মুখ-চোখ ভাল, কিন্তু প্রধান গলদ—রং ছিল খুব কালো।

নীলির পিতা বিদেশে কাজ করেন, জ্যাঠা থাকেন কলিকাতায়। তিনিই খোঁজ খবর করে' নীলির ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ দেন কলিকাতার এক খুব ধনী-পরিবারে। ভূপতি

ছেলেটি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলে এ পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সর্ব্বতোবিষয়ে খুবই বাঞ্ছনীয়।

ভূপতির পিতা মন্মথ গাঙ্গুলী মেয়ে কালো বলে' নগদ টাকা চেয়েছিলেন দশ হাজার ও ঠিক ঐ পরিমাণেরই যৌতুক অলঙ্কার ইত্যাদি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ও স্নেহপরবশ জ্যাঠা তাঁদের কালো মেয়ে সুখে থাক্‌বে আশায় কড়া-ক্রান্তিতে মন্মথ গাঙ্গুলীর পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে, ভূপতির সঙ্গে নীলির বিয়ে দিয়ে আরামের নিশ্বাস ফেলেন এই ভেবে যে "নীলি আমাদের রাজরাণী হ'ল।" কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় রাজরাণীর পরিবর্ত্তে কাঙালিনীই হ'ল সে।

শুভদৃষ্টির সময় রং কালো দেখে ভূপতির মন তার প্রতি বিতৃষ্ণায় বিমুখ হ'য়ে গেল এবং সংরকমে নীলিকে তার কাছ থেকে দূরে স'রিয়ে রেখে দিলে।

বাঙালীর মেয়ে ১৬ বছর বয়সে সবই বোঝে। নীলিও বুঝ্‌লে স্বামী তার প্রতি বিমুখ। স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়া যে হিন্দুনারীর কতবড় দুর্ভাগ্য তা নীলি বুঝেছিল; তাই সে তার জীবনের এ অধ্যায়টুক সযত্নে বছর-দুই সবার কাছ থেকেই গোপন করে' রেখেছিল, কিন্তু শেষে সবাই জানলে নীলির রং কালো বলে' ভূপতি তাকে একদিনের জন্যও কাছে ডাকে নি।

কয়েক বছর পর মীনার সঙ্গে দেখা। দুই সখীতে অনেক কথাই হ'ল। মীনার কোলে তিন বছরের শিশু। গরীব স্বামীর ঘরে সংসারের কাজে মীনার বিশ্রাম মাত্র নেই, তবু নীলি দেখ্‌লে মীনার মুখে কী প্রসন্নতার হাসি, স্বামীর কথা বলতে মীনার মুখ কেমন আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। মীনার কথা থেকেই নীলি বুঝে নিয়েছিল ঐ ৫০৲ টাকার ভেতর কলিকাতায় বাসা করে' স্বামী-পুত্র নিয়ে ভদ্রভাবে থাক্‌তে মীনাকে প্রত্যহই দারুণ অভাবের সহিত যুদ্ধ করতে হ'চ্ছে,—বিশেষ কারও অসুখ বিসুখ হ'লে ত কথাই নেই। তবু মীনার কথায় ব্যবহারে হাসিতে নীলি দেখে মীনা সুখী। আর তার নিজের অভাব বলে' কিছু নেই, কাজ করবার কিছু নেই, স্বামী সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হবেন বলে' কারো মন জুগিয়ে চলবার নেই, কোন বন্ধন কোন বাধা নেই, তবু নীলি ঘোর অসুখী। মীনার এত বন্ধন এত অভাব তবুও সে পরম সুখী। নীলি ভাবে, স্বামীপ্রেম সে-কি জিনিস, তাতে এমন কি মাধুর্য্য আছে, যাতে এত অভাব এত বন্ধনেও এত আনন্দ মেলে!

কাটা-ঘায় সর্ব্বদাই ব্যথা থাক্‌লেও ঘুমন্ত অবস্থায় যদি হঠাৎ তাতে আঘাত লাগে তবে যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সেই ব্যথা অনুভূত হ'য়ে সমস্ত দেহটাই যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে, তেমনি আজ নীলির মনের ব্যথায় আঘাত লাগল মীনাকে দেখে'।

নীলি ঠিক ঈর্ষা করে না কিন্তু ভাবে, আমার এই ধনীর পুত্রবধূ হওয়ার পরিবর্ত্তে জীবনটা যদি অমনি করে'ই গরীবের সাথে বিনিময় কর্‌তে পার্‌তাম, আমার কোলে যদি অমনি একটি শিশু থাক্‌ত, তবে আমি আর স্বামীর ভালবাসা পাবার জন্য হাহাকার কর্‌তাম না। কিন্তু হায়, কোন-মতেই যে হিন্দুনারীর এ বিধিলিপি বদ্‌লাবার নয়।

নীলি বড়লোকের মেয়ে, ধনীর পুত্রবধূ, কাজেই সংসারে তার কাজ কর্‌বার কিছু নেই। পিত্রালয়ে এলে মা-জ্যাঠাইমা তাকে কিছুই কর্‌তে দেন না; কোন সামান্য কাজ কর্‌তে গেলেও সবাই তাকে "আহা, থাক্ থাক্" বলে' বাধা দেয়, আর এই 'আহা'শব্দটাই নীলিকে মর্ম্মান্তিক বিদ্ধ করে' মনে করিয়ে দেয়—সে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা, তাই এত 'আহা' সঞ্চিত করেছে।

নীলির মা, জ্যাঠাইমা নিজেদের অন্তরভরা ভালবাসা দিয়ে তাকে ঘিরে' রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু বিনাকাজে বিনা-অবলম্বনে স্বামীপ্রেম-বঞ্চিতা নারীর অন্তরদাহ শান্ত হয় না ও প্রাণের শূন্যতা তাতে পূর্ণ হয় না। তার সবই আছে তবু মনে হয়—কিছুই নেই, কেউ নেই। উপরে অগণ্য নক্ষত্র-খচিত উদার নীল আকাশ, আর নীচে শস্যশ্যামলা বিরাট বিস্তৃত পৃথিবী, এ দুই অসীমের মাঝে তার জন্য যেন কোথাও এতটুকু স্থান নেই।

অপর্য্যাপ্ত অবসর, হাতের কাছে কোন কাজ নেই, মন তার বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। ভাবে, এই ত আমার পিত্রালয়, সুখের শৈশব এখানেই কাটিয়েছি, তবে কেন এখানে সুখ নেই?—পিতামাতা তাঁদের স্নেহময় বক্ষ দিয়ে আমাকে পূর্ব্বের মতই ঘিরে রেখেছেন, তবু কেন অভাব যায় না? কিসের এ অভাব, কেন এ অভাব, কিসে এর পূর্ণতা হয়?

কয়েক বছরের মধ্যে এমন কি ঘটিয়া গেল যার জন্ম এত জ্বালা এত অশান্তি। মীনা সুখী, আমিই বা সুখী নই কেন? স্বামী-প্রেম, সে ত আমি কোনদিনই পাই নি, তবে তার জন্ম কেন এত ভাবনা?—কি যেন কি নাই, তাই এই অনন্ত অভাব-বোধ!

লেখাপড়ায় কোনদিনই মন ছিল না, অত্যন্ত আদরে প্রতিপালিতা হয়েছে বলে' কেউ জোর করে'ও মন দেওয়ায় নি, তাই এখন পড়াশুনা নিয়ে ডুবে থেকে যে নিজের অশান্ত চিত্ত শান্ত কর্‌বে সে দিকে নলির মন নেই,—গান, বাজ্‌না, সেলাই কোথায় ভেসে গেল, কিছুতেই সে নিজকে ডুবিয়ে দিতে পারে না। ভিতরে ভিতরে সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল!

ভূপতি কোনদিন কাছে ডাকে নি জন্য, স্বামীর ভালবাসা পায় নি জন্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে একনিষ্ঠ প্রেম তা নীলির অন্তরে অন্তরে সুপ্ত থাক্‌লেও এখন তাতে বিদ্রোহ দেখা দিল। তার সরল স্বচ্ছ মনে প্রতিহিংসা ও কুটিলতা আশ্রয় নিতে চায় কিন্তু হিন্দুনারীর জন্মান্তর-সংস্কার বলে'ই সে পদ-পদে বাধা পায়, কিছুই করে' উঠ্‌তে পারে না। সে ভাবে, যে স্বামী আমায় স্ত্রী বলে'ই স্বীকার করেন না তাঁকে আমিই বা কেন স্বামী বলে' মেনে নিয়ে তাঁর ভালবাসা পাবার আশায় হাহাকারে জীবন কাটিয়ে দিই? আমি বাংলায় না জন্মালে,হিন্দুর মেয়ে না হ'লে ত আবার বিবাহ করে' সংসারী হ'তাম। এখন যখন তা পার্‌ব না তখন স্বামীর মুখ যাতে নীচু হয়, অতবড় বংশে যাতে কলঙ্কের দাগ লাগে তাই করি না কেন? কিন্তু ঐ যে হিন্দুনারীর সংস্কার বলে' বাধা, তাতেই অনেক কিছু বাঁধন আছে, সেই বাঁধনের বা সংস্কারের জন্মই নীলিও কোন কিছু করে' উঠ্‌তে পার্‌লে না। কোন অবলম্বন না পাওয়ায়, পড়াশুনায় নিজকে ডুবিয়ে রাখ্‌বার অভ্যাস না থাকায় নীলির মন নিজকে নিয়েই ব্যাপ্ত ও লিপ্ত হ'য়ে রইল এবং সদাই নিজকে সর্ব্ববিষয়ে সংযত রাখার চেষ্টায় নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে' তুল্‌লে।

নীলির মন এত বিদ্রোহী হওয়ার প্রধান কারণই কাজের একান্ত অভাব। তার মা জ্যাঠাইমা যদি তাকে কাজ দিতেন,—দুনিয়ায় তার চাইতেও ত কত দুঃখিনী, অনাথা, দরিদ্র বিধবা কত কষ্টে জীবন কাটাচ্ছে তা দেখাতেন ও সেবাব্রতের জন্ম নীলিকে ছেড়ে দিতেন, তবে তার একটা অবলম্বন ও সান্ত্বনা মিল্‌ত, মন বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌বার অবসর পেত না। কাজ না থাকা যে আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও মনের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা আমরা ভেবে দেখি না, এবং ঠিক কোন্ কাজ দিলে যে নারী আপনহারা হ'য়ে ডুবে থাক্‌তে পারে তা বুঝি না জন্মই আমাদের স্বামীহীনা বা স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা দুঃখিনী নারীরা মনোব্যথার লাঘব করে' উঠ্‌তে পারে না।

বছর খানেক পরের কথা। আবার মীনার সঙ্গে নীলির দেখা হ'ল। এবার মীনা এসেছে সিঁথির সিঁদূর মুছে' অনাথিনী হ'য়ে। নিউমোনিয়াতে তার স্বামী সাধের সংসার, প্রাণাধিক শিশুপুত্র, প্রিয়তমা স্ত্রী, সব ছেড়ে কোন্ অজানা লোকের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন।

৫০৲টাকা মাহিনার স্বামী কিছুই সঞ্চয় করে' রেখে যেতে পারেন নি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের ভরণপোষণ করার শিক্ষা আমাদের মেয়েরা পায় না; কাজেই পরের গলগ্রহ হ'তে মীনা ফিরে এসেছে পিত্রালয়ে। কিন্তু সেখানেও পরিবর্ত্তন,—পিতা অবর্ত্তমানে ভ্রাতার সংসার, ভ্রাতৃবধূ গৃহিণী, শোক-তাপে জর্জ্জরিতা বিধবা মাতা রান্নাঘর হাঁড়িহেঁসেল নিয়েই ব্যস্ত, সংসারে আর তাঁর কর্ত্তৃত্ব নেই।

নীলি দেখে—সেই সদানন্দময়ী মীনার কি গভীর পরিবর্ত্তন, কী-ই তার সর্ব্বহারা উদাসিনী মূর্ত্তি ও রিক্ত বেশ। মীনা গরীবের মেয়ে গরীবের স্ত্রী, অলঙ্কারে বেশভূষায় কোনদিনই সে সজ্জিতা হ'তে পারে নি, তবু যেন মীনার হাসিতে কথায় কত কী-ই অলঙ্কার, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ ছিল। আজ লালপাড়ের পরিবর্ত্তে সরু কালাপাড় সাড়ী ও পূর্ব্বের মতই হাতে সোনার রুলী ও গলায় সরু বিছাহার ছড়া (মায়ের কান্নায় মীনা ত্যাগ কর্‌তে পারে নি)। পুত্রের মাতা বলে' চুলও কাটতে পারে নি। বাইরে থেকে দেখ্‌তে বেশে বা অলঙ্কারে এমন কিছু পরিবর্ত্তন নয়, তবু মীনার চেহারায় কী গভীর বিষাদ ও ক্লান্তির চিহ্ন; মুখে সে কী গভীর হতাশের ছাপ। সেই মীনা ও এই মীনা! নীলি কতদিন ভেবেছে সে যদি বিধবা হ'ত তবু কিছু সান্ত্বনার ছিল, এখন মীনাকে দেখে' ভাবে, স্বামী-

হারানো সে এমন কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট যাতে মানুষের এতখানিই পরিবর্ত্তন ঘটে। নীলি মীনার দুঃখ প্রাণ দিয়েই অনুভব কর্‌তে চায়, কিন্তু সে নিজে স্বামীকে কাছে পায় নি জন্যই বিধবার যে কি নিরাশাপূর্ণ জীবন তা ঠিক বুঝে' উঠ্‌তে পারে না। ভ্রাতার সংসারে বিধবা মীনা পুত্র নিয়ে আসায় ঝঞ্ঝাট অনেক বেড়ে গেল—রাতদিন গোলমাল অশান্তি। মাতার অপরিসীম স্নেহ থাক্‌লেও অভাবের তাড়নায় পুত্রবধূদের বাক্যযন্ত্রণায় তিনিও সময় সময় মীনাকে রূঢ় কথা বলেন। মীনা কোন উপায় খুঁজে পায় না, রাতদিন সে সংসারের কাজে খাটে সত্য কিন্তু অর্থোপার্জ্জন করে' যে তাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা আন্‌বে সে শিক্ষা না থাকায় শুধুই নীরবে অহোরাত্রি চোখের জল ফেলে, মৃত্যু-কামনা করে। সময় সময় বাক্যযন্ত্রণায় উত্যক্ত হ'য়ে আত্ম-হত্যা করে' সব জ্বালা জুড়াতে চায়, কিন্তু ছেলের মুখ সে কাজে বাধা দেয়। তা ছাড়া জন্মান্তরে আবার স্বামীর সহিত মিলিত হবে, হিন্দুবিধবার সেও এক ঐকান্তিক কামনা ও আশা,—এইসব জন্য আত্মহত্যা করাও হয় না।

মীনা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুঝেছিল যে সে যদি প্রতিমাসে কিছু অর্থোপার্জ্জন কর্‌তে পারে তা হ'লে সংসারের অনেকখানিই অশান্তি ও গণ্ডগোল তিরোহিত হবে। কিন্তু কি করে' অর্থোপার্জ্জন কর্‌বে সে পথ জানা না থাকায় উপায়াভাবে সমস্ত গঞ্জনাই নীরবে সহ্য করে' যায়। এমন সময় সাধ্বী সরোজনলিনীর সমিতির কথা বাংলার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, মীনাও সেকথা শুন্‌লে। তার একান্ত ইচ্ছা হ'ল, সে-ও এ সমিতিতে যোগ দেয়, কিন্তু এখন আর তার ইচ্ছামতই সাধ্যমত সে ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌বার জন্য স্বামী বেঁচে নেই, কাজেই তখনই তার সমিতিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

তারপর একদিন মায়ের, বৌদি'দের অনুমতি নিয়ে সমিতিতে গিয়ে দেখে এল সে এক বিরাট ব্যাপার! তার মত অনাথা অনেক নারীই সেখানে কাজ কর্‌ছে, অনেকে তথায় অর্থোপার্জ্জন করে' নিজেদের ভরণপোষণ চালাচ্ছে। সে দেখ্‌লে, সমিতিতে থেকে দু'বছরের ভিতর কোন কাজ শিখে করে' নিজের খরচ চালাতে পার্‌বে। মীনা ভাব্‌লে, আমিই বা কেন এখানে আসি না, আমিই বা কেন ভাইয়ের সংসারে ধূমকেতুর মত উদয় হ'য়ে চিরকাল তাঁদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকি। তার একান্ত ইচ্ছা হ'ল, প্রত্যহ সমিতিতে এসে কাজ শেখে, কিন্তু সংসারের কাজের জন্যই এখন তাকে একান্ত প্রয়োজন, তাই ভ্রাতৃবধূরা স্কুলে যাবার জন্য মীনাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। মাতা বৃদ্ধা ও রুগ্না, পূর্ব্বের মত খাট্‌বার আর তাঁর শক্তি নেই, কাজেই মীনার সমিতিতে গিয়ে কাজ শেখা সম্ভব হ'ল না। তারপর প্রধান কথা,—আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাকায় সমিতিতে গিয়ে কাজ শিখে' যে কিছু উপার্জ্জন করা যেতে পারে সে কথা কেউই প্রায় বিশ্বাস করেন না। মীনা সমিতিতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভ্রাতৃবধূরা এবং পাড়ার পাঁচজন মীনার মাকে নানা কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন:; ইঙ্গিতে তাঁরা এও প্রকাশ কর্‌লেন যে মীনার মত অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়েকে এখন বাইরে যেতে দিলে সে কাজ শেখার নাম করে' সমিতিতে গিয়ে পাপের পঙ্কিল পথে নেমে যাবার সুযোগ করে' নেবে ইত্যাদি। কিন্তু সমিতির যে কি মহৎ উদ্দেশ্য, সেখানে যে আমাদের মেয়েদের কত-কিছু শেখ্‌বার আছে তা কেউই ভেবে দেখ্‌লেন না, সকলেই বাইরে থেকে মন্তব্য প্রকাশ করে' টিপ্পনী কাট্‌লেন।

মেয়ের কাছে সমিতির সংবাদ শুনে' মায়ের ইচ্ছা থাক্‌লেও তিনি মীনাকে সমিতিতে গিয়ে কাজ শেখ্‌বার জন্য মত দিতে পার্‌লেন না। এ অবস্থায় বাধ্য হ'য়েই মীনাকে চুপ কর্‌তে হ'ল। তবু মীনা সমিতির মেয়েদের সহিত সংশ্রব রাখ্‌লে।

মীনার প্রতি বিধাতা বিমুখ, তাই দুঃখিনী মীনার দুঃখ ষোল আনাই পূর্ণ কর্‌বার জন্য তার সংসারের আশা-আসক্তি একমাত্র অবলম্বন প্রাণের ধন পাঁচ বছরের ছেলেটিও তিন দিনের জ্বরে মীনার বুক খালি করে' চলে' গেল। এ আঘাত যে কত বড় মর্ম্মান্তিক শেল, তা একমাত্র তারাই বুঝ্‌তে পারে যাদের বিধিদত্ত এই কঠোর দণ্ড নীরবে মাথা পেতে বহন কর্‌তে হয়। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণা বা অভিযোগ কর্‌বার স্থান নেই, কোন আইন-আদালত, বিচার কিছুই নেই; নির্ম্মম নিষ্ঠুর কাল কারও মুখ না

চেয়ে তার খেয়ালমতই নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে' যায় —একবার ফিরে' চেয়েও দেখে না তার এই খেলায় কার কতখানিই সর্ব্বনাশ হ'ল।

মীনার বুক একেবারে ভেঙে গেল; স্বামী হারিয়ে শুধু সন্তানের মুখ চেয়েই সে সব গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করে' গিয়েছিল—যে, কোন রকমে সুশিক্ষা দিয়ে ছেলেটিকে মানুষ করে' তুল্‌বে আশায়, এখন তার সংসারে আশা-আকাঙ্ক্ষা, কোন বন্ধন, কোন আসক্তিই রইল না।

সে কোন রকমে শান্তি না পেয়ে, আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে,কু লোকের কু কথায় গ্রাহ্য না করে' সপ্তাহ খানেক পরেই সমিতিতে যোগ দিয়ে কাজের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। সেখানে সবাই সমব্যথায় ব্যথী, সম দুঃখিনী। সেখানে গিয়ে মীনার মন তবু কিছু শান্ত হ'ল। ক্রমে সমিতির কাজে সে প্রাণমন ঢেলে দিলে। সমিতির কাজে সে প্রাণপণ সাহায্য কর্‌ত, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও লেখাপড়া শিখ্‌তেও আরম্ভ করে' দিলে।

সমিতির একটা অংশে দুঃখী পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত ছেলেমেয়ে রাখার ব্যবস্থা সম্প্রতি হয়েছিল, * মীনা সেখানে গেল কাজ নিয়ে। সে মায়ের আদরে অনাথ ছেলে-মেয়েগুলিকে বুকে টেনে নিলে,—তারাই এখন হ'ল পুত্রহীনা মীনার পুত্র-কন্যা, সেইসব হতভাগ্য শিশুদের শিক্ষায় স্বাস্থ্যে মানুষ করে' বিশ্বের কাজে ছেড়ে দেওয়াই হ'ল মীনার একমাত্র সাধনা।

সমিতিতে এসেই তার মন অনেক শান্ত হয়েছিল। এখন সে একেবারে আপনাহারা হ'য়ে ডুবে গেল—এত বড় গভীর পুত্রশোকেও যেন শান্তির প্রলেপ মিল্‌ল, তার মাতৃস্নেহ এইসব শিশুদের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল। সমিতির ভেতর এসে এই সব কাজে যোগ দিয়ে সে দেখ্‌লে তারও এ সংসারে প্রয়োজন আছে। অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে যাদের বুকের কাছে পেয়েও হারিয়েছে, এই সব নরনারায়ণের সেবার ভেতর দিয়েই আবার তাদের কাছে পাওয়া যায়। অহোরাত্রি বুকের ভেতর যে চিতার দহন ছিল, তাতেও যেন শান্তিজলের পরশ পাওয়া গেল। সেবাব্রতের ভিতর দিয়েই মীনা ভগবানকে কাছে পাচ্ছিল, তাই তার বিড়ম্বিত হতাশাপূর্ণ নিরানন্দময় জীবনেও আনন্দের দীপ্তি ফুটে' উঠ্‌ল। পুত্রহারা হ'য়ে সে চুল কেটে ফেলে' সাদা থান পরে' নিরাভরণা হয়েছিল, এখন যেন তার ঐ বিধবার বেশের ভিতর দিয়ে শান্ত-সৌম্য অমলিন দেবীমূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল। মীনার এই অল্পবয়সের জীবনে অনেক কিছু প্রলয় ঘটে' গিয়ে জীবন তার নিস্ফল উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে পড়েছিল, শুধু এই সমিতিতে যোগ দিয়ে আবার সে মনের বল ফিরে পেয়ে বিশ্বের কাজে লাগ্‌তে পার্‌লে।

সমিতির কাজেও এখন মীনাকে প্রয়োজন। মীনা এমন সর্ব্বহারা হয়েছিল বলে'ই সমিতির কাজে প্রাণ দিয়ে খাট্‌তে পার্‌ছিল। কাজেই তার প্রাণের শক্তিতে সমিতির সে অনেক কিছু উন্নতি করেছিল।

সেলাই বিক্রী ও অন্যান্য উপায়ে সমিতিতে থেকেই অর্থোপার্জ্জন করে' মীনা প্রতি মাসেই ভাইয়ের সংসারে পাঠাতে লাগ্‌ল এবং প্রায় বছর দুই সে সমিতির ভেতরেই কাটিয়ে দিলে।

মীনা স্বাবলম্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইয়ের সংসারেও তার আদর বেড়েছে। ভ্রাতৃবধূরা "রোজগেরে ননদ" বলে' বিদ্রূপ কর্‌লেও তাকে সমিতি থেকে বাড়ী ফিরে আসার জন্য অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

মীনা দেখ্‌লে সেখানেও তার জন্য অনেক কাজ জমা আছে; বিশেষ, রুগ্না মাতার সেবার একান্ত প্রয়োজন। কাজেই মীনা আবার ভাইয়ের সংসারে ফিরে' এল। কিন্তু এবার সে বাড়ী থেকেই প্রতিদিন সমিতিতে যাতায়াত আরম্ভ কর্‌লে। অর্থাগমের সহিত সংসারের পরিবর্ত্তন ও তথায় মীনার প্রতিপত্তি হ'ল।

সমিতিতে গিয়ে বৃহৎ ব্যাপার দেখে', অনেকের সহিত আলাপ-পরিচয় হ'য়ে মীনার সঙ্কুচিত দৃষ্টি অনেক প্রসারিত হয়েছিল। আজন্ম ঘরের ভিতর আবদ্ধ থাকায় ঘরের বাইরে যে বিরাট বিশ্বসংসার পড়ে' আছে তার কোন সংবাদই এতদিন মীনার মনের কোণে স্থান পায় নি। এখন

* লেখিকার সম্ভাবনা হয় ত ভবিষ্যতে একদিন সফল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে—যদিও সরোজনলিনী সমিতিতে ঐরূপ কোন বিভাগ এখনো খোলা হয় নি। লেখিকার মাতৃহৃদয়ের পরিকল্পনার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।—বঃ সঃ

বাইরে এসে সবাইর সঙ্গে মিশে' সে দেখ্‌লে ছোট্ট চারখানি দেয়াল ঘেরা একমাত্র নিজেদের সংসারই সব কিছু নয়, বাইরে বৃহত্তর সংসার পড়ে' আছে,—সে সংসারেও কাজ কর্‌বার জন্য লোকের প্রয়োজন। এই বিরাট ব্যাপারে নানা লোকের সংশ্রবে বৃহৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার মনও অনেকটা প্রশস্ত হয়েছিল। এখন পুনরায় ভাইয়ের সংসারে এসে কর্তৃত্ব পাওয়ায় সে সব বিষয়ে যেমন শৃঙ্খলা আন্‌লে, বৃহৎ দেখেছিল বলে' তেমনি ক্ষুদ্রেও আর তার আসক্তি রইল না।

পূর্ব্বে ভ্রাতৃবধূদের ভেতর ছেলেমেয়ে নিয়ে বা সামান্য কারণেই কলহ লেগে থাকায় সংসারে শান্তি বা সুখ ছিল না, এখন মীনা ছেলেমেয়ের ভার নিজের হাতে নিয়ে সে বিষয়ে অনেকটা অশান্তি কমিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপিত করেছিল।

মীনা ভ্রাতৃবধূদেরও প্রায়ই সমিতিতে নিয়ে গিয়ে অনেকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের পূর্ব্বের সমিতি সম্বন্ধে অন্ধসংস্কার বা ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছিল। সমিতিতে গিয়ে তারাও অনেক কিছু দেখ্‌বার, শিখ্‌বার, কর্‌বার পেয়েছিল। ক্রমে তারাও বুঝেছিল, তাদের নিজেদের সংসারই সব নয়, বাইরে আরো অনেক কিছুই আছে। শুধু তাদের নিজ সংসারের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকলে হবে না, বাইরের সংসারের কাজেও খাট্‌তে হবে। এখন তারা সময় করে' নিয়ে প্রতিদিনই সমিতিতে যেতে ও তথায় কাজ শিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ক্রমে বৃহত্তরের সহিত পরিচয় হওয়ায় তাদের সঙ্কীর্ণতা অনেকটা দূর হ'ল। মন ও দৃষ্টি যেমন প্রশস্ত ও প্রসারিত হ'ল তেমনি আবার সংসারে শান্তি-সুখও ফিরে এল। এখন আর রাতদিন সংসারে কোলাহল নেই, জায়ে জায়ে বিবাদ নেই; সকলের মুখের যে ম্লান বিষাদ-গম্ভীর ভাব—সে যেন অনেকটা কমেছে। অস্বস্তি, গণ্ডগোল বাধাবার আর তাদের অবসর নেই, এখন সময় পেলেই তারা ছুটে যায় সমিমিতে,—যেন বৃহত্তর সংসার তাদের আদর করে' হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সাধ্বী সরোজনলিনীর সমিতির গুণে একটা অশান্তিপূর্ণ পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত হ'ল।

এখন নীলির কথা।—মীনা যখন বছর দুই পরে সমিতি থেকে ভাইয়ের সংসারে ফিরে এল, তখন নীলি দেখ্‌লে মীনার সে বৈধব্যমূর্ত্তির ভেতর শান্ত, সৌম্য, প্রশান্ত আনন্দের দীপ্তি। নীলি অবাক হ'য়ে গেল মীনার মূর্ত্তি দেখে'। সে ভেবে দেখ্‌লে, মীনা যখন স্বামী হারিয়েছিল তখন তার মুখে সে কী-ই যে গভীর ব্যর্থতাপূর্ণ, হতাশ-ম্লান ছাপ, আর এখন পুত্রহারা মীনার মুখে এ কি প্রশান্ত দীপ্তি!

কথায় কথায় একদিন নীলি ফস্ করে' মীনাকে জিজ্ঞাসা করে' বস্‌ল—"আচ্ছা মীনা, স্বামী হারিয়ে তোর এত বড়ই কি সর্ব্বনাশ হয়েছিল, খোকনকে হারিয়ে মনের এতখানিই কি ক্ষতি ও অভাব হয়েছিল যে তোর চেহারায় পর্য্যন্ত তার দাগ পড়েছিল; কিন্তু, হঠাৎ এমন কি হ'ল, বাইরের এই বিধবার বেশের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি, তবু তোর মুখে এ কি স্বর্গীয় আলো! আমি ত ভেবেছিলাম একে একে স্বামী-পুত্র হারিয়ে তুই পাগল হ'য়ে যাবি, কিন্তু তা ত নয়; তুই এমন কি শান্তির জিনিষ পেয়েছিস্ যাতে তোর এত বড় ব্যথাও ভুলে থাক্‌তে পার্‌ছিস?"

মীনা বল্‌লে,—"নীলি, আমার কোন ব্যথাই আমি ভুলি নি, স্বামী-পুত্র হারানোর ব্যথা কোন নারীই ভুল্‌তে পারে না, তবে কিনা সমিতিতে যোগ দিয়ে আমি আবার সব পেয়েছি, আমার হারাধন ফিরে পেয়েছি,—খোকন হারিয়ে সত্যই আমি পাগলিনী হয়েছিলাম, এখন আবার আমি খোকন পেয়েছি,...এখন দেখ্‌ছি অনেক খোকন পথে পড়ে' কাঁদছে, আমি এখন তাদের মা হয়েছি, তারাই এখন আমার খোকনের যায়গা জুড়ে' বুক ভরে' আছে,—এক খোকন হারিয়ে আজ আমি অনেক খোকন পেয়েছি—সেইসব শিশুরাই আজ অভাগিনী বিধবা পুত্রহারা মীনার পুত্রকন্যা!"

মীনার পরিবর্ত্তন দেখে' নীলি ভাবে—সমিতিতে গিয়ে নিশ্চয় মীনা কোন শান্তির সন্ধান পেয়েছে, কি সে শান্তির জিনিষ? শুধু কতকগুলি হতভাগা ছেলেমেয়ে মানুষ কর্‌লেই কি এমন আনন্দ পাওয়া যায়? আচ্ছা, আমিই বা কেন সমিতিতে যোগ দিই না?--আমি কিছু না হারিয়েও মনে হয় সর্ব্বহারা, সমিতিতে গিয়ে দেখি না কেন তথায় আমার জন্যও শান্তির প্রলেপ আছে কি না? দিন কয়েক সে এই নিয়ে খুব ভাব্‌লে। মীনার প্রশান্ত মুখ যতই দেখে ততই তার সমিতিতে যাবার আগ্রহ বেড়ে ওঠে; শেষে

একদিন মা ও জ্যাঠাইমার মত্ চাইলে মীনার সঙ্গে সমিতিতে যাবার জন্য। তাঁরা খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে নীলির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, শেষে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত বল্‌লেন, "তোর এমন কি টাকার অভাব মা, যে তুই যাবি মীনার মত রোজগার করতে? ও গরীবের মেয়ে গরীবের বউ,তাই পেটের দায়ে সবই করতে হ'চ্ছে; আর তুই হ'লি রাজার ঘরের বউ—তোর টাকার ভাবনা কি মা? আর আমরাই কি তোর জন্য ভাব্‌ছি যে তুই যাবি সমিতিতে রোজগার করতে?" মা জ্যাঠাইমার কথায় "রাজার ঘরের বউ" শুনে' গভীর পরিতাপের সহিত নীলির হাসিও পেল; তবু প্রকাশ্যে গম্ভীর ভাবেই বল্‌লে,—"আমি একবার সমিতিতে গিয়ে দেখে আস্‌তে চাই, সেখানে কি আছে, কি কাজ হয়। 'রাজার ঘরের বউ' বলে' টাকা রোজগার না করতে পারি, কিন্তু টাকার যাদের প্রয়োজন তাদের টাকা দিতে ত পারি।" কোন কোন বিষয়ে নীলি বড় একগুঁয়ে জেদী মেয়ে ছিল, কাজেই তাঁরা তার সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করতে পার্‌লেন না,—আর মেয়ে মনে কষ্ট পাবে ভেবে বেশী জোরও কর্‌লেন না।

এমনি করে' রোজই সে সমিতিতে যাওয়া আরম্ভ কর্‌লে। তথায় মীনার কাজে সাহায্য করে, অনেক নতুন কিছু দেখে শোনে, অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। যতক্ষণ সেখানে থাকে কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকায় নিজের কথা ভুলে যায়; বাড়ী এলেও তথায় কি করেছে, কি দেখেছে, নতুন কি শিখ্‌তে পারবে সেই চিন্তায় কাটিয়ে দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই সে নিজের অজ্ঞাতসারে সমিতির কাজে জড়িয়ে পড়্‌ল। মীনার সঙ্গে শিশুবিভাগে কাজ করে' ক্রমেই তার ভিতরের সুপ্ত সেবাপরায়ণা নারীপ্রকৃতি ও মাতৃভাব জেগে উঠ্‌ল,—সে আপনার ব্যথা ভুলে কাজ নিয়ে লিপ্ত রইল, আর তার নিজের কথা ভেবে কাঁদ্‌বার জন্য অবসর নেই, সমিতির কাজ তার নিজের কাজ মনে করে'ই সে রাতদিন খাট্‌তে লাগ্‌ল।

অর্থের তার অভাব ছিল না; পিতা ও জ্যাঠা প্রতিমাসে তা'কে যে টাকা দিতেন তাই সঞ্চয় করে' এখন সেই টাকা বহু সহস্রে পরিণত হয়েছে; তাছাড়া কিছুদিন পূর্ব্বে তার শ্বশুর মন্মথ গাঙ্গুলী যখন দেখ্‌লেন যে তাঁর প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যই ভূপতি কোনদিন বধূকে কাছে ডাক্‌লে না,তখন তিনি অনুতপ্ত হ'য়ে বধূর নামে দুইখানা বাড়ী ও ষাট হাজার টাকা উইল করে' দিয়েছিলেন। নীলি এখন সেই টাকাই সমিতির কাজে লাগিয়ে তার উন্নতি করে' তুল্‌লে।

মীনা ও নীলি একই বয়সী; তাদের এই ২৫।২৬ বছর জীবনের ভেতরেই অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। একজন কালের কঠোর নিষ্পেষণে স্বামী-পুত্র দুই হারিয়েছে, অপরা অদৃষ্টের পরিহাসে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হ'য়ে গত কয় বছর দারুণ অশান্তিতে কাটিয়েছে, এখন উভয় সখীই যেন সান্ত্বনার ও অবলম্বনের কিছু পেয়েছে; তাদের বিড়ম্বিত, হতাশাপূর্ণ জীবন বিশ্বের কাজে সঁপে দিয়ে ধন্য হ'তে পেরেছে। এখন তাদের মন প্রশস্ত, উদার,—নিজেদের নিয়ে কেঁদে সময় কাটাবার অবসর আর তাদের হয় না, এখন তারা কাঁদে পরের জন্য। পৃথিবীতে এসে শুধু নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে পরের জন্যও খাট্‌তে হবে—এ বাণী তাদের অন্তরে পৌঁছেছে; উভয় নারীই এখন শান্তি পেয়েছে।

তারা গভীর শ্রদ্ধাভরে প্রত্যহ সরোজনলিনীর ছবিটিকে প্রণাম করে' এই বলে,—"দেবী, তোমার পুণ্য-পীযূষ-ধারায়, ঐকান্তিক স্নেহে আমাদের ভিতর যে কাজ আরম্ভ করিয়ে দিয়ে সরে' গেছ, আমরা যেন তা তোমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সমাপ্ত করে' তুল্‌তে পারি।"

নানা কথা

রবীন্দ্র-বৈশাখী

বৈশাখ—বর্ষারম্ভ। বাঙলার তথা বিশ্বের অদ্বিতীয় রস-রূপকার মহাকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনের বর্ষারম্ভ করিয়াছিলেন একদা বৈশাখেই—বিশ্বজনকে নবতন অমৃত-আলোক বিতরণ করিয়া নবজীবন দান করিতে। জীবন-প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া কবি-রবি তাঁর বয়োরশ্মে সমগ্র মানব-মনোজগতকে রঞ্জিত ও সঞ্জীবিত করিয়া চলিয়াছেন। ঋতুবিচিত্র বর্ষাবৃত্তির মতই তাঁর জীবনাবর্ত্তও নানা রস-সৃষ্টিময়। আমরা তাই তাঁর শুভ জন্মতিথি-উৎসবকে "রবীন্দ্র-বৈশাখী" নামে অভিহিত করিলাম।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি-উৎসব (২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮) মহাসমারোহে শান্তিনিকেতন আশ্রম-তপোবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এখানে সেই উৎসব-সমারোহের সূচী-সূচনা করিতেছি না—তাহা সংবাদপত্রের কাজ। যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসব পরিবেশ রচিত হইয়াছিল, তাঁহার কথাই অতি-সংক্ষেপে এখানে কিছু বলিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসক, এবং একমাত্র সৌন্দর্য্য-সাধনার মধ্য দিয়াই তিনি সত্যকে ও মঙ্গলকে লাভ করিয়াছেন। তিনি শুধু কবি—স্বয়ং তিনিও তাহাই বলিয়াছেন—কিন্তু কবিত্বই তাঁহাকে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কণে নিপুণতা দানের সঙ্গে সঙ্গে উদার দর্শন ও উচ্চ রাজনীতির ক্ষেত্রে উপনীত করিয়া দিয়াছেন অন্তর্নিগূঢ় রহস্যের পথ দিয়া। তাঁহার স্বকীয় কবি ধর্ম্মই * তাঁহাকে বিশ্ব-মানবধর্ম্মের † উৎসের সন্ধান দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলনে" যে পরিণতি-সামঞ্জস্যের কথা পাওয় যায়, রবীন্দ্র-সাধনার মূলেও তাহা অংশিক ভাবে পাই।

আমরা যুগোত্তর মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার করি। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

*

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে গুরুসদয়ের অর্ঘ্য

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি কবিতা-অর্ঘ্য রচনা করিয়া দান করিয়াছেন ‡ বিচিত্র ভাবে। বহুমূল্য কোন লেখপুটে তাঁর কবিতাটি উৎকীর্ণ বা সজ্জিত করিয়া শ্রদ্ধাকে আভিজাত্য দান করেন নাই তিনি ;—স্বহস্তে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা-পত্রে কবিতাটি লিখিয়া মহাকবিকে তাঁর শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং সেই পুস্তিকার পত্রপার্শ্বদ্বয় তাঁর নবআবিষ্কৃত 'রায়বেঁশে' নর্ত্তকের নৃত্য চক্রে রঞ্জিত করাইয়া দিয়াছেন। আমরা সাধু দত্ত মহাশয়ের মৌলিকত্বে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

*

---

* "আমার ধর্ম্ম"—রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী—১৩২৪।

† 'Religion of man''—রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতা।

‡ এই সংখ্যার অন্যত্র মূল কবিতাটি দেখুন।

মানস-পুষ্পাঞ্জলি

মহাকবির জন্মোৎসবে পৃথিবীর নানা দিগ্দেশ হইতে নানা অনুরাগী ভক্তের নানা শুভেচ্ছা ও উপহার প্রেরিত ও আনীত হইয়াছে। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা দূর হইতে সবার পিছে সবার নীচে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে মানস-পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া অলক্ষিতে উৎসব-সৌষ্ঠবকে পূর্ণতা দিয়াছেন।

•

"জয়শ্রী"

প্রায় বর্ষেক কাল পূর্ব্বে ঢাকা হইতে ঐ নামে একখানি মহিলা-মঙ্গল পত্রিকা প্রকাশিত হইবে জানিয়া আমরা কনিষ্ঠার জন্য সস্নেহ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। নানা কারণে তখন পত্রিকাখানি প্রকাশিত না হইতে পারিলেও আমরা তাহার কথা সত্যই ভুলি নাই। তারপর বহুদিন পরে সেদিন যখন সে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল—কর প্রসারণ করিয়া সাদরে তাহাকে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু একি!—জয়শ্রীর মুখমণ্ডলে এমন কলঙ্ক-কালিমা কে লেপিয়া দিল! প্রথম বর্ষের প্রথম পৃষ্ঠার প্রারম্ভিক 'জয়শ্রী' কবিতা—যাহা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর নামে মুদ্রিত হইয়াছে—তাহা যে অনেক কয়মাস পূর্ব্বেই ভিন্ন নামে 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় (ক) মুদ্রিত হইয়াছিল! তারপর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে চোখে পড়িল—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অন্য একটি কবিতা, (খ) এবং সেটিও পূর্ব্বেই বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বীয় পূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতা অন্য পত্রিকায় ছাপিতে পাঠানো অবশ্য লেখিকার পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই।

আশা করি, জ্যেষ্ঠার তিরস্কারে কনিষ্ঠা অসন্তুষ্ট না হইয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবেন। জয়শ্রীর মঙ্গলকামনাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা আরও কয়েকটি কথা বলিব। পরিচালিকারা এই পত্রিকা পুরুষ-বর্জ্জিত ভাবে পরিচালিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। মহিলা-মঙ্গলের সংজ্ঞা কি পুরুষ-বর্জ্জন?—নারীপ্রগতি কি পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা? পুরুষের সহযোগিতা কি নারী-জীবনের সার্থকতার পরিপন্থী? ইতিমধ্যেই কোন পত্রিকা জয়শ্রীর এই পুরুষ-হীন সাহিত্য-প্রয়াসে সন্দিগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—ইহার উৎকর্ষ সুদূরপরাহত (গ)।

শেষ কথা এই, জয়শ্রীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে আদর্শ মহিলা-পরিচালিত নারীমঙ্গল পত্রিকা ছিল না (বা নাই), ইহা মনে করা ভুল। প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগকে ঐ 'জয়শ্রী'তেই প্রকাশিত শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত লিখিত "মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতে বলি।

'জয়শ্রী'র মঙ্গলকামনাই আমাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য।

•

সর্ব্ববঙ্গ নারী-মহাসভা

দুঃখের বিষয়, পুরুষের সহিত বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা-মূলক নারীপ্রগতিই যেন আজকালকার একটা ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু দেশ-পূজ্যা কোন মহিলাকেও যখন এই প্রতিযোগিতার অগ্নিতে স-সমারোহে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে দেখি, তখন আমাদের প্রকৃতই দুঃখ হয়। সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত সর্ব্ববঙ্গ নারী-মহাসভার (ঙ) সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর অভিভাষণে এই পুরুষবিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে নিজমুখে অধিক কিছু বলিতে নানা কারণে লজ্জা পাই। দৈনিক 'বসুমতী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকা এতদ্বিষয়ে সমীচীন আলোচনা করিয়াছেন।

*

কাঠি-নাচ

সম্প্রতি বীরভূমে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয় স্বাবিষ্কৃত প্রসিদ্ধ রায়বেঁশে নর্ত্তক সম্প্রদায় ছাড়াও অন্য এক

(ক) বঙ্গলক্ষ্মী—১৩৩৭, ৮১৫ পৃঃ।

(খ) বঙ্গলক্ষ্মী—১১১, ৯০৭ পৃঃ।

(গ) সম্মিলনী—১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৮।

(ঙ) স্বদেশীয় শিল্প, সমাজনীতি প্রভৃতি এই মহাসভার বিষয়-অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল রাজনীতি। নারী-সমস্যার বিবাহিত জীবন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইলেও নারীহরণ-সমস্যা-সমাধান প্রচেষ্টায় মহাসভা অবহিত হন নাই।

শ্রেণীর নর্ত্তক সম্প্রদায়ের সন্ধান পাইয়াছেন—যাহারা 'কাঠি' নাচ নামক এক প্রকার অপূর্ব্ব নৃত্য করিয়া থাকে, উভয় হস্তে নাতিদীর্ঘ কাঠি অর্থাৎ বাঁশের বাখারি লইয়া। ইহাও যেন সামরিক নৃত্যকলার পর্য্যায়েই পড়ে বলিয়া তিনি মনে করেন। কলিকাতায় একদল পশ্চিমারা যেরূপ কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠি বাজাইয়া গান করিতে করিতে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহা সেরূপ নাচ নহে। বাঁশের বাখারিগুলি তরবারির অনুকৃতি বলিয়া সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। শিল্পসৌন্দর্য্যের দিক দিয়াও ইহা চমৎকার। তিনি এবিষয়ে এখনও অনুসন্ধান করিতেছেন।

নটরাজের আশীর্ব্বাদ দত্ত মহাশয়ের উপর বর্ষিত হউক!

*

বাংলায় নব নব অজন্তার আবিষ্কার

নব প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি'র সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সম্প্রতি বাংলার একটি নিভৃত পল্লীতে পল্লীবাসী ও পল্লীবাসিনীদের ললিতকলা-বিদ্যায় স্বাভাবিক পারদর্শিতার এমনই একটি দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ইহাকে "বাংলা দেশে নব নব অজন্তার আবিষ্কার" বলিলে অত্যুক্তি হয় না! এই গ্রামটিতে বাগ্দী জাতীয় নিম্নশ্রেণীর লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বাড়ীতে বাড়ীতে, কুটীরের দেয়ালে দেয়ালে মেয়েরা প্রতি বৎসর নিজহাতে নানা রঙের সুন্দর সুন্দর আল্পনা-চিত্র আঁকিয়া থাকে। এই গ্রামের প্রায় অধিকাংশ গৃহেরই নির্ম্মাণকৌশল অতি সুন্দর, এবং স্থাপত্য বিদ্যায় ও কাঠের উপর নানাবিধ কারুকার্য্যে বাঙালী স্থপতিদের প্রাচীন কৌশলের যে সব কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন এই গ্রামে আজ পর্য্যন্ত আছে, অপিচ সেই প্রণালীতে এখনও পর্য্যন্ত বাঙালী স্থপতিরা নির্ম্মাণকার্য্য করিয়া থাকে।

এই গ্রামটি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ এই উভয় জেলার প্রান্তদেশে অবস্থিত। বঙ্গপল্লীর ঘরে ঘরে এখনও মেয়েদের মধ্যে ও শিল্পীদের মধ্যে কি অসাধারণ স্বাভাবিক ললিতকলার প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং তাহার সহজ স্ফুরণ ও অভিব্যক্তি দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে বৎসরের পর বৎসর কিরূপ স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করিবার জন্য, শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় 'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি'র তরফ হইতে কলিকাতা হইতে একজন সুদক্ষ চিত্রকরকে আনাইয়া এই গ্রামে পাঠাইয়াছেন, এবং এই চিত্রকর বাংলার পল্লীবাসী ও পল্লীবাসিনীর এই স্বাভাবিক ললিতকলা-বিদ্যায় পারদর্শিতার নিদর্শনগুলি নকল করিতে ব্যস্ত আছেন। চিত্রকরের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে এইগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইবে।

ইতিমধ্যে বীরভূমের অনেক গ্রামেই দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে মেয়েদের মধ্যে আল্পনা-চিত্রের অঙ্কনকার্য্যের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে এইসব জায়গায় পল্লীর লুপ্ত কলাসৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিতেছে।

দত্ত মহাশয় পল্লীশ্রীর পূজা-বেদী রচনা করিতেছেন!

*

কবির পুরস্কার

কিছুদিন হইল মাসিক বসুমতী পত্রিকায় * "কবির পুরস্কার" নামক একটি প্রবন্ধে প্রবন্ধকার সেকালের রাজপুতানার 'চারণ' ও মহারাষ্ট্রের 'গান্ধেলি' কবিরা কবিতা রচনা করিয়া ষ্টেট্ বা রাজরাজড়ার নিকট হইতে কিরূপ বহুমূল্য পুরস্কার লাভ করিতেন তাহারই মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে কালের পরিবর্ত্তনে সেদিন আর নাই—কবি বা গুণীরা আর ষ্টেট্ হইতে পুরস্কার বা বৃত্তি লাভ করেন না ও দারুণ জীবনসংগ্রামে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হওয়া দূরের কথা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

কথাটা সত্য। একদিন এই বাংলাদেশেও এইরূপ কবি-সমাদর ছিল। ভারতচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ রাজকবি রূপেই হইয়াছিল। এই সেদিনও তাহিরপুর, নাটোর প্রভৃতি রাজসরকার হইতেও গুণীগণ বৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু সেদিন আর সত্যই নাই। ইহার কারণ লইয়া আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু ইহাই

* বসুমতী—চৈত্র, ১৩৩৭।

সত্য যে প্রতিভার পোষণ আজ বাংলায় বিরল। বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল আচরণও পরিলক্ষিত হয়। দুর্ভাগ্য কবি গোবিন্দদাসের শোচনীয় দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ কোন জমিদার-সেরেস্তার প্রতিকূলতা। যাক্ সে কথা। আজকাল বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী অনেক কবিকেও কেরানী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং সাধারণ জমাখরচের মাপ-কাঠিতে তাঁহাদের মূল্য নিরূপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের যুগেও অনেক বাঙালী কবির কবিত্ব উপহাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিধাতার পরিহাস!—কবি তাঁহার কবিতার খাতা ফেলিয়া রাখিয়া কলম-হাতে বড়বাবুকে সেলাম বাজাইতে শিখিতেছেন! বড়বাবুর তিরস্কার—কবির পুরস্কার!

•

রাজার দুলাল বৈরাগী হ'ল

রাণীর তিরোভাবে রাজার দুলাল চৌদলে চড়িয়া নূতন রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব লইয়া ফিরে ইহাই সাধারণ প্রথা—কদাচিৎ বা সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বনবাসী হন স্বকীয় পারত্রিক মঙ্গলের জন্য এবং অরাজক রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। কিন্তু বৈরাগী রাজদুলাল বিশ্বহিতের জন্য সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আত্মদান-সাধনায় প্রিয়ার আত্মার প্রতিষ্ঠা করেন সর্ব্বভূতের মধ্যে—এরূপ রাজদুলাল সংসারে বিরল। সরোজনলিনীর স্মৃতি-অবলম্বনে এইরূপ মূল ভাব লইয়া মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত মনোজ বসু একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং বিষয়গুণে কবিতাটি কিরূপ সুন্দর হইয়াছে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র † পাঠকপাঠিকাগণ জানেন।

দুঃখের বিষয়, ঐ কবিতাটিতে একটি অদ্ভুত ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে—কবিতাটির সর্ব্বশেষ পংক্তিতে **'ঝিলিকের** হাসি' 'ঝিঝিকের হাসি' হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া ঐ ভুলটি সংশোধন করিয়া লইবেন। আরও একটি কথা,—বাংলা দেশের প্রত্যেক মহিলাসমিতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে—বিশেষতঃ মহিলাদিগকে উক্ত কবিতাটি আন্তরিকতার সহিত পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি এই জন্য যে উহাতে মহিলাসমিতি-সংস্থাপনের নিগূঢ় ইতিহাসটি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

† 'আহরণ'—বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ, ১৩৩৮।

ডমরু

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

তোমার　ডমরু নব বেজেছে গভীর রবে,
　　　　গুরু হে!
　　প্রাণের গুহায় গোপন নাগিনী সবে
　　আঁধার ত্যজিয়া আলোকের উৎসবে
　　নৃত্য-দোদুল চিত্তের তালে তালে
　　　　এসেছে মহোৎসবে।
তোমার　ডমরু নব বেজেছে গভীর রবে॥

তুমি　দেখেছ তোমার জ্ঞানের নয়ন দিয়া
　　নৃত্য-দোদুল নিত্য ধরার হিয়া,
　　তুমি যে এসেছ প্রাণের বারতা নিয়া
　　　　প্রাণের মহোৎসবে।
তোমার　ডমরু নব বেজেছে গভীর রবে॥

　　তুমি দেখিয়াছ নৃত্যের তালে তালে
　　বৃক্ষ আপন কুসুম ফুটায় ডালে
　　নির্ঝর চলে ঝঙ্কার তার তুলি'
　　　　নৃত্যের উৎসবে।
তোমার　ডমরু নব বেজেছে গভীর রবে॥

মৃত্যু তোমার আনেনি তিমির-কারা,
হারানো মাণিক হৃদয়ে হয়নি হারা,
জীবন মৃত্যু দেখেছ নৃত্য করে
প্রাণের মহোৎসবে।
তোমার ডমরু নব বেজেছে গভীর রবে॥

দেখেছ তোমার শোকের নয়ন-জলে
বিচ্ছেদ কভু নাহি এ বিশ্বতলে,
পূর্ণমিলনে সৌরজগৎ নাচে
নৃত্যের উৎসবে।
তোমার ডমরু নব বেজেছে গভীর রবে॥

তব বাণী আজ লভুক্ হে জনে জনে,
জন্ম মরণের আঁধার কাটুক্ মনে,
সংশয় থাক্ সন্তাপ যাক্ ভাসি'
নৃত্যের উৎসবে।
তোমার ডমরু নব বেজেছে গভীর রবে॥*

স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মের দায়িত্ব

মৌলভী একরামদ্দীন

মানুষের প্রকৃতি শুধু আত্মসুখ যায়। রাত্রিদিন তাহা আত্মসুখের পশ্চাতে ছুটিতেছে। মানুষ যে কার্য্য করে সব আত্মসুখের জন্য—আত্মসুখ ছাড়া অঙ্গুলিটিও নাড়ে না।

আমি "আত্মসুখ" খাঁটি সুখ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। মানুষের প্রকৃতি যে সুখ চায় অনেক সময় তাহা হয় ত খাঁটি নয় মেকি সুখ। মানুষ ভাবে না যে সে তাহার প্রকৃতির প্রেরণায় যে সদ্য সুখের পশ্চাতে চলিয়াছে, তাহা খাঁটি সুখ হওয়া দূরে থাকুক্—অনেক সময় দুঃখের আকর হয়। মানুষ তখন প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্ধ—ভাবী এবং খাঁটি সুখের কথা ভাবে না—সদ্য এবং মেকি সুখের জন্যই লালায়িত হয়। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষের প্রকৃতি মেকি সুখ ছাড়িয়া খাঁটি সুখকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রকৃতি জগতে বিরল—এমন কি, নাই বলিলেও চলে।

আমি "আত্মসুখ" প্রত্যক্ষ সুখ অর্থেও ব্যবহার করিতেছি না। নিজের হৃদয়ের কষ্ট দূর করা প্রত্যক্ষ আত্মসুখ নহে—অপ্রত্যক্ষ আত্মসুখ বটে। নিজের মনের কষ্ট দূর করিলে আত্মপ্রসাদই হয়, কিন্তু আমি ইহাকে আত্মপ্রসাদ না বলিয়া অপ্রত্যক্ষ আত্মসুখ বলিব।

দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত শুধু প্রত্যক্ষ কিম্বা অপ্রত্যক্ষ আত্মসুখ চায়। দুগ্ধপোষ্য শিশু ক্ষুধা লাগিলে কাঁদে আত্মসুখের জন্য। অশীতিপর বৃদ্ধ আরামে পড়িয়া থাকে আত্মসুখের জন্য। জগতে যত ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি, আত্মসুখই তাহার উদ্দেশ্য। যত অনাচার-অত্যাচার-দ্বেষ-হিংসা, আত্মসুখই তাহার কারণ। দুই কাঠা জমি, একটা জমিদারি, কিম্বা একটা রাজসিংহাসনের জন্য বিবাদের মূলে আত্মসুখ। সহোদর-সহোদরে, পিতা-পুত্রে, পতি-পত্নীতে বিসম্বাদের হেতু আত্মসুখ। চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, পরদারগমন, আত্মসুখের জন্য। মানব-জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মের মূলেই আত্মসুখ। কিন্তু খাঁটি সুখ কয়জন পায়?

খাঁটি সুখ হিংসায় হয় না—অহিংসায় হয়; বিগ্রহে হয়

* শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত তাঁর রায়বেঁশে নৃত্য আবিষ্কার এবং আবিষ্কৃত নৃত্যছন্দে অপূর্ব্ব সঙ্গীত রচনা করিয়া সঙ্গীত সহ ঐ নৃত্যের প্রচলন দ্বারা দেশবাসীকে এক নব অনুপ্রাণনা আনিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হালদার জানাইয়াছেন, তিনিও ঐ নৃত্য-সঙ্গীত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই গীতি-কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। বঃ সঃ

না—মিলনে হয় ; ঘৃণায় হয় না—প্রণয়ে হয় ; অত্যাচারে হয় না—অনুকম্পায় হয়। খাঁটি সুখে শান্তি আছে, কিন্তু মাদকতা নাই। মেকি সুখে উগ্র মাদকতা আছে, কিন্তু শান্তি নাই। তাই মেকি সুখ মানবপ্রকৃতিকে নেশায় মাতাইয়া খাঁটি সুখের দিক হইতে টানিয়া আনে—পারে নাই শুধু যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় প্রকৃতিকে।

দাতা দান করিতেছেন—সরকার বাহাদুরের খেতাব লাভের জন্য। তাঁহার কর্ম্মের মূলে মেকি আত্মসুখ।

দাতা দান করিতেছেন—খ্যাতি লাভের জন্য। তাঁহার কর্ম্মের মূলেও মেকি আত্মসুখ।

দাতা দান করিতেছেন—পরলোকে পুণ্যলাভের জন্য। তাঁহার কর্ম্মের মূলে খাঁটি আত্মসুখ।

দাতার দান করিবার কোন প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নাই। তিনি দান করিতেছেন কেবল দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য। এই কর্ম্মের মূলে যদিও আত্মসুখ প্রত্যক্ষ ভাবে নাই, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলেই তাহা যে অপ্রত্যক্ষভাবেও আছে, তাহা বোধগম্য হইবে। প্রকৃতপক্ষে দুঃখীর দুঃখমোচন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার মনে যে অশান্তি জন্মিয়াছে, তাহা দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইখানেই অপ্রত্যক্ষ ভাবে খাঁটি আত্মসুখ আসিতেছে।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা অতি পবিত্র। মা সন্তানকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না—না ভালবাসিলে তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট হয়—সেই কষ্ট দূর করিবার জন্যই তিনি সন্তানকে ভালবাসেন। এখানেও কি খাঁটি অপ্রত্যক্ষ আত্মসুখ নয় ?

অর্থাভাবে উপবাসী ধর্ম্মভীরু পথিক পথ চলিয়াছে। সে নির্জ্জন পথের মাঝে একটা একশত স্বর্ণমুদ্রার থলী কুড়াইয়া পাইল। থলীতে মালিকের নাম-ধাম লেখা আছে। সে এই থলীটি আত্মসাৎ করিবে কিম্বা মালিককে ফেরৎ দিবে ? মেকি সুখ বলিতেছে, "থলীটি আত্মসাৎ কর।" অপ্রত্যক্ষ খাঁটি আত্মসুখ বলিতেছে, "এমন কাজটি করিও না—থলীটি মালিককে ফিরাইয়া দাও।" লোভ, অর্থাভাব, স্থান ও ক্ষণের সুযোগ এবং প্রলোভনের গুরুত্ব মেকি সুখের দিকে টানিতেছে। সদ্ভাব, ন্যায় ও ধর্ম্মভয় বিপরীত পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সুনীতির পক্ষে কয়েকটা শক্তি এবং কুনীতির পক্ষে কয়েকটা শক্তি পরস্পর বিপরীত দিকে টানাটানি করিতেছে। এ যেন একটা tug of war। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর, আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণের ফলে হয় ত সুনীতির জয় এবং কুনীতির পরাজয় কিম্বা কুনীতির জয় এবং সুনীতির পরাজয় হইল। যে পক্ষই জয়লাভ করুক, কর্ম্মের মূলে আত্মসুখ ভিন্ন কিছুই নাই,—কোন পক্ষে খাঁটি কোন পক্ষে বা মেকি।

আমি শেষের উদাহরণে কয়েকটি শক্তির ক্রিয়া এবং কয়েকটি শক্তির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক বা একাধিক শক্তির ক্রিয়া এবং এক বা একাধিক শক্তির প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে। কোন ক্ষেত্রে এক বা একাধিক শক্তি বেশী, কোন ক্ষেত্রে বা কম থাকিতে পারে। কোন ক্ষেত্রে কোন শক্তি বা প্রতিশক্তি যে ক্রমে কার্য্য করিয়াছিল, অন্য ক্ষেত্রে সেই শক্তি বা প্রতিশক্তি তাহার চেয়ে বেশী বা কম ক্রমে কার্য্য করিতে পারে। শক্তি বা প্রতিশক্তি-সমূহের মধ্যে কোন শক্তির ক্রম বেশী থাকিলে তাহার কার্য্য-ক্ষমতাও বেশী এবং কম থাকিলে তাহার কার্য্য-ক্ষমতাও কম থাকিবে। শেষের উদাহরণে যদি পথিকের "অর্থাভাব" না থাকিত তাহা হইলে ঐ শক্তি কার্য্য করিত না এবং সামান্য অর্থাভাব থাকিলে ঐ শক্তি কম কার্য্য করিত। এরূপ ক্ষেত্রে সুনীতির জয়লাভের অধিক সম্ভাবনা ছিল। পথিকের ধর্ম্মভয় একেবারে না থাকিলে কিম্বা কম থাকিলে কুনীতির জয়লাভের অধিক সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং একটা শক্তির ক্রমের তারতম্যের জন্য ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

মানুষের প্রকৃতি মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ আমার যে প্রকৃতি আছে, কাল হয় ত সে প্রকৃতি থাকিবে না। আজ বাহিরের যে অবস্থায় একটা অপরাধের কার্য্য করিলাম, কাল সেই অবস্থায় হয় ত সেইরূপ কার্য্য হইতে এড়াইয়া গেলাম। কারণ ইতিমধ্যে আমার ভিতরের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাল এই কার্য্য করিয়া আমার মনে অনুতাপ জন্মিয়াছে, কিংবা অপরে ঐরূপ কার্য্য করিয়া শাস্তি পাইয়াছে দেখিয়াছি, তাহাতে আমি সতর্ক হওয়ায় আমার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাল যে কার্য্য অস-

ঝোঁকে করিলাম, আজ হয় ত তাহা করিতে বিরত হইলাম। কাল স্নায়ুনীতির শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যে যে প্রতিশক্তি কার্য্য করিয়াছে, আজ একটা নূতন প্রতিশক্তি, অনুতাপ বা শাস্তির ভয় আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দেওয়ায় তাহারা প্রবলতর হইয়া শক্তিপুঞ্জের শক্তিকে বাধা দিতেছে। সুতরাং কাল আমার যে প্রকৃতি ছিল আজ সে প্রকৃতি নাই, অর্থাৎ কাল আমার যে শক্তি ও প্রতিশক্তি-বিশিষ্ট প্রকৃতি ছিল আজ সে শক্তি ও প্রতিশক্তি বিশিষ্ট প্রকৃতি নাই, এক বা একাধিক শক্তি বা প্রতিশক্তি বাড়িয়াছে কিম্বা কমিয়াছে, কিম্বা তাহাদের ক্রম বাড়িয়াছে কিম্বা কমিয়াছে। কাল আমার প্রকৃতি এক অবস্থায় আমাকে যে কার্য্য করাইয়াছিল, আজ সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা পাইয়া তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই অবস্থায় আমাকে অন্যরূপ কর্ম্ম করাইল কিম্বা সেই কর্ম্ম হইতে বিরত করিল

মানুষের প্রকৃতি যদি পরিবর্ত্তিত না হইত তাহা হইলে তাহার কয়েকটা শক্তি ও প্রতিশক্তি-বিশিষ্ট প্রকৃতি কোন অবস্থায় কাল তাহাকে যাহা করাইয়াছিল, সেই অবস্থায় তাহা আজও করাইত, দশ দিন পরেও করাইত, দশ বৎসর পরেও করাইত। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান লইয়া বিচার করিলে এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

জড়-জগতে আমরা কি দেখিতেছি? একাধিক শক্তি একত্র যোগ করিলে যে ফল প্রসব করে, আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক সেই ফলই উৎপন্ন করিবে। দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফল জল। শত বার সহস্র বার লক্ষ বার দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন একত্র যোগ করিলে হইবে জল। এই সংমিশ্রণের ফল, সৃষ্টির আদিতে যাহা ছিল, সৃষ্টির মধ্যেও তাহা আছে এবং সৃষ্টির শেষেও তাহাই থাকিবে। কখনও জল ছাড়া কিছু বেশী এবং জল হইতে কিছু কম হইবে না।

প্রকৃতি নিজের প্রেরণার দ্বারা মানুষকে আত্মসুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। প্রকৃতি যে কর্ম্ম করাইবে মানুষের তাহা হইতে পরিত্রাণ নাই। মানুষ নিজ প্রকৃতির অন্ধ আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। মানুষের প্রকৃতি মানুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেত্রহস্তে চলিয়াছে, তাহাকে এক পা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দিবে না। কাহারও কাহারও ধারণা যে মানুষের মধ্যে "স্বাধীন ইচ্ছা" নামে এমন একটা শক্তি আছে যে তাহা কোন এক অবস্থায় যাহা মনে করিবে, মানুষকে তাহাই করাইতে পারিবে। তাঁহাদের মতে "স্বাধীন ইচ্ছা" কোন এক ক্ষেত্রে মানুষকে কর্ম্ম এক প্রকারে করাইতে পারে, অন্য প্রকারেও করাইতে পারে এবং কিছু না করাইতেও পারে। জড়-জগতে আমরা এমন কোন শক্তি দেখিতে পাই না, যাহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা আছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ছাত্র। আমরা কোন শক্তির এরূপ অসাধারণ ক্ষমতার কথা বিশ্বাস করিব না। আমরা কি বিশ্বাস করিব যে দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেনের যোগে কখনও হইবে জল, কখনও হইবে অন্য কিছু এবং কখনও কিছুই না। কখনই না। তবে আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, "স্বাধীন ইচ্ছা" কোন এক ক্ষেত্রে একই শক্তি ও প্রতিশক্তি-বিশিষ্ট প্রকৃতিকে একটা কর্ম্ম এক প্রকারে করাইতে পারে, অন্য প্রকারেও পারে, কিম্বা কিছু না করাইতেও পারে; অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে প্রলোভনকে সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারে, কিম্বা কতকটা এড়াইতে পারে, কিম্বা একেবারেই এড়াইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে মানুষের মধ্যে "স্বাধীন ইচ্ছা" নামক কোন শক্তি নাই; যদি থাকে তবে মানুষকে ইচ্ছামত কর্ম্ম করাইবার তাহার ক্ষমতা নাই। "স্বাধীন ইচ্ছা" হিতাহিত জ্ঞান মাত্র, যাহাকে আমরা এক কথায় বলি বিবেক। তাহার ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু মানুষকে মন্দ ত্যাগ করাইয়া ভাল করাইবার সাধ্য নাই। তাহার এই ক্ষমতা আছে, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু গাধাকে ঘোড়া বলিলেই সে ঘোড়ার স্বভাব পাইবে না—ভিখারিণীর পুত্রকে রাজরাজেশ্বর বলিয়া ডাকিলেই সে রাজা হইবে না—একটা লোহা কুড়াইয়া আনিয়া তাহা পরশ-পাথর বলিয়া পরিচিত করাইলেই তাহার পরশ-পাথরের শক্তি মিলিবে না। বিবেক হিতাহিত জ্ঞান মাত্র—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা নাম দিলেই তাহার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আসিবে না।

তবে বিবেকের "স্বাধীন ইচ্ছা" নাম দিয়া লাভ কি? বিবেক মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরের ন্যায় রাজাসনে জড়সড় হইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে তাহার কোন রাজক্ষমতা নাই। তাহার মাত্র দুইটি চক্ষু আছে, যদ্দ্বারা সে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির যুদ্ধকার্য্য স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছে এবং মনে মনে হয় ত কোন শক্তির পক্ষাবলম্বন করিতেছে; কিন্তু কোন পক্ষের বিরুদ্ধে তাহার অঙ্গুলি নাড়িবারও ক্ষমতা নাই। সে হয় ত কোন শক্তির জয়লাভে মনে মনে আনন্দানুভব করিবে কিম্বা তাহার পরাজয়ে শোক পাইবে। ইহা ছাড়া তাহার অন্য ক্ষমতা নাই। সে নিষ্কর্ম্মা—সে পঙ্গু—সে হস্তপদ-বিহীন!

আমি বলিয়াছি মানুষের প্রকৃতি তাহাকে আত্মসুখানুসন্ধানে নিযুক্ত করে। কিন্তু কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, মানুষের প্রকৃতি তাহার কর্ম্মের জন্য দায়ী হইলেও, মানুষ ত নিজের প্রকৃতির জন্য দায়ী, সুতরাং মানুষ প্রকৃতিকৃত কর্ম্মের জন্যও দায়ী। এইবার আমি দেখাইব যে মানুষ নিজের প্রকৃতির জন্য দায়ী নহে, সুতরাং প্রকৃতি-কৃত কর্ম্মের জন্যও দায়ী নহে।

মানুষ নিজের প্রকৃতির জন্য দায়ী কিনা বিচার করিতে হইলে প্রথমে মানুষের প্রকৃতি পৈত্রিক বা জন্মগত কিম্বা অর্জ্জিত, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। সকল মানুষ এক রকম প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। কথা ফুটিবার পূর্ব্বে কতকগুলি শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। কথা ফুটবার পূর্ব্বেই কোন শিশু কাঁদুনে, কেহ রাগী, কেহ ধীর, কেহ বা চালাক হয়। যেমন দুই-জনের চেহারা কখনও ঠিক এক রকম হয় না, সেই রকম দু'জনের প্রকৃতিও ঠিক এক রকম হইতে পারে না এবং হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি তাহারা কোথা হইতে পাইল? অন্য মানুষের সংসর্গে আসিয়া তাহাদের প্রকৃতি গঠিত হয় নাই, যেহেতু তখনও তাহারা অন্য মানুষের সংসর্গে আসিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। সুতরাং প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি পৈত্রিক বা জন্মগত—অর্জ্জিত নহে। হয় ত সাধুতা বা অসাধুতা, সরলতা বা কপটতা, কিম্বা নিরীহতা বা পাপপরায়ণতার বীজও তাহার প্রকৃতিতে নিহিত আছে, কিন্তু তখনও পরিস্ফুট হয় নাই—পরে হইবে। প্রকৃতির কতকগুলা দোষ যদি পৈত্রিক বা জন্মগত হয়, তাহা হইলে কেহ সাধ করিয়া সেই গুণ বা দোষ লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই এবং লইবার শক্তিও ছিল না। কোন বিশেষ গুণ বা দোষ লইয়া জন্মগ্রহণ করা দৈবঘটনা মাত্র।

আমি তর্কের স্থলে প্রকৃতির কতকগুলা গুণ বা দোষ জন্মগত এবং কতকগুলা অর্জ্জিত বলিয়া ধরিয়া লইব। প্রকৃতি অর্জ্জিত দোষ বা গুণগুলা কোথা হইতে পাইল? নিশ্চয়ই সংসর্গের গুণে বা দোষে তাহারা অর্জ্জিত হইয়াছে। সৎ বা অসৎ সংসর্গ লাভও দৈবের ঘটনা মাত্র। যদি তাহা দৈবঘটনা না হয়, তাহা হইলে মানুষের জন্মগত যে প্রকৃতিটুকু ছিল তাহা সৎ বা অসৎ সংসর্গ বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, কোন জন্মগত প্রকৃতি লাভও দৈব-ঘটনা মাত্র।

দৈবঘটনার জন্য মানুষ দায়ী হইতে পারে না। সুতরাং মানুষ নিজের প্রকৃতির জন্য দায়ী নহে। সোজা কথায় মানুষের কর্ম্মের দায়িত্ব নাই। মানুষের প্রকৃতি তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। মানুষের সে লৌহশৃঙ্খল ছিঁড়িবার শক্তি নাই। তাহার প্রকৃতি তাহার জন্য যে পথ বাঁধিয়া দিতেছে, তাহাকে সেই পথেই চলিতে হইতেছে। সেই পথ ছাড়াইয়া অন্য দিকে এক পা বাড়াইবার তাহার সাধ্য নাই।

নাবিক সিন্ধবাদ স্ব-ইচ্ছায় একটা সামুদ্রিক বুড়াকে নিজের স্কন্ধে চাপাইয়াছিল এবং ঐ বুড়া তাহাকে নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করাইতেছিল। সে বুড়াকে একদিন আছড়াইয়া মারিয়া তবে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। মানুষ নিজে ইচ্ছা করিয়া তাহার প্রকৃতিটাকে স্কন্ধে চাপিতে দেয় নাই। দৈব তাহাকে মানুষের স্কন্ধে চাপাইয়াছে। মানুষ সিন্ধবাদের মত তাহাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে পারে না। কোন সময় যদি চোর রত্নাকর সাধু বাল্মীকি হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার অর্থ—যে, সাধুসংসর্গ তাঁহার প্রকৃতিটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল এবং মেকি সুখের পথ হইতে টানিয়া খাঁটি সুখের পথের পথিক করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এখনও কি সেইরূপ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়? হয়—যদি যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, মহম্মদ, চৈতন্যদেব কিম্বা মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় পথপ্রদর্শক থাকেন। সাধু-

সংসর্গ, সদুপদেশ ও সুসাহিত্য প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

যদি মানুষের কর্ম্মের দায়িত্ব নাই, তবে কি শাস্তিদানের কোন মূল্য নাই? আছে, কিন্তু কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি বৃথা হইলেও দণ্ডদান মানুষের মনে শাস্তির ভয় জাগাইয়া দিয়া অপরাধের বিরুদ্ধে একটা প্রতিশক্তি গড়িয়া তুলিতে পারে। অপরাধীর দণ্ডবিধান, ঢ্যাড়রা পিটিয়া সতর্কতার ইস্তাহার জারী করে।

বহু পুরাকাল হইতে সকল জাতির মধ্যেই এই বিষয়ে বহু তর্ক, দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া এখনও চলিয়া আসিতেছে। এক পক্ষ বলেন কর্ম্মের দায়িত্ব আছে, অন্য পক্ষ বলেন নাই। এ বিষয়ে কখনও পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই। তবে আজ আমি নূতন করিয়া এ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি কেন?

আমি যদি এ বিষয়ে নূতন কিছু বলিতে পারি তবে বলিব না কেন?

স্বরলিপি

'রাইবিশে'র গান

কথা ও সুর— শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ স্বরলিপি – সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(দাদ্‌রা)

```
     ১´              ০           ১´            ০            ১´             ০
II প্‌ সা -া সা | সা -া সা I সা -া রা | গা -া সা I ধ্‌-সা ·া সা | রা -া ন্‌া I
   আ য়্‌ মো     রা ০ সা     বা ই মি     শে ০ ০     খে ল্‌ ব       রা ই বি
             ||
   সা -া -া | -া পা পা I পা -া পা | পা -া পা I ধা -া -া | -া ধা ধা I
   শে ০ ০     ০ মো রা    খে ল্‌ ব    রা ই বি     শে ০ ০      ০ মো রা
   পা -া পা | পা -া মা I গা -া -া | -া মা মা I গা -া রা | রা -া রা I
   খে ল্‌ ব    রা ই বি    শে ০ ০     ০ মো রা     না চ্‌ ব    রা ই বি
   মা -া সা | -া সা সা I সা -া সা | রা -া ন্‌া I সা -া -া | -া -া -া II
   শে ০ ০     ০ মো রা    না চ্‌ ব    রা ই বি     শে ০ ০     ০ ০ ০

         ১´            ০            ১´            ০           ১´            ০
পা পা II পা -া পা | পা -া পা I ধা -া -া | -া ধা ধা I পা -া পা | পা -া মা I
ন হে     ঘৃ ০ ণ্য    জি ০ নিস্‌   এ ০ ০      ০ ন হে     ঘৃ ০ ণ্য    জি ০ নিস্‌
         গা -া -া | -া মা মা I গা -া রা | রা -া রা I মা -া সা | -া সা সা I
         এ ০ ০      ০ ম হা     মূ ০ ল্য    জি ০ নিস্‌   এ ০ ০      ০ ম হা
         সা -া সা | রা -া ন্‌া I সা -া -া | -া -া -া II
         মূ ০ ল্য    জি ০ নিস্‌   এ ০ ০      ০ ০ ০
```

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

পা পা II পা -া পা | পা -া পা I ধা -া -া | -া ধা ধা I পা -া পা | পা -া মা I

মোদের ভা ব্ না ভ য়্ কি সে ০ ০ ০ মোদের ভা ব্ না ভ য়্ কি

গা -া -া | -া গা গা I মা মা -া | গা -া -া I রা -া রা | গা -া -া I

সে ০ ০ ০ হ য়ে খে লা য়্ ম ০ য়্ ভা ব্ না ভ ০ য়্

সা -া সা | রা -া ন্‌া I সা -া -া | -া গা গা I গা -া গা | মা -া গা I

ভা ঙ্ বো নি ০ মি ষে ০ ০ ০ হ য়ে নৃ ০ ত্যে ম ০ য়্

রা -া রা | গা -া রা I সা -া সা | রা -া না | সা -া -া | -া -া -া I

ভা ব্ না ভ ০ য়্ না শ্ বো নি ০ মি ষে ০ ০ ০ ০ ০

সা র্সা -া | সা -া -া II

আ ০ ০ ০ ০ ০

নিম্নলিখিত অংশ দুনে গাহিতে হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক মাত্রা পূর্ব্বের মাত্রার গতির অনুযায়ী অর্দ্ধ মাত্রায় হইবে।

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

-া -া II সা -া সা | -াঃরা -া I গা গা -া | গা গা -া I মা -া মা | -া রা -া I

দা ০ মা ০ মা র্ তা লে ০ তা লে ০ হে ০ লে ০ দু ০

গা -া -া | সা সা -া I সা -া রা | -া রা -া I রা -া -া | গা গা -া I

লে ০ ০ মো রা ০ মা র্ ব ০ কু ০ ঠা ০ র্ নি রা ০

সা -া রা | -া ন্‌া -া I সা -া -া | সা রা -া I গা -া গা | -া গা -া I

ন ০ ন্দে র্ মৃ ০ লে ০ ০ দে খে ০ প ০ রে র্ না চ্

গা -া মা | -া গা -া I রা -া রা | -া রা -া I গা -া রা | সা সা -া I

আ ন্ বো ০ না ০ কু ০ ভা ব ম ০ নে ০ ০ নে চে ০

সা -া রা | -া রা -া I রা -া গা | গা গা -া I সা -া রা | -া ন্‌া -া I

নি ০ র্ম্ম ল আ ০ ন ০ ন্দ পা ব ০ আ ০ প ন্ ম ০

সা -া -া | -া -া -া I সা র্সা -া | সা -া -া II

নে ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০

র্সা না II র্সা -া র্সা | র্সা -া -া I সা -া -া | -া -া

আয়রে দ শ্ বি শে ০ ০ ০ ০ ০ ০

আয়রে চ ০ ল্লি শে ০ ০ ০ ০ ০ ০

আয়রে ছি য়া ল্লি শে ০ ০ ০ ০ ০ ০

আয়রে ভ য় কি সে ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা সা I সা -া রা | -া রা -া I গা -া মা | -া গা -া I

দু লে নৃ ০ ত্যে র্ ব ০ শে ০ মা র্ ব ০

সা -া রা | -া ন্‌া -া I সা -া -া | -া -া -া I সা র্সা -া | সা -া -া II

পি ০ ত্তে র্ বি ০ ষে ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০

১´ • ১´ • ১´ •
সা রা II গা -া গা | া গা -া I গা -া রা | মা গা -া I রা -া রা | -া -রা -া I
রা জা মা ন সিং হে র্ দু ০ র্দ্ধ ০ র্ষ ০ ফৌ জ্ রা য়্ বেঁ ০
গা -া সা | সা সা -া I সা া রা | -া রা া I রা -া মা | -া গা -া I
শে ০ ০ এম্ নি ০ না চ ত ০ উ ০ ল্লা ০ সে ০ র ণ্
সা -া রা | -া ন্া -া I সা -া -া | -া সা রা I গা -া গা | -া গা -া I
বি ০ জ য় শে ০ ষে ০ ০ ০ ক ০ লি ০ ঙ্গে র্ স ০
গা -া মা | গা রা -া I রা -া রা | -া রা া I গা া সা | সা সা -া I
আ ০ টে র্ প ০ দা ০ তি ক্ বে ০ শে ০ ০ এম্ নি ০
সা -া রা | -া রা -া I রা -া মা | -া গা -া I সা -া রা | -া ন্া -া I
ছু ট্ ত ০ রা ই বেঁ ০ শে র্ দ ল গু জ রা ট্ দে ০
সা -া -া | -া পা -া I পা -া পা | -া পা -া I পা -া -া | পা পা -া I
শে ০ ০ ০ আ য় বি ০ ভে দ ভু ০ লি ০ ০ স বে ০
পা -া পা | -া পা -া I ধা -া -া | ধা -া -া I পা -া পা | -া পা -া I
খে ০ লি ০ মি ০ শে ০ ০ আ ০ য় বি ০ ভে দ ভূ ০
মা -া -া | গা গা -া I সা -া রা | া ন্া -া I সা -া -া | -া -া -া II ‖I
লি ০ ০ স বে ০ না ০ চি ০ মি ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

‘আয় মোরা সবাই মিশে’ খেলবো রাইবিশে’ গাহিয়া পূর্ব্বোক্ত সুরে “আ” তিনবার গাহিয়া শেষ হইবে।

আদর্শ নারী

শ্রী সুখলতা রাও বি-এ

"না জাগিলে আজ ভারতললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না —"

—তাই আজ ভারতের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, নারীর জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। কেহ দেশসেবা করিতেছেন, কেহ নিঃস্বার্থ হইয়া গৃহপরিবারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছেন—কেহ বা নিজের সুখ সুবিধা তুচ্ছ করিয়া পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, আবার কেহ শিক্ষাপ্রচারে যত্নবতী রহিয়াছেন, কেহ জনহিতকর ও নারীহিতকর নানাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর নারীর মধ্যে জার্ম্মানীর বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারিকা ও সমাজের যাবতীয় মঙ্গলসাধনে নিযুক্তা ডাঃ এ্যালিস সলোমন আদর্শস্থানীয়া। তিনি বিখ্যাত ধনবান ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষালাভের পর তাঁহাকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। কিন্তু যেদিন এই বালিকা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তিনি আজীবন কুমারী থাকিয়া শিক্ষাপ্রচারে নিযুক্তা থাকিবেন, সেদিন সেই আজন্ম সংস্কারাবদ্ধ পরিবারে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। দিকে দিকে বিপদবার্ত্তা ঘোষিত হইল। চারিদিক হইতে আত্মীয়স্বজন দলে দলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় এই সমগ্র পরিবার শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল, সুতরাং বিবাহের প্রশ্ন স্থগিত রহিল। এই সুযোগে এ্যালিস নানা উপায়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বলেন, একদা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাঁহার এই প্রশ্ন মনে হইল, "এই যে জীবন ইহার উদ্দেশ্য কি?" হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে উত্থিত এই প্রশ্নের উত্তর তিনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা এই, "পৃথিবীর দুঃখবেদনা দূর করা ও নিজের জীবনদ্বারা ইহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করানোই জীবনের উদ্দেশ্য।"

কৈশোরে তাঁহার জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয়, পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। এই সময় হইতে এ্যালিস নারীহিতকর নানা সভার সংস্পর্শে আসেন। একুশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বাধীনভাবে একটি নারীসমিতি সংগঠিত করেন। নারীর শিক্ষা, নারীর জাগরণ ও তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টা ও সাধনা অসাধারণ বলিতে হয়। ইহার পরে তিনি একটি 'সেবিকা-দল' সংগঠিত করেন। আন্তরিক ভাবে জগতের সেবা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। তিনি যে কেবল এই-সকল সংস্কারকার্য্যেই লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার প্রবল জ্ঞানস্পৃহা থাকাতে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ শিক্ষা গ্রহণ ও দেশবিদেশ ঘুরিয়া বহু কার্য্যকরী জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এ্যালিস Social work for women নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্কুলের ছাত্রীগণ সকলেই সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য নানা বিষয় শিক্ষা করিতেছেন। এই শিক্ষা কেবল পুস্তকের পাতায়ই আবদ্ধ নহে—প্রত্যেকের সেই অনুসারে কার্য্য করিবারও ব্যবস্থা আছে। এমন কি, ছুটীর সময়ও তাঁহাদের এই সকল কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে হয়। পরে পরীক্ষায় কৃত-কার্য্য হইবার পর তাঁহারা প্রশংসাপত্র পান ও এই সকল কার্য্যের জন্য বেতন পাইয়া থাকেন। যাঁহারা জীবনে এই পথ বাছিয়া লন—তাঁহারা জানেন যে এই ক্ষেত্রে তাঁহারা সামান্যই বেতন পাইবেন, ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা অতি সন্তুষ্ট-চিত্তে এই সকল কাজ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে প্রতিদিন সমাজকে দুঃখ, দুরবস্থা ও বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে হয়। নির্ম্মল ও প্রফুল্ল অন্তরে তাহা সম্পাদন করিয়া ইঁহারা গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ইহা ব্যতীত এ্যালিস অন্যান্য অনেক স্কুলের জন্য নানারূপ সুব্যবস্থা করেন।

গত যুদ্ধের সময় অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষুধার্ত্ত ও নিরাশ্রয়কে রক্ষা করিবার জন্য এই ক্ষমতাময়ী নারী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কায়মনোবাক্যে সমাজের মঙ্গলসাধনে ব্রতী

থাকিয়াও তিনি কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সময়ের অভাব তাঁহার কখনও হয় নাই।

ডাঃ এ্যালিস সলোমন Academy of social work বলিয়া আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার একটি অংশে দেশের মাতা ও স্ত্রীদিগকে সন্তানপালন, গৃহের সুশৃঙ্খলা রক্ষা, খাদ্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। পঞ্চান্ন বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ অনবরত পরিশ্রম করিয়াও তিনি কার্য্যক্ষম, উৎসাহী ও প্রফুল্ল। এই শক্তিরূপিণী নারী জগতের সমস্ত নারীজাতির অন্তরের প্রসুপ্ত শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া কহিতেছেন,—

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ্ নিবোধত।'
'উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠ ধন লাভ কর।'

এই জ্ঞানী ও কর্ম্মিষ্ঠা নারীর আর একটা আশ্চর্য্য দিক তাঁহার মধুর চরিত্র। তাঁহার দয়া, প্রেম, ভালবাসা সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহে, এই বিশাল জগতই তাঁহার সংসার। তাই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র এত প্রশস্ত। নারীজাতির কল্যাণসাধনে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশের এই মহীয়সী নারীর ন্যায়ই এক ধর্ম্মশীলা পরদুঃখকাতরা ও পুণ্যবতী নারী এই ভারতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—তিনি সরোজনলিনী। কালের করাল আহ্বানে তিনি তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া যে সকল মহিলা নারীজাতির উন্নতির নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সে সাধনা জয়যুক্ত হউক্।

ব্যবধান

(শুনত ফারাক ধনীয়ো গরীবোমে—হিন্দী)

শ্রী বিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ধনীর দুলাল চল্‌তে গিয়ে
হোঁচট্ খেল' পায়;
লক্ষ লোকে তোয়াজ্ করে
ঈষৎ বেদনায়।

চরম ব্যথায় দুঃখী গরীব
মর্‌ছে কত রোজ;
কেই বা তাদের বেদ্‌না বোঝে
নেয় বা ক্ষণিক খোঁজ!

শিক্ষার ক্ষেত্র

কুমারী ডোরিন ইয়ং বি-এস্-সি (লণ্ডন)

আজ ইউরোপে শিক্ষার আয়োজনের অভাব নাই। "দেশের সকলে শিক্ষা পাইতেছে কিনা" এ প্রশ্ন পশ্চিম মহাদেশে উঠিতে পারে না। সমস্যা দাঁড়াইয়াছে শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি তাহাই লইয়া।

যাঁহারা দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, তরুণের কল্যাণ যাঁহারা অন্তরের সহিত কামনা করেন, তাঁহারা চিরপ্রচলিত বিদ্যালয়-গুলির উপর সন্তুষ্ট নহেন—শিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনের তাঁহারা পক্ষপাতী। পুরাতনের পরিবর্ত্তে নবীন শিক্ষা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চারিদিকেই আজ দেখা দিতেছে। ইউরোপের সব দেশেই নবীন শিক্ষাপন্থী বিদ্যালয় (New Education School) মাথা তুলিতেছে।

শিক্ষার নূতন পথ বলিতে কি বুঝায়? প্রথমতঃ এই মতাবলম্বী মনীষীরা মনে করেন, শুধু লেখাপড়া এবং "ইতিহাস" আখ্যা দিয়া উপকথা শিখানোকে শিক্ষা বলা যায় না; ছেলেদের মানুষ করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। বালকেরা যদি মানবসমাজের যথার্থ কল্যাণকর না হয়, তবে শিক্ষার সব আয়োজনই বৃথা। ইঁহাদের বিশ্বাস, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধের উপর শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ফলপ্রদ। এই সম্বন্ধকে সহজ ও মধুর না করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের সাফল্য অসম্ভব। এই সম্বন্ধ ভয়ের নহে, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার। শিশুমনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির সম্যক্ বিকাশ—অর্থাৎ তাহার নিজের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করা ও সে চিন্তাকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারাই—শিক্ষা। জুলুম করিয়া ভয়ার্ত্ত শিশুকে শুষ্ক পুঁথির পড়া মুখস্থ করানোতে মনের বিকাশ হইতে বিকারের সম্ভাবনাই অধিক।

শাসন, নিয়মপ্রণালী ও কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জ্ঞান ছাত্রদের মধ্য হইতে স্বভাবতই স্ফুরিত হইবে। সাধারণ বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়, সে বন্ধন ভয়ের বন্ধন। ভয় শিশুর চিত্তবিকাশের একান্ত অন্তরায়, মনোবিজ্ঞানের একথা সকলেই জানেন। *

এই ধরণের সকল বিদ্যালয়গুলিতেই ছাত্র-তন্ত্র। চরিত্র-গঠনের পথে এই প্রণালী শিশুদের প্রভূত সহায়তা করে। জীবনের আরম্ভেই বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সমাজটুকুর জন্য তাহাদের অনেক ত্যাগ ও সেবা করিতে হয়। 'অভিজ্ঞ' (?) যাঁহারা তাঁহারা এই প্রণালীকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন, সে কথা বলাই বাহুল্য! "নিজের জন্য চিন্তা করা বা বয়োবৃদ্ধের সহিত বিতর্ক করা বালকদের পক্ষে অর্ব্বাচীনতা ছাড়া আর কিছুই না; গুরুজনের আদেশ-পালনই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা"—এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, বলা বাহুল্য শিশুদের তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন না। ছেলেদের সমস্যা তাহাদের নিজেদেরই; যদিও প্রবীণ শিক্ষকেরা এই সব সমস্যার সহজতর সমাধান করিতে সমর্থ তথাপি ছেলেদের এই সব সমস্যাক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত না করাই বাঞ্ছনীয়। এই সকল প্রচেষ্টাই বালকদের শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ।

উদাহরণ স্বরূপ একটি বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করি—এই ক্ষেত্রে বালক-বালিকারা কিরূপে নিজেদের সমস্যার নিজেরাই সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাই বলিব।

ইংলণ্ডে, লণ্ডন হইতে অদূরে, বালতন্ত্রে যাহাদের আস্থা আছে তাঁহারা একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীদের এইখানে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রতি বিভাগেই এক একজন অধ্যাপক পর্য্যবেক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যেক বিভাগ হইতে দুই জন প্রতিনিধি লইয়া, বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-সভা গঠিত। পর্য্যায়ক্রমে নির্ব্বাচিত

---

* চরিত্রের যে অর্থ সাধারণে করিয়া থাকে তাহা নহে। মানুষের সেই সত্তা, যাহা চলিষ্ণু,—ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে। চরিত্র একটা dymamic concept, মনের সঙ্কীর্ণতায়, ব্যবহারে ইহা যেন static হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অধিনায়ক বা অধিনেত্রী এই প্রতিনিধি-সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বিদ্যালয়ের সকল নিয়মপ্রণালীই এই সভায় আলোচিত হয়।

যে দিন সভা হইবে তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে, সভার কার্য্য-সূচী সাধারণের জন্য বাহিরে টানাইয়া দেওয়া হয়। আলোচ্য বা বক্তব্য কিছু থাকিলে, বিষয়টি কার্য্যসূচীতে উল্লেখ করিবার ক্ষমতা শিক্ষার্থীমাত্রকেই দেওয়া হইয়াছে। সভাস্থলে পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করিবার সকলেরই সমান অধিকার। প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে, ভোটের দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত বা অগ্রাহ্য হয়। গৃহীত প্রস্তাব প্রতিনিধি-সভা হইতে সাধারণ সম্মিলনীতে উপস্থিত করা হয়-- এখানে আলোচনা চলিতে পারে। অধ্যাপকেরাও ছাত্রদের সহিত আলোচনায় যোগ দিতে পারেন; তাঁহাদের অধিকার কিন্তু ছাত্রদের অধিক নয়। শিক্ষার্থী এই ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের অভিজ্ঞতার দ্বারা উপকৃত ও পরিচালিত হইয়া নিজেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

একটি নির্ব্বাচিত ছাত্র বা ছাত্রী এই সভার সম্পাদক। সভার সমস্ত বিবরণ সেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। এই বিবরণীতে এই বিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসনের ক্রম-পরিণতির ইতিবৃত্ত লিখিত রহিয়াছে।

শিক্ষার্থীদের নানা প্রকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এই বিবরণী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কোনটা ছোট-খাট, কোনটা বা বিদ্যালয়ের নিয়ম সম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন।

একটি তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিব। কোন সময়ে গুটি-পোকা সংগ্রহ করিয়া ছোট ছোট বাক্সে পাতা ভরিয়া তাহার ভিতর রাখা—একটা নেশার মত বিদ্যালয়ে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু অবিলম্বে কলরব উঠিল, বিদ্যালয়ে এই গুটি-পোকার জ্বালাতনে হাঁটাচলা মুস্কিল হইয়াছে। বন্দী গুটি-পোকাগুলি তাহাদের কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া বিদ্যালয়-গৃহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অনেকে এই উৎপাতের বিরুদ্ধে আবেদন করিল। কোনটা বা চেয়ারের পিঠে আশ্রয় পাইয়াছে,—একদিন একটাকে বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে পাওয়া গেল। একটি ছাত্র বলিল, তাহার 'সুপের' মধ্যে একটি ডুবিয়া মরিয়াছে! এই উৎপাতের কিনারা হওয়া প্রয়োজন।

কেহ বা বলিল গুটিপোকা ঠিক পোষ মানিবার প্রাণী নহে; তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা নিষ্ঠুরতা। অন্যদল অন্য মত দিল। তাহাদের মতে গুটিপোকা পোষায় অনেক শিখিবার বিষয় আছে, আনন্দও যথেষ্ট। আর রীতিমত যত্ন করিলে নিষ্ঠুরতাই বা হইবে কেন? নানা বাকবিতণ্ডার পর স্থির হইল—যে, গুটিপোকার ঠিকমত যত্ন হইতেছে কিনা ইহা নির্ণয় করিবার জন্য একটি সমিতি থাকিবে। শিক্ষার্থী-দের গুটিপোকা রাখিবার জন্য এই 'সমিতি'র নিকট হইতে 'পাশ' বা "লাইসেন্স" লইতে হইবে। বলা বাহুল্য যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপকেরা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সমাধান করিতে পারিতেন কি? আর যদি তাঁহারা উপর হইতে এই নিয়ম করিয়া দিতেন, ছেলেদের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া কি এত সহজ হইত? বিচার করিয়া যখন কোন সিদ্ধান্তে তাহারা পৌঁছিল, বালকেরা তাহার ন্যায়অন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিল। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে যদি কর্ত্তৃপক্ষ নিজের শাসনে এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেন, বালকেরা হয় ত তাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিত। ইহা মানিয়া লইতেই হইবে যে এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীদের অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। যাহা কিছু তাহাদের জীবনে ঘটিতেছে তাহার দায়িত্ব মুখ্যভাবে তাহাদেরই, এবং ঘটনা-গুলি কাহারও খেয়ালের শাসনে প্রবর্ত্তিত হইতেছে না, তাহা আমাদের জীবনের কার্য্যকারণ-নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা—এই বোধ তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইতে থাকে।

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করাটা কোন সময়ে ফ্যাসান হইয়া উঠিল। একটি ছাত্র সভায় উঠিয়া বলিলেন, "ভাষায় সুরুচির সীমা ক্রমাগত অতিক্রম করা হইতেছে। বন্ধ হইতেছে এমন দরজার ফাঁকে আঙুল পড়িলে, বা তরল বা ভঙ্গুর কোন জিনিষ হাতে লইয়া চৌকাঠে হোঁচট খাইলে, বা অনুরূপ ক্ষেত্রে ভদ্রেতর ভাষা সহ্য হয়, কিন্তু বড়াই করি-বার জন্যই এরূপ ভাষার ব্যবহার বিকৃত রুচির পরিচয়।" অবশেষে এইরূপ ভাষা ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়া স্থির হইল, প্রতিনিধিদের উপর ভার পড়িল চারিদিকে বিশেষভাবে

কান রাখিতে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্যা সমিতিতে দ্বিতীয়বার উত্থাপন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। উপর হইতে জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলে, এই প্রবৃত্তিটি গোপনে হয় ত আরও প্রচার লাভ করিত। শাসনের ভয়ে বাহির হইতে হয় ত বা ইহা বন্ধ থাকিত, কিন্তু অন্তরে ইহার অন্তশ্চর প্রবাহটুকুর শক্তি রোধ করা কঠিন হইত।

অবকাশ পাইলে অল্পবয়সের ছাত্রেরাও ভাবিতে ও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে প্রয়াস পায়। এই বিদ্যালয়ের অনেক ক্ষেত্রে তরুণ-চিত্তের শক্তির আভাস পাওয়া যায় ও গিয়াছে। প্রতিনিধি-সভা ছোট ও বড় ছাত্রছাত্রী লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যাহারা, তাহারা নিজেদের বয়সের স্বভাব-অনুযায়ী নিজেরাই সব পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করিত। ছোট যাহারা তাহারা কতক ভয়ে ও কিছু বা সঙ্কোচে বড়দের পথ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু একদিন তাহারা বিদ্রোহ করিল। তাহাদের 'পর্য্যঙ্ক' মহাশয়ের পরামর্শমতেই হউক, বা নিজেদের সিদ্ধান্তমতই হউক, তাহারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র একটি প্রতিনিধি-সভা গঠিত করিবার অধিকার দাবী করিল। তাহারা সাধারণ সম্মিলনীতে একটি 'Bill' উপস্থিত করিল।

এই প্রস্তাবটি লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা চলিল। কেহ মত দিলেন, প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়—শিশুরা নিজেদের ব্যাপার নিজেরা বুঝিয়া লইবেন, তাহাদের শিখিবার জন্য বড়দের কাছে যাইতে হইবে না। অন্যদল বলিল, ইহাতে সুফল পাইবার আশা নাই; ছোট যাহারা, তাহারা নিজেদের চালাইতে পারিবে না, বড়দের সহায়তা ছাড়া তাহাদের চলিবে না। তাহারা ইহাও জানাইল যে সমস্ত বিদ্যালয়ের কাজ এক হইয়া নির্ব্বাহ করা আবশ্যক, একই প্রতিনিধি-সভা শিশু ও বড় ছাত্রদের জন্য নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করিবে। আর একদল বলিলেন, শিশুরা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা-স্থাপনে যথেষ্ট যত্ন দেখাইয়াছে; তাহারা যদি মনে করে, ভিন্ন প্রতিনিধি-সমিতি লইয়া তাহাদের সুবিধা হইবে, তাহা হইলে সেই সুবিধা তাহাদের দেওয়া উচিত। অবশেষে স্থির হইল – অবকাশ না পাইলে বিকাশের আরম্ভ কেমন করিয়া হইবে; অতএব বড়দের আদর্শে ছোটদেরও একটি ভিন্ন সমিতি গঠিত হইল। যদি কোন ব্যাপারে বড় ও ছোট উভয়েরই স্বার্থ থাকে, তবে পূর্ব্ববৎ সাধারণ সম্মিলনীতে তাহার আলোচনা হইত।

এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ছোটরা নিজেদের দায়িত্ব-গ্রহণের মধ্য দিয়া চারিদিকে নিজেদের চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিতে ও কর্ম্মকুশলতা নিয়োগ করিতে অবকাশ পাইল। প্রয়োজন হইলেই বড়দের অভিজ্ঞতার নির্দ্দেশ তাহারা গ্রহণ করিতে পারিত।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে শিক্ষার এই নূতন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা একান্ত অসম্পূর্ণ। কিন্তু সে-টুকু আমরা দেখিলাম, - এই স্ব-নিয়ন্ত্রিত নিয়ম বা স্বতঃস্ফূর্ত সংযম, তাহা কি শিক্ষার্থীদের জীবনপথে যথার্থ সম্পদ্ নহে ?

সংসার-পথের দুঃখ, ক্লান্তি, আনন্দ বরণ করিবার শক্তির সাধনাতেই ছাত্রজীবনের সার্থকতা। তরুণ-পৃথিবীর কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা আজ ফিরিয়া আসিয়া নূতন করিয়া পথ খুঁজিতেছেন। *

* এই প্রবন্ধের লেখিকা সিংহলের 'সুজাতা' শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষা। এই প্রবন্ধটি তিনি বিশেষ ভাবে 'বঙ্গলক্ষ্মীর' জন্যই রচনা করিয়াছেন ইহা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন সেন এম্-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন)।

কেন্দ্রসমিতির কথা

কস্‌বা স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

গত ২৫শে এপ্রিল শনিবার কস্‌বা মহিলাসমিতি ও শিশু-পরিচর্য্যাগার-সমিতির উদ্যোগে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কস্‌বা গ্রামে নবনির্ম্মিত মণ্ডপে একটি সাধারণ মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রেসিডেন্সী বিভাগের মাননীয় কমিশনার মিষ্টার এফ্‌, ডব্লিউ, রবার্টসন আই-সি-এস্‌ মহোদয়ের পত্নী মিসেস রবার্টসন এই সভায় সভানেত্রীর কার্য্য করেন। প্রদর্শনী পরিচালক সভার সভানেত্রী মিসেস্‌ কে, এন, সেন উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহাদিগকে এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে বলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি.এ, নারী মঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি এবং শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকারের সহিত এই সভায় যোগদান করেন। মহিলা-কর্ম্মীরা এই সভায় শিশুমঙ্গল এবং নারীমঙ্গল বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন। কস্‌বায় এই প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি শিশু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। বহু সুস্থ শিশুকে এই উপলক্ষে পদক, এবং অন্যান্য খেলনা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। রেড্‌ক্রস্‌ সোসাইটীর মিসেস্‌ কটল এই পুরস্কার বিতরণ করেন। স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অন্যান্য বিভাগ-গুলিও অতি সুন্দর পরিচালিত হইয়াছিল। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বহু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক চার্ট এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং মহিলাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। কস্‌বা শিশু-পরিচর্য্যাগার এবং মহিলাসমিতির পরিচালিকা মিসেস্‌ ঘোষ এই প্রদর্শনী পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম.এ, বি-টি প্রদর্শনীর সম্পাদক রূপে অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় প্রদর্শনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

বাইনানে মহিলা সভা

গত ৩রা মে রবিবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাইনান গ্রামে স্থানীয় মহিলাসমিতির উদ্যোগে একটি মহিলা সভার অধিবেশন হয়। বহু মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে নারীর শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

রিষড়ায় মহিলা সভা

গত ৩রা মে রবিবার হুগলী জেলার অন্তর্গত রিষড়া গ্রামে রিষড়া মহিলাসমিতির উদ্যোগে একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মী কুমারী মমতা মিত্র এবং কুমারী হেমনলিনী মল্লিক এই সভায় যোগদান করেন। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে নারী-মঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

রাজবালা মহিলাসমিতি পরিদর্শন

গত ৭ই মে বৃহস্পতিবার রাজবালা মহিলাসমিতির সম্পাদকের আহ্বানে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী রাজবালা মহিলাসমিতি পরিদর্শন করেন, এবং ঐ সমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সভ্যাদের সহিত আলোচনা করেন।

ঢাকুরিয়া মহিলাসমিতি

গত ১০ই মে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ঢাকুরিয়া গ্রামে ঢাকুরিয়া মহিলাসমিতির উদ্যোগে একটি বিশেষ মহিলা সভার অধিবেশন হয়, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী এই সভার সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সর্ব্বপ্রথমে একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার

কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে মহিলাসমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যা নারীজাগরণ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গি এবং শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার তাঁহাদের ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত মহিলাদিগকে উৎসাহিত করেন। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে বাধা বিঘ্নে অভিভূত হইলে আমরা কখনই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব না। তিনি মহিলাদিগকে এই নারীমঙ্গল-কার্য্যে অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করেন। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে নারীর শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই সভায় মহিলাসমিতির নূতন কর্ম্ম-পরিচারিকা নিযুক্ত হন।

সিউড়ি মহিলাসমিতি

সিউড়ি মহিলাসমিতির শিল্প-বিভাগ পরিচালনের জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি মাসিক ৫৲ টাকা এবং জেলাবোর্ড মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ইতিনা মহিলাসমিতি

কেন্দ্রসমিতির সাহায্যে এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার সেন এম বি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিনা মহিলাসমিতিতে একটি ধাত্রীশিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ৩ জন ব্যবসায়ী ধাত্রী এবং ৯ জন মহিলা এখানে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। গত ৪ঠা চৈত্র সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে যশোহর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মিসেস্ ঘোষ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে সমিতির সভ্যাগণ গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মহিলা-সমিতি গ্রামের অধুনালুপ্ত উৎসবগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ বৎসর ফাল্গুন মাসের শেষে সভ্যাগণ বসন্ত-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গ্রামের কুমারডাঙ্গা নামক মাঠে ষাঁড়ের লড়াই হইয়াছিল। সমিতির সভ্যাগণ বিজয়ী বৃষকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। যাহাতে প্রতিগৃহে গোপালন করা হয় সেজন্য মহিলাসমিতি নানাভাবে চেষ্টা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শোক সংবাদ

সলপ মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী মনোরমা দেবীর কন্যা শ্রীমতী মণিমালার দেবীর পরলোকগমন সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। মহিলাসমিতির কর্ম্মে আত্মনিয়োগ দ্বারা নারীজাতির দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের জন্য তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাতেই ভগবান তাঁহার মনে প্রকৃত শান্তি প্রদান করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

মেয়রের সম্বর্দ্ধনা

গত ৮ই মে সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণ কলিকাতার মেয়র মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই উপলক্ষে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং পরিচালক সমিতির সভ্যগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃসভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম, সহযোগী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-নারায়ণ রায়, ডাঃ পি, সি, সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ ডাঃ রায়কে অভ্যর্থনা করিয়া শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করান। মাননীয় মেয়র শিক্ষালয়ের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া পরিতুষ্ট হন। এই উপলক্ষে ছাত্রীগণ স্বহস্তে মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করেন। পরিশেষে ছাত্রীগণ কয়েকটি সুন্দর আবৃত্তি, সঙ্গীত ও কনসার্টের দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করেন।

সরোজনলিনী নারী-শিল্পশিক্ষালয়

গত ১৬ই মে শনিবার সরোজনলিনী নারী-শিল্প-শিক্ষালয়ের গ্রীষ্মের ছুটি হইয়াছে। আগামী ১৮ই জুন পুনরায় খুলিবে। স্কুলের আফিস বরাবর খোলা থাকিবে। স্কুল সম্বন্ধে কোন কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে আফিসে আসিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পাইকপাড়া স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী

গত ২০শে এপ্রিল রবিবার সায়াহ্নে পাইকপাড়া রাজবাটীতে স্বাস্থ্য ও শিশু-প্রদর্শনী উপলক্ষে এক বিরাট মহিলা-সম্মিলন হইয়াছিল। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে "বালিকা ব্যায়াম সমিতি"র বালিকাগণের স্বদেশ-সঙ্গীত, ব্যায়ামকৌশল, ছোরা ও লাঠিখেলা,—বিশেষতঃ অতি অল্পবয়স্কা বালিকা কুমারী চপলা ঘোষের ছোরা ও লাঠিখেলার অদ্ভুত নিপুণতা উপস্থিত মহিলাগণের মনে আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। "বালিকা ব্যায়াম সমিতি"র শিক্ষকগণের চেষ্টায় বালিকাগণ যেরূপভাবে শিক্ষিতা হইতেছে, কালে সুস্থসবল সন্তানের জননী হইয়া বাঙ্গালীর দুর্ব্বল আখ্যা ঘুচাইতে পারিবে এবং সকল অবস্থায় নিজেদের রক্ষা করিবার মত শক্তি-সম্পন্না হইবে এরূপ আশা হয়।

সভানেত্রীর আহ্বানে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গাঙ্গুলি, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী সেই বিপুল নারীসঙ্ঘ মধ্যে পরম উৎসাহ সহকারে নারীগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে সুপরামর্শ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত মহিলাগণের উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর বালিকা কন্যা মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটি উৎসাহবাক্য বলিয়া আনন্দিত করিয়াছিল।

কেন্দ্রসমিতির অন্তর্ভুক্ত টালা মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সেন এবং সভানেত্রী মহাশয়া সভার শৃঙ্খলা ও কার্য্যনির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রসমিতির বিশেষ আনন্দের কথা যে, বহুকাল শিক্ষার অভাবে শতাব্দী পূর্ব্বে এই বাঙ্গলাদেশে স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে এই কুসংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছিল, শিশুসন্তানদের বিবিধ রোগে উপযুক্ত ঔষধ ও শুশ্রূষার পরিবর্ত্তে "ঝাড় ফুঁক," 'জল-পড়া,' 'তুধপড়া' প্রভৃতির দ্বারা সুস্থ করিবার বৃথা প্রয়াসে শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইতেছিল, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে নিজেরা সভা-সমিতি করা দূরে থাক্ সভাসমিতিতে উপস্থিত হইতেও ইচ্ছা বা সাহস ছিল না; সেই বঙ্গপল্লীর নারীরা আজ সরোজনলিনী নারীমঙ্গল কেন্দ্রসমিতির প্রেরণায় স্থানে স্থানে মহিলাসমিতি ও নারীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেদের শিক্ষোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, কেন্দ্রসমিতির সাহায্য ও পরামর্শ সুভাবে গ্রহণ করিয়া নিজেদের কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছেন। ইহা যে কতখানি আশা ও আনন্দের কথা তাহা সভায় উপস্থিত পাইকপাড়া রাজবাটীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণস্থ অবরোধবাসিনী হিন্দু নারীগণের এই বিপুল সম্মিলন লক্ষ্য করিয়া বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল।

সভাস্থলে বক্তৃতার সঙ্গে আলোকচিত্র দ্বারাও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি উপস্থিত মহিলা ও বালিকাগণকে বুঝান হইয়াছিল।

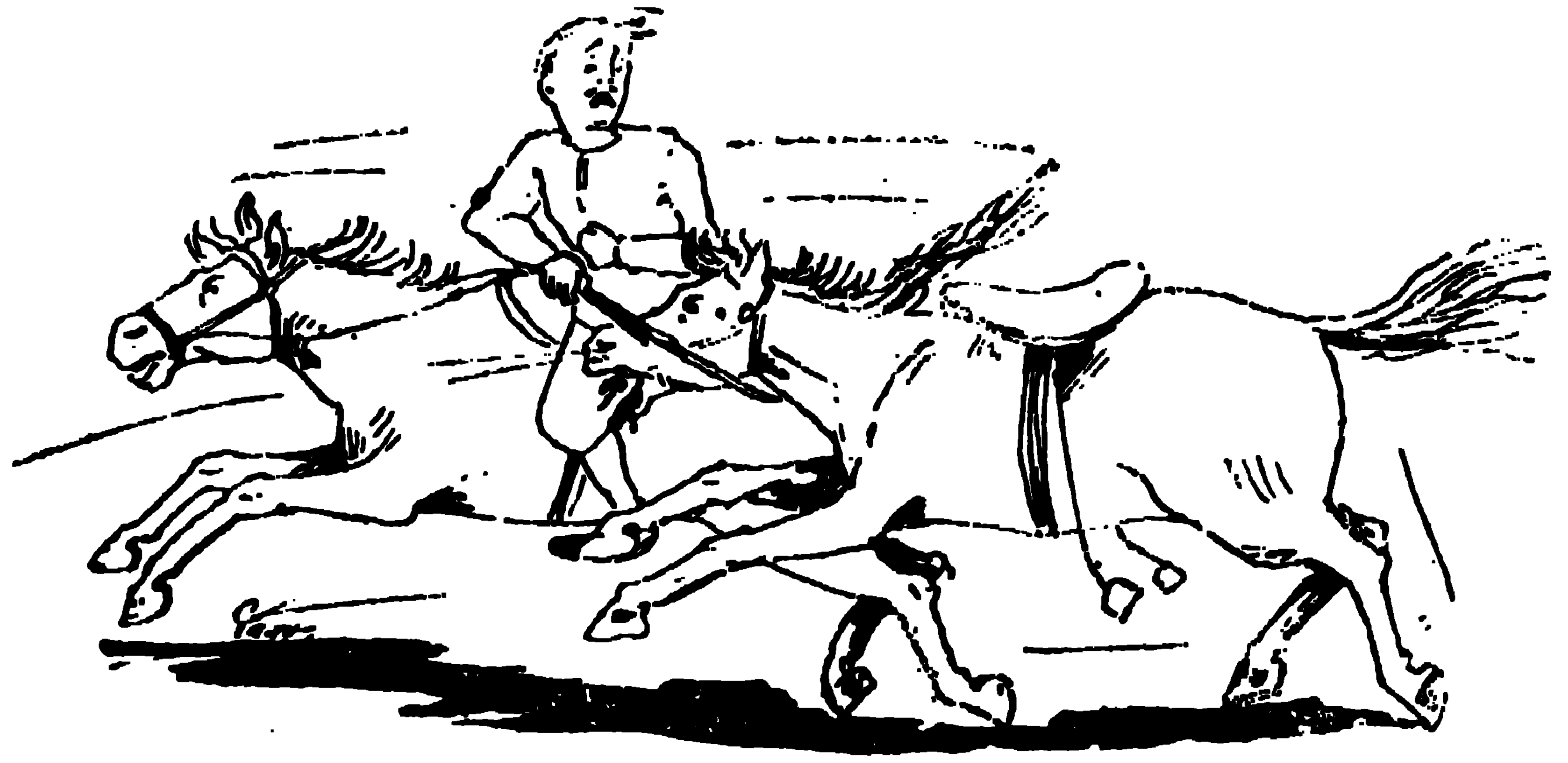

দোসর

শ্রী সতীশ রায়

(২৫)

বসন্ত রোগ হওয়ায় অশোক যে কত কুৎসিত হইয়া গিয়াছিল, সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। মনের সৌন্দর্য্য-বোধে আঘাত করে বলিয়া সে আয়নায় মুখ দেখিত না। কিন্তু দিনকতকের জ্বরে মৌরীর সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে তরুণীর স্বচ্ছ হৃদয়-ফলকে নিজের যে প্রতিচ্ছবি দেখিল, তাহাতে তার সব ক্ষোভ দূর হইয়া গেল। এই কালো মেয়েটির প্রাণের আলোকে সে দেখিল, সে যেন কোন তরুণ দেবতা! তাহাতে কোন অপূর্ণতা নাই! ভালোবাসার অমৃত পান করিয়া সে আজ অক্ষয়যৌবন, অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারী!

তাহার রূপের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। একখানি হৃদয়ে সে এমন একান্তভাবে পূজা পায়।

কালো অমারজনীর অন্তরালে শুভ্র, পবিত্র, স্নিগ্ধ, অরুণিম একটি উষার মূর্ত্তি আছে, মৌরীর প্রকৃতির স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।

এই উষার আকাশে সে স্বচ্ছন্দগতি পাখী—প্রাণের গান গাহিবে!

মধ্যে খানিকটা স্থান বাদ রাখিয়া, পাঁচ ছয়টি শাল-মহুয়া-পিয়াল এমন করিয়া ভীড় করিয়াছিল, যেখানে একটি আসন পাতা যায়। মধ্যকার সেই স্বল্পপরিসর ফাঁকা জায়গাটুকুতে অশোক বসিবার জন্ত ইট দিয়া গাঁথিয়া, সিমেণ্ট করিয়া একটি বেদী রচনা করিয়াছিল। সন্ধ্যার অবসরে সেইখানে সে মাঝে মাঝে বসিত, আজও সেখানে বসিয়াছিল। মৌরী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত,—কেহই কাছে ছিল না। কেবল ভুলো কুকুরটা পায়ের কাছে শুইয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে তাহার গায়ে মাথা ঘষিয়া, আদর পাইবার ইচ্ছা জানাইতেছিল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি—জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক অস্পষ্ট আবছা হইলেও দিনের মত বোধ হইতেছিল। অদূরে সাঁওতাল-পল্লীতে মাদল বাজিতেছে, আর তাহার তালে তালে স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া নৃত্য করিতেছে। 'বাহা'পূজা বা পুষ্পোৎসবে তাহারা প্রতিবেশী অশোককেও যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—শরীর খারাপ বলিয়া সে যায় নাই। কিছু ফল ও মহুয়াছেঁচা মদ তাহারা অশোককে পাঠাইয়া দিয়াছে। যদিও অশোক তা ব্যবহার করে না কিন্তু তবু এই আনন্দের দান অগ্রাহ্য করিয়া ফিরাইয়া দিতে মন সরে নাই।

শাল-মহুয়া ফুলের মদির গন্ধে মাতাল বাতাসে কি এক আবেগময় প্রাণ-চঞ্চলতা! গাছের তলায় পত্রান্তরালচ্যুত চন্দ্রকর আলো ছায়ার আলপনা দিতেছিল। উদ্দাম বাতাস শাল-শাখা দোলাইয়া অশোকের মাথায়, গায়ে ফুল ঝরাইতেছিল। এই জ্যোৎস্নাময় প্রাণ-চঞ্চল রাতে চরাচরের মধ্যে কেহ যেন ঘুমাইতেছে না। সমস্ত প্রকৃতি যেন কোন এক সুন্দর অতিথির আগমন-প্রতীক্ষায় পুষ্প-বাসর সাজাইয়া উৎসুকমনে বিনিদ্রনয়নে চাহিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে। অশোকের মনে ঐ ভুলো কুকুটার-ই মত একটু আদর পাইবার ইচ্ছা জাগিল,—আর একটি প্রাণের একটু নিবিড় পরশ—তার এই দেহ-মনের বুভুক্ষার অনলকে শান্ত করিতে। মধুমাসে মাটিতে যেন মধুর জোয়ার আসিয়াছে, চাঁদের আলোয় মধুবৃষ্টি হইতেছে, তাহার প্রাণের মধ্যেও ত মধুক্ষরণ হইতেছে,—কিন্তু তাহা যে বিরহ-জ্বালার অনল-ভরা। শীতের দীর্ঘ তপস্যার পরে প্রকৃতির মধ্যে যেমন সৃষ্টির উন্মাদনা জাগিয়াছে, তাহার মনেও সেই সৃজন-কামনার অস্থিরতা স্পর্শ করিতেছিল।

চরাচরের এই মধু-বৃষ্টির মধ্যে সেও দেহ-মনের একটু মধু-রস বর্ষণ করিতে চায়—ব্যথাভরা নিবিড় বাসনা মেঘে তাহার সমস্ত সত্তা ভরিয়া উঠিয়াছে যে!

সে সেই বেদীটির উপর বসিয়া ভাবিতেছিল—"এই একই গ্রহের বুকের কোনোখানে সেও ত আছে। এখানকার

চাঁদ যেমন আমায় আলো দিচ্ছে,—বাতাস কানের জন্যে আন্‌ছে পাখীর বিচিত্র গান, ঘ্রাণের জন্যে আন্‌ছে নাম-না-জানা নানা ফুলের মিশ্রিত গন্ধ!—আমার গায়ে সে যেন ভগবানের হাতের করুণার স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। ধরণীর কোনো এক কোণে বসে' সেও প্রকৃতির এই বিচিত্র আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'চ্ছে না। আজ যে এই জ্যোৎস্নায় দিক ভেসে যাচ্ছে, অসীমের অন্তঃপুরে তারার স্তিমিত প্রদীপ জ্বল্‌ছে, এই তারার প্রদীপ, চাঁদের জ্যোৎস্না ইন্দ্রজালের স্পর্শ দিয়ে তার মনেও ত স্বপ্নলোকের মায়াপুরী সৃজন কর্‌ছে। এই মৃত গ্রহটির উদ্বোধন হয়েছে, হর্ষ-কলরব-মুখরিত বিচিত্র জীবের জীবন লীলায়! প্রাণের দোলায় দুলে', গানের আনন্দে তাল দিতে দিতে, জীবধাত্রী পৃথিবীর মত তারা চলেছে না জানি কোন্ এক অফুরন্ত নিরুদ্দেশ-যাত্রায়। আকাশে কুমারী গ্রহতারারা এই সৌররাজ-পত্নী পৃথিবীর পানে কৌতূহলী মনে, বিনিদ্র নয়নে, রহস্য-আভাসের মত চেয়ে আছে!

"শেফালি আমার যাত্রা-সঙ্গিনী—নাই বা থাক্‌ল আমার জীব-দেহের পাশে—কিন্তু আমার মনের পাশে পাশে সে যে অনুক্ষণ রয়েছে! আমি ত তাকে হারাই নি! সঞ্জীব তাকে নিজস্ব কর্‌তে পেরেছে বলে' কি সে ভাবে, শেফালি তারই একান্ত আপনার লোক? সে যা পেয়েছে সে ত জীব-জগতের পশুরাও পেয়ে থাকে, আর আমি যা পেয়েছি তা দেবতার প্রাপ্য,—তা অমৃত! তার থেকে শেফালি আমার কাছে আরো সত্যরূপে, আরো সুন্দর, মধুর ভাবে ধরা দিয়েছে যে! তার মধ্যে আমি যা দেখেছি, যা পেয়েছি তা শুধু আমার নিজস্ব—আবার এক হিসাবে বিশ্বজনীন। তাই বলে' সে অমৃত একলা ভোগ কর্‌বার মত নীচ, স্বার্থপর আমি নই, আমার লেখার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব জগৎকে সে অমৃত আমি ভাগ করে' দিয়ে যাব।"

ভাবের আবেগে, তার মনের সুরাপাত্র ছাপাইয়া পড়িতেছিল—মনে হইতেছিল সে বড় একাকী!

হৃদয়-ভাবের বেদনায় তাহার নিমীলিত আঁখি বহিয়া হৃদয়ের তপ্ত আবেগ-ভরা অশ্রু ঝরিতেছিল—হঠাৎ তাহার মনে হইল, একটি ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাহার দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে।

ছায়াটি ক্রমে একটু স্পষ্টতর হওয়ায় দেখা গেল একটি নারীমূর্ত্তি। অশোক কি স্বপ্ন দেখিতেছে? কে এ-মৌরী নাকি? কিন্তু তার চলনের ত এমন ধীরগতি নয়, সে যে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটে।

ক্রমে ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া অশোকের পাশে আসিয়া দাড়াইল ও মাথা নীচু করিয়া অশোককে প্রণাম করিয়া পদ-ধূলি গ্রহণ করিল।

অশোক বিস্মিত স্তম্ভিত বাক্‌রুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—এ কি শেফালি!

ক্ষীণ মেয়েলি গলার স্বরে সে বলিল, "অশোক দা' চিন্‌তে পার্‌ছেন আমাকে?"

আর তো ভুল হইবার উপায় নাই। অশোকের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না, তবে জগতের ঘা খাইয়া তাহার আচরণ আর আগের মত ভাবাবেগ-পূর্ণ ছিল না। শুধু শান্তস্বরে বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস'না শেফালি।" বলিয়া একটু সরিয়া বসায় শেফালি তাহার পাশে বসিল। অশোক বলিল, "কার সঙ্গে এলে, কি করে' এলে এখানে শেফালি?'

শেফালি বলিল, "মা, আমি, পাতু, সমীর সবাই এসেছি। আমার পিস্‌তুত মামা গভর্ণমেণ্টের বড় এঞ্জিনিয়ার, নাম সুরেশচন্দ্র বসু, গভর্ণমেণ্টের কাজে পাঁচ বৎসর এ অঞ্চলে বাস কর্‌ছেন, আমরা তাঁর কাছেই এসে উঠেছি—আজ সকালেই পৌঁচেছি। সন্ধ্যার সময় তাঁরই মোটরে সুধীর বাবুকে সঙ্গে দিয়ে মা আমাকে আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে দেখ্‌তে। সুধীর বাবুই আমাদি'কে নিয়ে এসেছেন কোলকাতা থেকে।"

অন্নপূর্ণা যখন দেখিলেন সঞ্জীবের সহিত ইন্দুলেখার বিবাহ হইয়া গেল এবং শেফালি কোনদিন অন্তরের সঙ্গে সঞ্জীবের প্রতি অনুরাগিণী হইতে পারে নাই, অধিকন্তু সুধীরের কাছে শেফালির প্রতি অশোকের ঐকান্তিক অনুরাগ ও বসন্ত রোগে মুখশ্রী কুৎসিত হওয়ায় অশোকের দেশত্যাগী হওয়ার কথা শুনিয়া অশোকের হাতেই শেফালিকে দিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। আর শেফালি, সে যে কত গভীর ভাবে অশোককে ভালবাসি-য়াছে সে নিজেই তাহার পরিমাণ বুঝিতে পারে নাই।

তাহার কোমল হৃদয় অশোকের অভাবে শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মাকে একদিন বলিল, "মা, আমরা একবার সুন্দরবনের দিকে বেড়াইতে যাই, চল' না।"

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন। তারপর সুধীরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একেবারে শেফালির বিবাহ দিয়া যাইবেন স্থির করিয়া, পিস্তুত ভাই সুরেশ বাবুকে সমস্ত জানাইয়া সপরিবারে তাঁহার বাসায় আসিয়া উঠিয়াছেন।

শেফালির উত্তরে অশোক বলিল, "সুধীর আমার এখানকার ঠিকানা জান্‌ল কেমন ক'রে?"

"কেন, আপনি যে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন—"

"ও!"—অশোকের মনে পড়িয়া গেল, সে সুধীরকে প্রায় বৎসর খানেক পূর্ব্বে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিল, তাহাতে তাহার ঠিকানা দেওয়া ছিল।

"আমি এখানে পঞ্চবটী বেদীতে ব'সে' আছি তোমাদের ব'লে' দিলে কে?"

আবেগহারা সরল সাধারণ কথাবার্ত্তা। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে ঝটিকার নিদারুণ বিক্ষোভে গভীর সাগর-তলই আন্দোলিত হয় বশী, বাহিরে তাহার বড় একটা আভাস পাওয়া যায় না।

"কেন, আপনাদের বাড়ীতে যে সাঁওতালী দাসীটি কাজ কর্‌ছিল—সে।

"দাসী"—কথাটায় অশোক একটু আহত হইল। তার এই অনাথা প্রবাসসঙ্গিনীটিকে দাসী মনে করিয়া কোনোদিন সে দেখে নাই। বরাবর ভগিনীর মতই স্নেহ-যত্নে পালন করিতেছিল। কিন্তু মানুষ সমাজে আর কোন্ বিশেষণে তাহাকে অভিহিত করিতে পারে। কেন জানি না, অশোক একটু খোঁচা দিয়া বলিল, "শেফালি! তোমাকে যে সঞ্জীব বাবু বড় আস্‌তে দিলেন—তাঁর মত নিয়ে এসেছ ত?"

শেফালি একটু আপনাহারা হইয়া বলিল, "সঞ্জীব বাবু আমার কি? আমি যেখানেই যাই না কেন তাঁর মত নিতে যাব কেন?" অশোক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিল—আজ আগের চেয়েও শেফালিকে তাহার রহস্যময়ী বলিয়া মনে হইতেছিল। বলিল, "আমি ভাল ক'রে' বুঝ্‌তে পারছি না। সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে তবে তোমার বিয়ে হয়নি?"

শেফালি বলিল, "মোটেই না, হরমোহন বাবুর বোন্ ইন্দুলেখার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে।"

অশোক চমকিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "সুধীর আজকাল কি করে বল্‌তে পার?" শেফালি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সুধীর বাবু ত রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন! কোন্ ব্যারিষ্টারের মেয়ের সঙ্গে ওঁর বাবা বিয়ের সব ঠিকঠাক করেছিলেন, কিন্তু উনি সেখান থেকে ফিরলেন না। ওঁর মনে কি একটা আশাহত গোপন-বেদনা আছে, কেউ জানে না।"

অশোক জানিত। কি যে দেশহিত-চেষ্টা ইন্দুলেখাকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে হরমোহন বাবুর সাহায্যে সুধীরের মনে বিস্তারলাভ করিতেছিল—তাহার ব্যর্থ মিলনের এই এক সার্থক পরিণতি!

অশোকের সন্ন্যাসে কোনোদিন বিশেষ আস্থা ছিল না; কিন্তু প্রভাতের অরুণালোকের সহিত সন্ধ্যার খুব বেশী তফাৎ আছে কি? একটা আশা আর একটা অবসান। কিন্তু সেই অবসানের মধ্যেও ত আর একটি আশার অরুণোন্মেষ লুকানো আছে। আজ তাহার মনে হইল, ব্রাউনিংয়ের শিষ্য সুধীরের সে বিষয়ে স্থির বিশ্বাস ছিল!

অশোক মনে মনে কি ভাবিতেছে? তাহাকে এত অবহেলা! অভিমানে শেফালির চোখে জল আসিয়াছিল। সেই রাঁচির পাহাড়ে অভিমানবশে মনোযোগ-আকর্ষণের জন্য ইচ্ছা করিয়া হোঁচট্ খাইয়া পড়া!…শেফালি মনের দিক দিয়া খুব বেশী বড় হয় নাই!

অশোকও তাহার সামনে এতক্ষণ অতি সাবধানে স্থির হইয়া কথা বলিতেছিল। কিন্তু চাঁদ উঠিলে সাগর-জলে চাঞ্চল্য জাগে। সে আবেগপূর্ণ স্বরে ডাকিল, "শেফালি!"

একবার আহ্বানের কণ্ঠস্বরেই সমস্ত কথা শেফালি বুঝিল, সে জানিল অশোক তাহাকে এখনো ভুলে নাই।

সে বলিল, "ও কথা থাক্ অশোক দা!"—তাহার কণ্ঠস্বরও সমবেদনায় কোমল হইয়া আসিতেছিল—"আপনি সহরের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে নির্জ্জনে এমন অজ্ঞাতবাস করছেন কেন? বল্‌বেন না কি আমায়!"

"জিজ্ঞাসা করবার অধিকার তোমার আছে শেফালি! কিন্তু সে অধিকার যদি স্বীকার কর, তবে ত আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হয় না।"

শেফালি বলিল, "আপনি চিরদিন এমন হেঁয়ালিতে কথা বল্‌তে ভালোবাসেন।"

অশোক বলিল, "মনের সরল ভাব একদিন তোমায় কাছে স্পষ্ট কথায় খুলে বলেছিলাম শেফালি,—আর সে ঝুঁকি নিতে সাহস হয় না। আর এখন সে কথা মুখে ব'লে' কানে শুনলে মনের মধ্যে লজ্জা হয়।"

গাছের পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো শেফালির রুক্ষ অলকে ঘেরা সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া মাঝে মাঝে চুম্বন করিতেছিল। অশোক মুখ তুলিয়া দেখিল—তাহার উজ্জ্বল চক্ষু জলে টল টল করিতেছে!

শেফালি একটু আবেগভরা সুরে বলিল, "এত পরিবর্ত্তন

হয়েছে আপনার মনের?—আমি ত ঠিক সেই রকমই আছি! রোগাও হ'য়ে গিয়েছেন দেখ্‌ছি। অশোক দা! আপনার কি অসুখ হয়েছিল এর মধ্যে?"

অশোক ম্লান হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, দেহ এবং মন—দুটোরই। তুমি না আসা পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি দুটোকেই কাটিয়ে উঠেছি। যাক ও কথা; তুমি আজকাল কলেজে পড়্‌ছ?"

"না, ব্রাহ্ম গার্লস্‌ স্কুলে ফ্রী-বোর্ডার হ'য়ে টিচারি শিখ্‌ছি। জীবনটা যত ছোটই হোক কাটাবার একটা অবলম্বন চাই ত।" বলিয়া শেফালি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তারপর আবার কহিল, "অশোক দা! আমি সুধীর বাবুর কাছে শুনেছি যে আপনার বসন্ত হয়েছিল; আমাদের একটি খবর পর্য্যন্ত দেন নি? আমার কতখানি দাবি থেকে—কতখানি অধিকার থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করেছেন তা জানেন কি?" শেফালির কণ্ঠস্বরে একটা অনুযোগ, অভিমান ঘনাইয়া আসিল।

অশোক যেন বাস্তবের নির্ম্মম আঘাতে একটা মধুর স্বপ্ন হইতে সহসা জাগিয়া উঠিল। আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "রাতের অন্ধকারে তুমি জান্‌তে পারছ না শেফালি! রোগের আক্রমণ আমার মুখের উপর কি বীভৎস কলঙ্কের ছাপ রেখে চলে' গেছে! নিজের মুখ আমার নিজে দেখ্‌লে পর্য্যন্ত ঘৃণা হয়,—সেই দুঃখে আয়নায় মুখ দেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি! না, না শেফালি, তুমি যাও,—আমি তোমাকে ভালবাসি না।"

শেফালি আর পারিল না, আপন-হারা হইয়া বলিল, "নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না—অন্যে দেখে। আমার মন দিয়ে যদি নিজের মুখ দেখতেন তা হ'লে দেখ্‌তে পেতেন সে মুখ কত উজ্জ্বল, কত স্বর্গীয়।"

অশোক বিহ্বল হইয়া পড়িল, কহিল, "আমি ত কিছু ভুল শুন্‌ছি না শেফালি?—এযে আমার কল্পনারও অতীত!"

কদাকার গুটিপোকার মধ্যে যে দিব্য সুন্দর প্রজাপতি লুকাইয়া আছে, গোলাপকে তাহা কে বলিয়া দিল?

ঘণ্টায় কি সময়ের পরিমাপ হয়? কতক্ষণ যে তাহারা মুগ্ধমনে হৃদয়ের আবেগে বাক্যহারা হইয়া পাশাপাশি ব'সিয়া রহিল—কখন যে দুটি অভিমুখীন হৃদয় নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাদের সীমারেখা হারাইয়া ফেলিল। বাহির-বিশ্বের চন্দ্রালোকিত যাত্রা ও প্রাণচঞ্চল দক্ষিণ বাতাস কেবল আড়াতে তাহাদের মনের আনন্দ দোলায় দোল দিতে লাগিল। এই দুইটি আত্মহারা প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে, বাহিরে আর তাহাদের কোনো অস্তিত্ব রহিল না।

তাহাদের এই মিলন-লীলার নীরব সাক্ষী কেবল আকাশের চাঁদ নয়, পৃথিবীরও আর একজন ছিল। বুনো খেজুর ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া, ঈর্ষা-কুটিল আঁখি মেলিয়া, সে শেফালিকে লক্ষ্য করিয়া ছিল। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তবু গ্রীকভাস্করগঠিত একটি অনিন্দ্য নিটোল কালো পাথরের মূর্ত্তির মত প্রাণহারা হইয়া সে সেই মর্ম্মান্তিক অভিনয় দেখিতেছিল। অশোক ও শেফালির মত বহির্জ্জগতের কোনো অস্তিত্ব তাহার কাছেও ছিল না—সে মৌরী!

তাহাদের এত দেরীতে মনে মনে বিরক্ত হইয়া সুধীর বাহিরে আসিল। তাহার পরনে গৈরিক খদ্দর, মস্তক মুণ্ডিত। প্রকৃতির প্রাণ-চাঞ্চল্য এবং চন্দ্রালোককে সে এতক্ষণ দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরের কোণে বসিয়া, মোহমুদগর পড়িয়া প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আর পারিল না; বাহিরে আসিয়া দেখিল, ফাল্গুনমাসের এই জোৎস্না রাত ও দক্ষিণ হাওয়া যাহাদের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে সেই আপনভোলা প্রেমিক-প্রেমিকা দুইটি অদূরে পঞ্চবটীতে গলাগলি হইয়া, ঘেঁসাঘেসি করিয়া পাপাপাশি বসিয়া আছে!

এ দৃশ্যে মোহমুদ্গরের শুষ্কপত্র কখন যে এক দম্‌কা হাওয়ায় কোথায় উড়িয়া গেল—সে জানিতেও পারিল না। প্রতিজ্ঞা করিল, দেশ উদ্ধার সে করুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু পিতার মতে আর আপত্তি করিবে না!

তাহাদের "দুজনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী" হইয়া বসিয়া থাকার আনন্দে সুধীর বন্ধু হইয়াও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল; সহজভাবে সহ্য করিতে পারিল না। সে রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠে হাঁকিল, "ওহে অশোক! তোমরা কি আজ ঘনোবে না নাকি? সমস্তরাত ধরে' ওখানে বসে' থাক্‌বে?—ক্ষিধে-তেষ্টাও নেই? তোমাদের ভাবে পেট ভর্‌তে পারে কিন্তু খাবার অভাবে আমি মারা যাই যে! ঘরে এস, ঠাণ্ডা পড়্‌ছে, আবার অসুখ-বিসুখ বাধ্‌লে মুস্কিল হবে। ফাল্গুন মাসের জ্যোৎস্না রাত আজই একেবারে ফুরিয়ে যাচ্ছে না হে,—আরো বারকতক আসবে!"

তাহাদের চমক ভাঙিল। উভয়েই যেন একটা মধুর স্বপ্নাবেশ হইতে জাগিয়া উঠিল।

শেফালি লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, "তাইত, অনেক রাত হ'য়ে গেছে যে! ঠাণ্ডা পড়্‌ছে, চলুন "ঘরের ভিতরে যাওয়া যাক।" বিহ্বলভাবে অশোক বলিল,—"চল।"

* * *

সকালে উঠিয়া, মৌরীকে না দেখিতে পাইয়া, তাহারা আশেপাশের গ্রামের অনেক জায়গায় খোঁজ লইল—কিন্তু মৌরীর সন্ধান কেহ দিতে পারিল না।

শেষ।

সাবিত্রী সম্মিলনী

১লা বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল, শ্রীযুক্ত সি, কে সরকার মহাশয়ের বাড়ী ২৭নং গোপীমোহন দত্ত লেন, শ্যামবাজার, সাবিত্রী সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী শ্রীমতী মনীষা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় শ্রীমতী সরলাবালা সরকার সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায়, এই এক বৎসরের মধ্যে সাবিত্রীসম্মিলনীর সভ্যাসংখ্যা ছাপান্ন জন এবং পৃষ্টপোষক আট জন। ইহার পরিচালন প্রণালীটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক, ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে সভানেত্রী, সহসভানেত্রী এবং সম্পাদিকার পরিবর্ত্তে সাতজন কর্ম্মীর উপর ইহার যাবতীয় কর্ম্মভার ন্যস্ত হইয়াছে। এই সাতজন কর্ম্মীও আবার সমুদয় সভ্যার অধিক সংখ্যকের মতের দ্বারা মনোনীত হন্। বাগবাজার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রে দুইটি তাঁত বসান হইয়াছে; ইহাতে কাপড় গামছা ঝাড়ন ইত্যাদি বুনা হয়। ইহার চাহিদা খুব বেশী, তাঁতে থাকিবার সময়ই অনেক সময় বিক্রী হইয়া যায়। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাঁহারা তাঁত বুনেন তাঁহারা গ্রহণ করেন না, সম্মিলনীর অর্থভাণ্ডারে জমা হয়। এইখানে মহিলাদের জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধার জন্য একটি লাইব্রেরী অল্পদিন হইল খোলা হইয়াছে। গত আশ্বিন মাসে সম্মিলনীর শিল্প-প্রদর্শনীতে চিত্রশিল্পে শ্রীমতী শতদলবাসিনী বসু ও সূচিশিল্পে শ্রীমতী গৌরীরাণী সিংহ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থে দুইটি রৌপ্যপদক প্রদান করিয়াছেন। সাবিত্রী সম্মিলনীর

বগুড়া মহিলা সমিতি

শিল্পবিদ্যালয়ে এই বৎসর পরীক্ষায় শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী কাটিংএ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী হইতে শ্রীমতী চারুবালা দেবী ও শ্রীমতী সবিতা দেবী দুইটি রৌপ্যপদক তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য উপহার দিয়াছেন। মৃণ্ময়-শিল্পে শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, শ্রীমতী রমলা বসুকে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে রৌপ্যপদক প্রদান করা হইয়াছে।

সভায় বহু মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী সুশীলা বালা ঘোষ সভায় নিম্নলিখিত 'ভালো হব' প্রবন্ধটি পাঠ করেন :—

বাঁকুড়া মহিলা সমিতি

ঐ নীল সাগর রহস্যময়, তারি বুক থেকে উঠ্‌লেন মহালক্ষ্মী—তাই তিনিও অতি রহস্যময়ী।

আবার তাঁরি অংশে যে নারীর জন্ম, তাঁরও রহস্যের সীমা নেই। তাঁর সেবানিপুণতা, অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর সংসারের পরিপাটি, সন্তানপালনের অসীম সহ্যগুণ, আবার প্রয়োজন হ'লে গৃহবদ্ধ নারীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীরত্ব। এই সাধারণ নারীর দেহমনে, ঐ সব অসাধারণ গুণ যে কি করে' কোন্ দিক দিয়ে আসে তা বলা যায় না। বলা যায় না বলে'ই আমি নারীকে রহস্যময়ী বল্‌ছি।

আরো রহস্যময়—আমাদের এই সাবিত্রীসম্মিলনী। আমাদের মত অল্পশিক্ষিতা ও অক্ষমা মেয়েদের দ্বারা, মাত্র এক বছরের মধ্যে কি করে' যে এতখানি ঘটে' উঠ্‌লো—সে রহস্য আমি এখনও ভেদ করে' উঠ্‌তে পারি না। তাদের না আছে অর্থ না আছে সামর্থ্য, না আছে ঢাল্ না আছে তলোয়ার, শুধু-হাতে, বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করে' তারা একটি ছোট্ট গোছের শিল্পবিদ্যালয় গঠন করেছে, নিজেদের খদ্দরের সুতো নিজেদের হাতে বুনে তাই পর্‌ছে, জ্ঞানচর্চ্চার জন্য লাইব্রেরী করেছে এবং সর্ব্বোপরি কতকগুলি মহীয়সী মহিলার যে এত ভালবাসা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে তাতে আনন্দপ্রকাশের ভাষা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। এ আনন্দ এখন চাপা থাক্, কারণ সম্মিলনীর মেয়েদের পক্ষে এ পর্য্যাপ্ত নয়। তাদের চারিদিকে যে বেদনা ঘনীভূত, চোখের কোণে যে জল জমে উঠেছে, তা'দিগকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে সে জল তারা মুছাতে চায়। বাইরে আমাদের খুব বড় রকমের এই বদ্‌নাম আছে যে, আমরা পরস্পরের সুখ সহ্য করতে পারি না। এ বদ্‌নাম সত্য কি মিথ্যা তাই নিয়ে তর্ক করবার প্রয়োজন নেই, তবে আমাদের নিজেদের কর্ম্মে ও আচরণে যেমন করে' হোক এ বদ্‌নাম আমরা ঘুচাতে চাই। আমাদের হৃদয়কে আমরা এমন ভাবে গড়ে' তুল্‌বো, যাতে যে-কোন নারীর দুঃখকষ্টে, নিজের পরিবারেরই হোক, অথবা অন্য সমাজের কি অন্য দেশেরই হোক, যার জন্যে আমরা হাসিমুখে যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবো। এই রকম দুঃখকাতর হৃদয় যদি আমরা পাই, অথবা আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারি, তবে জগতে এমন কি ভাল কাজ আছে যা আমরা কর্‌তে পার্‌বো না? খুব বড় কাজ কর্‌বার জন্য হয় তো অনেক অর্থ, খুব বড় বাড়ী, অথবা বহু লোকবলের প্রয়োজন, কিন্তু তা না থাক্‌লেও আমরা দরিদ্রা পল্লীবাসিনীদের আমাদের আহার্য্যের সামান্য অংশ দিয়েও রক্ষা কর্‌তে পারি। আমাদের সাজানো-গোছানো অট্টালিকা থেকে নেমে গিয়ে, তাদের নিরাভরণ কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে' তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে তাদের সঙ্গে আনন্দ কর্‌তে পারি, তাদের অসুখের সময় বোনের মত সেবা কর্‌তে পারি, আর যদি কিছুই না পারি, তবে তাদের দুঃখকষ্টে গলা জড়িয়ে কাঁদ্‌তেও ত পারি। আমার মনে হয়, প্রথমে চাই মেয়েদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন, তারপর কাজ। তা না হ'লে

মৌলমিন মহিলা সমিতি

যেখানেই আমরা কাজ কর্‌তে যাই না কেন,তাতে নিজেদের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করবার ভাব আস্‌বে, বিরোধ বাধ্‌বে, আরো কত কি যে হবে তার ইয়ত্তা নেই। সত্য কথা এই যে, মেয়েদের আজকালকার কাজের ভিতর এই দুর্ব্বলতাগুলির অভাব নেই। আমরা সাবিত্রী সম্মিলনীর মেয়েরা প্রথমে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চাই, তারপর চাই কাজ। আগে নিজেরা ভাল হ'তে চাই, তারপর চাই অন্যকে ভাল কর্‌তে, তা না হ'লে একজন পঙ্গু আর একজন পঙ্গুকে কি করে' নিয়ে যাবে?

এর জন্য দরকার সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎ চিন্তা। এরই জন্য প্রতি বুধবার সম্মিলনীর অধিবেশনে সাধু মহাপুরুষ স্বদেশপ্রেমিক ও স্বার্থত্যাগী মহাজনের জীবনী আলোচনা হয়, যাতে তাঁদের মহাপ্রাণের আলো আমাদের এই স্বার্থপর অন্ধকারময় জীবনকে আলোকিত করে, যাতে তাঁদের পদছায়া ধরে' আমরাও বড় হ'তে পারি। যদি সত্যই বড় হ'তে চাই, ভাল হ'তে চাই,সৎ কাজ করতে ইচ্ছুক হই, তবে মানুষে সাহায্য না করুক করুণাময় ভগবানের সাহায্য হ'তে আমরা কোন দিনই বঞ্চিত হব না।

—সম্পাদিকা।

সলপ মহিলাসমিতি

স্থানীয় মহিলাগণের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যমে ১৩৩৫ সালের ফাল্গুন মাসে এই সমিতি স্থাপিত হয়।

সমিতির উদ্দেশ্য—(১) দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় দ্বারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, সহানুভূতি ও ঘনিষ্টতাবৃদ্ধি, (২) নানা প্রকার শিল্পচর্চ্চা দ্বারা পরস্পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন, (৩) সম্মিলিত চেষ্টায় সমাজ, জাতি ও গ্রামের সেবা।

সমিতির বর্ত্তমান সভ্যা-সংখ্যা ১৯ জন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রদ্ধেয় ৺ কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা ভবাম্বুজা দেবী সভানেত্রীরূপে কাজ করিতেছেন। প্রতি মাসে একবার করিয়া নিয়মিত অধিবেশনের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকায় এক এক মাসে এক এক জন সভ্যার বাড়ীতে অধিবেশন হইয়া থাকে। মাসিক অধিবেশন ব্যতীত মাঝে মাঝে বিশেষ অধিবেশনও হইয়া থাকে। মাসিক কোনও চাঁদা আদায় হয় না, প্রত্যেক সভ্যার চারি আনা করিয়া ষাণ্মাষিক চাঁদা আদায় হয়। সমিতির অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাধারণতঃ আলোচনা হইয়া থাকে—(১) সমিতির প্রয়োজনীয়তা, (২) দেশের এই দুর্দ্দিনে মহিলাদের কর্ত্তব্য, (৩) সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম, (৪) পরিবারে জননীর দায়িত্ব। (৫) সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে স্থানীয় দুই একটি দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করা।

গত ১২ই মাঘ সমিতির অক্লান্ত উদ্যমে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রী-সংখ্যা বর্ত্তমানে ২৫টি, ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমদাশঙ্কর সান্যাল বি-এল মহাশয় সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ও শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী সহ-সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা অসুস্থা ও শোকগ্রস্তা হওয়ায় পুনরায় সম্পাদিকার ভার গ্রহণ না করায় শ্রীযুক্তা সুভাষিণী দেবী সম্পাদিকা ও শ্রীযুক্তা নীহারবালা দেবী সহ-সম্পাদিকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা শশীবালা দেবী, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এবং শ্রীযুক্তা সতীরাণী দেবীর উদ্যম ও উৎসাহ উল্লেখযোগ্য।

স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য সমিতি হইতে কোন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম হওয়ায় স্থানীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে একখানি ঘর বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিদ্যালয়ের এই শিশু অবস্থায় বাহিরের সাহায্য ছাড়া সুন্দর ভাবে কার্য্যচলা বিশেষ কঠিন। আমরা এ বিষয়ে কেন্দ্র-সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রী সুভাষিণী দেবী, সম্পাদিকা

দিনের কিছু অংশ

সৌন্দর্য্য চর্চ্চায় কাটান সকলেরই কর্ত্তব্য-কারণ রূপ যদিও সকলের ভাগ্যে ঘটে না তথাপি যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা যেমন তেমন চেহারাও দশের আকর্ষণ যোগ্য করে তোলা যায়

রূপ ও সৌন্দর্য্যের জন্য
চিরপ্রসিদ্ধ ও অতুলনীয় প্রসাধন

হিমানী স্নো

ও

রমণীর স্বভাব কোমল অঙ্গে ব্যবহার যোগ্য

হিমানী সাবান

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

সোল এজেন্টস :—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

সাবান ও সুরভি প্রস্তুতকারক
হিমানী ওয়ার্কস্
কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta. and published by him at 45, Beniatola Lane, Calcutta.

তপস্বিনী গৌরী

শিল্পী—শ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

PRINTED BY C. H. ARAN & CO., CALCUTTA.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৮ [৮ম সংখ্যা

জাগরণী

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

জাগো, জাগো, জাগো,
জাগো ভারতবাসী,—
শত ঘনতিমির-শতাব্দীর
সুগভীর সুপ্তি বিনাশি' ॥

জাগো ধর্ম্মে পূত মর্ম্মে
নাশি' কলুষ-তমোরাশি।
জাগো জ্ঞানার্জ্জিত পুণ্যে
দিগন্ত সত্যে প্রকাশি' ॥

জাগো ঐক্যে, স্থির লক্ষ্যে,
বিশ্বমানব সনে সখ্যে,
মঙ্গল-কর্ম্ম-প্রয়াসী।
নাশি' অন্ধ ভেদ-দ্বন্দ্ব
সাম্য ও মৈত্রী-পিপাসী ॥

জাগো চিত্তে গীতি-নৃত্যে
নির্ম্মল পুলক বিকাশি'।
জাগো কর্ম্ম-যোগাশ্রিত ধর্ম্মে
জন-গণ-হিত-প্রত্যাশী ॥

জাগো শ্রমজীবী-সজ্জা-পরিধানে লজ্জা-
সঙ্কোচ-ভয় নির্ব্বাসি'।
জাগো অন্ন-বস্ত্র-ধন-উৎপাদন-ব্রতে
পরমুখ-অপেক্ষা নাশি' ॥

জাগো সত্যানুসরণে অবিচল চরণে
ফলাফল-লিপ্সা-উদাসী।
জাগো জ্ঞানে কর্ম্মে লক্ষ্যে ধর্ম্মে
পূর্ণ-মুক্তি-অভিলাষী ॥

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কি ?

শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি-এ

বহুকাল পূর্ব্বে আমি একটি প্রবন্ধে আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার বিচারপূর্ব্বক দেখাবার চেষ্টা করেছিলুম যে, আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর আধুনিক শিক্ষালাভ করবার ফলে আমাদের মেয়েরা সেকালের কতকগুলি গুণ যদিও হারিয়ে থাকেন, কিন্তু তার স্থান হয় নতুন কতকগুলি গুণে পূরণ হয়েছে, কিম্বা কালবশে পুরাতনের অনিবার্য্য রূপান্তর মাত্র ঘটেছে ; সুতরাং মোটের উপর সে শিক্ষায় মেয়েদের লাভ বই লোকসান হয়নি।

আজ আবার চতুর কৌচুলীর ন্যায় বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে, তার কি কি পরিবর্ত্তন বা উন্নতি করা যেতে পারে, তারই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। কিন্তু আমার এই কৌচুলীগিরি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, অতএব তার দোষত্রুটিও মার্জ্জনীয় হবে, আশা করি। তা' ছাড়া সেবার বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার তুলনা করা হয়েছিল অতীতের শিক্ষা বা অ-শিক্ষার সঙ্গে ; আর এবার তুলনা করা হ'চ্ছে ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে। তাই শুধু প্রস্থানভূমির বদল হয়েছে বলা যেতে পারে,—মতের নয়। এত বার এত জায়গায় মেয়েদের বিষয় এত কথা বলেছি, অর্থাৎ অনুরোধে বলতে বাধ্য হয়েছি, যে পুনরুক্তিরূপ মহাদোষ হ'লে আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন, এই আমার সবিনয় নিবেদন।

হাতেকলমে শিক্ষয়িত্রী হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়নি ; সে সাধ্য বা সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং এখানে কেউ কেউ শিক্ষাসম্বন্ধে কোনরূপ মতামত-প্রকাশে আমার যোগ্যতা-বিষয়ে সন্দিহান হ'লে আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হব না, কারণ আমি নিজেও তাঁদেরই দলের একজন। একজনকে এমনও কথা বলতে শুনেছি যে, পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছলেই মতামত-প্রকাশের একটা অধিকার জন্মায় (বোধ হয় সান্ত্বনাস্বরূপ)। তাঁর এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে না পারলেও, একমাত্র সেই অধিকারে অধিকারী হ'য়েই আমি আজ উপস্থিত বিষয়ে দু'চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি সে কথা ঠিক।

একই জিনিষকে এত দিক থেকে দেখা যেতে পারে যে, কোন এক বিষয়, বিশেষতঃ, শিক্ষার মত ব্যাপক ও জটিল বিষয়কে, বিশ্লেষণ করে', কোন এক প্রবন্ধের সীমানার মধ্যে সৌষ্ঠব ও সঙ্গতি দান করা শক্ত। তাই বিষয়টিকে দু'চারটি সরল রেখার ভিত্তির উপর স্থাপন করা দরকার, নইলে গুছিয়ে কিছুই বলতে পারা যাবে না। আর একে বাঙ্গালী, তায় স্ত্রীলোককে কিছু বলতে না দেওয়ার যে নিষ্ঠুরতা, তা' জীবহিংসা-নিবারণী সভার আইনে দণ্ডনীয় হবে নিশ্চয়। অবশ্য শ্রোতারাও সেই একই জীবশ্রেণীভুক্ত, সুতরাং আমার বক্তব্য যথাসম্ভব শীঘ্র সেরে ফেলে তাঁদেরও তার প্রতিবাদ করবার একটু অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমার প্রস্তাবিত চৌহদ্দির প্রথম ও প্রধান রেখা হ'চ্ছে এই স্বীকারোক্তি যে, স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক ; কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি যে এই ভিন্ন পথের গতি নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার বোধ হয় আজকাল অনেকেই অনুভব করে' থাকেন যে এই ধরণের কিছু একটা বদল করবার সময় এসেছে। অন্যান্য প্রমাণ ছেড়ে দিলেও এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে। অনতিপূর্ব্বে লাহোরে যে নিখিল-ভারত মহিলা-শিক্ষাপরিষদের অধিবেশন হয়, তা'তে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (হবার কথা ছিল) :—

এই পরিষদের মতে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে স্ত্রীলোক ও বালিকাদের শিক্ষাসম্বন্ধে একটি নূতন "মোড়" নেবার প্রয়োজন হয়েছে। হায়দ্রাবাদ ও কোচিনের মত দূরান্তর দু'টি প্রদেশ স্পষ্টাক্ষরে প্রস্তাব করেছেন যে, মেয়েদের ও ছেলেদের শিক্ষার ধারা স্বতন্ত্র করা হোক্।

যেমন আমাদের মেয়েদের বেরোবার উপযোগী বেশ ছিল না বলে' সেকালে পুরুষরা হাতের কাছে মুসলমানী, খ্রীষ্টানী

যে কোন পোষাক তৈরি পেয়েছেন, অগত্যা তাই পরিয়ে তাঁদের লোকসমাজে প্রথম বা'র করেছেন, তারপরে ক্রমে মেয়েরা নিজেই তার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করেছেন ও করছেন, তেমনি কালোপযোগী স্ত্রীশিক্ষা বল্‌তেও সে সময়ে ঠিক কিছু ছিল না বলে', তখন পুরুষেরা হাতের কাছে যে শিক্ষা তৈরি পেয়েছেন, অর্থাৎ বৃটিশরাজ-প্রবর্ত্তিত ছেলেদের শিক্ষা, তাই যে মেয়েদের দিতে বাধ্য হয়েছেন, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এখন সেই শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের ভেবে দেখা উচিত যে, আমাদের শিক্ষা কিসে আরো ভালো হ'তে পারে; আর শিক্ষিত পুরুষরাও সে চেষ্টার সাহায্য করবেন বলে' আমাদের ভরসা আছে। দুঃখের বিষয় সেই আরো-ভালোতে পৌঁছবার সোজা রাস্তা খুঁজে বা'র করা খুব সহজ নয়। গতানুগতিক পথ ছাড়্‌তে গেলেই বুদ্ধি খাটাতে হয়, এবং চোখ-কান খুলে' রেখে সাবধানে এগোতে পিছোতে হয়,—চোখ-কান বুজে' নয়।

এ বিচারে প্রথম প্রশ্ন হ'চ্ছে—কেন আমরা মনে করি যে মেয়েদের ও ছেলেদের ঠিক একরকম শিক্ষা হওয়া সমীচীন নয়? এ প্রশ্নের উত্তর দু'রকমে দেওয়া যেতে পারে; এক মূল থেকে আলোচনা করে', আর এক দেখে' বা ঠেকে' শিখে'। ধরে' নিচ্ছি যে শেষোক্ত শিক্ষাটি আমাদের জন-কতকের হয়েছে, অর্থাৎ ফলে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হয়েছি; তা' নইলে শিক্ষাসংস্কারের কথা তুল্‌বই বা কেন? অতএব মূলের বিচারেই প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

শরীরের গঠনের মত স্ত্রীপুরুষের মনের গঠন এবং ভবিষ্যৎ জীবনও যে ভিন্নপ্রকৃতির, এ কথাটাকে নির্ভয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত বল্‌তে পার্‌তুম, যদি একালে একদল সাম্য-বাদী উচ্চৈঃস্বরে তার প্রতিবাদ সুরু করে' না দিতেন। সেইজন্য মনের মায়ালোকের কথা ছেড়ে দিয়ে, অপেক্ষাকৃত স্থূলরাজ্যের কথাই ধরা যাক্। মেয়েরা যে মা হবার জন্য তৈরি হয়েছে, এবং অধিকাংশ মেয়েকেই যে গৃহিণী ও মাতা হ'তে হয়, এই সরল সত্যটিকে আমাদের পূর্ব্বোক্ত চৌহদ্দির দ্বিতীয় সীমা-রেখাস্বরূপ ধর্‌লে বোধ হয় কারো আপত্তি হবে না। তাহ'লে ছেলেদেরও যেমন কিছুদূর পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে, পরে প্রকৃতি বা সুযোগ-ভেদে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি মেয়েদেরও মানুষ-হিসেবে বিশেষ শিক্ষা দেওয়াই কি যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়? এস্থলে অবশ্য কথা উঠ্‌তে পারে যে, ছেলেদের জন্য যদি প্রাপ্তবয়সে প্রকৃতি ও সুযোগ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়, তাহ'লে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বেলায় সকলকেই এক ব্যবস্থা মেনে চল্‌তে হবে, এই বা কেমনতর বিচার? তারাও ত মানুষ, তাদেরও কি প্রকৃতিগত পার্থক্য থাক্‌তে নেই?

তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নিতে পার্‌তুম যে পার্থক্য থাক্‌তে অবশ্যই পারে, এবং ন্যায়তঃ তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন পথে চল্‌বার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কিন্তু ঐ দুই নম্বর রেখা-বন্ধনীর দ্বারাই যে এস্থলে নিজেকে নিজে বেঁধে ফেলেছি। অধিকাংশ ছেলেকেই যে ব্যারিষ্টর বা এঞ্জিনীয়র হ'তে হবে, এমন কোন কথা নেই (যদিও আজকাল আমাদের দেশে প্রায় তা'ই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে); কিন্তু অধিকাংশ মেয়েকেই যদি মা হ'তে হয় (যেটি আমাদের দ্বিতীয় সর্ত্ত বলে' ধরেছি), তাহ'লে তাদের সেই জীবনোদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে' তুল্‌তে হবে; কারণ বাপের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধের চেয়ে মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ ঢের বেশী ঘনিষ্ঠ, বিশেষতঃ প্রথম বয়সে; এবং সেই সম্বন্ধের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন কর্‌বার উপযুক্ত শরীর ও শিক্ষা না থাক্‌লে মা ও ছেলে দু'জনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুতরাং পরিবার এবং সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। যে শিক্ষায় উপার্জ্জনশীল গৃহকর্ত্তা বা নির্লিপ্ত জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর গঠিত হয়, অবিকল সেই শিক্ষা কখনোই সুগৃহিণী ও সুমাতা গড়ে' তোল্‌বার পক্ষে উপযোগী হ'তে পারে না, কারণ উভয়ের কাজ আলাদা, তাদের লক্ষ্য আলাদা, তাদের শরীর আলাদা, এবং—ভয়ে কব' কি নির্ভয়ে কব'—তাদের মনও আলাদা। অন্ততঃ এদেশে ত যথেষ্ট আলাদা দেখ্‌তেই পাওয়া যাচ্ছে, এবং এখনো দীর্ঘকাল আলাদা থাকাই সম্ভব।

তাই শিক্ষাকে দেশোপযোগী করা আমাদের চৌহদ্দির তৃতীয় সীমানা বলে' ধর্‌ছি, এবং এ প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বলে' আমার বিশ্বাস। কারণ, প্রত্যেক মানুষের ভিতর যা'-কিছু সদ্‌বৃত্তি আছে, তার উৎকর্ষসাধন করা, কিম্বা যা'-কিছু ক্ষমতা আছে তা' সমাজের সেবায় নিযুক্ত করা যে কোন অর্থেই "সুশিক্ষা" কথাটা ব্যবহার করি না

কেন,—সেটা যে দেশবিশেষের উপযোগী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে দু'মত হ'তেই পারে না; যদিও আমাদের অবস্থা-বৈগুণ্যে অনেকস্থলে কার্য্যতঃ তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এটাও মেয়েদের ভিন্ন শিক্ষার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তিবিশেষ। কারণ এদেশে ছেলেদের শিক্ষা বিদেশী ছাঁচে ঢালাই কর্‌বার যে দায় রয়েছে, মেয়েদের সম্বন্ধে সে দায় নেই, অন্ততঃ সে পরিমাণ নেই, এটুকু নিশ্চিত।

শিক্ষাকে কালোপযোগী করা সম্বন্ধে এত কথা বল্‌বার আছে যে, এটিকে চৌহদ্দির চতুর্থ ও শেষ সীমা-রেখা করা যেতে পারে। এরই মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থা বুঝে' ব্যবস্থার কথা, ব্যক্তিত্বের দাবীর কথা, সবই স্বতঃই এসে পড়ে। আমরা যে নববিদ্যালয় স্থাপন কর্‌তে চাচ্ছি, এতক্ষণ ধরে' যার ভিত্‌পত্তন করা হ'ল, সেটা সঙ্কীর্ণ মামুলীরকম হ'লে ত চলবে না, পরন্তু এমন উদার শ্রীক্ষেত্র হওয়া চাই, যেখানে একালের সকল ছাঁদের মেয়েই প্রবেশলাভ কর্‌তে পারবে এবং কর্‌তে চাইবে।

ক্ষেত্র অঙ্কিত করে' দিয়ে আমি খালাস, তার উপর বিদ্যামন্দির গড়ে' তোল্‌বার ভার বিশেষজ্ঞদের হাতে; কিন্তু এই চতুঃসীমার সঙ্গে তার গোলযোগ আর একটু স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করে' না দিলে আমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে পালন করা হবে বলে' মনে করিনে।

উক্ত চৌহদ্দির প্রথম সীমানা, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের শিক্ষার ধারা, শেষের দিকে ভিন্নমুখী হওয়া আবশ্যক; এবং দ্বিতীয় সীমানা, অর্থাৎ অধিকাংশ মেয়েকেই গৃহিণী ও মাতা হ'তে হবে,—এই উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ বিদ্যমান বলে' দু'টোই একসঙ্গে আলোচনা করা শ্রেয়। এই দু'য়ে-এক-একে দুই মূলসূত্র থেকে মেয়েদের অবশ্যশিক্ষণীয় অনেক বিশেষ বিষয় বেরিয়ে আসবে, যথা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, খাদ্য-বিচার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা, রন্ধন, সেলাই, হিসাব, মিতব্যয়ী গৃহস্থালী, সন্তানপালন, ইত্যাদি।

তৃতীয় সীমানা, দেশোপযোগী শিক্ষা থেকে আমাদের দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, পালপার্ব্বণ উৎসবাদি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, ভূগোল, মহাত্মাদের জীবনী ও শিল্পকলা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক নানা বিষয় শেখাবার আবশ্যকতা উপলব্ধি হবে।

চতুর্থ সীমানা, কাল ও পাত্রোপযোগী শিক্ষা থেকে, প্রত্যেক মেয়েকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটা কোন বিশেষ অর্থকরী বিদ্যা শেখাবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। কারণ যেরূপ দিনকাল পড়েছে, তাতে আমাদের মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার মত একটা কোন বিষয় শিক্ষা দিলে, সেটি কাজে লাগ্‌বার খুবই সম্ভাবনা। সধবা অবস্থাতেও ঘরে বসে' দু'পয়সা রোজগার করতে পার্‌লে অনেক গৃহস্থ-ঘরেরই বারমেসে অনাটনের কিঞ্চিৎ লাঘব হ'তে পারে। আর একান্নবর্ত্তী পরিবারের এই ভাঙ্গনদশায় বিধবার পক্ষে নিজের প্রাণ, মান ও সন্তান বাঁচাবার জন্য উপার্জ্জনক্ষম হ'তে পারা ত বিশেষ দরকার। বালিকা-বিদ্যালয়গুলি যদি গোড়া থেকে সে ভার নেয়, তাহ'লে বিধবাশ্রমগুলিকে আমাদের দেশের নারী-দুর্ভাগ্যরূপ দুস্তর সমুদ্রে ভাঙ্গা ভেলা ভাসাবার চেষ্টা কর্‌তে হয় না। অর্থো-পার্জ্জন ছাড়াও একালের গৃহ ও সমাজের উপযোগী হবার জন্য সৌভাগ্যবতীদের অন্য অনেক রকম শিক্ষার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, যথা—নিজের ভাষা ছাড়া হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি আরও দু'একটা ভাষা বল্‌তে, পড়্‌তে ও লিখ্‌তে পারা, সংস্কৃত পড়ে' মোটামুটি বুঝ্‌তে পারা, অন্যান্য দেশের (বিশেষতঃ বিলাতের) সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকা, ইত্যাদি।

পরিবার ও সমাজের সব দাবী মিটিয়ে অবশেষে ব্যক্তির জন্য খুব সঙ্কীর্ণ হ'লেও একটুখানি স্থান রাখ্‌তে হবে অন্ততঃ চৌহদ্দির বাইরের আঙ্গিনায় এই শিক্ষায়তনের ভিতর স্থান না পাবার বা না চাবার দু'তিনটি সঙ্গত কারণ দেখিয়ে আমার উদারতা প্রমাণ কর্‌তে চাই। এক হ'চ্ছে, সংসারা-শ্রমের ভারবহনে শারীরিক অপটুতা, তার উপর ত কোন কথা নেই। দুই হ'চ্ছে, ইচ্ছা থাক্‌লেও সুযোগের অভাব, তার উপরেও কোন হাত নেই। তিন হ'চ্ছে, এমন কোন মানসিক ক্ষমতা বা প্রবণতা, যার দরুণ সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনে স্বভাবতঃ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, যথা—প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব বা ঐকান্তিক জ্ঞানস্পৃহা বা বিশিষ্ট শিল্পানুরাগ, পরহিতৈষণা, ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল ব্যতিক্রমে আমার মূলসূত্র প্রমাণিত হয় মাত্র।

ফলতঃ, দাঁড়াচ্ছে এই যে, আর একবার

যা বলেছি ঘুরে' ফিরে' সেই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে', একই প্রস্তাব কর্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি। সেটি এই যে, প্রথম দিকে ছোট ছেলেমেয়েদের একই শিক্ষা দেওয়া হোক্, ধর ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত; ১১ থেকে ১৬ পর্য্যন্ত মেয়েদের উল্লিখিত বিশেষ শিক্ষার দিকে, এবং সেই সঙ্গে কোন একটি অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা হোক্। তারপরে যে মেয়েরা স্কুল ছাড়্‌বে, তাদের ম্যাট্রিক বা তদনুরূপ কোন শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়ে বিদায় করা হোক্। যারা তদূর্দ্ধে শিখ্‌তে ইচ্ছুক, তারা যদি সংসারাশ্রমে প্রবেশ কর্‌বার আশা রাখে, তাহ'লে পূর্ব্বশিক্ষিত বিশেষ বিষয়ের দু'একটি ইচ্ছামত বেছে নিয়ে তারই উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে' বিশেষজ্ঞ হোক্। আর যারা একাই জীবন সংগ্রামে নাম্‌তে চায় বা বাধ্য হয়, তারা শেষাশেষি ছেলেদের সঙ্গে আবার সমশ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'য়ে সমকক্ষভাবে কোন সাধারণ বা অর্থকরী বিদ্যালাভে যত্নশীল হোক্।

পরিশেষে বক্তব্য এই (আবার পুনরুক্তি মার্জ্জনীয়) যে, শিক্ষার সমস্ত ভার স্কুল-কলেজের ঘাড়ে চাপালে শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। গৃহকেও বিদ্যালয়ের সহকারী হ'তে হবে, উভয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ সুগম রাখ্‌তে হবে। অনেক সুশিক্ষা আছে, যা বাড়ীতে ভিন্ন দেওয়া যায় না; যথা— পারিবারিক সম্বন্ধ-রক্ষা, সামাজিকতা, নীতি, ইত্যাদি; অনেক সু-অভ্যাস আছে যা দৈনিক স্কুলে করিয়ে দেওয়া অসম্ভব; যথা—পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য, সময়জ্ঞান, সুশৃঙ্খলা, ইত্যাদি। আর সর্ব্বোপরি, যার যে ধর্ম্ম, শুধু শুষ্ক উপদেশে নয়, সরল ও সরস দৃষ্টান্তে একমাত্র নিজ নিজ পরিবারেই ছেলেমেয়েদের মনে তার গোড়াপত্তন করা যেতে পারে, যদিও পরবর্ত্তী জীবনে সৎগুরু বা সৎসঙ্গের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয় ছেলে ও মেয়ে দু'জনেরই সমান অধিকার স্বীকার করে'ও, মেয়েদের পক্ষে ধর্ম্মভাব যেন বেশী প্রয়োজনীয় বলে' বোধ হয়। কারণ "সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ," কুসুমাস্তৃত নয়; মেয়েদের মনও অপেক্ষাকৃত কোমল এবং স্পর্শকাতর। অথচ, ঘরের হাল মেয়েদেরই ধর্‌তে হয়, সংসারের শোক দুঃখ তাদেরই বেশী আঘাত করে, পরিবারের অক্ষম আতুরকে তাদেরই তত্ত্বাবধান কর্‌তে হয়। এ অবস্থায় একজন দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়ের উপর তারা সর্ব্বদা নির্ভর কর্‌তে না পার্‌লে অপরকে নির্ভর দিতে এবং সংসারের সব দিক সাম্‌লাতে পার্‌বে কি করে'? এই ধর্ম্মবল আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের ছিল বলে' আমার বিশ্বাস, এবং তাঁদের সেই ত্যাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে যদি এ কালের বিদ্যা ও কর্ম্মের সমন্বয় কর্‌তে পারি, তবেই আমরা সুশিক্ষিতা নামের যোগ্যা হব।

বঙ্গসাহিত্যে দীনেশচরণ

শ্রী ত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম্-এ

তামসী রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সৌদামিনী দীপ্তি পায়, বসুন্ধরার অন্ধ অন্তস্তল ভেদ করিয়াও মধ্যে মধ্যে 'প্রভাতরল জ্যোতিঃ' উত্থিত হয়। জীবন্মৃত জাতির অজ্ঞানতার তিমির-রন্ধ্র-পথে আর একপ্রকার দিব্যজ্যোতি স্ফুরিত হয়—সে জ্যোতি ভাস্বর অথচ কমনীয়, স্নিগ্ধ অথচ রুদ্র, ভীম অথচ কান্ত,—এ জ্যোতি প্রতিভার জ্যোতি, ইহা ভগবানের বিভূতি।

প্রতিভা নবনবোন্মেষশালিনী;—সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ভাস্কর, চিত্রকর সকলেই ইহার অধিকারী। কিন্তু কবি-প্রতিভার উদ্দেশ্য - বিশুদ্ধ, অনাবিল রসসৃষ্টি। তাই কবিগণ সংসার-মরুতে নির্ঝর, অন্ধকারে দীপশিখা, প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে তরণী, প্রাণহীন সমাজ-দেহে গতিশক্তি। তাঁহারা উপাস্য, তাঁহারাই উপাসক,—তাঁহারা সাধ্যবস্তু, তাঁহারাই সাধক।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় যে সকল কবি আপনাদের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের

প্রায় সকলেরই কণ্ঠ নীরব হইলেও তাঁহাদের সে সঙ্গীতের সুধাময় প্রবাহ এখনও বাঙ্গালীর প্রাণকে সরস ও সজীব রাখিয়াছে। বাঙ্গালী এখনও যেন অন্তরীক্ষ হইতে বিস্মিত মুগ্ধ চিত্তে তাঁহাদের সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতির ক্রীড়াকুঞ্জে যিনি লালিত-পালিত, —উন্মুক্ত নীলাম্বর-তলে, শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে, বিহগের কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, মলয়ানিলের শিহরণে যাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিকাশ, সেই দীনেশচরণ আজ বিস্মৃতপ্রায়। যে 'শ্রীবাড়ী'র (মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত পল্লী—দীনেশচরণের জন্মস্থান) পল্লীপ্রাঙ্গণে বসিয়া তিনি আপনার প্রাণের সমস্ত সম্পদ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, আজ সেই 'শ্রীবাড়ী'বাসীরাও তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে। একদিন যাঁহার কণ্ঠ বাংলার সাহিত্য-গগন মুখরিত করিয়াছিল—যাঁহার প্রতিভা বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্নকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল, আজ তিনি বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছেন। বাণীর আদরের দুলাল, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক দীনেশচরণ অস্ততোরণমূলে চিরবিশ্রামলাভ করিয়াছেন, আব বাঙ্গালী গত শতাব্দীর সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস হইতে একজন সিদ্ধ সাধকের নাম নির্দ্দয়ভাবে মুছিয়া ফেলিতেছে।

একদিন বাঙ্গালী দীনেশচরণকে চিনিত—সঙ্গীত-রচয়িতা দীনেশচরণকে চিনিত, কবি দীনেশচরণকে চিনিত, ঔপন্যাসিক দীনেশচরণকে চিনিত। দীনেশচরণের প্রায় প্রত্যেকটি গীতি ভক্তিরসাত্মক অথবা স্বদেশপ্রেমমূলক। ভক্ত দীনেশচরণ কখনও পূজামন্দিরের দ্বারে আরতিতে রত থাকিতেন, কখনও বা শান্ত-রসাত্মক গীতি আপন মনে গাহিতেন, কখনও বা স্বদেশপ্রেম তাঁহার সঙ্গীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার গীতিতে স্বদেশ-প্রীতি কিরূপ উচ্ছ্বসিত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব :—

পূরবী—আড়া

এ সুখ-সন্ধ্যায় আজি জাগ রে নিদ্রিত মন।
আশার কুসুম তুলি' গাঁথ মালা সুচিকণ।
ভারত-উদ্যানে কত, ফুটি' পুষ্প শত শত,
অকালে পড়িল খসি', স্মরিলে কাঁদে পরাণ।
নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-ঝঙ্কার
নীরব বাল্মীকি বীণা, নীরব কবি-কানন।
নাহি গাণ্ডীব-টঙ্কার, নাহি সে বীর-হুঙ্কার,
কালনিদ্রা-কোলে আজি জীবকুল অচেতন।
ভারত-জননী, শোকে তাপে বিষাদিনী,
তুমি কি মন এ সময়ে ঘুমে রবে অচেতন॥

(বাঙ্গালীর গান হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭১২-১৩)

দীনেশচরণের এই স্বদেশ-প্রীতি আমরা তাঁহার 'কবিকাহিনীতে' বিশেষরূপে পরিস্ফুট দেখিতে পাইব।

দীনেশচরণ মোটের উপর চারিখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'মানস-বিকাশ, 'কবিকাহিনী' ও 'মহাপ্রস্থান' তাঁহার কাব্য-গ্রন্থ; 'কুলকলঙ্কিনী' তাঁহার সামাজিক উপন্যাস। তরুণ কবি দীনেশচরণের 'মানস-বিকাশ' সম্বন্ধে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' 'পূর্ব্ববঙ্গের কবি দীনেশচরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। (মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—"কবির বাক্‌শক্তি এবং পদবিন্যাসশক্তি প্রশংসনীয়।" বঙ্কিমচন্দ্র যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কবির প্রগাঢ় ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'কবিকাহিনী'র কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

(ক) স্বদেশপ্রেমাত্মক কবিতা। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন 'সুজলাং সুফলাং' বলিয়া আপনার মর্ম্ম-বীণায় করুণ সঙ্গীতধ্বনি তুলিয়াছিলেন, সেদিন মায়ের নূতন মূর্ত্তি আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল। তারপর, হেমচন্দ্র 'বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে' বলিয়া শিঙ্গা বাজাইয়া বাংলার আকাশ, বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক দীনেশচরণ নীরব পল্লীর নিভৃত কুঞ্জে আপনার হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন। সে ঝঙ্কারে একদিন বাঙ্গালী সাড়া দিয়াছিল, সে সঙ্গীতধ্বনি একদিন বাঙ্গালীর কর্ণে পেঁছিয়াছিল। তাঁহার 'উদাসীনের বিদায়,' 'বাঙ্গালীরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে', 'ধবলশিখরে,' 'জাহ্নবী,' 'আর্য্যনাম' প্রভৃতি কবিতা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, দীনেশচরণ স্বদেশকে কিরূপ আন্তরিক ভালবাসিতেন।

সোনার ভারতের দুর্দ্দশাদর্শনে কবির হৃদয়ে নবদীপক বাজিয়া উঠিয়াছে, তিনি গাহিতেছেন :—

"ভারতের আর সেদিন কি হবে !
আর্য্যের গৌরব—মেঘাবৃত রবি,—
আবার হাসিয়া গগনে উদিবে !
ভারতের কোলে বীর পুত্রগণ,
শোভিবে যেন রে জলন্ত তপন।"

আর্য্যের পূর্ব্ব গৌরব-স্মরণে যেমন কবির শিরায় শিরায়, প্রতি ধমনীতে রক্তস্রোত দ্রুতবেগে নাচিয়া উঠিয়াছে, তেমনি এই পরাধীন পর-পদদলিত জাতির প্রতিও কবির দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তিনি আর্য্য জাতিকে সম্বোধন করিয়া সিংহনাদে বলিতেছেন :—

"তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান ?
যা'র বাণে শিলা হ'ত খান খান,
যার হুহুঙ্কারে দিগন্ত কাঁপিত,
কোদণ্ড-টঙ্কারে জলধি গর্জ্জিত ;
বিরাট মূরতি মহা তেজীয়ান,—
তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান ?"

(খ) ব্যঙ্গকবিতা (satire)। দীনেশচরণ ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ভক্ত রজনীকান্ত যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিগলিত হইতেন, তখন যেমন তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত গাথা সুধা বর্ষণ করিত, তেমনি আবার তাঁহার সরস সঙ্গীতে আমরা নির্ম্মল, শুভ্র সংযত হাস্যের আস্বাদন করিতাম। ভক্ত দীনেশচরণও রসিকতায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দীনেশচরণের ব্যঙ্গকবিতা গোবিন্দ-দাসের ব্যঙ্গকবিতার ন্যায় তীব্র গরলবর্ষী নহে,—তিনি ধীর, স্থির, সংযতভাবে সমাজের দোষরাশি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। 'বাঙ্গালী,' 'বাঙ্গালীর শরশয্যা' প্রভৃতি রচনা ব্যঙ্গকবিতার মধ্যে পরিগণিত। কবি নিরীহ বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম্মভাব দর্শনে তাহাকে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন :—

"যখন শ্বেতাঙ্গ শ্বেত মুষ্টির আঘাতে
বাঙ্গালীর রক্তপাত করে বিধিমতে,
তখন বাঙ্গালী যদি শত্রুর চরণ
নয়নের পুতলীরে করে প্রক্ষালন ;
ভাবি' দেখ সেই কর্ম্মে কত ধর্ম্মভাব !
যাহার অন্তরে সদা ক্রোধের অভাব
সে কিহে সামান্য লোক ? শুনিয়াছি বেদে
অহিংসা পরমধর্ম্ম ; সেই উক্তি হৃদে
জাগরূক নিরন্তর ; সেই ভাবে চলে,
শত্রুরে পরাস্ত করে দয়ার কৌশলে।"

আবার কখনও বাঙ্গালীজাতির পরাণুকরণপ্রবৃত্তিকে শত ধিকার দিয়া বলিতেছেন :—

"পর-ধনে ধনী যেই ধন্য বলি তারে !—
তুমিও তেমতি ধন্য সংসার মাঝারে !
বিলাতি বসন তুমি পরিধান কর,
বিলাতি পাদুকা পায় পর নিরন্তর,
বিলাতি পুস্তকে তব জ্ঞানের উদয়,
বিলাতি লেখনী ল'য়ে লেখ সমুদয়,
বিলাতি দর্পণে মুখ কর নিরীক্ষণ,
বিলাতি সুগন্ধি কর মস্তকে লেপন ;
পরম সৌভাগ্য তব, ভবরঙ্গাগারে
ধনাঢ্য ভিখারী তুমি ! কে পায় তোমারে !"

(গ) প্রেম-সঙ্গীত (love poems)। 'প্রেম-সম্মিলন', 'বিরহিণীর স্বপ্ন' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতার অন্তর্গত। তাঁহার প্রেম বার্ণসের বা গোবিন্দদাসের কবিতার ন্যায় sensualistic নহে—ইহা গভীর অতলস্পর্শ। ভারতের মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন :—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরণুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"
(উত্তররামচরিত, প্রথম অঙ্ক)

আর কবি দীনেশচরণ প্রেমের গভীরতা ও উজ্জ্বলতা বুঝাইবার জন্য 'মালোপমা'র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন :—

'দূর্ব্বাদলে যথা শিশির বিমল,
অন্ধকারে যথা চাঁদের কিরণ,
সিন্ধুগর্ভে যথা মুক্তা নিরমল,
এ সংসারে প্রেম ! তুমিও তেমন।"

এ ভালবাসায় হেমচন্দ্রের বা গোল্ডস্মিথের কবিতার ন্যায় নৈরাশ্যব্যঞ্জক সুর (pessimistic tone) নাই,—কবি দীনেশচরণ হেমচন্দ্রের মত বলিয়া উঠেন নাই :—

"এই যে ভালবাসা-ভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার।"
(চিত্ত-বিকাশ, ভালবাসা)

এ ভালবাসায় মাধুর্য্য আছে—দংশনও আছে, চন্দ্রের কৌমুদীও আছে,—আবার কলঙ্কও আছে, মিলনও আছে, —আবার বিরহও আছে। বিরহ সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন :— 'বিরহ বিনা তন্ শূন্ হায় বিরহ হায় সুলতান।' দীনেশচরণের 'বিরহিণীর স্বপ্নে' বিরহিণীর বেদনা উচ্ছ্বসিত ও মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটির ভাষাও যেন বিরহ-বর্ণনার সম্পূর্ণ উপযোগী। বাস্তবিক মিলন ও বিরহ বর্ণনায় কবি সমান সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

(ঘ) দার্শনিক তত্ত্বমূলক ও ভক্তিমূলক কবিতা। বাংলার কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

"কে জানে রে কালী কেমন,
যাঁ'র ষড় দর্শনে না পায় দরশন।"

কিন্তু ষড়্দর্শন যেখানে নীরব, ভক্তি সেখানে উজ্জ্বল দীপশিখা তুলিয়া ধরে। ভক্তের নিকট দর্শনের সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার নিরক্ষর কবিটি পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। তাই তাঁহাদের কবিতায় যে তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা মিল্টনে নাই, বায়রণে নাই, সেক্সপীয়রে নাই। দীনেশচরণের 'গঙ্গাজলে গলিত শব' নামক কবিতায় গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা কেমন সুন্দর পরিস্ফুট হইতেছে দেখুন :—

"হে শব, একটি তত্ত্ব তোমারে সুধাই ;—
মানবেরা অন্ধ যথা নয়ন থাকিতে,
তুমিও এখন কিহে রহিয়াছ তাই?
এখনও কি ভবিষ্যৎ পার না দেখিতে?
যেই যবনিকা মোরা তুলিতে অক্ষম,
কিংবা তুমি তুলি' তারে ধীরে ধীরে ধীরে,
নবীন রাজ্যের নব শোভা অনুপম
হেরিয়া ভাসিছ সুখ-সাগরের নীরে?"

এই কবিতাটি শান্ত ও বীভৎস রসের অপূর্ব্ব সমাবেশ, —কবির গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। "শারদীয় উৎসব" কবিতাটিতে কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্গোৎসব যে কি, তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, অধিকারও নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাই ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী জননীর স্তব করিয়াছেন এবং ভারতমাতাকে 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। মধুসূদন তাই মেঘনাদবধের পর লঙ্কার অবস্থা বর্ণনাকালে বলিয়াছেন :—

"বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে।"

আর তাই কবি দীনেশচরণ "শারদীয় উৎসব" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন :—

"এই চিত্রখানি বাঙ্গালীর ধন।
স্বদেশে বিদেশে সকল সময়
এই চিত্রখানি করিয়া স্মরণ
দুখ-জর্জ্জরিত হৃদয় জুড়ায়।
রোগের শয্যায় বিদেশে শুইয়া
এ চিত্রের কথা ভাবি মা যখন,
জ্যোতির্ম্ময়ী কত মুরতি আসিয়া
নীরবে শিয়রে দাঁড়ায় তখন।"

আমরা এখানে বলিতে বাধ্য যে, হেমচন্দ্রের 'দুর্গোৎসব' শীর্ষক কবিতায় (কবিতাবলী) এমন প্রাণের উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হয় নাই।

কবি দীনেশচরণের কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। 'ভারত-সঙ্গীতে' হেমচন্দ্র যেমন

"কোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত,—অন্য কব কি?

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

তেমনি দীনেশচরণ 'বাঙ্গালীরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন :—

"বহুদূরে, প্রিয় ভারত ছাড়িয়া,
নীলাম্বু-হৃদয়ে বসেছে জাগিয়া,
আমেরিকা—যা'র সেদিন জনম,
সো... ীন যাহার অধিবাসিগণ,
'ক্যা... া'তে কাটিত নীল তরঙ্গে,
জাগিল জর্ম্মানি কেশরী যেমতি,
নিদ্রা ত্যজি' উঠে, ভীষণ মূরতি,
জাগিল জাপা... , রুসিয়া জাগিল,
প্রতাপে পৃথিবী অস্থির হইল,
বাঙ্গালীরা ঘুমে র... কি বঙ্গে ?"

কবিবর হেমচন্দ্র একদিন ভারতরমণীর দুর্দ্দশা দর্শনে বলিয়াছিলেন :—

"অরে কুলাঙ্গার—হিন্দু দু... াচার—
এই কি তোদের দয়া—সদা... চার ?
হ'য়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সা... র—
রমণী বধিছ পিশাচ হ'... য় ?"

আর বিধবার দশা দর্শনে তাঁহার প্রাণের তন্ত্রীগুলিতে করুণ ক্রন্দন জাগিয়া উঠিয়াছিল :—

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে !
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে !"

দীনেশচরণের প্রাণের ক্রন্দন যেন আরও তীব্র—আরও আরও ব্যাকুল—

"এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো !
বিধবার চিত্ত হায় ! ঘোর মরুভূমি প্রায়,
বারিশূন্য, ছায়াশূন্য, সদা ধূধূ করে লো !
একদিন দুইদিন নহে, শ্যামা চিরদিন,
যতদিন ধূলায় না এ দেহ মিশায় লো !
এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো !
"আশা মরীচিকা শ্যামা, বিধবারে তোষে না,
ভবিষ্যের অন্ধকারে, ক্ষণেক তুষিতে নারে,
একটিও ক্ষুদ্র তারা ঝিক্‌মিক্‌ করে না ;
যখন হতাশে হায়, প্রাণ যেন ফেটে যায়,
তখন(ও) তাহারে কেহ বুঝাইতে পারে না।
আশা-মরীচিকা শ্যামা, বিধবারে তোষে না !"

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের কলিকাতা আগমনোপলক্ষে দীনেশচরণ 'জাগো মা আমার' শীর্ষক যে কবিতা রচনা করেন, উহার সহিত হেমচন্দ্রের 'ভারত-ভিক্ষা' কবিতার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা ভাবিতেছেন, উভয়ের কবিতায়ই স্বদেশ-প্রেম পরিস্ফুট হইতেছে। শুনিয়াছি, তখন যুবরাজের আগমনোপলক্ষে শ্রেষ্ঠ কবিতা-লেখককে পুরস্কার দেওয়া হইবে, ঘোষণা করা হয়। তদুপলক্ষে দীনেশচরণ, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র কবিতা রচনা করেন। অবশ্য নবীনচন্দ্রের কবিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, সুতরাং তাঁহার ভাগ্যেই পুরস্কার লাভ ঘটে।

দীনেশচরণের কবিতা তৎকালে সর্ব্বসাধারণকে কিরূপ মোহিত করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে এস্থলে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। দীনেশচরণ যখন ময়মনসিংহে হার্ডিঞ্জ স্কুলে ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়ে জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ সম্পাদিত 'বাঙ্গালী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুবিখ্যাত 'বান্ধব' পত্রিকারও তখন সূত্রপাত হয়। দীনেশচরণ উভয় পত্রিকায়ই প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তখন নর্ম্মাল স্কুলের প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ছাত্র দীনেশচরণের কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই অভিনন্দনে কবিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, 'ওই দেখ পূর্ব্ববঙ্গে উদিছে দিনেশ।' দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ কবিতাটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহা হউক দীনেশের জ্যোতি ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। 'বঙ্গদর্শনে'ও তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। তিনি স্বয়ং "ঢাকা বার্ত্তা" "ঢাকা প্রকাশ" প্রভৃতি পত্রিকা কিছুদিন অতি কৃতিত্ব সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

কবি পরিণত বয়সে 'কুলকলঙ্কিনী' নামে একখানা

উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বর্ণনার চমৎকারিত্ব আছে, মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ আছে, ঘটনার বৈচিত্র্য আছে, সংযত হাস্যরস আছে। 'কুলকলঙ্কিনী' মোহিনীর পরিণাম গ্রন্থকার এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সে পাঠকগণের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লয়। পাশাপাশি বালবিধবা বসন্তের চরিত্র অতি মনোরম হইয়াছে। বসন্তের যখন পদস্খলন হইতেছিল, তখন সে কিরণচন্দ্রের আত্মসংযমগুণে আত্মরক্ষা করিতে পারিল,—আর কুলবধূ মোহিনী, কিরণচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র ভ্রাতার প্ররোচনায় আপনাকে কলঙ্কসাগরে ডুবাইয়া দিল,—এই উভয় চরিত্র পাশাপাশি চিত্রিত হইয়াছে। "টেলিগ্রাফ মাসীর" চরিত্র অতি উপাদেয় ও উপভোগ্য অতুলৈশ্বর্য্য-শালী মহেন্দ্র চৌধুরীর ভাগ্যবিপর্য্যয় বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, দানবের অবতার লোকনাথ ও তাহার সহচর কৃষ্ণকান্তের চরিত্র ঘৃণোদ্দীপক। শিশুচরিত্র ও স্ত্রীচরিত্র-বিশ্লেষণেও গ্রন্থকার অত্যন্ত নিপুণ।

গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন, "রমণীর হৃদয় বড় অদ্ভুত গ্রন্থ; উহার মর্ম্মভেদ কেহই কোন যুগে করিতে পারে নাই, পারিবে না। (কুলকলঙ্কিনী, পৃঃ ৫৯) ইহা "স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" বাক্যের প্রতিধ্বনি। কি উদ্দেশ্যে জানি না, গ্রন্থকার রমণীকে দেবী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, দানবী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে মনস্তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, কুলকলঙ্কিনীর কতিপয় স্থান হইতে আমরা তাহা প্রমাণ করিব।

পরম সম্পদশালী মহেন্দ্র চৌধুরীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন:—"উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে না পারিলে ক্ষতি নাই কিন্তু আরোহণ করিয়া সহসা ভূপতিত হইলে অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়। বিদ্যুৎ স্ফুরণের পর অন্ধকার বড়ই ভীষণ, সৌভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য মর্ম্মান্তিক কষ্টদায়ক।" (ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ৯৮, রমণীর মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে গ্রন্থকার অন্যত্র বলিতেছেন, "এমন ঐশ্বরিক, স্বর্গীয়, পবিত্র, মধুর, কোমল, কঠিন, জটিল, কুটিল, অভেদ্য, রহস্যময় পদার্থ এ সংসারে দেখিলাম না। জন্মান্ধ হইয়া বেদ বেদাঙ্গ, দর্শন-পুরাণ, ন্যায়-স্মৃতি অধ্যয়ন করিতে সাহস কর, বধির হইয়া বীণাসম্ভূত মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে যত্ন কর, খঞ্জ হইয়া ধবলগিরির অভ্রস্পর্শী শিখরে বিহার করিতে বাসনা কর, কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও ইহার জটিলতম রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে চেষ্টা করিও না। প্রশান্ত মহাসাগরেরও সীমা আছে, বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শেরও তল আছে, কিন্তু এই মহাসমুদ্রের অন্ত নাই, তল নাই।" (কুলকলঙ্কিনী, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, ১২৪ পৃঃ) কুলকলঙ্কিনীর হৃদয়েও যে স্বর্গীয় কৃতজ্ঞতার ছায়া পড়িতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, "অস্পৃশ্য পঙ্ক হইতেও পদ্মের ন্যায় এমন নয়নরঞ্জন পুষ্প জন্মে।" (কুলকলঙ্কিনী, ঊনষষ্টিতম অধ্যায়, ২৬৬ পৃঃ) আমরা আর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ও পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দীনেশচরণের উপন্যাসে আমরা বহুস্থানে কবির এইরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই।

দীনেশচরণের উপন্যাসে দুই এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয়। 'কুলকলঙ্কিনী'র একাদশ অধ্যায়ে "coming events cast their shadows before" দেখিয়া আমাদের কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়ে। ইহার এক-ত্রিংশ অধ্যায়ে বসন্তের মনোরাজ্যে "হাঁ" ও "না"র দ্বন্দ্ব পাঠ করিয়া "কৃষ্ণকান্তের উইলের" সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বের কথা মনে হয়।

'কুলকলঙ্কিনী' সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস নহে। ইহার প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে ঘটনাবলী সুন্দররূপে বিন্যস্ত হয় নাই, উপাখ্যানভাগের সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই, মধ্যে মধ্যে যেন কিছু ফাঁক (gap) রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—চরিত্রগুলি যেন মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অস্বাভাবিকতা বিংশ শতাব্দীর পাঠকবৃন্দের নিকট যেরূপ গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেরূপ হইত না। এই সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও যে 'কুলকলঙ্কিনী' একখানি উপাদেয়, উপভোগ্য উপন্যাস, তাহা, যিনি উহা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন।

পরিশেষে যুক্তকরে তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা বলি—"হে সাধক! আজি

আমরা তোমার পূজার অন্ত অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছি, তুমি গ্রহণ কর। আবার তুমি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে প্রাণে তেজ দাও, মনে বল দাও, হৃদয়ে উৎসাহ দাও, কর্ম্মে প্রেরণা দাও, চিন্তায় স্ফূর্ত্তি দাও। অগ্নিমন্ত্রে তুমি দীক্ষিত ছিলে,—সাহিত্য-সাধনায় তুমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে,—অন্তরীক্ষ হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর,—আমরাও যেন তোমার ন্যায় বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। আজ আমরা ভক্তিবিহ্বলচিত্তে তোমার চরণে বারংবার প্রণাম করিতেছি।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

শ্রীরবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম আমি ষ্টেনোগ্রাফার হইয়াছি এবং দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছি। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত ব্যাপার নহে। মহাভারতে ইহার নজীর আছে, এবং অধুনা পণ্ডিতদিগের গবেষণায় প্রকাশ পাইয়াছে যে কিম্পুরুষবর্ষের লাগোয়া উত্তরে এবং উত্তরকুরুর ঠিক লাগায়া দক্ষিণেই স্বর্গের অবস্থান। তা ছাড়া, এটা স্বপ্ন, মনে রাখিবেন। আর এত জিনিষ থাকিতে কবিত্বহীন নীরস ষ্টেনোগ্রাফার হইতে গেলাম কেন তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তাঁহারা ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি আকারে কি সমস্ত লিখিয়া থাকেন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাহা কিছু বুঝিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি নিত্য বাড়িয়া যাইতেছে! সুতরাং ফ্রয়েডীয় মতবাদ অনুসারে ষ্টেনোগ্রাফারদিগকেই বোধ হয় অজ্ঞাতসারে আমার আদর্শ খাড়া করিয়া থাকিব, এবং সেই জন্যই আমার ষ্টেনোগ্রাফার হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। দেখিলাম স্বর্গে বিরাট কবি-জনসভা আহুত হইয়াছে। গৌড় দেশের প্রাচীন ও নবীন, জীবিত ও মৃত অনেক কবিকেই সেই সভায় দেখিলাম। বিভিন্ন যুগের কবির বিভিন্ন যুগোচিত পরিচ্ছদগুলি সত্য সত্যই এক অভিনব সমাবেশের সৃজন করিয়াছিল। কাহারও কাহারও মাথায় পাটের "পাছুড়া", কেহ বা মুণ্ডিতমস্তক এবং গৈরিক বসনধারী, কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া নামাবলী জড়াইয়া আছেন, কেহ বা বণ্ড্‌ষ্ট্রীটের মূল্যবান ইংরাজী পোষাকে দোদুল্যমান, আবার কেহ কেহ বা রেশমের পাঞ্জাবী ও উত্তরীয় পরিয়া আসিয়াছেন। ঠিক মাঝখানে, যখানে বাগ্দেবী সরস্বতী প্রস্ফুটিত কমলদলে তাঁহার অমলশুভ্র শ্রীচরণ স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, সেইখানে বাগ্দেবীর চরণছায়ায় চন্দনলিপ্ত কুসুমশোভিত আসনে বসিয়া আছেন আমাদেরই চিরবরেণ্য মহাকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ। শুনিলাম অদ্য তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হইতেছে—তাই দেবরাজের সাদর আমন্ত্রণে স্বর্গের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সশরীরে আসিয়াছেন।

সভারম্ভে দেবরাজ ইন্দ্র সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "হে সমাগত বিভিন্ন যুগবর্ত্তী কবি-জনমণ্ডলী! আপনাদের বিভিন্ন যুগোচিত পরিচ্ছদ দেখিয়া আমারই হাস্য সম্বরণ করা দায় হইয়া পড়িতেছে (উচ্চহাস্য)। আপনাদের পরস্পরের ভাষাও আপনাদের নিকট সুখবোধ্য নহে। আপনারা সকলেই এক জাতি—সকলেই বাঙ্গালী। পূর্ব্বে স্বর্গরাজ্যে আমরা সংস্কৃত ভাষাতেই কথোপকথন করিতাম। দেবাসুর যুদ্ধের সময় দানবদিগকে আমরা যে ভাষায় গালি গালাজ করিতাম তাহা খাঁটি সংস্কৃত ভাষা। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে আমরা সংস্কৃত একটু একটু করিয়া ভুলিতে সুরু করিলাম। কালিদাস আসিয়া আমাদের মুখে ভুল সংস্কৃত শুনিয়া অহরহঃ মূর্চ্ছান্বিত হইতেন। আমরা উত্তরোত্তর সংস্কৃত একেবারে ভুলিয়াই যাইতেছিলাম, তখন জয়দেব আসিয়া

আমাদের আবার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ধরাইলেন। কিছুকাল এই ভাবে চলিবার পর ক্রমে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আসিয়া আমাদের বাঁচাইলেন। আমরা তাঁহাদের "জনু" "কানু" সমন্বিত মৈথিলী বাংলা ভাষাতে মজিয়া গেলাম; আমার আজিকার ভাষা দেখিয়াই আপনারা আশা করি বুঝিতে পারিতেছেন যে বর্ত্তমানে আমরা ব্যাকরণসম্মত কেতাবী বাংলা ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকি। ভাষার এই যে বিভিন্ন পরিবর্ত্তন বর্ণনা করিলাম এর সঙ্গে ভাবেরও পরিবর্ত্তন অসম্ভব রকমে ঘটিয়াছে। ভাষাই শুধু উৎকর্ষ-লাভ করে নাই, ভাবও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া আসিয়াছে। এই ক্রম-বিকাশের ধারাকে আজ আপনাদের সম্মুখে পরিস্ফুট করিব। আজি যিনি আমাদের ক্ষণিকের অতিথি সেই মহাকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমস্ত দেশের মৃত কবিই বাঁচিয়া আছেন; সমস্ত প্রাচীনকালের ভাবধারা আসিয়া তাঁহাতেই মিলিত হইয়াছে। তিনি সমস্ত প্রাচীন কবি-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, সমস্ত আধুনিক কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবি, এবং তাঁহার সমান কবি ভবিষ্যতে আর জন্মগ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহস্থল। তিনি শুধুই কবি নহেন, তিনি স্বয়ং একটা বিপুল জগৎ। তিনি তাঁহার কল্পনার মধ্যে এমন এক সাম্রাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মর-জগতে এবং অমর-জগতে যাহার তুলনা নাই। পৃথিবীতে এমন কোনও রূপ নাই, রস নাই, বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, ছন্দ নাই, গতি নাই,—যাহা তাঁহার লেখনীর সাধনায় মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। মানবহৃদয়ে এমন কোনও প্রেম নাই, বিরহ নাই, ভাব নাই, অনুভূতি নাই, ব্যথা নাই, অভিব্যক্ত নাই, যাহা তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার বলে তাঁহার বিরাট কাব্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিয়াছেন। শুধু অতীত এবং বর্ত্তমান লইয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন; তাঁহার দৃষ্টি দিগন্তপ্রসারী, যুগান্তপ্রসারী। তিনি দ্রষ্টা, তিনিই ঋষি। তাই ভবিষ্যৎ মানবসন্তানের জন্য তিনি যে সকল অমূল্য সম্পদ রাখিয়া যাইবেন তাহার তুলনা নাই। আজ তাঁহার শুভ জন্মদিনে আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি, তিনি শত বৎসর সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যান। তাঁহার জন্মতিথিকে স্মরণীয় করিবার জন্য আমরা এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। তাঁহার রচিত "সন্ন্যাসী উপগুপ্ত" আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। আমার অনুরোধে উপস্থিত কবি-জনমণ্ডলীর প্রাচীনতম কবি হইতে আরম্ভ করিয়া যুগানুক্রমিক এক এক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি একে একে আসিয়া উক্ত কবিতার এক একটি অংশ তাঁহারা যে ভাষায় লিখিতেন সেই ভাষায় রচনা করিয়া যাইবেন। সেই সমুদায় রচনার সমষ্টি এই স্বয়ংসিদ্ধ ষ্টেনোগ্রাফার মহোদয় (আমি "স্বয়ংসিদ্ধ" কথাটিতে একটু চটিলেও শির নত করিয়া আদেশপালনে স্বীকৃত হইলাম) লিখিয়া লইয়া জনসমাজে প্রচার করিবেন। আজি পৃথিবীর নানাজাতির জীবিত কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সুধীবৃন্দ রবীন্দ্র-নাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস স্মরণীয় করিবার মানসে এক মধুচক্রের সৃজন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের মৃত কবিদিগেরও সেরূপ কিছু একটা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই আমি এই প্রস্তাব করিতেছি। কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ যখন স্বয়ং এই সভা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন তখন তিনি সবশেষে কয়টি পংক্তি স্বয়ং আবৃত্তি করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিবেন। আর একটি কথা বলিবার আছে। আপনারা সকলেই ত আপনাদের পরিতৃপ্ত হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য বিশ্বকবির সম্মুখে অর্পণ করিবার সুযোগ পাইবেন, কিন্তু আমি ত আর কিছুই করিতে পারিলাম না। তিনি তাঁহার অমর লেখনীর শক্তি দিয়া আমার হৃদয় জয় করিয়াছেন। যে স্বর্গের সিংহাসন মহাপরাক্রান্ত অসুরদিগকে ছাড়ি নাই, আজি আমি স্বেচ্ছায় তাহা ত্যাগ করিলাম, এবং আমার চিরবরেণ্য কবিকে সেই স্বর্গসিংহাসনে বসাইয়া আমার রাজকীয় ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম। এখন আপনারা আমার আদেশ-পালনে তৎপর হউন। - হতাশ হইবেন না, ইহার পর জল-যোগেরও ব্যবস্থা আছে।"

অতঃপর প্রাচীন কবি রামাই পণ্ডিত হইতে সুরু করিয়া সর্বশেষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মিলিয়া যে রচনাসমষ্টি উচ্চারণ করিলেন, আদেশানুক্রমে আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। কিন্তু জলযোগের কথাটা বাদ দিলে চলিবে না। অমৃতের ভাণ্ড দেবতারাই নিঃশেষ করিলেন,—আমাদের জন্য ব্যবস্থা হইল লিপ্‌টনের চা। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সহৃদয়া সম্পাদিকা মহোদয়া এ সম্বন্ধে কাগজে কিছু লেখালেখি করিবেন কি?

সর্ব্বপ্রথমেই রমাইপণ্ডিত সুর করিয়া ধরিলেন—

"মথুরা নগর যেন মরতে মন্দার।
সেতা যত বৈসে ধনী আনন্দে অপার॥
ছিষ্টি খিতি পাতাল আকাস আঁবর।
হেন ঠাঁঞি নাছিল কাঁহাত পুরঃসর॥
সেথা এ ভরমন্ বসে গাঙুর সোসাঞি।
উপগুপ্ত নিন্দ গেল মাড়ালের ঠাঁঞি॥
নমঃ নমঃ শ্রীধম্ম গোঁসাঞি।
কথারম্ভ করই শ্রীপণ্ডিত রমাই॥"

তারপর চণ্ডীদাস কীর্ত্তনের সুরে ধরিলেন—

"আঁধার রজনী মেঘের ঘটা
পথিক চলে না বাটে।
আঙিনার মাঝে শাওন ঝরিছে
প্রেমিক পরাণ ফাটে॥
হায় কি আর কহিব আমি।
শ্যাম বঁধুরূপ নীরদস্বরূপ
জাগে মনে দিনযামী॥
সন্ন্যাসীবর কিবা সে নাগর
কিবা সে সোনার অঙ্গ।
নিদে অচেতন মোহন নয়ন
বিজুরী থির তরঙ্গ।
রুণু ঝুনু ঝুনু মোহন নূপুর
সহসা বাজিল বুকে।
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল
আলোক পড়িল মুখে॥
চাহে মুখ তুলি ননীর পুতলি
বেদনা নাহিক গণে।
নয়নের কোণে সরম জাগিল,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥"

তারপর বিদ্যাপতি গাহিলেন,—

"তিমিরমগন দিশি নিশি আঁধিয়ারি।
শাওন গগন ঘিরি বিজুলী বিথারি॥
নগর নটীর দল চলে অভিসারে
নব যৌবনমদে মত্তা।
আঁচল সুনীল ঘন রুণু ঝুনু আভরণ
থমকিল বাসবদত্তা॥
প্রদীপে হেরল বালা চকিত নয়ানে
গৌর নবীন থির কান্তি।
তরুণ বয়ান জনু নন্দসুত কানু
মুখমাঝে ভাতিছে শান্তি॥
তরুণী কহল ধীরে ললিত সুকণ্ঠে
নয়নে বিজড়িত লজ্জা।
কমহ সুকুমার চলহ হামারি ঘর
কঠিন ধরণীতল শয্যা॥
কহে সন্ন্যাসী ধীরে করুণ বয়ানে
অয়ি সৌদামিনীপুঞ্জ।
অবহু হামারি সখি সময় ন আওল
সময়ে যাওব তব কুঞ্জে॥
সহসা ঝঞ্ঝা ঘন তড়িত শিখায়ে
মেলল বিপুল আস্য।
বিদ্যাপতি ভণে প্রলয়শঙ্খ সনে
হাসল দারুণ হাস্য॥"

পরে আসিলেন কৃত্তিবাস,—

"বছরের শেষ হতে আছে কিছু বাকী।
নানাজাতি ফুটে ফুল ডাকে নানা পাখী॥
বাতাস হয়েছে বড় উতলা আকুল।
পথতরু শাখে শাখে ধরেছে মুকুল॥
পারুল বকুল ফুটে রাজার কাননে।
বাঁশীর মধুর ধ্বনি ভাসিছে গগনে॥
জনহীন পুরী রাখি পুরবাসী সবে।
ফুলবনে গেছে চলি ফুল উৎসবে॥
আকাশেতে শশী তারা শোভে চারিভিতে।
কৃত্তিবাস গাহে শুনি লোক আনন্দিতে॥"

তাহার পর শ্রীকবিকঙ্কণ গাহিলেন—

"নির্জ্জন বনের পথে জ্যোছনার আলোকে ত
সন্ন্যাসী একাকী হয় পার।
মাথার উপরে তাঁর বনতরু বীথিকার
কোকিল কুজিছে বার বার॥

এতদিন পরে আজি এসেছে কি সাজে সাজি
সেই মিলনের দিন হায়।
হৃদয় মিশ্রের সুত অযুত সুগুণযুত
শ্রীকবিকঙ্কণ মধু গায়॥"

তখন কাশীরাম দাস উঠিয়া সুর করিয়া পড়িয়া গেলেন—

"নগর ছাড়ায়ে সাধু চলিলা তখন।
বাহির প্রাচীর শেষে করিলা গমন॥

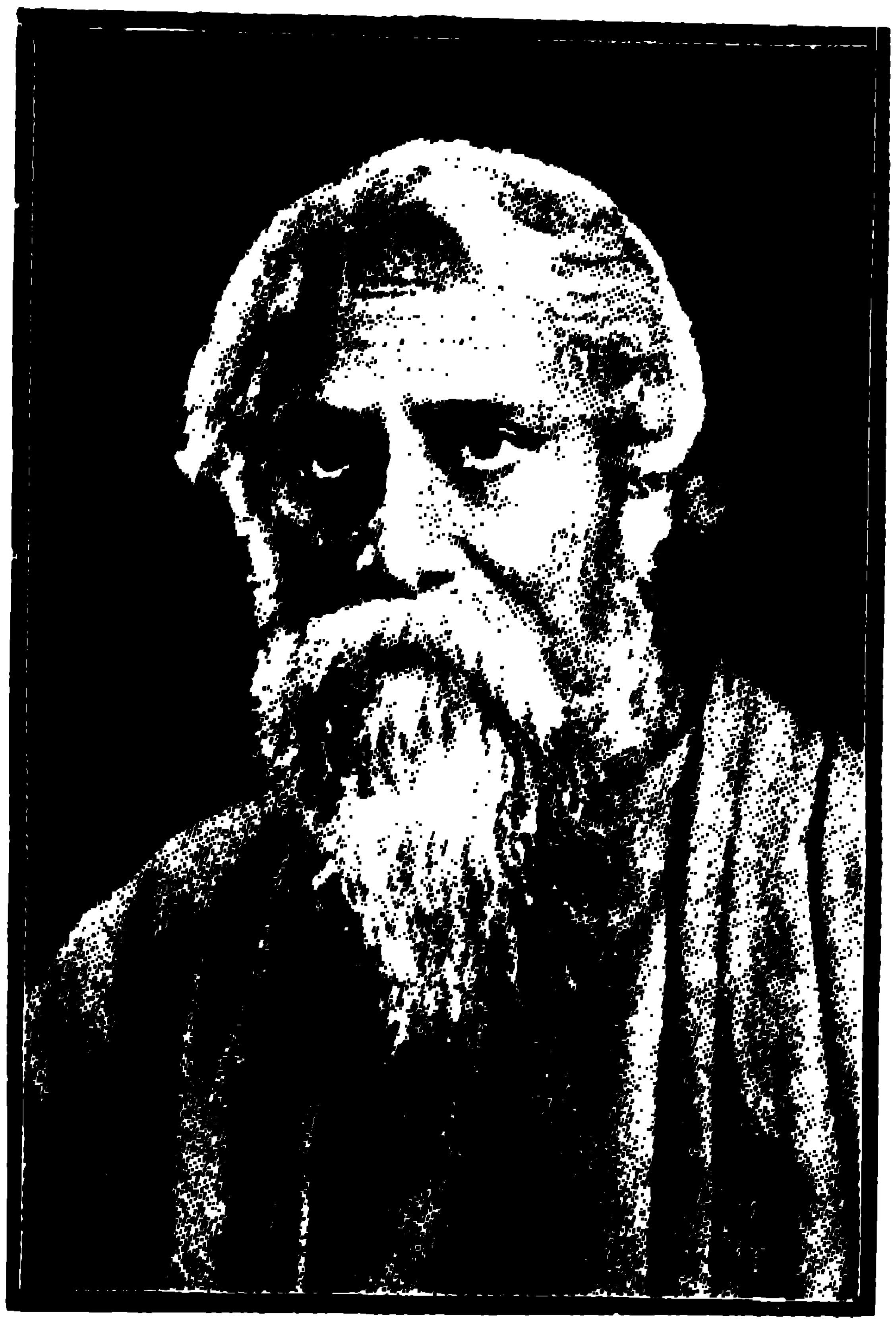

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

দাঁড়াইলা আসি ধীরে পরিখার পারে।
আমের বনের ধারে ছায়ার আঁধারে॥
কে ওই রমণী পড়ি মড়ার সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

এবার কবি ভারতচন্দ্র গাহিলেন—

"একি শঙ্কিত কম্পিত ব্যাধিভরে।
সে ধনী রমণী বুঝি পথে মরে॥
রোগকালী ঢালা নীল দেহজলে।
পুরবাসী জনে গেছে ফেলে চলে॥
হের ফুল্ল ফুলে আসে অলি বঁধু।
যায় ফেলে চলে তার পিয়ে মধু॥
ফুল ঝরি পড়ে হায় ব্যথাভরে।
হেরি ভারত আঁখিতে বারি ঝরে॥"

তারপর আবৃত্তি করিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত—

"ক্রমে ক্রমে আসে কমে সুধাকরকর।
মলয় বিলায় ফুলবাস মনোহর॥
মনোলোভা কত শোভা বনতরু ধরে।
কোকিল গাহিয়ে উঠে কানন ভিতরে॥
সন্ন্যাসী কাছে আসি আড়ষ্ট শির।
নিজ কোলে নিল তুলে বিষাদে গভীর॥
কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত লুপ্ত আজি নাম।
লেখনী কাহারও আজি না জান বিরাম॥

তখন উঠিলেন কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত; ঈষৎ ভগ্নকণ্ঠে গভীর উচ্ছ্বাসে আবৃত্তি করিলেন—

"ভারতি, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি!
কেমনে সন্ন্যাসীবর বন্দ্য নরকুলে
ইরম্মদাকৃতি ব্যাধি নিমেষে দূরিল
মন্ত্রবলে; কাঞ্চন-কঞ্চুক বিভা
বরাঙ্গনা তনু মলিনিল ব্যাধিভারে
অকাল কুটিল শরে, হায়রে যেমতি
নাগপাশ-পাশে রাম দশরথাত্মজ।"

তারপর উঠিলেন কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ পার্শ্বেই ছিল তাঁহার আসন। সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইলেও যশের মুকুট তাঁহার শিরে শোভিতেছিল। তিনি গাহিলেন—

"বসন্তে ফুর্ ফুর্ মসগুল্ বুল্ বুল্
ঝ স্তু ঝর্ ঝর্ সব বকুলের ফুল্।
কুহু কুহু তান ধরি গান করে কোকিলে—
বনতরু মর্ম্মর
ভেসে আসে থর্ থর্
জ্যোছনায় অম্বর হাসি হেরে নিখিলে।"

অবশেষে বংশীধ্বনির মত সুমিষ্ট কণ্ঠে দিগ্বিদিকে

আনন্দের শিহরণ সঞ্চারিত করিয়া আরত্তি করিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়
আজি রজনীতে হয়েছে সময়
এসেছি বাসবদত্তা।"

* * *

সর্বশেষে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। স্বপ্নে স্বর্গে গিয়া গোপন অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছি দেবরাজ ইন্দ্রের একটি "Standing order" আছে যে যে-ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী পাঠ করে নাই তাহার পক্ষে স্বর্গপ্রবেশ নিষিদ্ধ। ভবিষ্যৎ স্বর্গবাসীদের সুবিধার জন্য নীতিবিরুদ্ধ হইলেও এই গোপনীয় কথাটি প্রকাশ করা কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

বিরহিণী

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

এ বিশ্বের নিগূঢ় অন্তরে
এক বিরহিণী
একাকিনী
দিবারাত্রি আছে বসে' জেগে'
কত যুগ-যুগান্তর, অনাদির কোন্ আদি থেকে,
কোটি কোটি কল্পকাল ধরে', কার তরে…
বক্ষে তার
চির বেদনার
অশ্রুনিধি করে টলমল
অতল, উতল…
তাহার তরঙ্গ এসে
উচ্ছ্বসিয়া ভেসে'
শ্রাবণের সমস্ত আকাশ
করে' দেয় আকুল উদাস;
তারি দীর্ঘশ্বাস লেগে'
দিকে দিকে ঝড় উঠে জেগে'—
উন্মাদ অধীর
কালবৈশাখীর
হাহাকারে;
তারি বেদনার অন্ধকারে
অকস্মাৎ নীলাকাশ মেঘে অন্ধকার
কত বার।

চির বিরহিণী—তারি হৃদয়ের ব্যাকুল কম্পনে
ব্যথার কাঁপন লাগে ধরণীর বনে
নিশিদিন,
ধূলায় কাঁপিয়া জাগে তৃণ;
তারায় তারায় কাঁপে বিরহ-বিলাপ…
কেঁপে কেঁপে ফুটে' উঠে কুসুম-কলাপ,
কেঁপে কেঁপে ঝরে' যায়
প্রভাতে সন্ধ্যায়…
ফোটা আর ঝরা ফুল-গন্ধ ল'য়ে কেঁপে
ব'য়ে ব'য়ে বায়ু পড়ে ব্যেপে!

শুধু তায় নহে ওই বাহিরে ও বনে,
মানুষেরো মনে
চিরন্তনী সে ব্যথার
ব্যাকুল সেতার
নিত্য বাজে অনাহত
অবিরত
অশ্রান্ত ঝঙ্কারে;—
সুখের দুয়ারে
দুখ এসে প্রত্যহের বৈরাগীর প্রায়

বিরাগের খঞ্জনী বাজায়—
বিচিত্র গেরুয়া-রাগ গায় ;
মিলনের কপোলের 'পরে
ঝরে' পড়ে
বিয়োগ-বকুল—
বিদায়ের ফুল ;
জীবনের পদ্মপাতা মরণের শিশিরে আকুল !

বিরহিণী চির বিরহিণী—
পাই শুধু অঞ্চল-আভাস, শুনি শুধু অস্পষ্ট কিঙ্কিণী ;
তবু মনে হয়, যেন চিনি,
কোথায় দেখেছি যেন ওরে
কোন্ ভোরে ··
স্পষ্ট কিছু পড়ে নাক মনে,
শুধু ক্ষণে ক্ষণে
মনে হয়, ওরে চিনি যেন ! ..
মনে হয় কেন ?
তবে কি ও আমারই লাগি'
যুগে যুগে কালে কালে রাত্রিদিন জাগি'
আছে চেয়ে অনিমিখ আঁখি
আমারই মুখ পানে
আমারি ধেয়ানে ?···
বরিষার বৃষ্টি-ধোয়া নীলিমার পুটে
ফুটে' উঠে

শরতের সোনালী প্রভাত—
অশ্রুজল-মুছে-ফেলা নীল আঁখি-পাতে
তারি কি আহ্বান-দৃষ্টিপাত ?
শীতের প্রকৃতি—সে কি লুণ্ঠিত মলিন
তারি ধূলি-ধূসরিত দীন
মূর্ত্তিখানি প্রসাধন-হীন ?
বুঝি সে-ই—হেমন্তের শস্যের সোনায়,
বসন্তের বর্ণের উৎসবে,
রাঙা ফুলে, সবুজ পল্লবে
লুকাইয়া রেখে যায়
প্রণয়-ব্যথার লিপিখানি,
গোপন প্রাণের তার বাণী
লিখে' আনি' ;
আবার সে নিদাঘের প্রদীপ্ত শিখায়
কি খেয়ালে অকস্মাৎ
পোড়াইয়া করে ভস্মসাৎ
আপনি যে আপনার লেখা লিপিকায়
কেন হায় !...

হায় বিরহিণী,—
আমারো যে বক্ষ-মূলে
ফণা তুলে
বিরহ-নাগিনী !

মাটির সাকী

শ্রী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দেহে নাই কান্তি মনে নাই শান্তি।

গরীবের এ দুটি অভাব চিরদিনের।

কিন্তু চিরদিনের অভাবও স্বভাবে পরিণত হয় না, একদিন সহিয়া যায় এই মাত্র। এবং তাহাতেও আপশোষ বড় কম নহে!

নিজের একটা অপ্রিয় অকথ্য রূপান্তরের আপশোষ।

ওমনিবাস ট্রেন, ছ'টা সতর মিনিটে ছাড়িয়া বজবজ যাইবে। ট্রেনটি এমনি সংক্ষিপ্ত যে মেয়েগাড়ীর বাহুল্য নাই। গাড়ী ছাড়িবার কয়েকমিনিট পূর্ব্বে উঠিয়া সুশ্রী মেয়েটি ঠিক সামনে শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। মুখের দিকে চাহিবার ইচ্ছাও যেন হয় না। ভয় করে! মনে হয় ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে পাতলা ঠোঁটদুটি শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া উঠিবে, মসৃণ গাল ভাঙ্গিয়া ব্রণের দাগে ভরিয়া যাইবে, ভাসা ভাসা চোখদুটি বুভুক্ষায় মুমূর্ষু পশুর চোখের মত পীড়িত ও সকাতর হইয়া উঠিবে, কপালে দেখা দিবে তেলমাখা চটচটে ঘাম! রূপ দেখিলে দু'চোখ কুরূপের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যায়! কি আতঙ্কেই মিনিটগুলি ভরিয়া উঠিল।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়াইল। লাইনের একদিকে সহরতলী বালীগঞ্জ, অপরদিকে গ্রাম কসবা। আভিজাত্যের ছাপ মারা পিচ বাঁধানো পথটি রেলের গেট পার হইয়াই গোবর আর কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দু'-পাশের দোকানগুলির গ্রাম্য মূর্ত্তির গায়ে সহুরে ভাবের তালি লাগানো—খালি গায়ে বুট-পরা মানুষের মত। কিন্তু এগুলির দিকে চাহিয়া নিত্যই শঙ্করের মনে হয় যে এ রকম একটা দোকান দিতে পারিলেও বুঝি মন্দ হইত না।

ঘোষালপাড়া ছাড়াইলেই শঙ্করের বাড়ী। বাড়ীটি পাকাও বটে দোতলাও বটে কিন্তু যেমন পুরাতন তেমনি ক্ষুদ্র। পথ হইতে দোতলার খোলা ছাদে উঠিবার খোলা সিঁড়ি খানিকটা চোখে পড়ে, মনে হয় চুণবালির বাঁধনহীন কতকগুলি আলগা ইটে পা দিয়া এ বাড়ীর লোকের ঊর্দ্ধগতির প্রয়াস। স্থানটি কিন্তু বেশ ফাঁকা আর পরিষ্কার। বাড়ীর সামনে একটা পুকুর—ছোট কিন্তু জল পচা নয়। দক্ষিণে হাত পঞ্চাশেক মাঠের ব্যবধানে রায় বাহাদুর মহাদেব বোসের বাড়ী। রায় বাহাদুরের অনেক টাকা ছিল বলিয়া এখানে সস্তা জমি কিনিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর এখন বাঁচিয়া নাই, ছেলে সুকান্ত বাপের টাকা ও বাড়ীর মালিক। বড় বড় ঘর তুলিয়া, দামী আসবাবে সাজাইয়া, ছবির ফ্রেমের মত চারিদিকে বাগান করিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা সে বাড়ীটিকে বাসোপযোগী করিয়া নিয়াছে। বাগানের একটা যুবতী ও পুষ্পবতী বকুলিকার ছায়ায় বসিয়া নিত্য অপরাহ্নে সে পত্নী হিমানীর সঙ্গে চা পান করে।

আপিস-ফেরৎ পুকুরপাড় ঘুরিয়া নিজের বাড়ীর দরজায় যাইবার সময়টুকু শঙ্কর ইহাদের দেখিতে থাকে। মৃদু হাসি ও কথার মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার বিরাম, হ্রস্বপদ লোমশ কুকুরটিকে কাছে টানিয়া মাথা চাপড়ানো, আশে পাশে দুই চারিটা বকুলফুলের এলোমেলো বর্ষণ, শঙ্করের চোখে ইহা আর পুরানো হইল না। রোজই তার মনে হয় কলেজ-জীবনে পড়া কবিতাগুলির এক একটি বাছিয়া নিয়া উহারা যেন অভিনয় করে।

চেনা আছে, পরিচয় নাই। ও-পক্ষে আগ্রহের অভাব এ পক্ষে সঙ্কোচের বাধা। কল্পনাতীত উপভোগ্য জীবনটা উহারা কি ভাবে ভোগ করে জানিবার সকরুণ কৌতূহল নিয়া ভাঙ্গা ঘরে শঙ্কর দিন কাটায়।

পয়সার টানাটানি, ছেলেমেয়ের কান্না, আর বিধুর ধুঁকিতে ধুঁকিতে রান্না করা, বাসন মাজার ফাঁকে ফাঁকে অদৃষ্টের নিন্দাবাদ।

ন'টা এগারর গাড়ীতে আপিসে গিয়া ছ'টা সতরর গাড়ীতে বাড়ী ফেরা।

জীবনের এত অধিক বৈচিত্র্য সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপশোষ করিয়া মরে।

আজ বকুলতলা খালি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সচরাচর ইহা ঘটে না। শেষ বেলায় বকুলতলায় আসিয়া বসার নেশা যে কত তীব্র দূর হইতেও সে যে তাহা জানে।

বাড়ী ঢুকিয়াই কারণটা বোঝা গেল। ছেলেমেয়ে তিন জন কাঁদ-কাঁদ মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে, বিধু চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে চৌকীর মলিন বিছানায় এবং শিয়রের কাছে টুলে বসিয়া হিমানী তার মাথায় ডবল আইসব্যাগ চাপিয়া ধরিয়া আছে।

অবস্থাটা বুঝিতে একটু সময় নিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে ?

হিমানী বলিল, জ্বর। অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, এখনো জ্ঞান হয় নি। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি মেঝেতে প'ড়ে আছেন।

ঘামে জামাটা ভিজিয়া গিয়াছিল কিন্তু হিমানীর সামনে খোলা চলে না—তলায় গেঞ্জি নাই। স্বামীর খালিগা'ও হিমানী কোনদিন ভাখে নাই বলিয়াই শঙ্করের বিশ্বাস। বোতামগুলি আলগা করিয়া দিয়া সে বলিল, আমার আপিস এত দূরে যে চেঁচিয়ে ওরা ম'রে গেলেও শুনতে পাই না।

এই বাহুল্য কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য অবশ্য বাহুল্য নয়, হিমানী চুপ করিয়া রহিল।

ছোট মেয়েটি বাবাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখের শাসনে তার কান্না থামাইয়া শঙ্কর বলিল, আজ এসে দেখছি অজ্ঞান,আর একদিন এসে হয় তো দেখব ম'রে গেছে!

শঙ্করের আশঙ্কা হাল্কা করিয়া দিবার কোন চেষ্টা না করিয়া হিমানী বলিল, এ সময় কোন আত্মীয়াকে এনে কাছে রাখা উচিত্।

শঙ্করের সুর তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া গেল।

এখনি ? এই তো মোটে সাত মাস। এখন ভয় কিসের ?

হিমানীর মুখের উপর দিয়া একটা কালো মেঘ ভাসিয়া গেল, কথা কহিল ক্লিষ্ট স্বরে, এ যে কি ভয়ানক সময় আপনি বুঝবেন না। যত সাবধান হওয়া যাক ভয় কমে না। সর্ব্বদা একজন মেয়ে মানুষ কাছে না থাকলে যে কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে—

অন্ধকারে সাপের ঠাণ্ডা স্পর্শ পাওয়ার মত শিহরিয়া সে চুপ করিল। দেখা গেল মুখ তার ভারি বিবর্ণ হইয়াছে। তিনটি সন্তানের জননীর সম্বন্ধে অপুত্রবতীর আশঙ্কার পরিমাণটা শঙ্করের কাছে পরমাশ্চর্য্যের মত লাগিল। এ ভাবে হিসাব করিলে সকল অবস্থায় নরনারী-নির্ব্বিশেষে কতরকম সর্ব্বনাশই তো হইতে পারে, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া আধঘণ্টার ভিতর তার পঞ্চত্বলাভও সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়, সেজন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকার কোন অর্থই যে হয় না! কিন্তু ইহার আতঙ্ক অত্যন্তই সুস্পষ্ট,—ঠাণ্ডায় ফ্যাকাসে আঙুলগুলি পর্য্যন্ত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। মনে হয় বুকের ভিতর ধুক-ধুকানিরও সীমা নাই। শঙ্কর বলিল, আপনার শরীর আজ ভাল নেই মনে হ'চ্ছে।

জ্বরে অজ্ঞান স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া সদ্যপরিচিতার শরীর একটু ভাল না থাকার জন্য দুর্ভাবনা ভাল শোনাইল না। মুখ তুলিয়া ম্লান হাসিয়া হিমানী বলিল, রোজ যেমন থাকি আজও তেমনি আছি। আমার কথা বাদ দিন। শরীর ভাল থেকেই বা কি হবে!—ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি এসেছিলেন, রক্ত নিয়ে গেছেন। ওষুধও লিখে দিয়েছেন, জ্ঞান হ'লে একদাগ খাওয়াতে হবে।

আমার জন্য কিছুই করার রাখেন নি দেখছি। ডাক্তারের ভিজিট ?

লাগেনি। উনি আমাদের বন্ধু।

তবে পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু আপনার চা খাওয়ার সময় পার হ'য়ে গেছে, আপনি এবার ছুটি নিন।

হিমানী ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, না, আমায় ওঁর কাছে থাকতে দিন। চা এখানেই দিয়ে যাবে।

লণ্ঠনটা নতুন—ধোঁয়া হয় না, কিন্তু কমানো রহিয়াছে বলিয়া আলো অনুজ্জ্বল। এই আলোতেই হিমানীর মুখ-

পানা যেন স্পষ্টতর দেখাইতেছে। সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া শঙ্করের মনে হইল আপিস যাইবার সময় সে কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল যে ফিরিয়া আসিয়া গৃহে এমন দুর্ভাবনা ও এতবড় বিস্ময় সঞ্চিত থাকিতে দেখিবে! হিমানীর আজকার ব্যবহার অদ্ভুত। চার বছরের প্রতিবেশী ইহারা কিন্তু গরীব প্রতিবেশীকে কবে কতটুকু আমল দিয়াছিল? সম্বৎসরে হিমানী ও বিধুর মধ্যে একটি বাক্যবিনিময়ও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আর আজ নিজে হইতে আসিয়া এমন সেবাই আরম্ভ করিয়া দিল যে প্রয়োজন শেষ হইলেও উঠিয়া যাইতে চায় না। টাইমপিসটায় দশটা বাজে। বেলা একটা হইতে একভাবে বিধুর শিয়রে বসিয়া আছে। তিন-চার বার নিজে ডাকিতে আসিয়া একরকম ধমক খাইয়াই সুকান্ত ফিরিয়া গিয়াছে। কেরাণীর কুশ্রী বধূর সেবার জন্য ধনীর তরুণী প্রিয়ার এ কি লোলুপতা! মহত্ত্ব সন্দেহ নাই, উদারতারই পরিচয়, কিন্তু কী অস্বাভাবিক!

আধঘণ্টা পরে সুকান্ত আবার আসিল। কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অসীম-কুণ্ঠার সঙ্গে শঙ্কর মিনতি করিয়া হিমানীকে বলিল, আর তো দরকার নেই, এবার আপনি যান। কতক্ষণ এভাবে ঠায় ব'সে থাকবেন?

অপ্রত্যাশিত ভাবে এবার কিন্তু প্রতিবাদ আসিল সুকান্তর নিকট হইতে—থাক শঙ্কর বাবু, কিছু বলবেন না, একেই সেবা করতে দিন।

অবাক হইয়া শঙ্কর বলিল, কিন্তু—

সুকান্ত মাথা নাড়িল কিন্তু নয়। বাড়ী গিয়ে ছটফট করার চেয়ে এখানে শান্তিতে থাকা ভাল। আমার যদি একটু বসবার ব্যবস্থা ক'রে দেন ওর সেবা করাটা দেখতে পারি।

মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর দেখিল হিমানী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে। সুকান্ত এক প্রকার দুর্বোধ্য হাসি দিয়া সে দৃষ্টিকে নন্দিত করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

খাদ্য আসিয়াছিল সুকান্তর বাড়ী হইতে। ছেলে-মেয়েরা খাইয়া ঘরের এককোণে ক্ষুদ্র বিছানায় জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শঙ্কর বিছানার পাশে মাটিতেই বসিল। বুকের ভিতর চাপবাঁধা দুর্ভাবনা তবু হঠাৎ তার যেন হাসি পাইল। ঘরে আজ দুইজোড়া স্বামীস্ত্রী জড়ো হইয়াছে কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় কি অসীম পার্থক্য! শয্যায় পড়িয়া আছে চামড়া-ঢাকা একটা কঙ্কাল, বাসর-রাত্রিতেও যার কণ্ঠে মধুর বদলে জুটিয়াছিল দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পচা খাদ্যকণার দুর্গন্ধ, আজ সাত বছরের বেশী যে তার মনকে উপবাসী রাখিয়া দু'বেলা যোগাইয়াছে শুধু রাঁধা ভাত। তিনটি পেটমোটা শিশুর শিয়রে বসিয়া আছে একটা কলেপেষা জীবন্ত ইক্ষুদণ্ড, জীবনটা যার স্রষ্টা কবির সৃষ্টির খাতায় ভুলিয়া যাওয়া সাদা পৃষ্ঠা। আর রুগ্নার শিয়রে যে স্ত্রীটি বসিয়া আছে, যে স্বামীটি বসিয়া আছে তাহারই ছেঁড়া মাদুরে—রূপ-যৌবন অর্থ-সম্মান হাসি-উৎসবের কি সমারোহ উহাদের জীবনে! রাত্রি এগারটার সময়েও বিধুর জ্ঞান হইল না। কিছুক্ষণ হইতে হিমানী উসখুস করিতেছিল, হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সুকান্তকে বলিল, ডাক্তার বাবুকে আর একবার নিয়ে এসো।

সুকান্ত নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল, দু'জন এনো, কনসাল্ট করবেন।

সুকান্তর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা। সামান্য একটু মাথা নাড়িয়া এমনভাবে স্বীকৃতি জানাইল যেন দু'জন ডাক্তার আনিবার কথা সেও ভাবিতেছিল।

প্রতিবাদের ইচ্ছা শঙ্করের মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু কিসের প্রতিবাদ করিবে? ইহাদের ভাব দেখিয়া একথা তো কল্পনাও করা যায় না যে কলিকাতার সমস্ত ডাক্তার আনিয়া বিধুর চিকিৎসা করার চেয়ে বড় কর্তব্য ইহাদের আর কিছু আছে!

টর্চ্চ জ্বালিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাড়াটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে - সেও যেন আজ অসুস্থ এবং ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোর উপর তার শুশ্রূষার ভার। জানালার বাহিরেই চাঁদ ওঠার ইঙ্গিত, রোয়াকে বিধুর হাতে মাজা পিতলের ঘটিটা চকচক করিতেছে। বিধুর পায়ের আঙুলে রেড়ির তেলে ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো, হঠাৎ শঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিল। আজ দুর্ভাবনা—অতন্দ্র নিশার আলো নিভাইলে ওই পায়ে যদি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে?

হিমানীর পা' দুটি চৌকীর তলের আবছা অন্ধকারে। জরিবসানো চটির দু'একটা জরি শুধু চিক-চিক করিতেছে। পা' দুটি যেন অন্ধকারে মোড়া সোনা,কয়েকটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া পরিচয় মিলিতেছে। ওই পায়ের গোড়ালি কি ফাটা? আঙুলের চিপায় কি জলে ক্ষয় পাওয়া সাদা ঘা?

শঙ্করের মনে হইল হিমানীর পা' দুটি চৌকীর তলা হইতে টানিয়া আনিয়া এই একান্ত অসম্ভব সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া না নিলে চিরদিন তার মন কেমন করিবে।

চোখদুটা জ্বালা করিতেছে দেখিয়া শঙ্করের কৌতুক বোধ হইল। থাকিবার মধ্যে চোখে আছে একটু ক্ষীণ দৃষ্টি—সে চোখ আবার জ্বালা করে!

আপনি খাবেন না? . খেয়ে নিন। ভেবে আর কি করবেন!

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল হিমানী মুখের দিকে চাহিয়া আছে। স্ত্রীর অসুখের কথা ভাবিতেছিল না বলিয়া তার একবিন্দু লজ্জা হইল না। বলিল, আজ খাব না।

আপনি না খেলে এঁর কোন উপকার হবে না।

আমার অপকার হবে। অম্বলে বুক জ্ব'লে যাচ্ছে।

সকলেরি দেখছি সমান অবস্থা। আমারও অম্বল হ'লে বুক জ্ব'লে যায়।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে শঙ্কর কুঁজা হইয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিল।

আপনার অম্বল!

হিমানী ম্লান হাসিল, আর কলিক। যে দিন ধরে মনে হয় ব্যথায় বুঝি দম আটকাবে। মাগো, সে যে আমার কি কষ্ট!

শঙ্কর আবার কুঁজা হইয়া গেল—বিশেষভাবে হতাশ হইলেই তার মেরুদণ্ডটা ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়।

হিমানী একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু ওজন্য আমার নালিশ নেই।

কলিকের ব্যথা থাকার জন্য আবার নালিশ কি থাকিতে পারে শঙ্কর বুঝিতে পারিল না, বলিল, কেন?

হিমানী নতমুখে অস্বাভাবিক গলায় বলিল, শুনলে আপনি লজ্জা পাবেন, ও যে আমার প্রাপ্য। প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য ভগবান নির্দ্দিষ্ট ব্যথা মেপে রাখেন, মাথা পেতে নিজের ভাগ নিতেই হবে। ব্যথার এক রূপ এড়িয়ে গেলে অন্যরূপে দেখা দেবেই।

কি অদ্ভুত মন্তব্য! সঙ্কোচে নয় মন্তব্যের ভারে শঙ্কর মাথা হেঁট করিল। কথাগুলি যেন একবোঝা অভিযোগ —একটি সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার মত অসম্ভব ভারি!

কিন্তু শয্যাশায়িনী ওই সংক্ষিপ্তা মানবীটির অভিযোগও তো নিখিল মানবতার ইতিকথায় প্রক্ষিপ্ত নয়! ওর বুকের প্রত্যেকটি দৃশ্যমান পাঁজরা, ওর কালিপড়া চোখের অত্যধিক স্নেহের কালো ছানি, ওর জীবন যাত্রার অধিকারীর অন্তহীন বঞ্চনার তথ্য মানে কি! ভগবানের মাপিয়া রাখা ব্যথার ভাগের সঙ্গে মানুষের গুঁজিয়া দেওয়া ব্যথায় ওর শিরায় রক্তের রঙও বুঝি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে।

হিমানীর কথাটা সে বুঝিল, না বোঝার মত করিয়া। ও নিত্য অপরাহ্নে বকুলতলায় স্বামীর সঙ্গে চা পান করিতে পায়। ভোর বেলা মোটরে চাপিয়া লোকালয় ছাড়িয়া গিয়া খোলা মাঠের মাঝখানে নির্জ্জন পথপ্রান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে। লক্ষ ছাপানো মনের সঙ্গে নিত্য ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে,—আঙুলের সোনার কাঠি দিয়া সেতারের ঘুমন্ত রাগরাগিনীর ও ঘুম ভাঙ্গায়। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধে, সাবান মাখিয়া স্নান করে ঘরে পরিয়া বেনারসী ছিঁড়িয়া ফেলে।

বিধুর কি আছে?

সহানুভূতির অভাব ছিল না কিন্তু হিসাবে হিমানীর হার হইল।

সুকান্ত ডাক্তার নিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে বিধুর জ্ঞান হইল। রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়াই সকলকে চমকাইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। হিমানীর হাত হইতে দুইটা আইসব্যাগই খসিয়া পড়িল। ছোট খোকা ঘুম ভাঙ্গিয়া করুণ সুরে কাঁদতে লাগিল। শঙ্কর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিধুর আর্ত্তনাদের শব্দার্থ এই:

মাগো এ ডাইনী কে! খোকা! ওরে খোকা!

বার কয়েক গলা চিরিয়া খোকাকে ডাকিয়া সে দিব্য সুর করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, খোকারে···

হিমানী আইসব্যাগ দুটি তুলিয়া আবার মাথায় চাপিয়া

ধরিল। খানিক পরে শ্রান্ত হইয়া বিধু বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল।

হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কোন্‌টি ?

নেই।

নেই !

নাঃ। ওর মনে থাকতে পারে, পৃথিবীতে নেই। জ্যোস্নারাতে খোকা একদিন ছাত থেকে পাকা উঠানে প'ড়ে গিয়েছিল।

হিমানী চমকিয়া বলিল, সত্যি ?

হ্যাঁ। জ্যোস্না উঠলেই খোকাকে নিয়ে ও ছাতে উঠত কেন কে জানে! রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে ছুটে যেত ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলত, জ্যোস্না দেখতে ভাল লাগে।

ও কথা সত্যি নয়।—হিমানীর কণ্ঠে কাতরতা।

তা ঠিক। জ্যোস্না দেখে ওর ভাল লাগা অসম্ভব। কিন্তু কেন যে উঠত ভেবে পাই না।

মুখ আড়ালে রাখিয়া হিমানী নীরব হইয়া রহিল। তেল কমিয়া গিয়াছিল, বার কয়েক দপদপ করিয়া আলোটা নিভিতে আরম্ভ করিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শঙ্কর যখন তেলের বোতলটা নিয়া আসিল আলো প্রায় নাই। দেখা গেল জ্যোস্না আসিয়া সত্যই বিধুর পায়ের কাছে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিধু কিন্তু পা গুটাইয়া নিয়াছিল।

তেল ভরিবার চেষ্টায় আলোটা একেবারে নিভিয়া গেল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে হিমানী বলিল, কতদিন আগে শঙ্কর বাবু ?

কিসের ?

কতদিন আগে খোকা ছাত থেকে — ?

আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, পাঁচ ছ'মাস হ'ল বৈকি।

—চৈতের প্রথমে।

কান্না শুনিনি তো !

শঙ্কর মাথা নাড়িল, ও এখানে কাঁদেনি। খোকার সঙ্গে হাঁসপাতালে গিয়েছিল, সেখান থেকেই ওকে ওর মা'র কাছে রেখে এসেছিলাম।—লণ্ঠনটা কেরাসিন কাঠের ভাঙ্গা টেবিলে বসাইয়া দিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, কি জানেন, মড়াকান্না আমার একেবারে সহ্য হয় না। মাথা ঘোরে।

যেন সে ছাড়া জগতের আর সব মানুষের মড়াকান্না সহ্য হয়, যে কাঁদে তারও ! মানুষ যে কাঁচা মাটির পাত্র, একবার ভাঙ্গিলে চোখের জলে গুলিয়া আবার গড়া যায় একথা সে যেন জানে না। যেন একান্ত অনভিজ্ঞ শিশুটি !

হিমানী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মড়াকান্না সত্যি বড় বিশ্রী। কিন্তু কাঁদতে না পারলে আরও বিশ্রী হয়। আমার ছোট ভাইটি যখন ম'রে যায় আমি কাঁদতে পারিনি।

শঙ্কর বলিল, কেন ?

কি জানি। নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম ব'লে বোধ হয়। ছ'মাসের ভাইকে সাতবছরের করেছিলাম, সে মরলে কি কেউ কাঁদতে পারে ?

শঙ্কর নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—পারে না।

হিমানী যেন তাহাতে খুসী হইল না, ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, অন্ততঃ পারা উচিত নয়। ও-রকম ভাইএর সঙ্গে পেটের ছেলের কি তফাৎ আছে ! মরলে অজ্ঞান হ'তে হয়, কাঁদতে নেই।

বলিয়া সে নিজের মনে বার কয়েক শিরশ্চালনা করিল। আবোল তাবোল মন্তব্যগুলির মধ্যে ইহা কোন্‌টির প্রতি সংশয়ের প্রতীক বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি এবং কলিকাতার আর একজন নাম-করা ডাক্তারকে নিয়া সুকান্ত ফিরিল। চ্যাটার্জ্জি রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বলিলেন, রক্তে মেলিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অন্ত নাই। অন্যজন বিনা বাক্যব্যয়ে ইঞ্জেকসনের পিচকারীতে কুইনাইন ভরিলেন।

শঙ্কর বলিল, হাড়ে লেগে ছুঁচটা যেন না ভাঙ্গে ডাক্তার বাবু !

এই মন্তব্যে ঘরের আবহাওয়াটা অকস্মাৎ বীভৎস রকমের করুণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার খানিক পরে হিমানী শান্ত-ভাবেই স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতে যতটা সময় লাগিল তাহাতে বোঝা গেল বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

একটা কথা বলতে এলাম, বলিয়া ভূমিকা করিল।

কি কথা বলুন।

পাঁচ ছ'মাস আগে জ্যোস্না উঠলে আমরাও ছাতে উঠতাম। খোকার মৃত্যুর জন্ম আমাদের কি পাপ হয়নি?

শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনাদের কেন পাপ হবে?

হিমানীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, বলিল, হয়েছে। আমি সত্যি ডাইনী। না জন্মাতেই আমার সব খোকাকে আমি মেরেছি. কারো খোকা মরলে আমি ছাড়া আর কার পাপ হবে? জানেন জ্যোস্নায় নামতে আজ আমার গা ছমছম করছে। অপনার সেই খোকা যদি আঁচল ধ'রে টানে?

টানিলে শঙ্কর কি করিবে? পিতা বলিয়া এখন কি আর সে তার কথা শুনিতে চাহিবে!

হিমানী বলিল, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

সুকান্ত নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাড়াইয়াছিল, মৃদুস্বরে বলিল, ভয় কি, এসো।

সকালে সুকান্ত খবর নিতে আসিল বিধু কেমন আছে। চেহারা দেখিয়া সে যে সমস্তরাত্রি ঘুমায় নাই বুঝিতে কষ্ট হয় না। শঙ্কর টুলটা আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন।

দাঁড়ান,খবরটা দিয়ে আসি আগে: বলিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাঁচমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বিনা অহ্বানেই টুলটাতে বসিয়া পড়িল।

সকাল বেলার আলোতে রাত্রির আলোর ইঙ্গিতটুকুও নাই, এবং তাহা নিঃসন্দেহ পরম আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তথাপি বিধুর পায়ের আঙ্গুলে জড়ানো রেড়ির তেলের ন্যাকড়াটা শঙ্কর কখন যেন খুলিয়া নিয়াছে।

সুকান্ত বলিল, বুঝলেন শঙ্কর বাবু, জীবনে একফোঁটা সুখ নেই।

একথা সকলেই জানে, শঙ্কর কিছু বলিল না।

আপনার এখান থেকে গিয়ে কি চেঁচামেচি আর কান্না যে আরম্ভ ক'রে দিল যদি দেখতেন। কোন অভাব নেই তবু কেন যে ওর মাথা এমনভাবে খারাপ হ'য়ে গেল!

অভাবের প্রাচুর্য্যে আধমরা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া শঙ্কর এবারও কিছু বলিতে পারিল না। *

* এই গল্পের লেখক মাণিক বাবুর সংক্ষেপে একটু পরিচয় দেওয়া ভাল। ইনি 'প্রবাসী' পত্রিকার বিগত গল্পপ্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন।—বঃ সঃ

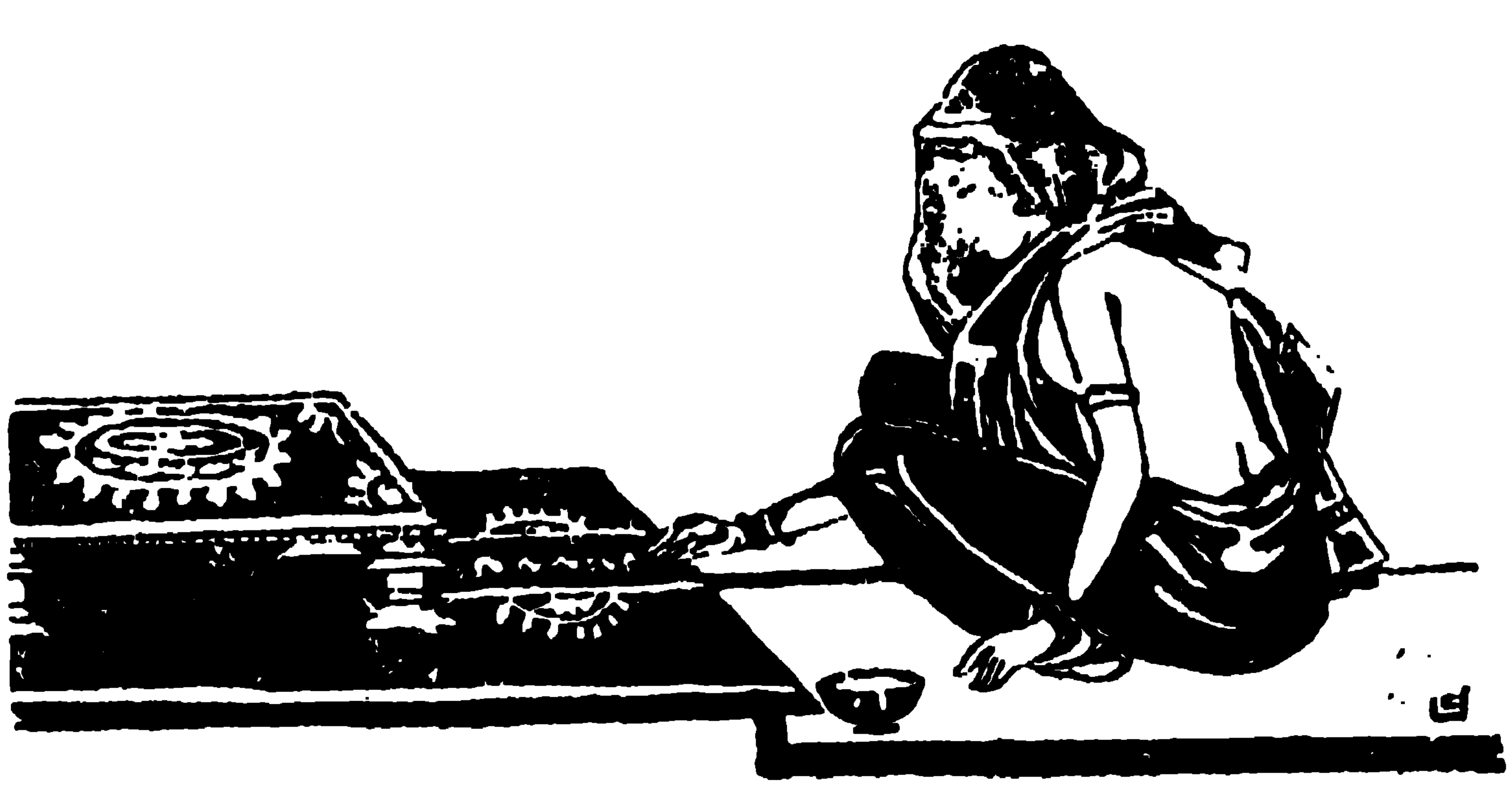

ক্ষমা

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

—দরিদ্রের ঘরে
আঙিনায় সন্ধ্যামণি নিত্য ফোটে ঝরে,
কে তা'র খবর রাখে ? কত দীনহীন
দেবতাপূজার ফুল আসে প্রতিদিন
মানুষের সমাজের অঙ্গন সীমায় ;
ধরার অবজ্ঞা সহি' নিত্য দিয়া যায়
আপনার অমলিন অন্তরের সেবা—
কে তা'র হিসাব লয়, খোঁজ রাখে কেবা ?

মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা ধরিত্রীর মত
আজন্ম সহিতে দুঃখ নীরবে সতত
দরিদ্রের কালো মেয়ে এসেছিল 'ক্ষমা'।
শৈশবে মরিল মাতা ; নেত্রবিষ-সমা
হ'ল সে সেদিন হ'তে সমস্ত পল্লীর।
নিজগৃহে বেদীতলে মাধবী-বল্লীর
একাকিনী খেলা করে' কাটিল শৈশব
অভাগীর ; নর্ম্মসঙ্গী পল্লীশিশু সব
দূর হ'তে দেখে' যেত সতৃষ্ণ নয়নে,
কাছে আসিত না ভয়ে।

কুসুম-চয়নে,—
দেবপূজা-আয়োজনে,—পিতার সেবায়,—
গৃহকাজে ক্রমে তা'র বাল্য কেটে যায়।
প্রতিবেশী দেয় গালি ; চিন্তায় আকুল
পিতা পাত্র খুঁজে' ফিরে। শুধু আছে কুল,
রূপ নাই, অর্থ নাই কে চাহিবে তা'রে ?
পাত্রী দেখিবার লাগি' আসে বারে বারে
ভদ্রাভদ্র নানা জীব নানা গ্রাম হ'তে ;
বিবিধ সুখাদ্য খেয়ে, করি' বিধিমতে
বারবার অপমান কন্যা ও জনকে
চলে' যায়। কানাকানি সুরু করে লোকে ;
পথেতে নিগ্রহ করে ; বাড়ী ব'য়ে এসে
পাড়ার গৃহিণী যত বিঁধে' যায় শ্লেষে
অভাগীরে ; গালি দেয় পিতা মনস্তাপে,
"এসেছে রাক্ষসী মেয়ে—সপ্তজন্ম পাপে।"
যতই বয়স বাড়ে, বেড়ে' চলে কথা ;
ক্ষমা অর্দ্ধাহারে রয়—মূর্ত্ত পবিত্রতা—
যৌবনে রাখিতে চাপি'। অবশেষে যবে
ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল,—পিতা নিশীথে নীরবে
কোথা গেল একদিন ; পরদিন প্রাতে
'বিমাতা' লইয়া এল শতমুদ্রা সাথে।

* • *

সেই পর্ণ-গৃহকোণে চূর্ণী নদীকূলে
আজো ঘৃতকুমারীর পুষ্পদণ্ড দুলে ;
গৃহপূর্ণ আছে শিশু—শুধু 'ক্ষমা' নাই।
যৌতুকে বঞ্চিত তা'র পিতার বেহাই
ক্ষমা করে নাই তা'রে বিবাহের পরে ;
'ক্ষমা' আসে নাই আর বিমাতার ঘরে।
পত্র এসেছিল কবে শ্বশুরের লিখা,
অভাগিনী মরিয়াছে হ'য়ে বিসূচিকা
একদিন মধ্যরাত্রে। কত কি রটায়
সন্দেহী পাড়ার লোক ; কিবা আসে যায় ?
বার্ত্তা পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছিল পিতা,
ফিরেছে দেখিয়া তা'র নির্ব্বাপিত চিতা।

নদী-নালা

রায় বাহাদুর শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, আই-এস্-ও

কিছুদিন পূর্ব্বে "গাছপালা" শীর্ষক প্রবন্ধ "বঙ্গলক্ষ্মী"তে লিখিয়াছিলাম। প্রবন্ধটি অনেকেরই ভাল লাগিয়াছিল। ঐ শ্রেণীর আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এবারের পালা "নদী-নালা।" মহাকবি সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন —গাছ কথা কয় না কিন্তু তাহার মুখ আছে। আমার সোদরোপম বন্ধু সাহিত্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী স্যার জগদীশচন্দ্রের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ছন্দোবন্ধে বলেন—"গাছপালা কয় না কথা

কিন্তু বোঝে ব্যথা।"

এই কবিতায় উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অনেক কথাই লুক্কায়িত আছে। কিন্তু যাউক সে কথা।

এখন বলিতে চাহিতেছি গাছপালার যেমন মুখ আছে, নদী-নালার তেমনি পুঁথি আছে। তবে সে পুঁথি তুলোটের বা দেশী বিলাতি কাগজের নহে। নদী-নালার পুঁথি ভাবরাশিতে প্রস্তুত। ভাবুক ভিন্ন সে পুঁথি অন্য কেহ পড়িতে বা বুঝিতে পারে না। নদী-নালা যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের অবস্থাটা কিরূপ হইত, সেই কথাই ভাবি।

ঋষির তপোবন, কৃষকের কুটীর, মধ্যবিত্ত লোকের বাসগৃহ, ধনীর অট্টালিকা আর রাজাধিরাজের রাজপ্রসাদ পূর্ব্বকালে সবই ছিল নদীর ধারে। কেন না জীবন-ধারণের জন্য শস্য চাই; আর সেই শস্য ভাল জন্মায় নদীমাতৃক দেশেই। মানুষ যখন অভিজ্ঞতার ফলে কূপ ও সরোবরাদি খনন করিতে শিখিল, তখন নদী হইতে দূরে বাস করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এমন খনন বিদ্যায় তাহারা পারদর্শী হইতে পারে নাই, ততদিন নদীতীরে বসবাস করা ভিন্ন যে মানুষের উপায় ছিল না একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জলের নাম জীবন। জীবন রক্ষা করিতে হইলে জীবন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। কাজেই নদী-নালা, সরিৎ-সরোবর মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। সাগর, উপসাগর, মহাসাগরের পক্ষেও ঐ একই কথা। এই কারণেই হয় ত স্রষ্টার বিধানে পৃথিবীতে স্থলের অপেক্ষা জলের ভাগ অধিক।

জলের অপর নাম নার। এই নারে অয়ন্ অর্থাৎ শয়ন করিয়া বিষ্ণু নারায়ণ। অনন্তশয্যায় নারায়ন শয়ান, লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। নারের মাহাত্ম্য নারায়ণের অনন্তশয্যাতেই প্রকাশ। মানুষ বুদ্ধিজীবী বলিয়া গর্ব্ব করে, কিন্তু এই যে অপ্, ইহাতে মানুষ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ইহাকে কলুষিত, অপবিত্র করে কেমন করিয়া, কোন্ প্রাণে, তাহা সহজ বুদ্ধির অগম্য।

এইবার বলিব, নদী-পথই মানুষের ছিল এককালে রাজবর্ত্ম। ব্যবসায়-বাণিজ্য নৌকাযোগে চলিয়াছে ঐ পথে। সেই কারণেই সমৃদ্ধিশালী নগর মাত্রেরই প্রতিষ্ঠা নদীতীরে। সেকালে গমনাগমনের সুবিধা ছিল নদনদীর উপর দিয়া। একালে রেলপথ, মোটারপথ ও বিমানপথের মর্য্যাদা বাড়িলেও জলপথের অমর্য্যাদা হয় নাই; আর ভবিষ্যতেও বোধ হয় হইবে না; কারণ সকল পথ মুক্ত থাকিলেও জলপথ পরিহার করিবার উপায় নাই। প্রলয়-পয়োধি-জলে মীন শরীরে যিনি বেদ রক্ষা করিয়াছিলেন, নোয়ার নৌকাও ভাসিয়াছিল তাঁহারই মহিমায়। এ জলপথ রুদ্ধ করিবে কে? কলকব্জার যুগে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের চলাচলের পথ গড়িয়া উঠিতে পারে বহুবিধ, কিন্তু অনাদিকালের ঐ জলপথ বন্ধ হইবার উপায় নাই। নদনদী মজিয়া যায়, সাগর শুকাইয়া যায়, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু জল থাকিতে জলযাত্রার পথ রোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

দেখিতে পাই হিন্দুর নানা তীর্থ, বড় বড় মন্দির ও

দেবালয় সমস্তই প্রায় নদীতীরে। ইহার কারণ বোধ হয় গমনাগমনের সুবিধা। কিন্তু সে একটা দিক্। অপর দিকও অনেক আছে। স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়—এখনকার চিকিৎসাতত্ত্বের কথাতেও বুঝিতে হয়, ঐ জলপথ। Sea Voyageএর তো কথাই নাই, কলিকাতা পোর্ট কমিশনারস্‌দের যে দু'একখানা ষ্টিমার বহু যাত্রী লইয়া গঙ্গাবক্ষে অপরাহ্নে সগর্ব্বে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতেও স্বাস্থ্যোন্নতি প্রমাণের নথী ভাল করিয়া আঁটা আছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সকল দেশেই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে জলপথের পাশ হইতে। আগেকার মানুষ সেই কারণ এবং অন্যান্য কারণেও হয় ত নদনদীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত—পূজা করিত। বিজ্ঞান যুগের মানুষ, অমন কল্পনা আর মানিতে চাহে না, নদনদীর নিকট কৃতজ্ঞ আর থাকিতে চাহে না। নদী-নালাকে আচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর তাহারা সেতু বাঁধিতেছে। রেলগাড়ী প্রভৃতি তাহাতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। কিন্তু সেই বাঁধনের ফলে নদনদীর স্রোত কমিতেছে, নদীগর্ভে পলি পড়িতেছে, ড্রেজ্ করিয়াও অনেক নদীর ধাত্ ঠিক রাখিতে পারা যাইতেছে না। নদী নালা মজিতেছে, সেই সঙ্গে মানুষও মজিতেছে। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ায় দেশ যায়, অনেক মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলাইয়া আসিয়া বসবাস করিতেছে। মজা-নদীতে বড় নৌকা, ষ্টিমার প্রভৃতি আর চলে না—চলে হয় ত শাল্‌তি, অথবা ডোঙ্গা। ব্যবসায়-বাণিজ্য তাহাতে ভাল করিয়া চলা কোনো প্রকারেই সম্ভবপর নহে। ইহার ফলে মানুষের যে কত বড় সর্ব্বনাশ, তাহা ভাবিলেও আতঙ্কিত হইতে হয়। গঙ্গা-মাঈ-ই মজিতে বসিয়াছেন—আর কিছুদিন পরে কলকাতার অবস্থা সপ্তগ্রামের মত হইবে কি না, তাহাই বা কে বলিবে? পাপ করে মানুষ, প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান তাহাদেরই।

বসুমতী সর্ব্বংসহা; গাছপালাও সকল অত্যাচার অহিংস হইয়াই সহ্য করে। নদী-নালা কিন্তু ঠিক্ তাহা নহে। নদনদী ক্ষত্রিয়ের মত কখনো উদার, কখনো রুদ্র-ভীষণ। শান্ত থাকিলে জীব-জগতের তাহারা অশেষ মঙ্গল-সাধন করে, অশান্ত হইলেই প্রলয়কাণ্ড ঘটাইয়া বসে। পাহাড়ে জল, পবনদেবের উন্মাদনা, "বরষার অতি ভরসা" নদনদীর ক্ষাত্রশক্তি। এ শক্তির বিকাশ দেখিলেই জলাধিপতি বরুণদেবের পৌরাণিক কাহিনী মানুষের মনে পড়ে। কিন্তু গাং পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখানোর প্রবাদবাক্যের মত মানুষ ঐ জলরাশি নানারূপে অপবিত্র করে, সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কের ময়লা ঢালিয়া জীবনরূপী জীবনকে বিষবৎ করিয়া তুলে। হায় রে! মানুষ বুঝে না কেন, মানুষ-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে এই জলের সৃষ্টি। জল সৃষ্ট না হইলে জীবজগৎ টিকিতেই পারিত না। আর "অপো নারায়ণের" উপর এই অত্যাচার! স্রোতস্বতী নিজেকেই নিজে পরিষ্কার রাখে—এই যা' রক্ষা। নতুবা জল অপবিত্র করিবার ফলে একদিনের মহামারীতেই বিশ্ব ধ্বংস হইত। স্বার্থপর মানুষ, স্বার্থের দায়ে, এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না ত!

মানুষ, প্রেমিক বলিয়া তোমার গর্ব্ব আছে। কিন্তু যেখানে গর্ব্ব, প্রেমের স্থান সেখানে কোথায়? প্রেমিক দান করে যথাসর্ব্বস্ব, প্রতিদান চাহে না—প্রতিগ্রহণ করে না। নদ-নদী, সরিৎ-সরোবর আর অপ্রমেয় সিন্ধু, তোমার আমার জন্য অনাদিকাল হইতেই সর্ব্বত্যাগের খাতায় নাম লিখাইয়া বসিয়া আছে। ঐ জলধারা, প্রেম-ধারায় জীব ও জগতের কল্যাণসাধন করিতেছে অযাচিত ভাবে। প্রেমের উহাই ত ধর্ম্ম। ঢাক ঢোল বাজাইয়া ভগবান প্রেম করেন নাই, আর তোমার আমার করিবারও উপায় নাই। তাহা করিলেই হইতে হইবে অপ্রেমিক। অহংজ্ঞানী প্রেমিক অপ্রেমিক হইয়া মরণকে আলিঙ্গন করিয়াই আছে। কিন্তু প্রেমিক মৃত্যুঞ্জয়।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বস্তু হে মানব, মৃত্যুঞ্জয় হইতে চাও ত, গাছ-পালা, নদী-নালার মত ত্যাগী হইও, যোগী হইও, প্রেমিক হইও—প্রেম তোমাকে মরণজয়ী করিবে। তখন "মানস-কুঞ্জের" কবির মত গাহিতে পারিবে—

"নাহিক মরণ এই সুন্দর ভুবনে,
রূপ হ'তে রূপান্তর মাত্র সে মরণ;
সলিল হইয়া শুষ্ক বাষ্পে পরিণত,
বাষ্পেতে সলিল বদ্ধ, অনিলে অনল।
লুক্কায়িত বীজে ক্রম, ক্রমে লক্ষ বীজ,
মৃত্তিকায় স্তূপীকৃত রস ও সৌরভ;
যখন যা' প্রয়োজন আসে পুনরায়
সে মহান গরীয়ান ভাণ্ডারেতে ফিরে।
শব্দভরা মহাকাল প্রতিধ্বনিময়,
জীবপরমাণু-ভরা অনন্ত প্রকৃতি;
বিশ্বনাথ তা'র মাঝে মহান ঈশ্বর,
দেবতা মানব কীট অংশ মাত্র তাঁ'র।
মহান ঈশ্বর যদি কভু লোপ পায়,
তবেই মরণ, নহে মরণ কোথায়?"

ঘরে বাইরে

ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যা

শ্রীমতী রিনিয়ুস, পদুকোটা ষ্টেটের পুলিশ কমিশনারের স্ত্রী। ইনি সম্প্রতি পদুকোটা ষ্টেট ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যা মনোনীতা হইয়াছেন। পরিষদের মহিলা সভ্যা হিসাবে তিনিই প্রথম এবং একমাত্র মহিলা।

মহিলা-সভার সভানেত্রী

ইনি শ্রীমতী কলা দেবী—সম্প্রতি এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ কায়স্থ মহিলা সভার সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি তত্রত্য স্ত্রী-আর্য্যসমাজের সভানেত্রী, বিধবাশ্রমের সহ-সভানেত্রী, আর্য্যকন্যা পাঠশালার পরিচালক-সভার সদস্যা—প্রভৃতি। 'ডি, এ, ভি' হাইস্কুলে অল্প কিছুদিন হইল তিনি ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সন্তরণে বাঙালী মহিলা

সম্প্রতি ব্যারিষ্টার মিঃ এ, কে, হাজরা, বি-এ (অক্স-ফোর্ড)-এর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নিভাননী দেবী পনের মিনিটের মধ্যে বারাকপুর হইতে গঙ্গা সন্তরণ করিয়া চাতরায় উপনীত হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসরেরও কম এবং তিনি সাড়ী ও সেমিজ ব্যতীত কোনরূপ পোষাক ব্যবহার না করিয়াও অক্লান্তভাবে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন।

সন্তরণ-দক্ষা

কুমারী কনি গিল্‌হেড্‌ একজন ইংরাজ বালিকা। ইনি সম্প্রতি 'পাট্‌নি'র সন্নিহিত টেম্‌স্‌ নদীতে সন্তরণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। চিত্রে দেখা যাইবে—কুমারী অতি-শীতল জলে দীর্ঘকাল সন্তরণের পর সন্তরণশেষে কূলে উঠিতেছেন কিন্তু ক্লান্ত হইয়া পড়েন নাই।

নেট্‌-বল ম্যাচে বালিকা

চিত্রে দেখা যাইতেছে একটি কেম্ব্রিজের বালিকা-খেলোয়াড় অক্‌স্‌ফোর্ডের বালিকা-খেলোয়াড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত। অক্‌স্‌ফোর্ডে অনুষ্ঠিত এই নেট্‌-বল ম্যাচে অক্‌স্‌ফোর্ডই শেষে জয়লাভ করে।

নৃত্যোৎসবে বালিকা

কিছুদিন হইল মাননীয়া লেডী জ্যাক্‌সন বেলভিডিয়ার প্রাসাদে একটি নৃত্যোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—'গার্ল গাইড্‌স্‌' পরিচালিত একদল বালিকা নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে।

নারীর নাগরিক দায়িত্ব

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

কিছুদিন আগে অবধি, ঘরের ভিতর ছাড়া বাইরে মেয়েদের যে কোনো কাজ থাকতে পারে, এ কথা আমাদের দেশে কেউ মনে করতেন না। কিন্তু আজকাল মেয়েরা নানাকাজে নামছেন, এবং কিছুতেই প্রায় বিফল হচ্ছেন না দেখে', এখন তাঁদের সম্বন্ধে আশা-ভরসা ঢের বেড়ে' যাচ্ছে। সামাজিক, নাগরিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, তাঁদের সহযোগিতা যে একান্ত দরকার, তা চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই আজকাল স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। অবশ্য এখনও বিরুদ্ধতা যথেষ্টই আছে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত মেয়েরা হাতে-কলমে কাজ করে' দেখিয়ে না দেবেন যে সব কাজেরই তাঁরা যোগ্য, ততদিন পর্য্যন্ত এ বিরুদ্ধতা থাকবেও। এই যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন, তাঁদের সুশিক্ষা দেওয়া এবং অবরোধ থেকে মুক্তি দেওয়া। বাল্যবিবাহ এখন আইনতঃ দণ্ডনীয় হয়েছে, সুতরাং আশা করা যায়, এই অনাচারটির জন্য আমাদের আর পিছিয়ে থাকতে হবে না। অবশ্য চৌদ্দবৎসরের মেয়েকে পত্নী এবং জননী হবার ঠিক উপযুক্ত মনে করা যায় না, তবু এটা মন্দের ভাল।

সামাজিক কাজে বাংলাদেশের মেয়েরা অনেকদিন হ'ল যোগ দিয়েছেন, যদিও অল্পসংখ্যায়ই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সম্প্রতি তাঁরা অধিকসংখ্যায় খুব পূর্ণউৎসাহেই যোগ দিয়েছেন, এবং যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এতে প্রমাণ হয় বাইরের জগতে কাজ করার যোগ্যতা তাঁদের আছে, বরং এক এক দিকে পুরুষের চেয়ে বেশীই আছে। তাঁরা স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় এবং অহিংস, তাঁদের দ্বারা দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া একটা কাজ ফেলে' অন্য কাজের পিছনে ছুটে' যাওয়ার অভ্যাস তাঁদের কম, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি সোজা পথেই সচরাচর চলে। হুজুকপ্রিয়তাও তাঁদের কম। এই সকল কারণে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অহিংসভাবে কাজ করার তাঁদের বিশেষ যোগ্যতা আছে।

নাগরিক কার্য্যে এখন তাঁদের যোগ দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে মেয়েরা এখন পর্য্যন্ত তেমন কিছু করেন নি। বাংলা দেশে দু'একটি মাত্র মহিলার নাম এ বিভাগে শোনা গিয়েছে, তাঁদের দ্বারাও কাজ খুব কিছু হয় নি। মান্দ্রাজের ডাঃ শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেডি এ বিষয়ে 'স্ত্রীধর্ম্ম' নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মতে মেয়েরা নাগরিক কাজের বিশেষ উপযুক্ত। তাঁরা পারিবারিক শৃঙ্খলাবিধানে, এবং বালকবালিকা, বৃদ্ধ ও অক্ষম মানুষের সেবাযত্নে অভ্যস্ত। এই জন্যে দুর্ব্বল ও অসহায়ের স্বার্থে যে সব আইনকানুন প্রণীত হয়েছে, সে সবের পরিচালনে মেয়েদের সহযোগিতা বিশেষভাবে দরকার। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদের জন্য অনেকগুলি আইন আছে, যেমন Children's Act, বাল্যবিবাহ বিষয়ক আইন, স্ত্রীলোকদিগকে পাপব্যবসায়ে লিপ্ত করার বিরোধী আইন, ইত্যাদি। এই সব আইনগুলি যদি ভালভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাহ'লে মেয়েদের সাহায্য দরকার এবং মেয়ে পুলিশও কিছু কিছু দরকার। এ কথা প্রথম শুনলেই আমাদের দেশের লোকে হয় ত চমকে উঠবেন, কারণ প্রস্তাবটা খুব নূতন বটে। কিন্তু মেয়েরা যখন প্রথম ডাক্তারী, নার্সিং এবং আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন, তখনও আপত্তি কম হয় নি। কিন্তু এখন তাঁদের মূল্য সবাই বুঝতে পেরেছেন, এবং এ সব ক্ষেত্র থেকে তাঁদের বিদায় করবার কথা কেউ মনেও করেন না। স্ত্রীলোক-অপরাধী এবং অল্পবয়স্ক-অপরাধীদের জন্যে স্ত্রীলোক পুলিশের নিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সব স্ত্রীলোক নানা অপরাধ, বিশেষ করে' শারীরিক পাপাচরণের জন্য অভিযুক্ত হয়, তাদের ন্যায়বিচার করতে হ'লে স্ত্রীলোকদের সহযোগিতা বিশেষভাবে দরকার। স্ত্রীলোকের দুঃখদুর্গতি স্ত্রীলোক বুঝতে পারেন ভাল করে' এবং তাঁদের কাছে অপরাধীরা নিঃসঙ্কোচে সব কথা জানাতেও পারে।

হয় ত সকলে জানেন না যে ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া

প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকেরা পুলিশের কাজে নিযুক্ত হন, এবং বেশ উপযুক্তভাবেই কাজ করেন। অষ্ট্রিয়াতে তাঁদের সহকারী পুলিশ বলা হয় এবং তাঁদের অল্পবয়স্ক অপরাধীদের ভার নিতে হয়। এ ছাড়া তাঁরা স্ত্রীলোক অপরাধীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাদের নিয়ে থানায় যান, অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা যাতে ভিক্ষা না করে ধূমপান না করে সে দিকে দৃষ্টি রাখেন, যে সকল স্থানে স্ত্রীলোকেরা পাপব্যবসায় করে সেগুলির তদন্ত করেন, এবং এই ব্যবসায় করার জন্ম যে সকল স্ত্রীলোক অভিযুক্ত হয় তাদের পরীক্ষা করেন। অষ্ট্রিয়ার পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সেখানে Police Welfare Department গুলিতে সাতাশ জন মহিলা কাজ করেন। সেখানকার পুলিশের অধ্যক্ষ আরো তের জন মহিলাকে কাজ দিতে চান, তিনি স্ত্রীলোক-পুলিশের খুব স্বপক্ষে। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে, যারা স্ত্রীলোক নিয়ে ব্যবসা করে, এই সহযোগী পুলিশরা তাদের অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। অপরিণতবয়স্ক ভিক্ষুক, অপরাধী প্রভৃতি, যাদের শরীর এবং নীতি দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের ভারও এঁরা নেন। এঁরা সর্ব্বদাই এই সকল অপরাধীদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন, স্ত্রীলোকদের এজাহার লেখার সময় উপস্থিত থাকেন, এবং পানাসক্ত স্ত্রীলোকদের উদ্ধারসাধনের জন্যে চেষ্টা করেন। যে সকল স্ত্রীলোক মাতাল স্বামীর অত্যাচারে পীড়িত, এঁরা তাদের রক্ষা করবারও চেষ্টা করেন। জেলখানায় তাঁরা ওয়ার্ডেনের কাজ করেন, এবং Police Juvenile Homes এবং স্ত্রীলোক ও বালিকাদের হোষ্টেলগুলির তত্ত্বাবধান করেন।

সম্প্রতি লিভারপুল ম্যানিসিপ্যালিটিতে স্ত্রীলোক-পুলিশ নিযুক্ত করার পক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটির স্বপক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই সাহায্যার্থে পুলিশ বিভাগে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা উচিত।

অবশ্য ভারতবর্ষের পুলিশ বিভাগে এখনি পুলিশ কনষ্টেবল্ হিসাবে স্ত্রীলোক নিয়োগ করা হোক্, তা আমি বল্‌ছি না। এখন সুশিক্ষিতা এবং সমাজসংস্কারে অভিজ্ঞা মহিলাদেরই এ বিভাগে বেশী দরকার। যে সব নার্সরা স্বাস্থ্যপরিদর্শিকার কাজ করেন, তাঁরা এখানে কাজ কর্‌তে পারেন। মহিলা-চিকিৎসকেরও খুব প্রয়োজন আছে। বালিকাদের বয়স স্থির করার জন্যে অনেক সময় তাদের পরীক্ষা কর্‌তে হয়, এবং অন্যান্য নানা কারণেও স্ত্রীলোক অপরাধীদের এবং অভিযোগকারিণীদের শরীর পরীক্ষা কর্‌তে হয়। এগুলি মহিলা-ডাক্তারের করা বাঞ্ছনীয়।

সব আইনই এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত, যাতে দুর্ব্বল এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা উৎপীড়িত না হয়। ধনবান্ ব্যক্তিদের প্রায়ই আইনের শরণ নিতে হয় না এবং কঠোর আইন প্রণয়ন করলেও তাঁদের খুব বেশী কিছু এসে যায় না। দরিদ্র এবং অসহায় মানুষের রক্ষার জন্যে যে সব আইন প্রণয়ন করা হয়, অনেক সময় সেই সব আইন প্রয়োগ করার ফলে দরিদ্র এবং অসহায় লোকেই বেশী উৎপীড়িত হয়। স্ত্রীলোক অপরাধীদের উপর অনেক সময় অযথা উৎপীড়ন হয়। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষিতা সাধিকা শ্রেণীর মহিলাদের সাহায্য প্রয়োজন। এঁদেরই পুলিশ বিভাগে নিয়োগ করা দরকার, নয় ত এঁদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া দরকার। স্ত্রীলোকেরা সব সময় যে পাপ বা অপরাধ করার জন্যই অভিযুক্ত হন, তা নয়। উচ্চশিক্ষিতা, উচ্চবংশের মহিলারাও আজকাল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অভিযুক্ত হচ্ছেন এবং জেলে যাচ্ছেন। এঁদের ভার সাধারণ পুলিশের হাতে দেওয়া একান্ত অন্যায়। এঁদের মর্য্যাদার হানি অনেকস্থলেই ঘটেছে কেবলমাত্র এই কারণে।

ইংলাণ্ডের পুলিশ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত, কিন্তু ইংলাণ্ডের পুলিশ বিভাগেও এখন স্ত্রীলোক নেওয়ার প্রস্তাব খুব বেশী হচ্ছে। পুরুষ-পুলিশ যতই উপযুক্ত হোক্, স্ত্রীলোক অপরাধী সম্বন্ধে নারীর সমান উপযুক্ত কিছুতেই হ'তে পারে না। বিচার বিভাগেও অনেক স্ত্রীলোক এখন জুরীর কাজ কর্‌ছেন, আমাদের দেশেও মেয়েরা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেছেন। অপরাধ স্ত্রীলোকেও করে পুরুষেও করে। সুতরাং উভয় পক্ষের অপরাধীদের প্রতি সমান সুবিচার করতে গেলে, শাসন ও বিচার বিভাগে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, উভয়েরই স্থান সমান হওয়া প্রয়োজন।

পুলিশ বিভাগে কি কি কারণে স্ত্রীলোক-চিকিৎসকের বিশেষ প্রয়োজন, তা আমি আগেই বলেছি। পাপব্যবসায়িনী এবং অপরাধিনী স্ত্রীলোকও, পুরুষের দ্বারা পরীক্ষিত না হ'তে

চাইতে পারে। তাদের এ ক্ষেত্রে বাধ্য করা অমানুষিক অত্যাচার হবে। অষ্ট্রিয়ার একটি বিখ্যাত নারীসঙ্ঘ এই বিষয়ে ভিয়েনার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বলেন পুলিশ বিভাগে ঢের বেশী স্ত্রীলোক থাকা দরকার। পুলিশ কমিশনার তাঁদের আবেদনের খুব সহানুভূতিসূচক উত্তর দিয়েছেন।

সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা এবং পতিতোদ্ধারের কাজে মহিলারাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। পাপব্যবসায় বন্ধ করার জন্য এবং অল্পবয়স্কা বালিকাদের রক্ষার জন্য যে আইন আছে, তার জোরে যে কোনো পুলিশ কর্ম্মচারী পাপব্যবসায়িনীদের ঘরে প্রবেশ করে' বালিকাদের জন্য অনুসন্ধান করতে পারে। পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুমতি পেলেই তাদের যথেষ্ট। কিন্তু যখন তারা এইরকম কোনো গৃহে প্রবেশ করবে এবং অনুসন্ধান করবে, তখন তাদের সঙ্গে পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত,অথবা অবৈতনিক মহিলা-কর্ম্মী থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল পাশ করানোর খুব চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অর্থের অভাব, মহিলা-কর্ম্মীর অভাব প্রভৃতি নানা কারণ দেখিয়ে, সেখানকার হোমমেম্বর এটির বিরুদ্ধতা করেন।

সকল প্রদেশের শিক্ষিতা এবং আলোকপ্রাপ্তা মেয়েদের উচিত স্ত্রীজাতির সকলপ্রকার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করবার চেষ্টা করা। তাঁরা অবৈতনিক কর্ম্মচারীরূপে কাজ করতে পারেন, যতদিন না যোগ্য বেতনভোগী লোক পাওয়া যায়। বড় বড় সহরে নাগরিক হিতসাধিকা মণ্ডলী গঠিত হওয়া উচিত। তাঁরা স্ত্রীলোকদের রক্ষার্থে যত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তার যোগ্য পরিচালনা হ'চ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। বালকবালিকাদের জন্য প্রণীত আইনের সুব্যবহার হ'চ্ছে কিনা তাও তাঁরা দেখবেন। এঁদের অবশ্য বিশেষ ক্ষমতা লাভের জন্য গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করতে হবে। কিন্তু সেটা বিশেষ শক্ত হবে বোধ হয় না। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারণী সভার প্রতিনিধিদের কলিকাতায় এই রকম বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পশুর চেয়ে মানুষের অবস্থা যাতে শোচনীয় না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই ত গেল আইনের সাহায্য নিয়ে নাগরিক কাজ করার কথা। অবশ্য বড় বড় দুর্নীতি দমনের জন্যে, অত্যাচারের প্রতিকারের জন্যে আইনের সাহায্য ত প্রয়োজন হবেই। কারণ দুর্নীতির ব্যবসায় যারা করে, তারাও স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করে, তারা কারো মুখের কথায় শুধু নিবৃত্ত হবে না। সেক্ষেত্রে হিত-সাধিকাদের আইনের বলে কাজ করতে হবে। কিন্তু আরো অনেকগুলি কাজ আছে, যা স্বেচ্ছাসেবিকারা নিজেরাই করতে পারেন, শাসন বিভাগের সাহায্য না নিয়ে। ঘরবাড়ী পরিষ্কার রাখা, সদর দরজার সামনে বা পিছনের গলিতে সকল রকম আবর্জ্জনা না ফেলা, সংক্রামক রোগের বীজ যাতে চারিদিকে না ছড়ায় তার ব্যবস্থা করা, এ সব বিষয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁরা উপদেশ দিতে পারেন। আমাদের দেশের মেয়েদের পরিবারের বাইরেও যে কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, নাগরিক হিসাবে, তা সহজে বোঝান যায় না। তাঁরা নিজের ঘরদোর হয় ত খুব ফিট্‌ফাট্ করে' সাজালেন, কিন্তু জঞ্জালগুলো আর এক জনের দরজার সামনে ফেলে দিলেন। সংক্রামক রোগের বীজ ছড়ানোর জন্য এঁরা অনেক পরিমাণে দায়ী। রোগীর ব্যবহৃত বিছানা-কাপড় কি ভাবে পরিষ্কার করা উচিত, রোগীর ঘরে যে সব ময়লা বা আবর্জ্জনা জমা হবে তা কেমন ভাবে সরান উচিত, সে বিষয়ে অল্প মেয়েরই জ্ঞান আছে। এমন কি কলার খোসাটাও যে ফুটপাথে ফেলে' দিলে লোকে আছাড় খেয়ে মরবে, সে খেয়ালও অনেক সময় তাঁদের থাকে না। ট্রেনে ষ্টীমারে ভ্রমণের সময়, আমাদের দেশের মেয়েদের অশিক্ষার অত্যাচারে অন্যান্য যাত্রীরা একেবারে উত্যক্ত হ'য়ে ওঠে। এ সকল বিষয়ে স্কুলে কলেজে কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় না, এর আলদা ব্যবস্থা দরকার। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্য ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা দিলে অনেক কাজ হ'তে পারে। ছেলেপিলের স্বাস্থ্যরক্ষা, মায়েদের নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়েও এখনও ঢের শেখবার আছে। অনাথ-আশ্রম, আতুরাশ্রম, পতিতা রমণীর আশ্রম প্রভৃতির অভাব দেশে অত্যন্ত বেশী। এ সকল গড়ে' তুলবার ভার মেয়েদের নেওয়া উচিত। দুঃখী-দরিদ্রের, বিপদগ্রস্তের সেবা প্রধানতঃ তাঁদেরই কাজ। পরিবারে মেয়েদের যে কল্যাণী জননী এবং ভগিনীর স্থান, নগরে এবং রাষ্ট্রেও তাই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তাঁদের নিজের থেকে অগ্রসর হওয়া উচিত, কারো অপেক্ষা না করে'ই।

চীনা রীতিনীতির কয়েকটি নমুনা

শ্রী বিমলেন্দু সরকার বি-এ

চীনাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের জুতার দোকানে, কিম্বা কাপড়ের বোঁচ্‌কা পিঠে নিয়ে যখন বাড়ী চড়াও করে সেই সময়। তাদের সঙ্গে আমাদের যেটুকু মেলামেশা আছে—সেটুকু শুধু কেনা-বেচার খাতিরে। চীনাদের আচার-ব্যবহার জান্‌বার সুযোগ আমরা খুব কমই পাই—তাই এই জাতিটির সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে হ'লে চীন-ফেরৎদের মুখে শোনা কথা ছাড়া আমাদের আর গতি নেই।

সম্প্রতি একজন শ্বেতকায় পুরুষ চীনদেশ ভ্রমণ ক'রে এদের রীতিনীতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হ'ল ছেলেবেলায় যে আজব দেশের কথা পড়ে-ছিলাম—এই চীনদেশেই বুঝি সেই আজব দেশ।

চীন জাতিটা যে অন্যান্য জাতিদের থেকে আচার-ব্যব-হারে স্বতন্ত্র সেটা আমরা ক'ল্‌কাতার ব'সেই কিছু বুঝ্‌তে পারি, যখন দেখি তাদের মেয়েরা পুরুষদের মতই পায়জামা পরে। তাদের রীতিনীতির অনেকগুলিই আধুনিক জগতের অনেক জাতির চালচলনের সঙ্গে খাপ খায় না।

এদের অদ্ভুত আদব কায়দার কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া গেল—

কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে চীনারা তার করমর্দ্দন না ক'রে নিজের করমর্দ্দন করে।

বৃষ্টিতে ছাতা ভিজ্‌লে চুঁয়ে ফেল্‌বার জন্যে তারা ছাতার হাতোলটা নীচের দিকে উল্টে ধরে।

কেউ মারা গেলে শোকপ্রকাশ কর্‌বার জন্যে তারা শাদা পোষাক পরে, কালো পোষাক নয়। এখানে তাদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য আছে।

তারা ফলমূল খায় আহার কর্‌বার আগে, পরে নয়।

চা দিবার সময় ডিসটা কাপের মুখে চাপা দেয় কাপের তলায় রাখে না। তা'তে অবশ্য চা'টা বেশ গরম থাকে। শরীরকে ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্যে তারা গরম কিছু পান করে—ঠাণ্ডা পানীয় নয়।

শোনা যায় স্নান কর্‌বার পরে তারা ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে—শুক্‌নো তোয়ালে দিয়ে নয়।

আমাদের কম্পাসের কাঁটা উত্তরমুখো থাকে—কিন্তু চীনা কম্পাসের কাঁটা দক্ষিণ দিকে থাকে। আমরা বলি দক্ষিণ-পশ্চিম তারা বলে পশ্চিম দক্ষিণ। তাদের পদবী নামের আগে থাকে। চীনারা খামের উপরে কেমন ভাবে ঠিকানা লেখে তার একটা নমুনা দেওয়া গেল—

"নিউ ইয়র্ক সিটি, এভেনিউ ফিফ্‌থ ২০, স্মিথ জন মিঃ।"

চীনা থিয়েটারে নানা রকম মজার ব্যাপার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নিজেকে আরাম দেবার জন্যে আমরা যেমন চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিই—তারা তেমনি গরম তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘসে! এতে তারা নাকি খুব আরাম পায়। সেজন্য চীনা থিয়েটারে গরম তোয়ালে সরবরাহ কর্‌বার ব্যবস্থা থাকে।

চীনা থিয়েটার কিন্তু এখনও আধুনিক সভ্যতার আলোক পায়নি। শত বৎসর আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। চীনা থিয়েটারের ষ্টেজে কোন রকম পর্দ্দার ব্যবস্থা নেই। পোসাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন আর সমস্ত পারি-পার্শ্বিক অবস্থা কল্পনায় ভেবে নিতে হবে। ঐক্যতান বাদকেরা ষ্টেজের পিছনে বসে। অভিনয় কর্‌তে কর্‌তে যদি কোন অভিনেতার কিছু পান কর্‌বার ইচ্ছা হয়—তিনি তা ষ্টেজের উপরেই কর্‌তে পারেন। কোন্‌টুকু অভিনয়ের অন্তর্গত আর কোন্‌টুকু নয় তা' শ্রোতা ও দর্শকদের অনুমান ক'রে বুঝে নিতে হবে।

একজন ব্যর্থপ্রেমিক লোক ষ্টেজের উপর প'ড়ে গেল—অর্থ, সে নিরাশ হ'য়ে জলে ডুবে মরল—কিন্তু পরক্ষণেই সে

যদি দর্শকদের সামনেই ষ্টেজ থেকে উঠে চ'লে যায়—তা'তে ঘটনাটির বাস্তবতার পক্ষে কোন হানি হয় না।

অভিনয়ে একজন লোককে যদি খুন করা হয়, আর সেই জখম ব্যক্তি যদি তখনই আবার সুস্থ শরীরে উঠে ষ্টেজের মধ্যেই চা পান করেন তা'তে কোন দোষ হয় না। দর্শকেরা এখানে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝে নেবেন যে ওটুকু অভিনয়ের বাইরে। কেউ যদি তা' মান্‌তে না চান—তবে নিজেই বোকা ব'নে যাবেন।

মে ল্যাং ফ্যাং—একজন প্রসিদ্ধ চীনা অভিনেতা—তাঁর নাম বোধ হয় অনেকেই শুনেছেন—। ইনি সর্ব্বদাই ষ্টেজের উপর চা পান করেন। তাঁর হুকুম পেলেই বয় ষ্টেজের উপরে চা নিয়ে আসে—তিনি মুখের কাছে পাখা দিয়ে একটু আড়াল ক'রে চা পান করেন। যদি তিনি চা পান কর্‌তে কর্‌তে বয়ের গায়ে চা ছিটিয়ে দেন—সেজন্য দর্শকেরা বা শ্রোতারা হাস্‌তে পাবেন না—কারণ চা-পান ব্যাপারটা নেপথ্যে হ'চ্ছে—দর্শকদের তার সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই ভেবে নেওয়া হয়।

পেকিং সহরে লাংফুসু নামে একটি চীনা আসবাবপত্রের হাট বসে। বিদেশীরা এখান থেকে তাদের পছন্দমত চীনা দেশীয় জিনিষপত্র কেনেন। যে সব রিক্সওয়ালারা এখানে খরিদ্দার নিয়ে যায়—তারা ঐ সব দোকানদারদের কাছ থেকে খরিদ্দারপিছু কমিশন আদায় করে। এই কমিশন দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে সেখানকার দোকানদারেরা একজোট হ'য়ে একটি বিজ্ঞাপন দেয়—তার অনুবাদটি নীচে দেওয়া গেল—

বিজ্ঞাপন

প্রিয় খরিদ্দারগণ, আপনারা লাংফুসু হাটে জিনিষ কিনিতে আসিবার সময় রিক্স কুলীদের সঙ্গে আনিবেন না—কারণ তাহারা আমাদের কমিশন আদায় করে। আমরা যদি তাহাদের কমিশন না দিই, তবে 'খারাপ জিনিষ' 'বড় দাম' এইরূপ মন্তব্য পেশ করিয়া তাহারা আপনাদের ভাঁওতা দিবে। যদি আমাদের কমিশন দিতেই হয়—তবে আমরা জিনিষের দামের মধ্যে তাহা আপনাদের কাছ থেকেই আদায় করিব; শেষ পর্য্যন্ত আপনারাই ঠকিবেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আসিবার সময় উহাদের সঙ্গে আনিবেন না। ইতি

আপনাদের বিশ্বাসী—ব্যবসায়ীগণ।

অল্পশিক্ষিত চীনারা চিঠি কিম্বা পার্শেল পোষ্ট ক'র্‌বার সময় মোড়কের উপর পোষ্ট অফিসের বিদেশী কর্ম্মচারীদের নানারূপ অনুরোধ লিখে জানায়। তাদের বিশ্বাস বিদেশী কর্ম্মচারীরা শীঘ্র ও যথাস্থানে চিঠি কিম্বা পার্শেল পাঠিয়ে দেবে। এই রকম অনুরোধের একটি নকল দেওয়া গেল—

Reverently submitted to the Great English Postman, Run! Take this most hasty letters to A-long, son of A-chak, the grocer, South Street, New Golden Mcuntains (Australia). Beware! Valuables are within!

সাধারণ চীনারা ভাল ইংরাজী শেখে না—অথবা ব্যবসার খাতিরে অল্প স্বল্প চর্চ্চা রাখ্‌তে হয়। অল্প বিদ্যার জোরে তারা যে সব ইংরাজী বলে তা'তে হাসি চাপা দায় হ'য়ে ওঠে। সাংহাই বন্দরে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনগুলি কয়েকটি দোকানের সামনে দেখ্‌তে পাওয়া যায়:

একটি চুল ছাঁটিবার সেলুনের সামনে লেখা আছে—"Heads cut fine"। এক দাঁতের ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীর সামনে সাইন-বোর্ড আছে—"TEETH Carpenter"। একটি ফটো তুল্‌বার ষ্টুডিওর সামনে বড় হরফে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—"Photographers Executed"।

এইখানে মনে রাখা দরকার—দোষটা তাদের জাতিগত নয়। লণ্ডনের বাজারে সাহেব দোকানদার চীনা খরিদ্দারকে আকৃষ্ট কর্‌বার জন্যে যদি চীনা ভাষাই ব্যবহার করে, তবে মনে হয় তারাও এমনি এক হাস্যকর ব্যাপার সৃষ্টি কর্‌বে।

‘রায়-বেঁশে’র ‘রাই’-বেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর চিত্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই রায়বেঁশে যোদ্ধাদের অদৃষ্টের যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তখন হইতেই তাহাদিগকে যোদ্ধার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সমাজের অন্য ক্ষেত্রে ব্যবসা খুঁজিতে হইয়াছে। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, যখন বাঙ্গালী জমিদারের অধীনে পাইকগিরি, বরকন্দাজি ইত্যাদি ব্যবসাও বাঙ্গালীর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন অগত্যা বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রার অনুগমন এবং পথে বরের দলকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ভার তাহাদের উপর পড়িল। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিয়া তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেশের অনেক স্থানেই অশান্তি ও ডাকাতি ইত্যাদির উপদ্রব ছিল বলিয়া বিবাহের শোভাযাত্রায় বলশালী রায়-বেঁশেদের রক্ষকস্বরূপে অনুগমনের বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে দেশে পূর্ণ শান্তি-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবশ্যকতা আর রহিল না। বরের শোভাযাত্রায় রায়বেঁশেদের অনুগমনের প্রথা উঠিয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ব্যাণ্ড্ ইত্যাদির ফ্যাসান প্রচলিত হইতে লাগিল। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ইতিমধ্যে রায়বেঁশের প্রাচীন যোদ্ধাবৃত্তির স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,— এমন কি, সাহিত্যে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী রায়বেঁশে নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ইহাদিগকে সাধারণ নর্ত্তক নর্ত্তকীর দল মনে করিয়া ‘রাইবিশে’ আখ্যা প্রদান করিয়াছে। আর এই রাইবিশেদিগকে তাণ্ডব নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণলীলার নাচ ও বাই-নাচের সঙ্গে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালী এক সময়ে বড় যোদ্ধার জাতি ছিল, বাঙ্গালী তাহা নিজেই ভুলিয়া গিয়া এখন কেবল রাধাকৃষ্ণের নৃত্যাভিনয়ে ও বাই-নাচের উপভোগে গা ঢালিয়া দিয়াছে। এখন আর নগ্নদেহে বীর-ধড়ি (ল্যাঙ্গট) পরিয়া পুরুষের যোদ্ধার নৃত্যের অর্থ অথবা মূল্য বাঙ্গালী বুঝিতে পারে না,— সেই নৃত্য তার চোখে আর ভালো লাগে না!

এই হইল বাংলার ইতিহাসের ও বাঙ্গালীর চরিত্রের উনবিংশ শতাব্দীর চিত্র। এখন নর্ত্তকের বেশে নাচিতে হইলে ধরিতে হইবে কৃষ্ণের ধড়া-চূড়া ও বাঁশী,—নর্ত্তকীর বেশে নাচিতে হইলে পরিতে হইবে—হয় বাঙ্গালী রাধিকার সাড়ী ও ঘোম্‌টা, নয় বৃন্দাবনী রাধিকার অথবা পশ্চিমা বাইজীর ঘাগ্‌রা। কিন্তু এই যুগে নর্ত্তকের নৃত্য হইতে নর্ত্তকীর নৃত্যেরই চাহিদা বাংলার সমাজে বেশী হইয়া পড়িল।

বাংলার জীবনে অতি-‘রাই’-ভাব

ইতিমধ্যে বাঙ্গালী সমাজে ও বাঙ্গালী চরিত্রে একটা মহা পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্তও বাংলার সমাজে ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, পা ফাঁক করিয়া সিগারেট ফুঁকা ও মজ্‌লিস করিয়া মদ খাওয়া সভ্যতার একটা বিশেষ ও চূড়ান্ত নিদর্শন। এবং এই সব মজলিসে, এমন কি, দুর্গোৎসব ইত্যাদি উপলক্ষেও, শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে এই যুগে মদমাংসর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বাই নাচের বহুল প্রচলন হইয়া পড়িল। সুতরাং ‘রাইবিশে’ আখ্যায় পরিচিত রায়বেঁশের বংশধরেরা এখন দেখিল যে বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিয়াই যদি জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে বাইজীর ঘাগ্‌রা পরা ছাড়া আর উপায় নাই। তাই অর্জ্জুনকে যেমন দায়ে পড়িয়া ধরিতে হইয়াছিল বৃহন্নলার বেশ, তেমনি রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীর বংশধরদিগকেও ধরিতে হইল

বাইজীর 'রাই'-বেশ। 'রায়-বাঁশের' পরিবর্তে ধরিতে হইল 'রাই'-বেশ,—বীর-ধড়ির পরিবর্তে ঘাগ্‌রা। বজ্রমুষ্টি-সঞ্চালন ও 'বেড়া-পাকের' তাণ্ডবের পরিবর্তে তাহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইল মৃদু পদবিক্ষেপে কোমর দুলাইয়া লাস্য। রায়বেঁশেদের জাতীয় জীবনে অসমসাহসিক যোদ্ধার পৌরুষমণ্ডিত গৌরবময় স্থান হইতে বাই-নাচের এই দুর্নীতির গহ্বরে পতন, বাঙ্গালীর চরিত্রে ও সমাজে প্রাচীন যুগের প্রকৃতি হইতে বর্তমান অধঃপতনের প্রতীকমূলক একটি নিদর্শন মাত্র।

এই অবনতির ধারা যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, রাইবিশে নৃত্যের বর্তমান প্রণালীর সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। অবনতি যেখানে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর হইয়াছে সেখানে রাইবিশেরা ঘড়িস্ ও ঘাগ্‌রা পরিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু যেখানে খাঁটি বাই-নাচের চাহিদা বাঙ্গালী সমাজে বেশী হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে তাহাদের লম্বা চুল রাখিয়া, মাথার মাঝখানে মেয়েলি সিঁথি কাটিয়া খোঁপা পরিতে হইয়াছে, এবং চুলে ও খোঁপায় বাইজীর অনুকরণে মন ভুলানো অলঙ্কার পরিধান করিতে হইয়াছে। ঘাগ্‌রা-পরা একটি ছবি এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া গেল। পাটি করিয়া মেয়েলি সিঁথি-কাটা খোঁপা-বাঁধা চুলে অলঙ্কার পরিয়া রাইবিশে নৃত্য দেখিয়া আমার মনে এত লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল যে, তাহার ছবি পর্য্যন্ত লইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। এবং সমাজের রুচির পরিবর্তনে সেই গৌরবময় তাণ্ডব নৃত্যের স্থানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রায়বেঁশেদের কি জঘন্য প্রণালীর নৃত্যের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই স্ফীত বক্ষে, বজ্রমুষ্টিবদ্ধ বাহু-সঞ্চালনের সহিত রণডঙ্কা ও কাঁসির তালে তালে সতেজে উন্নত দৃপ্ত পদবিক্ষেপে, ও বীরত্বব্যঞ্জক মুখভঙ্গে, মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার ও রণশিঙ্গার নিনাদ সহযোগে রণতাণ্ডব নৃত্য,—আর কোথায় এই বাঁয়াতব্‌লার বিলাস-তালে ও সভ্য-জগৎ-বর্জ্জিত কিস্তূতকিমাকার আমদানী হারমোনিয়াম যন্ত্রের লাস্যপ্রমোদক মেয়েলি মিহি কোমল সুরের সঙ্গে হাত-কাঁপানো, কোমর-দুলানো, কটাক্ষ-ছড়ানো, ইঙ্গিত-মাখানো, আধুনিক বঙ্গসমাজের মন-ভুলানো অতি-'রাই'-ভাবাত্মক মজ্‌লিসী নৃত্য! ইংরাজী কিম্বদন্তী অনুসারে বলিতে ইচ্ছা করে—"এই ছবি দেখ,—আর ঐ!" (Look at this picture and that!)

"আয় ঢকাঢক্ মদ খি'সে"

বাংলার ভদ্র সমাজের নৈতিক আব্‌হাওয়া ও বাঙ্গালীর চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের চমৎকার প্রতিকৃতি আমরা পাই এই দুই ছবির তুলনায়। প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের রণতাণ্ডব রায়বেঁশে নৃত্যের সঙ্গে বর্তমান 'রাইবিশে'র অতি-'রাই'-ভাবাপন্ন লাস্য-নৃত্যের যে পার্থক্য, গঙ্গারাঢ় ও পাল যুগের বাংলার পৌরুষময় ও প্রাণবান জীবন-পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান যুগের বাংলার জীবনে, ধর্ম্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে অতি-কৃত্রিমতার, অতি-কোমলতার, প্রাণস্পর্শহীনতার ও পৌরুষ-হীন অতি-'রুচি'-ভাবের সেই পার্থক্য। রায়বেঁশেদের নৃত্যের প্রণালীতে এই যে দুভার্গ্যজনক পরিবর্তন, ইহার জন্য দায়ী ইহারা নয়, ইহার জন্য দায়ী বাংলার ভদ্র সমাজের রুচিবিকৃতি। আমরা আগেই দেখাইয়াছি, প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীর বংশধরেরা জীবিকা-নির্ব্বাহের নির্ম্মম প্রয়োজনের খাতিরে, যে প্রণালীর নৃত্যের চাহিদা দেশের ধনী ও ভদ্র সমাজে হইয়াছে তাহাই যোগাড় করিয়াছে। ইহাতে ইহাদের দোষ দেওয়া চলে না। কেন না, যে ভদ্র-মজ্‌লিসের সামনে ইহাদের নৃত্য করিতে হয় তাহাদের মনোমত ও রুচি-অনুযায়ী ভাবভঙ্গীময় নাচই ইহারা দায়ে পড়িয়া অগত্যা যোগাড় করিয়াছে।

পাঁচ মাস আগে এই রায়বেঁশে নৃত্য যখন প্রথম আমার নজরে আসিয়াছিল এবং ইহার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যখন বীরভূমের অনেককেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন এই জেলার স্বনাম-খ্যাত নাট্যকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "রায়বেঁশে সম্বন্ধে এইমাত্র জানি যে এই নাচ বিবাহ উপলক্ষে হইয়া থাকে এবং ছেলেবেলা হইতেই এ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী শুনিয়া আসিতেছি—

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

" এই ছবি দেখ—"

'দাদার বিয়ে যেমন তেমন
আমার বিয়েয় রাইবিশে,—
আর ঢকাঢক্ মদ খি'সে' !"

এই কিম্বদন্তী হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালী ভদ্র সমাজের বিলাস-মজ্‌লিসে কি আব্‌হাওয়া প্রচলিত ছিল এবং কি প্রকৃতির দর্শকদের রুচি-অনুযায়ী নৃত্য বিবাহের সময়ে রাইবিশের দলকে যোগাড় করিতে হইয়াছিল। এই আব্‌হাওয়া যে এখনও চলিত আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, এখনও রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীরপ্রকৃতির বংশধরদিগকে ভদ্র সমাজের বিবাহের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছদ্মবেশী বৃহন্নলার মত রাই-বেশে নৃত্য করিবার জন্য ডাক পড়ে।

'কচি-ভাব' হইতে রক্ষা

জাতীয় জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী এই বিকৃত রুচি ও বিকৃত মনোভাবের দুর্ভাগ্যময় ফলপ্রসব সত্ত্বেও যে এই রাই-বিশের দল বাংলার ভদ্র সমাজের মতই তাহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রাচীন বীরভাব ও বীরত্ব-পদ্ধতি একেবারে ভুলিয়া গিয়া 'কচি-সংসদে' অথবা একটা পুরুষকার ও প্রাণবস্তু-হীন কৃত্রিম দো-আঁস্‌লা কিম্ভূত পদার্থে পরিণত হইয়া যায় নাই, ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। যদি তাহাদের প্রকৃতিতেও এই শোচনীয় বিকৃতি ঘটিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই প্রাচীন মহা-গৌরব-মণ্ডিত রণতাণ্ডব নৃত্যকলা ও ব্যায়াম-প্রণালী চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত, এবং কেবল মহাদেব-মূর্ত্তির ও প্রাচীন মন্দিরের গায়ের ক্ষোদিত মূর্ত্তির প্রতিকৃতি অনুকরণ ও পুঁথির বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃত্যকে আবার জীবন্তভাবে জাতীয় জীবনে প্রচলন করিবার সুযোগ ও সুবিধা বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিত না।

রায়বেঁশের বিশেষত্ব

ইহারা যে 'কচি-সংসদে' পরিণত হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, সৌভাগ্যবশতঃই বলিতে হইবে,

তাহারা এতদিন আমাদের আধুনিক পাঠশালা, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্রিমতা, প্রাণস্পর্শহীনতা, জড়তা, আনন্দহীনতা ও বিলাসিতা-প্রণোদক পুরুষকারনাশী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই রায়বিশে জিনিষটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত সত্তা,—ইহা কেবল একটি বিশেষপ্রকার নৃত্যকলা মাত্র নয়, ইহা পাঁচটি বিশিষ্ট অঙ্গসমন্বিত একটি পূর্ণাবয়ব সত্তা। এই পাঁচটি অঙ্গের প্রথম অঙ্গ—রণতাণ্ডব নৃত্যকলা; দ্বিতীয় অঙ্গ—নৃত্যকলার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু 'য়্যাঃ' নিনাদে হুঙ্কার; তৃতীয় অঙ্গ—রণশিঙ্গার স্বনন এবং রণডঙ্কা ও কাঁসির উন্মাদক ছন্দের রণন; চতুর্থ অঙ্গ—এই ধ্বনি, নৃত্য ও সিংহনাদের তালে তালে বীরোচিত সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া; পঞ্চম অঙ্গ—ব্যায়াম-ক্রীড়ার সময় মুখে হাততালি দিয়া উচ্চ আরাব করিয়া উল্লাসপ্রকাশ।

বৃহন্নলার লুক্কায়িত বীর-মূর্ত্তি

আধুনিক ভদ্র সমাজের বিকৃত রুচির ফরমাইসের খাতিরে ইহাদের নৃত্যকলা অনেক জায়গায়ই শোচনীয় অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে; এমন কি, ইহাও শুনি যে, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ইহারা নৃত্যকলার অঙ্গটি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে ভুলিতে পারে নাই। আর যেখানে ইহাদের নৃত্যকলা রায়বেঁশে ভাব ও পদ্ধতি হইতে বিচ্যুত হইয়া 'রাই'-ভাব ও 'রাই'-বেশ ধারণ করিয়াছে, সেখানেও রণডঙ্কা ও কাঁসির তালে তালে সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়ার প্রথা ইহারা এখনও বজায় রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া ইহাদের বীরভাব এখনও অনেকটা বজায় রহিয়া গিয়াছে। কারণ, বিবাহের সময় ইহারা যে কেবল নৃত্য করে তাহা নয়, সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের ব্যায়াম-ক্রীড়া হইতেও অদ্ভুত আপনাদের শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক বাংলার প্রাচীন সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। আর যখন সেই সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করে তখন হাদের 'রাই'-বেশ খুলিতে হয় এবং তাহার ভিতরে এখনও হারা যে বীর-ধড়ি পরিধান করে তাহা বাহির হইয়া পড়ে, এবং অর্জ্জুনের যেমন বৃহন্নলার নপুংসক বেশের আবরণের আড়ালে বীরের শক্তিময় মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল, ইহাদেরও তেমনি 'রাই'-বেশের ঘাগ্‌রার অন্তরালে (এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েলি সিঁথি ও লম্বা চুলের খোঁপা সত্ত্বেও) যে বীরের শক্তিমান মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যাহারা 'রাই'-বেশের ঘাগ্‌রা পরিয়া মেয়েলি নৃত্য করিয়া বিবাহের মজ্‌লিসে আধুনিক বাংলার ভদ্র সমাজের চিত্তবিনোদন করে, তাহারাই যে আবার পরমুহূর্ত্তে ঘাগ্‌রা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার আড়ালে বীর-ধড়ি-পরিহিত বিশাল-বক্ষ স্ফীতপেশীযুক্ত নগ্নদেহে বীরের ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহা ইহাদের বিচিত্র ইতিহাসময় জীবনের ও আমাদের আধুনিক সমাজের এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা।

অধিকাংশ স্থলেই এই প্রহেলিকাময় দৃশ্য রাঢ় প্রদেশে বিবাহ উপলক্ষে আজকাল দেখা যায়, অর্থাৎ 'রাই'-বেশে পুরুষদের লাস্যময় নৃত্য,—আবার সেই পুরুষদেরই বীর-ধড়ি পরিয়া নগ্ন বীরদেহে রণডঙ্কা ও কাঁসির তালে তালে অদ্ভুত সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া। রায়বেঁশে শ্রেণীর এই সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়াতে এমন একটি মৌলিকতা আছে, যাহাকে বিশেষভাবে বাংলার প্রতিভাজাত বলা যাইতে পারে। ইহারা ব্যায়াম-ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢোলের ও কাঁসির তালে তালে পরম উল্লাসে নৃত্য করিয়া থাকে এবং তাহাতে একটি অভিনব রসকলার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহাকে ব্যায়াম-ক্রীড়া না বলিয়া ব্যায়াম-নৃত্য বলা যাইতে পারে। *

খাঁটি রাইবিশে

এখনকার সকল রাইবিশের দলই যদি তাহাদের প্রাচীন 'রায়বেঁশে' রণতাণ্ডব নৃত্য ভুলিয়া গিয়া 'রাই'-বেশে নৃত্য করিত, তাহা হইলে এই রায়বেঁশে রণতাণ্ডব যে ভারতীয়

* আজকাল শ্রীযুক্ত দত্তের উৎসাহে বীরভূমের বহু উচ্চ এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা রীতিমত রায়বেঁশে তাণ্ডব নৃত্য ও রাইবিশে ব্যায়াম-নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন এবং ইহার ফলে তাঁহারা শিক্ষা-ক্ষেত্রে একটা নূতন শক্তি ও সাহসের উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে রায়বেঁশের পুনরাবিষ্কারের প্রাণবান প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লেখক ভবিষ্যতে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিবেন।—বঃ সঃ

"—আর ঐ।"

সুক্ষ্মকলার উচ্চ আদর্শে গঠিত কি গৌরবময় জাতীয় সম্পদ তাহা জানিবার এবং তাহাকে অবলুপ্তি হইতে উদ্ধার করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিত না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, আমি প্রথম যে রাইবিশে দলের নৃত্য দেখিয়াছিলাম, তাহাদের আদিম নৃত্যকলা-পদ্ধতিতে এই অবনতি প্রবেশ করে নাই। অনুসন্ধানের ফলে এখন দেখা যাইতেছে যে, রাঢ় অঞ্চলের পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ প্রদেশে এবং বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে ইহারা প্রাচীন রায়বেঁশে তাণ্ডব নৃত্য সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া তাহার স্থলে এখন কেবলমাত্র 'রাই'-বেশে বাই-নাচের মত লাস্য-নৃত্য করিয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নগ্নদেহে বীর ধড়ি পরিয়া ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া থাকে। এমন কি, শুনিতে পাই যে মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের মধ্যে নৃত্যকলাটি একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও কেবলমাত্র ব্যায়াম-ক্রীড়াই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু রাঢ় প্রদেশের একান্ত পশ্চিম ভাগে অর্থাৎ বীরভূমের পশ্চিম ভাগ ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশের কোন কোন স্থানে ইহাদের প্রাচীন তাণ্ডব নৃত্য-পদ্ধতি এখনও অনেকটা অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রহিয়াছে।

রাঢ় সৈন্যের গৌরব-ধারা

ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, রাঢ় প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তেই খাঁটি রায়বেঁশে শ্রেণীর অমিতপরাক্রম যোদ্ধাদের অতি প্রাচীনকাল হইতেই বসতি ছিল। ইতিহাস হইতে ইহা এখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'গঙ্গারাঢ়' বা 'গঙ্গারাঢ়' প্রদেশের ভারতীয় যোদ্ধাদের অতুল পরাক্রমের কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের সৈন্যদল পূর্ব্বভারতে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করে এবং ইহার ফলে সেকেন্দরকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ইহা হইতেই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে

পারি, এই গঙ্গারাঢ়ী সেনাদল সেই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিল।* গঙ্গারাঢ় প্রদেশ যে আধুনিক রাঢ় প্রদেশ ইহা বিদেশীয় পর্য্যটক মেগাস্থিনিস্ ও টলেমির গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রমাণাদি হইতে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে। এবং এই গঙ্গারাঢ় নাম হইতেই খুব সম্ভবতঃ আধুনিক রাঢ় নামের উৎপত্তি। রাঢ় প্রদেশের এই প্রচণ্ড পরাক্রমশালী যোদ্ধাদের অনেকেই যে রায়বেঁশে শ্রেণীর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গঙ্গারাঢ়ীদের সময় হইতেই যে একটা বিশেষ গভীর সামরিক গৌরব-ধারা এই প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছিল তাহাও নিঃসন্দেহ। কেন না, ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা পাই যে, রাঢ় প্রদেশের সৈন্যদলের বাহুবলের সাহায্যেই সেন রাজবংশ সামান্য সামন্তের পদ হইতে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। † এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাঢ় প্রদেশের সৈন্যদলের বাহুবলের সাহায্যেই উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ উড়িষ্যায় মুসলমান আক্রমণ বার বার প্রতিহত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ‡ পশ্চিম রাঢ়ের এই দোর্দ্দণ্ড সৈন্যদলের বলে বলীয়ান হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বীরভূমের রাজনগরের মুসলমান রাজবংশ এত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নবাবের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। * এবং পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেও লর্ড ক্লাইব বিলাতে সিলেক্ট কমিটির নিকট যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তৎকালের বীরভূমের রাজা, দিল্লীর উজীর এবং মারাঠা "এই তিন প্রধান শক্তির সঙ্গে সন্ধি করা বাঞ্ছনীয়।"† ইহা হইতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও পশ্চিম রাঢ় প্রদেশের সৈন্যদলের দুর্জ্জয় প্রতাপের প্রমাণ আমরা পাই। পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পরেও এই পশ্চিম রাঢ় প্রদেশের পরাক্রান্ত সৈন্যদের সাহায্যে বীরভূমের রাজা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ‡

ইহার পরেও বাংলার অন্যান্য রাজাদের শৌর্য্যবীর্য্যের তিরোধানের অনেক কাল পর পর্য্যন্তও বীরভূমের রাজনগরের রাজবংশ এই অঞ্চলে তাঁহাদের পরাক্রম বহুকাল বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৈন্যদলে অসংখ্য রায়বেঁশে যোদ্ধা ছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে ইহাদের রাইবিশে নামে খ্যাত বংশধরদিগের মধ্যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক সামরিক ভাব ও নৃত্যকলা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা যে বেশী-দিন বজায় থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। আমি অনেক রাই-বিশে দলের ব্যায়াম ও নৃত্যক্রীড়া দেখিয়াছি। রাজনগরের রাজধানীর অনতিদূরে এবং রাজনগরের গড়ের ভিতরে অবস্থিত 'গোহালিয়ারা' গ্রামের রাইবিশে দলের নৃত্যই ইহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সুন্দর। ইহা হইতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতার সমর্থন হয়। এই পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রাচীন 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদলের বংশধরদের লুপ্তাবশেষই এখন যোদ্ধার ব্যবসা হইতে বিচ্যুত হইয়া কাঙ্গালবেশে 'রাইবিশে' নামে অতি দীনভাবে কালাতিপাত করিতেছে এবং বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য ও ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে।

* (a)......He (Alexander)...... learnt beyond the river lay extensive deserts which it would take eleven days to traverse. Next came the Ganges, the largest river in all India, the farther bank of which was inhabited by two nations, the Gangaridæ and the Prasii whose King Argammes kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 2,00000 infantry, besides 2,000 four-horsed chariots and what was the most formidable force of all, a troop which he said ran up to the number of 3,000.

(b) ...... He (Alexander) gathered them (his Soldiers) all together and in a well weighed speech addressed the assembly on the subject of the expedition against the Gangaridæ; but when the Macedonians would by no means assent to his proposal, renounced his contemplated enterprise.

History of Alexander the Great by Q. Curtis Rufus and J. W. Mccrindle's Ancient India.

† বল্লালসেনের কাটোয়ার তাম্রশাসন। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

‡ (১) বিবিধপ্রসঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (২) Elphinstone's History of India. P.243 (7th ed).

* Sair-ul Mutakharin. II. P. 393-94.

† C. R. Hill's Bengal in 1756-57. vol. I. P. excvii and vol. II. P. 418.

‡ Hunter's Annals of Rural Bengal.

রায়বেঁশে ব্যায়াম-নৃত্য

বাংলার "স্পার্টান্" সৈন্য

রাঢ় প্রদেশের বাঙ্গালী যোদ্ধাদিগের খৃষ্টপূর্ব্ব সুদূর যুগ হইতে অমিত পরাক্রমের এই বিচিত্র ইতিহাস স্মরণ করিলে পশ্চিম রাঢ় প্রদেশকে বাংলার 'স্পার্টা' এবং রায়বেঁশে যোদ্ধাদিগকে বাংলার 'স্পার্টান্' সৈন্য নামে অভিহিত করা অশোভন বা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। • যে দেশে এবং যে সমাজে জাতির এইরূপ গৌরব-স্থানীয় যোদ্ধাদিগকে ধর্ম্ম ও সমাজের ভ্রান্ত বিধানে পদদলিত, নির্য্যাতিত, অবজ্ঞাত, অস্পৃশ্য ও শিক্ষা হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখা হয়, সেই দেশের এবং সেই সমাজের যে ইতিহাসে তাহা ক্ষয় হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। যে যে যুগে, অর্থাৎ * গঙ্গারাঢ় যুগে ও পাল যুগে, এবং সেন রাজত্বের প্রথম যুগে, এই বীরের দলকে উপযুক্ত শ্রদ্ধার স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই যুগেই বাংলার ইতিহাস বীর্য্যগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। সেন বংশের শেষ যুগে বল্লালী আমল হইতে হিন্দুয়ানির ছোঁয়াছুঁয়ির আতিশয্যে এই বীরের দল যখন সমাজে ও রাষ্ট্রে অতি-ঘৃণ্য ও অতি-অস্পৃশ্য হইয়া পড়িল, তখন হইতেই যে বাংলার ইতিহাসের এই বহুযুগব্যাপী গৌরব সহসা অস্তমিত হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। অতিরিক্ত হিন্দুয়ানির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ইহারা যে বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণে স্বস্তি বোধ করিয়াছিল এবং সেন রাজগণের সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। •

নব যুগের প্রতিষ্ঠার সুযোগ

ইহাদের শৌর্য্যবীর্য্য এবং সামরিক প্রকৃতি ও প্রণালী এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই,—এখনও ইহাদিগকে সমাজে ইহাদের পৌরুষের স্বাভাবিক প্রাপ্য উচ্চ ও গৌরবময় স্থান দিয়া, ইহাদিগের নিকট হইতে বাঙ্গালীর প্রাচীন বীরপ্রকৃতির অনুপ্রাণনা পুনর্গ্রহণ করিয়া, এবং ইহাদিগের শিক্ষার ও অন্নসংস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া বাংলার জাতীয় জীবনকে পুনরায় প্রভাবান্বিত করিবার সুযোগ আছে। সে সুযোগ বাঙ্গালী কি গ্রহণ করিবে? যদি ধর্ম্মের ও শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শের মূঢ়তা বশতঃ এখনও বাঙ্গালী ইহাদিগকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া সমাজে ইহাদের প্রাপ্য স্থানে না বসায় তাহা হইলে ক্ষতি বাঙ্গালীরই। কারণ, আর বেশী দিন ইহাদিগকে উপেক্ষা করিলে দেশ হইতে যে শৌর্য্যসম্পদ লুপ্ত হইবে তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না!

বাংলার হিন্দু সমাজের বিধানে নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অস্পৃশ্য এই বীরের দলকে অতীতের ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া আবার কোলে টানিয়া তুলিয়া সমাজে তাহাদের প্রাপ্য গৌরবময় স্থান প্রদান করিলে শিক্ষায় ও শৌর্য্যে বাংলায় আবার যে কি নূতন যুগের সূচনা করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা আমরা এখন করিব। (ক্রমশঃ)

* "...On its inhabitants devolved, during three thousand years, the duty of holding the passes between the highlands and the valley of the Ganges. To this day they are a manlier race than their kinsmen of the plains..........."

W. W. Hunter's Annals of Rural Bengal. P. 3.

* ইহারা তখন ছিল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বল্লালী যুগের সেন রাজাগণ ছিলেন ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল। এই বিদ্বেষের পরিচয় শূন্যপুরাণের শেষভাগে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামক কবিতায় পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ-পীড়নে ব্যতিব্যস্ত বৌদ্ধেরা মুসলমান বিজেতার সাহায্যে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিয়া মনে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

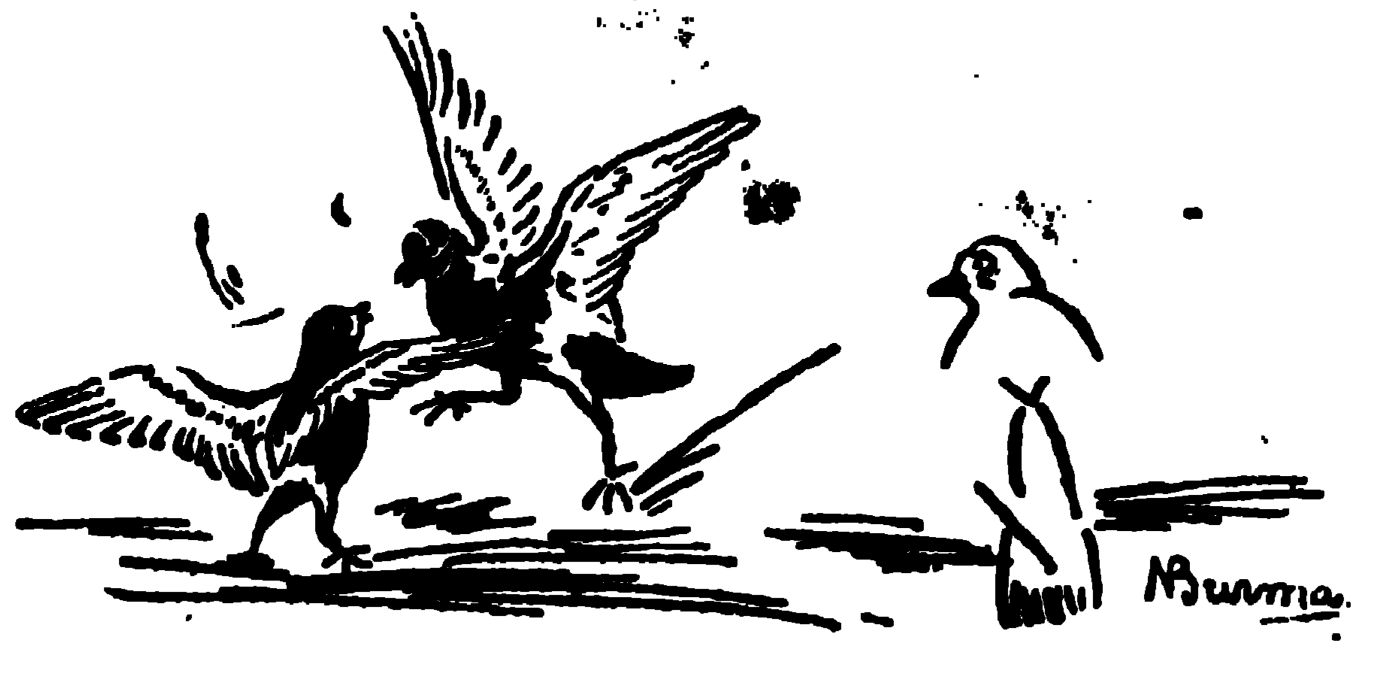

হাল ফ্যাসান

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

মালতীদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে শুক্লা তার ডাইরিতে এই কথাগুলো লিখ্‌লে—

মালতীদের ওখানে গিয়েছিলাম, বেশ মজা হ'ল, গ্রেমফোনে রবি বাবুর কতকগুলো গান শুন্‌লাম। "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার"টা রবি বাবুর গলায় বড্ড মানিয়েছে। সুধীর তো ছিলই, বেচারা বড় ভাল, যা বলি তাই করে, ওকে না হ'লে আমার এক মিনিটও চলে না, আজ কিন্তু দু' একবার সেই কথাটা পাড়্‌বার চেষ্টা করেছিল, আমি খুব সাবধানে কথার স্রোতটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম, তাই রক্ষা।

সুলেখার নাকি বিয়ের সব ঠিক্, শচীনেরই সঙ্গে শেষে হ'ল। যাক্, মাসের মধ্যে দশ বারো বার চা খাইয়ে লাভ আছে!

বাবার আজ ক্লাবে ডিনার, বাড়ী আস্‌তে দেরী হবে।

মা ছোট মাসীর ওখানে গিয়েছিলেন।

বুড়ুর ছেলে হয়েছে, ভাল হ'ল, শাশুড়ীটা যে দজ্জাল মেয়ে মানুষ, মেয়ে হ'লে হয় ত বেচারাকে মেরেই ফেল্‌ত!

ওঃ, একটা কথা লিখ্‌তে ভুলে যাচ্ছি। মালতীদের ওখানে শুন্‌লাম দেবকুমার ব'লে একজন ভদ্রলোক নাকি মেয়েদের নাম শুন্‌লেই চোটে যান। স্ত্রীজাতিকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন। স্পর্দ্ধা ত কম নয়! যে জাতির জন্যে পৃথিবীতে কত কুরুক্ষেত্রই না হ'য়ে গেল, সেই জাতিকে ঘৃণা করে কিনা একজন বাঙালী যুবক! কালে কালে কতই না শুনব। সীতার জন্যে লঙ্কাকাণ্ড হ'ল, হেলেনের জন্যে ট্রয়নগর ধ্বংস হ'ল, ক্লিওপেট্রার জন্যে ঈজিপ্ট ছারখার হ'ল, পদ্মিনীর জন্যে চিতোর—আর কত নাম করব? এর উপরও কিনা একজন পুরুষ বলে যে সে নারীদের ঘৃণা করে? কি লজ্জার কথা! কি অপমানের কথা! সব মেয়েদের মিলে কিন্তু এর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। ছলে বলে কৌশলে যে ক'রেই হোক্ একজন মেয়ের পায়ে এই গর্ব্বিত লোকটির গর্ব্বিত মস্তকখানি নত করাতে পার্‌লে তবে আমাদের মান রক্ষা হয়। আচ্ছা, আমিই একবার চেষ্টা ক'রে দেখি না? চারধারে তো আমার রূপের প্রশংসা শুনি, সত্যিই যদি আমি সুন্দরী হই তা হ'লে কি খুব চেষ্টা ক'রেও একটা পুরুষকে ভোলাতে পারব না? এ মতলোবটা মন্দ নয়, অবশ্য এতে দোষ নেই, আমি তো আর নিজের জন্যে এ সব করব না, কেবল সমগ্র নারীজাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্যেই না এই উপায় অবলম্বন করা। একবার যেদিন দেখ্‌ব 'ও' একটু ঘায়েল হয়েছে, ওম্‌নি তাকে সব কথা খুলে ব'লে রণে ভঙ্গ দেব—বাঃ বেশ মজা হবে! কেমন বোকা বোনে যাবে! ঠিক শাস্তি হবে! কিন্তু কোথায় তার দেখা পাব? শুনেছি তো ভদ্রলোকটি প্রায় কোথাও বেরোন না, দেখা যাক্, সামনে তো ছোট মাসীর গার্ডেন পার্টি আস্‌ছে, দেবকুমার বাবু মেসো মশায়ের কে হন' দেখা হ'লেও হ'তে পারে। বাপ্‌রে! আর ত লিখ্‌তে পার্‌ছি না, হাই তুলে তুলে প্রাণ যে যায়। শুয়ে পড়া যাক্।"

ছোট মাসীর পার্টির পর শুক্লার ডাইরিতে লেখা—

আজ ছোট মাসীর পার্টি ছিল, মা আমায় ময়ূরকণ্ঠী রংএর শাড়ীখানা পর্‌তে বল্লেন, আমি কিন্তু সেটা না প'রে বাবার দেওয়া 'সেল্ পিঙ্ক' রঙের ক্রেপের শাড়ী জ্যাকেট পরেছিলাম। জন্মদিনের দিন এগুলো দেখে সুধীর বলেছিল—ও হ্যাঁ, থাক্‌গে', সুধীর অমন তো দিন রাত বল্‌ছেই। এই তো সাদাসিধে সাজ, তাতেও কি রক্ষা আছে? গাড়ী থেকে নাম্‌তে না নাম্‌তে সকলে এমন কর্‌তে লাগ্‌ল যেন পার্টির মধ্যে আমিই সব চেয়ে সেজেছি!

আচ্ছা ননীদি' কি কাণ্ডটাই কর্‌লেন? হঠাৎ কোথা থেকে একজন লোক্‌কে নিয়ে এসে হাজির। লোকটাকে মানুষ না ব'লে বরফের চাং বল্লেও চলে, বাবাঃ, এমন গম্ভীর বদ্‌মেজাজী লোক জীবনে কখনও দেখি নি। ননীদি'

আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"ইনি হচ্ছেন কলির বিশ্বামিত্র, নারীবিরোধী দেবকুমার রায়।" তারপর একটু হেসে লোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন—"দেবকুমার,তোমার তপস্যা ভাঙাবার জন্যে আমাদের মেনকাও ঠিক আছেন—ইনি মিঃ মুখার্জ্জির কন্যা শুক্লা।" কথাগুলো শেষ ক'রে ননীদি' আমার দিকে এমন ক'রে হেসে চাইলেন যে সামনে যে পুরুষের কাপড় পরা হিমালয় পর্ব্বত দাঁড়িয়ে ছিল সেও একবার চেয়ে চোখ নামাল। ছিঃ! ননীদি'র এ কি রকম বদ্ রসিকতা? আর, সব চেয়ে রাগ হয় ভাব্‌লে, যে, লোকটা এমন ক'রে আমার দিকে চাইলে যেন আমি একটা ঝাঁটার কাঠি, কিম্বা তার চেয়েও কোন অপদার্থ জিনিষ। সত্যি, লোকটাকে আচ্ছা ক'রে একবার শিক্ষা দিতে পার্‌লে তবে আমার রাগ যায়। লোকটার কথাবার্ত্তাও বোধহয় ঘৃণার চোটে জ'মে বরফ হ'য়ে গিয়েছিল; "হাঁ", "না", ভিন্ন তো আর একটা কথাও মুখ দিয়ে বের হ'ল না, কেবল পেয়ালা পেয়ালা চা'ই খেতে লাগ্‌ল! ভাগ্যিস্ সুধীর এসে পড়েছিল তাই না রক্ষা, কতক্ষণই বা মানুষ একটা মৌনব্রতধারীর সঙ্গে কথা কইতে পারে বল? আমার তো প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। ননীদি'ও এমন! "আস্‌ছি" ব'লে সেই যে কোথায় উধাও হ'লেন, তাঁর আর পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সুধীর যখন আমাকে দেবকুমার বাবুর সঙ্গে ব'সে চা খেতে দেখ্‌লে তখন তার মুখ দেখে আমার এত হাসি পেয়েছিল! প্রথম তো সে আমাদের পাশ কাটিয়ে চ'লেই গেল, আমি এমন বিপদে পড়্‌লাম, কিছু না পেয়ে ফুলদান থেকে একটা লাল গোলাপ তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগ্‌লাম। তারপর সুধীরকে আর একবার দেখ্‌তে পেলাম, চেঁচিয়ে তো আর ডাক্‌তে পারি না, তাই হাতের ফুলটা ছুঁড়ে তাকে আঘাত কর্‌লাম। ও মা! আমার পাশে যে পরমহংসটি ব'সে ছিলেন তিনি এমন কটমটিয়ে তাকালেন যে আমার মনে হ'ল আমি না জানি কি ভীষণ পাপ ক'রে বসেছি! আর আমি হলপ ক'রে বল্‌তে পারি ও' নিজের মনে মনে বল্লে—"এ ফ্লার্ট"—একটু যদি জোরে কথাটা বল্‌ত, তা হ'লে ঐখানেই একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিতাম। সুধীর আস্‌তেই মহাদেব নিজের আসন ছেড়ে উঠে বল্লেন—"বসুন, আমি আস্‌ছি।" তারপর আমার সঙ্গে একটা কথা বলা দূরে থাক্ একবার চেয়ে পর্য্যন্ত দেখ্‌লে না, অম্‌নি গট্ গট্ ক'রে চ'লে গেল। জানি না কোথা থেকে ভদ্রলোকটির শিক্ষা হয়েছে, কথা তো বল্‌তে শেখা হয়ইনি, সামান্য ভদ্রতাটুকুও বাদ প'ড়ে গিয়েছে। রোস না, এর শাস্তি ওকে দেবই দেব। সুধীর এদিকে চোটেই অস্থির, আমায় বল্লে—"তুমি ঐ গুম্‌সো-মুখো লোকটার সঙ্গে ফ্লার্ট কর্‌ছিলে কেন?" এ ত বেশ মজা! গুম্‌সো-মুখো লোকটি মনে করেছেন আমি সুধীরের সঙ্গে ফ্লার্ট কর্‌ছি, আর সুধীর ঠিক উল্টো কথা বল্‌ছে। পুরুষ জাতটাই দেখ্‌ছি একটা অদ্ভুত—। এই নিয়ে সুধীরের সঙ্গে বেশ একচোট ঝগ্‌ড়াও হ'য়ে গেছে। মরুক্‌গে' আর পারি নে বাপু! সব কথাতেই সুধীরের রাগ! আমি তো আর ওর কেনা গোলাম—না, না, বিবি নই, যে, আর অন্য কোন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাব না! আহ্লাদ আর কি! কাল হয় ত আর আস্‌বেই না, তা না আসুক, আমি অত খোসামদ কর্‌তে পারি না। ঈস্, অনেক রাত হ'য়ে গেল যে, এবার শুতে না গেলে মা গোল বাধাবেন—।

বড় মাসীমার মেয়ে ডলির জন্মদিন উপলক্ষে বনভোজনের পর শুক্লার ডাইরিতে লেখা—

আজ সারাদিন বেশ মজা করা গেল, মেসো মশায়ের টালিগঞ্জের বাগানবাড়ীটা সত্যিই খুব সুন্দর—মস্ত বড় পুকুর, অনেকখানি জায়গা, সবদিকেই সুবিধা। ডলিকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছিল, লাল শাড়ী প'রে ওকে বেশ মানিয়েছিল, ছেলে মানুষ, ওদেরই তো এখন লাল পর্‌বার বয়স, তা' না হ'য়ে মা কেবল আমায় লাল পর্‌তে বলেন।

ননীদি' ঠিক গিয়ে জুটেছিলেন। ওঁকে দেখে আমার এমন রাগ হ'ল, উনিই তো আমার ঘাড়ে অমন এক অদ্ভুত জীবকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন! আবার কেমন জিজ্ঞেস করা হ'ল—"ও শুকু, দেবকুমারকে কেমন লাগ্‌ল?" আমি যথাসম্ভব গম্ভীর ভাবে বল্লাম, "ও সব দেবকুমার-টুমারদের দেবালয়েই মানায়, তাদের মর্ত্ত্যে এনে বৃথা কষ্ট দেওয়া।" ননীদি' খুব তো একচোট হাস্‌লেন, তারপর রুমাল দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লেন—"কেন? আলাপ

তেমন জমে নি বুঝি?" আমি অবজ্ঞাভরে বল্লাম—"আলাপ? ভদ্রলোকটি কথা কইতে পারেন কি না আমার সন্দেহ! জান্‌তাম তো উনি হাসির সঙ্গে নন্‌-কো-অপারেশন করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে যে বাক্যালাপটুকুও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন তা'তো জান্‌তাম না। ননীদি' আবার খানিক হেসে বল্লেন—"ভয় নেই, তোমাদের পাল্লায় পড়্‌লে, ওর বোল্‌ আপনিই ফুটবে।"

সুধীর গোড়াতে আসে নি, আমার উপর রাগ ক'রে বোধ হয়। তারপর যখন দুপুরে আমরা জলখাবারের আয়োজন কর্‌ছি, দেখি সুধীর মুখ ভার ক'রে আস্‌ছে, আমি সেদিকে দৃক্‌পাতই কর্‌লাম না, একমনে নিজের কাজই ক'রে গেলাম, সুধীরও প্রথম কিছু বল্লে না। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা যখন বাগানে বেড়াবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম তখন সুধীর আমার কাছে এসে জুটল. তারপর আস্‌তে আস্‌তে বল্লে—"শুক্লা, আমার উপর রাগ করেছ?" আমার তখন হাসি পাচ্ছিল, তবুও আমি যথাসম্ভব গম্ভীর হ'য়ে বল্লাম—"রাগ তো আমি করি নি, তুমিই তো আমার উপর শুধু শুধু রাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিলে।" সুধীর একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বল্লে—"আচ্ছা, সত্যি কথা বল, সেদিন তুমি দেবকুমারের সঙ্গে ফ্লার্ট কর্‌ছিলে না?" আমি বিরক্ত হ'য়ে বল্লাম—"বার বার এক কথা ব'লে কি লাভ হয় তা' তো জানি না, আর আমি যদিই বা ফ্লার্ট ক'রে থাকি তা'তে তোমার কি? আমার প্রতি কথা, প্রতি কাজ মাপকাঠি দিয়ে ওজন কর্‌বার অধিকারটা তোমায় দিয়েছি ব'লে তো মনে হয় না—" সুধীর বাধা দিয়ে বল্লে—"থাক্‌, যথেষ্ট হয়েছে, তোমার মত অমন হৃদয়হীনা মেয়ে খুব কমই দেখেছি!" আমি এবারও বেশ ঝাঁঝাল ভাবেই বল্লাম—"তাই যদি হয় তবে তুমি আমার সঙ্গে মিশ' না, সংসর্গে মানুষ নষ্ট হ'য়ে যায়, তা তো জান?" এবার সুধীর সুর নামাল, আস্‌তে আস্‌তে বল্লে—"মাপ কর শুক্লা, রাগের মাথায় ও-কথাটা ব'লে ফেলেছি, এতে কিন্তু আমার খুব বেশী দোষ নেই, তুমি আমায় যথেষ্ট কষ্ট দাও, তুমি আমার সঙ্গে কেবলই খেলা কর, কোন দিনও তো ঠিকমত একটা জবাব দিলে না!" আমি বল্লাম—"বাঃ, জবাব দিই নি?" সুধীর একটু বিষণ্ণ ভাবে বল্লে—"জানি, তুমি অনেক বার বলেছ যে তুমি বিয়ে কর্‌তে এখনও প্রস্তুত নও, কিন্তু এক একবার মনে হয় কখনই কি তুমি আমায় বিয়ে কর্‌তে প্রস্তুত হ'তে পারবে?" আমি রাগের ভাণ ক'রে বল্লাম—"আমায় অতই যদি সন্দেহ হয় তো—" সুধীর তখুনি বাধা দিয়ে বল্ল—"না রাগ কর না, আমি ত অপেক্ষা কর্‌তে রাজি আছি, কেবল এক একবার একটু অধীর হ'য়ে পড়ি—"

মাসীমা এখানে এসে পড়াতে এ কথাগুলো এখনকার মত চাপা রইল। আজ আর বেশী লিখে কাজ নেই, কাল আবার সকাল সকাল উঠ্‌তে হবে।

(ক্রমশঃ)

গোরের উপর

শ্রী মনোজ বসু

চাঁদ যে কখন উঠেছে—জানি না। ঘুম ধরেছিল ভারী—
আমি নিশি-রাতে কাজ সারা করে' খিল এঁটে তাড়াতাড়ি
ঘুমায়ে পড়িনু। হঠাৎ জাগিনু কতরাতে তার পরে।
দেখি, বেড়া দিয়া জোছ্না আসিয়া লুটায়ে পড়েছে ঘরে—
মাটি দিয়া লেপা মাচায়, শিকায়, মোর কাঁথা ও বালিশে,
বেতের ঝাঁপিতে, চুলে, কাপড়েতে একাকার হ'য়ে মিশে।
দোর খুলে দিয়ে পইঠার 'পরে দাঁড়ানু—ভাবিনু কত—
—বটপাতা নড়ে, পাতা বেয়ে ঝরে জোছ্না অনবরত।
বিলে নোনা জলে ঢেউ উঠিয়াছে, জল করে ঝিক্‌মিক্—
রাতের কি-পাখী ডেকে উড়ে গেল।—রহে কি মাথার ঠিক?
চোখে জল এলো কিনা মনে নাই,···ভাবিলাম কতখনা—
শেষে আসিয়াছি—মোর দোষ নাই, মন মোর মানিল না।
পরাণ-বন্ধু, জাগো—জাগো—
বাঁশ-ঝাড়ে বড় ঝড় লাগিয়াছে, কত কী যে আওয়াজ!
বড় বুক কাঁপে; তুমি কথা কও, ভয় লাগিয়াছে আজ।

—ভয় করিতেছে। কারা চিঁড়ে কুটে—শুনিছ ঢেঁকির পাড়?
ওরা ছাড়া আর কেহ জেগে নাই, সারা-গাঁও নিঃসাড়।
—কেহ দেখিছে না। তুমি হাত দিয়া আমার বুকের 'পরে
দেখ ত হেথায়—মানুষের বুকে, কত জোরে ঢেঁকি পড়ে!
সারাপথ বড় ছুটে আসিয়াছি—এই রাতে ঝরে ঘাম—
তুমি কোঁচা খুলে ঘাম মুছে দেবে, তাই ছুটে আসিলাম।
সেই ও-বছর দশদিন ভুল বকে' বকে' জ্বর-ঘোরে
—নিশুতি-রাত্রে ঝিঁঝিরা ঘুমাল—তুমি ঘুমাইলে গোরে,
আর, তার পরে কথা কও নাই। গেছে কত হাটবার,
হাটের ফিরতি পথে গান ধরে' বাড়ী ফেরো নাই আর।
আল্‌তা কিনিয়া দিতে;—সে আল্‌তা পরি নাই কতকাল,
আজ, অবশেষ শামুকে কাটিয়া পাও হইয়াছে লাল।
পরাণ-বন্ধু, জাগো—জাগো—

যদি জেগে উঠে দু'টো কথা কও, এ নিশীথে কে দেখিবে?
ও-বাড়ীর ঐ আকাশ-প্রদীপ তা'ও ত গিয়াছে নিভে!

একা কাঁদিতেছি। আমি কত ভীতু, তুমি তা' জানিতে খুব—
এত ভালবাসা—সবি ভুলে গেলে যেই গোরে দিলে ডুব?
আন্‌গাঁয়ে আমি বেশ আছিলাম দুখিনী মায়ের সাথে—
মা আমার কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সঁপে দিল তব হাতে।
তুমি হাত ধরে' খেয়ায় তুলিলে। মা'র সে কী ব্যাকুলতা!
কত দিন গেছে, আজও মনে হয় সে যে সেদিনের কথা।
মাটি কেটে চর উঁচু করে' তুলে খলিষামারীর বিলে
বাখারীর ঘর বেঁধে কুটা দিয়া ছাচ তলা করেছিলে।
আরো সাধ করে' খড়ের ময়ূর দিয়াছিলে মটকায়;
ঠাসা-ছাউনীর খাসা ঘরখানি! অমন ছিল না গাঁয়।
তুমি নাই। আজ, সে বাখারী দাঁত বা'র করে ফুটা চালে!
ঝড়ে উড়ে গিয়ে ময়ূর পড়েছে ঘেঁটেলার জঙ্গালে।
পরাণ-বন্ধু, জাগো—জাগো—
তুমি মজা করে' কথা কহিছ না যা'তে আমি পাই ভয়;
একা বধূ কাঁদে এই নিরালায়, তামাসার এ সময়?

শিয়ালে কি নিয়া করে কাড়াকাড়ি শ্মশানের কিনারেতে,
বাদুড়ের ঝাঁক ঝটপট উড়ে। ভয় করে না কি এতে?
গোরের দুয়ার নাই—সবে বলে। ওকথা শুনেছি ঢের।
তুমি একবার অনিয়ম কর পুরাতন নিয়মের।
আমি জানি—হোথা তুমি জেগে আছ! তাই দীপ জ্বেলে রাতে
ঝাঁপ খুলে দিই, কবরখানায় আলো-রেখা পড়ে যা'তে।
পথে কতবার নাটার কাঁটায় অঞ্চল টানিয়াছে—
—সে মানা মানি নি। বড় আশা করে' আসিয়াছি তব কাছে।

কতদিন হ'ল সোহাগ পাইনি, কথা শুনি নাই আর,
এ বুক চিরিয়া দেখাইতে পারি সেথা কত আঁধিয়ার।
আমি ভাল বলে' মাটির মতন যাহা কর স'য়ে যাই,
তাই, তুমি মোরে এমনি কাঁদাও, একটু দরদ নাই!

পরাণ বন্ধু, জাগো—জাগো—
তুমি জেগে উঠে কথা না কহিলে কিছুতে যাব না ঘরে,
সকালে সকলে দেখিবে ন'বউ গোরে রহিয়াছে মরে'!

মাতৃত্ব-বিদ্যা

শ্রীমতী রোডা মিলার

আজকাল আমরা প্রায়ই 'মাতৃত্ব-বিদ্যা'র কথা শুনিতে পাই। যে-কোন বিদ্যা বা শিল্পেই মানুষের নৈপুণ্য এবং বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। শিল্পশিক্ষার জন্য শিল্পীকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়—শিল্পকার্য্য করার জন্য তাহার বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক, এবং ইহাতে তাহার ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

যে-কোন শিল্পীর কথাই ভাবা যাউক, যথা কাঠুরে, মিস্ত্রী, চর্ম্মকার, তৈজসকার, অথবা কুম্ভকার, যদি তাহাকে সফল হইতে হয় তবে কি তাহার ঐ সকল গুণের প্রয়োজন হয় না? মাতৃত্ব মায়ের কাজ—মাতার জীবনব্যাপী পরম প্রয়োজনীয় সাধনা। ইহাতে শুধু যে মায়ের জ্ঞান, ধৈর্য্য, নৈপুণ্য এবং প্রেমের প্রয়োজন হয় তাহা নহে কিন্তু শিশু যাহাদেরই সংস্পর্শে আসে তাহাদেরও ঐ সকল গুণের বিশেষ প্রয়োজন।

সুস্থ শিশু জাতির প্রধান সম্পদ—কেন? কারণ তাহারাই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক। আজ শিশুরা যে-প্রকার হইবে, ভবিষ্যতে জাতি সেইরূপ হইয়া উঠিবে। তাই মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক সকলেই জাতীয় সম্পদের রক্ষক।

প্রত্যেক বিষয়ের আরম্ভই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ভিত্তিপ্রতিষ্ঠায় ভুল হইয়াছে সেখানে ঐ ভিত্তির উপরে বহুকাল স্থায়ী হইবে এমন সুদৃঢ় সৌধ-রচনা সম্ভব হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে, কেবল মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বাস্থ্য, চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল শিশুদের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত যদি সেই-সকল শিশুর জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য করিতে চান তবে শিক্ষক ধাত্রী এবং মাকে সর্ব্বপ্রথমে এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের এবং কখনো কখনো সাত বৎসরের ভার সম্পূর্ণরূপে মাতার উপরে, এবং শিশু স্বাস্থ্য ও রূপ বান, সুখী এবং বুদ্ধিমান হইবে, কি একেবারে বিপরীত হইবে তাহা সম্পূর্ণ-রূপে মাতার উপর নির্ভর করে।

আদর্শ মায়ের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন?

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় পশু এবং মনুষ্য-মাতার শিশুর প্রতি প্রেম থাকে। এই প্রেমের জন্য মা শিশুর মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে খাওয়ানো, আদর করা এবং যত্ন করায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। মায়ের প্রেম বুদ্ধি-মত্তা এবং স্বার্থহীনতা দ্বারা পরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, যে শিশুর নিদ্রা যাওয়া উচিত, যে ক্রন্দন করিতেছে, (ধরা যাউক যে শিশু স্বাস্থ্যবান এবং সবল) মা মূর্খ এবং স্বার্থপর হইলে বলেন, "আমি শিশুর ক্রন্দন সহ্য করিতে পারি না", এবং শিশুকে তুলিয়া লইয়া খাওয়ান হয়। যে মা বুদ্ধিমতী এবং যথার্থ স্বার্থহীনা তিনি শিশুকে তোলেন না, কারণ তিনি জানেন যে শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে খাওয়াইলে তাহার হজম-শক্তির ব্যাঘাত হয়, এবং ইহা তাহার চরিত্রের পক্ষে

তদধিক অনিষ্টকর যদি সে জানে যে শুধু কাঁদিয়াই সে যাহা ইচ্ছা তাহাই আদায় করিতে পারে।

(খ) জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়, শুধু অনুমান অথবা কল্পনায় চলে না, পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমাদের পক্ষে শিশুকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলা সহজ হয়। কেবলমাত্র শিক্ষার জন্য আমাদের ঔৎসুক্য এবং ইচ্ছা প্রয়োজন।

(গ) শিশুর পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা করিবার সাহস থাকা আবশ্যক। অজ্ঞলোকেরা কি বলে, সে দিকে কর্ণপাত করিতে হয় না, যখন কিছু শিক্ষা করিয়াছ, তখন সাহসের সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত কর।

(ঘ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য—যদি আমরা বিশ্বাস করি যে স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে জ্ঞানের ফল, এবং আমরা যাহা জানি তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেই হয়, তাহা হইলে ইহা সহজেই প্রতীত হয় যে, প্রত্যেকেই কিয়ৎপরিমাণে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। স্মরণ রাখিবেন, স্বাস্থ্যও ব্যাধির ন্যায় সংক্রামক, আমরা শিশুদের নিকট স্বাস্থ্যের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ হইতে চাই।

সন্তান-সম্ভবার কর্ত্তব্য

বিজ্ঞান স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদিগকে বলে যে, আরোগ্য করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই ভাল। স্বাস্থ্যলাভের জন্য গোড়ায় ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা খুব ভাল হওয়া চাই। প্রসবের পূর্ব্ব সময়টাই এই ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার সময়, এবং ভাবী শিশুর স্বাস্থ্য তাহারই উপর নির্ভর করিবে। এই সময়ে মায়ের রক্তস্রোত হইতে আহরিত দ্রব্যেই শিশুর মন ও শরীর গঠিত হয়। যদি মা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন তবে শিশুও সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিবে। মায়ের জানা উচিত যে, কতকগুলি স্বাস্থ্যের বিধি সকল মানুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য শিশুই হউক আর বয়স্কই হউক, এবং এই নিয়মগুলি জীবনব্যাপীই পালন করিতে হইবে—বিশেষ ভাবে গর্ভকালীন। নিম্নে কতগুলির উল্লেখ করা গেল :—

(১) দিন-রাত পবিত্র বাতাস, রক্ত পবিত্র রাখার জন্য এবং বিশেষ ভাবে ঠাণ্ডা লাগা ও কাসি ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন, তাই জানালা খোলা রাখিবেন।

(২) সূর্য্যালোক শরীর সবল করে, রোগবীজাণু ধ্বংস করে, এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করে। সম্ভব হইলে প্রতিদিন কিছু সময় রৌদ্রকিরণে অতিবাহিত করিবে।

(৩) মাংসপেশীগুলিকে সুস্থ এবং শরীর শক্ত এবং নীরোগ রাখার জন্য ব্যায়াম আবশ্যক। মাংসপেশী শক্ত থাকিলে প্রসব করা সহজ হয়, তাই গর্ভাবস্থায় ব্যায়াম আবশ্যক। ভ্রমণ করাই সব চেয়ে সহজ ও নিরাপদ ব্যায়াম। সতর্কতার সহিত অত্যন্ত ক্লান্ত হইবার পূর্ব্বেই থামিতে হইবে। যে সকল কঠিন পরিশ্রমে আপনি অনভ্যস্ত তাহা করিবেন না। যদি সম্ভব হয় অতিরিক্ত ভার উত্তোলন করা, হঠাৎ কোন প্রকার ঝাঁকি এবং অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৪) খাদ্য সুসঙ্গত ও পরিমিত হওয়া আবশ্যক। প্রতিদিনের খাদ্যে কিছু ফল ও তরিতরকারী থাকা দরকার। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্যে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৫) জল খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জলে রক্ত পরিষ্কার করে, অন্ত্রের সকল ময়লা পরিষ্কার করিয়া বাহির করিয়া দেয়, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা-নিবারণে সাহায্য করে। দিনে যত জল সম্ভব পান করিবেন, বিশেষত প্রাতে এবং বিভিন্ন সময়ে খাবারের অন্তরে। খুব সতর্ক হইতে হইবে—যেন খাবার জল ফুটাইয়া লইয়া পরিষ্কার কলসী অথবা কুঁজোতে রাখিয়া দেওয়া হয়।

(৬) নিয়মিত ভাবে পেট পরিষ্কার হওয়া সর্ব্বথা প্রয়োজন, কারণ শরীরের সকল অব্যবহার্য্য দ্রব্য বাহির হইয়া না গেলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। যদি এই অব্যবহার্য্য দ্রব্য পাকস্থলীতে থাকিয়া যায় তবে উহা পচিতে থাকে এবং সমস্ত শরীর বিষাক্ত করিয়া তোলে। কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে মাথাধরা, অবসাদ, অম্লশূল এবং অন্যান্য বহু ব্যাধির উৎপত্তি হয়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পাকস্থলী পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মিতে পারে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহার প্রতিরোধ বা আরোগ্য হইতে পারে :—

(অ) রেচক খাদ্য খাইবেন, যথা—ভারতীয় শস্য, আটা, দাল, কলাই, মটর, শাকসব্জি (কাঁচা ও রান্না), এবং ফল।

(আ) উপরোক্ত প্রণালীতে জল-পান।

(ই) ব্যায়াম।

(ঈ) নিয়মিত অভ্যাস গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত অল্প মাত্রায় এপারিষেনট্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধীরে ধীরে ঐ ঔষধ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(উ) খুব বাতাসযুক্ত ঘরে নিদ্রা এবং বিশ্রাম। রাত্রে ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট। গর্ভাবস্থায় পা উঁচুতে তুলিয়া অপরাহ্নে এক-ঘণ্টা বিশ্রাম লওয়া উচিত। ভাবী মাতাকে গর্ভাবস্থায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসেই ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালে যে সকল ব্যাধি উপস্থিত হয় তাহা প্রথমে জানিতে পারিলে সবই নিবারণ করা যায়। নিম্নলিখিত কিছু ঘটিলেই ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে :—

(ক) রক্তস্রাবে ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত শয্যায় শুইয়া থাকিতে হইবে।

(খ) অধিক মাসে চাপের জন্য পা ফুলিতে পারে, কিন্তু যদি হাত এবং মুখও ফোলে তাহা হইলে ডাক্তার দেখাইতে হইবে। শিরা ফুলিলেও ঐ বিধি।

(গ) তিন মাস পরে দাঁত পরীক্ষা করা এবং চিকিৎসা করা প্রয়োজন। খারাপ দাঁত প্রায়ই অস্বাস্থ্যের কারণ। শিশুর জন্মের দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই স্তনের বোঁটা প্রস্তুত করিতে হইবে; তাহা হইলে শিশুসেবার অশেষ উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্তন ধৌত করিয়া শক্ত গামোছা দ্বারা রগড়াইয়া দিতে হইবে।

(ঘ) স্তনের বোঁটা প্রতিদিন টানিয়া তেলযুক্ত অঙ্গুলিদ্বারা বোঁটাগুলিকে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বোঁটাদুটিকে সাবান এবং নখ পরিষ্কারের ব্রুস দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া শক্ত করিয়া নিতে হইবে।

বারান্তরে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। *

সারাদিন

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

সারাদিন বৃষ্টি পড়ে, বন্দী হ'য়ে আছি ঘরে,
দরজা জানালা খুলি তাও সাধ্য নাই,
আলোর মুখের হাসি, এত যারে ভালোবাসি,
বাতাসের কোলাকুলি কিছু নাই ভাই।
বসিয়া ঘরের কোণে, একেলা আঁধার সনে,
এই কথা বার বার শুধু মনে আসে,
আমরা ধরার প্রাণী, ঘরের সীমানা মানি,
সে ঘর আঁধার হ'লে আঁখি জলে ভাসে।

---

* লেখিকা এই প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র জন্যই লিখিয়াছেন, এবং ইহা বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ (প্রচারক)।—বঃ সঃ।

নানা কথা

নবীন সম্রাট-প্রতিনিধি

আমরা এবার সর্ব্বাগ্রে নবীন সম্রাট-প্রতিনিধিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহার উচ্চ পদাধিকার, মহার্ঘ পরিধেয় বা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের জন্য নহে, মহান্ মনুষ্যত্বের জন্য এবং আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের প্রতি আন্তরিক প্রীতিপোষণের জন্য।

ভারত-যাত্রার প্রাক্কালে * প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ডেলী হেরাল্ড'-এর প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরে স্মিতমুখে লর্ড উইলিংডন বলিয়াছিলেন, "গুরুভার কর্ত্তব্য হইলেও সেই কর্ত্তব্যের ভার আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া যাত্রা উন্মুখ হইয়াছি। ভবিষ্যতের উপর আমার যেমন বিশ্বাস আছে, তদ্দেশীয় বিভিন্ন-পন্থীরা যদি সেইরূপ সংশয়হীন সশ্রদ্ধ বিশ্বাসে আমার সহিত একমত হইয়া কর্ত্তব্য-দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঈপ্সিত সুফল অবশ্যই লাভ করা যাইবে।"

তিনি আরও বলেন, "ধন-বৈষম্য ও জাতি-বিভেদ ভুলিয়া একলক্ষ্যে অগ্রসর হইলে সাফল্য সুনিশ্চিত।" সেই সাফল্য কি?—উইলিংডন বলেন, "সাম্রাজ্যের অন্যান্য উপনিবেশের মতই ভারতের সম-অধিকার ও সম-অংশ গ্রহণ।"

ভারতে আসিয়া তিনি সন্ন্যাসী ভারত-প্রতীক মহাত্মা গান্ধীকে সাদর আহ্বানে স্বীয় প্রাসাদে আহ্বান করেন † এবং তাহাতে তাঁহার রাজকীয় মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাত্মা সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর সন্তুষ্টির মূল্য আছে এবং তাহা সম্রাট-প্রতিনিধির মহান্ মনুষ্যত্বই প্রমাণিত করে।

*

লেডী উইলিংডনের নারীত্ব ও মাতৃত্ব

মাননীয়া লেডী উইলিংডনকেও আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নারীত্ব ও মাতৃত্বের জন্য। তাঁহার নারীত্ব তাঁহাকে মহীয়সী মহাত্মাপত্নীকে আমন্ত্রিতা রূপে সহজ সৌজন্যে ও সখীত্বে গ্রহণ করাইয়াছে—অলীক আভিজাত্যকে উচ্চতমে উদ্বর্ত্তিত না করিয়া। এবং তিনি তাঁহার মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, ভারত-প্রাণ মহাত্মার শারীরিক কুশল ও দীর্ঘজীবনের জন্য ব্যগ্রতাপূর্ণ শুভেচ্ছা জানাইয়া।

স্বর্গীয় এই নারীত্ব ও মাতৃত্ব—প্রতি দেশে সর্ব্ব কালে ইহার নিকট বিশ্বমানব সুচির শ্রদ্ধাবনত!

*

* লণ্ডন, ২রা এপ্রিল, ১৯৩১।

† সিমলা, ১৪ই মে, ১৯৩১।

শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী—শিউড়ী

লেডী উইলিংডনের খদ্দর-প্রীতি

শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধীর নিকট মাননীয়া লেডী উইলিংডন মুক্তকণ্ঠে খদ্দরের প্রতি স্বীয় প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং সহাস্যমুখে তাঁহার সত্যই খদ্দর পরিতে ইচ্ছা করে ইহা বলিয়াছেন। সাধ্বী কস্তুরী বাঈ বলেন, অবশ্যই তাঁহাকে তিনি ভালো খদ্দরের সাড়ী পাঠাইবেন।

ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ভারত-সম্রাট-প্রতিনিধির পত্নীর উপযুক্তই হইয়াছে। ভারতনারীর পক্ষে বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার দীর্ঘজীবন ও নিত্যকুশল কামনা করিতেছেন।

*

গোল টেবিল ও কংগ্রেস

মহাত্মা গান্ধী বলেন, গোল টেবিলে সোজা হইয়া বসিতে হইলে কংগ্রেসীদিগকে এখনও অনেক কিছু করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রধান—মুসলমান-সমস্যা-সমাধান।

সাধু কবীর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বহু মহাজনই এই সমস্যা-সমাধানে অবহিত হইয়াছেন,—কিন্তু কি দুর্ভাগ্য এ দেশের, সমস্যা এখনও সমস্যাই রহিয়া গেল।

আমরা কবীরের দোঁহার ভাষায় বলি—

"হিয়ার ভিতর, ওরে, খুঁজে' দেখ্
বুঝে' দেখ্' একবার,
এখানে রহিম, এখানেই রাম
এই কথাটাই সার।"

*

যাইতেছ—কোথায় এবং কেন ?

সম্প্রতি বার্ষিক সাম্রাজ্য-দিবস উপলক্ষে "রয়েল এম্পায়ার সোসাইটি"র ভোজ-উৎসবে* ডাঃ ড্রামণ্ড শীল্‌স্ বলেন যে,—ব্রিটনবাসীকে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা

* লণ্ডন, ২১শে মে।

'কোথায়' এবং 'কেন' যাইতেছেন। সত্য লক্ষ্য এবং সার্থক সাফল্যের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপন। ইহা করিতে হইলে ঔপনিবেশিক পুরাতন উচ্ছৃঙ্খল পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া মানবোচিত মার্জ্জিত পদ্ধতিতে প্রকৃত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা করিতে হইবে—বিভিন্ন উপনিবেশ বা রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া এবং ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের একটি প্রয়োজনীয় হৃদ্‌গ্রন্থিস্বরূপ মনে করিয়া।

আমরা ডাঃ শীল্‌সের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

*

বর্ণবাদ

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পুরাতন পদ্ধতি ব্রিটিশজাতিকে সাধারণ ভাবে এরূপ ভারতীয়-বিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছে যে শ্বেত-দ্বীপের পান-গৃহ ভোজনাগার প্রভৃতিতেও অ-শ্বেতাঙ্গ ভারতীয়দিগের "প্রবেশ নিষেধ।"

সম্প্রতি "এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সমিতি"র কয়েক-জন য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সদস্য তত্রত্য একটি পানাগারে প্রবেশ করিতে যাওয়ায় য়ুরোপীয় বন্ধুদিগের সমক্ষে ভারতীয় ছাত্রগণ অপমানকর ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তাহার ফলে ছাত্রসঙ্ঘের সকলেই (য়ুরোপীয় ও ভারতীয়) ফিরিয়া আসেন।

ছাত্রসঙ্ঘ স্থির করিয়াছেন, এই নিন্দনীয় বর্ণবাদ দূরী-ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা হোটেল ও রেস্তরাঁ সমূহ বয়কট করিবেন।

আমরা শুধু বলি, হায় বর্ণগৌরবী সভ্য মানব,—ছিঃ!

*

শ্রীযুক্ত দত্তের আবিষ্কার ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের 'রায়বেঁশে' নৃত্যাবিষ্কারে এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশমান তাঁহার আবিষ্কার-সংক্রান্ত সচিত্র প্রবন্ধাবলী—বিশেষ করিয়া 'রাইবিশের গান' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এক সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দান করিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে এখানে সেই পত্রের কোন কোন বিষয়ের মর্ম্মাংশ মাত্র বঙ্গলক্ষ্মীর উৎসুক পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইতেছি। তিনি এই আবিষ্কার ও গবেষণাকে ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রণোদিত বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দত্তের যে দেশপ্রেমিক প্রাণ ও অন্তর্দৃষ্টি এই আবিষ্কারের মূলে আছে, তিনি মনে করেন, তাহা হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধতাজনক মোহাঞ্জন, অধুনা আমাদের দেশবাসীদিগকে একরূপ বঞ্চিত করিয়াছে বলিলেই হয়। এক কথায়, প্রাচীন বাংলার এই গত-গৌরব-কাহিনী যুগপৎ তাঁহাকে অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এবং তিনি মনে করেন যে দেশের নবযৌবনের সাধকদেরও ইহা নূতন সাধনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কলিঙ্গ, গুর্জ্জর ও যবদ্বীপ-বিজয়ী যে বাঙালী রায়বেঁশে যোদ্ধাদলের চিত্ত-উন্মাদনকারী গীতি-প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত দত্ত বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত করিতেছেন, ডাঃ সেন তাহাতে নবজীবনের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ ডাঃ সেনের এই গুণগ্রহিতার জন্য আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

*

ব্রহ্মে বিদ্রোহ ও তাহার কারণ

ব্রহ্মে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জনিত লুণ্ঠন-বিগ্রহাদি উপর্যুপরি নানাস্থানে হইতেছে—প্রত্যহই কোন না কোন আকারে ইহা সম্বাদপত্র-পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হয়। বিদ্রোহের কারণ কি? গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন—ইহা রাজ্যলাভ বা জয়োন্মাদনা-মূলক অস্ত্রোদ্যম নহে, নিরুপায় ক্ষুধাতুরের বিকার-আক্ষেপ। অন্নসমস্যা মানুষকে কি শোচনীয় সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যায়! কিন্তু এই বিদ্রোহ-প্রশমনের উপায় কি অন্নদান না একমাত্র প্রতি-অস্ত্রক্ষেপ?

*

বাঙালীর অন্নসমস্যা

বাঙালীর—বিশেষতঃ ভদ্র চাকুরে শ্রেণীর বাঙালীর অন্ন-সমস্যাও এই প্রকার শোচনীয়তার অন্তিম প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ এখানে

শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী—শিউড়ী

দিলাম*—"কলুটোলা ষ্ট্রীট দিয়া আসিবার সময় দেখিলাম ফুটপাথের এক স্থানে বহু লোকের ভীড় জমিয়াছে। আমিও সেইখানে যাইয়া দেখি একজন যুবক দুইখানি ব্রাস ও দুইটি কালির কৌটা (কালো ও ব্রাউন) হাতে দাঁড়াইয়া আছেন এবং জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 'অনুগ্রহ করিয়া আপনারা আমার নিকট জুতা জোড়াটি পালিস করাইয়া লইয়া যান। পারিশ্রমিক স্বরূপ এক একটি পয়সা দিয়া যাইবেন; এই ভাবে দশজনের নিকট দশটি পয়সা পাইলে আমার এক বেলা আহারের সংস্থান হইবে ···।"

এই ভদ্র যুবকটির করুণ কাহিনী শুনিলে সকলেরই চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু একক যুবকের একটি মাত্র উদরের অন্নসমস্যা যত সহজে সামান্য দশটি মাত্র পয়সা পাইলেই হয় ত সমাধিত হইয়া যাইতে পারে, একটি গোটা পরিবারের একক উপার্জ্জনকারী কর্ত্তার পক্ষে তাহা অসম্ভব। কবির ভাষায় বলা যায়, যাহার গৃহে—

"বসনাভাবে বধূ লুকায়,
অশনাভাবে শীর্ণকায়,
দুধের শিশু কাঁদিছে বুকে—
স্তন্যহীনা স্তন্যদা..."

সে হতভাগ্যের অন্নসমস্যা-সমাধানের উপায় কি?

* বিবৃতিকার—শ্রী নন্দলাল মিত্র (আনন্দবাজার পত্রিকা)।

জিজ্ঞাসা নূতন নয় কিন্তু উত্তর দিবে কে? অন্য পক্ষে, দেশের ধনী সম্প্রদায় ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া বিনাশ্রমের সঞ্চিত অর্থ অকারণ বিলাস-ব্যসনে অপচয় করিয়া ফেলিতেছেন। ইহার উত্তর নাই—এবং এইরূপ নিরুত্তর অবজ্ঞার ফলেই অশ্রুজলে অগ্নিকণা ফুটিয়া উঠে হয় ত!

*

ছোট লোকের বড় দান

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট) হইতে প্রকাশিত "যুক্তি" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত 'কাইরাদ্দারা' গ্রামের একটি দরিদ্রা কুলীরমণী সেণ্ট আণ্টনী স্কুলের পক্ষ হইতে ১২৫০০ টাকা মূল্যের একটি লটারীর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত নারী এই বিপুল অযাচিত সম্পদ নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ না করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিতা এই দুঃস্থা কুলীরমণী তাহার এই অসামান্য ত্যাগের দ্বারা যে মহৎ প্রাণের পরিচয় প্রদান করিল, তাহা প্রভূতবিত্তশালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও একান্ত বিরল নহে কি?

কিন্তু ইহাদিগকেই আমরা ছোট লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি।

*

ছোট লোক ও বড় লোক

এই প্রসঙ্গে অনেক দিন পূর্ব্বের আর একটা কথা মনে পড়িল। গত "শিউড়ী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী"র সময় শিউড়ী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল শাখা-সমিতির গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে আমরা তথায় ছিলাম। বহু বড় লোক বা ভদ্র শ্রেণীর এবং ছোট লোক বা ভদ্রেতর শ্রেণীর জননীরা ঐ মঙ্গল-উৎসবে তাঁহাদের শিশুগণ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভদ্র শ্রেণীর জননীরা সযত্নে তাঁহাদের শুচিতা বাঁচাইয়া পর্দ্দার অন্তরালে অবস্থান করিয়া ভৃত্য-মারফৎ তাঁহাদের শিশুদিগকে প্রদর্শিত করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছিলেন, এবং ভদ্রেতর শ্রেণীর সন্তান-গর্ব্বিতা জননীরা সগর্ব্বে তাঁহাদের শিশুদিগকে উদ্যত বাহুপুটে ধারণ করিয়া প্রদর্শনী-পরিবেশের মধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়াছিলেন। ঐ সময় তত্রত্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয় ভদ্রেতরা জননীদের লক্ষ্য করিয়া বলেন—ইঁহারাই, যাঁহাদের আমরা ছোট লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি, সন্তান-গর্ব্বিতা জননী রূপে উৎসব-ক্ষেত্রের এই মুক্ত আলোক ও বায়ুপ্রবাহের মধ্যে দাঁড়াইয়া, ইঁহারাই আজ মহীয়সী মহিলার গৌরবে গৌরবান্বিতা হইলেন, এবং দুঃখের বিষয় কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমাদের ভদ্র শ্রেণীর সম্মানার্হা জননীরা তাঁহাদের সঙ্কোচের সঙ্কীর্ণ সীমা দ্বারা তাঁহাদের মাতৃত্ব-গৌরবকে ছোট করিয়া এই শিশু-মঙ্গল উৎসবের আনন্দকে পরিম্লান করিলেন।

সেদিন শিউড়ীর সেই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ছোট লোক ও বড় লোকের একটা সত্য সংজ্ঞা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইয়াছিল।

*

আদর্শ পত্নী

সম্প্রতি একজন মার্কিন অধ্যাপক আদর্শ পত্নীর (perfect wife) একটা চমৎকার মাপকাঠি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন নিম্নলিখিত গুণ-বিভাগ দ্বারা। দেহ-সৌন্দর্য্যকে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার গুণ-তালিকার শেষ পংক্তিতে স্থান দান করিয়াছেন, যাহাকে সাধারণতঃ যুবধর্ম্মীরা উপক্রমণিকার শীর্ষাসন প্রদান করিয়া থাকেন। বুদ্ধিচাতুর্য্য-শালিনী এবং সামাজিকতানিপুণা রমণীই অধ্যাপক মহাশয়ের প্রিয়। তিনি অমিতব্যয়িনী (extravagant) কদাচ হইবেন না কারণ যুবকগণ প্রায়শঃই অল্পবিস্তর কপর্দ্দকশূন্য (more or less penniless) অবস্থায় বিবাহিত জীবনের সূচনা করে। তিনি ঈর্ষাপরায়ণতা পোষণ বা প্রদর্শন করিবেন না ; সুশিক্ষিতা হইবেন—কলেজী শিক্ষামান পর্য্যন্ত ; পরিচ্ছদ-প্রসঙ্গে সুরুচিসম্পন্না হইবেন ; স্বামীর আয় বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিবেন ; প্রয়োজন হইলে স্বামীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন—অবশ্য তাঁহার নিজের প্রধান কর্ত্তব্য গৃহকার্য্যের ক্ষতি না করিয়া ; তিনি সুগৃহিণী হইবেন ; তাঁহার স্বামীকে সভাসমিতিতে যাইতে অনুমোদন এবং আবশ্যক হইলে অনুগমন করিবেন ; তিনি ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্না এবং স্বামীর কর্ম্মপ্রণালী বুঝিতে সক্ষমা হইবেন ; তিনি সুমাতা হইবেন ; তিনি স্বাস্থ্যবতী হইবেন ; সর্ব্বশেষে সুদর্শনা হওয়া চাই—যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ভারতীয় পত্নীত্বের আদর্শের সহিত একটি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বড় একটা তফাৎ নাই। সে বিষয়—তিনি ধর্ম্মশীলা হইবেন কি না অধ্যাপক মহাশয় তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

*

গৃহত্যাগী সন্তান

আমরা প্রত্যেক সম্বাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই দেখিতে পাই গৃহত্যাগী নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জন্য শোকাভিভূত পিতামাতা "বাবা, ফিরিয়া এস" বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রদান করিতেছেন। আমরা নিঃসন্তানপুত্র পিতামাতার দুঃখ

সহজেই অনুমান করিতে পারি, কিন্তু নিরুদ্দেশের প্রকৃত কারণ জানা সম্ভবপর হয় না—নানা কারণ থাকিতে পারে।

সেদিন আমাদের একজন প্রতিবেশীর গৃহে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটায় ইহার অন্যতম কারণ হৃদয়ঙ্গম হইল। ভৃত্যের মুখে পুত্রের কোন এক কল্পিত অপরাধের কথা শুনিয়া অভিযুক্ত পুত্রকে কৈফিয়ৎ মাত্র দিবার অবকাশ না দিয়া অ-বিচারী পিতা তাহাকে অন্যায়ভাবে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং অভিমানী পুত্র তাই গৃহত্যাগ করিয়াছে—পিতামাতা হাহাকার করিয়া মরিতেছেন।

এইরূপ উদাহরণ অন্যক্ষেত্রেও আমরা পাই। যাঁহারা নিজের চোখে না দেখিয়া, নিজের কানে না শুনিয়া, নীচমনা ভৃত্য-শ্রেণীয়দের চোখ ও কানের প্রমাণে অভিযুক্তের বিচার করিয়া থাকেন গুরুদণ্ডদানে—বাক্য মাত্র বলিবারও অবকাশ না দিয়া, তাঁহারা এইরূপ গুরুতর ভুলই করিয়া থাকেন। তবে সেজন্য সকলেই অনুতপ্ত হন কি না ভগবান জানেন!

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
...মিক সং
গ্রে... সং
কলিকাতা।

ভূত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

উঠে এসে বসে' তিনি বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

তাদের নামগুলি বদ্‌লে বল্‌লে গল্প উপভোগ কর্‌বার পক্ষে আপনাদের কিছু বাধা হবে না।

বর্ম্মায় গিয়ে প্রথম যে জিনিষটি অনুভব করেছিলাম সেটা এই যে, সেই যাযাবর জাতির দেশে, বহুমানবের বিরামহীন আনাগোনার পথের মাঝখানে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত খুব গভীরতার জায়গায় দৃঢ় করে' কখনো তৈরি হয় না—কিন্তু সে সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে কৃত্রিম বাধা কতগুলি সেখানে নেই, যা কল্‌কাতায় আছে। বর্ম্মা, বাঙালী, তামিল, তেলুগু, চীনে, গুজরাটী, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ, ইহুদী, পার্শী কোনো জাতীয় মানুষই সেখানে কেবলমাত্র নিজেদের নিয়ে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী গড়ে না, সব জাতির সঙ্গে সব জাতির সামাজিক এবং অন্য প্রকারের মেলামেশা সেখানে অবাধ। অন্ততঃ গণ্ডী যেটুকু আছে, কল্‌কাতার অনুপাতে সেটা ধর্ত্তব্য নয়।

প্রথমেই তাই ঠিক কর্‌লাম, গভীর করে' না হোক্, নানাজাতি মানুষকে অন্ততঃ মোটামুটি জান্‌বার এই সুবিধা সম্পূর্ণভাবে নিতে হবে।

অনেক বাঙালীকে দেখেছি, বিদেশে গিয়েও নিজেদের সামাজিক গণ্ডীকে তাঁরা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন না, যেখানে পাঁচজন বাঙালী গিয়েছেন সেখানেই পাঁচজনকে নিয়ে একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে দশ-জন, সেখানে সেই আলাদা জগৎ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুটো দল হয়েছে, তার একদল পদ্মার পূর্ব্বপারের, একদল পশ্চিম পারের। যেখানে সংখ্যায় বাঙালী কিছু বেশী, সেখানে পূর্ব্ববাংলা পশ্চিমবাংলা, হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম, চট্টগ্রাম ঢাকা, ইত্যাদি করে' দলাদলির আর শেষ থাকেনি।

বিদেশে গিয়েও নিজের সমাজ এবং নিজের দলকে নিয়ে এমনভাবে কোণঘঁ্যাসা হয়ে থাকাকে আমি চিরকাল অত্যন্ত মূর্খতা বলেই মনে করেছি—এ যেন খোলা মাঠে বোরখা পরে' বেড়াতে যাওয়ার মত। প্রথম থেকেই রেঙ্গুনে যাঁরা আমার বন্ধু হয়েছিলেন, তাঁরা কেউ বাঙালী নন্। বাঙালীর কাছে বাঙালী স্বভাবতঃই uninteresting। কোন্ কথায় তারা হাস্‌বে, কোন্ কথায় কাঁদ্‌বে, কোন্ কথায় রাগ কর্‌বে, কোন্ ব্যবহারের তারা কোন্ রকম অর্থ কর্‌বে, প্রায় সকলেরই বেলাতে তা জানাই থাকে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে

বাঙালীর কাছে বাঙালীর surprises বিশেষ কিছু আশা কর্‌বার থাকে না।

দুটি লোককে বিশেষ করে' আমার ভাল লাগ্‌ত, এক কোকোজী, দুই Reggie। তাদের সঙ্গে শেষকালটায় আমার বাঙালী বন্ধু নিত্যগোপাল এসে জুট্‌ল, তাকেও যে আমার মন্দ লাগ্‌ত তা বল্‌তে পারি না। মোটামুটি ভালই লাগ্‌ত।

নিত্যগোপাল আমার চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের ছোট। তার দাদা মদনগোপাল সিটিকলেজে আমার সঙ্গে পড়্‌ত, তখন নিত্যকে দু'একবার আমি দেখে থাক্‌ব, কিন্তু আলাপ-পরিচয় তার সঙ্গে আমার কোনোকালে ছিল না। কলেজে যে বয়সে মানুষ পড়ে, সে-বয়সে পাঁচ বছরের তফাৎ অনেকখানি তফাৎ, বিশেষতঃ বন্ধুর সম্পর্কে সম্পর্ক বিচার কর্‌লে লঘুগুরু ভেদ যেখানে থাকে। সে যেমনই হোক, সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে' নিত্যগোপাল একদিন রেঙ্গুনে আমার কাছে এসে হাজির। তার কাছেই সেই প্রথম শুন্‌লাম, তার দাদা মদনগোপাল বেঁচে নেই, সংসারে আপনার বল্‌তেও এক বৃদ্ধা মাতা ছাড়া কেউ তার আর ছিল না। কাজেই তার সমস্ত ভার তখনকার মতো আমাকেই নিতে হলো। আমি তা খুসি হয়েই নিলাম। নিত্যকে আমার মোটামুটি ভালোই লাগ্‌ত, তা পূর্ব্বেই বলেছি। আমার মনে তাকে তার দাদার স্থানেই আমি গ্রহণ কর্‌তে রাজি ছিলাম। কিন্তু তার দুটি খুব বড় দোষ ছিল। এক সে বেজায় ভীরু ছিল। আর সে সুবিধা পেলেই আমার চিঠিপত্র লুকিয়ে লুকিয়ে পড়্‌ত। প্রথম দোষটির ফলে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাগে কম পড়্‌লেও তাকে তার জন্যে ক্ষমা করা কঠিন হত না। কিন্তু দ্বিতীয় দোষটির জন্যেই তাকে অবশেষে আমার বিদায় কর্‌তে বাধ্য হতে হলো। তাকে ছোট দেখে আলাদা বাড়ী একটা ভাড়া করে' দিলাম। তার খাবার-দাবার আমার বাড়ী থেকেই যেত।

আমার বর্ম্মী বন্ধু কোকোজীর বাড়ীতে নিত্যর সঙ্গে রোজ আমার দেখা হত। কোকোজী ঠিক পুরোপুরি বর্ম্মী ছিল না, তার দেহে খুব অল্প পরিমাণ আইরিশ রক্ত বিদ্যমান ছিল, তার পিতামহী ছিলেন আইরিশ। কোকোজী বর্ম্মী বলেই নিজের পরিচয় দিত, কিন্তু পোষাকটা কর্‌ত ইউরোপের। ঐখানে অন্য বিলেত-ফেরত্‌ বর্ম্মাদের সঙ্গে তার খুব প্রভেদ ছিল। বহুবৎসর ইউরোপে কাটাবার পরেও দেশে ফিরে এসে বর্ম্মারা নিজেদের স্বজাতীয় পোষাক পর্‌তেই ভালবাসে এবং তাই পরেই গর্ব্ব অনুভব করে। অ-বিলেতফেরত্‌দের সঙ্গে নিজেদের প্রভেদ সূচিত কর্‌বার জন্যে নামের পশ্চাতে সাহেব অথবা নামের গোড়াতে Mr. ব্যবহার করাও তারা প্রয়োজন মনে করে না।

Reginald Dawson ওরফে Reggie ছিল কবি। সেইটে তার আসল পরিচয়। জাতিতে সে ছিল মান্দ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান্‌, কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানত্ব তার মধ্যে খুব অল্পই ছিল, একমাত্র ক্রিষ্টমাসের সময় নূতন নূতন পোষাক করিয়ে, উপহার পাঠিয়ে এবং প্রত্যুপহার গ্রহণ করে', হোটেলে খানা-পিনা করে', নেচে সে তার ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিত। বাকী সময়টা কবিতা লিখে এবং কবিতা পড়ে' সে কাটাত। তার বাবা তার জন্যে যথেষ্ট বিষয়-আশয় এবং কিছু নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন,—খাবার পর্‌বার ভাবনা তার ছিল না।

খুব বেশীদিনের কথা নয়, নিত্যকার মতো কোকোজীর বাড়ীতে আমাদের কয় বন্ধুর সান্ধ্য আড্ডা জমে' উঠেছে। বাইরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়্‌ছে, রেঙ্গুনে মে মাস সুরু হতে না হতেই বৃষ্টি সুরু হয়ে যায়। তারপর নভেম্বার পর্য্যন্ত চলে। ভিতরে বিয়ারের আর্দ্রতা, কোকোজী খায়। রেঙ্গুনের সমস্ত বিশেষজ্ঞদের মতে তার পরমায়ু আর বড় জোর ছ'মাস। বেচারা ট্যুবারক্যুলোসিস্‌ নিয়ে বিলেত থেকে ফিরে-ছিল, সেইটে ক্রমে ক্রমে বেড়ে এখন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মর্‌তে যে সে কিছুমাত্র ভয় পায়, কোকোজী তা কোনো-দিনই স্বীকার কর্‌ত না, আমাদের বল্‌ত, "লোকে বলে, যক্ষারোগীরা কিছুতেই মনে কর তে চায় না তাদের মারাত্মক কিছু হয়েছে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচ্‌বে বলেই তাদের আশা থাকে এবং সেইটেই ও-রোগের একটা লক্ষণ। আমি ত কই মোটেই আশা কর্‌ছি না যে বাঁচ্‌ব? আমার বরং মনে হয়, ছ'মাস নয় তার আগেই আমি যাব।" কিন্তু বুঝ্‌তে পারি, মৃত্যুর কথা মুখে যতই বেপরোয়া হয়ে সে বলুক,

মনের মধ্যে সেই চিন্তাটাকেই প্রাণপণে বিয়ার দিয়ে ডুবিয়ে রাখ্‌তে সে চেষ্টা করে। ডাক্তারের বারণ, কিন্তু সেই চিরান্ধকারের পথযাত্রীকে কি হবে এই পৃথিবীর নিয়মকানুনের বাঁধন দিয়ে বেঁধে? যাত্রাপথকে সহজ সুগম কর্‌বার তার ঐটুকু চেষ্টাতে আমরা কোনোদিনই বাধা দিতাম না। Reggie খায়, তার খাওয়াটা মোটামুটি অভ্যাসই আছে বলে' এবং কোকোজীর একজন সঙ্গী দরকার বলে', যদিও প্রত্যেকবার গেলাসে মুখ ঠেকিয়েই সে একবার করে' মুখ বিকৃত করে। বলে, "বাপ, কি taste!" কোকোজী বলে, "তোমার এ বিষয়ে পছন্দ অপছন্দটা এখনো আদিম যুগের মানুষের মতো থেকে গেছে।" Reggie বলে, "কি রকম?" সে বলে, "এখনো জিবের সাহায্যে মিঠে-তেতো ইত্যাদি মোটা sensationগুলো দিয়ে তুমি বিচার কর। তার পেছনে যে subtletyর জায়গা সেখান অবধি তোমার দৃষ্টি পৌঁছয় না।" Reggie বলে, "subtle taste জিনিষটা বিয়ারের একচেটে নয়, French winesএ সেটা কিছু কম নেই।" কোকোজী বলে, "খুব বেশীও যে আছে তুলনায় তাও নয়।" Reggie বলে, "বিয়ারের অনেক গুণ থাক্‌তে পারে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাকে নিয়ে কেউ কবিতা লিখেছে বলতে পার? দ্রাক্ষারস যুগে যুগে কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছে, hops আর maltএর সাধ্য কি তা করে?" কোকোজী বলে, "আদিম যুগের মনোবৃত্তি না থাক্‌লে কবি হওয়া যায় না, সেইটেই এতে প্রমাণ হচ্ছে।" আমি বলি, "বর্ত্তমান যুগে কবিত্ব জিনিষটা ইতিমধ্যেই উপহাসাস্পদ হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে কবিদের জন্তেও হয়ত Mental Hospitalএর ব্যবস্থা হবে। তারা আদিম যুগের হোক বা না হোক, আজকালকার দিনে তারা অচল।" Reggie বলে, "কবিরা চিরযুগের, সে-হিসাবে তাদের আদিম যুগেরও ভাব্‌তে পার অনাগত যুগেরও ভাব্‌তে পার।" কোকোজী মুখ বেঁকিয়ে গেলাসে চুমুক দেয়। নিত্যগোপাল নিতান্ত হার মান্‌তে চাইত না ব'লে খেত। প্রথম প্রথম খেয়ে তার কিছু ভালো লাগ্‌ছে না, সেটা তার মুখ দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে খাওয়াটা তারও বেশ অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এত যে ভীরু, সেও এমন নির্ব্বিচারে কোকোজীর বাসনে তার নাকের গোড়ায় বসে' বিয়ার টান্‌ছে দেখে আমার খুব বিস্ময় বোধ হত। কোকোজী তখন সারাক্ষণই প্রায় কাশ্‌ছে, কাশির সঙ্গে রক্তও উঠ্‌ছে একটু-একটু। আমি খেতাম না বল্‌লে আপনারা আমায় বিশ্বাস না কর্‌তে পারেন, খেতাম বল্‌লেও নিজের প্রতি সুবিচার করা হ্য়ত হবে না, আমার কথাটা নাহয় বাদই রইল।

গ্রামোফোনের রেকর্ডের সঙ্গে কোকোজীর স্ত্রী Phyllis সেদিন খালি পায়ে classical danceএর নানারকম নিদর্শন আমাদের দেখাচ্ছিলেন। নাচতে তাঁর খুবই ভালো লাগ্‌ত, তাঁর আনন্দোদ্ভাসিত মুখ, তাঁর ক্লান্তিহীন সতেজ সাবলীল দেহভঙ্গী দেখে তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম। আমরা কেউ ভালো নাচ্‌তে জান্‌তাম না, এবং কোকোজী অসুস্থ বলে' তাঁকে একলাই নাচ্‌তে হত, তাতে তিনি একটু লজ্জা বোধ কর্‌তেন। কিন্তু Reggieর আগ্রহে প্রায়ই তাঁকে নাচ্‌তে হত। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌ছিলাম।

Phyllis ছিলেন সুন্দরী, Phyllis ছিলেন সাহসিকা, Phyllis ছিলেন বিদুষী। Landladyর কন্যা ছিলেন না, Birminghamএর এক প্রফেসারের কন্যা ছিলেন তিনি। নিজে ছিলেন Wolverhamptonএর একটি County Schoolএর অধ্যক্ষ। কোকোজী Oxford থেকে Stratford-on-Avon হয়ে Birminghamএ বেড়াতে গিয়েছিল, সেইখানে দৈবগতিকে Phyllisএর সঙ্গে তার দেখা হয়। নিছক রোমান্স করে', আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে বিরোধ করে' অপরিচিত দেশের স্বল্পপরিচয়ের সেই মানুষটিকে Phyllis বিয়ে করেন।

আমরা Phyllisএর সৌন্দর্য্য দেখ্‌তাম কিন্তু নিজের সৌন্দর্য্য বিষয়ে Phyllisএর কিছুমাত্র চেতনা ছিল না। আমরা তাঁর মধ্যে ইউরোপের নারীকে, বিশেষ করে' তাঁর নারীত্বকে দেখ্‌তাম, কিন্তু আমরা যে পুরুষ এ-বোধ তাঁর আছে বলে' কখনো মনে হত না। একটি অবাধ অকুণ্ঠিত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তেন, তাঁর অন্তরের নানা বিচিত্র প্রসাধনে আমাদের তিনি মুগ্ধ করে' রাখ্‌তেন, কিন্তু তাঁর সেই আন্তরিকতার মধ্যে ঠিক ধর্‌বার

ছোঁবার মতন কিছু আমরা পেতাম না, কেমন মনে হত আন্তরিকতাটাই এমন একান্তভাবে আছে যে ঠিক অন্তরটা তার মধ্যে কোথায় তা যেন বোঝা সহজ নয়। অর্থাৎ আমরা তাঁর কাছে বন্ধু ঠিক যতখানি ছিলাম, মানুষ হিসাবে ঠিক ততখানি ছিলাম না। এটা হয়েছিল, সম্ভবতঃ তিনি আমাদের ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌তেন না বলে'। কিন্তু সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া সহজ ছিল না।

Reggie ভিন্ন আমরা আর দুজনে তা নিয়ে কিছু বিশেষ মাথা ঘামাতাম না। তাঁকে যতটুকু পেতাম তাই আমাদের কাছে পর্য্যাপ্ত মনে হত। কিন্তু Reggie তাঁকে বুঝ্‌বার জন্যে, তাঁর মনের মধ্যে সাড়া জাগাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল; হাসি-পরিহাস মান-অভিমান কোলাহল-কলহে সে তাঁর অবিটুট আত্মপ্রতিষ্ঠাকে টলাতে চেষ্টা কর্‌ত। কোনো উপলক্ষের অপেক্ষা না করেই তাঁর জন্যে রাশিরাশি উপহার নিয়ে আস্‌ত। তাঁকে উদ্দেশ করে' কবিতা লিখত, অনেক উচ্ছ্বাস করে', হাত নেড়ে সেই কবিতা তাঁকে শোনাত। ফল কি হত জানি না। নিত্যগোপাল দুইচোখে এজন্যে Reggieকে দেখ্‌তে পার্‌ত না, কোকোজীকে বল্‌ত, "তুমি ওকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছ, যে, শেষকালে বিপদ ঘট্‌বে।" কোকোজী বল্‌ত, "বিপদ ঘটাবার চেষ্টাটা কোনো একটা দিক থেকে যতদিন হবে ততদিন বিপদ ঘট্‌বে না, আর দুদিক্ থেকেই যেদিন হবে সেদিন সেটা আর বিপদ থাক্‌বে না।" নিত্য-গোপাল বল্‌ত, "তোমার সাহস আছে স্বীকার কর্‌তে হয়।" কোকোজী বল্‌ত, "সাহস ত আছেই। সেটা আরও বেশী আছে এইজন্যে যে সে আমার চোখের উপরেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে। ওর উদ্দেশ্যটা যাই হোক, উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়গুলো honourable!"

ইংরেজী ভাষায় যাকে jealousy বলে, বাংলায় তার কোনো প্রতিশব্দ নেই। কেন নেই সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। তাদের নিয়ে jealous হতে পারা যায় এতখানি মূল্যও আমাদের দেশের নারীদের আমরা দিতে রাজি নই। বর্ম্মাদের ভাষায় নিশ্চয় সে প্রতিশব্দ আছে, কিন্তু আমাদের বর্ম্মা বন্ধু কোকোজীর কোনো ব্যবহারে কোনোদিন সে জিনিসটা প্রকাশ পেত না। সম্ভবতঃ তার স্বভাবে যে নিদারুণ একটা আভিজাত্য ছিল, তার পরিচিত অপরিচিত মহলে যেটা প্রায় অহঙ্কারের মতো হয়ে প্রকাশ পেত, সেই জিনিসটাই তাকে jealous হতে দিত না।

নানা দিক্ থেকে এই অহঙ্কার যত বেশী আঘাত পাচ্ছিল, তত বেশী করেই সেটা আত্মপ্রকাশও কর্‌ছিল। রোগের সূত্রপাত ইউরোপে থাক্‌তেই হওয়া সত্ত্বেও অনেকদিন তার নিজেরও কাছে সেটা ধরা পড়েনি। যখন পড়্‌ল, সে যে রুগ্ন এই জিনিসটা তার অহঙ্কারকেই প্রথমে আঘাত কর্‌ল। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিতে বেশ ভালো মাইনের কাজই কর্‌ত সে; কিন্তু ছোঁয়াচে রোগ, পাছে অপরকে তাই দিয়ে বিপন্ন কর্‌তে হয়, এই ভয়ে জবাব পাবার আগে নিজেই কাজে সে ইস্তফা দিয়েছিল, তারপর থেকে আমাদের ক' বন্ধুর সাহায্যের উপর নির্ভর করে' তার চল্‌ছে। কিন্তু দেখ্‌তাম, ঠিক সেইজন্যেই আমাদের সঙ্গে তার ব্যবহারে আগেকার সে স্বাভাবিক সহৃদয়তাটা আর নেই। সেই গলগ্রাহিতা অবস্থাটারই বিরুদ্ধে তার যে বিরোধ, সেটা আমাদেরই প্রতি ছোটবড় নানা দুর্ব্ব্যবহারে আমাদেরই বিরুদ্ধে বিরোধের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেত। ঋণের পরিমাণের অনুযায়ী বিরোধের পরিমাণটা বাড়্‌ত। নিজের কাছে ঐ করে' যেন সে নিজের মাথা উঁচু রাখ্‌ত। কিন্তু স্ত্রীর সম্পর্কে কোনোদিন কোনো দুর্ব্ব্যবহার আমাদের কারও সঙ্গে সে করেনি, যদিও এটা হয়ত ঠিক যে সে-সম্পর্কের জায়গায় আমরা যে ঋণদাতা এবং সে যে গ্রহীতা একথাটি আমরা কখনোই ভুল্‌তাম না। স্ত্রীর প্রতি তার নিজের ব্যবহারকেও অত্যন্ত গভীর ঔদাসিন্য বলে' আমাদের প্রায়ই মনে হত। একদিনও হাসিমুখে Phyllis-এর সঙ্গে কথা বল্‌তে বা আদর করে' তাঁকে কাছে ডাক্‌তে তাকে দেখিনি। আমাদের সমস্ত ব্যবহারের উপর সমস্তক্ষণ তার যেমন কড়া শাসন ছিল, স্ত্রীর উপরেও তাই ছিল। যদিও কোনো শাসনেরই প্রয়োজন Phyllisএর অন্ততঃ ছিল না।

নাচ শেষ হয়ে গেলে Reggie হঠাৎ Phyllisএর হাত দেখ্‌তে বসে' গেল। আবোল-তাবোল যা তা সে বল্‌তে লাগ্‌ল। কাজেই বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে হাত দেখাটা উপলক্ষ মাত্র, হাতটিকে নিজের হাতের মুঠোর নিতে

পারাটাই আসল। নিত্যগোপাল অত্যন্ত ছটফট্ করতে লাগল। Phyllisকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এ সমস্ত humbugএ বিশ্বাস করেন?" Phyllis কেবল তার স্বামীর দিকে একটু চাইল। কোকোজী বললে, "আমরা বৌদ্ধরা সৃষ্টি-ব্যবস্থাতে কার্য্যকারণ সম্পর্কের logicএ বিশ্বাস করি। ভবিষ্যৎ জিনিসটা বর্ত্তমানেরই ফল যদি হয়, তাহ'লে বর্ত্তমানের মধ্যেই কোথাও না কোথাও তার নিদর্শন থাকবেই। হাতের রেখার মধ্যেই যে সেটা নেই তা বলি কি করে'?" তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি জানো হাত দেখতে? আমি Cheiroর অনেকগুলি বই এ-বিষয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কিছু মনে রাখতে পারিনি।"

আমার কি মনে হলো, বললাম, "হ্যাঁ জানি।" তারপর তার বিশ্বাসের সূত্র অবলম্বন করে' একঘণ্টা ধরে' তাকে আমি নানা রকম করে' আশা দিলাম, সাহস দিলাম, তাকে বারবার করে' বললাম, তার সুদীর্ঘ পরমায়ু, Palmistry বিজ্ঞানের কোনো অর্থ যদি থাকে তবে অকালমৃত্যু তার পক্ষে অসম্ভব। Phyllis ইতক্ষণে Reggieর কাছ থেকে উঠে এসে আমার পাশ ঘেঁসে স্বামীর হাতের উপর ঝুঁকে বসেছিলেন। আমার হাত দেখার অভিনয় শেষ হলে দুটি বড় বড় চোখের গভীর কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমাকে অভিনন্দিত করলেন, যেন 'আশা আছে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করেই আমি তাঁদের আশা-ভরা ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করলাম। কোকোজীও খুব প্রীত হয়েছে এমন ভাব দেখালে, বললে, "হ্যাঁ Cheiroর বইয়ের কথা যতটুকু আমার মনে আছে তাতে আমারও ঠিক ঐরকম মনে হয় বটে।"

ঠিক এমনই সময় হঠাৎ টেবিলের ওপর থেকে একটা আধখানা খালি বিয়ারের বোতল মাটিতে পড়ে' চুরমার হয়ে গেল। সকলে অবাক্ হয়ে সেইদিকে চেয়ে ব্যাপার কি ভাবছি, এমন সময় নিত্যগোপাল লাফিয়ে উঠে-পড়েই "ভূমিকম্প" বলে' চীৎকার করে' দরজার দিকে ছুটে গেল। আমরাও সকলে মিলে তার পশ্চাৎবর্ত্তী হলাম। Reggie Phyllis-এর হাত ধরল, আমি কোকোজীকে টেনে নিয়ে চললাম। দরজা অবধি যেতে যেতে অন্ততঃ দশবার মনে হলো, এখনই সমস্ত বাড়ীটা চুরমার হয়ে যাবে। ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে তৈরী একটা সামান্য বাড়ী এত বড় দোলানির চোট কখনো সইতে পারে না। ছাত ও দেয়াল থেকে আস্তরের চাপ খসে' খসে' গায়ে এসে পড়তে লাগল, কিন্তু তবু পড়তে পড়তে সকলে নীচে এসে নামলাম।

(ক্রমশঃ)

দেহাতীত

শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার

দেহের দুয়ারে বাহু-বন্ধনে
　　বরিলে যাহারে আজ,—
ভুলোনা, ভুলোনা আত্মার ঘরে
　　আছে তার গৃহকাজ।

ক্রীড়া-সহচর তুমি ত না তার,
তুমিও কুড়াবে পূজা-উপচার,
পরমাত্মার মহাপ্রাঙ্গণে
　　জাগিছে পর্ব্বরাজ!

কাঁঠাল নারীমঙ্গল সমিতি

ভগবানের ইচ্ছায় এই সমিতি দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা আরও উন্নতি করিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। সমিতি-গঠনের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক মহিলা উপলব্ধি করিয়াছেন। এমন কি, বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন মহিলা ও পুরুষদের হৃদয়েরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাগেরহাটের শ্রীমতী লীলা মিত্র মহাশয়া সমিতি পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শনবহিতে লিখিয়া গিয়াছেন:—"এই সমিতি মাত্র কয়েকমাস স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে সভ্যাগণ নিজেদের মনের এতটা উন্নতি সাধিত করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।"

সমিতি স্থাপনের পূর্ব্বে একজন মহিলাও স্বাবলম্বিনী ছিলেন না। এমন কি, অনেক দুঃস্থা বিধবা মহিলা সন্তানাদি লইয়া ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন। সমিতি স্থাপনের পর অনেকেই যে কোন একটি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন ও অতি সচ্ছল ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পূর্ব্বে কেহ এক পয়সাও উপার্জ্জন করিত না, এখন প্রায় ২১ জন উপার্জ্জনক্ষমা, ইহা কম কথা নহে। গত পৌষ মাসে শ্রীমতী কমুদিনী গাঙ্গি এখানে আসেন ও বক্তৃতা দেন। তখন একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। শিল্পকার্য্য দেখিয়া গাঙ্গি মহাশয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উৎসাহ দিয়া যান। তাঁহাকে প্রাচীন প্রথায় 'বরণ' করিয়া গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়, তাহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। গত কেন্দ্র-সমিতির প্রদর্শনীতে সমিতির সভ্যা শ্রীমতী অবলাবালা বসু ও শ্রীমতী চারুবালা দেবীর প্রস্তুত দুইখানি নক্সী কাঁথা তরুণ কবি যসীম উদ্দিন সাহেবের চোখে পড়ে। ঐ দুখানি কাঁথা তাঁহার এত ভাল লাগে যে তিনি উহার উচ্চ প্রশংসা করেন।

মহিলাদিগকে নানাবিধ কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য সমিতি এই বৎসর পদক ও পুস্তক প্রভৃতি পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অনেক সহৃদয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ সমিতিকে পদক ও পুস্তক প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে কেহ ধাত্রী-বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন না। বর্ত্তমানে কেন্দ্রসমিতি হইতে সাহায্য পাইয়া অনেকেই উহাতে পারদর্শিনী হইয়াছেন। ৩ জন ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। ডাঃ অরুণচন্দ্র নাগ এম্-বি মহাশয় অতি যত্ন সহকারে ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার সদাশয়তায় আমরা মুগ্ধ। নিয়মিত ১২টি লেক্‌চারের পরেও আরও তিনটি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অনেক সময় ২০।২৫ টাকার "কল্‌' পরিত্যাগ করিয়াও লেক্‌চার দিয়া গিয়াছেন।

বাবু কেশবলাল, সমিতিকে একটি হারমোনিয়ম দিয়া সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কেন্দ্রসমিতি হইতে একজন শিল্পশিক্ষয়িত্রী তিন মাস এখানে রাখিবার জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, আরও কিছু সংগ্রহ হইলে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রী স্নেহলতা মিত্র,
সম্পাদিকা।

নেত্রকোণা নারীমঙ্গল সমিতি

গত ২০শে বৈশাখ নেত্রকোণা নারীমঙ্গল সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

মহিলাদের স্ত্রীশিক্ষার ও কুটীরশিল্পের বিস্তার, ধর্ম্মালোচনা, স্বাস্থ্যোন্নতি, অসহায়া বিধবাদিগকে সাহায্যপ্রদান, তাঁত ও চরকার প্রচার এবং মহিলাগণের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পরস্পরের সহানুভূতি দ্বারা নারীজাতির উন্নতিসাধন এই কয়েকটি উদ্দেশ্য লইয়া গত ১৩৩৬ সালের ১৫ই বৈশাখ এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে খুব সামান্য ভাবে আরম্ভ করিয়া মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে সমিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ১৪ই অগ্রহায়ণ হইতে সমিতির নিজস্ব তাঁতের ক্লাস খোলা হইয়াছে। সম্পাদিকা শ্রীমতী শৈলবালা মজুমদার প্রথমে অন্য স্থান হইতে টিপরাই তাঁতে তোঁয়ালে গামোছা প্রস্তুত-প্রণালী শিখিয়া আসিয়া সমিতিতে শিক্ষা দিতেন, তাহার পর একটি বিধবা বালিকাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়া তাঁতের শিক্ষয়িত্রী করা হয়। এখন ২০।২৫ জন মহিলা ও বালিকা দ্বারা ৪টি তাঁতে তোঁয়ালে গামোছা, লণ্ঠনের সলিতা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। তাঁত এবং সেলাই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত ৮টি সাধারণ সভার, ৪টি কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। সভ্যা-সংখ্যা বর্ত্তমানে ১১৬ জন। তন্মধ্যে কয়েকজন বালিকা ও কয়েকজন মুসলমান মহিলা সভ্যা আছেন।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী দেবী তাঁহার সুচিন্তিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় নারীজাতির শিক্ষার আদর্শ, উন্নতি, অতীত ও বর্ত্তমানের শিক্ষার অবস্থা প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, "অস্বীকার করি না যে নারীর মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা কর্ম্ম-শক্তি কম, কিন্তু ভারতের নারীত্বের আদর্শের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, নারীপ্রগতির একটি বিশেষ ধারা আছে, যাহা কোন দেশে পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না, সেটি তাহার ত্যাগ। এই ত্যাগই তাহার সতীত্ব, এই ত্যাগই তাহার মহত্ব, এই ত্যাগেই তাহার কমনীয়তা।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "দেশের আশাভরসা আপনাদের কাছে, জাতির জীবনকাঠি মরণকাঠিও আপনাদের হাতে। নারী-চরিত্রের আদর্শ বজ্রের মত কঠোর ও কুসুমের মত মৃদু-কোমল। যেখানে দুঃখ, দৈন্য, আর্ত্তি, নারী সেখানে বরাভয়করা করুণাময়ী কল্যাণী জগদ্ধাত্রী, আর যেখানে অত্যাচার, অবিচার, কলুষতা—নারী সেখানে ভৈরবী করালী কালী।"

পুণ্যবতী সরোজনলিনীর প্রেরণায় দেশের নারীমঙ্গল সমিতিগুলি যে মহৎ উদ্দেশ্য ও একনিষ্ঠ প্রয়াস লইয়া ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহা আশা ও আনন্দপ্রদ।

শ্রী শৈলবালা মজুমদার, সম্পাদিকা।

নারী সমবায় ভাণ্ডার

আজিকার বিশ্বব্যাপী নারীজাগরণের দিনে আমাদের দেশেও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র দিকে দিকে প্রসারিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের প্রগতিতে নারী আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। মহিলা কর্ম্মীরা শিক্ষা শিল্প প্রভৃতি গঠনকার্য্যের ক্ষেত্রে কিছুদিনের ভিতরেই যে কৃতিত্ব ও সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। সম্প্রতি নারী-শিক্ষা-সমিতি সমবায় মণ্ডলী লিমিটেড "নারী সমবায় ভাণ্ডার" নামে যে প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন তাহা মহিলা কর্ম্মীদের এই কর্ম্মশক্তিরই গভীর পরিচয় প্রদান করে।

বিগত ৫ই মার্চ্চ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ১২।১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট গৃহে শ্রীযুক্তা লেডী মুখার্জ্জী মহোদয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য মহিলাদের শিল্পকার্য্যে উৎসাহদান, ভারতের গৃহ-শিল্পের উন্নতিসাধন এবং মহিলাদের প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার শিল্পসম্ভার ও গৃহস্থালীর যাবতীয় উপকরণ ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি। মহিলাগণ তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি নিজ ব্যয়ে সমবায় ভাণ্ডারের সম্পাদিকার নিকট ৬।১ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট পাঠাইয়া দিলে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের উপযোগী ও বাজার-চলিত মূল্যের হওয়া উচিত। সমবায় মণ্ডলীর সভ্যাগণকে দ্রব্য সরবরাহ ও প্রস্তুত করিবার জন্য কাঁচা মাল ও টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এরূপ সাহায্য পাইতে হইলে সম্পাদিকার নিকট আবেদন করিতে হইবে। গৃহকর্ম্মের দ্রব্যাদি যাহাতে

মহিলারা নিজেরা ক্রয় করিতে পারেন, তাহার জন্য ভাণ্ডার-গৃহে মহিলা কর্ম্মী রাখা হইয়াছে। এখানে নানারকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যথা স্বদেশী চিরুণী, সাবান, তেল, আলতা, সিঁদুর, কাঁটা, এসেন্স, ক্রিম, টুথপেষ্ট, পাউডার, জুতার কালী, কাচ, এনামেল ও চীনামাটির বাসন, এমব্রয়ডারী,ব্লাউস পিস, ফ্রক, নানারকমের জামা, আচার, জ্যাম, জেলী, আসন,শাড়ী, খেলনা ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ মহিলাগণ এই ভাণ্ডারটির প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে এবং সর্ব্বপ্রকারে ইহার উন্নতির সাহায্য করিলে এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটি একটা স্থায়ী গৌরবের বিষয় হইতে পারিবে।

শ্রী কিরণময়ী বসু, কর্ম্মসচিব।

খুলনা মহিলা-সমিতি

আমাদের খুলনা মহিলা-সমিতির পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে। মহিলাদিগের পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষা-বিস্তার, কুটীরশিল্পের প্রচার, ও বিধবা ও গৃহস্থমহিলাদিগের অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য গত ১৯২৬ সালের ৯ই আগষ্ট শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৯২৯ সাল হইতে শ্রীমতী সরলা রায় সম্পাদিকা ছিলেন, গত ১৯৩০, ১০ই এপ্রিল তিনি সমিতির সম্পাদিকা পদ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী মমতা দেবী সর্ব্বসম্মতিক্রমে এখন সমিতির সম্পাদিকা রহিয়াছেন। সমিতির বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা ৭০ জন।—খ্রীষ্টান ও মুসলমান মহিলা সভ্যা ৪ জন আছেন, এবং তাঁহারা সমিতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না।

শ্রীমতী অনিলাবালা ঘোষ,শ্রীমতী বীরবালা বসু,শ্রীমতী সুরবালা রায়,শ্রীমতী সরলা রায় ও সম্পাদিকা সমিতি পরিচালনা করেন। একজন অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার কাজ ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ করিয়া থাকেন, ও ইঁহারা পরস্পরে সকলের প্রতি সকলে খুব সহানুভূতি ও ভালবাসা-পূর্ণ।

গত ১৯২৯, জানুয়ারীতে সমিতির একটি মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু সভানেত্রী হইয়াছিলেন। পরিচালিকাগণ কর্ত্তৃক পাঁচটি রৌপ্য-পদক, দশটি প্রাইজ ও প্রশংসাপত্র বিতরিত হয়। দুইদিনে সাত-আটশত মহিলা ও ভদ্র মহোদয় দর্শনার্থী হন্। ইহার বিস্তারিত বিবরণ যথাকালে আমরা 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে পাঠাইয়াছি।

আমাদের সমিতিতে একটি সেবা-বিভাগ করা হইয়াছে। —বেড্প্যান, ইউরিন্যাল, আইস্ব্যাগ, থার্ম্মোমিটার, হটওয়াটার ব্যাগ, ডুস্ক্যান, ফিডিং কাপ্, মেজার গ্লাস, বোরিক কটন্ গজ ও আইওডিন্, সিরিঞ্জ ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য সকল রাখা হইয়াছে। যাঁহাদের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় ঐ সকল দ্রব্য কিনিবার সঙ্গতি নাই, কিম্বা সঙ্গতি থাকিলেও হঠাৎ প্রয়োজনে মফঃস্বলে সব সময় কিনিতে না পাইয়া, যে কেহ কারণ সহ আবেদন জানাইয়া প্রার্থিত দ্রব্যগুলির অর্দ্ধমূল্য ডিপজিট্ রাখিলেই তাঁহাদের ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। জিনিস ফেরৎ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ডিপজিটের মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। সমিতি হইতে ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষিতা শ্রীমতী রমাবতী দেবী ও শ্রীমতী বীরবালা বসু যেখানে প্রয়োজন সেইখানে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে বাড়ী আসেন। এ সকল দেশে সঙ্গতি থাকিলেও আঁতুর ঘরের চিরপ্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কেহ সহজে রাজী হন না। শ্রীমতী বীরবালা বসু ঐ ব্যবস্থা না মানিয়া নিজ মতানুসারে কার্য্য করিয়া অনেক প্রসূতিকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।—প্রয়োজন হইলে তিনি নিজের বাড়ীর জিনিসপত্র দিয়াও যথেষ্ট সাহায্য ঐ সময়ে করেন।

১০।১২ জন সভ্যা আপন আপন গৃহের ব্যবহারোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী করেন। উহার আনুমানিক মূল্য মাসিক ১০০৲ টাকা। সমিতিতে চরকার সুতা কাটা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। প্রত্যেক সভ্যাই সুতা কাটেন। যাঁহাদের সঙ্গতি নাই তাঁহাদের চরকা ও তূলা দেওয়া হয়। সুতা অনেক জমিয়াগিয়াছে। এখানে একটি তাঁত বসাইবার আয়োজন চলিতেছে। একজন শিক্ষয়িত্রী শীঘ্রই আনিবার ইচ্ছা আছে। তাঁতের ও স্কুলের জায়গা এখনও স্থির হয় নাই বলিয়া শিক্ষয়িত্রী আনা উপস্থিত ২।১ মাস স্থগিত আছে।

অধিবেশনের সময় কেহ গাড়ীতে কেহ পদব্রজে আসেন। অধিবেশনের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সভ্যাদের মধ্যে যিনি যে বাড়ীতে সভা ডাকেন সেই বাড়ীতে অধিবেশন হয়। গাড়ী-

ভাড়া সমিতির তহবিল হইতে দেওয়া হয়। একজন চাপ্‌রাণী আছে, চাঁদা আদায় ও অন্যান্য কার্য্য করে।

সমিতির অধিবেশনে গীতাপাঠ, শিশুপালন, টোট্‌কা চিকিৎসার আলোচনা, প্রবাসী, বঙ্গলক্ষ্মী, বিচিত্রা হইতে মহিলাদিগের উপযোগী প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, সভ্যাদের রচিত প্রবন্ধ পাঠ, গীত, পরস্পরের গৃহ-পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অলোচনা ইত্যাদি হইয়া থাকে।

আমাদের সভানেত্রী স্থানীয় একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ারের পত্নী শ্রীমতী নির্ম্মল রায় এস্থান হইতে তাঁহার স্বামী বদ্‌লী হইয়া যাওয়াতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত সহৃদয়া সহকর্ম্মিণীর অভাব আমরা খুব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। তাঁহার স্থলে স্থানীয় সাবজজ্‌ শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী সুশীলা দেবীকে সভানেত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

১৯৩০, জানুয়ারী হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত	জমা
	—২৪১।৶৫
ঐ পর্য্যন্ত খরচ	—১৬৫।/১০
তহবিলে	৭৬/১০
ব্যাঙ্কে	৩১৯/১০

শ্রীমমতা দেবী,
সম্পাদিকা।

পথ-বাঁকে

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

—জানি,
এমনি করিয়া এ জীবন মম
নিয়ে যেতে হবে টানি'।
ভীড়-করা পথ ছাড়িয়া এসেছি,
নিরালায় চলি একা,
তারি মাঝে ফাঁকে কভু পথ-বাঁকে
মধু-মুখ দেয় দেখা!
ওদের চলার লীলার ছন্দ
জাগায় পরাণে পুলক-স্পন্দ,
জানি সে মিথ্যা হ'য়ে গেছে কবে
—এ মোর চলার বেলা
উষর মাঠের কণ্টক-তৃণে
ক্ষণিক ফুলের মেলা!

—জানি,
চির জীবনের অশ্রুর সাধ
বুকে থুইয়াছি আনি'।
যেই মুখগুলি এসেছে, আসিবে
হাসি-উৎসব নিয়া,
র'য়ে যাবে তার স্মৃতির ক্ষতটি
বেদনায় থমকিয়া।
সহজ পথের প্রবাহ ফেলিয়া
চলিয়াছি কোথা পরাণ মেলিয়া,
ফেলে যাওয়া—এযে তুলে নেওয়া শুধু
শতগুণ করে' বুকে;—
ওরা সাথে সাথে মোর পথ-বাঁকে
দেখা দিবে মধু-মুখে!

আত্মোন্নতি—শ্রী ভুবনমোহন দাস এম-এ। ১০।এ শ্রীনাথ দাসের লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য—॥০ আনা।

আত্মোন্নতি—আত্মিক উন্নতি। হিন্দুশাস্ত্রে (দর্শন) আত্মা নিরুপাধিক—আত্মার উন্নতি-অবনতি নাই। গ্রন্থকার এখানে দেহাশ্রয়ী আত্মস্বরূপের উন্নতির কথা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রজ্ঞানের মত-সমন্বয়ের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভূমিকাকার বলেন, "অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এই প্রথম গ্রন্থ, সুতরাং এইরূপ দুরূহ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে তাহা না ধরিয়া প্রীতির চক্ষে দেখা উচিত।"

তথাকথিত ফুলালী কাব্য ও মনস্তত্ত্বমূলক উদ্ভট উপন্যাসের অতি-প্লাবন সময়ে এইরূপ অধ্যাত্ম-আশ্রয়লাভ পাঠকের পক্ষে মঙ্গলকর।

মুক্তি-পথে—শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিম-বাথান হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—১৲ এক টাকা।

সাধারণভাবে ইহা একখানি কবিতাগ্রন্থ হইলেও ইহাকে বিশেষভাবে বলিতে হয়—ছন্দোবন্ধে গ্রথিত নব ভারতীয় মুক্তিবাদের ত্যাগমন্ত্র গীতা। কাব্যবিচারে বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবকে অতিক্রম করিয়া প্রাণসম্পদ স্ফুটতর হইলেও, ইহার ভাষা ও ছন্দও প্রায় ত্রুটিহীন। একদিক দিয়া ইহাকে বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ব: স:

শতাব্দীর সঙ্গীত—শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বীণা লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১০ আনা।

বাঙ্গলা সাহিত্যের 'অতি-আধুনিক' তরুণ কবিদের লেখা, পড়া প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছি, কেন না, ঐগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন একটা মারাত্মক দুর্ব্বলতা, শোচনীয় ন্যাকামি এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা চিন্তা করাও অসহ্য। একদিকে যখন বাহিরের কার্য্যক্ষেত্রে 'তরুণের অভিযান', 'যৌবনের জয়যাত্রা', স্বাধীনতার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির কথা শুনি, এবং অন্যদিকে তরুণের সৃষ্ট কাব্যে, সাহিত্যে তাহার কোন রূপ দেখিতে পাই না, তখন মনে সংশয় আসে, এ 'জাগরণ' কি সত্য, না কৃত্রিম উত্তেজনামূলক একটা কাল্পনিক ভাব-বিলাস? বস্তুতঃ বাহিরের কার্য্যপ্রচেষ্টার রূপ যখন জাতির মনের দর্পণ—সাহিত্যে ধরা পড়ে না, তখন সেই অসামঞ্জস্যের মূলে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের গলদ আছে, বুঝিতে হইবে।

যৌবন বিদ্রোহী, প্রলয়েই তাহার আনন্দ, ধ্বংসের মধ্য দিয়াই সে নূতন সৃষ্টি করে,—পুরাতনের আবর্জ্জনা, জীর্ণ পূতিগন্ধময় শবকে সে চিতার আগুনে তুলিয়া নূতন প্রাণকে বরণ করিয়া আনে। রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই তার এই রুদ্রলীলা! বাঙ্গলার অতি-আধুনিক তরুণ সাহিত্যে কালবৈশাখীর সেই রুদ্র উল্লাস, নটরাজের প্রলয়-নৃত্যের ছন্দ কই!

এই কথা ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় শ্রীমান বিবেকানন্দের "শতাব্দীর সঙ্গীত" হাতে আসিয়া পৌঁছিল। উপরেই দেখি নটরাজের প্রলয়-তাণ্ডবের পরিকল্পনা—সুন্দর প্রচ্ছদপটটি! ভিতরে খুলিয়া দেখি, যাহা চাহিতেছিলাম—এ সেই জিনিষ! যৌবনের বিদ্রোহের সঙ্গীত, বিপ্লবের জয়গান, গতানুগতিক অতীতের কঙ্কাল-স্তূপের মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির আবাহন! কবির নিজের মুখেই তার পরিচয় শুনুন—

এই বিংশ শতাব্দীর—আমি এই যুগের মানব,
আমার হৃদয়তলে জাগে সেই শ্মশান-ভৈরব—
তার ভস্ম তার জটা, নয়নের কটাক্ষ ভয়াল,
মৃতের কঙ্কাল 'পরে আনন্দের মত্ত করতাল,
তাথৈ তাথৈ নৃত্য, তার সেই পূর্ণ উন্মাদনা
নিদ্রিত কালেরে দেয় জাগ্রতের গভীর প্রেরণা!
আমার নখাগ্রে দেখি শতাব্দীর রক্ত-ইতিহাস,
আমার শ্রবণে বাজে এশিয়ার বিজয়-উল্লাস!

গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই এই রুদ্রবীণার সুরে, উদাত্ত ছন্দে রচিত। 'বিপর্য্যয়', 'স্বাধীনতা-সঙ্গীত', 'বিসুবিয়সের চেতনা', 'দিগ্বিজয়ী', 'দাবানল', 'গাহি তার জয়গান' 'জলদস্যু'—কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টির নাম করিব? বস্তুতঃ এই তরুণ কবির লেখার মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, যাহা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে এক নূতন ভাবধারা জন্মলাভ করিয়াছে—বর্ত্তমান সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এ যুগের মানুষ যে আর সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিতেছে না, তাহারা সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন পৃথিবী গড়িতে উদ্যত, ইহা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন! সেই বিদ্রোহের রেশ ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কবির বীণায় তাহারই উন্মাদনাময়ী সুর ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত, আশান্বিত, কেন না, পথের সন্ধান যখন একবার পাওয়া গিয়াছে, তখন তরুণ যাত্রীদলের অভাব হইবে না।

এতক্ষণ ধরিয়া কবির কাব্যের মূল ভাব ও আদর্শেরই কথা আমরা বলিয়াছি। তাঁহার ভাষা, ছন্দ ও সুরের কথা কিছুই বলি নাই। কবি যখন আপনার ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা,ছন্দ ও সুর আয়ত্ত করিতে না পারেন, তখন তাঁহার শক্তির সম্যক প্রকাশ হয় না, ভাব ব্যর্থ হয়। শ্রীমান বিবেকানন্দ সে হিসাবে ভাষা ও ছন্দের উপরেও অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন। স্থানে স্থানে আড়ষ্ট ভাব, অনাবশ্যক শব্দপ্রয়োগ, উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের পরিচয় অবশ্য আছে। কিন্তু তরুণ লেখকের পক্ষে এই দোষ মার্জ্জনীয়। তিনি যথার্থ কবি এবং বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্যে নিজের স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার সাহিত্যরসিকগণ এই তরুণ কবিকে যোগ্য সমাদার করিবেন, এ আশা আমরা অবশ্য করিতে পারি।

শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

নারীত্বের আদর্শ

শ্রী শান্তিময়ী দত্ত

সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে মানবজীবন-তরণীখানি, হালটি ধরিয়া রহিয়াছেন নারী। তরীর গতি নিরূপণ করিবার ভার নারীর হাতে—নিপুণ কর্ণধার যিনি, তিনি ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফানের মধ্য দিয়া নিরাপদে তরণীখানি গন্তব্যের পথে চালাইয়া লইতে পারেন, আবার অনভিজ্ঞ, অযোগ্যের হাতে পড়িলে কত শত জীবন-তরী মাঝ-সমুদ্রে অকালে প্রাণ হারায়।

কিন্তু কেবল নারী বা কেবল পুরুষ লইয়া সৃষ্টির পরিণতি সম্ভব হয় না। তাই বিধাতার বিধানে পুরুষ এবং নারী দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছে। একে অন্যের ভিতরে পরিপূর্ণতা খুঁজিয়া বেড়ায়। পরস্পরের মিলনে পরিবারের সৃষ্টি হয়। এই পরিবারের কেন্দ্র নারী—নারীর কর্ম্মক্ষেত্রও এই পরিবার। মানব-ইতিহাসেও দেখা যায়, পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি, রাজ্য ভাঙ্গে গড়ে নারীর প্রভাবে, নারীর ইঙ্গিতে, নারীর প্রেরণায়। সুতরাং সংসারে নারীর স্থান, নারীর কর্ত্তব্য, নারীর প্রকৃত স্বরূপ, নারীত্বের আদর্শ কোথায়, এবং কিরূপ এই জটিল সমস্যার সমাধান—ইহাই সব চেয়ে বড় চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন ভারতের রাজসভায়, ধর্ম্মসভায়, বিদ্যাপীঠে যদিও দুই চারিটি নারী-কণ্ঠের স্বর মাঝে মাঝে শোনা গিয়াছে, তবু প্রাচীন সামাজিক আদর্শে নারীর স্থান প্রধানতঃ ছিল পরিবারে,—গৃহিণীরূপে, জননীরূপেই তাঁহাদের প্রধান পরিচয়। গৃহিণী একান্তই গৃহের জন্য ছিলেন, ক্ষুদ্র পরিবারের প্রয়োজন-সিদ্ধি রূপেই তাঁহার জীবনের সার্থকতা ছিল। শুধু ভারতের আদর্শ ই যে তাহা ছিল এমন নয়, সমগ্র এশিয়ায় এবং ইউরোপের নানা দেশেও নারীত্বের আদর্শ কত সঙ্কীর্ণ এবং হীন ছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠে জানা যায়।

নারীকে পুরুষ তাহার সম্পত্তি-বিশেষ মনে করিত এবং প্রয়োজনানুরূপ কত শত অদ্ভুত রূপ কল্পনা করিয়া লইয়া নারীত্বের আদর্শ অঙ্কিত করিত, তাহার তুলনায় ভারত-নারীর আদর্শ চিরদিনই অনেক উচ্চে ছিল বলা যায়।

আধুনিক যুগে নারীত্বের আদর্শ, নারীর কর্ম্মক্ষেত্র, শিক্ষা, স্বাধীনতা, অধিকার প্রভৃতি লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ চলিতেছে। ইউরোপে নানা স্থানে নারী পুরুষের সহিত অধিকারের সাম্য লইয়া লড়াই করিতেছে, সমান যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া, শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়া স্বীয় অধিকার অর্জ্জন করিয়া লইতেছে। এই বিপ্লবের ঢেউ ভারতের শান্ত জীবনকেও আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। চিন্তাশীল সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ নারীর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ধর্ম্মজগতে, শিক্ষা-জগতে, জনসেবায়, এমন কি রণক্ষেত্রেও নারী আপনার শক্তি ও প্রতিভার অসামান্য পরিচয় দিয়াছেন। আজ যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলিবার পথ নাই, তবে কর্ম্ম-বহুল সংসারের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে কোন্‌টিকে কেন্দ্র করিয়া নারীর প্রতিভা, পূর্ণ-বিকাশের পথে অবাধে চলিতে পারে, সেইটি নিরূপণ করাই কঠিন অথচ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারীর কর্ম্মক্ষেত্র পরিবার। পরিবার-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে আপনার কৃতিত্ব প্রমাণ করিতে পারিলেই নারীর জীবন সার্থক ও সুন্দর হইতে পারে। কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে, পত্নীরূপে, জননীরূপে, গৃহিণীরূপে নারী সংসারে অধিষ্ঠিত। এই বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তব্য যিনি সুসম্পন্ন করিতে পারেন, তিনিই আদর্শ নারী। প্রত্যেকটি নারী ভাবী জননী এবং গৃহিণী। আধুনিক গৃহিণীর কর্ম্ম-ক্ষেত্র শুধু নিজের পরিবারের বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বমানব-পরিবারই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। আদর্শ জননী যিনি, তিনি নিজের দুই চারিটি সন্তানের জন্ম দিয়া, তাহাদের মানুষ করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করেন না।

তাঁহার মাতৃত্ব বিশ্ব-জোড়া, বিশ্বের প্রত্যেকটি মানব-সন্তানের জন্য তিনি নাড়ীর টান অনুভব করেন, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আপনার জীবনকে জড়াইয়া লইয়া অন্তরের সহানুভূতি দ্বারা তাহার সেবা করেন।

দেবী সরোজনলিনীর জীবনে এই আদর্শ-নারীর ছবি দেখিতে পাই। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, বিবাহিত জীবনে এই আদর্শের ক্রমবিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হই। শৈশবে,কৈশোরে আপনার সরল, সুমিষ্ট, মধুর, অমায়িক ব্যবহারে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবার দ্বারা তিনি পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায়, সঙ্গীতচর্চ্চায়, ব্যায়ামশিক্ষায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যৌবনে—বিবাহিত জীবনের অসংখ্য কর্ত্তব্য কি সুন্দররূপে নিখুঁতভাবে পালন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটি নারী কত ভাবে, কত দিক্ দিয়া আপনার জীবনকে বিকশিত এবং সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন এবং অপরের জীবনকেও আনন্দ দান করিতে পারেন তাহার দৃষ্টান্ত এই আদর্শ-নারীর জীবনের প্রতি অধ্যায়ে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

নারীর প্রধান কর্ত্তব্য পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির, গৃহপালিত পশুপক্ষীর, আশ্রিতবর্গের, এমন কি প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র সম্পত্তিরও যত্ন, সেবা ও তত্ত্বাবধান করা, প্রত্যেকের সুখ-সুবিধা, অভাব-অভিযোগের প্রতি সমদৃষ্টি রাখা। সরোজনলিনীর গার্হস্থ্য জীবনে কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই, কোথাও ত্রুটি নাই। যখন তাঁহার প্রাণমন দেশের এবং দশের সেবার উৎসর্গ করিয়াছেন, বাহিরের ডাক প্রতিনিয়ত তাঁহার গৃহের নিরিবিলি শান্ত জীবনকে স্থির থাকিতে দেয় না, বাহিরের কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা তাঁহার পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্যপথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে চায়—তখনও তাঁহার প্রশান্ত, স্থির, ধীর, কর্ম্মনিরতা গৃহিণী-মূর্ত্তি অচঞ্চলা। পতি সেবা, সন্তান-সেবা, অতিথি-সেবা, গৃহ-সেবার কী আদর্শ দেখি তাঁহার জীবনে! নিজহস্তে প্রতিদিন কিছু রন্ধন করিয়া, নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে, সন্তানকে, পরিবারস্থ সকলকে, অতিথি-অভ্যাগতদের সযত্নে আহার করাইয়া কত তৃপ্তি ছিল তাঁহার! ধনীর কন্যা এবং উচ্চপদস্থ সম্পন্ন ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী ছিলেন তিনি, অর্থের অভাবে যে সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতেন এমন নয়। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অফুরন্ত কার্য্যতালিকার গুরুভার দেখিয়া তাঁহার সুযোগ্য স্বামী পারিবারিক কর্ত্তব্য-পালনের দায়িত্ব আরও কতক পরিমাণে ভৃত্যদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। সরোজনলিনী অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে, যে রমণী আপন পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে সুসম্পন্ন না করেন, তাঁহার দ্বারা জগতের সেবার কল্যাণ হইবে না।

ভারত-নারী তাঁহার স্বামীর সহধর্ম্মিণী। কিন্তু কয়জনে স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী বলিয়া গৌরব করিতে পারেন? স্বামীর মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গিনী যিনি, স্বামীর সকল কর্ম্মের সহযোগিনী যিনি, সকল উন্নতিতে উৎসাহ-প্রদায়িনী যিনি, সকল বিপদে, সম্পদে, সংগ্রামে, গৌরবে, অপমানে পার্শ্ববর্ত্তিনী যিনি তিনিই সহধর্ম্মিণীর পদ দাবী করিতে পারেন। পতিব্রতা সাধ্বী সরোজনলিনীর পতিপ্রেম, পতিভক্তি, পতিপরায়ণতা—পতির দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, কর্ম্মশীল, সকল প্রকার জীবন জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইত। দেহের সেবা তো যে কোনো বেতনভোগী ভৃত্যের দ্বারা চলিতে পারে কিন্তু যেখানে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনে পদস্খলনের সম্ভাবনা, যেখানে সামাজিক কর্ত্তব্যে শিথিলতা, অথবা কর্ম্মজীবনে প্রেরণার অভাব হয়, সেখানে পুরুষের জীবনে নিপুণা সহধর্ম্মিণীর একান্ত প্রয়োজন।

সরোজনলিনীর বিবাহিত জীবনে দেখিতে পাই, কী দৃঢ়তা-কোমলতা, সংযম-শিথিলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ! কেমন অপরূপ কৌশলে ধীরে ধীরে স্বামীর জীবনে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; আবার স্বামীর সদ্‌গুণাবলী আপন চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন! সকল বিপদে, সংগ্রামে, সফলতায় বিফলতায়, দুঃখে, আনন্দে স্বামীর প্রকৃত জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন তিনি। ভীষণ জঙ্গলে; হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হইয়া আশ্চর্য্য নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া স্বামীর প্রাণে বলসঞ্চার করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে, বিচারক্ষেত্রে, ন্যায়বিচারে, সকল প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে স্বামীকে আপন চরিত্রের

দৃঢ়তা, ন্যায়পরতা এবং নির্ভীকতাপূর্ণ উদ্দীপনার দ্বারা সহায়তা করিতেন।

নারীর বিবাহিত জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য স্বামীর প্রতি, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি। ভারতনারী সন্তানবৎসলা বলিয়া গৌরবলাভ করেন। সন্তানের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল যাহাতে হয়, তাহা যিনি করিতে পারেন, তিনিই সন্তানকে প্রকৃত ভালবাসেন। কিন্তু ভারতের ঘরে ঘরে আমরা কি দেখিতে পাই? জননী সন্তানের জন্ম দিতেছেন, সন্তানকে খাওয়াইয়া, পরাইয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেছেন। সন্তান বিদ্বান, সত্যবাদী, নির্ভীক, ন্যায়-পরায়ণ, স্বদেশপ্রেমিক হইল কিনা তাহার খবর কয়জনে রাখেন? সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার জন্য কয়জন জননী দায়িত্ব অনুভব করেন? ঘরে ঘরে নারীর মুখে শোনা যায় "সন্তানের শিক্ষার ভার পুরুষের উপর; মূর্খ অশিক্ষিতা নারী সন্তান-শিক্ষার কি বুঝিবে?" সত্য, ভারতনারী আজ শিক্ষার অভাবে সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার ভার লইতে অক্ষম। কিন্তু সন্তানকে চরিত্রবান, নীতি-ধর্ম্ম-পরায়ণ করিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। চরিত্রই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ,—ধর্ম্মই জীবনের আলোক। শিশুর জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম এবং নীতিশিক্ষার প্রয়োজন। সন্তানের শৈশব-জীবনে মায়ের সাক্ষাৎ প্রভাব বিস্তৃত হয়। শিশু অনুকরণপ্রিয়, অল্পবয়সে সে মায়ের অতি নিকটে থাকে, কাজেই মায়ের স্বভাবের প্রতিচ্ছবি তাহার চরিত্রে এবং মনে স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। যে জননী সতর্ক নহেন, তাঁহার সন্তানের চরিত্রে অজানিতভাবে তাঁহারই চরিত্রের শত দুর্ব্বলতা অন্তর্নিহিত হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি শিশুর জীবন বিধাতার দেওয়া একটি পাঠ (lesson)। জননীকে অতি নিবিষ্টচিত্তে এবং সাবধানে এই পাঠ শিক্ষা করিতে হয়—অবহেলা করিলে সমস্ত জীবন বিষময় হইবার সম্ভাবনা। অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা নারী নিজের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রভাবে সন্তানকে চরিত্রবান এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে বিদ্যাশিক্ষার সহায়তা করিতে না পারিলেও বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী, আগ্রহবান ও পরিশ্রমী যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা প্রত্যেক জননী করিতে পারেন। আদর্শ-জননী সরোজনলিনীর জীবনে দেখি, তিনি কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী উচ্চশিক্ষিতা নারী ছিলেন না তথাপি সন্তানের শিক্ষার ভার নিজহস্তে লইয়াছিলেন। ধনীর গৃহে প্রায়ই দেখা যায়—বেতনভোগী দাস-দাসী বা ধাত্রীর হস্তে সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া জননী নিজের আমোদ-প্রমোদ, সামাজিক কর্ত্তব্য, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন ইত্যাদিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। সরোজনলিনী উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর সম্মানিতা গৃহিণী হইয়াও প্রকৃত সন্তানবৎসলা জননী ছিলেন। শিশুর স্বাস্থ্য ও মনের প্রতি প্রখর দৃষ্টি ছিল তাঁহার। শিশুর পানীয় দুগ্ধ পরিষ্কাররূপে দোহন করা হইল কিনা তাহা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া দেখা তাঁহার অসংখ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। নিজহস্তে শিশুকে স্নানাহার করান, নানাপ্রকার মন-ভুলানো ছড়া বলিয়া, গান গাহিয়া, খেলা করিয়া শিশুর আনন্দবর্দ্ধন, শিশুর জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি-মূলক কবিতা এবং সরল উপদেশের দ্বারা সন্তানের হৃদয়-বৃত্তির উৎকর্ষসাধন তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম জীবনের তালিকাভুক্ত ছিল। সন্তানের হৃদয়ে বিবেক জাগ্রত করিবার জন্য, স্বদেশপ্রেম উদ্দীপিত করিবার জন্য কী প্রাণ-গত চেষ্টা ছিল তাঁহার! সন্তানকে বলিতেন, "বাবা, তুমি লেখাপড়ায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে না পার তাতে আমার আক্ষেপ নাই, কিন্তু আমি চাই যে তুমি চরিত্রবান হও।" এইরূপ আশীর্ব্বাদ হয় ত অনেক জননীই সন্তানকে করিয়া থাকেন, কিন্তু সরোজনলিনীর বিশেষত্ব এইটুকু যে তিনি শুধু আকাঙ্ক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, যতদিন জীবিত ছিলেন, পুত্রের চরিত্রবান হইবার সাধনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন এবং নিজের জীবনকে আদর্শ-রূপে পুত্রের সম্মুখে ধরিতে পারিয়াছিলেন।

পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য নারীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইলেও শুধু আপন পরিবারটুকুর মধ্যে কর্ত্তব্যের সীমারেখা টানিলে মস্ত বড় ভুল হয়। গৃহস্থ যদি নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে যেমন গৃহের আশপাশ, আনাচ-কানাচের আবর্জ্জনাও পরিষ্কার করিতে হয়, প্রতিবেশীর গৃহ, আঙিনা, পুষ্করিণী, এমন কি রাস্তাপথ সড়কেরও পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং

তাহার জন্ম যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হয়, তেমনি আদর্শ নারী, যিনি নিজ পরিবারের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাকে প্রতিবেশীর, সমাজের এবং জাতীয় জীবনের কল্যাণের জন্যও খাটিতে হইবে। প্রতিবেশীর সন্তান যদি ভাল না হয়, নিজের সন্তানকে ভাল করিয়া গড়িবার চেষ্টা অধিকাংশ সময় ব্যর্থ হয়। সমাজের জীবনের আদর্শ যদি উচ্চ না হয়, জাতির জীবন যদি আদর্শানুযায়ী না হয়, একটি স্বতন্ত্র পরিবার কি করিয়া আদর্শ পরিবার হইতে পারে ?

দুইটি জীবনের মিলনে পরিবারের সৃষ্টি, পরিবার-সমষ্টি লইয়াই সমাজ, বিভিন্ন সমাজই আবার জাতি গঠন করে ; বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে দেশ, অসংখ্য দেশ লইয়া এই বিরাট বিশ্ব। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র এইরূপে ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়াছে।

আদর্শ নারী নিজ পরিবার গঠনের সময় সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন যে তাঁহার পরিবারটি ক্ষুদ্র হইলেও এই বিপুল বিশ্বের একটি অংশ। তাঁহার পুত্র একটি ভাবী বংশের গৃহস্বামী, তাঁহার কন্যা ভাবী জননী এবং একটি পরিবারের সম্ভাবিত গৃহিণী। তাঁহার স্বামী বিশ্বসভার সভাসদ, তিনি নিজে মানবপরিবারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী জননী। নিজের জীবন এবং পরিবারকে এইভাবে বিশ্বের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথিতে পারিলে নারী তাঁহার কর্ম্মজীবনে নূতন প্রেরণা অনুভব করেন। এই অনুভূতিতেই নারীর জীবনের চরম সার্থকতা— মূর্ত্তিমতী কল্যাণ তখনই জগতকে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর করে।

আদর্শরূপিণী সরোজনলিনীর এই বিশ্বপ্রেম, এই দেশ-প্রাণতা কী সহজ ও সুন্দর ভাবে তাঁহার কর্ম্মজীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন, তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের কর্ত্তব্যের সঙ্গে বহির্জগতের কর্ত্তব্যের এমন নিগূঢ় যোগ আছে যে, একটির প্রতি অবহেলা অপরটিকে নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। তাই এমন সুশৃঙ্খলা এবং নিপুণতার সহিত সংসারের এবং বাহিরের কাজ একযোগে সুসম্পন্ন করিতেন।

বিবাহিত জীবনের অধিকাংশ সময় মফঃস্বলে থাকিতে হওয়ায় তিনি মফঃস্বলের বহু নারীর সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভারতনারীর জীবন শিক্ষা এবং উদ্যমের অভাবে যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া নিজের প্রাণভরা সহানুভূতি ও অসীম শক্তি লইয়া তাঁহাদের উন্নতির জন্য খাটিতে আরম্ভ করেন। জাতীয় জীবনের অধোগতির প্রধান কারণই যে নারীর শিক্ষার অভাব তাহা নিজে নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাই ভগিনীগণকে বুঝাইবার জন্য স্থানে স্থানে মহিলা-সমিতি এবং শিক্ষামন্দির সংস্থাপন করেন। নারীর জীবন উন্নত না হইলে, নারী সুগৃহিণী, সুমাতা হইতে না পারিলে পরিবারের, সমাজের এবং দেশের উন্নতির জন্য সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। মফঃস্বলে নানা স্থানে, গ্রামে গ্রামে মহিলাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াই তিনি সুস্থির হইতে পারেন নাই, মফঃস্বলের নারীদের প্রশস্ততর চিন্তা ও ভাবের সংস্পর্শে আনিয়া তাঁহাদের আরও সুবিস্তৃত ভাবে দেখিবার ও ভাবিবার সুযোগ দিবার জন্য সহরের মহিলাসমাজের সহিত মফঃস্বলের মহিলাদের সম্মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্র-সমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। এই কেন্দ্র-সমিতির সহায়তায় বৃহৎ নগরীর নারীসমাজ অগ্রদূত হইয়া মফঃস্বলের নারীসমাজে উন্নতির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া দিবেন এবং এই সংযোগের ফলে তাঁহারা অনুভব করিবার সুযোগ পাইবেন যে "গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় কী বিরাট কার্য্যক্ষেত্র তাঁহাদের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে।" সরোজনলিনী নিজের প্রাণে এই মহতী প্রেরণার আহ্বান পাইয়াছিলেন, তাই তিনি নারীজাতির—বিশেষভাবে বঙ্গনারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। নারীশিক্ষা এবং নারীজাগরণের এক বৃহৎ অনুষ্ঠান-যজ্ঞে তিনি আপনার জীবনকে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই মঙ্গলযজ্ঞের অগ্নিশিখা শত শত নারীর সেবা-অর্ঘ্য লাভ করিয়া দিকে দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে।

সরোজনলিনীর জীবনে একটি সম্পূর্ণ মানুষের আদর্শ দেখি, ইহাই নারীত্বের চরম বিকাশ এবং পরম পরিণতি। নারীর জীবন, কেবল ঘরের কোণে নয়, কেবল পরিবারের সীমানার মধ্যে নয়, কেবল নিজের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশে নয়, কেবল বহির্জগতের আন্দোলন-ক্ষেত্রে নয়, পুরুষের সহিত সহ-অধিকার লাভে নয়, শুধু এই সকল ক্ষেত্রের কর্ত্তব্যের একটি বিরাট, সুন্দর সমন্বয়ে পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষায় দীক্ষায়,

শক্তিতে সাহসে নারী পুরুষের সমকক্ষা হইবেন, প্রয়োজন হইলে কর্ম্মক্ষেত্রেও তাঁহার সহযোগিনী হইবেন, সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীলা হইবেন, কিন্তু নারীকে তাঁহার স্বভাবের বিশিষ্টতা ভুলিলে চলিবে না। প্রত্যেক ভারতনারীকে স্মরণ রাখিতে হইবে—পরিবারই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, গৃহধর্ম্ম-পালনই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধন। খাঁটি ভারতনারীর জীবন বড় সঙ্কীর্ণ, গৃহপ্রাচীরের বাহিরে তাঁহার দৃষ্টি যায় না। একান্ত আপনার পরিবারের গণ্ডীর বাহিরেও যে এক বৃহত্তর পরিবার, সমাজ ও দেশ তাঁহার সেবার অপেক্ষা করে, এ চিন্তাও তাঁহার স্বপ্নের অতীত।

পাশ্চাত্য নারীর জীবনে এই জাতীয়তা-বোধ, এই বিশ্ব-সেবা এবং মৈত্রীর ভাব অধিকতর জাগ্রত এবং প্রস্ফুটিত। পাশ্চাত্য রমণীর সাহস, সপ্রতিভতা, স্বাবলম্বনপ্রিয়তা, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বদেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, পারিপাট্যজ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য গুণের সহিত বঙ্গনারীর স্বভাবসুলভ কোমলতা, নমনীয়তা, শালীনতা, স্নেহপ্রবণতা, আতিথেয়তা, সহিষ্ণুতা, সেবাপরায়ণতা, সন্তানবাৎসল্য, অনুপম সতীত্ব প্রভৃতি সহস্র গুণের একত্র সমাবেশেই নারীত্বের আদর্শ গড়িয়া উঠে।

প্রাতঃপূজনীয়া সতী-সাধ্বী দেবী সরোজনলিনীর জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাই। বঙ্গনারী ছিলেন তিনি, বঙ্গনারীর বৈশিষ্ট্যটুকু পুরোমাত্রায় বজায় রাখিয়া, পাশ্চাত্যের অনুকরণীয় গুণ কয়েকটি নিজের চরিত্রের সহিত মিশাইয়া লইয়া "ত্যাগ ও গ্রহণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে" জীবনটিকে কল্যাণ ও মাধুর্য্যে ভরিয়া তুলিয়া-ছিলেন। ধন্য সাবিত্রীসমা পূজনীয়া আদর্শ বঙ্গনারী সরোজনলিনী, তোমার আদর্শ গ্রহণ করিয়া নারীকুল ধন্য হউন। *

---

* সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্‌ প্রদত্ত প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।

বাণীর ডল

রেণু

"দিদি, দিদি, দেখ ডলটা কেমন বসে' আছে ?"

"ওরে সত্যিই তো, বাঃ! বেশ বসে' আছে তো! মনে হ'চ্ছে যেন তোর বইগুলো নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে!" বলে' কল্যাণী ডলের গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

বাণী অমনি "কেন দিদি তুমি আমার ডলকে মারলে ?" বলে' চীৎকার করে' কান্না জুড়ে দিলে।

এমন সময় তাদের পিতা ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে বল্লেন,—"কিরে, তোদের কি হ'লো ? অতো চেঁচাচ্ছিস্ কেন ?"

অমনি বাণী বলে' উঠ্ল "দেখ না বাবা, দিদি আমার ডলকে এক চড় বসিয়ে দিলে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—কেন দিদি আমার ডলকে মারবে ?—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—"

তখন তার পিতা বিজয় বাবু বল্লেন,—"তাতে আর কি হয়েছে ? দেখি, তোর ডলের কোথায় লাগ্ল"—বলে' তিনি তার ডলটিকে দেরাজের উপর থেকে তুলে নিলেন, এবং বাণীর কাছে এসে বল্লেন, "এই নে তোর ডল, আর এখানে রাখিস্ নি, তোর দিদি বড় দুষ্টু," বলে' তাকে সান্ত্বনা দিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে এলেন এবং তাকে একখানি ছবির বই দিয়ে তিনি অফিসে যাবার জন্য নীচেয় নেমে গেলেন।

বাণী ছবির বইটি পেয়ে মহাখুসী হ'য়ে দেখ্তে লাগ্ল। হঠাৎ ছবি দেখা বন্ধ হ'য়ে গেল এবং পাছুটি তার বারাণ্ডার দিকে এগিয়ে এলো, কেন না, প্রত্যহ ঠিক এই সময় ঐ যে একটি শব্দ শুনতে পায় "গাড়ী আয়া বাবা," আর বাণীকে দেখে কে, তার যত কাজ থাকুক না কেন সে ঠিক বারাণ্ডার কোণটিতে এসে দাঁড়াবে এবং তার দিদি যখন গাড়ীতে উঠে তার দিকে চেয়ে হাস্তে হাস্তে গাড়ী করে' অদৃশ্য হ'য়ে যাবে, সেও তখন ধীরে ধীরে তার কাজে চলে' যায়। এ রকম করে' বাণী দিনের পর দিন প্রত্যহ ঐ সময়ে এসে বারাণ্ডায় দাঁড়াত।

অবশেষে বাণী যখন বছর সাত-আটেকের মেয়ে হ'ল, তখন তার বাবা একদিন তার দিদির স্কুলে তাকে ভর্ত্তি করে' দিলেন।

বাণী প্রথমটা খুব খুসী হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে' গেল যে, এখন থেকে সারাদিন ডলকে ছেড়ে স্কুলে যেতে হবে। নাঃ—সে কি করে' হবে। সে যে একবারও তার ডলটিকে চোখের আড় করে না, কাকেও হাত দিতে দেয় না, এখন রোজ স্কুলে যাবে আর তার ভায়েরা হয়ত ডলটিকে ভেঙে রেখে দেবে, এই সব মনে করে' বাণী কেঁদে ফেল্লে, কিন্তু পিতার ভয়ে সে কাকেও কিছু বল্লে না—মনের কষ্ট মনে চেপে শুম্ হ'য়ে রইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাণী স্কুলে যেতে লাগ্লো বটে কিন্তু সারাদিন তার ডলের দিকে মন পড়ে' থাক্ত। স্কুলে প্রথমটা সকলে তাকে খুব ভালবাস্ত, পড়াশুনাও বেশ কর্ত, তবে এ নামটি সে বেশীদিন রাখ্তে পার্লে না, ক্রমশঃই তার পড়ার অবনতি হ'তে লাগ্লো, আর সে ভাল করে' পড়ায় মন দিত না, কেবল সারাদিন বসে' বসে' ডলের কথা ভাব্ত আর যেই ছুটি হ'তো অমনি তাড়াতাড়ি একগাল হেসে বাসে গিয়ে উঠ্ত এবং গাড়ী থেকে নেমেই ডলের কাছে আগে ছুট্ত, যখন দেখ্ত যে ডলকে কেউ নেয়নি তখন মন ঠাণ্ডা করে' ধীরে ধীরে লক্ষ্মীমেয়ের মত মায়ের কাছে গিয়ে খাবার চাইত।

এ-রকম করে' দিনগুলো কেটে যেতে লাগ্লো। বাণী মনে কর্লে আমার দুষ্টমী কেউ বুঝ্তে পার্ছে না কিন্তু হঠাৎ একদিন তার দিদি স্কুল থেকে এসে তার মাকে ও বাবাকে বাণীর পড়ার অমনোযোগের কথা প্রকাশ করে' দিলে, এবং বল্লে তাকেও আজ স্কুলে সকলের সামনে টীচারের কাছে বাণীর জন্য বকুনি খেতে হয়েছে। এই ভাবে বাবাকে একটু

বেশী করেই বাণীকে শাসন করবার কথা জানিয়ে দিয়ে পড়ার ঘরে চলে' গেল।

এইবার বাণীর পালা। তার বাবা যখন রুষ্ট স্বরে "বাণী—" বলে' ডেকে উঠলেন বাণীর তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল।

তখন তার বাবা তাকে বললেন—"বাণী, তুমি ভাল মেয়ে হ'য়ে পড়ায় কেন এত অমনোযোগ করছ? তোমার মতলব কি বল ত? চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না, জবাব দাও।"

কিন্তু বাণী কিছু উত্তর দিলে না।

তার বাবা আরও রেগে গেলেন—এবং বাণীর হাত ধরে' সামনে টেনে এনে বললেন—"জবাব দাও বাণী, মুখ বুজে থাকলে চলবে না।"

তথাপি বাণী নীরব।

তখন তার বাবা দেরাজের উপর থেকে তার ডলটি তুলে নিয়ে বাণীর মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—"এই পুতুল কাকেও দিয়ে দাও, না হয় ফেলে দাও, ও যতদিন না ভাল মেয়ে হবে ততদিন ওকে আমি কিছু দোব না।··· কল্যাণী, —কল্যাণী, -শুনে যাও।"

কল্যাণী পাশের ঘরেই পড়ছিল, সে পিতার ডাকে পড়া ফেলে পিতার সামনে এসে দাঁড়াতেই তার পিতা বললেন—"কল্যাণী, তোমার আর ক'দিন স্কুলে যেতে হবে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা তো এসে পড়ল?"

কল্যাণী উত্তর দিলে—"আর আমার এক সপ্তাহ স্কুল করতে হবে।"

তারপর বাণীর পিতা বাণীর দিকে চেয়ে বললেন—"শুনলে বাণী, এই ক'দিন তোমায় বাড়ীতে রাখব, তারপরে বোর্ডিংয়ে দেব। তার মধ্যে তোমার যা কিছু দরকার সব শেষ করে' বোর্ডিংয়ে যাবার মত ঠিক করে' রেখো। আমি আসছে সোমবারে তোমায় বোর্ডিংয়ে দিয়ে আসব। যাও, এখন তোমরা পড়তে যাও—" বলে' তিনি একটা চেয়ারে বসে' পড়লেন। কল্যাণী তার পড়বার ঘরে চলে' গেল, এবং যাবার সময় বাণীকে বলে' গেল, সে যেন ঘরে পড়বার জন্য যায়। কিন্তু বাণী তখন রাগে দুঃখে অভিমানে জ্বলছিল, সুতরাং সে তার খেলার ঘরে গিয়ে মাটিতে শুয়ে কাঁদতে লাগলো।

অনেক রাত্রে কল্যাণী এবং কল্যাণীর মা এঘর ওঘর খুঁজে শেষে বাণীর খেলার ঘরে এসে তাকে এই অবস্থায় পড়ে' থাকতে দেখে মনে একটু কষ্ট পেলেন। কিন্তু কেউ কিছু বললেন না।

বাণীর মা বাণীকে ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে তুলে' নিয়ে খাবার ঘরে এসে বাণীর চোখে জল দিয়ে খাবার জায়গায় বসিয়ে দিলেন। তখন বাণীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং বকুনির কথা মনে করে' "খাব না" বলে' কাঁদতে লাগলো।

অবশেষে তার মা অনেক কষ্টে জোর করে' তাকে দু'গ্রাস খাইয়ে দিয়ে শোবার ঘরে কল্যাণীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

বাণী সে রাত্রে ডলের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে অনেক রাত্রে ক্লান্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাণী প্রায় মাস ছয় হ'ল বোর্ডিংয়ে এসেছে এবং এখনো সে বোর্ডিংয়েই আছে, মাঝে মাঝে কেবল বাড়ী যায়। এখন পড়াশুনা বেশ ভালই করছে, এমন কি এবারে Half yearly পরীক্ষায় সে সেকেণ্ড হয়েছিল! বোর্ডিংয়ের মেয়েরাও সকলেই তাকে ভালবাসে। কল্যাণীও তার ছোট বোনটিকে মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। সে এবারে ম্যাট্রিক পাশ করে' আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে।

বাণী বোর্ডিংয়ে এসেছে বটে কিন্তু ডলটিকে সঙ্গে করে' এনেছে, তবে এখানেও তার নিস্তার নাই কারণ বোর্ডিংয়ের মেয়েরা সব সময়ে তার ডলটি নিয়ে নাড়াচাড়া করত, বাণী মিনতি করে' বারণ করলেও তারা শুনত না, সুতরাং বাণীকে এর জন্যে অনেক সময় কাঁদতে হ'তো।

একদিন স্কুলের ছুটির পর বাণী উপরে এসে দেখলে যে, মেয়েরা তার আগেই এসে পুতুলটিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, কেউ তার জামা ধরে' টানছে, কেউ তার হাত ধরে' টানছে, কেউ ডলের মুণ্ডটা নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে, এই সব দেখে বাণী মেয়েদের খুব মিনতি করে' বললে—"ভাই, তোমরা কি আমার পুতুলটাকে ভেঙে ফেলবে? তোমাদের

যত বলি তবু তোমরা শোন না, রোস, এবার আমি Head mistressকে বলে' দোব।" বল্‌তে বল্‌তে সে রাগে দুঃখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

ঠিক সেই সময় তাদের বোর্ডিংয়ের অলকাদি' বলে' এক-জন টীচার বোর্ডিংয়ের মেয়েরা যেখানে বাণীর পুতুলটিকে নিয়ে গোলমাল কর্‌ছিল সেখানে এসে বল্‌লেন,—"তোমরা কি কর্‌ছ? সকলে মাঠে যাও, বাস্‌রে, এত গোলমাল কর্‌ছ যে আমি পাশের ঘরে বসে' খাতা দেখ্‌তে পার্‌ছি না, তোমরা জান যে এ সময়ে কোন মেয়ের হলে থাক্‌বার নিয়ম নেই।" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ অলকাদি'র বাণীর দিকে নজর পড়্‌ল।

তিনি বাণীর কাছে এসে বল্‌লেন—"কি হয়েছে বাণী তোমার? কাঁদ্‌ছ কেন?" বলে' তিনি তার গায়ে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন।

তখন বাণী বল্‌লে,—"দেখুন না অলকাদি,' মেয়েরা রোজ আমার পুতুল নিয়ে টানাটানি কর্‌বে, আমি যত বারণ করি যে হাত দিও না, ততই তারা আরো টানাটানি করে, কেউ আমার কথা শোনে না। আজকে আমি উপরে এসে দেখি আমার পুতুলটা নিয়ে মেয়েরা এমন টানাটানি কর্‌ছে যে আর একটু হ'লেই ভেঙে যেত। আমি কত বল্‌লাম, তাতে আমার কথা কেউ শুন্‌লে না, তাই আমি কাঁদ্‌ছিলুম।"

তখন অলকাদি' বল্‌লেন,—"মেয়েদের তো ভারী অন্যায়, আচ্ছা তুমি কেঁদ না, আমি মেয়েদের খুব বক্‌বো, এখন তুমি খেলা করগে' যাও, আমি তোমার পুতুলকে আমার ঘরে রেখে দিচ্ছি, কেউ হাত দিতে পাবে না।" বলে' তিনি পুতুলটিকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে' গেলেন এবং বাণী নীচের নেমে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাণীদের বাৎসরিক পরীক্ষা এসে পড়্‌ল। বাণী খুব মন দিয়ে পড়াশুনা কর্‌ছে, কেন না এখন তার ডলের জন্য অত ভাবনা নাই, অলকাদি'র ঘরে আছে, কেউ হাত দেয় না, মেয়েরাও অলকাদি'র বকুনি খেয়ে অবধি বাণীকে আর কেউ কিছু বলে না; সুতরাং এতেই বুঝ্‌তে পারা যায় যে বাণী খুব ভাল করেই পড়্‌ছে।

বাণীকে অলকাদি' খুব ভালবাস্‌তেন। তাঁর নাকি বাণীর মত একটি বোন আছে যদিও বাণীর মত তাকে দেখ্‌তে সুন্দর নয়, তাহ'লেও অনেকটা বাণীর মত, সেইজন্য অলকাদি' এই ফুটফুটে মেয়েটিকে খুব ভালবাস্‌তেন। আরো, বাণী তার মিষ্ট এবং কচি গলায় খুব সুন্দর গান কর্‌তে পার্‌ত, সেজন্য শিক্ষয়িত্রীরা সকলে তাকে ভালবাস্‌তেন।

একদিন বাণী একমনে বসে' তার পরীক্ষার পড়া পড়্‌ছে এমন সময় বাণীর মা এবং একজন টীচার বাণীর কাছে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু বাণী কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা শব্দে বাণী পিছন ফিরে চাইতেই তার মাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ছুটে এসে মায়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারপর মুখ তুলে একবার শিক্ষয়িত্রীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে তাদের অমিয়দি' তার দিকে চেয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছেন। বাণী তখন লজ্জায় আবার মায়ের কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকালো।

তখন অমিয়দি' বল্‌লেন, "ওঃ, বাণীর যে দেখ্‌ছি মাকে পেয়ে বড় আনন্দ! তা তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গল্প করো, আমি যাই," বলে' তিনি চলে' গেলেন। তখন বাণী তার মাকে বসিয়ে বল্‌লে—"মা, দিদি কেন আসেনি? কেন তুমি তাকে নিয়ে এলে না মা? বাবা কোথায়?" এই সমস্ত নানা রকম প্রশ্ন করে' তার মাকে অস্থির কর্‌তে লাগ্‌লো এবং তার মাও পরের পর বাণীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। একদিন তার বাবা তাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন সে কথা জানিয়ে দিলেন, কিন্তু সব চেয়ে একটি আনন্দের কথা তাকে জানালেন যে শীঘ্রই বাণীর পরীক্ষার পর তার দিদির বিয়ে হবে এবং বাণীর পরীক্ষা হ'য়ে গেলেই তাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন। তখন আর বাণীর আনন্দ দেখে কে, সে আনন্দে নাচ্‌তে আরম্ভ করে' দিলে এবং মাকে একটু বস্‌তে বলে' অলকাদি'র কাছে এই আনন্দসংবাদ দিতে ছুটল ও অলকাদি'র কাছে গিয়ে সানন্দে বল্‌লে, "অলকাদি', আমার দিদির বিয়ে হবে—আমি পরীক্ষার পর বাড়ী যাব, আপনিও তো আমার সঙ্গে যাবেন? আমার দিদির কেমন বিয়ে হয় দেখ্‌বেন!"

অলকাদি' তার আনন্দ দেখে বল্‌লেন—"নিশ্চয় যাব,

তুমি যখন আমার এত আগ্রহ করে' নিমন্ত্রণ করলে তখন তো যাবই। বাণী, তোমার মা কি চলে' গেছেন?"

"না অলকাদি', মা এখনও আছেন।"

অলকাদি' আর কিছু বললেন না।

তখন বাণী বললে—"অলকাদি,' আমার ডলটা দিন না, আমি মাকে দেখাব তার কেমন নূতন জামা হয়েছে।"

অলকাদি' ডলটিকে তার হাতে দিলেন এবং হাসিমুখে বাণীর গালদুটি টিপে দিয়ে আবার লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন, আর বাণী তার মায়ের কাছে এসে ডলটিকে মায়ের কোলের কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে—"এই দেখ মা, অলকাদি' আমার ডলের কেমন নূতন জামা করে' দিয়েছেন।" বলে হাততালি দিতে লাগ্‌লো।

কিছুক্ষণ পরে শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'রে এবং তাঁরা যে তাঁর বাণীকে এত ভালবাসেন, যত্ন করেন, তার জন্য আনন্দ প্রকাশ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বাণীকে একটু আদর করে' বাড়ী ফিরে গেলেন।

বাণী তার ডলটিকে নিয়ে আবার অলকাদি'র ঘরে রেখে নিশ্চিন্ত মনে খেলতে গেল।

কয়েকদিন পরে বাণীদের পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। বাণী বেশ ভালই পরীক্ষা দিলে এবং পরীক্ষা শেষ হবার পর-দিনেই সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তার ডলটিকে সঙ্গে করে' বাবার সঙ্গে বাড়ী গেল।

তার দিদির বিয়ে হয়ে গেল। দিদির বর খুব সুন্দর দেখ্‌তে, তার দিদির বরটিকে বাণীর বেশ পছন্দ হ'ল এবং একদিনেই সে তাঁর সঙ্গে ভাব করে' ফেল্‌লে। কিন্তু তার পরদিন যখন তার দিদিটিকে নিয়ে চলে' গেলেন তখন দিদির বরটি খুব দুষ্ট প্রতিপন্ন হলেন। তার দিদিকে নিয়ে চলে' গেলেন বলে' বাণী তার মায়ের কাছে বসে' কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

কয়েকদিন পরে তার দিদির বিয়ের গোল চুকে গেল, এবং বাণীদের স্কুলের ছুটিও শেষ হ'য়ে গেল। সুতরাং স্কুল খোল্‌বার আগের দিন রাত্রে সে তার পিতার সঙ্গে ডলটিকে নিয়ে বোর্ডিংয়ে ফিরে গেল।

এর মধ্যে কয়েক বছর কেটে গেছে, বাণী এখনো বোর্ডিংয়েই রয়েছে এবং এবারে সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়্‌ছে।

এদিকে কয়েক মাস পূর্ব্বে কল্যাণীর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তবে সে খবর এখনও বাণীর কাছে পৌঁছায়নি, কেন না বাণীর পিতামাতা এখানে ছিলেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁরা একটি জরুরী কাজের জন্য দিল্লী গমন করেছিলেন, এবং এখনো সেইখানেই আছেন।

কল্যাণীর শ্বশুরবাড়ী দিল্লী, তাঁরা দিল্লী থাক্‌তে থাক্‌তেই কল্যাণীর পুত্রসন্তান হওয়াতে, বাণীর পিতামাতা উভয়েই যারপরনাই আহ্লাদিত হয়েছিলেন, তবে এ আনন্দের খবর বাণীকে এখনও দেন নি কারণ বাণীর পিতা-মাতা ও কল্যাণীর ইচ্ছা ছিল যে পূজার ছুটিতে তাঁরা কল্‌কাতায় যাবেন, এবং সকলে মিলে একদিন বাণীকে আন্‌বার জন্য বোর্ডিংয়ে গিয়ে সহসা তাকে চমকিত করে' দেবেন।

কল্যাণীর পুত্রসন্তানটি খুব সুন্দর হয়েছে—অনেকটা বাণীর মত মুখের ভাব। রং খুব ফরসা, গালদুটি গোলাপফুলের মত লাল, তবে তার চোখদুটি সব চেয়ে সুন্দর! তাকে দেখ্‌লে ভাল না বেসে থাকা যায় না, সুতরাং কল্যাণী জান্‌ত যে বাণী নিশ্চয় এই খোকাটিকে পেয়ে খুব খুসী হবে।

কিছুদিন পরে কল্যাণী, বিজয় বাবু, বাণীর মা এবং বাণীর ভগ্নীপতি দিল্লী হ'তে কল্‌কাতা যাত্রা করলেন।

কল্যাণী তার বোনটিকে পূজার সময় উপহার দেবে বলে' একখানি খুব সুন্দর বেনারসী সাড়ী এবং তার ডলের জন্য ভাল ভেলভেটের একটি পোষাক তৈরী করিয়ে এনেছিল। বাণীর মা তার জন্য দিল্লীর সুন্দর একখানি কাপড় ও খেলনা কিনেছিলেন, কেন না তাঁরা জানতেন বাড়ীতে গেলেই বাণী আগে বলবে, "আমার জন্য কি এনেছ?" এই ভেবেই তাঁরা আগে হ'তে ব্যবস্থা করে' রেখেছিলেন।

একদিন বাণী স্কুলের ময়দানে খেলা করছে, এমন সময় তার মা, কল্যাণী, কল্যাণীর স্বামী ও নতুন খোকাকে (কল্যাণীর পুত্র)-নিয়ে বাণীর বোর্ডিংয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাণীর কাছে খবর গেল যে তার মা এসেছেন। তখন বাণী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল—মা ত দিল্লীতে!

আজ তিন দিন হ'ল মায়ের চিঠি পেয়েছে, কই তাতে ত মা কল্‌কাতায় আস্‌বার কথা কিছু লেখেন নি।

অতি আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সহসা অনেকখানি অভিমানে বাণীর মনটা ভরে' গেল। আমরা যেমন বলি এক চোখে হাসি এক চোখে কান্না, বাণীর ঠিক সেই অবস্থা ঘট্‌ল। একদিকে অভিমানে ফুল্‌তে ফুল্‌তে, ও আর একদিকে আনন্দে লাফাতে লাফাতে visiting roomএ গিয়ে পৌঁছল।

বাণী সেখানে গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে গেল, কারণ সে জান্‌ত শুধু তার মা এসেছেন। কিন্তু একজন অপরিচিত যুবককে দেখে সে ভাব্‌লে এ আবার কে? এতকালের পর দেখা, বাণী চিন্‌তেও পার্‌ছে না যে ইনি তারই ভগ্নীপতি, যাঁর সঙ্গে সে দিদির বিয়ের রাত্রে কত গল্প করেছিল, ও তার পরদিন দিদি চলে' যেতেই দিদির বরটি দুষ্টু বলে' মায়ের কাছে যাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল, ইনি সেই নির্ম্মল বাবু।

তাঁর দিকে লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে মায়ের কাছে এগিয়ে যেতে বাণীর একটু আব্‌ছায়া গোছের চেনা-চেনা বলে' মনে হ'ল।

তখন কল্যাণীর স্বামী নির্ম্মল বাবু বাণীর এ-রকম থতমত অবস্থা দেখে না হেসে থাক্‌তে পার্‌লেন না, এবং হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"কি গো বাণী, আমাকে দেখে এ-রকম ভয় পেয়ে গেলে কেন? চিনতে পার্‌ছ না? বড় যে আমায় 'দুষ্টু' বলা হয়েছিল, মনে নেই?"

তখন বাণী আরও অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ল। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল, সে ঘরের মধ্যে গেল বটে কিন্তু মাথা তুলে আর নির্ম্মল বাবুর দিকে চাইতে পার্‌লে না।

এমন সময় তার দিদিকে একটি খোকা কোলে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে বাণীর আরও আশ্চর্য্য বোধ হ'তে লাগ্‌লো, বাণী ছেলেটির দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পার্‌লে না। কেবলই তার জান্‌তে ইচ্ছা কর্‌তে লাগ্‌লো এমন সুন্দর নধর শিশুটি কে? কিন্তু নির্ম্মল বাবুর সামনে জিজ্ঞাসা কর্‌তেও পার্‌ছে না।

অবশেষে চঞ্চল শিশুর হাসিভরা মুখখানির দিকে চেয়ে, আর থাক্‌তে না পেরে আনন্দে অধীর হ'য়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"দিদি এ কে?—দাও না একবারটি আমার কোলে!"

কল্যাণী ছেলেটিকে বাণীর কোলে দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

বাণী আরও আগ্রহভরে বল্‌লে—"লক্ষ্মীটি দিদি, বল না এ—কে?"

তখন তার মা বল্‌লেন—"বল্ দিকিন কে?"

বাণী তখন খোকাটিকে বুকে চেপে বল্‌লে—"আমি বল্‌তে পার্‌ছি না, তুমি বল্‌বে না দিদি কে?"

বাণীর মা বল্‌লেন—"আচ্ছা ধর্ এ যদি তোর দিদিরই খোকা হয়?"

তখন বাণী অবাক হ'য়ে গেল—অ্যাঁ, আমার দিদির ছেলে! এমন সুন্দর হয়েছে! কই আমি ত শুনিনি, কেউ তো আমায় বলেনি,—এই ভাবে নানা রকম কথা মনে করে' আবার বাণীর মনটায় অভিমান এল। কিন্তু এই সুন্দর শিশুটি তার দিদির বলে' সে এত আনন্দ ও তৃপ্তি পেলে যে সে-রকম আনন্দ সে এর আগে কোনদিন পায় নি। আনন্দে উৎফুল্ল বাণীর তখন আর মা, দিদি, বা জামাই বাবুর সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাক্ চাইবারও অবসর রইল না,—মুহূর্ত্তে সে খোকাকে কোলে নিয়ে উধাও হ'য়ে গেল।

বোর্ডিংয়ে গিয়ে এই ফুটফুটে ছেলেটি তার দিদির ছেলে বলে' সকলকে এমন আনন্দের সঙ্গে চিনিয়ে দিলে যে সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিংয়ের মেয়েদের মধ্যেও একটি আনন্দের সাড়া পড়ে' গেল। সবাই খোকাটিকে কোলে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি কর্‌তে লাগ্‌লো। তখন বাণীর মনে পড়্‌ল যে এই রকম করেই মেয়েরা একদিন তার ডলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছিল, আজও ঠিক সেই রকম, তবে সেদিন ছিল পুতুল, আর আজ—আজ তার দিদির ছেলে!

তখন বাণী আর থাক্‌তে পার্‌লে না, ছুটে গিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে ছেলেটিকে নিয়ে অলকাদি'র কাছে গেল।

অলকাদি' বাণীর কোলে ছেলেটিকে দেখে বলে' উঠ্‌লেন—"বাঃ! কি সুন্দর ছেলে! এটি কে বাণী?"

বাণী একগাল হেসে বল্লে—"আমার দিদির ছেলে!"

অলকাদি' বল্‌লেন—"বাঃ! চমৎকার ছেলে ত! তোমার দিদির? কল্যাণীর ছেলে? দেখি—দেখি! ওমা, দেখ্‌লে,

আমার কোলে কেমন এলো! বাঃ, বেশ ছেলে! খোকার নাম কি?"

বাণী বল্‌লে, "আমি তো জানি না, আপনি একটা সুন্দর নাম বলুন না অলকাদি'!"

তখন অলকাদি' অনেক ভেবে বল্‌লেন—"আচ্ছা, এর নাম রাখ 'প্রতীপ।' কেমন, নাম পছন্দ হয়েছে?"

বাণী মহাখুসী হ'য়ে অলকাদি'কে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দের সঙ্গে বল্‌লে, "হ্যাঁ অলকাদি', নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি দিদিকে বলি গে'।" বলে' সে অলকাদি'র কাছ থেকে ডলটিকে নিয়ে খোকার হাতে দিলে। যে ডলকে বাণী একদিন কাকেও ছুঁতে দেয় নি, আজ সে তার দিদির ছেলেকে একদিনে এত ভালবেসে ফেল্‌লে যে সেই ডলটিকে তার কচি কচি ছোট্ট হাতে দিতে একটুও ইতস্ততঃ কর্‌লে না।

বাণীর আস্‌তে দেরী হ'চ্ছে দেখে কল্যাণী বাণীকে ডাকতে এসে সামনে অলকাদি'কে দেখে তার একটু আনন্দও হ'ল, লজ্জাও হ'ল। সে অলকাদি'কে প্রণাম কর্‌লে। অলকাদি'ও তাঁর এই পুরানো ছাত্রীটিকে দেখে খুব খুসী হলেন।

কল্যাণীকে দেখে বাণী বলে' উঠ্‌ল—"দিদি, অলকাদি' তোমার খোকার কি সুন্দর নাম দিয়েছেন জান? ওর নাম 'প্রতীপ', বেশ সুন্দর নামটা না?"

"বাঃ, বেশ সুন্দর নাম হয়েছে," বলে' কল্যাণী খোকার গালদুটি টিপে দিলে।

কল্যাণী বাণীকে শীঘ্র করে' নিতে বলে' বোর্ডিংয়ের এদিক ওদিক ঘুরে নীচের নেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বাণীকে নিয়ে তাঁরা সকলে বাড়ী ফির্‌লেন।

বাণীর ছুটির দিনগুলো বেশ আনন্দে কেটে যাচ্ছে। কেন না, ডল আর দিদির ছেলেকে নিয়ে সারাদিন নাচিয়ে, কাঁদিয়ে, আদর করে', হাসিয়ে, প্রতীপের সঙ্গে খেলা করে', দিদির সঙ্গে খুঁটি-নাটি নিয়ে ঝগড়া করে', গল্প করে' বাণী দিনগুলো কাটিয়ে দিতে লাগ্‌লো। প্রতীপকে পেয়ে তার আরও খুসী হবার কারণ সকলেই বলেন প্রতীপকে নাকি ঠিক তার ডলের মত দেখ্‌তে!

একদিন বাণী ও কল্যাণী খেতে বসেছে এমন সময় প্রতীপ হামা দিতে দিতে এসে বাণীর গলা জড়িয়ে ধর্‌লে, তাই না দেখে বাণী সানন্দে চীৎকার করে' উঠ্‌ল, "ও মা, মা, দেখে যাও প্রতীপ কেমন হামা টান্‌তে শিখেছে? দিদি, দেখ, দেখ কেমন আবার তোমার কাছে যাচ্ছে! ও মা, শীগ্‌গির দেখে যাও একবার এসে—" তার এই চীৎকারে বাণীর মা রান্না-ঘর থেকে বাইরে এসে বল্‌লেন, "কি কর্‌লে রে তোদের প্রতীপ? কি দেখ্‌ব?"

বাণী বল্‌লে, "দেখ না কেমন হামা টান্‌ছে।"

প্রতীপ তখন মাসী এবং মার কাছ ছেড়ে দিদিমার দিকে দা—দা বল্‌তে বল্‌তে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো। তাই না দেখে দিদিমা হাস্‌তে হাস্‌তে তাকে কোলে তুলে নিয়ে একটু আদর করে' চুমা দিয়ে আবার কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে কাজে চলে' গেলেন।

ছেলেবেলা ডলকে পেয়ে বাণী যেমন আর সব ভুলেছিল, আজকাল ডলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীপকে পেয়ে আবার সব ভুলে' দিনরাত তাদের নিয়ে খেলায় আর ঘুমপাড়ানি গানে মেতে আছে।

এমনি একটি দিনে বাণী তার অলকাদি'র একখানি চিঠি পেলে, তাতে লেখা ছিল তাঁর খুব অসুখ।

তখন বাণী সহসা গম্ভীর হ'য়ে পড়্‌ল, এবং একদিন অলকাদি'র বাড়ী যাবে বলে' বাবার অনুমতি চাইলে। বাণীর পিতা সহজেই রাজী হলেন এবং আস্‌ছে শনিবারে বাণীকে নিয়ে যাবেন, বল্‌লেন। কল্যাণীও যাবে বল্‌লে; সুতরাং কথা রইল বাণী কল্যাণীকে নিয়ে শনিবার দিন অলকাদি'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে।

পিতার কাছ থেকে ফিরে এসে বাণী ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে যে প্রতীপ তার ডলটিকে নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে এবং পাচ্ছে না বলে' কাঁদ্‌ছে।

বাণী ডলটিকে নিয়ে প্রতীপের হাতে দিলে। প্রতীপ ডলটিকে পেয়ে মহাখুসী হ'য়ে "তাই"-"তাই" দিতে লাগ্‌লো। তাই দেখে বাণী কল্যাণীকে ডেকে আন্‌লে।

কল্যাণী এসে দেখে বল্লে—"বাঃ, বেশ খেলা হ'চ্ছে ছো! মা চেয়ে দেখ, যে বাণী তার ডলকে একদিন কাকেও ছুঁতে দেয় নি, মনে আছে ও' যখন খুব ছোট তখন আমি একদিন ওর ডলের গালে একটি চড় মেরেছিলুম, তাতে ও' কি কাণ্ডটাই না করেছিল! আর আজ সেই বাণীই কি না আমারই ছেলের হাতে ডলকে বেশ নিশ্চিন্ত মনে খেলা ক'র্তে দিয়েছে। এ যে দেখ্ছি আশ্চর্য্য করে' দিলে।"

দিদির কথা শুনে বাণী হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে, "ও-হো-হো, আমি সেই চড়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। বাঃ, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছ, রোসো আমিও তার শোধ নিচ্ছি—" বলে' বাণী প্রতীপের গালে ভয়ে ভয়ে এক চড় বসিয়ে দিলে। পাছে তার লাগে, কেঁদে ফেলে, এই ভয়টুকু তার মনে হয়েছিল, সুতরাং একটি ছোট চড় বসিয়ে দিয়ে দিদিকে বল্লে—"কেমন? হ'লো তো?"

তাই শুনে কল্যাণী বল্লে—"তা তুই মার্ না, আমি তো আর তোর মত পাগল নই যে চেঁচিয়ে মাৎ কর্‌ব!"

তখন বাণী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"আহা, তখন তো আমি ছোট ছিলুম তাই কেঁদেছি, তা বলে' এখন কি ঝগ্‌ড়া কর্‌ব?" বল্‌তে বল্‌তে প্রতীপকে কোলে নিয়ে নাচাতে লাগ্‌লো এবং কল্যাণী সেলাইয়ে মনোনিবেশ কর্‌লে।

শনিবার দিন বাণী ও কল্যাণী অলকাদি'কে দেখ্‌তে গেল।

অলকাদি' বাণীকে দেখে খুব খুসী হলেন কিন্তু কল্যাণীর উপর আরও খুসী হলেন যে তাঁর অসুখ হয়েছে শুনে তাঁর পুরানো ছাত্রী কল্যাণীও তাঁকে দেখ্‌তে এসেছে।

অলকাদি' কল্যাণী ও বাণীকে বস্‌তে বল্লেন। বাণী অলকাদি'কে বল্লে—"অলকাদি', আপনি কি রোগা হ'য়ে গেছেন?—"বল্‌তে বল্‌তে সে তাঁর গায়ে হাত বুলাতে লাগ্‌ল। কল্যাণী কাছে বসে' জিজ্ঞাসা কল্লে—"এখন কেমন আছেন অলকাদি'?

অলকাদি' বল্লেন—"আগের চেয়ে অনেকটা ভালই আছি। কল্যাণী, তোমার খোকাকে আন্‌লে না কেন? সে কি কর্‌ছে?"

কল্যাণী বল্লে, "সে ঘুমচ্ছে বলে' আন্‌লুম না, আচ্ছা আরেক দিন আপনাকে দেখ্‌তে আস্‌বার সময় নিয়ে আস্‌ব।" অলকাদি' বল্লেন—"হ্যাঁ ঠিক নিয়ে এস।" তারপর বাণীর দিকে চেয়ে বল্লেন—"বাণী, একটা গান কর না? তোমার গান অনেক দিন শুনিনি। কল্যাণীও আজ আমাকে একটা গান শোনাবে। তোমার গান বছর পাঁচ ছয় আগে শুনেছি।"

কিছুক্ষণ পরে বাণী অলকাদি'কে আনন্দ দেবার জন্য তার মিষ্ট গলায় গানটি বড় করুণ সুরে গাইলে। অলকাদি' তার গান শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন এবং অন্তর থেকে তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর কল্যাণী একটি গান করে' অলকাদি'র কাছে বিদায় চাইলে। অলকাদি' আরেক দিন তাদের আস্‌তে বল্লেন এবং খোকাকে যেন সঙ্গে করে' আনে এই কথা বিশেষ করে' বলে' বিদায় দিলেন। বাণী যাবার সময় বলে' গেল, অলকাদি' ভাল হ'লে তাঁকে সঙ্গে করে' তারা একদিন সিনেমা দেখ্‌তে যাবে, তাতে অলকাদি' বেশ খুসী মনেই মত দিলেন।

অনেক রাত্রে তারা বাড়ী ফির্‌ল। বাণী এসেই আগে যেমন ডলের কাছে ছুটে যেত এবারে কিন্তু সে আগেই প্রতীপের কাছে গেল। গিয়ে দেখ্‌লে সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সুতরাং বাণী পাছে তার ঘুম ভেঙে যায়, বেচারা উঠে পড়ে,তাই অতি সন্তর্পণে একটু আদর করে' চলে' গেল।

কয়েকদিন পরে তারা আবার প্রতীপকে নিয়ে অলকাদি'র বাড়ী বেড়াতে গেল। তখন অলকাদি'র অসুখ সেরে গেছে, তিনি খোকাকে কোলে করে' খুব আদর কর্‌লেন এবং তাকে একটি সুন্দর জামা ও একটি লাল টুকটুকে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। তারপর বুধবারে সিনেমা দেখ্‌তে যাবার কথা বাণী ও কল্যাণীকে জানিয়ে দিলেন। তাতে বাণী ও কল্যাণী একসঙ্গে খুব আনন্দের সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

বুধবার দিন সিনেমা দেখ্‌তে যাবে বলে' বাণী বেলা বারোটা থেকে সাজসজ্জা কর্‌বার জন্য বাক্স খুলে' পছন্দমত

কাপড় বা'র কর্‌তে লাগ্‌লো কিন্তু কোনটাই বাণীর পছন্দ হ'চ্ছে না, অবশেষে তার দিদির দেওয়া বেনারসীখানা পরে' যাবে ঠিক কর্‌লে। কথা ছিল অলকাদি' তাদের বাড়ী আস্‌বেন এবং এখানে খাওয়া দাওয়া করে' তাদের নিয়ে সিনেমা দেখ্‌তে যাবেন, সুতরাং বাণী ও কল্যাণী প্রস্তুত হবার আগে অলকাদি' এসে পড়্‌লে বড় লজ্জা হবে, সেজন্য বাণী খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লো।

কাপড় পরা হ'য়ে গেল। হঠাৎ তার প্রতীপের কথা মনে পড়্‌ল—তাইত, প্রতীপ কোথায়? সে ছুটে মায়ের কাছে গেল, সেখানেও প্রতীপকে দেখ্‌তে না পেয়ে নীচেয় নেমে গিয়ে যা দেখ্‌লে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল—সে মেঝের উপর ধপ্‌ করে' বসে' পড়্‌ল। দেখলে - হায়! যে প্রতীপকে সে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে সেই প্রতীপই কিনা আজ তার ডলটিকে ভেঙে ফেলে আনন্দে "তাই-তাই" দিচ্ছে! বাণীর মুখ থেকে কোন কথা বা'র হ'ল না, এক-বার প্রতীপের দিকে একবার ভাঙা ডলের দিকে চেয়ে তার চোখ দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করে' জল পড়্‌তে লাগ লো।

এক নিমিষেই তার সিনেমা দেখার আনন্দ উধাও হ'য়ে গেল। অত উৎসাহ অত সাজগোজ করে' বাণী মাটিতে বসে' হাপুস নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। অথচ ছোট বেলা যেমন তার ডলকে ছুঁলে ছোট ভাইবোনদের মারধর কর্‌ত তেমন ভাবে সে প্রতীপের গায়ে হাত তুল্‌তে পার্‌লে না। তার সেই বুকফাটা দুঃখের ভিতর কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌লো—হায়! যে ডলের জন্য আমি দিদির সঙ্গে কত ঝগ্‌ড়া ও কান্নাকাটি করেছি, যার জন্য বাবা ও মাকে ছেড়ে বোর্ডিংয়ে থাক্‌তে হয়েছে, আজ—আজ কিনা আমার সেই বড় আদরের ডলকে আমার প্রতীপ-সোনা এমনি করে' ভেঙে ফেল্‌লে!

এমন সময় কল্যাণী দূর থেকে বাণীকে এ-রকম গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে'থাক্‌তে দেখে তার কাছে এল,কিন্তু তার মুখ দিয়েও কথা বা'র হল না, তারও বাণীর দুঃখে চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল পড়্‌ল এবং রাগের মাথায় প্রতীপকে মার্‌বার জন্য হাত তুলেছে এমন সময় বাণী পিছন থেকে দিদির হাতটি চেপে ধরে' বল্লে, "লক্ষ্মীটি দিদি, তোমার পায়ে পড়ি ওকে মের' না, আমারই দোষে গেছে, ওকে কিছু বোল' না..." বলে' ডলের দিকে চেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রতীপের গালটি তার অশ্রুসিক্ত গালের উপর রেখে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধর্‌ল। *

* লেখিকা একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র।—বঃ সঃ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

গাঁয়ের মেয়ে

শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায় বি-এ

গাঁয়ের টেরে সবুজ ছায়ায় ছোট্ট কুটীরখানি,
ডান ধারে তার পথটি—বাঁকা রেখা গেছে টানি'।
বাঁ পাশ ছেয়ে আমের কানন দ'য়েল শামা'র বাসা,
য'ন তখন লেগেই আছে সুর সে ভাসা-ভাসা।
কিষাণ বসে দুপুরেতে গাম্‌ছা পেতে ছায়,
গরুগুলি চর্‌ছে মাঠে বিলের কিনারায়।
পাড়ের 'পরে দখিণ কোণে ঝাঁক্‌ড়া 'সাঁড়া'-ঝোপ,
মাছরাঙা তায় বসেই থাকে—ঝিমিয়ে আসে চোখ।

আঙিনাটি পরিপাটী নিকিয়ে মুছে নেওয়া,
যূঁই দোপাটী -মাটির বেড়ের ধারে ধারে দেওয়া।
ইটে গাঁথা তুল্‌সী বেদী, বাঁধাই থাকে ঝারি,
পুণ্যিপুকুর পূজো করা, 'ছোবা'-খেলার বাড়ী।
পাড়াগেঁয়ে মেয়ের স্মৃতি শৈশবে পায় দোলা,
বড় হ'য়েও পড়েই মনে—যায় না ভুলেও ভোলা।
কেউ গিয়েছে সহরেতে, কেউ বা আরও দূর,
বিয়ের পরে রাজপুতানা দিল্লী কি কানপুর।

যে যেখানে আপন মনে পাতিয়ে নিয়ে ঘর,
জীবন-ধারার অনুগামী নানা পথের 'পর।
তবুও সে গাঁয়ের কথা পঁচিশ বছর কাটে—
গাঁয়ের পথে অশথ-তলে, গাঁয়ের পুকুর-ঘাটে,
গাঁয়ের তলে নদীর জলে পান্‌সী ভেসে যাওয়া,
দল বেঁধে সব ছেলেমেয়ের সাঁতার কেটে নাওয়া…
ফেরার পথে সময় পেলে যেমন করেই হোক্‌
গাঁয়ের মেয়ে গাঁর মাটিতে ফির্‌তে বড়ই ঝোঁক!

কেন্দ্র সমিতির কথা

হুগলী মহিলা-সমিতি

গত ১ই মে সোমবার সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন হুগলী মহিলা-সমিতির কার্য্য পুনরুদ্দীপনের নিমিত্ত হুগলীতে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র চাটার্য্যি এবং জেলা জজ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন আই-সি-এস্‌ এবং স্থানীয় বহু ভদ্র মহিলার সহিত এই সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শনে সম্মত হইয়াছেন। হুগলী মহিলা-সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা রায় ব্যক্তিগত কর্ম্মনিবন্ধন সমিতির কাজ সবিশেষ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তিনি একজন নূতন সম্পাদিকা নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার উপর সমিতির কর্ম্মভার ন্যস্ত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বার্ষিক উৎসব ও মহিলা-সভা

গত ১৯শে মে হইতে সপ্তাহাধিক কাল ভদ্রকালী

ব্রহ্মচর্য্য বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে তিনদিন ঐ উপলক্ষে ধর্ম্ম এবং প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন ও তাহার আদর্শ বিষয়ে কথকতা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে নবনির্ম্মিত মণ্ডপে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও আশ্রমবাসিনী বালিকা ও মহিলাদিগের হাতের প্রস্তুত বিভিন্ন চারু ও কারুশিল্পের একটি অতি সুন্দর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম-এ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, এবং ঐ উপলক্ষে নারীজাতির কর্ম্ম ও সেবা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। গত ২৪শে মে বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ঐ সভায় নারীশিক্ষার আদর্শ বিষয়ে অলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন। গত ২৮শে মে ঐ স্থানে একটি বিরাট মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার এই সভার সভানেত্রীর কার্য্য করেন। কুমারী ক্ষমা দেবী নারীজাগরণ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে সভানেত্রী ভারতে নারীজাতির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ আলোচনা করেন। নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে দেশ ও বিদেশের নারীপ্রগতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই স্থানে মহিলা-সমিতি পরিচালনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

রিষড়া মহিলা-সমিতি

গত ১০ই মে রিষড়ায় স্থানীয় মহিলা-সমিতির উদ্যোগে একটি বিরাট মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে নারীর শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কর্ম্মী কুমারী মমতা মিত্র ও কুমারী হেমনলিনী মল্লিক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মহিলা-সমিতির কার্য্যবিবরণী

আমরা যশোহর, ভাটুদি, দক্ষিণ খুলনা, ঠাকুরগাঁ, ইতিনা প্রভৃতি স্থান হইতে ঐ সকল স্থানীয় মহিলা-সমিতির সবিশেষ সুবিস্তৃত কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় প্রত্যেকটি বিবরণী প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যা সমূহে ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে পারিব মনে হয়। আশা করি মহিলা-সমিতির কর্ম্মীরা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

কেন্দ্র সমিতির ইংরাজি মাসিক

কেন্দ্র সমিতির পরিচালক সভা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র স্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী'র ন্যায় একখানি ইংরাজি মাসিক প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি এই পত্রিকার সম্পাদিকা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। ইহাতে সুবিখ্যাত লেখকগণের রচনা এবং তৎসঙ্গে আমাদের দেশের নারীপ্রগতির সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইবে। এই পত্রিকার মূল্য ভারতে ৩৲, বিদেশে ৪৲ এবং একখানির মূল্য ।/০ আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার গ্রাহক হইবার জন্য সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদকের নিকট ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের কার্য্য দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিধবাশ্রমের তহবিলে অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক ১,০০০৲ টাকা, (২) রায় বাহাদুর বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা ৫০৲ টাকা, (৩) মিসেস্ জহরলাল দাস ১০০৲ টাকা, (৪) আসানসোলের মিঃ এন, কে, মিত্র, (৫) ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতা ১০৲ টাকা।

সাকরাইল সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত সাকরাইল সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসব ও পুরস্কার-বিতরণ সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। যে সকল মহিলা ও বালিকা সমিতিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, উক্ত

সভায় তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি দেওয়া হইয়াছিল :—(১) প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীদের শেলাইয়ের জন্য ১টি, (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীদের শেলাইয়ের জন্য ১টি, (৩) সূতাকাটার জন্য ১টি, (৪) সঙ্গীতের জন্য ২টি, (৫) ছোরা খেলার জন্য ১টি, ও (৬) নিয়মিত উপস্থিতির জন্য ২টি। পুরস্কারের জন্য পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য স্থানীয় মহিলা ও ভদ্রলোকগণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা চৌধুরাণী সমিতির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

মিঃ দেবধরের মহিলা সমিতি পরিদর্শন

পুনা সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি এবং তত্রস্থ সেবাসদনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত দেবধর সম্প্রতি ব্যাঙ্কিং এনকয়ারি কমিটির সদস্যরূপে কলিকাতা আসিয়া সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি মহিলা-সমিতির কার্য্য দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বঙ্গীয় শিল্পবিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেন এবং কেন্দ্র সমিতির সহকারী সম্পাদকের সহিত সমিতির ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনস্থ প্রধান কার্য্যালয়, টালা ও কসবা মহিলা-সমিতি পরিদর্শন করেন। উক্ত সমিতি-সমূহের কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি ভাবে সমিতিগুলির কার্য্য পরিচালিত হয় সে সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেক সমিতি হইতে তিনি কতকগুলি শিল্পদ্রব্যের নমুনা ক্রয় করিয়া লইয়া যান। মিঃ দেবধর মহিলা-সমিতির কার্য্য দেখিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং ইঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লঙ্কা মহিলা-সমিতি

বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন এবং ইতিপূর্ব্বে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির আদর্শে সিংহল দ্বীপে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠান গঠন এবং আমাদের-সমিতির সহিত তাহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংবাদ পাঠ করিয়াছেন। সিংহলের বিভিন্ন পল্লীতে বাংলা দেশের ন্যায় মহিলা-সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং তদুদ্দেশ্যে কলম্বোতে একটি কলিকাতার ন্যায় কেন্দ্র সমিতি গঠিত হইয়াছে। মিসেস্ এল্মার নাম্নী জনৈক উৎসাহশীলা মহিলা তথাকার কেন্দ্র সমিতির সম্পাদিকা হইয়াছেন। মিসেস্ এল্মার ইতিপূর্ব্বে সমিতির নাম "Ceylon Women's Association" রাখিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন "লঙ্কা মহিলা-সমিতি"। সিংহলেও নারী-প্রতিষ্ঠানকে তাঁহাদের ভাষায় মহিলা-সমিতি বলে। মিসেস্ এল্মার লঙ্কা মহিলা-সমিতির গঠন ও পরিচালনে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সমস্ত নিয়মপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাঃ মাথুলক্ষ্মীর মন্তব্য

ভারতীয় মহিলা শিক্ষাপরিষদের মুখপত্র মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত "স্ত্রীধর্ম্ম" পত্রের জুন সংখ্যায় ডাঃ শ্রীমতী মাথুলক্ষ্মী অম্মল রেড্ডি সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"আমরা সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির ১৯৩০ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। বঙ্গদেশে মহিলাদের উন্নতির জন্য যে সুন্দর প্রকৃত গঠনমূলক কার্য্য হইতেছে কার্য্যবিবরণীতে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে মহিলা কর্ম্মীগণের অগ্রগণ্যা ৮ সরোজনলিনী দত্তের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২৫ সালে এই অশেষ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে। সরোজনলিনী বঙ্গমহিলাগণের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এই সমিতির প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। ইহা অল্পদিনের মধ্যে সমুদয় বঙ্গদেশে এবং তাহার বাহিরে ৩৫৫টি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

কেন্দ্র সমিতি মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার, নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা, গৃহশিল্প শিক্ষা, পর্দ্দাপ্রথা এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল কার্য্য, প্রসবাগার স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় একটি বৃহৎ নারী-শিক্ষালয় পরিচালন,

বিভিন্ন পল্লী-মহিলা-সমিতিতে শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করিয়া মেয়েদের মধ্যে গৃহশিল্প শিক্ষাদান, নূতন মহিলা-সমিতি গঠনের জন্য প্রচারকার্য্য, একটি নার্সিং স্কুল ও পুরীতে একটি হিন্দু বিধবা-আশ্রম পরিচালন, মহিলাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি বঙ্গদেশে অশেষ কল্যাণকর কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। একটি মহৎহৃদয়া নারী বঙ্গদেশে এই বিরাট জাতীয় আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া মহিলাদের মধ্যে নবযুগের সূচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এক্ষণে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। লণ্ডন সহরেও সমিতির একটি শাখা আছে এবং সুন্দর কার্য্যপ্রণালীর গুণে এই সমিতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার গঠন ও পরিচালনে পরিচালক সমিতির সভ্যগণের অনন্যসাধারণ ত্যাগ আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে। বঙ্গদেশবাসিনী ভগিনী-গণের এই অসাধারণ সাফল্যে আমরা দক্ষিণ দেশবাসিনী ভগিনীগণ সবিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আমরা কামনা করি, তাঁহাদের এই সুমহৎ কার্য্য সাফল্য-মণ্ডিত হউক।"

মিঃ রোস্তমজীর পরলোকগমন

সুপ্রসিদ্ধ ছায়াচিত্র ব্যবসায়ী মেসার্স জে, এফ, ম্যাডান কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী মিঃ রোস্তমজীর পরলোক-গমনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে তিনি প্রতি বৎসর এক রাত্রির অভিনয়ের সমস্ত অর্থ প্রদান করিতেন। গত ৫ বৎসর যাবৎ নারীমঙ্গল কার্য্যে এই সাহায্যের জন্য ম্যাডান কোম্পানী ও তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ রহিয়াছি। আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গকে আমাদের অন্তরের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান হউক।

সদস্যের সম্মান লাভ

সম্রাটের বিগত জন্মদিন উপলক্ষে কেন্দ্র সমিতির পরিচালক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি-আই-ই এবং শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই রাজসম্মান লাভে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি এবং আমাদের অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

দিনের কিছু অংশ

সৌন্দর্য্য চর্চ্চায় কাটান সকলেরই কর্ত্তব্য-কারণ রূপ যদিও সকলের ভাগ্যে ঘটে না তথাপি যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা যেমন তেমন চেহারাও দশের আকর্ষণ যোগ্য করে তোলা যায়

রূপ ও সৌন্দর্য্যের জন্য

চিরপ্রসিদ্ধ ও অতুলনীয় প্রসাধন

হিমানী স্নো

ও

রমণীর স্বভাব কোমল অঙ্গে ব্যবহার যোগ্য

হিমানী সাবান

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

সোল এজেন্টস :—

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

সাবান ও সুরভি প্রস্তুতকারক

হিমানী ওয়ার্কস্

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচলে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৮ [৯ম সংখ্যা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

প্রার্থনা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

ভগবান্ হে! খোদাতালা হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!
মোরা সবে তব সন্তান হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

নহ প্রভু তুমি কভু ভিন্ন হে;—
জগৎ জুড়িয়া তব চিহ্ন হে!
দেহ প্রেম ভক্তি জ্ঞান হে;
পাপ হ'তে কর ত্রাণ হে,—
কর ত্রাণ হে! কর ত্রাণ হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

সকলের সনে কর যুক্ত হে;
কর হিংসা কলহ হ'তে মুক্ত হে,—
কর মুক্ত হে! কর মুক্ত হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

কর কল্যাণ-কর্ম্মে ব্রতী হে;
তব পদে রাখো সদা মতি হে;—
নাশো বিঘ্ন হে! নাশো ভয় হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

বিদ্যাপতি-কাব্যে নারীচরিত্র

শ্রী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

বাংলার সাহিত্য-জীবনে এমন এক দিন গিয়াছে যেদিন আকাশে বাতাসে, পথে প্রান্তরে,ঘাটে বাটে—সর্ব্বত্র চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী ধ্বনিত-রণিত হইয়া উঠিয়াছিল,—যেদিন সত্য সত্যই বাঙ্গালীর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' সেই অমৃতনিস্যন্দী পদলহরী বাঙ্গালী-জীবনকে সারা দিক হইতে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। আজও সেই গীত-সাহিত্য ধারা শুকাইয়া যায় নাই, আজও সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন পরপদলেহী বাঙ্গালী ব্যথিত ক্লিষ্ট জীবন বহিয়াও রহিয়া রহিয়া সেই পদাবলী গাহিয়া উঠে ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে সামান্য বৈচিত্র্য আনয়ন করিবার প্রয়াস পায়। বিদ্যাপতি ছিলেন কিনা,কত সালে কোথায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এই সব বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে। তবে বিদ্যাপতির পদাবলী-সাহিত্য বাংলার গীত-সাহিত্য হইতে বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্য অর্থহীন হইয়া উঠে। আমি বলি না যে চণ্ডীদাসের পদাবলী বাংলা সাহিত্য পূর্ণ রাখিতে পারে না,—তবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ের একত্রীকৃত পদাবলী বাঙ্গালীর একান্ত নিজের সাহিত্যসৃষ্টি।

"বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় নহে"—ইহা বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছিলেন ও তথায় তিনি যে কারণ দিয়াছিলেন তাহা অযৌক্তিক নহে। বল্লালসেন যে পাঁচ ভাগে বাংলা দেশকে বিভক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে মিথিলা এক ভাগ। লক্ষ্মণসেনের অব্দ অদ্যাবধি মিথিলায় প্রচলিত। সুতরাং বিদ্যাপতি যে বাঙ্গালীর গীত-সাহিত্যে বাণীর আসন রচনা করিতে পারিবেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতি বাংলার গীতসাহিত্যকাননে সর্ব্বদিক হইতে দেখিলে যে শ্রেষ্ঠ মধুকর ইহা অস্বীকার করা চলে না। তাঁহার রূপবর্ণনার বৈচিত্র্য, আবেগের পূর্ণ মাধুর্য্য, রসসৃষ্টির নিবিড় গাম্ভীর্য্য, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁহার সমস্ত কাব্যকে এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত ও রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। অতি-আধুনিক কালের কোন কোন শ্লীলতাবাদীর মতে বিদ্যাপতির পদাবলীর স্থানে স্থানে হীন অশ্লীলতা-দোষ ঘটিয়াছে; কিন্তু উদার মনোবৃত্তি ও সর্ব্বভাবের আবেগরাশিকে যদি ভাষা দিবার সাহস থাকে তবে তাহাতে সর্ব্বসময়ে শালীনতার বিধি মানিয়া চলা সম্ভব হয় কি? রসসৃষ্টি তাহা হইলে যে অসম্পূর্ণ হইবে ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কবিকে যদি রসসৃষ্টির আনন্দে মগ্ন থাকিয়াও সমালোচকের রক্ত-চক্ষুর কথা ভাবিয়া কাব্য লিখিতে হয় তবে দুনিয়ায় আজ পর্য্যন্ত কোন উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা সম্ভব হইত না,—সর্ব্বত্র বিধিনিষেধের বিরাট গণ্ডী মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারাকে ক্ষুণ্ণ করিত, বাণীর বুকের উপর জগদ্দল পাথর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে চাপিয়া পড়িত।

বিদ্যাপতির কাব্যে নারীচরিত্রের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। "নারীত্ব" বর্ত্তমান কালে কতিপয় 'সবুজ' লেখকের উপন্যাস ও কাব্যে যে হীন অর্থ জ্ঞাপন করিয়াছে যদি সেই অর্থে বিদ্যাপতির নারীচরিত্র আলোচনা করিতে হয় তবে তাহা অপেক্ষা ভ্রান্ত মত আর কি থাকিতে পারে? বিলাসব্যসনময়ী, ভোটাধিকার-উৎসুকা, বিদেশী অনুকরণ-প্রিয়া তথাকথিত তরুণী, আর বিদ্যাপতির কাব্যে রস-বিকাশময়ী, বিরহব্যাকুলা, দয়িতজীবনা নারী—শ্রীরাধা। "নারীত্ব" বলিতে সত্যই যাহা বুঝায়, সীমাহীন বৈচিত্র্য, সীমাহীন মাধুর্য্য, তাহা যেন বিদ্যাপতির শ্রীরাধা চরিত্রে অপূর্ব্ব আলোকে দীপ্ত হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বিষয়ে ইংরেজ কবির ভাষায় বলা চলে—

> "Age cannot wither on custom state
> Her infinite vanity."

ইংরেজ কবি অবশ্য সামান্য flirtingকেও যে "infinite

vanity"র পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন ; বিদ্যাপতির মতে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

বিদ্যাপতির কাব্যে শ্রীরাধা-চরিত্র এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমার অশ্রদ্ধা না থাকিলেও, বিদ্যাপতির কাব্যে শ্রীরাধা-চরিত্রকে দুনিয়ার সাধারণ নারীর মাপকাঠিতে বিচার করিতে যাওয়ায় হয় ত বা বৈষ্ণব পাঠকগণ একটু কোপ-কটাক্ষ করিবেন কিন্তু সত্যের আদর করিতে হইলে কাব্য-সাহিত্যে শ্রীরাধাকে নারী ভিন্ন কল্পনা করা অসম্ভব। বিদ্যাপতির পদাবলী-পুস্তক খুলিলেই প্রথমে আমাদের চোখে পড়ে—রাধার রূপবর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় তাহা কেমন জীবন্ত হইয়া আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—

"গেলি কামিনী গজহুগামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক
কুহকী ভেলি বরনারী॥"

সমস্ত সৃষ্টি চঞ্চল করিয়া যে অপরূপ রস বিশ্বসৌন্দর্য কে উজ্জ্বলতম করিয়া তোলে শ্রীরাধার সেই ত্রিভুবনবিজয়ী রসরূপ। কবির লেখনীমুখে কী সুন্দর ভাবে ইহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—

"অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা।"

শ্রীরাধার রূপমাধুরী যেন বিশ্বের গলে লম্বিত একগাছি মালা—কী অপূর্ব্ব বর্ণনাচাতুর্য্য, কী অপরূপ রসশিল্পীর রসসৃষ্টি! শ্রীরাধার মুখকমল পৃষ্ঠলম্বিত কেশদামের ভিতর একরূপ আত্মগোপন করিয়া আছে, কবির মনে হইতেছে যেন অন্ধকার পিছনে রাখিয়া রবিশশী একত্রে উদিত হইয়াছে—

"সুন্দর বদনে সিন্দুরবিন্দু
সাঙর চিকুরভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥"

আবার শ্রীরাধার চপল নয়নদুটির বঙ্কিম দৃষ্টি বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিলেন—

"চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলিভরে উলটায়॥"

কাজলকালো দুটি চপল আঁখির বঙ্কিম দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মৃদু হাওয়ায় কমল ভ্রমরভরে হেলিয়া পড়িতেছে। এরূপ বর্ণনা যেকোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে একান্ত গৌরবময় ইহা বলা বাহুল্য।

আবার ম্লানায়মান গোধূলি-আলোকে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-পথে শ্রীরাধা পতিত হইয়াছেন, কবির মুখে তাহা এমন সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে কবি বলিতেছেন—নবমেঘ ও বিজলীলেখা যেন পাশাপাশি শোভা পাইতে লাগিল অথবা মনে এই সন্দেহ হয় যে বিজলীর শোভা কি নারীর রূপ অপেক্ষা বেশী আনন্দদায়ক ?

"যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুলীরেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥"

স্নানান্তে সিক্তবসনা বিশ্বের প্রেমমূর্ত্তি—শ্রীরাধা ধীরে তীরে উঠিতেছেন, সিক্ত বসন হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে যেন বসন ঐ বরতনুর বিরহে ব্যথিত হইয়া কান্নায় লুটাইতেছে।

আবার একই শব্দ ব্যবহার দ্বারা কেমন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাইতেছে—

"সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন
সারঙ্গতনু সনাধানে।
সারঙ্গ উপরে জনু দহু সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে॥"

সুন্দরীর কোকিলের ন্যায় বাণী, হরিণের ন্যায় আয়ত লোচনদ্বয়, সেই লোচনের সন্ধানে মদন ব্যাকুল। আঁখি-তারা দুটি দেখিয়া মনে হয় যেন পদ্মের উপর দুটি ভ্রমর মধুপানে রত হইয়াছে।

তারপর যখন শ্রীরাধা যৌবনসীমায় উপনীত হইলেন, ধীরে ধীরে যৌবন জোয়ারের মত দেহের দুইকূল ছাপাইয়া রূপলাবণ্য বহিয়া আনিল, তখন কবি যে বর্ণনার উচ্ছ্বাসে নিজেও ভাসিয়া চলিয়াছেন তাহা দেখিয়া মন পুলকিত হইয়া

উঠে। এতদিন পুষ্পধন্বা নিদ্রিত ছিল আজ যেন কোন রূপরাজ্যের সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠিল—

"চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল তান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥"

আর এই দীপশিখার মত রূপজ্যোতি অচঞ্চল হইয়া শ্রীরাধার সারা দেহে মাধুর্য্য ছড়াইতেছে। তখন সকলই সুন্দর—সকলই মধুর! অধর ও আঁখির আবার বর্ণনাবৈচিত্র্য দেখুন—

"মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচনযুগল ভৃঙ্গ আকার
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥"

অধর দুইখানি এমনই রক্তবর্ণ যেন পদ্মের সহিত বন্ধুক-পুষ্প পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আঁখিদুটি যেন মধু-পানভোর মধুকর সদৃশ, চোখের পলক পড়িতেছে না—মনে হইতেছে যেন মধুকর মধুপান করিয়া আর উড়িতে পারিতেছে না।

এই সব রূপবর্ণনার ভিতর একটা জিনিষ সহজেই চোখে পড়ে—রূপবিকাশের দৈহিক দিক্—Physical aspect of beauty. বিদ্যাপতি খাঁটি কবি—তাই তাঁহার কাব্যানুভূতি ধাপে ধাপে রসসৃষ্টির সোপানে আরোহণ করিয়াছে। প্রথম দর্শনেই নারী তাহার মধুময় প্রেমের দীপশিখা হোমাগ্নির পবিত্র শিখার মত তুলিয়া ধরে নাই, বিরহের গুরু গাম্ভীর্য্য আত্মপ্রকাশ করে নাই বা দয়িত-বিরহ বেদনাকরুণ মিনতির মত আকাশ-বাতাস ছাপাইয়া হাহাকার করিয়া উঠে নাই। যদি কোন কবির কাব্যানুভূতিতে ক্রমবিকাশ বা evolution না থাকে তবে নিদাঘের দাহনদীপ্ত কুসুমরাজির মত তাহা স্বল্পায়ু ও অভিশপ্ত সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতির অমৃতনিস্যন্দী গীতধারা ধীরে ধীরে বন-ফুলের সহজ শোভায় উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছে,—অথবা উষার প্রথম আলোর মত, তরুণীর সলাজ হাসির মত ইহা ক্রমবিকাশের পথে আরোহণ করিয়াছে। প্রথমেই নিদাঘকালীন দীপ্ত মধ্যাহ্নের দাহনদ্যুতির মত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠে নাই ও অনতিবিলম্বে আপনার মৃত্যু-শয়ন রচনা করে নাই।

অতি ধীরে ধীরে, স্বর্ণদ্যুতি উষার সরমভরা আলোর ধারার মত শ্রীরাধার মানসপটে কৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগজনিত মধুময় মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। রাধা আনন্দে আবেগে আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। কৃষ্ণ সর্ব্বমনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বনাশা বাঁশী বাজাইতেছেন—সে বাঁশী যে একবার শুনিয়াছে তাহার কুলমান থাকে না, থাকিতে পারে না। তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া একেবারে শ্রীরাধাকে সর্ব্বনাশের নেশায় মাতাইয়া তুলিয়াছে। তাই রাধা অভিসারে চলিয়াছেন কুলমান সকলি ত্যাগ করিয়া, কোথায় সেই পাগলকরা বাঁশী রহিয়া রহিয়া বাজিতেছে তাহারই উদ্দেশে দূর গহনবনে নিশীথরাত্রে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

"নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাই মানয়ে বাধা॥
একলি করল পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥"

পথ তিমির-আচ্ছন্ন, সর্পসঙ্কুল, দোসংহীন, আকাশ মেঘময়, পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত পথ—

"ভীম ভুজঙ্গম সরণী।
কত সঙ্কট তাহে কোমলচরণী॥"

*

গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিপিন বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥"

আধুনিক কবির ভাষায় বলা যায়—

"সঘন গগন পঙ্কিল ধরা,
শঙ্কাবাকুল বিঘ্নভরা।"

তারপরে বিদ্যাপতি নারীর সীমাহীন রসবৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রথমে রাধাকৃষ্ণের মুরলী বিলাস, পরে মান, পরে মিলন ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

মিলনেরই বা কত সীমাহীন বৈচিত্র্য—স্বপনে কৃষ্ণ, শয়নে কৃষ্ণ, ধ্যানে কৃষ্ণ, ধারণায় কৃষ্ণ, সর্ব্ব-মনপ্রাণ জুড়িয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি বিরাজমান্!

বিদ্যাপতি রাধার মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

"একলি শুতিয়া ছিনু কুসমশয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবান॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহনু নয়ান॥"

আবার অন্যদিন

"··· কানু আওল ···
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।
নাগরশেখর নাগরীবেশে॥"

অপর এক দিন

"একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমলনয়ান॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥"

এমন ভাবে নিত্য নূতন কৌতুকলীলা চলিতে লাগিল। অন্যদিন

"নাহই উঠনু হাম কালিন্দীতীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥"

আবার, হার গাঁথিতে ব্যস্ত, অন্যমনস্কা রাধার সামনে

"তৈখান হাসি হাসি আওল কানু···।"

অন্যদিন কৃষ্ণ গোগাবরের বেশে শ্রীরাধাকে প্রেমের মন্ত্র শিখাইয়া গেলেন। এইভাবে নিত্য নূতন কৌতুকলীলা শেষ হইল, কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন—বিরহিণী রাধার ভাগ্যাকাশের দীপ্ত সূর্য্য অস্তমিত হইল।

তখন শাওনের ধারার মত অবিরল অশ্রুধারা সেই মুখকমল সিক্ত করিল—দিবসে রাত্রে, শয়নে স্বপনে কানুর চিন্তা তাঁহার সার হইল—

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।"

এই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদের তুলনা ভারতীয় সাহিত্যে কেন অন্য যেকোন সভ্য, শিক্ষালোকদীপ্ত দেশের সাহিত্যেরও মাথার মুকুট, গৌরবের মণিময় হার। বৈষ্ণব কবির ভাষায়—

"হরিরে ভাবিয়া রাধা হয়েছেন হরি।
আপনারে আপনি ফিরেন তত্ত্ব করি॥"

রাধার সব সুখ কৃষ্ণের সাথে বিদায় লইয়াছে শুধু পড়িয়া আছে বিরহের বুককাটা হাহাকার আর তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস। যাহাকে সামনে পাইতেছেন রাধা তাহাকেই প্রেম-নিবেদন করিতে বঁধুয়ার কাছে পাঠাইতে অধীর হইয়া উঠিতেছেন —

"পাখী জাতি যদি হও পিয় পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কহো তনু পাশে॥"

মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, একের পর একে সব ঋতু দেখা দিল—চলিয়া গেল। বিরহ-ব্যথা ক্রমেই বাড়িতেছে—গুরু গুরু মেঘের ডাকে, বিজলীর চপল আলোর সাথে কান্তবিরহিণী নারীর হৃদয় হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সে করুণ আর্ত্তনাদে বুঝি আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মেঘদূতের বিরহিণী যক্ষনারীর চেয়েও এ ব্যথা গাঢ়তর, তীব্রতর।

"·· নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোর॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
এ নি ভ্রমি দেইতছু ভোর॥"

আবার যখন ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে দিকে দিকে বিজয়-বার্ত্তা বিভাবিত হইয়াছে, পাতায় পাতায় কানাকানি মাতামাতি চলিতেছে, কোকিলের কুহুতানে, বনপাখীর মধুগানে একটা অপূর্ব্ব উল্লাস-উচ্ছ্বাস বহন করিয়া আনিতেছে,—তখন বিরহিণী নারীর বিরহব্যথা দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল।

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইয়ে।
মলয়ানিল হিম শিখরে সিধায়ল
পিয় নিজ দেশ না আওইয়ে॥
চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।

সময় বসন্ত কান্ত বহু দূরদেশ
জানহু বিহি প্রতিকূল ॥"

আবার ভরাভাদ্রের ধারার সাথে রহিয়া রহিয়া বিরহবেদনা যেন রূপ ধরিয়া দিকে দিকে আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে—

"এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাতমোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

এরূপ দীর্ঘ বিরহজ্বালার বেদনা সহিতে সহিতে, আঁখি-নীরে তটিনী রচিত হইল—

"লোচন লোরে তটিনী নিরমান।
তহি কমলমুখী করত সিনান।"

তারপর দুঃখের রজনী শেষ হইল, কৃষ্ণ গোকুলে আসিলেন। তখন মিলনের আগমনী-গানে গগন-পবন মুখর হইয়া উঠিল—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।..."

এখন "সোহ কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥"

প্রেম-মিলনের এই যে বিরাট বাস্তবতা, বিপুল পুলকোচ্ছ্বাস, মিলনের এই যে মধুময় বৈচিত্র্য ইহা বিদ্যাপতি অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ-দৃষ্টিতে নারীর মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। রাধা সখিগণের ঘন ঘন প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোর।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥"

এই মিলনের শেষ কথা! - এইখানেই প্রেমের বিরাট সত্তার বিপুলতা উপলব্ধি হয়।

বিদ্যাপতির নারীচরিত্রের আলোচনায় আমরা এ পর্য্যন্ত ইহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে প্রথমতঃ কবি বাস্তব রূপানুভব ও ভোগের দিক হইতে নারীকে বিচার করিয়াছেন। তাই এ পর্য্যন্ত আমরা কবির চরিত্রের Physical aspect দেখিতেই প্রয়াস পাইয়াছি। কাব্যানুভূতির প্রথম কল্পনা বাস্তবকে লইয়া। যদি কোন কবি প্রথমেই ক্রম-বিকাশের ধাপ বাদ দিয়া বাস্তবাতীত জগতে প্রবেশের চেষ্টা করেন তবে তাঁহার রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ সার্থক বলা চলে না কারণ বাস্তবকে প্রথম হইতে দূরে রাখিয়া অবাস্তবকে কল্পনার রঙীন আলোকে দেখাইতে গেলে যে অবাস্তব জগতের মাধুর্য্য তুলনামূলক হিসাবে হীন হইয়া পড়ে ইহা অস্বীকার করা চলে না।

বিদ্যাপতি দুনিয়ার অন্য সব শ্রেষ্ঠ কবিদের মত রূপরসময় জগৎ হইতে রূপাতীত জগতে তাঁহার রসানুভূতি পৌছাইয়া দিয়াছেন। এই ধীরগমনশীল ক্রমবিকাশ বা কাব্য-সৃষ্টিই রসজগতের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।

বিদ্যাপতির কাব্যে নারীচরিত্র-বিভাগের সংস্পর্শে আর একটা কথা সহজেই উপলব্ধ হয়। কবির কাব্যানুভূতির Physical aspectএর পাশাপাশি Sensuous aspect উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সরমসঙ্কুচিতা কিশোরী কৃষ্ণদর্শনে মুখ লুকাইয়া আছে; কৃষ্ণ বলিতেছেন—

"তুহ পুনঃ কাহে ডরাসি..."

কতিপয় সমালোচক বিদ্যাপতির কাব্যের এই Sensuous aspect বা ইন্দ্রিয়রসগ্রাহ্য দিক্‌টাকে তদীয় কাব্যানুভূতির এক মহৎ দোষ হিসাবে বিচার করেন। কিন্তু শ্লীলতার বেড়া টানিয়া যদি দুনিয়ার রূপসৃষ্টিকে "একঘরে" করিয়া রাখিতে হয় তবে সাহিত্য অসম্ভব। নীতিবাদের দোহাই দিয়া সাহিত্যে যাঁহারা অতি-শ্লীলতার ধুয়া ধরেন তাঁহারা যে দুর্ব্বল মনোবৃত্তির পরিচয় দেন তাহা রসগ্রাহীর পরিত্যাজ্য।

এক সময়ে ইংরেজকবি Keatsএর রচনাকে এইরূপ সাহিত্যের আসর হইতে বহিষ্কৃত করার জল্পনা চলিয়াছিল। এবং ইংরেজি সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, ইন্দ্রিয়রসগ্রাহ্য জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে যে সুস্পষ্ট আবেদন তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল, কবির মৃত্যুতে তাহা আরও সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতে অবকাশ পাইল না।

Sensuous বিষয় নীতিবাদের দিক্ হইতে ভাল নহে স্বীকার করি, কিন্তু যদি রূপময় জগৎ হইতে রূপাতীত জগতে অনুভূতি নিজ পথ করিয়া লইতে পারে তবে রূপরসভরা ভোগজীবনের যে সার্থকতা হয় তাহা নিছক ত্যাগময় জীবনে হইবার সম্ভাবনা নাই।

তারপর বিদ্যাপতির কাব্যে শ্রীরাধা নারী হিসাবে যে নীতির ভয়ে মোটেই ভীতা হন নাই তাহা নহে; তাই ধীরে ধীরে অভিসারে যাইতে যাইতে মনে অশান্তি জাগিয়া উঠিল —বিদ্যাপতির ভাষায়—

"অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥"

কিন্তু এই গোপন চলাটি ধরা পড়িলে লোকসমাজ রক্তচক্ষু মেলিয়া শাসনের ঝটিকা তুলিবে এই ভয়ে ভীরু নারী উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

"কামিনী খেল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে করলক অভিসার॥
ধম্মিল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ॥"

নারীচরিত্রের এই লোকসমাজভীতি বিদ্যাপতির কাব্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু রাধাকে কান্ত-অভিসারে যাইতে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দিতে পারে নাই। তাঁহার সর্ব্ববিজয়িনী নারীত্ব সীমাহীন বৈচিত্র্য লইয়া বিশ্বের সব বাধা সকল নিষেধের গণ্ডী ভেদ করিয়া কূলের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে রাধা-চরিত্রে নারীত্বের দীপ্তি কোথা? শ্রীরাধার রূপদ্যুতির অপরূপ বিকাশে, কৌতুকলীলার বৈচিত্র্যে, অভিমানিনী নারীর মানের প্রাখর্য্যে, প্রেমলীলার বিপুল রসোচ্ছ্বাসে ও সর্ব্বশেষে কান্তবিরহিণী নারীর করুণ বেদনার আর্ত্তনাদে যে সীমাহীন বিচিত্র নারীহৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা যুগে যুগে সকল কবির কাব্য রচনার মালমসলা যোগাইবে না কি? এইখানেই রাধাচরিত্রের "infinite vanity," সীমাহীন বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য—পরিণত নারীত্ব।

এখন দেখা যাউক যে বিদ্যাপতির কাব্যে নারীচরিত্রের এই যে মধুময় বিকাশ ইহা আর্ট হিসাবে বা আর্টের মাপ-কাঠিতে শালীনতার দিক দিয়া কতদূর সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পরিপন্থী। আমি পূর্ব্বেই বিদ্যাপতির চরিত্রাঙ্কণে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আভাষ দিয়াছি কিন্তু আধুনিক কালে যে তীব্র সমালোচনার উদ্যত খড়্গ কবির গৌরবোন্নত শিরের উপর লম্বিত আছে তাহার অর্থ বা তাৎপর্য্য যে ভ্রান্তধারণাপ্রসূত তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

সত্যসুন্দরকে অন্তরে উপলব্ধির পর বাহিরে বাণী দেওয়াই আর্ট বা সাহিত্য। সত্যসুন্দরের যে "অরূপ রহস্য-লাঞ্ছনা", যে অনন্ত দ্যোতনা সকল সীমার বাঁধন কাটিয়া রূপময় বিগ্রহের মুখে বাণী লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে—ইহাই কবির রাজ্য।

সকল কাব্যানুভূতি বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলে যে একটা আবেগ, একটা নিবিড় চঞ্চলতা উদ্দাম হইয়া সীমার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া চলে তাহা বিদ্যাপতির কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পাই। তাই বিদ্যাপতির কাব্য প্রাণশক্তির অনন্ত বিকাশ-মাধুরীতে স্নিগ্ধ, আবেগের অসীম প্রাচুর্য্য ও চঞ্চলতায় ছল-ছল করিয়া তটিনীর মত মুখর। শ্রীরাধার চারিদিক ঘিরিয়া কবির বীণায় যে বিচিত্র কলগুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া প্রাণের পুলকস্পন্দনে উদ্বেলিত, তাহাকে আর্ট হইতে দূরে নীতি-বাদের বেড়ার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে Culpable

homicide amounting to murder হইয়া উঠিবে কারণ এখানেও প্রাণনাশের অপরাধে সমান দোষ ঘটে।

বিদ্যাপতির কাব্যে আর্টের সৃষ্টি কেমন সুন্দর রূপে ধাপে ধাপে উঠিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমে পূর্ব্বরাগ —"কানু মুরলী বাজায়" বা ইংরেজীর intuition বা শ্রুতি, পরে রূপদর্শনে বিহ্বল চাঞ্চল্য—"মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু" ইত্যাদি, পরে স্পর্শানুরাগ—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

এ কান্নার যে বিরাম নাই, এ আবেগের যে শেষ নাই। কিন্তু স্পর্শেই ত রসসৃষ্টি বিশ্রাম লাভ করে নাই, কবি পাগলের মত হইয়া বাণী খুঁজিতেছেন। শেষে শ্রীরাধার মুখ হইতে

"সেই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়—"

বাহির হইয়া আবার ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে নব প্রকাশের দ্যোতনায়—

"বঁধু কি আর কহব আমি—" ইত্যাদি।

বিদ্যাপতি যেখানে যতি টানিয়া মিলনের চিত্রাঙ্কণ শেষ করিয়াছেন অন্য কবি আরও পরে যাইয়া নীরব হইয়াছেন। তারপরে শ্লীলতা প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠিয়াছে যে কবির নিজ জীবনের পরকীয়াপ্রীতি তাঁহার কাব্যের নারীমূর্ত্তির মহামহিমাকে ম্লান করিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগ বর্ণনে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে ও পবিত্রতার দীপশিখাকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে নাই। কিন্তু সকল দেশের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে কবির আত্মপ্রণয় পরবর্ত্তী রচিত সাহিত্যের মসলা যোগায় নাই ইহা বলা চলে না। Dante তাঁহার দয়িতাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া কল্পনা না করিতে পারিলে যে রসসৃষ্টি অতদূর উন্নত হইতে পারিত না ইহা নিঃসন্দেহ। বিদ্যাপতিও যদি লছিমা দেবীর রূপধ্যানে বিভোর হইয়া রাধামাধবের অপরূপ প্রেমলীলাকে বাণী দিতে পারেন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। স্থূল কামনা-বাসনার জগতেই যদি কবির অনুভূতি যবনিকা টানিয়া থামিয়া যাইত তবে তাঁহাকে দোষী বলা চলিত কিন্তু ইন্দ্রিয়রসভোগ্য জগৎ হইতে যে ভোগাতীত অমর জগতে তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাব্যদৃষ্টি পৌঁছিয়াছে তাহাতে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মন নত হইয়া আসে।

বিদ্যাপতির কাব্য-আলোচনায় আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাহা কবির রূপপ্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গী, নিজস্ব সুর। বাংলা সাহিত্য একান্তভাবে গীতিধর্ম্মের অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত, তাই রসসাহিত্য বেশীর ভাগই গীত-সাহিত্য!

রসব্যঞ্জনার আলোছায়ার বর্ণে বর্ণে বক্তব্যকে বিচিত্রিত করিয়া রূপান্তরিত করা বাংলা সাহিত্যের যেমন বিশেষ ধর্ম্ম, গীতমূর্চ্ছনা তেমনই ইহার সকল দিক ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাপতির কাব্যসাহিত্য শুধু বস্তু লইয়াই সংগ্রাম নহে, বরং বস্তুকে বা বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গীর বৈচিত্র্য অপরূপ মাধুরীতে মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী যে Romantic ভঙ্গী ইহা বলা বাহুল্য। কারণ বিদ্যাপতির রচনা ভাবাত্মক, তাঁহার অঙ্কনরীতিও তদ্রূপ গানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

বিদ্যাপতির কাব্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের একটা যুগ-প্রবর্ত্তন। বাংলা সাহিত্যে,নানা দেবদেবীর স্তুতিগান ভরপুর হইয়া উঠিয়া, ক্রমে ক্রমে শেষ হইয়া, প্রদীপের শেষ সলিতাটির মত ধীরে ধীরে নিভিয়া গেল। তখন দিকে দিকে নব ঝঙ্কার তুলিয়া শক্তি-পূজার মহা সমারোহ লাগিয়া গেল,বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের যুগ হইতে পৌরাণিক দেবদেবীর যুগের পরে রণরঙ্গিনী মাতৃমূর্ত্তি চণ্ডীর পূজাবেদী রচিত হইল। সহসা দিকে দিকে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের সিংহাসন কম্পিত করিয়া বিপ্লবের রক্ত নিশান উড়াইয়া মুসলমান ধর্ম্মমত বাংলার আকাশে বাতাসে জাগিয়া উঠিল। শেষে সব নীরব হইয়া মিলিত এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হইল। যখন বাংলা সাহিত্যের পুরাতন গতি প্রায় নিশ্চল হইয়া আসিয়াছে, যখন জীবনের আলো ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া উঠিয়াছে, তখন ঊষর মরুর উপর স্নিগ্ধসজল ভাবের বর্ষা বৈষ্ণবকবিকুলের শত শত গীত-ধারায় নামিয়া আসিল। এ যুগপ্রবর্ত্তক বিদ্যাপতি —ইতিহাসের দিক দিয়া না হইলেও তিনিই এ যুগের অন্যতম নায়ক।

চিরন্তন নরনারীর হৃদয়ের গোপন কক্ষে যে শাশ্বত সুধা আছে, অন্তরে অন্তরে যে বিরহিণী কাঁদিয়া আকুল হয়,

তাহাকে রূপ দিলেন বৈষ্ণব-কবিশিরোমণি বিদ্যাপতি। মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই দেখিল যে মানবমনে কী অফুরন্ত সুধাধারা অজস্র আবেগে পুলক-প্রাচুর্য্যে উচ্ছল হইয়া উঠিতেছে।

"তৃণ-তরুলতায়, পল্লবদল-কিশলয়ে এবং বিহ্বল হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় শোভা জাগিয়া উঠিয়াছে—যাহা চির-তরুণ চিরমোহন চিরন্তন।" ..."বৈষ্ণবযুগের নবসাহিত্য প্রচুর ভাবৈশ্বর্য্যে চিরন্তন নর-নারীর সুখদুঃখ কাহিনীর অনাবিষ্কৃত মহাসিন্ধুতে আসিয়া আত্মনিবেদন করিল।"

বিদ্যাপতি এ যুগে তাঁহার চরিত্রাঙ্কণের অপরূপ ভঙ্গীতে, রসসৃষ্টির অপূর্ব্ব বিকাশে, প্রেমব্যাখ্যানের রসগাম্ভীর্য্যে যে এক গৌরবময় যুগ আনয়ন করিলেন, পরবর্ত্তী লেখকেরা তাহাই নানা ভাবে সঙ্কলন করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক-অনুসরণ করিল।

সুতরাং যেকোন মাপকাঠি দিয়া বিদ্যাপতির কাব্যে নারীচরিত্রের বিকাশ আলোচনা করি না কেন তাঁহার নারী-সৃষ্টি এক অপূর্ব্ব দান। বিদ্যাপতি ইংরেজ কবি Keatsএর মতই Sensuous aspect of beauty বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্য্যকে লইয়া কিছু বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু শেষে তাঁহারই মত তাঁহার সমস্ত কাব্য জুড়িয়া এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন—

"A thing of beauty is a joy for ever" এবং 'Beauty is truth, truth beauty" ইত্যাদি।

বিদ্যাপতিও ইংরেজ কবির মত জলন্ত বিশ্বাস করিতেন যে—"What the mind seizes as beauty must be truth"। সুতরাং ইহা তাঁহার কাব্যানুভূতিকে এক অপরূপ সামঞ্জস্যের সুরেই বাজাইয়া তুলিয়াছে।

বিদ্যাপতি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কাব্যসম্পদ বাংলার গীত-সাহিত্যকুঞ্জে একটি অপূর্ব্ব কুসুম। ইহার কান্তি, ইহার মাধুর্য্য, ইহার সুগন্ধ ইহার স্নিগ্ধ আভাস সত্যই তুলনাহীন। কবি তাঁহার গানের রেশ বর্ত্তমান যুগে বাংলার ভানুসিংহ ও অনাগত যুগের কবিদের জন্য রাখিয়া স্বীয় গৌরবের দেদীপ্যমান প্রভায় চিরশ্রদ্ধার আসনে অমর হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহা সত্যম্ তাহাই সুন্দরম্। এই সুন্দরের অখণ্ড মূর্ত্তি বিদ্যাপতি দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যও চিরতরুণ রহিয়াছে।

ব্রতকথার আল্‌পনায় নানা বস্তুর 'ঠাট' ও তাহার অঙ্কন-পদ্ধতি

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

জগতের আধুনিক চিত্রশিল্পে এক নূতন আদর্শের বিস্তার ঘটিতেছে। তাহা প্রত্যেক দেশের চিত্রশিল্পের সমালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পুস্তক হইতে এই আদর্শ সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি*।—"ভাব ফুটাইবার জন্য বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিতান্ত প্রাকৃতিক জীব-জন্তুর অনুকরণে আঁকিবার বা গড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা আঁকিতেছ তাহা তোমার চিত্তে যেরূপ ভাব উৎপন্ন করে তুমি সেই রূপ আঁকিবে। ফটোগ্রাফে ছবি তুলিলে উদ্ভিদ, জীব-জন্তু, নর-নারী, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি যেরূপ দেখায়, চিত্রকরের শিল্পে অথবা স্থপতির কার্য্যেও এই সমুদায় বস্তু সেইরূপ দেখাইবে কি? কখনই না। যদি দেখায় তবে বুঝিতে হইবে—এখানে পাকা ওস্তাদের হাত নাই। বস্তুগুলি দেখিবার পর শিল্পীর চিত্তে যে ধারণা থাকে সেই ধারণা ফুটাইতে পারাই প্রকৃত কারিগরী। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে একই গৃহ, একই ব্যক্তি, একই উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন দেখাইবে। ইহার নাম Post Impressionism অর্থাৎ বস্তু দেখিবার (Impression) পর (Post) ধারণাগুলি চিত্রে বা স্থাপত্যে স্থায়ী করিবার রীতি। ইহা ভাব-

* 'বর্ত্তমান জগৎ', ৪র্থ খণ্ড। পৃঃ ৬৩।

বাদ বা আদর্শবাদ। যেরূপ দেখিতেছি সেই রূপই আঁকিতেছি—এই নিয়মকে Impressionism অর্থাৎ 'দেখা অনুসারে আঁকা' বলে। ইহা জড়বাদ—Naturalism বা Naterialism. আমাদের নবীন জগতে Post-Impressionismএর প্রভাব চলিতেছে।"

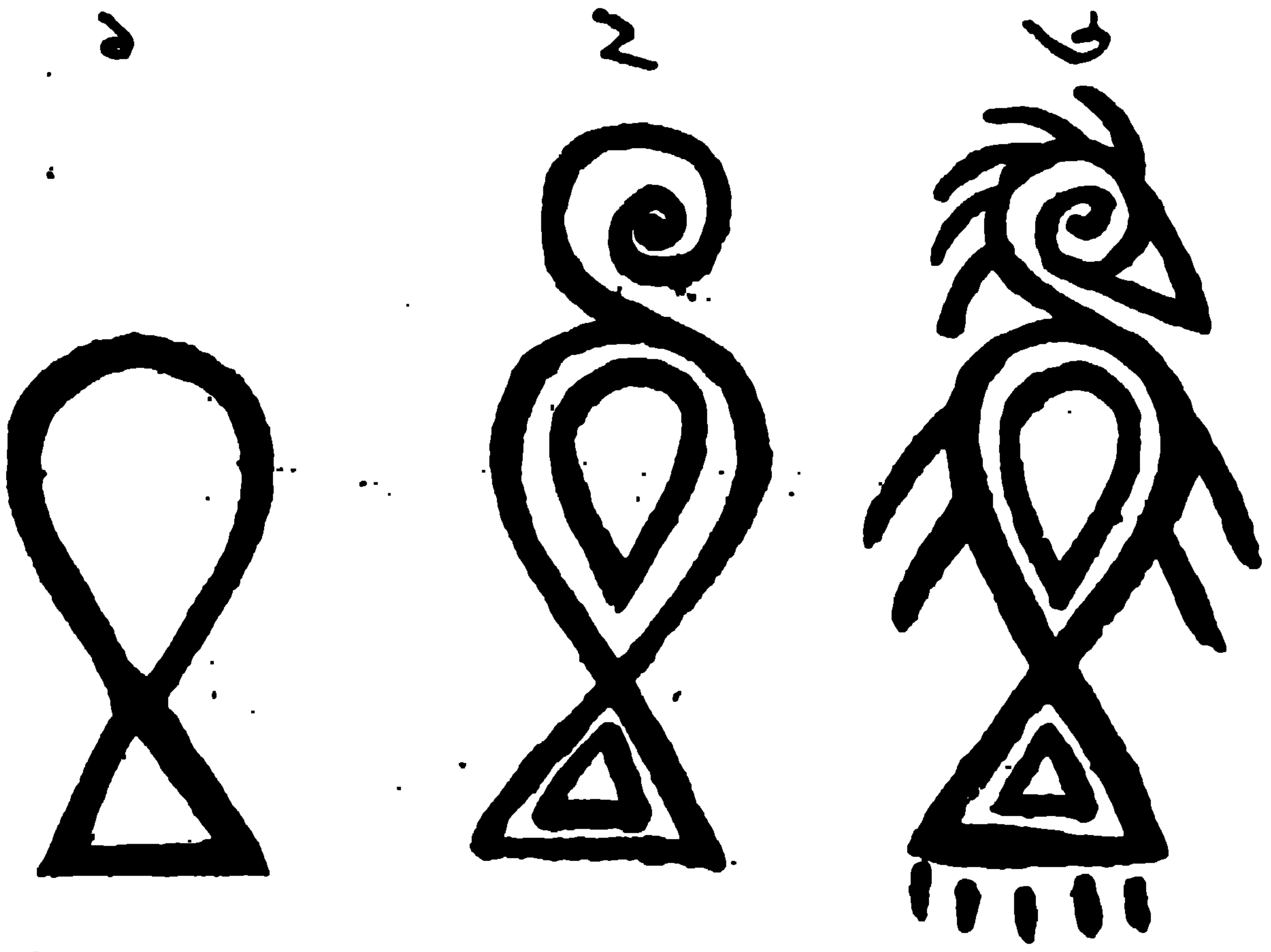

রেখাঙ্কনের কৌশল

কিন্তু আজ যাহা জগতের চিত্রশিল্প-ক্ষেত্রে আলোড়ন আনিয়াছে আমাদের নিকট তাহা নূতন নহে। অতি প্রাচীন কালে ভারত ও মিশরের চিত্র বা ভাস্করশিল্পের ইহাই ছিল অনেকটা আদর্শ। সরকার মহাশয় আরও বলেন, "প্রাচীন বা আদিম শিল্পের সৌন্দর্য্য সমালোচনা করিলে আধুনিক Post-Impressionism তত্ত্বের কোন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই জন্য আজকালকার শিল্পীদের মধ্যে যাঁহারা Post-Impressionist তাঁহারা প্রাচীন শিল্পের সমাদর-কর্ত্তা। * * * ইঁহারাই আবার প্রাচীন ভারত ও মিশরের সুকুমার-শিল্পের কীর্ত্তি গাহিয়া থাকেন।"

আশ্চর্য্যের বিষয় আল্পনায় এই Post-Impressionismএর প্রভাব দেখিতে পাই। আল্পনার মানুষ, পাখী, মাছ, গাছ, ঘোড়া, হাতী, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা, এমন কি হাট-বাজার, রান্নাঘর প্রভৃতির যে সমস্ত ঠাট দেখিতে পাই তাহা প্রাচীন বঙ্গের শিল্পী মহিলার 'আদর্শ বস্তু'র (Model) Post-Impressionism অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুর পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্জ্জিত অথবা পরিকল্পিত চিত্র।

এই Post-Impressionismএর প্রভাব আল্পনায় আছে বলিয়াই আল্পনাকে উচ্চাঙ্গের শিল্প বলিতে পারি। কিন্তু ইহা অতি বড় সত্য কথা যে ঐ একই কারণে আল্পনাকে আজ আধুনিক নারীর বা সমাজের অবহেলার সামগ্রী হইতে হইয়াছে। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি।

শিল্পীর মন সর্ব্বদা নূতনকে চাহে, পুরাতনকে নিয়া তাহার একদণ্ডও চলে না। তবে এই জগৎকে ডিঙ্গাইয়া তো কিছু করা চলে না! তাই শিল্পীর কাজ জগৎকে প্রতিনিয়ত নব নব রূপের ও ভঙ্গিমার ভিতর দিয়া দেখা। একদিন এই ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পসাধকেরা নিত্য নব নব রূপের সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। নানা মন্দিরে নানা গুহাভ্যন্তরে এখনও তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। একদিন প্রাচীন বঙ্গনারীর নব নব রূপের কামনার ঐকান্তিক সাধনায় এই আল্পনা-শিল্পের জন্ম ঘটিয়াছিল।

কিন্তু সাধারণ মানুষ তো নূতনকে চাহে না, পুরাতনকে নিয়াই তাহার দিন ভাল কাটে। সাধারণ মানুষ চাহে স্থূল বস্তু,—অগত্যা তাহার হুবহু প্রতিকৃতি।

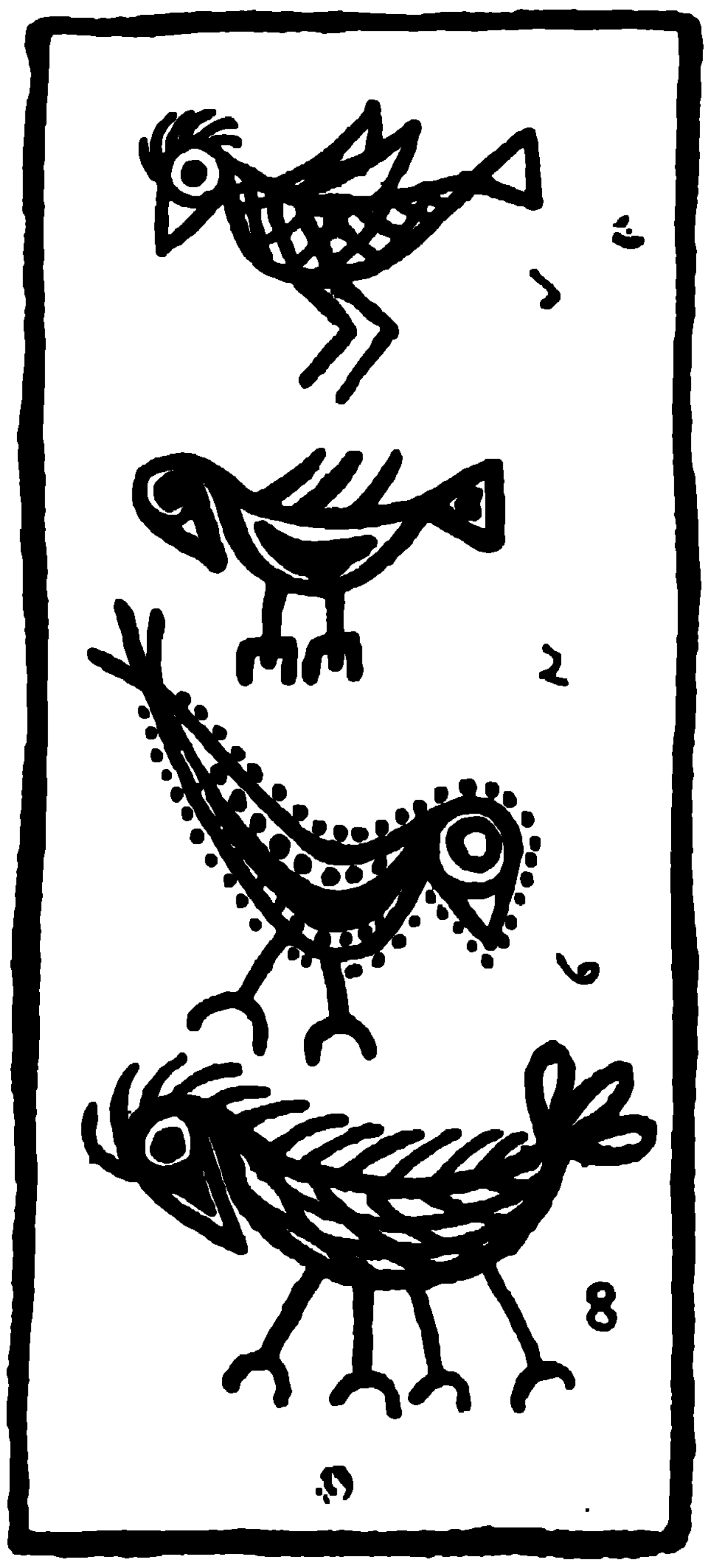

১ উড়ন্ত পাখী। ২ ব্রতকথার আল্পনার একটি পাখী। ৩ ডুম-খোর (?) পাখী। ৪ চারপা-ওয়ালা পাখী।

আল্পনার এই Post-Impressionism সাধারণ মানুষের কখনও ভাল লাগে নাই। তাহারা কখনও ইহার

মর্ম্মও বুঝে নাই। বিশেষতঃ পুরুষ তাহার কাজের ভিড়ে ইহাকে আমোলই দিতে চাহে নাই। নারীজাতিই আল্পনার সৃষ্টি ও পালন কর্ত্রী। প্রাচীন বঙ্গনারীর ইহা নব নব সাধনার ফল স্বরূপ রসগ্রাহী মনের আনন্দের সামগ্রী; সুতরাং অরসিক সাধারণের নিকট আল্পনার প্রাকৃতিক বস্তুর Post-Impression চিরকাল হেঁয়ালীই রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপে জনসাধারণের অনাদরে ও হয় তো কোন কোন ঐতিহাসিক কারণে একদিন আল্পনার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তারপর হইতে আল্পনার নব নব ঠাটের জন্ম অকল্পিতই রহিয়া গিয়াছে। হয় তো রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বিপ্লবে বঙ্গনারীর শিল্পসাধনায় ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকিবে। তারপর হইতে এ যুগ পর্য্যন্ত সেই পূর্ব্ববিশ্রুত 'ঠাট'গুলিকে মহিলারা পূজা বা ব্রতের উপকরণ হিসাবেই গণ্য করিয়া আসিতেছেন; কেহ তাহাকে সাধনার বস্তু হিসাবে দেখেন নাই বা কোন নূতন 'ঠাটে'র আবিষ্কারও কেহ করেন নাই।

"কাজল-লতা"
('জমাট' পদ্ধতির দৃষ্টান্ত)

কিন্তু যাহারা এই মৃত শিল্পকে এতাবৎকাল বহন করিয়া আসিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা চিরকালই ভাবিয়াছে যে ইহা তাহাদের অক্ষমতার পরিচায়ক। বাস্তবিক কেবল পূজাপার্ব্বণের জন্যই তাহাদের 'আঁকজোক' কাটিতে হয়। যাহারা উহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের উপাসক নহে, রসগ্রহণের অধিকারী তাহারা হয় নাই। এখনও যাঁহারা আল্পনা দিয়া থাকেন তাঁহাদেরও ঐ একই ধারণা—"এই যে পাখী আঁকিলাম এ তো আসল পাখীর মতো নয়, এই যে

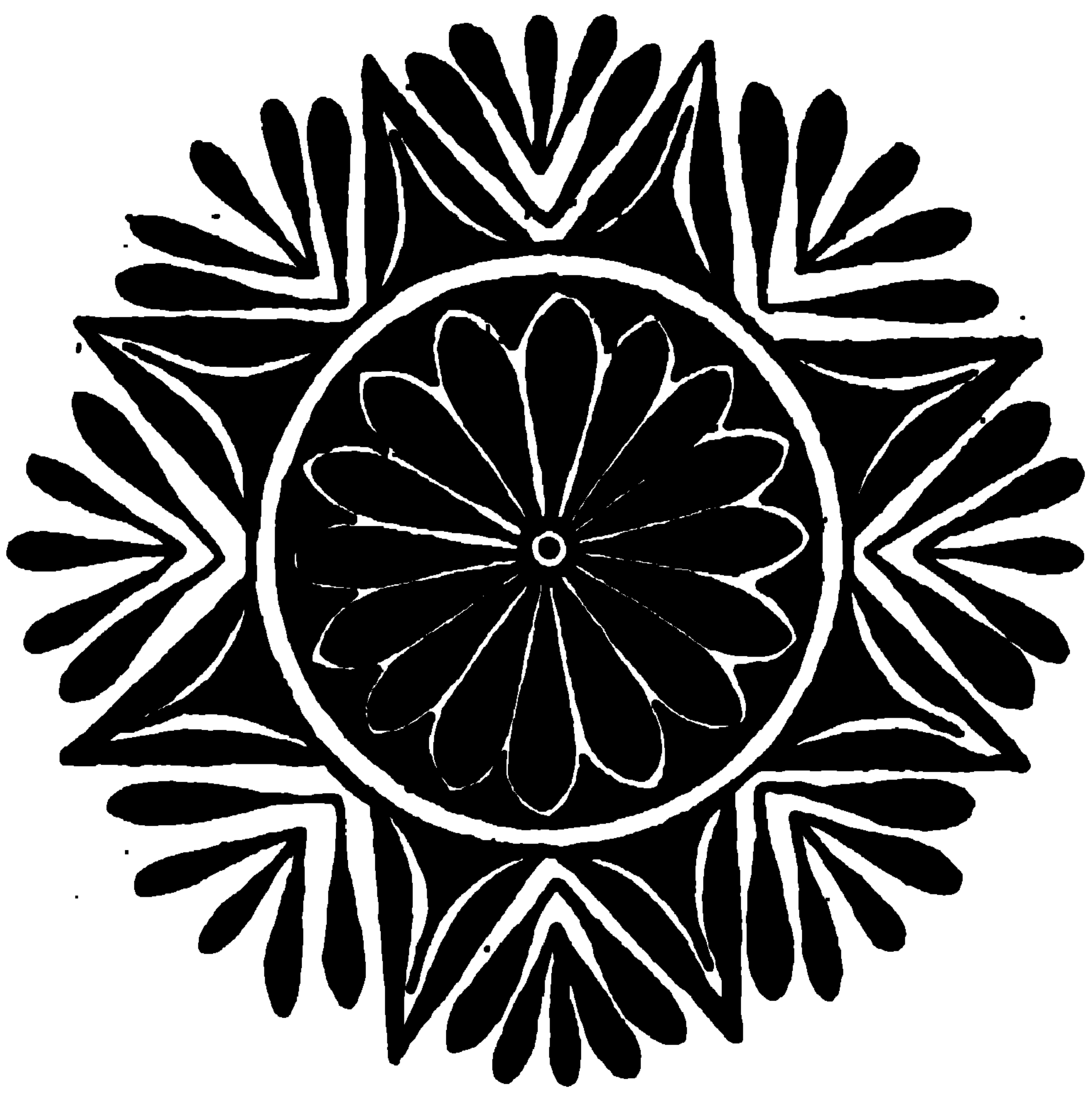

"ঘটলাজ" ('জমাট' পর্য্যায়ের দৃষ্টান্ত)

মানুষ আঁকিলাম এ তো আসল মানুষের মতো নয়, এই যে ধানের শীষ আঁকিলাম এ তো আসল ধানের শীষের মতো নয়,—এ আমাদের অক্ষমতা।" অরসিক সাধারণ মানুষও বলে—এ তোমাদের অক্ষমতা, ছেলেখেলা!

কিন্তু রসিক সমাজে আল্পনার অনাদর হইতে পারে না। আল্পনায় অতীত কালের নারী শিল্পীর মনের স্পর্শ পাই। প্রাচীন নারী শিল্পীরা কোন
বস্তুর যথাযথ নকল করেন ন　　ন্তর মনের রং মিশা-
ইয়া তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টি।
যে সুপ্রাচীন কালের সা
মার্জ্জিতরুচি-সম্পন্না হই
কে আল্পনায় গ্রহণ ক
নিজের মনের স্বাধীন
শক্তি! আজ যে
নানা বস্তুর 'ঠাট'গু
ইহার রস কেহ গ্রহ
আমাদের পুরুষ

অভাব। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা ছিল আজ তাহা নাই কেন?—ইহার উত্তর কে দিবে?

আল্‌পনার যে সমস্ত 'ঠাট' আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অঙ্কন করিবার সহজ ও অনাড়ম্বর কৌশলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ কৌশল না জানিলে কোন 'ঠাট্'ই শুদ্ধ বা যথাযথরূপে অঙ্কিত করা যাইবে না। অল্পপরিসর প্রবন্ধে প্রত্যেক ঠাটের অঙ্কনকৌশল আলোচনা করা অসম্ভব, তবে দুই একটি ঠাটের অঙ্কনকৌশলের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। 'গোড়াগুড়ী' নামক জোড়া-পাখীর * একটিকে ধরা যাইতেছে। (চিত্রে দ্রষ্টব্য) প্রথমে কেবল

লক্ষ্মীপেচকের ছবিটি প্রাকৃতিক পাখীর কাঠামো রাখিয়া অঙ্কিত। এইরূপে গরু, ঘোড়া, হাতী, কুম্ভীর প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর অবয়বের খুঁটিনাটি (details)-গুলিকে বাদ দিয়া মূল কাঠামো ঠিক্ রাখিয়া বহুবিধ ঠাট আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং ঐ সমস্ত ঠাট শিল্পীর প্রাকৃতিক প্রাণী বা বস্তুর Anatomy জ্ঞানের পরিচায়ক। কারণ সাধারণতঃ অবয়বের মোট গতির উপর রেখাঙ্কনের ভিত্তি। এমনও দেখা যায় একটি রেখা (গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হেঁচি-করকচি' পাখী দ্রষ্টব্য) পুচ্ছ হইতে একটানে মস্তকের গঠন হইয়া চোখের

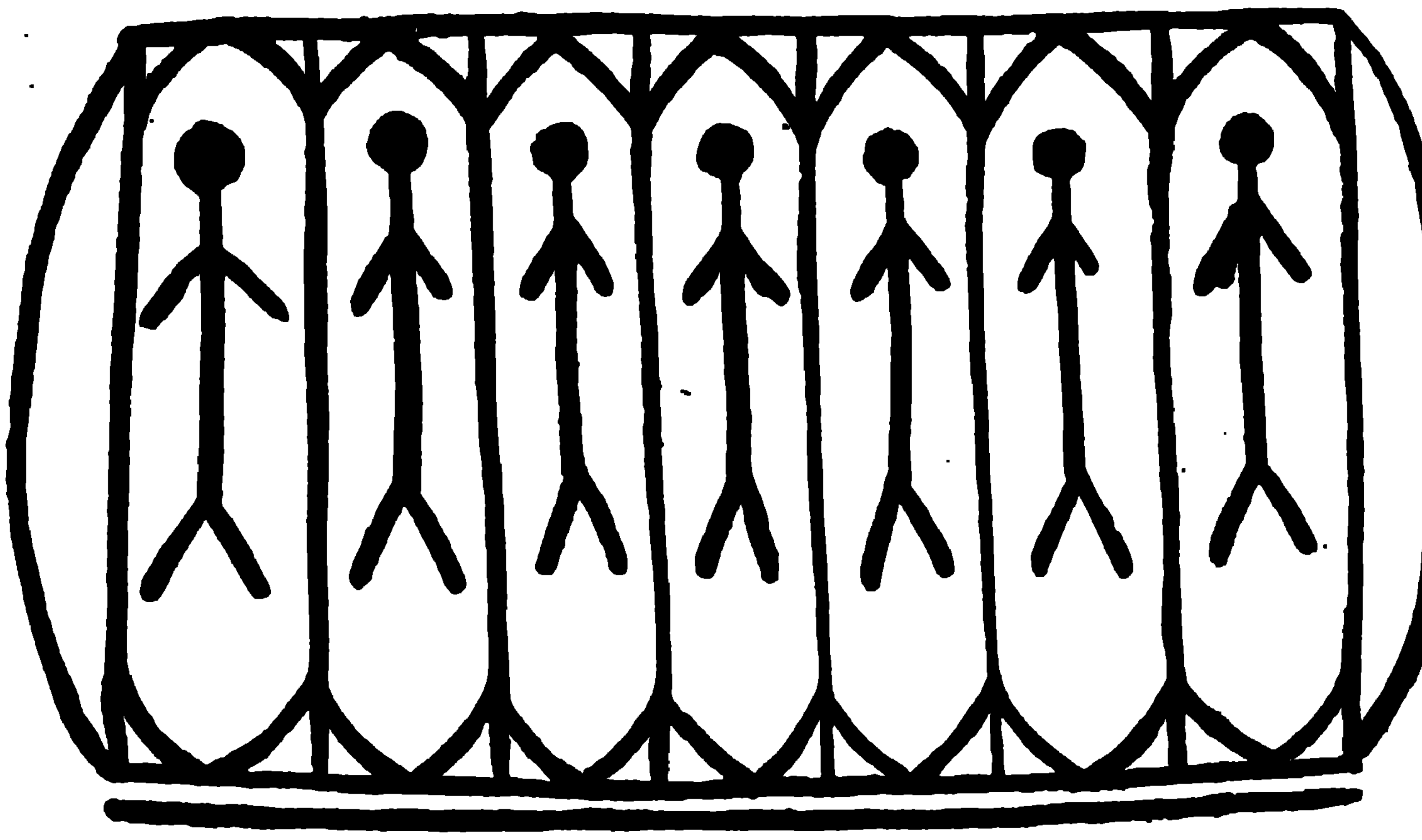

ব্রতকথার আল্‌পনার একটি দৃশ্য (সাত সতীন)

মাত্র মূল কাঠামোটিকেই অঙ্কিত করিতে হইবে, তৎপরে মস্তক, পুচ্ছ, পরে অন্যান্য খুঁটিনাটি (details)। বস্তুতঃ কোন ঠাটেই মূল বস্তুর কাঠামোকে একেবারে বাদ দেওয়া হয় নাই বরং তাহা অতি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত রক্ষিত হয়। শিল্পী বাহ্য আবর্জ্জনার ভিতর হইতে প্রত্যেক বস্তুর মূল কাঠামোটিকে (Block) অতি আশ্চর্য্যরূপে বাহির করিয়াছিলেন। তবে অনেক স্থলে অতিরঞ্জনের পরিচয় পাই। কিন্তু তাহা দোষাবহ নহে। তাহা Post-Impression বা শিল্পীর মনের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ। ১, ২, ৩, ৪ নং পাখীগুলিতে উহার পরিচয় পাই। ৪নং পাখীটির চারীখানি পা—উহার পুচ্ছটি তিনটি পাখার সমাবেশে সৃষ্ট।

অবস্থানে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এবং ঐ শেষ অর্থাৎ যে-স্থলে চোখের অবস্থান, সে স্থলটিকে বাঁকাইয়া বর্ত্তুলাকার করিয়া পাখীটিকে চক্ষুদান করা হইয়াছে। পাখীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান (Anatomy) সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান না থাকিলে একটানে এইরূপ রেখাঙ্কন অসম্ভব। গাছের 'অবয়ব' সম্বন্ধেও ঐরূপ শিল্পীর পূর্ণজ্ঞানের পরিচয় পাই। * সুকৌশলে কাঠামোটিকে বাহির করা হইয়াছে। দুই পার্শ্ব বক্র, কেবলমাত্র দুইটি পাতার যথাযথ অবস্থানে সুপারী গাছের পাতার প্রকৃতি বা বক্রতার আভাস পাই। অল্প দুই চারিটি ফলেই 'ফলবানের' ইসারা দিয়া যায়। এইরূপে অল্প নিদর্শনে মূল কাঠামোতেই গাছটি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু ইহার

* গত [illegible] সালের বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত 'গ্রামের আল্‌পনা' প্রবন্ধের সহিত জোড়াপাখীর ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

* গত জ্যৈষ্ঠের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য।

তলেও যে শিল্পীর সংযম ও চিন্তাশক্তির পরিচয় আছে তাহা অনুভব ক'রবার বিষয়।

আল্‌পনায় নানা বস্তুর Post-Impression অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুর পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জ্জন ও পরিকল্পন কতখানি বা কি কৌশলে করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করিবার বিষয় কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে সম্ভব নহে, কারণ আল্‌পনার প্রচলিত সমস্ত ঠাটগুলিকে একত্র সংগ্রহ করা অনুসন্ধান ও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের দেশে যেমন উৎসাহী লোকের তেমনি অর্থেরও অভাব। ইহা সত্য যে আর অন্ততঃ পাঁচ-দশ বৎসরের ভিতর চেষ্টা না করিলে, কাল-প্রভাবে সমস্তই লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু কয়জনে ইহার কদর বুঝে? শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় বাবুর ভাষায় বলি—

"নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—
মহামূল্য জিনিষ এ।"

আল্‌পনার বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করা যায় ততই দেখিয়া অবাক হইতে হয় যে প্রত্যেক বস্তুকেই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ (study) করা হইয়াছে। অতি সামান্য বস্তুর যথাযথ অবস্থানেও অতি চমকপ্রদ রসজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যেমন একটি মন্দির—ভিতরে কোশাকুশী প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতে শিব ঠাকুর, পূজারী ঠাকুর প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় নাই। মন্দিরের উপরে ত্রিশূল পোঁতাও আছে, কিন্তু তার পরে আরও আছে—একটি অতি ছোট্ট পাখী। উড়িতে উড়িতে শ্রান্ত পাখী বসিবার হয় তো কিছু পায় নাই, অবশেষে উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূলের উপরে গিয়া বসিয়াছে। কত তুচ্ছ ঘটনা—ইহা তো সচরাচরই ঘটে—কিন্তু কয়জনের এটা চোখে লাগে? এই যে সূক্ষ্ম-রস-বোধ, এই যে নিখুঁত পর্য্যবেক্ষণ, আল্‌পনায় এরূপ বহু বহু পরিচয় পাই। নাট-মন্দিরের—

বাইরে হাতী,
—দুয়ারে ঘোড়া!

অর্থাৎ নাট-মন্দিরে গান-বাজ্‌না, মজ্‌লিস চলিতেছে। ধনী দরিদ্র বহু লোকের সমাগম; কেউ আসিয়াছে হাতী চড়িয়া, কেউ আসিয়াছে ঘোড়া চাপিয়া! নাট-মন্দিরের ভিতরে যখন পুরা মজ্‌লিস চলিতেছে, সিং-দরজার বাহিরে ঘোড়া, হাতীগুলিকে সহিস বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মজ্‌লিসের গোলমালেও নারী শিল্পীর দৃষ্টি সেদিক এড়ায় নাই! রান্নাঘরে বিড়ালের আনাগোনা, পাল্কী-বেহারাদের হাতের লাঠি, পাল্কীর মধ্যে তাকিয়া বালিস, ইত্যাদি তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের ফল সন্দেহ নাই।

ব্রতকথার আল্‌পনায় (বেল্‌পুকুর) জোড়া-পাখীর ঠাট দেখিতে পাই। নাম হইতে বুঝিতে পারি—একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। স্ত্রীপুরুষের যুগল চিত্র—ইহা ঐক্য ও ভালবাসার প্রতীক। বঙ্গনারীর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসার কামনা হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া মনে হয়। বনের পাখীর মধ্যেও শিল্পী প্রেমের বন্ধন অনুমান করিতে ভোলেন নাই! ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

আল্‌পনায় সব চাইতে যাহা সুন্দর ও মনোহারী তাহা রেখাঙ্কনকৌশল। এই রেখাঙ্কনের সময় তিনটি জিনিষের উপর শিল্পীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে—গতি (Motion), অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (Anatomy) মূল-কাঠামো (Form) এবং সমতা (Balance)। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আল্‌পনা কেবলমাত্র রেখাঙ্কনের কৌশলেই সৃষ্ট, রংয়ের বিভিন্নতা বা আলোছায়ার সমাবেশ দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক বস্তুর Post-Impression অর্থাৎ পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন কার্য্যে 'রেখাঙ্কনকৌশল' অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে কোন কোন স্থলে শিল্পীর মনোভাব প্রকাশকালে রেখাঙ্কনের অত্যাবশ্যকতায় অল্পাধিক ব্যত্যয় ঘটিয়াছে; তবে সর্ব্বত্র সুসামঞ্জস্যই চোখে পড়ে।

এমনও দেখা গিয়াছে যে, মাঝে মাঝে দুই রেখার মধ্য-বর্ত্তী স্থান 'গোলা' দিয়া পূরিয়া আল্‌পনাটিকে 'জমাট' করা হয়। বিশেষতঃ 'ক্রমবর্দ্ধিত' আল্‌পনায় ও ব্রতকথার আল্‌পনার কোন কোন ঠাটে ঐ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হেঁচি-করকচি' ও 'গোড়াগুড়ী' নামক দুই জোড়া পাখীর ছবির তুলনা করা যাউক। গোড়াগুড়ী কেবল মাত্র রেখাঙ্কনের কৌশলেই সৃষ্ট কিন্তু 'হেঁচি-করকচি' কেবলমাত্র রেখাঙ্কনের কৌশলেই সৃষ্ট নহে, বস্তুতঃ উহা

সাদা-কালোর (black and white) * সমাবেশ দ্বারাই সৃষ্ট। কিন্তু ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহাতে কালো-সাদার সমাবেশ (combination) অতি নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে, কোথাও হাল্কা কোথাও ভারী (light and heavy) করা হয় নাই। ইহা আরও আশ্চর্য্যের কথা যে ইহা একটি পাখীর চিত্র নহে পরন্তু দুইটি পাখীর যুগল চিত্র। এতদ্ভিন্ন পাখী, গাছ, লতা, প্রভৃতি কালো-সাদার সমাবেশে (combination) সৃষ্ট আল্পনা সুপ্রাচীন কালের নারী শিল্পীর কালো সাদার সমাবেশ-জ্ঞানের কম দক্ষতার পরিচায়ক নহে। বরং আল্পনারও অনেকটা আধুনিক 'কাষ্ঠখোদাই' (Woodcut) পদ্ধতির খণ্ড খণ্ড 'এ-কোট' রংয়ের সাহসিক (Bold) প্রয়োগের মতো কালো-সাদার সমাবেশের পরিচয় পাইয়া অবাক হইতে হয়।

কিন্তু এখনও এই 'জমাট' বা 'এ-কোট' পদ্ধতির পরিচয় বেশী পাওয়া যায় নাই, ইহা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। আমি একটি 'কাজল-লতা'র ঠাট পাইয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ 'জমাট' পদ্ধতির। একটি বৃত্তাকার আল্পনাও আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহাও 'জমাট' বা 'এ-কোট' প্রকৃতির। উহা বৃত্তাকার আল্পনার 'ক্রমবর্দ্ধিত' ও 'ক্রমপুষ্ট' উভয় পর্য্যায় হইতেই ভিন্ন পর্য্যায়ের। অন্যান্য আল্পনার সহিত উহার তুলনা করিলে, উহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলিয়া সন্দেহ হয়। সাধারণতঃ পূজার সময় ঘট স্থাপনা করিতে এই আল্পনাটির ব্যবহার হয় বলিয়া উহার নাম ঘট-লাজ'। উহার 'লতা'গুলির নাম 'পটী'। অন্যান্য বৃত্তাকার আল্পনার 'লতা' হইতে 'পটী' ভিন্নপ্রকৃতির। বারান্তরে ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। *

* আপনারা হয় তো মনে করিবেন আল্পনার আবার কালো-সাদা কি? উত্তর—যখন সাদা কাগজের উপর ছবি আঁকা হয় তখন কালির রং কালো ও কাগজের রং সাদা পাই। কিন্তু আল্পনার চাউলের গোলা সাদা এবং মাটির রং বা পাকা মেঝের রং একেবারে কালো না হইলেও সাদার প্রতিদ্বন্দ্বী তো বটেই।

* এই প্রবন্ধের ও আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধদ্বয়ের কোন কোন আল্পনা খুলনা জেলার কাঁঠাল নারীমঙ্গল সমিতির সভ্যা—শ্রীমতী শৈবলিনী বসু, সুশীলাবালা মিত্র, স্নেহলতা মিত্র, সরসীবালা রায়, যাদুমণি ঘোষ, লক্ষ্মীমণি বসু প্রভৃতি কতিপয় মহিলার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি। শেষোক্ত দুই জন মহিলা অশীতিপর বৃদ্ধা। তাঁহারা চোখেও ভাল দেখেন না এবং আল্পনা দিতে গেলে হাতও কাঁপে। তৎসত্বেও বহুকষ্টে আমাকে কয়েকটি বহুমূল্য আল্পনা দিয়া ও ব্রতের 'ছড়া' বলিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। ইহা সত্য কথা, তাঁহাদের অঙ্গুলির আল্পনা আমি তুলির টানে যথাযথ নকল করিতে পারি নাই।

গান

অধ্যাপক শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

ঝরিছে করুণা-ধারা, ধরে না সে ধরে না।
তবুও মরুর তৃষা মরে না রে মরে না।
চায় চায়-আরও চায়, পায় সে যে আরও পায়,
ধরিয়া রাখিতে চায়, ভরে না রে ভরে না।
মেটে না মেটে না আশা, বেদনে বাড়ে পিপাসা-
তৃপ্তি যেন এ বেদনা হরে না রে হরে না!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মধ্যমণি

শ্রী সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন বৌ ঘরে এসেছে।

বৌ রূপসী বটে। ঢুলু ঢুলু চোখ, আমার মতোই নাক, কালো ভোম্‌রার মতো একপিঠ্‌ চুল। মুখখানিও সুশ্রী—তদুপরি যৌবনোল্লসিত দেহে দীপক রাগিণীর সুর গুঞ্জরিয়ে উঠ্‌ছে। জননীর ওষ্ঠপুটে আনন্দের হাসি ছল্‌কে পড়্‌তে চায়। আমারো চোখে মুখে দুষ্টু হাসি লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা সুরু করে' দিয়েছে। আমি ভাবি আর হাসি।

এম্‌নি ভাবে একটি করে' মাস কেটে যায় আর সুখের নেশা কোথায় কোন্‌ পাঁকের নীচে তলিয়ে গিয়ে কী যেন এক দুঃস্বপ্নের মত কি একটু করে' উঁকি মারে।

এ যাবৎ বৌর রূপের বার্ত্তাই পেয়ে এসেছি; কিন্তু গুণের দলগুলো যেম্‌নি একটি একটি করে' বিকশিত হ'তে লাগ্‌লো—মা'র মুখে হাসি মিলিয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠা কালো হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো!

আর আমার?

উৎকণ্ঠা বা তেমন কিছু না হ'লেও, আমিও চমকিত হলাম। বৌটির আমার স্বভাবজাত গুণ আঙুরের বাক্সে ঢেকে রাখ্‌বার বস্তু নয়;—এতই তার উত্তাপ যে,সে আপনি ফেটে বেরিয়ে পড়ে। বস্তুতঃ বৌকে কলহপ্রিয়া বল্‌লে সংস্কৃত ভাষায় তাকে উপাধি দেওয়া হয়। এম্‌নি জাতের মেয়ে মানুষের নাম শুনেছি কিন্তু তা যে এসে একদিন আমারি ঘাড়ে চেপে বস্‌বে,—তা আমি কি করে' ভাব্‌বো! এমন বিজাতীয় দজ্জাল মেয়েমানুষ নিয়ে ক'দিন ঘর করা চল্‌বে বা চল্‌তে পারে,সে বিষয় নিয়ে চিন্তা কর্‌বার ভার আপাততঃ মা'র ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি আবার বাইরে এসে তাস-পাশার আড্ডায় জমে' গেলাম। মা ভালোমন্দ বিহিত একটা কর্‌বেনই।

কিন্তু বাইরে থেকেই খবর পেয়েছি—মা নাকি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন,—ও বৌ নিয়ে নাকি ঘর করা চল্‌বে না।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই মা একদিন আমায় ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—বাঁকা, আমি আর পারিনে। আর একটা বৌ ঘরে নিয়ে এসো। একে বাড়ী পাঠিয়ে দাও; সংসার করা একে দিয়ে চল্‌বে না।

আমি উত্তরে বল্‌লাম—এত বড়ো একটা পাপের কাজ...

মা আমার মুখ থেকে কথাটি কেড়ে নিয়ে খানিকটা উষ্ণ হ'য়েই বল্‌লেন—কী পাপের কাজ! তোমার বাপ্‌-খুড়ো ক'টি বিবাহ করেছিলেন বা তোমার ঠাকুরদা'ই ক'টি করেছিলেন—তোমার জানা নেই? এম্‌নি করে' তুমি আমার মুখের ওপর বল্‌তে চাইছো যে, তাঁরা সব অন্যায় পাপ...

আমি জিব্‌ কেটে বল্‌লাম—তা ঠিক আমি বল্‌তে চাই না, তবে কিনা—আরো কিছু দিন দেখা যাক্‌। মানুষের স্বভাব কিছু বলা ত যায় না—বদ্‌লাতেও ত পারে!

তার পর মা আর কিছু দিন কিছু বলেননি।

এম্‌নি সময়ে আমার জীবনের দ্বিতীয় সর্গের দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'লো।

আর এই জন্যই প্রতি পদক্ষেপে আমায় স্বীকার কর্‌তে হয়—আমি ভগবানের নফর। আর আমার মতো এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ভগবানের নফরত্ব যে-কেহই স্বীকার কর্‌তেন—তাও আমি জানি।

বাড়ীতে একটি নিদারুণ বার্ত্তা এসে পৌঁছলো -মামা-বাবুর মৃত্যুসংবাদ। মা শুনে অবধি অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন এবং দু'দিন অবিশ্রাম শোকপ্রকাশের পর আজ তিনি অনেকটা সুস্থ হয়েছেন।

শোকাচ্ছন্ন তিনটি দিন-রাত্রি কেটে যাবার পর, চতুর্থ দিন সুপ্রভাতে আমাদের বাড়ীর আঙিনায় অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় হ'লো। ঘুম ভাঙলে চোখ চেয়ে দেখি আমাদের বাড়ীর

বাইরের প্রাঙ্গণে একটা হৈ রৈ ব্যাপার,—অশ্রান্ত কলরব, একটা অস্থিরতার উষ্ণ প্রস্রবণ।

পাঁচ পাঁচটি হাতী—তাদের কপালে জরীর ঝালর, পিঠে জরীর মস্‌লন্দের ওপর সোনারূপার কাজ করা হাওদা। পাঁচ পাঁচটি হাতীর ওপর পাঁচজন জরীর চাপকান পরা মাহুৎ—হাতে একটি করে' রূপার অাঁকুশ। তারি পিছনে—একটি রূপার তাঞ্জাম, ছুটি লাল বনাতের টোপ দিয়ে ঘেরা পাল্কী, তারপর—পর পর সাজানো, বন্দুকধারী সেপাই, বল্লম, সুল্‌পি, আসাসোটা, ঢাল-বল্লম-ধারী সর্দ্দার, লাঠিয়াল, পাইক—একটা অগণিত জনসঙ্ঘ।

স্বপ্নের মতোই মনে হয় বটে। কিন্তু এ স্বপ্ন নয়, আরব্য-রজনীর গল্প নয়, পাতালপুরীর কাহিনীও নয় বা ঠাকুরমা'র বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর রূপকথাও নয়। এ আমার কল্পরাজ্যের বাস্তব ছবি। ভাব্‌তে গেলে হয় ত মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, হয় ত মনে হ'তে পারে যে গোল পৃথিবীটা দ্রুত পাক্ খেতে খেতে কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু পৃথিবী তেম্‌নি সবল, সুস্থির, স্বগতিতে চল্‌ছে।

আমার মামা ছিলেন চক্‌দীঘির জমিদার। মস্ত বড়ো জমিদার। মামীমা মরে' যাবার পর মামা বাবু আর বিবাহ করেননি। আর, দ্বিতীয়বার বিবাহ কর্‌লেও যে তাঁর আর বংশরক্ষা হবার কোন সম্ভাবনা নেই—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল সুনিশ্চিত। দেশে পাড়াগাঁয়ে তিনি বড় একটা থাকতেন না। কল্‌কাতা আর লাক্ষ্ণৌতে ছ'মাস করে' কাটাতেন। দেহের ওপর অত্যাচারও করেছিলেন প্রচুর। তাঁর জীবিতকাল পর্য্যন্ত, তাঁর মৃত্যুর পর এই বিশাল সম্পত্তির ভাগ্যবান ওয়ারিশটি যে কে—তা কেউই জান্‌তো না—আমরাও না। তার পর কথাটা যতই বিস্ময়কর হোক্ না কেন, মামা বাবুর এই অকস্মাৎ মৃত্যুর পর তাঁর উইলে নাকি এই আমারি নাম খুঁজে' পাওয়া যায়। তাই মামার শূন্য সিংহাসনে বসবার জন্য আমার ডাক এসেছে।

মা'র আর শোক নাই—চোখে মুখে আজ হাসি যেন উছ্‌লে পড়্‌তে চায়। কাছে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করে' অনেক কথাই বল্‌তে চেয়েছিলেন—কিন্তু তার বাধা হ'লো আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কম্পিত ওষ্ঠ দু'খানি। বল্লেন মাত্র—চলো বাবা, ভগবান তোমার রাজদণ্ড হাতে তুলে' ধরে' দিচ্ছেন; তাঁর আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচের মতো তোমায় ঘিরে' থাকুক···ইত্যাদি।

মাকে বল্লাম—ভালো কথা; কিন্তু তাসপাশার আড্ডার লোকগুলো কিন্তু আমি সঙ্গে নিয়েই যাবো।

মা বল্লেন - বেশ, তাই নিয়েই চলো।

মা আমার রাজমাতা হ'য়ে, বৌ রাজরাণী হ'য়ে পাল্কীতে গিয়ে চড়ে' বস্‌লেন। আমি রাজা হ'য়ে তাঞ্জামে গিয়ে উঠ্‌লাম। পাঁচটি বন্ধুকে পাঁচটি হাতীর ওপর চড়িয়ে দিলাম।

অগণিত জনসঙ্ঘের দ্রুত পদশব্দ, বেহারাদের অজস্র তুল্‌কি বুলি, সর্দ্দারদের হল্লাধ্বনি, সব মিলিয়ে যাত্রাসমারোহ ঐশ্বর্য্যের ধূলি উড়িয়ে চল্‌লো। সর্ব্বাগ্রে আমার তাঞ্জামের অগ্রভাগে রৌপ্য-মকর-শোভিত ডাণ্ডাটি পথযাত্রীর কোন ত্রাস সঞ্চার কর্‌তে না পার্‌লেও—আভিজাত্যের গর্ব্ব নিয়ে উঁচু হ'য়ে সম্মুখবর্ত্তীকে শাসিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

মামার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হ'য়ে বসেছি। এর ভেতর ম্যানেজার ও এম্‌নি ধারার কয়েকজন পদস্থ কর্ম্মচারী এসেছিলেন, আমায় মাথা চুল্‌কিয়ে অভ্যর্থনা ও কিছু মিষ্ট-বাণী প্রচার কর্‌তে। তাঁদের অতিবিনয় ভাবটা আমি সহ্য কর্‌তে পারিনি। তাই মুখের ওপরই স্পষ্ট বলে' দিয়েছিলাম—মশাই, অরলিং-কর্‌লিং করবেন না, ওগুলো আমি ভালোবাসিনে।

ম্যানেজার ও তাঁর বাহিনী হতভম্ব হ'য়ে, চোখগুলো বিস্ফারিত করে' চলে' যাচ্ছিলেন। দেখে আমার একটু করুণা হ'লো—তাই ডেকে আবার বলে' দিলাম—দেখুন দুঃখিত হবেন না; আমার সোজাসুজি স্পষ্ট কথাই বল্‌বেন—ওতেই আমি খুশী হবো বেশী। তাঁরা চলে' গেলেন।

মিথ্যা এর ভেতর বিন্দুমাত্র নেই। এ অতীব সত্য কথা যে—এই সব রাজা-নাম-ধারী বাবুদের নষ্ট করে এম্‌নি ধারারই সব লোক। তৈলমর্দ্দন করে' করে' এঁদের এমন দশা করে' ফেলে যে শেষকালে এঁরা নিজেরাই নিজেদের

খুঁজে' পান না—দাম্ভিক উন্মত্ততার মধ্যে কোথায় যে তাঁরা জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেন তার নিকাশ করতে পারা পায় না। আর মনুষ্যত্বের নিক্তিতে ওজন করলেই যে এঁদের কি থাকে আর কি থাকে না—তাও তাঁরা বোঝেন না। এঁরা ভাবেন হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যায়;—তা যে যায় না, আমি তা জানি বলেই পছন্দ করিনে। রাজা হ'য়ে এমনি ধারায় শাসন ও সংরক্ষণ নিয়ে আমার দিনগুলো ভালোই চল্‌ছিল। দশজনের কানাকানিতে শুনতে পেতাম—নতুন রাজার রাজ্য নাকি কলিযুগের দ্বিতীয় রামরাজ্য! শুনে' হাসিও আস্‌তো, আনন্দও হ'তো, ভগবানের চরণে প্রণতিও জানাতাম। কিন্তু মানুষ হ'য়ে যখন জন্ম নিয়েছি তখন সুখ-দুঃখ দু'টাকেই জড়িয়ে থাক্‌তে হবে বৈকি?...ভেবেছিলাম বৌ-রাণী হ'য়ে বৌর স্বভাব অন্ততঃ কিছু বদ্‌লাবে; কিন্তু সে ধারণা আমার ভেঙে গেছে। কথায় বলে 'মলে' যায় না স্বভাব'—কথাটি সত্য।

সেদিন আমায় অন্দরে ডেকে নিয়ে মা ভারী আপ্‌শোষ কর্‌ছিলেন। বল্‌ছিলেন—হয় আর একটা বিয়ে কর, না হয় আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না; এ বৌ নিয়ে আমি ঘর কর্‌তে পারবো না, অন্য কারো পারাও অসম্ভব।

অসম্ভব, পারা যে আর চলে না—বিশেষতঃ অন্যের পক্ষে—সে আমিও বুঝি। মা যদিও বা বৌর ছোটো-খাটো দোষগুলো এড়িয়ে চল্‌তে পার্‌তেন—তা তিনি পারেন না। জমিদারের মেয়ে—মানুষের কাছে মাথা নত করা জন্মগত অনভ্যাস।

কিন্তু তা যদি একটু আধটু পার্‌তেন,—বৌকে যদি সে সুযোগ অল্পবিস্তর দেওয়া হ'তো, তা হ'লে সম্পূর্ণ না হ'লেও কিছু বদ্‌লালে বদ্‌লাতেও বা পার্‌তো। মন্দ যে,—অষ্টপ্রহর যদি তার কানের ভেতর ঐ কথাটুকুই ঢেলে দেওয়া যায়—ভালো সে হবে কোত্থেকে? মা সহ্য মোটে কর্‌তে পার্‌তেন না। বৌ এক কথা বল্‌লে মা তাকে দশ কথা শুনিয়ে নিস্তেজ করে' রাখ্‌তেই চেষ্টা কর্‌তেন। যাক্‌—সে নিয়ে মা'র সঙ্গে প্রতিবাদ করার শক্তি আমার অন্ততঃ নেই। মা'র কথার উত্তরে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে' দিলাম—আমাকে জিজ্ঞেস করা অনাবশ্যক। বাঙলাদেশে মেয়ের অভাব নেই—বিশেষতঃ আমার মতো রাজপাত্রের ক'নের অভাব হবে না। খোঁজ কর, পছন্দ কর, তারপর সব ঠিক করে' আমাকে জানিও—বিবাহ-মণ্ডপে পাবে।

কথাটা মাত্র মুখ দিয়ে বের করেছি,—অম্‌নি দেখি দিন কয়েকের মধ্যে অবিশ্রাম মেয়ে-ঘটক ও পুরুষ-ঘটকের গতায়াত সুরু হ'য়ে গেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুনি যে এই মাসের একুশে নাকি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির।

মনটা কি জানি কেন আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌লো। তাই দিনরাত্রি আবার পাশার ছক নিয়ে বসে' গেলাম। বন্ধু-মহলে হাসিঠাট্টার তূর্য্যধ্বনি আমার কানে গিয়ে বিশ্রী ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। কি আর করি! সইতে হ'লো।

।দন যায়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একুশে তারিখ এসে পড়্‌লো। মহা ধুমধামের সঙ্গে একুশের গোধূলি-লগ্নে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন হ'য়ে গেল।

মুখচন্দ্রিকার সময় বৌ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে দু'দণ্ড একদৃষ্টে চেয়ে ছিলাম। ইরানদেশের শকুন্তলা না হ'লেও বৌ অপরূপ সুন্দরী! অমন রূপ নাকি সচরাচর চোখে পড়ে না,—মা'র মুখেই শুনেছি। আরো শুনেছি—মা নাকি পাঁচ সাতটি পরগণা সেঁচে এমন মাণিক ঘরে এনেছেন। এ বৌ আমাদের ঘরে মানায় বটে!

ভিতরে এসে মা'র মুখখানি দেখে আমার ভেতরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লো। আহ্লাদে যেন একেবারে ফুলে' উঠ্‌লাম।

আবার পরক্ষণেই বাইরের বারেণ্ডার জানালার ভেতর হ'তে বড়ো বৌর দুটি হিংস্র চক্ষু দেখে মর্ম্মাহত হ'য়ে ঠিক ততখানি নেমে গেলাম।

ভগবানকে স্মরণ কর্‌লাম কিন্তু মনে বল পেলাম না।

আমার সহ্যগুণ সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের ঢের বেশী, সে কথা আমিই বলি। গতানুগতিক জীবনের ধারা থেকে সে পরিচয় আমি নিজেই বহুবার পেয়েছি ও নিজেই সে কথা ভাব্‌তে গিয়ে বিস্মিত হয়েছি।

বড় বৌ রাগ করে' বাপের বাড়ী চলে' গেছে। মা

তাতে দুঃখিত নন বিন্দুমাত্র। নূতন বৌ রূপে গুণে অতুলনীয়। স্বভাব, চলন, মুখের ভাষা সবই তার নম্র। গরীবের মেয়ে—দুটো মিষ্টি কথা বল্লেই তুষ্ট হয়। তদুপরি রাজরাণী হ'য়ে এসেছে, তারো আনন্দের সীমা নেই,—আমাদেরো সোনার সংসারে আনন্দের জয়গান বেজে উঠেছে।

সন্ধ্যা বেলায় অন্দরে গিয়ে দেখি—সাদা মার্ব্বেল পাথরের উঠোনটার ওপর মা নূতন বৌকে সুন্দর পরিপাটি রূপে সাজিয়ে গুছিয়ে কোলে নিয়ে বসে' আছেন। বৌর পরনে একটি শালের শাড়ী আর তারি সাদা জমির ওপর সব বদ্‌সাদের সভা বসে' গেছে! গা'-ভরা হ্যামিল্টনের বাড়ীর জড়োয়া অলঙ্কার ঝল্‌মল্ কর্‌ছে। দূর থেকে দেখি আর চক্ষু জুড়িয়ে যায়—আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে,—নির্লজ্জের মত পলকহীন দৃষ্টিতে আবার চেয়ে দেখি। শালের গায়ে বাদ্‌সাদের ছবি দেখে হঠাৎ মনে হ'লো—যেন মূর্ত্তিগুলো জীবন্ত হ'য়ে আমার বেগমটিকে লুকে নেবার জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে। আবার কিছুক্ষণ পরেই চোখ চেয়ে জেগে থেকেই বৌকে দেখ্‌তে পাই—আগ্রা প্রাসাদের সুবাসিত ধারাচন্দ্রের মধ্যস্থলে অনবগুণ্ঠিতা সিক্তবসনা এ যেন আর এক নূরজাহান!

মা'র আহ্বানে স্বপ্ন ভেঙে গেলো।—নিজের খেয়ালে নিজেই হেসে উঠ্‌লাম।

মা বল্‌লেন—আয় বাঁকা, বৌর মুখ দেখ্‌বি।

ঘোম্‌টা তুলে' মা মুখখানি দেখালেন। নূরজাহানই বটে!—গায়ের হীরা চুনি পান্না জহরৎগুলি যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে।

মায়ের কোলের কাছে গিয়ে বসে' পড়্‌লাম। মা আমাকেও কোলে তুলে নিলেন। নিজের অন্তরের একটুখানি অনিচ্ছায় মা'র অন্তরে যে কতখানি আনন্দের সঞ্চার কর্‌তে পেরেছি—তুলনা কর্‌তে গিয়ে আমি আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেলাম। ইচ্ছে হ'লো—একবার মাথার উপরের উন্মুক্ত উদার আকাশটির সঙ্গে কোলাকুলি করে' আসি। জীবনে এমন আনন্দ বোধ করি একটি দিনও পাইনি।

সন্ধ্যার পর আবার ভিতরে এসে দেখি—মা শুয়ে আছেন। নূতন বৌ তার পায়ের ধারে বসে' বসে' পা টিপ্‌ছে। বড় বৌর সঙ্গে যে এর কতখানি প্রভেদ তা সে দেখ্‌তে পেলে না।

মাকে বলে' ফেল্‌লাম—বড় বৌকেও নিয়ে এসো মা, দুজনে একসঙ্গেই থাক্।

মা বল্‌লেন—রক্ত ঠাণ্ডা হ'লে আপনিই আস্‌বে; তখন আমার বল্‌তে হবে না।

মনে মনে জান্‌তাম, দুটো বৌ নিয়ে একসঙ্গে ঘর কর্‌তে মা'র আপত্তি মোটে নেই; বরং তিনি তাই চান—কেবল তিনি সাহস পান না বড় বৌর স্বভাবের দোষে।

সপ্তাহখানেক হ'লো আমি গিয়েছিলাম রূপ্‌শান্তিপুর মহাল পরিদর্শন কর্‌তে। আরো চার পাঁচ দিন হয় ত থাক্‌তে হ'তো। এম্‌নি সময়ে রাজধানী হ'তে এক পেয়াদা জরুরী একখানি চিঠি নিয়ে এসে হাজির হ'লো। চিঠিখানি খুলে দেখি বৌর অসুখ, পত্রপাঠ ফিরে যেতে হবে। আর কথা নেই,—জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করে' বাড়ীমুখো রওনা হলাম।

বাড়ী এসে পৌঁছে যা দেখ্‌লাম—তাতে চিন্তিত হবার অন্ততঃ কিছু নেই। সামান্য জ্বর। মা ভালোবাসেন বেশী; তাই চিন্তিতও হয়েছেন বেশী। না হ'লে গরীবের ঘরে একে হয় ত অসুখই বলে না। দু'দিনের ভেতর জ্বর সেরে গেলো। মাকে বল্‌লাম—দেখ্‌লে? তোমার যে! একটুতেই ভেবে সাতখানা হয়েছিলে। বৌ তোমার চোখের মণি—তাই একটু কিছু হ'লেই জগৎ অন্ধকার দেখো!

কিন্তু মা তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মুখ অন্ধকার করে' যা বল্‌লেন—তাতেও যে এমন কি ভয়ের কথা আমি অনুমান কর্‌তে পার্‌লাম না। বৌর নাকি দু'দিন চারদিন অন্তর অন্তরই জ্বর হয়—তা হ'লেই বা এমন ভয়ের কারণ কি? চিকিৎসাপত্র কর্‌লে, ও' আপনা থেকেই সেরে যাবে—এই ছিল আমার ধারণা। হ'লো অন্যরূপ।

এম্‌নি করে' এক মাস, দু'মাস, ছ'মাস কেটে চল্‌লো—বৌর তবু থেকে থেকেই জ্বর হয়, সম্পূর্ণ নিরাময়

আর হ'য়ে উঠ্‌লো না। বৌর তপ্তকাঞ্চন বর্ণে হল্‌দে ছোপ পড়ে' গেছে; চোখদুটোও তেম্‌নি হলুদ-গোলা। মা'র আতঙ্ক বেড়ে উঠ্‌লো; সঙ্গে সঙ্গে আমারো ভীতি জন্মালো। তিন চার দিনের ভেতর ডাক্তার বদ্যিতে বাড়ী থৈ থৈ কর্‌তে লাগলো—কল্‌কাতা থেকে বড় বড় ডাক্তার এসে পড়্‌লো। ডাক্তাররা বল্‌লেন—কাম্‌লা রোগ। রোগটির সঙ্গে আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল না। শুনে অবধি মা'র মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনি যা বল্‌লেন, আমিও শুনে খুশী হলাম না। একবার ধর্‌লে নাকি এ ব্যায়রাম সহজে ছাড়্‌তে চায় না। রাজার বাড়ীর বৌ—চিকিৎসাপত্রের নিশ্চয়ই ত্রুটি হ'লো না, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বৌ ধীরে ধীরে শয্যা নিলে। আমার সুখের প্রদীপ স্তিমিত হ'য়ে এলো।

সেদিন বুঝ্‌তে পারলাম—স্ত্রীভাগ্য আমার নেই।

সুদীর্ঘ একটি বৎসর কেটে গেছে।

বউ শয্যাশায়ী; উত্থানশক্তিরহিত। সে নূরজাহান আর নেই—তার সমাধি হ'য়ে গেছে। কঙ্কালসার দেহখানি দেখ্‌লে এখন ভয় হয়। বিছানার ওপর কয়খানি অস্থি ছাড়া স্থূল দৃষ্টিতে হঠাৎ কিছু চোখে পড়ে না। দুটি নিমীলিত চক্ষুর দু'কোণ দিয়ে নিরন্তর অশ্রু ঝরে' পড়ে। ভূতগরিমার ধ্বংসাবশেষ এখন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

মা'র মলিন মুখখানি দেখ্‌লেও চোখে জল আসে। সাংসারিক ক্লিষ্টতায় স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়েছে। অনড় দেহখানি নিয়ে কোনরূপে নড়ে' চড়ে' বেড়ান। বিধবা হবার পর থেকে ব্যক্তিগত সুখ বল্‌তে তাঁর কিছু ছিল না। আমার সুখেই তাঁর সুখ, আমার আনন্দেই তাঁর আনন্দ। কতবার কতভাবে রঙ ফলিয়ে জীবন-লোকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-টাকেই তিনি টেনে আন্‌তে চেয়েছেন কিন্তু তার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতের গর্ভ হ'তে মেঘটাই আরো গাঢ়তর হ'য়ে উঠেছে বেশী। সাংসারিক ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর যদিও বা মাঝে মাঝে দু' একবার আশার আন্দোলন মর্ম্মরিত হ'য়ে ওঠে কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই কোথা হ'তে একটা বিপর্য্যয় এসে সেই অত্যন্ত-প্রত্যক্ষ সাবলীল গতির এক প্রান্ত ধরে' টেনে নিয়ে কোথায় কোন্ অন্ধকার প্রদেশে নিক্ষেপ করে কে জানে? সে কূজন-গুঞ্জন থেমে যায়,—থাকে খালি একটা শোকাস্তীর্ণ নীরবতা—বিগত দিবসের হরণ-পূরণের একটা সুদীর্ঘ তালিকা। আর তখন সেই সম্বলটুকু নিয়েই দিন কাটাতে হয়।

মা'র দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে সেদিন ভগবানকে একমনে এক-ধ্যানে মনের মত করে' ডেকেছিলাম। বিশ্বদেবতার চরণে এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের আত্মনিবেদন কি ভাবে গিয়ে স্পর্শ করেছিল জানি না,—কিন্তু তাঁর আশীর্ব্বাদ যে এম্‌নি বাঁকাচোরা পথ দিয়ে ঘুরে আস্‌বে তা আমি আদৌ ভাব্‌তে পারিনি। পরম বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে পড়্‌লাম—আমি যেন ভূগর্ভ হ'তে লাফিয়ে উঠ্‌লাম। দুনিয়াটাকে আরেকবার গভীর ভাবে ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম কিন্তু চোখের সামনে যা-কিছু সবই যেন ঝাপ্‌সা একাকার হ'য়ে উঠ্‌ল।

মা যে এই রুগ্ন দেহে এই শ্রান্ত দিনে বসে' বসে' অতি সঙ্গোপনে আবার আমার জীবনের সূত্র গ্রথিত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন আমি তার বিন্দুবিসর্গও জান্‌তাম না। জান্‌তে পেলাম সেদিন—যেদিন আয়োজনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে, পুনরায় বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হ'য়ে গেছে—যখন বাধা-নিষেধের আপত্তি অনাপত্তির কোন কথাই উঠ্‌তে পারে না। মা জানেন আমি তাঁর অবাধ্য হবো না—তাঁর সম্মান তাঁর মর্য্যাদা আমা হ'তে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেই না। এ তিনি জানেন বলেই এবার আমার মতামতের অপেক্ষা পর্য্যন্ত তিনি করেন নি।

এবার তৃতীয়া।

আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের পারিবারিক জীনের ধারা—সে আমাদেরি জন্যে। আধুনিকতার সঙ্গে তার সংস্পর্শ নেই। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সচল, কোন্‌টা অচল এ নিয়ে তর্ক করে' লড়াই চল্‌তে পারে—মীমাংসা হ'তে ত পারে না। সুতরাং ও' নিয়ে তর্ক করে' কোন লাভ নেই। আমার নিজের মতামত সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু বল্‌তে চাই না; কারণ আমার ব্যক্তিত্ব যখন আমার জননীর অঞ্চলের তলে তখন তাকে ঘোষণা করে'

কোন ফল নেই। মাকে একটু আধটু অনুযোগ দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন—তার উত্তর আমি তাঁকে দিতে পারিনি।

মা বলেছিলেন—বাঁবা, বৃদ্ধ বয়সে আমাকে আর জ্বালাস্‌নি। চিরদিন শিশু হ'য়েই ছিলি, মরণের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি তোকে অমনি দেখে যেতেই চাই।—ও-সব বিলিতী আচার-ধর্ম্ম নিয়ে আমাদের চল্‌বে না। তোর যে এখনো আরো তিনটি মা বেঁচে আছেন সে কথা ভুলতে গেলে চল্‌বে কেন বাবা?

এর পর আর কি বলা চলে? তাই স্তব্ধ হ'য়ে রইলাম। বিবাহের দিন ক্রমশঃ সমাগত হ'য়ে এলো।

এবারকার বিবাহে কিছু মৌলিকত্ব আছে। সে ভারী মজার বিয়ে!—এমন বিয়ে জীবনে আমি কখনো দেখিওনি শুনিওনি।

বিবাহমণ্ডপে চেলি পরে' গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছি তখন দেখি দুইটি ক'নে প্রস্তুত। আবার দুইটিরই নাকি একই সঙ্গে বিবাহ হবে।

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই বা চক্ষু বিস্ফারিত করবারও কিছু নেই। মজা আছে—শুনুন। প্রথম ক'নেটি মানবী নয়, একটি কপোতী। বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো, অন্দর-মহল হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি একটি লোক একটি রূপার থালার ওপর একটি ডানা-বাঁধা সুসজ্জিত সুশ্রী কালো লক্ষী-পায়রা নিয়ে এসে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত। এবং লোকটি সেই পায়রা সমেত রূপার থালাটি নিয়ে আমাকে ঘিরে সাতটি পাক্ দিয়ে—পায়রাটিকে আমার চোখের সম্মুখে এনে তুলে ধর্‌লো। জন দুই মাতব্বর গোছের লোক আমায় বল্‌লেন—ভালো করে' পায়রার চোখে চোখে তিনবার চেয়ে দেখো। আমি ত হেসেই খুন!—আর চাইবো কি? তবু চাইতে হ'লো। কপোতীর দুটি চক্ষের সঙ্গে আমার দুটি চক্ষের সম্মিলন হ'লে তাকে তারা উড়িয়ে দিলে। তারপর যথারীতি মানবী কন্যার সঙ্গে বিবাহ সুরু হ'লো।

বিবাহান্তে মা'র কাছ থেকে যা শুন্‌তে পেলাম—তাতে কপোতী-বিবাহের গূঢ় তত্ত্ব এই যে—ছয় চক্ষে ক্ষয়; দুটি বিবাহ আমার এর পূর্ব্বে হ'য়ে গেছে; বড় বৌর দুটি চোখ মেজ বৌর দুটি চোখ আর ভাবী ছোট বৌর আর দুটি চোখ—এই ৩×২=৬ চক্ষুর সম্মিলনে নাকি আমার ক্ষয়প্রাপ্তি ঘট্‌তে পারে—তাই এই বিপুল আয়োজন! এবং কপোতীর আর দুটি চক্ষু সংযোগ ক'রে' আট চক্ষু পূরণ করা হ'লো। মা বলেন প্রবাদে 'লিখন' আছে—"ছ'চক্ষে ক্ষয়..." তখন মিথ্যে নয়।

পরে আরো শুন্‌লাম ব্যবহারিক শাস্ত্রে এও নাকি ব্যবস্থা আছে, কোথাও কোন কোন কপোতীর মৃত্যু চোখে দেখ্‌লে বা কানে শুন্‌লেও মৃতাশৌচ পর্য্যন্ত পালন করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনে সে সৌভাগ্য কোনদিন ঘটে নি—ঘট্‌বে কিনা জানি না। ছয় চক্ষু যাতে না হয়—সে আড়ম্বরের কোন ত্রুটি হ'লো না। তৃতীয়বার বিবাহ ক'রে নূতন ডাগর বৌ ঘরে নিয়ে এলাম।

মা'র মলিন মুখ আবার খুশীতে ভরে' উঠ্‌লো।

আরো একটি বছর কেটে গেল। জীবনের পাতায় এই একটি বৎসরের স্মৃতির অনেক কাহিনী লেখা আছে। জীবনের পুঁজিপাটা সম্বল যা কিছু আমার ছিল—এই বছরটি তা হরণ করে' নিয়ে আমায় একেবারে নিঃস্ব ফকির করে' দিয়ে গেছে।

মা আমার স্বর্গে চলে' গেছেন। এই বৎসরের প্রথমার্দ্ধে তাঁর কাশীপ্রাপ্তি ঘটেছে। জীবনে আমার সব চেয়ে বড় অবলম্বন—তাই আজ আর নেই! তাঁর অঞ্চলের নিধি আমি; আমার দুঃখের হিসাব তেমন করে' আর কে নেবে? যাঁর আঁচলের নীচে থেকে আমি দুনিয়াটাকে ধূলিমুষ্টির মতো দেখ্‌তাম—দিনগুলো হেসে খেলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতাম—তিনি আর এই মর্ত্ত্যের মাটিতে নেই। ঐ শূন্যে আকাশের গায়ে চাঁদের সভায়, কিম্বা কোথায় কে জানে বসে' বসে' হয় ত অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে' দিচ্ছেন; কিম্বা হয় ত বা তাও নয়। সত্য-মিথ্যা তার কিছু বুঝি, অনেক কিছুই বুঝি না। তা যাক্, এই নিয়েই যখন আমার ঘরে থাকতে হবে, তখন শোকের

অধ্যায়টা অযথা তোলায় লাভ কি? তাতে শোক বাড়ে বই কমে না।

মা'র শ্রাদ্ধের সময় বড় বৌ আবার এসেচে। মেজ বৌ ঠিক তেম্‌নি অচল অবস্থায় পড়ে' আছে। তারো হয় ত মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলো! ছোটো বৌ বিয়ের পর থেকে আর বাপের বাড়ী যায়নি, এইখানেই আছে।

বড়ো বৌ, মেজ বৌ—দু'জনেরই রূপ ও গুণের তালিকা আমার এই কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। ছোটো বৌই বা বাদ যাবে কেন? সুতরাং তারও গুণাবলী একটু ছোটো করে' কীর্ত্তন করে' আমি এখন রেহাই পেতে চাই। জীবনের এই শ্রান্তক্লান্ত দিনে অযথা পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে' পাপের বোঝা আর কেন ভারী করি!

ছোটো বৌ চলনসই সুন্দরী।

রাজার বৌ—একটু আধটু বর্ণন্যূন হ'লেও গৃহস্থঘরে এর চেয়ে অতুল রূপের প্রায়াজন হয় না। গুণের ভেতর দুর্গুণ তেমন কিছু ছিল না। তবে বড় বৌর সংস্পর্শে এলে একটু আধটু করে' কলহের সূত্রপাত, এবং নিয়মিত অবকাশের পর সেই সংঘাতে অগ্ন্যুদ্গার হ'য়ে একটা মহাজ্বালার সৃষ্টি হ'তো বটে; কিন্তু সে দোষ তত ছোট'র নয় যত বড়'র। মা এ সুখ যে চোখে দেখে যেতে পারেন নি—সে জন্য আমি সুখী। সংস্পর্শদোষ বাঁচিয়ে বড়-ছোট'র দুটি ভিন্ন মহল করে' দেওয়া হয়েছে—তা সত্বেও মাঝে মাঝে সে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যায়; ছোটো বৌর এটি জাত্‌স্বভাব নয়,—স্থান-কাল-পাত্রে তার রুচি বদ্‌লাতে বাধ্য করে;—সে এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং তাকে সব ক্ষেত্রে সব সময়ে দোষ দেওয়া চলে না।

ছোটো বৌর কথা বল্‌বার কায়দা, হেঁটে যাবার নমুনা, চোখে চোখে দৃষ্টি-গতায়াতের একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমার জীবন-বাগিচায় সে ছিল যেন একটি বিদেশী ফুলের গাছ। ছোট ছোট করে' টক্ টক্ করে' কথা ছেড়ে দেওয়া,চোখের ইসারায় অন্তরের ভাষা নিবেদন করা, বেণী দুলিয়ে সাবলীল পদক্ষেপ,—যেন আধুনিকতার সত্য যেটুকু সেটুকুকে বাদ দিয়ে মূর্ত্তিমান মিথ্যাটুকুই জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌তো বেশী। বিলাসখানায় চীনামাটির টবে সাজিয়ে রাখ্‌লে তাকে মানায় ভালো, বা ঘরের ঐ ওলিওগ্রাফের ছবিগুলোর পাশে তাকে টানিয়ে রাখ্‌লে আরো ভালো মানায়।

কিন্তু সনাতনী মা আমার সে সব দৃশ্য দেখে না যাওয়ায় আমার এইটুকু উপকার হয়েছে যে চতুর্থ সংস্করণের জন্য আমাকে আর তাগিদ কর্‌বার কেউ নেই! তিনি বেঁচে থাক্‌লে যে পঞ্চমে গিয়ে না উঠ্‌তাম তাই বা কে বল্‌তে পারে?

মিথ্যার ভেতর অষ্টপ্রহর বাস কর্‌তে হ'লে বাইরের কিছু ধারকরা আয়োজন দিয়ে সেটাকে চাপা দিতে হয়, অন্ততঃ আমার মতে। তাই রসিকতার উচ্ছ্বাস আমার এই পড়ন্ত বয়সে আবার একটু একটু করে' তাল ঠুক্‌তে সুরু করে' দিয়েছে। তাস-পাশার আড্ডা আবার পুরো দমে চল্‌তে থাকে।

এমনি দিনে একটি অঘটন ঘটে' গেলো।

একটি দীর্ঘ অবকাশের পর বড় রাণী ছোটো রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং সে যুদ্ধের পরিণতি এত দ্রুত অগ্রসর হ'তে থাকে যে ভিতর হ'তে প্রয়োজনবোধে একটি দূতী এসে আমাকে জানিয়ে দিলে যে অন্দরমহলে তুমুল ঝগ্‌ড়া বেধেছে, অচিরেই এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গেলাম। ধীর পদবিক্ষেপে এই দুই কলহপরায়ণা নারীর কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেবেছিলাম থামিয়ে দেবো কিম্বা আমায় দেখেই হয় ত তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাবে। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! রণে ভঙ্গ দেওয়া দূরে থাক্, আমায় দেখে তাদের অন্তরের আগুন যেন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে' উঠ্‌লো। টেবিলের ওপর ছিল একটা ফুল্‌দানী, হঠাৎ কে যে সহসা সেই ফুল্‌দানী ছুঁড়ে আমার মাথায় আঘাত কর্‌লে বুঝ্‌লাম না—চোখের দৃষ্টি নিমেষেই অন্ধকার হ'য়ে এলো। মাথায় আঘাত পেয়ে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে বসে' পড়েছিলাম এইটুকু মাত্র জানি,—রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে আমার জামা কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছিল সেটাও যেন লক্ষ্য করেছিলাম মনে আছে।

তারপর কখন যে আমায় শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, কখন যে ডাক্তার এসে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছে,

কিছুই জানিনে। চেতনা যখন ফিরে পেলাম, দেখি, আমায় ঘিরে দাসদাসী লোকজন পরিচর্য্যায় ব্যস্ত, জানালায় দরজায় পর্দা টানিয়ে দেওয়া অন্ধকার একখানি ঘরের মধ্যে পালঙ্কের উপর আমি শুয়ে আছি,—কেরোসিন তেল দিয়ে চালানো কলের যে পাখা আনিয়েছিলাম, মাথার কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই আমার মনে পড়্‌লো মাকে। আজ কোথায় তিনি!—কোথায় কোন্ অমরাপুরীর আলোকোজ্জ্বল কক্ষে আজ তিনি বিরাজ কর্‌ছেন। এ হতভাগ্য সন্তানের কথা হয় ত আজ আর তাঁর মনেও নেই। তারপরেই মনে হ'লো আমার দুই সহধর্ম্মিণীর কথা—যাঁদের কলহ নিবারণ করতে গিয়ে আমার আজ এই দুর্দ্দশা। মা বেঁচে থাক্‌লে আজ হয় ত তাঁদের তিনি বাড়ী থেকে দূর করে' দিতেন। যা'ই হোক্, কোথায় তারা—জান্‌বার আগ্রহ হ'লো। চোখ মেলে তাকিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস কর্‌তে যাচ্ছি, দেখ্‌লাম, আমার পায়ের কাছে অন্ধকারে কে যেন বসে' রয়েছে। বললাম—কে?

কোনও সাড়া পেলাম না।

মাথাটা একটুখানি কাৎ করে' তাকিয়ে দেখি—সেই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী—যে সৌন্দর্য্যপ্রতিমাকে, যে অদ্বিতীয়াকে একদিন আমি দ্বিতীয়ার স্থান দিয়ে বধূরূপে গৃহে এনেছিলাম, সে তার ভগ্নস্বাস্থ্য আয়ুক্ষীণ কঙ্কালসার দেহ নিয়ে নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত আমারি পদতলে আমার দিকে একাগ্র উন্মুখ দুটি আঁখির স্নিগ্ধসকরুণ দৃষ্টি প্রসারিত করে' বসে' আছে।

আহা বেচারা!—কতদিন তাকে দেখিনি, আদর করিনি।

তাকে ডাক্‌লাম। অতি ধীরে সে আমার কাছে এসে মাথা হেঁট করে' দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—কেমন আছ মাধবী?

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এলো,—ভালো আছি।

তারপর কি কথা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তবু কি জানি কেন, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল,—তাঁরা কোথায়? বড়-ছোট—যাঁরা আজ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

মাধবী বল্‌লে—দু'জনেই লজ্জায় বাপের বাড়ী চলে' গেছেন।

বাপের বাড়ী!—আমায় এখানে এই দাসী-চাকরদের হাতে ফেলে? সেখানে গিয়ে কি বল্‌বে তারা? কেন এলো? সেও ত আমারই অপমান! বল্‌লাম—কাউকে দিয়ে একবার দেওয়ানকে ডেকে পাঠাতে পারো মাধবী?

মাধবী মন্থরগতিতে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি চেয়ে দেখ্‌লাম—বিরাট কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের দিকে মানুষ যেমন করে' তাকায়।

দেওয়ান এলো।

বল্‌লাম—এক্ষুণি আপনি বড় আর ছোট বৌরাণীর কাছে লোক পাঠান। না, না, লোক নয়—পাল্কী পাঠিয়ে দিন, তাঁদের ওখানে থাকা চল্‌বে না। আমার সম্ভ্রমের হানি হবে।

মাথার আঘাত আমার এমন বেশী গুরুতর কিছু নয়। দু'দিন যেতে না যেতেই সেরে উঠ্‌লাম। দেওয়ানকে জিজ্ঞেস কর্‌তেই তিনি বল্‌লেন—লোক দু' জায়গা থেকেই ফিরে এসেছে।

—ফিরে এসেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরে তার পরদিনই এসেছে, আপনার শরীর অসুস্থ বলে' সংবাদটা আপনাকে জানাইনি।

—কেন, কি সংবাদ?

—বড় রাণী-মা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি আর আস্‌বেন না।—এই তাঁর চিঠি। বলে' তিনি একখানি চিঠি আমার হাতে দিলেন। পড়ে' দেখি—তাঁরই হস্তাক্ষর। লিখেছেন—

কাজ নেই আমার রাণীর সম্মানে। এখানে ভিখারিণী হ'য়েও আমি সুখে থাক্‌বো। তোমার অসম্মান কোনদিনই আমি কর্‌ব না। আমায় যেন তুমি আর তোমার ও' রাজ-প্রাসাদে ডেকে পাঠিয়ো না—সেখানে যেতে আমি আর পার্‌বো না—আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার জোর আছে—তোমার অসীম সামর্থ্য, তার ওপর স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে যদি কোনোদিন আমায় নিয়ে যেতে চাও ত আমায় জীবিত নিয়ে যেতে বোধ হয় পার্‌বে না। তার চেয়ে এই বরং বেশ আছি।

আর একটি কথা। আমায় ক্ষমা কোরো। যে-রাগের জন্ম তোমায় হারিয়েছি, সেই রাগের বশবর্ত্তী হ'য়ে হঠাৎ ফুলদানীটা তুলে' নিয়ে ছোটগিন্নীর মাথার ওপর ছুঁড়েছিলাম,—তোমার ওপর নয়। আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই সেটা তোমাকেই আঘাত করেছে। এর জন্তে আমার লজ্জার আর সীমা নাই। তুমি যদি পারো ত ক্ষমা কোরো; আর যাঁর কাছে ক্ষমা চাইবার—তাঁর কাছে ত জীবনভোর চাইবই। ইতি—

এই ত গেল বড় রাণীর খবর -

আর ছোট রাণীর?

দেওয়ান মাথা নীচু করে' বল্লেন—সে খবর আর নাই-বা নিলেন!

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলে' উঠলাম—কি? কি খবর বল দেখি?

দেওয়ান তেম্নি মাথা হেঁট্ করেই বল্লেন—আমাদের যে পাল্‌কি তাঁকে নিয়ে গিছ্‌লো, সে পাল্‌কি তিনি আর গ্রামে ঢুক্‌তে দেননি, গ্রামের বাইরে একটা বাগান থেকে বিদেয় করে' দিয়ে…

—হেঁটেই বাড়ী গেছে? আমার অসম্মান করেছে তা হ'লে বল?

দেওয়ান বল্লেন—আজ্ঞে না। বাড়ী তিনি আর ঢোকেননি। কোথায় যে গেছেন, সে-খবর তাঁদের গ্রামের কেউ জানে না। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—কিন্তু অসম্মান যা কর্‌বার তা তিনি চূড়ান্তই করেছেন। আমাদের রাজেন্ আম্‌লা কলকাতায় গিয়েছিল বাড়ীর ভাড়া আদায় কর্‌তে। সে আমাদের ছোটো রাণীমাকে সেখানে যে-অবস্থায় যে-জায়গায় দেখে এসেছে সে-কথার আর...তাঁর কথা আপনি ভুলে' যান।

কিন্তু এ কি ভোলা যায়!

পূর্ব্বে যা কখনো ভাব্‌তে পারিও নি, চেষ্টাও করিনি… জীবনটা যে এম্‌নি ছি-ছি দিয়ে তার যবনিকা টেনে আন্‌বে, আমার ছোট্ট জীবনের এই পান্থশালায় এম্‌নি করে' কেনা-বেচা শেষ হবে—এ কথা যে আমি কখনো স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি। কত বাধা-বিরোধ, কত বক্রতার ভেতর দিয়ে জীবনের এলোমেলো ছন্দ আন্দোলিত হ'য়ে এসেছে—কিন্তু তার ভেতরেও যে ছিল মানবজীবনের একটি বিচিত্র রসধারা, ছিল মাধুর্য্য, একটা শুদ্ধির প্রলেপ। কিন্তু সে সব ভেঙে চুরে খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে যে কোথায় কোন্ অতলে মিলিয়ে গেলো—তার সন্ধানও বোধ করি আর মেলে না।

মাথায় বজ্রাঘাত হ'লেও যেন এত বেশী স্তম্ভিত হতাম না। কানদুটো আমার জ্বালা কর্‌তে লাগ্‌লো। সর্ব্বাঙ্গ তখন আমার থর্ থর্ করে' কাঁপ্‌ছে। হা ভগবান! এও আমার অদৃষ্টে ছিল!

দোতলার ঘরে গিয়ে একাকী চুপ করে' বসে' বসে' ভাব্‌ছি—একি হ'লো আমার! একি হ'লো! নিজের এবং আমার গর্ভধারিণী মাতার খেয়ালের পরিতুষ্টির জন্তে একটির পর একটি গ্রহণ কর্‌লাম। নিজেকে বড় বেশী করে' দেখেছিলাম বোধ হয়?—তাই বোধ করি আজ এই প্রায়শ্চিত্ত!…হায় মা! আজ তুমি কোথায়? মাকে বড় বেশী করে' মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো। তিনি আজ বেঁচে থাক্‌লে কি কর্‌তেন জানি না; আত্মহত্যা কর্‌তেও কুণ্ঠিত হতেন না হয় ত।

কিন্তু হায়, সবই ত হ'লো, আজ আমি থাকি কি নিয়ে? আজ আমার অবলম্বন কোথায়? এম্‌নি সব নানান্ চিন্তায় মন যখন আমার ভারাক্রান্ত, এমন সময় অন্দর মহল থেকে এক দাসী এলো—আমায় ডাক্‌তে। ব্যাপার কি?

একবারটি আসুন।

তার পিছু পিছু গিয়ে দেখি, যে, সে মাধবীর ঘরে ঢুক্‌ছে। মাধবী—সেই রোগশীর্ণা মৃত্যুপথবর্ত্তিনী মাধবী—আমার দ্বিতীয়া! এতক্ষণ তাকে আমার মনেই ছিল না। যাক্, তবু আশা হ'লো। অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু যেন আলোকের শিখা দেখ্‌তে পেলাম। আছে—আছে,

—এখনো একজন আছে, যাঁর দুটি চোখের পানে তাকিয়েও খানিক্ষণ চুপ করে' বসে' থাক্‌তে পার্‌বো।

ঘরের মধ্যে ঢুকে' দেখি, বাড়ীতে যতগুলো দাসী ছিল, সব এসে মাধবীর শয্যাপার্শ্বে ভিড় করে' দাঁড়িয়েছে।

মাধবী! মাধবী!

সেদিন বোধ করি পূর্ণিমার সন্ধ্যা। জানালার পথে অজস্র জ্যোৎস্না এসে মাধবীর শুভ্র শয্যায় এবং তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেই জ্যোৎস্নালোকিত শয্যাপ্রান্তে তার সেই কঙ্কালসার দেহখানি একেবারে যেন বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। মুখখানি বিশীর্ণ ম্লান হ'য়ে গেলেও তার সেই বিগত গরিমার চিহ্ন এখনো রয়েছে—তার ঢল-ঢল আয়ত দুটি চক্ষুতারকায়, আর তার সেই ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত আলুলায়িত অলকগুচ্ছে।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তার সেই দুটি স্নিগ্ধ-সকরুণ চক্ষের দৃষ্টি যেন আমার মুখের ওপর স্থির অচঞ্চল একাগ্রভাবে এসে পড়্‌লো।—মনে হ'লো কি যেন সে বল্‌তে চায়। কিন্তু দেখ্‌লাম, ঠোঁটদুটি তার মাত্র একটুখানি নড়ে' উঠ্‌লো, চোখের কোণ বেয়ে দরদর করে' জল গড়িয়ে এলো। তারপর—তারপর কে জান্‌তো —যে, শেষ বিদায়ক্ষণে আমায় শুধু একটিবার প্রাণ ভরে' দেখে নেবার জন্তেই সে আমায় ডাক দিয়েছে!

আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। কান্নার শব্দে মুখ তুলে' দেখি, একজন দাসী তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদতে আমায় বল্‌লে—চাদরটা টেনে দিন। শেষ হ'য়ে গেছে।

এতদিন পরে হঠাৎ যেন আমার ঘুম ভাঙলো। নিজেকে আর কোনো প্রকারেই সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লাম না। বুকের ভেতর থেকে মোচড় খেয়ে খেয়ে আমার অবরুদ্ধ অশ্রু সহসা দু'চোখ ছাপিয়ে উছ্‌লে উঠ্‌লো। মাধবীকে জড়িয়ে ধরে' আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। মা'র মৃত্যুর দিন ছাড়া জীবনে আমি কোনোদিন কেঁদেছি কিনা জানি না। আজ এই আমার দ্বিতীয়ার মৃত্যুশয্যায় বোধ করি আমি দ্বিতীয় বার কাঁদ্‌লাম, এবং এত কান্না বোধ হয় কখনো কাঁদিনি।

আমার আলিঙ্গন-পাশ থেকে মাধবীর মৃতদেহ জোর করে' ছিনিয়ে নিয়ে শ্মশানযাত্রীর দল তাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। আমার শ্মশানে যাওয়া হোলো না। বল্‌লাম—না, সে দৃশ্য আমায় তোমরা আর দেখিও না, মুখাগ্নি কর্‌তে হয় এইখানেই করি।

স্পষ্ট দেখ্‌লাম,—আমার এই দরদ দেখে পুরোহিত মুখ টিপে একবার হাস্‌লেন।

আমি সেইখানেই সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গৃহপ্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে' কত কাঁদ্‌লাম। কেঁদে কেঁদে হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। স্বপ্নে দেখি,—প্রাসাদ-তোরণে নহবৎ বাজ্‌ছে, উৎসবপ্রাঙ্গণ পুষ্পমালায় পরিশোভিত,চারিদিকে ঘন ঘন হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি হ'চ্ছে,—আর তারি মাঝখানে কোথায় যেন এক মর্ম্মরবেদীতলে চন্দনমাল্যবিভূষিতা ষোড়শী এক নববধূ লজ্জাবনত মুখে কার যেন আগমন-প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে উঠেছে। কিছুই ভালো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সহসা দেখ্‌লাম,—আমার মা যেন সেই বধূটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে সেইখান থেকে হাতের ইসারায় আমায় ডাক্‌লেন—আয়!

জীবনে সেই বুঝি সর্ব্বপ্রথম মা'র আদেশ অবহেলা করে' তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে চীৎকার করে' উঠ্‌লাম,—না না, আমি যাবো না মা, আমি যাবো না।

এবং চীৎকার করেই আমার ঘুম ভাঙলো। তাকিয়ে দেখি, শ্মশানযাত্রীরা তখন শবদেহের সৎকার করে' ফিরে এসে সকলে মিলে আমায় ঘিরে বসেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পুরুষ—স্বার্থপর ?

আজকাল মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ভয় হয়, কারণ তাঁহারা পছন্দ করেন না যে কোন পুরুষ তাঁহাদের বিষয় লইয়া কোনরূপ আলোচনা করেন, এবং ইহার জন্য তাঁহারা পুরুষদের প্রতি স্বার্থপরতার আরোপ করিয়া থাকেন —যদিও স্বার্থপর হইলেও পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্র রূপে তাঁহাদের সম্পর্ক একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, খ্রীষ্ট হইতে রবার্টসন্ এবং মনু হইতে 'অনিলা দেবী'-ছদ্মবেশী শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও গুরুসদয় দত্ত পর্য্যন্ত পুরুষরাই নারীদের জন্য বেশী ভাবিয়া, বলিয়া ও করিয়া আসিতেছেন। সকল ক্ষেত্রেই কি ইহা পুরুষের স্বার্থপরতা ? কিন্তু কোন কোন স্পষ্টকণ্ঠী নারী আজ সত্যই তাহা বলিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা দল বাঁধিয়া ইতিমধ্যেই সগৌরবে শ্রী-হীন জয়-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন— স্বাধিকারপ্রমত্তা হইয়া।

ভরসার বিষয় এই যে, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এইরূপ পুরুষ-বিদ্রোহিণীদের মঠ নহে, এবং ইহার মুখপত্রী বঙ্গলক্ষ্মীতে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য বিবৃত করিতেছি। বঙ্গলক্ষ্মী টেনিসনের "Tho Princess" কাব্যবর্ণিত কৌতুক-প্রদ আদর্শ অনুসরণ করেন নাই; তিনি চিরদিনই তাঁহার ভ্রাতা বা পুত্রকে প্রকাশ্য পার্শ্বস্থান প্রদান করিয়া থাকেন।

ভূমিকায় আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভালো যে, এই নারীমঙ্গল সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর কর্ম্মধারার মূলমন্ত্র ছিল, গৃহকে শ্রীসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া শ্রী-মতীকে বাহিরের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে ধী-মতী রূপে—ধীমানদের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য নহে, তাঁহাদের সহযোগিনী ও সহকর্ম্মিণী রূপে; যেমন তাঁহাদিগকেও সহযোগী ও সহকর্ম্মী রূপে গৃহের সীমায় শ্রীমতীরা পান। উপমা দিয়া বলা যায়—স্রোতস্বতীর মতই গিরিগুহা হইতে বহির্ম্মুখী হইয়া বাহিরের দিকে বহিয়া যাইতে হইবে বহিঃক্ষেত্রকে সরস ও উর্ব্বর করিয়া, কিন্তু মূল প্রাণধারা সংযুক্ত থাকিবে সেই গিরিগুহার আদি উৎসবের সহিত; এবং তটকে ধ্বংস না করিয়া শ্যামশ্রী দান করিতে হইবে।

যুগাবর্ত্তে নারী

কিন্তু এখানে আমি বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের কথাই বলিব —বিশেষ করিয়া যে সব বালিকা বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চান। বালিকা-দের পক্ষে বহিঃক্ষেত্র যাঁহারা আদৌ অপ্রয়োজনীয় ও গর্হিত মনে করেন তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিতে যাওয়া বৃথা। তাঁহারা বুঝিয়াও কেন বোঝেন না যে যুগাবর্ত্ত দ্রুতবেগে আব-র্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এই আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে না পারিলে সে জাতিকে প্রথমে পক্ষাঘাত ও পরে মৃত্যু দ্বারা আড়ষ্ট ও গতপ্রাণ হইতে হইবে। সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক ছাড়িয়া দিলেও দারুণ অর্থনৈতিক সমস্যা কি তাঁহাদিগকে বিচলিত করে না? যে চরিত্রনৈতিক বিশুদ্ধতার দোহাই তাঁহারা দিয়া থাকেন, তাহা কি হাত-পা বাঁধিয়া রাখিয়া রক্ষা করিতে হইবে, না, সেজন্য প্রয়োজন—বাহিরের মুক্ত বাতাস ও আলোক লাভ করিয়া, সুস্থ ও সবল হইয়া তাঁহারাই সংযম ও চরিত্র-শক্তি অর্জ্জন করিবেন ?

গৃহলক্ষ্মীদের গৃহের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এত বেশী কথা এতবার বলা হইয়াছে যে আর কিছু না বলিলেও চলে। অন্যদিকে বাঙালী মেয়েরা বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে সামান্য কিছুদিন হইল পা বাড়াইয়াছেন মাত্র। ক্ষেত্রগামী পথের কথাই এখন অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই পথের কথার গোড়ায়

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রগতির অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে বা জাতীয় সাধনার বিনাশ নহে।

অবশ্য, যে কর্মক্ষেত্রের কথা বলিতেছি, এদেশে তাহার সীমা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও বৈচিত্র্যশূন্য। মেয়েদিগকেই তাহা বিস্তৃত ও বিচিত্র করিয়া তুলিতে হইবে, এবং পুরুষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া নয়, তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা দ্বারাই তাহা সফল হইবে।

য়ুরোপীয় নারীদের সম্মুখেও এই কর্মক্ষেত্র একদা—তেমন বেশীদিনের কথা নহে—এইরূপই ক্ষুদ্রায়তন ছিল। এক হাতের একটি মাত্র অঙ্গুলি-পর্ব্বে সেদিন তাঁহাদের গতি-'মান' সহজেই নিরূপিত হইতে পারিত। সহজ সরল কোন একটি যোগ্যতানুযায়ী কর্মবিশেষ—তাহা তেমন বিশ্বাস বা নির্ভর-যোগ্যও ছিল না। তারপর দেখিতে দেখিতে বহু পথই মুক্ত হইয়া গেল—পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে নয়, সহযোগিতা-সহায়ে। তথায় রাজনৈতিক অধিকার লাভে কোন কোন ক্ষেত্রে সংঘর্ষ সূচিত হইলেও অধিকাংশ সামাজিক তথা অর্থনৈতিক প্রগতি-মুখে তাঁহারা পুরুষ-প্রতিদ্বন্দ্বিনারূপে অগ্রগামিনা হন নাই। এবং যে যে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য্য হইয়াছিল, সে সকল ক্ষেত্রেও নিখিল পুরুষ-সম্প্রদায়েরই তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন না বা পুরুষজাতি নির্ব্বিশেষে সকলেরই হাতে-মাথা-কাটিয়া জয়শ্রী লাভ করেন নাই।

ইংলণ্ডীয় নারীসমাজ

এখানে আমরা ইংলণ্ডীয় নারীসমাজের কথাই বিশেষ ভাবে বলিতে চাই, কারণ ভারতবর্ষীয় সমাজ-আদর্শের সহিত উহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য নাই। উহা ভারতীয় সমাজেরই মতই রক্ষণশীল, ধর্ম্মপ্রাণ, গৃহকেন্দ্রাভিমুখ ও গার্হস্থ্য-সৌষ্ঠব-প্রয়াসী—শিক্ষাক্ষেত্রে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে প্রাধান্য স্থান ইহার প্রমাণ।* আপেক্ষিক তুলনায়, সামাজিক রক্ষণতা সত্ত্বেও, তাঁহারা কতদূর উন্নতিশীলা, আমাদের বহুপশ্চাদ্বর্ত্তিনী উন্নতিকামিনীদের পক্ষে তাহা চিন্তনীয় ও ও শিক্ষণীয় বলিয়াই বিবেচনা করি।

এখন ইংলণ্ডীয় নারীপ্রগতি-পন্থা বহুমুখ ও বিচিত্র—অনেকগুলিই সুস্পষ্টীকৃত, কতকগুলি অস্পষ্টরেখাঙ্কিত বা অ-দৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও। স্কুল বা কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষিতার দল সহজেই তাঁহাদের রুচি-অনুযায়ী কর্মপথ খুঁজিয়া লইতে পারেন। এমন কি, উচ্চ রাজকীয় পদবী-অলঙ্কৃতা নারী সরকারী কর্মচারীও (Civil Service) এখন সেখানে বিরল নহে। শিক্ষাবিভাগীয় কর্ম, এবং ওকালতি, ব্যারিষ্টারি প্রভৃতি ছাড়াও, অন্যান্য প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়ক্ষেত্রেই তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—প্রাচীন বহু সংস্কারপাশ হইতে স্বেচ্ছায় মুক্ত হইয়া। উচ্চ, উচ্চতম শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহেও তাঁহারা ন্যূনসংখ্য নহেন, এবং প্রতি বৎসরই ঐসব স্থলে নারী কর্মীর চাহিদা ও জোগান ক্রমবর্দ্ধমান রূপে প্রত্যক্ষ হয়। ইহাতে কেহ যদি এরূপও বলেন যে সেখানে নারীদের সম্বন্ধে আর বেশী কিছু করিবার নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে তেমন অপরাধী করা যায় না।

কিন্তু ইংলণ্ডীয় চিন্তাশীল নারীসমাজ এবং পুরুষ বিশেষজ্ঞগণ নারীহিতৈষী রূপে—স্বার্থপরতা-প্ররোচিত হইয়া নয়) "কিছু করিবার নাই" একথা সমর্থন না করিয়া "অনেক কিছুই করিবার আছে" ইহা মনে করেন।

কতকগুলি ব্যবসায়ক্ষেত্রে (হিসাবরক্ষক, ভাস্কর, আইন-উপদেষ্টা প্রভৃতি) দেখা যায়, নারীদের উপর ভারার্পণ করিয়া অনেক সময় নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এমন নাটকীয় ব্যাপার প্রায়শঃই ঘটিয়া থাকে যে তাঁহাদের প্রতিভা যখন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়া সার্থকতামুখী হইয়াছে তখনই তাঁহারা বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য অতর্কিত ভাবে সহসাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট জীবনপন্থা পরিবর্ত্তিত করিলেন। আমাদের বাঙালী মেয়েদের সহিত এ বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাওয়া যায় না কি?

দায়িত্ববোধ-হীনতা

তা ছাড়া অনেক নারী কর্মীদের মধ্যে এখনও এরূপ বহু সংস্কার বা প্রথাজাত ভ্রান্ত বিশ্বাস বর্ত্তমান আছে যাহা অদ্যাপি তাঁহাদের গতিকে অব্যাহত হইতে দেয় নাই।

* ১৩৬৬-এর 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত শ্রীমতী দীপা চক্রবর্ত্তী লিখিত 'ইংলণ্ডে বিবিধ নারী-শিক্ষায়তন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আশ্চর্য্য! বিশিষ্ট কর্ম্মশক্তি সত্ত্বেও কোন কোন কর্ম্মী তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নয়ন পর্য্যন্তও অভিলাষ করেন না —উচ্চতর কার্য্যে গুরুদায়িত্ব বহন করিবার আশঙ্কায়। *

এদিকে ভারতীয় তথা বঙ্গকন্যাকাদের কর্ম্মক্ষেত্র-পরিধি একান্ত সঙ্কীর্ণতর, এবং সীমাপ্রসারের উপরোক্ত অন্তরায়গুলি ছাড়া কঠিন কঠিন আরও অন্তরায় বর্ত্তমান। তন্মধ্যে দুইটির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পুরুষদের প্রতি একদল নারীর প্রবল বিদ্রোহভাব পোষণ ও একদল প্রাচীনপন্থী পুরুষের বাহিরের নারী-কর্ম্মক্ষেত্রকে অস্বীকার। ইহার উপর আছে অন্ধ সংস্কার, আলস্য, পরনির্ভরতা, অবনত অবস্থার সমর্থন, আরামপ্রিয়তা প্রভৃতি আরও বহু বাধা-বিপত্তি—সর্ব্বোপরি দায়িত্ববোধ-হীনতা।

ইংলণ্ডীয় নারীউন্নতিকামীরাও এই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য নারীপ্রকৃতিকে কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে করেন। ইহা যেন তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ও সহজাত দুর্ব্বলতা।

সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠান

এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে চিন্তাশীলদের পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত নহে যে, একদিকে—বিশেষজ্ঞগণ মিলিয়া এমন এক একটি নারী-কর্ম্মকল্যাণ সঙ্ঘ গঠন করা কর্ত্তব্য (সে সব সঙ্ঘ অবশ্যই পুরুষবর্জ্জিত হইবে না †) যেগুলি নারীদের জন্য নব নব কর্ম্মপন্থা উদ্‌ঘাটিত করিবে, শিক্ষা দ্বারা অনুশীলনিক পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিবে, পথের কঙ্কর-কণ্টক সমূহ দূরীভূত করিবার প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিবে, প্রতিভাকে স্বচ্ছন্দ ভাবে চলমান করিবার সুবিধাদান বা সাহায্য করিবে; এবং অন্যদিকে—স্কুল ও কলেজের শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাব্রত-চারিণী শ্রেণীয়াদের সহিত সংযোগরক্ষা ও পরামর্শ-যোগে ভবিষ্যৎ জাতিলক্ষ্মীদের এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যে, কোন প্রকার প্রগতি বা কর্ম্মোন্নতি লাভের অর্থই হইতেছে কঠোর পরিশ্রম এবং প্রায়ই হয় ত অবকাশকালের আরামোপভোগ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন; অপিচ, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, নব তীর্থপথের অগ্রণী যাত্রী তাঁরা—সে পথের অবিচলিত গতিশীলতা যেন পশ্চাদ্‌-বর্ত্তিনীদেরও ঐ পথে গতিপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে, এবং এই সত্য যেন উপলব্ধ হয় যে, যে-পথ তাঁহাদের সম্মুখে আজ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে সে-পথের কষ্টকে অতিক্রম করিয়াই তাঁহাদের সামর্থ্যের যোগ্যতা প্রমাণিত হউক।—ইহার উপর তাঁহারা সর্ব্বদা এই সত্য স্মরণ রাখিবেন, এবং বিশ্বাস করিবেন যে ইহা পুরুষ-দানবের হস্ত হইতে নারীর স্বর্গোদ্ধার-রূপ জয়শ্রী লাভ নহে—ইহা পুরুষ-আবিষ্কৃত ও পুরুষ-সংরক্ষিত ঐশ্বর্য্যেরই দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ।

তারপর এইরূপ পন্থানির্দ্দেশক ও প্রগতিবাহক বিশেষ বিশেষ সাময়িক পত্রিকাদিও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে কথিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও অনুকূলতা আনয়ন করে। যেমন ইংলণ্ডের—"Women's Employment," "Journal of Careers," * ইত্যাদি।

আমরা ইংলণ্ডের কথাই বলিতেছিলাম। সেখানে বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর—প্রধানতঃ দ্বৈমানিক (secondary) ও কেন্দ্রীয় (central) স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সব বালিকা বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের চলিবার শিক্ষাদান বা পরিচালন বিষয়ক বিবিধ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠান বিশেষ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতেছে। লণ্ডনের "Headmistresses' Employemet Committe" এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ সঙ্ঘ। ইহা "Ministry of Labour"এর সহিত মিলিতভাবে পরিচালিত হয়। গত বৎসর (১৯৩০) ইহা প্রায় ১৪০০ শত সেকেণ্ডারি স্কুলের বালিকার কর্ম্মসংস্থানে সাহায্য করিয়াছে। অধিক সংখ্যক বালিকা সাধারণ আফিসের কাজে নিযুক্ত হইলেও অবশিষ্ট বালিকারা বিভিন্ন বিচিত্রতর কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—যথা, পরিকল্পন

* "They do not want promotion and the responsibility which it brings."—The Times Educational Supplement.

† যেমন—"সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি"।

* "Journal of Careers"কে বিশেষ করিয়া বলিতে হয়—নারীদের শিল্প ও ব্যবসায় সম্পর্কীয় একখানি আদর্শ পত্রিকা। ইহাতে উক্ত বিষয়ের বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকে এবং শিক্ষার্থিনীদের জন্য নানাপ্রকার স্কলারসিপ, bursaries (বৃত্তিবিশেষ) প্রভৃতির বহুল বিবরণী প্রকাশিত হয়।

(designing), গৃহাভ্যন্তর-চিত্রণ, হিসাবরক্ষণ, পাঠাগার-পরিচালন, নার্সিং, ঔষধালয়ের কার্য্য প্রভৃতি আরও অনেক কিছু। এতদ্ব্যতীত এই সঙ্ঘ বক্তৃতা, বিদ্যালয়ে মিলিত কথোপকথন (group talks) এবং কন্‌ফারেন্স প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘের গত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী (Annual Report—1930.) পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সব কার্য্যের জন্য সমিতিকে কি প্রকার কষ্টসাধ্য শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

এইরূপ আরও দুইটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যায় যাহাদের কার্য্য উল্লেখযোগ্য—একটি "Central Bureau for the Employment of Women," অপরটি "National Society for Women's Service." প্রথমটিতে বিশেষ ভাবে সমাজসেবা কার্য্যে জোর দেওয়া হয়, এবং দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ সরকারী কর্ম্মে প্রবেশলাভের অনুকূল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকে, ও সম্প্রতি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও ট্রিনিটি কলেজের "Women's Appointments Board"-এ নারী উপদেষ্টা নিয়োগে মনোযোগী হইয়াছে।

এখানে আমরা বাঙলা দেশের পক্ষে শিল্পক্ষেত্রে "সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি"র নাম করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সব বালিকা বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের বহিঃকর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশের ও উক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য আমাদের দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকৃত সাহায্য করেন না—কতকগুলি উপাধির 'আটি' মাথায় চাপাইয়া দেওয়া ছাড়া। কিন্তু তদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে একথা খাটে না—বিশেষতঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে। উক্ত য়ুনিভার্সিটি কয়েক বৎসর হইতে এই জন্য একজন বিশেষ মহিলা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার পূর্ণ সময় এই কার্য্যে দান করিয়া উদ্দেশ্যকে আশাতীত সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। কিন্তু "এহো বাহ্য আগে কহ আর,"—কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ ছাত্রদের জন্য যতখানি মনোযোগ ব্যয়িত করেন, ছাত্রীদের জন্য ততখানি নয়; ইহাতে নারীহিতৈষীগণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অপরাধী করিতেছেন। সে দেশের একজন পুরুষের (স্বার্থপর?) ভাষায়—"The universities, it must be confessed, until recently appeared to take the business of placing women less seriously than the business of placing men." অবশ্য, এই অবস্থা ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১৩০০০ জন। ইঁহাদের মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব একদিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। মহিলা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য মুক্ত যে কোন প্রকার কার্য্যেই প্রার্থীর অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক একদল প্রার্থী কার্য্য না পাইয়া ফিরিতে বাধ্য হইতেছেন, এবং ইহার কারণ হয় ত তাঁহাদের পক্ষে সুপারিশ করিবার তেমন কেহ নাই—ডিগ্রী থাকিলেও। অথচ স্বভাবতঃই নারী গ্র্যাজুয়েটদের এই গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা বিশেষজ্ঞের পদবী সঞ্চয়ের চেয়ে সেই সেই বিশেষ জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শ্রেয়তর মনে করেন, এবং সকল প্রকার অজ্ঞাত ও অভূত-পূর্ব্ব পথেও সাহসের সহিত চলিতে প্রস্তুত।

গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই সব গ্র্যাজুয়েট মহিলা স্বতঃই নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের আহ্বানে সাড়া দিতেছেন—পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রপথগুলি কার্য্যতঃ তাঁহাদের পক্ষে রুদ্ধ ছিল। প্রতি বৎসরই এই প্রগতিপথে তাঁহারা অনুকূলতা লাভ করিতেছেন বটে, তবে আশানুরূপ নহে। এই অনুকূলতার অল্পতায় ভগ্নমনা হইয়া অনেকে প্রতিভা এবং উচ্চতর কর্ম্ম-জীবনের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবেশে দ্বিধা বোধ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ বিগত ১৯২৪ সালের তুলনায় প্রবেশার্থিনীদের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে—অবশ্য অত্যল্পই তাহা। * সব দিক দিয়া বিচার

* ইহার অন্যতম কারণ, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে অনেক পিতামাতা পুত্র-কন্যা উভয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করিতে পারিতেছেন না। যথা—"Economic depression, which makes it difficult for many parents to send both sons and daughters to the university. (—The Universities Grants Commitee's Report.) এখানে আমাদের দেশের সহিত পূর্ণ সমতা পাই।

করিয়া দেখিলে, এক কথায়—এজন্য চাই আরও নূতনতর পথ ও সুদক্ষতর পরিচালনা।†

ঔপনিবেশিক ক্ষেত্র

ইহা ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রসমূহেও যাহাতে ব্রিটিশ কর্ম্মিকাদের জন্য সুবিধজনক পথ উন্মুক্ত হয় তাহার জন্য বিবিধ কথা ও কাজ চলিয়াছে। সেই সব কথা ও কাজের বিস্তৃত বিবরণ দিবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। সংক্ষেপে কিছু বলি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের বৃত্তিজীবন শ্বেতদ্বীপ হইতেও বিভিন্ন রূপে এবং ব্যাপক ভাবে বর্ত্তমান ও বর্দ্ধমান, কিন্তু তুলনায় মেয়েরা সেক্ষেত্রে এত সামান্য স্থান পাইয়াছেন যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়—কেবলমাত্র শিক্ষা, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিভাগীয় কার্য্যে তাঁহাদিগকে যা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা ইহার পরিবর্ত্তিত প্রকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং বহুলাংশে তাহার দায়িত্ব "Society for the Oversea Settlement of British Women"এর উপর অর্পণ করা যায়। কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানে মধ্যবিত্ত মূলধনের ছোটখাট আবাদী ব্যবসায়ের সুবিধা আজকাল মেয়েরা পাইতেছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও তাঁহাদের সুযোগ বাড়িতেছে, এবং তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীমতী ডেম মিরিয়েল টালবোটের অধিনেত্রীত্বে "প্রধান শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্ঘ" (Party of Headmistresses) সম্প্রতি কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেছেন—যাহাতে ঐসব শিক্ষায়তনে ব্রিটিশ ছাত্রীদের কর্ম্মশিক্ষার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। "Women's Farm and Garden Association" নামক অপর একটি সঙ্ঘ উদ্যান ও কৃষি ব্যবসায়ে বালিকাদের প্রবেশের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কুমারী হ্যাস্‌লেট নাম্নী অপর একটি বিদুষী নারী ইন্‌জিনিয়ারিং কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং "Women's Engineering Society"র অনরারি সেক্রেটারি ও "Electical Association for Women"-এর ডিরেক্টর রূপে ঈপ্সিত ব্রতকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত অধিকতর ভাবে স্কলারসিপ, bursaries (বৃত্তিবিশেষ), গ্রাণ্ট প্রভৃতি নানারূপ সাহায্য মেয়েদের জন্য ক্রমশঃই ব্যবস্থিত হইতেছে। এতদুদ্দেশে একাধিক ফাণ্ডও স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য "Central Employment Society for Promoting the Training of Women" প্রশংসাজনক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষও অন্যতম ব্রিটিশ উপনিবেশ। ভারতবর্ষের প্রতিও যে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয় নাই এবং ইহার কর্ম্মক্ষেত্রগুলি অধিকার করিতে তাঁহারা প্রয়াস পাইতেছেন না, ইহা মনে করা ভুল। ভারতনারী কি এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন না? বাঙলার মেয়েরা কি বলেন?—তাঁহারা কি কর্ম্মক্ষেত্রের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া চাহিয়া থাকিবেন?

শেষ কথা

শেষ কথা এই,—সংক্ষেপে পথবার্ত্তা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম; পাথের এবং প্রগতির বিচার-বিবেচনা আপনারা করুন। যে দারুণ অর্থনৈতিক সমস্যা আজ আমাদের ঘরে ঘরে বর্ত্তমান,—যে অভাবের অভিশাপে দেশের বধূরা বসনহীনা, জননীরা স্তন্যহীনা, বিধবা কন্যকারা পিতৃগৃহেও গলগ্রহ রূপে লাঞ্ছিতা অপমানিতা,—এই প্রবন্ধধৃত ইঙ্গিত যদি সেই সমস্যার,সেই জাতিজননীগণের অপমানের প্রতীকার-সূত্রাভাস মাত্রও আনিয়া দেয় তাহা হইলে এই স্বার্থপর (?) পুরুষ প্রবন্ধকারের শ্রম সার্থক হইবে। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রগতির অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে বা জাতীয় সাধনার বিনাশ নহে।

† "No effort should be spared to widen the range of occupations in which women graduates can earn their livelihood and put their university training to profitable use."
—The Universities Grants Committee's Report.

তুমি কথা কও

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

ওগো তুমি কথা কও বজ্রের হুঙ্কারে ;
আমি চুপি চুপি, কানে কানে,
তরুর মর্ম্মরে, কল তটিনীর গানে,
শরতের উদাসীন উত্তর-বায়ুর হাহাকারে !

তোমার আদেশে হয় বিদীর্ণ আকাশ ;
আমার মলয়-শিহরণ,
ধরার উরসে ধীরে করে সে প্রেরণ
কোরকের স্বপ্নকথা, কুসুমের সুরভি নিশ্বাস !

তবুও যে তোমার আমার বাণী,
সীমা-অসীমার সম্মিলন,
ধেয়ানের মূর্ত্তি উন্মীলন,
বিশ্বরূপে দিকে দিকে অ-নিমেষ প্রকাশিল আনি'।

জোষিদা টোরাজিরো

শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু

জন ব্রোন, গ্যারিবল্‌দী, ম্যাকশ্যনি প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাম অনেকই শুনিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের সহিতও পরিচিত আছেন অনেকেই, কিন্তু আজ আমি যে মহাপুরুষের অপূর্ব্ব দেশহিতৈষণার ও অসামান্য দৃঢ়তার কাহিনী আপনাদিগকে উপহার দিতে যাইতেছি, সেই অক্লান্তকর্ম্মী, অসাধারণ সংযমী, মহা ত্যাগী, অপূর্ব্ব মানসিক শক্তিমান, তেজস্বী জাপানী দেশপ্রেমিক জোষিদা টোরাজিরোর নামই হয় ত অনেকে শ্রবণ করেন নাই, কার্য্যাবলী জ্ঞাত হওয়া তো দূরের কথা।

জোষিদা একজন সৈন্তশিক্ষকের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দেশপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, এবং কি করিলে জাপান উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবে, কি করিলে জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বসভার শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবারউপযুক্ত হইবে, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

অনাহার তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, নিদ্রা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্রাম জানিতেন না,—তাঁহার জন্মভূমি কেমন করিয়া কি উপায়ে সমৃদ্ধি লাভ করিবে একমাত্র তাহাই ছিল তাঁহার ধ্যানধারণা !

পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপান নির্ব্বিবাদে যে-কোন বিদেশীয় বণিকের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিত, বিদেশীরাও জাপানে আসিয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জাপান গভর্ণমেণ্ট এই এক নিয়ম জারি করিলেন যে কোন বিদেশীর সহিত জাপান সংস্রব রাখিতে পারিবে না—এবং কোন বিদেশীও জাপানে বাণিজ্য করিতে আসিতে পারিবে না। আসিলে সেই সব জাহাজ পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলা হইবে,

আরোহীদেরও বন্দী করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত, কোন জাপানবাসী বিদেশীর সহিত পত্রব্যবহার কি অন্যপ্রকারে কোন সম্পর্ক রাখিয়াছে বলিয়া ধৃত হইলে তাহাকেও দণ্ডিত করা হইবে।

জোষিদা দেশের লোকের দুঃখকষ্ট দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—কোথায় জাপানবাসীদের অভাব,কোথায় তাদের অবনতির মূল তাহাই তিনি নিজের চোখে দেখিবার জন্য হাজার হাজার মাইল পথ পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকালে তাঁহাকে পিঠে করিয়া আহার্য্য,পানীয়, শয্যাদ্রব্য প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী বহন করিয়া ফিরিতে হইত। এই কঠোর পরিশ্রমে তিনি লেশমাত্রও ক্লান্তি অনুভব করেন নাই—বিশ্রামের জন্য কোথায়ও অধিককাল বৃথা অতিবাহিত করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে জাপানবাসীদের কষ্ট দূর করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক অধিবাসীর কোথায় দুঃখ, কোথায় কষ্ট, কোথায় অভাব তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং সেজন্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণের কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

জোষিদার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার জন্মভূমি জাপানকে সব দিক দিয়া বড় করিয়া তোলা। সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি যে তুমুল সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আমরা সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হই।

জাপানে বিদেশী শিক্ষক আনিয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু কে সে দেশে যাইবে? সকলেরই জীবনের ভয় হইল। কেহই আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিল না, অবশেষে স্থির হইল নির্ভীক জোষিদাই যাইবেন।

তিনি জাহাজ ধরিবার জন্য প্রথমে 'জেডো' যাত্রা করিলেন, উদ্দেশ্য—'কমোডোর প্যারে' ধরিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। জোষিদা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিলেন কিন্তু দমিলেন না,—'নাগাসাকিতে' রুশীয় জাহাজ ধরিবার জন্য পুনরায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায়! সেবারও জোষিদা অকৃতকার্য্য হইলেন।

জোষিদা ছাড়িবার পাত্র নন। সহস্র বাধাবিঘ্ন আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেও, তিনি বিচলিত হইতেন না, হইবার লোক যে তিনি নহেন!

জোষিদা এই সময় তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। সে সাহায্য অর্থ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সেই সৎ বন্ধুটির নাম—সকুমা সোগান।

সকুমা সোগান সেই চরিত্রের লোক ছিলেন, যাঁহারা জীবনে কোন মহৎ কার্য্য স্বয়ং করিতে পারেন না, মহৎ কার্য্য করিবার চেষ্টাও তেমন করেন না,—অথচ পরের মহৎকার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যান, এবং সেই সৎকার্য্যের প্রশংসা ও সমর্থন করিয়া থাকেন। সকুমা নিজে সাহস করিয়া কোন কার্য্য করিতে না পারিলেও যাঁহারা হৃদয়ে উৎসাহ এবং অদম্য সাহস লইয়া বিপদসঙ্কুল কর্ম্মজীবনে ঝম্প প্রদান করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলপ্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদ প্রদান করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না এবং সাহায্য করিবার অভিলাষও পোষণ করিতেন।

সকুমা 'ডাচ্' ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই সময় জোষিদাকে 'ডাচ্' শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। যোষিদা তাঁহার নিকট চলনসই 'ডাচ্' ভাষা শিক্ষা করিলেন।

সংবাদ আসিল, 'কমোডোর প্যারে' সিমোডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। জোষিদা প্রস্তুত হইলেন। বন্ধুগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে এই দুঃসাহসিকতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন, ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

জোষিদা পদব্রজে যখন জেডো হইতে সিমোডাতে পৌঁছিলেন, তখন গভীর রাত্রিকাল। এমন অসম সাহসিকতায় ব্রতী হইতে য়ুরোপের এবং অন্যান্য স্বাধীন দেশেরও খুব কম লোকই কখনও সাহস করে।

স্বদেশপ্রেমিক জোষিদা টোরাজিরো যখন 'কমোডোর প্যারে' ধরিবার আশায় পদব্রজে জেডো হইতে সিমোডাতে আসিলেন এবং জাহাজ দেখিয়া তাহাতে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, সেই সময়ে তিনি 'কমোডোরে'র হস্তে বন্দী হইলেন।

'কমোডোর প্যারে' সোগান গভর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ব্ব হইতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং কমোডোর প্যারে জোযিদাকে বন্দী করিয়া সোগান গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন।

জোযিদার আশায় ছাই পড়িল। জোযিদা কতই না আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন।—বিদেশে যাইয়া, বিদেশী শিক্ষক আনিয়া জাপানকে বিদেশী সভ্যতায়, ব্যবহারে এবং শিক্ষায় বড় করিয়া তুলিবেন।

সকুমাও জোযিদার সহিত ধৃত হইলেন। কিন্তু সকুমা আপনার সুন্দর হস্তাক্ষর প্রদান করিয়া মুক্তি পাইলেন এবং পরে জাপানকে উন্নতির পথে চালিত করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। তখনকার সময়ে জাপানে সুন্দর হস্তাক্ষর সম্মানের সহিত গৃহীত হইত।

জোযিদা টোরাজিরো সকুমার মত দুর্ব্বলচিত্তের লোক ছিলেন না। রবার্ট ব্রুস ও কলম্বসের মত দৃঢ় চিত্ত লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জোযিদা কারাগারে প্রেরিত হইলেন। তিনি অম্লান বদনে, অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং দৃঢ় মনে কারাগৃহকে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন।

কারাগারে প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও জোযিদা তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ত্যাগ করেন নাই। সেখানে তিনি বন্দী-দিগকে জাপানের অবস্থা বুঝাইতে সুরু করিলেন।

জেল-অধ্যক্ষ এ বিষয় জ্ঞাত হইয়া জোযিদাকে পূর্ব্ব-কারাগার হইতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু সেখানেও জোযিদা পূরামাত্রায় কয়েদীগণকে জাপানের দুরবস্থার কথা বুঝাইতে লাগিলেন।

জোযিদা পুনরায় স্থানান্তরিত হইলেন।

এইরূপে বহু কারাগৃহে তিনি স্থানান্তরিত হইতে লাগিলেন। এক জেল হইতে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য—জোযিদার দেশহিতৈষিতা নির্ব্বাণ করা। কিন্তু ঐরূপে নানা স্থানে তাঁহার মনের আগুন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এবং যে মহৎ ব্যক্তি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিকার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন কিন্তু নিরুৎসাহ হন নাই, যাহার জীবন দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, এবং ঐ সকল অকৃতকার্য্যতার দুঃখে-কষ্টে-নির্য্যাতনে যিনি জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও ত্যাগ করেন নাই, বরং আরো দৃঢ় করিয়া সেটাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাকে—তাঁহার ঐ বজ্রের মত কঠিন মনকে কি কারাগারে বন্দী করিয়া দমন করা যাইতে পারে? তাঁহার হৃদয়ে যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা সদাসর্ব্বদা বিরাজ করিতেছিল, তাহা শত নির্য্যাতনেও লোপ পায় নাই।

কিছুদিন পরে জোযিদা টোরাজিরো মুক্ত হইলেন। মুক্তিলাভ করিয়া এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় বালকবালিকাদিগকে জ্বলন্ত ভাষায় জাপানের দুরবস্থার কথা বুঝাইতে লাগিলেন।

জোযিদাকে দেখিয়া বিদ্যালয়ের বালকবালিকারা না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার কুশ্রী রূপ ও অপরিষ্কার বেশভূষা দেখিয়া ছেলেরা তাঁহাকে ঠাট্টা করিত—তাঁহার উপদেশপূর্ণ কথা তাহারা শুনিতে চাহিত না।

কিন্তু আগুন কখনও ছাই-চাপা থাকে না। যত দিন যাইতে লাগিল ততই বালকেরা আস্তে আস্তে জোযিদার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এখন তাহারা তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল। এবং ক্রমে তাঁহাকে তাহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে, তাঁহার বাণী দেবতার বাণী ভাবিয়া ভক্তিভরে আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতে লাগিল।

জোযিদা গোপনে জাপানে ডাচ্-শিক্ষক আনাইয়া ছেলেদের শিক্ষা দিতে সুরু করিলেন।

জোযিদা এবং তাঁহার অনুচরবর্গের উপর সোগান মন্ত্রীর সন্দেহ ছিল। গোয়েন্দা এবং চর লাগাইয়া তিনি জোযিদাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। ভয়ে ছেলেরা ডাচ্-শিক্ষকের কাছে আর পড়িতে গেল না, তাহাদের ডাচ্ শিক্ষা ঐখানেই শেষ হইল।

সোগান মন্ত্রী, জাপানের ন্যায়পরায়ণ সম্রাট মিকাডোকে অপসারিত করিয়া রাজ্য দখল করিবার সঙ্কল্প করিতে-ছিলেন, এবং উহাতে আশান্বিত হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কিটোতে যাত্রা করিলেন।

জোযিদা যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি চম্মুর কারাগারে বন্দী। মিকাডোকে হত্যা? জোযিদার অসহ্য

হইল। কারণ, জাপানে মিকাডো বংশপরম্পরায় দেবতার অংশ বলিয়া খ্যাত।

সোগান মন্ত্রীর প্রাণবিনাশের জন্য জোষিদা অলক্ষ্যে তরবারি শাণাইতে লাগিলেন।

তাহার ফলে একদিন জেডো হইতে কিয়োটো যাইবার পথে জেষিদার অনুচরবর্গ সোগান মন্ত্রীকে হত্যা করিল।

হত্যাপরাধে অপরাধী হইয়া জোষিদা জেডোর কারাগারে বন্দী হইলেন। তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

কিন্তু দেশবীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় তিলমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি সাহাস্যবদনে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং সকলের সম্মুখে নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, তেজস্বী ভাষায় জাপানের দুরবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন—সোগান গভর্ণমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলিতে লাগিলেন। আরো বলিলেন যে, জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতা একান্ত প্রয়োজনীয়; বিদেশী জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশী জাতির সভ্যতা এবং শিক্ষা ব্যতিরেকে জাপানের উন্নতির আর সহজ পন্থা নাই।

তাঁহার ঐসব মূল্যবান কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার বয়স দ্বাত্রিংশ বর্ষ।

পরবর্ত্তী কালে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া জাপান উন্নত হইয়াছে।

ভাস্কর

শ্রীপ্রতাপ সেন বি-এস্-সি

নীরস ঊষর কঠিন পাষাণ, অসাড় বক্ষতল,
ধূসর ধূলায় মৌন শায়িত - তন্দ্রায় বিহ্বল্।
কত বর্ষায় সিক্ত উপল, শিশিরে স্নিগ্ধ শিলা —
বসন্তে ফোটে ফাটলে কুসুম; - যেন স্বপ্নের লীলা!
ধীরে আসি' কবে কবি-ভাস্কর সুপ্তে টানিয়া তোলে —
সোনার কাঠির স্পর্শে জাগায় চেতনার হিল্লোলে।
রূপ দিল তায়, প্রাণ দিল তায় সুনিপুণ ভাস্কর,
আননে ফুটাল সজীব করুণা—বৈভবে সুন্দর।

অর্ণবে শিলা ভাসাল শ্রীরাম, বাঁধিল রামেশ্বর,
অজন্তা আদি অমর হইল—কারু-শিল্পের ঘর।
ভুবনেশ্বরে শিল্পাচার্য্য সৃজিল পরম স্থান,
পাষাণে ফুটাল অরূপের রূপ—গৌরবে সুমহান্।
পুরুষোত্তমে বিরাট কীর্ত্তি—শিলা-মন্দির মাঝে
জগতের নাথ, বিশ্বস্রষ্টা শাশ্বত হ'য়ে রাজে।
যুগ যুগ ধরি' গাহিল ভক্ত পরম-পিতার গান,
পুণ্য হইল পাষাণের বেদী—শিলা হ'ল ভগবান!

ঘরে বাইরে

ব্যায়ামক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

নিখিল ভারতনারী ব্যায়ামক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কুমারী তারা নায়ক নাম্নী "শ্বের মহারাণী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের" এই ছাত্রীটি বিজয়-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বরোদায় ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যন্ত্রে ও কণ্ঠে

সম্প্রতি মাদ্রাজ সঙ্গীতসঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত একটি বেহালা-বৈঠকে এই বালিকা—কুমারী ভি, এন্, তুলসী প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'মহাজন সভা' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যতম সঙ্গীত-জল্‌সাতেও কুমারী তুলসী প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। কুমারীর বয়স মাত্র একাদশ বর্ষ।

ব্যায়াম-অনুশীলন

লিভারপুল, মার সিসাইড ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের বালিকারা ব্যায়াম অনুশীলন করিতেছেন। এই বিদ্যালয় হইতে অন্যান্য স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রী সরবরাহ করা হয়।

তরবারি-ক্রীড়া

ব্রিষ্টলের একটি বালিকাবিদ্যালয়ের তিনটি বালিকা তরবারি-ক্রীড়া (lunge fencing) শিক্ষা করিতেছেন। এই স্থানের বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে ইহা নিয়মিত রূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

হাল ফ্যাসান

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেবকুমারের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হবার পর শুক্লার ডাইরিতে লেখা—

সেদিন কা'র মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না, তবে বিশ্বামিত্রের দেখা পেয়েছিলাম। হুঁ, একটু ভদ্রতা শিখেছে,—যদিও মোটরটা শোঁ ক'রে চ'লে গেল তবুও ভদ্রলোক টুপিটা তুল্‌তে ভোলেন নি। আশ্চর্য্য! অমন আদ্যিকালের পুরুষের কাছ থেকে তো এটা আশা করিনি। লোকটা একেবারে ভণ্ড, ও' নিশ্চয় ইচ্ছা ক'রে অমন গম্ভীর হ'য়ে থাকে, ভাবে ওর চেহারা দেখ্‌লে সব মেয়েরা এমন মোহিত হ'য়ে যাবে যে আগে থেকে সাবধান হ'য়ে থাকা ভাল, অমন হাঁড়ি-মুখ দেখে কোন মেয়ে হয় তো এগতে চাইবে না। সত্যিও তাই,—যে রকম মুখ ভার ক'রে থাকে কথা কইতে ভয় হয়!

আজ আবার ননীদি'র বাড়ীতে ওঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, আমায় দেখেই স'রে গেলেন,—বোধ হয় ভাব্‌লেন,আমি ওঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু কর্‌ব। কি রকম আস্পর্দ্ধা দেখ না, ওঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে আমার ব'য়ে গেছে। দু' চক্ষের বিষ!—দেখ্‌লে গা জ্ব'লে যায়! ননীদি' যে কেন অতবড় সাধু পুরুষকে আমাদের মত এমন দুষ্টু লোকদের মাঝে আনেন তা তো জানি না। ঈষ্‌! আবার টেনিসস্যুট পরা হয়েছিল! লোকটার বিষয় একটা কথা বল্‌তেই হবে, ওর চেহারাটা ভাল,—অন্য দিন চোখে অত পড়ে নি, আজ কিন্তু টেনিস-স্যুটে ওকে সত্যিই ভাল দেখাচ্ছিল। ভাব্‌লাম—দেখা যাক্‌ ও' কেমন খেলে।

তারপর সর্ব্বনাশ!—মনে হ'ল লোকটা আমার দিকে আস্‌ছে। শেষে দেখি সত্যিই আমারই কাছে এসে দাঁড়াল, পরে ধীরে ধীরে বল্‌লে—'আপনি খেল্‌বেন? আমাদের একজন পার্টনার কম পড়েছে—' ঈষ্‌, অমন লোকের সঙ্গে খেল্‌তে আমার ব'য়ে গেছে! আমি বল্লাম —'আমার এখন খেল্‌তে ইচ্ছে নেই, মাথা ধরেছে—' কথা শেষ না করতে করতেই সে চ'লে গেল।

একটু পরে সুধীর এসে আমায় খেল্‌তে ডাক্‌লে, আমি কিছুই না ভেবে অন্য কোর্টে খেল্‌তে সুরু ক'রে দিলাম। একবার দেবকুমার বাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল—ওঃ, কি ঘৃণাভরা সে চাহনি! সত্যি, কাজটা ভাল হয় নি, অমন প্রত্যক্ষভাবে ওকে অপমান করাটা উচিত হয় নি। আমি যে কখন কি ক'রে বসি!

এক সেট খেলেই গিয়ে ব'সে রইলাম। একটু পরে দেবকুমার বাবুও এসে বস্‌লে। আমি নিজের দোষটা ঢেকে ফেল্‌বার আশায় তাকে বল্লাম—'এর পরের সেটটা খেল্‌লে কেমন হয়?' সে একবার চেয়ে দেখ্‌লে তারপর গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—'আমি আর খেল্‌ব না।'

ওমা!—আমায় কেমন জব্দ ক'রে দিলে! অসভ্য অশিক্ষিত মূর্খ বর্ব্বর! এমন ক'রে একটা মেয়ের সঙ্গে ব্যবহার করতে লজ্জা কর্‌ল না? আর যদি কখনও ওর দিকে ফিরে চাই!...রাগের মাথায় চার পাঁচ সেট খেল্‌লাম তারপর ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরে দেখি সত্যিই মাথাটা ধ'রে পড়েছে। কত অডিকোলন ঢাল্‌লাম তবে না একটু আরাম পেলাম। আজ রাত্রে আর কিছু করব না, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়্‌ব।

নীহারের সঙ্গে কথা হবার পর শুক্লার ডাইরিতে লেখা—

অনেকদিন পর নীহারের সঙ্গে দেখা হ'ল। আগে তো ও' আমাদের এখানে প্রায়ই আস্‌ত, আমিও ওদের ওখানে কতবার গিয়েছি, মাঝে কি জানি কি হ'ল—যাওয়া-আসা অনেক ক'মে গিয়েছে। আজ মণিকাদের ওখানে দেখা হ'ল।

বেশ আমোদ করা গেল! সত্যি, মণিকাটা বড় আমুদে মেয়ে, এত নকল কর্‌তেও পারে! সেই পোড়া কাঠের মত চেহারা যার তার নামটা যে ভুলে যাচ্ছি,—তার কত রকম নকল দেখালে, হেসে হেসে প্রাণ যায় আর কি! বাব্বাঃ! নীহার যেন দেবকুমার বাবুর 'ফিমেল এডিশন', হাস্‌তে জানে না। খানিক পর আমায় আলাদা পেয়ে বল্লে—'শুক্লা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে চাই, রাগ না করে' ঠিক উত্তর দেবে?' আমি ভাব্‌লাম কলেজের বিষয় বুঝি কিছু বল্‌বে; ওমা, ওর প্রশ্ন শুনে তো আমি একেবারে অবাক! গম্ভীর ভাবে আমায় বল্লে—'সুধীরের সম্বন্ধে তুমি কি কর্‌বে? তাকে বিয়ে কর্‌বে না কেবল তার সঙ্গে খেলা কর্‌বে?' কথা শুনে আমার ভারী রাগ হ'ল। সুধীরের কিন্তু কি অন্যায়! আমাদের দু'জনের মধ্যে যা হয়েছে ও' কেন আর-একজনের সঙ্গে আলোচনা করেছে? রাগটা কোন রকমে সাম্‌লে নিয়ে বল্লাম—'সুধীর বুঝি তোমায় তার দূত ক'রে পাঠিয়েছে? তাকে বোল', এর জবাব তাকে আমি নিজেই দেব, কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থ হবার প্রয়োজন নেই।' নীহার কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বল্লে—'শুক্লা, ভুল বুঝো না, সুধীর আমায় এ বিষয় কিছুই বলেনি, আমার নিজের চোখ আছে। সুধীর যে তোমার জন্যে পাগল এ কথাটা কারু কাছেই নূতন নয়, আর তুমি যে সুধীরকে নিয়ে কেবল মজা করছ এটাও কারু বুঝ্‌তে বাকী নেই। আমি কেবল জান্‌তে চাই তুমি ওকে সত্যি চাও কি না? যদি না চাও তো ওকে ছুটি দাও, ওকে সুখী কর্‌বার জন্যে অন্যকে অধিকার দাও।'

নীহারকে আঘাত কর্‌বার জন্যেই বল্লাম 'সুধীরকে সুখী কর্‌বার কার হঠাৎ এত মাথাব্যথা হ'ল? তোমার নাকি? বেশ তো, তা ওকে নাও না, আমি ছেড়ে দিচ্ছি—' নীহার গম্ভীরভাবেই বল্লে—'এটা রাগারাগির কথা নয়, আমি সত্যিই তাকে সুখী দেখ্‌তে চাই, তুমি যদি ওকে বিয়ে ক'রে সুখী কর তাতে আমার কোন দুঃখ নেই; কিন্তু তুমি যে কেবল ওকে তোমার পোষা কুকুরের মত রাখ্‌বে এটা আমার সহ্য হয় না। সুধীর সে দরের ছেলে নয়, তুমি যদি সত্যি ওর অন্তরের পরিচয় পেয়ে থাক, তা হ'লে নিজেই সেটা বুঝ্‌তে পার্‌বে।' আমি তিক্ত হাসি হেসে বল্লাম—'সুধীরের সঙ্গে আমার অত অন্তরের পরিচয় হয়নি, তোমার সঙ্গে যখন তার এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তখন তাকে নিজের কাছে আটক ক'রে রাখ্‌লেই পার্‌তে!' নীহার তখনও রাগ না ক'রে আমার প্রত্যেক কথার উত্তর দিলে—'আমার সঙ্গে সুধীরের বল্‌তে গেলে কোন সম্বন্ধই নেই। তাকে আমার কাছে ধ'রে রাখ্‌বার ক্ষমতাও আমার নেই, তা যদি থাক্‌ত তা হ'লে কি তোমার মত মেয়ের কাছে তাকে ছেড়ে দিতাম?' বাঃ রে, এ রকম ভাবে শুধু শুধু আমায় অপমান কর্‌বার মানে কি? বেশ একটু বিরক্ত হ'য়েই বল্লাম—'আমি কি রকম মেয়ে সেটা জান্‌তে পারি কি?' নীহার একটুও বিচলিত না হ'য়ে বল্লে—'সেটা আমার বল্‌বার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তুমি যখন জান্‌তে চাচ্ছ তখন বলাই ভাল'—নীহার গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে স্পষ্ট-ভাবে বল্লে—'তুমি একজন 'হার্টলেস ফ্লার্ট,' তুমি স্বার্থপর, তোমার মধ্যে একটুও গভীরতা নেই, মানুষের হৃদয়গুলো তোমার কাছে খেল্‌বার সামগ্রী, খেলা ফোরালে পুরাতন খেল্‌না ফেলে দিয়ে নূতনের চেষ্টায় থাক। সমরেন্দ্রর কি দশা করেছিলে মনে আছে তো?'

ওকে আর বল্‌তে দিলাম না। ছিঃ! আমি কি সত্যিই এত নীচ? আজ প্রথম নিজেকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখে একটু ভয় হ'ল,—নীহারের উপর খুব বেশী রাগ কর্‌তে পারলাম না। নীহার কিন্তু সব কথাগুলো ঠিক বলেনি, সমরেন্দ্রর সঙ্গে তো আমি কিছু করিনি? মা আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন ওকে বিয়ে কর্‌তে চাই কি না, আমি স্পষ্টই ব'লে দিয়েছিলাম যে ওকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না; তারপরে ও' গিয়ে যে মেম বিয়ে ক'রে আন্‌লে সেটা বুঝি আমার দোষ? নীহার সব কথাই একটু বেশী বাড়িয়ে বলে। আর লিখ্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না, খাতাটা বন্ধ করা যাক্।

প্রতিমাদের বাড়ীর ব্রিজ্ পার্টির পর শুক্লার ডাইরিতে লেখা—

আজ প্রতিমাদের ওখানে রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ ছিল, যেতে পারিনি, আগে থেকে বড় মাসীমার ওখানে যাবার কথা ছিল যে। প্রতিমা কিন্তু ছাড়্‌বার মেয়ে নয়, সে বল্লে—'খেতে না আস্‌তে পারিস্ ব্রিজ তো খেল্‌তে পার্‌বি?

সকাল সকাল খেয়ে চ'লে আস্‌লেই হবে। মা দু' তিন জন সাহেব মেমদের আস্‌তে বলেছেন; তুই ঠিক আসিস্।' তাই কর্‌লাম্। খাবার পরই বড় মাসীমার ওখান থেকে প্রতিমাদের বাড়ী চ'লে এলাম।

ও বাবাঃ! বরফ একটু গলতে সুরু করেছে! দেবকুমার বাবু এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে এসেছেন, যা হোক্ আস্‌তে আস্‌তে মনুষ্যসমাজে মিশ্‌তে শিখ্‌ছেন,—তবু ভাল! প্রতিমার বাবার এক বন্ধু মিঃ ট্রি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিঃ হিউ ব'লে তাঁদের একজন বন্ধুও এসেছিলেন। একটা টেবিলে প্রতিমার বাবা, মা, মিঃ আর মিসেস্ ট্রি বস্‌লেন, অন্য টেবিলটায় প্রতিমা, মিঃ হিউ, দেবকুমার বাবু আর আমি। পার্টনারের জন্যে কাট্ কর্‌তে মিঃ হিউ আমার ভাগে পড়্‌লেন। বেচারা প্রথমে আমায় দেখে একটু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েছিল, ভেবেছিল এবার তাকে আমার জন্যে বেশ ভারী রকমই দণ্ড দিতে হবে। সত্যি,—আমায় বুঝি এতই বোকা দেখ্‌তে? যা হোক্ আমি যেমন হাত তুলেই 'নো ট্রাম্পস্' ডাক্‌লাম তখন সে বেচারা এমন কাতর ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে হাসি চেপে রাখা দায় হ'ল। আমাকে শুধ্‌রে নেবার আশায় বোধ হয় সে 'টু স্পেডস্' গেল, আমি কিন্তু তার উপর আবার 'টু নো ট্রাম্পস্' বল্লাম, তখন সে একেবারে নিরাশ হ'য়ে তাসগুলো টেবিলের উপর রেখে দিলে। খেলা শেষ হ'তে হটার যায়গায় যখন আমি গেম্ কর্‌লাম তখন মিঃ হিউ হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—'সেক্।' এর পর আমরা বেশ জিত্‌তে লাগ্‌লাম।

একবার হার্‌লে বুঝি মানুষ এমন চোটে যায়? দেবকুমার বাবুর মুখ যে একেবারে অন্ধকার! খানসামা কতবার কফি, লেমনেড ইত্যাদি দিতে চাইলে তা তিনি একবিন্দুও কিছু মুখে দিলেন না। এর উপর প্রতিমা আবার হেসে বল্লে, 'দেবকুমার বাবু, আজ আপনার হোল কি? শুনেছিলাম আপনি নাকি একজন ব্রিজ্ চ্যাম্পিয়ন!' দেবকুমার কি একটা বল্লে, ভাল শোনা গেল না, তারপর উঠে প'ড়ে এমন খেল্‌তে লাগ্‌ল যে আমি একেবারে অবাক্! কতবার 'ডাবল্' কর্‌লাম, তাতেও কি কিছু হয়? শেষে খেলা যখন শেষ হ'ল তখন আমরা বেশ কিছু পয়েন্টে হেরে গিয়েছিলাম। মিঃ হিউ কিন্তু এমন ভাল, আমায় বল্লে—'পার্টনার, আপনি খুব ভাল খেলেছেন, এবার একবার সুবিধামত মিঃ রায়কে হারাতে হবে।'

মেম সাহেবেরা চ'লে গেলেন। প্রতিমাকে বল্লাম—'এবার আমার বাড়ী পাঠাবার বন্দোবস্ত কর, আমি তো আর 'কার' পাঠাতে বলিনি।' দেবকুমার বাবু তখন কি একটা বই নিয়ে তন্ময় হ'য়ে পড়ছিলেন। প্রতিমা খোঁজ নিয়ে দেখ্‌লে তাদের সোফেয়ারটা চ'লে গিয়েছে, তখন ওর বাবা আমায় নিজেই ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে যেতে চাইলেন। দেবকুমার বাবুর বোধ হয় জিতে মনটা ভাল ছিল তাই বল্লেন—'ওঁকে আমিই নামিয়ে দিয়ে যেতে পার্‌ব।' আমি ওঁর দিকে না চেয়েই বল্লাম—'আপনি আবার কেন অত কষ্ট কর্‌তে যাবেন, আমি একটা চাকর নিয়ে ট্যাক্সি করেই যাব।' তিনি শুধু বল্‌লেন—'আপনি যা ভাল মনে করেন তাই কর্‌বেন।' আমার কথা শুনে প্রতিমার মা বল্লেন—'না শুকু, এত রাত্রে ট্যাক্সি ক'রে যেয়ে কাজ নেই, দেবকুমার তো বল্‌ছে তোমায় নামিয়ে দিয়ে যেতে ওর কোন অসুবিধা হবে না, ওরই সঙ্গে যাও না।'

অগত্যা যেতে হ'ল। সত্যি, অমন বদমেজাজী লোকের সঙ্গে যেতে আমার ভয় হচ্ছিল, রাগের মাথায় ও' হয় ত মেরেও দিতে পারে! একে তো সেই টেনিস্ পার্টির দিন থেকে আমার উপর এমনি চোটে আছে, তার উপর কথা বল্‌তে চেষ্টা করলে ও' হয় ত পথের মাঝখানে আমায় নামিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে। আমি কিন্তু চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি না, তাই সাহস ক'রে বল্লাম—'আচ্ছা, লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে বুঝি আপনার কষ্ট হয়?' সে এমন ক'রে 'কি?' বল্লে যে আমি একেবারে ছোট্‌কে প'ড়ে যাবার দাখিল! বাপ্‌রে—গলা নয় ত যেন ডাবল্ বেস্ বাজ্‌ছে। আমি আর কিছু না ব'লে চুপ ক'রে রইলাম। বাড়ীর কাছাকাছি আস্‌তে সে বল্লে—'এইখানেই আপনাকে নামাতে হবে তো?' আমি দুষ্টুমি ক'রে বল্লাম—'হ্যাঁ, যদি বলেন তো এই মোড়েই নেমে যেতে পারি।' সে কেমন গম্ভীর ভাবে বল্লে—'হ্যাঁ, তা পারেন, তবে গেট পর্য্যন্ত নামিয়ে দেওয়াই আমার ইচ্ছা।'

ও:, কি ঝাঁঝাল মেজাজ, পৃথিবীতে ওঁরই ইচ্ছামত কাজ হবে, অন্য তো কারু ইচ্ছা ব'লে জিনিষ নেই! আমি বল্লাম—'আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।' 'আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেব ব'লে মিসেস্ সেনের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি, রাস্তায় নামাতে পার্ব না।' ব'লে সে আপন মনে ঘড়িতে দম্ দিতে লাগ্ল। লোকটার কি সবই অদ্ভুত?—রাত দুপুরে যে কেউ ঘড়িতে দম দেয় তা আমি জান্তাম না। বাড়ী ও' ততক্ষণে এসে গিয়েছিল, আর কথা কাটাকাটি হ'ল না, কিন্তু ওর এই জেদের দরুণ ওকে সাজা দেবই দেব। আমি শুধু—'ধন্যবাদ' ব'লে একেবারে সোজা উপরে উঠে এলাম। সত্যি, এই লোকটিকে আমি দুটি চক্ষে দেখ্তে পারি না - চেহারা দেখ্লে আমার আপাদমস্তক জ্ব'লে যায়। থাক্‌গে যাক্, ওকে গাল দিতে আরম্ভ কর্লে আমার খাতা শেষ হ'য়ে যাবে।

(ক্রমশঃ)

দ্বন্দ্ব

শ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজার প্রিয় সখা চিত্রকর বিনায়কের যত কিছু ঝগ্‌ড়া রাণীর অন্দরের বীণাবাদিনী রুক্মিণীর সাথে।

কেন যে তাদের ঝগ্‌ড়া, কিসের যে তাদের কলহ তা' তারা বুঝ্‌তো না; তবু দেখা হোলেই দু'জনে দু'জনকে বিঁধ্‌তো কথার বাণে।

তা'তে তা'রা ব্যথা পেতো কিন্তু শান্ত হোতে পার্‌তো না।

তাদের ঝগ্‌ড়ায় রাজা-রাণী হাস্‌তেন। পরস্পরকে আঘাত কোরে নিজেরাই বেদনা পেতো; কিন্তু এই বেদনাই যে তাদের কত সুখের ছিল এ কথা তারা সেইদিন বুঝ্‌লে—যেদিন রাজা গেলেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে বিনায়কে সাথে নিয়ে।

রুক্মিণীর দিন বুঝি আর কাটে না। তার বীণাতে সুর বাজে না। চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ বেলা শেষ হোয়ে যায়, দূর বন থেকে পশ্চিমের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে, রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে রুক্মিণী ভাবে—'যে আমার বীণা শুনে বিদ্রূপ কর্‌তো সেই মানুষই নেই—কার জন্যে বীণা বাজাবো?'

রাজার শিবিরে লড়াইয়ের ফাঁকে বিনায়ক তুলি রং নিয়ে ব'সে ছবি আঁক্‌তে যায় আর তার মনে পড়ে রুক্মিণীর ঘৃণা-ভরা নিবিড়কালো চোখ। তুলি একপাশে সরিয়ে রেখে ভাবে—'কেন মিছে আঁকা? আমার ছবি দেখে যে মুখ ঘুরিয়ে নিত—সে তো আজ নেই।'

এমনি ক'রে একটি বছর কেটে গেল। রাজা জয়ী হোয়ে দেশে ফির্‌লেন।

বিনায়কের হাতে এখন তুলি চলে না, তলোয়ার চলে ভাল।

রুক্মিণীর ঘরেরকোণে বীণার তারে মর্চে ধরেছে।

রাণীর কুঞ্জবনে বকুলবীথিকায় দু'জনের হোল দেখা। আজ তারা মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলে খুঁজে পেয়েছে মনের ভাষা।

একাকীয়া

জসীম উদ্‌দীন

টিপ টিপ করে' বৃষ্টি পড়িছে, কালো কুজ্‌ঝটি-রাতি
রহিয়া রহিয়া গুমরি' কাঁদিছে উতল পবনে মাতি'।
ঘরে ঘরে সবে নিবায়েছে বাতি, ঘুমের বসন টানি'
গ্রাম যেন আজ মেঘলা রাতের দেখিছে স্বপনখানি।
ও পাড়া হইতে বিরহী চাষীর রাখালী সুরের গান
এই ঝড় জলে ভিজিয়া বাহিরে করে কার সন্ধান।

আঁধারে-আঁধার —রাতের নদীর আঁধারের বান আসি'
মাঠ ঘাট বন তলাইয়া দিয়া উল্লাসে চলে ভাসি'।
বাতাস তাহারে নাড়িয়া নাড়িয়া যেন হয়রান হ'য়ে
দূর তালীবনে ক্ষণেক জিরায় ভিজা অঞ্চল ল'য়ে।

এ আঁধার রাতে কার মেয়ে তুমি আঁচলে ঢাকিয়া বাতি,
একা পথ বেয়ে কোন্ সন্ধানে চলিয়াছ রাতারাতি।
উতল পবনে অলক উড়িছে, মেঘের বসনখানি
ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় যতবার গা'য় জড়াইতে চাহ টানি'।
এখন ত পথে চলে না পথিক, জনহীন মাঠ বাট
আঁধারের পর আঁধার লিখিয়া নীরবে করিছে পাঠ।
শ্মশানঘাটার আধ-নিবন্ত চিতার অনল ঘিরে'
কপিলবরণ পিশাচ নাচিছে আঁধার লইয়া শিরে।
গোরস্থানের কবর ফাঁড়িয়া মৃতেরা বাহিরে আসি'
মড়ার খুলিতে শিস দিয়ে দিয়ে ফিরিতেছে উল্লাসি'।

এখন তোমারে কে আনিল পথে, আজি এ আঁধার রাতে
ধরণীর ত্রাস মূর্ত্তি ধরিয়া ফিরিতেছে নিরালাতে।
আকাশে তাহার ঠেকিয়াছে শির, চরণ পাতাল-তলে,
এক হস্তেতে খণ্ড পৃথিবী—আর হাতে অসি দোলে।
মেঘের মন্দ্রে হুঙ্কার ছাড়ি' উগ্র সে কাপালিক
ফিরিছে নাচিয়া, ভয়ে তমসায় লুকায়েছে দশ দিক।

হেনকালে তুমি কেন পথে এলে ? কিসের মনস্তাপ
তোমারে বরণ করাতে শিখাল ভয়ঙ্করের শাপ।
আঁধার-নদীতে তুফান উঠেছে, লইয়া সোনার নাও,
দূরদেশিয়া গো, বল তুমি আর কোন্ দূর দেশে যাও ?
আঁধারের সাথে যুঝিয়া যুঝিয়া, বুকের প্রদীপখানি
বল তুমি আজ কার গেহছায়ে লইয়া যাইবে টানি'।
কালিয়া মেঘেতে গগন আঁধার, ঝরিছে বাদল-জল,
মাতাল বাতাসে কাঁপিছে তোমার আলো-ঘেরা অঞ্চল।
সবারি দুয়ার বন্ধ এখন, প্রদীপ জ্বলে না ঘরে,
স্বপন এখন করিতেছে খেলা মানুষের মন ধরে'।
এখন ত পথে চলে না পথিক, তবে বল কার লাগি'
দূর বনপথে প্রদীপ দোলাও একা একা রাত জাগি' ?

আমি কি আজিকে বাহির হইব ভয়ঙ্করের পথে ?—
কেউ কি আমার লেখন লিখেছে তোমার আলোর রথে ?
রহিয়া রহিয়া কাঁদিছে বাদল উতল পবনে মাতি',
একা পথ বেয়ে কে তুমি চলেছ আঁচলে ঢাকিয়া বাতি !

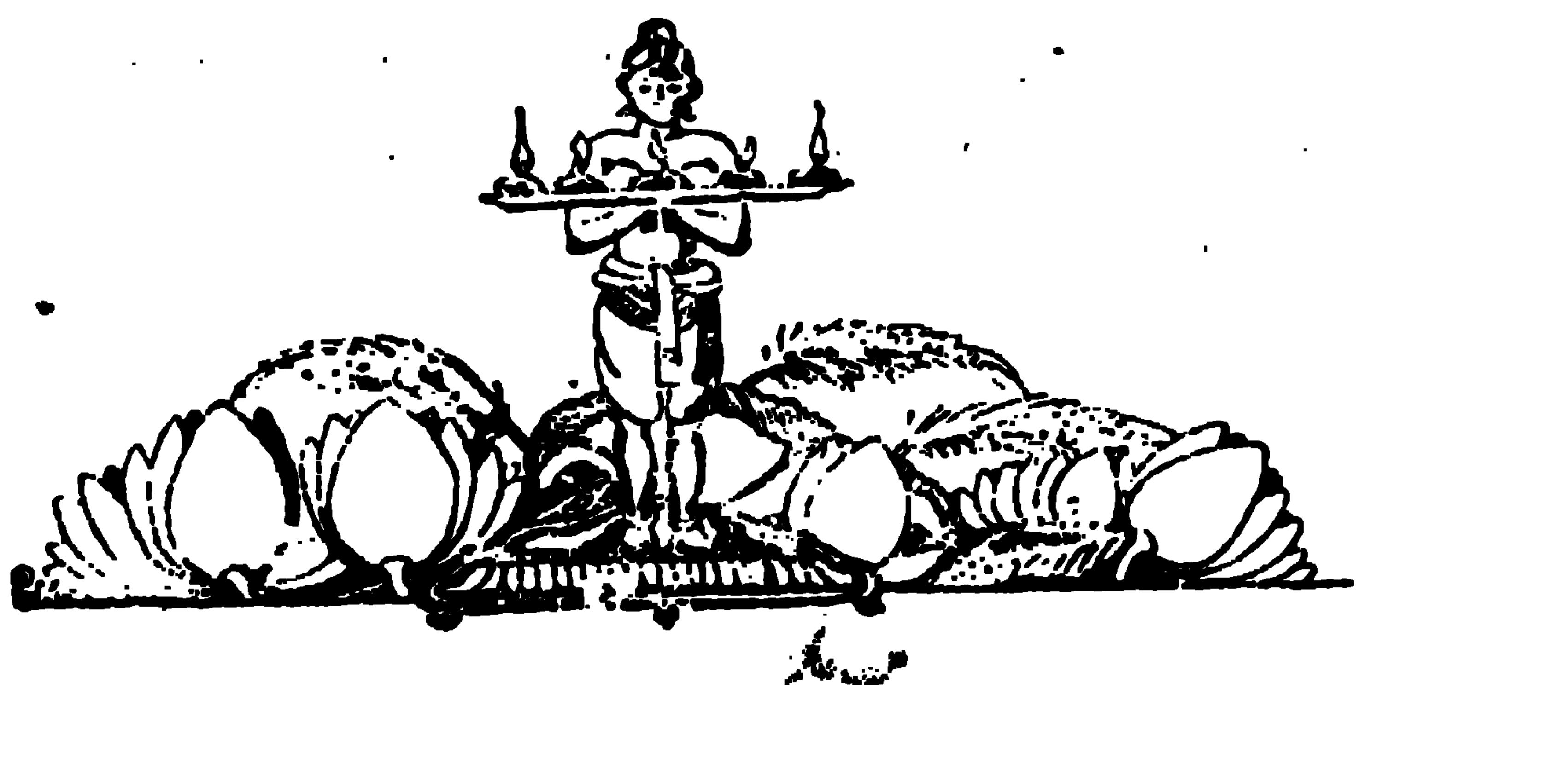

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাংলার যোদ্ধা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই সি-এস্

রায়বেঁশে' ও 'ভল্লা'

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে রায়বেঁশেদের বিচিত্র কাহিনী—তাহাদের অভ্যুত্থান, প্রভাব, অজ্ঞাতবাস ও অবনতি, ইতিহাসে বাংলার জীবনে যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের একটি প্রতীক স্বরূপ। অতি প্রাচীন যুগে, বাংলা ভাষার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, ইহাদের নাম যে কি ছিল তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহারা যে খুব সম্ভবতঃ ভীমের বংশধর ও অর্জ্জুনের রণতাণ্ডব নৃত্যকলার উত্তরাধিকারী তাহা আমরা দেখিয়াছি। এবং গঙ্গারাঢ় (গঙ্গারাষ্ট্র) যুগে যখন বাংলা শৌর্য্যেবীর্য্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন হইতেই রাঢ় দেশ এই শ্রেণীর যোদ্ধার শৌর্য্যগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া 'বাংলার স্পার্টা' নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ইহারা প্রধানতঃ ভল্লধারী যোদ্ধা ছিল এবং 'রায়বেঁশে' নাম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে খুব সম্ভবতঃ ভল্ল অস্ত্রের * নামের সঙ্গে ইহাদের নামের সংযোগ ছিল। এই অনুমানের অপ্রত্যাশিত সমর্থন পাওয়া যায়—'ভল্লা' নামে যে একটা জাতি মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় এখনও বর্ত্তমান আছে তাহা হইতে। এই ভল্লা জাতির লোক আধুনিক সমাজের শ্রেণীবিভাগ হিসাবে বাগ্দী জাতি শ্রেণীয়। ইহারা যে এককালে প্রবল বলশালী এবং যোদ্ধা শ্রেণীর ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বহুযুগের অবজ্ঞা ও ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ইহাদের আর্থিক অবস্থা অবনতির গভীরতম স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং যুগের পর যুগ বৎসরের পর বৎসর অনশনে থাকিতে হয় বলিয়া, ইহাদের শারীরিক তেজস্বিতা ও শক্তির মাত্রা এত অভাবনীয় ভাবে হ্রাস পাইয়াছে যে, ইহাদের প্রাচীন যুগের তেজস্বিতা ও শক্তির শতাংশের একাংশও বজায় আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, অবনতির গভীরতম গহ্বরে নিপতিত বাংলার নির্য্যাতিত এই বীরের দলের বীরোচিত মূর্ত্তির, তেজস্বিতার, অসমসাহসিকতার, অনির্ব্বচনীয় নির্ভীকতার ও বিপদে ভ্রূক্ষেপহীনতার যে শতাংশের একাংশ আজিও অবশিষ্ট আছে, তাহা আজকালকার বাংলার পুরুষকার-বিহীন শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের প্রাণে এখনও যে ভীতি-সঞ্চার করিয়া দেয়, ইহা বীরভূমের পূর্ব্বাঞ্চলের ও মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলের লোকের কাছে অবিদিত নাই। এবং ইহারা যে রাঢ় প্রদেশের "স্পার্টান" সৈন্যদলের একটা বিশেষ অংশ ছিল তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাদের বর্ত্তমান নাম হইতেও প্রতীয়মান হয় যে সংস্কৃত যুগে ইহাদের 'ভল্লায়ুধ,' 'ভল্লধারী' অথবা ভল্ল কথার সহিত সংযুক্ত এমনই কিছু একটা নাম ছিল, এবং বাংলা যুগে এই শ্রেণীর বেশীর ভাগ যোদ্ধাই 'রায়বেঁশে' আখ্যা লাভ করা সত্ত্বেও ইহাদের একটি শ্রেণীতে এখনও এই প্রাচীন নামের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি হইয়া যায় নাই। সমাজের হস্তে নির্য্যাতিত এবং জীবিকানির্ব্বাহ-বৃত্তির সুযোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া, আর্থিক অবস্থার পীড়নে ইহারা আজকাল অনেক স্থলে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থার সুযোগ পাইলে ইহারা যে আধুনিক কালেও বাংলার গৌরবের পাত্র হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মন্দির-প্রাচীরের যোদ্ধামূর্ত্তি

গঙ্গারাঢ় যুগে যে বাঙ্গালী সৈন্যের প্রচণ্ড পরাক্রমের স্মৃতি মাত্রেই সেকেন্দরের (Alexander) সৈন্যদের প্রাণে ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল, তাহাদের আকৃতি যে কিরূপ ছিল তাহার ছবি কল্পনা চক্ষে আঁকিয়া তুলিতে কোন্ বাঙ্গালীর প্রাণেই না একটা তীব্র আগ্রহ জাগিয়া উঠে? কিন্তু সেই আগ্রহের পরিতৃপ্তি সাক্ষাৎ ভাবে সম্ভব না হইলেও, তাহার

* "ভল্ল" শব্দটি বিনাশার্থক 'ভল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

বহু পরবর্ত্তী যুগের ভাস্কর্য্যে তাহার এমনই একটা নিদর্শন আমরা পাইয়াছি, যাহা আমাদের চোখের সামনে গঙ্গারাঢ় ও পাল যুগের বাংলার যোদ্ধার আকৃতির ছবি ফুটাইয়া তুলিবার সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ, বিগত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে বাংলার সমাজে যোদ্ধাশ্রেণীর জাতির যে কি আকস্মিক ও অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণও আমরা এই ভাস্কর্য্যমূর্ত্তির নিদর্শন হইতে পাই।

এই বহুমূল্য নিদর্শনটি আমরা পাইয়াছি শান্তি-নিকেতনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের সৌজন্যে। বৎসরেক কাল পূর্ব্বে নন্দলাল বাবু বীরভূম জেলার ইলমবাজার নামক গ্রামের আনুমানিক দুই তিন শত বৎসর কাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে দুইটি বীরমূর্ত্তি কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন, এবং সেই দুটিকে শান্তিনিকেতন কলা ভবনে' সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দুইটি বীরের প্রতিমূর্ত্তি তিনি কুড়াইয়া পাইলেন, ইহারা যে কোন্ জাতীয় এবং কোন্ দেশের লোক, তাহা তিনি তখন স্থির নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিগত মাঘ মাসে (১৩৩৭) শিউড়ী প্রদর্শনীক্ষেত্রে পুনরাবিষ্কৃত বাংলার রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরদিগের আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে দুইটি বীরমূর্ত্তি ইলামবাজারের ভগ্নমন্দির হইতে তিনি কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার রায়বেঁশে যোদ্ধাদেরই প্রতিমূর্ত্তি। নন্দলাল বাবুর নিকট হইতে এই মূর্ত্তি দুইটি লইয়া আমি তাহার যে আলোকচিত্র (Photo) উঠাইয়াছি তাহা এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইল, এবং ইহার সঙ্গে তুলনার জন্য রায়বেঁশেদের দুইটি বর্ত্তমান বংশধরের প্রতিকৃতির একই ভঙ্গীতে গৃহীত আলোকচিত্রও 'বঙ্গলক্ষ্মী'র পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হইল।

ভাস্কর্য্য ও সাহিত্যের সমর্থন

মন্দিরের দেয়ালে ক্ষোদিত যে দুইটি প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি রায়বাঁশের (ভল্ল) উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে * ও অপর মূর্ত্তিটির দক্ষিণ হস্তে উদ্যত তরবারি। উভয় মূর্ত্তিই ভীমকায়, স্ফীতপেশী, উন্নতবক্ষ। উভয়টিতেই অমিত বীর্য্য, সংহত শক্তি, সংযম ও গুরুগাম্ভীর্য্যের এমনই একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু যে গঙ্গরাঢ়ীর বাঙ্গালী যোদ্ধাদের বীর্য্যকাহিনী শুনিয়া সেকেন্দরের সৈন্যদল ভয়ে পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছিল, এবং যাহারা খৃষ্টপূর্ব্ব শেষ শতাব্দে ভারতবর্ষের বাহিরে এণ্টনীর সহিত রোমসম্রাট আগষ্টাসের যুদ্ধে, আগষ্টাসের পক্ষে যোদ্ধবেশে রণক্ষেত্রে অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া তৎকালীন ইতালীয় মহাকবি ভার্জ্জিলের অপরিমিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, † এবং পাল যুগে যে সকল বাঙ্গালী সৈন্য সমগ্র ভারতে দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছিল তাহাদেরই অমিত শক্তি ও পরাক্রমের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা এই দুই মূর্ত্তি হইতে পাই। আর, এই দুই মূর্ত্তি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ঘনরাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে, মুকুন্দরাম তাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে, এবং রামপ্রসাদ তাঁহার কাব্যগ্রন্থে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রায়বেঁশে যোদ্ধাদের শক্তি, সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্যের যে অপরিসীম প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কবিকল্পনা নহে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও রায়বেঁশে যোদ্ধাদের শারীরিক শক্তি এবং সামরিক শৌর্য্যবীর্য্য তৎকালিক জনসাধারণের বিস্ময় ও গৌরবের বিষয় ছিল। বর্ত্তমান বাংলার জীবিকানির্ব্বাহ-বৃত্তি হইতে বিচ্যুত, দারিদ্র্যপীড়িত, অনশন ও অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট রায়বেঁশে বংশধরদিগের নৃত্যে আমরা যে

* ভল্লের নিম্নের ফলকাংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

† ইতালীয় মহাকবি ভার্জ্জিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার 'জর্জ্জিকস্' নামক কাব্যে লিখিয়াছেন—"আমি আমার জন্মভূমি মণ্টুয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি মর্ম্মর-মন্দির নির্ম্মাণ করিব এবং তাহার তোরণ-শীর্ষে সুবর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গরাঢ়ীদিগের সমরে শৌর্য্য-কাহিনী লিখিয়া রাখিব।"

"...On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaridæ and the arms of our victorious Quirinius."

—Georgics iii, 27, translated by Ransdale & Lee.

হুগলী, মহানাদ) মন্দির-প্রাচীরের 'বাংলার যোদ্ধামূর্ত্তি'

নানারূপ অভিনয়ের আভাস পাই, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কেবল ভল্লধারী সৈনিক ছিল তাহা নয়, তাহারা যুদ্ধে প্রয়োজনমত তীরধনুক ব্যবহার * ও অসিচালনা করিত এবং তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী যোদ্ধাও ছিল। কেন না, তাহাদের তাণ্ডব নৃত্যে তাহারা এখনও এই সকল বিভিন্ন প্রকারের সমর-প্রণালীর অঙ্গভঙ্গী ও অস্ত্র-চালনার অভিনয় করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, আজকাল ইহাদের মধ্যে অনেকে কাষ্ঠনির্ম্মিত ‘গদ্‌কা’ (তরবারির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অনুকৃতি) হস্তে অসিযুদ্ধের অভিনয় করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষরা যে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভল্লযুদ্ধ ছাড়াও অসিযুদ্ধ করিত তাহার সমর্থন আমরা পাই এই মন্দির প্রাচীরের মূর্ত্তি হইতে। এই মূর্ত্তি দুইটি দেখিলে রামপ্রসাদের কাব্যে “দেখিতে সাক্ষাৎ কাল” বর্ণনাটি যে অতিরঞ্জন নয় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। † ইহাদের মাথায় যে সিংহের কেশরের ন্যায় বীরোচিত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাব্‌রি চুল থাকিত, তাহার প্রমাণও এই মন্দির-প্রাচীর-মূর্ত্তি হইতে আমরা পাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহাদের বর্ণনায় “সোনার মুকুট শিরে,” “সোনার টোপর শিরে,” “মাথায় জালের দড়ি” ইত্যাদি বর্ণনা পড়িয়া আজকাল অনেকেরই মনে এইগুলি কবিকল্পনা বলিয়া সন্দেহ করার একটা ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে। * কিন্তু এই সব বর্ণনার মধ্যে

---

* “কোটি কোটি তীরন্দাজ পেকো বিন্ধে একন্দাজ
রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।”

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ
(বঙ্গবাসী সং, ১৭ পৃঃ)

† “...নামজাদা মালগুলা গায় মাখা রাঙ্গা ধূলা
বিক্রমের কত কব কথা।
পাছে ডানা মারে আটি ধমকেতে মাটি ফাটি
গোড়া শুদ্ধ উপাড়ে অমনি।
পিছে হটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাত কাল
অকালেতে জলদের ধ্বনি॥
বাহু-যুদ্ধে যুঝে ভেলা ভূমে পড়ে করে খেলা
সন্ধান সবাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পায়
হাঁ করিয়া একা চোট হানে॥
কোটি কোটি তীরন্দাজ যেথা বিন্ধে একন্দাজ
রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে ধারা বয়া রক্ত পড়ে
খোমকে সমান যুঝে ছুটা।”

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ (বঙ্গবাসী সং, ১৭ পৃঃ)

* “লয়ে শত করিকাল ধাইল মদন পাল
ঘন ঘন ফেলে খাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে মহী থর থর করে
ফণিপতি আদি নাগ কাঁপে॥
সোনার নূপুর পায় বীর বেড়া পাকে ধায়
রায়বাঁশ ধায় খরশান।
সোনার মুকুট শিরে ঘন সিংহনাদ করে
বাঁশে দিল চামর নিশান॥
আশী গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
কাঁড় ধরে তিন তিন শাটি।
পরিধান বীরধড়ি কানে ফটিকের খড়ি
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি॥”

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং, ২৯০ পৃঃ)
(কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসজ্জা —পাঠান্তর)

“লক্ষ লক্ষ ফিরে কাল সাজিল মদন পাল
ঘন ঘন ফেলে খাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে ক্ষিতি টলমল করে
ফণিপতি আদি নাগ কাঁপে॥
আশী খণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
কাঁড় ধরে তিন তিন কাঠি।
পরিধান বীরধড়ি মাথায় জালের দড়ি
অঙ্গে মাখয়ে রাঙ্গা মাটি॥
বাজন নূপুর পায় বীর ঘটা পাইক ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরশান।
সোনার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে দোলে চামর নিশান॥”

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসজ্জা)
বঙ্গবাসী সং (৯৪ পৃঃ)

‘রণস্থলে সাজে রথী বীরবলে সেনাপতি
রথ আগে ধাইল দম্বল।
সোনার কলস জড়ে নেতের পতাকা উড়ে
রথশিরে ধবল চামর॥
বাজন নূপুর পায় বীর ঘণ্টা পাইক ধায়
রায়বাঁশ্তা ধায় খরশান।
সোনার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান॥”

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৬৫)

বর্দ্ধমান বাংলার লুপ্তাবশেষ যোদ্ধার মূর্ত্তি

যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই তাহার চমৎকার প্রমাণ আমরা পাই– সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য ভাস্কর দ্বারা ইলামবাজার মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত তৎকালিক রায়বেঁশেদের প্রতিমূর্ত্তিতে। এই দুইটি প্রতিমূর্ত্তি হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন—একটি মূর্ত্তির মাথায় মাথার ঝাঁকড়া চুলকে বেষ্টন করিয়া 'জালের দড়ি'র মতই ঝালরওয়ালা বেষ্টনী বাঁধা আছে, এবং ইহা কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যের "মাথায় জালের দড়ি" এই বর্ণনাটির আশ্চর্য্যভাবে সমর্থন করিতেছে। অপর মূর্ত্তিটির মাথায় টোপরের মতই একটি পাগড়ী বাঁধা আছে; এই টোপরটি যে খুব সম্ভ তঃ সোনালী কাপড়ের ছিল, তাহা উক্ত কাব্যের "সোনার টোপর শিরে," "সোনার মুকুট শিরে," ইত্যাদি

বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। এই কাব্য এবং ভাস্কর্য্যের উভয়বিধ প্রমাণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রায়বেঁশে জাতীয় বাঙ্গালী সৈন্যদের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাব্‌রি চুলকে অতি শোভনভাবে বেষ্টন করিয়া টোপর পরিবার অথবা পাগ্‌ড়ী বাঁধিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

সেকাল ও একাল

সমাজ তখন তাহাদের যোদ্ধা হিসাবে সমাদর করিত; সুতরাং অন্নাভাবে তাহাদের দেহ শীর্ণ হইত না, জীবিকা-নির্ব্বাহের বৃত্তির অভাবে তাহাদিগকে কাঙ্গাল-বেশ ধরিতে হইত না এবং তাহাদের মাথায় গৌরবমণ্ডিত বাব্‌রি চুলের বেষ্টনী বাঁধিবার জন্য সোনার পাগ্‌ড়ীর সোনার কাপড়ের অভাব হইত না। ইহাদের বর্ত্তমান বংশধরদিগের যে দীনতাব্যঞ্জক মূর্ত্তি তুলনার জন্য মুদ্রিত করা হইল, তাহা হইতে গত দুই শত বৎসরের মধ্যে বাংলার অমূল্য সম্পদ এই অমিতবিক্রম যোদ্ধাদের বংশধরদিগের অবস্থা ও আকৃতির কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন কেন হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের আচার ব্যবহার,রীতি-নীতি এবং মানসিক ভাবের অন্তর্নিহিত ধারার একটি প্রকৃত পরিচয় অতি আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠে। সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে বাংলা দেশের বীরের দলকে কেন কাঙ্গাল সাজিতে হইয়াছে,—এবং অনেক স্থলে দুঃসহ অভাবের নির্ম্মম প্রয়োজনে পড়িয়া দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে লুণ্ঠতরাজের দ্বারাও জীবিকা-অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাংলার প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরদিগকে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহন্নলার নপুংসক বেশে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, রণ-তাণ্ডব নৃত্যকলা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণলীলার ও বাইনাচের লাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত তাহাও আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এবং আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের যুদ্ধ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের সুযোগ এদেশে আর নাই। ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমান বাংলা দেশের লোক পুরুষের তাণ্ডব নৃত্যের আদর করিতে এবং অর্থ বুঝিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা এখন কেবল চায় মেয়েলি বাইজী নৃত্য অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নৃত্য।

বাংলার সমাজে 'উল্টোপুরাণের' অভিনয়

ইহা অপেক্ষাও আর একটা ঘোরতর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন বাংলার জীবনে ঘটিয়াছে। বাংলার সমাজে জড়তা, অলসতা, নিষ্কর্ম্মণ্যতা, দেহের অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা এবং মেয়েলি কৃত্রিম 'রুচি ভাব' শিক্ষিত সমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া, ভদ্র-সংজ্ঞার নিদর্শক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং শ্রমপটুতা, কর্ম্মঠতা, দৈহিক ক্ষিপ্রতা ও বলশালিতা, সাহসিকতা এবং পৌরুষের ভাব সমাজে ঘৃণ্য বিবেচিত হইয়া, ছোটলোকের সংজ্ঞার নির্দ্দেশক হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র খুঁজিয়া দেখুন, আর কোনো দেশে এরূপ 'উল্টো-পুরাণের' বীভৎস অভিনয় একটা জাতির জীবনে বাস্তব-ভাবে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে, এবং দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। অমুক লোকটি নিজের হাতে খাটিয়া নিজের কাজ করে, অমুক লোকটি শারীরিক বলের চর্চ্চা করে, অমুক লোকটি লাঠি খেলিতে অভ্যাস করে অথবা লাঠি খেলায় পারদর্শী, এবং তাহার শরীরে বল এবং মনে সাহস আছে?—তবে সেই ব্যাটা নিশ্চয়ই গুণ্ডা অথবা দস্যু, নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে একটা কিছু কু-অভিসন্ধি আছে, কেন না সে বর্ত্তমান বাংলার শিক্ষার ও আদর্শের ব্যতিক্রম। তুমি যদি শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে চাও তাহা হইলে তোমাকে হইতে হইবে ভীরু, রুগ্ন ও দুর্ব্বল। যদি ধার্ম্মিক হইতে চাও তাহা হইলে তোমার মনকে করিতে হইবে মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরে আবদ্ধ, জীবনকে করিতে হইবে বিচারহীন আচারে শৃঙ্খলবদ্ধ এবং ফোঁটা-তিলক পরিয়া পালন করিতে হইবে ছোঁয়াছুঁয়ির শুচি-বাই। যদি হালফ্যাসানের কবি অথবা সংস্কৃষ্টিবান (cultured) বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতে চাও তাহা হইলে রাখিতে হইবে চিকণ চাঁচর কেশ, পরিতে হইবে ফুল-কোঁচানো মিহি ধুতি এবং রেশমী পাঞ্জাবী,—চলিতে হইবে সলজ্জ রুচি-ভাবে,—

কহিতে হইবে টানা টানা মেয়েলি সুরে কথা এবং লিখিতে হইবে কোমল পেলব ধোঁয়াটে ভাবের অর্দ্ধবোধ্য-অর্দ্ধ-অবোধ্য ভাষায়। আর যদি সম্পত্তিপন্ন বা সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে চাও তাহা হইলে শরীরটাকে করিতে হইবে একটা পেশীহীন স্ফীত থলথলে মাংসপিণ্ড, গজাইতে হইবে ভুঁড়ি, বনিতে হইবে অলস ও অকর্ম্মণ্য, এবং চলিতে হইলে নির্ভর করিতে হইবে নিজের পায়ের উপর নয়—পাল্কী-বেহারার কাঁধের উপর অথবা মোটর গাড়ীর গদীর উপর, আর আত্মরক্ষার ভার দিতে হইবে পশ্চিমা অথবা গুর্খা দরওয়ানদের উপর। বাংলার পল্লীগ্রামে গরীবদের মধ্যে যদি দৈবাৎ কেহ বলশালী, সাহসী

"—মাথায় জালের দড়ি"

মন্দির-প্রাচীরের এই ক্ষোদিত মূর্ত্তিটির মাথার ঝাঁকড়া বাব্‌রি চুলকে বেষ্টন করিয়া 'জালের দড়ি'র বেষ্টনী দেখা যাইতেছে।

অথবা লাঠিয়াল শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদের সন্দেহদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অচিরে দুর্ভাগ্যময় ও দুর্ব্বহ হইয়া পড়িবে।

নির্য্যাতন ও গোপন সাধনা

এইরূপ ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রায়বেঁশে যোদ্ধা-দিগের বীর বংশধরগণ যে গত দুই শতাব্দী কাল তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পৌরুষাত্মক ব্যায়ামকলার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছে, তাহা যে কি কষ্ট ও দুঃসাধ্য সাধনা-সাপেক্ষ ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শারীরিক ব্যায়ামের চর্চ্চা করিতে গিয়া ইহাদের অনেককেই সমাজের চক্ষে সন্দেহের ভাগী হইয়া নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে, এবং অনেককেই এই নির্য্যাতন ও সন্দেহের ভয়ে এইরূপ ব্যায়াম-চর্চ্চা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। যাহারা এইরূপ বিপদ সত্ত্বেও পুরুষানুক্রম ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের ইহা করিতে হইয়াছে অতি গোপনে—লোকচক্ষুর আড়ালে। আমি যখন প্রথম বীরভূম অঞ্চলে কোথায় কোথায় রায়-বেঁশের দল এখনও আছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রথম প্রবৃত্ত হই, তখন এই নির্য্যাতনের ভয়ে ইহাদের অনেকেই রায়-

"—সোনার টোপর শিরে"

এই ক্ষোদিত মূর্ত্তিটির মাথায় পাগ্‌ড়ীর বেষ্টনী (সম্ভবতঃ সোনালী কাপড়ের) রহিয়াছে।

বেঁশের দলে থাকার কথা ও আপনাদের ব্যায়াম চর্চ্চার পারদর্শিতার কথা অস্বীকার করিয়াছিল এবং গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব দূর করিতে আমাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। দেশের এবং সমাজের মনোভাবের, শিক্ষাধারার ও আদর্শের এই শোচনীয় পরিণামের ফলে বাংলা দেশ হইতে গত দুই শতা-ব্দীর মধ্যে যে কত সাহস ও শৌর্য্যসম্পদ লোপ পাইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

জাতীয় জীবনের সংস্কার ও পুনর্গঠন

ফলতঃ ইহা নিঃসন্দেহ যে, বাংলার সমাজকে আবার শৌর্য্য-বীর্য্যে প্রভাবান্বিত করিতে হইলে বাংলার ভদ্র সংজ্ঞা হইতে ও ভদ্র সমাজের জীবন হইতে জড়তা, অলসতা, ভীরুতা, শ্রমবিমুখতা ও নিষ্কর্ম্মণ্যতার আদর্শ এবং শূন্যগর্ভ হামবড়া ভাবকে; বাংলার ধর্ম্মজীবন হইতে অতি-ব্রাহ্মণ্যের ছোঁয়া-ছুয়ি ও অস্পৃশ্যতার ভণ্ডামিকে, অতি-মন্ত্রতন্ত্রবাদের মিথ্যা ভেল্কীবাজীকে; এবং বাংলার শিক্ষার ও সাহিত্যের আদর্শ হইতে পুরুষকারহীন কৃত্রিম অতি কচি ভাবকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহজ, সরল, সবল, পৌরুষময় জীবন্ত ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে,—নিরানন্দতার ভাবকে উৎপাটিত করিয়া জাতীয় জীবনকে নির্ম্মল আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে,—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক মর্য্যাদা দান করিবার স্বভাব গঠিত করিতে হইবে।

জাতীয় জীবনের এই সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা আমূল সংস্কারের প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রয়োজন, দেশের লোকের ভাবের, চিন্তার ও জীবনের ধারাকে বর্ত্তমান কালের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা, কৃত্রিমতা ও এলোমেলো অস্বাভাবিকতা হইতে টানিয়া আনিয়া এমন একটা ছন্দে চালিয়া দেওয়া যাহা সহজ অথচ গৌরবময়; যাহা আনন্দময় অথচ নির্ম্মল; যাহাতে মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক মর্য্যাদা কৃত্রিম সাজগোজ ও জাঁকজমকের সহায়তা ছাড়াও আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে; যাহাতে দেশের লোককে জাতিবর্ণ ও ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সাম্যের ও আনন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে; এবং দেশের মানুষের মনকে দুর্ব্বলতা, কৃত্রিম লজ্জাশীলতা ও সঙ্কুচিত ভাব হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সহজ আড়ম্বরহীন পৌরুষের ধারায় চালিত করিয়া দেয়। এই ছন্দের সন্ধান আমরা বর্ত্তমান বাংলার শিক্ষায় বা আচারে পাইব না, —পাইব প্রাচীন ভারতের গন্ধারাঢ় যুগের ও মৌর্য্য যুগের জীবন্ত অনুপ্রাণনার স্পর্শে। বাংলা দেশের সৌভাগ্যক্রমে আমাদেরই অতি-আপন প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের নির্য্যাতিত বংশধরগণ তাহাদের দীনতার মধ্যেও প্রাচীন ভারতের কৃত্রিমতাহীন শক্তিময় জীবনের যে টুকরাটি আমাদের জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়া আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, তাহাতে এমনই একটি প্রাণবান জীবনীশক্তি নিহিত রহিয়াছে, যাহা আমাদিগকে এই ছন্দের সন্ধান আনিয়া দিবে। জাতীয় জীবনের সকল শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্রে এই ছন্দের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া আমরা যে জাতীয় জীবনকে আবার সহজ, সরল ও প্রভাবান্বিত করিতে পারিব ইহার প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমরা পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ রায়-বেঁশেদের নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এই সম্বন্ধে যে বাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন * তাহাতে বলিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী। আমাদের দেশেরও 'চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য।"

ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে রায়বেঁশে পদ্ধতি কেবল একটি নৃত্যপ্রণালী মাত্র নহে; ইহা আরও এমন কয়েকটি প্রাণবান উপাদানে গঠিত যাহা আমাদের বর্ত্তমান সমাজে প্রাচীন ভারতের অমূল্য দান বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং যাহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া আমরা বাংলার জাতীয় জীবনের সংস্কার ও পুনর্গঠনে প্রত্যক্ষ সহায়তা লাভ করিতে পারিব।

(ক্রমশঃ)

---

* বঙ্গলক্ষ্মী—বৈশাখ, ১৩৩৮।

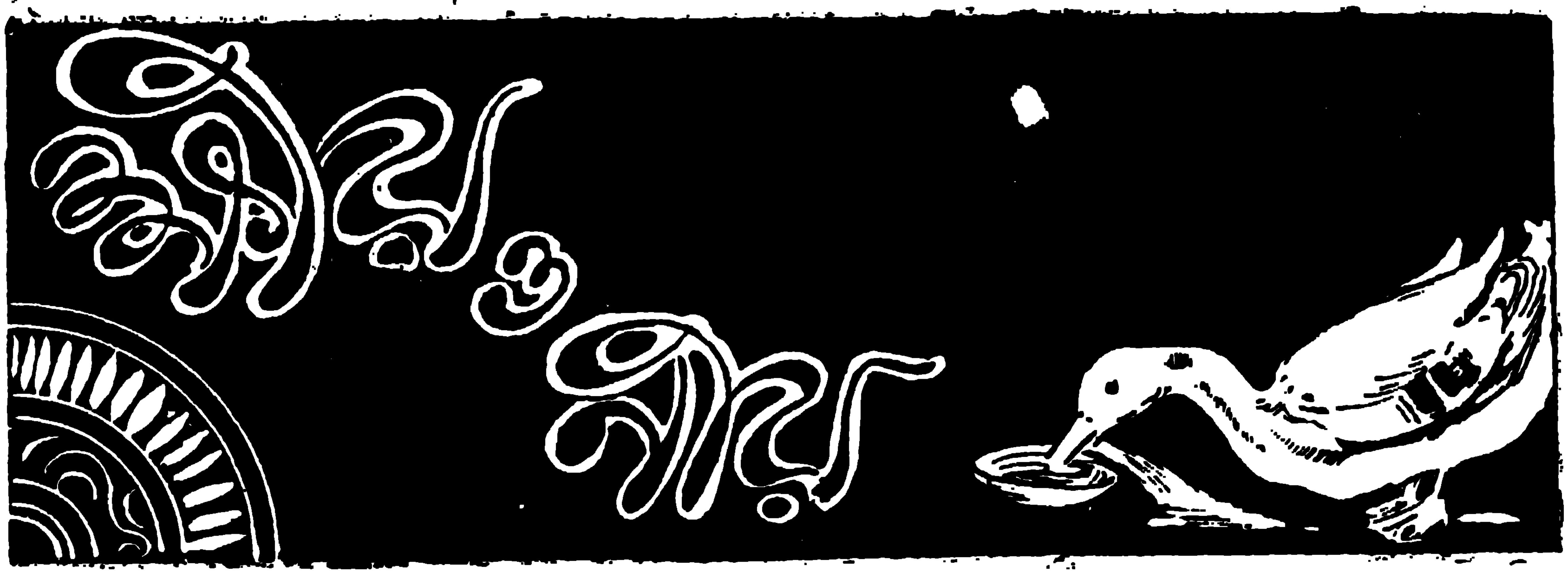

ত্রিস্রোতা—শ্রী কুমুদনাথ দাস। নওগাঁ, রাজসাহী হইতে বসাক, চৌধুরী এণ্ড্ কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য —১॥০ দেড় টাকা।

মানবমন, নিসর্গপ্রকৃতি ও ভগবদ্‌প্রীতি এই তিনটি ধারা মিলাইয়া 'ত্রিস্রোতা'র বেণীবন্ধন করা হইয়াছে। গদ্যপদ্য মিলাইয়া এরূপ হরগৌরী রচনা বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। কবিতাভাগের সবগুলির রূপ কাব্যবিচারে ত্রুটিহীন হয় নাই এবং বহুস্থানেই রসের উপর নীতিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। "সনে, থেমে," "করে', দূরে" প্রভৃতি মিল আজকাল কাব্যে অচল। যুক্তশব্দের বর্ণবৃদ্ধি-বিধান সর্ব্বত্র পালিত হয় নাই জন্য মাত্রিক দোষে কোন কোন পদ শ্রুতি-কটু। নীতিপ্রধান হইলেও "অস্পৃশ্যতা" কবিতাটি আমাদের খুব ভালো লাগিল। বিশ্ববিবুধজনের যে সকল বাণী ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার গদ্যভাগ কিন্তু চমৎকার হইয়াছে—সুমিষ্ট ভাষা, প্রসাদগুণ ও গাম্ভীর্য্যে ইহা পরিণত-প্রাণের পক্ষে তৃপ্তিপ্রদ।

চারণ—শ্রী কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। বাগ্‌চী এণ্ড্ সন্স্, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—বারো আনা।

রাজপুতানার আদর্শ বীরচরিত ও প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা-চরিত্র লইয়া এই গাথাগুলি বিরচিত। ইহাতে ১১টি গাথা আছে। রাজপুতানার এই শ্রেণীর উদ্দীপনাময় চরিতগাথা-গায়ককে 'চারণ' বলা হয়; সেই সূত্রে এই গ্রন্থের 'চারণ' নামকরণ হইয়াছে। ইহা মূল প্রাচীন রাজপুত চরিতগাথার অনুবাদ নহে, টড্-কৃত রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে বিরচিত। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষায় এইরূপ গাথা সর্ব্বপ্রথম রচনা করিয়া (কথা ও কাহিনী) যশস্বী হন। তিনি উদ্দীপনাকে গৌণ করিয়া রসমুখ্য ভাবে গাথাগুলি রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু রসের দিকটা জমাট হইয়া উঠে নাই এবং উদ্দীপনার দিকটাও ফিঁকে হইয়া আছে। ভাষা ভালো, ছন্দপ্রভৃতি সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ নহে। তবে, শিশুসাহিত্যের দিক দিয়া চরিত্রচিত্রণ হিসাবে ইহার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। নবীন লেখকের প্রথম রচনা হিসাবে ইহা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই।

কথা ও কাহিনী সিরিজ পুস্তিকা—প্রকাশিকা শ্রীমতী কিরণলেখা দেবী, 'কলা-ভবন', ৬২ নং কালীঘাট রোড, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা—এক আনা।

এই সিরিজের তিন সংখ্যা পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। প্রতি সপ্তাহে ইহার এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত সংখ্যাত্রয়ে তিন জন প্রসিদ্ধ আধুনিক গল্পলেখকের—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যালের তিনটি গল্প আছে। বঙ্গদেশে এরূপ সুলভ সাপ্তাহিক কথাপুস্তিকা প্রচারের প্রয়াস এই প্রথম।

ভালো কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে ছাপা ও রেশ্‌মী সূতায় শোভন ভাবে বাঁধা।

—বঃ সঃ

'বধূ-বরণ'—শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। মূল্য—দেড় টাকা।

আধুনিক কথা-সাহিত্যিকগণের মধ্যে শৈলজানন্দ দল-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রশংসাভাজন হইতে পারিয়াছেন। যাঁহারা অতি-আধুনিক সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের নিন্দা করিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু শৈলজানন্দের গল্পগুলিকে সত্যকার সাহিত্য বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার 'অতসী' নামক গল্পগ্রন্থ গতানুগতিক গল্পের ধারা অনুসরণ না করিয়া একটি নূতন রীতি ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিল। আজ তাঁহার 'বধূ-বরণ' পরিণততর শক্তির পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা, বিন্যাস-নৈপুণ্য এবং ভাষার সৌন্দর্য্য অপরূপ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। কেহ কাহাকেও ছাড়াইয়া উঠিতে চাহে নাই। শক্তিমান সাহিত্যিক না হইলে হয় ত অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাই থাকিয়া যায়, উহা বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ হইয়া দাঁড়ায়; না হয় ত কাব্যিক উচ্ছ্বাসে গল্পের গল্পত্বই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শৈলজা বাবুর গল্পগুলিতে কোথাও গল্পের আর্ট ক্ষুণ্ন হয় নাই। পরন্তু মানুষকে ও জীবনকে তিনি নূতন রূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার উদার সহানুভূতির স্পর্শে সকল চরিত্রই অনুরঞ্জিত হইয়াছে। সংসারকে তিনি পুণ্যময় শান্তিময় করিয়া দেখান নাই, পাপীর চরিত্রও গাঢ় বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু যে কারণ পরম্পরা তাহাকে হীনতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়াছে তাহার প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমাজের চোখে ননীমাধব চোর, প্রতারক, হৃদয়হীন—সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্ধকার কোণে একটি ক্ষীণ আলোক মাঝে মাঝে জ্বলিয়া ওঠে,—তাহার আভাসও লেখক দিয়াছেন। চিরদিন সে এমন ছিল না। যাহারা তাহাকে পঙ্ককুণ্ডে টানিয়া আনিয়াছে, সমাজ তাহাদের দিকে তাকায় নাই, কিন্তু লেখক তাহাদেরও দেখাইয়া দিয়াছেন। কতজনের প্রতারণা ও ছলনার ফলে অকারণে তাহাকে শাস্তির ভার বহন করিতে হইয়াছে! অবোধ বালককে লইয়া নারীর দল ছিনিমিনি খেলিয়াছে, শাসনদণ্ডের আঘাত সহিতে হইয়াছে তাহাকেই। দেখিয়া শুনিয়া যদি সে নারীর উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়া থাকে, তবে দোষ কি শুধু তাহার?

'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর' এই গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প। মাতৃত্বের সাধ এমন প্রবল উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহা পাঠকের মনকে উদ্দীপ্ত না করিয়া যায় না। সবল কল্পনায়, নিপুণ ঘটনাসংস্থানে, অকৃত্রিম সহানুভূতিতে গল্পটি অপূর্ব্ব রস-সমৃদ্ধ হইয়াছে। গল্পটির ভীষণকরুণ অবসান হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। 'ভঙ্গুর' গল্পটিতে নিয়তির নির্ম্মম লীলা নিপুণতার সহিত দেখান হইয়াছে। মনোবিশ্লেষণেও যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। 'মৃত্যুভয়' গল্পটিতে মানুষের জীবনের প্রতি আকর্ষণ যে কত নিবিড় ও স্বভাবগত তাহাই দেখান হইয়াছে। 'চক্ষুদান' গল্পটিও উপভোগ্য। 'জনী ও টনী' দুইটি কুকুরের নাম। সামান্য প্রাণীর কথা লইয়া এরূপ রস-সৃষ্টি লেখকের উদার মমতার ও রচনা-শক্তির পরিচায়ক।

শুনিতে পাই, গল্পের বই বাংলা সাহিত্যের বাজারে নাকি কাটে না। এরূপ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের যদি যথোচিত সমাদর না হয় তবে বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

কৃত্তিবাস

বঙ্গ-সাহিত্য

শ্রী শিবরতন মিত্র

প্রাক্ চৈতন্য যুগ

হিন্দুশাসনাধিকার কাল—বৌদ্ধ ও তন্ত্র-প্রভাব

(খ্রীঃ ৯ম—১৩শ শতাব্দী—অনুঃ ৮০০-১২০০ খ্রীঃ)

তৃতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩। ময়ূর ভট্টের 'ধর্ম্মমঙ্গল'—এ যাবৎ যতগুলি ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচারক 'ধর্ম্মমঙ্গল'-গ্রন্থ আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত * হইয়াছে, প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থের লেখক, নিজ নিজ গ্রন্থে ময়ূর ভট্টকেই ধর্ম্মমঙ্গল-গ্রন্থের **আদি-কবি** রূপে সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিয়া ধন্যতা লাভ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি স্থলমাত্র উদ্ধৃত হইল—

(১) ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি—ঘনরাম

(২) বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল—মাণিক গাঙ্গুলী

(৩) ময়ূর ভট্ট বন্দিয়া হৃদয়রাম গায়—হৃদয়রাম সেঠ

(৪) ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে সীতারাম দাস গায়—সীতারাম

(৫) আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
বরিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম শতদল।
বরিলা গোবিন্দ বন্দ্যো ধর্ম্মের মঙ্গল॥—গোবিন্দরাম

ময়ূর ভট্ট কবি, যাবতীয় ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক গ্রন্থের আদি-কবি বা প্রবর্ত্তকরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তথাকথিত নামাবশেষমাত্র মাডাগাস্কারের ডোডো-পক্ষীর ন্যায়, বঙ্গ-সাহিত্যে এতদিন কেবল তাঁহার নাম মাত্রই প্রচলিত ছিল—তাঁহার গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় দ্বারা সম্পাদন পূর্ব্বক, ময়ূর ভট্ট রচিত 'ধর্ম্মমঙ্গল'-গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ—ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস 'পুরাণখণ্ড' বা 'সাংজাতখণ্ড' প্রকাশিত করিয়া, বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। +

ময়ূর ভট্ট রচিত গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধের নাম 'চরিতখণ্ড' বা লাউসেনের কাহিনী। এই অংশ এখনও অপ্রকাশিত রহিলেও, প্রথম খণ্ড গ্রন্থের শেষে, এই দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণিতব্য বিষয়ের কতকটা পরিচয় প্রাপ্ত হই। গ্রন্থশেষে, দ্বিতীয় খণ্ডের এইরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

লাউসেন চরিত্রখণ্ড নাম বারমতী!
সকল মঙ্গলদ ধর্ম্মের প্রিয় অতি॥

---

* অদ্যাবধি—১ সহদেব চক্রবর্ত্তী, ২ নরসিংহ বসু, ৩ ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, ৪ রামচন্দ্র বন্দ্যো, ৫ সীতারাম দাস, ৬ রামদাস আদক, ৭ গোবিন্দরাম বন্দ্যো, ৮ মাণিক গাঙ্গুলী, ৯ রামনারায়ণ, ১০ খেলারাম, ১১ রূপরাম, ১২ শ্যাম-পণ্ডিত, ১৩ ক্ষেত্রনাথ, ১৪ ভগীরথ দ্বিজ, ১৫ বলদেব চক্রবর্ত্তী, ১৬ প্রভুরাম ও ১৭ হৃদয়রাম সেঠ—এই কয়জন 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থ-রচয়িতার পরিচয় বা গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

\+ এই গ্রন্থের ভূমিকার প্রথমাংশে লিখিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কেহই এ গ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। এ উক্তি ঠিক নহে। এই প্রবন্ধের দীনতম লেখক যে সর্ব্বপ্রথম ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা "বীরভূমি" মাসিক পত্রে এই গ্রন্থের আবিষ্কার-সংবাদ ও পরিচয় প্রকাশিত করেন—একথা ভূমিকার শেষাংশে সম্পাদক কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে "বীরভূমি" পত্রে কিছু রচনাদর্শও প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্যাম-পণ্ডিত রচিত ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথির বিবরণও ঐ সঙ্গে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

প্রথম মতীতে আছে সৃষ্টিপ্রকরণ।
রঞ্জার উৎপত্তি ইছায়ের বিবরণ॥ (১)
দ্বিতীয় মতীতে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
শাল্লে ভর দিয়া রঞ্জা পুত্রবর পান। (২)
তৃতীয়েতে শিশুচুরি মন্ত্রিমন্ত্রণায়।
মল্লশিক্ষা দুর্গার ছলনা আখড়ায়॥ (৩)
চতুর্থেতে মল্লবধ ফলক গঠন।
কুম্ভীরাদি বাঘ জন্ম বাঘের নিধন॥ (৪)
পঞ্চমেতে বারুই রঙ্গ সুরিক্ষা দলন। (৫)
ষষ্ঠমেতে হস্তীবধ দেশে আগমন॥ (৬)
সপ্তথেতে কাউরে কলিঙ্গ পরিণয়। (৭)
অষ্টমে সম্বন্ধ আর লৌহগণ্ডা ক্ষয়। (৮)
নবমেতে মায়াযুক্ত ইছাই নিধন। (৯)
দশম মতীতে অতিবৃষ্টি নিবারণ॥ (১০)
একাদশে ধর্ম্মসেবা ময়না নিধন। (১১)
দ্বাদশে পশ্চিম উদয় স্বর্গ আরোহণ॥ (১২)

এই দ্বিতীয় খণ্ড দ্বাদশ 'মতী' বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত বলিয়া, লাউসেনের চরিতখণ্ড, সাধারণতঃ "বারোমতী" বা সংক্ষেপে 'বার্ম্মতী' নামে পরিচিত।

ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশে ব্রাহ্মণ কবি ময়ূর ভট্ট—

"অতি গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে।
ভাষায় রচিনু পুঁথি ধর্ম্মের প্রীতিতে।"

দক্ষিণাঞ্চলে ময়না নামক দেশে কনকসেন নামে একজন ক্ষত্রিয়বংশীয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কর্ণসেন, গৌড়েশ্বরের অধীনে সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করিলে, তাঁহার লাউসেন নামক এক সর্ব্বগুণময় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই লাউসেনই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র চিত্রসেন। চিত্রসেনের পুত্র ধর্ম্মসেন। ইনি সর্ব্বগুণযুক্ত—জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মভক্ত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন মৃগয়া করিতে গিয়া—'রাজা দশরথ যেন শৃঙ্গভেদী হাতে'—শাশ্বত নামক এক মৌনব্রতধারী মুনিকে হত্যা করেন। রাজা অনুতপ্ত হইয়া পণ্ডিতগণ সমীপে বিধিসঙ্গত ভাবে এই ব্রহ্মবধের পাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কৃপাপ্রার্থী হইলেন। তাঁহারা বলিলেন—

ধর্ম্মপদে রাখ মতি পাবে রাজা অব্যাহতি
বারমতী করহ শ্রবণ। * *।
শ্রীধর্ম্মের মাহাত্ম্যকথা পুরাণেতে আছে গাঁথা
শ্রবণেতে পাপ বিমোচন॥

এই নিমিত্ত তিনি—

আহারাদি তেয়াগিয়া শ্রীধর্ম্ম মন্দিরে গিয়া
বসিলেন ধর্ম্ম আরাধনে। * *॥
দিবস গত হইল নিবিড় যামিনী এল
ধর্ম্মসেন নাহি গেল ঘর।

তখন—

বুঝিয়া ভক্তের মন অন্তর্য্যামী নিরঞ্জন
স্বপন কহিছে অতঃপর॥
শুন রাজা মতিমান পাতকে পাইবে ত্রাণ
প্রাণ দিতে হবে না তোমারে।
হইয়া ভকতিচিত ধর্ম্মনাম বিভূষিত
পুরাণ শুনিবে ব্রত কোরে॥
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তত্ত্ব শ্রবণে হইবে মুক্ত
ব্রাহ্মণে করিবে বহু দান।
যাবে ব্রহ্ম হত্যা পাপ না করিও মনস্তাপ
বার দিন শুনিবে পুরাণ॥
তুমি হও পৌত্র যার যে সব চরিত্র তার
তাহাই পুরাণ বারমতী।
বৈশাখী তৃতীয়া সিতে হবে পাঠ আরম্ভিতে
পূর্ণিমাতে পূর্ণ কর পুঁথি।
দ্বিজরূপী নিরঞ্জন সেনেরে কহি স্বপন
অদৃশ্য হইল ত্বরাপর।

এদিকে কবি ময়ূর ভট্ট 'বারমতী' রচনা করিতেছিলেন। তাই ধর্ম্মসেন সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কবি এই নিমন্ত্রণ পাইয়া রাজ-সন্নিধানে আগমন করিলেন; এবং—

কহিনু সাংজাত মত শ্রীধর্ম্ম মাহাত্ম্য যত
স্মরিয়া শ্রীগুরু নিরঞ্জন।

হয়ে নৃপ শুদ্ধমতি শুনিলেন বারমতী
ময়ূরক ভট্ট বিরচন ॥

কবি ময়ূর ভট্ট এইভাবে রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রথমাংশ—ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস বা 'সাংজাত খণ্ড' আরম্ভ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম সাবিত্রী-শাপে বল্লুক নদীতে শিলারূপে অবতীর্ণ হন—

তারপর সাবিত্রীর অভিশাপ তরে।
শিলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে ॥
বজ্রকীট সেই শিলা কৈল খণ্ড খণ্ড।
ধর্ম্মশিলা নামে তাহা ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড।
এইরূপে ধর্ম্মশিলা বল্লুকাতে রয়।
ধর্ম্মপদ ভাবিয়া ময়ূর ভট্ট কয় ॥

তাহার পর এই গ্রন্থে—রামাই পণ্ডিতের জন্মখণ্ড অধ্যায়ে তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ, ধর্ম্মশিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, ধর্ম্মপূজা-বিধানের নির্দ্দেশ, বল্লুকা-তীরে ধর্ম্মপূজার মন্দির স্থাপন, প্রভৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তদনন্তর—রামাই পণ্ডিতের ১০৪ বৎসর বয়সে দাসীভাবে কেশবতীকে গ্রহণ ও ধর্ম্মদাস নামক পুত্রলাভ—তাম্র উপবীত দান, ধর্ম্মদাসের ধর্ম্মপূজা, ধর্ম্মদাসের অনাচার, তাহার প্রতি অভিশাপ—'হইবে ডোমের পুরোহিত'—পরে, ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য প্রচারের আদেশ বর্ণিত হইয়াছে —

দান করি তাম্রবালা শিখাবে পূজিতে শিলা
কোন দোষ না ঘটিবে তায় * *।
বাগ্দী হাড়ী মুচি ডোম সকলে শিখাবে ক্রম
তাম্রবালা করাবে ধারণ।
হইবে পণ্ডিত রায় কহিনু আমি তোমায়
ধর্ম্মপূজা সবে শিক্ষা দিবে।
তুমি পতিতের শ্রেষ্ঠ জগতে হইবে রাষ্ট্র
তব মতে সকলে পূজিবে ॥

অতঃপর, 'ডোমের পুরোহিত ও ডোমের ব্রাহ্মণ' ধর্ম্মদাসের দ্বারা ধর্ম্মপূজা প্রচার ও তাহার বিবাহ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর—ধর্ম্মপূজার ছাগবলির হেতু, কলিঙ্গরাজের ধর্ম্মপূজা ও তাহার ফলে পুত্রলাভ ইত্যাদি বর্ণন করিয়া কবি গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য-সূচক গ্রন্থাবলীতে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় লইয়া আলোচিত হইয়াছে—(১) সৃষ্টিখণ্ড বা দেবতাখণ্ড, (২) সাংজাতখণ্ড বা ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তনের ইতিহাস এবং (৩) চরিতখণ্ড বা লাউসেন ও তাঁহার জননী রঞ্জাবতীর অত্যদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধনের পরিচয়। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য-পুরাণ' ও পরবর্ত্তীকালে রচিত রামদাস আদকের 'অনিল-পুরাণ' নামক গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্বের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস বা সাংজাত খণ্ড, ময়ূর ভট্ট কর্ত্তৃক আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। চরিতখণ্ড বা লাউসেনের বিবরণ, পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ সকলেই সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে কবি, বিশেষরূপে কোন আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই। তবে তিনি লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্ম-সেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিত লাউসেনের সমসাময়িক। রঞ্জাবতী, এই রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে 'শালে ভর' দিয়া লাউসেন নামক পুত্ররত্ন লাভ করেন। লাউসেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। মৃত্যুকাল—আনুঃ ১০২৪ খ্রীঃ। সুতরাং, দুই পুরুষ অন্তর ধর্ম্মসেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ময়ূর ভট্ট কবির আবির্ভাব-কালও এই জন্য খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমাংশে নির্ণয় করা অসঙ্গত হইবে না *।

* ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে যে ধর্ম্মপাল নামক নরপতির উল্লেখ আছে, তিনি ১ম ধর্ম্মপাল নহেন। কেন না, তাহার পুত্র দেবপাল বা তাঁহার সময়ে কোনরূপ অরাজকতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্ম-পালের সঙ্গেই লাউসেন সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। সেনপাহাড়ী বা শ্যামারূপার গড় যে দণ্ডভুক্তির সামন্ত রাজ্য ছিল, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর সোম ঘোষ, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ গড়ে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া শ্যামারূপার সামন্তরাজ কর্ণসেনকে বিতাড়িত করেন। কর্ণসেন তদনন্তর উত্তর রাঢ়ের রাজা মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার রাজধানী (বর্ত্তমান নাম গয়েশপুর, পূর্ব্বনাম—মহীপাল) মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মপালের মৃত্যুকাল—আনুঃ ১০২৫ খ্রীঃ।

ময়ূর ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল-গ্রন্থসম্পাদক মহাশয়, খৃঃ দশম শতকে লাউসেনের এবং একাদশ শতকে ময়ূর ভট্টের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন। আবার কেহ বা ময়ূর ভট্টের খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকে এবং কেহ বা লাউসেনের খ্রীঃ দ্বাদশ শতকে বর্ত্তমান থাকার কথা বলিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ময়ূর ভট্টের যে 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মূল গ্রন্থ বা প্রাচীন অনুলিপির প্রতিলিপি নহে। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা চৌদ্দ পনের শতকেরও নহে - লিপিকার ও গায়কগণ কর্ত্তৃক ক্রমপরিবর্ত্তনের ফলে একেবারে আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে পুঁথির অনুলিপি-আদর্শে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার লিপিকাল ১৩১০ সাল! সুতরাং উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ময়ূর ভট্ট কবির রচনাদর্শ, বা তাঁহার সময়ের রচনার ধারার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। শুদ্ধ ভাষা কেন, বর্ণিতব্য বিষয়ের সংযোগ-বিয়োগ ও পরিবর্ত্তনাদি সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ময়ূর ভট্ট কবির প্রাচীন অনুলিপি আবিষ্কৃত হইলে পর তাঁহার বা তাঁহার সমকালের রচনাদর্শের পরিচয় লাভ কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে—তৎপূর্ব্বে নহে।

ময়ূর ভট্ট রচিত গ্রন্থে কলিধর্ম্ম প্রসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এইস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

রামায়ে কহিছে ধর্ম্ম বুঝহ কলির মর্ম্ম
পাপকর্ম্মে রত হবে নর।
কলির দাপটে সবে ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিবে
দ্বিজ হবে শূদ্রের নফর॥
না রহিবে জাতিভেদ দ্বিজ না পঠিবে বেদ
হবে খেদ কামিনী কাঞ্চনে।
লভিলে সামান্য ধন গুপ্তভাবে দ্বিজগণ
লিপ্ত হবে অন্ত্যজ ওদনে॥
কামে হয়ে আত্মহারা হরিবে শূদ্রের দারা
নিজ দারা যেন ভুজঙ্গিনী।
নিরখিলে বিষ্ণুশিলা মনেতে বাসিবে ঢেলা
ফুলমালা ভুঞ্জিবে আপনি॥
বিজাতির ভাষা গান করিবে দ্বিজসন্তান
জাতিমান আপনি খোয়াবে।
দুহিতার লবে পণ হরিবে দেবের ধন
সদা মন বিষয় ভাবিবে॥
দেবতা ব্রাহ্মণে মতি না করিবে শূদ্রজাতি
দিবারাতি লোভেতে কাতর।
ধর্ম্মকর্ম্ম তেয়াগিয়ে ধন কড়ি অর্থ লয়ে
কোন্দল বাড়াবে পরস্পর॥
ভাঙ্গিয়া দেবের ভিঠা রচিবে আপন কোঠা
খোঁটা দিবে করি উপকার।
না কহিবে মিষ্টবোল গুরু শিষ্যে গণ্ডগোল
দুগ্ধঘোল সমান পশার॥
মিলিয়া যতেক গণ্ড পণ্ডিতে কহিবে ভণ্ড
রাজদণ্ড কড়িতে এড়াবে।
নীচকুলে হবে রাজা সদায় পীড়িবে প্রজা
লঘু পাপে গুরু সাজা দিবে॥
হইতে অর্থের দাস করিবে সকলে আশ
মিথ্যাভাষ কহিবে বিচারে।
নরহত্যা করি গুপ্ত সঙ্গেতে পুরুষ সপ্ত
হবে লিপ্ত নরক ভিতরে॥ * *
দেবদেবী না পূজিবে পূর্ব্ব কীর্ত্তি উঠে যাবে
তীর্থছাড়া হইবে অবনী॥
গাভীতে হরিবে পয় দেশে হবে দস্যুভয়
জলাশয় রবে বহু দূরে।
নাহি মঞ্জুরিবে তরু জলধি হইবে মরু
চারুশোভা না রবে সংসারে॥

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সঙ্ঘমিত্রা

শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তুমি বৌদ্ধসঙ্ঘ-বন্ধু, 'সঙ্ঘমিত্রা' তাই তব নাম,
হে কুমারী সন্ন্যাসিনি, লহ মুগ্ধ কবির প্রণাম।
ভারতের শেষ প্রান্তে পার হ'য়ে কন্যা কুমারিকা,
সিংহলের সিন্ধুতটে যেইদিন দিয়েছিলে দেখা
নারিকেল বনচ্ছায়ে, মুকুলিত লবঙ্গকাননে
প্রেমের পতাকা বহি'—সেইদিন আনন্দিত মনে
ভারতসমুদ্র বুঝি তরঙ্গের ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে
গাহিল বন্দনাগীতি; শঙ্খধ্বনি বাতাসে বাতাসে
প্রচারিল তব বার্তা, প্রতিধ্বনি দিকে দিকে তার
গৌতমের বাণীরূপে সিন্ধুপারে লভিল বিস্তার!
সেইদিন স্বর্ণলঙ্কা অকস্মাৎ সিন্ধুগর্ভ হ'তে
সীতা-সতীতীর্থ লোকে, সিংহলের দক্ষিণ সৈকতে
আবির্ভূত হয়েছিল বরিবারে তোমারে কল্যাণি?
সেদিন প্রভাতালোকে হে ভারতসম্রাট-নন্দিনি,
দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে দেখেছিলে নূতন মহিমা;
তোমার নয়নোপরে গৌতমের জ্ঞানের গরিমা
উদ্ভাসিল নবরূপে;—অনাগত কালের কল্যাণ
তোমার মহান্ ব্রতে নবদীপ্তি করি' গেল দান!

সম্রাট অশোক—তা'র মগধের ঐশ্বর্য্যের তলে
তোমারে বন্দিনী করি' প্রাসাদের সুবর্ণশৃঙ্খলে
রাখিল না স্নেহবশে আপনার পরিবার মাঝে,
এ কি তা'র নিষ্ঠুরতা? নহে, নহে,—বৃহত্তের কাজে
ক্ষুদ্রতারে দিয়ে বলি, বাৎসল্যের মোহ পাসরিয়া
ধর্ম্ম-সঙ্ঘ বুদ্ধ লাগি' তব কর্ণে মন্ত্র উচ্চারিয়া
উৎসর্গ করিল তোমা জগতের কল্যাণের তরে!
ঐশ্বর্য্য-বিলাসে কিম্বা বিবাহের সম্ভোগ-সায়রে
ডুবিতে দেয়নি তোমা লক্ষ লক্ষ নারীর মতন।
তুমিও তো সঙ্ঘমিত্রা, তব দীর্ঘ কুমারীজীবন
মহান্ প্রেমের মাঝে নির্ব্বাণের পূর্ণ সাধনায়,
সিংহলের সেবা লাগি' কাটাইলে পুণ্য গরিমায়!

এই তব আত্মত্যাগ মানবের কল্যাণের তরে,
রাজার নন্দিনী হ'য়ে ভিক্ষুণীর মহাব্রত ধ'রে,
আজন্মসন্ন্যাসী রূপে সংযমের দৃঢ় আচরণ,
নিখিল প্রেমের মাঝে যৌবনের ব্রত উদ্‌যাপন,
তোমারে দিয়েছে মিত্রা, মৃত্যুহীন মহৎ পরাণ—
অভিজাত-কুমারীর রাজকীয় গৌরব অম্লান!

সম্রাটের আশীর্ব্বাদ, অশোকের প্রবুদ্ধ চেতনা,
তোমার যৌবনে দিল সন্ন্যাসের গভীর প্রেরণা;
তাই তব কৌমার্য্যের, তাই তব সৌন্দর্য্যের 'পরে
যে দিব্য লাবণ্য ফুটি' উঠেছিল তপস্যার বরে—
তাহার তুলনা কোথা? ভারতের সম্রাটদুহিতা,
প্রথম বুদ্ধের পদে মগধের অয়ি নিবেদিতা,
শান্তির দূতিকারূপে তোমার সে ধর্ম্ম-অভিযান,
অহিংসায় দিয়ে গেছে শ্রেষ্ঠতর জয়ের সম্মান।
তরবারি-বলে নহে, নহে ক্রুদ্ধ কামান-গর্জ্জনে,
বিভীষিকা রূপে নহে, নহে ধ্বংস প্রলয় ক্রন্দনে—
সেবা-প্রেম-মৈত্রী দিয়ে, হৃদয়ের ধর্ম্ম দিয়ে তুমি,
একান্ত আপন করি' নিলে দূর বিদেশের ভূমি!
এই নব সেতুবন্ধ, এই তব মহত্তর জয়,
ভারতে সিংহলে দিল বন্ধুতার বন্ধন অক্ষয়!

সুগন্ধ পুষ্পের মত ওই তব কুমারীজীবন,
বুদ্ধের চরণতলে করি' গেলে অর্ঘ্য নিবেদন!
তাই সে সার্থক হ'লো সঙ্ঘের প্রেরণার মাঝে,
তাই সে সার্থক হ'লো বৃহত্তর ভারতের কাজে।
সহস্র বৎসর পরে তাই, তব জীবনবারতা,
আমার জীবনে আনে মহত্তর এ কি ব্যাকুলতা!
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া যদি পারিতাম একলক্ষ্য-পানে,
নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটে যেতে একের সন্ধানে,
বহুর মাঝারে তবে লভিতাম শ্রেষ্ঠ পরিণাম,
ভবিষ্যৎ কবি তবে পাঠাইত বিমুগ্ধ প্রণাম!

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রী নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি

বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার কল্পবৃক্ষটির এখনও শৈশব অবস্থা এবং এর বর্দ্ধনশীলতা আশানুরূপ নয়। এই শিশুকে আমাদের বহুযত্নে লালন পালন ক'রে পরিপুষ্ট ক'রে তুল্‌তে হবে। তার জন্যে আমাদের অক্লান্ত চেষ্টা, বিপুল উদ্যম, দৃঢ় অধ্যবসায় এবং প্রতিনিয়ত স্নেহসলিল সিঞ্চন আবশ্যক। বহুদিনের চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমানে দেশে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই শিশু-তরুটি শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে বিশাল আয়তন লাভ করবে।

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য দেশে যে একটা নূতন জাগরণ এসেছে আজকের এই সভাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মেয়েরা এখন তাঁদের কন্যাদের সুশিক্ষার বিষয়ে বিশেষরূপে সজাগ হয়েছেন। গত দশ বৎসরে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার যে অল্পই উন্নতি হয়েছে, এই সঙ্গে প্রদত্ত তালিকা হ'তে তা বোঝা যাবে। সুখের বিষয় এখন মেয়েদের শিক্ষাদান বিষয়ে আমাদের মনোভাবের অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তার ফলে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম ও প্রশস্ততর হয়েছে। এতদিন ধ'রে অগ্রগামীরা ভূমিকর্ষণের অশেষ শ্রম স্বীকার ক'রে এসেছেন, এখন বীজবপন ও শস্যরোপণের আনন্দের দিন সমাগতপ্রায়।

গত দশ বৎসরে স্ত্রীশিক্ষার যে উন্নতি হয়েছে নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিলাম।

১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪ শত ৬২। এদের মধ্যে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৩ শত ৬৫ জন পুরুষ এবং ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৭ জন স্ত্রীলোক।

১৯২১ সালে মেয়েদের জন্যে কতগুলি শিক্ষালয় এবং তাতে ছাত্রীসংখ্যা কত ছিল নিম্নের তালিকা হ'তে তা বোঝা যাবে।

	শিক্ষালয়-সংখ্যা	ছাত্রী-সংখ্যা
কলেজ	৩	২১২
হাই স্কুল	২৫	৪,৮০৫
মধ্য ইংরাজি	৪১	৬,০৪৯
মধ্য বাংলা	৩১	৩,১৪৮
প্রাথমিক	১২,০৬৯	২,৭৫,৩৩৪
অন্যান্য শিক্ষালয়	২৭৫	৮,২৩০
মোট	১২,৪৪৪	২,৯৭,৭৭৬

বর্ত্তমান বৎসরের লোকগণনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা হয়েছে :—

মোট	৫,০৯,৬৯,৬৬৭
তার মধ্যে পুরুষ	২,৬৪,৯৫,৩৭৫
এবং স্ত্রীলোক	২,৪৪,৭৪,২৯২

বর্ত্তমান বৎসরের সেন্সাস রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে ১৯৩০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে নিম্নে প্রদত্ত শিক্ষালয় ও ছাত্রী-সংখ্যার তালিকা তাই থেকে নেওয়া হোল।

	শিক্ষালয়-সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
কলেজ	৪	৭৭৫
হাই স্কুল	৩৩	৯,৪৯২
মধ্য ইংরাজি	৪৮	৬,৯১১
মধ্য বাংলা	১২	১,৩৫৪
প্রাথমিক	১৬,৭৪৩	৪,৭৬,৫১৩
শিল্প ও অন্যান্য বিশেষ শিক্ষালয়	৫৬	২,৪৩৯
ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি	৩	৫২
অন্যান্য শিক্ষালয়	২৪১	৭,১২৫
	১৭,১৩০	৫,০৪,৩৭৭

উপরের তালিকা হ'তে বেশ বোঝা যায়—গত ১০ বৎসরের মধ্যে মেয়েদের জন্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনেকগুলি বেড়েছে এবং ছাত্রী-সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতার সংখ্যা তুলনা করলে আমাদের দ'মে যেতে হয়। ১৯২১ সালের সেন্সাস্ অনুযায়ী কেবল অক্ষরজ্ঞান হয়েছে এমন সব মেয়েদের ধ'রে শিক্ষিতার সংখ্যা মাত্র শতকরা ২এর সামান্য উপর, আর আজ দশ বৎসর পরেও শতকরা ৩ জন উঠেছে কিনা সন্দেহ!

কাজেই ভবিষ্যতে এই অবস্থা দূর করবার জন্যে আমাদিগকে বিপুল কর্ম্মভার নিতে হবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হয় ততদিন সমস্ত ভারতের নারীসমাজকে সমবেতভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করতে হবে। এই জাগরণের মঙ্গলময় ক্ষীণ আলোক আমাদের আজ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এখন এই অস্ফুট প্রদোষকে আমাদের দিবালোকে উজ্জ্বলতর ক'রে দিতে হবে।

তারপর প্রধান সমস্যা হ'চ্ছে কি প্রকারে আমরা দেশের অভাব পূর্ণ করব এবং তাকে প্রকৃত পথে পরিচালন করব। এ কার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক অর্থ। দেশের চারিদিকে শিক্ষাবিস্তার করতে হ'লে আমাদের যথেষ্ট অর্থ চাই। বরাবর দেখা গিয়েছে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। আজকাল অবস্থা আরও মন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে অনেক স্কুল বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এই বিষয়ে সরকার যে সাহায্য করেন তা' যৎসামান্য। অতএব জনসাধারণ যদি ক্রমবর্দ্ধমান বালিকাদের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করতে অগ্রসর না হন তাহ'লে সুন্দরভাবে প্রারব্ধ এই কার্য্য অনিবার্য্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হবে। তার ফলে নারীসমাজের শিক্ষা আবার অবনতির নিম্নস্তরে এসে পড়বে, বহুদিনের চেষ্টা বিফল হবে। তাকে আবার বর্ত্তমান অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অনেক সময় লাগবে।

এই কঠিন সমস্যার সমাধান করবার জন্য আমি নিখিল ভারত নারীপরিষদের প্রতিনিধিগণকে আবেদন জানাচ্ছি। যাতে এই গুরুতর অবস্থায় পতন হ'তে আমরা পরিত্রাণ পাই তার জন্য আপনারা প্রকৃত উপায় নির্দ্ধারণ করুন।

অর্থসমস্যার মত উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবও একটি গুরুতর সমস্যা। শিক্ষয়িত্রীগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির সুব্যবস্থা এবং তাঁদের শিক্ষার জন্য আরও প্রশস্ততর ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দিলে এই অভাব দূর করা যেতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী না হ'লে ভাল স্কুলই বা কেমন ক'রে হবে, ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতিই বা কিরূপে সম্ভব হবে?

তারপর বালিকাদের শিক্ষা ঠিক আদর্শ-অনুযায়ী হ'চ্ছে কিনা এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীকে সাধারণতঃ আক্রমণ করা হ'য়ে থাকে। এই শিক্ষাপ্রণালীকে অনুপযুক্ত, অকল্যাণকর প্রভৃতি নানা দোষাবহ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। যদিও এই মত আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না—তথাপি একথা স্বীকার করতে হবে যে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি আছে। এই ত্রুটি উপলব্ধি ক'রে শিক্ষাবিভাগ পঠিতব্য বিষয়ের নানাপ্রকার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন-সাধনের চেষ্টা করেছেন। দেশের ভবিষ্যৎ মাতা ও পত্নীদের শিক্ষার অভাব কতক পরিমাণে দূর হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ের আরও সংস্কার আবশ্যক। তাই আমি পরিষদের প্রতিনিধি-দের অনুরোধ করছি, আপনারা সকল শ্রেণীর বালিকা ও মহিলাদের প্রকৃত শিক্ষার অভাব দূর করতে পারে এমন একটা আদর্শ ব্যবস্থাপ্রণালী নির্দ্দেশ ক'রে দিন, যা'তে তা'দিকে প্রকৃত নারীত্ব, পত্নীত্ব এবং মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারা যায়।

অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে কি প্রকারে মেয়েদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা-বিস্তার করা যেতে পারে তার বিষয় অল্প কথায় আলোচনার জন্য আমাকে মাত্র ৫।৭ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। এই কার্য্যে তিনটি প্রধান অভাব, যথা—অর্থের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব এবং সুসম্পূর্ণ সুসংযত শিক্ষাপদ্ধতির অভাব—তাও আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি। নিখিল ভারত নারীপরিষদ এই সকল সমস্যা সমাধান করবার জন্য কি কি করতে পারেন এখন সংক্ষেপে তার দুই একটি উল্লেখ করব:—

(১) স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংলা দেশে যত ব্যয় হবে তার অর্দ্ধেক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে ও পরিচালনে

যাতে ব্যয় হয় তা' দেখা আবশ্যক। এটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব। অতি দীর্ঘকাল ধ'রে বালিকাদের শিক্ষা অবহেলিত হ'য়ে আস্‌ছে। এখন অন্যরূপ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য যত ব্যয় হবে তার অন্ততঃ সিকি অংশ মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত।

(২) প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটি ক'রে উচ্চ শ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেকটিতে ছাত্রীনিবাস থাকা চাই। প্রত্যেক মহকুমায় অন্ততঃ একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং তার সঙ্গে ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে নূতন আইন হ'চ্ছে তাতে সমগ্র বাংলা দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-সমিতি এবং প্রত্যেক জেলার জন্য একটি জেলা-শিক্ষা-সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় সমিতিতে এবং প্রত্যেক জেলা-সমিতিতে উপযুক্তসংখ্যক নারী-সভ্যা থাকা দরকার। নচেৎ বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সুদূর-পরাহত।

(৪) যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাবিধানের প্রশস্ততর ব্যবস্থার জন্য আরও ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ স্থাপন করতে হবে। *

* নিখিল ভারত নারীপরিষদের গত ১লা জুলাইয়ের অধিবেশনে পঠিত।

নানা কথা

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য বহুশাখ বৈচিত্র্যে বর্দ্ধনশীল। কাব্যে, কথাসাহিত্যে, উপন্যাসে, শ্রুতিস্মৃতিতে, চরিত-কথায়, সমালোচনায়, চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ সন্দর্ভ-রচনা ইত্যাদিতে বিশ্বসাহিত্য-ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের দান উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই, আমাদের অনেকেরই এই সাহিত্যের শক্তিপ্রাণতায় আস্থা নাই। এমন কি, কেহ কেহ বা ইহার ভাব-প্রকাশোপযোগী ভাষা বা শব্দ-সম্পদে পর্য্যন্ত সন্দিহান *—মনে করেন, পাশ্চাত্য বাক্-বাহনের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বিশ্ববাণী-মন্দিরে অর্ঘ্য-উপনয়ন অসম্ভব। প্রাজ্ঞ বাণীসাধক অবশ্য ইহার বিপরীত বাক্যই বলিয়া থাকেন †। কেহ কেহ বা পরদেশী রাংতার সাজ দিয়া বঙ্গভারতীকে ঐশ্বর্য্যময়ী করিতে চান; এবং রঞ্জনের মোহে ঘৃণিত পঙ্ক লেপন করিয়াও কাহাকেও কাহাকেও বঙ্গলক্ষ্মীর আননে অলকা-তিলকা কাটিতেছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে দেখি। সর্ব্বোপরি, এক-প্রকার অতি-আধুনিকতা সাহিত্যশ্রীর চারিদিকে ধূলিজাল উড়াইয়া হাঁকিতেছেন—দেবীর ধূপারতি হইতেছে!

ইহার মধ্য হইতে সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ-নিরীক্ষণ বিশেষ ধীরতা ও সমালোচনা-সাপেক্ষ। ইহার জন্য চাই অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু ক্ষমতাবান্ সমালোচকের অভাব না থাকিলেও সময়ের অভাবেই হয় ত তাঁহারা বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের পরিচয় আলোচনায় উদাসীন।

* "...সে সাহিত্য অপরিসর, অগভীর ও অশিক্ষিত-পটুত্বের পরিচায়ক...।...বাংলা ভাষা বাঙালী জাতির 'সব-কাজের' ভাষা নয়, তাহা হইবার মত শক্তিও তাহার নাই।"—বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৭)

† "কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, 'জার্ম্মান ভাষার জটিল ভাব-প্রকাশের শক্তি এবং ইতালীয় ভাষার মাধুর্য্য বাংলা ভাষায় একত্র বিদ্যমান। মানুষের এমন কোন ভাব নাই, যাহা বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ করা যায় না'।"—ডাঃ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গলক্ষ্মী, কার্ত্তিক, ১৩৩৭)

পল্লবগ্রাহিতা

কিন্তু এই সময়ের অভাব যদি কোন শক্তিমান সাহিত্যিককে পল্লবগ্রাহিতায় উদ্বুদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহা দুঃখের কারণ হয়। আমরা এখানে সম্প্রতি-প্রকাশিত * প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত রমেশ বসুর 'Rocent Bongali Literaturo' প্রবন্ধের কথা বলিতেছি। ক্ষুদ্রায়তন দেখিয়া যে সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলনের আশা করিয়াছিলাম, তাহাতে নিরাশ হইতে হইল—ধরাকে সরার

* Modern Review—June, 1931.

মধ্যে আনিবার চেষ্টার ত্রুটি নাই সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার অভাবে অ-সম্পূর্ণ অ-সার সঙ্কলন মাত্রই পরিলক্ষিত হইল। উল্লেখযোগ্যকে পরিহার করিয়া অনুল্লেখীয়ের উল্লেখ ছাড়াও শ্রেণীবিভাগে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপান হইয়াছে। পক্ষান্তরে, প্রবন্ধ না বলিয়া ইহাকে পুঁথির দোকানের বিজ্ঞাপন-বিশেষ (গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম) মনে করিয়া নীরব হওয়াই শ্রেয়।

আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে রমেশ বাবুই 'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের' সুস্থ ও সুষ্ঠু আলোচনা করিয়া আমাদিগের নৈরাশ্য-মোচন করিবেন, কারণ অন্যত্র তাঁহার শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

*

বাংলা সাহিত্যে নূতন দান

'বাংলার যোদ্ধা ও যুদ্ধনৃত্য' সম্পর্কীয় যে ধারাবাহিক প্রবন্ধমালায় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত 'বঙ্গলক্ষ্মী'কে অলঙ্কৃতা করিতেছেন, অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারা যায়, বাংলা সাহিত্যে সত্যই তাহা নূতন দান। বিষয়-সম্পদে যেমন ইহা অপূর্ব্ব পৌরুষ ও গৌরব-ময়, ভাষাও তেমনি বলিষ্ঠ, প্রাণ-বান ও প্রাঞ্জল। কিন্তু, যদিও মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানবৃদ্ধ ডাঃ দীনেশচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টাগণের নিকট হইতে ইহা পূর্ণ-সমর্থন লাভ করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে এখনও ইহা যথোচিত সমর্থিত ও সমাদরপ্রাপ্ত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। শ্রীযুক্ত দত্ত যখন সর্ব্বপ্রথম এই গবেষণায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন অনেকে তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় সেই গবেষণা-ফল প্রকাশ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গবাণীর সেবাতেই তাঁহার সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ স্মরণীয় সন্দেহ নাই।

*

ভারতীয় নৃত্যকলা

সম্প্রতি 'বিচিত্রা'র শেষ-প্রকাশিত সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮) জনৈক ছদ্মনামা লেখকের 'ভারতীয় নৃত্যকলা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করা গেল। ইহা বিস্ময়কর ও লজ্জাকর যে প্রবন্ধকার একান্ত অবহেলার সঙ্গে বাংলা দেশকে নৃত্যকলায় সর্ব্বনিম্নতম স্থান দান করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—বাংলায় উল্লেখযোগ্য নৃত্যকলা কিছুই নাই।

যে দেশের পল্লীতে পল্লীতে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এখনও বহুবিধ বিশিষ্ট নৃত্যকলা প্রচলিত,—এই পরাধীনতার প্রাণহীন যুগেও যে দেশের শ্রেণীবিশেষে এখনও সেই প্রাচীন গৌরবময় কালের মৌলিক যুদ্ধ নৃত্যকলা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান এবং ঐ যুদ্ধনৃত্য প্রদর্শন করিয়া এখনও যে দেশের কোন কোন নর্ত্তকদল জীবিকা-অর্জ্জন করিয়া থাকে, সে দেশের নৃত্যকলা সম্পর্কে এইরূপ অর্ব্বাচীন ও অজ্ঞ মনোভাব প্রকাশ, প্রকাশকের পক্ষে অবশ্যই উচিত হয় নাই।

*

বঙ্গপল্লীর চিত্রণ-শিল্প

বঙ্গপল্লীর চিত্রণশিল্পের চমৎকারিত্বের কথা লইয়া আজকাল কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে একবার প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় * এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু আলোচনা ব্যতীত এই শিল্প রক্ষার প্রকৃত চেষ্টা হইতেছে অল্পই। কিন্তু আর ৫।৭ বৎসরের মধ্যে যদি এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া না হয় তাহা হইলে ইহার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি'র পক্ষ হইতে উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ এজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে কলিকাতা হইতে একজন কুশলী শিল্পী লইয়া গিয়া বীরভূম জেলার কোন কোন পল্লীগ্রামের লুপ্তাবশেষ বিচিত্র অঙ্কন-শিল্পের চমৎকার চমৎকার অনুকৃতি অঙ্কিত করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কথা পূর্ব্বেই আমরা 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে প্রকাশ করিয়াছি †। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় শীঘ্রই ঐ সকল চিত্র অবলম্বনে অঙ্কন-শিল্প বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিবেন এবং আমাদের আনন্দের

* বঙ্গলক্ষ্মী—শ্রাবণ, ১৩৩৫।

† বঙ্গলক্ষ্মী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮।

বিষয় এই যে 'বঙ্গলক্ষ্মী'তেই তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

*

সাহিত্য-সাধনা

আপনাকে বাজাইয়া সাহিত্যের বাজারে ফিরি করিয়া বেড়াইলেই সাহিত্য-সাধনা সফল হয় না। সাধক হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেবক হওয়া চাই—সেবাকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া আপনাকে পশ্চাতে রাখিতে হইবে। নিউটনের মত নিরহঙ্কার, ডারুইনের মত নম্র, কার্লাইলের মত ক্রোধহীন এবং শীলারের মত সহিষ্ণু সাধকরাই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। একলব্যের মত নীরব একাগ্র সাধনা চাই—আত্মদান প্রয়োজন। এইরূপ সাধকের সাধনা-ফলই কালজয়ী হইয়া থাকে; ঢাক-ঢোলের বাদ্য সাময়িক। 'স্বয়ং সিদ্ধ' কথাটা—ব্যঙ্গার্থক।

*

সাহিত্য-সাধক

এইরূপ একজন প্রকৃত সাহিত্য-সাধকের সাধনা-বিভূতি আজ আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে। আমরা এখানে প্রজ্ঞাপ্রবীণ রায় জলধর সেন বাহাদুরের কথা বলিতেছি। এক হাতে দুষ্টব্রণের (কার্ব্বঙ্কলের) অসহ্য যাতনা, অন্য হস্ত বাত-পীড়িত,এই অবস্থায় জ্বর ও জরা-জর্জ্জর দেহ লইয়া তিনি সম্প্রতি এক সাহিত্য-সভায় * অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে কেদারা-শায়ী হইয়াও স্মিতমুখে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া তাঁহার সারস্বত-ভক্তি ও সাহিত্যপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এরূপ অকৃত্রিম কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বর্ত্তমান বাংলায় বিরল নহে কি? মূল সভার সভানেত্রীরূপে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সত্যই বলিয়াছেন, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণোপম এই তপস্বী সাহিত্যিক-বৃদ্ধের সাহিত্যাগ্রহ দেখিয়া বিগলিত হইতে হয়।

ভগবান রায় বাহাদুরকে নিরাময় ও দীর্ঘজীবী করুন।

*

* গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য-সমাজের চতুর্দ্দশ অধিবেশন-সভা।

কথা-সাহিত্যে দীপ্তি দেবী

শ্রীমতী দীপ্তি দেবী বি এ, বি-টি'র নাম 'বঙ্গলক্ষ্মী'র পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি অল্প কিছু-দিন হইল কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, কিন্তু মানব-চরিত্র অঙ্কনের একটা দিকে তাঁহার পরিণত শিল্প-শক্তির পরিচয় পাই। যে প্রকাশ-ভঙ্গী তাঁহার রচনার রূপদান করে তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ—কাহারো নকল নহে, এবং তাহাতে ক্রিয়কর্ত্তাহীন কাটা-ছাড়া কথার হেঁয়ালি তথা ন্যাকামি নাই। ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর আখ্যায়িকার পরিণতি-নিপুণতা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, কথা সাহিত্যের মূল উৎসের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার অপর বিশেষত্ব—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের কৌতুকপ্রদ সংমিশ্রণে নির্ম্মল রসসৃষ্টি। সর্ব্বোপরি,—শ্লীলতাহীন তথাকথিত মনোবিশ্লেষণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করে নাই। অনুশীলন অবশ্যই তাঁহাকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইবে, আমাদের বিশ্বাস।

*

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'

বাঙালী পাঠকদের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের ভাষা বা লিপিকৌশল সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন আসে না। কিন্তু তাঁহার আখ্যায়িকার রূপ-পরিণতি ও রসসৃষ্টি লইয়া বিভিন্ন কাগজে আলোচনা চলিতেছে। সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় * শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত এইরূপ একটি আলোচনা পড়িলাম। আলোচনাটি পাঠ করিলে বুঝা যায়, আলোচক আলোচ্য গ্রন্থখানি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পাঠ করিয়া তাহার বিশ্লেষণ-প্রয়াসী হইয়াছেন। অবশ্য, আক্রমণের তীব্রতা পরিহার করিলে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত হৃদ্য হইত। বিদ্রূপাত্মক কঠোর ভাষায় ইহা যেন গুরুর প্রতি অনুরাগী অথচ ক্ষুব্ধ ভক্তের অস্ত্রক্ষেপ!

বিবেকানন্দ বাবুর বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অধিকাংশ নায়িকাগণই কলঙ্কিনী।

* বিজলী—১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৮।

কিন্তু "...পূর্ব্ববর্ত্তিনী নায়িকাগণ শিল্প, সৌন্দর্য্য ও বেদনার অন্তরালে 'ট্র্যাজিডি'র সুরে নামিয়া আসিয়া সম্ভ্রমরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সুন্দরী তরুণীর দল ঘটনাচক্রে জীবনের বিপর্য্যয়ে পড়িয়া নারী-হৃদয়ের যে চিরন্তন দাবী সমাজের দরবারে পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দরদী শরৎচন্দ্রের সহিত আমরাও সমাজদ্রোহী কলঙ্কিনীদিগকে শ্রদ্ধা, সমবেদনা ও ভালবাসা অর্পণ করিয়াছিলাম।" কারণ—"...তাহা কমলের ('শেষ প্রশ্নের' নায়িকা) বিদ্রোহের মত এমন করিয়া সংস্কারমুক্তির নামে ভদ্রতার (শালীনতা?) সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায় নাই।"

বিবেকানন্দ বাবুর শেষ কথা এই—"তিনি সমাজের রক্ষণশীলতার চাপে··· স্বদেশের সমস্ত Civilisation, Traditi n ও Cultureকে বিদ্রূপ, আক্রমণ ও ব্যঙ্গ করিতে, এবং ইহারই তুলনায় পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও দরদ দেখাইতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন।"

আমরা এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিব না; শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন—'অভয়া দিদি' কি আর ফিরিয়া আসিবেন না?

*

মহাত্মা গান্ধী ও গোলটেবিল

বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সহিত সাক্ষাতে মহাত্মা সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মহাত্মার সন্তুষ্টি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। মহাত্মা আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাইতেছেন, এবং আশা করেন যে, লণ্ডন যাত্রার পূর্ব্বেই সম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসামুখ হ'বে। সম্বাদপত্রের প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরে তিনি বলিয়াছেন, উপদেষ্টারূপে কেহই তাঁহার সহিত যাইতেছেন না—একমাত্র ভগবানই তাঁহার উপদেষ্টা।

মহাত্মার আশা সফল হউক এবং গোলটেবিলে সকলপ্রকার গণ্ডগোল সোজাভাবে মিটিয়া যাউক।

বিধিলিপি

শ্রী কল্যাণী দেবী

যেদিন প্রথম রমা এসে আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়, প্রথম প্রথম সবাই তাকে, যেমন প্রত্যেক মেয়েকেই কোরে থাকে, সেই রকম অবহেলা দেখিয়েছিল। আমার কিন্তু প্রথম-দর্শনেই কেন জানি না ওর উপর বড্ড দয়া হোল। মনে হোল ও' যেন আমার মায়ের পেটের বোন! একটু পরে ইলাদি' এসে রমার সঙ্গে আমাদের সবাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন; শুন্‌লাম, সে বোর্ডিংয়ে থাক্‌বে। শুনে আমার মনে মনে ভারি আনন্দ হোল! তবে মেয়েদের ঠাট্টার ভয়ে মুখে কিছু বোল্‌লাম না।

টিফিনের ঘণ্টা পড়্‌তেই রমার হাত ধ'রে বোর্ডিংয়ে চ'লে গেলাম; যদিও আমার পেছনে দুটো চোখ ছিল না তবুও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে অনেকেই অবাক হোয়ে আমার কাণ্ড দেখ্‌ছে। আমি নিজেও আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হোয়ে গেলাম!...আমার বরাবর একটু চুপচাপ থাকা অভ্যাস, কারো সঙ্গে বড় বেশী মিশ্‌তাম না। সেজন্য প্রায়ই শুন্‌তাম, সবাই বলাবলি কোর্‌ছে যে, "দীপ্তির বড় অহঙ্কার।" সে যা হোক্, আমি রমাকে আমার খাটে বসিয়ে, মাসীমা'র কাছে গেলাম খাবার আন্‌তে। যেই আমি ঘর থেকে বাইরে এসেছি অমনি সব মেয়েরা এসে আমাকে অস্থির কোরে তুল্‌লো, তাদের প্রশ্ন হ'চ্ছে আমি রমার মধ্যে কি এমন গুণ দেখেছি যার জন্য তাকে এত আদর দেখাচ্ছি? অনেকেই অনেক রকম ঠাট্টা কোর্‌তে লাগ্‌লো—আমি নাকি রমার সুন্দর মুখ দেখে তাকে ভালবেসেছি! আমি কোন কথাই বোল্‌লাম না।

স্কুলের ছুটী হবার পর আমি রমাকে নিয়ে আমার ঘরে গেলাম। আমিও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম যে আমার এত যত্ন করাটা একটু অস্বাভাবিক। তবু কেন জানি না রমাকে ছাড়্‌তে পার্‌লাম না।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌লো। রমার গুণে এখন সবাই তার বশ। কিন্তু আমার সঙ্গে সে বেশী মেশে ব'লে সবাই মনে মনে আমাকে ও তাকে হিংসা কোর্‌তো। এখন আর রমা সে-রকম পাড়াগেঁয়ে মেয়ে নেই; সে এখন সবাইয়ের সঙ্গে সমানে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটতে পারে, কথাবার্ত্তায় কোন বিষয়ে সে কারো চেয়ে হীন নয়। আমি কিন্তু বেশ লক্ষ্য কোর্‌তাম যে সে তার কি এক মনের দুঃখকে কেবলই হাসি দিয়ে চাপ্‌তে চায়।

একদিন কেবল সে তার মনের গোপন দরজা আমার কাছে খুলেছিল—তাও বেশীক্ষণের জন্য নয়। তার সংসারের পরিচয় আমিও বেশী জান্‌তাম না। তার বাবার নাম নির্ম্মলকুমার বসু। আমার বড়দা'র নামও তাই। আমি মাঝে মাঝে ভাব্‌তাম, সত্যি যদি রমা আমার ভাইঝি হোত তাহ'লে বেশ হোত। সে বোল্‌ত যে তার বাবা আছেন তবে তিনি তার ও তার মা'র খোঁজ নেন না। তারা মামার বাড়ীতেই থাক্‌তো; মামা বেশ ভাল লোক, তিনিই রমার পড়ার খরচ দিতেন।

অনেকেই বলাবলি কোর্‌তো যে রমার ও আমার মুখ নাকি অনেকটা এক রকমের, তবে রমা আমার চেয়ে ঢের সুন্দর ছিল। তা থাক্। একদিন মেয়েদের মনের ছাইচাপা আগুন পথ পেয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের দুইজনকে চারপাশ থেকে পুড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো। অপরাধ—একদিন নাকি রাত দশটার পর মেয়েরা আমাকে ও রমাকে একবিছানায় শুয়ে কথা বোল্‌তে শুনেছে। তারপর কত কথা উঠ্‌লো, সে সব কথা লিখ্‌তে আমি পার্‌বো না। ফলে মেট্রনের হুকুমমত আমরা দুজনে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বোল্‌তে পার্‌তাম না।

একদিন বাবা আমাকে দেখ্‌তে এলেন, আমি তাঁকে মনের দুঃখে সব কথা বোলে ফেল্‌লাম। বাবা কিন্তু রমার বাপের নাম শুনে ও তাদের অবস্থা শুনে আমাকে তার সঙ্গে বেশী মিশতে বারণ কোর্‌লেন। আমি অবাক হোয়ে গেলাম!—আমার বড্ড অভিমান হোল। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় হেডমিষ্ট্রেস্ ইলাদি'র কাছে গিয়ে কেঁদে ফেল্‌লাম। তিনি মেট্রনকে ডেকে আমাদের কথা বল্‌বার অনুমতি দিতে বোল্‌লেন এবং আমাকে সাবধান কোরে দিলেন যেন ভবিষ্যতে বোর্ডিংয়ের আইন ভঙ্গ না করি।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় রমার হাত ধ'রে ছাদে গিয়ে বোস্‌লাম এবং অনেক কথাবার্ত্তার পর তার ঠাকুরদা'র নাম আদায় কোরে নিলাম। তখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, কেন প্রথম দেখাতেই তাকে আমার এত আপন মনে হোয়েছিল। আমি তাকে কোন কথা বোল্‌লাম না। পূজার ছুটীতে যে যার বাড়ী গেলাম।

এবার গিয়ে আমি মা'র কাছে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম বড়দা'র আগে কোন বিয়ে ছিল কিনা? মা ত হেসেই খুন!—কোন কথাই বলেন না। মেজদা' যখন এলেন তখন তাঁর কাছে সব বোলে এর মানে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম। মেজদা' বোল্‌লেন যে সত্যিই বড়দা'র আগে খুব অল্প বয়সে বিয়ে হোয়েছিল। তারপর আমি হবার তিন মাস আগে বৌদি'র একটি মেয়ে হয়। তারপর কি একটা কারণে বাবার সঙ্গে দাদার শ্বশুরের ঝগ্‌ড়া হ'য়ে তার ফলে বাবা চিরদিনের মত বৌদি'কে বিদায় কোরে দিয়ে দাদার আবার বিয়ে দেন। বড়দা' এখন হুগলীর ডেপুটী—ছেলে-মেয়েতে তাঁর ঘর ভরা। হায়! কি দোষে যে বড় বৌদি'র ও তাঁর মেয়ের এত কষ্ট তা বুঝ্‌ত পার্‌লাম না।

ছুটীর পরে রমার কাছে মুখ দেখাতেও আমার লজ্জা কোর্‌তে লাগ্‌লো। পরের বছর আমরা দুজনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী গেলাম। ওমা! বাড়ী গিয়ে শুন্‌লাম আমার আবার নাকি বিয়ে! আমি একটা মতলব ঠিক কোরে মাকে বোল্‌লাম আমার একটি বন্ধু আমার কাছে এসে থাক্‌তে চায়। মা শুনে ভারি খুসী, বোল্‌লেন, "আজই তোর বন্ধুকে আস্‌তে লিখে দে।" আমার মনে ধারণা ছিল রমাকে কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না। পরের শনিবারে রমা এসে পৌঁছল। মাকে প্রণাম কোরে উঠে দাঁড়াতে মা তার মুখ দেখে চম্‌কে উঠ্‌লেন। আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, "দীপ্তি, তোর বন্ধুর বাবার নাম কি রে?" আমি অন্য একটা নাম বোলে পালিয়ে গেলাম।

তার পরে এক দিন বিকেলে রমাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। পথে রমেশ বাবুর সঙ্গে দেখা। এঁর পরিচয়টা একটু দি; ইনি একজন বিলাতফেরৎ ডাক্তার, আমাকে দেখে এঁর বেশ পছন্দ হয়েছে শুনেছিলাম, ঠিক ছিল এঁরই সঙ্গে শ্রাবণ মাসে আমার বিয়ে হবে। আমি তাঁকেও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে অনুরোধ কোরলাম। তিনি সানন্দে আমার কথায় মত দিলেন। আমি রমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। সত্যি কথা বোলতে রমা আমার চেয়ে ঢের সুন্দর ছিল। যত দিন যেতে লাগলো তত রমাদের দুজনের মধ্যে আলাপ জ'মে উঠলো। বাড়ীতে কিন্তু কেউ সে কথা জানতেন না। আমি বেড়াতে গিয়ে তাঁদের আলাপ করবার সুবিধা ক'রে দিতাম। হঠাৎ একদিন রমেশ বাবু এসে বাবাকে বোললাম যে তিনি আমাকে বিয়ে করতে অক্ষম। বাবা শুনে খুবই দুঃখিত হোলেন। আমি কিন্তু মনের মধ্যে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব কোরতে লাগলাম। তবে বাবার অবস্থা দেখে একটু দুঃখ হোল। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন কোরতে পারে! তার পর বাবা যেদিন শুনলেন যে রমেশ বাবু রমাকে বিয়ে কোরেছেন, সেদিন তিনি সত্যিই ভারি দুঃখিত হোয়েছিলেন। আমি বোললাম যে, আমি আই-এ পড়বো, বাবাও মত দিলেন। আমি পড়তে কলিকাতায় চ'লে গেলাম।

অনেকদিন পরের কথা। এখন আমি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। হঠাৎ একদিন বাবার অসুখের খবরে বাড়ী গেলাম। দেখে বেশ বুঝলাম, বাবার দিন ফুরিয়ে এসেছে। জানি না বাবা কেমন কোরে রমার পরিচয় পেয়েছিলেন। মারা যাবার আগের দিন আমার মাথায় হাত দিয়ে বোললেন, "দীপ্তি, তোর বিয়ে না হওয়াতে প্রথমে আমার সত্যিই বড্ড দুঃখ হোয়েছিল। কিন্তু যখন শুনলাম আমার একমাত্র আদরিণী কন্যা নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরেছে, সেদিন গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল।—সত্যি, কার এমন মেয়ে আছে! তারপর তোর মনের জোর দেখে আর বিয়ের কথা বলিনি। আজ তোমায় আমি প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ কোরে যাচ্ছি। এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন প্রত্যেক ঘরে তোমার মত মেয়ে জন্ম নেয়। লোকে ছেলে ছেলে কোরে পাগল হয়, তারা ত জানে না যে যদি মেয়ের মত মেয়ে হয়, তবে সে দশটি ছেলের কাজ কোরতে পারে।"

* * *

বাবা মারা যাবার পর ছয় বছর কেটে গেছে। রমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। সে সেদিন তার একটি মেয়েকে আমার কাছে দিয়ে গেছে; তার অনুরোধ, যেন নমিতাকে আমি আমার মত কোরে মানুষ করি। সে এটুকু বুঝলো না যে যার যা বিধিলিপি থাকে তা তার হবেই।

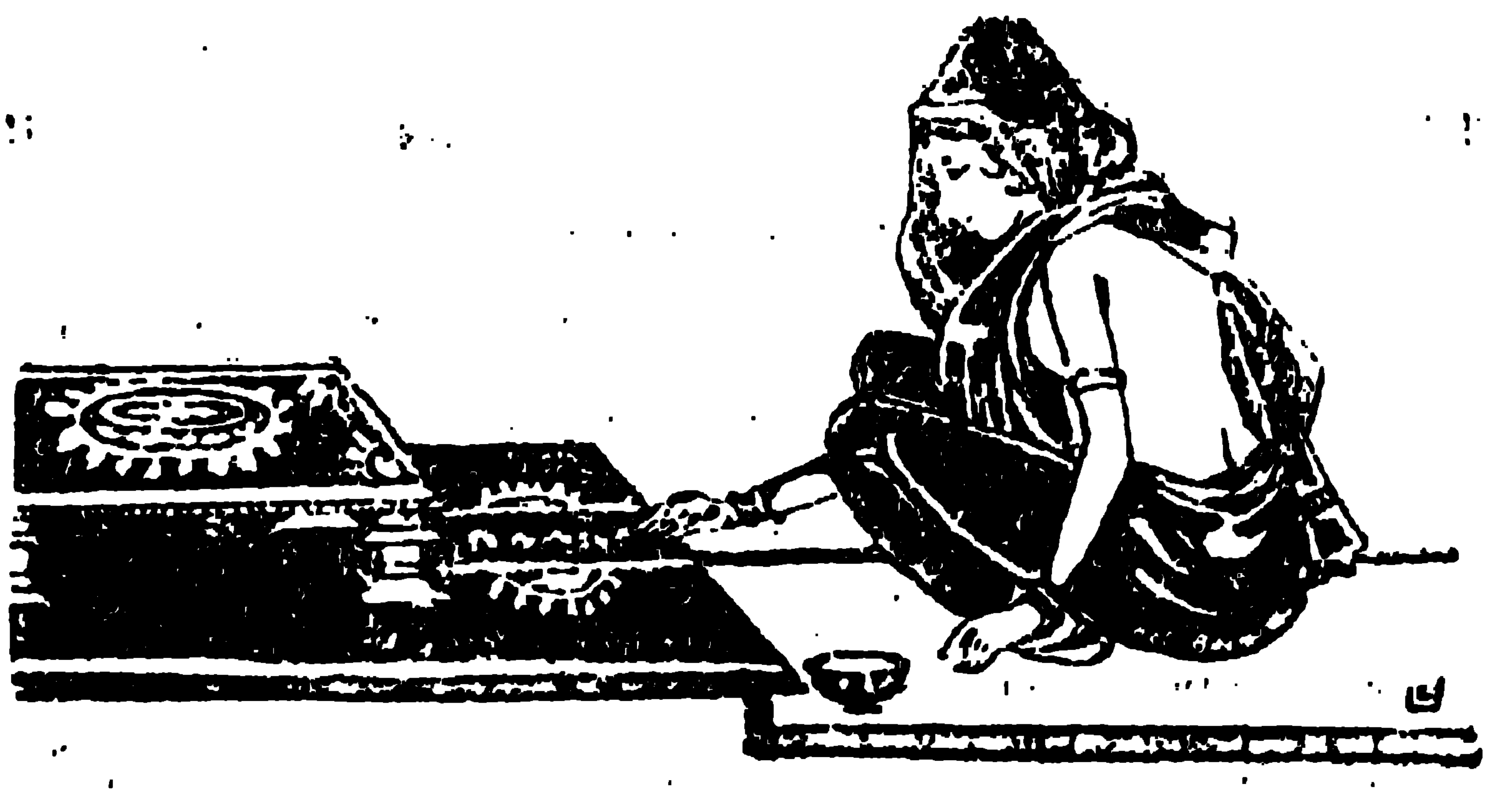

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

নারীর স্বাস্থ্য *

ডাক্তার শ্রী রমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

(১) নারীর কার্য্য শুধু সংসার-গণ্ডীর ভিতরেই নয়

আজকাল, বাঙ্গালীর মেয়েরা যে স্বাস্থ্যকথা শুনিতে চান, সেটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কারণ, অনেক বাড়ীতেই মেয়েদের মুখে এই এই কথাগুলি শোনা যায়—(১) "মাষকলাই-এ (মেয়েদের শরীরে) ঘুণ ধরে না (ব্যারাম হয় না)"; (২) "মেয়েদের (দুধ ঘির মত) ভাল খাইতে নাই"—কিন্তু মূল্যবান অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পরিতে আছে; (৩) "বেশী লেখাপড়া শিখা মেয়েদের পক্ষে অকল্যাণকর"; (৪) "এ পোড়া দেহের যত্ন লওয়াটা লজ্জার ব্যাপার"—ইত্যাদি। এবং সত্য সত্যই ব্যারামে ভুগিয়া, মেয়েদের বুক ফাটে ত' সময় থাকিতে মুখ ফোটে না! বস্তুতঃ, বঙ্গলক্ষ্মী-দের ক্ষমা ও ধৈর্য্য অসীম;—কিন্তু, দেহের প্রতি এই তাচ্ছিল্য-বুদ্ধি মারাত্মক! ইহার ঠিক উল্টাই হওয়া চাই—ভগবানের শ্রীমন্দির এই দুর্লভ মানবদেহের প্রতি, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সকলেরই মর্য্যাদাবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। এবং যখন আপনারা স্বাস্থ্যবিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে।

দেহের প্রতি অমর্য্যাদা করার সঙ্গে, আপনারা জাতি-হিসাবে আপনাদিগকে "অবলা" মনে করেন;—এটাও একটা মারাত্মক ভুল। দেবাসুরের যুদ্ধকালে, যখন দেবতারা পরাস্ত হইয়া পলায়নপর হন, তখন কে তাঁহাদের মানরক্ষা করিয়াছিল? এই নারীশক্তি! আপনারা আদ্যাশক্তির অংশ—আপনারা কখনো অবলা হইতে পারেন না! মন থেকে এই অবলাভাব মুছিয়া ফেলুন। পরন্তু, আপনাদিগকে দুইটি মস্ত এবং সত্যকথা সদা-সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে—আপনারা জাতির জননী ও ধাত্রী!

আপনারা মাতৃ-জাতি! বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ বংশধরদের আপনারাই জননী! বাঙ্গালাদেশের ভবিষ্যৎ-ভাগ্য যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিবেন, আপনারা তাঁহাদেরই জননী! তাই বারম্বার বলি, "মা, আপনি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন,—আপনি মা!" বেশী দিনের কথা নহে,—বিশ-ত্রিশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে, বাঙ্গালীই বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, সকলেরই শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী ছিল। কিন্তু, আজ—আপনাদের সন্তানরা আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, মেধা ও মনীষায়, আপনার জন্ম-ভূমিতেই, সকল বিষয়েই, অ-বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হঠিয়া যাইতেছে! আজ যত অ-বাঙ্গালী, এই সোণার বাঙ্গালায় আসিয়া, বাঙ্গালীদিগকে হঠাইতেছে।—জননীর চক্ষে এ দৃশ্য কত কষ্টকর, এ ব্যাপার কত দুশ্চিন্তাজড়িত। আপনারা মা ও ধাত্রী—এ দুঃখ আপনারা বেশ বুঝিতেছেন।

আপনারা বাঙ্গালী জাতির শুধু জননী নহেন—জাতির ধাত্রী ও পালয়িত্রী। সমস্ত জাতিটার লালন-পালন ও কল্যাণ, আপনাদেরই হাতে। আজ আপনাদের বংশধর-দিগের এই দুর্দ্দশার কারণ, আপনাদিগকেই অনুসন্ধান করিয়া, প্রতিকারে মনোযোগ দিতে হইবে।

আপনারা হয় ত বলিবেন—"আমরা গৃহস্থালীর কায করিব, না, এই সকল দিক দেখিব?"—ইহার উত্তরে আমি বলি—জগতে সর্ব্বত্রই, গৃহস্থালী ও সংসার মাতৃজাতির আসল কর্ম্মক্ষেত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহস্থালীর বাহিরেও, আপনাদিগের প্রচুর কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে—অন্ততঃ, যতদিন আবার আপনাদের সন্তানরা পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া না পান। গৃহস্থালীর যে যে ক্ষুদ্র কর্ম্মগুলি অনায়াসে দাসদাসী দ্বারা সাধিত হইতে পারে, সেগুলি তাহাদের

---

* ১৮ই এপ্রেল ১৯৩১ তারিখে, বেতারে "মহিলা-মজলিশে" প্রদত্ত বক্তৃতা।

হাতে দিয়া, অবসর সৃষ্টি করিয়া, সেই অবসর-কালে, জাতির কল্যাণে, আপনাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে। অপর দেশে, নারীর সম্মান লোকলোচনের সম্মুখেই দেখান হয়। কিন্তু, বাঙ্গালী যেরূপ প্রতি কথাতেই নারীর পরামর্শ গ্রহণ করেন, বোধ হয় জগতে অপর কোনও জাতি তদ্রূপ নারীর অঞ্চলের গাঁটছড়ায় আবদ্ধ নয়। বিশেষ করিয়া, এই জন্যই আপনাদের পক্ষে, জাতির কল্যাণার্থ, সকল অনুষ্ঠানেই, পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়ান খুব বেশী প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কাযেই, আপনারা সদা-সর্ব্বদাই মনে ও প্রাণে অনুভব করুন—আপনারা "জাতির জননী ও ধাত্রী"। আপনারা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, নিজ নিজ "ক্ষমতা"—কাযেই, তৎসঙ্গে নিজ নিজ "দায়িত্ব"—অনুভব করিতে আরম্ভ করুন। এই দায়িত্ব-বোধের সঙ্গে, "কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি" করিয়া লউন। যতদিন সুধু পুরুষরা কংগ্রেসে মাতামাতি করিয়াছিলেন, ততদিন কংগ্রেস খুব বেশী কিছু করিতে পারেন নাই; কিন্তু সুধু একটি বৎসরের সহযোগিতার ফলে, আজ ৪৫ বৎসরের স্থবির কংগ্রেস পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছে—এটা আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন! যে কবি গাহিয়াছিলেন—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না"—তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিকই, এক পক্ষে ভর করিয়া উঠা যায় না। কিন্তু যে অবগুণ্ঠনবতী মায়েরা মনে করিতেছেন যে, আমি সকলকেই অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে সংসারের গণ্ডী অতিক্রম করিতে বলিতেছি, তাঁহারা আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, "লজ্জা"ই নারীর ভূষণ; সেই ভূষণে ভূষিতা হইয়া, তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র সংসার-গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করুন,—এবং সকল বিষয়ে, পুরুষের সাহচর্য্য করুন—এইটুকুই আমার বিনীত নিবেদন। তজ্জন্য, বাহিরে আসিতে হয় আসুন, অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিতে হয় করুন,—দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে ব্যবস্থা আপনারাই করিয়াছেন ও করিতেছেন, কাযেই, আপনারাই করিবেন। বাঙ্গালার সকল কল্যাণকর কর্ম্মেই, বাঙ্গালী নারীর মঙ্গল-হস্ত যেন, অলক্ষিত হইলেও, সদাই উপস্থিত থাকে—এইটুকু আমার প্রার্থনা। আবার স্মরণ করাইয়া দিই,—আপনারাই জাতির জননী, ধাত্রী ও পালয়িত্রী!!!

(২) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য যে সকল কায আপনাদের করণীয়, তাহাদের মধ্যে "মানুষ গড়া"টাই সবচেয়ে বড় কায—এবং সেটা আপনাদেরই বিশিষ্ট কায। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত, মাতা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী, ও কন্যারূপে বাঙ্গালী রমণীর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ও অবসর খুব বেশী। সেই সুযোগের অবসরটা আপনারা পুরামাত্রায় গ্রহণ করুন।

"মানুষ গড়া"র কথার মধ্যে, স্বাস্থ্য কথাটাই খুব বেশী করিয়া আসিয়া পড়ে। এদেশে, একে ত স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনই নাই, তাহার উপরে, স্ত্রীশিক্ষা নামে দেহ ও মন-পেষণকারী তথাকথিত যে শিক্ষা প্রচলিত, তাহাতে বাড়া ভাতের মত, ভূতল, পাতাল ও অন্তরীক্ষের সকল বিষয়েরই রচা-"জ্ঞান" দান করা হয়, কিন্তু যে জিনিষটি আমাদের সবচেয়ে নিকট ও প্রিয়—এই দেহ—তদ্বিষয়ে কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না! কাযেই, সে বিষয়ে দু' চার কথা আপনাদিগকে শুনাইতে চাই।

যে বিষয়ে আমি বলিতে চাই, সে বিষয়ের জ্ঞানলাভটা সুধু যেন আমার বক্তৃতাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ না থাকে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর পুস্তক বাহির হইতেছে—আপনারা সে সকল সংগ্রহ করুন ও পড়ুন। জ্ঞান-তৃষ্ণা ও জ্ঞান-চর্চ্চা ব্যতীত, কোনও কর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া স্থাপিত হইতে পারে না। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—আপনাদিগের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা জাগাইয়া দেওয়া ও কতকটা কাযের জমি তৈয়ারি করিয়া দেওয়া।

আজ আমাদের বক্তব্য বিষয়—"স্বাস্থ্য"। "সুস্থ" থাকার অবস্থাটাকেই স্বাস্থ্য বলে। "সুস্থ" ও "স্বচ্ছন্দ" প্রায় একার্থেই ব্যবহৃত হয়।

"সুস্থ" থাকার লক্ষণ একটি নয়;—একত্রে তিনটি জিনিষের সমাবেশ—(১) পূর্ণ "আয়ুঃ" লাভ, (২) দেহের পূর্ণ "বিকাশ" লাভ, এবং (৩) দেহের সকল "যন্ত্রের "স্বচ্ছন্দ" ক্রিয়া সংঘটন। আমাদের দেশে আশীর্ব্বচনই—

"চিরায়ুঃ ভব," "দীর্ঘায়ুরস্তু" বা "শতায়ুর্ভব." এতদ্দেশীয় জ্যোতিষীগণের মতে, এ দেশের লোকদের আয়ুষ্কাল ১০৮ হইতে ২০ বৎসর। কিন্তু এখন, ৪০ পার হওয়াই দুর্ঘট হইয়াছে।

"দেহের পূর্ণতা" সম্বন্ধে আর বেশী কি বলিব? আপনারা নিজেদের দেহের আয়তন, কর্ম্মশক্তি ও আয়ুষ্কাল—আপনাদের পিতৃপিতামহের দেহের আয়তন, কর্ম্মশক্তি ও আয়ুষ্কালের সঙ্গে এক দিকে,—এবং, অপর দিকে, আপনাদের সন্তান-সন্ততিদের দিকে—মাত্র এই তিন পুরুষ তুলনা করিয়া দেখুন, এবং বুঝুন—এক একটা পুরুষ যাইতেছে, ও সেই সঙ্গে, ধাপে ধাপে, আমরা হীন ল, হীনস্বাস্থ্য ও অল্পায়ুঃ হইতেছি কি না?*

তার পর, দৈহিক যন্ত্রের "স্বচ্ছন্দ" কার্য্যের কথা। দেহটা এক জ্যান্ত কল বিশেষ। যে কল যত ভাল হয়, তাহা তত নীরবে চলে। কল পুরাতন হইলে, বা খারাপ হইলে, নানা রকম আওয়াজ করে; ও তখন যখন-তখন তাহার পিছনে দৃষ্টি রাখা দরকার হইয়া পড়ে। আমাদের এই দেহ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই খাটে। যতক্ষণ দেহ কল ঠিক আছে, ততক্ষণ কোথাও, কোন দিকে, আমাদিগকে দৃষ্টি দিতে হয় না। কিন্তু, এতটুকু বিকল হইলে, তখনি জানাইয়া দেয়, "আমি আছি।" যতদিন দাঁতের গোড়া না ফুলে, ততদিন কোনও খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ-কালে, একবারও ভাবি না যে, মুখের মধ্যে দাঁত আছে; যতদিন পেট না কামড়ায়, ততদিন আমরা ভাবিও না যে, খাদ্যদ্রব্য বুঝিয়া সুজিয়া খাওয়া উচিত; উন্মাদ ব্যক্তির বা রোগীর প্রলাপ-বাক্য না শুনিলে, মস্তিষ্কের কথাও আমাদের মনে আসে না! তাহা হইলেই দেখুন, "স্বচ্ছন্দ" থাকার মানে কি।

"ছন্দঃ" মানে "তাল"—সময় মেপে কায। আমাদের হৃৎপিণ্ড (হার্ট) মিনিটে, ৮০ বার, ঠিক্ তালে তালে, বুকে ঘা দেয়—"টিপ্-টিপ্ করে।" এই ঘা'য়ের মধ্যে, "প্রথম"টা দীর্ঘ, "দ্বিতীয়"টা হ্রস্ব। যতক্ষণ হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৮০টা ঘা দেয়, এবং তাহার প্রত্যেক ঘায়ের মধ্যে যে দুইটি অংশ আছে, তাহাদের পরস্পর হ্রস্ব দীর্ঘতা বজায় রাখে,—ততক্ষণ আমরা কখনো স্মরণও করি না যে, আমাদের হৃৎপিণ্ড আছে কি না! "প্রশ্বাস" কার্য্যটি (inspiration) দীর্ঘ ও "নিশ্বাস" কার্য্যটি (expiration) হ্রস্ব; এবং একত্রে, মিনিটে আঠারো বার নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে। ইহারা সংখ্যায় কম-বেশী যদি হয়, অথবা, যদি নিশ্বাস দীর্ঘ ও প্রশ্বাস হ্রস্ব হয় (অর্থাৎ, যদি হাঁপানি হয়),—তখনি আমাদিগকে বেশ্ হুস্ করিতে হইবে যে, শ্বাসকার্য্যের তাল বা ছন্দ গোলমাল হইয়া গিয়াছে! তাহার পরে, দেখুন, প্রত্যহ একই সময়ে, ক্ষুধার উদ্রেক, মলত্যাগের ইচ্ছা, ঘুমের আগমন ও গমন হইয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে, তাল কাটিলেই মুস্কিল! সারাদিনে, "ছন্দঃ" ঠিক থাকিলে, আমরা "দ্বি-পুরীষী ষমূত্রী;"—ইহার কম-বেশী হইলেই, গোলযোগ। তাহা হইলেই, আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, দেহের সমস্ত কল আপন-আপন ছন্দঃ ত বজায় রাখেই; পরন্তু, দেহের অপর সমগ্র যন্ত্রের সঙ্গে তাল রাখিয়া—সংযোগ, সঙ্গতি ও ছন্দঃ বজায় রাখিয়া, তবে চলে। দেহের যন্ত্রগুলি অভ্যাসের দাস, নিয়মের চাকর। কাযেই, তাহাদের ছন্দের এত প্রয়োজন; এবং যতক্ষণই দেহ স্ব (নিজ) ছন্দে (ইচ্ছায়) চলে, ততক্ষণই আমরা "সুস্থ"। কিন্তু এখানে আর একটি কথা আছে। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে,—ছন্দঃ রকমারি হয়। শীত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ ভেদে, শৈশব-বার্দ্ধক্য ও শীত-গ্রীষ্ম ঋতু ভেদে, ও ব্যক্তিগত শিক্ষা ও অভ্যাস ভেদে, এই ছন্দের তারতম্য ঘটে। যুবকের পক্ষে দিবানিদ্রা দূষণীয় হইলেও, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও সদ্যোপ্রসূতিদের পক্ষে উহা বাঞ্ছনীয়। শীতপ্রধান দেশে, প্রস্রাব বেশী ও ঘর্ম্ম কম হইলেও, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, ঘর্ম্ম বেশী ও প্রস্রাব কম হওয়াই স্বাভাবিক। যাহাই হউক, আপনারা বেশ্ ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবেন যে, উপর্য্যুক্ত তিনটি অবস্থার একত্র সমাবেশ না হইলে—আয়ুঃ, পুষ্টি ও স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া—একত্রিত না হইলে, "স্বাস্থ্য" পাওয়া হইল না। এটি ভুলিবেন না। এ কথাটা বারবার আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার যথেষ্ট হেতু আছে। এদেশে, কি শিক্ষিত

* ১৯১৬ সালে, আমি ৬ মাস কাল ধরিয়া কলিকাতার সহস্রটি উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি যে, প্রত্যেক বয়সের পুরুষ ছাত্রেরা পাশ্চাত্য সেই বয়সের ছাত্রীদের অপেক্ষাও হীন-স্বাস্থ্য—সর্ব্ব বিষয়ে।

কি অশিক্ষিত, কি স্ত্রী, কি পুরুষ,—সকলেরই একটা মস্ত দোষ আছে—দেহের সম্বন্ধে অনেক কিছু নির্ব্বিবাদে "মেনে লওয়া।" যদি কাহারো ছেলে রোগা হইল, তখনি তাহার বাড়ীর ও পাড়ার সকলেই মনে মনে মানিয়া লইলেন,—"ছেলেটির ঐ রকমই আড়া" (আয়তন)। কেন যে ঐ রকম আয়তন, কিসের অভাবে ঐ রকম অবস্থা, কেন এই ছেলেটি অপর ছেলের চেয়ে অপুষ্টদেহ,—তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করা দূরের কথা – মনে মনেও ভাবেন না! কাহারো যদি হাঁপানির ব্যারাম হইল, এবং সেই বংশে যদি হাঁপানি কাহারো পূর্ব্বে হইয়া থাকে, ত সুধু গৃহস্থ নহে, এদেশের চিকিৎসকরাও "পুরুষ-পারম্পর্য্য" অবাধে মানিয়া লয়েন;—খোঁজও করেন না, "বংশগত" দোষের উপরে বালকটির "নিজ দেহ-ঘটিত" বা "পারিপার্শ্বিক" কি অবস্থার ফলে, তাহার দেহ আক্রান্ত হইল। আমরা সকল জিনিষ এত সহজে "মানিয়া" লই কেন, জানেন? তাহার উত্তর সহজ,—প্রথমতঃ, আমরা ঘোর অদৃষ্ট-বাদী বলিয়া,—অর্থাৎ, অলস বলিয়া; দ্বিতীয়তঃ, আমরা অজ্ঞ বলিয়া—অনুসন্ধানের যে কষ্টটুকু সেটুকু নিজের ছেলের জন্যও করিতে চাই না; এবং তৃতীয়তঃ, মনের দুর্ব্বলতা জন্য; ইহা বিচারশক্তিকে চাপিয়া রাখে। ফলে, আমরা রোগের "মূল" সন্ধান করিয়া, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত না করিয়া, রোগের সঙ্গে "আপোষ" করিয়া নির্ব্বিচারে রোগের সঙ্গে "ঘরবাড়ী করি"! অথচ এদেশে, মানুষদের কথা ছাড়িয়া দিন, বাড়ীর টিক্‌টিকিটাও সকল রোগের অসংখ্য টোট্‌কা ও ব্যবস্থা জোর গলায় বলিতে দ্বিধা করে না!! এবং, আমাদের এই দেশের লোকের মত, পঙ্গপালপ্রায় কোনও দেশে এত লোক মরে না!!! গোড়াকার এই দুই প্রস্ত কথাগুলি আপনাদিগকে খুব যত্ন করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

(৩) বধূ-নির্ব্বাচন ও "বধূ-সেবা"

সত্য বটে যে কাহারো জন্মগত ধাতুপ্রকৃতি (Constitution) বদলান সহজ নহে; কিন্তু যে কোনও লোকের বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থাকে (Condition) বদলান খুব সহজ। দুর্ব্বলকে সবল করা, নিরক্তকে পূর্ণরক্ত করা, সরু বুককে চওড়া করা, কুঁজোকে সোজা করা, কম দম লোকের দম বাড়ান, নিত্য-ব্যারামীকে সুস্থ করা—এগুলি আজ বেশ সম্ভবপর হইয়াছে। আশা করি আপনারা আর রোগের সঙ্গে কিছুতেই আপোষ করিবেন না।

গিনি-সোণা ফেলিয়া, কেহ কেমিক্যাল গোল্ডের গহণা চান না। ভবিষ্যতে, যাহাতে আপনাদের ছেলেমেয়েরা গিনি সোণার হয়, সেই চেষ্টাই করুন। সেটি করিতে গেলে,—ভবিষ্যত বাঙ্গালার জন্য "মানুষ" "গড়িতে" হইলে, ঘরে পুত্রবধূ আনা থেকে, কার্য্যতালিকা সুরু করুন। কেন না, বাড়ীর বধূরা কখনো মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না, এমনিই এ দেশের শিক্ষা।

ঘরে বধূ আনিতে গেলে—তাহার "রূপের" কথাটা সব শেষেই তুলিবেন। "ধব্‌ধবে" চারটা জিনিষের মোহে পড়িয়া, আজ বাঙ্গালাদেশ উৎসন্নে, ও বাঙ্গালী মরণের পথে যাইতে বসিয়াছে—যথা, ধব্‌ধবে বৌ, ধব্‌ধবে কলে মাজা চাউল, ধব্‌ধবে রোলার-মিলের ময়দা, ও ধব্‌ধবে বিলাতী চিনি। পোষ্য-বধূ আনিবার সময়, সর্ব্বপ্রথমে তিনি সদ্বংশ-জাত কিনা তাহা দেখিবেন। সদ্বংশের শিক্ষা ও সাধনার ধারা বা কৃষ্টি (culture), চরিত্রবল, মনীষা, দীর্ঘায়ুঃ, ও অপর গুণের মূল্য অনেক। এই জন্য, ইংরাজরা ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া ও পালিত কুকুরের ২০।৩০ পুরুষের "আভি-জাত্য সংবাদ" (pedigree) জানিয়া, তবে কেনে—কিন্তু নিজেদের বিবাহের সময়ে, ইংরাজরা কামান্ধ হইয়া যায়! ভাবী পুত্রবধূর "বংশের" বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে অবগত হইয়া, তাহার পরে তাঁহার "কুলের" সন্ধান লইবেন। তৎপরে, মেয়েটির স্বাস্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব—এবং সবশেষে রূপ। যদি এই ভাবে পুত্রবধূ না আনা যায়, তবে সংসারে নানারকমের অসুখ ও অশান্তি আসার সম্ভাবনা। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কথা লেখে যে বারম্বার খুব অল্পসংখ্যক গোষ্টির মধ্যে বিবাহকার্য্য চলিলে, সে গোষ্টির স্বাস্থ্য, আয়ুঃ ও নৈতিক অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জাতির মধ্যে, এবং সমস্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে স্ব স্ব শ্রেণীতে বিবাহ প্রচলিত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা এ কথাটি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। এই আন্তর্জাতিক বিবাহে

অসুবিধা ঢের আছে, স্বীকার করি; কিন্তু উহার সুফল অতীব সুদূরপ্রসারী।

যাহা হউক যে পরের মেয়েটিকে তাহার পিতামাতার স্নেহক্রোড় ও জন্মাবধি স্নেহ-নীড় হইতে ছিন্ন করিয়া আনিলেন, সেটিকে "কন্যা" বিশেষে পালন করাই চাই। বলিতে লজ্জায় অধোবদন হয়, এমন কি অনেক শিক্ষিত বাড়ীতেও, বধূর উপর ভীষণ নির্য্যাতন হয়। লোকতঃ, আইনতঃ, ও ধর্ম্মতঃ, যে মেয়েটি পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া আপনার "গোত্র" লইল, সে আপনার "পোষ্য"-কন্যা। এই মেয়েটিকে আপনার পুত্রের মত—এমন কি তদপেক্ষা বেশী যত্ন করা চাই; কারণ, সে বয়সে ছোট; ও সে কতবড় ত্যাগ স্বীকার করিয়া, সম্পূর্ণ অপরিচিতদের মধ্যে আসিয়, তাঁহাদিগকে আপনার করিতে আসিয়াছে। সে আপনার বাড়ীর বন্দোবস্ত কিছু জানে না; ও আপনারা ভিন্ন তাহার কেহই নাই।

বিবাহের সমারোহে কত টাকাই অনর্থক অপব্যয় হয়। সেই টাকাটার বেশীর ভাগ বধূর সেবার জন্য রাখিলে, উত্তর-কালে সেই বধূর স্বাস্থ্য ও মন কত উপকৃত হয়। আমি বিবাহে লোকজন খাওয়ান আপত্তি করিতেছি না—সেটি সামাজিক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু আজকাল বিবাহোৎ-সবে যে কি ভীষণ অপব্যয় হয়, তাহা বলিতে পারি না! এ সম্বন্ধে সৎসাহস দেখাইবার সময় আসিয়াছে। কারণ, অধিকাংশ স্থলে কন্যাপক্ষের পয়সায় এই বড়মানুষী হয়। যেমন গোরুকে মাতৃজ্ঞানে স্বয়ং সেবা না করিলে, গোরুর অবস্থা হীন হয় এবং সেই গোরুর দুধ পান করিয়া স্বাস্থ্য ভাল থাকে না; তেমনি, স্বয়ং গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীঠাকুরাণীরা, প্রতিদিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বধূ-মাতার "সেবা" না করিলে, কখনো বংশে ভাল ছেলে জন্মায় না। যেমন কাঁচা ভিতে ও খারাপ মাল-মসলায় ভাল বাড়ী হয় না, তেমনি বধূমাতার খাদ্য বিষয় রীতিমত অবহিত না হইতে পারিলে, কিছুতেই সমাজকে সুসন্তান দেওয়া সম্ভবপর হয় না। এই জন্য, খুব সাধারণ ভাবে, আমাদের খাদ্যে ও ভোজনপ্রণালীতে কি কি মোটামুটি দোষ আছে, তাহা পরে বলিতেছি। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, মানুষ গড়ার একটা মশলা—খাদ্য; এবং খাদ্যই সব নয়। অন্য কথা পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

পল্লী-সম্পদ

শ্রী মনোজমোহন বসু

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কত অপরূপ সম্পদ লুকান রহিয়াছে, আমাদের চাহিয়া দেখিবার চোখ নাই। চোখ বুজিয়া থাকিয়া চারিদিকে অন্ধকারের স্বপ্ন দেখি।

এখন নববর্ষায় গ্রামের মাঠঘাট সরল নিরলঙ্কার 'বারাসে' গানে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ নিরক্ষর কবি উহার মধ্যে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার কথা কাহারও মনে নাই। আজিও সুর শুনিয়া চাষীদের চোখ ছলছল করিয়া ওঠে। কিন্তু আমাদের কানের পাশ দিয়া উহা বাতাসে ভাসিয়া যায়, কানে ঢুকে না।

রাইবিশে, ঢালিনাচ, কাঠিনাচ এমনি কত-কি অনুপম নৃত্যসুষমা অবজ্ঞাত নিম্ন-সমাজে এখনও শক্তি ও আনন্দের উৎস হইয়া বাঁচিয়া আছে। কিন্তু আমরা শিক্ষিতমণ্ডলী ইহাদের চিনি না, লোলুপ হইয়া তাকাইয়া আছি নিজে-নিস্কি মড্এলেন পাব্লোভা রোসেনারার পায়ের দিকে।

অনাচারী, আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান পটুয়াদের ছায়া মাড়ানই ত মহাপাপ! যদি দৈবৎ কিঞ্চিৎ উচ্চভাবগ্রস্ত হইয়া তাহাদের উঠানে গিয়া বলি—"দেখি ছাই-ভস্ম কি আছে তোদের," তাহারা অবিশ্বাস করিবে, গোড়ায় মিথ্যা কহিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিবে, বলিবে—"ছবি নাই"।

শেষকালে হয় ত জীর্ণঘরের মাচার তলে গুঁজিয়া-রাখা বর্ষা-ধারায় বিগলিত পিতামহের আমলের অস্পষ্ট পট বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জে কৈফিয়ৎ দিবে—"এসব আমাদের আমলের নয়, আমরা বাজে কাজ আর করিনে—চাষ ধরেছি। আস্‌ছে বছর নূতন ঘর বাঁধ্‌বো ঠিক।"

বাংলার জলে হাওয়ার বিচিত্র শ্যামল রূপসম্ভারের মধ্যে ছড়ায় গানে নাচের ছন্দে পটের ছবিতে আল্পনার দারু-চিত্রণে কাঁথার কন্থায় কলালক্ষ্মীর যে পদচিহ্ন পড়িয়াছিল এমনি অবহেলায় দিন দিন তাহা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবারও একজন দরদী দেশে নাই।

মনে মনে এইসকল কথা যখন ভাবিতেছিলাম হঠাৎ একজনের সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেল। দেখিলাম, সত্যকার প্রেমিক আছে বটে। তিনি কাজে লাগিয়াছেন, বৃহৎ আয়োজনের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া নাই।

কাজ হইতেছে কিন্তু ঢাক-ঢোল বাজিতেছে না। শহরের কলরব ও উত্তেজনা হইতে বহুদূরে নিভৃতে দিনের পর দিন পল্লীর সম্পদরাজি সংগৃহীত হইতেছে। ভদ্র-সমাজ চিরদিন যাহাদের দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহাদের ডাকিয়া তিনি কোল দিয়াছেন। বলিতেছেন—বাংলার সত্যরূপ তোদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে; তোরাও যেদিন ভদ্র হইয়া যাইবি বাংলার কৃষ্টি সেইদিন মরিবে।

'বঙ্গলক্ষ্মী' যাঁহারা পড়িয়া থাকেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তাঁহার কর্ম্মস্থল শিউড়ী পল্লীপ্রেমীদের তীর্থক্ষেত্র হইতে চলিয়াছে। সেই বিপুল ব্যাপারের ক'টা কথাই বা ছাপার অক্ষরে উঠিয়া থাকে!

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কানে আসিল, কোথায় মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানায় এক বাড়ীর দেয়ালে মাটির উপর কুললক্ষ্মীরা পদ্মহাতে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। সন্ধানী দরদীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। কলিকাতা হইতে মাহিনা-করা শিল্পী গিয়াছে সেই ছবি নকল করিয়া আনিবার জন্য। সে নাকি নব-অজন্তার আবিষ্কার!

শিউড়ী রওনা হইতে হইল। হাওড়া ষ্টেশনে শিল্পীবর যামিনী রায় মহাশয়ের সহিত দেখা। উভয়ে একই তীর্থের যাত্রী।

শিউড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির সম্পাদক নাট্যকার রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত। সহকারী সম্পাদক অফুরন্ত উৎসাহের আধার বগলাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও বহু ভদ্রের সমাগমে প্লাটফরমটি হইয়াছে তারাভরা আকাশের মতো। নির্ম্মলশিব বাবুর আতিথ্য ও অমায়িকতা ভুলিবার নহে। এমনি করিয়া সৌহৃদ্য ও সদাশয়তায় কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে শিউড়ী দূরাগত পথিক দুইটিকে চিরদিনের মতো নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

ক্লাব হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। বড় বড় লোকের আড্ডা, কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ হইল। হংসশ্রেণীর মধ্যে আনাড়ী বক হইয়া কেমন করিয়া ঘণ্টা দুই-তিন কাটাইতে হইবে মনে মনে তাহার মুসাবিদা করিতে করিতে সভয়ে রওনা হইলাম। গিয়া দেখি—অবাক কাণ্ড!

আমার খাল-বিল-নদী-সমৃদ্ধ পূর্ব্ব বাংলাকে এই নিঃসীম রুক্ষ মাঠের দেশে হুবহু উপড়াইয়া আনিয়াছে কে?

জারীগান আরম্ভ হইল। শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় মোক্তার মহাশয়েরা থিয়েটারের দল না করিয়া জারীর দল করিয়াছেন, এ দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহাদের দিয়াছে কে? সম্ভ্রান্তবর্গের অনুষ্ঠানে চাষীদের অবজ্ঞাত অপরূপ নৃত্যগীত শুনিতে শুনিতে মনে হইল—আজ আবার চাঁদের আলোয় পদ্মার কূলে বুঝি জোয়ারের ঢেউ লাগিয়াছে, কলাবনের পাশে কোন চাষার আঙিনার আসরে বসিয়া গান শুনিতেছি। আমি যে সুশিক্ষিত অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া আছি সে-কথা ভুলিয়া গেলাম। চিরদিনের অবহেলিত গীতিকাকে এত সম্মান কে দিল?

মোক্তার মহাশয়েরা উত্তর দিলেন—ঐ যিনি বসিয়া আছেন।

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। বলিলাম—মোক্তার বাবুরা, আমি আপনাদিগকে এবং আপনাদের প্রেরণাদাতা দত্ত মহাশয়কে সশ্রদ্ধ নমস্কার করি। একদিন আমাদিগের মোহান্ধকার ঘুচিয়া যাইবেই। সেদিন উচ্চনীচ সকল সম্প্রদায় এই বিচিত্র রূপময় বাংলার যথার্থ প্রাণবস্তুকে

সমাদর করিবে। কিন্তু আপনারা হইয়া রহিলেন ইহার অগ্রদূত।

আরও একটি নাচ হইল—কাঠি-নাচ। বাউরী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার চলন। আগে কেউ জানিত না, এমন অপূর্ব্ব জিনিষও লুকাইয়া থাকিতে পারে! নাচের সাথে ঢোল ও কাঁশী বাজিতে লাগিল। গানও আছে। বিমুগ্ধ হইয়া ভাবি, এই জাতি জীবনের পরম সঙ্কট অবস্থা লইয়াও না চয়া থাকে! মৃত্যুর মধ্যেও ছন্দের হিল্লোল বহিয়া আনিয়াছে। সৈন্য আহত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়াছে, চারিদিকে অগণ্য শত্রু। প্রাণের দীপশিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, বুঝি বা নিভিয়া যায়। আহত বীর শত্রুর সহস্র অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে, তবু নাচিতেছে। মনে হইল, হায়রে হত্যাকেও এরা অসুন্দর থাকিতে দিবে না! এমন দারুণ মুহূর্ত্তও এত মধুর হইয়া উঠিতে পারে!

দত্ত মহাশয়কে সানুনয়ে অনুরোধ করিলাম—পল্লীমাতা নিভৃত বক্ষে আমাদের বিমুখ দৃষ্টি হইতে ইহাদের কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা কেহ খবর রাখিতাম না। আপনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। শিক্ষিত সমাজকে এরস হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না, প্রচারের উপায় করুন।

সময় অল্প বলিয়া রাইবিশের নাচের আয়োজন হয় নাই। কিন্তু কয়টি সম্ভ্রান্ত-ঘরের বালিকা রাইবিশের অনুকরণে বীরের নাচ নাচিল। আজ সমস্ত বীরভূম যেন নাচিতেছে, উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধন ছোট বড়র বিচার নাই। এত আনন্দের উৎস যে কতদিন পাষাণ-চাপা ছিল! এই বালিকারা যেদিন মা হইবে ইহাদের সন্তানের মুখে বাংলার বিগত তেজ প্রদীপ্ত দেখিতে পাইব নাকি?

তারপর আসিল ছোটছোট বাউরীর মেয়েরা। প্রজাপতির মতো কি মনোহর নাচ! উহাদের স্বরচিত একটা গান লিখিয়া আনিয়াছি—

সাহেব নাকি বড় গুণবান গো—
ও, সাহেবের সোনার কলম বহাল থাকুক
জমিদারী ছুটুক নাম।

সাহেব অর্থাৎ গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। সরল অবোধ মেয়েরা মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে না, স্বরোল্লাসে প্রকাশ করে। দত্ত মহাশয়ের জমিদারী ও সোনার কলম কামনা করিয়াছে। সেকালে শুনিয়াছি ইহাদেরই একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দারোগা হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

গান ভাঙিল। আকাশ ভাঙিয়া আষাঢ়ের ধারা নামিল। বাসায় ফিরিয়া হাতের কাছে পাইলাম জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বিচিত্রা'। 'ভারতীয় নৃত্যকলা' প্রবন্ধে 'চিত্রগুপ্ত' লিখিয়াছেন—

অন্যত্র তবু যা' হয় একটা কিছুর চলন আছে সেটা নেহাৎ নিন্দনীয় নয়,—কিন্তু নাচ বিষয়ে বাংলা দেশই সবচেয়ে নিন্দনীয়। এখানে নাম করবার মত কিছুই নেই।...

পড়িয়া হাসি পাইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা।

শালিখা (হাওড়া)

ভগবদ্কৃপায় এই শিশুসমিতি তাহার তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য—স্থানীয় দুঃস্থা নারীদিগকে, বিশেষতঃ বিধবাদিগকে গৃহশিল্পের শিক্ষাদান করা এবং তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা, যাহাতে গৃহিণীগণ তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত অর্থে আয়বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন।

সমিতি-গৃহে প্রত্যহ শিক্ষার্থিনীগণের নিকট বাঙ্গালা দৈনিক পত্র হইতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রভৃতি প্রবন্ধাদি পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা হয়। শিক্ষার্থিনীগণের নৈতিক উন্নতির দিকে এবং অন্তঃপুর-মহিলাগণ যাহাতে বহির্জ্জগতের সহিত একেবারে বিচ্ছিন্ন না থাকেন সে বিষয়ে সমিতির দৃষ্টি আছে। সমিতির কেন্দ্রস্থল এখনও ২১ নং রামলাল মুখার্জ্জির লেনেই রহিয়াছে। এবং প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সমিতির কার্য্য হয়। শিক্ষার্থিনীরা প্রত্যেকের সুবিধামত ঐ সময়ের মধ্যে আসিয়া শিল্পকার্য্য শিক্ষা করেন এবং যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুতের অর্ডার থাকে তাহা অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করেন। এই বৎসর হইতে সমিতিতে নিয়মিত ভাবে চরকায় সুতা কাটা এবং তাঁত চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে এক মূক ও বধির বালক এই সমিতিতে সেলাই শিক্ষা দিত, গত বৎসর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর হইতে শিক্ষিতা সীবনবিদ্যায় নিপুণা শ্রীমতী সুবাসিনী চৌধুরী মহাশয়া (সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শিক্ষয়িত্রী) শিক্ষা দেন। তাঁহাকে সমিতির আয় হইতে মাসিক ৩৩৲ টাকা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে হয়। গত বৎসর সরোজনলিনী নারীশিল্প প্রদর্শনীতে আমাদের সমিতির শিক্ষয়িত্রীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২৷৷০ টাকার জিনিষ বিক্রয় হয়।

সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শালিখায় মহিলাসমিতি স্থাপন, যাহাতে অন্তঃপুর-মহিলাগণের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনায় মেলামেশার সুযোগ হয় এবং যাহাতে তাঁহারা ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা নিজ নিজ সংসারের ও সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে ক্রমশঃ সমর্থ হন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহায়তায় গত বৎসর মহিলাসমিতির প্রথম অধিবেশন এই স্থানেই হয়। তাহাতে প্রায় ১০০ শতের অধিক স্থানীয় ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মী শ্রীমতী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী প্রতিভা সেন ও শ্রীমতী শান্তিময়ী দাস বর্ত্তমান অবস্থায় নারীগণের কর্ত্তব্য কি এবং তাঁহাদের উন্নতিকল্পে কিরূপ কার্য্য করা যায়, কি কি কাজের ভার নারীরা লইতে পারেন, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নারীগণের কাজ করিবার উপকারিতা কি, এই সব বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সকল মহিলাই তাঁহাদের বক্তৃতাতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

স্থানীয় ভদ্র-মহোদয়গণ ও মহিলাগণের নিকট নিবেদন, যে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহের সেলাইয়ের কাজ, যথা মেয়েদের বড়ি, ব্লাউজ, সেমিজ, পেটীকোট, ছেলেদের ফ্রক, পাজামা, পুরুষের সার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতির অর্ডার দোকানে না দিয়া যেন এই সমিতিকে দেন, যাহাতে

তাঁহাদেরও আর্থিক কোন লোকসান না হয় অথচ তাঁহাদের সহানুভূতিতে এই অনুষ্ঠানটি পরিপুষ্ট হয় এবং দুঃস্থ পরিবার-বর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়।

শ্রী ভানুমতী দেবী
সম্পাদিকা

ভাট্দী (ফরিদপুর)

করুণাময় ভগবানে ইচ্ছায় আমাদের ক্ষুদ্র মহিলাসমিতি নান রূপ বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই সমিতি গত ১৩৩৬ সনের ২৩শে চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত প্রমোদলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার রায় চৌধুরী মহোদয়দ্বয়ের ঐকান্তিক উৎসাহে ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ পর্য্যন্তও বিশেষ তৎপরতার সহিতই কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। প্রতি মাসে চারিটি করিয়া সমিতির অধিবেশন হয়। সভায় "বঙ্গলক্ষ্মী" ও সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ, তকলী ও চরকা কাটা শিল্পাদি শিক্ষা এবং সময়োপযোগী বক্তৃতাদিও হয়। মুষ্টিভিক্ষা ও শিল্পাদির মূল্যই ইহার প্রধান আয়। আমরা সাধ্যমত গ্রামস্থ অভাবগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের, গরীব দুঃখীগণকে এবং দেশের কাজের জন্য সাহায্য দান করিয়া থাকি। বিগত ৬ই বৈশাখ তারিখে ফরিদপুরে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর সভানেত্রীত্বে যে জেলা মহিলাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়, তাহাতে এই সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী চৌধুরাণীকে প্রতিনিধি পাঠান হইয়াছিল।

গত ২৫শে বৈশাখ বেলা ২ ঘটিকায় সময় সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ১৩৩৮ সালের জন্য একটি কমিটি গঠন ও সম্পাদিকাদি নিযুক্ত করিবার পর অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

সম্পাদিকা—শ্রী মনোরমা দেবী চৌধুরাণী
ও নিস্তারিণী দেবী

মাণিকগঞ্জ

গত মার্চ্চ মাসে স্থানীয় মহিলাসমিতির উদ্যোগে মাণিকগঞ্জে একটি সুবৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

প্রদর্শনীতে সমিতির মহিলাদের নানারূপ শিল্পকার্য্য—এমব্রয়ডারী, তাঁতের কাপড়, বহুবিধ সূচিশিল্প, মাটির খেলনা, পুতুল, কাপড়ের ও কাগজের খেলনা, পুতুল, সার্ট, কোট, পাঞ্জাবী, সোয়েটার, তোয়ালে,—আইসের, রেশমের ও পুতির চিত্র এবং বহুবিধ শিল্পদ্রব্যাদি আসিয়াছিল। মাণিকগঞ্জ মহিলাসমিতির মেয়েদের ছাড়াও বেতিলা, নবগ্রাম, বায়রা, 'মত্ত' মহিলাসমিতির বহু শিল্পকার্য্য, এবং অন্যান্য গ্রামেরও শিল্পকার্য্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল ২ দিবস ব্যাণ্ড্ পার্টির সুব্যবস্থা ছিল এবং প্রদর্শনী অতি সুন্দররূপে সাজানো হইয়াছিল।

২৭ শে মার্চ্চ বেলা ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের হেড মিসট্রেস্ শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সরকারের অনুমোদন এবং ছোট ছোট মেয়েদের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মহকুমা মাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্,কে,চ্যাটার্জি আই-সি-এস্ মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তৎপর মেয়েদের কবিতা ও গান আবৃত্তি হয়। একটি ৭ বৎসরের মেয়ে এত সুন্দর গান ও আবৃত্তি করিয়াছিল যে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্থানীয় সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ঐ মেয়েটিকে রৌপ্যপদক দান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। সমিতি হইতে উপযুক্তরূপ সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার পর সেদিনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। সভাতে মেয়ে-পুরুষে প্রায় ২ হাজার লোক হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস ২৮শে মার্চ্চ মহিলাসমিতির মেলা "সারস্বত-ভবনে" বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত হয়। মেলাতে বহুবিধ জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল। মেয়েদের হাতের বহুবিধ মেঠাইয়ের দোকান, সরবত, চা, পান, সব্জী, ফল, খেলনা, কাপড়ের আসন, পাখা, ছিকা, সাজি, ডালা, মোয়া, মুড়্কি, ডালের বড়ি, আচার, মোরব্বা ইত্যাদির বহু দোকান একত্র হইয়া এক অভিনব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ক্রয়-বিক্রয়ও যথেষ্ট হইয়াছে। মেলাতে মহকুমার মেয়ে ছাড়াও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মেয়েরাও যোগ দিয়াছিলেন।

সুখের বিষয়, সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেন মহাশয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে এত বড়

বিরাট মেলায় কোনরূপ বিশৃঙ্খলা হয় নাই। মেলাতেও প্রায় দেড় হাজারের উপর মেয়ে সমাগম হইয়াছিল। ঐ দিন মেলা শেষ হওয়ার পর মেয়েরা একটি ছোট নাটকের অভিনয় এবং গান আবৃত্তি দ্বারা উৎসবের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল।

স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন সবরেজিষ্টার, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়দের উৎসবের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের পরিশ্রমেই এত বড় প্রদর্শনী সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এজন্য আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রী অমিয়বালা দেবী
সহ-সম্পাদিকা

যশোহর সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বাৎসরিক উৎসব

২৩শে মে তারিখে যশোহর নারীমঙ্গল সমিতির বাৎসরিক উৎসব-অনুষ্ঠান অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ২০০ মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ওয়াটার ওয়ার্কসের সুবৃহৎ বাংলোয় উৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহিলাসমিতির কতিপয় ছাত্রী দ্বারা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রচিত "হে নারী তোমার গৃহের দ্বারে সোনার সাজে প্রদীপ জ্বালো" এই সঙ্গীতটি গীত হয়। অতঃপর সম্পাদিকা শ্রীমতী চারুশীলা ধর মহিলাসমিতির বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন।

ইহার পর সমিতির ছাত্রীবৃন্দ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনীত হয়। ছাত্রীগণ এই অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর সভানেত্রী শ্রীমতী রাজবালা মিত্র সমবেত মহিলাগণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর এই সমিতির সর্ব্ববিষয় উন্নতির জন্য সকলকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। ইহার পর কয়েকটি সঙ্গীত হয়। সভ্যাগণ উপস্থিত সকলকে জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

সম্পাদিকা—শ্রীমতী চারুশীলা ধর—সভায় যে কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"প্রথম ১৯২৫ সালের মে মাসে যশোহর মহিলাসমিতি স্থাপিত হয়। কেন্দ্রসমিতির কর্তৃপক্ষ শ্রীমতী রাজবালা মিত্রকে সভানেত্রী, প্রমীলাবালা মিত্রকে সম্পাদিকা, হিরণ্ময়ী দত্তকে কোষাধ্যক্ষা ও মিসেস্ গিলবার্টকে সহঃসম্পাদিকা পদে নিযুক্ত করেন। তখন মাসে একবার সমিতির অধিবেশনের দিন ধার্য্য ছিল; সমিতিতে কোন কোন বই পড়া হইত। সভ্যা সংখ্যা অনুমান ১৪ জন ছিল।

এই সময় সমিতির কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই এবং পূর্ব্বোক্ত সম্পাদিকাও কিছুকাল পর পদত্যাগ করেন। এবং দুঃখের বিষয়, সেই কারণে আরও ৫।৬ জন সভ্যা নাম কাটাইয়া দেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে মফঃস্বল মহিলাসমিতি সকল সাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকে, অকারণে উহার সংস্রব ত্যাগ করিলে সমিতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহিলাদিগের ভিতর পরস্পরের আদান-প্রদান, ভাববিনিময়, শিক্ষার বিস্তার, শরীরচর্চ্চা, সন্তান-পালন, ধাত্রীবিদ্যা, তদুপরি শিল্পচর্চ্চা, কুটীরশিল্প প্রভৃতি অর্থকরী শিল্পবিস্তার করাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য সর্ব্বাগ্রে মহিলাদিগের উৎসাহের প্রয়োজন। সমবেত চেষ্টার ফলেই একমাত্র আদর্শ মহিলাসমিতি গঠিত হইতে পারে।

অতঃপর ১৯২৬ সালে শ্রীমতী চারুশীলা ধর সম্পাদিকা নিযুক্ত হন।

এই সময় স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে সমিতির অধিবেশন হইত। কিন্তু উহাতে নানা অসুবিধা হওয়ার দরুণ প্রত্যেক সভ্যার বাড়ীতে নিয়মানুক্রমে সমিতি হইয়া আসিতেছে। প্রতি মাসে অধিবেশনের দিন ২খানা গাড়ী অথবা মোটর-লরীতে সভ্যাগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যে কোন মহিলা মাসিক ।০ চাঁদা দ্বারা সভ্যাশ্রেণীভুক্তা হইতে পারেন। অপারগ হইলে কোন কোন স্থলে ফ্রী মেম্বারও লওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ৫০ জন সভ্যা সমিতিতে আছেন। প্রতিমাসে সমিতিতে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। উহাতে সকল সভ্যা দ্বারা একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত

হইয়াছে। উহা সমিতির উন্নতিবিষয়ক কার্য্যাবলীর সিদ্ধান্ত করেন।

শিল্প বিভাগ:—মহিলাসমিতি একজন সুদক্ষ দরজী দ্বারা জামা সেলাই ইত্যাদি শিক্ষা দান করিতেছেন। উক্ত দরজী প্রত্যেক পাড়ায় এক একটি ক্লাস করিয়া সেলাই শিখাইয়া থাকে। এভাবে সমিতির বহু সভ্যা শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অর্থকরী শিক্ষা দ্বারা মহিলাদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

গত ১৯২৬, ১৯২৯, ও ১৯৩০ সালে যশোহর মহিলা সমিতি কেন্দ্রসমিতির বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে যথাক্রমে ৫৲, ২০৲, ও ২৩৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

সমিতির সাহায্য-সমিতির গচ্ছিত অর্থ হইতে কয়েকবার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সাহায্য করা হইয়াছিল। খুলনা ও বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে এইরূপ একবার ৬০৲ টাকা ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করা হইয়াছিল। ২।৩ জন নিরাশ্রয়া বিধবার সাহায্যার্থে ১৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

৺ সরোজনলিনীর স্মৃতি-বাৎসরিক উৎসবে একবার কয়েক মণ চাউল ও অন্ধ খঞ্জদের কাপড় দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ২টি গরীব বালিকার সমুদয় খরচ সমিতি হইতে দিয়া স্কুলে পড়ান হইয়াছে। বর্ত্তমানে একটি মেয়ে সমিতির খরচে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেছে। মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষালাভেচ্ছু। আশা করা যায় এই সাহায্য দ্বারা ভবিষ্যতে বালিকাটির উদ্ধার হইবে।

এ পর্য্যন্ত মহিলাসমিতি সাধ্যানুযায়ী বহুপ্রকারে সাহায্য দান করিয়া আসিতেছে।

জনহিতকর কার্য্যে সমিতির সাহায্য:—মহিলাসমিতির চেষ্টায় স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী হইতে একজন শিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্তা হইয়াছে। উক্ত ধাত্রী সহরের সর্ব্বত্র বিনা পয়সায় কার্য্য করিয়া থাকে। সমিতির নিজস্ব অর্থ পর্য্যাপ্ত না থাকায় অনেক স্থলে জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করা অসম্ভব হয়।

বর্ত্তমান স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়টির সংস্কার অভাবে নিতান্ত দুরবস্থা হইয়াছে। এই জীর্ণ গৃহে বালিকাদিগের অবস্থানও নিরাপদ নয়।

সমিতির ২২ জন সভ্যা দ্বারা স্কুল কমিটীর অন্তর্ভুক্ত একটি পরামর্শ-কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটী স্কুলের যাবতীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবেন, স্কুলগৃহ সংস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

আমোদপ্রমোদ ও খেলাধূলা:—এই মহিলাসমিতির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ব্যায়ামচর্চ্চা ক্লাস পরিচালিত হইতেছে। সম্পাদিকার গৃহসংলগ্ন দুইটি ক্ষেত্রে ব্যাড্‌মিন্‌টন খেলা হইয়া থাকে। সভ্যাগণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উহাতে যোগ দিয়া থাকেন। সমিতির অন্যতমা সভ্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী সেন এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। তাঁর চেষ্টায় প্রায় ৩০।৪০ জন বালিকা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে খেলাধূলায় যোগদান করিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ব্যায়ামচর্চ্চা যেরূপ দরকার, চিত্ত প্রফুল্ল রাখাও তদনুরূপ আবশ্যক। এই জন্য সময় সময় সমিতি হইতে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করাও বিশেষ দরকার। একঘেয়ে জীবনযাত্রার প্রণালী মহিলাদিগের কর্ম্মক্লান্ত দেহকে অধিকতর অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। যখন মনটাকে হাল্কা করিয়া লইবার প্রয়োজন হয়, এই সকল আমোদপ্রমোদের সার্থকতাও তখনই উপলব্ধি করা যায়। সকল মহিলাসমিতিরই এই সকল বিষয়ে অগ্রণী হওয়া দরকার।

আমাদের এই মহিলাসমিতি কখন কখন এইরূপ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থার করিয়া থাকেন। একবার রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটকটি অভিনীত হইয়াছিল এবং দুই জন সভ্যা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দুইটি স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আজ এই বাৎসরিক উৎসবেও বালিকাদিগের দ্বারা "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনীত হইতেছে। এই উৎসব-অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বালিকাদিগের এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন এই যে, এই মহিলাসমিতিকে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে আপনারা সকলে সাহায্য করুন, কেন না সমবেত চেষ্টা, উৎসাহ ও সহানুভূতি দ্বারাই একমাত্র আদর্শ সমিতি গঠিত হওয়া সম্ভব।

আজ এই মহিলাসমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মীদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শ্রীমতী রাজবালা মিত্র এবং শ্রীমতী হিরন্ময়ী দত্ত সমিতির জন্মাবধি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নানা ভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা বয়োবৃদ্ধা কর্ম্মী হিসাবে না ধরিলেও ইঁহাদের পরামর্শ প্রার্থনীয়। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যাগণ বহু প্রকারে সমিতির উন্নতিসাধনে যত্নবতী হইয়াছেন। তজ্জন্য ইঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। এতদ্ব্যতীত আজ যে সকল মহিলা এই উৎসব-সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।"

শ্রী চারুশীলা ধর
সম্পাদিকা

কস্‌বা (বালিগঞ্জ)

নারীজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের চেষ্টায় গত ১৯৩০ সনের জুলাই মাসে এই সমিতিটি স্থাপিত হয়। জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মিসেস্ প্রতিভারাণী সিংহ এই সমিতির সম্পাদিকার পদে নিয়োজিতা ছিলেন এবং এই কয় মাসের গড়পড়তা সভ্যা-সংখ্যা পনর জন ছিল। তখন শুধু কাটিং শিক্ষা দেওয়া হইত এবং সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ক্লাস লওয়া হইত—সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তাহে দুইটি করিয়া ক্লাস হইত। মিসেস্ ষোড়শীবালা ঘোষ সমিতির স্থাপন হইতেই শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য চালাইতেছেন।

গত ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসে মাননীয় রায় শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহাদুর মহাশয়ের চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান রেড্ ক্রস সোসাইটীর দ্বারা কস্‌বা গ্রামে একটি বেবী-ক্লিনিক স্থাপিত হয় এবং আমি তাহার লেডী হেল্‌থ ভিজিটর হইয়া এখানে আসি। অতঃপর মিসেস্ প্রতিভারাণী সিংহ সমিতির সম্পাদিকার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ১৯৩১ সনের জানুয়ারী মাস হইতে আমি এই সমিতির সম্পাদিকার কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করি।

গত ডিসেম্বর মাসে প্রথম এখানে প্রাথমিক প্রতিবিধানের (**First-aid to the injured**) ক্লাস ৫।৬ জন ছাত্রীকে লইয়া খোলা হয়। পরে জানুয়ারী মাস হইতে স্বাস্থ্যবিধানের (**Hygiene**) ক্লাস খোলা হয়।

সমিতির মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি ক্লাস খোলা হয় এবং সপ্তাহে দুই দিনের জায়গায় তিন দিন এবং এক ঘণ্টার জায়গায় দুই ঘণ্টা ক্লাসের বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তাহে ছয়টি ক্লাস লওয়া হয়।

মঙ্গলবার—সেলাই ও স্বাস্থ্যবিধান।

বুধবার—প্রাথমিক প্রতিবিধান ও ইংরাজী।

শনিবার—সেলাই ও স্বাস্থ্যবিধান।

সেলাই ক্লাসের টিচার মিসেস্ ষোড়শীবালা ঘোষ।

ইংরাজী ক্লাসের টিচার—মিসেস্ জ্যোৎস্না গুপ্তা।

প্রাথমিক প্রতিবিধান ও স্বাস্থ্যবিধানের বক্তৃতা সম্পাদিকা দিয়া থাকেন।

মার্চ্চ মাসেই ছাত্রীদের অভিভাবকদের লইয়া কিছু চাঁদা তুলিয়া সমিতির কার্য্য ভালরূপে চালাইবার জন্য এবং অত্যাবশ্যকীয় সমিতির দুই একটি জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য একটি সভা আহ্বান করা হয়। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করিয়া সমিতির বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

মিসেস্ খগেন্দ্রনাথ সেন (প্রেসিডেণ্ট্) ৫৲। মিষ্টার সান্যাল ৩৲। মিষ্টার জগৎবন্ধু দত্ত ৲। মিষ্টার হরিশ্চন্দ্র রায় ১৲। মিসেস্ সুনীতিবালা ঘোষ (সম্পাদিকা) ৩৲। মিসেস্ প্রতিভা ব্রহ্মচারী (সহঃ সম্পাদিকা)—একটি এলার্মিং ঘড়ি। ডাক্তার সান্যাল ৫৲। মিসেস্ জ্যোৎস্না গুপ্তা ১৲ ও প্রসূতিতত্ত্ব বই একখানি। রায় শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহাদুর ৫৲ (জেনারেল সেক্রেটারী)। মিষ্টার খগেন্দ্রনাথ সেন ৫৲।

এই সভায় নিম্নলিখিতভাবে মেয়েদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা ধার্য্য হয়। সম্পাদিকার নবীনশশী মেমোরিয়াল মেডেল্—প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রথম পুরস্কার।

মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সুটকেশ ও প্রাথমিক প্রতিবিধান বই—দ্বিতীয় পুরস্কার।

সহকারী সম্পাদিকার ননীবালা মেমোরিয়াল্ মেডেল—সেলাইয়ের প্রথম পুরস্কার।

মিসেস জ্যোৎস্না গুপ্তার সেলাইয়ের বাক্স—দ্বিতীয় পুরস্কার।

মিসেস্ বীণাপাণি রায়ের মেডেল—উপস্থিতির জন্য ও ভাল হাতের-কাজের জন্য।

এতদ্ব্যতীত যে টাকা উঠিয়াছে তাহা হইতে যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদের উৎসাহের জন্য First-aid Book, Embroydary Book, উল; মুগা ও ডি, এম; সি সূতা, সেলাইয়ের কাঁটা প্রভৃতি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

মার্চ্চ মাস হইতেই সমিতির কার্য্য খুব ভালরূপ চলিতে থাকে এবং ছাত্রী-সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে ছাত্রী-সংখ্যা ২৬ জন; তন্মধ্যে দুইজন অবৈতনিক ভাবে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা লইয়া থাকেন।

টেষ্ট্ পরীক্ষায় ১২ জন মেয়ে সেলাই ও ৹ জন মেয়ে First-aid পরীক্ষা দেন এবং মিস্ বীণা ঘোষ সেলাইতে এবং শ্রীমতী প্রতিভা ব্রহ্মচারী ও মিসেস্ জ্যোৎস্না গুপ্তা First-aidএ প্রথম হন। মিস্ স্নেহলতা দেবী, মিসেস্ মালতী দত্ত ও মিস্ উমা দেবী সেলাইতে দ্বিতীয় এবং মিস্ সুহাসিনী সেন First-aidএ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ফাইনাল পরীক্ষায় সেলাইতে ১১ জন এবং First-aidএ ১০ জন মেয়ে উপস্থিত হন। মিসেস্ মালতী দত্ত সেলাইতে এবং শ্রীমতী প্রতিভা ব্রহ্মচারী First-aidএ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

বাৎসরিক অধিবেশন ও পারিতোষিক বিতরণ:—গত ২৬শে এপ্রিল রবিবার পুরস্কার বিতরণের দিন ঠিক হয় এবং মিসেস্ এ, কট্‌ল্, সি, বি, ই কে সমিতির পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং তিনি মেয়েদিগের হাতের কাজ এবং মহিলাসমিতি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। মিষ্টার ও মিসেস্ রবার্টসন্‌ও (ডিভিশনাল্ কমিশনার ও তাঁহার স্ত্রী) সমিতির মেয়েদের কাজ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই মহিলাসমিতির এই অল্প কালের ভেতর এইরূপ উন্নতি দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হন। মিস্ স্নেহলতা ও নিভাননীর হাতের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাঁহারা এজন্য পুরস্কারও পাইয়াছেন। মিস্ স্নেহলতা দেবী—বীণাপাণি মেডেল্ পাইয়াছেন।

বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও মহিলাগণকে সমিতির বিশেষ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ইঁহারা সমিতির উন্নতির জন্য মাসিক সাহায্য করিতেছেন।

মিষ্টার ও মিসেস্ খগেন্দ্রনাথ সেন ২৲। রায় শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহাদুর ১৲। মিসেস্ জ্যোৎস্না গুপ্তা ১৲। মিসেস্ বীণাপাণি রায় ১৲। মিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ১৲। মিষ্টার প্রমথনাথ সান্যাল ১৲। মিষ্টার রামরাখাল ঘোষ ॥৹।

এতদ্ব্যতীত ছাত্রীদের নিকট হইতে ৯৲।১০৲টাকা আদায় হয়। শুধু সেলাইয়ের টিচারকে মাসিক ১৩৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। অন্য সকলেই অবৈতনিক ভাবে পরিশ্রম করিয়া থাকেন জন্য যে টাকা আদায় হয় তাহা দ্বারাই সমিতির টিচারের বেতন ও সামান্য কাপড় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসের ব্যয় চলিয়া যায়। সমিতি হইতে দুইজনকে অবৈতনিক ভাবে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। ইণ্ডিয়ান রেড্ ক্রস সোসাইটী সমিতির ব্যবহারের জন্য একটি কোঠা ছাড়িয়া দিয়া সমিতির যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

যে স্বর্গীয়া দেবী এতদ্দেশে নারী-জাগরণের সৃজয়িত্রী, তাঁহার প্রতি মহিলাসমিতির পক্ষ হইতে আমার ঐকান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধা জানাইতেছি।

শ্রী সুনীতিবালা ঘোষ
সম্পাদিকা

কেন্দ্রসমিতির কথা

সীতাপুর মহিলাসমিতি

গত ১৪ই জুন হুগলী জেলার অন্তর্গত সীতাপুর গ্রামে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভানেত্রী এই সভায় নারীজাতির শিক্ষার সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা, সুখ ও শৃঙ্খলায় সংসার-পরিচালনার জন্য নারীর সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে একটি যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে জগতে নারীর স্থান, নারী-শিক্ষার আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাজবালা মহিলাসমিতির সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রাজবালা মিত্র মহাশয়ার চেষ্টা ও যত্নে সীতাপুরে এই মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতিটি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রসমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বেহালা মহিলাসমিতি

গত ২০শে জুন ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বেহালা, বরিশা এবং শাহাপুরের লোকদের উদ্যোগে বেহালায় শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ মুখার্জ্জির বাটীর প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের একটি সভা হয়। প্রায় ৩০০ শত মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সর্ব্বপ্রথমে একটি সঙ্গীত ও আবৃত্তি হইলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বেহালার মাননীয় ডাক্তার আই, বি, ঘোষাল এম-বি ভারতে নারীজাতির অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা করেন এবং বলেন যে বর্ত্তমানে নারীজাতি যদি সাময়িক অবস্থার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিতে না পারেন, তবে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ মহিলাসমিতিতে কুটীরশিল্পের প্রবর্ত্তন বিষয়ে আলোক-চিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন। ডাক্তার ঘোষালের প্রস্তাব অনুযায়ী এই স্থানে একটি মহিলাসমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বেহালা হরিসভার নিকটে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ব্যানার্জ্জির গৃহে এই সভার অধিবেশন হইবে।

মধুপুর মহিলাসমিতি

গত ২৫শে জুন তপনিকা মহিলাসমিতির উদ্যোগে মধুপুরে স্থানীয় মার্ব্বেল-হলে পুরুষ ও মহিলাদের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। মধুপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নারীমঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য, উৎপত্তি এবং কর্ম্মধারার সবিশেষ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নারীমঙ্গল সমিতি বহু দুঃস্থা বিধবাকে শিল্প শিক্ষা দান করিয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতেছেন, ইহা অতীব আশার কথা। তপনিকা মহিলাসমিতির সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শকুন্তলা বসু সমিতির যে ক্ষুদ্র বিবরণী উপস্থিত করেন তাহা পাঠ করেন। তৎপরে সরোজনলিনী সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে মহিলাসমিতির কার্য্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তপনিকা মহিলাসমিতি একটি বালিকাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বয়ং সম্পাদিকা ঐ বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন।

হাওড়া জেলা মহিলাসমিতি

কিছুদিন হইল হাওড়ায় কয়েকজন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা-দের চেষ্টায় একটি জেলা মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জেলা-সমিতি হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে মহিলাসমিতির কার্য্যে উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে পারিবেন। গত ১২ই জুলাই সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন স্থানীয় লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে বহু স্থানীয় মহিলারা উৎসাহিত হইয়াছেন।

শ্রীরামপুর মহিলাসমিতি পরিদর্শন

গত ১১ই জুলাই সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ হুগলীর শ্রীরামপুর মহকুমায় 'শ্রীরামপুর মহিলাসমিতি' পরিদর্শন করেন। বর্ত্তমানে একজন শিক্ষয়িত্রী এই সমিতিতে শিল্প শিক্ষা দিতেছেন।

ভদ্রকালী মহিলাসমিতি

গত ২৭শে জুন শনিবার সন্ধ্যাকালে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রকালী মহিলাসমিতির উদ্যোগে ভদ্রকালী ব্রহ্মচর্য্য বালিকাবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট মহিলা সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সর্ব্বপ্রথমে আশ্রমের মহিলারা একটি সঙ্গীত করিলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় মহিলাদিগকে নারীমঙ্গল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

শিবগঞ্জ মহিলাসমিতি

গত ১৭ই মে শিবগঞ্জ মহিলাসমিতির সম্পাদিকার বিশেষ নিমন্ত্রণে কেন্দ্রসমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী শিবগঞ্জে গমন করেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মাইতির বাড়ীতে পুরুষ ও মহিলাদের একটি সভা হয়। পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে শিশুমঙ্গল ও প্রসূতিপরিচর্য্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু-লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিল।

গত ১৯শে মে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মাইতির বাড়ীতে আর একটি সভা হয়। পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে সমাজ-সেবায় মহিলাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু মহিলা এই সভায় যোগদান করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণপুরে নূতন মহিলাসমিতি

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীনারায়ণপুরে একটি নূতন মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমিতিটি সুগঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায় বি-এ

শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায় বি-এ গত দুইবৎসর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্টা কর্ম্মীরূপে ইহার পরিচালনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উচ্চতর বিষয় অধ্যয়নের জন্য সমিতির কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার বিদায়-গ্রহণের প্রাক্কালে সরোজনলিনী নারী শিল্প শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণ একটি অভিনন্দন প্রদান করেন।

মাণিকগঞ্জে মহিলামঙ্গল উৎসব

ঢাকার অন্তর্গত বেতিলা হইতে শ্রীমতী অমিয়া দেবী জানাইতেছেন—গত ২৬।২৭শে মার্চ্চ মাণিকগঞ্জ মহিলাসমিতির উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য- ও শিল্প-প্রদর্শনী ও আনন্দ-মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানীয় বিরাট "সারস্বত ভবনে" প্রায় ২০০ শত মহিলার সমাগম হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী 'মা ও জাতি' বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বালিকাদিগের আবৃত্তি ও হস্তশিল্পের কার্য্যে সমাগত সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। আনন্দ-মেলাতে কেবল মহিলারাই দোকানী ও ক্রেতা ছিলেন। নানাবিধ মিষ্টান্ন,চাটনী,আচার প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছিল। গত ২রা জুলাই চরকা-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত ললিত মৈত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুনীতি আধঘণ্টাতে ৯৯ গজ সূতা কাটিয়াছেন। শ্রীমতী সুনীতি মহিলাসমিতির মেডেল ও স্যর পি, সি, রায়ের প্রদত্ত কাপ পুরস্কার পাইয়াছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস্, কে, চাটার্জ্জী আই-সি-এস্ মহাশয় ও মাণিক-গঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতি বেশ কাজ করিতেছে। মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই সমিতির দিনদিন উন্নতির কারণ। দাসরা, মত্ত ও বেতিলা মহিলাসমিতির সভ্যাগণও এই সকল

উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। মহিলাসমিতির মেয়েদের মধ্যে নূতন সাড়া জাগিয়াছে।

জনহিতকর কার্য্যে যশোহর নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্য

স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের সাহায্যকল্পে যশোহর সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সভ্যাগণ রিজিয়া নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।

সহরের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ অভিনয় দর্শন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ৫০০৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। সংগৃহীত টাকার অধিকাংশ বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই অর্থের কিয়দংশ দ্বারা মহিলাসমিতি ও বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অভিনয়ের প্রারম্ভে শ্রীমতী শান্তিলতা ও শ্রীমতী গৌরী দ্বারা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রচিত "হে নারী তোমার গৃহের দ্বারে" সঙ্গীতটি নৃত্যসহযোগে গীত হইয়াছিল। বালিকাদ্বয়ের নৃত্যের সহজ সুন্দর ভঙ্গিমা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

মহিলাসমিতির অন্যতমা সভ্যা শ্রীমতী প্রীতিলতা 'গণ' রিজিয়ার ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অপরাপর অংশে শ্রীমতী অনিলা দেবী বক্তিয়ার, শ্রীমতী ননীবালা চৌধুরী ইন্দিরা, শ্রীমতী শান্তিলতা ঘাতকের ভূমিকায় দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অভিনয়-রজনীতে ডাঃ ধর, ডাঃ সেন, বাবু নলিনীকান্ত মজুমদার, ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ, ভলাণ্টিয়ারগণ এবং কয়েকজন মহিলা বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সর্ব্বোপরি মহিলাসমিতির যে সকল সভ্যা অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা অভিনয়কে সাফল্য দান করিয়া এই সদনুষ্ঠানে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আন্তরিক ধন্যবাদের যোগ্য।

দিনের কিছু অংশ

সৌন্দর্য্য চর্চ্চায় কাটান সকলেরই কর্ত্তব্য·
কারণ রূপ যদিও সকলের ভাগ্যে ঘটে না
তথাপি যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা যেমন
তেমন চেহারাও দশের আকর্ষণ
যোগ্য করে তোলা যায়

রূপ ও সৌন্দর্য্যের জন্য
চিরপ্রসিদ্ধ ও অতুলনীয় প্রসাধন

হিমানী স্নো

ও

রমণীর স্বভাব কোমল অঙ্গে ব্যবহার যোগ্য

হিমানী সাবান

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

সোল এজেন্টস :—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

সাবান ও সুরভি প্রস্তুতকারক
হিমানী ওয়ার্কস্
কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

প্রেম ও প্রাণ

শিল্পী—শ্রী: প্রকৃতি দেবী

PRINTED BY C. H. ARAN & CO., CALCUTTA

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৮ [দশম সংখ্যা

আবাহনী

আমার হিয়ার মাঝে এস প্রভু
আপ্‌নি কথা হ'য়ে,
সকল কথা শেষ হ'য়ে যাক্
তোমার কথা ক'য়ে।

অঙ্গে আমার এস হ'য়ে
তরুণ-অরুণ-রেখা,
যে দিক্ পানে তাকাই আমি
মিলুক্ তোমার দেখা ;
সকল ঘরে ঘর বেঁধে রই
তোমায় ঘরে ল'য়ে।

রক্তে আমার রঙ দিয়ে যাক্
তোমার রূপের চিনা,
হৃদয়-রাগে সুর দিয়ে যাক্
তোমার হাতের বীণা।

তোমার কথায় এ দেহ-মন
উঠুক ভরে' হোক্ সচেতন,
আনন্দ আজ বক্ষ জুড়ে'
বাজুক র'য়ে র'য়ে ।
এস আপনি কথা হ'য়ে !

পৌরুষ

শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু সাহিত্যরত্ন, বি-এ

মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে বলিয়াছেন, "হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই-বর্ণনার তেমন প্রয়োজন দেখি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে শিখাও।"

এ রচনা রবীন্দ্রনাথের পুরাতন; কিন্তু পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া বাঙ্গালীকে ইহা শুনাইবার সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে শিখাইবার মত রচনা দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। বড় দুঃখেই তাই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছিলেন, "আবার তোরা মানুষ হ!" বাঙ্গালীকে মানুষ হইবার মত উদ্দীপনা অধুনা কোন্ রচনায় পাওয়া যায়? জোছনার কবিতা, হা-হুতাশ, হৃদয় হারিয়ে ফেলার গান, খুঁজিলে সকল শ্রেণীর গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে হাজার হাজার পাওয়া যায়, পূতিগন্ধময় যৌন সম্বন্ধকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়া nature paint করার শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যায়, অসভ্য অশ্লীল নগ্নতাকে প্রকৃত art বলিয়া প্রচার করিবার প্রচেষ্টার বহু পরিচয় পাওয়া যায়,—কিন্তু সাহিত্যে কাব্যে শিল্পে পৌরুষ বা মনুষ্যত্বের বিকাশ কয়টি দেখিতে পাওয়া যায়? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে যাহার শুভ্র তুষার-ললাটে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প হয়।" এই মহান্ চরিত্রের সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ আধুনিক সাহিত্যে বা সমাজে কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? রবীন্দ্রনাথ 'লড়াই' চাহেন না, অথচ স্বয়ং বলিয়াছেন, "প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে," "চিরদিন প্রতাপ, চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।" রবীন্দ্রনাথের শিখ-গুরু, নকড়গড়, শিবাজী প্রভৃতি যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, তিনি পৌরুষের কিরূপ ভক্ত।

বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে শিখাইবার যুগ কি সত্যই অন্তর্হিত হইতে চলিল? শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালাকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, বাঙ্গালীকে প্রেমের বন্ধনে এক করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যানুশিষ্যগণের হস্তে পড়িয়া বিকৃত শিক্ষায় পরিণত হইয়াছিল। মৃদঙ্গ করতাল, কণ্ঠী তুলসীমালার ঘটা প্রেমের ও একতার স্থান অধিকার করিল মানুষ প্রেম ও 'জীবে দয়া'কে পৌরুষের অন্তরায় বলিয়া ধরিয়া লইতে শিখিল। অথচ শ্রীচৈতন্য কোথাও মানুষকে অপৌরুষ প্রদর্শন করিতে—কাপুরুষ হইতে বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। 'মার খেয়ে দয়া করা'র অর্থ কাপুরুষতা নহে। বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভারতের অহিংসা-মন্ত্রের আধুনিক গুরু মহাত্মা গান্ধীও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "অহিংসা অর্থে কাপুরুষতা নহে। যেখানে মানুষের আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্ষুণ্ণ হইবে, সেখানে মানুষ শক্তিবিকাশ দ্বারা তাহার প্রতীকার-ব্যবস্থা করিবে।" শক্তি অর্থে আত্মিক শক্তিও বুঝায়, উহা দৈহিক শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ-সে শক্তির প্রয়োগে যে পৌরুষের, যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন হয়, রণস্থলে শস্ত্রসাহায্যে শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধে বুঝি-বা তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী মুক্তির কথা, স্বরাজের কথা কহিতেছে, তাহার সাহিত্যে কাব্যে শিল্পে সর্ব্বত্রই এই কথার আভাস পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু আত্মসম্মান-জ্ঞান আহত হইলে বাঙ্গালীর পৌরুষ বা মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে, এমন পরিচয় বাঙ্গালীর বাস্তব অথবা কাল্পনিক (সাহিত্যে) জীবনে কয়টি পাওয়া যায়?

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ফোঁস করিও, কামড়াইও না।" অর্থাৎ হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের শত্রুতা করিও না, কিন্তু তাহা বলিয়া যে তোমার

আত্মসম্মান-জ্ঞান আহত করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে ভয় দেখাইয় নিবৃত্ত করিতে ছাড়িও না। এই ফোঁস করিবার প্রবৃত্তিও কি বাঙ্গালী হারাইতেছে? তাহার সাহিত্যে মিহি সুরে কথা কহা, মিহি কেশ বেশ প্রসাধন করা. মিহি বিলাসের (প্রেম নহে—প্রেমের ভাণ) বৈধ অবৈধ মনস্তত্ত্বের বিকাশ করা আছে, কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমের অথবা পৌরুষ ও বীরত্বের উন্মাদনা বিরল।

পাবনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী উৎপীড়িত বিপর্য্যস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, তিনি সেখানে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। তাঁহার বর্ণনা এইরূপ:—'যে কয়খানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। হিন্দু গৃহস্থের গৃহের অঙ্গনে পদার্পণ করিয়া দেখিয়াছি, দাওয়ার উপর তিনচারি মূর্ত্তি উপবিষ্ট, প্রত্যেকের কণ্ঠে তিনপুরু তুলসীমালা, নাসিকা কপাল ও কণ্ঠে তিলকসেবা —আর চালের বাতায় গোঁজা দুই তিন জোড়া করতাল ও খোল। জিজ্ঞাসা করিয়াছি.—তোমরা দলে যতই অল্প হও, কিন্তু সকলে মিলিয়া আত্মসম্মান, মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিলে না কেন? না হয় মরিতে! জবাব পাইয়াছি, 'সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা!' ক্রোধে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়া দিয়াছেন যে, দুর্ব্বৃত্ত তোমাদের নারীর ইজ্জৎ হানি করিলেও নীরবে সহ্য করিবে? তোমাদের জোরু গরু অপহৃত বা ধর্ষিত হইলেও নির্ব্বিকার-চিত্তে ঘরে বসিয়া খোল করতাল বাজাইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিবে? শ্রীকৃষ্ণ ত প্রাণের সখা অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধই করিতে বলিয়াছিলেন। আমার এই কথায় তাহারা 'গোবিন্দ দয়া কর'—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল!"

বাঙ্গালী হিন্দুর এ মনোবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? সাহিত্য জাতির জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সকলেই জানেন। একেই ত cultural conquest দ্বারা বাঙ্গালী বহুদিন প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবার পর দাসমনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; তাহার উপর যদি বাঙ্গালী আপনার সাহিত্যের মধ্য মহান্ আদর্শ ফুটাইবার চষ্টা না করিয়া কেবল মধ্যম ও অধম শ্রেণীর চিন্তা ও চরিত্রের বিকাশ করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ভাব ও চিন্তার ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে? দুই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলেও অধিকাংশই ত পৌরুষের পূজা করে না। মিহি ভাষা, মিহি ভাব, মিহি চরিত্র,—ইহাই যেন সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িতেছে—বড় বা মহানের আদর্শ কোথাও ক্কচিৎ পাওয়া যায়।

মহাকাব্য হিসাবে মেঘনাদবধ যাহাই হউক, সে আলোচনা করিব না, মাত্র এইটুকু এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বলিব, ইহার মধ্যে যে পৌরুষের ভাষা ও চিত্র পাওয়া যায়, তাহার তুলনা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আছে কি? বীরাঙ্গনা প্রমীলার মুখে "কি কহিলি বাসন্তি! পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী, কার সাধ্য রোধে তার গতি?" অথবা বীরশ্রেষ্ঠ লঙ্কেশ্বরের মুখে "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে হে প্রচেতঃ! হা ধিক! এ কি সাজে তোমারে, ওহে জলদলপতি!" অথবা "উঠ বলি! বীরবলে ভাঙ্গি এ জাঙ্গাল—" ইত্যাদি পদের অনুরূপ ভাষা অধুনা কোথায় খুঁজিয়া পাইব!

অমর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবানন্দ প্রতাপে, প্রফুল্ল শান্তিতে বাঙ্গালী যে মহান্ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল, আজ তাহা মিহি যৌন-মনস্তত্ত্বের ও মিহি ঠুন্ ঠুনে ভাষার আবিল বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে, সে এখন আর বাঙ্গালী কমলাকান্তের দুর্গোৎসব দেখিতে পায় না। সে ভাষার ও ভাবের ঝঙ্কার, সে প্রাণোন্মাদকর দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি, সে পৌরুষের আকুলি-বিকুলি বাঙ্গালী হারাইতে বসিয়াছে।—"দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত-মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি!" অথবা, "শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী—অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি

দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি!" এ ভাষার—এ ভাবের কি তুলনা আছে? বঙ্কিমচন্দ্রের অমর 'বন্দেমাতরম্'—গান নহে, মন্ত্র। উহার তুলনা জগতের কোন ভাষায় নাই। কথার মারপেঁচে ভাব লুকাইয়া রাখার প্রবৃত্তি ইহাতে নাই, ইহা সহজ সরল প্রাণের কথা! এ যেন কবি চণ্ডীদাসের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ'। খাঁটি বাঙ্গালীর খাঁটি প্রাণের ভাষা!

বাঙ্গালীর প্রাণে পৌরুষের উদ্দীপনা জাগাইবার এমন ভাষা ও ভাব হেমচন্দ্রে নবীনচন্দ্রে ও রঙ্গলালে পাই। "বাজ্‌রে বীণা বাজ্ এই রবে," অথবা "কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ",—এ সব প্রাণস্পন্দনের ভাষা বাঙ্গালীকে এখন কয়জন শুনাইয়া থাকেন? গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালে বুঝি ইহার উৎস নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

বর্ত্তমানে একটা কথা উঠিয়াছে, নারীর অধিকার ও সম্মান। এখনকার যুগে নাকি পুরুষ নারীকে এই দুইটি দিক হইতে তাঁহার প্রাপ্য যত অধিক পরিমাণে দান করিতেছে, এবং নারীও যে পরিমাণে উহা আদায় করিয়া লইতেছেন, তাহাতে পুরুষের পৌরুষ যে ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে তাহা কখনও সম্ভব হয় নাই। ইহা কি সত্য? আর্য্যসাহিত্য ও পুরাণেতিহাস ত তাহা বলে না। রামায়ণের সীতা অথবা মহাভারতের সাবিত্রী দ্রৌপদী কুন্তী গান্ধারী ও দময়ন্তীর চরিত্র মহাকবিরা যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই, তেমন মহীয়সী নারীচরিত্র বর্ত্তমানেও প্রতীচ্যের সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, "সীতা আকাশ-পবিত্র-চরিতা, নক্ষত্রের মত ভাস্বরা, শেফালিকার মত সুন্দরী, যূথিকার মত নম্রা, জগতে অতুলনীয়া!" তাহার উপর সীতা রামময়জীবিতা। অথচ যখন রামচন্দ্র বনবাসের আদেশ পাইয়া স্বয়ং বনবাসগমনে উদ্যোগী হইলেন এবং সীতাকে সঙ্গে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, তখন এই সীতাই স্বামী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"আমার পিতা বুঝিতে ছিলেন না, হইলে তিনি যে একজন কাপুরুষের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেন!" অর্থাৎ রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজপুত্র হইয়াও বিপদসঙ্কুল গহনবনে পত্নীকে লইয়া যাইতে সাহস করিতেছেন না, ইহাতে তাঁহার কাপুরুষতা অনুসূচিত হইতেছে,—সীতা ইঙ্গিতে তাঁহাকে তাহা জানাইয়া দিলেন।

মহিমময়ী আর্য্যমহিলার যোগ্য কথাই বটে! আর্য্যবংশোদ্ভূত রামচন্দ্র পত্নীর যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহাকে "দেবি!" "আর্য্যে!" "বৈদেহি!" "মৈথিলি!" প্রভৃতি সম্মানজ্ঞাপক সম্বোধন করিতেন। পত্নীর মুখে এমন কঠোর কথা শুনিয়াও তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "দেবি! আমি তোমার মন পরীক্ষা করিতেছিলাম, নতুবা গহনবনেই কি, বা জনপদের মধ্যেই কি, সর্ব্বত্রই তোমাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার আছে।" কর্ত্তব্যবোধে প্রাণসমা পত্নীকে বনবাস দিয়াও রাজা রামচন্দ্র সহধর্ম্মিণী ব্যতীত যজ্ঞ অসমাপ্ত রহিয়া যায় দেখিয়া স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করাইয়া সিংহাসনে আপনার পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। নারীর প্রতি এই সম্মান এবং নারীর ন্যায্য অধিকার তখনকার যুগে এইভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সাবিত্রী, দ্রৌপদী প্রভৃতির নারীদের মর্য্যাদা ও অধিকারজ্ঞানের কথা পুরাণবিদ্‌গণ সম্যক অবগত আছেন।

মধ্যযুগের কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রতি আসক্ত হইলেও রাজান্তঃপুরের মহিষীদের প্রাপ্য সম্মানদানে কার্পণ্য করেন নাই, বরং একস্থানে তিনি রাজমহিষীর ভয়ে শকুন্তলার চিত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; পরন্তু অপর এক স্থানে বয়স্য মাধব্য পাছে রাজান্তঃপুরে শকুন্তলার কথা বলিয়া ফেলে এই ভয়ে উহা অলীক উপাখ্যান বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র সীতাকে 'দেবি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ইহা বহুস্থলেই দেখা যায়। পরন্তু সীতা যখন যেটি করিতে বলিতেছেন, তখনই রামচন্দ্র বলিতেছেন, 'দেবি! আজ্ঞাপয়।' ভবভূতির সময়ে আর্য্যসভ্যতা যে নারীকে দেবীর আসন প্রদান করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, ঋষি অষ্টাবক্রকে যখন সীতা বলিয়াছিলেন, "নমস্তে অপি কুশলং মে সকল গুরুজনস্য আর্য্যায়াশ্চ শান্তায়াঃ," তখন ঋষি

অষ্টাবক্রও তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন দেবী-সম্ভাষণ করিয়া, যথা, -"দেবি! ভগবান বশিষ্ঠস্বামাহ" ইত্যাদি।

এ সকল মধ্যযুগের কথা। কিন্তু আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি আর্য্যসভ্যতার প্রথম উষোদয়কালে সীতা-চরিত্রে অভিমানিনী আত্মসম্মানগর্ব্বিতা স্বাধিকারাভিজ্ঞা যে নারী-চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগে প্রাচ্য বা প্রতীচ্যে কেহ পারিয়াছেন কি? শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ ও লঙ্কাজয়ের পর যখন সীতাকে লোকাপবাদ ভয়ে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন মহর্ষি বাল্মীকি সীতার মুখে যে কথা কয়টি দিয়াছেন, তাহাতে আর্য্যনারী সভ্যতার প্রথম যুগেও কি প্রকৃতির ছিলেন, তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যায়। রামময় জীবিতা সীতা রামকেই 'প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব', 'লঘুনেব মনুষ্যেন', অর্থাৎ নীচ স্ত্রীলোকের প্রতি নীচ লোক যেমন ব্যবহার করে, তুমি আমার প্রতি তেমন ব্যবহার করিতেছ, —এই অনুযোগ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। রামচন্দ্রও তিরস্কৃত হইয়াও নারীর যোগ্য সম্মানদানে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। বীরত্ব বা পৌরুষের প্রকাশ এমন কত ক্ষেত্রেই না হইয়াছে! প্রতীচ্যের Chivalry কি ইহাকেও অতিক্রম করিয়া যায়?

মহাকবি সেক্সপিয়ারের Henry V. নাটকে নায়ক হেনরিকে যখন তাঁহার আত্মীয় সেনানী বলিতেছেন, আরও ইংরাজ সেনা আনিলে ফরাসীর বিপক্ষে অনায়াসে রণজয় হইত, তখন হেনরি বলিতেছেন,—

No, my fair cousin,
If we are marked to die,
We are enough to do our country loss etc.

এই পদটি জগতে স্মরণীয় হইয়া গিয়াছে, দেশপ্রেম, পৌরুষ ও বীরত্বাভিমানের অভিব্যঞ্জক এমন পদ জগতের সাহিত্যে বিরল। স্বাধীন জাতির সাহিত্যে এমন উদ্দীপনা-মূলক রচনা স্বাভাবিক। সেক্সপিয়ার অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

This England never did, nor ever shall
Lie at the proud feet of a Conqueror.

আমাদের রঙ্গলাল গাহিয়াছেন, —

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে— ।

ইহাও উদ্দীপনাময়ী রচনা; কিন্তু ইহাতে পরাধীন জাতির অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সেক্সপিয়ারের মত স্বাধীন জাতির গর্ব্ব, মান, বীর-অহঙ্কারের অভিব্যক্তি নাই। কিন্তু তাহা হইলেও রঙ্গলালের রচনায় যে পৌরুষ স্বপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাও ত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্ল্লভ।

সাহিত্যের এই দৈন্য আমাদের অশনে বসনে চাল-চলনেও দেখা দিয়াছে। আমাদের যাহারা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সেই তরুণরা এখন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের মত আহার করিতে পারে না। যে অধিক আহার করে, তাহাকে সকলে 'রাক্ষস' বলে, কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করে; এখন স্বল্পাহারীরা ভদ্রলোক, 'পাঁচ সেরী' 'দশ সেরী' এখন গল্প-কথা, 'আধ মণি' কৈলাস ত এখন মিথ্যাবাদীর কল্পনা! মিহি চুল ছাঁটা, মিহি ধুতি পরিধান পরা, মিহি গোঁফ রাখা, মিহি সুরে কথা কওয়া, মিহি ঢঙ্গে চলাফেরা,—এ সব যেন তরুণদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটা ভাত মোটা কাপড় এখন 'ছোটলোকের' মধ্যে সীমাবদ্ধ। তানপুরার স্থান হারমোনিয়াম গ্রহণ করিয়াছে, নগর-সঙ্কীর্ত্তন এখন কনসার্টে বা ষ্টিংব্যাণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

একটা সুলক্ষণ,—বিদেশীর অনুকরণ হইলেও আমাদের তরুণদের Sportingএ বিশেষ ঝোঁক হইয়াছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সুইমিং, বক্সিং, জিজুৎসু প্রভৃতিতে আমাদের তরুণরা সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিতেছে। কিন্তু এ সব বিদেশী খেলা ব্যয়বহুল, উহাতে পরিশ্রমের অনুরূপ আহার্য্য যোগান দেওয়া সাধারণ বাঙ্গালী অভিভাবকের পক্ষে কষ্টকর। শরীরের গঠন খেলার অনুপাতে গড়িয়া না উঠিলে সাহস ও পৌরুষের অভাব সঞ্জাত হইবেই। এ দৈন্য দূর হইবে কিরূপে? বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে শক্তি ও পৌরুষের খেলা দেখাইতে কয়জন সমর্থ? এখনও বাঙ্গালীকে জাতি তুলিয়া গালি পাড়িলে কয়জন বাঙ্গালীর আত্মসম্মান সিংহবিক্রমে গর্জ্জিয়া উঠে?

ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা এখন বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনেও প্রবেশ করিয়াছে,—এখানেও বাঙ্গালীর পৌরুষের অভাব। বাঙ্গালীর সে বিরাট হৃদয়ের পরিচয় কৈ? একটা রাসবিহারী বা একটা টি, পালিতে সারা বাঙ্গালার হৃদয়-

স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে পূর্ব্বে অন্নসত্র, জলসত্র, বৃক্ষরোপণ, কূপ-তড়াগ খনন, কথকতা, রামায়ণ গান, যাত্রা, চণ্ডীর গান, সদাব্রত, মুষ্টিভিক্ষা দান প্রভৃতি যে সকল সদনুষ্ঠান ছিল, এখন তাহা কোথায় গেল ? জাতির ইহাই ছিল পৌরুষ, – Chivalry.

বিরাট হৃদয়ের Chivalry বা পৌরুষ ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'কে বেড়িয়া, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের Selfishness হইতেছে আপনাকে ও আপনার জনকে বেড়িয়া। তাও দেখা যায়, আপনার জনকে আপনার স্বার্থের জন্য বলি দেওয়া হয়। এখনকার বাঙ্গালী তরুণ 'টি-সপ্', 'হোটেল', বা 'রেস্তোরাঁ'য় গিয়া আপনি একখানা চপ বা একখানা কাট্‌লেট আর এককাপ্ চা খাইয়া আসে পাছে গৃহে পুত্র-কন্যা ভাগ বসায়! অতীতের পূর্ব্বপুরুষ গৃহে একটা রুই বা একটা কাত্‌লা আনিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে একসঙ্গে বণ্টন করিয়া দিয়া আপনিও (যদি পাইত) একটুকরা অংশ গ্রহণ করিত। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের পৌরুষের অভাব চারিদিকেই।

কিন্তু সুদিনের উদয় হইয়াছে। দেশে যে ভাবের বন্যা আসিয়াছে,—যে ত্যাগ, যে কষ্টবিপদসহনক্ষমতা দেখা দিয়াছে, এখন তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আমাদের তরুণরা অসাধ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিতেছে,—গভীর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য বাঙ্গালী তরুণ পদব্রজে অতিক্রম করিতেছে অথবা সাইকেলে পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইতেছে, দুই তিন দিন জলে ভাসিয়া endurance বা সহন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা দেশসেবিকারূপে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেশসেবার অংশ গ্রহণ করিতেছেন। —সুখের কথা, এই আব্‌হাওয়ায় বাঙ্গালার দুই চারিটি কৃতী সন্তান বাঙ্গালীর পৌরুষের ইতিহাস হইতে দুই এক পৃষ্ঠা আবার বাঙ্গালীর সম্মুখে উপহার দিতেছেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয় 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে যে রায়বেঁশের ইতিহাস দিতেছেন, তাহা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনই বাঙ্গালীর শৌর্য্যের ইতিহাস-রূপে সময়োপযোগী হইয়াছে। এই প্রকৃতির রচনা সমাজের মঙ্গলকর। এ শুভ-সন্ধিক্ষণে, বাঙ্গালী ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে আবার তাহার সাহিত্যে শিল্পে পৌরুষ দেখা দিবে,—বাঙ্গালী জীবন্ত জাতিরূপে জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালার আকাশ বাতাসে আশার উষোদয় হইতেছে ; ভাবনার কারণ কি ? চাই কেবল হৃদয়টাকে বড় করা!

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মহিলা-কবি

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীনকালে মেয়েরা কিরূপ কবি ছিলেন, ইহা জানিতে আমাদের একটা আনন্দ হয়। কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা তাঁহাদের নাটকাদিতে মেয়েদের দ্বারা কবিতা রচনা করাইয়াছেন—কখনও সংস্কৃত ভাষায় আবার কখনও বা প্রাকৃত ভাষায়। কবিতা-রচনা তখনকার কালের মেয়েদের বেশ একটি রীতি ছিল বোঝা যায়। ইদানীং সংস্কৃত-বিদুষীর সংখ্যা বিরল হইতেছে। পণ্ডিতা রমা বাঈ যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি বিরাট পণ্ডিত-সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের মুখপাত্ররূপে, মহামহোপাধ্যায় কবি ৺অজিতনাথ ন্যায়-রত্ন মহাশয় অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে পণ্ডিতাজী সংস্কৃত ভাষায় এক বিপুল সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি উপস্থিত সভাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, যে-কোন ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইহাতে বঙ্গের তাবৎ পণ্ডিতমণ্ডলী

বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। বোধ হয় আপনারা অনেকেই কবিরত্ন জ্ঞানসুন্দরীর নাম শুনেন নাই। ইনি দাক্ষিণাত্যে 'কুম্ভকোণ' নগরে বাস করেন। ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীমতী মহারাণী ইঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, 'কবিরত্ন'—এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত প্রায় ৪০ খানি গ্রন্থ আছে।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামিজীর স্থাপিত চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমে বিদুষী শ্রীমতী বাসন্তী বেদান্ততীর্থ, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ও শ্রীমতী যোগেশ্বরী প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণীগণ অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে ও কথাবার্তা বলিতে পারেন ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। ১০।১২ বৎসরের মেয়েরা সংস্কৃত বলতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা সে স্থানে মাতৃভাষার ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। শ্রীমতী যোগেশ্বরীকে 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি দান কালে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমি এতদিন মাটির সরস্বতীই দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু আজ জীবন্ত সরস্বতী দেখিলাম।" যোগেশ্বরীর বয়স তখন ১৩ বৎসর। যাঁহারা সত্যভূষণ শ্রীমৎ ধরণীধর শর্ম্মা এই অপ্রচলিত নামে 'ভারতবর্ষ' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে স্ত্রী-শূদ্রের প্রণবাধিকার বিষয়ক চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারাও উক্ত বাসন্তী বেদান্ততীর্থের নাম শুনিয়াছেন। ইদানীং কলিকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষাতে মেয়েদের উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া আবার আমরা সংস্কৃত-বিদুষী ও কবি পাইব ভাবিয়া আনন্দিত হই।

বেদের ৫ম মণ্ডলে 'বিশ্ববারা' মেয়েটি যে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা ১৮ সূক্তে আমরা দেখিতে পাই। অথচ বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোকের বেদাধিকার শাস্ত্রবিগর্হিত বলেন। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যে দেখিতে পাই, বিদুষী গার্গীকে ঋষিরা সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আসুন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে গার্গি! আসুন।" বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী কিরূপভাবে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। 'শঙ্কর দিগ্‌বিজয়' পাঠে জানা যায়, মণ্ডনমিশ্রের সহিত মিথিলায় ৺শঙ্করাচার্য্য বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, উক্ত মিশ্র ঠাকুরের সমস্ত শাস্ত্রে পণ্ডিতা স্ত্রী 'শারদা' ঐ বিচারের সদস্যতা করেন। বাঙ্গালায় রঘুনন্দন যখন স্মৃতিশাস্ত্র-সংস্কার করেন, তখন তিনি "লক্ষ্মীবাক্য" এইরূপ কথা "মিতাক্ষরা" নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। "মিতাক্ষরা" নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের টীকা করেন একটি মহিলা—নাম লক্ষ্মীদেবী। ইনি মিথিলার মহারাজ চন্দ্রসিংহের স্ত্রী।

ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যদি জল্‌হণের—"সূক্তিমুক্তাবলী", শাঙ্গধরের—"শাঙ্গধরপদ্ধতি", বল্লভদেবের—"সুভাষিতাবলী", শ্রীধরের—"সদুক্তিকর্ণামৃত" প্রভৃতি লুপ্ত হইয়া যাইত তবে আজ আমরা অনেক মহিলা-কবির নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিতাম না। হয় ত তাঁহাদের রচিত কবিতা পুরুষের রচনা বলিয়া বুঝিতাম। আপনারা সকলেই অলঙ্কার শাস্ত্রের নাম শুনিয়াছেন। ভারতে এখন যে কয়েকখানি অলঙ্কার শাস্ত্র আছে তন্মধ্যে দণ্ডীর "কাব্যাদর্শ", মম্মট ভট্টের "কাব্যপ্রকাশ" ও বিশ্বনাথের "সাহিত্যদর্পণ" প্রধান। প্রথম দুইখানি অপেক্ষা তৃতীয়খানি আধুনিক। এবং তাহাই এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত আছে। দণ্ডী অনুমান ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। দণ্ডীর "কাব্যাদর্শে" মহিলা- কবিদের উদাহরণ অপেক্ষা শেষোক্ত দুইখানি অলঙ্কার-গ্রন্থে মহিলা-কবিদের অধিক উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। ইহা বড়ই গৌরবের বিষয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মম্মট ভট্ট তাঁহার বিখ্যাত অলঙ্কার শাস্ত্র "কাব্যপ্রকাশ" প্রণয়ন করেন। এই কাব্যপ্রকাশে মহিলা-কবি শীলা ভট্টারিকা প্রভৃতির কবিতা উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। জৈন রাজশেখর সূরি তাঁহার গ্রন্থ 'প্রবন্ধকোষে' শীলা ভট্টারিকার কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। রাজশেখর ১৩৪০ অব্দে জীবিত ছিলেন। ভোজরাজ ১০৯২ শতাব্দীতে দেহত্যাগ করেন। পূর্ব্বোক্ত 'কাব্যপ্রকাশে' একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যাহার প্রথমার্দ্ধ রচনা করেন ভোজরাজ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ রচনা করেন শীলা ভট্টারিকা। এইকথা সত্য হইলে, শীলা ভট্টারিকা ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিতা ছিলেন।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি বলেন :—

"শীলা-বিজ্জা-মারুলা-মোরিকাদ্যাঃ
কাব্যং কর্ত্তুং সন্তি বিজ্ঞাঃ স্ত্রিয়োঽপি।"

অর্থাৎ ১। শীলা ভট্টারিকা, ২। বিজ্জকা, ৩। মারুলা, ৪। মোরিকা প্রভৃতি—অর্থাৎ—৫। সুভদ্রা, ৬। বিকটনিতম্বা, ৭। ফল্গুহস্তিনী, ৮। প্রভুদেবী, ৯। বিজয়াঙ্কা, ১০। সীতা, ১১। অবন্তীসুন্দরী, ১২। চণ্ডালবিদ্যা, ১৩। ভাবদেবী, ১৪। সাটোপা, ১৫। ব্যাসপদা, ১৬। ইন্দুলেখা; ইঁহারা স্ত্রীলোক হইলেও প্রত্যেকেই 'কাব্য' রচনা করিতে পারদর্শিনী। রাজশেখর বলেন—শীলা ভট্টারিকার লেখার সহিত মহাকবি বাণের তুলনা হয়; যথা—

"শব্দার্থয়োঃ সমোগুম্ফঃ পাঞ্চালীরীতি বিষ্যতে।
শীলা ভট্টারিকাবাচি বাণোক্তিষুচসা যদি॥"

অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সমান বিন্যাস, পাঞ্চালীরীতি বাণের যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় শীলা ভট্টারিকারও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাকবি দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' দেবী সরস্বতীকে শুক্লবর্ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে মহাকবি মম্মট ভট্ট দণ্ডীকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণা বিজ্জকাকে তিনি দেখেন নাই, তাই তিনি সরস্বতীকে "সর্ব্বশুক্লা" বলিয়াছেন। ইহাতে বোঝা যায় আলঙ্কারিক মম্মট বিজ্জকাকে সরস্বতীর ন্যায় সম্মান করিতেন। কথিত আছে,—বিজ্জকা দণ্ডীর কাব্যাদর্শে সরস্বতীর শুক্ল বর্ণ পাঠ করিয়া অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "দণ্ডী যদি আমাকে দেখিতেন, তবে তিনি সরস্বতীকে নীলোৎপলশ্যামা বলিয়াই বর্ণনা করিতেন। কবিতাটি এই—

"নীলোৎপলদলশ্যা মাং বিজ্জকাংতা (মাংবা) মজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।"

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় এই ভয়ে, এই মহিলা কবিদের উদাহরণের উল্লেখ আর এখানে করিতে পারিলাম না। সময়ান্তরে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবির গান, ছড়া ও পাঁচালী

শ্রী মনমোহন নরসুন্দর এম্-এ

আধুনিক কাব্যসাহিত্য ও প্রাচীন পদাবলীসাহিত্য এই দুইয়ের মাঝখানে বাঙলা সাহিত্যের আসর জুড়িয়া বসিয়া আছে বাঙলার কবির গান ও পাঁচালী। এই কবির গান ও পাঁচালীগুলি বাঙলার খাঁটি লোকসাহিত্য। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল বর্ত্তমান-প্রচলিত লোকশিক্ষা ও প্রাচীন লোকশিক্ষা এই দুইয়ের মধ্যে বড় একটি ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। এখনকার সাহিত্য আর সাধারণের নয়। এ যেন কেবল শিক্ষিত ও সাহিত্যপিপাসু ব্যক্তির জন্য। শিক্ষাবিস্তারের ফলে মানুষের রুচি বদলাইয়া গিয়াছে, আর তার ফলেই দেশে আটপৌরে সাহিত্য ও পোষাকী সাহিত্য এই দুইয়ের মধ্যে একটা বড় রকমের ব্যবধান ঘটিয়াছে। তখনকার কালে এই ব্যবধান যে ছিল না তা নয়, তবে সেই ব্যবধানে এমন অনৈক্য ছিল না। তখন লেখ্য ভাষা ও ভাব ছিল—চল্‌তি ভাষা ও ভাবের মার্জ্জিত সংস্করণ। তাই কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্য, কাশীদাসী মহাভারত, রামপ্রসাদী সঙ্গীত, পদাবলীসাহিত্য যেন আপামর সাধারণের সাহিত্য। রসসৃষ্টির পথে উহা শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিত না। তাঁহারা ছিলেন আমাদের ঘরের কবি, খাঁটি বাঙলার মাটির কবি; তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে অপ্রত্যক্ষের দিকে, বরণীয়ের দিকে তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই উহা কেমন একটা সহজ সুরে জনসাধারণের মনের মাঝখানে গিয়া প্রবেশ করিত। ইহা সত্ত্বেও অশিক্ষিত মূর্খ কৃষকের ও সাধারণের মনে উহার অনেক কথা অনেক ভাব অস্পষ্ট

ঠেকিত। এই যে কাঠিন্যের আবরণটুকু, ইহাকেও ভেদ করিয়া জনসাধারণের মনে খাঁটি সাহিত্যরসের পরিবেশনের জন্য, জীবনের যাত্রাপথকে সুগম করিবার জন্য কয়েক জন লোকের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। জনসাধারণের জন্য তাহাদের একটা দরদ ছিল। তাহার ফলেই বাঙলা সাহিত্যে আকস্মিক কবির গান ও পাঁচালীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার পর যুগপরিবর্ত্তনে শরৎ কালের হাল্‌কা মেঘের মত এগুলি হেমন্ত-শীতের কুহেলি ভেদ করিয়া বসন্তের দুয়ারে আর পৌঁছিল না।

কবির গান, পাঁচালী অশ্লীল বলিয়া সাহিত্যের আসর হইতে বিতাড়িত হইল। জনসাধারণ তাহাদের একঘেয়ে জীবনের মাঝে যে আনন্দটুকু লাভ করিত তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইল। তাহার পরে যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ আসিয়া তাহার জায়গায় আসর জুড়িয়া বসিল। তাহাদের কটাক্ষপাতে, জাঁকজমকের জোরে কবির গান, পাঁচালীর প্রভাব আর রহিল না। সাগর-পারের যে হাওয়ার ফলে শিক্ষিতেরা অশিক্ষিতদের অবহেলা করিয়া, ঘৃণা করিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিল, আমাদের বাঙলা সাহিত্যও তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিল না। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতায় সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নূতন নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল। সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হইল বটে কিন্তু জনসাধারণ তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অভাব মোচনের জন্য পাঁচালীকার ও কবিওয়ালাদের কত বড় আগ্রহ ছিল।

মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ-কারদের চরিত্রগুলি আমাদের মত সাধারণ মানুষের, তাহারা আমাদেরই মত ভুল করিয়া, পাপাচরণ করিয়া, মানুষ হইতেই দেবত্বের অধিকারী হইয়াছিল। এগুলি বুঝিবার প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহারা আদর্শ চরিত্রগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত মিলাইবার জন্য, আপনার করিয়া লইবার জন্য, পরিশেষে জীবনের কার্য্যাবলীকে পরমাত্মামুখীন করিবার জন্য সহজ সুরের অবতারণা করিলেন,—তাহাকে সাধারণের পাতে পরিবেশন করিলেন। দেবতাকে দূর হইতে দেখিলে মানুষ ভয় পায়, পিছাইয়া পড়ে,—তাহাদের প্রীতি প্রতিহত হয়। এই ভয় ভাঙিয়া তাঁহারা নূতন পথ প্রদর্শন করিলেন। পাঁচালী কথাটির সংস্কৃত রূপ হইল—পঞ্চালিকা। পঞ্চালিকা শব্দের অর্থ গীতিকাব্য। এই গীতিকাব্যগুলি যেন মানবজীবন-পথের পাঁচালী। কবির গান ও পাঁচালী উভয়ই গীত-প্রধান। গান সহজেই মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। কবির গানে দুই দলের দুইটি চরিত্র সমর্থন করিয়া, সত্যকে আশ্রয় করিয়া, দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিয়া, তাহার মাঝে মাঝে অন্তরের খাঁটি সত্যকে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান পূর্ব্বক লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিয়া যেটুকু বাকি থাকিত, তাহার জন্যই মাঝে মাঝে গানের অবতারণা। বাঙালীর সমগ্র জীবনকে উপলব্ধি করিয়া তাহার দেশকাল, চালচলন, জীবনযাপন-প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া লোকশিক্ষার এমন পন্থা আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

ছড়া বা প্রবচন ও কথকথা—এই কবির গান ও পাঁচালীর আর এক একটি শাখা। বাঙালী মেয়েরা তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে এই সব ছড়া ও প্রবচনগুলি আবৃত্তি করিয়া উদ্ধত কর্ম্মশক্তিকে সংযত করিত ও সংযত হইতে শিখাইত। এই ছড়া বা প্রবচনগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নরূপে প্রচলিত। ইহা বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবনযাপন-পদ্ধতি হইতে প্রসূত। উহারা যেন মানুষের অন্তরের মাঝখান হইতে আপনাআপনি উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে। খনার বচন, ডাকের বচন ইহারই রূপান্তর মাত্র। এই সব লুপ্তপ্রায় ঐশ্বর্য্যসম্ভারগুলি যেন বাঙলা সাহিত্যের গ্র্যানিট্ স্তর। ইহার উপরই বাঙলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা।

মেয়েদের শিক্ষার নিমিত্ত আবার তৎকালে গ্রামে গ্রামে কথকতার আয়োজন ছিল। মানুষের চলার পথে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তৎকালে সার্ব্বজনীন লোকশিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল। তাই এগুলি আমাদের নিত্যকালের সম্পদ—খাঁটি লোকসাহিত্য। কালক্রমে কবির গানের মধ্যে যে কুরুচি ও অশ্লীলতা ঢুকিয়াছিল, সে কেবল কবিওয়ালাগণের প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভের হীন প্রচেষ্টা মাত্র।* পাঁচালীগুলি সে হিসাবে নির্ম্মল। বাঙলা

* ইহার অপর এবং প্রধান কারণ অধঃপতিত সমাজের রুচি-বিকার।—বঃ সঃ

সাহিত্যের ইতিহাসে—এগুলি পরবর্ত্তী কালের রচনা। তাই অনুমান হয় এই দোষ পরিহারের জন্যই বোধ হয় পাঁচালীর সৃষ্টি। পাঁচালীর মধ্যে উভয় দলের তর্কের স্থান নাই—তার বদলে ছড়া; আর গান উভয়তঃই। গত ভাদ্রের প্রবাসীতে "হুগলীর পল্লীকবি রসিক রায়" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বাঙলা সাহিত্যে পাঁচালীর স্রষ্টা দাশরথি রায় ইহা ঠেকিয়াই শিখিয়াছিলেন। এক কবির গানে তিনি এক মেয়ে-কবিওয়ালার কাছে অজস্র গালি খাইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক কবির আসর ছাড়িয়া পলায়ন করেন; এবং নির্ম্মলভাবে লোকশিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া পাঁচালীর প্রচলন করেন। কেবল পৌরাণিক নির্দ্ধারিত বিষয়ের মধ্যে এগুলি সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। যুগপ্রভাবকে স্বীকার করিয়া, তাহাকে বিচার করিয়া সাধারণের কাছে প্রকাশ করাও পাঁচালীর অন্যতম কাজ ছিল। নূতন নূতন হাবভাব যাহাতে মানুষ বিচার করিয়া গ্রহণ করে ও আবিষ্কৃত সত্য মানুষের কল্যাণকর কিনা এরূপ আলোচনা পাঁচালীকারদের লেখায় অজস্র আছে। দাশরথি রায় ও রসিক রায়ের পাঁচালী পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পাঁচালীকারদের লেখায় নূতনের উপর বিদ্বেষ এবং পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকার যে প্রচেষ্টা তাহা বেশ প্রকট দেখা যায়। ইহা যুগের প্রভাব ও উচ্চশিক্ষার অভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা বাদ দিলেও তাঁহাদের লেখার ভিতরে অনেক সমাজের গলদ ধরা পড়িয়াছিল।

আধুনিক সাহিত্যে চল্‌তি কথার প্রচলন খুব চলিতেছে। নবযুগের আহ্বানে সত্যের সোনার কাঠির পরশ পাইয়া মানুষ আজ নিজের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যকে চিনিতে শিখিয়াছে। যাহা নিত্যকালের তাহাকে লাভ করিবার, সংগ্রহ করিবার, বুঝিবার একটা প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। তাই অনেকেই পল্লীর সাহিত্য—এই সব লুপ্তপ্রায় কবির গান ও পাঁচালী-সাহিত্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন পূর্ব্ববাঙলার কিছু কিছু পল্লীগান সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র ২৪শ পরগণার ছড়া সংগ্রহ করিয়া 'সম্মিলনী' পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ও সমর্থনীয়।*

সাহিত্যে চল্‌তি কথার প্রচলনের প্রভাবে অনেকস্থলে প্রযোজ্য শব্দগুলি সাধারণের বুঝিবার পক্ষে কষ্ট হয়। লেখকেরা প্রাদেশিকতার ছোঁয়াচ এড়াইতে পারেন না, তাহার ফলে পাঠকের অসুবিধা হইয়া পড়ে। বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-মুসলমানের—সাধারণ কৃষক-জীবনের, গার্হস্থ্য-জীবনের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সরল পল্লীবাসীদের—আচার-অনুষ্ঠান-পর্ব্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়াই সমগ্র বাঙালী-জীবন। বিভিন্ন জেলার বা বিভিন্ন বিভাগের এই খণ্ড বাঙালী জীবনের পরিচয় সংগ্রহ করা ও উপলব্ধি করা আমাদের প্রত্যেক বাঙালীর কর্ত্তব্য। এই সকলের সঙ্গে একটা ঐক্যসূত্র গ্রথিত আছে। বিভিন্ন জেলার কবির গান, পাঁচালী ও ছড়াগুলি সংগৃহীত হইলে বাঙলা সাহিত্যের একটি বড় দিক আবিষ্কৃত হইবে,—বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে অমূল্যরত্ন সঞ্চিত হইয়া রহিবে আর সেই সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে একত্র করিয়া যে একটি খাঁটি সমগ্র বাঙালী জীবন লাভ করিব তাহা আমাদিগকে জীবনের প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবে। সেই সঙ্গে শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্যের উন্নতির মূল সূত্রগুলিও ধরা পড়িবে। নবীনকে প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া বিচার করিবার সুযোগ ঘটিবে। অপর দিকে, প্রচলিত আধুনিক সাহিত্যের যে প্রাদেশিকতা-দোষ, তাহাও দূর হইবে। সকল কথাগুলি আলোচনার ফলে সাধারণ প্রচলিত কথাগুলি ধরা পড়িবে। তাই ইহার যত বেশী আলোচনা হইবে ততই লাভ। কোন কোন জেলায় সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও কবির গান ও পাঁচালী গীত হইয়া থাকে। এগুলি সংখ্যায় অতি অল্প। শিক্ষিত লোকের অনাদর ও অবহেলায় ফলে যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও লুপ্ত হইবে। পূর্ব্ববাঙলার কয়েকটি জেলায় রাজেন সরকার ও হর আচার্য্য মহাশয়ের কবির গানের খুব নাম আছে। যাঁহারা ইহা শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন, কবির গানে যুগের প্রভাব কত বেশী।

বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রভাব ও গুণ, তাঁহারা উভয় দলে তর্কের মধ্যে, বিরুদ্ধমতবাদী লোক ও 'নেতা'মতবাদী

*শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের নেতৃত্বে "বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি" এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে কর্ম্মারম্ভের প্রয়াসী হইয়াছেন। বঃ সঃ

বা নেতার রূপকভাবে জনসাধারণের বোধগম্য করেন। শিক্ষিত লোকের উৎসাহ পাইলে ইঁহারা শীঘ্রই যে শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় দলের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্যই, মানুষের রুচি, সভ্যতা, শিক্ষা ও চিন্তাধারার ফলে সুকুমারশিল্প ও সৌন্দর্য সৃষ্টির নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইবেই কিন্তু জনসাধারণের জন্য এই সব লোকসাহিত্যের প্রয়োজন আছে, এবং শিক্ষিত লোকের পক্ষেও ইহা কম আনন্দদায়ক নহে। এই সব লুপ্তপ্রায় ছড়া, পাঁচালী ও কবির গানের উপর আজকাল অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে তবু ইহার অধিকাংশই এখনও অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে; সাহিত্যসেবক, শিক্ষিতদেরও যাহাতে এই সব প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তার জন্যই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ভুলের বেলা

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ঘন হ'য়ে আসে,
　উত্তরী সম ধূম-আবরণখানি
মূর্চ্ছিত ধরা আধঘুম অবকাশে
　আপন বুকের আরো কাছে লয় টানি'।
　　দেওদার বন নিঝুম মগন ধ্যানে,
　　ঝিঁঝি-ডাকা পথ চলে কার সন্ধানে,
　　বনের গহনে জোনাকীর দীপদানে
　ইঙ্গিত-সাড়ে কাহাদের কানাকানি।

বাতাস ঘুমায় শষ্প-শয়ন'পরে,
　নদী-জলধারা হারায়েছে কলভাষা,
পথের আঁধার বাহু মেলিয়াছে ঘরে,
　ঘরের আঁধার পথেতে বেঁধেছে বাসা।
　　নয়নে আমার নিদ তবু আজ নাহি,
　　বসে' আছি শুধু ধূ ধূ দিগন্তে চাহি'
　　স্বপন-লোকের মায়া-স্রোত অতিবাহি'
　চিত্তে উতরে কত উন্মাদ আশা!

সুন্দর, তুমি ভয় করো পূজারীরে,
　সেকথা জেনেছি প্রতিদিন প্রতি ছলে,
হৃদয় তোমার তাই ত রেখেছ ঘিরে
　আঁখি-পরাভব ঘন তিমিরাঞ্চলে।

ভুল করে' কভু, ভালোবাসো, ভাবি যদি,
নয়ন ফিরায়ে থাকো তুমি নিরবধি,
কৃপাশ্রু পাছে ভাবি, তাই রাখো রোধি'
　নিজ বেদনার উদ্গত আঁখিজলে।

তবু পথপাশে জেলেছি পূজার বাতি,
　সুন্দর ওগো, নাহি নিও অপরাধ,
বাহিরে ঘনায় তিমির-বরণা রাতি,
　অন্তরে মোর অনন্ত অবসাদ।
　　তব পথধারে বাতায়ন রাখি খুলি'—
　　ক্ষীণ বর্ত্তিকা কম্পিত শিখা তুলি'
　　উজলিবে তব যাত্রা-পথের ধূলি,
　মরিয়া মরে না এইটুকু মোর সাধ।

জানি সুন্দর, যেদিকে ফিরাও আঁখি,
　আকাশের আলো ভালোবেসে ঝরে' পড়ে,
তোমার চরণ-চিহ্নেরে ঢাকি' ঢাকি'
　অগণিত ফুল ফুটে ওঠে থরে থরে।
　　একটি কেবল যূথি-কলিকারে হিয়া
　　ফোটায় তবুও অশ্রুনিষেক দিয়া,
　　তোমার বাতাস তুলিবে সে সুরভিয়া
　ফোটে সেই আশা হৃদিবৃন্তের 'পরে!

জানি গো বন্ধু, তুমি শুধু যাবে চলে',
ফিরিয়া চাবে না এই অভাগার পানে,
দরদী তোমার কত আছে ধরাতলে
দীপালি ধরাতে হৃদয়ের দীপদানে।
আমার প্রদীপ কুণ্ঠিত শিখা ল'য়ে
বিফল আঁধারে জানি জানি যাবে ব'য়ে
যূথি-সৌরভ একান্তে লাজে ভয়ে
লভিবে সমাধি মূক মৃত্যুর ধ্যানে।

তবু হায় এই তপ-কৃশ দেহটিরে
কত যে আবেগে বহিয়া লইয়া আসি
বারবার তব যাত্রাপথের তীরে,
দ্বারে বারে ফিরি নয়নের জলে ভাসি'।
জানি সুন্দর, এ যাত্রা হবে সারা,
একদিন হায় বহিবে না আঁখিধারা,
অসীম আঁধারে তুমি হ'য়ে যাবে হারা',
অনন্তকাল র'বে হিয়া উপবাসী।

সেদিনো বন্ধু এমনি জ্বলিবে বাতি,
এমনি করিয়া ফুটিবে যূথির কুঁড়ি,
বাহিরে ঘনাবে তিমির-বরণা রাতি,
অবসাদ র'বে এমনি হৃদয় জুড়ি'।
এমনি করিয়া পথের একটি ধারে
নীরবে আসিয়া দাঁড়াইব বারে বারে,
সেদিনো পশিয়া সুগোপন সঞ্চারে
আশার ভাঁড়ারে মাণিক করিব চুরি।

ওগো সুন্দর, তোমারে পাওয়ার আশা
ছেড়েছি, যেদিন হেরেছি তোমারে চোখে;
অপরাধী নহে এ আমার ভালোবাসা,
সাহসী এ নহে, অন্ধ এ নহে শোকে।
আপনারে ল'য়ে এ ছলনা দিবানিশি,
বক্ষশোণিতে অশ্রুতে মেশামিশি,
স্বপনের রঙে রঙীন করিয়া দিশি
রজনী গোঁয়ানো আলেয়ার ধ্যানালোকে!

ওগো সুন্দর, যদি ছলনার ভরে
ক্ষণিক চাহিতে আমার এ মুখপানে,
আমারে ভোলাতে অশ্রু পড়িত ঝরে',
মধুর মিথ্যা কহিতে এ কানে কানে;
তিমিরাঞ্চল ক্ষণিক মুক্ত করি'
ওদুটি নয়ন নয়নে রাখিতে ধরি',
তবে এ আমার অনন্ত বিভাবরী
ভরিয়া উঠিত দুরন্ত গানে গানে।

এ ধরাতে তাহে কোন্ ক্ষতি কার হ'ত,
যদি ছলভরে বসিতে ক্ষণেক কাছে,
তপ্ত ললাট চরণে করিয়া নত
বলিতে পেতাম বলিবার যাহা আছে।
যদি রোমাঞ্চ ধরিত আমার দেহে,
উৎসব হ'ত দুদিন দীনের গেহে,
ছলনারে যদি মুগ্ধ মধুর স্নেহে
বক্ষে বাঁধিয়া বিধুর পরাণ বাঁচে!

হায় গো বন্ধু, প্রেম সে ত মরীচিকা,
মিথ্যা বেসাতি হৃদয়ের বিনিময়,
দুদিন জ্বালিয়া দীপ্ত দীপের শিখা
সুচির আঁধারে আপনারে করে লয়।
অধরে অধর বুকে যবে বুক রহে,
নিবিড় পেষণ সুখবেদনায় সহে,
মধু ছানি' কানে অনুরাগবাণী কহে,
কান পাতি' দ্বারে মরণ জাগিয়া রয়!

মনের মরণ দেহের মরণে ঠেলি'
আগেভাগে জুড়ে' বসে হৃদয়ের পাট,
আয়োজন যত সারা করে বেলাবেলি,
বেলাশেষে কিছু নাহি রহে ঝঞ্ঝাট!
মরণ যখন দাঁড়ায় দুয়ারে আসি,
ইঙ্গিতে ডাকে বাহিরে আঁধাররাশি,
কোথা পড়ে' রয় এত ভালোবাসা-বাসি,
সকল হারায়ে ভাঙে জীবনের হাট।

প্রেম যে ছলনা, আজ সারারাত ধরি'
ছলনার প্রেমে মন মজে, তাই ভাবি,
কি মূল্য পাব, সে বিচার নাহি কার'
ডুবুরির মতো সিন্ধু-অতলে নাবি।
ওগো সুন্দর, এ মন ত রাখো রাখো,
নয়নের জল নয়নে রুধিও না কো,
জ্যোৎস্না-জ্যোতিরে কেন অঞ্চলে ঢাকো,
মনের কুলুপে মিছে লাগায়ো না চাবি!

ভুল করে' ভাবি, ভালোবাসো, ভালোবাসি,
এইটুকু সুখ ক্ষম ওগো মোরে ক্ষম,
বসনপ্রান্তে ঢাকিও শ্লেষের হাসি
প্রিয় বলে' যদি ডাকি, কিবা প্রিয়তম।
জানো ত বন্ধু ভাঙিবে ভুলের বেলা,
আপনি একদা শেষ হবে এই খেলা,
তাই ভেবে মোর স্পর্দ্ধারে কোরো হেলা
বিধাতার মতো, ওগো বিধাতৃ সম!

বাহিরের পথে

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

ভূমিকা

স্নেহের অমিয়া ও জ্যোতি,—

আমরা স্কট্ল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের নানা স্থান ঘুরে এডিনবরায় ফিরে এসে তোমাদের সকলের চিঠি পেয়ে সুখী হ'লাম। তোমরা আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত চেয়ে পাঠিয়েছ; কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী লিখ্তে হ'লে যে রকম ভাবে নোট রাখা এবং ফটো ইত্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন, আমি তার কিছুই করি নি। ভ্রমণের সময় আমি কখনো ভাবি নি আমাকে এর কাহিনী লিখ্তে হবে। যা'ই হোক্ যেখানকার যতটুকু মনে আছে—বা নোট করা আছে (অনেক স্থানের কোন নোটই নাই) তাই তোমাদের সন্তোষার্থে লিখে ক্রমশঃ পাঠাচ্ছি।

ভ্রমণবৃত্তান্ত আরম্ভের পূর্ব্বে একটু ভূমিকা আবশ্যক। এই ভ্রমণে ভিয়েনা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গী ছিলেন "ক্যাপটেন দত্ত গুপ্ত আই-এম্-এস্" এবং তাঁর স্ত্রী "মাধুরী গুপ্তা।" পুনঃ পুনঃ এত বড় লম্বা নাম লিখে তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন না করে' আমি যথাক্রমে লিখ্ব শুধু "গুপ্ত" ও "মাধু" এবং সেই কারণেই বারবার "তোমাদের জামাই বাবু" বা "মেজর ভাদুড়ী আই-এম্-এস্" না লিখে শুধু লিখ্ব "ডাক্তার।"

মাধুদের একটু পূর্ব্ব ইতিহাস বলি—শিলং থাকা কালে মেয়েটির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। মা-মরা মেয়ে, মামা-মামী মানুষ করে, আর সেই মামা-মামী কার্য্যোপলক্ষে তখন ছিলেন শিলংএ; আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমে' গিয়েছিল। মাধু ও আমাদের যতীন চক্রবর্ত্তী'র মেয়ে কমলা কল্কাতায় বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা কর্ত ও ছুটীতে শিলং যেত। মাধুর মামীর সঙ্গে আমার ভাব ও পাতান "দি'দ" ডাক, তাই মাধু আমায় ডাকৃতে আরম্ভ করে' দেয় "মাসীমা", আর কমলা ডাকৃত "হিমুদি" বলে'। মাধু আই-এ পাশকরা বেশ মেয়েটি, ভারী সাদাসিধে কোমল স্বভাব। তারপর শিলং ছেড়ে যতীন চক্রবর্ত্তী'র পরিবার ছাড়া সে-দেশের পাতান বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় রাখা বা পত্রালাপ করার হাঙ্গামা চুকিয়ে দি'ব্বি বছর কয়েক কাটিয়ে দিয়েছিলাম, ও সেই ফাঁকে মাধু ও তার মামা-মামীর স্মৃতি প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল; ক্বচিৎ কোনদিন কোন কথাপ্রসঙ্গে বা শিলং-এর কোন কথা উঠ্লে সে-দেশের জানা অন্যান্য লোকের সঙ্গে হয় ত মাধুর মামীদের মুখগুলিও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মার্ত; বাস্ এই পর্য্যন্ত।

জানই ত গত বছর বড়দিনের ছুটীতে আমরা ছিলাম লণ্ডনে; একটা নিমন্ত্রণে মেজর দাসের বাড়ীতে হঠাৎ দেখা হ'ল মাধুর সঙ্গে। মাধুর স্বামী ডাক্তারদের লাইনেরই মিলিটারী ম্যান; পূর্ব্বে ছিলেন এডিনবরারই ছাত্র; যুদ্ধের সময় বছর কয়েক নানা ঘাটের জল খেয়েছেন; ডাক্তারদের চেনা ছেলে, কাজেই আমার সঙ্গে মাধুর যেমন পুরোনো গল্প নিয়ে জমে' উঠ্ল ডাক্তারদের সঙ্গেও গুপ্তের ঠিক্ তাই হ'ল। বিদেশে অনেকদিনের পর জানা লোক দেখ্লে যে রকম আনন্দ হয় তা আমি সেদিন বেশ বুঝ্তে পেরেছিলাম। দিন কয়েক বেশ পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিয়ে আনন্দে কাটিয়ে সস্ত্রীক গুপ্ত ফিরে গেল ম্যাঞ্চেষ্টারে নূতন একটা ডিগ্রী নেবার আশায়, আর আমরা খোকাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম এডিনবরায়।

দিন যায় না মাস যায়,—হঠাৎ একদিন জুন মাসের সকাল বেলায় একখানা চিঠি পাই, খুলে প্রথমেই চোখে পড়্ল "মাসীমা"; পড়ে' দেখি মাধু লিখছে; চিঠিখানার সার কথা—"ওরা শীঘ্রই দেশে ফিরে যাবে, যাবার পূর্ব্বে এডিনবরা ও লেক ডিষ্ট্রিক্ট্স্ (Lake districts) দেখ্তে চায়, আমাদের কাছে যেন ওদের জন্য একটা ঘর ঠিক রাখি।" লিখে দিলুম—চলে' এস আমাদের কাছে, এখানে এলে

পরামর্শ ঠিক করে' একত্রে দেশভ্রমণে বের হব। জুলাইয়ের প্রথমেই তারা এল। দিন কয়েক একসঙ্গে আনন্দে কাটান গেল এবং খানিকটা ভ্রমণ আমাদের সঙ্গে সেরে নিয়ে তারা অগাষ্টের জাহাজে চড়ে' দেশে রওনা হ'ল।

এখন ভূমিকা রেখে প্রসঙ্গে নামা যাক্। আমার দেশ দেখার উদ্দেশ্য শুধুই যে ঘুরে বেড়ান ছিল তা নয়। যেখানে যাব তার পথ-ঘাট দোকান-পসার কেন-বেচা বাড়ী-ঘর লোক-জন পোষাক-পরিচ্ছদ স্কুল-কলেজ থিয়েটার-সিনেমা, এক কথায় ভিতর-বাহির সব দেখা, এবং সে দেশের অবস্থা ভাল করে' জান। এসব কর্‌তে হ'লে চাই—(১) একটি ইউনিভারসিটির শিক্ষিত ছাত্র, যে সে দেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ দিতে পারে, (২) একটি এমন ব্যবসাদার, যার কাছে জানা যায় সে-দেশের বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থা এবং (৩) একটি দিনমজুর বা ক্ষেতে কাজ করে' খায় এমন চাষী, যে বল্‌তে পারে সে-দেশের গরীবের অবস্থা। যে-কোন দেশে গিয়ে এই তিন প্রকার লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ভাল করে' মিশ্‌তে পার্‌লে এবং সব দিকে চোখ খুলে চল্‌লে হয় ত সে দেশের খাঁটি সংবাদ কিছু জানা যায়, অন্ততঃ আমার এই বিশ্বাস। আমি তাই যেখানে যেখানে গিয়েছি প্রথমেই খোঁজ করে' নিয়ে এই রকম তিনটি লোককে ধরে' জিজ্ঞাসাবাদে অস্থির করে' তুলেছি। আমি মেয়ে, বিশেষ বাংলার মেয়ে, না হ'লে হয় ত আরও দুর্গম স্থানে যাবার সাহস হ'ত এবং পুরুষ হ'য়ে জন্মালে আরো বেশী কিছু জানা বা দেখ্‌বার সুবিধা হ'ত। দলের সকলের দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য এক নয়, তারপর ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কেউ নূতন দেশের বাড়ী-ঘর রাস্তা-ঘাট দেখেই ও পথচলা মেয়েপুরুষ দেখেই দেশ দেখার সার্থকতা ও সে-দেশ সম্বন্ধে মন্তব্য স্থির করে' নেন্, কেউ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্‌বেন বলে' সহরের সব ছেড়ে বনজঙ্গল দেখার জন্য মোটর করে' গিয়ে উপস্থিত হন, কেউ বা বিদেশে গিয়ে থিয়েটার-সিনেমা দেখে অর্থব্যয় করেন, কেউ বা ঐসব করা নিতান্তই অপব্যয় মনে করেন; কাজেই আমি-বেচারার সবার মন যুগিয়ে নিজের মত্ বজায় রাখ্‌তে সময় সময় ভারী মুস্কিলে পড়্‌তে হ'ত। দলের প্রায় সবার মত্—একটা গাইড্ সঙ্গে নিয়ে মোটর করে' দেশের

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

এ কোণ থেকে ও কোণ দৌড়ে বেড়ালেই সব হ'য়ে গেল। যা হোক্ তবু আমি অনেক কিছু দেখে নিয়েছি এবং যা ঠিক ইচ্ছামত হয় নি সেজন্যও মন খারাপ কর্‌বার কিছু ঘটে নি-বা করেছি, যেখানে গিয়েছি—যা দেখেছি তাতেই আমি পরম সন্তুষ্ট। দলের সহিত সব বিষয়ে মত না মিল্‌লেও দল থাক্‌লে যে কত অসুবিধাই হাসিমুখে সহ্য করা যায় তা আমি জেনেছি; তাই আমি পথে, বিপথের বন্ধুদের কাছে বা সঙ্গীদলের কাছে কৃতজ্ঞ।

গ্লাসগো

এডিনবরা থেকে গ্লাসগো রেলে ঘণ্টাখানেকের পথ। ৪৯ মাইল ব্যবধান। দেশে থাকতে গ্লাসগোতে জাহাজ তৈরী হয় বলে' খুব শুনেছি ও আর যা যা শুনেছিলাম সব মিলিয়ে গ্লাসগো দেখার ইচ্ছা বলবতী হ'য়ে উঠল।

গুপ্ত, মাধু তখন আমাদের সঙ্গেই আছে—ওরা দুজন, আমার বন্ধু 'এডিথ' বলে' এ দেশের একটি মেয়ে, ডাক্তার ও আমি স্বয়ং এই পাঁচ জন মিলে গ্লাসগো যাব স্থির করলাম। তবে সবারই মতের সঙ্গে এই ভ্রমণের আরম্ভেই আমার মতান্তর ঘটে' গেল (অবশ্য মনান্তর নয়)। সবারই মত—চল বাপু রেলে করে' টপ্ করে' গ্লাসগো পৌঁছে যাবে। আমি বলি—তা নয়, একখানা মোটরবাস ভাড়া কর (এসব মুলুকে বাস সার্ভিস্ খুব আছে), তাতে হয় ত আমরা পাঁচজন ছাড়া আরো লোক যাবে,তাতে ক্ষতি কি? বেশ আড্ডা দিয়ে হল্লা করতে করতে যাব। তা ছাড়া প্রধান কথাই বাস যাবে পাড়াগাঁয়ের ভেতর দিয়ে, মাঝে মাঝে থেমে; তাতে এদেশের পাড়াগাঁ, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, পাড়াগাঁর ঘর দোর পথ-ঘাট সব দেখা যাবে। আর রেল যাবে তার লাইনপাতা রাস্তা দিয়ে, দু' পাশের পাহাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। যদি গ্লাসগো দেখার সঙ্গে তার আশপাশটা দেখা চলে তাতে ক্ষতি কি?—ইত্যাদি কথায় সবাই বাসে যেতে রাজী হ'লেও একজন বলে' বসল, "না, বাসে গেলে ১ ঘণ্টার যায়গায় লাগবে ২ ঘণ্টা, কেন সে সময় নষ্ট করা? ততক্ষণ সহরটা ঘুরে দেখলে কাজ দেবে।" তখন আবার আমায় বলতে হ'ল, "আরে বাপু ছুটী ত ভোগ করতে যাচ্ছ সময়কে অসময় তৈরী করার জন্য, কলেজ-হাঁসপাতালে ত আর ঠিক সময়ে গিয়ে লেক্‌চার শোনবার তাড়া নেই, তবে কেন সময় সময় বলে' ফেসাদ বাধাও? ঠিক দেশীমতে বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের মত একঘণ্টার কাজ দু'ঘণ্টাতেই না হয় সেরে এলে, ছুটীতে আর এদেশী হাড় ক'খানায় সাহেবী কায়দা না করলেও চলবে।" শেষে সবাই হাসমুখে বাসে যাওয়াই হবে বলে' মন্তব্য প্রকাশ করলেন, তখন আমার মতটাই সকলে মেনে নিলেন দেখে আমিও বেশ একটা আরামের নিশ্বাস ফেললাম। পরদিন সকাল বেলায় কিছু স্যাণ্ডউইচ্, কেক্, বিস্কুট সঙ্গে করে' পাঁচজন মিলে বাড়ী থেকে ট্রামে করে' বাস-ষ্টেসনে পৌঁছে টিকিট কেটে দিব্বি চড়ে' বসলাম তার ভাল গদীলাগান সিটগুলি দখল করে'।

বেশ আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে, গাছপালা বাড়ী-ঘর-দোরের পাশ দিয়ে বাস-ষ্টেসনে ষ্টেসনে থেমে থেমে আইশক্রীম খেয়ে গল্প করতে করতে গ্লাসগো পৌঁছে গেলাম। পাড়াগাঁ দেখব ভেবেছিলাম বটে কিন্তু আমরা পাড়াগাঁ বলতে যা বুঝি সে সব এদেশে কিছুই নেই। আমাদের মত বিদেশীয়ের এ দেশের সহর-পাড়াগাঁর পার্থক্য কিছু চোখে পড়ে না। সাদা রংওয়ালা মেয়ে-পুরুষ সর্ব্বত্র; পুরুষের কোট, প্যাণ্ট, টাই, টুপী, জুতো সবই একধরণের—ধনী এবং মাঠে কাজ করছে চাষার পরিচ্ছদ একই; জিনিষ বিশেষে মূল্যের যা তারতম্য। মেয়েদেরও সেই হাঁটুর উপর গাউন পরা, সহুরে প্যাটার্ণেই হাইহিলের জুতো পরা, মুখে পাউডার মাখা, ছোট করে' চুল ছাঁটা। কচি ছেলেমেয়ের পোষাক-পরিচ্ছদও তাই। দোকান বাজারও অনেকটা সহরের ধরণের—বাড়ীগুলি শুধু গগনচুম্বী প্রকাণ্ড অট্টালিকা না হ'য়ে বেশ ছোটখাট জানালা কপাট লাগান দোতালা তেতালা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী—জানালায় সেই সহুরে কেতায় লেস লাগান পর্দ্দা, নেটের কারটেন। যে সব বাড়ীর দরজা খোলা ছিল আমি তার ভেতর দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিলাম ও সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে দেখালাম। খাট, বিছানা, বিছানা ঢাকা, টেবিল,চেয়ার, টেবিলক্লথ, ফুলদানী সবই আছে এবং ধরণধারণ প্রায় একই। সহর-পাড়াগাঁর পার্থক্য—ওদের সব দোকান বাজার বাড়ীঘর ছোট,—সহরের সব বড়, কিন্তু জীবনযাত্রা-প্রণালী সব একই—বড় টাইপ আর ছোট টাইপ।

গ্লাসগো বেশ ব্যস্ততাপূর্ণ সহর—বৃটিশ রাজত্বের ভেতর লণ্ডন প্রথম, কলকাতা দ্বিতীয়, বম্বে তৃতীয় ও গ্লাসগো চতুর্থ সহর। ধনীর চাইতে দিনমজুরের সংখ্যাই বেশী; যাদের কারখানা সেখানে আছে তারা রেলে বা মোটরে গিয়ে তার তত্ত্বাবধান করে কিন্তু বাস করে সহরের বাইরে ফাঁকা জায়গায়। এডিনবরায় বহু ধনী আছে যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব গ্লাসগোতে। পথঘাট বাঁধান,

বেশ বড় বড় দোকান বাজার আছে, সিনেমা থিয়েটার অনেক। সাধারণের জন্য, যাকে এখানে বলে পাব্লিক পার্ক, তার সংখ্যাও কম নয়। অনেক কলকারখানা আছে বলে' সহরটা ধোঁয়াটে ব'লে' মনে হয়। মোটের উপর সহরটি একরকম মন্দ নয়, গোলমেলে হৈ হৈ ধরনের সহর। ট্রাম, বাস ও তাদের যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা আছে। পাকা রাস্তা বিলাতের সর্ব্বত্র—গ্লাসগোতেও সে সব সুখ-সুবিধার অপ্রতুল নেই। পূর্ব্বেই বলেছি গ্লাসগো খেটে-খেকো সহর, তাই সে দেশের ট্রাম ও বাসের কণ্ডাক্টার সব মেয়েরাই। তারা বেশ ব্রিচেস্ পরে' টাইট কোট গায় দিয়ে যে যে কোম্পানীর অধীনে তার চিহ্নযুক্ত টুপী মাথায় দিয়ে দৌড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অবলীলাক্রমে কাজ করে' যাচ্ছে। নির্ভীক ভাবে গভীর রজনীতে যাত্রীদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে একলা মেয়ে, পুরুষ ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে বনজঙ্গলের মাঝের রাস্তা দিয়ে নিজ গন্তব্য স্থানে পৌছাচ্ছে। আমরা দূরে বসে' এদের মেলামেশায় যে রকম কেলেঙ্কারি হবে মনে করে' শিউরে উঠি, বাস্তবিক এদের মধ্যে সে রকম কোন কেলেঙ্কারি হয় না। জন্মাবধি পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশায় উভয় তরফেই প্রলোভন অনেক কেটে যায় এবং কাজের মাঝে নেমে আমি মেয়ে ও' পুরুষ অথবা আমি পুরুষ ও' মেয়ে এ ভাবনার অবসর এরা পায় না। আর কোন সুযোগে কাজের ফাঁকে যদিও পায়, তাতে পুরুষ নারীর অনিচ্ছায় তার কেশাগ্রও স্পর্শ কর্‌তে পারে না। কাজের সময় এদের মেয়ে, পোষাক পরিচ্ছদ কথা-বার্ত্তা চলাফেরা-দৌড়ান, এমন কি ঠিক পুরুষের মতই চুলছাটা, মুখে সিগারেট নিয়ে গল্প করা, এ সব এমন স্বাভাবিক ভাবে যুবকের পাশে থেকে ঠিক পুরুষের মতই করে' যায় যে বোঝা মুস্কিল কোন্‌টি মেয়ে আর কোন্‌টি পুরুষ; তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে পুরুষও ভুলে যায় তার পাশে বসে' যে কাজ কর্‌ছে সে পুরুষ নয় মেয়ে। গ্লাসগো ছাড়া বিলাতের আর কোথাও এমন মেয়ে কণ্ডাক্টর নেই। যুদ্ধের সময় নাকি সর্ব্বত্রই ছিল।

গ্লাসগো ইউনিভারসিটিটি আমার চমৎকার লাগ্‌ল। প্রকাণ্ড বাড়ী—পাহাড়ের উপর তৈরী, চারপাশ দিয়ে রাস্তা গেছে। রাস্তার থেকে বেশ একটু উঁচু ফাঁকা যায়গায় সেটি করেছে। ইউনিভারসিটি থেকে চারপাশের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখা যায়। ছুটী বলে' তখন বন্ধ ছিল। তবু আমরা খোঁজ নিয়ে অনেক করে' সব ঘর-দোর খুলিয়ে নিয়ে ভিতরের সব ব্যবস্থা দেখে এলাম। আমরা ইণ্ডিয়া থেকে এই সব দেখ্‌বার মতলব করে' এসেছি বলায় তথাকার অধ্যক্ষ সাহেবটি নিজে সব ঘর চাবী দিয়ে খুলে সব বিষয় বেশ করে' বুঝিয়ে আমাদের যত্ন করে' সর্ব্বত্রই ঘুরিয়ে নিয়ে দেখালেন। ভিতরের ব্যবস্থাও বেশ সুন্দর। গেটের যে দরোয়ানের কাছ থেকে সব খোঁজ নিয়ে সাহেবকে ধরে' ভিতর দেখার ব্যবস্থা কর্‌লাম—সে দরোয়ানটি ওখানে বহুকাল আছে, অনেক দেশী ছেলেদের চেনে, অনেকের নাম ও তাদের কার্য্যকলাপের তালিকা দিল। কিছুদিন আগে একটি দেশী মেয়ে পাশ করে' গেছে, তার খুব প্রশংসা কর্‌লে। ইউনিভারসিটির ভেতর ঢুক্‌তেই চারপাশের দেয়ালে খোদাই করা অনেক নাম চোখে পড়্‌ল। ইউনিভারসিটির যে সব ছাত্র যুদ্ধে মারা গেছে ঐ নামগুলি তাদেরই "ওয়ার মেমোরিয়াল" বলে' রাখা হয়েছে। চারপাশে তাকাতেই যখন হাজার হাজার ছেলের নাম চোখে পড়্‌ল তখন মনে হ'ল, হায় রে, প্রথম জীবনের আরম্ভে কত মায়ের বুক খালি করেই না এই সব যুবকেরা চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনটা যেন কি রকম খারাপ হ'য়ে উঠ্‌ল! তাই তখন মনে হ'ল স্কুল ও কলেজের ভেতর এ প্রকার "ওয়ার মেমোরিয়াল" করাটা যেন ঠিক হয় নি। যত দেশ ঘুর্‌লাম প্রায় সর্ব্বত্রই ইউনিভারসিটির ভেতর "ওয়ার মেমোরিয়াল" রয়েছে। অবশ্য এ "ওয়ার মেমোরিয়ালে" কেবলমাত্র সেই সেই কলেজের ছাত্রদেরই নাম লেখা আছে, সাধারণের নয়।

গ্লাসগো মিউজিয়াম ঐ এক রকম—খুব ভাল যে তাও নয়, আবার খুবই খারাপ তাও বল্‌তে পারি না। সংগ্রহ আছে মন্দ নয়, সাজাবার কায়দা ভাল লাগ্‌ল না। নূতন চোখে পড়্‌ল আমাদের দেশের সংগ্রহগুলি। কৃষ্ণনগরের মাটির খেল্‌নার অনেক সংগ্রহ আছে। কই মাছ, ইলিশ মাছ, রুই মাছ, ইত্যাদি অনেক রকমের জিনিষ রেখেছে, আর সে জিনিষগুলি অতি চমৎকার তৈরী, আসল-নকলের প্রভেদ

বোঝা যায় না। ইণ্ডিয়ার কোন্ জিনিষ কোথাকার তৈরী নাম লিখে সব টিকিট ঝুলিয়ে রেখেছে। বিদেশীরা দেখেই বলে—বাঃ! চমৎকার করেছে!—নিজেদের ভেতর আলোচনা করে যে ইণ্ডিয়ান কারিগরেরা, জন্তু পোকামাকড় তৈরী কর্‌তে পারে খুব ভাল। আমার মন্তব্য, জিনিষগুলির তৈরী সুন্দর—সত্যই প্রশংসনীয়। মিউজিয়ামে মারাঠা মেয়ের সেই খালি গা—কোঁচা দিয়ে কাপড় পরা—মধ্যখানে সিঁথি করে' পেতে চুলবাঁধা—সিঁদুরের ফোঁটা-ওয়ালা যে সব মডেল রেখেছে তার কোন কোন মূর্ত্তি উচ্চতায় আমার চাইতেও বড়। মারাঠা ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের মডেলও সব আছে। যা রেখেছে তা পোষাক-পরিচ্ছদ গড়ন ইত্যাদিতে আমাদের দেশের লোকের মতই বটে—কিন্তু ও' মডেলগুলি থাকায় আমাদের অপকার হয় বলেই আমার ধারণা। আমাদের দেশের, গায় জামা দেওয়া বা ধুতি সার্ট পরা বা সাড়ী ব্লাউজ জুতো পরা কোন মডেল নেই। এ দেশের বা বিদেশের শিক্ষিত লোকেরা ইণ্ডিয়ার হিন্দু ও ব্রাহ্মণ জাত সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে' জানে ও সেই জাত দেখ্‌বার জন্য মিউজিয়ামে আসে ও দেখে—গা খালি, গলায় পৈতা, হাঁটুর উপর কাপড় পরা, উবু হ'য়ে বসা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের চেহারা!—বিদেশীর চোখে দৃশ্যটা মোটেই প্রীতিপদ নয়। আর ঐ ধরণের গুটিকয়েক মডেল দেখেই তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষের একটা ধারণা করে' নেয়, আর সে ধারণাটি যে আমাদের অনুকূলে নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই আমার মতে ঐ মডেলগুলিকে কিছু কালের জন্য সরিয়ে রাখাই সঙ্গত অথবা তার পাশে অন্য মডেল রাখা কর্ত্তব্য। গ্লাসগো বিষয়ে আর কিছু বক্তব্য এবার নেই।

(ক্রমশঃ)

প্রেম নয়

শ্রী মনোজ বসু

নবগোপাল কবিতা লেখে, সেই কবিতা মাসিকপত্রে ছাপা হয়।

জনার্দ্দন সেন নেবুতলায় থাকেন। লোহার কারবার করেন বটে কিন্তু ভদ্রলোক রসগ্রাহী। আজ বছর পাঁচেক সেন মহাশয়ের সহিত নবগোপালের পরিচয় হইয়াছে, শ্যামবাজার হইতে নেবুতলা অবধি হাঁটিয়া মাঝে মাঝে সে কবিতা শুনাইতে আসে। জনার্দ্দন দিব্য চোখ বুজিয়া শুনিয়া যান, কোন তর্ক তুলিয়া গোলমাল করেন না এবং উপসংহারে নবগোপালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক মিষ্টকথা বলিয়া থাকেন।

কি করিয়া যে তরুণ কবি এবং প্রবীণ লোহার ব্যাপারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল তাহা জানি না। তোমরা ভাবিতে, ইহার মূলীভূত হেতু কাতু অর্থাৎ কাত্যায়নী—জনার্দ্দনের মেয়ে। কিন্তু সে কথা আর বলিবার যো রহিল না, ২৪শে তারিখে কাতুর বিয়ে হইয়া যাইতেছে, আজ সকালে নবগোপালের মেসে নিমন্ত্রণের চিঠি আসিয়াছে।

তা ছাড়া আজ না হয় কাতু ভারিকি হইয়াছে, পাঁচ বছর আগে ছিল একফোঁটা এতটুকু মেয়ে, বজ্জাতের শিরোমণি। তাহার সাথে প্রেম? প্রেম নয়। জনার্দ্দনের সাথে কাব্য-আলোচনা মাসাবধি চলিবার পরে কাতুকে দেখিয়াছিল, তাহার আগে কাতু বলিয়া কেহ আছে নবগোপাল জানিতই না।

এক রবিবারে দুপুর বেলা নবগোপাল কবিতা পড়িতেছে। সাত দিনের মধ্যে গড়ে তিন-সাতে একুশ নয়, তাহার দুইটা কম—উনিশটা কবিতা লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে চার পাঁচটা এমন অদ্ভুত হইয়াছে যেন চোখের জল টানিয়া নিয়া আসে। নবগোপাল পড়িয়া যাইতেছিল, জনার্দ্দন চোখ বুজিয়া গূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছিলেন। খানিক পরে গড়গড়ার টান

বন্ধ হইয়া গেল, অতিরিক্ত ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থাকে। নবগোপাল পড়িয়া যাইতে লাগিল। সহসা সন্দেহ জাগিল,গড়গড়ার টান বন্ধ হইল ভাবাবেশে কিম্বা নিদ্রাবেশে? ডাকিল—জনার্দ্দন বাবু, শুনছেন? জনার্দ্দনের সাড়া নাই। ত্বত্তোর বলিয়া কবিতার খাতা বন্ধ করিল। এই সময়ে নজর পড়িল, দুয়ারের কাছে ডুরে কাপড় পরা একটি ছোট মেয়ে মুখ বাড়াইয়া মিট মিট করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মেয়েটির দিকে চাহিতেই হাসিয়া মুখ লুকাইল। নবগোপাল ডাকিল—অ খুকী,এসো না—এসো এখানে—। খুকী দিল এক ছুট—ঝমর ঝমর করিয়া মল বাজিতে বাজিতে মিলাইয়া গেল। বেশ তো—খাসা তো খঞ্জন পাখী কখনো চোখে দেখে নাই, শুনিয়াছে সে পাখী নাচিতে নাচিতে পলাইয়া যায়। হঠাৎ জনার্দ্দন চোখ খুলিলেন—কই? থাম্‌লে কেন? পড়ো—

এই প্রথম দেখা।

ইহার দুই দিন পরে। নবগোপাল গিয়া দেখিল—জনার্দ্দন নাই, একটা বড় অর্ডার পাইয়া বড়বাজার লোহা-পটীতে গিয়াছেন। ফিরিতেছিল, কিন্তু ঠিক দুপুরের রোদে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া বড় কষ্ট হইয়াছে, একটু না জিরাইলে পারা যায় না। জুতা খুলিয়া ফরাসের উপর বসিয়া খানিক পাখা করিল। আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল তবু জনার্দ্দনের দেখা নাই। আজ আর হইবে না। উঠিয়া জুতা পায়ে দিতে গিয়া নবগোপাল আর জুতা খুঁজিয়া পায় না। তক্তাপোষের নীচে তাকাইয়া দেখিল, সেখানে নাই। চৌকাঠের বাহিরে যদি রাখিয়া আসিয়া থাকে, খুঁজিয়া দেখিল সেখানেও নাই। নিমন্ত্রণবাড়ী ত নয় যে জুতা চুরি যাইবে,পাড়াগাঁ হইলে ভাবা যাইত শিয়ালে মুখে করিয়া লইয়া গেছে। ইতিমধ্যে ঘরেও কেহ আসে নাই। জুতা-বিভ্রাটে নবগোপাল চিন্তিত হইল। সাড়ে চারি টাকার জুতাজোড়া—একমাসও হয় নাই। হঠাৎ দেখিতে পাইল তক্তাপোষের ওদিকের পায়ার কাছে একজোড়া মল পড়িয়া আছে। মলের অধিকারিণীর কথা মনে পড়িল। তারপর ঠাহর হইল, মলজোড়ার কাছাকাছি তক্তাপোষের নীচে সিমেণ্টের একটা খালি পিপে পড়িয়া আছে, সেটা যেন নড়িতেছে। নবগোপাল কহিল—কে? কে ওখানে?—খুকী তুমি জুতো নিয়েছ নাকি?—সিমেণ্টের পিপে খুক্ খুক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। নবগোপাল বলিল—ও খুকী, বেরিয়ে এসো—ওখানে বিছে-টিছে কাম্‌ড়াবে, অমন জায়গায় লুকিয়ে থাকে কখনো? আচ্ছা এই আমি চোখ বুজ্‌লাম—এই—এই—কিচ্ছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, চোখ খুলে দেখ্‌বো এখানে আমার জুতোজোড়া আপনাআপনি পড়ে আছে—। জুতোজোড়া সত্য সত্যই যথাস্থানে পৌঁছিল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নবগোপাল চোখ মিট মিট করিয়া দেখিতেছিল। কাতু পলাইয়া যাইতেছে, ধাঁ করিয়া তাহার বাঁ হাতখানা ধরিয়া ফেলিল—ওরে দুষ্টু, শব্দ হবে বলে' মল খুলে রেখে জুতো চুরি—এত বুদ্ধি তোমার? কেমন এইবার—? কাতু আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নবগোপালের শক্ত মুঠি খুলিল না। হঠাৎ সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নবগোপাল ভারী অপ্রস্তুত হইল। বলিল—কাঁদো কেন খুকী, কি হোল?—খুকী বলিল,—আমার লাগে না বুঝি—হাত একেবারে ভেঙে গেছে, উহু হু। মহাব্যস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল দেখি দেখি, কোথায় লাগ্‌লো? না,কিছু হয় নি—ফুঃ—অঃ ছাঃ, ধুলো পড়ে দিচ্ছি,ধুলো আনো একমুঠো—ধুলোপড়া ধুলোপড়া ছাগলের শিং—কিন্তু মন্ত্র শেষ হইবার আগেই যন্ত্রণ নিরাময় হইল। নবগোপাল ধুলো পড়িতেছে, কাতু ফিক্ করিয়া হাসিয়াই দৌড়—দৌড়—দৌড়—। পিছন হইতে নবগোপাল ডাকিতে লাগিল—খুকী, তোমার মল পড়ে রইল—নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। আর খুকী!

পরদিন। এদিনে আর কোন বাধা নাই জনার্দ্দন বসিয়া আছেন, মহা আড়ম্বরে কাব্যচর্চ্চা হইতেছে। কাতু কাহাকেও কিছু না বলিয়া সরাসরি ফরাসের উপর গিয়া বাবার কাছে গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়িল। এই অতিশান্ত মেয়েটির যেন ইহা নিত্যকার অভ্যাস। এমন একমনে শুনিতে লাগিল যে ডাগর চোখের পাতাটিও নড়ে না। কবিতা পড়া শেষ হইল। নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন শুনলে খুকী? কাতু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল—ভালো। একটু পরে বলিল—তুমি অনেক ছড়া জানো—আমায় শিখিয়ে দেবে? নবগোপাল তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিল যে উহা ছড়ার মতো হেয় জিনিষ নয়—কবিতা, বইয়ের

মধ্যে ছাপা হইয়া বাহির হয়। কিন্তু কাতু প্রত্যয় করিল না, এই লোকটা—জামা গায়ে কাপড়-পরা আর সকলের মতো মানুষ একটা—তাহার ছড়া নাকি ছাপা হইয়া বই হয়! মাথা নাড়াইয়া বলিল—তুমি বই ছাপাও? যাঃ মিথ্যেবাদী কোথা কার—বই না হাতি—। কাতু সম্প্রতি বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, বইএর সম্ভ্রম বোঝে। নবগোপালের বড় ইচ্ছা হইল—নিজের নাম ছাপানো অবস্থায় দেখাইয়া এই বোকা মেয়েটার তাক লাগাইয়া দেয়। কিন্তু বাড়ী হইতে একবার ঘুরিয়া আসিতে না পারিলে তাহার উপায় নাই। জনার্দ্দন হিসাবী মানুষ—সাহিত্যরসিক বটে, কিন্তু মাসিক-পত্র কিনিয়া পয়সার অপব্যয় করেন না।

আর একদিন দুপুর বেলা। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—নবগোপাল খাতা বগলে ঘামিতে ঘামিতে আসিয়া রোয়াকে উঠিল। ঘরের ভিতর ফড়্ ফড়্ করিয়া ফুরশির আওয়াজ উঠিতেছে, কর্ত্তা যে বাড়ীতে আছেন এবং সচেতন অবস্থায় আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, নবগোপাল পুলকিত হইয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে বিশেষ আশা রহিল না। জনার্দ্দন ইজিচেয়ারে পড়িয়া নাক ডাকাইতেছেন, ফুরশির আওয়াজ বলিয়া যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নাকের ডাক, দূর হইতে নাক ও ফুরশির আওয়াজের প্রভেদ নির্ণয় করা দুষ্কর। কাতুও মেঝের উপর সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। নবগোপাল মনক্ষুণ্ণ হইল। এই কাঠ-ফাটা রোদে শ্যামবাজার হইতে এত পথ আসিয়াছে! মনে হইল কাতুর কি অসুখ করিয়াছে, ঘুমের ঘোরে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে, সমস্ত মুখ লাল, মাঝে মাঝে কাটা কবুতরের মতো ছট্ফট্ করিয়া উঠে। নবগোপাল বড় ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—কাতু, ও কাতু, কাত্যায়নী—। কাতু চোখ মেলিল বটে, কিন্তু কথা বলে না। এত ডাকাডাকি, জবাব নাই—স্বর বন্ধ হইয়া গেল নাকি? ডাক্তারেরা এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট কোন কোন ব্যারামের কথা বলিয়া থাকে বটে। জনার্দ্দনকে ডাকিয়া তুলিতে যাইতেছে, সহসা কাতু লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল—বাব্বাঃ, দুপুরে একটু ঘুমুতেও দেবে না—কী জ্বালাতন! সাথে সাথে নাক মুখ দিয়া প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হইতে লাগিল। বোঝা গেল, সে কেন কথা কহিতেছিল না। তামাক টানিতে টানিতে জনার্দ্দন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সাজা তামাক পাইয়া পোড়ার-মুখী চুরি করিয়া টানিয়া দেখিতেছিল। নবগোপাল বলিল—তামাক খাচ্ছিলি তুই—আমি বলে' দেবো, সব্বাইকে বলে' দেবো—। কাতু প্রতিবাদ করিল—বা-রে, আমি ঘুমিয়েছিলাম না? দেখো নি আমার চোখ বোজা?—আমি তামাক খাই নি। নবগোপাল বলিল—ও রে মিথ্যুক, তামাক খাস্ নি? তবে অত ধোঁয়া বেরুচ্ছিল কেন রে—নাক দিয়ে মুখ দিয়ে যেন ইঞ্জিনের চোঙের মতো? কাতু সাফ অস্বীকার করিল—কখন? কক্ষণো নয়! অমন মিছে কথা বোলো না—।

মিছে কথা? নবগোপাল হাত ধরিয়া ফেলিল—দেখি মুখ শুঁকে দেখি—এখনো গন্ধ রয়েছে, তোমার বাবাকে জাগিয়ে দেখাবো—দাঁড়াও—। কাত্যায়নী তাহার কনুইতে দিল কামড়, একেবারে দুটা দাঁত বসিয়া গেল। নবগোপাল হাত ছাড়িয়া দিয়া যন্ত্রণায় বসিয়া পড়িল। কনুয়ের সে দাগ আজও মুছিয়া যায় নাই। কাতুকে ভালবাসে, না ছাই! মেয়ে-মানুষ হইয়া তামাক খায়, হউক না ছোট মানুষ—অমন মেয়েকে ছাই পাতিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহার রক্তটুকুও যেন মাটিতে না পড়ে। আপনার কেহ হইলে নবগোপাল সেদিন ঐ মেয়েকে পিটাইয়া হাড় ভাঙিয়া দিত।

কিন্তু পাঁচ বছর আগেকার সেই চঞ্চল দুরন্ত কাতু আজ আনতনয়না শান্ত কিশোরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি গত বুধবারের বৃত্তান্তটা শোন—

বুধবারে বিকাল বেলা সেই যে বড় জল হইয়া গেল, তাহার কিছু আগে নবগোপাল যথারীতি খাতা সহ জনার্দ্দনের বাড়ী গিয়াছিল। বৈঠকখানার দুয়ার ভেজানো, সে অবস্থায় ধাঁ করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে নাই,—আগে কড়া নাড়িতে হয়, কড়া যদি না থাকে বারকয়েক সশব্দে কাশিলেও চলে। নবগোপালের ত সে কাণ্ডজ্ঞান নাই। ঘরে ঢুকিয়া মহা বেকুব হইয়া গেল। পাঁচ বছর এ বাড়ীতে গতায়াত, কোনদিন গিন্নী নবগোপালের সামনে পড়েন নাই, তিনি বৈঠকখানার দিকে আসেন না। কিন্তু ঐ দিন আসিয়াছিলেন এবং বিপুল বপু লইয়া তক্তাপোষের আধখানা জুড়িয়া বসিয়া ছিলেন, কর্ত্তার সঙ্গে কি একটা

কথা হইতেছিল। নবগোপালকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া কেবলমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জারক্ষা করিলেন, ঐ বপুখানা লইয়া অন্দরে পলাইয়া যাওয়া ত সোজা কথা নয়।

জনার্দ্দন ঠেকাইয়া দিলেন—আহা উঠ্‌ছো কেন? ও-যে নবগোপাল, ঘরের ছেলের মতো! ওর পদ্য পড়ো নি? দাড়ি-টাড়ি উঠ্‌লে ঠিক রবিঠাকুর হবে, বলে' দিচ্ছি—"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া লজ্জা করিলেন না। সাধ্যও ছিল না, এইটুকু দাঁড়াইয়াই হাঁপ ধরিয়া আসিয়াছিল। বলিলেন—তুমি নবগোপাল? কোনদিন দেখি নি বটে, ওঁদের মুখে খুব নাম শুনে থাকি—। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো—বাবা, বোসো—। এবং একটু পরেই সহসা কর্ত্তার উপর ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—হাত গুটিয়ে বসে' থাক্‌লে যে? ফর্দ্দ-টর্দ্দ করো, ভদ্দোর লোককে শুধুমুখে বিদায় কর্‌তে হবে নাকি?—গিন্নি বলিয়া গেলেন, কর্ত্তা নিরাপত্তিতে ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন—সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি ইত্যাদি, ভদ্রলোককে ঠিক যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতে হয়! তাঁহার প্রথমদিনই মিষ্টান্নের কথা মনে পড়িয়াছে অথচ জনার্দ্দন পাঁচ বছর কেবল ভূরি ভূরি মিষ্টকথাই শুনাইয়াছেন। এই বস্তুতান্ত্রিক আপ্যায়নে নারীজাতির প্রতি ভক্তিতে নবগোপাল আপ্লুত হইয়া উঠিল।

গিন্নি উঠিলেন, বড় ব্যস্ত। বলিলেন—তুমি এসেছো, থির হ'য়ে যে দুটো কথা বল্‌বো বাবা, তার কি যো আছে? —দেখিগে আবার ওদিকে, চারখানা লুচির যোগাড় ত কর্‌তে হবে?—

লোকে নাকি বলিয়া থাকে, বাংলাদেশে কবিতা লিখিয়া কোন খাতির নাই!

কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নিজহাতে নগদ আট আনার মিষ্টান্নের ফর্দ্দ করিয়া দিয়া এবং তদতিরিক্ত লুচির প্রস্তাবের পরেও জনার্দ্দন হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—আজকে যে তুমি এসেছো, খাসা হয়েছে—তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম, ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন—। ওরে বেহায়া মেয়ে, তারা এক্ষুণি এসে পড়্‌বে—এ দিকে যে বড় ঘুর্‌ ঘুর্‌ কর্‌ছিস্‌?

বেহায়া মেয়ে বলা হইল কাতুকে। সে ওদিকের দুয়ারের সামনে দিয়া যাইতে যাইতে নবগোপালকে দেখিয়া দাঁড়াইল, হয় ত ঘরেও আসিত, কিন্তু বাবার তাড়া খাইয়া সরিয়া গেল।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কারা আস্‌বে?

জনার্দ্দন বলিলেন—আহিরীটোলা থেকে—কারা-টারা নয় হে—সেই একজনই, তোমাদের আজকালকার যেমন দস্তুর। আমি এ ভালোই বলি—যার জিনিষ সে-ই দেখে শুনে বাজিয়ে নিয়ে যায়, মন্দ কি?

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কাতুর বিয়ে নাকি?

—সে কি বাপু, আমার হাত? জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতার নিয়ে—যদি আরজন্মে ওদের হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকে, তবে ত? বাবাজীবন নিজেই দেখ্‌তে আস্‌ছেন আজ—।

নবগোপাল কহিল—বেশ ভালো কথা।

জনার্দ্দন বলিতে লাগিলেন—ভালো বলে' ভালো? কাজ যদি ওখানে লেগে যায়, বুঝ্‌বো মেয়ের ভাগ্যি, মেয়ের বাবারও ভাগ্যি। হাঁ—সম্বন্ধ বটে! অবিনাশ দত্তের নাম শোন নি? সেই-ই—

নামটি হয় ত সুবিখ্যাত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নবগোপাল শুনে নাই। জনার্দ্দনের কথাতেই সমুদয় পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল—তবু গিন্নি বলেন, এমন পটের মতো মেয়ে দোজবরের হাতে! আরে লোহাপটীতে তিন-তিনখান দোকান, কম্‌সে কম লাখো টাকা খাট্‌ছে—দোজবরে বল্লেই হোল? সুভালাভালি দু' হাত এক হোক্‌, তারপর বছরের মধ্যে আমার ব্যবসার ভোল ফিরিয়ে না দিতে পারি ত তখন দেখো—। বাবাজীবন মানুষ খুব ভালো, এরি মধ্যে অনেক আশা-টাশা দিয়েছেন—বুঝ্‌লে?

নবগোপাল বলিল—তবে আমি উঠি, আপনারা ব্যস্ত আছেন—

জনার্দ্দন বলিলেন—উঠ্‌বে মানে? আমি যে ভাব্‌ছিলাম তোমার কথাই। বাবাজীবন নিজে মেয়ে দেখ্‌বেন, আমি বাপ হ'য়ে কি করে' সেখানে থাক্‌বো? এসে যখন পড়েছ, তুমি ঘরের ছেলে—তোমাকে সব সেরে সাম্‌লে দিতে হবে। যে হাবা মেয়ে, কি কথার কি সব উত্তর দিয়ে বস্‌বে তার ঠিক কি?

যথাসময়ে বাবাজীবন আসিলেন। আধুনিক দস্তুর-অনুযায়ী নিজেই পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন বটে, তা বলিয়া বয়স হিসাবে তিনি কিন্তু অতি আধুনিক নহেন। ভুঁড়ি দেখিলেই প্রত্যয় জন্মে টাকা আছে এবং লোকটি কাজেরও। আসিয়াই হুকুম করিলেন চট্‌ পট্‌ নিয়ে আসুন কিচ্ছু সাজাবেন না—একেবারে এককাপড়ে, যেমন আছে তেমনি—

ঝি কাতুকে লইয়া আসিল। জনার্দ্দন নবগোপালকে বিশেষ প্রকারে ইসারা করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। কিন্তু কাতু সত্যসত্যই এককাপড়ে আসে নাই। দেখিলে হাসি আসে, সাজিলে গুজিলে তাহাকে কি মানায়? টিপ্‌ পরিয়া চুলে পাতা কাটিয়া মা ঠাকুরমা এবং বাড়ী-শুদ্ধ বোধ করি বা পাড়াশুদ্ধই সকলের নানা আকারের বিবিধ গহনায় সর্ব্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া রাঙা বেনারসীর আঁচল লুটাইতে লুটাইতে কাতু আসিয়া ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ হাঁকিলেন—তোল তোল—মুখটা উঁচু করো - ও ঝি, মুখটা তুলে ধরো না গো—। ঝি মুখ উঁচু করিয়া ধরিল কিন্তু তখনই নামিয়া পড়িল—অবিনাশ দুই চোখের দূরবীণ কষিবার সময় পাইলেন না, আর মেয়ে ঘামিয়া ঘামিয়া খুন হইতেছে, পড়িয়া যায় আর কি! নবগোপাল হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল।

অবিনাশ ঘাড় নাড়াইয়া বলিলেন—উঁহু, বস্‌লে হবে না—হাঁটিয়ে দেখ্‌তে হবে যে—ঝি, তুমি নিয়ে যাও ত ঐ দেয়ালের কোণ অবধি -।

হাঁটাইয়া দেখা হইল। খোঁপা খুলিয়া চুলের বহর মাপা হইল। হাতের কব্জিতে বুড়া আঙুল ঘসিয়া ঘসিয়া অবিনাশ সঠিক বুঝিলেন, পরিদৃশ্যমান রঙটাও মেকী নহে। কিন্তু দৃষ্টি-পরীক্ষা লইতে গিয়া বাধিল মুস্কিল। কাতু কিছুতেই চোখ মেলিয়া তাকাইতে পারে না। এদিকে নেপথ্য হইতে জনার্দ্দন নবগোপালকে পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত করিতেছেন এবং হাত পা নাড়িয়া কাতুর উদ্দেশ্যে শাসাই-তেছেনও খুব। কিন্তু খানিক ঘাড় তুলিয়া তাকাইতে গিয়া আবার নীচু হইয়া পড়ে, কাতুর আর তাকানো হয় না। নবগোপাল বুঝাইতে লাগিল—এমন ত দেখিনি—আহা, অত লজ্জা কিসের? বুঝ্‌লেন অবিনাশ বাবু, বড্ড লাজুক—যেন একালের মেয়ে নয়। এমন ভালো আপনি মোটে দেখেন নি। কই—তাকাও, তাকাও না - আচ্ছা, আমার দিকে তাকালেই হবে—আমার দিকে —আমার দিকে—হাঁ, এই যে—ভালো করে'—

কোন প্রকারে একপলক চাহিয়াই কাতু ঘাড় গুঁজিল, যেন দুটা চোখের খোঁচা মারিল। আর একদিন দুটা দাঁত বসাইয়াছিল, হঠাৎ এমন-এমনি সে কথা নবগোপালের মনে পড়িয়া গেল।

অবশেষে কাতু ছুটী পাইল। সাথে সাথে জনার্দ্দন আসিলেন এবং আসিল লুচি সহযোগে সেই সন্দেশ ক্ষীর-মোহন প্রভৃতি একখানি মাত্র রেকাবী বোঝাই হইয়া। দেখা গেল, অবিনাশের উদরে আয়তনের অনুপাতে স্থানেরও প্রাচুর্য্য আছে। নবগোপাল উঠিল। জনার্দ্দন কিছুতেই ছাড়িবেন না—শুভকর্ম্মের মধ্যে এসে পড়্‌লে—নেহাৎ একটা পান খেয়ে যাও—। কিন্তু নবগোপাল দাঁড়াইল না। মোড়ে আসিয়া আধ পয়সার পান কিনিল, ফিরিয়া ফিরিয়া জনার্দ্দনের বাড়ীর দিকে তাকাইতে লাগিল, দোক্তা লইল, আর একবার সুপারি চাহিয়া লইল, বোঁটার আগায় করিয়া একটুখানি চুণও লইল, শেষে ভক্‌ ভক্‌ করিয়া অবিনাশের গাড়ী তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, সেও বড়রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

আজ সকালে নবগোপালের মেসে একখানা লাল রঙের চিঠি আসিয়াছে—আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আহিরীটোলা নিবাসী ৺পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র দত্ত বাবাজীউর সহিত মদীয় কন্যা কল্যাণীয়া কাত্যায়নী দাসীর শুভবিবাহ হইবেক। মহাশয় সানুগ্রহে উক্ত দিবস ইত্যাদি। চিঠি পড়িয়া নবগোপালের মনে হইল তাহার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, শুভকর্ম্মের কতদূর কি হইল এ কয়দিনের মধ্যে একবার সন্ধান লওয়া উচিত ছিল। বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে নেবুতলায় গেল। জনার্দ্দনের সঙ্গে দেখা হইল না, তিনি হোগলার মেরাপ বাঁধিবার বায়না দিতে গিয়াছেন। কাতুকে ডাকিয়া এক গ্লাস জল চাহিল। জল খাইতে খাইতে নবগোপাল কহিল—তোর ভাগ্যি ভালো রে কাতু, অবিনাশের বউ হচ্ছিস—শুনেছিস ত কতবড় লোক, শুনিস নি আবার—

শ্বশুরবাড়ীর কথা চুরি করে' শুনেছিস। সত্যি, এবারে তুই রাজরাণী হ'লি—। কাতু গেলাস লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নবগোপাল আবার বলিল—তোর বিয়ের পদ্য ছাপাবো, আজ দুপুরে লিখে ফেলেছি—এইসা হয়েছে—

কাতু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সত্যি নাকি? ভালো হয়েছে—?

—খুব ভালো হয়েছে—হবে না কেন? প্রাণের ভেতর থেকে এসেছে কিনা—তুই ত পর ন'স—

কাতু হাসিয়া কহিল—পর নই, আপনার?

বড্ড আপনার রে—। আচ্ছা, শুনে দেখ্—পকেটেই পদ্য আছে—

পকেট হইতে পদ্য বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ী পরিজন স্বধর্ম্ম স্বদেশ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া অবশেষে নবদম্পতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে, কোন বিষয়ে আর খুঁত ধরিবার যো নাই। নবগোপাল সগর্ব্বে কহিল—কেমন হয়েছে? বল্ ত এবার—লজ্জা করিস নে—

—না, লজ্জা কোর্‌বো না,—দেখি বলিয়া কাতু কবিতাটি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ছিঁড়িয়াই নির্ব্বাকভাবে চলিয়া যাইতেছিল, নবগোপালও প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ছিঁড়্‌লে যে বড়ো! কেন আমার কবিতা ছিঁড়্‌লে—কেন?

কাতু শান্তভাবে কহিল—তুমি ছাইভস্ম লিখ্‌বে কেন? আমাদের যে শুনে ঘেন্না ধরে' যায়—

নবগোপাল কহিল—আমি ছাইভস্ম লিখি?

—লেখোই তো। প্রাণের ভেতর থেকে এসেছে, বল্‌ছিলে না?—তোমার প্রাণ নেই। তুমি যদি পদ্য ছাপাও আমি গলায় দড়ি দেবো—কী করেছি আমি তোমার? বলিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে কাতু ছুটিয়া পলাইল।

কবিতার নিন্দা করিলে নবগোপাল ক্ষমা করে না। সে সাব্যস্ত করিয়াছে, কাতুর বিয়েয় সে যাইবে না। না যাক্, তাহাতে শুভকর্ম্ম আট্‌কাইয়া থাকিবে না, তোমরা যদি ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ চাও ২৪শে সন্ধ্যার পর নেবুতলা লেনে জনার্দ্দনের বাড়ী ঢুকিয়া পড়িও মিষ্টান্ন মিলিবে। নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছি জামরুল গাছ-ওয়ালা সাদা বাড়ী—দেখিলেই চিনিতে পারিবে।

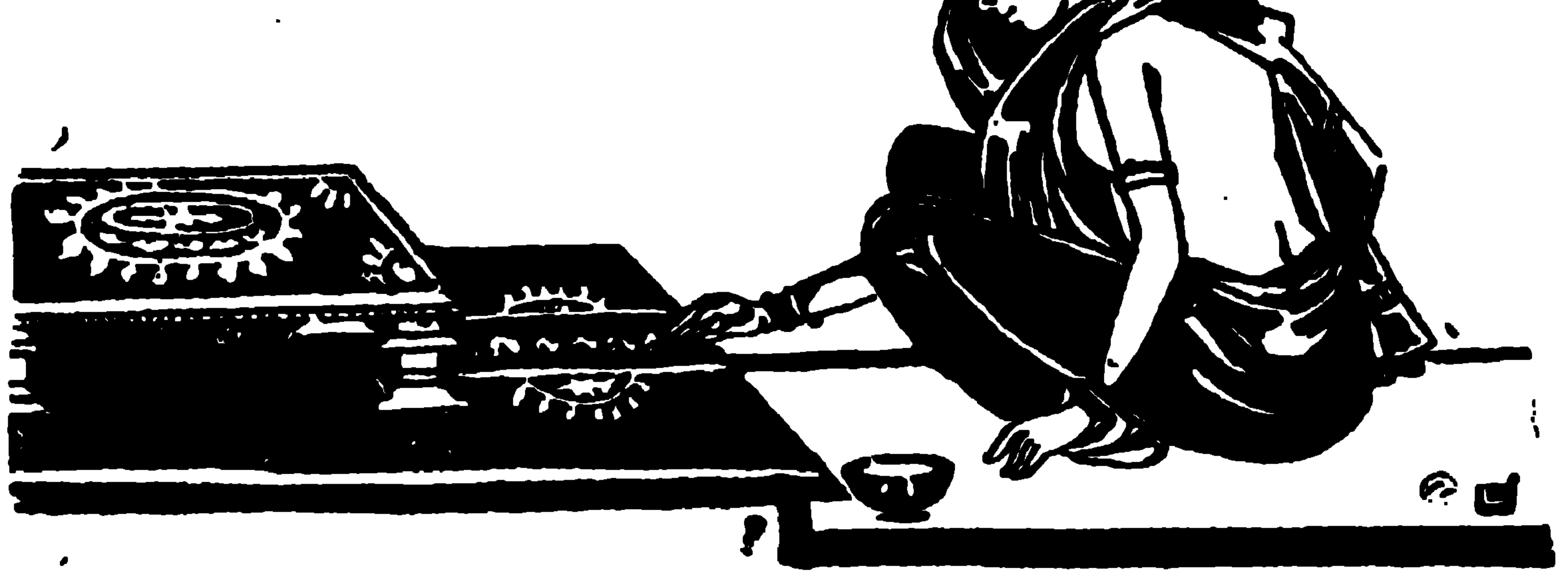

পতঙ্গের মৃত্যু

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ছোটো রাতের পোকা উড়্‌ছিল খুব জোরে,
দেয়ালেতে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ গেছে পড়ে'।
কেউ জানে না পড়্‌ল কখন, কেউ দেখেনি গায়,
কতই অমন রাতের পোকা আপ্‌নি আছাড় খায়!
এ কিন্তু আর উড়্‌লো নাকো—কি হ'ল কে জানে,—
নিঝুম মেরে রইল পড়ে' একলাটি সেইখানে।
রাত্তিরেতে বাড়ীর মধ্যে ঘুমোয় যখন লোকে
জ্যান্ত পোকার পেট চিরে সব পিঁপ্‌ড়ে তখন ঢোকে!
একটি দুটি করে' শেষে মিল্‌ল দু'চার শত,
সারাটা রাত কাম্‌ড়ে খেয়ে চল্‌ল অবিরত।
ছোটো পোকা জ্যান্ত আছে—মাংস নিয়ে তা'র
পিঁপ্‌ড়ে বাড়ীর তল্লে চলে পিঁপ্‌ড়ে সারেসার!

সকাল হ'ল।—বারান্দাতে খেল্‌তে এসে খোকা
ছট্‌ফটিয়ে মর্‌ছে দেখে একটি রাতের পোকা।
পেটটা তাহার ফাঁপ্‌রা তখন খোলার ওপরটাতে
মাথাটুকুই বাকী কেবল—পিঁপ্‌ড়ে ঢোকে তা'তে!
মরেও যে তা'র নাইকো মরণ তবু নাড়ায় পা'!
সারা শরীর ফুরিয়ে এলো আয়ু ফুরায় না।
খোকার দাদা এসে দেখে খোকার চোখে জল;
বল্‌লে, হাঁরে, কি হয়েছে? কাঁদিস্ কেন বল্।
পোকা বলে, আচ্ছা এমন নিঠুর কেন এরা?
জ্যান্ত পোকা খায় কি করে' রাক্ষুসে পিঁপ্‌ড়েরা?
দাদা বলে, এরি তরে কাঁদ্‌বি নাকি বসে'?
কালের মুখে পড়্‌ল পোকা আপন ভাগ্যদোষে।
ওরে খোকা, সংসারেতে নিত্য এমন হয়,
ভোগের জিনিষ ঠাণ্ডা হ'তে সবুর নাহি সয়।
এই না বলে' জুতোয় পিষে ফেল্‌লে মেরে পোকা;—
"ও দাদা,—কি কর্‌লে' বলে' ডুক্‌রে ওঠে খোকা।

সাঁওতালী সৃষ্টি-রহস্য

শ্রী কালীপদ ঘটক

সাঁওতাল পরগনা জেলার আদিম অধিবাসী সাঁওতাল-গণ পৃথিবীর প্রাচীন অনার্য্যজাতিদিগের অন্যতম। নিত্যোন্নতিশীল জগতে বহু মূর্খ ও বর্ব্বর জাতি দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে অগ্রসর হইয়া কালপ্রবাহে আজ জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চাসনে সমারূঢ়। কিন্তু তেমনি শান্ত—তেমনি অবোধ—তেমনি সুন্দর এই সাঁওতাল জাতি চিরন্তনের সাক্ষী স্বরূপ আজও ভারতের তথা পৃথিবীর বক্ষে বর্ত্তমান। "কালস্য কুটিলা গতিঃ" এ পর্য্যন্ত তাহাদের গণ্ডী অতিক্রম করিবার সুযোগ পায় নাই। ইহাদের দৈনন্দিন কার্য্যপদ্ধতি ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সরল নিরক্ষর সাঁওতালগণ মুক্ত নীল আকাশের তলে তাহাদের ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলি বাঁধিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার সহ মহানন্দে কালাতিপাত করে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি সকল ঋতুই তাহারা সমান ভাবে সহ্য করিতে সক্ষম। জনহীন প্রান্তর, অরণ্য এবং পার্ব্বত্য স্থান সাঁওতালদিগের প্রিয় আবাসভূমি। এক এক স্থানে চার পাঁচটি সাঁওতাল পরিবার একত্রিত হইয়া বাস করে, অনেক স্থানে দুই একটি এমন কি একটি মাত্র পরিবারকেও বাস করিতে দেখা যায়।

তাহাদের শরীর সুস্থ সবল এবং বর্ণ অতিশয় কালো। রোগ-ব্যাধি একরূপ হয় না বলিলেই হয় এবং কেহ কখনও ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করে না। কদাচিৎ কাহারও কোন অসুখ হইলে লতা-গুল্ম, বৃক্ষের মূল এবং উত্তপ্ত লৌহশলাকার চিড়ি * ব্যবহার করিয়া আরোগ লাভ করে। তাহারা সকলেই জনমজুর, কৃষিকার্য্য ও মৃত্তিকা খনন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের আহার্য্য সংস্থান করিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া বন্যজন্তু শিকার করিয়া আহার করে। ফেন-ভাত ইহাদের প্রধান খাদ্য, কেহ কেহ তৎসঙ্গে সামান্য শাকসব্জীও আহার করিয়া থাকে। ধনুর্বিদ্যায় ইহারা বিশেষ পারদর্শী; ইহাদের শরসন্ধান কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখা যায়।

এতদ্দেশে সাঁওতালেরা 'মাঝি' ও তাহাদের স্ত্রীলোকেরা 'মেঝেন্' নামে সুপরিচিত। ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, অতিশয় পরিশ্রমী ও সরলবিশ্বাসী। কিন্তু একগুঁয়েমি সাঁওতালদিগের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। একবার যদি তাহারা কোন জিনিষকে সত্য বলিয়া বুঝিয়া লয়, তাহা হইলে আর কাহারও সাধ্য নাই যে তার বিপরীত ভাবটি তাহাদিগের নিকট প্রতিপন্ন করে। কিন্তু যদি কোন ব্যাপারে একবার 'না' বলিয়াছে, তাহা হইলে প্রাণান্তেও আর 'হাঁ' বলিবে না। মোটের উপর ইহারা অতি উদারপ্রকৃতির মানুষ—ছল চাতুরী প্রতারণায় চির অনভ্যস্ত। মধ্যে মধ্যে মাঝি ও মেঝেনরা একত্র হইয়া মাদল, লাগ্‌রা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সমন্বয়ে নৃত্যগীত করিয়া থাকে। নিম্নে একটি গানের নমুনা প্রদত্ত হইল—

দংসিরিং। †

মিলান্ মিলান্ টাণ্ডিরে তালা মিলান্ টাণ্ডি।
তকই দুলান কিদা বার চুড়ে—
তকই দুলান কিদা বার চুড়ে।
ইঙ্গি মাহাশয় জুরি গি বাং
ইঙ্গা আপা দিল্‌তে দুলান কিদা॥

মাদলের তাল—

দাতাড়্ দাড়প্ দৈতিড়্ হিতাং তিড়্ ভদিড়্ তাঁড়্
বেঢপ্ দড়াং—তিড়িং তাঁড়্ বেঢপ্ দড়াং।

মেঝেনদিগের সমবেত কণ্ঠের সুমিষ্ট গান, অভিনব নৃত্যকলা ও মনোহর অঙ্গভঙ্গী প্রত্যেক গুণগ্রাহী ব্যক্তিরই হৃদয় স্পর্শ করে।

তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের কোন গ্রন্থাদি দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার প্রধান কারণ সাঁওতালী ভাষার কোন সাহিত্য নাই এবং অন্যান্য ভাষাতেও তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহাদের শাস্ত্রাদি, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু জাতীয় সম্পদ তৎসমস্তই এতাবৎ তাহাদের মুখে মুখে গল্পচ্ছলে চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন বিজ্ঞ সাঁওতালের নিকট তাহাদের শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায়। বহু কষ্টে বহু স্থান ঘুরিয়া তাহাদের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম।

সৃষ্টির পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। চারিদিকে শুধু অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অনন্ত জলরাশি। সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্যমান ছিল। ঠাকুর ও ঠাকরাণ্ * প্রত্যহ স্বর্গ হইতে ঐ দ্বীপে অবতরণ পূর্ব্বক স্নান করিতেন। তাঁহারা সঙ্গে লইয়া আসিতেন এক স্বর্গীয় আলোক। একদিন স্নানের সময় গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে ঠাকরাণের স্কন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ ময়লা নির্গত হইল। ঠাকরাণ্ আনমনে উভয় হস্তদ্বারা সেই ময়লা লইয়া মর্দ্দন করিতে করিতে দেখিলেন তাহা দুইটি পক্ষীর আকারে পরিণত হইয়াছে। ঠাকুর ঠাকরাণ্ তদ্দর্শনে পরম প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ঐ যুগল পক্ষীর প্রাণদান করিলেন। একটি হইল পুরুষ, অপরটি স্ত্রী। পক্ষীদ্বয় সজীব হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে ঠাকুর ও ঠাকরাণ্ যুগপৎ আনন্দ ও চিন্তায় অভিভূত হইলেন। চিন্তার কারণ—সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে পক্ষীদম্পতির বাসস্থানের অভাব। উভয়েই ঘোর চিন্তামগ্ন। দুশ্চিন্তায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল স্বেদযুক্ত হইল। ঠাকরাণ্ হস্তদ্বারা ললাট স্বেদমুক্ত করিয়া তাহা দ্বীপবক্ষে পরিত্যাগ করিলেন; তাহা হইতে উৎপন্ন হইল এক কারাম বৃক্ষ †। তৎপরে জলের উপর নিষ্ঠীবন

* কোস্কা।

† বিয়ের গান।

* প্রধান দেবতা ও দেবী।

† চাকল্‌তা গাছ।

ত্যাগ করায় পদ্মের মৃণাল ও পদ্মপাতার সৃষ্টি হইল। স্নানের সময় কেশ স্খলিত হওয়ায় বীণা নামক এক-প্রকার গুল্মগুচ্ছের উদ্ভব হইল। পক্ষীদম্পতী সেই কারাম বৃক্ষে নীড় বাঁধিয়া এবং সেই বীণাগুচ্ছে ও পদ্মপাতায় বিচরণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে ভাবিয়া উভয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন। ঠাকুর ও ঠাক্‌রাণের ইচ্ছাক্রমে পক্ষীদ্বয়ের আহারেরও সংস্থান হইল। সেদিনের মত দেবদম্পতী স্নানান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ঠাকুর ও ঠাক্‌রাণ্ স্নান করিতে আসিয়া প্রত্যহ পক্ষীদ্বয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে পক্ষিণী গর্ভধারণ ও ডিম্ব প্রসব করিল। তাহা দেখিয়া দেবদম্পতী আনন্দ অনুভব করিলেন।

সেই অনন্ত সমুদ্রগর্ভে এক বৃহদাকার সর্প বাস করিত। সে পক্ষীডিম্বের সন্ধান পাইয়া কারাম বৃক্ষস্থিত নীড় আক্রমণ করিল এবং সেই ডিম্বগুলি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঠাকুর ও ঠাক্‌রাণ্ পূর্ব্বদৃষ্ট ডিম্বগুলি পরদিন আর দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইলেন। এইরূপে কয়েকবার ডিম্বগুলি বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহারা স্বর্গ হইতে একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তাহা হইতে একটি বলিষ্ঠ জলচর কুকুর সৃষ্ট হইল এবং সে ঐ পক্ষীনীড়ের প্রহরী নিযুক্ত হইল। পক্ষিণী পুনশ্চ দুইটি ডিম্ব প্রসব করিল, সর্প তাহা আক্রমণ করিলে কুকুর তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিল।

যথাকালে ঐ ডিম্বদুইটি প্রস্ফুটিত হইলে তাহা হইতে দুইটি মানবশিশুর উৎপত্তি হইল—একটি পুরুষ, অপরা প্রকৃতি। পক্ষীদ্বয় বিজাতীয় অদ্ভুত প্রাণীযুগল দর্শন করিয়া সভয়ে পলায়ন করিল। ঠাকুর ও ঠাক্‌রাণ্ উক্ত শিশুদ্বয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে কপিলা গাভীর দুগ্ধ আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। শিশুদ্বয়ের নাম হইল—পিল্‌চু ও পিল্‌চী। ইহারাই সৃষ্টির আদি পুরুষ ও আদি স্ত্রী। ক্রমে ক্রমে শিশুদ্বয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঠাকুর, ঠাক্‌রাণ্ ও মারাংবুরু (১) প্রভৃতি দেবগণ ঐ শিশুদ্বয়ের বাসস্থানের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সংকল্প করিলেন। উপরে স্বর্গ, মধ্যে জলরাশি ও পাতালে মৃত্তিকা; সেই পাতালপুরী হইতে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য কে মৃত্তিকা উত্তোলন করিবে ইহাই হইল সমস্যা। দেবগণ দ্বীপে অবতরণ করিয়া সমস্ত জলচর প্রাণীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক মৃত্তিকা উত্তোলনের জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে কাঁক্‌ড়া অগ্রসর হইয়া, বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য দেবগণের নিকট তাহার মস্তক রাখিয়া গেল। কিন্তু মৃত্তিকা উত্তোলনের সময় সেই কুচক্রী সর্প জলরাশি মন্থন করিতে লাগিল। তজ্জন্য উত্তোলিত মৃত্তিকা মধ্যপথ হইতে পুনরায় পাতালস্থ হইল। কাঁক্‌ড়া অকৃতকার্য্য হইল, সুতরাং তাহার মস্তক আর ফিরিয়া পাইল না। এইজন্য অদ্যাপি কাঁক্‌ড়ার মস্তক দৃষ্ট হয় না। পরে চিংড়ি মাছও এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহার গচ্ছিত উদরটি বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল। বোয়াল মাছ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিল, মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহার মুখবিবর সুদীর্ঘ হইয়া গেল। মাগুর, শোল প্রভৃতি মৎস্যগণও উক্তরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া গাত্রাবরণ শূন্য হইল।

দেবগণ চিন্তিত হইয়া বিরাটকায় কেঁচোকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কেঁচো কহিল যে অনেক জলচর প্রাণী তাহার শত্রু, সুযোগ পাইলেই তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারে। সুতরাং তাহার রক্ষণের কোন সুবন্দোবস্ত হইলে এবং তাহার উত্তোলিত মৃত্তিকা ধারণ করিবার জন্য জনৈক সহকারী পাইলে সে এ কার্য্য অক্লেশে সম্পন্ন করিতে পারে। দেবগণের আদেশে বিশ্‌কুর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) একটি ষোলমণ লৌহের সুদীর্ঘ নল প্রস্তুত করিলেন, সেই নলের এক প্রান্ত পাতাল স্পর্শ করিল ও অপর প্রান্ত জলরাশির উপর বিদ্যমান রহিল। এক প্রকাণ্ড কচ্ছপকে কেঁচোর সহকারী নিযুক্ত করা হইল। উপরিস্থ নলের মুখের নিকট তাহাকে স্থাপন করিয়া তাহার তিনটি পা লৌহ-শৃঙ্খলিত করা হইল—যাহাতে গুরুভার-বহনে বিচলিত হইয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে না পারে। কেঁচো উপরিস্থ নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাতালে মৃত্তিকা ভক্ষণ আরম্ভ করিল এবং নলের অপর প্রান্তস্থ দেহপ্রান্ত দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে পাতালস্থ মৃত্তিকারাশি কচ্ছপের পৃষ্ঠে সংগৃহীত হইয়া গগনস্পর্শী বিরাট পর্ব্বতে পরিণত হইল। এই কচ্ছপ নড়িলেই অদ্যাপি ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

ঠাকুর ও ঠাক্‌রাণের আদেশক্রমে মারাংবুরু

(১) ঈশ্বর বা ধর্ম্মরাজ।

সহকারী দেবগণ সহ ঐ পর্ব্বত সমতল করিবার জন্য গরু, মহিষ, লাঙ্গল, কুরণ (১) প্রভৃতি লইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন। আলোক দেখাইবার জন্য তাঁহারা জোনাকী পোকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুদিগের চারি পায়ে লৌহের তার দ্বারা বাঁধিয়া তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে নামান হইয়াছিল, তজ্জন্য অদ্যাপি গো-মহিষের খুর দ্বিখণ্ডিত। দেবগণের প্রচেষ্টায় গগনস্পর্শী পর্ব্বত সমতলীকৃত হইল। তিন অংশ স্থল ও এক অংশ জল (?) লইয়া পৃথিবী সৃষ্ট হইল। পিল্‌চু ও পিল্‌চী ক্রমে ভাষাবিদ্ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং মারাংবুরু তাঁহাদিগকে কৃষিকার্য্যে দীক্ষিত করিয়া লাঙ্গল, গরু প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক বিবিধ গাছ-গাছ্‌ড়া উৎপন্ন করিলেন। পৃথিবী সৃষ্টির পর দেবগণ সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া দিবা ও রাত্রি দ্বারা সময়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপরে চারিটি যুগের সৃষ্টি হইল, যথা—মান, বীণ, পায়দা ও কলি। পিল্‌চু ও পিল্‌চী কৃষি-উৎপন্ন শস্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

পৃথিবীতে মানব-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার জন্য দেবগণ স্বর্গ হইতে এক কুম্ভকার প্রেরণ করিয়া বহুসংখ্যক মাটির মানবমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের প্রাণদান করিলেন। মূর্ত্তিগুলি সজীব হইল বটে, কিন্তু তাহারা মূক, মূর্খ ও অতিশয় কদাচারী হইল। তাহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার সাধিত হইবে না ভাবিয়া মারাংবুরু তাহাদিগের ধ্বংসের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা পিল্‌চু জমি কর্ষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ বৃষদ্বয় চমকিত হইয়া লম্ফপ্রদান করিল। শত চেষ্টাতেও তাহারা একপদ অগ্রসর হইল না। পিল্‌চু বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; হঠাৎ এক ক্ষুদ্রকায় পক্ষী আসিয়া তাঁহার মস্তকে চঞ্চুর আঘাত করিল। পিল্‌চু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন পশ্চিম দিকে বিরাট অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। পক্ষীর ইঙ্গিতে তৎসহ সস্ত্রীক এক প্রস্তর-গহ্বরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার গরুগুলিও আশ্রয়প্রাপ্ত হইল। পাঁচ দিন ও পাঁচ রাত্রি অবিরত অগ্নিবৃষ্টি হওয়ার পর পূর্ব্বদিক হইতে শীতল বারিপাত আরম্ভ হইল এবং পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি পরে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

এই দশ দিন ও দশ রাত্রির অবসানে পিল্‌চু ও পিল্‌চী গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন—মূক ও কদাচারী মনুষ্যগুলি গতায়ুঃ এবং পৃথিবীস্থ তৃণগুল্মাদি সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আহার্য্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইবে এই চিন্তায় তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড মৃত মহিষ ভূপতিত রহিয়াছে। পিল্‌চু পিল্‌চী ঐ মহিষের মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া দেখিতে পাইলেন সেই স্থানের তৃণগুল্মাদি সজীব রহিয়াছে, সেগুলি তাঁহারা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিলেন,—তাহা হইতে পৃথিবী পুনরায় শস্যশ্যামলা হইল। এইরূপে দিন চলিয়া যায়। পিল্‌চু ও পিল্‌চী যৌবনে উপনীত হইলেন, কিন্তু কাহারও মনে লালসার লেশ মাত্র জাগে নাই। তাঁহারা নিরাবরণ অঙ্গে বাস করিতেন। দেবগণ এই আদি দম্পতীর বংশসৃষ্টির সহায়তা করিবার জন্য মারাংবুরুকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি পিল্‌চু ও পিল্‌চীকে কতকগুলি গাছগাছড়া হইতে বাখর (২) ও তাহা হইতে একপ্রকার মদ্য-প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিয়মিত ভাবে উহা পান করিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের সাত পুত্র ও আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে তাঁহাদের মনে লজ্জাবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহারা বৃক্ষপত্র ও বল্কল দ্বারা অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতেন। এই সময় আদি দম্পতী পিল্‌চু হাড়াম ও পিল্‌চী বুড়ী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন। পুত্রকন্যাগণ কৈশোর প্রাপ্ত হইলে একদিন পিল্‌চু হাড়াম সাত পুত্র সহ জঙ্গলে শিকার করিতে বহির্গত হইলেন। পিল্‌চী বুড়ীও তাঁহার আট কন্যাকে লইয়া বনান্তরে ফলমূল ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। উভয় দল পথভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কেহ আর কাহারও কোন সন্ধান পাইল না। বহুদিবস পরে পিল্‌চু হাড়াম ও পিল্‌চী বুড়ী অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে পরস্পর মিলিত হইলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুকাল পরে স্বর্গারোহণ করিলেন।

ক্রমে তাঁহাদের পুত্র ও কন্যাগণ যৌবনে পদার্পণ করিল। তখন সকলেই পরস্পর দলের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

(১) জমির ভূমি সমতল করিবার একপ্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র।

(২) মদ্য প্রস্তুত করিবার মসলা।

কিছুদিন পরে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অরণ্যমধ্যে উভয় দল মিলিত হইল। পুরুষেরা স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দর্শন করিয়া পরম প্রীত ও বিমোহিত হইল। পরিচয়ে তাহারা পরস্পরের অজ্ঞাতই রহিল। সপ্ত যুবকের সহিত দ্বিতীয়া হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত সপ্ত যুবতী মিলিয়া হইয়া তাহাদের হৃদয় বিনিময় করিল। প্রথমা তাহার নারীত্বের ব্যর্থতায় ব্যথিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গিনীগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে কি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবে? তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিল যে সেই সাত যুবকযুবতীর সন্তান-সন্ততিগণের ধাত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া সে অতি সমাদরে তাহাদের সম্প্রদায়ে বাস করিতে পারিবে। তদবধি প্রথমার নাম হইল মারাংধাই। বিবাহের পর সাতজনে সাতটি গ্রাম নির্ম্মাণ করিল এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবনযাপন করিতে লাগিল। এই সপ্ত ভ্রাতার সাতটি বিভিন্ন গোত্র হইল—যথা হাঁস্‌দা, হেম্বরম্, কিস্‌কু, মুর্ম্মু, টুডু, সরেং ও বাস্‌কী।

কিছুকাল পরে মারাংধাইয়ের মৃত্যু হইল। সকলে মিলিয়া তাহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া বিরাট শ্রাদ্ধভোজের আয়োজন করিল এবং আকণ্ঠ আহার করিয়া উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অবশেষে মারাংবুরুর আদেশক্রমে তাহারা মারাংধাইয়ের চিতা হইতে উৎপন্ন তামাকুলের পাতা ছিন্ন করিয়া আনিল এবং সেই চিতার ছাই সহ একত্রে গুঁড়া করিয়া ভক্ষণ পূর্ব্বক রোগমুক্ত হইল। তাহাদের প্রত্যেকের বারো পুত্র ও বারো কন্যা জন্মগ্রহণ করিল এবং এই পুত্রকন্যাগণ হইতে ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল।

ইহাই সাঁওতালী শাস্ত্রের সৃষ্টিরহস্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

(আলোচনা)

শ্রী পরিমল গোস্বামী এম্‌-এ

আষাঢ়ের বঙ্গলক্ষ্মীতে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি-এ মহাশয়ার স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা প'ড়ে আনন্দলাভ করেচি। মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হ'লে আমার ত মনে হয় যদি কারো সত্যকার অধিকার থাকে তবে সে মেয়েদেরই আছে—অন্ততঃ তাই ত হওয়া উচিত। পুরুষ নিজেরাই অনেক রকম সমস্যায় জড়িত এবং পীড়িত আছেন, তাঁদের এই দুঃসময়ে নারী যদি নারীশিক্ষা-সমস্যার সমাধান কর্‌বার ভার নেন তবে পুরুষে তার প্রতিবাদ কর্‌বেন এমন আশঙ্কা করি না।

অবশ্য এমন পুরুষও আছেন, এবং তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, যাঁরা মনে করেন—বিধাতা, পুরুষের ওপরেই সকল বিষয় চিন্তা কর্‌বার ভার চিরদিনের জন্যে অর্পণ ক'রে রেখেছেন। তাই, যে-হেতু নারীকে কোনো বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে হবে না, সেই হেতু তাঁদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সুযোগ দিয়ে তাঁদের বুদ্ধিকে বিকশিত ক'রে তোল্‌বার পথগুলিকে তাঁরা কাঁটা দিয়ে ভর্ত্তি করবার জন্যে উদ্যত হ'য়ে ব'সে আছেন।

যে কারণেই হোক চিন্তা করাটা পুরুষের মজ্জাগত ব'লে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁরা যদি কিছু ভেবে থাকেন তবে সেটা সব সময়েই নারী-চিন্তাধারার পরিপন্থী হবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো একটা বিষয়কে নানা দিক থেকে দেখার একটা মূল্য আছে, এবং সেই ভরসাতেই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর্‌তে উদ্যত হয়েচি। লেখিকা নিজেই বলেচেন, একই জিনিসকে অনেক দিক থেকে দেখা যেতে পারে, এবং সেই জন্যেই আমার আলোচনা যদি অসঙ্গত বলেই মনে হয়, তবে তার

আগে এই ভূমিকা ক'রে রাখ্‌চি যে এটা আর কিছু নয়, আমি বিষয়টিকে আর একটা দিক থেকে দেখ্‌চি মাত্র।

আরো একটা কথা আছে। কথায় বলে নিজের রুচিতে খাওয়া এবং পরের রুচিতে পরা। শিক্ষা যতটুকু মনের খাদ্য ততটুকুতে নিজের রুচি মান্‌তে হবে, কিন্তু শিক্ষা শিক্ষিতকে সৌন্দর্য্যও দান করে, সুতরাং বাইরের দিক হ'তে এর যে একটা শোভনতা আছে তাকে অপরের রুচির দিকে খানিকটা তাকিয়ে থাক্‌তে হয়।

লেখিকার প্রথম "চৌহদ্দি রেখা" হ'চ্চে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে? সে আলোচনা অবশ্য লেখিকা করেছেন, কিন্তু তার আগে এটা মান্‌তে হ'চ্চে যে সকল বিষয়ে নয়। কেন না সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এগুলো পুরুষে শেখে ব'লে মেয়েরা শিখ্‌বে না তা' নয়। এ-সব সম্পর্কে মেয়েদের ও পুরুষদের শিক্ষার কোনো বিরোধিতা নেই। কথা উঠ্‌চে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা নিয়ে। যেমন ছেলেরা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে কেউ ডাক্তারি পড়ে, কেউ বাণিজ্যবিদ্যা শেখে, তেমনি মেয়েরা ম্যাট্রিক পড়্‌বার সময় অথবা পাশ ক'রে সবাই আদর্শ গৃহিণী কিংবা মা হবার কোনো টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা পাক্।

কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় আদর্শ জননী হবার পৃথক কোনো টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা সম্ভবপর কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় ভাল রান্না, ভাল শিল্পকাজ, ভাল সঙ্গীতবিদ্যা বা ভাল ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার চেয়েও সাধারণ উচ্চশিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্য-বোধটি জাগিয়ে তুল্‌তে পার্‌লেই স্ত্রী বা পুরুষকে দিয়ে অসাধ্য-সাধন করানো যায়। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাগুলো সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে একই সময় চল্‌তে পারে না; টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ওপরে জোর দিলে উচ্চশিক্ষা মারা পড়্‌বেই।

অধিকাংশ মেয়েকেই যেমন গৃহিণী বা মাতা হ'তে হবে, তেমনি অধিকাংশ ছেলেকেও ত গৃহী বা পিতা হ'তে হবে। ছেলেরা কিন্তু আদর্শ পিতা হবার কোনো টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা পাচ্চে না, এবং স্কুল-কলেজেও উচ্চশিক্ষাকে অগ্রাহ্য ক'রে আদর্শ গৃহী কিংবা পিতা হবার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত কর্‌বার জন্যে কোনো আন্দোলন হয়েচে ব'লে জানি না।

ফলকথা, আদর্শ পিতা বা মাতা হওয়া প্রধানতঃ কর্ত্তব্য-বোধের ওপর নির্ভর করে, এবং যে-শিক্ষা জ্ঞান এবং কর্ত্তব্য-বোধকে জাগিয়ে দেয় সেই শিক্ষাই উভয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয়। একান্ত মেয়েদের জন্যেই দরকার এমন শিক্ষা যদি কিছু থাকে সে হ'চ্চে সেলাই, রান্না, ধাত্রীবিদ্যা এবং শুশ্রূষা। এ ছাড়া সংসার কর্‌তে হ'লে যে সব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক, তা' পুরুষ-মেয়ের জন্যে পৃথক নয়। তবে যে-মেয়েরা ঠিক ক'রে আছেন তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কর্‌বেন না তাঁদের জন্যে অবশ্য এমন স্কুল চাই যেখানে কিছু ধারাপাত এবং শুভঙ্করীর জ্ঞান, 'ভাগ' পর্য্যন্ত অঙ্ক, প্রাথমিক ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি অক্ষর-পরিচয়, রান্না, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাথমিক প্রতিবিধান, কিছু ধাত্রীবিদ্যা ও শিল্পকাজ শিখিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব হবে না। এখানে কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের শিক্ষা এক বছরের জন্যেও একত্র দেওয়া চল্‌বে না।

এ রকম শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ'কে ত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ বলা চলে না। আমাদের দেশে অনেক দুঃস্থ বিধবা আছেন, তাঁদের জন্যেও আর এক রকম ব্যবস্থা চাই, এটাও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ হবে না। আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা তাকেই বল্‌তে হবে যা সকল মেয়ের পক্ষেই আদর্শ হবে। অর্থাৎ তা কর্‌তে গেলেই তাকে কলেজের শিক্ষা পুরোপুরি দিতেই হবে। সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের জ্ঞানলাভ কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থা পর্য্যন্ত উপকারী এবং তার পরেই অপকারী এ হ'তে পারে না। এ ছাড়া অর্থ-উপার্জ্জনের জন্যে নানারকম টেক্‌নিক্যাল স্কুল থাক্‌তে পারে, মেয়েরা নিজের নিজের প্রয়োজনের তাগিদে সেই সব শিক্ষালয়ে প্রবেশ কর্‌তে পারেন। ধাত্রীবিদ্যা, নার্সিং ও সেলাইয়ের কাজ বিশেষ ক'রে মেয়েরা শিখ্‌বেন, এ ছাড়া তাঁরা আর সবই শিখ্‌তে পারেন যা পুরুষে শিখে থাকেন। মেয়েরা ডাক্তারি পড়্‌তে পারেন, পেইণ্টিং, ফোটোগ্রাফি শিখ্‌তে পারেন, আইন পড়্‌তে পারেন, বিক্রয়-বিদ্যা, টাইপ্‌রাইটিং, বীমার কাজ, বয়ন সবই শিখ্‌তে পারেন।

লেখিকা তৃতীয় সীমানায় যা নির্দ্দেশ করেছেন তার জন্যে

পৃথক কোনো প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে কি? সাধারণ উচ্চশিক্ষার মধ্যেই স্বদেশ ও স্বসমাজ-পরিচিতির ব্যবস্থা থাক্‌বেই।

এর মধ্যেকার একটি বিষয়ে ভয়ে ভয়ে কিছু বল্‌ব। পালপার্ব্বণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান, কিছু পরিচয় থাকা মন্দ নয়, কিন্তু ওটাকে হাতে কলমে শিক্ষার বিষয় ক'রে তোলায় বিজ্ঞানশিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয় বলেই আমার বিশ্বাস। বাইরে থেকে দেখ্‌তে ওর একটা সৌন্দর্য্য আছেই, কিন্তু ঐ সব আচার এবং পালপার্ব্বণ মেয়েদের বুদ্ধিবিকাশের পথকে একেবারে গোড়াতেই আট্‌কে দিয়েচে। পরকালের পুণ্যসঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বাইরের কোনো অনুষ্ঠান বা নিষ্ঠাপালন কল্যাণকর ব'লে আমি মনে করি না। "দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পাল-পার্ব্বণ" প্রভৃতি শিক্ষা গৃহেই প্রশস্ত। আচার-ব্যবহার রীতিনীতি এসব পরস্পর মেলামেশায় শিক্ষা হয়। পুরুষেরা যেমন নিজেদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ক'রে থাকেন, মেয়েরা যদি সে রকম সুযোগ পান তবে ওসব শিক্ষা সহজেই হ'তে পারে। পালপার্ব্বণ অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে ধর্ম্মশিক্ষা নয় একথা বলাই বাহুল্য। তবে এ-সব যাঁরা শিখ্‌বেন তাঁদের আড়ম্বর ক'রে হঠাৎ বাধা দেবারও যেমন দরকার নেই, তেমনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে নৈবেদ্য সাজানোর বিধি প্রভৃতি শিক্ষা দেবারও কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না।

তাহ'লে দাঁড়াচ্চে এই যে মেয়েদের আদর্শ মা হবার শিক্ষা তাঁরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে পেতে পারেন,—যে জ্ঞান থেকে পুরুষেরা আদর্শ পিতা হবার শিক্ষা লাভ কর্‌বেন। পৃথক শিক্ষা যা প্রয়োজন তা মোটামুটি দু'তিনটি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে মাত্র। পূর্ব্বেই বলেচি কতকগুলো বিষয় বিশেষ ক'রে মেয়েদের পক্ষে উপযোগী—যেমন সেলাইয়ের কাজ, ধাত্রীবিদ্যা ও নার্সিং। আবার অনেকগুলো বিভাগ আছে যা বিশেষ ক'রে পুরুষের পক্ষেই উপযোগী—যেমন এঞ্জিনিয়ারিং কিংবা মিলিটারি বিভাগ।

লেখিকা বলেচেন, "যে শিক্ষায় উপার্জ্জনশীল গৃহকর্ত্তা বা নির্লিপ্ত জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর গঠিত হয়, অবিকল সেই শিক্ষা কখনই সুগৃহিণী ও সুমাতা গ'ড়ে তোল্‌বার পক্ষে উপযোগী হ'তে পারে না।" আমার মনে হয় একই শিক্ষায় ও-দুটো হ'তে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা, জ্ঞানকে উদ্বোধিত করা। এবং যে শিক্ষায় এটা সম্ভব হয় সে-শিক্ষা পুরুষকে যদি তার পুরুষত্বে উদ্বোধিত করে, তবে তা' নারীকেও নারীত্বে উদ্বোধিত কর্‌বে। যিনি কর্ম্মবীর,জ্ঞানবীর তাঁর সম্বন্ধে আদর্শ পিতা হবার প্রশ্নই ওঠে না, যেমন কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর স্বামী বিবেকানন্দের ওপরে সমাজ পিতৃত্বের দাবী করে নি। তেমনি যদি কোনো নারী মা না হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করেন তাঁর ওপরেও মাতৃত্বের দাবী করা চল্‌বে না। সুতরাং গৃহিণী কিংবা মাতা হওয়াটাই সব সময় আদর্শ না হ'তে পারে। আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে এমন শিক্ষায় নারীর প্রয়োজন নেই, তা হ'লেও আশঙ্কার কিছু নেই, কেন না কর্ম্মবীর বা জ্ঞানবীর গঠিত কর্‌বার ত কোনো টেক্‌নিক্যাল স্কুল নেই যে আমরা মেয়েদের সেখানে পাঠাতে ভয় পাব। যাঁরা নির্লিপ্ত জ্ঞানবীর অথবা কর্ম্মী হয়েচেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা পেয়েই হয়েচেন,—না পেয়েও হয়েচেন। বুদ্ধিকে, জ্ঞানকে অজ্ঞানের হাত থেকে মুক্ত কর্‌বার যে শিক্ষা সেই হ'ল আদর্শ শিক্ষা—সেই শিক্ষা পুরুষকে পুরুষত্বের ক্ষেত্রে আহ্বান কর্‌বে, নারীকে নারীত্বের মহিমায় জাগিয়ে তুল্‌বে।

লেখিকার আসল বক্তব্য এই যে নারীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে শিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই। কিন্তু যাঁরা স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর্‌তে বিস্তর আড়ম্বর কর্‌বার দরকার হয় না।

একজন গ্র্যাজুয়েট যদি গৃহিণী হন, তবে তাঁর 'হিসাব রাখ্‌তে' আট্‌কাবে না, 'আচার-ব্যবহার রীতিনীতি'তে তিনি অজ্ঞ হবেন না, 'সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল মহাত্মাদের জীবনী' এ সব তাঁর ভালই জানা থাক্‌বে। 'পুরাণ' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ তাঁর অল্প আয়াসেই হ'তে পারে, বেদ-বেদান্ত পড়্‌তেও আট্‌কাবে না। সেলাইয়ের কাজ তিনি অবসর-সময়ে ঘরে নিশ্চয়ই শিখে নিতে পেরেচেন। বাকী রইল উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা। কিন্তু আদর্শ গৃহিণী হবার পক্ষে এটা অপরিহার্য্য নয়, যদিও সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা বা অন্য কোনো শিল্পকলায় বিশেষ ঝোঁক থাক্‌লে তিনি তা বহু পূর্ব্ব হ'তেই চর্চ্চা না ক'রে পারেন নি।

যাঁদের মতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই,

অথবা যেখানে ১৪।১৫ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতেই হবে সেখানে অবশ্য লেখিকার নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলো মোটামুটি শিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি কিন্তু তাকে আদর্শ স্ত্রীশিক্ষ বল্‌ব না। তাকে বল্‌তে হবে প্রয়োজনের মাপে শিক্ষা। আমার এক বন্ধু, তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করতে। কোষ্ঠী এবং কুলশীলের বাধা কাটিয়ে এবং বহু অপেক্ষা ক'রে তিনি আই-এ পাশ পর্য্যন্ত পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে প্রায় বল্‌তেন, মেয়ের বাপের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছি ভাই, সবাই এসে বলেন,—তাঁর মেয়েটি রান্নায় ওস্তাদ সেলাইয়ের কাজে বড় নিপুণ, গানের গলা বড় মিষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি এমন স্ত্রী চাই না যার একমাত্র গুণ হ'চ্চে সে ভাল রান্না করতে পারে অথবা ভাল সেলাই করতে পারে। আমি চাই এমন একজনকে যে আমার সেবানিপুণ ভৃত্য না হ'য়ে বন্ধু হ'তে পারে,—যার সঙ্গে আমার প্রিয় বিষয়গুলো নিয়ে দু'দণ্ড আলাপ করতে পারি।

এই ব্যাপারটা থেকে এইটে বোঝা যাচ্চে যে আজকাল অনেক ছেলে শুধু গৃহিণী চায় না, সখাও চায়। সুতরাং লেখাপড়ার দিক দিয়ে একেবারে নিম্নস্তরে প'ড়ে থাকা মেয়েদের পক্ষে কল্যাণকর না হ'তে পারে।

প্রয়োজনের মাপে অল্প শিক্ষাকে কায়েমি ক'রে দেওয়ায় বিপদ আছে। এই রকম শিক্ষা জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না, হয় অভ্যাসের ওপরে। এতে ক'রে হাতের জড়তা কিছু যায় বটে কিন্তু মনের জড়তা যায় না। যুগযুগান্তের কুসংস্কারের বোঝা আমাদের মেয়েদের মনে চেপে রয়েচে। এ থেকে তাদের মনকে মুক্ত করতেই হবে। চিন্তার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে মুক্ত হ'লে তবে দেশের কল্যাণ। অর্থকরী বিদ্যা শেখ্‌বার প্রয়োজন খুবই আছে—স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা-শিক্ষার আপোষ দেশের অবস্থা বুঝে সব সময়েই করতে হবে, কিন্তু তবু আদর্শকে খাটো করা চল্‌বে না। দেশের জন্যে যাঁরা মঙ্গলকামনা করচেন তাঁদের সঙ্গে নারীর চিত্তের যোগ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাঁদের শিক্ষাকে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আটকে দিলে এটা সম্ভবপর হবে না। স্ত্রীশিক্ষা দেশে নেই বল্লেই চলে, এ অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা এমন একটা সমস্যা সৃষ্টি করে নি যাতে ক'রে দেশের মধ্যে গুরুতর কোনো অশান্তি লেগে উঠেচে। স্ত্রীশিক্ষার অভাবই দেশের সমস্যা, সুতরাং পদ্ধতি-পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন এখনি উঠেচে ব'লে আমার বিশ্বাস নয়।

ঘরে বাইরে

তর্ক-প্রতিযোগিতা

কাশী, নারী-শিক্ষায়তনের (Women's College) ছাত্রী কুমারী সরলা দেশাই সম্প্রতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ (University Union) কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত তর্ক-প্রতিযোগিতায় জয়িনী হইয়া একটি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

বর্শা-ক্ষেপণ

প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে প্রতিযোগিনী বর্শা (Javelin) নিক্ষেপ করিতেছেন। সম্প্রতি মিড্‌ল্‌সেকস্ বার্ষিক মহিলা ক্রীড়া-উৎসবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

দৌড়-প্রতিযোগিতা

ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড ব্রিজ্, সিভিল সার্ভিস্ ক্রীড়ানুষ্ঠানে (Civil Service Sports) এই তিনটি বালিকা ১০০ গজ দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উড়োজাহাজের পাইলট

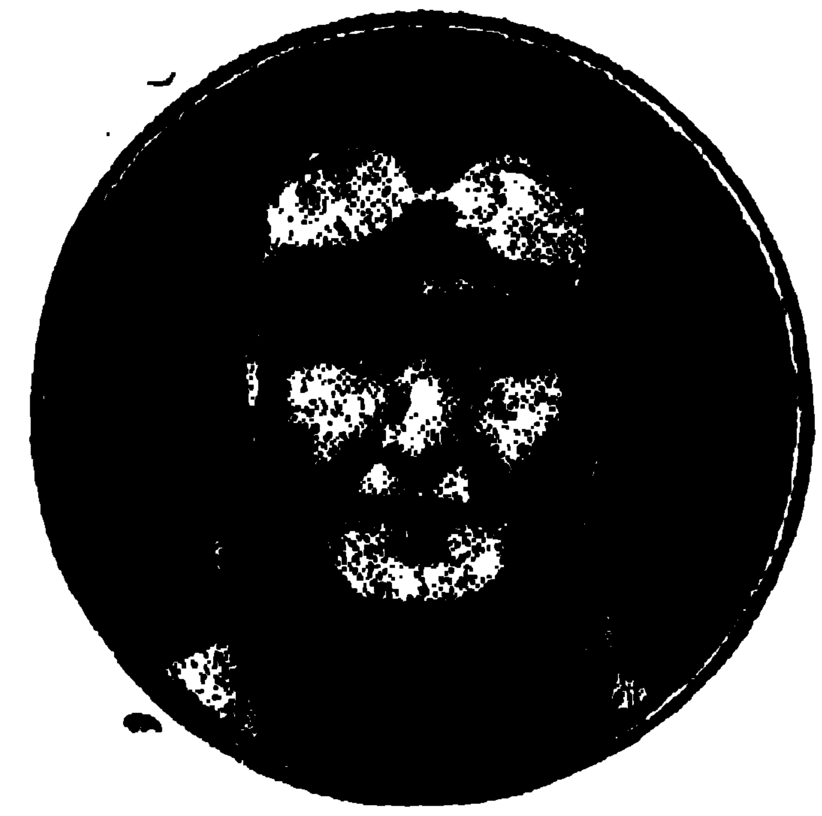

কুমারী উইনি ব্রাউন—ইনি একজন ম্যাঞ্চেষ্টার-বাসিনী মহিলা। উড়োজাহাজের পাইলট হিসাবে তিনি তদঞ্চলের সর্ব্বপ্রথম মহিলা পাইলট। তিনি লণ্ডনের কিংস্ কাপ্ (King's Cup) লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ৩৫০ জন প্রতিযোগিনীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাকে ঐ কাপ্ লাভ করিতে হইয়াছিল।

সুইডিস্ কেবিনেটের মন্ত্রী

কুমারী কে, হেচলগ্রীন—ইনি সর্ব্বপ্রথম মহিলা যিনি সুইডিস্ কেবিনেটের মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি স্বাস্থ্য বিভাগীয় মন্ত্রী। কার্য্যারম্ভেই তিনি নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

'রায়বেঁশে' রসকলা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

ভারতের প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ আমাদের সামনে প্রাচীন ভারতের এমনই একটি রূপ আনিয়া দিয়াছে, যাহা ভারতসভ্যতার একটি উচ্চশ্রেণীর রসকলা *। এই রসকলাতে নৃত্য আছে, বাদ্য আছে, এবং তাহা ছাড়া অন্যান্য আরও কয়েকটি উপাদান আছে, যাহার বিশ্লেষণ এবং প্রকৃত স্থান-নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগের প্রথমতঃ রসকলার প্রকৃতি এবং শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। ইহার আলোচনা হইতে আমরা বিশেষভাবে বর্ত্তমান বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে রায়বেঁশে রসকলার মূল্য ও উপযোগিতা যে কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিব।

"ভূমা"ই সুখ-স্বরূপ

মানুষের সকল শিক্ষা এবং সাধনার উদ্দেশ্য, সুখ ও শান্তি-লাভ। সেই সুখ ও শান্তি-লাভ দুইপ্রকার—ঐহিক এবং পারত্রিক, অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে ইন্দ্রিয়াত্মক এবং আধ্যাত্মিক। ঐহিক সুখের জন্য প্রয়োজন—দেহের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, এবং অর্থের সাধনা দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার পরিতৃপ্তি। পারত্রিক অথবা আধ্যাত্মিক সুখের জন্য প্রয়োজন—পরমার্থ অথবা পরমাত্মার সাধনা বা সন্ধানলাভ। অন্য দেশের লোক ইহা স্বীকার করুক অথবা নাই করুক, আমরা—যাহারা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির (Culture) উত্তরাধিকারী—ইহা জানি যে, ঐহিক সুখটা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র; পারত্রিক সুখই উৎকৃষ্ট এবং মহৎ। সুতরাং পারত্রিক সুখের সন্ধানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। কারণ পারত্রিক সুখই ভূমার অথবা অনন্তের উপলব্ধি-স্বরূপ। সেই সুখের সন্ধানই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং এইখানেই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥"

"যিনি ভূমা তিনিই সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। সেই ভূমাকেই জানিতে হইবে।" অর্থাৎ ইহাই জীবনের পরম এবং চরম উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই মোক্ষ, মুক্তি, অথবা জড়তা এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে নির্ব্বাণলাভ।

কি ঐহিক কি পারত্রিক উভয় সুখের সন্ধানের জন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু ঐহিক সুখসম্ভোগ ধর্ম্মসাধনার সহায়তা ছাড়াও সম্ভবপর হয়। যে ঐহিক সুখে ধর্ম্মসাধনার সংশ্রব নাই তাহা যে নিকৃষ্ট, তাহা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সর্ব্বশ্রেণী-নির্ব্বিশেষে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই উপলব্ধি ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে যেমন ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা অন্য কোন দেশে হয় নাই, এবং সেই জন্য ভারতবর্ষের আধুনিক শত দীনতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের, তাহা পাশ্চাত্য মনীষীরাও আজকাল ক্রমশঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। অবশ্য, আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তাই বলিয়া কোন জাতির পক্ষে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করাও সঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে নানাপ্রকার দৈন্য এবং আধিব্যাধি-প্রপীড়িত হইয়া জাতির পারত্রিক সুখের সাধনাও বিঘ্নপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের মনে

---

* আজকাল ললিতকলা অথবা সূক্ষ্মকলার কথা লিখিতে গিয়া বাংলা সাহিত্যে অনেকেই তাহার পরিবর্ত্তে 'আর্ট' কথাটা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাংলা ভাষায় যেখানে কোন ভাবপ্রকাশের উপযোগী কথা পাওয়া যায় না, সেখানে বিদেশী কথা আনিয়া ভাষার সমৃদ্ধিবিধান করা অবশ্য ভালো; কিন্তু যে ভাবের প্রকাশ করিবার জন্য আমরা 'আর্ট' কথাটাকে বাংলা ভাষায় টানিয়া আনিতে চাই, সেই ভাবের অভিব্যক্তি বাংলা 'রসকলা' কথাটি দ্বারা তাহা হইতেও অধিকতর পূর্ণ এবং শোভন ভাবে প্রকাশ হয়।

রাখিতে হইবে যে, ঐহিক সুখের সাধনা হইতে পারত্রিক সুখের সাধনাই শ্রেষ্ঠ এবং মুখ্য।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম-সাধনা

কোন জাতির অথবা ব্যক্তির জীবন শক্তিমান ও সার্থক হয় তখনই, যখন তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের চিরন্তন সত্যের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সমন্বয়ের উপর। এই সমন্বয়সাধনের প্রণালী প্রধানতঃ তিনটি—জ্ঞানচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং রসানুভূতি-চর্চ্চা। সত্যের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনের এই তিনটি প্রণালীর মধ্যে কোনটিরই যদি সাধনার অভাব হয়, অথবা সাধনাতে কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়া সত্যের সহিত তাহার সহজ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধকে বিযুক্ত করে, তাহা হইলেই জাতির ও ব্যক্তির জীবন অবনতির পথে এবং মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, "জ্ঞান যেথা মুক্ত", যেখানে স্ত্রীপুরুষ এবং শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে জ্ঞানলাভের পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, জ্ঞানের প্রকৃত রূপের সন্ধান পাইবার জন্য মানুষ যে দেশে ব্যাকুল, যে দেশের শিক্ষাপ্রণালী জ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত,—ধর্ম্ম যে দেশে মানুষের সহজ ও সরল বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, যেখানে মানুষের জীবনপদ্ধতি ধর্ম্মের মূলীভূত নীতি দ্বারা সোজাসুজি ভাবে চালিত হয়,—সেইখানেই ব্যক্তির ও জাতির জীবন শক্তি ও সার্থকতা লাভ করে।

কিন্তু যে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষের জ্ঞানলাভের পথ রুদ্ধ, যে দেশে মানুষ শাস্ত্রের পুঁথির পাথর চাপা দিয়া জ্ঞানপিপাসার উৎস-মুখ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, যেখানে ধর্ম্মের নীতির সঙ্গে জীবনের সম্পূর্ণ অসমন্বয়, যেখানে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে "মিথ্যা আচারের মরুবালিরাশি বিচারের স্রোত-পথ"কে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অথবা যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সহজ ধর্ম্মের সরল প্রেমের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইয়া কৃত্রিমতাজনিত অসাম্যের উপর স্থাপিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সেই দেশেই ব্যক্তি ও জাতি শক্তি ও সার্থকতা-লাভ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। জ্ঞানের ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা-দোষ প্রবেশ করিলে ব্যক্তির ও জাতির অবনতি অবশ্যম্ভাবী, ইহা এত সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ হইতে পারে না।

অবশ্য, ধর্ম্ম জ্ঞানেরই একটি অংশ বিশেষ। অন্ততঃ ইহা ঠিক যে, ধর্ম্ম যদি জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে তাহা বিপথগামী হয়। ইহা শুধু ভারতবর্ষের নয়, অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি যখন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় তখন তাহা যে কি বিষময় ফলের উৎপাদন করে তাহা আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির, এবং পাশ্চাত্য ইতিহাসে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারি। ফল কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম উভয়ই যখন পরমার্থের অভিমুখ হয়, তখনই তাহা সত্য এবং শুভ।

ঐহিক সুখ যে কোন কোন স্থলে পারত্রিক সুখের সাধনায় সহায়তা করে, তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমরা পাই স্ত্রীপুরুষের প্রেমে। এবং সেই জন্যই স্ত্রীপুরুষের প্রেম সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এখানেও আমরা দেখিতে পাইব যে, এই মানবীয় প্রেমের ইন্দ্রিয়াত্মক অংশটি মানুষের সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয় অথবা হওয়া উচিত নয়। প্রেমের ইন্দ্রিয়াত্মক অংশ যদি আমাদিগকে এক জীবাত্মার সঙ্গে অন্য জীবাত্মার আত্মিক পরিচয় ও মিলন-সাধন করাইয়া দিতে সমর্থ হয়, তবেই এবং তখনই মানবীয় প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

অন্তশ্চৈতন্যের প্রভাব

জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার প্রধান অবলম্বন ও ভিত্তি—যুক্তির উপর, এবং ধর্ম্মসাধনার প্রধান অবলম্বন ও ভিত্তি—বিশ্বাসের উপর। কিন্তু এই যুক্তির ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি এবং অবলম্বন আছে বলিয়া ইহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ যুক্তি ও বিশ্বাস আমাদিগকে পরমার্থের এবং পরমাত্মার পথের দিক্‌নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে তাহার উপলব্ধি করাইয়া দিতে সমর্থ হয় না। আসল কথা—যে, বাহ্যচৈতন্যের দ্বারা পরমার্থের এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ এবং পূর্ণ উপলব্ধি অসম্ভব। এই উপলব্ধি একমাত্র আমাদের অন্তশ্চৈতন্যের ভিতর দিয়া সম্ভব।

দিন ও রাত্রির উদাহরণ হইতে ইহা কতকটা বুঝা যাইবে। দিনের সূর্য্যের আলোক আমাদের বাহ্যিক চৈতন্যের প্রতীক,—এবং রাত্রির অন্ধকার আমাদের অন্তশ্চৈতন্যের প্রতীক। সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে আমরা পৃথিবীটি অর্থাৎ আমাদের অতি নিকটের খুঁটিনাটি সব বস্তু স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মহত্তর উপলব্ধি সূর্য্যের আলোকের দ্বারা অসম্ভব। এমন কি, সূর্য্যের আলোক তাহার অন্তরায়স্বরূপ। সূর্য্যের আলোক যখন অপসৃত হয়, তখন সেই অন্ধকারময় বিশালতার মধ্য দিয়া আমরা কোটি কোটি নক্ষত্রমণ্ডল-সমন্বিত অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এবং তখনই বুঝিতে পারি যে, যে পৃথিবীর মধ্যে এবং পৃথিবীর যে সকল বস্তুগুলির মধ্যে আমাদিগের জীবনকে আমরা বিজড়িত করিয়া রাখি, তাহা এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তেমনই আমরা যখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের এবং মনন-বৃত্তির সাক্ষাৎ চেতনা-লোক হইতে ডুব দিয়া অন্তশ্চৈতন্যে উপনীত হই, তখনই আমরা সেই অনন্ত পরমাত্মার—যাহার ক্ষুদ্র অংশমাত্র আমরা—উপলব্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই। উপনিষদও এই কথা বলিয়াছেন; অর্থাৎ যুক্তিমূলক বর্ণনার দ্বারা অথবা মননক্রিয়ার দ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি লাভ করা অসম্ভব। কারণ বাক্য এবং মন উভয়ই তাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে।—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

অন্তশ্চৈতন্যে উপনীত হইলেই আমরা পরমাত্মার উপলব্ধি পাই কেন, তাহার কারণ—আমাদের অন্তশ্চৈতন্যেই জীবাত্মার প্রকৃত সত্তা নিহিত রহিয়াছে, যাহা পরমাত্মার প্রকৃত অংশস্বরূপ। মানুষের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা অথবা মনীষী, তাঁহারা সাধনা দ্বারা বাহ্য-জ্ঞানলোক পরিত্যাগ করিয়া সমাধিগ্রস্ত হইবার শক্তিলাভ করেন এবং সেই সমাধিগ্রস্ত অবস্থায় পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরামাত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই সমাধির শক্তি নাই; সুতরাং সেই পথ তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ। তবে সাধারণ মানুষ এই অন্তশ্চৈতন্যের সাধনা কি করিয়া করিবে এখন ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

রসকলার সাধনা-ক্ষেত্র

এইখানেই রসকলা মানুষকে পরমার্থ-লাভের সাধনার উপায়স্বরূপ হইয়া সহায়তা করে। কারণ বিশ্বে পরমাত্মার প্রকাশের একটি লক্ষণ—আনন্দের ছন্দ। রসানুভূতির ভিতর দিয়াই আমরা অন্তশ্চৈতন্যের সাধনা করিয়া সেই আনন্দময় ছন্দের উপলব্ধি করিতে পারি। এবং বিশ্বের সেই আনন্দময় ছন্দের সহিত নিজের জীবনকে মিলিত করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনসাধন-সুখ লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ, বিশ্বের চিরন্তন সত্যই বলুন অথবা পরমাত্মাই বলুন,—অনন্তকে যে নামেই আমরা অভিহিত করি না কেন—যে অনন্ত সত্যের আমরা অংশ এবং যে অনন্ত সত্যের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় উপলব্ধির জন্য জড়জগতের শত অন্ধকার আবরণ-স্তরের ভিতর দিয়াও মানুষের প্রাণ প্রতিনিয়ত ব্যাকুল আগ্রহে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে, তাহার উপলব্ধির উপায় রসানুভূতির ভিতর দিয়া যেরূপ সহজসাধ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সে রকম নহে।

আনন্দ-ব্রহ্ম

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তির দ্বারা অথবা কেবলমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যে পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের উপলব্ধি করা যায় না, তাহা 'নেতি, নেতি' ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা এই ভারত-ভূমিতেই সুদূর অতীত যুগে মানবসভ্যতার শৈশবে মনীষীগণ উপনিষদাদিতে বিশদভাবে ঘোষিত করিয়া গিয়াছেন।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

"ভাষার শক্তি নাই যে তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করে,—তাঁহার সত্তার কল্পনা মননশক্তির অতীত।"

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগু যখন বরুণকে পরমাত্মার অথবা পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন বরুণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি

জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"

"যাঁহা হইতে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ জীবিত থাকে এবং প্রতিগমন করিয়া তাহারা আবার যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে প্রবৃত্ত হও ;—তিনিই ব্রহ্ম।"

ইহার উত্তরে ভৃগু প্রথমতঃ প্রাণরূপ সত্তা (Eternal Life-spirit), বুদ্ধিরূপ সত্তা (Eternal Intelligence) ইত্যাদি পরব্রহ্মের স্বরূপের নানাপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বরুণ তাহার সবগুলিই ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। ভৃগুর উত্তর তখনই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইল—যখন তিনি অবশেষে বলিলেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

"আনন্দ হইতেই বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে, এবং প্রতিগমন করিয়া ইহারা আবার আনন্দেতেই প্রবেশলাভ করে।"

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

"বাক্য এবং মন যাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই পরব্রহ্মের আনন্দকে যিনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি আর কিছু হইতেই ভয় প্রাপ্ত হন না।"

কেবল তাহাই নহে ; সত্য, জ্ঞান, অনন্ত,শান্তিময়, মঙ্গলময় ইত্যাদি যে-কোন ভাবেই আমরা সেই 'একমেব অদ্বৈত' পরমাত্মার কল্পনা অথবা বর্ণনা করি না কেন, তিনি বিশ্বে আমাদের সম্মুখে কেবল মাত্র একটি রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন—তাহা তাঁহার আনন্দ-রূপ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

রসো বৈ সঃ

এখন কথা হইতেছে, পরব্রহ্মের এই যে আনন্দরূপ—একমাত্র যাহা হইতেই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব—সেই আনন্দরূপকে আমরা জীবনে উপলব্ধি করিয়া জীবনকে আনন্দময় ও অমৃতময় করিব কি উপায়ে ? তাহার উত্তরও আমরা পাইতেছি, যথা—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।"

"ইনি রসস্বরূপ। রসরূপ ইঁহাকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করে।"

আমরা আরও পাই—

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি।"

"কেই বা শরীর ধারণ করিবার চেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিতে পারিত, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইহা হইতেই সকল লোক আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

সুতরাং আমরা পাইলাম যে, পরমেশ্বর অথবা পরমাত্মা আনন্দরূপ। একমাত্র তাঁহার আনন্দরূপের ভিতর দিয়াই বিশ্বের সৃষ্ট জীব তাঁহার সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া, জীবনকে সেই আনন্দের রসে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারে।—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।"—জীবের প্রাণে রসস্বরূপে সঞ্চারিত হইয়াই তিনি জীবকে সেই অমৃতের আনন্দ দান করিয়া থাকেন।

রসকলার স্থান ও কার্য্য

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জ্ঞান বা ধর্ম্মনীতির মনন-বৃত্তির দ্বারা আমরা তাঁহাকে পাইব না ; পাইব একমাত্র তখনই, যখন অন্তরের ভিতর বিশ্বের আনন্দরসের অনুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইব। অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা পথপ্রদর্শক হইবে মাত্র, কিন্তু সেই আনন্দ-উপলব্ধির প্রকৃষ্ট প্রণালী হইবে একমাত্র বিশুদ্ধ রসানুভূতির চর্চ্চা। জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মনীতির গবেষণা বা আলোচনার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব, কেন না পরমাত্মা অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয় এবং নিরাধার। তাঁহার আনন্দরূপ হইতেই তাঁহাকে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এবং সেই উপলব্ধি প্রাণে আনিতে পারিলেই মানুষের প্রাণ অমৃতের সন্ধান পাইয়া যাবতীয় ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে।—

"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যেহনিরুক্তেহনিলয়নে-ঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতোভবতি।"

কোন জাতিকে সমৃদ্ধিলাভ করিতে হইলে, বিদ্যা এবং অর্থসঞ্চয়ের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু মানবের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, পরমার্থলাভ বিষয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞান অপেক্ষাও যে রসকলা-চর্চ্চার স্থান সমধিক উচ্চে, তাহাও আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি। এই জন্যই প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক যুগে রসকলাকে শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে উপরোক্ত চূড়ান্ত সত্যের উপলব্ধি অন্য দেশ অপেক্ষাও অতি প্রাচীন কাল হইতে নিবিড়ভাবে হইয়াছিল বলিয়াই, সূক্ষ্মকলাকে অথবা রসকলাকে অন্যান্য বিদ্যা এবং চৌষট্টি কলার অন্যান্য কলা হইতে পৃথক ও সমুচ্চ স্থান দিয়া "দেবজনবিদ্যা" * আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ, অন্যান্য কলাবিদ্যা পৃথিবীর জড়বস্তুর রসাস্বাদন করিতে মানুষকে সহায়তা করে; কিন্তু রসকলা অথবা সূক্ষ্মকলা-বিদ্যা অন্য সকল কলাবিদ্যার উচ্চস্তরে,—তাহারা বিশুদ্ধ রসানুভূতির চর্চ্চা দ্বারা মানুষের প্রাণকে পৃথিবী হইতে টানিয়া তুলিয়া দেবলোকের সন্ধান পাইতে এবং দেবজনবাঞ্ছিত পরমাত্মার অনন্ত-রসের আস্বাদ লাভ করিয়া জীবনকে আনন্দময় করিতে সহায়তা করে।

রসকলার উপাদান

এখন দেখা যাউক, রসকলাগুলি কি উপাদানে গঠিত, এবং কি প্রণালীতে তাহাদিগের চর্চ্চা করিয়া আমরা জীবনে আনন্দলাভ ও পরমাত্মার স্বরূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমরা যখন "রস" কথাটা ব্যবহার করি, তখন তাহাকে দুইটি অর্থে ব্যবহার করি—ইহার মধ্যে একটি জড়পদার্থের আস্বাদমূলক রস এবং অপরটি অধ্যাত্ম আনন্দের অনুভূতিমূলক। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়কে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়;—ইহার একশ্রেণীর ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অথবা উৎকৃষ্ট, এবং অপরশ্রেণীর ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল অথবা নিকৃষ্ট। চক্ষু এবং কর্ণ, এই দুই ইন্দ্রিয়ের স্থান প্রথম বিভাগে। ইহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং ইহাদের দ্বারা আমরা গতির, রূপের, রেখার, আকারের, বর্ণের, শব্দের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরসের অর্থাৎ অধ্যাত্মরসের অনুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হই। ইহারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, কেন না ইহাদের দ্বারাই আমরা রসস্বরূপ পরমাত্মার বিশুদ্ধ আনন্দময় সত্তার অনুভব লাভ করিতে পারি—চক্ষুর দ্বারা গ্রাহ্য গতি, আকার, রূপ, রেখা ও বর্ণের সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া, কর্ণ দ্বারা শব্দ এবং সুরের সমাবেশে সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া। নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের স্থান দ্বিতীয় বিভাগে। ইহারা অপেক্ষাকৃত স্থূল ও নিকৃষ্ট; কেন না ইহাদের দ্বারা আমরা যে রসের উপভোগ পাইতে পারি—গন্ধ-সুখ, আস্বাদন-সুখ এবং স্পর্শ-সুখ এবং তাহাদের আস্বাদনে যে আনন্দের উপলব্ধি হয় তাহা নিকৃষ্ট এবং যাহাকে বলি 'ইন্দ্রিয়াত্মক' (sonsual) সেই শ্রেণীর। তাহাকে নিকৃষ্ট বলি কেন? কারণ, এই শ্রেণীর রস ও আনন্দের আস্বাদন পশুরাও করিতে পারে। ইহার উপ-ভোগ-শক্তিতে মানুষের পশু হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। সুতরাং এই প্রবন্ধে আমরা যখন পরমাত্মা লাভের আনন্দের কথা বলিব, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে আনন্দ নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক দ্বারা আস্বাদনজনিত ইন্দ্রিয়াত্মক আনন্দ নহে,—তাহা অধ্যাত্ম আনন্দ, যাহা একমাত্র অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারাই লাভ করা যায়, 'দেবজনবিদ্যা' অথবা রসকলার চর্চ্চার সাহায্যে বিশুদ্ধ রসানুভূতির ভিতর দিয়া।

রসকলার ছন্দ

এই দুই প্রকার রসের মধ্যে আরও একটি বিভিন্নতা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়াত্মক রসের নিকৃষ্টতা ও অধ্যাত্ম রসের উৎকৃষ্টতার আর একটি নির্দ্দেশক-স্বরূপ। সেটা এই—যে, যে যে উপাদান হইতে অধ্যাত্ম রসের অনুভূতি আমরা পাই, তাহার সবগুলিই ছন্দাত্মক। কেন না ছন্দ তাহার সবগুলিরই একটি অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম, এবং সেই উপাদানগুলি ছন্দোবদ্ধ রূপ সৃষ্টি করে বলিয়াই সেই রূপ হইতে আমরা অনন্তরসের অনুভূতি পাই। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়াত্মক রসের

* বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'বিদ্যা' শব্দের শাঙ্কর ভাষ্য।

উপাদানগুলিতে কোন ছন্দের সমাবেশ নাই, এবং ছন্দ তাহার কোনটিরই অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম নহে।

আজকাল যৌনভাবাত্মক সাহিত্য এবং যৌনভাব-উত্তেজক শিল্পকলার স্থান ও মূল্য লইয়া একটা প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক ও আলোচনা আমাদের দেশে চলিতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আমরা যাহাকে দেবজনবিদ্যা অথবা রসকলা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, অর্থাৎ, যাহা অধ্যাত্মরসের অনুভূতি আনিয়া দিয়া রসস্বরূপ পরমাত্মার আনন্দরূপকে আমাদের উপলব্ধি করাইয়া দিতে সহায়তা করে, সেই শ্রেণীর রসকলায় প্রকৃত পক্ষে যৌনভাবাত্মক সাহিত্য এবং যৌনভাব-উত্তেজক শিল্প-কলার কোন স্থান হইতে পারে না। কারণ, শেষোক্ত রসাস্বাদন প্রণালীগুলি স্থূল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, এবং যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়াত্মক বলিয়াছি সেই শ্রেণীর। তাহারা আমাদিগকে অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান না দিয়া বরং বিপথগামী করে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের ভোগাস্বাদনে প্ররোচিত করিয়া বিশুদ্ধ অনন্ত-রসস্বরূপ পরমাত্মার উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত করে। সুতরাং যৌনভাবাপন্ন সাহিত্য ও শিল্প যে উচ্চাঙ্গের রসকলা নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

রসকলার শ্রেণী-বিভাগ

এখন দেখা যাউক যে, রসকলা অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ রসকলা অথবা দেবজনবিদ্যাগুলির প্রকৃতি এবং গঠনপ্রণালী কি। রসকলাকে সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, যথা—সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য্য এবং স্থপতি-কলা। ইহার প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য বিশ্বের ছন্দকে, ভূমার ছন্দকে রূপ প্রদান করিয়া সেই রূপকে চক্ষু অথবা কর্ণের গোচরীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে অন্তশ্চৈতন্যে সেই রসের অনুভূতির সৃষ্টি করা—যে রস পরমাত্মার আনন্দরূপের উপলব্ধি দান করে;—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী-ভবতি।"

সঙ্গীতকলার (গীত এবং বাদ্য) অবলম্বন-শব্দ এবং সুর। অর্থাৎ শব্দ এবং সুরের সমাবেশকে ছন্দোবদ্ধ রূপ প্রদান করিয়া সঙ্গীতকলার সৃষ্টি হয়। সঙ্গীতকলার অন্যতম অংশ নৃত্যকলার বিষয় পরে বলা হইবে।

কাব্যকলার অবলম্বন—শব্দ। অর্থাৎ শব্দের সমাবেশকে ছন্দোবদ্ধ রূপ প্রদান করিয়া কাব্যকলার সৃষ্টি হয়।

চিত্রণকলার অবলম্বন—রেখা এবং বর্ণ। অর্থাৎ রেখা এবং বর্ণের সমাবেশকে ছন্দোবদ্ধ রূপ প্রদান করিয়া চিত্রণ-কলার সৃষ্টি হয়।

ভাস্কর্য্যের অবলম্বন—প্রস্তর, মৃত্তিকা অথবা কাষ্ঠ প্রভৃতি জড়বস্তু। ইহার কোন একটিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া বাস্তব বা কল্পিত পদার্থের আকৃতির রূপ প্রদান করিয়া ভাস্কর্য্য-কলার সৃষ্টি হয়।

স্থপতিকলার অবলম্বনও—প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি কোন প্রকার জড়বস্তু। ইহার কোন একটির ছন্দোবদ্ধ সমাবেশকে ভাবব্যঞ্জক রূপ প্রদান করিয়া স্থপতিকলার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সঙ্গীতকলার বিশেষত্ব

এখন সঙ্গীতকলার সম্বন্ধে আমরা একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে গিয়া এই রসকলাতে কয়েকটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই। প্রথম বিশেষত্ব—এই রসকলার মধ্যে তিনটি বিভাগ আছে, অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য। ইহার প্রত্যেকটিই সঙ্গীতের এক একটি বিশেষ অংশ-স্বরূপ। যদিও এই তিনটি অথবা ইহার যে-কোন দুইটির একসঙ্গে ব্যবহারে সঙ্গীত-রসকলার সৃষ্টি হয়, তথাপি ইহার কোনটি অপর কোনটির একান্ত অধীন নহে; কারণ ইহার প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে এক একটি রসকলার সৃষ্টি করিতে পারে এবং সেই জন্য প্রত্যেকটিই এক একটি বিভিন্ন রসকলা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নৃত্য-কলা

সঙ্গীতকলার দ্বিতীয় বিশেষত্ব—সঙ্গীতকলার যে অংশ নৃত্যকলা নামে অভিহিত, তাহা কেবল যে সঙ্গীতকলার অপর দুইটি অংশ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর তাহা নহে, অন্য সকলপ্রকার রসকলা হইতেও ইহা বিশিষ্টস্থানীয়। ইহার একটি আপন বিশেষত্ব আছে যাহা অন্য কোন

রসকলার—এমন কি গীত-বাদ্যেরও নাই। সেই বিশেষত্বটি এই—যে, গীত, বাদ্য, চিত্রণ ইত্যাদি সকল রসকলারই সৃষ্টির জন্য রসশিল্পীকে কোন একটি বাহ্যিক অবলম্বনের (medium) সহায়তা লইতে হয়। যথা—গীত-বাদ্য এবং কাব্যে সুর বা শব্দের অবলম্বন, চিত্রণে রেখা এবং বর্ণের অবলম্বন, ইত্যাদি। নৃত্যকলা-শিল্পীর এরূপ কোন বাহ্যিক অবলম্বনের সহায়তার প্রয়োজন হয় না—কারণ তিনি নিজেরই ছন্দোবদ্ধ গতিকে রূপ-প্রদান করিয়া রসানুভূতি দান করেন। সেইজন্য অন্যান্য রসকলা হইতে নৃত্যকলা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা অন্যান্য রসকলা অপেক্ষা ব্যাপক এবং প্রভাববান। এবং এই বিশেষত্ব আছে বলিয়াই নৃত্যকলা ভারত-সভ্যতার যুগে যুগে পরমাত্মার বিশুদ্ধ আনন্দ-উপলব্ধির একটি বিশেষ সোপান স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বাসর

শ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিনও এমনি তারায় ভরা আকাশ ছিল—যেদিন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আজকের রাতটাও তেমনি মধুর হোয়ে আমার জীবনে এসেছে।

তখন আমি সেই সবে অনেক দিন পরে পশ্চিম থেকে ফিরে এসেছি,—তার দাদা যতীনের সঙ্গে গেলুম তাদের বাড়ি।

সন্ধ্যার পর সামনের খোলা ছাদে সে গান ধর্‌লে, যতীন আমার হাতে একটা এস্রাজ তুলে দিলে।

অনেক রাতে যখন গানের মজলিস্ ভাঙল তখন অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম নীচে।

সে দরজার পাশে থেকে ডেকে বল্লে—"আবার আস্‌বেন।"

আঃ!— তার পরের দিনগুলি···আজ মনে হোচ্ছে যেন তারা আমার ঘুমের মাঝের স্বপ্ন! আর আজকের এই রাতটা? এও কি স্বপ্ন?

আমার বোন সুধা এসে ওষুধ খাইয়ে মাথার কাছে বোস্‌ল।

বল্লুম—"সেই গানটা গা দেখি বোন্—সেই যে—

'শুধু যাওয়া আসা
শুধু আলোর আঁধারে
কাঁদা হাসা'।"

তার গান শেষ হোলে বল্লুম—"এইবার তুই যা' বোনটি, কিন্তু আজ রাত্তিরে আমার মাথার কাছের জানালাটা আর বন্ধ করিস্‌নে ভাই। যে ক'টা দিন আছি চোখ ভরে দেখে নি ঐ আকাশটাকে।

সুধা চোখে আঁচল চেপে ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। পাশের ঘর থেকে তার চাপা কান্নার আওয়াজ এলো।

জগৎটাকে বড় সহজ ভাবে নিতে শিখেছিলুম—তাই যখন সে আমায় আঘাত কর্‌লে, সে বেদনা বড় বেশী করেই আমার বুকে বেজেছিল। সে আঘাত বুঝি সইতে পারিনি। তাই আজ নিরুদ্দেশ যাত্রার ডাক এসেছে।

সন্ধ্যা-তারাটার পানে চেয়ে মনে হোল, কাল ভোরে ঐ তো দেখা দেবে শুকতারার রূপে। আমার মনও বুঝি ঐ তারারই মত—এ জীবনের অন্ধকারে তাকে হারিয়ে ফেলে ফিরে পাব আর-জীবনের উষায়।

২

আজকের সকাল আমায় কাছে এসে পৌঁছাল তার শুভ্র আনন্দের ডালি বহন করে।

পাশের জানলাটার ফাঁকে অশ্বত্থ গাছের একটা ডাল দেখা যাচ্ছে, তার পাতা কাঁপ্‌ছে সকালের হাওয়ায়।

মাথার বালিসের তলায় হাত দিয়ে ছুখানা চিঠি বের করে আন্‌লুম।

এখানা সে লিখেছিল যেদিন্ আমাদের বিয়ের কথা হয় সেই দিন—নানা কথার পর সে লিখেছে 'এতদিন যেন স্বপ্নে ছিলুম, আজ পরিপূর্ণ আলোয় জেগে উঠে যেন নিজেকে নিজেই চিন্‌তে পার্‌ছি না। আমাকে তুমি গ্রহণ কর্‌বে? এ ভাব্‌তেও যে কি আনন্দ, কি বেদনা, তা কেমন করে জানাবো? আজ জীবন এত পরিপূর্ণ মনে হোচ্ছে—যে, আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না। ইতি তোমার মনু।'

সব তো শেষ হোয়ে গেছে তবু চিঠির প্রত্যেক অক্ষরটি কেন এখনও এমন আনন্দের মূর্ত্তি ধরে আমার কাছে দেখা দেয়!

আর এ চিঠিখানা—এর নীল কালী এখনও ঝাপ্‌সা হোয়ে আসেনি। এটা সে লিখেছিল যেদিন আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়—সে লিখেছে 'ভুল্‌তে বোল না! ভুলতে পার্‌বো না। মনু।'

এই চিঠি ছুটিই আমার ছুঃখ-দিনের পাথেয়। মাথার বালিসের তলায় চিঠি ছুটো লুকিয়ে রেখে খোলা জানলাটার ফাঁকে নীল আকাশটার পানে চেয়ে রইলুম।

আজ মনে হোল সুখের শেষ আছে,—ছুঃখের বুঝি অন্ত নেই এ জগতে,—বুঝি ঐ নীল আকাশের মতই অনন্ত।

সুধা ঘরে এসে বল্লে—"দাদা, অনেক দিন পরে তার চিঠি পেয়েছি আজ। তোমার অসুখের কথা জানে না সে। লিখেছে—তোমার বিয়ের দিন এসে কোমর বেঁধে খাট্‌বে আর পেট ভরে খাবে।"

বল্‌তে বল্‌তে সুধার গলা ভারি হোয়ে এলো, তার ছুই চোখ জলে ভরে উঠ্‌লো।

বল্লুম—"কাঁদিস্‌নে বোন, কি সুখ আর কি যে ছুঃখ আমরা তার কি জানি? যে ঢেউয়ের ধাকায় এসে পড়ি সুখের চরে, আবার তারই টানে তলিয়ে যাই ছুঃখের অতলে। তাকে লিখে দিস্—আমার বাসরশয্যা পাতা হয়েছে; অপেক্ষা কোরে থাক্‌বো মৃত্যুরও পরে। আবার কাঁদিস্ কেন সুধা, বোনটি আমার! তোর গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমার ঘুম আসে; সেই গানটা গা' তো ভাই—সেই—'ভাঙল মিলন-মেলা'।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মেয়েদের প্রতি

শ্রী অনুরূপা দেবী

যাঁরা অনেকদিনের আগ্রহ ও চেষ্টায় আমার আমার দেশের এই মেয়েগুলির সাম্‌নে এসে আজ আশীর্ব্বাদ কর্ব্বার সুবিধা করে’ দিয়েছেন, তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞত জানাচ্ছি, যারা আশীর্ব্বাদের যোগ্য তাদের এই সঙ্গে আশীর্ব্বাদ, আর প্রণম্য যদি কেউ এর মধ্যে থাকেন তাঁকেও আমার বিনীত প্রণাম।

মেয়েরা! আজ তোমরা সুকুমারমতি বালিকা, সংসারের কোন কিছুরই সংস্পর্শে আজ পর্য্যন্ত তোমরা ভাল করে’ আস্‌বার অবসর পাওনি। পৃথিবী বল্‌তে এখনও তোমাদের মনের মধ্যে দেখা দেয় ভূগোলের গোলাকার বৃত্তরেখা আর তার পরিচয়—পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল। একটা সুখে দুঃখে পরিপূর্ণ, কান্নাহাসি-ভরা বাস্তব জগৎ যে বর্ত্তমান আছে—এবং সেটার পরিচয় যে শুধু তার গোল-কত্বেই পর্য্যাপ্ত নয়,—এ বোধ তোমাদের বয়সে কোন মেয়েরই থাকেনা; হয় ত আমাদেরও ছিল না। ছিল না তার প্রমাণ স্বরূপে এইটুকু মনে পড়ে, তখনকার দিনে একটা পাখী মরে’ গেলে শোকে বিছানা নিয়েছিলুম, রাস্তায় হরিবোল দিতে শুন্‌লে সারাদিন কান্না থাম্‌ত না। আর আজ? থাক্ সে কথা—শোন মায়েরা! কঠিন কঠোর সংগ্রামময় সংসারের সঙ্গে তোমাদের নবীন জীবনগুলি এখনও কোনরূপ সংঘর্ষে আস্‌তে সময় পায়নি; শরীর-মন আজও তোমাদের প্রভাতের নবরবিকিরণসমুজ্জ্বল শিশির-সম্পৃক্ত সদ্যপ্রস্ফুটিত অম্লান মল্লিকা ফুলগুলির মতই নির্ম্মল ও পবিত্র রয়েছে, মধ্যাহ্নসূর্য্যের খর করজাল, ঝঞ্ঝাবায়ুর নির্ম্মমতা,—কালের করাল সঙ্ঘর্ষ তোমাদের নূতন জীবনের আশা, আনন্দ ও নবীনতাকে এখনও স্পর্শ করে’ ম্লান, বিশীর্ণ ও অবলুণ্ঠিত কর্‌তে পারেনি; জীবনের এই সবচেয়ে শুভ মুহূর্ত্ত, সর্ব্বাপেক্ষা শুভদিন,—সমস্ত জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুল্‌তে, এই তোমাদের সাম্‌নে মঙ্গলময় শুভ অবসর এসেছে, একে তোমরা তোমাদের কল্যাণময় হস্তে বরণ করে’ নিয়ে হে কল্যাণিগণ! চিরকল্যাণে নিজ নিজ সংসারকে, সুদূর ভবিষ্যৎকে সুকল্যাণে মণ্ডিত করে’ তোল। জীবনের এই প্রভাতকালকে অবহেলায় ব্যর্থ হ’তে দিলে জীবনমধ্যাহ্নে যখন সূর্য্যের তেজ খরতর হ’য়ে উঠ্‌বে, তখন তাকে মাথার উপর সইতে পারা কঠিন হবে মা! তাই গৌরীর মত এখন থেকেই তোমাদের রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ কর্ব্বার জন্য একটু করে’ তপস্যার অভ্যাস রাখা একান্তই প্রয়োজনীয়।

পর্ব্বত-রাজপুত্রী উমা তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পিতৃগৃহ, যে গৃহকে উল্লেখ করে’ মহাকবি কালিদাস বলেছেন, “যদি চাও স্বর্গভূমি, বৃথা তপ কর তুমি, দেবের বাঞ্ছিত দেবি! তব পিতৃভবনে।” সেই দেবনিবাস তুল্য পিতৃগৃহ, পিতৃসম্পদ, সুকুমার কৈশোর কালের সমস্ত আনন্দ, এই সমুদয় পরিত্যাগ করে’ উমা কৃচ্ছ্র-সাধন কঠোর তপস্যায় মহারুদ্রকে প্রসন্ন কর্‌তে কায়মন সমর্পণ করেছিলেন, এবং তা করে-ছিলেন বলেই একদিন বিমুখী ত্রিশূলী প্রত্যাখ্যাতার কাছে প্রত্যাবৃত্ত হ’য়ে স্বেচ্ছায় তাঁকে বরদাতা হয়েছিলেন—সাধনায় সিদ্ধি এসেছিল।

আমার মেয়েরা! তোমরাও সেই জগজ্জননী মহাশক্তি-রই অংশসম্ভূতা, তোমরাও তোমাদের এই সমাগতপ্রায় সুকুমার কৈশোর কালকে বৃথা সুখান্বেষণে অপব্যয়িত হ’তে না দিয়ে হিমাচলসুতা পার্ব্বতীর মতই কঠিন পঞ্চতপের শুচি-শুদ্ধ হোমাগ্নিজ্বালার পার্শ্বে আতপ্ত, দুরন্ত শিশিরসিক্ত শীতরাত্রে বিনিদ্র, সজল জলদজাল-পরিবেষ্টিত বর্ষণশ্রান্ত সন্ধ্যায় অনাবৃত থেকে একমনপ্রাণ হ’য়ে রুদ্রযজ্ঞের সমাপন চেষ্টায় সচেষ্ট হও; তাহ’লে ভক্তবৎসল ভগবান কখনই তোমাদের প্রতি বিমুখ হ’য়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না,—পার্‌বেন না, দেখা তোমাদের দেবেনই, বরদাতা হ’য়ে অভয়মূর্ত্তি ধরেই দেখা দেবেন। মদনভস্মের কালাগ্নি-শিখা তাঁর ললাট থেকে নিবে এসেছে, এই সময় সবাই মিলে তাঁর প্রসন্নতা লাভের জন্য, চিরসৌভাগ্য লাভের জন্য, মহা-মনে দীক্ষা নিয়ে

দেশের কাজে দশের সঙ্গে একযোগে তপস্যাচরণ কর্‌তে থাক। পার্ব্বতী তাঁর তপঃসিদ্ধি দ্বারা নিজগৃহে পরবাসী, পরাধীনতার নিপীড়নে প্রপীড়িত দেবসমাজকে অধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত কর্‌বার জন্য কুমারকে প্রাপ্তি সম্ভব করেছিলেন। হে কুমারীবৃন্দ! আর আজ তোমরা তোমাদের তপস্যার প্রভাবে এদেশের সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কুমারকে নবজীবন-সম্পন্ন করে' তোল। কন্যারূপে, ভগিনীরূপে, গৃহিণীরূপে, জননীরূপে পুরুষকে দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত, সচেতন কর্‌তে পারলে, তবে এ যুগে তোমাদের জন্মান সার্থক হবে—কুল পবিত্র হবে, জননী ধন্যা হবেন। সকলে এই মাতৃপূজার মহামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মহাত্মার প্রদর্শিত অহিংস ব্রতধারিণী হ'য়ে ভারতবর্ষের আদর্শ, যুগযুগ-পরিচালিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ, চিরসম্মানিত হিন্দু সতীর মহিমাখ্যাতি অম্লান রেখো—সহস্র প্রলোভন ও প্ররোচনা যেন তোমাদের টলাতে না পারে। এই আমার ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ। *

ভাদ্র

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

ধান-ক্ষেতে কে রে নৌকা দিছিস্—
ডাক ছেড়ে কয় আছেল ভাই;
ভরা জলে মাঠ থই-থই করে,—
পাল তুলে যায় বিদেশীরাই।
সমুখের গ্রাম দেখা নাহি যায়,
শুধু একখানি আব্‌ছা টান,—
জলের উপরে বাঁচায়ে রেখেছে
জলডোবা-মধু সবুজ প্রাণ!
ঐদিক হ'তে ঢেউ চলে' আসে,
ঘাটে ঘাটে লেগে ভাঙিয়া যায়;—
আধেক কলস ডুবায়ে বধূর
প্রাণ কাঁদে,—ভাবে, হায় রে হায়!—
বাপের দেশের ঐদিকে পথ,—
ছাড়িয়া এসেছে কত না কাল;
পরাণের ভাই আসে না দেখিতে—
কাঁদিয়া বোনের হ'ল কি 'হাল'!
দূরে ধানক্ষেতে 'কোড়া' ডাকে কোথা
টুব্‌-টুব্‌ করে'—উদাস সুর!
ভরা বরষার বেদনার দূত,—
যেতে হবে যেন অনেক দূর।
টিকাড়া বাজায় কোন্ 'ভাওলায়'—
ডিক্‌-ডিক্‌-ড্রিম্—অলস দিন;
চেয়ে চেয়ে বেলা ব'য়ে যায় হায়
শুধুই কেবল অর্থহীন!

খালে ঘোলা জল কল্ কল্ করে,—
সারা দিন চলে একটানা;
ধনুকের মত বাঁকা সাঁকোটায়
আসা-যাওয়া করে লোক নানা।
ওপারে শুকায় জেলেদের জাল;—
কাহাদের যেন পাট কাটি'
ডিঙিটি বাহিয়া আসে রমজান
মাঠে এতখন জন্ খাটি'।
পাড়ে কচুবন ডুবু ডুবু করে,
'ধার' পড়ে' গেছে মাঝ দিয়া,
বন্দেআলীর ছোটে ছেলে গ্যাদা
বসে' আছে সেথা ছিপ্‌ নিয়া।
'বানা' দিয়ে কারা 'ঘিয়ার' পেতেছে
ভাদুড়ী বাড়ীর ঠিক নীচে;
ঐদিকে চেয়ে এলোমেলো মন
ভেবে চলে আজ কত কি যে!
অশথ-তলায় খড়ো কালী-ঘর,—ভেঙে পড়ে' গেছে
স্রোতে জলে;
পড়ে কাৎ হ'য়ে মায়ের মূর্ত্তি,—
জীর্ণ মলিন—যায় গলে'।
হোথা 'আওতায়' মাঝি 'খরা' বায়
ভাদ্রের সাথে তাল রাখি';
দূরান্তরের স্বপ্ন লেগেছে—
কি মায়া ভুলায় মোর আঁখি!

* শিবপুর ভবানী বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় সভানেত্রীর অভিভাষণ।

হাল ফ্যাসান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

সুলেখার বিয়ের পর শুক্লার লেখা —

আজ আমি ঠিক ক'রেছিলাম কোন রকম দুষ্টুমি করব না। লক্ষ্মীমেয়ের মত চুপচাপ ব'সে থাক্‌ব তারপর সময় হ'লে বাড়ী ফির্‌ব, কিন্তু তা তো হ'ল না, এ সব সেই দেবকুমারের দোষ,ওকে দেখ্‌লেই আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়।

বিয়ে-বাড়ী ঢুক্‌তেই সুলেখার মা আমার হাতে একরাশ ফুলের মালা দিয়ে বল্‌লেন —"সকলকে দিস্।" আমি মালা নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখি দেবকুমার আসছে কি সুন্দর শালের জামিয়ার গায়ে দিয়েছিল! আমি কিন্তু ঠিক করেছিলাম ওকে কিছুতেই মালা দেব না, এদিকে বিনোদ বাবু সেখানে এসে বল্‌লেন -"ওরে, দেবকুমারের গলায় যে মালা নেই, ওকে একটা দিবি না?" কি জানি আমার মাথায় আজ কোন্ ভূত চেপেছিল আমি পিছন দিকে মালাগুলো লুকিয়ে রেখে গম্ভীরভাবে বল্‌লাম —"হ্যাঁ, একটা এনে দিতে হবে।" বিনোদ বাবু ব্যস্ত ছিলেন তখুনি আবার অন্য কাজে চ'লে গেলেন, আমি ভাব্‌লাম বেশ মজা! ওমা,গাড়-জ্বালান লোকটা আমার কাছে এসে কি বল্‌লে জান? শুন্‌লে কেউ বিশ্বাস করবে না। বরফের ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণস্বরে বল্‌লে—"মিথ্যা কথা বল্‌বার কোন দরকার ছিল না, মালা আমি চাই না, বরং ঢুক্‌তেই যে মালাটা পেয়েছিলাম সেটাও দিয়ে যেতে পারি—" ব'লে শালের মধ্যে থেকে একটা হাত বা'র করলে, তাতে দেখি একগাছি বেলফুলের মালা জড়ান। এ কি বিভ্রাট! কিন্তু ওর সাম্‌নে কিছুতেই হার মান্‌তে পার্‌লাম না, তাই বেশ গর্ব্বিত ভাবেই উত্তর দিলাম—"আপনার দয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ! আমি কেন মিথ্যে কথা ব'লেছিলাম সেটার আসল মানে আশা করি বুঝ্‌তে পেরেছেন।" ব'লেই আমি সেখান থেকে পিছন ফিরে চ'লে গেলাম। তখন বোধ হয় আমার মাথার ঠিক ছিল না!

সভাতে তখনও ক'নে আসে নি, আমি সামিয়ানার পিছনে এসে দাঁড়াতেই সুধীর তার নিজের চৌকিটা ছেড়ে দিলে। পাশ ফিরে দেখি দেবকুমার ব'সে আছে! আমি সুধীরের দিকে ঝুঁকে বল্‌লাম —"এখানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বোস না?" তারপর আবার বল্‌লাম —"ওকি, তুমি মালা পাওনি? আমারই তো হাতে মালার ভার ছিল। তুমি কেন আমার ওদিকে আস নি?" সে একটু দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লে—"আস্‌ব না কেন? তার আগেই যে কে একজন আমায় একটা মালা দিয়েছিল, একবার ভাব্‌লাম সেটা ফেলে দিয়ে তোমার কাছ থেকে একটা আদায় করি—" আমি হেসে বল্‌লাম—"তা নয় আমি একটা উপহারই দিলাম—" আমার হাতে যে মালাটা জড়ান ছিল সেটা খুলে তাকে দিলাম। আমার ডান দিকে যে ভদ্রলোকটি ব'সে ছিলেন তিনি যে এ ব্যাপারটা ভালচোখে দেখেন নি তা বলাই বাহুল্য। আমার কিন্তু বেশ মজা লাগ্‌ছিল! সুধীর একবার হেসে বল্‌লে—"কি শুক্লা, আজ তোমার হয়েছে কি, চোখ-মুখ যে জ্বলজ্বল করছে—" আমি হেসে বল্‌লাম—"কি যে বল!"

অঘ্রাণ মাসের পক্ষে মন্দ শীতটা পড়েনি। পিঠের কাপড়টা একটু টেনে দিলাম দেখে সুধীর বল্‌লে—"শীত করছে?" আমি বল্‌লাম—"হ্যাঁ, শালটা ড্রয়িংরুমে ফেলে এসেছি—" সুধীর তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের শালটা খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে- দিলে। আমি বল্‌লাম -"ওকি? তোমার নিজের যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে? তার চেয়ে চট্ ক'রে আমার শালটা এনে দাও না।" সুধীর বল্‌লে—"তোমার শাল আন্‌ছি, তুমি ততক্ষণ ঐটে গায়ে দিয়ে থাক।" শালটা ভাল ক'রে গায় দিতে গিয়ে তার একটা কোণ দেবকুমার বাবুর গায়ে গিয়ে পড়্‌ল,অমনি তিনি এমন ক'রে স'রে গেলেন, যেন কি অপবিত্র জিনিষই না তাঁর গায়ে লেগেছে। আমি

ভাল হ'চ্ছে না। তাকে বৃথা আশা দেওয়াতে তোমার অন্যায় হয়েছে, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়; তুমি কি ভাব তা জানি না।" মা এমন ভাবে কথা বল্লে আমার মনে বড় কষ্ট হয়! আমায় নিরুত্তর দেখে মা আবার বল্লেন—"বেশ ক'রে বুঝে দেখ, সুধীর-সংক্রান্ত ব্যাপারটা খুব প্রশংসনীয় নয়।" আমার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল! আস্তে আস্তে বল্লাম—"মা, আমি কি কর্‌ব?" মা ধীরে ধীরে আমার চোখের জলে ভেজা চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বল্লেন—"যা হবার তা তো হয়েছে, এখনও উপায় আছে; সুধীরকে স্পষ্ট সব বল, তারপর তাকে যেতে দাও, তাকে বিয়ে না ক'রে নিজের কাছে শুধু আটকে রাখ্‌লেই লোকে নানারকম কথা ব'লে বেড়াবে।" আমি বল্লাম—"যেমন ক'রে হোক এর একটি নিষ্পত্তি কর্‌ব।"

সারা দুপুরটা শুয়েই কাটালাম, বিকেলে মা বাইরে বেরুলেন, আমি আজ আর সঙ্গে গেলাম না। বাগানে একটা বেতের চেয়ার 'নয়ে ব'সে একটা বই পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম, এমন সময় চাপরাশীটা একটা ছোট পার্শেল আর একটা চিঠি আমার হাতে দিলে। চিঠি খুলে দেখি দেবকুমার বাবু লিখ্‌ছেন—"মাননীয়াসু, আপনার রুমাল কালই ফেরাইনি ব'লে লজ্জিত। আশা করি, ত্রুটি মার্জ্জনা কর্‌বেন।—ইতি শ্রী দেবকুমার রায়।"

ঠিক তারই উপযুক্ত চিঠি! কোথা থেকে পেলে, কি বৃত্তান্ত কিছুই নেই, কেবল রুমাল ফেরৎ পাঠালেই চুকে গেল! আমি পার্শেলটা আর খুল্‌লামই না, যেমন ছিল তেমনই রেখে দিলাম।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সাধনা

শ্রী শিবরতন মিত্র

বঙ্গসাহিত্যের স্বরূপ ও সাধনা

একটি খরস্রোতা, বিপুলকায়া, আবর্ত্ত ও কল্লোল-ময়ী নদী প্রচণ্ডবেগে তরঙ্গ তুলিয়া যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যায়, মানবজাতির মানস-নদীও সেইরূপ কালের বুকে বহিয়া যাইতেছে। কবে, কোথায় এই নদীর জন্ম, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন—তবে, নির্দ্দেশ করার চেষ্টায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। কোথায় এই নদীর পরিণতি, কোন্ মহাসিন্ধুর বুকে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা কে বলিবে? কিন্তু সেই মহাসিন্ধুর কল্পনায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। ইহাই বিশ্ব-মানব বা মানবজাতির সাহিত্য-সাধনা।

নদীর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাতে মানবের মানস-ক্ষেত্র উর্ব্বর হয়—সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়, মানবাত্মার পিপাসা নিবারিত হয়। সাহিত্যের গতি, নদীরই গতির মত। নানা দেশ—নানা ভাষা—নানা সাহিত্য। কিন্তু বাহিরে ভেদ রহিলেও, ভিতরে মহামিলন! এখনকার দিনে, বিশ্ব-সাহিত্যের সুষ্ঠিত্ত পরিচিত না হইলে, প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না, গভীররূপে সাহিত্যের আস্বাদনও করা যায় না। বিশ্ব সাহিত্যের মধ্যে আমাদের ভারতীয় সাহিত্য তাহার মধ্যে বঙ্গসাহিত্য।

বিগত দেড়শত বৎসর মধ্যে, এই বঙ্গসাহিত্য এক অভিনব পুষ্টি, গভীরতা ও গতিশীলতা লাভ করিয়াছে। ইহার বৈচিত্র্যও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালী জাতির উন্নতমুখী সাধনা, বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা—এই সাহিত্যে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। আমরা বাঙ্গালী - শরীরের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে জন্মিয়া বাঙ্গালী হইয়াছি। কিন্তু মনের দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা বাঙ্গালী হইতে হইলে, সাহিত্যের অনুশীলন করা আবশ্যক। কারণ, আমাদের দেশের মানস-জীবন, এই সাহিত্যের মধ্যেই বিম্বিত ও স্পন্দিত। দেশীয় সাহিত্যের আলোচনার ইহাই হেতু।

আমরা প্রত্যেকে যেমন এই সাহিত্য সাধনায় যোগদান করিয়া, ইহার সহিত মিলিয়া, দিনের পর দিন অগ্রসর হইব, তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাহিত্য প্রচারক হইয়া, আমাদের চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, এই প্রবাহের সহিত অগ্রসর হইতে সাহায্য

করিব। সাহিত্যের জন্য এইটুকু করিতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি ন্যায়তঃ বাধ্য।

সাহিত্য-সৃষ্টি, অবশ্য সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং গ্রন্থ-রচনা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহা জনসমাজে প্রচার করা ভাল কাজও নহে। অনধিকার-চর্চ্চা সকল ক্ষেত্রেই পাপ। আত্ম-জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি। আমি কতটুকু জানি, যাহা জানি বা জানি বলিয়া মনে করি, তাহার কতটুকুই বা আমার নিজের, আর কতটুকুই বা ধারকরা বা পোষাকী জিনিষ, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। আমাদের শিখিবার যতখানি, বলিবার বিষয় ততখানি নাই। এই সুলভ ছাপাখানার দিনে, এই লিখিবার বা বই ছাপাইবার প্রলোভনের একটা বিকট উন্মাদনা, চারিদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে।

বঙ্গের দুইজন সুবিখ্যাত মনস্বী স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম—কোন বিষয়ে রচনা করিয়া তাহা তাড়াতাড়ি প্রকাশিত করা ভাল নয়। রচনাটি কিছুদিন পর পুনর্লিখিত করা উচিত, তাহা হইলে নিজেনিজেই তাহার সংশোধন হইয়া যাইবে। অবশ্য এ উপদেশ যুবক বা শিক্ষার্থীর জন্য হইলেও, তাহা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবেও প্রযোজ্য। সাংবাদিকগণের কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যের জন্য স্থায়ী রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই উপদেশ স্মরণ করিতে বলি।

আত্ম-নির্দ্ধারণ

আজকাল আত্ম-নির্দ্ধারণ বলিয়া একটা খুব বড় কথা বিদ্বৎসমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক মহাজাতি বা Raceকে আত্ম-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—অর্থাৎ, তাহার নিজস্ব সভ্যতার ও সাধনার বিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখিয়া অন্যান্য মহাজাতির সহিত আদান-প্রদানের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক মহাজাতির পক্ষে যাহা সত্য, প্রত্যেক ভাষা ও সহিত্যের পক্ষেও তাহা সত্য। আমাদের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকেও নিজের বিশিষ্টতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এতদিন আমরা সে বিষয়ে মনোযোগী হই নাই। আমাদের বর্ত্তমান রচনা-রীতি ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয় গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে যে-সকল রচনা-রীতি চলিতেছে, তাহা আমাদের বিশিষ্টতার কতখানি পরিচায়ক, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

বর্ত্তমান বাঙ্গালার অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখকের রচনা, ইংরাজী ভাষার অনভিজ্ঞ লোক একেবারেই বুঝিতে পারে না। অথচ, সেই সেই লেখক ও তাঁহার অনুরক্ত ভক্তেরা মনে করেন এবং প্রচারও করেন যে, ইহা সুবোধ্য কথা-ভাষায় লিখিত হইয়াছে! কিন্তু ভাল ইংরাজী-জানা লোক ছাড়া সে ভাষা কেহই বুঝিতে পারে না। ইহা কি একটা নিতান্ত বিসদৃশ ব্যাপার নহে? দেশের জনসাধারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পায় নাই। তাহারা ঠিক্ কিরূপ ভাষায় কথা কহে, গ্রামে বসিয়া গ্রাম্যলোকের সহিত মিশিয়া ইহা যদি নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত সাধারণ জনশ্রেণীর যে বিষম ব্যবধান ঘটিয়াছে, তাহা দূর করা সম্ভবপর হইতে পারে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই কঠিন সাধন-পথ পাড়িয়া রহিয়াছে। কলিকাতা নহে—মফঃস্বল হইতে এই সাধনা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। কেন, তাহা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

অনুভব-পদ্ধতি—জাতীয় বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির (Race) সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক জাতির অনুভব করিবার, চিন্তা করিবার এবং সেই সেই অনুভূতি ও চিন্তা. বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি ঠিক্ একরূপ নহে। একটি বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া, কি কোথায় বসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বক্তার মনের কোন্‌টির চিন্তা বেশী জোরে সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারা যায়। যেমন—"আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি"—এই একটি বাক্য। নাট্য-সাহিত্যে (In dramatic mood) বলা হয়—'দেখেছি গো দেখেছি—বেশ ভালো করে' দেখেছি—আমি নিজে দেখেছি'। এই দুই প্রকার বাক্যপ্রয়োগের পশ্চাতে বক্তার হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়ার বিশেষরূপ পার্থক্য রহিয়াছে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative philology) যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন

যে কোন জাতির চিত্ত, ক্রিয়াকেই প্রধানরূপে দেখে, আবার কোন জাতির চিত্ত, স্বভাবতঃ কর্ত্তাকেই প্রধানরূপে দেখে। কোন জাতির ভাব-নিষ্ঠতা (Subjectivism) অধিক, আবার কোন কোন জাতির বস্তু-নিষ্ঠতা (Objectivism) বেশী। জাতীয় প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য নানাবিধ কারণ-সমবায়ে সংগঠিত হইয়া উঠে। সেই সমুদয় কারণের আলোচনায় আমাদের আপাততঃ প্রয়োজন নাই। কিন্তু, এই প্রকার বৈশিষ্ট্য যে আছে, তাহা সাহিত্যের আলোচনায় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া, আমাদের এই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐ বৈশিষ্ট্যের পরিচয়লাভ একান্ত আবশ্যক।

ইংরাজী-সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্য

ভারতবর্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক কেন, তাহা আলোচনার বিষয়। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের ভারতবর্ষের যে-কোন সাহিত্যের তুলনা করুন। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যের আলোচনা, সমগ্র জাতির জীবনেরই আলোচনা। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস আমরা যতদূর জানি, তাহাতে দেখিতে পাই, ইংরাজ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। নানা দেশের নানা জাতি, তাহাদের সাহিত্য, ধর্ম্ম ও আচার লইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে, এবং ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান ও শোণিত-সংমিশ্রণের দ্বারা একটি জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। রোমান্, কেল্ট, এংগেল, নরম্যান্, ফরাসী প্রভৃতি এই প্রকারে সংমিশ্রিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের সাহিত্যও ঠিক্ তাহাই। এই গঠনকার্য্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার পর ইংরাজের সম্প্রসারণ আরম্ভ হইল। এই সম্প্রসারণে ইংরাজের জাতীয় জীবন ও সাহিত্য, পৃথিবীর অতীতের ও বর্ত্তমানের, নিকটবর্ত্তী ও সুদূরবর্ত্তী যাবতীয় জাতির সাধনা ও চিন্তা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। গ্রীস, রোম, মিসর, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, ব্যাবিলন ও চীন প্রভৃতি অতীতের সুসভ্য জাতিসমূহ ব্যতীত, ফিজি প্রভৃতি অসভ্য দেশও, এই সম্প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে। ইংরাজ জাতির এই যে ইতিহাসের ধারা—এই ধারার মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আসিয়া ইংরাজকে ভাবিতে হইয়াছিল—কিছু হারাইয়া ফেলিয়াছি, অতএব আর অগ্রবর্ত্তী না হইয়া, সেই হারানিধির অন্বেষণ করা প্রথম প্রয়োজন। এ প্রকার আন্দোলন যে ইংরাজী সাহিত্যে নাই, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু এই প্রকারের আন্দোলন আত্যন্তিক প্রয়োজন হয় নাই, স্থায়িত্বলাভও করে নাই।

হারানিধির অন্বেষণ

এইবার আমাদের সমস্যা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা, অর্থাৎ পূর্ব্বদেশের যাবতীয় প্রাচীন জাতির যাহারা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি, এবং আত্মপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আবার গৌরবশিখরে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, সেই সমুদয় জাতির বর্ত্তমান সময়ের প্রধান চিন্তাই এই যে আমরা একটা বড় জিনিষ হারাইয়াছি—সেই হারানিধি সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মানসী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের ইহাই প্রথম কথা।

পূর্ব্বদেশগুলি কিছুকাল, পশ্চিমের তাড়নায় বাহিত হইয়াছে—ইহা সত্য কথা। স্ব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও কিয়ৎ-পরিমাণে হারাইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন এই সমুদয় দেশ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আত্ম-নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্যে এইরূপ প্রচেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা ইংরাজী লেখাপড়া বেশ ভালরূপে শিখিয়া মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছি। ইংরাজী শব্দযোজনা ও বর্ণনা প্রণালী প্রভৃতি আমাদের ভিতর এত অতিরিক্ত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে বিনাচেষ্টায় সেই সমুদয় জিনিষ বাঙ্গালা হরফে ও বাঙ্গালা কথায় বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু হরফ ও কথা বাঙ্গালা হইলেই, তাহার প্রাণটাও যে বাঙ্গালা তাহা নহে। এখন সাহিত্যে বাঙ্গালার যাহা প্রাণ, তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত—

আত্মনির্ণয় বা আত্মনির্দ্ধারণ। এই আত্মনির্ণয়, উন্নতিমুখী গতির বিরোধী নহে—আবার, ঐকান্তিক স্থিতিশীলতাও নহে। গতি চাই, পুষ্টি চাই—সমগ্র বহির্জ্জগতকে আত্মসাৎ করা চাই। কিন্তু প্রাণশক্তির জোর না থাকিলে, এই সমুদয় ব্যাপারগুলি একটি অসম্ভব বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে। সুতরাং, আমাদের বৈশিষ্ট্য-নির্দ্ধারণ সাহিত্যক্ষেত্রে একান্তভাবেই আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে এই বৈশিষ্ট্য অবধারণ করিতে হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সাধন করিতে হইলে মফঃস্বল হইতেই তাহা করা আবশ্যক।

রচনা-রীতি ও আত্ম-নির্দ্ধারণ

রচনারীতি (Stylo) যে কত বড় জিনিষ তাহা আমরা এখনও বেশ ভাল করিয়া অনুভব বা আলোচনা করি নাই। আমার 'মোহন সুধা', 'অক্ষয় সুধা' ও 'সাগর-সুধা' গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং, এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রকারের রচনারীতি নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্যটি বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আত্মনির্দ্ধারণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের বা বাঙ্গালা ভাষার আত্মনির্দ্ধারণ যেরূপ আবশ্যক, তেমনি বাঙ্গালা দেশের এক একটি বিভাগেরও আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ইহা অবশ্য সাধনাসাপেক্ষ এবং দুরূহ কার্য্য এবং হয় ত এ কার্য্যের একটা চরম মীমাংসাও নাই। তথাপি আমাদিগকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের সমুদয় স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তা প্রভৃতি যদি কেহ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে এক এক অংশের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাঁহার মানসপটে জাগিয়া উঠিবে। আত্মনির্দ্ধারণের জন্য এই প্রকারের পর্য্যবেক্ষণ একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গের নদীপ্রধান স্থানের গ্রামসমূহ, আর বীরভূম জেলার গ্রামসমূহ একরকম নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সম্বন্ধও একরূপ নহে। এমন কি পল্লীবাসীর গ্রাম্যসঙ্গীতের সুরও পৃথক্—পোষাক-পরিচ্ছদের আচার ব্যবহারের ত কথাই নাই। এই সকল বিষয় বেশ প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। সাহিত্য-সাধনায় পর্য্যবেক্ষণ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই।

আমরা সাহিত্যের জন্য উন্নতির চেষ্টা করি, কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি যে জীবনের উন্নতির একটি অবশ্যম্ভাবী ফল সে কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। আমাদের সাহিত্যিক জীবনের উন্নতি হউক—আমাদের মানস-জীবন সম্প্রসারিত হউক, —উন্নততর চিন্তারাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া আমরা প্রকৃত আত্মোন্নতি-সাধনে মনোনিবেশ করি, —ইহাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত।—নচেৎ,সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যবসায়বুদ্ধি ও নানারূপ কৃত্রিম চাতুরী প্রবেশ করিয়া দেশের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিবে।

নাগরিক সাহিত্য বা ঔপন্যাসিক সাহিত্য

যাঁহারা বর্ত্তমান সাময়িক-সাহিত্যের বাদানুবাদের সহিত পরিচিত, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে কিছুদিন হইতে আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। নারী-চরিত্রই এই বাদানুবাদের বিষয়। পাশ্চাত্য স্বাধীন-প্রেম যেদিন হইতে আমাদের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে সেই দিন হইতেই এই বাদানুবাদের সৃষ্টি। যাঁহারা কলিকাতা সহরে থাকেন, প্রাচীন সমাজের বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন রকম করিয়া নিজেদের সমাজ গড়িয়াছেন, অথবা যাঁহারা ঐ প্রকারের নব্য সমাজের সংসর্গে আসিয়া,ঐ প্রকারের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যাহাই বলুন—আমরা গ্রামের লোক, গ্রাম্য-সমাজ ও গ্রাম্য-জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল যুগে, গ্রামের লোকেরাই উচ্চতর চিন্তা করিয়া থাকে। নাগরিক জীবন,উন্নততর ও গভীরতর চিন্তার অনুকূল নহে; বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে—তপোবনেই জ্ঞানের জন্ম হইয়াছে, আর সভ্যতা গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

আধুনিক উপন্যাসের প্রেমচিত্র সম্বন্ধে আমাদের গ্রাম্য-

বুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, তাহা নিবেদন করিতেছি। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ, মানব-জীবনে একটি অতিপ্রধান ব্যাপার। এই সম্বন্ধের সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়া মানুষ দেবত্বে আরোহণ করে, আর অপব্যবহার করিলে মানুষ ক্রমে অসুর, পিশাচ ও পশু হইয়া যায়। ভারতবর্ষ এই অভিজ্ঞতা বহু যুগ পূর্ব্বে লাভ করিয়াছে। ইউরোপের জাতিসমূহ, তুলনায় নিতান্তই আধুনিক। তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও দল বাঁধিয়া দস্যু-বৃত্তি করিয়া বেড়াইত। গৃহহীন, অন্নহীন—সুতরাং সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্য জীবন তাহাদের ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমুদয় চঞ্চলমতি ও জীবিকান্বেষণে পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান নরনারীকে সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্য জীবনে ও সুশৃঙ্খলিত সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক ছিল।

নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ হয়—পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ হয়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এই আকর্ষণ, নিম্নতম স্তরে সাময়িক সম্ভোগে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে—ইহাতে কোন স্থায়ী ফল উৎপাদন করে না। তাহার পর এই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থায়িত্বলাভ করে। তখন পুরুষ বা নারীর, সাময়িক দেহগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখসম্ভোগই, এই মিলনের ফল বলিয়া মনে হয় না—পুত্রকন্যা-প্রতিপালন প্রভৃতি স্থায়ী কার্য্য অবলম্বন করিয়া এই মিলন বা সম্বন্ধ মার্জ্জিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Gradual Idealisation বলে। ক্রমশঃ এমন দিন আসিতে পারে যখন দৈহিক লালসা একেবারেই থাকে না, অথচ উভয়ের মিলন অতিশয় মধুর ও গভীর হইয়া থাকে। সহধর্ম্মিণীত্ব এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইংরাজীর Transmulation.

আমরা যদি পুরাণাদির সাহায্যে আমাদের ভারতীয় সামাজিক অভিব্যক্তির বিবরণ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, একদিন আমাদের দেশে পৈশাচিক, রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল। তখনও আমাদের সমাজ হয় ত সুব্যবস্থিত হয় নাই, অথবা অন্যান্য সমাজকে আত্মসাৎ করিবার জন্য এই প্রকারের কতকগুলি অব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সে বহু অতীতের কথা। এখন আমরা বুঝিয়াছি যে পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন, প্রজাপতির আদেশেই হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী সংযম অভ্যাস করিবে। যে সংযত নহে, সে ভদ্রলোকই নহে; অধিকন্তু, সে মানুষই নহে। সংযত পুরুষ ও নারী, পরস্পর মিলিত হইবে—কিন্তু নিজেদের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখসাধনের জন্য নহে, বংশরক্ষার জন্য এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ধারা রক্ষা করিবার জন্য।

ভারতবর্ষ বহু যুগের বহু প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, মানবজীবনের এই চরম ও পরম শিক্ষা পাইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার হস্তেই বিবাহের ভার থাকিবে, মনোভবের উপর ভার থাকিবে না,—ইহাই ভারতবর্ষের সাধনার শেষ কথা। ভারতের ও প্রতীচ্য জগতের ইতিহাস ও সমাজের তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

এইবার চিন্তা করুন—আমরা আমাদের সাহিত্য-সাধনায় কোন্ দিকে অগ্রসর হইব? তরলমতি যুবক যুবতী, যাহারা শৈশব হইতে কোনরূপ সুশিক্ষা পায় নাই, তাহারা ইন্দ্রিয়ভোগের যথেচ্ছাচার স্বভাবতঃ ভালবাসে। কিন্তু, ইহা কে ভালবাসে? ভারতবর্ষের শাস্ত্র বলিলেন—যিনি প্রকৃত মানুষ, তিনি ইহা ভালবাসিতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যে পশু রহিয়াছে, সেই পশু ইহা ভালবাসে। আমরা, আমাদের সাহিত্য দ্বারা, মানবপ্রকৃতির অন্তর্ভূত এই পশুগুলিকেই কি বলবান্ করিয়া যথেচ্ছাচারের পথে ছাড়িয়া দিব? না,—এইগুলিকে শাসন করিয়া, সংযত করিয়া, আত্মশক্তির বিকাশসাধন করিয়া, ত্যাগ ও অহিংসার পথে অগ্রসর হইব? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই প্রকৃত মীমাংসা রহিয়াছে।

আমাদের দেশে এখন ভোগবাদীর সংখ্যা বেশী; তাঁহারা বলিবেন—তোমরা ভোগের পথ বন্ধ করিয়া মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছ; সেই কারণেই তোমাদের এই দুর্গতি। এতদিন ভোগবাদীরা নির্ভয়ে একথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—এই বুদ্ধ-চৈতন্যের দেশে, আবার নূতন আদর্শের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকের বিমল জ্যোতি পৃথিবীর অন্যান্য ভোগসর্ব্বস্ব দেশেও আজ উপস্থিত। সুতরাং ভারতের এই তপস্যা, বৈরাগ্য ও আত্মশক্তির বার্ত্তা নষ্ট হইবার নহে।

ঔপন্যাসিকগণ এই কথা মনে রাখিলেই, সাহিত্যের আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে দূরীভূত হওয়া কঠিন; কারণ যাঁহারা গ্রন্থরচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেন কয়জন? তাঁহারা নাম চাহেন, অর্থ চাহেন। কাজেই মানবের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়া তাঁহারা খ্যাতি ও অর্থ অন্বেষণ করেন। ইহাই এখন সাহিত্যের অবস্থা! সুতরাং এই আবর্জ্জনা দূর করা বড়ই কঠিন।

তথাকথিত উপন্যাসের যুগ

বর্ত্তমান যুগের উচ্চশ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন যে উপন্যাসই সর্ব্বোত্তম সাহিত্য—এবং এখন উপন্যাসের যুগ চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে নাটকের যুগ, তাহার পূর্ব্বে মহাকাব্যের যুগ ছিল। সাহিত্যের এই যে যুগ-বিভাগ—ইহা অবশ্য বিদেশীয় সমালোচকগণের নিকট আমরা পাইয়াছি। সাহিত্যের যুগের সহিত সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ আছে একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

পাশ্চাত্য সমালোচক যখন বলিলেন—বর্ত্তমান যুগ উপন্যাসের যুগ, তখন আমাদিগকে যে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে—ইউরোপের সমাজের বা জনসাধারণের যে অবস্থা, আমাদের অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকারের হইয়াছে কিনা? হয় ত কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সেই অবস্থা লাভ করিয়া থাকিবেন! কিন্তু জনসাধারণ ঠিক সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে কিনা, ইহা ভাবিবার কথা।

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যের তুলনা করিলে প্রথমেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সমালোচনা করিয়া একটা বিষয় বুঝিবার যে সামর্থ্য ইংরাজের হইয়াছে, সমালোচনা করিয়া নিজের স্বাধীন মত গঠন করিবার যে অভ্যাস সাধারণ ইংরাজের জন্মিয়াছে, আমাদের এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের অসদ্ভাব বশতঃই, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও এই সমালোচনা-শক্তি ও স্বাধীনভাবে মতগঠনের সামর্থ্য, আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া উঠিল না!

সমালোচনাবৃত্তি সুবিকশিত না হইলে, মানুষের মধ্যে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য না জাগিলে, ঔপন্যাসিক সাহিত্যের বাহুল্য জাতির পক্ষে হিতকর নহে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এখন কেবল উপন্যাসেরই ছড়াছড়ি! তরলমতি যুবক, আর অল্পশিক্ষিতা অলস-স্বভাবা যুবতীরা এই সমুদয় গ্রন্থের গ্রাহক ও পাঠক। আমরা ইহা বড়ই অমঙ্গলকর বলিয়া মনে করি। বিলাতে বা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে উপন্যাস-সাহিত্যের বাহুল্য দেখাইয়া যাঁহারা আমাদের মতের প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাহাকেও আমাদের মত মানিয়া লইতে হইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে দেশের ও সমাজের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ নিজ নিজ মত গঠন করিবেন—ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

সাহিত্য-সাধনার অন্তরায়

এখন সাহিত্যে মূলধনের প্রভাব (Capitalism in Literature) দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। যাহাদের টাকা আছে, তাহারা নিছক্ ব্যবসা করিবার জন্য, ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য, সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। মূলধনীর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটিয়া লেখকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বাজে ছবি, বাজে গল্প লিখিয়া, সাধারণ তরলমতি পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহারা দেশও জানে না, সমাজও জানে না; ধর্ম্ম, মানবতা বা ঈশ্বর জানেও না—বা মানেও না!

কোন মহৎ উদ্দেশ্য বা উচ্চ প্রেরণা লইয়া ইহাদের উদ্ভব নহে ইহাদের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নাই, থাকিবার আবশ্যকও নাই, অর্থের জোরে, বিজ্ঞাপনের জোরে—বাহ্য চাকৃচিক্যে ভুলাইয়া, লোকের হাতে যা-তা তুলিয়া দিতেছে! সাহিত্যসৃষ্টি বা উন্নতি ইহাদের উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন! সাহিত্যের পবিত্র প্রাঙ্গণে ব্যবসাদারের প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া সাহিত্যের অবনতি ঘটাইতেছে। যাহাদের সাহিত্যে কিছু

দিবার মত চিন্তা বা বুদ্ধি নাই, তাহারা পরিচালক হইলে সাহিত্যের যে দুর্গতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঘটিতেছে!

ক্রমে ক্রমে সাহিত্য-ক্ষেত্রে মূলধনের বিনিয়োগ হওয়ায় আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইল। পূর্ব্বে যাঁহারা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র চালাইয়াছেন, তাঁহারা একটা বিশেষ রকমের আদর্শ বা প্রেরণা লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু এখন যে-সে পয়সার জোরে কাগজ করিতেছেন। উৎকৃষ্ট লেখকের সংখ্যা বাড়িতেছে না, নবীন লেখকগণকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার বা সুভাবে পরিচালিত করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। একেবারে দায়িত্ববুদ্ধিহীন লোক, অর্থের জন্য বা নামের জন্য, সাহিত্য-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছে।

সাহিত্য ও ধর্ম্ম,ইহার মধ্যে প্রভেদ খুব কম—প্রভেদ নাই বলিলেই ভাল হয়। যেমন ধর্ম্মের নামে মঠ-মন্দির করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করা একটা পাপ, সেই-রূপ সাহিত্যের নামে মানুষের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন বা উত্তেজনা বিধান করিয়া অর্থ ও খ্যাতি উপার্জ্জন করাও একটি পাপ—এবং এই দ্বিতীয় প্রকারের পাপকেই, আমরা গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করি।

সাহিত্য-সাধনার আদর্শ

সাহিত্য-সাধনা মানব-জীবনে কঠিনতম সাধনা। ধর্ম্ম-সাধনার সহিত ইহার প্রভেদ নাই। সুতরাং, এই সাহিত্য-সাধনাকে উদ্দেশ্য বলিয়াই গ্রহণ করিব—অন্য কিছুর উপায় বলিয়া নহে। সাহিত্যসেবীর চরিত্রই প্রথম ও প্রধান জিনিষ। ঋষি-জীবনের আদর্শ, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই পুরোদেশে অবিচলিত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক।

ধর্ম্মরাজ্যে যেমন আত্মশক্তির ভূমিতে দাঁড়াইয়া সাধনপথে চলিতে হইবে সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি প্রত্যেক পদক্ষেপে ও প্রত্যেক উদ্যমে আত্মশক্তির ভূমি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং, একালে যাহাকে ফ্যাশন বলে, অন্ধভাবে তাহা দ্বারা বাহিত হইলে চলিবে না। Idola-কে সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর গুরুরূপী ভগবান্ অন্তর্য্যামী হইয়া বিরাজমান্। তাঁহার প্রতি চাহিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া, সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই আদর্শ নূতন নহে—প্রাচীন ভারতবর্ষ সাহিত্য-সাধনার এই আদর্শ বহুবহুযুগ পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং সাহিত্যে ব্যবসাদারী বা 'মাড়োয়ারী' পন্থা, চাতুরী, কাপট্য ও হুজুগ, পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যারূপিণী ব্রহ্মময়ী সরস্বতী দেবীর যাঁহারা একনিষ্ঠ উপাসক, তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, সে-জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা বাণীর প্রকৃত উপাসক, তাঁহাদের গোষ্ঠী যাহাতে বৃদ্ধিলাভ করে সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

সাহিত্য সাধনার পথে যাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হউন। Lord Macaulay বলিতেন—"আমি যে লিখি, তাহার কারণ আমার মাথা বোঝাই হইয়া রহিয়াছে—পকেট খালি বলিয়া লিখি না (I write not because my pocket is empty, but because my brain is full.)। অতএব যশের জন্য, অর্থের জন্য লিখিব না। যিনি সত্য, শিব ও সুন্দর, তাঁহাকে উপলব্ধি করিব, এবং বাহিরে অন্যান্য সকলের হৃদয়ে, মনে ও বাক্যে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্যের সাধনা করিব। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্ব্বে, এই উপদেশই দিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষকে জানিতে হইবে—বেশ ভাল করিয়া ধ্যান-যুক্ত হইয়া তাহার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য জানিতে হইবে। এই বহু জাতির মিলনের দিনে, বহুপ্রকারের আদর্শ ও সাধনার ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের দিনে, ভারতবর্ষের সেই সনাতনী বাণী, ধ্যানযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুনিতে হইবে। নিজেদের বৈশিষ্ট্য যথাযথ রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধ হইব না—অন্যান্য দেশের ও অন্যান্য জাতির অতীতে ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, বিচারপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিব ও আয়ত্ত করিব। ইহাই সাহিত্য-সেবকের সাধনাদর্শ হইবে।

এই আদর্শ জয়যুক্ত হউক—বিশ্বমানবের উপাস্য পরম-দেবতা যিনি শব্দমূর্ত্তিতে শাস্ত্ররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতিকে পরিচালনা করিতেছেন, সেই বেদপুরুষ ব্রহ্মণ্যদেব আমাদের সাহিত্য-সাধনার সহায় হউন।

নারীর স্বাস্থ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী রমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

(৪) খাদ্য কথা

(১) ভাত।—আমরা যে ভাবে ভাত খাই, তাহাতে পর-পর চাউলের কত অংশ অপচয় হয়, লক্ষ্য করুন:— (১) কলে মাজিবার সময়ে চাউলের উপরের লাল ও পাত্লা সাদা এই আবরকদ্বয় উঠিয় যায়; এই দুইটির সঙ্গে, চাউলের লাবণিক অংশ, স্নেহাংশ (কুঁড়ো) এবং চাউলের কোণা (ভ্রূণ, খুদ) ফেলা যায়। চাউলের লাল আবরণে, বেরী-বেরী নিবারক ভাইটামীন্ থাকে, কুঁড়োয় যথেষ্ট স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও কোণায় যথেষ্ট প্রোটীড জাতীয় পদার্থ থাকে। কলে মাজার ফলে, চাউলের এই তিনটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ নষ্ট হয়। (২) তাহার পরে, ভাত সিদ্ধ করিয়া, ফেন ফেলিয়া দিলে,—তৎসঙ্গে অনেকটা শ্বেতসার-অংশ ও ভাইটামীন অপচয় হয়। এই ফেনটা, সাগু বার্লি'র মত, লবণ বা গুড় সংযোগে রোগীর পথ্য বা পানীয়-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আর্কট নগর অবরোধকালে, সিপাহীরা এই ফেন খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছিল। খুদ ও কুঁড়ো খাইয়া হাঁস, মুরগী, শূকররা কেমন কান্তিযুক্ত হয়। আমরা ফেন খাইতে ভয় পাই—কারণ, "উহা খাইলে গুরুপাক হয়" এই অমূলক ধারণা আমাদের মধ্যে আছে বলিয়া। অথচ, সেই আমরাই, রোগীকে প্রথম পথ্য ফেন-সুদ্ধ ঘুঁটের-পোড়ের ভাত দিই! অতএব, গৃহে গৃহে, ফেন-সুদ্ধ ঢেঁকীছাটা আতপ চাউলের ব্যবহার হওয়া চাই—চাউলের লাল রং দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। পূর্ব্ববঙ্গে, প্রাতরাশ হিসাবে, সামান্য ফেন-ভাত খাইয়া স্বাস্থ্য বেশ ভালই থাকে এবং সকলেরই তাহা বেশ সহ্য হয়। গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি ফেন খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। ফেন-সুদ্ধ ভাত খাইলে, চাউলের খরচও কমিয়া যায়।

(২) ডাইল।—আমরা বড়ই অযত্ন করিয়া ডাইল খাই। (১) আমরা সাধারণতঃ একজাতীয় ডাইলই খাই,- দুবেলা মুগের অথবা একবেলা মুগের ও একবেলা কলাইএর ডাইল, এইরকম খাই। অথচ, পাঁচ মিশালী ডাইল খাওয়াই সব-চেয়ে ভাল। (২) আমরা অতিমাত্রায় জল দিয়া ডাইল রাঁধি—এবং পাতে তাহার অল্পই খাই, বেশীর ভাগ ডাইলের দানা বাটীতেই পড়িয়া থাকে। (৩) বড়ি, বড়া, ধোঁকা, পাঁপর, খিচুড়ি—এগুলির প্রচলন আমাদের মধ্যে খুবই কম। এবং (৪) অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে, সকলকে খাওয়াইয়া, অধিকাংশ স্থলে মেয়েদের খাইবার সময়ে ডাইল কুলায়ও না!—ডাইল খাইলে অনেকের অম্ল হয়; এবং কলাই ও মসুর ডাইল অনেক অবস্থায় হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। ছোলা ও অড়হড় খাইতে গেলে, একটু বেশী ঘি দিয়া খাইতে হয় বলিয়া কেহ কেহ হজম করিতে পারেন না। যাহা হউক, স্মরণ রাখিবেন যে, ডাইল, দ্বিদলশস্য (বরবটি, সীম ইত্যাদি), মাছ, মাংস, ডিম, Nuts ও ছানা একই জাতীয় খাদ্য;—অর্থাৎ, দেহের নিত্য "ক্ষয়পূরণ" ও "গঠন" এই প্রোটীড জাতীয় খাদ্য অমৃততুল্য। কাযেই, বিশেষ করিয়া ছেলেবেলায়, ডাইল খাওয়া অতীব প্রয়োজনীয়- হেলায় শ্রদ্ধায় খাওয়া ভুল। ডাক্তারি কথার বাহুল্য না করিয়া, মোটামুটি এই-টুকু বলিতে পারি যে, যে কোনও "একপ্রকার" ডাইল খাইলে, দেহের সকলরকম ক্ষয়পূরণ সম্ভবপর হয় না বলিয়া, "পাঁচ-মিশালী" ডাইল নিত্য খাওয়াই উচিত। খেঁসারীর ডাইল অধিকদিন খাইলে পক্ষাঘাত হইতে পারে, এটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ডাইল রাঁধিবার সময়ে, খোসাসুদ্ধ রাঁধা ও খাওয়া ভাল; এবং ডাইল গলিয়া ক্ষীরের মত হইয়া যাইবে, এই ভাবেই রাঁধিতে হয়। যাঁহাদের "রাঁধা"-ডাইল সহ্য না হয়, তাঁহারা "ভাতে দিয়া" ডাইল খাইতে পারেন। ডাইল খাইলে, সুন্দররূপে কোষ্ঠশুদ্ধি ঘটে। ছোলা, মুগ

প্রভৃতির কাঁচা অবস্থায় "কল" বাহির করিয়া লইয়া খাইলে, সহজ-পাচ্য ও ভাইটামীন-বহুল হয়।*

(৩) মাছ।—মাংস ও ডিম অপেক্ষা, মাছ সহজপাচ্য; কিন্তু মাছ সহজে পচে। মাছে খুব-বেশী মাত্রায় ফস্‌ফরাস্ আছে বা মাছ মস্তিষ্কের পক্ষে হিতকর—এ কথাগুলির মূলে সত্য নাই। "পাকা" মাছ ও তেলামাছ গুরুপাক। টাট্‌কা মাছ খাওয়া খুব ভাল। পুষ্টিকর হিসাবে, কৈ, মাগুর ও সিঙ্গী মাছ উৎকৃষ্ট। পরিপাক করিতে পারিলে, "মাছের তেল" হইতে যথেষ্ট ভাইটামীন পাওয়া যায়।

(৪) মাংস।—এ গরম দেশে, মাংস যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। বিশেষ করিয়া, ঋতুকালে, গর্ভাবস্থা ও ৩৫ বৎসর বয়সের পরে মাংস ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। মাছ, মাংস, ডাইল, Nuts ও ছানা হইতে, শরীরের "ক্ষয়" নিবারিত ও "গঠন"-কার্য্য সম্পাদিত হয়; এগুলিকে প্রোটীড্ বলে। প্রোটীড্‌দের মধ্যে, নানারকমের গুণের তারতম্য দেখা যায়—কোনও "এক"জাতীয় প্রোটীড্ হইতে দেহের "সকল"রকম ক্ষয়পূরণ সম্ভবপর নহে—Nuts ও ছানা ব্যতীত। এই গরম দেশের পক্ষে, ও মানবশরীরের পক্ষে, সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও উপকারী প্রোটীড্ খাদ্য—Nuts ও ছানা। মাংস একদিকে যেমন শরীরের পোষণে সাহায্য করে, তেমনি, অপর দিকে, মাংস হইতে ইউরিয়া প্রভৃতি বিষ জন্মাইয়া যকৃত ও মূত্রযন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করে। এবং অন্ত্রে পচিয়া, শরীরের ক্ষয়সাধন করে। আমরা মাংস খাইলেই, পরিমাণে অনেকটা খাই; এই কারণ, ভুক্ত মাংসের শতকরা দশভাগ হজমই হয় না; ও খুব তেল-মসলা সংযোগে মাংস রাঁধি; তদুপরি, আমরা অত্যন্ত অলস। সাহেবরা পোড়া বা সিদ্ধ মাংস খান এবং যাহার যেমনই অবস্থা হউক না কেন, সাহেবরা সাধারণতঃ অত্যন্ত পরিশ্রমী। বলি দিয়া বা শিকার করিয়া মাংস খাওয়ার পশ্চাতে, সংযম ও পরিশ্রমের যথাক্রমে ইঙ্গিত আছে,—আশা করি তাহা বুঝিতে পারেন। ফল কথা, মাংসের ব্যবহার আপনাদের মধ্যে যতটা কম হয় ততই ভাল। বেশী ছানা খান।

(৫) ডিম।—ইহার শ্বেত অংশটা প্রোটীড বহুল ও লাল অংশটা স্নেহ-বহুল। কাঁচা খাইলে, ডিম সহজে পরিপাক হয়—এবং যত সিদ্ধ করা যায়, ডিম তত দুষ্পাচ্য হয়। মাংসাপেক্ষা ডিম দেহের পক্ষে সামান্য কম অনিষ্টকর। এদেশের মেয়েরা সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ বলিয়া, ডিম না খাওয়াই ভাল। ডিমের পুড়িংটা মুখরোচক ও অপেক্ষাকৃত লঘুপাক। ডিম অতীব শীঘ্র ও সহজে পচিয়া যায় বলিয়া, বেশ সতর্ক না হইয়া খাওয়া উচিত নয়।

(৬) শাকসব্জী।—যেখানেই সবুজ রং, সেখানেই ভাইটামীন্। এই জন্য, শাকসব্জী সকলেরই প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত। তদ্ব্যতীত, শাকসব্জীর সাহায্যে দেহে নানা-জাতীয় লবণ (Salts) রক্তে যেমন সুন্দররূপে, সহজে ও সত্বর গৃহীত হয়, তেমন অপর কোনও উপায়ে হয় না—ফলের কথা ব্যতীত। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য, শাকসব্জীর তুলনা নাই। রাঁধার দোষে, শাকসব্জীর অনেকটা লবণাংশ ও শ্বেতসার-অংশ অপচয় হয়। যদি তরকারীগুলি খোসাসুদ্ধ রাঁধা যায়, তবে সে অপচয় হয় না। তরকারীর খোসা ফেলিয়া দেওয়াটা, স্বাস্থ্য ও অর্থের দিক দিয়া, অপচয়কর। তরকারীর খোসা ছাড়াইয়া রাঁধিলে, ঝোলটুকুও চুমুক দিয়া খাওয়া উচিত। শাকসব্জী যত বেশীক্ষণ সিদ্ধ হয়, তাহা তত ভাইটামীন-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে। আমাদের রক্ত ক্ষারধর্ম্মী। যথোপযুক্ত পরিমাণে ক্ষার রক্তে থাকিলে, দেহ সুস্থ ও রোগ-প্রতিরোধক থাকে। রক্তে এই ক্ষার যোগান দিতে, ফলমূল ও তরীতরকারীই পারে। শরীরে ক্যাল-সিয়াম, লৌহ, আইওডীন্, ফস্‌ফরাস্, পোটাসিয়াম্, সোডি-য়াম্ প্রভৃতি লবণ এই শাকবর্গ হইতেই আসে। এইজন্য, স্বাস্থ্যরক্ষার্থে, শাকসব্জীর স্থান খুব উচ্চে। আমরা যে ভাবে মাংস খাই, তাহাতে আমাদের দেহের রক্তের ক্ষারত্ব কমিয়া আসিতে পারে। হিংস্র জন্তুরা প্রথমে শিকারের রক্তের সঙ্গে লবণ ও প্রোটীড্ খায়; তৎপরে মাংসে, প্রোটীডই বেশীর ভাগ পায়। পরদিনে, দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলির সঙ্গে ভাইটামীন্ খায়। হাড়ে ক্যালসিয়াম ইত্যাদি থাকায়, হাড় খাইয়া দেহে ক্যাল্‌সিয়াম সংগ্রহ করে, কোষ্ঠশুদ্ধির উপায় করে ও দাঁত মাজার কাজ করে।

(৭) ফলমূল।—যদিও বা পুরুষরা ফল খান, অনেক

---

* আস্ত মুগ বা ছোলা পাঁচ-ছয় ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া জল হইতে উঠাইয়া ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিলে, পরদিন প্রাতে উহাদের অঙ্কুর বা কল বাহির হয়। অঙ্কুর অবস্থায়, উহারা সুপাচ্য ও ভাইটামীন-বহুল হয়।

বাড়ীর মেয়েরা তা খান না। নিয়ম করিয়া, মেয়েদের ফল খাওয়া উচিত—চেষ্টা করিয়া ফলে রুচি আনা খুবই দরকার। হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা ফলে বেশী অনুরক্ত। ফল খাইলে, রক্ত পরিষ্কার থাকে ও ক্ষারধর্ম্মী থাকে, যকৃত সুস্থ থাকে, কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, দেহে ভাইটামীনের উপচয় ঘটে। বোধ হয়, এই জন্যই, কচি ছেলেরা সহজ-বুদ্ধির প্রেরণায়, গাছে উঠিয়া কাঁচা ফল খায়। ফলে শর্করা থাকায়, মিষ্টফল মাত্রেই পুষ্টিকর। ফল হইতেও, ক্যালসিয়াম, লৌহ প্রভৃতি ধাতু (Salts) দেহে সহজে গৃহীত হয়। ফলের আর একটা সুবিধা এই যে, আবরণের মধ্যে থাকার দরুণ, ভাল করিয়া ধুইয়া খাইলে, জীবাণুঘটিত কোনও ব্যারাম ধরিতে পায় না। ফল দাগী হইলে, বা অতীব পাকিয়া যাইলে, (বিশেষ করিয়া তরমুজ), সেই ফল খাইলে উদরের পীড়া হইতে পারে।

(৮) Nuts.—যদিও ফল নহে, তবু বাদাম, চীনাবাদাম, আখরোট, নারিকেলের শস্য, পেস্তা প্রভৃতি Nuts-গুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর। এদেশে, অভিভাবকরা বাটীর ছেলেমেয়েদের ও কুটম্বদের পাতে বিষবৎ, ধূলিলিপ্ত, বাসি "দোকানের খাবার" অম্লানবদনে দিতে পারেন; কিন্তু সাহস করিয়া, উৎকৃষ্টতম ঐ Nutsগুলি যে কেন দেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ঐগুলিতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকায়, উহারা দেহের পক্ষে খুবই পুষ্টিকর এবং কোষ্ঠশুদ্ধির পক্ষে পরম হিতকারী। দেহের ক্ষয়পূরণে ও গঠনকার্য্যে Nuts পরম হিতকারী।

(৯) দুধ।—পরিশেষে দুধের কথা। দুধ দুর্ম্মূল, ও কচি ছেলেরা এবং মেয়েরা কিছুতেই দুধ খাইতে রাজী হয় না। যদি অবস্থায় কুলায়, তবে নিয়ম করিয়া, বাটীর প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে প্রত্যহ অন্ততঃ একসের খাঁটি, এক-বলকের দুধ খাওয়াইতেই হইবে। খাঁটি এক-বলকের দুধে যথেষ্ট ভাইটামীন আছে; তাহা ছাড়া, দুধের মাটা ও ছানা দেহগঠনে ও মস্তিষ্কপোষণে অমৃততুল্য। পূর্ব্বে, প্রোটীড খাদ্য হিসাবে ছানার স্থান কত উচ্চে, তাহা বলিয়াছি। দুধ, দৈ, ঘোল, ননী, মাখন, ঘি, ছানা—সবগুলিতেই প্রচুর পরিমাণে ভাইটামীন আছে। যাঁহারা গোরুর দুধ মহার্ঘ মনে করেন, তাঁহারা বাটীতে ২।৪টা ছাগল পুষিয়া এই poor man's cow (অর্থাৎ ছাগী) থেকে দুধ পাইতে পারেন। ভাঁটকলাই (Soya bean) * নিষ্পেষণে ঠিক দুধের মত রস পাওয়া যায়। যে গর্ভবতী নারী সমস্ত গর্ভকাল প্রত্যহ একসের খাঁটি গোদুগ্ধ খাইতে পান, তাঁহার সন্তান ভাল দাঁত ও অস্থি লইয়া জন্মায়। যে শিশু মাতৃস্তন্য ত্যাগের সঙ্গে, অন্ততঃ ৬।৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, প্রত্যহ একসের খাঁটি দুধ খাইতে পায়, তাহার কখনো দাঁতের পীড়া হয় না,—সে সাধারণতঃ সুপুষ্ট ও নীরোগ দেহ পায়। দুধের সকল কথা অল্প সময়ের মধ্যে বলা শক্ত। তবে এটা খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে হইলে, বা স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইতে গেলে,—দুধই অমৃত; কাযেই, এই অমৃত আহরণ করিবার জন্য, গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীর সর্ব্বদা স্বহস্তে গো সেবা করা চাই—চাই—চাই। দুধের অভাবে ছাগদুধ ও ভাঁটকলাই ব্যবহার করা চলে।

(১০) ঘি, মাখন, তেল।—গোড়াতেই বলিয়া রাখি, কোনও তৈলে ভাইটামীন্ আদৌ নাই, ঘৃতে ও মাখনে ভাইটামীন যথেষ্ট আছে। কিন্তু উভয়ই দুর্ম্মূল ও দুষ্প্রাপ্য। আবার এ দিকে, প্রত্যহ কিছু ঘৃত বা মাখন বা তৈল খাইতে না পাইলে, রাত্রান্ধতা জন্মে। ঘিয়ে ভেজাল দেওয়া অতীব সহজ। আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, তিন পোয়া চর্ব্বির সঙ্গে, একটু ভাল দৈ, খাঁটি ঘি ও লেবুপাতা দিয়া জ্বাল দিলে, একসের খুব সরেস খাঁটি ঘিয়ের মত দেখিতে ও গন্ধে হয়, অথচ তাহার বারো আনাই চর্ব্বি! তাহা ছাড়া, "ভেজিটেব্‌ল্ প্রডাক্ট" (বনস্পতি-ঘৃত) যত সহজে ও বেমালুম ঘিয়ের সঙ্গে মিশে তেমন আর অপর কোনও জিনিষ মিশে না। যে কোনও বাজে, অর্থাৎ, মনুষ্যের অভক্ষ্য ও সর্ব্বরকমে অব্যবহার্য্য মাছের বা শস্যজাত তৈলের সঙ্গে বারম্বার হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত হইলে, অতি-পচা ও অতি-দুর্গন্ধ তৈলও গন্ধহীন, দেখিতে ধব্‌ধবে ও মোমের মত গাঢ় হয়। ইহাকেই "হাইড্রোজিনেসান্" বলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে, যত রকমের অব্যবহার্য্য পচা তৈল,—গন্ধহীন ও দেখিতে সুদৃশ্য হয়—এবং জান্তব তৈলকে অনায়াসে "উদ্ভিজ্জ" তৈল

* Soya beanএর তিন চারি জাতি আছে। দার্জ্জিলিং জেলায়, ক্যালিম্পং সহরে উহার উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যায় (সরকারী কৃষি-আগারে)।

বলিয়া চালান যায়! তাহা ছাড়া, এই হাইড্রোজিনেসানের ফলে উক্ত তৈলের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহার ফলে, উহা খাইলেও সহজে দেহের মধ্যে গৃহীত হয় না (absorbed হয় না)—কাযেই ভেজিটেবল প্রডাক্ট বেশীদিন খাইলে, উদরের পীড়া জন্মে। অতএব, যাঁহারা মাখান বা ঘি খাইতে পান না, তাঁহারা যদি Nuts খান, তবে যথেষ্ট পরিমাণে ও সস্তায় স্নেহজাতীয় পদার্থ পাইতে পারেন। চীনা বাদাম খুব সস্তার জিনিষ এবং পল্লীগ্রামে নারিকেলও দুষ্প্রাপ্য নয়। এই দুইটিরই খুব বেশী ব্যবহার করা উচিত। ঘৃতে ভেজাল আছেই আছে—এবং সে ভেজাল যে কোন্ জাতীয় মৃত জন্তুর চর্ব্বি, তাহা না জানিলেও আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে, যখনি কেহ "ঘৃত" ভোজন করেন, শতকরা তাহার মধ্যে ৯৯ জনই মনে মনে বেশ জানেন যে, কোনও জন্তুর চর্ব্বি তিনি খাইলেন! মনকে এইরূপ প্রতারণা করার চেয়ে, প্রকাশ্য টাট্কা চর্ব্বি গলাইয়া খাইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এটুকু মনের বল আমাদের হওয়া চাই। গোসেবা ও গোপালন আবার ঘরে ঘরে প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই।

ভাইটামীন—জিনিষটি খাদ্যের মধ্যে এমন একটি জিনিষ, যাহার 'অভাবে' নানা রোগ হয়; এবং যাহা খাদ্যে বর্ত্তমান থাকিলে, দেহ সুস্থ থাকে। এ সম্বন্ধে, "ঘরের কথা" নামক পত্রিকায় সম্প্রতি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া, এখানে আর কিছু বলিলাম না। সুধু, কিসে ভাইটামীন্ আছে ও কিসে তাহা নাই, খুব সংক্ষেপে তাহাই বলিব। আপনারা এইটুকু বেশ যত্ন করিয়া মনে রাখিবেন যে, যত ভাইটামীন্ যুক্ত খাদ্য খাইতে পারিবেন, ততই স্বাস্থ্য ভাল হইবে ও থাকিবে।

এই এই জিনিষে আদপে ভাইটামীন্ নাই:—

(১) চিনি, মিছরী ও তাহাতে পাককরা দোকানের খাবার, জ্যাম, জেলী। (দোলো চিনি ও গুড়ে যথেষ্ট চুণজাতীয় লবণ বা ক্যালসিয়াম আছে ও সামান্য ভাইটামীন্ও আছে।) (২) রোলার মিলের ময়দা। (৩) সর্ষের তৈল, নারিকেল তৈল, ভেজিটেবিল প্রডাক্ট। (৪) ক্ষীর। (৫) তরীতরকারী মাত্রেই অতি মাত্রায় ফুটাইলে।

এই এই গুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামীন্ আছে:—

(১) সূর্য্যপক্ক খাদ্য বা পানীয়ে। (২) কাঁচা বা একবলকের দুধ, দৈ, ঘোল, ননী, মাখন, ছানায়। (৩) ডিমে। (৪) মাছ, জন্তুদের মগজ, যকৃত, কিড্নী ও হার্টে। (৫) বিলাতী বেগুন, সবুজ পাতা মাত্রেই। (৬) কমলালেবুতে।

খাবারের কথা এত ফেনাইয়া বলিয়াছি বলিয়া, কেহ কেহ হয় ত মনে করিতেছেন যে, আমি খরচের বাহুল্য করিতেছি। আমি তাহা আদপে করি নাই, বরং অপচয় নিবারণ করিয়া, ব্যয়সংক্ষেপ করিবার পরামর্শই দিয়াছি। ভাত, ডাইল ও তরকারী—ইহাদের যতটা অপচয় হয়, তাহাই নিবারণ করিতে বলিয়াছি। মাছ, মাংস, ডিমে—খুব বেশী জোর দিই নাই। দুধটা বেশী বেশী খাইতে বলিয়াছি মাত্র। দোকানের খাবার ত্যাগ করিয়া, Nutsএ মনোযোগী হইতে বলিয়াছি। ঘৃত খাইবার সামর্থ্য না থাকিলে, নারিকেল ও চিনা বাদাম খাইতে বলিয়াছি। জল খাবারের জন্য, মুড়ি বা চিঁড়া, ঘৃত ও তৈল সংযোগে, অথবা নারিকেলের শস্য সহযোগে—খাওয়াই ভাল। দধি ও চিঁড়া উৎকৃষ্ট জলখাবার। যাঁহার সামর্থ্যে কুলায়, তিনি লুচি, মোহনভোগ ও ঘরের তৈয়ারি নানারকম ক্ষীরের খাবার খাইতে পারেন। দরিদ্ররা জলযোগের উদ্দেশ্যে, "কল" বাহির করা ছোলা বা মুগের ডাইল, মটরশুঁটি বা মটরকলাই, ছোলাভাজা প্রভৃতি ও সময়ের ফলমূল ব্যবহার করিতে পারেন।

একরকম বিস্তারিত ভাবেই খাদ্যকথা বলিলাম। অনুগ্রহ করিয়া এগুলি যত্ন করিয়া স্মরণ রাখিবেন। ভাবী বংশধরের ও তাহার জননীর দেহগঠনের ও সুস্থ রাখার মালমসলা এইগুলি। খাদ্য বিষয়ে যাঁহারা বিস্তারিত ভাবে পড়িতে চাহেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত Matriculation Hygiene পড়িবেন। (ক্রমশঃ)

দুঃখীর ভূগোল

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

স্থলের চেয়ে জল যে বেশী
আমরা সেটা বুঝ্‌তে পারি,
দাঁড়াবারি স্থলটুকু নাই,
ঝর্‌ছে সদা নয়ন-বারি।
দুইটা গতি এই পৃথিবীর,
তাতে তাহার নাইক ক্ষতি,
মোদের শুধু দুর্গতি যে
তাতেই থাকি ক্লিষ্ট অতি।
সুমেরু আর কুমেরু তার
আবিষ্কারের কষ্ট কত?
মোদের মেরুদণ্ড দেখ
হ'চ্ছে নিজেই আবিষ্কৃত।

শুনি ত হয় সূর্য্যগ্রহণ
এলে রাহু রবির কাছে,
কিন্তু দেখি সকল সময়
মোদের গ্রহণ লেগেই আছে
ভূমিকম্পে বসুন্ধরা
ক্বচিৎ কখন কাঁপে যদি,
মোদের অধীর চরণ-তলে
কাঁপ্‌ছে ধরা নিরবধি।
উল্টে যাবে এই ধরণী
প্রলয়কালে শুন্‌ছি নাকি,
সেদিনে সব দীনের কপাল
বল ঠাকুর ওল্টাবে কি?

ভূত-ভারতী

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাস্তা তখন ধূলায় অন্ধকার, দুদিকের বাড়ীগুলোর থেকে রাশিরাশি ইঁট চূণ-সুরকির চাপ রাস্তা জুড়ে এসে পড়েছে, তখনও পড়্‌ছে, আর সেই ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভয়াকুল জনতা উন্মাদবৎ "মহাত্মা গান্ধিকি জয়" ব'লে' চেঁচাচ্ছে। আমার মনে হলো, অনেক ফিরিঙ্গিকেও সেই চীৎকারে যোগ দিতে দেখলাম। মনে পড়্‌ল সেদিনই গান্ধিকে arrest করা হয়েছে।

ভূমিকম্প থাম্‌লে Reggioর গাড়ীতে সকলে মিলে বেরনো গেল রেঙ্গুনের সমস্ত পথ ঘুরে কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে দেখ্‌তে। যখন ফির্‌লাম্‌ তখন রাত প্রায় দুটো। কোকোজী আবার আমাদের উপরে তার বাড়ীতে ডাক্‌লে, বল্‌লে, "আজ রাত্রে ঘুম ত আর হবেই না, কতটুকু রাত আছেই বা, এসো গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেব।" নিত্য-গোপাল কিছুতেই রাজি হলো না। বল্‌লে, "শুন্‌লে না, লোকে বলাবলি কর্‌ছে, আর একবার ভূমিকম্প হয়ে তবে থামবে?" আমরা বল্‌লাম, 'যারা এটার কথা বল্‌তে পারেনি তারা আর-একটার কথা বল্‌ছে কেমন করে'?" সে বল্‌লে, "বড় ভূমিকম্প কখনো কেবল একটা ধাক্কা দিয়ে থামে না। যে disturbanceএর ফলে প্রথমে একটা ধাক্কা আসে, সেইটেই থিতিয়ে বস্‌বার সময় আবার

একটা ধাক্কা আসে। সেইটে দেখে' তারপর উপরে যেয়ো, ততক্ষণ নীচেই থাকো-না।" আমরা অনেক করে তাকে বোঝালাম, সে কিছুতেই শুন্‌ল না। অগত্যা তাকে বাদ দিয়েই আমরা আবার উপরে গিয়ে উঠ্‌লাম। সবাই খুব shock পেয়েছিলাম সেটা ঠিক, Reggioর কথাতে তার প্রতিষেধক স্বরূপ আবার কয়েকটা বিয়ার খোলা হলো।

গান্ধির arrestএর সঙ্গে ভূমিকম্পের কি সম্পর্ক থাকতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা সুরু হলো। ক্রমে সেই আলোচনা নানা অলৌকিক কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করে' আজকেরই মতো ভূতুড়ে কাণ্ডের গল্পে এসে পৌঁছল। দেখ্‌লাম Phyllisএর মুখ অত্যন্ত ম্লান হয়ে আস্‌ছে, ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেও তাঁকে এত ম্লান দেখায়নি। এর ওপর কোকোজী যখন তাঁকে বল্‌লে, "জানো Phyllis, আমি ঠিক করেছি, মরবার পরে ফিরে আস্‌বার কোনো উপায় যদি থাকে তবে তোমার কাছে আমি ফিরে আস্‌ব," তখন তিনি হাস্‌লেন, কিন্তু তাঁর আয়ত দুটি চোখের কোণে দুফোঁটা অশ্রু মুক্তাফলের মতো টলটল করতে লাগ্‌ল

Roggio আমাকে বল্‌লে, "তুমি ত মস্ত একজন Spiritualist, কোকোজীকে নিশ্চয় সেবিষয়ে সাহায্য করতে পার্‌বে।"

কোকোজী বল্‌লে, "তাইত, তুমি যে Spiritualism নিয়ে চর্চ্চা করে' থাকো সেকথা ত মনেই ছিল না। আজ বস্‌বে? দেখা যাক্‌-না তোমার Spirit বন্ধুরা কি বলেন?"

আমি বল্‌লাম, "কি বিষয়ে?"

সে বল্‌লে, "ধর-না, এই ভূমিকম্প বিষয়ে।"

আমি বল্‌লাম, "ভূমিকম্প ত যা হবার হয়ে গিয়েছে। তোমার অসুখটার বিষয়ে যদি জান্‌তে চাও ত বসি।"

কোকোজী কিছু বল্‌বার পূর্ব্বেই Phyllis বলে' উঠ্‌লেন, "হাঁ, বসুন-না দয়া করে'।"

আর 'না' বল্‌বার উপায় ছিল না। কিন্তু যে অপরাধ সেদিন করেছিলাম, আশা করি দেবতা তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি Automatic Writingএর চর্চ্চা করতাম, পেন্সিল হাতে নিয়ে মন স্থির করে' বসলে আমার হাত অবলীলায় চলত। পরিচিত-অপরিচিত নানা মানুষের আত্মাদের নাম লেখা হত, নানা পারলৌকিক তথ্যের আলোচনা, নানা সমস্যার সমাধান হত। আমি এটা জানতাম যে আমি নিজেকে নিজে ফাঁকি দিচ্ছি না, কিন্তু আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে কি জিনিস লুকানো আছে এবং আমার মাংসপেশীর উপরে সে-সমস্ত জিনিসের কতখানি প্রভাব তা জান্‌বার আমার উপায় ছিল না। তখন অবধি আমি অতি সতর্কতার সঙ্গে এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করে' আসছিলাম, তা সত্ত্বেও আমার খ্যাতি রেঙ্গুন ময় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রেততত্ত্বে অনুরাগী বহু নরনারী আমার কাছে আসতেন, লাট-সাহেবের দরবার থেকেও কারও কারও গোপন শুভাগমন কয়েকবার হয়েছে। সেইদিন, কোকোজীর সেই ঘরটিতে বসে' প্রথম সকলকে আমি ফাঁকি দিলাম। অন্যদিনের মতো পরিচিত অপরিচিত বহু আত্মা আমার হাতে এল, অন্যদিনেরই মতো নানা-তত্ত্বের আলোচনা হলো, নানারকমের পরীক্ষা তারা দিল এবং মোটামুটি উত্তীর্ণ হলো, কিন্তু কোকোজীর অসুখের প্রসঙ্গে তারা সকলেই এক কথা বললে, অসুখ সারবে এবং সারতে বেশীদিন দেরীও হবে না। আমিই জোর করে' যেন তাদের ঘাড় ধরে' তাদের দিয়ে লেখালাম, কারণ আমি প্রতিবারেই বুঝতে পারছিলাম, যে তারা সত্যিকারের আত্মাই হোক বা আমারই মগ্ন-চৈতন্যের ক্রীড়া-সৃষ্টি মাত্র হোক, আমার সচেতন-মনের শাসন না থাকলে তারা কেউ সেকথা সেদিন লিখত না।

Phyllisএর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, সে পুরোপুরি আমাকে বিশ্বাস করেছে। একটি প্রশান্তভরা আনন্দে উদ্বোধনের দিনের প্রতিমার মুখের মতো সুন্দর তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে!

কোকোজীর মুখেও একটি অনাবিল প্রীতি-প্রসন্নতা পরিষ্কার দেখলাম। বুঝলাম, আমার মিথ্যাচরণ সার্থক হয়েছে। আহা, বেচারা! তার অবস্থার অন্য মানুষদের মনে মিথ্যা আশার আলো প্রকৃতি সদয় হাতে জ্বেলে রেখে দেন, কিন্তু তার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির জ্যোতিঃ সেই আলোককে নিষ্প্রভ ব্যর্থ করেছে। বুদ্ধি দিয়ে সে সব বুঝছে, তার তীব্রতা দিয়ে নিরাশার অন্ধকারকে সে নিবিড়তর করে দেখছে। ছলনা করেও সেই অন্ধকারে একটুখানি আশার রঙ যদি ধরিয়ে দিতে পেরে থাকি, তবে আমার সে ছলনা সার্থক

হয়েছে ছাড়া আর কি ? তার এমন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ জীবনের শেষ ক'টা দিন একটুখানি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে' তার অন্ততঃ কাটুক।

নিত গোপাল যখন ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ এবং দুশ্চিন্তায় অবসন্ন মন নিয়ে টলতে টলতে ঘরে এসে ঢুকল তখন রাত আর অল্পই বাকী। পূবের দিকের আকাশে অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। তাকে দেখে আমরা সকলে কোলাহল করে উঠলাম। তাকে প্রশ্ন করে' জানা গেল, সে এতক্ষণ পথে পথেই ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও বসতে শুদ্ধ পায়নি। ক্লান্তিতে পা যখন আর চলতে চাচ্ছিল না, তখন Fytche Squareএর একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটাবে স্থির করেছিল, কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লে তার সব কটা গেট্ তালাবন্ধ। ...নম্বর গলিতে নিজের বাড়ীটার ঢুকবার পথের অবস্থা দেখেই ঢুক্‌তে আর তার ভরসা হয়নি।

তার অবস্থা দেখে' হাসতে বেশীক্ষণ আর আমরা পারলাম না। একটা ঈজি চেয়ারে তাকে বালিশে মাথা দিয়ে শুইয়ে কম্বলে বেশ করে গা ঢাকা দিয়ে তার ঘুমোবার ব্যবস্থা করে' দিলাম। কোকোজী বল্‌লে, "চা খাবার সময় তোমায় ডাক্‌ব কিনা বলে' তুমি ঘুমোও।" সে বল্‌লে, "ঘণ্টাদুই একটু ঘুমোতে পেলেই হবে, তারপর যখন খুসি তোমাদের ডেকো।" সে চোখ বুজলে আমরা একটু চাপাগলায় কথা বল্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু Seance চল্‌ল।

একটি আত্মা এসে নাম লিখ্‌ল, Walter। Walter আমার spirit guide, আমার অতীন্দ্রিয়-লোকের পথ প্রদর্শক বন্ধু। প্রায় আড়াই বৎসর তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। Reggie বল্‌লে, "এটা ত তোমার পুরো নাম নয়, বাকীটা লেখ।" সে বল্‌লে, "ধরো Priestley।" Reggie বল্‌লে, "ধরতে হবে কেন ?" সে বললে, "নামের মধ্যে আছে কি ? আমি Priestley না হয়ে Wolfe, Walsh, Heys, Mackail বা Tomlinson হলেও তোমাদের পক্ষে একই কথা হবে। পৃথিবীতে আমায় কি নামে লোকে জান্‌ত তা জেনে তোমরা করবে কি ? তোমাদের কাছে অন্য আত্মা যারা আসে তাদের থেকে আমাকে আলাদা করে জানা তোমাদের দরকার, সে পক্ষে Walter Priestley যথেষ্ট।"

Reggie বল্‌লে, "যে-কেউ এসে Walter Priestley লিখ্‌তে পারে ; তুমিই এলে কি না কি ক'রে আমরা বুঝব ?"

সে বল্‌লে, "সেটা mediumকে বুঝতে হবে। আমরা যখন আসি তখন প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বভাব-অনুযায়ী এক বিশেষ ধরণের উপলব্ধি mediumএর মনে নিয়ে আসি। সেইটে দিয়ে আমাদের চিনতে হয়। তা না পারলে আর medium কি ? ক্রমে এমন হবে, medium ছাড়া অন্যেরাও সেই উপলব্ধি দিয়ে বিশেষ বিশেষ আত্মার সান্নিধ্য বুঝতে পারবেন। আমরা কিছু না লিখলেও বুঝতে পারবেন।"

Phyllis বল্‌লেন, Walter যে খুব ভালো আত্মা তা প্রথম থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সে আসা-মাত্র তাঁর অকারণেই খুব ভালো লাগছিল, প্রিয়বন্ধুর আগমন প্রত্যাশায় যেমন রোমাঞ্চ হয় তেমনই রোমাঞ্চ তাঁর হয়েছিল ! আমার হাতের পেন্সিলটা নৃত্যপর সর্পের মতো সাবলীল ছন্দোময় গতিতে কাগজের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। Reggie কি-একটা বল্‌তে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে কোকোজী বল্‌লে, "তোমাকে ডাকলেই তুমি আস্‌বে ?"

"নিশ্চয় ! তোমরা আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করে' ডাকবে।"

"তাহ'লে পরস্পরকে আরও ভালো ক'রে জান্‌তে আমাদের ক্ষতি কি ?"

"কিছু না। খুব ভালো করেই ক্রমে আমরা পরিচয় করব।"

"পৃথিবীতে তুমি কি-নামে পরিচিত ছিলে, কোথায় তোমার বাড়ী ছিল, কি তুমি করতে, কেউ তোমার আছে কি না, এ-সমস্ত জান্‌তে পেলে পরিচয়টা কি সম্পূর্ণতর হবে না ?"

সে বল্‌লে, "হবে না। আমার মধ্যে আমার সত্য পরিচয় যেটা, সেটা আমার নামধাম জাতি-গোত্রের বাইরের জিনিস। তোমরা ভুলে যাচ্ছ, আমি মৃত্যুর সিংহদ্বার পার হয়ে এসেছি। যে জিনিস ছেড়ে আস্‌তে হয় তার মূল্য যদি চূড়ান্ত হত, তবে ছেড়ে আস্‌বার ব্যবস্থাটা বিধাতার বিধানে থাক্‌ত না।"

কোকোজী বল্‌লে, "কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর মানুষ,

পার্থিব পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে খানিকটা ধর্তে ছুঁতে না পেলে আমাদের মন তৃপ্তি পায় না যে!"

সে বল্লে, "তার চেয়ে বড় তৃপ্তি তোমাদের ক্রমে আমি দেব, পার্থিব যা নয় এমন পরিচয়ের তৃপ্তি, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

নিত্যগোপাল কখন উঠে বসেছিল, আমরা লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ সকলে সচকিত হয়ে দেখ্‌লাম দেয়ালের গায়ের ছায়া ঘেঁসে ঘেঁসে সে পা টিপে টিপে বেরিয়ে চলেছে। Phyllis বলে' উঠ্‌লেন, "ও কি হচ্ছে?"

আবার একটা কোলাহল উঠ্‌ল।

নিত্যগোপাল ততক্ষণে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল, বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে, "তোমাদের গোলমালে ঘুম হচ্ছে না, তাছাড়া ভোরও হয়ে গিয়েছে, আর একটু ঘুরে আস্‌ছি।"

Phyllis বল্লেন, "উনি ভয় পেয়েছেন।" আমাদের কারও সম্বন্ধে এতখানি অকরুণ মন্তব্য দূরে থাক্, কোনো মন্তব্যই তিনি সচরাচর করতেন না। মনটা বিরক্তিতে ভরে' উঠ্‌ল।

পেন্সিলটার দিকে চোখ পড়াতে দেখ্‌লাম, সেটা স্থির হয়ে আছে, কিন্তু হাতের আড়ষ্ট অথচ অস্বাভাবিক জোরের ভাব দেখে' বুঝলাম, Walter অপেক্ষা কর্‌ছে। নিত্যগোপাল বেরিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে' কোকোজী আবার বল্লে, "তবু আমরা যদি জান্‌তে চাই, বন্ধু মনে করে' তুমি আমাদের বল্‌তে পার না?"

মনে হলো Walter একটু ভাব্‌ল। তারপর পেন্সিল হঠাৎ এত দ্রুত চল্‌তে লাগ্‌ল যে প্রোফেসারের দেওয়া নোট নেবার বেলাতেও এত তাড়াতাড়ি কেউ লিখ্‌তে পারে না। বল্লে, "হাঁ পারি, কিন্তু বল্‌তে চাই না এই জন্যে যে তারদ্বারা তোমাদের কৌতূহল হয়ত চরিতার্থ হবে, কিন্তু সেই-সঙ্গে এমন আর-একটা জিনিসকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে যার ফল আমাদের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধস্থাপনের পক্ষে হবে মারাত্মক। তোমরা আমার পার্থিব পরিচয় কেন জান্‌তে চাচ্ছ সেটা তোমরা নিজেরাই হয়ত জানো না, কিন্তু আমি জানি। তোমরা এখনও ঠিক আমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছ না, তার অর্থ mediumকেই বিশ্বাস কর্‌ছ না। না, medium তোমাদের প্রতারণা কর্‌ছে ভাবছ, তা আমি বল্‌ছি না। মনে কর্‌ছ, সমস্ত ব্যাপারটা তার আত্মপ্রতারণাও হতে পারে। সেইজন্যে তোমরা আমাকে পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে চাও।"

কোকোজী বল্লে, "পরীক্ষা কর্‌তে চাওয়াটা কি অন্যায়? সত্যকে যাচাই করে' নিতে চাওয়াই ত সুস্থ মনের লক্ষণ।"

সে বল্লে, "তা জানি। এইখানেই ত যত গোল। তোমাদের জগতের স্বাস্থ্যের নিয়ম এজগতে খাটে না। কতগুলি সত্য আছে, তাদের পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়ে সুরু কর্‌তে হয়, সাক্ষ্যপ্রমাণ নিজে থেকে তারপর জোটে। আমাদের বেলাও তেম্‌নি। প্রথম থেকে প্রমাণ চাওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা লওয়ার মধ্যে সামান্য যেটুকু অবিশ্বাস, একটু যেটুকু সন্দেহ-সংশয় আছে, তার ভারে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপনের অতি ক্ষীণ যে যোগসূত্র তা ছিঁড়ে যায়। তোমরা বোঝো না এ সম্বন্ধ স্থাপন সত্যিই কত কঠিন, কতখানি আনুকূল্য সবদিক্ দিয়ে থাকলে তবে তা সম্ভব হয়। আমাদের বহু প্রয়াস,বহু পরিশ্রম তোমাদের এতটুকু অবিশ্বাসের নিঃশ্বাস লাগ্‌লে মুহূর্ত্তে পণ্ড হয়ে যায়।"

"তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে কোনো প্রশ্নই আমরা কর্‌তে পার্‌ব না?"

"না, দয়া করে' কোরো না। কেন পরীক্ষা কর্‌তে চাও?"

"কেন লোকে চায়? আমাদের অবস্থায় তুমিও কি এই চাইতে না?"

"হ্যাঁ, চাইতাম। কিন্তু এখন সত্যিই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কতবড় ভুল করতাম। পরীক্ষা কর্‌তে চাওয়া, প্রমাণ পেতে চাওয়া তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তা স্বীকার করি। কিন্তু তোমাদের আমি কথা দিচ্ছি, তোমরা আমায় বিশ্বাস কোরো, পরস্পরের সঙ্গে যোগ স্থাপনের পথে সংশয়ের আড়াল তুলো না,—তোমরা না চাইতেই নিজে থেকে এত বেশী প্রমাণ জড়ো হবে যে তোমরা তাই নিয়ে কি কর্‌বে শেষটা বুঝে উঠতে পারবে না। কিন্তু সে কথাও আগে

থাকতে তোমাদের বলে' আমি ঠিক করছি কি না জানি না।"

Reggie মুখ বেঁকিয়ে একটু হাস্‌ল। কোকোজী তাকে তীব্রস্বরে ভর্ৎসনা করে উঠল, বল্লে, "যে-জিনিস বোঝো না, তাই নিয়ে দাঁত বার করে' হাসো কেন?"

Reggie বল্লে, "হাসি পেলে কি করব?"

কোকোজী বল্লে, "বেরিয়ে গিয়ে হাস্‌বে। যদি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করতে না পারো, Seanceএ বস্‌বে না।"

Reggie রাগ করে বেরিয়ে গেল না। কোকোজীর কাছ থেকে এ ধরণের কথা মাঝে মাঝে শোনা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তার কাছ থেকে পাওয়া কোনো অপমান আমরা আর গায়ে মাখতাম না। কিন্তু কখনো কারও প্রতি কর্কশ বাক্য অকারণে সে প্রয়োগ কর্‌ত না। যখনই যে কথাটা বল্‌ত, সত্য বল্‌ত, কিন্তু যতটা রূঢ় করে' বলা যায় বল্‌ত। কোথাও কোনো অপরাধ, কোনো বিচ্যুতি তার চোখে এড়াত না, কিন্তু যখনই রূঢ় ব্যবহার কর্‌ত সত্যকার অপরাধ কিছু না থাক্‌লে কর্‌ত না। Reggie গম্ভীর মুখে চুপ করে' বসে' রইল।

এরপর Walterএর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা চল্‌তে লাগল। দেখলাম, একটু একটু করে' Phyllis সে আলোচনায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। সচরাচর আমাদেরও যে-সব কথা তিনি বল্‌তেন না, বা যে ধরণের আলোচনায় আমাদের সঙ্গে তিনি যোগ দিতেন না, আজ দেখ্‌লাম অসঙ্কোচে Walterএর সঙ্গে সে সব বিষয়ে তিনি ক্রমাগত আলোচনা করে' চলেছেন। বুঝ্‌লাম, Walterএর প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা নিয়ে Walterএর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হলো। এবারে Walter জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল, তিনি উত্তর দিতে লাগ্‌লেন, নিজেও মাঝে মাঝে Walterকে দু-এক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন, জবাবও পেতে লাগ্‌লেন। লণ্ডনের কথা, Wolverhamptonএর কথা, শিক্ষাসম্বন্ধীয় নানা সমস্যা, বিলাতের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের নানা সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, ব্রহ্মদেশ তাঁর কেমন লাগে, দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে কি না, এমনই ধারা নানা অন্তরঙ্গ বিষয় নিয়ে বহুক্ষণ দুজনের গল্প চল্‌ল। যেন বিদেশে বহুকাল পরে দুটি পরমাত্মীয়ের সাক্ষাৎ হয়েছে, যেন সেখানে তাঁরা দুটিতে শুধু আছেন। আমরা কেউ নেই!

সেদিন সেই সূত্রে প্রথম জান্‌লাম Phyllisএর দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা সত্যই কত প্রবল। এই অপরিচিত বিদেশে নিজেকে সত্যিই তিনি কত নির্বান্ধব নির্বাসিতের মতো মনে করে' থাকেন। কোকোজীর মুখে বেদনার ক্ষীণ রেখাপাত মুহূর্তেকের জন্যে লক্ষ্য করলাম কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সে সংযত করে নিলে। Phyllis লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না, তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যেই কিনা জানি না, কিন্তু আলোচনার শেষে বল্‌লেন, "অবশ্য আমার স্বামী যদি ফেরেন তবেই ফিরতে চাই, তাঁকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমি সুখী হব না।"

কোকোজী বল্‌লে, "উনি এখন ক্লান্ত হয়েছেন, Phyllis, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।"

Walter বললে, "আমার আবার ক্লান্তি কি? তবে mediumকে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে বটে।"

সমস্ত রাত্রির অনিদ্রা, তারপর ভূমিকম্পের দরুণ সেই নিদারুণ shock, তদুপরি প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে' নিজের বাইরেকার, হয়ত নিজের চেয়ে ক্ষমতা-সম্পন্ন একটা শক্তির প্রভাবে ক্রমাগত কাগজে পেন্সিল ঘসার ফলে ক্লান্ত যে হয়েছিলাম, সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেদিন Phyllisএর মুখে যে একটি তৃপ্তিভরা আনন্দের হাস্য-সমুজ্জ্বলতা দেখেছিলাম সচরাচর তা দেখবার সৌভাগ্য হত না বলে' বল্‌লাম, "আমি কিছুই ক্লান্তি বোধ করছি না!"

Phyllis বুঝতে পারলেন বলে' মনে হলো। একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তবু তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমার স্বামীর সম্বন্ধে একটি কথা কেবল জিজ্ঞেস কর্‌ব?"

"নিশ্চয় কর্‌বে। কি কথা?"

"তাঁর অসুখটা কি সার্‌বে?"

জোর পেন্সিল চেপে লেখা হলো, "নিশ্চয় সার্‌বে। আমি বলছি, তোমরা দেখে' নিও।"

কোকোজী বললে, "বাস্, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। Good Bye Mr. Priestley।"

Phyllis বল্‌লেন, "Good Bye Walter।"

কাগজে ক্ষীণভাবে অতি মন্থর গতিতে পেন্সিল চলে' লেখা হলো, "Until we meet again।"

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

বন্যাদায়

সহসাই উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এবং পূর্ব্ববঙ্গের কিয়দংশ প্রবল বন্যাধারায় ভাসিয়া গেল। যুগ-মন্বন্তরের দেশে প্রলয়ঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছে—মুক্তবন্ধ ধ্বংস জটাজুট তাঁর এলাইয়া পড়িয়াছে দিকে দিকে—আধিব্যাধি রোগশোক দুর্ভিক্ষের হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত—হত্যা, লুণ্ঠন চলিয়াছে চারিদিকে। তারপর সেই অশুভ জটাজাল বহিয়া নামিয়া এল —স্বর্গ-সুরধুনী-সুধা নয়, মৃত্যুময় মহা-প্লাবন!

সহরের এই সৌধাবাসে বসিয়া পল্লীর সেই বিকার-আক্ষেপ চোখে পড়িবে না সত্য, কিন্তু আর্ত্ত হাহাকার তার উতল বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে নাকি! স্কুল-কলেজের পড়ুয়া যুবকগণ,— রেস্তরাঁর টেবিল হইতে, সিনেমা-হাউসের জানালা হইতে চোখ ফিরাইয়া একবার পল্লীর দিকে তাকাও; এবং—

"হে সহরের সৌধবাসি,
দু'এক মুঠি, দু'এক কণা
দাও—যা' পারো, ভালোবাসি'।"

*

দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষের সংক্রামকতা ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশকেই আক্রান্ত করিয়া ফেলিল। বস্ত্রাভাবে কৃষক ১ মণ ধান ॥৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিয়া বস্ত্রমূল্যের যোগাড় করিতেছে,—গৃহী তাঁহার ৬০৲ টাকা মূল্যের সবৎসা গাভী ।০ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন অন্নাভাবে। অন্নাভাবে পরিবারের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া পরিবারস্বামী আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইতেছেন! মজুররা মধ্যবিত্ত যাঁহাদের গৃহে খাটিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করে, তাঁহাদের দ্বারে গিয়া দেখিতেছে - তাঁহারা গালে হাত দিয়া ম্লানমুখে বসিয়া আছেন! ধনীরা মহানগরীর বিলাস-হর্ম্ম্যে বসিয়া ভাবিতেছেন—এবার বোধ হয় খাজনা-অনাদায়ে ব্যাঙ্কের টাকায় হাত পড়িল;—কাহারও কাহারও বা আমলা-ফয়লারা বন্ধকী কর্জ্জের চেষ্টায় এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—প্রভুর প্রমোদের কড়ি চাই-ই চাই!

ঠিক এমনই সময়ে স্বনামধন্য সচিবপ্রবর স্যার প্রভাসচন্দ্র বলিলেন,—বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই, সাধারণ অন্নকষ্ট মাত্র। বড় দুঃখেও হাসি পায়! কিন্তু ইহা অজ্ঞতা না অস্বীকৃতি? *

*

*"...১১।১২ বৎসরের একটি বালিকা একফুট চওড়া একখানি ছেঁড়া গামছা ও হস্তের সাহায্যে কোনরূপে লজ্জানিবারণ করিয়া সামনে আসিয়া

বিচারকের সহানুভূতি

আত্মহত্যাপ্রয়াসিনী নারীকে বিচারক লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া (আদালত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়া) রায়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—হায় অভাবগ্রস্ত পরিবারের অভাগিনী! ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে এইরূপই হইয়া থাকে।...সহরের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্র-পরিবারের বেকার স্বামী নিরুপায় হইয়া অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিবার পর স্বামিগতপ্রাণা বিভ্রান্তা পত্নী আত্মনাশের জন্য অহিফেন সেবন করিয়াছিল। আহত-হৃদয় বিচারক উক্তভাবে তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

আমরা বিচারককে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; কিন্তু ঐ সহানুভূতির মূল্য কি, যদি তার অভাবের সংসারে স্বচ্ছলতা আনিবার প্রকৃত উপায়নির্দ্দেশ না করা হয়?

*

ব্যয়সংক্ষেপ

দেশজোড়া দারুণ অর্থনৈতিক সমস্যা। সমাধানের উপায়—একদিকে আয়বৃদ্ধি, অন্যদিকে ব্যয়সংক্ষেপ। প্রতিদিনে প্রতিষ্ঠানে অফিসে অফিসে ব্যয়সংক্ষেপের খস্‌ড়া রচনা চলিতেছে। কিন্তু ব্যয়সংক্ষেপের অর্থ ইহা নয় যে, গরীবদের ভাত মারা। যাঁহাদের স্বচ্ছল সংসার, মোটা মুনাফার অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের বাড়্‌তি বেতন ছাটিবার ব্যবস্থা মন্দ নয়, এবং সহজেই তাঁহারা অল্পবেতনে বা সাময়িক বিনাবেতনেও হয় ত সহাস্য গর্ব্বে বদান্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু দরিদ্র কর্ম্মীদের পক্ষে আদৌ সে কথা খাটে না—বরং অবস্থা-বিশেষে বেতন বৃদ্ধি করাই অবশ্যকর্ত্তব্য। আসল কথা এই যে, আড়ম্বর কমাইতে হইবে। প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য আসাসোটা বহাল রাখিতেই হইবে, এমন কি কথা! প্রয়োজন নাই, 'সো' মাত্র—যাহা 'সো-কেসে' সাজাইয়া রাখা চলে, এমন আড়ম্বরে মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে কি? তারপর, তিনটি জিনিষ অকর্ম্মণ্য তিন জন তিন বারে বহিয়া আনিল, এরূপ সংখ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার চেয়ে, কর্ম্মঠ একজন—যে অনায়াসেই তিনটা জিনিষ একসঙ্গে একবারে বহিয়া আনিতে পারে, তাহাই শ্রেয়তর নহে কি? কর্ম্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উপযুক্ত বেতনে বিশেষজ্ঞকে রাখিতেই হইবে,—আড়ম্বর বজায় রাখিতে হইলে কর্ম্মের অমর্য্যাদা করিয়া 'সো-কেস্' সাজাইতে হয়।

আমাদের এই কথা একটা রাষ্ট্র—একটা ব্যবসায়-কেন্দ্র—একটা অফিস এবং একটি গৃহের পক্ষে সমান ভাবেই খাটে।

*

ব্যবসায় রক্ষা

এই অভাবের দিনে বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ব্যয়সংক্ষেপ করা যায় এবং তাহাতে অনায়াসে ব্যবসায়ও রক্ষা পায়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা যদি এই ব্যবসায়-রক্ষার অজুহাতে নির্দ্দিষ্ট বেতনে রক্ষিত কর্ম্মচারীদের (বিশেষতঃ যাহাদের দ্বিতীয় কোনপ্রকার জীবনোপায় মাত্র নাই) বেতন-দান অনির্দ্দিষ্ট এবং অনিয়মিত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে কর্ম্মচারীদের পক্ষে মহাসর্ব্বনাশ! অথবা—মাসের পর মাস দুই-চারি টাকা করিয়া কিস্তিতে কিস্তিতে বেতন পরিশোধ করিলেও তাহাদের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই করা হয়—কারণ তাহাতে পাওনাদারকে থোকে টাকা দেওয়া চলে না, ঐ দুই-চারি টাকা এটায় ওটায় দুই চারি দিনেই উবিয়া যায়। অবশ্য, ব্যবসায়ীদের পক্ষেও অবশ্যকর্ত্তব্য সংরক্ষণ-তহবিলে মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থ সংরক্ষিত করা; কিন্তু কর্ম্মী-দিগকে অনাহারে রাখিয়া ঐ তহবিল পরিপুষ্ট করিতে হইবেই—ইহা নিতান্ত একদেশদর্শী যুক্তি। পক্ষান্তরে, বুভুক্ষু কর্ম্মীর কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ভাবেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে বাধ্য।

দাঁড়াইল। ইহাদের কাল সমস্তদিন অনাহারে কাটিয়াছে। মহিম (গৃহস্বামী) প্রাতে উঠিয়া কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। সাহায্য-কেন্দ্রে গিয়া চাউল আনিতে বলায় দরজার পাশ হইতে শতছিন্ন বস্ত্রে আবৃত একটি স্ত্রীলোক উত্তর করিল—'কাপড় নাই; বেইজ্জত হ'য়ে কেমন করে' যাব বাবা'!"

—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, হিলি (বগুড়া) কংগ্রেস কমিটি।

(দৈনিক বসুমতী; ২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৮; ৬ পৃঃ।)

আমাদের দেশীয় ব্যবসায়গুলির কর্ম্মকর্ত্তারা অনুগ্রহ করিয়া ধীরতা ও সহানুভূতির সহিত ইহা ভাবিয়া দেখিবেন।

*

ইংরাজ—বণিক রাজ

গোলটেবিলের ভূমিকা স্বরূপ (?) প্রসিদ্ধ "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকা (২৮শে জুলাই, ১৯৩১) বলিতেছেন, ইংরাজরা নিজেদের বিষয়ে নিঃস্বার্থ ও নির্লিপ্ত ইহা মনে করা ভুল, এবং তাহাদিগকে বণিক বা দোকানী জাতিরূপেই গ্রহণ করা উচিত। এই দোকানীর দল এবার নূতন করিয়া এই শিক্ষা পাইয়াছে যে, সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার দ্বারাই গ্রাহক-বর্দ্ধন সম্ভবপর—জোর করিয়া মাল-গছানো এযুগে অচল। অপর দিকে ইহাও সত্য যে, ভারতীয় ঋণের জন্য তাহারা দায়ী হইবে না এবং কার্পাস পণ্যও ভারতের বাজারে প্রেরিত হইবেই।

"ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ান"-এর স্পষ্টবাদিতার জন্য ধন্যবাদ!

*

হত্যা ও ফাঁসি

সম্প্রতি দেশে যেসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছে, একজন হত্যাকারীর দণ্ডদান প্রসঙ্গে (রায়ে) জনৈক বিচারক বলিয়াছেন, এই সব হত্যাকাণ্ড স্বকীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অথবা ব্যক্তিগত বিজিগীষাপ্রসূত নহে।

কিন্তু হত্যা—হত্যাই। য়ুরোপীয় কোন কোন দেশে এবং এসিয়ারও কোন কোন স্থানে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, বৃহত্তর স্বার্থ এবং উচ্চতর আদর্শের জন্য হত্যাশ্রয়ী বিভীষিকা দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে—যদিও তাহা স্থায়ী মহত্তর কল্যাণ কিনা তাহার সন্দেহ-নিরসন করিবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতিবাহী, মানব-সভ্যতার আদি জন্মভূমি, পরমার্থিক শান্তিসাধনার তপোবন-ক্ষেত্র, ত্যাগবাদী ভারতবর্ষের ইহা আদর্শ নহে। এই ধর্ম্মক্ষেত্রের মাটিতে গুপ্তহত্যার রক্তের চাষ দ্বারা মঙ্গলের অমৃতফল কথনই ফলিবে না—ফলিতে পারে না। আমাদের দেশের সাহসী যুবকদলকে ইহা ধীরভাবে স্মরণ করিতে বলি।

পক্ষান্তরে, এই সব হত্যাপরাধের বিচারে একটির পর একটি এই যে তাহাদিগকে ফাঁসিতে লটকাইয়া হনন-দণ্ডদান করা হইতেছে,—বর্ত্তমান জগতের সভ্য মানবসমাজ ইহার সমর্থন করে কি? দণ্ডদানের উদ্দেশ্য—অনুতাপ-উৎপাদন ও সংশোধন। এই সব শিক্ষিত ও সাহসী যুবকদের—যাহারা সম্ভবতঃ অন্য কোনপ্রকার চরিত্রনৈতিক অপরাধে অপরাধী নহে বরং সৎ ও পরোপকারী বলিয়া সমাজে খ্যাতি আছে—ইহাদিগকে যদি ভ্রান্ত আদর্শের বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সুপথে পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে হয় ত ইহাদের দ্বারা স্বদেশের তথা জগতের অনেককিছু মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

আমরা ভারতগভর্ণমেণ্ট এবং ভারতসম্রাটের নিকট এজন্য আবেদন উপস্থিত করিতেছি।

*

রতন-লাইব্রেরী

কবি বলিয়াছেন, সুখ-দুঃখ উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত-ময় মানব-মনের বিচিত্র ভাবধারা গ্রন্থাগারের গ্রন্থপুঞ্জের মধ্যে ফল্গুর মত অন্তর্ব্বহমান—মহাসিন্ধুর ঘনমন্দ্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস যেন ক্ষুদ্র শঙ্খের মৌন রন্ধ্রগর্ভে সুপ্তিমগ্ন!…

এই গ্রন্থাগার-আন্দোলনের যুগে (Library Movement) গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতার ব্যাখ্যা বাহুল্য। এমন কি, প্রতীচ্যের অনুকরণে "ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার"ও আজকাল ভারতবর্ষে বিরল নহে (এবিষয়ে বরোদা রাজ্যের নাম বিশেষ ভাবে করা যায়)। মোটের উপর এখন অর্থ থাকিলেই অল্পকালের মধ্যে রুচি-অনুযায়ী যে-কোন প্রকার গ্রন্থাগার সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু 'রতন লাইব্রেরী' নামক যে গ্রন্থাগারের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি তাহা তথাকথিত রাষ্ট্র বা সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার বা ধনী-গৃহের সখের লাইব্রেরী নহে। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইয়াও সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় একক এই সুন্দর গ্রন্থাগারটি তাঁহার বাসগৃহ বীরভূম, শিউড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার অপর এবং প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বহু দুষ্প্রাপ্য অ-পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির সংগ্রহে ইহা ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ প্রতিষ্ঠাতা

এইসব অমূল্য রত্নরাজিকে উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষিত করিতে না পারায় ধূলা এবং কীটের আক্রমণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

*

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক

শিক্ষার্থী—শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে; শিক্ষক—শিক্ষার পর অনুশীলন, অনুধ্যান করিয়া, শিক্ষাকে আত্মস্থ করিবার পর শিক্ষাদানের অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল 'অ, আ' হইতে যে শিশু সেদিন দাগা বুলাইতে সুরু করিল, সেও যদি মনে করে আমি শিক্ষকের অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহা হাস্যকর হয় মাত্র—কেহই তাহাকে শিক্ষকের আসন দান করে না; এবং সংশোধিত না হইলে তাহার পতন হয়।

*

সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-স্রষ্টা

সেইরূপ সাহিত্য-সাধনার প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়াই যদি কোন সাহিত্যসেবক মনে করেন তিনি একজন যুগপ্রবর্ত্তক এবং যুগোত্তর সাহিত্যস্রষ্টা ঋষি হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও অনুরূপ হাস্যকর ও পতনসূচক। কিন্তু এদেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপই এখন ঘটিতেছে। সম্পাদকদের প্রতি স্বার্থপরতার আরোপ ত সাধারণ কথা, কেহ কেহ এমনও মনে করিতেছেন, দীর্ঘজীবী রবীন্দ্রনাথ স্বার্থপরতা করিয়া তাঁর প্রতিভার পথ আটকাইয়া রাখিয়াছেন!

ভ্রান্ত!—কেহ কাহারও প্রতিভার পথ আটকাইয়া রাখিতে পারে না; এবং দুই-একটি সাময়িক পত্রিকায় দুই-একটি রচনা প্রকাশিত হইলেই সাহিত্যের সিদ্ধসাধক হওয়া যায় না। কারণ—"অজহুঁ বীজ অংকুরমে..."

*

অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস

সাধনায় আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধান্বিত থাকা একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই; কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অর্থ অহঙ্কার নহে। আত্মবিশ্বাস সাধনাকে ফলবান করে, কিন্তু সেই ফলবান সাধনার নম্রশোভন রূপই বাঞ্ছনীয়—ন্যাড়া তালগাছের ঔদ্ধত্য কুৎসিত ও পীড়াদায়ক। শক্তিমানের পরিচয় ধীরতামণ্ডিত দৃঢ়তায়,—মুখর আত্মপ্রকাশ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের সেই গানের চরণ মনে পড়ে—

"ধীরে বন্ধু, ধীরে
চল..."

ছেলে ও মেয়ে

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি এস্

ছেলের চাইতে মেয়ে
ঢের বেশী ভালো,—
ছেলে আনে টাকা-কড়ি,
মেয়ে জ্বালে আলো।

কানাডা

শ্রী পুলিনবিহারী সাহা

যুক্তরাজ্যের উত্তর সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া আর্টিক মহাসমুদ্রের কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ মাইলের একটি ভূভাগ উত্তর আমেরিকার মানচিত্রে দেখা যায়। এই ভূভাগটির নাম কানাডা। পূর্ব্ব সীমানা হইতে পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত এই মহাদেশটি দৈর্ঘ্যে তিন হাজার মাইল।

কানাডা আটটি প্রদেশে বিভক্ত—(১) নাভাস্কাটিয়া, (২) নিউব্রানস্থইক, (৩) কুইবেক, (৪) অন্টারিও, (৫) মনিটোবা, (৬) সাসকাচিয়ান, (৭) আলবার্টা ও (৮) বৃটিশ কোলোম্বিয়া। এই প্রদেশ কয়টি ব্যতীত তিনটি দ্বীপও এই মহাদেশটির অন্তর্গত। প্রথমটি প্রিন্স এডওয়ার্ড এবং তার কিছু উত্তরে আর দুইটি—ইউকুন ও ম্যাকেঞ্জি।

এই দ্বীপ তিনটিতে প্রধানতঃ এ্যাংলো-সাক্সন জাতির সমৃদ্ধিশালী, কর্ম্মঠ ও স্বাস্থ্যময় নবীন বংশধরগণ বাস করে। আর্টিক মহাসমুদ্রের অপূর্ব্ব সুন্দর গাম্ভীর্য্য এই দ্বীপ তিনটিতে বিরাজ করে।

কানাডার লোকসংখ্যা প্রায় নয় কোটি। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের অধিবাসীগণ স্থায়ীভাবেই বাস করে এবং এই দুইটি দিককেই বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সুন্দর ও সুউচ্চ প্রাসাদবেষ্টিত করিয়া যান্ত্রিক সভ্যতায় সভ্য করা হইয়াছে। কিন্তু উত্তর ভূভাগ সভ্য হইতে রাজী না হইয়া তার বিস্তীর্ণ জঙ্গলে মুশ, এল্ক, দীর্ঘকায় ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘগুলিকে লইয়া পরমানন্দে কাল কাটায়। নোমাডিক শ্রেণীর আদিম অধিবাসীগণ এখনও পর্য্যন্ত সেই বিপদসঙ্কুল স্থানে দুর্গম নদীর মধ্যে উপদ্বীপ রচনা করিয়া পাঁচশো বছর পূর্ব্বের অতি সাধারণ মানুষের জীবন যাপন করে। মাঝে মাঝে অন্য প্রদেশের শ্বেত-মানুষগুলি শিকার করিবার জন্য দলবদ্ধ ভাবে অরণ্যগুলিতে হানা দেয়, আবার কোনও দল বা ভবিষ্যতের রঙীন আশায় উৎফুল্ল হইয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি আবিষ্কার করিতে পদার্পণ করে।

মনিটোবা, সাসকাচিয়ান ও আলবার্টার দক্ষিণ দিকগুলিতে কোন জঙ্গল নাই। এই তিনটি প্রদেশেরই দক্ষিণ দিকে সমতল উন্মুক্ত প্রান্তরের স্থানে স্থানে সবুজ প্রকাণ্ড মাঠ ও চাষের উপযুক্ত জমি দেখা যায়। এই স্থানটির অপর নাম "কানাডিয়ান প্র্যারী।" এখানে একটি বড় গাছও দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে এই স্থানের কয়েক

কানাডার পুরাতন পার্লামেন্ট ভবন—টোরোন্টো

হাজার একার জমি একটি বিরাট সমুদ্রের মত দোদুল্যমান গোধূমক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই বিস্তীর্ণ গম-বাগিচার মাঝে চাষাদের কুটীর ও তাহাদের গৃহপালিত পশুগুলি বাগিচার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে চাষাদের গ্রামগুলিতে অতিবৃষ্টির অভাব না হইলেও গমের ক্ষেতে অনাবৃষ্টির লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় সরকারের সেচবিভাগ নানাভাবে গমক্ষেতের জলকষ্ট দূর করিয়াছে।

অন্টারিয়ো, কুইবেক ও নাভাস্কাটিয়া এই তিনটি প্রদেশ একত্রে ইংলণ্ডের সমতুল্য। সমৃদ্ধিশালী নগর থাকিলেও এই প্রদেশ তিনটির স্থানে স্থানে গ্রাম্যশোভারও অভাব

দেখা যায় না। দক্ষিণ অন্টারিয়োর বেশী ভাগই পল্লীভূমি। পঞ্চাশ বৎসর আগেকার সর্পসঙ্কুল শালবন এখনকার দিনে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলেও ম্যাপেল বার্চ্চ ও শালবাগান এখনও স্থানে স্থানে দেখা যায়। তবে সেগুলি আর দেশবিদেশে চালান্ যায় না, পল্লীবাসীর নিত্য-প্রয়োজনের জন্যই সেগুলি ব্যবহৃত হয়।

রকি পর্ব্বতের শ্রেণীগুলি কানাডা হইতে বৃটিশ কোলোম্বিয়াকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিলেও এই দেশটিও কানাডার একটি প্রদেশ। কানাডার উত্তরাংশের মত এই প্রদেশটিও নানা অরণ্যে শোভিত। বৃটিশ কোলোম্বিয়া কানাডার শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর স্থান। প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই প্রদেশটি সুইট্জারল্যাণ্ড ও নরওয়ের সমকক্ষ। সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালা শেলকার্ক ও পার্শেলএর মধ্যে ৫১৩২ বর্গ মাইলের বাম্ফ সহর ও কানাডার বিখ্যাত ন্যাশানাল পার্ক অবস্থিত। এই সহরটিতে কেবলমাত্র দুইটি ঋতুর আবির্ভাব হয়—শীত ও বর্ষা। এবং ইহা পুরা বৎসরই গোলাপ-ফুলের জন্য উত্তর আমেরিকার অধিবাসীদের অতি প্রিয় স্থান।

প্যাসিফিক মহাসমুদ্রের কিনারায় বৃটিশ কোলোম্বিয়ার দেশগুলি বৃহৎ আকারের "ডগ্লাস ফার"এর জন্য বিখ্যাত। চল্লিশ ফিট চওড়া গুঁড়িওয়ালা গাছের অভাবও ও-দেশে মোটেই হয় না। এইরকম একটি গাছ ভ্যানকুভার সহরের ষ্ট্যানলী পার্কে দেখা যায়

বৃটিশ কোলোম্বিয়ার রাজধানীর নাম ভিক্টোরিয়া। সহরটির জল-হাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ঔপনিবেশিক ইংরাজ-পরিবারবর্গের অতি প্রিয়। লোকসংখ্যা দুই লক্ষ এবং তাদের শতকরা ৭৬ জনই ইংরাজ। ভ্যানকুভার সহর বৃটিশ কোলোম্বিয়ার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার বন্দরের নাম প্রিন্স রূপার্ট।

সেণ্ট লরেন্স তীরের প্রথম সভ্য অধিবাসীরা ফ্রান্স হইতেই আসিয়াছিল। তাই এই জায়গার অন্য নাম থাকিলেও এখনও স্থানটিকে দ্বিতীয় বা নূতন ফ্রান্স বলা হয়। আজও পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসীরা ফরাসী ভাষাকেই মাতৃভাষা বলে। কুইবেক প্রদেশের ছোট বড় সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ফরাসীর অনুকরণেই গঠিত। যদিও তারা বৃটিশ নরপতিকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে তবুও তাদের কথাবার্ত্তায় ও আচার-ব্যবহারে তারা ফরাসীজাতি বলিয়াই গর্ব্ব অনুভব করে।

এই সকল অধিবাসীরা যখন ফ্রান্স হইতে আসিয়াছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জনই ছিল যুবক। যখন তারা এখানে আসিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল তখন তাদের জামাকাপড় সেলাই করিবার, রাঁধি-

আদিম অধিবাসীদের পুঃ উঃ পর্ব্বের দর্শকরা

বার ও তাদের একঘেয়ে জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিবার জন্য গৃহিণী বা স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু নির্জ্জন প্রদেশে বধূ আসিবে কোথা হইতে। তাই তারা তাদের দুঃখ জানাইয়া ফরাসী নরপতির কাছে আবেদন পাঠাইল। আবেদনের উত্তরে নরপতি জানাইলেন প্রতিবৎসর দুই শত তরুণীকে লইয়া একখানি করিয়া জাহাজ এই উপনিবেশে আসিবে এবং এখানকার অধিবাসী পুরুষরা তাদের বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবে।

যখন এই "কনে-জাহাজ" আসিয়া পৌছাইত তখন এখানকার অধিবাসীরা তাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পোষাক পরিয়া "আর্সলাইন" গীর্জ্জার বড় হলের দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। হলঘরের ভিতর কনেদের দাঁড় করানো হইত এবং প্রতিবারে একজন পুরুষকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। যে পুরুষটি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিত তাকে দুইমিনিট সময় দেওয়া হইত কনে পছন্দ করিতে। যাকে পছন্দ হইত পুরুষটি তার হাত ধরিয়া ঘরের অন্য দরজা দিয়া প্রস্থান করিত এবং

কালবিলম্ব না করিয়াই তাহাদের বিবাহ হইত। যদি কাহারও পত্নীর মৃত্যু হইত তাহা হইলে তাহাকে আবার বিবাহ করিবার জন্য দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত। কিন্তু যাহারা বিধবা হইত তাদের বিবাহ হইতে দেরী হইত না।

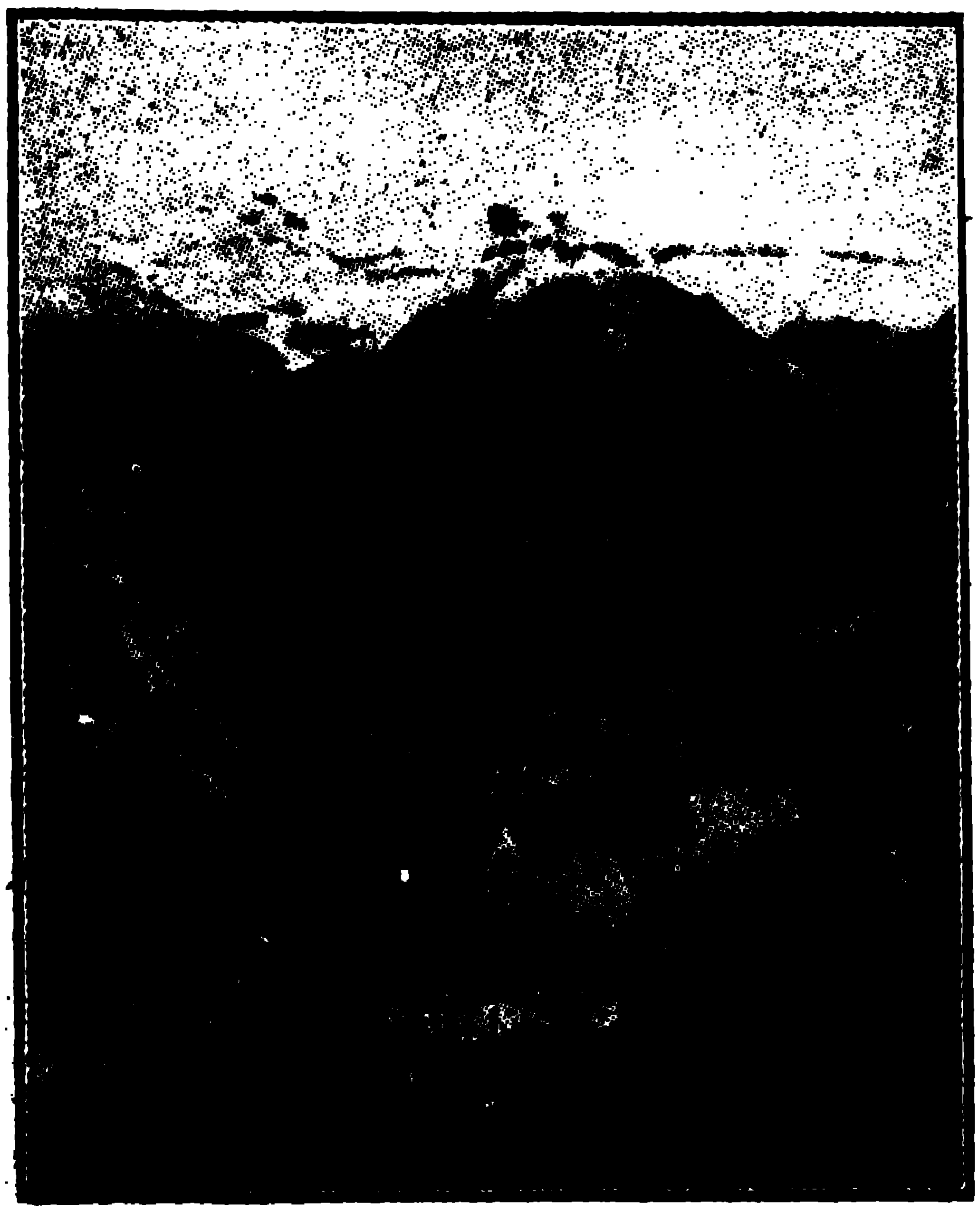

কুইবেকের নগর-দুর্গ

আজকাল কিন্তু ওদেশে মেয়ের অভাব মোটেই হয় না। এখানকার অধিবাসীরা সরল ও ধর্ম্মভীরু। পূর্ব্বপুরুষের আচার-ব্যবহারের উপর এরা বেশ শ্রদ্ধাশীল। এক কথায় —পরিবর্ত্তনবিরোধী। এরা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পালন করে। তামাক আর আপেল এখানকার প্রধান ফসল। ঘোড়ার জন্যও এ জায়গাটা বিখ্যাত।

সেণ্ট লরেন্সের একটু উপরেই কুইবেক সহর। ডান দিকে ওণ্টারিয়ো ও এরী হ্রদ; বামে হার্ণ হ্রদকে রাখিয়া বিস্তীর্ণ উর্ব্বর বাগিচার মতই কুইবেক প্রদেশ অবস্থিত। কুইবেক – এই প্রদেশের রাজধানী। এখানকার লোকসংখ্যা এক লক্ষ। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী আবিষ্কারক চ্যাম্প্লান এই সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। সহরটির একাংশ নদীর তীরে, অপরাংশ উঁচু ঢালু পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত। পাহাড়ের ঠিক তলদেশেই নগরকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটি নগর-দুর্গ আছে। এই দুর্গদ্বারে তৃতীয় জর্জ্জের সেনাপতি উল্ফ ফরাসী সেনাপতি মটকামকে পরাজিত করেন। কানাডার রোমান ক্যাথলিকদের লাভাল ইউনিভার্সিটী এই কুইবেক সহরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিছু উত্তরেই কানাডার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর মণ্ট্রিল। এখানকার লোকসংখ্যা নয় লক্ষ। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই সহরটি রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখন এই সহরটি কানাডার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মালপত্রের রপ্তানীর জন্য বিখ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ নোৎরদ্যাম গীর্জ্জা এবং প্রোটেষ্টাণ্টদের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটীর জন্য মণ্ট্রিল বিখ্যাত।

সাত লক্ষ অধিবাসীকে লইয়া কানাডার দ্বিতীয় সহর ও অণ্টারিয়োর রাজধানী টোরোণ্টো প্রতিবৎসর অধিকতর সমৃদ্ধশালী হইতেছে। ওটোয়ায় নূতন পার্লমেণ্ট ভবন নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে টোরোণ্টোতেই পার্লমেণ্ট ভবন ছিল। এখন এই ভবনটিই টোরোণ্টোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অট্টালিকা।

পাহাড়ে ওঠা

মণ্ট্রিলের ১১৬ মাইল উত্তরে ওটোয়াই কানাডার রাজধানী। লোকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার। ওটোয়ার

পার্লামেণ্ট ভবন জগতের আধুনিক দীর্ঘতম অট্টালিকার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

ট্রাম ও মোটরই এখন কানাডার যানবাহন। রাস্তাঘাটে যানবাহনের চলাচলের কোনও শৃঙ্খলা নাই। আধুনিক গৃহের এবং পার্কের অতিবাহুল্য ঘটিলেও পুরাতন ঘরবাড়ী ও বাগানগুলির কারুকার্য্যের নিকট ঐগুলি বহুগুণে নিষ্প্রভ। সব বাড়ীতেই বড় বড় বারান্দা আছে। গ্রীষ্মকালে বাড়ীর অধিবাসীরা ঘরের বদলে এই সব বারান্দাতেই রাত কাটায়। শীতকালে শীতপ্রধান দেশের বাড়ীগুলি অপেক্ষা এখানকার বাড়ীঘরকে বেশীভাবে গরম রাখা হয় এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকিবার জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি অপেক্ষা এখানে অনেক বেশী পরিমাণে বরফ ব্যবহার হয়।

দেশের অধিবাসীদের দেশপ্রেম খুব গভীর। তারা তাদের মাতৃভূমিকে সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং গর্ব্বভরে তাদের দেশের সুখসুবিধা বিদেশীকে জানায়। নাগারিকদের প্রতিনিধিগণ দেশবিদেশের সৌখিন ব্যক্তিদের কানাডা ভ্রমণের ইচ্ছা জাগাইবার জন্য অনেক সময় বহু অর্থব্যয় করিয়া বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপন পাঠায়। বিদেশের ভ্রমণশীল দল কানাডায় আসিয়া স্থানাভাবে কষ্ট না পায় সেজন্য তাহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার লোক থাকিতে পারে এইরূপ ক্লাব নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সকল ক্লাবের নাম "কুড়ি হাজার" বা "পঁচিশ হাজার"।

সব বাড়ীতেই টেলিফোন আছে। টেলিফোনকে ওরা বাড়ীর একটা বিশিষ্ট আসবাব বলিয়া মনে করে। প্রত্যেক বাড়ীতে ও ছোট বড় সব সহরেই বিজলী-আলো জ্বলে।

প্রত্যেক সহরেই একটি "ষ্টোর" থাকে। ষ্টোর মানে বড় দোকান। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর দোকান অপেক্ষা এই ষ্টোর শ্রেণীর দোকান একটু ভিন্ন রকমের। ষ্টোরে কেবলমাত্র কমলালেবু আর পোষ্ট অফিসের সাজসরঞ্জাম পাওয়া যায়। ষ্টোরের মালিকটির কাছে কানাডার কোনও সহর বা পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাক্ না কেন সব কয়টিরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে। এই ষ্টোরের মালিকরূপে যিনি থাকেন তাঁকে এই সব প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দিবার জন্য মিউনিসি-প্যাল কর্ত্তৃপক্ষ যথাযোগ্য মাসোহারা দিয়া থাকেন। খুব সম্ভব বিদেশীদের যাহাতে কষ্ট না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্যই এই ষ্টোরের সৃষ্টি।

পল্লীপ্রদেশে পল্লীবাসীদের কুটীরগুলি পাথরের এবং বারান্দাওয়ালা। প্রত্যেক কুটীরের সামনেই কুটীরের দীর্ঘতা অনুযায়ী ফুলবাগান। আধুনিক বিলাসদ্রব্যের কোন অভাবই সেখানে দেখা যায় না।

কিন্তু ওণ্টারিয়ো বা নিউব্রান্সুইকএর পল্লীভবনগুলির ধরণ একটু নূতন রকমের। বনের ধারে বা হ্রদের ঠিক

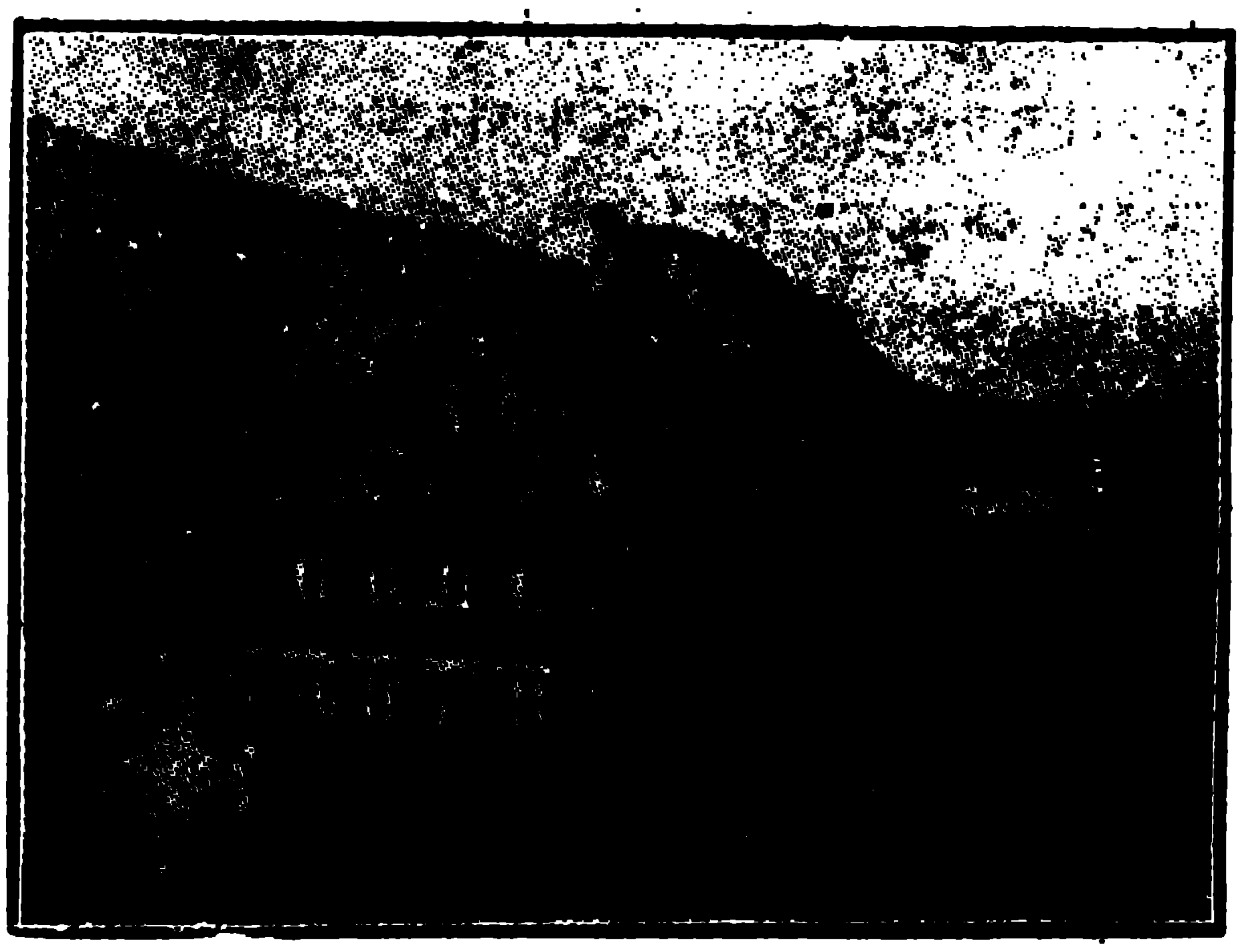

লেকের ধারের বাড়ী

উপরেই, ছোট্ট পাহাড়ের পাশে বা ঠিক লাগোয়া "লগ কেবিন" অর্থাৎ ছোট্ট কাঠের বাড়ী। বাড়ীটির একধারে একটি ছোট্ট মাঝারি রকমের চিমনী রান্নাঘরের ধুমনিকাশের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। সবশুদ্ধ দুইখানি ঘর। রান্নার জন্য একটি উনুন, শিকারের জন্য একটি বন্দুক, একটি ছোট কামান, আর মাছ ধরিবার নানা সরঞ্জামই হয় বাড়ীর আসবাব। এদের আতিথেয়তা প্রশংসনীয়। অপরিচিত কোন ভ্রমণকারী বা বিদেশীকে কুটীরের কাছে দেখিতে পাইলে এরা তাঁর সমাদর করে আর তাঁকে পানাহারের নিমন্ত্রণ জানায়—এবং আনন্দের সঙ্গে স্থানীয় সকল দর্শনীয় বস্তু যত্নের সঙ্গে দেখায়। এই স্থানের অধিবাসীরা প্রধানতঃ শিকার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলেও সারা শীতকালটা সরকারী অরণ্যগুলিতে কাঠ কাটিবার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বিদেশীদের "গাইডের" কাজেও ইহাদের দেখা যায়।

গ্রামীর জীবনপ্রণালী কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ধরণের। এখানকার বাড়ীগুলিও কাঠের তৈয়ারী কিন্তু প্রত্যেক প্রতিবেশীর বাড়ীর দূরত্ব প্রায় একাধিক মাইল। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রায় এক বৎসরের খাবার জমা থাকে। একখানি বাড়ী হইতে অপরখানির দূরত্বের মাঝে কেবল গমক্ষেত। সারা বৎসরের বেশী সময়টাই এরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গমক্ষেতে কাটাইয়া দেয়। কোন কোন বৎসর শীতকালে যখন তুষারে মাঠ ভরিয়া যায় তখন এদের প্রায় অনাহারেই দিন কাটাইতে হয়। কিন্তু এই যে ক্ষতি, এরা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সেটা পুষাইয়া লইয়া কেউ বা শীতকালে দক্ষিণে স্বাস্থ্যঅন্বেষণে যায়, আবার কেউ বা তাদের ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য সহরে পাঠাইয়া দেয়।

কুইবেক প্রদেশের গ্রামবাসীরা অধিকাংশই ফরাসী আর ধনী। এরাই একমাত্র রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী। এরা নিজেদের খাবার নিজেদের চাষ হইতে উৎপন্ন করে এবং সরল ও মিতব্যয়ী।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা কানাডার কোন প্রদেশের পল্লীবাসীদেরই তেমন দেখা যায় না।

কানাডার সকল বিদ্যালয়ই সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। সব বিদ্যালয়ই ইংরাজদের ইটন, হ্যারো, রাগবী প্রভৃতি বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলির অনুকরণে গঠিত। ছেলেমেয়েদের একই বিদ্যালয়ে একত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পল্লীবাসী বালকবালিকাদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য নানাস্থানে সরকারী কলেজও নির্ম্মিত হইয়াছে। "আপার কানাডা কলেজ"ই কানাডার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেজ। প্রত্যেক প্রদেশেই ইউনিভার্সিটী আছে। টোরোণ্টো, কুইবেক, মণ্ট্রিলএ। ইউনিভার্সিটীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কানাডার রৌপ্যমুদ্রার নাম "ডলার"। একশত সেণ্ট, বা ইংরাজি চার শিলিং বা আমাদের দেশের আড়াই টাকায় ওদের এক ডলার। এক সেণ্ট দামের তাম্রমুদ্রাকে ওরা "কপার" বলে। আমাদের দেশে কপারের দাম আড়াই পাই। দুই, পাঁচ, কিংবা দশ ডলারের নোট পাওয়া যায়। পল্লীবাসীরা মুদ্রাকে বিট বলে—কিন্তু বিট নামে ওদেশে কোন মুদ্রাই নাই।

গ্রামের দিকে চুরি ডাকাতি হয় খুব কমই। বড় বড় সহরে চুরি ডাকাতি খুব বেশী না হইলেও অনেক রকম লোককে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। দেশের সকল আইনকানুনই ইংরাজী আইন-কানুনেরই নামান্তর মাত্র। আবগারী বিশেষতঃ মদ বিক্রয়ের জন্য খুব কড়া নিয়ম আছে। মদ-বিক্রয়কারীকে ঠিক আমাদের দেশের মত সরকারী লাইসেন্স লইতে হয়। তবে মদ বিক্রেতাদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ আইনের প্রবর্ত্তন আছে। আদিম অধিবাসীরা মদ খাইলেই দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বলিয়া তাহাদের মদ বিক্রয় করিলে মদ-বিক্রেতাকে আইন অনুসারে দণ্ডিত হইতে হয়। এই সকল মদ-বিক্রেতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য একদল ছদ্মবেশী রাজ-কর্ম্মচারী দেশের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সমস্ত স্থানে বে-আইনীভাবে মদ বিক্রয় করা হয় সেই সকল স্থানের নাম "ব্লাইণ্ড পিগ"। অনেকের মতে মদ-বিক্রেতাদেরই "ব্লাইণ্ড পিগ" বলা হয়।

শিকারীদের জন্যও দেশে আইন আছে—অর্থাৎ একটি শিকারী কতগুলি জীবকে বন্দী বা হত্যা করিবে তারই একটি বাঁধাধরা নিয়ম আছে। যদি কোনও শিকারী অতিরিক্ত জন্তুকে শিকার করে এবং সে কথা প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহার বন্দুক ও বাড়ীর আসবাব সরকারী তোষাখানায় জমা হইয়া যায় এবং শিকারীকে একটি মোটা রকমের জরিমানা দিতে হয়।

আমাদের দেশের মত ওদেশেও যখন তখন ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। তবে জারী করিবার ধরণটা একটু ভিন্ন রকমের। রাজ প্রতিনিধির আদেশটি বড় বড় রাস্তার নিকট টানাইয়া দেওয়া হয়—আর সেই রাস্তায় একজন সাধারণ পুলিশ বেটন হাতে দাঁড়াইয়া থাকে, রাজ-প্রতিনিধির আদেশ-পত্রটি কেহ না ছিঁড়িয়া লয় তাহাই দেখিবার জন্য। কিন্তু পুলিশের পাগড়ীর মর্য্যাদা ওদেশে এত বেশী যে সেখানকার অধিবাসীরা ১৪৪ ধারা জারী হইবার পরই রাস্তায় পুলিশ দেখিলেই মাথার টুপী নামায়।

১৯১০ সালে একটি চোর কয়েদখানা হইতে পালায়।-

একটি চৌকিদার তাকে উত্তর দিকের দুর্গম জঙ্গলে প্রায় দুই হাজার মাইল তাড়া করিয়া গ্রেপ্তার করে। ওদেশের পুলিশ কর্ম্মচারীরা কানাডার সুনামের জন্য অনেক দুঃসাহসিক কায করিয়া থাকে।

কানাডার প্রথম তুষারপাতের বেশ একটু মাদকতা আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর মন্ট্রিলের বুড়া অধিবাসীরা পর্য্যন্ত পাগলের মত তুষারের উপর গড়াগড়ি দেয়। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষাও তারা তাদের বাড়ীঘর বেশী গরম রাখে।

জমি যখন শক্ত তুষারে ঢাকা পড়িয়া যায়, ওদেশের ছেলে-বুড়া সকলেই তাদের বরফ-গাড়ী শ্লেজ বা "শ্লে"কে বাড়ীর দরজায় দাঁড় করাইয়া রাখে। আমাদের দেশে যেরূপ ঠেলাগাড়ীতে ফেরী করিয়া বরফ বিক্রী হয় ওদেশের শ্লে তার চেয়ে একটু উন্নত ধরণের। বড় শ্লে কুকুরে টানে আর ছোট ছেলেদের শ্লের সামনে ব্রেক্ লাগানো থাকে। ছেলেরা পাহাড়ের ঢালু জায়গায় শ্লে চালায়। তারা এই খেলাটাকে বলে "কোষ্টিং"। যুবক ও বৃদ্ধেরা কুকুর-টানা শ্লেতে পাঁচ-ছয় মাইল পর্য্যন্ত বাজী রাখিয়া ছুটাছুটি করে। তারা একে বলে "স্নোসোর"। এই স্নোসোর খেলাটা ওদেশের মেয়েদেরও খুব প্রিয়।

কিন্তু আইস-হকি ওদেশে শীতকালের সবচেয়ে বড় খেলা। একটা বড় ঘরের মেঝে শক্ত তুষার দিয়া আবৃত করিয়া তার উপর খুব বড় একখণ্ড বরফ চাপা দেওয়া হয়। তারপর অন্য দেশে মাঠে যেমন হকি খেলা হয় সেই রকম ভাবে ওরা বরফের ওপর হকি খেলে। ওদের দেশে হকির বলকে "পাক" বলে। স্কেটিং-পায়ে খেলোয়াড়রা অন্য দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের মতই অতি আশ্চর্য্যভাবে বরফের উপর লাফালাফি করে।

আইস-হকি ওদেশের একটা আন্তর্জাতিক খেলা। বিভিন্ন প্রদেশের খেলোয়াড়রা তাদের বিশিষ্ট নগরবাসীদের সঙ্গে নিয়া খেলিতে যায়। এই সমস্ত দর্শকদের বলা হয়—কটার। আইস হকির জন্য কানাডায় ১৮৯৩ সাল হইতে একটি বড় কাপের খেলা কেবলমাত্র ১৮৯৮ সালকে বাদ দিয়া প্রতিবৎসরই খেলা হয়। কাপটির নাম "ষ্ট্যানলী কাপ।"

গ্রীষ্মকালে আদিম অধিবাসীদের "পুঃ উঃ" (Pwo Woo) পর্ব্বই ওদেশের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব। আদিম অধিবাসীদের এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বটিতে ওদেশের শ্বেত-মানুষগুলিও আনন্দের সঙ্গে যোগ দেয়।

গ্রীষ্মকালেও কানাডায় অনেক খেলাধূলা হয়। যুক্তরাজ্যের জাতীয় খেলা "বেসবল" আর আদিম

মাউণ্ট ডোনাল্ড—সেলকার্ক পর্ব্বতমালার শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ

অধিবাসীদের কাছ হইতে পাওয়া "ল্যাক্রশ"ই গ্রীষ্মকালে কানাডার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। গ্রীষ্ম ও শীতের এই সব জাতীয় খেলা ছাড়া ক্রীকেট, টেনিস, পোলো আর গল্ফের আদর ওদেশে বেশ আছে। এখন প্রতিযোগিতায় ওরা যুক্তরাজ্যকে অনেক পিছনে ফেলে রেখেছে।

কানাডার রেলগুলি সকল সভ্যদেশের রেল হইতে একটু ভিন্ন ধরণের। আমাদের রেলগুলির প্রত্যেক কামরায় যেমন দরজা থাকে ওদেশে রেলগাড়ীর তা থাকে না। ওদের রেলের পেছনকার গাড়ীতে একটি দরজা থাকে মাত্র, আরোহীদের সিঁড়ির সাহায্যে সেই দরজার ভিতরে ঢুকিতে হয়। ভিতরের সরু পথ যাত্রীদের যাওয়া আসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পথের দুইধারেই বিভিন্ন শ্রেণীর কামরা।

প্রত্যেক কামরায় চার জন যাত্রীর বসিবার বন্দোবস্ত আছে। আর প্রত্যেক গাড়ীতে মেয়ে আর পুরুষ যাত্রীদের জন্য দুইখানি ড্রেসিং রুম আছে। ড্রেসিং রুম খুব দামী আসবাব দিয়ে সাজানো থাকিলেও তিন জনের বেশী যাত্রী একসঙ্গে সে ঘরে ঢুকিতে পারে না—ঘরটি এত ছোট।

কানাডার ষ্টেশনগুলি আমাদের দেশের যে কোনও ষ্টেশনের চেয়ে অনেক গুণে বড়। ওদের দেশে গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টাধ্বনি করা হয় না। ট্রেন ছাড়িবার ঠিক একমিনিট আগে রেলের কণ্ডাক্টর একটি চোঙায় মুখ দিয়া গম্ভীর ভাবে আদেশ করেন—"সকলে গাড়ীতে ওঠো।" এক ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে না থামা পর্য্যন্ত কানাডার ইঞ্জিনগুলি সারা রাস্তাটা তাদের রেলের বড় ঘণ্টা "চ্যাপেল বেল" বাজাইতে আরম্ভ করে।

কণ্ডাক্টর যে কেবল গার্ডের কাজ করেন তা নয়। তাঁকে টিকিট চেকার আর বুকিং ক্লার্কেরও কাজ করিতে হয়। ট্রেন যখন চলিতে থাকে তখন গার্ডসাহেবকে এক একটি কামরায় গিয়া 'টিকিট দেখি' বলিতে হয় এবং যারা টিকিট কিনিতে পারে নাই তাদের টিকিট বেচিতে হয়। গোটাকতক সুপ্রসিদ্ধ সহরের ষ্টেশনগুলি ছাড়া কোনও ষ্টেশনে কুলী পাওয়া যায় না।

সকল দেশেই রেল কোম্পানীকে নিজের পয়সা খরচ করিয়া রেলপথগুলির জায়গা কিনিয়া লইতে হয়। কিন্তু কানাডার সরকার বাহাদুর নিজের পয়সা খরচ করিয়া জায়গাজমি কিনিয়া রেল কোম্পানীকে দান করেন। আবার অনেক জায়গায় সরকারকে নিজ ব্যয়ে রেলপথও নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হয়।

গম কানাডার সর্ব্বপ্রধান ফসল। পৃথিবীর যে কোনও দেশের তুলনায় কানাডার গম বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

কানাডার পূর্ব্ব প্রদেশগুলির বিশেষতঃ আলবার্টার পনির এবং মাখম্ আয়ারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও ইয়োরোপের নানাস্থানের অধিবাসীদের কাছে সুপরিচিত।

নোভাস্কোটিয়া ও অণ্টারিয়োর ফলব্যবসায়ীরা তাদের আপেল ফল ইংলণ্ডে চালান দিয়া প্রতিবৎসরই বহু অর্থ উপার্জ্জন করে। নোভাস্কোটিয়ার আনাপোলিস্ ও কর্ণওয়ালিস গ্রাম দুইটি তাদের বড় আপেলের জন্য ইংলণ্ডের ছোট বড় সকলেরই কাছে প্রশংসা অর্জ্জন করে। ১৯০১ সালে ভ্যানকুভারে সরকারী কৃষিজ প্রদর্শনীতে এই দেশের একটি আপেল ফল পাঠানো হইয়াছিল। তার ওজন ছিল তিন পাউণ্ড দুই আউন্স।

গমের পরেই কানাডা তার কাঠের জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত। এই দেশটির এক চতুর্থাংশ বিশেষতঃ বৃটিশ কোলোম্বিয়া কেবল অরণ্যে ভরা। বৃটিশ কোলোম্বিয়াকে ইউরোপের লোকেরা পৃথিবীর কাঠগুদাম বলে। সেডার, ডগলাস ফার, এরোপ্লেন নির্ম্মাণের উপযোগী স্প্রুস, হেমলক, হোয়াইট ফার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাঠ প্রতিবৎসরই এই দেশ হইতে পৃথিবীর নানান্ দেশে চালান দেওয়া হয়।

কাঠ কানাডার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ। টোরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফারন্সে একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের সভ্যতা কাঠের তৈরী। দোলনার শিশু হ'তে আরম্ভ ক'রে মরণোন্মুখ বৃদ্ধেরও কাঠের দরকার হয় বিভিন্নরূপে…আমরা কাঠের দোল্‌নায় খেলা করি, কাঠের ঝুমঝুমিতে ছেলে ভুলাই, কাঠের বাজনায় গান গাই, কাঠের শাঁসে তৈরী কাগজে কাঠের রসে তৈরী কালীতে লিখি।…আমাদের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী কাঠের বাড়ীতে বাস করে, আর বাকী অধিবাসীদের জ্বালানি কাঠের দরকার হয়।"

কানাডার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশগুলি সোনার খনির জন্য বিখ্যাত। শুধু খনি হইতেই ওদেশে সোনা উঠে না। নদীতটের বালিতেও সোনা পাওয়া যায়। পূর্ব্ব কানাডার যে দুইটি নদীর বালি এইরূপ সোনার জন্য বিখ্যাত তাহাদের নাম—ইউকন ও ফ্রেশার।

ইউকন নদীর যে ধারটায় বালির সঙ্গে সোনা পাওয়া যায় সেই জায়গাটা আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের কাছে। জায়গাটার নাম ক্লোনোডাইক। এই জায়গাটি কানাডিয়ান সভ্যতার শত শত মাইল দূরে শীতপ্রপীড়িত অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

সোনা-ই কানাডার একমাত্র খনিজ ধাতু নয়। রূপা, দস্তা, তামা, লোহা ও কয়লার জন্যও কানাডার খ্যাতি আছে। সোনার জন্য ক্লোনোডাইক যেমন, রূপার জন্য বৃটিশ কোলোম্বিয়ার কোবাল্টও সেই রকম বিখ্যাত।

কানাডায় আদিম কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সংখ্যা অনেক বেশী হইলেও তাহারা কদাচিৎ শ্বেত-মানুষগুলির আবাস-স্থানে আসে কৃষ্ণকায়গুলি যে স্থানে বাস করে সেই স্থানের নাম রিজার্ভ। এই রিজার্ভের মধ্যে এখানকার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এখানকার বেকারগণ কানাডা সরকারের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। ইহাদের রেডস্কিন বলা হয়।

আর এক শ্রেণীর আদিম অধিবাসীদের নাম এস্কিমো। ইহারা আর্টিক মহাসমুদ্রের শীতপ্রধান দেশগুলিতে বাস করে। ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

এই আদিম কৃষ্ণকায়গুলি ছাড়া হিন্দু, চীনা ও জাপানী প্রভৃতি বহু কৃষ্ণকায় জাতি কানাডার বিভিন্ন স্থানে বাস করে।

প্রথমে যখন চীনারা এদেশে আসিতে আরম্ভ করে তখন তাহাদের কোনরূপ বাধা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতিরিক্তভাবে প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯১০ সাল হইতে প্রত্যেক নূতন চীনার নিকটে হেড্-ট্যাক্স আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এখন যদি কোনও চীনা কানাডায় যায় তাহা হইলে তাহাকে একশত পাউণ্ড হেড্-ট্যাক্স দিতে হয়।

জাপানী অধিবাসীর সংখ্যাও এইরূপ ভাবে প্রতিবৎসর বাড়িতে থাকিলে জাপান-রাজশক্তি একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জাপানীকে কানাডায় বাস করিতে পাঠাইবে অধুনা এই মর্ম্মে কানাডার সরকারের নিকট প্রতিশ্রুতি-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কিন্তু হিন্দুদের আজও সেখানে অবাধ-গতি, কারণ তাহারও ইংরাজ রাজত্বে বাস করে। তবে খুব কম সংখ্যক হিন্দুই সেখানে বাস করিবার ইচ্ছায় থাকিয়া যায়।

সাসকাচিয়ানে আর একদল কৃষ্ণকায় দেখা যায়। ইহারা নাকি রাশিয়ার আদিম অধিবাসী। ইহাদের বিশিষ্টতা এই যে ইহারা নিরামিষী ও শান্ত প্রকৃতির লোক। ইহাদের দুই তৃতীয়াংশই চাষী এবং বাকী অধিবাসীরা শিকার করিয়া করিয়া জীবন ধারণ করে।

সমিতির কথা

ভোলা

গত বৎসর সমিতির স্থায়ী সভানেত্রী শ্রীমতী সুখদাসুন্দরী দেবীর পরলোকগমনে সমিতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল, এবং সমিতির উন্নতিসাধনে তিনি সর্ব্বদা যত্ন লইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্রীযুক্তা বগলাসুন্দরী ঘোষ সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

সমিতির সভ্যা-সংখ্যা বর্ত্তমানে ৪০ এবং আশা হয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

সমিতি গত বৎসর একটি বিপন্ন মহিলা ও তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সাহায্যার্থে ৫০৲ টাকা, এবং অপর একটি বিপন্ন পরিবারকে ১৫৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ২।৩টি অন্নক্লিষ্ট ভদ্র পরিবারকে মাঝে মাঝে গোপনে চাউল দান করিয়াছেন।

সমিতির উদ্যোগে ও স্থানীয় কয়েকজন ভদ্র লোকের চেষ্টায় ভোলাতে "বীণাপাণি বালিকাবিদ্যালয়" নামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রী-সংখ্যা ৮০র অধিক হইয়াছে। সমিতির কতিপয় সভ্যা উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া পরিচালনকার্য্য দেখিতেছেন।

সমিতি নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর মেয়েদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই সমিতির উপর যাঁহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে তাঁহারা সমিতিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। স্থানীয় ভদ্রলোক, বিশেষতঃ যুবকগণ সমিতিকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন।

শ্রী সরযূবালা সেন গুপ্তা
সম্পাদিকা

ঠাকুরগাঁও

মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপায় নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঠাকুরগাঁও মহিলাসমিতির দ্বিতীয় বর্ষও অতীত হইল। বর্ত্তমান সময়ে সমিতির সভ্যা-সংখ্যা ৫১ জন।

সমিতির সভা শুক্ল পক্ষে মাসে একবার করিয়া হয়। সভায় অধিকাংশ সভ্যারা একত্রে মিলিত হইয়া সমিতির উন্নতি বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিয়া থাকেন।

গত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সমিতির একটি শিল্পশিক্ষা-ক্লাস চলিতেছিল। সভ্যাদের অনেকেই এবং স্থানীয় বালিকাদের মধ্যে ১০।১২টি ঐ ক্লাসের ছাত্রী হিসাবে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সরোজনলিনী নারী-শিল্পালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্তা শ্রীমতী অমলা সেন বিশেষ কৃতিত্বের সহিত শিল্প-ক্লাসে সেলাই ও নানারূপ সূচিকার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন। ফলে গত ১৯৩০ সালে কেন্দ্র-সমিতির প্রদর্শনীতে সোয়েটার, গলবন্ধ, টেবিলক্লথ, ব্লাউস্, রুমাল ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য পাঠান হইয়াছিল। সমিতির বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, প্রেরিত জিনিষগুলির মধ্য হইতে স্থানীয় সমিতির অন্যতমা সভ্যা শ্রীমতী বিলাসমণি বসু কর্ত্তৃক প্রস্তুত একটি উলের সোয়েটার আমাদের মাননীয়া লাট পত্নী লেডী জ্যাক্সন ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। তাহা ছাড়া সভ্যা এবং ছাত্রীদের অনেকের বাসাতেই ছেলে-মেয়েদের ফ্রক্, ইজার, পেনী, সার্ট, পাঞ্জাবী প্রস্তুত হইতেছে। বাজারের দর্জ্জীর উপর আর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না।

সমিতির অন্যতমা ছাত্রী শ্রীমতী কালিদাসী দেবী স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে কাটা-কাপড়ের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঠাকুরগাঁয়ের সুবিজ্ঞ ও সুচিকিৎসক সরকারী ডাক্তার-খানার ডাক্তার বাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দে বক্সী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যত্নসহকারে সমিতির ৮ জন সভ্যাকে ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছুরি কাঁচি ঔষধাদি পূর্ণ একটি করিয়া বাক্স পাইয়াছেন।

শ্রী ইন্দুমতী দেবী
সম্পাদিকা

শ্রীরামপুর

গত ১৩৩৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে শ্রীরামপুর আক্না বালিকাবিদ্যালয়ে স্থানীয় মহিলাগণের সাধারণ সভায় শ্রীরামপুর মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১২ জন সভ্যা লইয়া একটি কার্য্যকরী সভা গঠিত হয়। সমিতির নিজগৃহ না থাকায় আক্না বালিকাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রতি শনিবার সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সভ্যা-সংখ্যা মোট ৩১ জন। তন্মধ্যে গড়ে ১০।১১ জন মাত্র সভ্যা সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়া থাকেন। গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই বলিয়াই উপস্থিতি-সংখ্যা এত অল্প। যাঁহারা পদব্রজে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত তাঁহারাই সমিতিতে আসিয়া যোগদান করিতে পারেন। সমিতির উদ্দেশ্য—(১)পরস্পর মেলামেশা ও ভাবের আদানপ্রদান, (২) নারী-জাতির শিক্ষা, সামাজিক ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতি-বিধানে চেষ্টা এবং (৩) নারীদিগকে গৃহশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ও তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। সমিতির প্রতি অধিবেশনে বর্ত্তমানে তূলা-পেঁজা, সূতা-কাটা, বোনা, সৎগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা, জামা-সেমিজ ইত্যাদি তৈয়ারী করা ও বিক্রয়, সেলাই শিক্ষা দেওয়া, উল ও সূতার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা, এই কয়টি কাজ নিয়মিত ভাবে হইয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত ৪।৫ জন মহিলা এই বিষয়ে সমিতির সাহায্যে নিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিক্ষার ভার সমিতির কয়েকজন সভ্যার উপর ন্যস্ত আছে। বড়ই আনন্দের বিষয় যে ২জন মহিলা সেলাই কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের সংসারের ব্যয়ভার প্রভূত পরিমাণে বহন করিতেছেন। তন্মধ্যে ১জন মাসে প্রায় ৩০।৩৫ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। আজ পর্য্যন্ত সমিতিতে মোট ৪৯টি জামা, সেমিজ ইত্যাদি তৈয়ারী ও বিক্রয় হইয়াছে। সেলাই বাবদ এই প্রকারের লাভ মোট ১১৸৶১০ সমিতির তহবিলে জমা হইয়াছে। সভ্যাগণের নিকট চাঁদা এ পর্য্যন্ত ৩৭৷০ আদায় হইয়াছে। খরচ বাদ বর্ত্তমানে মজুত টাকা ২৭৷৷৵০ সমিতির তহবিলে আছে। সমিতিতে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। স্থানীয়া একজন শিক্ষিতা ধাত্রী শিক্ষার ভার লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী দাস
সম্পাদিকা

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

কেন্দ্রসমিতির কথা

সেনহাটীতে নারী-শিল্প-শিক্ষালয়

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে সেনহাটী মহিলাসমিতি নারী-শিল্প-বিদ্যামন্দির নামে একটি শিল্পশিক্ষালয় যোগ্যতার সহিত পরিচালন করিতেছেন। প্রতিদিন ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এই শিল্পবিদ্যালয়ের ক্লাস হইয়া থাকে। গ্রামের বহু কুমারী, বধূ ও বিধবা এখানে শিল্প শিক্ষালাভ করিতেছেন। সমিতি শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য নিজব্যয়ে বালিকাবিদ্যালয়ের সংলগ্ন একখণ্ড জমিতে একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেন্দ্রসমিতি হইতে প্রেরিত শ্রীমতী নলিনীবালা দত্ত এবং অপর একজন মহিলা এখানে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন। শিল্পবিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে নানাপ্রকার ছাটকাট, সেলাইয়ের কাজ, বস্ত্রবয়ন, মণিপুরী তাঁতে তোয়ালে বোনা, শতরঞ্চ ও গালিচা বোনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে শিক্ষালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ৪৫জন। এই শিক্ষালয় পরিদর্শন করিয়া খুলনার ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টার অব স্কুলস্ মিঃ জে, জি, সেন বলিয়াছেন—"বাংলার মফঃস্বলে এ শ্রেণীর বিদ্যালয় এই প্রথম।" বালিকাবিদ্যালয় সমূহের সহকারী ইনস্পেক্ট্রেস্ শ্রীমতী মনীষা রায় এম-এ কেন্দ্রসমিতির পক্ষ হইতে এই শিক্ষালয় পরিদর্শন করিয়া স্কুলের কার্য্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আমরা সেনহাটী মহিলাসমিতির এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

মৈমনসিংহ মহিলাসমিতির প্রশংসনীয় কার্য্য

কেন্দ্রসমিতির অন্তর্ভুক্ত যে সমুদয় মহিলাসমিতি আছে তাহাদের মধ্যে মৈমনসিংহ মহিলাসমিতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই সমিতির সভ্যাসংখ্যা বর্ত্তমানে ৪০৩ জন। সমিতি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত গত বৎসর একটি ধাত্রীশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালন করেন। ৬জন মহিলা ধাত্রীশিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমিতি ৩০৲ টাকা বেতনে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ও পারদর্শী দর্জি নিযুক্ত করিয়া ২০টি কেন্দ্রে বিবিধপ্রকার সেলাই শিক্ষা দিতেছেন। উল্লিখিত ২০টি সেলাই ক্লাসের মধ্যে ১২টি তাঁত ও চরকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং সমিতির ৭১ জন সভ্যা নিজ নিজ গৃহে নানা আকারের টিপ্রাই তাঁতে বয়নকার্য্য করিতেছেন। প্রধান সমিতির কয়েকজন সম্পাদিকার গৃহে অল্পবয়স্কা বালিকাদের জন্য ব্যায়াম-ক্লাস খোলা হইয়াছে। ব্যায়াম-কেন্দ্রে ড্রিল, লাঠি, ছোরা প্রভৃতি খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। কতিপয় মহিলা সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ গৃহে সাবান প্রস্তুত করিয়াছেন। সমিতি প্রতিবৎসর একটি করিয়া শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সমিতি নার্সিং ক্লাস খুলিয়া ২৫টি মহিলাকে এই কার্য্য শিক্ষা দিতেছেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম বি এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বিনা পরিশ্রমিকে প্রত্যেক সপ্তাহে এক দিবস করিয়া শিক্ষাদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সমিতি বর্ত্তমানে সহরের নানাস্থানে ২৬টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমিতির কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। গত বৎসর নানাপ্রকার উল্লেখযোগ্য কার্য্যের জন্য মৈমনসিংহ মহিলাসমিতি কেন্দ্রসমিতি হইতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রদত্ত ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাগেরহাট মহিলা-শিল্প-বিদ্যালয়

সকল জেলার মধ্যে খুলনা জেলার মহিলাসমিতিগুলি সকলপ্রকার উন্নতিমূলক কার্য্যে অগ্রগামী। সম্প্রতি বাগেরহাট সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলা মিত্র এবং শ্রীমতী উষামতী দেবী এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মীগণ স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা প্রচারের জন্য একটি স্থায়ী শিল্পশিক্ষালয় খুলিয়াছেন। আমরা এই শিল্পশিক্ষালয়ের সাফল্য কামনা করি।

কস্‌বা ধাত্রীশিক্ষা কেন্দ্র

২৪পরগনা জেলার অন্তর্গত কস্‌বা মহিলাসমিতি স্থানীয় ধাত্রীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রসবকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি একটি ধাত্রীশিক্ষা কেন্দ্র খুলিয়াছেন। কস্‌বা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অক্লান্তকর্ম্মী রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয় এই কেন্দ্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

অভিনয়ের বেশে যশোহর মহিলাসমিতির সভ্যাগণ

দত্তপুকুর মহিলাসমিতি

গত ২৬ শে জুলাই রবিবার ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত দত্তপুকুরে—নিবাধই গ্রামে স্থানীয় মহিলাগণের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহু পুরুষও উপস্থিত ছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী ও প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী এই সভায় আলোকচিত্র সহযোগে মহিলাসমিতির প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, গঠন-প্রণালী এবং সমাজসংস্কার ও সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানাদি বিষয়ে নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রসমিতি হইতে মহিলাকর্ম্মীর আগমনসংবাদে স্থানীয় ডাঃ সন্তাপকুমার সিংহ এবং সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত করুণাময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে দ্বিপ্রহরে বহু মহিলার আগমন হইয়াছিল। এই সময় শ্রীযুক্তা সরকার মহিলাগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও মহিলাসমিতি বিষয়ক বিবিধ আলোচনাদি করেন এবং বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন; তাহাতে উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সেই দিনই এখানে একটি মহিলাসমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত করুণাময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী সমিতির সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই স্থানীয় মহিলাগণ দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার সময়ে নারীজাতির গৃহগণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকাই মাত্র গৃহিণীত্বের পরিচায়ক নহে এবং সত্যকার গৃহিণীর গৃহের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলকার্য্যে গৃহকর্ত্তার সহায়ক হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য এইরূপ বোধে তাহার প্রথম কৃত্য গৃহশিল্পের সমুন্নতিতে যত্নপরায়ণা ছিলেন। এইরূপ কার্য্য করিতে হইলে মহিলাদের একটি মিলিত নিজস্ব সঙ্ঘের প্রয়োজন; তাই তাঁহারা মহিলাসমিতি স্থাপন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রসূতিপরিচর্য্যা এবং সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া মহিলা-সমিতির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বৌবাজার মহিলাসমিতি পরিদর্শন

গত ২৮ শে জুলাই মঙ্গলবার নারীমঙ্গল কেন্দ্রসমিতির

সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী বৌবাজার মহিলাসমিতি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা চক্রবর্ত্তী সমিতির কার্য্য যাহাতে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে, সেইরূপ উপদেশ দিয়া অতি সুন্দর একটি বক্তৃতা করেন।

বৌবাজার সমিতির অন্তর্ভুক্ত অন্তঃপুর-শিক্ষালয় ও বালিকাবিদ্যালয় দুইটি খুব ভালরূপেই চলিতেছে

সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়ে মহিলাসভা

গত ২১শে জুলাই নিখিল ভারত মহিলাসম্মিলনীর উদ্যোগে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির শিল্পবিদ্যালয়ে একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলে পর নারীমঙ্গল সমিতির মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী সমাজসেবায় নারীর স্থান বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। তৎপর নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশ-চন্দ্র সেন বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে বাল্যবিবাহ ও তাহার বিষময় ফল, নারীর অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শিশুমৃত্যু, সমাজসংস্কারে নারীর দায়িত্ব ও অধিকার, সামাজিক জীবনে সঙ্ঘশক্তির সার্থকতা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সঙ্গীতান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

কৃষ্ণনগরে মহিলাসভা ও শিল্পপ্রদর্শনী

গত ১লা আগষ্ট হইতে ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে মহিলা-সম্মিলনী উপলক্ষে একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই প্রদর্শনীতে বাংলা দেশের বহু শিল্প ও তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রকারের মেয়েদের প্রস্তুত বহু কুটীরশিল্প উপস্থিত করা হইয়াছিল। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে শিল্পদ্রব্য এবং বহু বিভিন্ন প্রকারের সুচিত্রিত চার্ট প্রদর্শিত হইয়াছিল। কবিতাযুক্ত চার্টগুলি মহিলা ও পুরুষদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গত ৩রা আগষ্ট সন্ধ্যাকালে স্থানীয় টাউনহল প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের একটি বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে গঠনমূলক কার্য্যে নারীর সাহার্য্য ও অধিকার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে নারীশক্তি শিক্ষা, সমাজসেবা এবং শিল্প-চর্চ্চা বিষয়ে বিশেষভাবে নিযুক্ত না হইলে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া কখনই সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।

বাঁকুড়া মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠিত শিশু-শুশ্রূষাগার

জব্বলপুর মহিলাসমিতি

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নানা-প্রকার জনহিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মেয়েরা মিলিয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুর সহরে একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতির চেষ্টায় গত এপ্রিল মাসে উক্ত স্থানে একটি শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে স্থানীয় মহিলারা বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান ও নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া ইহার বৈচিত্র্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সমিতির

সভ্যাদের স্বহস্তপ্রস্তুত উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, বড়ি, পাঁপর, আচার, জেলি, নারিকেলের চিড়া, চোষী ইত্যাদি বহুপরিমাণে বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছিল। সমিতি হইতে ১২টি সার্টিফিকেট এবং ২৮টি পুরস্কার মহিলাদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যের জন্য তিনটি মহিলাকে বাহির হইতে সংগৃহীত মেডেল বিতরণ করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় শ্রীমতী উষা মিত্র সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিভাষণ হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া পাঠ করা হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। তিনদিন কাল প্রদর্শনী স্থায়ী হইয়াছিল। মহিলাসমিতির সভ্যাগণ এই উপলক্ষে বুদ্ধচরিত মূক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অভিনয়ের জন্য ১৲ টাকা হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত টিকিট করা হইয়াছিল। সমিতি হইতে একখানি হাতে লেখা ত্রৈমাসিক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীমতী উষা মিত্র উদ্বোধন-সভায় সভানেত্রীরূপে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন আমরা তাহা পাইয়াছি। বঙ্গলক্ষ্মীর বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানাভাব বশতঃ তাহা প্রকাশিত হইল না। আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

যশোহর মহিলাসমিতিতে অভিনয়

শ্রীযুক্তা চারুশীলা ধরের নেত্রীত্বে যশোহর মহিলাসমিতির সভ্যাগণ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়াছেন। স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য তাঁহারা "রিজিয়া" নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের টিকিট বিক্রয় করিয়া ৭০০৲ টাকা উঠিয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশই তাঁহারা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন এবং কতকাংশ দ্বারা মহিলাদের জন্য একটি স্থায়ী পাঠাগার স্থাপন করিতেছেন। সমিতির এই প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য আমরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং আশা করি অন্যান্য সমিতি তাঁহাদের এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। অভিনয়ের বেশে কয়েকজন সভ্যার ছবি এই সংখ্যায় বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত হইল।

বাঁকুড়া সমিতির শিশু-শুশ্রূষাগার

বাঁকুড়া মহিলাসমিতি কয়েকবৎসর হইল দরিদ্র শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি শিশু-শুশ্রূষাগার স্থাপন করিয়াছেন। এখানে দরিদ্র শিশুদের নিয়মিত চিকিৎসা হয়। তাহাদের মধ্যে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করা হয়। অনেক পিতামাতা তাহাদের শিশুদের দুগ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সমিতি এই অভাব অনুভব করিয়া প্রতিদিন প্রাতে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঁকুড়া মহিলাসমিতির এই মহৎ দৃষ্টান্ত অন্যান্য সমস্ত সমিতির বিশেষ অনুকরণীয়।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

বসন্তকুমারী বার্ষিক স্মৃতিসভা:—গত স্নানযাত্রার দিন পুরী বিধবাশ্রমের স্থাপয়িত্রী লেডী বসন্তকুমারী দেবীর প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্বনামধন্যা ডাঃ শ্রীমতী যামিনী সেন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। পুরীর বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ সভায় উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয়া বসন্তকুমারীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পুরীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, পি, থাডানি স্বর্গীয়া বসন্তকুমারীর গুণাবলীর পরিচয় দিয়া তাঁহার সংকল্পিত কার্য্যের সাফল্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল তৎপরে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

ভূপেন বাবুর বক্তৃতা:—"যাঁহার পুণ্যস্মৃতির সম্মানার্থ অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, কি উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি সংস্থাপিত করেন, তাহাই সংক্ষেপে বলিবার জন্য শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী হেমলতা দেবী আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

৺বসন্ত কুমারী দেবী আজ এক বৎসর কাল ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অর্থ, নাম, যশ ইত্যাদিতে পরিবৃত হইয়াও বাঙ্গলা দেশের বিধবাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন স্বামী-পুত্রের অভাবে ইঁহারা কিরূপ বিপন্ন হইয়া আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহরূপে অথবা অসদুপায়ে দুঃখে জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হ'ন। অবশ্য দেশের সে দিন আর নাই যখন এই পতি-হীনা নারীগণ তাঁহাদের পিতা, ভ্রাতা, দেবরাদি কর্ত্তৃক যথেষ্ট সমাদৃতা হইতেন। সমাজেরও সে অবস্থা নাই যখন এই সকল ব্রহ্মচারিণীগণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবার শিক্ষা ও শাসন সমাজে প্রচলিত ছিল। এখন সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে বিধবাগণ প্রকৃতই সংসারের ভারস্বরূপ হইয়া

সকলের উদ্বেগের কারণস্বরূপ হইয়াছেন। একথা বলিতে লজ্জা হইলেও তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই দুঃখ বিমোচনের জন্য, যাহাতে তাঁহারা নারীর উপযোগী একটু শিক্ষা লাভ করিয়া নিজের জীবিকার্জ্জনে সক্ষম হ'ন এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এই "বিধবা আশ্রম" নিজের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে শুধু ইঁহাদের দুঃখ অনুভব করিয়া অর্থসাহায্য ক'রিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি নিজে এই আশ্রমের দুঃখী নারীদের সহিত একত্রে বাস করিয়াছিলেন এবং চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের নৈতিক ও ধর্ম্ম-জীবন প্রকৃত বিকাশলাভ করে।

তিনি রুগ্ন ও হৃতস্বাস্থ্য হইয়াও যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের দৃষ্টান্তে নিজের স্বার্থ বলি দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন কিরূপে অকৃতার্থ জীবনকেও কৃতার্থ করিয়া তুলা যায়। তাঁহার জীবন আমাদের দেশের ধনী নরনারীদের বিশেষভাবে অনুকরণীয়। বাঙ্গালী নরনারী আজ যাঁহারা অর্থ ও নামের ক্ষুদ্র স্বার্থ-গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা আজ নিজেকে ভুলিয়া এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে স্বজাতির অগৌরব ও দৈন্য যেন মুছাইয়া দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ৺বসন্তকুমারীর দৃষ্টান্তে তাঁহাদের অর্থবল ও চেষ্টায় তাঁহাদের ভগ্নী ও কন্যাতুল্যা নারীরা যাহাতে একটু মানুষের মত জীবনযাপন করিতে পারে তাহার সহায়তা করিয়া দেশের ও দশের গৌরবভাজন হউন।

তাঁহার শেষ অবস্থায় তিনি এই আশ্রমটি "সরোজ-নলিনী" শিক্ষাসমিতির হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তাঁহাদের কর্তৃপক্ষ শ্রীমতী হেমলতা দেবী কৃতিত্বের সহিতই আজ এক বৎসর এই বিধবা আশ্রমটি চালাইতেছেন। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"

তৎপরে স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী "পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

কৃপানন্দ স্বামীর বক্তৃতা:—"প্রায় হাজার পাঁচেক বৎসরের ভারত-ইতিহাসের প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত প্রমাণানুমানের দুঃখজনক কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রাণে বেদনা উপস্থিত হয়। স্বাধিকারবর্জ্জিত ভারত-ললনাদের শোচনীয় আধুনিক ইতিহাস সমধিক বিষাদময়। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে অমিতাভের প্রেরণায় ভারতের কন্যাগণ—তথা শ্রেষ্ঠী-কন্যাগণ—যে অতুলনীয় শিক্ষাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার গৌরবময় স্বর্ণাক্ষররঞ্জিত কথা ইতিহাসের পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি হইতে আজও বিলুপ্ত হয় নাই। পুরুষগণ আইনকর্তা হইয়া নারীদের প্রায় সমস্ত অধিকার নষ্ট করিয়া দিয়াছেন,—ধর্ম্মে তাহাদের পঙ্গু করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট প্রণব ও বেদাধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। অথচ বলিয়া থাকি আমরা মাতৃ-জাতিকে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি। ঋষিরা নারীদিগকে যে শ্রদ্ধা করিতেন আমরা তাহার দাবী করি। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চিরদিনই যাহারা অত্যাচার করে ও যাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হয় তাহাদের মধ্যে একটা সত্যের সমাধান হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নারীর স্বাধিকার লাভের যে প্রেরণা আসিয়াছে আমি ইহাকে প্রকৃতির প্রেরণা বলিয়া মনে করি। মুষ্টিমেয় কন্যা-হিতকামীরা প্রবল পুরুষতান্ত্রিক সমাজবিদ্রোহের মুখে নগণ্য। কিন্তু আজ তাহাদের সময় আসিয়াছে, আজ কন্যাগগনে স্বাধিকারের নব অরুণোদয় দৃষ্ট হইতেছে। তাই আমরা নারী-উন্নতিকর কোন প্রতিষ্ঠান দেখিলে আনন্দিত হই। আমি সম্প্রতি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহার অধ্যক্ষা বিদুষী শ্রীমতী হেমলতা দেবী। তাঁহার নিজতত্ত্বাবধানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা বিধবাশ্রম ও তৎসংলগ্ন বালিকা-বিদ্যালয় সুপরিচালিত। সুন্দর বয়নবিদ্যালয় ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। সুদূর আসাম ও বোম্বাই হইতে পর্য্যন্ত কন্যাগণ আসিতেছেন। আমার অল্পসময় উপস্থিতি মধ্যেই আসাম হইতে একটি জমিদার কন্যা আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন দেখিলাম। দলে দলে দর্শনার্থী ও কার্য্যবাহুল্য দেখিলাম। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ইহার নানাদিক দিয় শ্রীবৃদ্ধি হই-তেছে। ইহার সুনাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে সরকারী বেসরকারী সমস্ত ভদ্রমহোদয়-গণই ইহার সভ্য বা পৃষ্ঠপোষক। আমার দৃঢ় ধারণা অচির-কাল মধ্যেই ইহা অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

অধ্যক্ষা মহোদয়ার কার্য্যকুশলতা, শৃঙ্খলা, সহৃদয় আপ্যায়ন ও সমদৃষ্টির জন্য সকলেই স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ। আশ্রম ও বালিকা-বিদ্যালয় যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে ইঁহাদের নিতান্ত স্থানাভাব হইতেছে। এইজন্য শীঘ্রই বালিকাবিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। আশ্রমের সম্মুখস্থ বিস্তৃত খোলামাঠে শীঘ্রই উহা আরম্ভ করা হইবে। আশ্রম অতি সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে ফাঁকা যায়গায় প্রতিষ্ঠিত। অর্থাভাবের জন্য ইঁহারা আশানুরূপ বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছেন না। আমি আশা করি এই আশ্রম প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে নানাদিক দিয়া সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবে।"

বিধবাশ্রমে দান:—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্প্রতি বিধবাশ্রমে অর্থসাহায্য করিয়াছেন:— শ্রীমতী সুধাংশুপ্রভা মিত্র ১২৲, স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী ১০৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু ১০৲, রায় বাহাদুর ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত ৫৲, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত ৫৲, শ্রীমতী শোভনা দেবী ১৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুণ্ডু ২০৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দে ৫০৲, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ৫০৲, জনৈক ভদ্র লোক ১০৲।

প্রসাধন।

'কুড়িতেই বুড়ী' এ অপবাদ বোধহয় বাঙ্গলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। নিজেদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দিকে অমনোযোগ ও তাচ্ছীল্যই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাহা বলাই বাহুল্য। প্রসাধন চিরকালের প্রথা, আজকাল 'পর্দ্দা'র অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রসাধন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। চেহারার 'চটক' কমবেশী সকলেরই চাই। সুলভ ও সহজসাধ্য বলিয়া সাবানের প্রচলন আজকাল সর্ব্বত্র। দুঃখের বিষয় সাবানের ভালমন্দ বিচারে এদেশের নারীগণ একেবারেই অমনোযোগী। বাঙলার মেয়েদের একটা বৈশিষ্ট্য তাহাদের অনুপম লাবণ্য, ক্ষার এই লাবণ্যের মহাশত্রু। কাজেই

সাবান নির্ব্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। গায় মাখিবার সাবান সম্পূর্ণরূপে ক্ষারশূন্য না হইলে সহজেই রুক্ষ ও কর্কশ হয়। তা' ছাড়া সাবানটি চর্ম্ম-স্নিগ্ধকর হইলেই ভাল। হিমানী সাবান এ হিসাবে অতুলনীয়। ইহাতে ক্ষার-দোষ ত থাকেই না, অধিকন্তু 'হিমানী'র চর্ম্মস্নিগ্ধকর উপাদান ইহাতে যুক্ত থাকে বলিয়া ইহা শিশু ও নারী-শরীরের বিশেষ উপযোগী। লেডী প্রতিমা মিত্র, শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী দেবী, ডাক্তার এইচ, কে, সেন, এম, এ, ডি, এস্, সি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলা ও বৈজ্ঞানিকগণ হিমানী সাবান ব্যবহার করিয়া ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। রূপ ও লাবণ্যের জন্য হিমানী সাবান সত্যই অতুলনীয়।

চন্দন, খস্‌খস্, হোয়াইট রোজ, প্রভৃতি নানা গন্ধযোগে বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী পাওয়া যায়।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

মহামৃত্যুঞ্জয়

শিল্পী—শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

PRINTED BY C. H. ARAN & CO., CALCUTTA

কর্ম্মচারী সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৮ [১১শ সংখ্যা

মা নাই?

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শূন্য আজ আমাদের গেহ,
নাই সেথা জননীর স্নেহ—
মা আজিকে নাই।
অনন্ত আনন্দময়
আমাদের সে আশ্রয়
হ'য়ে গেছে ছাই॥

কত না দিনের কত কথা
মনে পড়ে, বাড়ে ব্যাকুলতা—
ভাসি আঁখি জলে।
সুখে থাক দুঃখে থাক
কেউ ব্যস্ত হবে নাক—
মা 'গয়েছে চলে॥

মনে পড়ে স্নেহের শাসন,
কান্না দেখে গোপনে ক্রন্দন
আজ মনে পড়ে।
ধৈর্য্য করুণার ছবি
একেবারে নষ্ট সবি—
পরিণত জড়ে?

মা আমার কোথাও কি নাই?
স্নেহ প্রেম সে কি হয় ছাই
আগুনেতে পুড়ে?
আকুল আহ্বান তবে
মিথ্যা হবে—ব্যর্থ হবে—
শূন্যে যাবে উড়ে?

রবি শশী নক্ষত্র-নিচয়
শূন্যে যদি পেয়েছে আশ্রয়
পেয়েছে আবাস,
তবে কি ব্যাকুল প্রাণ
শুধুই পাবে না স্থান—
পাবে না আশ্বাস? *

* এই অপূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতাটি শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—বঃ সঃ।

কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি

শ্রী সরোজনাথ ঘোষ

প্রতীচ্য দেশের পণ্ডিতগণের মতে বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যে কথাসাহিত্যই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অবশ্য প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের এই মত সর্ব্বজনমান্য না হইতে পারে; কিন্তু এ কথা সত্য যে, কথাসাহিত্যের স্থান সাহিত্যে অত্যন্ত গৌরবজনক তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। মানবসভ্যতা, মানবমনের চিন্তাধারা, সামাজিক রীতিনীতি সমস্তই কথাসাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। কথাসাহিত্যের প্রতাপও অসামান্য। সহস্র বক্তৃতায় যাহা না হয়, কথাসাহিত্যের প্রভাবে তাহা সহজে সম্পাদিত হইয়াছে, অথবা তাহার ফল ফলিয়াছে, ইহা বাস্তব জীবনে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

কি কারণে এমন ঘটিয়া থাকে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই; কিন্তু এ কথা সত্য, কথাসাহিত্যের প্রভাব আমোঘ। সুতরাং কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা এ যুগে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে ইহার আলোচনা নিরর্থক হইবে না বলিয়া মনে করি।

যে আকারে কথাসাহিত্য খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছে, তাহা প্রাচীন যুগের কথাসাহিত্য হইতে বিভিন্ন। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রতীচ্য দেশেও ইহার আবির্ভাব দীর্ঘকালের নহে। অর্থাৎ বিগত মোটামুটি তিনশত বৎসরের মধ্যেই ইহার আবির্ভাব ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বর্ত্তমান আকারের কথাসাহিত্য সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কাহারও মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইংলণ্ডে স্কট, ডিকেন্স, জর্জ্জ ইলিয়ট প্রভৃতির অসাধারণ প্রতিভার ফলে কথাসাহিত্য পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ফরাসী দেশ এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। ভিক্টর হুগো, আলেকজাণ্ডার ডুমা, মোপাঁসা, ডোডে, ব্যালজাক প্রভৃতি কথাসাহিত্যকে অনবদ্য মহিমায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন। ডষ্টাভয়েস্কি, কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি রুসীয় এবং মরিস্ যোকাই প্রভৃতি হঙ্গেরীয় লেখক কথাসাহিত্যকে প্রেয় এবং শ্রেয়রূপে গড়িয়া তুলেন।

উল্লিখিত প্রতিভাশালী লেখকগণ যখন সত্য শিব সুন্দরের জয়যাত্রা সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানবজাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তখন প্রতীচ্য জাতির সভ্যতা মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় আকাশপথে অপূর্ব্ব মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতি যখন গৌরবময় অবদানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করে, তখন তাহার মহিমা দিকে দিকে অনুকৃত হইতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, যখনই কোনও দেশ বা জাতি উন্নতির পথে আরোহণ করিতে থাকে, তখন সেই দেশে—সেই জাতির মধ্যে শক্তিধর নরনারীর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। প্রতিভার স্ফুরণের ইঙ্গিত হইতেই জাতীয় চরিত্রের এবং দেশের অবস্থার উন্নতি-অবনতির গতি-প্রকৃতি অনুমান করা যায়।

কথাটা আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, মানবমন যতই উন্নত, উদার ও বহুমুখ হইবে - সূক্ষ্মতম ভাবে যখন সত্য শিব সুন্দরের রূপ ধ্যানযোগে উপলব্ধি করিয়া ভাষার ঝঙ্কারে, শব্দের মধুর বিন্যাস ও ব্যঞ্জনায়, চরিত্রের বিকাশে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, ততই তাহা লোকের চিত্তকে অভিভূত,আকৃষ্ট করিয়া উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। সাহিত্যের সার্থকতা এইখানেই। কথাসাহিত্য সেই কার্য্য-সাধন স্বল্পায়াসে করিতে পারে বলিয়া প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ইহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যিকগণ এ ব্যাপারে সমধিক সাফল্য লাভ করায় প্রতীচ্য দেশের অসংখ্য নরনারী কথাসাহিত্যের প্রভাবে অল্পাধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া

পড়িয়াছিল। প্রতীচ্য কথাসাহিত্য তাই সমগ্র বিশ্বে অনুকৃত হইতেও আরম্ভ করিয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী কথা-সাহিত্যিকগণের বিচিত্র প্রতিভার দ্যুতিতে সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশ, কল্পনা-প্রবণ বাঙ্গালী জাতির শিক্ষিতসম্প্রদায় কথাসাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

য়ুরোপের এই গৌরবময় যুগ বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান কালে অর্থাৎ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এখনও অব্যাহত আছে কিনা, এবং ভবিষ্যতে সেই অনবদ্য মহিমা সমুজ্জ্বল-দীপ্তিতে বিশ্বের আকাশে প্রদীপ্ত থাকিবে কিনা,তাহা আলোচনা এবং প্রমাণ-সাপেক্ষ। তবে এ কথা এখানে উল্লেখ অবশ্যই করা যাইতে পারে যে, প্রতিভার তরঙ্গোচ্ছ্বাস সর্ব্বযুগে সর্ব্বত্র সমানভাবে থাকিতে পারে না। সমুদ্রে যখন পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিবার পর আবার ক্রমেই নামিয়া সমুদ্রবক্ষে মিলাইয়া যায়। প্রতিভার তরঙ্গও ঠিক তেমনই ভাবে এক সময়ে কোনও দেশের মধ্যে নরনারীর মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া যেভাবে প্রকাশিত হয় তাহা দীর্ঘকাল একই ভাবে থাকিতে পারে না। কখনও তাহা হয় নাই, হইবার আশাও অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

ভারতবর্ষের অতীত সুসভ্য যুগের যে প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছে, তাহা হইতেই সুস্পষ্ট দেখা যায়, বাল্মীকি বেদ ব্যাসের অতুলনীয় যুগ অতীত হইলে—দীর্ঘকাল তেমন প্রতিভার প্রকাশ এ দেশে দেখা যায় নাই। বিক্রমাদিত্যের যুগে, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি নবরত্নের প্রতিভার দীপ্তি ভারতবর্ষকে উচ্চ গৌরব ও সম্মানের গরিমায় আলোকিত করিয়াছিল। তারপর ঘনান্ধকারে মাঝে মাঝে সামান্য প্রতিভাস্ফুরণের দীপ্তি দেখা গেলেও বহুকাল বিচিত্র প্রতিভা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নাই।

ভারতবর্ষের কথা এখন থাক্। এখন প্রতীচ্য দেশের কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক্। ফরাসী দেশের কথাসাহিত্য য়ুরোপ ও আমেরিকার কাছে অতুলনীয় বলিয়া বন্দিত। ভিক্টর হুগো, মোপাঁসা, ব্যালজাক্, ডোডে প্রভৃতি বৃহৎ উপন্যাস অথবা ছোট গল্প রচনা করিয়া কথাসাহিত্যকে অপূর্ব্বসম্পদে শ্রী-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেশের আবেষ্টন, প্রাকৃতিক প্রভাব, নরনারীর রুচি, সামাজিক অবস্থা, চিরন্তন ভাব-ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, মানবমনের বিচিত্র ও জটিল তত্ত্বগুলি অতি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া যথাযথ ভাবে দেখাইয়া তাঁহারা রসগ্রাহী মানবকে বিস্ময়রসে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন। দেখা যায়, তাঁহাদের রচনায়, তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রে কোথাও সামান্য অসামঞ্জস্য বা কৃত্রিমতা নাই। দেশের সর্ব্ববিধ বাহ্য ও অন্তর-প্রকৃতির সহিত নিগূঢ় পরিচয় এবং ভূয়োদর্শনের প্রভাবেই তাঁহারা কথাসাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ স্থানে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোনও দেশের ধারকরা জ্ঞান বা অপ্রকৃত অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা চরিত্রসৃষ্টি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পান নাই বলিয়াই সমগ্র সভ্য দেশের সভ্য ও শিক্ষিত রসপিপাসু ব্যক্তি তাঁহাদের অনবদ্য রচনার প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়েন। ফরাসী দেশের নৈতিক জীবনের দীনতা অথবা দুর্ব্বলতা দেখিয়া রসরসিক মোপাঁসা জাতীয় চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া এমন অনেক রসপূর্ণ ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন, যাহা অশ্লীলতার পর্য্যায়ে পড়িয়া থাকে; কিন্তু প্রতিভাশালী লেখক সে-সকল রচনা স্ত্রীজাতির—জায়া, সহোদরা, মাতা, কন্যার পঠনীয় নহে মনে করিয়াই যে সকল গ্রন্থে সেই গল্পগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "After-dinner Serios"। ডোডে যখন "Sapho" নামক উপন্যাস রচনা করেন, তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "Dedicated to my son when he is twenty"। অর্থাৎ বিংশ বৎসর বয়স্ক যুবক-পুত্রের করে ইহা উৎসৃষ্ট হইল। ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থ প্রথম-যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় পাঠ করিলে পিচ্ছিল সংসারপথে তাহার পদস্খলন হইবে না।

আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে সুস্পষ্ট অনুমিত হয় যে, সত্য শিব সুন্দরকে স্মরণ করিয়াই এই সকল মনীষী ফরাসী সাহিত্যিক কথা-সাহিত্য রচনায় মন দিয়াছিলেন। জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে, সংযত জীবনযাত্রার

অভ্যস্ত হইয়া দেশ ও জাতির কল্যাণকল্পে যাহাতে নরনারী অগ্রসর হইতে পারে, এইরূপ কল্পনা বা উদ্দেশ্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদিগের অন্তরে জাগ্রত ছিল। শুধু উদ্দেশ্যহীন সৌন্দর্য্যের স্তুতির ছলে প্রথম-রিপুর উপাসনায় তাঁহারা রচনাকে কলঙ্কিত করিতে প্রয়াস পান নাই।

ইংলণ্ডের দিকে ফিরিয়া দেখিলেও আমরা এই একই প্রমাণ পাই। স্কট, ডিকেন্স, জর্জ্জ ইলিয়ট প্রভৃতি প্রতিভাশালী কথাসাহিত্যিকগণ মহনীয়, উদার, সুন্দর মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বৃটিশ জাতি যে সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী এবং উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টিকে ইংলণ্ডের প্রতি কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই বৃটিশ জাতির উন্নত যুগের পরিচয় কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়াও ধরিতে পারা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম-পাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কাউণ্ট টলষ্টয় ডিকেন্সের চিত্রকে তাঁহার পাঠাগারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। চার্লস ডিকেন্সের অনবদ্য রচনাশক্তির প্রতি ঋষি টলষ্টয়ের এমনই প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

রুসিয়ার চিন্তারাজ্যে কাউণ্ট টলষ্টয়ের অসামান্য প্রভাবের কথা সর্ব্বজনবিদিত। কথাসাহিত্যে টলষ্টয়ের স্থান কোথায় তাহা রসরসিকগণ নির্ব্বিচারেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সত্য শিব সুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক ঋষি টলষ্টয় কথাসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং রচনার প্রভাব রুসিয়াকে নানাদিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বিপ্লবের পূর্ব্বেও যেমন তিনি রুসিয়ার মনোরাজ্যে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, বিপ্লবের গ্লানি দূরীভূত হইবার পর নবজাগ্রত রুসিয়া আবার যখন আত্মস্থ হইবে, তখন তাহার মনোরাজ্যে এই অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী লেখকের রচনার প্রভাব আবার নূতন করিয়া প্রভাববিস্তার করিতে থাকিবে।

ধীরচিত্তে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রতীচ্য জগতের সভ্যতার গতি-প্রকৃতির সহিত কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। সভ্যতার প্রভাবে কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিংবা কথাসাহিত্যের প্রভাবের ফলেই সভ্যতার গতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা নিপুণ ভাবে গবেষণার বিষয়। তবে এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, প্রতীচ্য জগতের সভ্যতার সূর্য্য মধ্যাহ্নগগন হইতে পশ্চিম-গগনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি বলিতেছেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার দানের শেষ-পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ পশ্চিম-য়ুরোপের দিবার বস্তু আর কিছুই নাই। এ কথা যদি সত্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে য়ুরোপের বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যের আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, ইহার গতি আছে সত্য, কিন্তু তাহা চক্রনেমির নিম্নদিকেই ধাবিত হইতেছে।

সত্য শিব সুন্দরকে বর্ত্তমান যুগের কলাবিদ্‌গণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ভাবে মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আধুনিক যুগের প্রতিভাশালী লেখকরূপে পরিচিত প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সভ্য মানবের পশুপ্রকৃতির দিকেই সমধিক মন দিয়া বাহা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন, তাহাতে মধ্যাহ্নগগনের প্রদীপ্ত ভাস্করের দীপ্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, অস্তগামী সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ রশ্মিরই ম্লান দীপ্তির দেখা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের যুগে, অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের এমন উৎকট আসুরিক উদাহরণ দেখিলে সুস্থ সবল মন শঙ্কিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকা ও য়ুরোপে তাহাই দেখা দিয়াছে। যৌন সমস্যার রূপ ধরিয়া কথাসাহিত্যে যাহার আমদানী হইতেছে, প্রতীচ্য বহু পণ্ডিত তাহা সভ্যতার পরিপন্থী, সমাজস্থিতির প্রতিকূল, মানবতার বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন না। আধুনিক অনেক মার্কিন সাময়িক পত্র পাঠ করিলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। টলষ্টয়-রচিত রুসিয়ার কথাসাহিত্যের তপোবনে শেকভ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকগণ যে অসম্ভব, অশোভন এবং সত্য শিব সুন্দরের বিরোধী কথাসাহিত্যের কণ্টকারণ্য রচনা করিতেছেন, তাহা শুধু অস্পৃশ্য নহে, অমেধ্য।

মানবমনকে প্রলুব্ধ করিতে পাপ বা শয়তান ও তাহার দলবল যেরূপ মনোরম মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হয়, যেরূপ মনোহারী যুক্তির জাল বয়ন করিয়া দুর্ব্বল মানবচিত্তকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, তাহার ইতিহাস মানবসভ্যতার জীবনযাত্রার বিচিত্র রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক সাহিত্যেও স্বাধীন চিন্তা এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার রূপ ধরিয়া এমনই প্রকার মতবাদ য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সাহিত্যের মধুর, পবিত্র ও অনবদ্য রসধারা বিকৃত হইয়া পড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকার মতবাদ যাঁহারা প্রচার করিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্য-জ্ঞানের অভাব নাই। মহাকবি মিল্‌টনের বর্ণিত শয়তানের সভায় মোলক্, বেয়ালজিবব, কোমস্ প্রভৃতি আখ্যাধারী পণ্ডিত ও বিদ্রোহী দেবদূত-গণের ন্যায় শক্তিধর পণ্ডিতগণও য়ুরোপের বর্ত্তমান সাহিত্যে দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা বস্তুতান্ত্রিক ইন্দ্রিয়সেবাকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে এমন মনে করা যায় না।

একটা উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছি। অবশ্য সে কথাটা রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারের সম্বন্ধেই আংশিকভাবে প্রযোজ্য। জার্-শাসিত রুসিয়ার রাষ্ট্রনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যাপারে লেনিন, ষ্টালিন প্রভৃতি "পঞ্চ পাণ্ডবের" মতবাদ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রুসিয়ার অভিনব রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভের সময় Communism বা সর্ব্বস্বত্ব-বাদ এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সমগ্র সভ্যজাতি বিস্ময়চকিত নেত্রে ইহার গতিবেগ লক্ষ্য করিতেছিলেন। কম্যুনিজম মতবাদ অনুসারে রুসিয়ার শাসন-রীতি চলিতে চলিতে যখন উহা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িবার উপক্রম হয়, তখন অতি গোপনে লেনিন কম্যুনিজম নীতি অচল বলিয়া উহার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে কম্যুনিজম নীতি বাহিরে প্রচলিত থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা ক্রিয়াহীন হইতে থাকে। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, আধুনিক রুসিয়ার ভাগ্য-নিয়ামক ষ্টালিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন* প্রত্যেক শ্রমিক সমান সুযোগ ও সুবিধার অধিকারী হইয়া থাকিলে, সমানভাবে অর্থোপার্জ্জন করিলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কম্যুনিজম নীতির যাহা প্রাণবস্তু ষ্টালিন এখন তাহা পরিহার করিতেছেন।

এই দৃষ্টান্ত উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই যে, যৌন সমস্যার অবতারণা করিয়া যাঁহারা সমাজধর্ম্ম ও জীবন-যাত্রার পবিত্র ধারাকে কলুষিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের এই মতবাদ অচিরে লেনিন ষ্টালিনের অদ্ভুত মত-বাদের মত অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেই। পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম যুগে এ সকল সমস্যা নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। এই দেশের বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিতে যাঁহাদের সম্যক অধিকার আছে, এমন দুই-চারি জন পণ্ডিতের সহিত আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ ভারতবর্ষে নূতন নহে। চার্ব্বাক প্রভৃতি ঋষির স্বাধীন মতবাদ আলোচনা করিলে তাহা প্রমাণিত হয়। ভোগের নানা-প্রকার উপায় ভারতবর্ষে যে অনাবিষ্কৃত ছিল তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। বাৎস্যায়নের কামসূত্র যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইন্দ্রিয়সেবার কি বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব পদ্ধতি তাহাতে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে যে চরম সত্যটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা অধ্যাত্ম তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের ত্রিকালদর্শী, অদ্ভুত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী ঋষিগণ অনেকপ্রকার অভিজ্ঞতার পর মানব-জীবনের পক্ষে যাহা প্রেয় ও শ্রেয়, সেই পন্থার আবিষ্কার করেন এবং সভ্যতার পথে মানুষ অগ্রসর হইয়া চরম লক্ষ্যে যাহাতে পৌঁছিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। ইহ-লোক-সর্ব্বস্ব প্রতীচ্য দেশ এখনও সে সত্যের সন্ধান পায় নাই। তাই এখন দিকে দিকে ঘুরিয়া গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিতেছে। সুতরাং তাহাদের প্রদর্শিত পন্থা যে শ্রেয় এবং প্রেয় ইহা কখনই স্বীকার্য্য নহে।

কিন্তু আমাদের দেশের একশ্রেণীর বিকৃত-রুচি লেখক য়ুরোপের বাহ্য-শোভার মোহে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দোষ তাঁহাদের নহে। এ দেশে যে ধর্ম্মবিশ্বাসহীন শিক্ষাবিধি প্রচলিত আছে, তাহার প্রভাবে ক্রমেই এ দেশের ছাত্রগণ

পূর্ব্ব দিকচক্রবালের শোভা ও মাধুর্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পশ্চিম-গগনপ্রান্ত-শায়ী অস্তোন্মুখ রক্তিম রবির দিকে মুখ ফিরাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। স্বদেশের কীর্ত্তি, মহিমা, অবদান সম্বন্ধে তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে কোনও আলোচনা করিবার অবসর না পাইয়া যাহা তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, এবং বিচারবিবেচনা-শূন্য মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পশ্চিমের নিছক অনুকরণ করিয়া এক অবাস্তব জীবন গড়িয়া তুলিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের এই মোহ যে আত্মহত্যার পথে জাতিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। বুঝিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের মধ্যে বুঝি নাই।

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ অনবদ্য মধুর মূর্ত্তিতে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়াছিল, কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে সেই কথা-সাহিত্যের বিচিত্র রূপলীলার সেই অনবদ্য শোভা অব্যাহত অটুট হইয়া রহিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কথা-সাহিত্যিকগণও সেই সম্মান ও সৌন্দর্য্য—সেই চিরন্তন সত্য শিব সুন্দরের পূজা যথাশক্তি চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কম্যুনিজমের উৎপাত য়ুরোপ-ক্ষেত্রে তূর্য্যধ্বনি সহকারে ঘোষিত হইবার পর, য়ুরোপের যৌন-সমস্যামূলক তত্ত্ব-প্রচারকগণ বস্তুতান্ত্রিকতার আবরণে এই রীরংসামূলক মত-বাদের ঢক্কানিনাদ তুলিবামাত্র বাঙ্গালার একশ্রেণীর অপরিণতবয়স্ক লেখক নৃত্য করিয়া উঠিলেন। সেই তাণ্ডব-নৃত্যে বাঙ্গালার বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্যতপোবনের পবিত্রতা ও শান্তি আজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অগ্রগতি নহে—চক্রনেমির নিম্নাবর্ত্তনের গতি বলিলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হইবে না।

বাঙ্গালার কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে যে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, তাহা ইদানীং ধীরবুদ্ধি পণ্ডিতগণ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিমের অনুকরণে দেশের ভাবধারা আবেষ্টন, রুচি, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজপদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া যাহা রচিত হইতেছে, তাহা বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রার সঙ্গে সাদৃশ্যবর্জ্জিত ও অবাস্তব, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যাহা অশিব, যাহা মিথ্যা এবং অসুন্দর, বাহ্য-সৌন্দর্য্যের আবরণ সত্ত্বেও তাহা কখনই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সুতরাং সাহিত্যে তাহা আবর্জ্জনার মতই সঞ্চিত হইয়া থাকিবে এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন, সমালোচনার—নিরপেক্ষ সমালোচনার দাবানলে তাহা একদিন ভস্মীভূত হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রের সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিই আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালীকেও আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সকল বিষয়েই বাঙ্গালীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় অবহিত না হইলে তাহার জাগরণ নিষ্ফল হইবে। সাহিত্য সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের মুকুর। সাহিত্য জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই অমোঘ সত্যকে শিরোধার্য্য করিয়া বাঙ্গালীকে ঘরের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষগণ বাঙ্গালার প্রাণধারাকে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের অনুযায়ী গড়িয়া তুলিয়া যে আদর্শ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতিকে তাহা কায়-মনোবাক্যে অনুসরণ করিতে হইবে, না হইলে জাতি হিসাবে তাহার বাঁচিবার, সুস্থ-সবল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অধিকার বিলুপ্ত হইবে। কথাসাহিত্যকে কণ্টক-আবর্জ্জনা ও অমেধ্য স্তূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নবীন-প্রবীণ সকলকেই একান্তমনে সাধনা করিতেই হইবে। নহিলে কোনক্ষেত্রেই মুক্তিলাভ ঘটিবে না।

সেকালের কথা

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

অনেক দিন পরে আবার সেকালের কথা 'বঙ্গলক্ষ্মী'কে শোনাতে এসেছি। সেকাল অর্থ কিন্তু পুরাকাল নয়—আমাদের বাল্যকাল। সেও পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগেকার কথা, সুতরাং, সে সময়ের কথাকে 'সেকালের কথা' নামে অভিহিত করলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

সেকালে অর্থাৎ আমাদের বাল্যকালে স্কুলে কি-ভাবে পড়াশুনা করতাম, সে বিবরণ পূর্ব্বে দুই-একবার বলেছি; তার আর পুনরাবৃত্তি করব না। এক দিনের অভিজ্ঞতার কথাই নিবেদন করব। সে অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও স্পষ্ট আছে, এখনও সে কথা মনে করতে গেলে পিঠে হাত দিয়ে দেখি, বেতের আঘাত-চিহ্ন মিলিয়ে গেছে কিনা।

তখন আমি বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। বাঙ্গালা স্কুল কথাটার অর্থ হ'চ্ছে, যে স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়।

আমাদের সময় দুই শ্রেণীর বাঙ্গালা স্কুল ছিল; একটার নাম ছাত্রবৃত্তি স্কুল, যার এখন নামকরণ হয়েছে মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয় (Middle Vernacular School), আর একটার নাম ছিল মাইনর স্কুল, এখন যাকে বলে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় (Middle English School)। এই দুই-শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পাঠ্য একই ছিল, মাইনর স্কুলে ফাউ স্বরূপ ইংরাজী সাহিত্য নামমাত্র পড়ানো হোতো। মাইনর পরীক্ষায় পাশ ক'রে ইংরাজী সাহিত্যের যে জ্ঞান লাভ হোতো, তা সম্বল ক'রে ইংরাজী স্কুলে গেলে সে স্কুলের কর্ত্তারা নিতান্ত দয়া ক'রে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করতেন; কিন্তু মাইনর-পাশ ছেলের যা ইংরাজী জ্ঞান লাভ হোতো, তাতে তাকে ইংরাজী স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করলেই ঠিক হোতো। আমি ভুক্তভোগী কিনা, অর্থাৎ আমিও এক সময় মাইনর পাশ ক'রে ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ ক'রে যে রকম বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলাম, তা আমার বেশ মনে আছে।

কিন্তু, সে কথা এখন থাকুক; আমার বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকা নিতান্ত ছোট ছিল না। তার একটু পরিচয় দিই। চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, লোহারামের ব্যাকরণ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস, শশীবাবুর ভূগোল-বিবরণ, ক্ষেত্রতত্ত্ব (যার নাম এখন হয়েছে জ্যামিতি), প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধি-

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

কারীর পাটীগণিত, অর্থব্যবহার, জমিদারী মহাজনী ও বাজার-হিসাব; স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও কি একখানি পুস্তক ছিল তার নাম এখন মনে পড়ছে না; আর একখানি বই পড়তাম, তার নাম বস্তুবিচার। ফর্দ্দটা নিতান্তই ছোট নয়, বিশেষ দশ-এগার বৎসরের ছেলের পক্ষে।

সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, এমন কি ঐ বস্তুবিচার পর্য্যন্তও পড়তে পারতাম, যত গোল লাগত ক্ষেত্রতত্ত্ব, পাটীগণিত, আর জমিদারী মহাজনী নিয়ে। এই গণিত শাস্ত্রটাকে আমি তখন বাঘের মত ভয় করতাম। সেই

ক্ষেত্রতত্ত্বের 'যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই তাহাকে রেখা বলে' এই যে সংজ্ঞা, ইহার অর্থ যে কি হ'তে পারে, এ বস্তুটা যে কি, তা কিছুতেই আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ লাভ কর্‌তে পার্‌ত না। পরে ইংরাজী স্কুলে গিয়ে দেখেছিলাম এই সংজ্ঞাটি 'A lino is length without breadth' এই মহাকাব্যের অনুবাদ। এখনও কিন্তু এই 'অবস্থিতি' কথাটার মর্ম্ম সম্যক অনুধাবন কর্‌তে পারিনে। তার পর, 'স্বীকার্য্য' আছেন, 'স্বতঃসিদ্ধ' আছেন। এঁরা যখন এই একাদশ বর্ষ বয়সের শিশুর সম্মুখে সারি দিয়ে দাঁড়াতেন, তখন মনে হ'ত, এ পাপ ক্ষেত্রতত্ত্বের অস্তিত্ব লোপ কবে হবে। প্রাণপণে এগুলো গলাধঃকরণ কর্‌বার পর এলেন 'সম্পাদ্য' ও 'উপপাদ্য'। এই মহাপুরুষদ্বয়কে তখন পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অভিনন্দিত করা আমার মত 'সুকুমারমতি' বালকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিল। এবং তার জন্য লাঞ্ছনা, নির্য্যাতনও কম ভোগ কর্‌তে হয় নাই।

এই ত গেল ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা। এখন পাটীগণিতের কথা বলি। পাটীগণিতের সেই 'গঃ সাঃ গুঃ' আর 'লঃ সাঃ গুঃ' এই দুইটা অদ্ভুত নাম মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত আমার মনে থাক্‌বে। এ দুইটি হ'চ্চে সংক্ষিপ্ত নামকরণ অর্থাৎ ডাকনাম; আসল নাম হ'চ্চে 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক' ও 'লঘিষ্ট সাধারণ গুণতক'। একেবারে 'প্রত্নকর্ম্ম-নন্দিনী'!

সে আলোচনা আপাততঃ বন্ধ থাক্। যার জন্য লাঞ্ছনা ও বিপুল বেত্রাঘাত সহ্য কর্‌তে হয়েছিল, সেই কথাটাই ব'লে ফেলি।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পাটীগণিতে একটা ভারি চমৎকার অঙ্ক ছিল। সে অঙ্কটির বিশেষত্ব এই যে, নীরস গণিতের মধ্যে তিনি সরস পদ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অঙ্কটি এই—

আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন।
ক্রোধে জলে ফেলে দিল পবননন্দন॥
অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ শেহালার দলে॥
উপরে বাহান্ন গজ দেখ বিদ্যমান।
করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ॥

অতি সুন্দর, অতীব মনোরম এই কবিতাটি। পাটীগণিত-রূপ বিশাল, বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে এটি ওয়েসিস্—একেবারে নন্দনকানন! এতে ষড়রসের সমাবেশ! আমাদের কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, যতীন বাগ্‌চী, নরেন্দ্র দেব, রাধাচরণ দূরে থাকুন, স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এমন ষড়রসাত্মক কবিতা লেখেন নাই, লিখ্‌তেও পারেন না। এর মধ্যে না আছে কি? দেউল আছে, ক্রোধ আছে, স্বয়ং পবন-নন্দন হনুমান আছেন, পঙ্ক আছে, সলিল আছে, একেবারে বাহান্ন গজ আছে, এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ 'সুবোধ শিশু' আছে। সমগ্র কবিতার মধ্যে যা কিছু ত্রুটি, তা ঐ শেষের লাইনটা। ওতে 'সুবোধ শিশু'র উপর 'দেউল প্রমাণে'র ভার না দিয়ে কবিতালেখক যদি 'প্রমাণ'টা সমাধান ক'রে দিতেন, তা হ'লে 'সুবোধ শিশু'রাও নিস্তার পেতো, আর আমার মত ঘোর নির্ব্বোধ শিশুও বেত্রাঘাতের নির্ম্মম যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ কর্‌তে পার্‌ত।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই—একদিন আমাদের অঙ্কের শিক্ষক দ্বিতীয়-পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে এসে চাখড়ি দিয়ে উপরিলিখিত কবিতাগ্রস্ত অঙ্কটি কালো বোর্ডে লিখে দিয়ে 'দেউল প্রমাণ' কর্‌বার আদেশ আমাদের উপর প্রচার কর্‌লেন।

আমরা কবিতাটি প'ড়ে অনেক কথার অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লাম না। তখন একজন 'সুবোধ শিশু' জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "পণ্ডিত মশাই, 'দেউল' অর্থ কি?"

পণ্ডিত মশাই ধীরভাবে বল্‌লেন, "দেউল শব্দের অর্থ জান না! দেউল অর্থ স্তম্ভ, বুঝ্‌লে?

আমি অঙ্কশাস্ত্রে একেবারে নির্ব্বোধ। আমার কি দুর্ম্মতি হোলো; আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "পবননন্দন হনুমান ত লঙ্কা পুড়িয়েছিলেন। তিনি এই পাটীগণিতের মধ্যে এলেন কি ক'রে? আর যদি বা এলেন, তাঁর ক্রোধের কারণটা কি? আর তাঁর যখন ক্রোধই হোলো, তখন তাঁর প্রকাণ্ড লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে স্তম্ভটাকে ভেঙ্গে ফেল্‌লেই পার্‌তেন, জলে ফেলে দিতে গেলেন কেন?"

আর যাবে কোথায়! পণ্ডিত মহাশয় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে বল্‌লেন, "জ্যাঠা ছেলে কোথাকার! এটা কেন, ওটা কেন? যাঃ, আমি জানিনে, জিজ্ঞাসা কর্

তোর হেড্ পণ্ডিত মশাইকে। তিনিই তোর মাথাটা খেয়েছেন। গাধা কোথাকার!"

গণিত পড়্‌বার সময় এ রকম সম্ভাষণ লাভ আমার পক্ষে নূতন নয়, প্রতিদিনেরই পাওনা। ও আমার গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

পণ্ডিত মশাই তখন অন্যান্য ছেলেদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমরা আর কোন শব্দের অর্থ জান্‌তে চাও কি? পঙ্ক অর্থ পাঁক, তা তোমরা জান। পঙ্ক থেকে জন্ম জন্য পদ্মের আর এক নাম পঙ্কজ। সলিল অর্থ যে জল, তা তোমরা নিশ্চয়ই জান, কেমন?"

অন্য একটি সুবোধ শিশু বল্‌ল, "ও সব জানি পণ্ডিত মশাই, কিন্তু তেহাই বস্তুটা কি তা ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না?"

পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন, "তা বুঝবে কি ক'রে। অভিধান দেখা ত তোমাদের কোষ্ঠীতে লেখে না। আমি যখন সংস্কৃত শিক্ষা কর্‌তে আরম্ভ করি, তখন একাদিক্রমে তিন-বছর সুধু অমরকোষই কণ্ঠস্থ করেছিলাম। যাক্ গে। তেহাই অর্থ তৃতীয়াংশ, ইংরাজীওয়ালারা যাকে বলে ওয়ান থার্ড। এখন বুঝ্‌লে?"

আর একটি ছেলে বোর্ডের দিকে চেয়ে বল্‌ল, "পণ্ডিত মশাই, ঐ 'শেহালা' আবার কি?"

পণ্ডিত মশাই বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "যত সব গণ্ডমূর্খ! একটা কথারও যদি অর্থ জানে। আরে গাধারা, শেহালা হ'চ্চে শেওলার শুদ্ধ নাম। পুকুরে শেওলা দেখ নি?"

আমরা সকলেই হাঁ, হাঁ ক'রে উঠ্‌লাম। তখন পণ্ডিত মশাই মুকুন্দ নামক আমাদের ক্লাসের একটি সুবোধ ছেলেকে বল্‌লেন, "মুকুন্দলাল, এইবার তুমি বোর্ডের উপর অঙ্কপাত কর।"

মুকুন্দলাল বোর্ডের কাছে গিয়ে অঙ্কপাত কর্‌লে—

$$\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৩}$$

পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন, "হাঁ, ঠিক হয়েছে। এইবার ঐ ভগ্নাংশগুলি যোগ দেও।"

মুকুন্দলাল অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিল। সে সমস্তটা যোগ দিয়ে দেখালো যে ১ যোগফল হোলো।

তখন পণ্ডিত মশাই আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "এইবার প্রশ্নটার সমাধানের জন্য যা কর্‌তে হবে, তা তুমি কর। যাও বোর্ডের কাছে।"

আরে মশাই, বোর্ডের কাছে গিয়ে কি কর্‌ব। এর পরে যে কি কর্‌তে হবে, তা আমার এগার বছরের মস্তিষ্কে মোটেই প্রবেশ কর্‌ল না। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

পণ্ডিত মশাই রাগে অধীর হ'য়ে বল্‌লেন, "অমন গাধার মত ব'সে রইলি যে? উঠে আয়।"

তখন কি আর করি, পবননন্দনের উপরই আমার রাগটা বেশী হোলো। আরে বাপু, এতখানি ডুবিয়ে দিলি, এ বাহান্ন গজ আর ডুবাতে পার্‌লি নে? এখন তার জন্য বেত খাই আমি!"

যাক্, পণ্ডিত মশাইয়ের চেয়ারের কাছে সন্ধিপূজার পাঁঠার মত গিয়ে দাঁড়ালাম।

তখন তিনি বেত্র আস্ফালন ক'রে বল্‌লেন, "কিছু বুঝ্‌তে পেরেছিস্?"

আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লাম, "না।"

তখন আর কি! আমার পৃষ্ঠে সপাসপ বেত্রাঘাত, আর তার সঙ্গে বচন—"পবননন্দন হনুকে ডাক্, তার ক্রোধ হোলো কেন, জিজ্ঞাসা কর্।" এই রকম এক একটা কথা বলেন আর আঘাতের পর আঘাত করেন!

এখানেই দণ্ড শেষ হোলো না; বেত্রাঘাত শেষ ক'রে বল্‌লেন, "যা গাধা, চারটে পর্য্যন্ত বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌বি।"

তথাস্তু!

এই পর্ব্বের এখানেই শেষ, কি বলেন?

গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ভাগ্যচক্র *

শ্রী সীতা দেবী বি-এ

বহুকাল আগে, ব্যাসিলিও নামক একজন ডাক্তার ইটালীর পাইসা নগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের ভিতরই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পাইসার বনিয়াদী বংশের লোকেরাও ক্রমে তাঁহাকে জামাতা রূপে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা একথা নানাভাবে ব্যাসিলিওর কানেও তুলিয়া দিতে লাগিলেন।

ব্যাসিলিও বিবাহ করিতে ইচ্ছুকই ছিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই একটি তরুণীকে পত্নীরূপে নির্ব্বাচন করিলেন। এই মহিলাটির পিতামাতা কেহই বাঁচিয়া ছিলেন না, অর্থসম্পদও তাঁহার বিশেষ ছিল না, তবে তিনি উচ্চবংশজাতা ছিলেন বটে। যৌতুক স্বরূপ, একখানি পুরাতন বসতবাড়ী ভিন্ন তিনি আর কিছুই আনিতে পারেন নাই, তবে বিবাহের পরই ব্যাসিলিওর অপ্রত্যাশিত রকম ধনসমাগম হইতে লাগিল। তাঁহারা বহু পুত্রকন্যার জনকজননী হইয়া, সুখেস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিন পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছিল। কন্যাটির এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রটির তাঁহারা যথাকালে যোগ্য পাত্র-পাত্রী দেখিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রটি বিদ্যাচর্চ্চায় অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, কিন্তু দ্বিতীয় পুত্রটি একেবারে অপদার্থ হইবে বলিয়া পিতামাতা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই আছে বলিয়া বোধ হইত না, সে অত্যন্ত জেদী ও মূর্খ ছিল। লেখা-পড়ার প্রতি তাহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, মেজাজটা ছিল খিট্‌খিটে ; একবার কোনো বিষয়ে "না" বলিলে, কোনমতেই আর তাহাকে "হাঁ" বলান যাইত না। ব্যাসিলিও বহু চেষ্টা করিয়াও যখন এই পুত্রটিকে কিছু শিক্ষা করাইতে পারিলেন না, তখন হতাশ হইয়া তাহাকে নিজের একটি সদ্যক্রীত জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

যুবক ল্যাজারো সেইখানেই থাকিয়া গেল। বৎসর-দশ পরে, পাইসাতে হঠাৎ এক ভীষণ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল। দলে দলে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ডাক্তার ব্যাসিলিও ভয়কে তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে নগরবাসীদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নিজের সম্বন্ধে কোনই সাবধানতা অবলম্বন করিলেন না। ফলে তিনিও অল্পদিনের মধ্যেই এই ভয়াবহ ব্যাধির করাল কবলে পতিত হইলেন। ইহাতেই তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের শেষ হইল না, তিনি নিজের পরিবারবর্গকেও সংক্রামিত করিয়া গিয়াছিলেন। একে একে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রকাণ্ড প্রাসাদে কেবলমাত্র একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা বাঁচিয়া রহিল।

পাইসার লোকেরা দলে দলে নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তবে ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির প্রকোপ কমিয়া আসিল, এবং অনেকে আবার ফিরিয়া আসিল।

ল্যাজারো এখন পিতার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইল। সে পাইসাতে আসিয়া পৈত্রিক বাটিতে বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের জাঁকজমক আর এ বাড়ীতে দেখা গেল না। ল্যাজারো একটিমাত্র চাকর নিযুক্ত করিল, সে এবং সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা মিলিয়া বাড়ীর সকল কাজ চালাইতে লাগিল। দেশের জমিদারী, ক্ষেত-খামার প্রভৃতির ভার সে একজন গোমোস্তার উপর দিয়া আসিল, এই ব্যক্তি খাজনা প্রভৃতি আদায় করিয়া, পাইসাতে প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিতে লাগিল।

যদিও ল্যাজারোর মূর্খ এবং গোঁয়ার বলিয়া অখ্যাতি ছিল, তবু এত টাকার মালিক হওয়ায় লোকে সে কথা ভুলিয়াই গেল। নানাজনে ল্যাজারোকে কন্যা সম্প্রদান

---

* ইতালীয় গল্প হইতে।

করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সকলকে একই উত্তর দিল। সম্প্রতি চার বৎসর সে বিবাহ করিবে না বলিয়া সংকল্প করিয়াছে, পরে অবশ্য তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। সে একবার "না" বলিলে, তাহাকে "হাঁ" বলান মানুষের অসাধ্য, সুতরাং আর কেহ তাহাকে কিছু বলিল না। ল্যাজারোর আমোদপ্রমোদে অরুচি ছিল না, কিন্তু লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে সে একেবারেই ভালবাসিত না। নিমন্ত্রণের পত্র দেখিলে সে একেবারে চমকাইয়া উঠিত।

ল্যাজারোর বাড়ীর সম্মুখেই এক জেলের কুটীর ছিল। তাহার নাম গ্যাব্রিয়েলো, সে এই কুটীরে স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা লইয়া বাস করিত। মাছ এবং পাখী শীকার করিয়া, সে কোনোমতে ইহাদের ভরণপোষণ করিত। সে খুব চতুর শীকারী ছিল, এবং তাহার জাল, খাঁচা প্রভৃতি খুব মজবুত ছিল, সুতরাং স্ত্রী সান্তার সাহায্যে তাহাদের সংসার একরকম ভাল ভাবেই চলিত। সান্তা সেলাই করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে গ্যাব্রিয়েলোর চেহারা, চুল, গলার স্বর, সকলই অবিকল ল্যাজারোর মত ছিল। তাহাদের গায়ের রং, দাড়ী-গোঁফ পর্য্যন্ত এক ধরণের। তাহাদের যমজ ভাই হইয়াই জন্মানো উচিত ছিল, কারণ শুধু চেহারায় নয়, তাহাদের বয়স এবং মতিগতি সবই একপ্রকারের ছিল। ল্যাজারো যদি গ্যাব্রিয়েলোর পোষাক পরিয়া যাইত, তাহা হইলে ধীবরের স্ত্রীও তাহাকে অন্য মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিত কিনা সন্দেহ। একজন ধনী ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করিয়া থাকিত, আর একজন দরিদ্র ধীবরের, এই ছিল প্রভেদ।

ল্যাজারো এই সাদৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিল। গ্যাব্রিয়েলোকে তাহার বড় ভাল লাগিল, এবং নানা উপায়ে সে ঐ জেলের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায়ই ধীবরের বাড়ীতে সে নানাপ্রকার সুখাদ্য এবং দামী পানীয় পাঠাইতে লাগিল। ইহাতে গ্যাব্রিয়েলো এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে ল্যাজারো আরো খুসি হইয়া, তাহাকে বাড়ীতে খাইতে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের আড্ডা খুব জমিয়া উঠিতে লাগিল, কারণ গ্যাব্রিয়েলোর শীকারের গল্প, এবং বানানো গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। ল্যাজারোর এই সকল গল্প অত্যন্ত ভাল লাগিত। গ্যাব্রিয়েলো খুব চতুর ব্যক্তি ছিল, সে নানা উপায়ে কিছুদিনের ভিতর ল্যাজারোকে এমন বশীভূত করিয়া ফেলিল যে সে ধীবর বন্ধুকে ছাড়িয়া আর একদণ্ডও থাকিতে পারিত না।

একদিন ল্যাজারো বাড়ীতে মস্ত ভোজ দিল। খাওয়া চুকিয়া যাইবার পর গ্যাব্রিয়েলোকে লইয়া সে গল্প করিতে বসিল। মাছ ধরিবার উপায় কত রকম আছে, সেই কথা ওঠাতে গ্যাব্রিয়েলো বহুপ্রকার মাছ ধরার কৌশলের বর্ণনা আরম্ভ করিল। একটা কৌশল ল্যাজারোর অত্যন্ত পছন্দ হইল। ইহাতে ধীবর নিজের গলায় মাছ ধরিবার জাল ঝুলাইয়া জলে নামিয়া পড়ে, এবং হাত ও মুখের সাহায্যে খুব বড় বড় মাছ ধরিতে সক্ষম হয়। এইভাবে মাছ ধরিবার জন্য ল্যাজারো একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার আর একমুহূর্ত্তও বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না।

ল্যাজারো তাহার ধীবর বন্ধুকে ক্রমাগত তাগিদ দিতে লাগিল, "চল, চল, আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি।" গ্যাব্রিয়েলোও রাজী, ধনী বন্ধুকে খুসি রাখাই এখন তাহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ, মাছ ধরার পক্ষে আদর্শ সময়, সুতরাং আর দেরি না করিয়া মাছ ধরিবার সাজসরঞ্জাম লইয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িল। সহর হইতে কিছু দূরে বড় একটি নদী, তাহার দুই তীরে সুদৃশ্য তরুশ্রেণী পথিককে ছায়াদান করে। গ্যাব্রিয়েলো ল্যাজারোকে গাছের ছায়ায় বসাইয়া, গলায় জাল বাঁধিয়া জলে নামিয়া পড়িল। প্রথমে দেখিয়া শিখিয়া, তাহার পর সে নিজে জলে নামিবে এই ছিল ল্যাজারোর ইচ্ছা।

গ্যাব্রিয়েলো খুব দক্ষ শীকারী, অল্পক্ষণ পরেই সে জল হইতে উঠিয়া পড়িল, তাহার জালে তখন আট নয়টা বড় বড় মাছ। ল্যাজারোর কাছে ইহা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মানুষে যে কি করিয়া জলের নীচে দেখিতে পায়, বা মাছ ধরিতে পারে, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। নিজে নামিয়া দেখিবে স্থির করিয়া সে গ্যাব্রিয়েলোর সাহায্যে বেশভূষা ত্যাগ করিয়া, হাতে, গলায়

জাল জড়াইয়া, নদীর একটা অগভীর অংশে নামিয়া পড়িল। গ্যাব্রিয়েলো তাহাকে বেশীদূর অগ্রসর না হইতে পরামর্শ দিয়া, নিজের কাজে মন দিল।

একলা জলের মধ্যে ছাড়া পাইয়া, ল্যাজারো মহানন্দে জলে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গ্যাব্রিয়েলো কিছুদূরে গভীর জলে মাছ ধরিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে বড় বড় মাছ মুখে করিয়া উঠিয়া বন্ধুকে আরো বেশী মৎকৃত করিয়া দিতেছিল।

ল্যাজারো চীৎকার করিয়া বলিল, "জলের নীচে নিশ্চয় আলো আছে, নইলে এত বড় বড় মাছ ও ধরছে কি করে'? দাঁড়াও আমি একবার ডুব দিয়ে দেখ্‌ছি।"

গ্যাব্রিয়েলোর মত মাথা নীচু করিয়া সে এক ডুব মারিল। জলে নামা তাহার কোনো দিনও অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ পা ফস্‌কাইয়া জলের তলায় চলিয়া গেল, এবং স্রোতের টানে অগভীর জল হইতে গভীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। জলের তলায় দেখা যায় কি না তাহা দেখিতেই সে প্রথমে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু নিশ্বাস আট্‌কাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে ভয় পাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যতই অস্থির হইতে লাগিল, ততই তাহার নাকমুখ দিয়া জল ঢুকিয়া ঢুকিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। দুই তিন বার ভাসিয়া উঠিয়া সে অবশেষে চিরদিনের মত সলিল-সমাধি লাভ করিল।

গ্যাব্রিয়েলো এতক্ষণ মাছ ধরায় এত ব্যস্ত ছিল যে হতভাগ্য বন্ধুর কি দশা হইল তাহা বুঝিতেও পারে নাই। খুব বড় একটা মাছ ধরিয়া সে মহানন্দে বন্ধুকে দেখাইবার জন্য ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু বন্ধু কোথাও নাই দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িল। তীরে উঠিয়া গিয়া থাকিবে আশা করিয়া সে জল ছাড়িয়া উঠিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু ল্যাজারোর পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। শেষে পাগলের মত হইয়া সে আবার জলে নামিয়া পড়িল, এবং কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বন্ধুর মৃতদেহ আবিষ্কার করিল। উহা জলস্রোতে ভাসিয়া অপর তীরে নীত হইয়াছিল।

গ্যাব্রিয়েলো বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন ভয়ানক অবস্থায় কি যে করা উচিত, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার কেবলই আশঙ্কা হইতে লাগিল যদি এ খবর সহরে গিয়া প্রচার করে, তাহা হইলে সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিবে, ভাবিবে বন্ধুর অর্থ অপহরণ করিবার জন্য সে-ই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। সে অনেকক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মৃতদেহের নিকট জড়বুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

অবশেষে তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। "বাঁচ্‌লাম বাবা," বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। "এ ব্যাপার ঘট্‌তে আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, এই এক রক্ষা। কি কর্‌তে হবে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এদিকে লোকজন সন্ধ্যার পর আসে না, সেও এক বাঁচোয়া।"

মাছ ধরিবার সাজসরঞ্জাম সে ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া ফেলিল, তাহার পর ল্যাজারোর মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়া, নদীর ধারের নলখাগ্‌ড়ার বনে রাখিয়া আসিল। তাহার পর একটা জাল লইয়া এমনভাবে মৃতদেহের হাতে ও গলায় জড়াইয়া দিল, যেন দেখিলেই লোকে মনে করে যে এইরূপ আকস্মিক ঘটনায়ই সে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

তাহার পর ল্যাজারোর পরিত্যক্ত কাপড়চোপড়, জুতা পর্য্যন্ত পরিধান করিয়া, সে তীরে বসিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার সহিত মৃত ল্যাজারোর চেহারার যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল, উহারই গুণে সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে এবং তাহার পরবর্ত্তী জীবন অতি সুখের হইবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। ইহার জন্য যে খানিকটা সাহস এবং চাতুরীর প্রয়োজন হইবে, ইহা সে মানিয়াই লইল, এবং প্রাণপণে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, "কে আছ, শীগ্‌গির এস, বেচারা জেলে ডুবে মর্‌ছে। হায়, হায়, ডুবে গেল!"

তাহার চীৎকারে ধীবর, মাঝি প্রভৃতি অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে গ্যাব্রিয়েলোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি হইয়াছে। সে তখনও ল্যাজারোর মত কথার ভঙ্গী নকল করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,

"বেচারা গ্যাব্রিয়েলো আমার সঙ্গে মাছ ধর্‌তে এসেছিল, অনেকবার বড় বড় মাছ ধরে' আমায় দেখিয়েছে, কিন্তু শেষবার ঘণ্টাখানিক হ'ল যে ডুব দিয়েছে, আর ওঠেনি।"

কোন্‌খানে সে ডুব দিয়াছে তাহা সকলে গ্যাব্রিয়েলোকে দেখাইয়া দিতে বলিল। তাহার পর জলে নামিয়া খানিক খোঁজাখুঁজি করিতেই মৃতদেহ জালবদ্ধ অবস্থায় বাহির হইয়া পড়িল। সকলেরই বিশ্বাস হইল, এইভাবে জালে হাত-পা জড়াইয়া যাওয়ার জন্যই হতভাগ্য ধীবরের মৃত্যু হইয়াছে।

সকলে গ্যাব্রিয়েলোর জন্য হায় হায় করিতে লাগিল। এমন দক্ষ ধীবর কিনা শেষে জালে আট্‌কাইয়া মারা গেল! ইহাকেই বলে দুর্দ্দৈব। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া মৃতদেহ জল হইতে টানিয়া তুলিল। গ্যাব্রিয়েলোর গুণগান করিয়া তাহার আত্মীয়বন্ধু সকলে যখন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তখন গ্যাব্রিয়েলোর প্রায় হাস্যসম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে শোকের ভাণ করিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

ধীবরের মৃত্যুর কথা দেখিতে দেখিতে সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। একজন ধর্ম্মযাজক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিকটতম গির্জ্জায় দেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে গ্যাব্রিয়েলোর বন্ধু আত্মীয় সকলে ভীড় করিয়া আসিল। সাস্তাও সন্তানসন্ততি লইয়া অসহ্য দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যখন কপালে করাঘাত করিয়া, চুল ছিঁড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন উপস্থিত কেহ আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। আসল গ্যাব্রিয়েলো যে, তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়িল।

টুপীটা ভ্রূর উপর বেশ করিয়া টানিয়া নামাইয়া দিয়া, সে ভগ্নকণ্ঠে সান্তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "ওগো ভালমানুষের মেয়ে, অত কান্নাকাটি করে' আর হবে কি? একটু শান্ত হও। আমি তোমার এবং তোমার ছেলেপিলে সকলের ভার নিচ্ছি। বেচারী গ্যাব্রিয়েলো আমাকে একটু আমোদ দিতে গিয়ে যে প্রাণ হারাল, তা আমি কখনও ভুল্‌ব না। তুমি বাড়ী যাও, আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমার কোন অভাব হবে না। আমি যদি তোমার আগে মারাও যাই, তাহ'লে উইল্‌ করে' তোমাদের সকলের জন্যে টাকাকড়ি রেখে যাব।"

তাহার কথা শুনিয়া চারিপাশের লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সান্তা ও তাহার আত্মীয়স্বজনে মিলিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। গ্যাব্রিয়েলো এখন সোজা গিয়া ল্যাজারোর বাড়ীঘর সব দখল করিয়া বসিল। ল্যাজারোকে বহুকাল এত নিকট হইতে সে দেখিয়াছিল, যে তাহার ধরণধারণ নকল করিতে, তাহাকে বিশেষ কিছু বেগ পাইতে হইল না। ল্যাজারোর চাবির তাড়া সর্ব্বদা তাহার পকেটেই থাকিত, গ্যাব্রিয়েলো কোটের পকেটে হাত দিয়াই সেটা খুঁজিয়া পাইল। চাবি লইয়া সে যত বাক্স, সিন্দুক, আলমারী খুলিয়া খুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। টাকাকড়ি, মোহর, গহনা, মণিমুক্তাতে বাড়ীটি পরিপূর্ণ। গ্যাব্রিয়েলোর দুই চোখ লোভে একেবারে জ্বলিতে লাগিল। সে-ই এখন এই সবের অধিকারী!

আনন্দে তাহার নাচিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু কোন-মতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া সে কি উপায়ে মানুষের চোখে আরো ভাল করিয়া ধূলা দিতে পারে, তাহার ফন্দি আঁটিতে বসিল। ল্যাজারোর অদ্ভুত স্বভাবচরিত্র তাহার উত্তমরূপে জানা ছিল, সুতরাং রাত্রে খাওয়ার জন্য ডাক পড়িতেই সে চীৎকার করিয়া শোকপ্রকাশ করিতে করিতে খাইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। বৃদ্ধা ঝি এবং চাকর তাহাকে সান্ত্বনা দিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলো তাহাদের কোনো কথা না শুনিয়া, টেব্‌ল হইতে ভাল ভাল সব খাবার তুলিয়া, তৎক্ষণাৎ সান্তার কুটীরে লইয়া যাইতে আদেশ করিল।

চাকর খাবার পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া, বলিল যে সান্তা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইয়াছে। গ্যাব্রিয়েলো তখন খাইতে বসিল, এবং অল্প কিছু খাইয়া, শয়নকক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িল। পরদিন বেলা ন'টা পর্য্যন্ত সে বাহিরই হইল না, ঘরের ভিতর বসিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল এবং ল্যাজারোর অকালমৃত্যুর জন্য মধ্যে মধ্যে শোকও করিতে লাগিল। দুইটি মানুষ যতই এক-প্রকার হউক, সামান্য কিছু প্রভেদ তাহাদের মধ্যে থাকিবেই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ল্যাজারোর কোনো

আত্মীয়স্বজন ছিল না এবং ঝি-চাকররা গ্যাব্রিয়েলোর গলার স্বর এবং কথাবার্ত্তার ধরণে সামান্য যে প্রভেদ প্রকাশ পাইল, সেটা আকস্মিক দুঃখের ফল বলিয়া ধরিয়া লইল। গ্যাব্রিয়েলোর স্ত্রী যখন দেখিল যে তাহার স্বামীর বন্ধু দুই বেলাই খাদ্য-পানীয় প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়া দিতেছে, তখন সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের বিদায় করিয়া দিল এবং আগের মত ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের কুটীরে বাস করিতে লাগিল।

গ্যাব্রিয়েলো, ল্যাজারো যে সময় বিছানা ছাড়িয়া উঠিত, সেই সময় উঠিতে আরম্ভ করিল। যদিও এখন তাহার উপর অনেক বাড়ীঘর, জমিদারী প্রভৃতির ভার আসিয়া পড়িল, তবু সে সান্তার যাহাতে কোনো অভাব না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল। ল্যাজোরোর সকল চাল-চলন সে নিখুঁৎ ভাবে নকল করিতে লাগিল। যদিও এতকাল কর্ম্মিষ্ঠ ধীবরের জীবনযাপন করিয়াছে, তবু এখন ল্যাজারোর ধনসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার আলস্যও যেন গ্যাব্রিয়েলোকে আশ্রয় করিল। কিন্তু লোকের মুখে সে সান্তার অসহ্য শোকের কাহিনী যতই শুনিতে লাগিল, ততই তাহার মন খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রী তাহাকে এত ভালবাসে জানিয়া একদিকে যেমন সুখী হইল, তেমনি নিজে সুখভোগ করিবার লোভে বেচারীকে এত যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে মনে করিয়া তাহার অনুতাপ হইতে লাগিল। কি উপায়ে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার নিজের পত্নীরূপে পাওয়া যায়, গ্যাব্রিয়েলো একমনে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে একদিন সান্তার কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। সান্তা তখন নিজের এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বসিয়া কথা বলিতেছিল।

গ্যাব্রিয়েলো গিয়া বলিল সান্তার সহিত তাহার প্রয়োজনীয় কথা আছে। মামাতো ভাইটি তাহা শুনিবামাত্র বাহির হইয়া চলিয়া গেল, কারণ ধনী বন্ধু দুঃখিনী বিধবার জন্য যে যথেষ্ট করিতেছেন, সে বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ ছিল না। সে বাহির হইয়া যাইবামাত্র, গ্যাব্রিয়েলো উঠিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সান্তা ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ইনি কি সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া কোনো অযথা প্রতিদান দাবী করিতে আসিয়াছেন? গ্যাব্রিয়েলো যখন তাহার শিশু পুত্রটির হাত ধরিয়া সান্তার দিকে অগ্রসর হইল, তখন সে ভয়ে পিছাইয়া গেল। স্ত্রীর এক নষ্ঠ প্রেমের এমন পরিচয় পাইয়া, গ্যাব্রিয়েলো আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তাহার পর সান্তার হাত ধরিয়া সে আগের মত স্বরে এবং ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিল। সান্তা তখনও তাহার দিকে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকাইতেছে দেখিয়া, গ্যাব্রিয়েলো নিজের পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "খোকা, আমাদের কপাল ফিরে গিয়েছে, সেটা দেখ্‌ছি তোমার মায়ের পছন্দ হ'চ্ছে না।" সে পকেট হইতে একমুঠা টাকা বাহির করিয়া ছেলের হাতে গুঁজিয়া দিল।

তাহার স্ত্রী নানাপ্রকার ভাবের আতিশয্যে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, গ্যাব্রিয়েলো আর সত্য গোপন রাখিতে পারিল না। সে সদর দরজা বন্ধ করিয়া স্ত্রীকে একেবারে ভিতরের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল এবং মৃদুস্বরে তাহাকে সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার পত্নী আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। গ্যাব্রিয়েলো তাহাকে মিষ্ট কথায়, আদর করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। পত্নীর জন্য এতখানি ভালবাসা যে তাহার মনে ছিল তাহা সে কোনদিন অনুভব করে নাই।

কিন্তু ভাগ্যগুণে যে ঐশ্বর্য্য তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহা নিজেদের হাতে রাখিতে হইলে যে বহু চাতুর্য্য এবং বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা গ্যাব্রিয়েলো স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিল। কি ভাবে তাহাদের চলিতে হইবে, তাহা সান্তাকে বুঝাইয়া দিয়া, এবং সমস্ত ব্যাপার গোপন রাখিতে বারবার উপদেশ দিয়া, গ্যাব্রিয়েলো নিজের নূতন গৃহে প্রস্থান করিল। সান্তাও লোকদেখান দুঃখ সমানে করিতে লাগিল। গ্যাব্রিয়েলোর সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। সারারাত জাগিয়া সে কেবলি চিন্তা করিতে লাগিল, কি উপায়ে সান্তার সহিত আবার মিলিত হইতে পারে। অবশেষে একটা উপায় স্থির করিয়া, ভোরবেলা সে বিছানা ছাড়িয়া

উঠিয়া পড়িল। পাইসা নগর'তে সাণ্টা ক্যাটেরিনার গির্জ্জা নামক একটি বিখ্যাত গির্জ্জা ছিল। ইহার আচার্য্য ছিলেন ফ্রা আন্‌সেল্‌মো। সকলেই তাঁহাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। গ্যাব্রিয়েলো তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তাহার একটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আচার্য্যের সহিত কথা বলিবার আছে। ফ্রা আন্‌সেল্‌মো তাহাকে একটা নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গেলেন। গ্যাব্রিয়েলো নিজের পরিচয় ল্যাজারো বলিয়াই দিল, এবং কিরূপ দৈবদুর্ঘটনায় সে পরিবারের একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাও বর্ণনা করিল।

তাহার পর আসিল তাহার ধীবর বন্ধুর জলমগ্ন হওয়ার কাহিনী। বেচারা ধীবর যে কেবল তাহাকে আমোদ দিবার জন্যই নদীতীরে গিয়াছিল, এবং ভাগ্যচক্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, ইহা সে অনেকবার করিয়া বলিল। গ্যাব্রিয়েলোর পত্নী এবং সন্তানদের দুরবস্থার জন্য সে প্রচুর পরিমাণে দুঃখ প্রকাশ করিল, এবং ধর্ম্মতঃ সেই যে তাহাদের অবস্থার জন্য দায়ী তাহাও বলিল। তাহার সাধ্যমত সান্তার উপকার এবং সাহায্য তাহার করা উচিত।

কিন্তু টাকা দিলেই ত সকল দুঃখের অবসান হয় না? সান্তা যে এমন প্রেমময় স্বামী হারাইয়াছে তাহার কি প্রতিকার আছে? এক যদি নূতন কোনো পথে তাহার নারীহৃদয়ের প্রবল ভালবাসাকে চালিত করা যায়, তাহা হইলে হয়।

"আমি নিজে তাকে বিয়ে করতেই রাজী আছি।" গ্যাব্রিয়েলো বলিয়াই ফেলিল। "আমি যদি তাকে এবং তার ছেলে-মেয়েদের যথাসাধ্য যত্নে পালন করি, তাহ'লে ভগবান আমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমিই বেচারা গ্যাব্রিয়েলোকে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিলাম!"

আচার্য্য কোনোমতে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, তাহার প্রস্তাব অতি উত্তম, এবং ভগবান নিঃসন্দেহে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। গ্যাব্রিয়েলো শুনিয়া অত্যন্ত খুসি হইল, এবং পকেট হইতে একমুঠা টাকা বাহির করিয়া মৃত বন্ধুর আত্মার কল্যাণার্থে দান করিল। আচার্য্য ইহাতে অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিলেন পরলোকগত আত্মার জন্য সেই দিনই গির্জ্জায় প্রার্থনা করা হইবে। সান্তাকে যে সে ধনী ব্যক্তি ও উচ্চবংশজাত হইয়াও বিবাহ করিতে চায়, ইহার জন্যও ফ্রা আন্‌সেল্‌মো অনেক প্রশংসা করিলেন। কখন বিবাহ করা গ্যাব্রিয়েলোর অভিপ্রেত জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল সেইদিনই সে বিবাহ করিতে চায়।

আচার্য্য বলিলেন, "যেমন তোমার অভিরুচি। আচ্ছা, বিয়ের সাজসরঞ্জাম কিনে ঠিক হ'য়ে থেকো।"

গ্যাব্রিয়েলো বাড়ী গিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিয়া গেল, সান্তাকেও খবর পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর সাণ্টা ক্যাটেরিনার গির্জ্জায় খুব ধুমধাম করিয়া গ্যাব্রিয়েলো নিজের পত্নীকে আর একবার বিবাহ করিল।

ইহার পর ল্যাজারো নামধারী গ্যাব্রিয়েলোর চাল ঢের বাড়িয়া গেল। পুরাতন ঝি-চাকর দুটিকে পেন্সন দিয়া বিদায় করিয়া দিল, এবং নূতন একদল চাকর রাখিয়া মহা জাঁকজমকে বাস করিতে লাগিল। মূর্খ ল্যাজারোর সকল দিক দিয়া এত উন্নতি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল।

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হইবার পরে সান্তার যে সকল পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা ল্যাজারোর বংশপদবী গ্রহণ করিল। ইহাদের বহু সন্তানসন্ততি হওয়ায় বংশটি আবার ইতালীতে বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

যাত্রা-পথে

শ্রী হেমলতা দেবী

আনন্দের ঐ বার্ত্তা এল,
উঠ্‌ল পথে রোল,
যাত্রী তোরা—অমানুষে
মানুষ করে' তোল্‌।

অচল যারা অধম যারা
সবার আগে চলুক্‌ তারা,
সবার আগে মিলুক্‌ তাদের
অভয়-ভরা কোল!

যাত্রা-পথে রবে না কেউ
অমনি পড়ে',
আনন্দে আজ উঠ্‌বে সবাই
আপ্‌নি গড়ে';
সবার বুকে বাজ্‌বে সুখে
মুক্তির হিল্লোল।

সুন্দর তোর অন্তরে আজ
পড়্‌বে ধরা,
বাঁধিস্‌নে কেউ স্বার্থ-পাশে
বসুন্ধরা;
সবার বাঁধন খুলে দিয়ে
আপন বাঁধন খোল্‌।
যাত্রা-পথে অমানুষে
মানুষ করে' তোল্‌॥

ব্রত-কথার আল্‌পনায় নানা বস্তুর ঠাট্‌ ও তাহার ছড়া

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

যশোহর-খুলনার পল্লী-অঞ্চলে এমন কতকগুলি ব্রত-কথার প্রচলন আছে, যাহার 'ছড়া'র মূল অংশের ভাবার্থ লইয়া আল্‌পনা অঙ্কন করাও ব্রত-পালনের একাঙ্গ। ঐ-প্রকার ব্রতের মধ্যে 'বেল্‌-পুকুরের' ব্রত, * 'তারার ব্রত', 'মাঘ-মণ্ডলের ব্রত' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল ব্রতের আল্‌পনার ঠাট্‌ ‡ বা ভঙ্গীগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া সমস্ত ঠাট্‌গুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—

(ক) পাখী।

(খ) জীব-জন্তু।

(গ) মানুষ।

(ঘ) গাছ, লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদি।

(ঙ) উদ্ভট্‌ জন্তু।

(চ) গ্রহ-নক্ষত্র।

(ছ) নিত্যব্যবহৃত বস্তু।

(জ) ঘটনা বা দৃশ্য।

ইহাদের প্রত্যেকটি ঠাটের বিশদ আলোচনা করা অসম্ভব; তথাপি যতদূর সম্ভব আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

(ক) পাখী

আল্‌পনায় পাখীর ব্যবহার একটু বেশী বলিয়া মনে হয়। প্রায় সাত-আট প্রকারের ঠাট্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি বিশিষ্ট পাখীর ঠাট্‌ আছে যাহা পূজা বা ব্রতের উপলক্ষে দেওয়া হইয়া থাকে, বা ঐ উপলক্ষেই তাহাদের সৃষ্টি। যেমন—'লক্ষ্মী-পেচক'। লক্ষ্মীর বাহন হিসাবে লক্ষ্মীপূজার আল্‌পনায় লক্ষ্মী-পেচকের আগমন অনিবার্য্য। পেচকের গোলাকৃতি মুখ-মণ্ডলের মধ্যে গোল গোল দুইটি চোখ, নিম্নে তিনটি দাঁত, মাথার উপরে বড় বড় দুইটি কান, লক্ষ্মীর বাহনের ভীষণ রূপের আভাস দেয়! লম্বা অবয়বের উপর একখানি পাখা কয়েকটি সরল রেখার সমাবেশে ও দেহের ভিতরের অংশ কয়েকটি 'কুচ্‌কি' দেওয়া বক্র রেখার

চামর (ব্রতকথা)

সমাবেশে সৃষ্ট। সমস্তটি মিলিয়া পেচকের ঠাট্‌টি এমনি মজার হইয়াছে যে আসল পেচক দেখিলে যেমন মনে ভয় হয় তেমনি এই আল্‌পনার পেচকটিও আমাদের ভয় দেখায়!

'বেল্‌-পুকুরের' ব্রতে দুইটি জোড়া-পাখীর ঠাট্‌ পাওয়া যায়। উহাদের ছবি ও বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পাখী দুইটির ছড়াটিও বেশ মজার—

> 'হৈচি' রে 'কয়কচি' রে এবার বড় ধান,
> ধান খাবি না, পান খাবি, খাবি ক্ষীরের নাড়ু?
> —দুই হাত ভরিয়ে দেব সুবর্ণের খাড়ু।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকারের পাখীর ঠাট্‌ আছে। কাকের ঠাট্‌টি সব চাইতে সুন্দর। অন্যান্য পাখার ঠাট্‌

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে 'বেল্‌-পুকুরের' ব্রতের ছড়া ও ছবি কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

‡ 'ঠাট্‌' কথাটি পল্লী-মেয়েরা আল্‌পনায় ব্যবহার করেন বলিয়া আমিও ব্যবহার করিলাম। আমার মতে 'ঠাট্‌' কথাটিতে যেরূপ স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পায় এরূপ আর কোনও শব্দে তাহা সম্ভব নহে।

সাধারণতঃ আল্‌পনায় যেভাবে দেখান হইয়া থাকে কাকের ঠাট্‌টি সেইরূপ ভাবে না অঙ্কিত না করিয়া সম্পূর্ণ অন্য 'খাঁজে' দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই জন্য কাকের ঠাট্‌টির অঙ্কনকৌশল উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হয়। উহা তিন ভাগে বিভক্ত,—মস্তকের কক্ষে গোলাকার চক্ষু, ভিতরের অংশে একখানি পক্ষ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে সংলগ্ন, এবং শেষ ভাগে, অর্থাৎ যাহা পুচ্ছ, তাহাতে একটি রেখার বেষ্টনী দেওয়া আছে। সর্ব্বোপরি, কেবল মাত্র ঠোঁট ও পদদ্বয় ভিন্ন আর সমস্ত অবয়বের শেষ রেখাটি (out-line) কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র 'কুড়ী'দ্বারা বেষ্টিত। তাহাতে যদিও সমগ্র ঠাট্‌টি একটু অলঙ্কারবহুল (crowded) হইয়াছে, তথাপি উহার সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

কাঁটা গাছ

কিন্তু কেবলমাত্র আর একটি পাখীর ঠাটে ভিন্ন আর কোনও পাখীর ঠাটে ঐ প্রকার 'কুড়ী'র প্রয়োগ দেখা যায় না (গত শ্রাবণ মাসের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য)। এই উভয় পাখীর ঠাটের শেষ রেখার (out-line) উপরে অঙ্কিত 'কুড়ী'র মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে—কাকের ঠাটে লম্বা ও 'ভুম্‌খোর' পাখীর ঠাটে গোল। একটি ময়না পাখীর ঠাট আছে। তাহার মন্ত্র বা ছড়া এই—

ময়না, ময়না!
সতীন যেন হয় না।

আল্‌পনায় পাখীর পায়ের গঠন 'একটানা' করিয়া অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ পায়ের মধ্যস্থলে সাধারণতঃ যেমন একটি 'কব্জী' থাকায় পদদ্বয় ঈষৎ বক্র থাকে, ও চলাচলের সুবিধা হয়, তাহা একেবারেই বর্জ্জন করা হইয়াছে। কিন্তু একটি পাখীর আল্‌পনা পাওয়া যায়, যাহার পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে কব্জী আছে ও তাহা বক্র থাকায় পাখীটিকে উড়ন্ত বা চলমান বলিয়া মনে হয় (গত শ্রাবণ মাসের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য)। পাখীর ঠাট্‌গুলি সাধারণতঃ রেখাঙ্কনের কৌশলেই সৃষ্ট; অন্ততঃ 'জমাট' প্রয়োগের ঠাট্‌ কেবল মাত্র 'হেঁচি-কর্‌কচি' নামক জোড়া-পাখীর আল্‌পনায় ভিন্ন আর কোনও ঠাটেই দেখা যায় না। তবে আরও অনুসন্ধান করিলে হয় তো মিলিতে পারে।

(খ) জীব-জন্তু

জীব-জন্তুর মধ্যে হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, কুম্ভীর, কচ্ছপ, প্রভৃতির ঠাট্‌ই প্রধান। এতদ্ভিন্ন চেলা, মাছ, সাপ প্রভৃতির ঠাট্‌ও দেখিতে পাওয়া যায়। হাতীর ঠাট্‌টিও অতি সুন্দর। পিঠের উপর হাওদা,—নানা নক্সা কাটিয়া সুন্দর করা হয়। শুঁড়টি ভিতরের দিকে বাঁকাইয়া গুটান। ঘোড়ার ঠাট্‌টি ভাল ভাবে মোটেই পাওয়া যায় নাই কিন্তু গরুর ঠাট্‌টি স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়। তবে চর্চ্চার অভাবে এই সমস্ত জন্তুর ঠাট্‌গুলি ক্রমশঃই খারাপ (disfigured) হইয়া যাইতেছে।

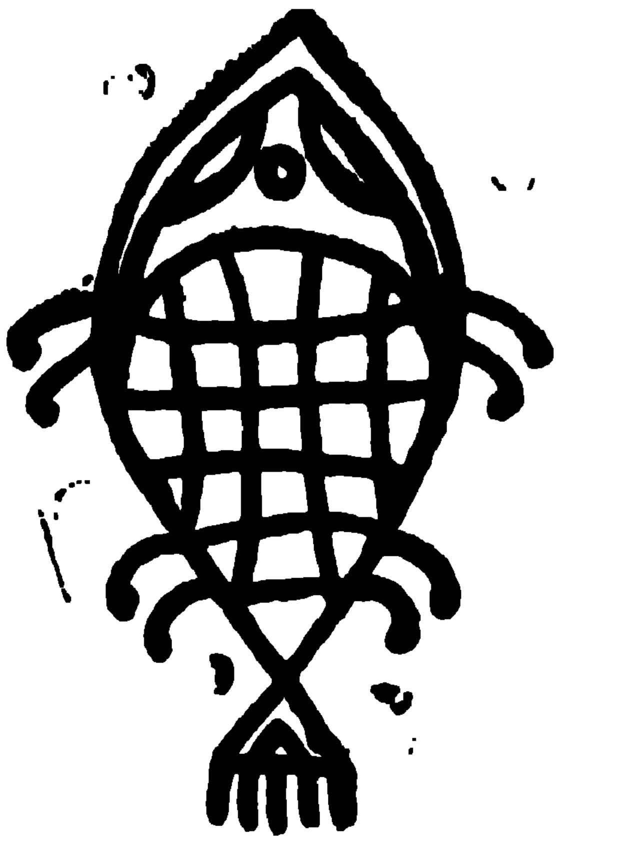

চিত্রা মাছ

কুম্ভীরের ঠাট্‌টি লম্বা, সম্মুখে বড় চেরা মুখ, পিছনে বক্র ও বিকৃত লেজ। কচ্ছপটি গোলাকার, চারিখানি পা, তাহা হইতে চারিটি নখ বক্রভাবে বাহির হইয়াছে। কোন কিছুই বাদ যায় নাই!

মনসা-পূজার আল্‌পনায় আটটি সর্পের আল্‌পনা একসঙ্গে দেওয়া নিয়ম এবং উহারা 'অষ্ট-নাগ' নামে পূজিত হয়।

দুইটি মাছের ঠাট্ পাওয়া যায়; একটিকে অনেকটা চিত্রা মাছের মত মনে হয়। সাধারণতঃ ঐ মাছটির ঠাট্ পুচ্ছ নিম্নে ও 'মুড়া' উচ্চে রাখিয়া অঙ্কিত হয়। কিন্তু অন্য মাছটির ঠাট্ আড়াআড়ি ভাবেই অঙ্কিত হয়। আঁইসগুলিও উপর হইতে নিম্নে আড়াআড়ি ভাবে কয়েকটি রেখা টানিয়া দেখান হয়; কিন্তু অন্যটির আঁইস কয়েকটি ছোট বক্র রেখা পরস্পর স্থাপন করিয়া দেখান হয়। যদিও শেষোক্ত প্রণালীতে স্বাভাবিকতার বেশী দেখা পাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই নূতনত্ব বেশী।

(গ) মানুষ

আল্‌পনায় পুরুষ, মেয়ে ও শিশু, এই তিন প্রকারের ঠাট্ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ মানুষের মস্তক সোজা, কিন্তু মেয়ে মানুষের মস্তক বক্র ও নিম্ন, এবং ঘোমটা-টানা। শিশুদের ঠাট্ অনুপাতে ছোট। বেল্‌পুকুরের ব্রতে একটি ব্রাহ্মণের ঠাট্ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম—পেটুক ব্রাহ্মণ। একটি মানুষের আল্‌পনা দিয়া তাহার নিম্নে খানিকটা গোলার পোঁচ্ দিয়া দেওয়া হয়। এবং এইরূপ কল্পনা করা হয় যে, ঐ পেটুক ব্রাহ্মণের পেটের অবস্থা বড়ই গুরুতর…। আল্‌পনায় এই একটি মাত্র রসিকতার ছবি আছে। ব্রতকথার সমস্ত আল্‌পনা দেওয়ার পর যে খারাপ গোলা বাটিতে পড়িয়া থাকে তাহা দ্বারাই ঐ পেটুক ব্রাহ্মণের ছবি আঁকা হয়। উহার মন্ত্রটি এই—

'পেটুক বামুন, পেটুক বামুন, তোরে পূজ্‌লি কি হয়?
—শাঁখা হয়, সুখো হয়, সাত পুতির মা হয়।

বেল্‌পুকুরের ব্রতে একটি সন্তানকোলে জননীর ঠাট্ পাওয়া যায়। উহার মন্ত্রটি এই—

হাতে পো, * কাঁখে পো, তোরে পূজ্‌লি কি হয়?
- শাঁখা হয়, সুখো হয়, সাত পুতির মা হয়।

(ঘ) গাছ, লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদি

আল্‌পনায় পাঁচ ছয়টি গাছের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। বেল্‌পুকুরের ব্রতে—সুপারি (গুয়া), কুল, বট ও তাল গাছের, এবং মনসা পূজায়—'সেঁজী' গাছের ঠাটের প্রচলন আছে। একটি কাঁটা গাছের ঠাট্‌ও দেখা যায়। প্রত্যেকটি গাছের ঠাট্‌ই প্রাকৃতিক গাছের ভাব লইয়া অঙ্কিত। তাল গাছের পাতাগুলি গোল ও চেরা চেরা, গাছের আগায় বড় বড় তাল ফলিয়া আছে। কুল গাছটির আল্‌পনায় কাঁটা পর্য্যন্ত দেখান হয়। উহার ছড়াটি এই—

কুল গাছটি ঝাকড়া-মাকড়া,
সতীন বেটী বুড়োপাগ্‌লা!

উপরের পদটিতে কুলগাছের ঝাঁকড়া প্রকৃতি ও নিম্নের পদটিতে সতীনের বয়সের উপর টিট্‌কারি একই সঙ্গে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বট গাছের ঠাট্‌টিতে ঝুরি নামিয়াছে, পাতাগুলি ঘন ও লম্বা। কাঁটা গাছের ছবিটি প্রকাশিত হইল।

কাক

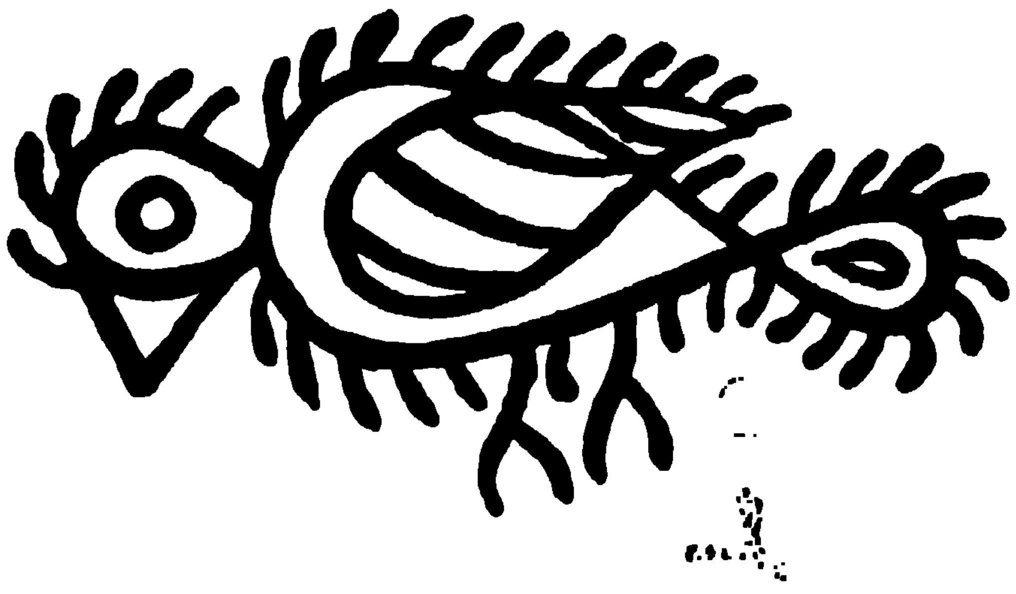

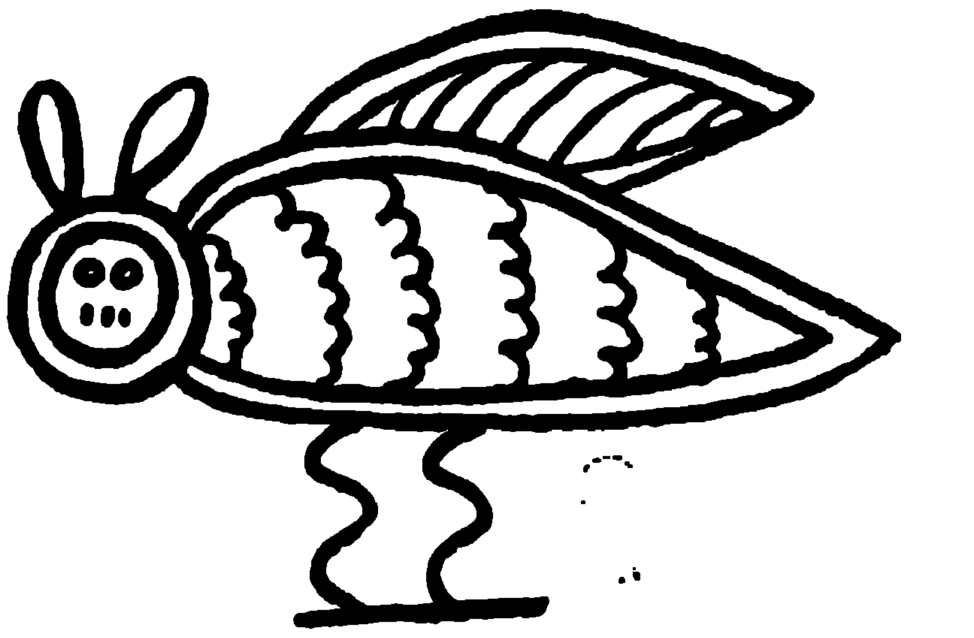

লক্ষ্মীপেচক (লক্ষ্মীপূজার আল্‌পনা)

বৃত্তাকার আল্‌পনার 'লতা'ই তাহার প্রাণ। সুন্দর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ লতার সমাবেশেই উহার সৃষ্টি। বারান্তরে কেবলমাত্র বৃত্তাকার আল্‌পনা ও তাহার লতা প্রভৃতির আলোচনা করিবার আশায় এই স্থলে উহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

আল্‌পনায় 'পাণের পাতা' দুই প্রকারে অঙ্কিত হয়। পাণের-বাটার উপরে যে পাণ অঙ্কিত হয় তাহা 'জমাট' পদ্ধতিতে, ও অন্য যে আরও একটি ঠাট্ দেখা যায় তাহা রেখাঙ্কনের কৌশলে সৃষ্ট। পাণের পাতার মন্ত্রটি এই—

পাকা পাণ, মূর্ত্তিমান,
স্বামী যেন আমার হ'ন।

* পো—পোলা—পুত্র।

(ঙ) উদ্ভট্ জীব-জন্তু

বেল্-পুকুরের ব্রতে একটি খুব মজার আল্পনা আছে। একটি চৌকা ঘরের মধ্যে একটি পুরুষ ও একটি মেয়ের আল্পনা দিয়া, ঘরের বাহিরে একটি উদ্ভট্ জন্তু অঁাকা হয়। ঐ উদ্ভট্ জন্তুটির নাম 'উঠ্-বিড়ালী'। এইরূপ কল্পনা করা হয় যে ঘরের মধ্যে স্বামী ও সতীন একত্রে বসিয়া আছে। কিন্তু স্বামীর সোহাগ সতীন পাইবে ইহা একটা কথার কথা নয়! তাই বাহির হইতে অনাদৃতা সতীনের এই উদ্ভট্ হিংস্র জন্তুর কল্পনা করিতে হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে—

'উঠ্-বিড়ালী' ঘরে-য়া,
ভাতার (ভর্ত্তা) এড়ে সতীন খা!

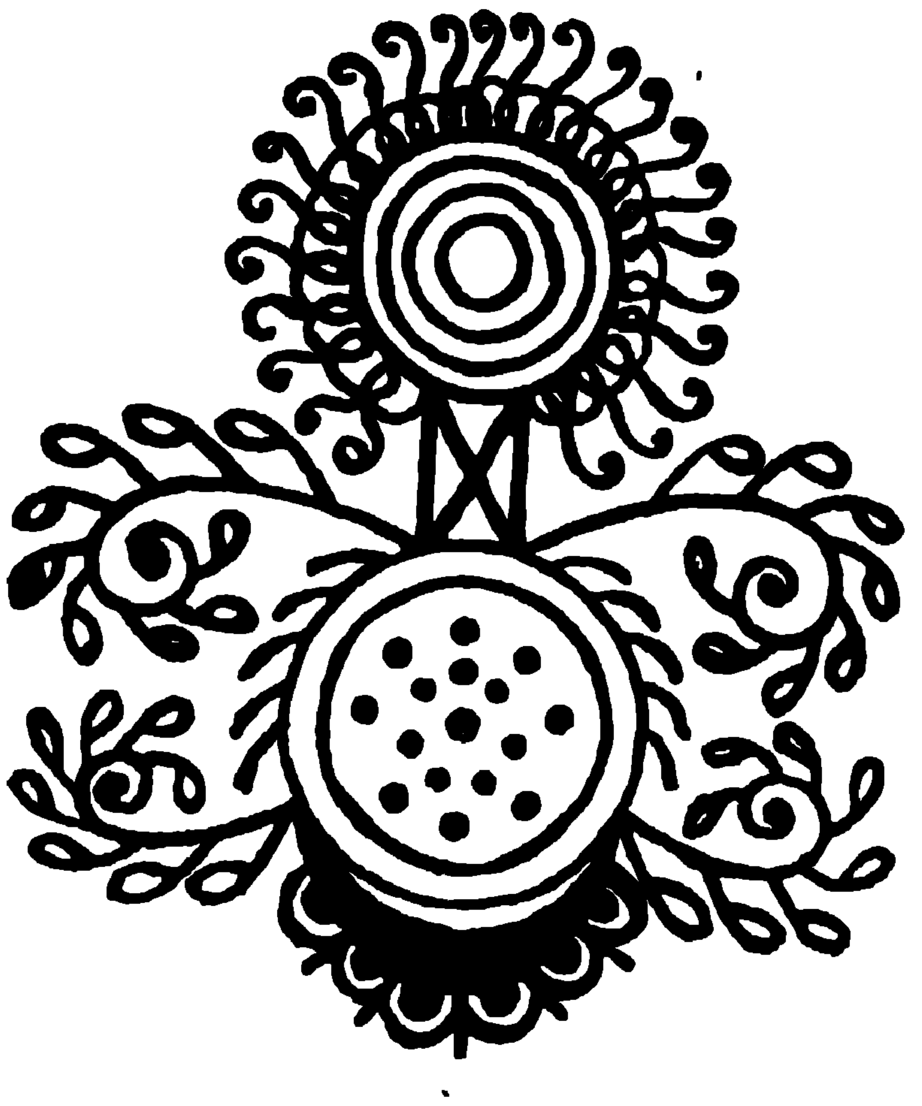

তারার ব্রতের আল্পনায়
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা—(ক)

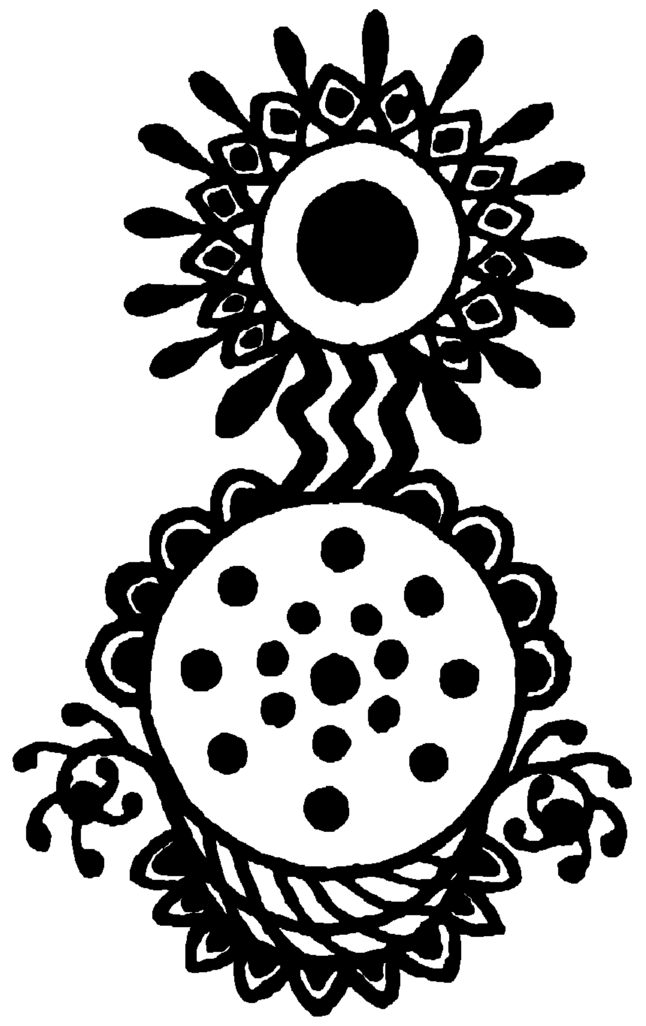

চন্দ্র-সূর্য্য-তারা—(খ)

সতীনের নিধনই তাহার আকাঙ্ক্ষা—স্বামীর নহে। যদিও এইরূপ উদ্ভট্ জন্তুর আগমন অসম্ভব তথাপি অনাদৃতা সতীনের ইহা অন্তরের একান্ত বাসনা। এই উদ্ভট্ জন্তুটির চারিখানি পা, কুম্ভীরের মত লেজ ও ভীষণ দাঁতওয়ালা মুণ্ড অঙ্কিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত চারপা-ওয়ালা একটি উদ্ভট্ পাখীও আল্পনায় আছে (গত শ্রাবণ মাসের বঙ্গলক্ষ্মী দ্রষ্টব্য)।

(চ) গ্রহ-নক্ষত্র

চন্দ্র-সূর্য্য-তারা এই তিনটির সংযোগে সৃষ্ট আল্পনার একটি ছবি গত চৈত্র মাসের বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আরও দুইটি ঠাট্ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্ব-প্রকাশিত ঠাট্‌টি বেল্-পুকুরের ব্রতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই দুইটি ঠাট্ই 'তারার ব্রত' হইতে গৃহীত। এই আল্পনা দুইটিতে কলা-কৌশল অতি নিপুণ ভাবে প্রকাশমান। উভয় ঠাটেই সর্ব্ব-উচ্চে সূর্য্য, তাহা হইতে নানা কৌশলে জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখান হইয়াছে। (ক) ঠাটে সূর্য্য হইতে তিনটি বক্ররেখা নামিয়া নিম্নের গোলাকৃতি আকাশমণ্ডলে সংযুক্ত হইয়াছে। আকাশমণ্ডলের বাহিরে ছয়টি 'দল' বা 'পাপ্‌ড়ি', ভিতরে ষোলটি তারা। আকাশমণ্ডলের নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্র থাকে। চন্দ্রটিকেও কয়েকটি 'দল' বা 'পাপ্‌ড়ি' দ্বারা সজ্জিত করা হয়! (খ) টাট্‌টিও নানা অলঙ্কারে সজ্জিত। মূল আকৃতি উভয়ের অনেকটা একই প্রকার, তবে চন্দ্র ও সূর্য্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডল উভয়েরই পৃথক প্রকারের। অধিকন্তু (খ) ঠাটের আকাশমণ্ডলের উপর ও নিম্ন উভয় পার্শ্ব হইতে চারিটি শাখা বাহির হইয়াছে। এবং সূর্য্য ও আকাশমণ্ডলের সংযোজকটিরও আকৃতি একটু ভিন্ন প্রকারের।

'মাঘ-মণ্ডলের' ব্রতেও চন্দ্র-সূর্য্য-তারার ঠাটের প্রচলন আছে, কিন্তু তাহা গোলা দিয়া অঙ্কিত না করিয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া অঙ্কিত হয়।

(ছ) নিত্যব্যবহৃত বস্তু

নিত্যব্যবহৃত অনেক বস্তুই আল্পনায় গ্রহণ করা

হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি আমার চোখে পড়িয়াছে—পাণের-বাটা, কৌটা, কোশাকুশী, ঘণ্টা, কুলা, চামর, কাজল-লতা, ধানের গোলা, হাশুলী (একপ্রকার অলঙ্কার), আয়না, চিরুণী, ইত্যাদি। পাণের-বাটা পল্লীগ্রামে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। সব বাড়ীতেই ইহার আয়োজন থাকে। একখানি বাটা বা রেকাবিতে করিয়া পাণ, সুপারি, ও চুন রাখিয়া দেওয়া হয়। আল্‌পনায় ইহার সমস্তই দেখান হয়। এমন কি সুপারি কাটিবার একখানি বেঁকি 'যাঁতি'ও অঙ্কিত হয়।

কৌটার আল্‌পনার মন্ত্রটি এই—

সাত সতীনের সাত কৌটা,
আমার একটি অভ্রের কৌটা।
—অভ্রের কৌটা নড়ে চড়ে,
সাত সতীনে পুড়ে মরে!

চামরের আল্‌পনাটির প্রথমে একটি আংটা। তৎপরে পর-পর তিনটি ত্রিকোণাকার বাঁট। প্রত্যেকটি বাঁটের পার্শ্বের দুই কোণ হইতে দুইটি করিয়া বক্র রেখা সমান তালে নামিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক রেখার নিম্নভাগটি বাঁকাইয়া বর্ত্তুলাকার করা হয়। কিন্তু যাহারা ব্রতপালন করে তাহারা চামরটিকে চামর বলিয়া জানে না। তাহারা বলে উহা 'ইন্দ্র' দেবতা। প্রাচীন কালে যখন এই চামরের ঠাট্‌টি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই ইহাকে চামর বলিয়াই সবাই জানিত, কিন্তু বর্ত্তমানে কালপ্রভাবে উহা চামর হইতে 'ইন্দ্র' দেবতায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে উহাকে চামর বলিয়া ধরা যায়। উহার ছড়াটি এইরূপ—

'ইন্দ্র' পূজা জুড়ো হয়ে
সাত ভার বুন (ভগিনী) হ'য়ে
—সাবিত্রীর সমান হই!

গহনার মধ্যে কেবল মাত্র হাশুলী নামক একপ্রকার রূপার গহনার ঠাট্‌ পাওয়া যায়। ঐ প্রকার রূপার হাশুলী আজিও পল্লীঅঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

আয়নার ঠাট্‌টির ছড়া—

আয়না আয়না!
সতীন যেন হয় না।

(জ) ঘটনা বা দৃশ্য

আল্‌পনায় অনেক ঘটনা বা দৃশ্যের ঠাট্‌ দেখা যায়। যেমন হাট-বাজার, মন্দির বা মঠ, পাল্কি-বেহারা, রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, গঙ্গা-যমুনা নদী ইত্যাদি। বড় বটতলায় গ্রামের হাট বসিয়াছে, খরিদ্দার দোকানদার প্রভৃতি কিছুই আল্‌পনায় বাদ যায় নাই। মঠের ছড়াটি এইরূপ—

মঠের মাথায় দিয়ে ঘী,
—আমি যেন হই বড় মানুষের ঝি।

মঠের মধ্যে শিব-মূর্ত্তিরও ঠাট্‌ অঙ্কিত হয়।

বেল্‌-পুকুরের ব্রতে গঙ্গা-যমুনার আল্‌পনা দেওয়া হয়। দুই নদীর মূল একই স্থান হইতে অঙ্কিত হয় অর্থাৎ যেন সঙ্গমস্থান হইতে গঙ্গা-যমুনা দুইটি ধারা বাহির হইয়াছে। দুই নদীর মধ্যেই নৌকা ও মাঝি এবং জলের ভিতরে কুম্ভীর, মাছ প্রভৃতিও অঙ্কিত করিবার নিয়ম।

সংক্ষেপে ইহাই আলোচনার শেষ। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর যে সমস্ত ঠাট্‌ তত প্রধান নহে তাহার আলোচনা করিলাম না। ইহা সত্য যে অনুসন্ধান করিলে আরও বহু বহু ব্রত ও তাহার আল্‌পনার ঠাট্‌ আবিষ্কার করা যাইতে পারে এবং পরে আবিষ্কৃত হইলে তাহারও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

চর্চ্চার অভাবে এক এক পুরুষে আল্‌পনার ঠাটগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এমনও দেখা গিয়াছে একটি সামান্য বস্তুর নামই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি ছড়াও আর সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্‌পনাকে রক্ষা ও উন্নত করিতে হইলে কেবলমাত্র পূর্ব্বাবিষ্কৃত ঠাট্‌গুলির আলোচনা ও চর্চ্চা করিলেই চলিবে না, পুনরায় নব নব ঠাটের উদ্ভাবন ভিন্ন ইহার উন্নতি অসম্ভব।

কিন্তু অশিক্ষিতা অরসিকা মহিলাদের দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। ইহা কেবল শিক্ষিতা রসিকা মহিলাদের অঙ্গুলিস্পর্শেই সম্ভব।

গৌতম বুদ্ধ

শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু

কপিলাবস্তুরাজ শুদ্ধোদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌতমের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষাপ্রচারের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে। সিংহল, ব্রহ্ম, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতির অধিবাসীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম মানিয়া চলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—

"আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ
ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর···"*

কপিলাবস্তুরাজ 'কলি'রাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজার দুই রাণীই তখন নিঃসন্তানা ছিলেন। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে বড়রাণী মহামায়া যখন অন্তঃসত্তা হইলেন, তখন রাজ্যে আর আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। রাজা শুদ্ধোদন বৃদ্ধ বয়সে প্রথম পুত্রের মুখ দর্শন করিবার আনন্দে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিলেন।

মহামায়া প্রসব হইবার জন্য পিতৃভবনে যাইবার পথে, লুম্বিনির মনোহর উদ্যানস্থিত রেশম-বৃক্ষের নিম্নে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সকলে তাঁহাকে গৌতম বলিয়া ডাকিতেন (কিন্তু তাঁহার নাম ছিল সিদ্ধার্থ)।

উনিশ বৎসর বৎসর বয়সে কল্যাণ-কন্যা যশোধরার সহিত গৌতমের বিবাহ হয়। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত বিলাসী এবং আমোদপ্রিয় হইয়া উঠেন।

গৌতমের অত্যধিক বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদনের আত্মীয়স্বজন নিতান্ত ভীত এবং দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি এই সময়ে সহসা যুদ্ধ বাধে, তখন এই বিলাসপ্রিয়, অপটু নেতা গৌতমকে লইয়া কি করিবেন তাঁহারা ?

কথাগুলা যখন গৌতমের কানে উঠিল, তখন তিনি সত্বর দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন, আপনার ক্ষমতা ও নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, গৌতম ক্রীড়াক্ষেত্রে নামিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে, এমন কি তাঁহার ব্যায়ামশিক্ষককে পর্য্যন্ত পুরুষোচিত ব্যায়ামে পরাজিত করিয়া সকলের মনস্তুষ্টি করিলেন।

উনত্রিশ বৎসর বয়সে একদিন গৌতম রথে আরূঢ় হইয়া, সারথি 'চানা'কে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সহসা এক লোলচর্ম্ম, কুব্জদেহ, অক্ষম বৃদ্ধকে পথের উপর দেখিয়া গৌতম তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"চানা, এর অবস্থা এমন কেন ?"

চানা গৌতমের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"যুবরাজ, সকল মানুষেরই এক সময়ে এই দশা হবে। এই পৃথিবীতে কেউ কখনো নশ্বর দেহ নিয়ে চিরকাল বলিষ্ঠ, সুশ্রী, কর্ম্মঠ থাকতে পারে না। যুবরাজ,—কালের হাত থেকে কেউ ত নিস্তার পায় না।"

আর একদিন গৌতম সারথিকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলে পথিপার্শ্বে একটা ঘৃণিত, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"চানা, এর অবস্থা এমন কেন ?"

---

* যাঁহার অদ্ভুত সংযম ও ত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া লোকে বিস্মিত হয়, যাঁহার অত্যাশ্চর্য্য দৃঢ়তা এবং বৈরাগ্য-বিভূতির সম্মুখে এদেশের এবং বিদেশের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ পর্য্যন্ত ভক্তিভবাক্ হইয়া যান, সেই মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধের কার্য্যকলাপ যে নিতান্ত অলীক (myth), এবং স্বয়ং গৌতম বুদ্ধই যে একজন কল্পিত ব্যক্তি (imaginary being), অক্সফোর্ডের স্বর্গীয় অধ্যাপক উইল্‌সন্ কিন্তু একদিন ইহা বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। যদিও রীস্ ডেভিস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ অধুনা উইল্‌সনের মত্ কেহই স্বীকার করেন না, এবং তাঁর মত্ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন (without basis) ইহা এখন সুপ্রমাণিত হইয়াছে। —বঃ সঃ।

চানা কহিল,—"যুবরাজ, আগেই তো বলেছি, জীবিত ব্যক্তির ভাগ্যই এমন!"

ইহার কয়েক মাস পরে পথিপার্শ্বে একটা গলিত শব পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গৌতম আর্দ্র হইয়া সারথিকে প্রশ্ন করিলেন,—"চানা, পথের ওপর শব কেন?"

সারথি রথ চালাইতে চালাইতে একবার গৌতমের চিন্তিত মুখের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল—"যুবরাজ, আর কেন প্রশ্ন কর্‌ছেন,—এর উত্তর তো আগেই দিয়েছি!"

গৌতম বুঝিলেন। তাহার পর কিছুদূরে যাইয়া, এক সৌম্যমূর্ত্তি, সুন্দর, তেজস্বী সাধুকে দেখিয়া গৌতম পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন,—"চানা, এঁকে এমন তেজস্বী এবং মনোরম দেখাচ্ছে কেন?"

চানা কহিল—"যুবরাজ, উনি যে সন্ন্যাসী। সাধু-সন্ন্যাসীরা এমনি হ'য়ে থাকেন, কারণ ওঁরা পবিত্র জীবন যাপন করেন।"

অনেকে বলেন, যে, গৌতম যে চারিটি দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহা ভৌতিক দৃশ্য! তাঁহারা বলেন, দেবদূত গৌতমকে ধর্ম্মপথে চালিত করিবার জন্য, তাঁহার এবং চানার চক্ষুর সম্মুখে বিভিন্ন বেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার অনেকে ইহাও বলেন যে, গৌতম একদিনেই চারিটি দৃশ্য দেখিয়াছিলেন।

সেই চারিটি দৃশ্যই গৌতমের জীবনের পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। সেই সব দৃশ্য গৌতম ভুলিতে পারিলেন না; যতই তিনি আপনাকে অন্যদিকে চালিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই যেন সেগুলি আরও দৃঢ় ভাবে তাঁহার অন্তরের মধ্যে বসিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন সমস্ত দুপুর নদীতীরস্থ প্রমোদ-উদ্যানে অতিবাহিত করিয়া, বৈকালের শেষ দিকটায়, নদীতে অবগাহন করিয়া গৌতম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। সহসা সেই সময়ে দূত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, যশোধরা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন।

আনন্দের সংবাদ শুনিয়া গৌতম গম্ভীর হইলেন। তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন ছাড়া কোন চিহ্নই ফুটিয়া উঠিল না। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—"এ আমার অত্যন্ত শক্ত বাঁধন, কিন্তু বাঁধন যতই শক্ত হোক্, আমাকে তা ছিন্ন কর্‌তেই হবে।"

কপিলাবস্তুর অধিবাসীগণ এই নূতন সদ্যপ্রসূত আগন্তুকের আগমনে অনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌতমের রথ আসিয়া প্রাসাদে পৌছিলে, নগরবাসীগণ আহ্লাদে গীতবাদ্য করিতে করিতে, নৃত্য করিতে লাগিল।

গৌতমের কানে শুধু একটু যুবতীর গান অত্যন্ত ভাল লাগিল—তিনি তাহার গানে অতিশয় অকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। যুবতী গাহিতেছিল—"ছেলের মা-বাপ সুখী হোক্—ছেলের দাদা-দিদি সুখী হোক্।"

'সুখী' শব্দের অর্থ—জন্ম হইতে মুক্তি পাওয়া—গৌতম 'সুখী'র অর্থ উহাই করিলেন। অত্যন্ত খুসী হইয়া গৌতম আপনার কণ্ঠস্থিত বহুমূল্যবান হার খুলিয়া গায়িকার নিকটে প্রেরণ করিলেন। গৌতমের তখন পার্থিব অর্থে, গহনায়, বিলাসিতায় আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। পার্থিব সুখের চিন্তা একেবারে তখন তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। যে সত্যের সন্ধানে ছুটিবার জন্য গৌতমের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, যে পথের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে গৌতম আপনাকে কঠিন ও দৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে সুরু করিয়াছিলেন—তাহার তুলনায়, সেই স্বর্ণ-হীরক-খচিত মূল্যবান কণ্ঠহারের মূল্য কতটুকু?

গৌতমের এখন হইতেই দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল,—পার্থিব আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে কাহারও মুক্তি হইবে না। যে যত ভোগ করে, যাহার যত বেশী আকাঙ্ক্ষা, সে-ই তত বেশী দুঃখ ভোগ করে—তাহাকে এই অসার কামনা-বাসনা-পূর্ণ সংসারে কেবলই জন্ম লইতে হয়। গায়িকা গৌতমের বহুমূল্যবান কণ্ঠহার পাইয়া ভাবিল, গৌতম নিশ্চয়ই তাহার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন! সুতরাং, সে বহু রঙীন ছবি দেখিল, কত সুখের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায়ই দেখিতে লাগিল—গৌতমের প্রধানা মহিষী হইবার আশাও তাহার মনে উদিত হইল।

কিন্তু, গৌতম সেই যে একটিবার তাহার দিকে চোখ

তুলিয়া দেখিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার আর তিনি গায়িকার দিকে চাহিলেন না, সত্বর স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন।

সেই সন্ধ্যায় নর্ত্তকীরা যথাযথ নৃত্যগীত সুরু করিয়া দিল, কিন্তু গৌতম সেদিকে কোন মতেই মন দিতে পারিলেন না—শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন।

মধ্যরাত্রে গৌতমের নিদ্রা ভাঙিয়া গেলে দেখিলেন, বড় ঘরে যাইতে হইলে যে ঘর পড়ে, সেই ঘরে নটীগণ নিদ্রা যাইতেছে। গৌতমের মন অসহ্য ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অতি সন্তর্পণে উঠিয়া গৌতম দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া গেলেন—দেখিলেন চানা দ্বারে পাহারা দিতেছে। গৌতম চানাকে নিভৃতে ডাকিয়া অশ্ব প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন।

যশোধরার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি পুষ্পাবৃতা হইয়া, পুত্র রোহুলকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, বক্ষের সহিত জড়াইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছেন।

স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে, গৌতমের ইচ্ছা হইল, প্রাণ ভরিয়া তাহাদের দেখেন। কয়েক মুহূর্ত্ত গৌতম নির্নিমেষ নেত্রে, সেই দুইটি ঘুমন্ত প্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার প্রাণ বড় প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল, রোহুলের কচি কপোলে একটি চুম্বন দিবার নিমিত্ত! আপনার হাত দুইটা রোহুলের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া, সহসা গৌতম তাহা সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন। তাঁহার ভয় হইল, পাছে যশোধরা জাগিয়া উঠেন—পাছে তাঁহার যাইবার পথে বিঘ্ন ঘটে।

গৌতম আপনাকে অতিকষ্টে সংবরণ করিয়া লইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মন পবিত্র হইবে, এবং তিনি বুদ্ধ হইবেন, সেই মুহূর্ত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বর্ষাধৌত নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি ধরার বক্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌতম সেই রাত্রে একমাত্র সঙ্গী সারথি চানাকে লইয়া, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, প্রাসাদ,—সমুদয় ভোগের সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

'মার' বা সয়তান উদ্যানপথে সহসা আবির্ভূত হইয়া, গৌতমকে দাঁড় করাইয়া কহিল—"তুমি সংসারে ফিরে যাও, ফিরে গেলে তোমাকে চার-চারটে মহাপ্রদেশের একচ্ছত্রাধিপতি রাজা করে' দেব।"

গৌতম কোন কথা না বলিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন সয়তান কহিল—"একদিন গৌতমকে পরাজিত কর্‌বই। শীঘ্রই হোক্, অথবা বিলম্বেই হোক্, গৌতমের মনে কাম ও ক্রোধ উপস্থিত হবেই। তখন আমিই গৌতমের প্রভু হব, গৌতম তখন আমার ভৃত্য হবে—আমি যা বল্‌ব, তখন তাকে তাই কর্‌তে হবে—তখন আমার কাছে তাকে মস্তক অবনত কর্‌তেই হবে।"

কিন্তু সয়তান গৌতমকে জয় করিতে পারে নাই। যদিও একবার গৌতমের মনে বাসনা এবং কামনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অসামান্য মানসিক সংযমের ফলে গৌতম 'মার'কে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সয়তানের অশুভ ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া, ধর্ম্মপথে চলিতে গৌতমের জেদ আরো বাড়িয়া গিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন—"ছায়া যেমন সদা-সর্ব্বদা শরীরকে অনুসরণ করে, সেই দিন হইতে গৌতমও সেইরূপ ছায়ার ন্যায় ধর্ম্মকে সহস্র বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া অনুসরণ করিতে লাগিলেন।"

সেই রাত্রে গৌতম অনেকখানি পথ অতিক্রম করিলেন। তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আনোমা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া কটিদেশে লম্বিত দীর্ঘ তরবারির সাহায্যে আপনার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, গাত্র হইতে সমুদয় অলঙ্কার খসাইয়া চানার হাতে দিয়া কহিলেন—"ভাই চানা, তুমি গৃহে ফিরে যাও, অলঙ্কার ও পোষাকে আর আমার স্পৃহা নেই।"

যুবরাজের সেই অলঙ্কারশূন্য,ত্যক্তপরিচ্ছদ,নগ্ন গাত্র দেখিয়া চানা চোখের জল কোনমতেই দমন করিতে পারিল না। চানা গৌতমকে কত বুঝাইল, কিন্তু গৌতম তাহার কোন

কথাই শুনিলেন না। পবিত্র হইয়া আবার গৃহে ফিরিবেন, এই আশ্বাসবাক্যে চানাকে সান্ত্বনা দিয়া কপিলাবস্তুতে পাঠাইয়া দিলেন।

সাত দিন একাকী একটি আম্রবৃক্ষের নিম্নে অতিবাহিত করিবার পর, গৌতম রাজগির বা রাজঘরিয়ার অন্তর্গত বিম্বিসারের প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিম্বিসার সন্ন্যাসী গৌতমকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু গৌতম স্বীকৃত হইলেন না। কারণ, তখনও পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষকতা করিবার মত দায়িত্ব, পাণ্ডিত্য এবং পবিত্রতা তাঁহার আসে নাই।

প্রথমে গৌতম আলারা নামক এক ব্রাহ্মণ তার্কিকের শিষ্যত্ব বরণ করিলেন এবং কিছুদিন পরে উদ্রক নামক আর একজন ব্রাহ্মণের নিকট হিন্দু দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন।

কিন্তু গৌতমের মন ইহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না।

গৌতম তখন আপনার উদ্দেশ্যসাধন করিতে, উরুভেলা জঙ্গলে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তাঁহার পাঁচ জন শিষ্য জুটিল। তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া গৌতম ভীষণ তপস্যা করিতে সুরু করিলেন। তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম দেশময় বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

বহুদিন উপবাসের ফলে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে গৌতম আপনাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলেন, আর একপদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া তিনি ভূমিতে পতিত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে দুই-তিন জন মনে করিল, গৌতমের জীবন শেষ হইয়াছে। কিন্তু গৌতম মরেন নাই, শুধু পড়িয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অজ্ঞান হইয়া ছিলেন মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে গৌতম সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

তাহার পর হইতে গৌতম উপবাস ভঙ্গ করিয়া কিছু কিছু আহার করিতে সুরু করিলেন। পূর্ব্বে যে কৃচ্ছ্রসহ উপাসনায় তিনি মনোনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও অবিলম্বে ত্যাগ করিলেন।

গৌতমের ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসী হইয়া গৌতম প্রার্থনা করেন না, উপযুক্ত আহার করেন—এ আবার কেমন কথা? সুতরাং শিষ্যমণ্ডলী গৌতমকে ত্যাগ করিয়া বারাণসী গমন করিলেন।

শিষ্যেরা গৌতমকে ছাড়িয়া যাইবার পর, গৌতম নিরঞ্জনার তীরের দিকে অগ্রসর হইয়া তথায় সুজাতা নাম্নী একটি নিকটস্থ গ্রামের বালিকার নিকট হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া একটি বটবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া আহার সমাপন করিলেন। ঐ বটবৃক্ষের নিম্নে বসিয়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া গৌতম ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে কি করিবেন?

কিন্তু সংসারের মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা, বড় সহজসাধ্য নহে। কামনা-বাসনা চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন কাজ।

প্রথমটা, গৌতম সংসারের মায়া, কামনা এবং লোভের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, চিন্তা করিতে করিতে তিনি প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেন।—বড় বড় পণ্ডিতের দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া, গৌতম যদিও বুঝিয়াছিলেন, অর্থ, রাজ্য, অলঙ্কার, স্ত্রীপুত্র চিরস্থায়ী নয়, তথাপি এখানে তাঁহার তরঙ্গায়িত চিত্তে পার্থিব ভোগের বাসনা জাগিয়া উঠিল।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত গৌতম মনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন; অবশেষে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনা-কামনা, লোভ প্রভৃতি পার্থিব আকর্ষণ মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে পবিত্র হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে তাঁহার শিক্ষকদ্বয়ের (আলারা ও উদ্রক) নিকটে তাঁহার নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। গৌতম তাঁহাদের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু শিক্ষকদ্বয় পূর্ব্বে দেহত্যাগ করায়, গৌতম তাঁহার পাঁচটি শিষ্যদের সহিত মিলিত হইবার জন্য মৃগদাবে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে গৌতমের সহিত এক পরিচিত ব্যক্তির

সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সে গৌতমকে প্রসন্ন এবং ধীর দেখিয়া প্রশ্ন করিল—"কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করার ফলে, আপনাকে এমন প্রসন্ন এবং ধীর দেখাচ্ছে ?"

গৌতম উত্তর করিলেন,—"আমি কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি পেয়েছি,—রিপুদের জয় করতে পেরেছি, সেই জন্যে আমাকে এমন দেখাচ্ছে।"

গৌতমের পরিচিত ব্যক্তি, তাঁহার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হওয়ায় পুনরায় প্রশ্ন করিল—"আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

গৌতম উত্তর করিলেন—"আমি এখন বারাণসী নগরে ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন করতে যাচ্ছি; যারা সেখানে অন্ধকারে অবস্থান করছে, তাদের সত্যের পথে নিয়ে গিয়ে আলোক প্রদান করব।

লোকটি ভাবিল, গৌতম নিতান্ত বাজে কথা বলিতেছেন। সে বিদ্রূপ করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল,—এ-সবের অর্থ কি,—ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করবে তুমি ?"

গৌতম উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমি। আমি মন্দ বাসনা, সম্পূর্ণভাবে মন থেকে দূর ক'রে দিয়েছি। পার্থিব লোভ আর আমার মনকে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না, এখন প্রকৃত ধর্ম্মের পথে সকলকে চালিত করব।'

লোকটি হাসিয়া কহিল—"গৌতম, তোমার স্পৃহা ঐখানেই শেষ, এর বেশী এক পদও তুমি অগ্রসর হ'তে পারবে না।" বলিয়াই সে আর কোন উত্তর শুনিবার প্রত্যাশা না করিয়া দ্রুত স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল।

লোকটির কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, গৌতম বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এবং একদা এক শীতল সন্ধ্যায় তথায় উপনীত হইলেন।

সেখানে গৌতমের পাঁচটি শিষ্য বাস করিতেছিল। গৌতমকে দেখিয়া তাহারা কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না,—"প্রভু" অথবা "শিক্ষক" বলিয়াও অভ্যর্থনা করিল না। গৌতম উপবাস ভঙ্গ করিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, এবং তপস্যা হইতে বিরত হইয়াছিলেন বলিয়া, পঞ্চ শিষ্য গৌতমকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

গৌতম তাহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"তোমরা আমাকে বিদ্রূপ ক'রো না। এখনো তোমরা মৃত্যুর (ধ্বংসের) পথে,—শোক, নিরাশা, দুঃখ, কষ্ট থেকে এখনও তোমরা মুক্তি পাওনি। কিন্তু, যে পথে গেলে মুক্তি পাওয়া যায়, সে পথ আমি পেয়েছি, এবং তোমাদেরও সেই পথে নিয়ে যেতে পারি।"

বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারকের মতে,—যদি কেহ মুক্তিলাভ করিতে চাহে, যদি কেহ ধার্ম্মিক এবং পবিত্র জীবন যাপন করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, কাম, প্রভৃতি রিপুদের সবলে বশীভূত করিতে হইবে, মনকে অত্যন্ত পবিত্র রাখিতে হইবে,—কারণ, মন বিশুদ্ধ হইলে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায়। সর্ব্বত্র দয়া প্রদর্শন করাও, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মতে খুব বড় ধর্ম্মের কাজ।

যতদিন পর্য্যন্ত গৌতম, ষাট্‌টি শিষ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলেন, ততদিন তিনি মৃগদাবেই বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন—যশ। ইনি সর্ব্বপ্রথমে, একরাত্রে গৌতমের নিকট আসিয়া, মস্তক ও শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডিত করিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে একে একে, যশ—তাঁহার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, অনেককেই গৌতমের নিকট আনাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন।

বর্ষাকালের শেষে শরৎ-প্রারম্ভে একদিন গৌতম তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"প্রিয় শিষ্যগণ, আমি মানসিক বলে রিপুদের বশ করেছি, এবং আমার শিক্ষকতায় তোমরাও রিপুদের বশ করে', আমারই মত পবিত্র হয়েছ, এবং মনে অপরিসীম আনন্দ পাচ্ছ। কিন্তু এখনও আমাদের কঠিন কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে রয়েছে। যারা মুক্তির কোন উপায় উদ্ভাবন করতে না পেরে, অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করে' মুক্তির (জন্ম হইতে পার পাওয়া) পথে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এখন পৃথক হব—প্রত্যেকে এক এক দিকে যাও, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্যকভাবে বুঝিয়ে নগরে নগরে ঘুরে নগর-

বাসীদের বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত কর। আমি এখন সেনগ্রামে যাব—সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ব।”

এইরূপে গৌতম, প্রতি বর্ষাকালে শিষ্য সংগ্রহ করিয়া, শরৎকালের প্রারম্ভে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে উরুবেলা মরুসন্নিহিত স্থানে অনেক স্বনামধন্য সন্ন্যাসী ও দার্শনিক ছিলেন। গৌতম তাঁহাদের নিকটে উপনীত হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার মর্ম্ম তাঁহাদের বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন। তাঁহারা ঐ ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ গৌতমের গুরুত্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পুত্রের বিচিত্র বৈরাগ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনিলেন গৌতম সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া শুধু দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

শুদ্ধোদন অনুচরবর্গকে গৌতমকে প্রাসাদে আনিতে আদেশ করিলেন।

গৌতম পিতৃআদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, শীঘ্র কপিলাবস্তুতে শিষ্যসহ যাত্রা করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মের রীতি-অনুযায়ী, সহরের বাহিরে, একটা কুঞ্জবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা এবং খুল্লতাতগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিন্তু গৌতমের খুল্লতাতগণ গৌতমকে কোন সম্মানই প্রদর্শন করিলেন না।

গৌতমের ধর্ম্মের ইহাই রীতি ছিল যে, পরদিনের আহারের জন্য অপরে তাঁহাকে শিষ্যসহ নিমন্ত্রণ করিবেন। যেদিন তিনি শিষ্যসহ কোন নিমন্ত্রণ না পাইতেন, সেদিন তাঁহাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইত, কিম্বা ভিক্ষা করিয়া অন্ন জোগাড় করিতে হইত।

গৌতম প্রাসাদ হইতে কোন নিমন্ত্রণ পাইলেন না, তখন তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবার জন্য সহরে উপস্থিত হইলেন।

এখানে আসিয়া তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল, প্রাসাদে প্রবেশ করেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্বীয় নীতির পানে চাহিলেন—তিনি প্রাসাদে গেলেন না, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা শুদ্ধোদনের কর্ণে যখন এ সংবাদ প্রবেশ করিল, তখন তিনি স্বয়ং গৌতমের নিকট গিয়া কহিলেন—“ধার্ম্মিক বুদ্ধ, তুমি একি কর্‌ছ? তুমি কি ভুলে গেছ, কত বড় রাজার ছেলে তুমি—তোমার বংশমর্য্যাদা কতখানি! অন্নের জন্যে পাত্র নিয়ে তুমি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে’ বেড়াচ্ছ? তোমার ঐ কর্‌বার প্রয়োজন কি? তুমি কি মনে কর, তোমাকে এবং তোমার সন্ন্যাসী শিষ্য-দের অন্নবিতরণের সামর্থ্য আমার নেই?”

গৌতম ধীর ভাবে কহিলেন—“পিতা, ইহাই আমার ধর্ম্মের রীতি।”

শুদ্ধোদন বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—“কি রকম? তুমি কি রাজবংশে জন্মগ্রহণ কর নি? তুমি রাজবংশে যে কলঙ্ক লেপন কর্‌লে—তা আজ পর্য্যন্ত কেউ করে নি।”

গৌতম কহিলেন—“পিতা, আপনি এবং আপনার সংসারের ব্যক্তিরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে’ গর্ব্বানুভব কর্‌তে পারে। কিন্তু আমার এখন তাতে কিছুমাত্র গর্ব্ব কর্‌বার নেই—আমার গর্ব্ব, আমার মান, আমার যা কিছু, সবই এখন আমার ধর্ম্মে—ধর্ম্ম ছাড়া গর্ব্ব কর্‌বার মত আমার এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।”

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন—“কিন্তু পিতা, যখন কেউ বহু-মূল্যবান জিনিষ পায়, তার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য তার পিতাকে সেই মূল্যবান জিনিষ অর্পণ করা। আমি যে অমূল্য জিনিষ পেয়েছি—আপনাকে তা প্রদান কর্‌ছি।”

শুদ্ধোদন পুত্রের কথার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না, তাঁহার সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। তিনি পুত্রের হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রটি আপনার হস্তের মধ্যে লইয়া, তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন।

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে গৌতমকে প্রাসাদে দেখিয়া সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।— কিন্তু, গৌতমের স্ত্রী,

যশোধরা আসিলেন না। অদ্য দীর্ঘ সাত বৎসর পরে প্রাসাদে স্বামীর আগমনবার্তা শুনিয়াও যশোধরা তাঁকে উল্লসিতা হইয়া দেখিতে আসিলেন না; শুধু কহিলেন—"স্বামীর ভালবাসা এখনো আমি হারাই নি; তিনি ইচ্ছা কর্‌লেই, এখানে আস্‌তে পারেন, এবং তখন, আমি তাঁকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে অভ্যর্থনা করব।"

গৌতম ধীরভাবে কহিলেন "যশোধরা এখনও বাসনা থেকে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারেনি। ও এখন আমাকে তার বাহুপাশে বদ্ধ কর্‌তে পারে, তোমরা কেউ বাধা দিও না।"

গৌতম যশোধরার নিকটে মুণ্ডিতমস্তকে, মুণ্ডিতমুখে, গৈরিক বর্ণের পোষাকে উপস্থিত হইতেই, যশোধরা শিশুর ন্যায় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গৌতমের পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলেন—"নাথ, একি হয়েছ তুমি! মাথা মুণ্ডিত করে', গৈরিক বর্ণের পোষাকে আপনাকে ভূষিত করে' সন্ন্যাসী হয়েছ?—তুমি সংসার থেকে বিদায় নিলে!..."

গৌতম যশোধরার মস্তকে একখানা হাত রাখিয়া ধীর-স্বরে কহিলেন—"রিপুদের জয় করে' এখন আমি পবিত্র হয়েছি যশোধরা,—সংসারের মায়ার ভেতর ডুবে থাক্‌লে, তাই কি পার্‌তুম?"

শুদ্ধোদন সহসা কহিয়া উঠিলেন,—"গৌতম, যশোধরা তোমাকে যে কত ভালবাসে তা' আর কি বল্‌ব? তুমি চলে' যাবার পর থেকে সে, দিনে একবারের বেশী আহার কর্‌ত না, অনাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন কর্‌ত, কোন-প্রকার আমোদে, ভোগে তার স্পৃহা ছিল না।"

পরে গৌতমের স্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত প্রিয়া হইয়া-ছিলেন,—বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে গৌতমের স্ত্রীই শ্রেষ্ঠা ছিলেন।

গৌতমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ, গৌতমের খুবই অনুগত ছিলেন। নন্দের বিবাহের দিন গৌতম তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমুদয় মর্ম্ম বুঝাইয়া, তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু, নন্দ এত শীঘ্র সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। বাসনা-কামনা তখন তো তিনি পরাজয় করিতে পারেন নাই—যে, গৌতমের কথায় সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন।...

কিন্তু শেষে গৌতমই জয়ী হইলেন—নন্দকে আপনার নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন।

কিছুদিন পরে একদা যশোধরা পুত্র রোহুলকে উত্তম পোষাকে সজ্জিত করিয়া কহিলেন—"রোহুল, তোমার পিতার কাছে গিয়ে পৈতৃক স্বত্ব আদায় কর। উনি বহু বহু অর্থের মালিক।"

যশোধরার কথায়, বালক রোহুল কহিল—"আমার পিতা কে, মা? আমি তাঁকে তো চিনি না..."

তখন যশোধরা রোহুলকে জানালার নিকটে লইয়া গিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে, মধ্যাহ্নভোজনে লিপ্ত, তেজস্বী গৌতমকে দেখাইয়া কহিলেন—"উনিই তোমার পিতা, রোহুল; তুমি ওঁর কাছে যাও।" বলিয়া পুত্রের দুই গণ্ডে চুম্বন দিয়া গৌতমের নিকট প্রেরণ করিলেন।

বালক রোহুল কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়াই, গৌতমের অতি নিকটে যাইয়া হর্ষোল্লাসিত আননে কহিল— "পিতা, আপনার কাছে এসে আমার বড় আনন্দ হ'চ্ছে।"

গৌতম কোন কথা না বলিয়া শুধু হাত তুলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আহার সমাপন করিয়া গৌতম যখন উঠিতে যাইতে-ছিলেন, তখন রোহুল পৈতৃক স্বত্বের কথা বলিল।

গৌতম তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্যের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আমার ছেলে পার্থিব পৈতৃক স্বত্ব চায়, কিন্তু ওটা তো ক্ষণকালের জন্যে, এক সময় তো ধ্বংস হবেই। আমি রোহুলকে এমন 'পৈত্রিক স্বত্ব' দেব যা কখনো ধ্বংস হবে না।...আজ থেকে রোহুলকে আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌লাম।" এই বলিয়া গৌতম পুত্রকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন।

রাজা শুদ্ধোদন যখন ইহা শুনিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় দুঃখে ভাঙিয়া পড়িবার মত হইল। তাঁহার দুই প্রিয় পুত্র গৌতম ও নন্দকে তিনি পূর্ব্বেই হারাইয়াছিলেন, এখন তিনি পৌত্র রোহুলকেও হারাইলেন যে!

ভবিষ্যতে যাহাতে গৌতম আপন ইচ্ছায় কোনও পিতা-মাতার সন্তানকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে না

পারেন, সেইজন্ত শুদ্ধোদন গৌতমকে কহিলেন—"যে পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ না করলে, তাদের সন্তানকে তুমি স্ব-ইচ্ছায় তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারবে না।"

গৌতম পিতার আদেশ অমান্ত করিলেন না।

কয়েক মাস পরে, কোন এক দেশের বণিক গৌতমের নিকট আসিয়া, তাঁহার আত্মীয়দিগের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

গৌতম প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার দেশের লোক অত্যন্ত ভীষণ; তারা যদি তোমায় গালি দেয়, তুমি তখন কি করবে?"

বণিক না ভাবিয়াই উত্তর করিলেন—"আমি একটা কথাও মুখ দিয়ে বা'র করব না।"

গৌতম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- "তারা যদি তোমায় প্রহার করে, তখন তুমি কি করবে?"

বণিক তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"আমি তাদের একটুও আঘাত করব না।'

গৌতম খুসী হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"যদি তারা তোমায় হত্যা করতে চেষ্টা করে, তখন তুমি কি করবে?"

বণিক উত্তর করিলেন,—"এ দেহটা তো নশ্বর, এর ধ্বংস এক সময় না এক সময় হবেই। আর, মৃত্যুতে যখন মুক্তি, তখন আর ভয় কি? বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৃত্যু-কামনা করে।"

গৌতম অত্যন্ত খুসী হইয়া বণিককে তাহার দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার আদেশ প্রদান করিলেন

যৌবনের প্রাক্কালে কিশাগোতমী একটি সুন্দর পুত্র প্রসব করে। তাহার বিবাহ হইয়াছিল—বাল্যকালে। দুই-তিন বৎসর পরে একদিন তাহার পুত্র শেষ নিঃশ্বাস ফেলিলে, কিশাগোতমী মৃত পুত্রের শীতল দেহটি আপনার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া, দয়ালু ব্যক্তিদিগের দ্বারে দ্বারে ঔষধের জন্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

অবশেষে, এক জন বৌদ্ধ, কিশাগোতমীকে কহিলেন—"আমার কাছে মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলবার ঔষধ নেই, কিন্তু গৌতম বুদ্ধের কাছে এর ঔষধ আছে—তুমি তাঁর কাছে যাও।"

কিশাগোতমী আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা না করিয়া গৌতম বুদ্ধের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কহিল—"প্রভু, আমার মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলবার মত ঔষধ আপনার কাছে আছে কি?"

গৌতম কহিলেন- "হাঁ, সেরূপ ঔষধ আমার জানা আছে।" এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন—"যে বাড়ীতে কোন স্ত্রীর স্বামী মরেনি, কোন স্বামীর স্ত্রী মরেনি, কোন মাতা-পিতার পুত্র মরেনি, কোন পুত্রের মাতা-পিতা মরেনি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউই মরেনি, এমনি বাড়ী থেকে সরষের বীজ নিয়ে এস।"

গৌতমের কথা শেষ হইতেই কিশাগোতমী মৃত ছেলেটাকে লইয়া চলিতে চলিতে কহিল "আচ্ছা, সরষে এখনিই আমি আনছি।"

গৌতম বুদ্ধ গোপনে একটু হাস্য করিলেন মাত্র; ভাবটা এই—যে, হায় রে বালিকা, এখনও তুমি সংসারের কিছুই বুঝ নাই। সংসারের এই তো নিয়ম—জন্ম ও মৃত্যু।

অনেকে জানে যে, জন্ম হইলেই মৃত্যু এক দিন না একদিন হইবেই। তারা জানে—মানুষ কখনও অমর হইয়া আসিতে পারে না। কিন্তু তবু মানুষ আত্মীয়স্বজন, স্ত্রীপুত্র, পিতামাতার মৃত্যুতে আকুলভাবে শোক প্রকাশ করিতেও ভুলে না। তাহাদের মৃত্যুজনিত শোক যেন ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাহির হইয়া আসে।—কেন? এরূপ হয় কেন? সন্ন্যাসী ও সংসারী ব্যক্তিদের মধ্যে তফাৎ এই-খানে;—তাঁহারা 'মায়া' জন্মের মত দূর করিয়া দিয়াছেন, কাহারও মৃত্যু দেখিলে তাঁহারা ভীত হন না, কারণ তাঁহারা জানেন, মৃত্যুই আত্মার মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। যে যেমন কাজ করে, মৃত্যুর পর সে ঠিক তেমনি ফল ভোগ করে। কিন্তু সংসারী? -তাহারা মায়ায় ডুবিয়া থাকে। মায়ায় পড়িয়া তাহারা ভগবানের নিয়ম একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। কাহারও মৃত্যু হইলে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, তখন তাহারা মনে করে, সকল মানুষ বুঝি

অমর—কেবল আমাদেরই আত্মীয় মরিয়া গেল, কেবল আমাদেরই স্ত্রীপুত্র মরিয়া গেল !

কিশাগোতমী বহু বাড়ী ঘুরিল, কিন্তু কোথাও এমন বাড়ী পাইল না, যেখানে মৃত্যুর কবলে কেহ পড়ে নাই।

কিশাগোতমী হতাশ হইয়া পড়িলেও কতকটা সে শান্তি পাইল। হয় তো বা সে বুঝিয়াছিল—শুধু তাহার পুত্র তো মরে নাই, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

একটি গৃহ হইতে এক ব্যক্তি সর্ষপ আনিয়া কিশা-গোতমীকে কহিল —"এই নাও সরিষা।"

কিশাগোতমী কহিল—"এখানে কেউ মরে নি তো ?"

কিশাগোতমীর এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি কহিল —"তুমি কি বল্‌ছ ? এও কখনো হয়—? মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে কে কবে ? তুমি কি জান না যে, বেশী লোকই মরে, খুব অল্পসংখ্যক লোকই বেঁচে থাকে ! মানুষ বেঁচে আছে, এটাই ভয়ানক আশ্চর্য্য, মানুষ মরে— এটা একেবারেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"

কিশাগোতমী তখন প্রকৃতই বুঝিল যে, মানুষ অমর নহে বিধাতার ইহাই নিয়ম। তখন সে অনেকটা শান্তি পাইল, মৃত পুত্রের শোক অনেকটা তাহার প্রশমিত হইয়া গেল।

মৃত পুত্রটিকে একটা বনে নিক্ষেপ করিয়া কিশাগোতমী গৌতমের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"আমি তো পেলাম না...লোকে বলে 'জীবিতের অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই বেশী'।"

গৌতম তখন কিশাগোতমীকে জগতের অনিত্যতার সম্বন্ধে বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে সে শোক একেবারে ভুলিয়া গেল এবং শেষে গৌতমের শিষ্যা হইয়া পড়িল।

অশীতিবর্ষ বয়সে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত কষ্টের সহিত, স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে হিরণ্যবতী নদীর নিকট পৌঁছিয়া, একটি বৃহৎ শালবৃক্ষের নিম্নে শয়ন করিয়া, দীর্ঘ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন—সেই বিশ্রামই গৌতমের শেষ বিশ্রাম।

সেই বৃক্ষের নিম্নে শয়ন করিয়া গৌতম বুদ্ধ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য আনন্দের সহিত, তাঁহার মৃত্যুর পর কি কি করিতে হইবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। দুই জনের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, আনন্দ আপনাকে কোনমতেই সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না -তাঁহার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

গৌতম বুদ্ধ আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"আনন্দ, কেঁদ না ! এই যে দেহটা দেখ্‌ছো, এটাকে চিরকাল কেউ ধরে' রাখ্‌তে পারে না। যখন আমাদের জন্ম হয়েছে, তখন মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই নশ্বর দেহটার ধ্বংস তো হবেই ; তবে আগে আর পরে।"

একটু দম লইয়া পুনরায় কহিলেন—"এ পৃথিবীতে এমন কি কিছু আছে, যার ধ্বংস নেই ? যখনই জন্ম তখনই মৃত্যু, যখনই সৃষ্টি তখনই ধ্বংস—এই তো বিধাতার নিয়ম।"

তাহার পর এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অপর শিষ্যগণের দিকে চাহিয় কহিলেন—"প্রিয় শিষ্যগণ, আনন্দ বহুকাল আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করে' এসেছে।...আমার মৃত্যুর পরে, কি কি কর্‌তে হবে, আনন্দ সবই জানে। তোমরা সকলে আনন্দের কথা শুনো।"

মধ্যরাত্রে গৌতম তাঁহার শিষ্যগণকে কহিলেন—"প্রিয় শিষ্যগণ, আমি এবার দেহ ত্যাগ কর্‌বো। তোমরা সর্ব্বদা এই সত্যটা মনে রাখ্‌বে—যাতে জীবন তাতেই মৃত্যু, যাতে সৃষ্টি তাতেই ধ্বংস—জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস নিয়েই পৃথিবী চলেছে।"...

কথাগুলি বলিয়াই গৌতম সংজ্ঞা হারাইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই, তাঁহার পবিত্র জীবনপ্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল – বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

ভারতের সংকৃষ্টি*-তে রসকলার স্থান

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস.

আমরা দেখিয়াছি যে, যে আনন্দ হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, যে আনন্দ দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ জীবন ধারণ করিয়া থাকে, এবং যে আনন্দে আবার তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, ভূমার সেই আনন্দের ছন্দকে জীবনে উপলব্ধি করিয়া, সেই ছন্দের তালে জীবনের সমন্বয় করিয়া মানুষ রসস্বরূপ পরমাত্মার আনন্দের অনুভূতি লাভ করে। এবং, এই যে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দের অনুভূতি, ইহার সঙ্গে সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য্য এবং স্থপতিকলা—এই পাঁচটি রসকলার অথবা 'দেবজনবিদ্যা'র অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের এই আনন্দের অনুভূতি মানুষের জীবনে আনিয়া দিতে, রসকলা মানুষকে ধর্ম্মনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার অপেক্ষাও অধিক ভাবে সাহায্য করে।

রসশিল্পী ও রসাস্বাদক

ভূমার ছন্দে অধিষ্ঠিত আনন্দ-ব্রহ্মের সঙ্গে রসকলার এই যে সম্বন্ধ, তাহা ব্যক্তির এবং সমাজের জীবনে দুই প্রকারে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ—রসকলা-স্রষ্টার দিক দিয়া, এবং দ্বিতীয়তঃ—রসকলা-আস্বাদকের দিক দিয়া। রসকলার স্রষ্টা এবং রসকলার আস্বাদক উভয়েই রসগ্রাহী, অর্থাৎ, উভয়েই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দকে জীবনে উপলব্ধি করিয়া, জীবনকে আনন্দময় ও সার্থক করিবার সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে উপরোক্ত সামঞ্জস্য থাকিলেও কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য আছে; সেগুলি এই—প্রথমতঃ, যিনি রসকলার স্রষ্টা, তিনি ভূমার আনন্দের ছন্দ সোজাসুজি ভাবে, অর্থাৎ অন্য কোন অবলম্বনের (medium) সহায়তা না লইয়া, প্রাণে উপলব্ধি করিয়া, তাহা হইতে পরমাত্মার রসাস্বাদন করিতে পারেন। তিনি সোজাসুজি ভাবে ভূমার রসাস্বাদন করিতে পারেন, কারণ তিনি ভূমার ছন্দের সঙ্গে এবং ভূমার সত্যের সঙ্গে জীবনের সমন্বয় করিতে পারেন। এই সমন্বয় তাঁহার জীবনে চিরস্থায়ী ভাবেই আসুক অথবা ক্ষণস্থায়ী ভাবেই আসুক, ইহা ঠিক যে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি পরব্রহ্মের রসের উপলব্ধি করিয়া রসকলার সৃষ্টি করিতে পারেন—যে মুহূর্ত্তে আপনার জীবনের সঙ্গে তিনি ভূমার ছন্দের অথবা ভূমার সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি দ্বারা সমন্বয় স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ পূর্ণ সমন্বয়ের ফলে যে রসকলার সৃষ্টি হয়, সেই রসকলাই সত্য ও প্রভাববান্,—এবং সেই রসকলা-শিল্পীই মানুষের জীবনে ব্যাপক ভাবে এবং প্রগাঢ় ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, যিনি রসকলার স্রষ্টা, তিনি নিজের জীবনে রসের অনুভূতি ত করেনই, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁহার এই তফাৎ যে, তিনি সোজা-সুজি ভাবে ভূমার ছন্দকে নিজের জীবনে উপলব্ধি দ্বারা রসানুভূতি করিয়া জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারেন, এবং সেই আনন্দের প্রেরণার ফলে তিনি নিজের প্রাণে অনুভূত রসের আনন্দকে গতি, সুর, শব্দ, চিত্রণ ইত্যাদির দ্বারা রূপ প্রদান করিয়া রসকলার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষ জীবনে রসের অনুভূতি করিতে সক্ষম হয় বটে, এবং

---

* ইংরাজী 'কাল্চার' (culture) কথাটার ভাব বাংলায় প্রকাশ করিতে আজকাল কেহ কেহ 'সংস্কৃতি' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেহ কেহ আবার 'কৃষ্টি' কথাটি ব্যবহার করেন। 'সংস্কৃতি' কথাটির মৌলিক অর্থের সঙ্গে 'কাল্চার' কথাটির ভাবের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। 'কৃষ্টি' কথাটিও শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হয়। 'কাল্চার' কথাটির দ্বারা ইংরাজীতে যে ভাবটি ব্যক্ত হয়, 'সংকৃষ্টি' কথাটির দ্বারা সেই অর্থ সব চেয়ে শোভন ভাবে প্রকাশ হয় বলিয়া মনে করি। সুতরাং 'সংকৃষ্টি' কথাটিই বর্ত্তমান ধারাবাহিক প্রবন্ধে এই অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে।

তাহাদের মধ্যে সকলে না হোক্, অনেকেই সেই ভূমার ছন্দকে সোজাসুজি ভাবে জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদের এই উপলব্ধি-শক্তি, রসকলাশিল্পীর উপলব্ধি-শক্তির মত ততটা প্রখর নয়, এবং তাহার ফলে সেই উপলব্ধিও ততটা পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট হইতে পারে না। বিশ্বের রসের সোজাসুজি ভাবে পূর্ণ এবং স্পষ্ট উপলব্ধি-শক্তির অল্পতা আছে বলিয়াই, শক্তিমান প্রেরণার অভাবে, সাধারণ মানুষ আপনা হইতে রসকলার সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু রসকলা-স্রষ্টা (artist) নিজের অনুভূতির পূর্ণতার প্রেরণার ফলে যে রূপের অথবা রসকলার সৃষ্টি করেন, সেই রূপের অথবা সেই রসকলার সাহায্যে সাধারণ মানুষ ভূমার আনন্দের ছন্দের উপলব্ধি করিয়া, তাহা দ্বারা নিজের জীবনে পরব্রহ্মের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হয়।

রসকলা-স্রষ্টা যদিও রসের সৃষ্টি করেন না, কেবল মাত্র রসের অনুভব করিয়া, তাহার রূপ প্রদান করিয়া রসকলার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে অল্পকথায় রসকলা-স্রষ্টা না বলিয়া রসস্রষ্টা অথবা রসশিল্পী বলিতে পারি। একটা দিক দিয়া প্রকৃত পক্ষে এই নামের সার্থকতাও আছে,—কেন না, তাঁহার সৃষ্ট রসকলার দ্বারা সাধারণ রসাস্বাদকের জীবনে তিনি রসের অনুভূতির জনন অথবা সৃষ্টির সহায়তা করেন।

আনন্দজ ও আনন্দজায়ক

রসকলার সঙ্গে রসশিল্পীর (artist) এবং রসাস্বাদকের সম্বন্ধের যে বিশ্লেষণ আমরা করিয়াছি, তাহা হইতে এখন বুঝিতে পারিব, রসকলার সঙ্গে ভূমার আনন্দের অথবা পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ আনন্দের সম্পর্ক কি। এই সম্পর্ক দ্বিবিধ —আনন্দজ ও আনন্দজায়ক; অর্থাৎ, রসশিল্পীর মনের উপলব্ধ আনন্দ হইতে রসকলার জনন অথবা সৃষ্টি হয়, এবং সেই রসকলাই আবার লোকের মনে ভূমার অথবা পরব্রহ্মের আনন্দের উপলব্ধির জনন অথবা সৃষ্টির সহায়তা করে।

ইন্দ্রিয়াত্মক কলার নিকৃষ্টতা

রসশিল্পী ভূমার আনন্দ-রসের উপলব্ধি করিতে পারেন আপন অন্তশ্চৈতন্যের মধ্যে সোজাসুজি অনুভূতি দ্বারা; অথবা চক্ষু কিম্বা কর্ণের সাহায্যে, বিশ্বের গতির, শব্দের অথবা আকারের আনন্দময় ছন্দের উপলব্ধি করিয়া। সাধারণ মানুষ প্রধানতঃ চক্ষু অথবা কর্ণের সহায়তায় রসকলার রূপকে অন্তশ্চৈতন্যের গোচরীভূত করিয়া সেই ছন্দের উপলব্ধি করিতে পারে। এখানেও আমরা আবার দেখিতেছি যে, পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ রসের উপলব্ধি করিতে পারি আমরা—হয় কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া অন্তশ্চৈতন্যের সোজাসুজি অনুভূতি দ্বারা, অথবা আমাদের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট যে দুইটি ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষু এবং কর্ণ, তাহাদের সহায়তা দ্বারা রসকলার রূপকে অন্তশ্চৈতন্যের গোচরীভূত করিয়া। আমাদের তিনটি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের—অর্থাৎ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই তিনটি দ্বারা আমরা যে-সকল সুখের অথবা আনন্দের উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা পরমাত্মার বিশুদ্ধ আনন্দ-রসের উপলব্ধির সহায়ক নহে, এবং প্রকৃত রসকলার সৃষ্টির সঙ্গে তাহার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, সেই সুখ এবং সেই আনন্দের দিক দিয়া মানুষের পশু হইতে কোন বিশিষ্টতা নাই, এবং সেই সুখ এবং সেই আনন্দ প্রকৃত রসকলার অথবা দেবজ্ঞনবিদ্যার অঙ্গীভূত নহে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম যখন পরমার্থের অভিমুখ না হইয়া, ঐহিক স্বার্থ-লাভের অথবা ভোগবিলাসের সোপান মাত্র হইয়া পড়ে, তখন তাহা হইতে ব্যক্তির এবং জাতির জীবনে যেমন বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, তেমনি, এমন কি ততোধিক ভাবে, রসকলা বা রসচর্চ্চাও ব্যক্তিকে এবং সমাজকে বিপথগামী করে—যখন তাহারা পরমাত্মার বিশুদ্ধ আনন্দের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সহায়ক মাত্র না হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতেই অথবা ইন্দ্রিয়াত্মক আস্বাদনের উপলব্ধিতেই মানুষের মনকে এবং প্রাণকে বিজড়িত করিয়া রাখে। "ততোধিক ভাবে" বলিয়াছি, কারণ, রসকলা পরমার্থের উপলব্ধির সহায়তায় আমাদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্চ্চা হইতেও যেমন বেশী সহায়তা করে, সেইরূপ অপর দিকে আবার রসকলা যদি ব্যক্তিকে এবং সমাজকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির ও সম্ভোগের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ও বিজড়িত করিয়া বিপথগামী করে,

তখন তাহার ফল আরও বিষময় হয়। কেন না, রসকলার শক্তি মানুষের এবং সমাজের জীবনে অতি ব্যাপক এবং প্রভাববান্।

আত্মার ভাষা

এখন রসকলাকে আমরা আর এক দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিব, যাহা হইতে তাহার উৎপত্তি এবং প্রভাবের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে আমরা আরও সহায়তা পাইব। রসকলা কেবল রসশিল্পীর আনন্দ-রসের অভিব্যক্তি নয়, ইহাকে রসশিল্পীর আত্মার আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছন্দোবদ্ধ অভিব্যক্তি, অথবা ছন্দোবদ্ধ রূপ কিম্বা ভাষা বলা যাইতে পারে। ইহাকেই ইংরাজীতে "artistic self-expression" অথবা আত্মার রসাত্মক অভিব্যক্তি বলা হইয়া থাকে। রসকলার এই সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি মনে রাখিতে পারিলে,রসকলার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা হইতে আমরা রক্ষা পাইব। কারণ, রসকলার এই মূলীভূত প্রকৃতির অথবা প্রকৃত পরিচায়ক সংজ্ঞার উপলব্ধির অভাবের ফলে, দেশে দেশে এবং যুগে যুগে, রসশিল্পের অথবা রসকলার আদর্শে বিচ্যুতি আসিয়া পড়িয়াছে। রসকলা যে মানুষের আত্মার গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাষা বা অভিব্যক্তি মাত্র, এই উপলব্ধি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে যেরূপ স্পষ্টভাবে হইয়াছিল এবং হইয়া আসিয়াছে, তাহা অন্য কোন দেশে হয় নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমান ইউরোপ রসকলার এই আদর্শ অথবা প্রকৃতি এখন সবেমাত্র উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ইউরোপ এখন বুঝিতে পারিতেছে, তাহারা রসকলার যে আদর্শ লইয়া বড়াই করিতেছিল, তাহার ভিত্তি ছিল রসকলার উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ধারণায়।

ইউরোপীয় রসকলার আদর্শ-বিচ্যুতি

এই ভ্রান্ত ধারণা আধুনিক ইউরোপের জাতিরা পাইয়াছিল তাহাদের শিক্ষাগুরু-স্থানীয় গ্রীসের কাছ থেকে। যে গ্রীসের রসকলার প্রেরণা হইতে বর্ত্তমান ইউরোপ তাহার রসকলার আদর্শ লইয়াছে, তাহার ভিত্তি ছিল—আত্মার আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তির উপর নয়, বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তির নিখুঁত অভিব্যক্তির উপর। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীসের সংস্কৃতির এবং বর্ত্তমান ইউরোপের সংস্কৃতির অন্যতম স্রষ্টা মনীষী প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'রিপাব্লিক' (The Republio) নামক গ্রন্থে রসকলার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, রসকলা বাস্তব পদার্থের অনুকৃতি। এই আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়াই গ্রীসের যাবতীয় রসকলা, বিশেষতঃ গ্রীসের ভাস্কর্য্য, বাস্তব জিনিষের অথবা মানুষের বাস্তব আকৃতি ও বাহ্যরূপের অনুকরণে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করিয়াছিল। গ্রীসের এক একটি ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের চূড়ান্ত অনুকৃতিই গ্রীসের ভাস্কর্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; অর্থাৎ, গ্রীসের সংস্কৃতির সাধনা ছিল বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের উপাসনা। ইউরোপীয় জাতিরা খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের বর্ব্বরতা, এবং মধ্যযুগের (middle ages) ধর্ম্মজীবনের সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দী হইতে গ্রীসের সংস্কৃতির লুপ্ত আলোকের সন্ধান পাইয়া, পুনর্জ্জীবন (Ronaissance) লাভ করিয়া যখন বর্ত্তমান যুগের নবসভ্যতার পথে পদার্পণ করিল, তখন তাহারা তাহাদের শিক্ষাগুরু গ্রীসের নিকট হইতে রসকলার এই ভ্রান্ত আদর্শও গ্রহণ করিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবের ফলে রসকলাতে আত্মার ভাবপ্রকাশের যে চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল, গ্রীক সংস্কৃতির এই বাহ্যেন্দ্রিয়াত্মক সৌন্দর্য্যের আদর্শের প্রভাবের ফলে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। তাই আমরা দেখি যে, এখনও ইউরোপীয় রসশিল্পীগণ গ্রীসের সংস্কৃতির দাসত্বের এই প্রভাবকে দূর করিতে পারিয়া উঠিতেছেন না।

ভারতীয় রসকলার আধ্যাত্মিকতা

সুতরাং, মোটামুটি আমরা দেখিতে পাই যে, ইউরোপীয় রসকলা বাস্তবের অনুকৃতিমূলক এবং বাহ্যেন্দ্রিয়াত্মক সৌন্দর্য্যের উপাসনামূলক। এই জন্য ইউরোপীয় রসকলাকে মোটের উপর এক দিক দিয়া নকলনবিশী কলা অথবা নকল-কলা আখ্যায় এবং আর এক দিক দিয়া বিলাস-কলা আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা অনেকটা ফটোগ্রাফি শ্রেণীর। ইহার যে মূল্য নাই, তাহা

বলা যায় না। বিজ্ঞানের দিক দিয়া এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের পরিতুষ্টির দিক দিয়া ইহার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাকে আমরা রসকলার অথবা দেবজনবিদ্যার প্রকৃতির যে উচ্চ আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ভারতের রসকলা যুগে যুগে বাস্তবের অনুকৃতির এবং ইন্দ্রিয়াত্মক ভাবের আদর্শকে নিকৃষ্ট ও অযোগ্য জ্ঞান করিয়া পরিহার করিয়া আসিয়াছে, এবং আত্মার আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীসের সংস্কৃতির প্রেরণামূলক ইউরোপের শিল্পাগারসমূহে যেমন ইন্দ্রিয়াত্মক ভাবপ্রণোদক ও অনুকৃতিমূলক শিল্পের ছড়াছড়ি, ভারতবর্ষের রসকলায় ঠিক তার বিপরীত। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতিভা রসকলা হইতে ইন্দ্রিয়াত্মক ভাবকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করিয়া তাহাকে আত্মার বিশুদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি করিয়া তুলিতে যে কি অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয় সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অত্যাশ্চর্য্য বস্তু। ইহা যে কত বড় সত্য, তাহা একটা উদাহরণ হইতে বুঝা যায়। গ্রীসের ভাস্কর্য্যে এবং বর্ত্তমান ইউরোপের ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে যে সব নগ্নমূর্ত্তির ছড়াছড়ি, এইগুলি একদিকে যেমন দৈহিক শক্তি ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবের আদর্শের বিশিষ্টতার প্রকাশক, তেমনি অপর দিকে আবার অধিকাংশ স্থলেই, সেগুলি তীব্র ইন্দ্রিয়াত্মক ভাবের প্রণোদক। মোট কথা, গ্রীসের এবং বর্ত্তমান ইউরোপের ললিতকলা অধিকাংশ স্থলেই আত্মার আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি নয়, আত্মার ভাষা নয়, তাহারা দেহের শক্তি-সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-লালসার ভাষা। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনায় রসকলার যে রূপ ও আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমরা একটা অতি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি। ভারতের সাধনা আত্মার আশা এবং আকাঙ্ক্ষার এমনি বিশুদ্ধ প্রেরণামূলক যে, নগ্নমূর্ত্তির নগ্নতা হইতেও ভারতের রসকলা ইন্দ্রিয়াত্মক ভাবকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কি বোরোবোদুর বা সাঁচি স্তূপের ভাস্কর্য্যে, কি অজন্তা বা ইলোরার চিত্রশিল্পে, কি প্রতিমা-ভাস্কর্য্যে, শত শত নগ্নমূর্ত্তির সামনে দাঁড়াইয়াও মানুষের মনে বিন্দুমাত্র ইন্দ্রিয়াত্মক বা যৌন ভাবের প্ররোচনার উদ্রেক হয় না। পরন্তু, সেই নগ্নতার ভিতর দিয়াও এমনই একটা বিশুদ্ধ ভাব মনে জাগিয়া উঠে, যাহা মানুষের আত্মাকে নির্ম্মল অতীন্দ্রিয় আনন্দ-লোকে টানিয়া লইয়া যায়।

ইউরোপীয় আদর্শের ভ্রান্ত অনুকরণ

ইউরোপের রসবিদ্ মনীষীগণ যাঁহারা এক কালে ভারতবর্ষের রসকলাকে অবজ্ঞাভরে রসকলার শ্রেণীতেই স্থান দিতেন না—আজকাল রসকলার আদর্শ ও প্রকৃতির এই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, এক দিকে যদিও ভ্রান্ত ধারণার ফলে আদর্শচ্যুত আধুনিক বাঙ্গালী ও ভারতবাসী, ইউরোপীয় যৌন ভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়াত্মক রসকলার ভ্রান্ত আদর্শের অনুকরণে এবং উপভোগে মুগ্ধ, অপর দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ রসবিদ্গণ আজকাল বোরোবোদুর ও সাঁচির, অজন্তার ও ইলোরার রসকলার বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে প্রেরণা গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য রসকলায় পুনর্জীবন আনিবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। ইউরোপ আমেরিকা চাহিতেছে, ভারতের সংস্কৃতির প্রেরণা লইয়া রসকলাতে আত্মার ভাষার অভিব্যক্তি আনয়ন করিবে; এই অবস্থায় যখন দেখি, বাঙ্গালীর সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর শিল্পে, আত্মার বিশুদ্ধ ভাব-ব্যঞ্জনার আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া দেশের তরুণ শিল্পীগণ রসকলাকে ইন্দ্রিয়ের এবং যৌন তৃপ্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি করিয়া তুলিতে—রসকলাকে আত্মার ভাষার অভিব্যক্তির স্থান না দিয়া ইন্দ্রিয়ের ভাষার অভিব্যক্তি করিয়া তুলিতে, এবং অধ্যাত্মভাবের ব্যঞ্জনার রূপ প্রকাশ করিতে চেষ্টা না করিয়া বাস্তবতার অনুকরণে প্রতিভার প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত, তখন স্বভাবতঃই মনে দুঃখ হয়। এই বিজাতীয় ভ্রান্ত আদর্শ দেশের তরুণদের মন হইতে যত শীঘ্র অপসৃত হয় ততই ভাল। ভারতবর্ষের সাধনার ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপকে বুঝিবার চেষ্টা যখন আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আসিবে, তখনই এই ভ্রান্ত আদর্শ আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া যাইবে। সেই উপলব্ধি আমাদের শিক্ষিত সমাজে এখনও আসে নাই। তাই ভারতীয় রসকলায় বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা পাশ্চাত্য কলারসিক

হ্যাভেল বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজকাল ভারতবর্ষের শিক্ষা রসকলার সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত…এবং, যে বোরোবোদুরের ভাস্কর্য্য এসিয়ার উজ্জল সূর্য্য বুদ্ধের জীবন-কাহিনী মানবসভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য্যে রচিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত সাধারণ ভারতীয়দের কাছে তেমনি অর্থহীন, এস্কিমো কিম্বা ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীগণের নিকট গ্রীস এবং রোমের ভাস্কর্য্যকলা যেমন অর্থহীন। *

হ্যাভেল্ ইহা লিখিয়াছিলেন ২২ বৎসর পূর্ব্বে। এই ২২ বৎসরের মধ্যে ভারতের শিক্ষিত লোকের মধ্যে ভারতের সংস্কৃতি ও রসকলা সম্বন্ধে কতকটা উপলব্ধি আসিয়াছে সত্য, কিন্তু সাধারণ আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর দিক্ দিয়া ইহার স্পষ্ট উপলব্ধির খুব কমই প্রমাণ দেখা যায়। পরন্তু, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য নকল-কলার ও বিলাস কলার প্রভাবের একটা প্রবল ঢেউ আসিয়া রসকলার অনুভূতি-শক্তিকে আরো বিপথগামী করিয়া দিতেছে।

"That Blessed word, Mesopotamia !"

বাংলার তরুণ-দলের মধ্যে অনেকেই আজকাল সাহিত্যে ও শিল্পে "আর্ট" কথাটি এমনি একটা ধোঁয়াটে অর্থে ব্যবহার করেন যা থেকে মনে হয় যে তাঁহারা "আর্ট" যে কি জিনিস তাহা স্পষ্ট বোঝেন না, অথচ ইহাতে একটা কিছু রহস্যময় প্রকৃতি আরোপ করিয়া যৌনভাব-উত্তেজক বিলাসপ্রবণতার সঙ্গে তার একটা বিশেষ কিছু রহস্যময় সম্বন্ধ আছে বলিয়া ধরিয়া নেন্।

ইংরাজিতে একটা সুন্দর কিম্বদন্তী আছে। একটি অতি-বৃদ্ধা রমণী লোকমুখে কয়েকবার "মেসোপটেমিয়া" কথাটি শুনিয়াছিলেন। এই "মেসোপটেমিয়া" জিনিসটা যে কি, বা কোথায় অবস্থিত ছিল বা আছে, ইহাতে মানুষ, জন্তু, কি আর কিছু একটা বোঝায় তা তিনি জানিতেন না বা জানিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। কিন্তু এই "মেসোপটেমিয়া" কথাটির শব্দাড়ম্বরের প্রভাবে তাঁর কান ও প্রাণ-মন এতই বিমোহিত হইত যে যখনি তিনি মনে ভাবের আবেশ আনিবার প্রবৃত্তি বোধ করিতেন তখনি বলিয়া উঠিতেন:—'Ah, that blessed word, Mesopotamia !—"আহা! সেই যাদুকরী কথাটি—মেসোপটেমিয়া!" আর অমনি মূর্চ্ছা যাইতেন। আমাদের দেশেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তরুণ-দলের মধ্যে অনেকেরই "আর্ট" কথাটির শ্রবণে ও ব্যবহারে এই রকমই একটা যাদুকরী ভাবের আবেশের লক্ষণ দেখা যায়—"Ah, that blessed word—art !" "আহা! ঐ যাদুকরী কথাটি—আর্ট!"

রসকলা যে পরমার্থ-লাভের অথবা প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট পন্থা, এই আদর্শের অনুসরণেই যে তাহার সার্থকতা, এবং এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলেই যে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হয়, ইহা যাহারা না বুঝে, তাহারা রসকলার প্রকৃত মর্ম্ম, এবং ব্যক্তির ও জাতির জীবনে রসকলার প্রকৃত স্থানের উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না।

বিভিন্ন ধর্ম্মোপাসনায় রসকলার স্থান

রসকলার মুখ্য উদ্দেশ্য যে পরমার্থের বিশুদ্ধ অনুভূতি-লাভের সহায়তা করিয়া মানুষকে অধ্যাত্ম-লোকে উপনীত করা, ইহা ভারতের ধর্ম্মজীবনে যুগে যুগে অতি স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে, এবং তার ফলে ধর্ম্মের সঙ্গে রসকলার অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্বন্ধ ভারতবর্ষে এখনও যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অন্যান্য কোন দেশে লক্ষিত হয় না। কি সঙ্গীত, কি কাব্য, কি চিত্রণ, কি ভাস্কর্য্য, কি স্থপতিকলা, এই সকলই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের এক একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া সর্ব্বদা পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ, ধর্ম্মের অঙ্গ ছাড়া ইহাদের অন্য কোন ব্যবহার বা প্রয়োগ, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দী

* "In the present day what we call education in India stands so far aloof from all artistic culture that no Indian has ever come forward to expound the philosophy of Indian art, or to assert its rightful place by the side of the great aesthetic schools of the world. The name of Borobudur, where the story of the Light of Asia is told in one of the grandest epics man ever carved in stone, conveys no more meaning to an English-educated Indian than Athens or Rome would to an intelligent Eskimo or Laplander."—Indian Sculpture and Painting by E. B. Havell. P. 11.

পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ইহার পরবর্ত্তী যুগে যে এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষে রসকলার পরমার্থের একটা প্রধান মার্গস্বরূপ ব্যবহার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পূর্ণতার সহিত হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই রসকলার সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চার এবং অধ্যাত্মভাব-লাভের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন যুগে কি মিশর, কি গ্রীস, কি রোম সকল দেশেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য্য ও স্থপতিকলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ব্যাপকভাবে প্রেরণার প্রধান অবলম্বন শুধু বাইবেল-গ্রন্থ পাঠ বা বাইবেলের নীতি প্রচার নয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেরণার ব্যাপক ভাবে প্রচারের জন্য আমরা দেখি বিপুল ব্যবস্থা—গির্জ্জায় গির্জ্জায় সঙ্গীতের, চিত্রণ-শিল্পের, এবং স্থপতিকলার। গির্জ্জার নির্ম্মাণপ্রণালীর স্থপতিকলায় অধ্যাত্মভাব জাগাইবার যে বিরাট চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা গত দেড়সহস্র বৎসরের খৃষ্টীয় স্থপতিকলার বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। ভাস্কর্য্যকলাও যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনায় কি বিরাট সহায়তা করিয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গির্জ্জায় আমরা দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় প্রোটেষ্টাণ্ট্ নামক অন্যতম সম্প্রদায়ের গির্জ্জায়ও রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জার মত ভাস্কর্য্যের এত ছড়াছড়ি না থাকলেও যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। চিত্রণকলার প্রভূত ব্যবহার আমরা খৃষ্টীয় গির্জ্জার বিচিত্র বর্ণশোভিত স্ফটিক-বাতায়নশ্রেণীতে বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। সঙ্গীত-কলার দুইটি অঙ্গ—অর্থাৎ গীত এবং বাদ্য যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ, তাহাও আমরা সকলেই জানি। সঙ্গীতকলার অন্যতম অঙ্গ নৃত্যকে কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপাসনা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। তাহার কারণ—যে, ইউরোপে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাববিস্তারের পূর্ব্ব হইতেই সামাজিক জীবনে নৃত্যকলা এমন একটি রূপ ধারণ করিয়াছে যাহা ধর্ম্মের সহায়ক না হইয়া বিশেষ ভাবে পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার ফলে নৃত্যকে ধর্ম্মাত্মক (sacred) কলা না বলিয়া অধর্ম্মাত্মক (profane) কলার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাইব যে, ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে নৃত্যকলার স্থান ইহার ঠিক বিপরীত।

মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালী হইতে যদিও রসকলার অন্যান্য শ্রেণীকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, তথাপি স্থপতি-কলা ইহার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ, এবং মস্‌জিদ-নির্ম্মাণের রসকলার উৎকর্ষের সাহায্যে মুসলমান স্থপতিগণ উপাসকের মনে অধ্যাত্মভাব জাগাইবার বিপুল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। উপাসনার পদ্ধতিতেও সুর এবং শব্দের ছন্দোবদ্ধ সমাবেশ ও অঙ্গসঞ্চালনের ছন্দোবদ্ধ সংযত গতির সমাবেশ লক্ষিত হয়।

ভারতের ধর্ম্মসাধনায় রসকলার স্থান

ভারতবর্ষে কি হিন্দু কি বৌদ্ধ ধর্ম্মে উপাসনা-ক্ষেত্রে পাঁচটি রসকলার প্রত্যেকটিকেই এক একটি প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরিচয় আমরা ভারত-সভ্যতার প্রত্যেক যুগে পাই। রসকলাকে ধর্ম্মোপাসনার এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়করূপে এত ঘনিষ্ঠ এবং ব্যাপক ভাবে ব্যবহার পৃথিবীর আর কোনও দেশে করা হয় নাই। রসকলাকে পরোক্ষভাবে ধর্ম্মোপাসনার সহায়ক করিয়াই ভারতবর্ষ ক্ষান্ত হয় নাই, সাধারণ মানুষের মনে পরব্রহ্মের অশেষ রসানুভূতির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জন্মাইবার জন্য, একটি বিশিষ্ট প্রণালীর ভাস্কর্য্য-রসকলার বিপুল সৃষ্টি করা হইয়াছিল—যে ভাস্কর্য্য-রসকলাকে আমরা আজকাল প্রতিমা নামে অভিহিত করি, এবং যে ভাস্কর্য্য-রসকলার চর্চ্চা বর্ত্তমান সময়ে প্রতিমা-পূজা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভাস্কর্য্য-রসকলা এই প্রতিমা-পূজায় পর্য্যবসিত হওয়ায় ধর্ম্মের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা পরে আলোচনা করা হইবে। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, এই প্রতিমারূপ ভাস্কর্য্য-রসকলার সৃষ্টির মূলে যে উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ছিল তাহা পৌত্তলিকতা নয়; অর্থাৎ, একটা মাটির বা পাথরের পুতুলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা নয়, তাহার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ছিল—এই প্রতিমারূপ ভাস্কর্য্য-রসকলার সাহায্যে দেশের সমস্ত জনসাধারণের মনে অধ্যাত্ম রসবোধ জাগাইয়া দেওয়া। প্রতিমা-গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের রূপগঠনের ভ্রান্ত চেষ্টা নয়,—রসকলার সহায়তায়

রস-রূপ পরব্রহ্মের প্রকৃতির অনুভূতি সাধারণ লোকের মনে জাগাইয়া দিয়া ধর্ম্মোপাসনার একটি প্রকৃষ্ট পন্থার সহায়তা তাহাদিগকে দেওয়া। কারণ, সাধারণ লোকে জটিল দার্শনিক যুক্তির প্রয়োগের সহায়তায় পরব্রহ্মের উপলব্ধি লাভ করিতে অক্ষম; একমাত্র রসকলার অন্তশ্চৈতন্যাত্মক অনুপ্রাণনার সাহায্যেই তাহারা সেই উপলব্ধি লাভ করিতে পারে। এই বৃহৎ সত্যের অনুভূতি ভারতবর্ষে মানবসভ্যতার শৈশব-যুগ হইতেই অতি স্পষ্টভাবে মনীষীগণ উপলব্ধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রত্যেক রসকলাকে তাঁহারা অন্যান্য দেশের ধর্ম্মের মতন কেবল ধর্ম্ম-মন্দিরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল লোকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণতা জাগাইয়া দিবার জন্য ঘরে ঘরে প্রত্যেক রসকলার দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ ভাবে চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, (অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই প্রভেদ—যে, ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে স্থপতি-কলার ধর্ম্মমন্দির-রচনা, ঘরে ঘরে প্রতিমারূপে ভাস্কর্য্য-রসকলার প্রতিষ্ঠা, ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীদের আত্মার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক আলিম্পনকলার চিত্রণ, ঘরে ঘরে দৈনন্দিন গীত, বাদ্য ও নৃত্য-সহযোগে ধর্ম্মোপাসনার জীবন্ত প্রথা। ইহা করিয়াও ভারতবর্ষ ক্ষান্ত হয় নাই; দলে দলে রসশিল্পীর সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছিল—যাহাদের কাজ ছিল চিত্রকর-(পটুয়া) বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধর্ম্মভাবের বিশ্লেষক চিত্রণ-শিল্প ঘরে ঘরে সঙ্গীত-সহযোগে প্রদর্শন করা—কথক, কবি, কীর্ত্তনিয়া, বাউল-বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বগুলির অনুভূতি, কাব্য আবৃত্তি করিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, রসকলার সহায়তায় সাধারণ মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া।

ভারতের জনসাধারণের 'ঈশ্বর-অনুভূতি'

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশুদ্ধ অধ্যাত্মভাব-পূর্ণ নৃত্য, বাদ্য, গীত, কাব্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য্য এবং স্থপতিকলার ঘরে ঘরে চর্চ্চার বিপুল প্রবাহ বহাইয়া দিবার এই যে যুগ-যুগ-ব্যাপী বিরাট্ চেষ্টা,—তাহার ফলে আমরা কি দেখিতে পাই? এই দেখিতে পাই, যে, বিশ্বের মূলীভূত যে সকল বৃহৎ অধ্যাত্ম সত্যের উপলব্ধি, অন্যান্য দেশে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, বড় বড় মনীষীদের মধ্যেও বিরল এবং কষ্টসাধ্য, ঘরে ঘরে নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষের মধ্যে তাহার সহজ অনুভূতি ভারতবর্ষের একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের নিরক্ষর জন-সাধারণের মধ্যেও 'ঈশ্বর-অনুভূতি'র (God conscious-ness) এই যে জীবন্ত ব্যাপক ভাব, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য মনীষীগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ, ইহা তাঁহাদের কল্পনার একটি অতীত বস্তু। পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে, যে, ভারতবর্ষের এই যে বিশেষত্ব যাহা আধুনিক যুগের শত অবনতি ও দীনতা সত্ত্বেও ভারতের সংস্কৃতিকে এখনও জগতের সংস্কৃতির উচ্চাসনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূলে বিশুদ্ধ রসকলার অধ্যাত্ম ভাবের সার্ব্বজনীন প্রচারের বিপুল ব্যবস্থা।

রসকলার আধ্যাত্মিক প্রেরণা

আমরা দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মোপাসনার ক্ষেত্রে জন-সাধারণের পক্ষে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ অথবা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রচেষ্টা অপেক্ষাও বিশুদ্ধ রসকলার ব্যাপক ভাবে চর্চ্চা অধিকতর প্রভাববান্। তাহার কারণ—যে, অসাধারণ মনীষা-যুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে জ্ঞানমার্গ দ্বারা পরব্রহ্মের উপলব্ধি দুর্ল্লভ। পরন্তু, বিশুদ্ধ রসকলা চর্চ্চার দ্বারা অন্তশ্চৈতন্যে রসের সঞ্চার এবং পরমাত্মার আনন্দলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। আবার ঠিক এই কারণেই আমরা দেখিতে পাইব যে, অন্যান্য রসকলা অপেক্ষা সঙ্গীতকলা জাতির জীবনে ধর্ম্মোপাসনার এবং ভূমার আনন্দলাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কেন না, কাব্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য্য, স্থপতিকলা ইত্যাদি রসকলা হইতেও সঙ্গীতকলা মানুষের মনে নিবিড়তর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কারণ, অন্যান্য রসকলা হইতে সঙ্গীতকলা অধিকতর সূক্ষ্ম, এবং ইহার রসগ্রহণ করিতে মননবৃত্তির চেষ্টার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম।

বিশ্বের নৃত্যশীলতা

আবার সঙ্গীতকলার গীত এবং বাদ্য এই দুইটি অঙ্গ হইতেও নৃত্যকলা মানুষের জীবনে অধিকতর প্রভাববান্। তাহার কয়েকটি কারণ আছে; প্রধানত:—গীত এবং বাদ্য-কলার অভ্যাস করিতেও যতটুকু চেষ্টার প্রয়োজন, নৃত্যকলার অভ্যাসে তাহার প্রয়োজন ইহা হইতেও কম। কারণ, নৃত্য মানুষের পক্ষে অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক। শিশু মায়ের গর্ভে থাকিতেই, চৈতন্য লাভের পূর্ব্ব হইতেই স্বতঃই নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, এবং আমরা দেখিতে পাই যে, বাছুর ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই নৃত্য করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, নৃত্য যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের একটি অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্ম;—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নৃত্যময়। প্রতি অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সৌরমণ্ডল এবং অগণিত নক্ষত্র-মণ্ডল নৃত্যের অবারিত আনন্দের ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভূমার যে এই নৃত্য, ইহা সত্য এবং শুভ। ইহার মধ্যে কোন মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না, কেন না ইহা পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ আনন্দের অভিব্যক্তি।

ভূমার নৃত্য-ছন্দে জীবনের সমন্বয়

সুতরাং, বিশ্বের এই যে সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল নৃত্যের ধারা, ইহার সঙ্গে জীবনের সমন্বয় করিতে পারিলে, ভূমার উপলব্ধি এবং ভূমার আনন্দ লাভের যেরূপ স্বাভাবিক উপায় লাভ হয়, সেইরূপ আর কোন প্রকারেই হয় না। এই জন্যই জীবনকে ভূমার আনন্দের ছন্দে ঢালিয়া দিবার পক্ষে নৃত্যই আর-সকল রসকলা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সহজ উপায়। এবং, এই সত্য ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে উপলব্ধ, স্বীকৃত এবং কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

চিরন্তনী

শ্রী কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত এম্-এ, বি-এস্‌সি, এম্-বি

প্রথম নয়ন মেলি' চাহিতে আকাশ পানে
দেখিনু সে নীলাঞ্চলখানি
বিছায়ে বিশ্বের গায় শূন্য-দৃষ্টি কারে চায়
বিরহিণী—তাহারে না জানি।
নিতি সে সকাল-সাঁঝে সাজে অভিনব সাজে
নয়নে নূতন রাগ মাখি,'
নীলাম্বরে সীমাহারা ফুটে রবি শশী তারা
কভু ইন্দ্রধনু-রেখা আঁকি'।
কভু নয়নের বারি নিবারিতে নাহি পারি'
উথলি' বরষা-বারি ঝরে,
রক্ত পীত বর্ণমালা পলাশ চম্পক ঢালা
পুষ্প সম ফুটে থরে থরে।
উষসীর বর্ণে লেখা পূর্ব্বরাগ রক্ত-রেখা,
দীপ্তপ্রেম দগ্ধ দ্বিপ্রহরে,
স্বর্ণরশ্মি অনুরাগে সায়াহ্ন-গগনে জাগে, —
সূর্য্য ডুবে যায় অগোচরে।
সীমান্তের পর-পারে খদ্যোত ধূপ-হারে
সাজি' কোথা চলে অভিসারে,—
সীমন্তের ইন্দুলেখা যায় কিনা যায় দেখা
অনন্তের অসীম আঁধারে!

ঘরে বাইরে

গীতাভিনয়-ভূমিকা

কঞ্জিভেরাম, "গভর্ণমেণ্ট মহিলা ট্রেনিং বিদ্যালয়ের" ছাত্রী কুমারী ডি, কে, পট্টমল সম্প্রতি 'সাবিত্রী-সত্যবান' নামক গীতাভিনয়-ভূমিকায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য, প্রথম

পুরস্কার রূপে একটি সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুমারী পট্টমল যেন সঙ্গীতে অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি এজন্য বহু প্রশংসাপত্র ও পদক ইতিপূর্ব্বেই লাভ করিয়াছেন।

তরবারি-প্রতিযোগিতা

বার্ণে, রেন্‌লে ক্লাবের তরবারি-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বিনীদ্বয় তরবারি-ক্রীড়া করিতেছেন।

গোল-চাকি

এই অত্যদ্ভুত গোল-চাকি খেলা জার্ম্মানীর একটি অতিপ্রিয় প্রমোদ-ক্রীড়া। প্রত্যেক ক্রীড়া-সঙ্ঘ এবং ব্যায়াম ক্ষেত্রেরই ইহা একটি প্রধান অনুষ্ঠান।

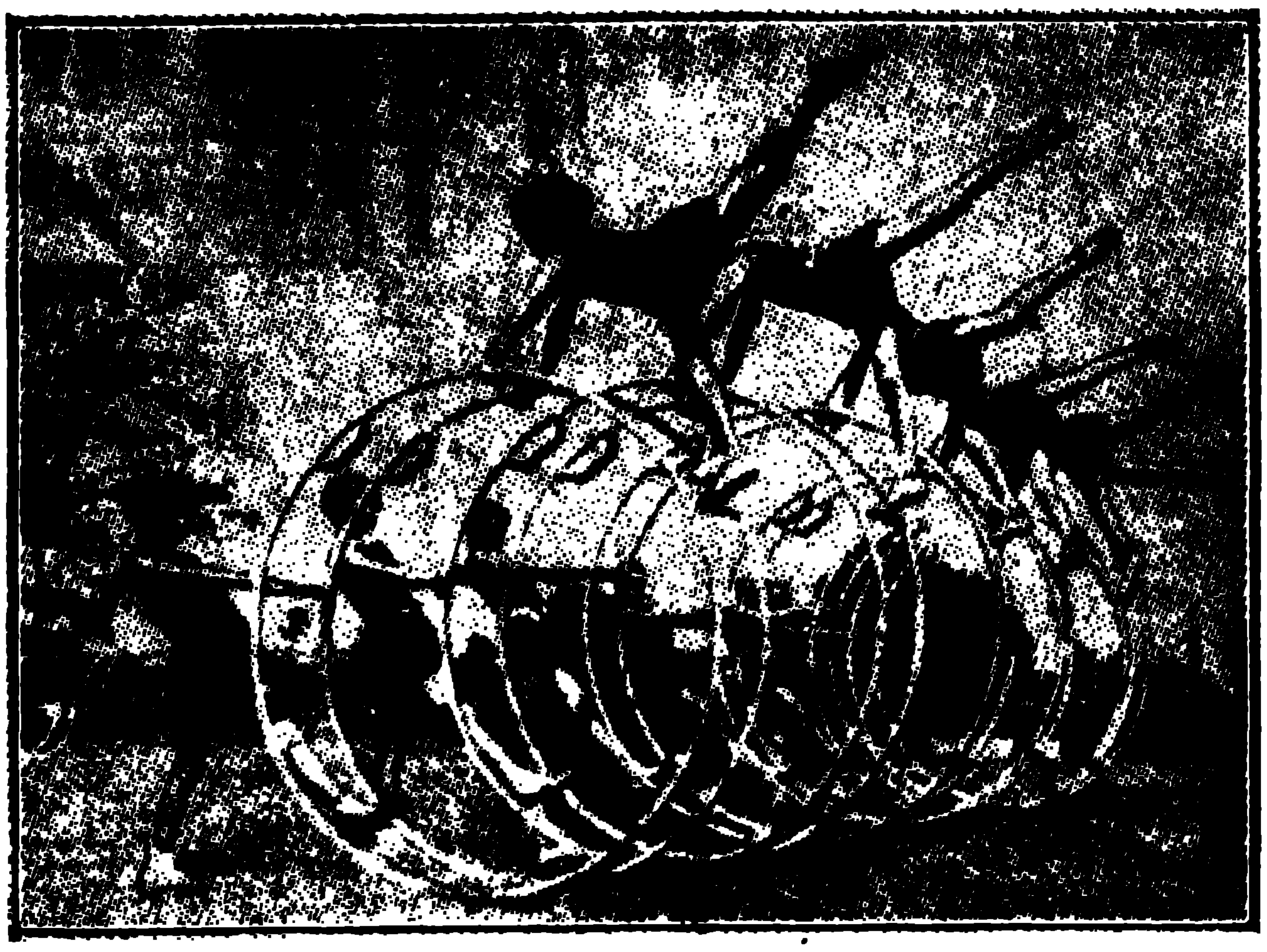

নারী ব্যায়াম-সম্মিলন

আন্তর্জ্জাতিক নারী ব্যায়াম-সম্মিলনে বৃটিশ বালিকা-দল যোগদান করিতে চলিয়াছেন।

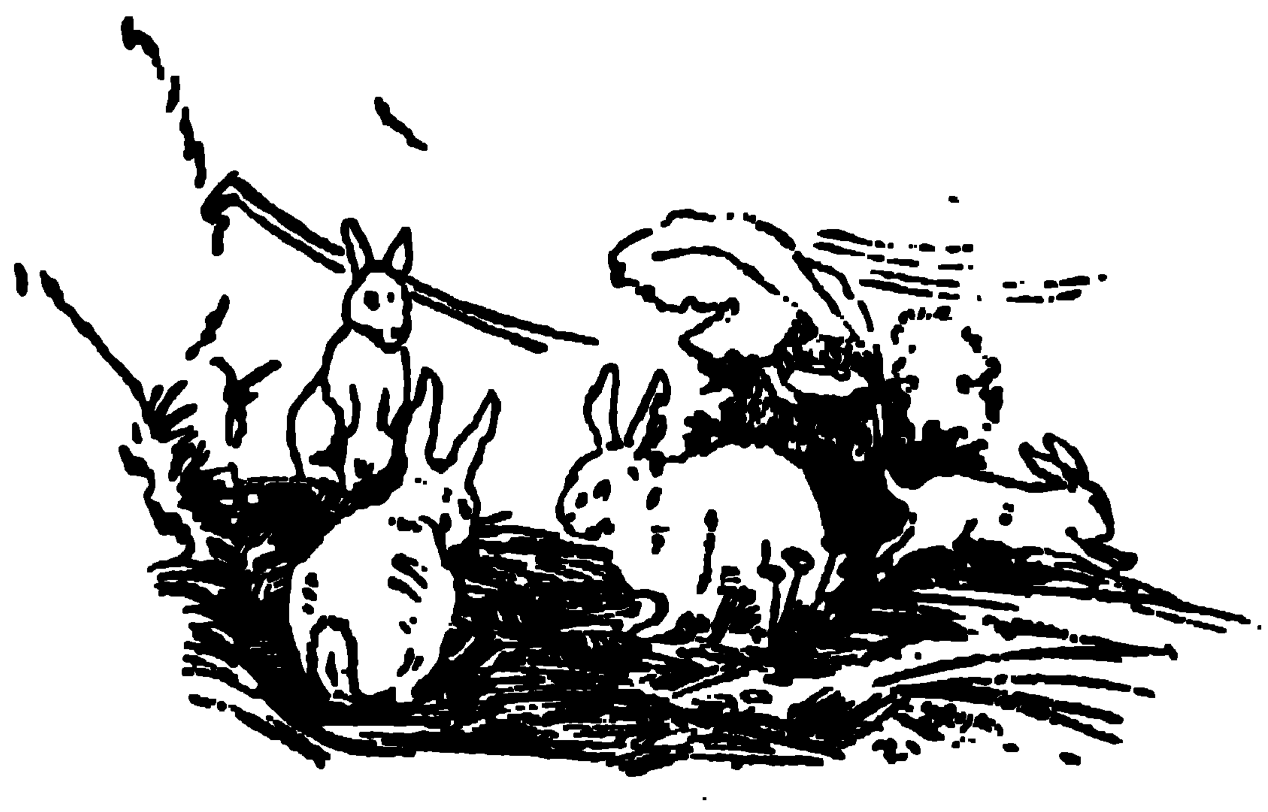

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

তৃতীয় পক্ষ

শ্রী অনন্তকুমার সান্যাল

বারে বারে তুমি একই কথা বল দিনে রেতে শতবার,
ও ছাড়া কি কিছু বলিবার মত খুঁজিয়া পাও না আর ?
অবলার জাতি যা বলাবে বলি, মানিতে যা হবে মানি—
কত আর কব—তোমারি পায়েতে রেখেছি পরাণখানি।

সরযূর সাথে হাসাহাসি করি, চিঠি করি টানাটানি ?
হাঁ তা ত করিই, চিঠি তার এলে আমিই তা আগে জানি
নিরালাতে গিয়ে দুই জনে বসে' এক সাথে মিলে' পড়ি,
তাই নিয়ে শেষে ওতে ও আমাতে হেসে যাই গড়াগড়ি।
তার পর সেই চিঠির জবাব আমারি লিখিতে হবে,
না দিলে তখনি আঁখি ছল-ছল—অশ্রু-দরিয়া ববে।
যেমন যা পারি লিখে' দিই বসে'—লেখা ত সে হয় ছাই—
রোজ রোজ বল নূতন নূতন কথা কোথা খুঁজে' পাই ?
রমেশ লিখেছে, এমন মিষ্টি সরযূ তোমার লেখা,
কোথা ভুলে' যাও এ-সকল কথা দুজনে হইলে দেখা ?
'আর যাহা লেখে, মুখ ফুটে' আমি বলিতে তোমার কাছে
পারিব না কভু—এতও তোমার জামাতার পেটে আছে ?
চোখের সুমুখে, মনে হয় যেন, হাতে হাত ধরি' সব
কথাগুলা তার হাসিয়া দাঁড়ায় থামাইয়া কলরব।
ও কি, মুখখানি শুকাইল কেন, কোন্‌খানে হ'ল দোষ ?
কি কথা বলিলে খুসী হও মনে, কিসে বাড়ে তব রোষ,
তিনটি বছর কাটিল তবুও কিছুই বুঝিতে নারি—
খুলে' যদি বল, সকল সময় তেমনি চলিতে পারি।

সরযূ আমার মেয়ে ? সেত জানি, যেদিন বলেছ ডেকে
আদরের চোখে দেখিতে তাহারে, ঠিক সেই দিন থেকে—
ভুল বলিয়াছি, তারো আগে থেকে, প্রথম যেদিন এসে
হাত ধরে' মোর নিয়ে গেল ঘরে, বিয়ে-রাতে হেসে হেসে,
সেদিন হইতে গা ছুঁয়ে তোমার দিব্বি করিতে পারি,
বুক ভেঙে যায় কখনো দেখিলে মুখখানি ওর ভারি।
নিজে করি সব, গরব করি না, কখনো পরাণ ধরি'
বলি না উহারে তৃণ-কুটীটিরে রাখিতে দু'ভাগ করি।
যখন যে কথা জেগে ওঠে মনে কখনো লুকাতে গেলে,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি' মুখপানে চায়—একেবারে কেঁদে ফেলে।
তবে এও ঠিক, ওর কাছে বলে' যতখানি সুখ পাই।
রাগ ক'রো নাক, তোমারে বলিতে লজ্জায় মরে' যাই।
সরযূ আমার এক বছরের ছোট, ও ত তাই বলে,
তবুও সকল রকম কথাই উহার সঙ্গে চলে।
কি বলে আমায় শোন নাই বুঝি ?—বলিতেও হাসি পায়—
মাথা খাও মোর একথা যেন গো কানে তার নাহি যায়—
বলে, মা, তোমার সোনার গঠনে ময়ূরকণ্ঠী সাড়ি,
ডাগর নয়নে গভীর চাউনি, তুলনা দিতে না পারি।
হাসিতে তোমার মনের কালিমা উজলি' হাসিয়া উঠে,
প্রভাত-গগনে যেমন করিয়া মেঘ-ফাঁকে রোদ ফুটে।

কি বল, তোমাতে মন নাই মোর, বুড়ো বলে' হেলা করি ?
ছি ছি ছি, ব'লো না, পাপ হয় ওতে—তোমারে কি বিস্মরি'
কুম্ভীপাকের নরকে পচিব ? সে ভয় আমার আছে।
তবুও কথাটা তুলিলেই যদি, খুলে' বলি তোমা কাছে।
পতি যে নারীর কতবড় গুরু, স্বরগ-পথের সাথী,
কানের কাছেতে শুনি তা নিত্য, কিবা দিবা কিবা রাতি।
শুধাই তোমারে, রাগ ক'রো নাক, আচ্ছা সে সব মুনি—
তিন-কাল তাঁরা দেখিতে পেতেন, তোমার মুখেই শুনি—
যাঁদের আদেশে শ্মশানের পাশে বালিকার বলি হয়,
তরুণ-মনের গোপন গুহায় বেদনা জমিয়া রয়,
শমন যাহার ভবন-দুয়ারে ডেকে লয় পরিচয়,
তারি সাথে যদি তরুণী বালার পরলোক গাঁথা হয়,
বল তব শুনি, পশু ও মানবে কি ভেদ তাঁহারা রাখে ?
দুই নখে করে' ছেঁড়ে মনটিরে—বড় দেখে ভোগটাকে ?

জ্যোছ্‌না-পুলক খেলে যদি বুকে তবে ত সরসী নাচে ;
শিশিরে শীতল জলের অধিক কি চাহ তাহার কাছে ?
কি কথা বলিতে কি কথা আসিয়া হইল মুখের বা'র,—
ক্ষমা কর পতি,—সতীর দেবতা, তোমারে নমস্কার।

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

লেক-ডিষ্ট্রিক্ট্‌স্‌

এ মুলুকে ছুটী হ'লেই অনেকে যায় লেক-ডিষ্ট্রিক্ট্‌সে, আর দলে দলে আসে আমেরিকান টুরিষ্ট্‌ সেখানকার দৃশ্য দেখ্‌বে ব'লে। দেশে থাক্‌তে এর এমন কিছু জান্‌তাম না, কেবল ইদানীং বিলাতফেরৎ দিশী ভায়াদের মুখে আদায় কর্‌ছে। আমার দিশী ভাই-বোনেরাও ছুটী পেলেই Lake districts ঘুরে আসেন। শুনে শুনে আমরাও ভাব্‌লুম দেখেই আসা যাক্‌ কেমন জায়গা। গাছ-পালা, ঝরণা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার—তা ছাড়া ওটা হ'চ্ছে Rob Royএর দেশ। স্কটের "Rob Roy" খানা যখন পড়েছিলাম দেশে ব'সে, তখন

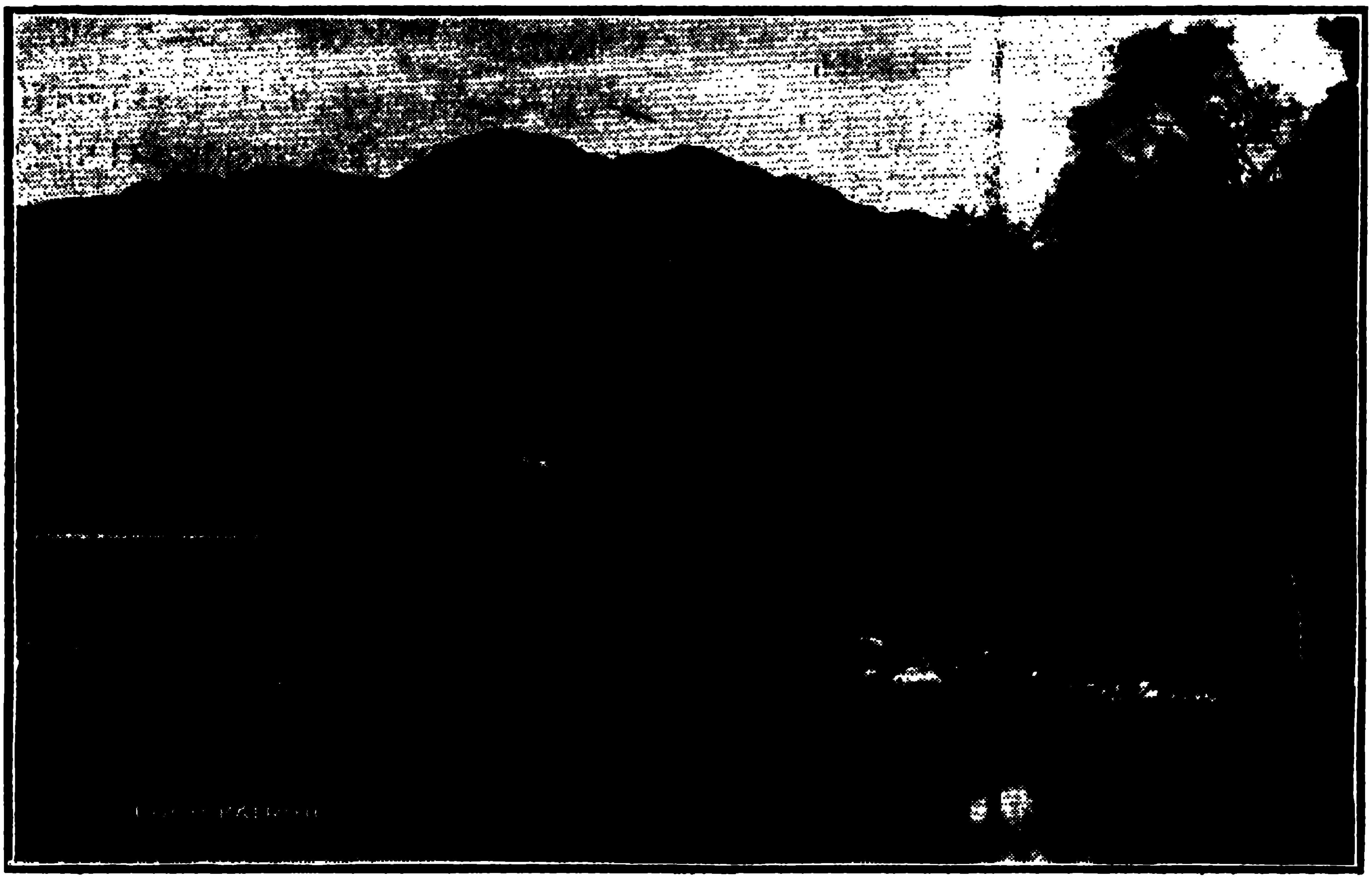

লেক্‌ ক্যাট্রিন

ছাড়া। Lake districts-এর নামও শুনিনি। Lake districts ব'লে কোন ছাপ আমার মনের কোণে তেমন পড়েও নি। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে এই ব্যবসাদার জাতেরা Lake districtsএর নাম বহুদূরে প্রচার ক'রে ফেলেছে ও নানা ফন্দী-ফিকির বা'র ক'রে বিদেশী—বিশেষ আমেরিকান্‌ যাত্রীদের কাছ থেকে বেশ টাকাও

কেন জানি মনে হয়েছিল যদি কোন সুযোগে Rob Royএর দেশটা দেখে আস্‌তে পারি। তাই Rob Royএর দেশটা দেখার জন্য Lake districts যাবার ইচ্ছা আমার মনেও জেগে উঠ্‌ল। স্কটের "Lady of the Lake" খানা তোমার পড়া না থাকলে পোড়ো, ঐ "Lady of the Lake"এর জন্যই এ জায়গাটা প্রসিদ্ধ,—তাই সেই লেডীর বাসস্থানটা

দেখ্‌বার ইচ্ছাটাই আর-সবার মনেও প্রবল হ'ল।

মাধু, গুপ্ত, আমি ও ডাক্তার এই চারজনে মিলেই বেরিয়ে পড়্‌ব মতলব করেছি—হঠাৎ লণ্ডনে দেখা একটি বাঙ্গালী মেয়ে—মিস্ রায় (আমি ঠাট্টা ক'রে ডাকি বেঁটে মাসী)—ময়মনসিংহ স্কুলের হেডমিস্‌ট্রেস্ আমাদের এখানে এসে উপস্থিত। মাসী মেয়েটি বেশ ভাল, এখানে একটি টীচার ট্রেনিং কোর্স নিয়ে এসেছিল—ছুটী ফুরিয়ে এসেছে—সস্ত্রীক মেজর দাসদের সঙ্গে এক জাহাজেই দেশে ফিরবে—মতলব কর্‌লাম। এবং, আর যা যা দেখ্‌ব মনে করেছিলাম, তা কর্‌তে হ'লে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চার ঘোড়ার টানা গাড়ীতে যেতে হয়, কারণ ঐ ভেতরের রাস্তাটা প্রাইভেট লোকের, তারা মোটর চালিয়ে রাস্তা খারাপ কর্‌তে দিতে নারাজ। আমরা পাঁচজন ছাড়া প্রায় একশতের উপর লোক সেই মাঠের মাঝের হোটেলে একত্র হ'লাম,—সে-দলের গুটিকয়েক অন্য দেশীয় লোক ছাড়া সবাই আমেরিকান্, ইণ্ডিয়ান্ কেবল আমরাই পাঁচটি।

আহারান্তে বাইরে এসে দেখি খান আষ্টেক চার ঘোড়া

লেক্ ক্যাট্রিন—অপর দৃশ্য

এতদিন পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকায় কিছু দেখ্‌তে পারেনি, কিন্তু Lake districts না দেখে দেশে ফিরবে না, তাই এডিনবরায় আমাদের কাছে এসে হাজির হয়েছে। তখন আমরা পাঁচ-জন মিলে পরদিন প্রাতেই বেরিয়ে পড়্‌লাম। রেলে ক'রে মাইল কয়েক দৌড়ে এক জায়গায় গিয়ে নেমে পড়্‌লাম। সেখানে খাবার ব্যবস্থা বেশ আছে—আর সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দুপাশের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেতে হয়। আমরা Lakeএ পৌঁছে ষ্টিমারে চ'ড়ে বেড়াব লাগান গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে; সে গাড়ীও আবার একটু নূতন ধরণের—মাটি থেকে অনেক উঁচু; বেঁটে-লম্বা সবাইকে মই লাগিয়ে উঠ্‌তে হ'ল। গাড়ীগুলি লম্বায় আমাদের দেশের বড় বাসের মত, ভেতরে গদীপাতা, কোনটা গদীছাড়া কাঠের বেঞ্চি, একটি বেঞ্চিতে পাঁচজন ক'রে লোক বস্‌তে পারে, এইরকম লম্বায় পাঁচখানা বেঞ্চি আছে,—তারপর কোচ্‌ম্যানের সিট্। মাথার ওপর নীলাকাশ (এ দেশে মেঘ-ঢাকা আকাশ) ছাড়া কোন আবরণ নেই, গাড়ীর পাশও খোলা, শুধু ঝাঁকানিতে দু'পাশের লোক যাতে না

প'ড়ে যায় সেজন্য একটু কাঠের রেলিং দেওয়া।

এই অসমতল পার্ব্বত্যপথে, এই চারপাশ-খোলা অদ্ভুত-ধরণের গাড়ীখানা চার-চারটা ঘোড়া টেনে নিয়ে মাইলের পর মাইল যাবে, আর আমরা তার ভেতর থেকে দৃশ্য দেখ্‌ব, ভাব্‌তেই ত প্রাণটা যেন কেঁপে উঠ্‌ল! পাশে ছিল মাসী—বল্‌লাম, "মাসী, শেষে কি বেঘোরে প্রাণটা যাবে—যেমন ষণ্ডা ঘোড়া তেমনি খোলা গাড়ী আর তেমনি সরু রাস্তা, চোখের সাম্‌নেতে একটা পাহাড় দৃষ্টি রোধ ক'রে রেখেছে;

এদিকে আকাশ অন্ধকার ক'রে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। তখন সবাই মিলে গাড়ীতে ওঠার তাগিদ প'ড়ে গেল। দেখ্‌লাম ভাত-খেকো আমরা কেন, মাংস-খেকো সাহেব-পুঙ্গবেরাও গাড়ীতে চ'ড়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পার্ব্বে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল। যা'ই হোক্‌, আমাদের গাড়ীতে আমাদের সঙ্গী হলেন—১৬টি সাহেব-মেম। বৃষ্টির সঙ্গে দিব্বি ঝড়ও উঠ্‌ল, দৃশ্য দেখার চাইতে তখন আমাদের তিনজনের মাথার কাপড় ও সাহেব-মেমদের টুপী ঠিক রাখাই হ'ল শক্ত।

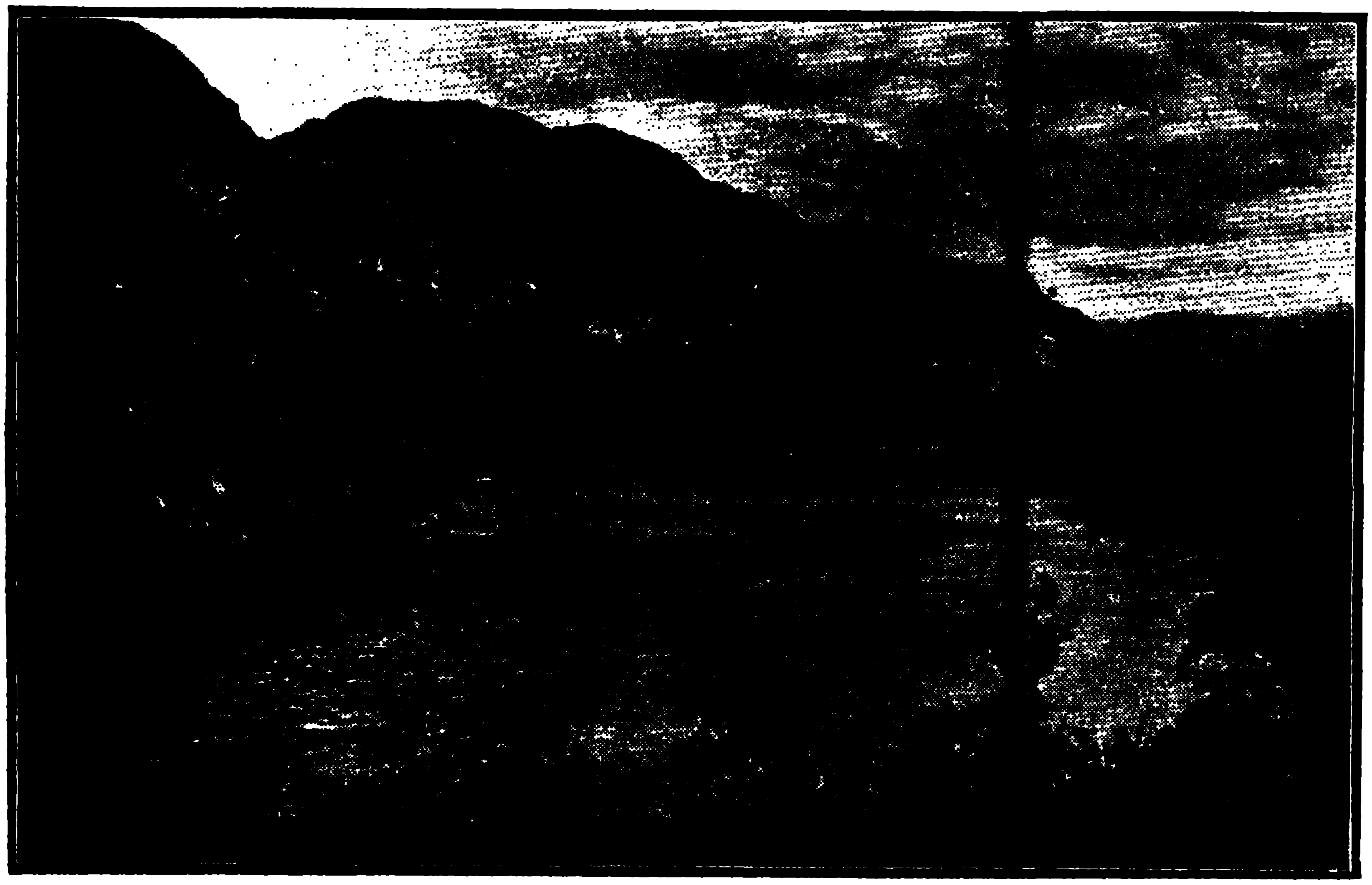

লেক্‌ ক্যাট্রিন—দৃশ্যান্তর

ওর উপর দিয়ে অশ্বপুঙ্গবেরা গাড়ী টান্‌তে গিয়ে কোন নালা-নর্দ্দমায় না ফেলে দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে দেয়!·· "চেয়ে দেখি—মাসীর ভয় আমার চাইতেও বেশী, বেচারা বড্ড ঘাব্‌ড়ে গেছে।—এমন সময় মাধু এসে হাজির। পাছে কোন কথায় তার মনেও ভয়ের ছোঁয়াচ লেগে যায়, তাই আমিই আবার হাসিমুখে সুর বদ্‌লে নিয়ে বল্‌লাম—"উঠে পড় মাসী চট্‌ ক'রে, ভাল সিটগুলি বেছে নিয়ে একটু আরাম ক'রে বসা যাক্‌।" মাসী বল্লে, "না—আগে ঐ সাহেব ব্যাটারা উঠুক্‌, তবে।"

শেষে এমন হ'ল—মুষলধারে বৃষ্টি, যা কখনও এ দেশে হয় না। এ দেশের বৃষ্টি ঐ ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়ের চোখের জলের মত; কিন্তু সেদিন সেই খোলা মাঠে বৃষ্টি নাম্‌ল যেন আমাদের দেশের ডাক-ছেড়ে-কাঁদুনে মেয়ের মত, বড় বড় ফোঁটায়—অনবরত।

ও রকম বৃষ্টি বাংলা মুলুকে দেখা আমাদের অভ্যাস আছে, কিন্তু সাহেবরা গেল বড্ডই ভড়্‌কে। সেদিন আবার আমরা পাহাড়ে রাস্তায় যাব, শীত হবে ব'লে বর্ষাতি (Rain-coat) না নিয়ে নিয়েছিলাম ওভারকোট। মেম-

সাহেবরাও ঠিক তা'ই, কেবল গুটিকয়েক অতি-সাবধানী সাহেব বর্ষাতি এবং ওভারকোট দুইই নেয়েছিলেন। কিন্তু তা হ'লে কি হবে, মাথার উপর ঢাকা নেই, আর ঐ বৃষ্টি আমাদের কোট কাপড় ছেড়ে সেমিজের ভেতর পর্য্যন্ত জপ্‌জপে ক'রে ভিজিয়ে দিল, আর শীতে ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি দিয়ে দাঁতে দাঁতে লেগে ঠক্ ঠক্ শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। যার যে ক'টি ছাতা সঙ্গে ছিল তা খুলে মেয়েদের মাথাগুলো বাঁচাবার ব্যবস্থা পুরুষরা কর্‌লে বটে কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু বাঁচ্‌ল না বরং ছাতার চারপাশের জল প'ড়ে মাঝে যে বেচারারা ব'সে থেকে তাদের পাশটা দু'পাশের লোকের চাপে বাঁচাচ্ছিল তাও ভিজে উঠ্‌ল।

সত্যি কথা বল্‌তে গেলে কষ্টের একশেষ—যতই পাহাড়ে উঠ্‌ছি শীত তত বাড়ছে, তাতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে জামা-কাপড়-জুতোয় মুড়ে ব'সে থাকা যে কি কষ্টকর তা সেদিন আমরা সেই শতাধিক প্রাণী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম! থেকে থেকে মনে হচ্ছিল—যেন গায়ের রক্ত জমাট বরফে পরিণত হ'চ্ছে, পেটের ভেতর খিল ধ'রে যাচ্ছে।

সাহেবরা হ'চ্ছে স্ফূর্ত্তিবাজ লোক; চুপ ক'রে মুখ বুজে ব'সে থেকে এই কষ্টটিকে কষ্ট হ'চ্ছে মনে ক'রে সহ্য করা আরো কষ্টকর দেখে লাগিয়ে দিলে চেঁচামেচি। আমাদের পিছনে-সামনে আরও খানকয়েক গাড়ী। সব যাত্রীরই এক অবস্থা! এ-গাড়ীর লোক ও-গাড়ীর লোকদের ডেকে নিয়ে গল্প কর্‌বার চেষ্টা করলে; কিন্তু বৃথা হ'ল—জলের ছাটে খোলা মাঠে কেউ কারো কথা শুন্‌তে পায় না, কেবল এক অস্পষ্ট চীৎকারধ্বনি কানে পৌছায় মাত্র। কেউ আবার (অবশ্য আমেরিকান্‌রা) এ দেশের লোকদের ভারী গালাগাল দিলে ও-রকম খেলো ও খোলা গাড়ীর ব্যবস্থায়। কেউ আবার আকাশের দেবতার ওপর রাগ ক'রে বৃষ্টির সঙ্গে ঝগড়া করার মতলব কর্‌লে। এই রকম হট্টগোল,—আমরাও সবেতেই যোগ দিয়ে সব বিষয় নিয়েই মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তে লাগলাম। না, তবু পথ যেন আর ফুরায় না! কথা হ'ল, ভূতের গল্প করা যাক্, সেটাই জম্‌বে সব চেয়ে বেশী; কিন্তু কে করে ভূতের গল্প কেই বা জমায় আসর—যাকেই ভূতের গল্প কর্‌তে বলা হ'চ্ছে সে-ই শীতে ভেতরে ভেতরে নিজেই জ'মে উঠ্‌ছে।

ঠিক এমন সময় আরম্ভ হ'ল রব্ রয়ের (Rob Roy) দেশ। সবার দেহেই যেন বেশ একটা নূতন শিহরণ খেলে গেল। তখন রব্ রয়কে নিয়েই সব যাত্রী নূতন ধরণের গল্প, মন্তব্য, টিপ্পনী জুড়ে দিলে।

মাঝে সরু রাস্তা, তার দু'পাশে কোথাও শুধু ঘাস, কচিৎ কোথাও বড় গাছ নিয়ে পাহাড়, ও প্রায়ই ছোট ছোট ঝর্ণা। আবার কোন পাহাড়ে খুব সরু নদীও ব'য়ে যাচ্ছে—অনেক স্থলে তা এত সঙ্কীর্ণ যে লম্বা পা-ওয়ালা লোক এপারে এক পা এবং ওপারে আর এক পা দিয়ে পারাপার হ'তে পারে। কোন নদী এত অগভীর যে তার নীচের ছোট পাথরগুলি সব বেশ চোখে পড়্‌ছে। তবে ছোট-বড় সব নদী-নালাতেই স্রোত আছে, পাহাড়ে মেয়ে কিনা—দুর্দ্দান্ত!...কোথাও হয় ত খুব বড় একটা পাথর বা ঢিবি চোখে পড়্‌ল—যাত্রীরা মন্তব্য কর্‌লেন, ঐ ওরই আড়াল থেকে Rob Roy শত্রুদের পরাস্ত কর্‌ত। কোন ঝর্ণা দেখে বলা হ'ল, এইটে Rob Roy লাফিয়ে পার হ'ত, তাই অপর-পক্ষ তাকে কিছুতেই পরাস্ত কর্‌তে পার্‌ত না। এইরকম নানা কথায়, কল্পনায় ও হাসি-ঠাট্টায় সব যাত্রীরা মিলে বেশ আমোদ-আহ্লাদে মেতে বৃষ্টিটাকে একেবারে উপেক্ষা ক'রে কাটান গেল। তবু যেন রাস্তা আর ফুরায় না—গল্পের মশলা প্রায় ফুরিয়ে এল কিন্তু আমাদের গন্তব্য স্থান এসে পৌছাল না। তখন মাসীকে বল্‌লাম (সে বেচারী আমাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে পাশে বসেছিল) "মাসী গান কর; এই ঝড়-বাদলে রবি ঠাকুরের গান গুটিকয়েক চালাও, বেশ হবে।" মাসী মেয়ে ভাল, সহজেই রাজী হ'ল—গান আরম্ভ কর্‌লে। মাসীর গান আগেও শুনেছি, গাইয়ে মেয়ে, কিন্তু সে দিনের গান যেন লাগ্‌ল সবচেয়ে ভাল। কবিসম্রাট্ কত কবিতাই লিখেছেন—জল-বাদল ও প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে; মাসী যে গানগুলি গাইল তা যেন "কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল রে—।" সে কবিতা-গুলি ত আমি নিজেই কতবার পড়েছি; কিন্তু কল্‌কাতার দোতালা তেতালা বাড়ীতে আবদ্ধ হ'য়ে ব'সে ও-কবিতা প'ড়ে যেন ঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'ত না—যেমন সেদিন হ'ল সত্যিই বাদল মাথায় ক'রে, প্রকৃতির কোলে ব'সে। আমাদের সঙ্গীদল একবর্ণও ত বোঝে নাই, তবু ধর্‌লে মাসীকে চীৎকার ক'রে গান কর্‌বার জন্য, মাসীও তখন বেশ গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিলে। ডাক্তারও মাঝে মাঝে অনুবাদ ক'রে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, তারাও যতটুকু বুঝ্‌লে তা'ই নিয়েই বেশ বাহবা দিলে। মাসীর গান শুন্‌তে শুন্‌তে শীঘ্রই আমরা ষ্টীমার-ঘাটে পৌছে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

গোলক-ধাঁধা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

ভাসে চাঁদ নীল গগনে,
নাচে ডাল সমীরণে।
লালিমা উষার ভালে,
চষে ক্ষেত চাষী হালে॥

কোলে মা'র শিশু হাসে,
মাতে বন ফুলের বাসে।
টল-মল নদীর জলে
নেয়ে দাঁড় বেয়ে চলে॥

নিঝুমে ঝিল্লী ডাকে,
পথে বৌ কল্‌সী-কাঁখে।
কোথায় ঐ বাঁশী বাজে,
টানে বৌ ঘোম্‌টা লাজে॥

ছুপুরে ছায়ার তলে
খেলে গায় ছেলের দলে।
পূরবী হাওয়া মেতে'
খেলে ঢেউ হরিত্‌ ক্ষেতে॥

মাঠেতে খেলার মেলা
সোনালি সাঁজের বেলা।
গোধূলির ছায়া ঘিরে,
ধেনুপাল ঘরে ফিরে॥

আকাশে উজল তারা,
মুখরা নিঝর-ধারা।
পাখী গায় বনের কোণে,
উছলে আবেগ মনে॥

বরষে বাদল-ধারা,
নিঝরী পাগল পারা।
কমলের বুকে মধু,
উতলা ভোম্‌রা-বঁধু॥

কোকিলের কুহু-তানে
কি কথা জাগে প্রাণে?
জোছনার আঁধার-আলো,
কে কারে বাসে ভালো?

যতনে বাসা বাঁধা,
ছুদিনের হাসা কাঁদা।
জীবনে মরণেতে
কে দিল মালা গেঁথে?

প্রাণে প্রাণ বাঁধে ভেলা,
অসীমে অশেষ খেলা।
প্রণয়ী প্রেমের গানে
খুঁজে পথ কাহার পানে?

অবিরাম চলে জগৎ,
কে তারে দেখায় রে পথ ?
ধরারে করে' সরা
কে করে ভাঙ্গা-গড়া ?

কেন হয় ব্যথার খনি
পরাণের পরশ-মণি ?
ঝিনুকের ভেঙ্গে' মরম
কেন হয় মোতির জনম ?

মরণের পর-পারে
পে'তে প্রাণ চাহে কারে ?
বিরহের ব্যথা কেন
মিলনের সোপান হেন ?

ধরণীর ধূলায় গড়া
দেহে কার আসন জোড়া,
করে' সে ভবের খেলা
কোথা যায় ভোরের বেলা ?

অতলের তলে নিধি
কি লাগি' গড়ে বিধি ?
ধরা কয় তারার সাথে
কি কথা নিশীথ-রাতে ?

বিশাল এই গোলক-ধাঁধা
কি প্রেমের ডোরে বাঁধা ?
বঁধু তার বঁধুর সনে
মিলে কোন্ স্বরগ-কোণে ?

সসীমের বুকের মাঝে
অসীমের সাড়া বাজে।
ফুটা'য়ে ফুলে ফুলে
নেবে সে কোলে তুলে' ॥

—বিচিত্রা, ভাদ্র, ১৩৩৮।

'ম'কার মহিমা

শ্রী প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

'ওঁ ব্রহ্মা'—নাম স্মরণ করিয়া, আজ এই মহাঅষ্টমী দিনে 'ম'কারের অসীম মহিমা দেখাইতে আরম্ভ করিলাম। মানব প্রথমে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া 'মা-মা' শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে এবং মহামায়ার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সূতিকা-শ্রম হইতে শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত এই রঙ্গমঞ্চের প্রারব্ধ কর্ম্মাভিনয় সম্পাদন করে। মহামহিম মহিমার্ণব মান্যবর মহামহোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া, মাষ্টার মিষ্টার মহাশয়, মৌলবী মোল্লা মৌলানা, এম্-এ এম্-বি এম্-এস্‌সি পর্য্যন্ত উপাধিতে 'ম'কারের আধিপত্য একচেটিয়া। মুদীর মুড়ি-মুড়্‌কি মধু-মিশ্রি, ময়রার মণ্ডা-মিঠাই মতিচুর-ক্ষীরমোহন, বর্দ্ধমানের মিহিদানায় ও কলিকাতার ভীমনাগে 'ম'কারের অধিষ্ঠান। মাছ-মাংস, মুগ মসুরী, মাসকলাই মটরে তুমি বিদ্যমান। কাশ্মীর হইতে মাইশোর, হিমালয় হইতে কুমারিকা, বোম্বে হইতে বার্ম্মা পর্য্যন্ত তোমার মহিমা প্রচারিত। মান-অপমান উত্তম-মধ্যম, প্রথম-অধম, সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ, আমোদপ্রমোদে তোমার অধিকার।

মুহম্মদের ইস্‌লাম ধর্ম্মে, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সেবাশ্রমে ও মহম্মদ মহ্‌সীনের দানধর্ম্মে তোমার সমান অনুরাগ। মহম্মদ ঘোরী, সুলতান মামুদ, তাইমুরলঙ্গ প্রভৃতি আক্রমণকারীগণও তোমার প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। রামনামের মাধুরী, মুড়ির মহিমা, বিক্রমাদিত্যের বিক্রম ও মানসিংহ টোডরমলের ক্ষমতায় তুমি বর্ত্তমান। মধুমাসে মাধবী-বিতানে মাধব-মিলনে, মালতী মল্লিকা চামেলী কামিনী-কুসুমে, আম্রমুকুলে, পদ্মমৃণালে, প্রথম প্রেমের উন্মাদনায়,—মরুভূমির মরীচিকায়,—কাম মোহ মদ মাৎসর্য্যে, হিন্দুর ধর্ম্মমন্দিরে মঠে, মুসলমানের নমাজে,

মনুমেণ্ট ফোর্ট-উইলিয়ামে, কুতবমিনার ইমামবারাতে, সোমনাথের ও কামাখ্যার মহামায়ার মন্দিরে, জুমা মস্‌জিদ ময়ূর-সিংহাসন মতিমহল মমতাজ-মহল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, —মহারাজা জমিদারের মটরকার মোসাহেব ম্যানেজারে, ষ্টিমার ট্রাম ব্রুহাম অমনিবাস ও ব্যোমযানে, নিম দাড়িম্বে, আম জাম কমলা বাদামে, মশা মাছি মশারিতে, মাঠে ময়দানে পল্লীগ্রামে, জামা মুজা বিনামা সেমিজ কামজে, রেশমী রুমালে, মিল মেসিনে হোমিওপেথিক বেয়োকেমিক হেকিমি মুষ্টিযোগ মেডিসিনে, মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে মুসাবিদায়, বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে মেসোপটেমিয়ার মহাসমরে, আমাদের সম্রাট্ মহামহিমান্বিত পঞ্চমজর্জ মহোদয়ের ভারতে শুভাগমনে, মর্লি মিণ্টো মণ্টেগু চেম্‌স্‌-ফোর্ড রিফর্ম ও আরউইন-গান্ধী এগ্রিমেণ্টে, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায়, বীরভূমের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট দত্তমহাশয়ের সহ-ধর্ম্মিণী প্রতিষ্ঠিত মহিলা-মঙ্গল সমিতিতে তুমি দেদীপ্যমান।

শ্রীমদ্ভাগত, বাল্মীকির রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারতে, মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধে, সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী সীতারাম আনন্দমঠ কমলাকান্তে, রমেশচন্দ্রের সমাজ মাধবীকঙ্কণে, হেমচন্দ্রের কাব্যে, মিল্টনের মহাকাব্যে, হোমার মেরিডিথ মেকলে মুর মোথিও আর্ণল্ডে, মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশীতে, মল্লীনাথের টীকায়, অমিয়-নিমাইচরিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও রামকৃষ্ণ কথামৃতে তোমার অমরত্ব প্রমাণ হইতেছে। সোম মহাশয়ের মধুস্মৃতিতে, সমাদ্দার মহাশয়ের সমসাময়িক ভারতে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণে, রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ভ্রান্ত-প্রেমে, অমৃতলালের ও অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাট্যকলায়, ভারতবর্ষ-সম্পাদক মহাশয়ের মুসাফির-মঞ্জিল হিমালয়ে, শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজ রামের সুমতি বামুনের মেয়ে পণ্ডিতমশাই ও মেজদিদিতে, কুমুদ মল্লিকের মধুর কাব্যে, ওমরখৈয়ামে, বঙ্গের প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়ক ধর্ম্মসঙ্গীতে, মুকুন্দরাম মদনমোহনের কাব্যামৃতে, এমন কি মহিলা-লেখিকাগণের মধ্যেও কামিনী রায় গিরীন্দ্রমোহিনী স্বর্ণকুমারী মানকুমারী, নিরুপমা দেবী অনুরূপা দেবী'র কাব্য ও উপন্যাসে, মিস্ মেয়োর মাদার-ইণ্ডিয়াতে তোমার মহিমা অসামান্য।

তোমার মহিমা আর কি বলিব? সম্ভ্রান্ত মজ্‌লিসে, মহোৎসবে, মাঘোৎসবে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, সভাসমিতি মেনেজিং-কমিটি কমিশন সম্মেলনীতে, মেসে, প্ল্যাটফর্ম্মে, হারমনিয়াম গ্রামোফোনে, মেয়েমহলে, আম্‌লা কাম্‌লা মজুরী মুহুরী মক্কেল মোক্তার মফঃস্বল মুন্সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট্ কমিশনার মিনিষ্টারে, মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বার চেয়ারম্যান মেয়রে, হাকিমের হুকুমে, বড় মানুষের মেজাজে, মোসাহেবের তোষামোদে, রাজা-মহারাজার মন্ত্রী অমাত্য ওমরাহ সৈন্যসামন্তে, এমন কি সামান্য কর্ম্মচারীতে ও গোটা মা'নের মজুরীতে তোমার সমান ক্ষমতাই মালুম হয়।

মধু-চন্দ্রমা-যামিনীতে, ধুমধাম নামধাম জাঁকজমক আড়ম্বর সমারোহে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সমাধিমন্দিরে মুনির আশ্রমে, মোগলের বেগমমহলে, আনন্দময়ী মা'র আগমনে, রমণীর ঘোমটায়—

"রমণীর মুখ!
মুখময় মাখা প্রেম, গোঁফ্ নাই মুলায়েম্—"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

প্রথম সলাজ-মধুর চুম্বনে, মন্থর গমনে, মণি মাণিক্য মুকুতায়, বহুমূল্য মস্‌লিনে, পরমাসুন্দরী রমণী—স্বামী-সহ-ধর্ম্মিণীতে, মেয়ে-জামাইয়ে, মেঘমালা উর্ম্মিমালা মুকুতা-কুসুম-মালায়, সুরম্য হর্ম্ম্যমালায়, মনোহর কুসুমদামে, মনোমুগ্ধকর মানস-প্রতিমায়, কোমল কমনীয় রমণীর রূপমাধুরীতে, বামার মধুর কণ্ঠে, মধুর মিলনে—

"সে মাধুরী অনুপম কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয়—"

(রজনী সেন)

ইন্দ্রের অমরাবতী ও শিবের কৈলাসধামে, প্রকৃতির লীলাভূমি আসাম ও হিমালয়ে, প্রাণময় ব্রহ্মাণ্ডে—

"ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময়, মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময় সংসারে—"

(হেমচন্দ্র)

জন্মভূমি বসুমতীতে, মৃদুমন্দ সমীরণে,—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, মহাপ্রলয়ে, ভূমিকম্পে,ঘনতমসাবৃত অম্বরে তোমাকে দেখিতে পাই।

ভূমণ্ডল ও আমেরিকার মানচিত্রে, মাসিক পত্রিকার সমালোচনায়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও স্তম্ভে, পুস্তকের প্রারম্ভে ভূমিকা মুখবন্ধ ও উপক্রমণিকায়, মুখ্য কর্ম্মে, উপমেয় ও উপমানে—

"যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু-মিলনে,
যথা কমলিনী মলিনী যামিনী-যোগে থেকে।"

মহাত্মা গান্ধী (মোহনচাঁদ করমচাঁদ) মৌলনা মহম্মদ আলী ও পণ্ডিত মতিলালের স্বদেশপ্রেমে, মহাবলবন্ত ভীমের বিক্রমে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—মৃত্যু ও সম্মুখসংগ্রামে, কুমার অধিক্রম মজুমদারের মেসোপটেমিয়া গমনে, মহেশ বাবুর ইকনমিক ফার্ম্মেসীতে, ইন্দুমাধব মল্লিকের ইকমিকে ও ভ্রমণ-কাহিনীতে, শিরোমণি মহাশয়দের ধর্ম্মমীমাংসায়, ব্রোমাইড্ এনলার্জমেণ্টে, কেমিকেল একজামিনে, মেট্রিকুলেশন ইণ্টার-মিডিয়েট একজামিনেশনে, গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমায়, মেটেরিয়া মেডিকায়, এনাটমিতে, মেডানের ফিল্ম সিনেমা-কোম্পানীতে, বীমা লিমিটেড মিউচুয়েল কোম্পানীতে তুমিই সতত বিরাজমান।

মান-সম্ভ্রম অভিমান মানভঞ্জন পদমর্য্যাদা আত্মসম্মান ভড়ং-ভাঁড়ামি নেমকহারামিতে, পূর্ণিমা অমাবস্যায়, জন্ম-জন্মান্তরে, জন্মমৃত্যুতে, অমরধামে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, কুম্ভ-মেলার মিছিলে, তামাসায়, মথুরার যমুনাতীরে বিশ্রাম-ঘাটে, জ্যামিতি পরিমিতিতে, জমিজমা জমিদারী মহাজনীতে, অন্তিমকালে রামনামে, আগমে নিগমে তুমি সার।

উম্মাদ মূর্চ্ছা মৃগী উদরাময় আমাশয় মেলেরিয়া সংক্রামক ব্যারামে, মৃগয়া-গমনে, বনমধ্যে ভ্রমণে, মায়ামৃগে, পরিশ্রমের পর বিশ্রামে, মস্তকের মুকুটে, এম-সি-সি মোহনবাগান টিমে, মাথার মণিতে, মহরম রমজানে, মাতালের একগুঁয়েমিতে, তামাকের ছিলিমে, মৌতাতের মাত্রায়, এডভারটাইজমেণ্ট, রোমাণ্টিক মুভমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট পোর্টমেণ্ট ও সেটলমেণ্টে, সমাজের অমঙ্গলের চরমসীমায় ইকনমিক প্রব্লেমে, বিষম সমস্যায়, সম্রাটের মঙ্গলকামনায়, সত্যমঙ্গল-প্রেমময় পরমেশ্বরের পরম অনুকম্পায়—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে—"
(রজনী সেন)

টাইম্‌স ষ্টেটস্‌মেন অমৃতবাজার মোহাম্মদী,মুজিবর রহমানের মুসলমান, হেমলতা দেবীর বঙ্গলক্ষ্মী, রামানন্দ বাবুর মডার্ণ রিভিউ, মর্ণিং-পোষ্ট মাঞ্চেষ্টার-গার্ডিয়ান বসুমতী বন্দেমাতরম্ ও মানসী-মর্ম্মবাণীতে এবং রামপুরহাটের রাঢ়দীপিকার সম্পাদক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূল্যবান সমালোচনায় তোমার অসীম ক্ষমতা একচেটিয়া (মনোপলি)।..সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্!—ইতি সমাপ্ত।

গীতায় গৃহধর্ম্ম—শ্রী শরৎচন্দ্র ধর। প্রকাশক—গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস, ৪১।১।২ সি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দশ আনা।

ধর্ম্মাত্ম কর্ম্মের সাধনায় এই মায়া ও মৃত্যুময় সংসারে কিরূপে আনন্দরূপমমৃতমের সন্ধান ও স্পর্শলাভ করা যায়, গীতোক্ত মতবাদ দ্বারা, এই গ্রন্থে তাহার একটি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় জীবনাদর্শে ইহা পুণ্যবর্ত্তিকারূপে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মর্ম্মর-প্রাসাদ—শ্রী চারুবালা সরস্বতী। ১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, আর্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা।

দারিদ্র্যের মহত্বকে ঐহিক অর্থ-সম্পদের উর্দ্ধে বিজয়ীর স্থান দান করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী উপদেশচ্ছলে শিশুদের সম্মুখে সনাতন ভারতীয় আদর্শকেই সম্মানিত-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই উদ্‌ভ্রান্ত ঐহিকতার যুগে আমরা এইরূপ আদর্শের সার্থকতার সমর্থন করি। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

ভূতুড়ে দেশ—শ্রী অখিল নিয়োগী ও শ্রী প্রভাংশু গুপ্ত। ২০, কলেজ রো, কলিকাতা, ডেভেনহাম এণ্ড কোম্পানী হইতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা

ছেলেদের জন্য রচিত ভূতের গল্প। বুড়োদেরও এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে হয় এমনি চিত্তাকর্ষক কাহিনী। বাংলা দেশে এমন সুন্দর ছাপা ও ছবিতে ভরা ছেলেদের বই খুব বেশী নাই। অন্যতম গ্রন্থকার অখিল বাবুর আঁকা ছবিগুলি চমৎকার হইয়াছে। ছেলেরা এ বই হাতে পাইলে লুফিয়া লইবে, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

—বঃ সঃ

বীণা—শ্রী অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দশ আনা।

সুকবি শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এই মৌলিক রচনাপূর্ণ পদ্য-গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত কবির বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বাঙ্গলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সুকবির নিপুণ করস্পর্শে "বীণা"র সহজ, সুন্দর, সাবলীল ভাষার পদ্যগুলি মনোমুগ্ধকর বীণার ঝঙ্কারের মতই মধুর ও প্রাণস্পর্শী। ইহার "অতীত ও বর্ত্তমান", "আবিষ্কার," "অপূর্ণ" "শেষ রশ্মি", "কাব্যশ্রী","দান" প্রভৃতি পদ্যগুলির ভাব সুপরিস্ফুট ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা কবির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রী চারুবালা সরকার

প্রচারক—সম্পাদক শ্রী অতুল রায়। ২ এফ্ নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা; প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা।

ইহা একখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ইহার বিজ্ঞাপন-বহুল মুদ্রণ-পরিপাট্য দেখিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ-প্রকাশিত পত্রিকাদর্শ-অনুকারী পত্রিকা বিশেষ বলিয়াই আমরা ইহাকে মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম, প্রবন্ধ-গৌরবেও ইহা পশ্চাদ্‌পাংক্তেয় নহে, এমন কি, ইহাকে প্রথম-শ্রেণীর একখানি সাময়িক পত্রিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুদ্রণ-পরিপাট্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইহার চিত্র-সৌষ্ঠবও মূল্যবান। আমরা স্পষ্টকণ্ঠেই বলিতে পারি, এইরূপ একখানি পত্রিকার সত্য সত্যই প্রয়োজন ছিল।

—বঃ সঃ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
পোষ্ট নং

ভূত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

বাড়ী ফির্‌তে খানিকটা রাস্তা Reggieর সঙ্গে আস্‌তে হয়। রাস্তায় তখনো ভালো করে' লোক-চলাচল সুরু হয়নি, স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শে নিশান্তের ক্লান্তি দূর হয়ে যাওয়াতে Reggie মৃদুগলায় গান ধরে' দিয়েছে। হঠাৎ গানের একটা কলির মাঝখানে থেমে সে বল্‌লে, "এত কি ভাব্‌ছ?"

আমি বল্‌লাম, "কিছু না", এবং তার হাত থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেলাম।

কিন্তু নিজের মনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ ছিল না। কেন না আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, কোকোজীর অসুখ সার্‌বে এটা এবার সত্যই Walterএর কথা, আমার কথা নয়। আমি এত ক্লান্ত হয়েছিলাম এবং Walterএর প্রভাব এত বেশী আমাকে অভিভূত করেছিল, যে অন্যান্য বারের মতো এবারে আর নিজের হাতে Phyllisএর শেষ প্রশ্নের জবাব লিখ্‌তে আমার মনে ছিল না। Walterএর লেখা শেষ হয়ে আস্‌ছে এমন সময় নিজের অমনোযোগিতা মনে পড়ে' ভয়ে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে দেখ্‌লাম অকারণেই ভয় পেয়েছি। বুঝতে পার্‌লাম না, এবারে আমার অন্যান্য বারের ছলনার শাস্তিস্বরূপ আমার নিজেরই মন আমার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌ল কি না।

সমস্তদিন ভেবেও এ রহস্যের কোনো কিনারা কর্‌তে পার্‌লাম না। এটা জান্‌তাম, খুব ভালোরকম নিঃসংশয় না হয়ে কোনো কথা বলা Walterএর স্বভাব নয়। কিন্তু কোকোজীর অসুখ ত সার্‌বার মতো নয়? ভাব্‌লাম, কে জানে, হয় ত Walterএর যেরকম মন, তাতে আমারই মতো দয়া-পরবশ হয়েই Phyllisকে সেও মিথ্যা আশা দিয়ে ভুলিয়েছে।

কোকোজীর বাড়ী যাবার জন্যে আমাদের কোনোদিন ডাক্‌তে হত না, আমরা নিজে থেকেই যেতাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা হতেই কোকোজীর আহ্বান এল। বুঝ্‌লাম, আহ্বানটা Phyllisএর, এবং সেটা আমাকে নয়, Walterকে।

হাতে একটা জরুরী কাজ ছিল, সেটা সেরে যেতে যেতে সেদিন একটু দেরি হয়ে গেল। কোকোজী বল্‌লে, "যেদিন তোমাদের আমরা চাই না, সেদিন সন্ধ্যা না হতেই এক এক করে' এসে উদয় হও, তারপর খুব মোটা করে' বল্‌লেও চলে' যেতে বলা হচ্ছে সেটা বুঝ্‌তে পার না। আজ ডেকে পাঠালাম বলেই কি দুঘণ্টা দেরি করে' এলে?"

আমি বল্‌লাম, "খুব জরুরী একটা কাজ ছিল।"

কোকোজী বল্‌লে, "সে খবরটা আমাদের দেবার ব্যবস্থা কর্‌লে মিছিমিছি তোমার পথ চেয়ে আমাদের এতটা সময় নষ্ট কর্‌তে হত না।"

আমি বল্‌লাম, "অপরাধ হয়ে গিয়েছে।"

সে বল্‌লে, "সেটা স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়। অপরাধ তোমরা খুব সহজেই স্বীকার কর, কিন্তু সেটা সত্যি যে অপরাধ—তা খুব ভালো করে' অনুভব কখনোই করো না, এ আমি জোর করে' বল্‌তে পারি। তোমার এ ধরণের lapse—এ আজ নতুন নয়, এমনও কতদিন দেখেছি, অমুক সময়ে আস্‌বে কথা দিয়েও সে প্রতিশ্রুতি তুমি রক্ষা করনি। এবং এও জানি, ভবিষ্যতে আরওই ওরকম দেখ্‌তে হবে।"

আমি বল্‌লাম, "ভবিষ্যতে যাতে আর না হয়, তা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।"

সে বল্‌লে, "আমি রাগ করি এজন্যে আমার বেলায় তা কর্‌বে, কিন্তু অপরের বেলায়? শোনো, রাগারাগির কথা

নয়। এটা তোমার একলার দোষও নয়। সমস্ত বাঙালী-দের মধ্যেই এই জিনিসটা আমি লক্ষ্য করেছি। তোমরা নিজের সময়কে যতটা মূল্যবান্ মনে কর অপরের সময়কে ততটা মূল্যবান্ ভাবো না। তোমার বোঝা উচিত যে তোমারই মতো জরুরী কাজ আমারও থাকতে পার্‌ত। তুমি আস্‌বে না বা দেরিতে আস্‌বে জান্‌তে পার্‌লে আমি স্বচ্ছন্দে তোমার অপেক্ষা না করে' সে সময়টা নিজের কাজে ব্যয় কর্‌তে পার্‌তাম।"

Roggio বল্‌লে, "তুমি ভুল কর্‌ছ। বাঙালীর কাছে তাদের নিজেদের সময়ের মূল্যও কিছু নেই, অপরের সময়ের মূল্যও নেই সেই কারণেই। ওরা লোককে বাড়ীতে আস্‌তে বলে' নিজেরাই তাদের জন্যে অপেক্ষা করে না, হয় ত যাদের ডাকে তারা যে আস্‌বে সেটাও ভালো করে' বিশ্বাস করে না,—এবং ঠিক সেই জন্যেই অন্যেরাও যে সত্যি সত্যি তাদের কথার উপর নির্ভর করে' আর-সব ফেলে' তাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে—সেটাও ভালো করে' ভাব্‌তে পারে না।"

আমি বল্‌লাম, "কথাটা আমাকে নিয়েই সুরু হয়েছিল, তিরস্কারগুলোও আমাকে কর্‌লেই ভালো ছিল না কি, বাঙালী জাতটাকে নিয়ে টানাটানি না কর্‌লে চলে না বুঝি?"

কোকোজী একটুখানি মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লে, "বাঙালী জাতির নিন্দা শুন্‌লে কোনো বাঙালী চটে' যায় সেটা আজ তুমি প্রথম দেখালে।"

তাঁর স্বামীর কোনো কথাতে Phyllis কখনো কথা বল্‌তেন না। কোকোজী যখন রূঢ় ব্যবহার কর্‌ত, কতদিন তাঁর মুখের দিকে আমরা চেয়ে দেখেছি, কোনোদিন বুঝ্‌তে পারিনি কি ভাবে সেগুলিকে তিনি নিচ্ছেন। মনে হত কিছু যেন তিনি শুন্‌তে পাচ্ছেন না। অথবা, কথাগুলো রূঢ় হচ্ছে তা বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। কিম্বা তিনি ভাব্‌ছেন, এদের দেশে এই রকম করে' কথা বলাই রীতি। সেদিনও তাঁর মুখের দিকে চাইলাম, তিনি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে উঠে গেলেন। সমবেদনা তাঁর মুখে কি সেদিন ছায়াপাত করেছিল, সেইটেই লুকোবার জন্যে চলে' গেলেন? কে জানে?

Roggio বল্‌লে, "যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এবার কিছু জরিমানা দিয়ে মিটিয়ে ফেল দেখি? গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আজ বিয়ার ছাড়া আর কিছু আন্‌লে হয় না?"

কোকোজী বল্‌লে, "বিয়ারে যেমন তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়—এমন আর কিছুতে হয় না। তুমি যে জিনিসটার কথা বল্‌ছ সেটা তৃষ্ণা নয়, আর কিছু। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, এখানে alcohol খেয়ে মাৎলামো করা চল্‌বে না।"

Roggio কোকোজীকে অত্যন্ত ভয় কর্‌ত। পাছে আবার তাকে নিয়ে সুরু হয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "আচ্ছা, বিয়ারই সই।"

টাকা নিয়ে লোক গেল।

Phyllis ফিরে এসে বস্‌লে আবার পেন্সিল ধর্‌লাম। সেদিন প্রথমেই এল Walter। Phyllisই সকলের আগে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। দেখ্‌লাম,পরিচিত বন্ধুর জন্যে সাগ্রহে বহুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বার পর তার দেখা পেলে মানুষের মুখ যেমন তৃপ্তিতে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে তৃপ্তিকে আমিও যে ভাগ করে' পেলাম তা অবশ্য তিনি জান্‌তে পার্‌লেন না। ঔৎসুক্যে তাঁর চোখদুটি জ্বলজ্বল কর্‌তে লাগ্‌ল। সে চোখদুটিতে বিষাদের কালো ছায়া আর রহস্যময় চিন্তার গভীরতা ছাড়া আর কিছু কোনোদিন দেখিনি।

আবার দুজনে চিরপরিচিত বন্ধুর মতো নানা বিষয়ে কথা চল্‌তে লাগ্‌ল। বিবাহ করে' নির্ব্বাসনে আস্‌বার আগে যে-জীবনের মধ্যে তিনি ছিলেন, তার নানা ছোটখাটো ঘটনা, ছোট ছোট হাসিপরিহাস, বিশ্রম্ভালাপের মতো জমে উঠ্‌ল। নিত্যগোপাল এসেছিল, তাকে আর Reggieকে নিয়ে কোকোজী পাশের ঘরে চলে গেল। আমরা দুজন Walter-কে নিয়ে একঘরে রইলাম।

আমি বিব্রত বোধ কর্‌ছিলাম না বল্‌লে সত্য বলা হবে না, কিন্তু এই নির্ব্বাসিতাকে এইটুকু আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা আমার সাধ্য ছিল না। আমি জান্‌তাম না, Walter সত্যিই কে, সে আমারই মগ্নমনের ছদ্মরূপ কিনা। এটা লক্ষ্য কর্‌তাম, Phyllisএর যে কথার যেমন জবাব তার

প্রতি আমার মনোভাব নিয়ে আমি দিতাম, Walterও তাই দিয়ে থাকে। Phyllisএর সম্বন্ধে আমার মনে যে একটা শ্রদ্ধাভরা মুগ্ধতার ভাব ছিল, Walterএর প্রত্যেকটি কথায় সেই জিনিষটিই প্রকাশ পেত, আমি লক্ষ্য কর্‌তাম। কিন্তু আবার এও দেখ্‌তাম, যে দেশে আমি কোনোদিন যাইনি সে দেশ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা সে এমন অবলীলায় বল্‌ত যা আমার পক্ষে কিছুতেই বলতে পারা সম্ভব ছিল না। কিন্তু Sub-consciousএর থিওরিকে কতদূর অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া যে যায় তাও ত আমি জান্‌তাম? এমন হতে ত বাধা নেই, যে পৃথিবীতে মন জিনিষটা একটাই, সকলের চোখের আড়ালে সে ঐক্যের স্থান, বালুঢাকা নদী-স্রোতের মতো, প্রতি মানুষের মনে তারা আলাদা এক-একটি উৎসমুখ? হতে ত পারে, মগ্ন-চৈতন্যের দ্বারা সেই গভীরতার সঙ্গে আমার যোগ স্থাপিত হচ্ছে, পৃথিবীর যে-কোনো মানুষ যা-কিছু জানে, তা জান্‌তে আমারও কিছু বাধা নেই? কিন্তু এত বেশী বিচার কর্‌বার প্রবৃত্তি তখন আমার ছিল না। যদি Walterকে ফাঁকি বলেও নিঃসংশয়ে জান্‌তাম, তবু সে ফাঁকি Phyllisকে আমার দিতে হত।

বাড়ী যাবার পথে নিত্যগোপাল বল্‌লে, "তোমাতে আর Reggieতে বেশ আছ যাহোক্।"

আমি বল্‌লাম, "কি রকম?"

সে বল্‌লে, "শ্রীহস্ত হাতে কর্‌বার লোভে একজন সাজ্‌লেন palmist; তুমি তাঁর চেয়েও বুদ্ধিমান লোক, এমন ভড়ং নিয়েছ যে এরপর তোমাকে সুন্দরী আর চোখের আড়াল কর্‌তে চাইবেন না। কি কথা হলো তোমাদের এতক্ষণ ধরে'?"

বিরক্তিতে আমার দাঁতে দাঁত চেপে বস্‌তে লাগ্‌ল। প্রাণপণে নিজকে সম্বরণ করে' নিয়ে বল্‌লাম, "ভড়ং বলেই যদি তোমার মনে হয় তবে ভয় পেয়ে ওরকম লোক হাসিয়ে পালাও কেন?"

সে বল্‌লে, "রাগ চটো কেন? আমি ত আর কারুকে বল্‌তে যাচ্ছি না?"

তার সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে পাশের একটা গলি ধরে' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে' এলাম

(ক্রমশঃ)

সান্ত্বনা

শ্রীসেবক

ফুটেই থাকে কাঁটা আমার
        কমল যদি তুল্‌তে গিয়ে,—
ফিরেই থাকি ক্লান্ত যদি
        কাঁটায়-কাটা হাতটি নিয়ে,—
পূজার ডালাখানি এ আর
না-ই হ'ল মোর ভরা এবার…
বিফলতার বেদনা?—বেশ্!
        তা'ই বলে' নই দুঃখী আমি;
করেছি ত সাধ্যমতন
        যতন তবু, জীবন-স্বামি!

সুরটি কেবল সাধ্‌তে গিয়ে
        যদিই প্রথম মীড়ের সাথে
বীণা আমার যায় টুটে',—হায়,
        তার ছিঁড়ে' যায় কর-আঘাতে,—
দেব্‌তা, তোমার বন্দনা-গান
অম্‌নি যদিই হয় অবসান,—
হোক্‌না প্রভু!…নাই অপমান;
        কিসের অনুশোচনা?
জানি,—আমিই করেছি ত
        ও নামগান-রচনা!

দেউল-দোরে যেতেই যদি
        দুয়ার হ'ল রুদ্ধ তোমার,—
মাথায় লব' অভয় আশিস্
        যদিই সে সাধ ব্যর্থ আমার,—
নয়ন ছেপে আস্‌বে কি জল?
বক্ষ চেপে কাঁদ্‌ব কেবল?
ভুলিনি ত, তবু—তোমার
        পরম-চরণ-পরশ-করা
দোরের গোড়ায় লুটিয়ে পড়া,—
        ধাপের ধুলো মাথায় ধরা!

নানা কথা

ভারত ও ব্রিটেন

মূর্ত্ত-ভারত মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে চলিলেন এবং মহৎ গ্রেট-ব্রিটেন তাঁহার সম্বর্দ্ধনা-সমারোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান—ইহা জগৎ-যুগেতিহাসের স্মরণীয় সংঘটন। ইহা স্মরণীয়তর-রূপে ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্বর্ণাঙ্কিত হইবে, ঈশ্বরেচ্ছায়, এই চক্র-মিলন যদি চিত্ত-মিলনে স্থায়িত্ব লাভ করে। কবি-অনুভূতি কহিতেছে—

"...মেলিতেছে দল ত্যাগনির্ম্মল
শুচিসুশুভ্র শান্তি-কমল।"

আমরাও যেন শান্তির সৌরভ পাইতেছি।—কুয়াসা কাটিয়া এখনই কখন সূর্য্যোদয় হইয়া মহাভারতের নব-দিবার সূচনা করিবে!...শান্তি! শান্তি! শান্তি!

*

দুর্ভিক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাণী

সন্দিগ্ধ ত্যাগসাধক কবিধর্ম্মীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কবি...শুধু এ সংসারে উৎসবের উপচারে—
দুর্দ্দিনের হাহাকারে নহে?"

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের প্রতি এই বাণী উচ্চারণ করিয়া তাহার উত্তর দিলেন—

"The famished, the homeless,
Raise their hands towards heaven
And utter the name of God.
Their call will nevr be in vain.
In the land where God's response
Comes through the heart of man
In heroic service and love."*

*

দুর্ভিক্ষে রবীন্দ্রনাথের দান

সম্প্রতি ঔপন্যাসিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে রবীন্দ্র-অনুরাগীগণ, "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উপলক্ষে কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপঢৌকন দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, রবীন্দ্রনাথ শরৎ বাবুকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, ঐ সংগৃহীত অর্থ তিনি বাংলার বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়িত করিতে ইচ্ছা করেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর স্বরচিত নাটিকাভিনয় দ্বারাও ঐ-জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হউন!

*

---

* বন্যাবিধ্বস্ত বাংলার অগৃহ অন্নহীনদের দুর্দ্দশা-দুঃখে ব্যথিত মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট এই বাণীটি প্রেরণ করিয়াছেন—" 'ভগবান, রক্ষা কর' বলিয়া যাহারা আজ ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের জন্য ভগবানের অব্যর্থ দয়া মানুষের হৃদয়ের মধ্য দিয়া সেবা ও প্রেম-রূপে অবতরণ করিবেই।"

ঐতিহাসিক সাধনা

ইতিহাস উপন্যাস নয় বা আদর্শ চরিত্রসৃষ্টি নয়;—অতীত কালের কুয়াসাচ্ছন্ন বেলা-বালুকান্তর হইতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-প্রণালীর আলোকপাত করিয়া সত্যের উপলমণির আবিষ্কার। প্রচলিত মত-বিশেষকে মানিয়া লইলেই ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গেল না,—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, বাজাইয়া দেখিতে হইবে। বাংলা দেশে এইরূপ ঐতিহাসিক সাধনার প্রবর্ত্তকরূপে স্বর্গীয় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নাম স্মরণীয়। তাঁহার পরবর্ত্তীগণ অনেকেই—স্যর যদুনাথ, রাখালদাস, রাজেন্দ্রলাল, নলিনীকান্ত, নিখিলনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি—উপরোক্ত প্রণালীর ঐতিহাসিক সাধনায় যশস্বী হইয়াছেন।

সম্প্রতি "কলিকাতা রিভিয়ু" * পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজা রামমোহনের ব্যক্তি-জীবনের এক অধ্যায়" † নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা ঐরূপ ঐতিহাসিক সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। এই মহৎ মানবের জীবনী-সঙ্কলনে বিগতজীবনের সত্যোদ্ধার করিতে গিয়া, ব্রজেন্দ্র বাবুকে অনেক আঘাতই সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয়, ঐতিহাসিক সাধক তাঁহার সাধনার একনিষ্ঠতা হারান নাই। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, ব্রজেন্দ্র বাবু প্রমাণিত করিতেছেন যে—সাধারণ সমাজলোকক ভালো-মন্দ আলো-আঁধারের মধ্য হইতেই মানবের মহত্ব ফুটিয়া উঠে।

*

সেকালের কথা

আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়,—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর আবার তাঁহার 'সেকালের কথা'‡ বঙ্গলক্ষ্মীকে শুনাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন।

মানুষ শ্রুতি-স্মৃতির সাহায্যে মানুষকে সেকালের কথা শুনাইয়া স্বভাবতঃই তৃপ্তি অনুভব করে। সেকালের কথা শুনাইবার ফাঁকে সে তাহার অতীতের 'আমি'কে খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়, শুধু আত্মবিলাসের জন্য নহে, কিন্তু বর্ত্তমানের সহিত তাহাকে মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া পরিচিতি দ্বারা চিরচলমান্ কালের গতি-কে স্বীয় জীবনের অথবা সমাজ-জীবনের যতি-বিভাগে তরঙ্গিত করিয়া তুলিতে—অপূর্ব্ব স্তোত্রের মত। অধুনা-বিস্মৃত নবীনচন্দ্রের (?) 'আমার জীবন', রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি,' জগদিন্দ্রনাথের 'শ্রুতিস্মৃতি' প্রভৃতি ইহারই প্রয়াস।

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' আমিত্বের অত্যধিক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ বলিয়া আমাদের মনকে একটু পীড়িত করিলেও, ফেনতলশায়ী জলের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজেতিহাসের দিক দিয়া তাহাকে একেবারে মূল্যহীন বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'—বিশ্ব-সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট কাব্য-বিশেষ। অপূর্ব্ব প্রতিভার সহিত স-প্রতিবেশ স্বীয় জীবনকে একটি বিচিত্র কাব্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া, মহাকবি তাঁর অন্তরের ক্রমবিকাশকে বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে অবগাহিত করিয়া শতদলের মত প্রকাশের রৌদ্রালোকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। জগদিন্দ্রনাথের 'শ্রুতি-স্মৃতি' একটি ঐশ্বর্য্য-আবর্ত্তে তরঙ্গিত ভ্রমণশীল অন্তরাত্মার বেদনাময় মুক্তির আবেদন-বাণী। তৎকালিক বিভিন্ন প্রদেশ ও সমাজের চিত্রময় জীবনের ধারাকে দার্শনিকতার তটাবেষ্টনে বাঁধিবার প্রয়াসে ইহা কাহিনীর পর্য্যায়ে না পড়িয়া দর্শনের পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু উপরোক্ত স্মৃতি-কাহিনীগুলিতে ব্যক্তি-জীবনের যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজ-জীবনের ততটা পরিচয় পাই না। পক্ষান্তরে সেন মহাশয়ের 'সেকালের কথা'য় সমাজ-জীবনের পরিচয় বায়স্কোপের চলচ্চিত্রের মতই আশ্চর্য্য অঙ্কনকুশলতায় ফুটিয়া উঠে—ব্যক্তি যেন বর্ত্তিকা হাতে লইয়া সমাজকে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিতেছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে 'সেকালের কথা' বঙ্গসাহিত্যে সত্যই অদ্বিতীয় বলিয়া মনে হয়, এবং এইগুলি গল্প-(stories) পর্য্যায়ে না পড়িলেও, প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পের যাদুকর মোপাসাঁর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—রচয়িতা যেন

* The Calcutta Review, Aug., 193 (P. 156—179).
† "A chapter in the personal history of Raja Rammohon Roy."

‡ তাঁহার পূর্ব্বকথিত সেকালের কথাগুলি "সেকালের কথা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে (প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)।

আপনারই রচনার শ্রোতা বা দর্শকমাত্র। মোপাসাঁর মতই ইহাতে রস-রসিকতা আছে—অথচ উহার মত আবিল নহে।

*

বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত দত্তের দান

সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'রায়বেঁশে' নৃত্য, 'কাঠি' নাচ, 'জারি' গান ও নৃত্য, এবং ঐ সব নৃত্যের তালে ও ছন্দের ধারানুসরণে শ্রীযুক্ত দত্ত কর্ত্তৃক রচিত সঙ্গীত প্রভৃতি বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর শুষ্কতা ও কঠোরতার মধ্যে আনন্দের পরিবেশ-রচনা, বিশুদ্ধ রসকলা-চর্চ্চার সহিত ব্যায়ামানুশীলন ও পৌরুষচর্চ্চা, জাতীয় রসশিল্পের ধারাবহন, এবং পরোক্ষভাবে চরিত্র ও চিত্ত-গঠনের দিক দিয়াও এই নৃত্য ও গীতি-প্রবর্ত্তন মহামূল্যবান, সন্দেহ নাই। স্বীকার করিতেই হইবে—বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা শ্রীযুক্ত দত্তের একটি বৃহৎ ও মহৎ দান।*

*

শিক্ষাবিভাগের সমর্থন

সম্প্রতি বাংলার শিক্ষামন্ত্রী (Education Minister) মাননীয় খাজা নাজিমুদ্দিন সি-আই-ই, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর (Director of Public Instruction) মিঃ বটমলি (Mr. Buttomley), এবং শারীর-শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর (Director of Physical Education) মিঃ বিউক্যানন (Mr. Buchanan), বীরভূম, শিউড়ীর স্কুল সমূহ পরিদর্শন-কালে এই মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত দত্তকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিঃ বটমলি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত দত্তের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত এই সব লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত ভবিষ্যৎ শিক্ষাক্ষেত্রে বৃহত্তর ও মহত্তর উন্নতি আনয়ন করিবে; এবং এ বিষয়ে তাঁহার দেশ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণী।*

*

কবি কুমুদরঞ্জনের গুণগ্রাহিতা

সম্প্রতি শিউড়ী প্রবাস-কালে প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় শ্রীযুক্ত দত্ত প্রবর্ত্তিত নৃত্য ও গীতি-কলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হন। পরে, গুণগ্রাহী কবি তাঁহার কর্ম্মস্থল বর্দ্ধমান, মাথরুন হাইস্কুলে ঐগুলির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং স্বীয় পল্লী-বাসস্থানের বিদ্যালয়েও উহার প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। শুনিলাম, কবি নাকি ঐ বিষয়ে কবিতাও রচনা করিয়াছেন। কবির গুণগ্রাহিতা প্রশংসনীয়।

*

ত্রুটি-স্বীকার

বিগত সংখ্যায় আমাদের অনবধানতা বশতঃ অনভিপ্রেত বিষয়-বিশেষ প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমরা ত্রুটি-স্বীকার এবং দুঃখ-প্রকাশ করিতেছি।

*

ভ্রম-সংশোধন

ছাপার ভুলে, বর্ত্তমান সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীর পত্রাঙ্ক—৪৬০ পৃঃর পর, "৩৬১—৪৬৮" পৃঃ "৪৪৫—৪৫২" পৃঃ রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া ঐ ভুল সংশোধন করিয়া লইবেন।

---

* শ্রীযুক্ত দত্ত বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় শীঘ্রই এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবেন।

* হাইস্কুল পরিদর্শন-সময়ে শ্রীযুক্ত বটমলির মন্তব্য :—

"The country owes a lot to Mr. G. S. Dutt for his enthusiasm in reviving these folk-songs and folk-dances of the country and as far as I can see such activities as these will play a large and valuable part in education in future. I congratulate Mr Dutt on his enthusiasm and wish his ideas all good luck."

নারীর স্বাস্থ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী রমেশচন্দ্র রায় এল্‌·এম্‌·এস্‌

(৫)

"খোলা বায়ুতে" গাছপালা যেমন বাড়ে, বদ্ধ স্থানে তেমন বাড়ে না। ঘরের ভিতরে গাছের টব রাখিলে, সেই টবের গাছ ক্রমশঃ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে বাড়িতে চায়। এই ত গেল গাছপালার কথা। ইতর প্রাণীরা যখন-তখন রৌদ্রে শোয়। তাহারাও সূর্য্যকিরণ ও মুক্ত বাতাস চায়। চাষী ও মাঝিরা সারাদিন রৌদ্র, জল, বাতাস পায় বলিয়া, তাহারা কেমন বলিষ্ঠ ও নীরোগ হয়, তাহা আপনারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আপনারাও, আজ বিদেশে হাওয়া খাইতে যাওয়ার একটা প্রেরণা ভিতর থেকেই পান; এবং আপনারা বিদেশে সুধু বিশুদ্ধ হাওয়া খাইতে যান না—আপনারা সেই সঙ্গে প্রচুর সূর্য্যকিরণ সেবন করিতেও যান। যিনি যত বেশী পরিমাণে সূর্য্যকিরণের ultra-violet রশ্মি গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার চামড়া তত কালো হয়। এবং কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা উক্ত ultra-violet রশ্মির নামও শুনেন নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত, এই রং কালো হওয়াটা যে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তাহা সহজজ্ঞানে বেশ বুঝিতে পারেন। এদেশে, কচি ছেলেদিগকে রৌদ্রে শায়িত রাখার প্রথা এখনো পল্লীগ্রামে দেখা যায় এবং যে ছেলে শৈশবে প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র সেবন করিতে পায়, তাহার অস্থি তত পুষ্ট হয়। যে ছেলেরা প্রচুর পরিমাণে, অতীব খাঁটি পুষ্টিকর খাদ্য ও দুধ খাইতে পায়, অথচ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূর্য্যকিরণ সেবন করিতে পায় না, তাহাদের হাড় শক্ত হয় না, এবং "রিকেট্‌স্‌" নামক পীড়া তাহাদেরই হয়। এই জন্য, গরীবদের ছেলেরা, অতি সামান্য রকম খাইতে পাইলেও, সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে বলিয়া, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে মুক্ত বাতাস ও সূর্য্যকিরণ পায় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যত "রিকেট্‌স্‌" না হয়, সর্ব্বদা জামাজোড়ার বাহুল্যের ও সার্সি পর্দ্দাওয়ালা ঘরের মধ্যে যে ধনীর ছেলেরা মানুষ হয় তাহাদেরই মধ্যে এই ব্যারামের আধিক্য দেখা যায়! আশা করি, এই কয়েকটি কথা হইতেই, আপনারা সকলেই স্বাস্থ্য রক্ষার্থ মুক্ত বায়ু ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূর্য্যকিরণ সেবন করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি এই কথাটা প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে খাটে, তবে ইহা কত বেশী করিয়া খাটে মেয়েদের গর্ভাবস্থায়—যখন সমানে দুইটি প্রাণীর পুষ্টি যোগাইতে হয় ও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ ভাল করিয়াই গড়িয়া দিতে হয়। যে গর্ভবতী নারী প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে, মুক্ত বায়ু ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূর্য্যকিরণ সেবন করিতে পান, তাঁহার খাবার যদি পরিমাণে ও গুণে উনিশ-বিশ নিরেশ হয়, তাহাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু খাবার প্রচুর হইয়া, যদি রৌদ্র ও বাতাস সেবন কম হয়, তবে তাঁহার পক্ষে স্বাস্থ্য রক্ষা করা দুরূহ হয়। এই জন্য, আমার খুব স্পষ্ট মত এই যে, নারীর পক্ষে, "অসূর্য্যম্পশ্যা" হওয়াটা অপমানের কথা, অগুণের পরিচয়—কোনও মতে গৌরবের কথা নয়। বস্তুতঃ, পর্দ্দাটার বাহুল্য মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যেই বেশী। মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল করিতে ও রাখিতে হইলে, এই মুক্ত বায়ু সেবন ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূর্য্যকিরণ সম্ভোগ করাটা অতীব প্রয়োজন। সহরে, বাড়ীর ছাদের উপরে, অথবা খুব ভোরে পার্কে বেড়ান, এবং পল্লীগ্রামে, নানাস্থানে ভ্রমণ করা অতীব প্রয়োজন। এ দেশে, বহুকাল পূর্ব্বে, মেয়েরা অবাধে সভাসমিতিতেও যাইতেন। কিন্তু বারম্বার বিদেশীয়দের আক্রমণের ফলে, ও বহুকাল মোগল-পাঠানের অধীনে বাস-কালীন, এদেশে অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অতীব সুখের বিষয় যে, আজকাল অনেক বাড়ীর মেয়েরাই আত্মীয় সঙ্গে স্বচ্ছন্দে রাস্তায় বেড়ান এবং ট্রাম, বাসেও

যাতায়াত করেন। এটি শুভলক্ষণ, সন্দেহ নাই। এবং এই পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার সৎসাহস দেখান জাতির কল্যাণে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে, মনে করি। কারণ, একে অবরোধ, তাহার উপরে বোরখা—এই দুইটির ফলে, মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ক্ষয়কাশের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সময় থাকিতে এই কথাটির প্রতি দৃষ্টি পড়া আবশ্যক হইয়াছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের প্রতি আমি এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

(৬)

এই বারে, অঙ্গচালনার (exercise) পালা। ভগবান তাঁহার সৃষ্টির কোথাও কাহাকেও "বসিয়া" খাইবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই (No one was born to eat the bread of idleness.)। রমণীরা পুরুষের আশ্রয়ে থাকিবেন বলিয়া যে, তাঁহারা কোনও রকমে অঙ্গচালনা করিবেন না—অর্থাৎ, নিজ মান নিজে রক্ষা করিবেন না,—এমন ইঙ্গিত সৃষ্টির কোথাও নাই। রক্ষক হিসাবে পুরুষ দেহে বল সঞ্চয় করিবেন, এবং আশ্রিতা বলিয়া, সত্য সত্যই প্রাণপণ চেষ্টায়, আদা-জল খাইয়া নারী প্রকৃত অবলা হইবেন—এ বিসদৃশ ব্যবস্থা বাঙ্গালা ছাড়া, এমন কি ভারতবর্ষেও আর কোথাও নাই। সাঁওতাল প্রভৃতি বনবাসীরা, দরিদ্র কুলীরা, গর্ভধারণ করা ও প্রসব করাটাকে ব্যারাম করিয়া তোলে নাই—দৈহিক অপর সমস্ত নৈসর্গিক কার্য্যের মত, স্বচ্ছন্দেই তাহা করিয়া থাকে।—আর, যত ব্যারাম আমাদের (বিশেষ করিয়া, শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরই) ঘরে—গর্ভধারণ থেকে প্রসব করা পর্য্যন্ত, দোল দুর্গোৎসবের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, চিতোর ও জয়পুরের হিন্দুরমণীরা, কি রকম অঙ্গচালনা করিতেন, তাহা ইতিহাস-বিখ্যাত। আভিজাত্য-গর্ব্বিতা ইংরাজ মহিলারা অন্য অনেক প্রকৃতিবিরুদ্ধ কায করিলেও, অঙ্গচালনায় পরাঙ্মুখী নহে। শুধু বাঙ্গালীর মেয়েরাই কি এখনো ঘরে ঘরে নিত্য ব্যায়াম করাটা ভদ্রতার বিরুদ্ধ মনে করিবেন? নিয়মিত ভাবে, প্রত্যহ, ক্রমশঃ বর্দ্ধিতহারে, ব্যায়াম না করিলে, কখনও দেহ গড়ে না। ব্যায়াম না করিলে, দেহের দোষ-ত্রুটি দূরীভূত হয় না বরং ক্রমশঃই পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। ব্যায়ামের অভাবে, দেহের সমস্ত কল ছন্দোভঙ্গ হইবার পথে দাঁড়ায়,—দেহ রোগের আকর হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, রীতিমত ব্যায়াম করিলে, দেহের সৌষ্ঠব ও লাবণ্য ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে; ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়ে; সুনিদ্রা হয়; এক কথায় ব্যায়ামই দেহকে গড়ে ও বজায় রাখে। আজ বাঙ্গালী নারীদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চা নাই বলিয়া, জগতের মধ্যে সুধু বাঙ্গালাদেশেই নারীধর্ষণ ও নারীহরণ সম্ভবপর হইয়াছে। আজ ব্যায়ামের চর্চ্চা নারীদের মধ্যে নাই বলিয়া, বাঙ্গালীর স্ত্রী, স্বামীর গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালী রমণীরা জবরদস্তি-অবলা থাকেন বলিয়া, সকল প্রবল জাতিই জানে যে, বাঙ্গালীর অন্দরমহলে হানা দিলে বাঙ্গালী জব্দ। অপরের এই উদ্ধত স্পর্দ্ধা কে বাড়াইয়াছে? বাঙ্গালাদেশের নারীগণ—আপনারাই! জগতের মধ্যে সুধু বাঙ্গালাদেশে নারীধর্ষণ ও হরণের পথ কে মুক্ত রাখিয়াছে?—আপনারা! "আপনার মান রাখিতে আপনি, জননি, কৃপাণ ধর গো!" সুধু মান রক্ষার্থে নয়, দেহ রক্ষার্থে, স্বাস্থ্য রক্ষার্থে, ও ভবিষ্যদ্বংশধরের কল্যাণার্থেও—প্রত্যেক নারীর পক্ষে, ব্যায়াম করাটা অতীব প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান পুরুষকেই মুক্ত হাওয়া ও ব্যায়াম করিবার একচেটিয়া অধিকার দেন নাই;—ভগবান পুরুষকে শক্তি ও নারীকে দৌর্ব্বল্যের আধার করেন নাই;—ভগবান নর ও নারীকে সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সহায়ক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এ কথাটি আপনারা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন; এবং অন্যায় লজ্জা, অন্যায় ভয় ত্যাগ করিয়া, যাহাতে পাঠান ও রাজপুত রমণীর ন্যায় স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে স্বামীর পাশে দাঁড়াইতে পারেন, তাহাই করুন—নতুবা আপনাদের, (কাযেই, জাতির) ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন! যে গৃহকর্ত্রী নিজ পুত্রবধূকে স্বাস্থ্যবতী করিয়া, বংশে সুপুত্র ও সুকন্যা পাইবার আশা করেন, যিনি খাঁটি গিনিসোনা দিয়া নিজ কুল ও নিজ সমাজ সাজাইতে চাহেন, তাঁহাকে একসঙ্গে নিজ কন্যা ও পুত্রবধূর উপরে সমান দৃষ্টি রাখিয়া, খাদ্য বিষয়ে, হাওয়া ও রৌদ্র সেবন বিষয়ে এবং ব্যায়াম বিষয়ে যত্ন লইতেই হইবে। এই তিনটি পরস্পর-সহায়ক - একটিও বাদ দিলে চলিবে না—একথা খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবেন;—আমি প্রলাপ বকিতেছি না!

(৭)

এ পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে নারীজীবনের স্থূল কথাগুলি বলিয়াছি। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী নারী-জীবনে, তিনটি "ফাঁড়া"র কাল আছে—যথা, (১) ঋতু আরম্ভ সময়ে, (২) ঋতু বন্ধ হইবার সময়ে ও (৩) গর্ভকালে। এই তিনটি ফাঁড়াকাল সকল নারীর পক্ষে বিপদের সময় নয়; সভ্যতার মাশুল যেখানে যত বেশী দেওয়া হয়, সেখানে এই ফাঁড়াগুলি তত বেশী রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা যায়। শ্রমজীবী নারীরা শৌচ-প্রস্রাব ত্যাগের মত, স্বচ্ছন্দেই প্রসব করে। কিন্তু ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া, যথোপযুক্ত রৌদ্র ও মুক্তবায়ু না সেবন করিয়া, যদি শুধু আলস্যেই জীবন যাপন করা যায়, তবেই এমন অবস্থা প্রসবের সময়ে দাঁড়াইতে পারে যে, জন্মের মত "সাধ" ভক্ষণের প্রয়োজন হইতে পারে। প্রসবের এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতে, এবং প্রসবের পরে ছয় মাস কাল সময় পর্য্যন্ত,—ডাক্তার ও ডাক্তারখানা লইয়া বর্ত্তমানের মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে ঘর-বাড়ী করিতে হয়!

যাহা হউক, ঐ তিনটি "ফাঁড়া"র কালের সম্বন্ধে দু'চার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি:—

(১) ঋতুকাল।—হিন্দুমতে, এই সময়ে নারী অস্পৃশ্যা—তাঁহাকে কোনও কিছু ছুঁইতে বা করিতে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, এই সময়টা দেহের ও মনের "সম্পূর্ণ" বিশ্রাম আবশ্যক। নারীর শরীরের ও মনের উপরে, তাঁহার বিশিষ্ট যন্ত্রাদির যে কত প্রচণ্ড প্রভাব আছে, তাহা প্রত্যেক নারীকেই বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা তাঁহারা জানেন না বলিয়া, ঋতুকালে ঠাকুরঘর প্রভৃতি দু'চারটা কার্য্য ব্যতিরেকে, সকল কার্যই করেন,—এমন কি, থিয়েটার-বায়স্কোপও বাদ দেন না। এবং ঋতুর চতুর্থ দিবসে, আইনের মর্য্যাদা কোনও রকমে রক্ষা করিয়া, স্নানান্তে গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই করেন। এই অত্যাচারের ফলে, বাধক বা স্রাবাধিক্য-ব্যারাম জন্মে। ঋতু-কালটি নারীর পক্ষে মানসিক ও দৈহিক সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময়; এই সময়ে, মৎস্য, মাংস, ডিম না খাওয়াই উচিত; এবং সময় কাটাইবার সঙ্গী হিসাবে, নাটক-নভেল একদম বর্জ্জনীয়। সাত্ত্বিক আহারই ঋতুকালে প্রশস্ত ও শয্যাগ্রহণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

(২) ঋতু শেষ হইবার সময়ে (সাধারণতঃ, ৪০-৪৫ বৎসর বয়সে)—নারীর দেহে একটা প্রবল স্নায়বিক ঝড় উঠে। তাহার ফলে, কাহারো অসময়ে ও ঘন ঘন স্রাবাধিক্য ঘটে, কাহারো মস্তিষ্কবিকৃতি পর্য্যন্ত হয়। এ সময়টিও নারীর পক্ষে সর্ব্ব রকমে মানসিক ও দৈহিক বিশ্রামের কাল।

(৩) গর্ভকালে—এই কয়েটি জিনিষ করা চাই;—(ক) চিকিৎসকের পরামর্শমত, প্রত্যহ ব্যায়াম করা চাই এবং প্রত্যহ নিয়ম করিয়া যথাসম্ভব আলো ও মুক্ত বাতাস সেবন করা চাই। (খ) এই সময়ে, যথাসম্ভব মাছ, মাংস ও ডিম ত্যাগ করিয়া, প্রচুর ফলমূল, nuts, শাকসব্জী ও খাঁটি দুধ পান করা চাই। ফলমূল, শাকসব্জী ও দুধে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ভাল হইবে ও থাকিবে; এবং শিশুর স্বাস্থ্যেরও (বিশেষ করিয়া তাহার দাঁতের) বনিয়াদ মজবুত করা হইবে। (গ) নিত্য কোষ্ঠশুদ্ধি ও সুনিদ্রা হওয়া চাই।

গর্ভকালে, অনেক মেয়েরই বমন বা বিবমিষা হয়। এদেশে, অমনি গৃহিণীরা মানিয়া লয়েন যে, ওটা "হইয়াই থাকে।" গর্ভাবস্থায় বমন বা বিবমিষা, স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়—উহা হওয়া স্বাভাবিকও নয়। উহা ব্যারামের পূর্ব্ব-সূচনা (warning)। যাঁহাদের এইটি হইবে, তাঁহাদের উচিত, মাছ, মাংস, ডিম একেবারে বন্ধ করিয়া, প্রচুর পরিমাণে এক-বলকের দুধ, ফল, মূল ও শাকসিদ্ধ ঝোল খাওয়া ও প্রচুর জল পান করা। বমন হওয়া কোনও অবস্থাতেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ হইতে পারে না—এ কথাটি স্মরণ রাখিবেন। আবশ্যক হইলে, সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

গর্ভিণীর যথেষ্ট প্রস্রাব নিত্য হওয়া চাই। হঠাৎ যদি প্রস্রাবের মাত্রা কমিয়া যায়; অথবা, যদি অকারণে উপর্য্যু-পরি প্রত্যহ মাথা ধরিতে থাকে, তবে যেন কদাচ উহাকে অগ্রাহ্য করা না হয়। তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব পরীক্ষা করান ও সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া চাই।

গর্ভাবস্থার সকল উৎপাত একে একে উল্লেখ করা অসম্ভব। এই জন্য, স্থূল ভাবে বলি, ঘরে গর্ভিণী থাকিলে, সারাদিন তাহার দেহের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে সন্ধান লওয়া আবশ্যক; এবং স্বাভাবিক কিছু হইতে এতটুকু ব্যতিক্রম হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অগ্রাহ্য না করিয়া, প্রতিবিধানে যত্নপর হওয়া চাই।

আজকাল প্রসবের পরে, পোর্ট ওয়াইন, ভাইব্রোনা,

ব্রাণ্ডি প্রভৃতি অহিতকর মদ্য খাওয়ান ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে। মদ্যমাত্রেই স্রাব বাড়ায় ও দেহের শৈথিল্য আনায়। কাযেই, দেহ খট্‌খটে করিতে গেলে, এগুলি বর্জ্জনীয়। অথচ ক্রমশঃই এই জিনিষগুলির ব্যবহার (অন্ততঃ সহরে) বাড়িয়া যাইতেছে। এগুলির জন্য, আমরা (চিকিৎসরাও) যতটা দায়ী, কতকগুলি বিদ্যাবাগীশ সব-জান্তা ধাত্রীও ততটা দায়ী। আমাদের মধ্যে, অনেকেই বিলাতী চসমা পরিয়া, বিলাতী গুরুর মন্ত্রগুলি অত্যন্ত অবিবেচকের মত, আওড়াই। এবং অনেক গৃহস্থের মধ্যে, এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ধাত্রীরা আধা-চিকিৎসক। বস্তুতঃ তাহা নহে। খুব সোজা ভাষায় বলিতে গেলে, ধাত্রীরা আঁতুড়ের বিশেষজ্ঞ ড্রেসার ও শুশ্রূষাকারিণী মাত্র। প্রসবের আসল ব্যাপার তাঁহারা খুব কমই জানেন ও বুঝেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রেস্কৃপসান লিখিতে দেওয়া, তাঁহাদের স্পর্দ্ধা বাড়ান মাত্র—নিজের বিপদকে অনেক সময়ে তদ্বারা টানিয়া আনা হয়। বলিতে দুঃখ হয়, বর্ত্তমানযুগের পচন-নিবারক প্রক্রিয়ার (aseptic midwifery) মূলতত্ত্বও তাঁহারা অধিকাংশই জানেন না—হাতে হাতিয়ারে কতক কতক কায করিয়া যান মাত্র।

উপসংহারে, আঁতুড়ের কথা একটু বলি। এদেশে, বর্ত্তমান কালে, এমন কি শিক্ষিত সংসারেও—আঁতুড় ঘরটি নরককুণ্ড। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে অকেযো, সব চেয়ে আলো হাওয়া-হীন ঘরে, যত আজে-বাজে, পুরাতন, ময়লা জিনিষ দিয়া আঁতুড় করা হয়। অনেক বাড়ীতে, পুরুষ-পরম্পরা-ব্যবহৃত দ্রব্যই বারম্বার আঁতুড়ে দেওয়া হয়। আঁতুড়ে আগুন জ্বালিয়া, ঠাণ্ডার ভয়ে চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা টাঙাইয়া, এবং নানারকম সাংসারিক প্রথার তাড়নায়, প্রসূতির জীবনকে অনেক সময়ে বিপন্ন করিয়া তোলা হয়। বংশের ভাবী দুলাল, বাঙ্গালার ভাবী-গৌরব—এই কি তাহাকে অভ্যর্থনা করাবার উপযুক্ত স্থান ও ব্যবস্থা? নোংরা ঘর, নোংরা চারিপাশ, নোংরা আসবাব, নোংরা ধাত্রী—এই অজগর-নোংরার ফল—পেঁচোয় পাওয়া (ধনুষ্টঙ্কার ব্যারাম), সেপ্টিক হওয়া, ইত্যাদি। অথচ একটু সামান্য বুঝিয়া দেখিলেই, এ জিনিষ একদম বদলান যায়। ভাবী বংশধরের অভ্যর্থনা-গৃহ নন্দন-কাননের মত হাস্যময় প্রফুল্ল হওয়া চাই। বাঙ্গালীর ঘরের পুরুষরা এ সকল "মেয়েলি ব্যাপারে" খোঁজ লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন না বলিয়া, বোধ হয় আঁতুড়ের এত দুর্দ্দশা ও এদেশে শিশুমৃত্যু এত বেশী! আবার অনেক মধ্যবিত্ত ঘরে আঁতুড়-ঘর থেকেই, বিলাতী "পেটেন্ট ফুডের" আরম্ভ হয়!!!

(৮)

এবারে, মেয়েদের কতকগুলি কদভ্যাসের কথা বলিব। দুধ না খাওয়া, ব্যায়াম না করা, দোকানের খাবারের উপরে অত্যধিক মোহ, দিনের মধ্যে দশবার কাপড় ছাড়া (অথচ প্রত্যেক কাপড়খানা পূর্ব্বের চেয়েও হয় ত বেশী ময়লা), শুচিবাই, ইত্যাদি, অনেকগুলি কদভ্যাস থাকিলেও আমি বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাই:—

(১) দোক্তা খাওয়া। সুর্ত্তি, জর্দ্দাও দোক্তার তৈরি। এই অভ্যাসটি অতীব মারাত্মক। ইহার কুফল সুদূর-প্রসারী। ইহার ফলে, বুকের দোষ (হার্ট ডিজিজ্), ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অতিস্রাব, মানসিক উদ্বেগ, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অসংখ্য উৎপাত জন্মে।

(২) মুখে তামাক-পোড়া রাখা বা গুলের গুঁড়া দিয়া দাঁত মাজাও অতীব কদভ্যাস। ইহার ফলে, দাঁতের মাড় খারাপ হয় ও আংশিকভাবে দোক্তা খাওয়ার কাজ হয়।

(৩) চা-পানের উপরেও আমি টিপ্পনী করিতে চাই; যে-হেতু, মেয়েরা "কড়া" করিয়া চা খান ও চায়ের সঙ্গে কিছুই খাবার খান না; ফলে, ডিসপেপ্‌সিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি আনে। চা সস্তার খাবার বলিয়া, ইহার এত প্রচার দাঁড়াইয়াছে।

(৪) নভেল পাঠ।—বাঙ্গালা মাসিক পত্রের বারো আনাই নভেলে ভর্ত্তি থাকা চাই। এবং কি মাসিক পত্র, কি সাধারণ লাইব্রেরী,—মেয়েরা তাহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া নভেল পড়েন। এই জাতীয় পাঠে, মেয়েদের মধ্যে হিষ্টিরিয়া, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, খিট্‌খিটে মেজাজ, ভোগের লিপ্সা প্রভৃতি বাড়িয়া যায় গার্হস্থ্য জীবনের অনেকটা তৃপ্তি কমে।

(৫) বাসী খাওয়া ও বাসী করিয়া খাদ্যদ্রব্য খাওয়া—এদেশের অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়। শীতকালে অনেক

বাসী জিনিষই ভাল থাকে। কিন্তু,গ্রীষ্মকালে, রুটি, তরকারী ও কাঁচা দুধ রাখিয়া দেওয়া—পরদিনে ব্যবহার করিবার জন্ম,—অতীব মারাত্মক অভ্যাস। আমি দেখিয়াছি যে, বৈকালে দুধ লইয়া, পরদিন প্রাতে শিশুদিগকে খাওয়াইবার জন্ম, বিনা দ্বিধায় গৃহিণীরা দারুণ গ্রীষ্মেও রাখিয়া দিয়াছেন। এরূপ বাসী খাইয়া, মারাত্মক অসুখ হইতে দেখিয়াছি। সরাসরি অসুখের কারণ না হইলেও, বাসী খাবারে, এমন কি দুধে—ভাইটামীন আদপে থাকে না।

(৬) দুর্লভ হইলেও, কোনও কোনও বাড়ীতে, নোণা ইলিশ বা সামান্য-গন্ধ হইয়াছে এমন মাছ, খুব ঝাল ও পিঁয়াজ ও তেল দিয়া, অম্লান বদনে ব্যবহার হইতে দেখিয়াছি। এটিও মারাত্মক অভ্যাস। মেয়েরা সাধারণতঃ সকল তরকারীই বেশী তেল দিয়া ও মশলা দিয়া রাঁধিবার পক্ষপাতী; ইহা বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

(৭) "টাট্কা ভাজা, গরম-গরম" দোকানের ভাজা-খাবার মেয়েদের কাছে একটা মস্ত আদরের জিনিষ। কি মসলায়, ও কি তেলে, বা তথাকথিত "ঘিয়ে" ভাজা, তা' তাঁহারা বুঝেনও না, এবং জানিতে চাহেনও না;—শুধু "টাট্কা ভাজা" ও "গরম-গরম" হইলেই সে খাবারের সাত-খুন মাপ! এ বুদ্ধি নিন্দনীয়।

(৮) মাটিতে খাদ্য পরিবেশন করা ও মাটিতে পড়িয়া গেলে সেই খাদ্য উঠাইয়া খাওয়া, ও শিশুকে খাওয়ান, অতীব গর্হিত কর্ম্ম।

(৯) স্ত্রীলোকরা নিজ নখের দিকে খুব কমই দৃষ্টি রাখেন। অথচ নখের নীচে থাকে না, এমন ময়লাই নাই।

যাহাকে বলে "এক নিশ্বাসে রামায়ণ গান করা", সেই অসম্ভব কার্য্যই করিলাম। সকল কথা খুলিয়া বলিতে গেলে, অনেক সময় লাগে। আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে, তাহা করিতে পারিলাম না। আশা করি, যেটুকু বলিয়াছি, তাহা আপনারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন ও মাতৃজাতির কল্যাণে কাযে লাগাইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

হাল-ফ্যাসান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী দীপ্তি দেবী, বি-এ, বি-টি

মেজ মামী-মা'র ষ্টীমার পার্টির পর শুক্লার লেখা—

আজ মেজ মামী-মা'র ষ্টীমার পার্টিতে যেতে আমার আদতেই ইচ্ছা ছিল না, তার প্রধান কারণ সুধীর,—এত শীগ্‌গির সুধীরের সঙ্গে দেখা কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। তাকে কি ব'লে বিদায় দেব তা' আমি এখনও ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। বেশী জিদ্ কর্‌লে মা আবার চোটে যাবেন, তাই গেলাম। ষ্টীমারে উঠেই আমি পিছনের ডেকে একটা ডেক্ চেয়ার নিয়ে এক কোণায় চুপ ক'রে ব'সে রইলাম,—আজ আমার কারু সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না।

ষ্টীমারটা কিন্তু কি সুন্দর সাজান হয়েছিল—তার উপর একটা ষ্ট্রিং ব্যাণ্ড্‌ও ছিল। মেম সাহেবরা থাক্‌লে হয় ত নাচই আরম্ভ ক'রে দিত···বাপ্‌রে! কি খাবারের ছড়াছড়ি, ছেলেগুলো এক একজন যে কতগুলো ক'রে স্যাণ্ডউইচ্ খেলে দেখেই আমার গা ঘুলোতে লাগ্‌ল। বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল, তার উপর যখন ষ্টীমারটা আস্তে আস্তে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল তখন সত্যিই ভাল লাগ্‌ছিল। ঈস্—মেয়েগুলো সব কি! পরনিন্দা পেলে কিছুই চায় না···আবার এদের মধ্যে সব ক'টাই নাকি আমার বন্ধু! ওরা ভাব্‌ল—নাম না বল্লে আমি যেন আর কিছুই বুঝ্‌তে পারি না, অবিশ্যি ওরা ভাবে নি বাতাসে কথার স্বর কতদূর ব'য়ে নিয়ে যায়। মলিনা মুখ বাঁকিয়ে বল্লে—"ঈস্! ওর pose দেখ্‌ছিস্? এক একবার এমন ছ্যাব্‌লামি কর্‌চে যে দেখ্‌লে লজ্জা লাগে। আবার আজকে ঢং দেখ্ না, যেন কত 'ডিগ্‌নিফাইড্ লেডী!' কারু সঙ্গে কথাই বলছে না, কেবল জলের দিকে চেয়ে আছে। ও তো এম্‌নি ক'রেই নিজেকে অমন এট্রাক্‌টিভ্ করে।···সাধে ছেলেগুলো সব ওর পিছন পিছন ঘুরে মরে!" আমার আর শুন্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল না—আমার নিন্দে কর্‌ছিল ব'লে নয়, মানুষের মন যে এত গরলে পূর্ণ থাক্‌তে পারে সেটার আরও বেশী পরিচয় পাবার ইচ্ছা আমার ছিল না ব'লে।

আমি সেখান থেকে উঠে গিয়ে অন্য আর একটা যায়গায় বস্‌লাম। এখানে সুধীরকে আস্‌তে দেখে আমার বড় খারাপ লাগ্‌ল,—ওকে কি ক'রে সব কথা বল্‌ব? ওর মুখ দেখ্‌লে এমন মায়া করে···একটু কড়া বল্‌লেই এমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চায় যে আমি আর কিছু বল্‌তে পারি না। এসেই বেচারা বল্‌লে—"শুক্লা, সেদিন রুমাল নিয়ে অমন একটা ব্যাপার ক'রে আমি সত্যিই লজ্জিত। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না; খুব বেশী রাগ কোর' না আমার উপর।" এর উপর আর মানুষ কি বোল্‌তে পারে? ভেবেছিলাম এ সম্বন্ধে দু'একটা কড়া কথা শোনাব, তা আর হ'ল না। আমি আস্‌তে আস্‌তে বল্লাম—"থাক্‌গে', যা' হবার তা' হয়েছে, অত হাঙ্গাম না কর্‌লেই ভাল হ'ত, বৃথা এই সব নিয়ে খানিকটা ঘেঁাট হোল।" সুধীর বেচারা লজ্জিত ভাবে মাথা নামালে।

আমি দু' তিনবার লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লাম নীহার এদিক-পানে ঘন ঘন পায়চারি কর্‌ছে। তাই আমি সুধীরকে বল্লাম—"তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, আজ আর হবে না, তুমি বরং এখান থেকে যাও। বৃথা লোককে সমালোচনা কর্‌বার সুযোগ দিয়ে কিছু লাভ নেই।" সুধীরও তৎক্ষণাৎ বল্লে—"ঠিক বলেছ শুক্লা, আমি এখান থেকে পালাই, একদিন না হয় তোমাদের ওখানে যাব, চা'টা কিছু এদিকে পাঠিয়ে দেব কি?" আমি বল্লাম—"এক গ্লাস্ লেমনেড পাঠাতে পার।"

আঃ, জলটা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! আমি চুপ ক'রে ব'সে লেমনেড খাচ্ছিলাম,এমন সময়ে দেবকুমার বাবু আমার

কাছে এসে বসলেন। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'লাম। যা হো'ক, ঠিক করলাম ওর সঙ্গে আজ আর ঝগড়াঝাঁটি বাধাব না,—বৃথা সময় নষ্ট, অমন পাহাড়টাকে কে নোয়াতে পারবে? তার কথা শুনে কিন্তু আমি আরও অবাক হ'য়ে গেলাম—সে তার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বল্লে—"কালকেই আপনার রুমালটা ফেরৎ না দিয়ে যে কতখানি অন্যায় করেছি তা' আজ টের পেলাম, এই ব্যাপারটা নিয়ে লোকে যে সব বলাবলি করছে তা' শুনে'। আশা করি, সে সব কথাগুলো আপনার কানে যায় নি। মানুষের মন যে এমন ন'চ হ'তে পারে তা' আমি আগে জান্‌তাম না। আর সব থেকে খারাপ লাগ্‌ছে ভেবে, যে এর কোন প্রতিকার করতে পারব না, কারণ যাঁরা এ নিয়ে সমালোচনা কর্‌ছেন, তাঁরা সকলেই স্ত্রীলোক এবং প্রত্যেকেই আপনার বন্ধু।" বাপ্‌রে! মার্ব্বেল পাথরের মুখে কথা ফুটেছে দেখ্‌ছি!···যা হোক নিজের ব্যবহারে লোকটা লজ্জিত আছে, আর কিছু বলা হবে না। ঈস্!—কি রকম ঘৃণাভরে আমার বন্ধুদের বিষয় বল্লে? আমি আস্তে আস্তে বল্লাম—"যেতে দিন, ওসব বিষয় ভেবে কিছু লাভ নেই। হ্যাঁ, আপনার চিঠি আর পার্শেলটা পেয়েছি। রুমালটার উপর আমার এমন রাগ হয়েছিল যে আমি পার্শেলটা খুলে পর্য্যন্ত দেখি নি।" ব'লে আমি হাস্‌তে লাগ্‌লাম। দেবকুমার বাবুর মুখে কিন্তু হাসি ফুট্‌ল না। তিনি কিছু বল্লেন না, আমিও চুপ ক'রে রইলাম। এতক্ষণে চাঁদটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল; এমন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছিল, তার উপর মেজ মামী-মা'র দুষ্টু ছেলেটা সেখান দিয়ে যেতে যেতে গেয়ে উঠ্‌ল—"লাভ্‌লি টু স্পুন, আণ্ডার দি মুন—" আমার ঠিক মনে হ'ল, দেবকুমার বাবু "ড্যাম্" বল্লেন, তবে আমার ভুলও হ'তে পারে। আমি একটু হেসে বল্লাম—"আপনি কি এত ভাব্‌ছেন?" তিনি শুধু বল্লেন—"আপনার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয় সেদিন কোন্ গ্রহের আধিপত্য ছিল তাই ভাব্‌ছি।" আমি ফের হেসে বল্লাম—"বোধ হয় শনির।" উত্তর পেলাম—"আমরও তাই মনে হয়—"

কথাটা বেশীদূর গড়াবার আগেই আমি বল্লাম—"আপনাকে ওদিকে বোধ হয় কে ডাকছে"—সব বাজে কথা! ও ফিরে চাইতেই দেখে সুধীর এ'দিকে আসছে। অম্‌নি সে বল্লে—"আপনার বৃথা সময় নষ্ট ক'রে দিলাম, মাপ করবেন।" আমার এমন অপ্রস্তুত লাগ্‌ল, আমি গোড়াতে মোটেই সুধীরকে দেখ্‌তে পাই নি, ছিঃ—দেবকুমার বাবু কি ভাব্‌লেন! মনে করলেন, সুধীরের সঙ্গে কথা বল্‌বার জন্যেই আমি তাঁকে তাড়ালাম! আর আমি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা মেয়েদের দলে চ'লে গেলাম। সেখানেও কি রক্ষা আছে? আমায় দেখ্‌তে না দেখ্‌তে ছোট মাসী বল্লেন—"বাবা—শুকু যেন দিন দিন আরও সুন্দর হ'চ্ছে, দার্জ্জিলিং না গিয়েই গাল দুটো লাল হয়েছে!" অম্‌নি মেজ মামী-মা ব'লে উঠ্‌লেন—"সত্যি ঠাকুরঝি, মেয়ের বিয়ে দাও না কেন? সকলেই যে ওকে বৌ করতে চায়—" প্রতিমার মা একটু হেসে বল্লেন—"আজকালকার মেয়েরা কি মা-বাপের মত্ নিয়ে বিয়ে করে? তারা নিজের পছন্দ-মাফিক বর করে। ঐ দেখ না, ইন্দু দিদির মেয়ের কাণ্ড, সেই শরৎকে বিয়ে ক'রে তবে ছাড়্‌লে।" দূর্ ছাই!—কোথাও কি একটু চুপ ক'রে বস্‌বার যো নেই?: বাড়ী পৌঁছতে পারলে বাঁচি!

আঃ—যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়··· নাব্‌বার সময় সুধীর বল্লে—"কাল তবে তোমাদের ওখানে যাব, কি কথা আছে বল্লে যে—" ঠিক সেইখানেই দেবকুমার বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে কিছু না ব'লে আগেরই মত হাঁড়ি-মুখ ক'রে চ'লে গেলেন।" একটু ঘুরেছিল, আবার যেই কে সেই! সত্যি, সুধীর কি আর কথা বল্‌বার যায়গা পেলে না?···

ঈস্, বারটা বাজ্‌তে চল্ল, এবার না শুতে গেলে মা ভয়ানক চোটে যাবেন—

শুক্লা আগ্রা পলায়নের পর লেখা—

আমি আগ্রায় পিসী-মা'র কাছে পালিয়ে এসে বাঁচ্‌লাম। দিনরাত লোকে আর কিছু পায় না কেবল আমারই নিন্দা ক'রে মরছে। বাঃ রে, মানুষের কি একটা ভুল হয় না? আমি সুধীরের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি; আস্‌বার আগে একখানা চিঠি লিখে এসেছিলাম—তাতে তো ওকে কষ্ট দেবার মত কিছু ছিল না?

কেবল লিখেছিলাম—"সুধীর ভাই, তোমার প্রতি যে অন্যায়টা করেছি সেটাকে কখনও ভুলতে পার্‌বে? আমি

যে তোমায় বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না, এটা আমি বরাবরই বুঝেছিলাম তবুও তোমায় স্পষ্ট ক'রে না বোলে তোমায় বৃথা আমার কাছে আট্‌কে রাখাটা যে কতদূর অন্যায় কাজ, তখন আমি সেটা সত্যি ঠিক বুঝিনি। এর জন্যে আমার খুব বেশী কঠিন ভাবে বিচার কোর' না। আমার একটা কথা তোমার কিন্তু নিশ্চয় বিশ্বাস কর্‌তে হবে—দেবকুমার বাবুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তাকে আমার রুমাল দান করা দূরে থাক্! তার সঙ্গে ভাল ক'রে একবার কথাও বলিনি। লোকে আমার নামে মিথ্যা অনেক রটিয়ে বেড়াচ্ছে। তাতে আমার বিশেষ কিছু যায় আসে না; কেবল তুমি আমায় ভুল বুঝ' না। আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌লাম না বোলে রাগ কোর' না, আমি এখন কিছুদিন কারু সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই না। আজ আমি আগ্রা চল্লাম, ফিরে এসে দেখা করা যাবে। সব ঘটনার জন্যে আমার ক্ষমা কোর'—ইতি শুক্লা।" এতে দুঃখ দেবার মত কি কোন কথা আছে? বুল্‌বুলটা অম্‌নি যা'তা' আমায় লিখে পাঠালে।... হ্যাঁ, 'পুনশ্চ' আমি শুধু লিখেছিলাম—"নীহার সত্যিই খুব ভাল মেয়ে।" এতেই বা কি দোষ? একটু জানিয়ে রাখ্‌লাম, সুবিধা মত সে গিয়ে ওকে বিয়ে কর্‌তে পারবে।

আস্‌বার সময় কারু সঙ্গে কিন্তু দেখা ক'রে আসি নি, অনেকে হয় ত জানেই না যে আমি কোলকাতা ছেড়ে এসেছি।—যে তাড়াতাড়ি সব ঠিক হ'ল! ওমা, একটা মজা হয়েছে, দেবকুমার বাবুর সেই পার্শেলটা, যেটা আমি একেবারে খুলিই নি, সেটা আমার অন্য সব জিনিষের সঙ্গে চ'লে এসেছিল। সেদিন সেটা খুলে দেখি—রুমালটা আদতে আমার নয়, হ্যাঁ, সেটা মল্‌টিস্ লেস্ দেওয়া সিল্কের রুমাল বটে,তবে সেটা আমার নয়; প্রথমতঃ রুমালটার এক কোণে আমার নাম "এমব্রয়ডার" করা ছিল, তারপর আমার রুমালটা বেশ ব্যবহার করা; এটা তো মনে হ'চ্ছে নতুন,—আর এতে তো "লিলি অব্ দি ভ্যালি"র একটুও গন্ধ নেই? এ কার রুমাল উনি পাঠিয়ে দিলেন!...দেখ্‌লে, বৃথা রুমাল নিয়ে সুধীর অত হাঙ্গাম কর্‌লে, একটু যদি ভাল ক'রে খোঁজ নিত তো বুঝ্‌ত,ও কত বড় ভুল করেছে। যাক্,রুমালটা দেবকুমার বাবুকে পাঠিয়ে তবে আমি বাঁচ্‌লাম, পরের জিনিষ আমি কেন নিতে যাব? ও এখন এর জন্যে 'এড্‌ভারটাইস' করুক কিম্বা তার বৌয়ের জন্যে রেখে দিক্! দেবকুমার বাবুর বৌ? কি মজার কথা! বাবাঃ—কে ওকে বিয়ে কর্‌তে যাবে? ভয়ে তো কেউ ওর কাছে এগতেই পারে না—যে গম্ভীর চেহারা! আর তা' ছাড়া উনি তো নিজেই নারী-বিরোধী! দেবকুমার বাবুকে যে চিঠিটা পাঠালাম সেটা রচনা কর্‌তে আমার অনেক সময় চ'লে গেল, ঘণ্টা দুই পর তবে এইটুকু লিখ্‌তে পার্‌লাম—"দেবকুমার বাবু, আপনি যে রুমালটা পাঠিয়েছিলেন সেটা আমার নয়, তাই ফেরৎ পাঠালাম—ইতি শ্রী শুক্লা দেবী।" আহাঃ—কি চমৎকার চিঠি! প'ড়ে নিজেরই হাসি পেল।

মা'র চিঠি পাবার পর শুক্লার লেখা—

আচ্ছা,—সুধীর কি লোক! বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছে আর আমাকে একটুও জানালে না? মার চিঠিতে খবর পেলাম। ভালই হোল, নীহারই ওকে সুখী কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু সুধীর কি রকম ছেলে? এতদিন আমার পিছনে কত ছোটাছুটিই না কর্‌লে, আর মাসখানিক যেতে না যেতেই বিয়ে কর্‌তে প্রস্তুত? আমি যতই দুষ্ট হই না কেন ঠিক এ রকম কাযটা কর্‌তে পার্‌তুম না, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জারও খাতিরে ক'দিন সবুর কর্‌তে হয়। যাক্‌গে', সব পুরুষই দেখ্‌ছি ঐ রকম, প্রথমটা দেখায় কতই না ভালবাসে, সুবিধা হ'লেই ছেড়ে পালায়। ওরি মধ্যেই এক-একজন একটু ভাল, যেমন দেবকুমার বাবু, যাঁরা স্পষ্টই বলেন তাঁরা মেয়েদের ঘৃণা করেন; অতএব তাঁদের কাছে মানুষে বেশী কিছু আশাও করে না। বাপ্‌রে—আমার কি বদবুদ্ধি মাথায় চেপেছিল? দেবকুমার বাবুকে ভেবেছিলাম বশ কর্‌ব, যে সুধীর আমার পিছনে পিছনে ছায়ার মত ঘুরত সে-ই পালাতে দ্বিধা কর্‌ল না, আর আমি কিনা একজন নারীবিরোধীর মন হরণ কর্‌তে গিয়েছিলাম? সাহস তো কম নয়!—আমি কি বোকাই ছিলাম, ভাব্‌তাম চেহারার জোরে সব কর্‌তে পারব। এবার বেশ ভাল রকমই শিক্ষা হ'ল। প্রতিমাটা এমন, ও বোধ হয় আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে লিখেছে যে সুধীর নাকি আমার উপর রাগ ক'রে নীহারকে বিয়ে কর্‌তে

চলেছে, ও নাকি এই ক'রে প্রতিশোধ নিচ্ছে। শোন কথা! এমন অদ্ভুত রকমের প্রতিশোধ নেওয়া তো কোথাও দেখি নি, ইংরেজিতে যাকে বলে—"কাট্ অফ্ ইয়োর নোস্, টু স্পাইট ইয়োর ফেস্"—এও যে দেখ্ছি তাই! আচ্ছা; দেবকুমার বাবু আমার এসব কথা শুনে কি মনে করেন? মেয়েদের প্রতি তাঁর যে অশ্রদ্ধাটা ছিল সেটা বোধ হয় আরও জমাট বেঁধে গিয়েছে। আমি মেয়েদের হ'য়ে তাঁর সঙ্গে লড়্তে গিয়েছিলাম; লাভের মধ্যে তাঁর চোখে আমাদের জাতটাকে আরও হীন ক'রে দিয়ে এলাম। দূর হোক্গে', দেবকুমার বাবু যা' খুসি ভাবুন না, তাতে আমার কি? না, এবার কিন্তু একটু সাবধান হ'তে হবে, আর কোন লোকের সঙ্গে আমি কথাই কব না, লোকে যখন আমার এই সামান্য বন্ধুত্বটাকে এত গর্হিত ক'রে দিলে তখন আর এ ছাড়া উপায় কি? আমি কিন্তু যদি ভাইস্রয় হতাম তা হ'লে পরনিন্দের উপর সব চেয়ে আগে ট্যাক্স বসাতাম।···

ওঃ,—এ দেশটা কি শুক্নো, রাতদিনই তেষ্টা পায়, দিনের মধ্যে ক' পেয়ালা চা আর কফি যে খাই তার ঠিক নেই।

কি মজা.—পিসীমার বন্ধু মিসেস্ স্কটের ফ্যান্সি ড্রেস্ পার্টি তো শীঘ্রই আস্ছে, আবার সকলকে 'মাস্ক' প'রে যেতে হবে, কেউ কাউকে চিন্তে পারবে না। মিসেস্ স্কট কিন্তু বড় ভাল, আমায় এত যত্ন করেন···প্রথম দিন থেকেই আমায় "লিটিল সান সাইন গার্ল" ব'লে ডাক্তে সুরু ক'রে দিলেন। উনি তো আর আমার আসল মেজাজের পরিচয় পান নি?

যাক্, ওঁর সঙ্গে কিন্তু আমি অনেক জায়গা ঘুরে এলাম। আগ্রার কোর্টটা তো উনিই আমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়ে আন্লেন,—প্রমথ দা'র সঙ্গে গেলে কি আর এত দেখা হ'ত? এক দিকটা দেখা হ'তে না হ'তেই বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত। জ্যাস্মিন টাওয়ারটা কি চমৎকার! সেই সাজাহানের শেষ শয্যা,—সাম্নে যমুনার কালো জল আর দূরে তাঁর প্রিয়তমার শেষ চিহ্ন! আমার এ সব দেখে কিন্তু মন খারাপ হ'য়ে গেল। আচ্ছা, এ সব দেখ্লে দেবকুমার বাবুর কি মনে হবে? ওর ঐ সান দিয়ে বাঁধান হৃদয়টাকে বোধ হয় কিছুই স্পর্শ কর্তে পারে না!

আর একদিন মিষ্টার আর মিসেস্ স্কটের সঙ্গে সিকান্দ্রা দেখে এলাম। আকবরের কবরে বেশী কিছু কায করা নেই বটে কিন্তু তবুও কি সুন্দর! আহা! জাহাঙ্গীরের ছ' মাসের মেয়ের কবরটা দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। কবরটার উপর একটা চৌবাচ্চার মত আছে, সেটা নাকি জাহাঙ্গীরের আদেশানুসারে প্রতি'দিন দুধ দিয়ে ভ'রে দেওয়া হ'ত,—তারপর গরীব দুঃখীদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ঐ দুধ দেওয়া হ'ত। এই সব মোগল বাদ্শা'রা একদিকে যেমন নিষ্ঠুর ছিল আবার অন্য দিকে তেম্নি ভালও বাস্তে পার্ত। সব মানুষের চরিত্রই বোধ হয় এই রকম ভাল-মন্দে মেশান। (নীহার কিন্তু ভাবে আমার মধ্যে সবই মন্দ, ভাল কিছু নেই। আর শুধু নীহারই কেন? দেবকুমার বাবুও কিছু কম যান না—ফের দেবকুমার বাবুর নাম কর্ছি? এই না ঠিক কর্লাম ওর বিষয় একবারও ভাব্ব না!) সিকান্দ্রা থেকে ফের্বার সময় আমাদের মোটরটা গেল বিগ্ড়ে, আর ছাই একটা টঙ্গাও মিল্ল না কতখানি পথ হাঁট্তে হ'ল। মিঃ স্কট এমন মজার লোক, যখন দেখ্লেন আমার হাঁট্তে কষ্ট হ'চ্ছে তখন কেমন গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"এস না, আমি তোমায় কোলে ক'রে খানিক দূর নিয়ে যাই—" কি অদ্ভুত কথা! এত বড় বুড়ো হাতী মেয়েকে কোলে কর্বেন কি? ইংরেজদের কাছে ১৭ টা যেন বয়সই নয়। প্রমথ দা' কিন্তু কি লোক? পরদিন আমার মুখে এই ব্যাপারটা শুনে বল্লে—"হাঁ, তাই কাগজে দেখ্ছিলাম মিসেস স্কট তাঁর স্বামীকে ডিভোর্স কর্বেন···তুমি এই সুযোগে আগু বাড়াও।" প্রমথ দা'র কি সব-তাতেই ঠাট্টা! বেচারা মিঃ স্কটের আমার বয়সী দু' দুটো মেয়ে বিলেতে আছে।

আজ আর মা'র একখানাও চিঠি পাইনি। ইদানীং মা'র চিঠিতে কিছুই খবর থাকে না। আগে বেশ বড় বড় চিঠি লিখ্তেন; প্রায়ই তো লিখ্তেন—"আজ দেবকুমার এখানে এসে চা খেয়েছে—দেবকুমার সেদিন আমাদের থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিল" ইত্যাদি—তাই বোধহয় মা'র লেখ্বার সময় হয় না। এবার আমি পোষ্টকার্ড ছাড়া আর একখানাও চিঠি দেব না। মা কিন্তু কি! যে লোকটা তার মেয়েকে উঠ্তে বস্তে এমন অপমান করে, তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা কেন? দেখ না, যতদিন আমি কলকাতায় ছিলাম ততদিন

কি আমাদের বাড়ী আসা হয়েছিল? ভাবত্‌, আমি বোধ হয় ওকে বিয়ে করতে চাইব!…আমার ভাগ্যে যদি একটাও বর না জোটে তবুও আমি অমন গোম্‌দামুখো লোককে বিয়ে কর্‌ব না। মা'র উপর সত্যি ভারী রাগ হ'চ্ছে!

কাল একটা মাস্ক কেন্‌বার জন্যে বেরোলাম, তা' কোথাও যদি একটা কিছু পাওয়া গেল। এ ত আর আমাদের কলকাতা নয়? আমাদের হল এণ্ডার্স‌ন, আর্মি নেভি, হোয়াইটয়্যায়েসের দোকান এখানে কোথায়?—রাস্তাগুলোই বা কি? একটাও কি আমাদের চৌরঙ্গীর কাছে লাগে? মাগো, এমন ধূলোও তো কোথাও দেখি নি! আমি এবার কোলকাতা পালাব, মা খুব থিয়েটার দেখে বেড়ান আর আমি এখানে ধূলো গিলি! মাস্ক না পেয়ে শেষে একটুক্‌রা কালো স্যাটিন কিনে আন্‌লাম; তারপর পিসী-মা'র বুড়ো দর্জ্জিকে বারাণ্ডায় বসিয়ে প্যাটার্ন-বই দেখিয়ে তবে না ঠিক হ'ল? পিসীমা কিন্তু আমার কি সুন্দর ফ্যান্সি ড্রেস দিয়েছেন;—উনি দিল্লীতে থাক্‌তে কোন্‌ একজন বেগম তাঁকে একসেট পেশোয়াজ ওড়্‌না ইত্যাদি সব উপহার দিয়েছিলেন। কি সুন্দর জিনিষগুলো! অনেকগুলো মুসলমানী গয়নাও জোগাড় করেছি। পিসীমা বল্‌ছেন তো বেশ সাজ হবে, প্রমথ দা' কিন্তু কেবল বলে—আগ্রানী আয়ার মত আমায় দেখাবে। সেদিন পিসেমশায় ঠাট্টা ক'রে বল্লেন—"শুকু, মোগল বাদ্‌শাদের সময় হ'লে তোমায় তারা ঠিক ধ'রে নি.য় গিয়ে হারেমে দিত।" প্রমথটা অম্‌নি হেসে বল্লে—"তাতে দুঃখ কি? ভাইসরয় না হয় ওকে তাঁর বিবির আয়া ক'রে নিয়ে গিয়ে গবর্ণমেণ্ট হাউসে পুরে ফেল্‌বেন।" কি দুষ্টু! ওতে আমাতে যদি একটুও বনে! পিসিমা তো তাই বলেন—"আমার এই ছেলে-মেয়ে দুটো দিনের মধ্যে পাঁচশো বার ঝগড়া কর্‌ছে, আবার তখুনি ভাবও হ'চ্ছে, এরা কি এক মিনিট চুপ ক'রে বস্‌তে পারে না?"

সত্যি, প্রমথ দা' আমায় বড্ড জ্বালায়।… (ক্রমশঃ)

তোমার উদ্যানে

(জাপানী কবিতা। য়াকামোচি—হইতে। ৭৫০ খৃঃ।)

শ্রী বিশ্বেশ্বর দাস

তোমার উদ্যান-বুকে বনতরু-ঘেরা
ছায়া-ঢাকা উপত্যকা রাজে;
সেথা হ'তে একটানা মিশে পিক-গান
প্রভাতের নীলাম্বর-মাঝে।

পুনঃ দূর দূরান্তের কুসুম-রক্তিম
গিরিপথে সন্ধ্যাবেলা নিতি
জাগে সেই প্রাণখোলা সুর-রেশখানি
—অফুরন্ত সে আনন্দ-গীতি।

আমার কাননে হেথা জুঁই চামেলিয়া
সদ্যোফুট—দোলে মৃদু বায়;
আশে পাশে নাই তার একটি কোকিল
কোনখানে গান নাহি গায়।
শুনিতে পাই না আমি যে-কাহিনীটুকু,
পিক কেন তোমারে শুনায়?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

শিল্পী ডাইক্

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

চিরপ্রবহমান জীবনের অনন্ত যে জয়যাত্রা জন্মমৃত্যুর দুর্গম পথে ক্রমবিকাশের পানে এগিয়ে চলেছে, তারই রূপ দেয় শিল্পী স্থিতিশীল অনুভূতির মধ্য দিয়ে। শিল্পীর অন্তর অনন্ত-সৌন্দর্য্যের আনন্দরসে অনুষিক্ত হ'য়ে শিল্পের মধ্যে যে অজস্র ঝঙ্কারের অপরূপ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলে, মানব-হৃদয়ের চিরন্তন রসপিপাসার মাঝে তা অমরত্ব লাভ করে। ইন্দ্রিয়াতীত এই শিল্প-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে পেরেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পীশ্রেষ্ঠ "স্যার এ্যন্থনি ভ্যান ডাইক্";—তাঁর নব নব সৃজনীশক্তির সৌন্দর্য্য আজ তাঁকে শিল্পজগতে অমরত্ব দান করেছে।

শীতের সন্ধ্যা। ঘনায়মান কুয়াসার আবরণ ধীরে ধীরে এ্যান্টোয়ার্প সহরটিকে আবৃত করতে ব্যস্ত—অস্তগামী অরুণের অপস্রিয়মান স্তিমিত আলোককে পীতাভ ক'রে দিয়ে। পনেরো শো নিরানব্বই খৃষ্টাব্দের এম্নি এক শীতের সন্ধ্যায় বেলজিয়ামের বিভবশালী এক বণিকের গৃহে প্রাচুর্য্য আর ঐশ্বর্য্যের কোলে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করলো। অপরূপ সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে তার দেহ শ্রীমণ্ডিত—শ্রেষ্ঠ শিল্পীর একখানি অপরূপ ছবির মত।

কৈশোর থেকেই এঁর বুকে জাগে শিল্পের অনুভূতি, অন্তরে জাগে অসীমের প্রেরণা—কল্পলোকের আলোকাভাস, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের লীলার আবেগ। এই রসের প্রেরণায় রূপ-তুলিকার স্পর্শ জাগাবার জন্যে শিল্পচর্চ্চার দিকেই ইনি ঝুঁকে পড়লেন খুব কিশোর-বয়সেই।

অর্থের অভাব ছিল না, কাজেই ঐকান্তিক সাধনার পথে প্রতিবন্ধক ছিল না মোটেই। রূপ আর গুণের একত্র সমন্বয়ে, মিষ্ট ব্যবহার আর মধুর বাক্যে আত্মীয়-পরিজনদের চিত্ত তিনি জয় করেছিলেন। এঁর সুষ্ঠু কর্ম্মপ্রতিভা এঁর পিতার মনে ভবিষ্যতের অত্যুজ্জ্বল স্বপ্নের আভাস জাগায়, তিনি যত্ন ন'ন পিতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতায় পুত্রের ভবিষ্যৎকে জয়শ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলবার জন্যে। শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠ সুযোগ ডাইক্ লাভ করেন পিতার ঐকান্তিক অনুকম্পা আর ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে। সাধারণ শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের মত জীবনের দুঃখদৈন্যের তিক্ততা সাধন-পথে তাঁর জীবনকে কটু ক'রে তুলতে পারে নি। প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাঁর সাধনার ধারা ব'য়ে চ'লে অনাহত ভাবেই।

সৃজনী-শক্তিতে সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন 'রুবেন্স'। অসামান্য ছিল তাঁর তুলিকার স্পর্শ, অপূর্ব্ব ছিল তাঁর সৃষ্টি। যাঁর কাছে সারা য়ুরোপের শ্রদ্ধা ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্তো তাঁর কাছেই ডাইকের শিক্ষা সুরু হোল অপরিসীম ঔৎসুক্যের মধ্য দিয়ে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাছ হ'তে ডাইকের শিক্ষা লাভ হোল অপূর্ব্ব,—অন্তরে ছিল তাঁর সৃজনী শক্তি, বুকে ছিল তাঁর অনন্তের অনুভূতি,—প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হ'ল রুবেন্সের শিক্ষকতার সোনার কাঠির স্পর্শে। তাঁর পরিকল্পনা আর তুলিকা-সঞ্চালনের শক্তি রুবেন্সকে পর্য্যন্ত আত্মহারা ক'রে তুললো—নিজের দীক্ষার অসামান্য সাফল্যে।

রুবেন্সের কাছে শিক্ষা শেষ ক'রে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর এক-খানি ছবি আঁকলেন—চমৎকার ছবি, যিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে এম্নি একটা কারুণ্যের দীপ্তি ফুটে উঠলো, তাঁর চোখে-মুখে স্নেহ করুণার এম্নি একটা আভাস লাগ্‌লো, যার জন্যে দর্শক মাত্রেরই মনে শ্রদ্ধা জাগলো তরুণ এই শিল্পীর উপর—সারা বেলজিয়ামে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি।

শিল্পী ডাইকের বয়স তখন কুড়ি বছরও পার হয় নি।

এই সময় ইংলণ্ড থেকে ডাইকের ডাক এল—চিত্রপ্রিয় এক ধনীর কাছ হ'তে। ডাইকের কোন অভাবই ছিল না; কাজেই অনেক টাকার লোভ দেখিয়েও ডাইককে তিনি ভোলাতে পারলেন না। কিন্তু অর্থের চেয়ে লোভনীয় হ'চ্ছে যশ, সম্মানের মোহ। কাজেই তিনি এলেন ইংলণ্ডে। কিন্তু যতটা সম্মান, শ্রদ্ধা আর আদর-অভ্যর্থনার আশা তিনি

ক'রে এসেছিলেন তাতে তাঁকে ব্যর্থকাম হ'তে হোল। তবে এখানে একশো পাউণ্ডের একটা চাকরী পেলেন, কিন্তু তাতে তাঁর চঞ্চল মন বশ্যতা স্বীকার করলো না বেশি দিন, তিনি ফিরে এলেন বেলজিয়ামে।

হঠাৎ এক দিন ইটালীতে যাবার তাঁর খেয়াল হোল। য়ুরোপের মায়াকানন ইটালী,—য়ুরোপের শিল্পীশ্রেষ্ঠেরা ওখানে বাস করেন, কেউ বা জন্মগত অধিকারে, আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানুষের অন্তরের যে অনুভূতি জাগে তারই আনন্দে কেউ কেউ। রুবেন্সের কাছ থেকে তিনি পেলেন উদ্দীপনা—তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ইটালীর বুকে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করবে যথেষ্ট, একথা রুবেন্স বার বার জানালেন—ডাইকের মনে আগ্রহ আর শক্তিতে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলবার জন্যে।

যাবার আগে ডাইক একখানি চমৎকার চিত্র দিয়ে গেলেন রুবেন্সকে—গুরু-দক্ষিণা।

কিন্তু তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য ইটালীতেও শান্ত হোল না।

একে একে য়ুরোপের সকল দেশই তিনি বেড়ালেন।

শেষে আবার একদিন এলেন ইংলণ্ডে—কিন্তু পূর্ব্বের মতই সেখানে সম্মান পেলেন না মোটেই। শেষে অভিমান-ক্ষুব্ধ বুকে তিনি আবার ফিরে গেলেন জন্মভূমির কোলে।

জগতের বুকে শক্তি একদিন শ্রদ্ধা লাভ করবেই—ডাইকও একদিন য়ুরোপের বুকে শ্রদ্ধা লাভ করলেন, যশও তাঁর হোল অনন্যসাধারণ ভাবেই। শেষে এমনও একদিন এল, যখন য়ুরোপীয়েরা ডাইকের একখানি ছবি দেখলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করতো—ডাইকের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে কারুর মনেই বাধতো না একটুও।

ডাইকের খ্যাতি ইংলণ্ডের রাজদরবারেও পৌছল। রাজা চার্লস্ ডাইকের পরিকল্পনার পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন ইংলণ্ডে। ডাইকের বয়স তখন বত্রিশ বছর মাত্র।

ডাইক লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলেন সাফল্যের গর্ব্বে। এবার সেখানকার উপযুক্ত অভ্যর্থনা আর অযাচিত সমাদরের প্রাচুর্য্যে শিল্পীর চিত্ত উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো আত্মশক্তির সম্মানে। দরবার-গৃহ মুগ্ধ হ'য়ে পড়ল তাঁর অসামান্য শিল্পী-সুলভ কমনীয়ত', রমণীসুলভ অকৃতি—স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছ, চাঁপার মত অঙ্গুলিগুলি দেখে'; শিল্পের চেয়ে ডাইকের ব্যক্তিত্বের মোহই রাজা চার্লসকে মুগ্ধ করলো বেশি ক'রে। রাজপ্রাসাদের ভোজনাগার চিত্রিত করবার ভার পড়লো ডাইকের উপর—পারিশ্রমিক অপর্য্যাপ্ত!

কিন্তু এ সম্মান ডাইকের ভাগ্যে স্থায়ী হোল না বেশি দিন। চার্লসের প্রজারা হ'য়ে উঠলো রাজ-বিদ্রোহী—

কাজেই অর্থের অনাটনে ভোজনাগার চিত্রিত করবার কাজ বন্ধ হ'য়ে গেল।

সাফল্যগর্ব্বিত ডাইকের মনে দারুণ আঘাত লাগলো। অন্তরের পরিকল্পনা তুলির রেখায় ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা তিনি ত্যাগ করলেন। অন্তরের এই দৈন্যকে ভোলবার জন্য বিলাসিতার আড়ম্বরের প্রয়োজন হোল অতিরিক্ত ভাবে—শিল্পীর বিলাসী মন আপনাকে হারিয়ে ফেলতে চাইলো বিলাসের মধ্যে।

শেষে অর্থের হোল অনাটন—সারাটা জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোলে কাটিয়ে জীবনের শেষ-নিশ্বাস তিনি ত্যাগ করলেন দুঃখকষ্টের তীব্র তিক্ততার মধ্যে। শিল্পী আর সাহিত্যিকের উপর স্রষ্টার যে অভিসম্পাত যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের কোলে পুঞ্জীভূত হ'চ্ছে ডাইকও সেই অভিসম্পাতের হাত এড়াতে পারলেন না।

একচল্লিশ বছর বয়সেই তরুণ শিল্পী ধরণীর বুক হ'তে বিদায় নিলেন। কিন্তু মৃত্যুকে উনি জয় করেছেন ওঁর শিল্পের স্থায়িত্বে—শিল্পীর প্রতিভার যে ক্ষয় নেই, সৌন্দর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি নেই,—শিল্পীর আত্মা যে শাশ্বত চিরসুন্দর! ওঁদের কীর্ত্তির তো মৃত্যু নাই—তুলিকার টানে, ভাবের ইঙ্গিতে যে সৌন্দর্য্যকে এঁরা রূপ দিয়ে যান, যুগ যুগ যুগ ধ'রে তার তরঙ্গ ধ্বনিত হয় বিশ্ববীণার তারে তারে!

ওগো অমর শিল্পী,—তোমার নমস্কার!

নারী-শক্তি

শ্রী ঊষা মিত্র

ভগবানের অসীম দয়ায় এই মহিলাসমিতি দু' বছর অতিক্রম ক'রে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। আজ ছোট ছোট মেয়েদের উৎসাহে পূর্ণ যৎসামান্য কাজ ভদ্রমহোদয় ও ভগিনীদের সামনে স্থাপিত করা হয়েছে; আশা আছে, গত বছরের মত এ বছরও তাঁরা উৎসাহ দেবেন। সামান্য হ'লেও লজ্জার এতে কিছু নেই। মানুষ মানুষের কাছে অনেক কিছু দাবী কর্‌তে পারে; সেই হিসাবে আজ বোনদের কিছু বল্‌বার দাবী কর্‌ছি। যদিও নতুন বল্‌বার কিছু নেই সবই পুরাতন কথা, তবে পুরাতনই নাকি চিরসুন্দর—নবীনতার আদিম উৎস—অফুরন্ত তার মধু, অসীম তার স্পর্দ্ধা।

যাক্ সে কথা,—বল্‌ছিলুম কি, যে, যদিও ভারতনারীকে নিকৃষ্ট প্রমাণিত কর্‌বার এক-শ্রেণীর লোকে খুবই চেষ্টা ক'রে থাকেন, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে বোঝা যায়—নারী কোনও দিন হীন ছিল না, হবে না, সে কিছু দিনের জন্যে সুপ্ত থাক্‌তে পারে মাত্র—ছিলও তাই। প্রাচীন বইয়ে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুদের কাছে ভগবানের বাণী—সব থেকে প্রাচীন বই ঋগ্বেদের কয়েকটি গাথা উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে, যে গুলো নারীর কাছেই প্রকাশ হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, পুরাকালে নারীর স্থান ধর্ম্মজগতে কত উচ্চে ছিল এবং এও বুঝ্‌তে পারা শক্ত নয় যে বেদ বোঝ্‌বার শক্তিও নারীর ছিল—লেখাপড়ার দিক দিয়ে তাঁরা হীন ছিলেন না। হিন্দুসমাজে সব চেয়ে উচ্চে ঋষির স্থান। অনেক মেয়ে-ঋষির নাম আমরা প্রাচীন সাহিত্যে দেখ্‌তে পাই। সামাজিক রীতিনীতিও নারীর জন্যে অপমানজনক ছিল না। মেয়েদের পতি-নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হ'ত এবং এ থেকে এও বুঝ্‌তে পারা যায় যে বালিকা-বয়সে বিয়ে দেওয়া তো হ'তই না উপরন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তা ও স্বতন্ত্রতা দাবী কর্‌বার অধিকার থেকেও ওদের বঞ্চিত করা হ'ত না। মধ্যযুগে রাণী দুর্গাবতী, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাই, সুলতানা রিজিয়া, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এবং অনেক রাজপুত নারী রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়ে ভারত-নারীর শক্তির অব্যাহত ধারার প্রমাণ দিয়েছেন।

আধুনিক যুগে নারীশক্তির পরিচয়—বর্ত্তমান ভারতের নব জাগরণে ভারতীয় নারীর অবদান। বাইরের আহ্বান পাওয়া মাত্র হাজারো হাজারো মেয়ে ঘরে-বাইরে সমানে কাজ চালিয়ে কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তিকে পূর্ণ ক'রে তুলেছেন। মনীষা তাঁদের যে পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন নয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পরীক্ষার ফলাফল দেখ্‌লে তা পরিষ্কার হ'য়ে যায়—অবশ্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ মেয়েরা পান নি। সুযোগ পেলে সামাজিক সংস্কারের কাজে, রাষ্ট্রীয় অধিকার-লাভে এবং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁরা সব সময় অগ্রসর হ'তে দ্বিধা কর্‌ছেন না। আমাদের দেশে কংগ্রেস সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের অধিবেশনে নারী সভা-নেত্রী হয়েছেন—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী অ্যানী বেসাণ্ট। নারীশিক্ষার আদর্শস্বরূপ স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তর জীবনী পড়্‌লে বোঝা যায়—ঘরে-বাইরে নারীশক্তি কি সুচারুরূপে সুন্দরভাবে কাজ কর্‌তে পারে, কর্‌ছে। আজ কত শত অনাথা 'সরোজনলিনী দত্ত সমিতি' থেকে জীবিকা-নির্ব্বাহ কর্‌ছে। ভারতবাসীর গর্ব্বস্বরূপ 'সরোজনলিনী দত্ত সমিতি'র শাখা বিলাতেও আছে।

কিন্তু মনে হয়, নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের এক দিকে আজ যেন বড়ই শিথিলতা দেখা দিচ্ছে—সে বিষয় হ'চ্ছে সন্তান-পালন ও সন্তান-শিক্ষা। এ কথা কিছুতে অস্বীকার করা চলে না যে সংসারে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান-পালন। সন্তান-পালন অর্থে তাকে শুধু আহারাদি দিয়ে বড় ক'রে তোলা নয়, সৎশিক্ষা দানে তার প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করাই এর প্রকৃত অর্থ। বাপের চেয়ে সন্তান

মায়ের কাছে অনেক কিছু শেখ্‌বার দাবী রাখে, অতএব মাকে তার সে দাবী পূর্ণ কর্‌বার উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়-গতিকে আজ আমরা হয়ে পড়েছি তার অনুপযুক্ত। পুরাকালে নারী শিক্ষিতা ছিল—তারা সন্তানের শিক্ষাকে স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রধান অংশ ব'লে জান্‌ত। কিন্তু এখন আমরা ঐ জিনিষটুকু জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে অকেজো ও বিরক্তিকর ব'লে বাদ দিয়ে থাকি।—যদিও এই জন্যে আমরা সম্পূর্ণ দোষী নই।

অতীতের গৌরবস্মৃতির সশ্রদ্ধ আলোচনার দরকার, কারণ এ থেকে আমরা নূতন সৃষ্টির প্রেরণা পাব। কিন্তু যদি সেই স্মৃতির ভারে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে বর্ত্তমানের দিকে অন্ধ হ'য়ে ব'সে থাকি, তা হ'লে আমাদের আত্মহত্যা করা হবে। কারণ, মানুষের মনই যখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তখন মানুষের সভ্যতা, রীতিনীতি, আচারব্যবহারও কখনো কালপ্রবাহের সঙ্গে রূপের পরিবর্ত্তন স্বীকার না ক'রে পারে না। গতিই প্রাণের লক্ষণ। তবে এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে আমাদের বর্ত্তমানের মূল সুদূর অতীতে ছড়িয়ে আছে। সে নিগূঢ় সংযোগসূত্র ছিন্ন ক'রে আমরা যেন প্রতিকূল ভূমিতে ফলবান্ গাছ তৈরী কর্‌বার ব্যর্থ প্রয়াস না পাই।

যদিও আমরা পুরাকালের শিক্ষিতা জননীর বংশগত সন্তান, তবুও ঘটনাস্রোতে আমাদের অধোগতি হয়েছে অনেকখানি। তারপর সম্প্রতি নবযুগের স্ত্রীশিক্ষার নূতন বন্যায় দেশ ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছি। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার অর্থ কতকগুলো পাশ্চাত্য বইয়ের গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ নয়। যদি এই-গুলোকেই আমরা শিক্ষার পরম আদর্শ স্থির করি, তবে সে হবে মস্ত ভুল। দুঃখের বিষয়, যা আমাদের শিক্ষার এবং জীবনের গোড়ার কথা সে দিকে আমরা দৃষ্টি দিই না। আজকালকার স্কুল-কলেজে মেয়েদের যা শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে তাতে মেয়েরা পুঁথিগত বিদ্যা শিখ্‌লেও, আমাদের ঘরের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার জন্যে যে রকম ব্যবহারিক জ্ঞান এবং সে জীবনকে উন্নত, সুন্দর ও আনন্দময় কর্‌বার জন্যে অন্যান্য যে বিদ্যা, তাদের সঙ্গে পরিচয় রাখ্‌ছেন না। যে শিক্ষায় গণিত, তর্কশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতির কঠিন সমস্যা মেয়েরা সহজে সমাধান ক'রে ফেল্‌ছেন, অথচ প্রতিদিনকার জীবনসমস্যায় পরাজিত হচ্ছেন, সে শিক্ষার গোড়ায় যে গলদ আছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। শিক্ষা বল্‌তে কতকগুলা শব্দ শেখা নয়, ওকে আমাদের বৃত্তি বা শক্তি সমূহের বিকাশ বলা যেতে পারে; অথবা শিক্ষা বল্‌তে আমাদের এমন ভাবে গঠন ক'রে তুল্‌তে হবে যাতে আমাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়।

মেয়েদের—ধর্ম্ম, শিল্প, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রান্না, সেলাই, শরীরপালন ইত্যাদি বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম আগে শেখাতে হবে। এই বর্ত্তমান মানুষ গ'ড়ে তোলার আন্দোলন না হ'লে আজ অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন নারীদের ফ্যাসান ও অনুকরণের বন্যা যে কোথায় নিয়ে যেত, সে এক অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেউ বল্‌তে পারেন না। নারী যখন মা, তাঁকে সদ্‌দৃষ্টান্ত ছেলে-মেয়েদের সামনে রাখ্‌তে হবে। লেখা-পড়া বা কোন বিদ্যা শেখা খারাপ হ'তে পারে না; আর,দেশ-কাল হিসাবে পুরাতনের মহিমায় মুগ্ধ হ'য়ে তাকেই আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌লে চল্‌তে পারে না, সে সবই ঠিক। কিন্তু যা শিখ্‌ব তা আমাদের কাজের হওয়া চাই। অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো পড়ার চাপে স্বাস্থ্য নষ্ট ও সময়ের অপব্যয় হয় অথচ সত্যিকার শিক্ষা কিছুই হয় না। লাভের মধ্যে ভগ্ন স্বাস্থ্যে রুগ্ন সন্তানের জননী হ'য়ে নিজের এবং সন্তানের উন্নতির পথ রুদ্ধ ক'রে বসি। ফ্যাসানটুকুকে অভ্যাসে কায়েমী ক'রে চুল বাঁধা থেকে শাড়ীর আঁচলটুকু পর্য্যন্ত নিখুঁত ভাবে অনুকরণ ক'রে থাকি। নিজেকে দুর্ব্বল দেখান ও এতটুকুতেই ক্লান্ত হওয়া—সেও ওরই অঙ্গ। মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে তর্ক বাধিয়ে বসি, একবার এ কথা ভেবেও দেখি না যে অন্তঃপুরের সম্রাজ্ঞীর অধিকার—যা আমরা পেয়ে থাকি, তাকে কি ভাবে ক্ষুণ্ণ ক'রে বাইরে বেরুবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠি। হাজার বার স্বীকার কর্‌ছি, নারীর পূর্ণবিকাশ অন্তঃপুরের গণ্ডীর মাঝেই আবদ্ধ নয়, তার চরিতার্থতা অন্তঃপুর ও বাহির এ দুয়ের দাবীর সামঞ্জস্যে। কিন্তু এ কথা তাকে সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে, আগে অন্তঃপুরের কর্ত্তব্য সুচারু ভাবে সম্পন্ন কর্‌তে হবে, তারপর বাইরের; নইলে বালির ভিত্তির ওপর পাথরের প্রাসাদ দুদিনেই সশব্দে ভেঙ্গে পড়্‌বে। সমান-অধিকার আমরা চাই কিন্তু সে সাম্য মানে এ নয় যে পুরুষেরা তাল-

মন্দ যা করেন আমরাও ঠিক তাই কর্‌তে চাই। আমরা যে সাম্য-স্বাধীনতা চাই তার প্রকৃত অর্থ হ'চ্ছে যে পুরুষরা যেমন নিজেদের ধরণে নিজেদের পূর্ণবিকাশ কর্‌বার অধিকার ভোগ কর্‌ছে, আমরাও তেমনি আমাদের নিজস্ব ধরণে আমাদের বিকশিত কর্‌বার সুযোগ চাই। স্বাধীনতা জীবনের পরম কাম্য, কিন্তু স্বাধীনতা এবং অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা এক নয়; এক কাজ অসমাপ্ত রেখে অপর কাজে দৌড়ান অস্থির এবং অগভীর-চিত্ততার পরিচায়ক। প্রয়োজনের সময় নারী বাইরে বেরুবে মায়ের অসীম শক্তিময়ী রূপ নিয়ে, কিন্তু তাকে এও মনে কর্‌তে হবে সেই মাতৃমূর্ত্তিকে গৃহে গঠন ক'রে বাইরে দিতে হবে।

অনেকের মতে মানুষ জন্মাবার সময় তাদের নিজস্ব এমন কতকগুলো সংস্কার নিয়ে জন্মায় যে গুলোর কাছে তার মা-বাপের শিক্ষাদানের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে হার মানে। বড় হ'য়ে সে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে চলে। আবার অনেকে বলেন, ও সব ধারাণা ভ্রান্ত, শিক্ষাই সব। কিন্তু আমরা স্বাভাবিক বুদ্ধি নিয়ে যদি একটু বিচার করি, তবে সত্যি জিনিসটুকু হয় ত চোখে প'ড়ে যেতে পারে। ভাল কোনও গাছের বীজ নিয়ে যদি বিশ্রী স্থানে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে সময়কালে তার ভাল ফল পাবার আশা আমরা কর্‌তে পারি কি? সে ত সম্ভব নয়। কেন নয়? কারণ যদিও বীজটুকু ভালই ছিল তবুও তার মাটি ভাল ছিল না, এবং জল বাতাস রোদও প্রচুর পরিমাণে সে পায় নি। তেমনি মানুষ। দেখা গেছে মা-বাপ সৎচরিত্র, সুশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, তা সত্বেও সন্তান উপযুক্ত হয়নি। এর কারণ—ঠিক গাছেরি মত। তাকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় নি। সে ছেলে-মেয়ের কাছে আমরা কি আশা কর্‌তে পারি? জ্ঞানীরা বলেছেন, প্রত্যেকটি ঘটনা প্রত্যেকটি দৃশ্য মানুষের মনে স্বীয় ছায়া অল্পবিস্তর রেখে যায়। সীনেমা, থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়ে মনে করি চোখের বা কানের খানিকটা তৃপ্তি ক'রে এলুম এবং পরদিন হয় ত সে ঘটনা ভুলেই গেছি মনে কর্‌লুম। কিন্তু তা নয়, এ আমাদের বোঝ্‌বার ভুল। যে দৃশ্য সত্যই মন আমাদের আকর্ষিত ক'রে নেয়, সে আকর্ষণ একটুখানির জন্যেই হোক না কেন, বাইরে থেকে আমরা না বুঝ্‌লেও— মনের এক কোণে তার একটা ছায়া থেকেই যায়; তেমনি শিক্ষা। ছোট বেলায় শিশুর চিত্ত স্বভাবতঃই কোমল থাকে; সেই কোমল জিনিষের ওপর পিতামাতার শিক্ষা পাথরে আঁকা চিত্রের মত দৃঢ় ভাবে এঁকে যাবারই সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য তার জন্মগত সংস্কার যে কিছু থাক্‌তে পার্‌বে না, এ কথা অস্বীকার কর্‌বার মত সাহস রাখি না। তবে এও মূল্যহীন নয় যে, সৎশিক্ষা জীবনসংগ্রামে এক অমোঘ অস্ত্র। শিক্ষিত সন্তান যখন কোন খারাপ কাজে প্রলুব্ধ হয় তখন তার সৎশিক্ষার বাধা দেওয়া স্বাভাবিক—মনে আঁকা সেই সৎচিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠাই সম্ভব। শিক্ষার মানে শুধু ওষুধ গেলার মত কতকগুলো বই গলাধঃকরণ কর্‌তে পারাই নয়, ভাল বস্তুর গভীর সত্যের এবং সৌন্দর্য্যের দিকে তার রুচি করিয়ে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা! এক কথায়, তাদের মন প্রশস্ত বা সঙ্কীর্ণ হবার, তাদের কতকগুলো সু বা কু অভ্যাসে অভ্যস্ত করিয়ে দেবার জন্যে সন্তান নিজে নয় বরং পিতার চেয়েও মাতাই বেশী দাবী। এ দায়িত্বজ্ঞান আমাদের সব মায়েরি থাকা দরকার। বড় হ'য়ে সন্তানরা বাইরের বৃহত্তর সমাজে মিশে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নিজের এক ব্যক্তিগত মতামত ও যাত্রাপথ তৈরী কর্‌বেই। কিন্তু সেই সৃষ্টির গঠন ও বিকাশে মায়ের দেওয়া শিক্ষা অনেকখানিই সাহায্য ক'রে থাকে। জগতের সর্ব্বকালের মহাপুরুষদের জীবনীতে তাঁদের মায়েদের সৎশিক্ষাদানের ইতিহাস স্বর্ণ-অক্ষরে লেখা আছে।

দুঃখের কথা, আমরা নিজেদের ধর্ম্মই নিজেরা বুঝি না। আমাদের অমন মহান সজীব ধর্ম্ম আজ অন্ধ বিশ্বাসে কতকগুলো ভালমন্দ আচার-ব্যবহার পালন করায় পরিণত হয়েছে। আজকাল সহজ সরল ভাষায় গীতা বেরিয়েছে, কিন্তু নভেল ছেড়ে সেটুকু পড়া উচিত মনে করি না। অবশ্য সবারি কথা বল্‌ছি না, কিন্তু অধিকাংশই আমরা এই। যদিও নারী—কন্যা, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, প্রেয়সী, কিন্তু তার নারীত্বের চরিতার্থতা জননীরূপেই। অতএব, মায়ের কর্ত্তব্য —সেই চরিতার্থতাকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের প্রাণ ও তার গর্ব্ব-স্বরূপ সেই মহান্‌ পবিত্র ধর্ম্মের দিকে ছেলেদের শিশু অবস্থা থেকে আকর্ষিত ক'রে তাতে তাদের শুধু সহজ রুচি করিয়ে দেওয়া

নয় বরং জন্মগত সংস্কারের ন্যায় অস্থিমজ্জাগত করিয়ে দেওয়াই মায়ের কর্ত্তব্যের এক প্রধান অংশ।

স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা তা সে ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্ তাকে সব প্রথম মায়েদের ছেড়ে দিতে হবে। এই বিশ্বভরা যে আমাদের মা-বোনেরা আছেন তাঁদের ভালবাস্‌তে হবে, তাঁদের দোষক্রটি যদি কিছু থাকে সে সব সমালোচনার দণ্ডে শাস্তি না দিয়ে স্নেহ দিয়ে সংশোধন ক'রে নিতে হবে। পরের দোষ-ক্রটিকে বড় ক'রে দেখা আমাদের অনেকেরি স্বভাব, কিন্তু এতে কোন সার্থকতা নেই। বরং এতে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য যে দিনে দিনে গ্লানির ভারে ম্লান হ'য়ে পড়্‌ছে, এবং তারি অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দৈহিক এবং নৈতিক জীবনেও ঘুণ ধরেছে, তার প্রমাণ বোধ হয় আমাদের সামনে ধরা অনাবশ্যক। জীবনে মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক দিকগুলোকে পরস্পর সম্বন্ধবিহীন স্বতন্ত্র ক'রে রাখা যায় না। একই শক্তির এরা বিভিন্ন প্রকাশ। কাজেই একটাকে হীন ক'রে অন্যের উন্নতি কর্‌তে যাওয়া ভাবহীন ভাষা বা ভাষাহীন ভাব দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির ন্যায় মূঢ়তার লক্ষণ। যদি মনকে প্রশান্ত, উন্নত, দৃঢ় করি তা হ'লে দেখ্‌ব তার প্রতিক্রিয়া দেহের ওপর কি সুন্দর ভাবে স্বাভাবিকরূপে হ'চ্ছে। অপরাপর কর্ত্তব্যের মাঝে এও এক প্রধান কাজ যে ছেলে-মেয়েদের দৈনিক ব্যায়ামে অভ্যস্ত করিয়ে দেওয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি বেশী রকম দৃষ্টি রাখা। মানুষ যদি ইচ্ছা করে তবে আজীবন তার উন্নতি কর্‌তে পারে। ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে পুষ্ট ও নীরোগ করা আমাদের হাতে। স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তবে ঘরে-বাইরের প্রলোভন আকর্ষণ ক'রেও পরাভব স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হবারি সম্ভাবনা বেশী।

আমরা মায়ের জাতি। অনেকে আমাদের শক্তির কথা হয় ত কোনও দিন ভেবেও দেখি না। কিন্তু সত্যিকার আগ্রহ একাগ্রতা নিয়ে যদি অন্তরের মাঝে চেয়ে দেখি, তবে দেখ্‌তে পাব শক্তির অংশে জন্মেছে যে নারী তার শক্তির শেষ নেই। আমাদের বুকের মাঝে এমন সব শক্তি সুপ্ত আছে যা বাঞ্ছনীয় হ'লেও বিস্ময়কর নয়। তাকে জাগিয়ে তোলা আমাদেরি হাতে। সকল রকম সুবিধা ও সুযোগ না থাকার জন্যে শুধু তর্ক ও দুঃখ ক'রে লাভ কিছু নেই। কিন্তু যা আছে এরই ভেতর সুবিধা ক'রে সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে ঘরে এবং বাইরে মায়ের কর্ত্তব্যকে পূর্ণ করা নারীর সাধ্য এবং সাধনার বাইরের প্রশ্ন নয়।

আমাদের দেশে জীবনকে অখণ্ড রূপে দেখা হয়েছে। ধর্ম্ম, দর্শন শিল্পাদিকে জীবনে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা হয় নি। শক্তির জাগরণ হয় জীবনের সকল রকম পথের ভেতর দিয়ে। এত দিন পৃথিবীর সভ্যতার জ্ঞান, বিজ্ঞান, চারুশিল্পের দিক দিয়ে হয়ত নারী তেমন কিছু সার্থক দান করেন নি। কিন্তু আজ যখন নারী-জাগরণ দেখা দিচ্ছে, আজ আমাদের ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যে এই নারী-শক্তি যেন ঘরে-বাইরে সামঞ্জস্য ক'রে ভারতের তথা পৃথিবীর সভ্যতার প্রকৃতি ও পরিধি বৃহত্তর মহত্তর সুন্দরতর করুক্। যে ক্ষীণ দীপশিখা আজ অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে মৃদু-আলোক বিকীরণ কর্‌ছে তারই ভাস্বর আকাশচুম্বী আলোয় সমগ্র মানবসমাজের অন্তর-বাহির উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক্। এই আমাদের প্রার্থনা, আমাদের তপস্যা, আমাদের সাধনা।

এই সমিতিকে জন্ম দিয়ে দু' বছর আমি যথাশক্তি এর জন্যে কাজ করেছি কিন্তু শরীরের অসুস্থতার জন্যে এ দায়িত্ব-পূর্ণ কাজের ভার নিতে এখন আমি অসমর্থা। তাই আজ সমিতি থেকে বিদায় নিচ্ছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা,— এই সমিতিকে তিনি অমর করুন।*

* জব্বলপুর মহিলাসমিতির শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভার সভানেত্রীর অভিভাষণ।

সিমলা টুটিকাণ্ডি আর্য্যনারী সমিতি

৫ মাস সমিতির কার্য্য বন্ধ থাকিবার পর ১লা মে হইতে পুনরায় সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর আমরা ৩ জন গুর্খা মহিলাকে সভ্যারূপে পাইয়াছি। সমিতির কার্য্যাবলী ইঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে—ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয়। ইঁহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, এবং নানারূপ ছাঁট-কাট, সূচীশিল্প শিক্ষা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত আরো অনেকে যোগদান করিয়াছেন।

ছাঁটকাট, এম্‌ব্রয়ডারী এবং পশমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক সভ্যাই নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় সার্ট, প্যাণ্ট, পাঞ্জাবী, র‍্যাপার, ব্লাউজ, সেমিজ, পেটীকোট ইত্যাদি এবং পশমের সাল, সোয়েটার, মাফলার, মোজা, টুপী, কোট ইত্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া সংসারের আয় করেন। এতদ্ব্যতীত প্রদর্শনী ইত্যাদি উপলক্ষে নানারূপ সূচীশিল্প প্রস্তুত করিয়া প্রশংসা পাইতেছেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় কুমারী রেণুকা রায় ও কুমারী মণিকা ধরের নেত্রীত্বে বালক-বালিকাদের লইয়া সমিতির ক্লাস গঠন করা হইয়াছে। ২০।২৫টি বালক-বালিকাকে প্রতি শনিবারে ৩ ঘণ্টা করিয়া ছোট ছোট উপদেশমূলক গল্প বলা, রচনা শিক্ষা, ড্রয়িং এবং কিছু সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। গান-বাজনার বন্দোবস্তও আছে।

এ বৎসর মাতৃমন্দির পত্রিকাখানি বন্ধ হওয়ায় ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'জয়শ্রী' পত্রিকাখানি লওয়া হইতেছে।

গত ১৯শে জুন সমিতির জন্মোৎসব উপলক্ষে নানারূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সভ্যাগণ নিজেরা রন্ধনাদি করিয়াছেন, এবং হিন্দু, ব্রাহ্ম, গুর্খা, সকল সম্প্রদায়ের মহিলাগণ একত্রে আনন্দের সহিত ভোজন করিয়াছেন।

সিমলা-প্রবাসী বঙ্গমহিলাগণের পরস্পর মেলা-মেশার উদ্দেশ্যে, মাননীয়া লেডী প্রতিমা মিত্রের ইচ্ছায় ১ বৎসর যাবৎ প্রায় ৭০ জন মহিলা লইয়া "প্রবাসী মহিলাসমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। আর্য্যনারী সমিতির সভ্যাগণ সেখানেও মাসে ।০ চাঁদা দিয়া মাসে একবার যোগদান করেন। ঐ সমিতির আয়ে ২টি পিতৃহীনা বালিকাকে স্কুলে পড়ান হইতেছে এবং নারীশিক্ষা-মূলক কার্য্যে ঐ অর্থ ব্যয় করাই সমিতির উদ্দেশ্য। আর্য্যনারী সমিতির সম্পাদিকা উক্ত সমিতিরও সম্পাদিকা মনোনীত হইয়াছেন।

সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাব অক্টোবর মাসে হইয়া থাকে।

পুণ্যময়ী সরোজনলিনীর বাণী স্মরণ করিয়া আমরা সমিতিকে উন্নত করিবার এবং সিমলার বিভিন্ন পল্লীতে সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি।

শ্রী নলিনীবালা সেন,
সম্পাদিকা।

কালিয়া

আমাদের সমিতির ভার শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী (সমিতির প্রেসিডেণ্ট) গ্রহণ করিয়াছেন এবং সমিতির জন্য একটি পাকা ঘর করিয়া দিয়াছেন। ১লা শ্রাবণ সমিতির একটি স্কুল খোলা হইয়াছে। এই ১ মাসে স্কুলে ৬৫ জন মেয়ে হইয়াছে। ৩০শে শ্রাবণ মেয়েদের রান্না করান হইয়াছে।

স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়:—১। মন্দিরের সম্মুখে স্তোত্রপাঠ, ২। সাধারণ পাঠ,

৩। সেলাই শিক্ষা, ৪। চিত্র শিক্ষা, ৫। চরকার সূতা কাটা শিক্ষা, ৬। তাঁত বয়ন শিক্ষা, ৭। সঙ্গীত শিক্ষা, ৮। মাসে ২ দিন রন্ধন শিক্ষা। বড় কালিয়ার শ্রীযুক্তা সরোজবালা দেবী তাঁতের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং আমাদের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বিভা দেবী স্কুলের ধাত্রী-শিক্ষা ক্লাস ৺পূজার পর হইতেই খোলা হইবে। মুসলমান, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বহু নিম্নশ্রেণীর বালিকা স্কুলে প্রত্যহই বেশী হইতেছে। বহু মহিলা তাঁত ও ধাত্রী-শিক্ষার জন্য নাম দিয়াছেন, এবং সেলাই শিখিতে আসেন। সমিতির ঘরের পেছনেই একটা খোলা মাঠ আছে;

বেহেলী মহিলাসমিতি

শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁত এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই, এজন্য সরোজ দেবী এখনো স্কুলে কাজ করিতেছেন। ছাত্রী-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এজন্য একজন শিক্ষয়িত্রী শীঘ্রই লওয়া হইবে। শিক্ষয়িত্রীদের বেতন, রান্নার খরচ ইত্যাদি যাবতীয় সমস্ত খরচই সরোজিনী দেবী দিতেছেন এবং দিবেন। ইনি কালিয়ার সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বর্দ্ধমানের উকিল শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনের স্ত্রী। সমিতিতে সেখানে বালিকারা টিফিনের ছুটীতে খেলা করে। যেদিন রান্না করান হয়, সেদিন সব মেয়েরাই খাইয়াছিল। সেদিন মেয়েদের আনন্দে যে তৃপ্তি পাইয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়। এখন বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় কয়েকটি মেয়েকে রান্নার জন্য নেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

শ্রী সরোজবালা দেবী,
সহঃ সম্পাদিকা।

মন্দির

শ্রী শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ঐ স্বর্গের মন্দির-দ্বার
খুলেছে দেবতা আপন হাতে,
লক্ষ লোকের চরণ-চিহ্ন
আঁকা আছে তার হৃদয়-পাতে।
তবু মন্দির স্থির প্রশান্ত
অটুট তাহার অঙ্গ-ভাতি
প্রথম অরুণ-কিরণ যেন বা
জাগাবে চাতকে পোহায়ে রাতি।

শ্রমের সঙ্গে ধূলি আছে সেথা,
কত না দিবসে গিয়াছে ভরি',
তবুও পড়েনি ধূলির চিহ্ন
অমল-শুভ্র দেউল 'পরি।
স্বর্গ-দূতের স্নেহ-সুধাভরা
ঝরঝার মত অশ্রু-ধারা
বহি' বার বার মন্দির মাঝে
করিত যেন বা নূতন-পারা।

বাহিরে নিখিল-ধরণী হয়েছে
পুরাতন আর ক্লান্ত-কায়া,
আসিলে কখনো সে পূত দুয়ারে
দূরে চলে' যায় কালের মায়া।
সেখানে থাকে না বয়সের ভার,
থাকে না ধর্ম্ম-বিচার আর,
সেখানে মিশে যে মানুষের প্রাণ—
বিশাল মধুর এক-আকার!

আসিনু সেখানে—কিবা সুন্দর,
কি যেন স্নিগ্ধ মাধুরী-মাখা;
নাহি গো সেথায় ধূপের গন্ধ,
রমণীয় বেদী চিত্র-আঁক।
সেখানে সুরভি প্রভাত-সমীরে
একাকিনী বসি' একটি নারী,
সে মোর জননী—দেখিব কি আমি
জীবন ভরিয়া প্রতিমা তাঁরি! *

কেন্দ্রসমিতির কথা

হুগলী মহিলাসমিতির বার্ষিক উৎসব

গত ১৫ই আগষ্ট শনিবার চুঁচুড়ায় হুগলী মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শান্তি জ্যাকেরিয়ার গৃহে হুগলী মহিলাসমিতির বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মহিলাসমিতির সভ্যারা ব্যতীতও অন্যান্য মহিলারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে হুগলী মহিলাসমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা এবং সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ওজস্বিনী ভাষায় নারীপ্রগতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, মহিলাসমিতির ভিতর দিয়াই নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হইয়া উঠিবে। বক্তৃতান্তে মহিলাসমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা চারু দাস সম্পাদিকার সময়োপযোগী অভিভাষণ পাঠ করেন। মহিলাদের ভিতরে সমিতির ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হইবার পর, সঙ্গীতান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। সম্পাদিকা স্বয়ং মহিলাদিগকে সূচী-শিল্প শিক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

বেহালা মহিলাসমিতি

গত ১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার বেহালা মহিলাসমিতির উদ্যোগে বেহালা ব্রাহ্মণসমাজ লেনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী, কুমারী মমতা মিত্র, প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে নারীমঙ্গল সমিতির বহুমুখী কর্ম্মধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৎপরে পণ্ডিত শাস্ত্রী ধ্রুবচরিত্র সম্বন্ধে দীপালোচনা করেন। মহিলাদের ভিতরে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

আগরপাড়া মহিলাসমিতি

গত ২৫শে আগষ্ট মঙ্গলবার আগরপাড়া মহিলা-সমিতির উদ্যোগে আগরপাড়ায় বাঁড়ুয্যে-বাড়ীতে পুরুষ ও মহিলাদের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী এই সভায় উপস্থিত হন এবং আলোক-চিত্র সাহায্যে মহিলাদের শিল্পশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অতিপ্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও বর্ষা সত্ত্বেও এই

* Dolben-এর ইংরাজী কবিতা হইতে অনুবাদিত।

প্রাচীনপন্থী গ্রামের বহু সধবা, বিধবা ও কুমারী মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। হলে স্থানাভাব হওয়ায় বহু পুরুষদিগকে উঠিয়া মহিলাদের জন্য স্থান করিয়া দিতে হয়। হিতবাদীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ এই সভার উদ্যোগ করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সভার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ভদ্রকালী মহিলাসমিতি

গত ২রা আগষ্ট রবিবার বৈকাল বেলা ভদ্রকালী মহিলা-সমিতির উদ্যোগে ভদ্রকালী ব্রহ্মচর্য্য বালিকাবিদ্যালয়-ভবনে মহিলাদের একটি সাধারণ সভা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী এবং প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী কেন্দ্রসমিতির পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আশ্রমের কয়েকটি বালিকা প্রথম উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা সরস্বতী সমাজসেবায় মহিলাদের অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর, পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে শিশুপালন ও মাতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু মহিলা এই মহিলাসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্যামপুকুর মহিলাসমিতি

গত ১০ই আগষ্ট সোমবার কেন্দ্রসমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী শ্যামপুকুর মহিলাসমিতি পরিদর্শন করিতে গমন করেন। শ্যামপুকুর মহিলাসমিতি কয়েকজন অতিদরিদ্র মহিলা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু মহিলাগণ দরিদ্র হইলেও কর্ম্মে ও শিল্পশিক্ষায় তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ, এবং তাঁহারা আশা করেন যে, এই মহিলা-সমিতির সাহায্যে তাঁহাদের দারিদ্র্য অচিরে তাঁহারা ঘুচাইতে সমর্থ হইবেন। শ্রীযুক্তা চক্রবর্ত্তী কিরূপভাবে চলিলে তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, সেই বিষয়ে তাঁহা-দিগকে উপদেশ দেন।

তালপুকুর সুবার্ব্বন রিডিং ক্লাবে নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা

গত ১৫ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা ৭টার সময় নারিকেল-ডাঙ্গা সুবার্ব্বন রিডিং ক্লাবের সভ্যদের উদ্যোগে একটি সাধারণ সভা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বর্ত্তমানে ভীষণ অর্থসমস্যার সমাধানকল্পে দেশ-ব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে মহিলাদেরও যে কর্ত্তব্য আছে এবং পূর্ণাঙ্গে সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালিত না হইলে যে কিছুতেই চলিতে পারে না এবং তাহা করিতে হইলে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া মহিলাসমিতি স্থাপন পূর্ব্বক তাহার মধ্য দিয়া গৃহশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, প্রসূতি পরিচর্য্যা প্রভৃতি বিষয়ের প্রচার ও এই সব কার্য্যে মহিলাদের উদ্বোধিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য, এই সব বিষয়ের বক্তৃতা করেন। বহু লোক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যের সাফল্যের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

গড়িয়াহাটায় মহিলা-সভা

গত ৬ই সেপটেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় লেক এরিয়া মহিলাসমিতির উদ্যোগে মিঃ জি, সি, রায়ের বাড়ীতে গড়িয়াহাটার হিন্দুস্থান প্লটের মহিলাদের একটি সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির সহযোগী সম্পাদক মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম্‌-এল্‌-সি মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে নারীমঙ্গল সমিতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিষয়ক বহুমুখীন মঙ্গলকর এবং অভিনব প্রচেষ্টার বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সত্ত্বেও বহু মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ জে, সি, ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় এই সভার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বালীগঞ্জে মহিলাসভা

গত ৭ই সেপটেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে বালীগঞ্জে মিঃ জে, সি, রায়ের বাড়ীতে একটি মহিলাসভার অধি-বেশন হয়। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশ-

চন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে পূর্ববঙ্গদের শিক্ষা ও মহিলাসমিতির কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নতি দ্বারাই জাতীয় উন্নতির পথ সহজ হইয়া উঠে।

সাঁত্রাগাছি মহিলাসমিতি

গত ১৬ই ভাদ্র বুধবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় সাঁত্রাগাছি মহিলাসমিতির সহঃ সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরবালা দেবী পরলোক গমন করেন। তাঁহার এই অকাল এবং আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য সমিতির একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির মহিলা-কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার সরস্বতী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। বহু মহিলা উপস্থিত হইয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

স্কুলে নূতন শিক্ষার বিষয়

সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ে সেলাই, ছাটকাটের কার্য্য, এমব্রয়ডারী, কার্পেট ও শতরঞ্চ বোনা, ঠক্‌ঠকি তাঁতে নানাপ্রকার কাপড় প্রস্তুত, মণিপুরী তাঁতে তোয়ালে বোনা, মোড়া, ফুলের সাজি, বাক্স প্রভৃতি বেতের কাজ, জয়পুরী পিতলের কাজ, ইংরাজি বাংলা অঙ্ক প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা, সঙ্গীত এবং নার্সিং এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাস হইতে মোজা, মাফলার এবং কম্ফর্টার বোনা শিক্ষা দিবার কতকগুলি উৎকৃষ্ট কল ক্রয় করা হইয়াছে। একজন উপযুক্ত শিক্ষক এই কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল মহিলা মোজা বোনা শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে এইস্থানেই কাজ দেওয়া হইবে।

সাহায্যার্থে অভিনয়

সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থে এখানকার এবং কয়েকজন বাহিরের ছাত্রী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দুইটি অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন। "গান্ধারীর আবেদন", "উমার তপস্যা", "পূজারিণী" এই কয়টি বিষয়ের অভিনয় এবং তৎসঙ্গে কন্‌সার্টের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষ ভাবে কেবলমাত্র বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীগণের জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর অভিনয় হইবে। টিকিটের মূল্য আট আনা। ২৮শে নবেম্বর সর্ব্বসাধারণ মহিলাদের জন্য অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। টিকিটের মূল্য ১৲ এবং ২৲। শিক্ষালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী প্রতিভা সেন বি-এ মহাশয়ার নিকট ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনের ঠিকানায় টিকিট পাওয়া যাইবে।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

সম্প্রতি কানপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন পুরীতে আসিয়াছিলেন। তিনি বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করেন এবং আশ্রমের ছাত্রীদের প্রস্তুত কয়েকটি শিল্পদ্রব্য ক্রয় করেন। কানপুরে গমন করিয়া তিনি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকে ১০০৲ টাকা ও নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন—

"আপনার আশ্রম-বিদ্যালয়ের জন্য ১০০৲ টাকা পাঠাইলাম, প্রাপ্তি স্বীকার করিলে বাধিত হইব। আপনি যাহা আমাদের মাতৃজাতির জন্য করিতেছেন,—ভগবানের আশিস্ আপনার কার্য্যের উপর বর্ষিত হউক। ইচ্ছা হয় যে একবার আপনার পায়ে ধরিয়া এখানে লইয়া আসি। এ দেশটা বড়ই পিছাইয়া আছে। এ দেশীয় একজন মহিলার ভিতরও যদি ঐ আগুন জ্বালিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রদেশের কাজ আরম্ভ হইয়া যায়। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন।"

সরোজনলিনী শিক্ষালয়-বোর্ডিং

সরোজনলিনী শিক্ষালয় সংলগ্ন বোর্ডিংএ যে সকল ছাত্রী অবস্থান করেন তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল বায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করাইবার জন্য স্কুলের গাড়িতে করিয়া কলিকাতার বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। ছাত্রীদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে যে এইরূপ বাহিরে বেড়াইতে যাওয়ার উপকারিতা কতখানি তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

গত জন্মাষ্টমীর দিন বোর্ডিংএর সমস্ত ছাত্রীগণকে বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হয়। বৈকাল চারিটার সময় দুইখানি বাসে ছাত্রীগণ কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। হাওড়ার পরেই পল্লীর শ্যামল শোভা চোখে পড়ে। কলিকাতাবাসীর দৃষ্টিপথে এই মুক্ত সৌন্দর্য্য অতিশয় উপভোগ্য।

গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠের বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন উদ্যানে ছাত্রীগণ

অবাধে বিচরণ করিয়া ও গঙ্গার স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মঠের প্রশস্ত বাঁধাঘাটের সোপানে বসিয়া গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শত শত নৌকা জলের উপর ভাসিয়া যাইতেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি সোপানের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। মাঝিরা গান গাহিতে গাহিতে দাঁড় টানিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া সকলেরই মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। সন্ধ্যায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আরতি দেখিয়া ও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সকলে প্রত্যাগমন করে।

বেঙ্গল কেমিকেলের দান

সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের বোর্ডিংয়ে অনেক দরিদ্র মহিলা ছাত্রী থাকেন। অসুস্থ হইলে ঔষধের ব্যয়ভার বহন করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। আমাদের সমিতির সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় এম-বি অশেষ যত্নের সহিত ছাত্রীদের অসুখের সময় বিনা ফি'তে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। এতদিন বাজার হইতে মূল্য দিয়া ঔষধ কিনিতে হইত। সম্প্রতি বঙ্গদেশের বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক বাঙ্গালীর গৌরব বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ঔষধ এক এক শিশি প্রদান করিয়া অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সাধু তারাচরণের স্কুল পরিদর্শন

গত ১লা ভাদ্র বিখ্যাত সাধু শ্রীমৎ তারাচরণ সরোজ-নলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয় পরিদর্শন করেন। মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এবং মিসেস চৌধুরী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। তিনি স্কুলের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

মিস্ বসুর স্কুল পরিদর্শন

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের স্কুল সমূহের ইনস্পেকট্রেস শ্রীমতী হৃদয়বালা বসু গত ৩রা আগষ্ট সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয় পরিদর্শন করেন। তিনি স্কুলের বিভিন্ন বিভাগ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

শারদোৎসবে——

হিমানী কাস্কেট

আধুনিক অঙ্গরাগের পাঁচটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সজ্জিত পেটিকা—সুদৃশ্য রেশমী কাপড় মোড়া—বাক্সটি মজবুত ও রুচিসম্মত মূল্য দশ টাকা মাত্র এ দামে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাস্কেট অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাজারের অন্য কাস্কেট ইহার তুলনায় নিতান্তই খেলো মনে হইবে, কিনিবার আগে হিমানীর কাস্কেটগুলি দেখিতে অনুরোধ করি।

অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে

নিরুপমা কাস্কেট ৫॥০

কুঙ্কুম কাস্কেট ৩॥০

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমানীর নানা প্রসাধন দ্রব্য ও উপহারে অতুলনীয়

অতুলনীয় উপহার

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি

সাহিত্যরসিকদিগের জন্য প্রতি বৎসরের অপূর্ব্ব আয়োজন। গল্পে ও চিত্র সম্ভারে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এবারে কথাবস্তু রচনার ভার লইয়াছেন শ্রীকেশব গুপ্ত, বিজয়রত্ন মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবিনাশ ঘোষাল, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী প্রভৃতি। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী-নিপুণ তুলিকায় এবারেও ইহা সমুজ্জ্বল হইবে। মূল্য পূর্ব্ববৎ ১॥০—২৫ হিমানী পুরস্কার কুপনের পরিবর্তে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ও

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

৩৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta. and published by him at 45 Beniatola Lane. Calcutta.

আহিরিণী

শিল্পী—শ্রী মনীষী দে

PRINTED BY C. H. ARAN & CO., CALCUTTA

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৬ষ্ঠ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৮ [১২শ সংখ্যা

প্রাচীন সাহিত্যে নারীর দুঃখ

শ্রী রমেশ বসু এম-এ

আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সব-কিছুই নাকি অচ্ছেদ্যভাবে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত—কোনমতেই ধর্ম্মের বাঁধনের নড়চড় হবার যোটি নেই! পুরুষ কখনও কখনও পৌরুষবলে ধর্ম্মের বিধানকে ভেঙ্গেছে বা ইচ্ছামত ব্যবহার করেছে—কিন্তু নারী বেচারীদের বেলায় ধর্ম্ম তার দশদিকের দশদ্বারে ঘাটি বসিয়ে দিন-রাত পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। নারীকে আমাদের মধ্যযুগের প্রাচীনেরা হয় দেবী, না হয় দানবী বলে' অভিনন্দিত করেছেন, কিন্তু তাকে মানবী বলে' সহজে মেনে নিতে পারেন নি; তাই হয় নারীকে নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ করা হয়েছে না হয় সর্ব্বদা সন্দেহের চোখে দেখে হীন মনোভাব প্রকাশ কর্‌তে একটুও বাধে নি। তাঁরা নারীকে শক্তিরূপা বলে' ঠিক্‌ই ধর্‌তে পেরেছিলেন, সে শক্তিকে ঐশ্বরিক বা আসুরিক বলে' মনে করা হ'ত; মানবীশক্তিকে তাঁরা বোধ হয় বিশ্বাস কর্‌তেন না।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ পেরিয়ে এসে এই "বিষম কালের শেষে" নারীকে মানবীরূপে দেখ্‌বার সুযোগ হয়েছে। সেকালের লোকেরা ত্রিকালদর্শী সাবধানী লোক ছিলেন তাই তাঁরা অনাগত ভবিষ্যৎপুরুষ আমাদের বহু বহু আগে থেকেই সাবধান করে' রেখে গিয়েছেন যেন কলিকালের আমরা নারী সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকি! কলির দোষ কীর্ত্তন কর্‌তে যেয়ে প্রাচীন পুরাণের অনুযায়ী বাঙালী কবি বলে' গিয়েছেন—

পিতা মাতা জ্ঞাতি ত্যজি, জারার কুটুম্ব ভজি,
পরম দুর্ল্লভ হৈবে নারী। (কবিকঙ্কণ)

মনের কথা আরও পরিষ্কার করে' না বলে' থাক্‌তে পারেন নি:—

বধূজন হবে বলী, শাশুড়ীর ধরি চুলি,
শ্বশুরে করিবে অপমান।

প্রাচীনদের আশঙ্কা এক দিক থেকে সফল হয়েছে! এই কালে আমরা নারীকে "দুর্লভ" মনে কর্‌ছি বটে, কিন্তু সে নারীর মানবীত্বের গুণেই। সেকালে নারীর যে প্রয়োজন

স্বীকার করা হয়েছিল আজ আর তাতে একালের শিক্ষিত পুরুষের মন সায় দেয় না, নারীর নিজের কাছেও নিজের প্রয়োজন অন্যরূপ হয়েছে। সত্যই আজ নারীর মূল্য বেড়েছে—আজ নারী 'দুর্লভ' হয়েছে।

সেকালের কবিরা যখন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসরণ করে' নারীর জন্য ব্যবস্থা দিতেন তখন তাঁরা ছিলেন এক রকমের, আর আবার যখন তাঁদের কবি-হৃদয় মানুষের সুখ-দুঃখের হিসাব কর্‌ত তখন তাঁরা নারীর দুঃখ বুঝ্‌তে পার্‌তেন। পুরুষের মত নারীর দুঃখও তার মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে—একজন যা দুঃখ বলে' মনেই করে না, অন্যজন তাই সইতে পারে না। সেকালের নারীরা কৌলীন্য, কন্যাপণ, স্বামীর বহুবিবাহ, সতীদাহ, পরীক্ষাদান প্রভৃতি ব্যাপারগুলোকে অনেক দুঃখের কারণ মনে না করে' অনেক সময়ে গৌরবেরই মনে কর্‌তেন। এর কারণ হ'চ্ছে পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর প্রতি নির্দ্দিষ্ট স্থান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত মনোভাব।

নারী-জীবনের দুঃখগুলির তিনটি স্তর আমাদের প্রাচীন কাব্য থেকে উদ্ধার করা যায়।

প্রথম, আমরা দেখ্‌তে পাই অন্নবস্ত্রের জন্যও নারীর কম দুঃখ ছিল না। মনুষ্য-জীবনের এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটানও যেন অনেক সময়ে নারীর পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। স্ত্রীত্ব বা মাতৃত্বের গৌরবেই নারী তার এই নিম্নতম অধিকার দাবী কর্‌তে পার্‌ত না, কারণ পুরুষ-প্রভুর কাছে তার প্রার্থনা যেরূপ রূপ ও ভাষায় ফুটে বেরিয়েছে তাতে তাকে জীব বলে' স্বীকার করা হয়েছে, মানুষের সঙ্গিনী বলে' মান্য করা হয়নি। তা'হ'লে ওরূপ প্রার্থনার কোন কথাই উঠ্‌তে পার্‌ত না। বর-কনেকে বিদায় দিবার সময় শাশুড়ী ঠাকরুণ 'কুলীনের পো' নতুন জামাইর হাতখানা তুলে নিজের মাথায় রেখে যদি বলেন—

আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত...

(শিবায়ন—রামেশ্বর)

তবে যে ছবি আমাদের চোখের সাম্‌নে এবং মনের মধ্যে ফুটে ওঠে তাতে মনে হয় নারী যেন পুরুষের পদ-প্রান্তে বসে' করজোড় করে' দু'হাত তুলে অন্নভিক্ষা কর্‌ছে। যদি বলা যায় নারীকে ত 'অন্নপূর্ণা' কল্পনা করাও হয়েছিল, তার উত্তর এই যে সে অন্নও পুরুষের ভিক্ষার দান! এরই রকম-ফের, দেবতার কাছে নারীর উৎকণ্ঠাসূচক আবেদন—নিজের জন্য না হলেও বা কি?—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

(অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র)

সমাজে পুরুষের "অন্নদাতা ভয়ত্রাতা" হ'য়ে থাক্‌বার বাসনাই নারীর দেহ ও মনের ওপর ভূতের মত চেপে বসেছিল—তাকে পরিপূর্ণ হ'তে দেয় নি।

বাংলার প্রাচীন কবিরা "বারমাস্যা" নামে যে সব ছড়া রচনা করে' গিয়েছেন তাতেও নারীর বাহিরের অভাবের দিক্‌টা অতি করুণভাবে ফুটে উঠেছে। বার মাসে ছয় ঋতুতে অনেককে শরীরের যে সব দুঃখকষ্ট সহ্য কর্‌তে হ'ত তার জলন্ত চিত্র এগুলিতে পাওয়া যায়। নরনারী পরস্পরের প্রতি প্রেমে বদ্ধ হ'য়ে যে দুঃখ সহ্য করে এগুলি সে ধরণের দুঃখ নয়, এতে নারীর স্বচ্ছন্দতার প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহই ছিল নারীজীবনের চরম সার্থকতা, সুতরাং স্বামীসৌভাগ্য ছিল অতি গৌরবের ও গর্ব্বের জিনিস। বিবাহিতা নারীর নিকট সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ খাড়া করে' যে-কোন অবস্থায় নারীর শারীরিক ও মানসিক সতীত্ব দাবী করা হ'ত। সতীধর্ম্মের কাছে নারীর ব্যক্তিগত সুখ ও সাধকে বলি দিবার বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিবাহের মন্ত্রের শক্তি নারীকে সমাজে ও গৃহে তার স্থান নির্দ্দেশ করে' দিয়েছে। "কুলবতী স্ত্রী"র পক্ষে স্বামীর প্রতি মনোভাব অতি স্পষ্টভাষায় এইরূপ পাওয়া যায়—

দরিদ্র আচারহীন যদি হয় পতি।
নিন্দার আশ্রয়ে পতি নাহি ছাড়ে সতী॥

যে বর সে যুদ্ধের বিজয়ীবেশে নারীর দুয়ারে এসে তাকে হরণ কর্‌তে উপস্থিত হয়, তার পক্ষে মন জয় কর্‌বার কোন আবশ্যকতা হয় না; তাকে বরণ করে' নেওয়াই নারীর কাজ; আঁচলের গাঁঠছড়া যদি দুটি মনকে বাঁধ্‌তে না পারে তবে ধর্ম্মের মুখের দিকে চেয়ে নারীকে সব-কিছু সইতে হয়; তার অন্তরের হাহাকার বাইরে বেরুতে পারে না। সেকালের কবিরা নারীর এই মানুষ-সুলভ বেদনাবোধ এবং অসম বিবাহের চরম সর্ব্বনাশের কাহিনীকে যে ভাবে ফুটিয়ে

তুলেছেন তাতে যদিও অনেক সময়ে করুণার বদলে হাস্য ও বীভৎস ভাবের উদ্রেক করবার চেষ্টা আছে তবু তার তীব্রতা হাসিকে অশ্রুতে পরিণত করে' দেয়। আমাদের শাস্ত্র বলেন নারীর পক্ষে পতি-দৈবত ব্যক্তিবিশেষ নন, প্রায় তত্ত্ববস্তু বিশেষ; কিন্তু কবি-বর্ণিত মানবীর মন ত তাতে মানে না। প্রাচীন কবিরা অনেকেই "নারীগণের পতি-নিন্দা" নাম দিয়ে ছড়া রচনা করেছেন, তাতে পতির নিন্দার চেয়ে বরং নারীজীবনের বিফল বাসনার কথাই বেশী করে' ফুটেছে। কবিকঙ্কণ বোধহয় এবিষয়ে পথ-প্রদর্শক, আমরা তাঁর কথাই উদ্ধৃত করছি :—

সভে বলে খুল্লনার বর মিলেছে ভাল।
মদনমোহন বরের রূপে ঘর করেছে আলো॥
এক যুবতী বলে দিদি মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে নাহি সই দুঃখিনী মোর পারা।
কোলের কাছে রহিতে সদাই করে হারা॥
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক সুপ ঘণ্ট বিনা না করে ভোজন॥
দড় ব্যঞ্জন আমি সই যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কান্দি॥
আর যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি॥
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড়ই দুরধার।
গোদে তেল দিয়া কত তুলিব নেকার॥
আর যুবতী বলে সই আমার পতি কালা।
আনের সংসার সুখ মোরে বিষম জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে।
রাত্রি হৈলে নিদ্রা যায় গরুড় শয়নে॥

এই ব্যাপারের আরেক রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার নাম "শাশুড়ীদের জামাই-নিন্দা।" কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহার "শিবায়নে" লিখেছেন :—

ছকী বলে আরে মোর ছার কপাল ছি।
অন্ধ বরে বিভা দিনু খুদী হেন ঝি॥
শুয়ে থাকে শয্যায় সুন্দরী করি কোলে।
হবা তাকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে॥
ষোড়শী সুন্দরী নারী সে কি তাকে সাজে।
পাদকুড়া পোক যেন পদ্মফুল-মাঝে॥
চন্দ্রমুখী চাঁপা কান্দে মল্লিকার মোহে।
কুব্জা বরে বেটী দিয়া ভিজে গেল লোহে॥
কোদণ্ডের মত সে কুণ্ডলাকৃতি কুঁজে।
পুড়া পুটনির প্রায় পড়্যা থাকে সেজে॥
ভগী বলে অভাগী নাহিক আমা বই।
কথায় উঠিল কথা অতএব কই॥

* * * *

ভাত ছেড়ে ভঙ্গ দিল ভোজনের কালে।
কোণে বসে কাঁদি আমি রন্ধনের শালে॥
কেমনে কুশল হয় কামিনীর কাজে।
কন্যাকে জিজ্ঞাসি কিছু কয় নাহি লাজে॥
চক্ষু চাপে চাড় করে চাড় বলে কি।
বক্ষ বরে বিভা দিনু বুঝি হেন ঝি॥
শয্যায় শিশুর প্রায় শুয়ে থাকে কোলে।
কদাচ কান্তের প্রায় কেহ নাহি বলে॥
মাধুনী ধুনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সেধে এনে বেটী দিল বাপ॥
বারো মাস দারুণ গোদের গন্ধ ছুটে।
নাক ধরে নিকটে বসিতে আঁত উঠে॥
তায় তৈল দিতে তনুত্যাগ হয় ঘ্রাণে।
বিষম জঞ্জালে বাছা বাঁচিবে কেমনে॥
সোহাগী সন্তাপ করে সম্পদীর তরে।
বুড়া বরে বেটী দিয়া বুক ফেটে মরে॥
তরুণী তাহারে বিষ বাসে নাহি ভাল।
দুহিতার দুঃখে দেহ দগ্ধ হয়ে গেল॥
সরস ব্যঞ্জন বিনা খায় নাই অন্ন।
একটুকু মন্দ হলে মারে মতিচ্ছন্ন॥

ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্গত না হলেও বিবাহিতা নারীর পক্ষে স্বামীদের এই সব শারীরিক অভাব-অভিযোগের কথা শাস্ত্র-পন্থী কবির হাতেও দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় কম তীব্র মনে হয় না।

স্বামীদের নিজেদের কথা ছেড়ে দিলেও বহু গুণবান্ স্বামী বহুবিবাহ দ্বারা নারীকে সপত্নীত্বের স্বাদ বুঝিয়ে দিয়ে তাদের

জীবন চরিতার্থ কর্‌তে ত্রুটি করেন নি। এবিষয়ে সামাজিক মনোভাব গড়ে' তুল্‌তেও চেষ্টা করা হয়েছিল :—

সেই নারী ভাগ্যবতী, ধনবান্ যার পতি,
বিবাহ করয়ে দুই তিন।
এক নারী পুত্রবতী, সবার উত্তম গতি,
সতীনের পুত্র নহে ভিন্॥

এই শুভ প্রচেষ্টাও স্বামীধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা কর্‌ত। কিন্তু কবিদের চোখ নারীদের সপত্নীত্বের দুঃখকে কি ভাবে দেখেছে দেখুন :—

শুনি লো লোকের মুখে, শেল হেন বাজে বুকে,
প্রভু দিবে নিদারুণ সতা॥
* * *
দারুণ সতিনী, ভুখিল বাঘিনী,
কেবল যমের যন্ত্রণা॥
* * *
যে ঘরে নিবসে সতা, অবশ্য কন্দল তথা।
* * *
মল্ল যেন কোন্দলে যুঝে দু'সতীন।

সেকালে মায়ের মন সহজ মানববুদ্ধি থেকেই বহু-বিবাহকারী বরে কন্যাদান কর্‌তে আপত্তি কর্‌ত :—

নাহি দিব দারুণ সতীনে।
* * *
ধন জন যার ঘরে, আনিয়া প্রথম বরে,
বিলম্বে করিব কন্যা দান।

বহুবিবাহের আর এক ধরণ ছিল ব্যাভার-প্রথা, তাকে ঠিক বিবাহ মনে করাও যায় না। অথচ সমাজে এ প্রথা বেশ চল্‌তি ছিল।

কুল ছিল সেকালে বরের দিক থেকে প্রধান গুণ, তারপর বিবেচনা করা হ'ত তার আর কোন গুণের কথা। তাই সেকালের দুঃখ ছিল, যদি কন্যা কুলীনে দেওয়া না যেত বা কুলে কোন 'কলঙ্ক' থাকৃত :—

নাহি জানি কন্যা মোর হবে কার বশ॥
কুলে শীলে হীন-দোষ হয় যেই জন।
সেইখানে দিব কন্যা করি সমর্পণ॥
যেন করিবর-দন্ত কনকে জড়িত।
অকলঙ্কে 'দলে সুতা হয়ে সে উচিত'॥
অকুলীনে দিলে সুতা থাকয়ে গঞ্জন।
লোকে অপযশ গায় দগধে জীবন॥

কুল-গৌরবের জন্য নারীকে অকূলে ভাসাতেও লোকে রাজী ছিল।

সেকালের সমাজব্যবস্থার সহমরণ বা সতীদাহ প্রশংসার কার্য্য বলে' গণ্য হ'ত। নারীর পক্ষে স্বামীর মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবার কোন সার্থকতা স্বীকার করা হ'ত না। তাকে লোভ দেখানো হ'ত সে মরে' গিয়ে পতির সঙ্গে মিলিত হবে, পৃথিবীতে থেকে বিরহ ভোগ করবার দরকার কি? শাস্ত্রের বিধানে—

সতী পুড়ি পতি পায় পতি-লোকে।

কিন্তু কবি মানুষের দিক থেকে তরুণীর জীবনের মূল্য দিয়ে তাকে একেবারে হেলার বস্তু বলে' মনে করেন নি। তাই তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছিল—

জ্বালাবার যোগ্য সে যৌবন তোর নয়।

যে যুগে নারীর মূল্য অন্য সব দিক থেকে যত সম্ভব কম বলে' ধরা হত সে যুগে বিবাহে কন্যাপণ বিদ্রূপের মত শোনায় না কি? এই কন্যাপণের দায়ে বহু নারীর জীবন নষ্ট হ'য়ে যেত। আর এই পণের হাত থেকে উদ্ধার পেতে অনেক চেষ্টা পেতে হ'ত :—

আহরিয়া বর আনি, কহিয়া মধুর বাণী,
পণ বিনা করে সমর্পণ॥

কবি মায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

হিতাহিত নাহি জ্ঞান, না নিবে কন্যার পণ,
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি॥

নারীকে শাস্ত্রীয় বিধানের দ্বারা আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেও পুরুষের মনের সন্দেহ সহজে যেত না—

পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনের জাতি,
রক্ষা পায় পরম যতনে।

নারীকে পতিব্রতা করে' তুল্‌তে এবং রাখ্‌তে কত শত চেষ্টার ফলেও পুরুষের ধারণা ছিল—

শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা
ভাগ্যে পায় একজন।

সেইজন্য নারীর পাতিব্রত্যে কিছুমাত্র সন্দেহ হলেই নারীকে পরীক্ষা দিতে হ'ত, তার বিস্তৃত বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে আছে। জলে ডুবিয়ে, সাপের বিষ দিয়ে, গরম লোহার দাগা দিয়ে, আগুন দিয়ে এই সব পরীক্ষা করা হ'ত। এই সব শারীরিক অত্যাচারকে পবিত্রতার প্রমাণ বলে' গণ্য করাই সামাজিক বিধান ছিল। কবিরা এই সব পরীক্ষার সবিস্তার বর্ণনা করে' মায়ের মুখ দিয়ে একথা না বলিয়ে পারেন নি :—

মা বলে মোর ঝিয়ে না যাবে আগুনি।
থাকিবে আমার-গৃহে হইয়া গৃহিণী॥

স্বামীকে বহু সপত্নীর সঙ্গে ভাগ করে' পেতে হ'ত বলে' নারীকে একটি বিদ্যা আয়ত্ত করতে হ'ত, তার নাম বশীকরণ বিদ্যা। এই আগ্রহে বহু ওষুদের ব্যবস্থা করা হ'ত এবং এর জন্য মেয়ে-বৈদ্যের আদর ছিল—

আমার লাগুক কড়ি তোমার হকু যশ।
ঔষধ করিয়া মোর স্বামী কর বশ॥

অতি বীভৎস গোছের এই সব ওষুদের নাম। একটি হ'চ্ছে—

কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।

যেন স্বামী "নাক বিন্ধা পশু" হয়ে থাকে। আরেকটি—

সাপের আঁটুলি আনে খুঁজি বাদ্যা-ঘরে।

আরেকটির ব্যবস্থা ও গুণ—

কাপাসের বাড়ী হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া সাধু তার রবে দুই দণ্ড॥
খুন্না করিবে যদি সাধুর অপমান।
মৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান॥

আরেকটি ওষুদের কথা দেখুন—

আমা সবার করিয়া আনিল সাপের দই॥

হিন্দু সমাজের নারীর দুঃখ সুধু হিন্দু পুরুষের হাত হতেই আসেনি। সেকালে পর্তুগীজ দস্যুরা সমস্ত নিম্নবঙ্গকে "মগের মুলুক" করে' তুলেছিল। তাতে নারীকে ক্রীতদাসী রূপে অত্যাচার এবং বিক্রী করা হ'ত। নারীহরণের ইতিহাসও সে সময় থেকেই পাওয়া যায়—

হরি সাউ বলে ঝি বাজারেতে যাবে।
দেখিলে পাঠান তোরে আগেতে হরিবে॥

(মসনদ্-ই-আলার গীত)

এ অবধি যে আলোচনা করা গেল তাতে দেখা যাবে সেকালের নারীর দুঃখ ছিল ব্যক্তিগত, যার যার নিজের অভাব-অভিযোগ এবং নিজের স্বামী-সৌভাগ্যের অভাব বশতঃ। কিন্তু পুরুষ-সাধারণের প্রতি বিরাগ ছিল না। শত দুঃখেও নারী "কোণে বসে' কাঁদা" ছাড়া আর কিছু করত না। আজকালকার দিনে যে মনস্তাত্ত্বিক দুঃখের আবিষ্কার ও প্রচার হয়েছে তা সেকালে ছিল মনে হয় না, কারণ সেকালে স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের (feminism)কোন ধারণাই হ'তে পারত না। পুরুষের পক্ষে প্রধান ভয় ছিল পাছে স্ত্রীরা স্বামীদের ভয় না করে। বারো বৎসর হলেই নাকি মেয়েরা পুরুষেরে "নাহি করে ভয়"। সুতরাং সেকালের নর-নারী সম্বন্ধের অনেকখানিই এই ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরুষের হাতে নারীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত আরেকটি অস্ত্র ছিল নারীর স্বভাবসুলভ লজ্জা। এই লজ্জা দ্বারা নারী তার দুঃখকে ঢেকে রাখত। কারণ নারী-সমাজেই এর প্রভাব খুব বেশী ছিল—

এক মেয়ের লাজ হলে সকল মেয়ের লাজ…

(ঘনরাম)

এ অবস্থায় আমরা প্রাচীন সাহিত্যে একজন কবির একটি কথায় একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছি, তিনি নারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

পুরুষের গৃহ যেন পাখীর পিঞ্জর।

এই ধারণাই ত আজকাল 'খেলাঘর' ("Doll's House") প্রভৃতি কথার মধ্যে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে!

দু'চার জায়গায় এর চেয়েও শক্ত কথা আছে, তবে সেগুলি নারীকে হীন করে' দেখাবার জন্তে ব্যবহৃত হয়েছে—

স্বামী যে না দিল সুখ, সে মৈলে কোন্ দুখ।

(ঘনরাম)

পল্লীরাষ্ট্র

শ্রী বলাই দেবশর্ম্মা

গৃহকে সুপরিচালিত করিবার একটা রীতি-নীতি আছে। আবার তাহার সহিত যখন অপর দশটি সংসারের ভাল-মন্দ, সুখ-স্বস্তি একীভূত হয়, তখন ঐ নীতি-পদ্ধতি বৃহত্তর শাসন-পালনের মতই বৃহত্তর ব্যাপার হইয়া উঠে। আবার ঐ সমষ্টিবদ্ধ গৃহগোষ্ঠী পরিচালনের দায়িত্ব রাষ্ট্র-পরিচালন অপেক্ষা অধিক। কারণ, রাষ্ট্রকার্য্য চলে মোটামুটি—কতকটা স্থূলভাবে; উপরি উপরি ও ভাসা ভাসা। কিন্তু পল্লীর প্রত্যেক গতি-ভঙ্গিমাটি লক্ষ্যে পড়ে বলিয়া এবং তাহার মনুষ্যগুলির উপর একটা বিশেষ নজর থাকায় পল্লী-সেবা একটু নিগূঢ়ভাবে করিতে হয়। প্রত্যেকের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একটা অন্তরঙ্গ দায়িত্ব দেখা দেয়।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কোন গৃহস্থই গৃহের অধিবাসীবর্গকে উপেক্ষা করেন না, এবং গৃহকর্ত্তব্য পালন করিতে অবহেলাও দেখান না। সেইরূপ প্রতি পল্লীসমাজই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নীতি-নিয়মে পরিচালিত হয়। কোনও একটি ব্যক্তির আচার আচরণও উপেক্ষিত হয় না। যে দৃষ্টি গৃহের উপর থাকে, সেই একই লক্ষ্য থাকে সমাজের উপর। আর এই শাসন পালন—রাষ্ট্রপরিচালনের প্রকৃতি-প্রাপ্ত অথচ তদপেক্ষা নিগূঢ়। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য—শাসন, পালন এবং অর্থনীতি-সম্পর্কিত ব্যাপারের উপরই প্রধানতঃ নিবদ্ধ। পল্লীসমাজ আয়ত্তাধীন বলিয়া এবং দরদযুক্ত হওয়াতে সমাজের সর্ব্বাঙ্গের প্রতিই সুচারু দৃষ্টি থাকে।

রাজকর্ত্তব্য বেশী অথবা গৃহকর্ত্তব্য বেশী ইহা লইয়া বিতণ্ডা না করিয়া এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র-কর্ত্তব্য যদি প্রতি মানবের চরিত্র-গঠনের উপর লক্ষ্য দিয়া থাকে তাহা হইলে উহাই অবশ্য মহীয়ান। শাসন ও পালনের যে কোন মহনীয়তাই নাই এমন বলিতেছি না; কিন্তু তদপেক্ষা বেশী—মানুষের আত্মিক কল্যাণ-সাধন। [illegible] ও যাহাতে উহা সংসাধিত হয়, তাহারই মূল্য অধিক। গ্রীক মেগাস্থিনিসের ঐতিহাসিক ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় মনুষ্য তাহাদের গৃহকে অর্গলবদ্ধ করিতে জানে না; মিথ্যা কথার সহিত তাহারা পরিচিত নহে। এমন মানুষ এবং এমন নরনারী সৃষ্টি করিতে পারিলে রাষ্ট্রশাসনের কৃত্রিম ব্যবহার প্রয়োজনই থাকে না।

যে সভ্যতার অঙ্কে বাঙালী প্রতিপালিত, তাহার মর্ম্মকথা—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং"—আমি ব্রহ্মদেব, অন্য কেহ নহি। যে সমাজ এবং সমাজ-পদ্ধতি এবং তাহার সহিত গৃহস্থধর্ম্মের নিগূঢ় বিধিব্যবস্থা মনুষ্যের ব্রহ্মবুদ্ধি-জাগরণের অহরহই প্রয়াস পাইতেছে, সেই সমাজের সম্পর্কিত মানুষগুলির জন্য রাষ্ট্র-ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজনই নাই। বরং চোখ রাঙাইয়া শাসন অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবে প্রতিপালনই মনুষ্যত্বের পক্ষে শুভঙ্কর।

পল্লীতে শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই উহাকে পল্লীরাষ্ট্র বলিয়াছি। না হইলে পল্লী মোটেই রাষ্ট্র স্বভাবপ্রাপ্ত নহে। এবং যে শাসন ও সংরক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও দূরত্বের সহিত নহে, একান্ত আত্মীয়ভাবেই। ঘর-গৃহস্থালী যেমনভাবে চালান হয়, ঠিক তেমনই পরিচালিত হয় সমাজ বা পল্লী-রাষ্ট্র। কেহ বেকার বসিয়া থাকিলে গ্রাম্য বৃদ্ধ তাহার কাজের একটা ব্যবস্থা করিয়া দেন। বৈষয়িক বা অন্যবিধ কলহ উপস্থিত হইলে দশজনে উহার সুমীমাংসা করিয়া দেন। কোন দুর্নীতি দ্বারা সমাজ অশুচি হইলে গ্রামের সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিকার করেন। এইরূপে একটি পল্লীর মাঝখানে থাকিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রের যে উগ্র প্রচেষ্টা তাহা সংসাধিত হয়।

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সমগ্র জাতিজীবনে আত্মশক্তির উন্মেষ সাধিত হয়। ঘর-গৃহস্থালী হইতে বৃহত্তর জীবনের পরিচালন পর্য্যন্ত বেশ দৃঢ়ভাবে জনচরিত্রের সিদ্ধ সম্পদ-রূপে উন্মেষিত হয়। কোন গৃহস্থকে রাষ্ট্র বা ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। আজ যদি

মিউনিসিপ্যালিটি হইতে জলের ব্যবস্থা সহসা বন্ধ হইয়া যায়, তবে নাগরিক জীবন বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। আধুনিক পল্লী-মানবের অবস্থাও তদ্রূপ। জেলা-বোর্ড হইতে ঐরূপ পথঘাট অথবা জলাশয় প্রভৃতির ব্যবস্থা না হইলে পল্লীজীবন একান্তই বিব্রত হইয়া পড়ে। এবং এইরূপ অবস্থার প্রতিকার করিতে গিয়া জনমত একটা প্রতিবাদ উত্থিত করে বটে, কিন্তু উহা ক্রমশঃ বাক্‌সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে, অথবা অযথা-বিদ্রোহী হয়।

পল্লীরাষ্ট্রে কেহ কাহারো ধার ধারিত না। প্রত্যেকের জীবনপ্রয়োজন প্রত্যেকে নিজেই অর্জ্জন ও সর্জ্জন করিত। কিন্তু কেহ কাহারো ধার ধারিত না বলিয়া যে কাহারো সহিত কাহারো হৃদ্য সম্বন্ধ ছিল না এমন নহে। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিটি প্রত্যেকের সহিত প্রীতির পরিচয়ে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত ছিল। এইখানে একটি কথা আলোচনা করা বিশেষভাবেই প্রয়োজন যে আধুনিক মন যেমন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পল্লীচিত্ত ঠিক এরূপ ছিল না। আজ একজন গ্রাম্য লোক সুরাটের সংবাদও অবগত আছে, আবার স্পেনের বিদ্রোহ কি কারণে সংঘটিত হইল, তাহাও অবগত আছে।

চিত্তখানিকে এইরূপে চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া, বৃহত্তর সত্তার সহিত পরিচিত হওয়া মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্তই যে প্রয়োজনীয় ইহা বলিতে পারি না। এরূপ করিতে পারিলে ভাল হয়; কিন্তু ঐ প্রকার করিতে গিয়া যদি বিক্ষিপ্ততা আসে তাহা হইলে ঐরূপ করা অপেক্ষা সঙ্কুচিত হওয়াই ভাল। চীনের খবর রাখি, সাইবিরিয়ার সংবাদ রাখি, নীগ্রো-জাগরণ কোন্ পদ্ধতিতে চলিতেছে সে সম্বন্ধেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি; কিন্তু নিজের খবর যদি না রাখিতে পারি তাহা হইলে ঐ বিশ্বভৌমিকতা মানুষের পক্ষে অশুভঙ্করই বলিতে পারি। অন্ততঃ,—আমাদের কাছে জীবনের যাহা মূল্য, সেই দিক দিয়া এই বাহিরের সহিত পরিচয় তেমন কল্যাণজনক নহে।

এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিব না। করিলে প্রসঙ্গান্তরে যাইতে হয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, 'জানা-শোন', চেনা-পরিচয়, খবরাখবর না জানিলেও অন্তঃকরণের দিক দিয়া পল্লীমানব 'বসুধৈব কুটুম্ব' ছিল। ভিক্ষুক দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে কখনই ফিরিত না; অতিথি প্রত্যাখ্যাত হইত না। আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বজন-স্বগণ সকলেই প্রতিপালিত হইত। দূরসম্পর্কীয়ের সহিতও আত্মীয়তার নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল —এবং এইটাই বোধ হয় পল্লীসভ্যতার সর্ব্বস্ব।

দুইটা বিষয়ের কথা আসিয়া পড়ে। আধুনিকের এই প্রসারিত অবস্থা, আর পল্লীর সেই নিবদ্ধচিত্ততা। বর্ত্তমানের সম্পর্কের যে ব্যাপকতা আছে, তাহার উপরিকার অবস্থাটি দেখিতে শুনিতে ভাল; কিন্তু তাহা অন্তঃকরণের দিক দিয়া তেমন সুস্থ নহে। আধুনিকের লোকহিতৈষণা, তাহার সাম্য প্রীতিপ্রবোধক হইয়াছে এমন বলিতে পারি না, বরং ঐ ক্ষেত্রে তাহার দৈন্যই বিকট ভাবে দেখা দিয়াছে। কিন্তু পল্লীসমাজ তাহার আবাসস্থানের দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামের সংবাদ রাখে না—রাখিতে জানে না; কিন্তু দূরবর্ত্তী তীর্থস্থানে অন্নসত্র খুলিয়া আছে। অথবা অখ্যাত ও সামান্য আত্মীয়কে আবাহন করিয়া আনিয়া সস্নেহে ও সসম্ভ্রমে তাহার ভরণপোষণের যোগাড় করিয়া দেয়। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা জানিতে হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। পল্লীরাষ্ট্রের যাহা কিছু মহিমা এবং জীবন-ব্যাপার, তাহার উপযোগিতা, তাহা প্রত্যক্ষগোচর হইবে পল্লীসমাজের একান্নবর্ত্তিতার পরিচয়ে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথায় পল্লীরাষ্ট্রের নিগূঢ় মর্ম্মকথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের বাহিরের আকাঙ্ক্ষা, ভিতরের কর্ম্ম ও ভাবনার মূল্য যে কত অধিক তাহাই বুঝিতে পারিব একান্নবর্ত্তী গৃহ-জীবনের পরিচয় লইলে। আর এইখানেই মনুষ্যত্ব তাহার দুশ্চর তপশ্চর্য্যার মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চাহিয়াছে। রাষ্ট্রের কর্ম্ম গৃহের ধর্ম্মে কেমন ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া তাহার চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে, বাঙলার এই একান্নবর্ত্তিতার মধ্য দিয়া তাহার দিব্য রূপ দেখিতে পাইতেছি।

রাষ্ট্ররূপ—একান্নবর্ত্তিতা

জীব—জন্মমাত্রেই বিচ্ছিন্ন। সকলেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে চায়। প্রত্যেকে চাহে প্রত্যেকের জীবনযাত্রার

যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাকে একটু স্বতন্ত্রভাবে পাইতে ও উপভোগ করিতে। অতি প্রাথমিক অবস্থার জীব হইতে এই রীতি ও কার্য্য চলিতেছে। সকলেই চাহে নিজের ভাগ বেশী করিয়া পাইতে। তবে মনুষ্যসমাজে ইহার কিছু ব্যতিক্রম আছে। মানুষ তাহার নিজের সহিত তাহার সন্তান-সন্ততিকেও একীভূত করিয়াছে। সভ্য মনুষ্য কেবল মাত্র নিজের সুখই দেখে না, দেখে তাহার পুত্র-কলত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। তবে মানুষের কাছে ইহার একটা উপরিকার স্তর আছে।

পুত্র-কলত্র-প্রতিপালন সাধারণ জীবস্বভাব হইতে একটু উন্নত স্তরের হইলেও উহা মনুষ্যস্বভাবের খুব যে পরম অবস্থা—ইহা বলিব না। সন্তান-সন্ততিকে প্রতিপালন করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জীব মাত্রেই আছে। মনুষ্যের তাহা একটু বেশী। এই বেশীটুকু দিয়া মনুষ্যত্বের পরিমাপ করা যায় না। মানুষ জীব হইলেও জীবশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যত্বের লক্ষণ—আত্ম হইতে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়া। ইহা কিন্তু সহজ কথা নহে। মানুষকে বয়স্থ হইতে হইলে যেমন ধীরে ধীরে নানারূপ অবস্থার মধ্য দিয়া বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইয়া উঠিতে হয়, বিশ্বগ হওয়ারও তেমনি একটা সুষ্ঠু ও সহজ সাধনা রহিয়াছে। একবারে বিশ্বাভিমুখী হইতে পারা যায় না—ধীরে ধীরে যাইতে হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান। মমতা ও স্নেহকে একটু সম্প্রসারিত করিয়া দেওয়া,—যে যত্ন ও সেবা, যে আদর ও আপ্যায়ন একান্ত ভাবে আপনার উপর নিবদ্ধ ছিল, তাহার গতিমুখকে বাহিরের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়াই একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথার মর্ম্মগত উদ্দেশ্য।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে গৃহকর্ত্তা, তাঁহার স্ত্রীপুত্র, তাঁহার ভ্রাতাভগ্নীই কেবল বাস করেন না, অতি দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও ঐ পরিবারের অঙ্গীভূত। একটা কোন সম্পর্ক থাকিলেই হইল—তাহা যত দূরেরই হউক। সেই সম্পর্কের মূল যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে তাহাকে নিঃসম্পর্কীয় বলিয়াও মনে হইতে পারে। তাহা হউক, ইহা লইয়াই বাঙলার সমাজজীবন একান্তই সহজভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং ইহার মধ্যে দূরকে নিকট করিবার, পরকে আপন করিবার প্রচেষ্টাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

পরস্পরের সুখ-সুবিধার জন্য সমাজবন্ধন নহে। মানুষ যে গ্রামে, নগরে, সমাজে, সংসারে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বসবাস করে, তাহার মর্ম্মকথা অনুরাগের আকর্ষণ। মানুষ মানুষকে চাহে—হয়ত বা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়াই চাহে। এবং মনুষ্যকে পাইলেই মানবের অন্তর্গূঢ় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। হইতে পারে জীবনযাত্রাকে সুগম করিয়া তোলা সমাজগঠনের উদ্দেশ্য; কিন্তু উহাই একমাত্র নহে। মনে হয়, মানুষকে আপন করিয়া পাইবার জন্যই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা এই পাইবার সাধকে সিদ্ধি-দান করিয়াছে। মিথুন-জীব তাহার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে শিখিয়াছে। এই দশজন লইয়া ঘর করায় মানুষের ক্ষুদ্রতা কাটিয়া গিয়া তাহাকে উদার করিয়া তুলিয়াছে। একসঙ্গে বাস করিয়া ঐ মিলনজনিত একটা সহজ হৃদ্যতা স্ফূর্ত্তি পায়; আবার উহার জন্য পরস্পরে ত্যাগ ও উৎসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করে। দশের সঙ্গে বাস করিতে হইলে সবটা নিজের লইয়া থাকিলে চলে না—কতকটা বর্জ্জন করিতে হয়।

মানুষ একা একা থাকিলে এই বর্জ্জনের ভাব কিছুতেই জাগ্রত হয় না। বরং উহাতে স্বার্থের দিকে, সঙ্কীর্ণতার প্রতি আরও আকর্ষিত করে। উদারতার, পরার্থপরতার শিক্ষা দিতে হইলে মনুষ্যকে দশজনের সহিত সম্মিলিত হইবার সুযোগ দিতে হয়। আর, উহাই একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা।

রাষ্ট্র কথাটা বারম্বার ব্যবহার করিলাম। শাসন ও পালন লইয়া কথা হইতেছে; আর হইতেছে মনুষ্যত্বকে সম্বর্দ্ধিত করিবার কথা। যাহাতে এবং যেমন করিয়া যথার্থ-ভাবে মানবতার কল্যাণ হয়, তাহাই দেখিতে চাহিতেছি। আর এই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান রাষ্ট্রাধিপত্য একটা গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে যে, তাহার সৃষ্টি—তাহার রীতি-নীতি আইন-কানুনই শ্রেষ্ঠ।

পালন ও পরিপোষণ লইয়া যখন কথা, তখন পল্লীসমাজ হইতে গার্হস্থ্য জীবন পর্য্যন্ত ঐ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র বলিলে ক্ষতি কি? আর যখন রাষ্ট্রের সহিত তুলনামূলক সমালোচনাই করিতেছি, তখন উহাকে রাষ্ট্র বলিয়া উহার

মাঝে যে রাষ্ট্রিক গতি ও প্রকৃতি আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই উচিত। এখন দেখিব—একান্নবর্ত্তী গৃহরাষ্ট্রে মানবতার কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের কথা—শান্তি, শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার (Civil right) সংরক্ষণ। গৃহের কথা—শান্ত, সংযত ও শিষ্ট মনুষ্য গড়িয়া তোলা ও মনুষ্যত্বের অধিকারে পরিপুষ্ট করিয়া তোলা।

মর্ম্মগত উদ্দেশ্য প্রায়ই এক উপায় বিভিন্ন। রাষ্ট্র বাহ্যের উপর ঝোঁক দিয়াছে বেশী; গৃহ নির্ভর করিয়াছে স্বভাবধর্ম্মে। মানুষ সত্যকার যাহা তাহাই হইয়া উঠিলে লাঠি-ঠেঙ্গা লইয়া আর মানুষকে সংশোধিত করিতে হয় না। মানব সহজভাবেই হয় শান্ত ও মিত্র। গৃহরাষ্ট্রের ইহাই লক্ষ্য। তাই ঘরের মাঝে দশজনকে লইয়া মানবধর্ম্মের অনুশীলন করা হয়। ভালবাসিতে পারিলে চারিত্রিক পুষ্টি লাভ হয়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে শুধু ভালবাসা নহে,—ইহা খুব মহিম নহে, ইহা স্বার্থের বিষব্যাধির ঔষধও নহে; যখন আমাকে ভালবাসিবার পর তোমাকেও ভালবাসিতে পারিব, তখনই যথার্থ ভালবাসার প্রতিষ্ঠা হইবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপদ-জীবনের কাছেও মিত্র-মানব হইয়া উঠিব।

দশজনের সহিত ঘর করিতে করিতে চরিত্রের চ্যুতি-বিচ্যুতি সব কাটিয়া যায়। আর যেরূপ এই দশের সংসার পরিচালিত হয়,—তাহা রাষ্ট্রের বৃহত্তর শাসন ও পালন-কার্য্যের অপেক্ষাও মহিমাময়। কারণ ইহা উপর হইতে ভিতরে গিয়াছে—সত্যকার মানুষ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে। যে মানুষ বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে, শুধুই আহরণ করিতে চাহে, সেই মানুষ সম্মিলিত হইয়াছে, বিসর্জ্জন করিয়াছে। আর একান্নবর্ত্তিতা এই ভাব যে দণ্ড উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, তাহা নহে। একান্নবর্ত্তিতার যে ব্যবহারিক রূপ আছে, তাহার পরিচয় লইলে ব্যাপারটি আরও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইবে।

* লেখকের—অপ্রকাশিতপূর্ব্ব ভাবী "পল্লীরাষ্ট্র" গ্রন্থের এক অধ্যায়।

নারীর উক্তি

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

বসন্ত, অনন্ত ফুল জাগায় ফুৎকারে,
শরৎ, সুদীর্ঘ শ্বাসে তাদের ঝরায়,
বরষা, হেমন্ত, করে নষ্ট একেবারে।
গ্রীষ্ম—শুধু কেন্দ্রীভূত উত্তাপ সহায়
অলক্ষ্যে কুসুম-বক্ষে জন্ম দিতে পারে
আম্রগুচ্ছে, জম্বুপুঞ্জে; এ তপ্ত নিশায়
তাই দিয়ে ব্রত-ডালা সাজানু এবার,
ধর্ম্মরাজ সাক্ষী, বন্ধু, নাই পুষ্পভার!

দেখিতে পাও না যদি, তাই অনুযোগ?
কি করিব, বিধাতার এমনি নিয়োগ!—
এ মন্ত্র গোপন নিত্য তাঁহারি বিধান,
চকিতের দেখা লাগি', তাই খান্ খান্
বুকের পঞ্জরমালা হয় যে করিতে,
ত্রস্ত হিয়া ছুরিকায় সহসা চিরিতে।

আড়ালে লুকান মন, কখনো কি তবে
দেখনি বারতা তার, মুগ্ধনেত্র নভে?
পড়নি গীতিকা সেই, শুধু তারি মাঝে
তারার আখরে লেখা নিয়ত বিরাজে!
সে আলোক কখনো কি পড়ে নাই চোখে,
সেথা ছাড়া আর যাহা নাই কোন লোকে!

তোমরা দিয়েছ শুধু, নিয়েছি আমরা
স্নেহ-প্রেম-সোহাগের সুখের পসরা
বহুদুঃখে বহে' আনা নিশি-দিনমান
তোমাদের জীবনের যশোধনমান!
সম্রাট সমান, তবু দিয়েছ আনিয়া,
আমাদের অঞ্জলিতে সম্মান মানিয়া;
আমরা হাসিয়া শুধু রাণীর মতন,
কণিকে কৃতার্থ করি সে ধন-রতন,—
দেবীর মতন কভু, অচঞ্চল হিয়া;
দেবতা-দুর্ল্লভ ধনে, কৃপাদৃষ্টি দিয়া
হেলায় তুলিয়া লই; হবে বুঝি তাই,
অমূল্য ধনের মূল্য পাসরিয়া যাই—
অথবা অভ্যাস-দোষে মনে নাহি থাকে,
কতখানি নিলে, ভাল সাজে আপনাকে!

কথিত ভাষায় হাস্যরস

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

সরস রচনাকে যদি কৃতিত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে যিনি মৌখিক আলাপে বা বক্তৃতায় হাস্যরসের আমদানী করিতে পারেন তাঁহার বোধ করি উচ্চতর সম্মান প্রাপ্য; কেন না কাগজ কলম লইয়া অনেক কাটকুট করিয়া একটা হাসির জিনিষ খাড়া করা যত কঠিন, মুখে মুখে অনর্গল হাস্যরসের অবতারণা করাটা বোধ হয় তাহা অপেক্ষাও কঠিন। পক্ষান্তরে একথা ঠিক যে, এমন অনেক লেখকের নাম আমরা শুনিয়াছি যাঁহারা রচনায় ও কথাবার্ত্তায় সমান পরিমাণেই হাস্যরসের সৃজন করিতে পারিতেন। আবার এমন লোকও দেখা যায় যাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে শ্রোতা হাসিয়া আকুল হন, অথচ যাঁহারা কাগজ কলম লইয়া বসিলে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠেন। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক Mark Twainএর সরস রচনা পাঠ করিয়া না হাসিয়াছেন এমন লোক বোধ হয় নাই, কিন্তু শুনিয়াছি এই রসিক লেখকের এমন বিষণ্ণ মূর্ত্তি ও এমন করুণ কথাবার্ত্তা ছিল যে পূর্ব্বপরিচয় না থাকিলে কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না যে ইনিই একদিন প্রায় অর্দ্ধজগতের অধিবাসীর হাস্যরসের খোরাক জোগাইয়াছেন।

কথোপকথন জিনিষটা একটা আর্ট,—চৌষট্টি কলার মধ্যে ইহাকেও একটি কলাবিশেষ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মূক কিম্বা কল্পনাবিহীন না হইলে কথা ত সকলেই কহিয়া থাকে। কিন্তু কথোপকথন দ্বারা শ্রোতার চিত্তবিনোদন করিতে পারে কয়জন? বিনা অনুশীলনে সরস কথাবার্ত্তা বলিবার ক্ষমতা কিছুতেই জন্মিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত হাস্যরসিক স্যার হ্যারি লডারকে হাস্যরসের অবতারণার জন্য যে পরিমাণ চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হয় তাহা অধিকাংশ পাঠকের বোধ হয় জানা থাকিতে পারে। মানুষকে আকৃষ্ট করিবার, মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিবার একটি প্রধান উপায় হইল সরস ও সুমধুর আলাপন, এবং সরস-মধুর আলাপনের প্রধান অঙ্গ হইল হাস্যরস।

কথোপকথনের মধ্যে রসিকতা সকল দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কালিদাসের নাটক হইতে সেকালের রাজা ও সভাসদদিগের জীবনযাত্রার আভাষ পাই। রাজাদের এক একটি বিদূষক থাকিতেন, তাঁহারা রসিকতা করিয়া রাজাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। কিন্তু এ রসিকতা উচ্চদরের ছিল না, বরং ছিল অনেকটা ভাঁড়ামির মত। বিদূষক হইতেন ব্রাহ্মণ, এবং শতকরা নিরানব্বই জায়গায় রাজাকে পাইত প্রেমে এবং বিদূষকটির পাইত ক্ষুধা। তাই বিদূষক শ্রেণীর লোকের প্রাণটা সর্ব্বদাই করিত 'খাই, খাই,'—এবং তাঁহাদের অধিকাংশ রসিকতাই হইত ঔদরিক। এ কথা অবশ্য সকল বিদূষকের পক্ষে খাটে না। আর এক শ্রেণীর রসিকতা

ছিল অপরার সহিত প্রেমে পতিত রাজার মহিষীভীতির উপর ভিত্তি করিয়া। অর্থাৎ, মেমসাহেব-ভীত ইংরাজের যে সখের গান আছে—

"I can't go the way
Of marrying you to-day;
My wife won't let me!"

ইহা হইল উক্ত সংস্কৃত রসিকতার বর্ত্তমান ইংরাজী এডিশন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজারাণী'তে একজন নূতন ধরণের বিদূষক দেখিয়াছি, ইনি যেমন তেমন বিদূষক নহেন। ইঁহার হাস্যরস উদরের গভীর গহ্বরে সীমাবদ্ধ gastric juice নহে,—ইঁহার রসিকতা কোথাও আনন্দে উচ্ছল হইয়া চলে, কোথাও বা বিদ্রূপের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। ইঁহার কাছে অনুস্বর ধনুঃশর নহে, এবং রাজাকে ইনি বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে রাজা অন্তঃপুরে অন্তর্ধান করিতেছেন, রাজ্য পিছু পিছু চলিয়াছে.—"রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা।" দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজার "বর্ব্বর" চীৎকারকে লক্ষ্য করিয়া এই বিদূষকের উক্তি—"চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার, আজও তার অনশন হ'ল না অভ্যাস।" রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা প্রাচীন কালের বিদূষককে এক নূতন রূপ দান করিয়াছে।

ভাঁড়ামি জিনিষটা রসিকতা নহে। ভাঁড়ামিতে অনেকটা ইতরতা আছে, রসিকতায় আছে মৌলিক প্রতিভা। কৃষ্ণচন্দ্রের গোপালভাঁড় আজিও বাঁচিয়া আছে তাহার কারণ তাহার ইতরতার জন্য নহে, তাহার রসিকতার গুণে।

আমাদের কথিত ভাষায় একদা বহুল পরিমাণে হাস্যরস থাকিত। 'রসালাপ', 'খোসগল্প' প্রভৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা একদিন আমাদের দেশে খুবই ছিল। বর্ত্তমানে আমাদের বিকৃত শিক্ষার গুণে রসালাপকে আমরা আমাদের ঘরের আঙিনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। তৎপরিবর্ত্তে দিবারাত্রি বিষণ্ণ বদন ও চিন্তার ভার লইয়া বসিয়া আছি। আমাদের গ্রাম্যজীবনে যে সকল আনন্দের ধারা ছিল সেগুলি অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়। ইহাদের অন্যতম ছিল নৃত্যকলা। আমার অগ্রজোপম এবং সম্মানার্হ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আবার এই দিকে আমাদের দৃষ্টি গিয়াছে; তিনি যে সকল লুপ্তোদ্ধার করিতেছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী।

'ভদ্র' সমাজ হইতে 'রসালাপ'কে আমরা বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও যাহাদের আমরা 'ইতর' বলিয়া থাকি তাহারা আজিও ঐ জিনিষটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে আমরা অনেক সময়ে পবিত্র হাস্যরসের সন্ধান পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। আজও তাহাদের গ্রাম-সম্পর্কের বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা তাহাদিগকে হাসাইয়া জীবনের ভার লাঘব করিতেছে। বস্তুতঃ আমাদের তথাকথিত অশিক্ষিত নিরক্ষর জাতির মধ্যে এখনও যে সকল সদ্গুণ বাঁচিয়া আছে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচিত সেই সকল সদ্গুণ শিক্ষা করা। তাই যে সকল বি-এ, এম্-এ ডিগ্রিধারী বাবু স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষে বড় বড় যুক্তিতর্ক দেখাইয়া উহার কুফল বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা শিক্ষার অভিমান পকেটস্থ করিয়া যেন সাঁওতাল, হাড়ি এবং ডোমদিগের নিকট হইতে স্ত্রীস্বাধীনতার শিক্ষা গ্রহণ করেন। আর, আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষাভিমানে পেচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন দিন জীবনীশক্তিকে হ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমাদের পল্লীর আটচালায় গিয়া আমাদের সেই চিরতরুণ দাদ ঠাকুরটির নিকট হইতে হাস্যরসের অপর্য্যাপ্ত খোরাক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দুই-হাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বিলাইয়া দেন।

আমাদের চলিত কথায় যে হাস্যরস আছে তাহাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়;—এক, যাহাতে বক্তার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে যে কথাটা খুবই হাসির হইয়া দাঁড়ায়। আর দ্বিতীয়তঃ, যে হাস্যরস বক্তার নিজের প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট। যাহাতে বক্তার নিজের কোনও কৃতিত্ব নাই, অথচ কথাটা হয় হাসির, এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কথাবার্ত্তার মুদ্রাদোষ। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, কাহারও কাহারও কথার একটা মাত্রা থাকে। কেহ কেহ প্রতি কথাতেই বলেন 'বিবেচনা কর', কেহ কেহ বলেন 'ধর না কেন', কেহ কেহ বলেন 'তোমার গিয়ে—', আবার কেহ কেহ বলেন 'হতভাগা ছুঁচো'। আমার নিজের জানা একটি 'বিবেচনা

কর'-বাদী কৃষকের কথার উল্লেখ করিব। এই কৃষকের একজোড়া বলদ ছিল। সে একদিন সকালে গোহালে গিয়া তাহার বলদ দুটিকে বাহিরে টানিতে টানিতে কহিল—"শুধু জাব খেয়ে 'বিবেচনা কর্‌লে'ই ত হবেনা, এখন মাঠে গিয়ে লাঙ্গল নিয়ে 'বিবেচনা কর্‌তে' হবে।" বলদ দুইটির প্রবল আপত্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে তাহাদের দৃঢ় ধারণা লাঙ্গল কাঁধে করিলে 'বিবেচনাশক্তি'র ব্যাঘাত ঘটে, তাহার অপেক্ষা গোহালে বসিয়া জাব খাইলে 'বিবেচনা করা' যায় ভাল।

একজন দারোগার বদ্ অভ্যাস ছিল, কথায় কথায় বলিতেন—'ধর না কেন।' একদা এক ডাকাতি মামলার আসামী ফেরার হইল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। দারোগা বাবু সদ্য-আগত এক জমাদারকে কহিলেন—"এত করেও ত বেটার তল্লাশ হ'ল না হে, এখন কি বল্‌ব আমি হাকিমকে 'ধর না কেন'।" জমাদার বাবু বুঝিলেন হাকিমকেই ধরিতে হইবে। তিনি পত্রপাঠ হাকিমকেই ধরিয়া চালান দিলেন! এটা অবশ্য গল্প।

একটি সত্য ঘটনার কথা আমরা জানি। একজন ভদ্রলোক প্রতি কথায় বলিতেন 'হতভাগা ছুঁচো'। ভদ্রলোকটির বাড়ীতে একদিন গুরুঠাকুর আসিয়াছেন। তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ভদ্রলোকটি কহিলেন—"আরে কে ও, 'হতভাগা ছুঁচো' গুরুঠাকুর যে!"

এইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর হাস্যরসের কথা কিছু বলিব। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমাদের কৃতিত্ব বড় বেশী কিছু নাই। বঙ্গদেশে বাগ্মী অনেক জন্মিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যচ্ছটায় বহ্নি ও বিদ্যুৎ যত আছে হাস্যরস সেরূপ পরিমাণে নাই। অথচ রসিকতার দ্বারা শ্রোতার চিত্তে যত সহজে আঘাত করা যায় এমন আর কিছুতে যায় না। গরম গরম বক্তৃতা সুরার মত ক্ষণিকের জন্য শ্রোতার চিত্তকে উত্তেজিত করে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই নেশা কাটিয়া যায়। পক্ষান্তরে সরস বক্তৃতা আমাদের পল্লীগৃহের বাতায়নে সরবতের মত চিত্তকে শীতল করে, এবং দিনের পর দিন কাটিয়া গেলেও তাহার স্বাদটুকু মুখে লাগিয়াই থাকে। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রভৃতি কোথায় কি বলিয়াছিলেন আজিকার দিনের বঙ্গসন্তান তাহা ভুলিয়াছে, কিন্তু রসরাজ অমৃতলালের সরস উক্তিগুলি আজিও আমাদের চিত্তবিনোদন করে। বর্ত্তমান কালে বক্তৃতার মধ্যে হাস্যরসের আমদানী পাশ্চাত্য দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ এখনও হয় নাই। অনেককেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন—"আরে, এখন কাঁদ্‌বার দিন ঘনিয়ে এসেছে, হাস্‌ব কেমন করে' ?" এ কথার জবাব আমাদেরই এক কবি বহুদিন পূর্ব্বে দিয়া গিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম হইতেছে—মৃত্যু আসুক, তবু হাসিতে ছাড়ি কেন? কবি তখন অন্তিমশয্যায় শায়িত। যন্ত্রণাকর বিস্ফোটক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আক্রমণ করিয়া অবশেষে পদতল আক্রমণ করিয়াছে। এই অবস্থায় কবির এক বন্ধু কবিকে দেখিতে আসিলেন। বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর কবি কহিলেন—"ফোড়া এখন আমার পায়ে ধর্‌ছে।" গভীর দুঃখেও যিনি বিচলিত না হইয়া হাসিমুখে দুঃখকে জয় করিতে অগ্রসর হন দুঃখ আসিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া থাকে।

হাস্যরসকে বক্তৃতা হইতে আমরা দূরে ঠেলিয়া রাখিলেও পাশ্চাত্য দেশে ইহার আদর অনেক বেশী। Lord Dewarএর নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। সরস কথোপকথন ও বক্তৃতার গুণে সুধীসমাজে ইঁহাকে 'King of epigramatists' বলিয়া ডাকা হয়। ইঁহার এক শ্রেণীর রসিকতাকে 'Dewarism' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রসিক বক্তার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কতকগুলি বক্তৃতা হইতে কয়েকটি সরস উক্তি পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

অনেকে পাথার বাতাস খাইয়া চুরুট ফুঁকিয়া অনর্থক কতকটা চেঁচাইয়া এবং মহাব্যস্ততার ভাণ করিয়া মনে করেন খুব কাজ করিতেছেন। বাংলাতে ইহাকে বলে কোপরদালালি করা। এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিদ্রূপ করিয়া Dewar বলিয়াছেন—"There are two classes: those who work, and those who sit and talk and expound how work should be done."

অনেক পিতামাতা শিশুপুত্রের বুদ্ধি দেখিয়া মনে মনে

ভাবেন, 'এ ছেলে বাঁচ্‌লে হয়, বড় হ'লে এ একটা কেষ্ট-বিষ্টু না হ'য়ে যায় না।' কিন্তু বড় হইলে দেখা যায় যে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি উল্টাপথে চলাতে তাহাকে কারাগারে জীবন অবসান করিতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে Lord Dewarএর উক্তি—"Many a man sets out to leave foot-prints on the sands of time and only succeeds in leaving finger-prints at Scotland yard."

এমন লোক দু'চারটি সকল দেশেই আছে যাহারা বলে, "আরে মশায়, আমি এককথার মানুষ, আমার যে কথা সেই কাজ।" টাকা ধার করিবার সময় এরা বলে—"হ্যাণ্ডনোট আর কি কর্‌বেন মশায়, আমার কথাও যা হ্যাণ্ডনোটও তাই।" এ' প্রকৃতির লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় সে সম্বন্ধে Dewarএর উপদেশ—'When a man says his word is as good as his bond, get the bond."

সকল দেশের মেয়েদেরই বোধ হয় একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে, সস্তাদরে জিনিষ কিনিতে ভালবাসেন। কোনও কিছু খুব সস্তাদরে কিনিলে খুব দাঁও মারিয়াছেন ভাবিয়া বোধ হয় মনে মনে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিবেন না যে জিনিষটা যে সস্তা দরের এ কথা তাঁহারা অপরকে বলিতে ব্যগ্র। বরং অপরে মনে করুক এটা খুবই মহার্ঘ জিনিষ,—এইটাই মেয়েদের মনের ভাব। নকল হীরার ব্রেসলেট পরিয়া তাঁহারা মনে মনে কামনা করেন সকলে উহাকে আসল হীরার বলিয়াই ভাবুক। তাই Dewar বলিয়াছেন—"All women like bargains, but they would never have it suggested that they were wearing a bargain."

বর্ত্তমান কালের বিবাহিতা পাশ্চত্য নারীদের বিদ্রূপ করিয়া Dewar একস্থানে বলিয়াছেন—"Girls in the Mahammedan religion never see their husbands before they are married. Some wives in the christian religion seldom see their husbands after they are married."

আশা করি, সকলেই স্বীকার করিবেন, শাশুড়ীর জ্বালা বড় কম জ্বালা নহে। এক-শাশুড়ীতে রক্ষা নাই, তাহার উপর যদি আবার বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কতিপয় শাশুড়ীর জ্বালায় মানুষ বোধ করি পাগল হইত। অতএব যে একের অধিক বিবাহ করে তাহার তুল্য গণ্ডমূর্খ আর ইহজগতে নাই। Dewar বলিয়াছেন—"One mother-in-law is a better argument against polygamy than a hundred reasons for it."

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য-নারীদিগের 'স্কার্ট' ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িতেছে। ইহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমাদের দেশে এখনও গৃহিণীর সুপ্রশস্ত অঞ্চল আছে, এবং প্রাণভয়ে ভীত হইলে সে অঞ্চলের তলদেশ এখনও আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য এই পাশ্চাত্য পুরুষদের! হায়, কি ফ্যাসনই আসিয়াছে! তাই Lord Dewar বলিয়াছেন—"The man today who hides behind a woman's skirt is not a coward: he is a magician."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাঙালী মেয়েদের দেখাশুনা ও পড়াশুনা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ

পূজার ছুটি আগতপ্রায়। যাঁহারা নিজে কিম্বা যাঁহাদের আত্মীয়েরা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বৎসরের অধিকাংশ সময় জন্মস্থানে থাকেন না, অন্য কোন সহরে বা গ্রামে থাকেন, তাঁহারা অনেকে পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবেন, দেশভ্রমণে বাহির হইবেন, কিম্বা স্বাস্থ্যলাভের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়া থাকিবেন। যাঁহারা বাড়ী যাইবেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই বাড়ী গ্রামে বা সহর-নামধারী বৃহৎ গ্রামে। বাংলা দেশে বাস্তবিক সহর নামের যোগ্য জায়গা তিনটি মাত্র আছে—কলিকাতা, হাবড়া ও ঢাকা। অন্য সহরগুলি বৃহৎ গ্রাম মাত্র; কোথাও কোথাও আফিস-আদালত, কলেজ, কারখানা ইত্যাদি হইয়াছে, গ্রামের সহিত এই যা প্রভেদ। সুতরাং প্রায় সকল বাঙালীকেই গ্রামবাসী বলিলে ভুল বলা হয় না।

যাঁহারা ছুটিতে গ্রামে যাইবেন, তাঁহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গ্রামের জীবনকে কল্যাণের আকর ও আনন্দময় করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এখন গ্রামগুলি রোগের আকর, কুসংস্কারের পীঠস্থান এবং দুঃখময় হইয়া আছে। তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শুধু গ্রামের বাহ্য চেহারা দেখাই যথেষ্ট নয়, গ্রামবাসীদের জীবন কেমন করিয়া কাটে, তাহাও জানা দরকার। তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্র। তাঁহাদের ঘরগুলির ভিতরে গেলেই তাঁহাদের দিন-রাত কেমন করিয়া কাটে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের চেহারা ও পরিচ্ছদ হইতেও এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান জন্মে। কিন্তু শুধু মানুষগুলি ও তাঁহাদের ঘর-বাড়ী দেখাই যথেষ্ট নয়। কিছু শুনিতেও হইবে। আত্মীয়ের কাছে, মমতাবিশিষ্ট লোকদের কাছে ভিন্ন কেহ নিজের সুখদুঃখের কথা বলিতে চায় না। এই জন্য গ্রামবাসীদের কাছে হিতসাধক ও তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাহিরের একজনের [illegible] গিয়া প্রশ্ন করিলে অনেক সময় অনেক দুঃখী মানী [illegible] কষ্টই দেওয়া হইতে পারে। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অমায়িক ভাবে ও সমানের মত মিশিলে কাহাকেও এরূপ কষ্ট দিবার সম্ভাবনা ঘটিবে না; অধিকন্তু তাহার দ্বারা গ্রামবাসীদের অন্তরের ও বাহিরের জীবনের পরিচয় অনেকটা পাইয়া গ্রামের সেবক হইবার যোগ্যতা জন্মাইবে।

এইরূপ দেখা ও শুনার দ্বারা কেবল বাংলা দেশের গ্রামগুলিকে জানাই যথেষ্ট নহে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ-সমূহের গ্রাম ও সহর দেখিলে এমন অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে, যাহা বঙ্গের লোকালয়গুলির উন্নতিসাধন-চেষ্টায় কাজে লাগিতে পারে। ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও আদর্শ-গ্রাম নির্ম্মিত হইয়াছে। সন্ধান লইয়া সেগুলি দেখা আবশ্যক। যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পূজার ছুটি কাটাইবেন, তাঁহারা সহরে থাকিলে নিকটবর্ত্তী কোন-না-কোন গ্রামও দেখিতে পারেন। যাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইবেন, তাঁহারা শুধু বিখ্যাত সহর না দেখিয়া গ্রামও দেখিলে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং সেবক হইবার যোগ্যতা বাড়িবে।

আমাদের দেশে তীর্থভ্রমণের যে রীতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহা মুখ্যতঃ পুণ্যলাভের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও গৌণ অন্য যে লাভ তাহা হইতে হইত এবং এখনও হইতে পারে তাহা কম নয়। আমাদের মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, তাঁহাদিগকে শুধু শুধু দেশভ্রমণ করিতে বলিলে তাঁহাদের মন তাহাতে সায় না দিতে পারে। কিন্তু তীর্থভ্রমণের নাম করিলে তাঁহারা রাজী হইবেন। এবং বস্তুতঃ ধর্ম্মমত যাঁহার যাহাই হউক ও তীর্থস্থান-সকলে দুষ্ট ভণ্ডলোক যতই থাক, সকল তীর্থের সহিত পূতচরিত্র অনেক ব্যক্তির স্মৃতি জড়িত বলিয়া সাধারণ দেশভ্রমণ হইতে কিছু ভিন্ন রকমের সুফল তীর্থভ্রমণ হইতে সকলেই পাইতে পারেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তীর্থ ব্যতীত ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক তীর্থও

অনেক আছে। ইহাদের সহিত ভারতীর বহু প্রসিদ্ধ পুরুষ ও মহিলার এবং বহু যুগান্তরসংঘটক ও অন্তবিধ ঘটনার স্মৃতি জড়িত। দেশভ্রমণে বাহির হইলে এক এক বার অন্ততঃ দুই একটি ঐতিহাসিক তীর্থ দেখা উচিত। এই সব স্থান দেখিবার সময় তথাকার সমুদয় প্রধান প্রধান ঘটনার বৃত্তান্তপূর্ণ বহি কিম্বা সকল প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ কোন লোক সঙ্গে থাকিলে দর্শনের ফল পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় গাইড বা প্রদর্শক পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের অনেক কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যে-যে তীর্থ দেখিতে যাওয়া হয়, তথাকার ভাষা জানিলে আরও সুবিধা হয়। তাহাতে দেখা ও শুনা দুরকমই চলিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ভাষা জানা ত সোজা নয়, এবং শুধু দেশ-ভ্রমণের সুবিধার জন্ম অনেকগুলা ভাষা শেখা সঙ্গতও নয়। বাঙালীরা শুধু হিন্দী জানিলেই উত্তর-ভারতের সব জায়গায় মোটামুটি কাজ চলিতে পারে।

বলা বাহুল্য, যাহা কিছু ভাল ও জ্ঞাতব্য, তাহা আমাদের দেশেই আবদ্ধ নহে। সেই জন্ম ভারতবর্ষের বাহিরেও প্রাচ্য ও পাশ্চত্য নানা দেশ দেখার লাভ আছে। আধুনিক যুগে বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ লোকদের মধ্যে রাম-মোহন রায় সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশে গিয়াছিলেন। তার পর বাঙালী পুরুষেরা অনেকে পাশ্চাত্য দেশে গিয়াছেন। বাঙালী মহিলাদের বিদেশভ্রমণের আরম্ভও খুব সেদিনকার কথা নয়। কিন্তু আজকাল যত মহিলা শিক্ষালয়ে শিক্ষা-লাভের বা শুধু দেশভ্রমণের জন্ম যান, পঞ্চাশ বা পঁচিশ বৎসর আগেও তত যাইতেন না। আজকাল যাঁহারা যান, তাঁহারা কেহ কেহ নিজেদের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশও করেন। এই সব ভ্রমণকারিণীদের দেশসেবার যোগ্যতা বাড়িত পারে।

ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তীর্থ দেখা সকলের পক্ষে সোজা নয়। বিদেশ দেখা আরও কঠিন। কিন্তু ঘরে বসিয়াও ভ্রমণের কিছু ফল পাওয়া তার চেয়ে সোজা। যাঁহারা বিদেশ দেখিয়াছেন, তাঁহারা ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতার দ্বারা এই ফল দিতে পারেন, এবং যাঁহারা শুনিবেন তাঁহারা সেই ফল পাইতে পারেন। আর এক উপায়, ভূগোলের বহি পড়া। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় ঠিক এমন সচিত্র ভূগোলের বহি বা তদ্রূপ অন্ত বহি নাই, যাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের আবশ্যকমত জ্ঞান লাভ করা যায়। ইংরেজীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে এরূপ সচিত্র বহি আছে যাহা হইতে তাহাদের চেহারা, গায়ের রং, পরিচ্ছদ, রীতিনীতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জীবজন্তু সম্বন্ধেও ঐরূপ বহি আছে। প্রসিদ্ধ স্থান ও ঘটনাদির বর্ণনাসম্বলিত সচিত্র বহিও আছে। এসব কিন্তু দামী বই, এবং ইংরেজী না জানিলে পড়া যায় না। বঙ্গের মত গরীব দেশে বাংলা ভাষায় এরূপ দামী বই প্রকাশ করিলে ক্রেতা ও পাঠক জুটিবে না। কিন্তু এক এক খানা এমন সচিত্র ও অপেক্ষাকৃত সস্তা বাংলা ভূগোলের বই নিশ্চয়ই লেখা ও প্রকাশ করা যাইতে পারে, যাহা সহজ ও সুখপাঠ্য হইবে এবং যাহা হইতে নানা দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রীতিনীতি ও সভ্যতার বিষয় আমাদের অন্তঃপুরিকারাও জানিতে পারেন। আমা-দের ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে ভূগোল পড়ে বটে, কিন্তু তাহা হইতে তাহারা নানা দেশের ঐ সব বৃত্তান্ত কমই জানিতে পারে। ইস্কুলে পড়াই-বার ভূগোলের এবং যে-সব ছেলেমেয়ে তাহা পড়ে তাহাদের শিক্ষার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকায়, আমি জানি না তাহারা জানে কিনা,যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই স্বাধীন এবং এই সত্তরটি স্বাধীনদেশের মধ্যে পঁয়-তাল্লিশটি সাধারণতন্ত্র ও বাকী অধিকাংশগুলিতে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত। তাহারা ইহাও জানে কিনা, বলিতে পারি না, যে, অধিকাংশ দেশে নারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। সভ্যদেশ-সকলের মধ্যে ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে নিরক্ষর দেশ, ভারত-বর্ষে জনপ্রতি গড় বার্ষিক আয় সব চেয়ে কম, ভারতবর্ষের লোকদের গড় আয়ু সভ্যদেশ-সকলের অর্দ্ধেক, এবং ভারত-বর্ষে মৃত্যুর হার অন্ত সব সভ্যদেশের চেয়ে বেশী—এসব কথা আমাদের ছেলেমেয়েরা তাহাদের ভূগোল পড়িয়া শিখে কিনা, বলিতে পারি না।

সুখপাঠ্য এরূপ একখানি সচিত্র ভূগোলের বহি প্রকাশিত হওয়া উচিত, যাহা ছেলে-বুড়ো সুখে পড়িবে ও যাহা হইতে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে।

ছবি

শ্রী বিমলাংশুপ্রকাশ রায় বি-এ

চা আন্‌তে এত দেরীও করে!…অনিমেষচন্দ্র চেয়ারে বসে' বসে' টেবিলের বিশৃঙ্খল পুস্তকরাশির এটা ওটা নাড়া চাড়া করে' করে' যেখানে খুসী যেমন-তেমন ভাবে হাঁট্‌কে রাখ্‌ছিল—কোনটার পাতা খোলা, কোনটার পাতা মোড়া, কোনটা চিৎ, কোনটা উপুড়—যেন লড়াইয়ের পর [illegible]ন্ত সৈন্যের অবিন্যস্ত অবস্থিতি।

[illegible] ঝপুসিং চা নিয়ে এল, খাবারও আন্‌তে লাগ্‌লো একটার পর একটা বার বার যাওয়া-আসা করে'। অনিমেষের পিতার আমলের ভৃত্য এই ঝপুসিং। সে এই পরিবারের উত্থান পতনের আনন্দ-আঘাত সমানে নিজেও বুক পেতে গ্রহণ করেছে। ধনে এবং জনে যখন পরিবারটি ভরপুর ছিল তখনকার সেই সুদিনের ছবিটি চোখের সাম্‌নে ধরে' এই দুর্দ্দিনে পুরাতন ভৃত্যটি তেম্‌নি প্রভুর সেবা করে' চলেছে…আর কারুকেই দাদাবাবুর খাবার ছুঁতে কিছুতেই দেবে না সে।

অর্থ যা গিয়েছে তার জন্যে দুঃখ তেমন নেই, দাদাবাবু সবই তা ফিরিয়ে আন্‌তে পারে, কিন্তু মানুষ যা গিয়েছে তা কি আর ফির্‌বার!…যার যাবার সময় হয়, সে যাবেই। তার বিদায়ের জন্যে সময়ে মনকে প্রস্তুত করলেই সে আঘাত সহ্য করা যায়। কিন্তু অসময়ের অবসান—অসতর্ক চিত্তকে যেন খেঁৎলে দিয়ে যায়।

চা খাবার পরে চায়ের শূন্য পেয়ালা, খাবারের রেকাবি, জলের গেলাস প্রত্যেকেই এক একটি বইয়ের স্তূপের উপর আসন পেতে' বস্‌লো। ঠিক সেই সময় খবরের কাগজওয়ালা একটা গজলের সুর ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে কাগজ দিয়ে গেল। কেতাবরাশির উপর চায়ের পেয়ালার অপমানের দৃশ্যটা খবরের কাগজের বিশাল বিস্তৃতি দিয়ে ঢেকে ফেলে অনিমেষ তাতে ঝুঁকে পড়্‌লো। ছিন্নাকৃতি খবরগুলো পড়া হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] [illegible]খানি ক্রমে চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে চিৎ হ'য়ে এলিয়ে পড়্‌লো, এবং কাগজটা হাতে করে' শূন্যে তুলে ধরে' বিজ্ঞাপনগুলোর উপর সে অলস আঁখি বুলিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

খানিক পরে কাগজটা ফেলে দিতেই দৃষ্টিটা সোজা গিয়ে পড়্‌লো সম্মুখের দেয়ালের বেশ একটু উপরের দিকে টাঙানো একটি সযত্নে বাঁধানো ছবির প্রতি। এক মুহূর্ত্তে মন তার অতীতের মাঝে ডুবে গেল।…ছবিখানি তোলা হয়েছিল বিয়ের দু'চার দিন পরেই চারু গুহের ষ্টুডিওতে গিয়ে।

ছেলেবেলাকার স্নেক্‌ল্যাডার খেলার কথা মনে পড়্‌লো। গুটিটা এগিয়ে চল্‌তে চল্‌তে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট কোঠায় গিয়ে দানটা পড়েছে অমনি ফিরে' যাও সেই সুরুর কোঠায়।

হঠাৎ চমক ভাঙলো পাশের বারান্দা হ'তে একটি বালকের উল্লসিত চীৎকারে। বালকটি তার নিজেরই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিয়ে নিজেই ছুটে এলো—"বাবা! এই দেখ, এই পাখার ছানাটা কোত্থেকে উড়ে এসে পড়েছে আমাদের বাড়ীতে। আমি ধরে' ফেলেছি। আচ্ছা, এটা কী পাখী বাবা? কি খেতে দেবো?—ঝপুসিং! ও ঝপুসিং! এই দেখ—"

পিতাকে কথা কইবার কোন অবসর না দিয়ে, ঝপুসিংকে আবার তার আনন্দ-সমাচার দিতে সে যেমন ছুটে এসেছিলো তেম্‌নি ছুটে বেরিয়ে গেল হাতের মুঠোর চাপে ছানাটা বাঁচে কি মরে সেদিকে হুঁস্ নেই।

অনিমেষ যে বর্ত্তমান ভুলে' ছবির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে ছিল, তা যে বালক দেখ্‌তে পায় নি সে আস্‌বার আগেই তার কণ্ঠস্বর তাকে সজাগ করে' দিয়েছে—তাতে অনিমেষ কিছু স্বস্তি অনুভব করছিল।

ছয় বৎসর বয়সে বালক মাতৃহারা হ'য়ে প্রথম কয়েকটা দিন মাত্র সে মায়ের সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করেছিল। তারপর এই দুই বছর সে কখনো মায়ের কথা কারু কাছে তোলে

নি। অনিমেষ স্ত্রীর ছবিখানা প্রথমে তার পড়ার টেবিলের উপরেই সাজিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পুত্রের এই নীরবতায় ক্রমশঃ সেটাকে দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় এবং ইদানীং প্রায় সিলিংএর কাছাকাছি তুলে' দিয়েছে। বালক-মনের মাতৃবিয়োগের আঘাতে কি ভাবে প্রলেপ দিতে হবে তা ভেবে পিতা কূল পাচ্ছিল না। স্মৃতিটাকে সজাগ করেই রাখে কি ভুলতে দিয়েই সাহায্য করে!

স্নেকল্যাডার খেলাটা কি সত্যিই আবার আরম্ভ করা যায়? আবার কি জীবন-নাট্য সুরু হ'তে নূতন ভাবে চালনা করা যায় না? খোকা এই যে ছুটে এল ছুটেই চলে' গেল এর মধ্যে কি একটা অর্থভরা আক্ষেপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না? অনর্গল প্রশ্ন করে' জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ছুটে চলে' যাওয়ার মানে - কোন পুরুষের সাধ্য নেই তার কথায় সাড়া দিতে পারে। এখান হ'তে যে ঐ ঝপুসিংয়ের কাছে গেল, তার কাছ হ'তে আবার আর কোথাও হয় ত যাবে; কিন্তু শিশুমন যে একটি মাতৃহৃদয় পেলেই সব ছুটোছুটিতে সমাপ্তি দিতে পারে তা সে নিজে না বুঝলেও তার পিতার বোঝা উচিত। এই কথাটা কিছুদিন হ'তেই অনিমেষের মনে কেবলি তোলপাড় করছিল। তা ছাড়া ওর শরীরের যত্নও যথেষ্ট হ'চ্ছে না।—শরীর-মন দুয়েরই পরিচর্য্যার প্রয়োজন।

অনিমেষের পিতা লেক্ রোডের উপর এই নূতন বাড়ীখানা তৈরী করা সম্পূর্ণ সমাপ্ত না কর্‌তেই এসে যখন 'গৃহপ্রবেশ' কর্‌লেন তখন কি ভেবেছিলেন যে ওদিকে তাঁর জীবনের সমাপ্তির দিনও সন্নিকট। বাড়ীখানার তিন দিকেই পলাস্তারার কাজ বাকি। এক দিককার প্ল্যানে দুটো কামরা বাড়াবার কথা ছিল। তাই সেই অনাগত প্রকোষ্ঠ দুটিকে আলিঙ্গনের আশায় সেই দিক দুই সারি ইট আজও হাত বাড়িয়ে রয়েছে।

পিতা, মাতা ও স্ত্রী, তিন মাসের মধ্যে যখন তিন জনে ইহলোক হ'তে বিদায় নিলেন, অনিমেষ শিশু পুত্রটিকে বুকে করে' যেন অকূলের কূলভাঙা পর পর তিনটি প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্য হ'তে খানিকটা মারাত্মক চুবুনি খেয়ে উঠলেন। তাতে নিজের যতটা না দম আট্‌কে যাবার মতো হয়েছিল, তার শতগুণ যে শিশুটির হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি?

ঘরভরা লোকের সঙ্গ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে নিঃসঙ্গ শিশু—ঘরগুলোকেই এক একটা জীবন্ত সঙ্গীরূপে অবলম্বন করে' নিল। এ দেয়ালের কাছে এসে চুপি চুপি কি কথা বলে' যায়, আবার ও-কোণায় গিয়ে কি বলে—যেন 'বুদ্ধিমন্তর' খেলা সুরু করে' দেয়। খাটের রেলিঙে, চেয়ারের হাতলে, দরজার কপাটে কত হাতাহাতি হুড়োহুড়ি হয়—যেন ঘরে এক-দঙ্গল দস্যি ছেলেই বা বিরাজ কর্‌ছে। অনিমেষ গোপনে নিরীক্ষণ করে, গোপনে নিশ্বাস ফেলে।

দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ার পেতে যখন অনিমেষ বসে, দৃষ্টি পড়ে গিয়ে একখণ্ড শস্যক্ষেত্রের ওপর। নিত্যবর্দ্ধিষ্ণুকায়া নগরীর বিস্তৃতি ঐ টুকুন ক্ষেত্রকে এখনও নিজের কবলে গ্রহণ কর্‌তে বাকী রেখেছে। গ্রামের উৎপন্ন শস্যও আহরণ কর্‌বে সহর—অজগর সর্পের নিশ্বাসের বলে, আবার শস্য-উৎপাদনের জমীটুকুতেও গিয়ে নিজের বিশাল দেহ এলিয়ে দিতে হবে।

অনিমেষ চেয়ে দেখে—বিদূরিতবারিদ হেমন্তের সন্ধ্যায় যে চাষীরা ভারা ভারা ধান কেটে কাঁধে ব'য়ে কোথায় বিদায় দিয়ে এল, সেই চাষীরাই ঐ আবার এসেছে আজ বাদলের সকালে নবজলধারার সঙ্গে সঙ্গে ধান্যরোপণেরই গীত গেয়ে তালে তালে পা ফেলে!

সেদিন সন্ধ্যায় দুই জন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে' ঘরে প্রবেশ কর্‌লেন ঘটক। ঝপুসিং তাঁদের বস্‌তে দিয়ে এক চোখে হাসি অন্য চোখে অশ্রু ব'য়ে দাদাবাবুকে খবর দিল।

মৃগশিশুর নৃত্যভঙ্গীতে খোকাবাবু যখন-খুসী যে ঘরে ইচ্ছা ছুটে বেড়াতো। বাইরের বস্‌বার ঘরেও তার 'প্রবেশ-নিষেধ' ছিল না। তার উপস্থিতিতে উকিল বা মক্কেলের মোকদ্দমার কথাবার্ত্তায় তিলমাত্র বাধা কোন কালে হ'তে সে দেখে নি। কিন্তু আজ যখন সে সেই ঘরে প্রবেশ কর্‌বামাত্র তার পিতা ও তিন জন আগন্তুক একসঙ্গে চম্‌কে উঠে কথা বন্ধ কর্‌লেন—তাঁদের চাইতেও বেশী চম্‌কাল খোকা নিজেই। এমন ত কোন দিনই হয় নি। সবিস্ময়ে তাদের পানে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো—এ কোন্ দেশী

মক্কেল! কিন্তু বিস্ময়ের মাত্রা চূড়ান্ত হ'লো, যখন তার বাবা গম্ভীরভাবে বল্লেন "খোকা এখন এ ঘর হ'তে য ও।"

খোকা পিতার দিকে তাকিয়ে থেকেই পিছু হটে হটে' ঘর হ'তে বেরিয়ে এলো। কিন্তু বেরিয়ে একেবারে চলে' গেল না। বালসুলভ কুতূহল পেয়ে বস্‌লো তাকে। দরজার ফাঁকে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বাধাপ্রাপ্ত কথাবার্ত্তা কিছুক্ষণের মধ্যেই পুনরায় পূর্ণ-মাত্রায় জমে' উঠ্‌লো।

কিন্তু বাধা আবার এল। সকলে অবাক হ'য়ে দেখ্‌লো—খোকা এবার এল মেজের ওপর সজোরে ধুপ্ ধুপ্ পা ফেলে—যেন বল্‌তে চায়, তোমাদের নিষেধ এই প'য়ের নীচে পিষে ফেলে এই আমি প্রবেশ কর্‌ছি। অনিমেষ বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, "এ কি খোকা! বল্লুম যে এখন এসো না?"

খোকা নিরুত্তরে কতটা জোরে নিজের পা মেজের উপর স্থাপন কর্‌তে পেরেছে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। "ও কি দাড়িয়ে রইল যে? যাও বল্‌ছি।"

কিন্তু যাবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করে' খোকা দুই হাতে একটা শূন্য চেয়ারের পিছনটা সজোরে চেপে ধর্‌লো।

ল্যাম্পটা জ্বেলেই অনেকে যেমন চিম্‌নী বসাবার ব্যস্ততায় তখনো-জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠিটাকে ছুঁড়ে কোথায় ফেল্‌ছে—কিছুতে গিয়ে আবার আগুন ধরাচ্ছে কিনা—তাকিয়ে তা একবার দেখে না, অনিমেষ তেম্‌নি ভাবে পুত্রকে সজোরে ঠেলে ঘর হ'তে বের করে' দিয়ে দরজা টেনে নিজেদের নিতান্ত জরুরি কথায় মন দিল।

যখন অনিমেষ গিয়ে শোবার ঘরে প্রবেশ কর্‌লো তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। ঘুমন্ত খোকার দিকে চোখ পড়্‌তেই বুঝ্‌তে পার্‌লো ঘরে একটা বিপ্লব খেলে গেছে। বিছানার একপ্রান্তে অতি সন্তর্পণে ঘুমিয়ে আছে সে। পাশে একটা টিপয় কোত্থেকে টেনে এনেছে, তার উপরে সাজিয়েছে একটি কড়ি-বসানো সুন্দর ছোট্ট হাতবাক্স। অনিমেষের মনে পড়্‌লো এই ব ক্সটা খোকাকে তার মা দিয়েছিল তিন-বছর আগে ওর জন্মদিনে। গত দুই বছর অনিমেষ বাক্সটার অস্তিত্বই ভুলে' ছিল—খোকা কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছিল সে-ই জানে। আর বাক্সটার উপরে বসিয়েছে সেই দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিখানি পেড়ে এনে। অনিমেষ ছবির পূর্ব্বস্থিত জায়গার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো টেবিলের উপর একটা চেয়ার চাপানো রয়েছে, আর তার উপর রয়েছে একটা ছোট টুল।

অনিমেষ ভেবেছিল খুব উঁচুতে ছবিখানিকে তুলে দিলে ছোট ছেলের চোখ অতদূর গিয়ে পৌঁছবে না। কিন্তু সে ছোট বলেই যে তার দৃষ্টি সর্ব্বদা উর্দ্ধপানে থাকে তা খেয়ালে আসে নি।

বিছানার যে অংশটিতে অনিমেষের শোবার কথা, সেস্থান আজ আর খালি নেই। এক জোড়া তাসে সেখানে খেলার ঘর খাড়া হয়েছে। এই বাইসিকেল-মার্কা তাস জোড়াও অনিমেষের দুই বৎসর পূর্ব্বেকার পরিচিত। এতদিন এও লুকানো ছিল। অন্তরের গোপন ব্যথা-টুকুর মতোই এই সামগ্রীগুলিকেও সঙ্গোপনেই রাখা হয়েছিল—যেন দশ জনের দৃষ্টি, দশ রকম প্রশ্নের ধূলো এই পবিত্রতাকে মলিন করে' না ফেলে।

এম্‌নি তাসের ঘর তৈরী কর্‌তে মাতা-পুত্রকে কত সন্ধ্যায় নিবিষ্টচিত্ত—অনিমেষ দেখেছে। ঘরটির এক দিক যেমন নির্ম্মিত হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌তো, অপর দিক খসে' খসে' পড়্‌তো। আবার তৈরী হ'তো—আবার পড়্‌তো। আজকের ঘরটিও এই নিশীথরাতের বাদল-হাওয়ায় অধিকাংশই পড়ে' গেছে।

খোকার মুখখানির কাছে গিয়ে অনিমেষ দেখ্‌লো—দুই গালের উপর দিয়ে ব'য়ে-যাওয়া অশ্রুর শুক্‌নো দাগ। একটি গালের নিম্নপ্রান্তে শেষ বিন্দুটুকু তখনো শুকায় নি—আলোকের ঝলক্ প'ড়ে তখনও মুক্তোর মতো জ্বল্‌ছে।

অনিমেষ বুঝ্‌লো, মাতৃহীন বালকের চিত্ত অসহায় অবস্থায় মুহূর্ত্তে দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। অন্তরের বিজ্ঞ অংশ নিজেকে মাতার আসনে বসিয়ে বাইরের খোকাটিকে নানা-রকমে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পেয়েছে,—মাতার আসনে অপর কাকেও আস্‌তে দেবে না। কিন্তু প্রবোধ সে না মেনে উপাধান সিক্ত করেছে। অনিমেষ নত হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে' আকুল চুম্বনের আকর্ষণে বালকের অশ্রু বিন্দুটুকুকে মুছে নিতে গিয়ে নিজেরাই অশ্রুর প্লাবন ঢেলে দিল।

পূরবী

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন নাহি জানি
বড় ভালো লাগে মোর দিনান্তে দিগন্তকোণে
গোধূলির শেষ-রশ্মিখানি।
ম্লানপাণ্ডু সকরুণ নিভে-আসা ঢুলে-পড়া
ক্লান্ত ক্ষীণ তন্দ্রাতুর আলো
সারা দিবারজনীর সমস্ত বৈচিত্র্য হ'তে
কেন জানি মোর লাগে ভালো।
চেয়ে তার পানে
নৈঃশব্দ্যের সিন্ধুনীরে একা নেমে যেতে চাই
কেন যে কে জানে!

কে বলিবে কেন
অতীতের ধ্বংসরাশি আমি এত ভালোবাসি
প্রাণ ভরে' পূজা করি হেন!
অভ্রভেদী যে মহিমা—চূর্ণশির, দীর্ণবক্ষ—
লুটাইছে পথধূলি 'পরে,—
আজিকার ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণশীর্ষসৌধ হ'তে
সে আমার চিত্ত চুরি করে।
ভগ্নস্তূপে তাই
একা বসি' অন্ধকারে বিস্মৃতির পরপারে
ভেসে চলে' যাই।

আমি ভালোবাসি
ঝরে'-পড়া ফুলদল, মেঘমগ্ন দিবালোক,—
শয্যালীন মুমূর্ষুর হাসি।
দেবতামন্দির-তলে যেথায় আরতি চলে
শঙ্খঘণ্টা গন্ধদীপ ধূপে—
শ্মশানের চিতাপাশে সেথা হ'তে ছুটে আসে
মন মোর কেন জানি চুপে!
বেদনার চুমা
মর্ম্মে তুলে যে ঝঙ্কার বিশ্বের সঙ্গীতে তার
পাই না উপমা।

কবে নাহি জানি
অশ্রুভরা পূরবীতে কে কবি বাঁধিয়া দেছে
আমার জীবন-বীণাখানি!
এ দেহের জন্মগেহে তাই সাজায়েছে স্নেহে
মা' মোরে মলিন আবরণে;
বসুন্ধরা তাই মোরে ঘিরেছে এমন করে'
রোগে, শোকে, বিপদে, মরণে।
নিজমনে হাসি
মোর ভাগ্যলিপিটিরে পড়ি আমি ফিরে ফিরে
উন্মনা উদাসী।

তাই প্রাণ চায়
উৎসবের উৎসমুখে পাষাণ চাপায়ে সুখে
ভ্রমিবারে আঘাতে ব্যথায়।
নীলকণ্ঠ ভগবান যে আনন্দে করে পান
সৃষ্টি-সিন্ধু-মন্থনের বিষ,
ভরি' মোর প্রাণপাত্র লব' তারি কণামাত্র—
এ মোর সাধনা অহর্নিশ।
তারি আয়োজনে
ধরণীর দুঃখরাশি আমি আজ ভালোবাসি
বিনা প্রয়োজনে।

তরবারি-ক্রীড়া পরিচালন

এই নারী—কুমারী মেরিয়ন লীয়ড (আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্রবাসিনী) একটি "নারী তরবারি খেলোয়াড় দলের" (a team of women fencers) ক্যাপ্টেন। এই দলটি সম্প্রতি য়ুরোপ-ভ্রমণ করিতে মনন করিয়াছেন।

লম্বা-কাছি

চিত্রে দেখা যাইতেছে মেয়েরা লম্বা-কাছি টানিতে উদ্যত হইয়াছেন। জনৈক উপদেষ্টা বা শিক্ষক, "লীয়ন্‌স্‌"এর এই বালিকাগুলিকে তাঁহাদের বার্ষিক ক্রীড়া-উৎসবের জন্ত প্রস্তুত হইতে শিক্ষাদান করিতেছেন।

বর্শা-ছোড়া

এই জার্ম্মান বালিকা-কয়েকটি বর্শা-ছোড়া খেলায় একসঙ্গে ব্যায়াম ও আনন্দ উভয়ই উপভোগ করিতেছেন। এই খেলাটি তাঁহাদের সব খেলার চেয়ে প্রিয়।

আল্‌পনা

দক্ষিণ ভারত, মালাবার প্রদেশের (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) এই হিন্দুমহিলাটি গৃহদ্বারে আল্‌পনা দিতেছেন।

রচনার জন্য পুরস্কার

কুমারী ইসাবেলা টম্‌সন্, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত থোবার্ণ কলেজের (Thoburn College) একটি ছাত্রী। ইনি সম্প্রতি "ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বেকারত্বের বৃদ্ধি ও বিস্তার, এবং তৎপ্রতিকারে ষ্টেট বা সরকার কি করিতে পারেন," এই বিষয়ক একটি রচনার জন্য "বড়লাটের রৌপ্যপদক" (Viceroy's Silver Medal) পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বালক অপরাধীর দল

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে আনন্দদায়ক পৃথিবীতে আর যে কি আছে তা বলা ভার। তাই এই ছেলেমেয়েদেরই বিষয় কিছু বল্‌তে চাই। যাদের বিষয় বল্‌ব তারা কিন্তু সাধারণ ছেলেমেয়ে নয়, এদেরই ইংরাজিতে "জুভিনাইল অফেণ্ডারস্‌" অর্থাৎ বালক অপরাধী বলে। ৭ বছরের উর্দ্ধের ও ১৬ বছরের নিম্নের যে কোন বালক-বালিকা আইন-ভঙ্গ অপরাধে দণ্ডিত হ'য়ে আদালতের কাঠগোড়ায় এসে দাঁড়ায় তাদেরই "জুভিনাইল অফেণ্ডারস্‌" বলা হয়। ১৯২২ সালের পূর্ব্বে এইরূপ "আসামীদের" বিচার সাধারণ পুলিস কোর্টেই হ'ত। ফলে হয় ত ৮।১০ বছরের একটি ছেলে রাস্তার ধারে নুয়ে-পড়া কোন গৃহস্থের পেয়ারা গাছ থেকে একটি পেয়ারা পাড়্‌বার জন্যে দণ্ডিত হ'য়ে দাগী চোরদের সঙ্গে একই কারাগারে আবদ্ধ থাক্‌ত। পরিণামে এই বালক যদি একটি রীতিমত পাকা চোর হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে এর জন্যে দায়ী কে? এই সব নানা কারণে ১৯২২ সালে "বেঙ্গল চিলড্রেন এক্‌ট্‌" বা "বঙ্গীয় শিশুরক্ষণ আইন" নামে একটি আইন অনুমোদন করা হয়। উপস্থিত কেবল কোলকাতা সহর, শিয়ালদহ, হাবড়া ও খিদিরপুর এই আইনের অধীন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের নিজেদের কুপ্রবৃত্তির হাত হ'তে রক্ষা করাই এই আইনটির প্রধান উদ্দেশ্য। তারা যাতে সৎপথে থেকে দেশের ও দশের কাজে লাগ্‌তে পারে এরই জন্যে এই নূতন আইনের সৃষ্টি। "চিলড্রেন কোর্টের" বা "শিশুদের বিচারালয়ের" হাকিমের সঙ্গে এই সব অপরাধী বালকদের যা সম্পর্ক তা বিচারক ও আসামীর সম্পর্ক নয়। পিতা যেমন ভাবে তাঁর অপরাধী পুত্রের বিচার ও শাস্তির বিধান করেন চিলড্রেন কোর্টের হাকিমও সেইমত করে' থাকেন। এই জন্যই বালকদের বিচারালয় অন্য সব আদালত হ'তে অনেক তফাৎ। বিচারের সময় জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। পুলিস কর্ম্মচারীরা তাদের আইনসঙ্গত পোষাকের পরিবর্ত্তে সাধারণ লোকের মতই কাপড় পরে। পুলিস কোর্টের আদব-কায়দা এখানে চলে না; ছেলেরা যাতে নির্ভয়ে হাকিমের কাছে তাদের মনের কথা বল্‌তে পারে এই জন্যেই এ সবের ব্যবস্থা। কেবল অপরাধীকে দণ্ড দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য নয়, যাতে এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুপথে আর না যায় তারই জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। এ স্থলে জনসাধারণকে একজন আইন-ভঙ্গকারীর হাত হ'তে রক্ষা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, যাতে একটি অজ্ঞান বালক বা বালিকা অনিষ্টের পথে না ভেসে যায় তারই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। বালক অপরাধীদের সম্বন্ধে এই নূতন ভাবের উৎপত্তি ও তাদের জন্যে এইরূপ সহৃদয় নিয়মপ্রণালীর সৃষ্টি হয় প্রথম আমেরিকায়। সেখান থেকে এই নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে এক অভিনেত্রী এই মত প্রচার করেন ইংলণ্ডে। নারীরই উপযুক্ত কাজ বটে!

এই সব বালক অপরাধীদের জন্যে অনেক রকমই শাস্তির বিধান আছে। অপরাধ বুঝে তাদের সময় সময় বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু মারলেই যে ছেলে শোধ্‌রায় না তা এ স্থলে স্পষ্টই দেখা যায়। একই ছেলে বেত্রাঘাত পাওয়া সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ কোন না কোন অপরাধের জন্য আদালতের কাঠগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে এ ব্যাপারও কিছু নূতন নয়।

কোন কোন স্থলে অপরাধীর পিতা বা পিতৃ-স্থানীয়ের কাছ হ'তে হাকিম একটি "বণ্ড" লিখিয়ে নেন। কোর্ট থেকে একজন অফিসার নিযুক্ত হন যাঁকে ইংরাজিতে "প্রোবেশন অফিসার" (পরীক্ষাকারী) বলে। এই অফিসার হপ্তায় হপ্তায় ছেলেটিকে তার বাসায় গিয়ে দেখে আসেন, সে কেমন থাকে। এ বিষয় হাকিমের কাছে তাঁকে সাপ্তাহিক রিপোর্ট দিতে হয়। ছেলেটির ব্যবহার সম্বন্ধে হাকিম সন্তুষ্ট না হ'লে "বণ্ড" কাটিয়ে দিয়ে অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। অনেক সময় পিতামাতার অসাবধানতার জন্যে ছেলেরা কুসংসর্গে পোড়ে চুরি করে, সেই সব ক্ষেত্রে হাকিমের কড়া নজরে

থাকার দরুণ বাপ-মায়েরাও ছেলের প্রতি আগের থেকে বেশী মনোযোগ দেন।

যে সব ছেলেদের কেউ দেখ্‌বার নেই তাদের জন্যে সরকারী যা ব্যবস্থা আছে সেই ভাল। ১২ বছরের নীচে হ'লে হাকিম এইরূপ অপরাধীকে আলিপুর "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল" (শিল্পশিক্ষালয়)ও ১২র উর্দ্ধে হ'লে আলিপুর "রিফর্মেটরী"তে (সংশোধনালয়) পাঠাতে পারেন। এখানে তাদের লেখাপড়া শেখান হয়। এ ছাড়া ছাঁটকাট, তাঁতের কাজ, আসন গালচে বোনা, লোহার কাজ ইত্যাদি অনেক রকম বিষয়েও শিক্ষা পায়। তার পর দলবদ্ধ হ'য়ে নানা রকম খেলাধূলোর সুযোগও এদের দেওয়া হয়। এ স্থলে ধীরে ধীরে খেলার মধ্য দিয়ে চরিত্রগঠন করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি দোতালা বাড়ীর উপরতালায় এই সব অপরাধী বালকদের রাখা হয়। এটাকে "হাউস অব ডিটেন্‌শন্" (বিচারার্থীর আটক-ঘর) বলে। নীচের তালায় কোর্ট বসে। বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেরা কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী কর্‌তে শেখে। এখান থেকে চলে' যাবার সময় ঠোঙ্গা-বিক্রীত পয়সা তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। যে সময়টা তারা "হাউস অব ডিটেন্‌শনে" আটক থাকে সে সময়টা তাদের যাতে বৃথা না কাটে এই জন্যে কতকগুলি মহিলা সুবিধামত তাদের সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে স্নেহের সম্পর্ক পাতিয়ে কিরূপে তাদের সাহায্য কর্‌তে পারেন তারই চেষ্টা করেন। এই সব ছেলেদের জীবনে স্নেহের ভাগটা যে কত কম তা চট্ করে' ধারণা করা যায় না। এই স্থলে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একটি চুরীর দায়ে অপরাধী বালকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে কোন এক ভদ্রমহিলার চোখে জল দেখা যায়, তাই দেখে বালকটি আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে—"মা, আমি যদি জান্‌তাম আমার ব্যবহার, যার বিরুদ্ধে অন্যায় করেছি সে ছাড়া আর কারু মনে কষ্ট দিতে পারে, তা হ'লে আমি এ কাজ কর্‌তাম না।" সে স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে নি যে সে ভাল হয় কি মন্দ হয় তাতে আর কারু কিছু এসে যায়,—তাকে ভালবাস্‌বার পৃথিবীতে কেউ ছিল না যে! এমন অনেক ছেলে আছে যারা চুরি করা যে অন্যায় তাই বোঝে না। সারাদিন না খেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যদি সে দোকানদারের অসাক্ষাতে এক খাম্‌চা চিনি তুলে মুখে পুরে দিয়ে জল খায় এতে সে কি এমন অন্যায় কাজ করেছে?

কিছুদিন ধরে' এই সব অপরাধী বালকদের দেখে দেখে কতকগুলি জিনিষ চোখে পড়ে। এদের মধ্যে খুব কম ছেলেই বাঙালী হিন্দু। অধিকাংশই পশ্চিমা বা উড়িয়াবাসী। এর একটি কারণ হ'চ্ছে যে এই সব ছেলেরা কাজ পাবার আশায় তদের বাপ বা গ্রামসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কোলকাতায় আসে। যতদিন কাজ খুঁজে না পায় ততদিন তারা বাসায় পোড়ে থাকে। বাপেরা কাজে বেরিয়ে যায়, তাদের আর দেখ্‌বার কেউ থাকে না। তার পর আস্তে আস্তে কুসংসর্গে পোড়ে অবশেষে আদালতের কাঠগোড়ায় এসে হাজির হয়। মায়ের কোল ছেড়ে এসেই এদের এই দশা, তাই সব মায়েদের উপর এদের একটা দাবী আছে। এ ছাড়া কোলকাতায় যদি কোন ছেলে আসে তা হ'লে বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় যে তাদের ঘরে সৎমা এবং মুসলমান ছেলে হ'লে সময় সময় সৎবাপ বর্ত্তমান। এরা যে এই ছেলেদের জন্যে মাথা ঘামায় না তা বলা বাহুল্য। ফলে শীঘ্রই এরা কুপথে চলে' যায়। এদেরও জীবনে স্নেহের অভাব, এবং সব নারীকেই এদের স্নেহ বিতরণ কর্‌তে হবে।

সময় সময় এও দেখা যায় যে বিনা কারণে ছেলেরা চুরি করে। একটি ভদ্রঘরের অবস্থাপন্ন ছেলে নিজের মুখে স্বীকার করে যে পরের জিনিষ দেখ্‌লে সে না নিয়ে থাকতে পারে না। এ সব ক্ষেত্রে শাস্তির চেয়ে চিকিৎসারই বেশী প্রয়োজন।

তার পর দুষ্ট লোকে চুরি করাবার জন্যে যে ছোট ছেলেদের বিদেশ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে আসে সে বিষয়ও কোন সন্দেহ নাই। এই রকম দুটি ছেলের কথা মনে পড়ে, তারা অবশ্য এখন আলিপুর রিফর্মেটরীতে। দুটির মধ্যে যেটি বড় সে শাড়ী ধুতি ইত্যাদি কাঁধে ফেলে বেচ্‌বার জন্যে রাস্তায় হেঁকে বেড়াত, কেউ কিন্‌তে এলে ছোট ছেলেটি নির্ব্বিবাদে তার পকেট কাট্‌ত। এ বিদ্যার হাতে খড়ি হয় তাদের অবশ্য কোন দুষ্ট লোকের কাছে। এই লোকগুলো এমন চালাক যে যখনি তাদের ছোট ছোট অনুচরের ধরা পড়ে তখনি তারা আড্ডা বোদ্‌লে ফেলে; তাই পুলিসের

লোকেরা তাদের চট্ কোরে খুঁজে পায় না। এ জায়গায় ছোট ছেলেদের শাস্তি দিয়ে লাভ কি ?—তাদের দিয়ে যারা রোজগার করায় তাদের ধর্তে পার্লে বরং কাজ হয়।

অনেক সময় এও দেখা গিয়েছে যে ছেলেদের দিয়ে চুরি করাবার জন্যে তাদের কোকেন খাইয়ে নেশা করান হয়। এইরূপ একটি ছেলের করুণ ইতিহাস এ স্থলে অপ্রসঙ্গ হবে না। বেহার অঞ্চল থেকে একটি ছেলেকে কোন দুষ্ট লোক কোলকাতায় ভুলিয়ে আনে। প্রথম প্রথম তাকে খুব আদর-যত্নকরে, তার পর অল্প অল্প কোরে তাকে কোকেন খাওয়াতে শেখায়। যখন ছেলেটির নেশা বেশ পেকে এল, তখন তার কোকেনের মাত্রা বন্ধ করা হ'ল—যদি না সে কিছু চোরাই মাল প্রতিদিন তার মনিবের জন্যে এনে দেয়। নেশার দায়ে কত ভদ্রলোকই চুরি কর্তে পেছোয় না তো এই ছেলে! কোকেন না খেয়ে ১২।১৩ বছরের ছেলে পাগলের মত চীৎকার করে' আছড়ে পড়ছে!...এ দৃশ্য যে কী ভীষণ তা বলা যায় না। সময়ে এদের না রক্ষা কর্লে এরা চোর ডাকাত খুনেদের দল ভারী কর্বে সে আর কি আশ্চর্য্য কথা।

চুরির জন্য যারা আদালতে আসে তাদেরই কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। আর একদল ছেলে আছে যারা প্রতিদিনই হাকিমের সাম্নে এসে দাঁড়ায়,এরা হ'চ্ছে ভিখিরি ছেলের দল, পথের ছেলে। "বেঙ্গল চিল্ড্রেন এক্টসে" এ সব ছেলেদের জন্যে যা ব্যবস্থা আছে তা উপস্থিত অর্থাভাবে কাজে পরিণত করা হয় নি। ভিক্ষা করার জন্যে হাকিম এদের কেবল মুখে শাসন কোরে ছেড়ে দিতে বাধ্য। এতে কোন ফল ত হয়ই না উল্টে আদালতের ভয়টাও বারবার আসার দরুণ কেটে যায়। এদের জন্যে সাধারণ লোকের সাহায্যে যা করা হ'চ্ছে সে বিষয় পরে বল্বার ইচ্ছা রইল।

বালক অপরাধীদের মতন বালিকাদের জন্যে উপস্থিত কোন বন্দোবস্তই নাই। তাদের জন্যে আলাদা "হাউস অব ডিটেন্শন"ও নাই এবং রিফর্ম্মেটরী বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলও নাই। তবে এইরূপ বালিকাদের সংখ্যা খুব কম। তার কারণ যে, মেয়েরা স্বভাবতঃ ছেলেদের চেয়ে ভাল, বা জায়গা নেই বোলে পুলিসের লোকেরা ইচ্ছা করেই ধরে না তা বলা বড় শক্ত। যদি কখনো এ রকম দু' একটি মেয়ে ধরা পড়ে তবে তারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই থাকে। আর যদি তাদের রিফর্ম্মেটরীর মতন কোথাও পাঠাবার দরকার হয় তবে বাধ্য হ'য়ে হাকিমকে "সোসাইটি ফর দি প্রোটেক্শন অব চিলড্রেন ইন ইণ্ডিয়া" (ভারতীয় শিশুসংরক্ষণ সঙ্ঘ), "স্যাল ভেশন আর্ম্মি (মুক্তি-ফৌজ) ইত্যাদির শরণাপন্ন হ'তে হয়। যদি এমন কখনও হয় যে "হাউস অব ডিটেন্শনের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী না থাকে তা হ'লে এ মেয়েদের যে কোথায় রাখা হবে তা ভাব্বার বিষয়।

"ইম্মরাল ট্র্যাফিক এক্ট" বা দুর্নীতিরোধক আইন অনুসারে যে সব মেয়েদের ধরা হয় তাদের অপরাধী বলা যায় না বরং তাদেরই বিরুদ্ধে অন্যে অপরাধ করে, তাই এই রকম বালিকাদের বিষয় এ ক্ষেত্রে কিছু বল্লাম না।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম "চিল্ড্রেন এক্ট" অনুমোদন করা হয়। তার পরে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেষের উল্লিখিত ঐ দুই প্রদেশেই হাকিমের সঙ্গে মহিলারা আদালতে বসেন। বালক-বালিকাদের জন্যে কোন কাজেই নারীকে বাদ দেওয়া চলে না এটা সভ্য জগৎ মেনে নিয়েছে কেবল পুনঃপুনঃ বলা সত্ত্বেও বাঙলা দেশের কর্ত্তৃপক্ষ আজও সে বিষয় নিঃসন্দেহ হ'তে পার্লেন না। এতে আমরা কি বুঝ্ব? বাঙলা দেশ উজাড় কোরেও কি একটি যোগ্য পাত্রী পাওয়া যায় না? না—বাঙলার পুরুষেরা আজও তাঁদের মেয়েদের উপযুক্ত মনে করেন না?

রাস্তার ছেলে

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে কতক ছেলে ভিক্ষা করা বা অন্য কোন সামান্য অপরাধে বালকদের বিচারের জন্যে নির্দ্দিষ্ট আদালতের হাকিমের সাম্নে এসে দাঁড়ায়। ভিখারী ছেলেদের জন্যে সরকার থেকে যা ব্যবস্থা কর্বার কথা আছে তা অর্থাভাবে এখনও কাজে পরিণত কর্তে পারা যায় নি। তাই তারা দিনের পর দিন আদালতে আসে আর ফিরে যায়। হাকিম মুখে একটু শাসন করে' দেন বটে কিন্তু তাতে যে বিশেষ কিছু ফল হয় না তা বেশ বোঝাই যায়।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে এই দলের ছেলেরা আসে বেশীর ভাগ হগ মার্কেট অঞ্চল থেকে। ভোর বেলা পুলিশের লোকে সরকারী পোষাকের পরিবর্ত্তে সাধারণ লোকের বেশে এসে মার্কেটের চারিপাশে টহল দেয়। অলি-গলিতে বিস্তর ছেলে শুয়ে থাকে, এদের অপরাধ হ'ল জনসাধারণের পথ আট্‌কানো অর্থাৎ "ষ্ট্রীট অবষ্ট্রাক্‌শন কেস্।" এইরূপ অনেক রকম অপরাধ আছে যাকে Petty offence বলে। ভিক্ষা চাওয়াও এরই অন্তর্গত। এই স্থলে একটি কথা বলা দরকার। ইংলণ্ডে ভিক্ষুকের দলকে আইন দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু এ দেশে হবার যো নেই কারণ ভিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত। এবং এই কারণেই ভিক্ষা নিতে কারু আত্মসম্মানে ঘা পড়ে না। তাই এই সব ছেলেদের ভিক্ষা বন্ধ করে' কাজে লাগান এত শক্ত। অথচ এদের এম্‌নি ভাবে থাক্‌তে দিলে দেশকে যে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় সেটা বলা বাহুল্য।

এই সবের জন্যেই "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল্‌ অব্‌ ওইমেনের" (বঙ্গীয় মহিলাপরিষদ) "পাব্‌লিক সার্ভিস গ্রুপ" (সাধারণ সেবা-বিভাগ) এই দিকে মনোযোগ দেয়। নানা চিন্তার পর কতকগুলি মহিলা ঠিক কর্‌লেন যে এঁদের প্রথম ভাল করে' চিন্‌তে হবে—তারা কি খায়? কোথায় শোয়? তাদের কেউ আছে কি না? কি কাজ তারা করে? সারাদিন তারা কি কোরে কাটায়? এই সব বিষয় না জান্‌লে তাদের কোন বিষয় সাহায্য করা সম্ভব নয়।

ছোট ছেলেদের চেন্‌বার প্রধান উপায় হ'ল খেলার মধ্যে দিয়ে। তাই একদিন দুপুরে এই মহিলারা ছয়টি এইরূপ রাস্তার ছেলেকে নিয়ে "পিক্‌চার প্যালেসের" পাশের ছোট মাঠটিতে বল খেলা সুরু করে' দেন। এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যে রাস্তায় ভীড় জমে' যাবে সে আর কি আশ্চর্য্য কথা? জ্যৈষ্ঠ মাস, বেলা দুটো, তাতে মানুষের চাপাচাপি, বিড়ির দুর্গন্ধ, পুলিসের আনাগোনা, ব্যাপারটা যে খুব উপভোগ্য তা নয়, তবে যে উদ্দেশ্যে এ কাজে নামা গিয়েছিল তার খানিকটা সুবিধা হয়। প্রতি মঙ্গলবার এই অদ্ভুত খেলা চল্‌ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছয়টির জায়গায় বেশ অনেকগুলি ছেলেই এসে জুট্‌ল। শেষে প্রতিদিন এরা আস্‌তে সুরু কর্‌ল। এক দিন খেলার জন্যে রেখে বাকি দিনে নানা রকম হাতের কাজ শেখান আরম্ভ হ'ল। ঘণ্টা খানেক কাজ কর্‌বার পর তাদের কিছু জলযোগ করতে দেওয়া হ'ত, যাতে এরা বুঝ্‌তে শেখে যে না খাট্‌লে আহার মেলে না—এই উদ্দেশ্যে।

পরে এরাই নিজেরা লেখাপড়া শেখ্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিউ মার্কেট অঞ্চলে যে সব ছেলেরা ঘোরে তারা অধিকাংশই মুসলমান, তাই কর্পোরেশনের সাহায্যে উর্দ্দু শেখাবার জন্যে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া প্রতি শনিবার দুইজন স্কাউট-মাষ্টার এই ছেলেদের নিয়ে খেলাবার জন্যে আসেন। এঁদের জন্যে মহিলাগণ বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের কাছে ঋণী।

রাস্তার ছেলেদের শিক্ষালাভ

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে এই যে, কেন এরা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে? এদের কি দেখ্‌বার কেউ নেই? কারু কারু আত্মীয়স্বজন আছে বটে কিন্তু তারা সেখানে যে কারণেই হোক্‌ সুখে থাকে না, তাই পালিয়ে বেড়ায়। যদি দূর-আত্মীয় হয় তো আর কোন খোঁজ নেয় না, বাপ-মা আপন থাকে তো তদারক চলে বটে তবে গরীব অশিক্ষিত হওয়ার দরুণ কি করে' ঠিকমত অন্বেষণ করতে হয় তা তারা জানে না। সময় সময় রাগের মাথায় ছেলেরা পালিয়ে আসে বটে কিন্তু রাগ পোড়ে গেলে বাড়ী খুঁজে না পেয়ে রাস্তারই হ'য়ে যায়। তারপর অনেক সময় দুষ্টু লোকে বিদেশ থেকে ছেলে ভুলিয়ে

এনে কার্য্যসিদ্ধি হ'য়ে গেলে ছেড়ে দেয় তখন তারা আর কোথায় যাবে? রাস্তাই তাদের আশ্রয়। এই রকম কোরেই রাস্তার ছেলের দল বাড়ে। এরা গিয়ে জোটে কোন না কোন বাজারের কাছে, কারণ সেখানে তাদের খাবার শোবার সুবিধা বেশী। শোবার জন্যে এদের বিশেষ কোন জায়গার দরকার হয় না, কয়েক হাত জমি পেলেই হ'ল। রাস্তাই হোক বা মাঠই হোক্ তাতে কিছু এসে যায় না, শুলেই হ'ল। গায়ের কাপড়খানি ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র তাদের থাকে না। রাখ্‌বার জায়গাই বা কোথায়? তা চকোলেট প্রায়ই দোকানদারেরা ফেলে দেয়, অতএব খাবারের অসুবিধা এদের খুব বেশী নেই।

ভিক্ষার দ্বারা যে এরা নিজেদের অভাব খানিকটা ঘোচায় সেটা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই, এমন কি সুযোগ পেলে এরা যে চুরি-চামারি করে এও ঠিক,তবে কাজ যে এরা একেবারেই করে না তা নয়। যে সব সাহেব-মেমরা থিয়েটার বায়স্কোপে আসেন তাঁদের জন্যে ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে বা গাড়ী আগ্‌লে বেশ দু' পয়সা রোজগার করে, এ

রাস্তার ছেলেরা লেখাপড়া শিখ্‌ছে

ছাড়া পরনের কাপড়েও এদের বিশেষত্ব আছে, কারু কোমরে কেবল মাত্র ময়লা একখানা ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রো জড়ান, কারু বা গায়ে ঝুলছে কোন সাহেবের পরিত্যক্ত সার্ট পা পর্য্যন্ত। সাঁতারের পোষাক, মেমেদের ফ্রক, কিছুই বাদ যায় না। কখনও এমনও দেখা যায় যে তাদের মাথায় রয়েছে সোলার টুপি, পায়ে টেনিস জুতো তিন হাত লম্বা, আর বাকি গা খালি! তার মানে কুড়িয়ে কাড়িয়ে তারা যা পায় তাই পরে, কখনও বা দু' এক পয়সা দিয়ে ছেঁড়া কাপড় কেনে।

আহারটা এদের ভাগ্যে মন্দ জোটে না। মার্কেটের আশে পাশে অনেকগুলি মুসলমান হোটেল ও চায়ের দোকান আছে, এঁটো-কাঁটা বাসী ভাত-তরকারীর ছড়াছড়ি। অনায়াসে অনেকগুলিরই পেট চলে' যায়। এ ছাড়া পচা ফল, শুক্‌নো রুটীর টুক্‌রো, কেকের গুঁড়ো, ছাতাপড়া বিস্কুট ছাড়া দোকানদারদের বাসন-কোসন মেজে দিয়ে, ফাইফরমাস খেটে মন্দ উপায় করে না। টেনিস্ খেলার সময় মাঠে বল কুড়িয়ে দিন তিন-চার আনা এরা অনায়াসেই রোজগার করে, কখন কখন কোন পূজোপার্ব্বণের সময়ে সঙ সেজেও মন্দ হয় না। তারপর গঙ্গায় যাঁরা মানত কোরে পয়সা, ডাব, ফল ইত্যাদি ভাসিয়ে দেন, এই ছেলেরা ডুব দিয়ে সেগুলি কুড়িয়ে নেয়। কখন কখন এরা খিদিরপুরে জাহাজ ঠোলাইয়ের সময় গিয়ে কিছু উপার্জ্জন করে, তবে কোথাও থেকে টানা কাজ কর্‌তে এরা পারে না। এর কারণ হ'চ্ছে যে এরা কোন নিয়মের ধার ধারে না, দিনরাত যা খুসী করে। আপনমনে ঘুরে বেড়িয়ে এদের দিনগুলো জলের মত কেটে যাচ্ছে, কিন্তু এই রকম করেই কি চিরকাল যাবে? জীবনে কোন উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই, কেবল দুষ্ট লোকের হাতের খেলার সামগ্রী! হেন অন্যায় কাজ নেই যা এদের

"সর্দ্দারের" এদের দিয়ে করিয়ে না নেয়। এম্‌নি ভাবেই কি এরা ভেসে যাবে?

এরা যে এখন পড়াশুনো অল্পস্বল্প কর্‌ছে সেটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। এদের উপর কারু কোন জোর নেই তাই এদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবে এইটুকু বলা যায় যে এটা একটা কাজের আরম্ভ মাত্র, অনেক কিছু কর্‌বার আছে এবং কাজটি অগ্রসর হবে খুবই ধীরে ধীরে। বনের ছাড়া-হরিণকে খাঁচায় পোরা তো সহজ ব্যাপার নয়! কিন্তু তবুও এদের ফিরিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে, কারণ এরাই হ'ল ভবিষ্যতের চোর ডাকাত খুনে বদমায়েস। কয়েক ঘণ্টায় সৎসংসর্গে এসে এদের যতটুকু উপকার হয় পুনরায় তাদের দলের লোকের মধ্যে ফিরে গিয়ে সেটা সবই প্রায় নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই এদের রাত্রে বাজার ছেড়ে অন্য কোথাও থাক্‌বার ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে এবং যাতে টানা কাজ কর্‌বার ইচ্ছা এদের মধ্যে আসে, যাতে আত্মসম্মান-বোধ মনে জেগে ওঠে এরও জন্যে চেষ্টা হ'চ্ছে। এরা সাধারণ পিতৃ-মাতৃহীন ছেলে নয় তাই এদের কোন অনাথআশ্রমে দিলে চল্‌বে না, এদের বশ করে' ভুলিয়ে ভালিয়ে তবে বাঁচান যাবে কারণ তারা যে বিপদের মধ্যে আছে তাই তারা বোঝে না। এই জন্যে এদের জন্যে রেঙ্গুন ও কলম্বোতে যেমন "ষ্ট্রীট বয়েস্ ক্লাব" আছে সেই রকম একটা কিছু গোড়ে তুল্‌বার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। এ কাজ একজন দু'জনের নয়, সকলেরই সাহায্য প্রার্থনীয়।

বালুচরে

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

তোমায় আমি রেখে যাব
আমাদের এই বালুচরে।
থেকো তুমি ঘুমিয়ে হেথা
ধানের আঁচল বুকে করে'॥
ঐ পারেতে নামবে বেলা
মেঘে মাখি' রঙের খেলা,
সন্ধ্যারাণী কাঁখের ঘড়া
ভাসিয়ে দেবে জলের 'পরে॥

এই চরেতে থাক্‌বে তুমি
তরুণ ধানের ছায়ায় মিশে',—
ঘুম পাড়াবে চরের হাওয়া
গান বাজায়ে ধানের শীষে;
এখান দিয়ে চল্‌তে চাষী
বাজিয়ে যাবে বাঁশের বাঁশী,
তাহার বুকের সকল ব্যথা
আঁচল পেতে রাখ্‌বে ধরে'॥

গোখুর-ধূলায় আঁচল টেনে
রাখাল ছেলে ফির্‌বে গাঁয়ে,
তোমার বুকের কাছটি দিয়ে
নূপুর-পরা অলস পায়ে;
বাজিয়ে কলস চাষীর ক'নে,
গাঙের ঘাটে সখীর সনে
জল ভরিতে মনে মনে
হয়ত তোমায় যাবেই স্মরে'॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

যতখানি এলাম চারপাশের দৃশ্য বেশ ভাল। সবাই মুগ্ধ হ'য়ে সুখ্যাতি কর্‌লে। কৌতূহলোজ্জ্বল চোখ নিয়ে এত হাসি-গল্প-কষ্টের ভেতরেও সবাই দু'পাশের যতদূর যা-কিছু দেখা যায় তা দেখে নিলে। দৃশ্য দেখে সবাই বল্লে হাঁ এতদূর এভাবে আসা সার্থক হ'ল বটে, দেখ্‌বার মত জায়গা। মাসীও দেখি খুব মুগ্ধ হ'য়ে গেছে; যাকে বলে শতমুখে প্রশংসা—প্রকৃতির প্রশংসা কর্‌তে কর্‌তে বল্লে তার টাকা খরচ করা সার্থক হয়েছে, আনন্দে তার মন ভ'রে উঠেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হ'ল সেই জন্যেই মাসী খোস-মেজাজে দিব্বি গলা ছেড়ে অতগুলি গান চালাতে পেরেছে। মাধু ও গুপ্তও বেশ উপভোগ করেছে। ডাক্তার কিন্তু সে দিন নীরবই ছিলেন। আমার ধারণা, বেচারা শীতে জড়সড় ছিল। পাছে ঠাণ্ডায় অসুখে পড়েন তাই তাঁর জন্য আমারও বেশ ভয় হয়েছিল। তার পর আমার কথা—আমিও সত্যি এ যাত্রাটা উপভোগ করেছি, তবে হয়ত অপরের সঙ্গে আমার একটু তফাৎ ছিল—আমি যতটা এই জল-বাদল মাথায় ক'রে আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে যাত্রাটা উপভোগ করেছি, প্রকৃতির দৃশ্য দেখে ততটা যেন মুগ্ধ হ'তে পারিনি। কেন না, আমি যা দেখ্‌লাম তদপেক্ষা অনেকটা বেশী আশা করেছিলাম। ছোট এক ঝর্‌ণা যদি দেখে, অমনি গাড়ীশুদ্ধ লোক চীৎকার ক'রে ওঠে, "দেখ, দেখ কী চমৎকার!" একটু দূরে ঢিবির মতন সবুজ ঘাসে ঢাকা মাথাউঁচু একটা পাহাড় যদি চোখে পড়ে, অম্‌নি ব'লে ওঠে, "কী সুন্দর দৃশ্য!"এই রকম আর-কি—সবেতেই মুগ্ধতা। মাসী থেকে থেকে বলে, "কীই চমৎকার বিরাট মহান প্রকৃতির দৃশ্য, এমন জীবনে দেখিনি⋯" সে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে প্রকৃতির রূপ দেখে'; বলে—হিংসে হয় এদের প্রকৃতির দান দেখে'। মাঝে মাঝে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করে—কেমন লাগ্‌ল? আমি কখন থাকি চুপ ক'রে', কখনও বলি—ভাল।

শেষে একবার বল্লাম, "মাসী, দেশে ফিরে গিয়ে একবার শিলং দার্জ্জিলিং হরিদ্বার মুসৌরীটা ঘুরে আস্‌বার সময় করে' নিও; তার পর যদি তোমাতে আমাতে দেখা হয় তখন হয়ত তোমার গলায় অন্য সুর শুন্‌ব। স্কটের "লেডী অব্‌ দি লেক" পড়ে' ছুটে এসেছ Lake districts দেখ্‌বে বলে'; প্রকৃতির এই রূপে তুমি মুগ্ধ হয়েছ,—কিন্তু এর তুলনায় আমাদের দেশের প্রকৃতি যে কত সুন্দরী, উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়ে সে খোঁজ রাখ না, আশ্চর্য্য মনে হয়। এ পাহাড়ে কি আছে মাসী? শুধুই ত সবুজ ঘাসে ঘেরা ঝর্‌ণা,তাই বা কী এমনি বিরাট যে স্তব্ধ হ'য়ে যেতে হবে তার রূপ দেখে'। আর আমাদের দেশে যাও শিলংএ। গৌহাটী হ'তে শিলং এই ৮০ মাইল দৌড়ের ভিতর প্রতি ইঙ্গিতে তুমি দেখ্‌তে পাবে প্রকৃতির সুস্থ শ্যামল লালিত্যযুক্ত রূপ। (তখনও আমার সুইজারল্যাণ্ড দেখা হয়নি—সে দৃশ্য বাস্তবিকই অতুলনীয়!) আমাদের সেই শিলংএর যুবতী, রূপবতী, রমণীয় প্রকৃতির কাছে কি এই বিশীর্ণা ক্ষীণ-কায়া বালিকা স্কটল্যাণ্ডের প্রকৃতি?—এ সৌন্দর্য্য মাসী, সাহেবদের চোখেই ভাল—যাদের এর চাইতে বেশী কিছু গর্ব্ব কর্‌বার নেই। প্রকৃতি দু'হাত খুলে', অপর্য্যাপ্ত অজস্র ভাবে তাঁর দান আমাদের দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে, এত সুপ্রতুল জিনিষই আমাদের আছে যে অভিযোগ কর্‌বার কিছু নেই—আমারা কেন এদের এই সামান্য জিনিষ দেখে' হিংসে কর্‌তে যাই—কেন এ কাঙ্গালপনা কর মাসী? আগে আমাদের যা আছে তা দেখে নাও, তখন তুলনা ক'রো। আমাদের দারজিলিং শুধু সবুজ রংএর ঘাসে ঢাকা নয়, অনেক স্থান যেন মখমল-মোড়ান। কত রং বেরংএর

শেওলা (moss) না তার পাহাড়ী গায়ে। এখানে এক সবুজ ছাড়া দ্বিতীয় রং চোখে পড়ে না। বন বল্‌তে যা বোঝায় তা কিছুই নেই। তেমন খুব বড় গোটা কয়েক গাছই ত খানিকটা জায়গা জুড়ে নেই। একত্র জড়াজড়ি করা গুটিকয়েক গাছের জঙ্গলও এত অল্প স্থান জুড়ে' যে দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই ফুরিয়ে যায়। তার পর ঝর্‌ণা—তাই বা এমন কী? এডিনবরা থেকে লোমণ্ড লেকে (Lomand) যাবার পথের ঝর্‌ণার তুলনায় গৌহাটী থেকে শিলং যাবার পথের

বন জঙ্গল ঝর্‌ণা নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যে শিলং সমৃদ্ধিশালিনী হ'লেও লেক লোমণ্ডের মত লেক ওখায় নেই। লোমণ্ড সেদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় লেক—২৪ মাইল লম্বা, কোন কোন স্থানের পরিসর ৬।৭ মাইল। আদুরে মেয়ের মত সবুজ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে তর্ তর্ করে' লোমণ্ড ব'য়ে যাচ্ছে। আমরা এযাত্রা জাহাজে করে' লেকটা বেড়িয়ে নিয়েছি। সম্প্রতি খোকা ও আমার দেবর ভূপেনকে নিয়ে আমি আর একবার লেকটার ধারে ধারে এবং আশে পাশে নানা স্থানে ঘুরে দেখে এসেছি। নিজেদের মোটরকার

লেক্ ক্যাট্রিন—নবতন দৃশ্য

ঝর্‌ণা আরও বড়, আরও বেগবতী। এখানে দু' একটা ঝর্‌ণা একটু বড়—আরগুলি অতি সরু পাহাড়ের গায়ে রূপালি তারের মত ঝির ঝির করে' নাম্‌ছে। প্রকৃতির দানে শিলং অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

মাসী চুপ করে' গেল আমার কথা শুনে'। বল্‌লে—"আমার এ দৃশ্যও কিন্তু বড়ই ভাল লাগে।" আমিও তাতে সায় দিয়ে বল্‌লাম—"আমারও বেশ ভালই লাগ্‌ছে, কিন্তু হিংসে কর্‌বার কিছুই নেই।" মাসী হেসে উঠ্‌ল।

থাকাতে স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত সমস্ত দেখাশুনা ও উপভোগ কর্‌তে পেরেছি। সকাল বেলা ৯টায় বের হ'য়ে রাত্রি ১০টায় ফিরে আসি। দেশে থাক্‌তে ভূস্বর্গ কাশ্মীর অথবা সুপ্রশস্ত লেক আছে এমন কোন স্থান দেখার সৌভাগ্য ও সুবিধা আমার ঘটে নি। সুতরাং ভারতের লেক সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

দেশভ্রমণটা এদেশের শিক্ষার অঙ্গ। এদেশের ছেলে-মেয়েরা ছুটী হ'লেই দলে দলে দেশভ্রমণে বের হ'য়ে পড়ে। নানা দেশ, পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গল, নদনদীর

নৈসর্গিক শোভা দর্শনে চক্ষের তৃপ্তি ও চিত্তের প্রফুল্লতার সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান লাভ হয় তা কেবল মাত্র পুস্তকপাঠে হ'তেই পারে না।

আমাদের দেশ গরীবের দেশ। আমাদের দেশে যাঁরা সমর্থ তাঁদের ছেলে-মেয়েরাও পাঠ্যাবস্থায় কদাচিৎ দেশভ্রমণের সুযোগ পেয়ে থাকে। সুতরাং ভারতের নৈসর্গিক সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান সমস্তই পুস্তকগত। তাই চাক্ষুষ জ্ঞানের অভাবে বিদেশে এসে যা দেখি তাতেই মুগ্ধ হই ও বাহবা দিই। অধিকাংশ এই রকমের শিক্ষিত ছেলেই আসে এদেশে জীবনের উন্নতির জন্য। এদেশে সব বিষয়েই খরচ বেশী। ভারতে দেশ-ভ্রমণে একশত টাকা ব্যয় করে' যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় এখানে পাঁচশত টাকা ব্যয়েও তা হয় না। কিন্তু আমাদের যে ছেলে শিক্ষার জন্যে বিদেশে আসে সে ছেলে কিছুতেই এ খরচটা বন্ধ রাখ্‌তে পারে না—পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে বা দোষে। বল'তো ছুটী হ'লে কি নিয়েই বা ছেলেটি থাকে! যখন সবাই চলে' যায় নূতন কিছু দেখ্‌তে—তখন দেশ ও আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে দিনের পর দিন,বছরের পর বছর কি করে' সে ছেলেটি কাটায় একা বিদেশে! তার শরীর ও মনের খোরাক যোগাবার জন্যই মধ্যে মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন—কাজেই তার পক্ষে আমি এ ব্যয় অপব্যয় বলে' মনে করি না।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের যে ছেলে বিদেশে আসে সে যদি আমাদের দেশের দ্রষ্টব্য স্থান-গুলি যথাসম্ভব কিছু কিছু দেখে আসে তাহ'লে বিদেশের বিশেষ দর্শনীয় স্থান ভিন্ন সে যত্রতত্র গিয়ে বৃথা অর্থব্যয় কর্‌বে না এবং যখন বিদেশীয়েরা যেখানে সেখানে যা-তা দৃশ্য দেখে' বাহবা দিতে থাকবে তখন কথায় কথায় অতি সহজে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌তে পার্‌বে ভারতের বিপুল, মনোহর নৈসর্গিক প্রকৃতির প্রতি।

অর্থহিসাবে দুনিয়ায় আজ আমেরিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাত্‌টা হুজুগপ্রিয়। খেয়ালমত দল বেঁধে যত্রতত্র যেতে এবং জলের মত অর্থব্যয় কর্‌তে ওদের একবারেই আট্‌কায় না। দেশভ্রমণ যেন ওদের একটা নেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বহুসংখ্যক আমেরিকান পর্য্যটকের সঙ্গে আলাপ করে' ভারত সম্বন্ধে ওদের অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে আমি যারপর-নাই আশ্চর্য্য হয়েছি। ওদের অনেকেরই ধারণা ভারতে দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই নেই এবং ভারতে এসে ম্যালেরিয়া ও প্লেগের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া কঠিন। এই অলীক ধারণা অতি সহজে দূর কর্‌তে পারে আমাদের বিদেশস্থ শিক্ষিত ছেলেরা। ভারতের নৈসর্গিক সম্পদ সম্বন্ধে মোটামুটি অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলেই তারা বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে যে সৌন্দর্য্যে, রমণীয়তায় ও বৈচিত্র্যে ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য কত শ্রেষ্ঠ এবং ভারতভ্রমণ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বর্ত্তমানে ভারতে আমেরিকান পর্য্যটকের সংখ্যা বড়ই কম। আমাদের যারা বিদেশে আছে তারা চেষ্টা কর্‌লে এবং বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে কিছু ব্যয় কর্‌লে, আমার বিশ্বাস, বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র আমেরিকান পর্য্যটককে ভারতে আনা যেতে পারে এবং তদ্দ্বারা আর্থিক হিসাবে আমরা লাভবানও হ'তে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই,

চার ঘোড়ার গাড়ী—লেক্ ক্যাট্রিন যাবার পথে

সাহেবী হোটেল প্রায় সবই সাহেবদের সম্পত্তি, সুতরাং লাভের মোটা অংশ তারাই গ্রাস কর্‌বে। একটা কাগজে পড়েছিলাম যে পাঁচ মাসে এক বিলাতেই আমেরিকান টুরিষ্টরা চার কোটী টাকার উপর ব্যয় কর্‌ছে। এখন অনুমান করে' দেখ, আমেরিকানরা দেশভ্রমণে কত কোটী কোটী টাকা ব্যয় করে।

আর একটা কথা বলি শোন। আমি এদেশের যত দেশ ঘুর্‌লাম, যা কিছু দেখ্‌লাম তাতে এই মনে হ'ল, আমাদের দেশের তুলনায় প্রকৃতির দানের চাইতে এদেশের মানুষের তৈরী নকল প্রকৃতি ঢের বেশী সুন্দরী। আমাদের দেশ একে কিন্তু রুচি পাইনি। তাই বলি, এদেশের মানুষের তৈরী জিনিষ চমৎকার, কিন্তু প্রকৃতি ভারী কাঙ্গাল।

যথাসময়ে হোটেলে পৌঁছে আগুন দেখে সবার মনই আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। আমরা ভিজে আস্‌ছি, আগেই সে সংবাদ হোটেলে পৌঁছে গেছে, তাই প্রকাণ্ড আগুন জেলে রেখেছিল। আগুনের চারিদিকে আমরা সব সাদা-কালোয় একসঙ্গে বসে' দাঁড়িয়ে হাত পা গা জুতো মোজা ইত্যাদি শুকোবার ধুম পড়ে' গেল। ঝি এসে সকলের কোট খুলে নিয়ে অন্যত্র গ্যাসে শুকিয়ে আন্‌তে গেল। আহারাদি সেখানেই সম্পন্ন করে' জাহাজে করে' খানিকক্ষণ লেকে

লোমণ্ড লেক্

ত গরীব, তারপর লোকের রুচি নাই,—নিজের বাড়ীটাই খেটে খুটে ছবির মত করে' সাজিয়ে রাখ্‌তে পারে না। এদের মধ্যে যারা সম্পন্ন নয় তারাও সাদা-কালো পাথর এনে ঝিনুক কুড়িয়ে বুনো গাছ সুবিন্যস্ত ভাবে বুনে দিয়ে উঁচু নীচু ঢিবি ঢাবা করে' নকল প্রকৃতি তৈরী করে এমন চমৎকার করে' যে বাস্তবিকই তা প্রশংসনীয়। মাঠের ঘাসগুলিতে জল দিয়ে কল দিয়ে সমান করে' ছেঁটে দিয়ে, গাছের সারি লাগিয়ে, বেড়া করে' সব সমান ও মানানসই ভাবে কেটে দিয়ে এরা বাড়ী মাঠ ঘাট দিয়ে এমন নকল প্রকৃতি তৈরী করে যে তা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়।

আমাদের বাড়ীর ভেতর মাটির উঠান থাক্‌লে তাতে দূর্ব্বা গজিয়ে আগাছায় ভরে' উঠে, তা কেটে ছেঁটে রেখে সবুজ জমী তৈরী কর্‌বার রুচি আমাদের নেই। দেশের বহু ধনীর বাড়ীও দেখেছি—অর্থের প্রাচুর্য্য চোখে পড়েছে, বেড়িয়ে "লেডীস্ ক্যাসল" ও অন্যান্য দর্শনীয় জিনিষ দেখে নিয়ে যেখানে যেমন থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম; তা থেকে গিয়ে পুনরায় এডিনবরা ফিরে আসার কথা হ'ল। ফের্‌বার সময়ও সেই ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা—তবে এবার বৃষ্টি পাইনি বরং মেঘের কোলে লুকোচুরি খেলে ঝিক্‌মিকে রদ্দুর উঠেছিল।

ফেরার পথে ভেবে দেখ্‌লাম অমন খোলা গাড়ী করার উদ্দেশ্যটা ভাল। লোকে গ্রীষ্মকালে যায় ওসব জায়গার দৃশ্য দেখ্‌বে বলে'। তখন প্রায়ই রোদ ছাড়া বৃষ্টি থাকে না—এদেশের রোদ আবার আমাদের দেশের মত তীব্র বা দুরন্ত নয়—রোদে কোন কষ্ট হয় না। তাই চারদিক যাতে ভাল করে' দেখ্‌তে পারা যায় সেই জন্যই অমন চারদিকে-খোলা গাড়ীর ব্যবস্থা।

গ্লাসগো (দ্বিতীয়বার)

লোমণ্ড লেক থেকে ফের্‌বার পথে মাসী কথাপ্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে' বল্‌লে—"আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, দু'দিন আগে এলেই গ্লাসগো ইউনিভারসিটিটা দেখে যেতে পার্‌তাম।" আমি ভেবে দেখ্‌লাম যে, মাসীর ইচ্ছা পূর্ণ করা যেতে পারে যদি আমরা একটু কষ্ট স্বীকার করে' অন্য পথ দিয়ে এডিনবরায় ফিরে যাই। বাঙ্গালীর মেয়ে, একাকিনী এত দূরদেশে এসেছে শিক্ষার উন্নতিকল্পে। আমরা যদি এ সামান্য অসুবিধাটুকু স্বীকার না করি তবে কে কর্‌বে?

ডাক্তারকে বল্‌লাম—"একটু কষ্ট করে' মাসীকে গ্লাসগোটা দেখিয়ে দাও না। ডাক্তার ও গুপ্ত উভয়েই রাজী হলেন। মাসী আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে' সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগ্‌ল। তার ধারণা, আমার জন্যই তার সব জায়গাগুলি অত ভালভাবে অল্প সময়ে অল্প খরচায় দেখা হ'ল। আমরা পাঁচ জনে গাড়ী থেকে নেমে গ্লাসগোর রেল ধরে' তথায় উপস্থিত হলাম।

কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমরা একবার গ্লাসগো দেখে এসেই তোমাদিগকে গ্লাসগো সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখে জানিয়েছি। সমস্ত সহরের ভিতর ইউনিভার্সিটির মত মনোরম স্থান আর একটিও নাই। পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড বিল্ডিং। দক্ষিণে কেলভিন গ্রোভ (Kelvin grove) নামক সুবিস্তৃত পার্কের ভিতর দিয়ে কেলভিন নদী ব'য়ে যাচ্ছে—অতি সুন্দর দৃশ্য। আশ পাশে শিক্ষকদিগের বাড়ী-ঘর, লাইব্রেরী, সাধারণ বিল্ডিং হল (Common Hall), মানমন্দির, প্রাণীবিজ্ঞান বিল্ডিং (Zoology Buildings) প্রভৃতি ইউনিভার্সিটি সংশ্লিষ্ট সমস্তই আমরা দেখে গিয়েছি। বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে মেয়েদের কলেজটিও (Queen Margaret College for women) ইউনিভার-সিটীরই অন্তর্গত। অতি সুন্দর।

ইউনিভার্‌সিটিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রাণী-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, খগোল বিজ্ঞান (Astronomy) প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া এখানকার শিল্পবিদ্যালয় (Technological College) প্রসিদ্ধ। দেশ-দেশান্তর হ'তে ছেলেরা এসে এখানে হাতে-কলমে নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা করে। এখানকার পশুবিদ্যালয়েরও (Veterinery College) খুব সুনাম। আমাদের 'চমু'র দেবর এই কলেজেই পড়্‌ছে।

সহরের মধ্যস্থলেই জর্জ স্কোয়ার। উহার চারদিকে মিউনিসিপ্যাল আপিস, স্বাস্থ্য-বিভাগ, ব্যাঙ্ক, পোষ্টাফিস, এবং অন্যান্য বড় বড় বাড়ী। এসব নিয়ে স্কোয়ারটি অতি সুন্দর দেখায়।

কেলভিন্ গ্রোভ পার্কের মধ্যে কেলভিন্ হল নূতন ক'রে প্রস্তুত হয়েছে—প্রকাণ্ড হল। উহার কাছেই আর্ট গেলারি ও মিউজিয়াম।

এখানকার কেথিড্রেলটিও (Cathedral) দেখ্‌বার জিনিষ। পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত অনেকগুলি স্তম্ভ (Pillars)—মধ্যস্থলে টাওয়ার (Tower)।

এঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ প্রস্তুত ও জাহাজ মেরামতের জন্য গ্লাসগো বিখ্যাত। বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজও এখানে তৈরী হয়।

গত কয়দিন ঘুরে ঘুরে একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম তাই ইউনিভারসিটীর কাছে এসে বল্‌লাম—"আমি বাপু আর পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠ্‌তে পারি না, বাইরে এই রাস্তার ধারে একটু দাঁড়াই, তোমরা মাসীকে দেখিয়ে আন।" মাধুর অবস্থাও প্রায় আমার মতই, সেও বল্‌লে, "দেখা জিনিষ অবার কি দেখ্‌ব—আমিও এখানে থাকি, তোমরা যাও।"

গুপ্ত ও ডাক্তারকে দিয়ে মাসীকে পাঠিয়ে দিলাম সব দেখ্‌বার জন্য ও দুইটি সুটকেস্ নিয়ে আমরা উভয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম রাস্তার একটু নির্জ্জন জায়গাতে।

খানিক বাদে একটি দিশী চেহারা চোখে পড়্‌ল। সে ছেলেটি আমাদের সে অবস্থায় 'দুজন মিলে একাকী' থাক্‌তে দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল! যা'ই হোক্, সে অন্য রাস্তা থেকে মোড় ঘুর্‌লে দেখি সে ছেলেটি আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। শেষে কাছে এসে ইংরেজীতে বল্‌লে সে আমাদের কোন সাহায্য কর্‌তে পারে কি না। আমরাও ইংরাজীতে

ধন্যবাদ দিয়ে বল্‌লাম, "না, আমাদের সঙ্গীরা গেছে ইউনিভারসিটী দেখ্‌তে, আমাদের ও-কাজটা আগেই সারা হ'য়ে গেছে, এই জন্য আমরা বাইরে তাদের অপেক্ষায় আছি।" তারপর বিদেশে দিশী দেখ্‌লে যা হয়—সে কোথা থেকে আস্‌ছে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ জুড়ে দিয়ে জানা গেল—ছেলেটির নাম "তপন গুপ্ত"; ঢাকায় বাড়ী, গ্লাসগোয় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। "জ্ঞান লাহিড়ী"র কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'চমু'র দেবর কিনা জানি না, তবে ছেলেটি বল্‌লে, "জ্ঞান লাহিড়ী" বলে' একটি ছেলে এখানে আছে গত ক' বছর হ'ল, বেশ ছেলে, আজ ক'দিন হ'ল তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।"

তখন আমরা বাঙ্গলার গল্প জুড়ে দিয়েছিলাম মাধু জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনি প্রথমে ইংরাজিতে কথা বল্‌লেন কেন? সাড়ী পরা দেখে তো বোঝা উচিত ছিল আমরা দিশী মেয়ে।"

সে বল্‌লে, "দিশী মেয়ে বুঝেছিলাম বটে তবে বাঙ্গালী কি পাঞ্জাবী তা বুঝিনি।" প্রশ্ন হ'ল—"আমরা ত আপনাকে ডাকিনি, চলে' গিয়ে আবার ফিরে এলেন কেন?"

উত্তর—'দিশী মেয়ে, পুরুষ সঙ্গে নেই, দুটি সুটকেস্‌ নিয়ে এমন সন্ধ্যায় এ যায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখে মনে হ'ল পথ হারিয়ে গেছেন, তাই আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হয়—"

এই রকম আর কি। ছেলেটির সঙ্গে বেশ গল্প করে' খানিকট সময় কাটান গেল। মাসী সহ গুপ্ত ও ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। ছেলেটিকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানান ছাড়া ওঁদের আর কোন কথা হ'ল না, কারণ ট্রেনের সময় হয়েছে, সাম্‌নে যে ট্রামখানা ছিল তাতেই আমরা চড়ে' বস্‌লাম। বিদেশে এসে দিশী ছেলেরা এই রকম ভাবে পরকে সাহায্য কর্‌তে সদাই বেশ প্রস্তুত থাকে, দিশী ছেলের ভেতর এ গুণটুকু লণ্ডনেও বেশ লক্ষ্য করেছি। দেশে নিজের লোককে দেখে যতই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক, বিদেশে বিপদে-আপদে সব ছেলে-মেয়েই সবাইকে সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত থাকে। যথাসময়ে বাষ্পযান আমাদের এডিনবরায় পৌঁছে দিলে।

(ক্রমশঃ)

অগ্রহায়ণে সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লিখিবেন—

বিশ্বকবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাটির ঢেলা

শ্রী হেমলতা দেবী

'পাড়া জুড়ে শাঁখের আওয়াজ,
ঘন ঘন হাঁক,—
দুয়ার জুড়ে দাঁড়িয়ে হোথা
নূতন খোকার বাপ।
বাড়ী জুড়ে দাপাদাপি
করে ছেলের দল,
"নূতন খোকা—নূতন খোকা—
দেখ্‌তে যাবি চল্‌।"

আজ্‌কে ভোরে এল ঘরে
ঐ যে নূতন খোকা,
এক্‌কালে সে মানুষ হবে,—
নাইক লেখা-জোকা,
আন্‌বে কত টাকাকড়ি,
করবে কতই দান,
হাজার গুণে বাড়িয়ে দেবে
পরিবারের মান।

ঠাকুর-মা তার বেরিয়ে এল
হাতে নামের ঝুলি,
উঁকি মারে, "ভাগ্যে মেয়ে
হয় নি"—মুখে বুলি।
"কোন্‌ দেবতার আশিস্‌ রে তুই,
কোন দেবতার বর,
আমার ঘরে ঝাঁপিয়ে এলি
নূতন বংশধর।..."

হায় অদৃষ্ট, হায় মেয়ে তোর
এতই অবহেলা,—
মানুষ হওয়ার নাই কি শক্তি,
শুধুই মাটির ঢেলা!

ভূত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

এরপর কয়েকদিন নিত্যগোপালকে দেখিনি। কোকোজীর বাড়ীতেও সে আস্ত না। কিন্তু নব-পরিচিত অশরীরী বন্ধুটি নিয়েই তখন সকলে এত মেতেছিল যে পুরাতন বন্ধুর শারীরিক অনুপস্থিতিটা কেউ বিশেষ লক্ষ্য কর্‌ল না। কোকোজী একবার কেবল বল্‌ল, "ও একটু বেশীরকম ভয় পেয়েছে। বাঙালীর প্রাণ, কতটুকুই বা! অনেক ফিকির করে' তাকে টিকিয়ে রাখ্‌তে হয়!"

যে বন্ধুত্বের স্থান এতদিন ধরে' এত স্বার্থত্যাগের মূল্য দিয়ে আমরা অধিকার কর্‌তে পারিনি, Walter দুদিনের পরিচয়েই কোকোজীর বাড়ীতে সেই স্থান অবলীলায় অধিকার কর্‌লে। আমারই দ্বিতীয় অস্তিত্বের মতো ছিল Walter, তবু কি-রকম হিংসা হতে লাগ্‌ল। বেচারা নিত্যগোপাল, তার ত ব্যাপারটা ভালো লাগ্‌বেই না। এরপর রাত্রিতে কোকোজীর বাড়ীতেই আমাকে আহারও কর্‌তে হত, আহারের পর বহু রাত অবধি এক ঘরে কোকোজী Roggieকে নিয়ে বিয়ার খেতে খেতে গল্প কর্‌ত, আর-এক ঘরে Phyllis Walterকে নিয়ে গল্প কর্‌তেন। সান্ধ্য মজ্‌লিস্ থেকে আমি ক্রমে ক্রমে বাদই পড়ে' যেতে লাগ্‌লাম। Walter বিদায় নিয়ে গেলে আমিও বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌তাম। যেদিন খুব বেশী ক্লান্তি বোধ হত সেদিন কোকোজীর বাড়ীতেই একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তখনকার আমার ছোটখাট নানা অভাব অসুবিধা খুঁটিয়ে জান্‌বার জন্যে, আমাকে যতটা সম্ভব আরাম দেবার জন্যে, Phyllisএর সে কি ব্যগ্রতা দেখ্‌তাম। সেইটুকু পুরস্কার ত আমার ছিলই, কিন্তু তাঁকে যে খুসি দেখ্‌তাম, তাঁর নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে তাঁকে যে একজন বন্ধু আমি জুটিয়ে দিতে পেরেছিলাম, সেইটেই ছিল আমার আসল পুরস্কার।

কোকোজী একদিন বল্‌লে, "আজকে তোমরা আলো নিবিয়ে বসেছিলে?"

Phyllis বল্‌লেন, "হাঁ। Walter বল্‌ছে, সে আমাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে, তার জন্যে আমাদের মন খুব একাগ্র কর্‌বার দর্‌কার আছে। আলো জ্বালা থাক্‌লে একাগ্রতার বাধা হয়।"

কোকোজী বল্‌লে, "একেবারে এতটা আশা নেই বা কর্‌লে। কোনো বিষয়েই অসংযম ভালো নয়।"

Phyllis মাথা নীচু করে' রইলেন। ওঁর নীরব বেদনাটি আমার অন্তরকে স্পর্শ কর্‌ল। আমি বল্‌লাম, "ওঁর কিছুমাত্র অসংযম আমি ত দেখিনি। কিন্তু যে কারণে উনি আত্মিক ক্ষমতা অর্জ্জন কর্‌তে চান বলে' আমার মনে হয় তার জন্যে তাড়াতাড়ি করা দরকার আছে।"

কোকোজী বল্‌লে, "সে কারণটা কি, শুনি?"

তাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বল্‌লাম, "আজকেই Walterকে সেকথা উনি বল্‌ছিলেন। জান্‌তে চাচ্ছিলেন, Faith cure কর্‌বার ক্ষমতা অর্জ্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না।"

কোকোজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌ল, তারপর গলার সুর নামিয়ে বল্‌ল, "তুমিও কি সত্যিই মনে কর, তোমার এই বুজ্‌রুকিগুলিকে আমি বিশ্বাস করি?"

কোকোজীর কোনো কথা আমরা গায়ে মাখ্‌তাম না তা আগেই বলেছি। বল্‌লাম, "তোমার মনে হয় বুজ্‌রুকি?"

কোকোজী বল্‌লে, "আমার কি মনে হয় না-হয় তাতে কিছু যায় আসে না, জিনিসটা যা তাইই।"

আমি বল্‌লাম, "তুমি যদি বল তাহলে আর না হয় আমরা বস্‌ব না।"

সে বল্লে, "কেউ যদি বোকামী করে' আনন্দ পায় তাতে আমি কেন বাধা দিতে যাব? কিন্তু আমার কথাটা না ভাব্লেও তোমাদের চলে, আমি বেশ আছি, Faith cureএর ব্যবস্থা আমার জন্যে না করলেও আমি এর চেয়ে কিছু খারাপ থাক্‌ব না।"

তার কথাতেই তাকে ভালো করে' লক্ষ্য করে' আমি বুঝতে পারলাম সত্যিই সে যে বেশ নেই। এই ক'দিনেই তার চেহারা কত বেশী যে খারাপ হয়ে গিয়েছে, গলার নীচের হাড়গুলি ভেসে উঠেছে, গলার আর সেই হাড়ের মাঝখানে দুদিকে বড় বড় দুটি গর্ত্ত, সেখানে তাকিয়ে রক্ত-গতির স্পন্দনকে শোনা যায়। সারাক্ষণই প্রায় সে কাশ্‌ছে, কথা বল্‌তে সুরু করে' কতবার সে কথা শেষ কর্‌তে শুদ্ধ পার্‌ছে না। বল্লাম, "Walter এসে অবধি তোমার একটু অসুবিধা হয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, Phyllisএর উচিত তাঁর অখণ্ড অবসর এখন তোমার সেবাতে নিযুক্ত করা।"

সে বল্লে, "আমার সেবা? হায়! সেবা নিয়ে আমার কি লাভ হবে শুনি?"

আমি বল্লাম, "তুমি ভাব্‌ছ তুমি সেরে উঠ্‌বে না? কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয় সার্‌বে, তুমি দেখো। তোমার সত্যিই একটু ভালোরকম সেবা হওয়া এখন দরকার।"

সে বল্লে, "ঢের হয়েছে, রাখো। আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করবার কিছু দরকার ত নেই। তোমার Spirit বন্ধুদের ডেকে এনেও তাদের দিয়ে ঐ মিথ্যা কথাটা বলাচ্ছ। অকারণে এই পাপের বোঝা কেন ঘাড়ে কর্‌ছ? আমরা বৌদ্ধ, জানো ত, মৃত্যুটাকে আমরা বিশেষ কিছু মনে করি না, মৃত্যু আমাদের উৎসবের জিনিস। তোমার কি ধারণা আমি নিত্যগোপালের মতো মর্‌বার ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছি?"

আমি বল্লাম, "তা হওনি আমি জানি। কিন্তু মরতে তোমার ইচ্ছে করে? Phyllisএর কথা তুমি ভাবো না?"

সে একটুক্ষণ চুপ করে' রইল। বুঝ্‌লাম না, কথাটা তার মনকে কোথায় গিয়ে স্পর্শ কর্‌ল। বল্লে, "ভেবে কিছু লাভ যদি থাক্‌ত ত ভাব্‌তাম। তাছাড়া আর ভাব্‌বার আছে কি? এমন ব্যাপার পৃথিবীতে এই প্রথম ঘট্‌ছে না। যে দুর্ভাগ্য পৃথিবীর অন্য কেউ বহন কর্‌তে পেরেছে, Phyllisও তা পার্‌বে, এ বিশ্বাস আমার মনে আছে।" বলে' দুরন্ত Phyllisএর দিকে সে একবার ফিরে তাকাল। তার সেই চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তার মনে Phyllisএর আসন যে কোন্‌খানে, চিরদিনের জন্যে Phyllisকে ছেড়ে যাওয়া যে তার কতখানি ছেড়ে যাওয়া, সেইদিন তা আমি বুঝ্‌লাম। আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

আমার কাঁধে জ্বরতপ্ত একটি হাত রেখে কোকোজী বল্লে, "তুমি কাঁদ্‌ছ? ছি ছি, তুমি পুরুষ না? যে অদৃষ্ট বিরূপ, যার মধ্যে এতখানি নিষ্ঠুরতা, তার কাছে এমনভাবে কখনো হার মান্‌তে হয়? আমরা এক কেবল নিজের মাথা উঁচু রাখ্‌তে পারি, তা ছাড়া আর আমাদের কর্‌বার আছে কি? সেটুকু কর্‌তে কেন ছাড়ব? কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে শত্রু হাসাতে তোমার ইচ্ছে করে? ছিঃ!"

তার একটি হাতকে নীরবে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আমি শুধু অবিরল ধারে অশ্রু মোচন কর্‌তে লাগ্‌লাম। সে এরপর আর কিছু আমায় বল্লে না। সে রাতটাও কোকোজীর বাড়ীতেই আমার কাট্‌ল। Reggieও বাড়ী গেল না। কোকোজী সেদিন সমস্ত রাত জেগে বসে' বিয়ার্ খেল, আমাদেরও জাগিয়ে রাখ্‌ল। গ্রামোফোন্ বাজিয়ে চারজনে আমরা নাচ্‌লাম, মাঝে মাঝে Phyllis একলা নাচ্‌লেন। হাসি-গান-গল্প-গুজবে ঘরের বাতাস উৎসব-মাদকতায় পূর্ণ হয়ে রইল। সে উৎসবের শেষ যেন নেই, মৃত্যু যেন নেই, কান্না যেন নেই।

কিন্তু মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সুরু হয়ে গেল ঠিক তার পর দিনই। পথে বেরিয়ে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড। দলে দলে বর্ম্মারা দা, শাবল, কুড়ুল যে যা পেয়েছে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে আর যেখানে অন্ধ্রদেশীয় কুলীদের দেখ্‌ছে ধরে' ধরে' সাবাড় করে দিচ্ছে। ঘরবাড়ী জ্বালাচ্ছে, দোকানপাট লুট কর্‌ছে। একেবারে নাদির-শার যুগের দিল্লীর অবস্থা। বাড়ী ফির্‌তে পাঁচ মিনিট লাগ্‌ল, তার মধ্যে দুটো মানুষকে চোখের ওপর খুন হতে দেখ্‌লাম।

কিছুদিন ধরে' অন্ধ্রদেশীয় জাহাজী কুলীদের ধর্ম্মঘট চল্‌ছিল। সেদিনই কর্ত্তাদের সঙ্গে মিটমাট করে তারা কাজে ফির্‌ছিল। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ যে একটা ছিল তাদের কথা কেউ ভেবে দেখেনি। জোর করে' নিজেদের কথা তারা এখন ভাবাচ্ছে।

ধর্ম্মঘটের দিনগুলি বর্ম্মী কুলী আমদানী করে' কাজ চালানো হচ্ছিল। তাতে কাজের অসুবিধা হ'চ্ছিল বটে, কিন্তু অন্ধ্রদেশীয়দের কাজে ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজ ছুটে যাওয়ায় বর্ম্মাকুলীদের অসুবিধাটা হলো সম্ভবতঃ তার চেয়ে বেশী। কিন্তু তারা বিদ্রোহ করলে কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে নয়, তাতে আরও বেশী অসুবিধা ঘট্‌বার সম্ভাবনা ছিল, তারা বিদ্রোহ করলে অন্ধ্রকুলীদের বিরুদ্ধে। কর্ত্তারা রক্তারক্তি থামাতে সাহায্য করছেন ভেবে অধিকাংশ অন্ধ্রকুলীকে জাহাজঘাটে মালগুদামে জাগাজে পণ্ট্‌নে আটক করলেন। তাতে বর্ম্মাদের সাক্ষাৎ সমরের সুবিধা বেশী হলো না, কিন্তু অন্ধ্রকুলীদের স্ত্রীরা ছিল, মা-বোনরা ছিল, ছেলেমেয়েরা ছিল, শিশুরা ছিল, কাজেই তাদের কচুকাটা করে তারা দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে লাগল। কিন্তু কোনটা যে দুধ কোনটা যে ঘোল তা নিয়েও বেশ একটুখানি গোল ছিল কেননা অন্ধ্রকুলী বাইরে যারা ছিল তারা জোট বেঁধে পথে পথে ঘুরেও আততায়ী বর্ম্মাদের দেখা বিশেষ কোথাও পেল না।

সমস্ত দিন নৃশংস ধ্বংসলীলা চলল। গরীব অন্ধ্রদের ৫০০ রিক্‌শ চুরমার হলো, তাদের ঘরবাড়ী জ্বলল, গলিতে গলিতে পরিবার-শুদ্ধ কাটা গেল, বর্ম্মার বাঙালী, বর্ম্মার গুজরাটি, বর্ম্মার মাড়োয়ারী, বর্ম্মার মান্দ্রাজী, বর্ম্মার হিন্দুস্থানী, শিখ, হিন্দু, মুসলমান, কেউ টুঁ শব্দটি করল না। অন্ধ্ররা ভাবতে আরম্ভ করলে তাদের দেশটা সাতসত্যিই ভারতবর্ষের অন্তর্গত কি না। তাদের স্ত্রী-মা-বোনরা ভারতবর্ষের নারী কি না, তাদের শিশুরা ভারতবর্ষের শিশু কি না। অন্ধ্রদেশীয় স্ত্রীলোক এবং শিশুদের আততায়ীর নৃশংস হত্যা থেকে বাঁচাবার জন্যে অন্ধ্র ভারতীয়রা কেউ দাঁড়াবে এত বড় দুরাশাকে তারা হয়ত কখনো মনে স্থান দিয়েছিল। মানুষের মন ত?

সন্ধ্যাবেলা কোকোজীকে বলাতে সে বলল, "আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সমাধানে কোনো পাপ পাপ নয়। ব্রহ্মদেশ ত ইংরেজরা নামে মাত্র অধিকার করেছে, ব্রহ্মদেশ আসলে অধিকার করেছ তোমরা। তারা নিয়েছে আমাদের রত্নখনি, আমাদের forests, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য, সে তারা না নিলেও হয়ত পড়েই থাকত; তোমরা আমাদের দেশের গরীবদের একেবারে মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছ। চাকরী বাকরীগুলি নিচ্ছ তোমরা, ওকালতী ডাক্তারী তোমরা করছ, দোকান-পাট হাট-বাজার তোমাদের দখলে, কুলী মজুর খালাসী খানসামা সব তোমরা। কুসীদজীবী-চেট্টিদের কল্যাণে দেশের জমিজমাও তোমাদের হাতে যাচ্ছে। চাস-বাসও তোমরা সুরু করে দিয়েছ। এমন-কি আমাদের দেশের বিবাহযোগ্য মেয়েগুলিকেও তোমরা নিচ্ছ। এভাবে আর পঁচিশ বছর চললে ব্রহ্মদেশে বর্ম্মাদের অস্তিত্ব শুদ্ধ থাকবে না। এ অবস্থাটার প্রতিকার হওয়া দরকার নয়?"

আমি বললাম, "প্রতিকারটা কি নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিয়ে হবে?"

কোকোজী বললে, "দোষী নির্দ্দোষীর ব্যক্তিগত ভাবে বিচার এক্ষেত্রে চলবে না। এটা জাতিতে জাতিতে লড়াই, যতদিন এ লড়াই চলবে ভারতীয় মাত্রকেই আমরা শত্রু মনে করতে বাধ্য।"

আমি বললাম, "তাতে তোমাদের কিছু লাভ হবে?"

সে বললে, "অন্ততঃ আমরা ভাবছি যে হবে। তোমাদের মধ্যে নিত্যগোপালের মতো মানুষের অভাব নেই, তারা অন্ততঃ দেশ ছেড়ে যাবে ত? একজনও যদি যায়, একটি শত্রু কমবে।"

আমি বললাম, "একজন নয়, ধর সমস্ত ভারতীয়রাই যদি তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যায়, তারপর তোমাদের দেশ টিকবে? কোনোকিছুতেই ত ভারতীয়দের সাহায্য না হলে তোমদের চলে না"

কোকোজী বললে, "ইংরেজদের শাসনে দেড়শো বছর থেকে তোমাদের এই একটা লাভ হয়েছে দেখছি যে তাদের মনোবৃত্ত কতক তোমরা লাভ করেছ। তাহলে তোমাদের দেশে ইংরেজরা দোষ করেছে কি? ঠিক এই কথাটাই ত তাদের বেলায় তোমাদের দেশ সম্পর্কে খাটে। তাদের সঙ্গে তা নিয়ে তাহলে এমন বিষম তর্ক কর কেন?"

আর তর্ক করব না মনে করে চুপ করলাম, কিন্তু কোকোজী বলতে লাগল, "ইংরেজরা যত দোষেই দোষী হোক, তারা অন্ততঃ তোমাদের দেশে একটি আধুনিক কালচার, একটা উন্নততর চরিত্রের আদর্শ, একটা এক-জাতীয়ত্বের বোধ নিয়ে এসেছে, অন্য জিনিষগুলির কথা না-হয় নাই ধরলাম। কিন্তু তোমরা আমাদের দেশে কি নিয়ে এসেছ? আমাদের খাচ্ছ, তার পরিবর্ত্তে আমাদের দিচ্ছ কি? তোমাদের সংস্পর্শে এসে আমাদের চরিত্রের কিছু উন্নতি হয়েছে বা হবার উপায় কিছু আছে? তোমাদের, বিশেষ করে বাংলা দেশের, cultural renaissanceএর কথা খুব ত বলো, কেউ আজ অবধি চেষ্টা করেছ ব্রহ্মদেশীয়-দের তার কথা বুঝিয়ে বলতে, বা তাদের মধ্যে সে culture-এর প্রতি অনুরাগী মানুষ সৃষ্টি করতে? চেষ্টা করার কথা ছেড়ে দাও, ওসব দিক দিয়ে আমাদের প্রতি যে তোমাদের কোনো কর্ত্তব্য আছে সে-কথা কেউ ভাবো? আমি জানি তুমি দেশে ফিরে গিয়ে কি বলবে। তুমি বলবে, ব্রহ্মদেশ-বাসীরা রক্তলোলুপ বর্ব্বরের জাত। কিন্তু একথা তোমাদের মনে হবে না, এই রক্তলোলুপ বর্ব্বরেরা বহু বৎসর ধরে তোমাদের বহু লক্ষ লোককে পরমাত্মীয়ের মতো পোষণ করেছে। একথা তোমাদের মনে হবে না, তোমাদের মধ্যে বহু সহস্র সু-সভ্য ভারতীয় এদের নারীদের পাণিপীড়ন করে বহু সন্তানের দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নির্ব্বিকল্প মন নিয়ে তাদের ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন। একথা তোমরা ভাববে না, তোমাদের দেশের মূর্খেরা এদেশে এসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছে, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়দের উপকারের জন্যে পরিচালিত ভারতীয়দের একটিও প্রতিষ্ঠান এদেশে নেই। ইংরেজরা অন্ততঃ দেখতেও ত ভালো, এই সুন্দর ব্রহ্মদেশে তোমরা নেংটিপরা কালার দল ক্রিমি-কীটের মতো এসে পড়েছ। এতদিন যে তোমাদের আমরা সহ্য করেছি, সেই ত আশ্চর্য্য। সভ্য পৃথিবী এখনো শারীর বলের প্রাধান্যকে স্বীকার করে, সে হিসাবে ইংরেজকে এদেশের রাজা বলে' আমরা মানি, যেমন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তোমরাও মানো, কিন্তু তোমাদের কি বলে' মানব? তোমরা কে?"

সেদিন আর seanceএর বৈঠক বসল না, অন্ধকার হবার আগেই বাড়ী ফিরলাম; বাড়ী এসে কোকোজীর কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, সত্যিই সভ্য কারা? যারা অত্যাচরিত হয়ে অত্যাচার করে, না যারা নিজের স্বদেশ-বাসী নারীদের এবং শিশুদের অবর্ণনীয় নির্য্যাতন চোখে দেখেও প্রতিকারের চেষ্টায় অঙ্গুলি হেলায় না?

পরের দিন গোলমাল আরও বেড়েই গেল দেখে' বিকালে কোকোজীর বাড়ী আর গেলাম না। বাড়ীতে আমার ছোট দুটি ভাই ছিল, দুজন কুরুঙ্গি চাকর ছিল, সকলে মিলে আততায়ীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার নানা আয়োজন করতে উঠে-পড়ে লাগলাম। উপরে বারান্দায় রাশিরাশি ইঁট এনে জড়ো করা হলো। বাড়ীতে লোহা যা ছিল সব দিয়ে নানা বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করা হলো। সমস্ত দিন বাড়ীর আশেপাশে খুন-জখম লুট-তরাজ চলল, ঘরবাড়ী পড়ল, কিন্তু আমাদের কোনোই বিপদ ঘটল না। তবু কতকটা ভয়ে ভয়েই ঘুমোতে গেলাম। শোবার আগে বাড়ীর সমস্ত দরজা-জানালা ভালো করে হুড়কো এঁটে বন্ধ করতে ভুললাম না।

ভোর হতেই শুনলাম বাড়ীর নীচের রাস্তায় তুমুল কোলাহল, বহুকণ্ঠের সমবেত চীৎকার ও গালাগালি। তাড়াতাড়ি বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দেখি, হিন্দু-স্থানী, কুরুঙ্গি ও চুলিয়াদের এক উত্তেজিত জনতা আমাদেরই সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে। কি ব্যাপার, না তারা এক বর্ম্মী ডাকাতকে তাড়া করেছিল, সে এই বাড়ীরই সিঁড়ি উঠে কোথাও লুকিয়েছে। তাড়াতাড়ি ভাইদের ডাকলাম, কুরুঙ্গি চাকর দুজন এল, নিজেদের উদ্ভাবিত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ির দরজা খুলতেই পলাতক বর্ম্মী ডাকাতটিকে দেখতে পেলাম। দুতলা থেকে তেতলায় উঠবার সিঁড়ির landingএর উপরে মাচার মতো খানিকটা জায়গা ছিল, দেখলাম সেইখানে একটা রেলিংএর কাঠ ধরে' সে বাদুড়-ঝোলার মতো করে' ঝুলছে। কুরুঙ্গি চাকররা তাদের বর্শা উঁচিয়ে মার-মার করে' উঠতেই লোকটা ঝুপ করে' আমাদের চারজনের মাঝখানে এসে পড়ল। চুলের মুঠি ধরে' উঠিয়ে দেখি—নিত্যগোপাল।

বেচারা বর্ম্মাপাড়ায় গলির মধ্যে বাস করত। এই কদিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে আজ রাত থাকতে এক

বর্ম্মী প্রতিবেশীর পোষাক ধার করে' পালিয়ে আমার কাছে আস্‌ছিল। পথে এই বিপত্তি। তাকে গুড়ি মেরে মেরে পালাতে দেখে' হিন্দুস্থানী ও কুরুঙ্গির দল তাকে ডাকাত বলে' সহজেই সিদ্ধান্ত করেছে এবং এই অবধি সমস্তটা রাস্তা ধাওয়া করে নিয়ে এসেছে। প্রাণ নিয়ে যে সে আস্‌তে পেয়েছে এই ঢের।

আমি বল্‌লাম. "তা তুমি বর্ম্মী পোষাক পর্‌তে গেলে কেন? বাঙালীদের ত কোনো পক্ষেরই কেউ কিছু বল্‌ছে না, নিজের পোষাকে এ্লেই পার্‌তে?"

সে বল্‌লে, "আমি ভেবেছিলাম, বর্ম্মী পোষাকই বেশী safe হবে—"

ভাইদের একজন বল্‌লে, "ভালোই ভেবেছিলেন। বর্ম্মী গুণ্ডাদের রাজত্ব কাল রাত্রের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ সারা রেঙ্গুনে কোথাও রাস্তায় একটা বর্ম্মী দেখবার জো নেই। দেখ্‌ছেন না, হিন্দুস্থানীরা আর চুলিয়ারা কুরুঙ্গিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?"

বেচারা নিত্যগোপাল! এত খবর তার জান্‌বার কথা নয়। আমরা তার অবস্থা দেখে' হাস্‌ব না কাঁদ্‌ব ভেবে ঠিক কর্‌তে পারিনে।

বল্‌লাম, "এই নাও ধুতি, এই নাও জামা। কাপড় বদ্‌লে চা-টা খেয়ে বাড়ী ফিরে যাও। বর্ম্মারা আর উৎপাত কর্‌বে না।" সত্যিই পথে কোথাও বর্ম্মী দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভারতবর্ষের অন্ততঃ দুটো প্রদেশের লোকও যে কুরুঙ্গিদের বিপদ্‌কে নিজেদের বিপদ্ মনে করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সেই গর্ব্বেই আমার বুক স্ফীত হয়ে উঠ্‌ল। তার ওপর চুলিয়ারা বর্ম্মাদের চেয়েও বেশী রক্তলোলুপ, বর্ম্মাদের ভয় হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

নিত্যগোপাল কাপড় বদলাল, চা-টাও খেল, কিন্তু বাড়ী ফিরে গেল না। বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে কটা দিন আমায় থাক্‌তে দাও।"

আমি বল্‌লাম, "থাক্‌তে দিতে আমার অসুবিধা কিছু নেই, কিন্তু থাক্‌তে আমি দেব না। পুরুষমানুষের এত ভয় পাওয়া উচিত নয়, এ ভয়কে প্রশ্রয় দিতে আমি চাই না।"

সে বল্‌লে, "নিজের জন্যে ভয় আমি পাচ্ছি না, কিন্তু আমার মা বেঁচে আছেন জানো ত? গেল বছর দাদা মারা গেছেন, ছোট ভাই একটি ছিল—সে গেছে, দুজন দিদি ছিলেন—তাঁরা ঢের আগেই গেছেন, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। আমি ভাব্‌ছি তাঁর জন্যে। যদিই কিছু হয়—"

এর উপর আর কথা চলে না। সুতরাং তার আমার সঙ্গে থাকাই স্থির হয়ে গেল। সকাল-সকাল তাকে স্নানাহার করালাম। হাঙ্গামার ক'দিন আফিস বন্ধ থাক্‌বে, কাজে যাবার তাড়া ছিল না, দুপুরে তাকে নিয়ে কোকোজীর বাড়ী যেতে চাইলাম, সে কিছুতেই রাজি হলো না। বিশ্রামের অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল, সমস্ত দিনটাই ঘুমোল। সন্ধ্যাতেও কোকোজীর বাড়ী সে আমায় যেতে দিতে চাইল না, বল্‌লে, "বর্ম্মী ত, কখন ওদের মেজাজ কিরকম হয় বলা যায় না, যাক্‌না দুদিন?"

কথাটাকে আমি হেসেই উড়িয়ে দিলাম দেখে' বল্‌লে, "বাড়ীতেও ত বিপদ্ আপদ্ কিছু ঘট্‌তে পারে? তোমার ছোট ভাই দুটি রয়েছে, বাড়ী ছেড়ে এসময়টা তোমার যাওয়া উচিত নয়।"

আমি বল্‌লাম, "তারা আমার ছোটভাই হলেও দুজনেই full grown মানুষ, কুরুঙ্গি চাকর দুটোও দর্‌কার হলে প্রাণ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, তার ওপর তুমি রইলে। আমার অভাবে কিছু অসুবিধা হবে না।"

কিন্তু সে কিছুতেই আমায় ছেড়ে দিলে না। বল্‌লে, "কোকোজী যেমন তোমার বন্ধু, আমিও ত বন্ধু, একদিন না-হয় আমার কাছেই রইলে? দুজনে বেশ গল্পসল্প করে' সময় কাটানো যাবে। তার বাড়ীতে ত রোজই যাচ্ছ, আমার সঙ্গে পনেরো দিন তোমার দেখাই হয়নি।"

যদিও বুঝ্‌লাম শুদ্ধমাত্র আমার সঙ্গসুখ লাভ কর্‌বার জন্যে তার এ আগ্রহ মোটেই নয়, তবু থেকেই গেলাম। কোকোজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময়কার তার ব্যবহারের রূঢ়তায় মনটাও কোথায় যেন একটু তিক্ত হয়ে ছিল। ভাব্‌লাম, দুএকদিন একটু দূরে থেকেই না-হয় দেখা যাক্, তার ফলে তার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন কিছু ঘটে কি না। রাত্রে বাইরের ঘরে নিত্যগোপালের শোবার ব্যবস্থা হলো। ভেতরের একটা ঘরে শুতাম আমি, আর একটা ঘরে শুত আমার ভায়েরা। অনেক রাত অবধি আমার সঙ্গে গল্প করে' নিত্যগোপাল শুতে গেল।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদিকার জল্পনা

দেশভক্ত

দেশের সহস্র নরনারী আজ দেশের কাজ কর্‌বার জন্য উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। দেশের পক্ষে এটি যে মহা সৌভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সৌভাগ্য-দীপ্তির অন্তরালে যে দুর্ভাগ্যের একটি কলঙ্কলিপ্ত মলিন রেখা টানা হয়েছে, সেটি সকলে মিলে' দু'হাত দিয়ে মুছে' না ফেল্‌লে এই দীপ্তি দেশের মাটি থেকে ঊর্দ্ধে উঠে' আকাশপথে আলোক বিকীর্ণ করে' পৃথিবীর সামনে দেশকে তুলে' ধর্‌তে পার্‌বে না। বিরোধ-বিচ্ছেদের দ্বারা দেশের প্রাণকে, শক্তিকে, আত্মাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ? যাঁরা শক্তিশালী তাঁরাই যদি বিরোধে ব্যাপৃত থাকেন তবে দেশ বাঁচায় কে? কবিতায় আছে—

"মজ্জাগত দুর্ব্বলতা আছে আমাদের
মিলিতে পারি না মোরা, লক্ষ প্রমাদের
করিতে পারি না শেষ। তাই নিত্য ভয়
জীবনে জড়ায়ে থাকে,—দুর্ভাগ্য সঞ্চয়
করি তাই প্রতি পদে,—শত লক্ষ প্রাণ
জীবিত থাকিতে মোরা তাই ম্রিয়মান।"

দেশের ইতিহাসে নিজের নামটি অমর করে' রেখে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে, পৃথিবীর ইতিহাসে দেশের নামটি অমর করে' রেখে যাওয়ার ইচ্ছা কি প্রকৃত দেশভক্তের প্রাণের কথা নয়?

"চোখের 'পরে জেগে থাকুক্ দেশ,—
ঘুচুক্ দ্বন্দ্ব, ঘুচুক্ ধন্দ,
ঘুচুক্ বন্ধ-ক্লেশ।"

* * *

মহানারী

প্রসঙ্গচ্ছলে একদিন একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক বল্‌লেন, নারী যদি শ্রেষ্ঠ মানবত্ব লাভ করেন, তবে নারী, নারী না থেকে পুরুষ হ'য়ে যান। কথাটা কানে কেমন ঠেক্‌ল—নারী আবার কেমন করে' পুরুষ হ'য়ে যাবেন? লোকে কথাটা শুনে হাস্‌বে যে! উত্তরে তিনি বল্‌লেন—যিনি আত্মার আলোকে চলেন, বলেন, কাজ করেন, তিনি নর ও নারী এই উভয় সংজ্ঞার ঊর্দ্ধে উঠে' যান।—তখন তাঁকে পুরুষ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?—যেমন মহাপুরুষ।

বেশ ত। শ্রেষ্ঠ মানবীকে না হয় মহানারী বল্‌লে হবে—শোনা মাত্র লোকে তা'হলে বুঝতে পার্‌বে, কাকে বল্‌ছে ও কি বল্‌ছে।

উত্তর—তা মন্দ হয় না বটে, এখন থেকে ঐ সকল নারীরা তা'হ'লে মহানারী নামেই অভিহিতা হোন!

* * *

বাঙালীর সুকীর্ত্তি

সম্প্রতি এক বাঙালী ভদ্রসন্তান দুর্ব্বল শরীর নিয়ে সমুদ্র-যাত্রা করেছিলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার মাঝ-পথে একদিন রাত্রে ডিনারের পর তাঁর কেবিনে গিয়ে শোন। রাত্রির মধ্যে কোন খবর আর কেউ জান্‌তে পারে না। ভোর যখন চারটে, ষ্টুয়ার্ট গিয়ে কেবিনের দরজা খুল্‌ল। দেখে—লোকটির মৃতদেহ বিছানায় পড়ে'। তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেনের কাছে খবর গেল। ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হবার পর মৃত্যু সাব্যস্ত হ'য়ে জাহাজের নিয়ম অনুসারে মৃত-দেহ কফিনে ভরে' জলে ফেলে দেবার ব্যবস্থা হ'ল। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পরেই নিকটস্থ একটি বন্দরে জাহাজ ভিড়্‌বার কথা। জাহাজস্থ বাঙালী সন্তানেরা দেহটি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করায় আপত্তি প্রকাশ করে' বল্‌লেন—নিকটস্থ বন্দরে জাহাজ উপস্থিত হ'লে আমরা নিজেদের জাতীয় প্রথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর্‌ব। সেই অনুযায়ী দেহ পাঁচ-ছয় ঘণ্টার জন্য রক্ষিত হ'ল। যথাস্থানে জাহাজ পৌঁছলে সকল বাঙালী মিলে' জাহাজ থেকে দেহটিকে সযত্নে ভূমিতে নামিয়ে যথা-রীতি চিতা সজ্জিত করে' অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন কর্‌ল।

জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য মৃতের আত্মীয়দের এবং সমস্ত বাঙালী জাতির নিকট হ'তে জাতির-গৌরব এই সকল সুসন্তান ধন্যবাদের পাত্র। বাঙালীকে ঈশ্বর সর্ব্বত্র জয়যুক্ত করুন।

* * *

আর্ট স্কুলে নারী-বিভাগ

কলিকাতা আর্ট স্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ তাঁর স্কুলে একটি নারী-বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করেছেন। সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত হ'লে দেশের নারীদের শিল্পচর্চ্চায় প্রতিভা-বিকাশের এবং স্থায়ীভাবে উপার্জ্জনের একটি পথ খুলে দেওয়া হবে।

সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত হোক্, আমরা প্রার্থনা করছি। বর্ত্তমান সময়ে নারীদিগের জন্য এইরূপ নানা পথ তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

* * *

পুরী আশ্রমে ছাত্রীদের সুযোগ

বিধবাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, মাসিক হাতখরচের দু'একটি টাকার জন্য তাঁরা প্রায়ই বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। বাড়ীতে চেয়ে চেয়ে হয়রান হন—টাকা সহজে আসে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পুরী বিধবাশ্রমে একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পুরীর মহানুভব ব্যক্তিরা এ বিষয়ে সহায়তা করছেন। কাটিংয়ে যাঁরা অল্প পরিমাণেও শিক্ষিতা হ'য়ে উঠ্ছেন, অবসর-সময়ে তাঁদের দ্বারা অর্ডারী কাজ করিয়ে দু'এক টাকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষাও চল্ছে,—কিছু কিছু উপার্জ্জনও হ'চ্ছে।

অন্যান্য বিধবা-প্রতিষ্ঠানেও এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লে ছাত্রীদের পক্ষে ভাল হয়।

* * *

বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার মহিলা-বিভাগ

কয়েক দিন হ'ল উক্ত মহিলা-বিভাগের একটি রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয়েছে। রিপোর্টটি পাঠ করে' আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি।

বছর-দুই আগে বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে জানান যে, তাঁরা ঐ সভা থেকে একটি মহিলা-বিভাগ স্থাপন করতে ইচ্ছুক। আমরা যেন উপস্থিত থেকে তার প্রথম আয়োজনটা সুরু করিয়ে দিই। তাঁদের অনুরোধে সেখানে যাই ও সম্ভ্রান্ত সদ্গোপ মহিলাদের ভদ্রতা, সভ্যতা, আদব-কায়দা, পরিচ্ছদপারিপাট্য ও স্বাস্থ্যশ্রী দেখে মুগ্ধ হই। নিজের দেশে সদ্গোপ-সমাজে এমন শোভনস্বভাবা এতগুলি মহিলা আছেন ইহা আমার ধারণা ছিল না। নিজের এই অজ্ঞতার জন্য লজ্জাবোধ করলুম। সে দিনের সভায় তাঁরা তাঁদের স্বজাতীয় মহিলাদের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হন। দুই বৎসর পরে বর্ত্তমান রিপোর্টে সেই চেষ্টার সুফল দেখে তাঁদের প্রীতি ও সম্মান জানাচ্ছি। সদ্গোপ জাতীয় বিধবাদের উন্নতি ও উপার্জ্জনের জন্য তাঁরা বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হোন, এই অনুরোধ।

এইখানে একটি কথা মনে আসে। নিজের বিশেষ একটি কর্ম্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত বিশ্বমানবের সেবা করতে পারেন, এমন শক্তিশালী পুরুষ বা নারী সংসারে দুর্লভ। তাঁরা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রণম্য। বিশ্ববাসীর মা হবার অধিকার ক'জন নারীর থাকে? কিন্তু নিজের সন্তানের মা হবার অধিকার প্রত্যেক নারীরই আছে। বিশ্বের কর্ম্মভার গ্রহণ করতে না পেরেও, স্বপরিবার, স্বজাতি, স্বসম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যাঁরা চেষ্টা করেন, তাঁরাও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হবেন, ইহাই আমাদের অন্তরের বিশ্বাস।

* * *

বিধবা বেকার-সমস্যা

দেশ এখন নিজের উপর ভর করে' দেশের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে' তুলতে চাইছে—দেশের লোকের জীবিকানির্ব্বাহে সাহায্য করবার জন্যে। প্রতিষ্ঠান যেমন

দরকার,—ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও সেই অনুপাতে দরকার। উচ্চশিক্ষা সকলের ভাগ্যে ঘটা সঙ্কট; হাতের কাজের দক্ষতায় এখন অনেককে অন্ন জোটাতে হবে। বেকার পুরুষদের যেমন অন্নসমস্যা—বেকার বিধবাদের ততোধিক। অন্নাভাবে অনেক বিধবাও মরছে, কেউ জানুক্ বা না জানুক্। বর্ত্তমানে বিধবাদের শিক্ষার জন্য যে তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে—সরোজনলিনী শিল্প-শিক্ষালয়, হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম ও বিদ্যাসাগর বাণীভবন—প্রয়োজনের তুলনায় সে যৎসামান্য।

অনেকটা চিন্তা করে' দেখে কলিকাতা কর্পোরেশনকে আমরা জানাচ্ছি, পাড়ায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার তাঁরা যেরূপ ব্যবস্থা করেছেন, সেই সঙ্গে বিধবাদের শিল্প-শিক্ষার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় অবৈতনিক শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপন কর্‌লে দেশের একটা মস্ত অভাব দূর হয়। সরোজ-নলিনী শিল্পশিক্ষালয় থেকে যাঁরা বৎসরে বৎসরে পরীক্ষা পাশ করে' বেরুচ্ছেন,কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিয়োজিত হ'য়ে ঐ সকল প্রাথমিক শিল্প-শিক্ষালয়ে তাঁরা অনায়াসে কাটিং, তাঁত, গালিচা, সতরঞ্চি, জয়পুরী কাজ, এম্ব্রয়ডারী ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প শিখাতে পারেন। এরূপ ভাবে শিল্পশিক্ষা বিস্তার কর্‌লে অল্পদিনে শিল্পচর্চ্চা দেশব্যাপী হ'য়ে উঠ্‌বে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বিধবারও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিধবারা কৃপাপাত্রী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা দেশের একটা শক্তিও বটে। তাঁ'দি'কে কাজে লাগাতে পার্‌লে দেশ নিজে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পাবে। তখন বিধবারা ঠিক আর কৃপাপাত্রী থাক্‌বে না, দেশের বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় জীব হ'য়ে দাঁড়াবে। কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের এ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

* * *

বন্যায় বিপত্তি

বন্যায় দেশের যে বিপত্তি ঘটেছে, দেশ যে ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, তাতে প্রাণবান্ মানুষ মাত্রেই এতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে' পারেন না। দূর থেকে কানে শুনে' যাঁরা সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছেন তাঁরা মহৎ; আর যাঁরা হাত বাড়িয়ে বিবস্ত্রকে বস্ত্র পরাচ্ছেন, হাতে তুলে' অন্নহীনকে অন্ন দিচ্ছেন তাঁরা দেবতার আসন পাবেন সন্দেহ নাই। প্রকৃতি প্রতিকূল—ভগবান ছাড়া কে বাঁচাবেন? সহস্র দুর্গতির মধ্য দিয়ে জাতি আজ মাথা তুল্‌বে, ভগবানের এই ইচ্ছা।

অনেকে বল্‌ছেন, রেলরোড প্রস্তুত করে' বহুস্থানে নদীস্রোতের অবাধগতি রোধ করাতেই বন্যার উৎপত্তি। বিশেষজ্ঞরা এ বিষয় চিন্তা করুন।

আগামী সংখ্যা অপরাজেয় কথাশিল্পী

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের রচনায় ধন্য হইবে।

এড্‌গ্যর্‌ ওয়ালেস্‌

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

শক্তিমান ইংরাজ কথাশিল্পীদের মধ্যে 'ওয়ালেস্‌' এক-জন। এ যুগের ইংরাজী সাহিত্যের পরিপুষ্টি করেছেন যে ক'জন লেখক গল্প এবং কবিতার মধ্য দিয়ে, ওয়ালেস্‌ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী কথা-কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় কর্‌তে হ'লে, ওয়ালেসের রচনার সঙ্গেও সম্যক-ভাবে পরিচিত থাকা দরকার। বর্ত্তমানে ইংরাজী সাহিত্যে এঁর সমকক্ষ গোয়েন্দাকাহিনী-লেখক আর দেখা যায় না—"স্যর আর্থার কোনান্‌ ডয়েল" ত আর নেই।

অতি-দরিদ্রের ঘরে এঁর জন্ম, কারখানার মজুরদের বস্তিতে।...

মাত্র ন'দিনের মাতৃহারা শিশুকে এক কৃষক নিয়ে এসে প্রতিপালন কর্‌তে সুরু কর্‌লেন পিতার মত স্নেহ-যত্নে। সেই পালক-পিতার করুণায় শৈশব আর বাল্যের ক'টি বছর এঁর কেটে গেল আদর-আবদারের মধ্য দিয়ে। তিনিই এঁর নাম রাখেন "এড্‌গ্যর।"...

বাল্যে এবং কৈশোরে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর ইনি মানুষ হ'য়ে ওঠেন সেখানে বস্তির নগ্ন দারিদ্র্যের রূঢ় বীভৎসতা না থাক্‌লেও, দারিদ্র্যের প্রকাশ সেখানে ছিল সাদাসিধা শান্ত সরলতায়। সে দারিদ্র্যের আদর্শ ছিল সরল নিষ্কলুষ জীবনযাত্রার নির্দ্বন্দ্ব পথ, শ্রমক্লান্ত কৃষকের পেশী-বহুল বলিষ্ঠতা;—জীবনের সামান্য হাসি-কান্না তখনও তাঁর চোখে জাগিয়ে তুল্‌তো ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন।...

কৈশোর তখনও পার হ'য়ে যায় নি, এমনি একদিন বেরিয়ে পড়্‌তে হোল সৈন্য হ'য়ে, না হ'লে দারিদ্র্যের যে নগ্নতা তাঁর কাছে ক্রমশঃ দেখা দিচ্ছিল তার ফলে তাঁকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে হোতো দারুণ অর্থকষ্ট আর অনাহারের বিভীষিকায়। সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'য়ে ইনি শিখ্‌লেন সহযোগিতা, কর্ম্মকুশলতা, আত্মসম্মান।—সবার উপর ইনি সঞ্চয় কর্‌লেন অভিজ্ঞতা—ভিন্ন ভিন্ন মানবমনের প্রকার-ভেদ—বিভিন্নতা।

সৈন্যদল থেকে এঁকে পাঠানো হয় 'মেডিক্যাল কোরে'—আহতদের সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বার জন্য। যে অঞ্চলে এঁকে পাঠানো হোল সেখানে আহতদের সংখ্যা ছিল খুব অল্পই—মাত্র চারজন, কিন্তু সাংঘাতিক আহত ছিল না তাদের মধ্যে একজনও। অবসরের অভাব ছিল না মোটেই, গল্পগুজব আলাপ-আলোচনায় দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল সরল স্বচ্ছ স্রোতের মত। এইখানেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হয়,—শিক্ষার আলোক সর্ব্বপ্রথম ইনি লাভ করেন এই-খানেই। এর আগে তাঁর অক্ষরপরিচয় পর্য্যন্ত ঘটে নি। এইখানেই লেখাপড়ায় এঁর প্রথম হাতে-খড়ি হোল এক পাদ্রী-পত্নীর সহযোগিতায়—মেরিয়ান ক্যাল্‌ডেকোট (Marion Caldecott) এঁকে শিক্ষাসহ ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের ছোটখাটো বইগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নারীর সস্নেহ শিক্ষার মধ্য দিয়ে, রক্তাপ্লুত কঠোরতায় অভ্যস্ত একটি সৈন্যমন, শান্ত শুভ্র স্নেহশীল হ'য়ে ওঠে।...

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অপরের প্রকাশ-ভঙ্গিমার সঙ্গে পরিচয় ঘট্‌বার পর থেকেই এড্‌গ্যরের মনে জাগ্‌লো নিজেকে প্রকাশ কর্‌বার আগ্রহ। নিজের মধ্যে সেই শক্তির উৎস খুঁজে পাবার জন্য যতই তিনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন, ততই তাঁর মন উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো অপরের প্রকাশ-ভঙ্গিমার সঙ্গে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হবার আশায়। সাধনা সুরু হোল—ক'দিন জল্পনা-কল্পনা চল্‌লো, তারপর একদিন লিখে ফেল্‌লেন একটি হাসির গান। বন্ধুমহলে চাঞ্চল্য পড়ে' গেল, "আর্থার রবার্টস্‌"এর (Arthur Roberts) গায়ক বলে' একটু খ্যাতি ছিল, তিনি দু'-পাঁচটা মজ্‌লিসে গানটা গাই-লেন, শ্রোতাদের হাসি-গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে ওয়ালেসের নামও হোল সামান্য—সেই ব্যারাকের মধ্যেই। তারপর থেকে ইনি সৈন্য-ব্যারাকের ছোট-বড় ঘটনাগুলি নিয়ে লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন কবিতা,—যদিও সেগুলো কোন মার্জ্জিত রচনাপদ্ধতি বা ছন্দ-ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই

সৃষ্ট হোত—কিন্তু তা ব'লে' সৈন্যমহলে ঐগুলোর আদর ছিল যথেষ্ট। তারা তাঁর নাম দিল—"চারণ—আমাদের ব্যারাকের চারণ।"

এই সময় পাত্রীপত্নী মেরিয়ন "কিপ্‌লিং"য়ের রচনার সঙ্গে এড্‌গ্যারের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, কিপ্‌লিংয়ের কবিতার মধ্যে এড্‌গ্যার খুঁজে পেলেন অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিমা, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য,—কিপ্‌লিংয়ের প্রতিটি লাইন তাঁর মনের মাঝে জাগিয়ে তুল্‌তো জাগ্রত স্বপ্ন। কিপ্‌লিংয়ে খুঁজে পেলেন অন্তরের ভাষা, মনের আবেগ। তখন থেকেই কিপ্‌লিংকে আদর্শ করে' তিনি রচনাবিন্যাসের চেষ্টা কর্‌তে লাগলেন।—

নি—কিন্তু সত্যই সেটি যেদিন ছাপা হোল সেদিন তিনি বিস্মিত না হ'য়ে পারলেন না। কিন্তু তার চেয়েও বেশী বিস্ময় ঘট্‌লো—যেদিন সামান্য সেই 'অভিনন্দন কবিতাটি' পড়ে' কিপ্‌লিংয়ের এত ভালো লাগ্‌লো যে তিনি চাইলেন তার লেখকের সঙ্গে দেখা কর্‌তে। কল্পনাতেও এড্‌গ্যার এতদূর অগ্রসর হন নি কোনদিনই, তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লেন—যেদিন কিপলিংয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌বার নিমন্ত্রণপত্র পেলেন।

কিপ্‌লিংয়ের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল ঐকান্তিক, কিন্তু সে পরিচয়কে ব্যক্তিগত করে' তুল্‌তে তাঁর অন্তর দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো নিজের মানসিক দৈন্যের

এড্‌গ্যার্ ওয়ালেস্

কিপ্‌লিং তখন ফির্‌ছিলেন ভারত থেকে। কেপ্‌টাউনে যেদিন তিনি এসে পৌঁছেছেন বলে' খবর এল সেইদিনই এড্‌গ্যারের মনে জাগ্‌লো সৃষ্টির আগ্রহ, রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কবিতা লিখে ফেল্‌লেন শ্রদ্ধাভরে। লেখক হিসাবে তখনো তাঁকে কেউ চেনে না, তাঁর নামও আগে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায় নি এক দিনও। কবিতাটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন. কেপ্‌টাউনের একখানি পত্রিকায়—কেপ্‌-টাইম্‌সে—কি ভেবে কে জানে। কবিতাটি যে কেপ্‌টাইম্‌সে বেরুবে তা তিনি কল্পনাও করেন

কথা চিন্তা করে'। কিন্তু তবু তিনি গেলেন কেমন যেন একটা মোহ-মন্ত্রমুগ্ধের মত। যখন তিনি কবিশ্রেষ্ঠের সম্মুখীন হলেন পারিপার্শ্বিক মনীষীদের মাঝে, তখন তাঁর কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে, মানসিক আর স্নায়বিক অবস্থাতে তখন তিনি শ্রান্ত। কিন্তু কিপ্‌লিংয়ের মিষ্ট কথায়, কোমল দৃষ্টিতে, সরল ব্যবহারে ভয়ানক-কিছু-একটা ঘট্‌বার আশঙ্কা এড্‌গ্যারের মন থেকে অনেকটা দূর হ'য়ে গেল কয়েক মুহূর্ত্তের পরিচয়েই। তারপর যখন সামনের আসনে বসে' কাঁটা-চামচে চালাতে সুরু কর্‌লেন, তখন

'সুস্বাদু খাদ্যগুলো উপভোগ করার চয়ে কিপ্লিংয়ের কথা-গুলোতেই তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে লাগ্লেন। কিপ্লিংয়ের মুখে তিনি শুন্লেন নিজের কবিতার শ্রুতিমধুর সমালোচনা, তাঁর উপদেশ—দেখ, ওয়ালেস্, ও-কাজ ছেড়ে দাও, তোমার মাঝে সৃষ্টি-শক্তি আছে - অনবরত লেখ,—সুলেখক বলে' নাম কর্তে পার্বেই একদিন!

কিপলিংয়ের ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহানুভূতি ওয়ালেসের মনে আত্মবিশ্বাস জাগালো। তারপর থেকে ওয়ালেস্ সুরু কর্লেন দৈনিক সংবাদপত্রে লিখ্তে—পেতেও লাগ্লেন সামান্য কিছু কিছু। সেই সামান্য অর্থ সঞ্চয় কর্তে লাগ্লেন, চাকরীর ঋণ শোধ দেবার ইচ্ছায়। অর্থ সঞ্চয় হোল, আফিসের ঋণ শোধ করে' ইনি মুক্তি পেলেন, কাজও ছেড়ে দিলেন।

সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ বাধ্লো 'বুয়োর'দের সঙ্গে; ইনি রয়টারের কাজে চলে' গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। আগে ছিলেন সৈনিক,—যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচিতের অভাব ঘট্লো না, খবরও সংগ্রহ কর্তে লাগ্লেন খুব শীঘ্রই। তার ফলে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এঁর উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠ্লেন—যে খবর গোপন কর্বার কথা তাও প্রকাশ পাচ্ছে। ওয়ালেসের সৌজন্য দেখে তাঁদের মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন ধূঁইয়ে উঠ্লেও অকারণে তা প্রকাশ পেল না। কিন্তু যেদিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সর্তগুলো পর্য্যন্ত বিলাতের কাগজে বাহির হ'য়ে গেল সরকার থেকে সন্ধি ঘোষণা হবার দু'দিন আগেই, "লর্ড কিচেনার" ওয়ালেসের উপর বিরক্তি প্রকাশ কর্লেন—পূর্ব্বের যুদ্ধে যে ক'টি সম্মানপদক ওয়ালেস্ লাভ করেছিলেন সেগুলি কেড়ে নিয়ে—বাজেয়াপ্ত করে'। কিন্তু এড্গ্যারের নাম মুখর হ'য়ে উঠ্লো, লোকের মুখে মুখে- তিনি হ'য়ে পড়্লেন সর্ব্বজনপ্রিয়। এই সময়ে তিনি একখানি দৈনিক বাহির কর্লেন "ফ্রিম্যান কোহেন"এর (Freeman Cohen) অর্থানুকূল্যে।

একদিন হঠাৎ এঁর পরিচয় ঘট্লো বিখ্যাত সম্পাদক "টম্ মার্লো"র (Tom Marlow) সঙ্গে। মার্লোর অনুগ্রহে ইনি কাজ পেলেন গুপ্তচরের—কয়েকটি জটিল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহের কাজ—"কঙ্গো" দেশের গোলযোগের কারণটি কি, "মরোক্কো"র জার্মানদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধের কি ফলাফল ঘট্ছে, যে সব ষড়যন্ত্রকারীরা স্পেনসম্রাট "আলফান্সো"কে গোপনে হত্যা কর্বার চেষ্টা কর্ছে—তাদের উদ্দেশ্য কি? এই জটিলতার সন্ধান রাখ্তে গিয়ে অনেকবার তাঁকে বিপদে পড়্তে হয়েছে কিন্তু সে সবই তিনি তুচ্ছ কর্লেন আর্থিক উন্নতির আশায়। পরে যখন বুঝ্লেন—এ কাজে অর্থ নেই, তখন এদিক থেকে ছুটি নিলেন একেবারেই।

তারপর থেকে তাঁর সুরু হোল ছোট গল্প লেখা। এতে তিনি যা পেতে লাগ্লেন তা' তাঁর কাছে একেবারেই যৎকিঞ্চিৎ নয়। দু-একখানা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসও লিখ্লেন পরে; সুনাম হোল বটে কিন্তু সে গল্প আর উপন্যাসগুলির সমাপ্তি ঘট্লো মাসিকের পৃষ্ঠাতেই। বইয়ের আকারে লেখা প্রকাশ কর্বার জন্য তখন তিনি এমন উৎসুক হ'য়ে উঠ্লেন, যে, একটি ছোট গল্পকে ফেনিয়ে একখানি উপন্যাস করে' ইনি বাহির কর্লেন নিজের পকেট থেকে ব্যয় করে'; এই বইখানির নাম "দি ফোর্ জাষ্ট মেন" (The four just men)। ইতিপূর্ব্বেই তিনি এত জনপ্রিয় হ'য়ে পড়েছিলেন যে বইখানির বিজ্ঞাপন বাজারে প্রকাশ হ'তে না হ'তেই তিরিশ হাজার কপি বিক্রী হ'য়ে গেল। এড্গ্যার হঠাৎ এমনভাবে উপন্যাসিক হিসাবে হঠাৎ খ্যাত হ'য়ে পড়্বেন মনেও করেননি। এই একখানি বইই উপন্যাসিক বলে' তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন কর্লো। এই সময় ইংরাজ পাঠক-মহলে গোয়েন্দাকাহিনী পড়্বার আগ্রহ লক্ষিত হোল খুবই। নিজের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত কর্বার চেষ্টায় ইনি গোয়েন্দা কাহিনী লিখ্তে সুরু কর্লেন। সৈন্য যখন তিনি ছিলেন —সেই সৈনিকের অভিজ্ঞতা, রয়টারের কাজে গুপ্তচরের অভিজ্ঞতা—গোয়েন্দাকাহিনী লেখ্বার মত উপযুক্ত উপাদান হিসাবে যথেষ্ট। তাঁর গোয়েন্দাকাহিনী সেইজন্য অন্যান্য অভিজ্ঞ লেখকদের চেয়ে চিত্তাকর্ষক হয় বেশী, তাঁর বই পড়্বার জন্য পাঠক মহলে তাই চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে। উপায়ও যা হয় তা একেবারে অপ্রচুর নয়, সেইজন্যই গোয়েন্দাকাহিনী লেখার উপরই ইনি বিশেষ রত হ'য়ে

পড়লেন। মাঝে কয়েকখানি উপন্যাস এবং নাটকও ইনি রচনা করেন, কিন্তু গোয়েন্দাকাহিনীতেই তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার বিকাশ হয়েছে বেশী করে'। এদিকে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন একজন—স্যর আর্থার কোনান ডয়েল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু ঘটায় ইনিই এখন শ্রেষ্ঠত্বলাভ করেছেন। ইংরাজী গল্প-সাহিত্যে এঁর প্রতিপত্তি এখন অসাধারণ. এঁর গল্পের জন্য পাঠকসমাজ প্রতীক্ষা করেন উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত উৎসুক আগ্রহে।

সামান্য দরিদ্র কৃষকপুত্র—আজন্ম দারিদ্র্য আর অশিক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হ'য়েও আজ ইনি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছেন। এঁর রচনার মধ্যে আছে অপূর্ব্ব সৃষ্টির প্রেরণা, তীব্র অনুভূতি, যার শক্তি আজ এঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে আকস্মিক ভাবেই। শিল্পীর এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি—এঁর প্রতিভাকে আমরা করি সম্মান!

বিদ্রোহ

শ্রী অমিয়া দত্ত

ভাবী পতির গৃহিণী হ'তে হবে এই ভেবে যে এদেশে মেয়েদের গ'ড়ে তোলা হয় এটা কমলা বরাবর লক্ষ্য ক'রে এসেছে—তাতে তার বিরক্তিও অসীম। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সে কখনো যে স্বামীর ওপর একান্তভাবে নির্ভর করবে না, এ বিষয়ে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এজন্য পড়াশুনো শেষ করবার পর নিজের ভরণপোষণের জন্য একটা কাজও সে শিখেছিল। কৃত্রিম ফুল তৈরী করতে সে বিশেষ পারদর্শিনী।

কবে বিয়ে হবে ও স্বামী তাদের সমস্ত ভার মাথায় নেবে এই আশায় কুমারীজীবনে মেয়ের যে দিন গোণে অরুণের দৃষ্টি সেদিকে খুব প্রখর ছিল—তাতে তার প্রাণে দুঃখ ও ঘৃণা দুই সমান। তাই সে স্থির করেছিল এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করবে যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করতে পারে। এ-রকম মেয়েই তার সত্যি-কারের সমকক্ষ ও জীবনসঙ্গিনী হবে, শুধুই গৃহিণী নয়।

নিয়তির বিধানে এই কমলা ও অরুণের মিলন হ'লো। অরুণ ছিল চিত্রশিল্পী, আর কমলার কথা তো আগেই বলেছি - সে ফুল তৈরী করতো। বিয়ের পর তারা একটা বাড়ীর তিনখানি ঘর ভাড়া নিলে। মাঝখানের ঘরটি তাদের ষ্টুডিও, বাকী দুখানি ঘরের একখানি অরুণের ও অন্যখানি কমলার শোবার ঘর। স্বামী-স্ত্রীর একই শোবার ঘর ব্যবহার করা নিতান্ত সেকেলে প্রথা বোলেই তারা মনে করতো।

চাকরের কোন দরকার তাদের নেই। রান্নাবান্না নিজেরাই করে। কেবল একজন ঝি রাখা হয়েছে, সে দুবেলা এসে বাসনমাজা ঘরধোয়া প্রভৃতি কাজগুলো ক'রে দিয়ে যায়।

সন্দিগ্ধমনা বন্ধুবান্ধব প্রশ্ন করে, "পর যদি তোমাদের ছেলেপুলে হয়, তখন কি করবে?"

"পাগল আর কি! ছেলেপুলে আমাদের হবে না।"

দিনগুলি সুন্দরভাবে কাটতে লাগলো। সকালে উঠে অরুণ যায় বাজারে, সেই অবসরে কমলা চা, লুচি ও হালুয়া তৈরী করে ও ঘরগুলো গুছিয়ে নেয়। তারপর দুজনে চা খাওয়া সেরে কাজ করতে বসে। কাজ করতে করতে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, তখন দুজনে মিলে নানারকম হাসি গল্পে সময় কাটায়। বারোটার সময় আবার দুজনে মিলে রাঁধাবাড়া করে। বিকেলে কোনদিন বায়স্কোপে, কোনদিন গঙ্গার ধারে, কোনদিন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ী দুজনেই বেড়িয়ে আসে। রাত্রে খাওয়ার পর যে যার নিজের ঘরে চ'লে যায়। তবে কেউই ঘরের দরজা বন্ধ

করে না। সকলেই বলে যে এ-রকম আদর্শ ও সুখী দম্পতী খুব কমই দেখা যায়।

কিন্তু তরুণী-পত্নীর মা ও বৃদ্ধা পিসীমা প্রায়ই চিঠি লেখেন ও নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে তাকে অস্থির ক'রে তোলেন। নাতির মুখ দেখ্‌বার ইচ্ছা তাঁদের অত্যন্ত প্রবল। কমলা তাঁদের একমাত্র সন্তান। তার যদি ছেলে না হয়—তাহ'লে পিতৃপুরুষের এক গণ্ডুষ জল পাবার আশাও থাকে না। কমলার জানা উচিত যে বিবাহ কেবল মাত্র আত্মসুখের জন্য নয়, সন্তান-জন্মই এর চরম উদ্দেশ্য। কমলা বলে এ মত অত্যন্ত সেকেলে। তার পিসীমা প্রশ্ন করেন যে নতুন মতে যদি সবাই চলে তাহ'লে পৃথিবী থেকে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে না কি? কমলা এদিক থেকে অবশ্য কিছুই ভাবে নি, এবং তার ভাব্‌বার কোন ইচ্ছাও ছিল না। তারা দুজনে খুব সুখী—জগতের কাছে একটা আদর্শ বিবাহের নমুনা তারা দেখাতে পেরেছে, এই-ই ত যথেষ্ট।

তাদের দুজনের মধ্যে কেউই 'কর্ত্তা' নয়। খরচপত্র তারা ভাগাভাগি ক'রে বহন করে। কখনো অরুণ বেশী রোজগার করে, কখনো বা কমলা। কিন্তু বছরের শেষে যুক্ত-তহবিলে দুজনেই সমান টাকা দেয়।

* * * *

সে দিন কমলার জন্মদিন। সকালে ঘুম ভাঙতেই সে দেখে অরুণ তার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে। হাতে একটি মস্ত বড় সুগন্ধি গোলাপের তোড়া। বিছানার ওপর তোড়াটি রেখে সে সাদরে কমলাকে চুম্বন কর্‌লে। কমলার জীবনে এমন আনন্দময় জন্মদিন ইতিপূর্ব্বে আসেনি।…

এমনি সুখে দুবছর কেটে গেলো। হঠাৎ একদিন কমলা অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌লো। কি যে হয়েছে তা ঠিক বোঝা যায় না। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। দিনকয়েক পরে তার শরীরের অবস্থা দেখে অরুণ ব্যস্ত হ'য়ে ডাক্তার আন্‌লো। ডাক্তার দেখে-শুনে বল্‌লেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, আপনার স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে। অরুণ শুনে ভারী খুশী! কিন্তু কমলা একথা শুনে কেঁদেকেটে চোখ লাল ক'রে তুল্‌লো। এখন তার কি দশা হবে? অল্পদিন পরেই তো আর সে কাজ ক'রে টাকা উপায় কর্‌তে পার্‌বে না, স্বামীর ওপরেই তাকে নির্ভর কর্‌তে হবে। তা ছাড়া চাকরও রাখ্‌তে হবে। তার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আদর্শের এইখানেই শেষ!

কিন্তু কমলার মা ও পিসীমা সুসংবাদ পেয়ে আনন্দে অধীর হ'য়ে তাকে চিঠি লিখ্‌লেন ও জানালেন যে সন্তানের জন্যই বিবাহ, এই ভগবানের বিধান। সে যেন খুব সাবধানে থাকে ও এজন্য মন খারাপ না করে।

অরুণ তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাতে লাগ্‌লো যে ভবিষ্যতে সে কিছু উপায় কর্‌তে পার্‌বে না একথা যেন সে না ভাবে। শিশুর সমস্ত ভার তো তাকেই নিতে হবে। সে কাজটার দাম কি টাকা উপায়ের চেয়ে কম? সত্য বল্‌তে গেলে টাকা মানে কাজ। অতএব সে তার নিজের অংশের টাকা ছেলের দেখাশুনো ক'রেই দেবে।

তবু কমলা সান্ত্বনা পায় না। সে যে স্বামীর রোজগারের ওপর নির্ভর কর্‌বে, এই চিন্তা তাকে সর্ব্বদা কাঁটার মত খোঁচা দিতে লাগ্‌লো। কিন্তু যখন ছেলে হ'লো, তখন সেই অসহায় কচি মুখখানি দেখে সে সব দুঃখই ভুলে গেল!…

পূর্ব্বের মতই সে অরুণের স্ত্রী ও সঙ্গিনী, অধিকন্তু এখন সে তার সন্তানের জননী। *

* স্ত্রীধর্ম্ম হইতে।

আগামী সংখ্যায় থাকিবে
গল্পের যাদুকর
শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
অপূর্ব্ব গল্প।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

জলে-স্থলে

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

হাঁটা পথখানি পার হ'য়ে এসে ঠেকিনু জলের কাছে ;
সমুখে রাত্রি,···বিদেশ-বিভুঁই—কপালে দুঃখু আছে।
সঙ্গী দু'জন ভয়হীন মন হাসিয়া বাড়ায় হাত,—
"পুরুষ মানুষ ডরে না কাহারে মাঠেই কাটাব রাত।"

সন্ধ্যা তখন ঘনায়ে আসিছে দূর আকাশের গায় ;
ঝাঁক বেঁধে কাক চলে পশ্চিমে, বাদুড় পূরবে ধায়।
গাছপালা-ঢাকা নদীর ওপারে ছোট গ্রামখানি ঘিরে'
আরতির সুর উচ্চ-মধুর, ওঠা-নামা করে ধীরে।
এপারে পক্ক ধানের শীর্ষে লাগে হেমন্ত-বায়ু ;
খেয়া-ঘাটে বসে' কোন্ সে বাউল গোণে সন্ধ্যার আয়ু !
ধীর-মন্থর গতি সুন্দর তরী বেয়ে যায় কা'রা ;—
মনে হয় যেন অজানার পথে ওরা বন্ধনহারা—!

আশ্রয় দে'ছে গাঁয়ের মোড়ল তাহার চৌনী ঘরে ;
খাসা ঘরখানি, দক্ষিণ খোলা—খাড়া কাছাড়ের 'পরে।
কোল ঘেঁসে তার ছন্ ক্ষেতটায় বায়ু করে শন্ শন্ ;
দূর দিগন্তে চাহিয়া ভাবিতে ছাড়া পেয়ে যায় মন।
তুলসী-তলায় দীপ দিয়ে গেল মোড়ল-গিন্নী হবে ;
হাট করে' এসে দুয়ারে দাঁড়াল কা'রা যেন এই সবে।
ঘোম্টার ফাঁকে নম্র-চাহনি—শুধায় কাছেতে আসি'—
"গরীবের ঘরে এসেছ বাবুরা—মনেতে সরম বাসি।
ঐখানে বাছা, চুলা করে' দিছি, দুটি কিছু বেঁধে নাও ;
ভুল-চুক-দোষ নিও না—আমরা ছোট জাত,—ওঠো, যাও।"
যেতেই হইল, ওজর-নজির চলিল না কিছু হেথা,—
চলি সেইখানে, অনুরোধ-বেশে উপরোধ রয় যেথা।

বকুই-তলায় হয়েছে জায়গা সুন্দর ফিটফাট,
মোড়লের মেয়ে কালিদাসী নাম, উনুনে দিতেছে কাঠ।
মেয়েদের সাথে পুরুষের হার রহিয়াছে কোন্খানে
পথের প্রবাসে চাষার-মেয়েও দেখিতেছি তাহা জানে !
অবাক করিল ;—হায়রে মানবী, এক সুরে বাঁধা সব ;
ঐ মেয়েটার চোখে মুখে দেখি সেই এক উৎসব !
আজিকার দিনে কেমন করিয়া কি কথা বলিতে হয়,
তার সাথে ওর কোন্ ফাঁকে কবে হ'য়ে গেছে পরিচয় !

আঁধার-নদীতে ব্যাপারীর নায় থমক বাজিয়া ওঠে,
সারাদিনকার শ্রান্ত কৃষক সেথায় যাইয়া জোটে।
মধুমালতীর গল্পের গান,—'ঘাটু' গায় একটানা ;—
কি যেন হায়রে পাইবার ছিল, কি জানি হ'ল না জানা !
দূরে বহুদূরে মিটি মিটি জ্বলে প্রদীপ--রাতের আঁখি ;
বুকভরা কত কথা ল'য়ে মনে ওর পানে চেয়ে থাকি !

'শিয়াল-মোতি'র ফুলের পাথারে ওঠে গুঞ্জন-গান ;
প্রথম শীতের স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসে তার তাজা ঘ্রাণ।
ফিকে হ'য়ে আসে পূবের আকাশ ওপারে গাঁয়ের শেষে ;
একটা কি যেন উদাসী পক্ষী চলে ওরই উদ্দেশে।
সাদা কুয়াসার পাতলা আমেজ মাঠের উপরে থির ;
কাঠের চালির মাঝিরা জেগেছে,—বন্দনা করে পীর।
নীল জলে পড়ে সোনার আলোক। শিশু-দিবসের পাণি
রাত্রি-শেষের অবগুণ্ঠন দূরে ফেলিতেছে টানি'।

বেলা হইয়াছে, বন্ধুরা ওঠে, হাসিয়া এ ওরে কয়—
"বিদেশ বিভুঁয়ে প্রবাস-যাপন কষ্ট বড়ই—নয় ?"
কালিদাসী এসে জল দিয়ে গেল,—লজ্জা-নম্র মুখ ;
এই কাজটুকু করিবে জন্য ছিল যেন উৎসুক।
আভূমি-প্রণত মোড়ল উঠিয়া কহিল, 'ধন্য মানি,
এমন অতিথি পেয়েছি দুয়ারে কি তার মূল্য জানি।'
হাত-ধরে' তারে তুলিয়া বলিনু, "তোমরা জান না ভাই,
তোমাদের এই সরল প্রাণের তুলনা কোথাও নাই।"
দুপুরের আগে ছাড়িল না ওরা,—কি সে সেবা-বৈভব,—
গ্রামের মহৎ নিষ্ঠারে আজি করিলাম অনুভব।

ছোট নাওখানি তীর ঘেঁসে যায়, আমরা আরোহী তার ;
চারিপাশে কত ক্ষুদ্র জিনস্‌ও মনে হয় দেখিবার !
সদ্য-শ্মশানে মাটির কলসী, কুলা-ভরা ধান, শাঁখা,
মনের নয়নে কেমন করিয়া হইয়া গেল যে আঁকা...
বাঁশের আগায় শাড়ীটি বাঁধিয়া নিশান উড়ায়ে দে'ছে ;
না মিটিতে সাধ কোন্ অভাগিনী অকালে চলিয়া গেছে !
জলের কিনারে কাশগাছে ফুল দুপুরের রোদে হাসে,—
হাসি নয়—ওর দুঃখের সুখ আকাশে বাতাসে ভাসে।
জালি টেনে যায় মৎস্য-শিকারী মাথায় 'থালুই' বাঁধি' ;
শাপলার ডাঁটা চিবায়ে রাখাল কা'রে করে সাধাসাধি।
মাঠের গেরুয়া মরা জল স্থির-বিষণ্ণ-বিমলিন ;
শালু তুলে' ফিরে দুখিনীর মেয়ে ডুবে' ডুবে' সারাদিন।
বিষাদ-মধুর শুষ্ক দুপুর—চেয়ে চেয়ে চলে' যাই ;
বাঁধন হারানো উদার শান্তি তারই ইঙ্গিতে পাই !...

আধুনিক ভারতে নৃত্যকলার পরিণতি

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

আমরা দেখিয়াছি যে নৃত্য মানুষের একটি সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আর কেবল তাহাই নহে, নৃত্য যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের একটি অন্তর্নিহিত ধর্ম্মস্বরূপ। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নৃত্যময়, এবং প্রতি অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সৌরমণ্ডল ও অগণিত নক্ষত্র-মণ্ডল নৃত্যের অবারিত আনন্দের ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিশ্বের এই যে সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল নৃত্যের ধারা, ইহার সঙ্গে জীবনের সমন্বয় করাই ভূমার পূর্ণ উপলব্ধি এবং ভূমার বিশুদ্ধ আনন্দলাভের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। এই জন্যই জীবনকে ভূমার আনন্দের ছন্দে ঢালিয়া দিবার পক্ষে নৃত্যই আর-সকল রসকলা হইতে মানুষকে বেশী সহায়তা করে। এবং এই সত্য ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে উপলব্ধ, স্বীকৃত ও কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিয়াছে।

যে ভারতের সংস্কৃতিতে মানবসভ্যতার আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া নৃত্যকলাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনায় এই সমুচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেই ভারতের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে আজ নৃত্যের স্থান এত ঘৃণ্য, এত দুর্নীতি ও কলুষ-পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, আধুনিক ভারতের ধর্ম্ম ও শিক্ষার নেতাগণ নৃত্যের নাম শুনিবামাত্রই সঙ্কোচে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠেন ; এবং কেবল সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মসমাজ নয়, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত হিন্দুসমাজও পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম-জীবন হইতে নৃত্যকলাকে সঙ্কোচে ও ভয়ে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম-জীবনে নৃত্যের যখন এই অবস্থা, তখন ভারতের আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৃত্য স্থান পাইবে না—ইহা স্বাভাবিক।

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্যকলার স্থান

অথচ প্রাচীন ভারতে কেবল যে ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই নৃত্য একটি সমুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা নহে, প্রাচীন ভারতের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও নৃত্যকলার একটি শ্রেষ্ঠতম স্থান ছিল। এবং গীত, বাদ্য ও নৃত্যকলা—এই তিন রস-কলাকে চৌষট্টি কলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া 'দেবজন-বিদ্যা' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে নারদ যখন শিক্ষার্থীরূপে সনৎ-কুমারের নিকট শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ইতিপূর্ব্বে কি-কি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা সনৎকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহার উত্তরে নারদ যে যে বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছিল—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, পুরাণ, ব্যাকরণ, ব্রহ্মবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা অথবা 'দৈবজয়িকী' বিদ্যা, অর্থাৎ ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি শস্ত্রবিদ্যা, মল্লযুদ্ধ বিদ্যা, গজ, অশ্ব ও রথ চালনা বিদ্যা

প্রভৃতি ;—এবং সর্ব্বশেষে ছিল দেবজনবিদ্যা, অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি রসকলা বিদ্যা।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে ইংরাজিতে liberal education অর্থাৎ উদার ও পূর্ণ শিক্ষা বলা হইয়া থাকে, প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা এবং নৃত্য-কলা বিদ্যা তাহার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। এবং প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, কাঞ্চী, বারাণসী, বিদর্ভ এবং নালন্দা ইত্যাদি সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য পৌরুষকলার সঙ্গে নৃত্যকলারও রীতিমত শিক্ষাদানের বিধান ছিল।

"বাঙ্গালী হাসিতে ভুলিয়াছে"

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষায়, যে-বাংলাদেশকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী বলিয়া বড়াই করিয়া থাকি, সেই বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে নৃত্যকলার সহিত শিক্ষার এই যে বিচ্ছেদ আজ ঘটিয়াছে, ইহা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং এই বিচ্ছেদের বিষময় ফল বাংলা আজ হাতে হাতে পাইতেছে।

সম্প্রতি শিক্ষাশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ স্যার মাইকেল স্যাডলার হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ভারতীয় এবং বিদেশীয় মনীষীগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতি হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা যে সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলা দেশের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়, কেবল আংশিক ভাবেই সত্য। মোট কথা, আমরা আজকাল সাধারণতঃ 'বাঙ্গালী' বলিতে আমাদের নিজেদেরই মত যে মুষ্টিমেয় আধুনিক-শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের দলকে বুঝিয়া থাকি, কেবল তাহাদের এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। কিন্তু বাংলার প্রতি সহস্রের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন লোক, যাহারা আধুনিক শিক্ষায় অশিক্ষিত, যাহারা আমাদের চক্ষে অসংস্কৃত (uncultured), যাহাদিগকে আমরা "বাঙ্গালী" সংজ্ঞাভুক্ত বলিয়াই মনে না করিয়া কেবল-মাত্র বাংলার উপরোক্ত আধুনিক শিক্ষিত মুষ্টিমেয় শ্রেণীর দাস বা রাখাল-স্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করি, এবং যাহারা আধুনিক ছুঁৎমার্গাবলম্বী হিন্দুসমাজের, এবং আধুনিক 'ভদ্র', 'শিক্ষিত' ও 'সম্ভ্রান্ত' সম্প্রদায়ের কাছে অবজ্ঞাত ও নির্য্যাতিত হইয়া, বাংলার তথা ভারতের খাঁটি প্রাচীন সংস্কৃতির দীনহীন বাহকরূপে, সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ভারতের সংস্কৃতি চ্যুত গর্ব্বিত কর্ত্তা শ্রেণীদের মুখাপেক্ষী হইয়া, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতিকষ্টে কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। আভিজাত্যাভিমানী ধর্ম্মের ভ্রান্ত ছুঁৎ-মার্গাভিমানী, এবং আধুনিক-শিক্ষার ছাপ-অভিমানী আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমাদেরই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, আধুনিক-শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত, অনশন ও অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট, গরীব-দুঃখী পল্লীবাসী ভাই-বোনেরা হাসিতে ভুলিয়া যায় নাই। তাহাদের মধ্যে যেখানে আধুনিক শিক্ষার গর্ব্বিত ঝলক্ পৌঁছিতে পারে নাই, তথায় জীবন আনন্দের স্ফুরণে পরিপূর্ণ। আমাদের 'ভদ্র,' 'শিক্ষিত' ও 'সম্ভ্রান্ত' বাঙ্গালী সমাজের ছেলে-বুড়োদের মধ্যেও কখনো কখনো হাসি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিকারগ্রস্ত রুগ্নের হাস্যের মতই সহরের রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্রাগার প্রভৃতি প্রমোদ-মজ্‌লিসের বিকট নেশার হাস্য। একটি স্বাস্থ্যবান জীবন্ত তেজস্বী জাতির দৈনন্দিন ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে মুক্ত, আনন্দময় ও সহজ হাস্যের উৎস প্রবাহিত হইয়া থাকে, ইহা সে হাস্য নয়।

কেন হাসিতে ভুলিয়াছে ?

এক দিকে আধুনিক বাংলার 'শিক্ষিত,' ধনগর্ব্বিত ও 'সম্ভ্রান্ত' সমাজের জীবন, এবং অপর দিকে বাংলার সমাজের পদদলিত, অবজ্ঞাত, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত "ছোটলোক"দের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের আনন্দ, ধনের আধিক্যের অথবা অতি-স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করে না, এবং পক্ষান্তরে, উপবাস ও অর্দ্ধাশনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতেও মানুষ জীবনে আনন্দের ধারাকে অটুট রাখিতে পারে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রথমোক্ত সমাজের নিরানন্দ ও কৃত্রিমতাময় জীবনের এবং শেষোক্ত শ্রেণীর সহজ-সরল আনন্দময় জীবনের মধ্যে এই যে

পার্থক্য, ইহার জন্য দায়ী—সম্পূর্ণভাবে নাই হোক্, অন্ততঃ প্রভূত পরিমাণে—আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রণালী।

ভারতের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী যে বহু দোষে দূষিত, এবং বহুদিক হইতে যে ইহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, তাহা আজকাল সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি, সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাগণ নিজেরাই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর নানাপ্রকার দোষের বিষয় আলোচনা করা এখানে অসম্ভব। কেবল একটি মাত্র গুরুতর দোষেরই আলোচনা আমরা এখানে করিব। সেই দোষ—আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে আনন্দের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ।

জীবনে আনন্দের অভিসিঞ্চন

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে আনন্দ হইতে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, যে আনন্দ দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ জীবিত থাকে, এবং যে আনন্দে আবার তাহারা প্রতিগমন করে, ব্রহ্মের সেই আনন্দ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের জীবনীশক্তি স্বরূপ। সুতরাং যদি কোন জাতি অথবা শ্রেণীবিশেষের জীবন এই আনন্দরসের অভিসিঞ্চন হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই দুর্ভাগ্য দেশে আর্থিক ধন-সমৃদ্ধির বহুল ছড়াছড়ি সত্ত্বেও জীবনের উৎস শুকাইয়া যাইবে, এবং জাতি অচিরাৎ অবনতির পথে এবং মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইবে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে যদি আবার মৃত্যুর পথ হইতে টানিয়া ফিরাইয়া আনিতে হয়, এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে যদি আবার দৈনন্দিন জীবনে নির্ম্মল হাস্য হাসিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সব-চেয়ে দরকার ব্যক্তির ও জাতির জীবনকে ভূমার সেই আনন্দে অভিসিঞ্চিত করা—যে আনন্দের অবারিত ছন্দ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যুগ হইতে যুগ আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। জাতির এবং ব্যক্তির জীবনে এই যে আনন্দ-প্লাবনের অভিসিঞ্চন, ইহা বিজ্ঞানের শত গবেষণা ও আবিষ্কার, কল-কারখানার অদ্ভুত যন্ত্রশক্তি-প্রসূত পুঞ্জীভূত বস্তুসম্ভার, অথবা দর্শনশাস্ত্রের গভীর তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব। ইহা সাধন করার একমাত্র উপায়—ব্যক্তির এবং জাতির জীবনে রসকলা-চর্চ্চার আনন্দময় জাতীয় ধারার জীবন্ত অনুপ্রাণনার সংস্পর্শ আনিয়া জীবনকে ভূমার নির্ম্মল আনন্দের ছন্দে মিলাইয়া দেওয়া।

নৃত্যই জীবনের লক্ষণ

ভূমার আনন্দের ছন্দে মিলাইয়া দিবার জন্য নৃত্যকলা মানুষের যেমন সহায়ক, জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা, ধর্ম্মানুষ্ঠান অথবা অন্য কোন রসকলার চর্চ্চা তেমন নহে। তাহার কারণ,—নৃত্য জীবিত প্রাণীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বস্তুতঃ, নৃত্যশীলতা এবং নৃত্যের শক্তি ও প্রবৃত্তিই প্রাণীর জীবনের একটি লক্ষণ-স্বরূপ, এবং তাহার অভাবই মৃত্যুর লক্ষণ। নৃত্যকলার সাহায্যে সাধারণ মানুষের পক্ষেও রসশিল্পী বা রসস্রষ্টা হইয়া সোজাসুজি ভাবে নিজের জীবনে ভূমার আনন্দের উপলব্ধি যে রকম সহজসাধ্য, অন্য কোন রসকলার দ্বারা তেমন নহে। কেন না, অন্য রসকলায় পারদর্শিতা লাভের জন্য যতটা বিশেষজ্ঞতা অথবা অনুশীলনের প্রয়োজন, নৃত্য মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বলিয়া ইহাতে পারদর্শিতা লাভে ততটা চেষ্টা বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। মানুষের জীবনে পরব্রহ্মের অনুভূতি লাভের সোপান স্বরূপ বিধাতার মহৎ দান এই যে নৃত্যের শক্তি ও প্রবৃত্তি, যাহা জীবনীশক্তির একটি অপরিহার্য্য উপাদান, এবং যাহার অভাবই মৃত্যুর অন্যতম লক্ষণ স্বরূপ, ইহাকে ভারতের আধুনিক শিক্ষিত-সমাজ নরনারীর জীবন হইতে যে কেন নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে, ইহা ভারতের ইতিহাসের একটি অদ্ভুত প্রহেলিকা।

আধুনিক ভারতে জাতির এবং ব্যক্তির জীবন হইতে নৃত্যের নির্ম্মল ধারার এই যে নির্ব্বাসন, তাহার মূলে আছে আমাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর এবং শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে ভারতের সাধনার ও সংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের এবং সেই সাধনার ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। সেই পরিচয় এবং সেই শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকিলে ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায় আজ নৃত্যের উল্লেখ মাত্রেই সঙ্কোচে, সন্দেহে ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিত না, এবং ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের গভীর জ্ঞান-গবেষণায় নৃত্যকে মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে যে কি অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয় গৌরবময় স্থান দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়ে ভারতের যাবতীয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকিত না।

নৃত্যের আধুনিক ভ্রান্ত আদর্শ

আজকাল নৃত্য বলিতে আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত লোকে যাহা বোঝে, তাহা ভারতের সংস্কৃতিতে নৃত্যের যে আদর্শ তাহা হইতে গৃহীত নহে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নৃত্যবিষয়ক আদর্শ হইতে গৃহীত। তাই নৃত্য বলিতে আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয়েরা বোঝেন, হয় বাইজীর নৃত্য—যাহাকে পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা "The Nautch" আখ্যা দিয়া ভারতীয় নৃত্যের আদর্শস্থানীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; অথবা আধুনিক সহরের রঙ্গমঞ্চের ইন্দ্রিয়ভাব-উত্তেজক অল্লাধিক অশ্লীল পেশাদার নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্য; অথবা পাশ্চাত্য সাহেব-মেমদের পরস্পর-আলিঙ্গনবদ্ধ 'বল্'-নৃত্য (Ball-room dance)। এই তিন প্রকার নৃত্য ছাড়া যে সভ্য অথবা শিক্ষিত মানুষের দেখিবার অথবা নাচিবার যোগ্য অন্য কোনপ্রকার নৃত্য থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণতঃ বিশেষ কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। যে নৃত্যপ্রণালী আজকাল ভারতীয় 'বাইজী'র নৃত্য নামে বিখ্যাত, তাহা যদিও একসময় মূলতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবাত্মক 'দেবদাসী'-শ্রেণীর নৃত্য ছিল, এবং কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংশ্রবেই প্রচলিত ছিল, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় ও মজ্‌লিসে রাজা, নবাব ও তাঁহাদের আমীর-ওম্‌রাহ-অমাত্যদের বিলাস-ব্যসনের পরিতৃপ্তির চাহিদায় যে রূপান্তর ধারণ করিল, সেই রূপ যে মোটের উপর অশ্লীল ও দুর্নীতিময় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আধুনিক ভারতের সহরে রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য আমরা দেখিতে পাই, তাহাও যে মোটের উপর অশ্লীলভাবাত্মক এবং দুর্নীতির প্রণোদক, ইহাও নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্য 'বল্'-নৃত্যের প্রণালী পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-প্রসূত,—তাহা পাশ্চাত্য জাতিদের পক্ষে হয়ত শ্লীল, শোভন ও দুর্নীতিবিহীন হইতে পারে, যদিও প্রায় প্রত্যেক পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যেই এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের আলিঙ্গনবদ্ধ এইরূপ নৃত্য ভারতের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক, এবং এই নৃত্যের অবলম্বনে ভারতের স্ত্রীপুরুষের চরিত্রে সুনীতি না আসিয়া দুর্নীতি আসিবারই সম্ভাবনা বেশী।

"পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"

"পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—এই বাণীটি এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য এবং সত্য বলিয়া মনে হয়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—"What is one man's meat is another man's poison." "যে আমিষ একজনের খাদ্য-স্বরূপ, তাহা অন্যের পক্ষে বিষতুল্য।" ইহা শুধু ব্যক্তির পক্ষে নয়, জাতির পক্ষেও খাটে। আজকাল আমাদের দেশের একদল তরুণ "তারুণ্যের" ধুয়া ধরিয়া চীৎকার করিতেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশের নরনারীর সামাজিক এবং নৈতিক জীবনে যে-যে ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের দেশের জীবনেও তাহা ঘটানো উচিত; নতুবা আমরা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইব না। এই দলকে পাশ্চাত্য দেশেরই উপরোক্ত মন্ত্রের কথাটিই মনে করাইয়া দিতে চাই। "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" কথাটি যে আমাদের দেশ-প্রসূত একটি কুসংস্কার-মাত্র নয়, ইহা হইতে হয়ত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভারতের সংস্কৃতি-বিস্মৃত আমাদের আধুনিক-শিক্ষিত সমাজের চক্ষে যাহা নৃত্য বলিয়া পরিগণিত, তাহার মধ্যে কোনটাই বিশেষ করিয়া শ্লীলতা বা সুনীতির পরিপোষক নহে। অন্ততঃ ইহা ঠিক যে, ইহাদের কোনটাই যে বিন্দুমাত্রও অধ্যাত্ম ভাবের প্রণোদক, তাহা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

পাশ্চাত্য সমাজে খৃষ্টপূর্ব্ব যুগ হইতেই ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্যের যে একটা বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। এবং ইহার ফলে 'বল্'-নৃত্য প্রভৃতি সামাজিক নৃত্য ধর্ম্মভাবাত্মক (sacred) শ্রেণীর মধ্যে গণ্য না হইয়া স্বভাবতঃই অধর্ম্মভাবাত্মক (profane) শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং তাহার ফলে তাহার রূপের সঙ্গেও ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ বিরোধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যে তিন প্রকার নৃত্যের সহিত আমাদের শিক্ষিত সমাজের বিশেষ পরিচয়, ইহার ভিতর কোনটাই যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়, তাহা বলা বাহুল্য। পক্ষান্তরে এই-গুলির প্রচলনে দেশের প্রভূত অমঙ্গল হইয়াছে এবং আরও হইবার সম্ভাবনা আছে। এমত অবস্থায় আমাদের

আধুনিক-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্যের উপর যে একটি বিরাগ ও সঙ্কোচময় সন্দিগ্ধ ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু নৃত্য সম্বন্ধে ধারণার এই বিসদৃশ পরিণতি হইয়াছে—ভারতের সংস্কৃতিতে নৃত্যকলার স্থানের প্রকৃত পরিচয়ের অভাবে, এবং আধুনিক সহরের শিক্ষিত-সমাজে প্রচলিত নৃত্যকলার বিপথগামী আদর্শের অনুসরণের ফলে।

অশ্লীল নৃত্যকলার কুপ্রভাব

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রসকলা পরমার্থের উপলব্ধির সহায়তায় আমাদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চা হইতেও যেমন বেশী সহায়তা করে, সেইরূপ অপর দিকে আবার রসকলা যদি ব্যক্তিকে এবং সমাজকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির ও সম্ভোগের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ও বিজড়িত করিয়া বিপথগামী করে, তখন তাহার ফল আরও বিষময় হয়। কেন না, রসকলার শক্তি মানুষের এবং সমাজের জীবনে ও চরিত্রে অতি ব্যাপক এবং প্রভাববান্।

আবার অন্যান্য রসকলা হইতেও নৃত্যকলার প্রভাব মানুষের এবং সমাজের জীবনে ও চরিত্রে অধিকতর সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী। নৃত্যকলা যখন ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির অথবা কামবৃত্তির অভিগামী হইয়া বিপথগামী হয়, তখন তাহা হইতে ব্যক্তির এবং জাতির জীবনে মহা অনর্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আধুনিক সমাজের মজ্‌লিসী নৃত্যে নৃত্যকলার যে রূপ আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি, তাহা সমাজের পক্ষে যে মহা অনিষ্টকর এবং তাহা শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণের যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভারতীয় নৃত্যকলার মঙ্গল-রূপ

কিন্তু ভারতের সংস্কৃতিতে নৃত্যকলার স্থান ও আদর্শ ছিল ঠিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাচীন ভারত নৃত্যকলার সাধনা করিয়াছিল কামপ্রবৃত্তি পরিতুষ্টির জন্য নয়,—বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিস্মৃতি আনিয়া অতীন্দ্রিয়-লোকে উপনীত হইয়া পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ আনন্দময় অনুভূতির সোপান গঠন করিবার জন্য।

জাতির জীবনে শক্তি ও আনন্দের সম্যক্ স্ফুরণ আবার ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মানুষের চরিত্রের উন্নতির ও আধ্যাত্মিক সাধনার এবং আনন্দবিধানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান স্বরূপ এই যে নৃত্য-রসকলা, ইহাকে ভয়, সঙ্কোচ ও সন্দেহে সমাজের জীবন ও শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বর্জ্জন করিলে জাতির অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হইবে না, এবং বর্জ্জন করিবার যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণও নাই। ভারতের জীবনে নবশক্তি, আনন্দ এবং পৌরুষের সাধনার এই যুগে, শক্তি, আনন্দ ও পৌরুষের সাধনার প্রধান সহায়ক স্বরূপ বিশুদ্ধ নৃত্যের অতীন্দ্রিয় মঙ্গল-রূপকে আবার আমাদের সমাজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতেই হইবে;—তাহা ছাড়া উপায় নাই।

ইহা আমরা করিতে পারিব—বিজাতীয় বিপথগামী বীভৎস-প্রণালীর ইন্দ্রিয়াত্মক নৃত্যকে বর্জ্জন করিয়া, এবং ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনা-প্রসূত নৃত্যের বিশুদ্ধ মঙ্গল-রূপকে সমাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় সমাদরে বরণ করিয়া। সেই মঙ্গল-রূপ যে কি, তাহার আলোচনাই আমরা এখন করিব। *

(ক্রমশঃ)

* আগামী সংখ্যায় লেখকের "ভারতীয় নৃত্যকলার মঙ্গল-রূপ" নামক বহুচিত্র-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। —বঃ সঃ

'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতে'র লেখক
বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তক
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গলক্ষ্মীর আগামী সংখ্যায় লিখিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

অজানার ডাক*

শ্রী জ্যোতিপ্রসন্ন সেন বি-এ

একাঙ্ক নাটিকা

কুশীলবগণ

মণিকা	পাহাড়ী মেয়ে
মধু	মণিকার প্রেমিক ; প্রসিদ্ধ পথপ্রদর্শক
পথিক	পর্ব্বত-আরোহী
বড়-শিখর, গোশিখর, সোমশিখর	স্বপ্নে দৃষ্ট পাহাড়-সমূহ

জুঁই, মালতী ইত্যাদি…ফুলবালাগণ

রাখাল, 'ডুবে-মরা', 'ঘুমিয়ে-মরা' ইত্যাদি	ছায়ামূর্ত্তি-সমূহ

প্রথম দৃশ্য

[বসন্তকাল। সূর্য্য অস্তমিত ; একটি পার্ব্বত্য-কুটীর। একদিকের খোলা জানালা দিয়া তিনটি পর্ব্বতের চূড়া দেখা যাইতেছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিতেছে। ঘরের ভিতর একটি ক্ষীণ বাতি। মণিকা নামে একটি পাহাড়ী বালিকা আপন-মনে বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া একটি গ্রাম্য-গান গাহিতেছে—আর জামা সেলাই করিতেছে। মণিকা সুন্দরী,—বয়স তার ষোল-সতের বছর হইবে। পরিধানে একটি মেটে রংএর শাড়ী—গলায় একটি ফুলের মালা। অলঙ্কারের বালাই নাই—নিরাভরণা বলিয়াই যেন তাকে আরও অধিক সুন্দর দেখাইতেছিল।

অবিন্যস্ত চুলগুলির কয়েকগোছা আসিয়া তার গৌরবর্ণ মুখের উপর পড়িয়াছে ; বাতাসে তাহা আন্দোলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এমন সময় দরজা-ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পথিক প্রবেশ করিল। পথিক সুশ্রী যুবক,—পরিধানে পর্ব্বত-আরোহীর উপযুক্ত পোশাক। হাতে একটা চটের থোলে ও একখানা কম্বল।]

পথিক। নমস্কার!

মণিকা। নমস্কার মশাই!

পথিক। দেরী হ'য়ে গেছে বোধ হয় খুবই।

মণিকা। এখানে কি রাত কাটাতে চান?

পথিক। সেই ভেবে এসেছি—জায়গা হবে কি?

মণিকা। জায়গা মোটেই নেই ; তবে মাকে ডেকে দি।

পথিক। বড়-পাহাড়ের চূড়ায় উঠ্‌বে মনে ক'রে এসেছি।

মণিকা। (বিস্মিত ভাবে) বড়-পাহাড়! সে যে ভীষণ দুর্গম পথ…

পথিক। তা হোক্—একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্।

মণিকা। কেন,—গোশিখর, সোমশিখর তো রয়েছে?

পথিক। সেগুলো আমার হ'য়ে গেছে।

মণিকা। সে পাহাড়টা বড়ই ভীষণ—প্রাণ যাওয়াও আশ্চর্য্য নয়!

পথিক। হোক্, তবু চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে ক্ষতি কি?

মণিকা। বাবার পায়ে চোট লেগেছে। মধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সে ছাড়া তো এখানে আর কেউ নেই…

পথিক। সেই বিখ্যাত মধুর কথা বলচো তো?

মণিকা। হাঁ, সে-ই বটে। আপনি-ই না এ-বছর ছোট সবগুলো পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছেন?

পথিক। হাঁ—কেবল এই বড়-পাহাড়টি বাদে।

---

* Galsworthy হইতে।

মণিকা। আপনার কথা আমরা আরো শুনেছি। বাবার জন্য একদিন অপেক্ষা করবেন না ?

পথিক। না, কালই আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

মণিকা। মশাইর বুঝি খুব জরুরী কাজ ?

পথিক। হাঁ—তাই বটে।

মণিকা। আপনি বোধ হয় কোন বড় সহর থেকে এসেছেন ? খুব বড় নাকি ?

পথিক। সেখানে দশ লক্ষ লোকের বাস···

মণিকা। অতো!... আমি দুবার মাত্র সহরে গিয়েছিলুম।

পথিক। সারা বছরই এখানে থাক ?

মণিকা। শীতকালে নীচে নেমে যাই।

পথিক। সহর দেখতে তোমার খুব ইচ্ছা করে ?

মণিকা। হাঁ—কখনো কখনো করে বই কি! [দরজার কাছে গিয়া] মধু ? [অন্য দরজার দিকে দেখাইয়া] ওখানে অনেক লোক আছে।

পথিক। তাই নাকি ?

মণিকা। তারা সূর্য্যোদয় দেখবে ব'লে এসেছে।

[পথিকের পকেট হইতে একখানা বই পড়িয়া যাইতেই মণিকা উহা কুড়াইয়া লইল]

মণিকা। আমি কিছু কিছু বই পড়েছি।

পথিক। এখানি একজন বড় লেখকের লেখা কবিতার বই। তুমি কি এখানে শুধু প্রাকৃতিক শোভা দেখেই থাক - কোন দিন কি কাব্যের স্বপ্নে তোমার জীবন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না ?

মণিকা। [ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া] দেখুন, আজ পূর্ণিমা। চাঁদকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

[তাহারা জানালা দিয়া বাহিরের চন্দ্রের শোভা দেখিতেছিল—এমন সময় একজন লম্বা, সুশ্রী এবং সবল যুবক প্রবেশ করিল]

এই যে মধু—

মধু। মশাই আমায় খুঁজছেন ?

মণিকা। [ভীত স্বরে] বড়-পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চাইছেন··· [মধুর কানে কানে] সহর থেকে এসেছেন।

মধু। বড়-পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব মশাই!

পথিক। তুমিও একথা বলছ,—তুমি না অতবড় নামজাদা পথপ্রদর্শক ?

মধু। [গম্ভীর ভাবে] আচ্ছা, আমরা ভোরে রওনা হবো···

[প্রস্থান

মণিকা। বহুদিন সেখানে যেতে কেউ সাহস পায়নি।

পথিক। [হাতের থোলে ও কম্বল মাটির উপর রাখিয়া] আমি এখানে ঘুমুতে পারি কি ?

মণিকা। আচ্ছা— দেখছি। [দৌড়াইয়া বাহিরে গেল]

পথিক। [মেজেতে কম্বল পাতিয়া] এতেই হবে।

[খাওয়া পাওয়ার জন্য তিনি বাহিরে গেলেন—একটু পরে মণিকা সেখানে আসিল]

মণিকা একখানা বিছানা এখনও খালি আছে ; এখানে আপনার ঘুম হবে না বড় শক্ত।

পথিক। ধন্যবাদ। কিন্তু এতেই আমার চলবে। অন্য কোন বিছানার প্রয়োজন নেই।

মণিকা। তবু আমার অনুরোধ···

পথিক। তোমার নাম কি ?

মণিকা। 'মণিকা'।

পথিক। বেশ নাম তো...তোমাকে খুসী কর্ত্তে আমি অন্য সবার সঙ্গে এক-বিছানায় ঘুমোতেও রাজি আছি।

মণিকা। না—না—তা কেন কর্ত্তে যাবেন ? ও-সবের প্রয়োজন নেই।

পথিক। আচ্ছা—তোমার যা অভিরুচি।

[গমনোদ্যত]

মণিকা। সহরে থাকা খুব আরামের নয় কি ?

পথিক। কি জানি! যখন সহরে থাকি আমার এখানে আসতে ইচ্ছা হয়,—আবার যখন এখানে আসি, সহরে ফেরবার জন্য প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে।

মণিকা। [হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া] আমারও ঠিক এই অবস্থা। কিন্তু আমাকে সব সময় এখানে কাটাতে হ'চ্ছে!

পথিক। হাঁ, সহরে তোমার মত কেউ নেই।

মণিকা। দু' জায়গায় একজন কি ক'রে থাকবে! [সহসা] সহরে থিয়েটার আছে—বায়স্কোপ আছে—কত

সুন্দর সুন্দর দালান ঘর বাড়ী আছে—রেলগাড়ী আছে—কত ভাল ভাল বই আছে—আর—

পথিক। দুঃখ-দারিদ্র্য আছে—

মণিকা। কিন্তু সেখানে জীবন আছে—

পথিক। আর মৃত্যুও আছে…

মণিকা। কাল পাহাড়ে উঠে'—আবার এখানে ফিরে আসছেন তো?

পথিক। না—

মণিকা। [স-নিশ্বাসে] সমস্ত পৃথিবী আপনার সামনে বিস্তৃত পড়ে রয়েছে—যেখানে খুসী যেতে পারেন। আর আমার কিছুই নেই—

পথিক। মধু আর ঐ পাহাড়গুলো ছাড়া…

মণিকা। কি জানেন—শুধু চারটে খেয়ে বাঁচাই জীবনের একমাত্র কাম্য নয়। তাতে অন্তরের ক্ষুধা মেটে না…

পথিক। [তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া] তোমাকে আমার ভারী সুন্দর লাগে…

মণিকা। কিন্তু আমি তো মোটেই সুন্দর নই…আমার সমস্ত জীবনটাই অপূর্ণতায় ভরা—

পথিক। আমি আবার ফিরে আসবো…

মণিকা। বড়-পাহাড়ে ওঠা হ'য়ে গেলে আর কোন পাহাড় বাকী থাকবে না। এখানে আসবার আপনার কোন প্রয়োজন থাকবে না—সুতরাং আপনি আসবেনও না!

পথিক। তুমি বেশ বুদ্ধিমতী—

মণিকা। মোটেই না—আমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নেই। আমার ভেতরটা সর্ব্বক্ষণ পুড়ে যাচ্ছে…

পথিক। কেন?

মণিকা। জানি না…[সহসা] সহরে গিয়ে আমায় ভুলে যাবেন না তো?

পথিক। [হাতের ভিতর মণিকার একখানা হাত নিয়া] সহরে এর মত মধুর কিছু নেই!

মণিকা। [বিজ্ঞ ভাবে] কেন, সহরই তো রয়েছে!

পথিক। [ভাঙা গলায়] মণি, তোমার হাত—

[মণিকা হাত বাড়াইয়া দিল। পথিক তাহার হাত ঠোঁটে স্পর্শ করিল। মণিকা সরিয়া গেল]

পথিক। মণি, তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে…

[মণিকা জবাব দিল না]

আচ্ছা, এখন ঘুমোতে যাই—তুমিও যাও।

মণিকা। নমস্কার!

[মধুর প্রবেশ। পথিক যাইতে যাইতে আবার মণিকার দিকে ফিরিয়া চাহিল; তারপর বাহির হইয়া গেল]

মণিকা। [মধুর প্রতি] তাঁর এখানে ভাল ঘুম হবে না—তাই অন্যত্র জায়গা ক'রে দিয়েছি।

মধু ধীরে ধীরে মণিকার কাছে গেল; কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মণিকার একখানি হাত তুলিয়া ধরিয়া ওষ্ঠস্পর্শ করিল]

মণিকা। আমার উপর রাগ করেছ?

[মধু জবাব দিল না; বাতি নিভাইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। মণিকা জানালা দিয়া জ্যোৎস্নাধৌত পাহাড়ের চূড়াগুলির শোভা দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কম্বল মুড়ি দিয়া সেখানে শুইয়া পড়িল।]

মণিকা। [নিদ্রালু ভাবে] তারা দুজনেই আমার হাতে চুমো খেয়ে গেছে…[ঘুমাইয়া পড়িল]

কাল রংএর দৃশ্যপাত

*

* *

*

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্যটি উষার আলোর মত কি একটা আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মণিকা তখনও শুইয়া আছে। সে উঠিয়া বসিল এবং শরীর হইতে কম্বলখানা সরাইয়া রাখিল। তার ঘুমের রেশ সম্পূর্ণ কাটে নাই …এখন স্বপ্ন দেখিতেছে। সে দেখিতে পাইল—পাহাড়ের দিকের দেয়ালটা যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—পাহাড় এবং তার মধ্যে কিছুই নাই—কেবল মাত্র খানিকটা পথ।

মণিকা এবং পাহাড় এর মধ্যবর্ত্তী অন্ধকার স্থানটুকুতে জুঁই, শিরীষ, জবা এবং অপরাজিতা—এই কয়টি ফুলবালা দাঁড়াইয়া মণিকার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল]

মণিকা। বাঃ—এদেরও মুখ আছে!

[পাহাড়ের শিখরগুলির চারিদিকে সুনীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই নাই। শিখরগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

জুঁই। [গাহিয়া উঠিল] তারার কোলে তারা ঢলে,
চাঁদের হাসি ধরার গায় ;
শিরীষ, জবা, অপরাজিতা। আনন্দের আজ বান ডেকেছে,
দেখ্‌বি যদি ছুটে আয় !

[তাদের নৃত্যগীত চলিতে লাগিল। মণিকা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। সহসা গোশিখর অনভ্যস্তের মত কথা বলিয়া উঠিল]

গোশিখর। আমি গোশিখর। গরু এবং ভেড়ার দলের সঙ্গে আমি বাস করি। আমি চিরমূক এবং বৈচিত্র্যহীন। আমি চিরগম্ভীর। আমি দুর্দ্ধর্ষ—আমিই দুরন্ত পার্ব্বত্য-পবন। আমি সকল পশুর ঘাস জোগাইয়া থাকি। আমার কোলে চিরশান্তি। আমার চোখের দিকে চাও—আমাকেই ভালবাস···

মণিকা। [একশ্বাসে] গোশিখর—মধু আর পর্ব্বতদের পক্ষ থেকে কথা বল্‌ছে। এযে আমারই হৃদয়ের আধখানা !

[ফুলবালাগণ আনন্দে হাসিয়া উঠিল]

গোশিখর। আমি চিরন্তন—তুষার পান করিয়া আমার তৃষ্ণা মিটাই। আমার চোখগুলি পাংশুবর্ণ—তারা বিষাদের আবাস ! গাভীর হাম্বারব,—বাতাসের ধ্বনি, প্রস্তর-পতনের শব্দ, অলির গুঞ্জন, রাখালের বংশীরব, তটিনীর কলনাদ—এ ছাড়া কোন কথা আমি জানি না—কোন ভাষা আমার নাই ! আমার চিন্তার ধারা অতি সাধারণ, কিন্তু আমার প্রতি ধমনীতে উষ্ণরক্তস্রোত বহিতেছে। আমার শক্তি অসাধারণ—গাম্ভীর্য্যই আমার ভূষণ।

মণিকা। হাঁ, আমি একেই চাই। ওর শক্তি অসাধারণ !

গোশিখর। বৎসে, আমাকেই অবলম্বন কর—আমাকেই ভালবাস—আমার সঙ্গে উন্মুক্ত আকাশের তলে বাস কর।

মণিকা। [ধীরে ধীরে] আমার ভয় হ'চ্ছে !—

[সহসা সোমশিখর যুবকের কণ্ঠে বলিয়া উঠিল]

সোমশিখর। আমি হ'চ্ছি জনপদ—যার রাস্তা বেয়ে আলাদিন তার আশ্চর্য্য-প্রদীপ নিয়ে নেচে বেড়ায় ! আমি সঙ্গীতসুধায় জগৎকে মুগ্ধ করি। আমি চির বৈচিত্র্যময় !—নিত্য নূতন দেবতার যাগযজ্ঞ করি—নিত্য নূতন লীলারসে জগৎকে মাতিয়ে রাখি। আমি সুরম্যধবল অট্টালিকায় বাস করি এবং রজনীর অন্ধকারে আপনাকে অনির্ব্বচনীয় ভোগের স্রোতে ভাসিয়ে দি। বিশ্বমানবের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারাতেই আমার জীবন—[আস্তে আস্তে] আমার শত শত প্রেমিকা আছে—কিন্তু কখনও কারও কাছে বেশীক্ষণের জন্য বাঁধা থাকি না। নিত্য নব-ফুলে নব-মধু আমি খুঁজি···বৎসে, আমার সঙ্গে এস—সুখ পাবে।

ফুলবালাগণ। [ভীত কণ্ঠে] ওগো যেও না ! ওগো যেও না !

সোমশিখর। সুখের জন্মমৃত্যু আমি নিত্য প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি—ক্ষুধার্ত্ত মানবের শত শত শপথবাণী শুনে থাকি। নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকারে প্রেমিক-প্রেমিকার আবেগপূর্ণ চুম্বনের নিঃশব্দ আদানপ্রদান আমি নিত্য দেখ্‌তে পাই··· বৎসে, আমাকে ছাড়া তোমায় উপবাসী থাক্‌তে হবে এবং ময়্‌তে হবে।

মণিকা। এ যে সহরের কথা বল্‌ছে—এ যে আমার অন্তরখানা ছিঁড়ে ফেল্‌তে চাইছে···

সোমশিখর। আমার নিত্য নূতন খেয়াল জাগে। আমার ভাবনার সংখ্যা—তোমার বাগানের ফুলের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী ; তারা তোমাদের বনের পাখীর চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি উড়ে বেড়ায় ! আমি আশা এবং নৈরাশ্যের সুরা পান করি। আমার জীবন কোন-দিন বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে ওঠে না।

মণিকা। আমার ভয় হ'চ্ছে···

সোমশিখর। বৎসে, আমায় ভালবেসে সুখ পাবে—আমি জীবনকে নিত্যনব রংএ রঙীন ক'রে তুলি। আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার—তোমার অন্তর যা চায় আমি তার সবই যোগাব—

মণিকা। বাঃ ! এর কথাগুলোর সঙ্গে মধুও আছে যে···

ফুলবালাগণ। [কাঁদিয়া উঠিল] ওগো বিষ—ওগো বিষ !

গোশিখর। মণি, আমার সঙ্গে থাক…আমি প্রত্যূষে তোমাকে মলয় পবনে জাগাব…

[ফুলবালাগণ আনন্দে হাসিয়া উঠিল]

সোমশিখর। আমার সঙ্গে এসো মণি! আমার বিচিত্র পাখার বাতাস দিয়ে আমি তোমায় জাগাব।

[ফুলবালাগণ কাঁদিয়া উঠিল]

মণিকা। [দুঃখে] ওঃ—আমার হৃদয়টা ছিঁড়ে গেল!…

সোমশিখর। বৎসে, আমার সঙ্গে এলে তুমি পৃথিবীর সব রহস্যের সন্ধান জান্‌তে পাবে। আমার হাত ধ'রে প্রজাপতিরও আগে ছুটে চল্‌বে।

জুঁই। আমার গন্ধ বাতাসেরও আগে ছুটে চলে—

সোমশিখর। আমি তোমায় সমুদ্র দেখাবো।

অপরাজিতা। আমার রং তার চেয়ে অনেক বেশী নীল—

সোমশিখর। আমি তোমার জীবন অভিনব লালিমায় ভ'রে দেব।

জবা। আমার লাল তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর—

সোমশিখর। বৎসে—শোন আমার কত মণিমুক্তা, রেশম মখমল—

শিরীষ। আমি মখমলের চেয়ে অনেক বেশী কোমল--

সোমশিখর। [সগর্ব্বে] আমার চমৎকার দালান-কোঠা আছে—

ফুলবালাগণ; [কাঁদিয়া উঠিল] আমাদের তেমন কিছুই নেই…

মণিকা। এর সবই আছে।

গোশিখর। রূপালি পাখাওয়ালা কালো মেঘগুলি এসে প্রতিদিন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে থাকে। মধ্যাহ্নে সূর্য্যের তাপে আমার শিখরগুলিতে আগুন লেগে যায়। প্রত্যূষে আমার কোলে শিশির-কণাগুলি ঝরে পড়ে—তারা মুক্তার চেয়েও দেখ্‌তে অধিক সুন্দর—অধিক মূল্যবান্। আমাকে ছেড়ে—আমার তুষার এবং শ্যামল প্রাঙ্গণ হ'তে দূরে গিয়ে তুমি কিছুতেই বাঁচ্‌তে পার্‌বে না বৎসে!

মণিকা। উঃ—এ অসহ্য।

গোশিখর। আমি তোমাকে কোনদিন ছেড়ে যাব না।

সোমশিখর। একশ'বার আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো—আবার একশ'বার ফিরে আস্‌বো—তোমার গালে চুমো খাব!

মণিকা। [ফিস্ ফিস্ করিয়া] হৃদয়, শান্ত হও।

গোশিখর। আমার বুকে তুমি শুষ্কপত্রের বিছানায় ঘুমোতে পার্‌বে।

[ফুলবালাগণ আনন্দে হাসিয়া উঠিল]

সোমশিখর। আমি তোমাকে আমার দুধের মত ধব্‌ধবে কোমল বিছানায় ঘুম পাড়াবো।

[ফুলবালাগণ কাঁদিয়া উঠিল]

আমি তোমায় চমৎকার বিচিত্র খাদ্যসম্ভার খেতে দেব।

গোশিখর। আমি তোমাকে টাট্‌কা দুধ খেতে দিব—

সোমশিখর। আমার গান শোন—

[দূর হইতে পিয়ানোর মৃদুধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল]

মণিকা। [বুকে হাত দিয়া] আমার হৃদয়—আমাকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে সে!

গোশিখর। আমার গান শোন—মণি!

[দূর হইতে রাখালের বংশীধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল]

মণিকা। বাঃ—চমৎকার বাঁশী বাজাচ্ছে!

গোশিখর। মণি, আমার সঙ্গে থাক—

সোমশিখর। মণি, আমার সঙ্গে এস—

গোশিখর। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি—

সোমশিখর। আমি তোমায় আশা দিচ্ছি—

গোশিখর। আমি শান্তি দিব—

সোমশিখর। আমি দিব নব নব বৈচিত্র্য—

গোশিখর। আমি তোমায় 'নিস্তব্ধতা' দিচ্ছি—

সোমশিখর। আমি দিব কণ্ঠে নূতন সুর—

গোশিখর। আমি তোমাকে একজন প্রেমিক দিয়েছি।

সোমশিখর। আমি তোমায় বহু প্রেমিক দিব।

মণিকা। [কথাগুলি যেন তার কাছ থেকে জোর করিয়া বাহির করা হইল] দুজনকেই—এদের দুজনকেই আমি ভালবাস্‌বো।

[সহসা বড়-পাহাড়ের চূড়া কথা বলিয়া উঠিল]

বড়-পাহাড়। দুজনকেই তুমি ভালবাস্‌বে বৎসে! তুমি নির্জ্জন গিরির উপত্যকায় এসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়্‌বে—আবার সহরে গিয়ে জ্ঞানের আলোক পেয়ে নৃত্য কর্ব্বে। এদের দুজনেই তোমার উপর অধিকার খাটাবে। পাহাড়ের প্রচণ্ড সূর্য্য তোমায় তাপিত কর্ব্বে—আবার তার শুভ্র চন্দ্রমা তোমায় সুধা দান কর্ব্বে।... সহরের গ্যাসের আলো দেখেও পথ বেয়ে চল্‌তে হবে। দুটিকেই তোমার খুব ভাল লাগ্‌বে—আবার দুজায়গা-ই তোমার কাছে অনন্ত নরক ব'লে মনে হবে। তোমার অন্তরটা হ'চ্ছে একটা ঘড়ির দোলকের মত—কোন-দিন বিরাম নেই—একবার এধার আবার ওধার। তাতে ভীত হয়োনা বৎসে! সকল রকমের ভালবাসার আদান-প্রদানেই মানবজীবনের সার্থকতা। এ যেন একটা ছোট্ট ভেলা—সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে—ঢেউয়ের ঘায়ে এক একবার তীরে গিয়ে ঠেকে—কিছুক্ষণ বাদেই আবার ভাস্‌তে থাকে—চলার আর বিরাম নেই! ভালবাসা জিনিষটা কি? চুপ ক'রে বসে আছি—কিছুক্ষণ মনের খেয়ালে একটা গান সুরু কর্‌লুম—তারপর আবার থামিয়ে দিলুম। ভালবাসাও তেম্‌নি। মানুষের জীবন বড়ো ফাঁকা। দুটি নদীর মাঝখানে বালুর বাঁধ দেবার মতই মানবের ভালবাসা। একজনের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই—তাকে দেখে বেশ ভাল লাগ্‌লো—তাই ভালবাস্‌লুম। কিন্তু কিছুকাল পরেই আর নূতনত্ব কিছু থাকে না—আবার পরিবর্ত্তনের জন্ম প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে!...এ এক চমৎকার প্রাকৃতিক নিয়ম। পরিবর্ত্তন—আবার বিশ্রাম; তেম্‌নি আশা এবং স্থিরতা—বহু এবং এক। বৎসে! এ গোলকধাঁধায় কিছুদিন ঘুরে নাও—জগতের পানপাত্র নিঃশেষে পান কর্ত্তে চেষ্টা করো।... অবশেষে আমার কাছে আস্‌তেই হবে—

[মণিকা মন্ত্রচালিতের মত তাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত হাত বাড়াইল—কিন্তু সব আস্তে আস্তে ঘুমের ঘোরে অদৃশ্য হইয়া গেল]

*

*　　*

*

তৃতীয় দৃশ্য

[অন্ধকার দৃশ্য আবার কিঞ্চিৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। মণিকা একটি সহরের তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান। তোরণদ্বারের ভিতর দিয়া সহরের আলোকমালা দেখা যাইতেছে। তোরণের একপার্শ্বে একটি যুবক দণ্ডায়মান। অপর পার্শ্বে একটি আবৃতমূর্ত্তি। সোমশিখর গাহিতে লাগিল]

আমারে ছাড়িয়া প্রিয়া সে আমার
　কোথা কোন্ পথ 'পরে?
আমি বাতায়নে বৃথা নিশি জাগি,
　নিরাশে নয়ন ঝরে।
বাহিরে আঁধার পথ সে অজানা—
কোথা চলে প্রিয়া নাহি শুনি মানা—
হেথা সজ্জিত রয়েছে সকলি,
　এস ফিরে এস ঘরে!

মণিকা　[ফিস্ ফিস্ করিয়া] এই কি সহর?

[সোমশিখর গাহিতে লাগিল]

শান্তির আশায় যদি ছুটিয়াছ নারী,
　হেথা এস—পাবে তাহা, হবে না বিফল;
তুমি মোর হৃদয়ের হবে অধিরাণী—
　ভালবেসে পাবে সুখ—জীবন সফল!

মণিকা। [তোরণদ্বারের দিকে বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া] এর ভেতরে বেশ গরম এবং আলো আছে...

[সোমশিখর গাহিতে লাগিল]

ওরে ও মোর মরম-বীণা
　বাজ্‌গে' প্রিয়ার কানে কানে,
ভ'রে দে'গে' পরাণটি তার
　আমার গোপন প্রণয়-গানে!

[মণিকা তাহার দিকে ছুটিয়া গেল; কিন্তু চারিদিকের আলোক আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল এবং সোমশিখর

ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া গেল। তোরণদ্বারে দেখা গেল পথিক দণ্ডায়মান]

মণিকা। ও, আপনি এখানে ?

পথিক। হৃদয়রাণীকে বুকে না পেলে সমস্ত জীবনটাই যে ফাঁকা হ'য়ে যায়! এসো প্রিয়ে—[হাত বাড়াইয়া তাকে ধরিলেন]

মণিকা। এখানে আমরা নিরাপদ তো ?

পথিক। নিরাপদ!—তার মানে? তোমার পাহাড়-জঙ্গালের ভিতরেই তুমি নিরাপদ ছিলে নাকি ?

মণিকা। আমি এ কোথায় এসেছি ?

পথিক। সহরে।

[হাসিমুখে তিনি তোরণদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন ; দূর থেকে সহরের আলোগুলি দেখিয়া মনে হইতেছিল—তারা যেন নাচিতেছে]

মণিকা। [ফিস্ ফিস্ করিয়া] ওগুলো কি ?

পথিক। আলো—প্রিয়তমে! ওরা হ'চ্ছে সহরের আলোকমালা। সহরের জীবনও এদেরই মতো রঙীন—এদেরই মতো নৃত্য-বৈচিত্র্যে ভরপূর!

মণিকা। এরা এত উজ্জ্বল ? ও কি—আমায় বিদ্রূপ কর্চ্ছে ?

পথিক। এসো—

মণিকা। আমার ভয় কর্চ্ছে!

পথিক। কেন—নূতনের সন্ধান পেয়ে ? তুমি কি শুধু পাহাড়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌তে চাও! পৃথিবীর এক টা দিক মাত্র দেখ্‌বে ? রাণী আমার! চিরটাকালই পাহাড়ের গরু-ভেড়াদের নিয়েই থাক্‌বে—নতুন জ্ঞানের আলোকে মনের অন্ধকার দূর কর্‌বার সুযোগ থাক্‌তেও ? আমি তোমায় কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখাবো—

মণিকা। তারা কি ভাল ?

পথিক। হাঁ. তারা সব—

মণিকা। [তোরণের দিকে অগ্রসর হইয়া] সহর কি সুন্দর এবং আলোকময়…এর ভেতরে কি অন্ধকার নেইই ?

পথিক। রাণী আমার! আমার অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে তোমার কাছ থেকে সব অন্ধকার দূর ক'রে রাখ্‌বো!

মণিকা। কিন্তু—আমি তো তোমায় ভালবাসিনে ?

পথিক। মণি, বেঁচে থাক্‌তে হ'লে ভালবাসতেই হবে! ভালবাসা এক অদ্ভুত ব্যাপার…আচ্ছা, নদী তটকূল ভেঙে ভেঙে ছুটে চলে—কেন চলে বল তো ? কারণ সে জানে—যে, তার এম্‌নি ভাবে ছুটতেই হবে অজানা প্রিয়তমের সন্ধানে—তার ভালবাসায় উন্মাদ হ'য়ে—নতুবা তার জীবনটাই ব্যর্থ। তা' না ক'রে সে যদি আধ-পথে গিয়ে থেমে যায়—তার ফলে কি হয় ?—তার মৃত্যু ঘটে। তাই ভালবাসা মানে—বেঁচে থাকা। দিন যদি রাত্রির পেছনে এম্‌নি ভাবে না ছুট্‌তো—দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন যদি না আস্‌তো—তা'হ'লে মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পার্‌তো কি ?… ভালবাসা জিনিষটা একটা আলেয়া—তার পেছনে যতই ছুট্‌বে—সে ততই দূরে চ'লে যাবে। দীর্ঘ দিবস এর পশ্চাতে ছুটে'—রাত্তিরে হয় তো তোমার মনে হবে যে তুমি তাকে পেয়েছ ও তোমার মুঠোর ভেতরে রয়েছে—কিন্তু আসলে হয় তো কিছুই পাওনি – সবটাই ফাঁকা। ব্যপায় তোমার বুক টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌বে—চোখ থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়্‌তে থাক্‌বে—তবু তাতেই সুখ পাবে! [ফিস্ ফিস্ করিয়া] এস প্রিয়ে—সহর দেখ্‌বে এস।

মণিকা। [বুকে হাত দিয়া] হাঁ, আমি যাবো—

[পথিক তাকে জড়াইয়া ধরিয়া তোরণদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল]

পথিক। আমায় ভালবাস্‌বে তো ?

মণিকা। হাঁ, আমি তোমায় ভালবাস্‌বো।

[তারা সহরে প্রবেশ করিল। পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। সোমশিখর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—এবং গান ধরিল]

বাতাসের আগে হায় সময় চলিয়া যায়
পেরেছ কি রোধিতে তাহারে ?
মিলনের হাটখানি দুদিনে ফুরাবে জানি,
বিরহ দাঁড়াবে আসি' দ্বারে।
নিত্য নব লীলারসে মানব সতত ভাসে,
কি তাহার জান পরিণাম ?
মুহূর্ত্তে এ খেলা-ঘর ভেঙে যাবে অবেলায়,
পূর্ণ নাহি হবে মনকাম!

প্রেমিক-প্রেমিকা সবে কোথায় মিলায়ে যাবে,
থাকিবে না কোন চিহ্ন তার ;
বৃথা সব আয়োজন— ব্যর্থ সব আশারাশি
বৃথা ব'সে গাঁথ ফুলহার !
কাল যে ভ্রমর-বঁধু পান করেছিল মধু
সুখস্বপ্নে হয়েছিল ভোর,—
চেয়ে দেখ আজ তার কোন চিহ্ন পাওয়া ভার,
সব সাধ হ'য়ে গেছে 'ওর' !

[তার সুর অদ্ভুত এবং আবেগপূর্ণ হইয়া উঠিল]

দুদিনের ভালবাসা দুদিনের সুখ-আশা
দুদিনের হাসি-অশ্রুজল—
কত তারে রোধিবারে করি চেষ্টা বারে বারে,
সময় তো মানে না শৃঙ্খল !
মানবের মন আহা বুঝেও বুঝে না তাহা
অন্ধ হ'য়ে ছুটে তারি আশে—
সোনার স্বপন যবে অসময়ে শেষ হবে
সে তখন যাবে কার পাশে ?

[আস্তে আস্তে গান থামিয়া গেল। সব অন্ধকার হইয়া আসিল। সোমশিখর ছায়ায় মিলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে চারিদিক উষার আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তোরণদ্বারের ভিতর হইতে মণিকা বাহির হইয়া আসিল। তার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে—যেন জীবনের উপর একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িয়াছে]

মণিকা। আমার অন্তরটা বুড়ো হ'য়ে গেছে !

[দূরে ফুলবালাদের গান শোনা গেল ; তোরণপথ দিয়া পথিক বাহির হইয়া আসিল]

পথিক। প্রিয়ে—

মণিকা। তুমি ! কেবলি তুমি ?

পথিক। তোমাকে দেখাবার আরও অনেক আশ্চর্য্য জিনিস আছে। [মণিকা মাথা নাড়িল] হ্যাঁ, সত্যি আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি ! নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর বিরক্ত হওনি ?

মণিকা। ঐ শোন—[ফুলবালাগণের গান শোনা গেল]

পথিক। বৈচিত্র্যহীন নিদ্রার নীরস সুর ! তবে কি জীবন আমার ব্যথায় ভ'রে উঠ্‌লো—তুমি আমার হবে না ?

মণিকা। তাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই—

পথিক। এসো !

মণিকা। [বুকে হাত দিয়া] এ পাখীটা আর উড়্‌তে পার্চ্ছে না। [ঠোঁটে হাত দিয়া] ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে।

পথিক। তুমি তবে আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে ?

মণিকা। ঐ দেখ—[তোরণদ্বারের ভিতর দিয়া উষার আলোকে গোশিখরকে দেখা গেল]

পথিক। ওটা কি ?

মণিকা। আমার লীলাভূমি পাহাড়—আমায় ডাক্‌ছে।

পথিক। ও কিছুই না [তাকে সজোরে ধরিয়া] ওগো যেও না, যেও না—আমি তোমাকে সহরের যা কিছু আশ্চর্য্য আছে দেখিয়েছি আরো দেখাবো...

[কিন্তু মণিকা তার দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল]

যদি বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে একত্র থাক্‌তে না পাই—এস আমরা দুজনে একসঙ্গে মরি ! —দেখ, ঘুমিয়ে-প'ড়ে-মরা আর ডুবে-মরা কত আরামের···চলো আমরা হয় একসঙ্গে ডুবে মরি, নয় ত একজনে আরেক জনকে বুকে নিয়ে চিরনিদ্রায় আবিষ্ট হই।

[দুইটি ছায়ামূর্ত্তি প্রবেশ করিল—'ঘুমিয়ে-প'ড়ে মরা' এবং 'ডুবে-মরা'—তারা নাচিতে নাচিতে মণিকার কাছে আসিল]। কিছুক্ষণ তার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হাসিল- তারপর আবার নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া গেল]

মণিকা। হাঁ, এরা দুটিই বেশ চমৎকার !

[সে আবার সহরের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই পথিকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু মণি তোরণদ্বারে পৌঁছিবামাত্রই ফুলবালাগণের গান এবং রাখালের বাঁশী শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোশিখর গাহিয়া উঠিল]

ধরার মেয়ে চ'লে এস ধরার কোলে খেল্‌বে যদি—
দোয়েল তোমায় গান শেখাবে নাচ্‌বে শিখী নিরবধি।
ফুলগুলি সব তোমায় ঘিরে খেল্‌বে নিত্য নূতন খেলা,—
তোমায় তারা কর্ব্বে রাণী—নিত্য মহোৎসবের মেলা !
কন্যা আমার চ'লে এস,— স্নেহ-শীতল কোলটি মম

রাখ্‌বে তোমায় সযতনে মিথ্যা কেন দূরে ভ্রম' !

[গানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইল। মণিকা সেদিকে ফিরিয়া বলিল]

মণিকা। এই আস্‌ছি।

পথিক। [মণির পা জড়াইয়া ধরিয়া] প্রিয়তমে ! তবে কি আমাকে এম্‌নি ভাবে মর্ত্তে হবে ? আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে ? তোমাকে ছাড়া আমার সমস্ত জীবনটাই যে শূন্য হ'য়ে যাবে !

মণিকা। [পা ছাড়াইয়া লইয়া] ছাড়ো বল্‌ছি—হতভাগা কোথাকার !···আমি চ'লে যাচ্ছি।

পথিক। সব অন্ধকার হ'য়ে গেল !

[তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়া উত্তরীয় দ্বারা মুখ ঢাকিল]

[মণিকা যখন গোশিখরের কাছে গেল—বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সমস্ত দৃশ্যটা অন্ধকার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গান এবং বাঁশীর শব্দের মিশ্রিত সুর শোনা যাইতে লাগিল।]

*

* *

*

চতুর্থ দৃশ্য

[কুয়াসাপূর্ণ উষার আলোকে দৃশ্য ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। মণিকা একটা সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত পর্ব্বতপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে সুনীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই নাই। তার পশ্চাতে আধখানা পাণ্ডুর চাঁদ দেখা যাইতেছে। একটি ঢালু পাহাড়ের উপর একটি রাখাল বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। নানা ভূষণে ভূষিত ফুলবালাগণ নাচিতেছে। প্রত্যেকেই মণিকাকে লক্ষ্য করিয়া এক একটি ফুল ছুঁড়িয়া মারিতেছে। মণিকা উহা কুড়াইয়া লইয়া নিজের কানে এবং চুলে গুঁজিতেছে।]

মণিকা। শিশির-বিন্দু !—[পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া] রাখাল !

[ফুলবালাগণ আসিয়া তাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারা যখন তার চারিদিকে নৃত্য করিতেছিল, সেই অবসরে রাখাল অদৃশ্য হইয়া গেল। সে ফুলবালাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল—তাহারাও অদৃশ্য হইয়া গেল। কুয়াসায় সমস্ত দৃশ্যটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল]

মণিকা। চ'লে গেল...

[হাতে চোখ রগড়াইয়া আবার পাহাড়ের দিকে ফিরিয়া তাকাইল। দেখিতে পাইল—মধু দাঁড়াইয়া আছে]

মণিকা। তুমি !

মধু। এই যে তুমি ফিরে এসেছ,—সহর কেমন লাগ্‌লো ? অত দেরী হ'ল যে ? সেখানে শান্তি পেলে না নিশ্চয়ই !

মণিকা। আমি তাতে দুঃখিত নই।

মধু। তবে ফিরে এলে কেন ?

মণিকা। বড্ডো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম—তাই।

মধু। আমায় আর কোনদিন ছেড়ে যেতে পার্ব্বে না—।

মণিকা। কেন—[বিদ্রূপের সুরে] কি তোমার আছে যা দিয়ে তুমি আমায় বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বে ?

মধু। [মণিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া] এম্‌নি ভাবে।

মণিকা। জানো—আমি পরিবর্ত্তনের আস্বাদ পেয়েছি—এখন আর সেই অজ্‌ খুকীটি নই !

মধু। [চিন্তিত ভাবে] হাঁ, তুমি অনেকটা বদলে গেছ। তোমার চোখগুলো ব'সে গেছে—মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে পড়েছে—!

মণিকা। তবে—তোমার এখানে এমন কি আছে—যার প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো ?

মধু। ঐ সূর্য্য—

মণিকা। আমাকে পুড়িয়ে মার্‌বার জন্যে ?

মধু। বাতাস—

[বাতাসের মৃদু শব্দ শোনা গেল]

মণিকা। আমায় ঠাণ্ডা লাগাবার জন্যে ?

মধু। নিস্তব্ধতা—

[বাতাসের শব্দ থামিয়া গেল]

মণিকা। হাঁ, এ জায়গাটা নির্জ্জন বটে !

মধু। ফুলশিশুরা তোমায় ঘিরে নাচ্‌বে—

[ফুলবালাগণ নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর একে একে সবাই ঘুমাইয়া পড়িল]

মণি। দেখো, এরাও কেমন এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়ে...

মধু। ছাগশিশুরা এদের ঘুম ভাঙাবে।

[রাখাল আবার পর্ব্বতশিখরে দেখা দিল। তার বাঁশী বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাগশিশুগণ নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল। তারা ফুলবালাগণকে ঘিরিয়া কিছুক্ষণ নৃত্য করিবার পর তাদের ঘুম ভাঙিল। আবার সকলে একসঙ্গে নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল। রাখালের বাঁশী থামিয়া গেল]

মধু। মণি, আমায় ভালবাস ?

মণিকা। তুমি মোটেই সুন্দর নও।

মধু। মণি, আমায় ভালবাস ?

মণিকা। যাও—তুমি একদম নীরস !

মধু। তা' বটে—আমার বাক্‌চাতুরী নেই। শোন! এই আমার কণ্ঠস্বর—[হাতে চারিদিক দেখাইয়া] কোথাও টুঁ শব্দ নেই! ঊষা থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যা-তারার উদয় পর্য্যন্ত সব নীরব—নিস্তব্ধ !

[তার হাত মণিকার বুকের উপর রাখিয়া]

এ পাখীটার আর দিনরাত উড়ে বেড়াতে হবে না...

মণিকা। [মধুর চোখদুটো ধরিয়া] তোমার চোখ-দুটো বড়ো ভয়ানক! এদের ভেতর আমি যেন সব হিংস্র জন্তুর তাণ্ডবলীলা দেখ্‌তে পাই...আচ্ছা, এরা কি সব-সময়েই এ রকম ভীষণ থাকে নাকি ?

মধু। কখ্‌খনো না। তোমার দিকে চাইতেই এরা এ-রকম জ্ব'লে ওঠে! কেন জানো ? আমি তোমায় একান্ত ভাবে চাই...তুমি যে একটা ফুল—আমি তোমায় মাথার ভূষণ ক'রে রাখ্‌তে চাই!

মণিকা। [মধুর করতল স্পর্শ করিয়া] কিন্তু তোমার হাত বড় কর্কশ—এতে ফুল তোলা চল্‌বে কি ?

[সহসা তার আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সে পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। সেখানে রাখাল শুইয়া আছে]

মণিকা। হেথা একটা গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়্‌ছে না—দিনটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে!...রাখাল!

[রাখাল নড়িল না—কথাও বলিল না]

আকাশের সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছে! [আবেগের সহিত] রাখাল! না:—ও আমার ডাকে সাড়া দেবে না। এখানে কেউ আমার ডাকে সাড়া দেবে না—

মধু। [অত্যন্ত আগ্রহের সহিত] কেন—আমি কি কেউ নই ?

[সন্ধ্যার অন্ধকার দৃশ্যটাকে ঘিরিয়া ফেলিল]

মণিকা। দেখ, ঘুমেতেই দিনটা কেটে গেল। রাত্রি হ'য়ে গেছে।

[কতকগুলি মেয়ে ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া প্রবেশ করিল। তারা ঘুমের মূর্ত্তি—তাদের পরিচ্ছদ সাদা। তারা মণিকাকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল]

মণিকা। কে ?—তোমরা কারা ? তোমরাই কি নিদ্রার মূর্ত্তি ? আমার সাধনার ধন—নিদ্রা! আর সাধের বিশ্রাম!

[হাসিমুখে সে মধুর দিকে হাত বাড়াইল]

[মধু তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া নিদ্রার মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। সব অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। চাঁদের মৃদু আলোকে দৃশ্যটা কিছু আলোকিত হইয়া উঠিল। পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া রাখাল গাহিল]

ছোট্ট আমার ছাগশিশু রে
বড়ই তোরে ভালবাসি,—
নিতুই তোরে দেখ্‌তে যে সাধ
তাই ত হেথা নিত্য আসি।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা
আর যত সব দেব্‌তা আছে
ভরিয়ে দে' বাক্ মাঠখানি তোর
সবুজ সজীব কোমল ঘাসে।
বাঘ-বাঘিনী-সিংহ শ্বাপদ
না পায় যেন সন্ধান তোর ;
সুখেই যেন দিন কেটে যায়—
সুখেই নিশা হয় যেন ভোর!

[রাখালের গান থামিয়া গেল। চাঁদ অদৃশ্য হইল—সব অন্ধকার হইয়া গেল। একটা মিথ্যা উষার আলো দেখা দিল—দেখা গেল মণিকা নিদ্রিত মধুর পাশ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। রাখাল চলিয়া গিয়াছে। গোশিখর কুয়াসা-আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে]

উঃ—কতটা কাল আমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি ·· আমার অন্তরটা ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে উঠেছে!

[সহসা বড় পাহাড়ের চূড়ায় একটি যুবককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া] আমি তোমায় এখন চিন্‌তে পেরেছি। —পৃথিবীর প্রাণ, আমি তোমার গন্ধ পাচ্ছি, তোমার দৃষ্টি আমি চিন্‌তে পার্চ্ছি! তোমায় ছেড়ে আমি চ'লে গিয়েছিলাম! এই আস্‌ছি—

[চলিতে আরম্ভ করিল]

মধু। [জাগিয়া] ওকি—কোথায় যাচ্ছ?

মণিকা। পৃথিবীর পরপারে—

মধু। [উঠিয়া তাকে থামাইবার চেষ্টায়] আমায় ছেড়ে তুমি কিছুতেই যেতে পার্‌বে না।

[মণির হাসিমুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

মণিকা। বন্ধু, আমার সময় এসেছে···

মধু। তবে কি আমার ওষ্ঠস্পর্শ বড়ই নিষ্ঠুর হয়েছিল? আমি কি কোন খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার ওপর?

মণিকা। না—তাতে আমি দুঃখিত হইনি।—কিন্তু আমায় যেতেই হবে! আর যে সময় নেই...

[সোমশিখরকে দেখা গেল। গোশিখরও ঠিক তার বিপরীত দিকে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পিয়ানোর ধ্বনি শোনা গেল]

মধু। সহরের অভিশপ্ত বাদ্যধ্বনি···তবে কি তুমি তারই কাছে ফিরে যাচ্ছ? [সোমশিখরকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া] কই—আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে—

মণিকা। আমার জন্য ভেবো না বন্ধু—আমি চিরদিন অগ্রগতির পথেই যাবো।

মধু। প্রেয়সী—আমায় এ নির্জ্জন বনে হাওয়ার সাথী ক'রে রেখে একলা ফেলে চ'লে যেও না—তুমি চ'লে গেলে আমার ভালবাসার মৃত্যু ঘট্‌বে—সঙ্গে সঙ্গে আমিও ম'রে যাব।

[মণিকাকে জড়াইয়া ধরিল]

মণিকা। ছাড়ো হতভাগা কোথাকার—আমি যাবোই—

মধু। [পাথরে মাথা ঠুকিয়া] উঃ—সব শেষ হ'য়ে গেল!

[রাখালের বাঁশী বাজিয়া উঠিল—গোশিখর মানুষের মত তার দিকে হাত বাড়াইল। পিয়ানো বাজিল—সঙ্গে সঙ্গে সোমশিখরও মণিকার দিকে হাত বাড়াইল। মণিকা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

মণিকা। বন্ধুগণ, আমায় যেতেই হবে। এক্ষুণি ভোর হ'য়ে যাবে।

[নীরবে সোমশিখর ও গোশিখর কুয়াসা-উত্তরীয় দিয়া মুখ ঢাকিল। মিথ্যা-উষার আলো নিভিয়া গেল—সব অন্ধকার হইয়া গেল]

* * * *

পঞ্চম দৃশ্য

[একটা অস্পষ্ট আলোকে বড়-পাহাড়ের চূড়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেখানে মণিকা দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে সব অন্ধকার। কেবল গোশিখর ও সোমশিখর ছায়ার মত দাঁড়াইয়া আছে—দেখা যাইতেছে]

মণিকা। হে বিরাট, হে মহান্‌, আমি এসেছি।

বড়-পাহাড়। ঘূর্ণায়মান বহ্নি, চিরচঞ্চল ভাবে তুমি চারিদিকে সব জিনিস দগ্ধ ক'রে এসেছ। যেখানে গেছ সবাইকে কাঁদিয়ে এসেছ; তবু তাতে তোমার অনুমাত্র অনুতাপ হ'চ্ছে না! বৎসে,—তোমার নিয়ত্তর ঘূর্ণিপাক চিরদিনের মত থেমে গেছে···তোমার জীবনের সব কাজ সব ঘোরাঘুরি শেষ হ'য়ে গেছে! ওগো অজানা সাগর-পারের যাত্রী, তুমি সেই দেশের সন্ধানী—যেখানে আলো এবং আঁধার, পরিবর্ত্তন এবং শান্তিতে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নেই! —সবই এক। বৎসে, এবার অজানার হাতে নিজেকে স'পে দাও,—তারই নির্দ্দেশে চল্‌তে থাকো—তবেই শান্তি পাবে।

[মণিকা হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাকে প্রণাম করিল। আস্তে আস্তে আলো নিষ্প্রভ হইয়া গেল]

* * * *

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ভোর হইয়া আসিয়াছে। মধু এবং পথিক মণিকার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

মধু। [মণিকাকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়া] মণি, ওঠ, রাত যে ভোর হ'য়ে এল—

[মণিকা নড়িয়া উঠিল,—তার ঠোঁটদুটি কাঁপিতে লাগিল—যেন কি বলিতেছে]

পথিক। থাক্‌না—ঘুমোক্‌। ও স্বপ্ন দেখ্‌ছে!

[মধু বাতি জ্বালাইল—তার আলো মণির মুখের উপর পড়িল। তারপর তারা দুইজনে চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল। মণিকা কথা বলিয়া উঠিল]

মণিকা। [হাঁটু ভাঙিয়া বসিয়া যন্ত্রচালিতবৎ হাত জোড় করিয়া] হে মহান্‌, আমি এসেছি!

[তারপর জাগিয়া চারিদিকে চাহিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইল] ও—একি! আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম?

[খোলা জানালা দিয়া আকাশে উষার আলো দেখা গেল। রাস্তা দিয়া রাখালগণ গরু লইয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে—তাদের আনন্দ-কোলাহল শোনা গেল।]

যবনিকা-পতন

ভিখারিণী মেয়ে

কুমারী অচলা মুখোপাধ্যায়

ভাদ্র মাস। আকাশ যেন অভিমানে গম্‌গম্‌ কর্‌ছে। ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি—কড়্‌কড়্‌ ক'রে মেঘ ডাক্‌ছে; বিদ্যুৎ চম্‌কাল—

ছোট্ট একটি কুটীরে একজন বৃদ্ধা রোগী ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে; মধ্যে মধ্যে রোগের যন্ত্রণায় গোঁগাচ্ছে। মাথার শিয়রে একটি ৯।১০ বছরের মেয়ে ব'সে। ভাদরের আকাশের মতই তার চোখদুটি ছল্‌ছল্‌ কর্‌ছে। আজ তিনদিন সে কিছুই পায় নি। বৃষ্টির জন্য বাড়ী থেকে বা'র হ'তে পারে নি। যদি একটু বৃষ্টি থামে সে ভিক্ষায় বা'র হয় কিন্তু কেউই কিছু দিতে চায় না; অতি কষ্টে যা কিছু পায় তা তার রোগাক্রান্তা মাকে দিয়ে কিছু বাঁচে না।

কিন্তু আজ? আজ যে কিছুই নেই! তার ক্ষুধার্ত্তা মাকে সে কি খেতে দেবে? বালিকা একমনে ভাব্‌ছে তার স্নেহময়ী মা'র কথা—তার মা নিজে কতদিন না খেয়ে তাকে খেতে দিয়েছেন; তাকে আনন্দিত দেখ্‌লে কত আনন্দিত হয়েছেন; এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। হায় রে! আমি যদি মা'র ছেলে হ'তাম, তাহ'লে কি আজ মান-অপমান, ঝড়-বৃষ্টি কিছুই ভ্রূক্ষেপ কর্‌তাম? নাঃ—মা'র প্রাণের চেয়ে কি মান-অপমান, ঝড়-বৃষ্টি বেশী? মনকে দৃঢ় কর্‌তে হবে! আমি তো ভিখারিণীর মেয়ে, আমার আবার মান-অপমান, ঝড়-বৃষ্টি কি? যে করেই হোক্‌ মাকে বাঁচাতে হবে। বালিকার মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল। সে তার মা'র দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। তার মাকে নিদ্রিতা দেখে মনে মনে বোধ হয় সে আনন্দ অনুভব কর্‌ল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল।

বড় বাড়ী—এই বৃষ্টির দিনে বাড়ীর লোকেরা কেউ বা তাস কেউ বা ক্যারাম খেল্‌ছে; কেউ বা হাতে একখানা ডিটেক্‌টিভ নভেল নিয়ে পাতা ওল্‌টাচ্ছে—চোখে ঘুমের আবেশ। এই রকম আনন্দে তারা দুপুরবেলাটা কাটাচ্ছে। বাড়ীর চাকর-দরোয়ানরা সদর দরজা বন্ধ ক'রে নিজেদের ঘরে ঘুমুচ্ছে। এমন সময় ভিখারিণী মেয়ে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে, "ওগো কিছু ভিক্ষে দাও না গো, এই ঝড়-জলে বড় কষ্ট পাচ্ছি, আজ তিন দিন কিছু খাইও নি—" বার বার ধাক্কা দেওয়াতে দরোয়ানটা খুব বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; দরজা খুলে যখন ভিখারিণী মেয়েকে দেখ্‌লে তখন তার ক্রোধের মাত্রাটা বেড়ে উঠ্‌ল যেন সহস্র গুণে—সে কর্কশস্বরে বল্‌ল, "বেরিয়ে যা! ভিক্ষে পাবি নে—"এই ব'লে

তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দিলে।…নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে ভিখারিণী মেয়ে রাস্তায় মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল।

আঘাতটা জোরেই লেগেছিল—নাক দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে,—কপালের খানিকটা কেটে গিয়েছে—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌তে লাগ্‌ল। রাস্তার পাহারাওয়ালা ছুটে এসে দরোয়ানটাকে ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল,'কেয়া কর্‌তা—খুন করেগা ?' গোলমাল শুনে ওপর থেকে বাবুরা অনেকে ছুটে এলেন ও ব্যাপারটা কি দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। দরোয়ান তখন একটু ভয় পেয়েছে, সে নিজের দোষ কাটাবার জন্য বল্‌ল, "আমি দরজা বন্ধ কর্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। আর এই মেয়েটা চুরি কর্‌বার মতলবে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকছিল ; এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়, আমি তাড়া ক'রে যাওয়াতে,ও ভয় পেয়ে দৌড়ে যেতে গিয়ে উল্টে প'ড়ে গেল—" মেয়েটি দরোয়ানের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইলে, সে দৃষ্টি সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা বুঝি দরোয়ানের ছিল না ; তাই সে চোখ নামিয়ে নিল।

বাবুদের মধ্যে একজন মেয়েটির দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "এইটুকু মেয়ে,—এই বয়স থেকেই চুরি ? না জানি বড় হ'লে কি হবে!" মেয়েটি এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ছিল, এইবার মুখ তুলে কি বল্‌তে যাচ্ছিলো, কিন্তু কোন কথাই ফুট্‌লো না। তার প্রাণের মধ্যে ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেল। রাগ, দুঃখ, অপমান, অভিমান একসঙ্গে মিলে-মিশে বুকে তার দুরন্ত তরঙ্গ তুলে দিলে। তার কিছুই প্রকাশ কর্‌বার সে ভাষা পেল না। অত্যন্ত বিহ্বল ও বেদনা-পীড়িত হৃদয়ে সে কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলে গেল।

বৃষ্টি তখন একটু থেমেছে ; কিন্তু ভিখারিণী মেয়ের পা আর চলে না। তিন দিন কিছু খায়নি—তার ওপর এই সাংঘাতিক আঘাত! টল্‌তে টল্‌তে চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কোথায় যাবে ? হায় রে! তবে কি সে তার মাকে বাঁচাতে পার্‌বে না ? তার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। মুখখানি তার শিশির-ভেজা গোলাপ ফুলের মতই সুন্দর দেখাচ্ছিল। এমন সময় একখানা ট্যাক্সি তার গায়ে এসে পড়্‌ল ; সে ছিট্‌কে পাশে প'ড়ে গেল। ড্রাইভারটা তাড়াতাড়ি গাড়ীখানা থামিয়ে ফেল্‌লে। কয়েকজন লোক গাড়ী থেকে নেমে মেয়েটিকে তুল্‌ল—কিন্তু তখন সে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

খানিক পরে ভিখারিণী চোখ মেলে চাইল; হঠাৎ কি কথা মনে হওয়াতে উঠ্‌তে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু কিছুতেই পার্‌ল না। তাকে উঠ্‌তে দেখে একজন লোক তার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বল্‌ল—"পুলিশে খবর দিও না ; তুমিই ত গাড়ীর সামনে এসে পড়্‌লে…তোমার শরীর সুস্থ হয়েছে তো ?" মেয়েটি অবাক হ'য়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে রইল—সে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছে ? ভগবান কতই করুণা তোমার! তার গায়ে যেন জোর ফিরে এল।

সে বারবার সেই দাতার দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে সামনে-দাঁড়ান রিক্‌সখানি ভাড়া ক'রে তাতে উঠে বস্‌ল। রিক্‌স একটা ময়রার দোকানে এসে দাঁড়ালে সে অনেককিছু কিনে নিয়ে বাড়ীর দিকে চল্‌ল। মা যখন এই-সবগুলি পেয়ে তৃপ্ত হবেন তখন তাঁর মুখখানি আনন্দে ভ'রে উঠ্‌বে—সেই সকল দৃশ্য কল্পনা কর্‌তে কর্‌তে ভিখারিণী মেয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

ঐ তো তাদের কুটীরখানি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একি! বাড়ীতে অতগুলি লোক জুটেছে কেন ? ভিখারিণীর বুক ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল। কোন কি অকল্যাণ—? না, না তা কি হয় ? সে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়্‌ল। এ্যাঁ—একি! ভগবান এত নিষ্ঠুর তুমি ? মা, মা,—চেয়ে দেখ,তোমার জন্য কত জিনিষ এনেছি! ওঃ—এত করেও তোমাকে বাঁচাতে পার্‌লাম না ?…ভিখারিণী মেয়ে চীৎকার ক'রে তার মা'র মৃতদেহের ওপর আছ্‌ড়ে পড়্‌ল।

তারপর ? তারপর সব নিস্তব্ধ। শুধু একবার বেদনাতুর কুটীরখানা হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল। *

* লেখিকা একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

রায়বেঁশে

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

যখন সহরবাসী 'প্যাভ্‌লোভা','উদয়শঙ্কর' প্রভৃতির নৃত্যে বিভোর, তখন আমাদের পল্লীগ্রামে পুরাতন অথচ চির-নূতন রায়বেঁশে নৃত্যের নূতন হিল্লোল তুলিয়াছেন আমাদের বন্ধুবর সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্। এই নৃত্য বহুদিন অনাদৃত অবস্থায় আত্মগোপন করিয়া ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। বিবাহের শোভাযাত্রার সঙ্গে রাইবিশে দলের নৃত্য এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু এই রাইবিশে দলই যে আমাদের সেই রণদুর্দ্ধর্ষ বাঙ্গালীবীরের বংশধর তাহা আমরা এতদিন জানিতে পারি নাই। গুরুসদয় লিখিয়াছেন,—"কিন্তু ইহা এই পতিত বাঙ্গালী সমাজের একটা পরম আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের কথা যে, উপবাসে নিরন্নোদর, শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত ও অস্পৃশ্যতার অন্ধ অবজ্ঞায় উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, ইহাদের আত্মার বীরোচিত তেজ ও আনন্দ ইহারা এখনো হারায় নাই; এবং তাহারা এই মহাসম্পদ্‌গুলি হারায় নাই বলিয়াই এখনো বাঙ্গালী হয়ত অতীতের আত্মঘাতী ভুল সংশোধন করিয়া ইহাদিগকে ইহাদের উপযুক্ত আদর ও স্নেহ দান করিয়া ইহাদের অন্নসংস্থান ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, ইহাদিগকে বীরোচিত-প্রকৃতির শিক্ষকের পদে বরণ করিয়া লইবে, এবং ইহাদিগের নিকট হইতে আমাদের অতীত যুগের এই সকল উদ্দীপনাময় অমূল্য সামরিক নৃত্যকলা ও ব্যায়াম-ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনে আবার শক্তি, সাহস ও আনন্দের সহজ ও জীবন্ত ধারার উৎস জাগাইয়া তুলিতে পারিবে, এই আশা আমি করি। এই যে আজ আমাদেরই অতি আপন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের সঙ্গে আমাদের বহুযুগের পর নূতন করিয়া আবার পরিচয় হইল, তাহার ফলে যেন সেই উদ্বোধন ও সেই প্রচেষ্টা আমাদের 'শিক্ষিত', 'সম্ভ্রান্ত' ও 'ভদ্র' সমাজের হয়—এই আমার প্রাণের আশা ও প্রার্থনা। 'রাইবিশে' নামে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও আজ সেই অতীত যুগের গৌরবময় বাংলার বীরসন্তান 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের বীর বংশধরগণ আমাদিগকে আবার বীর-প্রকৃতিতে নূতন করিয়া দীক্ষিত করুক্ ও বীরের প্রকৃত মর্য্যাদা দেখাইতে আমাদিগকে শিক্ষিত করুক্।... বাঙ্গালী যেন বাংলার পল্লীতে শত উদয়শঙ্করের শিক্ষাগুরু-স্থানীয় ভারতীয় আদিম বিশুদ্ধ তাণ্ডব নৃত্যকলার যে জীবন্ত মূর্ত্তরূপ আজ কাঙ্গাল বেশে বাংলার পথে পথে বেড়াইতেছে, তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে এবং তাহার প্রকৃত আদর করে।"

এই বীর-নৃত্যের মধ্যে কালপ্রভাবে বহু ভেজাল জুটিয়াছিল। রায়বেঁশে 'রাইবিশে' হইয়া খেম্‌টা-নাচের হীন অনুকরণ-পটু হইয়াছিল। গুরুসদয় এই নৃত্য হইতে খাঁটি বীর-নৃত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বীরভূমের 'গোয়ালিয়ারা'র যে রায়বেঁশে সেনা কলিঙ্গ জয় করিয়াছিল, যাহারা মান-সিংহের সময়ের অজেয় বীর বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহাদেরি

বংশধরগণের নৃত্যকে খাঁটি রায়বেঁশে নৃত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমাদের এই নৃত্য দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সত্যই "এমন পুরুষোচিত নৃত্য দুর্লভ"—আমিও এই নৃত্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। কি বিচিত্র লীলাময় অঙ্গচালনা, কি লীলাময় ক্ষিপ্র-লঘু গতি!

এই রায়বেঁশেগণ সত্যই যেন রসকলার সাধক, শত অবজ্ঞা-অনাদরের মধ্যে ইহারা সেই প্রাচীন নৃত্যকে আপন করিয়া রাখিয়াছে। গুরুসদয়ের সোনার কাঠির স্পর্শে আজ মৌনমূক অনাদি অতীতের মুখে বাণী ফুটিয়াছে! এই রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলনের জন্য গুরুসদয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় দরদী-হৃদয় বাংলার গৌরব। সৌভাগ্যক্রমে তিনি কতকগুলি সুযোগ্য সহযোগী পাইয়াছেন—বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্-এ, শ্রীযুক্ত রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র এবং স্থানীয় লিজ (Lee's) ক্লাবের উৎসাহী সভ্যগণ।

লাভপুর, সুলতানপুর, নলহাটী প্রভৃতি স্থানগুলিতে রায়বেঁশে নৃত্য ও ব্যায়ামের প্রচলন হইয়াছে। উহা দেখিবার জিনিষ। দেশের ছেলেরা এমন সুন্দর স্বদেশী সহজ-সরল নৃত্য ও ব্যায়াম যে কেন এতদিন শিখে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য মনে হয়। এই নৃত্য সম্বন্ধে গুরুসদয় 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে ধারাবাহিক যে সুন্দর প্রবন্ধগুলি লিখিতেছেন, তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই পাঠ করা উচিত। এ নৃত্য সম্বন্ধে কেন যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে না দেখিয়া দুঃখ হয়। অদ্য আমি গুরুসদয়ের রচিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি, এবং যদি পাঠক-পাঠিকাগণের অনুমতি পাই, এ নৃত্য সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রায়বেঁশের পরিচয়

"বাঙ্গালী যোদ্ধার কি স্বরূপ দেখায়
তার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি যদি দেখ্‌বি ত আয়।
'বোরো-বোদুর' ও অজন্তার গুহা হ'তে
যেন উঠে এসেছে লোক বাংলায় পথে!
বহু দীর্ঘ শতাব্দীর অবজ্ঞা স'য়ে
পথে ভ্রমে বীরের দল কাঙ্গাল হ'য়ে।
তবু ভোলে না অতীতের গৌরব-ধারা,
নীচে বীরের নৃত্য—হ'য়ে আত্মহারা।
পদ-দলিত লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত
থাকে নিরন্নোদর—রাখে বক্ষ স্ফীত!
পায়ে বাজন-নূপুর, বুকে অসীম সাহস,
পেটে অন্নের ক্ষুধা, মুখে নৃত্যের হরষ;—
মুহুঃ হুঙ্কার-রবে ভীতি জাগায় মনে,
তেজো-দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ-ঝলক্ নয়নে;—
বেড়া-পাকের চাকে কভু দ্রুত ঘুরে,
বেগে দাপট মেরে' কভু শূন্যে উড়ে;—
কভু ব্যাঘ্র-ঝম্পে পড়ে ভূমিতলে,
কভু লম্ফে কাঁপায় ক্ষিতি সিংহের বলে।
মহা-দেবের মূর্ত্তি কালের ভস্মে ঢেকে',—
খেলে তাণ্ডব-নৃত্য গায়ে ধূলি মেখে';—
রণ-ভল্ল-বিহীন হাতে মুষ্টি পেকে'
রণ-ভল্ল-বিক্ষেপ-রীতি বেড়ায় এঁকে।
কবে আস্‌বে সে দিন,—ভাবে থেকে' থেকে'—
যেদিন চিন্‌বে স্বদেশবাসী আমরা যে কে?"

গুরুসদয় সত্যই গাহিয়াছেন—

"রণ-নৃত্য-কলার তেজোদ্দীপক ধারা
যারা বুঝ্‌বে,—এদের দেখে বুঝুক্ তারা।
রণ-বীরের ক্রীড়ার তেজোস্ফুটক ধারা
যারা শিখ্‌বে,—এদের কাছে শিখুক্ তারা।"

—পুষ্পপাত্র, আশ্বিন, ১৩৩৭

লোকারণ্য—শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত। ১১নং কলেজ স্কোয়ার, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং হইতে আশুতোষ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—আড়াই টাকা।

সংবাদপত্র-জগতের হট্টগোল হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার সাহিত্যজগতের রোমাঞ্চকর জীবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও তিনখানি উপন্যাস বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি জাতির সুখদুঃখ, ভালোমন্দ এবং আশানৈরাশ্যের সংঘর্ষে আসিয়া মনের মধ্যে যে প্রবল আঘাত ও স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে উহার পরিস্ফুট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার অধুনাতম উপন্যাস "লোকারণ্যের" মধ্যেও আমরা জাতীয় জীবনের একটা বিরাট অংশের সন্ধান পাইলাম। নেতৃত্ব ও ক্ষমতা-লোলুপ "গণপতি"কে এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবক "বিশ্বপতি"কে আমরা কোনও না কোনও আকারে প্রত্যহ জাতীয় জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে দেখিতেছি। ইহারা আমাদের মনের উপর দাগ কাটিয়া দেয়, কারণ বাহিরের যে রূপটা লইয়া আমরা পলিটিক্সে হল্লা করি, সেটা সংবাদপত্রের রূপ, কিন্তু আর্টিষ্টের নির্ম্মমতার মধ্য দিয়া আমরা ইহাদের অন্তরের মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম। আন্দোলনের আকর্ষণে "সুপ্রভা" অকস্মাৎ তাহার নিভৃত অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া "গণপতি"র জীবনে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা একদিকে উপন্যাসটিকে যেমন সজীব করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই আমাদের সম্মুখে এক সমস্যার সূত্রপাত করিয়াছে। পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশা—তাহা যতই সুবুদ্ধিপ্রসূত হউক না কেন, ঘটনাচক্রে সেই সম্পর্ক কেমন জটিল ও মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতে পারে সুপ্রভা ও গণপতি তাহার একটা জীবন্ত চিত্র। অন্যের মধ্যে সুপ্রভার স্বামীর চরিত্রটি অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। "বিনোদ" স্বামী-জগতের একটি 'টাইপ্'—স্ত্রীর অপেক্ষা টাকা এবং টাকার অপেক্ষাও ভণ্ডামি এই লোকটির প্রধান অবলম্বন।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের মর্ম্মান্তিক পরিণতি ও নিষ্পাপ বালিকা 'শান্তি'র করুণ মৃত্যু লেখক কৃতিত্বের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে যে চমকপ্রদ নাটকীয় ভাবটি আছে, তাহা আর একটু সংযত হইলে, বোধ হয় উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। 'কবি অতুলের' পত্নী বেশ মাধুর্য্যপূর্ণ, কিন্তু নারীজগতের নূতন কোন রূপ তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। 'কবি অতুল'কেও আমরা ভালবাসি, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার অবসর দেন নাই। 'সবিতা' ও 'অসীমের' প্রেম, বিরোধের মধ্য দিয়া সংযমের সহিত অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে বিশেষ নূতনত্ব ইহার মধ্যে নাই।

বহু লোকের এবং বিরাট জনতার কোলাহলে পড়িয়া আমাদের জীবনের গতি মাঝে মাঝে কিরূপ বিপর্য্যয়ের সূচনা করে, প্রফুল্ল বাবুর 'লোকারণ্য'

আমাদিগকে সেই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিল। ইহাই এই উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং শক্তিমান লেখকের ভাষা ও বর্ণনা-গুণে তাহা দুঃখের মাধুর্য্য লইয়া বাঙালী পাঠকের মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে।

ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই অতি সুন্দর এবং প্রকাশক-দিগের শিল্পরুচির পরিচায়ক।

বিপ্লবী-নায়িকা—শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—যুগান্তর বাণী-ভবন, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মূল্য ১।০ আনা।

ফরাসী দেশের 'মেরিয়া থেরেসা' সম্বন্ধীয় একটি কবিতা 'বিপ্লবী-নায়িকা' নামে এই গ্রন্থে প্রথম-কবিতারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই জানেন যে, এই থেরেসার জীবন কোন প্রচলিত সামাজিক বিধিবন্ধনের সীমায় আবদ্ধ ছিল না—কিন্তু তৎকালিক ফরাসী সমাজ ইহার প্রভাবে আংশিক পরিচালিত হইত; প্রথম-জীবনে সম্রাট্ নেপোলিয়নও একদা ইঁহার সান্নিধ্যে অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রথম-কবিতার নামানুসরণেই গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—'বিপ্লবী-নায়িকা।'

কিন্তু নাম শুনিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই—রাষ্ট্রবিপ্লবাত্মক গ্রন্থ ইহা নহে; এক দিক দিয়া যদিও ইহাকে সমাজ-বিপ্লবের খণ্ডচিত্র বলা যায়। প্রচলিত সংস্কার-বদ্ধ কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস—এই অর্থে সমাজ-বিপ্লব। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার নারীর শক্তিরূপ বা পৌরুষময়ী প্রকৃতির অন্বেষণ করিয়াছেন - বহির্বিশ্বের গতি-পথে। এই গতি-পথে শক্তির সহিত সেবাও হাত-ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে—ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রাকে মধ্যকেন্দ্র করিয়া।...পশ্চাতে পশ্চাতে সমাজনির্জ্জিতা পতিতা চলিয়াছে তার নারীত্বের অভিমান লইয়া, সম-পাদক্ষেপে।

কাব্যকে সমাজনীতির দিক দিয়া বিচার করা হয় ত সঙ্গত হইবে না; কিন্তু "সমাজের নীতি-বিধান মাত্রই কি নারীর শৃঙ্খল স্বরূপ", এ প্রশ্ন যদি কেহ আজ সহসা করিয়া বসেন, তাঁহাকে দোষ দেওয়া যাইবে কি?...উন্মাদনার আধিক্য এই কাব্যখানিকে দুর্ব্বার জলোচ্ছ্বাসের মত এতই অস্ত-চঞ্চল করিয়াছে যে, প্রশান্ত আকাশের প্রতিবিম্ব ইহাতে স্থিরভাবে পড়িতে পারে নাই; অবশ্য, অন্য পক্ষে উন্মাদনাই কাব্যের প্রাণ।

কাব্যবিচারে কিছুই যে ত্রুটিবিচ্যুতি ইহাতে নাই, ইহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। কিন্তু সাহসিক প্রকাশে, বলিষ্ঠ ভাষায় ও প্রাণশীল ছন্দে ইহা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন সুর আনিয়া দিয়াছে—বলিতেই হইবে। প্রত্যেকটি পংক্তিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া এই কাব্য-গ্রন্থখানি তরুণ কবির জয়গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

—বঃ সঃ

বার্ষিক শিশুসাথী—শ্রী রাজকুমার চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী। মূল্য—১৸০ টাকা।

আজকাল শিশুদের জন্য বিশেষভাবে লেখা একশ্রেণীর বার্ষিকী বাজারে দেখা দিয়াছে। বোধ হয় আশুতোষ লাইব্রেরীই ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। শিশুদের জন্য কোন-কিছু প্রকাশ করার দায়িত্ব বড়ই বেশী। ভালমন্দ সকলই তাহাদের কচি মনকে সহজে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। সেইজন্য যাহাতে শিশুর মনের সরল সাবলীল গঠন-ক্রিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে—সেই বিষয়ই এই সব বার্ষিকীতে স্থান পাওয়া উচিত।

আলোচ্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণই শিশুদের জন্য লেখা। শিশু-সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা লেখকগণের উৎকৃষ্ট রচনা-সম্ভারে ইহা সমৃদ্ধ। শিশুগণ যে ইহা পাইয়া পূজার আনন্দ বিশেষভাবে উপভোগ করিবে ইহা না বলিলেও চলে। বইখানিতে গল্প, কবিতা এবং ছবি তো আছেই, শিশুদের উপযোগী করিয়া লিখিত বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিও প্রচুর আছে। এবং তাহা পড়িয়া শিশুদের পিতামাতারাও কম আনন্দ পাইবেন না। বইখানির ছাপা, ছবি, বাঁধাই মনোজ্ঞ। আমরা এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—তাঃ

রূপ-যন্ত্র—শ্রী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ১৩২।২ বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা।

একাঙ্ক—রূপক-নাটিকা। ভূমিকা পড়িয়া আমরা যেরূপ জিনিস আশা করিয়াছিলাম, সেরূপ জিনিস না পাইলেও, নাটিকাটি আমাদের ভাল লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, তাষা বেশ সুমার্জ্জিত এবং সাবলীল গতি-বিশিষ্ট; তবে দুই এক স্থলে রবীন্দ্রনাথের বাক্য-রীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। রূপক হইলেও কথিত বিষয়টি কোন স্থলে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হইয়া যায় নাই, এই জন্ম সাধারণ পাঠক-পাঠিকারও ইহা ভাল লাগিবে আশা করি। পুস্তকের কলেবর হিসাবে দাম একটু বেশী মনে হইল। ছাপা ও কাগজ বেশ ভাল।

— কঃ

মাদল—শ্রী চাঁদমল রাজগরিয়া। ৫৩,হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—॥০ আনা।

বাংলা কবিতাগ্রন্থ, কিন্তু গ্রন্থকার একজন রাজপুতানা-বাসী (বিদ্যার্থীরূপে অধুনা কলিকাতা-প্রবাসী) রাজপুত যুবক। বাংলা দেশ ও ভাষার প্রতি ইহা কবির অকৃত্রিম প্রীতির পরিচায়ক। এবং, রচনা-বিচারে বলা যায়,—যদি কোন বাঙালী তরুণ-কবির প্রথম-রচনাও ইহা হইত, তাহা হইলেও সেই কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে একান্ত অশ্লাঘার বিষয় হইত না। কিন্তু কবি যে বাঙালী নহেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় "পূজা"র সহিত'বাহু'অর্থে "ভুজা"র মিলে (উর্দ্ধে তুলিয়া ভুজা—৩০ পৃঃ)। আমরা জানি, 'ভুজা' অর্থে 'ভাজা';—'দশভুজা' প্রভৃতি হইতে পারে, "ভুজা তুলিয়া" হয় না।···কয়েকটি রচনা তথাকথিত 'গজল্‌'-এর অনুকরণে রচিত; যথা—

"আজি কেন অবেলায়
মাতিলে ফুল-খেলায়—" ইত্যাদি।

বিশিষ্ট কোন কবিকে স্পষ্ট মনে পড়ে।···সত্যেন্দ্রনাথেরও অনুকৃতি আছে। কিন্তু

"বুলবুলি গো বুলবুলি
ঝামসিয়ে ফুল বিলকুলি
··· ··· মুর্ঝেছে আজ
ফুলবাগিচার ফুলগুলি—"

—হাস্যের উদ্রেক করে মাত্র। 'মুর্ঝেছে' কি 'মূর্চ্ছেছে'র অপভ্রংশ? না, 'শুকাইয়া যাওয়া' অর্থে হিন্দী শব্দের কবি-প্রয়োগ?

কবির ক্ষমতা আছে। আর একটু অবহিত হইলে ভবিষ্যতে সাধনা সফলতার পথে অগ্রসর হইবে।

—বঃ সঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
পুস্তক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সোনার-মেয়ে

শ্রী কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

এক ছিল মোর গাঁয়ের মেয়ে সকাল-দুপুর খেল্‌তো খেলা—
পথের ধুলো মাথায় মেখে উঠ্‌তো খেলে সাঁঝের বেলা।
পুবের আলো গড়িয়ে যখন পছিম্ কোণে পড়তো এসে,
চল্‌তো পচি আপন-মনে ঘরের পানে ধুলোর বেশে।
ধুলোয় ভরা রূপ দেখে মা বল্‌তো—“পচি, তুই জ্বালালি!”
শুনেই যেন অবাক্ পচি খিল্ খিলিয়ে হাস্‌তো খালি!
“কি করেচি?—বেশ করেচি, খেল্‌ব না ত কাঁদ্‌বো নাকি—”
বল্‌তো পচি বুক ফুলিয়ে—“কেমন আমি জানিস্ তা কি?
সে দিন যখন বক্‌লি মা তুই, ভোঁ দৌড় দিয়ে আম্‌বাগানে—
চুপ্‌টি ধ’রে ঝোপের আড়ে রইনু যখন ওদিক্ পানে,
তখন কেমন বল্লি হেঁকে—‘আয়মা ঘরে লক্ষ্মী মেয়ে—’
বল্লি, ‘হোথায় সাপ আছে, আয়—’ বাগান পানে রইলি চেয়ে।
অনেক ঘুরে দৌড়ে যখন ‘মা এসেচি’ বল্‌নু তোরে—
বুকের ’পরে লুটিয়ে মোরে মুখ দিলি মোর চুমোয় ভোরে।
আমায় কত সাধ্‌লি সেদিন বক্‌লে কি তা পড়্‌বে মনে?
ফের যদি মা বকিস্ মোরে ছুট্‌বো দূরের শালের বনে।
ডাক্‌লে জোরে সেথায় কি আরতোর ডাকা মা শুন্‌তে পাব,—
মন-ভুলানো বনের পানে তোর কথা কি জান্‌তে চাব?
মাথার ’পরে চাঁদের আলো—তারার মালা রইবে সাথী—
সুদূর বনের সবুজ বুকে কাটিয়ে দেব জাগর-রাতি।”

পচি-র কথায় হাস্‌তো মা তার গাম্‌ছা দিয়ে মুছ্‌তো মলা,
দুল্‌তো পচি মায়ের বুকে দু’ হাত দিয়ে জাড়িয়ে গলা।
বাংলা দেশের সোনার-মেয়ে পচি-র হোল গড়ন বড়—
পাড়ার লোকে বল্লে মায়ে, “মা তুমি মা কেমনতরো?
অমন্ মেয়ে আইবুড়ো মা’র—কেমনে তার খাবার রোচে!”
পচি-র বিয়ে হলেই যেন পাড়ার লোকের দুঃখ ঘোচে।
‘জামাই কেনা’র পয়সা কে দেয় কথার বাণে সবাই বেঁধে—
মা বিধবা মনের দুখে আপন-মনে বেড়ায় কেঁদে।
অনেক পরে একটি রাতে যেদিন পচি-র বর সে এলো—
পাড়ার লোকের দরদ্ হ’তে মা যেন তার শান্তি পেল।
তার পরে তার বুকের পাথর লোহার চাপে বস্‌লো বুকে—
যেদিন মাতা শুন্‌লে পচির ছাই পড়েচে স্বামীর সুখে।
পাশ্‌করা তার জামাই শেষে শুন্‌লে যখন মাতাল ভারী—
মদের নেশায় পাগল হ’য়ে গভীর রাতে ফেরেন বাড়ী।
মেয়ের গায়ে মদের ঝোঁকে মনের সুখে মারেন লাথি—
কে যেন হায় মুগুর দিয়ে ভাঙ্‌লো মায়ের বুকের ছাতি।
ক’দিন পরে দেখ্‌লে মাতা দেখ্‌লে প’ড়ে খবর-খানি।
এক্‌লা ঘরে আগুন্ দিয়ে ছাই হয়েচে সোনার রাণী।
পড়্‌লো লেখা—রইলো চেয়ে—মায়ের পরাণ উঠ্‌লো জ্বলে,—
বাংলা দেশের সোনার-মেয়ে বিলিয়ে দেওয়া চোখের জলে!…

সেনহাটী

২১শে আগষ্ট,—আজ সেনহাটী মহিলাসমিতির নারী শিল্প-বিদ্যামন্দিরের জন্মদিন। গত বৎসর এমনই দিনে কেবলমাত্র সরোজনলিনী নারীমঙ্গল কেন্দ্র সমিতির ও মুষ্টিমেয় কয়েক-জন হিতাকাঙ্খী ও হিতাকাঙ্খিণীর উৎসাহেই এই দুরূহ কার্য্য আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের অপার করুণায় আমরা কৃতকার্য্যও হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রীরা যে উন্নতিলাভ করিয়াছে সকলেই একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুলটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা আমরা যথাসাধ্য করিতেছি সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এরূপ বৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। আমরা চাই মঙ্গলাকাঙ্খীদের সাহায্য ও উৎসাহ বাণী।

এই এক বৎসরের মধ্যেই স্কুলে দুইটি সেলাইয়ের কল, তিনটি সতরঞ্চের আসন বুনাইবার তাঁত এবং দুইটি গালিচার আসন বুনাইবার তাঁত প্রস্তুত করা হইয়াছে। কলিকাতা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত শিক্ষয়িত্রী যত্নসহকারে বালিকা ও বধূদের শিক্ষা দিতেছেন।

স্কুলের পূর্ব্ব ঘরখানিতে ইতিমধ্যেই নূতন করিয়া টিনের ছাদ দেওয়া হইয়াছে এবং আর একখানি নূতন গোলপাতার ঘর তোলা হইয়াছে। স্কুলের প্রস্তুত আসন ও অন্যান্য দ্রব্য গ্রামের ভদ্রমহোদয় ও মহিলারা যত্ন করিয়া ক্রয় করিতেছেন।

গত ১৩ই আগষ্ট খুলনা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল্ বাহাদুর এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"এই এক বৎসরের মধ্যে স্কুলটি আশাতীত উন্নতিলাভ করিয়াছে। উন্নতির অনেক পথই যদিও এখনও পূরণ হয় নাই তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে খাঁটি পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।"

উত্তরবঙ্গের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের এবং চট্টগ্রামের বিপন্ন হিন্দুদের সাহায্যের জন্য মহিলাসমিতির সভ্যাগণ এবং এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া চাউল, কাপড় ও নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রী লীলা দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদিকা

যশোহর সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যশোহর নারীমঙ্গল সমিতির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহিলাসমিতির অন্যতমা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী দত্ত স্থানীয় হাঁসপাতালের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন। উক্ত তারিখের অধিবেশনের দিন মহিলাসমিতি তাঁহাকে একটি অভিনন্দন প্রদান করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্তা দত্ত সমিতির উন্নতি কামনা করিয়া সমিতির প্রতি তাঁহার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সমিতির অন্যান্য কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়।

গত আগষ্ট মাসে যশোহর মহিলাসমিতির সভ্যাগণ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাপীড়িত স্থানের সাহায্যার্থে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী যাইয়া মহিলাদিগের নিকট হইতে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করেন। ইঁহারা ২৫৲ টাকা ও ২১ খানা বস্ত্র আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত চট্ট-গ্রামের নিপীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যার্থে ২৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই অর্থ দেশসেবক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহিলাসমিতির সভ্যাগণের উদ্যোগে স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মহিলাদিগের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। যশোহর টাউনে বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষালাভের কোনও সুযোগ এবং উপযুক্ত বিদ্যালয় না থাকায় উক্ত বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য মহিলাসমিতি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। গত জুলাই মাসে মহিলাসমিতি বিদ্যালয়ের সংস্কারকার্য্যে ২২৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মহিলাসমিতি বালিকাবিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মহিলাসমিতির অন্যান্য কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

শ্রী চারুশীলা ধর
সম্পাদিকা

মূলঘর

আজ প্রায় ৪ বৎসর হইল শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনী সেন মহাশয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে মূলঘর গ্রামে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে। তারপর হইতে কয়েকটি উৎসাহী ভদ্রমহোদয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটি ৪ বৎসরে আশানুরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই সমিতির সভ্যা-সংখ্যা প্রায় ৬০ জন। ইহা ব্যতীত গ্রামস্থ সমুদয় মহিলাকেই সমিতির সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। এবং যাহাতে তাঁহারাও এই সমিতিতে সভ্যাশ্রেণীভুক্তা হন তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে এবং কিছু কিছু নূতন সভ্যাও হইতেছেন। সমিতির কার্য্যাদি চালাইবার জন্য একটি পরিচালক সমিতি গঠিত আছে। ইঁহাদের চেষ্টা এবং যত্নেই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রামটি বড় বলিয়া ইহাকে ৪টি পৃথক কেন্দ্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেক কেন্দ্রে এক একজন সহকারী সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে সমুদয় কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

তের জন সভ্যা লইয়া বর্ত্তমানে পরিচালিকা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই স্থানীয় লোক। সেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া এই সমিতি একটি সেবা-বিভাগ স্থাপিত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্তা কমলিনী রায় এই বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের অসহায়া দরিদ্রা কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলে তাহার সেবা-শুশ্রূষা পথ্যাপথ্যের ভার এই সমিতি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তদ্‌বিষয়ে সমুদয় আবশ্যক বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। নিঃস্ব দুঃস্থ গ্রামবাসীদিগকেও এই সমিতি তাহাদের আপদ-বিপদের সময় যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রতি অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পাঠ ও সঙ্গীতচর্চ্চা প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়। এই মিলন যাহাতে দৃঢ়ীভূত ও অধিক কাল স্থায়ী হয় তজ্জন্য এই সমিতি হইতে কয়েকটি বিভিন্ন বিভাগ হইয়াছে। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ে পরস্পরে বিস্তারিত আলোচনা এই সমিতির প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে হইয়া থাকে। এবং প্রত্যেককে ঐ বিষয়ের প্রচার ও অনুষ্ঠানের জন্য সমিতি সাধ্যমত সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী কৃষি-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং অতি দক্ষতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন। প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে এবং প্রতি গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গিয়া তিনি আবশ্যকমত সাহায্য করিয়া থাকেন। ফলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ছোট-খাট রকমের এক একটি ফল ও ফুলের বাগান গড়িয়া উঠিতেছে।

সমিতির সভ্যারা বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য, কিন্তু চাঁদা প্রভৃতি বাবদে যাহা পাওয়া যায় তাহার বেশীর ভাগই ব্যয় হইয়া যায় সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দরুণ। কাজেই অর্থ-সমস্যার কিছু উন্নতি না করিতে পারিলে এই আশা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই গ্রামে এখনও সকলেই পদব্রজে সমিতিতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। গত বৎসর আমরা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি হইতে ২০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম।

গ্রামে কয়েকটি প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্বারা বালিকারা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই প্রাপ্ত হইতেছে এবং শীঘ্রই একটা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের আলোচনা চলিতেছে।

এই সমিতি হইতে উক্ত বিদ্যালয়গুলিকে সাময়িক পুরস্কার দ্বারা সাহায্য করা হইয়া থাকে এবং মহিলারা মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে একটি অল্প-বয়স্কা বালিকা জলমগ্ন হইয়াছিল, ঐ বাটীস্থ একজন মহিলা উহা দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহার উদ্ধারসাধন করেন। ব্রাহ্মণপাড়া হইতে একটি অল্পবয়স্কা বালিকা বিদ্যালয় হইতে আসিবার পথে একটি দুয়ানী কুড়াইয়া পায় এবং উহা শিক্ষকমহাশয়ের নিকট প্রদান করে; ব্যাপারটি সামান্য হইলেও অতটুকু বালিকার পক্ষে এই লোভসম্বরণ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় একটি দরিদ্র গৃহস্থের পুত্র একটু সামান্য জ্বরে হঠাৎ মারা যায়। মারা যাওয়ার পর সেই বাড়ীতেই আর একটি বালিকারও ঐরূপ ব্যারাম হয়। এই সমিতি উহার সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসাদি ও ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে আরোগ্য-পথে ফিরাইয়া আনে।

আলোচ্য বর্ষে সমিতিতে—আয় চাঁদা বাবদ ২৫৲ ও পূর্ব্বের তহবিলে সূতা প্রভৃতি বিক্রয় দরুণ ১২৲, বিবাহাদি উৎসবে ও এককালীন দান বাবদে ২৭৲, সর্ব্বশুদ্ধ এই ৬৪৲ এবং কেন্দ্র সমিতির পুরস্কার ১৮৲, একুনে ৮২৲ টাকা; তন্মধ্যে চরকা ও তুলা খরিদ বাবদে ১৮৲ দুঃস্থ পরিবারে সাহায্য ও রোগীর শুশ্রূষা ও পথ্যাদি বাবদে ৯১৲, কৃষিকার্য্যে সাহার্য্যার্থে বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ ইত্যাদি ২।০, তাঁতশালা স্থাপনের সাহায্য ১৫৲, বালিকাবিদ্যালয়ে ৫৲, এবং সমিতির অন্যান্য ব্যয় ২৷।, স্থানীয় ব্যাঙ্কে ৫০৲, ইহা ভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় খরচাদির জন্য সম্পাদিকার নিকট ৬৲ টাকা আছে।

প্রতি সপ্তাহে পর্য্যায়ক্রমে মহিলাবৃন্দ একত্রিত হইয়া মাতৃমঙ্গল, শিশুপ্রতিপালন ও প্রসূতিপরিচর্য্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিবিধপ্রকার প্রবন্ধাদি পাঠ এবং তদ্‌বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া থাকেন। এই আলোচনা-সমিতিতে বর্ত্তমান সময়ে প্রবর্ত্তিত মাসিক পত্রাদি, দৈনিক সংবাদ-পত্রাদিও পঠিত হইয়া থাকে। যাহাতে প্রত্যেকেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞাত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে।

গ্রামের শিল্প শিক্ষারও বহুল প্রচার হইয়াছে। সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বদান্যতায় গত বৎসর যে শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিতা মহিলারা এখন নিজেরাই এই সমিতির তত্ত্বাবধানে পৃথক পৃথক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমস্ত গ্রামে নানাবিধ আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার শিক্ষা এবং উৎসাহ দিতেছেন। বর্ত্তমানে এই গ্রাম হইতে দোকানে প্রস্তুত জামা-পোষাক খরিদ একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেমিজ, ব্লাউজ, পাঞ্জাবী, কোট, সার্ট, ফ্রক ইত্যাদি, নানাবিধ চিকণের কাজ, কাঁথা ও আসন প্রভৃতি সূচিকার্য্য, কাপড় ধোলাই, মুড়িভাজা, বড়ি দেওয়া প্রভৃতি গৃহস্থের ঘরের কার্য্যাদি প্রচার জন্য এই সমিতি পরিশ্রম করিতেছেন। বর্ত্তমানে চরকায় সূতা-কাটার দিকেও এই সমিতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে এখানে কিছুদিন হইতে একটি তাঁতশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি উহাকে নানা উপায়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন, এবং উহাতে নিয়মিত সূতা যোগান দিয়া আসিতেছেন। প্রতি গৃহে চরকা প্রচলনের জন্য এই সমিতি হইতে প্রচারকার্য্য চলিতেছে এবং সমিতির ব্যয়ে তুলা কিনিয়া দিয়া সূতা কাটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। শিক্ষয়িত্রীর প্রচেষ্টায় প্রায় ১৫ জন সার্ট, কোট, সেমিজ, পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, ফ্রক ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য শিল্পশিক্ষা উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছেন। ইঁহারাই বর্ত্তমানে ইহার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রী ভুবনমোহিনী রায়
সম্পাদিকা

বারাসত দক্ষিণপাড়া মহিলাসমিতি

শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের মহিলাসমিতি ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিবে, এবং তাঁহারি দয়ায় ক্রমে সমিতির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইতিমধ্যে টালা মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সেন আমাদের মহিলাসমিতি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং সমিতির কার্য্য দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গত মাঘ মাসে মালদ্বীপ হইতে রেজিষ্টার সাহেব ও তাঁহার পত্নী আমাদের মহিলাসমিতির কার্য্য দেখিয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবং সার্টিফিকেট লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন।

১। সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য—

পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান, মেলা-মেশা, শিশুমঙ্গল, পারিবারিক জীবনে শান্তি-স্থাপন।

২। সমিতির বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা ৩০ জন। বিশিষ্ট সভ্যা—শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী, হরিদাসী, কুমুদিনী, গোলাপকামিনী, প্রমীলা, সন্তোষিণী, ক্ষেমঙ্করী।

৩। সমিতি দ্বারা জনসেবার কার্য্য—দেশের লোকের অসুখে সমিতির সভ্যারা রোগীর সেবা ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এমন কি দেশের লোকেরা অসুখে, বিপদে, অভাব-অনাটনে, গৃহবিবাদে, আকস্মিক বিপদে সর্ব্বাগ্রে মহিলাসমিতিতে সংবাদ দেন। সম্পাদিকা ও সহ সম্পাদিকা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন।

৪। এক ভদ্রবাড়ীর বধূ এবং অন্য একজন ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত বিবাদ এক সপ্তাহ চলিয়াছিল। অবশেষে ফৌজদারিতে দাঁড়ায়, এমন সময় আমরা খবর পাইয়া সেখানে যাইয়া সমস্ত মিটাইয়া দিলাম।

৫। মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার—প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী আমরা ঘুরি, যাহাতে গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। লোকের পুকুরে পানা হইলে তাঁহারা যদ্যপি পরিষ্কার না করেন আমরা ঝুড়ি লইয়া গিয়া ৫।৭ জন জলে নামিয়া সমস্ত পানা উঠাইয়া ফেলি। এ প্রকার ৩।৪টি পুকুর পরিষ্কার করিয়াছি।

৬। গৃহশিল্প-শিক্ষা—

প্রত্যেক সভ্যাই চরকা কাটেন এবং সেই সূতায় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সম্পাদিকা ও সহ-সম্পাদিকা এবং অন্য ২।৪ জন সভ্যাও কাপড় আর কেনেন না, নিজের হাতের সূতায় প্রস্তুত কাপড় পরিতেছেন। শীঘ্রই একটি তাঁত বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

৭। প্রত্যেক শনিবার সমস্ত সভ্যাদের ডাকাইয়া গৃহশিল্পের শিক্ষা দেওয়া হয়। চটের আসন, জামা, সেমিজ, ফ্রক, পাঞ্জাবি, সার্ট, কাঁথা সেলাই, চিকণের কাজ সাবান, নারিকেলের দড়ি পাকান, পাটের দড়ি পাকান, বড়ি দেওয়া, আচার তৈয়ারি, নানারকম পশমের কাজ, মুড়ি-ভাজা, নারিকেলের নানাবিধ খাবার সকলেই ঘরে তৈয়ারি করেন, (কাহাকেও বাজারের খাবার কিনিতে দেওয়া হয় না) পৈতার সূতা কাটা হয়।

৮। সম্পাদিকার বাড়ীতেই সমিতির স্থায়ী ঘর। বয়স্থা মেয়েদের ও অল্পবয়সী বিধবাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বিধবাদের যাহাতে মাসিক কিছু কিছু আয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

৯। আমরা একটি সব্জী-বাগান তৈয়ারি করিয়াছি, নিজেরা বেড়া দিই, জল তুলি, কোদাল, নিড়েন লইয়া কাজ করি। এক আলু ছাড়া সমস্ত সব্জীই বাগানে হয়। কলা, মানকচু, পাকাকলা, কুমড়া, লাউ, সকলরকম শাক, পেঁপে বিক্রয় হয়; সমিতির তহবিলে কিছু থাকে, আমাদের সংসারেরও অনেক উপকার হয়।

৯। ধাত্রী-শিক্ষা বিষয়ে আমরা পাড়ায় কোন প্রসূতির প্রসববেদনা হইলেই সেখানে গিয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলে প্রসব হয় তাহার ব্যবস্থা করি।

১০। রিঙ্গার কোম্পানীর ঔষধ আনাইয়া দেশের ভদ্রাভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই রোগ দেখিয়া ঔষধ দান করি।

১১। সমিতির তহবিল—

বারাসাতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আমাদের ২২০৲ টাকা জমা আছে। হাতেও কিছু আছে, সমিতির খরচের জন্য।

শ্রী শরৎকুমারী দেবী
সম্পাদিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কেন্দ্র সমিতির কথা

পল্লী সংস্কার

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে বিদ্যাসাগর কলেজ-হলে কোটালীপাড়া সম্মিলনীর বার্ষিক সভা ও প্রীতি-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্-এ, পি-এইচ-ডি সভাপতির কার্য্য করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে কোটালীপাড়া সম্মিলনীর প্রস্তুত বিশেষ স্লাইডের সাহায্যে পল্লীর প্রাচীন শিক্ষা, সভ্যতা এবং আচার-অনুষ্ঠান এবং বর্ত্তমান পল্লীর অবস্থা ও কি-ভাবে তাহার উন্নতি সম্ভব এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কোটালীপাড়া সম্মিলনী প্রচারকদের সাহায্যে পূজার ছুটীতে গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নতির জন্য পুরুষ ও মহিলাদের ভিতরে প্রচারকার্য্য পরিচালন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

শিল্প-প্রদর্শনী

স্বদেশী মেলায় শিল্প-প্রদর্শনী উপলক্ষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য ও কেন্দ্র সমিতির পুস্তকাদি বিক্রয়ার্থ একটি ষ্টল খোলা হইয়াছে। প্রতিদিন বহু পুরুষ ও মহিলা এই ষ্টলে উপস্থিত হইয়া শিল্পদ্রব্যাদি ক্রয় ও পরিদর্শন করিতেছেন। ইহা ছাড়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক কতকগুলি চার্টও প্রদর্শিত হইতেছে।

বিদেশী মহিলার বক্তৃতা

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সহর হইতে এক জন বিদুষী মহিলা জগৎ পর্য্যটনে বাহির হইয়া এই কলিকাতা সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি একাধারে বক্তা, গ্রন্থকর্ত্রী, প্রচারক ও আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। ইনি মিস্ এ, গার্ট্রুড জ্যাকব বি-এস্-সি। ইনি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞা, এবং ঐ বিষয়ে মহিলাদের জন্য গভীর তত্ত্বপূর্ণ একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। গত ৫ই অক্টোবর এই মহিলা সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির শিল্প-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং ইহার কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের হর্ষোৎফুল্ল বদনমণ্ডলে এই সমিতির কার্য্যের সার্থকতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মিস্ জ্যাকব ছাত্রীদের নিকট আলোকচিত্র সাহায্যে নিউ জিয়াল্যাণ্ড সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এই বক্তৃতার বাংলায় অনুবাদ করিয়া দেন।

বেলতলা বালিকাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা

গত ৫ই অক্টোবর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে বেলতলা উচ্চ ইংরাজী বালিকাবিদ্যালয়ে নারীর শিক্ষা ও তাহার আদর্শ এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে শিক্ষার আদর্শকে অতি উচ্চ ও ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। সাহিত্যচর্চ্চাই চরম শিক্ষা নহে ; বস্তুতঃ মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সকল শক্তির উন্মেষকেই যথার্থ শিক্ষা বলা হয়। এবং সেই শিক্ষাই মানুষ ও জাতিকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করে। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ এই বক্তৃতায় যোগদান করেন।

বাঁটরা মহিলাসমিতি

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ব্যাটরায় ব্যাটরা মহিলাসমিতির একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি এ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে ইউরোপে নারীর শিক্ষা ও শিল্পসাধনা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বহু মহিলা ও ছাত্রী এই সভায় যোগদান করেন।

মহিলাসমিতি পরিদর্শন

প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর বৈদ্যবাটী, রিষড়া ও আন্দলমোড়ি মহিলাসমিতি পরিদর্শন করেন। বর্ষার জন্য এই সকল স্থানে মহিলাসমিতির কার্য্যে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। প্রচারক মহাশয় এই সকল স্থানের বিশেষ কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মহিলাসমিতি পরিচালন বিষয়ে উপযোগী পরামর্শ দেন।

বর্ষশেষের নিবেদন

বঙ্গলক্ষ্মীর ৬ষ্ঠবর্ষ শেষ হইয়া গেল।

প্রথম দিনকার সম্বলের সহিত আজিকার দিনের তুলনা করিলে অবাক হইতে হয় এবং আরও উজ্জলতর ভবিষ্যতের কল্পনায় মন ভরিয়া উঠে। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের উৎকৃষ্ট রচনামালা বঙ্গলক্ষ্মীর অলঙ্কার হইয়াছে। ইহার জন্য অনেকে আমাদিগকে গৌরবভাগী করিতে চাহেন, কিন্তু আমরা জানি লেখক-লেখিকারা বঙ্গলক্ষ্মী ও মাতৃজাতির প্রতি অগাধ স্নেহ বশতঃই তাঁহাদের রচনাবৈচিত্র্যে ইহাকে এমন করিয়া সাজাইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং নববর্ষের জন্য আশীর্ব্বাদ ও সাহায্য ভিক্ষা করি।

আশার শেষ নাই। আগামী বর্ষের পত্রিকাকে সাহিত্যের দিক দিয়া আরও মনোজ্ঞ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অগ্রহায়ণে প্রথম সংখ্যাতেই **বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** মহাশয় লিখিবেন। আর লিখিবেন **অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** মহাশয়। উভয়েই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এরূপ মহাসৌভাগ্য বঙ্গলক্ষ্মীর এতদিন হয় নাই। নৃত্য ও আলিপনা বিষয়ক যে প্রবন্ধগুলির জন্য ষষ্ঠ বর্ষের বঙ্গলক্ষ্মী অজস্র প্রশংসা পাইয়াছে, আগামী বর্ষে সেগুলিও থাকিবে। বাংলার সমস্ত বিখ্যাত গল্প-লেখকের গল্প আমরা একে একে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি। উপন্যাস ও কবিতার দিক দিয়া বৈচিত্র্যের অভাব হইবে না। প্রথম সংখ্যায় যাঁহাদের রচনার আশা করি তাঁহাদের কয়েকজনের বিষয় প্রচ্ছদ-পটের উপরে উল্লেখ করিলাম।

এই সমস্ত আয়োজনের জন্য ব্যয়বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রস্তাব হইয়াছিল, কাগজের কলেবর কিছু বাড়াইয়া নববর্ষ হইতে মূল্য বৃদ্ধি করা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অর্থকৃচ্ছ্রতার বিষয় ভাবিয়া উহা সঙ্গত বিবেচিত হইল না। আপাততঃ মূল্য বাড়িল না। বার্ষিক ৩৸০ টাকা মূল্যে আমরা যে আয়তন ও আকারের কাগজ দিয়া থাকি বাংলায় আর কেহ তাহা দিতে সাহস করেন না। বহু সহৃদয় নরনারী বঙ্গলক্ষ্মীকে ভালবাসেন এবং অনুগ্রহ করিয়া ইহার গ্রাহক হইয়াছেন বলিয়া আমরা এরূপভাবে সেবা করিতে পারিতেছি। বঙ্গলক্ষ্মী ব্যবসাদারী কাগজ নয়, ইহার সেবিকা এবং সেবকমণ্ডলীর অনেকেই অবৈতনিক। ইহার সমস্ত আয় নারীজাতির কল্যাণে সমিতি পাইয়া থাকেন। সুতরাং বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ পরোক্ষে সমগ্র নারীজাতিরও উপকার করিয়া থাকেন।

নববর্ষের বঙ্গলক্ষ্মী ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব এইরূপ কল্পনা লইয়া ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদে নূতন অভিযানে যাত্রা করিতেছি।

মিস্ সোমকে অভিনন্দন

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতমা নেত্রী শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম মহোদয়ার পঞ্চচত্বারিংশ জন্মদিনে সমিতি ও শিক্ষালয়ের কর্ম্মী ও ছাত্রীগণ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর কার্য্য করেন। প্রথমে তাঁহাকে চন্দন ধুনা দীপ গন্ধমাল্য দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হয়। তৎপরে সভানেত্রী ধান্যদূর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেন।

কর্ম্মী ও ছাত্রীগণের পক্ষে শ্রীমতী অমিয়াপ্রভা বসু কবিতায় এবং শ্রীমতী প্রতিভা সেন গদ্যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। তৎপরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মিস্ সোমের গুণপনার উল্লেখ ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন। শিক্ষালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী প্রতিভা সেনের কর্ম্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

মালয় হইতে বঙ্গমহিলাদের সাহায্য

মালয়-প্রবাসিনী আমাদের ভগিনী সহৃদয়া শ্রীমতী বিমলা সেন সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যের জন্য কুয়ালালাম্পুর নামক সহরের বঙ্গমহিলাগণের নিকট হইতে ৭০ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—"আমি গত লোটাস ডে'তে কিছু লোটাস বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এদেশের অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এখানকার বাঙ্গালী মহিলাদের নিকট হইতে ৩৬ ডলার সংগ্রহ করিয়াছি। মোটের উপর ৪৬।৭ সেণ্ট—৭০ টাকা পাঠাইলাম। এই অর্থ মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন।" আমাদের এই প্রবাসিনী ভগিনীকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। দূরে থাকিয়াও তাঁহার স্বদেশবাসিনী ভগিনীগণের শিক্ষার জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কেবলমাত্র অর্থের দিক দিয়া আমরা এই দানের মহত্ব দেখিতেছি না—ইহার মধ্যে একটি মহান্ নারীহৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া সংসার, সমাজ ও দেশের কল্যাণসাধন করুন।

সরোজনলিনী নারীশিল্প-শিক্ষালয়ে অভিনয়

সরোজনলিনী নারীশিল্প-শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থে গত ২৬শে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর স্কুলের সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম, কেন্দ্র-সমিতির অন্যতমা সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা গীতা দেবী এবং শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবীর নেত্রীত্বে স্কুলের ও বাহিরের কয়েকজন ছাত্রী অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। "গান্ধারীর আবেদন," "উমা", "পূজারিণী" এই কয়টি ক্ষুদ্র নাটিকার অভিনয় এবং কনসার্ট দুই দিন উপস্থিত মহিলাগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। শ্রীযুক্তা গীতা দেবী এবং শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবী অভিনয়গুলিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার বিষয়ে বহু শ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধারাণী দাঁ এবং শ্রীমতী মমতা দেবী, শ্রীযুক্তা হেমনলিনী মল্লিক ও শ্রীযুক্তা অমিয়প্রভা বসু অতি নিপুণভাবে মেয়েদের সাজাইয়া দেন। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার ডাবলু, সি, ব্যানার্জ্জির পৌত্রীগণ—শ্রীমতী ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী শীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করেন। কেবলমাত্র মহিলাগণ অভিনয় দর্শন করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একটি স্থায়ী ষ্টেজ নির্ম্মাণের জন্য ৬০ টাকা দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অভিনয়ের টিকিট বিক্রয় করিয়া প্রায় ৪০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

টালা মহিলাসমিতি পরিদর্শন

কেন্দ্র সমিতির পরিচালক সভার সহঃ সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম এবং প্রধান সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ টালা মহিলাসমিতি পরিদর্শন করেন।

বর্ত্তমানে সমিতিতে সেলাইয়ের কাজ, এমব্রয়ডারী, শতরঞ্চ বোনা, সাবান প্রস্তুত, বেতের কাজ, কাপড়ে রং করা ও ছাপ দেওয়া, চাটনী ও বড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে শিক্ষা করিয়া তিনজন মহিলা মাসিক ১৫ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন এবং সমিতির অন্যতমা সভ্যা শ্রীমতী উষাময়ী চৌধুরী একটি সেলাইয়ের স্কুল চালাইয়া মাসিক ২৫ টাকা উপার্জ্জন করেন। সমিতির একটি ছোট সব্জী-বাগান আছে। তথায় নানাপ্রকার সব্জী উৎপন্ন হয়। সমিতি স্থানীয় করপোরেশন বালিকাবিদ্যালয় সুপরিচালনে নিয়মিত সাহায্য করিয়া থাকেন। সভ্যাগণ নগদ ২০ এবং ২ মণ চাউল ও ৩০ খানা কাপড় দান করিয়া এবৎসর বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করিয়াছেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সেন সমিতির কার্য্য উত্তম রূপে পরিচালনের জন্য অনেক শ্রমস্বীকার করেন। আমরা আশা করি তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা সহকর্ম্মী ভগিনীগণের মনে নূতন শক্তির সঞ্চার করিবে।

আমেরিকান মহিলার স্কুল পরিদর্শন

মিস্ এ, গাট্রুড্ জ্যাকব নাম্নী জনৈকা আমেরিকান মহিলা সম্প্রতি ভারতভ্রমণে আসিয়া সরোজনলিনী নারী শিল্প-শিক্ষালয় এবং কেন্দ্র সমিতির কার্য্যালয় পরিদর্শন করেন, বলা হইয়াছে। সমিতির কার্য্য দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন,—"আমি এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম। সমিতি নারীজাতির উন্নতির জন্য অশেষ কল্যাণকর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সমিতির কার্য্য চতুর্দ্দিকে আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ুক। এখানকার সমিতির কার্য্যের কতকগুলি ম্যাজিক লণ্ঠন শ্লাইড আমি সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। দেশে গিয়া ভারতে মহিলাগণের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাইবার চেষ্টা করিব। এখানকার মহিলা ছাত্রীগণের সহাস্য আনন দর্শন করিয়া তাহারা স্কুলের শিক্ষায় কত আনন্দ পাইতেছে বুঝিতে পারিলাম। আমি সমিতির মঙ্গলকামনা করিতেছি।"

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় বঙ্গলক্ষ্মী আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। নূতন বৎসর হইতে যাহাতে বঙ্গলক্ষ্মীর প্রবন্ধগৌরব ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এইবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বর্ষশেষে আমাদের গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন এই যে, যাঁহারা এখন বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক আছেন তাঁহারা আগামী বর্ষের গ্রাহক থাকিয়া নারীজাতির উন্নতিকর কার্য্যে সাহায্য করিবেন। পুরাতন গ্রাহক যাঁহারা আগামী বর্ষেও বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক থাকিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ২৫শে কার্ত্তিকের মধ্যে তাঁহাদের দেয় বার্ষিক চাঁদা ৩৷০ আনা মানিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের পক্ষে আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ২০শে কার্ত্তিকের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিবেন। মানিঅর্ডার যোগে টাকা অথবা নিষেধাজ্ঞা না পাইলে আমরা অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভিঃ পিঃ খরচ সহ বার্ষিক মোট ৩৷৵০ আনার জন্য ভিঃ পিঃতে প্রেরণ করিব।

আর একটি বিষয় গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইতেছি যে, ডাকঘরের নূতন আইন অনুযায়ী ভিঃ পিঃ প্যাকেট তিন দিনের অধিক কোন পোষ্টাফিসে জমা রাখিবে না, তিন দিনের মধ্যে ভিঃ পি গ্রহণ না করিলে উহা আমাদের নিকট ফেরৎ আসিবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ, এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে তাঁহাদের শৈথিল্য বশতঃ কোন ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।

শারদোৎসবে——

হিমানী কাস্কেট

আধুনিক অঙ্গরাগের পাঁচটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সজ্জিত পেটিকা—সুদৃশ্য রেশমী কাপড় মোড়া—বাক্সটি মজবুত ও রুচিসম্মত মূল্য দশ টাকা মাত্র এ দামে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাস্কেট অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাজারের অন্য কাস্কেট ইহার তুলনায় নিতান্তই মেকো মনে হইবে, কিনিবার আগে হিমানীর কাস্কেটগুলি দেখিতে অনুরোধ করি।

অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে

নিরুপমা কাস্কেট ৫৷৷০

কুঙ্কুম কাস্কেট ৩৷৷০

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমানীর নানা প্রসাধন দ্রব্য ও

উপহারে অতুলনীয়।

অতুলনীয়

উপহার

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি

সাহিত্যরসিকদিগের জন্য প্রতি বৎসরের অপূর্ব্ব আয়োজন। গল্পে ও চিত্র সম্ভারে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এবারে কথাবস্তু রচনার ভার লইয়াছেন শ্রীকেশব গুপ্ত, বিজয়রত্ন মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবিনাশ ঘোষাল, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী প্রভৃতি। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী-নিপুণ তুলিকায় এবারেও ইহা সমুজ্জ্বল হইবে। মূল্য পূর্ব্ববৎ ১৷৷০—২৫ হিমানী পুরস্কার কুপনের পরিবর্ত্তে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ও

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

৪৩, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মীনার কাজ

আমরা সর্ব্বপ্রকার সোনার গহনা ও অতি সুন্দর মীনার কাজ করা, চুড়ী বালা, নেক্‌লেস্‌, হেয়ার ক্লিপ, আংটী, সাড়ী পিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকি নিম্নে মূল্য তালিকা দেখুন!

একটী গিনি স্বর্ণের আংটি মূল্য	...	...	১০৲
একগাছী ,, ,, চুড়ী ,,	...	...	২৫৲
একটী ব্রোচ ,, ,, ,, ,,	...	...	৩০৲
একজোড়া ,, ,, লেস্‌পিন ,,	...	...	৩০৲

ইহা ছাড়া সোনা রূপার অন্যান্য গহনা ও বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা মজুত রাখি এবং অর্ডার অনুযায়ী ও তৈয়ারী করিয়া দিই। আমাদের প্রস্তুত গহনার দাম বাজার তুলনায় অনেক কম পরীক্ষা প্রার্থনীয়। আমাদের গহনা যাহারা ক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে ২৲ টাকা মূল্যের মীনার কাজের সুন্দর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত একখানা তালিকা বিনা মূল্যে উপহার দেওয়া হইবে।

৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে সুবৃহৎ তালিকা পাঠান হয়।

কে, মণিলাল এণ্ড কোং।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং জুয়েলার্স এণ্ড গোল্ডস্মিথস্‌।

১৭৩ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

Tel. Add. NAVCHETAN.

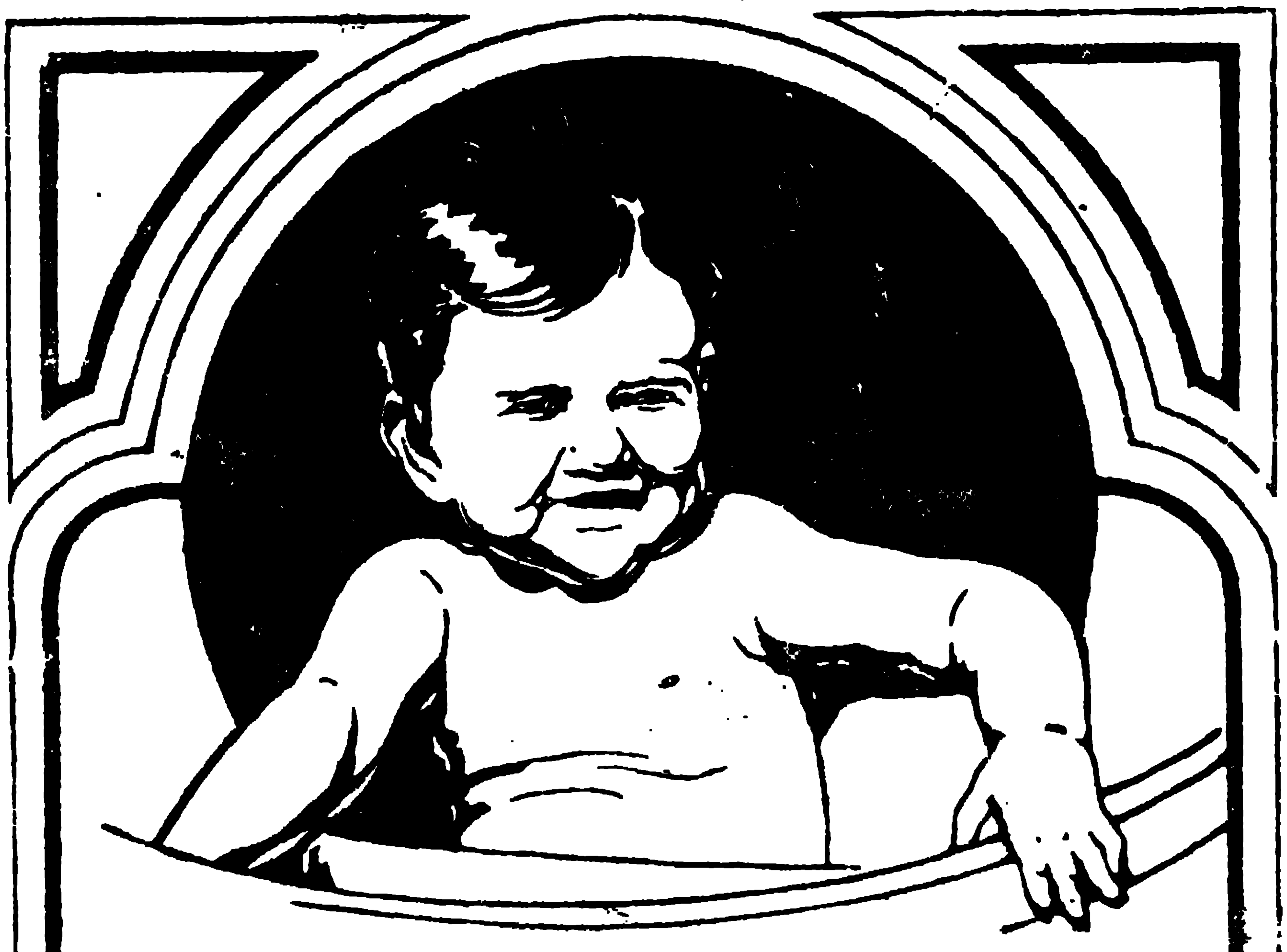

ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য

ঠিক্ রাখ্‌তে

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য,

আসল ভারতীয় যব হইতে প্রস্তুত

দি লিলি বিস্কুট কোং

কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের

"ফ্লুটিনা" এত আদৃত কেন?

'ফ্লুটিনা'র সুর ডোয়ার্কিনের বাড়ীর অ... যন্ত্রের মতই হৃদয়স্পর্শী, করুণ ও মনোহর— ... প্রবল নয়, আবার নিতান্ত মৃদুও নয়। সুরের ... সামঞ্জস্যসাধন ডোয়ার্কিনের বাড়ীর প্রায় ৬০ বৎসর ব্যাপী গবেষণা ও পরীক্ষার ফল।

ফ্লুটিনা বাজাইয়া যে তৃপ্তি পাওয়া যায় অন্য কোন হারমোনিয়ম বাজাইয়া তাহা পাওয়া যায় না। হাপর চালনা স্থগিত করিলেও ফ্লুটিনা হারমোনিয়মের বায়ুকোষে প্রচুর হাওয়া সঞ্চিত থাকে।

'ফ্লুটিনা' হারমোনিয়মের বহিরবয়বের আড়ম্বর হীন সৌষ্ঠব ও পরিকল্পনা লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না।

সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

DWARKIN & SON.
8, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.

আপনার সমস্ত গহনা আমাদের দোকানে প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করি—কেন?

—কারণ—

১। আমাদের প্রস্তুত গহনা খাঁটী গিণি সোণায় তৈয়ারী।

২। আমাদের মজুরী বাজার তুলনায় অনেক কম অথচ জিনিষের finish ও make অনেক ভাল।

৩। আমাদের প্রস্তুত গহনায় পান মরতা নাই বলিলেই চলে। ব্যবহারান্তে জিনিষের মূল্য গিণি সোণার দরে পান মরতা বাদ না দিয়াই ফেরত দেওয়া হয়।

বিশ্বাস এণ্ড কোং,

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স,

১৫৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।